৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত

সচিত্র মাসিকপত্র

আষাঢ়—অগ্রহায়ণ ১৩৩২

সম্পাদক—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

প্রকাশক—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্‌

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভারতবর্ষ

সূচিপত্র

ত্রয়োদশ বর্ষ—১ম খণ্ড—আষাঢ়—অগ্রহায়ণ, ১৩৩২

বিষয়ানুসারে বর্ণানুক্রমিক

চিত্র-সূচি

আষাঢ়—১৩৩২

বহুবর্ণ চিত্রসূচি

শ্রাবণ—১৩৩২

বহুবর্ণ-চিত্র

ভাদ্র—১৩৩২

বহুবর্ণ-চিত্র

আশ্বিন—১৩৩২

বহুবর্ণ চিত্রসূচি

কার্ত্তিক—১৩৩২

বহুবর্ণ চিত্রসূচি

অগ্রহায়ণ—১৩৩২

বহুবর্ণ চিত্র

অম্বপালী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

ভারতবর্ষ

আষাঢ়, ১৩৩২

প্রথম খণ্ড | ত্রয়োদশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

বর্ষ-প্রবেশ

কবিশেখর শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ

অরুণ উদয়ে যথা নিশান্ত নলিনী
অপূর্ব্ব মাধুরী-মাখা,—করে ঢল ঢল !
হে বর্ষ ! প্রবেশে তব এ বিশ্ব-মোহিনী,
সৌরকরে মেঘসম রঞ্জিত উজ্জ্বল !
অতীত ফিরিয়া আসি বিচিত্র বর্ত্তনে,
সৃজিছে সৃষ্টির শত রহস্য গভীর !
আনে আশা মরীচিকা এ মরভবনে
মোহন-মূরতি-মঞ্জু-মধুর-মদির !
পীত রৌদ্র-দীপ্ত আম্র-মঞ্জরী-মুকুল
কদম্ব-করবী-কুঞ্জ—কল-কুহরণ,
তারকা, তপন, শশী—সন্ধ্যা, বনফুল,
শোভার নির্ঝর-ধারা করে বরিষণ !
তাই তব আগমনে প্রফুল্ল অন্তর,
হে চির-তরুণ তৃষ্য শাশ্বত সুন্দর !

বিশ্ব-মানসে বৈষ্ণব কাব্য

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক, এম্-এ, বি-সী-এস্

(১)

বিশ্ববাসীর সঙ্গে বৈষ্ণব কাব্যের যোগ কোথায় ?

বিশ্বে মানুষ তো আছেই,—তা' ছাড়া অপর প্রাণী-জগৎ, বাহ্য প্রকৃতি, আকাশ, বায়ু,—সমস্ত লইয়াই যে বিশ্ব-প্রকৃতি !

কাব্যের ভিত্তি 'ভাব'।

বাহ্য প্রকৃতির দিক দিয়া দেখিলে বৃক্ষ-লতা, আকাশ-বায়ু সমস্তই যেন একটা ভাবের বন্ধনে আবদ্ধ। প্রাণী-জগতের দিক দৃষ্টিপাত করিলে,—দুইটী পাখী যখন একত্র বসিয়া আছে, গাভী যখন বৎসকে নিকটে পাইয়া তাহার দিকে স্থির-নেত্রে চাহিয়া আছে, তখন ভাবের বন্ধন তাহাদের মধ্যে কতদূর তা' বুঝিতে পারা যায়। তাহারা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যে কাব্যের 'ভাব',—তাহারি নির্ব্বাক্ অনুভূতি জ্ঞাপন করিতেছে,—নির্ব্বাক্ অবস্থায়ই তাহা অনুভব করিতেছে। মানুষের মধ্যে এই ভাবের উপলব্ধি-ক্ষমতা না থাকিলে তাহা মানুষের চোখে পড়িতই না।

মানুষ বাক্য দ্বারা ভাবকে প্রকাশ করিতে সমর্থ। সেই অভিব্যক্তিতে কোথাও বা ভাব-সঙ্কেত বা ভাবোচ্ছ্বাস, কোথাও বা ভাব-বিহ্বলতা বা ভাবোন্মাদ। কাব্যের যাঁরা নায়ক-নায়িকা, কাব্যের যিনি রচয়িতা, কাব্যের যিনি অনুভূতি-প্রয়াসী তাঁর কাছে তা'তে আনন্দ। কাব্যের জগৎ সেই আনন্দে অনুপ্রাণিত,—সেই আনন্দের স্বচ্ছন্দ-গতিত্ব বাংলার বৈষ্ণব কাব্যে অভিব্যক্ত।

বৈষ্ণব কাব্যের 'আনন্দে'ও আনন্দ,—'বেদনায়ও' আনন্দ। 'আনন্দে' তো আনন্দ আছেই ; তা' ছাড়া ক্লেশ, পরাজয়, বিষাদ, বৈরাগ্য, আত্ম-সমর্পণ,—এতে এ-সমস্তই এক 'আনন্দের' সুরে সঞ্জীবিত। এই অভিনব 'আনন্দের' অনুভূতিতেই বৈষ্ণব কাব্যের ভাবানুভূতি,—তা'র উপলব্ধির ক্ষমতা না থাকিলে বৈষ্ণব কাব্যের স্বরূপ অনুভব করা যায় না।

এই বৈষ্ণব কাব্য বাংলার আত্ম-বিবৃতির একটা দিক, বিশ্বের সঙ্গে ইহার সংস্পর্শ কোথায়, তা ভাবিতে গে গোড়ায় কবির কথাই মনে পড়ে,—

> "আবার মোরে পাগল ক'রে দিবে কে ?
> হৃদয় যেন পাষাণ-হেন বিরাগ-ভরা বিবেকে।"
>
> [রবীন্দ্রনাথ

(২)

'বিশ্ব-ভারতীর' কর্ম্ম-ব্রত বিশ্লেষণ করিবার আচার্য্য-কবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—"যাহা বাস্ত বিশ্বের সম্পদ্, তাহা বিশ্ববাসীর আত্ম-ব্যক্তিত্বেই ত অস্তিত্ব বিকাশ করিয়া থাকে।" (১)

পৃথিবীর দ্বিধা-প্রধাবিনী গতির মত মানুষের হ সর্ব্বদাই দুইটী গতির শক্তি-সামঞ্জস্যের মধ্যে চালিত একটীর কেন্দ্র তার নিজ ব্যক্তিত্বে ; অপরটীর কেন্দ্র কল্পিত মানব-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরালে। মানব-ব্যক্তিত্বে 'সত্য' নিহিত আছে তাহাতে, আর বিশ্ব-মানবের অ যে নিত্য-'সত্য' বিরাজমান, তাহাতে মৌলিক বে পার্থক্য নাই।—তাই, এক হিসাবে, বিশ্বের ব্যক্তিগত তার অন্তর্নিহিত সত্যের সঙ্গে বিশ্বমানবের আভ্য সত্যের জ্ঞাতিত্ব, একবংশীয়ত্ব, লইয়া স্বভাবতঃই বিশ্বকে আমন্ত্রণ করিতে উন্মুখ। (২)

কিন্তু একটা ব্যক্তিত্বের দাবীতে অপরকে অ করিতে হইলে সেই ব্যক্তিত্বে স্বকীয় সত্তার অনুভূতি চা আত্মদর্শন চাই। অপরের নিকট নিজেকে জ্ঞাপন ক

(১) The true *universal* finds its own manifes in the *individual.*" Viswa-bharati Quarterly, Jan 1924 (Magh 1330), page 387.

(২) "Viswa-bharati" is an "invitation t wor'd,"—an "offer of sacrifice to the highest Tru Man." Viswa-bharati Quarterly, April, 1923 (Va 1330), page 4.

হইলে নিজেকে ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া চাই। মানুষ 'গ্রহণ'-তো করেই,—তার 'প্রদানে'র ক্ষমতাও চাই,—আর এই 'প্রদানের' ক্ষমতাই তার সমগ্র ঐশ্বর্য্যের উৎকৃষ্ট পরিমাপক।

বিশ্ব-কেন্দ্রের বাণী শ্রবণ করিতে হইবে,—তা'তে আত্মোন্নতির মন্ত্র-সিদ্ধির সহায়তা হইবে; কিন্তু শ্রবণের ইন্দ্রিয় না থাকিলে তা' শোনা যাইবে না,—তা'তে মানব-মানসে কোন রেখাই আঁকিবে না। এরূপ স্থলে 'প্রদানের' ক্ষমতা দূরে থাকুক, 'গ্রহণের' ক্ষমতারই অভাব।

এই শ্রবণের ক্ষমতা, গ্রহণ-প্রদানের সামর্থ্য, আত্ম-প্রকাশের শক্তি,—মানবের সম্পদ্। ইহার অঙ্কুর মানব-ব্যক্তিত্বে নিহিত আছে। এই ব্যক্তিত্ব অনুসারেই আমাদের উপনিষদের 'ব্রহ্মত্ব',—"তত্ত্বমসি,"—"সত্যম্, শান্তম্, শিবম্, অদ্বৈতম্।"

'সত্য' নিজেই সত্য,—তা'তে আবার শান্তি, মঙ্গল, অভিন্নতা!

এই 'অভিন্নতা'-বোধেই মানবে-মানবে মিলন-স্পৃহা, আর প্রেমে সেই মিলনের সম্ভবতা। প্রেমেই অপরের সঙ্গে নিকট-সংস্পর্শ, প্রেমেই 'একে'র পক্ষে 'সমস্তে'র মণ্ডলীতে প্রবেশাধিকার,—প্রেমই বিশ্ব-আত্মার দ্বার উদ্ঘাটনের উপায়।

এই প্রেমের অনুসরণে আবার অবস্থাক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের আত্ম-দর্শন অথবা আত্ম-দ্রষ্টার ব্যক্তিত্ব নিতান্ত আত্ম-হারা। এই আত্ম-হারা প্রেমই বৈষ্ণব কাব্যের আদর্শ।

(৩)

যাহা 'সমস্ত',—যে জিনিষ সৃষ্টি-মণ্ডলীতে 'আছে', যাহা—'সৎ', 'অস্তি', (৩) 'স্থিতি'-বিশিষ্ট,—তাহা প্রেম-স্পর্শে, অন্তরের আহ্বানে সাড়া দেয়। যাহা 'নাই', 'নাস্তি', (৪)—তাহা কিছুতেই সাড়া দেয় না; অথবা যা' প্রেম-স্পর্শে বা আন্তরিক আহ্বানে সারা দেয় না তাকে বিচার-মীমাংসায় "নাই", বা "নাস্তি", বা তাহারি কাছা-কাছি কোনো জিনিষ বলা যাইতে পারে।

এই অনুভূতির প্রভাবে সৃষ্টির প্রভাত হইতে সৃষ্ট মানব 'মৃত' এবং 'অ-মৃত'কে বিভিন্ন করিয়া দেখিলেন,—'মৃতের' অন্তরালে 'অ-মৃতে'র সন্ধানে যুগে-যুগে, দেশে-দেশে বিভিন্ন জাতি তাঁহাদের আত্ম-বিবৃতিতে এই তথ্যের অনুশীলন-স্পৃহা জ্ঞাপন করিলেন। স্রষ্টা ভগবান্ যখন "অস্তি" তখন প্রেমের প্রার্থনায় তাঁহাকে স্পর্শ করা যাইবে,—তিনি 'সাড়া' দিবেন,—এই জ্ঞান মানুষের মনে আসিল; বিভিন্ন প্রণালীতে এই বাসনা আত্ম-বিকাশ করিল; বিভিন্ন ধর্ম্ম-মতে ভগবৎ-আরাধনার ব্যবস্থা হইল।

মানবের "অস্তিত্বে" চিন্তা, অনুভূতি, সৌন্দর্য্য-উপলব্ধি, আনন্দ, আকাঙ্ক্ষা, পরার্থপরতা, আত্মবিকাশের ব্যাকুলতা মানবের একটা সার্ব্বভৌমিক আধ্যাত্মিকত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। যাহা ভৌতিক দৃষ্টিতে "অস্তি" তাই সমস্ত "অস্তিত্ব"কে সমাধা করে নাই,—মৃত্যুর অন্তরালে মানবাত্মার "অমৃতত্ব"-বোধ মানব-হৃদয়ে আত্ম-প্রতিষ্ঠিত।

এই আধ্যাত্মিকত্ব গীতায় গীত হইয়াছে,—

"দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তর-প্রাপ্তি,—র্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥"

"তথাগত" ভগবান্ বুদ্ধ তাঁহার সমস্ত মতের মধ্যে সর্ব্বজীবে সমদর্শন মত জ্ঞাপন করিলেন।

খ্রীষ্ট বলিলেন, (৫)—"মানুষ কেবলমাত্র পার্থিব আহার্য্য লইয়াই জীবন-ধারণ করে না।"

মহম্মদ বলিলেন,—"স্বর্গ ও মর্ত্ত্য জগদীশ্বরেরি। তাঁহাতেই সমস্ত জিনিষ প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।" (৬)

—বিশ্বের বিভিন্ন দিক হইতে একই অধ্যাত্ম-চিন্তার ধারা,—

"তোঁহে জনমি পুন তোঁহে সমাওত,
সাগর-লহরী সমানা!" [বিদ্যাপতি]

(৪)

প্রাচীন ভারতের দ্রাবিড়ীয় ও আর্য্য জাতির চিন্তা-প্রণালীতে, চীন ও কোরিয়ায়, ফিনীসিয়া ও কার্থেজে, মিশর ও বেবিলনে, গ্রীস ও রোমে, পারস্য ও আরবে,—

(৩) Latin *"est"*.

(৪) Latin *"non-est"*.

(৫) "Man shall not live by bread alone". St. Luke, 4—4.

(৬) "God's is the Empire of the Heavens and the Earth,—and to Him must all things return." S. Lane-Poole. "Speeches etc" of Mohamed, Introduction, Golden Treasury Series. page lii.

এই আত্ম-বিবৃতির প্রচেষ্টা কত দিক দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার আলোচনার বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আবশ্যক নাই।

তথাপি বিশ্বমানবের মনোবৃত্তির সহিত কোথায় আমাদের স্পর্শ-স্থল তাহাই দেখাইতে সামান্য দুই-একটী মাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি।

বাংলার বৈষ্ণব কাব্যের ধারাবাহিক প্রতিষ্ঠানের পূর্ব্বেই একটা সময় ছিল, যখন ভগবৎ-চিন্তার দিক দিয়া শাশ্বত সৌন্দর্য্যের একটা নিবিড় অনুভূতি মানবের মধ্যে ভাবাবেশ বা ভাবোন্মাদনায় তাহাকে আত্ম-প্রকাশিত করিতেছিল।

যাহা অপ্রকাশিত হইয়াও প্রকাশিত, প্রকাশিত হইয়াও অপ্রকাশিত,—তাহাই লইয়া একটা চিন্তা-প্রবণতা মানুষকে যে এক আনন্দপ্রদ সৌন্দর্য্যের উপলব্ধিতে বিলীন করিতে পারে, ইহা মানব-অন্তঃকরণের একটী চিরন্তন ধর্ম্মের মধ্যে।

পারস্য ও আরবের "মিষ্টিসিজ্‌ম্‌" [mysticism] ও পারসীয় "সুফিজ্‌ম্‌" [Sufism]-এর বিষয় চিন্তা করিলে এই শ্রেণীর আত্মবিকাশ-পদ্ধতির কথা মনে পড়িবে।

বেদান্ত-সারের "তত্ত্বমসি"-মতের ও বৌদ্ধ নির্ব্বাণ-তত্ত্বের সহিত পারসীয় ও আরবীয় "মিষ্টিসিজ্‌ম্‌"-এর সম্বন্ধ, ও এই সূত্রে গ্রীসীয় "নিও-প্লেটোনিক" [Neo-Platonic] মত কি ভাবে সংশ্লিষ্ট,—এই বিষয় "ইস্‌লামীয় সভ্যতা"-সম্বন্ধে বিখ্যাত ও চিন্তাশীল লেখক শ্রীযুক্ত এস্‌-খোদাবক্স্‌ "জারমান্‌" পণ্ডিত ভন্‌ ক্রেমারের (৭) [Von Kremer's] গ্রন্থ হইতে সুন্দর ভাবে দেখাইয়াছেন।

"নিও-প্লেটোনিষ্ট্‌"গণ [Neo-Platonists] খৃষ্টীয় প্রথম কয়েক শতাব্দী মধ্যে পারস্য ও আরব দেশে উপস্থিত হইলেন, তাহার পূর্ব্ব হইতেই ঐ সব দেশে ভগবানের "প্রিয়ত্ব"-উপলব্ধি বিদ্যমান ছিল।

"নিও-প্লেটোনিষ্ট"গণ স্রষ্টা ভগবানকে "সর্ব্বমঙ্গল" [Supreme Good] রূপে মানিতেন, (৮)—তাঁহাদের মতে ভগবান্‌ নিজেই নিজেতে অস্তিত্বশীল [Self-existent]; কিন্তু পারস্যদেশের মানব-অন্তঃকরণে এই সম্বন্ধীয় চিন্তায় যে "প্রিয়ের" জন্য আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান্‌ ছিল, তাহা সে দেশের সাহিত্যে এক অভিনব ধারা সৃজন করিল,—উহা পারসীয় "সুফিজ্‌ম্‌" বলিয়া পরিচিত। এই পারসীয় সুফি-মতকে "তাস্‌-ওয়াফ্‌" [tasawwuf] বলে। (৯)

"নিও-প্লেটোনিষ্ট্‌-মতে ঈশ্বর সর্ব্বগুণ-সমষ্টি (abstract),—সুফির নিকট ঈশ্বর নিতান্তই "প্রিয়"—ব্যক্তি-গুণবিশিষ্ট, প্রেমাস্পদ (essentially personal)। এই ব্যক্তিগুণবিশিষ্ট বাঞ্ছিতের ধ্যানে (১০) সুফি কবি "আত্ম-

---

(৭) Translation of Von Kremer's Historical Studies (Culturges chichtliche Streifzüge auf dem Gebiete des Islams) in 'History of Islamic Civilisation' by Mr. S. Khoda Buksh. M. A., B. C. L. (1905).

"We find mentioned in this work, 'the Vedanta-Sara,' the spiritual exercise which consists of the frequent repitition of a certain formula. e. g. *Tat tvam asi*,—That Thou art"........"An expresssion which repeatedly occurs with the Vedanta School is—'He who knows the Highest Brahma becomes himself Brahma'...This extrenal resemblance between the two systems'—those of the Vedanta and the Arabian and Persian mysticism,—obtains a further confirmation by their remarkable internal similarity. Both are pantheistic, and have as their subject the union of the individual with God,—with Brahma"......"We are constrained to to ascribe to Indian influences the rise of Muslim mysticism." Page 113-114.

The Platonic philosophy, notably in its Neo-Platonic form, also counted adherents among the Arabs." Page 107.

"Budhistic views partly transformed that Muslim mysticism which had for its source the Vedantic School." Page 115.

"The works of the Greek thinkers were brought within the reach of the Arabs through the medium of Arabic Translations." Page 117.

(৮) "The Neo-Platonists believed in the Supreme Good as the Source of all things." 'The Persian Mystics' by F. Hadland Davis, Wisdom of the East Series, pages 12-13.

(৯) Pers. "Suf"=Wool.

(১০) "Sufism or mystic Philosophy"......"finds expression in various order of Dervishes" and "owes

ধারা" হইতেন,—ভাবাবেশ [Ecstasy] এই আত্ম-বিস্মৃতি বিবৃতির একটা দিক। "নিও-প্লেটোনিষ্ট"গণও এই ভাবাবেশ-মত [Doctrine of Ecstasy] অনুসরণ করেন,—কিন্তু পারসীয় "সুফিজ্‌ম্" তাহার স্বকীয়ত্বকে স্বদেশের সৌন্দর্য্য-সম্ভারেই স্থির রাখিয়াছেন। (১১)

প্রাচীন আরবীয় সাহিত্য মরুপ্রান্তর হইতে এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা লইয়া উদ্ভূত হইয়াছিল,—তাহার মধ্যে প্রায়ই থাকিত এক "প্রেমাস্পদের" আদর্শ [Image of the Best Beloved] (১২)। এই সাহিত্যেও "নিও-প্লেটোনিক" [Ishraqui (১৩)]-মতের সহিত আংশিক পার্থক্য রাখিয়াই ভগবৎ-"প্রেমের" আদর্শ প্রকাশিত হইল (১৪)—আর এই আদর্শের অনুসরণে "ভাবাবেশ"-মত [Doctrine of Ecstasy] উচ্চ স্থান পাইল।

জোরোস্তারের (Zoroasters) আত্ম-জ্ঞান-মত [Doctrine of Light or Illumination] এবং "মানিকীয়" [Manichæans] দের আত্ম-তত্ত্ব এই উভয়কে লইয়া "ইশ্‌রাকি" [Ishraqui]-মতের আংশিক ধারা-প্রভাব আরবীয় চিন্তাস্রোতের সহিত মিলিত হইল; তখন আরবের "নাক্‌শবন্দী" [Naqshbondi] দরবেশগণ "ধিকির" [Dhikr]-নামক "কীর্ত্তন" প্রথার প্রবর্ত্তন করিলেন।

বৈষ্ণব কাব্যেরই অনুমোদিত ধারার মত এই "কীর্ত্তন"-প্রথা ভগবানকে "প্রিয়তম-নিকটতম" করিয়া লইতেছে। দার্শনিকতত্ত্বের "পুরুষ" ও "প্রকৃতি",—মানব-সত্তার চিরন্তন "পুরুষ" ও "স্ত্রী,",—সাহিত্যের রসে, কাব্যের রসে সম্মিলিত;—"ধর্ম্ম ও কবিতা, কবি ও ভক্ত পরস্পরের তত্ত্বে ওতপ্রোত ও আত্মবিস্মৃত হইয়া অপরূপ রসানন্দে বিলসিত।" (১৫)

"কীর্ত্তন" কাহিনী সূত্রে শ্রীচৈতন্যদেবের ভাবোন্মাদনার কথা মনে পড়ে,—

"কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥" [বিদ্যাপতি]

(৫)

এক হিসাবে "অধ্যাত্মতঃ সকল কবিই বৈষ্ণব কবি",—সেই কাব্যের সুরে "মানবাত্মা তীব্র, উচ্চ, উচ্ছ্বসিত ঋজুকণ্ঠে আপনার মাহাত্ম্য ও বিশ্বমানবের একত্ব ঘোষণা করিতেছে।" (১৬)

---

its origin mainly to the School of Indian Philosophy, which is known as that of the Vedanta School." Page 108. Khoda Buksh "Islam."

' Budhism and the doctrine of the Vedanta School introduced the pantheistic conception of the world, which notably in Eastern countries,—in India, Persia, and even Asia minor,—obtained constantly increasing popularity and called into being numerous orders of Dervishes." Page 117. Khoda Buksh "Islam."

"With the growth of the *ecstatic* and *rapturous* tendencies numerous orders of Dervishes sprang up in Islam." Page 108. Khoda Buksh "Islam."

(চিন্তাশীল সাহিত্যিক চট্টগ্রামের শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন তাঁহার "বঙ্গবাণী" গ্রন্থে বৈষ্ণব কবিদিগের "প্রেমের" আদর্শ ও পারসীক "সুফি" মতে "আত্মার" সম্মিলন প্রণালীর উল্লেখ করিয়াছেন। "বঙ্গবাণী" ১৪৬ পৃঃ)

(১১) দিওয়ানি শম্‌সি তাব্রিজ্ (Divani Shamsi Tabriz) বলিতেছেন:—

"I am silent. Speak Thou, O, Soul of Soul.
From desire of whose Face every atom grew articulate."

(Translation from Persian, by F. Hadland Davis).

(১২) "What is this nation (Arabian),—which leapt up before the world in sudden and amazing fortune ?"..."It was from the Desert that Arab poetry was to come." The long caravan-marches...taught the Arab to sing rhymes." History of Arabic Literature by Clement Huart, Chapter I.

(১৩) "The Platonic school is known among the Orientals (Arabs) as 'Ishraqui'." Khodā Buksh. "Islam, page 107.

(১৪) "Pure, un-mixed Essence of God,—most High." Khoda Buxsh "Islam." pag 109.

"Dhikr"—"by which the Naqshbandi Dervishes believe they attain the greatest ecstatic raptures." Khoda Buksh, "Islam", page 109.

(১৫) (১৬) শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন, "বঙ্গবাণী" [৫২-২৭ পৃঃ]

উত্তরকালের আরব সাহিত্যে "ইবন্ তুফাইল" [Ibn Tufail, (১৭) ১১৮৫ খ্রীঃ] নামক গ্রন্থকার "হাই ইবন্ ইয়াক্ধান" [Hayy Ibn Yokdhan]-শীর্ষক "আত্মার উন্মেষ" [Awakening of the Soul] বিষয়ে এক দার্শনিক উপন্যাস লিখিলেন। এক পরিত্যক্ত মানব-শিশু একটী জনহীন অরণ্যময় দ্বীপে বৎস-হারা হরিণী কর্তৃক পশুপক্ষাদিগের মধ্যে লালিত-পালিত হইয়া পরিশেষে কি-উপায়ে আত্মদর্শন ক্ষমতা-বলেই মানব-আত্মার সমস্ত জ্ঞান-সম্পদ্ লাভ করিল, তাহাই এই পুস্তকের বিবৃত বিষয়।

কোরাণ-সাহিত্যের উক্তি,—"তিনিই স্থিতি, তিনিই সুন্দর, তিনি তিনিই" [He is the Existence, He is Beauty, He is He],—বেদান্ত-সারের "তত্ত্বমসি"-জ্ঞান বালক-হৃদয়ে উন্মেষিত হইল।

এই বালকের কাছে মনুষ্য, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ সকলই এক বিশ্বজীবনের বিকাশ মাত্র।

"কিয়ে মানুষ-পশু- পাখী যে জনমিয়ে
অথবা কীট-পতঙ্গে।
করম-বিপাকে গতাগতি পুন-পুনঃ
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে॥" [বিদ্যাপতি]

(৬)

সাধারণ পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে এক-একটা অধ্যাত্ম-বোধের ভাব আশ্চর্য্য উপায়ে প্রকাশিত।

খাসি-রমণী বিরহ-কাতরা,—তাঁহার যেন মনে হইতেছে প্রিয়-সঙ্গ ব্যতীত কি করিয়া জীবন কাটিবে। যেন বৃন্দাবনের শ্রীরাধিকা বলিতেছেন,—

"কি কহসি, কি পুছসি,—শুন প্রিয় সজনি।
কৈছনে বঞ্চব ইহ-দিন-রজনী!" [বিদ্যাপতি],

কিন্তু খাসি-রমণী শ্রীরাধিকার ভাবে ভাবিতেছিলেন কি না জানি না,—তবে তাঁহার মন একেবারে মাটীর পৃথিবী ছাড়িয়া আকাশে উড়িতেই চাহিতেছে,— (১৮)

"প্রাণ মোর নাচে তালে-তালে,—
যাব আমি, যাব আমি,—দূর গগনেতে,
যাব আমি মেঘের আড়ালে'!"

এক ত্রিপুর (Tipra) রমণী,—নিতান্তই পর্ব্বত-বাসিনী,—তাঁহার প্রিয়ের সঙ্গে মিলনের সম্ভাবনা নাই, তাই বিরহ-কাতরা। তিনি বিধাতাকে দোষ দিতেছেন,—যেন শ্রীরাধিকা বলিতেছেন,—

"সজল নয়ান করি পিয়া-পথ হেরি-হেরি
তিল এক হয় যুগ-চারি।
বিহি বড় দারুণ তাহে পুন ঐছন
দূরহি কয়ল মুরারি॥" [বিদ্যাপতি]

ত্রিপুর বালিকা (১৯) গাহিতেছেন,—

"বন্য বরাহ অবাধে জলেতে নামিয়া সাঁতার কাটে;
গৃহের বিড়ালী,—জীবন থাকিতে গেল না জলের ঘাটে।
বন-তরু-লতা বসন্ত আসিলে নূতন পাতায় সাজে,
গৃহেতে লাগানো দারুখণ্ড কভু জাগে না ঘরের মাঝে।
* * * * * * * *
আমি যারে চাই, তার ভালে যবে বিধাতা 'লেখন' লেখে,
নিঠুর বিধাতা লেখে-নি সে 'লেখা' মোর কথা মনে রেখে।

(১৭) "The Awakening of the Soul",—Story of Hayy Ibn Yokdhan, a philosophical Romance by Ibn Tufail, Secretary at Granada (died in Morocco 1185 A.D.) Published by the Oxford University Press in "Philosophus Autodidactus," Edited by Edward Pococke, 1671 A. D. Translated from Arabic by Dr. Paul Bronnle. (Cranmer Byng and Kapadia's "Wisdom of the East" Edition 1907)

(১৮) খাসি ভাষায় (উহারা রোমান অক্ষরে লেখে) সঙ্গীতাংশটী এইরূপ :—

"To yathuh ki mynsim jong nga
Shano phynsa her,—
Nga'n sa her, nga'n sa her shah lyndit ki lyoh."

(১৯) মূল তিপ্‌রা সঙ্গীতটীর [তিপ্‌রা ভাষায় বাংলা অক্ষর ব্যবহৃত হয়] কিয়দংশ এইরূপ :—

"বলং অআঙ্গ তুকুবাই লাখা
আমিংসা তুকুলিয়া।
বলংনি বুফাং রতম্ বাই লাখা,
ফাকলাই রতম্ লিয়া"
* * * * * *
বন সুইফুর আনি সুইলিয়া ববাই আংনানি কক্‌গিয়া।
[বঙ্গানুবাদ, "মানসী ও মর্ম্মবাণী," বৈশাখ ১৩৩১]

ভুলি মোর নাম, লিখে ফেলে দিল অদৃষ্টবারতা তার,
তাই মোর সাথে তাহার মিলন হবার নহেকো আর ॥

ত্রিপুর বালিকার দোষারোপ বিধাতার উপর,—তাঁর "প্রিয়ের" অদৃষ্টলিপি লিখিবার সময় বিধাতা একেবারেই যখন বালিকার কথা ভাবেন নাই তখন তাঁহাদের মিলনের আর কোন সম্ভাবনা নাই! তাই বালিকা ক্ষোভ করিয়া বলিতেছেন,—তাঁহার বড় দুঃখ রহিল তিনি আগেই বিধাতার হাতখানি কেন কাটিয়া রাখেন নাই :—

"ক্ষোভ,—বিধাতার হাত খানি আগে কাটিয়া রাখিনি আমি!"

(৭)

বিশ্বমানবের অধ্যাত্ম-বোধ কত ভাবেই প্রকাশিত!

খ্রীষ্টীয় শকাব্দার বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতেই চীনদেশের আত্ম-চিন্তার বিবরণ তাহার সাহিত্যে প্রতিভাত।

সে দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই কংফুসী [Confucius] ও লাও-চু [Lao Tsu]-র মতাবলী,—যাহাকে "তাও" [Tao, Taoism] বলে, তাহা,—মানবের মনকে এক আধ্যাত্মিক জাগরণে সজীব রাখিয়াছিল। ক্ষেত্র পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত না থাকিলে বুদ্ধদেবের ধর্ম্মরীতি তাহাতে এতদূর ক্ষমতা বিস্তার করিতে পারিত কি না সন্দেহ।

চীনদেশীয়ের নিকট লাও-চু [Lao Tsu]—র "তাও" [Tao] এক আশ্চর্য্য শক্তি,—সে যে কি তাহার কোন সংজ্ঞা নাই, সে একটী 'ভাব (idea) যাহা মানুষের এ জীবনের সহিত পূর্ব্বাপর জীবনের এক অচিন্তনীয় সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়া দিতেছে। "তাও" প্রধান, মহৎ। "মানুষ পৃথিবীর নিকট তাহার আইন গ্রহণ করিতেছে, পৃথিবী স্বর্গের নিকট, স্বর্গ 'তাও'-এর নিকট,—কিন্তু 'তাও'এর যে বিধান, তাহা নিজেই নিজেতে বিকশিত।" (২০)

কংফুসীর পূর্ব্ব-পুরুষ-উপাসনাবাদ [Ancestor Worship] (২১) মৃত্যুর অতীত মানবাত্মার ব্যক্তিগত অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে।

এই পূর্ব্ব-পুরুষ উপাসনাবাদ [ancestor worship] বৌদ্ধ ধর্ম্মের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই জাপানে "শিন্তো" [Shinto] নামক এক আধ্যাত্মিক-মত রূপে নিজ প্রাদুর্ভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই "শিন্তো"ও জাপানীর নিকট একটী 'ভাব' (idea), (২২)—ইহারও কোন সংজ্ঞা নাই।

এই মত অনুসারে প্রত্যেক জাপানবাসীর বিশ্বাস, তাহাদের মৃত এবং জীবিত আত্মীয়গণ সর্ব্বদাই এক সঙ্গে রহিয়াছেন। এই অধ্যাত্ম-বোধ মানবকে জানাইয়া দিতেছে যে, অতীত সমস্ত কাল (Past Eternity) আর

---

(২০) Tao is great...man takes his law from the Earth; the Earth takes its law from Heaven ; Heaven takes its law from Tao ; but the law of Tao is its own spontaneity." 'The sayings of Lao Tsu', Lionel Giles. (Wisdom of the East). page 21.

(২১) "Worship of Ancestors." "The like responds to the like...When the descendants in sincerity and concentration of spirit beckon the ancestral spirit to return to the house, on such occasions the scattered spirit is capable of assembling again and returning." The Confucian God Idea, py Chinese thinker Y.Y. Tsu in "China of To-day" (page 79-80).

(২২) "There is self-contentment in Shinto. How can it be otherwise when Death itself is conceived of as Deification, and when Nature,—all its destructive forces not excluded,—is thought to be working for us ?

That the dead are alive somehow and somewhere is the strongest faith of our people, and as long as science does not prove such a belief to be contrary to its discoveries and teachings, Ancestor-Worship is not deemed to be a superstition......

Shinto is a religion without a founder, without theology, and without scriptures......we speak of the eighty myrird deities of the Shinto pantheon...The Shinto shrine is a repository of every sacred memory." The Japanese Nation by Inazo Nitobe, Japanese Exchange Professor in America (1911-12). Lectureon Religious Beliefs, page 125-131. ('Story of Nations' Series.)

ভবিষ্যৎ অনন্তকাল (Future Eternity) এই পার্থিব জীবনের সঙ্গেই এক সূত্রে গ্রথিত। "শিন্তো"-র মত অনুসারে কোনো-কোনো নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রত্যেক জাপানী এক ক্ষুদ্র দর্পণ-খণ্ডে নিজ প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া তখনই সরিয়া যান,—পার্থিব জীবনের নিতান্ত অলীকত্ব যাহাতে সর্ব্বদাই মনে থাকে, এই উদ্দেশ্য।

বহুদিন পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ একটী প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"আমাদের সঙ্গে সঙ্গে কত-শত অদৃশ্য লোক রহিয়াছেন,—আমরা সকল সময় তাহা জানিতেও পারি না। অবিরত তাঁহাদের কথোপকথন শুনিয়া আমাদের মতামত কত নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, তাঁহাদের কার্য্য কত নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, তাহা আমরা বুঝিতেই পারি না,—জানিতেই পারি না।" (২৩)

বিশ্বমানবের জগৎ নিতান্তই মানবাত্মার জগৎ। তাহার ভৌতিক অবস্থিতির বাহিরে সীমাহীন অধ্যাত্ম-অবস্থিতি। কাব্যের জগৎ,—বৈষ্ণবের জগৎ এই "ভৌতিক" ও "আধ্যাত্মিক" লইয়া, ইহাদের পরস্পরের মধ্যে চিরন্তন সম্বন্ধ লইয়া। বাহ্য পৃথিবীকে লইয়া এই "জগতের" ব্যবহার তো আছেই,—কিন্তু ইহা বাহ্য পৃথিবীতেই সীমাবদ্ধ নহে। ইহার বিস্তৃতি অতীত ও ভবিষ্যতে অনন্ত-প্রসারিত; ইহাতে "ভৌতিক" ও "আধ্যাত্মিক" অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত; একের সৌন্দর্য্য, ভাব-মাধুর্য্য অপরের অস্তিত্বে সার্থকতাপূর্ণ।

এই অনুভূতি যেখানে আছে সেখানে বিশ্বমানবের জ্ঞাতিত্ব।

"O Light, O glory of the human race !
What stream is this which here unfolds itself
From out One Source, and from itself
withdraws" (২৪)

সেই বৈষ্ণব কাব্যের কথা,—"তোঁহে জনমি পুন !"

(৮)

ইংরেজকবি ওয়ার্ডওয়ার্থ [Wordsworth] বলিলেন,—সেই একই সুর সে ধ্বনিতে,—

"Trailing clouds of Glory do we come
From God who is our Home"[Immortality Ode].

শেলি [Shelley] বলিতেছেন,—"Our sweetest thoughts are those that tell of saddest things" [Sky Lark]। যেন শ্রীরাধিকারই অনুভূতির মত,—বেদনায় যেন আনন্দ, আনন্দে যেন বেদনা ! যেন রাধা ভাবিতেছেন,—

"পিরীতি রতন করিব যতন পিরীতি গলার হার।
শ্যাম বঁধুয়ার নিদারুণ বাঁশী পরাণ বধে আমার॥" (২৫)
[চণ্ডীদাস]

বৈষ্ণবের সুরেই যেন কীটস্ [Keats] বলিতেছেন 'যাহা সুন্দর তাহাতে চিরন্তন আনন্দ,—তাহাতে চিরন্তন সত্য',—আনন্দ ও সত্য ছাড়া 'সুন্দর' সুন্দরই নয় :

"A thing of Beauty is a Joy for ever."
"Beauty is Truth,—Truth Beauty."

যেন বৈষ্ণবেরই সুরে এই কবি গাহিতেছেন,- ক্লেশের ভিতর কি শান্তি,—বেদনার অনুভূতিতে কত আনন্দ :

"O sorrow,
Why dost thou borrow
Heart's lightness from the merriment
of May !"
[Endymion]

আবার বৈষ্ণবেরই সুরে যেন টেনিসন্ [Tennyson] দেখাইতেছেন নৈরাশ্যের মধ্যেও কত আনন্দ ["divine despair"], প্রিয়জনের পার্থিব অবসানের পরও পূর্ব্বানুভূত প্রণয়মিলনস্মৃতি কত মধুর :

"Sweet as remembered kisses after death."
["Tears, Idle Tears"]

আবার এই কবি (Tennyson) "প্রণয়" এবং "পার্থিব দেহাবসান"কে যেন বৈষ্ণবের শ্রীরাধিকার অনুভূতিতেই বিচার করিতেছেন,—

(২৩) সমালোচনা,—৩৬ পৃঃ

(২৪) Dante, *The Divine Comedy*, Purgatorio *XXXIII*, l. 115 etc. (Longfellow's Edition).

(২৫) বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্য সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, "ইহাতে স্বার্থের আহুতি, অধিকারের বিলোপ," ইহা "স্বর্গীয় অশ্রু ও নির্ম্মল স্বার্থত্যাগের রাজ্য"। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য", ৬ষ্ঠ অঃ, "পদাবলী-সাহিত্য।"

"I fain would follow Love if that conld be,
I needs must follow Death, who calls for me.
Calls ! and I follow ! I follow,—let me die."
["Sweet is True Love" etc.]

যেন বৃন্দাবনের বিরহ-বিধুরা শ্রীরাধিকা প্রিয়ের অপেক্ষায় এত দিন আত্মজীবন লইয়া বসিয়া থাকিয়াও অবশেষে নিয়তির আহ্বানে মৃত্যুকেই আত্মদান করিতেছেন,—

"হিয়া" মেরি বোলত, "চলহ প্রণয়-সাথ,"—
অব নাহি হোয়ত সোহি।
"নিয়তি" ডাকত আজু,—চলনু "মরণ" সাথ
হাম্‌কা লো ডাকত ওহি॥
ডাকত, তেঁহি অব চলনু।
আহ মরণ হামারি! (২৬)

জীবন আর মৃত্যুর এই চিরন্তন খেলা,—পৃথিবীর এই ক্ষুদ্র অথচ মনোরম ক্রীড়া-নীড়ের চতুর্দ্দিকে মৃত্যুর অনিবার্য্য আবেষ্টন, 'সান্ত' আর 'অনন্তের' এই মোহিনী লীলার মধ্যে তথাপি পার্থিব আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতির প্রাণস্পর্শী মাধুর্য্য,—রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন,—

"এ যদি সত্যই হয় মৃত্তিকার পৃথ্বী'পরে মুহূর্ত্তের খেলা,
এই সব মুখোমুখী, এই সব দেখাশোনা, ক্ষণিকের মেলা,—
* * * * *
তবে মৃত্যু, দূরে যাও, এখনি দিয়োনা ভেঙ্গে এ খেলার পুরী;
ক্ষণেক বিলম্ব কর,—আমার দু'দিন হ'তে করিয়োনা চুরি।(২৭)

(৯)

এই যে মানবের আকাঙ্ক্ষা, এ-জন্ম ও-জন্ম লইয়া আলোড়ন; এই যে আদর্শ-চিন্তা, আদর্শের দিকে চিত্তের গতি, আদর্শের অপ্রাপ্তিতে বেদনা; এই যে অধ্যাত্ম-বোধ;—এই সার্ব্বজনীন চিত্ত-বৃত্তি বিশ্বের মানবে-মানবে জ্ঞাতিত্ব সংজ্ঞাপক করিতেছে, এই চিত্ত-বৃত্তির আত্ম-বিবৃতির মধ্যে সাহিত্য,—কাব্য-সাহিত্য একটী দিক। এই কাব্য-সাহিত্য আবার অবস্থাবিশেষে নানা শ্রেণীর,—যেমন খণ্ডকাব্য, মহাকাব্য, গীতিকাব্য প্রভৃতি।

গীতিকাব্য দেশ-কালানুসারে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে,—মূলতঃ গীতিকাব্য (lyrical poetry) সঙ্গীতেই গীত হইত।

বাংলার গীতিকাব্য বৈষ্ণবের সুরে তাহার সর্ব্বোচ্চ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। যে 'আত্মহারা' প্রেমের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, যে প্রিয়ের জন্য, বাঞ্ছিতের জন্য আকাঙ্ক্ষা দেশ-বিদেশে মানুষকে আপ্লুত করিয়াছে, যে ভাবাবেশ বা ভাব-বিহ্বলতা মানব-হৃদয়ের আনন্দ-মণ্ডিত বেদনা বা বেদনা-ক্লিষ্ট আনন্দের পরিচায়ক, যে আস্থা মানুষকে এ-জন্ম-পূর্ব্বজন্ম-পরজন্মের বন্ধনে আবদ্ধ করিতেছে,—সমস্ত বিশ্বকে এক সুরে গ্রথিত করিতেছে,—সেই প্রেম, সেই আকাঙ্ক্ষা, সেই বিহ্বলতা, সেই আস্থা বৈষ্ণব কাব্যের মেরুদণ্ড। (২৮) বেদনা ও আনন্দের সমাবেশে যে 'পরমানন্দ' তাহাই ওই কাব্যের রস,—এই রসে বৈষ্ণবের জগৎ,—মানব, বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী,—সকলি সঞ্জীবিত।

এই বৈষ্ণব কাব্য বাঙালীর নিজস্ব। আর এই কাব্যের সর্ব্বোচ্চ সৃষ্টি প্রেমবিহ্বলা নায়িকা শ্রীরাধিকা। বিশ্ব-সাহিত্যের বরেণ্যা নায়িকামণ্ডলীর মধ্যেও বৈষ্ণবের শ্রীরাধিকা এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি!

(১০)

চীনের "তাও" [Tao] এর মত, জাপানের "শিণ্টো" [Shinto] র মত "সুফী" [Sufi] ও "নাক্‌শবন্দী" [Naqshbandi]র আবেশ-বিহ্বলতা [Ecstasy]র মত,—বাঙালীর বৈষ্ণব কাব্য একটা "ভাব" [Idea], একটী জীবনীশক্তি [vital force]। যেন ইহার কোন সংজ্ঞা নাই,—এ নিজেই নিজের সংজ্ঞা, নিজেই নিজেতে আত্মবিবৃত; কালস্রোতের মধ্যে ইহার স্থির ধারা নিজেরই মাধুর্য্যপ্রভাবে প্রবাহিত। ["It is its own spontaneity"].

---

(২৬) 'ভারতবর্ষ', পৌষ, ১৩২৬। (২৭) রবীন্দ্রনাথ, "প্রতীক্ষা", কাব্য-গ্রন্থাবলী, ৩১৪ পৃঃ।

(২৮) "এই কবিতা মনুষ্য হৃদয়ের চিরকালের কবিতা", শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন, "বঙ্গবাণী", ২০ পৃঃ।

"প্রেম পৃথিবীতে একবার মাত্র রূপ গ্রহণ করিয়াছিল,—তাহা বঙ্গদেশে। [শ্রীচৈতন্য-রূপে]।... ..এই অপূর্ব্ব ভক্তি ও প্রেমের উপকরণ দিয়া শ্রীমতী রাধিকাসুন্দরী সৃষ্ট,...তাঁহার বিরহের এক কণিকা কষ্ট বহন করিতে পারে, তাঁহার সুখের এক লহরী ধারণ করিতে পারে, এরূপ নারীচিত্র পৃথিবীর কাব্যোদ্যানে নাই।" রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য", ৭ম, অঃ।

স্ত্রী-পুরুষের প্রণয় গাথা-বলিলে ইহাকে বুঝা যায় না,—অথচ ইহা সেই প্রণয়েরই সঙ্গীতের সুরে জাগ্রত। বাহ্য-প্রকৃতির প্রতি মানবের সৌন্দর্য্য-দৃষ্টির দিক' দিয়া ইহাকে দেখানো যায় না;—অথচ ইহা সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতিকে, বৃন্দাবনের তাল-তমালকে, ধেনু ও বৎসকে, শুক ও সারিকে আত্ম-সৌন্দর্য্যের হিল্লোল-স্পন্দনে প্রেমবিহ্বল করিয়া রাখিয়াছে। মানবের প্রতি ভালবাসার কথায় ইহাকে ব্যক্ত করা যায় না,—অথচ বৃন্দাবনের গোপ-গোপী, গোষ্ঠ-বিহারী রাখাল সকলেই ইহার প্রণয়-কীর্ত্তনে আত্ম-বিস্মৃত। দার্শনিকতত্ত্ব বলিলে ইহাকে বলা হয় না,—অথচ দর্শনের সমস্ত তথ্য,—সৃষ্টি, স্থিতি, জীবন, মৃত্যু,—সকলকে ইহা সম্মোহিত করিয়া রাখিয়াছে। ভগবানের প্রতি প্রেমজ্ঞাপনের কথায় ইহাকে বুঝানো যায় না,—অথচ অনন্ত, শান্ত, সত্য, শিব, অদ্বৈতকে লইয়াই ইহার ব্যবহার।

ইহাকে লিখিত কাব্য বলিলে চলে না,—কারণ, ইহার যাহা অ-লিখিত তাহাও কাব্য। এ-খালি 'করুণ' (pathetic) শ্রেণীর কাব্য নহে,—এ কাব্য উদার, মহান্ (sublime), ইহার অনুভূতি-কেন্দ্র একবার ধূলি হইতেও নিম্নে, আবার আকাশ হইতেও উচ্চে।

এ স-সীমের উপর দাঁড়াইয়া অসীমকে আহ্বান করিতেছে; এ,—"কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ।" [চণ্ডীদাস]

এ যেন পৃথিবী শুকাইয়া মরুভূমি হইয়া গেলেও তার মধ্যে প্রবাহিত স্ফটিকধারা; যেন চন্দ্র অস্তমিত হইলেও তার পর মানব-মানসে জ্যোৎস্নার প্লাবন; যেন সঙ্গীত শেষ হইলেও তার সুরের তান।

কথার বাহিরেও ইহার অর্থ,—সেই অর্থ যেন অন্তরের কোন্ বৈরাগ্য-ভিত্তির উপর আত্ম-ন্যস্ত রহিয়াছে,—আর তাই ভিতরে-বাহিরে তাহা কি এক মাধুরী-ময়ী "অনর্থ" সৃষ্টি করিয়া মানুষকে পাগল করিয়া দিতেছে,—

"অন্তরে মোর বৈরাগী গায়,—তাইরে, নাইরে, নাইরে,—না!" [রবীন্দ্রনাথ]

(১১)

বৈষ্ণব কাব্য বাঙালীর নিজস্ব,—গোপনে, অতি যত্নে বাঙালীর হৃদয়ে ইহা সংরক্ষিত। কিন্তু তথাপি বোধ হয় বিশ্বমানবের দৃষ্টির সম্মুখে রাখিলে ইহাকে খাঁটি 'জহুরি' ঠিক ধরিয়া ফেলিবে!

কবির কথায়,—"নিজের প্রাণের মধ্যে, পরের প্রাণের মধ্যে, প্রকৃতির প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া" তবে ইহাকে চিনিতে হইবে। (২৯)

বৈষ্ণব কাব্যের প্রেম-সম্পদ্ মাণিককে শ্রীরাধা চিনিয়াছেন, তাই প্রেমাস্পদকে বলিতেছেন,—

[আমার] "অনেক দিবসে মনের মানসে
তোমা-ধনে মিলাওল বিধি।"—

আর যদি

[আমার] "নারী না করিত বিধি তোমা হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশ-দেশ।"
[লোচন দাস]

শ্রীরাধা আবার বলিতেছেন,—

"বঁধু হে আর কি ছাড়িয়া দিব!
এ বুক চিরিয়া যেখানে পরাণ
সেখানে তোমারে থোব।" [জ্ঞানদাস]

আর,

"দরিদ্র যেমন পাইয়া রতন
থুইতে ঠাঁঞি না পায়।"

বিশ্ব-মানসে বৈষ্ণব-কাব্যের কি অনন্ত প্রভাব!

---

(২৯) রবীন্দ্রনাথ, "সমালোচনা" ৯০ পৃঃ

গরমিল

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(প্রথম অংশ)

৪

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পর নরেশ আপন মনে বলিতে লাগিল—"যাক্, এ পথও বন্ধ দেখ্‌ছি! লীলা তো আমার একটা কথাও বুঝ্‌তে পারে না,—যে পারে সে তো শুনলেই না! এখন উপায়? শীগ্‌গিরই এর যাহোক একটা হেস্ত-নেস্ত না করতে পারলে, হয় তো এর পর এদের সঙ্গে আমার একটা বিরোধ উপস্থিত হ'তে পারে। আমি বেশ বুঝতে পারছি, এ রকম অবস্থায় আর বেশী দিন থাক্‌লে, আমার ভবিষ্যৎ জীবনটা একেবারে অন্ধকার হোয়ে উঠ্‌বে! না—না, এই বেলা সময় থাক্‌তে আমি মুক্ত হোতে চাই। এ কি বন্ধন নাগপাশের মতো ক্রমশঃ আমাকে চারিদিকে জড়িয়ে ধরে আমায় প্রতি দিন অলস, অবশ, নির্জ্জীব ক'রে আন্‌ছে? সত্যই কি আজীবন আমাকে এদের এই মাপ-জোপ-করা ঘর ক'খানিতে, এই হিসেব-করা আস্‌বাব-গুলোর ভিতর গুণে গুণে পা ফেলে এমনি গুঁড়ি মেরে মেরেই কাটাতে হবে? এমন কি, এদের এই ওজোন-করা কথাবার্ত্তা, কেতা-দোরস্ত আচার-ব্যবহার, বাঁধা-ধরা সাজ-সজ্জাগুলো কি আমাকে অনুকরণ করে চলতে হবে?—অসম্ভব! অসম্ভব!—এ রকম কোরে আমি বেঁচে থাকতে পার্ব্বো না! এর মধ্যেই যেন আমার হাঁপ ধ'র্‌ছে। ইচ্ছে ক'র্‌ছে, এই বাড়ীখানাকে দু'হাতে প্রাণপণে তুলে ধরে জোর ক'রে একবার উল্‌টে বসিয়ে দিই! একটা কিছু নতুন রকম পরিবর্ত্তন হোতে পারে তাহ'লে! কিন্তু পরিবর্ত্তন কি নতুন, এ সুরের প্রবেশই যে এখানে একেবারে নিষেধ! একখানা চেয়ার এঘর থেকে ও-ঘরে নিয়ে গেলেই যেন এদের সর্ব্বনাশ হোয়ে যায়! একটা কিছু কোনও খানে যদি একটু নাড়া-চাড়া করে রাখি,—সমস্ত বাড়ীখানা যেন ভূমিসাৎ হ'য়ে গেছে,—এমনি কোরে ওঠে এরা সকলে মিলে! ভয়ে ভয়ে সর্ব্বদা আমি যেন আড়ষ্ট হোয়ে থাকি! একটু আল্‌গা হোয়ে আরামে খানিকটা পায়চারি করে যে কতকটা সোয়াস্তি পাবো তার যো'টি নেই! নাঃ—এখানে এ ভাবে বাস করা আর আমার চল্‌বে না!...এই প্রকাণ্ড কৌচখানা ঘরের মাঝখান থেকে সরিয়ে যদি একটু ওই দেয়ালের দিকে ঘেঁসিয়ে রাখি, তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয় শুনি?—এই দিগ্‌-ধোড় ইজিচেয়ারটাকে দরজার গোড়া থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে যদি ওই দক্ষিণের জান্‌লাটার কাছে বসিয়ে দিই, তা' হোলে কি একটা কোনও মহাপাতক করা হয়? সৌরজগতের নিয়মের মতো সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে এগুলো কি অনন্তকাল পর্য্যন্ত এই একই

ভাবে একই যায়গাতে থাকবার জন্যে তৈরী হয়েছে? এগুলো কি যে যার যায়গায় সব শেকড় গেড়ে বসে গেছে না কি? স্বয়ং ব্রহ্মা এসেও কি এসব আর নড়াতে পারবেন না? দেখি দাঁড়াও তো—একবার নড়ানো যায় কি না—" বলিতে বলিতে নরেশ উঠিয়া কর্ত্তার প্রকাণ্ড কৌচখানা হিড়-হিড় করিয়া টানিতে টানিতে দেয়ালের দিকে সরাইয়া দিল।

"বাঃ! এ তো নড়ে দেখছি!—আর এই মান্ধাতার আমোলের ইজিচেয়ারখানা?"—বলিয়াই সেখানাকে দুই হাতে একেবারে শূন্যে তুলিয়া ফেলিয়া বার দুই জোরে ঝাঁকানি দিয়া নরেশ একেবারে দক্ষিণের জানালার সম্মুখে সশব্দে বসাইয়া দিল।

"আচ্ছা, ওই পাথরের টেবিলটা কি ওঘরে যাবার এই সোজা পথটা আট্‌কে চিরকাল ওইখানে হাতীর মতো চার পা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে? রোসো—ওটাকেও আজ হঠিয়ে দিই ওখান থেকে; নইলে আমার চলা-ফেরার ভয়ানক অসুবিধে হয়।"

সশব্দে পাথরের সেই মস্ত টেবিলটা টানিয়া একপাশে সরাইয়া দিয়া নরেশ লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া ঘরের ভিতর পায়চারি করিতে করিতে বলিতে লাগিল—"আঃ! একটু হাত-পাগুলো নেড়ে যেন বাঁচলুম! আমার তো মনে হচ্ছিল, হয় ত বা চলতেও বুঝি ভুলে গেছি! আজ প্রায় এক বছর হোতে চললো—আমি এ বাড়ীতে কারুর পায়ে চলার একটু শব্দ পর্য্যন্ত কোন দিন শুনতে পাইনি! কারুর একটু উঁচু গলা এক দিনও শুনিনি। কেবল ফিস্ ফিস্ করে বিনিয়ে বিনিয়ে কথা, আর এক-আধবার মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসি! কেউ এ বাড়ীতে কখনও প্রাণ খুলে চেঁচিয়ে হাসেও না ছাই! দেখি একবার, হাসিটা মনে আছে কি না—"হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—!" নরেশ পাগলের মতো আপন মনে অট্টহাসি হাসিতে লাগিল।

"গানটান গুলো কি আর মনে আছে সব? হার্ম্মোনিয়মটা তো দেখছি পড়ে পড়ে ছাতা ধরে গেল! সেই যেদিন শশাঙ্ক গেছে, সেদিন থেকে এখানে তো গান-বাজনাও একেবারে বন্ধ! দেখি দাঁড়াও, গাইতে বাজাতে এখনও পারি কি ভুলে গেছি?"—বলিতে বলিতে টেবিলে হারমোনিয়মের ডালাখানা খুলিয়া ফেলিয়া নরেশ বাজাইতে বসিয়া গেল। তার পর প্রাণপণ জোরে বাজ্‌নার সঙ্গে সঙ্গে গান ধরিল—

"বিঘ্ন বিপদ দুঃখ দহন তুচ্ছ করিল যারা,
মৃত্যু গহন পার হইল, টুটিল মোহ কারা;
দিন আগত ঐ—
ভারত তবু কৈ?
নিশ্চল নির্ব্বীর্য্য বাহু, কর্ম্ম-কীর্ত্তি-হানে
ব্যর্থ শক্তি, নিরানন্দ জীবনধন দীনে
প্রাণ দাও, প্রাণ দাও, দাও, দাও প্রাণ হে
জাগ্রত ভগবান হে জাগ্রত ভগবান।"

* * * *

রায় বাহাদুর, গৃহিণী, কমলা, লীলা সকলেই নরেশের গানের শব্দ শুনিয়া সেই ঘরে ছুটিয়া আসিল। রাগে কর্ত্তার দুই চক্ষু লাল, গৃহিণীর মুখখানি ভার। লীলার দৃষ্টিতে নিষেধের পরিপূর্ণ মিনতি, কেবল কমলার মুখের ভাবটা ঠিক বোঝা গেল না। কতক গোপন হাস্যের অস্পষ্ট ছায়া, কতক কৃত্রিম বিরাগের নিপুণ ছদ্মবেশ যে একত্র সে মুখে উঁকি মারিতেছিল।

গৃহিণী বলিলেন "এ সব কি কাণ্ড নরেশ?"

কমলা বলিল, "হঠাৎ আপনার জামায়ের ঘাড়ে গা চেপেছে বোধ হয়।"

কর্ত্তা বলিলেন "আমার বাড়ীটা তো যাত্রার দলে আখড়া নয় বাপু!"

নরেশ ধীরে ধীরে হারমোনিয়মের ডালাটি বন্ধ করি অপ্রতিভের মতো উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আজ্ঞে না, এ হারমোনিয়মটা ঠিক আছে কি না একবার দেখ্‌ছিলুম!"

ঘরের ভিতরের কৌচ ও টেবিল চেয়ারগুলোর অব দেখিয়া গৃহিণী বলিলেন, "এগুলোও কি ঠিক আছে কি দেখ্‌ছিলে নরেশ?"

এতক্ষণে কর্ত্তারও সেদিকে নজর পড়িতে, তিনি ভয়ান চম্‌কাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "তাই তো! এ কি? এগুে সব এমন নাড়াচাড়া ক'রে রাখলে কে?"

বিনীত ভাবে নরেশ বলিল, "আজ্ঞে, ওগুলো না যায় কি না, আমি পরীক্ষা করছিলুম।"

কর্ত্তা গিন্নী অবাক্ হইয়া বলিলেন, "নাড়া যায় কি না দেখ্‌ছিলে!—সে কি?"

কমলা তাড়াতাড়ি সেগুলা টানিয়া-টুনিয়া যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে করিতে বলিল, "হারমোনিয়মটা তো একটু বাজালেই ঠিক আছে কি না বুঝতে পারতে; তার সঙ্গে অমন গর্দ্দভরাগিণীতে গান ধরবার মানেটা কি শুনি?"

নরেশ ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল, "গান-টানগুলো গাইতে ভুলে গেছি কি না, একবার যাচাই ক'রে দেখছিলুম।"

গৃহিণী আশ্চর্য্য হইয়া কর্ত্তাকে বলিলেন, "নরেশের কি হঠাৎ মাথা খারাপ হয়ে গেল?"

কর্ত্তা চিন্তিত ভাবে বলিলেন, "হ'তেও পারে!—হয় ত খুব সম্ভব তাই!" তার পর নরেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ নরেশ, বিবাহের আগেও কি তোমার মধ্যে মধ্যে এ রকম হ'তো!"

নরেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, "আজ্ঞে না। বিবাহের আগে কখনও হয়নি; আর এখনও যে সম্পূর্ণ খারাপ হোয়েছে, তা মনে করবেন না। তবে আমার ভয় হচ্ছে যে, এ ভাবে আর কিছু দিন থাকলে হয় ত মাথাটা আমার সত্যই খারাপ হয়ে যাবে!"

গৃহিণী ভীত হইয়া বলিলেন, "কেন বাবা নরেশ, তোমার এ রকম মনে হচ্ছে? এখানে কি তোমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে?"

নরেশ দ্বিধা মাত্র না করিয়া বলিল, "যথেষ্ট হচ্ছে।"

কর্ত্তা গিন্নি উভয়েই ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "সে কি! সে কি!"

নরেশ বলিতে লাগিল, "আশৈশব আমি দুর্ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিছি বটে, কিন্তু এমন পরিশ্রান্ত আর কখন হইনি। আজ আমার মনে হচ্ছে, জগতে আমার চেয়ে অসুখী বোধ হয় আর কেউ নেই!"

কমলা মৃদু হাসিয়া বলিল, "তাই না কি! এখনও যে এক বছরও হয়নি তোমাদের বে' হয়েছে,—এর মধ্যেই অসুখী হওয়াটা তো সম্ভব নয়।"

গৃহিণী সস্নেহে বলিলেন, "তাই বুঝি ক'দিন থেকে বাছা আমার মুখটি শুকিয়ে বেড়াচ্ছে,—কেমন যেন মনমরা গোছ ভাব! কি হয়েছে বাবা বল তো? লোকজনেরা কেউ কি তোমাকে অসম্মান দেখিয়েছে? খুকীর সঙ্গে কি কিছু বচসা হয়েছে,—সে কি কোনও অন্যায় করেছে? বল, লজ্জা কি, বল না।"

নরেশ তথাপি চুপ করিয়া আছে দেখিয়া কর্ত্তা বলিলেন, "তোমার অভাব-অভিযোগের কথা যদি আমাদের না জানাও, তাহ'লে প্রতীকার হবে কেমন করে?"

গৃহিণী বলিলেন, "চুপ করে রইলে কেন নরেশ?—তবে কি তোমার প্রতি আমাদের কোনও স্নেহের অভাব দেখেছো?—তাই কি বলতে কুণ্ঠিত হচ্ছো?"

নরেশ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। অস্থির ভাবে বলিল, "না মা, একটুও না। বরং এতো বেশি স্নেহ পাচ্ছি আপনাদের কাছে, যে তাতে আমার সর্ব্বনাশ হ'তে বসেছে!"

বাধা দিয়া বিরক্ত ভাবে কর্ত্তা বলিলেন, "এ কথার অর্থ কি নরেশ?"

নরেশ বলিতে লাগিল, "আপনারা আমাকে এত বেশি আদর যত্ন করছেন, যে, আমি ছেলেবেলা থেকে ওটাতে মোটেই অভ্যস্ত নই বলে' আজ একেবারে হাঁপিয়ে উঠিছি!—আরাম আর আয়েস এই দুটো সর্ব্বনেশে জিনিস এত বেশি ক্লরে আমার জন্যে এখানে বন্দোবস্ত করা হয়েছে যে, কষ্ট বা পরিশ্রম—এগুলো যে কি রকম, তা আমি প্রায় ভুলে যেতে বসিছি। আমি আমার নিজের শক্তি-সামর্থ্য ক্রমশঃ হারিয়ে ফেল্‌ছি! আমার কাজ কর্ব্বার উৎসাহ চ'লে যাচ্ছে! আমার ভয় হচ্ছে, বুঝি বা আমার জীবনের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা সব অতৃপ্ত থেকে যাবে।"

গম্ভীর ভাবে কর্ত্তা বলিলেন, "তোমার জীবনের উচ্চ আকাঙ্ক্ষাগুলোর সন্ধান পেলে, হয় তো সেগুলো সার্থক করবার একটা উপায় করতে পারা যায়।"

নরেশ উৎসাহিত হইয়া বলিল, "দেখুন, আমি চাই নিজের চেষ্টায় উপার্জ্জন ক'রে আমার পরিবার প্রতিপালন করতে,—আমি চাই সমাজে একটা মান্য-গণ্য পদস্থ ব্যক্তি হোয়ে উঠ্‌তে—আমি চাই এই কর্ম্মহীন নির্জ্জীব কুঁড়েমির বাইরে গিয়ে একটা কার্য্যক্ষম জীবন্ত মানুষ হ'তে!"

কর্ত্তা হোঃ হোঃ শব্দে হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, "এ যে তোমার নিতান্ত আহাম্মুকের মতো খেয়াল নরেশ?—একে বলে সেই সুখে থাক্‌তে ভুতে পাওয়া!"

গৃহিণী কর্ত্তাকে চোখে কি একটা ইসারা করিয়া বলিলেন, "আহা, শোনই না ছাই সবটা আগে,—ওর মনের ইচ্ছেটা কি,—ও কি হ'তে চায় জেনে, সেই ভাবে ওকে তোমার সাহায্য করা উচিত। পাঁচপাঁচটা পাশ করেছে ও, —কেন হবে না শুনি ?" নরেশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বল তো বাবা, তোমার কি হ'তে সাধ যায়। হাইকোর্টের উকীল হবে, না শ্বশুরের মতো সদরআলা হাকিম হবার ইচ্ছে আছে ?"

তার পর আবার স্বামীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ও যা হ'তে চায়, তোমাকে তাই করে দিতে হবে, বুঝ্‌লে ? নরেশ আজ শুধু আমাদের জামাই নয়—ও আমাদের শশাঙ্কর অভাব ভুলিয়ে রেখেছে।"

কথাটা শুনিবামাত্র কমলার সর্ব্বশরীরে যেন একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ বহিয়া গেল ; কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মসম্বরণ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "আপনাদের জামায়ের যে রকম কল্পনার দৌড়, তাতে 'কবি' হওয়াই ওঁর পক্ষে সব-চেয়ে সুবিধে।"

নরেশ বলিল, "আমার এক বন্ধু মেদিনীপুরে ওকালতি করছে। এর মধ্যেই তার বেশ পসার হ'য়েছে। সে বলছিল আমাকে উকীল হতে—"

কমলা চোখ দুইটা কপালে তুলিয়া বলিল, "সর্ব্বনাশ ! তাহলে যে তোমাকে সেইখানে গিয়েই থাক্‌তে হবে ! এখান থেকে তো মেদ্‌নীপুরে ওকালতী করা পোষাবে না !"

নরেশ হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমার উকিল হবার ইচ্ছে নেই। পয়সার জন্যে যে কাজে মিথ্যেকেও সত্য বলে প্রমাণ করবার চেষ্টা করতে হবে, সে রকম নীচ উপজীবিকা আমি গ্রহণ করতে চাই না।"

কর্ত্তা শুনিয়া বলিলেন, "কাজটাকে যতটা খাটো ঠিক করেছ নরেশ, ওটা ততটা খেলো নয়। ন্যায় বা সত্যের প্রতিষ্ঠাও উকীলের সাহায্যেই হতে দেখিছি আমি।"

নরেশ তাহা স্বীকার করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, এক পক্ষে সেটাও ঠিক বটে। দেখুন,—আমাদের কলেজের প্রিন্সি-প্যাল সেদিন আমাকে প্রোফেসার হবার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। আপনি কি বলেন ?"

কর্ত্তা উত্তর দিবার আগেই গৃহিণী বলিলেন, "তাই বা কি করে হবে নরেশ ? তাহ'লে যে তোমাকে কলকাতায় গিয়ে থাকতে হবে !"

নরেশ বলিল, "সে তো যেতে হবেই মা ! আমি যদিও প্রোফেসার হতে ইচ্ছে করিনি, কিন্তু আজকালের মধ্যেই যে কলকাতায় চলে যাবো, সেটা একরকম ঠিক করে ফেলিছি !"

কথাটা শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "সে কি ! কলকাতায় চলে যাবে কেন ?"

কর্ত্তা বলিলেন, "প্রোফেসারি কাজটা বেশ সাধু কাজ বটে, কিন্তু উপার্জ্জনের দিকটা নেহাৎ অল্প। তা সে যা হয় পরে ঠিক করা যাবে। এখন বেলা হয়েছে। যাও, আগে নেয়ে খেয়ে নাও।"

গৃহিণী নরেশের কাছে সরিয়া গিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "হ্যাঁ বাবা, বলি কিছু দেনাপত্র নিয়ে জড়িয়ে পড়োনি তো ? হঠাৎ কলকাতা যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছো কেন, আমায় সব খুলে বল না—ভয় কি ;—আমি সব মিটিয়ে দেবো অখন।"

নরেশ মৃদু হাসিয়া বলিল, "না মা, আপনাদের আশী-র্ব্বাদে আমি ঋণের দায় থেকে অনেক দিন মুক্তি পেয়েছি। সে সব কিছু নয়। আমি কলকাতায় গিয়ে একটা কিছু ব্যবসা করবো ঠিক করছি !"

কর্ত্তা সে ঘর হইতে চলিয়া যাইতেছিলেন। নরেশের ব্যবসার কথাটা কাণে আসিতেই দরজার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—"নাঃ—এটাকে দেখ্‌ছি আর খেয়াল বলাও চলে না,—এ একেবারে নিছক্ পাগলামী ! ব্যবসা করবে কি হে, ও কি ভদ্রলোকের কাজ ! যাও, যাও, চট্ করে নেয়ে খেয়ে নিয়ে ক'সে একঘুম দাও গে, মাথাটা ঠাণ্ডা হবে তাহ'লে।"

নরেশ উত্তেজিত ভাবে বলিল, "আমার মাথার ভেতর যে আগুণ জ্বলছে—এ সহজে ঠাণ্ডা হবে না। যত দিন যাচ্ছে, ততই যেন সে আগুণের জ্বালা বাড়ছে !—আমি কাজ চাই—কাজ চাই—এখানে এমন নিশ্চেষ্ট নিরুপায় বসে বেঁচে থাকতে পার্ব্বো না। আমি এ হাত-পা-গুলোকে খাটাতে চাই। মনটারও একটা খোরাক চাই। আমার অন্তরের আশা আকাঙ্ক্ষাগুলোর একটা স্বাভাবিক নিবৃত্তির পথ খুঁজে নিতে চাই। এই কয়েদখানার মতো

বাড়ীটাতে আদবকায়দার হাতকড়ি পরে এ ভাবে আটক্ হোয়ে থাকা আর আমার সহ্য হচ্ছে না।"

কথাটা শুনিয়া কর্ত্তার ও গৃহিণীর মুখ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল। কমলা কিন্তু হাসিমুখেই বলিল, "শ্বশুর-বাড়ীটাকে যখন কয়েদখানা বলে মনে হ'চ্ছে ঠাকুরজামাই, তখন তোমার মনের অবস্থা যে খুবই খারাপ, এটা আমাদের নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হবে। তা কিসের ব্যবসা করবে মনে করছো? ধান চালের না গুড় পাটালীর?"

গৃহিণী বলিলেন—"তা বাছা, কাজ-কর্ম্মই যদি করতে চাও, তো এইখানেই কেন একটা কিছু কারবার ফেঁদে বোস না?"

কর্ত্তা বলিলেন, "সে কিছু মন্দ কথা নয়। তোমার মনের অবস্থা যখন এ রকম, তখন একটা কিছু কাজে লেগে যাওয়াই উচিত। তা তুমি এক কাজ কর না,—আমার জমীদারীটাই না হয় দেখা শোনা কর না। কিম্বা যদি একান্তই কোন কারবার করবারই ইচ্ছেটা বেশি থাকে, তা'লে তাইতেই লেগে যাও, মূলধন যা লাগে আমি দোবো। তোমার কাজ কর্ব্বার এই ঝোঁকটাকে আমি বন্ধ ক'রে দিতে চাইনি—ওটা খুব ভালো। সে ছোঁড়াটা ছিল কিন্তু—ঠিক তোমার উল্টো; কাজের নাম শুনলে ভয় পেতো! তা যাক্, আর গোলমাল কোর না—আমি শিগ্‌গিরই দেখে শুনে তোমায় যা হোক্ একটা কাজে লাগিয়ে দিচ্ছি—তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকো।"

নরেশ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল—"কিন্তু তা'হলে তো আমি স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারবো না! সে যে সকল রকমে আমাকে আবার আপনারই অধীন হোয়ে থাক্‌তে হবে! আমি কারুর সাহায্য নিয়ে কাজ আরম্ভ করতে চাই না। আমি নিজে স্বাধীন ভাবে আপনার পায়ের ওপোর ভর দিয়ে দাঁড়াতে চাই।"

"মূলধন পাবে কোথায়?"

"নিজের পরিশ্রমে উপার্জ্জন ক'রে নেবো। না পারি, কারুর কাছ থেকে আপাততঃ কিছু টাকা ধার করে নেবো। ধরুন আপনার কাছ থেকেই যদি চাই, তাহ'লে কি কিছু টাকা ধার পেতে পারি না?"

"একটী পয়সাও নয়।"

"কেন?"

"আমার ইচ্ছে; আমি তোমাকে ধার দেবো না।—কেন জানো?—আমি চাই, আমার জামাই ঠিক জামায়ের মতই বাড়ীতে থাকবে। আমি ইচ্ছে করি না যে, আমার মেয়ে কোনও ফিরিওয়ালা দোকানদার, কোনও চাকরে কেরাণী, কি কুলি মজুর কিম্বা পেশাদার উকিল মুহুরীর স্ত্রী বলে পরিচিত হয়।"

"স্বাধীন উপজীবিকা কি আপনি পছন্দ করেন না?"

পরাধীন দেশে পরাধীন জাতের আবার স্বাধীন উপ-জীবিকা কি? কথাটা শুনলে আমার হাসিও পায়, রাগও হয়। চোখের সামনে তো দেখ্‌তে পাচ্ছি—'স্বাধীন উপজীবিকা' বলে একটা লম্বা-চৌড়া ভড়কানো গোছের নাম দিয়ে করছে তো সবাই একটু ভদ্ররকমের ভিক্ষে!—একএকখানা বড় বড় সাইন-বোর্ড ঝুলিয়ে হাঁ করে হাত পেতে খদ্দেরের মুখ চেয়ে বসে আছে!"

"বলেন কি? ব্যবসায়ীদের আপনি ভিক্ষুকের দলে ফেলছেন? ও কথা বল্‌লে তাদের অপমান করা হয়।"

"কিছুমাত্র নয়। ব্যবসার প্যাঁচওয়া ফন্দী আর ঘোরালো জুচ্চুরীর চেয়ে বরং সোজা সুজি ভিক্ষে করা ঢের ভালো। তাতে অন্ততঃ লোককে ঠকানোর পাপটা এড়ানো যেতে পারে।"

"সে কি! ব্যবসা করাটাকে জুচ্চুরী বল্‌ছেন?"

"জুচ্চুরী নয় ত কি?—পাঁচ টাকার কেনা জিনিসটা তুমি পাঁচজনকে ভাঁওতা ঠকিয়ে আট টাকায় গছাতে পারলে তবে তো দুপয়সা লাভ পাবে? তাহ'লেই দেখ না কেন, ওটা জুচ্চুরী ঠগবাজী হোল না কি? কি জানো—ব্যবসাটা হচ্ছে ঠিক্ 'লাইসেন্স'-নেওয়া চুরি আর কি! প্রকাশ্য ভাবে সর্ব্বত্রই চল্‌ছে,—কেবল লাইসেন্সের জোরে 'পেনাল কোডের' ধারাগুলো এড়িয়ে যায়!"

"এ ভাবে বিচার করলে তো কোন কাজেই হাত দেওয়া চলে না দেখ্‌ছি!"

"তোমার দরকার কি বাপু হাত দিয়ে? তুমি রাজনগরের একটা পুরোনো বনেদী বড়লোকের ঘরে একটা সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়েকে বিবাহ করেছো—যাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কেউ কখন কুলি মজুরের মতো কেরাণীগিরী, মাষ্টারী কি মোক্তারী করেনি। চিরকাল পায়ের ওপোর পা দিয়ে বসেই কাটিয়েছে,—নয় তো বড় জোর—হাকিম

হ'য়ে হুকুম চালিয়েছে। তুমি আর কিছু পারো আর না পারো, অন্ততঃ তোমার স্ত্রীর পিতৃকুলের মানসম্ভ্রম, তাদের বংশমর্য্যাদাটা বজায় রেখে চলো। তুমি 'এম্-এ, বি-এ পাশ করেছো বটে, কিন্তু ও পাঠশালার ছাপ দেখে কেউ তোমাকে আমার চেয়ে বেশি খাতির করবে না—এটা তুমি নিশ্চয় জেনো। অথচ কাল যদি তুমি আমার জমীদারী হাতে নাও, দেখ্বে, রাস্তায় বেরুলে দুধারি লোক তোমাকে সেলাম কর্‌ছে! এত বড় যে ইংরেজ গভর্মেণ্ট এরাও ডেকে উপযাচক হোয়ে আমাদের খেতাব দেয়।"

"কিন্তু, আমি যে পরের ময়ূরপুচ্ছ নিয়ে বড় হতে চাই না—সেটা আপনি ভুলে যাচ্ছেন।"

"তুমি দেখ্‌ছি একটী আস্ত গাড়োল! যেটাকে পরের ময়ূরপুচ্ছ বলে' মনে করছো, সেটাতে যে তোমার এখন একটা নেয্য অধিকার জন্মেছে—সেটাই বা তুমি ভুলে যাচ্ছো কেন?—আমার যে এখন ঐ এক মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই! দুদিন্ বাদে যা সম্পূর্ণ তোমার নিজের হবে, আজ সেটাকে পরের জিনিস বলে তুচ্ছ করাটা যে তোমার আর একটা প্রকাণ্ড আহাম্মুকীর পরিচয় দেওয়া হচ্ছে।"

"স্ত্রীর প্রাপ্য সম্পত্তি দখল করে সম্ভ্রান্ত সাজাটাকে আমি অতি নীচ দীনতা বলে মনে করি!"

"তোমার কথাগুলো বড্ড বেশি কড়া হ'য়ে পড়্‌ছে। তুমি একটু সংযত হ'য়ে কথা কইলে আমি বড় বাধিত হব।"

শ্বশুর ও জামাতার কথাবার্ত্তা ক্রমেই কলহে পরিণত হইবার উদ্যোগ হইতেছে দেখিয়া, গৃহিণী তাড়াতাড়ি স্বামীর সন্নিকটে আসিয়া বলিলেন, "ওগো, থাক্ থাক্—তুমি আর বেশি তর্ক বিতর্ক কোর না। তর্ক করলেই তোমার মাথা গরম হ'য়ে ওঠে।" জামাতাকে বলিলেন "বাবা নরেশ, আর তর্কে কাজ নেই, ডাক্তাররা তোমার শ্বশুরকে তর্ক করতে বিশেষ করে নিষেধ করেছেন। উনি যা বলছেন শোনই না কেন। উনি তোমার গুরুজন, তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী। ওঁর কথা শুনে চললে তোমার ভালই হবে।" মেয়েকে বলিলেন, "খুকি, যা তো মা, ওঁর সর্ব্বতের গেলাসটা এনে দে তো—বকে বকে ওঁর গলা শুকিয়ে গেছে।"

কমলা বলিল "চল ঠাকুর জামাই—খাবে চল, সকাল থেকে এক পোড়া তর্ক জুড়ে অনেক বেলা করে ফেল্‌লে!"

নরেশ গম্ভীর হইয়া বলিল, "আমার ক্ষিধে নেই! আমি আজ আর কিছু খাবো না।"

গৃহিণী নরেশের ভাবগতিক দেখিয়া তাহার নিকটে আসিয়া স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, "ছিঃ বাবা, রাগ করতে আছে কি; চল খাবে চল।"

নরেশ উত্তেজিত ভাবে বলিল, "এ বাড়ীতে আমি আর জলস্পর্শ কোরবো না!"

লীলা ঠিক সেই সময় কর্ত্তার সর্ব্বতের গেলাসটি হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিতেছিল। নরেশের কথাটা কাণে আসিতেই সর্ব্বৎ-ভরা কাঁচের গেলাসটা তাহার হাত হইতে মেঝেয় পড়িয়া গিয়া চুরমার হইয়া গেল। হঠাৎ গেলাসটি ভাঙিয়া যাওয়ার শব্দে সকলেই একটু চম্‌কাইয়া উঠিল। কমলা ও গৃহিণী 'আহা হা!' করিয়া উঠিলেন। কর্ত্তা একবার করুণনেত্রে সেদিকে চাহিয়া বলিলেন, "যাক্‌গে- ওখানটা সাফ করিয়ে ফেল। উঃ! ভারি গরম বোধ হচ্ছে! জানালার সার্শীগুলো সব খুলে দাও কেউ।" বলিয়া খবরের কাগজখানা ভাঁজ করিয়া লইয়া নাড়িতে নাড়িতে বাতাস খাইতে সুরু করিলেন।

কমলা তাড়াতাড়ি গিয়া সার্শীগুলা খুলিয়া দিতে লাগিল। গৃহিণী একখানা পাখা আনিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। লীলা তখন ঘরের মেঝেয় নতজানু হইয়া শতখণ্ড কাঁচের গেলাসের টুক্‌রাগুলা হেঁট মুখে কুড়াইতেছিল। নরেশ নিতান্ত নির্লজ্জের মত একদৃষ্টে তাহাই দেখিতেছিল।

৫

পাখার বাতাস করিতে করিতে গৃহিণী কর্ত্তার কপালে হাত দিয়া দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওমা, তাই তো গো! ঈস্! এ যে বড্ড ঘেমেছো দেখ্‌ছি! রোসো, একখানা তোয়ালে এনে মুছিয়ে দিই। বৌমা! তুমি বাছা আর এক গ্লাস সর্ব্বৎ তৈরি ক'রে আনো—বকাঝকা ক'রে তোমার শ্বশুর বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।"

কর্ত্তা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "না—না, আর আনতে হবে না, কিন্তু এ কি! সকল বিষয়েই তর্ক। যা বলি তারই একটা উল্টো জবাব! এ রকম তো জীবনে কখনো আমি

দেখিনি! আমার মুখের ওপর তো আজ পর্য্যন্ত কাউকে জবাব দিতে শুনিনি!"

গৃহিণী তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন, "যাক্‌গে। ছেলেমানুষ অতশত জানে না, কথার পিঠে দু'কথা ক'য়ে ফেলেছে। ও তো এখনও তোমার ধাত ঠিক বুঝতে পারেনি! তাছাড়া আজ ক'দিন থেকেই ওর মনটাও একটু যেন খারাপ হ'য়ে রয়েছে—নারে খুকী?"

লীলা সলজ্জভাবে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল "হ্যাঁ।"

গৃহিণী উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন বল্ তো মা। তুই কিছু জানিস?"

লীলা নীরবে ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল।

গৃহিণী পাখাখানা রাখিয়া মেয়ের নিকট উঠিয়া গিয়া অনুনয় করিয়া বলিলেন, "খুকী, কি জানিস্ সব খুলে বল আমার কাছে—লুকোস্‌নে কিছু।"

"আমি তো তা কিছু জানি না মা!" বলিয়া লীলা তাহার উদ্গত অশ্রুজল গোপন করিবার জন্য ভাঙা কাঁচের টুক্‌রাগুলা জানালা দিয়া ফেলিয়া দিতে গেল, কিন্তু তাহার চক্ষের জল কমলার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে এড়াইতে পারিল না। কমলা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, "এ কি! কাঁদছিস কেন ভাই? কি হ'য়েছে?" গৃহিণীও সত্বর নিকটে আসিয়া বলিলেন, "তাই তো, কাঁদছিস্ যে! কি হয়েছে মা?"

কর্ত্তা একবার কন্যার অশ্রুনিসিক্ত মুখের দিকে ফিরিয়া দেখিয়া জলদগম্ভীর কণ্ঠে হাঁকিলেন "নরেশ! কি বলেছো তুমি ওকে? ও যে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে?"

গৃহিণীও জামাতার দিকে বিরাগপূর্ণ দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন, "নিশ্চয় একটা কিছু গুরুতর কাণ্ড হ'য়েছে,—নইলে ও তো সহজে কাঁদে না!"

লীলা তাড়াতাড়ি চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল—"কই, এই তো আমি তো আর কাঁদ্‌ছি না।"

কমলা হাসিয়া ফেলিয়া তাহার গালে একটা টোকা মারিয়া বলিল, "পোড়ারমুখী! এই মাত্র কাঁদ্‌ছিলি, আর বলছিস কাঁদিনি!"

নরেশ কঠোর বিদ্রূপের সহিত বলিয়া উঠিল, "এক ফোঁটা চোখের জল দেখে যার জন্যে আজ বাড়ীশুদ্ধ আপনারা অস্থির হোয়ে উঠেছেন, তার যা কিছু দুঃখ সব কিন্তু আপনাদেরই অনুগ্রহে! বোধ হয় এখন থেকে ওকে রোজই চোখের জল ফেলতে হবে!"

নরেশের কথা শুনিয়া সকলে সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নরেশ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিল, "দেখুন—আজ যখন কথাটা উঠেছে, তখন সব পরিষ্কার ক'রে বলাই ভালো। আমার মনে হয়, আমাদের এ বিবাহ বড় অশুভক্ষণেই হয়েছে। আমরা কেউই পরস্পরের যোগ্য নই। স্বামী-স্ত্রীর মিলনের যেটি প্রধান বন্ধন, আমাদের উভয়ের মধ্যে সেই বস্তুটারই একান্ত অভাব দেখ্‌তে পাচ্ছি!"

উত্তেজিত ভাবে গৃহিণী বলিলেন, "নরেশ!—কি বল্‌ছো তুমি এ সব?"

কর্ত্তা তাঁহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "তুমি থামো। ব্যাপারটা কি আমাকে ভালো ক'রে বুঝতে দাও। হ্যাঁ, কি বলছিলে নরেশ?"

নরেশ নির্ব্বিকার কণ্ঠে উত্তর দিল, "আমাদের স্বামী স্ত্রীর মিলনের মধ্যে প্রেমের পবিত্র বন্ধন স্থাপিত হয়নি।"

কর্ত্তা বিস্ফারিত নেত্রে নরেশের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। গৃহিণী কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন, "লীলা! নরেশ যে তোকে নিয়ে সুখী হ'তে পারেনি, এ কথা এত দিন আমাদের কাছে বলিস্‌নি কেন খুকী?"

লীলা কোনও উত্তর দিবার আগেই নরেশ বলিল, "এ ক্ষেত্রে অপরাধী ও নয় মা, অপরাধী আমি। আমিই ওর মনের মতো হতে পারিনি বোধ হয়, তাই ও আমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে পারেনি!"

গৃহিণী চিন্তিত মুখে মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"হ্যাঁরে, নরেশ যা বলছে, যদি যথার্থই অবস্থাটা তাই হয়ে থাকে, তবে তো—"

বাধা দিয়া নতমুখে লীলা বলিল, "উনি তাই মনে করেন মা। কিন্তু আমার মুখে তোমরা কি এক দিনের জন্যেও ও রকম কোনও কথা শুনেছো?"

বিজ্ঞের মতো গম্ভীর ভাবে নরেশ বলিল, "দেখুন, ওর মনের এখনও সম্পূর্ণ পরিণতি হয়নি। ও নিজেই হয় তো জানে না যে কি ওর অভাব, কোথায় ওর ত্রুটী। আর জানতেও বোধ হয় কোন দিন পার্ব্বে না, যদি ওকে

চিরকাল ওর এই পিতৃগৃহের অসংযত আদরের অন্তরালে এমনিই দায়িত্বহীন জীবন যাপন করতে হয়।”

কর্ত্তা তাঁহার চশমাখানা খুলিয়া কোঁচার কাপড়ে বেশ করিয়া মুছিয়া লইয়া আবার চক্ষে দিয়া বলিলেন,“অর্থাৎ—?”

নরেশ বলিতে লাগিল—“পিতামাতা ছাড়া এখন আরও একজনের প্রতি যে ওর একটা বড় রকম কর্ত্তব্য রয়েছে, পিতামাতার চেয়েও যার দাবী ওর ওপোর এখন সব থেকে বেশি—সেই সহজ শিক্ষাটাই ওর এখানে থাকলে কোন দিনই হবে না। ও তার স্বামীকে নিজের বড় ভায়ের চাইতে আর অধিক কিছু মনে করে না। ও জানে ওর যে স্বামী, সেও ওরই মতো চিরকাল এখানে থেকে ওর পিতামাতার আনন্দ বর্দ্ধন করবে এই মাত্র!”

কমলা মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—“সেটা বুঝি তুমি একেবারেই ইচ্ছে কর না?”

নরেশ উত্তেজিত ভাবে উত্তর করিল, “ইচ্ছে থাকলেও সেটা করা আমি বিধেয় মনে করি না। ওর সঙ্গে আমার সম্বন্ধের যেটা পরম বন্ধন, সেটা ও যে আজও হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি। আমি এখানে থাকি বা চলে যাই, তাতে ওর কিছুই আসে যায় না। ও চিরকাল এখানে ওর পিতামাতার স্নেহনীড়ে আদরে থাক্‌তে পেলেই চরিতার্থ হবে মনে করে। ওর নিজের কোনও স্বাধীন ইচ্ছে নেই, কোনও আশা আকাঙ্ক্ষা নেই, কোনও সাধ আহ্লাদ নেই! ওর পিতামাতার যা অভিরুচি, ওরও অবিকল তাই। আমাকে ভুলেও ও কখন কোনও অনুরোধ করে না। কোনও দিন ওর মনের কোনও সাধ, কোনও বাসনা—ও আমার কাছে জানায়নি। আজ পর্য্যন্ত ওর কাছে আমি একটা কোনও উচ্ছ্বসিত সোহাগের বাণী শুনতে পাইনি। ওর যত কিছু স্নেহ-ভালবাসা-ভক্তি-অনুরাগ সমস্তই যেন একমাত্র এঁদের দুজনেরই একচেটে সম্পত্তি। আর কারুর তাতে বিন্দুমাত্রও অধিকার নেই বোধ হয়।”

গৃহিণী এক গাল হাসিয়া বলিলেন, “ওগো, শুনছো?—লিলি আমাদেরই সব চেয়ে বেশি ভালবাসে বলে নরেশের ভারি রাগ হয়েছে।”

কর্ত্তাও সহাস্য মুখে কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হ্যাঁরে খুকী?—তুই আমাদের সব থেকে ভালোবাসিস বলে কি নরেশ রাগ করে?”

লীলা সলজ্জ ভাবে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল রায় বাহাদুর চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িয়া উচ্চ হাস্য করিয় বলিলেন “এঃ নরেশ! তুমি দেখ্‌ছি নেহাৎ ছেলেমানুষ এর জন্যে কি এতো রাগারাগি করতে আছে? লোকে শুন্‌লে যে তোমায় ভারি ঠাট্টা করবে!”

নরেশ তখন অধিকতর গম্ভীর হইয়া বলিতে লাগিল “দেখুন, এ ছেলেমানুষী নয়, আর এ ব্যাপারটা এমন হেসে উড়িয়ে দেবার মতোও নয়। আমাদের দুজনের মধে স্বামী-স্ত্রীর যে সম্বন্ধ স্থাপিত হ’য়েছে—তার স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তার পক্ষে ঐ জিনিসটাই আজ প্রধান অন্তরায় হ’য়ে দাঁড়িয়েছে! তাই আমি ওটাকে আর মোটেই সহ করতে পার্‌ছি না।”

কর্ত্তা নরেশের পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, “তাহ’লে দেখ্‌ছি নিশ্চয় তোমার মাথা খারাপ হ’য়ে গেছে বাবাজী!”

নরেশ বলিল, “তা হ’তে পারে—কিন্তু সে জন্যে আপনারাই সম্পূর্ণ দায়ী।”

কথাটা শুনিয়া কর্ত্তার মুখখানি গম্ভীর হইয়া উঠিল তিনি আবার চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন—“কি রকম?”

নরেশ বলিতে লাগিল—“আপনারা যেন আমাকে এখানে একটা কলের পুতুলের মতো করে রেখেছেন—আমি যেন আপনাদের আদুরে মেয়ের একটা খেলনার সামিল সে যদি ভুলেও কোন দিন আমাকে তার চেয়ে একটু বেশি কিছু মনে ক’রে, সেটা বোধ হয় আপনারা কেউই সহ করতে পার্‌বেন না।”

কর্ত্তা রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, “নরেশ, তুমি একটু সংযত হোয়ে কথা কও!”

নরেশ হাত জোড় করিয়া বলিল, “আজকের মতে আমার বেয়াদবিটুকু আপনারা মাপ করবেন। আমি আজ খোলাখুলি গোটাকতক কথা বল্‌তে চাই। আমার বক্তব্য আর কিছু নয়,—আমি শুধু আপনাদের জানাতে চাই যে, পিতামাতার স্নেহচ্ছায়ায় চিরদিন পরিবৃত থাক্‌লে কোন বালিকাই তার স্বামীর যথার্থ পত্নী হবার যোগ্যতা লাভ করতে পারে না। এই দায়িত্বহীন বেষ্টনের মধ্যে বন্দিনী হ’য়ে থাকলে, এও বোধ হয় কোন দিনই যাবে

বলে প্রকৃত গৃহলক্ষ্মী, সংসারের কর্ত্রী, পতির সহধর্ম্মিণী বা স্বামীর জীবনসঙ্গিনী—তা হো'য়ে উঠ্‌তে পার্‌বে না। চিরকাল এম্‌নিতর এক অবোধ বালিকাই থেকে যাবে!"

কমলার চোখে মুখে একটা দুষ্ট হাসি ফুটিয়া উঠিল। সুস্পষ্ট বিদ্রূপের ঝঙ্কার দিয়া সে বলিল, "তবে যে বল্‌তে—ওর এই ছেলেমানুষীটুকুর জন্যেই লীলাকে তোমার সব চেয়ে বেশি মনে ধরেচে?"

নরেশ ইহাতে কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া উত্তর দিল—"সে কথা আমি এখনও অস্বীকার করছি না বৌদি! ওর ওই বালিকাসুলভ স্বভাব যথার্থই আমাকে মুগ্ধ করেছে—ওর ওই শান্ত স্নিগ্ধ সরলতা আমাকে যেন এক অপূর্ব্ব আনন্দ কিরণে অভিষিক্ত করে দিয়েছে! ওর অনাবিল সঙ্গ, অকলুষ স্পর্শ যেন নির্ম্মল উষালোকের মতো আমার দেহ মন উজ্জ্বল ও পবিত্র করে দিয়েছে! ও যেদিন হাসিমুখে আমারই গলায় তার বরমাল্যখানি পরিয়ে দিলে, সেদিন আমি ওকে পেয়ে আমার জীবন ধন্য মনে করিছিলুম; আমার জন্ম সার্থক হ'ল ভেবেছিলুম! জগতের যা কিছু সৎ, যা কিছু মঙ্গল,—যা কিছু কল্যাণকর,—তারই মূর্ত্তিমতী ছায়ার মতো ও সেদিন আমার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করেছিল! ওর অনিন্দ্যসুন্দর মূর্ত্তিখানি সেদিন বিকশিত শতদলে কমলার কনক-প্রতিমার মতো আমার চক্ষে যেন মহামহিমময়ী হ'য়ে প্রকাশ পেয়েছিল! কিন্তু আজ আর আমাদের মধ্যে কোনও দূরত্ব নেই। আজ আমি ওর একান্ত নিকটতম আত্মীয় হ'য়ে শুধু ওকে প্রশংসার চক্ষে দেখেই পরিতৃপ্ত হ'তে পার্‌ছি না!—আমি চাই যে সেও আজ আমাকে তার অনির্ব্বচনীয় প্রেমে অভিষিক্ত ক'রে নিক। আজ আর আমি শুধু প্রতিমার সম্মুখে অর্চ্চকের আসন অলঙ্কৃত করে নির্ব্বিকার বসে থাকতে পার্‌ছি না; আজ আমি চাই যে ওর অন্তরের সুপ্ত ভাবরাশি জাগ্রত ও জীবন্ত হ'য়ে উঠে আমার হৃদয়ের সকল চিন্তাকে পরিবেষ্টন করে নিয়ে তাকে তৃপ্ত করে দিক্—শান্ত করে দিক্।—আমার এ দুঃখদগ্ধ জীবন আজ সেই মহামিলনের আনন্দ কিরণে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠুক! জন্মার্জ্জিত অভ্যাস ও সংস্কারের দোষে যে আকর্ষণটা আজ তার মনে প্রবল হোয়ে উঠে আমাকে তার কাছ থেকে দূরে রেখে দিয়েছে—আমি নিষ্ঠুরের মতো সেটাকে চূর্ণ করে দিয়ে—আজ আমাদের দুজনের মধ্যে সব ব্যবধান দূর করে ফেল্‌তে চাই!"

গিন্নী চুপি চুপি কর্ত্তার কাণে কাণে বলিলেন, "জামাই দেখ্‌ছি মেয়েটাকে খুব ভালবাসে!"

কর্ত্তা গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া জানাইলেন "হুঁ, কিন্তু ছোক্‌রার দেখ্‌ছি মাথার গোলমালও একটু আছে। বড় নির্লজ্জ বেহায়ার মতো যা-তা আমাদের সাম্‌নে বলছে।"

গিন্নী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আজকালকার ছেলেরা যে লঘু-গুরু মানে না গো!"

লীলা ধীরে ধীরে জননীর নিকট আসিয়া বলিল, "মা, আমার নতুন নেকলেস্‌টা বার ক'রে দিও, চারু বাবুর ওখানে আমি একলাই যাবো মনে কর্‌ছি। এই নিয়ে যখন এত রাগারাগি—তখন তুমি না যেতে পারলেও আমাকে অন্ততঃ যেতেই হবে দেখছি!"

কমলা কথাটা শুনিতে পাইয়া লীলার পিঠে একটি ছোট চাপড় মারিয়া বলিল, "আঃ, বাঁচালি ভাই!—"তার পর নরেশের কাছে আসিয়া বলিল, "তোমার উনি নেমন্তন্ন যেতে রাজি হয়েছেন, এইবার সব গোল মিটলো তো?—নাও,—এখন চল, নাইবে খাবে চল—"

নরেশ সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না—না এ শুধু নেমন্তন্ন যাওয়া না যাওয়ার কোনও কথা নয়,—এটা তার চেয়েও ঢের গুরুতর কথা। নেমন্তন্ন যেতে চা'ক্ বা না চা'ক্, তাতে আমার কিছু যায় আসে না!"

লীলা মুখখানি ভারি করিয়া জননীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "দেখ্‌লে তো মা! যেই রাজি হলুম, অম্‌নি বল্‌লে যাক্ না যাক্ তাতে কিছু যায় আসে না!—এ কি রকম বল তো! উনি যখন যা চান, যেই কিন্তু সেটা করা হয়—অম্‌নি বলেন—'আমি তো তা বলিনি!' তখন আবার ঠিক্ উল্টো আর একটা কিছু ধরে বসেন!—আমি বাপু অত মন যুগিয়ে চল্‌তে পারি না!"

গৃহিণী তখন কন্যার পক্ষ লইয়া জামাতাকে বলিলেন, "নরেশ! তুমি কিন্তু বাবা আজ এই নেমন্তন্ন যাওয়া নিয়েই সকাল থেকে রাগারাগিটা বাধিয়েছো?"

নরেশ বলিল, "না মা, সে জন্যে নয়, বিবাদটা হচ্ছে আসলে—আমাদের দু'জনের যে প্রকৃত সম্বন্ধ—তারই চূড়ান্ত দাবী দাওয়া নিয়ে!—আমি স্ত্রীর কাছ থেকে স্বামীর

যা যথার্থ প্রাপ্য, তাই থেকে বঞ্চিত হ'য়ে রয়েছি। মাঝে মাঝে সৌভাগ্য ক্রমে আমি ওর কাছ থেকে যে সহানুভূতিটুকু পাই, সে যেন দীনের প্রতি দাতার করুণা ভিক্ষার মতো! নাম যশ পুণ্য বা কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে উদ্বোধিত যে কাজ, তার সঙ্গে কোন দিনই হৃদয়ের কোনও ঐকান্তিক যোগ থাকে না। আমিও তাই আজ পর্য্যন্ত ওর হৃদয়ের আন্তরিক কোনও পরিচয় পেয়ে ধন্য হ'তে পারিনি—আর তা বোধ হয় কখনো পার্ব্বোও না—যদি না ওকে আমি শীগ্‌গির আপনাদের কাছ থেকে তফাৎ ক'রে নিতে পারি!"

গৃহিণী শঙ্কিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি তবে লীলাকে আমাদের কাছ থেকে তফাৎ ক'রে নিতে চাও?"

কর্ত্তা বলিলেন—"তোমার উদ্দেশ্যটা আমরা ঠিক্ বুঝতে পাচ্ছি না নরেশ!"

নরেশ বলিতে লাগিল, "আমি চাই ওকে আমার সত্যকার স্ত্রীরূপে পেতে,—আর সেটা সম্ভব হবে কেবল সেই দিনই, যে দিন ও বুঝ্‌তে পারবে যে, ও আর শুধু আপনাদেরই কন্যা নয়, আমার স্ত্রীও বটে। যে দিন, যে মুহূর্ত্তে ও জানতে পারবে যে, আপনাদের পরিত্যাগ ক'রে গেলেও ওর দিন বেশ সুখেই চল্‌তে পারে, সে দিন সেই মুহূর্ত্তেই আমি ওর হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করতে পারবো।"

বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে স্বামীর দিকে চাহিয়া গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বল্‌ছে এ?"

পেচকের মতো দুই চক্ষু বাহির করিয়া উভয় হস্তই নাড়িতে নাড়িতে কর্ত্তা বলিলেন—"কি জানি! কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।"

নরেশ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বলিতে লাগিল, "কেবলমাত্র পিতামাতার অনুগত আদুরে মেয়ে হওয়া ছাড়া, ওকে যদি কোনও দিন পতির অনুরক্তা স্বামীর ছন্দানুবর্ত্তিনী সুশীলা ও সুচরিতা পত্নী হ'তে হয়, তাহ'লে এই বেলা ওকে এ বাড়ী ত্যাগ করে যেতে হবে। এ ভাবে এখানে থাকলে ওর জীবন যে পথে গ'ড়ে উঠ্‌বে, আমরা সকলেই তাতে চিরকালের জন্য অসুখী হবো—আমি তাই সময় থাকতে ওকে আমার নিজের আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাই।"

নরেশের মনোগত অভিপ্রায়টি যখন এমনই নিদারুণ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, আর তাহাতে কোন প্রকার সন্দেহ প্রকাশ করা চলে না, তখন কাতর ভাবে গৃহিণী বলিলেন, "লীলাকে ছেড়ে যে আমরা থাক্‌তে পারবো না বাবা! ওকে যদি তুমি কেড়ে নিয়ে যাও, তাহ'লে আর আমরা বাঁচবো না!"

কর্ত্তাও এবার নরম হইয়া বলিলেন, "দেখ নরেশ, একটা কথা বলি শোনো। তুমি তো জানো—আমাদের পাঁচটি সন্তান হ'য়েছিল। কিন্তু তাদের চারটিকে একে একে ভগবান তাঁর কোলে টেনে নিয়েছেন। এখন কেবল ওই একটা মেয়েই আমাদের জীবনের সম্বল পড়ে আছে, ওকে নিয়েই কোনও রকমে আমরা বেঁচে আছি—"

ব্যাকুল হইয়া গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন, "ওকে আমরা চোখের আড়াল করতে পার্ব্বো না; আর জন্মাবধি আমাদের ছেড়ে ও কখনও কোথাও গিয়ে এক দিনের জন্যে থাকেনি। ও কি আমাদের কাছ থেকে যেতে পারে? ও গেলে আমরা যে এ বাড়ীতে আর একদণ্ডও তিষ্ঠুতে পার্ব্বো না!"

নরেশ অবিচলিত কণ্ঠে বলিল, "কাজটা যতই কেন কঠিন ও কষ্টকর হোক্ না, এ আপনাদের করতেই হবে। আপনারা উদ্যোগী হ'য়ে যথা সময়ে যদি না ওকে ওর নিজের গৃহে পাঠান, তাহ'লে সবার বড় আত্মীয় হয়েও সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করবেন ওর আপনারাই। তাই বলছি, প্রসন্ন মনে অনুমতি দিন—আমি ওকে সময় থাকৃতে ওর স্বস্থানে নিয়ে যাই।"

গৃহিণী এবার কাঁদ-কাঁদ হইয়া কর্ত্তাকে বলিলেন, "ওগো, কি হবে তাহ'লে? আমি লীলাকে ছেড়ে কি করে থাক্‌বো? তুমি নরেশকে একটু বুঝিয়ে বল না!"

কর্ত্তা তখন চেয়ার হইতে উঠিয়া নরেশের কাছে সরিয়া আসিয়া বলিলেন, "দেখ নরেশ, তোমাকে আমরা ভালো ছেলে ব'লেই জানি। আমাদের যাতে কষ্ট হবে, সে কাজ বোধ হয় তুমি কখনই কর্ব্বে না।"

নরেশ হেঁটমুখে মাটির দিকে চাহিয়া উত্তর দিল, "অপ্রিয় হ'লেও কর্ত্তব্যকে অবহেলা করা চলে না। জানি, আপনাদের খুবই মনকষ্ট হবে; কিন্তু উপায় নেই। দু'দিনের জন্যে সেটুকু কোনও রকমে সহ্য ক'রে থাকৃতে হবে। স্নেহের বশে অন্ধ হোয়ে এটুকু স্বার্থত্যাগ করতে না পারলে,

আপনাদের মেয়েরই আখের-উমের মাটি করা হবে। আমি যদি এই বেলা ওকে এখান থেকে না নিয়ে যাই, তাহ'লে আমাদের দু'জনের জীবনই চিরকালের জন্যে অসুখী হ'য়ে যাবে, আর আমাদের সে অবস্থাটা, আমি জানি, আপনাদের পক্ষেও মোটেই প্রীতিকর হবে না। তাই মিনতি করে বল্‌ছি, আর অমত কর্ব্বেন না, কাল দিন ভালো আছে. কাল আমরা আপনাদের কাছে বিদায় নিয়ে যাই।"

ক্রোধে, ক্ষোভে, অভিমানে আগুণ হইয়া কর্ত্তা বলিয়া উঠিলেন—"অসম্ভব! সে হ'তে পারে না নরেশ!"

গৃহিণী বলিলেন, "আমাদের এই সর্ব্বনাশ কর্ব্বার জন্যেই কি আমরা তোমার হাতে লীলাকে তুলে দিয়েছিলুম? বিয়ের আগে তো তোমার সঙ্গে এ নিয়ে একটা বোঝাপড়া হ'য়েছিল—যে লীলা আমাদের এখানেই থাক্‌বে।"

কর্ত্তা বলিলেন, "নিশ্চয়, সে কথা তখন বার বার ক'রে আমি ওকে বলিছি,—ও তখন তাতেই স্বীকার হয়েছিল; কিন্তু এখন বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাচ্ছে! দেখ নরেশ, আমি তোমাকে এখনও ভালো করে বল্‌ছি, মিনতি করে বল্‌ছি, তোমার ও দুরভিসন্ধি ত্যাগ কর। তোমার ভবিষ্যতে যাতে ভাল হয়, তোমরা স্বামী স্ত্রী দু'টিতে জীবনে যাতে না কখন কষ্ট পাও, আমি তার সমস্ত সুবন্দোবস্ত করে রেখেছি। তবু যদি তুমি এমন অন্যায় অভদ্রতা করতে চাও, তাহ'লে জান্‌বো যে, আমরা ভুল ক'রে একজন ইতরের হাতে মেয়ে দিয়েছি। দেখ, একটা কথা বলি তোমায় শোন,—হয় ত তুমি যা ব'ল্‌ছ সব ঠিক্; কিন্তু আমরা কটা দিনই বা আছি?—এ বৃদ্ধ বয়সে আর আমাদের এত বড় আঘাতটা দিয়ো না। যে কটা দিন বাঁচি—আমাদের সুখে মরতে দাও। আমি তোমার কাছে এইটুকু ভিক্ষে চাচ্ছি। এ বংশের কেউ কখনও কারুর কাছে এতটা হীনতা স্বীকার করেনি—"

কর্ত্তার উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়া নরেশ বলিল, "আমাকে আপনারা মাপ করুন। অন্য কোন উপায় থাক্‌লে আমি কখনই এ কাজ করতুম না; কিন্তু আমি নাচার। হাজার অপ্রিয় হলেও এ কাজ আমাকে করতেই হবে। আজ যদি আপনাদের মুখ চেয়ে আমার সঙ্কল্প কাজে পরিণত করতে ইতস্ততঃ করি, তা'হলে জন্মের মতো আমাকে অসুখী হ'য়ে থাক্‌তে হবে। সুতরাং লীলাকে আমি আজকালের মধ্যে নিশ্চয়ই নিয়ে যাবো জানবেন,—এ বিষয়ে কারুর কোন আপত্তিই আমি শুনবো না স্থির করিছি।"

গৃহিণী ব্যাকুল হইয়া বলিলেন "না নরেশ, লীলাকে আমরা কিছুতেই যেতে দিতে পার্ব্বো না।"

কমলা উত্তেজিত ভাবে বলিল, "নিশ্চয়, কখনই যেতে দেবো না। কার সাধ্য লীলাকে এ বাড়ী থেকে এক পা নিয়ে যায়!"

অবসরপ্রাপ্ত হাকিম রায় বাহাদুর মুকুন্দ মজুমদারের মলিন মুখে একটা করুণ হাস্যের বিবর্ণ ছায়া দেখা দিল! মর্ম্মান্তিক হতাশের একটা বেদনাতুর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তিনি কমলার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"সে যে হয় না মা; লীলার স্বামী যদি তাকে এখানে রাখতে অসম্মত হয়—তাহ'লে জোর করে তাকে এখানে ধরে রাখবার আমাদের কোন আইনসঙ্গত অধিকার নেই! নরেশের সঙ্গেই ওকে যেতে হবে—তা সে যেখানেই হোক!"

লীলা তাহার উদ্গত অশ্রুজল বস্ত্রাঞ্চলে মুছিতে মুছিতে মায়ের নিকট সরিয়া আসিয়া বলিল, "না মা—আমি তোমাদের ছেড়ে আর কোথাও যেতে পার্ব্বো না!"

গৃহিণী কন্যাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া প্রায় সরোদনে বলিতে লাগিলেন—"কি করবে মা, না পারলেও তোমাকে যেতেই হবে; হিঁদুর মেয়ের যে পতি ভিন্ন আর গতি নাই! আর শুন্‌লে তো মা,—উনি বললেন তোমাকে রাখবার আমাদের কোন অধিকারই নেই!' কর্ত্তব্য যতই কঠোর হোক্ না কেন, আমরা তা পালন করতে বাধ্য!"

লীলাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া কমলা তাহার চোক দু'টি মুছাইয়া দিতে দিতে নরেশকে ভর্ৎসনার সুরে বলিতে লাগিল, "ছিঃ! তুমি এতবড় শয়তান! তোমার শরীরে কি একটুও দয়ামায়া নেই? তোমার মনে কি একতিল বিবেচনা নেই? আমাদের সকলকে ব্যথা দিয়ে আমাদের সমস্ত অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করে তুমি একে কেড়ে নিয়ে যেতে চাও? কিন্তু—আমি বেঁচে থাকতে তা হতে দিচ্ছি না জেনো! লীলা এখনও ছেলেমানুষ—নেহাৎ কচি বাচ্ছা! এই দুধের মেয়েকে আমি একলা পাঠাবো তোমার মতো একজন একগুঁয়ে লোকের ঘর করতে? সে তুমি মনের

কোণেও ঠাঁই দিও না। আমিও যাবো ওর সঙ্গে—যেখানেই তুমি নিয়ে যাও না কেন ওকে! আমি কিছুতেই একে একলা তোমার মতো এক গোঁয়ারের হাতে ভরসা ক'রে ছেড়ে দিতে পারি না। যার মনে এক ফোঁটা দয়ামায়া নেই, সে সব করতে পারে! কোন্ দিন রাগের মাথায় হয় ত' একে মেরেই বস্‌বে! আমি থাক্‌বো এর কাছে অষ্ট প্রহর পাহারা দিয়ে, দেখি তুমি এর কি করতে পারো?"

কমলার এতবড় ভর্ৎসনাটা উচ্চ হাস্যে উড়াইয়া দিয়া, তাহার সমস্ত ভীতি প্রদর্শনকে এক মুহূর্ত্তে ব্যর্থ করিয়া, নরেশ খুব আগ্রহের সহিত বলিয়া উঠিল, "বাঃ, এ তো বেশ ভাল কথা বৌদি! এই সবে প্রথম নতুন সংসার পাততে যাচ্ছি—আমরা দু'জনেই এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; কিছুই জানি না। তুমি যদি দয়া ক'রে গিয়ে আমাদের গোড়ার' দিকটার সব গোছ-গাছগুলো ক'রে দাও, সে তো তা হ'লে খুব ভালই হয়!"

দ্বিতীয় অংশ

১

কমলা মুখে যাহা বলিয়াছিল, কাজেও তাহাই করিয়াছে। নরেশ যেদিন সত্য সত্যই লীলাকে তাহার পিত্রালয় হইতে লইয়া আসিল, কমলাও তাহাদের সঙ্গে আসিয়াছিল। তারপর আজ প্রায় এক বৎসর হইতে চলিল—কমলা কিন্তু এখনও লীলার নিকট হইতে চলিয়া আসিতে পারে নাই। ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া পত্নীকে তাহার পরমাত্মীয় দু'টীর স্নেহপাশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনায়, পতি-পত্নীর মধ্যে যে কঠিন ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছিল, অসাধারণ সংযম ও অধ্যবসায়ের সহিত নরেশ তাহা দূর করিবার একান্ত চেষ্টা করিতেছিল বটে, কিন্তু দুরদৃষ্ট বশতঃ সেদিনও পর্য্যন্ত তাহাদের মধ্যে সন্ধি বা শান্তির কোনও পুণ্য প্রতিষ্ঠান ঘটিয়া উঠে নাই; তাই কমলাও আর নিশ্চিন্ত হইয়া গৃহে ফিরিতে পারে নাই।

শ্বশুরালয় পরিত্যাগ করিয়া আসিবার অল্প দিন পরেই সৌভাগ্যক্রমে নরেশ গভর্ণমেণ্টের 'মিউনিশন' বিভাগে যুদ্ধসংক্রান্ত মাল সরবরাহের কাজ পাইয়াছিল। তাই আশাতিরিক্ত অর্থ উপার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গেই লীলার মনোরঞ্জনের জন্য সে একখানি প্রাসাদ-তুল্য নূতন বাড়ী কিনিয়াছে। প্রিয়তমার পিতৃগৃহের যে ঘরে যেখানে যে আস্‌বাবটি যেমন করিয়া সাজানো ছিল, নরেশ কলিকাতার সমস্ত দোকানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া হুবহু সেই রকমেরই সব জিনিসপত্র আনিয়া এ বাড়ীখানিকেও ঠিক তেমনিই করিয়া সাজাইয়াছে; কিন্তু তথাপি লীলার নিকট হইতে এখনও নরেশ তাহার অপরাধের জন্য ক্ষমা লাভ করিতে পারে নাই।

সেদিন সকালে নূতন বাড়ীর ড্রয়িংরুমে একখানি আরাম-চেয়ারে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বসিয়া লীলা কার্পেটের উপর পশমের নক্সা বুনিতেছিল; আর কমলা পাশের একখানি কৌচে বসিয়া লীলাকে নবপ্রকাশিত একখানি উপন্যাস পড়িয়া শুনাইতেছিল। গল্পটী শুনিতে শুনিতে হঠাৎ লীলার হাতের বোনার কাঠি কার্পেটের অসমাপ্ত ঘরে স্থির হইয়া গেল। কমলা তখন পড়িতেছিল—

"স্ত্রী এবার জোর করিয়া বলিল, 'না!' গোড়ায় বটে স্বামীর অপরাধ হইয়াছিল; কিন্তু এবার সম্পূর্ণ দোষ স্ত্রীর। প্রাণপণ যত্নে সে পত্নীকে সুখী করিবার চেষ্টা করিয়াছে, যাহাতে স্ত্রী তাহার অপরাধ ভুলিয়া গিয়া হাসিমুখে তাহাকে ক্ষমা করিতে পারে। যাহাতে অন্ততঃ করুণাপরবশ হইয়াও স্ত্রী তাহাকে আবার পূর্ব্বের ন্যায় প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে, এই আশায় দিবারাত্রি বেচারী কত না কষ্ট, কত না মনোবেদনা সহ্য করিতেছে। যত বড় একগুঁয়ে মেয়েই হোক্ না কেন, পিতামাতার প্রতি যত বেশি টানই তার থাক্ না কেন, স্বামীর সে প্রাণপাত যত্ন, সে অগাধ অকৃত্রিম ভালবাসা যে এমন অযাচিত ভাবে পায়, সে কখনই তার অনুতপ্ত পতিকে মার্জ্জনা না করিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু অদ্ভুত এই মেয়েটার চরিত্র! যে, সে কিছুতেই তার এমন স্বামীরও অনুরাগিণী হইতে পারিল না। স্বামী তার যেমন প্রতি দিন নিজের স্বার্থ ও সুবিধার সহস্র হানি স্বীকার করিয়াও বিমুখ পত্নীর প্রেমনিষ্ঠ হইয়া তাহাকে সদয় দেখিবার জন্য উন্মুখ হইয়া অপেক্ষা করিতেছে, স্ত্রী কিন্তু তেমনিই নীচ স্বার্থপরের ন্যায় তার সুখ সুবিধার ঈষৎ ব্যতিক্রমটুকু কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছে না। স্বামী যেমন তাহার অপরাধের তুলনায় শতগুণ বেশি প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে—স্ত্রী কিন্তু

তেমনি নির্ব্বোধের ন্যায় তার নিজের অপরাধের বোঝা প্রতি দিন ভারি করিয়া তুলিতেছে! কাঁচা ঘুমটি ভাঙিয়া দিয়া শিশুকে জাগাইয়া তুলিলে, তার অভিমানের একঘেয়ে কান্না যেমন কিছুতেই থামিতে চাহে না, এ অভাগিনীর অভিমানের অন্ধকারও যেন তেমনি কিছুতেই দূর হইতেছিল না। সহস্র চেষ্টা করিয়াও স্বামী তাহাকে প্রবোধ দিতে পারিতেছে না।"

কমলার পড়ায় বাধা দিয়া লীলা চকিত বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "বৌদি! সত্যিই কি ও বইখানায় ওসব কথা লেখা রয়েছে?"

"সত্যি নয় ত কি আমি এসব বানিয়ে বলছি?"

"যা পড়লে তাই কি সব ঠিক অক্ষরে অক্ষরে লেখা?"

"অত কথায় কাজ কি বাপু, তুমি কেন নিজেই একবার স্বচক্ষে পড়ে দেখ না।" এই বলিয়া কমলা বইখানি লীলার হাতে তুলিয়া দিল। লীলা অনেকক্ষণ বইখানি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল, তার পর ধীরে ধীরে বন্ধ করিয়া কমলাকে ফিরাইয়া দিল। কমলা এতক্ষণ উদ্‌গ্রীব হইয়া লীলার মুখভাব লক্ষ্য করিতেছিল। বইখানি ফেরত পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন, এখন বিশ্বাস হ'লো তো?"

লীলা একটু চিন্তিত ভাবে বলিল, "দেখ, এ উপন্যাসখানার ঘটনাটা আমার জীবনের ব্যাপারের সঙ্গে যেন অনেকটা মিলে যাচ্ছে! কিন্তু কে লিখেছে—তার নাম নেই তো? গ্রন্থকারের নাম কি জানো?"

"কি ক'রে জানবো বল? তুমি যা বল্‌লে, বইখানা পড়তে পড়তে আমারও ঠিক তাই মনে হয়েছিল বটে! তা আমি ভাবলুম, বোধ হয় হঠাৎ কোন দৈবচক্রে এ উপন্যাসের ঘটনা সব তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর অবস্থার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে!"

লীলা অসহিষ্ণুর মত তীব্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "না বৌদি! তুমি জানো না, এ নিশ্চয় কেউ জানাশুনো লোক, আমাকে উপহাস কর্ব্বার জন্যে ইচ্ছে করেই এসব লিখেছে। কিন্তু কে সে বল ত?"

"তোমাদের ভেতরকার ঘরোওয়া কথা সব জানে অথচ বইটই লিখ্‌তে পারে—এমনতর আত্মীয় যে কেউ আছে, তা তো আমি জানি না!"

"দেখ, আমার বোধ হয় এ কোনও পুরুষ মানুষের লেখা, বন্ধুত্বের খাতিরে যার কাণে এসব কথা কতকটা পৌঁছেচে!"

মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "কথাটা কোন্ দিক থেকে আর একজনের কাণে পৌঁছেচে শুনি? তবে কি নরেশই মনের দুঃখে—"

বাধা দিয়া লীলা বলিল—"সে যেদিক থেকেই হোক্ না,—যে লোকটা কিন্তু লিখেছে, সে একটি একের নম্বর গাধা! পিতামাতার প্রতি সন্তানের স্বাভাবিক টান, আর মেয়েছেলের প্রতি তাঁদের অগাধ স্নেহটাকে এ মূর্খের মত কেবল কদর্য্য বিদ্রূপ করেছে! তার মাধুর্য্য বা মহত্বটুকু একবারও এই হৃদয়হীন লেখকটির চোখে পড়েনি, কিম্বা হয়ত' ইচ্ছে ক'রেই সেদিকটায় চোখ বুজিয়ে লিখে গেছে!"

কমলা এবার উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল, "তুমি যে দেখছি বইখানার অপ্রকাশিত লেখকটির ওপর একেবারে হাড়ে চটে গেলে!"

"যাবো না!—এক যায়গায় দেখলুম, নির্লজ্জের মত লিখেছে কি না—'সে স্ত্রী অসতী, যে স্বামীর চেয়ে তার পিতামাতাকে বেশি ভালবাসে!' সতীত্ব সম্বন্ধে লেখকটির কি চমৎকার ধারণা দেখেছো? সাধে কি মূর্খ বলছি,—পিতামাতাকে ভালবাসা ভক্তি করা যে সতীত্বেরই একটা আদর্শ গুণ—এ সাধারণ জ্ঞানটুকুও এ লোকটির মাথায় নেই!"

"না লীলা, এ কথায় আমি তোমার সঙ্গে সায় দিতে পারলুম না। কেন না, তুমি যা এতে নেই বল্‌ছো, তা কিন্তু ঠিক্ পরের পাতাটায়ই রয়েছে—সবটা পড়লে বুঝতে পারতে;—এই শোনো—"

কমলা পড়িতে লাগিল—"মেয়ে যখন অবিবাহিতা বালিকা, তখন পিতামাতার প্রতি তার সমস্ত স্নেহ ভালবাসা অর্পিত থাকাই স্বাভাবিক; কিন্তু যৌবনে সুযোগ্য স্বামীর সাহচর্য্যে চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, তেমনিই পতিপ্রেম তার সমস্ত স্নেহ-ভালবাসা আকর্ষণ ক'রে রাখে। তার পর যখন সে সন্তানবতী জননী হইয়া উঠে, তখন অবশ্য তার সেই মাতৃহৃদয় সমস্ত জগৎকেই অপরিসীম স্নেহধারায় অভিষিক্ত ক'রে দিতে চায়!"

দুই কাণে দুই হাত দিয়া লীলা বলিয়া উঠিল, "থাক্—থাক্, বৌদি ; বন্ধ কর, ও ছাই-ভস্ম আর তোমার পড়তে হবে না। আমি ও শুন্‌তে চাই না। যতই শুন্‌ছি, ততই বইটার ওপর আমার অশ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে—আর যে লোকটা লিখেছে তার ওপর আমার একটা ঘেন্না ধরে যাচ্ছে! ছিঃ! তুমি কি আর পড়বার মতো বই খুঁজে পেলে না বৌদি ?"

কমলা এ প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়া নীরবে নতমুখে বইখানার পাতা উল্টাইতে লাগিল। লীলাও অনেকক্ষণ চুপ করিয়া কার্পেটখানার অসমাপ্ত ফুলটা শেষ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে লাগিল ; কারণ, মন তার বোনার কাঠির অনুসরণ না করিয়া, তখনও সেই ছাই-ভস্ম বই-খানার কথাই তোলাপাড়া করিতেছিল। শেষটা আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া কমলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, ও বইখানা শেষ হয়েছে কি ভাবে বৌদি ? ওদের পরিণামটা কি হ'লো শুনি ?" কথাটা লীলা এমন তাচ্ছিল্য ভাবে জানিতে চাহিল, যেন এ বিষয়টা শুনিবার জন্য তার এমন কিছু বিশেষ আগ্রহ নাই। কিন্তু তাহার এ ছলনা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী কমলাকে একটুও প্রতারিত করিতে পারিল না। লীলার মনের প্রকৃত অবস্থাটা বুঝিতে পারিয়া কমলা চুপটি করিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিল। কোনও উত্তর দিল না, যেন কথাটা সে শুনিতেই পায় নাই।

লীলা আবার জিজ্ঞাসা করিল, "শেষটা ওদের কি হ'ল বৌদি ?" যেন কতই অন্যমনস্ক ছিল, এমনি ভাবে কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "কাদের ?"

লীলা বিরক্ত হইয়া বলিল, "আহা, ওই যে গো, তোমার হাতের ঐ জঘন্য বইখানায় যে স্বামী-স্ত্রীর কথা লিখেছে !"

কমলা তেমনিই অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দিল, "শেষটা তেমন ভাল নয়,—বড় করুণ আর বিয়োগান্ত ব্যাপার !"

লীলা এবার রাগিয়া উঠিল,—অনেকক্ষণ আর কিছুই জিজ্ঞাসা করিল না। তার পর কিন্তু আবার নরম হইয়া জানিতে চাহিল "কার পরিণামটা বেশি শোচনীয় করেছে দেখলে ?"

কমলা এবার লীলার মুখের দিকে চাহিয়া উৎসুক আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আন্দাজ করে বল দেখি কার ? দেখবো বলতে !"

কার্পেট, কাঠি, পশমের গোলা সমস্ত পাশের টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া লীলা বলিল, "এসব স্থলে মেয়ে মানুষকেই ভুগ্‌তে হয় বেশি। নিশ্চয় দুঃখ পেয়েছে শেষটা স্ত্রীই সব চাইতে ; কেন না, গোড়া থেকেই লেখক দেখিয়েছেন যে, সে কষ্ট পাচ্ছে কেবল নিজের দোষে !"

কমলা বইখানির শেষ পরিচ্ছেদটি খুলিয়া দেখিতে দেখিতে বলিল, "ঠিক বলেছিস্ লীলা,—এ স্ত্রী দেখছি শেষটা আর একজনের প্রেমে পড়ে গেল !"

লীলা যেন চম্‌কাইয়া উঠিল, বিবর্ণ মুখে জিজ্ঞাসা করিল "সে কি ! আর একজনের প্রেমে পড়ে গেল ?"

"হ্যাঁরে, এই যে এখানে লিখেছে শোন্ না—" বলিয়া কমলা পড়িতে লাগিল—'সকল নারীর জীবনেই এমন এক দিন আসে, যে দিন প্রেমের সবচিন্ ঠাকুরটি তাঁর সুরভিত পুষ্পধনুর আঘাতে তার হৃদয়ে প্রণয়ের অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করিয়া দেন। সে দিন যদি সে স্বামীকে না পায়, স্বামীকে ভালবাসতে না পারে, তাহ'লে অনিবার্য্য ভাবে অন্য কোনও পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়, যার কাছে সে একটুও সহানুভূতি লাভ করিতে পারে। অনাদিকাল থেকে জগতে প্রকৃতির এই নিয়ম চলে আসছে।'

লীলা এবার ভীত হইয়া উঠিল। সভয় কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "অন্য কোনও পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয় ? সে কি বৌদি ! হ্যাঁগা সত্যি ?"

"তাই তো জানি। আর চোখেও দেখেছি অনেকগুলো এ রকম ঘটনা।"

লীলা দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, "বল কি বৌদি ? স্বামীকে ছেড়ে অন্য একজনকে ?—কি ভয়ানক !"—বলিতে বলিতে লীলা টেবিলের উপর হইতে বুনিবার সরঞ্জামগুলা তুলিয়া লইয়া আবার বুনিতে সুরু করিল ; কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই বোনার কাজ বন্ধ করিয়া আপন মনে কি যেন ভাবিতে লাগিল। কমলাও আর কোনও উচ্চবাচ্য না করিয়া নীরবে বই পড়িতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া লীলা জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ, তার স্বামীর কি হ'ল বৌদি ?"

"তারও একটা কিনারা হয়েছে দেখলুম। সে বেচারি

ভয়ানক অসুখে পড়েছিল। স্ত্রী তো ঐ রকম, দেখবার শোনবার আর কেউ ছিল না। শেষ পাড়ার একজন অনেক সেবা শুশ্রূষা ক'রে তাকে বাঁচালে। সে একটি গরীবের মেয়ে,—সুন্দরী, বয়সও হয়েছে; কিন্তু পয়সার অভাবে বিবাহ হয়নি তখনও—"

"সে কি করে জুটলো?"

"তারা যে ওদের বাড়ীর পাশেই থাকতো! বিধবা মা আর ঐ সোমত্ত মেয়ে, দুটীতে কায়ক্লেশে সংসার চালাতো। বড় গরীব, কোনও দিন খেতে পেতো, কোনও দিন পেতো না। ইনি তাদের দুঃখের কথা জানতে পেরে, সহানুভূতি জানিয়ে, প্রায়ই কিছু কিছু সাহায্য করতেন। তাই উপকারীর প্রত্যুপকার কর্‌বার জন্যে, ওঁর প্রতি তাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাবার সুযোগ পেয়ে, তারা মায়ে-ঝীয়ে অনাহারে অনিদ্রায় প্রাণপাত করে রোগশয্যায় তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করতে লাগল। বিমুখ পত্নীর নিরবচ্ছিন্ন অবহেলায় স্বামীর মনটা এত দিন যেন শূন্য কুটীরের মতো হা-হা করছিল। পীড়িত অন্তরটি তার কাতর হ'য়ে এত দিন একটি প্রাণের মত মনের-মানুষের সন্ধানে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে ফিরছিল; ঠিক সেই সময়ে এই মেয়েটি এসে, ধীরে ধীরে তার অক্লান্ত সেবা যত্ন দিয়ে, তার সকৃতজ্ঞ হৃদয়ের অপরিসীম শ্রদ্ধা প্রতিনিয়ত নিবেদন ক'রে, আর সুন্দর সর্ব্বাঙ্গে তার মুকুলিত যৌবন-সঞ্চারিত তরুণ লাবণ্যশ্রীর দুর্নিবার আকর্ষণ নিয়ে সেই শূন্য মন্দিরটি সম্পূর্ণ দখল করে ফেললে! তার পর এমন এক দিন এল, যেদিন সেই দু'টি অপূর্ণ জীবন একত্র মিলিত হ'য়ে পরস্পরের নিবীড় প্রেমে বিলীন হ'য়ে সার্থকতা ও সম্পূর্ণতায় চিরবাঞ্ছিত সুখস্বপ্নে বিভোর হ'য়ে রইল।"

লীলা শুনিয়া ধিক্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, "ছিঃ ছিঃ—সে মেয়েটা কি গো! তার একটা বিবাহিতা স্ত্রী রয়েছে জেনেও তাকে—"

মৃদু হাসিতে হাসিতে কমলা বলিল, "তাতে কিছু এসে যায় না বোন্! যে ভালবাসে সে তার প্রেমাস্পদের কাছে কণামাত্র প্রতিদান পেলেই জীবন ধন্য মনে করে। এ মেয়েটীও তার আকাঙ্ক্ষিত প্রণয়ীর কাছে তার প্রাণঢালা ভালবাসার আশাতিরিক্ত বিনিময় পেয়ে, তার ঐ বিবাহিতা পত্নী বর্ত্তমান আছে জেনেও, আপনাকে বিলিয়ে দিতে একটুও ইতস্ততঃ করেনি। কারণ, এ বুঝতে পেরেছিল যে, সে পত্নী স্ত্রীর কর্ত্তব্যে অবহেলা করে স্বামীর উপর তার সব অধিকার হারিয়ে ফেলেছে! সে সতীন বটে, কিন্তু স্বামীর হৃদয়ের ভাগ নিতে অক্ষম!"

লীলা আর কিছু বলিতে পারিল না; অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কি যেন অভোর চিন্তায় অকূল পাথারে সে তখন তলাইয়া যাইতেছিল। তার পর হঠাৎ কি ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা বৌদি, ঠিক্ ক'রে বল, তুমি হলে কি এ রকম অবস্থায় ঐ দুঃখী মেয়েটার মতো করতে?"

কমলা সজোরে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল,—"কখনই না।" তার পর হাসিতে হাসিতে বলিল—"আমি চাই সবটা নিতে, পুরোপুরি একচেটে ক'রে—নইলে কিছুই নেবো না! খুচরো ব্যাপারী তোর বৌদি নয়, বুঝলি।"

কমলার জবাব শুনিয়া লীলা আর কোনও কথা কহিল না, মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে আবার বোনার কাজ সুরু করিয়া দিল। কিন্তু গোটাকয়েক ফুল তোলা শেষ না হইতেই আবার জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ ভাল কথা, তার শেষ পর্য্যন্ত কি দুর্দ্দশা হ'লো বৌদি?"

"কার?"

"সেই বিবাহিতা স্ত্রীটীর?—সে তো আর একজনের প্রেমে পড়েছিল বল্‌লে—তার পর?—তার দুর্গতিটা কতদূর গড়ালো শুনি?"

কমলা হাসিতে হাসিতে বলিল, "দুর্গতিই বটে! তার সেই একতরফা প্রেমের স্বপ্নটা যে দিন সেই হৃদয়হীন নবাগতের পঙ্কিল বাসনার কদর্য্যতায় ঠেকে চুরমার হ'য়ে গেল, সে দিন সে তার নিজের ভুল বুঝ্‌তে পেরে, স্বামীর কাছে ধরা দিতে গেল। কিন্তু এসে দেখলে—যে দ্বার এক দিন তারই পথ চেয়ে উন্মুক্ত পড়ে ছিল, সে পথে আজ এক আগন্তুক প্রবেশ করে তার সমস্ত অধিকার দখল ক'রে বসেছে! যে মুহূর্ত্তে সে জান্‌তে পারলে যে, স্বামী তার আর একজনকে ভালবেসেছে, অমনি তার সমস্ত অন্তর যেন ক্ষুধিত হ'য়ে সেই হারিয়ে-ফেলা স্বামীর জন্যে লালায়িত হয়ে উঠ্‌ল! সে তখন প্রাণপণে নিজের স্বামীকে ফিরে পাবার জন্যে বিধিমতে চেষ্টা করতে লাগ্‌ল;

কিন্তু তখন আর চেষ্টা করা বৃথা, অনেক বিলম্ব হ'য়ে গিয়েছিল তার—"

এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই লীলা হঠাৎ চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িল। বোনার সাজ-সরঞ্জামগুলা সেই চেয়ারের উপরই রাখিয়া দিয়া, তাড়াতাড়ি ঘরের একধারের একটা আলমারীর কাছে গেল; এবং ব্যস্ত ভাবে চাবি খুলিয়া আলমারীর দেরাজগুলা টানিয়া টানিয়া কি যেন খুঁজিতে লাগিল।

কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "কি খুঁজ্‌ছিসরে!"

"সে 'ফটো'খানা কোথায় আছে, জানো বৌদি?"

"কোন্‌খানা?—সেই বরক'নের বেশে তোর আর—নরেশের 'যুগলমূর্ত্তি' যেখানাতে তোলা হ'য়েছিল?"

"যাও'! তুমি ভারি দুষ্টু!"

"তবে কোন্‌খানা?—বে'র আগে নরেশ তার যে ছবিখানা তোকে উপহার দিয়েছিল?"

"না, দূর! - কিন্তু কি হ'লো বল তো সেখানা?"

কমলা মৃদু হাসিয়া বলিল "বারে মেয়ে! মনে নেই বুঝি, সেখান থেকে চলে আসবার পর সেই এক দিন তুই বল্‌লি যে, তার ছবি পর্য্যন্তও কাছে রাখ্‌বিনি,—আমি তাই তোর কাছ থেকে সেখানা চেয়ে নিয়ে লুকিয়ে রেখেছি যে!"

"তুমিই লুকিয়ে রেখেছো বুঝি?"

"কি আর করি! ছবিখানা কি নষ্ট হবে, তাই তুলে রাখ্‌লুম। যে তোমার তখন ল্যাজ-ফোলা রাগ!—জানি, রাগ পড়লে এক দিন না এক দিন তার খোঁজ হবে—"বলিতে বলিতে কমলা উঠিয়া গিয়া তার টেবিলের টানার ভিতর হইতে নরেশের একখানা বড় ফটোগ্রাফ বাহির করিয়া লীলার হাতে দিল।

"তাই তো, এখানা সেই অবধি তোমার কাছেই রয়েছে বুঝি? আর আমি চারিদিকে খুঁজে মরছি—" বলিতে বলিতে লীলা ছবিখানা না দেখিয়াই, একেবারে আলমারীর ভিতর পুরিয়া চাবি বন্ধ করিয়া দিয়া, চেয়ারে ফিরিয়া আসিয়া বসিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ অস্থির ভাবে আবার উঠিয়া গিয়া; চাবি খুলিয়া আলমারীর দেরাজ হইতে ছবিখানা বাহির করিয়া আনিয়া, দেখিতে দেখিতে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ বৌদি, ইনি কি ওই নতুন বইখানা পড়েছেন?"

"কি জানি?—দেবো না কি তাকে এখানা পড়্‌তে?"

লীলা প্রথমটা উদাস ভাবে বলিল, "তোমার ইচ্ছে!" কিন্তু তার পরই' মুখ ভার করিয়া অভিমানিনীর মত অনুযোগের কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "তোমার ভারি ইচ্ছে যাচ্ছে, তাঁর কাছেও বসে এই যাচ্ছে-তাই বইখানা এই রকম চেঁচিয়ে পড়ে তাঁকেও শোনাতে—না? তোমার মনের ভাবটা কি আর আমি বুঝ্‌তে পারিনি মনে করেছো?—যাতে আমি অপদস্থ হই, তোমার কেবল সেই চেষ্টা!"

কমলা ইহার কোন উত্তর দিবার আগেই একজন ঝী আসিয়া লীলার হাতে একখানা ডাকের চিঠি দিয়া গেল। লীলা চিঠির খামের উপর ঠিকানাটার লেখা দেখিয়াই বলিল, "বাবা চিঠি লিখেছেন বৌদি!"

তাড়াতাড়ি লীলা খামখানা ছিঁড়িয়া যখন চিঠিখানা বাহির করিতেছে, এমন সময় নরেশ আসিয়া ঘরে ঢুকিল। নরেশকে দেখিয়াই লীলা চিঠিখানি আঁচলের মধ্যে লুকাইয়া লইয়া, তৎক্ষণাৎ সে ঘর হইতে অন্য ঘরে চলিয়া গেল। নরেশ একবার সেদিকে চাহিয়া বলিল, "দেখ্‌লে বৌদি! আমি যখনই এসে ঘরে ঢুকি, অমনি ও আমার সাম্‌নে থেকে সরে যায়।—আজ এক বচ্ছর ধরে আমার সঙ্গে ও এম্‌নি লুকোচুরি খেল্‌ছে!"

কমলা সে কথার আর কোনও জবাব না দিয় জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাকে আজ এমন শুক্‌নো শুক্‌নে দেখ্‌ছি কেন? শরীরটা কি ভালো নেই?"

নরেশ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "শরী বেশ আছে বৌদি, কিন্তু মনটা আজ ভারি দমে গেছে 'গরীবের মেয়ে' বলে একখানা নতুন উপন্যাস বেরিয়েছে তুমি পড়েছো কি?"

"গরীবের মেয়ে? হ্যাঁ—হ্যাঁ,—আমি তো সেইখানা এখন লীলাকে প'ড়ে শোনাচ্ছিলুম!"

"লীলাও জানে?—কি বল্‌লে সে বৌদি গল্পটা শুনে?"

"সে বলে ওখানা যাচ্ছেতাই,—বটতলার বাজে বই।"

নরেশ গম্ভীর হইয়া বলিল, "না বৌদি, নেহাৎ বাজে নয়; আমি তো পড়তে পড়তে প্রথমটা চম্‌কে উঠেছিলুম মনে হচ্ছিল, যেন আমারই বিবাহিত জীবনের চিত্রখান

হুবহু চোখের সামনে দেখ্‌তে পাচ্ছি! এ বইখানার ভেতর থেকে আমি এমন একটা কিছু পেয়েছি, যা সত্যিই আমাকে রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছে ভাই!”

কমলা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—“ও কিছু নয়,—কোনও প্যাঁচওয়া বই পড়লেই খানিকক্ষণ মনের ওপোর তার একটা প্রভাব থাকে।”

“কিন্তু বইখানি পড়ে অবধি আমার ভারি ভয় হচ্ছে,—বুঝি আমার জীবনেও শেষটা ঠিক্ ঐ রকমই ঘট্‌বে!”

“কেন, পাশের বাড়ীতে কি কোনও গরীবের সোমত্ত মেয়ে আইবুড়ো থুবড়ী হ’য়ে আছে—সন্ধান পেয়েছো?”

“ঐ তো! তোমার সবেতেই ঠাট্টা! আমি নিজের বিষয় তত ভাবি না,—লীলার জন্যেই ভয় পাচ্ছি!”

“কিন্তু আমার ভয়টা যে তোমার জন্যেই বেশি হচ্ছে!—কেন জানো?—লীলার দাদা যখন ডাক্তারী শিখ্‌ছিল, তখন সে প্রায়ই বল্‌তো যে, দেখ, এই সব রোগের লক্ষণ ক্রমাগত পড়তে পড়তে আমার মনে হ’চ্ছে, যেন আমারও শরীরে যত কিছু রোগের লক্ষণ দেখ্‌তে পাচ্ছি!—তাই ভাব্‌ছি যে, ‘গরীবের মেয়ে’ পড়ে শেষটা তুমিও না কোনও গরীবকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার ক’রে বসো!” কথাটা শেষ করিয়া কমলা খুব খানিকটা হাসিয়া উঠিল!

নরেশ কিন্তু অতিরিক্ত গাম্ভীর্য্যের সহিত সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিতে লাগিল, “হাসির কথা নয় কমলা!—ওটা ভারি সত্য!—তবে তোমায় আজ স্পষ্টই বলি শোন,—আমারও বুকের ভেতর মাঝে মাঝে একটা দুর্দ্দান্ত লোভ এসে উঁকি মারে। আমি তার প্রবল শক্তির কাছে হয় তো কোন দিন পরাভূত হ’য়ে যাবো! তুমি জানো না, সে কত বড় লোভ!—আমার জীবনের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষার সফলতা দেখিয়ে, সে আমাকে প্রতি দিন এমন প্রলুব্ধ করছে যে, ক্রমেই তাকে দাবিয়ে রাখা আমার পক্ষে শক্ত হ’য়ে পড়ছে!”

কমলা ভ্রূকুটী করিয়া বলিল, “তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি নরেশ!—বইখানা তো আগাগোড়া পড়লুম। তাতে এমন কিছু নেই যাতে স্বামীর দল তোমার মতো এতটা ভড়্‌কে যেতে পারে। আমার তো মনে হয় যে, বইখানার সার মর্ম্ম হচ্ছে—একগুঁয়ে মেয়েমানুষদের একটু সুমতি দেওয়া! বিশেষতঃ—যাদের কাঁচা বয়েস আর অল্পদিন বে’ হয়েছে, তাদের স্বামী তো প্রায়ই কালকের ছেলে,—হয় ত’ সবে টাট্‌কা কলেজ ছেড়েছে, নয় ত তখনও পর্য্যন্ত পাঠশালার সম্পর্ক চোকেনি। বের আগের দিন পর্য্যন্ত কেবল ছেলে-ছোকরার দলেই তার মেলা-মেশা ছিল। তার কাছে একেবারে অপরিচিতা যুবতীর সঙ্গে মেলা-মেশার আদব-কায়দা সম্বন্ধে নিখুঁত অভিজ্ঞতাটুকু আশা করা যায় না। বের পরদিনই সে কিছু একেবারে পাকা স্বামীটি হ’য়ে উঠ্‌তে পারে না। সেটা হ’তে তার কিছু দিন সময় লাগে। তার পুরোনো অভ্যাসগুলো ফস্ করে ছেড়ে দিয়ে, সে কিছু এক’দিনেই বিবাহিত জীবনের সমস্ত দায়িত্বটুকু বুঝে নিয়ে, রাতারাতিই একজন কর্ত্তব্যপরায়ণ পতি হ’য়ে উঠ্‌তে পারে না! প্রথম প্রেমের একটা প্রবল মাদকতা, জীবনে নূতন নারী-সাহচর্য্যের একটা অভিনব আনন্দ,—তাকে প্রচুর শক্তি ও উৎসাহ এনে দেয় বটে, কিন্তু সেটা পুরোপুরি গ্রহণ করতে তার যথেষ্ট সময় লাগে।”

প্রবল উৎসাহের সহিত কমলার ডান হাতখানি ধরিয়া ঘন ঘন নাড়িয়া দিয়া নরেশ বলিল, “ঠিক্ বলেছো তুমি! সেদিনও পর্য্যন্ত বুঝ্‌তে পারিনি যে, কোন্‌খানে আমার ত্রুটী! যেদিন পারলুম, সেদিন সে আমার কাছ থেকে আরও দূরে সরে গেল! কিন্তু তুমি তো নিজের চক্ষে দেখেছো কমলা—আজ পর্য্যন্ত তাকে ফিরে পাবার জন্যে আমি কি না করিছি! প্রতি দিন সব দিক দিয়ে চেষ্টা করিছি, কিসে তার প্রাণের কাছটিতে গিয়ে পৌছতে পারি। কিন্তু কিছুতেই তাকে আপনার ক’রে নিতে পারলুম না; সে আমার নিকটতম হওয়া দূরে থাক্, আরও তফাতে সরে গেল! এ সব তো তুমি চক্ষের সামনে দেখ্‌তে পাচ্ছ!—সে কি আমার দোষ?—আমার চিন্তা, আমার আকাঙ্ক্ষা ব্যাকুল হয়ে দিনরাত তার পিছনে ফিরছে; কিন্তু সে দেখো, পাথরের মতো নিরুত্তর হয়ে আছে। তার মনস্তুষ্টির জন্যে নিত্য নূতন উপায় খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হ’য়ে পড়িছি; কিন্তু তবুও তো তার আশা আজও ছাড়্‌তে পারিনি! তার প্রতি আমার যে অগাধ ভালবাসা, তা যেন আরও গভীর, আরও গাঢ়তর হ’য়ে উঠেছে—অথচ তার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু প্রতি দিনের পুঞ্জীভূত

রাগের দল যেন ভিড় করে এসে হৈ হৈ শব্দে আমার নের মধ্যে ঢুকে পড়েছে! মাঝে মাঝে তারা এমন প্রবল 'য়ে ওঠে যে, আমার সমস্ত আশা-ভরসাকে একেবারে াঁধার করে দেয়! আমি তখন নিতান্ত অসহায়ের মতো একজন ব্যথার ব্যথী, আপন জন খুঁজে বেড়াই; কিন্তু কাউকেই দেখ্‌তে পাই না—কেবল তুমি—তখন তুমিই তোমার সেবাপরায়ণ শান্ত স্নিগ্ধ রূপটি নিয়ে, তোমার অসীম সমবেদনার অক্ষয় সৌন্দর্য্য নিয়ে, আমার মনের মধ্যে বারবার বরাভয় মূর্ত্তিতে জেগে ওঠো—" বলিতে বলিতে দুই হাত বাড়াইয়া কাঙালের মত ক্ষুধিত দৈন্য দৃষ্টি লইয়া নরেশ কমলার কাছে সরিয়া আসিতেছিল; কিন্তু বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্র বেগে কমলা তাহার নিকট হইতে সরিয়া গিয়া বলিল, "হ্যাঁ—তুমি আজকাল বড় মনকষ্টে আছ, দেখতে পাচ্ছি বটে!"

নরেশ উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিল, "আজকাল?—উঃ! তুমি জানো না, কী যন্ত্রণাই আমি সইছি এই গোটা বছরের প্রত্যেক দিনগুলোয়! যেন মনে হচ্ছে—কত অনন্তকাল ধরে আমি এই দারুণ কষ্ট ভোগ করছি! আর দিনকতক যদি এই ভাবে কাটাতে হয়, তাহ'লে আমি বোধ হয় পাগল হয়ে যাবো! ওকে প্রসন্ন করবার জন্যে—ওকে সুখী করবার জন্যে—ওর মুখের প্রীতি-প্রফুল্ল হাসিটুকু দেখ্‌বার জন্যে আমি এত দিন ধ'রে যে প্রাণপাত চেষ্টা ক'রে এসেছি, ক্রমে সেটা আমার কাছে একটা দুর্ব্বহ বোঝার মত ঠেক্‌ছে,—আমি যেন আর সে গুরু ভার সহ্য করতে পারছি না! দিন দিন আমার উৎসাহ ক'মে আসছে! সে চেষ্টা—সে উদ্যম—যেন ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে সুরু করেছে। এখন আমার কেবলই মনে হয়—মিছে—মিছে!—সব মিছে! ব্যর্থ এ বিপুল চেষ্টা—পণ্ড এ প্রাণপাত পরিশ্রম! কোনও ফল হ'ল না—উদ্দেশ্য সাধন হ'ল না। পরিণাম যতদুর দেখ্‌তে পেলেম—অন্ধকারের মত মলিন,—শূন্যের চেয়েও ফাঁকা! আশার একটু ক্ষীণ রেখাও কোনও দিন আমাকে সঞ্জীবিত ক'রে তুল্‌লে না। দু'টো মোহবা, কি কিছু বখশিষ্ যা বাড়ীর চাকর-বাকরেও মাঝে মাঝে পায়—আমি যদি অন্ততঃ সেটুকুও পেতুম! একটু তৃপ্তির হাসি, দুটো সোহাগের বাণী—এও কোনও দিন আমার ভাগ্যে জোটেনি! এই যে না খেয়ে না দেয়ে এক হপ্তা, পনেরো দিন ক'রে সহরের বাইরে নানান অসুবিধে, হাজার কষ্ট সহ্য করেও ঘুরে আস্‌ছি—এ কি কেবল আমার ব্যবসার উন্নতির জন্যে? কারবারের সুনাম বজায় রাখবার জন্যে? না—তারই মুখ চেয়ে? এই যে প্রতি মাসের শেষে রাতের পর রাত বিনিদ্র ব'সে দেনা-পাওনার হিসেব-নিকেশ কষে মরি—এ কি কেবল ওই মাল-সরবরাহ কাজের খাতিরেই? এর সঙ্গে কি আমার আর কোনও বড় স্বার্থ জড়িত নেই? সে কি ভাবে—কেন আমি এত পরিশ্রম করি? সে কি বোঝে যে, তার জন্যেই আমার এই কারবার নেওয়া? সে কি জানে—তার মুখ চেয়েই আমার এ উপার্জ্জন? মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে পয়সা রোজগার ক'রে আনছি, তাই আবার জলের মতো অকাতরে ব্যয় করছি কার জন্যে বলো ত? এই যে বাড়ী—এই যে সব আস্‌বাবপত্র—আগাগোড়া সব অগাধ অর্থব্যয়ে ঠিক তার পিতৃ-গৃহের অনুকরণে সাজিয়ে তুলিছি—এ কি আমার সখের জন্যে? না—তারই মুখ চেয়ে? তার শৈশব কৈশোর যৌবনের সঙ্গে আজন্ম-বিজড়িত যে সব পরিবেষ্টন—তাকে সাধ্যমত অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে এই যে আমি প্রাণপণ যত্ন করছি, এর যে কতখানি মূল্য—কতটা মর্য্যাদা—এ যদি সে একটুও বুঝ্‌তো, তাহ'লে যত বড় দুর্জ্জয় অভিমানই হোক্ না তার, সে এমন করে আমার প্রতি বিমুখ হ'য়ে থাকতে পারতো না। সে নির্ব্বোধ, তাই আমার দিকে ফিরেও চাইলে না। কিন্তু মানুষের ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে তো? আমারও সমস্ত দেহ-মন আজ সেই সীমায় এসে পৌঁছেচে। তাই তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌তে চায়! সমস্ত দিনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর আমি যখন ক্লান্ত অবসন্ন হ'য়ে ঘরে ফিরি, কেউ তো ছুটে এসে হাসিমুখে আমাকে অভ্যর্থনা করে না,—কারুরই সমবেদনায় উচ্ছ্বসিত সস্নেহ কৃতজ্ঞ দৃষ্টি আমায় তনু-মন অভিষিক্ত ক'রে আমাকে আনন্দে আপ্লুত ক'রে দেয় না,—কারুরই সেবারত ব্যগ্র বাহু প্রেমবিচ্ছুরিত স্নিগ্ধ ছায়া বিস্তার করে আমার সমস্ত অবসাদ দূর করে দেয় না—আমার তৃষিত তপ্ত পরিশ্রান্ত চিত্তে শান্তি ও আরামের চিরবাঞ্ছিত সুধমাটুকু সাগ্রহে ঢেলে দিয়ে আমাকে তৃপ্ত ক'রে দিতে আসে না। আমি যেন সংসার-স্বর্গ সৃষ্টি করেও অমৃত লাভে বঞ্চিত হয়েছি!"

নরেশের বুকফাটা অভাব ও অভিযোগের এই মর্ম্মন্তুদ্ কাহিনী কমলার ডাগর আঁখি দু'টিকে অশ্রুজলে ভরিয়া তুলিয়াছিল। গোপনে তাহা মুছিয়া ফেলিয়া সহাস্য মুখে কমলা বলিল, "মাভৈ, নরেশদা, এইবার তুমি অমৃত লাভ করে অমর হবে,—আমি তোমায় বর দিলুম।"

"অর্থাৎ—?"

"অর্থাৎ লীলার মতিগতি এইবার ফিরেছে ব'লে বোধ হচ্ছে,—কাজে কাজেই সেই সঙ্গে তোমার কপালও ফিরতে সুরু হচ্ছে—"

"কি বলছ তুমি কমলা?"

"বলছি ঠিক্। ঐ দেখ লীলা আসছে—"

(ক্রমশঃ)

অন্ধ ভিখারী

শিল্পী—শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগির]

বাংলার ভদ্রলোক

পরশুরাম

ভদ্রলোকের দুরবস্থা হইয়াছে—এ বিষয়ে দ্বিমত নাই। দেশের অনেক মনীষী প্রতিকারের উপায় সন্ধান করিতেছেন এবং জীবিকা নির্ব্বাহের নূতন পন্থা নির্দ্দেশ করিতেছেন। কিন্তু বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান যে উপায়েই হোক, তাহা শীঘ্র ঘটিয়া উঠিবে না নিশ্চিত। রোগের বীজ ধীরে ধীরে সমাজে ব্যাপ্ত হইয়াছে; ঔষধপ্রয়োগ মাত্রই রোগমুক্তি হইবে না। সতর্কতা চাই, ধৈর্য্য চাই, ঔষধের প্রতি শ্রদ্ধা চাই। রোগের নিদান একটি নয়, নিবারণের উপায়ও একটি হইতে পারে না। যে যে উপায়ে প্রতিকার সম্ভব বলিয়া বোধ হয়, তাহার প্রত্যেকটি সাবধানে নির্ব্বাচন করা উচিত, নতুবা ভুল পথে গিয়া রোগভোগের কালবৃদ্ধি হইবে।

দুর্দ্দশা কেবল ভদ্র-সমাজেই বর্ত্তমান এমন নয় কিন্তু সমগ্র সমাজের অবস্থার বিচার আমাদের বিষয়ের অন্তর্গত নয়, সেজন্য কেবল তথাকথিত ভদ্রশ্রেণীর কথাই বলিব। 'ভদ্র' বলিলে যে শ্রেণী বুঝায়, তাহাতে হিন্দু মুসলমান দুই-ই আছে। মুসলমান ভদ্রসমাজে ঠিক কি ভাবে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা আমার জানা নাই, সেজন্য হিন্দু ভদ্রের কথাই বিশেষ করিয়া বলিব। তবে প্রতিকারের পন্থা যে উভয়ের পক্ষেই এক, তাহা বলা বাহুল্য।

শত বৎসর পূর্ব্বে 'ভদ্র' বলিলে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ এবং অপর কয়েকটি সম্প্রদায় মাত্র বুঝাইত। ভদ্রের উৎপত্তি প্রধানতঃ জন্মগত হইলেও একটা গুণ-কর্ম্ম-বিভাগজ বিশেষত্ব সেকালেও ছিল। ভদ্রের প্রধান বৃত্তি ছিল—জমিদারি বা জমির উপসত্বভোগ, জমিদারের অধীনে চাকরি অথবা তেজারতি। বহু ব্রাহ্মণ যাজন এবং অধ্যাপনা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন; অধিকাংশ বৈদ্যই চিকিৎসা করিতেন। ভদ্রশ্রেণীর অল্প কয়েকজন রাজকার্য্য করিতেন এবং কদাচিৎ কেহ কেহ নবাগত ইংরাজ বণিকের অধীনে চাকরি লইতেন। ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি বৃত্তি নিম্নতর সমাজেই আবদ্ধ ছিল। ভদ্র গৃহস্থ প্রতিবেশী ধনী বণিক গৃহস্থকে অবজ্ঞার চক্ষুতেই দেখিতেন; উভয় গৃহস্থের মধ্যে সামাজিক সদ্‌ভাব থাকিলেও ঘনিষ্ঠতা ছিল না। উচ্চবর্ণের লোকেরা পাটোয়ারী বুদ্ধি এবং মামলা পরিচালনের দক্ষতাকেই বৈষয়িক বিদ্যার পরাকাষ্ঠা মনে করিতেন, প্রতিবেশী বণিক কোন্ বিদ্যার সাহায্যে অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে তাহার সন্ধান লইতেন না। বণিকের জাতিগত নিকৃষ্টতা এবং অমার্জ্জিত আচার-ব্যবহারের সঙ্গে তাহার অর্থকরী বিদ্যাও ভদ্রসমাজে উপেক্ষিত হইত। এইপ্রকার সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এখনো বর্ত্তমান; কেবল প্রভেদ এই যে বাঙালী বণিকও তাঁহাদের বংশ-পরম্পরা-লব্ধ বিদ্যা হারাইতে বসিয়াছেন। আর, যাঁহারা ভদ্র বলিয়া গণ্য, তাঁহারা এতদিন তাঁহাদের অতি নিকট প্রতিবেশীর কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে অন্ধ থাকিয়া আজ হঠাৎ আবিষ্কার করিয়াছেন যে ব্যবসায় না শিখিলে তাঁহাদের চলিবে না।

একালের তুলনায় সেকালের ভদ্রলোকের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না; কিন্তু তখন বিলাসিতা কম ছিল, অভাব কম ছিল, জীবনযাত্রাও অল্প ব্যয়ে নির্ব্বাহ হইত। ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশে এক যুগান্তর উপস্থিত হইল। বাঙালী বুঝিল—এই নূতন বিদ্যায় কেবল জ্ঞানবৃদ্ধি নয়, অর্থাগমেরও সুবিধা হয়। কেরাণি-যুগের সেই আদিকালে সামান্য ইংরাজী জ্ঞান থাকিলেই চাকরি মিলিত। অনেক ভদ্রসন্তানেরই সেরেস্তার কাজের সহিত বংশানুক্রমে পরিচয় ছিল; সুতরাং সামান্য চেষ্টাতেই তাঁহারা নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করিলেন। জনকত অধিকতর দক্ষ ব্যক্তির ভাগ্যে উচ্চতর সরকারী চাকরিও জুটিল। আবার যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী ও উদ্যোগী, তাঁহারা নূতন বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া ওকালতি ডাক্তারি প্রভৃতি স্বাধীন বৃত্তি

অবলম্বন করিলেন। তখন প্রতিযোগিতা কম ছিল, অর্থাগমের পথও উন্মুক্ত ছিল।

এইরূপে ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রশ্রেণী নূতন জীবিকার সন্ধান পাইলেন। বাঙালী ভদ্রসন্তানই ইংরাজী শিক্ষায় অগ্রণী ছিলেন, সুতরাং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে তাঁহার সাদর নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল। অর্থাগম এবং ইংরাজের অনুকরণের ফলে বিলাসিতার মাত্রা বাড়িতে লাগিল, জীবনযাত্রার প্রণালীও ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। এই সকল নূতন ধনীর প্রতিপত্তি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ইঁহাদের উপার্জ্জনের পরিমাণ যাহাই হোক, কিন্তু কি বিদ্যা! কেমন চাল-চলন! ভদ্রসন্তান দলে দলে এই নূতন মার্গে ছুটিল। সেকালে নিষ্কর্ম্মা ভদ্রলোকের সংখ্যা এখনকার অপেক্ষা বেশী ছিল; কিন্তু একান্নবর্ত্তী সংসারে একজনের রোজগারে অনেক বেকারের ভরণ পোষণ হইত। সভ্যতা এবং বিলাসিতা বৃদ্ধির সঙ্গে উপার্জ্জকের নিজস্ব খরচ বাড়িয়া চলিল, বেকারগণ অবজ্ঞাত হইতে লাগিলেন। এতদিন যাঁহারা আত্মীয়ের উপর নির্ভর করাই স্বাভাবিক মনে করিতেন, অভাবের তাড়নায় তাঁহারাও চাকরির উমেদার হইলেন। অপর শ্রেণীর লোকেরাও পৈত্রিক ব্যবসায় ছাড়িয়া সম্ভ্রম বৃদ্ধির আশায় ভদ্রের পদানুসরণ করিতে লাগিলেন।

ভদ্রের প্রাচীন সংজ্ঞা পরিবর্ত্তিত হইল। ভদ্রতার লক্ষণ দাঁড়াইল—জীবন-যাত্রার প্রণালী-বিশেষ। ভদ্রতা লাভের উপায় হইল—বিশেষ প্রকার জীবিকা-গ্রহণ। এই জীবিকার বাহন হইল স্কুল কলেজের বিদ্যা, এবং জীবিকার অর্থ হইল—উক্ত বিদ্যার সাহায্যে যাহা সহজে পাওয়া যায়, যথা চাকরি।

নূতন কূপের সন্ধান পাইয়া কয়েকটী ভদ্রমণ্ডুক সেখানে আশ্রয় লইয়াছিল। কিন্তু কূপের মহিমা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল,—মাঠের মণ্ডুক হাটের মণ্ডুক দলে দলে কূপের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া ভদ্রতা লাভ করিল। কূপ মণ্ডুকের দলবৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু আহার্য্য ফুরাইয়াছে।

ভদ্রের সংখ্যা-বৃদ্ধি হইয়াছে। সকল জীবিকা ভদ্রের গ্রহণীয় নয়, কেবল কয়েকটি জীবিকাতেই তাঁহার সম্ভ্রম বজায় থাকিতে পারে। সেকালের তুলনায় এখন ভদ্রোচিত জীবিকার সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে, কিন্তু ভদ্রের সংখ্যা-বৃদ্ধির অনুপাতে বাড়ে নাই। কেতাবী বিদ্যা, অর্থাৎ স্কুল কলেজে লব্ধ বিদ্যা যে জীবিকায় প্রয়োগ করা যায়, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা লোভনীয়। কেরাণি-গিরির বেতন যতই সামান্য হোক, ওকালতিতে পসারের সম্ভাবনা যতই অল্প হোক, তথাপি এ সকলে একটু কেতাবী বিদ্যা খাটাইতে পারা যায়। মুদিগিরি, পুরাতন লোহা বিক্রয় বা গরুর গাড়ির ঠিকাদারিতে বিদ্যা-প্রয়োগের সুযোগ নাই, সুতরাং এ সকল ব্যবসায় ভদ্রোচিত নয়। কিন্তু কেতাবী বৃত্তিতে যখন আর অন্নের সংস্থান হয় না, তখন অপুর বৃত্তি গ্রহণ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। নিতান্ত নাচার হইয়া বাঙালী ভদ্র ক্রমশঃ অকেতাবী বৃত্তিও গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে,—কিন্তু খুব সন্তর্পণে বাছিয়া লইয়া। যে বৃত্তি এদেশে পুরাতন এবং নিম্নশ্রেণীর সহিত জড়িত, তাহা ভদ্রের অযোগ্য। কিন্তু যাহা নূতন আমদানি হইয়াছে, কিম্বা যাহার ইংরাজী নামই প্রচলিত, এরূপ বৃত্তিতে ভদ্রতার তত হানি হয় না। ছুতারের কাজ, কামারের কাজ, সেলাইএর কাজ, কোচমানি, মুদিগিরি, ময়রার দোকান চলিবে না; কিন্তু ঘড়ি মেরামত, বাইসিক্‌ল্ মেরামত, নক্সা আঁকা, দর্জির দোকান, চায়ের দোকান, মাংসের হোটেল—এ সকলে আপত্তি নাই, কারণ সমস্তই আধুনিক অথবা ইংরাজী নামে পরিচিত।

কিন্তু এই সকল নূতন বৃত্তিতে বেশী রোজগারের আশা নাই। দরিদ্র ভদ্র সন্তান উহা গ্রহণ করিয়া কোনো রকমে সংসার চালাইতে পারে; কিন্তু যাহাদের উচ্চ আশা, তাহারা কি করিবে? চাকরি দুর্লভ, উকীলে দেশ ছাইয়া গিয়াছে, ডাক্তারিতে পসার অনিশ্চিত, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসার প্রভৃতি বিদ্যাজীবীর পদও বেশী নাই। বিলাতে অনেকে পাদ্রি হয়, সেনা-নায়ক হয়, নাবিক হয়; কিন্তু বাঙালীর ভাগ্যে এ সকল বৃত্তি নাই।

বাঙালী ভদ্রলোক অন্ধকূপে পড়িয়াছে। তাহার চতুর্দ্দিকে গণ্ডী। গণ্ডী অতিক্রম করিয়া উপরে আসিতে সে ভয় পায়, কারণ সেখানে সমস্তই অজ্ঞাত অনিশ্চিত। কে তাহাকে অভয়দান করিবে?

অনেকেই বলিতেছেন—অর্থকরী বিদ্যা শেখাও, ইউ-নিভার্সিটির পাঠ্য পরিবর্ত্তিত কর। ছেলেরা অল্প বয়স হইতে হাতে-কলমে কাজ করিতে শিখুক। তার পর একটু বড় হইয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কার্য্যকরী বিদ্যা ও শিল্প শিক্ষা করুক। যাহারা বিজ্ঞান বোঝে না, তাহারা banking, accountancy, economics ইত্যাদি বাণিজ্য এবং ধন-বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব শিখুক। দেশে শিল্প এবং বাণিজ্যের প্রসার হইলেই বেকারের সংখ্যা কমিবে।

উত্তম কথা, কিন্তু অতি বৃহৎ কার্য্য। রোগ নির্ণয় হইয়াছে, ঔষধের ফর্দ্দও প্রস্তুত, কিন্তু এখনও অনেক উপকরণ সংগ্রহ হয় নাই, মাত্রা স্থির হয় নাই,—রোগীকে কেবল আশ্বাস দেওয়া হইতেছে। ঔষধ সেবনে যদি বাঞ্ছিত সুফল না হয়, তবে সে নিরাশায় মরিবে। অতএব প্রত্যেক উপকরণের ফলাফল বিচার করা কর্ত্তব্য, যাহাতে রোগীর কাছে সত্যের অপলাপ না হয়।

প্রথম ব্যবস্থা—সাধারণ বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের হাতে-কলমে কাজ শেখানো। আমার যতদূর জানা আছে, এই কাজের প্রচলিত অর্থ—ছুতারের কাজ, কামারের কাজ, দর্জির কাজ, সূতাকাটা, তাঁত বোনা, নক্সা করা এবং কৃষি। যে সকল ছাত্রের ঐ জাতীয় কাজ কৌলিক ব্যবসায়, কিম্বা যাহারা ভবিষ্যতে ঐ প্রকার বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সন্তুষ্ট হইবে, তাহাদের পক্ষে উক্ত প্রকার শিক্ষা নিশ্চয়ই হিতকর। যাহারা অবস্থাপন্ন এবং রোজগার সম্বন্ধে উচ্চ আশা রাখে, তাহারাও উপকৃত হইবে, কারণ মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য যেমন বুদ্ধির পরিচর্য্যা এবং ব্যায়ামশিক্ষা প্রয়োজন, হাতের নিপুণতাও তেমনি প্রয়োজন। কিন্তু উচ্চাভিলাষী ছাত্রের পক্ষে এই প্রকার শিক্ষা কেবল গৌণভাবেই হিতকর,—মুখ্যভাবে উপার্জ্জনের কোনো সহায়তা করিবে না।

দ্বিতীয় ব্যবস্থা—কার্য্যকরী বিদ্যা ও বৈজ্ঞানিক শিল্প-শিক্ষা। Mechanical এবং electrical engineering, agriculture, surveying banking, accountancy ইত্যাদি শিখাইবার ব্যবস্থা অল্প-বিস্তর আছে। এখন কয়েক প্রকার নূতন শিল্প শিখাইবার চেষ্টা হইতেছে,—যথা, চামড়া সাবান কাচ চিনামাটির জিনিষ এবং বিবিধ রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত, সূতা ও কাপড় রং করার প্রণালী, ইত্যাদি। উদ্দেশ্য এই যে, দেশে অনেক নূতন ব্যবসায় ও শিল্পের প্রতিষ্ঠা দ্বারা শিক্ষিত ভদ্র-সন্তানের কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত হইবে। উল্লিখিত কয়েকটি বিদ্যা—যথা engineering, accountancy ইত্যাদি—শিখিলে চাকরীর ক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্যবসায় এবং শিল্পের প্রতিষ্ঠা কি পরিমাণে হইবে তাহা ভাবিবার বিষয়।

পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে উচ্চশিক্ষা বলিলে সাধারণতঃ সাহিত্য ইতিহাস দর্শন ইত্যাদিই বুঝাইত। ছাত্র ও অভিভাবকগণ যখন দেখিলেন, যে, কেবল এই প্রকার শিক্ষায় জীবিকালাভ দুর্ঘট, তখন অনেকের মন বিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকিল। একটা অস্পষ্ট ধারণা জন্মিল যে, বিজ্ঞানই হইল প্রকৃত কার্য্যকরী বিদ্যা; বিজ্ঞান শিখিলেই শিল্পজাত পণ্য উৎপাদন করিবার ক্ষমতা জন্মিবে এবং ভদ্রসন্তানের জীবিকাও জুটিবে। তখন কাব্য সাহিত্য দর্শনের মায়া ত্যাগ করিয়া দলে-দলে ছাত্রগণ বিজ্ঞান শিখিতে আরম্ভ করিল, বি-এস্‌সি, এম্‌-এস্‌সিতে দেশ ছাইয়া গেল। কিন্তু কোথায় শিল্প, কোথায় পণ্য? আত্মীয় স্বজন ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন—এত সায়েন্স শিখিয়াও ছোকরা শেষে কেরাণি বা উকীল হইল! হায়, ছোকরা কি করিবে? বিজ্ঞান ও কার্য্যকরী বিদ্যা এক নয়; কেমিষ্ট্রি ফিজিক্‌স্‌ পড়িলেই পণ্য উৎপাদন করা যায় না, এবং কোনো গতিকে উৎপন্ন করিলেই তাহা বাজারে চলে না।

এখন আমরা ঠেকিয়া শিখিয়াছি যে, বিজ্ঞানে পণ্ডিত হইলেই বিজ্ঞানের সদ্‌ব্যবহারে দক্ষতা জন্মে না। সে বিদ্যা আলাদা,—যাকে বলে technical education. অতএব উপযুক্ত শিক্ষকের কাছে উপযুক্ত সরঞ্জামের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিল্প শিখিতে হইবে। শিক্ষার পদ্ধতি নির্ব্বাচনে ভুল করিয়া পূর্ব্বে হতাশ হইয়াছি,—এবারেও কি আশা নাই? সাবান কাচ চামড়া শিখিয়াও কি শেষে কেরাণিগিরি বা ওকালতি করিতে হইবে?

আশা পূর্ব্বেও ছিল, এখনো আছে। কিন্তু আশার মাত্রা অসঙ্গত ছিল, তাই ঠিক যাহা চাহিয়াছিলাম তাহা পাই নাই এবং এবারেও হয় ত সম্ভাব্যের অতিরিক্ত ফল-কামনা করিতেছি।

বিজ্ঞান শাস্ত্রে শিল্পজাত দ্রব্যের যে উল্লেখ থাকে, তাহা

উদাহরণ রূপেই থাকে ; উৎপাদনের তথ্য তন্ন তন্ন করিয়া বলা হয় না এবং ব্যবসায় সম্বন্ধে কোনো উপদেশ দেওয়া হয় না। বিজ্ঞান পাঠে শিল্প সম্বন্ধে একটা সাধারণ জ্ঞান লাভ হয়,—এবং দেশবাসীর মধ্যে এই জ্ঞান যত বিস্তৃত হয়, শিল্পবৃদ্ধির সম্ভাবনাও তত অধিক হয়। যে সকল কারণ বর্ত্তমান থাকিলে দেশে শিল্পবৃদ্ধি সহজ হয়, বিজ্ঞান শিক্ষা তাহার অন্যতম, কিন্তু একমাত্র কারণ নয়।

তাহার পর technical education বা শিল্পশিক্ষা। ইহার অর্থ—যে প্রণালীতে শিল্পজাত দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই প্রণালীর সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়। অনেকে মনে করেন ইহাই শিল্প-প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত ব্যবস্থা। এই বিশ্বাস কতদুর সঙ্গত তাহা বিচার করিয়া দেখা উচিত।

বিজ্ঞানে খাদ্য সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, কিন্তু খাদ্য প্রস্তুত বা রন্ধন সম্বন্ধে বিস্তারিত উপদেশ নাই। বিজ্ঞান পড়িলে রন্ধন শেখা যায় না,—সেজন্য উপদেষ্টার কাছে হাতা-খুন্তির ব্যবহার অভ্যাস করিতে হয়। ইহাই রন্ধন-শিল্পের technical education। এই শিক্ষা লাভ হইলে চাকরি মিলিতে পারে এবং অবস্থা অনুসারে অভ্যস্ত রীতির একটু আধটু বদল করিলে মনিবকেও খুশী করা যায়। আয় ব্যয়ের কথা ভাবিতে হয় না,—তাহা মনিবের লক্ষ্য। কিন্তু যদি কোনো উচ্চাভিলাষী লোক রন্ধন-বিদ্যাকে একটা বড় কারবারে লাগাইতে চায়, অর্থাৎ হোটেল খুলিয়া জনসাধারণকে রন্ধন-শিল্পজাত পণ্য বিক্রয় করিতে চায়, তবে কেবল পাচকের অভিজ্ঞতাতেই তাহার কুলাইবে না, বিস্তর নূতন সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। মূলধন চাই, উপযুক্ত যায়গায় বাড়ী চাই, উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত মূল্যে কাঁচামাল খরিদ চাই, লোক খাটাইবার ক্ষমতা চাই, যথাসময়ে বহুলোকের আহার্য্য প্রস্তুত চাই,—হিসাব রাখা, টাকা আদায়, আয়-ব্যয় খতাইয়া লাভ লোকসান নির্ণয়,—প্রভৃতি নানা বিষয়ে সূক্ষ্মদৃষ্টি চাই। এই অভিজ্ঞতা কোনো নির্দ্দিষ্ট শিক্ষার ব্যবস্থা হইতে পাওয়া যায় না।

সর্ব্বপ্রকার শিল্প এবং ব্যবসায়ের পথই এইরূপ অল্পাধিক দুর্গম। শিল্পজাত পণ্য উৎপাদন করা যাহার ব্যবসায়, সে ঠিক কি প্রণালী অবলম্বন করে এবং কোন্ উপায়ে ব্যবসায়ের ভীষণ প্রতিযোগিতা হইতে আত্মরক্ষা করে, তাহা অপরকে জানিতে দেয় না। সুতরাং technical education পাইলেই ব্যবসায়-বুদ্ধি জন্মিবে না এবং শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইবে না। চাকরি মিলিতে পারে, কিন্তু তাহার ক্ষেত্র সংকীর্ণ, কারণ দেশে প্রতিষ্ঠিত শিল্পের সংখ্যা অল্প। শিক্ষা শেষ হইলেই অধিকাংশ যুবক স্বাধীন কারবার আরম্ভ করিতে পারিবে, ইহা দুরাশা মাত্র।

যাহা বলা হইল, তাহার ব্যতিক্রমের উদাহরণ অনেক আছে। অনেক দৃঢ়সংকল্প উদ্যোগী ব্যক্তি কেবল পুঁথিগত বিজ্ঞান-চর্চ্চা করিয়া কিম্বা বিজ্ঞানের কোনো চর্চ্চা না করিয়া এবং অপরের সাহায্য না পাইয়াও শিল্প-প্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করিয়াছেন। বিজ্ঞান-চর্চ্চা এবং কার্য্যকরী শিক্ষার বিস্তারের ফলে এইরূপ সুযোগ বর্দ্ধিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অর্থাৎ পূর্ব্বে যদি একলক্ষ শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে একজন শিল্প-প্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন, এখন হয় ত দশজন হইবেন। নূতন শিক্ষা-পদ্ধতি হইতে আমরা এইমাত্র আশা করিতে পারি যে, কয়েকজনের নূতন প্রকার চাকরি মিলিবে এবং কয়েকজন অনুকূল অবস্থায় পড়িলে স্বাধীন ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে। কিন্তু অধিকাংশের ভাগ্যে আপাততঃ কোনো প্রকার সুবিধা লাভ হইবে না।

Technical educationকে নিরর্থক প্রতিপন্ন করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কেবল ইহাই বলিতে চাই—যদি ছাত্রগণ অত্যধিক সংখ্যায় নির্ব্বিচারে এই পথে জীবিকার সন্ধানে আসেন, তবে তাঁহাদের অনেকেই বিফল-মনোরথ হইবেন ; কারণ নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা সহজসাধ্য নয়, এবং এদেশে কারখানাও এত নাই, যাহাতে যথেষ্ট চাকরি মিলিতে পারে। অতএব জীবিকা লাভের অপেক্ষাকৃত সুগম পন্থা আর কিছু আছে কি না দেখা উচিত।

বাংলাদেশ পরদেশীতে ভরিয়া গিয়াছে। তাহাদের একদল এদেশের কুলী মজুর ধোপা নাপিত কামার কুমার মাঝি মিস্ত্রিকে স্থানচ্যুত করিতেছে, আর একদল দেশী বণিকের হাত হইতে ছোট বড় সকল ব্যবসায় কাড়িয়া লইতেছে এবং নূতন ব্যবসায়ের পত্তন করিতেছে। শিক্ষিত বাঙালী লোলুপনেত্রে এই শেষোক্ত দলের কীর্ত্তি দেখিতেছে, কিন্তু তাহাদের পদ্ধতিতে দন্তস্ফুট করিতে পারিতেছে না। এই সকল পরদেশী ইংরাজী বিদ্যা জানে না, economics

বোঝে না, ইহাদের হিসাব-প্রণালীও আধুনিক book-keeping হইতে অনেক নিকৃষ্ট,—অথচ বাণিজ্যলক্ষ্মী ইহাদের ঘরেই বাসা লইয়াছেন। ইহারা বিজ্ঞানের খবর রাখে না, নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতেও ব্যস্ত নয়,—কারণ ইহারা মনে করে পণ্য প্রস্তুত অপেক্ষা পণ্য লইয়া কেনা-বেচা করাই বেশী সহজ এবং তাহাতে লাভের নিশ্চয়তাও অধিক। ইহারা নির্ব্বিচারে দেশী, বিলাতী, প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয়, উপকারী, অপকারী সকল পণ্যের উপরেই ব্যবসায়ের জাল ফেলিয়াছে। উৎপাদকের ভাণ্ডার হইতে ভোক্তার গৃহ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ঋজু-কুটিল নানা পথের প্রত্যেক ঘাঁটিতে দাঁড়াইয়া ইহারা পণ্য হইতে লাভ আদায় করিয়া লইতেছে।

শিক্ষিত বাঙালী, কতক ঈর্ষার জন্য, কতক অজ্ঞতার বশে, এই সকল পরদেশীর কার্য্যপ্রণালী হেয় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। ইহারা বর্ব্বর, অশিক্ষিত, দুর্নীতি-পরায়ণ,—টাকার জন্য দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছে। ইহারা লোটা-কম্বল সম্বল করিয়া এদেশে আসে; যা-তা খাইয়া, যেখানে-সেখানে বাস করিয়া, অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া কৃপণের মত অর্থ সঞ্চয় করে। ধনী হইলেও ইহারা মানসিক সম্পদ্ বর্জ্জিত। ভদ্র বাঙালী অত হীনভাবে জীবনযাত্রা আরম্ভ করিতে পারে না; তাহার ভব্যতার একটা সীমা আছে যাহার কমে তাহার চলে না;—অতএব দগ্ধোদরের জন্য সে খোট্টার শিষ্য হইবে না।

অনেক বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া বাঙালী ভাবিয়াছিল—ইংরাজের আচার ব্যবহার অনুসরণ না করিলে উন্নতির আশা নাই। সে ভ্রম এখন গিয়াছে; বাঙালী বুঝিয়াছে—মোটা চাল-চলনের সহিত বিদ্যা-বুদ্ধি-উদ্যমের কোনো সম্পর্ক নাই। এখন আবার অনেকে ভ্রমে পড়িয়া ভাবিতেছেন—খোট্টার অধিকৃত ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে, জীবনযাত্রার প্রণালী অবনত করিতে হইবে এবং মানসিক উন্নতির আশা বিসর্জ্জন দিতে হইবে।

যাহারা বাঙালীর মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াছে, তাহাদের অনেক দোষ থাকিতে পারে; কিন্তু এরূপ মনে করার কোনো হেতু নাই যে, ঐ সকল দোষের জন্যই তাহারা প্রতিযোগিতায় জয়ী হইয়াছে। নিরপেক্ষ বিচারে ইহাই সাব্যস্ত হইবে যে, বাঙালীর পরাজয় তাহার নিজের ত্রুটির জন্যই হইয়াছে।

এই সকল পরদেশী বণিকের শিক্ষা ও পরিবেষ্টন সযত্ন-অনুসন্ধানের যোগ্য। ইহারা জন্মাবধি বণিগ্‌বৃত্তির আবহাওয়ার মধ্যে লালিত হইয়াছে এবং আত্মীয়-স্বজনের নিকটেই দীক্ষা লাভ করিয়াছে। বাঙালী কেরাণি মার্চ্চেণ্ট আফিসে গিয়া নির্লিপ্ত চিত্তে invoice, voucher, day-book, ledger লিখিয়া দিনগত-পাপক্ষয় করিয়া আসে। মনিবের সহিত তাহার কেবল বেতনের সম্পর্ক। সে নিজের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পালন করে মাত্র,—মনিবের সমগ্র ব্যবসায় বুঝিবার তাহার সুযোগও নাই, স্বার্থও নাই। পরদেশী বণিকের অনেক কাজ গৃহেই নিষ্পন্ন হয়। এবং তাহার সহায়তা করিয়া বণিকপুত্র অল্প বয়সেই পৈত্রিক ব্যবসায়ের রস গ্রহণ করিতে শিখে; এবং কেনা বেচা আদায় উসুল জাব্‌দা রোকড় খতিয়ান হাতচিঠা হুণ্ডি মোকাম বাজারের গূঢ় তথ্যে অভিজ্ঞতা লাভ করে।

এই business atmosphere বাঙালী ভদ্রের গৃহে দুর্লভ। উকীল ব্যারিষ্টার ডাক্তার কেরাণির পুত্র ইহাতে বঞ্চিত। বণিগ্‌বৃত্তির বীজ বাঙালী ভদ্রের গৃহে নূতন করিয়া বপন করিতে হইবে। অনেক অঙ্কুর নষ্ট হইবে, কিন্তু অভিভাবকের উৎসাহ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিলে ফলবান বিটপীও অচিরে দেখা দিবে।

দালাল, আড়তদার, ব্যাপারী, পাইকার, দোকানী প্রভৃতি বহু মধ্যবর্ত্তীর হাত ঘুরিয়া পণ্যদ্রব্য ভোক্তার ঘরে পৌছায়। পণ্যের এই পরিক্রম পথে অগণিত ব্যক্তির অন্ন সংস্থান হয়। এই মহাজন-অনুসৃত পথই জীবিকার রাজপথ। বাঙালী ভদ্রসন্তানকে এই পথের বার্ত্তা সংগ্রহ করিয়া যাত্রা আরম্ভ করিতে হইবে।

আরম্ভ দুরূহ সন্দেহ নাই। অভিজ্ঞ অভিভাবকের উপদেশ পাইলে নূতন ব্রতীর পন্থা সুগম হইবে। কিন্তু যেখানে এ সুযোগ নাই, সেখানেও শুভাকাঙ্ক্ষী অভিভাবক যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারেন। পুত্রের শিক্ষার জন্য খরচ করিতে বাঙালী কুণ্ঠিত নয়। সাধারণ শিক্ষার জন্য যে অর্থ ও উদ্যম ব্যয় হয়, তাহারই কিয়দংশে ব্যবসায়-শিক্ষা আরম্ভ হইতে পারে। অনেক উদার অভিভাবক এই উদ্দেশ্যে অর্থব্যয় করিয়া বাঞ্ছিত ফল পান নাই, ভবিষ্যতেও

হয় ত অনেকে পাইবেন না। কিন্তু সাধারণ শিক্ষার ব্যয়ও সকল সময় সার্থক হয় না।

সকল যুবকই অবশ্য ব্যবসায়ী হইবে না। কিন্তু যে হইতে চাহিবে, তাহার সঙ্কল্প স্থির করিয়া পাঠদ্দশাতেই বণিগ্‌বৃত্তির সহিত পরিচয় আরম্ভ করা ভাল। এজন্য অধিক আড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন। আগে ধন-বিজ্ঞান শিখিব, তার পর ব্যবসায় আরম্ভ করিব, এরূপ মনে করিলে শিক্ষা অগ্রসর হইবে না। আগে ভাষা তার পর ব্যাকরণ—ইহাই ব্যবহারিক জ্ঞান লাভের প্রকৃষ্ট রীতি। দোকান, হাট, বাজার, আড়ৎ ব্যবসায়-শিক্ষার সুগম বিদ্যাপীঠ;—এই সকল স্থানে নিত্য যাতায়াত করিলে শিক্ষার্থী অনেক নূতন তথ্য শিখিবে। আমদানি, রপ্তানি, আড়তের বিক্রয়-প্রথা, পণ্যের ক্রয়-মূল্য, বিক্রয়-মূল্য, হিসাব-প্রণালী, টাকা আদায়ের প্রথা—ইত্যাদি বহু জটিল বিষয় সরল হইয়া যাইবে। অভিভাবক যদি শিক্ষার্থীর নিকট এই সকল সংবাদ গ্রহণ করেন, তবে তিনিও উপকৃত হইবেন এবং ছাত্রকেও সাহায্য করিতে পারিবেন। সাধারণ শিক্ষা (অর্থাৎ স্কুল-কলেজের শিক্ষা) শেষ হইলে শিক্ষার্থী দিনকতক কোনো ব্যবসায়ীর কর্ম্মচারী হইয়া হাতে-কলমে কাজ শিখিতে পারে। এদেশে ব্যবসায় শিখিবার জন্য Premium দেওয়ার প্রথা নাই; কিন্তু যদি দিতেও হয়, তবে তাহা অপব্যয় হইবে না। যদি পছন্দমত কোনো নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায় শিখিবার সুযোগ না থাকে, তথাপি যে কোনো সমজাতীয় ব্যবসায়ে শিক্ষানবীশি করায় লাভ আছে,—কারণ সকল ব্যবসায়েরই কতকগুলি সাধারণ মূল সূত্র আছে। খুব বড় ব্যবসায়ীর অফিসে সুবিধা হইবে না,—সেখানে নানা বিভাগের মধ্যে দিগ্‌ভ্রম হইবে, সমগ্র ব্যাপার সম্বন্ধে শৃঙ্খলিত ধারণা সহজে জন্মিবে না।

শিক্ষানবীশি শেষ হইলে সামান্য মূলধন লইয়া কারবার আরম্ভ হইতে পারে। সুবিধা হইলে অভিজ্ঞ অংশীদারের সহিত বখরার বন্দোবস্ত হইতে পারে। অবশ্য প্রথম হইতেই জীবিকানির্ব্বাহের উপযোগী লাভ হইবে না। কলেজে উচ্চ শিক্ষা বা কার্য্যকরী বিদ্যা শিক্ষা করিতে যে সময় লাগে, ব্যবসায় দাঁড় করাইতে তাহা অপেক্ষা কম সময় লাগিবে, এরূপ আশা করা অসঙ্গত। প্রথমে যে ছোট ব্যবসায় আরম্ভ হইবে, তাহা 'হাতে-খড়ি' বলিয়াই গণ্য করা উচিত। তার পর অভিজ্ঞতা এবং আত্মনির্ভরতা জন্মিলে কারবার বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

এই প্রকার শিক্ষার জন্য এবং সামান্য মূলধনে ব্যবসায় আরম্ভ করিতে হইলে যে কষ্ট-সহিষ্ণুতা আবশ্যক, সৌখীন বাঙালীর ধাতে তাহা সহিবে কি? নিশ্চয় সহিবে। বাঙালী যুবক অশেষ পরিশ্রম করিয়া রাত জাগিয়া মড়া ঘাঁটিয়া ডাক্তারি শেখে। উত্তপ্ত টিনের ঘরে জ্বলন্ত হাপরের কাছে লোহা পিটাইয়া এঞ্জিনিয়ারিং শেখে। প্রখর রৌদ্রে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা দমন করিয়া সর্ভেয়িং শেখে। ভোরে অর্দ্ধসিদ্ধ ভাত খাইয়া ডেলি-প্যাসেঞ্জার হইয়া সমস্ত দিন কলম পিষিয়া বাড়ী ফেরে। এ সকল কাজকে সে শ্লাঘ্য বা ভদ্রোচিত মনে করে, সেজন্য কষ্ট সহিতে পারে। যেদিন সে বুঝিবে—বণিগ্‌বৃত্তি হীন নয়, ইহাতে অতি উচ্চ আশা পূরণেরও সম্ভাবনা আছে,—সেদিন সে এই বৃত্তির জন্য কোনো কষ্ট গ্রাহ্য করিবে না।

আশার কথা—পূর্ব্বের তুলনায় বাঙালী এখন ব্যবসায়ে অধিকতর মন দিয়াছে। আজকাল অনেক দেশহিতৈষী কুটীর-শিল্প, উন্নত কৃষি এবং কার্য্যকরী শিক্ষা লইয়া আলোচনা করিতেছেন। তাঁহারা যদি বণিগ্‌বৃত্তির উপযোগিতার প্রতি মনোযোগ দেন, তবে অনেক যুবক উৎসাহিত হইয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবে। বণিগ্‌বৃত্তি সহজেই সংক্রামিত হয়। জনকতক অগ্রগামীর উদ্যম সফল হইলে তাহাদের দৃষ্টান্তে পরবর্ত্তী অনেকেই সিদ্ধিলাভ করিবে। বাঙালীর বুদ্ধির অভাব নাই; নিপুণতা এবং সৌষ্ঠব-জ্ঞানও যথেষ্ট আছে। এই সকল সদ্‌গুণ ব্যবসায়ে লাগাইলে প্রতিযোগিতায় সে নিশ্চয়ই জয়ী হইবে।

বণিগ্‌বৃত্তির প্রসারে বাঙালীর মানসিক অবনতি হইবে না। মসীজীবি বাঙালীর যে সদ্‌গুণ আছে, তাহা কলম পিষিয়া উৎপন্ন হয় নাই। পরদেশী বণিকের যে দোষ আছে, তাহাও তাহার বৃত্তির ফল নয়। অনেক বাঙ্গালী বিদেশী বণিকের গোলামি করিয়াও সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শনের চর্চ্চা করিয়া থাকেন। নিজের দাঁড়ি পাল্লা নিজের হাতে লইলেই বাঙালীর ভাবের উৎস শুখাইবে না।

রাজগী !

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল্

(২৫)

আমি যাহা আশা করিয়াছিলাম, তাহা ফলিয়া গেল। আমি বাড়ী আসিয়া দেখিলাম, নরেন্দ্রবাবু আসিয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন।

আমি তাঁর কাছে সব কথা খুলিয়া আগেই চিঠি লিখিয়াছিলাম। তার পর দলিল হইয়া গেলে তাঁর কাছে টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম। কাজেই তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকিব-হাল হইয়াই ছিলেন।

কিছুক্ষণ তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া, তাঁহাকে লইয়া অন্দরে গেলাম। খাইবার ঘরে সাবিত্রী ঘোমটা টানিয়া আমার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। আমি আসিতেই সে আমার পায়ে নত হইয়া প্রণাম করিল। আমি বলিলাম, "ইনি আমার গুরু নরেন্দ্র বাবু।" সে মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কোনও রকম অভিবাদন করিল না।

বামনের মেয়ে হইয়া যে সে কায়স্থকে প্রণাম করিতে পারিল না, তাহা কিছুই বিচিত্র নহে। কিন্তু ইহাতে আমার মনে হইল যে, সাবিত্রীর সঙ্গে আমার কোনও খানেই যোগ নাই,—সে এক দেশের লোক, আমি সম্পূর্ণ অন্য দেশের।

আহারাদির পর আমি নরেন বাবুকে লইয়া বাহিরে গেলাম। তার পর সমস্ত দিন ধরিয়া তাঁর সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইলাম। তাঁর নামে আমি যে সম্পত্তি লিখিয়া দিয়াছি, নবাবগঞ্জ মৌজা তার মধ্যে একটি। এই মৌজার ঘরে ঘরে ঘুরিয়া তিনি তথ্য সংগ্রহ করিলেন; সমুদায় ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ঘুরিয়া তার একটা মোটামুটি নক্সা করিতে লাগিলেন; এবং কার কোন্ জমীতে কত অংশ, তার হিসাব টুকিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, "এ সব বিস্তারিত খবর আপনি আমার বাড়ীতে ব'সেই পাবেন। সেট্‌লমেণ্টের নক্সা ও চিঠার নকল আমার কাছে আছে, তাহা হইতেই সব জানা যাইবে।"

তবু সমস্ত দিন ক্ষেতে ক্ষেতে ঘুরিয়া আমরা প্রায় সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিলাম। বাড়ী ফিরিবার সময় নরেন বাবু বলিলেন, "যা ভেবেছিলাম তাই। কাজটা মোটেই সহজ নয়। এই সব জমীগুলো এত ছোট ছোট টুকরা টুকরা হ'য়ে র'য়েছে,—একজনের এক ক্ষেত এখানে, আর এক ক্ষেত বিশ বিঘা দূরে। এতে চাষের অসুবিধা হয়। আর কারো কারো দেখছি, জমী এত ছোট যে, তা' থেকে তার লাভ হ'তে পারে না। এদের মালিক ক'রবার আগে এদের টুকরোগুলো consolidate করে বড় বড় জোত করে দিতে হ'বে। তার পর আস্তে আস্তে এদের সম্পূর্ণ স্বত্ব দিতে হ'বে। তা ছাড়া আর এক আপদ এই যে, তোমার সম্পত্তিটা এক টানা নয়। এত লক্ষ কোটি মালিক, এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মালিকী অংশ,—এর ভিতর consolidation হওয়াও কঠিন। কি রকম করে কি করা যায়—ভেবে চিন্তে স্থির ক'রতে হ'বে।"

তিনি বাড়ী আসিয়া সেট্‌লমেণ্টের নক্সা ও চিঠা এবং কাগজ পত্র লইয়া নানারকম হিসাব করিতে বসিয়া গেলেন। আমি তখন একবার অন্দরে গেলাম।

দোতালার বারান্দায় ঠিক আমার স্ত্রীর শুইবার ঘরের সামনে দেখিলাম—বসিয়া আছেন আমাদের গুরুপুত্র। কন্দর্প-কান্তি সৌখীন যুবাপুরুষ! তাঁর মাথায় দীর্ঘ শিখা ও গলায় কতকগুলি মালা ছাড়া তাঁর ধর্ম্ম-ব্যবসায়ের বিশেষ কোনও লক্ষণই নাই। তাঁর সম্মুখে মাটিতে বসিয়া আছে আমার স্ত্রী সাবিত্রী,—একাগ্র চিত্তে গুরুপুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া সে তদ্গত চিত্তে তাঁর কথা শুনিতেছে। আমার স্ত্রীর কঠোর সৌন্দর্য্যের ভিতর এতখানি ভাবাবেশ দেখার সৌভাগ্য আমার কখনও হয় নাই।

ঈর্ষার তীব্র বিষে আমার অন্তর জ্বলিয়া উঠিল। আমার গভীর সন্দেহ হইল। দন্তে ওষ্ঠ চাপিয়া আমি

আমার ঘরে প্রবেশ করিলাম। সাবিত্রী আমার আসা লক্ষ্য করিল কি না, বুঝিতে পারিলাম না। আমি আমার ঘরের ভিতর বসিয়াই ইহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলাম।

গুরুপুত্র বলিলেন, "তা বৌরাণী, এখন অন্ততঃ পাঁচ হাজার টাকা না হ'লে তো কিছুতেই চলে না। কলকাতা থেকে জয়েষ্ট আর বরগা সব এসে র'য়েছে—টাকা দিয়ে নিতে হ'বে, নইলে মাশুল বেড়ে যাবে। ঢাকা থেকে আরও এক নৌকা চূণ আনাতে হ'বে—তারও সময় তো র'য়ে যায়। আর রাজ-মজুরেও মাইনা চাচ্ছে। বড়ই ঠেকে পড়েছি বলেই চাইতে হ'চ্ছে; নইলে বাবা বল্লেন, দ্বিজেশের এই দুঃসময়—এর ভিতর টাকা চাইতে মন চায় না।"

আমি দেখিতে পাইলাম, আমার স্ত্রী ভয়ানক বিব্রত ও লজ্জিত ভাবে মাটির দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে কি বলিল। কথাটা ঠিক ধরিতে পারিলাম না। তবে বুঝিলাম যে, টাকা নাই—এই অপ্রিয় কথাটাকে লজ্জার মাথা খাইয়া তাহাকে বলিতে হইতেছে। যতটা লজ্জা ও যতটা বেদনা এ কথায় সাবিত্রীর মুখে ফুটিয়া উঠিল, সবটাই যে টাকা না দিতে পারার সঙ্কোচের জন্য, এমন আমার মনে হইল না।

আর বেশী অপেক্ষা করিতে আমার সাহস ছিল না। আমার বুক আশঙ্কায় কাঁপিতেছিল। প্রতি মুহূর্ত্তেই আমার আশঙ্কা হইতেছিল যে, হয় তো এখনি এমন একটা কিছু দেখিয়া ফেলিব, যাহাতে আমার সন্দেহ নিশ্চয়তায় পরিণত হইয়া যাইবে। কেন এ আশঙ্কা? কেন এ ঈর্ষা? সাবিত্রী তো আমার কেউ নয়। জন্মের মত তো আমি তাকে ছাড়িয়া যাইতেছি। তবে তার ভাল হওয়া বা মন্দ হওয়ায় আমার কি আসে যায়?

কি আসে যায়? কিন্তু এ যুক্তিতে মন মানিল না। আমি শঙ্কিত হইয়া সাবিত্রীকে ডাকিলাম।

সাবিত্রী আমার ডাক শুনিয়াই চমকিত হইয়া মাথার কাপড়টা টানিয়া দিয়া ত্রস্তব্যস্তে উঠিয়া আসিল। কেন এ চমক? অতটা ব্যস্ততা কেন? হায় রে, এই নারীকে আমি পবিত্র পাষাণ দেবতা মনে করিয়াছিলাম!

সাবিত্রী উঠিতেই গুরুপুত্র বলিলেন, "তবে এখন একটু নীচে যাই। এখন যদি টাকাটা দেওয়ার সুবিধা নাই হয়, তবে কাল সকালে দিও।" বলিয়া তিনি আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেলেন।

সাবিত্রী আসিয়া বলিল, "কখন এলে তুমি? ঠাকুর-কুমারকে প্রণাম ক'রলে না?"

আমি উত্তরে গম্ভীর ভাবে বলিলাম, "তুমি আমার গুরুকে প্রণাম ক'রেছিলে?"

সাবিত্রী অবাক বিস্ময়ে আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

আমি বলিলাম, "থাক সে কথা,—তোমার এখন পাঁচ হাজার টাকা চাই?"

সাবিত্রী আর একটু বিস্ময় ও বোধ হয় একটু উদ্বেগের সহিত আমার মুখের দিকে চাহিল। আমি সে দৃষ্টির ভীষণ অর্থ করিলাম। আমার মনে হইল যে, গুরুপুত্রের সঙ্গে তার গোপন সম্ভাষণ আমি শুনিয়াছি, তাহাতেই সে বিস্মিত হইয়াছে। ভাবিলাম, না জানি আরও কত গুরুতর কথা আমি আসিবার আগে হইয়া গিয়াছে। আমি সে সব শুনিয়াছি ভাবিয়া সাবিত্রী চমকিত হইয়াছে। আমার মনের ভিতর কে যেন তীব্র হলাহল ঢালিয়া দিল।

শান্ত ভাবে আমি বলিলাম, "হাজার দশেক টাকা বোধ হয় খাজাঞ্চীর কাছে আছে, তুমি চিঠি লিখে আনিও যখন যা' দরকার।" তার পর বুকের ভিতর হইতে দানপত্রখানা লইয়া তাহাকে বলিলাম, "এই নেও। এখানা ভাল ক'রে সিন্দুকে রেখে দেও গে। তুমি আমার কাছে অর্দ্ধেক সম্পত্তি চেয়েছিলে। আগে চাইলে ভালো ক'রতে। তখন আমার অনেক বেশী ছিল। এখন আমার যা কিছু আছে, তার ঠিক অর্দ্ধেক তোমাকে এই দানপত্র করে দিয়েছি। তার উপর এই বাড়ী মায় আসবাব সরঞ্জাম সব দিয়েছি। সম্পত্তির পরিমাণ বড় কম হ'ল। তবে এসব দায়মুক্ত—আর ধার টার কিছু নেই। যে পোনেরো হাজার টাকা পাবে, সবই তুমি খরচ ক'রতে পারবে।

"তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কের একটা দায় আমি এতদিন বয়ে এসেছি,—সে দায় আজ শোধ ক'রলাম। এখন আমি মুক্ত। এখন আর তোমার আমার উপর কোনও দাবী-দাওয়া রইলো না। দাবী ক'রলেও তুমি কিছু

পাবে না, কেন না আমার আর কিছুই নেই। সম্পত্তির আর অর্দ্ধেকটা আমি দান ক'রে ফেলেছি।

"আর, এও ব'লে রাখি যে, তোমার উপরও আমার কোনও দাবী-দাওয়া রইলো না। তোমার সম্পত্তি তুমি যা' ইচ্ছা তাই ক'রতে পার; তোমার শরীর, মন, ধর্ম্ম, প্রেম, যাকে ইচ্ছা তুমি দিতে পার—তোমার কোনও কিছুতেই আমার বলবার কিছু রইলো না।

"পরশু দিন আমি চাকরী ক'রতে ক'লকাতা যাচ্ছি। আর বোধ হয় দেখা হ'বে না।"

নিশ্চল পাষাণ-প্রতিমার মত নির্ব্বিকার চিত্তে দাঁড়াইয়া সাবিত্রী আমার হাত হইতে দানপত্রখানি লইয়াছিল। তার সেই কঠিন পাথরের মত দৃষ্টি স্থির করিয়া আমার দিকে চাহিয়া, সে আমার সব কয়টা কথা শুনিল—এক-টুকুও সে বিচলিত হইল না। মুখে তার এক ফোঁটা ভাবান্তর উপস্থিত হইল না।

আমার কথা শেষ হইবামাত্র সে চট করিয়া ঘুরিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। কেন যাইবে না? আর তো দাঁড়াইবার প্রয়োজন নাই; তার অর্দ্ধেকের অধিকার তো সে পাইয়াছে।

আমি একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম।

(২৬)

রাত্রে নরেনবাবুকে লইয়া অন্দরে খাইতে গেলাম। সাবিত্রীকে খাইবার ঘরে দেখিলাম না। তার কথা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলাম না। সে কেন আর আসিবে? আমাকে সেবা করিবার যে প্রয়োজন ছিল, সব তো মিটিয়া গিয়াছে। আর তার আমাকে দিয়া কি প্রয়োজন?

নরেন্দ্রবাবুকে অন্দর ও বাহিরের মাঝামাঝি একটা ঘরে শোয়াইয়া দিয়া, আমি আমার শুইবার ঘরে ফিরিলাম। পথে দেখিলাম, একটা ঘরে গুরুপুত্র শুইবার উদ্যোগ করিতেছেন। তাহাকে দেখিয়া আমার সমস্ত অন্তরে যেন বিষের জ্বালা উপস্থিত হইল। এ হতভাগা ঠিক অন্দরের ভিতর আসিয়া শুইয়াছে দেখিয়া, আমার দারুণ সন্দেহ হইল। আমি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া আমার ঘরে চলিয়া গেলাম।

আমার ঘরের দরজা রোজ খোলাই থাকে; কিন্তু আজ ঘরে গিয়াই দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম—পাছে সাবিত্রী আসিয়া জ্বালাতন করে। তার মুখ দেখিবার আর আমার এক ফোঁটাও ইচ্ছা ছিল না।

আমি অত্যন্ত অপ্রসন্ন চিত্তে শুইয়া পড়িলাম। সমস্ত দিনের ক্লান্তির ফলে অবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আমি স্বপ্ন দেখিতে-ছিলাম, গভীর রাত্রে গুরুপুত্র নীরবে সাবিত্রীর ঘরের দিকে চলিয়াছেন। ভয়ানক উত্তেজিত অবস্থায় ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ঘুম ভাঙ্গিয়া যেন আমি শুনিলাম, বারান্দায় পায়ের শব্দ। তার পর কে যেন সাবিত্রীর ঘরের দিকে চলিয়াছে। তার পর যেন সাবিত্রীর দরজা আস্তে বন্ধ হইল। সে ঘরে এমন কতকগুলি শব্দ শুনিলাম, যাহাতে সন্দেহ রহিল না যে, ঘরে মানুষ নড়িতেছে।

আমি তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিলাম। আমার মাথার ভিতর খুন চাপিয়া গেল। কিন্তু খুব সন্তর্পণে পা টিপিয়া অগ্রসর হইলাম।

সাবিত্রীর ও আমার ঘরের মাঝখানে একটা দরজা ছিল—সেটা সর্ব্বদা বন্ধ থাকিত। তার উপর কাণ পাতিয়া শুনিলাম—ভয়ানক সন্দেহজনক শব্দ। আমি অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম যে, দরজাটা আমার দিক হইতেই বন্ধ। আমি আলগোছে হুড়কা খুলিয়া দরজা খুলিলাম।

ঘরে লণ্ঠন জ্বলিতেছিল; কিন্তু এক কোণায় খুব নামান ছিল। খুব অস্পষ্ট আলোতে কিছুই ভাল করিয়া দেখা গেল না। খাটের উপর কাহাকেও দেখিলাম না; কিন্তু ঘরের আর এক পাশে, যেখানে সাবিত্রীর বিছানা তারই পাশে নড়াচড়ার শব্দ, গভীর নিঃশ্বাসের শব্দ পাইলাম। আমি পা টিপিয়া অগ্রসর হইয়া লণ্ঠনের কাছে গেলাম। চট করিয়া আলোটা উজ্জ্বল করিয়া দিয়া সেই দিকে চাহিলাম। যাহা দেখিলাম, তাহাতে স্তব্ধ মুগ্ধ বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

দেখিলাম, আমার সেই ফটোগ্রাফ মাথায় ঠেকাইয়া সাবিত্রী মাটির উপর শুইয়া মুখ গুঁজিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে—ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। সমস্ত সুন্দর দেহখানি তার গভীর বেদনায় কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, সে মুখ চাপিয়া ফুঁপাইতেছে।

কি বিশ্বজোড়া ব্যথা এ নারীর প্রাণে, যাতে সে এমন করিয়া দীন হইয়া কাঁদিতেছে! গর্ব্বিতা দৃপ্তা সাবিত্রী—যে তার স্বামীর কাছে একটি দিনের তরে সামান্য হীনতা স্বীকার করে নাই, একটি অনুরোধ করে নাই, এক ফোঁটা অশ্রু ফেলে নাই, সারা জীবন কেবল দর্পের উপর কাটাইয়াছে—সে আজ দীনা হীনা সামান্য নারীর মত মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিতেছে!

আমার চক্ষের সম্মুখ হইতে একটা পুরু পরদা পড়িয়া গেল। আমি আজ দিব্য আলোকে দেখিতে পাইলাম—কি ঘোর অবিচার আমি করিয়াছি সাবিত্রীর উপর! আমি তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া সাবিত্রীর মাথার কাছে বসিয়া ডাকিলাম "সাবিত্রী!"

সাবিত্রী চমকাইয়া উঠিয়া বসন সংবৃত করিয়া বসিল। তার বুকের তলা হইতে বাহির হইল কুঞ্চিত লাঞ্ছিত অশ্রুসিক্ত আমার সেই দানপত্র।

সাবিত্রী এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিল। এক মুহূর্ত্তের জন্য তার মুখে ফুটিয়া উঠিল সেই কঠোর গর্ব্বিত দৃষ্টি! তার পর সে দৃষ্টি মিলাইয়া গেল,—অশ্রুর ধারায় সে দৃষ্টি গলিয়া গেল।

সাবিত্রী আমার দুই পায়ের উপর আছাড়িয়া পড়িয়া পায়ে মাথা ঠেকাইয়া বলিয়া উঠিল, "ওগো, আমায় ক্ষমা কর, দয়া কর! আমায় প্রাণে মেরো না। আমার দিকে চেয়ে দেখ—আমার সব দর্প চূর্ণ হ'য়েছে। আর আমার কোনও অহঙ্কার নেই। তোমায় বড় দুঃখ দিয়েছি,—তুমি আমায় দয়া কর।"

আমি সাবিত্রীকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া তাহার অধরোষ্ঠে গভীর চুম্বন দিলাম। এই তাহাকে আমার প্রথম চুম্বন—আমার সমস্ত হৃদয় স্নিগ্ধ হইয়া গেল।

সাবিত্রীর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে আবার আমার পায়ে লুটাইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "ওগো দেবতা—দেবতা—দেবতা আমার!"

আমি আবার তাহাকে উঠাইয়া বুকে লইলাম। সে পরম সার্থকতার সহিত আমার বুকের উপর সম্পূর্ণ এলাইয়া পড়িল।

সাবিত্রী বলিল, সব মানের মাথা খাইয়া, আমার পায়ের উপর পড়িয়া ক্ষমা চাহিবার জন্য, সে-ই গিয়াছিল আমার ঘরে। কিন্তু বন্ধ দুয়ার দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে,—ডাকিতে সাহস হয় নাই। তারই পদশব্দে আমি চকিত হইয়া উঠিয়াছিলাম।

তার খাটের উপর আমি তাহাকে শোয়াইয়া দিলাম। তার ঘন স্নিগ্ধ চিকুররাশি এলাইয়া দিয়া আমি তাহা লইয়া খেলা করিলাম। তার অঙ্গে আমি সস্নেহে হাত বুলাইয়া দিলাম। শিশুর মত সরল আনন্দে তার মুখ উদ্ভাসিত হইল, চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। সেই আশ্চর্য্য পাথরের চোখের ভিতর এখন অপূর্ব্ব প্রেম ফুটিয়া উঠিয়াছে; অশ্রুর বন্যায় পাষাণের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়া রুদ্ধ নির্ঝরিণী ছুটিয়া বাহির হইয়াছে। সেই অপূর্ব্ব সুন্দর চক্ষু দুটির উপর আমি দুটি চুম্বন দিলাম।

* * * * *

আমার সম্পত্তি আমি বিলাইয়া দিয়াছি, কিন্তু সাবিত্রীকে পাইয়াছি; আমি এক ফোঁটাও ক্ষতি বোধ করিতেছি না। সারারাত্রি আমরা পরস্পরের জীবনের সব কথা বলিলাম। আমি অকপট চিত্তে আমার সমস্ত জীবনের গুপ্ত ইতিহাস খুলিয়া বলিলাম।

* * * * *

ভোরে ঘুম ভাঙ্গিল। দেখিলাম, সাবিত্রী উঠিয়া বসিয়া আমার চুলগুলি আস্তে আস্তে পাট করিতেছে, আর আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। আমি চক্ষু মেলিতেই সে লজ্জায় লাল হইয়া আমার বুকের ভিতর মুখ লুকাইল। আমি তার মুখখানা সাপটিয়া আমার বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিলাম।

একটু পরে সাবিত্রী উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি তার হাত চাপিয়া ধরিলাম—তখনও ভাল করিয়া সকাল হয় নাই। সাবিত্রী নববধূর মত লজ্জায় লাল হইয়া বলিল, "তোমার পায় পড়ি, এখন আমাকে ছেড়ে দেও। লোকে ভাববে কি?"

আমি তাকে রাত্রে আমার ঘরে আনিয়াছিলাম, কেন না তার ঘরে ভাল বিছানা নাই। সকালবেলায় যদি কেহ আসিয়া দেখিয়া ফেলে যে, সে আমার ঘরে রাত্রি যাপন করিয়াছে, তবে সে লজ্জা পাইবে! আমার ভারি কৌতুক বোধ হইল। আমি বলিলাম, "লোকে ভাববে,

তুমি ভারি অপকর্ম্ম ক'রেছ—এত বড় অপকর্ম্ম জীবনে কখনও কর নি।"

সাবিত্রী ভারি বিব্রত হইল, কিন্তু এ কথায় আনন্দে তার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আমি তার মনের ভাব যেন দর্পণের মত আমার অন্তরে প্রতিফলিত দেখিতে পাইলাম। লোকে এ কথা জানিবে ভাবিয়া তার লজ্জা হইতেছে; কিন্তু সেই লজ্জাই তো সে চায়। আজ যে তার সমস্ত লোককে ডাক ছাড়িয়া বলিতে ইচ্ছা করিতেছে যে, সে স্বামী-সোহাগিনী! এ সৌভাগ্য যে সে লুকাইয়া ভোগ করিতে পারে না। এত দিন এত ঐশ্বর্য্যের ভিতর শুধু সে এইটি পায় নাই বলিয়াই কাঙ্গালিনী হইয়া ছিল।

সে বলিল, "লক্ষ্মীটি আমার, আমায় ছাড়; আমার পূজোর বেলা বয়ে' যাচ্ছে। পূজো করে' তবে আমার ভাঁড়ার দিতে হ'বে।"

আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম,—তার সেই পূজারিণীর মহিমময় মূর্ত্তি দেখিবার আশায় তাহাকে ছাড়িলাম। সে কিন্তু ঠিক তখনি গেল না। একটু দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর সে হঠাৎ আমার মুখের উপর একটি চুম্বন দিয়া লজ্জায় ছুটিয়া পলাইল।

দুয়ারের কাছে গিয়া সে ডাকিয়া বলিল, "তুমি একটু পরে একবার আমার ঘরে এসো কিন্তু।"

আমি তখনই উঠিলাম না। বিছানায় আলস্যে গা ছড়াইয়া দিয়া পড়িয়া রহিলাম,—একটা অপূর্ব্ব পুলকের আবেশে আমার সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন হইয়া গেল। এত সুখ আমার ঘরে থাকিতে, মূর্খ আমি, বেদনায় আকুল হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিয়া সুখের ক্ষুদ-কুঁড়া কুড়াইয়া বেড়াইয়াছি,—সতী সাধ্বীর মনে দীর্ঘ দশ বৎসর ধরিয়া তুষানল জ্বালাইয়াছি! মনে হইতে আপনাকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু বর্ত্তমানের সৌভাগ্য আমার অতীতের সব দুঃখ ঢাকিয়া ফেলিল। আমি আরাম করিয়া বিছানায় পড়িয়া রহিলাম।

কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া স্নান করিলাম। বেশ পরিপাটী করিয়া বেশভূষা করিলাম। আজ যে আমার মহা উৎসবের দিন! তার পর সাবিত্রীর ঘরে গেলাম।

দেখিলাম—সে সাবিত্রী নাই। সে আজ খুব দামী একখানা বেনারসী শাড়ী পরিয়াছে। সিন্দুক উজাড় করিয়া সে সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার পরিয়াছে। এই সাজসজ্জার ভিতর দিয়া তার রূপ যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। গহনা তার অনেক ছিল, কোনও দিন সে তাহা পরে নাই। আজ সে সব অলঙ্কার পরিয়া রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তিতে তার দীর্ঘ ও কঠোর ব্রতের উদ্‌যাপনের পূজা করিতে বসিয়াছে। শিবের মাথায় শেষ বিল্বপত্র দিয়া সে প্রণাম করিয়া উঠিল। তার পর আমার দিকে ফিরিয়া সে আমাকে ডাকিল।

তার পূজার আসনের সামনে একখানা জলচৌকীর উপর পুরু গালিচার একটা আসন পাতা ছিল। আমার হাত ধরিয়া সে আমাকে সেখানে বসাইল। তার পর আমার রীতিমত পূজা আরম্ভ করিল। কৌতুকভরে আমি হাসিমুখে তার দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে একবার আমার দিকে চাহিতেই, আমার হাসি দেখিয়া, লজ্জায় হাসিয়া মুখ নত করিয়া মনে মনে মন্ত্র পড়িতে লাগিল,—হাসিটুকু তার মুখে লাগিয়াই রহিল। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত তার সে সৌন্দর্য্য চক্ষু দিয়া পান করিলাম।

শেষে সে বাছা বাছা সুন্দর সুগন্ধ ফুল তুলিয়া লইয়া আমার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া গলায় আঁচল জড়াইয়া আমাকে প্রণাম করিল। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলাম। সাবিত্রী মাথা তুলিতেই, আমি বলিলাম, "রোস, আমার একটা কাজ আছে; আমি তোমার পূজা করবো।"

সে অবাক হইল; আমার কথা বুঝিতে পারিল না। আমি তখন আমার পায়ের উপরকার ফুলগুলি হইতে কয়েকটি বাছিয়া লইয়া তার চুলের ভিতর গুঁজিয়া দিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিলাম। সে আবার আমাকে প্রণাম করিল।

তখন সাবিত্রী বলিল, "আজ আমার ব্রত উদ্‌যাপনের পূজা। আজ আট বৎসর ধরে এই দিনের জন্য রোজ পূজার পর দেবতার কাছে আর তোমার উদ্দেশে মাথা খুঁড়ছি। দেবতার দয়ায় আজ আমি তোমার পূজা করতে পেয়েছি। তোমাকে আজ আর একটু দয়া করে আমার পূজাটা সম্পূর্ণ ক'রতে দিতে হ'বে, একটু দক্ষিণা নিতে হ'বে।" বলিয়া সে বুকের কাপড়ের তলা হইতে সেই দানপত্রখানা বাহির করিয়া আমার পায়ে রাখিল।

আমি কিছু বলিবার আগেই সে বলিল, "দয়া করে তুমি এটা নেও, তোমার সম্পত্তি ফিরে নেও। আমি তোমাকে পেয়েছি, আর কিছুই আমার চাই না। এ বোঝা দিয়ে আমাকে আর শাস্তি দিও না। আমার বড় অহঙ্কার! আজ আট বৎসর ধরে তোমার জন্য মনে মনে মাথা খুঁড়ছি, কিন্তু তোমার কাছে মাথা নোয়াতে পারি নি, বড় অপমান বোধ ক'রেছি। তার শাস্তি এমন পেয়েছি যে, আমার অতি বড় শত্রুরও যেন সে সাজা না হয়। আর যেন আমার অহঙ্কার না হয়—আমায় এই আশীর্ব্বাদ কর। আর যেন কোনও কিছুতে নিজেকে তোমার সঙ্গে স্বতন্ত্র করে' না দেখি, তুমি ছাড়া যেন আমার কিছুই না থাকে। এ সম্পত্তি আমি চাই না। কিছুই আমি চাই না; আমি শুধু যেন চিরদিন তোমার পায় ঠাঁই পাই।"

সাবিত্রীর দুই চক্ষু প্লাবিত করিয়া অশ্রুর প্রবাহ ছুটিয়াছিল; কিন্তু তার হৃদয়ে বুঝি বেদনা ছিল না। তার এ দশ বছরের ব্যথা যেন এই অশ্রুধারায় গলিয়া পড়িতেছিল; কিন্তু তার মুখ ছিল আনন্দে উজ্জ্বল।

আমার বুক ভরিয়া উঠিল, কথা কহিতে গলায় বাধিল। কিছুই বলিতে পারিলাম না। আমার নিজের অপরাধের অনুভূতি এমন তীব্র ভাবে কখনও আমার হৃদয়ে জাগিয়া উঠে নাই। আজ আমি পরম দীনতার সহিত অনুভব করিলাম যে, সাবিত্রী দেবী- সাবিত্রী প্রেমিকা! আমি কত হীন, কত অযোগ্য তার! তার পূজা, তার শ্রদ্ধা, তার ভক্তি আমাকে ভয়ানক কুণ্ঠিত করিয়া ফেলিল; কিন্তু আমি কিছুই বলিতে পারিলাম না,—শুধু দুই চক্ষু-বাহিয়া আমার অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। নীরবে সেই দলিলখানা হাতে লইয়া তার হাতে দিয়া অনেক কষ্টে শুধু বলিলাম, "আচ্ছা নিলাম, এখন তুমি এটাকে রেখে দেও।"

তার পর সে আমার কাছে বিদায় লইয়া গেল সংসারের কাজে। আমি চলিলাম বাহিরে। আমার অন্তর যেন স্বর্গের সুরভিতে ভরিয়া উঠিল,—অপূর্ব্ব উল্লাসে হৃদয় নাচিতে লাগিল। আমি উৎফুল্ল হৃদয়ে বাহিরে চলিয়া গেলাম।

(ক্রমশঃ)

এসেছে আষাঢ়

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ

এসেছে আষাঢ়
তরুলতা ভানুতাপে বিকল অসাড়
কত দিন ছিল মুখ বুজে,
বনের মনের গান গিয়েছিল মরে'
এত দিনে দিন পেল' বুঝে
অই শোন দিকে দিকে ফের মর্‌মরে।

কেঁদেছে চাতক,
ফটিক-জলের তরে, আজ পলাতক
ডুবে পাছে মরে ধারা-জলে,
চকোর ফুকারি ফেরে আঁধার আকাশে,
হায় চাঁদ কোথা গেল চলে?
সুধা তো দুরাশা, আলো নাহি পরকাশে

দেবের একখানা তাম্রশাসন পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত রাধা-গোবিন্দ বসাক মহাশয় Epigraphia Indica পত্রের xii খণ্ডে উহার পাঠ প্রকাশিত করিয়াছেন। এই শাসনে শ্রীচন্দ্রদেবের পিতা ত্রৈলোক্য চন্দ্রদেব সম্বন্ধে একটি রহস্যময় কথা লিখিত আছে। ত্রৈলোক্যচন্দ্র—

চন্দ্রানামিহ রোহিতাগি (রি)
ভুজাং বংশে বিশাল শ্রীয়াম্

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ চন্দ্রদের অনেকগুলি বংশ ছিল, ইহাদের মধ্যে রোহিতাগিরির মালিক যাঁরা ছিলেন, সেই বংশে ত্রৈলোক্যচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বংশ বিশালশ্রী ছিল, অর্থাৎ বেশ টাকা পয়সাওয়ালা ছিল। রোহিতাগিরি স্পষ্টই ত্রিপুরা জেলার লালসাই পাহাড়ের নাম। অতঃপর রহস্যের কথা এই যে, ত্রৈলোক্যচন্দ্র—

আধারো হরিকেল রাজককুদছত্রস্মিতানাং শ্রীয়ম্
যশ্চন্দ্রোপ্পপদে বভূব নৃপতি দ্বীপে দিলীপোপমঃ।

হরিকেলের রাজার ককুদ্ ছত্রে হাস্য করিতেন যে রাজলক্ষ্মী, ত্রৈলোক্যচন্দ্র সেই রাজলক্ষ্মীর আধার স্বরূপ ছিলেন। এবং পরে তিনি চন্দ্রদ্বীপে রাজা হইয়াছিলেন। নিহিতার্থ একটু প্রণিধান করিয়া দেখা যাক্।

চন্দ্রদ্বীপ বাখরগঞ্জ জিলার অধিকাংশের প্রাচীন নাম। উহা হরিকেল রাজ্যের অন্তর্গত। কাজেই ত্রৈলোক্যচন্দ্র হরিকেলের রাজার অধীনে সামন্তরাজা হইয়াছিলেন। এ দিকে কিন্তু ত্রৈলোক্যচন্দ্র হরিকেল রাজলক্ষ্মীর আধার স্বরূপ ছিলেন। অর্থাৎ হয় অর্থবলের জন্য অথবা বাহুবলের জন্য হরিকেল-রাজ ত্রৈলোক্যচন্দ্রের উপর নির্ভর করিতেন। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্র যে সমগ্র হরিকেলের রাজা হইয়া শ্রীবিক্রমপুর সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ তাম্রশাসন প্রচার করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা হইতেই হরিকেল-রাজের পর-নির্ভরতার ফল কিরূপ ফলিয়াছিল, তাহা বেশ পরিষ্কারই বুঝা যায়। ধনবল বা বাহুবলের সাহায্য দিয়া ত্রৈলোক্যচন্দ্র চন্দ্রদ্বীপটি পাইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্রীচন্দ্র প্রভুবংশকে উচ্ছেদ করিয়া নিজেই হরিকেলের রাজা হইয়া বসিলেন। রোহিতাগিরি ও তাহার আশে পাশের যায়গা তো আগে হইতেই চন্দ্রদের হাতে ছিল। শ্রীচন্দ্র তাই এইবার ত্রিপুরা, নোয়াখালি, ঢাকা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জের মালিক হইয়া বসিলেন। প্রাচীন নাম বলিতে গেলে, তিনি সমতট ও বঙ্গের একছত্র রাজা হইলেন।

এই ককুদ-ছত্র-ওয়ালা হরিকেলের রাজাটি কে? অভিধান খুলিয়া দেখুন, ককুদের নানা রকম মানে আছে। একটি অর্থ সর্প। যদি এই অর্থ গ্রহণ করা যায়, তবে বুঝিতে হইবে যে, এই হরিকেল রাজের রাজছত্র সর্প-চিহ্নিত ছিল। অবশ্য অন্য রকম মানেও করা যায়। এখন কান্তিদেবের তাম্রশাসনখানা দেখুন। উহার মাথায় যে রাজমুদ্রা সংলগ্ন আছে, তাহাতে দেখা যায়, একটি ত্রিভঙ্গ খিলানযুক্ত মন্দিরের মধ্যে চতুষ্পদ সিংহ-মূর্ত্তি,—শাসনের মধ্যে হিরণ্যকশিপু-বধের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, নৃসিংহ-মূর্ত্তি। তাহার নীচে উঁচু অক্ষরে লেখা—শ্রীকান্তি-দেবঃ। সমগ্র মুদ্রাটির নিম্নাংশ বেষ্টন করিয়া লাঙ্গুলে লাঙ্গুলে জড়াইয়া দুইটি বৃহৎ সর্প ফণা ধরিয়া আছে।

এই সর্প দুইটি এত বড় ও স্পষ্ট রূপে উৎকীর্ণ যে, উহারা যে শুধু শোভার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, এমন মনে হয় না। আমার মনে হয়, ইহাই হরিকেল-রাজের রাজচ্ছত্রের ককুদ চিহ্ন। এবং এই কান্তিদেবের হাত হইতেই শ্রীচন্দ্র-দেব হরিকেল কাড়িয়া লইয়াছিলেন। শ্রীচন্দ্রের তাম্র-শাসন বিক্রমপুর নগরী হইতে প্রদত্ত। কান্তিদেবের সময়ে যাহার নাম বর্দ্ধমানপুর ছিল, বিক্রম পণ্যে লব্ধ হইয়া তাহা বিক্রমপুর বলিয়া বিখ্যাত হইয়া উঠিল। বর্ম্মরাজগণ আনুমানিক ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে বিক্রমপণ্যেই চন্দ্রগণের নিকট হইতে বিক্রমপুর কিনিয়া লইয়াছিলেন। শেষ বর্ম্মরাজের নিকট হইতে এই বিক্রম-পণ্যেই বিজয়সেন আনুমানিক ১০৯০ খৃষ্টাব্দে বিক্রমপুর কিনিয়া লইয়াছিলেন। চন্দ্র ও বর্ম্মরাজগণের সমস্তগুলি এবং সেনরাজগণের অনেকগুলি তাম্রশাসনই শ্রীবিক্রমপুর রাজধানী হইতে প্রদত্ত।

বাতায়ন রক্ষে

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বাগচী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

দ্বন্দ্ব

শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

১১
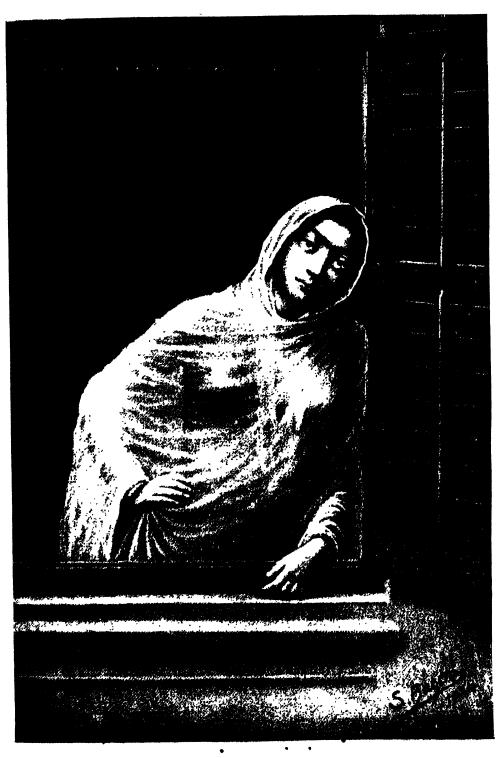
কিরণ তাহার কাজ শেষ করিয়া বাড়ী, ফিরিয়া দেখিল, তাহার হলঘরের বারাণ্ডায় লীলা একা দাঁড়াইয়া আছে।

"এই যে! কতক্ষণ এসেছো? দেখা হলো অরুণের সঙ্গে?" হাসিমুখে নিকটে আসিয়া কিরণ প্রতিদিনের মত তাহার হাত ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল।

লীলা কিন্তু আজ আর তাহার মুখের দিকে চাহিতে পারিল না। কিরণকে দেখিয়াই তাহার বুকের মধ্যে অত্যন্ত কাঁপিতেছিল। তাহার মুখ একেবারে রক্তশূন্য, সাদা! সে মাথা হেঁট করিয়া মাটির দিকে দৃষ্টি নামাইয়া কম্পিত মৃদুকণ্ঠে বলিল, "কিরণ! তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। এসো—একটা নিরালা জায়গায় বসে সব বোলবো!"

কিরণ হতবুদ্ধি হইয়া গেল। লীলার তেজোময় মূর্ত্তিই তাহার চির-পরিচিত,—লজ্জা ও সঙ্কোচে-ভরা নতশির, এ রূপ তাঁহার কাছে সম্পূর্ণ নূতন। তাহার হাসিমুখ শুকাইয়া গেল। অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া সে বলিল, "ব্যাপারটা কি? কি হয়েছে—লিলি?"

মুখ নীচু করিয়া লীলা বলিল, "আমি একটা বড় অন্যায় কাজ করে ফেলেছি! তুমি যে আমায় কি বলবে, আর সকলেই বা কি বলবে, আমি তাই ভাবছি।"

কিরণ অস্থির হইয়া উঠিল। লীলা অন্যায় কাজ করিয়াছে! এ কি সম্ভব? এমন কি কাজ সে করিতে পারে, যাহার জন্য সে নিজে এমন কুণ্ঠিত ও কাতর হইয়া পড়িয়াছে? অত্যন্ত আকুল হইয়া সে বলিল, "এমন কি অন্যায় করেছ তুমি? এসো—এইখানে বসে সব বল দেখি? কি হয়েছে?"

দুজনে বারাণ্ডার শেষ প্রান্তে একটা বেঞ্চের উপর বসিল। সামনে একটা অশ্বত্থ গাছের মোটা ডালে দড়ার দোলনা ফেলিয়া মালীর পুত্র গিরিধারিয়া পরম নিশ্চিন্ত ভাবে দুলিতেছিল। লীলা তাহার ম্লান নেত্রের কুণ্ঠিত দৃষ্টি সেই দিকে নিবদ্ধ রাখিয়া বলিল, "আমি সত্যই বড় অন্যায় কাজ করেছি, কিরণ! কিন্তু কেন যে করেছি, সে সবই তোমায় বুঝিয়ে বলছি—সব কথা শুনে তুমি আমার অবস্থাটা বুঝে দেখো। আজ সকালে অরুণের সঙ্গে আমার দেখা করতে আসবার কথা ছিল—সে তো তুমি জানই। আমি নিজেই ইচ্ছে করে এ দুঃসাহসের কাজ করতে সঙ্কল্প করেছিলুম,—কারো বারণ বা যুক্তি কিছুই শুনি নি। কিন্তু যখন তোমার বাড়ীর দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলুম, তখন কেমন একটা অজানিত কুণ্ঠা ও সঙ্কোচে আমার বুকের ভেতর কেঁপে কেঁপে উঠছিল। আমি ভাবছিলুম, জীবনে কোন দিন যাকে চোখেও দেখি নি, যার সঙ্গে আমার কোনও সম্বন্ধই নেই, সেই একজন অচেনা লোকের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমি যে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছি, এমন অদ্ভুত খেয়াল কোথা হতে আমার মাথায় ঢুকলো! আজকের এ খেয়ালের শেষ ফল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? তখন মনে হচ্ছিল, কেন তোমার বারণ শুনলুম না? তার পর আর একটা কথা এই যে, আমাদের প্রথম পরিচয়টা কি ভাবে হবে? আমি যে কি বলে নিজের পরিচয়টা দেবো—তার অনেক রকম মহড়া দিতে দিতে যাচ্ছিলুম। হেসো না তুমি—আমি সব কথাই বলছি তোমায়, ভাবলুম। বোলবো—'আমি বীণার বোন—লীলা। আপনি আমায় কখন দেখেন নি, তবু আপনি এখানে এসেছেন শুনে আমি নিজেই আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছি। পরে হয় ত আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হতে পারে।' আবার ভাবলুম—এই রকম বলি—'আমার অনধিকার-প্রবেশের জন্য মাপ করবেন। বীণার কাছ থেকে আপনার জন্যে একখানা চিঠি এনেছি।' প্রথম পরিচয়টা যে কি ভাবে দেবো, সেটা অনেকবার অনেক রকম করে ঘুরিয়ে

ফিরিয়ে মুখস্থ করতে করতে যাচ্ছিলুম। ভাঙা-গড়া সমানে চলছিল, কারণ, কোনটাই মনের মত হচ্ছিল না। যা হোক, বাড়ীর কাছাকাছি আসতে একটা কিছু স্থির করে ফেলা গেল। কিন্তু তখন আর একটা বিপদ এই হলো যে, যতই তোমার বাড়ীর কাছে আসি, ততই ব্যাপারটা এত অদ্ভুত ও লজ্জাকর মনে হতে লাগলো, যে, আমি ভাবতে লাগলুম, ফিরে যাই—আর গিয়ে কাজ নেই।”

বলিতে বলিতে লীলা কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। সামনের বাগান হইতে পাখীদের গান শোনা যাইতেছে। গাছের পাতা কাঁপাইয়া শির-শির করিয়া বাতাস বহিতেছিল। তাহার মৃদু হিল্লোলে বাগানের পুষ্পিত লতা ও লম্বা ঘাসের শ্রেণী কাঁপিয়া কাঁপিয়া দুলিতেছিল। কিরণ কোন কথা না বলিয়া স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া ছিল। সে স্থির করিতে পারিল না—এবার তাহাকে কোন্ কথা শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

অনেকক্ষণ পরে লীলা আবার বলিতে লাগিল, “হয় ত ফিরে গেলেই ভাল করতুম। কিন্তু তুমি ত আমার স্বভাব জানোই—যা ধরবো, তা আমায় করতেই হবে, না হলে আমার নিজের কাছ থেকে নিজেরি নিষ্কৃতি নেই। তাই, সব লজ্জা সঙ্কোচ চেপে আমি ঘোড়া ছুটিয়ে এখানে এসে পৌঁছলুম। একজন সহিস এসে আমার ঘোড়াটা ধরতে, আমি তাকে অরুণের কথা জিজ্ঞাসা করায়, সে আমায় তার ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে ঘোড়া নিয়ে আস্তাবলের দিকে চলে গেল। আমি ধীরে ধীরে বারাণ্ডায় উঠে, ঘরের দরজার কাছে দাঁড়ালুম। সে তখন টেবিলের ধারে বসে মাথায় হাত রেখে হয় তো কিছু ভাবছিল।

আমি খুব আস্তেই ঘরে ঢুকেছিলুম, কিন্তু আমার সেই মৃদু পায়ের শব্দ তার কাণ থেকে এড়ায় নি। সে চমকে উঠে, কে এসেছে, জানবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে বলে উঠলো—‘কে—বেহারা?’ আমি তখন থতমত খেয়ে গেলুম। বুকের ভিতর তখন এত কাঁপছিল, যে, কোন কথা বলতে পারলুম না! সে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার বল্লে—‘কে ওখানে? সাড়া দিচ্ছ না কেন?’ কিন্তু আমি তখন কি বোলবো? আমি যা কিছু মুখস্থ করে এসেছিলুম, সে সবই ভুলে গেলুম। শুধু আত্মবিস্মৃত হয়ে [illegible] তার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। তার তরুণ যৌবনের শোভা-সম্পদে-ভরা মুখ, আর সেই মুখে—সেই বড় বড় কালো চোখে কি শূন্য লক্ষ্যহীন দৃষ্টি! সে যখন—কে এসেছে, জানবার জন্যে তার অন্ধ নয়নের ব্যাকুল দৃষ্টি তুলে অসহায়ের মত এদিক ওদিক চাইছিল, তখন একটা অব্যক্ত যাতনায় আমার চোখ ফেটে জল ঝরতে লাগলো! এদিকে আমায় নীরব দেখে সে অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে বলে উঠলো, ‘কিরণ! তুমি কি এখনি ফিরে এলে! কথা বোলছো না কেন?’ এবার আমি থতমত খেয়ে বলে ফেল্লুম, ‘কিরণ এখনো ফেরে নি, আমি আপনাকে দেখতে এসেছি?’ আমি এই কথা বলবামাত্র সে চৌকি থেকে লাফিয়ে উঠলো, ‘এ কি? বীণা! তুমি আমায় দেখতে এসেছো!’ এই কথা বলেই চক্ষের নিমেষে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে এলো!

কিরণ এতক্ষণ নীরবে শুনিতেছিল। সে এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত চমকিয়া উঠিয়া বলিল, “সে কি! তোমাকে বীণা বলে সে কি করে ভুল করলে? এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার!”

লীলা বলিল, “সেই ভুলেই তো এত কাণ্ড ঘটলো! সে আমায় কাছে বসিয়ে হঠাৎ ঝরঝর করে কাঁদতে লাগলো! আমার আগে থেকেই মন বিপর্য্যস্ত হয়েছিল। তার পর এই আকস্মিক ব্যাপারে আমি এমন হতবুদ্ধি হয়ে গেলুম, যে, তাকে কোন কথা বলবার বা বাধা দেবার আমার কোন শক্তি থাকলো না। খালি মনে হচ্ছিল—অরুণ এ কি করল! তার পরে ক্রমশঃ আমার মনে পড়তে লাগলো, বীণার ও আমার আকৃতি, গঠন, ও গলার স্বর প্রায় একই রকম। অন্ধকারে থাকলে বাড়ীতে প্রায়ই একজনকে আর একজন বলে লোকে ভুল করতো। দরজার বাইরে থেকে কথা বল্লে—কে লীলা, আর কে বীণা অনেক সময় বোঝা যেত না।”

কিরণ অধীর ভাবে বলিয়া উঠিল, “যাক্‌গে সে কথা। তার পরে তুমি নিজের পরিচয় দিয়ে তার সে ভুলটা ভেঙে দিয়েছ তো? তা হলেই হলো। তার পর কি বলছিলে বলো—কি হলো তার পর?”

লীলা মাথা নীচু করিয়া বলিল, “সেই কথাই তো বলছি, তুমি শুনে যাও। তার পরে আমি নিজে একটু প্রকৃতিস্থ হতেই, তার হাত থেকে আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সরে

বসলুম। তাকে নিজের পরিচয় দেব বলে তার মুখের দিকে চাইতেই হঠাৎ আমার স্বর বন্ধ হয়ে এলো!

"আমি দেখলুম, আমাকে বীণা বলে ভুল করে তার মনে কি বিপুল আশা ও আনন্দ আবার জেগে উঠেছে! যখন প্রথম তাকে দেখি, তখন দেখেছিলুম, যেন সে মুখে জীবনের কোন লক্ষণ ছিল না,—হতাশা ও বেদনায় মণ্ডিত সে কি বিষণ্ণ, কি মলিন সে মুখ! কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যে তার মধ্যে যে কি পরিবর্ত্তন ঘটে গেল, সে আমি তোমায় বলে বোঝাতে পারবো না কিরণ! সে যেন নতুন জীবনে, স্ফূর্ত্তিতে, নতুন উৎসাহে পূর্ণ হয়ে উঠলো! সে নিজে নিজেই পাগলের মত বকছিলো—'ওঃ! তুমি তা'হলে আমায় ভোল নি বীণা? আবার তবে তুমি আমার কাছেই ফিরে এলে? তুমি বোধ হয় আমার সে চিঠিখানা পেয়ে কত ব্যথা পেয়েছ, আমাকে হৃদয়হীন নিষ্ঠুর ভেবে হয় তো কত কেঁদেছ! কিন্তু সত্যি বলছি বীণা, সে চিঠিখানা আমি লিখেছিলুম, শুধু শুষ্ক কর্ত্তব্যের খাতিরে, আর ঘোর নিরাশায়। তোমাকে এ অবস্থায় নিজের সঙ্গে জড়িত করে কষ্ট দিতে কিছুতেই ইচ্ছে ছিল না তাই। না হলে মন যে আমার তোমায় কাছে পাবার জন্য কি তৃষিত, কি আকুল হয়েছিল, সে আমি তোমায় কি করে বোঝাবো? তুমি আবার আমার কাছে ফিরে এসেছো, এতে যে আমার কি আনন্দ হচ্ছে, সে অন্তর্যামী যিনি—তিনিই জানছেন।'

সে উচ্ছ্বসিত আনন্দে এই রকম পাগলের মত বকে যাচ্ছিল। আমি তাকে কি করে তখন বলি, 'ওগো! তোমার ভুল হয়েছে! বীণা আর তোমায় চায় না, সে তোমার সঙ্গে সব সম্বন্ধ ত্যাগ করেছে, তার কাছে আর কিছুর আশা করো না তুমি!' যে জীবনের সব আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছে,—এই ক্ষীণ আশার আলোটুকু তার কোন্ প্রাণে আমি নিবিয়ে দেব? আমি জানি, আমার অন্যায় হচ্ছে, তবু আমি মুখ ফুটে কিছু বলতে পারিনি, কিরণ! আমি তার সঙ্গে এমন ভাবে কথা বলেছি, যে, সে শেষ পর্য্যন্ত আমাকে বীণা বলেই জেনেছে ও সেই আনন্দে বিভোর হয়ে আছে!"

"লিলি!" কিরণ সহসা উদ্দীপ্ত ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া লীলার মুখের দিকে চাহিল।

লীলা একবার তাহার দিকে চোখ তুলিয়াই তখনি মাথা হেঁট করিল। তাহার মুখ তখন একেবারে রক্তশূন্য, বিবর্ণ। কেবল তাহার পাতলা লাল ঠোঁট দুটি অত্যধিক আবেগে কাঁপিতেছিল।

তাহাকে নীরব দেখিয়া কিরণ অত্যন্ত কঠোর স্বরে বলিল, "আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেছি, তুমি কি করে এমন কাজ করলে?"

লীলা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বলিয়া উঠিল, "না—না; কিরণ। তুমি আমার উপর রাগ করতে পাবে না! আমি মায়ের মুখের সামনে এর জবাবদিহি করতে পারবো, বাবার মুখের উপর তর্ক করতে পারবো, কিন্তু তুমি—তুমি—আমার একমাত্র বন্ধু,—আমার বড় প্রিয় তুমি; আমার উপর তুমি রাগ করে থাকবে, সে আমি কোন মতে সহ্য করতে পারবো না!"

কিরণ লীলার এ আকুলতায় কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। সে বলিল, "আমি কিছু বুঝতে পারছি না—কি করে তুমি এমন নির্লজ্জ কাজ করলে? একবার ভেবে দেখলে না,—সে কত বড় দুঃখী—কত বড় অসহায়, ভাগ্যবঞ্চিত! সে কারু খেয়াল বা খেলার পাত্র নয়। এত বড় প্রতারণা তাকে করতে পারলে তুমি? তোমার নিজের মুখে শুনেও এ কথা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না যে আমার! তুমি এমন কাজ করলে?"

লীলা তাহার সজল চোখ দুটি তুলিয়া করুণ দৃষ্টিতে কিরণের মুখের দিকে চাহিল; "বলিল, আমি তোমায় বড় উত্যক্ত করেছি কিরণ! তোমার তিরস্কার এখন আমায় সহ্য করতেই হবে।"

কিছুক্ষণ উভয়ে নীরব হইয়া রহিল। কিরণ ক্ষুব্ধ, বিস্মিত ও দারুণ বিরক্তিপূর্ণ হৃদয়ে লীলার এই বিসদৃশ আচরণের কথা ভাবিতেছিল। আর লীলা তাহার নিজেরই হৃদয়ের এ দীনতা দেখিয়া নিজেই হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছে! সে যে চিরদিন নিজের ইচ্ছামত চলিয়া নিজের খেয়ালমত কাজ করিয়া, নিজের দর্পে চলিয়া, আসিতেছে,—সে ত কোন দিন কাহারও বিরাগ বা অসন্তোষের কিছুমাত্র ধার ধারিত না,—আজ তাহার এ কি হইল? কিরণের সুমুখে সে যে মুখ তুলিতে পারিবে না, তাহার বিরক্তির ভয় যে তাহাকে এমন আকুল করিয়া তুলিবে, তাহাই কি সে পূর্ব্বে ভাবিতে পারিয়াছিল?

মৃদু দোলায় অলস নিশ্চিন্ত ভাবে গিরিধারীকে দুলিতে দেখিয়া তাহার বন্ধু সুখনের মনে অনিবার্য্য কৌতুকস্পৃহা জাগিয়া উঠিল। সে নিঃশব্দে পিছন দিক হইতে পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া সহসা প্রাণপণ বলে গিরিধারীকে এক ঠেলা দিয়া বিষম জোরে দোলাইয়া দিল।

গিরিধারী তখন অতি আরামে দুলিতে দুলিতে চক্ষু মুদিয়া বয়স্কদিগের অনুকরণে একটি প্রচলিত ঝুলনের গান গাহিতেছিল—'পিয়া গঁয়ে পরদেশীয়া, না লিখে পাতি রে-হয়ি' !

অকস্মাৎ প্রবল দোলায় সবেগে দুলিয়া উঠিয়া, সে পতনের ভয়ে ব্যাকুল হইয়া, তাহার বিরহ-গীতি অসম্পূর্ণ রাখিয়াই, তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—মায়ী-রে মায়ী !

সুখন হাসিতে ফাটিয়া পড়িয়া, হাততালি দিতে দিতে সামনে আসিয়া দাঁড়াইতেছিল, ইতিমধ্যে মালীর কুটীর হইতে মালীগৃহিণীকে—'কউন্ গুলাম কা বেটা রে' বলিতে বলিতে রণরঙ্গিনী মূর্ত্তিতে আসিতে দেখিয়া, সে বেচারা অকাল রসভঙ্গে সহসা বিপরীত দিকে চম্পট দিল।

গিরিধারীর চীৎকারে সচেতন হইয়া কিরণ বলিল, "কথাটা ভাল করে ভেবে দেখ লীলা ! দয়া, সহানুভূতি, মমতা—এ সবই খুব ভাল জিনিস। কিন্তু সব জিনিসেরই সীমা আছে। মাত্রা ছাড়ালে ভাল জিনিসেরও কোন মর্য্যাদা থাকে না। তুমি যে পথে চলেছ, তা অত্যন্ত অসম্মানকর। তোমার নিজের সম্মানের পক্ষে। তা ছাড়া, অরুণের প্রতি এটা যে কত বড় অত্যাচার, তা তুমি বুঝতে পারছ না ? যে অনিবার্য্য নিরাশা ও ব্যথা তাকে সহ্য করতেই হবে, সেটা প্রথম থেকে অভ্যাস করাই ভালো। দুদিনের জন্য তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে মিছে নূতন করে তাকে কষ্ট দেবার কি সার্থকতা আছে—আমি ত কিছু বুঝি না।"

লীলা পুষ্পিত চন্দ্রমল্লিকার গাছে বাতাসের খেলা দেখিতে দেখিতে বলিল, "আমি শেষ পর্য্যন্ত ভেবে দেখেছি কিরণ ! আমার সম্মান যাতে নষ্ট না হয়, আর তার প্রতিও কোন অন্যায় যাতে না হয়, তুমি আসবার আগে আমি সে সব কথাই ভেবে দেখেছি।"

"অর্থাৎ শেষ পর্য্যন্ত সে তোমাকে বীণা বলেই জানবে, আর তুমি তাকে বিয়ে করবে—এই তো ?" কিরণের স্বর আবার উত্তপ্ত হইয়া উঠিল।

লীলা বলিল, "আমার এখনো আশা আছে,—আর কিছু দিন ভেবে দেখলে বীণা তার মত্ বদলাবে। তত দিন আমি এই ভাবেই এসে মাঝে মাঝে তাকে দেখে যাব। আর যদি কিছুতেই বীণা না বোঝে, তা হলে অরুণকে বিয়ে করতেও আমার কোনও আপত্তি নেই। কারণ, আমি তাকে ভালবাসি !"

"ঐখানেই তোমার ভুল ! তুমি কখনো তাকে ভালবাস না।"

"নিশ্চয়ই ! আমি অনেক ভেবে বুঝে দেখেছি, আমি তাকে ভালবাসি, যথার্থই ভালবাসি।"

"কখনও না !" অত্যন্ত রাগিয়া কিরণ বলিল, "তোমার দয়া ও সহানুভূতি—এই দুটোকেই ভালবাসা বলে চালাতে চাচ্ছ, আর নিতান্ত নির্ব্বোধের মত একটা কাজ করছো ! আমি কখনো এ সব কাণ্ড ঘটতে দেব না।"

লীলা অত্যন্ত ক্ষুব্ধচিত্তে কিরণের মুখের দিকে চাহিল। তাহার দৃষ্টি কাতর মিনতি-ভরা। সে বলিল, "কিরণ ! তুমি আমার এত দিনের বন্ধু হয়ে আজ আমার সঙ্গে এই রকম ব্যভার করবে ?"

"আমি তোমার বন্ধু—তাই তুমি না বুঝে যে অন্যায় কাজ করেছ, সময় থাকতে তার প্রতীকার করবার অধিকার আমার আছে। আমি অরুণকে সব বুঝিয়ে বোলবো। তার কষ্ট হবে বলে সে সময় তুমি তাকে কোন কথা বলতে পার নি, এ কথা শুনলে সে আর কিছু মনে করবে না। সে মানুষ,—মানুষের মতই তাকে তার নিরাশার কষ্ট মাথা পেতে নিতে ও সহ্য করতে দাও ; তুমি নিজে থেকে কেন বুঝছো না—এ কাজটা কত খারাপ হচ্ছে ?"

লীলা অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তার পর মাথা তুলিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "আমি তোমার কথায় সায় দিতে পারছি না। তোমার মধ্যস্থতার ফলে যে বেচারা এত কষ্ট পেয়েছে, তাকেই আবার নতুন করে যাতনা সহ্য করতে হবে। তুমি জানো—তার দুর্ভাগ্য আমার কাছে তোমাদের মত তুচ্ছ বিষয় নয় ! তোমাকে কিংবা আর কাউকে সন্তুষ্ট করবার জন্য তাকে আমি দুঃখ দিতে পারবো না !"

বলিতে বলিতে লীলার মুখের স্বাভাবিক জ্যোতিঃ ফিরিয়া আসিল। সে তেজে গর্ব্বে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া স্থির চক্ষে কিরণের দিকে চাহিয়া বলিল, "জানো তুমি—আমি নিজেই নিজের প্রভু,—আর কারু মত বা ইচ্ছা অনুসারে চলা আমার স্বভাব নয়! অরুণের কাছে আমি নিজে এক দিন সব স্বীকার করবো। আর সব শুনেও সে যদি আমায় চায়, তা হলে তাকে সুখী করবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করবো। আমার ভবিষ্যৎ আমি নিজে স্থির করে নিয়েছি,—আর কারু তাতে কথা বলবার কি অধিকার? তোমার কাছে শুধু আমি এই চাই যে, আমার বলবার আগে তুমি তাকে কোন কথা ভাঙবে না। এখন যদি তুমি আমায় বঞ্চনা করো—আমি যাবজ্জীবন তোমায় ঘৃণা করবো। জানো ত? আমি তোমায় কত ভালবাসি?"

"আমি জানি না! জানবার দরকারও নেই! তুমি যদি তোমার ইচ্ছামত চলো, আমার বলবার অধিকার কি?" কিরণ রাগে মুখ অন্ধকার করিয়া বারাণ্ডায় পায়চারী করিতে লাগিল।

লীলা এক মুহূর্ত্ত তার সেই বিমুখ মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আজ তার এ কি পরাজয়ের দিন! তাহার মনের বল, দর্প—সবই যে ভাসিয়া যাইতে চলিল! কিরণ রাগ করিয়া দূরে থাকিলে, সে যে এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিতে পারে না!

লীলা আবার তার সমস্ত অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া কিরণের কাছে গেল। বলিল, "কিরণ! তুমি রাগ করে যাই বল না,—আমি তোমায় সত্যই ভালবাসি,—তোমার কাছে কোন কথা লুকিয়ে রাখতে পারি নি। আজও তোমায় সব খুলে বল্লুম। এখন যদি তুমি গোঁয়ারতুমি করে অরুণকে কষ্ট দাও, তা হলে জীবনে কখনো আমি তোমার মুখ দেখবো না। কিন্তু এখন,—এখন আমার এই সঙ্কটের সময় তুমি কি আমার একটা কথাও রাখবে না কিরণ? এমনি করে এত সহজে আমায় দূরে সরিয়ে দেবে?" অশ্রুর উচ্ছ্বাসে লীলার স্বর রুদ্ধ হইয়া গেল।

কিরণ তখনি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বল, কি বলবে?"

"শুধু বিশ্বাস কর,—আমি চুরি করে বীণার প্রাপ্য ভালবাসা তার কাছ থেকে নিতে আসি নি। তার কষ্ট ভুলিয়ে রাখবার জন্যেই এ কাজ করেছি। যত দিন না আমি নিজে থেকে তাকে সব কথা বলি, তত দিন তুমি চুপ করে থেকো। আমি মাঝে মাঝে এসে তাকে দেখে যাবো। তাতে আমার বা তার কোন ক্ষতি হবে না। বল, আমার কথা রাখবে?"

কিরণ অত্যন্ত অপ্রসন্ন মুখে বলিল, "তোমার এ কথায় আমার সমস্ত মন থেকে বিদ্রোহ জেগে উঠছে! আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, এ ব্যাপারের সবটারই আমি প্রতিবাদ করি। তুমি প্রতারক, ঠক,—তুমি স্বেচ্ছাচার করছো। তুমি এখন আর সে লীলা নেই, কাজেই তোমার সঙ্গে আমার আর আগেকার সে ভাব থাকতে পারে না। এ রকম স্বেচ্ছাচার কেউ সহ্য করতে পারে না।"

এবার লীলাও অত্যন্ত রাগিল। সে বলিল, "স্বেচ্ছাচার কি রকম! যা ইচ্ছে তাই বোলতে সুরু করেছ যে দেখছি?"

তাহার রুষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া সমান উত্তেজিত ভাবে কিরণ বলিল, "তা নয় তো কি? তুমি আজ যে কাজ করেছ, কোন ভদ্রকন্যা কখনো করা ছেড়ে তা ভাবতেও পারে না। তুমি একজন অচেনা পুরুষের সঙ্গে নিজে উপযাচক হয়ে অতিমাত্রায় ঘনিষ্ঠতা করেছ,—এ কথা মনে হয়ে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি! শেষে হয় তুমি তাকে বিয়ে করে এই কুৎসিত ব্যাপার শেষ করবে, আর নয় ত দেখবে—তুমি একটা নিতান্ত আত্মসম্মান-জ্ঞান-শূন্য সাধারণ স্ত্রীলোকের অধম। যে খেলা তুমি খেলছো, তার শেষ ফল ও পরিণাম এই!"

লীলার মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে খানিক চুপ করিয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিল। তার পর জোর করিয়া মুখ তুলিয়া সহজভাবে বলিল, "চুলোয় যাক ও কথা! তুমি কি ভাববে না ভাববে, সে ভাবনায় আমার কোন দরকার নেই। এখন বল—তুমি আমার কথা রাখবে কি না?"

কিরণ অবাক হইয়া কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এত কথা—এত তর্ক—এত অপমান—তবুও সে তাহার জেদ ছাড়িবে না? কি অদ্ভুত প্রকৃতির মেয়ে! অবশেষে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সে বলিল, "কাজেই—না রেখে উপায় কি!"

(ক্রমশঃ)

বিবিধ-প্রসঙ্গ

বাল্য-বিবাহ ও অকাল-মৃত্যু

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র বি-এ, এটর্ণী-এট-ল

আমাদের দেশের অকাল-মৃত্যুর সংখ্যা ইয়োরোপাদি সভ্য দেশের তুলনায় বেশী। তাহার কারণ অনুসন্ধান করা ও তাহা যাহাতে বন্ধ হয় সেরূপ চেষ্টা করা সকলেরই উচিত; সুতরাং এ বিষয়ে যত আলোচনা হয় ততই ভাল। গত মাঘ মাসের সংখ্যার "ভারতবর্ষে" শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র দে মহাশয় পূর্ব্বলিখিত প্রবন্ধগুলির সার সংগ্রহ করিয়াছেন; এবং তাহা হইতে এই প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, বাল্য-বিবাহের অন্যান্য অশুভ ফলের মধ্যে উহা বেশী অকাল-মৃত্যুর কারণ। অন্যান্য অশুভ ফলের কথা আপাততঃ ছাড়িয়া দিয়া অকাল-মৃত্যুর সহিত বাল্য-বিবাহের কোন কার্য্য-কারণ সম্পর্ক আছে কি না, তাহারই আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

গোড়াতেই একটা কথা ঠিক করিয়া লওয়া উচিত। কোন্ সময়ের বিবাহকে "বাল্য-বিবাহ" বলা হইতেছে? ৩৫ বৎসর যাবৎ বাল্য-বিবাহের দোষের অনেক আলোচনা দেখিলাম, কিন্তু ঠিক কোন্ বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত, তাহা কাহাকেও স্পষ্ট করিয়া বলিতে শুনিলাম না। আমাদের বিবাহ-প্রথার বিরোধীদের মধ্যে তিন শ্রেণীর লোক আছেন। এক শ্রেণীর লোকের মতে—যত দিন না পুরুষের স্ত্রী-পুত্রাদির উপযুক্ত রকমে ভরণ-পোষণ করিবার ক্ষমতা হয়, তত দিন বিবাহ করা উচিত নয়। সুতরাং অনেকের পক্ষে ৫০, ৬০ বৎসর বয়সেও বিবাহ করা দোষাবহ হইতে পারে, যদি তখনও সে স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণ-পোষণ করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে না পারে। আবার যাহার বিষয়াদি আছে, সে পাঁচ বৎসর বয়সে বিবাহ করিলেও তাঁহাদের মতে আপত্তিজনক হয় না। এরূপ আপত্তিকারীদের কথার এবারে আলোচনা করিব না, বারান্তরে করিবার ইচ্ছা রহিল; তাঁহাদের মতে বিবাহকে কিন্তু ঠিক "বাল্য-বিবাহ" বলা সঙ্গত নয়। আর এক শ্রেণীর লোক লেখাপড়া শেষ করার পূর্ব্বে বিবাহে আপত্তি করেন। ইঁহাদের সহিত হিন্দুর বিবাহ-প্রথার বিরোধ অতি অল্প; কারণ, পূর্ব্বকালে কেবল ব্রাহ্মণেরাই লেখাপড়া শিখিত—তাহাদের গুরু-গৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই বিবাহ করিবার নিয়ম ছিল। বাকী লোকেরা বড় লেখাপড়া শিখিত না। আজকালও আমাদের দেশে লেখাপড়া শেষ করিবার পূর্ব্বে বিবাহ করাটা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু এখন আবার এক নূতন কথা উঠিয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের পক্ষেও লেখাপড়া শেষ করিবার পূর্ব্বে বিবাহ করাটা কর্ত্তব্য নব্যতন্ত্রীদের মতে উচিত নয়। ইঁহাদের সহিত হিন্দু-বিবাহ প্রথার যথেষ্ট বিরোধ; কারণ, হিন্দুরা বহুকাল হইতেই, স্ত্রীলোকের প্রথম রজোদর্শনের পূর্ব্বেই কিম্বা তৎসময়ে বিবাহটা একান্ত কর্ত্তব্য—এ কথা বলেন। হিন্দুদিগের স্ত্রী-শিক্ষার আদর্শ আর এখনকার স্ত্রী-শিক্ষার আদর্শের সহিত বহু প্রভেদ থাকায়, এরূপ বিরোধ হইতেছে। হিন্দু স্ত্রী-শিক্ষার যে আদর্শ, সেরূপ স্ত্রীশিক্ষা বিবাহ হইলেও সহজে হইতে পারে। এরূপ বিরোধীদের কথাও বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা কেবল বিবাহের বয়সের দিকে লক্ষ্য করিয়াই আমাদের বিবাহ-প্রথার দোষ দেন। তাঁহারাই শরীর-বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া বলেন যে, অল্প বয়সে বিবাহ দিলে—স্ত্রীলোকদিগের স্বাস্থ্যহানি হয়, সন্তানেরা বলিষ্ঠ হয় না ও অনেক বেশী অকাল-মৃত্যু হয়। ইঁহাদের কথাটাই এবারে আলোচ্য।

আমাদের দেশে পুরুষদের শুক্র জন্মিবার পূর্ব্বে আজকাল আর বিবাহ হয় না বলিলেই হয়। স্ত্রীলোকদিগের রজোদর্শনের পূর্ব্বে বিবাহ যাঁহারা দোষের বলেন, তাঁহাদের সহিতই হিন্দুদের বিশেষ বিরোধ। এখন দেখা যাউক, তাঁহারা কিরূপ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এইরূপ বিবাহকে বেশী অকাল-মৃত্যুর কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। এইখানে পাঠকবর্গকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, যাঁহারা কোন একটা বিষয়ের বা ঘটনার কারণ নির্দ্দেশ করিতে চাহেন, তাঁহারাই তাহার প্রমাণ দিতে বাধ্য। ন্যায়শাস্ত্র মতে কারণ-নির্দ্দেশ করিতে হইলে দুইটী উপায়ের সাহায্যে তাহা করিতে হয়—Observation (পর্য্যবেক্ষণ) ও Experiment (পরীক্ষা)। আর একটা সহকারী উপায় আছে—সেটা Analogy (সাদৃশ্য ন্যায়)।

অকাল-মৃত্যুর সহিত বাল্য-বিবাহের কোন কার্য্য-কারণ সম্পর্ক আছে কি না, এ বিষয়ে কোন কালে, কোন দেশে যে বিশেষ ভাবে Experiment হইয়াছে, তাহা আমার জানা নাই; এবং বিজ্ঞান-শাস্ত্রানুযায়ী Experiment যে হইতে পারে, তাহাও সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং এ স্থলে পর্য্যবেক্ষণের উপরই আমাদের নির্ভর করিতে হইবে। এ ক্ষেত্রে কিরূপ পর্য্যবেক্ষণ হইয়াছে, একবার দেখা যাউক। আমার যতদূর মনে আছে, ব্রাহ্ম-বিবাহের বয়স নিরাকরণের সময় ৺কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় কতিপয় খ্যাতনামা ডাক্তারদের এ বিষয়ে মত লইয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে ১২, ১৩ হইতে আরম্ভ করিয়া ২৪, ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের বয়স ও ১৭, ১৮ হইতে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত পুরুষদের বয়স বিবাহের পক্ষে প্রশস্ত সময় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। আর একবার Age of Consent বিলের সময়ে

অনেক ডাক্তার কবিরাজদিগের মত লওয়া হইয়াছিল। সে সময়ে কিন্তু তাঁহাদের ভিতর খুব বেশী রকমের মতভেদ দেখা গিয়াছিল। ইহা ছাড়া আর কখন যে আমাদের দেশের ডাক্তার, কবিরাজ, হাকিম, ধাত্রীদের,—যাঁহাদের এ বিষয়ে পর্য্যবেক্ষণ করিবার ক্ষমতা ও সুযোগ বেশী আছে, তাঁহাদের মতের census লওয়া হইয়াছিল, তাহা আমার জানা নাই। ইয়োরোপ, আমেরিকায় বাল্যবিবাহ হয় না, সুতরাং সেখানকার ডাক্তারদের পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুযোগের অভাব এবং সে দেশের জল-হাওয়া ও সামাজিক অবস্থা আমাদের অবস্থা হইতে পৃথক হওয়ায় তাঁহাদের মতের কোন মূল্য নাই। আমাদের দেশের যে সকল ডাক্তাররা "বাল্যবিবাহের" বিরুদ্ধে মত দিয়াছেন, তাঁহারা কতগুলি case দেখিয়া, কিরূপ ক্ষেত্রে, কি প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদের মত দিলেন, তাহা নির্দ্দেশ করেন নাই। সুতরাং বিজ্ঞান-শাস্ত্রানুসারে তাহাদের মত প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য নয়; এবং ন্যায়শাস্ত্রমতে যে পর্য্যবেক্ষণ প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে, তাহার সম্পূর্ণ অভাব। দুই চারিটী ডাক্তারের মত উদ্ধৃত করিয়া, বাল্যবিবাহ বেশী অকাল মৃত্যুর কারণ—এই কথাটা প্রমাণ হইয়া গেল বলাটা কতদূর ন্যায়সঙ্গত, তাহা পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন। বাল্যবিবাহের বিরোধীরা তো তাঁহাদের কোন পর্য্যবেক্ষণের ফল প্রকাশ করেন নাই। আমরা একবার চেষ্টা করিয়া দেখি—কোন প্রমাণ পাওয়া যায় কি না।

বাল্যবিবাহের সহিত যদি বেশী অকাল-মৃত্যুর কোন কার্য্য-কারণ সম্পর্ক থাকিত, তাহা হইলে তাহার দোষময় ফল শিশুমৃত্যুর ও স্ত্রীলোকদিগের মৃত্যুর সংখ্যার মধ্যে দেখিতে পাওয়া উচিত। বাল্য-বিবাহের বিরোধীরা এই শিশুমৃত্যুর সংখ্যার আতিশয্যের দিকে লক্ষ্য করিয়াই এই কথা বলেন। আমাদের দেশে বিলাত অপেক্ষা শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা অনেক অধিক।

আমাদের দেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত, বিলাতে তাহা নাই। ইহা হইতে বাল্যবিবাহ অধিক শিশুমৃত্যুর কারণ, এই সিদ্ধান্ত ন্যায়শাস্ত্র মতে করা যায় না। বিলাতের লোক ফর্সা—আমরা কাল, সুতরাং কাল হওয়াটাকে যেমন অধিক শিশুমৃত্যুর কারণ বলাটা অসঙ্গত,—শুধু এই যুক্তির সাহায্যে বাল্যবিবাহকে অধিক শিশুর মৃত্যুর কারণ বলাটা ঠিক ততটাই অসঙ্গত। কার্য্য-কারণ সম্পর্ক দেখাইতে হইলে ন্যায়শাস্ত্রোক্ত method of concomitant variation দ্বারা তাহার পরীক্ষা করিয়া লইতে হয়। যদি একটী ঘটনা আর একটী ঘটনার সহিত এরূপভাবে সংযুক্ত থাকে যে, একটা বাড়িলে বা কমিলে আর একটা সেইরূপ বাড়ে বা কমে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত ঘটনাটিকে শেষের ঘটনার কারণ বলা যায়। ইহাকেই method of concomitant variation বলে। বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার কোন্ কোন্ জেলায় শিশুমৃত্যুর হার কিরূপ এবং সেই সেই জেলায় বাল্যবিবাহ কতটা প্রচলিত ১৯১১ সালের আদমশুমারি (census) হইতে তাহার একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়াছি। দুঃখের বিষয় ১৯২১ সালের censusএ এরূপ তালিকা প্রস্তুত করিবার উপকরণ নাই। তালিকা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। যে সকল জেলায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বাল্যবিবাহের প্রচলন অর্থাৎ যাহাতে পাঁচ হইতে দশ বৎসর বয়স্ক ১০০০ বালিকার ভিতর ৫৮৫ হইতে ১৫০ বালিকা বিবাহিতা, তাহাদিগকে "ক" শ্রেণীভুক্ত করিলাম। এবং যে সকল জেলায় পাঁচ হইতে দশ বৎসর বয়স্ক ১০০০ বালিকার ভিতর ১৫০ হইতে ১০০ বিবাহিতা, সেই সকল জেলাকে "খ" শ্রেণীভুক্ত করিলাম। এবং ওইরূপ ১০০০ বালিকার ভিতরে ১০০ অপেক্ষা কম বালিকা যে সকল জেলায় বিবাহিতা সেই জেলাগুলিকে (অর্থাৎ এই সকল জেলায় সাধারণতঃ এক বৎসরের কম বয়সী শিশুদিগের মৃত্যুসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা কম; অর্থাৎ ওইরূপ ১০০ শিশুর ভিতর ২০ কিংবা তদপেক্ষা কম সংখ্যক শিশুর মৃত্যু হয়) প্রথম শ্রেণীভুক্ত করা গেল। যে সকল জেলায় ওইরূপ শিশুমৃত্যুর সংখ্যার হার শতকরা ২০ হইতে ২৪ তাহাদিগকে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করা গেল এবং শিশুমৃত্যুর সংখ্যা যেখানে শতকরা ২৫ কিংবা তদূর্দ্ধ, তাহাদিগকে তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করিলাম। ওই তালিকাগুলিতে সর্ব্ববিষয়ের সমষ্টি-মৃত্যুর হারও দিলাম। তাহা হইতে ওই সকল জেলার স্বাস্থ্যের অবস্থাও দেখিতে পাইবেন।

'ক' শ্রেণী

জেলা	পাঁচ হইতে দশ বৎসরের ১০০০ বালিকার ভিতর বিবাহিতার সংখ্যা	শিশু মৃত্যুর হারে কোন শ্রেণীভুক্ত	শিশু মৃত্যুর হার শতকরা	সাধারণ মৃত্যুর হার শতকরা
১ দারভাঙ্গা	৫৮৫	প্রথম	১৩ হইতে ১৬	৩০ হইতে ৩৫
২ ভাগলপুর	৪৩৫	"	১৩ ,, ১৬	৩০ ,, ৩৫
৩ মুঙ্গের	৩৭৩	"	১৭ ,, ১৮	৩৫ ,, ৪০
৪ মজফ্ফরপুর	৩৪০	"	১৭ ,, ১৮	৩৫ ,, ৪০
৫ হাজারিবাগ	২৪৫	"	১৭ ,, ১৮	৩০ ,, ৩৫
৬ মানভূম	১৮৬	"	১৩ ,, ১৬	২৫ ,, ৩০
৭ চব্বিশপরগণা	১৭৭	"	১৭ ,, ১৮	২৫ ,, ৩০

জেলা	পাঁচ হইতে দশ বৎসরের ১০০০ বালিকার ভিতর বিবাহিতার সংখ্যা।	শিশু মৃত্যুর হারে কোন শ্রেণীভুক্ত	শিশুমৃত্যুর হার শতকরা	সাধারণ মৃত্যুর হার শতকরা
৮ পূর্ণিয়া	১৭৩	প্রথম	১৯ হইতে ২০	৩৫ হইতে ৪০
৯ গয়া	১৭০	দ্বিতীয়	২১ ,, ২২	৪০ ,, উর্দ্ধ
১০ যশোহর	১৬৫	প্রথম	১৯ ,, ২০	৩৫ ,, ৪০
১১ বাঁকুড়া		,,	১৯ ,, ২০	৩০ ,, ৩৫
১২ বীরভূম	১৫৪	দ্বিতীয়	২৩ ,, ২৪	৩০ ,, ৩৫

'খ' শ্রেণী

জেলা	পাঁচ হইতে দশ বৎসরের ১০০০ বালিকার ভিতর বিবাহিতার সংখ্যা।	শিশু মৃত্যুর হারে কোন শ্রেণীভুক্ত	শিশুমৃত্যুর হার শতকরা	সাধারণ মৃত্যুর হার শতকরা
১ পাটনা	১৪৫	তৃতীয়	২৫ হইতে ২৭	৪০ হইতে উর্দ্ধ
২ মুরশিদাবাদ	১৪২	দ্বিতীয়	২১ ,, ২২	৩৫ ,, ৪০
৩ মেদিনীপুর	১৩৮	,,	২১ ,, ২২	৩১ ,, ৩৫
৪ ফরিদপুর	১৩৭	প্রথম	১৯ ,, ২০	৩০ ,, ৩৫
৫ হুগলী	১৩৬	দ্বিতীয়	২১ ,, ২২	৩০ ,, ৩৫
৬ পালামাউ	১৩৬	,,	২১ ,, ২২	৩৫ ,, ৪০
৭ নদীয়া	১৩৩	প্রথম	১৯ ,, ২৯	৩৫ ,, ৪০
৮ সাহাবাদ	১৩১	দ্বিতীয়	২৩ ,, ২৪	৪০ ,, উর্দ্ধ
৯ সাঁওতাল পরগণা	১৩০	প্রথম	১৭ ,, ১৮	২৫ ,, ৩০
১০ খুলনা	১২৯	দ্বিতীয়	২১ ,, ২২	৩০ ,, ৩৫
১১ বর্দ্ধমান	১২৯	,,	২৩ ,, ২৪	৩০ ,, ৩৫
১২ চাম্পারণ	১২৪	প্রথম	১৯ ,, ২০	৩৫ ,, ৪০
১৩ রাজসাহী	১১৭	,,	১৯ ,, ২০	৩৫ ,, ৪০
১৪ রঙ্গপুর	১১১	দ্বিতীয়	২১ ,, ২২	৩০ ,, ৩৫
১৫ বাখরগঞ্জ	১০৪	,,	২১ ,, ২২	৩০ ,, ৩৫
১৬ মালদহ	১০৫	প্রথম	১৭ ,, ১৮	৩৫ ,, ৪০

'গ' শ্রেণী

জেলা	পাঁচ হইতে দশ বৎসরের ১০০০ বালিকার ভিতর বিবাহিতার সংখ্যা।	শিশু মৃত্যুর হারে কোন শ্রেণীভুক্ত	শিশুমৃত্যুর হার শতকরা	সাধারণ মৃত্যুর হার শতকরা
১ পাবনা	৯৫	প্রথম	১৭ হইতে ১৮	৩৫ হইতে ৪০
২ দিনাজপুর	৮৭	দ্বিতীয়	২৩ ,, ২৪	৪০ ,, উর্দ্ধ
৩ পেসরা	৮৩	প্রথম	১৭ ,, ১৮	২৫ ,, ৩০
৪ সাবন	৬৭	,,	১৯ ,, ২০	৪০ ,, উর্দ্ধ
৫ ত্রিপুরা	৫১	,,	১৩ ,, ১৬	২৫ ,, ৩০
৬ বালেশ্বর	৫৬	তৃতীয়	২৫ ,, ২৭	৩৫ ,, ৪০
৭ রাঁচি	৫৪	প্রথম	১৭ ,, ১৮	২৫ ,, ৩০
৮ জলপাইগুড়ি	৫২	তৃতীয়	২৫ ,, ২৭	৩৫ ,, ৪০
৯ ঢাকা	৫০	প্রথম	১৭ ,, ১৮	৩০ ,, ৩৫
১০ ময়মনসিংহ	৪১	,,	১৭ ,, ১৮	২৫ ,, ৩০
১১ সিংহভূম	৪০	,,	১৩ ,, ১৬	২২ ,, ২৫
১২ নোয়াখালি	৩৫	,,	১৩ ,, ১৬	৩০ ,, ৩৫

জেলা	পাঁচ হইতে দশ বৎসরের ১০০০ বালিকার ভিতর বিবাহিতার সংখ্যা	শিশু মৃত্যুর হারে কোন শ্রেণীভুক্ত	শিশু মৃত্যুর হার শতকরা	সাধারণ মৃত্যুর হার শতকরা
১৩ কটক	২৫	দ্বিতীয়	২৩ হইতে ২৪	৩৫ হইতে ৪০
১৪ পুরী	২০	,,	২৩ ,, ২৪	৩৫ ,, ৪০
১৫ দারজিলিঙ	১৭	,,	২১ ,, ২২	৩৫ ,, ৪০
১৬ চট্টগ্রাম	১৫	প্রথম	১৭ ,, ১৮	৩০ ,, ৩৫

এই তালিকা হইতে দেখা যায়, যে সকল জেলায় বালিকা-বিবাহ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহার বেশীরভাগ স্থলেই শিশু-মৃত্যুর হার সর্ব্বাপেক্ষা কম। সুতরাং method of concomitant variation দ্বারা অধিক শিশু-মৃত্যু যে বাল্য-বিবাহের ফল, এ কথা একেবারে সপ্রমাণ হইল না।

কলিকাতার শিশু-মৃত্যুর হার দেখিলে, বাল্য-বিবাহ যে অধিক শিশু-মৃত্যুর কারণ, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায় না। কলিকাতার ওয়ার্ড সকলের মধ্যে শিশু-মৃত্যুর হার, ৫, ১২, ১৬, ১৭ ও ২৫ ওয়ার্ডে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, শতকরা ৪৩ ও তদধিক। ৫নং ওয়ার্ড জোড়াবাগান এবং ২৫নং ওয়ার্ড ওয়াটগঞ্জ। ইহার মধ্যে জোড়াবাগান বড়ই অস্বাস্থ্যকর বলিয়া বিখ্যাত। ওয়াটগঞ্জ ওয়ার্ডের ভিতর হাসপাতাল থাকাতে তাহার শিশু-মৃত্যুর হার বেশী হওয়া সম্ভব। কিন্তু ১২, ১৬ ও ১৭ ওয়ার্ডে ইয়োরোপীয়দের সংখ্যাই অধিক ও তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কার ও ফাঁকা। ১২নং ওয়ার্ডের পশ্চিমে গঙ্গা ও দক্ষিণে গড়ের মাঠ। ইহার ভিতর সেই সময়ে ৬২৩ জন স্ত্রীলোক বাস করিত। তাহার মধ্যে ৪৭৯ জন খৃষ্টান, ৩১ জন হিন্দু, ১০ জন মুসলমান, ৬৪ জন ইহুদী, ১০ জন বৌদ্ধ, ১৫ জন কনফুসিয়ান ও ৮ জন পার্শী। ১৬নং ওয়ার্ডের উত্তর দিকে পার্ক ষ্ট্রিট আর পশ্চিমদিকে গড়ের মাঠ। তাহাতে ৮১৫ জন স্ত্রীলোক বাস করিত। তাহার মধ্যে ৫৭৪ জন খৃষ্টান, ১৮১ জন হিন্দু, ৩৮ জন মুসলমান, ১৩ জন ইহুদী, ১ জন বৌদ্ধ। ১৭নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ দিকে সারকুলার রোড ও পশ্চিম দিকে গড়ের মাঠ। ইহতে ৫১২ জন স্ত্রীলোকের বাস ছিল। তাহার মধ্যে ৪৭১ জন খৃষ্টান, ৮০ জন হিন্দু, ৩১ জন মুসলমান, ৫ জন ইহুদী ৩ জন ব্রাহ্ম, ১ জন পার্শী, ১ জন বৌদ্ধ।

এই তিনটী ওয়ার্ডে যখন অল্প বয়সে বিবাহিতা হিন্দু স্ত্রীলোকদের সংখ্যা এত অল্প, এবং যখন আমরা জানি, তাহার ভিতর চাকরাণী, মেথরাণীর আয়ার সংখ্যাই বেশী, এবং তাহাদের ভিতর নাবালিকার সংখ্যা প্রায় নগণ্য, তখন যে এ সকল ওয়ার্ডের শিশুমৃত্যু, অর্থাৎ ইয়োরোপদেশবাসী বেশী বয়সে বিবাহিতাদের মধ্যে শিশু-মৃত্যুর সংখ্যার হার বেশী তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

আবার সর্ব্বাপেক্ষা কম শিশু-মৃত্যুর হার দেখি ভবানীপুর (১৩) ও গোয়াবাগান (৩) অঞ্চলে। এখানে শিশু-মৃত্যুর হার শতকরা ১৩ হইতে ১১।

তাহার পর ওয়ার্ড নং ৪, ৯, ১১, ২১ এবং ১০এ শিশু-মৃত্যুর সংখ্যার হার শতকরা—২২ হইতে ২৫।

১০নং ওয়ার্ড ছাড়া বাকী ওয়ার্ডগুলিতে হিন্দুর সংখ্যাই বেশী।

সুতরাং দেখা গেল, শিশু-মৃত্যুর হার দেখিয়া বাল্য-বিবাহকে তাহার কারণ বলা কতটা অসঙ্গত।

এই তো গেল শিশু-মৃত্যুর কথা। এইবারে স্ত্রীলোকের মৃত্যুর কথা দেখা যাউক।

১৯১১ সালের আদমসুমারীর ৩০৩ পৃষ্ঠায় লেখা আছে যে, স্ত্রীলোকদিগের মৃত্যুর হার পুরুষদিগের মৃত্যুর হার অপেক্ষা অনেক কম। বিহার প্রদেশে যেখানে পুরুষদের ১০০ মরে, সেখানে স্ত্রী-মৃত্যু ৮৯·২, বাঙ্গালায় ৯১·২, সমস্ত ইয়োরোপের average ৯০·৫। এই রিপোর্টের ৩০১ পৃষ্টায় লেখা আছে যে, পুরুষের মৃত্যুর তুলনায় বাঙ্গলার স্ত্রীমৃত্যু স্কট্‌ল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডের স্ত্রীমৃত্যু অপেক্ষা কম। আবার ২৭৩ পৃষ্ঠায় হিন্দু-বিবাহ-প্রথা-বিরোধী গেট্ (Sir Edward Gait) সাহেব বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের বাঁচিবার সম্ভাবনা (Chances of life) অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের চেয়ে বেশী।

যদি বাল্যবিবাহ স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে স্বাস্থ্যহানিকর হয়, তাহা হইলে তাহাদের বাঁচিবার সম্ভাবনা বেশী হইতে পারিত না। Sir Edward Gait এই হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের বাঁচিবার সম্ভাবনা বেশী বলিতে বাধ্য হইয়া, শেষকালে অনেক মাথা ঘামাইয়া তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিলেন যে, হিন্দুদের বিধবা-বিবাহ না থাকাতে এবং উহাদের ভিতর অনেক বাল-বিধবা থাকাতে, তাহারা সন্তান প্রসবের বিপদ হইতে রক্ষা পায় বলিয়াই এইরূপ হয়। কিন্তু তাহার এ যুক্তি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ বিধবারাও যেরূপ সন্তান প্রসব করে না, অবিবাহিতারাও সেইরূপ সন্তান প্রসব করে না। ভারতবর্ষে হাজারকরা

হিন্দু	বিধবা	২১২	অবিবাহিতা	২৮৭	মোট	৫০১
মুসলমান	ঐ	১৬০	ঐ	৩৬২	"	৫২২
খৃষ্টান	ঐ	১০৮	ঐ	৪৯৭	"	৬০৫

সুতরাং যাহারা সন্তান প্রসব করে না, এইরূপ স্ত্রীলোকদিগের সংখ্যা খৃষ্টান ও মুসলমান সম্প্রদায়ে বেশী হইলেও, তাহাদের অপেক্ষা বাল্য-বিবাহিতা হিন্দু-রমণীদের বাঁচিবার সম্ভাবনা যখন বেশী, তখন সেটা অসন্তান প্রসবকারিণী বিধবার সংখ্যার আতিশয্যে হয় এরূপ বলা

অসঙ্গত। সুতরাং বিস্তৃত পর্য্যবেক্ষণের ফলে দেখা যায় যে, বাল্য-বিবাহকে অধিক স্ত্রী-মৃত্যুর কারণ বলা যায় না।

এ বিষয়ে আরও একটা কথা বলা যাইতে পারে। যখন প্রথমে (১৮৭০ সালে) বিলাতী জীবনবীমা আফিস সকল দেশী লোক-দিগের জীবনবীমা করিতে আরম্ভ করিল তখন তাহারা এদেশ-বাসীদের নিকট হইতে ইয়োরোপীয়াদের অপেক্ষা বেশী হারে Premium লইত; তখন তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, এদেশবাসীদের পরমায়ু কম। কিন্তু কুড়ি পঁচিশ বৎসরের মৃত্যু-সংখ্যা খতাইয়া তাহারা দেখিল যে এদেশবাসীদের পরমায়ু ইয়োরোপীয়ানদের অপেক্ষা অল্প নয়। তখন তাহারা এদেশবাসীদের Premium এদেশবাসী ইয়োরোপীয়ানদের সমান করিয়া দিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বাল্যবিবাহিত পিতামাতার (সেকালে সকলেরই বাল্যবিবাহ হইত) সন্তান বেশী বয়সে বিবাহিত পিতামাতার সন্তান অপেক্ষা অল্পায়ু নয়। এখন দেখুন, বাল্যবিবাহকে বেশী অকালমৃত্যুর কারণ বলাটা একেবারেই প্রমাণ-বিবর্জ্জিত ও অযুক্তিসঙ্গত কি না। বিস্তৃত পর্যবেক্ষণের ফলে তো বাল্যবিবাহকে বেশী অকালমৃত্যু, শিশুমৃত্যু বা স্ত্রীমৃত্যুর কারণ বলিয়া মনে করা যায় না। এইবারে অন্য কি যুক্তি বলে বাল্য-বিবাহকে অকালমৃত্যুর কারণ ও স্বাস্থ্যহানিকর বলা হয়, তাহা দেখা যাউক। শারীর বিজ্ঞান হইতে পাওয়া যায় যে, ২৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মানুষের আয়তন বৃদ্ধি হয়। যদি ইহার ভিতর সন্তানোৎপাদন করা হয়, তাহা হইলে অপরিণত অবস্থায় হইল বলা যাইতে পারে। যদি অপরিণত বয়সে সন্তানোৎপাদন করা হয়, তাহা হইলে মাতার ও পিতার সন্তানোৎপাদনে যে শক্তি ক্ষয় হয়, তাহা তাহাদের পুষ্টির দিকে যাইতে পারিত। অপরিণত অবস্থার মাতা পিতার সন্তানদের পূর্ণ বলশালী হওয়ার সম্ভাবনা অল্প। এই তর্ক ছাড়া যে শারীর বিজ্ঞান-শাস্ত্র হইতে অন্য কোন যুক্তি পাওয়া যায়, তাহা আমার জানা নাই। অনেক বড় বড় ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিয়াও আমি কোন সদুত্তর পাই নাই। এখন এই যুক্তির সারবত্তা কতদূর, তাহা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক।

প্রথমতঃ দেখা যায়, এই তর্ক ন্যায় শাস্ত্রোক্ত a priori তর্ক। সুতরাং তাহাকে পাকাপাকি সিদ্ধান্ত বলা যায় না। পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা তাহা পরীক্ষা করিতে হয়। পর্য্যবেক্ষণের ফল পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এসব স্থলে সাদৃশ্য ন্যায়ের সাহায্য লইতে হয়। তাহাও পরে দেখিব। এস্থলে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, যখন হইতে সন্তানোৎপাদিকা শক্তির বিকাশ হয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই শক্তির ব্যবহার প্রকাশ পায়, বা শক্তি ক্ষয় করিবার ইচ্ছা প্রকৃতি হইতেই হয়। অনেক স্থলে প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট পথে সেই শক্তির ব্যবহার প্রকাশ বা ক্ষয় না হইলে, সেই শক্তির অনেক রকম অবৈধ এবং অধিক হানিকর উপায়ে ক্ষয় হইতে দেখা যায়। অনেক স্থলেই সে শক্তি সঞ্চিত হয় না। যদি শক্তি সঞ্চিতই না হয়, তাহা হইলে, বাল্যবিবাহ-বিরোধীদের এই যুক্তির সারবত্তা আছে এ কথা তর্কস্থলে মানিয়া লইলেও, ফলতঃ কোন মূল্য নাই। এস্থলে আরও বক্তব্য এই যে, যে স্থলে প্রকৃতিই কোন শক্তির ব্যয় বা ক্ষয় করিবার ইচ্ছা দিয়া সেই শক্তি ক্ষয় করান, সেখানে সেই সঙ্গেই সেই শক্তির পূরণ করিয়া দিবার ব্যবস্থা প্রকৃতিই করিয়া দেন। যেমন নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইলে শক্তির ক্ষয় হয়—নড়িবার চড়িবার ইচ্ছা প্রকৃতি হইতেই হয়, তাই নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইলে এই নড়া-চড়ার দরুণই শক্তির আবার সঞ্চয় হয়। এস্থলেও আমরা দেখিতে পাই যে, সন্তান প্রসবের পর অধিক স্থলেই প্রসূতির এই প্রসবের নিমিত্ত যে শক্তি ক্ষয় হয়, তাহা প্রকৃতি শীঘ্রই পূরণ করিয়া দেন। এ কথাটা স্মরণ করিতে হইবে। সুতরাং প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট পথে শক্তির ক্ষয় হইলেই, শক্তির ক্ষয় হওয়াটা যে শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে, এ কথাটা বলা চলে না। বাল্যবিবাহ-বিরোধীদের এই তর্কে একটা কথা প্রথমেই স্বীকার লওয়া হইতেছে যে, যদি সন্তানোৎপাদিকা শক্তি প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট উপায়ে ব্যয়িত না হইত, তাহা হইলে শরীর গঠনে প্রযুক্ত হইত। কিন্তু এ কথাটা পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া না দেখিলে এবং growthএর সহিত সন্তানোৎপাদিকা শক্তির কিরূপ সম্পর্ক, তাহা অবধারিত না হইলে কথাটা স্বীকার করা চলে না জগৎ-বিখ্যাত জীবতত্ত্ববিৎ জার্ম্মাণ পণ্ডিত Dr. Weismann বহু পর্য্যবেক্ষণের ফলে এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে, যে সকল জীবকোষ (cells) শরীর গঠন ও তাহার পুষ্টিসাধন করে (somatic cells) আর যে জীবকোষ সন্তানোৎপাদন করে (reproductive cells) তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত। তাঁহার এই মত বেশীর ভাগ জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা মানিয়া লইয়াছেন। যদি তাঁহার এই সিদ্ধান্ত সত্য হয়, তাহা হইলে তো সন্তানোৎপাদিকা কোষের ব্যয়ে শরীর গঠনের ও পুষ্টির সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন অপকার হইতে পারে না। ব্যয়ের ও অপব্যয়ের প্রভেদটা স্মরণ রাখিতে হইবে। নপুংসকেরা যাহাদের সন্তানোৎপাদিকা শক্তির ক্ষয় একেবারেই হয় না, তাহারা তো সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ, দীর্ঘজীবী ও কর্ম্মক্ষম নয়। সুতরাং বাল্য-বিবাহ-বিরোধীদের এই তর্ক অস্বীকার করিয়া না লইবার যথেষ্ট কারণ আছে।

এখন দেখিলাম যে, পর্য্যবেক্ষণের ফলেও বাল্যবিবাহ যে শরীরের পক্ষে হানিকর, তাহা সপ্রমাণ হইল না; এবং ন্যায়শাস্ত্রোক্ত যুক্তি-বলেও হইল না। এখন দেখা যাউক, সাদৃশ্যন্যায়ে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় কি না। এইরূপ ক্ষেত্রেই সাদৃশ্য ন্যায়ের (analogy) সাহায্য লইতে হয় এবং বাল্যবিবাহ-বিরোধীরাও তাহার সাহায্য লইয়াছেন। নির্ম্মলবাবু, সত্যশরণ সিংহ মহাশয়ের তর্ক হইতে তুলিয়া লিখিয়াছেন, "কাঁচা বেগুনের বীজে গাছ পুঁতিলে গাছ বড় হলে কুঁকড়ে যায়। তাহাতে ফল ধরে না। নারিকেল তাল প্রভৃতি গাছের প্রথম বছরের ফুলে ফল ধরে না। গরু ঘোড়া প্রভৃতির প্রথম বিয়ানের ছানাগুলি হয় মরে যায়, না হয় চিরকাল রুগ্ন অবস্থায় বেঁচে থাকে।" এখন এই সাদৃশ্য ন্যায়ের তর্কটা একবার

পরীক্ষা করা যাউক। কাঁচা বেগুনের বীজের analogyটা সম্পূর্ণ—অপ্রাসঙ্গিক; কারণ, মানুষের সহিত বেগুণ-গাছের সাদৃশ্য analogy—বেগুনের সহিত নয়। বেগুনের সহিত ভ্রূণের analagy (সাদৃশ্য)। অপরিণত ভ্রূণের সন্তান যেমন বলিষ্ঠ হয় না—কাঁচা বেগুনের বীজের সন্তানেরা (অর্থাৎ গাছেরা) তেমনই জোরবান হয় না। "নারিকেল তাল প্রভৃতির প্রথম বৎসরের ফুলেও ফল ধরে না।" এ কথাটাও অপ্রাসঙ্গিক। কেন না, ফুলের সহিত স্ত্রীলোকদের ঋতুর analogy—তাই প্রথম ঋতুকালে যে উৎসব হয়, তাহাকে পুষ্পোৎসব বলে। যেমন—কি বড় কি ছোট গাছেদের অনেক পুষ্প হয়, তাহার মধ্যে অল্পই পুষ্পে ফল ধরে, সেইরূপ স্ত্রীলোকদিগেরও প্রতি ঋতুতেই গর্ভ হয় না। সুতরাং তাহাদের এই তর্কের কোন সারবত্তা নাই! গরু ঘোড়া কুকুরদের যে প্রথম বেয়ানের ছানারা বাঁচে না,—সব মরিয়া যায়, এ কথাটী এই প্রথম শুনিলাম। আমি তো অনেক প্রথম বিয়ানের ছানাদের সহজ ভাবে বাঁচিয়া থাকিতে দেখিয়াছি। সত্যবাবু কি প্রমাণের বলে এই কথাটা বলিলেন, বুঝিতে পারিলাম না। সুতরাং কথাটা প্রমাণাভাবে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। এখন দেখা গেল যে, বাল্য-বিবাহ-বিরোধীরা সাদৃশ্যন্যায়ের দ্বারা কোন প্রমাণই দিতে পারিলেন না। বরং দেখি—শরীর আয়তন পূর্ণ হইবার বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই গাছেরা ফুল ও ফল প্রসব করে। নব্যতন্ত্রীদের মতে শরীরায়তন পূর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা অপেক্ষা করে না। যখনই গাছের ফুল ধরে, তখন হইতেই মধুমক্ষিকা, প্রজাপতি প্রভৃতি পতঙ্গেরা পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে যাইয়া গাছেদের প্রজনন-ক্রিয়া ও গর্ভনিষেক করে। তাহাদের বাধা দিবার কেহ নাই। জন্তুদেরও মধ্যে দেখিতে পাই—শরীরায়তন পূর্ণ হইবার পূর্ব্ব হইতে সন্তানোৎপাদন করে। স্তন পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই গর্ভ হয়। আমরা দেখি যে, স্ত্রীলোকেরা যত দিন ঋতুমতী হয়, তত দিনই কেবল তাহাদের গর্ভ হয়। ঋতু বন্ধ হইলেই তাহাদের গর্ভধারণ করিবার আর ক্ষমতা থাকে না। ঋতু আরম্ভ হইলেই তাহাদের গর্ভ হইবার শক্তি আসে। প্রথম রজোদর্শন আর শরীর সম্পূর্ণ হওয়া, এই দুই সময়ের মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের অন্য কোন শারীরিক চিহ্নের বিকাশ হয় না- যাহা দৃষ্টে বলা যাইতে পারে যে, এখনই প্রকৃতি প্রদর্শিত গর্ভোৎপাদনের প্রকৃষ্ট সময় আসিয়াছে।

অতএব প্রকৃতি-প্রদর্শিত চিহ্ন দেখিয়া বলিতে হইলে, বলিতে হইবে যে, প্রথম ঋতুকাল হইতেই স্ত্রীলোকেরা গর্ভোপযোগী হইয়াছে। আর প্রকৃতি-নিরপেক্ষ হইয়া চলিতে গেলে বলিতে হইবে, শরীর আয়তন পূর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। গাছপালা হইতে দেখিতে পাই যে, তাহারা শরীর আয়তন পূর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে না। জন্তুদের হইতেও দেখিতে পাই যে, যখনই স্ত্রী-জন্তুরা প্রথম ঋতুমতী হয়, তখন হইতেই পুং জন্তুরা তাহাদের অনুবর্ত্তন করে ও তাহাদের গর্ভ-নিষেক করে। তাহাদের বাধা দিবার কেহ নাই। সুতরাং বলিতে হইবে যে, প্রকৃতি দেখাইয়া দিতেছে যে, প্রথম পূর্ণ আয়তন প্রাপ্তি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবার কথা সাদৃশ্যন্যায় analogy হইতে পাওয়া যায় না; বরং তদ্বিপরীত কথাই পাওয়া যায়। বিজ্ঞান-শাস্ত্রবিশারদেরা তো প্রকৃতির কার্য্য যতই দেখেন, ততই তাহার উৎকর্ষে বিস্ময়ান্বিত হন; তাই তাঁহারা তাহার উপর কলম চালাইতে নারাজ। সুতরাং জীবতত্ত্বের দোহাই দিয়া শরীর আয়তন পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে বিবাহ দেওয়া উচিত নয় বলাটা একেবারেই বিজ্ঞান-শাস্ত্রের বিরোধী কথা।

অনেকে বলেন যে, আমরা বিজ্ঞান-শাস্ত্রোক্ত উপায়ে প্রকৃতির উপর উৎকর্ষ আনিতে পারি; এবং শরীরায়তন পূর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া বিবাহ দিয়া সেই উৎকর্ষ আনা সম্ভব। এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, যাঁহারা কোন ক্ষেত্রে এরূপ উৎকর্ষ আনিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা প্রকৃতির কার্য্য বিশেষ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এবং অনেক Experiment করিয়া এরূপ সফলতা লাভ করিয়াছেন। এ স্থলে যেরূপ বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ ও Experiment এর সম্পূর্ণ অভাব, তাহা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। সুতরাং এটী সেরূপ সিদ্ধান্ত নয়। এ স্থলে আর এক কথা আছে। আমরা যে প্রকৃতির উপর উন্নতিবিধান করিতে পারিয়াছি, তাহা কিরূপ, তাহা একবার অনুধাবন করা হউক। আমি যতদূর জানি, তাহাতে মানুষের চেষ্টায় নিম্নলিখিত প্রকার উন্নতি আনিতে পারা গিয়াছে। যথা:—ছোট বীচি কিংবা বীচিবিহীন ফল, কাঁটাবিহীন গাছ, বড় আয়তনের ফল ও জন্তু—বেশী দ্রুতগামী অশ্ব কিম্বা দুগ্ধবতী গরু। এ সকলই আমাদের পক্ষে বেশী উপযোগী এবং আমাদের পক্ষে বেশী উপযোগিতাকেই আমরা তাহাদিগের উৎকর্ষ বা উন্নতিবিধান বলি। এই সকল বৃক্ষ বা জন্তুরা প্রকৃতির নিয়মানুসরণ পূর্ব্বক স্বাধীন ভাবে থাকিলে, তাহারা যে অধিক দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তাহার কোন প্রমাণ নাই। বরং তাহারা যে পরের বেশী যত্ন না পাইলে মরিয়া যায়, তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব তাহাদের survival ক্ষমতা কম। সুতরাং এই সকল বৃক্ষদের বা জন্তুদের নিজের পক্ষে সেই তথাকথিত উন্নতি বা উৎকর্ষ বাস্তবিক অবনতি বা অপকর্ষ। এই তথাকথিত উৎকর্ষ দেখিয়া যে আমরা মানুষদের পক্ষে প্রকৃতির উপর কোন উৎকর্ষ আনয়ন করিতে পারি, এই কথাটী এইরূপ ক্ষেত্রে বলাটা প্রগল্ভতা মাত্র।

আমরা দেখিলাম যে, বিস্তৃত পর্য্যবেক্ষণের ফলে আমাদের প্রচলিত বিবাহ প্রথাটাকে দোষাবহ বলা যায় না। সাদৃশ্য ন্যায় হইতে পাইলাম যে, স্ত্রীলোকদিগের প্রথম রজোদর্শনের সময় বিবাহটাই প্রকৃতি-প্রদর্শিত প্রশস্ত সময়। বাল্যবিবাহ-বিরোধীদের যুক্তির সারবত্তা কতখানি, তাহাও দেখাইলাম। এখন দেখা যাউক, আমাদের দেশের এই মৃত্যুর সংখ্যার হারের আতিশয্যের অন্য কোন কারণ আছে কি না।

কলিকাতার স্বাস্থ্য প্রদর্শক Dr. Pearse সাহেব ১৯০১ সালে দেখিয়াছেন যে, যত শিশু প্রথম বৎসরেই মরে, তাহার অর্দ্ধেক

২১০০ মৃত শিশুর মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করিয়া তিনি পাইলেন যে, তাহার মধ্যে ১০০০ শিশুর মৃত্যু প্রসব-ঘরের অস্বাস্থ্যকর অবস্থা ও প্রসব করণের অস্বাস্থ্যকর প্রকরণের জন্যই হইয়াছিল। কলিকাতায় যদি অবস্থা এইরূপ হয়, তাহা হইলে পাড়াগাঁয়ে তাহার বেশী হওয়াই সম্ভব। সমান ধরিয়া লইলেও এইখানেই শতকরা ৩৭ (২১০০ : ১০০০) শিশু-মৃত্যুর হার কমিয়া গেল।

আমাদের দেশের ম্যালেরিয়া কালাজ্বর কিরূপ ভীষণ ও তাহাতে কিরূপ মৃত্যুর হার বাড়ে, তাহা কাহারও অবিদিত নহে। সুপেয় জলের অভাবে কতরূপ উৎকট ব্যায়রাম হয, তাহাও সকলের জানা আছে। গরীব হইলে যে সময়ে চিকিৎসার অভাব হয় ও সুপথ্য দিবারও ক্ষমতা থাকে না এবং তাহাতেও যে মৃত্যুর হার অনেক বাড়িবে, তাহাও সহজে অনুমেয়। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য বিলাতে গরীবদের ভিতর মৃত্যুর হার অবস্থাপন্ন লোকদিগের মৃত্যুর হার অপেক্ষা কত বেশী তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। Rev. Usher তাহার Neo-malthusiasm পুস্তকের ১২৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, যেখানে ভদ্র-লোকদিগের ১০০ ছেলেদের ভিতর ৮টি মরে, গরীবদের সেখানে ৩০জন মরে। আবার দেখুন—ভদ্রলোকদিগের (gentry) সমষ্টি পরমায়ু যেখানে ৪৫, সেখানে দোকানদারদিগের পরমায়ু ২৯, শারীরিক পরিশ্রমীদের ২৭ ; কোথাও কোথাও ১৬ পর্য্যন্ত নামিয়াছে (Bethnal green)। তাহা হইলে দেখা গেল, গরীব হইলে মৃত্যুর হার কত বাড়ে। সুতরাং আমাদের দেশে যেখানে অনেক লোকের পক্ষে একাহারই জোটে না, সেখানে যে মৃত্যুর হার অনেক বাড়িবে, তাহার যথেষ্ট অন্য কারণ আছে। তাহাকে আর উপনিষদ রামায়ণ মহাভারতের সময় হইতে প্রচলিত বাল্যবিবাহের ঘাড়ে চাপাইবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।

আজকাল অনেকে বলিয়া থাকেন যে, ভারতের গৌরবের সময়ে বাল্যবিবাহ প্রথাটা প্রচলিত ছিল না। এই কথাটার অনেকবার পুনরাবৃত্তি শুনিয়া অনেকে বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কথাটা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, বাল্যবিবাহ প্রথাটা প্রচলিত হইয়াই আমাদের অধঃপতন হইয়াছে। সুতরাং ইহা বন্ধ করাটা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। এ কথাটার কিরূপ প্রমাণ আছে, তাহা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক।

আমি বেদের সময়ের আমাদের সামাজিক অবস্থার বিষয় কিছুই জানি না ; এবং যাঁহারা বেদের সময়ের কথা বলিয়া থাকেন, তাঁহারাও যে বেশী কিছু জানেন এবং তাঁহাদের কথা আমাদের অবনতমস্তকে স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত, তাহাও স্বীকার করিতে পারি না। কেন না, বেদ খুব কম লোকেই ভাল করিয়া পড়িয়াছেন। বেদ এরূপ দুর্ব্বোধ্য প্রাচীন ভাষায় লিখিত যে, তাহার ব্যাখ্যাতে পণ্ডিতদের ভিতর আকাশ-পাতাল মতভেদ। বেদের সময়টাও অতি দীর্ঘব্যাপী। তাহার কোন্ সময়ে আমরা জ্ঞান-গৌরবে গৌরবান্বিত ছিলাম, এবং সে সময়ে আমাদের সামাজিক অবস্থা ও প্রথা কিরূপ ছিল, তাহা পাকাপাকিভাবে জানিবার কোন উপায় নাই। তাই বেদের সময়ের কথাটা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। ভারতবর্ষ যে উপনিষদ রামায়ণ মহাভারতের সময়ে শৌর্য্য-বীর্য্য জ্ঞান-গরিমায় গৌরবান্বিত ছিল, সে বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই। সে সময়ে যে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। রামায়ণ উপনিষদের সময়ে যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল না, তাহার প্রমাণ কেহ যে দেখাইয়াছেন, তাহা তো জানি না। মহাভারতে শকুন্তলা, দ্রৌপদী, সাবিত্রী, দময়ন্তী, সুভদ্রা প্রভৃতির স্বয়ম্বরের কথা দেখিতে পাই—এবং ইঁহাদের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াই, আমাদের মহাভারতের সময়ে যে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত ছিল না, এ কথাটা বলা হয়। এখন দেখি যে, ইঁহারা সকলেই ক্ষত্রিয় রাজকন্যা, অসামান্য রূপলাবণ্যশালিনী। দ্রৌপদী তো যজ্ঞাগ্নি হইতে একেবারে যৌবন অবস্থায় উত্থিত হইলেন ও তাহার অনতিবিলম্বেই তাহার স্বয়ম্বর সম্পন্ন হইয়া গেল। তাহার পূর্ব্বে তাঁহার বিবাহ হইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। শকুন্তলা বিশ্বামিত্রের পরিত্যক্তা কন্যা,—কণ্ব ঋষির দ্বারা বনাশ্রমে পালিতা। সুতরাং তাঁহার উপযুক্ত পাত্র পাওয়ার সুবিধা হয় নাই, ইহা সহজেই অনুমেয়। সুভদ্রা হরণ তাঁহার স্বয়ম্বর হইবার পূর্ব্বেই হইয়াছিল। (আদিপর্ব্ব ২১৯ অধ্যায়) মহাভারতের বনপর্ব্বে ২৯৩ অধ্যায়ে দেখিতে পাই যে সাবিত্রীকে যৌবনস্থা দেখিয়া, মহর্ষি নারদ রাজা অশ্বপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কন্যাটী যৌবনস্থা হইয়াছে, তথাপি কেন সৎপাত্রে সম্প্রদান করিতেছ না ?" সুতরাং দেখা যায় যে, যৌবনস্থা হইবার পূর্ব্বেই বিবাহ দেওয়া উচিত,—এবং ইহাই মহর্ষি নারদের মত হইতে সূচিত হইতেছে। দময়ন্তীর বেলায় মহাভারতের বনপর্ব্বের ৫৪ অধ্যায়ে দেখিতে পাই যে, বিদর্ভাধিপতি তনয়াকে যৌবন-সীমায় অবতীর্ণ দেখিয়া (চিন্তিত হইয়া) শীঘ্রই স্বয়ম্বরের উদ্যোগ করা কর্ত্তব্য ইহা নিশ্চয় করিলেন। ইহা হইতে দেখা গেল যে, কন্যা যৌবন সীমায় আসিলেই তাহার স্বয়ম্বর হইত। মনুতেই পাই যে, প্রথম ঋতুকালে তিন বৎসরের মধ্যে যদি কন্যার অভিভাবকেরা তাহার বিবাহ না দেন, তাহা হইলে সেই কন্যা নিজে বর ঠিক করিতে পারেন। এখন, এই যৌবনসীমা বলিতে আমরা কি বুঝি, তাহা দেখা যাউক। এক মতে—কন্যাদের যৌবন আরম্ভ হয় ১৬ বৎসরে। দ্বিতীয় মতে—দৃষ্টার্ত্তবা হইলে তাহাকে যুবতী বলে (রাজবল্লভ)

> দরোদ্ভিন্নস্তনং কিঞ্চিৎ
> চলাক্ষং মেদুরস্মিতং।
> মনাগভিব্যক্তভাবং
> নবযৌবনমুচ্যতে॥

নবযৌবনের লক্ষণ উজ্জ্বল নীলমণিতে এইরূপ বর্ণিত আছে। অতএব এই সকল ক্ষত্রিয় রাজকন্যাদের স্বয়ম্বর যে ১২ হইতে ১৬ বৎসরের ভিতর হইত, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। ইহার ঊর্দ্ধে যে হইত, তাহার কোন প্রমাণ নাই। ব্রাহ্মণেরা চিরকালই আমাদের সমাজের শীর্ষ-

স্থানীয় ও শিক্ষক। তাঁহাদের ভিতর দেবযানীর কথা ছাড়া অন্য একটা উদাহরণও লইলাম না। দেবযানি অসুরদের ভিতর বাস করিয়াছিলেন, ও তাঁহার আখ্যানে এত অলৌকিক কথা আছে যে, তাহা আদর্শ বলিয়া লওয়া চলে না। এই মহাভারতেই দেখি, যে অর্জ্জুনের পুত্র ও শ্রীকৃষ্ণের ভাগিনেয় অভিমন্যুর ১৬ বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ হইয়াছিল; এবং তাহার পূর্ব্বে তাহার স্ত্রী উত্তরার গর্ভ হইয়াছিল। (আদিকাণ্ড ৬৭ অধ্যায়, দ্রোণপর্ব্ব ৩৩, ৩৫, ৪৯ ও ৭২ অধ্যায়) সেই গর্ভের সন্তানই পরীক্ষিত। তিনি অল্প বয়সে মরেন নাই। এখন দেখুন, ধর্ম্মাবতার যুধিষ্ঠির ও গীতা-প্রণেতা পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণ এই ষোল বৎসরের পূর্ব্বে যখন অভিমন্যুর বিবাহ দিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা যে বাল্য-বিবাহের পক্ষপাতী, তাহা নিঃসন্দেহ। ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রথম অধ্যায় দশম কাণ্ড প্রথম শ্লোকে পাই যে চাক্রায়ন ঋষি তাঁহার স্ত্রীর (যাঁহার স্তনোদ্গম হয় নাই) সহিত ইভ্যগ্রামে অতি কষ্টে বাস করিতেন। রামায়ণে দেখি যে, রামচন্দ্রের ১৫ বৎসর বয়সে ও সীতার ৬, ৭ বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়াছিল। ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্নের বিবাহ সীতার ভগিনীদের সহিত সেই সময়ে হইয়াছিল। এই বিবাহে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ, মহর্ষি বিশ্বামিত্র, রাজর্ষি জনক, বামদেব, জাবালি, কশ্যপ, কাত্যায়ন প্রভৃতি ঋষিরা এবং অযোধ্যা ও মিথিলার অমাত্যবর্গ ও সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোকেরা উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহাদের সম্পূর্ণ অনুমোদনে এই সকলে বিবাহ কার্য্য সম্পূর্ণ হয় (আদিকাণ্ড ১৬ ও ২০ সর্গ ও আরণ্য কাণ্ড ৪৭ সর্গ) যদি বাল্যবিবাহ কেহ দোষাবহ বিবেচনা করিত, বা ইহা নূতন প্রথা হইত, তাহা হইলে কেহ না কেহ এই বিবাহে আপত্তি করিত। তাহা ত কেহই করে নাই। সুতরাং বলিতে হইবে যে, তৎকালে ও তাহার-বহুকাল পূর্ব্ব হইতে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। এখন দেখুন—আমাদের কাহার কথা বিশ্বাস করা উচিত। পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণ, ধর্ম্মাবতার যুধিষ্ঠির, আদর্শ জ্ঞানী রাজর্ষি জনক, ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ, মহর্ষি বিশ্বামিত্র ও বহু ঋষিদের কথা শুনিব? না জনকতক ক্ষত্রিয় রাজদের অসাধারণ রূপবতী কন্যাদের স্বয়ম্বর দেখিয়া ইংরাজি পণ্ডিতদের ও তাঁহাদের পদাঙ্কানুসারী একালের দুই একজন এদেশী পণ্ডিতদের কথা শুনিয়া—আমাদের গৌরবের দিনে যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল না. এই কথা মানিয়া লইব?

এই মহাভারতেই দেখিলাম যে, বাল্যবিবাহিত অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ অল্প বয়সে রুগ্ন শরীরে মরেন নাই! রামায়ণের সময়ে অকাল-মৃত্যুর প্রাদুর্ভাব ছিল না। তাহার প্রমাণ এই যে, একটী অকাল-মৃত্যু দেখিয়া রামচন্দ্র, শূদ্রকের তপস্যা তাহার কারণ বলিয়া স্থির করিয়া তাহার শিরশ্ছেদন করেন। একালেও আমরা বহু অল্প-বয়সের পিতামাতার বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী সন্তান দেখিয়াছি। বিখ্যাত লেখক বিপুল দেহধারী ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁহার পিতার ১৬ বৎসরের সন্তান। আমার কন্যা তের বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে প্রথম সন্তান প্রসব। করে তাহার ১১মাস পরে দ্বিতীয় পুত্র। হয় তাহার দেড় বৎসর পরে তৃতীয় পুত্র হয়। তৎপরের সন্তান ১ বৎসর তিন মাস পরে হয়। এইরূপে তের বৎসরের ভিতর ১০টি সন্তান হয়। আমার সেই কন্যার স্বাস্থ্য—সাধারণ বাঙ্গালীর মেয়েদের যেরূপ স্বাস্থ্য, তাহার অপেক্ষা কোন অংশে ভাল ছিল না। তাহার প্রথম পুত্র বেশ জোরবান ছিল; সে দেড় বৎসর বয়সে জলে ডুবে মরে: দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম সন্তান বেশ বলিষ্ঠ এবং জীবিত আছে। বাল্যবিবাহের সন্তানেরা যদি রুগ্ন হইত, তা হইলে এই সকল সন্তান ওরূপ বলিষ্ঠ হইতে পারিত না। তুর্কীস্থানবাসীদের ভিতর বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। (এখন আছে কি না তা জানি না)। রুসিয়াতে চাষাদিগের ভিতর অনেকের ৮, ৯ বৎসরে বিবাহ হইত (Vide Latourneau's Evolution of Marriage, Ch. VII. P. 48)। চীনদেশে অল্প বয়সে বিবাহ হয়। ১৮ বৎসরের বালক-দিগের তাহাদের কর্ত্তৃপক্ষীয়রা বিবাহ দেন। ইংলণ্ডের প্রধান সেনাপতি Lord Wolseley প্রথম চীন যুদ্ধে ছিলেন। তাঁহার মতে— উত্তর চীনেদের মতন সাহসী দুর্দ্ধর্ষ বীর্য্যশালী সেনা তিনি পৃথিবীর কোথাও দেখেন নাই ও দক্ষিণ চীনেদের মতন কষ্টসহিষ্ণু ক্ষিপ্রকারী নৌবিদ্যায় পারদর্শী নাবিক সৈন্যও কোথাও নাই। আবিসিনিয়া-বাসীদের ও নিউজিল্যাণ্ডের মাউরিদিগের ভিতরও বাল্যবিবাহ প্রচলিত। তাহারা শারীরিক বলশালী—ইয়োরোপবাসীদের অপেক্ষা কোন অংশেহীন নহে। তুর্কীস্থানদের বীরত্ব ইয়োরোপ হইতে চীনদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রুষিয়ার শারীরিক বলশালিত্বের কথা কাহাকে বলিতে হইবে না। যে সকল জাপানী রুষকে বিধ্বস্ত করিয়াছিল ও যাহাদের বীরত্বে ইয়োরোপ স্তম্ভিত হইয়াছিল, তাহারা আমাদেরই মত বাল্যবিবাহিত ও যৌথ-পরিবারে-প্রতিপালিত পিতামাতার সন্তান। এখানে ১৮৯৮ সালে বাল্যবিবাহ বন্ধ করা হয়—তাহার পূর্ব্বে ১১, ১২, ১৩ বৎসরে কন্যাদের বিবাহ হইত ও ১৭, ১৮তে বালকদিগের বিবাহ হইত। এই সকল দেখিয়া, বাল্যবিবাহ অস্বাস্থ্যকর কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারি না। ১৯০৫ সালের পূর্ব্বে যক্ষ্মাকাশের প্রকোপ দেখি নাই। বাল্যবিবাহ যত কমিতেছে, যক্ষ্মার প্রকোপ ততই বাড়িতেছে। Venereal diseases এর প্রকোপও যথেষ্ট বাড়িতেছে। বাল্যবিবাহ কমিয়া যাওয়ার ফলে এরূপ হইতেছে বলাটা বোধ হয় বাল্যবিবাহ অকাল-মৃত্যুর কারণ বলাটা অপেক্ষা অধিক সঙ্গত। বাল্যবিবাহের স্বাস্থ্যহানিকর কথাটা তুলিয়াছে ইংরাজেরা। তাহাদের দেশে এ প্রথা প্রচলিত নাই। আমাদিগকে তাহারা অবজ্ঞার চক্ষে দেখে। নিজেদের দেশের প্রথার সহিত অন্য দেশের প্রথা বিভিন্ন হইলে, বিশেষতঃ তাহারা যদি নিজেদের অপেক্ষা হীনাবস্থাপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই ভিন্ন প্রথাকে দোষাবহ অনেকে সহজেই মনে করে। এ স্থলেও সেইরূপই হইয়াছিল। তাহার উপর ইংরাজেরা আমাদের দেশের রাজা। এদেশ এত গরীব যে, অনেক লোক এক বেলার বেশী খাইতে পায় না। এদেশে অসাধারণ মৃত্যুর হার তাহাদের শাসনের দোষ স্পষ্টাক্ষরে দেখাইয়া দিতেছে। সুতরাং এদেশের গরীবত্ব ও অধিক মৃত্যু আমাদের বাল্যবিবাহ ও যৌথ

পরিবারের ফলে হইয়াছে বলিয়া আমাদের ঘাড়ে চালাইয়া দিতে পারিলে তাঁহারা দোষ হইতে অব্যাহতি পান। এ কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে; এবং তাঁহাদের মুখে শুনিয়া, বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া, এ কথাটা স্বীকার করা—আমাদের রাজনৈতিক পরাধীনতা আমাদের মনের উপর যে প্রভাব করিয়াছে তাহারই ফলে কি না, এ কথাটা পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন।

৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর C.I.E,

শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল্

বাংলা ১৩১৭ সালে বাঙালীর Carlyle কালীপ্রসন্ন ঘোষের পরলোক-গমনে বাংলা সাহিত্যের যে সমূহ ক্ষতি হইয়াছে, তাহার আজও পূরণ হয় নাই, হইবে কি না কে জানে? প্রতি যুগেই প্রতিভার আবির্ভাব সম্ভব নহে—বিশেষতঃ সাহিত্যক্ষেত্রে।

কালীপ্রসন্নের ভাষার ভঙ্গী ও তাঁহার সংস্কৃতপ্রিয়তা সর্ব্বজনবিদিত। তাঁহার সময়ে ইংরাজী পদ্য-সাহিত্যের বন্যা বাংলাকে মাতাইয়া তুলিতেছিল; কিন্তু গদ্যসাহিত্যের প্রভাব বেশী দূর বিস্তৃত হয় নাই। ইংরাজী শিক্ষার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের রুচির এক অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিল; বাঙালীর হৃদয়-বীণায় নূতন তার সংযুক্ত হইল—তাহা নব নব সুরে বাজিয়া উঠিল। বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় কঠিন সংস্কৃত সাহিত্য ও তথানুগত বাংলা সাহিত্য কিছু সরল হওয়ায়, দেশের লোক নূতন বাংলা সাহিত্য খুঁজিতে লাগিল। ঈশ্বরগুপ্ত, রাজকৃষ্ণ ও পরবর্ত্তী যুগে দীনবন্ধু, রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেম, নবীন ও রবীন্দ্র নব নব রাগিণী শুনাইলেন, বাংলার বিপিনে নব বাঁশরীর স্বরলহরীর সহিত অনাদৃতা বঙ্গভাষার নূপুরশিঞ্জন এক অপূর্ব্ব উন্মাদনার সৃষ্টি করিল;—পুরাতন পলাইল, নূতন আবেশে, নূতন ছন্দে, নূতন গানে বাংলার আকাশ বাতাস ভরিয়া উঠিল।

এই নব উচ্ছ্বাসময় কাব্য-সাহিত্যের যুগে গদ্য লেখার প্রচেষ্টায় বঙ্কিম, রমেশ ও কালীপ্রসন্ন ব্যতীত কেহ তেমন যশস্বী হন নাই। বঙ্কিম সংস্কৃতের সহিত কতকটা যুদ্ধ ঘোষণা ও কালীপ্রসন্ন সংস্কৃতের সহিত সন্ধি করিয়া নূতন কথা-সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শব্দ-যোজনায় কালীপ্রসন্নের যে বিশেষত্ব ছিল, তাহা কতকটা Johnsonএর মত। গালভরা ও কাণভরা শব্দ চয়ন করিতে তিনি অদ্বিতীয়। নিজে কত নূতন শব্দের যে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা সাধারণ বাংলা অভিধানে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

'বিবাহ কত প্রকার' নামক প্রবন্ধে তিনি কয়েকটি নূতন কথার প্রচার করিয়াছেন, যথা—"মৃগয়িক, সলিলিক, তাণ্ডুলিক ইত্যাদি (বিবাহের নাম)। কত ইংরাজী শব্দের নূতন নূতন অনুবাদ দিয়াছেন, যথা, Library=গ্রন্থাবলী, Bigoted=নির্ব্বন্ধশীল, Anecdote=ইতিকথা, Patriotic=পিত্র্যাভিমানী ইত্যাদি। কত সাধারণ ভুল (Common errors) ধরিয়া দিয়াছেন, যথা—

Incorrect	Correct
নিভিয়া	নিবিয়া
বিদেশীয়	বিদেশী
বেশী	বেশি
একত্রিত	একত্র ইত্যাদি।

সকল সময়ে তিনি যে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতেন তাহা নহে; এমন কি অনেক সময়ে সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে অশুদ্ধ শব্দও চালাইয়াছেন, যথা—"জ্বালাতনকারিণী, মধুমাখা, ইত্যাদি।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জমকালো ও শ্রুতিসুখকর শব্দের প্রতি তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তিনি প্রায়ই "মানুষ" না লিখিয়া "মনুষ্য" লিখিতেন; স্থান-বিশেষে, বিশেষতঃ কাব্যে ও লঘুসাহিত্যে "মানুষ" কথাটী ভাল শোনায়—যথা, "মানুষ আমরা নহি ত মেষ," "আবার তোরা মানুষ হ" ইত্যাদি। কিন্তু যে সব স্থানে কালীপ্রসন্ন "মনুষ্য" কথাটী প্রয়োগ করিয়াছেন, সেখানে ঐ কথাটীই সুখশ্রাব্য হইয়াছে। তাঁহার একটী বিশেষত্ব এই যে, তাঁহার লিখিত ভাষা ও কথিত ভাষায় অধিক প্রভেদ ছিল না; তিনি হাসিতে হাসিতে গম্ভীর হইয়া যাইতেন, রহস্য করিতে আরম্ভ করিয়া তথ্য নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইতেন। বিবাহ লইয়া রহস্য করিতে করিতে তিনি বলিয়াছেন, 'বিবাহের শেষ পরিণতি কিসে? ব্যাকরণের উত্তর সংবাহে অর্থাৎ পাদমর্দ্দনে'। তার পরেই তিনি 'বিবাহ কত প্রকার', এই তথ্য নির্দ্ধারণে অগ্রসর হইয়াছেন।

তিনি তরল লঘুসাহিত্যের পক্ষপাতী ছিলেন না বলিয়া, তাঁহার হাস্যের উৎস শুষ্ক ছিল, এ কথা কেহ যেন মনে না করেন। তাঁহার 'ভ্রান্তিবিলাস' ও 'প্রমোদলহরী'তে তিনি হাস্যস্রোত বহাইয়াছেন; 'চোরচরিত' ও 'চাটুকার' প্রবন্ধে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার এক দিক দেখিতে পাই।

"When flatterers meet, the devil goes to dinner"—এইটী তাঁহার প্রিয় Quotation ছিল; তিনি চাটুকারকুলের উপর এত বীতশ্রদ্ধ ছিলেন, যে, তাঁহার এই প্রবন্ধের তীব্রতায় অনেক বন্ধু-বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল।

'প্রচলিত ও অপ্রচলিত মিথ্যা কথা' প্রবন্ধে তিনি Honourable friend (মাননীয় বন্ধু) এই সনাতন Legislative ভাষায় দুইটী মামুলী কথার যে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা পরম উপভোগ্য।

"দেবতার বাহন" শীর্ষক প্রবন্ধে ব্রহ্মার বাহন হংস, বিষ্ণুর বাহন গরুড়, ভোলানাথের বাহন বৃষভ, নারদের বাহন ঢেঁকি, কুবেরের বাহন পুষ্পরথ, ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত ও গণেশের বাহন ইঁদুর কেন হইল, তাহার 'অতি গূঢ় তাৎপর্য্য' তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন; শেষোক্ত ঠাকুর ও তাঁহার বাহন (অর্থাৎ গণেশ ও ইঁদুরের) বিষয়ে লিখিয়াছেন "গণেশ গণপতি এবং গণপতি বলিয়াই সিদ্ধিদাতা। সুতরাং ইঁদুর

তাঁহার উপযুক্ত সহচর। কোথায় কোন্ গণপতি, ইঁদুরের দাঁতে পথ না খুলিয়া, নৈতিক সম্পদময় গন্তব্য স্বর্গের সোপানমালায় পদার্পণ করিতে পারিয়াছেন? এই জন্যই আগে ইঁদুর তার পর সিদ্ধিদাতা! এই জন্যই যাহারা মনুষ্যের মধ্যে মূষিক-জাতীয়—আকৃতি ও প্রকৃতি প্রভৃতি সকল বিষয়ে মূষিক, যাহাদিগকে দেখিলেই চক্ষু বিরক্ত হয়, যাহাদিগের ঘ্রাণ মাত্রেই শরীর ও মন ঘৃণায় শিহরিয়া উঠে, তাহারা গণনায়কদিগের নিত্য পার্শ্বচর ও প্রীতিভাজন।"

•'বাবু' কথাটার উৎপত্তি—বব চাঞ্চল্যে, বৃথাভিমানে পরানুকরণে, প্রগল্ভতায়াং, ধৃষ্টব্যবহারে চ। ঔণাদিক ণুঃ প্রত্যয়ঃ। ণ ইৎ যায়, উ থাকে, আকারের বৃদ্ধি।

অর্থ—যাহাদিগের স্বভাব চঞ্চল, অভিমান শূন্যগর্ভ অথচ গগনের সপ্তমণ্ডলস্পর্শী, চিত্ত পরানুকরণরত, চরিত্র প্রগল্ভ্য এবং ব্যবহার যার-পর-নাই ধৃষ্ট তাহারা বাবু।

'হাকিম' কথাটার উৎপত্তি—হক হুঙ্কারে, তর্জ্জনে গর্জ্জনে, ভ্রূকুঞ্চনে লোকপীড়নে চ। ইমণ্ প্রত্যয়ঃ; ণকার ইৎ বলিয়া উপধা অকার স্থানে আকার। যেহেতু হকধাতু সকল অর্থেই ভয়াবহ ও পীড়াজনক, অতএব,—যাঁহার হুঙ্কার কি ঝঙ্কার নাই, তর্জ্জন, গর্জ্জন, দর্প কিম্বা দাম্ভিকতা নাই, এবং লোকপীড়নেও অকৃত্রিম অনুরাগ নাই, তিনি বিচারক বলিয়া আসন পাইতে পারেন, কিন্তু তিনি হাকিম নহেন।

'স্ত্রী' শব্দটার উৎপত্তি—'স্ত' যিনি জ্ঞানদাতা ও ইষ্টদেবতার ন্যায় সতত ভক্তিভাবে পূজনীয়া; স্ত্রৈ, যিনি একটু বেশী শব্দ করিতে পারেন, অর্থাৎ যাঁহার জিহ্বা আর সকলের জিহ্বা হইতে একটু বেশী চলে।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—রহস্য করিতে গিয়া তিনি গবেষণার পথে প্রবেশ করেন। এই জন্য রবীন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রের কাব্য-সাহিত্যের হাস্যরসের সহিত তাঁহার গদ্যসাহিত্যের হাস্যরসের তুলনা করা উচিত হইবে না।

তাঁহার বিপুল চিন্তাশক্তি সংস্কৃত সাহিত্যের নাগপাশে বদ্ধ, ও তাঁহার গবেষণার প্রচেষ্টা অত উগ্র না হইলে, তাঁহার নিকট হইতে আমরা শারদ জ্যোৎস্নার ঝরণাধারার মত অনাবিল হাস্যধারায় পরিপ্লুত হইতাম। তবু যাহা পাইয়াছি তাহা শ্লীল, সুন্দর ও পরম উপভোগ্য। বিপুল পাণ্ডিত্য, অগাধ অধ্যয়ন, ও গভীর চিন্তাশক্তির সাহায্যে বাংলার গদ্যসাহিত্যের জন্মবাসরে তিনি নূতনের আবেষ্টনের মধ্যে থাকিয়াও নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা যে শব্দসম্পদময়ী, স্বচ্ছন্দগামিনী ভাষার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন. তাহা বাংলা গদ্যের medieval model স্বরূপ চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবে। সমাসের শৃঙ্খল পরিয়া তাঁহার ভাষা পঙ্গু হইয়াছে বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদিগকে তদানীন্তন সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করিতে অনুরোধ করি। দশ পনের বৎসর পূর্ব্বেও ভদ্রপরিবারের গৃহিণী ও বধূগণ, উৎসব ও নিমন্ত্রণ উপলক্ষে যথাসম্ভব গুরুভার স্বর্ণালঙ্কার ও বস্ত্রসম্ভারে সুসজ্জিত হইতেন; আর আজকালের নিয়মানুসারে সেই সকল গুরু অলঙ্কার ও বস্ত্রাদিকে Pension দিয়া নূতন লঘু ও অতি সংক্ষিপ্ত অলঙ্কার ও বস্ত্রসজ্জা উৎসব ও নিমন্ত্রণের মানরক্ষা করিতেছে।

ভাষা-সুন্দরীও সেইরূপ সংস্কৃতের নাগপাশ হইতে মুক্ত হইয়া, বহির্জগতের স্বভাব-সুষমায় মজিয়া পরম রমণীয় বিচিত্র চন্দসজ্জায় সাজিয়াছে। রুচিভেদে সাহিত্যের প্রকার ও সজ্জাভেদ অবশ্যম্ভাবী। বর্ত্তমানের মাপকাঠি দ্বারা ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বের কথা মাপিলে চলিবে কি?

তাঁহার কাব্যানুভূতির পরিচয় 'বান্ধবের' প্রবন্ধাবলীতে বিকীর্ণ রহিয়াছে। তাঁহার ভাষাতেই বলি, "যখন মন কল্পনার ঐন্দ্রজালিক পক্ষে উত্তীর্ণ হইয়া তারকায় তারকায় প্রকৃতির স্বর্ণাক্ষর-লেখা পাঠ করিতে থাকে, এবং গিরিশৃঙ্গ, সাগরগর্ভ, আলোক ও অন্ধকার সর্ব্বত্র এক সঙ্গে বিচরণ করে, যখন জ্ঞান অনুভূতিতে ডুবিয়া যায়, এবং বুদ্ধি অনুসন্ধান করিতে বিরত হইয়া তরঙ্গের ন্যায় হৃদয়েই বিলয় পায়, তখন ভয়বিহ্বলা ভাষা আপনিই জড়ীভূত হইয়া যায়—কে আর কাহার কথা প্রকাশ করে? প্রকৃতি নীরব, কাব্য নীরব, কবিও তখন স্পন্দহীন ও নীরব।"

তাই তাঁহার রচনাও ভাবসমুদ্রের মধ্যে ভক্তির তরঙ্গ দেখিতে পাই। তাঁহার দৃঢ় ভগবৎপ্রেম তাঁহাকে সংসার আবর্ত্তের মধ্যে পথ দেখাইয়াছে। তাঁহার দৃঢ় সংস্কার এই ছিল যে, "রক্তমাংসের স্নেহ মমতা পশুর মধ্যেই বেশী, কিন্তু প্রীতি অথবা ভক্তির আকর্ষণজনিত মমতা মনুষ্যেরই বিশেষ সম্পত্তি।"—এইখানে মানুষ ও পশুর প্রভেদ, তিনি বিশেষভাবে এই পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—"নদী যেমন সাগরের উদ্দেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করে, মনুষ্য-হৃদয়ের সজীবপ্রীতি ও সজীবভক্তিও সেই প্রকার, নিজ নিজ বিকাশের অনুরূপ ভাবসাগরে পঁহুছিবার জন্য, কোথাও কঙ্কর পথের ন্যায় ক্রূরতার বিঘ্ন, কোথাও বা কঠোরতম পর্ব্বতবর্ত্মের ন্যায় বিপদপরম্পরা উল্লঙ্ঘন করিয়া অতৃপ্ত তৃষ্ণায় ঘুরিয়া বেড়ায়।" এই 'অতৃপ্ত তৃষ্ণা' যদি ভগবানের উদ্দেশে না চলিল তবে ইহা বিশ্বের কাম্যবস্তুর প্রতি ছুটিবে। তাই দেখিতে পাই গৃহত্যাগী বুদ্ধ শোকাহত অশ্বরক্ষক ছন্দককে বলিতেছেন—

> "অসার সম্ভোগ-সুখ অনিত্য অধ্রুব;
> চঞ্চল চঞ্চলা মত রিক্তমুষ্টি সম
> অসার, অস্থায়ী জল-বুদ্বুদের মত,
> দুর্ভোগ্য স্বপনসম, দুস্পৃশ্য সফল
> সর্পমস্তকের মত পূর্ণ মহাবিষে।
> কে বল কখন কাম্য বস্তু উপভোগ
> —কামিনী, কাঞ্চনে, রাজ্যে—তৃপ্তি কামনার
> পাইয়াছে এ জগতে?"

মহাকবি নবীনের প্রাণে, তিনি এক দিন জ্বলন্ত উৎসাহ ঢালিয়া দিয়াছিলেন। নবযুগের নব মহাভারত রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস

রচনা করিবার জন্য নবীনচন্দ্র যখন পাগলের মত হইয়াছিলেন, যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী তাঁহার হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল, তখন কালীপ্রসন্ন উৎসাহ ও উদ্দীপনাপূর্ণ পত্র দ্বারা তাঁহাকে শুভ কার্য্যে অগ্রসর হইতে বলিয়াছিলেন। 'পলাশীর যুদ্ধে'র বিগলিত স্বদেশপ্রেমে, দুর্নিবার দেশভক্তিতে ও অপূর্ব্ব ছন্দোলীলায় মুগ্ধ হইয়া, কালীপ্রসন্ন 'বান্ধবে' যে প্রাণস্পর্শী সমালোচনা করিয়াছিলেন, তাহা ভাষার ঝঙ্কারে, বর্ণনার পক্ষপাতশূন্য বিচারে সমালোচনা-সাহিত্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

আমাদের ছাত্রদিগকে সমালোচনা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা নাই। বোধ হয় এ বিষয়ে তাহারা সম্যক্ পরিপক্ক। কিন্তু ইংরাজী ভাষায় 'সমালোচনা'রূপ একটা পঠিতব্য বিষয় পাওয়া যায় ;—দুঃখের বিষয় বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিম, চন্দ্রনাথ, কালীপ্রসন্ন ও ললিতকুমার প্রভৃতি কয়েকজন মনীষী ব্যতীত প্রকৃত সমালোচকের পরিচয় পাই না।

কালীপ্রসন্নের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার পরিচয় পাই 'জানকীর অগ্নিপরীক্ষা' নামক পুস্তকে। তিনি ইহাকে 'কাব্য-ইতিহাসবিজ্ঞান' নামেও পরিচিত করিয়াছেন। তিনি বুঝাইতে চান যে, জানকী চরিত্রের শুদ্ধি জনসমক্ষে প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণ করিবার জন্য যথার্থই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়াছিলেন ও নিষ্কলঙ্ক বলিয়া তথা হইতে অদগ্ধ অবস্থায় নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন। অগ্নি হইতে অদগ্ধ অবস্থায় বাহির হওয়া যে বিজ্ঞানবিরুদ্ধ নহে, তাহা তিনি যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের দ্বারা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি বলিতে চান যে, এই বিষম অগ্নি-পরীক্ষার সময়, দশরথের প্রেতাত্মা যে দেহীরূপে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহাও বিজ্ঞানসম্মত। এই বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ থাকিলেও তাঁহার চেষ্টা এবং ভাব ও ভাষার সৌন্দর্য্য প্রশংসনীয়।

তিনি যে বাগ্মী ছিলেন, এ বিষয়ে অনেকেই অবগত ছিলেন। কলিকাতায় ও ঢাকায় তিনি অনেক বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

'নর্থব্রুক হলে' রামমোহন রায়ের স্মৃতিবাসরে তিনি বলিয়াছেন, "পূর্ব্ব ও পশ্চিমের বিরাট ব্যবধান দূর করিয়া, রামমোহন দাঁড়াইয়া আছেন—"স্থিতিপৃথিব্যামিব মানদণ্ড"। এই কথাটি অনেকের মুখে মুখে ফিরিতেছে।

১২৮৪ হইতে ১৩০৮ পর্য্যন্ত ভাওয়ালের রাজসরকারে chief manager পদে সমাসীন থাকিয়াও, তিনি গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের অবসরে ১২৮১ হইতে ১২৯৬ পর্য্যন্ত ও পরে ১৩০৮ হইতে কিছুকাল বিখ্যাত 'বান্ধব' পত্রিকার পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিম, 'বান্ধবে' কালীপ্রসন্ন, দুই বাংলার দুই প্রধান পুরুষ। দুইজনেই গদ্যকবি, দুইজনেই পুরাতন ও নূতন সাহিত্যের যুক্ত বাসরে দেশের সাহিত্যিক জীবন ধন্য করিতে আসিয়াছিলেন। এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহার বিষয় কিছু বলা হইল না। তাঁহার অদ্বিতীয় প্রতিভার নিকট প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্ভ্রমে মাথা নত করিবে।

সঙ্গীতের অসাম্প্রদায়িকতা

শ্রীবাণী দেবী

বর্ত্তমান যুগে মানবের জ্ঞানের সকল বিভাগেই জাগরণ দেখা দিয়াছে। সঙ্গীতবিভাগও যে তাহার ব্যতিক্রমস্থল নহে, তাহা চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। একথাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, জাগরণের পথে সঙ্গীত আমাদের আশানুরূপ দ্রুতগতিতে চলিতেছে না। তাহার কারণ আমাদের মনে হয় এই যে, আমরা সঙ্গীত সম্বন্ধে বহুকাল যাবৎ প্রচলিত কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণার অন্ধ পক্ষপাতী হইয়া আছি। তাহাদের মধ্যে কোন্‌টীই বা সত্য এবং কতটুকুই বা সত্য, অথবা কোন্‌টীই বা অসত্য এবং কতটুকুই বা অসত্য, তাহা বিচার করিতে আমরা বড় একটা অগ্রসর হই না। এ কথা মানি যে, সেই সকল ধারণা আমাদের মনে বহুকাল ধরিয়া বদ্ধমূল হওয়াতে তাহাদের প্রভাব অতিক্রম করা বহুল আয়াসসাধ্য, এবং সে, আয়াস স্বীকার করিতেও অনেকে প্রস্তুত নন।

ভ্রান্ত ধারণাসমূহের মধ্যে একটী প্রধান ধারণা হইতেছে এই যে, সঙ্গীতে ভৌগোলিক বিভাগ আছে। আমরা সঙ্গীতকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, এই দুই সুবৃহৎ বিভাগে বিভক্ত করিয়া উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের একটী স্থূল বিভাগরেখা কল্পনা করিয়া লই। সঙ্গীতের মধ্যে স্বরসম্বদ্ধ বা harmonised কোন কিছু দেখিলেই আমরা তাহা পাশ্চাত্য বিভাগে ফেলিয়া দিই, এবং প্রত্যক্ষভাবে রাগরাগিণীতে অবলম্বিত কোন কিছুই দেখিলেই তাহা প্রাচ্য বিভাগে ফেলিয়া দিই। আমাদের ধারণা এই যে প্রাচ্য অথবা তাহাদের মুখপাত্র ভারতীয় সঙ্গীতে স্বরসম্বাদ বা harmony বলিয়া কোন কিছু ছিলও না এবং হওয়া সম্ভবও নহে—উহা পাশ্চাত্য সঙ্গীতেরই নিজস্ব ; স্বরভেদ বা melody-প্রধান * রাগরাগিণী কেবল ভারতীয় সঙ্গীতেরই নিজস্ব—উহা পাশ্চাত্য সঙ্গীতে ছিলও না, এবং হওয়া সম্ভবও নহে। এইরূপ ধারণার ফলে আমরা স্বভাবতই সঙ্গীতের উন্নতি ও প্রসারের পথে অর্গলরূপে দাঁড়াইয়া আছি। অপর দিকে, পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞদিগেরও অনেকে এই প্রকার একটা অস্ফুট ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদেরও সঙ্গীতকে স্বাধীনতার পথে পরিচালিত করিতে, যথাযথ স্বরবিন্যাসের দ্বারা মিষ্টতামণ্ডিত করিতে সক্ষম হইতেছেন না। দুঃখের বিষয়, কি ভারতে, কি পাশ্চাত্য জগতে, সঙ্গীত সম্বন্ধে এই প্রকার সাম্প্রদায়িক একদেশদর্শিতার, এই প্রকার ভৌগোলিক বিভাগ ও পার্থক্যের কল্পনা অল্পে অল্পে অপহৃত হইতেছে।

এই প্রকার ধারণায় কোন যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি আছে বলিয়া আমরা

* আমাদের সঙ্গীতে প্রত্যেক স্বরটী ভিন্ন ভিন্ন করিয়া পৃথকভাবে প্রকাশ করা হয়, পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ন্যায় একাধিক স্বরকে সম্বদ্ধ করিয়া প্রকাশ করা হয় না, তাই আমাদের সঙ্গীতের প্রধান অংশকে 'স্বরভেদ' বা melody বলিলাম।

মনে করি না। আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে যে, স্বরভেদ বা melody এবং স্বরসম্বাদ বা harmony সঙ্গীতের এপিঠ ওপিঠ—একই সঙ্গীতের বিভিন্ন ছাঁদে বিভিন্ন প্রকারে প্রকাশ করিবার ভঁাজ বা প্রণালী মাত্র। একই মাধ্যাকর্ষণ যেরূপ স্থান ও অবস্থাবিশেষে কোথাও বা জলপ্রপাতে, আর কোথাও বা চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহ-উপগ্রহের পরস্পরের আকর্ষণে প্রকটিত হয়, সেইরূপ একই সঙ্গীত দেশ-কাল-অবস্থার মাহাত্ম্যে কোথাও বা স্বরভেদপ্রধান রাগরাগিণীতে, আর কোথাও বা স্বরসম্বাদের সাহায্যে আত্মপ্রকাশ করিতে চায়।

আমাদের দেশের সঙ্গীতের ক-খ যিনি জানেন, তিনিই বলিতে পারিবেন যে, এদেশীয় সঙ্গীতজ্ঞদিগের মতে এক একটী গান বা গৎ এক একটী বিশেষ রাগরাগিণীতে অবলম্বিত থাকে। সেই রাগরাগিণী অন্তর্নিবিষ্ট এক একটী বিশেষ স্বরবিন্যাসের সাহায্যে আত্মপ্রকাশ করে। স্বরভেদের সাহায্যে সেই স্বরবিন্যাসকে বিকশিত করিয়া তুলিলেই রাগরাগিণীর রূপ পরিস্ফুট হইয়া পড়ে। রাগরাগিণী হইল সঙ্গীতের আত্মা বা কেন্দ্রস্থিত ভাব, এবং স্বরবিন্যাস হইল রাগরাগিণীর শরীর বা আকার। চিত্রের সহিত সঙ্গীতের তুলনা করিলেই এ বিষয় সুস্পষ্ট হইবে। আমি যদি সন্তানবাৎসল্য আঁকিতে চাই, তবে সেই সন্তান-বাৎসল্য ভাবটীই হইল আমার চিত্রের আত্মা বা মূল কেন্দ্র। তার পর, আমি যখন যশোদার কোলে গোপালকে রাখিয়া সেই ভাবটীকে ব্যক্ত আকার প্রদান করিলাম, তখন সেইটী হইল ঐ চিত্রের শরীর বা আকার। পরিপার্শ্বের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ না রাখিয়া কেবলমাত্র যশোদার কোলে গোপালের চিত্র আঁকিয়াই আমি বাৎসল্যভাবের রূপ ফুটাইয়া তুলিতে পারি। প্রাচ্য চিত্রে এই প্রকার অপরিহার্য্য অংশগুলির ভিতর দিয়াই মূল মন্ত্রকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করা হয়। জয়পুরী, চৈনিক প্রভৃতি প্রাচ্যদেশীয় প্রাচীন চিত্র পর্য্যালোচনা করিলেই আমার বক্তব্য সুবোধ্য হইবে। সেইরূপ যে রাগরাগিণী আমি প্রকাশ করিতে চাহিব, সেই রাগরাগিণীর অন্তর্নিহিত স্বরবিন্যাসকে তাহার স্ব-রূপে প্রকাশ করাইতে হইবে। এক একটী স্বরবিন্যাসের বিভিন্ন আকারে—উদারা, মুদারা, তারা এবং উহাদের সংমিশ্রণোদ্ভূত আকারে সমাবেশ, অথবা বিভিন্ন সম্বাদী স্বরবিন্যাসের সংযুক্ত সমাবেশ হইতেই এক একটী শুদ্ধ বা মিশ্র রাগরাগিণীর রূপ পরিস্ফুট হয়;—অন্য ভাষায় বলা যায় যে, এক একটী শুদ্ধ বা মিশ্র রাগরাগিণীর উৎপত্তি হয়। শুদ্ধ হৌক বা মিশ্র হৌক, প্রত্যেক স্বরবিন্যাসের যে সকল স্বরের দ্বারা কোন একটী রাগরাগিণীর রূপটী ফুটিয়া উঠে, ভারতীয় সঙ্গীতে প্রধানত সেই সকল স্বরের একাধিক স্বরকে ভিন্ন বা পৃথকভাবে যথাসম্ভব ফুটাইয়া তুলিয়া তাহারই সাহায্যে সেই রাগরাগিণীর রূপটী প্রকাশ করিবার দিকে ঝোঁক দেওয়া হয়। পাশ্চাত্য সঙ্গীতে প্রত্যেক স্বরবিন্যাসের বা স্বরগ্রামের অন্তর্নিবিষ্ট স্বরগুলির একাধিক সম্বাদী ও অনুবাদী স্বর বাছিয়া লইয়া সেগুলিকে সমগ্র স্বরগ্রামের সহিত সম্বাদীভাবে একসঙ্গে ফুটাইয়া তুলিবার দিকে ঝোঁক দেওয়া হয়। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ইহাই হইল প্রধান প্রভেদ। ভারতীয় সঙ্গীতে এই কারণে রাগরাগিণী ও তাহারই পরিস্ফুটনে সহায় স্বরভেদ প্রভৃতির দিক এত প্রসার ও গভীরতা লাভ করিয়াছে; এবং ইহার বিপরীতে, পাশ্চাত্য সঙ্গীতে বহুলস্বর স্বরসম্বাদের দিক এত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া ভারতীয় সঙ্গীতও স্বরসম্বাদের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্ক-রহিত নহে; এবং পাশ্চাত্য সঙ্গীতও স্বরভেদের সহিত সম্পূর্ণ নিঃসম্বন্ধ নহে।

ভারতীয় সঙ্গীতে যে স্বরসম্বাদ ছিল, এবং এখনও যে তাহার ছায়া দৃষ্ট হয়, তাহা আমি আমার "ভারতীয় সঙ্গীত ও স্বরসম্বাদ" প্রবন্ধে (তত্ত্বোধিনী পত্রিকা ১৮৪৫ ফাল্গুন) সবিস্তার বলিয়াছি। ভারতের প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রে "বহুলস্বর" প্রভৃতি শব্দ এবং তৎসম্বন্ধীয় বর্ণনা এ বিষয়ে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করে। বর্ত্তমানকালেও সামগান যে ভাবে গীত হয়, তাহাতেও স্বরসম্বাদের সুন্দর আভাস পাওয়া যায়। সেতারের তার বাঁধিবার প্রণালীর ভিতরেও স্বরসম্বাদের ছায়া সুস্পষ্ট। গৎ বাজাইবার সঙ্গে ঝঙ্কার দেওয়াকে স্বরসম্বাদের আদিম রূপ ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। বীণ, সেতার প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে ঝঙ্কারতারের যে প্রকার বন্দোবস্ত থাকে, তাহা দ্বারাই তো স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, ঐ সকল যন্ত্র উদ্ভাবনের সময়ে স্বরসম্বাদের প্রতি নিশ্চয়ই দৃষ্টি রাখা হইয়াছিল। ইংরাজীতে যাহাকে part-singing বা অংশত-গীত বলা যায়, তাহার মূল ভাব হইতেছে, গানের একই অংশ একই সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা বিভিন্ন সুরে গান করা। আমাদের দেশে কীর্ত্তন, রামায়ণ-গান প্রভৃতিতে ইহার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। কোল প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতিসমূহের মধ্যে এইভাবে গান করা এখনও প্রচলিত আছে দেখা যায়। স্বরসম্বাদের ভাব অন্তরে জাগ্রত না থাকিলে এই প্রকার একই অংশ বিভিন্ন সুরে এক সঙ্গে গান করা অসম্ভব হইত।

প্রাচ্য সঙ্গীতে স্বরভেদের প্রাধান্য থাকিলেও যেমন তাহাতে স্বরসম্বাদের সম্পূর্ণ অভাব দেখা যায় না, সেইরূপ পাশ্চাত্য সঙ্গীতে স্বরসম্বাদের প্রাধান্য থাকিলেও তাহাতে রাগরাগিণীর অন্তর্নিহিত স্বরভেদপ্রধান স্বরবিন্যাসের সম্পূর্ণ অভাব দৃষ্ট হয় না। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে পাশ্চাত্য সঙ্গীতশাস্ত্রে 'melody' প্রভৃতি স্বরভেদ-সূচক শব্দের অস্তিত্বই কল্পিত হইতে পারিত না; অথবা ঐ সকল শব্দের বিপরীতভাবসূচক 'harmony', 'chord' প্রভৃতি স্বরসম্বাদ-সূচক শব্দসমূহেরও আবির্ভাব দেখা যাইত না। আমার মনে হয়, পাশ্চাত্য জাতিসমূহের মধ্যে communal spirit বা সংঘবদ্ধভাব কিছু বেশী মাত্রায় থাকাতেই উহাদের চিত্রেও যেমন পরিপার্শ্বের সহিত সম্বন্ধমূলক পরিপ্রেক্ষার (perspectiveএর) ভাব বেশী ফুটিয়া উঠে, উহাদের সঙ্গীতেও সেইরূপ বহুলস্বর স্বরসম্বাদের ভাবই সমধিক পরিস্ফুট হয়। কিন্তু সংঘবদ্ধনের ভিতরেও যেমন ব্যক্তিগত ভাবের সম্পূর্ণ অভাব হইতে পারে না, সেইরূপ স্বরসম্বাদের ভিতরেও স্বরভেদের একান্ত অভাব হইতে পারে না। পাশ্চাত্য সঙ্গীতে বীঠোবেনের 'বিষাদধ্বনি' (Sonata Pathetique), 'অন্ত্যেষ্টিযাত্রা'

(Funeral March), গুণোর (Gounodর) 'নৈশগীতি' (Serenade), অথবা স্কটল্যাণ্ডবাসী হাইল্যাণ্ডারদিগের 'পুটবংশী' (bagpipe) বাদ্য প্রভৃতি শুনিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, পাশ্চাত্য সঙ্গীতেও রাগরাগিণী পরিচায়ক স্বরভেদ বা একস্বরত্বের অসম্ভাব নাই।

আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, দেশ-কাল-অবস্থার বিভিন্নতার ফলে সঙ্গীতে কোথাও বা বহুলস্বর স্বরসম্বাদ (harmony), আর কোথাও বা একস্বর স্বরভেদ (melody) ফুটিয়া উঠিলেও, সকল দেশীয় ও সর্বজাতীয় সঙ্গীতেরই ভিতর হইতে একটা অসাম্প্রদায়িক সার্বভৌমিক ভাব উদ্ভিন্ন হইয়া উঠে। সঙ্গীতের মধ্যে ভৌগোলিক প্রভৃতি সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর অতীত একটা সার্বভৌমিক তত্ত্ব নিহিত আছে বলিয়াই পাশ্চাত্য হাইল্যাণ্ডারদিগের সঙ্গীতের সহিত ভারতীয় পার্বত্য জাতিসমূহের সঙ্গীতের এত মিল দেখা যায়। এই কারণেই স্কটল্যাণ্ডের হাইল্যাণ্ডার বল, আর এদেশের পার্বত্য জাতিই বল, উভয় জাতিরই সঙ্গীতের দ্বারা শ্রোতার মনে একটা পার্বত্য ও আরণ্য ভাব উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। সঙ্গীতে এই তত্ত্ব আছে বলিয়াই কোথায় স্কটল্যাণ্ড, আর কোথায় ভারতবর্ষ, উভয় দেশের মধ্যে সহস্র সহস্র ক্রোশের সুবৃহৎ ব্যবধান থাকিলেও উভয় দেশের পার্বত্য জাতির সঙ্গীতে সম্বাদপ্রবণ একটা সবল ভাবের আশ্চর্য্য সমপ্রাণতা পরিস্ফুট দৃষ্ট হয়। সঙ্গীতে একটা সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর অতীত সার্বভৌমিক তত্ত্ব অন্তর্নিহিত আছে বলিয়াই দক্ষিণ ইউরোপের সমতলক্ষেত্রের সঙ্গীতের সহিত ভারতীয় সমতলক্ষেত্রের সঙ্গীতের এত মিল দেখা যায়। এই কারণেই ইউরোপের অন্তর্গত ইটালি প্রভৃতি দেশের সমতলবাসীই বল, আর ভারতের জাহ্নবীবিধৌত সমতলক্ষেত্রের অধিবাসীই বল, উভয়েরই সঙ্গীত শুনিলে শ্রোতার মনে কেমন একটা কোমল করুণ ভাব উদ্বুদ্ধ হয়। ইটালীয় সঙ্গীতজ্ঞ রসিনির রচনা-প্রণালী আমাদের স্বরভেদমূলক রচনাপ্রণালীকে এই সার্বভৌমিক তত্ত্বের ভিতর দিয়াই অনেকাংশে স্পর্শ করে। সার্বভৌমিক তত্ত্বের কারণেই কোথায় সেই ইটালি প্রভৃতি দেশ, আর কোথায় এই ভারতের অন্তর্গত আর্য্যাবর্ত্ত প্রভৃতি সমতলক্ষেত্র, উভয়ের মধ্যে শত শত ক্রোশের সুবৃহৎ ব্যবধান থাকিলেও উভয় দেশীয় সঙ্গীতেই সূর্য্যকরোজ্জ্বল, শত স্রোতস্বিনীবিধৌত শস্যশ্যামল ভাব যেন পরিস্ফুট হইতে চায়; উভয় জাতীয় সঙ্গীতে একটা করুণাত্মক স্বরভেদপ্রবণ কোমল ভাবের আশ্চর্য্য সমপ্রাণতা অনুভূত হয়।

সঙ্গীতে যে একটা সার্বভৌমিক তত্ত্ব থাকিবে, তাহা কিছু বিচিত্র নহে। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ভগবান্ হইতে সত্যধর্ম্ম নামিয়া যেমন মানবমাত্রেরই অন্তরে নিহিত হইয়াছে; মানবমাত্রেরই আত্মাতে যেমন ব্রহ্মের অনন্ত মঙ্গলভাব অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত আছে, সেইরূপ একই ভগবানের প্রেমধারা সঙ্গীতের আকারে নামিয়া মানবমাত্রেরই হৃদয় অধিকার করিয়াছে; একই ভগবান সঙ্গীতেরও মূলতত্ত্ব মানবমাত্রেরই হৃদয়ে নিহিত করিয়া দিয়াছেন। এই কারণে সঙ্গীতের মূলতত্ত্ব, যথার্থ প্রকৃতি প্রকৃতই সার্বভৌমিক—সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর অতীত। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সঙ্গীত একটু গভীরভাবে আলোচনা করিতে গেলেই আমাদের মনে এই সংশয় জাগ্রত হয় যে, সঙ্গীতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বলিয়া প্রকৃত মূলগত কোন ভেদ বা পার্থক্য আছে কি না—থাকিতে পারেই কি না। মনে হয় যে, একই গোলাপ যেমন মাটির গুণে, জলহাওয়ার গুণে নিজের গোলাপত্ব না হারাইয়াও বিভিন্ন নামরূপ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ একই সঙ্গীত দেশকাল-অবস্থার বিভিন্নতার কারণে বিভিন্ন আকার প্রকার ও বিভিন্ন নামরূপ গ্রহণ করে। যে সঙ্গীত পাশ্চাত্য দেশে জলহাওয়ার গুণে স্বরসম্বাদের অভিমুখে ঝুঁকিয়াছে, সেই সঙ্গীতই ভারতে স্বরভেদব্যক্ত রাগরাগিণীতে পরিস্ফুট হইবার দিকে ঝুঁকিয়াছে। এই কারণে আজকাল পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞদিগেরও অনেকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বলিয়া সঙ্গীতে কোন বিভাগ-রেখা টানিতে প্রস্তুত নন।

আমার বক্তব্যের সমর্থনে দুই চারিটী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া আমার সিদ্ধান্তটীকে দৃঢ় করিতে চাই। সঙ্গীতের মূল তত্ত্ব ভগবান কর্ত্তৃক মানবমাত্রেরই আত্মাতে নিহিত, সুতরাং সার্বভৌমিক, বলিয়াই ভারতেও যে সপ্তস্বরের সাহায্যে সকল গানই গীত হয়, ইউরোপেও সেই একই সপ্তস্বরের সাহায্যে সকল গান গীত হয়। প্রভাতের উদীয়মান কনক-তপনের চিত্রেই বল, অথবা সন্ধ্যার অস্তমিত সূর্য্যের চিত্রেই বল, কি প্রাচ্য, কি প্রতীচ্য, সকল স্থানেরই অঙ্কিত চিত্রে যেমন একটা মূলগত ঐক্য দেখা যায়, সেইরূপ সকল দেশের ও সকল জাতির সঙ্গীতেই প্রাভাতিক ভাবই বল, আর সান্ধ্য ভাবই বল, অনেকটা একই ধরণে ব্যক্ত হয়। একবার গ্রামোফোনে আমি একটী বাজনা শুনিয়া বুঝিলাম যে, উহা প্রভাত সংক্রান্ত কোন কিছু বিষয়ক—বাজনার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হইতেছিল যে, ছন্দে ছন্দে তালে তালে উদীয়মান প্রভাত-তপন প্রকাশিত হইবার কথাই যেন উহা ব্যক্ত করিতেছে। অবশেষে দেখি যে, ঐ বাজনার নাম Morning Hymn বা প্রভাতিক স্তব। সেইরূপ আমরা দেখিয়াছি যে, পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞ অনেকেও আমাদের ভয়রো, ভৈরবী প্রভৃতি রাগরাগিণী শুনিয়া বলিয়াছেন যে উহারা প্রভাতের ভাবব্যঞ্জক। পাশ্চাত্যদিগের নৈশ সঙ্গীত শুনিলেও তাহার মধ্যে কেমন একটা নৈশভাব সুস্পষ্ট উপলব্ধ হইবে। আমার বিশ্বাস, প্রাচ্য বা প্রতীচ্যবাসী যিনিই হউন, আমাদের পূরবী, ইমনকল্যাণ, বেহাগ প্রভৃতি রাগরাগিণী শুনিলে কেহই বলিতে পারিবেন না যে, এগুলির দ্বারা তাঁহার মনে প্রভাতের ভাব জাগিয়া উঠে। এই সকল রাগরাগিণী শ্রোতাগণকে সান্ধ্য ও নৈশ-ভাবেরই স্রোতে নিঃসন্দেহ ভাসাইয়া লইয়া চলিবে। প্রতীচ্য সঙ্গীতেও শোপ্যার (chopin) "নৈশগীত" "Nocturne" বা Gounodর Serenade শুনিলে কাহারও মনে প্রভাতের উজ্জ্বল ভাব জাগিয়া উঠিবে না, নিশীথের একটা নীরব কোমলকরুণ ভাবই জাগিয়া উঠিবে। তাহার কারণ এই যে, মানুষ সর্বত্রই মানুষ, এবং সকলেরই অন্তর্নিহিত সঙ্গীত মূলত একই ভিত্তির উপরে গ্রথিত। সন্ধ্যাকালে যখন সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিতে করিতে মানবমাত্রেরই

অন্তরে একটা উদাস-করুণভাব আনয়ন করে, সেই সময়ে অথবা সেই সময়ের জন্য রচিত—প্রাচ্যই হউক বা প্রতীচ্যই হউক—গীতাদিতে যে ঐ উদাস-করুণ ভাবেরই প্রাধান্য থাকিবে, তাহা তো স্বতঃসিদ্ধ। সেই প্রকার গভীর অন্ধকার রাত্রির গম্ভীর ভাব যখন মানবমাত্রকেই আচ্ছন্ন করে, বলা বাহুল্য যে, সেই গভীর নিশীথে রচিত অথবা সেই সময়ের জন্য রচিত প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য উভয় সঙ্গীতে একটা নৈশ গম্ভীর ভাবেরই ছায়া নিপতিত হইবে। প্রকাশের আকারে প্রকারে ভেদ থাকিলেও দেখা যাইতেছে যে মূলত প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, উভয় সঙ্গীতই এক সাধারণ ভূমিতে দণ্ডায়মান।

সমস্ত সঙ্গীতে একটা অসাম্প্রদায়িক ভাব অন্তর্নিহিত আছে বলিয়াই বিভিন্ন জাতি পরস্পরের দুঃখ বা হর্ষসূচক গানবাজনার ভিতরে দুঃখ বা হর্ষের অভিব্যক্তি উপলব্ধি করিতে পাবে। কেবল তাহাই নহে, আমরা দেখিয়াছি যে, বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন দেশীয় দুঃখ বা হর্ষসূচক সঙ্গীত রচনাতেও একই প্রকার ঢং আসিয়া পড়ে। সকলেই জানেন, এবং বাজনার নামেতেই ব্যক্ত হইতেছে যে, বীঠোবেনের 'বিষাদগীতি'র মূল ভাব গভীর বিষাদ। বলা বাহুল্য যে, এই বিষাদ ব্যক্ত করিবার জন্য যে ঢং বা প্রণালী উপযুক্ত বোধ করিয়াছিলেন, বীঠোবেন তাঁহার রচনাতে সেই প্রণালীই অবলম্বন করিয়াছেন। বাজনাটী শুনিলেই মন বিষাদের ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। পূজনীয় পিতৃদেব শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্প্রতি পিলু-বারোঁয়া রাগিণীতে "আমার প্রাণের ব্যথা কারে জানাই" নামক একটী গান রচনা করিয়াছেন। সকলেই জানেন যে, এই রাগিণীর মূল ভাব বিষাদ; এবং গানের পদ হইতেও বিষাদেরই ভাব যে ব্যক্ত হইতেছে তাহা বলাই বাহুল্য। বীঠোবেনের ঐ "বিষাদ-গীতি"র প্রারম্ভেই কয়েক "কলি" বা barএর মধ্যেই সমস্ত বাজনাটীর মূলভিত্তি গাঁথা হইয়াছে এবং অবশিষ্ট অংশ তাহারই বহির্বাঙ্গক অংশমাত্র। একদিন ঐ বাজনাটী বাজাইতে আরম্ভ করিয়াই উপলব্ধি করিলাম যে, ঐ মূল অংশের সহিত পিলুবারোঁয়ার কত ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য। তখন ঐ "বিষাদগীতি" ও পিতৃদেবরচিত গীত তুলনা করিয়া দেখি যে, "বিষাদগীতির" ঐ মূলভিত্তি যে প্রণালীতে অভিব্যক্ত করা হইয়াছে, পিতৃদেবের গানও স্বভাবতই সেই প্রণালীতেই রচিত হইয়াছে—একই সুর নিম্ন স্তর হইতে ক্রমশ যথাযথ উচ্চ স্তরে গিয়া চরমে পৌঁছিবার পর আবার নিম্নস্তরে নামিয়া আসিয়াছে। এস্থলে পিতৃদেবের উল্লেখ করাতে আমার যদি কোন ত্রুটী হইয়া থাকে, আশা করি তাহা কেহই গ্রহণ করিবেন না। বীঠোবেন ও পিতৃদেব, উভয়ের কথা এক সঙ্গে বলিয়া আমি দেখাইতে চাই যে, দেশের, কালের ও অবস্থার সুমহান ব্যবধান সত্ত্বেও উভয়ের রচনাপ্রণালীর মধ্যে সৌসাদৃশ্যের কারণ হইতেছে সঙ্গীতে সর্ব্ববিধ সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর অতীত এক সার্বভৌমিক মূল তত্ত্বের অস্তিত্ব। তবে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সঙ্গীতের প্রভেদ এইটুকু—যাহা আমি ইতিপূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি—যে, প্রাচ্য সঙ্গীতে স্বরভেদ বা একস্বরত্বের প্রাধান্য—প্রত্যেক স্বরকে পৃথকভাবে ফুটাইয়া প্রত্যক্ষভাবে প্রত্যেক গান বা গতের মূল কেন্দ্র রাগরাগিণীকে ফুটাইবার চেষ্টা করা হয়; প্রতীচ্য সঙ্গীতে স্বরসম্বাদ বা বহুলস্বরত্বের প্রাধান্য—একাধিক সম্বাদী স্বরকে একসঙ্গে ফুটাইয়া সঙ্গীতের মূলভিত্তি রাগরাগিণীকে অনেক স্থলে ঢাকিয়া ফেলিয়া বহিরঙ্গ স্বরসম্বাদকেই অতিমাত্র প্রাধান্য দেওয়া হয়।

প্রতীচ্য সঙ্গীতে স্বরভেদকে অপেক্ষাকৃত অবান্তর স্থান এবং স্বর-সম্বাদকে অতিমাত্র প্রাধান্য দেওয়া হইলেও সঙ্গীতের মূলতত্ত্ব স্বরভেদ-ব্যক্ত রাগরাগিণী পরিত্যক্ত হইতে পারে নাই। প্রাচ্য সঙ্গীতে দুএকটী ব্যতীত স্বরসম্বাদের নিদর্শন পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য সঙ্গীতে স্বরসম্বাদের ভিতরেও বিশেষ বিশেষ রাগরাগিণীর প্রকাশক স্বরবিন্যাস দৃষ্ট হয়। প্রতীচ্য যে কোন সঙ্গীতকে স্বরসম্বাদের দ্বারা যতই কেন আচ্ছন্ন করা হৌক না, তাহার ভিতরে কোন-না-কোন রাগরাগিণী অন্তঃসলিলভাবে, গূঢ় ও প্রচ্ছন্নরূপে বিরাজমান থাকিবেই। যেমন কোন সমাজে সংঘবদ্ধ ভাবের অভাব ঘটিলেও ব্যক্তিত্বের অভাব হয় না, এবং সংঘবদ্ধ ভাবের মধ্যেও ব্যক্তিত্ব অপরিহার্য্যরূপে বর্ত্তমান থাকিবেই, ব্যক্তিত্বই যেরূপ সমাজের মূলতত্ত্বরূপে অন্তর্নিহিত; সেইরূপ সঙ্গীতেও স্বরসম্বাদের অভাব ঘটিলেও স্বরভেদব্যক্ত রাগরাগিণীর অভাব হইবে না, এবং স্বরসম্বাদের মধ্যেও রাগরাগিণীর অস্তিত্ব অপরিহার্য্য—রাগরাগিণীই সঙ্গীতের মূলতত্ত্বরূপে নিত্য বর্ত্তমান। ইহা কেবল মতবাদ নহে, ইহা পরীক্ষিত সত্য। এই কারণেই আমরা প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য উভয় দেশীয় নৈশ সঙ্গীতেরই ভিত্তিরূপে কোন-না-কোন সান্ধ্য বা নৈশ রাগরাগিণীর স্বরবিন্যাসকে অবস্থিত দেখি। Chopinএর Nocturne গুলি সুপ্রসিদ্ধ। Beethovenএর Pathetique sontaতে যেমন আমরা পিলুবারোয়াঁ রাগিণীর অবস্থিতি দেখিলাম, তেমনি Chopinএর দ্বিতীয় Nocturneএ পূরবী, ছায়ানট ও ইমনকল্যাণ রাগিণীগুলির ঠাট বা রূপ খুব সহজেই অনুভূত হয়। তাঁহার অন্যান্য নৈশ সঙ্গীতেও খাম্বাজ, পূরবী, কেদারা প্রভৃতি রাগিণীর স্বরবিন্যাসের সংমিশ্রণ দেখা যায়। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, প্রতীচ্য সঙ্গীতের ভিতরেও যেমন রাগরাগিণীর সন্ধান পাওয়া অসম্ভব নহে, সেইরূপ প্রাচ্য সঙ্গীতকে স্বরসম্বদ্ধ করাও অসম্ভব নহে।

রাগরাগিণী যে সঙ্গীতের সার্বভৌমিক মূলতত্ত্ব, সঙ্গীতমাত্রেই তাহার অপরিহার্য্য অস্তিত্বই সে বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ। স্বরসম্বদ্ধ সঙ্গীতে আমরা বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বের প্রকাশ দেখি, এবং স্বরভেদব্যক্ত সঙ্গীতে আমরা একত্বকেই একমাত্র সাররূপে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করি। প্রকৃতিতে যেমন আমরা বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বের একটী বন্ধনসূত্র দেখি, স্বরসম্বদ্ধ সঙ্গীতেও সেইরূপ দেখি যে, নানাবিধ বৈচিত্র্যের মধ্যেও মূল রাগরাগিণীর একটী বন্ধনসূত্র থাকিবেই। মূল রাগ-রাগিণীর বহিঃশরীর স্বরবিন্যাসের অভাব হইলে কোন্ স্বরের উপর স্বরসন্ধিই বা হইবে, আর কাহারই বা উপর স্বরসম্বাদ করা হইবে? কোন একটা শুদ্ধ বা মিশ্র রাগরাগিণীর উপর অবলম্বিত না হইয়া কোন স্বরসম্বাদই দাঁড়াইতে পারে না। প্রাচ্য কোন রাগরাগিণীর

স্বরবিন্যাসের কোন এক বা একাধিক স্বরকে স্বরসন্ধি প্রভৃতির সাহায্যে পল্লবিত বা পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে অনুবাদিত করিয়া তুলিলেই তাহাকে স্বরসম্বদ্ধ করা যাইতে পারে—আমরা তথাকথিত পাশ্চাত্য সঙ্গীত প্রাপ্ত হই; আর পাশ্চাত্য স্বরসম্বদ্ধ কোন গান বা গতের সারটুকু বাহির করিয়া লইলেই তাহার অন্তঃস্থিত শুদ্ধ বা মিশ্র রাগরাগিণীটুকু প্রাপ্ত হই। রাগরাগিণী হইল সঙ্গীতের মূলমন্ত্র, স্বরবিন্যাস হইল তাহার খাঁটি অর্থ, এবং স্বরসম্বাদ হইল তাহার অন্যতর ভাষ্য বা টীকা। রাগরাগিণী সুব্যক্ত করিবার সহায় স্বরবিন্যাস ও তদনুষঙ্গী স্বরভেদের সহিত স্বরসম্বাদের এতই যোগ, উহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ এতই ঘনিষ্ঠ যে, স্বরভেদের পরিবর্ত্তে স্বরসম্বাদেরই উন্নতিসাধন Beethoven প্রভৃতি পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞ-দিগের লক্ষ্য হইলেও তাঁহারা স্বরসম্বাদের পরিধি যথেষ্ট প্রসারিত ও সমুন্নত করিবার সঙ্গে সঙ্গে স্বরভেদেরও প্রয়োগক্ষেত্র প্রসারিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

ভারতের ঋষিরা যেমন ধ্যানবলে সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা ব্রহ্মবিদ্যাকে করতলন্যস্ত করিয়াছিলেন, ব্রহ্মজ্ঞানকে মানবমাত্রের সকল জ্ঞান বিভাগেরই অন্তর্নিহিত কেন্দ্ররূপে প্রতীতি করিয়াছিলেন, সেইরূপ, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ভারতের ঋষিমুনিরাই একান্ত সাধনার ফলে সঙ্গীতের সার্ব্বভৌমিক মূলতত্ত্ব রাগরাগিণীর সন্ধান লাভ করিয়াছিলেন। এই সার্ব্বভৌমিক তত্ত্বের আবিষ্কারই তাঁহাদের জগতকে বিশেষ দান। এই সার্ব্বভৌমিক তত্ত্বের অনুশীলন ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিবার সহায় এবং রাগরাগিণীর মধ্যে সমস্ত সঙ্গীতেরই সমাবেশ হইতে পারে, ইহা উপলব্ধি করিয়া তাঁহারা, যতপ্রকার উপায়ে সেই মূলতত্ত্ব রাগরাগিণীকে সুব্যক্ত করা যাইতে পারে, সেই সকল উপায়েরই উন্নতিসাধনে হৃদয় মন অর্পণ করিয়াছিলেন; স্বর-সম্বাদকে সঙ্গীতের মাত্র বহিরঙ্গরূপে প্রতীতি করিয়া তাহার উন্নতি-সাধনে বিশেষ কোনই দৃষ্টি দেন নাই। ইহার বিপরীতে পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞেরা ঐ বহিরঙ্গ স্বরসম্বাদেরই উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করিয়াছেন।

উপরে যাহা বলিয়া আসিলাম, তাহা হইতে আমরা এই সুস্পষ্ট সত্যে উপনীত হইতেছি যে, স্বরসম্বাদও যেমন পাশ্চাত্যদিগের একচেটিয়া নিজস্ব নহে, উহা মানবমাত্রেরই অন্তরে ভগবান কর্ত্তৃক নিহিত সার্বভৌমিক তত্ত্বেরই বহিরঙ্গ মাত্র, স্বরভেদপ্রধান স্বরবিন্যাসের দ্বারা প্রকাশিত রাগরাগিণীও সেইরূপ প্রাচ্যদিগের একচেটিয়া নিজস্ব নহে—উহা মানবমাত্রেরই অন্তরে অবিনশ্বর অক্ষরে ভগবান কর্ত্তৃক লিখিত সঙ্গীত সম্বন্ধীয় সার্বভৌমিক মূলতত্ত্ব। স্বরভেদ ও স্বরসম্বাদ একই সঙ্গীতের মুক্তির পথে সমুত্থিত হইবার দুইটি পক্ষ। সুতরাং স্বরসম্বাদের বা harmonyর দিকে ভারতীয় সঙ্গীতকে কতকটা অগ্রসর করিয়া দিলে, তাহা যে ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাণবিরোধী হইবে, অথবা তাহার ফলে ভারতীয়-সঙ্গীত যে নিজের বৈশিষ্ট্য হারাইবে, তাহা আমরা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারি না। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সঙ্গীতে রাগরাগিণীর, প্রাণ সমধিক প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিলে তাহা যে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রাণঘাতী হইবে, অথবা তাহার ফলে পাশ্চাত্য সঙ্গীত যে নিজের বৈশিষ্ট্য স্বরসম্বাদ হইতে বিচ্যুত হইবে, সে কথা আমরা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারি না।

বর্ত্তমান যুগে জ্ঞানের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় সঙ্গীত বিভাগেও মৈত্রীকে ব্যবহারের নিয়ামক করিতে হইবে, সামঞ্জস্য অবলম্বন করিতে হইবে—প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে যথাসম্ভব মিলন সাধন করিতে হইবে। সঙ্গীতের সার্ব্বভৌমিক তত্ত্বের উপর দাঁড়াইয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য প্রকাশ-প্রণালীর মধ্যে বিরোধবিবাদ বিদূরিত করিতে হইবে। সঙ্গীতের প্রকৃত উন্নতি সাধন করিতে চাহিলে একদিকে যেমন স্বরভেদপ্রধান রাগরাগিণীর প্রয়োগ পাশ্চাত্য সঙ্গীতে প্রসারিত করিতে হইবে, অপরদিকে সেইরূপ স্বরসম্বাদপ্রধান প্রকাশপদ্ধতিকেও প্রাচ্য সঙ্গীতে প্রবর্ত্তিত করিবার অবসর দিতে হইবে। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের যাহা ভাল দেখিবে, তাহা আমাদের উপযোগী করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। পাশ্চাত্য সঙ্গীতে যাহা গ্রহণের উপযুক্ত, নকলনবিশের ন্যায় তাহা হুবহু নকল করিতে বলি না। তাহাকে আমাদের রাগরাগিণীর স্বরবিন্যাসের উপর দাঁড় করাইয়া দেশীয় ভাবধারার অনুকূল করিয়া লইতে হইবে। পূজনীয় সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, পিতৃদেব, শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি সঙ্গীতজ্ঞেরা অনেকগুলি বিদেশীয় সুরকে এই প্রকারে দেশীয় ভাবে অনুবাদ করিবার কার্য্যে বিশেষ সফলকাম হইয়াছেন। বিদেশীয় আচার-ব্যবহার, বিজাতীয় পোষাক-পরিচ্ছদ গ্রহণের ব্যবস্থা অনেক সময়ে অশোভন ও ব্যর্থ হয়। কিন্তু বিদেশীয় বিজাতীয় হইলেও জ্ঞানের কোন বিষয় গ্রহণ সম্বন্ধে অশোভন ও ব্যর্থ হইবার কোন কথাই উঠিতে পারে না। ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যাতে রোমক অংশ প্রবেশ করাইবার ফলে মঙ্গলই হইয়াছে, জ্যোতির্বিদ্যার উন্নতি ও প্রসারই হইয়াছে। সেইরূপ পাশ্চাত্যদিগের নিকটে সঙ্গীত বিষয়ক কোন কিছু গ্রহণ করিলে আমাদের লজ্জা পাইবার তো কোন কথাই নাই, বরঞ্চ তাহা আমাদের সজীবতারই সাক্ষ্য প্রদান করিবে। গণিতবিষয়ক সত্য যেমন সকল দেশেই সত্য—দুই আর দুইয়ে চার হয়, ইহা যেমন দেশ-কাল-নির্বিশেষে সত্য, সেইরূপ সঙ্গীতবিষয়ক সত্যগুলিও দেশকালনির্বিশেষে সত্য—সা ও রে একসঙ্গে বাজাইলে এদেশেও সম্বাদী হইবে না, ইংলণ্ডেও সম্বাদী হইবে না। সজীব পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গীতজ্ঞেরা আমাদের রাগরাগিণী অবলম্বনে সঙ্গীত রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই জাগরণের দিনে আমরা যদি অন্য জাতির ভাল বিষয় গ্রহণ করিতে পশ্চাতে পড়িয়া থাকি, তবে আমাদিগকে ধীরে ধীরে জ্ঞানের রাজ্য হারাইতে হইবে। পাশ্চাত্যেরা প্রাচ্য সঙ্গীতের মনোমত ভাল অংশ গ্রহণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন, আর আমরা পাশ্চাত্য সঙ্গীতের কোন অংশ গ্রহণ করিবার উপযুক্ত দেখিলেও কি অস্পৃশ্য বলিয়া তাহা হইতে দূরে সরিয়া থাকিব? তাই বলি, সঙ্গীতবিষয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনের পথে যাঁহারা পথপ্রদর্শক হইবেন, তাঁহারা আমাদের নমস্য ও কৃতজ্ঞতার পাত্র। আর, সঙ্গীতবিষয়ে প্রাচীন-পন্থীরা—যাঁহারা এই

প্রকার মিলনের বিরোধী, তাঁহারাও আমাদের নমস্য, তাঁহাদেরও উদ্দেশে আমাদের কৃতজ্ঞতা সমুত্থিত হইতেছে। তাঁহারাই ভারতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য আবাহমানকাল রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। জাতীয় অবনতির সঙ্গে আমাদের অনেক ভাল জিনিস বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রাচীনপন্থীরাই ভারতীয় সঙ্গীতের নির্ম্মল ধারাকে বিলুপ্ত হইতে দেন নাই। শত শত রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে আমরা হীরকসদৃশ ভাস্বর নানা বিষয় পরিত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে কাচতুল্য নিষ্প্রভ অনেক বিষয় গ্রহণ করিয়া হর্ষচিত্তে বিচরণ করিতেছি, আনন্দে বিভোর হইয়া আছি। কিন্তু সঙ্গীতবিষয়ে প্রাচীন-পন্থীরা প্রকৃত জহুরীর ন্যায় ভারতীয় সঙ্গীতের প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝিয়া তাহাকে অবিকৃত আকারে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদেরই সেই নিঃস্বার্থ ও অক্লান্ত চেষ্টার ফলে আজও আমরা ধ্রুপদ প্রভৃতি উচ্চদরের অনুপম সঙ্গীত শুনিয়া মুগ্ধ হইবার অবসর লাভ করিতেছি, কেবল টপ্পা জাতীয় সঙ্গীতের মোহে ডুবিয়া যাই নাই। বর্ত্তমান যুগে বিরোধ বিবাদ ভুলিয়া গিয়া, সাম্প্রদায়িকতার জেদ পরিত্যাগ করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় পদ্ধতিকে যথাসামঞ্জস্য গ্রহণ করিলে সঙ্গীত-রাজ্যেও ভারত যে পুরাকালের ন্যায় জগতের মহাসভায় শ্রেষ্ঠতম আসন গ্রহণ করিবে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

উপসংহারে যে গীতপতি পরম দেবতা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মানব-মাত্রেরই অন্তরে সঙ্গীতের নির্ঝরের আকারে তাঁহার স্নেহপ্রেম ঢালিয়া দিয়াছেন, এবং যিনি আমাদের অন্তরে সঙ্গীতের অসাম্প্রদায়িক ভাব উপলব্ধি করিতে দিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সঙ্গীতকে মিলনের পথে অগ্রসর করিয়া দিবার সুমহান বাণী প্রেরণ করিতেছেন, সকল সম্প্রদায়ের নমস্য, সর্ববিধ জ্ঞানের একমাত্র আধার সেই পরমেশ্বরকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া আমার বক্তব্যের উপসংহার করি।

কন্যা

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম-এ, বি-এল্

সন্ধ্যা জ্বালা' হয়ে গেছে ঘরে, আর মোটে
নাহিক সময়, চতুর্দ্দশী এর পর।
বাহিরে পালকী রাখি, মিলি একজোটে
করে খিটিমিটি, আর মিনিট অন্তর
হাঁকে, "আস, শীঘ্র আ-স"—উড়ে বাহকেরা;
দ্বারের নিকটে মার বুকে মাথা রাখি
মেয়ে ফুলে ফুলে কাঁদে—বাল্যস্মৃতি-ঘেরা
গৃহ ছেড়ে যেতে হবে কোথা! মারও আঁখি
করে ছল-ছল, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ তাঁর,
"ছি—কাঁদিতে কি আছে, লক্ষ্মী মা আমার!
ও-মাসে আনিব তোরে।" "দাদাকে, বাবাকে
যেতে ব'লো," ছোট ভাইটির মুখ চুমি'
পালকীতে চড়ে, "ব'লো, ভুলোনা মা তুমি।"
—স্বামীগৃহে যায় মেয়ে, মা চাহিয়া থাকে।

বধূ

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম-এ, বি-এল্

জ্যোৎস্না আসিয়া পড়ে বিথানের 'পরে,
শুভ্র শয্যা—শুয়ে আছে বধূ আর বর।
গল্প আর গল্প, ঘুম চ'লে গেছে কোথা,
রাত্রি দ্বিপ্রহর, তবু ফুরায় না কথা।
"আচ্ছা, হাঁ-গা, ফুলগাছ নাই এখানে ত
একটাও; যুঁই বেশ, যদি পাওয়া যেত!
এনে দেবে গোটাকত গাছ?" "দেব, তবে—
আমায় অগ্রিম কিন্তু কিছু দিতে হবে।"
"কোথা পাব?" হাসে চোখদুটি বড় বড়,
"কী বা আছে?" "চুমো" "যাঃ-ও তুমি দুষ্টু, বড়",
পাশ ফিরে শোয় রাগে। কিছুক্ষণ পরে
কি ক'রে মিলিয়া যায় অধর অধরে,
লজ্জায় লুকায় মুখ বুকের ভিতর;
হয়েছে তাদের বিয়ে আজ দু' বছর।

চট্টগ্রামের কয়েকটী দৃশ্য

(বরকল)

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার দত্তগুপ্ত

চিরশ্যামলা, কাননকুন্তলা, শৈলকিরীটিনী কবিধাত্রী চট্টলার অন্তর্গত নদ-নদী, বন-নির্ঝর, উৎস-পরিবেষ্টিত বরকল প্রদেশটি রাঙ্গামাটি হইতে প্রায় ৪৫ মাইল দূরে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থিত। এই ছায়াঘেরা বিজন প্রদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য কবিত্ব-শক্তি বিকাশের বিশেষ অনুকূল। প্রকৃতিরাণী তাঁহার সমস্ত সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়াই যেন এই গোপন স্থানটিকে শ্যামল বন-রেখা, অবারিত আকাশ, ধূমল পর্ব্বত দ্বারা নব নব সাজে সাজাইয়া লোক-চক্ষুর সম্মুখে স্থাপিত করিয়াছেন। জ্যোৎস্নাময়ী নিশীথিনী যখন আপনার ভাবে আপনি হাসে, বনান্তবায়ু যখন সৃষ্টির অনন্ত বারতা বহন করিয়া স্থাবর জঙ্গমে আপনার রহস্য ছড়াইয়া বেড়ায়, শরতের উন্মুখ যৌবনে শ্যামলা প্রকৃতি যখন আপনার সৌন্দর্য্যে উছলিয়া পড়ে, সেই পবিত্রতাময়, চির-সৌন্দর্য্যময় প্রাণ-মন-কাড়া প্রাকৃতিক শোভা কতই সুন্দর, কতই মনোহর এবং কতই ভাবুকজন-স্পৃহনীয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দিগন্ত-প্রসারিত পর্ব্বত-গাত্রে দয়েল, শ্যামা, পাপিয়া, ফিঙ্গে, টিয়া প্রভৃতি বন্য পক্ষীরা কলকণ্ঠে প্রকৃতির নির্জ্জনতায় সুমিষ্ট সঙ্গীত-লহরী তুলিতেছে। এই স্বভাব-মিষ্ট প্রাণ-কাড়া বিচিত্র সুর কবি ও অকবি উভয়েরই প্রাণ আনন্দে পরিপূর্ণ করিয়া কত শত বিচিত্র কাব্যের ও চিন্তার সৃষ্টি করে। এই ইন্দ্রজাল-সৃষ্টিবৎ শৈল-সিন্ধু-পরিবেষ্টিত রম্য কাননের নৈসর্গিক শোভায় মুগ্ধ হইয়াই কি পলাশীর কবি ৺নবীনচন্দ্র অনেক নূতন সৌন্দর্য্য-চিত্র সাধারণের নিকট উপস্থিত করেন নাই?

বরকল জলপ্রপাত (১)

এই সুন্দর শোভাময় বরকল, (Barkal) এই নক্ষত্র-পুলকিত নীলাভ আকাশ, এই স্থির, স্বচ্ছ-চন্দ্রিকা-চর্চ্চিত
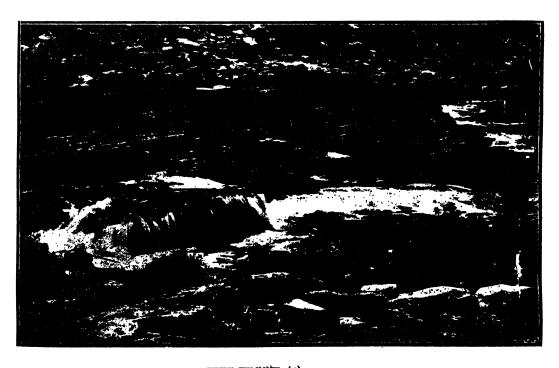
বরকল জলপ্রপাত (২)
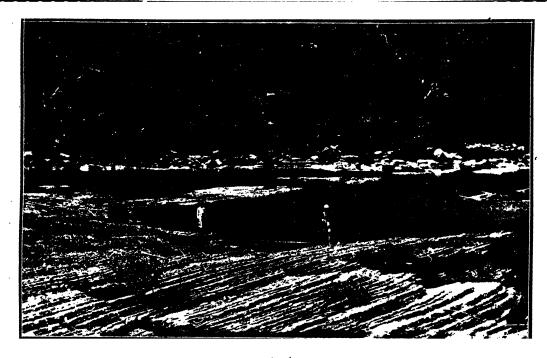
বরকল জলপ্রপাত (৩)

বরকল জলপ্রপাত (৪)

এই জলধারাটিকে কেহ কেহ The green-water বলেন। ইহার একমাত্র কারণ ইহাকে দূর হইতে সবুজ দেখায় ;—জল অতীব সুস্বাদু।
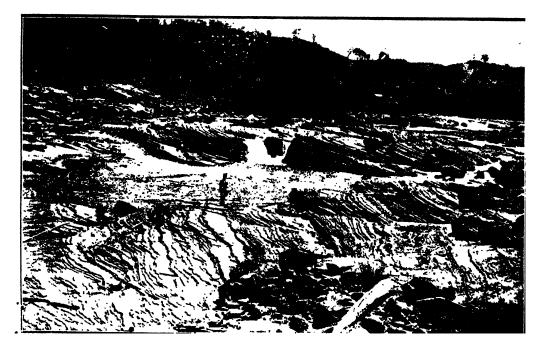
বরকল জলপ্রপাত (৫)

বরকল-জলধারা—এই নির্জ্জনতার বুকে উপস্থিত হইলে ভগবানের প্রতি স্বতঃই হৃদয়ে ভক্তির আবির্ভাব হয়, এবং জীবন যেন এক নূতন রাগিণীতে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। বুঝি বা, এই সুন্দরী শোভাময়ী পৃথিবীর ছায়া-ঘেরা বিজন পথ-ঘাট, মাঠ, পর্ব্বত, নদ-নদীর কলকল রব, শ্যাম প্রান্তরের দক্ষিণ হাওয়া, জ্যোৎস্নার হাসি, হেমন্তের হিমানীই ভাবুকের প্রাণ, কবির কাব্য, বিশ্বচিন্তার ধর্ম্ম। সেফোর সঙ্গীতে ও ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের কবিত্বে তাহারই বিকাশ; মাইকেল-নবীন-হেম-রবীন্দ্রে তাহারই পরিচয়। জগতের সকল সৌন্দর্য্যই যেন অন্তর্যামী নৈসর্গিক সম্পদের মধ্যে ঢালিয়া দিয়াছেন। এই জলপ্রপাত-পরিবেষ্টিত বরকল ভূমির অতুলন সৌন্দর্য্যের শতাংশও লেখনীতে ফুটাইয়া তোলা আমার পক্ষে অসম্ভব।
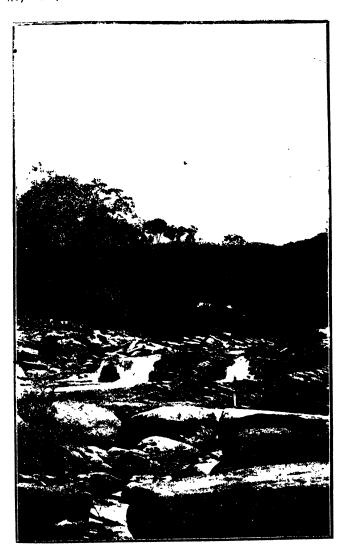
বরকল জলপ্রপাত (৬)

বরকল-জলধারাই The waterfall of Barkal নামে অভিহিত। এই পাহাড়-পর্ব্বত-পরিবেষ্টিত নির্জ্জন প্রদেশের নাম বরকল;—এজন্য এই জল-ধারাকেও এই প্রদেশের নামানুসারে বরকল-জলপ্রপাত বলা হয়। ১৯২২ ইংরেজীতে গবর্মেণ্ট এই জলধারা হইতে Hydro-electric Currentএর বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু অর্থের অনাটন বশতঃ সম্প্রতি তাহা স্থগিত রাখা হইয়াছে। কর্ণফুলী নদী হইতেই বরকল জলপ্রপাতের উৎপত্তি। জলধারার এক পার্শ্বে সারি সারি কুসুমিত-তরুলতা-পরিবেষ্টিত শ্যামল-শস্য-ক্ষেত্র-পরিশোভিত পর্ব্বত-সমাচ্ছন্ন অদূরবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীগুলি অস্তমিত দিন-মণির রক্তিম কিরণ-মালার সংস্পর্শে একখানি সুন্দর ছবির ন্যায় প্রতীয়মান হয়। অপর দিকে তরঙ্গায়িত শৈলশ্রেণী আবহমান কাল হইতে সুদৃঢ় প্রাচীরবৎ মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক যুগ-যুগান্তের কত নিগূঢ় রহস্য প্রকাশ করিতেছে। জলধারার অবিশ্রান্ত ঝরঝর নিনাদের সহিত ঝিল্লীর ঐক্যতান, স্নিগ্ধ, শান্ত, শ্যাম অরণ্যানীর সুশীতল ছায়া ও পক্ষীর সুমিষ্ট সঙ্গীত মিশ্রিত হইয়া জন-মানবহীন গোপন প্রদেশটিকেও এক অপার্থিব সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিয়াছে। প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ প্রকৃতির কান্ত-মধুর নিরুপম সৌন্দর্য্যের ভিতরে সকল সৌন্দর্য্যের স্রষ্টা ও সকল সৌন্দর্য্যের আধার অন্তর্যামীকে অন্বেষণ করিতে ভালবাসিতেন। যখন যেখানকার নৈসর্গিক শোভায় মুগ্ধ হইতেন, তখনই সেই পবিত্র স্থানটিকে তাঁহারা তীর্থধামে পরিণত করিতেন। হিন্দুর মহাতীর্থ চন্দ্রনাথ, বাড়বকুণ্ড ও আদিনাথই কি ইহার সাক্ষ্য প্রদান করে না?

প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে আরবীয় পরিব্রাজক "ইবন-বতুন', চীন পরিব্রাজক 'মাহুদ' প্রভৃতি বহু স্বনাম-প্রসিদ্ধ মনীষিগণ চট্টগ্রামের সবুজ সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়াছেন। বাংলার গৌরব সুপ্রসিদ্ধ জগত-বরেণ্য মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ও শ্রদ্ধেয় ৺সত্যেন্দ্রনাথ ইহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছেন। ৺সত্যেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—

সুন্দরী তুমি কোমলে কঠিন, বিরাজিছ কিবা গৌরবে,
কঠিনতা তুমি ঢেকেছ তোমার, সবুজবনের সৌরভে।
নীলিমা-শ্যামলে-কঠিনে-কোমলে অপরূপ
চট্টলা! তুমি বঙ্গভূমির ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি গো!

* আমার পরম বন্ধু শ্রীযুত শশিভূষণ দাসগুপ্ত মহাশয় এতৎসহ প্রকাশিত চট্টল-চিত্রগুলি দান করিয়া প্রবন্ধ-লেখায় আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

বাণী-রাণী

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

রাণি, রাণি, রাণি
বুকে ধরি' ওই পা দু'খানি
স্পর্দ্ধিতের দলিয়াছি দৃপ্ত অহঙ্কার,
প্রেমিকেরে বসায়েছি চির মহিমার
আকাঙ্ক্ষিত আনন্দের লোকে,
অমৃতের পরশ-পুলকে
করিয়াছি রোমাঞ্চিত নিখিল-হৃদয়
মরুভূমে করিয়াছি রসের আলয়,
জয় তব জয়,
মরমের মধু পদ্মখানি
জ্যোতির্ম্ময়ী তব রাজধানী,
ধন্য আমি, তোমারে যে সেবি
তুমি বাণী, তুমি মোর দেবী।
জানি, জানি, জানি,
রিক্তশোক, রিক্তদুঃখ'গ্লানি
সুর্ম্মরের সুধাপাত্র গানে, প্রাণে ভরি'
ওই তব রাঙাপায়ে যে দিয়াছে ধরি'
অন্তরের আকুল আগ্রহে,
কি ভৎর্সনা নিয়ত সে সহে
ওই মুখ ধ্যান যার, ওই প্রতিমাটি
দুটি আঁখি নীলে যার রূপের রেখাটি
আলো-তুলিকাটি
বুলাইয়া যায় লিখে লিখে,
পরিহাসে জাগে দশদিকে
সংসারের উষর প্রান্তরে—
নিন্দা তার, কোটি কণ্ঠস্বরে।

তুমি যার সব
নিত্য যার মহামহোৎসব
করি পান চারুধারা তোমার প্রেমের,
অনবদ্য উৎস তব অনন্ত ক্ষেমের
বহিয়াছে মানসে যাহার
কিরণের পরি' লীলাহার,
রহি তব আরাধনে শান্ত, সমাহিত
তব শুভ্র ছবি করি' পরাণে বিম্বিত,
লাঞ্ছিত, ধিক্কৃত
জগতের বিষ—রসনায়
ক'রেছে সে মহা সাধনায়—
বাক্যহীন উপেক্ষার ভরে
নয়নের জ্বালাময় করে।
হিয়া—বসন্তের
শ্যামশোভা, দিক্‌দিগন্তের
দোলে ওই কুসুমিত বিচিত্র অঞ্চলে,
কোন্ প্রীতি-মন্ত্রে আজি ত্রিভুবন-তলে
ছুটিয়াছে বাধাবন্ধহারা
প্রাণ-পুষ্প-মকরন্দ-ধারা?
কোথা বাজে মিলনের মৃদুল বাঁশীতে
কম্পিত-কল্পনা-তন্ত্রী গুঞ্জরণে, গীতে
দিবসে, নিশীথে?
যেথা চিত্ত-শতদলে সিংহাসন পাতা
অনিন্দ মুরতি ওগো কবির বিধাতা
তারি মাঝে এস', এস রাণি
এস বাণী, এস বীণাপাণি।

পিয়ারা

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল

১১

শনিবারে থিয়েটারে ভারী ধুম।

পাপিয়া মনে-মনে একটা সঙ্কল্প আঁটিল—এই চপলা যে কি দিয়া তৈরী, সে যে কত হীন, সেটুকু অমলের চোখে যদি ধরাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে অমলের অন্ধ চিত্ত হয়তো জাগিতে পারে। আর জাগিয়া তখন হয়তো সে দেখিতে পারিবে, পাপিয়া কি অমূল্য মন লইয়াই বসিয়া আছে!

শুক্রবার সন্ধ্যার সময় সে কাশীপুরে আসিয়া অমলের সঙ্গে দেখা করিল, এবং অবিচল মূর্ত্তিতে অকম্পিত স্বরে বলিয়া গেল, অমল যেন থিয়েটার সুরু হইবার ঠিক আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে ডানদিকের ফটকের সামনে দাঁড়াইয়া থাকে। কারণ চপলা তাকে দেখিয়া চিনিতে চায়! এই কথাটুকু বলিয়াই সে গম্ভীর ভাবে চলিয়া আসিল।

শনিবার সকালে পাপিয়া চপলাকে লিখিয়া পাঠাইল,—

ভাই চপলা দিদি, আমি তোমার সঙ্গে থিয়েটারে যেতে চাই। আমায় নিয়ে যেয়ো। মানগোবিন্দ অফিস থেকে সোজা থিয়েটারে যাবে। তার সঙ্গে বক্সেই দেখা হবে। তার অফিসের কাজে মোটরটা সন্ধ্যার সময় ব্যস্ত থাকবে, ভাই তাই তোমার সঙ্গে যেতে চাইছি। তোমার মোটর ঠিক আছে তো? ভৃঙ্গরাজও যাচ্ছেন তো?

চপলা জবাব লিখিল,—

আচ্ছা। এখানে সন্ধ্যার আগে আসিস্ তা হলে। ভৃঙ্গরাজ এখানে নেই। পাথরের কন্ট্রাক্টের কাজে চুণার গেছে। আশ্বস্ত হও। দুদিন ছুটী সখি, ছাতু মাখতে হবে না। ভারী আপদ,—তা যাই বলিস্! নয়, ভাই?

সন্ধ্যার পর চপলার গাড়ী থিয়েটারের ফটকের সামনে আসিলে গাড়ীর মধ্য হইতে পাপিয়া দেখিল, তৃষিত চাতকের মত পিপাসু নেত্রে চাহিয়া অমল ঐ দাঁড়াইয়া আছে!...তার বুকে কে যেন ছুরি বসাইয়া দিল। এত দরদ! তবু চপলা তার কথা কিছুই জানে না! তার মনে হইল, চপলাকে একবার বলে, ঐ দেখ, তোমার সেই কবি ...কিন্তু না! যদি চপলা তার পানে চাহিয়া একটা তাচ্ছল্যের হাসিও হাসে,...তাহা হইলে অমল হয়তো ভাবিবে, ও তাচ্ছল্য নয়, দরদের হাসি, তারিফের হাসি! না—তার চেয়ে...

পাপিয়া চপলার গায়ে ঠেলা দিয়া কহিল,—ওঃ, ভিড় দেখচো!—

—ও তো ফটকের সামনে ভিড় হবেই!

—তা নয় গো, পিছন দিকে ওধারে!

চপলা পিছন ফিরিয়া চাহিল, আর ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তার গাড়ীও ফটকের মধ্যে ঢুকিল। পাপিয়া খুশী হইল, অমলের দিকে চপলার নজর পড়ে নাই! অমলের পানে চাহিয়া পাপিয়া হাসিল, আর অমল মুখে-চোখে রাজ্যের লজ্জা লইয়া কাঠের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল।...

বক্সে বসিয়া পাপিয়া নীচে চাহিয়া দেখে, ঐ যে অমল! কি সতৃষ্ণ ভঙ্গীতে প্রকাণ্ড পর্দাখানার দিকে সে চাহিয়া আছে!···

বাদ্য বাজাইয়া পট তুলিয়া থিয়েটার-ওয়ালারা পালা সুরু করিয়া দিল।···ঐ সীতা—উর্ম্মিলা, মাণ্ডবীদের সঙ্গে উদ্যানে বসিয়া গল্প করিতেছে...কৌশল্যা আসিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গেল···লক্ষ্মণ আসিয়া চরণ বন্দনা করিল!...চকিতে একটা হাসির ঝাপ্টার মত সে দৃশ্য সরিয়া রাজবাড়ীর ঘর আসিয়া উদয় হইল। দুর্ম্মুখ অস্থির মনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—ঐ রাম...ঐ লক্ষ্মণ ..বশিষ্ঠ···কি-সব কথাবার্ত্তা হইতেছে। তারপর...মুখে প্রেমের হাসির জ্যোতিঃ মাখিয়া সীতা আসিল—রামের বুকে কি আদর যাচিয়া সে মাথা রাখিল... রাম কথাও কহিল না—শুষ্ক চোখে সীতার পানে চাহিয়া। সীতা ব্যাকুল চোখে চাহিল, কহিল,—কথা কচ্ছ না কেন? মুখ তোমার মলিন কেন···? রামচন্দ্র সীতার হাত ধরিয়া সখেদে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বসিয়া পড়িল—তার

পর দুর্ম্মুখের মুখে যা শুনিয়াছিল, সীতাকে বলিল। সীতা ম্লান চোখে রামের পানে চাহিল। রাম বলিল,—প্রজারা তোমার নির্ব্বাসন চায়,সীতা···বলিয়াই রাম মূর্চ্ছিত হইল!... কিন্তু···এ-সব যেন পুতুলের খেলা! তাদের একটা কথাও পাপিয়ার কাণে যাইতেছে না! পাপিয়ার চোখের সামনে ষ্টেজের উপর কি কতকগুলা সাজে সাজিয়া কয়টা প্রাণী নড়াচড়া করিতেছে, আর তার চোখের দৃষ্টি, তার সমস্ত মন···নীচে, ঐ পাঁচ-টাকার সীটে একটি লোকের হাব-ভাব-ভঙ্গী, তার ব্যথিত নিঃশ্বাসটুকু অবধি সাগ্রহে লক্ষ্য করিতেছে!...ও কি, ও যে কাঁদিতেছে...অমলের দুই চোখে জল যে!...ষ্টেজের পানে চাহিয়া পাপিয়া দেখে, রামের কাছে বিদায় লইয়া সীতা কম্পিত ত্রস্ত চরণে লক্ষ্মণের সঙ্গে ঐ কোথায় চলিয়াছে!

চারিধারে চটপট্ করতালি-ধ্বনি উঠিল। পাপিয়ার চমক ভাঙ্গিল। মানগোবিন্দ পাপিয়াকে ঠেলিয়া বলিল,—Excellent! তোমার চপলা দিদি কিন্তু first class actress! নাঃ, ওর আর জোড়া নেই ষ্টেজে!

এ-সব কথা পিয়ারীর কানেও গেল না।...সে পাষাণ-মূর্ত্তির মত নিশ্চল হইয়া পাঁচ টাকার একটা সীটের দিকে চাহিয়া ছিল।···এত লোক বসিয়া থিয়েটার দেখিতেছে, পান খাইয়া, সিগারেট টানিয়া, হাসিয়া, গল্প করিয়া তারা মাঝে মাঝে চঞ্চল উন্মাদ হইয়া উঠিতেছে...কিন্তু ঐ লোকটি...ওর চোখের সাম্‌নে অযোধ্যার সেই প্রাচীন যুগ যেন ছবির মত ফুটিয়া উঠিয়াছে—আর একাগ্র চিত্তে বসিয়া ও সেই ছবিই দেখিতেছে!···এ লোকগুলার সঙ্গে উহার কত প্রভেদ...! পাপিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিল।...

সহসা থিয়েটার-শুদ্ধ লোক হুড়মুড় করিয়া উঠিয়া পড়িতে পাপিয়া আবার চমকিয়া উঠিল। ব্যাপার কি?··· মানগোবিন্দ তার হাত ধরিয়া টানিল, কহিল,—ওঠো পাপিয়া...

পাপিয়া সবিস্ময়ে কহিল,—কেন···?

মানগোবিন্দ হাসিয়া কহিল—কেন আবার কি!... থিয়েটার হয়ে গেল যে। সীতার পাতাল-প্রবেশ - তার পর আবার কি! সব তো ফুরিয়ে গেল। বেড়ে করেছিল কিন্তু শেষের ঐ trick sceneটা! মাটী ফেটে সীতা নেমে গেল তার মা বসুমতীর কোলে! চমৎকার! তা এখন ওঠো,—আর ফার্স-টার্স তো নেই—আজ শুধু এই একখানা বই-ই যে!

—ওঃ! বলিয়া কোনমতে অপ্রতিভ ভাব কাটাইয়া পাপিয়া উঠিল।...এতক্ষণ সে তো থিয়েটার দেখে নাই—চোখের সামনে কয় ঘণ্টা ধরিয়া কি যে হইয়া গেল, তা সে কিছুই জানে না! সে শুধু ঐ একটি লোকের উপরই তার দৃষ্টি আর মন নিবদ্ধ রাখিয়া উহারই ধ্যানে তন্ময় ছিল!

পাপিয়া এখন উঠিল, উঠিয়া বলিল,—তুমি যাও। আমি চপলা দিদির সঙ্গে যাবো—ওর সঙ্গেই এসেচি কি না! ভয় নেই, এখনি আমি বাড়ী ফিরবো...

—দেখো...মানগোবিন্দ একটু চিন্তিত হইল।

পাপিয়া কহিল,—ভয় নেই গো। তুমি এগোও... বলিয়াই পাপিয়া ক্ষিপ্র চরণে নীচে ষ্টেজে নামিয়া গেল। চপলা তখন মুখের হাতের রং ধুইয়া তোয়ালে দিয়া জল মুছিতেছে—আর আশে-পাশে ভক্তের দল জয়ধ্বনি করিতেছে।

পাপিয়াকে দেখিয়া চপলা কহিল,—এই যে আমার হয়েছে। আমি তৈরী। এখনি যাবো।···তারপর ম্যানেজারের দিকে চাহিয়া সে বলিল,—আমার গাড়ীটা ভেতরে এসেছে কি না, একবার দেখতে বলুন না কাকেও...

কাছেই প্রম্পটার দাঁড়াইয়া ছিল—ম্যানেজার তাহাকে আদেশ করিতেই সে ছুটিল গাড়ীর খোঁজে। ম্যানেজার তখন সবিনয়ে চপলার পানে চাহিয়া কহিল,—তাহলে আসচে শনিবারেও একবার দয়া করতে হবে, চপল। আজ যে কত লোক জায়গা না পেয়ে ফিরে গেছে! তাদের নিশ্বেস কুড়িয়ো না, বুঝলে!

চপলা হাসিয়া কহিল,—দেখ্ তো ভাই পাপিয়া, ওঁদের মজা! ওঁরা বললেন, এক রাত্তির শুধু নাবে,··· তারপর আবার এখন আব্দার তুলছেন...

পাপিয়া কোন কথা কহিল না।

ম্যানেজার বলিল—ভৃঙ্গরাজকে ধরতে হবে ফের...? বল...

চপলা বলিল,—সে এখানে নেই, চুণার গেছে।

ম্যানেজার বলিল,—তা হলে...কি হবে? নামতেই

হবে যে! নাহ'লে থিয়েটার চালাবো কি করে? ও পার্ট আর কাকে দিতে পারি এখন, বল? লক্ষ্মীটি, আমাদের একেবারে ভুলো না।...

চপলা বলিল,—আচ্ছা, আসচে শনিবারে নামবো—কিন্তু সে রাত্রে আর দেড়শো টাকা নিচ্ছি না। পূরোপুরি দুশো চাই!···

ম্যানেজার বলিল,—ঐ তো···আমরা ছাপোষা মানুষ—তোমার ভাবনা কি, চপল?

—না, না, ওর কমে পারবো না।

ম্যানেজার কহিল,—আচ্ছা, ঐ দুশোই হবে···পঞ্চাশ টাকা নয় আমাকে দান করে যেয়ো, বাড়ী ফেরবার সময়।···কিছু কি দাবী নেই···?

ম্যানেজার হাসিল। চপলাও চোখের দৃষ্টিতে হাসির ফিনিক ফুটাইয়া কহিল,—বটেই ত!···

প্রম্পটার আসিয়া সংবাদ দিল,—গাড়ী তোয়ের।

—তাহলে আসি। বলিয়া চপলা ম্যানেজারকে নমস্কার করিয়া পাপিয়ার হাত ধরিয়া আসিয়া মোটরে উঠিল। মোটর ফটকের মুখে ভিড় পাইয়া থামিল।

পথে তখন কি ভিড়! কালো মাথার ঢেউ ছুটিয়াছে যেন! তা ছাড়া গাড়ী, মোটর;···ফটকের ধারে পথের উপর দাঁড়াইয়া...অমল! পাপিয়া তাহাকে দেখিল। হর্ণ বাজাইয়া তাদের মোটর অমলের পাশে আসিয়া পড়িল। অমল তন্ময়-দৃষ্টিতে গাড়ীর মধ্যে চাহিল, পাপিয়া মুখ বাড়াইয়া হাসিল—চপলাও ফিরিয়া দেখিল। পাপিয়াকে কহিল,—কে রে? তোর জানা···?

মৃদু স্বরে পাপিয়া কহিল,—আমার দেবতা···

কথাটা চপলার কাণে গেল। বটে! বলিয়া সে মুখ বাড়াইল...অমলের সঙ্গে অমনি তার চোখোচোখি হইল। তার নিরীহ বেকুবের মত ভঙ্গী দেখিয়া, চপলা একেবারে দম্‌কা হাসিতে ফাটিয়া পড়িল। মোটরও তীব্র বেগে আগাইয়া গেল—সঙ্গে-সঙ্গে পিছনে একটা ভয়ঙ্কর রোল উঠিল—গেল, গেল—ধর, ধর—এমনি রব! পাপিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল—কে একজন গাড়া চাপা পড়িয়াছে, আর ভিড় একেবারে হৈ-হৈ করিয়া সেখানটায় গিয়া জড় হইতেছে!

পাপিয়ার বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল।···যদি তাই হয়? যে রকম তন্ময় হইয়া এদিকে চাহিয়া ছিল···আর কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া·· তার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। কি করিয়া জানা যাইবে···?

সোফারের পাশে বিট্টু ভৃত্য বসিয়াছিল। পাপিয়া গাড়ী থামাইয়া তাকে বলিল,—তুই যা তো রে, কি হয়েছে, দেখে আয়।

চপলা বলিল,—কি আবার হবে...?

পাপিয়া কহিল,—কেউ চাপা পড়লো না কি···

চপলা কহিল,—দেখে কি হবে?

পাপিয়া কহিল,—তবু জানবো না? আহা!

চপলা কহিল,—তুই যেন কি! এখন বাড়ী গিয়ে শুতে পারলে বাঁচি—

পাপিয়া কহিল,—না ভাই, না। তুই যা রে বিট্টু—

বিট্টু ছুটিয়া গেল। আর গাড়ীর মধ্যে বসিয়া পাপিয়া কম্পিত-বক্ষে ভগবানকে ডাকিতে লাগিল—তা যেন না হয়, ঠাকুর....

একটু পরেই বিট্টু আসিয়া খপর দিল, একটি ছোকরাবাবু মোটর চাপা পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে।

পাপিয়ার বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। সে কহিল—কি রকম দেখতে? গায়ে একটা হলদে রঙের রেশমী চাদর...? সেই বাবু···?

বিট্টু কহিল,—হাঁ মা, ঐ যে বাবু হামাদের বাড়ী গেছলো···ও-রোজ সবেরে···

—এ্যাঁ—! পাপিয়ার সাম্‌নে সমস্ত আকাশখানা যেন সশব্দে ফাটিয়া গেল! সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।...

জ্ঞান হইলে পাপিয়া চাহিয়া দেখে, মোটর তার বাড়ীর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, আর বিট্টু ডাকিতেছে,—মা, মা-জী—

পাপিয়া ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল। চপলা...? বিট্টু কহিল, তিনি তাঁর বাড়ীতে নামিয়া গিয়াছেন। পাপিয়ার চোখের সামনে সেই চীৎকার ভাসিয়া উঠিল—গেল গেল, ধর ধর...পাপিয়া কাঁপিয়া উঠিল, ডাকিল—বিট্টু—

—মা-জী—

পাপিয়া কহিল,—এই পাঁচ টাকা বখশিস্ নে! নিয়ে শীগ্‌গির যা! সেইছোকরাবাবু যে মোটর চাপা পড়লো,

তার কি হলো, খপর নিয়ে আয়। শীগ্‌গির...যাবি আর আসবি—একটা ট্যাক্সি নিয়েই যা...

বিট্টু চলিয়া গেল। পাপিয়া মোটর হইতে নামিয়া উপরে উঠিল। ঘরে আসিয়া দেখে, মানগোবিন্দ বিছানায় শুইয়া ঘুমাইতেছে! সে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল, তারপরে বারান্দায় আসিয়া বসিল। নির্জ্জন পথ...মাঝে-মাঝে গ্যাস জ্বলিতেছে। পাপিয়ার মনে হইল, ও-গুলা যেন রাত্রির চোখ! অসংখ্য করুণ নেত্র মেলিয়া নিশীথিনী তার দুঃখ দেখিতেছে! সে বারান্দায় বসিয়া পথের পানে চাহিয়া রহিল...আর কায়-মনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিল,—বিট্টু যেন ভালো খপর আনে, ঠাকুর!...

বিট্টু যখন খপর লইয়া ফিরিল, রাত্রি তখন তিনটা বাজিয়াছে। পাপিয়া ধড়মড়িয়া উঠিয়া নীচে আসিল, কহিল,—কি খপর রে?

বিট্টু বলিল, সে মারা যায় নাই—পুলিশ তাকে একটা মোটরে চাপাইয়া বেলগেছিয়ার হাসপাতালে লইয়া গিয়াছে।...

পাপিয়া কহিল,—ঠিক খপর দিচ্ছিস? দেখিস্, মিথ্যে বলিস্ নে। যদি ঠিক হয় তোর খপর, তাহলে আরো বখশিস্ পাবি।

বিট্টু বলিল, সে একটা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া প্রথমেই থিয়েটারে যায়; সেখানে বীটের পাহারাওয়ালার কাছে খপর লইয়াছে—তার পর সেখান হইতে থানায় গিয়া খপর লয়, থানা হইতে খপর লইয়া সে হাসপাতালে যায়—এবং বাবুর ঘরের লোক বলিয়া সেখানে পরিচয় দিয়া দেখিয়া আসিয়াছে, বাবু বাঁচিয়া আছেন, নিঃশ্বাস পড়িতেছে, তবে নাক হইতে মাথাটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। চোট লাগিয়াছে চোখে আর মাথায়। আপাততঃ ভয়ের কিছু না থাকিলেও পরে কি হইবে, ডাক্তার বাবুরা সে সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে এখন কোন কথা বলিতে পারেন না।

পাপিয়া কহিল,—কাল একবার আমায় নিয়ে যেতে পারবি হাসপাতালে?

বিট্টু বলিল,—কেন পারবো না!

পাপিয়া কহিল,—তাহলে তোর সঙ্গে যাবো। আমি গাড়ীতে থাকবো, আর তুই ভেতরে যাবি।...বাবু যেন জানতে না পারে...বুঝলি?

বিট্টু হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, আচ্ছা! অর্থাৎ সে খুব বুঝিয়াছে। এ পাড়ায় বিট্টু আজ প্রায় সাত বৎসর কাজ করিতেছে—কাজেই এ-সব কথা বুঝিবার মত বুদ্ধিও যে তার বিলক্ষণ জন্মিয়াছে, এইটুকুই সে ঘাড় নাড়িয়া জানাইয়া দিল।

পাপিয়া কহিল,—আচ্ছা, যা, এখন শুগে যা। গাড়ী-ভাড়া ওর মধ্যে হয়ে গেছে তো! কাল সকালে বখশিস্ নিস্ পাঁচ টাকা।

বিট্টু চলিয়া গেল। পাপিয়া সেই বারান্দাতেই বিমূঢ়ের মত বসিয়া রহিল। ঘুমাইতে হইবে, ঘুম পাইয়াছে, এখন এ কথাও সে ভুলিয়া গিয়াছিল।

১২

হাসপাতালে প্রায় একমাস থাকিবার পর অমল সারিয়া উঠিল, কিন্তু চোখের দৃষ্টি হারাইল। সে অন্ধ হইল। ডাক্তাররা বলিলেন, চোখের চোট খুব গুরুতর—যদি ভবিষ্যতে এমনি কখনো সারে, তবেই ভালো! নচেৎ ভিতরে প্রচুর রক্তস্রাব হইয়াছে। আজীবন তাকে অন্ধ হইয়াই কাটাইতে হইবে।

সারিয়া উঠিয়া অমল শুনিল, এবার তাকে হাসপাতাল ছাড়িয়া যাইতে হইবে! অমল ভাবিল, এর চেয়ে তার মৃত্যু হইল না কেন? একা অসহায় সে—অন্ধ হইয়া বাঁচিবে কি করিয়া? ডাক্তারদের বলিল—অন্ধ আমি, কোথায় যাবো?

ডাক্তার বলিল,—কেন, আপনার তো সে ভাবনার কোন কারণ দেখচি না।...আপনার লোক অত টাকা খরচ করে আপনার নার্শদের ভোজ দেওয়ালেন, আমাদের পার্টি দেওয়ালেন...

অমল অবাক্ হইয়া বলিল,—আমি...আমার লোক...!

ডাক্তার বলিলেন—কেন, রোজ আপনার কে আত্মীয়া দেখতে আসেন...আপনার দিদি বোধ হয়! বিধবা মানুষ—থান-পরা, মোটা চাদর গায়ে...গাড়ীর মধ্যে বসে থাকেন, চাকর এসে দেখে যায়...

অমল আরো বিস্মিত হইয়া কহিল—সে কি, ডাক্তারবাবু! আমার যে কেউ নেই এ পৃথিবীতে...

ডাক্তার ভাবিলেন, লোকটার মাথা আজো ঠিক হয় নাই! ঠিক না হওয়া বিচিত্রই বা কি! যে আঘাত লাগিয়াছিল, এ তো এক-রকম পুনর্জন্ম হইয়াছে! তিনি বলিলেন,—তিনিই তো আসবেন, বলে গেছেন; বেলা তিনটে নাগাদ্ এসে আপনাকে আপনার বাড়ীতে নিয়ে যাবেন। নাহ'লে আজ সকালেই আপনার ডিস্‌চার্জ্জ হয়ে যাবার কথা...!

অমল অবাক্ হইয়া গেল। তার দিদি...? নিত্য খপর লইতে আসেন! ডাক্তারবাবুদের ও নার্শদের ভোজ দিয়াছেন!...এ কি সে স্বপ্ন দেখিতেছে,—না, দয়াময় ভগবান আজ অন্ধ করিয়া কোন্ আপনার জনকে সহায় করিয়া পাঠাইয়াছেন, এ অন্ধকে হাত ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য...!

আহারাদির পর অমল শয্যায় পড়িয়াছিল। তার চোখ হইতে সব আলো কাড়িয়া এ কি করিলে, ভগবান...! সে যে-ধ্যানটুকু সম্বল করিয়া পড়িয়া ছিল...সে ধ্যানের দেবী যে-মুহূর্ত্তে তার পানে হাসিয়া চাহিল—যে-মুহূর্ত্তে পরম তৃপ্তি-ভরে তার চোখের সহিত দৃষ্টি বিনিময় করিয়া সে ধন্য হইয়াছে, কৃতার্থ হইয়াছে, এ চোখের সে-দৃষ্টি ঠিক তার পরক্ষণেই এমন অকরুণ নির্দ্দয় হাতে কাড়িয়া লইলে!...এ জীবনের মত তাকে দেখার আশাও বিলুপ্ত করিয়া দিলে...!

হাসপাতালের বেয়ারা আসিয়া খপর দিল, আপনার গাড়ী আসিয়াছে—আসুন...

অমল অবাক্! তার গাড়ী আসিয়াছে! সে কোন প্রশ্ন তুলিল না। ভৃত্য হাত ধরিয়া অমলকে একখানা ঘোড়ার গাড়ীতে তুলিয়া দিল। গাড়ীর দ্বার বন্ধ হইল, গাড়ী চলিল। অমল হাত বাড়াইয়া দেখিল, গাড়ীতে কেহ আছে কি না!...কেহ নাই! কথা কহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—গাড়ীতে কে? কোন জবাব নাই। গাড়ীর মধ্যে সত্যই কেহ ছিল না—শুধু একটা ভৃত্য কোচবক্সে বসিয়া গাড়োয়ানকে পথ নির্দ্দেশ করিতেছিল।

চলিয়া চলিয়া গাড়ী আসিয়া এক জায়গায় থামিল।...কে একজন গাড়ীর দ্বার খুলিয়া তার হাত ধরিল, কহিল,—নামুন, বাড়ী এসেছি।

অমল কহিল,—কোথায়? কার বাড়ী?

যে হাত ধরিয়াছিল, সে বলিল,—কাশীপুরে আপনার বাড়ী।

অমল কহিল,—তুমি কে?

লোকটা বলিল,—আপনার চাকর।

অমল কহিল,—আমার চাকর! আমার তো চাকর নেই...তোমার নাম?

লোকটা বলিল—শিবকিঙ্কর। আমায় শিবু বলে ডাকবেন।

অমল তার হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে নামিল। গাড়ী চলিয়া গেল।

অমল কহিল—আচ্ছা শিবু, বলতে পারো, তোমায় কে পাঠালে?...

শিবু কহিল,—আজ্ঞে, মা-জী...

—মা-জী! কোথাকার মা-জী?...কে তোমার মা-জী...?

—আজ্ঞে, বাড়ী গেলেই দেখতে পাবেন।

—আমার তো চোখ আর নেই, শিবু...দেখার ভাগ্য চিরদিনের জন্যে খুইয়েছি...অমল দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। শিবু তার হাত ধরিয়া তাকে ঘরে লইয়া গেল।

ঘরের মধ্যে শয্যায় বসিয়া অমল হাত বুলাইয়া শয্যা অনুভব করিল। ডাকিল,—শিবু...

—বাবু...

—এ কার বিছানায় আমায় নিয়ে এলে?

—আজ্ঞে, আপনারি।

—আমার বিছানা!...না। সে তো এত নরম নয়। এ যে নরম, ফুলের মত!...তারপর একটু থামিয়া আবার সে ডাকিল—শিবু...

শিবু কাছে আসিল। অমল কহিল—তোমার হাত...

শিবু অমলের হাতে হাত রাখিল। অমল তার হাত দুটো চাপিয়া ধরিয়া কহিল—তোমার এই হাত ধরে মিনতি করচি, আমায় আজ অন্ধ বলে তামাসা করো না। বল ভাই, এ কোথায় আমায় নিয়ে এলে! কেন নিয়ে এলে...?

শিবু মিনতির স্বরে কহিল—কি সব বলচেন বাবু! আমি চাকর, আপনি মনিব। আমি আপনাকে ছুঁয়ে বলচি, আপনার সঙ্গে তামাসা করছি না, কোনো ছলনাও করছি না। এ যথার্থই আপনার সেই চিরকালের পুরোনো ঘর...

অমল তার হাত ছাড়িয়া দিয়া চুপ করিয়া রহিল। গাছের ডালে একটা পাখী ডাকিতেছিল—ও-পাশের ঘাটে মাঝিরা নৌকায় পেরেক মারিয়া কাঠ জুড়িতেছিল। উৎকর্ণ হইয়া অমল সে শব্দ শুনিল, তারপর কহিল,—সেই চেনা শব্দ··· পাখীর সেই চেনা ডাক...এখন বোধ হয় বিকেল?

শিবু কহিল—আজ্ঞে, হ্যাঁ,—

অমল কহিল,—সব মিলছে···বিকেলের সেই হাওয়া, পাখীর সেই ডাক, ..সব ঠিক! শুধু বিছানাটা তফাৎ হয়ে গেছে!...তা, শিবু...

শিবু বলিল—বলুন···

অমল কহিল,—তুমি যে বললে, তোমার মা-জীই সব করেছেন...তা কোথায় তিনি? তাঁকে ডাকো একবার··· দয়াময়ী দেবী, তাঁর এত দয়া অন্ধ আতুরের ওপর! তাঁকে ডাকো, তাঁকে আমি প্রণাম করি একবার।

শিবু কহিল,—তিনি আপনার জন্যে খাবার নিয়ে এখনি আসবেন—খাবার তৈরী করচেন!

অমল সস্নেহে কহিল,—না, না, খাবারের কোনো দরকার নেই। তাঁকে ডাকো, তাঁর পায়ের ধুলো পেলেই আমার সব ক্লান্তি ঘুচে যাবে···

শিবু কোন কথা বলিল না। অমল উৎকর্ণ হইয়া আকুল চিত্তে বসিয়া রহিল---করুণাময়ী, এত করুণা...কে তুমি!···আজ চোখের দৃষ্টি কাড়িয়া ভগবান, এ দগ্ধ দীন পৃথিবীকে কি এ শ্যামল স্নেহচ্ছায়ায় ভরাইয়া তুলিলে!...

শিবু কহিল,—মা-জী এসেছেন, বাবু...আমি বাইরে যাচ্ছি।

অমল কহিল,—একটু দাঁড়াও শিবু—তিনি কোথায়? তোমার মা-জী? আমায় তাঁর পায়ের কাছে বসিয়ে দাও—বলিয়া অন্ধ অমল আশ্রয় মাগিয়া দুই হাত বিস্তার করিয়া দিল! অমনি হাতে কার কোমল স্পর্শ অনুভব করিল! সেই কোমল হাতখানি দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া সেই হাতখানি অমল বুকে তুলিয়া তার উপর প্রাণের কৃতজ্ঞতা উজাড় করিয়া দিল। তারপর বাষ্প-গাঢ় কণ্ঠে কহিল—অন্ধ আমি, চক্ষু হারিয়েছি...করুণাময়ীকে দেখতে পেলুম না...কিন্তু এ স্পর্শ—এ যেন অমৃত, স্বর্গ আমার···বলিয়া সেই কোমল হাতখানি নিজের অন্ধ নয়নের উপর চাপিয়া ধরিল। অন্ধের নয়নের কোণে দুই বিন্দু জল মুক্তার মত ফুটিয়া উঠিল।

করুণাময়ী গাঢ় কণ্ঠে কহিল,—একটু কিছু খান...

এ কার স্বর ..! এ স্বর···! না, এ স্বর তো আগে আর সে কখনো শোনে নাই!

অমল একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—খাবো না।

করুণাময়ীর বুক ভাঙ্গিয়া দুই চোখ ঠেলিয়া অশ্রুর সাগর ছুটিয়া আসিতেছিল। অতি-কষ্টে সে অশ্রু-বেগ চাপিয়া সে কহিল,—কেন···?

অমল কহিল,—কে আপনি না জানলে আমি খাবো না···এত দয়ার পর এ নির্দ্দয়তা···এ যে আমার প্রাণে বড় বাজচে!

করুণাময়ী কাতর-কণ্ঠে কহিল—দয়া! তার কি পরিচয় পেয়েছেন আপনি?

অমল হাসিয়া কহিল—পাই নি...! হাসপাতালে নিত্য গিয়ে খোঁজ নেওয়া, ডাক্তারবাবুদের নার্শদের ভোজ দেওয়া—অন্ধ আমি, আমার জন্য লোক পাঠিয়ে এমন সমাদরে এখানে আনা...তারপর এই ফুলের মত নরম বিছানা, তৈরী খাবার—এ যে কল্পনার অতীত,···এততেও কি পরিচয় যথেষ্ট পাই নি!...

করুণাময়ীর দুই চোখ ছাপাইয়া জল ঝরিতেছিল। আঁচলে চোখের জল মুছিয়া সে কহিল—পরিচয় যদি না দি...? পরিচয় না নিয়ে যদি শুধু স্নেহ আর সেবাই নেন, তাতে ক্ষতি আছে...!

—আছে,···আমার দিক থেকে শুধু নেওয়াই চলবে, বুঝচি। তবু কার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো, মনকেও তা জানাবো না?

—আমি কে, বুঝতে পারচেন না···?

—ঠিক পারচি না। তবে—

—তবে কে, বলুন দিকি—

—কিন্তু না—কে আপনি? কিসের আকর্ষণেই বা এই গরিব অন্ধ আতুরের জন্যে এতখানি করছেন—এ যে পাগলেও করে না···

—যদি বলি, আমারি জন্যে আপনার এ দুর্দ্দশা! সে-রাত্রের সেই বিপদ, এই অন্ধতা—এ-সব আমারি জন্যে··· আর এত যত্ন পাওয়া, সে অত-বড় অপরাধের কিছু প্রায়-

শ্চিত্তও যদি হয়, এই ভেবে শুধু এ সেবার ভার আমি নিতে এসেছি···

অমল অবাক্ হইয়া গেল। এর অপরাধে তার এই দুর্দ্দশা! কে...এ? তবে কি ইহারই মোটরে সে-রাত্রে সে চাপা পড়িয়াছিল! তাই অনুতাপে গলিয়া...কিন্তু না—এ তো একজন নারী ..একজন নারী অসাবধানে মোটর চালাইয়া তাহাকে আহত করে নাই, নিশ্চয়ই!··· তবে···কার অপরাধের জন্য কে এ কঠিন দণ্ড মাথায় তুলিয়া লইতেছে! একজন নারী কার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে আসিয়াছে—তার নিজের ঘর-বাড়ী, আত্মীয়-স্বজন, সব ছাড়িয়া...এ যে অসম্ভব ব্যাপার! কে এ...?

অমল কহিল,—এ হতেই পারে না। আমি অন্যমনস্ক ছিলুম. বলেই চাপা পড়েছিলুম—সে দোষ আমারই। আর কারো দোষ তাতে হতেই পারে না!

—কিন্তু আপনার তো সেখানে যাবার দরকারই ছিল না, যদি না—

—যদি না থিয়েটার দেখতে যেতুম—এই কথা বলচেন তো?

—থিয়েটারে তো আপনি যান না—শুধু সেই দিনই গেছলেন! আর কেন গেছলেন—

অমল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। কিন্তু পরক্ষণেই কিসের আনন্দে তার মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। উচ্ছ্বসিত স্বরে সে কহিল,—চপলা যদি সীতা না সাজতো, তাহলে যেতুম না—এই কথা বলচেন? সে কথা ঠিক...তাহলে... তাহলে আপনি—কিন্তু না, না– আমি পাগলের মত এ কি বক্‌চি···

উদ্‌গ্র আগ্রহে করুণাময়ী কহিল,—বলুন, বলুন, আমি কে?...উত্তরের প্রতীক্ষায় সে নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া যেন ফুঁসিতে লাগিল।

অমল কহিল,—আপনি চপলাসুন্দরী···আপনারই ধ্যানে···?

সহসা পাশে একটা আর্ত্ত স্বর ফুটিল; সে আর্ত্ত স্বরে শিহরিয়া অমল থামিয়া পড়িল. এবং পরক্ষণেই কহিল,— ও কি! আপনার লেগেচে কোথাও···?

গাঢ় স্বরে উত্তর হইল—না।

—তবে···তেমনি একটা চীৎকার যেন শুনলুম···!

—ও আপনার মনের ভুল! উত্তেজনার ঘোরে কি শুনেচেন!

অমল কহিল—কৈ, দেখি আপনার হাত!—আঃ!··· তাহলে আপনিই চপলাসুন্দরী...?

গাঢ় স্বরে উত্তর হইল,—যদি সে হলে আপনি অসুখী না হন, তাহলে আমি সে-ই! নারীর দুই চোখে অশ্রুর ঝর্ণা বহিল।

অমল কহিল,—কিন্তু এত দয়া—! বুঝেচি, আপনি ভেবেচেন, আপনাকে দেখতে গিয়েই অসাবধানে গাড়ী চাপা পড়েছি—ঠিক তা নয়!—তবে আপনার চোখের দৃষ্টির সঙ্গে যে-দণ্ডে আমার দৃষ্টি মিশলো, আমার দেহে-মনে যেন কিসের বাণ ডেকে গেল—দুনিয়ার যত আলো চোখের সামনে কি প্রখর দীপ্তিতে যে জেগে উঠলো— তারপর সব অন্ধকার!...অন্ধকার, কেবলি অন্ধকার— আজীবন দুই চোখে এই অন্ধকার বয়েই আমায় বেড়াতে হবে এখন!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অমল চুপ করিল—আর করুণাময়ী···! তার চোখের জল কিছুতে আর থামিতে চায় না! এত জলও ছিল তার দুই চোখে!

বহুক্ষণ পরে অমল কথা কহিল। সে বলিল,—আপনিই আমার জন্যে এত করেছেন, করচেনও! এ যে অন্ধ হয়েও আনন্দ আমার ধরচে না আজ...

করুণাময়ী কহিল,—কি আর করেছি!...আমি পোড়ারমুখী আপনার পানে যদি চেয়ে না দেখতুম— তাহলে তো আর এ বিপদ হতো না!···সে যে কি অপরাধ করেচি—তার জ্বালায় পলে-পলে পুড়ে মরচি... উঃ—

অমল কহিল—আপনি মাঝে মাঝে আসবেন তো আমাকে দেখতে···! আর ঐ চাকরটিকে আপনিই বুঝি আমাকে আগ্‌লাবার জন্যে রেখেচেন···

করুণাময়ী আর্ত্ত স্বরে কহিল—না, না, কারো কাছে বিশ্বাস করে তোমায় আমি ছেড়ে দিতে পারি না যে··· আমি যাবো না, তোমার এ ঘর ছেড়ে কোথাও যেতে পারবো না আমি!...এখানেই আমি থাকবো গো!··· ওগো অন্ধ, ওগো বেচারা,—তোমার সেবাই আমার জীবনের ব্রত হোক্। অনেক পাপ করেচি, তোমার

সেবায় কি তার কিছুও কমবে না? আমার হারানো হাসি কি এ জীবনে কোন দিন ফিরিয়ে পাবো না...?

অমল কহিল—তুমি কাঁদচো...?

—না। করুণাময়ী দুই হাতে জোর করিয়া মনের যা-কিছু বেদনা ঠেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—এবার তুমি খাও—

অমল রেকাবি লইয়া খাবার খাইতে লাগিল—আর করুণাময়ী তার পানে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতেছিল, আর-একদিনের কথা...সেদিনও অমল জলখাবার খাইতেছিল, কিন্তু মুখে সেদিন কি অপ্রসন্ন ভাব! আর আজ...!

হারে হতভাগিনী...সেদিন সে যা, তাই ছিল—পাপিয়া! অমলের একটু হাসি, এতটুকু প্রসন্ন দৃষ্টির ভিখারিণী পাপিয়া! আজ আর সে পাপিয়া নয়—সে চপলা! সেই নির্ম্মম নিষ্ঠুর পিশাচী চপলা! যেদিন সে পাপিয়া ছিল, অন্ধ অমল সেদিন সে পাপিয়াকে চেনেও নাই—আর আজ দুই চোখ হারাইয়া—সে-পাপিয়াকে চেনা তার পক্ষে আরও অসম্ভব! (ক্রমশঃ)

মাতৃমূর্ত্তি

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সুধীররঞ্জন খাস্তগির]

ভারতীয় দর্শনে দুঃখবাদ

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন এম্-এ

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, ভারতের দর্শনসমূহ আগাগোড়া দুঃখবাদে (Pessimism) পরিপূর্ণ,—উহাতে সুখবাদের (Optimism) স্থান আদৌ নাই। আমরা দেখাইব, তাঁহাদের এই মত সম্পূর্ণরূপে সত্য নহে—দুঃখবাদে ভারতীয় দর্শনের আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু উহার চরম পরিণতি দুঃখবাদে নহে—ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি লাভেই উহার পরিসমাপ্তি।

অন্যান্য দেশের দর্শনের সহিত ভারতীয় দর্শনের একটু পার্থক্য আছে। অন্যান্য দেশে দর্শনশাস্ত্র কেবল তর্কশাস্ত্র মাত্র ;—বাদ, জল্প, বিতণ্ডায় উহা পরিপূর্ণ। বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশজনিত আনন্দই উহার মুখ্য ফল। বুদ্ধিশক্তির প্রভাবে একজন দার্শনিক কি ভাবে অপরের মত খণ্ডন ও স্বীয় মত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন,—পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসের ছত্রে-ছত্রে তাহার প্রমাণ বিদ্যমান। কিন্তু ভারতবর্ষে দর্শন-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য অন্যরূপ। আমাদের দেশে প্রত্যেক শাস্ত্রেরই প্রারম্ভে অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন—এই চারিটী বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। যে বিষয়ের প্রয়োজন নাই, সে বিষয় শাস্ত্রে স্থান পায় নাই। এ দেশে দর্শনশাস্ত্রসমূহের মুখ্য প্রয়োজন—পরস্পরের সহিত বিবাদ নহে, খণ্ডন ও প্রতিষ্ঠা নহে। উহাদের প্রয়োজন—দুঃখ-নিবৃত্তি। শুধু নিবৃত্তি নহে, দুঃখের ক্ষণিক অভাব নহে,—আহারে যেরূপ ক্ষুন্নিবৃত্তি, ঔষধে যেরূপ ব্যাধির উপশম, তাদৃশ নিবৃত্তি বা উপশম নহে—সমূলে দুঃখের উচ্ছেদ-সাধন। যাহা দর্শনের প্রয়োজন, তাহাই মানবের পরম পুরুষার্থ।

তবেই দেখা গেল, দুঃখবাদে যে ভারতীয় দর্শনের আরম্ভ, তাহা কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। বৌদ্ধ দর্শনে দুঃখবাদ বিশেষরূপে পরিস্ফুট। ভগবান্ বুদ্ধদেব জগতের দুঃখে ব্যথিত হইয়াই সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ; এবং ত্রিতাপগ্রস্ত জীবকে নির্ব্বাণের সন্ধান দিয়াছিলেন। সাঙ্খ্য দর্শনের গোড়ায়ও ত্রিবিধ দুঃখের অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। (১) ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনও দুঃখের অস্তিত্ব

(১) "ত্রিবিধদুঃখস্যাত্যন্তনিবৃত্তিঃ পরমপুরুষার্থঃ।"

স্বীকার করিয়া ইহা নাশ করিবার উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পূর্ব্বমীমাংসাও যখন কর্ম্মকাণ্ডকেই দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় বলিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই দুঃখকে অস্বীকার করেন নাই। স্বর্গপ্রাপ্তি প্রভৃতিই কর্ম্মের চরম লক্ষ্য। তবে এই সুখ চিরস্থায়ী নহে। কেন না, স্বর্গ হইতে আবার পতন হয়—"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।" বেদান্ত-দর্শনেও ব্যবহারিক জগতে দুঃখের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয় নাই। শুধু দর্শনশাস্ত্রে কেন, ধর্ম্মশাস্ত্রেও দুঃখের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও কোন কোন শ্লোকে বলা হইয়াছে—জগৎ দুঃখময়। বাস্তবিক, আর্য্য ঋষিগণ দুঃখকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিবার কোন কারণ দেখেন নাই। কেন না, যাহা অনুভবসিদ্ধ, তাহা মিথ্যা হইবে কিরূপে? অতএব, তাঁহারা হেগেল (Hegel) (২) বা লাইব্‌নিজের (Leibnitz) ন্যায় (৩) কোন অদ্ভুত সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই। এই সকল কারণেই পাশ্চাত্য মনীষিগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, হিন্দুদর্শনের একটি প্রধান দোষ—ইহার দুঃখবাদ। কিন্তু পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের দুঃখবাদের (Pessimism) সহিত ভারতের এই দুঃখবাদের পার্থক্য কোথায়, তাহা তাঁহারা প্রণিধান করিয়া দেখেন নাই।

স্বর্গ বা অপবর্গ, দুঃখনিবৃত্তি, নির্ব্বাণ, মোক্ষ প্রভৃতি যে দেশে দর্শনের চরম লক্ষ্য, সে দেশে দুঃখ যে কিছুতেই নিত্য বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই, তাহা বেশ বুঝা যায়। তত্ত্বজ্ঞান, প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক প্রভৃতি যাহাই দুঃখনিবৃত্তির উপায় হউক না কেন, এ কথা বলা যাইতে পারে যে, যাহা অনিত্য, তাহারই নিবৃত্তি সম্ভব, নিত্য বস্তুর নিবৃত্তি সম্ভব নহে।

দুঃখ আমাদের স্বরূপ নয়, আনন্দই আমাদের স্বরূপ। শ্রুতিতে আমাদিগকে অমৃতের পুত্র বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ বলিতেছেন, "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং খলু প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।" অর্থাৎ—"আনন্দ হইতেই এই জীবসমূহ উৎপন্ন হইতেছে, আনন্দেই জীবসমূহ জীবিত রহিয়াছে, আনন্দেই জীবসমূহ লীন হইতেছে।" সাঙ্খ্য-দর্শন বলিতেছেন, জীব যখন বুঝিতে পারে যে, প্রকৃতিই যাবতীয় সুখ-দুঃখের ভোক্তা, পুরুষ কেবল দ্রষ্টা-মাত্র, সাক্ষীস্বরূপ,—তখনই সে সকল সুখ-দুঃখের অতীত হইয়া যায়। সেশ্বর সাঙ্খ্য বা যোগদর্শনও এই মতাবলম্বী। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনেও উক্ত আছে, তত্ত্বজ্ঞান হইলেই আমাদের অপবর্গ লাভ হয়। (৪) বেদান্ত দর্শন বলিতেছেন, জীব যখন স্বরূপতঃ ব্রহ্ম, তখন আনন্দই তাহার স্বরূপ। জীবমাত্রেই আনন্দলাভের আশায় ছুটিতেছে,—ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিতে যে আনন্দ হয়, তাহাও সেই ব্রহ্মানন্দের অংশ-মাত্র,—তবে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির আনন্দ অখণ্ড নয় বলিয়া উহা অবিমিশ্র হইতে পারে না,—উহা দুঃখ-মিশ্রিত। একমাত্র আত্মোপলব্ধি দ্বারাই অখণ্ড অবিমিশ্র আনন্দ লাভ হইয়া থাকে। জীব তখন বলিয়া থাকে "ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং স্বাত্মানমঞ্জসা বধি। ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং ব্রহ্মানন্দো বিভাতি মে স্পষ্টম্।" ইত্যাদি (পঞ্চদশী)

উপনিষদে ভগবান্‌কে রসস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে। "রসো বৈ সঃ, রসো হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।" বৈষ্ণবশাস্ত্রেও ভগবানের বিগ্রহকে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বলা হইয়াছে। বৈষ্ণব দার্শনিকের মতে সেই বিগ্রহের সেবায়ই জীবের দুঃখনিবৃত্তি, আনন্দলাভ। দেহাত্মাভিমানী জীবই দুঃখের অধীন। যিনি ভগবানের দাস, তিনি দুঃখের অতীত। ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ,—এই সম্বন্ধের নাম ভেদাভেদ সম্বন্ধ। অথচ উহা অচিন্ত্য অর্থাৎ বুদ্ধির অগম্য। সেই প্রিয়তমের সহিত মিলনে অপূর্ব্ব আনন্দ, তাঁহার সহিত বিরহও মধুর। যিনি এই রসাস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহার আর দুঃখ কোথায়?

অতএব, আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, পাশ্চাত্য মনীষিগণ ভারতীয় দর্শনের উপর যে দোষারোপ করিয়া-ছেন, তাহা অসঙ্গত। ভারতীয় দর্শন কেবল তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দ্বারা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা যায় না,—প্রত্যেক দর্শনশাস্ত্রে বিভিন্ন প্রকার সাধনের উল্লেখ আছে। এই জন্যই বিভিন্ন দর্শন বিভিন্ন অধিকারীর জন্য লিখিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই সকল অপূর্ব্ব তত্ত্ব বুঝিতে পারেন নাই।

---

(২) হেগেল বলেন :—Evil is a necessary phase in the self-evolution of the Absolute".

(৩) লাইব্‌নিজ বলেন :—"This world is the best of all possible worlds".

(৪) "তত্ত্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।"

ভারতীয় দর্শন আলোচনা করিবার সময় আমাদের অধিকার ও প্রয়োজনের কথা বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত। তাহা হইলে আমরা দর্শনের প্রকৃত রসাস্বাদন করিতে পারিব। এইখানেই ভারতীয় দর্শনের বিশেষত্ব। ভারতীয় দর্শন উপলব্ধির বস্তু। ঋষিগণ যাহা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাই লিখিয়াছেন। তাই, তাঁহারা তাঁহাদের মতসমূহ দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। তাই তাঁহাদের প্রতিপাদ্য বিষয় সর্ব্বদাই আলোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, এবং এইজন্যই অধ্যাপক মোক্ষমূলর ভারতীয় দর্শনের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। (৫)

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মধ্যে যাঁহারা দুঃখবাদী, তাঁহারা বলিয়াছেন, জগতে সুখ অভাবাত্মক, দুঃখই সত্য এবং এই দুঃখের মাত্রা ক্রমেই বাড়িতেছে। যাঁহারা সুখবাদী, তাঁহারা বলিতেছেন, দুঃখ অভাবাত্মক, সুখই সত্য, এবং এই সুখের মাত্রা ক্রমেই বাড়িতেছে। জার্ম্মাণ দার্শনিক লোট্জে (Lotze) সমস্ত মতের সমালোচনা করিয়াও কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন :—"Pessimism as a theory is equally tenable as optimism" অর্থাৎ "মত হিসাবে সুখবাদও যেমন সমর্থনযোগ্য, দুঃখবাদও তেমনি সমর্থনযোগ্য।" একমাত্র ভারতীয় দর্শনেই ইহার মীমাংসা রহিয়াছে। ভারতীয় দর্শন বলিতেছেন, দুঃখ অভাবাত্মক নহে, কিন্তু অনিত্য। সুখ ও দুঃখ পরস্পর সাপেক্ষ (Relative), কিন্তু আবার উভয়েই স্বতন্ত্র পদার্থ। অতএব, সুখও দুঃখের অভাব মাত্র নহে। তবে, জীব স্বরূপতঃ দুঃখাতীত, সে আনন্দস্বরূপ; আনন্দেই তাহার উৎপত্তি, আনন্দেই তাহার স্থিতি। সে অমৃতের শিশু, চরমেও অমৃতের অধিকারী। অমৃতত্বে তাহার জন্মগত অধিকার। আত্মার স্বাধীনতার উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত।

এই জন্মগত অধিকারের কথা ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়াই আমাদের যত দুঃখ, যত অপমান। জানি না, কবে আবার আমরা সেই অধিকার লাভ করিব?

(৫) Maxmuller এর Six Systems of Indian Philosophyর ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

চিত্রে বৈচিত্র্য

শ্রীহরিহর শেঠ

(১)

যাহা অসাধারণ তাহাই বিচিত্র। সে চিত্রে কিছু বৈচিত্র্য আছে বা যে চিত্রে সে সব বৈচিত্র্য হইতে পারে—বহু চিত্র সহযোগে তাহার সম্বন্ধে বলা এবং তাহা দেখান এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। চিত্রে বৈচিত্র্য এ প্রবন্ধের নাম দিলেও, বিচিত্র চিত্র এই নামটিও এখানে সমান প্রযোজ্য। খেয়াল হইতেই প্রায় এই বৈচিত্র্য উদ্ভূত হইয়া থাকে,—তা মানুষেরই হোক আর প্রকৃতির-ই হোক। একের খেয়ালে অপরের উপভোগের সুযোগ হইতে অনেক সময় দেখা গেলেও, কখন-কখন তাহা যে পরের পীড়ার কারণ হয় না, তাহা বলিতে পারি না। আজ যে একজনের খেয়ালে কতকগুলি বিচিত্র চিত্র সংগ্রহ ও অঙ্কিত হইয়া এই বিচিত্র প্রবন্ধের সৃষ্টি হইতেছে—জানি না, ইহা পাঠক-পাঠিকাদের কতদূর উপভোগের বা পীড়ার কারণ হইবে।

লেখনী বা তুলিকা দ্বারা বহু প্রকারের বহু রেখার সমন্বয়ে বা বিবিধ বর্ণ-সম্পাতে, অথবা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আলো ও ছায়ার সমন্বয়ে সাধারণতঃ ছবি প্রস্তুত হইয়া থাকে। কোন-কোন ক্ষেত্রে শিল্পীর খেয়ালে বা স্বাভাবিক ভাবে এই সব সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। একই ছবি বিভিন্ন ভাবে দেখিলে ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখায়। ছবির মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে অন্য ছবি ইচ্ছাক্রমে অঙ্কিত বা স্বাভাবিক ভাবে আপনা হইতেই সৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন-কোন চিত্রে দৃষ্টি-বিভ্রম আনয়ন করে; এক বিষয়ে

ছবি অন্যরূপ দেখায়, অর্থাৎ সমস্ত পূর্ণ ছবিখানি দুই তিনটি দৃশ্য-বোধক থাকে। এই সকল চিত্রকেই আমি বিচিত্র চিত্র বলিতেছি।

চিত্রই এ প্রবন্ধের প্রাণ। বিভিন্ন প্রকারের ছবি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বিষয় বুঝাইবার চেষ্টা করিব।
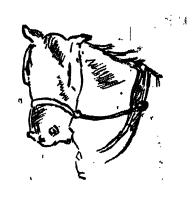
১ম ছবিখানি একটি ঘোড়ার মুখ এবং ২য় খানিতে দেখা যায়, একটা সাঁওতালকে এক সাহেব পিস্তল দ্বারা মারিতে উদ্যত হইয়াছে। এই উভয় ছবিই উল্টাইয়া দেখিলে দেখা যায়, প্রথম খানি চুরুট মুখে একটি কুকুরের

১ম চিত্র

২য় চিত্র

৩য় চিত্র

৪র্থ চিত্র

বাচ্ছা গাছে বাঁধা আছে এবং দ্বিতীয় খানিতে দেখা যায়, সাঁওতাল সাহেবের উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া মারিতে উদ্যত হইয়াছে। প্রথমখানি বহুদিন পূর্ব্বে "ষ্ট্রাণ্ড" নামক বিলাতি মাসিকে প্রকাশিত হইয়াছিল। উহা ইচ্ছাক্রমে

৫ম চিত্র

৬ষ্ঠ চিত্র
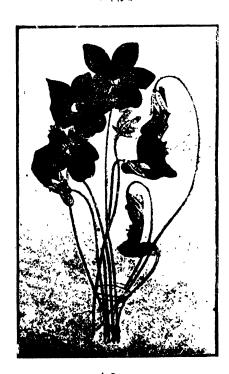
৭ম চিত্র

৮ম চিত্র

ঐ ভাবে অঙ্কিত নহে—আকস্মিক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয়খানি একটা গল্পের সাধারণ ছবি মাত্র, দৈবক্রমে ইহাতে এই বিচিত্রতা ঘটিয়াছে। ৩য় ও ৪র্থ ছবি দুইখানি সাধারণ বিজ্ঞাপনের ছবি মাত্র, কিন্তু উহাও বিপরীত দিক

হইতে দেখিলে ৩য় খানি ঠিক সোজামতই দেখায় ; ৪র্থ খানি খুব পরিষ্কার না হইলেও যেন মনে হয় একজন চুরুট টানিতেছে।

১ম চিত্র

১২শ চিত্র

১০ম চিত্র

১৩শ চিত্র

১১শ চিত্র

১৪শ চিত্র

১৩শ চিত্র
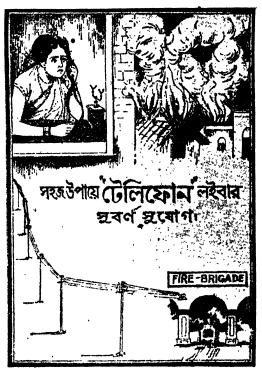
১২শ চিত্র

কোন ছবির মধ্যে প্রচ্ছন্ন বা গোপন ভাবে এমন নিপুণতা সহকারে অন্য ছবির সন্নিবেশ দেখা যায়, যাহা দেখিলে শিল্পীর ক্ষমতার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। ৫, ৬ ও ৭ সংখ্যক ছবি তিনখানি সাধারণ দৃষ্টিতে তিনটি

১৫শ চিত্র
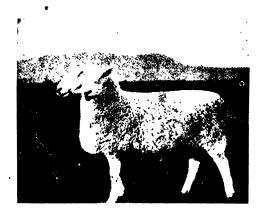
১৮শ চিত্র

২০শ চিত্র

২৮শ চিত্র

বিভিন্ন জাতীয় পুষ্পলতা-গুচ্ছ মাত্র। উহার মধ্যে ছয়টি নেপোলিয়নের মুখাবয়ব ও দুইটী তৎপত্নী জোসেফিনের মুখের ছবি এমন সুকৌশলে অঙ্কিত আছে, যাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। নেপোলিয়নের সমাধি নামক ৮ ও ৯ সংখ্যক ছবি দুইখানিতে বৃক্ষ যুগলের মধ্যে নেপোলিয়নের পূর্ণ মূর্ত্তি দুইটিও অতি সুন্দর] ভাবে চিত্রিত হইয়াছে।

১১শ চিত্র

২৪শ চিত্র

২৩শ চিত্র
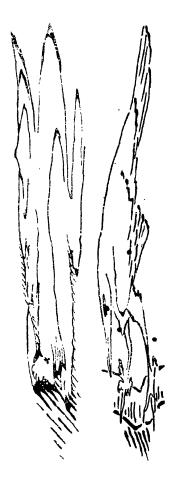
২৫শ চিত্র

১০ম চিত্র একটি প্রাচীন কালের সৈনিকের ছবি। উহার মধ্যে অলক্ষ্যে রমণী মূর্ত্তিটি চিত্রকরের বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছে। ১১শ ছবিখানি একটি বৃদ্ধের ছবি। উহার মধ্যে একটি যুবতী, একটি বালক ও একটি সিংহমূর্ত্তি অতি কৌশলের সহিত অঙ্কিত হইয়াছে।

১২শ, ১৩শ ও ১৪শ চিত্রগুলি সাধারণ বিজ্ঞাপনের ছবি। ইহার প্রথম খানিতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ভিতর হইতে একটি মূর্ত্তি উঁকি মারিতেছে মনে হয়। দ্বিতীয় খানি একটি সাহেবের মুখ, উহার দক্ষিণ গণ্ডের স্বাভাবিক শেড্‌টি একটি সারসের মত দেখাইতেছে। ১৪শ খানিতে সামান্ত একটু আঁচড় দেওয়ায় রমণীর মস্তকোপরি একটি বকের ছবি হইয়াছে। ১৫শ চিত্রে কেদারার হাতলের সম্মুখে যে মনুষ্য-মূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হইতেছে, উহা ফটোতে স্বাভাবিক ভাবে আলো ও ছায়ার সমন্বয়ে সৃষ্ট হইয়াছে।

২৩শ চিত্র

১৬শ চিত্র

১৭শ চিত্র

আলোক-চিত্রের মধ্যেও চেষ্টা করিলে বিচিত্র ফটো প্রস্তুত হইতে পারে। ১৬ ও ১৭ সংখ্যক ছবি দুইখানি তাহারই উদাহরণ। ১৮শ চিত্রে যে দুই মুণ্ড বিশিষ্ট ভেড়া দেখা যায়, উহা প্রকৃত পক্ষে দুই মুণ্ড বিশিষ্ট ভেড়ার ছবি নহে। চিত্র গ্রহণকালে ভেড়াটির মুণ্ড সঞ্চালনের ফলে দৈবক্রমে এরূপ ছবি হইয়া গিয়াছে।

১৯ সংখ্যক হস্তাঙ্কিত পরিচিত ছবিখানি বিশেষ কৌতুকোদ্দীপক। উহাতে তিনটি শিশুর ছবি চিত্রিত আছে, কিন্তু এমনই সুকৌশলে একত্র করিয়া আঁকা

২৮শ চিত্র

হইয়াছে, যে বিভিন্ন ভাবে দেখিলে সাতটি শিশু দেখা যায়। এইরূপ ২০শ চিত্রে মাত্র চারিটি চক্ষু অঙ্কিত আছে, কিন্তু তাহাতেই দ্বিচক্ষু বিশিষ্ট তিনটি সুন্দর মুখ বুঝাইতেছে। এই প্রকার ঘোড়া খরগোস প্রভৃতির ছবিও দেখা যায়।

বর্ণমালার অক্ষর সংযোগে যেমন মানুষের ছবি আঁকার খেয়াল দৃষ্ট হয়, তেমনি কেবল জীবজন্তুর দ্বারাও লেখা হইতে পারে। ২১ সংখ্যক ছবি খানিতে কতিপয় পাঁকাল মৎস্যের ন্যায় মৎস্য, এমন বিচিত্র ভাবে চিত্রিত করা আছে, যাহাতে ইংরাজি "correspondence" কথাটি পড়া যায়।

২২ এর খানি একটি সাধারণ বিজ্ঞাপনের ছবি। উহার

২৯শ চিত্র

৩০শ চিত্র

বিষয় হইতেছে প্রসাধনরতা একটি সুকেশা রমণী। অকস্মাৎ দেখিলে মনে হয় যে, স্ত্রীলোকটি একটি ছোট

কুকুর বা বিড়ালকে দুই হস্তে আদর করিতেছে। ২৩ সংখ্যক ছবিখানি কতকটা বিপরীত ভাবের। ইহাতে একটি মানুষকে এমন করিয়া অঙ্কিত করা হইয়াছে যে, হঠাৎ দেখিলেই মেষ-পালের মধ্যে একটি মেষ বলিয়া ভ্রম হয়। আবার চিত্রকরের খেয়ালে এমন বিকৃত করিয়া ছবি অঙ্কিত হয়, সহজ দৃষ্টিতে যাহা একটা হিজিবিজি মনে হইলেও, বিশেষ প্রকারে দেখিলে সুন্দর জীবচিত্র পরিদৃষ্ট হয়। ২৪ সংখ্যক ছবিখানি এই শ্রেণীর। উহা চক্ষের সহিত ঠিক সমান্তরাল করিয়া দেখিলে একটি বিড়াল ও একটি পাখীর ছবি দেখা যায়।

২৫ সংখ্যক ছবিখানি অতি সামান্য একটি রেখা-চিত্র মাত্র। ইহাতে চিত্রকরের যে নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়। ইহাতে মুখমণ্ডলের মধ্যে মুখ-বিবর ভিন্ন আর কিছুই আঁকা না থাকিলেও, উহা দেখিবামাত্রই মনে হয় যে একটি লোক হাসিতেছে। চিত্রের উপর কল্পনার প্রভাব কতটা, তাহা এই সামান্য ছবিখানি হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়।

২৬,২৭ ও ২৮ সংখ্যক ছবিগুলিতেও চিত্রকরের বিশেষ গুণপনা প্রকাশ পায়। এইগুলির সবই. মানুষের মুখ। ইহাদের উল্টাইয়া ধরিলেও আর একটি করিয়া মানুষের মুখ দেখা যায়। প্রথম দুইখানি নেপোলিয়নের প্রতিকৃতি। শেষখানিতে এক দিকে একটি সম্ভ্রান্ত লোকের এবং অপর দিকে এক লজ্জাহীনের ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ তিনখানিই মানুষের চেষ্টায় অঙ্কিত, কিন্তু ২৯ সংখ্যক খানি আরও বিচিত্র। উহা ফটোগ্রাফের কাচে স্বাভাবিক ভাবে প্রতিফলিত হইয়া প্রস্তুত হইয়াছে। আরও আশ্চর্য্যের কথা—অন্য মুখটিও কতকটা মূলের অনুরূপ। ৩০ সংখ্যক ছবিখানি একটি মানুষের মুখ ও উহার ছায়া। কিন্তু উহা এমনই স্বাভাবিক ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে যে, বিপরীত দিক হইতে দেখিলে চক্ষুর নীচে পর্য্যন্ত আর একটি মুখ দেখা যায়।

৩১শ চিত্র

৩১ সংখ্যক ছবিখানি আর এক খেয়ালের উদাহরণ। উহা ঠিক কিসের ছবি, তাহা প্রথম দেখিয়া বেশ বুঝা যায় না। উহার অংশ-বিশেষ চাপা পড়িয়া দুই খানি কেমন সুন্দর ছবিতে পরিণত হয়, তাহা মধ্যের ও দক্ষিণ পার্শ্বের খানি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

বাংলার মুস্‌লিম্ নারী

মুহম্মদ অব্‌দুল্লাহ্

মুস্‌লিম্ নারীর জন্য শাস্ত্রকার যে সকল মতামত দিয়াছেন, পূর্ব্ববর্ত্তী এক প্রবন্ধে তাহা মোটামুটি ভাবে দেখান হইয়াছে। এইবার সাধারণ ভাবে, সামাজিক জীবনে বাংলাদেশের মুস্‌লিম্ নারীর অধিকার ও অবস্থা কিরূপ, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

বাংলাদেশে মুস্‌লিম্ নারীর অবস্থা যে মোটেই সন্তোষজনক নয়, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শাস্ত্রকার জ্ঞানী, তিনি নিজের কর্ত্তব্য ঠিকমত পালন করেন; কিন্তু যাহাদের জন্য শাস্ত্র রচিত হয়, তাহারা তাঁহার মত জ্ঞানী নহে। যাহাদের বিবেক পরিপক্ব, তাহারা নিজেদের বিবেচনা মত কাজ করিলে ক্ষতির আশঙ্কা প্রায় থাকে না; কিন্তু কাঁচা বুদ্ধি লইয়াও যাহারা শাস্ত্র মানিয়া চলিতে নারাজ, তাহারাই নানা গণ্ডগোলের সৃষ্টি করে। বাংলার মুস্‌লিম্ সমাজের শাস্ত্রজ্ঞান ও বিচারশক্তি খুব কম, শাস্ত্রার্থ তাহাদের ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবার লোকেরও অভাব। কাজেই তাহাদের ভুল পথে চলা নিতান্ত অস্বাভাবিক নয়। রান্নাবাড়া করা ও সন্তানের জননী হওয়াই এখন এ দেশে সাধারণ মুস্‌লিম্ রমণীর প্রধান কর্ত্তব্য; এবং শুধু এই কর্ত্তব্য পালন করিয়াই তাহারা জীবনের পর জীবন কাটাইয়া দিতেছে। একটিবারও বুঝি তাহাদের মনে এই চিন্তা জাগে না যে, তাহারাও সকলের মত মনুষ্যের জন্ম লইয়া দুনিয়ায় আসিয়া থাকে; এবং মানব-জীবনের কর্ত্তব্য এর চেয়েও অনেক বড়। কিন্তু চিরকালই কি এই সকল মানব-জীবন, নারী-জন্ম বেদনাবিহীন ব্যর্থতার মধ্যে দিয়াই জগতের কাজ শেষ করিতে থাকিবে? অমূল্য নারী-জীবন কি চিরকালই এই ভাবে—স্ফুরিত ও বিকশিত হইবার সুযোগ না পাইয়া, একটির পর একটি করিয়া নিরানন্দ জগৎ হইতে ঝরিয়া পড়িবে?

বাংলাদেশে মুস্‌লিম্ সমাজ অপেক্ষা হিন্দু সমাজে শিক্ষার বিস্তার অনেক বেশী। সংখ্যার অনুপাতে হিন্দু নারী মুস্‌লিম্ নারী অপেক্ষা ঢের বেশী শিক্ষিতা। মুস্‌লিম্‌গণ সংখ্যায় হিন্দুদের অপেক্ষা অধিক; কিন্তু তবুও তাহারা যে সমাজ ও রাষ্ট্র-জীবনে হিন্দুদের সমান নহে, তাহার কারণ, তাহাদের মধ্যে হিন্দুদের সমান শিক্ষার অভাব। পুরুষদের হিসাবে হিন্দুসমাজ শিক্ষার দিক্ দিয়া মুস্‌লিম্ সমাজকে ছাড়াইয়া যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, মেয়েদের হিসাবে তাহা হইতেও অনেক বেশী। ১৯২১ সালের আদম শুমারীর হিসাবে বাংলাদেশে লেখাপড়া জানা মেয়ের সংখ্যা মোট ৪০৭৮৩১। পাঁচ বৎসর ও তদূর্দ্ধ বয়সের লেখাপড়া-জানা নারীর সংখ্যা হাজারকরা ২১ জন। তার মধ্যে হাজারকরা হিন্দুনারীর সংখ্যা ৩৬ জন ও মুস্‌লিম্ নারীর সংখ্যা ৬ জন। আবার সকল বয়সের গড় ধরিলে

হিন্দুনারীর সংখ্যা হয় হাজারে ১৪ এবং মুস্‌লিম্ নারীর ৭ অর্থাৎ তাহার অর্দ্ধেক। প্রাইমারী ইস্কুলের ছাত্রীদের মধ্যে মুস্‌লিম্ বালিকার সংখ্যা যেমন দেখা যায়, হিন্দু সমাজের সহিত তুলনা করিয়া সেজন্য বেশী আক্ষেপ করা চলে না। কিন্তু এই সকল বালিকার শিক্ষা হিন্দু বালিকাদের মত বেশী দূর অগ্রসর হয় না কেন? মুস্‌লিম্ সমাজের অর্থকষ্টই কি কেবল সে জন্য দায়ী?

হিন্দু সমাজ অপেক্ষা মুস্‌লিম্ সমাজে আর্থিক অভাবের তীব্রতা অধিক, এ কথা মানি। কিন্তু তাহাই যদি স্ত্রী-শিক্ষার পথের কণ্টক হয়, তবে পুরুষের শিক্ষায় তাহা সমান অন্তরায় হয় না কেন? অনেক ক্ষেত্রে এই জন্যই নারী পুরুষ উভয়েরই শিক্ষা বাধা পায় বটে, তবে সকল স্থলে তাহা স্বীকার করিবার যৌক্তিকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ পুরুষের শিক্ষার আবশ্যকতা যতটুকু স্বীকার করা হয়, স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা ততটা স্বীকার করা হয় না। আবার উপযুক্ত শিক্ষালয়ের অভাবও অনেক সময় স্ত্রী-শিক্ষার প্রতিবন্ধক হয়। কিন্তু আমার মনে হয়, এ সকল সত্ত্বেও মুস্‌লিম্ সমাজে স্ত্রীশিক্ষার সবচেয়ে বড় অন্তরায় পর্দা সম্বন্ধে তাহাদের অন্ধ কুসংস্কার। দীর্ঘকাল হইতে তাহাদের মধ্যে এই লজ্জাকর ভ্রান্ত বিশ্বাস চলিয়া আসিতেছে যে, কোন রকমে ছাড়া পাইয়া কঠোর অবরোধের বাহিরে গেলেই নারী ভ্রষ্টা হইয়া পড়িবে। মূঢ়তার সীমা আর কোথায় হইতে পারে! হতভাগ্য মুস্‌লিম্ সমাজ, ইহাই কি তোমার শাস্ত্রের অনুশাসন? ইস্‌লামের উদার শাস্ত্র কি কোনো দিন মানুষের ন্যায্য অধিকার খর্ব্ব করিয়া তাহার প্রকৃত উন্নতির পথে অন্তরায় হইয়াছে? কিন্তু অজ্ঞ মুস্‌লিম্ সমাজের ধারণা আছে, এই কঠোর পর্দার ব্যবস্থাই শাস্ত্রের আদেশ; তাহারা 'ধর্ম-ব্যবসায়ীদের' কাছে এই কথাই শুনিয়াছে।

মুস্‌লিম্ সমাজের মেয়েরা অল্প বয়সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কিছুদিন পড়াশুনা করিতে পায়। তার পর একটু বড় হইলেই তাহারা স্কুলে যাইবার অযোগ্য হইয়া পড়ে। দুঃসহ অবরোধের অমঙ্গলকর বোঝা মাথায় লইয়া বিবাহিত হইবার পর তাহারা সংসার ধর্মে নিযুক্ত হইতে বাধ্য হয়। সুতরাং তাহাদিগকে উচ্চশিক্ষার কল্যাণের সহিত নারী-জন্মের সৌন্দর্য্য উপভোগে বঞ্চিত থাকিতে হয়। বর্ত্তমানে আমরা ইউনিভার্সিটীর পরীক্ষা পাশ করাকেই শিক্ষার ষ্ট্যাণ্ডার্ড ধরিয়া থাকি; ইহাই আমাদের উচ্চশিক্ষার আদর্শ। কিন্তু আজকালও বোধ হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মুস্‌লিম্ বালিকার নাম সকল বৎসর একটি করিয়াও পাওয়া যায় না। আজ পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালী মুস্‌লিমের মেয়ে এম-এ পাশ করিয়াছেন বলিয়া জানি না। যতদূর জানা আছে, আজ পর্য্যন্ত ডাক্তারী কলেজেও কোন মুস্‌লিম্ ছাত্রী ভর্ত্তি হন নাই। মেয়েদের জন্য এ সকল শিক্ষা ভাল কি মন্দ, সে বিচার করিতেছি না। আপাততঃ শিক্ষার ব্যবস্থা এইরূপই আছে,—অন্য কোনরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা নাই বলিয়াই এই কথা বলিতেছি। এ রকম শিক্ষা স্ত্রীজাতির উপযোগী না হইতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া কি হিন্দু ছাত্রীগণ তাহা ছাড়িয়া দিতেছেন? আর ইহা স্ত্রীজাতির উপযোগী নহে বলিয়াই যে মুস্‌লিম্ বালিকারা এ দিকে ঝোঁক দেয় না, এরূপ বিশ্বাস করিবারও কোন হেতু নাই। শিক্ষার উপযোগিতা বা অনুপযোগিতা বিচার করিবার প্রথম অধিকার তাঁহাদেরই আছে, যাঁহারা সেই ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়াও আশানুরূপ ফল পান নাই; এবং শুধু তাঁহারাই তাহাকে উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য দোষগুলি ধরিয়া দিতে পারেন।

যথেষ্ট লেখাপড়া না জানায় মুস্‌লিম্ মহিলাগণ নিজেদের অভাব অভিযোগ বা অভিজ্ঞতার বিবরণ প্রকাশ করিতে পারেন না। ইহাতে তাঁহাদের জ্ঞান ও কাল্‌চারের পথ সংকীর্ণই থাকিয়া যায়। তাহার ফলে সাধারণ সমাজের জ্ঞানও একচোখোই রহিয়া যায়। ইহাতে সমাজের সামান্য ক্ষতি হয় না। তাহাতে মায়ের কোলে বসিয়া সন্তানের শিক্ষালাভের ও মানসিক পুষ্টির পথ সুগম হইতে না পারায়, সমাজ-শরীর যথেষ্ট স্বাস্থ্য ভোগ করিতে পায় না। দুইটি দিক্ সমান ভাবে বাড়িতে না পাওয়ায়, তাহা নিজেকে একপেশে ও কম-জোর করিতে থাকে।

বাংলার হিন্দু মহিলাগণ কংগ্রেস প্রভৃতি সভা সমিতিতে যোগ দিয়া থাকেন; অনেক কাজের ভার লইয়া যোগ্যতার সহিত তাহা সম্পাদন করেন। ভারতের অন্য অনেক প্রদেশের মুস্‌লিম্ মহিলাগণও সেরূপ কার্য্যে নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দেন। কিন্তু শুধু বাংলার অভি-

শুধু মুস্‌লিমাই .সে সুযোগে বঞ্চিত। পর্দার কঠোরতা মুস্‌লিম্ নারীর দেহ-মনের উপর যে বিতৃষ্ণার ছাপ দিয়া যাইতেছে, তাহা সমাজের পক্ষে মারাত্মক ব্যাধির মতই অনিষ্টকর। এই বিতৃষ্ণা ও অস্বাস্থ্যের ভাব ক্রমশঃ সন্তানের দেহে সংক্রামিত হইয়া ক্ষীণজীবী সমাজকে দিন দিন আরো ক্ষীণ করিতে থাকিবে। সর্ব্বনাশী পর্দা আমাদের উন্নতির অন্তরায় ও ধ্বংসের কারণ হইতেছে; কিন্তু অন্ধ আমরা তাহা দেখিতে বা দেখিয়া তাহার প্রতীকার করিতে কোন চেষ্টাই করিতেছি না। পুরুষ একা চেষ্টা করিয়াও প্রতিকার করিতে পারে না। ইহার বিরুদ্ধে প্রথমে কয়েকজন সুশিক্ষিতা মহিলাকেই বিদ্রোহী হইতে হইবে। এই বিদ্রোহ অচিরে ঘটিতে দেখিব বলিয়া আমরা আশা করিতে পারি কি? মুস্‌লিম্ নারীর পর্দার জন্য শাস্ত্রের নির্দিষ্ট বিধান মানিলেই যথেষ্ট হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

সকল অবস্থায় নিজের স্বাতন্ত্র্য ও সম্মান রক্ষা করিবার সম্পূর্ণ অধিকার পুরুষের মত নারীরও আছে। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয়—বাংলার মুস্‌লিমার সে অধিকার অক্ষুণ্ণ নাই। এদেশে শিশুমৃত্যুর মত শিশু-বিবাহের সংখ্যাও অত্যধিক। বাংলাদেশে মুস্‌লিম্ সমাজে ইহার প্রভাব বোধ হয় হিন্দু সমাজের চেয়েও বেশী। ইহার ফলে শিশু কনেরা অনেক সময় বিধবা হইয়া থাকে। তাহাদের অনেকেই আবার শৈশব হইতে আমরণ বৈধব্যের অস্বাভাবিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে বাধ্য হয়, যদিও শাস্ত্র তাহার তীব্র নিন্দা করে। ইহাতে ব্যভিচারের পথও যে কিছু প্রশস্ত হয় না, এমন কথা বলা যায় না। যাই হোক, এই ব্যবস্থাটা সমাজের শরীফ্ (সম্ভ্রান্ত) সম্প্রদায়ের মধ্যেই নিবদ্ধ আছে,—সকল স্তরে ইহা খাটে না; এবং ক্রমশঃই এ প্রথা ক্ষীণ হইতেছে। এই ব্যবস্থাটি আমাদের দেশে হিন্দু-সমাজ হইতে আসিয়াছে। কোন কোন বিধবা শুধু অসঙ্গত সংস্কারের বশে এই ব্যবস্থাকে এত বেশী মানে যে, তাহা দেখিয়া মনে হয়, হিন্দু-সমাজে সহমরণ প্রথা এখনো বজায় থাকিলে, তাহারা স্বামীর মৃতদেহের সঙ্গে .নিজের জীবন্ত দেহটাকেও কবরে সমাহিত রাখিতে প্রলুব্ধ হইত। কেবল শাস্ত্রজ্ঞানের অভাবেই এই সকল মুস্‌লিম্ বিধবার এই দুর্দ্দশা।

বিবাহের সময় কনেদের মত জিজ্ঞাসা করা হয় বটে, কিন্তু বেশী না হইলেও কোন কোন ক্ষেত্রে পাত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া তাহাকে মত দিতে বাধ্য করা হয়। তবে সমাজে শাস্ত্রের এই মতটুকু এখনো বাতিল হইয়া যায় নাই যে, কন্যার বিনা অনুমতিতে বিবাহ হইতে পারে না। দরকার হইলে বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য স্বামীর মত স্ত্রীরও অধিকার আছে,—এ কথা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলা হইয়াছে। কিন্তু হিন্দু-সমাজের মত মুস্‌লিম্ সমাজেও আমরা বালিকা বধূর নির্য্যাতন দেখিতে পাই। অথচ বিবাহ-বিচ্ছেদের নিতান্ত প্রয়োজন হইলেও, সে সকল বধূ স্বামিগৃহের দুঃসহ যন্ত্রণা ও অত্যাচারের উপর নিজেদের দুঃখময় জীবন বিসর্জন দিয়া ক্ষান্ত হয়। তাহারা তাহাতে কিছুমাত্র সন্তোষ লাভ করিতে পারে না; বরং কেবল অসন্তোষের বোঝা লইয়া আত্মবিনাশের পথেই অগ্রসর হয়। এ অবস্থাতেও যে তাহারা বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করে না, তাহার কারণ শিক্ষা ও সাহসের অভাব; এবং সমাজের ভয় ও পরমুখাপেক্ষিতা তাহাদের হৃদয়ে সে বল জাগাইতে পারে না।

বাংলার মুস্‌লিম্ সমাজ যে দুরবস্থার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতেছে, হিন্দু সমাজও তাহা হইতে একেবারে মুক্ত নয়। হিন্দু সমাজেও পর্দা আছে, কিন্তু তাহার কড়াকড়ি মুস্‌লিম্ সমাজের মত নয়। হিন্দু নারীর সামাজিক অবস্থা যে কোন কোন বিষয়ে মুস্‌লিম্ নারীর চেয়ে ভাল, তাহার কারণ, গত শতাব্দীতে যে সংস্কারের ঢেউ আসিয়া হিন্দু সমাজকে আলোড়িত করিয়া গিয়াছে, মুস্‌লিম্ সমাজে তাহা আসে নাই। বাংলার নবাবী হাতছাড়া হইবার পর হইতে মুস্‌লিম্ হৃদয়ে যে জড়তা দেখা দিয়াছিল, তাহা বহুকাল ধরিয়া তাহার মৌলিক চিন্তাশক্তি উদ্বুদ্ধ হইতে দেয় নাই; হিন্দুর উন্নতি-প্রচেষ্টার কোলাহলও তাহাকে জাগাইতে সমর্থ হয় নাই।

মহাত্মা রামমোহন রায়ের মধ্যে সমাজ-সংস্কারের মৌলিক প্রবৃত্তি ও হৃদয়ের বল ছিল অসাধারণ। হিন্দু সমাজের সংস্কার শুধু তাঁহার আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করিয়া ছিল। বারুদ প্রস্তুত ছিল, কেবল আগুনের অপেক্ষা। গাছে যখন প্রথম ফুলটি ফুটে, তাহার আশে পাশে তখন অনেক কুঁড়ি দেখা যায়; প্রথম ফুলটি ঝরিবার সঙ্গে সঙ্গে

সেগুলিও ফুটন্ত ফুলের সুবাসে সকলকে মাতাইয়া তুলে। রামমোহনের সঙ্গে সঙ্গেই কেশবচন্দ্র প্রভৃতির আবির্ভাব সেই ভাবেই হইয়াছিল। তাঁহাদেরই সাধনার ফল ব্রাহ্ম সমাজ। ব্রাহ্ম সমাজের লোকসংখ্যা অতি সামান্য হইলেও বাঙ্গালী সমাজে ব্রাহ্মদের প্রভাব বড় অল্প নহে। ব্রাহ্ম নারীদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার বঙ্গনারীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী। এই সংস্কারের তুফান শুধু ব্রাহ্ম সমাজ গড়িয়াই ক্ষান্ত হয় নাই,—হিন্দু সমাজের উপরও ইহার যথেষ্ট প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছে। সেই প্রভাবের ফলেই আজ হিন্দু সমাজ মুস্‌লিম্ সমাজকে এতটা ছাড়াইয়া উঠিতে পারিয়াছে। একটি সমাজ ছাড়িয়া অন্য সমাজে যোগ দিতে হইলে অনেকখানি মনের বল ও বুকের পাটা দেখাইতে হয়; সকল লোক তাহা পারে না। হিন্দু সমাজ ছাড়িয়া অনেকে ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অনেকে ব্রাহ্মমত ভাল বলিয়া বিশ্বাস করিয়াও প্রকাশ্য ভাবে দীক্ষা লইবার সাহস পান নাই। তাঁহারা হিন্দু সমাজেই থাকিলেন, কিন্তু তাহার মধ্যে থাকিয়াই অনেক নূতন মত দরকার মত কাজে লাগাইয়া নিজেদের উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া লইলেন। এই ভাবেই হিন্দুনারীর শিক্ষার পথ প্রশস্ত হইয়াছে। ইহার মূলে রামমোহন প্রভৃতির সংস্কার। ইহা বাংলার রেনেসাঁস্।

কিন্তু এই রেনেসাঁসের প্রধান বিষয় ছিল ধর্ম্ম। কাজেই বাংলার অর্দ্ধেক লোক,—মুস্‌লিম্ সমাজ ইহা হইতে কোন উপকার পায় নাই। এই সংস্কারের ক্ষেত্র ছিল হিন্দু সমাজ, তাই এই বিপ্লবটার সকল বিষয় হইতেই মুস্‌লিম্ সমাজ দূরে থাকিতে চেষ্টা করিয়াছিল। তাহাদের জড় প্রকৃতি তাহাদের বুঝিতে দেয় নাই যে, তাহারাও এই সমাজ-বিপ্লব হইতে কিছু সামাজিক উপকার পাইতে পারিত। তাই এতকাল তাহারা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিল। এমনি করিয়া তাহারা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেরও সুফল ভোগ করিতে পারে নাই। ভ্রান্ত ধর্মবিশ্বাসের অন্ধতা তাহাদিগকে মূঢ়তারই পথ দেখাইয়া আসিয়াছে। মুস্‌লিম্ পুরুষেরই এই অবস্থা,—সুতরাং নারীর উন্নতির আশা কোথায়?

আবার অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গ সারা দেশটার মধ্যে জাগরণের একটা বিপুল সাড়া আনিয়া দিয়াছে। এ আন্দোলনের দেহটা আর নাই, তবে প্রাণটা সাধারণের চোখের আড়ালে এখনো নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিয়াছে। এই দেহের অভাবে এখন প্রায় সকল নেতাই নিজ নিজ সমাজের উন্নতির জন্য মন দিয়াছেন। যদি সাধু উদ্দেশ্য লইয়া এই কাজ করা হয়, তবে অল্প পরিশ্রমেই অধিক মজুরী মিলিতে পারিবে। কিন্তু নারীর শিক্ষা ও স্বাধীনতার জন্য যদি সবিশেষ চেষ্টা না করা হয়, তবে সমাজের উন্নতি আরো কিছুকাল স্থগিত থাকিতে বাধ্য হইবে। বাংলার মুস্‌লিম্ নারীর উন্নতির আশা এইবার করা যায়,—সমাজের ঘুমঘোর বোধ করি অনেকটা কাটিয়াছে। কিন্তু পর্দার অনুচিত কঠোরতা অপসারিত করা প্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়।

বাংলার মুস্‌লিম্ সমাজ নারীর প্রতি যে সকল অনাচারের ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহাতে তাহার নিজেরই ক্ষতি। এই সকল অনাচারের জন্য প্রধানতঃ তথাকথিত শরীফ্‌রাই দায়ী। তাঁহাদের ফাঁকা শরাফৎ (সম্ভ্রম) সমাজের উন্নতির প্রতিবন্ধক। পর্দার এত কঠোরতা ভারতের বাহিরে অন্য কোন দেশের মুস্‌লিম্ সমাজে নাই। এখন আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত—কিসে আমাদের মঙ্গল হয়। তার পর শাস্ত্রের সঙ্গে মিলাইয়া লইয়া প্রয়োজন মত তাহা কাজে পরিণত করা কর্ত্তব্য। কাজটা কঠিন বটে,—ইহাতে ত্যাগের প্রয়োজন বিলক্ষণ এবং কার্য্যক্ষেত্রে বাধাও অনেক আছে; কিন্তু তাই বলিয়া কি সে কাজ চিরকাল অসম্পন্নই থাকিয়া যাইবে? সমাজের এ অবস্থাতেও বোধ হয় বাংলাদেশে এমন মুস্‌লিম্ নারীর একেবারেই অভাব হইবে না, যাঁহারা যথেষ্ট শিক্ষার সহিত ত্যাগ ও নির্ভীকতার আশ্রয়ে থাকিয়া, এই সকল সমাজ-ধ্বংসী প্রথার প্রতিরোধ করিতে অগ্রসর হইতে পারেন। তাঁহাদের কাজে সহায়তার জন্য উপযুক্ত পুরুষেরাও আত্মপ্রকাশ করিতে ভীত বা বিরত থাকিবেন না বলিয়া আশা করা যায়। মনে রাখিতে হইবে, এরূপ নিয়ম ভাঙ্গা বিদ্রোহের জন্য প্রধানতঃ যৌবন-জলের তরঙ্গ চাই; কেন না বার্দ্ধক্যের পুরাতন সংস্কার ও গোঁড়ামি প্রায়ই এ রকম চেষ্টার কণ্ঠরোধ করিতেই অগ্রসর হয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে প্রাচীনদের সৎপরামর্শ ভক্তিভরে সুযুক্তির সহিত গ্রহণ করা উচিত।

সব জিনিসেরই পরিবর্ত্তন হইতেছে, আমাদের পৃথিবীও তাহার পুরান খোলস ছাড়িয়া নূতনের সন্ধানে ফিরিতেছে। এখন দুনিয়ার গতি প্রজ্ঞার উন্নতি চায়; মহাসমরের সূচনা হইতেই এই লক্ষণটি অতি স্পষ্ট হইয়া ধরা দিয়াছে। এই স্বাভাবিক গতি কেহই রোধ করিতে পারে না। যাহারা সেজন্য চেষ্টা করে, তাহারা শুধু নৈরাশ্য ও বিফলতার গ্লানি লইয়া ফিরিয়া আসে; এবং তখন আর প্রতিযোগিতায় টিঁকিতে না পারিয়া, মিছামিছি পশ্চাতে পড়িয়া থাকিয়া, কেবল লাঞ্ছনার পাত্র হয়। মুস্‌লিম্ নারীর শিক্ষা ও স্বাধীনতার জন্য আমরা যাহা চাই, তাহা নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতে হইবে না; তাহা তের শত বৎসর আগেকার শাস্ত্রের পুরাতন ভাবের নব আবিষ্কার মাত্র। তবে সে আবিষ্কার অবশ্যই সময়োচিত পোষাকে সাজিয়া আসিবে। এই প্রস্তাব যে কিছুমাত্র অসঙ্গত ও অযৌক্তিক নহে, তাহা শাস্ত্রজ্ঞ মুস্‌লিম্ মাত্রেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু এখনো যদি সমাজের মধ্যে, বিশেষতঃ নারী সমাজের মধ্যে, নড়াচড়ার কোন সাড়াশব্দ না পাওয়া যায়, তবে বুঝিতে হইবে, অল্‌-কুর্‌আনের এই বাণী বিশেষ করিয়া আমাদেরই উদ্দেশে বলা হইয়াছে;—"তাহাদের হৃদয় থাকিতেও তাহারা বুঝে না, চোখ থাকিতেও দেখে না এবং কাণ থাকিতেও শোনে না; তাহারা পশুর মত, বরং আরো ভ্রান্ত; ইহারাই অমনোযোগী।" (৭ অধ্যায়, ১৭৯ শ্লোক।) এবং "মূক, বধির ও অন্ধ; সুতরাং তাহারা ফিরিবে না।" (২ অধ্যায়, ১৮ শ্লোক।)

কান্না-বিলাসী

শ্রীইন্দুমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়

মনের বনের গহন পথের
সে এক উদাসী;
বাজিয়ে চলে ব্যথার বাঁশী
করুণ হুতাশি!

হিয়ার পাষাণ কুরে কুরে
কোন্ লিপি সে লিখতে সুরে—
আঁখির পাতা ভিজিয়ে চাহে
কান্না-বিলাসী;
আদিকালের কি প্রণয়ী
আস্‌তেছে সে বেদন বহি'
আমার লাগি—কাঁদন-ঝরা
দূরের প্রবাসী!

মনের বনের গহন পথের
পথিক উদাসী!

ও তার বিলিয়ে দেবার আপনাকে
বুঝতে নারি সহজটাকে
শেষটাকে কি জয় করে সে
বেড়ায় উলাসি;
ও তার, সজল-চাওয়া বাসি ভাল
মিষ্টি তাতে প্রাণের আলো—
দীপ জ্বালি' তাই দুয়ার খুলে
বসি—প্রত্যাশী;
মোর আসবে কখন গহন রাতের
পথিক উদাসী!

কোষ্ঠীর ফলাফল

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩৬)

বেলা এখনও বোধ হয় ঘণ্টা খানেক আছে,—শিবগঙ্গার ধারে উপস্থিত হইলাম। দৃশ্যটি মনোরম, যেন প্রকাণ্ড একখানি ফ্রেমে বাঁধা আরসি। তাহার বক্ষে চতুষ্পার্শ্বস্থ বৃক্ষাবলীর প্রতিবিম্ব পড়ায় এবং সোপানের প্রারম্ভোপরি একটি সুদৃশ্য রাজধর্ম্মশালা থাকায়, তাহাদের ছায়া প'ড়ে শিবগঙ্গা যেন একখানি ছবির মতই দেখাইতেছিল। সংসার-কোলাহলের বাহিরে ইহা স্বতঃই শান্তি আনিয়া দেয়। মনে হয়—এমন সব স্থান থাকিতে সহরের সহস্র চাঞ্চল্যকে মানুষ কি সুখে বরণ করিয়া নিজেদের অশান্তির ও অস্বস্তির মধ্যে ফেলিয়াছে। কিন্তু জীবন-যাত্রা বলিয়া জিনিষটা মনে পড়িলে এ মোহ ভাঙিয়া যায়।

হঠাৎ একটি সুগভীর শ্বাস মোচনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ-স্পর্শী স্বরে "গুরুদেব" শব্দটি আমার প্রাণে প্রবেশ করিয়া সমস্ত দেহ-মনকে করুণ আঘাতে সেই দিকে ফিরাইয়া দিল। দেখি একটি সৌম্য-দর্শন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আনত নেত্রে চিন্তার প্রতিমূর্ত্তি রূপে মন্দির-প্রাঙ্গণের দ্বিতীয় দ্বারটি দিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইলেন। পরক্ষণেই আমাদের পরিচিত দীর্ঘদেহ গৌরবর্ণ পাণ্ডাজী দ্রুত আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি কোন চিন্তা রাখবেন না বাবা, মায়ের কাছে আমি নিজে উপস্থিত থাকব', ভয়ের কোন কারণ নেই। বাবার কাছে আরও কত লোক হত্যা দিয়ে রয়েছে,—তিনি সকলেরই কামনা পূর্ণ করেন।"

ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বেশ নিবিষ্টভাবে দেখিয়া শেষে বলিলেন, "বাবা, তুমি কে,—তোমাকে তো পূর্ব্বে আমি কখনও দেখি নাই; তোমার সহৃদয়তা আমার অর্দ্ধেক ভাবনা লাঘব করে দিয়েছে।"

পাণ্ডাজী বলিলেন,—"বাবা আমি বাঙালী ব্রাহ্মণ, আমাদের তিন পুরুষ এই স্থানে কেটেছে—তাই আমাকে এই রকম দেখছেন। আমরা বাবার সেবক, আপনাকে বড় কাতর দেখে ছুটে এলুম। আপনি মায়ের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকুন—আমি মাকে দেখব।"

এই কয়েক দিন মধ্যে পাণ্ডাজিকে আমি যতই দেখিয়াছি ততই তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বাড়িয়াছে; তিনি "বাঙ্গালী" শুনিয়া আজ একটা গর্ব্ব-মিশ্রিত আনন্দ অনুভব করিলাম। আমার মনটা আপনা আপনিই বলিয়া উঠিল, "অহো ভগবান, তুমি কোথায় যে কি মাধুরী লুকিয়ে রেখেছ! গর্ব্বিত মূঢ় মানব কেবল আঘাত করিতেই জানে,—দীন জনেরাই যথার্থ ধনী। অসহায় চিন্তাকুল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে এইমাত্র পাণ্ডাজী যতটা দিলেন, ততটা সম্পত্তি আমাদের কয়জনের আছে!

ব্রাহ্মণ ছলছল নেত্রে পাণ্ডাজীর পিঠে হাত রাখিয়া বলিলেন—"বাবা, তুমি সত্যই ব্রাহ্মণ,—বৈদ্যনাথ তোমার অভীষ্ট পূর্ণ করবেন, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বাসায় চললুম।" পাণ্ডাজী নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন।

আমি থাকিতে পারিলাম না, একটু অগ্রসর হইয়া ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ক্ষমা করবেন, আপনাকে এত কাতর দেখ্‌ছি কেন?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "বাবা, আমি বড় বিপদগ্রস্ত, ভগবান কি পাপে যে আমাদের এই বৃদ্ধ বয়সে এত বড় কঠিন শাস্তি দিলেন তা বলতে পারি না। বলতে পারি না-ই বা কেন,—নিজে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হয়ে—চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক হয়ে—বাপ পিতাম' যা করেন নি, তা করতে গেলুম কেন? আমার মতিচ্ছন্ন হয়েছিল বাবা;—আমাদের একমাত্র পুত্রকে ইংরাজী পড়তে দিছলুম; কেন দিছলুম তা এখন স্মরণ নেই বাবা। প্রথমতঃ গ্রামের পাঁচজন ভদ্রবাবুরা এ প্রবৃত্তি দিয়েছিলেন বটে, সেটা আমি কারণ বলে ধরি না, পশ্চাতে নিশ্চয়ই আমাদের একটা লোভ ছিল যা ব্রাহ্মণোচিত ছিল না। এ সেই পাপের সাজা। কিন্তু ভগবান যে আমাদের এত বড় সাজা দেবেন—ওঃ গুরুদেব!"

ব্রাহ্মণ কাঁদিয়া ফেলিলেন। ভাবিলাম ছেলেটির নিশ্চয়ই কোনও শক্ত পীড়া, তাই এঁরা বাবার দ্বারে হত্যা

দিতে আসিয়াছেন। বলিলাম "বাবা বৈদ্যনাথের যখন শরণ নিয়েছেন তখন আর দ্বিধা রাখবেন না—মঙ্গলই হবে।"

ব্রাহ্মণ চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, "আমি যে অপরাধী বাবা ;—তবে এই বিদেশে এত অপ্রত্যাশিত সহানুভূতি পেয়ে আশা হয় বাবা বৈদ্যনাথও আমাকে সদয় হবেন। ছেলেটির গর্ভধারিণী তো আহার নিদ্রা ত্যাগ করে বাবার দ্বারে আজ হত্যা দিচ্ছেন ; পাড়াগাঁয়ে চিরদিন গৃহ কর্ম্মে আবদ্ধ ছিলেন, কখনো ঘরের বার হননি ; ভয় লজ্জা সঙ্কোচ সবই তাঁর অত্যধিক,—আজও কারুর সামনে আমার সঙ্গে কথা কইতে সঙ্কুচিত হন, তাই বাবা তাঁর জন্যেও বড় চিন্তা হচ্ছে। ইতিপূর্ব্বে ওই দেবতার মত লোকটি আশ্বাস দিয়ে যাওয়ায় তবে বাসায় যেতে পারছি—তা না তো পা উঠছিলনা বাবা।"

বলিলাম, "উনি অতি সজ্জন লোক- দেবতাই বটে ; মন্দিরে ওঁর প্রভাবও যথেষ্ট, আপনি ও-চিন্তা আর রাখবেন না। ছেলেটির পীড়াটা কি ?"

ব্রাহ্মণ বাষ্পাকুল নেত্রে বলিলেন "শ্যামসুন্দর আমার বরাবরই যেমন পিতৃমাতৃভক্ত তেমনি বাধ্য ও বিনয়ী ছেলে ; কলকাতা থেকে লেখাপড়া করছিল। আজ পনেরো ষোল দিন হ'ল মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী এসেছে। কিন্তু আমাদেব পাপে শ্যামসুন্দরের মাথাটি একটু বিগড়ে গেছে বাবা,—উন্মাদের লক্ষণ,—গুরুদেব !" এই পর্য্যন্ত বলিয়া চক্ষু মুছিলেন।

বলিলাম, "যদিও সামান্য কিছু পরিবর্ত্তন দেখে থাকেন, সেটা পরীক্ষার তরে অতিরিক্ত পরিশ্রম, রাত্রি জাগরণ, চিন্তা প্রভৃতির জন্যই হয়ে থাকবে, সপ্তাহ খানেক ঠাণ্ডাঠুণ্ডি করলে বা একবার পুরীতে সমুদ্রের ধারে দিনকতক থেকে এলেই সেরে যাবে ;—আর যখন বাবাকে ধরেছেন তখন ত চিন্তাই নেই। আচ্ছা—আপনাদের এরূপ অনুমানের কারণটা কি, পরিবর্ত্তনটা কিসে লক্ষ্য করলেন,—কথা-বার্ত্তায়, ভাবভঙ্গীতে, কি ব্যবহারে ?"

বাহ্মণ বলিলেন, "না বাবা সে সব কিছু নয়, তা হলে তো এত সত্বর গ্রামে এ নিয়ে একটা লজ্জাকর কানাঘুষো সৃষ্টি হ'ত না। আমি বাবা চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক—রসময় ন্যায়ালঙ্কার,—গ্রামটিতে বহু ব্রাহ্মণের বাস, সকলেই আমাকে শ্রদ্ধা সম্মান করেন,—চতুষ্পাঠীতে এসে বসেন। শ্যামসুন্দর যেদিন কলকাতা থেকে বাড়ী এল—অনেকেই তখন উপস্থিত ছিলেন। এসে সকলেরই পায়ের ধূলো নিলে, সকলকেই যথাযথ প্রণাম করে তবে বাড়ী ঢুকল। হা ভগবান ! সকলে কিন্তু সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন—শ্যামসুন্দরের দুদিককার গোঁফ্ আধাআধি কামানো ! সেদিন সকলেই তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন, যাবার সময় বলে গেলেন—'আহা এমন ছেলে—নারায়ণ না করুন—আপনি কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকবেন না।'

"আমি ভেবেছিলুম বাবা—কোনো মেড়ো নাপিতের ভুলচুক। তাঁদের কথায় আমার মাথায় যেন বজ্র হানলে—আমি অন্ধকার দেখলুম। সত্যইতো—যখন চুল ফিরিয়েছে তখন আয়না সামনে ছিলই,—মুখও দেখেছে ; ভুলচুক হলে সবটা কামিয়ে ফেলতে পারত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলের সেইটাই তো নিয়ম। তাতে তো আর লজ্জা বা অপমানের কিছু ছিলনা। কিন্তু ওই বিকৃতি সত্বেও ছেলে কি করে এতটা পথ ওই মুখ দেখাতে দেখাতে গ্রামের মধ্য দিয়ে বাড়ী এসে ঢুকল ! এতো প্রকৃতিস্থের লক্ষণ নয়—বিশেষ যে শিক্ষিত—জ্ঞানবান। আবার কি না প্রত্যহ প্রত্যূষে উঠে নিজের হাতে ওই কাজটিই করে—হা ভগবান ! গোঁফটা ফেলে দিতে বলায় বলে 'ওতে কি হয়েছে',—আর হাসে। যে জ্ঞানবান চক্ষুষ্মান এটা বোঝেনা 'ওতে কি হয়েছে', তাকে কি বলব বল ! নীলমণি আচার্য্য বলছিলেন—পাগলা গারদে,—গুরুদেব !" ব্রাহ্মণের সে কি মর্ম্মভেদী গভীর দীর্ঘনিশ্বাস।

একটু সামলাইয়া বলিলেন, "যথাসর্ব্বস্ব খুইয়ে কলকাতায় লেখাপড়া শিখতে দিয়েছিলুম বাবা,—তার পরিবর্ত্তে পেলুম একটী পাগল ! আজ কি না গ্রাম ও গ্রামান্তরের ইতর-ভদ্র মেয়ে-পুরুষেরা ন্যায়ালঙ্কারের বাড়ীর চারিদিকে কৌতূহল দৃষ্টিতে উঁকি মারছে, কেউ বলছে 'পাশকরা-পাগল দেখে আসি !' ব্রাহ্মণী গোপনে দিনরাত অশ্রু মুছছেন, বউমা ধরাশয্যা নিয়েছেন ;—শ্যামসুন্দর নির্ব্বোধের মত বসে বসে হাসছে। তার গর্ভধারিণী কত করে পাগলকালীর বালা আনালেন,—ধারণ করাতে পারলেন না।

"সেদিন শরৎবাবু বললেন, 'ন্যায়ালঙ্কার মশাই কচ্ছেন' কি, আর বিলম্ব করবেন না, রোগটি এদেশী রোগ নয়,

তার ওপর আক্রমণটা মস্তিষ্কের পাঁচইঞ্চির মধ্যে হওয়ায় বড়ই আশঙ্কার কথা রয়েছে। হঠাৎ বিকটাকারে প্রকট হতে পারে। শ্যামসুন্দরের জন্যে বাবা বৈদ্যনাথের কাছে হত্যা দেওয়া হোক। দেবতা প্রসন্ন না হলে এ সব রোগ যায় না, ডাক্তার বদ্দির কাজ নয়।' শরৎবাবু এ সব বিষয়ে বোঝেন ভাল, তাই বাবার চরণে এসে পড়েছি বাবা, এখন তাঁর কৃপাই ভরসা—গুরুদেব!"

আমি ত একদম অবাক্! কি সর্ব্বনাশ,—এ কি অদ্ভুত ব্যাপার! বাংলা দেশে এমন গ্রামও আছে যেখানে এই অভিনব গোঁপ-শিল্পটা এখনও অপরিজ্ঞাত! এই "ডেয়ার্কির" ষ্টাইলটা বাঙ্গলাদেশে পুরাতন হয়ে ক্রমে একদিক কামিয়ে একদিক মাত্র রাখবার সময় হয়ে এলো, এখনো দেবগ্রামে এর সাড়া পর্য্যন্ত নেই! সে দেশে কি জামাই-ষষ্ঠীও নেই!" বলিলাম, "আমাকে ক্ষমা করবেন—আমি আপনার কাছে সকল বিষয়েই ছোট; আমি বলছি, বাবার কৃপায় কাল বেলা দশটার মধ্যে আপনারা শান্তি পাবেন, আপনাদের এই মানসিক কষ্ট সম্পূর্ণ নিবৃত্তি পাবে।"

তিনি বলিলেন, "তোমার বাক্য বাবা বৈদ্যনাথ সার্থক করুন; আমি অপরাধী, এতটা আশা কোন্ সাহসে করি। প্রার্থনা করি পুত্র সংস্রবে তুমি সুখী হও।"

বলিলাম, "আপনাদের আশীর্ব্বাদে ভগবান আমাকে সে সুখ দিয়েছেন,—আমি অপুত্রক।"

ব্রাহ্মণ আশ্চর্য্য হইয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলেন, "এ্যাঁ,—উঃ খুব বেঁচে গেছ, আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি বাবা! এ্যাঁ, পুত্র নেই—কি শান্তি!"

ব্রাহ্মণ যে কতটা কষ্টে এই সিদ্ধান্ত করিলেন, তাহা অনুমানের বিষয় হইয়া থাকাই ভাল।

পরে তাঁহার বাসা দেখিয়া ও কাল সকালে নয়টার সময় আসিব বলিয়া আমরা নিজের বাসায় ফিরিলাম।

জয়হরি আমাদের কোন কথাই শোনে নাই; শিবগঙ্গার ধারে বসিয়া মুড়ির চাক্তি খাইতেছিল—মাছেদেরও খাওয়াইতেছিল। বাসার পথে হঠাৎ সে প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা মশাই, উনি রাঙা আলু কেন কিনলেন? কই, তার তো কিছু দেখলুম না।"

আমি প্রথমটা কিছু বুঝিতেই পারিলাম না, পরে কর্ত্তার তত্ত্ব ও গবেষণামূলক আলুর দর নির্ণয় ব্যাপারটা মনে পড়িল, বলিলাম, "বাড়ীতেই যখন রয়েছে, তাড়াতাড়ি কেন? তুমি যেন প্রশ্নটা তাঁদের কাছে কোরো না।"

কি মুস্কিল, বলে 'ওঁরা যদি ভুলে যান!' বিরক্ত হইয়া বলিলাম, 'ভুলে যান যাবেন, তোমার মাথাব্যথায় কাজ নেই।"

"না, আমি ভাবছিলুম, ওতে কি কি হতে পারে।"

সেই ভাবেই বলিলাম, "ওতে মুখ হেঁট ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।"

জয়হরি বেশ সপ্রতিভের মত সহাস্যে বলিল, "সেত' খাবার সময় হবেই মশায়, কিন্তু—"

আমি চাপা-গলায় "ব্যস্" বলিয়া বাসার রোয়াকে উঠিয়া পড়িলাম।

বেলা নয়টা আন্দাজ ন্যায়ালঙ্কার মশায়ের বাসায় উপস্থিত হইতেই তিনি বলিলেন, "এসেছ,—বড় ভাল হয়েছে, আমাদের তো মাথার ঠিক নেই বাবা; ব্রাহ্মণীর কথা শুনে কিছু ঠিক করতে পারছি না, বড় বিচলিত হয়েছি। তিনি বলেন—কে যেন তাঁর কানে বললেন—"উঠে যা।" এর অর্থ তো বুঝতে পারছি নে বাবা; এর মানে কি—"অসুখ সেরে গেছে, আর পড়ে থাকতে হবেনা, বাড়ী যা?" দেবতার কথা—কি করে বুঝবো বাবা—এর টীকাই বা করবে কে! এই কষ্ট করে এতদুর এসে শেষ সন্দেহের ওপর ফেরাটা কি ঠিক্ হবে? ভবভূতির পুঁথিও তো এমন শক্ত ঠ্যাকেনি; ভারবীও এমন অর্থ-সঙ্কটে ফেলেন নি, বড় সমস্যায় পড়েছি বাবা।"

বলিলাম—"অত বিচলিত হবেন না—বাবা বৈদ্যনাথ আপনাকে তাঁর কথার অর্থ বুঝিয়ে দেবার জন্যেই এই অধমকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ওর অর্থ মুখে বলে বা টীকার দ্বারা বুঝিয়ে আপনার মত পণ্ডিতকে বিশ্বাস করান কঠিন,—তাই প্রমাণ সহ সেটা সুস্পষ্ট দেখিয়ে দেবার আদেশ আমার ওপর হয়েছে, অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে আসুন।"

* * * *

ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী উভয়েই সঙ্গে আসিয়াছিলেন। পোষ্ট অফিসের চিঠি বিলি শেষ হইয়া গেল, ভদ্র বায়ুভুক্‌দের মজলিশ্ ভাঙিল। ওই চল্লিশ পঞ্চাশ জনের মধ্যে আমার

সঙ্কেত-মত উভয়েই অবাক্ বিস্ফারিত নেত্রে সতেরোটি অর্দ্ধ-নারীশ্বর মূর্ত্তি দর্শন করিলেন! বলিলাম "এই সব দিব্য পুরুষদের মধ্যে—জমীদার, ডাক্তার, ডেপুটী, এমন কি ব্যারিষ্টার সাহেব হইতে মোসাহেব পর্য্যন্ত আছেন,—এখন বাবা বৈদ্যনাথের প্রত্যাদেশের অর্থ উপলব্ধি করতে পেরেছেন কি? না এঁদের সকলেরই মাথা খারাপ বলতে চান?"

"না বাবা—এখন বলতে চাই—আমারই মাথা খারাপ! কিন্তু কারণ তো বুঝলাম না; আর কোন্ টোলই বা এর বিধান দিয়েছেন?"

বলিলাম—"কারণ নির্ণয় করা কঠিন; বোধ হয় এটা কোনও একজাতীয় কলা, তাই মুখের সঙ্গেই নিকট সম্বন্ধ। এ সব হাওয়ার খেলা, আমাদের সুজলা সুফলা বাঙলায় চট্ ধরে। উর্ব্বর ভূমির গুণই এই। কোনও টোলের বিধানে এ ভোল আসেনি; এ সম্বন্ধে অত বড় বিশ্ব-বিখ্যাত "আনাটোল্" পর্য্যন্ত নীরব। এটা একটা ইভলিউসনি ব্যাপার—দিন কতক থাকবে; এগিয়ে চলাই এর ধারা। ক্রমোন্নতি কল্পে এর পর ডুবতে সুরু হতেও পারে।"

শুনিয়া ব্রাহ্মণ চমকিয়া উঠিলেন। এই সময় ছেঁড়া অলষ্টর গায়ে, খালি পা, চুল ফেরানো, হাতে বাজারের সুদৃশ্য সাজি বা বাস্কেট্,—একটি যুবক window delivery (চিঠি) লইবার জন্য হাঁফাইতে হাঁফাইতে হাফ্ ছুটে হাজির। দেখি তাহারও ন্যাজা-মুড়ো বাদ দেওয়া গোঁফ্! জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—তমলুকে তার বাড়ী। মস্ত বড় বাবুর রাঁধুনী বামুন। প্রশ্ন করিলাম, "গোঁফের এ দুর্দ্দশা কেন?"

শুনিলাম "খানার সময় বাবুদের বৈঠকে যেতে-আসতে হয়, তাই ছোটবাবুর হুকুম—অসভ্যের মত থাকলে চলবে না। ছোটবাবু তো কেও-কেটা নন্। লাট সাহেবের লিবি (levy) খান্। "লিবি" কি বাবু,—এঁটো?"

বলিলাম—"এঁটো নয়—ঘেঁটো।" সে হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

ব্রাহ্মণকে বলিলাম "আপনার ত' স্বচক্ষে সব দেখাও হ'ল, স্বকর্ণে সব শোনাও হ'ল, এখন ঠাওরাচ্ছেন কি?"

ব্রাহ্মণ চিন্তাকুল ভাবে বলিলেন, "ছেলেটাকে মিথ্যা অনেক পীড়া দেওয়া হয়েছে,—না বুঝে উপযুক্ত ছেলেকে অপমানও করা হয়েছে। এখন সত্বর বাড়ী ফিরে সে সব স্বীকার করাই উচিত। আজই ফিরবো;—সে না অভিমানে একটা কিছু করে বসে;—উঃ কি অন্যায়ই করেছি!" ব্রাহ্মণ চঞ্চল হইয়া পড়িলেন।

বলিলাম,—"আর বৃথা ভাব্‌বেন না; চারটের মধ্যেই গাড়ী, বাবা বৈদ্যনাথের পূজা দিয়ে সত্বর আহারাদি সেরে প্রস্তুত হয়ে পড়ুন গে।" আমি প্রণাম করিলাম। ব্রাহ্মণ আমার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন "বাবা বৈদ্যনাথ তোমাকে একটি পুত্র দিন। তোমাকে না পেলে আমাদের কি দশাই হ'ত।"

বলিলাম, "আবার এ কি বলছেন, পুত্র কি!"

তিনি হাসিয়া বলিলেন "তখন কি মাথার ঠিক ছিল বাবা। পুত্র সুদুর্লভ জিনিষ,—না হলে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের ব্যবস্থা থাকত' না; ওটি চাই বাবা। ওর চেয়ে বড় প্রার্থনা, কি বড় আশীর্ব্বাদ আর নেই। আচ্ছা, তা হলে তোমাদের উচ্চ শিক্ষিত অঞ্চলে মেটে কার্ত্তিকের গোঁফেও এ কলা ফলতে সুরু হয়েছে কি বাবা? কুমোরটুলি কলকেতায় না!"

বুঝিলাম, রসময় ন্যায়ালঙ্কার নিতান্ত বেকায়দায় পড়েই এতক্ষণ বিরস মেরেছিলেন; বলিলাম, "বাঙলা দেশে বোধ হয় শিল্পোন্নতি আসন্ন, তাই এই সৌন্দর্য্যবোধটা দেখা দিয়েছে; এগুলো সাময়িক আপৎকাল মাত্র, তার পরেই নিন্না—।

"আমাদের শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্র বাবুও বলছেন—"শুধু ভারতবর্ষ নয় সব দেশের শিল্পই এমনই এক একটা দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে চলে গেছে, একটা থেকে একটায় যাবার মধ্যের পথে এই সব সঙ্কট দেখা দেয়।" ইত্যাদি। সুতরাং শাস্ত্রানুসারেও এ সময়—অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতং;—নয় কি?"

তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন—"বেঁচে থাক বাবা, চিরসুখী হও। তোমাকে পাবার মত লাভ আমার কোন দিন ঘটেনি। দুঃখ এই—এখনি হারাতে হবে,—শ্যামসুন্দরকে দেখবার জন্যে ভেতরটা বড়ই চঞ্চল হয়ে উঠেছে বাবা।"

তাঁহাদের বাসায় পৌঁছাইয়া দিয়া প্রণামান্তে ফিরিলাম। ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছি—মানুষ অবস্থার দাস না

হইলে জগতে বৈচিত্র্য বলিয়া কথাটা একটা কথার-কথা হইয়া অভিধানের মধ্যে আত্মহত্যা করিত। সে নানা অবস্থায় জগৎটাকে নানারূপে উপলব্ধি করায় বলিয়াই বৈচিত্র্য।

কানে আসিল "এই যে আপনি!" চাহিয়া দেখি—জয়হরি। সে বলিল, "আপনার জন্যে বসে বসে শেষ ঠাণ্ডা হয়ে যায় দেখে দু কাপ্‌ চা-ই খেতে হ'ল।" বলিলাম "তাইত, বড় কষ্ট দিয়েছি ত! অনুপানগুলো থাকলেই হবে, তার ত' ঠাণ্ডা হবার ভয় নেই।"

"ভয় নেই কি মশায়! ওঁরা যে আজ এক রেকাবী গরম গরম সিঙাড়া দিছ্‌লেন, ভেতরে বাদাম আর পেস্তার পুর ছিল। খেতে যা হয়েছিল মশাই, একেবারে স্বর্গং! এখন আপশোষ হচ্ছে আপনাকে খাওয়াতে পারলুম না।"

বলিলাম—"বাড়ীতে আর নেই কি? নিশ্চয়ই আছে।"

জয়হরি মাথা নাড়িয়া দুঃখের সুরে জানাইল, "না মশায়, ওইটেই আমার ভুল হয়ে গেছে, ঠাণ্ডা হয়ে গেলে খেতে পারবেননা বলে আমি যে সব চেয়ে নিলুম।"

বলিলাম,—"বুদ্ধির কাজই করেছ, ও জিনিষ ঠাণ্ডা খেলে কি আর রক্ষে ছিল!"

জয়হরি ভীতভাবে বলিল, "কেন বলুন দিকি! আমি যে খান দশেক ঠাণ্ডাও খেয়ে ফেলেছি!"

বলিলাম,—"তাতে আর হয়েছে কি? ভেতরে তো গরম জিনিষ পোরা।"

জয়হরি—"তাই বলুন মশাই!"

বলিলাম—"চা-টা ত খেতেই হবে জয়হরি।"

জয়হরি উৎসাহের সহিত বলিল, "চলুন না—বাজারে দোকান মজুদ, মুখ বদলান যাবে।"

শিল্পী—শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর] বংশীধর

জীবনটা ত দেখা গেল শুধুই কেবল কোলাহল
এখন যদি সাহস থাকে, তবে মরণটাকে দেখ্‌বি চল !—দ্বিজেন্দ্রলাল

অন্নচিন্তা

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি

আমাদের ছেলেরা ইংরেজী লেখাপড়া শিখ্‌ছে, দুতিনটা পাসও দিচ্ছে, কিন্তু সংসারক্ষেত্রে প্রবেশের সময় অন্নচিন্তায় কাতর হয়ে চোখে আঁধার দেখ্‌ছে। শিক্ষিতের স্বজাতি, শিক্ষিত। কাজেই শিক্ষিতের প্রতি শিক্ষিতের দরদ দেখা যাচ্ছে। বিজ্ঞজন এদের অবস্থা ভাব্‌ছেন, বেকার-সমস্যা এদেরই জন্য উঠ্যেছে।

কিন্তু এরা বা ক জন! আ-শিক্ষিত ভদ্র গণ্‌লে বেকার ও পেটভাতায় চাকরের দল বিপুল দেখা যাবে। বহু বহু ভদ্র আছেন, যাঁরা বিদ্যামন্দিরে প্রণামী দিতে পারেন নাই, তাঁরা নীরবে অর্ধাশনে দারিদ্র্যপাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌ছেন। গ্রামবাসী যাঁরা পার্‌ছেন, তাঁরা গ্রাম ছেড়ে শহরে যাচ্ছেন, বস্ত্রের আবরণে মলিন ও দীর্ণ দেহ আর ঢাক্‌তে পার্‌ছেন না।

ব্যাপার তুমুল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অন্যদিকে, যারা 'ইতর' নামে খ্যাত, তারাও যে সকলে সুখে আছে, তাও নয়। এরাই দেশের কারু ও কার্মিক। এদের কর্মের অভাব ছিল না; কিন্তু দুর্দৈব এই, বাহির হ'তে লোক না এলে বাঙ্গালা দেশ অচল হয়ে থাকত। কলিকাতায় পা দিলেই মনে হয়, কলিকাতা বাঙ্গালা দেশ নয়। জেলার শহরে গেলেও দেখি, কায়িক-কর্মে ও শ্রমসহিষ্ণুতায় বাঙ্গালী পরাভূত হচ্ছে।

যে সকল কারু ও কার্মিক শহরে ও শহরের কাছে বাস ক'র্‌ছে, তাদের সাংসারিক অবস্থা ভাল হয়েছে। হয়েছে বটে; কিন্তু সেটা কর্ম-সামর্থ্যের গুণে নয়, অ-বাঙ্গালীর সহিত সংগ্রাম বাধে নাই বল্যে হয়েছে। যেখানে সংগ্রাম বেধ্যেছে, সেখানে বাঙ্গালীকে হঠ্যে আস্‌তে হ'চ্ছে। অনেকের রোজগার বেড়্যেছে, কিন্তু স্থিতি হ'চ্ছে না। চওড়া ফিন্‌-ফিনা ধুতি ও গেঞ্জি ও কাটে, মদে ও জুয়ায় টাকা উড়ে যাচ্ছে। 'হঠাৎ বাবু'র কাঁচা পয়সা সহজে জীর্ণ হয় না। গ্রামে যাদের দুই এক বিঘা চাষ আছে, তারা বরং ভাল। কৃষির উৎপন্নের সঙ্গে বেতন যোগ হয়ে মোট আয় বৃদ্ধি হয়েছে, সঞ্চয়প্রবৃত্তিও আছে। যারা কৃষিজীবী, কৃষিকর্মই এক সম্বল, অত্যাপাত না ঘ'ট্‌লে, তারাও এক রকম কর্যে খাচ্ছে। কিন্তু সঞ্চয় নাই বল্যে একটু অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি, অমনই হাহাকার।

এই সকল 'ইতর' লোকের অবস্থা দেখে হঠাৎ মনে হ'তে পারে, 'ভদ্র' বেকার-সমস্যার এই ত পূরণ চোখের সাম্‌নে রয়েছে। 'ভদ্রেরা' চাষ করুন না, হাতুড়ী দিয়ে লোহা পিটুন না, মাথায় মোট নিয়ে কুলির কর্ম করুন না। যাঁরা এই উপদেশ দেন, তাঁরা ভুল্যে যান ভদ্রেও এই কর্ম ক'র্‌লে ইতরে কি কর্ম ক'র্‌বে? ভদ্রে কতক কর্ম করেন না বল্যেই ইতরের অবস্থা ভাল হয়েছে, কর্মপটুতা হেতু নয়। দ্বিতীয়তঃ গ্রামবাসী অধিকাংশ ভদ্রের জমি আছে, কিন্তু কৃষাণ অভাবে কৃষি হ্রাস হ'চ্ছে। যে কৃষিকর্মে পোষায়, তা একজনের কায়িকশ্রমে নয়। তৃতীয়তঃ, 'ভদ্র' তাঁরা, যাঁরা পুরুষানুক্রমে কায়িক শ্রম করেন নাই, এখন ক'র্‌লে সমাজে মান থাকে না, নিন্দা হয়। অনেক উপদেশক কিন্তু এ কথা জেন্যেও কানে তোলেন না, মনে করেন দেশটা বুঝি আমেরিকা, একটু ব'ল্‌বার অপেক্ষায় বস্যে ছিল! যারা অন্নচিন্তায় কাতর, তাঁরা মূর্খ হ'লেও নির্বোধ নন। ঘরের আনাচ-কানাচ হাতড়্যেও কিছু না পেয়ে জড়বুদ্ধি হয়ে পড়্যেছেন।

উচ্চশিক্ষিত বেকারের প্রতিও এই উপদেশ শুন্যে আস্‌ছি। "বাপু হে, চাকরি চাকরি করিও না, চাষ কর, ব্যবসা বাণিজ্য ধর।" কিন্তু চোরা যে ধর্মের কাহিনী শোনে না, সে কি তার দুষ্টামি? দেখ্‌ছি, উপদেশটা হাওয়ায় উড়্যে যাচ্ছে। এর অনেক কারণ আছে। প্রথম কারণ, যাঁরা উপদেশ দিচ্ছেন, তাঁরা লেখা-পড়া শিখ্যে লেখা-পড়ার কর্মই ক'র্‌ছেন, কখনও ক্ষেতে গিয়ে রোদে

তেতে জলে ভিজ্যে কোদাল ধরেন না, সিন্দুকের মতন দোকানঘরে চটের উপর বসেন না, কিম্বা হাটে হাটে গাঁয়ে গাঁয়ে ধান ও পাটের দর চর্চ্যে বেড়ান না। আমি চাকরি ক'র্‌ব, কিন্তু তুমি ক'র্‌বে না, যেহেতু চাকরি খালি নাই, এই যে যুক্তি সেটা কটুক্তি। তা ছাড়া, লেখা-পড়ার চাকরও ত চাই, নইলে সংসার অচল। চাকরির উমেদারও চাই, নইলে ভাল মন্দ বাছ্‌তে পারা যায় না। বড়লাট সাহেব চাকর, ভারত-সেনাপতিও চাকর; হাইকোর্টের জজ চাকর, আর মুদীর দোকানের কেষ্টাও চাকর। তফাৎ এই, বেতনের ও মানের। বেতনেরও তত নয় মানের যত। কুলীর সর্দারি ক'র্‌লে অনেক রোজগার হয়, কিন্তু মান নাই। মারোআড়ী মোটরেই চড়ুন, আর টাকার গদীতেই বসুন, মানীর মান পান না। মান সেখানে, যেখানে প্রভুত্ব আছে, বেতন যতই হ'ক। বাহুবলে বলার্থীর মধ্যে, ধনবলে ধনার্থীর মধ্যে প্রভুত্ব ঘ'ট্‌তে পারে, কিন্তু নৃপত্ব ও বিদ্বত্ব কদাচ তুল্য নয়। লেখাপড়ার কর্ম, বিদ্বানের কর্ম, মানের কর্ম। কেবল ধন উপাস্য নয়; ধন ও প্রাণ অপেক্ষা মান কাম্য। আদালৎ তার সাক্ষী।

এই যে প্রবৃত্তি, মানরক্ষার ও মানবৃদ্ধির ইচ্ছা, এটা বঙ্গদেশ নয়, ভারতখণ্ড নয়, পৃথিবীর সর্বত্র, বর্বর ও সভ্য, সকল মানুষকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দমন করো্য সন্ন্যাসী হ'তে গেলে নূতন করো্য সৃষ্টি ফাঁদ্‌তে হবে। বিলাতে কি অভিজাতি নাই? 'ভদ্র' ও দোকানদারের মানের প্রভেদ নাই? আমেরিকায় প্রেসিডেণ্টের পুত্র মাথায় মোট নিয়ে যেতে পারেন, কারণ সেখানে ব্রাহ্মণ নাই শূদ্র নাই, লাট নাই, লাটীও নাই। কিন্তু এ দেশ ত আমেরিকা নয়। কেবল মাথায় মোট বইবার বেলা আমেরিকা, আর বর্ণাশ্রম-ধর্মের বেলা ভারত? তাই কি ছাই বর্ণাশ্রমধর্ম আছে? বামুনের ছেলেকে আদালতের পেয়াদা হ'তে দেখ্‌লে বুঝি, বর্ণাশ্রমধর্মে দিন চলে না।

এই সুযোগে সমাজসংস্কারপ্রার্থী বলেন, বালাই গেছে, দেশটা পশ্চিমের কাছাকাছি হ'চ্ছে। কিন্তু যদি টাকার গরবে বিদ্যার গৌরব ভুলতে হয়, তা হ'লে পশ্চিমের দিকে না গেলেই ভাল ছিল। পশ্চিমের রক্তচ্ছটায় চোখ ঝল্যে গিয়েই ইতর ভদ্র,' সবার অন্নচিন্তা দারুণ হয়ে পড়্যেছে। ইস্কুল কলেজের ছেলেদিকে রাখ্‌লাম বিলাতী উদ্যানের মনোহারী নিকুঞ্জে; এখন ব'ল্‌ছি বাইরে এস! শেখালাম বিলাতী মতিগতি; এখন ব'ল্‌ছি, টেরি কাটা, মোজা পরা, বাবু সাজা চ'ল্‌বে না! কায়িক শ্রম, প্রাণধারণের নিমিত্ত কায়িক শ্রম, যাকে চৌদ্দ পনর বছর ক'র্‌তে দিই নাই, সে এখন কেমন করো্য ক'র্‌বে? কাজেই সে বণিকের দোকানে লেখা-পড়ার কাজ ক'র্‌ছে।

আরও কথা আছে। বৃত্তিমাত্রেই পাদবিশিষ্ট। চাকরি একপাদ, একা স্বশরীরে হাজির হ'তে পার্‌লেই বৃত্তি চ'লতে থাকে। আর কোনও বৃত্তি একপাদ নয়। কোনটা দ্বিপাদ, যেমন মহাজনি, ধন ও বুদ্ধি থাক্‌লে ক'র্‌তে পারা যায়; কোনটা ত্রিপাদ, যেমন কৃষি ও বাণিজ্য, ধন জন মন বা বুদ্ধি থাকা চাই। ব্যবসায় (industry), কলা (manufacture) চতুষ্পাদ, ধন জন মন ও সরণী (system) চাই।

আসল কথা এইখানে। বিদ্যাহেতু শিক্ষিতের গৌরব আছে, কিন্তু যে বুদ্ধির কথা ব'ল্‌ছি সে বুদ্ধি নাই। ছবছর বয়স হ'তে বিশ বছর তক যাকে কেবল লিখ্‌তে প'ড়তে শেখালাম, লেখাপড়ার কর্মেরই যোগ্য ক'র্‌লাম; যাকে এই সব বৃত্তির সহিত পরিচিত করাই নাই, যাকে সে বুদ্ধিই দিই নাই, সে সাঁতার না শিখ্যে কেমন করো্য জলে ঝাঁপ দিতে পা'র্‌বে?

এই অভিযোগ খাড়া করো্য কয়েকজন বিজ্ঞ দোষ দিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তাদের। তাঁরা এমন আড্ডা খোলেন কেন, যদি চাকরি জোটাতে না পা'র্‌বেন? যেন গিরিমেণ্ট ছিল ছাত্রদের খোর-পোষের ভার বিশ্ব-বিদ্যালয়কে নিতে হ'বে! ধমকে চমকে কর্ত্তারা কিন্তু ভয় পেলেন; ব'ল্‌লেন ইস্কুলে বৃত্তি শেখানা হবে, কলেজে বাণিজ্য বিদ্যায় ডিগ্রি দেওয়া যাবে। আশ্চর্যের কথা, কেহ ভাব্‌লে না, সরস্বতীর মন্দিরে লক্ষ্মীর পেচক প'শলে দুজনের একজনকে পলায়ন ক'র্‌তেই হবে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হ'ল বিদ্যা-প্রতিষ্ঠা। আর, বৃত্তি শিক্ষার উদ্দেশ্য হল, অর্থ উপার্জন। বিদ্যা ও প্রয়োগ-কৌশল এক ত নয়। যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশপথে রেখা-চিত্র

পরীক্ষা ক'র্‌তে পার্‌লেন না, তাঁরা বৃত্তিশিক্ষার কি পরীক্ষা ক'র্‌বেন, ভেবে পাই না। বসালাম ময়দার কল, এখন লোকের কথায় তাতে শুরকী ভাঙ্গ্‌তে গেলে, না পাব ময়দা, না পাব শুরকী, কলটাই ভেঙ্গে যাবে। বিশ্ববিদ্যালয় বৃত্তি শেখাচ্ছেন না, তা নয়। উকীলি, ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারি শেখাচ্ছেন। কিন্তু সে নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্থান আছে, বিপুল অর্থ ব্যয়ও হ'চ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় অন্য বৃত্তিও শেখাচ্ছেন। লেখা-পড়ার বৃত্তিও বৃত্তি। কেরাণী ও মাষ্টার, হাকিম ও উকীল, পত্রসম্পাদক ও লেখক, লাটের মন্ত্রী ও সভাসদ,—এঁরা আগাছার মতন আপনই জন্মেন নাই।

তথাপি, জীবনসংগ্রামে বাঙ্গালীর পরাভব দেখ্‌তে পাচ্ছি। এই পরাভব দুই প্রকারে দেখ্‌তে পাই। অন্য ভারতীর সহিত প্রতিযোগিতায় যে পরাভব, সেটা স্পষ্ট। আর, অন্নচিন্তায় যে আর্ত্ততা, সেটা অস্পষ্ট। মনে করি যেন, বাঙ্গালী ছাড়া স্বদেশী বিদেশী কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী বাঙ্গালা দেশে নাই। তা হ'লেই কি বাঙ্গালীর কর্মসামর্থ্য বেড়ে যেত, ধন উপার্জনের শক্তি বাড়্‌ত, না অকাল-মৃত্যু হ'তে রক্ষা পেত, না জীবনকে উৎসবময় করে্য রাখ্‌তে পার্‌ত?

অনেকদিন হ'ল ঈশ্বরগুপ্ত লিখেছিলেন,—

ব্যবসায়ে পটু নহে, সাহসবিহীন।
আলস্যের দাস হয়ে, থাকে চিরদিন॥
সর্ব্বদা ব্যসনে রত, ক্ষীণ কলেবর।
নিয়ত নির্ভর করে, দৈবের উপর॥
অতিশয় ভয়শীল, সদা মরে ত্রাসে।
জন্মভূমি ছেড়ে কভু, না যায় প্রবাসে॥
শ্রমভয়ে অল্পেতে, সন্তোষ হয় মনে।
তাদের মহত্ত্ব লাভ হইবে কেমনে॥

কিন্তু দেখ্‌ছি, অনেক বাঙ্গালী শৌর্যে ও বীর্যে, শ্রমে ও ব্যবসায়ে, ও অন্য বহুবিধ গুণে মহত্ত্ব লাভ করে্যছেন। যখন বাঙ্গালীরই মধ্যে আদর্শ পাচ্ছি, তখন উত্থানের সম্ভাব্যতা স্বীকার ক'র্‌তে হবে।

কিন্তু যখন দেখি অগণ্য বাঙ্গালী আদর্শের ধারি দিয়াও যায় না, বহু দূরে পড়ে্য আছে, তখনই মনে চিন্তা হয়, দোষ স্বভাবজ হয়ে গেছে, নানা দিকে নানা প্রতীকার চিন্তা ক'র্‌তে হবে, গোরু-হারালে-গোরু-পাওয়া-যায় মার্কা-মারা ওষুধের সাধ্য নয়। এই দোষ গ্রাম্যজনের চোখও এড়ায় নাই। তারা বলে, বাঙ্গালী তালপাতার সিপাই, বাতাসে হেলে, সোজা দাঁড়াতে পারে না। যদি দৈবক্রমে আগুনের ফুলকি গায়ে পড়ে, অমনই দাউ-দাউ করে্য জ্বলে্য ওঠে। কিন্তু সে ক্ষণমাত্র, তালপাতার আগুন থাকে না।

আমরা তাল-পাতা বটি, তেল জল মাখিয়ে রাখ্‌তে পার্‌লে মন্দ দেখাই না। কিন্তু মেষ নই, আজ্ঞানুগামিতা আমাদের কোষ্ঠীতে নাই। যদি সংহতি-শক্তি থাকৃত, তা হ'লে এই তাল-পাতা অসাধ্য সাধন ক'র্‌তে পার্‌ত, মদমত্ত হাতীকেও ধর্‌তে পার্‌ত।

এই যে বাঙ্গালী প্রকৃতি, এর গোড়া কোথায়? যখন দেখি, শিক্ষিত বাঙ্গালী এই বিপুল ধরিত্রীতে কর্মক্ষেত্র খুজে্য পান না, স্ব-স্থ হ'তে পারেন না, এক মুঠা অন্নের তরে ভিখারীর বেশে দ্বারে দ্বারে ঘুরে্য বেড়াচ্ছেন, তখন বুঝি মনের বোঝা নিজের বাঁধা, কর্ম করবার সামর্থ্য নাই, নিজের সামর্থ্যে বিশ্বাস নাই। অতএব কর্ম-সামর্থ্য বাড়াতে হবে, বিশ্বাস জন্মাতে হবে। যে কায়িক শ্রমে পরাভূত হয়, সে মানসিক শ্রমেও পরাভূত হয়, মন বইতে চাইলেও শরীর বইতে চায় না; একাগ্রতা থাকে না, বহুকালব্যাপী কর্ম সাধ্য হয় না।

এই অবস্থার তিন কারণ মনে হয়। (১) দেশজ, (২) জন্মজ, (৩) উপার্জিত। এই কারণত্রয় প্রতিপন্ন ক'র্‌তে হ'লে অনেক কথা ব'ল্‌তে হয়। এখানে সংক্ষেপে সার্‌ছি।

দেশ ব'ল্‌তে জলবায়ু সম্বলিত ক্ষেত্র। যে ক্ষেত্রে মানুষ বাস করে, তার প্রভাব মানুষের চরিত্রে প্রকাশিত হয়। জঙ্গলদেশের মানুষ দারুণ হয়, পাহাড়ে্য দেশের মানুষ শ্রমপটু হয়, উষ্ণ ও আর্দ্রদেশের মানুষ অলস হয়, ইত্যাদি। বাঙ্গালী চরিত্রের সুকুমার ভাব যে দেশের গুণে স্থায়ী হয়ে আছে, তাও স্বীকার ক'র্‌তে হবে। প্রাচীনকালের আর্যেরা সেকালের বাঙ্গালীকে বিহঙ্গম বলে্য গেছেন। কি দেখে্য বলে্যছিলেন, কে জানে। হয়ত লঘুগতি ক্ষীণদেহ দেখে্যছিলেন।

দ্বিতীয় কারণ, জন্মজ। পিতামাতার ও পূর্বপুরুষের

দোষগুণ সন্তানে সঞ্চারিত হয়। আমাদের প্রাচীন মনস্বীরা এই দেখ্যে সু-জন সৃজনের জন্য যে কত দিক ভেবেছিলেন, তা স্মরণ কর্‌লে আধুনিক পাশ্চাত্য সু-জন্য বিদ্যাকে মাথা নোয়াতে হবে। কিন্তু তাঁদের উপদেশ কেহ শুন্‌লে না মান্‌লে না। পশ্চিমদেশেও শুনুছে না মানুছে না। লোকে বুঝ্‌লে, সকলকে বিবাহ কর্‌তেই হবে, নইলে পিতৃপুরুষের পিণ্ডলোপ। বুঝলে না যে-সে পুত্র দ্বারা নরক হ'তে ত্রাণ হয় না। তাঁরা চারি বর্ণ দেখ্যে চারি বর্ণ স্বীকার কর্যে গেলেন। পরে ঘট্‌ল, চারি বর্ণের চারি কুড়ি জাতিভাগ, চারি কুড়ির চারি কুড়ি 'ঘর' ভাগ। তাঁরা ব'ল্‌লেন, সবর্ণ বিবাহ যদিও শ্রেষ্ঠ, অনুলোম বিবাহও ক'র্‌তে পার। লোকে বুঝলে, বর্ণ ও জাতি এক, জাতি ও ঘর এক। তাঁরা মৌলিক হ'তে কুলীন উৎপাদনের তরে কুলীনের লক্ষণ দিয়ে গেলেন। লোকে আধুনিক বিজ্ঞানের 'বিশুদ্ধ রেখা' (pure line) বুঝ্‌লে না, উত্তম সঙ্কলন হ'ল না; অশুদ্ধ বিশুদ্ধ মিশ্যে গেল। অতএব না প্রাকৃতিক না ব্যবস্থানুগত, বিবাহ হ'ল না, ঘুণ-ধরা কাঠে ঘুণ বাড়্‌তে লাগ্‌ল। যতোধর্ম স্ততো জয়ঃ— এই সত্য ভুল্যে গিয়ে সন্তানে কি ধর্ম কি গুণ থাক্‌লে সে জয়ী হবে, সে ভাবনা কারও হ'ল না। কিন্তু দেশের হাওয়া বদ্‌লাবার নয়, সমাজবিধিও সহজে পরিবর্তিত হয় না। কাজেই উপার্জিতের প্রতিই লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে।

গোড়ার কথা আবার ভাবি। জীবন সংগ্রামে বাঙ্গালী অযোগ্য হয়ে প'ড়্‌ছে; শিক্ষিত, আ-শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ভদ্র অ-ভদ্র সবাই। দুদশজনের কৃতিত্ব দেখ্যে একটা রয়ের (race) কৃতিত্ব বুঝ্‌তে পারা যায় না। বরং দ্রুম দেখ্যে বুঝি, এরণ্ডের অরণ্যে আরও দ্রুম জন্মিতে পা'র্‌ত। অসামর্থ্যের কারণ দেহের বলের অভাব ও শিক্ষার দোষ।

কৃশ দেহেও বল থাকৃতে পারে, আর স্থূল দেহও দুর্বল হ'তে পারে। অতএব দেহ দেখ্যে বলাবল নির্ণয় ক'র্‌তে পারা যায় না। আয়ুর্বেদে বলবানের লক্ষণ উক্ত আছে, সে লক্ষণ, চেষ্টা-পটুতা। চেষ্টা—কায়িক কর্ম, সে কর্ম শরীর দ্বারা সাধ্য। যে কায়িক কর্মে পটু, সমর্থ, সে বলবান্। যে শক্তে পেলে ব'স্‌তে চায় না, ব'স্‌তে পেলে উঠতে চায় না, যার মুখ ম্লান, শরীর বিবর্ণ, যার তন্দ্রা ও নিদ্রা সর্বদা, তাকে বলবান্ ব'ল্‌তে পারা যায় না। কারণ বলের এমনই গুণ, মানুষকে নিশ্চেষ্ট হ'তে দেয় না। তখন উৎসাহ, অধ্যবসায়, নিরালস্য আপনই আসে। সুস্থ ব্যক্তিরও লক্ষণ কতকটা এই। তার শরীরানুরূপ কর্মসামর্থ্য থাকে, তার ইন্দ্রিয় ও মন প্রসন্ন থাকে। যার না থাকে, তাকে আমরা রো-গা, অর্থাৎ রুগ্ন বলি।

গণ্‌তিতে বাঙ্গালী সাড়ে চারি কোটি, কিন্তু ক জন স্ব-স্থ, এবং ক জন বলবান্? নারী, বালক, বৃদ্ধ বাদ দিলে যে যুবা থাকে, তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখলেও ক জন? নগর-বাসী দেখ্‌লেও চল্‌বে না। গ্রামবাসী দেখতে হবে। কলিকাতায় যে সব ছাত্র কলেজে প'ড়্‌ছে, তারা দেশের মধ্যবিত্ত ও ধনী ভদ্র শ্রেণীর সন্তান। বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে প্রায় সাত হাজার ছাত্রের দেহ নিরীখ করা হয়েছে। দেখা গেছে, শতকে ষাটি স'ত্তর জনের দেহ রুগ্ন। অর্ধেক কুঁজা হয়ে দাঁড়ায়, আর মাত্র আটজন সংহত-গাত্র! বাকি নিরানব্বই জন কি কর্মের যোগ্য? বাঙ্গালী যে টানা-পাখার নীচে চেয়ারে হেলান দিয়ে কেরাণী হ'তে ভালবাসে, তার একটা কারণ এখানে। বাঙ্গালীর যে সংহতি-শক্তি নাই, তারও একটা কারণ এখানে। বলবান্ পরস্পর মিল্‌তে পারে; দুর্বল পারে না। একাকী প্রাণ-গতিক ভালয় ভালয় চালাতে চায়। দুষ্টবুদ্ধি আশ্রয় ক'র্যে পরকে ফাঁকি দিয়ে নিজে বড় হ'তে চায়। এ কথা সত্য, বাঙ্গালী মেলেরিয়ায় জর্জর। দু পুরুষ ধর্যে এই দারুণ ব্যাধি ভোগ ক'র্‌লে, বল-বীর্য কত থাকবে? বিপদ এই, কার্য ও কারণ এক হয়ে গেছে, বলহানির কারণ মেলেরিয়া, মেলেরিয়ার কারণ বলহানি।

আমাদিকেই কিন্তু এই সঙ্কট হ'তে মুক্তির পথ দেখ্‌তে হবে। স্বর্গ হ'তে ইন্দ্র আস্‌বেন না, বরুণও আস্‌বেন না, হাত ধর্যে পথ দেখিয়ে দিবেন না। "দেশ ত দেশেই আছে কি তার উদ্ধার—" এ কথা আর কতকাল বল্‌তে থাক্‌ব? গ্রাম পরিষ্কার, পুকুর পরিষ্কার কে না চায়? কিন্তু ইচ্ছা থাক্‌লেও চেষ্টার অভাব; কারণ খাটবার শক্তি নাই, এই হেতু প্রবৃত্তি নাই।

আশা এই, অভ্যাস দ্বারা শক্তি বাড়াতে পারা যায়।

ব্যায়াম দ্বারা বল লাভ ক'র্‌তে পারা যায়। ব্যায়াম দ্বারা শরীরের লঘুতা হয়, কর্মসামর্থ্য বৃদ্ধি হয়, দেহ সুঠাম হয়, আর রোগও দৃঢ়গাত্রকে সহসা আক্রমণ কর্‌তে পারে না। ব্যায়াম ও খেলা এক নয়। ফুটবল, ক্রিকেট কিংবা হাডুডুডু নুনকোট প্রভৃতি খেলার গুণ আছে। কিন্তু ব্যায়ামের চারি গুণ ক্রীড়াতে নাই। ইস্কুলে যে চলন (Drill) ও চার-কর্ম (scouting) শেখানা হ'য়, তার-ও গুণ আছে, বিনয় লাভ হয়। কিন্তু ব্যায়ামের ফল হয় না। বি-আয়াম—দেহের যাবতীয় অঙ্গ প্রসারিত করা। প্রসারণের পর সঙ্কোচন। যে অঙ্গ যেমন সরু যেমন মোটা হ'লে শরীর সুন্দর হয়, সুঠাম হয়, তা ব্যায়াম দ্বারা হ'তে পারে, ক্রীড়া দ্বারা নয়। ব্যায়ামের এক রূপ মল্লক্রীড়া বা কুস্তি। ইহার প্রধান লক্ষ্য, আত্মরক্ষা। বাহু দ্বারা, লাঠি দ্বারা, অসি দ্বারা, যাহা দ্বারা হউক, ব্যায়ামের লক্ষ্য আর মল্লক্রীড়ার লক্ষ্য এক নয়।

বাল্যকালে দেখেছি, গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় আখড়া ছিল। সে আখড়ায়, ভদ্র ইতর, সকলকেই দেখ্‌তে পেতাম। কিন্তু মেলেরিয়ার পর হ'তে আখড়া-টাখড়া সব উড়ে্য গেছে। তখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি, জ্বরের কোঁ-কোঁ-রবে বাহুর অস্ফোট ডুবে্য গেল। এখন সামান্য চোরের ভয়ে লোকে দরজায় খিল আঁটে, তখন ডাকাত প'ড়্‌লে ধ'র্‌তে দৌড়াত। পুরীতে এখনও পঞ্চাশটা আখড়া আছে, পাণ্ডাদের শরীর দেখ্‌লে বুঝি সে গুলায় এখনও চাবি পড়ে নাই। চাবি দিবার জো নাই, পাণ্ডারাই যাত্রীর রক্ষক। পূর্বকালে শত্রুর আক্রমণ হ'তে তাঁরাই মন্দির রক্ষা কর্‌তেন। কিন্তু আর বুঝি সে দিন থাক্‌ছে না। একদিকে মেলেরিয়া ঢুকছে, অন্যদিকে ছেলেরা ইস্কুল কলেজে পাঠ পড়তে আরম্ভ করে্যছে। এ এক আশ্চর্য-কথা, ইংরাজী ইস্কুলে ঢুক্‌লে মতি আর পূর্বপথে চলে না। গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে দেশের কি ঘোর পরিবর্তন হয়েছে, তা স্মরণ হলে স্তম্ভিত হ'তে হয়। আজ যদি বিদ্যাসাগর নব্য হ'য়ে জন্মিতেন, একখান বাঁশ নিয়ে দামোদরের বানে ঝাঁপিয়ে প'ড়তে কদাপি পার্‌তেন না।

বলহানির আরও এক কারণ ঘটে্যছে। পূর্বকালের দুধ ঘি নাই, মাছ মাংস নাই, যেন শনির দৃষ্টিতে অন্তর্হিত হয়েছে। সে ভোক্তা নাই, সাবু খেলেও অম্বল হ'চ্‌ছে। শাগ-ভাত-মুড়ি—পশ্চিমবঙ্গের গ্রামবাসীর নিত্য খাদ্য হয়েছে। পূর্ববঙ্গ এখনও ভাল আছে, পুষ্টিকর ও বলকর অন্ন এখনও পাচ্‌ছে। আমার বিশ্বাস, এই খাদ্যগুণে পূর্ববঙ্গের ওজস্বিতা ও উদ্যম দেশের মুখ রক্ষা ক'র্‌ছে। সেন্‌সস্‌ রিপোর্টেও আমার যুক্তির সমর্থন আছে। পশ্চিম-বঙ্গে প্রজাক্ষয় হ'চ্‌ছে; সারা বঙ্গে যে কিছু বৃদ্ধি, সে পূর্ববঙ্গের কল্যাণে।

কি দুঃখ! শক্তিসাধকের দেশ শক্তিহীন হ'চ্‌ছে! ক্রমশঃ নিরামিষাশী হয়ে প'ড়্‌ছে, কিন্তু নিরামিষাশীর বলকর ও পুষ্টিকর দুধ ঘি পাচ্‌ছে না। কেবল ভাত ও ডালের জলে জীবন রক্ষা হ'তে পারে, কিন্তু এই পর্য্যন্ত। ঘিয়ের নাম নাই, তেলও না থাকার মধ্যে। লোকে জানে না, কিসে কি হয়, একটা খাদ্য ক'মলে তার কি পরিবর্ত ধ'র্‌তে হয়। আর কত অগণ্য নরনারী দুবেলা পেট ভরে্য নুন-ভাতও পায় না, তা ধনশালী কলিকাতাবাসীর কল্পনাতেও আস্‌বে না। এক বেলা ভাতডা'ল, আর বেলা ডা'লরুটি খেতে ব'ল্‌লে দেশকে উপহাস করা হবে। তথাপি জানি, পশ্চিমা দরিদ্র লোকেও ডাল রুটি খায়। এমন কি, ভারতের প্রধান খাদ্য ভাত নয়, রুটি। কেবল বাঙ্গালা দেশ নিয়ে ভারতের পূর্বভাগে ভাত প্রধান খাদ্য। সে যা হ'ক, ব্যায়ামের সঙ্গে সঙ্গে খাবার দেখা উচিত। কৃশ ও ক্ষুধিতের ব্যায়াম নিষিদ্ধ। ক্ষুধার্ত হ'লে, প্রকৃতি বলেন, বিশ্রাম কর; যদিও ইস্কুলে ইস্কুলে এই বিধি নিত্য ভাঙ্গা হ'চ্‌ছে। আহারের পর, প্রকৃতি বলেন, বিশ্রাম কর। কিন্তু কে সে আজ্ঞা পাল্‌ছে, খেয়েই সকলে বিদ্যা-স্থানে ও কর্মস্থানে ছুট্‌ছে। সে বিদ্যায় কি হ'বে, যদি লাভ ক'র্‌তে অগ্নিমান্দ্য জন্মে, বাড়ন্ত মুখে শরীর ভেঙ্গে যায়? দুবেলা ইস্কুল কলেজ স্বচ্ছন্দে চ'ল্‌তে পারে; চ'ল্‌ছে না, যেহেতু যাঁরা চালিয়েছেন, তাঁরা দুবেলা ইস্কুলে যান নাই।

সুস্থ থাক্‌বার নিমিত্ত আনন্দ-উৎসবের কি প্রয়োজন, তা এখন যুক্তি দ্বারা বুঝতে হ'চ্‌ছে। কলেজের উচ্চ শ্রেণীর এক ছাত্র একবার আমায় জিজ্ঞাসা করেছিল, তৃষ্ণা কাকে বলে। সে লক্ষণ দিয়ে মিলাতে চায়, তার তৃষ্ণা পায় কি না। আনন্দ উপভোগ সম্বন্ধেও আমাদের অবস্থা অস্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে, লোককে বুঝাতে হ'চ্‌ছে, আনন্দ চাই। ইন্দ্রিয় ও মনের স্ফূর্তি না থাকলে স্বাভাবিক মানুষের

বাঁচাই কঠিন। দেশে বহু উৎসব ছিল, হিন্দুর জীবনই উৎসবময়; দুর্গাপূজা শ্যামাপূজা প্রভৃতি পূজা পূর্বকালের যজ্ঞ। কিন্তু সে ঘটা গেছে, উৎসাহ গেছে, যজ্ঞের হোমমাত্র আছে। এর এক কারণ অর্থাভাব; প্রধান কারণ, ইংরেজী শিক্ষিতেরা এখন সমাজশাসক, যাঁরা মনে করেন উৎসবে যোগ দেওয়া কুসংস্কার। আরও শোচনীয়, তাঁরা আনন্দ উপভোগের সামর্থ্য হারিয়েছেন। থিয়েটার হ'লে মন্দ নয়, কিন্তু উপলক্ষ কই? বারোয়ারী, বার ভূতের কাণ্ড! এখন শিখেছেন, "দরিদ্র নারায়ণ"! আত্মারাম না হয়ে নারায়ণ দেখছেন, দরিদ্রে! বর্ত্তমান শিক্ষার এ কি পরিণাম! বিদ্যা-আয়তনের ভিৎ না বদ্‌লালে রক্ষা নাই।

অন্নচিন্তা লঘু ক'র্‌তে হলেও ভিৎ বদ্‌লাতে হবে। কিন্তু সে ত অল্প কথায় ব'ল্‌বার নয়। সাত আট বৎসর পূর্বে 'প্রবাসী' পত্রে তিন প্রবন্ধে শিক্ষার ধারা পরিবর্তনের কথা লিখেছিলাম। সূত্রটা সেখানে আছে, এখানেও আছে। বিদ্যালয় চাই, বিশ্ববিদ্যালয় চাই; সে সবে লক্ষ লক্ষ বালক ও যুবা কাতারে কাতারে প্রবেশ করুক। কিন্তু যারা পূজারী, তারাই করুক; অন্যে গেলে অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হয়। কারণ এরা সন্ন্যাসী নয়, ভেখধারী। যে সকল ছাত্র বুদ্ধিমান্, মেধাবী ও শ্রমশীল, তারাই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের যোগ্য। এমন ছাত্র শতকে পাঁচ জন মেলে কি না, সন্দেহ। এদিকে পড়াতে হবে, দক্ষিণা নিয়ে নয় দরকার হ'লে বেতন দিয়ে পড়াতে হবে, এদের জন্য রাজকোষ উন্মুক্ত রাখ্‌তে হবে, যত কাল চাইবে তত কাল পালন ক'র্‌তে হবে। কারণ দেশে বিদ্বান্ চাই, পণ্ডিত চাই। এরা পরে চাকরি করুক, কি বাণিজ্য করুক, যে কর্মই করুক তাতেই দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে। শিক্ষার ব্যয় বহু লাভে পূরণ হবে। পূর্বকালে এমনই করে ব্রাহ্মণ জন্মেছিলেন। আর এক শ্রেণী আছে, যাদের অন্নচিন্তা নাই, লক্ষ্মীর কৃপায় চাকরির উমেদার হ'তে হবে না, এরাও কলেজে যাবার যোগ্য। এখানেও দেশের স্বার্থ দেখ্‌ছি। অনেকে বিলাতী ব্যসনে মত্ত হবে বটে, কিন্তু এমন লোকও পাব যাদের ধন ও বিদ্যার গুণে দেশের নানা দিকে হিত হ'তে পারবে।

এই দুই শ্রেণী ছাড়া, যাকে অন্নচিন্তা ক'র্‌তে হবে, তাকে প্রথম হ'তে শ্রমসহিষ্ণু আত্মনির্ভরশীল স্ব-স্থ ক'র্‌তে হবে। এর অর্থ এমন নয় যে সে মূর্খ থাক্‌বে, অবিনীত হবে। চাকর্যো, কারু, কলাজীবী, বা বণিক হ'তে গেলে যে বিদ্যা চর্চা কমাতে হবে, তা নয়। বর্তমান শিক্ষায় কিন্তু এই হ'চ্ছে। দোকানী জাহাজের খবর রাখ্‌ছে না, উকাল মকদ্দমা ছাড়া কথা কন না, হাকিম বড় হাকিমের মেজাজ ছাড়া আর কিছু লক্ষ্য করেন না। অবশ্য বহু বহু ব্যতিক্রম আছে। তথাপি ব'ল্‌তে পারি জীবিকা উপার্জন ছাড়া আরও কিছু আছে, যা নইলে জীবন অপূর্ণ থাকে। মানব জমীন্ যে কত পতিত আছে, তার সংখ্যা হয় না।

ইস্কুল, কলেজ, হোষ্টেল, প্রভৃতি নামগুলি তুলে দিয়ে দেশী নাম রাখা আবশ্যক হয়েছে। কারণ ভাবানুষঙ্গ হেতু বিলাতের অনুকরণ ইচ্ছা হয়। বোধ হয়, এখন কোনও শিক্ষক বাঙ্গালা ভাষায় বিদ্যাভ্যাসের বিরোধী নন। শুন্যেছি, নাকি শিক্ষকের ধুতি চাদরে বাঙ্গালী হয়ে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করার হুকুম নাই। আপাদকণ্ঠ বস্ত্রাচ্ছাদিত না হ'লে যে শিক্ষণ কর্মে বিঘ্ন হয়, তাও ত নয়। ইংরেজ শিক্ষক তাঁর দেশের পোষাক পরেন, আমরাও আমাদের দেশের প'র্‌ব। শিক্ষা বিভাগের আইনে যদি আমাদের ধুতি পরা নিষেধ থাকে, তা হ'লে অবিলম্বে তার রদ হওয়া উচিত। বেশভূষা, চা'ল-চলন, ভাব-ভঙ্গি, ক্ষুদ্র বিষয় নয়। কৃত্রিমতার আবরণ দেখ্‌তে দেখ্‌তে মানুষ কৃত্রিম হয়ে পড়ে, নিয়মের দোহাই দিয়ে আত্মরক্ষা করে। ইংরেজী ভাষা শেখাতে যদি ইংরেজ সাজ্‌তে হয়, জাপানী শেখাতে জাপানী সাজ্‌তে হয়, তা হ'লে দেশকে ছোট করে ভাষাটাকেই বড় করে তুলি। ইস্কুল কলেজের হোষ্টেলের দেশী নাম, মঠ। তফাৎ এই, মঠ চলে ধার্মিকের দানে, হোষ্টেল চলে ছাত্রের দক্ষিণায়। যদি হোষ্টেলকে মঠ বলি, মঠের নিত্য নৈমিত্তিক বিনা আপত্তিতে চ'ল্‌তে পার্‌বে। মঠের ছাত্রদের চাকর নাই, বহু স্থলে পাচকও নাই। ধনীর ছেলে যদি নিজের কাপড় নিজে কাচ্‌তে, নিজের বাসন নিজে মাজ্‌তে, হাট বাজার গিয়ে দ্রব্যাদি বয়ে আন্‌তে না পারে, তা হ'লে মঠে তার না আসাই উচিত। এই ভাব কিন্তু এ দেশী নয়। আমাদের দেশে ছাত্রের আদর্শ,

ব্রহ্মচারী। এই আদর্শ হঠাৎ পরিবর্তন করাতে ছাত্রের চরিত্র দেশের বিসদৃশ হয়ে পড়্যেছে। সে আসন-আহ্নিক নাই, সে ব্যায়াম নাই, সে উৎসব নাই, সে আত্ম-সংযম ও আত্ম-মান নাই। ইস্কুল-কলেজে দুই এক ঘণ্টা 'নীতি' উপদেশ দিয়া ছাত্রদিকে 'মানুষ' কর্‌বার প্রয়াস, নিতান্তই হাস্যকর। মঠের নীতিতেই ছাত্রেরা মানুষ হয়ে ওঠে। এই হেতু সকল ছাত্রকে মঠে থাক্‌তে হবে; নিকটে বাড়ী কি বাড়ীর গাড়ি থাক্‌লেও মঠে থাক্‌তে হবে।

বিদ্যালয় অবশ্য বিদ্যালয় থাক্‌বে। শিক্ষার ক্রম প্রথম হ'তে প্রাচ্য ক'র্‌তে হবে; ইংরেজী শিক্ষা ছাত্রের বার বছর বয়সের পর আরম্ভ ক'র্‌তে হবে। শিক্ষার প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ক্রম আছে। ইদানী বি-টি পাশ হয়ে শিক্ষকেরা বুঝ্‌ছেন, দুই ক্রমে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। পশ্চিমদেশের বহু শিক্ষা-বিদ্যাবিৎ বালচরিত্র লক্ষ্য করে্য সে দেশের সনাতন বৃদ্ধশিক্ষা তুল্যে দিয়ে বালশিক্ষা প্রচলিত করে্যছেন। বালশিক্ষাক্রমই প্রাচ্যশিক্ষাক্রম। এই ক্রম সফল, অন্য ক্রম বিফল। তথাপি, ব'ল্‌তে দুঃখ হয়, ক্রমের সূত্রটা ছেড়্যে অনেকে কাঁচের পুঁতি কুড়িয়ে বেড়ান। বিদ্যালয়ে বৃত্তিশিক্ষা চ'লবে না, রথ দেখা আর কলা বেচা কখনও এক সঙ্গে চ'লে না। তেমনই কলা-শিক্ষাও চ'ল্‌বে না, কিন্তু কলার সূত্রশিক্ষা, বিদ্যার নিমিত্ত, কর্তব্য। কণ্ঠে হ'ক, যন্ত্রে হ'ক, গীতের যেমন স্বরগ্রাম আছে, যাবতীয় কলারও তেমন আছে। এটা যন্ত্রবিদ্যা (mechanics) নয়, কর-শিক্ষা (manual training)। শুন্যেছি, বঙ্গদেশে মাত্র কয়েকটা ইস্কুলে কর-শিক্ষা আরম্ভ হয়েছে। যদি চিত্র-লেখনের তুল্য বাস্তবস্তু বিবেচিত না হয়ে মানব-প্রকৃতির সহিত কর-শিক্ষার সম্বন্ধ স্পষ্ট উপলব্ধ হয়, তা হ'লে এই শিক্ষা সার্থক হবে, অন্যথা কালক্ষেপ মাত্র।

উচ্চ বিদ্যালয়ে, কলেজেও দেখা গেছে, বালশিক্ষাক্রম সফল হয়, বৃদ্ধশিক্ষাক্রম চর্বিতচর্বণ মাত্র। কিন্তু চর্বিত-চর্বণে আমরা এত দক্ষ হয়েছি যে আখের ক্ষেতে আখ ভেঙ্গে চিবাতে গেলে দাঁতই ভেঙ্গে যায়; যেখানে যাই, সেখানেই থোড়-বড়ি-খাড়া। খেয়ে খেয়ে ছেলেদের অরুচি জন্মে, তারা ঘড়ীর ঘণ্টা গণ্‌তে থাকে, ছুটি পেলে মুখ বদ্‌লাতে ঘরে দৌড়ে। কিন্তু পালাবার জো নাই, অষ্ট বাঁধনে অষ্টাঙ্গ বাঁধা আছে, না শিক্ষকের না ছাত্রের হাত পা মেল্‌বার জো আছে। ছাত্রেরা চৌদ্দ পনর বৎসর কারা ভোগ করে্য পাকা কয়েদী হয়ে যায়, মুক্তির পরোয়ানা পেলেও ঘরে যাবার পথ খুঁজে্য পায় না। পোষা পাখী পিঁজরা ভুল্‌তে পারে না, ঘুরে্য ঘুরে্য পিঁজরার কাছে আসে। চাকরি, সেই পিঁজরা, ছাতু আছেই আছে। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় বলে্যছিলাম অনেক জায়গায় অনেক হাঁড়ীতে থোড়-বড়ি-খাড়ার ডাল্‌না রান্না হ'চ্‌ছে, নূতন হাঁড়ীতে একটু নূতন ব্যঞ্জন রান্না হ'ক, বালক্রমে প্রয়োগ হ'তে বিদ্যায়, মূর্ত বিজ্ঞান হ'তে অমূর্ত বিজ্ঞানে যাবার পথ খোলা হ'ক। কথাটা কর্তাদের মনে লাগে নাই। কারণ এর মানে সীমা-লঙ্ঘন! গণ্ডীর মাহাত্ম্য লোপ, জাতি-নাশ! আমার হাঁড়ীর ডাল্‌না তুমি খাবে, তোমার হাঁড়ার ডাল্‌না আমাকে খেতে হবে! সুজ্জিঠাকুর চৌদশ দিন নাই উঠুন, কিন্তু বিহার-ওড়িয়্যাবাসী বাঙ্গালা দেশে যাবে, আর বাঙ্গালা-বাসী বিহার-ওড়িষ্যায় আস্‌বে, টাকার জন্য যেতে আস্‌তে পারে, কিন্তু বিদ্যার জন্য যাবে আস্‌বে? দেশভক্তেরাও ব'ল্লেন, সে যে প্রলয় কাণ্ড! এই সকল রুদ্ধগবাক্ষ অচলায়তন উৎপাটিত না হ'লে কোনও প্রদেশের শিক্ষা-সমস্যার সমাধান হবে না।

অথচ কলা-শিক্ষার ব্যবস্থা ক'র্‌তে গেলে এই প্রলয়-কাণ্ড না ঘটিয়ে গতি নাই। জেলার শহরে দু চারিটা বিদ্যালয় থাক্‌তে পারে, কিন্তু কলা-শিক্ষালয় একটা বই দুটা থাক্‌তে পারে না, একটা কলা বই দুটা কলা শেখানা যেতে পারে না। ব্যয় বাহুল্য ভাব্‌ছি না, ভাব্‌ছি শিক্ষিতের অন্ন। মনে করি যেন কোথাও কামারের কাজ শেখানা হ'চ্‌ছে, বছর বছর বিশ পঁচিশ দক্ষ কামার তৈয়ার হ'চ্‌ছে। কিন্তু পরে খাবে কি? গোলাম-খানা, উকীলখানার বিরুদ্ধেও ত এই অভিযোগ।

অথচ দেখ্‌ছি, অকর্মণ্য অ-শিক্ষিত কারু সচ্ছন্দে গ্রামে থেকেই অন্নচিন্তা লঘু ক'র্‌তে পেরেছে। এরা যে জীবনসংগ্রামে টিকে্য আছে, তা তাদের নিজের গুণে নয়, কর্মসামর্থ্যে নয়, লোকের দয়ায় নয়, প্রকৃতির নিষ্ঠুরতায় ও আমাদের নির্বুদ্ধিতায়। যে দেশে মুড়ি-মুড়কির সমান দর, সে দেশে মুড়কি দুর্লভ। কর্ণিক হাতে

নিলেই যে রাজমিস্ত্রী হয়, আর বিকালবেলা একটা চক্‌চকে টাকা হাতে পায়, তার শিক্ষার প্রয়োজন কোথায়? এইরূপ, সকল কর্মেই। আমরা গুণীর আদর ক'র্‌তে শিখি নাই, তাই গুণহীনে দেশ ভ'রে গেছে।

অথচ কারুর কর্মসামর্থ্য বাড়াতে হবে; কেবল মাথার সামর্থ্য বাড়ালে হাত পা পঙ্গুত্ব প্রাপ্ত হবে। কারুর কর্ম-সামর্থ্য ও দক্ষতা বাড়াবার অভিপ্রায়ে দুপাঁচটা কারু-শিক্ষালয় (Industrial school) স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু সে সব অভাবের পর পূরণ নয়, কারুকরি শিক্ষার্থীর ইচ্ছায় নয়, কাজেই জলপানি যুগিয়ে চালাতে হ'চ্ছে। প্রথম প্রথম এতে দোষ নাই; কিন্তু শিক্ষিতকে দেখে অন্যে শিখ্‌তে আস্‌ছে না কেন? অতএব ব'ল্‌তে হবে, উদ্দেশ্য সাধু বটে, কিন্তু কল্প প্রশস্ত নয়। পৃথক শিক্ষালয়ের সময় এখনও আসে নাই, পৃথক শিক্ষাশালা আমাদের দেশের কল্পও নয়। এখানে একটা দৃষ্টান্ত দিই। বর্তমানে এম্‌ ই ইস্কুলগুলা প্রায় উঠে যাচ্ছে। কোনটা উচ্চ ইংরেজী ইস্কুলে পরিণত হচ্ছে, কোন্‌টা কম বেতনে উচ্চ ইস্কুলের নীচের ধাপ হয়েছে। কারণ ইস্কুলে ঢুকলেই কর্ম-তীর্থে যাবার ট্রেনের টিকিট কাটা হয়। দরিদ্র যাত্রী পাসেঞ্জার ট্রেণে ওঠে, ধিকি ধিকি যায়, থার্ড ক্লাসে কষ্ট খুব, কিন্তু ভাড়া কম। তীর্থের গরিমা শুনেছে, কিন্তু কষ্ট ভুগে নাই। এ সকল যাত্রীর নিমিত্ত চাই ধর্মশালা; শিক্ষালয় সে ধর্মশালা। শিক্ষালয়, বিদ্যালয় বটে, আরও কিছু। গ্রামে শিক্ষালয়, চারি পাশের গ্রামের ছেলেরা আসে। বার বছর বয়স পর্য্যন্ত বিদ্যালয় ও শিক্ষালয়ে শিক্ষা সমান হবে। তার পর প্রভেদ। বিদ্যালয়ের যোগ্য ছাত্র বিদ্যালয়ে যাবে, শিক্ষালয়ের যোগ্য ছাত্র সেখানে থাকবে। দেখ্‌তে হবে, চারি পাশের গ্রামে কোন্‌ কারুর অভাব আছে। প্রথমে তার কর্ম শেখাতে হবে। কতকগুলি আমাদের সর্বদা আবশ্যক হয়, যেমন গৃহনির্মাণ। গৃহনির্মাণ একার দ্বারা হয় না। পূর্বকালে চারি ভাগ ছিল, এবং যদিও চারি ভাগের সবাই শিল্পী নাম পেত, প্রত্যেকের নাম ও কর্ম পৃথক ছিল। প্রথম শিল্পী স্থপতি, যিনি গৃহ স্থাপনা (plan) করেন। তিনি স্থাপনা কর্মের যোগ্য, সর্ব-শাস্ত্রবিৎ ধার্মিক, গণিতজ্ঞ, চিত্রজ্ঞ, সর্বদেশজ্ঞ, পুরাণজ্ঞ, সত্যবাদী, মৎসরাদিরহিত। এইরূপ স্থপতি ভুবনেশ্বরের মন্দির স্থাপনা করেছিলেন, যে-সে কারুর দ্বারা হয় নাই। তার পর সূত্রগ্রাহী, স্থপতির পুত্র বা শিষ্য, গুণে প্রায় তুল্য, স্থপতির মতিগতিপ্রেক্ষক হয়ে মান উন্মান প্রমাণাদি নির্ণয় ক'র্‌তেন। তদনুসারে তক্ষক কাষ্ঠাদি স্থূল বা সূক্ষ্ম ক'র্‌তেন। তার পর মৃৎশিলা কাষ্ঠাদি সম্মেলনপটু বর্ধকি গৃহ নির্মাণ করতেন। এই চতুষ্টয় বিনা দেবালয়, মনুষ্যালয়, কোন গৃহ নির্মিত হ'ত না। প্রাসাদশিল্প হ'ক, কুটীরশিল্প হ'ক, যে শিল্পই হ'ক, একটা বিদ্যা, বাস্তুবিদ্যা। এখন সে বিদ্যা লুপ্ত হ'তে চলেছে, অথচ নিত্য প্রয়োজনীয়। এই রূপ, কামারের কর্ম। বহু গ্রাম আছে যেখানে দুই এক ক্রোশের মধ্যে কামার নাই, যদি বা আছে, হাতুড়ে। এইরূপ, অভাব দেখে যদি কলাশিক্ষা দেওয়া হয়, শিক্ষিতেরা অক্লেশে আত্মমান রক্ষা ক'র্‌তে পারবে, অন্যে অন্য বৃত্তি শিখ্‌তে প্রবৃত্ত হবে, চাকরির মোহও কাট্‌তে থাকবে।

যেখানে তাঁত ব্যবসায় আছে, পিতল কাঁসার ব্যবসায় আছে, যেখানে যে ব্যবসায় আছে, সেখানে সে-সে ব্যবসায়ের বিদ্যা শেখালে ছাত্রের সহজে পটুতা হবে, ব্যবসায়ে যোগ দিতে প্রবৃত্তি হবে, পরে তা সফলও হবে। যেখানে গঞ্জ আছে, সেখানে ব্যাপার কর্ম। মারোআড়ী কত সহজে ব্যাপার করে, আমরা আশ্চর্য হই। তারা যে পাঠশালায় প'ড়্‌বার সময় ব্যাপার ক'র্‌তে শেখে, সে বার্তা রাখি না। তার পক্ষে ব্যাপার করা নূতন নয়। কে না দেখেছে, যে ছেলে দোকানে বসে, সে বড় হয়ে অক্লেশে দোকানী হয়। এম-ই, ইস্কুল, ইস্কুল; ছেলেরা আস্‌বে, বিদ্যা অর্জন ক'র্‌বে, সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তিজ্ঞানও ক'র্‌বে। শুনেছি, এমন ইস্কুল আছে, পাদ্রী সাহেবেরা করেছেন। ক্রমে এই কল্পনা উচ্চ ইংরেজী ইস্কুলে চালাতে হবে, ক্রমে কলেজেও চল্‌তে পারবে।

এখানে একটা কথা উঠ্‌বে। এ সব শেখাবার টাকা কোথায়, শিক্ষক কোথায়? বাস্তবিক, যদি অট্টালিকা না হলে কিংবা অমুক কোম্পানীর বেঞ্চি না পেলে শিক্ষালয় হবে না মনে হয়, তা হ'লে টাকা নাই, হাত পা গুটিয়ে কুবেরের মুখপানে চেয়ে থাকলেও নাই। যদি সর্বশাস্ত্রবিৎ স্থপতি নইলে শিক্ষালয়ের স্থাপনা হ'তে পারে না মনে হয়, তা হ'লে বাস্তবিক শিক্ষকও নাই। শিক্ষক গ'ড়ে নিতে

হ'বে, বিদ্যালয়ের শিক্ষক হ'তে বেছে নিতে হবে। শিক্ষক যে অনেক চাই, তাও নয়। কারণ এক একটা বৃত্তি দু চারি বছর মাত্র এক শিক্ষালয়ে চ'ল্‌তে পারবে, তার পর বদ্‌লাতে হবে। জেলার শহরে নানা বৃত্তি চ'ল্‌ছে, বিলাতী কলের জিনিসে বাজার ভরো আছে। সেখানেও দু চারি বছর পরে কলা বা বৃত্তি বদ্‌লাতে হবে। মনে করি যেন একটা জেলায় উপস্থিত দশটা বৃত্তি শেখার প্রয়োজন আছে। মনে করি যেন সকল প্রয়োজন সমান, টাকাও অল্প। তখন দশ জন শিক্ষক স্ব স্ব সাজ নিয়ে দু চারি বছর ছাড়া শিক্ষালয়ে শিক্ষালয়ে শিখিয়ে বেড়াবেন। কি করো সাবান ক'র্‌তে হয়, কিংবা জুতার কালী ক'র্‌তে হয়, সে সব কলা গ্রামিক নয়। গ্রামে যা ছিল বা লুপ্তপ্রায়, আগে তাকে রক্ষা করি; প্রথমে ক্ষেম তার পর যোগ।

গ্রামে ও নগরে কত যুবা কারু ও কার্মিক আছে, শিক্ষা অভাবে কর্মপটুতা নাই, দক্ষতা নাই। কেহ কেহ এদের নিমিত্ত নৈশ বিদ্যালয় করোছেন, অশেষ যত্নে পাঠ পড়াচ্ছেন। কিন্তু শিক্ষা শব্দের অর্থে লেখা-পড়া বুঝো ঠিক পথ ধ'র্‌তে পারেন নাই। কর্মে দক্ষতা জন্মাবার এ পথ নয়। কর্ম ধরো বিদ্যায় পঁহুছিয়ে দিলে বালক্রমে শিক্ষা হবে, সে বিদ্যা স্থায়ী হবে। অশিক্ষিত মাত্রেই বালক, বয়স যতই হ'ক। তাদের পক্ষে আগে ক্ষেত্র, পরে ক্ষেত্রতত্ত্ব; আগে শব্দজ্ঞান, পরে বানান; আগে বানান, পরে লিখন। অতএব নৈশবিদ্যালয় নাম তুলো দিয়ে শিক্ষালয় রাখ্‌লে ভাল হয়।

এখানে অন্নচিন্তা শেষ করি। কারণ এ চিন্তা শেষ হবার নয়। যাবৎ মানুষ, তাবৎ চিন্তা থাক্‌বে, কখনও লঘু হবে কখনও গুরু হবে। গুরু হ'লেই লঘু হ'বে, প্রকৃতি দ্বারা হ'ক মানুষের দ্বারা হ'ক। দেখা গেল, একটী কারণে দাস্যবৃত্তি আমাদের অবলম্বন হয় নাই। এই বৃত্তি কারও প্রিয় নয়। বাঙ্গালী স্বভাবতঃ বিহঙ্গম; যেখানে বিহঙ্গম আছে, কার সাধ্য তাকে পিঁজরায় পোরে? না খেতে পেয়ে শুখিয়ে থাক্‌বে, কুলি হ'তে পার্‌বে না, বাড়ীর চাকর হ'তে পার্‌বে না। যেখানে বাগুরায় বদ্ধ হয়েছে, সেখানেও পোষ মানে নাই, পালাবার তরে ছট-ফট ক'র্‌ছে। আমাদের নন্দনেরা নিন্দার্হ নয়; নিন্দার্হ আমরা, বৃদ্ধেরা। কে তাদিকে বাবু করোছে? কে বাপু বাপু বলো দুলাল করো তুলোছে? কে বাঙ্গালীকে আনন্দ হ'তে বঞ্চিত করোছে? কে পশ্চিম দেশের মোহনমন্ত্রে মুগ্ধ হয়েছে?

বলের অভাবে, চেষ্টা-পটুতা নাই। এই অভাবে লেখাপড়ার কাজেও অবসাদ আসে। ক্ষুর দিয়া কাঠ কাট্‌তে পারা যায় না, কাটারী কুড়াল চাই। ক্ষুর-ধার বুদ্ধি যার, সে যে বলহীন, কর্মসামর্থ্যহীন, 'ভেতো' হয়ে থাকে, সেই ত আশ্চর্য! দেশ বদ্‌লাবার নয়, জন্ম বদ্‌লাবার নয়, কিন্তু শিক্ষা দ্বারা দেহের ও মনের বল আন্‌তে পারা যায়। এই হেতু শিক্ষা-বিষয়ে দুচারি কথা ব'ল্‌তে হয়েছে। যাদৃশী ভাবনা, তাদৃশী সিদ্ধি, এই বাক্য স্মরণ করো সেই ভাবনা-তরঙ্গের একটা কথা উপস্থিত করোছি। *

* ভবানীপুরে বারোয়ারীতলায় পঠনের অভিপ্রায়ে গত ২০ চৈত্র লিখিত।
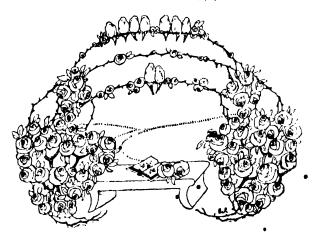
কথা ও সুর—শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন **স্বরলিপি—শ্রীমতী সাহানা দেবী**

গান

আয় আয় আমার সাথে ভাসবি কে আয়
আজ আমার জোড় লেগেছে ভাঙ্গা বেলায়
ঐ দেখ চাঁদের আলো
ঐ শোন কল কল
কেমনে থাকবি বল শুক্নো ডাঙ্গায়
আয় তোরা কুলকুলানো কুল ভুলানো
এই দরিয়ায় !

নায়ে মোর নাই কিছু নাই
(তাই) সবার লাগি হবেরে ঠাঁই
ভুলেছি কূলের বালাই
ভেসেছি তাই !

কে তোরা বাঁধা বাটে
কে তোরা বাঁধা ঘাটে
সুখেতে থাকিস্ যদি থাক্ তোরা ভাই
যার আঁখি ছলছল চলচল আমার এ নায় !

ঐ দেখ সুরধুনী
ওঠে কার ডাকটী শুনি
আমিও ডাক শুনেছি
আয় আয় আয় !

চল আজ স্রোতের সনে
ছুটী সেই ডাকের পানে
যেখানে জীবন মরণ সব ভেসে যায়
সেখানে পাবে জানা সেই অজানায় !

কালেংড়া—দাদরা

II { গা | মা পা দা | পা দা র্সনা | দা পা । | মগা । মা | পা মপা দপা | মগা । গা |
আ য় আ য় আ মা র সা থে - ভা স্ বি কে আ - য় - আ

মা গমা পদা | মগা -া } { র্সা | র্সা সর্ঋসা ঋর্সনা | না সা না | দা পা (-া | -া া) }
য় আ - য় - আজ আ মা র্ জো ড়্ লে গে ছে - - -

দা | না র্সা না | দা পা -া | -া -া II II
ভা ঙ্গা - বে লায় -

° + ° + ° +

II { পা দা না র্সা র্ঋা র্সা । । না র্সা -া । -া । না । র্সা র্সা র্জ্ঞা । র্জ্ঞর্ঋা র্সা -া ।
ও ই দে খ চাঁ দে র আ লো - - - ও ই শো ন্ ক ল -
কে তো রা - বাঁ ধা - বা টে - - - কে তো রা - বাঁ ধা -
চ ল আ জ স্রো তে র স নে - - - ছু টী সে ই ডা কের -

° + ° +

র্সা নর্সা র্ঋর্সা । না দা পা । -া -া -া । -া । } { পা ।
ক ল - - - - - - - - - - কে
বা টে - - - - - - - - - - স্থ
পা নে - - - - - - - - - - সে

° + ° + ° +

পদা দা । । পা । দা । পা ণদা পা । মগা -া মা । পদা মপা -া । -া । } র্সা ।
ম নে থা ক্ বি ব ল - শুক্ নো ডা ঙায় আয়
খে তে থা কি স্ য দি - থাক্ তো রা ভাই যার
খা নে জী ব ন্ ম র ন্ সব ভে সে যায় সে

° + ° + ° +

র্সা সর্ঋর্সা র্ঋর্সনা । না র্সা না । দা পা দা । না র্সা না । দা পা দা । না র্সা না । দা
তো রা - কু ল্ কু লা নো - কূ ল ভু লা নো - এ ই দ রি
আঁ খি - ছ ল - ছ ল - চ ল - চ ল - আ মা র্ এ
খা নে - পা বে - জা না - (- - - -) সে ই অ জা

° +

পা দপা দপা । মগা -া । II II
যা - - য় -
না - - য় -
না - - য় -

° + ° + °

II সা । ঋা গা মা । মা -া মা । মা গমা পদা । পমা -া পমা । গা -া মা ।
না যে মো র্ না ই কি ছু না - - - - ই - তাই

+ ° + ° + °

গা মা গা । গঋা সা ঋা । গা মা গা । ঋা সা -া । -া । { দা । দা দা -া ।
স বা র্ লা গি - হ বে - রে ঠাঁ ই ভু লে ছি -

+ ° + ° + °

পা পা দা । পা ণদা পা । মা গা মা । পদা মপা -া । -া । } II
কু লে র বাঁ ধা ই ভে সে - ছি তাই - -

• + • + •
সা | ঋা গা মা | মা মা -া | মা মা পম | পমা গা মা | গা সা ঋা |
ও ই দে খ সু র ধু নী - - - ও ঠে কা র্

+ • + • + •
গা মপা মগা | ঋা সা -া | -া া { দা | দা দা -া | পা -া দা | পা ণদা পা |
ডা ক্ টী শু নি - - আ মি ও - ডা ক্ শু নে ছি -

+ • +
মগা -া মা | গমা পা ণদা | পা -া } II
আ- - য় আ - য় আয়

আশুতোষ

শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী

(২)

আশু যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে বি-এ, এম-এ ও বি-এল পড়িত, তখন আমি অসুস্থ হইয়া কলিকাতায় তাহার বাসা-বাড়ীতে ৺চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজ মহাশয় দ্বারা চিকিৎসা করাইতে গিয়াছিলাম। আমাদের পিসতাত-ভ্রাতা ৺আনন্দ-নাথ সান্ন্যাল মহাশয় আমাদিগের সহিত সেখানে ছিলেন। সেকালের খাঁটি ভদ্রলোক,—রোগে সেবা ও আত্মীয়গণকে সতত সকল প্রকারে সাহায্য করিবার জন্য তিনি উন্মুখ থাকিতেন। তিনি কখনও জীবনে তোষামোদের ধার ধারিতেন না। রাজসাহীর কোন এক রাজা এক সময় শীতবস্ত্র বিলাইবার দিন তাঁহাকে একযোড়া গঙ্গাজলী শাল উপহার পাঠাইয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া সেই বাহকের হাতেই সে শাল ফেরত পাঠাইয়া অতি অপমানসূচক পত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন। কতক্ষণ পরে রাজা বাহাদুর স্বয়ং আসিয়া তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি তাহাতে বলিয়াছিলেন "আমি জাতে কুলীন ব্রাহ্মণ; অতি গরীব হইলেও, অব্রাহ্মণের দান কখন স্পর্শ করিতে পারি না। তোমাকে যে দাদা বলিয়া ডাকিবার অধিকার দিয়াছি, ইহা সৌভাগ্য মনে করিবে। শাল-দোশালা কখন উপহার পাঠাইবে না। সেই হইতে রাজসাহী জেলার রাজা-মহারাজা, জমীদারবর্গ তাঁহাকে অত্যন্ত ভয় করিয়া চলিতেন। কিন্তু আপদ বিপদে সকলের দ্বারেই তিনি অযাচিতভাবে যাইয়া উপস্থিত হইতেন। তিনি আমাদিগকে অতিশয় স্নেহ করিতেন; কখনও আমাদের কোন ত্রুটি ধরিতেন না।

আশুর চাঁপাতলার বাসা একটা বিদ্যাপীঠ হইয়া উঠিয়াছিল। সে বড় সুখের দিন গিয়াছে। কত ছাত্র, কত সম্পাদক, কত লেখক ও কত গণ্যমান্য ব্যক্তি শনি-রবি-বারে আশুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। আশু তখন যুবক মাত্র। তাঁহাদিগের সহিত সাহিত্যচর্চ্চা হইত। "Indian Mirror"এর সহকারী সম্পাদক আশু বন্দ্যো-পাধ্যায়, কবি ঈশানচন্দ্র (কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়েরা অনেকেই সাহিত্যালোচনা করিয়া যাইতেন। সেই সময় এক দিন "সাধারণী" সম্পাদক অক্ষয়বাবু তাঁহার যুক্তাক্ষরশূন্য

"গোচারণের মাঠ" আমাদিগের ভ্রাতা-ভগিনীকে উপহার দিতে আসিয়াছিলেন। সমস্ত বইখানি নিজে পড়িয়া শুনাইয়া গেলেন। "গোচারণের মাঠ" পড়িয়া আশু তাহার একটা হাস্যকর Parody লেখে—

"গোরথ ধাবন"

"তে-কোণা বাঁশের ঠাঁঠ চাকার উপর
সিঁদুরে দামড়া জোড়া করে লড়বড়।
সোয়ার তাহাতে পাঁচু হাতে এক লড়ি
নবাবী খেয়ালে আছে গোরথেতে চড়ি।"

(সম্পূর্ণ কবিতাটা হারাইয়া গিয়াছে)

এই কবিতা বন্ধুগণের মধ্যে হাতে হাতে চারিদিকে ফিরিতে লাগিল। অক্ষয় বাবুর নিকট সংবাদ পৌছিবা-মাত্র তিনি চুঁচুড়া হইতে আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া, সম্পূর্ণ কবিতাটী শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিয়া গেলেন যে, আশুর "গোরথ ধাবন" আমার "গোচারণের মাঠ" অপেক্ষা অনেক ভাল। ইহা পড়িয়া মনে হইতেছে, আশুকে আগে লিখিতে দিলে, যোগ্যতর হস্তে তাহা সমর্পণ করা হইত।" কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের সহিত আশু কৈশোরে একবার বঙ্কিমবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে কাঁঠালপাড়ায় গিয়াছিল। বঙ্কিমবাবুর "মেজদাদা" সঞ্জীববাবু পিতৃদেবের পরম বন্ধু ছিলেন। সেই সূত্রে উভয় পরিবারে বেশ একটা আত্মীয়তা থাকায়, বঙ্কিমবাবু আশুকে অত্যন্ত যত্ন-আদর সহকারে এক রাত্রি নিজের কাছে রাখিয়া বড় আনন্দ বোধ করেন। তিনি গোপনে কবিবর নবীন বাবুকে বলিয়া-ছিলেন "ভবিষ্যতে এ ছেলে একটা মানুষের মত মানুষ হবে হে,—দুর্গাদাস বাবুর বংশ কেন, সমস্ত ভারতবর্ষ গৌরবান্বিত করিবে। শিকারী বেড়ালের গোঁপ দেখিলেই চিনিতে পারা যায়।"

আশু কলেজের পাঠের জন্য সময়াভাবে সেখানে আর যাইতে পারে নাই। বঙ্কিমবাবু তাহাকে সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত দু' চার বার বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন; কার্য্যতঃ তাহা পুনর্ব্বার ঘটিয়া উঠে নাই। সুস্থ শরীর; যৌবনের উদ্যমে হৃদয় উৎসাহে পরিপূর্ণ। আশু বি-এ, এম-এ, বি-এল এক সঙ্গে অধ্যয়নে অতিশয় যত্নশীল; এবং কলেজের প্রফেসার-দিগের অতিশয় প্রিয় ছাত্র। কৃষ্ণনগর কলেজের রো সাহেব তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক। আশুকে তিনি আশৈশব ভালবাসিতেন। যাহাতে আশু বি-এর সহিত এম-এ দিতে পারে, তাহার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। বি-এ পরীক্ষা দিয়াই আশু এম-এ দিবার জন্য সহৃদয় সুপণ্ডিত টনি সাহেবের মত জানিতে গিয়াছিল। অনেক কথাবার্ত্তা হইলে, তাহার কৃতিত্বে অতি পরিতুষ্ট হইয়া তিনি আশুকে এম-এ দিবার আদেশ দেন। আশু বি-এ পাশের পরে এম-এ পরীক্ষায় ইংরাজীতে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল। সেই প্রথম বি-এ, এম-এ এক সঙ্গে দেওয়ার অনুমতি পাওয়া গিয়াছিল।

বি-এল পড়া ছাড়িয়া দিয়া সেই বৎসরই আশু বিলাত যাইবার জন্য প্রস্তুত হয়। ১৮৮১ সালেই সে বিলাত রওনা হইয়া যায়। সে কেম্ব্রিজের সেণ্টজন কলেজে ভর্ত্তি হইয়া আইন অধ্যয়ন ও সেই সঙ্গে অঙ্কে Tripos দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। দুই পরীক্ষাই সে খুব যশের সহিত পাশ করিয়াছিল।*

আশু কেম্ব্রিজেরও বি-এ। কেম্ব্রিজ ছাত্র-সভায় প্রতিযোগিতায় "সাভানারোলা"র উপর কবিতা লিখিয়া সে প্রথম হয়। পরে সে কলেজের 'ঈগল' নামক কাগজের সম্পাদকতার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিল। অসংখ্য ইংরাজ যুবকের মধ্যে একজন বাঙ্গালী যুবক "ঈগল" কাগজের সম্পাদকের পদ লাভ করায়, কলেজে তাহার অতিশয় যশঃ লাভ হইয়াছিল। কর্ত্তৃপক্ষ ও ছাত্রমণ্ডলী সবাই তাহার বন্ধু স্থানীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার সহপাঠীরা কখনও তাহাকে কোন প্রকার হিংসা করেন নাই; সকলেই ছুটীর সময় তাহাকে নিজেদের গৃহে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন; আশুর সহিত ব্যবহারে শ্বেত কৃষ্ণের তারতম্য পরিলক্ষিত হইত না।

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীসৌরেন্দ্রচন্দ্র দেব বি-এস্‌সি

নিঃশ্বাসে সামর্থ্য-নির্ণয়

খনির ভিতরে কাজ ক'রবার জন্য লোকের যেরূপ সামর্থ্য থাকা উচিত তা' পরীক্ষা ক'রবার জন্য ডাঃ হান্‌টিংটন্ (Dr. Huntington) নামে একজন চিকিৎসক একপ্রকার নূতন ধরণের বৈদ্যুতিক যন্ত্র উদ্ভাবন ক'রেছেন। এই যন্ত্রের দ্বারা তিনি কর্ম্ম-প্রার্থীর সামর্থ্য পরীক্ষা ক'রে তা'কে খনির কাজে গ্রহণ করেন। পরীক্ষার প্রণালী হ'চ্ছে—একটি ঘরের ভিতরে কর্ম্ম-প্রার্থীকে বসিয়ে রেখে শ্বাসের গতি নিরূপক যন্ত্রটী তার বুকের উপর বসিয়ে দেওয়া হয় এবং অপর একটি ঘরে পরীক্ষক বসে থেকে আর একটি শ্বাসের গতি-জ্ঞাপক যন্ত্র-সাহায্যে কর্ম্ম-প্রার্থীর নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শক্তি পরীক্ষা ক'রে তার সামর্থ্য নির্ণয় করেন।

নিঃশ্বাসে সামর্থ্য নির্ণয়।
(একটি ঘরে কর্ম্মপ্রার্থীকে বসিয়ে তার পরীক্ষা হ'চ্ছে। অপর একটি ঘরে (বাম পাশে) চিকিৎসক তা'র নিঃশ্বাসের গতি পরীক্ষা ক'রছেন)

বেতারে নারী

মেরি গিলক্রাইষ্ট (Mary Gilchrist) নামে একজন নারী বেতারবিদ্ একপ্রকার নূতন ধরণের বেতার যন্ত্র নির্ম্মাণ ক'রেছেন। এই যন্ত্র-সাহায্যে সহস্র সহস্র মাইল দূরবর্ত্তী স্থান থেকেও তিনি অতি সহজে বেতার বার্ত্তা গ্রহণ ক'রতে পারেন। সম্প্রতি তিনি তাঁর আমেরিকার বাটীতে ব'সে সুদূর জার্ম্মাণীর কোনও একটি বেতার ষ্টেসন থেকে বেতার বার্ত্তা গ্রহণ ক'রছেন।

বেতার নারী (মেরি গিলক্রাইষ্ট তাঁর পরীক্ষাগারে বসে জার্ম্মাণীর বেতার বার্ত্তা গ্রহণ করছেন

বাত্যানির্দ্দেশক যন্ত্র

সম্প্রতি ভি, এল, ক্রিষ্টলার (V. L. Christler) নামে একজন বৈজ্ঞানিক এমন একটি যন্ত্র নির্ম্মাণ ক'রেছেন, যার সাহায্যে তিনি দশ বারো ঘণ্টা পূর্ব্বেই ঝড়ের আগমন সংবাদ জান্‌তে পারেন। এমন কি, এই যন্ত্রের দ্বারা তিনি ঝড়ের গতিবিধি, শক্তি, ইত্যাদিও জান্‌তে পারেন, এবং তদনুযায়ী তিনি সকলকে সাবধান ক'রে দেন।

বাত্যানির্দ্দেশক যন্ত্র।
(বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে যন্ত্রের পরীক্ষা ক'রছেন)

জনসভায় বেতার

প্রসিদ্ধ বক্তার বক্তৃতা শোনবার জন্য মহতী সভায় বহু লোকের সমাগম হ'য়ে থাকে। কিন্তু সেই বিরাট জনসভার চারিদিকে বক্তার কণ্ঠস্বর পৌঁছিতে পারে না বলে সকলকে সন্তুষ্ট করা কোনও বক্তার পক্ষেই সম্ভবপর নয়। এজন্য কয়েকজন বৈজ্ঞানিক মিলিত হয়ে যাতে সকল শ্রোতাকে সমভাবে সন্তুষ্ট করা যায়, সেজন্য বেতার যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ ক'রেছেন। বিরাট জনসভার স্থানে
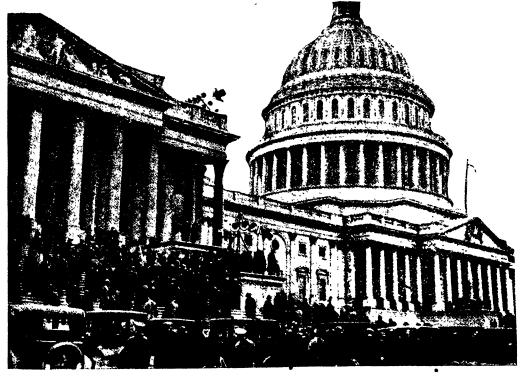
জনসভায় বেতার। (একটি বিস্তৃত ময়দানের সামনে loud speaker সাহায্যে লোকেরা বক্তৃতা শুনছে)
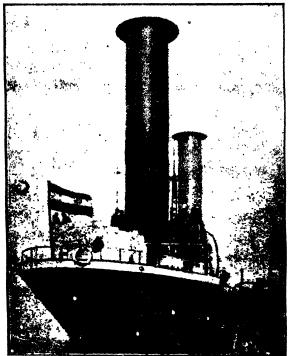
আর একটি দৃশ্য
(ময়দানের আর একটি স্থানে loud speaker সাহায্যে লোকেরা বক্তৃতা শুন্‌ছে)

স্থানে বেতার শব্দগ্রাহী যন্ত্র রেখে বেতার শব্দবর্দ্ধক বা উচ্চ কথকের (loud speaker) দ্বারা চারিদিক হতে শ্রোতাদের বক্তৃতা শোনান হয় এবং সকল শ্রোতাই এককালে বক্তৃতা শুনে সন্তুষ্ট হয়।

"অভিনব জাহাজখানি" যাত্রা ক'রবার জন্য সজ্জিত হ'চ্ছে

অভিনব জাহাজ

এণ্টন ফ্লেটনার (Anton Flettner) নামে একজন জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক সম্প্রতি এক প্রকার নূতন ধরণের জাহাজ নির্ম্মাণ ক'রেছেন, যাহার গতি সাধারণ জাহাজের গতি অপেক্ষা পনেরো গুণ বেশী। তিনি নানারূপ যন্ত্র সাহায্যে
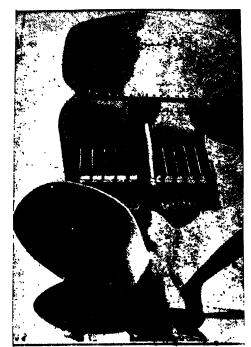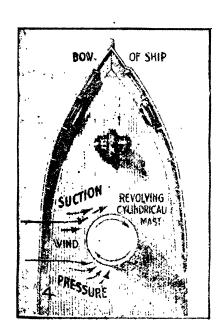
বায়ুর চাপে জাহাজের গতিবৃদ্ধি

আর একটি চিত্র। (বাহির হইতে বায়ু গ্রহণ করে সেই বায়ুর সাহায্যে জাহাজ কিরূপ চালিত হয় তাহা এই চিত্রে ব্যক্ত করা হয়েছে)

এণ্টন ফ্লেটনার; (এণ্টন ফ্লেট্নার (বাম দিকে) ও কাপ্তেন গার্‌হার্ড দু'জনে জাহাজখানি চালাবার জন্ম প্রস্তুত হ'চ্ছেন)

অভিনব যন্ত্র। (অভিনব জাহাজের অভিনব যন্ত্রের চিত্র। এই যন্ত্রের সাহায্যে জাহাজ চালিত হয়ে থাকে)
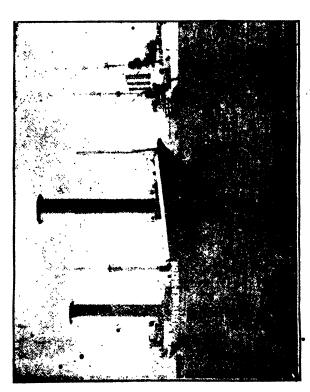
জাহাজটিকে এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ক'রে তুলেছেন যে, বোধ হয় কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁর নবনির্ম্মিত জাহাজ বর্ত্তমানের সমস্ত প্রসিদ্ধ জাহাজকে দ্রুতগতিতে পরাজিত ক'রে জলের উপর মোটর গাড়ীর তুল্য প্রাধান্য লাভ ক'রবে।
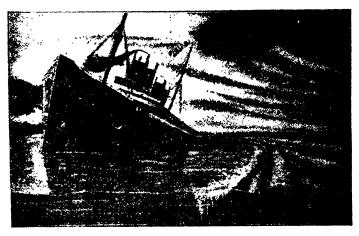
তরঙ্গ-ভঙ্গ।(জাহাজখানি তরঙ্গ-ভঙ্গ করে নির্ব্বিঘ্নে চলে যাচ্ছে)

তরঙ্গ ভঙ্গ

ফিলিপ ব্রাসার (Philip Brasher) নামে একজন মার্কিণ নাবিক উত্তাল তরঙ্গে জাহাজ যা'তে বিপন্ন না হয় তার একটি নূতন উপায় উদ্ভাবন করেছেন। সেই উপায়টি হ'চ্ছে এই যে একটি বাষ্পীয় যন্ত্রের সাহায্যে বাহির হইতে বায়ু গ্রহণ ক'রে সেই বায়ু যন্ত্রের দ্বারা
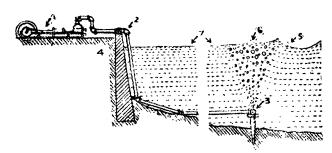
তরঙ্গ-ভঙ্গের কারণ নির্ণয়। (যন্ত্রটী (ক) বাহির হইতে বায়ু গ্রহণ করে নল (খ) সাহায্যে সেই বায়ু সছিদ্র নলের (গ) ভিতর হইতে বাহির হইয়া তরঙ্গ ভঙ্গ ক'রছে)

তীব্রবেগে সম্মুখস্থিত উত্তাল তরঙ্গের উপর নিক্ষেপ করা হয়। বায়ুর তীব্র চাপে তরঙ্গ ভাঙিয়া গিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয় এবং জাহাজ নির্ব্বিঘ্নে পথ অতিবাহিত ক'রে।

তেজ পরীক্ষা। তাপ পরীক্ষা।
(বৈজ্ঞানিক কৃত্রিম দিবালোকের তেজ পরীক্ষা ক'রছেন)

কৃত্রিম দিবালোক

লণ্ডনের টেট্ চিত্রশালায় (Tate Art gallery in London) ভাল ভাল প্রসিদ্ধ চিত্রগুলি যাহাতে আলোক অভাবে খারাপ না দেখায়, সেজন্য কয়েকজন বৈজ্ঞানিক মিলিত

যন্ত্রের সাজসজ্জা।
(যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করে রাখবার জন্য বিশেষ ভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে তার বাক্স তৈয়ারী হচ্ছে)
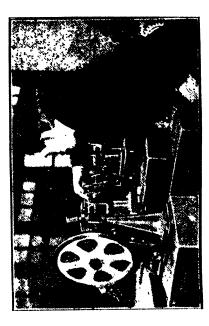
দিবালোকের যন্ত্র।
(এই যন্ত্রের দ্বারা বৈজ্ঞানিক কৃত্রিম দিবালোক তৈয়ারী করেন)

শ্রবণশক্তির পরীক্ষা।
(একটি ঘড়ির দ্বারা বাটীতে বসিয়া শ্রবণশক্তির পরীক্ষা ক'রবার একটি অভিনব উপায়)
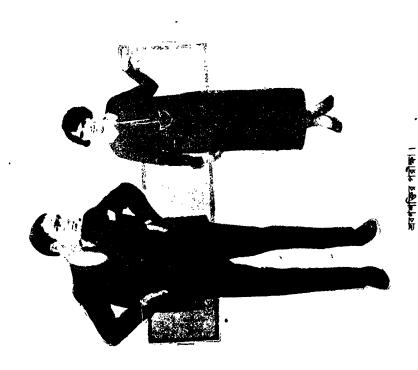
হয়ে "হারমেরা ফটোমিটার" (Hermera Photometer) নামে একটি নূতন ধরণের যন্ত্র নির্ম্মাণ ক'রেছেন। এই যন্ত্রের দ্বারা কৃত্রিম সূর্য্যকিরণ তৈয়ারী ক'রে সেই কিরণ এমন ভাবে চিত্রশালার ভিতরে নিক্ষেপ করা হয় যে চিত্রশালাটী তীব্র অথচ স্নিগ্ধ দিবালোকে আলোকিত হয়ে থাকে, এবং সেই আলোকে আলোকিত হয়ে চিত্রগুলি অতি সুন্দর দেখায়।

বধিরত্বে বেতার

বহুকাল ধরে রোগ ভোগের পর বা কোনও কারণে লোকের শ্রবণ শক্তির অভাব হ'লে প্রারম্ভেই তার ব্যবস্থা করা উচিত; নতুবা অনেক সময়ে তাকে পরে কষ্ট-ভোগ ক'রতে হয়। এই অসুবিধা দূর ক'রবার জন্য কয়েকজন চিকিৎসক মিলিত হয়ে কয়েকটি নূতন উপায় উদ্ভাবন ক'রেছেন। তার মধ্যে বেতার শব্দ বর্দ্ধক যন্ত্র প্রধান স্থান অধিকার করেছে। মনে সন্দেহ হলেই সেই যন্ত্র ব্যবহার ক'রে কোনও স্বল্পশ্রবণ ব্যক্তি নিজের শ্রবণ শক্তি পরীক্ষা ক'রে তার ব্যবস্থা ক'রতে পারেন।
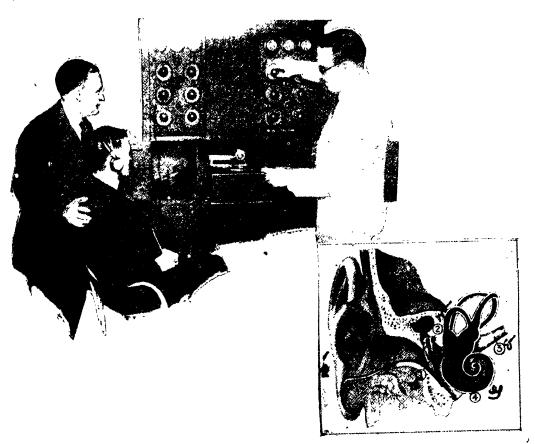
বধিরত্বে বেতার।
(বেতার দ্বারা চিকিৎসক রোগীর শ্রবণশক্তি পরীক্ষা ক'রছেন)

শ্রবণ যন্ত্রের চিত্র।
(কর্ণের ছিদ্র (ক) দিয়া শব্দ 'খ' চিহ্নিত স্থানে গিয়ে বিভিন্ন শব্দ তরঙ্গে প্রতিধ্বনিত হয়ে তিনটি অস্থির (গ) সাহায্যে শ্রবণ যন্ত্রের অন্তর্দেশে (ঙ) গমন করে এবং তথা হইতে শ্রবণশক্তির স্নায়ু (ঘ) দ্বারা মস্তিষ্কে পরিচালিত হয়)

প্রলয়ঙ্করী

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

১

বেলা দশটা আন্দাজ তার বেতো ঘোড়ায় চ'ড়ে পঞ্চানন সাহা ওরফে পঞ্চু, যশোদা চাটুয্যের বাড়ীর দরজায় এসে পৌছে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। তার বয়স হ'য়েছিল, তাই এই দুই ক্রোশ পথ অতিক্রম করতে তার যথেষ্ট ক্লান্তি বোধ হ'চ্ছিল। কিন্তু এই ক'রেই ত' তার এত দিন কাটল—অত গ্রাহ্য করতে গেলে চলেনা। পঞ্চু ডাকসাইটে সুদখোর। লোকের রক্ত-শোষণ করেই তার এতটা বয়স কাটল। নিজের ইমারত, ধন-দৌলত অনেক হ'য়েছে; কিন্তু তবু সে এখনও এই ব্যবসার প্রত্যেক উঞ্ছকর্ম্ম নিজেই করত, অন্যকে দিতে ভরসা হ'তনা। তার এই অনন্য-পরায়ণ সেবায় লক্ষ্মীও প'ড়েছিলেন বাঁধা; এবং পাছে এই চঞ্চলা দেবীটি তার অনবধানতার কোন সুযোগের ফাঁকে তাকে ফাঁকি দেন, এই ভয়ে সে তাঁকে অতি সাবধানতার অবরোধের মধ্যে নিত্য রেখে দিত। যশোদা চাটুয্যে দুশ টাকা ধার নিয়েছিল, যা এখন চক্র এবং অচক্র নানারকম বৃদ্ধির হারে দাঁড়িয়েছিল পাঁচশ'য়। তাগিদ যে ইতিমধ্যে হয়নি তা নয়। কিন্তু তাতে বিশেষ কোন ফল হয় নি। তাই আজ অত্যন্ত কঠিন তাগিদের সঙ্কল্প করে পঞ্চু নিজেই এসেছে।

ঘোড়াটিকে গাছের ছায়ায় বেঁধে পঞ্চু বাইরের রোয়াকে উঠে ডাকলে, 'যশোদা বাবু, অ যশোদা বাবু'—

উত্তরে ভেতর থেকে একটা কান্নার আওয়াজ এলো, 'ওগো কি হ'ল গো!'

পঞ্চু মাথার ঘাম মুছে, চুপটি করে দাঁড়িয়ে রৈল। এ কি রকম জবাব হ'ল? তবে কি—?

এমন সময় রাস্তার একজন লোক পঞ্চুকে জিজ্ঞাসা করলে, কাকে ডাক্‌ছ কত্তা?

পঞ্চু বললে, যশোদা বাবুকে।

লোকটি তালু ও জিহ্বায় বিচিত্র আওয়াজ ক'রে বললে, সে আর তোমার ডাকে জবাব দেবে না কত্তা। সে যে আজ ষোল দিন হোল মারা গেছে।

পঞ্চুর চোখের সামনে যেন পৃথিবী দুলতে লাগল, সে আর দাঁড়াতে পারলেনা। খানিকটা চুপ ক'রে থেকে জিজ্ঞাসা করলে, তার ওয়ারিস?

লোকটি বললে, তার স্ত্রী আর তার এক ছোট্ট ছেলে। তুমি পঞ্চু সা নয়? টাকা ধার দিয়েছিলে বুঝি?

পঞ্চু বললে, হাঁ।

মাথা নেড়ে লোকটি বললে, সে টাকা আর পেয়েছ, —সে গেছে! বলে একটুখানি হেসে সোজা চ'লে গেল।

এই অভাবনীয় সংবাদে পঞ্চুর সারা দেহ থেকে বিন্ বিন ক'রে ঘাম বেরোতে লাগল। সে চুপটি ক'রে ব'সে রইল। পাঁচ-পাঁচ শ' টাকা! যাবে না কি? এত সহজে? আচ্ছা পাজী লোক ত' যশোদা চাটুয্যে,—টাকা না দিয়েই সরে পড়ল? কিন্তু এর একটা উপায় না ক'রে ত' ফেরা চলবেনা। টাকা না থাকে বাড়ী ত' আছে।

তেষ্টা পাচ্ছিল, তাই নিকটস্থ কুয়োয় গিয়ে পঞ্চু খানিকটা জল চেয়ে খেয়ে নিলে। সেখানে একবার ভাল ক'রে খবর নিলে যে, যশোদা সত্যি আছে না গেছে।

তার পর আবার রোয়াকে এসে গলা খাঁকারি দিয়ে ডাক্‌লে, যশোদা বাবু—ইয়ে—।

পাশে রমণী-কণ্ঠের জড়িত আওয়াজ এলো, আপনি কে?

পঞ্চু বুঝলে যে সে যশোদার বিধবা। বল্লে, আমি পঞ্চানন সাহা,—আহা যশোদা বাবুর পরলোক যাওয়া শুনে অবধি আর চোখের জল মানচেনা। বড্ড ভাল লোক ছিলেন। তা হাঁ তিনি আমার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছিলেন, 'এখন হ'য়েছে পাঁচ শ'—

রমণী কহিল, "সে টাকার কথা তিনি মৃত্যুশয্যায়

শুয়েও ভোলেন নি, কতবার বলেছেন," বল্‌তে বলতে তার কণ্ঠরোধ হ'য়ে এলো।

পঞ্চু বললে, হাঁ, তা তেমনি লোকই ছিলেন বটে। কিন্তু এখন যে ও-টাকাটার ব্যবস্থা করতে হয়, তা নইলে তাঁবাদি হয় যে!

এই কঠিন ব্যক্তির নির্ম্মমতা সৌদামিনীর মর্ম্মভেদ ক'রে দিলে! সে এর কথা যে ইতিপূর্ব্বে শোনে নি তা নয়, কিন্তু শোনা যে সবটা হয়নি, তা সে বেশ বুঝতে পারলে। জবাব তার মুখ দিয়ে কিছুই বেরোলো না, সে শুধু কাঁদতে লাগল।

পঞ্চু বললে, তাঁবাদি হ'য়ে গেলে সবটাই গেলো। আর নালিশও চলবেনা!

সৌদামিনীর কান্না ছাড়া আর কোন উত্তরই ছিলনা।

পঞ্চু বললে, তা হ'লে কি বলো মা?

সৌদামিনী বল্লে, আমি আর কি বলব? টাকা ত' তিনি রেখে যাননি! তাঁর ঋণ আমি স্বীকার করছি। কিন্তু কোথা থেকে দি?

অপ্রসন্ন মুখে পঞ্চু রোয়াক থেকে নেমে প'ড়ে, তার বেতো ঘোড়ার দড়ি খুলে তার পিঠে সওয়ার হ'য়ে ব'সে, গাঁয়ের দিকে হাঁকিয়ে দিলে। সেখানে খবর নিতে হবে, যে পাজী যশোদা বাড়ীটাও বাঁধা রেখে গেছে কি না!

২

অতি-সাবধানী পঞ্চু সাহার এক ভাই ছিল, তাকে নিয়ে যত গোল। দেশের আইন না কি বেয়াড়া, কখন কি গোল পাকায় তার ঠিক নেই,—সুতরাং দেনার খত তমসুক সব তার স্ত্রী ভামিনী সাহানীর নামে লেখা হোত—ঐ ভাইয়ের সম্বন্ধে একেবারে নিঃসন্দেহ হবার জন্যে। ভাই বেচারার কোনও দিন পঞ্চুর এই কারবারের ওপর লুব্ধ দৃষ্টি পড়েছিল কি না, ভগবান জানেন,—কিন্তু যেহেতু সাবধানের মার নেই, সেই জন্যে পঞ্চু অভিজ্ঞদের অনেক গোপনীয় পরামর্শ নিয়ে, তার কারবার এই রকম ক'রেই চালাত।

নালিশ হ'য়ে গেল। নালিশ করলেন শ্রীমতী ভামিনী সাহানী জোজে শ্রীপঞ্চানন সাহা বাদী; এবং প্রতিবাদী হ'ল সৌদামিনী আর তার নাবালক ছেলে।

লঘু হাওয়ায় পাল তুলে নৌকা যেমন কূলের দিকে চলে, তেমনি এই মামলা ডিক্রীর কূলে ভিড়ল; এবং তার পর ক্রমে ক্রমে নিলাম খরিদ পর্য্যন্ত হ'য়ে গেল যে ভামিনী সাহানীর নামে, তিনি রইলেন এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। শেষকালে এসে পড়ল দখল নেবার দিন।

সৌদামিনীর গ্রামের এক ব্যক্তি—হরিচরণ দখল নেবার আগের দিনটিতে এসে পঞ্চু সার কাছে পড়ল, যে বিধবাকে যেন স্থানচ্যুত না করা হয়।

পঞ্চু সা তার একরাশ খাতাপত্রের মধ্যে ব'সে কড়া-ক্রান্তি হিসেব করছিল। সে তার বিস্মিত দুই চোখ হরিচরণের দিকে তুলে বল্লে, সে কি কথা। তবে এত খরচ-পত্র ক'রে ডিক্রি নিলাম কেন? ওর বাড়ী ছাড়া ত' অন্য সম্পত্তি নেই, যা নিয়ে আমার টাকা পরিশোধ হয়!

হরিচরণ বললে, কিন্তু সৌদামিনী বিধবা, নিরাশ্রয়,—তাকে ওই বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে তার দাঁড়াবার জায়গাটি পর্য্যন্ত নেই।

পঞ্চু হেসে বল্লে, তোমরাই ত' তার সব হিতাকাঙ্ক্ষী র'য়েছ—তোমরাই না হয় টাকাটা দিয়ে দাও না। ও বাড়ীটার ওপর আমার কোনও লোভ নেই। আমার টাকা পেলে, আমি স্বচ্ছন্দে বিধবাকে থাকবার জন্যে ওই বাড়ী ছেড়ে দেবো। বলে' সে এমনি ব্যঙ্গের হাসি হাসলে, যার অর্থ বুঝতে একটুও দেরী হয় না।

হরিচরণ বল্লে,—আমাদের যদি দেবার মত টাকা থাকৃত ত' দিতাম। আমাদের তা' নেই। কিন্তু আপনার ত' অভাব নেই। সুতরাং ও টাকাটা ছেড়ে দিলে কোন বিশেষ ক্ষতি হয় ত হত না; অথচ একজন বিধবা বেঁচে যেত!

পঞ্চু হেসে বল্লে, আমি যদি এমনি ক'রে ছাড়তে সুরু ক'রে দি, ত' পঞ্চু সা কোথায় গিয়ে যে দাঁড়াবে, তার ঠিক নেই। টাকা দিয়ে কেউ কখন ছেড়েছে শুনেছ? কাজের কথা কইতে যদি, টাকার ব্যবস্থা করতে, ত' ভেবে দেখা যেত। মিছে কাজে সময় নষ্ট করবার আমার অবসর নেই, তা জানো বোধ হয়।

হরিচরণ চলে যাবার সময় বল্লে, অথচ বোধ করি মিছে কাজে সমস্ত জীবনটাই নষ্ট হল!

ক্রুদ্ধ পঞ্চু সাহা রোষ-দৃষ্টিতে তার দিকে যখন তাকালে, তখন হরিচরণ চলে গেছে !

৩

ভামিনী সাহানীর চেহারাটা কতকটা ভামিনী ধরণেরই, অর্থাৎ নামের মতই মোটা-সোটা, কালো-কোলো। নাকে একটা মস্ত বড় নথ, তাতে একটা দামী পাথরও ছিল। সে আড়ালে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনেছিল। শুনে তার মনের ভেতর কোন্-খানটা যেন জ্বলছিল ! পুরুষের এই অর্থ-তৃষ্ণার কাছে অসহায়া সদ্য-বিধবারও পরিত্রাণ নেই।

স্বামী আসতে সে তার নথ নেড়ে বললে, রায়গাঁর যশোদা চাটুয্যের বিধবাকে তুমি কাল বাড়ী ছাড়া করবে ?

পঞ্চু হাসবার মত ক'রে বললে, আমি কি করছি ? সে ত' নিজেই হ'চ্ছে—টাকাটা দিয়ে দিলেই ত' হ'ত।

ভামিনীর চোখ দুটো যেন জ্বলছিল। সে বল্লে, সে কোথা থেকে দেবে? নতুন বিধবা হ'য়েছে,—আহা, তোমার কি দয়ামায়া একটুও নেই ? এই যশোদা চাটুয্যের মা-ই না সাত বছর আগে তোমার ভারি অসুখের সময় তোমার জন্যে মা মঙ্গলচণ্ডীর ওষুধ পাঠিয়ে তোমাকে ভাল করেন ? এ সব কথাও কি ভুলতে হয় ?

পঞ্চু বল্লে, কিন্তু টাকা ধার নিলে ত সেটা দিতে হয়।

ভামিনী ব'ল্ল, যে ধার নিয়েছিল, তার কাছ থেকে নাওগে না ! এর ভেতর মেয়ে-মানুষকে জড়াও কেন ? ও বেচারা কি জানে, কেমন করে দেবে ? আর তোমার টাকার ত' কমি নেই, না হয় এটা ছেড়েই দিলে। পরকালে ত' তবু একটা কিছু বলবার থাকা চাই। ছেলে নেই পুলে নেই, কার জন্যে এ অধর্ম্ম করা ?

পঞ্চু রাগ করার মত ক'রে বললে, তোমার কথা আমি শুনতে চাইনে। এর ভেতরে মেয়ে-মানুষ কেন ? শাস্ত্রে বলে স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী।

ভামিনী বল্লে, এর মধ্যে যে মেয়ে-মানুষকে জড়িয়েছ ! তোমরা পুরুষে পুরুষে লাঠালাঠি করগে না,—আমাদের ব'য়ে গেছে। কিন্তু এর ভেতরে এনেছো যে একজন মেয়ে-মানুষকে। না—তাকে কিছুতেই ভিটে-ছাড়া করতে পারবেনা !

পঞ্চু গরম হ'য়ে বল্লে, তবে টাকা আদায় হবে কি ক'রে ?

ভামিনী বল্লে, চুলোয় যাক্ গে তোমার টাকা।

পঞ্চুর দুর্ব্বল স্থানে পা পড়েছিল। সে চোখ পাকিয়ে বল্লে, খবরদার, আমাকে রাগিও না বলছি।

ভামিনী গর্জ্জন ক'রে উঠে বললে, ঢের ঢের রাগ দেখেছি। কোনও কথা বলিনে তাই ! ও-বাড়ী আমি তোমাকে কিছুতেই নিতে দেবো না,—কেমন তুমি বিধবাকে ভিটে-ছাড়া করো দেখি ত' !

পঞ্চু ব্যঙ্গ হাসি হেসে বললে, আচ্ছা সে দেখা যাবে, কাল সকালে বই ত' নয় ! দেখি কেমন ক'রে ওকে বাঁচাতে পার ! কে আমাকে আটকাতে পারে ?

ভামিনী খুব চটে মটে চলে গেল।

৪

পঞ্চু সার এই ব্যবহারে রায়-গাঁর লোক খুব মর্ম্মাহত হ'য়েছিল। কিন্তু এই দরিদ্র গাঁয়ে যাদের বাস ছিল, তাদের কারুরই এমন সংস্থান ছিল না, যে এর কোন প্রতীকার করে। এই মোটা টাকাটা দিয়ে দিতে পারলেই এর একমাত্র উপায় হোত, কিন্তু টাকা আসে কোথা থেকে ? সুতরাং চোখের সামনেই ওরা পঞ্চু সার এই কীর্ত্তি চুপ করে দেখতে লাগলো।

সেদিন সকালে হরিচরণের মা সৌদামিনীকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্যে এসেছিলেন। স্বামীর মৃত্যু এই সেদিন মাত্র হয়েছে,—তাঁর অবশেষ স্মৃতিটুকু মাত্রই এখন বিধবার সম্বল ! সেই স্মৃতি-মণ্ডিত, বহু সুখ-দুঃখ, আনন্দ-নিরানন্দের কাহিনী-পূর্ণ এই তার একমাত্র স্বামীর ঘরটিকে ছেড়ে যেতে সৌদামিনীর সমস্ত অন্তর আজ কান্নায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্ছিল। অথচ তাকে চেপে রাখবার চেষ্টায় বুক যেন ভেঙ্গে আসছিল। আজ তাকে তার একমাত্র আশ্রয় ছেড়ে তার ছোট ছেলেটিকে নিয়ে বেরোতে হবে সীমাহীন অনিশ্চয়তার পথে, অন্ধকারের মাঝখানে। আজ হরিচরণের মার এই স্নেহ তার দুঃখের সময়ে অমূল্য বটে, কিন্তু তার পর ?

হরিচরণের মা বললেন, চলো মা, এই বেলা। এর পর পঞ্চুর লোকেরা এসে পড়বে। আমার কাছে থাকবে, দুঃখ কি মা ?

দুই চোখ জলে ভরে এলো,—সৌদামিনী বল্লে, তাই চলুন !

বাইরে হরিচরণ এবং আরও দু' একজন গাঁয়ের লোক দাঁড়িয়ে ছিল। এখনই যে দৃশ্য তাদের দেখতে হবে, তারই করুণতায় তাদেরও চোখ ছলছল করছিল।

এমন সময় একটা গরুর গাড়ী এসে দাঁড়াল, এবং তার ভেতর থেকে কষ্ট করে যে স্ত্রীলোকটি বেরোলো, সে ভামিনী। ভামিনী হরিচরণকে জিজ্ঞাসা করলে যে, এই মৃত যশোদা চাটুয্যের বাড়ী কি না,—এবং তার কাছ থেকে খবর নিয়ে, সোজা চলে গেল বাড়ীর ভেতর।

সদ্য-বিধবা সৌদামিনীকে চিনতে তার দেরী হ'লো না। সে একেবারে তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে বললে, বোন, তোমার এই দুঃখের ওপর যে আরও দুঃখ দিতে চায়, সে কি মানুষ? তোমাকে আমি এই দুঃখ থেকে বাঁচাব বোন। তুমি এই বাড়ীতে অচল হ'য়ে থাকো,—দেখি, কে নড়াতে পারে।

সৌদামিনী বিস্ময়ে ভামিনীর দিকে চেয়ে বল্লে, তোমাকে ত চিনতে পারলাম না, দিদি!

ভামিনী বল্লে, তোমাকে ত' আমি চিনেছি বোন, তা হ'লেই হ'ল। না—তোমাকে কোথাও যেতে হবে না। আমি তোমার সঙ্গে রইলাম এখানে,—দেখি, কে কি করতে পারে? তার পর সৌদামিনীর ছেলেটিকে টেনে নিয়ে বল্লে, বাছার আমার মুখ শুকিয়ে গেছে—কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলে গেছে। নাও ত বাবা, ব'লে পাতায় মোড়া খানিকটা খাবার বার করে তাকে দিয়ে বল্লে, খাও,—আহা, সকাল থেকে বাছার মুখে একটু জলও পড়েনি। নরকেও স্থান হবে না, নরকেও না!

হরিচরণের মা ও সৌদামিনী বিস্ময়ে পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলেন, এবং পাতা-শুদ্ধ খাবার নিয়ে ছেলেটি অবাক্ হয়ে বসে রইল।

তখন ভামিনী তাকে কোলে নিয়ে জোর ক'রে খাওয়াতে লাগল।

এমন সময় বাইরে গোলমাল শোনা গেল। পঞ্চু খুব বড় গলা করে বললে, এই বাড়ী,—আর তার সঙ্গের লোকটি চেঁচিয়ে ডাক্‌লে, সৌদামিনী দেব্যা, এই বাড়ীর দখল তোমাকে ছাড়তে হবে, এবং এর দখল আজ থেকে দিতে এসেছি মহামান্য আদালতের হুকুমে ডিক্রীদার শ্রীমতী ভামিনী সাহানীকে।

হরিচরণের মা বললেন, ঐ তারা এলো। এখন উপায়?

ভামিনী উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে, উপায় এখনই হবে মা; এই বলে সোজা বাইরে চলে গেল।

সেখানে গিয়ে আদালতের সেই লোকটিকে বল্লে, কি চাও তোমরা?

পঞ্চু গলার আওয়াজে চেয়ে যখন দেখলে ভামিনী, তখন যেন সে একেবারে কাঠ হ'য়ে গেল। চীৎকার ক'রে বললে, তুমি এখানে কেন ভামিনী?

ভামিনী অবজ্ঞার স্বরে বল্লে, চুপ করো,—এর সঙ্গে কথা কয়ে নি।

আদালতের সেই লোকটি বল্লে, আমরা দখল দিতে এসেছি।

ভামিনী বল্লে,—দরকার নেই, আমি দখল চাইনে। আমার সমস্ত টাকা আমি পেয়েছি,—আমার আর কোন দাবী নেই। তোমরা ফিরে যেতে পারো।

সে লোকটি বল্লে, আপনি?

ভামিনী বল্লে, আমি ডিক্রিদার খরিদদার শ্রীমতী ভামিনী সাহানী।

পঞ্চু পাগলের মত চীৎকার ক'রে উঠল, ভামিনী, ভামিনী, সর্ব্বনাশ করলে। না—ওর কথা তোমরা শুনো না, আমি দখল চাই!

আদালতের সেই লোকটি তার দিকে ফিরে বললে, আপনি কে? আপনি স্বয়ং স্বীকার করেছেন যে, উনিই ভামিনী সাহানী; আর আমাদের কাগজে দেখছি যে, উনিই ডিক্রীদার খরিদদার। সুতরাং আপনি মিছে চেঁচামেচি করলে ত' চলবে না,—ওঁর কথা আমরা শুনতে বাধ্য। তার পর ভামিনীর দিকে চেয়ে বললে, না—আমরা আর দখল দেবো না, আমরা ফিরেই চল্লুম মা।

পঞ্চু তাদের শাসাতে লাগল,—দেখে নেবো তোমাদের,—আজই আমি আদালতে গিয়ে সব কথা জানাবো। ও কে? কেউ না। টাকা আমার।

আদালতের লোকেরা ফিরে গেল, আর ভামিনী বাড়ীর ভিতর গিয়ে সৌদামিনীর ছেলেটিকে খাওয়াতে বসল!

হরিচরণের মা আর সৌদামিনী তেজোগর্ভ মেঘের মত এই অপূর্ব্ব মানুষটির দিকে বিস্ময়ে চেয়ে রৈল!

ভামিনী হেসে বললে, চণ্ড-চামুণ্ডদের তাড়িয়েছি বোন। তোমার ঘর তোমার রৈল দিদি।

তার পর হরিচরণের মার দিকে চেয়ে বললে, মা, তুমি বরং ঘরে গিয়ে এঁর জন্যে কিছু খাবার পাঠিয়ে দিও। আমাকে বোধ করি আবার আদালতে যেতে হবে।

সৌদামিনী ভামিনীর দিকে চেয়ে বল্লে, দিদি, আপনি?

ভামিনী বল্লে, শুনলে না বোন, আমি তোমাদের মহাজনের স্ত্রী ভামিনী। কত দুঃখই দিয়েছে বোন, তোমাকে।

৫

সে-দিন কাছারীতে ভারী হুলস্থুল। হাকিমের সামনে গিয়ে পঞ্চু হাত পা ছুঁড়ে চেঁচিয়ে উঠল, হুজুর, বেইমান সব আদালতের লোক, আমাকে দখল দিলে না।

হাকিম কারণ জিজ্ঞাসা করলে, যারা দখল দিতে গিয়েছিল তারা বললে, হুজুর, ডিক্রীদার ভামিনী সাহানী বল্লেন, তাঁর টাকা তিনি সমস্ত পেয়েছেন, তিনি দখল নিতে চান না। সুতরাং আমরা ফিরে এসেছি।

পঞ্চু চীৎকার করে উঠল, কার টাকা কে পেয়েছে?

এমন সময় একজন উকীল এসে বল্লেন, আমি ডিক্রীদার ভামিনীর উকীল। আমার মক্কেলের সমস্ত পাওনা শোধ হ'য়ে গিয়েছে, সেই মর্ম্মে এই দরখাস্ত দিচ্ছি।

হাকিম বল্লেন, বেশ কথা।

পঞ্চু চেঁচিয়ে উঠল, হুজুর, মিথ্যে কথা। ও টাকা আমার,—ভামিনীর নয়। আমি এক পয়সাও পাই নি।

হাকিম বল্লেন, তুমি বলতে চাও—ও টাকা ছিল তোমার—বাদিনী ভামিনী সাহানীর নয়?

পঞ্চু উৎসাহিত হ'য়ে বল্লে, হুজুর ঠিক, একেবারে খাঁটি কথা।

হাকিম বোধ করি পঞ্চুকে ভাল রকমই চিনতেন। তিনি মোটা মোটা গোটা দুই বই উল্টে পাল্টে পঞ্চুর দিকে চেয়ে বললেন, তুমি আসল মোকদ্দমায় হলফ নিয়ে বলে এসেছ—ও-টাকার সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ নেই, ও তোমার স্ত্রী ভামিনী সাহানীর। আজ আবার বলছ—ও-টাকা তোমার। দুটোর মধ্যে একটা কথা নিশ্চয়ই মিথ্যা হবে। যদি তুমি এই মুহূর্ত্তেই সরে না পড়, ত' তোমাকে ফৌজদারী সোপরদ্দ করব।

পঞ্চু ঢোঁক গিলে প্রায় কেঁদে ফেলবার মত ক'রে বল্লে—হুজুর!

হাকিম বল্লেন, হাঁ, আমার কথার অন্যথা হবে না, বুঝে দেখ।

তখন পঞ্চু আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল—তার চোখ দিয়ে যেন আগুন ছুটছিল।

ভামিনী যে গাড়ীর মধ্যে ছিল, তার কাছে গিয়ে পঞ্চু চীৎকার করতে লাগল, দেখে নেবো তুমি কেমন আমার স্ত্রী! কেমন ক'রে তুমি আমার বাড়ী ঢোক! পঞ্চানন সাহাকে যা-তা লোক পাওনি!

গাড়ীর ভেতর থেকে ভামিনী গাড়োয়ানকে বল্লে, চলো।

গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় মা।

ভেতর থেকে উত্তর এলো—রায়গাঁয়ের যশোদা চাটুয্যের বাড়ী।

৬

দিন প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে—গাছের মাথায় সূর্য্যের কিরণ ঝিকমিক করছিল। সৌদামিনী তার ছেলেটিকে নিয়ে রোয়াকে বসে ভাবছিল, আজকার দিনের বিচিত্র ঘটনা। কোথা থেকে কে এসে যে কখন আপনার হ'য়ে বসে, তা চিন্তার অতীত।

এমন সময় ভামিনীর গাড়ী এসে দাঁড়াল। সে নেমে এসে, সৌদামিনীর পাশে ব'সে জিজ্ঞাসা করলে, বোন, খাওয়া দাওয়া হ'য়েছে?

সৌদামিনী বল্লে হ'য়েছে দিদি, কিন্তু তোমার?

ভামিনী হেসে বল্লে, আমার এখনও হয়নি, একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না ক'রে ত সোয়াস্তি পাচ্ছিলুম না। তা আমার কোন কষ্ট হয়নি। এইবার হবে।

সৌদামিনী আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্লে, বাড়ী যাবে না?

ভামিনা হেসে বল্লে, এই ত' আমার বাড়ী। আমার স্বামীর বাড়ীতে আমার ঢোকা বারণ হ'য়ে গেছে।

শঙ্কিত নেত্রে সৌদামিনী ভামিনীর দিকে চেয়ে বল্লে, দিদি!

ভামিনী হেসে বল্লে—ভয় পাচ্ছ বোন? ভয় কিসের?

এই দেখ আমার এই হাত-বাক্সে গহনা ভরা। এতে আমাদের বাকী জীবন বেশ চলে যাবে। তার পর, ভগবান হাত-পাও ত' দিয়েছেন! মেয়ে-মানুষ, তা হ'য়েছে কি? আর পুরুষদের এখনও চিনলে না? তারা মুখে যত বড়াই করে, কাজে যদি তার সিকিও করত। যখন রাগ পড়ে যাবে, তখন দেখ না বুড়ো কি করে আবার"—বলে সে খুব হাসতে লাগলো।

সৌদামিনী খানিকক্ষণ মুগ্ধের মত চেয়ে রৈল। তার পর ভামিনীর হাত নিজের হাতে নিয়ে বল্লে, আর-জন্মে নিশ্চয়ই তুমি আমার বোন ছিলে দিদি।

ভামিনী বল্লে, শোন কথা,—আর জন্মে কেন, এই জন্মেই যে আমরা বোন হলুম।

সৌদামিনী খানিকটা চুপ ক'রে রৈল,—চোখের জল আর বাধা মানতে চায় না। তার পর বল্লে, দিদি, দেখ, ভুলেই গিয়েছিলুম, তোমার খাবার উয্যুগ করি'—বলে উঠতে গেল।

ভামিনী তাকে ধরে নিজের কাছে বসিয়ে বল্লে, কিছু দরকার নেই বোন—সে কাল থেকে হবে। আজ আমি গাড়োয়ানকে চিঁড়ে দৈ আর চিনি আনতে বলেছি—দিব্যি খাওয়া হবে 'খন—ও আমার খুব অভ্যেস আছে। বলে হাসতে লাগল।

৭

ভামিনী ঠিক কথাই বলেছিল। দিন দুই রাগের মাথায় কেটে যাওয়ার পর, পঞ্চুর যখন রাগ প'ড়ে এল, তখন তার নিজের বাড়ী তার কাছে মরুভূমি ব'লে বোধ হ'ল। গৃহের অভ্যন্তরে যে ভামিনী কতখানি জায়গা অধিকার ক'রে বসেছিল, সে এখন পঞ্চু মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করতে লাগলো। ত্রিশ বৎসরের অভ্যাসই বল, আর স্নেহ-ই বল, আর ভালবাসাই বল,—পঞ্চুর কাছে বাড়ীটা বড়ই ফাঁকা ঠেকতে লাগলো। রাস্তায় বেরোবার জো নেই, ছেলেরা হাততালি দিয়ে ছড়া কেটে বলে—

পঞ্চানন সা
ঠোঁট কামড়ে খা,
বউ ছাড়্‌ল বাড়ী
পঞ্চুর গলায় দড়ি।

ঘরের ভেতরও প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে, 'চিরদিনের প্রিয় খাতা-পত্র হিসেব শুষ্ক ব'লে বোধ হয়; এবং সবচেয়ে বিপদের কথা—ভামিনী সাহানীর নামের কতকগুলো খত তমসুক তাঁবাদি হ'য়ে যায়।

সুতরাং দিন পনেরো পরে এক দিন খুব ভোরে সেই বেতো ঘোড়ায় চড়ে পঞ্চু আবার বেরিয়ে পড়ল,—রায়গাঁয় যশোদা চাটুয্যের বাড়ীর উদ্দেশে। বুক দুর্‌-দুর্‌ করতে লাগলো। আর অপমানের যে জ্বালা বুকের মধ্যে জ্বলছিল, তারও ক্ষত টনটন করতে লাগলো। কিন্তু উপায় কি?

খানিকক্ষণ যশোদা চাটুয্যের বাইরের রোয়াকে ব'সে নিজেকে সামলে নিয়ে ডাকলে, 'ভামিনী—অ ভামিনী।'

ভামিনী তখন সবেমাত্র সৌদামিনীর ছেলে সুকুকে খাবার খাওয়াতে ব'সেছে। স্বর চিনতে তার দেরী হ'লো না। সুকুকে বললে, 'বস ত' বাবা দেখে আসি।'

ঠিক বাহির-বাড়ী আর ভিতর-বাড়ীর মাঝখানে একটা অপ্রশস্ত যায়গায় দু'জনে দেখা হ'ল। পঞ্চু চুপ করে চেয়ে রৈল।

ভামিনী খানিকক্ষণ পরে কথা কহিল, এখানে এসেছ যে?

পঞ্চু শুষ্ক কণ্ঠে বললে, তোমাকে নিয়ে যেতে!

ভামিনী তার নথ নেড়ে বল্লে, আমাকে নিয়ে যাবার কথা বলতে তোমার লজ্জা হয় না! মনে নেই—কাছারীতে হাজার লোকের সামনে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে! লজ্জা করে না?

পঞ্চু ধীরে ধীরে ভামিনীর হাত ধরলে,—ভামিনী কিন্তু ছাড়াবার চেষ্টা করলে না। হাজার হোক নারী-হৃদয় ত!

পঞ্চু আস্তে আস্তে বললে, কিন্তু না নিয়ে যাওয়ার লজ্জা যে তারও চেয়ে বেশী। দোহাই তোমার!

ভামিনীর দৃষ্টি নরম হ'য়ে এলো। সে বললে, দেখো, অনেক দিন পরে আমি একটি ছেলে পেয়েছি—সৌদামিনীর ছেলে সুকু। আমাকে যদি নিয়ে যেতে চাও, ত' তার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। তা নইলে আমি কোথাও স্বস্তি পাব না।

পঞ্চু বললে, কি ব্যবস্থা?

ভামিনী বল্লে, তোমার টাকার ত' অভাব নেই,—হাজার পাঁচেক টাকা ব্যাঙ্কে ওর নামে জমা ক'রে দিয়ে, ব্যাঙ্কের খাতা নিয়ে ওবেলা গাড়ী নিয়ে এসো, আমি যাবো।

পঙ্কুর বুকের ভেতর থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ঠেলে উঠতে চাইলে। সে চুপ ক'রে খানিকটা ভেবে বল্লে, আচ্ছা তাই হবে।

ভামিনী পঙ্কুর শুষ্ক হাত আপনার হাতের ভেতর নিয়ে বললে, যাকে ছেলের মত স্নেহ করেছি, তার জন্যে পাঁচ হাজার টাকা, না হয় খরচই হোল! কি বল? মনে কর যেন আমার একটা ভারী অসুখে তোমার ঐ টাকাটা খরচ হ'য়েছে।

পঙ্কুর বুকের ভেতরটা হঠাৎ যেন শিউরে উঠল। সে বল্লে, না—তা মনে করতে হবে কেন,—আমি অমনিই ওই টাকাটা দোবো।

ভামিনী বল্লে, তা হ'লে সকাল সকাল আসবে ত'? দেরী যেন না হয়।

অনেক দিন পরে পঙ্কুর বুকের ভেতরটা যেন হাল্কা বোধ হ'তে লাগল,—পাঁচ হাজার টাকার ক্ষতি সত্ত্বেও! সে স্পষ্ট অনুভব করলে যে, আজকের দিনের লাভ,—তার অনেক পাঁচ হাজারের চেয়ে বেশী দাঁড়াল,—সে তার মনের শান্তি!

এমন কি তার মুখে হাসিও দেখা দিলে। সে হেসে বল্লে, আচ্ছা, খুব সকাল সকালই আসব।

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সুধীররঞ্জন খাস্তগির] জল্‌কে চল্‌!

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত

শ্রীম—কথিত

গিরীশ-মন্দিরে জ্ঞান-ভক্তি-সমন্বয়-কথা-প্রসঙ্গে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ স্বর্গীয় গিরীশ ঘোষের বসুপাড়ার বাটীতে ভক্তসঙ্গে-বসিয়া ঈশ্বরীয় কথা কহিতেছেন। বেলা ৩টা বাজিয়াছে। মাষ্টার আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। আজ বুধবার ১৫ই ফাল্গুন, শুক্লা একাদশী—২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৫ খৃঃ। গত রবিবার দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম-মহোৎসব হইয়া গিয়াছে। আজ ঠাকুর গিরীশের বাড়ী হইয়া ষ্টার থিয়েটারে বৃষকেতু অভিনয় দর্শন করিতে যাইবেন।

ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বেই আসিয়াছেন। কাজ সারিয়া আসিতে মাষ্টারের কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়াছে। তিনি আসিয়াই দেখিলেন, ঠাকুর উৎসাহের সহিত ব্রহ্মজ্ঞান ও ভক্তিতত্ত্বের সমন্বয় কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশ প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি)। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, জীবের এই তিন অবস্থা।

"যারা জ্ঞান বিচার করে তারা তিন অবস্থাই উড়িয়ে দেয়। তারা বলে যে ব্রহ্ম তিন অবস্থারই পার ; স্থূল সূক্ষ্ম কারণ তিন দেহের পার ; সত্ত্ব রজঃ তম তিন গুণের পার ; সমস্তই **মায়া**, যেমন আয়নাতে প্রতিবিম্ব পড়েছে ; প্রতিবিম্ব কিছু বস্তু নয় ; **ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু**।

"ব্রহ্মজ্ঞানীরা আরও বলে, দেহাত্ম-বুদ্ধি থাকলেই দুটো দেখায়। প্রতিবিম্বটাও সত্য বলে বোধ হয়। ঐ বুদ্ধি চলে গেলে, সোঽহং 'আমিই সেই ব্রহ্ম' এই অনুভূতি হয়।

একজন ভক্ত। তা হলে কি আমরা সব বিচার কোরব ?

[দুই পথ ও গিরীশ। বিচার ও ভক্তি। জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। বিচার-পথও আছে ; বেদান্তবাদীদের পথ। আর একটী পথ আছে ভক্তিপথ। ভক্ত যদি ব্যাকুল হয়ে কাঁদে ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য, সে তাই পায়। জ্ঞান-যোগ ও ভক্তিযোগ।

"দুই পথ দিয়াই ব্রহ্মজ্ঞান হতে পারে। কেউ কেউ ব্রহ্মজ্ঞানের পরও ভক্তি নিয়ে থাকে লোক-শিক্ষার জন্য ; যেমন অবতারাদি।

"দেহাত্ম-বুদ্ধি, 'আমি'-বুদ্ধি, কিন্তু সহজে যায় না ; তাঁর কৃপায় সমাধিস্থ হলে যায়—নির্ব্বিকল্প সমাধি, জড় সমাধি।

"সমাধির পর অবতারাদির 'আমি' আবার ফিরে আসে—বিদ্যার আমি, ভক্তের আমি। এই 'বিদ্যার আমি' দিয়ে লোকশিক্ষা হয়। শঙ্করাচার্য্য 'বিদ্যার আমি' রেখেছিল।

"চৈতন্যদেব এই 'আমি' দিয়ে ভক্তি আস্বাদন করতেন, ভক্তি ভক্ত নিয়ে থাকতেন ; ঈশ্বরীয় কথা কইতেন ; নাম সংকীর্ত্তন করতেন।

"আমি তো সহজে যায় না, তাই ভক্ত জাগ্রত স্বপ্ন প্রভৃতি অবস্থা উড়িয়ে দেয় না। ভক্ত সব অবস্থাই লয় ; সত্ত্ব রজঃ তম তিন গুণও লয় ; ভক্ত দেখে তিনিই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হয়ে রয়েছেন, জীব-জগৎ হয়ে রয়েছেন ; আবার সাকার চিন্ময়রূপে দর্শন দেন।

"ভক্ত বিদ্যামায়া আশ্রয় করে থাকে। সাধু-সঙ্গ, তীর্থ, জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য এই সব আশ্রয় করে থাকে। সে বলে, যদি 'আমি' সহজে চলে না যায়, তবে থাক্ শালা 'দাস' হয়ে 'ভক্ত' হয়ে।

"ভক্তেরও একাকার জ্ঞান হয় ; সে দেখে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই নাই। স্বপ্নবৎ বলে না, তবে বলে তিনিই এই সব হয়েছেন ; মোমের বাগানে সবই মোম, তবে নানা রূপ।

"তবে পাকা ভক্তি হলে এইরূপ বোধ হয়। অনেক পিত্ত জমলে তবে ন্যাবা লাগে ; তখন দেখে যে সবই হোল্‌দে। শ্রীমতী শ্যামকে ভেবে ভেবে সমস্ত শ্যামময়

দেখলে; আর নিজেকেও শ্যাম বোধ হল। পারার হ্রদে সীসে অনেক দিন থাকলে সেটাও পারা হয়ে যায়। কুমুরে পোকা ভেবে ভেবে আরশুলা নিশ্চল হয়ে যায়; নড়ে না; শেষে কুমুরে পোকাই হয়ে যায়। ভক্তও তাঁকে ভেবে ভেবে অহংশূন্য হয়ে যায়। আবার দেখে 'তিনিই আমি' 'আমিই তিনি'।

"আরশুলা যখন কুমুরে পোকা হয়ে যায়, তখন সব হয়ে গেল। তখনই মুক্তি।

[নানা ভাবে পূজা ও গিরীশ। 'আমার মাতৃভাব'।]

"যতক্ষণ আমিটা তিনি রেখে দিয়েছেন, ততক্ষণ একটী ভাব আশ্রয় করে তাঁকে ডাকতে হয়—শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য—এই সব।

"আমি দাসী ভাবে এক বৎসর ছিলাম—ব্রহ্মময়ীর দাসী। মেয়েদের কাপড় ওড়না এই সব পরতাম; আবার নথ পরতাম। মেয়ের ভাবে থাকলে কাম জয় হয়।

"সেই আদ্যাশক্তির পূজা করতে হয়; তাঁকে প্রসন্ন করতে হয়। তিনিই মেয়েদের রূপ ধারণ করে রয়েছেন; তাই আমার মাতৃভাব।

"মাতৃভাব অতি শুদ্ধ ভাব। তন্ত্রে বামাচারের কথাও আছে; কিন্তু সে ভাল নয়; পতন হয়। ভোগ রাখলেই ভয়।

"মাতৃ ভাব যেন নির্জ্জলা একাদশী; কোন ভোগের গন্ধ নাই। আর আছে ফল মূল খেয়ে একাদশী; আর লুচি ছক্কা খেয়ে একাদশী। আমার নির্জ্জলা একাদশী; আমি মাতৃভাবে ষোড়শীর পূজা করেছিলাম। দেখলাম স্তন মাতৃস্তন, যোনি মাতৃযোনি।

"এই মাতৃভাব সাধনের শেষ কথা। 'তুমি মা আমি তোমার ছেলে' এই শেষ কথা।

[সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম। গৃহস্থদের নিয়ম ও গিরীশ।।

"সন্ন্যাসীর নির্জ্জলা একাদশী; সন্ন্যাসী যদি ভোগ রাখে, তা হলেই ভয়। কামিনী কাঞ্চন ভোগ। যেমন থুথু ফেলে আবার থুথু খাওয়া। টাকা, কড়ি, মান, সম্ভ্রম, ইন্দ্রিয়সুখ—এই সব ভোগ। সন্ন্যাসীর ভক্ত স্ত্রীলোকের সঙ্গে বসা বা আলাপ করাও ভাল নয়—নিজেরও ক্ষতি আর অন্য লোকেরও ক্ষতি। অন্য লোকের শিক্ষা হয় না, লোক-শিক্ষা হয় না। সন্ন্যাসীর দেহধারণ লোক-শিক্ষার জন্য।

"মেয়েদের সঙ্গে বসা কি বেশীক্ষণ আলাপ, তাকেও রমণ বলেছে। রমণ আট প্রকার। মেয়েদের কথা শুনছি; শুনতে শুনতে আনন্দ হচ্ছে; ও এক রকম রমণ। মেয়েদের কথা বলছি (কীর্ত্তনম্) ও একরকম রমণ; মেয়েদের সঙ্গে নির্জ্জনে চুপি চুপি কথা কচ্ছি; ও এক রকম। মেয়েদের কোন জিনিস কাছে রেখে দিয়েছি, আনন্দ হচ্ছে; ও একরকম। স্পর্শ করা এক রকম। তাই গুরুপত্নী যুবতী হলে পাদস্পর্শ করতে নাই।

"সন্ন্যাসীদের এই সব নিয়ম। সংসারীদের আলাদা কথা; দু' একটী ছেলে হলে ভাই ভগ্নীর মত থাকবে; তাদের অন্য সাত রকম রমণে তত দোষ নাই।

"গৃহস্থের ঋণ আছে। দেবঋণ, পিতৃঋণ, ঋষিঋণ; আবার মাগঋণও আছে, একটী দুটী ছেলে হওয়া আর সতী হলে প্রতিপালন করা।

"সংসারীরা বুঝতে পারে না, কে ভাল স্ত্রী কে মন্দ স্ত্রী; কে বিদ্যাশক্তি কে অবিদ্যাশক্তি। যে ভাল স্ত্রী বিদ্যাশক্তি, তার কাম ক্রোধ এসব কম; ঘুম কম; স্বামীর মাথা ঠেলে দেয়। যে বিদ্যাশক্তি তার স্নেহ, দয়া, ভক্তি, লজ্জা এই সব থাকে। সে সকলেরই সেবা করে বাৎসল্য ভাবে; আর স্বামীর যাতে ভগবানে ভক্তি হয় তার সাহায্য করে, বেশী খরচ করে না পাছে স্বামীর বেশী খাটতে হয়, পাছে ঈশ্বর চিন্তার অবসর না হয়।

"আবার পুরুষ মেয়ের অন্য অন্য লক্ষণ আছে। খারাপ লক্ষণ, টেরা, চোখ কোটর, উন পাঁজর, বিড়াল চোখ, বাছুরে গাল।"

[সমাধিতত্ত্ব ও গিরীশ। ঈশ্বর লাভের উপায়—গিরীশের প্রশ্ন।]

গিরীশ। আমাদের উপায় কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ভক্তিই সার। আবার ভক্তির সত্ত্ব, ভক্তির রজঃ, ভক্তির তম, আছে।

"ভক্তির সত্ত্ব দীন হীন ভাব ; ভক্তির তমঃ যেন ডাকাত পড়া ভাব ; আমি তাঁর নাম করছি আমার আবার পাপ কি ? তুমি আমার আপনার মা, দেখা দিতেই হবে।

গিরীশ (সহাস্যে)। ভক্তির তমঃ আপনিই তো শেখান।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। তাঁকে দর্শন করবার কিন্তু লক্ষণ আছে। সমধি হয়। সমাধি পাঁচ প্রকার ; ১ম, পিঁপড়ের গতি, মহাবায়ু উঠে পিঁপড়ের মত। ২য়, মীনের গতি ; ৩য়, তীর্য্যক্ গতি ; ৪র্থ, পাখীর গতি ; পাখী যেমন এ ডাল থেকে ও ডালে যায় ; ৫ম, কপিব্য, বানরের গতি ; মহাবায়ু যেন লাফ দিয়ে মাথায় উঠে গেল, আর সমাধি হল।

"আবার দু রকম আছে ; ১ম, স্থিত-সমাধি ; একেবারে বাহ্যশূন্য ; অনেকক্ষণ, হয়ত অনেক দিন, রইল। ২য়, উন্মনা সমাধি ; হঠাৎ মনটা চার দিক থেকে কুড়িয়ে এনে ঈশ্বরেতে যোগ করে দেওয়া।

[উন্মনা-সমাধি ও মাষ্টার।]

(মাষ্টারের প্রতি) তুমি ওটা বুঝেছ ?

মাষ্টার। আজ্ঞে হাঁ।

গিরীশ। তাঁকে কি সাধন করে পাওয়া যায় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। নানা রকমে তাঁকে লোকে লাভ করেছে। কেউ অনেক তপস্যা সাধন ভজন করে ; সাধন সিদ্ধ। কেউ জন্মাবধি সিদ্ধ ; যেমন নারদ শুকদেবাদি ; এদের বলে নিত্য-সিদ্ধ। আবার আছে হঠাৎ-সিদ্ধ ; হঠাৎ লাভ করেছে। যেমন হঠাৎ কোন আশা ছিল না, কেউ নন্দ বসুর মত বিষয় পেয়ে গেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গিরীশের শান্তভাব, কলিতে শূদ্রের ভক্তি ও মুক্তি

শ্রীরামকৃষ্ণ। আর আছে স্বপ্ন-সিদ্ধ, আর কৃপা-সিদ্ধ। এই বলিয়া ঠাকুর ভাবে বিভোর হইয়া গান গাহিতেছেন।

গান

শ্যামাধন কি সবাই পায়,
অবোধমন বোঝে না একি দায়।
শিবেরই অসাধ্য সাধন মন মজান রাঙ্গা পায়॥
ইন্দ্রাদি সম্পদ সুখ তুচ্ছ হয় যে ভাবে মায়,
সদানন্দ সুখে ভাসে শ্যামা যদি ফিরে চায়॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র যে চরণ ধ্যানে না পায়,
নির্গুণে কমলাকান্ত তবু সে চরণ চায়॥

"ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ ভাবাবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। গিরীশ প্রভৃতি ভক্তেরা সম্মুখে আছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে ষ্টার থিয়েটারে গিরীশ অনেক কথা বলিয়াছিলেন ; এখন শান্তভাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (গিরীশের প্রতি) তোমার এ ভাব বেশ ভাল ; শান্তভাব। মাকে তাই বলেছিলাম, মা ওকে শান্ত করে দাও, যা তা আমায় না বলে।

গিরীশ। (মাষ্টারের প্রতি) আমার জিভ কে যেন চেপে ধরেছে ; আমায় কথা কইতে দিচ্ছে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ এখনও ভাবস্থ, অন্তর্মুখ। বাহিরের ব্যক্তি বস্তু ক্রমে ক্রমে সব যেন ভুলে যাচ্ছেন। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া মনকে নাবাচ্ছেন। ভক্তদের আবার দেখিতেছেন। (মাষ্টার দৃষ্টে) এরা সব সেখানে (দক্ষিণেশ্বরে) যায় ;— তা যায় তো যায় ; মা সব জানে।

(প্রতিবেশী ছোকরার প্রতি)। কি গো ! তোমার কি বোধ হয় ? মানুষের কি কর্ত্তব্য ?

সকলে চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর কি বলিতেছেন যে ঈশ্বর লাভই জীবনের উদ্দেশ্য ?

(নারাণের প্রতি) তুই পাস করবিনি ? 'ওরে পাশ-মুক্ত শিব পাশ-বদ্ধ জীব'।

ঠাকুর এখনও ভাবাবস্থায় আছেন। কাছে গ্লাস করা জল ছিল, পান করিলেন। তিনি আপনা আপনি বলিতেছেন, কইভাবে তো জল খেয়ে ফেললুম !

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীযুক্ত অতুল। ব্যাকুলতা।]

এখনও সন্ধ্যা হয় নাই। ঠাকুর গিরীশের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অতুলের সহিত কথা কহিতেছেন। অতুল ভক্তসঙ্গে

সম্মুখেই বসিয়া আছেন। একজন ব্রাহ্মণ প্রতিবেশীও বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (অতুলের প্রতি) আপনাদের এই বলা, আপনারা দুই করবে, সংসারও করবে ভক্তি যাতে হয় তাও করবে।

ব্রাহ্মণ প্রতিবেশী। ব্রাহ্মণ না হলে কি সিদ্ধ হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেন ? কলিতে শূদ্রের ভক্তির কথা আছে। শবরী, রুইদাস, গুহক চণ্ডাল, এ সব আছে।

নারাণ। (সহাস্যে) ব্রাহ্মণ, শূদ্র, সব এক।

ব্রাহ্মণ। এক জন্মে কি হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর দয়া হলে কি না হয়। হাজার বৎসরের অন্ধকার ঘরে আলো আনলে কি একটু একটু করে অন্ধকার চলে যায় ? একেবারে আলো হয় !

(অতুলের প্রতি) তীব্র বৈরাগ্য চাই—যেন খাপ খোলা তরোয়াল। সে বৈরাগ্য হলে, আত্মীয় কালসাপ মনে হয়, গৃহ পাতকুয়া মনে হয়।

"আর আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে হয়। আন্তরিক ডাক তিনি শুনবেনই শুনবেন।

সকলে চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর যাহা বলিলেন, এক মনে শুনিয়া সেই সকল চিন্তা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (অতুলের প্রতি) কেন ? অমন আঁট বুঝি হয় না।

অতুল। মন কৈ থাকে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। অভ্যাসযোগ। রোজ তাঁকে ডাকা অভ্যাস করতে হয়, এক দিনে হয় না; রোজ ডাকতে ডাকতে ব্যাকুলতা আসে।

"কেবল রাত দিন বিষয় কর্ম্ম করলে ব্যাকুলতা কেমন করে আসবে ? যদু মল্লিক আগে আগে ঈশ্বরীয় কথা বেশ শুনত, নিজেও বেশ বলত; আজকাল আর তত বলে না, রাত দিন মোসাহেব নিয়ে' বসে থাকে, কেবল বিষয়ের কথা।"

[সন্ধ্যা সমাগমে, ঠাকুরের প্রার্থনা। তেজচন্দ্র।]

সন্ধ্যা হইল; ঘরে বাতি জ্বালা হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুরদের নাম করিতেছেন, গান গাহিতেছেন ও প্রার্থনা করিতেছেন।

"বলিতেছেন 'হরিবোল' 'হরিবোল' 'হরিবোল'; আবার 'রাম' 'রাম' 'রাম'; আবার 'নিত্যলীলাময়ী'। ওমা উপায় বল মা; 'শরণাগত, শরণাগত, শরণাগত।'

গিরীশকে ব্যস্ত দেখিয়া ঠাকুর একটু চুপ করিলেন। তেজচন্দ্রকে বলিতেছেন, তুই একটু কাছে এসে বোস।

তেজচন্দ্র কাছে বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মাষ্টারকে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিতেছেন, আমায় যেতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মাষ্টারের প্রতি) ও কি বলছে ?

মাষ্টার। বাড়ীতে যেতে হবে, তাই বলছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি ওদের অত টানি কেন ? ওরা নির্ম্মল আধার—বিষয়-বুদ্ধি ঢোকেনি। বিষয়-বুদ্ধি থাকলে উপদেশ ধারণা করতে পারে না। নূতন হাঁড়িতে দুধ রাখা যায়, দই পাতা হাঁড়িতে দুধ রাখলে দুধ নষ্ট হয়।

"যে বাটিতে রসুন গুলেছ, সে বাটি হাজার ধোও, রসুনের গন্ধ যায় না।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ ষ্টার থিয়েটারে বৃষকেতু অভিনয়-দর্শনে, নরেন্দ্র প্রভৃতি সঙ্গে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বৃষকেতু অভিনয় দর্শন করিবেন। বিডনষ্ট্রীটে যেখানে এখন মনোমোহন থিয়েটার, পূর্ব্বে সেই মঞ্চে ষ্টার-থিয়েটার অভিনয় হইত। থিয়েটারে আসিয়া বক্সে দক্ষিণাস্য হইয়া বসিয়াছেন। মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তেরা কাছেই বসিয়াছেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। নরেন্দ্র এসেছে ?

মাষ্টার। আজ্ঞে হাঁ।

অভিনয় হইতেছে। কর্ণ ও পদ্মাবতী করাত দুই দিকে দুইজন ধরিয়া বৃষকেতুকে বলিদান করিলেন। পদ্মাবতী কাঁদিতে কাঁদিতে মাংস রন্ধন করিলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অতিথি আনন্দ করিতে করিতে কর্ণকে বলিতেছেন, এই বার এস, আমরা একসঙ্গে বসে রান্না মাংস খাই।

অভিনয়ে কর্ণ বলিতেছেন, তা আমি পারব না; পুত্রের মাংস খেতে পারব না।

একজন ভক্ত সহানুভূতি-ব্যঞ্জক অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিলেন। ঠাকুরও সেই সঙ্গে দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

অভিনয় সমাপ্ত হইলে ঠাকুর রঙ্গ-মঞ্চের বিশ্রাম ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গিরীশ নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তেরা বসিয়া আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরে প্রবেশ করিয়া নরেন্দ্রের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন ও বলিলেন, আমি এসেছি।

ঠাকুর উপবেশন করিয়াছেন। এখনও ঐক্যতান বাদ্যের (কনসার্ট) শব্দ শুনা যাইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। এই বাজনা শুনে আমার আনন্দ হচ্ছে। সেখানে (দক্ষিণেশ্বরে) সানাই বাজত, আমি ভাবাবিষ্ট হয়ে যেতাম; একজন সাধু আমার অবস্থা দেখে বলত, এ সব ব্রহ্মজ্ঞানের লক্ষণ।

গিরীশ ও 'আমি আমার'।

কনসার্ট থামিয়া গেলে শ্রীরামকৃষ্ণ আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশের প্রতি)। এ কি তোমার থিয়েটার, না তোমাদের?

গিরীশ। আজ্ঞা, আমাদের।

শ্রীরামকৃষ্ণ। **আমাদের** কথাটীই ভাল; **আমার** বলা ভাল নয়। কেউ কেউ বলে আমি নিজে এসেছি; এ সব হীনবুদ্ধি অহঙ্কারে লোকে বলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্র প্রভৃতি সঙ্গে।

নরেন্দ্র। সবই থিয়েটার।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ হাঁ ঠিক। তবে কোথাও বিদ্যার খেলা, কোথাও অবিদ্যার খেলা।

নরেন্দ্র। সবই বিদ্যার।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ হাঁ; তবে উটি ব্রহ্ম জ্ঞানে হয়। ভক্তি ভক্তের পক্ষে দুইই আছে; বিদ্যা মায়া অবিদ্যা মায়া।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুই একটু গান গা।

নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন।

গান।

চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী।
মহাভাব'রসলীলা কি মাধুরী মরি মরি।
বিবিধ বিলাস রস প্রসঙ্গ, কত অভিনয় ভাবত রঙ্গ;
ডুবিছে উঠিছে করিছে রঙ্গ, নবীন নবীন রূপ ধরি।
(হরি হরি ব'লে)
মহাযোগে সমুদায় একাকার হইল, দেশ কাল
ব্যবধান ভেদাভেদ ঘুচিল (আশা পুরিল রে,—
আমার সকল সাধ মিটে গেল) এখন আনন্দে
মাতিয়া দু বাহু তুলিয়া বল রে মন হরি হরি।

নরেন্দ্র যখন গাইতেছেন, 'মহাযোগে সব একাকার হইল' তখন শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, এটি ব্রহ্মজ্ঞানে হয়; তুই যা বলছিলি, সবই বিদ্যা।

নরেন্দ্র যখন গাইতেছেন, 'আনন্দে মাতিয়া দুবাহু তুলিয়া বলরে মন হরি হরি,' তখন শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে বলিতেছেন, ঐটী দুবার করে বল্।

গান হইয়া গেলে আবার ভক্ত সঙ্গে কথা হইতেছে।

গিরীশ। দেবেন্দ্রবাবু আসেন নাই; তিনি অভিমান করে বলেন আমাদের ভিতর তো ক্ষীরের পোর নাই; কলায়ের পোর। আমরা এসে কি কর'ব?

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিস্মিত হইয়া)। কই, আগে ত উনি ওরকম করতেন না?

ঠাকুর জল সেবা করিতেছেন, নরেন্দ্রকেও খাইতে দিলেন।

যতীন। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। 'নরেন্দ্র খাও' 'নরেন্দ্র খাও', বলছেন; আমরা শালারা ভেসে এসেছি।

যতীনকে ঠাকুর খুব ভালবাসেন। তিনি দক্ষিণেশ্বরে গিয়া মাঝে মাঝে দর্শন করেন; কখন কখন রাত্রেও সেখানে গিয়া থাকেন। তিনি শোভাবাজারের রাজাদের বাড়ীর ছেলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)। ওরে (যতীন) তোর কথাই বলছে।

ঠাকুর হাসিতে হাসিতে যতীনের থুঁতি ধরে আদর করিতে করিতে বলিলেন 'সেখানে যাস্ গিয়ে খাস্।' অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বরে যাস্।

ঠাকুর আবার বিবাহ-বিভ্রাট অভিনয় শুনিবেন; বক্সে
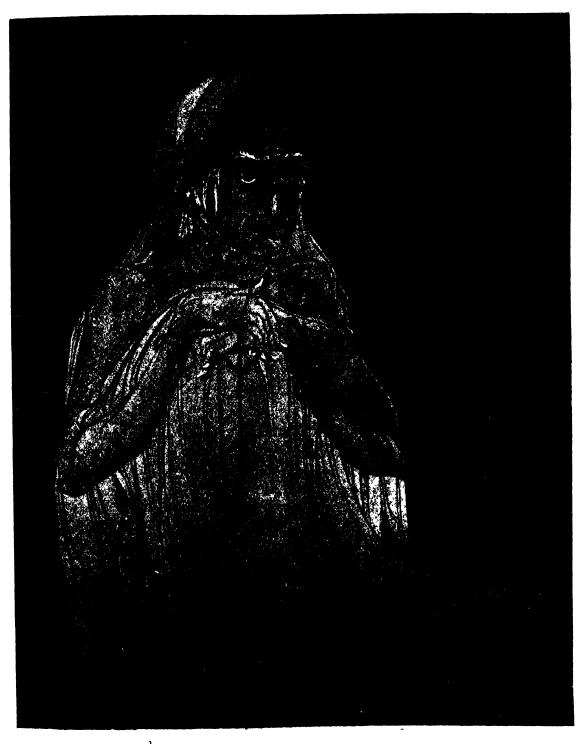
শেষ চিন্তা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত মহম্মদ আবদার রহমন চগ্‌তাই

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

গিয়া বসিলেন। ঋষির কথাবার্ত্তা শুনে হাসিতে লাগিলেন।

[গিরীশের অবতারবাদ। শ্রীরামকৃষ্ণ কি অবতার ?]

খানিকক্ষণ শুনিয়া অন্যমনস্ক হইলেও মাষ্টারের সহিত আস্তে আস্তে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। আচ্ছা, গিরীশ ঘোষ যা বলছে (অর্থাৎ অবতার) তা কি সত্য ?

মাষ্টার। আজ্ঞা ঠিক কথা ; না হলে সবার মনে লাগছে কেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেখ, এখন একটী অবস্থা আসছে ; আগেকার অবস্থা উল্টে গেছে। ধাতুর দ্রব্য ছুঁতে পারছি না।

মাষ্টার অবাক হইয়া শুনিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এই যে নূতন অবস্থা, এর একটী খুব গুহ্য মানে আছে।

ঠাকুর ধাতু স্পর্শ করিতে পারিতেছেন না। অবতার বুঝি মায়ার ঐশ্বর্য্য কিছুই ভোগ করেন না, তাই কি ঠাকুর এই সব কথা বলিতেছেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)।—আচ্ছা, আমার অবস্থা কিছু বদলাচ্ছে দেখছ ?

মাষ্টার। আজ্ঞা, কই ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কার্য্যে ?

মাষ্টার। এখন কাজ বাড়ছে—যত লোক জানতে পারছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেখছ ! আগে যা বলতুম এখন ফলছে ?

ঠাকুর কিয়ৎকাল চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলছেন, আচ্ছা পল্টুর ভাল ধ্যান হয় না কেন ?

[গিরীশ কি রসুন গোলা বাটি ? The Lord's message of hope for socalled 'Sinners']

এইবার ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বর যাইবার উদ্‌যোগ হইতেছে।

ঠাকুর কোন ভক্তের কাছে গিরীশের সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'রসুন গোলা বাটি হাজার ধোও রসুনের গন্ধ কি একেবারে যায় ?' গিরীশও তাই মনে মনে অভিমান করিয়াছেন ; যাইবার সময় গিরীশ ঠাকুরকে কিছু নিবেদন করিতেছেন :

গিরীশ। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) রসুনের গন্ধ কি যাবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যাবে।

গিরীশ। তবে বল্লেন 'যাবে' না ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। অত আগুণ জ্বললে গন্ধ ফন্ধ পালিয়ে যায়। রসুনের বাটি পুড়িয়ে নিলে আর গন্ধ থাকে না, নূতন হাঁড়ী হয়ে যায়।

"যে বলে আমার হবে না, তার হয় না। **মুক্ত অভিমানী মুক্তই হয়,** আর বদ্ধ অভিমানী বদ্ধই হয় ! যে জোর করে বলে, আমি মুক্ত হয়েছি সে মুক্তই হয়। যে রাত দিন আমি বদ্ধ, আমি বদ্ধ বলে, সে বদ্ধই হয়ে যায় !

নিকুঞ্জ-কানন

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল্

অস্তমিত দিবালোক, সন্ধ্যা আসে ধীরে,
বৃন্দাবনে স্তব্ধ এবে নিকুঞ্জ-কানন,
নাহি যায় দেখা তথা একটি প্রাণীরে।
কেহ নাহি পারে নিশা করিতে যাপন।
ভাবাবেশে চিত্ত মোর শুনিবারে পায়,
নূপুরের রব আর বাঁশরীর সুর।
সখীরা কি কথা কহে অস্ফুট ভাষায়।
নিত্যলীলা হয় তথা মিলন-মধুর।
কোথা রাধা, কোথা শ্যাম, কোথা বৃন্দাবন।
কোথায় নিকুঞ্জবনে সখীদের মেলা।
জাগরিত আমি, কিবা হেরি এ স্বপন,
এ কি সত্য—না জানি কি কুহকের খেলা।
সত্য মিথ্যা কিছু হরি জানিতে না চাই,
ক্ষণতরে যেন নাহি তোমারে হারাই।

হাইফেন

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

—১—

"এই, ওঠ।"—বলিয়া মলয় বিলোপের সম্মুখের খোলা বইখানা টানিয়া দূরে ফেলিয়া দিল।

বিলোপ মেসে থাকে। এবার তাহার এম্‌-এ পরীক্ষা দিবার বৎসর। তাই সে অধ্যয়নে রত ছিল। মলয় তাহার সহপাঠী; সে বিলোপের সঙ্গে বি-এ পাস করিয়া এখন এটর্নির কাজ শিখিতেছে—তাহার পিতা একজন বড় এটর্নি। বিলোপ বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—উঠে কোথায় যেতে হবে?

মলয় হাসিয়া বলিল—যে দিকে দু চক্ষু যায়। বড়-দিনের ছুটিটা তোমার পড়্‌বার জন্যে হয় নি।

বিলোপ উঠিয়া দূরে নিক্ষিপ্ত বইখানা তুলিয়া বন্ধ করিয়া যথাস্থানে রাখিতে রাখিতে বলিল—দু চক্ষু ত লোক-লোকান্তরে যেতে পারে। সাত দিনের মধ্যে ফিরে আস্‌তে পারা যায় এমন একটা সীমা নির্দ্দেশ কর্‌লে ভালো হত না?

মলয় বলিল—সীমা নির্দ্দেশ করা যাবে ষ্টেসনে গিয়ে। পাঁচ-শ মাইল চৌহদ্দির মধ্যে যেখানে হোক্ গেলেই হবে।

মলয় বিলোপকে সঙ্গে করিয়া ছুটিতে বেড়াইতে যাইবার আভাস আগেই দিয়া রাখিয়াছিল। তাই এই আকস্মিক প্রস্তাবে আশ্চর্য্য না হইয়া বিলোপ বিছানা আর জামা-কাপড় গুছাইয়া লইতে লইতে জিজ্ঞাসা করিল—আজ এমন হঠাৎ যাবার খেয়াল হল যে?

মলয় হাসিয়া বলিল—অকস্মাতের আশা আমাকে ঘরে থাক্‌তে দিলে না। কোন অচেনা প্রেয়সীর বিরহ আমাকে উতলা করে' তুলেছে।

বিলোপ লেপ পাট করিতে করিতে হাসিয়া বলিল—চলো, আমি ঘটকালি করে' এবার তোমার আইবুড়ো নাম ঘুচিয়ে আন্‌ব।

মলয় হাসিয়া বলিল—দেখো, ঘটকালি কর্‌তে গিয়ে নিজে যেন প্রেমে পড়ে' যেও না।

বিলোপ হাসিয়া বলিল—তাহলে ত ভালোই হবে; একেবারে 'রীতিমত নভেল'! নভেলের সেই চিরন্তন ত্রিভুজের টানাটানি! গল্পটা চারু বন্দ্যোপাধ্যায়কে বল্‌লে তিনি হয় ত আমাদের নিয়ে একটা উপন্যাস লিখে ফেল্‌তে পার্‌বেন।

মলয় হাসিয়া বলিল—তাতে মজা মন্দ হবে না। কিন্তু ভাই, তাঁকে বোলো আমার নামটা যেন বদ্‌লে রাখেন।……মশারিটা আবার বিছানার মধ্যে ভর্‌ছ কেন? শীতকালে মশারি কি হবে?

বিলোপ বিছানা বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল—তোমার ত মতি স্থির নেই যে কোথায় যাবে। যদি ঢাকায় যাও তাহলে এই মশারি ঢাকা না দিলে ঢাকাই মশারা মিলে আমার নামটাকে একেবারে সার্থক করে' তুল্‌বে।

মলয় হাসিয়া বলিল—না, ঢাকায়-ফাকায় যাওয়া নয়, ফাঁকায় খোলায় কোথাও যেতে হবে, নইলে অচেনা প্রেয়সীর দর্শন মিল্‌বে কেমন করে'……ও-সব আবার কি হবে?—ছুঁচ সুতো সেফ্‌টি-পিন ছুরী কাঁচি বাতি দেশলাই—যত রাজ্যের আগ্‌ড়ুম-বাগ্‌ড়ুম জমিয়ে বোঝা বাড়িয়ে তুল্‌ছ, যেন নতুন-বৌ ঘর-বসত কর্‌তে চলেছ……

বিলোপ হাতুড়ি পেরেক আর দড়ি লইয়া বাক্‌সের মধ্যে ভরিতে ভরিতে বলিল—ঘর-বসত কর্‌তেই ত যাচ্ছি, বিদেশ বিভূঁইয়ে হঠাৎ একটা জিনিসের দর্‌কার হলে তখন কোথায় পাবে? আর তোমার নতুন-বৌকে যদি ঘর-বসত কর্‌তে বাসাড়ের বাসাতেই ধুলো-পায়ে লগ্ন কর্‌তে হয়……

মলয় হাসিয়া বলিল—সাধে কি তোমাকে তোমার মেসের বন্ধুরা গিন্নি বলে' ডাকে!

বিলোপ বাক্‌স বন্ধ করিয়া জামা গায়ে দিতে দিতে বলিল—ভাগ্যিস গিন্নি হয়েছিলাম তাইতে ত বিদেশে বেড়াতে যাবার সময় তোমার আমাকে না হলে চলে না।

মলয় বলিল—তা ভাই ঠিক, কিন্তু তোমার সঙ্গে বিদেশে গিয়ে সুখ আছে, মজা নেই; বিদেশে গিয়েও মনে হয় যেন বাড়ীতেই আছি।

বিলোপ কোনো কথা না বলিয়া বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল, সে স্বভাবতঃই অল্পভাষী গম্ভীর-প্রকৃতির লোক। সে নত হইয়া তক্তপোষের তলা হইতে একটা বেতের বাক্স টানিয়া বাহির করিল এবং তাহাতে মিলারের তালা একটা টিপিয়া লাগাইয়া দিল।

মলয় বিস্মিত হইয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল—ওটাও যাবে না কি?

বিলোপ মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ।

মলয় জিজ্ঞাসা করিল—পেটারীর জঠরে আছেন কি কি বস্তু?

বিলোপ কৌতুক-ভরা হাসি হাসিয়া বলিল—চা চিনি ঘন-দুধ কাপ্ সসার্ জেলি মাখন আর আধখানা রুটি। আজ যে রকম গতিক দেখ্‌ছি তাতে ঐ আধখানা রুটি চিবিয়েই আমাদের দুজনের রাত কাটাতে হবে।

মলয় প্রতিবাদের স্বরে বলিয়া উঠিল—আরে কেল্‌নারের সদাব্রত খোলা থাকতে 'আমি কি ডরাই বন্ধু বুভুক্ষা রাক্ষসে!'

বিলোপ বলিল—হিঁদুর ছেলে, গরু শূয়োর খেয়ে তৃপ্তি পাওয়া যায় না। কেল্‌নার কোম্পানীর পুণ্যনাম যখন কীর্ত্তন কর্‌লে তখন হাওড়া ষ্টেসনে গিয়ে ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া রেলওয়ে দিয়ে কোথাও যাওয়ার মৎলব তোমার মনে চাপা আছে বুঝ্‌তে পার্‌ছি। ষ্টেসনে যাবার সময় পুলের কাছে ভীমনাগের দোকান থেকে কিছু সন্দেশ সংগ্রহ করে' নিতে হবে।

মলয় বলিল—আচ্ছা তা হবে। এখন তোমার চাকরকে ডেকে জিনিস-পত্তর নিয়ে বেরোও ত।

বিলোপ উচ্চস্বরে হাঁক দিল—এই পর্‌গন।

মেসের নীচের তলা হইতে ভৃত্য সাড়া দিল—যাই বাবু।

বিলোপ আবার হাঁকিয়া বলিল—একখানা গাড়ী ডেকে আন ত।

মলয় বাধা দিয়া বলিল—গাড়ী আমার সঙ্গে আছে। তোমার ভৃত্যপ্রবরকে বলো তোমার গন্ধমাদনটি সেই গাড়ীর মাথায় চাপিয়ে দিক।

বিলোপ আবার হাঁকিল—এই পর্‌গন, তুই একবার উপরে আয়।

ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল আধবুড়ো হিন্দুস্থানী চাকর পরগন, তাহার ডান হাতে সোনার তাগা এবং গলায় কালো রেশমের সুতায় জরি জড়াইয়া গাঁথা একটি ছোট চৌকা সোনার পদক, গলার রেশমী ফাঁসের জরির পুঁঠেটা পিঠের মাঝখান পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে। তাহাকে দেখিয়াই বিলোপ বলিল—এই মোটগুলো গাড়ীর মাথায় তুলে' দে ত।

পরগন একে একে মোট বহিয়া গাড়ীর মাথায় উঠাইয়া দিল। বিলোপকে গাড়ীতে বসাইয়া মলয় গাড়ীতে উঠিতে উঠিতে কোচম্যান্‌কে বলিল—ঘর চলো।

বিলোপ আশ্চর্য্য ও খুশী হইয়া বলিল—তবু ভালো! আমি মনে করেছিলাম এই দুপুর বেলা থেকেই হাবড়া ষ্টেসনে গিয়ে ধন্না পাড়্‌তে হবে। এখন্ ত লোকাল-গাড়ী ছাড়া আর কোথাও যাবার গাড়ী নেই।

মলয় হাসিয়া বলিল—বাড়ী থেকে খেয়ে নিয়ে রাত্রে পুরী এক্‌স্‌প্রেসে পুরী যাওয়া যাবে।

বিলোপ হাসিয়া বলিল—এতদিন পরে মতি স্থির করে' একটা কর্ম্ম কর্‌তে পার্‌ছ দেখ্‌ছি। এইবার স্থির হয়েছ, এইবার প্রজাপতির শুভদৃষ্টি তোমার উপর পড়্‌বার অবসর পাবে।

মলয় হাসিতে হাসিতে বলিল—সেই জন্যেই ত শ্রীক্ষেত্রে চলেছি যদি শ্রী ফেরে।

বিলোপ হাসিয়া বলিল—চলো, শ্রী ফেরাবার ঘটকালির ভার আমার উপর।

মলয় জিজ্ঞাসা করিল—তোমার শ্রী ফির্‌বে কবে?

বিলোপ হাসিয়া বলিল—ভগবান্ ভবিতব্যতাই জানেন।

—২—

দুই বন্ধু পুরীতে গিয়াছে। তাহারা ভিক্টোরিয়া ক্লাবে আশ্রয় লইয়াছে। প্রথম দিনটা অতি সাধারণ ভাবেই অতিবাহিত হইয়া গেল। পরদিন প্রত্যূষে বিলোপ সমুদ্রতীরে বাহির হইয়া পড়িয়াছে; মলয় জীবনে কখনো সূর্য্যোদয় দেখে নাই, সমুদ্রে সূর্য্যোদয়ের প্রলোভনও তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিতে পারে নাই। রাত্রে শুইবার

সময় বিলোপ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল ভোরবেলা বেড়াইতে যাইবার জন্য তাহার সুখনিদ্রা ভঙ্গ করিবে কি না। তাহাতে মলয় উত্তর করিয়াছিল—সূর্য্যোদয় দেখা অপেক্ষা দুই ঘণ্টা বেশী নিদ্রা সম্ভোগ করা ঢের বেশী সুখকর ও আরামদায়ক। সে সূর্য্যাস্ত দেখিয়াই সূর্য্যোদয়ের ছবি কল্পনা করিয়া লইতে পারিবে; ভগবান্ যে কল্পনাশক্তি দিয়াছেন তাহার সদ্ব্যবহার করা চাই ত। যদি বিলোপ নেহাৎ পীড়াপীড়ি করে তাহা হইলে সে শ্রীক্ষেত্র ত্যাগ করিবার দিন সূর্য্যোদয়ের জাগরণের পূর্ব্বে জাগ্রত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা করিয়া দেখিবে। এই জন্য বিলোপকে একাকীই প্রাতভ্রমণে বাহির হইতে হইয়াছে।

সমুদ্রের তীরে সেই প্রত্যুষেই বহু নরনারীর সমাগম হইয়াছে। সকলেরই সঙ্গী আছে; কেবল বিলোপ একাকী। তাহার মনে সৌন্দর্য্য-দর্শনে যে-সব ভাবোন্মেষ হইতেছিল তাহা প্রকাশ করিয়া আলোচনা করিয়া সৌন্দর্য্যকে সে সম্ভোগ করিতে পারিতেছিল না বলিয়া তাহার মনের মধ্যে সৌন্দর্য্যের কোনো ছবিই বেশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবার অবসর পাইতেছিল না। সে আনমনে বেড়াইতে বেড়াইতে তরুণী-কণ্ঠের সুমিষ্ট কাকলি শুনিয়া চমকিয়া উঠিল—বাবা, দেখ দেখ, ঠিক যেন একটা সোনার কলসী জলের উপর উপুড় করা রয়েছে।

বিলোপ চকিত দৃষ্টিতে একবার উদীয়মান সূর্য্যচ্ছবির দিকে দেখিয়া লইয়া যেদিক্ হইতে সেই মিষ্ট ধ্বনি আসিয়াছিল সেইদিকে তাকাইল। দেখিল একটি মোটা বেঁটে টেকো সৌম্যদর্শন বৃদ্ধের সঙ্গে একটি শ্যামলা তরুণী সমুদ্রের ঢেউএর একেবারে শেষ সীমায় দাঁড়াইয়া সূর্য্যোদয় দেখিতেছে। তরুণীর বর্ণ শ্যাম হইলেও তাহার কমনীয় মুখে ও তন্বী দেহলতায় এমন একটি শ্রী আছে যে তাহাকে সুন্দরী বলিতে হয়; তাহার পরণে মভ্ রঙের শাড়ী আর জামা, পায়ে লাল চামড়ায় জরি দেওয়া দিল্লীর সেলিমশাহী নাগরা জুতা। বিলোপ সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেই তরুণীর নবারুণোদ্ভাসিত আনন্দিত মুখের দিকে একবার তাকাইয়া আবার সূর্য্যের দিকে মুখ [illegible] দেখিতেছে

এমনই ভাবে সে বৃদ্ধ ও তরুণীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া গেল।

বৃদ্ধ কন্যার কথার উত্তরে বলিলেন—ঐ ত ধন্বন্তরির সুধার স্বর্ণকলস! ঐ ত স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারদের অমৃত-ভাণ্ড।

তরুণী আর কোনো উত্তর দিল না। বৃদ্ধ নীরব।

তাহাদের উভয়কে নীরব থাকিতে দেখিয়া বিলোপ চকিতে একবার দৃষ্টি ফিরাইয়া তাহাদের দুজনকে দেখিয়া লইল; দেখিল পিতা-পুত্রীর মুখ সৌন্দর্য্যের আনন্দরসে অভিষিক্ত হইয়া লাবণ্য-ললিত দেখাইতেছে। সে ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া যেন আপন মনেই বলিয়া উঠিল—ঠিক কথা! এই জন্যেই ঋগ্বেদে ঊষা ও সূর্য্যোদয়ের মধ্যবর্ত্তী সময়ের মিশ্রিত আলোক ও অন্ধকারকে যমজ অরুণবর্ণ অশ্বিনীকুমার বলা হয়েছে!

বৃদ্ধ ও তরুণী প্রসন্ন হাস্যোদ্ভাসিত মুখ ফিরাইয়া বিলোপের দিকে দৃষ্টিপাত করিল এবং বৃদ্ধ নিজের অন্তর-ভাবের প্রতিধ্বনি শোনার আনন্দে উৎফুল্ল স্বরে বলিলেন—হ্যাঁ বাবা, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ভ্রমণ করলে দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমার চ্যবনের মতন জরাগ্রস্ত বৃদ্ধকেও নবযৌবন দান করেন। আপনার কি বেদ আলোচনা করা আছে?

বিলোপ লজ্জিত স্মিতহাস্যে বলিল—এবার আমি সংস্কৃতে এম-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।

বৃদ্ধ খুশী হইয়া বলিলেন—বেশ বেশ! এটি আমার মেয়ে। এর নাম মৃদুলা। এও এইবার বি-এ পরীক্ষায় ফার্ষ্ট ক্লাস সংস্কৃত অনার্স্ পেয়ে সংস্কৃততেই এম-এ পড়ছে। বড় ভালো মেয়ে…নিজের মেয়ে বলে' যে বল্‌ছি তা নয়…ওর মতন…

মৃদুলার মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিয়াছিল; সে জানিত তাহার পিতা কন্যার গুণ বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাকে নিরস্ত করা শক্ত; তাই সে পিতার হাত চাপিয়া ধরিয়া অতি মৃদু কুণ্ঠিত স্বরে ডাকিল—বাবা…

মৃদুলার পিতা কন্যার দিকে প্রসন্ন মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—তা এতে লজ্জা কি মা? তুমি যে আমার গর্ব্বের আর গৌরবের সামগ্রী……

মৃদুলা বিব্রত ও ব্যস্ত হইয়া চকিতে একবার বিলোপের

দিকে চাহিয়া চক্ষু নত করিয়া তিরস্কারপূর্ণ মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিল—আঃ বাবা !...

বিলোপ পিতা-পুত্রীর স্নেহদ্বন্দ্ব নীরবে উপভোগ করিতেছিল। মৃদুলার পিতা কন্যার তিরস্কারে কন্যার গুণ বর্ণনায় ক্ষান্ত হইয়া বিলোপকে বলিলেন—"আপনি এক দিন দয়া করে' আমাদের বাড়ীতে আসুন না ? শাস্ত্র আলোচনা করা যাবে।" তিনি বিলোপের নির্ব্বাক্ মুখে সম্মতির প্রসন্নতা লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—আমরা এই সমুদ্র বেলার উপরেই ঐ যে ইস্পাত-রঙের বাড়ীটা ঐটাতে থাকি—আমার নাম শ্রীত্রিলোকরাম ভট্টাচার্য্য······

বিলোপ নম্রভাবে বলিল—যে আজ্ঞে। আমি যাব, কিন্তু একটি সর্ত্তে......

বিলোপের মুখে হাসি দেখিয়া বৃদ্ধও হাসিয়া বলিলেন—কি সর্ত্ত বলুন, শুনে দেখি পালন করতে পারব কি না।

বিলোপ হাসিয়া বলিল—আমাকে আপনি 'তুমি' বলে' সম্বোধন করবেন......

ত্রিলোক অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। ভ্রাম্যমান বহু নরনারী সেই অট্টহাস্য শুনিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। তিনি বলিলেন—এই ? তা আচ্ছা, বলা যাবে। আজকাল কাউকে তুমি বলতে ভয় হয় বাবা, কে বেয়াদব ভেবে বসবে, কার মানহানি হবে···

আবার অট্টহাস্য। যাহারা তাঁহার কাছাকাছি বেড়াইতেছিল, তাহারা সেই হাস্যরবে আকৃষ্ট হইয়া আবার ত্রিলোকের দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিল। একজন তরুণী তাহার সঙ্গিনীর দিকে ফিরিয়া হাসিয়া বলিল—"উঃ ! বুড়োর কি গগন-ফাটানো হাসি !" একজন যুবক তাহার সঙ্গীকে বলিল—বুড়োর হাসি যেন হাঁড়িতে ভরে' এক হালি চীনে পটকায় আগুন দিয়েছে !

ত্রিলোকের এই প্রাণখোলা সরল হাস্য দেখিয়া বিলোপ খুশী হইয়া বলিল—আমার মানহানি হবে না। মান্য ব্যক্তি 'আপনি' বলে' সম্বোধন করলে আমার অত্যন্ত কুণ্ঠা বোধ হয়।

ত্রিলোক বলিলেন—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়' মশায় বলতেন—কুড়ি বছর বয়স হলেই আজকালকার ছেলেমেয়েদের আপনি বলা উচিত...to be on the safe side......

আবার অট্টহাস্য। ত্রিলোকের অট্টহাস্যের পৌনঃপুনিক আবির্ভাবে বিলোপ অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেছিল। তাহার মুখে খুশীর আভাস দেখিয়া মৃদুলার মুখও স্মিতহাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল।

অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে গায়ে পড়িয়া আলাপ করিয়া ও বাড়ীতে যাইবার নিমন্ত্রণ পর্য্যন্ত আদায় করিয়া তাঁহার কন্যার সম্মুখে আর দাঁড়াইয়া থাকা অনুচিত মনে হওয়াতে বিলোপ ত্রিলোকের কথার পরে হাসির ফাঁকে হঠাৎ বলিয়া উঠিল—রৌদ্র উঠ্‌ল, এখন যাওয়া যাক।

বিলোপ কথাটা বলিতে চাহিয়াছিল ত্রিলোককে ; কিন্তু তাহার দৃষ্টি মৃদুলার মুখের উপর নিবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল বলিয়া বিদায় চাওয়া হইয়া গেল মৃদুলার কাছে। মৃদুলার মুখ লাল হইয়া উঠিল, সে ঈষৎ হাসিল। সেই হাসি দেখার পর বিলোপের গমনশক্তি বিলোপ হইয়া গেল, কথা অনুযায়ী কাজ করিবার কোনো চেষ্টাই তাঁহার দেখা গেল না।

ত্রিলোক বলিলেন—তা বাবাজীর নামটি ত আমাদের জানা হয় নি......

বিলোপ বলিল—আজ্ঞে আমার নাম শ্রীবিলোপচন্দ্র সরকার।

ত্রিলোক আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—বাবাজীর এখানে কোথা থাকা হয় ?

—আজ্ঞে, ভিক্টোরিয়া হোটেলে।

—একলাই আসা হয়েছে বুঝি ?

—না, আমার এক বন্ধুর সঙ্গে আমি এসেছি।

—তা যেদিন আমাদের বাড়ীতে যাওয়া হবে, সেদিন সেই বন্ধুকেও যেন নিয়ে যাওয়া হয়, তাঁরও নিমন্ত্রণ রইল। তিনি আজ বেড়াতে আসেন নি ?

—আজ্ঞে না, তিনি উপকথার রাজপুত্র—সূর্য্যদেব উঠে সোনার কাঠি না ছোঁয়ালে তাঁর ঘুম ভাঙে না...

ত্রিলোকের আবার অট্টহাস্য। তিনি হাসিয়া লইয়া বলিলেন—তা হলে ত তাঁর সঙ্গে সমুদ্র-তীরে দেখা হবার সম্ভাবনা নেই ; এক দিন তা হলে বন্ধুকে নিয়ে আমাদের বাড়ীতে গেলে আমরা সুখী হবু।

বিলোপ হাসিয়া বলিল—তাই একদিন যাব।

ত্রিলোক হাসিমুখে বলিলেন—আচ্ছা, এখন তবে বিদায় হই, পুনর্দ্দর্শনায়।

বিলোপ নীরব হাসিমুখে ত্রিলোককে এবং পরে মৃদুলাকে নমস্কার করিল।

মৃদুলা নম্র লজ্জিতভাবে প্রতিনমস্কার করিয়া পিতার পাশে পাশে চলিতে লাগিল।

বিলোপ সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিতে লাগিল মৃদুলার অপস্রিয়মান মূর্ত্তিকে। মৃদুলা খানিক দূর গিয়া মুখ ফিরাইয়া একবার পিছন দিকে দেখিল। বিলোপের মনে হইল মৃদুলা তাহাকেই দেখিতে চাহিতেছে। তাহার মন আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেই সে তাহাকে নিরস্ত করিয়া বলিয়া উঠিল—প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদ্ উদ্বাহুর্ ইব বামনঃ গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্, কারণ এ ফল forbidden fruit in the Garden of Eden—ক্কঃ ভট্টাচার্য্যবংশশ্চ ক্কঃ সরকারসুতশ্চাহম্—ক্কঃ স্বয়ং মহদন্তরম্ সূচয়তঃ। যদি কর্ণের মতন বল্‌তে পার্‌তাম—সূতো বা সূতপুত্রো বা যো বা সো বা ভবাম্যহম্, দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম, মদায় সম্ভ পৌরুষম্!

বিলোপের দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

মৃদুলা বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিবার সময় আর-একবার পাশের দিকে মুখ ফিরাইয়া বিলোপ যেদিকে দাঁড়াইয়া ছিল সেইদিকে দেখিয়া অন্তর্হিত হইয়া গেল। বিলোপের আবার দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল, সে মনে মনে বলিয়া উঠিল—'মনু সে যে ভারতমনু্য' সত্যেন দত্ত ঠিক বলে' গেছেন, আজ আমি তা বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি।

আশা কুহকিনী তাহার কানে কানে বলিয়া গেল—যে ব্যক্তি তাহার মেয়েকে অত বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইতেছে সে হয়ত জাতের বিচার নাও করিতে পারে।

বিলোপ আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাসার দিকে চলিতে লাগিল। সে ত্রিলোকের বাড়ীর সম্মুখ দিয়াই গেল, কিন্তু আর কাহাকেও দেখিতে পাইল না।

বিলোপ যখন বাসায় ফিরিয়া গেল তখন মলয় ঘুম থেকে উঠিয়াছে, বসিয়া বসিয়া নিবিষ্টমনে সিগারেট টানিতেছে। বিলোপকে দেখিয়াই মলয় বলিয়া উঠিল—সূর্য্যোদয় দেখা হল?

এই প্রশ্ন হইবা মাত্রই সূর্য্যচ্ছবির পরিবর্ত্তে মৃদুলার মুখ বিলোপের মনের মধ্যে উদিত হইল। সে হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ।

মলয় জিজ্ঞাসা করিল—অরুণদেবকে কেমন দেখ্‌তে?

বিলোপ হাসিয়া বলিল—সুন্দরী প্রেয়সীর হাসিমুখের মতন।

মলয় উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিল—বাহবা! সংস্কৃত কাব্য পড়া তোমার সার্থক হয়েছে!

বিলোপ হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ, আজ আমি তা বুঝ্‌তে পার্‌ছি।

বিলোপের এই কথার অর্থ মলয় বুঝিল যে সূর্য্যোদয় দর্শনে কাব্যরসিক বিলোপ আনন্দলাভ করিয়াছে। কিন্তু বিলোপের মনের মধ্যে যে অর্থ গুপ্ত ছিল তাহা হইতেছে এই যে ভাগ্যে সে সংস্কৃত পড়িয়াছিল তাই সে অত অনায়াসে মৃদুলার পিতার সহিত পরিচয় করিয়া লইয়া বাড়ীতে যাইবার নিমন্ত্রণ পর্য্যন্ত পাইয়া আসিয়াছে।

মলয় বিলোপকে জিজ্ঞাসা করিল—কোনো চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হল?

বিলোপ বলিল—না। তবে একজন অচেনা লোকের সঙ্গে চেনা হল।

মলয় হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কে সে? Anybody interesting?

বিলোপ একটু থামিয়া বলিল—এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক…

মলয় হাসিয়া বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—বুড়ো! তাদের কথা অশ্রাব্য......সংস্কৃত কাব্য পড়া তোমার নিরর্থক হয়েছে—ভোর বেলা গিয়ে এক বুড়োর সঙ্গে আলাপ করে' এলে? আর কারো সঙ্গে আলাপ কর্‌তে পার্‌লে?

বিলোপ ক্ষুণ্ণভাবে হাসিয়া বলিল—না, সে সৌভাগ্য আমার হয় নি।

মলয় একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া গাল ফুলাইয়া বলিল—তবে আর তোমার কথা শুন্‌তে চাই না।

বিলোপ আর কিছু বলিল না। মলয় বলিল—চলো চা খেয়ে আসা যাক। অনেকক্ষণ ব্রেকফাষ্টের ঘণ্টা পড়ে' গেছে।

বিলোপ বলিল—চলো।

দুই বন্ধুতে চা খাইতে চলিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

ব্রেজিল

শ্রীনরেন্দ্র দেব

দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসীরা জাতি হিসাবে এখনও ঠিক গড়ে উঠতে পারে নি। তবে তারা যে এদিকে ক্রমেই এগিয়ে চলেছে তাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। যে জাতি নূতন ক'রে গড়ে উঠছে তাদের ইতিহাস ও তাদের কাহিনী

ছুটি ছেলে।
(এরা ব্রেজিলের আদিম অধিবাসীদের সন্তান। হাতে জলহস্তীর দন্ত-নির্ম্মিত বন্ধন। পায়ে কড়ির মল। গলায় লম্বা লম্বা লাল কাঁঠির মালা।)

খুব চিত্তাকর্ষক। যৌবনের চঞ্চলতার ত্রুটি তাদের আছে বটে, তেমনি তার যতরকম সুবিধা—অর্থাৎ যৌবনের উৎসাহ, উত্তেজনা, নব নব পথের সন্ধান জানবার জন্য একটা তীব্র আগ্রহ এবং প্রাচীন পদ্ধতির নাগপাশ ও সাবেক ধারার মোহ ছিন্ন ক'রে এগিয়ে যাবার একটা অদম্য প্রবৃত্তি তাদের সব দিক দিয়ে সাহায্য ক'র্‌ছে।

দক্ষিণ আমেরিকায় অধিকাংশ প্রদেশে স্পেনের প্রভাবটাই খুব বেশী প্রবল দেখতে পাওয়া যায়; কিন্তু ব্রেজিল সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না। কারণ, ব্রেজিল সেকালে পোর্ত্তুগীজদের দখলে এসেছিল; সুতরাং সেখানকার ভাষা আজও পোর্ত্তুগীজ র'য়ে গেছে। যেমন—পেরু, আর্জেন্টিনা, চিলি প্রভৃতি প্রদেশে স্পেনীয় ভাষাই এখনও প্রচলিত রয়েছে! কিন্তু পোর্ত্তুগীজরা যদিও স্পেনীয়দের চেয়ে বরাবরই সকল বিষয়ে বেশী উৎসাহী, তথাপি জাতি হিসাবে তাদের এই উৎসাহ কোনও দিনই উন্নতির সর্ব্বোচ্চ সোপানে গিয়ে উঠতে পারে নি। কারণ, তাদের সেই

মিশ্র-বর্ণের দু'টি ছেলেমেয়ে।
(পোর্ত্তুগীজ ও নিগ্রো সম্মিলনে এদের উৎপত্তি।)

অন্তর্নিহিত শক্তিটুকুই ছিল না—যার জোরে উন্নতির পথে জাতির গতি অবাধ অবিচঞ্চল ও ধ্রুব হ'তে পারে। সুতরাং পোর্তুগীজের অধীন থাকলেও ব্রেজিল দক্ষিণ আমেরিকার স্পেন-অধিকৃত কোন দেশের চেয়েই খুব বেশী এগিয়ে যেতে পারেনি।

ব্রেজিলের অধিবাসীদের কৃষিকার্য্যটাই জীবন ধারণের
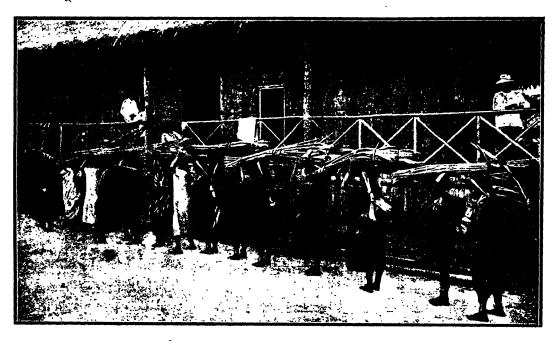
মজুরনীর দল। (এরা কারখানা থেকে কাজ ক'রে ফিরছে।)

নৌ-বহরের পোত-সৈন্যের মিছিল।

প্রধান অবলম্বন হ'য়ে উঠেছে। কফি, রবার ও ইক্ষুদণ্ডের চাষই সেখানে প্রধান। এই তিনটি জিনিসের রপ্তানি ব্রেজিল থেকে ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। কেবল মাত্র এই তিন রকম জিনিসই উৎপন্ন করে ব্রেজিল অদূর ভবিষ্যতে ধনী হ'য়ে উঠ্‌তে পারে। এ ছাড়া ব্রেজিলের ধনাগমের আর একটা প্রধান উৎস হ'চ্ছে সেখানকার গো-মেষাদি পশু ব্যবসায়। রায়ো গ্রাণ্ডে হ'চ্ছে এই পশুব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র। টিনের মধ্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা রক্ষিত গোমাংসের বিরাট কারবারও সেখানে পত্তন হয়েছে। য়ুরোপকে তার খাদ্যের জন্য এখন অনেকখানি নির্ভর করতে হয় এই দক্ষিণ আমেরিকার চাষাদের উপর।

ব্রেজিলীয়ানরা উত্তর আমেরিকার ব্যবসায়ীদের কাছেই এই পশু পালনের কারবার শিখেছে। এখনও ব্রেজিলের অধিকাংশ পশুব্যবসায়ের মালিক উত্তর আমেরিকাবাসীরা। দক্ষিণ আমেরিকায় পশু-ব্যবসায়ের আর একটি বড় কেন্দ্র হ'চ্ছে 'সাওপৌলো'। এখানকার ব্যবসাটি সম্পূর্ণভাবে বিদেশীর হস্তগত। খৃষ্টীয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে কতিপয় উৎসাহী নব-দেশ-আবিষ্কারকের চেষ্টায় এই 'সাওপৌলো' সহর স্থাপিত হয়েছিল। তাদের বংশধরেরা আজও এখানে 'পৌলিস্তা' নামে পরিচিত। 'পৌলস্ত' ঋষীর সঙ্গে এদের পূর্ব্বপুরুষের কোনও সম্বন্ধ ছিল কি না, সে কথা প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ব'লতে পারেন! এই সাও-পৌলো সহর ও তার বিখ্যাত বন্দর "সান্তো" যে আজ এতখানি প্রাধান্য লাভ ক'রেছে, এ কেবল তাদেরই যত্নে ও চেষ্টায়। ব্রেজিলের ব্যবসায়ের উন্নতির মূলে এদের শক্তি ও অধ্যবসায়ই খুব বেশী কাজ করেছে। পৌলিস্তারা এখনও এ অঞ্চলের সকলেরই শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র হয়ে আছে। তাদের স্বাধীন ও উন্নত চরিত্রই অপর জাতির চেয়ে তাদের এই মর্য্যাদা ও বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে।

এ দেশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে, প্রথম অবস্থায় পোর্ত্তুগীজেরা এসে রেড্‌ইণ্ডিয়ানদের বশীভূত করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ক'রছে। নিগ্রোরা তখন নিরপেক্ষ থেকে উভয়েরই ইচ্ছানুরূপ সাহায্য ক'রতো। ক্রমে অবস্থার পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেল। দ্বিতীয় অবস্থায় দেখা গেল যে, নিগ্রো ও ইণ্ডিয়ানরা ঐক্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পোর্ত্তুগীজদের বিরুদ্ধে একত্রে যুদ্ধ ক'রছে। ফলে শীঘ্রই পরস্পরের সংমিশ্রণে এক নূতন মিশ্র জাতির উদ্ভব সম্ভব হ'য়ে উঠ্‌ল। য়ুরোপীয়দের সংস্পর্শে থেকে এই নব জাতি একটা উন্নতির আকাঙ্ক্ষা, একটা প্রচণ্ড অনুসন্ধিৎসা, একটা সত্বর শিক্ষা করবার গুণ লাভ ক'রলে। ইণ্ডিয়ানদের কাছ থেকে তারা তাদের প্রবল ভাবপ্রবণতা ও অসীম ধৈর্য্য পেলে; আর নিগ্রোরা দিলে তাদের সহৃদয়তা, অন্তরঙ্গতা ও পারিবারিক স্নেহবন্ধন।

উনবিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বহু সংখ্যক জার্ম্মাণ, ইটালিয়ান, পোল প্রভৃতি ব্রেজিলে এসে পড়েছে। জার্ম্মাণরা সেখানে তাদের একটা ছোটখাটো উপনিবেশ স্থাপন ক'রেছে বললেও হয়। জার্ম্মাণ চাল-চলন, রীতি-নীতি-পদ্ধতি পুরো মাত্রায় বজায় রেখে তারা সেখানে বাস করছে। পোলরাও তাদের একটা আলাদা পল্লী ক'রে নিয়েছে বটে, কিন্তু জার্ম্মাণদের মতো তারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার জন্য সর্ব্বদা সতর্ক ও সচেষ্ট নয়। ইটালিয়ানরা কেউ চিরদিনের জন্য ব্রেজিলে বসবাস ক'রতে চায় না; যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করতে পারলেই তারা দেশে ফিরে আসে। সুতরাং ব্রেজিলের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ তেমন ঘনিষ্ঠ হ'য়ে ওঠেনি। তবে সে দেশের আবহাওয়ার প্রভাব যে কতকটা—দীর্ঘকাল বসবাসের ফলে, তাদের উপর ও অন্যান্য য়ুরোপীয় জাতির উপর পড়ে না—এমন কথা বলা চলে না।

পূর্ব্বে ব্রেজিলের যে নব-সৃজিত মিশ্রজাতির কথা বলেছি, তাদের অস্তিত্ব যে দক্ষিণ আমেরিকার সর্ব্বত্র দেখতে পাওয়া যায় না এ কথা ঠিক। কারণ সেটা—ওই ফরাসী-দেশের চেয়ে পনেরগুণ বড় এবং পূর্ব্ব যুগের রুষ সাম্রাজ্যের সঙ্গে প্রায় সমান—এতবড় একটা বিশাল দেশের পক্ষে সম্ভবও নয়। ব্রেজিলের মধ্যে এখনও দূরে দূরে এমন সব জায়গা আছে, যেখানে বহু লোকে বাস করে, অথচ ব্যবসায় ক্ষেত্র ও কর্ম্ম কেন্দ্র হ'তে সে সব স্থান এত তফাতে যে, রেলপথের অভাবে এবং নদীপথের সুবিধা না থাকায়, তাদের মধ্যে কোনও যোগাযোগ নেই। এ সব অঞ্চলের অধিবাসীরা অবশ্য সকলেই ইণ্ডিয়ান। এরা নিজেদের মধ্যে সেই সৃষ্টির আদিম ভাষায় কথাবলে। থাকে এমন সামান্য ভাবে—যে কোনও সহরেরই তারা মুখাপেক্ষী নয়। এদের চেয়ে নিকটতর কতকগুলো প্রদেশে কেবল নিগ্রোদের বস্তি।

এই নিগ্রোরা বরং ইণ্ডিয়ানদের চেয়ে অনেক বিষয়ে সভ্যতার পথে এগিয়ে এসেছে বলা যেতে পারে।

উৎপন্ন হ'তে পারে। 'কদলি-কানন' অর্থাৎ কলা গাছের একেবারে জঙ্গল দেখতে পাওয়া যায় এই ব্রেজিলে। আনারস

বিবাহ উৎসবের নৃত্যকারিণীগণ।

ধর্ম্মোৎসবের নৃত্যকারিণীগণ।

ব্রেজিলের মৃত্তিকা এমন প্রখর উর্ব্বরা যে, জীবন ধারণের

এত অপর্য্যাপ্ত সেখানে হয় যে, কেবল এই ফলেরই চাষ

সেখানে জমী চষে বুন্‌তে হয় না ; শুধু নখে আঁচড়ে বীজ ফেলে দিলেই যথেষ্ট। কাজে কাজেই সেখানে নিগ্রো বা ইণ্ডিয়ানদের জীবন ধারণের জন্য বেশী কষ্ট স্বীকার ক'রতে হয় না। বেশী পরিশ্রম করতে হয় না। অনায়াসে লব্ধ ফলমূল খেয়ে তারা বেশ সুখে থাকে।

কিছু দিন থেকে বিদেশী বণিকেরা এসে সেখানে চাষ-বাসের খুব বড় রকম ফ্যালাও কারবার ফেঁদে বসায়, তাদের অর্থাগমের আরও একটু সুবিধা হয়ে গেছে। জীবিকা সুলভ বলে সেখানে কেউ মজুরী খাটতে চায় না ; অথচ যারা গিয়ে সেখানে চাষের কারবার সুরু করেছে—জন মজুরের সাহায্য না পেলে তাদের কারবার চলে না, কাজেই তারা নানা প্রলোভন দেখিয়ে মজুর সংগ্রহের চেষ্টা করে। এই মজুর সংগ্রহ ব্যাপারে বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটা রীতি-মতো প্রতিযোগিতা চলে। আমাদের বাগানে বা আমাদের ক্ষেতে কাজ ক'রলে আমরা প্রতি মজুরকে এত ক'রে মজুরী দেবো, তা ছাড়া—এই এই জিনিস উপহার দেবো—এই রকম প্রলোভন দেখিয়ে একজন হয়ত মজুর সংগ্রহের চেষ্টা ক'রছে ;—আর একজন তাদের ব'লে পাঠালে—ওরা যা দেবে ব'লছে আমি তার চেয়ে তোমাদের মজুরীও বেশী দেবো এবং উপহারও বাড়িয়ে দেবো—তোমরা আমার কাছে কাজ ক'রবে এসো !' এইভাবে মজুর নিয়ে সেখানে টানাটানি প'ড়ে যায়। কাজে কাজেই এরাও সেই সুযোগটা ষোল আনা ভোগ করে নেয়। যাদের ওখানে খাটুনী কম, মজুরী বেশী, ব্যবহার ভাল, উপহার পছন্দসই, সেইখানেই তারা কাজ ক'রতে যায়।

পূর্ব্বে এখানে ক্রীতদাস পাওয়া যেতো। তারাই এই মজুরের কাজ করতো। তাদের উপর কিন্তু সে সময় ভীষণ অত্যাচার চলতো। তাদের কেউ পেট ভরে খেতে পরতে দিত না। চাবুক মেরে দিন রাত জানোয়ারের মতো খাটিয়ে নিতো। কেবল একজন প্রভুর হুকুম তামিল করলেই তাদের অবস্থা নিশ্চিন্ত ছিল না ; অনেককে তিন চারজন মনিবের হুকুম পালন ক'রতে হ'তো। কাজেই অত্যাচারটাও তাদের ভোগ ক'রতে হতো সেই অনুপাতে। এমন কি শতকরা দশজন ক'রে ক্রীতদাস তখন কেবল অমানুষিক অত্যাচারের চাপেই মারা যেতো।

ব্রেজিলের অধিকাংশ প্রদেশ এখনও গভীর অরণ্যে সমাচ্ছন্ন। কোনও মানুষ এ পর্য্যন্ত সে অরণ্য ভেদ ক'রে তার মধ্যে প্রবেশ করবার চেষ্টা করেনি। মনুষ্য-বাসের কাছাকাছি যে সব জঙ্গল আছে, তার গভীরতাও বড় কম নয়। আকাশস্পর্শী বিরাট বনস্পতি-সমূহ এখানে যেন পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রে প্রতি দিন প্রবল তেজে বেড়ে উঠ্‌ছে ! এই সব বনস্পতিকে বেষ্টন ক'রে আবার ঘন-পল্লব-বিশিষ্ট লতাজাল বৃক্ষ হতে বৃক্ষান্তরে অসম্ভব সত্বর বিস্তৃত হয়ে পড়ছে ! কাজেই জঙ্গলের মধ্যে সেখানে চিরান্ধকার বিরাজমান। বিচিত্র উজ্জ্বল পক্ষরাজি সমন্বিত নানা বর্ণের বিহঙ্গ, রকমারি রঙিণ প্রজাপতির পাল, সেখানে প্রতি দিন দেখ্‌তে পাওয়া যায়। বানরের উৎপাত সেখানে উত্তর ভারতের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়, এবং বিষাক্ত সর্প ও সরীসৃপের দংশন আশঙ্কাও সেখানে প্রতি পদক্ষেপে আছে। সেখানকার আবহাওয়াটাও কেমন যেন ভিজে ভিজে ও ভারি ঠেকে ! বাতাসের গন্ধটাও যেন স্যাঁৎসেঁতে মনে হয় ! রাত্রে বেশ গা ছম্‌ছম্‌ করে। একটা ভয়-ভয় ভাব, একটা অস্বস্তির অশান্তি যেন সর্ব্বদাই অনুভব ক'রতে হয়।

পূর্ব্বে সেখানে দেশের শাসন-পরিষদই রেল-পথ বিস্তারে অর্থ-সাহায্য ক'রতো ; কিন্তু এখন তার প্রয়োজন হয় না। রেল-কোম্পানী করা সেখানে একটা খুব লাভজনক ব্যবসা প্রমাণ হওয়ায় এখন অনেকগুলি যৌথ-কোম্পানী সেখানে রেলের কারবার আরম্ভ ক'রে দিয়েছে।

শাসন-পরিষদের মন্ত্রীরা সবাই জনসাধারণের শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তারে প্রাণপণ চেষ্টা ক'রবো ব'লে নির্ব্বাচনের আগে ইস্তাহার জারি করেন বটে, কিন্তু কাজের মধ্যে কতকগুলো ইস্কুল করা ছাড়া তাঁরা আর বিশেষ কিছুই ক'রতে পারেন নি। যারা লেখাপড়া জানে এমন লোক ছাড়া আর কেউ ভোট দিবার অধিকারী নয় বলে একটা বিধিও সেখানে প্রচলিত আছে ; তবু লেখাপড়া শেখবার আগ্রহ সেখানে খুব বেশী লোকের দেখতে পাওয়া যায় না। ইস্কুলে প'ড়ে সেখানকার ছেলেরা যা না শিখ্‌তে পারে, খানিকক্ষণ বক্তৃতা শুনলে ও গল্প করলে তার চেয়ে ঢের বেশী জ্ঞান তারা লাভ করে। বক্তৃতা শুন্‌তেও তারা যেমন ভালবাসে, বক্তৃতা ক'রতেও

সুসজ্জিতা 'বৈবৈ' তরুণীযুগল।
(নৃত্যোৎসবের জন্য এরা প্রস্তুত হয়েছে। 'বৈ বৈ' মেয়েরা সর্ব্বদা নগ্ন অবস্থায় থাকে না।)

সুসজ্জিত 'বৈবৈ' পুরুষদ্বয়।
(এরা আমাজনের অধিবাসী বীর কিন্তু স্ত্রীলোকদের মতো মাথার চুলে ফুল পরে, গলায় হার দেয়, হাতে পায়ে কঙ্কণ বাজু ও মল পরে।)

সৌখীন 'তুকানো'। ('তুকানো' শ্রেণীর এই ইণ্ডিয়ান ভদ্র লোকটির পরিধানে বস্ত্র নেই বটে, কিন্তু চুরুটের আধারটি যে কোনও সভ্য

তারা সেই রকমই পাগল! নূতন কোনও মতলব ঠাওরাতে ও নূতন কিছু বরণ করে নিতে তারা খুবই তৎপর। এবং সেই নূতন সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করতেও তারা একেবারে দারুণ ব্যস্ত হয়ে ওঠে; কিন্তু তাদের এই উৎসাহ বেশীদিন স্থায়ী হয় না। শীঘ্রই তাদের আগ্রহ শিথিল হয়ে যায় এবং সে নূতন মৎলবটাও অনাদৃত পড়ে থাকে।

পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা তাদের মধ্যে খুব বেশী শুনতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেটা তারা কারও প্রতি বিদ্বেষ-বশতঃ বা আক্রোশ-বশতঃ ক'রে না। বড্ড বেশী বকা বা কথা কওয়া তাদের স্বভাব ব'লে' তারা বাধ্য হ'য়ে অনেক

কাসাবার ছাতু তৈরি।
(রুটি করবার আগে কাসাবার বিষমুক্ত মূলকে গুঁড়িয়ে ছাতু ক'রে নিচ্ছে এই দুটি শক্তিশালিনী আমাজন যুবতী।)

সময় প্রতিবেশী ও আত্মীয় বন্ধুদের সম্বন্ধে অপ্রিয় আলোচনাও ক'রে থাকে। তবে তাদের সে আলোচনার মধ্যে এত বেশী হাস্য পরিহাস ও রসিকতার সমাবেশ থাকে যে, সেটা নিন্দা ও কুৎসার কুরূপ ধারণ করবার কিছুমাত্র সুযোগ পায় না। একজন শিক্ষিত ব্রেজিলিয়ান যদি উত্তেজিত হয়ে না পড়ে, তাহলে তার মতো শান্ত ও সুবিবে-চক লোক খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। তারা নিরুপদ্রব থাকতেই ভালবাসে, দাঙ্গাহাঙ্গামা মোটেই পছন্দ করে না। কোনও লোককে বা কোনও শ্রেণী বিশেষকে অতিরিক্ত কিছু সুবিধা বা স্বত্বদান করতে তারা কিছুতেই স্বীকৃত হয় না। সামাজিক ভেদাভেদ বা উচ্চ নীচ অথবা ধনী দরিদ্রের পার্থক্য তারা একেবারেই মানতে চায় না। যে সভ্যতার হিসাবে অর্থই মানুষের কদর ও মূল্য নির্দ্ধারণের একমাত্র মাপকাটি রূপে পরিগণিত, দক্ষিণ আমেরিকায় আজ সেই সভ্যতার ক্রম-বিকাশের সূচনা দেখে তারা মর্ম্মান্তিক দুঃখিত।

ব্রেজিলিয়ানদের ব্যবহার বেশ ভদ্র, তাদের জীবন-যাত্রার ব্যাপার বেশ সহজ ও সাদা-সিধে। তবে মফঃস্বলের জমীদার যারা, তারা যখন সহরে বেড়াতে আসে, তখন অনেক পয়সা অপব্যয় করে।

তাদের সৌজন্য, উদারতা ও সহগুণ ছাড়া তাদের অতিথি-বৎসলতাও একটা উল্লেখযোগ্য গুণ। তারা লোকের সঙ্গে বেশ প্রাণ খুলে মেশে এবং সহজেই তাদের অন্তরঙ্গ করে নেয়। দুই বন্ধু বা নিকটাত্মীয়তে পথে সাক্ষাৎ হ'লে তারা শুধু করমর্দ্দন করেই ক্ষান্ত হয় না, পরস্পরকে অনুরাগ ভরে আলিঙ্গন করে।

পূর্ব্বেই বলেছি যে, এরা জাতি হিসাবে একটু অলস প্রকৃতির। তবে ভবিষ্যদ্বংশধরেরা সে আলস্যটুকু যে উত্তরাধিকার সূত্রে পায়নি এটা বেশ বোঝা যায়, তাদের খেলাধূলা ও ব্যায়াম প্রভৃতিতে উৎসাহ দেখে। চেহারাটাও তারা টেনেটুনে ইংরেজ ও আমেরিকানদের মতো চাঁচা-ছোলা ও ফিট্‌ফাট্ ক'রে তুলেছে। কিন্তু এদের দেশের আবহাওয়া যে রকম, তাতে এদের পক্ষে খুব বেশী পরিশ্রমী বা খাটিয়ে লোক হ'য়ে ওঠা অসম্ভব। যারা যৌবন অতিক্রম ক'রে এসেছে, তারা অধিকাংশই মোটা হয়ে পড়েছে; এবং এদের মেয়েদের স্থূলাঙ্গী হওয়াটাই হ'চ্ছে সৌন্দর্য্যের একটা প্রধান লক্ষণ! এদের মেয়েরা য়ুরোপীয় মেয়েদের মতো তত বেশী বাইরে বেড়িয়ে বেড়ায় না। অধিকাংশ সময়ই তারা বাড়ীতে ব'সে কাটায়। ব্রেজিলিয়ান স্বামীরাও এটা মোটেই পছন্দ করেন না যে তাদের স্ত্রীরা স্বামীর অনুপস্থিতিকালে গৃহের বাহিরে থাকেন। কাজে কাজেই ব্রেজিলিয়ান মেয়েরা বাড়ীতে

রবারের তাল পাকানো

ভাগ্যচক্র !
(ব্রেজিলের একটী যে কোনও জুয়া খেলার ক্লাবে প্রবেশ করলেই এ দৃশ্য দেখা যায়)

রবার গাছের আঠা সংগ্রহ

রবারের খণ্ড

মুর্গীর ছানাওয়ালা !
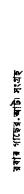
এক ঢিলে গাউন প'রে আর একজোড়া চটি জুতো পায়ে দিয়েই চব্বিশ ঘণ্টা থাকেন। যখন বাইরে কোথাও যাবার দরকার হয়, তখন বটে তাঁরা খুব ঘটা ক'রে সাজগোছ ও অঙ্গ-প্রসাধন করেন। নইলে বাড়ীতে তাঁরা মোটেই ফিট-ফাট হ'য়ে থাকেন না। ব্রেজিলিয়ান পুরুষেরা কিন্তু খুব বাবু। সেখানে পথে বেজায় ধূলো বলে অধিকাংশ লোকই একটা করে 'ধূলোট-জামা' (Dust cloak) হাতে করে পথে নিষ্ক্রান্ত হন। ঠাণ্ডা জলে দুবেলা স্নান করাটা এদের অভ্যাস আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের মতো এদেশের লোকের দিবানিদ্রার অভ্যাস একেবারেই নেই।

প্রাতরাশটা এদের মধ্যে অতি সামান্য জলযোগমাত্র। একটু কফি, এক টুকরো পাঁউরুটি এবং কিছু ফল এইমাত্র। যারা কাজকর্ম্ম উপলক্ষে সহরের বাইরে থাকে, তাদের নটা থেকে দশটার মধ্যেই ভোজন সেরে নিতে হয়। কারণ মফঃস্বলের কাজ-কর্ম্ম সকাল সকাল সুরু হয়ে যায়। ওদিকে বিকেল পাঁচটা থেকে ছটার মধ্যে তারা 'ডিনার' খেয়ে নেয়। সহরের লোকেরা কিন্তু লণ্ডন বা নিউইয়র্কের মতো বাঁধা সময়ে খাওয়া দাওয়া করে।

একান্নবর্ত্তী পরিবার ব্রেজিলিয়ানদের মধ্যে এখনও দেখতে পাওয়া যায়। চার পাঁচ ভাই বিবাহ ক'রে এক সংসারেই বাস ক'রছে, এরকম দৃষ্টান্ত ব্রেজিলে বিরল নয়। ছেলেপুলেরা অতিরিক্ত আদর পায় বলে প্রায়ই অশিষ্ট হয়ে ওঠে।

জুয়া খেলাটা ব্রেজিলে খুব বেশী। একটা কোনও কাজের জন্যে এক সঙ্গে অনেক টাকার দরকার হ'লেই, সেখানে গভর্মেণ্ট পর্য্যন্ত লটারীর টিকিট বেচে টাকা তোলে। এখানকার বা অন্য দেশের গভর্মেণ্টের মতো সুদ দিতে চাইলেই তারা সাধারণের কাছ থেকে ঋণ পায় না। লটারী বা স্ফূর্ত্তি-খেলা ছাড়া আরও অনেক রকম জুয়া খেলা সেখানে প্রচলিত আছে। জুয়া খেলার বিরুদ্ধে সে দেশের কর্ত্তৃপক্ষ এখনও পর্য্যন্ত কোনও আইন-কানুন গড়ে ফেলেন নি। তাই সেখানকার ছোট বড় প্রত্যেক সহরেই একাধিক জুয়ার আড্ডা দেখতে পাওয়া যায়।

ব্রেজিলের ধর্ম্ম-যাজকেরাও কেউ এই সর্ব্বনাশকর জুয়া খেলা বন্ধ করবার জন্য চেষ্টা করেন না, তার প্রধান কারণ এখানে ধর্ম্ম-যাজকদের কেউ বড় মান্য করে না। গির্জ্জায় উপাসনার দিন মেয়েদেরই ভিড় হয় বেশী। পুরুষদের সংখ্যা নিতান্ত কম। ব্রেজিলিয়ানরা কোনও ধর্ম্মেরই গোঁড়া নয় বলেই বোধ হয় তারা সর্ব্বধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান। সেখানকার জনসাধারণ গির্জ্জায় যায় না বটে, কিন্তু তারা কেউ ধর্ম্মে অবিশ্বাসী নয়। প্রায়ই সেখানে যে সব ধর্ম্ম সংক্রান্ত উৎসব উপলক্ষে মিছিল বাহির হয়, ব্রেজিলের জনসাধারণ মহা উৎসাহে তাতে যোগ দেয়। পূর্ব্ব-

কাসাবার রুটি।
(আমাজন-গৃহিণী কাসাবার মূলে অনেকগুলি সুগোল রুটি তৈরি করেছেন।)

পুরুষের ধর্ম্ম তারা সহজে ত্যাগ করতে চায় না। এমন কি সে ধর্ম্মে তার আস্থা না থাকলেও, সে কুলপ্রথা অনুসারে সেই ধর্ম্মেই দীক্ষিত হ'তে একটুও ইতস্ততঃ করে না।

সঙ্গীতের দিক দিয়ে ব্রেজিলিয়ানদের যে বিশেষ কিছু উন্নতি হয়নি, এ কথা যারাই তাদের গীতবাদ্য শুনেছে, তারাই স্বীকার করবে। অথচ সঙ্গীতের চর্চ্চা যে তারা কিছু কম করে এমন নয়। প্রায় প্রত্যেক সহরেই

বাঁশীর ওস্তাদ্
(পাশাপাশি পাঁচটা বাঁশী এক সঙ্গে বাজাচ্ছে বিভিন্ন সুরে অথচ harmony রেখে !)

বাসনওয়ালা ।
(এরা বিদেশী লোক, বিদেশী বাসনই ফেরী ক'রে বেচছে ।)

"মিউনিসিপ্যাল ব্যাণ্ড" আছে। এরা প্রত্যহ সাধারণের প্রীতি সম্পাদনের জন্য সহরের 'বাদ্য-বেদীতে' (Band stand) এসে বাজায়। ব্রেজিলের রেডইণ্ডিয়ানরা তাদের বাঁশী ও ঢোল নিয়ে যে রকম মেতে ওঠে—যুদ্ধের সঙ্গীত শুনে সৈনিকেরা তেমন ক্ষেপে ওঠে না! ইণ্ডিয়ানদের রীতি-নীতি ও প্রকৃতি সকল শ্রেণীর সমান নয়। তাদের মধ্যে কোনও দল বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং কারিগর বা শিল্পী হিসাবে বেশ সুদক্ষ। আবার কোনও দল একেবারে এত নোংরা এবং এমন নির্ব্বোধ

অশ্বারোহী প্রবাসী পোর্ত্তুগীজের দল।

যে, মানুষের সেই আদিম অবস্থার বর্ব্বরতা থেকে তারা এখনও এক পা'ও এগিয়ে আসতে পারে নি! সময় সময় অন্য কিছু খেতে না পেলে তারা গাছের পাতা, শিকড় এবং সাপ-ব্যাঙও খেয়ে থাকে।

শ্বেতাঙ্গেরা সে দেশে পদার্পণ করবার আগে সেখানকার আদিম অধিবাসীরা যে একটা বেশ সরল, সবল, সুস্থ, সুন্দর ও নিষ্পাপ জাত ছিল, সে বিষয়ে আর কোনও ভুল নেই। শ্বেতাঙ্গরা তাদের মধ্যে এসে পড়বার পর তাদের কাছ থেকে তারা কতকগুলো ভীষণ বলক্ষয়কর ও জাতি-বিধ্বংসী সর্ব্বনেশে নেশা করা ছাড়া আর কিছুই বিশেষ শিখ্‌তে পারে নি; বরং উল্টে তাদের জানা অনেক জিনিস তারা ভুলে যাচ্ছে! তাদের নিজেদের অনেক আচার ব্যবহার তারা ছেড়ে দিয়েছে, তাদের অনেক স্বাভাবিক গুণ তারা হারিয়ে বসেছে, প্রকৃতির অযাচিত দানে তারা স্বভাবের শিশুর মতো যে অটুট স্বাস্থ্য ও অগাধ সন্তোষের অধিকারী ছিল, তার অনেকখানি তারা আজ অবহেলায় নষ্ট ক'রে ফেলেছে। নানা উদ্ভিদ্ ও দ্রব্য গুণে তারা আগে যে কোনও ব্যাধি ও ক্ষত অতি সত্বর আরোগ্য ক'রে ফেলতে পারতো। তীব্র ঘ্রাণ-শক্তি-বিশিষ্ট পশুর মতো তারা পূর্ব্বে দেশান্তরের অপরিচিত পথ অনায়াসে চিনে চ'লে আস্‌তে পারতো, বিবাহার্থী যুবারা আগে বীর্য্য-শুল্কে কন্যা গ্রহণ ক'রতো! সে সব তারা আজ আর পারে না বটে, অথচ পাশ্চাত্য সভ্যতার দিকেও যে তারা বিশেষ কিছু অগ্রসর হ'য়েছে সে কথাও বলা চলে না। এখনও অনেক স্থানে ইণ্ডিয়ানরা ঠিক বন্য পশুর মতো দল বেঁধে বাস করে। তাদের মধ্যে এক একদল এখনও পাথরের কুঠার, তীর-ধনুক এবং জাল কাঁধে নিয়ে ঘু'রে বেড়ায়। তাদের জনকতককে ধরে একবার সভ্য করবার চেষ্টা করা হয়েছিল,—বেশ ক'রে

কর্ম্মস্থলের উদ্দেশে। (শিশু-পুত্রকে পৃষ্ঠদেশে ঝুলিয়ে নিয়ে, তরুণী ইণ্ডিয়ান্ জননীরা কর্ম্মস্থলে যাত্রা করে।)

সাবান মাখিয়ে, নাইয়ে ধুইয়ে, ভাল কাপড়-চোপড় পরিয়ে এবং উৎকৃষ্ট খানাটানা খাইয়ে রাখা হ'চ্ছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তাদের মধ্যে একজন লোক ছাড়া আর কারুর এ সুখ সহ্য হ'ল না। সবাই মরে গেল! এরা সামনে

বেতের কাজ (আমাজনরা বেতের ঝুড়ি বুনছে।)

কফির বীজ।

খোসা ছাড়িয়ে নেওয়া। (বীজগুলি একটু নরম হ'লেই, ধুয়ে নিয়ে শুষ্ক স্থানে ফেলে তাকে ডু'পা' দিয়ে থেঁৎলাতেই খোসা ছেড়ে যায়।)

হীরক-সন্ধানীরা।
৭২১ খৃঃঅব্দে এই খানে প্রথম হীরক পাওয়া যায় বলে এ স্থানের নাম হ'য়েছে 'দায়মণ্ডিনা'। এখানকার নদীগর্ভে এখনও হীরক খুঁজে পাওয়া যায় ; তাই এক দলের পেশাই হ'চ্ছে হীরকের সন্ধান করা।)

চুল ছেঁটে ফেলে মাথায় পালক গেঁথে পরে। এরা আঁখির পল্লব ও ভ্রূযুগলের কেশ উৎপাটন ক'রে ফেলে এবং অঙ্গ চিত্রবিচিত্র ক'রে নিজেদের যথাসম্ভব কুৎসিত করে তোলে!

আমাজন নদী-কূলের ইণ্ডিয়ান মেয়েরা পায়ের ডিমটাকে ফুলিয়ে বড় করবার জন্যে উপর নীচেয় দড়ি

উৎসব-বেশে আমাজন যুবা!

বেঁধে রেখে দেয়। যাদের ওটা আগে করা হয়না, তারা কাদা মাটির তৈরি রং করা একটা নকল পায়ের ডিম নিজেদের পায়ের ডিমের উপর বেঁধে রাখে। কোন কোন দলের পুরুষদের মধ্যেও এই দুর্ব্বলতা আছে। আমাজনের ইণ্ডিয়ানদের রীতি-নীতি, প্রকৃতি ও সামাজিক চাল-চলন সম্বন্ধে এখনও অনেক জিনিস জানবার বাকী আছে। স্পেন গিয়ে দক্ষিণ আমেরিকা জয় করবার বহু কাল পূর্ব্বে এই আমাজন ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে যে একটা বেশ উঁচুদরের সভ্যতা বিদ্যমান ছিল এখন তার অনেক সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে! জগতে বীর-নারীর কাহিনী কি এখান থেকেই প্রথম সৃষ্ট হ'য়েছিল? এই শক্তিময়ী আমাজন বালাদের বীরত্ব-গাথায় একদিন আমাজন নদীর উভয় কূল মুখরিত ছিল।

আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের মতো দক্ষিণ আমেরিকার এই আমাজনদের মধ্যেও বালক-বালিকাদের সাবালক হবার পূর্ব্বে বহু কঠিন ও দুঃসাধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে তবে তারা বয়ঃপ্রাপ্তদের সঙ্গে সমান অধিকার লাভ করে। আমাজনদের মধ্যে নৃত্য-উৎসবটাই হচ্ছে প্রধান। এই নৃত্য উৎসবে নাবালকরা যোগ দিতে পায় না। এদের এই নৃত্য উৎসব কেবলমাত্র একটা আমোদের ব্যাপার নয়, এটা তাদের একটা ধর্ম্মানুষঙ্গিক অনুষ্ঠান। এই নৃত্য-উৎসবের জন্য তাদের অনেক দিন আগে থেকেই প্রস্তুত হ'তে হয়, উপবাস ক'রে নয়, বলকর ও পুষ্টিকর উৎকৃষ্ট ভোজ্য প্রচুর পরিমাণে আহার ক'রে! কারণ, এই নৃত্য উৎসব এত দীর্ঘকাল ধরে চলে যে স্বাস্থ্যবান ও শক্তিমানেরা ছাড়া আর সকলেই উৎসব শেষ হবার আগেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে! বিবাহ উপলক্ষে এদের নাচ সাত দিন অবিশ্রান্ত চলে। কোনও কোনও ধর্ম্ম-উৎসবের নাচ পনেরো দিন পর্য্যন্ত চলে।

আমাজন নদী পৃথিবীর একটি সবচেয়ে বড় নদী। পূর্ব্বেই বলেছি এদেশ অসাধারণ উর্ব্বরা। সে আমাজনেরই

ছাতু ছেঁকে ফেলা। (রুটি তৈরি করবার আগে কাসাবার ছাতু উত্তমরূপে ছেঁকে নিতে হয়।)

জলের গুণে! এখানে ধান, গম, কলা, মুলো, আম, কমলালেবু, তুলো, রবার প্রভৃতি প্রচুর উৎপন্ন হয়। তাছাড়া ভৈষজ্য উদ্ভিদ্ এত রকমের এখানে পাওয়া যায় যে, পৃথিবীর বহু ঔষধের উপাদান এরাই সরবরাহ করে। আমাজনের এক আশ্চর্য্য সম্পদ হচ্ছে এখানকার দুধের গাছ! এই গাছের কাণ্ডে শলাকা বিদ্ধ ক'রলেই অতি

আমাজন রমণীদের সর্পনৃত্য। (এই চিত্রিত-অঙ্গ নগ্ন বালিকারা শ্রেণীবদ্ধ ভাবে পরস্পরকে পিছন থেকে আলিঙ্গন করে এমন ভাবে তীর্য্যকগতিতে নৃত্য করে, যেন মনে হয় এক বিরাট সর্প নৃত্য ক'রছে!)

সুমিষ্ট ঘন দুগ্ধ পাওয়া যায়। ব্রেজিলের বিখ্যাত বাদাম ইংরাজদের অতি প্রিয় খাদ্য।

এখানে বন্যজন্তুদের উৎপাত ভয়ানক। বিষাক্ত সর্প, হিংস্র ব্যাঘ্র, খর-নখর গৃধ্র, রক্তশোষক বাদুড় প্রভৃতির অত্যাচার এখানে অত্যন্ত বেশী। আমাজন অরণ্যের সম্পদও যেমনি প্রচুর, বিপদও তেমনি অসংখ্য। এখানকার পিপীলিকা আমাদের দেশের পিপীলিকার চেয়ে দশগুণ বড় এবং বিষাক্ত। এখানকার প্রকাণ্ড মাকড়সা তেড়ে এসে কামড়ায়। কর্কট-কীট অজ্ঞাতসারে চর্ম্ম ভেদ করে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে। এখানকার ফড়িংগুলো উচ্চিংড়েগুলো পর্য্যন্ত এমন ডাকে যেন ইঞ্জিনের হুইস্‌ল বাজ্‌ছে! আবার রঙীণ অর্কিডের সুন্দর ফুল, নানা বিচিত্র বর্ণের মনোহর প্রজাপতি এবং গুচ্ছে গুচ্ছে পুষ্পিত লতা-গুল্মরাজির শোভা এ দেশের অরণ্যকে নন্দনকাননের সৌন্দর্য্য এনে দিয়েছে!

ব্রেজিলের লোকসংখ্যা প্রায় আড়াই কোটী হবে, কিন্তু ইণ্ডিয়ানদের সংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষের বেশী নয়। এখানকার বাড়ীগুলি সব বেশ সাদাসিধে চৌক ধরণের। তবে প্রত্যেক বাড়ীখানির সঙ্গেই একটু ক'রে বাগান আছে। বাড়ীগুলি মজবুদ্ করবার দিকেই এদের লক্ষ্য বেশী। শোভার দিকে তত দৃষ্টি নেই। সাদা সবুজ এবং লাল এই তিন রকম রঙের বাড়ীই এখানে বেশী দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এখানকার প্রত্যেক গীর্জ্জারই দু'টী ক'রে চূড়ো।

এখানকার গ্রামবাসীরা এবং শ্রমিক বা মজুর শ্রেণীর লোকেরা প্রধানতঃ ভাত কিম্বা কালো-শিম সিদ্ধ করে খেয়েই জীবনধারণ ক'রে থাকে। শুক্‌নো

কফি বীজ পচানো। (জলে ভিজিয়ে এই বীজের খোসা ছাড়িয়ে নেওয়া হয়।)
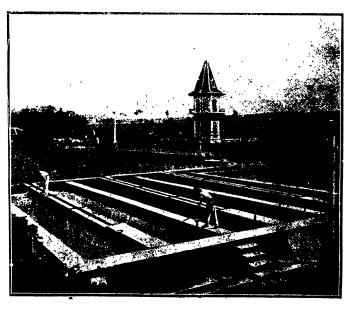
নোনা গোমাংসই এদের একমাত্র আমিষ ভোজন। শূকর-মাংসও এরা মাঝে মাঝে খায়; কিন্তু সে ভাতের সঙ্গে কিম্বা শিমের সঙ্গেই সিদ্ধ ক'রে নেয়; পৃথক রাঁধে না। ভেড়া এখানে প্রচুর পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ভেড়ার মাংস এরা খেতে পায় না; কারণ ভেড়ার মাংস সমস্তই রপ্তানী হ'য়ে যায়।

ব্রেজিলের খনিজ সম্পদও বড় কম নয়। তার এখনও সব উদ্ধার হয়নি। হীরক এবং স্বর্ণটাই এখানে বহু দিন থেকে খনিত হচ্ছে। কোনও ব্যবসাতেই এখানে কেউ একচেটিয়া অধিকার পায় না। ব্রেজিলের রাজধানী ও প্রধান সহর রায়োডি জেনায়ইরো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রতিযোগিতায় পৃথিবীর সমস্ত রাজধানীকে পরাস্ত করতে পারে। গগনস্পর্শী বিরাট শৈলমালার ক্রোড়ে, পাশাপাশি কতকগুলি চমৎকার উপসাগরের মনোহর তীরে এই নগরটি স্থাপিত। এই

বিষাক্ত মূল নির্বিষ করা!
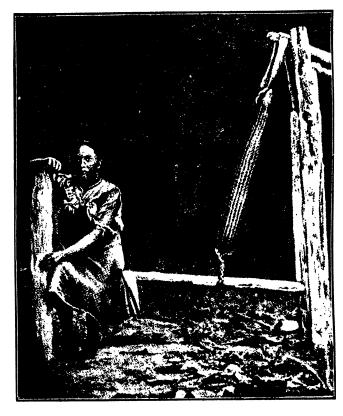
(কাসাবার মূল নিংড়ে তার বিষাক্ত রসটা বার করে দিয়ে ব্রেজিলের ইণ্ডিয়ানরা তাইতে রুটী তৈরী ক'রে খায়। বিষাক্ত রসটি নিংড়ে বা'র ক'রে ফেলবার এই কলটি ওদের ভারি চমৎকার। এই তরুণী তার শরীরের ভারে ঢেঁকিতে চাপ দিয়ে ওই বেতের বোনা খোলটি একবার টেনে লম্বা ক'রছে আবার ছেড়ে দিচ্ছে। এই উপায়ে ঝুড়ির অভ্যন্তরস্থ শিকড়গুলি শীঘ্রই বিষাক্ত রস থেকে মুক্ত হ'য়ে খাদ্যোপযোগী হ'য়ে ওঠে!)

ব্রুশ, ঝাড়ণ ও বেতের চেয়ার-বিক্রেতা!

নগর-প্রান্তের একটি গিরিশৃঙ্গের (The Sugarloaf) উপর 'তার-বর্ত্ম' সংলগ্ন আছে। এই তারবর্ত্মে বিলম্বিত শকটে আরোহণ করে পর্ব্বতের উপরে যাওয়া যায়। তারবর্ত্মবাহী শকটগুলি মোটর ইঞ্জিনের শক্তিতে চলে! রায়োর আর একটি বিরাট পর্ব্বতের নাম হ'চ্ছে 'কর্কোভেদো'। এই

পর্ব্বতের শিখর হ'তে দুই সহস্র ফীট নিম্নে শায়িত রায়ো নগরীর শোভা অতি চমৎকার দেখায়। এখান থেকে দূরে মেঘের আবছায়ার মধ্যে অর্গাণ পর্ব্বতের অভ্রভেদী শৃঙ্গ দেখা যায়। এই শৃঙ্গটি এমন কৃশ ও দীর্ঘ হয়ে উপরে
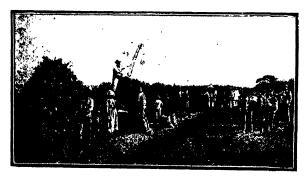
কফির চাষ
(পৃথিবীর বারো আনা কফি ব্রেজিল সরবরাহ করে।)

উঠেছে যে ঠিক যেন আকাশের বুকে অঙ্গুলি সঙ্কেতের মতো দেখায়! তাই ব্রেজিলবাসীরা এটাকে বলে শ্রীভগবানের তর্জ্জনী-হেলন। রায়ো সহর প্যারিস, লণ্ডন, নিউইয়র্ক প্রভৃতি সহরের অপেক্ষা কোনও অংশে হীন নয়। রায়োর 'ন্যাশানাল লাইব্রেরী' তত্ত্ব-অনুসন্ধানী সুধী মনীষীদের একটা লোভনীয় গ্রন্থাগার! এখানে পাঠকদের জন্য যেরকম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা আছে, জগতের অন্য কোনও গ্রন্থাগারে সেরূপ নেই! ব্রেজিলিয়ান ছাত্র ও পণ্ডিতেরা তাই লণ্ডন মিউজিয়মের পাঠাগারে ঢুকেও হাঁফিয়ে ওঠে!

ব্রেজিলে সংবাদপত্রের প্রচলনটা খুব বেশী। প্রায় প্রত্যেক সহরেই দু'একখানা ক'রে খবরের কাগজ ছাপা হয়। রায়ো, ও সাওপাউলো প্রভৃতি সহরে একাধিক রঙ্গালয় আছে। সাওপাউলো হ'চ্ছে ব্রেজিলের দ্বিতীয় প্রধান সহর। এর লোকসংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ। সাওপাউলোতে নানা বিভিন্ন জাতির বসবাস আছে। এই সহর থেকে দু'খানি ফরাসী, একখানি জার্ম্মাণ, একখানি স্পেনীয়, একখানি সিরীয় এবং একাধিক পোর্ত্তুগীজ ও ইতালীয় সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। এখানকার বিদ্যালয়গুলির মধ্যে একটি ইংরাজী ও একটি আমেরিকান ইস্কুল আছে। অন্যান্য ইস্কুলের সংখ্যা প্রায় শতাধিক।

ব্রেজিলের বিখ্যাত বন্দর 'সান্তো'র পরই 'বাহিয়া' বন্দরের নাম উল্লেখযোগ্য!

বাহিয়া বন্দর থেকে ব্রেজিলের অনেক জিনিস রপ্তানী হয়। তার মধ্যে তামাক, চিনি ও কোকোই প্রধান। আর একটা জিনিস এখান থেকে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হয়, সেটার নাম হ'চ্ছে "মাতে"। মাতে একরকম গাছের পাতা। দক্ষিণ আমেরিকাবাসীরা ঠিক চা' খাবার মতোই এই মাতে-সিদ্ধ জল পান করে। মাতের গাছগুলি দীর্ঘ। দশ বারো ফুট থেকে বিশ পঁচিশ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হয়। কিন্তু প্রচুর পত্র-পল্লবে গাছগুলি এমন ঝাঁকড়া হ'য়ে ওঠে যে, সেগুলি এত যে লম্বা, তা মোটেই চোখে পড়ে না! এখানকার আদিম অধিবাসীরা এই মাতে-গাছগুলির পূজা করে। এরা সেখানে আমাদের দেশের বট-অশথের মতো পবিত্র শ্রেণীর বৃক্ষ। মাতের পাতা শুকিয়ে নিয়ে বিক্রয় করা হয়। অনেকে আবার শুষ্ক পাতাগুলি গুঁড়িয়ে চূর্ণ
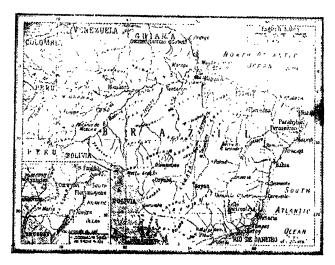
ব্রেজিলের মানচিত্র

করে নিয়ে বিক্রয় করে। মাতের চাষ করবার জন্য বিশেষ কিছু পরিশ্রম করতে হয় না। অল্প চেষ্টাতেই প্রচুর বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। একটা পাত্রে মাতের শুষ্ক পাতা কিম্বা মাতে চূর্ণ রেখে তার উপর খানিকটা খুব গরম

জল ঢেলে দিয়ে পরে একটা নল কিম্বা খড় ডুবিয়ে টানে।

মাতে পান করলে শুধু শরীরটাই চাঙ্গা হয়ে ওঠে না, শরীরের পুষ্টিসাধনও হয় এবং রক্ত শোধনও করে। এর একটা অজীর্ণতা আরোগ্য করবারও শক্তি আছে। অতি মাংস ভোজনের কুফলও মাতে পান করলে বিদুরিত হয়। ফরাসী স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান-সমিতি (The French Societe de Hygiene) মাতের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁরা বলেন গ্রীষ্মপ্রধান দেশের প্রত্যেক অধিবাসীরই 'মাতে' সেবন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। দাম খুব বেশী নয়, বিলেতে এক পাউণ্ড এক শিলিং দামে বিক্রয় হয়। এক পাউণ্ড 'মাতে' কিনে অন্ততঃ একশ' জনকে পান করানো চলে।

একুশ থেকে চুয়াল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত বয়ঃক্রমের মধ্যে কিছু দিন সৈনিক ভাবে কার্য্য করবার জন্য এখানকার প্রত্যেক পুরুষ আইন অনুসারে বাধ্য। এদের সামরিক বিভাগে নৌবহরও আছে।

দুর্দ্দশা

চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর দশাপ্রাপ্তি
ভাবের নহে ;—অভাবের—অর্থাৎ................

মনের পরশ *

শ্রীদিলীপকুমার রায়

১

মানুষ ভাবে এক হয় আর। নইলে কে ভেবেছিল যে পল্লব সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে শেষটায় সঙ্গীত-চর্চ্চায় জীবন নিয়োগ করবে? জীবনে কোন্ পথ বেছে নেবে সে সম্বন্ধে সে বয়সের ও মনের নানান্ অবস্থায় নানারূপ ভেবেছিল বটে—(কার না ভাব্‌তে হয়?)—কিন্তু সঙ্গীতকেই মূলতঃ জীবনের ব্রত স্বরূপ করবে, এ কথা যে তার মনে স্বপ্নেও স্থান পায় নি, সেটা বোধ হয় জোর ক'রেই বলা যেতে পারে।

শৈশবে তার ঠাকুরদাদা তাকে একবার জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন, সে বড় হ'লে কি হ'তে চায়। সে অম্লান বদনে উত্তর দিয়েছিল, 'রহিম খাঁ কোচমান।' সে সময়ে রহিম খাঁর পাশে কোচবাক্সে বসে সে প্রায়ই তার সঙ্গে নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষার আলোচনা করত। এর কিছু দিন পরে পল্লবের উচ্চাশা তার পিতার মোটর-চালকের সম্মানজনক পদবীকেই একান্ত ভাবে আশ্রয় ক'রেছিল। তার পরে আরও বড় হ'লে সে ভাব্‌ল ঠাকুরদাদার মতন ডাক্তার হবে। তার পর ভাব্‌ল পিতার মতন জজ হবে। তার পর মনের নানান খেয়ালে সে যথাক্রমে ঠিক্ করল সিভিলিয়ান, কমিশনর, ব্যারিষ্টার, আরও কত কি হবে। শেষটায় সাব্যস্ত হ'ল এঞ্জিনিয়ার হবে। সেজন্য সে গণিতে মন দিল। ডিগ্রী পরীক্ষায় যখন ফল ভালই হ'ল, তখন তার পিতা অনুপম পুত্রকে তার ইচ্ছামত এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে বিলেত পাঠালেন। তিনি নিজে দাসত্বের রজ্জু গলায় দিয়ে অবধি ভেবেছিলেন, পুত্রকে আর যাতেই নিযুক্ত করুন না কেন, চাক্‌রিতে নিযুক্ত করবেন না। তাই পল্লবের বিলাতে এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যাবার ইচ্ছায় তিনি খুবই সহানুভূতি প্রকাশ করলেন। পল্লবও তরুণসুলভ রঙীন স্বপ্ন দেখ্‌ল যে, এঞ্জিনিয়ার হ'য়ে রাতারাতি সে লক্ষপতি হয়েছে; অৰ্দ্ধেক রাজত্বের সঙ্গে লালায়িতা রাজকন্যা তাকে বরণ করেছে; সে দেশের ও দশের একজন হয়েছে—ইত্যাদি ইত্যাদি। তার পিতার জ্বলন্ত আদর্শবাদে চাক্‌রি কিরূপ পদে পদে দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায় হ'য়েছিল তা দেখে, ও আশৈশব তাঁর কাছ থেকে চাক্‌রির লাঞ্ছনার কথা শুনে তার দাসত্বের স্বর্ণশৃঙ্খলে দারুণ অশ্রদ্ধা জন্মে গিয়েছিল। এঞ্জিনিয়ারিং—স্বাধীন পেশা। আর টাকাও আছে;—যেহেতু "বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী" এ কথা শাস্ত্রেই আছে। তাছাড়া, পল্লবের বিলেতে আসার সময়ে ধারণা ছিল যে যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন শুধু পুরুষত্বের নয়, মনুষ্যত্বেরও একটা প্রধান লক্ষণ। কারণ, পল্লব তার সাধ্যমত নানারকম দিক্ দিয়ে ভেবে চিন্তে ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আলোচনা ক'রে স্থির ক'রেছিল যে, টাকা নইলে দেশের কোনও বড় কাজই হয় না। আর 'বাঙালী শুধুই কেরাণী হয়'! সে দেখাবে যে, বাঙালী চাক্‌রির সুযোগ স্বেচ্ছায় পায়ে ঠেলে, স্বাধীন পেশা বেছে নিতে পারে। পল্লব কখনই অপর পাঁচজনের একজন হবে না। অসামান্যতা অর্জ্জন করার স্বপ্ন দেখ্‌তে কোন উচ্চাশী বালক না ভালবাসে? পল্লবের তরুণ মনও ডিগ্রী নিয়েই আকাশকুসুম রচনা করতে সুরু ক'রে দিল। সে খ্যাতনামা হয়ে দেশের ও দশের একজন রূপে গণ্য হয়েছে, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের মুখোজ্জ্বল ক'রেছে, পিতার বুক তার

* আর্ট বা চরিত্রচিত্রণ আমার এ উপন্যাসটির উদ্দেশ্য নয়। য়ুরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আমাদের মধ্যে কারুর কারুর মন কি ভাবে সাড়া দেয় সেটাই, খানিকটা বাস্তব ও খানিকটা কল্পনার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ক'রে, সাধ্যমত ফুটিয়ে তোলা আমার লক্ষ্যস্থল। তরাং নিছক উপন্যাসের মাপকাটি বা তুলাদণ্ডে এ উপন্যাসটির মূল্য-নির্দ্ধারণ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।—যেহেতু এর লক্ষ্য ও আদর্শ ভিন্ন।

সাফল্যে দশ হাত হয়ে উঠেছে, সকলেই ধন্য ধন্য করছে—আরও কত কি! পুত্র যে একটা মানুষের মতন মানুষ হবে, এ বিশ্বাস অন্য সব পিতার মতন অনুপমেরও ছিল। তাঁর নিজের জীবনের অনেক রঙীন আশাই বাস্তবের কঠোর পরিহাসে ধূলিসাৎ হয়েছিল। তাই তিনি ভেবেছিলেন যে, পুত্র যাতে তাঁর অকৃতকার্য্যতার অভিজ্ঞতা হ'তে দেখে শেখে—(যাতে তাকে আবার তাঁর মতন ঠেকে শিখ্‌তে না হয়)—সে দিকে তিনি সতর্ক দৃষ্টি রাখ্‌বেন। তাঁর নিজের চাকরি করতে হয়েছিল অনেকটা বাধ্য হ'য়ে, কারণ তিনি অল্প বয়সে বিবাহ করেছিলেন। তাই তিনি স্থির করেছিলেন যে, উপার্জ্জনক্ষম না হ'লে পুত্রের বিবাহ দেবেন না। তিনি ছিলেন স্থিরপ্রতিজ্ঞ লোক। সুতরাং বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের শত অনুরোধ ও সাবধান-বাক্য উপেক্ষা ক'রে অনুপম পুত্রকে ২১ বৎসর বয়সেই অবিবাহিত অবস্থায় বিলেত পাঠিয়ে দিতে দ্বিধা করেন নি। তিনি মনে প্রাণে উদারপন্থী লোক ছিলেন, যদিও তাঁকে আজীবন চাকরির হাড়ভাঙা খাটুনির জাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট হ'তে হয়েছিল বলে তিনি সমাজে অনেক ছোট বড় সংস্কার-কার্য্যেই যোগদান করবার সময় পেয়ে ওঠেন নি। তাই অনেকটা এ অক্ষমতার প্রতিক্রিয়ায় তাঁর উদারপন্থা মাতৃ-হারা পুত্রের শিক্ষা বিষয়ে নিজেকে নিঃশেষ ক'রে বিলিয়ে দিতে উন্মুখ হ'য়ে উঠেছিল। ফলে পুত্রের অঙ্গে হস্তক্ষেপ করা দূরে থাকুক, পুত্রকে তিনি রূঢ় কথাও প্রাণ ধ'রে বল্‌তে পারতেন না। তাঁর শাসন-শৈথিল্যের জন্য তাঁর নিকটবন্ধু বা আত্মীয়েরা তাঁকে মাঝে মাঝে ভৎর্সনা করলে তিনি বল্‌তেন যে, পিতামাতা সন্তানকে অধিকাংশ স্থলেই শাস্তি দিয়ে থাকেন নিজেদের রাগ বা বিরক্তিকে সংবরণ করতে পারেন না ব'লেই—তাকে সৎপথে চালিত করার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে নয়। কাজেকাজেই এরূপ শাসনে সুফলের চেয়ে কুফলই হ'য়ে থাকে বেশি। তার ওপর পুত্র শৈশবেই মাতৃহারা হ'য়েছিল ব'লে, তিনি তাকে শাসন করবার প্রেরণা বড় একটা মনের মধ্যে খুঁজে পেতেন না। পুত্রের স্বাধীন ইচ্ছায় তিনি সাধ্যমত বাধা দিতেন না। তিনি সর্ব্বদা সচেষ্ট থাক্‌তেন—তার দায়িত্বজ্ঞানকে সব চেয়ে শীঘ্র জাগিয়ে তুল্‌তে। তিনি অল্প কথার মানুষ ছিলেন। পল্লব যেদিন বিলাত যাত্রা করে, সেদিন তিনি তাকে কোনও উপদেশ দেন নি বা বিলেতে কি ভাবে জীবন যাপন করতে হবে সে বিষয়ে উচ্চবাচ্য করেন নি;—শুদ্ধ এই কয়টি কথা বলেছিলেন "তোমার যা ইচ্ছে হয় হোয়ো, যা ইচ্ছে হয় পোড়ো; কেবল যা করবে সেটি মন দিয়ে কোরো; এইটুকু মাত্র আমার কামনা। তোমার কোনও আন্তরিক বাসনায় আমি বাধা দেব না, বা তোমার ইচ্ছায় শুধু আমার অনিচ্ছার ওজরে অমত করব না—এ কথা নিশ্চয় জেনো।" অন্তরীক্ষ থেকে কোনও সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ তাঁর এ কথা শুনে হেসেছিলেন কি না জানা নেই। তবে পল্লব যখন বিলেত থেকে চিঠি লিখ্‌ল যে, সে ইঞ্জিনিয়ারও হবে না, ডাক্তারও হবে না, হবে—গায়ক, তখন যে সে তার পিতা অনুপমকেও স্তম্ভিত করে দিয়েছিল, এ কথা জানা গেছে।

যাহোক্‌, পল্লব লিখ্‌ল যে, সে সঙ্গীতশাস্ত্র অধ্যয়ন করবে ও সেটা আবার বিলাতী সঙ্গীতশাস্ত্র। বাড়ীতে টিটিক্কার প'ড়ে গেল। সঙ্গীতে কি আবার পড়ার কিছু আছে না কি? গান গাওয়ার জন্য যে পড়াশুনোর কিছু দরকার থাক্‌তে পারে, তা যদিই বা পল্লবের উদার প্রতিবেশী এক আধজন বুঝলেন, কিন্তু তার জন্য যে রাশ রাশ টাকার শ্রাদ্ধ ক'রে বিলেত যাবার দরকার থাক্‌তে পারে, এ কথা কারুরই বোধগম্য হ'ল না।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে অনুপম ছিলেন—কম কথার মানুষ। এরূপ লোক সচরাচর যখন একবার মন স্থির করে, তখন সহজে তার কথার নড় চড় হয় না। অনুপমও পুত্রের এরূপ ইচ্ছায় প্রথমটা হৃদয়ে গভীর আঘাত পেলেও তাঁর প্রতিজ্ঞা হ'তে যে বিচলিত হবেন না, এ সিদ্ধান্তে পৌছতে তাঁর বেশি দেরি হয় নি। কেবল এ সংবাদ পেয়ে তাঁর সবল মনেরও আক্ষেপ হ'তে লাগল যে যদি এ সম্ভাবনার কথা তাঁর আগে মনে উদয় হ'ত! কারণ পুত্রের সঙ্গীতানুরাগে তাঁর বরাবর সহানুভূতি থাক্‌লেও তাঁর অশেষ আশার পুত্তলী যে শেষটা এরূপ একটা অশ্রুতপূর্ব্ব কাণ্ড ক'রে বস্‌তে পারে, এ সম্ভাবনা তাঁর কখনও মনে হয় নি। যাই হোক্‌, তিনি অনেক চিন্তার পর পুত্রকে লিখ্‌-লেন—"তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ আমি করিব না বলিয়া কথা দিয়াছিলাম। সে প্রতিজ্ঞা আমি ভুলি নাই। তবে তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী হিসাবে তোমাকে এ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতার জোরে দুই একটি মাত্র কথা বলা আমি কর্ত্তব্য

মনে করিতেছি। সেটি এই যে আমাদের দেশে সঙ্গীতকে জীবনে পেশারূপে অবলম্বন করিলে যে পরিণাম শুভ হইবার সম্ভাবনা বড় অধিক নহে, এ কথা বোধ হয় অস্বীকার করা কঠিন। তাই আমার বক্তব্য—বা অনুরোধ, আদেশ নহে—যে তুমি সঙ্গীত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অন্ততঃ ব্যারিষ্টারিটিও পাশ করিয়া আসিও। স্বদেশে ফিরিয়া তোমার যদি সঙ্গীত-চর্চ্চার সুবিধা না হয়, তবে যাহাতে নিতান্ত নিরবলম্ব হইয়া না পড়, সেই জন্যই আমি তোমাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ অনুরোধ না জানাইয়া পারিলাম না। এ ছাড়া আর আমার কিছুই বলিবার নাই; কারণ উপদেশ আমি তোমাকে কখনই দিই নাই বা দিবও না। কেবল আমার ঐকান্তিক কামনা এই যে, তুমি তোমার স্বভাবসিদ্ধ আন্তরিকতা যেন অটুট রাখিয়া ফিরিতে পার।"

পল্লব এ পত্রের প্রতি ছত্রের মধ্যে স্বল্পভাষী স্নেহশীল পিতার চিরপরিচিত গভীর উদারতা ও নিহিত ব্যথার পরশ অনুভব করল। সে উত্তরে লিখল—"আপনি যে আপনার নিজের সম্পূর্ণ অমত সত্ত্বেও আমার ইচ্ছায় বাধা দেন নাই, এজন্য আপনাকে আপনার অযোগ্য পুত্র যে কি বলিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইবে তাহা জানে না। এ কৃতজ্ঞতার অপরিশোধ্য ঋণ আংশিকভাবে শোধ করিবার জন্যই আমি ব্যারিষ্টারি পড়িব, যদিও ব্যারিষ্টারি কখনও করিব না।"

অনুপম এ পত্র প'ড়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌লেন। তাঁর মাতৃহারা পুত্রকে তিনি কখনও তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও কাজ করান নি—এমন কি পড়াশুনোও নয়। সৌভাগ্যক্রমে পল্লবের বাল্যকাল থেকেই বই পড়তে ভাল লাগ্‌ত। সে তার পিতার প্রকাণ্ড লাইব্রেরীতে বসে নাটক, নভেল, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি নির্ব্বিচারে পড়ত। অনুপম কোনও বই পড়তেই তাকে বারণ করতেন না। শুধু তাই নয়, পল্লব যতদিন না নিজে থেকে ইস্কুলে যাবার আগ্রহ প্রকাশ করেছিল, ততদিন তিনি তাকে ইস্কুলেও পাঠান নি—বাড়ীতে শত কাজ সত্ত্বেও তাকে নিজেই পড়াতেন। পল্লবকে তিনি ইস্কুলে পাঠাবার নামও করতেন না। তাঁর বন্ধুবান্ধব এতে অনেক সময়ে আপত্তি করলে, তিনি মৃদু হেসে শুদ্ধ বল্‌তেন, "এক দিন ও নিজেই ইস্কুলে যেতে চাইবে।"

হ'লও তাই—পল্লব বার তের বৎসর বয়সে সমবয়সী আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের সকলকেই ইস্কুলে যেতে দেখে নিজেই ইস্কুলে যাবার আগ্রহ প্রকাশ করল। তখন অনুপম পুত্রকে ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দিয়েছিলেন। কলেজেও তিনি তাকে স্বেচ্ছামত বিষয় নির্ব্বাচন করে পড়তে বলেছিলেন। কেবল পল্লব তাঁর মত জান্‌তে চাইলে, তিনি নিজের যা ভাল মনে হয় তা বল্‌তেন। তিনি সর্ব্বদাই বল্‌তেন যে, বালকের মধ্যেও একটা দায়িত্বজ্ঞান সহজে বিকাশ পেতে পারে, যদি তাকে ছেলেবেলা থেকে একটু স্বাধীনভাবে ভাবতে দেওয়া হয়; পিতামাতার কর্ত্তব্য নিজেদের যতটা সম্ভব পিছনে রেখে সন্তানের সহজ দায়িত্বজ্ঞান ও উচিত বুদ্ধিকে জাগিয়ে তোলা

সেই জন্যই অনুপম পুত্রকে ব্যারিষ্টার হবার জন্যে অনুরোধ জানাতেও সঙ্কোচ বোধ করেছিলেন। কারণ তিনি জান্‌তেন যে তিনি পুত্রকে কখনও আদেশ করেন নি ব'লে তাঁর সামান্য অনুরোধও তার কাছে আদেশের ছদ্মবেশেই নিজের আবেদন জ্ঞাপন করবে। সুতরাং যখন পল্লব পিতার অনুরোধকে সানন্দে সকৃতজ্ঞভাবে পালন কর্ত্তে সম্মত হয়ে চিঠি লিখল, তখন অনুপমের উদার মনটি তাঁর বাধ্য হয়ে আদেশ করার সঙ্কোচের গুরুভার হ'তে মুক্তিলাভ না ক'রেই পারে নি।

(২)

পল্লব অনেকখানি সত্যকার আদর্শ-বাদের দ্বারা প্রণোদিত হ'য়েই এঞ্জিনিয়ারিং পড়া ছেড়ে দিয়েছিল। অবশ্য ঠিক্ নিছক আদর্শবাদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হ'য়েই যে সে এ পথ বেছে নিয়েছিল এ কথা বল্‌লে সত্যের একটু অপলাপ করা হয়। মানুষ জীবনে কোনও গুরুতর পদক্ষেপই বোধ হয় একটিমাত্র মোটা যুক্তির চাপে করে না,—অনেকগুলি জটিল ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতেই ক'রে থাকে। পল্লবেরও জীবনের মোড় হঠাৎ ফিরে যায় নি; ফিরে গিয়েছিল—অনেকগুলি কারণে। সে সব কথা ব'লতে হ'লে গোড়া থেকে সুরু করা দরকার।

কৈশোর হ'তে ধীরে ধীরে রঙীন যৌবনের কোঠায় পদার্পণ করার সময়েও পড়া মুখস্থ করাটা বিষময় মনে হয় না এমন মানুষকে বোধ হয় অতিমানুষ পর্য্যায়ভুক্ত করাই বেশি সঙ্গত। পল্লব ছিল—সাধারণ মানুষ। সুতরাং তার ক্ষেত্রেও পরীক্ষা পাশের লোভনীয়তা ও

চতুর্ব্বর্গ-ফল-দায়িত্বের মোহ হ'তে তার মনটি ক্রমশঃ মুক্তি লাভ করছিল। যদিও সে ছেলেবেলা থেকে সুধী-সমাজে শুনে এসেছিল যে যারা লেখা পড়া করে, এক তাদের ছাড়া অপর কারুর অদৃষ্টে গাড়ী ঘোড়া চড়ার অপার সুখ লেখা বিধাতার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ; কিন্তু পরিণত বয়সে সে স্পষ্ট দেখল যে এ কিংবদন্তী শুধু যে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় তাই নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে জীবনের অভিজ্ঞতা উল্‌টো সাক্ষ্যই দিয়ে থাকে। তার ওপর এমন সময়ে কেম্ব্রিজে তার দুটি উচ্চহৃদয় বন্ধুর দৃষ্টান্ত তার মনকে এত গভীরভাবে নাড়া দিয়ে দিয়েছিল যে তার কাছে পরীক্ষা পাশের কাম্যতা পাণ্ডুর হয়ে না উঠেই পারে নি। এ বন্ধু-যুগলের একজন—মোহনলাল—সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দিতে এসে দেশের সেবার্থে কৃষি শিখ্‌তে লেগে গেল। অপরটি কুঙ্কুম—ব্যারিষ্টারী পড়তে এসে সেটা ছেড়ে হঠাৎ দর্শনশাস্ত্র পড়তে আরম্ভ করে দিল। মোহনলাল বল্‌ল, নিজে গণ্যমান্য হওয়াই জীবনের লক্ষ্যস্থল নয়, আসল কথা দেশের সেবা। কুঙ্কুমও বল্‌ল, দেশকে বড় করতে হ'লে পরিণাম চিন্তা ত্যাগ ক'রে আদর্শবাদকেই বড় করে দেখ্‌তে শেখা দরকার।

বন্ধু-বৎসল পল্লবের মনটি দুজন প্রিয় বন্ধুর জীবনে আদর্শের এরূপ জাজ্জ্বল্যমান প্রভাব দেখে যে একটু বেশি রকমই বিচলিত হয়ে পড়েছিল সেটা সহজেই অনুমেয়।

তবু ছেলেবেলার স্বপ্ন গাড়ী ঘোড়া চড়া, দেশের ও দশের একজন হওয়া, সুবোধ বালক রূপে বিকাশ লাভ করা। ছেলেবেলার ধারণা মন থেকে গিয়েও যায় না। তা ছাড়া দেশ থেকে বাল্য-বন্ধুরা প্রায়ই সোৎসাহে চিঠিপত্র লিখ্‌ত যে তারা কত আশা ক'রে বসে আছে যে পল্লব বিলেত থেকেই একটা মস্ত চাকরি নিয়ে দেশে ফিরে তাদের সকলের মুখোজ্জ্বল করবে। আত্মীয় স্বজনও ঐ একই ঢঙে তাদের ব্যক্তিগত জীবনের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ জাহির করত যে—পল্লব বিলেত থেকে ফিরে এসে রাশি রাশি অর্থোপার্জ্জন করবে। পল্লবও যখন বিলেত এসে-ছিল, তখন এই মান্যগণ্য হওয়া, বিস্তর অর্থোপার্জ্জন করে মহা দান-ধ্যান করে খ্যাত হওয়া—এই সব তার স্বগভীর আদর্শেই অন্ধভাবে নিয়ন্ত্রিত হ'ত। কারা কি বাল্যে কি যৌবনে মানুষের আদর্শ খুব বেশির ভাগ মানুষের কাছে প্রচলিত সামাজিক আদর্শের প্রভাব হ'তে একেবারে মুক্তি-লাভ করতে পারে না। তাই দেশে থাক্‌তে পল্লবের মধ্যে এ আদর্শ-সমস্যা নিয়ে বড় একটা দ্বিধা বা প্রশ্নই ওঠে নি।

এমন সময়ে বিলেতে এসে তার পারিপার্শ্বিকের আমূল ওলট-পালট হ'য়ে গেল, যার ফলে তার মনটি বাল্যের আদর্শের গরীয়ানত্ব সম্বন্ধে সংশয়ী হ'য়ে উঠ্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। বিশেষতঃ, অন্তরঙ্গ বন্ধুর জীবনকে উচ্চতর আদর্শের পরশ-পাথরে স্বর্ণবর্ণ হয়ে যেতে দেখার ফলে সে নানান্ ছোট-খাট কথাবার্ত্তা, ইঙ্গিত, ঘটনাকেও এক নতুন চোখে দেখ্‌তে আরম্ভ করল। একই ঘটনার আবেদন মানুষের মনের উপর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। পল্লব এক দিন তার এক জাপানী সহাধ্যায়ীকে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা কর্‌ল, তার পরীক্ষার পড়া কেমন তৈরি হয়েছে। তাতে সে উত্তর দিল—"পরীক্ষা আবার কি? আমি শিক্ষার জন্য এসেছি—পরীক্ষা দিতে নয়। শিখে দেশে ফিরে যাব। পরীক্ষা দিতে গেলে সময়ের বড় বেশি অপব্যয় হয়।"

পরীক্ষা দেওয়াটা সময়ের অপব্যয়! কথাটা পল্লবের তখনকার সংশয়াকুল, অনুসন্ধিৎসু মনের কাছে যেন একটা গভীর সমাধানের পূর্ব্বাবেশ এনে দিয়েছিল। তার এই কথাটাই তখন কেবল মনে হ'ত। কিন্তু সাহস ক'রে কথাটা মনে এলেও সে মুখে আন্‌তে সঙ্কুচিত না হ'য়েই পার্‌ত না। বাল্যের সংস্কার বড় কঠিন বস্তু ও আশ্চর্য্য রকম ঘাতসহ। আজকাল তার মনটা শুধু পরীক্ষার পড়া নয়, পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট সব কিছুরই প্রতি যেমন পরীক্ষা-ঘরের খাতা টুল সতর্ক পাহারা প্রভৃতি—বিমুখ হ'য়ে আস্‌ছিল। কিন্তু সে অনেক সময়ে বিদ্রোহ-উদ্যত মনকে এই ব'লে বোঝাতে চেষ্টা পেত যে পরিণামে যা শুভ তা আপাতঃ-মধুর হয় না। কিন্তু সেই জাপানী যুবকের কথা শুনে অবধি তার সন্দেহ হ'তে লাগ্‌ল যে তাই বলে হয়ত প্রমাণ হয় না যে যা-ই আপাতঃ-মধুর নয় তা-ই পরিণামে শুভ।

এই সব নানান্ চিন্তা তার মনকে একটা মহত্তর আদর্শের অনুসরণ করায় উৎসাহ দিতে লাগ্‌ল। অবশ্য সে প্রণোদনাটা নিছক্ আদর্শবাদের ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে একটা মস্ত লোভ ছিল কুঙ্কুম ও মোহন-লালের বাহবা পাবার। তাদের আদর্শবাদের পাশে তার

নিজের জীবনের আশা ও আদর্শ এখন তার বড় বেশি নিষ্প্রভ মনে হ'তে লাগ্‌ল। তার মন তাকে ক্রমাগতই বল্‌তে লাগ্‌ল যে এরূপ বন্ধুর সৌহার্দ্দ্য বজায় রাখ্‌তে হলে শুধু তাদের আদর্শবাদকে তারিফ করলে চল্‌বে না, নিজের জীবনকে আংশিক ভাবেও সে আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত কর্‌তে হবে।

কিন্তু কি উপায়ে? শুধু আদর্শবাদ ভাল বুঝলেই ত হয় না। সকলের জীবনকে আদর্শবাদ একই প্রণালীতে পরিচালিতও করে না। এ কথা পল্লব অনেকটা অস্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করত। তাই সে তার নিজের জীবনকে কি উপায়ে উচ্চতর আদর্শে রঞ্জিত করে তুল্‌তে পারে সেটা অনেকটা হাত্‌ড়ে খুঁজে বেড়াতে লাগ্‌ল।

মানুষের জীবনের খুব গভীর পরিণতি অনেক সময়ে দৃশ্যতঃ সামান্য ঘটনার আঘাতে হয়ে থাকে দেখা যায়। পল্লবের জীবনে এই সময়ে এইরূপ একটি দৃশ্যতঃ ছোট ঘটনা তার জীবনের মোড় বড় অপূর্ব্ব উপায়ে ফিরিয়ে দিয়েছিল।

পল্লব আশৈশব সঙ্গীতকে বড় ভালবাস্‌ত। অতি শৈশব হ'তেই সে তার পিতার কাছে গান শিখ্‌ত। তা-ছাড়া তার পিতা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের একজন উচ্চদরের বোদ্ধা ছিলেন ও বড় বড় ওস্তাদকে বাড়ীতে ডেকে পয়সা খরচ ক'রে তাদের গান বাজনা শুন্‌তেন। কাজেই ছেলেবেলা থেকেই পল্লব উচ্চাঙ্গের স্বরসঙ্গীতের আস্বাদ পাবার সুযোগ পেয়েছিল—যে সুযোগ খুব কম বাঙালী গৃহস্থ সন্তানেরই ভাগ্যে ঘটে। এর ফলে পল্লবের শুধু যে ভাল গান শেখ্‌বার একটা মস্ত সুযোগ হয়েছিল তাই নয়, তার তরুণ মনের সবুজ অনুরাগ তার সমস্ত আবেগ ও উৎসাহ নিয়ে বিশুদ্ধ সঙ্গীতের রসে সিঞ্চিত হ'য়ে বিকশিত হবার সুযোগ পেয়েছিল। কেম্ব্রিজে এসে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের অভাবে তার প্রাণটা সময়ে সময়ে বড়ই পিপাসিত হ'য়ে উঠ্‌ত। মনের এই ব্যাকুল অবস্থাতে তার অজ্ঞাতে য়ুরোপীয় সঙ্গীতের প্রতি তার মনটা ঝুঁকে পড়ছিল। বিলেতে ভাল হিন্দুস্থানী সঙ্গীত শুন্‌তে পেলে হয়ত তার মনটা য়ুরোপীয় সঙ্গীতের প্রতি অনুরক্ত হ'য়ে ওঠ্‌বার সুযোগ পেত না। কারণ য়ুরোপীয় সঙ্গীতের বহু পর্দ্দা এক সঙ্গে বাজানোটা তার কাণে মোটেই সুশ্রাব্য মনে হ'ত না ব'লে সে বিলেতে অভ্যস্ত হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের পরশ হ'তে বঞ্চিত না হ'লে হয়ত তার মনের দুয়ার অনভ্যস্ত সঙ্গীতের আবেদনের সামনে রুদ্ধই থেকে যেত। কিন্তু বিলেতে চিরাভ্যস্ত সঙ্গীতের রস ও আনন্দ থেকে বাধ্য হ'য়ে বঞ্চিত হ'য়ে অবধি তার মনটা মাঝে মাঝেই রাস্তায়-ঘাটে-শোনা পিয়ানো বা বেহালার নূতন ধরণের ধ্বনি-স্রোতে ধীরে ধীরে বেশি ক'রে সাড়া দিচ্ছিল। কখনও হয়ত থিয়েটার বা কোনও কন্‌সার্টে কোনও একটি গৎ বা স্বরবিন্যাস তার হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত কর্‌ত। তবে অধিকাংশ স্থলেই তার মেলডিতে অভ্যস্ত কাণ হার্মনির প্রবল নিনাদে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওঠার দরুণ তার কখনও-কদাচিৎ হৃদয়তন্ত্রীর অনুরণন সে প্রবল ধ্বনিসমষ্টিতে নিষ্পিষ্ট হ'য়ে যেত।

তবু শুন্‌তে শুন্‌তে তার কাণ য়ুরোপীয় ঐক্যতান গীতবাদ্যে অল্প অল্প ক'রে অভ্যস্ত হয়ে উঠ্‌ছিল। ক্রমে ক্রমে সে বুঝতে পারছিল যে আগে যে সব সুরসমষ্টি বা ধ্বনিবিন্যাস তার কাছে নিছক আর্ত্তনাদ ব'লে মনে হ'ত তার মধ্যে কোথায় একটা মিলের গরিমা আছে। এমন সময়ে একটি ছোট্ট মেয়ে উপলক্ষ হ'য়ে তার জীবনের গতিকে এমন এক প্রণালীতে চালিত কর্‌ল যেটা পল্লব কখনও স্বপ্নেও কল্পনা করে নি বল্‌লেও বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না।

পল্লব কেম্ব্রিজে একটি lodgingএ থাক্‌ত—দুটি ঘর নিয়ে। তার পাশের বাড়ীতে সে প্রায়ই পিয়ানো বাজানো শুন্‌তে পেত। সুরগুলি ছোট ছোট, শক্ত নয়—কিন্তু তার ভারি মিষ্ট লাগ্‌ত। সে বাইসিকিলে চড়ে কলেজে যাবার সময় মাঝে মাঝে তার ক্লাসের সহপাঠী একটী আঠার উনিশ বছরের ছেলেকে একটি ছয়-সাত বছরের টুক্‌টুকে ফুলের মতন মেয়ের সঙ্গে পাশের বাড়ীর খোলা বাগানে খেলা করতে দেখ্‌ত। সে দুচার দিনের মধ্যেই বুঝতে পারল যে ছেলেটি ছোট মেয়েটির কোনও নিকটাত্মীয়—সম্ভবতঃ ভাই। কারণ তাদের মুখের গঠনের মধ্যে একটা সাদৃশ্য ছিল।

এই ছোট্ট মেয়েটি যখন তার দাদার সঙ্গে সাম্‌নের বাগানে ফুল তোলা, দৌড়াদৌড়ি প্রভৃতি খেলা নিয়ে ব্যস্ত থাক্‌ত, তখন কখনও বা অস্তগামী সূর্য্যের রঙীন আলোয়

তার মিষ্ট মুখখানি. রঞ্জিত হয়ে এক অপূর্ব্ব শোভায় রক্তিম হয়ে উঠ্ত, কখনও বা বায়ুভরে তার সোণালি রঙের চূর্ণালক তার মুখের ওপর এসে পড়ে তার চঞ্চল কোমল মুখখানিকে আরও কমনীয় ও কোমল ক'রে তুল্ত।

পল্লব দেশে শিশুসঙ্গ বড় ভালবাস্ত—বিশেষতঃ সুন্দর শিশুদের সঙ্গে খেলাধুলা ও গল্প কর্‌তে। বিদেশে সে ছোট ছোট ভাই বোনদের অভাব প্রায়ই বোধ কর্‌ত। তার মনের এম্‌নি অবস্থায় পাশের বাড়ীর প্রায়ই-খেলারতা ছোট্ট মেয়েটি তাকে অত্যন্ত আকৃষ্ট করে তুল্‌ল। তার ওপর এক দিন সে তার জান্‌লা দিয়ে দেখতে পেল যে সে ঘরে বসে প্রায়ই যে মিষ্ট পিয়ানো শুন্‌তে পেত—সে সব এই ছোট্ট মেয়েটিরই কীর্ত্তি। সে ঠিক্ কর্‌ল যে সে পাশের বাড়ীর ছেলেটির সঙ্গে ক্লাসে আলাপ করে নেবে ও তার সাহায্যে ঐ ছোট্ট মেয়েটির সঙ্গে ভাব করবে।

সে মাঝে-মাঝে ক্লাসে ইচ্ছে করে একটু দেরি করে গিয়ে তার প্রতিবেশী সহপাঠীর পাশেই বস্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। ফলে, দুচার দিনের মধ্যেই তার সঙ্গে পল্লবের আলাপ হ'য়ে গেল। পল্লব তার কাছ থেকে শুন্‌ল যে তার নাম জন নর্টন। তার পিতা বিগত মহাযুদ্ধে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তার বিধবা মা তার শিক্ষার জন্যই কেম্ব্রিজে আছেন। ছোট মেয়েটি তার একমাত্র বোন; নাম রিণা।

দু চারদিন পরে জন পল্লবকে তাদের বাড়ীতে বিকেলে চা খেতে নিমন্ত্রণ কর্‌ল। পল্লব সাগ্রহে সম্মত হ'ল।

রিণার সঙ্গে পল্লবের ভাব হ'তে বিশেষ দেরী হ'ল না। কারণ রিণা ছিল ভারি মিশুক ও সপ্রতিভ। তার ওপর পল্লব তার ছোট হাতের পিয়ানো বাজানোর এমন তারিফ করল যে রিণার তুষ্ট মনটি পল্লবের প্রতি সহজেই ঝুঁকে পড়্‌ল।

বাস্তবিক এই ছোট্ট মেয়েটি তার ছোট্ট মোমের মতন হাতদুটি দিয়ে যে কি সুন্দর পিয়ানো বাজাত, তা পল্লব না দেখ্‌লে বোধ হয় বিশ্বাসই করত না। জন তাকে সগর্ব্বে বল্‌ল যে সকলেই বলে যে রিণা একটা 'প্রডিজি'। পল্লব দেশে একটি পাঁচ বৎসরের মেয়েকে ধ্রুপদ ধামার গাইতে শুনে অবাক্ হয়েছিল, কিন্তু তেমন মুগ্ধ হয় নি। রিণার পিয়ানো বাজানো কিন্তু তার সত্যিই ভাল লাগ্‌ত। তা ছাড়া তার ছোট্ট কচি আঙুলগুলির আশ্চর্য্য নিপুণতার সঙ্গে পরিচালনা করাটা পল্লবের দেখ্‌তেও ভারি আশ্চর্য্য মনে হ'ত।

এক দিন রিণা তার ভক্তকে হঠাৎ বলে বস্‌ল "মিষ্টার বাক্‌চি, আপনি যদি পিয়ানো এত ভালবাসেন তবে পিয়ানো শেখেন না কেন বলুন ত?"

আশ্চর্য্য, এ কথাটা পল্লবের কখনও মনে হয় নি! হয়ত মনে হয় নি বলা ভুল। কারণ, হয়ত তার মন আস্তে আস্তে তৈরী হ'য়ে আস্‌ছিল; হয়ত তার মনের মগ্নচৈতন্যে পিয়ানো শেখার ইচ্ছা ধীরে ধীরে স্ফুট হ'য়ে আস্‌ছিল; হয়ত একদিন না একদিন সে ইচ্ছা স্ফুটতর আকারে তার চেতন মনের কোণেও রূপগ্রহণ না ক'রেই পারত না। কিন্তু সে যাই হোক্, আজ রিণার সামান্য একটি কথাই যে উপলক্ষ হ'য়ে তার জীবনের গতি ফিরিয়ে দিয়েছিল, সে কথা সে পরে মাঝে মাঝেই ভেবে বিস্ময় বোধ কর্‌ত।

পল্লব রিণারই শিক্ষকের কাছে পিয়ানো শিখ্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। যখন তার বাজানো অভ্যাস কর্ত্তে কুড়েমি আস্‌ত তখন সে রিণার মতন ছোট মেয়েরও এ বিষয়ে উৎসাহ বোধ করার কথা মনে করে উৎসাহ পেত।

সে পিয়ানোয় উন্নতি লাভ কর্ত্তে লাগ্‌ল বটে কিন্তু পরীক্ষা আসন্ন ভেবে মাঝে মাঝে তার মনে হ'তে লাগ্‌ল যে এতে পড়াশুনোর ক্ষতি বিলক্ষণ হচ্ছে। তবে সঙ্গে সঙ্গে সে জাপানী ছাত্রটির কথা মনে করে মনকে বোঝাবার চেষ্টা পেত যে পরীক্ষা আবার কি? জীবনে শিক্ষালাভই আসল। কুস্কুমের ও মোহনলালের দৃষ্টান্তও সঙ্গে সঙ্গে তার মনশ্চক্ষের সাম্‌নে উজ্জ্বল হয়ে প্রতিভাত হ'ত। কিন্তু আবার মনে হ'ত যে তাতে কি? তারা ত একটা ব্রত নিয়েছে, আমি পিয়ানো শিখ্‌ছি ত ব্রত হিসেবে নয়, অথচ এজন্য পড়াশুনোর ক্ষতিও হচ্ছে প্রচুর। তবে? এ "তবে"র উত্তর তার মনের মধ্যে আস্তে আস্তে গ'ড়ে উঠ্‌ছিল বটে, কিন্তু মূর্ত্ত হয়ে উঠ্‌বার তখনও দেরি ছিল।

এ দ্বিধাদ্বন্দ্বের মাঝখানে প'ড়ে তার প্রাণটা যখন বড় বেশী অস্থির হয়ে উঠত, তখন সে পাশের বাড়ীতে গিয়ে রিণার সঙ্গে হাসি গল্প ক'রে তাকে পিয়ানো শুনিয়ে তার পিয়ানো শুনে বেশ একটা তৃপ্তি পেত।

মাঝে মাঝে সে, জন ও রিণা কেম্ব্রিজে পিয়ানো অর্গান বেহালা প্রভৃতির recital শুন্‌তে যেত ও জনের সঙ্গে যুরোপীয় সঙ্গীত তার কিরকম লাগ্‌ল সেই নিয়ে আলোচনা কর্‌ত। মাঝে মাঝে সে দু একটা symphony কন্‌সার্ট

শুন্‌তে যেত। এই সব শুন্‌তে শুন্‌তে তার ধীরে ধীরে য়ুরোপীয় সঙ্গীতে harmony যে একটা কত বড় কীর্ত্তি, সে সম্বন্ধে চোখ ফুটতে আরম্ভ কর্‌ল। দেশে থাক্‌তে পথে ঘাটে পিয়ানোর অশিক্ষিত-পটুত্বের যে নমুনা সে শুন্‌ত, তাতে তার মন য়ুরোপীয় সঙ্গীতের মহিমা সম্বন্ধে সচেতন হবার বড় একটা সুযোগ পায় নি। এখন সে আস্তে আস্তে উপলব্ধি কর্ত্তে আরম্ভ কর্‌ল যে বিদেশীর কোনও মহিমময়ী কীর্ত্তিকেও মনপ্রাণ খুলে গালি পাড়া কত সহজ!

এমন সময়ে এক দিন কেম্ব্রিজে একজন মস্ত বড় অষ্ট্রিয়ান্ পিয়ানো বাজালেন। সেদিন ছাত্রবৃন্দের কি ভিড়! দু তিন দিন আগে থেকে সমস্ত রিজার্ভ আসন বিক্রয় হয়ে গেল। পল্লব, জন, রিণা ও মিসেস নর্টন অনেক কষ্টে শেষ পংক্তিতে চারটি বাজে আসন সংগ্রহ করতে পারলেন।

বাজনা শেষ হ'য়ে গেল। শ্রোতৃবৃন্দের কি সে করতালি! বিখ্যাত বাদক মহোদয় একবার নেপথ্য হ'তে বাহিরে আসেন আর কর্ণ বধিরকর করতালির রোল ও "আবার-আবার" ধ্বনি। তিনি আর একটা গত্ বাজালেন। পুনরায় সেই অশ্রান্ত করতালি। শেষটায় হলঘরটির দীপ নির্ব্বাপিত কর্‌তে হ'ল।

পল্লবের মনটা সেদিন হঠাৎ যেন একটু বেশিরকম বিচলিত হয়ে পড়্‌ল। সে মিসেস নর্টন, জন ও অন্যান্য অনেকের কাছেই শুনেছিল যে য়ুরোপে একজন বড় গাইয়ে বা বাজিয়ের ভাগ্য কেমন রাজেন্দ্রেরও কাম্য। আজ যেন সে হঠাৎ এ কথার মর্ম্ম উপলব্ধি কর্‌ল।

কনসার্ট শেষ হ'লে রিণা সরল ভাবে হেসে বল্‌ল "মিষ্টার বাক্‌চি, এক দিন আপনিও এই রকম সম্মান পাবেন ও আমিও পিয়ানো বাজিয়ে এই রকম ফুলের মালা পাব; নয়?"

পল্লবের কথাটা শুনে মনে মনে হাসি পেল। সে রিণাকে বল্‌ল "নিশ্চয় রিণা। তুমি আর আমি তখন duet বাজাব, কেমন?"

রিণার চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে একপাশে পল্লবের ও অপর পাশে দাদার আঙুল ধরে ঝুল্‌তে ঝুল্‌তে বল্‌ল "বেশ বেশ। কাল থেকে আমরা আরও ভাল ক'র duet বাজাব তাহলে, আচ্ছা?"

পল্লবের কাণে এ কথাটা গেল না। তার মনে হচ্ছিল বিলাত ও ভারতের মধ্যে ব্যবধান কতখানি! এখানে একজন বড় শিল্পীর কি আদর, কি প্রতিপত্তি! আর তার স্বদেশ! তার মনটা ভারি হয়ে উঠল।

(৩)

সেই দিন থেকে তার মনের কোণে একটা ইচ্ছা ক্রমাগত আনাগোনা করতে আরম্ভ কর্‌ল। তার মনটা সঙ্গীতের দিকে ক্রমশঃই ঝুঁকে পড়ছিল বটে, কিন্তু সঙ্গীতকে যে জীবনের অবলম্বন করেও বড় হওয়া যায়, এ কথা সে ইতিপূর্ব্বে কখনও গম্ভীরভাবে মনে স্থান দেয় নি। কিন্তু সে দিনের বাদকের ভাগ্যে কৃতজ্ঞ শ্রোতৃবৃন্দের অজস্র করতালি, উজ্জ্বল প্রশংসমান দৃষ্টি ও ফুলের তোড়া লাভের দৃশ্য তার মনকে তার শত আপত্তি সত্ত্বেও সঙ্গীতকারের গৌরবময় জীবনের দিকে সচেতন করে দিয়েছিল। কিন্তু সে এ চিন্তা হেসেই উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করত। এ দেশ আর আমাদের দেশ! নাঃ, চিত্তস্থৈর্য্য হারানো কিছু নয়! আমাদের দেশে গায়ক হলে চল্‌বেই বা কেমন ক'রে, লোকে বল্‌বেই বা কি? দিন গুজরাণের সমস্যা নিয়ে যদি বা সে অচঞ্চল ভাবে মাথা ঘামাতে পার্‌ত, লোকে কি বল্‌বে ভেবে কিন্তু তার অভিমানী মনটা একেবারে সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ত। দেশের ও দশের একজন যে তার হ'তেই হবে!

এ চিন্তার সময়ে তার মনে হ'ত কুঙ্কুম ও মোহনলালের কথা। তাদের সাম্‌নেও কি জীবন-সমস্যা একই ভাবে প্রতিভাত হয় নি! তারাও কি আত্মীয়-স্বজনের আশা ভরসার মূলে কুঠারাঘাত করে কৃষি ও দর্শন শাস্ত্রের মতন অনুজ্জ্বল বস্তুর চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হয় নি? পল্লব না এত দিন ভাবছিল কিরূপে তার জীবন আদর্শবাদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করবে! এই ত পন্থা। বিধাতা ত আজ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করছেন যে এই পথে গেলেই তার অভিমানকে বর্জ্জন করা যাবে ও সে সত্যই মহৎ জীবন যাপন করার সুযোগ পাবে! সে না এত দিন ভাবছিল যে কি উপায়ে সে কুঙ্কুম ও মোহনলালের প্রশংসা পাবে?—এই-ই ত পথ, ও তার যোগ্যতা প্রমাণের প্রকৃষ্ট উপায়!

কিন্তু কুঙ্কুম ও মোহনলাল যদি প্রশংসা না করে! যদি তারা সঙ্গীতকারের জীবনকে হেয় জ্ঞান করে! না তা করবে কেন?—করতেও ত পারে? তারা হয়ত

তার মতন সঙ্গীতকারের জীবনের মহনীয়ত্বের প্রতি সচেতন হয়ে ওঠার সুযোগ পায় নি ?

তবে তার আদর্শবাদ এ চিন্তায় বিদ্রোহ করে বলত— কুঙ্কুম ও মোহনলালের সমর্থনই কি আদর্শবাদের চরম কষ্টিপাথর না কি ? কিন্তু হায় মানুষের হৃদয় ! সে লোকমতও অনেক সময় উপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু প্রিয় বন্ধুর উপেক্ষা সইতে অক্ষম না হয়েই পারে না, বিশেষতঃ তরুণ বয়সে যখন বন্ধুত্বের দান তার জীবনের বারআনা স্থান অধিকার ক'রে থাকে।

পল্লব স্থির করল এক দিন কুঙ্কুম ও মোহনলালকে চায়ে নিমন্ত্রণ করে তাদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করবে।

(৪)

"কি বল মোহনলাল ?"

পল্লবের এই চিন্তাকুল প্রশ্ন সেদিন সন্ধ্যার ম্লানিমায় আরও বিষণ্ণ শোনাল। মোহনলাল হঠাৎ কিছু উত্তর দিতে পারল না। সে কুঙ্কুমের দিকে একবার তাকাল। কুঙ্কুম পল্লবের সমস্ত কথা চুপ করে মন দিয়ে শুনে একটি শোফার উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় শুয়ে একদৃষ্টে ঘরের fireplaceএর দিকে তাকিয়ে ছিল।

মোহনলাল ও কুঙ্কুম পল্লবের চেয়ে দুই তিন বৎসরের বড় ছিল। মোহনলাল ছিল ধনীর সন্তান। কিন্তু পাঠানুরাগ তার বাল্যাবধি প্রবল ছিল। সে ও কুঙ্কুম এক ইস্কুলে ও পরিশেষে এক কলেজ থেকে পাশ করে। সহাধ্যায়ী কুঙ্কুমকে সে বহুদিনের আলাপে পরম বন্ধু রূপেই পেয়েছিল। পল্লবের সঙ্গে তাদের আলাপ হয়েছিল পড়ার সূত্রে নয়—পল্লবের বাড়ীতে তাদের পিতামাতার যাতায়াত ছিল ব'লে। ফলে পল্লব, মোহনলাল ও কুঙ্কুম তিনজনের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়। তার পর এই দূর বিদেশে এক বিশ্ববিদ্যালয়ে একত্রে পড়ার দরুণ তাদের সে বন্ধুত্ব আরও গভীর হয়ে উঠেছিল।

ত্রয়ীর মধ্যে মোহনলালই সর্ব্বপ্রথম বিলাতে আসে— তখন সবে যুদ্ধাবসান হয়েছে। তার বৎসর খানেক পরে পল্লব এসেছিল ও তার মাস তিনেক পরে কুঙ্কুম এসে যোগ দেয়।

মোহনলাল বাল্যকাল হ'তেই একটু প্র্যাক্টিকাল গোছের ছেলে ছিল ব'লেই হোক্ বা যে কারণেই হোক্, সঙ্গীতানুরাগ ব'লে কোনও বস্তু তার মনের মধ্যে বড় একটা গভীর ছাপ আঁকে নি। তাই সে পল্লবের প্রস্তাবে চমৎকৃত হ'লেও সাড়া দিতে পারল না। সে পল্লবের কথা শেষ হ'লে একটু চঞ্চলভাবে উঠে জানালার কাছে গিয়ে সন্ধ্যার ম্লান আলোয় বাইয়ের অবিশ্রান্ত তুষারপাত দেখতে লাগ্‌ল। খানিকক্ষণ ঘরের মধ্যে নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগ্‌ল।

শেষে সে বল্‌ল "ভাই পল্লব, এরূপ প্রস্তাবটা আমার কাছে যে খুবই অভাবনীয় ঠেক্‌ছে তা আমি বলতে বাধ্য। তাই তোমার প্রশ্নের উত্তরে যে কি বল্‌ব আমি ঠিক্ ঠাহর পাচ্ছি না। তবে তুমি এইমাত্র বিলেতের শিল্পীজীবনের মহিমা কীর্ত্তন করতে করতে একটু বেশি উচ্ছ্বসিত হ'য়ে পড়েছিলে ব'লে সে সম্বন্ধে আমি এইটুকু মাত্র বল্‌তে পারি যে, বিলেত হচ্ছে বিলেত ও আমাদের দেশ হচ্ছে আমাদের দেশ। নয় কি ? অর্থাৎ বিলেতে শিল্পীর প্রতিপত্তি প্রচুর হ'লেও আমাদের দেশের অবস্থাটা ঠিক্ সে রকম নয়। সুতরাং সেটা ভাল ক'রে উপলব্ধি না ক'রে এ লাইনে যাওয়া ঠিক্ সঙ্গত বলে আমার মনে হচ্ছে না।"

পল্লব বল্‌ল—"অর্থাৎ ?"

মোহনলাল বল্‌ল "অর্থাৎ, তোমার একটা কথা একটু ভাল করে বিবেচনা ক'রে দেখা উচিত। সেটা এই যে, যখন তুমি ফিরে যাবে তখন লোকে তোমায় যে অবজ্ঞার চোখে দেখ্‌বে তার গুরুতরত্ব নিতান্ত তাচ্ছিল্যের ব্যাপার হবে না।"

পল্লব বল্‌ল "ভাই, সে কথা কি আমি একটুও ভেবে দেখি নি মনে কর ? কিন্তু আর্টের জন্য—"

মোহনলাল বাধা দিয়ে বল্‌ল "ভাই পল্লব, কিছু মনে কোরো না ; তুমি যতই দেশের লোককে বোঝাতে চেষ্টা কর না কেন যে সঙ্গীত একটা মস্ত বড় আর্ট, য়ুরোপে তার এত আদর, এত প্রতিপত্তি, একাগ্র সাধনা নইলে তার চর্চ্চা রাখা অসম্ভব ইত্যাদি—তুমি যদি সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে সঙ্গীতকেই ব্রত ক'রে দেশে ফের তা'হলে তারা কি এ সব হেসেই উড়িয়ে দিয়ে বল্‌বে না যে ছেলেটা কেবল লম্বা লম্বা বোল্‌চাল ছাড়া আর কিছুই শেখ্‌বার সময় পায় নি ? তা ছাড়া আমার মনে হয় যে আর একটা কথাও ভেবে দেখা দরকার যে, দেশে ফিরে তুমি মিশ্‌বে কার সঙ্গে।

এখানে গাইয়ে-বাজিয়েরা শিক্ষিত সমাজের সম্মানভাজন। কিন্তু আমাদের দেশের অবস্থা যে ঠিক্ উল্‌টো এ কথা ভুললে ত চল্‌বে না ভাই !"

কুস্থুম এতক্ষণ একটা কথাও বলে নি—পল্লবের প্রস্তাব তাকে ভাবিয়ে দিয়েছিল। সে বরাবর একদৃষ্টিতে আগুনের দিকে তাকিয়ে পল্লবের সঙ্গীতানুরাগের কথাই ভাব্‌ছিল। হঠাৎ মোহনলালের শেষ কথায় পল্লবের উত্তর দেওয়ার আগেই সে ব'লে উঠ্‌ল "তা বটে মোহনলাল! আমি সঙ্গীত সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিও না। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বিচার কর্‌তে গেলে কি বলা যায় না যে, নতুন কিছু করার এ রকম শত শত অন্তরায় চিরকালই থাক্‌বে ; তাই কোনও নতুন পথ বেছে নেওয়ার সময়ে বোধহয় শুধু বাধাবিপত্তি ভেবে চলাটাই সবচেয়ে গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক নয়। কেন না এ সব অসুবিধের জন্য যদি সর্ব্বদাই পেছোতে হয়, তবে ত এক কেরাণী, উকীল ও ডেপুটি ছাড়া আর কিছুই হওয়া চলে না। দেখ না—"

মোহনলাল বাধা দিয়ে বল্‌ল "ভাই কুস্থুম, তুমি যা বল্‌ছ তা মিথ্যা নয় বটে, কিন্তু আমার এ সম্বন্ধে একটা কথা সব চেয়ে বড় কথা মনে হয়। সেটা এই যে প্রত্যেকের জীবনটা তার কাছে একবারই আসে। তাই এ জীবন নিয়ে যে নতুন experiment কর্ত্তে চায় সে করুক, কিন্তু যে চায় না, তার কাছে এ সব বড় বড় যুক্তি শুধু বাক্যসারই হয়ে দাঁড়াবে না কি ? খুব অসামান্য দুচারজনের কথা ছেড়ে দিলে বোধহয় এ কথা বলা যেতে পারে যে মানুষ প্রথমে চায় সুখশান্তি। তাই মুখে আমরা যত বড় বড় কথাই বলি না কেন, কাজে সমাজের অবজ্ঞাকে বরণ ক'রে উচ্চতর সুখশান্তি সৃষ্টি করে নেওয়ার চেয়ে কঠিন কাজ যে সংসারে অল্পই আছে এ কথা বোধহয় তুমি সহজে অস্বীকার কর্ত্তে পারবে না। তুমি নিজে অবশ্য ব্যারিষ্টারী ছেড়ে নিছক জ্ঞানচর্চ্চার আদর্শে দর্শনশাস্ত্র পড়ছ। কিন্তু তোমার সাম্‌নে বল্‌ছি ব'লে সঙ্কুচিত হ'য়ো না—এতটা আদর্শবাদ কোনও দেশেই বোধহয় খুব বেশি দেখা যায় না। তা ছাড়া আর একটা কথাও এ সম্পর্কে ভোলা চলে না ; সেটা এই যে পল্লবের মন ও তোমার মন এক প্রকৃতির নয়। তুমি নিজে দারিদ্র্যের মুখ দেখেছ। পল্লব বরাবর সুখের কোলেই মানুষ। তাই সে তোমার মতন নিজের মনটির স্বরূপ জান্‌বার অবকাশ বা সুযোগ পায় নি। কারণ এটা ত মানো যে নিজের মনটিকে দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে যে ভাবে চিন্‌তে পারা যায়, সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে সে রকম যায় না ? তা ছাড়া পল্লব আশৈশব একটু রঙীন-প্রকৃতি। সুতরাং বয়সের তুলনায় সে যে নানা বিষয়ে একটু ছেলেমানুষ আছে, তার মতামত বিচার করার সময় সে সত্যটির দিকে সচেতন থাকা দরকার।"

ব'লেই মোহনলাল পল্লবের দিকে চেয়ে বল্‌ল "পল্লব ভাই রাগ কোরো না।" কারণ সে জান্‌ত যে পল্লবকে কেউ ছেলেমানুষ বল্‌লে সে মনে মনে খুসি হ'ত না।

পল্লব মোহনলালের এ কথায় মনে মনে খুব সন্তুষ্ট না হ'লেও সহজ সুরে বল্‌ল "না না মোহনলাল, মনে কর্‌ব কেন ? তবে কি জান ?—"

মোহনলাল কথাটা ব'লেই বুঝেছিল যে পল্লব আঘাতকে অস্বীকার কর্‌লেও একটু আহত হয়েছে। সে তার একটি হাত তার হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে তার উপর সস্নেহ চাপ দিয়ে বল্‌ল "তুমি কি বল্‌বে ভাই শুন্‌ছি। আগে আমার কথাটা শেষ কর্‌তে দাও। দেখ জীবনটাকে তোমার চেয়ে আমি খুব কম ক'রেও বছর তিনেক বেশি দেখেছি। অন্ততঃ তোমার আসার বছর খানেক আগে বিলেতে আসার দরুণ আমার অভিজ্ঞতাটা যে খানিকটা বেড়ে গেছে সে কথা বোধহয় মোটামুটি বলা যেতে পারে। তোমার বয়সে আমারও একটা খুব বড় রকম আদর্শবাদ ছিল।"

কুস্থুম হেসে বল্‌ল "মোহনলাল, তোমার নামে লোকে আর যে অপবাদই দিক্ না কেন, অবিনয়ের অপবাদ যে দিতে ইতস্ততঃ কর্‌বে এ কথা বোধহয় অনেকটা জোর ক'রে বলা যেতে পারে। নইলে যে লোক ধনীর সন্তান হ'য়েও কৃষি শেখে—তা আবার সিভিল সার্ভিসের প্রলোভনকে পায়ে ঠেলে—তার আদর্শ-বাদকেও কি "আছের" কোঠায় না ফেলে "ছিল"র কোঠায় ফেল্‌তে হবে না কি ?

মোহনলাল নিজের প্রশংসা শুনে একটু কুণ্ঠিত স্বরে বল্‌ল "আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে। এখন যা বল্‌ছিলাম। আমার বলার উদ্দেশ্য ছিল কেবল এই মাত্র যে যৌবনে পা দেবার সময়ে মানুষের মন তিনচার বৎসরে বড় কম

রূপান্তরিত হয় না। তাই আমার এ তিনচার বৎসরে যে অভিজ্ঞতাটা হয়েছে, পল্লব হয়ত তা থেকে লাভ কর্ত্তে পারে ভেবে আমি—"

পল্লব একটু আহত হ'য়ে তার হাতটা মোহনলালের হাতের মধ্যে থেকে টেনে নিয়ে ব'লে বস্‌ল "তাই ব'লে ভাই, জীবন সম্বন্ধে পরের মুখে ঝাল খাওয়াই যে একমাত্র পন্থা তা আমার মনে হয় না। অর্থাৎ তুমি এই তিন চার বৎসরে যে ভাবে বদ্‌লেছ, অপরের ধারণাও যে ঠিক্ সেই ভাবেই বদ্‌লাবে, এ কথা মনে করাটা বোধহয়—খুব দূরদর্শিতার পরিচায়ক নয়।"

কথাটা ব'লেই পল্লব বুঝল যে এর মধ্যে যে খোঁচাটা সে প্রচ্ছন্নভাবে দিতে গিয়েছিল সেটা একটু বেশি তীব্র হ'য়ে তার নিজের অভিমানকেই প্রকাশ ক'রে ফেলেছে। কুঙ্কুমও তার এ শীলতার অভাব লক্ষ্য ক'রে না ব'লে থাক্‌তে পার্‌ল না—

"ভাই পল্লব! মোহনলাল পিঠ চাপ্‌ড়ে কথা বলার লোক নয়, এ কথা তোমার চেয়ে ভাল কেউ জানে না। কাজেই তার ওপর তোমার এ অন্যায় আরোপ করাটা উচিত হয় নি।"

মোহনলাল তাড়াতাড়ি বল্‌ল "না না পল্লব, আমি কিছু মনে করি নি। তুমি সত্যি কথাই বলেছ। প্রত্যেক মানুষেই জীবনকে ও জগৎকে এমন একটা চোখে দেখে ঠিক্ যে ভাবে আর কেউ দেখে নি ও এইটেই জীবনের ধর্ম্ম। তাই পরের মুখে ঝাল খাওয়াটা যে বাঞ্ছনীয় নয় সে বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার মতভেদ নেই। তবে আমি আমার জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে তোমার জীবন নিয়ন্ত্রিত কর্‌তে চাই নি। আমি শুধু এই কথা বল্‌তে যাচ্ছিলাম যে, প্রথম যৌবনে আদর্শবাদ বড় বেশি জ্বলন্ত থাকে ব'লে সে সময়ে আমরা প্রায়ই নিজের মনের শক্তি নির্ণয়ে উদাসীন হয়ে বসি; যেন শুধু আদর্শবাদই যথেষ্ট। আমার জীবনে শেষ কয়েক বৎসরে এ উপলব্ধিটি বার বার নানা রূপ ধ'রে আমাকে আঘাত করেছে ব'লেই আমি তোমাকে নিতান্ত বন্ধুভাবে আমার এ অভিজ্ঞতাটি জানাতে চেয়েছিলাম। তবে আমার বলার ধরণটা হয়ত ঠিক্ যথাযথ হয় নি ব'লেই তোমার পক্ষে আমাকে ভুল বোঝা সম্ভব হয়েছে।"

পল্লবের নিজের ভুল বুঝতে দেরি হয় নি। কেবল সে একটু বেশি অভিমানী ছিল ব'লে সহজে নিজের দোষ স্বীকার কর্ত্তে পার্‌ত না। এ দুর্ব্বলতার জন্য তার আত্ম-গ্লানি বড় কম হ'ত না, এবং কখনও এ দোষ স্বীকার কর্‌তে মনকে রাজি করাতে পার্‌লে তার মনটা বড় কম হাল্‌কা হ'য়ে যেত না। তবু মানুষের হৃদয়টি এম্‌নি অসঙ্গতিতে ভরা যে সে জেনে শুনে বার বার একই ভুল করে ও ততবারই সে ভুলকে সমর্থন করতে ব্যগ্র হয়ে ওঠে। সে সময়ে সে ভাবে না যে কোনও ভুলের সমর্থন করাটাই তার অপরাধ ক্ষালনের শ্রেষ্ঠ পন্থা নয়, যেমন মজ্জমান রক্ষার্থীকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধ'রে তার চলৎশক্তি রহিত করবার সময় ভাবে না যে সে পদ্ধতি কারুর প্রাণ রক্ষারই শ্রেষ্ঠ উপায় নয়। সে কিন্তু আজ হয়ত মোহন-লালের কাছে মাপ চাইত। তবে মোহনলাল উদারভাবে তার খোঁচাটাকে ইচ্ছে ক'রেই গায়ে না মাখায়, সে পরিত্রাণ পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দোষটা মোহনলালের প্রসারিত স্কন্ধের উপরই চাপিয়ে দিয়ে বল্‌ল "তা হ'তে পারে।" কেবল তার অবাধ্য মনটি অত্যন্ত স্পষ্ট স্বরে তার কাণে কাণে বল্‌তে লাগ্‌ল "কিন্তু পল্লব এ ক্ষেত্রে তা হয় নি।"

সেদিন এ আলোচনা বহুক্ষণ চল্‌ল। কুঙ্কুম প্রথমে একটু দ্বিধা-সন্দিগ্ধ ছিল, কিন্তু পল্লবের সোৎসাহ কথা শুন্‌তে শুন্‌তে তার মনটি পল্লবের প্রতি সহানুভূতিতে আর্দ্র হ'য়ে উঠ্‌ল। কিন্তু মোহনলাল কেবলই বল্‌তে লাগ্‌ল যে হঠাৎ কোনও কিছু করা ঠিক নয়; নিজের মনকে আগে বোঝা দরকার। পল্লব উত্তেজনার মাথায় বল্‌ল যে সে এজন্য দেশে গ্লানি ও নিন্দা সহ্য কর্‌তে প্রস্তুত আছে, কারণ সৎসাহস নইলে সংসারে কোনও নতুন পথেরই সৃষ্টি হয় না ইত্যাদি ইত্যাদি। মোহনলাল শেষে পল্লবের কাঁধে একটা হাত রেখে স্থির দৃষ্টিতে তার চোখের দিকে চেয়ে বল্‌ল "ভাই পল্লব, আমার যা বল্‌বার তা আমি সব বলেছি। তোমাকে ছেলেমানুষ আখ্যা দিয়ে যে আমি তোমার ওপর উপদেশ বর্ষণ করতে চাই না এ কথাও তুমি জানো। তাই আশা করি আমি একটা কথা তোমাকে বিশেষ ক'রে বল্‌তে চাইলে তুমি আমাকে ভুল বুঝ্‌বে না। আমার নিজের জীবনে বারবার ঠেকে শিখে আমার একটা কথা বড় বেশি মনে হ'য়েছে যে আমাদের নিজেদের স্বরূপটি সম্বন্ধে কোনও নিশ্চিত ধারণা

নিয়ে একরোখা ভাবে চল্‌তে যাওয়ায় চেয়ে মারাত্মক ভুল সংসারে অল্পই আছে। ভাই, রাগ কোরো না, তোমাকে একথা একটু বেশি জোর দিয়ে বলার দরকার আছে মনে করেই আমি আজ তোমাকে এত ক'রে সংযত হ'তে বল্‌ছি। কারণ জীবনে জলঝড় তুমি বড় বেশি সওনি বা পোড়ও বড় বেশি খাও নি। অথচ এ জলঝড়-সওয়া ও পোড়-খাওয়ার মধ্যে দিয়েই আমরা প্রত্যেকে আমাদের আসল রূপটি সম্বন্ধে অনেকটা সত্য জ্ঞান লাভ করি। তাই আমার প্রধান বক্তব্য এই যে সঙ্গীতকে ব্রত করলে আমাদের দেশে ও সমাজে যে অবজ্ঞা সইতে ও ঘা খেতে হবে—(অর্থোপার্জ্জনের কথা ত ছেড়েই দাও)—তার গুরুত্ব সম্বন্ধে খুব ভাল ক'রে সচেতন না হওয়া পর্য্যন্ত এ পথ নিও না। অর্থাৎ এক কথায় হঠাৎ কিছু কোরো না; ভাব, ও নিজেকে নানান্ উপায়ে পরীক্ষা কর। এইটুকু মাত্র তোমার বন্ধুর অনুরোধ, উপদেশ নয়।"

কুসুম বল্‌ল "মোহনলাল! তুমি যা বল্‌ছ সেটা যে খাঁটি কথা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথাও কি সাধারণ নীতি হিসেবে বলা যায় না যে ভেবে চিন্তে হিসেব কিতেব ক'রে কোনও বড় কাজও হয় না। সংসারে সব বড় ও মহৎ কাজই সাধিত হয়েছে—মানুষের অন্তরের সহজ প্রেরণায় ও দুর্নিবার কর্ম্ম-প্রণোদনায়।"

মোহনলাল একটু চিন্তাকুল ভাবে বল্‌ল "সেটাও সত্যি কথা। তবে কি জান ভাই! আমি সঙ্গীতকে কখনও ভালবাস্‌বার সুযোগ বা শিক্ষা পাই নি। কাজেই হয়ত পল্লবের এ সৎসঙ্কল্পকে ঠিক্ যে ভাবে দেখা উচিত সেভাবে দেখ্‌তে পারছি না।"

তার পর পল্লবের দিকে চেয়ে মোহনলাল বল্‌ল "অবশ্য এরূপ স্থলে অন্তরঙ্গ বন্ধুও ঠিক্ পথ দেখাবার স্পর্দ্ধা করতে পারে না। শেষ পদক্ষেপের দায়িত্ব প্রত্যেকের নিজেরই নেওয়া ছাড়া গতি নেই। তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে পথ তুমি খুঁজে পাবেই পাবে যদি সরল ভাবে খুঁজতে পার। আমার কেবল মনে হয় খুব বেশি ঝোঁকের বশে কাজ করার সপক্ষে যত কথা বলা যায় বিপক্ষে তার চেয়ে বেশি কথা বল্‌বার থাকে। কেন না নিজেকে চেনার চেয়ে কঠিন কাজ সংসারে অল্পই আছে।"

(৫)

পল্লবের মনে মোহনলালের শেষ কথাগুলি একটা গভীর ছাপ এঁকে দিয়েছিল। সে স্থির কর্‌ল যে সে হঠাৎ একটা কিছু ক'রে বস্‌বে না, সময় নেবে। তাই সে পূর্ব্বের মতই ক্লাসে যেতে লাগল ও সাধ্যমত পড়াশুনো করার চেষ্টা কর্‌তে লাগল। কিন্তু তার শত চেষ্টা সত্ত্বেও তার মনে পরীক্ষার জন্য পড়া আর ভাল লাগছিল না। যদি এ পরীক্ষা পাশের ওপর তার জীবন মরণ নির্ভর কর্‌ত, তাহলে হয়ত তাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাঠ্যপুস্তকে মনোনিবেশ কর্‌তে হ'ত। কিন্তু সে জান্‌ত যে তার আন্তরিক কোনও ইচ্ছায় তার পিতা যে বাধা দেবেন না ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তার নড়চড় হবে না। তাই তার নীরস পাঠ্যপুস্তক তার কাছে ক্রমশঃই বিষবৎ প্রতীয়মান হ'তে লাগল। কিন্তু পরীক্ষা এ সব বোঝে না। সে আসে। কারণ আসাই তার ধর্ম্ম। পল্লব ভাবত যে এ পরীক্ষা দেওয়া বোধ হয় আর শেষ হবে না। তার প্রায়ই মনে হ'ত যে সেই জাপানী ছেলেটিই সুখী। কারণ সে ইচ্ছামত শিখ্‌তে পাচ্ছে, পরীক্ষার জন্য তাকে অহরহ ভাব্‌তে হচ্ছে না। শেখা—এই ত চাই। পরীক্ষা পাশ, তক্‌মা অর্জ্জন এ সব আবার কি? সঙ্গীত ও এঞ্জিনিয়ারিং, অনুরাগ ও কর্ত্তব্য, এই দোটানার মধ্যে পড়ে তার প্রাণটা প্রায়ই হাঁপিয়ে উঠত।

এরূপ মনের অবস্থা যে পরীক্ষা-পাশের অনুকূল নয় তা বোধ হয় বলাই বাহুল্য। পল্লব পরীক্ষায় পাশ হ'ল বটে, কিন্তু ভাল ফল লাভ করতে পার্‌ল না।

জীবনে এই তার প্রথম পরীক্ষায় মন্দ ফল লাভ। কাজেই সে এ আঘাতে ম্রিয়মান হ'য়ে পড়্‌ল। কুসুম ও মোহনলাল তাদের পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হ'ল। এ বৈষম্যে পল্লব আরও ক্ষুব্ধ হ'য়ে পড়্‌ল। মোহনলাল ও কুসুম তাকে যথাসাধ্য প্রবোধ দেবার চেষ্টা পেল যে পরীক্ষায় ভাল ফললাভ করাই জীবনের চরম লক্ষ্য নয়। কিন্তু পল্লব বুঝল যে সে নিজের কর্ত্তব্য করে নি। তার পিতা তাকে বলেছিলেন, যে কাজই করে যেন সে মন দিয়ে করে। পল্লব সঙ্গীত ও এঞ্জিনিয়ারিং এই দোটানার মধ্যে প'ড়ে কোনওটাই মন দিয়ে করে নি। এক একবার ক্ষোভের মাথায় সে স্থির ক'রে বস্‌ত যে, সে আর ইতস্ততঃ

কর্‌বে না, সব ছেড়ে কেম্ব্রিজে সঙ্গীতই অধ্যয়ন করবে। কিন্তু তখনি তার মনে মোহনলালের সাবধানবাক্য উদয় হ'য়ে তার যুক্তি ও বিচক্ষণতার দাবী-দাওয়াকে অন্তরায় ক'রে দাঁড় করাত। অর্থোপার্জ্জন সমস্যার কি হবে! উত্তরে পল্লব মনকে বোঝাত যে তার জন্য তার পিতা যে সংস্থান রেখে যাবেন, তাতে তার মোটা ভাত মোটা কাপড় চ'লে যাবে। কিন্তু আখেরে? একা থাক্‌লে না হয় দিন কোনও মতে কেটে যেতে পারে; কিন্তু মানুষ কিছু সমস্ত জীবন একা থাকে না। তাছাড়া সঙ্গীতকে পেশা করলে লোকে বল্‌বে কি? এর উত্তরে তার আদর্শবাদ তার কাণে কাণে বল্‌ত যে লোকের বলাবলি নিয়ে অত মাথা ঘামালে সংসারে কোনও সৎকর্ম্মই করা চলে না। কিন্তু মানুষের সবল মুহূর্ত্তে সে লোকমতকে ছোট ক'রে দেখলেও দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে বোঝে যে তার মনের উপর বাইরের পাঁচজনের মতামতের প্রভাব কতখানি। সে এ কথার মর্ম্মার্থ অবিরাম মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে যেন প্রত্যহই বেশি ক'রে উপলব্ধি করতে লাগল। তার মনে হ'তে লাগল যে যারা তার বিলাত থেকে বড় খেতাব ও চাকুরি-ভূষিত হয়ে দেশে ফেরার সম্বন্ধে নিঃসংশয়, তারা কি ভাববে! সে তার অন্যান্য সফলকাম বন্ধুদের পানে কেমন করে সমান সমান ভাবে তাকাবে! সব চেয়ে শক্ত কথা—যখন তার জ্ঞাত ও অজ্ঞাত অসংখ্য শুভার্থী ও শুভার্থিনীগণ এসে তার প্রিয়জনের নিরাশার সঙ্গে সহানুভূতি প্রকাশ করবে তখন সে বেদনায় সে-ই বা কোন্ মুখে তাঁদের সান্ত্বনা ও ভরসা দেবে! তাঁরা ত তার আদর্শবাদ প্রভৃতি বড় বড় কথা বুঝবেন না? তাঁরা যদি অবুঝ হ'য়ে তার মহৎ প্রণোদনার গরিমা সম্বন্ধে সচেতন না হ'তে পেরে পূর্ব্বোক্ত দরদীদের আক্ষেপ সান্ত্বনা শুনে মাথা হেঁট করেন, তবে সে তাঁদের হেঁট মাথা কেমন ক'রে সোজা ক'রে তুলে ধ'রবে?

মনের এরূপ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় সে এক দিন বিকেলে চা খাওয়ার নিমন্ত্রণে মিসেস নর্টনের বাড়ীতে গেল। সেদিন জন ছিল না।

দরজার ঘণ্টা বাজাতেই রিণা ছুটে এসে দুয়ার খুলে তার গলা ধ'রে ঝুলতে ঝুলতে তাকে অনুযোগ জানাল যে সে অনেকদিন তাদের বাড়ী আসে নি।

পল্লবও অনুযোগের সুরে বল্‌ল, "তুমিই বা আস নি কেন রিণা? আমি ত ঠিক্ তোমার পাশের ঘরেই থাকি ও পিয়ানো বাজাই। তুমি নিশ্চয়ই তা শুনে বুঝতে পারতে যে আমি বাড়ীতেই আছি। তবু কেন আজকাল আর আগের মতন আমার কাছে আস্‌তে না বা চকলেট্ নিয়ে যেতে না?"

রিণা তার লাল টুকটুকে ঠোঁট দুখানি ফুলিয়ে বল্‌ল, "আমি যেতাম না বৈকি! মা-ই ত আমাকে যেতে দিত না, বল্‌ত 'মিষ্টার বাক্‌চির পরীক্ষা কাছে তাঁকে এখন বিরক্ত কোরো না রিণি'!"

পল্লব সহানুভূতির সুরে বল্‌ল "বটে?"

রিণা পল্লবের হাত ধ'রে তাকে বস্‌বার ঘরে একটা আরাম কেদারায় বসিয়ে তার কোলের ওপর বসে বল্‌ল "শুধু তাই! মা কত কি বল্‌ত। মা বল্‌ত 'মিষ্টার বাক্‌চি তোমার মতন দুষ্টু নন যে পড়াশুনো করেন না!' মিষ্টার বাক্‌চি, বলুন ত, এরকম বলা মার অন্যায় নয়? আমি কি দুষ্টু মেয়ে?"

পল্লব আদর ক'রে রিণার গালদুটি টিপে দিয়ে কৃত্রিম কোপে বল্‌ল, "কে বলে? এমন কথা যে বলে তাকে আমি দেখা হ'লে খুব একচোট শাসন ক'রে দেব 'অখন। আমি ত তোমার মতন লক্ষ্মী মেয়ে ত্রিভুবনে দেখতে পাই না।"

রিণার মা চা নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর সঙ্গে পল্লবের আলাপ প্রথমে রিণার সূত্রে হ'লেও ক্রমে পল্লব মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে গল্পালাপ করবার জন্যই আস্‌ত। জনের কাছে মিসেস নর্টনের শতমুখে সুখ্যাতি শুনে পল্লবের মনে তাঁর প্রতি যে শ্রদ্ধার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল, তাঁর সঙ্গে আলাপে সে বীজ সহজেই বিকশিত ও মঞ্জরিত হ'য়ে উঠেছিল।

পল্লবের মিসেস নর্টনকে প্রথম দিনই ভাল লেগেছিল। কারণ তিনি যে শুধু সুন্দরী ছিলেন তাই নয়, তাঁর মুখের মধ্যে এমন একটা শুভ্র পবিত্রতার ও অন্যমনস্ক বৈরাগ্যের ছায়া বিরাজমান ছিল যেটা পল্লবের মনে কেমন যেন এক গভীর তৃপ্তির অবলেপ এনে দিত। দেশে তার দুই একজন বিধবা আত্মীয়ার মুখের পবিত্রতা ও প্রশান্তির আভাষ তার মনে বরাবরই একটা গভীর পরিতৃপ্তির আস্বাদ এনে দিত। মিসেস নর্টনের আননে সে অনেকটা সেই রকম জ্যোতিঃ

দেখ্‌তে পেত ব'লেই তার তাঁকে প্রথম দিন থেকেই এতটা ভাল লেগে গিয়েছিল। মিসেস নর্টনের সঙ্গে তার যতই পরিচয় হ'তে লাগ্‌ল তার এ শ্রদ্ধাও ততই গভীর হয়ে উঠ্‌ছিল। পল্লবের কাছে জননীর অসংখ্য গুণাবলী ও মহত্ত্বের কথা বল্‌তে বল্‌তে জনের চোখ দুটি প্রায়ই উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ত। পল্লব তার কাছে মিসেস নর্টনের সম্বন্ধে যে সব কথা শুন্‌ত তাতে তার প্রায়ই মনে হ'ত যে সে এ যাবৎ ইংরাজ মেয়েদের ওপর গভীর অবিচার করে এসেছে। মিসেস নর্টন শুধু উচ্চবংশীয়া নন তার উপর ধনী পিতার একমাত্র সন্তান। কিন্তু যথেষ্ট সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হওয়া সত্ত্বেও তিনি আভিজাত্যের মধ্যে বিবাহ করেন নি। তাঁর পিতামাতার ইচ্ছা সত্ত্বেও ও অনেকগুলি ধনী-সন্তানের তাঁর পাণিপ্রার্থী হওয়া সত্ত্বেও তিনি মিষ্টার নর্টনকে বিবাহ করেন শুদ্ধ প্রেমের জন্য—কারণ মিষ্টার নর্টন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ মাত্র ছিলেন। তাঁর বিবাহিত জীবন সুখময়ই হয়েছিল। তিনি স্বামীকে এত প্রাণ ঢেলে ভালবেসেছিলেন যে, যুদ্ধে তাঁর মৃত্যুর পরে পিতামাতার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও আর বিবাহ করতে রাজি হন নি ও দু'বৎসরের মধ্যেই দু'তিন জন করপ্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বরাবর ম্লান হেসে বল্‌তেন যে, বিবাহ মানুষের একবারই হ'তে পারে।

কিন্তু বিলাতী সমাজে ধনী সুন্দরী মধ্যবয়স্কা বিধবার "না" বলাকে কেউ বিশ্বাস করে না। তাই মিসেস নর্টন সামাজিক নিমন্ত্রণে প্রভৃতিতে গেলে তাঁর হতে-পারে এরূপ অনেক স্বামীই তাঁকে মনোযোগ, সানুরোধ দৃষ্টি, সাড়ম্বর ভদ্রতা প্রভৃতি দ্বারা নিরন্তর উত্ত্যক্ত করে তুল্‌ত। যতই দিন যেতে লাগ্‌ল তাঁর প্রতি পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায়ের সানুরাগ দৃষ্টি ততই স্নেহ-সজল হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। শেষটা এমন হ'য়ে দাঁড়াল যে মিসেস নর্টনকে বাধ্য হ'য়ে লণ্ডনের সামাজিক ও ফ্যাশনেবল্ জীবনের সব মায়ামমতা ছেড়ে পুত্র কন্যাকে নিয়ে কেম্ব্রিজে বাস কর্ত্তে আস্‌তে হ'ল। বাধ্য হ'য়ে সামাজিক জীবনের সঙ্গে শেষ বন্ধনটিও ছিন্ন ক'রে চ'লে আসার পর থেকে এই সন্তান দুটিই বিয়োগবিধুরা পতিব্রতা বিধবার যেন একমাত্র সম্বল হ'য়ে দাঁড়াল। তখন থেকে তাদের শিক্ষা দেওয়া, পড়াশুনা, গৃহকর্ম ও ধর্ম্মচিন্তার মধ্যেই মিসেস নর্টন আপনাকে একান্ত ভাবে মগ্ন ক'রে রেখেছিলেন।

মিসেস নর্টন স্বভাবতঃই উদারপন্থী ছিলেন। তাই তিনি পল্লবকে ভারতীয় ব'লে দূরে রাখবার চেষ্টা করতেন না। বরং তার সঙ্গে বেশি সাদর ব্যবহার করতেন—নইলে পাছে সে ইংরাজ-রমণীর স্বভাবতঃ দূর ব্যবহারকে জাত্যভিমান ভেবে আহত হয়। তাছাড়া তিনি চাইতেন যে তাঁর সন্তানদ্বয় বাল্যকাল থেকেই নানাজাতীয় লোকের সঙ্গে মেশে। কারণ তিনি প্রায়ই বল্‌তেন যে মানুষের জাতীয় অভিমান, সভ্যতার গর্ব্ব প্রভৃতির মূল হচ্ছে বাল্যের কুশিক্ষা। তাই (তিনি বল্‌তেন) এ অভিমানের মূলে কুঠারাঘাত কর্ত্তে পারলেই ভাল, এবং শৈশবে নানা-জাতীয় লোকের সংস্পর্শে এলে এ উদ্দেশ্য যেমন সহজে সিদ্ধ হয় তেমন আর কিছুতে হয় না। তাঁর সদা-সংযত ব্যবহার, গম্ভীর অথচ প্রফুল্ল আনন, ভদ্র অথচ আন্তরিক আতিথেয়তা, কথাবার্ত্তায় চিন্তাশীলতা ও সর্ব্বোপরি মৃত স্বামীর প্রতি একান্ত নিষ্ঠার কাহিনী—পল্লবের মনে একটা গভীর ছাপ অঙ্কিত করেছিল। দেশে বায়স্কোপ প্রভৃতি দেখে, দুচারটে বাজে উপন্যাস প'ড়ে ও তার বিলাত-প্রত্যাগত দু' চারজন বিজ্ঞন্মন্য আত্মীয়ের অসার মতবাদ শুনে শুনে পল্লবের মনে দৃঢ় ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে, মেমসাহেবরা সবই বিলাসিনী, হাব-ভাবপরায়ণা ও উচ্ছৃঙ্খল। তার মনটি পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায়ের নীতিবাগীশ-দের উদ্দীপ্ত নিন্দায় সায় দিয়ে গম্ভীর ভাবে শিরঃসঞ্চালন করে বল্‌ত যে যারা যার-তার সঙ্গে গল্প করে, মেশে, হাসে, নাচে, গায় তাদের মধ্যে আবার সতীত্ব?—অসম্ভব। কিন্তু মাত্র মিসেস নর্টনের সঙ্গে পরিচিত হওয়া অবধি তার কেবলই মনে হ'ত যে তার সে সব ধারণা কি অসার ছিল! তরুণ বয়সে মানুষ অল্প অভিজ্ঞতায় ও অনেক সময়ে দু একটি মাত্র দৃষ্টান্ত থেকে নির্ভয়ে ভাল মন্দ দুই বিষয়েই সাধারণ মতামত প্রচার কর্ত্তে ভালবাসে। দেশে তার এক প্রবীণ পিতৃবন্ধু বলেছিলেন যে মেয়েরা সব—। মিসেস নর্টনের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করার পর সে অকথ্য কথা মনে আন্‌তেও পল্লবের কুণ্ঠার সীমা থাক্‌ত না। এবং এ অন্যায় কুৎসার প্রতিক্রিয়ায় তার মধ্যে আজকাল প্রায়ই বিলাতী মেয়েদের সদ্‌গুণাবলীকে একটু

বেশি বড় ক'রে দেখত। আর তার বিলাতী সমাজের সঙ্গে পরিচয় সামান্য ও নিতান্ত অগভীর হ'লেও এ অল্প অভিজ্ঞতায়ই তার মনে একটা কথা বড় বেশী ক'রে আঘাত দিত। সেটা এই যে য়ুরোপ সম্বন্ধে যারা কিছুই জানে না, শিষ্ট য়ুরোপীয়দের সঙ্গে যারা জীবনে কখনও মেশবার সুযোগ পায় নি, এমন কি য়ুরোপের সভ্যতা ও সমাজ সম্বন্ধে যাদের ধারণার মূল—মাত্র তাদের কূপমণ্ডুকতা;—তারাই কি না য়ুরোপের শুধু চালচলন নয়, নৈতিক অবস্থা প্রভৃতি গুরুতর বিষয়েও অবলীলাক্রমে মতামত প্রকাশ কর্‌তে তৎপর হ'য়ে ওঠে।—আর তা এমন নিশ্চয়তার সঙ্গে যেন তাদের বাণী বেদের চেয়েও অপৌরুষেয়! কার্য্য কারণ সম্বন্ধের চেয়েও অবশ্যম্ভাবী!! গণিতের স্বতঃসিদ্ধ সূত্রের চেয়েও অকাট্য!!!

মিসেস নর্টনের মতন সুযোগ, সুবিধা—এমন কি শত প্রলোভন ও অনুরোধ সত্ত্বেও যে নারী পুনর্ব্বিবাহ না ক'রে স্বামীর স্মৃতি-ধ্যান ক'রে জীবন কাটাতে কৃতসঙ্কল্প হয়, সে-ই বড় সতী, না জোর ক'রে যাদের আমরা ধরে বন্ধ ক'রে অনাহারে শুকিয়ে দেবী ক'রে রাখি তারাই বড় সাধ্বী, এ প্রশ্ন পল্লবের মনে ক্রমেই বেশি ক'রে উদয় হ'ত। এ সম্বন্ধে মোহনলালের একটি কথা তার প্রায়ই মনে হ'ত। বিধবা-বিবাহের বিপক্ষে কুঙ্কুমের দু একটি প্রবল মতামতের উত্তরে এক দিন মোহনলাল বলেছিল যে, যে দেশে লোকমত বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে, সে দেশে বিধবার পক্ষে পুনর্ব্বিবাহে ঘৃণা খুব গভীর ত হ'তে পারেই না, বরং সে সুযোগ উপস্থিত হ'লে তার বিবাহ না করাটাই অভাবনীয় হ'য়ে ওঠে। পল্লবের মনে হ'ত 'ঠিক্ কথা'। সঙ্গে সঙ্গে তার আরও মনে হ'ত যে এরূপ ক্ষেত্রে বিবাহ না করাটা ঠিক্ অভাবনীয় ব'লেই মহিমময়। কারণ সাধারণ মানুষ সমসাময়িক আচার ও নীতির মাপকাটি দিয়েই পনর আনা কাজের ও প্রবৃত্তির উচিতানুচিত বিচার করে। কাজেই যেখানে বিধবা-বিবাহ প্রশস্ত সেখানে পূর্ব্ব স্বামীর স্মৃতির প্রতি নিষ্ঠা বজায় রাখা অনেক বেশি কঠিন না হ'য়েই পারে না। সঙ্গে সঙ্গে মিসেস নর্টনের পবিত্র মুখকান্তি, গভীর পাতিব্রত্য, সহৃদয় ব্যবহার প্রভৃতি মনে করে তার কোমল আদর্শপন্থী মনটি প্রায়ই ভ'রে উঠত।

"রিণা যে একাই বেশ আসর সরগরম ক'রে রেখেছে দেখছি মিষ্টার বাক্‌চি। আপনিও বোধহয় বেশ থাকেন ছেলেপিলেদের সঙ্গে, না?"

পল্লব বল্‌ল, "সব ছেলেপিলেদের সঙ্গে বেশ থাকি এমন কথা বল্‌লে সত্যের অপলাপ করা হবে মিসেস নর্টন।"

"কিন্তু আমার ত মনে হয়, আপনি ছোট ছেলেপিলে-দের খুব ভালবাসেন।"

"বাসি বটে—কিন্তু সকলকে নয়। শিশু মাত্রকেই নির্ব্বিশেষে ভালবাসতে পেরেছিলেন বোধ হয় জগতে একজন মাত্র। তিনি যীশুখৃষ্ট। আমি ভালবাসি—সুন্দর ও মিশুক ছেলেপিলেদের। কারণ আমার মনে হয় যে, সব শিশুর স্বভাব মিষ্ট হয় না, বা সকলের সঙ্গে ইচ্ছে কর্‌লেই ভাব করাও যায় না। তাছাড়া—তাছাড়া"—

ব'লে একটু থেমে পল্লব হঠাৎ একটি ছোট্ট দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের সঙ্গে বলে বস্‌ল "তাছাড়া সকলের পিতামাতা সেটা পছন্দও করে না।" ব'লেই সে একটু কুণ্ঠিত হ'য়ে পড়ল; কারণ একটা নিরুদ্ধ ব্যথাই তার শেষ কথা কয়টির মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে ফেলেছিল। পরীক্ষায় ভাল করে পাশ না করার দরুণ আজকাল তার মনটা প্রায়ই একটু বেশি রকম সমবেদনার জন্য লালায়িত হয়ে থাক্‌ত। নইলে হয়ত সে আজ হঠাৎ এমন অতর্কিত ভাবে তার এক নিহিত ব্যথার প্রসঙ্গ ওঠাতে পার্‌ত না। মিসেস নর্টন একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্‌লেন, "সে কি মিষ্টার বাক্‌চি! সন্তানকে আদর করলে কি কখনও কোন পিতামাতা অসন্তুষ্ট হ'তে পারে?"

পল্লব বল্‌ল, "আমিও এক সময়ে তাই ভাবতাম মিসেস নর্টন। ভিক্টর হিউগোর একটা বিখ্যাত বইয়ে একবার প'ড়েছিলাম যে, বাপমা যতই কেন না কঠিন হোক্, কেউ তাদের সন্তানকে সুন্দর বল্‌লে তার প্রতি তাদের হৃদয় আর্দ্র না হ'য়েই পারে না। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা অন্যরূপ।"

রিণা হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বল্‌ল, "মা ঐ আইরিণ ডাক্‌ছে। আমি একবার বাইরে যাই?"

মিসেস নর্টন বললেন "আচ্ছা যাও, কিন্তু যদি এক ফোঁটাও বৃষ্টি পড়ে, তাহ'লে খেলা ছেড়ে তক্ষনি বাগান থেকে চলে আস্‌তে হবে মনে রেখো।"

রিণা "আচ্ছা" বলে বেরিয়ে গেল।

রিণা বাইরে চলে গেলে মিসেস নর্টন পল্লবকে চা দিয়ে বললেন "আপনার এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা কি রকম বলুন না মিষ্টার বাক্‌চি—অবশ্য যদি বলতে বাধা না থাকে।" ব'লেই তাঁর মনে হ'ল হয়ত এ কথাটা জিজ্ঞাসা না করলেই ছিল ভাল। কারণ তিনি প্রশ্নটি ক'রেই তাঁর নারীসুলভ সহজ-অনুভূতির সাহায্যে বুঝতে পেরেছিলেন যে, এ বিষয়ে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে হয়ত পল্লবের এক ব্যথার তারে ঘা পড়বে। তাই তিনি আবার তাড়াতাড়ি বল্‌লেন, "কিন্তু যদি বাধা থাকে তাহ'লে আমি আপনাকে বল্‌তে বল্‌ছি না—"

পল্লব বাধা দিয়ে বল্‌ল, "না মিসেস নর্টন, বাধা আর কি? বিশেষতঃ আপনাকে বল্‌বার আবার বাধা কি থাক্‌তে পারে?"

এই "আপনাকে" কথাটির ওপর সে সহসা একটু বেশি জোর দিয়ে ফেল্‌ল। মিসেস নর্টন যে অতর্কিতে তার ব্যথার স্মৃতি জান্‌তে চাইবার দরুণই এ সঙ্কোচ বোধ কর্‌ছিলেন সে কথা পল্লব টের পেয়েছিল। অপরের ব্যথার প্রতি মিসেস নর্টনের এরূপ সদা-সচেতন দরদ পল্লবের বরাবরই বড় ভাল লাগ্‌ত।

অবশ্য সে অনেক সময়েই এরকম ছোট খাট ব্যাপারের মধ্য দিয়ে তাঁর কোমল নারীহৃদয়ের মনোজ্ঞ সৌকুমার্য্যের পরিচয় পেত। কিন্তু আজ তাঁর এ সহজ সমবেদনাকে সে হঠাৎ একটু বেশি বড় ক'রে না দেখেই পার্‌ল না। তার একটু বিশেষ কারণও ছিল। পরীক্ষার ফল মন্দ হওয়া অবধি তার মনটা প্রায়ই বিষণ্ণ থাক্‌ত। এরূপ সময়ে নারীহৃদয়ের সামান্য সহানুভূতিও মানুষের মনের উপর কম সান্ত্বনার স্নিগ্ধতা এনে দেয় না। তাই আজ মিসেস নর্টনের এ সামান্য সুকুমার গুণের দৃষ্টান্তটিও তার কাছে বড় হ'য়ে না উঠেই পারে নি। ফলে সে "আপনাকে বল্‌বার বাধা কি থাক্‌তে পারে" প্রশ্নটি কর্‌বার সময়ে "আপনাকে" কথাটির ওপর অজ্ঞাতে একটু বেশি জোর দিয়ে বস্‌ল।

মিসেস নর্টন নিজেকে পল্লবের এ আবেগের লক্ষ্য বুঝে সহসা একটু আরক্তিম হয়ে উঠ্‌লেন। কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ জোর ক'রে সহজ সুরেই বল্‌লেন "তবে বলুন না মিষ্টার বাক্‌চি। কিন্তু তার আগে আপনি আর চা বা কেক চান কি না বলুন।"

পল্লব বল্‌ল "ধন্যবাদ। যদি আর একটু চা দেন ত বেশ হয়।" তার আর চা নেওয়ার ইচ্ছা ছিল না, তবে কথাবার্ত্তাকে একটু সহজ করে তোলার জন্যই সে এ কয়টি সাদা কথা ব'লে একটু স্বস্তির আস্বাদ পেতে চাইল।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে পল্লব বল্‌তে লাগ্‌ল—তখন সে জাহাজে করে দেশ ছেড়ে বিলেতে আস্‌ছে। তার দুর্ভাগ্যক্রমে সে জাহাজে একজনও ভারতীয় আরোহী ছিল না। জাহাজের ইঙ্গ-ভারতীয় আরোহিগণ তাকে শতহস্ত দূরে রাখ্‌ত। এমন কি জাহাজের টেবিলেও তার আশে পাশের সাহেব মেমরা তার সঙ্গে কথা কইত না। একজন মাত্র মোটা ও বেঁটে বড় সাহেব ছিলেন। তাঁর যেন জীবনের ব্রত ছিল—পল্লবকে সর্ব্বদা বিলাতী আদবকায়দা ও ভদ্র ব্যবহার সম্বন্ধে অশ্রান্ত ভাবে উপদেশ দেওয়া। পল্লব এই নিঃসঙ্গ অবস্থায় মাসখানেক ভারি কষ্ট পেয়েছিল। তার আত্মীয়-স্বজন-বিচ্ছেদ-বিধুর মনটি তখন অভূতপূর্ব্ব রকমে একটি মিষ্ট কথার ও একটু মিষ্ট ব্যবহারের কাঙাল হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু তাকে সে সান্ত্বনাটুকুও দেবার কোনও লোক ছিল না। জাহাজে বিজলীবাতির কাজে একটি দরিদ্র বাঙালী ছেলে নিযুক্ত ছিল। পল্লবের সামুদ্রিক পীড়ায় মুহ্যমান অবস্থায় কেবল সেই ছেলেটি এক আধবার তার খোঁজ নিত। হঠাৎ আত্মীয়-স্বজন-প্রিয়পরিজনের স্নেহক্রোড় হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে তার কাতর মনটি যখন এ নিঃসঙ্গতার মাঝখানে একান্ত ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছিল, তখন যেন বিধাতা কৃপাপরবশ হয়েই দুটি ছোট্ট ইংরাজ শিশুকে তার বেদনা দূর করতে পাঠিয়ে দিলেন। পল্লবের ব্যথাতুর মনটির কাছে এ শিশু দুটির সঙ্গ যেন অমৃতময় বোধ হ'তে লাগ্‌ল। এ দুটি ভাইবোন প্রায়ই তার কোলে চড়ে অনর্গল তার সঙ্গে গল্প ক'রে যেত। দেশে তাদের কটা চাকর আছে, কত খেলনা আছে, কয়টি কুকুর আছে—ইত্যাদি গুরুতর তথ্য পল্লবকে জ্ঞাপন করা ছিল তাদের নিত্যকর্ম্ম। পল্লবের স্নেহ-তৃষ্ণার্ত্ত মনটির ওপর এই শিশুদ্বয়ের বিশ্রম্ভালাপ যেন সুধাবর্ষণ করত। পল্লবও তাদের খুব গল্প বল্‌ত। ফলে তাদের সঙ্গে তার খুব শীঘ্রই ভাব হয়ে গেল। পল্লব প্রায় রোজ রাত্রে দেশের স্বপ্ন দেখ্‌ত, এবং রোজ সকালে নিদ্রাভঙ্গ হবামাত্র তার আক্ষেপ হ'ত যে স্বপ্ন সত্য হয় না। সঙ্গে সঙ্গে তার

শৈশবের দোলার দুরত্বের কথা মনে ক'রে তার মনটি ব্যথা ভারে অবনত হয়ে পড়্‌ত। কিন্তু তার এই শিশু বন্ধুযুগল লাভ করার পর থেকে সত্যই তার এই নবলব্ধ বন্ধুত্বের তৃপ্তির মধ্য দিয়ে তার সে প্রাত্যহিক সকালবেলার ব্যথার অনেকটা উপশম মিল্‌ত।

বস্তুতঃ সমস্ত দিনের মধ্যে কয়েকঘণ্টা তাদের সঙ্গে খেলাগল্প করাই ছিল পল্লবের সমুদ্র-জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা। এমন সময়ে এক দিন সকালে পল্লব তাদের ডাক্‌তেই তারা ব'লে উঠ্‌ল যে, তারা আর তার কাছে যাবে না। ব্যথিত হ'য়ে 'কেন' জিজ্ঞাসা করাতে ছোট মেয়েটি বল্‌ল যে তাদের মা কাল রাত্রে তাদের বলেছে যে নেটিভের কাছে তাদের যাওয়া চল্‌বে না। এ কথা বল্‌তে বল্‌তে ব্যথায় পল্লবের অন্যমনস্ক চোখে দুই বিন্দু অশ্রু টল-মল কর্‌তে লাগ্‌ল।

মিসেস নর্টনের চোখ দুটিও এ কাহিনী শুন্‌তে শুন্‌তে জলে ভরে উঠেছিল। এতক্ষণ পল্লব সেটা লক্ষ্য করে নি; কারণ সে মাটির দিকে চোখ নীচু করে যেন আপন মনেই এ কাহিনী নিজের কাছে আবৃত্তি করে যাচ্ছিল। তার বলা শেষ হ'লে হঠাৎ তার ও মিসেস নর্টনের চক্ষু মিলিত হ'ল। মিসেস নর্টন লজ্জিত হয়ে মুখ ফিরিয়ে তাঁর অশ্রুভার গোপনে তাঁর রেশমী রুমালে মুছে অস্ফুট স্বরে বল্‌লেন "তারা মানুষ নয় বোধ হয়।"

পল্লব বিদেশীর কাছে আজ অবধি কখনও এত মন খুলে কথা কয় নি। তাই সে হঠাৎ এতটা নিঃসঙ্কোচে মিসেস নর্টনের কাছে নিজের গোপন ব্যথার কথা বলে ফেলার জন্য একটু কুণ্ঠিত বোধ না ক'রেই পার্‌ল না, যদিও সঙ্গে সঙ্গে যে সে একটা পরম তৃপ্তির আস্বাদও পায় নি তা নয়। যাই হোক্ সে তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গান্তরের অবতারণা করার জন্য বল্‌ল—"দেখুন ত কোথা থেকে আমরা কি কথা এনে ফেলি! আশ্চর্য্য! যাক্ একথা। আমি আজ আপনাকে একটা পরামর্শ জিজ্ঞাসা কর্‌তে এসেছি।"

মিসেস নর্টনও একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে জিজ্ঞাসু নেত্রে পল্লবের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন "বলুন।" ব'লেই একটু হেসে বল্‌লেন—"যদিও আমি যে কি বিষয়ে আপনার পরামর্শদাত্রী হ'তে পারি তা ভেবেই পাচ্ছি না।"

পল্লব তার সঙ্গীতানুরাগ, বিলাতে সঙ্গীত শেখার ইচ্ছা, বন্ধুবান্ধবদের এ সম্বন্ধে উপদেশ এ সবই খুলে বল্‌ল।

মিসেস নর্টন ধীরভাবে সব কথাগুলি শুনে বল্‌লেন "আমি আপনার দ্বিধা সঙ্কোচ বোধ হয় অনেকটা বুঝতে পারছি। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে আমাদের মতন অনভিজ্ঞা নারীর পক্ষে আপনাকে পরামর্শ দিতে যাওয়া কি ঠিক?—বিশেষতঃ যখন আমি আপনাদের দেশের ও সমাজের অবস্থা সম্বন্ধে কিছুই জানি না বল্‌লেও চলে। তা আপনি এক কাজ করুন না কেন? আমার একটি আত্মীয় সাউথেণ্ডে থাকেন। সমুদ্রের ধারে তিনি একটি চমৎকার বাড়ী কিনে আছেন। তিনি লণ্ডনের একটা ব্যাঙ্কে কাজ করেন ও খুব উচ্চশিক্ষিত লোক। তাঁর সঙ্গে আপনি আলাপ করুন না কেন? তিনি জগতের অনেক দেখেছেন শুনেছেন ও শুধু তাই নয়, তিনি একজন সত্যই অসাধারণ চরিত্রের মানুষ। এমন উদার অথচ তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বিদ্বান্ অথচ নিরহঙ্কার, খাঁটি ইংরাজ অথচ অভিমানবর্জ্জিত লোক আমি কমই দেখেছি। তিনি সম্ভবতঃ আপনাকে ভাল পরামর্শ দিতে পারবেন। আপনি যদি তাঁর বাড়ীতে গিয়ে কিছুদিন থাক্‌তে রাজি থাকেন তা'হলে আমি চিঠি লিখে তাঁর নিমন্ত্রণ আপনাকে আনিয়ে দিতে পারি।"

পল্লব ভাব্‌ল, মন্দ কি? তাছাড়া মোহনলাল তাকে একবার বলেছিল যে, ভারতবর্ষে যাই হোক্ না কেন, ইংলণ্ডে নিজের বাড়ীতে ইংরাজের মতন ভদ্রলোক্ জগতে দুর্লভ। পল্লব ভাব্‌ল একবার পরখ করে দেখাই যাক্ না কেন।

পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে সব বন্দোবস্ত হয়ে গেল। পল্লব কেম্ব্রিজ থেকে সাউথেণ্ডে যাত্রা করল। রিণা ও মিসেস নর্টন পল্লবের সঙ্গে ষ্টেশনে গেল। তাকে গাড়ীতে তুলে দেবার সময়ে রিণা বল্‌ল "মিষ্টার বাক্‌চি! সাউথেণ্ড থেকে ফেরবার সময়ে কিন্তু আমার জন্য একটা লাল ডল আনা চাই। নইলে আপনার সঙ্গে আমার আড়ি হবে।"

পল্লব চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে বল্‌ল "বাপ্‌রে! তাহ'লে কি ডল না এনে পারি?"

মিসেস নর্টন ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে বল্‌লেন, "না না মিষ্টার বাক্‌চি, ডল টল কিছু আন্‌তে হবে না। রিণাকে কোনও

মতে কথা শোনাতে পারছি না, কি করি বলুন ত? বল্‌লে শোনে না। সকলকে বিরক্ত ক'রে মারে। ডল ওর ঢের আছে।"

রিণা কাঁদ কাঁদ স্বরে উত্তর দিল "ডল ত আছে। কিন্তু লাল ডল কি আছে? আইরিণের দাদা তাকে কেমন লাল টুকটুকে ডল কিনে এনে দিয়েছে। আর আমি লাল ডল চাইলেই যত দোষ! বা রে!"

পল্লব তাকে কোলে তুলে নিয়ে বলল "ঠিক কথা রিণা। লাল ডল না হ'লে কখনও সংসারে চলে! তোমার কোনও দোষ নেই। সব দোষ তোমার মার। আমি নিশ্চয়ই তোমার জন্যে লাল ডল আন্‌ব।"

এমন সময়ে গার্ড চেঁচিয়ে বলল "সব আরোহী প্রস্তুত হোন্‌।"

মিসেস নর্টন বললেন "মিষ্টার বাক্‌চি। আদর রেখে উঠুন এখন। রিণার ডলের সমস্যা নিষ্পত্তির জন্য ত গাড়ী অপেক্ষা করবে না।"

পল্লব গাড়ীতে উঠে মিসেস নর্টনের সঙ্গে হস্তমর্দ্দন করে রিণার গালে একটি চুমা দিয়ে বল্‌ল "গুড বাই রিণা।"

উত্তরে রিণা তার গলা জড়িয়ে ধ'রে তাকে দুটি চুমা দিয়ে বল্‌ল "গুডবাই মিষ্টার বাক্‌চি। না—না আইরিণ বলেছিল অ-রিভোয়ার বল্‌তে হয়। না মা?"

মিসেস নর্টন হেসে বল্‌লেন, "হাঁ।"

গাড়ী ছাড়্‌ল। পল্লব গাড়ীর জান্‌লা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রুমাল নাড়তে লাগ্‌ল। মিসেস নর্টনও রুমাল নাড়তে লাগ্‌লেন। রিণা মহা ব্যস্ত হ'য়ে তার ছোট্ট পকেটে হাত দিয়ে রুমাল খুঁজে না পেয়ে মহা উদ্বিগ্ন হ'য়ে মাকে জিজ্ঞাসা করল,

"মা, আমার রুমাল?"

মিসেস নর্টন বল্‌লেন, "রুমাল এখন থাক্‌। তুমি শীগ্‌গির হাত নাড় রিণি। ঐ দেখ মিষ্টার বাক্‌চি তোমার দিকে চেয়ে কি বল্‌ছেন।"

পল্লব সস্মিতমুখে বল্‌ছিল, "লাল ডল—কেমন?"—

রিণা রুমালের শোক এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে সজোরে হাত নাড়তে নাড়তে বল্‌ল, "হাঁ—লাল ডল—খুব্‌ বড় ..."

ধীরে ধীরে রিণার উদ্ভাসিত মুখ ও মিসেস নর্টনের স্নেহকোমল আনন সন্ধ্যার ম্লানিমায় অস্পষ্ট হয়ে এল। ক্রমে দূরে কেবল মিসেস নর্টনের সাদা রুমালখানি দেখা যাচ্ছিল। ক্রমে তাও অদৃশ্য হ'ল। দূর বিদেশে এই দুই শুভাকাঙ্ক্ষিণীর সস্নেহ বিদায় সম্ভাষণে পল্লব তার মনের মধ্যে কেমন যেন এক স্নিগ্ধ মলয়-পরশের পুলক-শিহরণ অনুভব করল। কারণ বিদেশীর মধ্যে বন্ধু লাভ তার এই প্রথম। তাই এ অভিনব অভিজ্ঞতার সুষমা তার কাছে এক অপূর্ব্ব রহস্যরসে সিঞ্চিত হ'য়ে ধরা না দিয়েই পারে নি।

ষ্টেশনে নানান্‌ লোকে ট্রেণের নানান্‌ আরোহী আত্মীয় বন্ধুর উদ্দেশে রুমাল হাত বা টুপি নাড়ছিল। পল্লব ইতিপূর্ব্বে বিলাতে ট্রেণে ভ্রমণ করবার সময়ে অনেক সময় এরূপ বিদায়-সম্ভাষণের জন্য একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা বোধ করত। আজ তার সর্ব্বপ্রথম সে কামনা পূর্ণ হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে একটা সগর্ব্ব আনন্দের উদয় হ'ল যে এ দূরদেশে বিদেশীর মধ্যেও তাকে এমন আত্মীয়ের মতন বিদায়-সম্ভাষণ দেবার লোক আছে। তা ছাড়া আজ তার কেমন যেন বার বার এই কথা মনে ক'রে একটা অনির্দ্দেশ্য তৃপ্তির রসে সমগ্র মনটা কাণায় কাণায় ভ'রে উঠ্‌ল যে যাদের প্রীতির ডালি আজ তার হৃদয়ের দুয়ারে এতটা সত্যকার অমৃত পরশ বহন করে এনে দিয়েছে দুদিন আগে তাদের অস্তিত্বও যে তার অগোচর ছিল! এ একটা কি সুদূর মধুর অনুভূতি!...পরকে আপন করার মধ্যে যে সার্থকতা-রস আছে, তার পরশ সব নবলব্ধ বন্ধুত্বের অভিজ্ঞতার মধ্যেই বিরাজ করে বটে,—কিন্তু এ লাভের ক্ষেত্রে বিদেশী, ভিন্নধর্ম্মীও যে এত সহজে নিকটে আস্‌তে পারে, এ অনুভূতির নূতনত্ব আজ পল্লবের কাছে সর্ব্বপ্রথম এক অপূর্ব্ব রসসম্পদে মহিমোজ্জ্বল হ'য়ে ধরা দিল...সঙ্গে সঙ্গে তার এ নবলব্ধ বান্ধবীদ্বয়ের অকৃত্রিম ও অহেতুক স্নেহশুভেচ্ছার কথা ভেবে তার হৃদয়টি কৃতজ্ঞতারসে আপ্লুত হ'য়ে উঠ্‌ল। (ক্রমশঃ)

উড়ো-চিঠি

শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সুকুমার বিদ্বান এবং প্রিয়দর্শন যুবক হইলেও তাহার "স্ত্রী-ভাগ্য" যে তেমন সুবিধার ছিল না, এ কথাটা লইয়া অনেক সময়ে বন্ধু-মহলে প্রথম প্রথম বেশ একটু সমালোচনা চলিত। তাহার বন্ধুরা যখন তামাসা করিয়া বলিত--"কিন্তু যা বল সুকুমার, তোমার স্ত্রীর রংটা ভাই একটুও ফরসা নয়, ওকে 'অমলা' বলা চলেই না।" সুকুমার হাসিয়া কহিত, "ওহে, মানুষের চামড়ার বর্ণটা যেমনই হোক্ না, তার কোন মূল্য নেই···রূপ দেখতে হবে অন্তরের, সেইখানেই ঢালা আছে পাকা খাঁটি রং...মানুষের আসল রূপ!" জবাব শুনিয়া বন্ধুরা হাসিত।

কিন্তু, অতীত কথা পুরাতন হইলেও, দুঃখের বিষয়, সুকুমারের স্ত্রী অমলার গায়ের বর্ণটা, এত সাবান, Hazelene ইত্যাদি মাখা সত্ত্বেও যখন কিছুতেই ফিরিল না, অমলা তখন মনের দুঃখ বুকে চাপিয়া রূপ-প্রসাধন সম্বন্ধে একেবারেই হাল ছাড়িয়া দিল! সুকুমার এ সম্বন্ধে তাহাকে কিছু বলিলে অমলা মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিত "যার জন্য রূপের দরকার, তা ত হয়েই গেছে...রূপ দিয়ে আর কি ক'রব!" কিন্তু দিনের পর দিন একটা অমূলক ধারণা তার অন্তরকে পীড়ন করিতে লাগিল। অমলা ভাবিল, সে রূপহীনা বলিয়া স্বামী তাহাকে ভালবাসে না! তার একটা হেতুও সে মন হইতে খুঁজিয়া বাহির করিল। পাশের বাড়ীটায় এক ঘর ব্রাহ্ম বাস করিতেন। তাঁদের ১৮।১৯ বছরের ফুট-ফুটে চেহারার সাজ-গোজ করা মেয়েটি বেথুন কলেজের গাড়ী আসিলে যখন তার একরাশ কালো চুলের গোছা পিঠে ফেলিয়া বই হাতে নতমুখে গাড়ীতে উঠিত, তখন তার সুন্দর, মাধুর্য্যভরা মুখখানি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। একদিন যখন অমলা দেখিল, সেই মেয়েটির দিকে সুকুমার চাহিয়া আছে, তাহার ব্যাধিগ্রস্ত মন তখন বেদনায় ভরিয়া উঠিল। কর্ম্মক্লান্ত সুকুমার Court হইতে ফিরিয়া, সন্ধ্যাকালে যখন তাহার ঘরের দক্ষিণের জানালা খুলিয়া দিয়া অলস ভাবে ঈজি-চেয়ারখানায় শুইয়া পড়িত তখন সেই পাশের বাড়ী হইতে, অর্গ্যানের সুরে মিলিত, মধুর সঙ্গীতধ্বনি বাতাসের সঙ্গে ভাসিয়া আসিত, আর সুকুমার চক্ষু বুজিয়া তন্ময় ভাবে গান শুনিত! সহসা অমলা ঝড়ের মত ছুটিয়া আসিয়া স-শব্দে জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া, মুখ-চোখ লাল করিয়া গর্জ্জন করিয়া কহিত, "ওই বেহ্ম মেয়েটাকে না দেখতে পেলেই বুঝি মন ছট্‌ফট্ করতে থাকে, আর অমনি জানলাটা খুলে দেওয়া হয়?" সুকুমার হাসিয়া কহিত, "তুমি কি ক্ষেপলে না কি?···আচ্ছা, এতই যদি সন্দেহ তোমার, না হয় জানলা বন্ধ ক'রে দাও।—কিন্তু গানটা মন্দ লাগ্‌ছিল না···তুমিও না হয় শোন একটু!" এমনিধারা খুটি-নাটির ভিতর দিয়া ক্রমে অমলার মনে বেশ একটা সন্দেহের ছায়া ঘনাইয়া উঠিল।

সেদিন Court বন্ধ ছিল। সমস্তটা দিন বৃষ্টি হওয়ার পর এই কিছুক্ষণ হইল একটু থামিয়াছে। আকাশে তখনও মেঘ ভরপুর। সুকুমার চা পান শেষ করিয়া সম্মুখের জানালাটা খুলিয়া একবার আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল। তারপর কি ভাবিয়া ঈজি-চেয়ারখানা একটু সরাইয়া নিকটস্থ টেবিলের উপর হইতে একখানা কাগজ লইয়া পড়িতে লাগিল। এমন সময় পাশের বাড়ী হইতে অর্গ্যান বাজিয়া উঠিল, বর্ষার ভিজে বাতাসে ভাসিয়া আসিল সেই সুরের সঙ্গে সুর মেশানো কোমল কণ্ঠ নিঃসৃত একটা সঙ্গীত স্তবক "মেঘের পরে মেঘ জমেছে আঁধার করে আসে"···সুকুমার পুস্তক পাঠ ভুলিয়া গেল; সে তন্ময়চিত্তে গান শুনিতে লাগিল। অমলা নিঃশব্দে আসিয়া তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইল···আজ তাহার মুখখানিও বাহির প্রকৃতির মতই ঘনঘটাচ্ছন্ন। সহসা চুড়ীর শব্দে সুকুমার মুখ ফিরাইতেই দেখিল, অমলা! সুকুমার হাসিয়া কহিল "কেমন লাগ্‌ছে?" অমলা ব্যঙ্গস্বরে কহিল, "সুধাবৃষ্টি কচ্ছেন আর কি! কাণ জুড়িয়ে গেল!"

অমলার হাতে একখানি পত্র দেখিয়া সুকুমার বলিল "ওখানি কার চিঠি?"

অমলা মুখভঙ্গি করিয়া কহিল, "কিছুই জানেন না যেন! মহাশয়ের প্রেম-পত্র!!"

সুকুমার আশ্চর্য্য ভাবে কহিল "প্রেম-পত্র?"

—"আজ্ঞে—ভাগ্যিস্ ডাকে ফেলা হয় নি, তাই দেখতে পাওয়া গেল! পড়ব?…শুনবে?"…কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই অমলা মুখভঙ্গি করিয়া পড়িতে লাগিল " 'প্রাণের আমিনা' !

সুকুমার একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল "ওঃ এই!…থাক্ আর পড়তে হবে না…আমি বুঝেছি।"

ব্যঙ্গস্বরে অমলা কহিল "লিখতে পেরেছ, আর এখন শুনতে বুঝি ভারি লজ্জা হচ্ছে…নয়?"

সুকুমার উদাস কণ্ঠে বলিল, "ও শুনে আর কি ক'রব? যাক্…তবুও রক্ষে। আমি ত ভেবেই আকুল…Criminal Procedure Codeএর কোন section আবার মাথায় চাপালে শেষটায়!…এই ত তোমার "charge", না আরও কিছু আছে?" সুকুমার খুব খানিকটা হাসিল।

"থামো…থামো, তোমার ও সব ওকালতী চাল্ আর খাটছে না…আবার হাসছ কোন মুখে?…লজ্জা হচ্ছে না?"

হো-হো শব্দে সুকুমার হাসিয়া কহিল, "একটুও না। বরং ভারি আমোদ হচ্ছে এই কথাটা ভেবে যে তুমি আমায় কতখানি ভালবাস!"

অমলা অবাক্ হইয়া গেল। সে মনে করিয়াছিল, এই গোপনীয় চিঠিখানা দেখাইলে তাহার স্বামীর অবস্থা না জানি কিই-বা ঘটিবে! কিন্তু এ কি হইল? এমন জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও তাহার স্বামী কিছু মাত্রও লজ্জিত না হইয়া বরং হাসিতেছে দেখিয়া তাহার মনে একটা খট্‌কা লাগিল।…তবে কি সে ভুল করিল… না, তাই বা কেমন করিয়া হয়…এই ত তাহার স্বামীর নিজের হাতের লেখা চিঠি! সে সহসা দৃঢ় কণ্ঠে কহিল "হেসে উড়িয়ে দেবে মনে করেছ,…তা আর হচ্ছে না। তুমি কি বলতে চাও, এ লেখা তোমার নয়?"

"হ্যাঁ আমারই লেখা। সুধু ওই একখানা কেন, ওমনি ধারা আরও অনেক চিঠি আছে, দেখাচ্ছি। কিন্তু তার আগে মাথা ঠাণ্ডা ক'রে সব শোন, নইলে ব্যাপারটা ভাল বুঝতে পারবে না।" ব্যাপারটা ক্রমেই যেন অমলার কাছে রহস্যময় হইয়া উঠিতেছিল। সে সুকুমারের কাছে সরিয়া আসিয়া কহিল, "কই দেখি সে সব চিঠি!…তারপর যা হয় শুনবো।" মৃদু হাসিয়া সুকুমার পাশের দেরাজ করিয়া খুলিতে খুলিতে কহিল, "বিশ্বাস হচ্ছে না, কেমন?… এই দেখ কত চিঠি, "আমিনার" নামে লেখা রয়েছে, আর তার তলায় নাম সই করছে 'মনসুর'।…আর এ সমস্তগুলিই আমারি হাতের লেখা। যে চিঠিখানা তুমি পেয়েছ, ওটা অর্দ্ধেক লেখা হয়েছিল মাত্র—বাকীটা শেষ হয় নি' ব'লে তলায় নাম লেখা নাই!" অমলা বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "কে মনসুর? আর তুমিই বা এ সব লিখতে গেলে কেন…কে আমিনা?"

সুকুমার পত্নীর হাত ধরিয়া টানিয়া ঈজি চেয়ারের পাশে বসাইয়া কহিল, "শোন, সে বড় এক অদ্ভুত প্রেমের কাহিনী· বাদলার সন্ধ্যাটা বরং কাটবে ভাল। প্রায় আট দশ বছর আগেকার কথা, আমি তখন এলাহাবাদে আমার মামার বাসায় থেকে কলেজে পড়তাম। বছরের মাঝামাঝি সময়ে হঠাৎ মামা বদলি হয়ে চলে গেলেন; কাজেই আমাকে একটা বাসা দেখতে হ'ল। সহরের এক কোণে মুসলমান পল্লীতে একটা একতলা বাড়ী কম ভাড়ায় পাওয়া গেল। আমি ও আমার বন্ধু হরেন দুজনে মিলে সেখানে থাকতাম। চাকর বাকর ছিল না, নিজেরাই যা হয় কোন প্রকারে চালিয়ে নিতাম। আমাদের বাড়ীর সামনে একটা স্ত্রীলোক থাকতো, তার বয়স হবে বছর ২৫।৩০ আন্দাজ। রংটা তার যেমন কালো, দেহটা আবার তেমনি মোটা। সে তার ছোট ছোট চোখ দুটোতে সুরমা দিয়ে, পায়ে হাতে মেহেদি পাতার রং লাগিয়ে, পাণ খেয়ে পুরু ঠোঁট দুখানা লাল ক'রে, একখানা ফিরোজা রংয়ে ছোপান কাপড় পরে যখন তার দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়াতো—লোকে তার দিকে চেয়ে না হেসে থাকতে পারত না!

এক দিন আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি,—সে আমার বাড়ীর সামনে কুয়ার কাছে জল নিতে এসে, আমার দিকে—চেয়ে একটু মুচকী হেসে ঘাড় দুলিয়ে বল্লে "ভাল আছ বাবুজী?"…তার এই বেয়াদবীতে আমার ভয়ানক রাগ হ'ল, আমি মুখ ফিরিয়ে ঘরের ভিতর চলে এলাম। হরেন তখন বাসায় ছিল না; সে এলে তাকে বল্লাম, এ পাড়া ছেড়ে একটা ভদ্র পাড়ায় বাড়ী দেখ্। সে আমায় বোঝালে এত সস্তায় এমন বাড়ী আর

এক দিন, সকালে ঘরে বসে আমি পড়ছি, স্ত্রীলোকটা একেবারে আমার ঘরের ভিতরে এসে হাজির! আমি ত অবাক্!...কী সাহস তার। হাতের বইখানা ফেলে রেখে তার দিকে বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লাম 'কেয়া মাঙ্গতা হিঁয়া?' স্ত্রীলোকটা একটুও লজ্জা না করে কাতরভাবে আমার দিকে চেয়ে ভাঙ্গা হিন্দি আরবী মেশানো ভাষায় বল্লে, 'বাবুজি, ম্যায়নে আপকো থোড়া কুছ তক্‌লিফ্ দেনে খাতির'—"

কি জানি কেন তার মুখের করুণ ভাব, চোখের কাতর দৃষ্টি দেখে আমার মনটা নরম হ'য়ে পড়লো!—জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি তোমার কথা?'

স্ত্রীলোকটা খুব মিনতি করে করুণ কণ্ঠে বল্লে, "আপনি যদি দয়া ক'রে একখানা চিঠি আমায় লিখে দেন্"...

কথাটা শোনা মাত্রই আমার বেজায় রাগ হ'ল।...কি আপদ্...চিঠি লেখাতে আর লোক পেলে না!—যাই হোক্, এখন তাকে যত শিগ্‌গির হয় বিদেয় করতে পারলে বাঁচি, এই ভেবে কাগজ কলম নিয়ে বল্লাম 'বল কাকে কি লিখ্‌তে হবে।'

সে বল্লে 'সেথ্ মনসুর খাঁকে...দিলদার নগরে!'

'কি লিখতে হবে বলে যাও।'

স্ত্রীলোকটা বল্‌তে লাগলো—"হো মেরা দিলকা রৌশন্, মেরা জান্—কলিজা—আমি তোমায় কত ভালবাসি! খোদা তোমায় সুস্থ রাখুন। কেমন ক'রে তুমি এতদিন তোমার ছোট্ট আমিনাকে ভুলে আছ...একটিবার এসে দেখা দাও—? ক্ষুদ্র বালিকা যে"—

আমার তখন বেজায় হাসি পেয়েছিল! ক্ষুদ্র বালিকাই বটে! দেহখানি অন্ততঃ ৬ ফুটের কম নয়, ওজনেও বোধ হয় সাড়ে তিন মণের বেশী হবে!—যাক্ কোন প্রকারে ত আমি হাসি চেপে জিজ্ঞাসা করলাম 'আচ্ছা মনসুর কে?...তার বয়স কত?'

'কাঁচ্চা বয়েস বাবুজী...আমার তরুণ বন্ধু সে।' স্ত্রীলোকটা অন্যদিকে চেয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌তেই আর কোন কথা ও-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা উচিত নয় মনে করে আমি বল্লাম—'যাক্, এখন আর কি লিখ্‌তে হবে বল।' সে এমনি ধারা কত দুঃখ, আবেগ, অনুরোধের মধ্যে দিয়ে তার চিঠি শেষ করলে,—আমিও পরিত্রাণ পেলাম!

প্রায় ২।৩ সপ্তাহ পরে একদিন বিকেল বেলায়—হঠাৎ ঘরের দরজাটা খোলার শব্দে মুখ ফেরাতেই দেখি, সেই স্ত্রীলোকটা জিজ্ঞাসার অপেক্ষা না ক'রে একেবারে ঘরের মধ্যে! সে এসেই বল্লে— 'বাবুজী, আপনার বোধ হয় এখন কোন কাজ নেই?'

আমি বিরক্ত হয়ে বল্লাম 'না—কেন?'

সে তেম্‌নি ভাঙ্গা গলায় মিনতির সুরে বল্লে 'যদি মেহেরবাণি ক'রে আর একখানা চিঠি লিখে দিতেন'...

—কি ব'লব তোমায় অমলা, আশ্চর্য্য এই কথা কয়টি বলবার ভঙ্গী! এই যে আমার এত রাগ, এত বিরক্তি, সব যেন তার আবেগভরা মিনতির কাছে হার মান্‌লো!...অস্বীকার করতে পারলাম না! বল্লাম 'কাকে...তোমার সেই বন্ধুটির কাছে ত?' সে ঘাড় দোলাইয়া হাসিয়া বলিল 'না বাবুজী!...এবারে সে—আমার বন্ধু মনসুর লিখছে!' শুনে ত আমি অবাক...এ বলে কি?... হেঁয়ালিপূর্ণ ব্যাপারটা ভাল বুঝতে না পেরে বল্লাম 'তার মানে?'

স্ত্রীলোকটা দুঃখিতভাবে বল্লে 'আমায় মাফ্ করুন বাবুজী, বড় বোকা আমি...সব কথা আপনাকে গুছিয়ে বল্‌তে পারছি না যে!...আচ্ছা মনে করুন এটা আমার বন্ধুর চিঠি!...আমারই মত তারও একজন "আমিনা" আছে—সে যেন তাকেই লিখ্‌ছে!'—অদ্ভুত ব্যাপার! সন্দেহে, বিস্ময়ে তার মুখের দিকে চাইতেই দেখি, তার ঠোঁট দুটো কাঁপছে, চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে!—কি জানি মনের ভিতর কেমন একটা কি হ'ল -আমি চেঁচিয়ে বল্লাম "তোমার 'আমিনা' বা 'মনসুর' ব'লে কোন লোক নিশ্চয়ই নাই...সব মিছে কথা...এই চিঠি লেখাবার ছুতো ক'রে তুমি ঘনিষ্টতা করতে এসেছ আমার সঙ্গে!...বেরিয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে এখুনি..."

স্ত্রীলোকটা হঠাৎ কেঁদে ফেল্লে!...আমার ত চক্ষু স্থির...এ আবার কি বিপদে পড়লাম!

কিছুক্ষণ পরে সে আমার খাটের কাছে সরে এসে হাঁটু গেড়ে ব'সে যোড়হাত ক'রে বল্লে, "আমায় মাফ্ কর বাবুজি, সত্যই 'মনসুর' ব'লে আমার কেউ নেই, কিন্তু 'আমিনা' আছে...আমিই 'আমি'!...নাই-বা থাক্‌লো 'মনসুর';...

তোমার একখানা চিঠি লিখে দিতে আর কতটুকুই বা সময় যাবে বাবুজী!...এই চিঠিখানা পেয়ে যদি আমার"... সে আর বল্‌তে পারল না, ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো!... আমি ত আড়ষ্ট!—বলবার কথা কিছুই খুঁজে পেলাম না!

স্ত্রীলোকটা তার চোখ মুছে বল্লে এতই যদি তোমার অবিশ্বাস, এই ফিরিয়ে নাও বাবুজী তোমার আগেকার লেখা চিঠি!—আমি অন্য কারুকে দিয়ে না হয় লেখাব... তোমার কাছে আসব না আর!'

সত্যই ত! আমার লিখে দেওয়া সেই চিঠিখানাই ত বটে! আমি বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'যদি কোন লোকই নেই, তবে এ চিঠি পাঠাবার কি উদ্দেশ্য তোমার?' সে ঘাড় নীচু করে বল্‌তে লাগলো 'যদিও 'মনসুর' বলে কেউ নেই, কিন্তু থাক্‌তে ত পারতো! আমি ভেবে নিয়েছি—সকলের মত আমার স্বামীও কোন দূর বিদেশে আছে... আমি তাকে চিঠি লিখি, সে তার উত্তর দেয়! যে চিঠি তুমি "মনসুরের"—পক্ষ হয়ে 'আমিনা'র কাছে লিখে দেবে বাবুজী, সেই চিঠিখানা আমি ডাকে ফেলে দেব!..পিয়ন যখন এসে আমার দরজার কড়া নেড়ে ডেকে বলবে 'আমিনা বিবি...চিট্‌ঠি হ্যায়', আমার যে প্রাণে তখন কি আনন্দ হবে বাবুজী, তা যে তুমি ভাবতেও পার না! এমনি ধারা লেখা চিঠিতে সোহাগ, আদর, অভিমানের কথাগুলো যখন লোকে আমায় পড়ে শোনায়, আমি যে তখন আমার কথাও ভুলে যাই! শুন্‌তে শুন্‌তে আমার চোখ দুটো বুঁজে আসে, কলিজার ভিতরটা একটা ভয়ানক সুখের আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠে! বাবুজী, জগতে যার কেউ নেই, কেমন করে সে বেঁচে থাকে বল ত? তাই আমি, আমার মনের সঙ্গেই খেলা করি, ভাব করি···আসনাই করি! একটা মন-গড়া রূপ কল্পনা ক'রে নিয়ে, হৃদয়খানাকে সুখের অনুভূতিতে পূর্ণ ক'রে তোলে···তেমনি! "মনসুর" না থাকুক···আমার মনটা ত আছে!!" স্ত্রীলোকটা তার আঁচলে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলো!

আমি ভয়ানক লজ্জিত হ'লাম! একটা গভীর দুঃখে আমার মন ভ'রে গেল! পাশের টেবিল থেকে কাগজ কলম নিয়ে বল্লাম 'আচ্ছা বল,...কি লিখতে চাও তুমি··· আমি লিখে দিচ্ছি!' * * * * তার চিঠি লেখা শেষ করলাম। সে অতি যত্নে চিঠিখানা তার বুকের কাছটায় লুকিয়ে নিয়ে চলে গেল! এর পর প্রায় প্রতি সপ্তাহেই আমাকে তার এমনিধারা উড়ো-চিঠি লিখে দিতে হ'ত!

মাস ছয়েক বাদে একদিন সন্ধ্যাকালে সে এসে বল্লে, "বাবুজী, আর তোমায় বিরক্ত করতে আসব না আমি!... আমার এই শেষ চিঠিখানা লিখে দাও!"

কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতেই সে হেসে বল্লে, 'মুল্লুক চলে যাব!'...তার পর আমায় দিয়ে তার চিঠি লেখাতে লাগ্‌লো!...উঃ সে কি করুণ! বল্লে, ওগো দয়িত আমার, একবার এস। মৃত্যু আমার দ্বারে এসে কতবার ফিরে গেছে, আমায় নিয়ে যেতে কতবার সেধেছে, কিন্তু তোমায় না দেখে যে এত দিন যেতে পারিনি। দেখবার আশা বুকে পুষে, কত দিন, কত মাস, কত বছর কেটে গেল, তুমি ত এলে না...দেখা দিলে না! আর যে তাকে ফেরাতে পারি না!...সে আমায় কোন্ এক চির-উজ্জ্বল রূপালি দেশে নিয়ে যেতে চায়! সেখানে না কি দুঃখ নাই, অভিমান নাই, বিরহ নাই, অশ্রু নাই··সুধুই মিলনের মহা-মেলা! তুমি ত জান রমণীর দুর্ব্বল হৃদয়! এত বড় প্রলোভন ত্যাগ করবার শক্তি আমি যে হারিয়ে ফেলেছি · পার যদি, তুমি আমায় রক্ষা কর"—তার পর, সে তার পুরানো চিঠিগুলো আমার কাছে ফেলে দিয়ে বল্লে, 'এই নাও বাবুজী, তোমায় দিয়ে লেখানো সব চিঠি··· ওতে আর আমার কাজ নেই। তোমাকে কত বিরক্ত ক'রেছি...আমায় ক্ষমা করো!...খোদা তোমায় সুখে রাখুন···সেলাম বাবুজী . চল্লাম!'

পরের দিন ভোর-বেলায়, হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যেতেই উঠে দেখি, রাস্তায় খুব গোলমাল হচ্ছে···সামনের বস্তির একটা খোলার বাড়ীতে কতকগুলো পুলিশ আর লোকের ভীড়। ..কি ব্যাপার?...জনতা ঠেলে দোর-বন্ধ-করা একখানা ঘরের সম্মুখে গিয়ে পাশের খোলা জানালার ফাঁক দিয়ে ভিতরে দৃষ্টি পড়তেই প্রাণটা শিউরে উঠলো... দেখি, গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে—"আমিনা" !!

.. অমলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল "হ্যাগা...সত্যি" ?

"গর্কীর" একটা গল্পের ছায়া অবলম্বনে লিখিত।
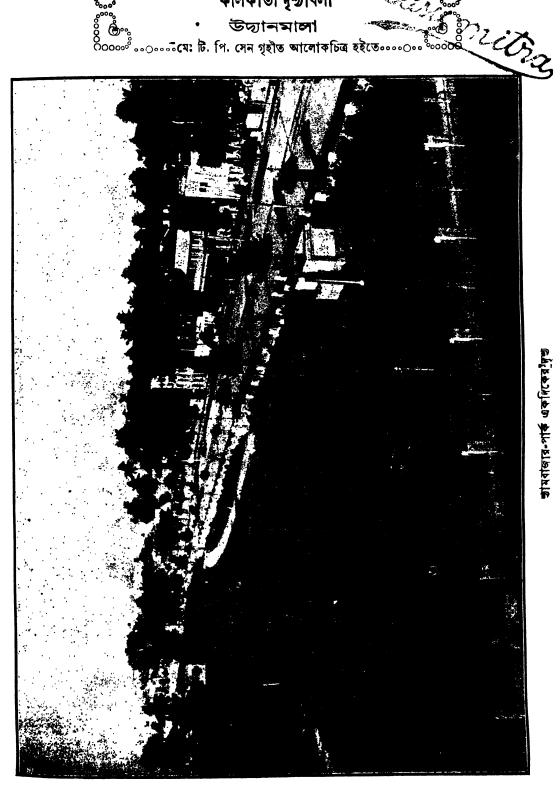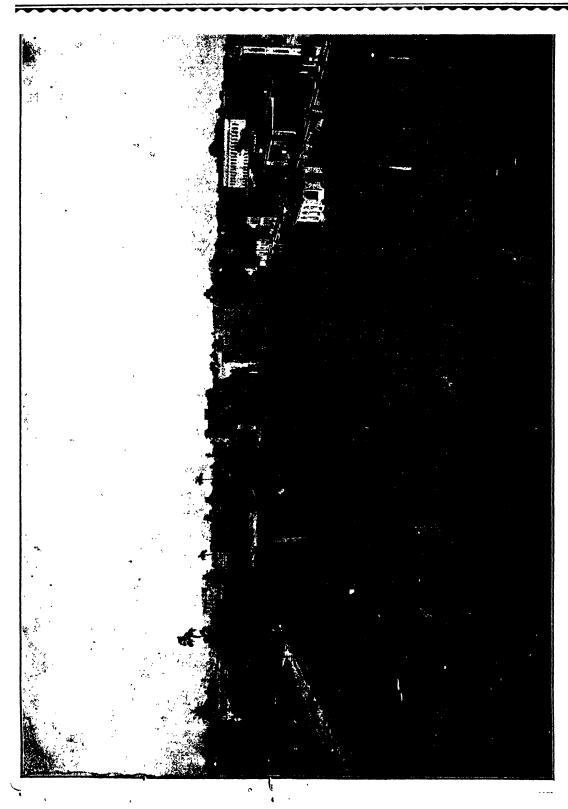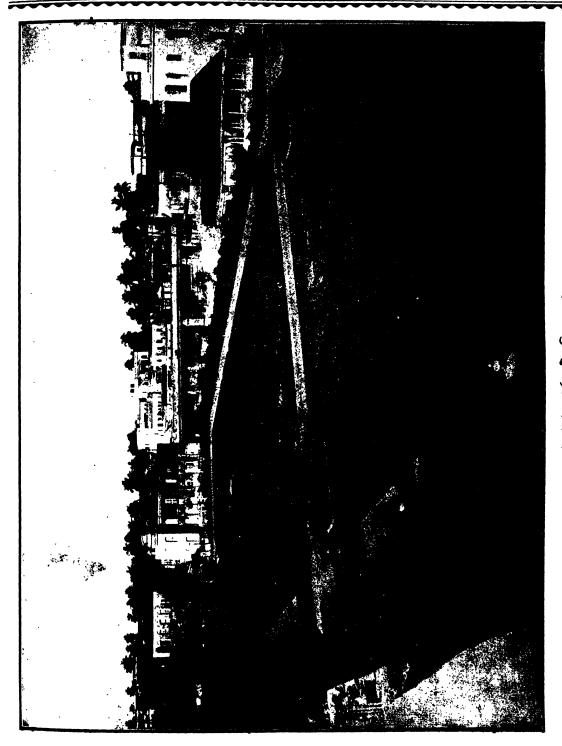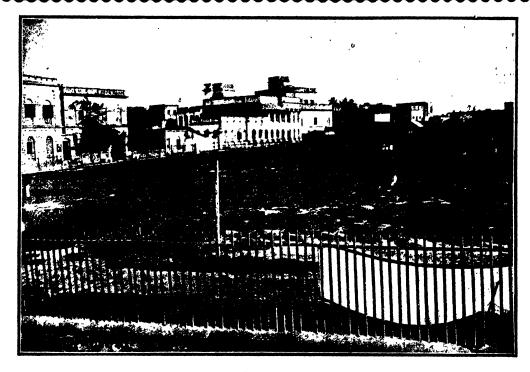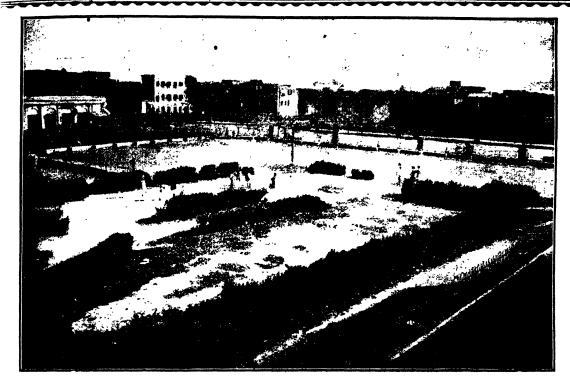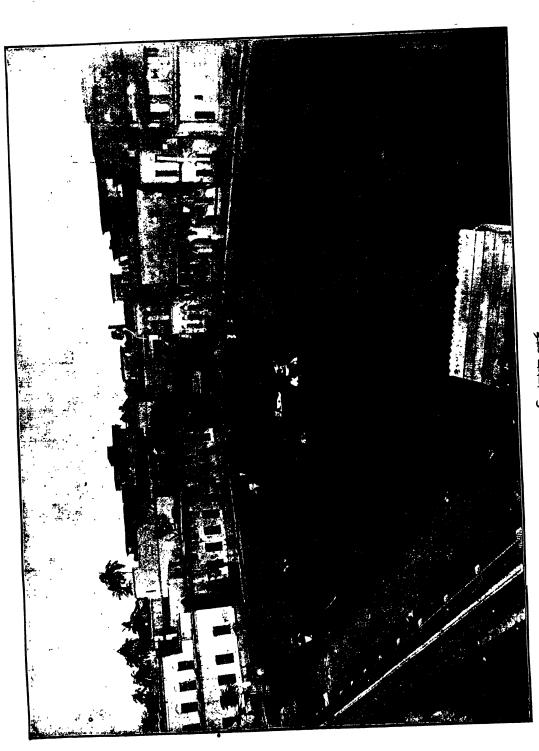
কলিকাতা দৃশ্যাবলী

উদ্যানমালা

মেঃ টি. পি. সেন গৃহীত আলোকচিত্র হইতে

শ্যামবাজার-পার্ক একদিকের দৃশ্য

শ্যামবাজার পার্ক দ্বিতীয় দিকের দৃশ্য

শ্যামবাজার পার্ক তৃতীয় দিকের দৃশ্য

শ্যাম স্কোয়ার

ঘোড়াপুকুর স্কোয়ার

মহিলা পার্ক

বিদ্যাসাগর পার্ক
(রামকৃষ্ণ দাস লেন)

মির্জ্জাপুর পার্ক

কলেজ স্কোয়ার

ওয়েলিংটন স্কোয়ার

ডালহৌসী স্কোয়ার

রক্ত-কমল

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ, বি-টি

(১)
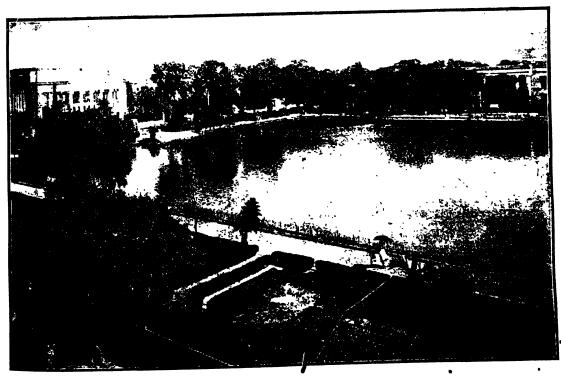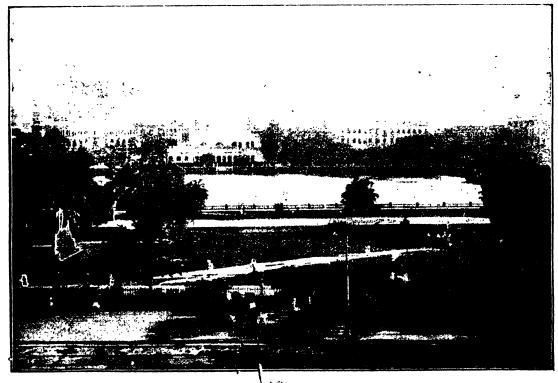
কাশীর হরিশ্চন্দ্র ঘাটের উপর সবচেয়ে ভাল ও বড় বাড়ীটা দখল করিয়া দুয়ারের সম্মুখে প্রস্তরফলকে নিজের নামের শেষে এম্-ডি যুক্ত করিয়া রাখিলেও জ্ঞানপ্রকাশকে কেহই বড় একটা রোগী দেখিবার জন্য বাহিরে যাইতে দেখে নাই। লোকটাও এমন অদ্ভুত যে, কাশীর মত বাঙালীবহুল স্থানে থাকিয়াও সে বাড়ীর বাহির হয় না—লোকের সঙ্গে দেখাশুনা বা মেলামেশা তো দূরের কথা। লোকে ভাবিল, লোকটি কাশীতে নূতন আসিয়াছে, তাই হয়ত ভাবিয়াছে সকলের সঙ্গে বেশী মেলামেশা করিলে কেহই টাকা দিবে না, সকলেই হয়ত বন্ধুত্বের দাবী করিয়া বসিবে। কিছুদিন এখানে থাকিলেই বুঝিবে, চিকিৎসা করিয়া এখানে ভিজিটের আশা নাই বলিলেই হয়। যেখানে গণ্ডায় গণ্ডায় সিভিল সার্জ্জন পেন্‌সন্ লইয়া শিবপ্রাপ্তির লোভে শিবলোকের সিংহদ্বার আগুলিয়া আছে, সেখানে ডাক্তারের ও মেজাজ খাটে না।

কিন্তু পূরা একটি বৎসর কাটিয়া গেলেও লোকে তাহার স্বভাবের কোন পরিবর্ত্তন দেখিল না। পূর্ব্বের মত সেই সর্ব্বক্ষণ বাড়ীতে থাকা আর রাত্রি ৯।১০টার পর গান। আর সে কি গান! তাহার যেন কোন শ্রান্তি নাই—সর্ব্বক্ষণই স্রোতের মত বহিয়া চলিয়াছে। কোন রাত্রে গান নহে স্বধু বাঁশী—সে বাঁশী সারারাত্রি যেন সমস্ত কাশী ভরিয়া বাজিতে থাকে। এক এক রাত্রে বাঁশী বা গান নহে—বাজে স্বধু বেহালা। যাহারা বোঝে তাহারা বলে লোকটির যেমন 'গলা', তেমনি হাত।

এই সুন্দর 'গলা' ও হাতওয়ালা লোকটিকে বাড়ীর বাহিরে লোকে দৈবাৎ দেখিতে পাইত। মাসের মধ্যে এক আধ দিন এমন কোন নাছোড়বান্দা ব্যক্তি যদি আসিত যাহার এই ডাক্তারটিকে নহিলে চলিবে না, তাহা হইলে সে অগত্যা বাহির হইত। কিন্তু তাহার ভৃত্য আগে গিয়া একখানা গাড়ী করিয়া আনিত। সেই গাড়ীতে আহ্বানকারী লোকটি, ডাক্তার নিজে ও একটি দুগ্ধফেন-শুভ্র-লোমবহুল ক্ষুদ্রাকৃতি কুকুর উঠিত।

এই ভৃত্যের নিকট হইতেও বাবুর সম্বন্ধে কিছু জানিবার উপায় ছিল না। কারণ, কিছু জিজ্ঞাসা করিলেই সে বলিত, 'বাবু জানেন'; এবং বাবু যে কি জানেন, তাহা বাবু ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তির জানিবার সুবিধা বা সম্ভাবনা ছিল না।

এই অদ্ভুত লোকটির সম্বন্ধে লোকের কৌতূহলের অন্ত ছিল না। ছাদের উপর উঠিয়া, দুয়ারের ফাঁক দিয়া, বাজারে, ঘাটে, যেখানে দেখা হইয়াছে, চাকরটাকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া লোকে এইটুকু জানিতে পারিয়াছে যে, বাড়ীতে নারীজাতির কোন সম্পর্ক নাই; চাকর, মনিব, একটি কুকুর ও কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র এই লইয়া ডাক্তারটির সংসার। বিবাহ করিয়াছে কি করে নাই, করিবে কি করিবে না—এ কয়টার একটা খবরও কেহ পাইত না।

শেষটা প্রতিবেশীরা জ্ঞানবৃদ্ধি সম্বন্ধে হতাশ হইয়া একযোগে হাল ছাড়িয়া দিল।

(২)

সকাল হইতে ইতস্ততঃ করিয়া দুপুরে চন্দ্রিকা ডাকিল—"বাবু!" আহারাদি শেষ হইলে জ্ঞানপ্রকাশ একখানি ইজিচেয়ারে অর্দ্ধশায়িত থাকিয়া একখানি বই পড়িতেছিল। বই হইতে মুখ তুলিয়া জ্ঞানপ্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল— "কি রে?"

চন্দ্রিকা একটু অবনতমুখে বলিল—"আমি তা হলে যাব?"

"হ্যাঁ যাবি বৈ কি; তোর মেয়ের বিয়ে—তুই না গেলে কি করে চলবে? কোন্ ট্রেণে যাবি?"

"বিয়ের এখনও এক হপ্তা দেরী আছে। কবে যাব ঠিক করিনি। একজন লোক থাকবে বলেছে; আজকে তার আস্‌বার কথা। তাকে সব দেখিয়ে শুনিয়ে তবে তো যাব।"

"আবার লোকের হাঙ্গামা কেন করতে গেলি? এ কটা দিন কুকারেই চালিয়ে নিতাম। কলের জল আছে আর ভাবনা কি?"

ভাবনা যে কি তা চন্দ্রিকা খুব জানিত, যাহার জন্য সে বাড়ী হইতে উপরি-উপরি পাঁচছয়খানা চিঠি আসা সত্বেও যাইতে পারে নাই। বাড়ীতে চিঠি লিখিয়া দিয়াছিল—বাবুকে একা রাখিয়া যাইবার উপায় নাই। একটা বিশ্বাসী লোক ঠিক করিয়া দিয়া তবে সে যাইতে পারিবে—তা সে যতই দেরী হউক্ না।

চন্দ্রিকা সিং সে সব কথা না বলিয়া শুধু জানাইল "একটা লোক না হলে যে কষ্ট হবে;—অন্ততঃ চা কি জলখাবারটা করে দেবারও তো একটা লোকের দরকার।"

"তা এ ক'টা দিন আমিই একরকম করে চালিয়ে নিতাম।" বলিয়া জ্ঞানপ্রকাশ একখানি ছোট রেকাবি হইতে মোটা করিয়া কাটা একখণ্ড সুপারি লইয়া মুখে ফেলিয়া দিল।

একটু পরেই জ্ঞানপ্রকাশ আবার বলিল—"হ্যাঁরে চন্দ্রিকা, তোর মেয়ের বিয়েতে কত খরচ হবে?"

"শ'তিনেক টাকায় হয়ে যাবে।"

"তিনশ টাকায় কি করে হবে রে?"

"তা কেন হবে না বাবু? বরযাত্রদের খাওয়াতে শ'খানেক, গহনা শ'খানেক, আর এদিক-ওদিকের খরচ বাকি টাকাটায় হয়ে যাবে।"

"গহনা শ-খানেকে কখন হয় পাগল!"

"তা কেন হবে না বলুন! গায়ে রূপার গহনা, পায়ে কাঁসার জিনিস। আপনাদের মতন তো আর সোণায় মুড়িয়ে দিতে হবে না!"

"তা তুই তো আমাকে কিছুই বল্লিনে—কোন খরচ চাইলিনে?"

"গেল বারেই তো আপনি তিনশো টাকা দিইছিলেন। তার মা মারা গেল তাই না বিয়েটা হোল না। সেই টাকাই তো আছে।"

"সব টাকা কি করে থাক্‌বে চন্দ্রিকা! শ্রাদ্ধে তো তোকে খরচ কর্ত্তে হইছিল।"

"শ্রাদ্ধের জন্য যে আপনি আলাদা একশো টাকা দিইছিলেন মনে নেই? বিয়ের টাকা আমি পোষ্টাফিসের খাতায় জমা রেখেছিলাম—পাছে খরচ হয়ে যায় ভেবে। সেদিন দোয়ারকাকে পাঠিয়ে দিলাম সব কেশাকটা

"দোয়ারকা তোর ছোট ভাই,—নয়?"

"হ্যাঁ বাবু।"

"হ্যাঁ ভাল কথা, আমার মণিব্যাগটা একবার নিয়ে আয় তো।"

"এখন টাকা কি হবে?"

"নিয়ে আয় না, কত আছে দেখি;—যা ওঠ্।"

চন্দ্রিকা অনিচ্ছায় উঠিয়া বাক্স হইতে মণিব্যাগ বাহির করিয়া আনিল। টাকাকড়ি চাবি সব চন্দ্রিকার জিম্মাতেই থাকিত।

"হ্যাঁরে তুই যে কতকগুলো গিনি করে রেখেছিলি, সেগুলো কোথায় গেল?"

"সে তো ব্যাগে থাকে না—সেই রূপার কৌটাতে আছে।"

"তা সেটাও নিয়ে আয়, একবার দেখি।"

চন্দ্রিকা পুনরায় উঠিয়া কৌটা আনিয়া দিল।

কৌটা খুলিয়া কয়েকটি গিনি তুলিতে তুলিতে জ্ঞানপ্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল—"চন্দ্রিকা, তোদের দেশে গিনির মালার ভারি আদর, নয়?"

চন্দ্রিকা ব্যাপারটা অনুমান করিয়া চক্ষুর্দ্বয় কপালে তুলিয়া বলিল—"কি জানি বাবু, সে সব আমীর লোকদের কাছে হতে পারে। আমাদের মত লোক গিনি টিনি ভালবাসে না।"

জ্ঞানপ্রকাশ সে কথা কাণে না তুলিয়া কতকগুলি গিনি লইয়া বলিল—"চন্দ্রিকা, তোর মেয়েকে এই কটা গিনি গাঁথিয়ে দিবি; বুঝ্‌লি?"

চন্দ্রিকা বাবুকে জানিত। তথাপি একবার আপত্তি করিবার চেষ্টা করিল। বলিল—"যা দরকার সব তো হয়ে গেছে, বাবু। এখন উপায় নেই, অত খরচ কল্লে চল্‌বে কেন? আর আমাদের মধ্যে ও-সব গহনার চলন নেই।"

"তুই বেশী কত্তাত্ব করিস্‌নে বাপু। আমি তোর মেয়েকে এই গহনাটা দিচ্ছি। আমি তো তোদের মত রূপোর হাঁসুলি দিতে পারিনে—সেটা তো জানিস্?"

চন্দ্রিকা বাবুর হাত হইতে গিনি লইয়া গণিয়া দেখিল বারোটা গিনি। ভয়ে ভয়ে বলিল—"একেবারে বারোটা যে বাবু।"

"তুই তা হলে গুণ্‌তে শিখেছিস্ এতদিনে"—বলিয়া হাসিতে-হাসিতে জ্ঞানপ্রকাশ বইখানা হাতে তুলিয়া লইল।

চন্দ্রিকা নিরুত্তর হইয়া গেল।

একটু পরে বই হইতে মুখ তুলিয়া ব্যাগ হইতে দুইখানা ১০৲ টাকার নোট বাহির করিয়া জ্ঞানপ্রকাশ বলিল—"দেখ্ চন্দ্রিকা, যাবার দিন কাশী থেকে কিছু ফল আর আমাদের বাঙ্গলা দেশের কিছু মিষ্টি কিনে নিয়ে যাবি। সন্দেশ রসগোল্লা নিবি—বুঝ্‌লি? তুই যে বাঙ্গালীর বাড়ী থাকিস্, তার একটা চিহ্ন থাকা দরকার তো?"

আপত্তি করা নিরর্থক জানিয়া হাত বাড়াইয়া চন্দ্রিকা নোট দুখানাও লইল। তার পর মণিব্যাগ ও কৌটা তুলিয়া রাখিতে গেল। কিন্তু চোখ দুটা তাহার জলে ভরিয়া আসিল।

অপরাহ্নে চন্দ্রিকা সিংয়ের ঠিক-করা লোকটি আসিয়া উপস্থিত হইল। জ্ঞানপ্রকাশ তাহার পানে একবার চাহিয়া দেখিল মাত্র, কিছু বলিল না। চন্দ্রিকা তাহাকে আড়ালে লইয়া গিয়া কি কি করিতে হইবে, বাবুর দিকে কি ভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, সব মোটামুটি একরকম বুঝাইয়া দিল ও সকালে আসিতে বলিল,—একটা দিন সে কি ভাবে কাজ করে তাহা একবার দেখিয়া লওয়া তাহার অভিপ্রায়।

অপরাহ্নে চন্দ্রিকা প্রভুকে চা আনিয়া দিল। হাতের বই খানা রাখিয়া জ্ঞানপ্রকাশ ধীরে ধীরে চা পান করিয়া আবার পড়ায় মনোনিবেশ করিল।

একটু পরেই ঘরে আলো জ্বালিয়া দিয়া চন্দ্রিকা জিজ্ঞাসা করিল—"কিছু খাবার দেব বাবু?"

জ্ঞানপ্রকাশ ঘাড় নাড়াইয়া জানাইল—'না'।

চন্দ্রিকা আর একবার বলিল—"পরশু খুব ভাল সন্দেশ রেখেছিলাম; আজও যদি না খান্ তো সব নষ্ট হয়ে যাবে।"

"সন্দেশ কি কর্‌তে আনিস্ চন্দ্রিকা—ও আর ভাল লাগে না"—একটু অপ্রসন্নমুখে জ্ঞানপ্রকাশ বলিল।

একটা কথা মনে পড়ায় চন্দ্রিকা লজ্জিত হইল। তবু সে শেষ চেষ্টা করিয়া বলিল—"রাত্রে তো অর্দ্ধেক দিন খাবার পড়েই থাকে; সন্ধ্যার সময়ও যদি কিছু না খান, শরীর টি'কবে কি করে? অন্য খাবার কিছু আন্‌ব?"

চন্দ্রিকার কথার সুরে এমন একটা মিনতি ছিল, যাহাতে জ্ঞানপ্রকাশ চোখ তুলিয়া একবার চাহিল। তার পর বলিল—"আচ্ছা, যা ঘরে আছে তাই নিয়ে আয়।"

চন্দ্রিকা খুসী হইয়া একখানি রেকাবিতে সন্দেশ আনিয়া প্রভুর সম্মুখে রাখিল। জ্ঞানপ্রকাশ তাহা হইতে একটি সন্দেশ তুলিয়া লইয়া ডাকিল—'কিটি'।

কিটি চেয়ারখানার তলাতেই হাত পা গুটাইয়া বেশ আরামে শুইয়া ছিল। প্রভুর আহ্বানে তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া চার খানা পা একটু একটু প্রসারিত করিয়া একবার আলস্য ভাঙ্গিয়া ও একটা মৃদু শব্দ করিয়া প্রভুর পানে চাহিল—যেন উত্তর দিল, "আজ্ঞে।"

জ্ঞানপ্রকাশ কিটির পানে চাহিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল—'কিটি, তুমি ক্রমশঃ বড় কুড়ে হয়ে যাচ্ছ। আমার চেয়ে;—বুঝেছ? কেবল খাওয়া আর ঘুম। একটু আধটু কাজ-কর্ম্ম কর; একেবারে বাবু হ'য়ে যেও না।'

কিটি যেন কথায় সায় দিয়া প্রভুর পায়ের কাছে আর একটু ঘেঁসিয়া বসিল।

পাত্র হইতে দুইটি সন্দেশ লইয়া কিটির কাছে ফেলিয়া দিয়া জ্ঞানপ্রকাশ বলিল—"নে, খাবার খা। চন্দ্রিকা সিং বল্‌ছে সন্দেশ না খেলে রোগা হয়ে যাবি।"

সন্দেশ দুটি সুধু এক একবার শুঁকিয়া কিটি প্রভুর পানে চাহিল।

জ্ঞানপ্রকাশ একটি সন্দেশ ডান হাতে তুলিয়া তাহাতে একটা কামড় দিয়া বলিল—"এই দেখ আমি খেয়েছি; তুই খা।"

কিটি তখনও প্রভুর পানে চাহিয়া রহিল।

অবশিষ্ট সন্দেশটুকু মুখে ফেলিয়া দিয়া—জ্ঞানপ্রকাশ বলিল—'এই দেখ্ এবার খেয়ে ফেলেছি।' তার পর জলের গ্লাস লইয়া জল পান করিল।

কিটি তখন আনন্দে জলযোগ আরম্ভ করিল। এদিকে জ্ঞানপ্রকাশও অন্য দিনের মত গাইতে বসিল।

রাত্রি ১২ টার সময় জ্ঞানপ্রকাশ গান বন্ধ করিয়া ডাকিল—"চন্দ্রিকা!"

চন্দ্রিকা চোখ রগ্‌ড়াইয়া সম্মুখে আসিল। "আর এক পেয়ালা চা দিতে পারিস্ চন্দ্রিকা?"

চন্দ্রিকা ফিরিয়া গিয়া ষ্টোভ জ্বালিয়া—জল চড়াইয়া দিল।

জ্ঞানপ্রকাশ আবার গান গাহিয়া যাইতে লাগিল।

চা তৈয়ার হইয়া গেলে রাখিতে আসিয়া চন্দ্রিকা দেখিল—বাবু গান গাহিতেছেন আর তাঁহার চক্ষু বার বার সজল হইয়া আসিতেছে। কয়েক ফোঁটা জলও চোখের পাশ দিয়া গড়াইয়া পড়িল।

চন্দ্রিকা কিছু না বলিয়া সুধু প্রভুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য দাঁড়াইয়া রহিল।

গান শেষ হইলে জ্ঞানপ্রকাশ চায়ের পেয়ালা হাতে লইয়া কি ভাবিতে লাগিল। চোখের জল মুছিতেও মনে রহিল না। একটু পরে বলিল—"চন্দ্রিকা, গান আজ বড্ড ভাল লাগ্‌ছে।" সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েক ফোঁটা জল তাহার চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িল।

(৩)

জ্ঞানপ্রকাশ জমীদারের ছেলে; অল্প বয়সেই পিতৃ-মাতৃ-হীন হয়। বিশ্বাসী দেওয়ান শিবনাথের হাতে তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার পড়ে; বিষয়ের ভার তো আগে হইতেই ছিল।

বি-এ পাশ করিয়া জ্ঞানপ্রকাশ ডাক্তারি পড়িতে চাহিল। শিবনাথ একবার বলিলেন—"ও পথে তো আবার পাঁচ-ছ বৎসর লাগিবে; তার চেয়ে বিষয় আশয় দেখিলে হইত না?"

জ্ঞানপ্রকাশ বলিল—"আমি দেখিলে বিষয় আশয় এমন আর কি বাড়িয়া যাইবে?" শিবনাথ বলিলেন—"তবু তো সব শেখা ও জানা দরকার।"

জ্ঞানপ্রকাশ বলিল—"শেখা? তা সে ডাক্তারি পাশ করিয়া আসিলেও আপনি শিখাইয়া দিতে পারিবেন। যত দিন আপনি আছেন, তত দিন আমাকে একটু পড়াশুনা করিতে দিন্। বাবা মা কেউ তো নেই;—আপনিই সব। আপনি যদি এমন বলেন—"

বৃদ্ধ শিবনাথ সজল-নয়নে বলিলেন—"না বাবা, আমি এ কথা আর বল্‌ব না। আমার কথা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি। তোমার যত দিন ইচ্ছা লেখাপড়া কর।"

জ্ঞানপ্রকাশ ডাক্তারি পড়িয়া পাশ করিল। তার পর স্থির করিল আইনটাও পড়িয়া লইবে এবং শিবনাথের সম্মতি লইয়া ল-কলেজে নাম লিখাইল।

বাড়ীতেও সে যাইত। অজয়ের পিতা ব্যারিষ্টার সঞ্জয় সেন মিঃ এস্, সেন নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। ব্যারিষ্টারির প্রতি তাঁহার অসীম অনুরাগ। জ্ঞানপ্রকাশকে তিনি বেশ পছন্দ করিয়াছিলেন। ছেলেটি সুশিক্ষিত, সচ্চরিত্র, ও তদুপরি ধনবান্ বলিয়া সেন-জায়ার তাহাকে আরও ভাল লাগিয়াছিল। ইহার কারণ এই যে তাঁহাদের একমাত্র কন্যা বিজয়ার স্বামী-নির্ব্বাচনে বিভ্রাট ঘটিয়াছিল। ইহার একটা ইতিহাস ছিল।

মিঃ সেনের একটি পণ ছিল যে, ব্যারিষ্টার ছাড়া তিনি আর কাহাকেও জামাতা করিবেন না। তাঁহার মত, যেমন পশুর রাজা সিংহ, তেমনি মানুষের রাজা ব্যারিষ্টার—যাহার ভ্রূভঙ্গে ও দর্পে চিফ্ জাষ্টিস্ পর্য্যন্ত কাহিল হইয়া পড়েন। কিন্তু এই রকম সৎপাত্র বাজারে তৈয়ারি মিলে না, তৈয়ার করিয়া লইতে হয়। ইহার জন্য মিঃ সেন অর্থব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না। অজয়ের বন্ধুদের মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া উপযুক্ত ছেলেদের তিনি সমাদর করিতেন ও বাড়ীতে আহ্বান করিয়া বাড়ীর মেয়েদের সহিত পরিচিত করাইয়াও দিতেন। যে কয়েকটি যুবক তাঁহাদের বাড়ী যাতায়াত করিত, তাহাদের মধ্যে কুমুদনাথ নামক একটি যুবকের প্রতি বিজয়া অনুরক্তা হয়। বিজয়া তখন স্কুল ছাড়িয়া সবে কলেজে প্রবেশ করিয়াছে। কুমুদনাথ দুইবার বি-এ ফেল করিয়াও কলেজ ছাড়ে নাই। কুমুদের দৈহিক সৌন্দর্য্য, তাহার কথাবার্ত্তা কহিবার অদ্ভুত ক্ষমতা, সর্ব্ববিধ কার্য্যে তাহার অসীম সাহস বিজয়াকে নিরতিশয় মুগ্ধ করিয়াছিল। মিঃ সেন ইহা লক্ষ্য করিয়া তাহার সহিত বিজয়ার বিবাহের কথাবার্ত্তা ঠিক করিয়া ফেলিলেন। স্থির হইল যে মিঃ সেনের খরচেই কুমুদ বিলাত যাইয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসিবে এবং আসিয়াই বিজয়াকে বিবাহ করিবে। বি-এ পাশের জন্য আর বৃথা চেষ্টা না করিয়া কুমুদ যথাসময়ে বিজয়াকে কাঁদাইয়া বিলাত যাত্রা করিল। প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ মিঃ সেন কুমুদকে পাঠাইতেন। পূর্ব্বে কথা ছিল, পরীক্ষা দিয়াই কুমুদ চলিয়া আসিবে। পরীক্ষার পরই সে জানাইল, বিলাত ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে সে একবার সমগ্র য়ুরোপটা ঘুরিয়া আসিবে। মিঃ সেন আপত্তি করিলেন না। মনকে বুঝাইলেন যে, ইহাতে

কিন্তু য়ুরোপ-ভ্রমণে একটু বেশী দিন লাগিয়া গেল। পরীক্ষার সংবাদ বাহির হইলে জানা গেল কুমুদ পাশ করিয়াছে। অভিনন্দন-সূচক টেলিগ্রামাদি পাঠানো হইল। আসিবার খরচ চলিয়া গেল; কিন্তু কুমুদ ফিরিল না, অথচ না আসিবার কারণও জানাইল না। মিঃ সেন উদ্বিগ্ন হইয়া, বিলাতে তাঁহার যে সকল বন্ধু ছিলেন, তাঁহাদের কাছে কুমুদের সংবাদের জন্য লিখিলেন।

সংবাদ আসিল অতি নিদারুণ। মাস ছয়েক হইল সে সেখানেই এক শ্বেতাঙ্গিনীকে বিবাহ করিয়াছে এবং বিলাতেই থাকিবার সংকল্প করিয়াছে। তখন মিঃ সেন মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তিনি কুমুদকে সত্য-সত্যই ভালবাসিতেন। তাহার এই ব্যবহারে তাঁহার অন্তরে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল। বিজয়ার মুখের পানে তিনি চাহিতে পারিতেন না। কি করিয়া আবার সবদিক বজায় হইবে, তিনি সতত এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঠিক এই সময়ে জ্ঞানপ্রকাশের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়।

বিজয়া অতি সুন্দরী। এই আঘাত তাহার তীব্র সৌন্দর্য্য ও সর্ব্বোজ্জ্বল মূর্ত্তি স্নিগ্ধ ও শান্ত করিয়া আরও মনোরম করিয়া তুলিয়াছিল।

জ্ঞানপ্রকাশ ডাক্তারি পড়া শেষ করিয়াও আইন পড়িতেছে জানিয়া, মিঃ সেন তাহাকে এক দিন কথায় কথায় বলিলেন, সে কেন বিলাত গিয়া ব্যারিষ্টারিটা পড়িয়া আসে না? উকিল আর ব্যারিষ্টারে অনেক তফাৎ, যেমন বাংলাদেশের জরাজীর্ণ ছাগাকৃতি গাভী আর ভাওয়লপুরের প্রসিদ্ধ গাভীতে ব্যবধান।

জ্ঞানপ্রকাশ তাহাতে কোন আপত্তি করিল না। কেবল বলিল—"জ্যেঠা মহাশয়ের একবার মত লইতে হইবে।" শিবনাথকে জ্ঞানপ্রকাশ জ্যাঠা মহাশয় বলিত।

জ্ঞানপ্রকাশকে ব্যারিষ্টারি পড়িতে ইচ্ছুক জানিয়া তিনি তখন নিজের সংকল্প প্রকাশ করিলেন এবং বিজয়ার সহিত বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। জ্ঞানপ্রকাশ যেন হাতে স্বর্গ পাইল। সে সাগ্রহে সম্মত হইল; এবং ভরসাও দিল যে জ্যাঠা মহাশয়ের মত লওয়া কঠিন হইবে না। মিঃ সেন বলিলেন, তাহাকে বিবাহ শেষ করিয়া তবে বিলাত যাত্রা করিতে হইবে।

বিজয়াকে লাভ করিবার পর ইংল্যাণ্ড হইতে শতগুণ দূরে যাইতেও জ্ঞানপ্রকাশের আপত্তি ছিল না।

একটা ভাবনার বিষয় ছিল—বিজয়া পাছে কোন গোলমাল করিয়া বসে। কুমুদকে সে যে তখনও ভুলিতে পারে নাই মিঃ সেন তাহা জানিতেন। মেয়ে বড় হইয়াছে—বিশেষতঃ সেই ব্যাপারের পর মেয়ের মতটা একবার লওয়া দরকার। মত জানিবার ভার পড়িল অনসূয়ার উপর। অনসূয়া মিঃ সেনের দুর-সম্পর্কের ভ্রাতুষ্পুত্রী। বৎসরের মধ্যে ছয় মাসের উপর অনসূয়া তাহার বিধবা মাতার সহিত এখানে থাকিত। তাহা ছাড়া মিঃ সেনের যখনি কোন আত্মীয়ার প্রয়োজন হইত, তখনি তাহাদের আনাইতেন।

অনসূয়া বিজয়ার চেয়ে বয়সে কিছু ছোট—অতি শান্ত ও মধুর প্রকৃতি; চন্দ্রমা-শোভিত গগনের এককোণে নীল স্নিগ্ধোজ্জ্বল তারাটির মত ফুটিয়া থাকিত। মিঃ সেনের কথামত অনসূয়া বিজয়ার কাছে কথাটা উত্থাপন করিল; জানাইল যে, জ্যাঠামহাশয় এই বিবাহ স্থির করিয়াছেন। পরদিন বিবর্ণ মুখে অনসূয়া মিঃ সেনকে জানাইল যে, খুব আগ্রহ না জানাইলেও বিজয়া কোন আপত্তি করে নাই ও করিবে না। শুনিয়া মিঃ সেনের মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু সেই দিন হইতেই অনসূয়ার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল।

জ্ঞানপ্রকাশ তখন শিবনাথকে নিজের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া পত্র লিখিল ও তাঁহার অনুমতি চাহিল। তাঁহাকে অনুরোধ করিল, তিনি যেন নিজে আসিয়া বিজয়াকে দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া যান্।

জ্ঞানপ্রকাশের পিতা স্বেচ্ছায় ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; সুতরাং এই পরিবারে জ্ঞানপ্রকাশের বিবাহে শিবনাথের কোন আপত্তি রহিল না। তিনি নিজে হিন্দু হইলেও ইহাতে আনন্দে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। যথাসময়ে বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পরেই অনসূয়া মায়ের সঙ্গে দেশে যাইতে চাহিল। জ্ঞানপ্রকাশ তাহাতে বাধা দিল। অনসূয়াকে সত্যই সে স্নেহচক্ষে দেখিত; বলিল—"আমি বিলাত চলিয়া যাই, তখন যাইও।"

যথাসময়ে জ্ঞানপ্রকাশের বিলাতযাত্রার দিন আসিল। বিজয়ার নিকট বিদায় লইয়া জ্ঞানপ্রকাশ যখন অনসূয়াকে খুঁজিল, তখন তাহার সাক্ষাৎ মিলিল না।

জ্ঞানপ্রকাশের বিলাত যাইবার মাসখানেক পরে মিঃ সেন কুমুদের নিকট হইতে এক পত্র পাইলেন। এক ইংরাজতনয়া তাহার সামান্য একটু দুর্ব্বলতার জন্য ভয় দেখাইয়া তাহাকে বিবাহে সম্মত করাইয়াছিল, এবং সে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ করিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে সে ইহারি জন্য মহা বিপদে পড়িয়াছে। এক্ষণে জানা গিয়াছে যে, সে অপরের বিবাহিতা স্ত্রী; পূর্ব্ব বিবাহের কথা গোপন করিয়া এবং সেই বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন না করিয়াই সে পুনরায় বিবাহ করিয়াছিল। তাহার পূর্ব্ব স্বামী এখন তাহার নামে নানা অভিযোগ আনিয়াছে। এখন হাজার কয়েক টাকা নহিলে তাহার আর পরিত্রাণ নাই—জেল অনিবার্য্য। পরিশেষে সে ক্ষমা চাহিয়াছে এবং ইহাও জানাইয়াছে যে, দেশে ফিরিয়া আসিয়াই সে বিজয়াকে লাভ করিতে পারিলে কৃতার্থ হইবে।

মিঃ সেন সত্যই কুমুদকে স্নেহ করিতেন। তিনি প্রার্থিত অর্থ তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দিলেন এবং বিজয়ার যে বিবাহ হইয়া গিয়াছে, সে কথাও জানাইলেন।

ইহার মাস তিনেক পরে কুমুদ হঠাৎ এক দিন মিঃ সেনের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল।

কুমুদ একজন অতি উৎকৃষ্ট অভিনেতা। সে আসিয়াই এমন দুঃখ ও অনুতাপের ভান করিল যে, সকলেরই হৃদয় তাহার প্রতি সমবেদনায় পূর্ণ হইয়া গেল। বিজয়া তো কাঁদিয়াই ফেলিল।

লজ্জা জিনিসটা কুমুদের কোন কালেই ছিল না। সে মিঃ সেনের বাড়ীতে নিয়মিত ভাবে যাতায়াত করিতে লাগিল। কুমুদের কথা কহিবার যে অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল, তাহা সে এই সময়ে খুব কাজে লাগাইল। ধীরে ধীরে সকলে তাহার ভীষণ অপরাধের কথা ভুলিয়া গেল। বিজয়ার এখনও মাঝে মাঝে মনে হইতে লাগিল যে, জ্ঞানপ্রকাশ মাঝখানে আসিয়া না পড়িলে, আগে যেমনটি ছিল, আজ আবার তেমনই হইত।

জ্ঞানপ্রকাশ যখন পাশ করিয়া ফিরিল, কুমুদ তখন ভাঙ্গা আসর রীতিমত জমাইয়া বসিয়াছে। সে এসব কথা কিছুই অবগত ছিল না, তাই কুমুদকে ইহাদের প্রকাশ যখন বিজয়াকে লইয়া পৃথক্ বাসা করিল, তখনও কুমুদ যাতায়াত করিতে লাগিল। কুমুদ নাম মাত্র কোর্টে যাইত। জ্ঞানপ্রকাশ যখন কোর্টে কেস্ লইয়া ব্যস্ত থাকিত, কুমুদ তখন বিজয়ার কাছে আসিয়া অনুতাপ জানাইয়া ও কল্পিত দুঃখ ও মনোভঙ্গের কাহিনী কহিয়া বিজয়ার চিত্ত বিগলিত করিত। জ্ঞানপ্রকাশের বিশ্বস্ত ভৃত্য চন্দ্রিকা সিংহের কিন্তু কুমুদের এ ভাবে ঘনিষ্ঠতা ভাল লাগিত না; কিন্তু সে ভৃত্য, কোন কথা বলিতে তাহার সাহসে কুলাইত না।

কয়েক দিন পরেই এক দিন কুমুদ বিজয়াকে লইয়া নিরুদ্দেশ হইল। কথাটা সেই দিনই রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। মিঃ সেন সেই রাত্রিতেই নিতান্ত অপরাধীর মত জ্ঞানপ্রকাশের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। পূর্ব্ব-কথা যাহা এতদিন গোপন রাখিয়াছিলেন, সব জ্ঞানপ্রকাশের কাছে বলিলেন। জ্ঞানপ্রকাশ কাহাকেও দোষ দিল না। শুধু বলিল—"তাহাদের মঙ্গলের জন্যই আমি বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া লইব। ইহাতে তাহাদের বিবাহে কোন বাধা থাকিবে না।"

জ্ঞানপ্রকাশ ইহার পর অতি অল্প দিনের মধ্যে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া লইয়া, ব্যারিষ্টারির পসার ছাড়িয়া কলিকাতা ত্যাগ করিল। কেবল চন্দ্রিকা কিছুতেই প্রভুর সঙ্গ ত্যাগ করে নাই। জ্ঞানপ্রকাশ যাইবার সময় শিবনাথকে জানাইল যে, দেশবিদেশ ঘুরিয়া বৎসর দুই তিন পরে সে ফিরিবে। দরকার হইলে সে অর্থের জন্য পত্র লিখিবে। যদি সে পাঁচ বৎসরের মধ্যেও না ফেরে, তাহা হইলে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি শিবনাথের পুত্রের হইবে—কারণ শিবনাথের পুত্র তাহার আসল ভাইয়েরই মত।

তার পর বৎসর থানেক চন্দ্রিকাকে সঙ্গে করিয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া জ্ঞানপ্রকাশ কাশীতে আসে। চন্দ্রিকার অনুরোধে সে কাশীতে কিছু দিন থাকা স্থির করিয়াছিল। এক স্থান ছাড়িয়া অপর স্থানে যাইবার উৎসাহও তাহার আর ছিল না। চন্দ্রিকা অনুরোধ করিয়া বাসার দুয়ারের পাশে প্রস্তর-ফলকে প্রভুর নামের সঙ্গে ডাক্তারির খেতাবটা অঙ্কিত করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল, যাহার ফলে মাঝে মাঝে তাহাকে দুই-একটী রোগী দেখিবার

হরিশ্চন্দ্র ঘাট হইতে স্নান করিয়া এক যুবতী ফিরিতেছিল। বেলা তখন দুইটা বাজিয়া গিয়াছে; সেদিন সূর্য্যগ্রহণ; তাই মুক্তির স্নান করিতে অত বেলায় সে ঘাটে আসিয়াছিল। মাথা নীচু করিয়া যুবতী হন্ হন্ করিয়া আসিতেছিল, এমন সময় গানের কয়েক ছত্র তাহার কাণে আসিল :—

"দুঃখেরে আমি ডরিব না আর,
দুখ হবে মোর কণ্ঠের হার;
জানি তুমি মোরে করিবে অমল,
যতই অনলে দহিবে!"

যে বাড়ী হইতে গানের শব্দ আসিতেছিল—যুবতী মন্ত্রমুগ্ধের মত সেই দিকে চাহিল। এ কণ্ঠ তাহার অতি পরিচিত। ঠিক রাস্তার উপরেই বাড়ী। একটু পাশে আসিয়া প্রস্তরফলকে গৃহস্বামীর নাম পড়িয়া সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

প্রথমেই যে ঘর, তাহার দুয়ার খোলা ছিল। সুরের আহ্বানে সে মুক্ত দ্বার দিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল। বামদিকের কক্ষে জ্ঞানপ্রকাশ অরগ্যান সহযোগে গান গাহিতেছে, আর তাহার পায়ের কাছে বসিয়া একটি কুকুর তাহার মুখের পানে চাহিয়া আছে। সেই ঘর হইতে জ্ঞানপ্রকাশের মুখের একাংশ মাত্র দেখা যাইতেছিল। তাহাকে দেখিবামাত্র যুবতী তাহার শব্দায়মান বক্ষঃ দুই হাতে ধরিয়া সেখানে বসিয়া পড়িল। লোকচক্ষু হইতে আপনাকে বাঁচাইবার জন্য রাস্তার দিকের দুয়ারটা বন্ধ করিয়া দিল।

ঘুরাইয়া ফিরাইয়া জ্ঞানপ্রকাশ গাহিয়া যাইতে লাগিল :—

সংসারে যদি নাহি পাই সাড়া
তুমি তো আমার রহিবে।
বহিবারে যদি না পারি এ ভার,
তুমি তো বন্ধু বহিবে!
কলুষ আমার, দীনতা আমার,
তোমারে আঘাত করে শত বার,
আর কেহ যদি না পারে সহিতে
তুমি তো বন্ধু সহিবে!
যাক্ ছিঁড়ে যাক্ মোর ফুল-মালা,
থাক্ পড়ে থাক্ ভরা ফুল-ডালা।
হবে না বিফল মোর ফুল তোলা
তুমি তো চরণে লইবে!
দুঃখেরে আমি ডরিব না আর,
দুখ হবে মোর কণ্ঠের হার।
জানি তুমি মোরে করিবে অমল,
যতই অনলে দহিবে।

যুবতী দেখিল জ্ঞানপ্রকাশের চক্ষে কতবার অশ্রু ফুটিয়া উঠিল, কতবার ঝরিয়া পড়িল। গান শেষ হইলে সে কিছুক্ষণ অরগ্যানের উপর মাথা রাখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে মাথা তুলিয়া চোখ মুছিয়া ডাকিল—কিটি!

কুকুরটি একেবারে গা ঘেঁসিয়া কোলের উপর মাথা রাখিল।

জ্ঞানপ্রকাশ বলিল—"কিটি, আজ একাদশী, কিছু খেতে নেই, বুঝ্লি?"

কিটির লেজ কাটা, তাই লেজ নাড়িতে না পারিয়া মাথাটি প্রভুর কোলের উপর একবার বুলাইয়া লইল।

"কিটি, আর দুটো দিন বাদেই চন্দ্রিকা আস্বে—এ দুটো দিন আর উপোস্ কর্তে পার্বিনে?"

কিটি মুখ তুলিয়া মাঝারি গোছের একটা শব্দ করিয়া আবার মুখ নামাইল; যেন বলিল—"তুমি যদি উপোস্ কর, আমিই বা পারিব না কেন?"

"কিটি আর একটা গান শুন্বি?"

কিটি তাহার আপন ভাষায় কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই একটা শব্দ শুনিয়া সম্মুখের ঘরের দিকে চাহিল ও পরক্ষণে সেই দিকে ছুটিয়া গেল। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য চক্ষু ফিরাইয়া জ্ঞানপ্রকাশ দেখিল, অনসূয়া তাহার দিকে সজলচক্ষে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর কিটি আনন্দে তাহার পায়ের কাছে লুটাইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিতেছে।

জ্ঞানপ্রকাশ প্রথমে কথা কহিল—'অনসূয়া!'

অনসূয়া কম্পিতপদে জ্ঞানপ্রকাশের কাছে আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

"ওই বিছানাটায় বস। এমন সময়ে এসেছ' যে তোমায় অভ্যর্থনা করবার কোন উপায়ই নেই"—

অনসূয়া শয্যার একপ্রান্তে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি এখানে কতদিন আছেন?"

"দু-মাস। তুমি কবে এসেছ—কার সঙ্গে?"

"আমি মার সঙ্গে মাসখানেক হ'ল এসেছি। এ ঘাটে প্রায়ই আসিনে। ভুবনেশ্বর দর্শন করব বলে আজ এসেছিলাম। মার শরীরটা আজ খারাপ; তাই আজ তিনি আসতে পারেননি।"

"কোথায় আছ?"

"এই কাছেই আউধ মহল্লায় আমার এক মাসীমা থাকেন—সেইখানেই আছি।"

"আচ্ছা, এবার কি কথা কই বল তো?

"কথা খুঁজে পাচ্ছেন না? আচ্ছা আমি এইবার জিজ্ঞাসা করে যাই, আপনি উত্তর দিন। আপনার লোকজন সব কোথায় গেল?"

"লোকজন তো এখানে নেই।"

"কেউ নেই! রাঁধবার বা কাজ করবার লোক?"

"না।"

"কেন আপনার চন্দ্রিকা কোথায় গেল?"

"সে মেয়ের বিয়ে দিতে দেশে গেছে।"

"আর কোন লোক রাখেন নি?"

"সেই একজন লোক ঠিক করে গেছ্‌ল।"

"কোথায় গেল সে?" "সেও চলে গেছে।"

"কবে গেল?" "তিন দিন হ'ল।"

"আর ফিরে অসেনি?" "না।"

"এল না কেন?" "যাবার সময় কতকগুলো জিনিস না বলে নিয়ে গেছল, সে জন্য লজ্জায় বোধ হয় আসেনি। কতকগুলো টাকা, একটা ঘড়ি, কতকগুলো কাপড় জামা, এই সব।"

"এ তিন দিন কি করে চল্‌ল?" "গান গেয়ে।"

"কি খেতেন?" "দুপুরে কলের জল খেতাম। রাত্রে পাশের গলির এক ভদ্রলোক কিছু খাবার করে পাঠিয়ে দিতেন। তাঁর স্ত্রীর চিকিৎসা করার জন্য তিনি খবর নেন।"

"দিনে পাঠান না?" "তাঁর স্ত্রী রুগ্না। সেই জন্য তিনি দিনে যা হয় দুটো নিজ হাতে রেঁধে মুখে দিয়ে যান, রাত্রে নিশ্চিন্ত হয়ে রাঁধেন।"

"এ কদিন দিনমানে কিছু খান্‌নি?"

"কলের জল বেশী করে খেয়েছি।"

"তাই বুঝি আপনার কিটিকে অমাবস্যার দিনে একাদশী করবার পরামর্শ দিচ্ছিলেন! চলুন তো আমায় রান্নাঘরটা একবার দেখিয়ে দেবেন।"

"কেন?" "আপনাকে অনেক দিন পরে রেঁধে খাইয়ে যাই,—নিন উঠুন।"

"রান্নাঘর এই পাশেই—এই দিক দিয়ে যেতে হয়; কিন্তু এখন তো কোন জিনিসের ব্যবস্থা নেই।"

"চাল ডাল আছে তো?" "তা আছে।"

"আলু কয়লা এ সব?" "তাও বোধ হয় আছে। চন্দ্রিকা তো মাসখানেকের জিনিস রেখে গেছ্‌ল।"

"তা হলেই হবে। আমি দুটো আলুভাতে ভাত চড়িয়ে দিইগে"—বলিয়া অনসূয়া উঠিল।

"সব বিশ্রী হয়ে আছে, কষ্ট হবে।"

"কিচ্ছু কষ্ট হবে না—আপনি চুপ করুন তো।"

"তবে এক কাজ বরং কর। তিন দিন চা খাওয়া হয়নি, তুমি বরং একটু চা করে খাওয়াও, ভাত থাক্।"

"আচ্ছা, আমি আগে চা করে আনি।"

জ্ঞানপ্রকাশ চেয়ারে বসিয়া ভাবিতে লাগিল। কিটি অনসূয়াকে সব ঘর-দুয়ার দেখাইয়া ফিরিতে লাগিল।

উঠানের এক পাশে উচ্ছিষ্ট খাদ্যস্পৃষ্ট তিন-চারখানা থালা, কয়েকটা বাটি ও গেলাস পড়িয়া আছে।

রান্নাঘরের দুয়ার খোলা। কয়েকটি হাঁড়ি উনানের পাশেই কাত হইয়া পড়িয়া আছে। একটা লোহার কেট্‌লি বারান্দায় পড়িয়া,—তাহার ঢাকনিটা উঠানে ছাই-গাদার উপর কি করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

অনসূয়া জ্ঞানপ্রকাশের দুঃখের কথা সবই জানিত। আঁচলে চোখ মুছিয়া সে চৌবাচ্চা হইতে জল লইয়া আগে ঘর-দুয়ার পরিষ্কার করিয়া লইল। কেট্‌লি বেশ করিয়া মাজিয়া উনান জ্বালিয়া পেয়ালা ধুইয়া দুই পেয়ালা জল চড়াইয়া দিল। গোয়ালা আসিয়া তাকের উপর যেমন দুধ রাখিয়া গিয়াছিল, তেমনি পড়িয়া ছিল। জল গরম হইতে হইতে টি-পট্‌টি খুঁজিয়া বাহির করিয়া পরিষ্কার করিল। তার পর জলে চা ছাড়িয়া দুধটুকু জ্বাল দিয়া লইয়া ক্ষিপ্রহস্তে চা প্রস্তুত করিয়া আনিল।

জ্ঞানপ্রকাশ চায়ের পাত্রে ধীরে ধীরে দুইটি চুমুক দিয়া বলিল—"সুন্দর হয়েছে, অনেক দিন এমন সুন্দর চা খাইনি।" সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানপ্রকাশের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল।

অনসূয়া কহিল—"কি রোগাই হয়েছেন আপনি!"

জ্ঞানপ্রকাশ মুখ তুলিয়া একবার ম্লান হাসি হাসিল। সঙ্গে সঙ্গে দুই ফোঁটা জলও তাহার চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ভাত আলুভাতে ও একটা তরকারী রাঁধিয়া অনসূয়া জ্ঞানপ্রকাশকে খাইতে দিল। যৎসামান্য খাইয়া জ্ঞানপ্রকাশ কিটিকে খাইতে দিল।

অনসূয়া কহিল—'এবার আমি যাই।'

জ্ঞানপ্রকাশ নতদৃষ্টি অনসূয়ার মুখপানে চাহিয়া বলিল—"আচ্ছা অনসূয়া, আবার যদি চন্দ্রিকা কখন চলে যায়, তোমায় কোথায় খবর পাঠাব—যদি এসে এমনি করে খাইয়ে যাও।"

অনসূয়া মৃদু হাসিয়া বলিল—"যদি এক মাসের মধ্যে খবর পাঠান তো ১৩৩নং আউধ গর্ব্বিতে খবর দেবেন; এর পরে হলে আমাদের বাড়ীতে—কুসুমপুরে।"

"কিন্তু তুমি শ্বশুরবাড়ী গেলে?—সেখানকার ঠিকানাটা কি?"

"সেটা ঠিক জানিনে—কারণ সেটা এখনও হয়নি।"

বলিয়া অনসূয়া একটু দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া পড়িল।

রাস্তায় নামিয়া তাহার সজল চক্ষুদুটি একবার বেশ করিয়া মুছিয়া লইয়া অনসূয়া পাশের পথ ধরিল।

৫

মাকে সব কথা বলিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া অনসূয়া পরদিন সকালে সকালে তাহার ছোট মাস্‌তুত ভাইটিকে সঙ্গে করিয়া জ্ঞানপ্রকাশের বাসায় আসিল।

অনসূয়ার মা এ সংবাদে বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন ও সারাদিন উন্মনা রহিলেন। বিজয়ার বিবাহের পর অনসূয়ার বিবাহের চেষ্টা হইতেই অনসূয়া মাকে কাঁদাইয়া জানাইয়াছিল, সে বিবাহ করিবে না। সমাজ কি বলিবে বলিয়া কিছু পীড়াপীড়ি করিলে সে মায়ের পা ধরিয়া জানাইয়াছিল যে, তাহার তো ভাই নাই যাহার জন্য সমাজকে মানিয়া চলিতে হইবে। মা আর সে ভগবানের নাম করিয়া জীবনটা কাটাইয়া দিলেই চলিবে। জ্ঞানপ্রকাশকে ভালবাসিয়াছিল বলিয়াই সে যে বিবাহ করিতে চাহিতেছে না—ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার মনে একটা ক্ষীণ আশা জাগিল, তাহা তিনি গোপনেই রাখিলেন।

অনসূয়া আসিয়া দেখিল জ্ঞানপ্রকাশ তখনও শুইয়া ও কিটি বসিয়া পাহারা দিতেছে। দুধ সকালে আসিবে কি না তাহার ঠিক নাই ভাবিয়া সে ছোট একটি বাটি করিয়া খানিকটা দুধ আনিয়াছিল। অনসূয়া বরাবর রান্নাঘরে গিয়া ঘর-দুয়ার পরিষ্কার করিয়া কিছু খাবার ও চা প্রস্তুত করিয়া আনিল।

জ্ঞানপ্রকাশকে ডাকিতে সে উঠিয়া বসিল। সকালেই অনসূয়াকে দেখিয়া সে বিস্মিত হইয়া বলিল—'কই, তুমি তো বলনি যে সকালে আস্‌বে!'

অনসূয়া উত্তর দিল—'না বল্‌লে আসতে নেই? এত দেরীতে ওঠেন কেন? এতে যে শরীর আরও খারাপ করে। কত রাত্তিরে শোন?' "ঠিক নেই।"

"কাল কত রাত্তিরে শুয়েছিলেন?" "দুটো তিন্‌টে হবে।"

"কি করছিলেন এতক্ষণ?" "গান।"

"সমস্তক্ষণ?" "হ্যাঁ।"

"কষ্ট হয় না?" "না,—না গাইলে বরং কষ্ট হয়।"

"তা এখন উঠুন, খাবারটুকু খেয়ে চা খেয়ে ফেলুন। আমি ততক্ষণ রান্নাটা চড়িয়ে দি। কিছু তরকারি কেবল আনিয়ে নিতে হবে—তা রঞ্জিৎ এনে দিতে পারবিনে?"

অনসূয়ার মাস্‌তুত ভাই রঞ্জিৎ। সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"খুব পারব। এই তো বাজার।"

জ্ঞানপ্রকাশ বলিল—"শুধু একটু চা দাও, আজ আর কিছু খাব না, শরীরটা ভাল নেই। মাথায় কি একটা যন্ত্রণা হচ্ছে।"

"কেন, অসুখ হয়েছে?—দেখি!" বলিয়া অনসূয়া জ্ঞানপ্রকাশের গায়ের উত্তাপ দেখিবার জন্য হাত বাড়াইয়া আবার কি ভাবিয়া হাত সরাইয়া লইল।

জ্ঞানপ্রকাশ একবার "উঃ" বলিয়া জোরে নিশ্বাস ফেলিল।

"আপনার কষ্ট হচ্ছে?" বলিয়া অনসূয়া জ্ঞানপ্রকাশের কপালে হাত দিয়া দেখিল—গাও গরম হইয়াছে।

"না, এ কিছু নয়, সেরে যাবে"—বলিয়া জ্ঞানপ্রকাশ মুখ ধুইবার জন্য উঠিতে গেল; কিন্তু মাথার যন্ত্রণায় "উঃ" বলিয়া শয্যার উপর শুইয়া পড়িল।

"থাক্, আপনি উঠ্‌বেন না"—বলিয়া ক্ষিপ্রহস্তে অনসূয়া মুখ ধুইবার জল আনিয়া জ্ঞানপ্রকাশের মুখ ধোয়াইয়া দিল।

শয্যায় শুইয়া শুইয়াই জ্ঞানপ্রকাশ চা পান করিল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে জ্বর খুব বাড়িয়া উঠিল। ডাক্তারের ব্যাগে থারমমিটার থাকে, তাহা অনসূয়া জানিত। অনসূয়া থারমমিটার বাহির করিয়া রোগীর উত্তাপ পরীক্ষা করিল;—দেখিল ১০৫ ডিগ্রি।

মাথায় জলপটি দিয়া অনসূয়া বাতাস করিতে লাগিল। আউধমহল্লায় একজন ডাক্তার থাকিতেন; অনসূয়া রঞ্জিৎকে তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দিল ও মাকে খবরটা দিয়া আসিতে বলিল।

খানিক পরে জ্ঞানপ্রকাশ চক্ষু মেলিয়া একবার চাহিল। অনসূয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কিছু বল্‌বেন?"

জ্ঞানপ্রকাশ বলিল—"ঐ ব্যাগটায় আমার ড্রয়ারের চাবি আছে। দরকার হলেই ড্রয়ার থেকে টাকা নিও। আর যদি অসুখ খুব বাড়ে—আমার জ্যাঠামশায়কে একটা তার করে দিও। আমার ডায়েরীতে ঠিকানা লেখা আছে।"

অনসূয়া বলিল—"আপনি ভাব্‌বেন না, শীগ্‌গির সেরে যাবে।"

"না, ভাবনার তো কিছু আর নেই।"

ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া গেলেন। ঔষধ লিখিয়া দিলেন। বাসায় পুরুষ কেহ না থাকায় রোগীর সম্বন্ধে কাহাকেও কিছু বলিতে পারিলেন না। অনসূয়া ভিজিট দিতে আসিলে বলিলেন—'বাইরের ওই লেখাটা আগে তুলে রেখে দিও মা। তখন ভিজিট নেব।"

অপরাহ্নে জ্বর আরও বাড়িল। রাত্রে কে থাকিবে, একা সে কি করিবে, যদি কিছু বিপদ ঘটে তো কাহার সাহায্য চাহিবে, এই সব কথা অনসূয়া ভাবিতেছে, এমন সময় একটা মুখ-বন্ধ হাঁড়ি ও একটা কাপড়ের পুঁটুলি হস্তে চন্দ্রিকা সিং আসিয়া উপস্থিত হইল।

প্রকাশের বিবাহের পূর্ব্বে ও পরেও অনসূয়াকে সে বার কয়েক দেখিয়াছে। প্রভুকে শয্যাগত দেখিয়া চন্দ্রিকা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

কখন অসুখ হইয়াছে, কখন অনসূয়া আসিয়াছে, যে চাকর সে রাখিয়া গিয়াছিল সে কোথায় গেল, এ ক'দিন প্রভুর কি করিয়া কাটিয়াছে, এ সমস্ত সংবাদ শুনিয়া চন্দ্রিকা কাঁদিয়া ফেলিল।

অনসূয়ার চোখেও জল আসিয়াছিল। তবু সে চন্দ্রিকাকে বুঝাইল—'এখন অধীর হইলে চলিবে না। অসুখ কাহার না হয়! চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় সারিয়া উঠিবেন।'

অনসূয়াকে চন্দ্রিকা ছাড়িয়া দিল না। হাত যোড় করিয়া কহিল—'একে তো আমি রোগের কিছুই বুঝি না, তার উপর বাবুর অসুখে আমার হাত পা উঠিতেছে না। আপনি না থাকিলে বাবু বাঁচিবেন না।'

অনসূয়া মায়ের অনুমতি লইয়া রহিয়া গেল।

পরদিন জ্ঞানপ্রকাশের জ্ঞান রহিল না। অনসূয়ার কথামত চন্দ্রিকা ডাকঘরে গিয়া শিবনাথের নামে তার করিয়া আসিল। চন্দ্রিকা, অনসূয়া ও কিটি এক প্রকার আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রোগীর কাছে বসিয়া রহিল। চন্দ্রিকা ও অনসূয়া তবু পালা করিয়া উঠিয়া স্নান করিয়া মুখে কিছু দিয়া আসিত, কিটি কিছুতেই সে ঘর ত্যাগ করিত না।

পরদিন অপরাহ্নে শিবনাথ একজন পরিচারক সঙ্গে করিয়া আসিয়া পৌঁছিলেন।

জ্ঞানপ্রকাশের অবস্থা দেখিয়া তিনি চোখের জল রাখিতে পারিলেন না। চন্দ্রিকা ও অনসূয়ার কাছে সব শুনিয়া বলিলেন—"জ্ঞানের বাড়ীতে জ্ঞানের পয়সায় আমরা রাজার হালে আছি, আর জ্ঞান এখানে এত কষ্ট পাচ্ছে;—রেঁধে দেবার একটা লোক নেই। ক্ষিদেয় ও কি না জল খেয়ে ক্ষিদে মেটায়?"

যিনি চিকিৎসা করিতেছিলেন তাঁহাকে ডাকান হইল। কাশীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তারকে আনানো হইল। শিবনাথ হাত যোড় করিয়া বলিলেন—"আপনারা দুই জনেই দেখুন।"

বৃদ্ধির মুখে রোগ কমে না। তার উপর শক্ত টাইপের [illegible]। অনসূয়া লজ্জা সংকোচ সব ভুলিয়া সর্ব্বক্ষ

শুশ্রূষায় রত রহিল। ডাক্তারেরা পর্য্যন্ত বলিতে লাগিলেন—যদি ইনি বাঁচেন এঁরই শুশ্রূষার গুণে। শুনিয়া অনসূয়ার মাথা লজ্জায় নত হইয়া পড়িত, চক্ষে অশ্রু দেখা দিত।

রোগীর জ্ঞানের লক্ষণ কেবল মাঝে মাঝে বুঝা যাইত। কখন কখন কেবল নাম করিত, জ্যাঠামশায়,—অনসূয়া—চন্দ্রিকা। এক এক দিন বলিত—"কিটি কিটি—খা।"

ঠিক পঁয়তাল্লিশ দিন পরে জ্ঞানপ্রকাশের জ্বর ত্যাগ হইল। তাহার স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। সে প্রথমেই ডাকিল "কিটি—কিটি!"

পথ্য পাইয়া যে দিন জ্ঞানপ্রকাশ উঠিয়া দাঁড়াইল, কিটির সে দিন স্ফুর্ত্তি দেখে কে? তাহার যেন সজীবতা ফিরিয়া আসিল। সে দিন আর বাড়ীতে একটা পাখীর পর্য্যন্ত বসিবার যো ছিল না।

অনসূয়া এক দিন জ্ঞানপ্রকাশকে পথ্য খাওয়াইয়া দিয়া সযত্নে তাহার মুখ মুছাইয়া বলিল—"উঃ! কি ভাবিয়েই তুলেছিলেন আপনি এবার! ভাগ্যে জ্যাঠামশায় সময় মত এসে পড়েছিলেন, তাই তো এত চিকিৎসার ব্যবস্থা হ'ল। নইলে কি হ'ত?"

জ্ঞানপ্রকাশ বলিল—'সুধু চিকিৎসায় হয়নি, অনসূয়া, তোমার শুশ্রূষার গুণেই প্রাণ ফিরে পেয়েছি। কিন্তু লাভ তো কিছু নেই এতে। আমার এতদিনকার চেষ্টা তুমি ব্যর্থ করে দিলে। সেই তো আবার দিনের পর রাত্রি আর রাত্রির পর দিন। আলো নেই, বাতাস নেই—যেন অন্ধকারে হাঁফিয়ে থাকা!'

অনসূয়া বলিল—'দেখুন, অসুখ থেকে সেরে উঠেছেন। এখন এ সব আর ভাব্‌বেন না। জীবনে কর্‌বার কত কাজ আছে। এক দিক থেকে অলাভ পেয়েছেন বলে চারিদিকে বিমুখ হয়ে থাকা আপনাকে শোভা পায় না। এবার থেকে শরীরের দিকে চাইবেন। আমরা তো কদিন পরেই চলে যাব। জ্যাঠামশায়ও তো বরাবর থাক্‌বেন না।'

(৬)

জ্ঞানপ্রকাশ খানিকক্ষণ আনমনা রহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কবে তুমি যাবে অনসূয়া?"

"আপনাকে আর একটু সুস্থ দেখ্‌লে দুইচার দিনের মধ্যেই যাব।——রাগ কর্‌লেন?"

"না রাগ কর্‌ব কেন? তুমি যা করেছ তা যথেষ্ট। তোমাকে কিসের জোরে ধরে রাখ্‌ব?"

অনসূয়ার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। কিন্তু সে মুখ খুলিল না।

জ্ঞানপ্রকাশ আবার বলিল—"দেখ অনসূয়া, কেউ দরদ্ করবার আছে, কেউ ভালবাস্‌বার আছে, আমি না থাক্‌লে কারু মন কাঁদবে—এ ভরসা না থাক্‌লে মানুষে বাঁচতে চায় না; জীবন তার কাছে মরণের চেয়ে ভয়ানক হয়ে ওঠে।"

অনসূয়া মাথা নত করিয়া বসিয়া ছিল। ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া বলিল—"আপনাকে দরদ কর্‌বার লোক তো আছে।"

"আছে বটে; জ্যাঠামশায়ের স্নেহ ভোলবার নয়। চন্দ্রিকা ও কিটির অনুরাগও কম নয়; কিন্তু মন যেন আরও কিছু চায়।"

"এ ছাড়াও এমন একজন আছে যে তোমাকে দেখ্‌লে সব ভুলে যায়।"—ভাবাবেগে অনসূয়ার বক্ষঃ তখন তোলপাড় করিতেছিল।

'আছে!—কে আছে অনসূয়া?'—জ্ঞানপ্রকাশের গলা তখন কাঁপিতেছিল।

অনসূয়া উত্তর দিতে পারিল না। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া ফেলিল।

আহত হৃদয়ে জ্ঞানপ্রকাশ অনসূয়ার বিগলিত অশ্রু-পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে অনসূয়ার একখানি হাত আপনার হাতের মধ্যে লইয়া বলিল—"অনসূয়া, আমাকে ক্ষমা কর। তোমাকে আমি চিন্‌তে পারিনি। কিন্তু তোমাকে আমি আর ছেড়ে দেব না। তোমার প্রতি আমি চির দিন অনুরক্ত, কিন্তু অন্য চক্ষে তোমাকে দেখেছিলাম। এখন ভাবি—তখন যদি ভুল পথে না যেতাম, তাহলে জীবনটা এমন হ'ত না।"

অনসূয়ার বহুদিনকার সঞ্চিত অশ্রু এতকাল পরে আজ ঝরিতে লাগিল। সে হাত সরাইয়া লইল না। একটি কথাও তাহার মুখে আসিল না। তাহার উদ্বেলিত হৃদয় বাক্য হারাইয়া ফেলিয়াছিল।

ঠিক এই সময়ে শিবনাথ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনসূয়া লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি হাত সরাইয়া লইতে,

তিনি বলিলেন—"বোস, মা, বোস, বুড়ো ছেলের কাছে লজ্জা কি মা!—হ্যাঁ একটা কথা বল্‌তে এলাম তোমাদের। আস্‌ছে সোমবারেই সবাই আমরা দেশে ফিরে যাচ্ছি। জ্ঞানকে আমি আর এমন করে ছেড়ে যাচ্ছি নে। এতদিন জ্ঞান, আমি তোমার সব কথা শুনে এসেছি; এবার তোমাকে দিন কতক আমার কথা শুন্‌তে হবে। আর মা অনসূয়া, তোমাকে আমি ছাড়্‌ছি না—এই সঙ্গে তোমাকে যেতে হবে; আর আস্‌তে দেব না। তুমি আমার জ্ঞানের গৃহলক্ষ্মী হবে। তোমার মার কাছে আমি এই অনুমতি নিয়ে আস্‌ছি। তাঁকেও সঙ্গে নিয়ে যাব। তিনি সঙ্গে না থাক্‌লে গৃহস্থালী কে দেখ্‌বে? আমি আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, তোমরা সুখী হবে।"

অনসূয়া ও জ্ঞানপ্রকাশ দুই জনে এক সঙ্গে উঠিয়া শিবনাথকে প্রণাম করিল। তাহাদের দুই জনের অশ্রু পূজার ফুলের মত পিতৃসম বৃদ্ধের চরণে নিবেদিত হইল।

শোক-সংবাদ

৺দক্ষিণাচরণ সেন

প্রসিদ্ধ যন্ত্র-সঙ্গীত-বিশারদ দক্ষিণাচরণ সেন মহাশয় আর ইহ জগতে নাই, যন্ত্র-সঙ্গীত ক্ষেত্র হইতে একজন প্রধান ব্যক্তির তিরোভাব হইল। এদেশে ঐকতান বাদনের

৺দক্ষিণাচরণ সেন

একটা নূতন পদ্ধতি দক্ষিণা বাবুই প্রচলিত করিয়াছিলেন; তাঁহার অনুসৃত স্বরলিপি এখনও গীতবাদ্য-শিক্ষার্থীর নিকট নিরহঙ্কার লোক অতি কমই দেখিতে পাওয়া যায়; যিনিই দক্ষিণা বাবুর সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তিনিই তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার শিষ্যসংখ্যাও বড় কম ছিল না, অনেককে তিনি যন্ত্র-সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন। আমরা দক্ষিণাবাবুর শোক-সন্তপ্ত আত্মীয়-স্বজনের গভীর শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

৺যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

বিগত ১লা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রথিত-নামা যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ৬৬ বৎসর বয়সে অকস্মাৎ সন্ন্যাসরোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবাতেই যজ্ঞেশ্বর বাবু জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। টড সাহেব কৃত 'রাজস্থানে'র বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া তিনি সাহিত্য-ক্ষেত্রে যশস্বী হইয়াছিলেন; তাঁহার রচিত 'বীরমালা' বাঙ্গালা সাহিত্যের একটী অমূল্য রত্ন। শেষ বয়সে তিনি কাশীমবাজার কলেজের বাঙ্গালা সাহিত্যের অধ্যাপকতা করেন এবং কাশীমবাজার হইতে প্রকাশিত 'উপাসনা' পত্রিকাও কয়েক বৎসর সম্পাদন করেন। ইনি কিছুদিন হইতে সভ্যতার 'ইতিহাস' প্রণয়নে ব্যাপৃত ছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উক্ত পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইবার পরেই তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন, পরবর্ত্তী খণ্ডগুলি আর প্রকাশিত হইল না। আমরা যজ্ঞেশ্বর বাবুর পরলোকগমন সংবাদে বড়ই ব্যথিত হইয়াছি। ভগবান তাঁহার সন্তানহীনা বিধবার হৃদয়ে

রবারাবৃত ক্যাম্বিসের ক্ষুদ্র নৌকায় ১২ ঘণ্টায় ৬০ মাইল অতিক্রম

বাগবাজার সুইমিং ক্লাবের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস একজনের বসিবার উপযুক্ত রবারাবৃত ক্যাম্বিসের ক্ষুদ্র নৌকাযোগে কলিকাতা হইতে ১২ ঘণ্টায় ৬০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া রাণাঘাটে পৌছিয়াছিলেন।

নৌকাখানি জার্ম্মাণদেশে নির্ম্মিত,—ইহা দৈর্ঘ্যে ১৩ ফুট প্রস্থে ২ ফুট ৪ ইঞ্চি, ও উর্দ্ধে ১১ ইঞ্চি মাত্র। উহার ওজন প্রায় অর্দ্ধ মণ। নৌকাখানি দুইটি থলিয়ায় খুলিয়া

রবারাবৃত ক্যাম্বিসের ক্ষুদ্র নৌকায় ১২ ঘণ্টায় ৬০ মাইল অতিক্রম

ভরা যায়, ইহাতে দুইটি পাল ও দু'দিকে টানিবার উপযুক্ত একটি দাঁড় আছে।

অমরেন্দ্র বাবু বেলা ২ ঘটিকার সময় নদীয়াভিমুখে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যা ৬টার সময় চারি ঘণ্টায় চুচুড়ায় পৌছান। পর দিবস বৈকাল ৫ ঘটিকায় পুনরায় যাত্রা করেন। তখন অনুকূল বায়ুযোগে তাঁহার নৌকাখানি ছুটিতে থাকে। …দাচ তিনি পাল তুলিয়াছিলেন। তাঁহার ছাতটিই অধিকাংশ স্থলে পালের কার্য্য করিয়াছিল। সন্ধ্যায় ত্রিবেণী অতিক্রম করিবার পরই প্রবল ভাটায় তাড়িত হইয়া ক্ষুদ্র নৌকাখানি পশ্চিমকূলে নসরায়ের নিকটবর্ত্তী মুনো গ্রামের সন্নিকটে উপস্থিত হইলে, অমরেন্দ্রবাবু নৌকাখানিকে জল হইতে টানিয়া তুলিয়া স্থানীয় জমীদার বাটীতে আতিথ্য স্বীকার করেন। পরদিন প্রাতে তিনি পুনরায় রওনা হইয়া, প্রতিকূল বায়ুতে ক্রমান্বয়ে দাঁড় টানিয়া বেলা প্রায় ৯৷৷০টার সময় জিরাটে অবতরণ করেন। সেই দিবসই বেলা ৫টার সময় আবার রওনা হইয়া সন্ধ্যার সময় চূর্ণী নদীতে প্রবেশ করিয়া রাত্রি ৮৷২০ মিনিটের সময়—রাণাঘাটে পৌছিয়াছিলেন। এবার হাওয়া বা স্রোত না থাকায় তাঁহাকে বরাবর দাঁড় টানিতে হইয়াছিল।০ রাণাঘাট হইতে নৌকাখানি ব্যাগে ভরিয়া তিনি ট্রেণযোগে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

সাময়িকী

এই আষাঢ় মাসে 'ভারতবর্ষ' ত্রয়োদশ বৎসরে পদার্পণ করিল। আজ তাই সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা ভগবানের নাম স্মরণ করি। তাহার পরই 'ভারতবর্ষে'র প্রতিষ্ঠাতা পরলোকগত দ্বিজেন্দ্রলালের নাম স্মরণ করি। শ্রীভগবানের কৃপা ও দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেরণাই 'ভারতবর্ষ'কে এই এক যুগ বঙ্গবাণীর সেবায় নিয়োজিত রাখিয়াছে; 'ভারতবর্ষ' যে যথেষ্ট জনাদর লাভ করিয়াছে, তাহা ভগবানেরই আশীর্ব্বাদে; আমরা নিমিত্ত মাত্র। দ্বিজেন্দ্রলালের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যের অকৃত্রিম সেবকবৃন্দের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করিয়া আমরা এই সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর বাঙ্গালা-সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিলাম। যোগ্যতার স্পর্দ্ধা কোন দিন করি নাই; বাঙ্গালা-সাহিত্যের সেবাই আমাদের ব্রত; আমরা সেবা করিবারই অধিকারী, কর্ম্ম করিবারই অধিকারী; কর্ম্মের ফলের দিকে কোনদিন আমরা লোলুপ দৃষ্টিপাত করি নাই, জয়-পরাজয়ের কথা এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবি নাই, প্রতি-যোগিতার কথা কোন দিনই আমাদের মনে আসে নাই। আজ তাই এই ত্রয়োদশ বৎসরের দ্বারে দাঁড়াইয়া আমাদের শুভানুধ্যায়ী বন্ধুবান্ধব, আমাদের গ্রাহক অনুগ্রাহক, আমাদের সুযোগ্য সহযোগীবৃন্দকে যথাযোগ্য প্রণাম, নমস্কার ও অভিবাদন করিয়া আমরা 'ভারতবর্ষ'কে ত্রয়োদশ বর্ষে অভিষিক্ত করিলাম। এই দ্বাদশ বৎসর আমরা যত্ন চেষ্টা অর্থ ব্যয়ের ক্রটী করি নাই, নিজেদের শক্তি সামর্থ্য 'ভারতবর্ষে'র সেবায় নিয়োজিত করিয়াছি; এখনও তাহাই করিব—সাফল্য অসাফল্যের কথা কোন দিন ভাবিও নাই, ভাবিবও না।

এই মাসের প্রচ্ছদ-পটে যাঁহার প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইল, তিনি সর্ব্বজন-পরিচিত 'মেঘনাদ-বধ'-কাব্য রচয়িতা, মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত,—যিনি একদিন গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিলেন—

"——রচিব মধুচক্র গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

এবার 'সাময়িকী'র প্রধান কথা দেশপূজ্য মহাত্মা গান্ধীর বাঙ্গালা দেশে ভ্রমণ। সেই যে ফরিদপুরের প্রাদেশিক সম্মেলন উপলক্ষে মহাত্মা গান্ধী বাঙ্গলা দেশে আগমন করিয়াছেন, সেই হইতে তিনি বাঙ্গালা দেশেই আছেন এবং আরও মাসাধিক কাল থাকিবেন। এই সুদীর্ঘ সময় তিনি কলিকাতায় বসিয়া দেশের খবর সংগ্রহ করেন নাই, পরের মুখে ঝাল খান নাই; এই দুর্ব্বল শরীরে তিনি বাঙ্গালা দেশের প্রধান প্রধান সহরে, নগরে, গ্রামে ভ্রমণ করিয়াছেন। এখনও সে ভ্রমণের শেষ হয় নাই, এখনও তাঁহাকে আরও অনেক স্থানে যাইতে হইবে, অনেক স্থানের অসংখ্য নরনারীকে দর্শন দিতে হইবে। তাঁহার আগমনে বাঙ্গালা দেশের মধ্যে একটা উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছে। এ উত্তেজনা সুধু শিক্ষিত বাঙ্গালী নরনারীর মধ্যেই আবদ্ধ নহে, দেশের জনসাধারণ, আবালবৃদ্ধবণিতা মহাত্মাজীর দর্শন লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা অশিক্ষিত, সাধারণ লোক, যাহারা সমাজে অবজ্ঞাত, যাহারা দিনমজুরী করিয়া কোন প্রকারে জীবন অতিবাহিত করিয়া আসিতেছে, তাহাদের মধ্যেই যেন মহাত্মার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশের যেখানেই তিনি গিয়াছেন, সেখানেই হাজার হাজার নরনারী তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য, তাঁহার মুখের একটী কথা শুনিবার জন্য দূর গ্রাম হইতে ছুটিয়া আসিয়াছে। আর কি শক্তি এই দুর্ব্বল-শরীর মহাত্মা গান্ধীর। তিনি বিশ্রাম কাহাকে বলে তাহা জানেন না, কৌপীনধারী নগ্নদেহ, নগ্নপদ সন্ন্যাসী প্রফুল্ল মুখে প্রতিদিন গ্রামে গ্রামে ছুটিয়া বেড়াইতেছেন,—ক্লান্তি নাই, অবসাদ নাই!

মহাত্মা গান্ধী এবার বাঙ্গালা দেশে রাজনীতি প্রচার করিতে আইসেন নাই। এই যে মাসাধিক কাল তিনি বাঙ্গালা দেশের গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিলেন এবং পরে আরও করিবেন, ইহার মধ্যে এক দিনও তিনি নন-কো-অপারেসন, কাউন্সিল প্রবেশ, রিফরম ব্যবস্থা প্রভৃতি কোন কথাই বলেন নাই; এমন কি রাজনীতি-ক্ষেত্রের মহারথী

বৃদ্ধ সার সুরেন্দ্রনাথের সহিত বারাকপুরে সুদীর্ঘ সময় কথোপকথনের মধ্যেও তিনি রাজনীতি সম্বন্ধে কোন আলাপ করেন নাই ; বাঙ্গালার নানা স্থানে তাঁহাকে বোধ হয় শতাধিক বক্তৃতা করিতে হইয়াছে ; কিন্তু কোথাও একবারও তিনি রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে একটী কথাও বলেন নাই। তাঁহার বাণী এবার "চরকা, অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন ও হিন্দু-মুসলমানের মিলন।" আর কোন কথা নাই ; যেখানে গিয়াছেন, যত কথা বলিয়াছেন, তাহার সার কথা 'চরকা ঘুরাও, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন কর, হিন্দু-মুসলমানে মিলিত হও, আমার আর কোন কথা নাই, আর কোন উপদেশ নাই।' এখন চরকা, খদ্দর, অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন, হিন্দু মুসলমানের মিলনই তাঁহার জপ-তপ হইয়াছে, এক মনে তিনি সেই মন্ত্রই জপ করিতেছেন, সকলকে তিনি সেই মন্ত্রই দান করিতেছেন। যেখানে তিনি যাইতেছেন, সেখানেই দেখিতেছেন চরকা চলিতেছে কি না, লোকে খদ্দর ব্যবহার করিতেছে কি না। তিনি বলিতে চান, চরকাতেই ভারতের মুক্তি হইবে, অস্পৃশ্যতাবর্জ্জনেই ভারতের উন্নতি হইবে, হিন্দু-মুসলমানে মিলনেই ভারতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। বাঙ্গালা দেশ কি মহাত্মার এই মন্ত্র গ্রহণ করিবে ?

আমাদের সরকার বাহাদুর ভারতবর্ষে দুইবার উপাধি বর্ষণ করেন,—একবার ইংরাজী নববর্ষের প্রথম দিনে, আর একবার মহামহিম ভারত সম্রাটের জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে। বৎসরের এই দুই দিনই অনেক লোক শিমলা শৈলের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকেন। দেশে উপাধি লোলুপের সংখ্যাও বড় কম নহে। এই দুইদিনে কেহ বা আনন্দে উৎফুল্ল হন, কেহ বা বিষাদে অবসন্ন হন, আবার কেহ বা ভাবেন 'আজকে বিফল হোলো, হ'তে পারে কা'ল।' এবারও বিগত ৩রা জুন মহামহিম ভারত সম্রাটের জন্মতিথি উপলক্ষে ভারতবর্ষে উপাধি বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এ বর্ষণে বাঙ্গালা দেশ প্লাবিত হয় নাই,—অমনি দুই এক ফোঁটা মাত্র পড়িয়াছে। সাহেব-সুবাদের কথা ছাড়িয়া দিই, লাট-বেলাটের কথাও বলিয়া কাজ নাই। বাঙ্গালীর মধ্যে যাঁহারা উপাধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই মধ্যে দুই চারিজনের নাম উল্লেখ করিব। মহীশূরের দেওয়ান এল্‌বিয়ন রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালার বাহিরের হইলেও বাঙ্গালী ত, সুতরাং তাঁহাকে 'সার' উপাধিতে ভূষিত দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইবেন। 'সার' অব্‌দুর রহিম বাঙ্গলার মজলিসের প্রধান মেম্বর ; আইন অনুসারে তিনিই নাকি কয়েক মাসের জন্য বাঙ্গালার লাট হইবার হক্‌দার ছিলেন। তাহা হয় নাই ; তাহার বদলে তিনি এবার কে-সি-এস-আই হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়কে 'সার' উপাধি দিলেই ঠিক মানাইত, কিন্তু তিনি হইয়াছেন সি-আই-ই। সকলে বলিতেছে এই সবে আরম্ভ। তাহাই হউক। বাঙ্গালার সাহিত্য-সেবকদিগের মধ্যে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু, বৈজ্ঞানিক-প্রবর শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয় 'রায় সাহেব' হইয়াছেন। তাঁহার ন্যায় খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকের পক্ষে এই উপাধি যে শোভন হয় নাই, ইহা সকলেই বলিতেছেন। খুলনা মহেশ্বর পাশার প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীমান শশিভূষণ পাল 'রায় সাহেব' হইয়াছেন ; আনন্দের কথা। বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের লাইব্রেরিয়ান শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত মহাশয়ও 'রায় সাহেব' হইয়াছেন। সাহিত্যিক হিসাবে অক্ষয় বাবুর উচ্চতর উপাধি লাভ করা উচিত ছিল। আর যাঁহারা উপাধি পাইয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই সরকারী আহারী বা অনাহারী কর্ম্মচারী ; তাঁহাদের মঙ্গল হউক।

সন্ন্যাসিনী শ্রীশ্রীগৌরী মাতা প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম ও অবৈতনিক হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় অন্যূন ২৮ বৎসর যাবৎ মাতৃজাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া আসিতেছে। এই আশ্রম ২২।৬ বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, শ্যামবাজারে প্রতিষ্ঠিত। আশ্রমে প্রায় ত্রিশটি অনাথা বালিকাকে বাসস্থান, খোরাক, পোষাক ও শিক্ষাদান নিঃস্বার্থভাবে দেওয়া হয়। অভিভাবক যাহাদের সম্পূর্ণ ব্যয় নির্ব্বাহ করেন এমন অনেক বালিকাও এখানে শিক্ষা লাভ করিতেছেন। ধর্ম্ম-চর্চ্চা এবং লেখা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চরকা, তাঁত, সেলাই, রন্ধন ও যাবতীয় গৃহ কর্ম্মাদি প্রতিশক্তের সহিত শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ে বাহিরের ছাত্রীগণও এখানে প্রত্যহ শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। এই

বিদ্যালয় হইতেই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। তা ছাড়া আশ্রমবাসিনী মেয়েরা সংস্কৃত ও ইংরেজীতে উচ্চ শিক্ষা যাহাতে লাভ করিতে পারেন, সেরূপ বিশেষ বন্দোবস্তও আছে। ইতিমধ্যেই কয়েকটি কুমারী ব্যাকরণে উপাধি লাভ করিয়াছেন এবং সাংখ্যের আদ্য ও মধ্য পরীক্ষা দিয়াছেন। একজন বি-এ, পাশ করিয়াছেন এবং কয়েকজন আই-এ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন। এতদিন এই দীর্ঘকাল স্থায়ী অনুষ্ঠানটি ভাড়াটে বাড়ীতেই অবস্থান করিতেছিল; সম্প্রতি নিজস্ব ত্রিতল বাড়ী নির্ম্মিত হওয়ায় তথায়ই শৃঙ্খলার সহিত আশ্রম ও বিদ্যালয়ের কার্য্যাদি সম্পাদিত হইতেছে। বাড়ী নির্ম্মাণ কার্য্যে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। গৃহ-নির্ম্মাণ ভাণ্ডারে এ পর্য্যন্ত যত টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, তার উপর আরো ১৫০০০৲ হাজার টাকা উঠিলে অনুষ্ঠানটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইতে পারে।

আশ্রম-সম্পাদিকা শ্রীদুর্গাপুরী দেবী বি-এ, ব্যাকরণতীর্থ। আশ্রম-প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীশ্রীগৌরীমা। প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শ্রীতপাপুরী দেবী ব্যাকরণতীর্থা

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল প্রণীত নূতন উপন্যাস "পিতা-পুত্র" প্রকাশিত হইল; মূল্য—১৷৹

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত নূতন উপন্যাস "বিসর্জ্জন" প্রকাশিত হইল; মূল্য—১৷৹

রায় শ্রীতারকনাথ সাধু বাহাদুর সি. আই. ই. প্রণীত নূতন উপন্যাস "ঋণ-মোক্ষ" প্রকাশিত হইল; মূল্য—২৲

কাব্যকুসুমাঞ্জলি রচয়িত্রী শ্রীমতী মানকুমারী বসু প্রণীত "বীরকুমার-বধ কাব্য" (নূতন সংস্করণ) প্রকাশিত হইল; মূল্য—১৷৷৹

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত রহস্য-লহরী সিরিজের নবম উপন্যাস "ছদ্মনন্দিরে দস্যুলীলা" ও দশম উপন্যাস "জোড়া ডিটেকটিভ" প্রকাশিত হইয়াছে; প্রত্যেকের মূল্য—৸৹

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "সাধন-মন্দির" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য—২৷৷৹

শ্রীহেমমালা বসু প্রণীত কাব্য "রাবেয়া" প্রকাশিত হইল;—১৷৷৹

শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "ভবেশ" প্রকাশিত হইল; মূল্য—২৷৷৹

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ প্রণীত উপন্যাস "নিবক্ষরা" প্রকাশিত হইল; মূল্য—১৷৷৹

শ্রীরামহরি ভট্টাচার্য্য প্রণীত "বাঁচিবার উপায়" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য—১৲

শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত "একলব্য" নাটক প্রকাশিত হইল; মূল্য—১৷৷৹

শ্রীসঞ্জীব চৌধুরী এম-এ প্রণীত "জঙ্গ বাহাদুর" নাটক প্রকাশিত হইল; মূল্য—১৷৹

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত রঙ্গনাট্য "ওলোট-পালোট"এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল; মূল্য—।৵৹

Publisher—**Sudhanshusekhar Chatterjea.**
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,

Printer—**Narendranath Kunar,**
The Bharatvarsha Printing Works,

শ্রাবণ, ১৩৩২

প্রথম খণ্ড | ত্রয়োদশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

শঙ্কর ও রামানুজ

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ

শঙ্করাচার্য্যের মতে ব্রহ্ম নির্গুণ নির্বিশেষ। শুভ বা অশুভ কোন প্রকার গুণ তাঁহার নাই। ঈশ্বরকে দয়ালু ও সর্বশক্তিমান বলা হয় বটে, কিন্তু ঈশ্বর ও ব্রহ্ম এক নহেন। মায়াযুক্ত ব্রহ্মকে ঈশ্বর কহে। কাচের কোন বর্ণ নাই; কিন্তু নিকটে যদি জবাফুল থাকে, তাহা হইলে কাচকে লালবর্ণের বলিয়া বোধ হয়। সেইরূপ ব্রহ্মের কোন গুণ নাই, কিন্তু মায়ার সান্নিধ্য বশতঃ ব্রহ্মকে সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়। জবাফুলকে কাচের উপাধি এবং মায়াকে ব্রহ্মের উপাধি বলা হয়। ব্রহ্মের যেমন কোন গুণ নাই, সেইরূপ ব্রহ্মকে কোন বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না, অর্থাৎ ইহা বলা যায় না যে ব্রহ্ম এই প্রকারের।

অস্থূলমনণু অহ্রস্বমদীর্ঘং

তাঁহাকে স্থূল বা সূক্ষ্ম, হ্রস্ব বা দীর্ঘ বলা যায় না।

রামানুজ কিন্তু এ কথা স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে ব্রহ্ম অসংখ্য কল্যাণগণের আধার এবং সকলপ্রকার দোষবর্জিত। ঈশ্বর এবং ব্রহ্মে কোন প্রভেদ নাই। ব্রহ্ম নির্গুণও নহেন, নির্বিশেষও নহেন। রামানুজের মতে নির্বিশেষ বস্তু হইতেই পারে না। কারণ নির্বিশেষ বস্তু সম্বন্ধে কোন প্রমাণ প্রযোগ করা যায় না। সকল প্রমাণ সবিশেষ বস্তু প্রতিপাদন করে। এ কথাও বলিতে পার না যে, নির্বিশেষ বস্তু সম্বন্ধে প্রমাণ প্রয়োগ করা না যাইতে পারে; কিন্তু এরূপ বস্তু অনুভব করা যায়। কারণ সকল অনুভব সবিশেষ। সবিশেষ অনুভব হইতে নির্বিশেষ অনুভব নিষ্কর্ষণ করিবার যতই চেষ্টা কর, তাহার মধ্যে কিছু বিশিষ্টতা থাকিয়া যাইবেই,— অর্থাৎ সে অনুভব সবিশেষই থাকিবে। শব্দময় বেদ দ্বারা নির্বিশেষ ব্রহ্ম প্রতিপন্ন হইতে পারে না, কারণ শব্দ সবিশেষ বস্তুকেই বোঝায়, নির্বিশেষ বস্তু বুঝাইবার শব্দের কোন সামর্থ্য নাই।

রামানুজের মতে বেদান্ত বাক্য সকল নির্বিশেষ নির্গুণ ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করে না; সবিশেষ সগুণ ব্রহ্মকেই

প্রতিপাদন করে। জগৎ-সৃষ্টি সম্বন্ধে উপনিষদ বলিয়াছেন,—

সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং

তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয় তত্তেজোঽসৃজত ইত্যাদি

"হে সৌম্য, পূর্বে সেই একমাত্র সৎ ব্রহ্মই ছিলেন, আর কিছুই ছিল না; তিনি ইচ্ছা করিলেন 'আমি বহু হইব, সৃষ্টি করিব'; তিনি তেজ (অগ্নি) সৃষ্টি করিলেন" এই শ্রুতি-বাক্য হইতে বুঝা যায় যে, ব্রহ্মই জগতের উপাদান, এবং যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই সৃষ্টি করিতে পারেন। অর্থাৎ ব্রহ্মের জগদুপাদানত্ব, সর্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি গুণ আছে। অতএব শ্রুতি-বাক্য নির্গুণ ব্রহ্ম প্রতিপাদন করেন না, সগুণ ব্রহ্ম প্রতিপাদন করেন।

শ্রুতি বলিয়াছেন—

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম

শঙ্করাচার্য্য বলেন যে এখানে সত্য, জ্ঞান এবং অনন্তকে ব্রহ্মের গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয় নাই, ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, অর্থাৎ যাহা সত্য তাহাই ব্রহ্ম, যাহা জ্ঞান তাহাই ব্রহ্ম, যাহা অনন্ত তাহাই ব্রহ্ম। কিন্তু রামানুজ বলেন তাহা নহে। এখানে সত্য জ্ঞান এবং অসীমতাকে ব্রহ্মের গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত সকলেই যদি এক বস্তুকেই (ব্রহ্মকেই) বুঝাইত, তাহা হইলে সত্য শব্দের অর্থ এবং জ্ঞান শব্দের অর্থ এক হইত, কিন্তু তাহা নহে। অতএব সত্য, জ্ঞান প্রভৃতি ব্রহ্মের বিশেষণ।

শ্রুতিতে ব্রহ্মকে কোথাও নির্গুণ বলা হইয়াছে, কোথাও সগুণ বলা হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য বলেন নির্গুণবাচক শ্রুতি ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করে, সগুণবাচক শ্রুতি মায়ারূপ উপাধিযুক্ত ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে। অর্থাৎ নির্গুণবাচক শ্রুতি-ই ঠিক; সগুণবাচক শ্রুতি ঠিক নহে। রামানুজের মতে সগুণবাচক শ্রুতি এবং নির্গুণবাচক শ্রুতি উভয়ই ব্রহ্মের স্বরূপকে লক্ষ্য করিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে। সগুণবাচক শ্রুতি হইতে জানা যায়, ব্রহ্ম অনন্ত রকমের কল্যাণগুণযুক্ত; নির্গুণবাচক শ্রুতির উদ্দেশ্য ব্রহ্মে কোন নিকৃষ্ট গুণের লেশমাত্রও নাই। রামানুজ বলেন যে, কতকগুলি শ্রুতি গ্রহণ করিয়া, অপর কতকগুলি পরিত্যাগ করা ঠিক নহে। শ্রুতি যে ব্রহ্মকে কল্যাণগুণযুক্ত এবং নিকৃষ্টগুণরহিত বলিয়া প্রতিপাদন করেন, তাহা নিম্নলিখিত শ্রুতি-বাক্য হইতে বুঝিতে পারা যাইবে—

এষ আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো

বিজিঘিৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ

"এই আত্মার পাপ নাই, জরা মৃত্যু ও শোক নাই, ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই; ইনি সত্যকাম এবং সত্যসংকল্প।" এখানে ব্রহ্মে নিকৃষ্ট গুণগুলি নিষেধ করিয়া উৎকৃষ্ট গুণগুলি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অতএব যেখানে কেবল সগুণবাচক শ্রুতি আছে তাহার উদ্দেশ্য যে, ব্রহ্ম কল্যাণগুণযুক্ত; যেখানে কেবল নির্গুণবাচক শ্রুতি আছে তাহার উদ্দেশ্য ব্রহ্ম দোষরহিত।

শঙ্করাচার্য্য বলেন ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা; আমাদের যে মনে হয় বিশাল বিচিত্র জগৎ রহিয়াছে তাহা মনের ভ্রম; একমাত্র ব্রহ্মই আছেন আর কিছুই নাই। রামানুজ ইহা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন শ্রুতিতে নানা স্থানে জগৎ-সৃষ্টির কথা আছে। জগৎ যদি মনের ভ্রম হইবে, তাহা হইলে এই সকল শ্রুতি-বাক্য নিরর্থক বলিতে হইবে। ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া কোন কোন স্থলে বলা হইয়াছে বটে "তুমিই সত্য" "তুমিই পরমার্থ।" তাহার উদ্দেশ্য এরূপ নহে যে জগৎ মিথ্যা। উদ্দেশ্য এই যে জগতের যাবতীয় বস্তু ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, ব্রহ্মেই অবস্থান করে এবং ব্রহ্মেই বিলীন হয়; অতএব সকল বস্তুই ব্রহ্মাত্মক; অতএব ব্রহ্ম ভিন্ন কিছু নাই। জগৎকে যেখানে "নাস্তি" বলা হইয়াছে, সেখানে উদ্দেশ্য এই যে জগৎ বিনাশশীল, জগতের প্রতি বস্তুর প্রতিক্ষণেই পরিবর্ত্তন হইতেছে। যাহার আদি অন্ত নাই, যাহা সবদা একরূপ, যাহার কখনও বিনাশ হয় না, সেইরূপ বস্তুকেই অস্তি বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম ও জীব সেরূপ বস্তু, এজন্য তাহাকে অস্তি বলা হইয়াছে। জগৎ সেরূপ বস্তু নহে, এজন্য তাহাকে নাস্তি বলা হইয়াছে।

জগৎ যদি মিথ্যা, তাহা হইলে জগৎ আছে এইরূপ ভ্রম হয় কেন? শঙ্করাচার্য্য বলেন, অবিদ্যার ফলে এইরূপ ভ্রম উৎপন্ন হয়। এই অবিদ্যার অপর নাম অজ্ঞান বা মায়া। ইহা কিরূপ বস্তু তাহার পরিচয় দিবার সময়

শঙ্করাচার্য্য বলেন, ইহা সৎ নহে, কারণ ব্রহ্মই একমাত্র সত্যবস্তু; আবার ইহা আকাশ-কুসুমের ন্যায় অসৎও নহে; ইহা জ্ঞানের অভাব মাত্র নহে, ইহা ভাবরূপ বস্তু অর্থাৎ জ্ঞানের অভাবকে অজ্ঞান বলা হয় না, অজ্ঞান বলিয়া একটা বস্তু আছে; ইহার স্বরূপ অনির্বচনীয়। এই অবিদ্যার প্রভাবে জীব বুঝিতে পারে না যে সে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, কারণ এই অবিদ্যা ব্রহ্মকে আবরণ করিয়া থাকে।

রামানুজ এই প্রকারের অবিদ্যা বা অজ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, এমন কোন বস্তু থাকিতে পারে না, যাহা সৎও নহে, অসৎও নহে; সকল বস্তুই হয় সৎ, নয় অসৎ। রামানুজ যে অবিদ্যা স্বীকার করেন তাহা ভিন্ন প্রকারের,—তাহা জীবের পূর্বকৃত কর্মের ফল। এই অবিদ্যা হেতু জীব ব্রহ্মকে অনুভব করিতে পারে না এবং সংসারে কষ্ট পাইয়া থাকে। এই অবিদ্যা ব্যতীত মায়াকেও রামানুজ স্বীকার করেন; সেই মায়া ব্রহ্মের শক্তি; তাহা সত্য বস্তু।

শঙ্করের মতে মায়া ও অবিদ্যা এক বস্তু, যাহা হইতে জগৎ ভ্রম উৎপন্ন হয়। রামানুজের মতে মায়া ও অবিদ্যা ভিন্ন বস্তু; ঈশ্বরের শক্তির নাম মায়া, জীবের পূর্বকৃত কর্মের ফল অবিদ্যা, এই অবিদ্যা জীবের চক্ষু হইতে ব্রহ্মকে আবরণ করিয়া রাখে।

শঙ্করাচার্য্যের মতে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, অতএব সকল জীব এক বস্তু। রামানুজ বলেন জীব ও ব্রহ্ম এক নহে, জীবসকল পরস্পর বিভিন্ন। শঙ্করাচার্য্য বলেন জীব—এবং ব্রহ্মের—স্বরূপ অনুভূতি মাত্র। অর্থাৎ আত্মা জ্ঞাতা নহে, জ্ঞানস্বরূপ, অনুভবিতা নহে, অনুভূতি মাত্র। রামানুজ বলেন আত্মা জ্ঞাতা এবং অনুভবিতা। শঙ্করাচার্য্য বলেন জ্ঞাতৃত্ব অহঙ্কারের ধর্ম্ম। রামানুজ বলেন জ্ঞাতৃত্ব আত্মার ধর্ম। শঙ্করাচার্য্য বলেন অহং জ্ঞান, অর্থাৎ "আমি" এইরূপ বোধ, আত্মার ধর্ম নহে, অহঙ্কারের ধর্ম; ইহা মিথ্যা জ্ঞান, মোক্ষ অবস্থায় অহং জ্ঞান থাকে না। রামানুজ বলেন দেহকে অহং বলিয়া মনে করা মিথ্যা জ্ঞান, ইহা অহঙ্কারের ধর্ম; কিন্তু দেহব্যতিরিক্ত আত্মাকে অহং মনে করা সত্য জ্ঞান, মোক্ষ অবস্থাতেও এরূপ অহং জ্ঞান থাকে। ভগবানেরও এরূপ অহং জ্ঞান আছে। গীতায় শ্রীভগবান বহুবার নিজকে অহং বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রামানুজ আরও বলেন যে, মোক্ষ অবস্থায় যদি অহং জ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে আত্মার বিনাশ হইত এবং সেরূপ মোক্ষ কেহ চাহিত না।

শঙ্করাচার্য্যের মতে মোক্ষ হইলে জীব ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায়; রামানুজের মতে মোক্ষ হইলেও জীব ব্রহ্মের সহিত এক হয় না, তবে ব্রহ্মের দর্শন পায় এবং নিরন্তর ব্রহ্মানন্দ অনুভব করে।

রামানুজ বলেন, সকল আত্মার স্বরূপ জ্ঞানাকার; এজন্য শাস্ত্রে কোন কোন স্থানে সকল আত্মাকে এক বলা হইয়াছে; কিন্তু বিভিন্ন জীবের আত্মা বিভিন্ন, এবং পরমাত্মা সকল জীবাত্মা হইতে ভিন্ন। পরমাত্মা সকল জীবের মধ্যে অন্তর্যামীরূপে বর্ত্তমান আছেন বলিয়া বেদে কোন কোন স্থানে জীবকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, যেমন তৎ ত্বম্ অসি। কিন্তু অন্যত্র জীব ও ব্রহ্মের ভেদ স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে; যেমন

> দ্বা সুপর্ণা সযুজা সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে
> তয়োরেকঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি
> অনশ্নন্নন্যো ইভিচাকশীতি

"একটী বৃক্ষে দুইটি সুন্দর পক্ষযুক্ত পক্ষী থাকে। একটী পাখী স্বাদু ফল ভক্ষণ করে, অপরটি ভক্ষণ না করিয়া অবলোকন করে। একটী পক্ষী জীবাত্মা, অপরটি পরমাত্মা; জীব কর্ম্মফল ভোগ করে; পরমাত্মা ফল ভোগ করেন না, সাক্ষীরূপে অবস্থান করেন।"

অবিদ্যা বা অজ্ঞানের নিবৃত্তি দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়, এবং ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়, এ বিষয়ে রামানুজ এবং শঙ্করাচার্য্যের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার উপায় কি, এ বিষয়ে কিছু মতভেদ আছে। শঙ্করাচার্য্য শ্রুতিবাক্য শ্রবণ ও বিচারকে প্রধান উপায় বলেন, রামানুজ উপাসনাকে প্রধান উপায় বলেন। উপাসনা যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সহায়ক তাহা শঙ্করাচার্য্যও স্বীকার করেন। তিনি বলেন যে উপাসনা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়, চিত্ত শুদ্ধ হইলে তাহাতে সহজে জ্ঞানের প্রকাশ হয়; কিন্তু জ্ঞানের উৎপত্তি হয় শ্রুতিবাক্য শ্রবণ করিয়া। রামানুজ বলেন, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় ব্রহ্মকে উপাসনা করা। রামানুজ আরও বলেন যে, ব্রহ্মজ্ঞান হইতেছে উপাসনাত্মক। অর্থাৎ বাক্য শুনিয়া

যে বাক্যার্থ জ্ঞান হয়, ব্রহ্মজ্ঞান তাহা নহে ; কারণ তাহা হইলে শাস্ত্রে ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে বিধান দিবার কোন প্রয়োজন থাকিত না। বাক্য শুনিলেই ত তাহার অর্থজ্ঞান হয়, তাহার জন্য বিধানের প্রয়োজন কি? অধিকন্তু বাক্যার্থ জ্ঞান হইলে অবিদ্যার নিবৃত্তি হয় না ইহা সুবিদিত। অতএব শাস্ত্রে যে আছে ব্রহ্মকে জানিবে, তাহার অর্থ ব্রহ্মকে উপাসনা করিবে। সে উপাসনা তৈল-ধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন স্মৃতিধারা রূপ ধ্রুবস্মৃতি। এই ধ্রুবস্মৃতি এবং দর্শন একই বস্তু। ইহাকেই আবার ভক্তি বলা হয়। এই জ্ঞান বা ভক্তির সাধন যজ্ঞাদি কর্ম। অতএব জ্ঞানের জন্য কর্ম প্রয়োজন (শঙ্করাচার্য্যের মতে জ্ঞানের জন্য কর্ম প্রয়োজন নহে), সৎকর্ম দ্বারা জ্ঞানের বিরোধি পাপের বিনাশ হয়।

শঙ্করাচার্য্য এবং রামানুজ উভয়ের মধ্যে প্রধান কতকগুলি বিষয়ে মতভেদ উল্লেখ করা হইল। উপনিষদ পাঠ করিলে কখনও মনে হয় শঙ্করাচার্য্যের মতই ঠিক, আবার কখনও মনে হয় রামানুজের মতই ঠিক। ব্রহ্মসূত্র, ভগবদ্গীতা প্রভৃতি গ্রন্থ যেন রামানুজের মতের অধিকতর অনুকূল বলিয়া বোধ হয়। শঙ্করাচার্য্যের মত জ্ঞানের পথ আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে, রামানুজের মত ভক্তি-পথ আলোকিত করিয়াছে। কোন মত ভাল, তাহা লইয়া তর্ক চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে, আবার চিরকাল চলিবে। যিনি মনে করিবেন অগ্রে তর্ক দ্বারা কোন্ মতটি ঠিক তাহা স্থির করিয়া পরে সেই পথ গ্রহণ করিব, তিনি বোধ হয় অনর্থক কালক্ষেপ করিবেন। কোন্ মতটি ঠিক তাহা নির্দ্ধারণ করা তত প্রয়োজনীয় নহে,—বেশী প্রয়োজন, একটি মত গ্রহণ করিয়া তন্নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হওয়া। বোম্বাই যাইবার দুইটি পথ আছে। ঘরে বসিয়া কেবলই রেলের বহি দেখিয়া যদি ঠিক করিতে চেষ্টা করা যায় যে কোন্ পথটি ভাল, তাহা হইলে বোধ হয় কখনও বোম্বাই যাওয়া হইবে না। যে হোক একটা পথে বাহির হওয়া আবশ্যক, সে পথটি সবচেয়ে ভাল না হইলেও তত বেশী ক্ষতি নাই, কারণ শেষ পর্য্যন্ত বোম্বাই-ই পৌঁছান যাইবে। সেখানে গিয়া বরং আলোচনা করা যাইতে পারে কোন্ পথে কষ্ট কম। ঈশ্বরকে লাভ করিবার পথ সম্বন্ধেও সেই কথা। যে পথ হৃদয়ের অনুকূল সেই পথে আগাইয়া পড়, দুঃখ কষ্ট বিলম্ব দেখিয়া নিরুৎসাহ হইও না, দুঃখ কষ্ট সব পথেই আছে। উৎসাহের সহিত আগাইয়া যাও। শেষ পর্য্যন্ত সকল দুঃখ কষ্ট সার্থক হইবে।

ব্রজ-বিপঞ্চী

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক, এম্‌-এ, বি-সী-এস্

১

আজহুঁ-কি বা-দন বাজঁ?
ব্রজক বিপঞ্চী পঞ্চম উছলয়
শো ন তুঁ' ব্রজ-বন-মাঝঁ?

২

মৃদঙ্গ-বীণক আজহুঁ-কি গুঞ্জত মঞ্জুম-মুরলিক সাথঁ,
ঝিঙ্‌ঝিক ঝঙ্কারঁ, কিঙ্কিণী ঝুমরিউ, সঙ্গীত-মূরছান-মাতঁ?
মঞ্জরি-কঙ্কন খঞ্জরি-খবাব-এ
মন্থর-মধুরিম-তালঁ,
পিঞ্জির-কাননে নাচত-কি পাখিয়া,
হাসত-কি তাল-তমালঁ?
চঞ্চল-চাহনি,—আজহুঁ কি ফি-রত কানুয়া-রাধা-অরু মাতি,
অঞ্চল লোটয়ি শাঙর-বিরহিণী বঞ্চল কথি দিনু-রাতি?

৩

শুনু, আঝুঁ বাদন বাজঁ!
ব্রজক বিপঞ্চী বাঁশরিক-সঙ্গতঁ,—
বা-জত হিয়া-বন-মাঝঁ!

রাজগী !

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল্

(২৭)

নরেন বাবু অনেকক্ষণ আগে উঠিয়া আসিয়া সেই সব কাগজপত্র লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিতেছিলেন। আমি তাঁর কাছে গিয়া বসিলাম।

তিনি consolidation of holding, rent purchase প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেকগুলি কথা বলিয়া গেলেন, তাঁর সব মতামত ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন, সেটেলমেণ্টের ম্যাপ ও চিঠার এক এক দাগ ধরিয়া দৃষ্টান্ত দিয়া তাঁর কথা বুঝাইলেন। আমি কিছুই শুনিলাম না, দেখিতে পাইলাম না। আমার কাণের ভিতর তখন বাজিতেছিল বিজয়-দুন্দুভি, অন্তর আমার তার তালে তালে তাণ্ডবে নাচিতেছিল। আমি বলিতেছিলাম হাল্কা হাল্কা কথা, হাসির কথা, আনন্দের কথা, রসের কথা।

খানিকক্ষণ বাদে নরেন্দ্র বাবু আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। একটু পরে বলিলেন, "দ্বিজেশ, তুমি আমায় অবাক্ ক'রেছ। এত বড় ত্যাগ ক'রে তুমি এত উল্লসিত, এত আনন্দ তোমার অন্তরে!—এ দেখে যে আমার কি আনন্দ হ'চ্ছে কি বলবো। তোমার চরিত্র-গৌরব দেখে আমার তোমার পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছা ক'রছে।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "অমন কাজও ক'রবেন না দাদা, ক'রলে ঠকবেন। আমাকে অতবড় ত্যাগী ভাববেন না। আমি ভয়ানক স্বার্থপর। ত্যাগ করে আমার আনন্দ হয় নি, লাভ করে আমি উল্লসিত হ'য়েছি।"

একটু বিস্মিত হইয়া নরেন্দ্র বাবু বলিলেন, "কি লাভ ক'রলে ভাই?"

"একটা মহামূল্য মণি আমার ঘরের ভিতর লুকান ছিল, সেইটা আমি পেয়েছি।"

নরেন্দ্র বাবু একটু বিব্রত ভাবে আমার মুখের দিকে চাহিলেন। আমি বলিলাম, "খাবার সময় সে মণি দেখাব এখন আপনাকে।"

তার পর চা খাইয়া আমি নরেন্দ্র বাবুকে তাঁর কাগজ-পত্র হইতে উঠাইয়া ঠেলিয়া লইয়া চলিলাম গ্রামের ভিতর। প্রজাদের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া সকলের তত্ত্ব তালাস করিলাম। সকলের সঙ্গে আনন্দ করিয়া মিশিলাম। নীচ জাতীয় প্রজাদের ছেলে মেয়েদের কোলে কাঁখে করিয়া আদর করিলাম। বুড়োদের সঙ্গে রহস্যালাপ করিলাম। সবাইকে বলিলাম, "আর তোমাদের দুঃখ নেই ভাই, তোমাদের আমি এই দেবতার হাতে তুলে দিয়েছি, এখন তোমরা রাম রাজ্যে বাস ক'রবে।"

প্রজারা অবাক্ হইল, তারা বুঝিতে পারিল না। আমি তাদের বুঝাইয়া বলিলাম। বলিলাম, "অছিমদ্দি আর তার স্ত্রী এক দিন বলেছিল, আমি রাজ্যভার নিলে প্রজার দুঃখ থাকবে না। দুঃখ যে কেমন থাকবে না তা' তারা হাড়ে হাড়ে বুঝে গেছে। এখন আমি রোক-শোৎ,—এই দেবতা তোমাদের দেখবেন।"

নরেন বাবু আমার পিঠে থাপ্পড় মারিয়া বলিলেন "রাসকেল, তুমি এমনি বাঁদরামী ক'রবে তো আমি সব ছেড়ে ছুড়ে পালাব কিন্তু।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "রাগ ক'রবেন না দাদা। এদের কাছে আমি আপনাকে দেবতা বলে' প্রচার করছি ব'লেই যে আপনি দেবতা হ'চ্ছেন, এ কথা স্বপ্নেও ভাববেন না। তবে কি জানেন? আমাদের এটা দেবাধিষ্ঠিত দেশ কি না, এখানে যিনি দেবতা না হন তিনি কোনও মতেই মানুষের ঘাড়ে চেপে ব'সতে পারেন না। মানুষ যে ভাল হ'তে পারে সেটা আমরা স্বীকার করি না। তাই যদি কাউকে আমরা একটু বিশেষ রকম ভাল দেখতে পাই, তাকে অমনি স্বয়ং ভগবান না ক'রলে মনে সোয়াস্তি পাই না। কেবল বুদ্ধ বা চৈতন্য নয়, আজকালকার শ্রীরামকৃষ্ণ বা গান্ধী পর্য্যন্ত দেবতা হ'য়ে পড়েছেন। তাই আপনাকে এদের মনের ভিতর পাকা করে' বসাবার জন্য একটু আপনাকে দেবতা সাজাতে হ'চ্ছে। কয়েকটা দিন অপেক্ষা করুন না, আমি এদের মধ্যে আপনার অলৌকিক কীর্ত্তি সম্বলিত এমন এক নরেন্দ্র-পুরাণ প্রচার ক'রে দেব যে, রাজ্যের লোক আপনার কাছে তাবিজ আর মাদুলীর জন্য এসে উপস্থিত হবে। আপনি বরং সময় থাকতে কিছু মাদুলীর অর্ডার দিয়ে রাখুন।"

নরেনবাবু হাসিয়া বলিলেন, "তুমি একটা এক নম্বরের বাঁদর। কিন্তু যা' বলেছ মিথ্যা নয় ভাই। আমরা যে বেশ সহজ ভাবে মহৎ লোককে মানুষ বলে তার কাছে জ্ঞান বা সেবা গ্রহণ ক'রতে পারি না, তাকে দেবতা করে আসনে বসিয়ে পূজা করি, তার কারণ হ'চ্ছে এই যে, আমরা সব মানুষের ভিতরকার জাগ্রত বিশ্বদেবতাকে দেখতে পাই না। বেদান্ত আমাদের যতই উপদেশ দিক—"তত্ত্বমসি", আমরা বাস্তব জীবনে সেটা স্বীকার করি না। বেদান্তের পুঁথিকে তফাতে রেখে ফুল তুলসী দিয়ে পূজা করি, আর এদিকে নমঃশূদ্রকে ঘরের আঙ্গিনা থেকে দূর করে দেই। সহজ মানুষের পোনেরো আনা যে মোটের উপর ভাল, মহেশ্বর যে ব্যস্তভাবে সবার ভিতর প্রকাশ হ'য়েছেন, সে কথা 'পঞ্চদশী'র বুলি আওড়িয়ে যতই কেন বলি না, স্বীকার করি না। আমাদের সাধারণ লোক সম্বন্ধে মনের সহজ ভাব এই যে, তারা জোচ্চোর, শঠ ও নীচ—সবাই যেন আমাদের গলা কাটবার জন্য ত'য়ের হ'য়ে র'য়েছে,—কেবল পুলিশের ভয়ে পেরে ওঠে না। আমরা ভেবে দেখি না যে তাই যদি সত্যি হ'ত, যদি মানুষের প্রত্যেকের ভিতরকার দেবতা তাদের সৎপথে না রাখতো, তবে পুলিশ আদালতে মানুষকে কখনই সোজা রাখতে পারতো না।"

প্রজাদের আমার উপর মনের ভাব বড় ভাল ছিল না। গোবিন্দের উৎপীড়নে তারা আমার উপর ভীষণ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তারা আমার কথায় চট করিয়া বড় বেশী বিচলিত হইল না। তারা শুনিয়াছিল যে আমি সম্পত্তি বেচিয়া মনোহর সার দেনা শোধ করিয়াছি। কাজেই ভাবিল নরেন বাবু বুঝি এই জমীদারীর খরিদ্দার। কাজেই তারা আমার কথায় হাসিল ও ঘাড় নাড়িল, কিন্তু একটু তফাতে রহিল, বড় কিছু বিশ্বাস করিল না।

নরেন্দ্র বাবু যখন তাঁর সব কল্পনার কথা তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, পরস্পরের জমী বদল করিয়া কি রকম করিয়া বড় বড় জোত করা যাইবে আর তার আবাদের বড় রকম সুবিধা করা যাইবে এ সব কথা যখন তিনি বুঝাইলেন, তখন তারা সকলেই সম্মতি জানাইয়া ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে ঘাড়ে ব্যথা করিয়া ফেলিল। আমি কিন্তু স্পষ্ট বুঝিলাম যে তাহাদের মনে সন্দেহ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে। কয়েকদিন বাদে সংবাদ পাইলাম যে তাহারা জোট করিয়াছে, নূতন মালিক যে ফাঁকি দিয়া তাহাদের জোত কাড়িয়া লইবে সে হইতে পারিবে না। বেশ বিদ্রোহের সূচনা দেখা গেল।

দুপুর বেলায় নরেন্দ্র বাবুকে আহারের জন্য অন্দরে লইয়া গেলাম। সাবিত্রী তার রাণীর বেশে আমাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল; আর হঠাৎ সে নরেন্দ্র বাবুকে গড় হইয়া প্রণাম করিল। নরেন্দ্র বাবু তিন পা পিছাইয়া

গিয়া কপালে হাত ঠেকাইয়া বলিলেন, "মা, আমি যে কায়স্থ।"

সাবিত্রী কিছু বলিল না, স্তধু হাত বাড়াইয়া তাঁর পায়ের ধূলা লইল। আমি তার মুখে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ দেখিতে পাইলাম, মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া রহিলাম।

আমি নরেন্দ্র বাবুকে হাসিয়া বলিলাম, "এই মহামূল্য মণিটি আমার ঘরে অযত্নে পড়ে ছিল, কাল রাত্রে কুড়িয়ে পেয়েছি।"

সাবিত্রী লজ্জায় মুখ ঢাকিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে আমার পীড়াপীড়িতে আবার আসিয়া বসিল, লজ্জায় সে আমাদের কারও দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না।

ছুপুর বেলায় নরেন্দ্র বাবু আবার নকসা ও চিঠা লইয়া বসিলেন। আমি অন্দরে গেলাম। সাবিত্রী আমার কাছে আসিলে আমি সম্পত্তির যে ব্যবস্থা করিয়াছি ও ভবিষ্যৎ জীবনের সম্বন্ধে যে সংকল্প করিয়াছি তাহা তাহার কাছে খুলিয়া বলিলাম। তার মুখখানি একটু মলিন হইয়া উঠিল। কিন্তু সে তার মনের মেঘ জোর করিয়া দূর করিয়া বলিল, "তুমি যদি তাই ঠিক করে থাক তাই হ'বে। তোমার যে পথ তা' ছাড়া তো আমার ভিন্ন পথ নেই। আমিও তোমার সঙ্গে ক'লকাতায় গিয়ে খেটে খাব।"

"তুমি খেটে খাবে কি করে ?"

"সে দেখতেই পাবে। কিন্তু যাই কর, আর তুমি আমায় ফেলে যেতে পারছো না।"

"ফেলে যেতে চায় কে পাগল ?" বলিয়া আমি তাহার চিবুক ধরিয়া নাড়া দিলাম।

সে বলিল, "তা হ'লে ও দানপত্রটা নষ্ট করবার জন্য কি ক'রতে হ'বে করে ফেল শীগ্‌গির। কোনও দলিল টলিল রেজেষ্ট্রী ক'রতে হবে কি ?"

আমি বলিলাম, "কেন, ওটা নষ্ট ক'রবার দরকার কি ? ও থাক না তোমারই।"

সাবিত্রী বলিল, "ও কথা মুখেও এনো না,—কি করতে হ'বে আমাকে দিয়ে করিয়ে নেও। তোমার সম্পত্তি, তোমাকে আমি দক্ষিণা দিয়েছি, তোমার ও নিয়ে যা খুসী ক'রতে পার।"

আমি বলিলাম, "ওটাও তবে নরেন বাবুর নামে দানপত্র ক'রে দাও।"

দানপত্র হইয়া গেল। নরেন বাবু সে দানপত্র দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। বলিলেন, "বড় শক্ত পরীক্ষায় ফেল্‌লে ভাই। এটা নেব কি নেব না তাই ঠিক ক'রতে পারছি না। রাজরাণীকে কি পথের ভিখারী ক'রবার দায়টা শেষে আমার ঘাড়েই চাপিয়ে দিলে ?"

সাবিত্রী বলিল, "না দাদা, ও সম্পত্তি আমার কোনও দিন ছিল না, আর ও গেলে আমি ভিখারী মোটেই হব না। আমার গহনা ঢের আছে।"

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া সে বলিল, "কিন্তু— গুরুদেবের কাছে বাগ্‌দত্তা আছি—"

নরেন বাবু আনন্দের সহিত সে টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন। আর আমাদের বাড়ীখানা তিনি লইতে একেবারে অস্বীকার করিলেন।

মোটর বোটখানা আমি বেচিবার চেষ্টা করিলাম। একটা খরিদ্দারও জুটিল। কিন্তু সাবিত্রী আমাকে কিছুতেই বেচিতে দিল না—শেষ পর্য্যন্ত কান্না সুরু করিয়া দিল। আমি অনেক বুঝাইলাম, কিছুতেই বুঝিল না। শেষে বাধ্য হইয়া আপাততঃ ওটা বিক্রীর চেষ্টা ছাড়িয়া দিলাম। ওই বোট সম্বন্ধে সে আমাকে অন্যায় খোঁটা দিয়া ব্যথিত করিয়াছিল বলিয়া তার এ বিষয়ে একটা গভীর বেদনা ছিল।

এক দিন আমি বলিলাম. "আর তো বসে থাকলে চলবে না দাদা, একটা কাজকর্ম্ম তো ক'রতে হবে। সে সম্বন্ধে কি পরামর্শ দেন ?"

দাদা বলিলেন, "কাজ তো তোমার এইখানেই আছে। এত বড় একটা স্কীম কার্য্যে পরিণত করা আমার একার কাজ নয়। তুমি এখানে ব'সে সেটা ক'রতে পার, দেওয়ান নায়েব সব বরখাস্ত করে দিচ্ছি, তার বদলে তোমাকে ছুশো' টাকা মাইনে দিয়ে রাখলে আমার ঢের বেশী কাজ হ'বে।"

কিন্তু এখানে !—এই রাজবাড়ীতে বসিয়া ! সে আমি কিছুতেই ভাবিতে পারিলাম না। আমি বলিলাম, "না দাদা, সে আমি পারবো না।"

সাবিত্রী বলিল "তোমার যে আরও কাজ এখানে বাকী র'য়েছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি কাজ?"

সাবিত্রী বলিল, "পরে ব'লবো।"

সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় সাবিত্রী ধরিয়া বসিল, তাহাকে লইয়া মোটর বোটে বেড়াইতে হইবে। আমি আনন্দের সহিত সম্মত হইলাম। খানিক দূর ঘুরিয়া ফিরিয়া বাড়ী ফিরিবার পথে একটা ঘাটে সাবিত্রী নৌকা লাগাইতে বলিল। আমি কম্পিত হৃদয়ে তার সঙ্গে সেখানে নামিলাম। সেখানে আসিতে আমার মনটা বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। সেখানে বিধুর কল্পিত স্মৃতি-মন্দিরের ভিত্তি গাঁথা হইয়া পড়িয়া ছিল। আমি এ মন্দিরের কাজ বন্ধ করিয়াছিলাম। বন্ধ করিতে আমি বড় ব্যথা পাইয়াছিলাম, কিন্তু উপায়ান্তর ছিল না।

সাবিত্রী আমার হাত ধরিয়া সেই খানেই লইয়া গেল। সেই ভিত্তির উপর এক যায়গায় সে আমাকে বসাইয়া আমার পাশে বসিল। কৃষ্ণাচতুর্থীর চন্দ্রের আলো আমাদের ছাইয়া ফেলিল, তাহাতে যেন এ ইষ্টক-স্তূপকে একটা অনৈসর্গিক আলোকে ভরিয়া দিল।

সাবিত্রী বলিল, "এ মন্দির তুমি সম্পূর্ণ কর।"

আমি তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলাম; বলিলাম, "সে আর এখন হয় না।"

সাবিত্রী জোর করিয়া বলিল, "হয়, হতেই হ'বে। টাকা নেই? টাকা আমি দেবো, তোমার এটা ক'রতে হবে।"

"কোথায় পাবে টাকা?"

সাবিত্রী তার কাপড়ের তলায় হাত ঢুকাইয়া দিয়া কোমরের কাছ হইতে বাহির করিল একটা রেশমী-রুমালের মোড়ক। সে মোড়ক খুলিয়া আমার সামনে ধরিল। তার বহুমূল্য রত্নালঙ্কারের হীরকগুলি চাঁদের আলোয় ঝকমক করিয়া উঠিল। এগুলি সাবিত্রীর বিবাহের সময় তার পিতা দিয়াছিলেন; ইহার মূল্য আট দশ হাজার টাকার কম হইবে না।

সাবিত্রী বলিল, "এগুলি তোমার নিতে হ'বে। এই-খানে এই স্মৃতিমন্দিরে দাঁড়িয়ে আমি তোমাকে উপলক্ষ্য করে এসব তাকেই দিচ্ছি, যার উপর আমি তোমার চেয়ে এক চুল কম অত্যাচার করি নি—আর যে তার সমস্ত জীবনের দুঃখেরই মূল্যে অমূল্য সম্পদ উদ্ধার করে রেখে গেছে আমার জন্য। এ প্রায়শ্চিত্ত তোমার আমাকে ক'রতে দিতে হবে।"

আমার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। আমি কোনও কথা বলিতে পারিলাম না, কেবল নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলাম। সাবিত্রীও আমার মুখের দিকে চাহিয়া নীরবে কাঁদিল। আমাদের দুটি অনুতপ্ত হৃদয়ের স্নেহের অঞ্জলি পরলোকে বিধুর আত্মার কিছু তৃপ্তি সম্পাদন করিল কি না কে জানে?

(২৮)

স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়া আমি সাবিত্রীকে লইয়া কলিকাতায় আসিলাম। মোটর বোটখানা সাবিত্রী যত্নের সহিত ঢাকিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিল। কলিকাতার বাড়ীখানা বিক্রী করিয়া একখানা ছোট বাড়ী ভাড়া করিলাম। বাড়ী বিক্রয়ের টাকা নরেন বাবুকে দিতে চাহিলে তিনি বলিলেন "এ টাকা এখন তোমারই থাক। তোমার একটা কিছু করে' খেতে হ'লে কিছু মূলধন দরকার হ'বে। তা না হ'লেই ভাল ছিল; কিন্তু যখন তা' ছাড়া তোমার কাজের কোনও যোগাড় হ'বে না, তখন ও টাকাটা তোমার রাখতেই হ'বে।"

সেই টাকা অবলম্বন করিয়া একখানা খবরের কাগজ করিলাম। এখন ছোট বাড়ী আমার, চাকর বাকর নাই। সাবিত্রী রাঁধে বাড়ে, গৃহকর্ম্ম করে, কেবল একটা ঠিকা ঝি আসিয়া এক ঘণ্টা কাজ করিয়া দিয়া যায়।

ছয় মাস পরে নরেন বাবু এক দিন হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁর কল্পনা তিনি সম্পূর্ণ করিয়া লিখিয়া পড়িয়া স্কীম করিয়াছেন। পড়িয়া দেখিলাম, চমৎকার স্কীম, কিন্তু তাহাকে কাজে লাগাইতে পদে পদে বিঘ্ন। এই ছয় মাসের অভিজ্ঞতায় নরেন্দ্র বাবু বিঘ্নগুলি বেশ ভাল করিয়া আয়ত্ত করিয়াছেন। এবং তাঁর স্কীমের স্থানে স্থানে তাহা টুকিয়া খুব বড় বড় জিজ্ঞাসার চিহ্ন দিয়া রাখিয়াছেন।

নরেন বাবু বলিলেন, "আমার কলেজের ছুটী ফুরিয়েছে, আর ছুটী নেব না ঠিক ক'রেছি। এ কর্ম্ম আমার নয়। সমস্ত প্রজারা ধর্ম্মঘট করে আমার স্কীমের বিরুদ্ধে লেগেছে।

আমার উপর অত্যাচার করাও বিচিত্র নয়। তাতে আমি কুণ্ঠিত নই; কিন্তু আমি বুঝতে পারছি যে আমার পক্ষে এই লোকগুলিকে বুঝিয়ে তাদের উপকার করা অসম্ভব। তা' ছাড়া এর এতগুলি বিঘ্ন আছে যে, নূতন একটা আইন ছাড়া এ করা যাবে কি না সন্দেহ। তোমার কাজ তুমি বুঝে নেও বাপু. আমাকে রেহাই দেও। এ ছয়মাস জমীদারী করে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে।"

নরেন বাবু কিছুতেই মানিলেন না। তিনি ইস্তফা দিলেন। কাজেই আমাকে দেশে ফিরিতে হইল। খবরের কাগজের ভার নরেন বাবুর আর একটি শিষ্য লইল। রাজবাড়ীর ছোট এক কোণায় আমরা বাসা করিলাম। কলিকাতায় যেমন ছিলাম তেমনি রহিলাম। আস্তে আস্তে প্রজাদের বুঝাইয়া সুঝাইয়া একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতেছি। পথে বাধা বিঘ্ন অনেক, কিন্তু সাবিত্রী ও আমি পরস্পরকে সাহস দিয়া সজীব রাখিতেছি,—ধীরে ধীরে বোধ হয় সফলতার দিকে অগ্রসর হইতেছি।

এক বৎসর কৃষিবিদ্যা শিখিয়া আসিয়া অনেকটা জমী লইয়া একটা আদর্শ কৃষিশালা করিয়াছি। সেখানে আমি একা যন্ত্রপাতির সাহায্যে যতটা আবাদ করিতে পারি করি, মাঝে মাঝে দুই চারিজন মজুর লাগাই।

সাবিত্রী আসিয়া মাঝে মাঝে ক্ষেতে আমার সঙ্গে কাজ করে। সে গৃহকার্য্য ভয়ানক সংক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। রান্না খাওয়ার অনাবশ্যক আড়ম্বর চুকিয়া গিয়াছে। তাই তার অবসরের অন্ত নাই। অবসর সময়ে সে হয় আমার সঙ্গে ক্ষেত্রে কাজ করে, না হয় তাঁতে কাপড় বোনে, না হয় লেশ বোনে। এমনি করিয়া আমাদের সব খরচ খুব সচ্ছল ভাবে চলিয়া যায়। আর আমরা পড়া শুনা করিবার'ও প্রজাদের সঙ্গে মিলিবার মিশিবারও যথেষ্ট অবসর পাই।

আমাদের কাণ্ড কারখানায় প্রথমে দেশময় হট্টগোল পড়িয়া গিয়াছিল। তার পর ক্রমে গ্রামবাসী কৃষকেরা আমার কাছে শিখিতে আসিতে লাগিল। আমি এই সুযোগে নরেন্দ্র বাবুর স্কীম অনুসারে জমীর নূতন বিলির প্রস্তাব করিলাম,—তাহাদিগকে আমার প্রণালীতে চাষবাসের সুযোগ বুঝাইয়া দিলাম।

ক্রমে আগ্রহ করিয়া প্রজারা আমার প্রস্তাবে সম্মত হইল। আমি তাহাদের একটা সমবায় করিয়া নূতন বিলির আয়োজন করিতেছি। পরিশ্রম বাঁচাইবার যন্ত্রপাতি আনাইতে দিয়াছি। জমী বিলি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

সেদিন আমি তাদের বলিলাম, "দেখ ভাই, আমি আর এ সম্পত্তির মালিক নই। তোমরা সবাই মালিক,—আমি তোমাদেরই মত একজন, আমার ছোট জমীটুকুর মালিক।"

তারা আশ্চর্য্য হইল, বিশ্বাস করিল না। যখন অবস্থাটা ঠিক বুঝিল তখন তাহারা এমন জয়ধ্বনি করিতে করিতে আমাকে বাড়ী পর্য্যন্ত অনুগমন করিল যে, আমি লজ্জিত হইয়া উঠিলাম।

বাড়ীর দুয়ারে সাবিত্রী তার ছোট খোকাটির হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তার মুখ গর্ব্বে আনন্দে উজ্জল হইয়া উঠিল। সে আনন্দের আতিশয্যে খোকাকে বুকের ভিতর চাপিয়া ঘন ঘন চুম্বন করিতে লাগিল।

নবাবগঞ্জের রাজবাড়ীর ইট কাঠ এখনো আছে, কিন্তু রাজাও নাই, রাণীও নাই।

কিন্তু মুস্কিল এই যে, গ্রামের লোকগুলি এখন আমাকে রাজা ছাড়া কিছুই বলিতে চায় না। সাবিত্রীকে বরঞ্চ কেউ কেউ মা বলে,—যদিও বেশীর ভাগ লোকে বলে রাণী-মা।

আমার এ ক্ষোভ নরেন্দ্রবাবুকে জানাইয়াছিলাম। তিনি উত্তরে লিখিলেন,

"লোকগুলি ঠিক বুঝেছে। তোমার জমীর রাজগী ছেড়ে তুমি এতদিনে তাদের অন্তরের উপর অক্ষয় সাম্রাজ্য স্থাপন ক'রেছ। আজ তোমরা যে অর্থে রাজা ও রাণী, সে অর্থে রাজা রাণী জগতে চিরদিনই থাকবে। তুমি দেবতা না হ'য়ে যে রাজা হ'য়েছো, সেটা আমি তোমার পক্ষে সৌভাগ্যের কথা মনে করি। তুমি যে সত্যই রাজা —তোমার এই অক্ষয় রাজগীকে আমি অভিনন্দন করি।"

সমাপ্ত

জেকো-স্লোভেকিয়া

ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম-এ, পি-আর-এস, পিএইচ-ডি

অনেক বাঙ্গালী পাঠকের নিকটই 'জেকো-স্লোভেকিয়া' নামটি সম্পূর্ণ অপরিচিত। কিন্তু বর্ত্তমান জগতের ইতিহাসে এই দেশটি একটি বিশিষ্টস্থান অধিকার করিয়াছে।

পূর্ব্বকথা—'জেক' ও 'স্লোভাক' এই দুইটি স্লাভ জাতি সংমিলিত হইয়া বর্ত্তমানে 'জেকো-স্লোভেকিয়া' নামক একটি নূতন দেশের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহারা উভয়েই পরাক্রান্ত "অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারী" সাম্রাজ্যের অধীন ছিল; এবং বিগত মহাযুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার ধ্বংসের ফলে বহু শতাব্দী পরে বিলুপ্ত স্বাধীনতা ফিরাইয়া পাইয়াছে। জেক জাতির সংখ্যা ৭৫ লক্ষ এবং স্লোভাকেরা ২৫ লক্ষ।

'জেক' জাতির বাসস্থান 'বোহিমিয়া' প্রদেশ বহুকাল পর্য্যন্ত একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য ছিল। প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে জার্ম্মাণি ও অষ্ট্রিয়ার ত্রিংশ বর্ষব্যাপী যে ভীষণ ধর্ম্মযুদ্ধ (Thirty years' war) আরম্ভ হয়, তাহার ফলে অষ্ট্রিয়া বোহিমিয়া প্রদেশ অধিকার করে। স্লোভেকিয়া প্রদেশ খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে মেগিয়ার জাতি কর্ত্তৃক অধিকৃত হয় এবং তদবধি ইহা 'হাঙ্গারীর' অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এইরূপে দুইটি পরাক্রান্ত স্লাভ জাতি তাহাদের চিরশত্রু জার্ম্মাণ * ও মেগিয়ারের অধীন হয়। যাহাতে এই স্লাভ জাতি স্বীয় প্রাচীন সভ্যতা ও শিক্ষা বিসর্জ্জন দিয়া বিজেতাদিগের সভ্যতা অবলম্বন করে, তাহার জন্য বিধিমত চেষ্টা হইয়াছিল। স্লোভাক জাতিরা নিজের ভাষা ভুলিয়া যাহাতে মেগিয়ার ভাষাকে মাতৃভাষা রূপে অবলম্বন করে, তাহার জন্য কোন উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ে স্লাভ ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইত না। বিগত ৪৭ বৎসরের মধ্যে এমন একটি উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় ছিল না, যেখানে স্লোভাক শিশুগণ স্বীয় মাতৃভাষায় অধ্যয়ন করিতে পারিত। কেবল যে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এইরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইত না তাহা নহে, বেসরকারী কোন বিদ্যালয়েও স্লাভ ভাষা শিক্ষা নিষিদ্ধ ছিল। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্লাভভাষা শিখান হইত; কিন্তু এরূপ বিদ্যালয়ের সংখ্যাও ক্রমশঃ কমিতেছিল। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ১৯২১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ইহার সংখ্যা কমিয়া ৪২৯এ দাঁড়াইয়াছিল। যাহাতে স্লোভাকরা কোন রকমে মাথা তুলিয়া না দাঁড়াইতে পারে, তাহার জন্য মেগিয়ার গভর্ণমেণ্টের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। এই অমানুষিক অত্যাচারের ফলে সহস্র সহস্র স্লোভাক দেশত্যাগ করিয়া আমেরিকায় গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

স্লোভাকগণ যেরূপ মেগিয়ার জাতি কর্ত্তৃক নিষ্পেষিত হইতেছিল, জেকগণও অষ্ট্রিয়ার জার্ম্মাণদের হস্তে সেইরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছিল। ফলে একই দেশবাসী এই দুই জাতির মধ্যে এরূপ প্রবল বিরোধের ভাব জাগিয়া উঠিতেছিল, যাহা সচরাচর ভিন্নদেশবাসী বিভিন্ন জাতির মধ্যেও দেখা যায় না। জেক ও জার্ম্মাণ পরস্পর সাক্ষাৎ হইলেই কলহের আবির্ভাব এক প্রকার অনিবার্য্য ছিল। প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সভায় এই দুই দলের বিবাদ এরূপ সাংঘাতিক হইয়া উঠিয়াছিল যে, এই সভার অধিবেশন একপ্রকার স্থগিত রাখিতেই হইত। বিদ্যালয়ে, কলকারখানায়, এমন কি ধর্ম্ম মন্দিরে, যেখানেই এই দুই জাতীয় লোকের পরস্পর সাক্ষাৎ, সেখানেই একটা মারামারি বা রক্তারক্তি, অন্ততঃ তাহার পূর্ব্বাভাষ। কোন দোকানেই এই দুই জাতীয় কর্ম্মচারী নিয়োগ করা সম্ভব ছিল না; কারণ, তাহা হইলে বেচা-কেনার পরিবর্ত্তে মারামারি সামলাইতে দোকানদারের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইত। সর্ব্বশেষে এই আত্মকলহ এমন চরম হইয়া দেখা দিল, যে তাহা আমাদের মনে যুগপৎ কৌতুক ও বিষাদের সৃষ্টি করে। এই দুই জাতি প্রতিজ্ঞা করিল যে তাহারা একই রেলষ্টেসন হইতে রেলগাড়ীতে উঠিবে না। বড় সহর তো দূরের কথা, সাধারণ গ্রামেও দুইটি করিয়া রেল ষ্টেসন হইল—একটি জার্ম্মাণ ও অপরটি জেকদের জন্য!

জাতীয় ভাবের উদ্বোধন—এই পরপদদলিত নিপীড়িত লাঞ্ছিত স্লাভ জাতি কিন্তু কখনও অতীত গৌরবের কথা

* 'অষ্ট্রীয়ার' অধিবাসীরা জার্ম্মাণ জাতীয়।

বিস্মৃত হয় নাই। সেই ধ্রুবতারার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহারা সুপ্রভাতের অপেক্ষায় এই জাতীয় জীবনের দুঃখময় তমিস্র রজনী কোন প্রকারে অতিবাহিত করিতেছিল। যাঁহারা এই আশার আলোক দেখাইয়া জাতীয় জীবনকে নির্ম্মম অবসাদের ও আত্ম-বিলোপের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই পণ্ডিত ও শিক্ষক সম্প্রদায়-ভুক্ত। তাঁহারা অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠা উদ্ঘাটিত করিয়া, নির্জ্জীব মৃতপ্রায় জাতির চিত্তে জড়তা ও হীনতার স্থলে মহান ও উচ্চ আশার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই প্রকারে উনবিংশ শতাব্দীতে পণ্ডিত প্রবর 'ডবরভ্স্কি,' জুংম্যান, সাফারিক, কোলার এবং পালাকী প্রভৃতির উদ্যমে জেক জাতির মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার হয়। প্রসিদ্ধ সমালোচক 'মুচ' বলেন যে, ঐতিহাসিক 'পালাকী'ই এই নূতন জাতীয় ভাবের সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহার অমর লেখনী-প্রসূত স্লাভ জাতির প্রাচীন ঐতিহাসিক কাহিনী নিপীড়িত জেক জাতির মধ্যে নূতন জীবনের সঞ্চার করিয়া তাহার বর্ত্তমান ইতিহাস গঠনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। এইরূপে পণ্ডিতমণ্ডলীর উদ্যম, অধ্যবসায় ও ঐকান্তিক চেষ্টার উপরই জেকগণের জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা। বিংশ শতাব্দীতে যে জেক জাতি স্বাধীনতা লাভ করিয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠ হইয়াছে, তাহারও মূলে দুই জন মনস্বী পণ্ডিত।—ইঁহাদের নাম ম্যাসারিক ও বেনেশ।

ম্যাসারিক—টমাস গ্যারিস ম্যাসারিক ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে দরিদ্র পিতামাতার গৃহে জন্মলাভ করেন। অর্থাভাবে তাঁহার শিক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপ্ত করিয়া তিনি এক কর্ম্মকারের নিকট উক্ত ব্যবসায় শিক্ষা করিবার জন্য শিক্ষানবীশ নিযুক্ত হন। কিন্তু তাঁহার জ্ঞানস্পৃহা এতদূর বলবতী ছিল যে, তিনি নানাবিধ কষ্ট সহ্য করিয়াও, অবশেষে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরূপে প্রবেশ করেন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন গ্রীক্ ল্যাটিন ও পদার্থবিদ্যা শিক্ষা করিয়া অবশেষে তিনি লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ৩২ বৎসর বয়সে তিনি প্রাগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। কেবল পাণ্ডিত্য নহে, তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাবও অতি অসাধারণ ছিল। সহস্র সহস্র স্লাভ যুবক সার্ব্বিয়া, ক্রোয়েটিয়া, বুলগেরিয়া ও রাশিয়া হইতে তাঁহার নিকট শিক্ষার্থী হইয়া আসিয়া নূতন উদ্দীপনা লাভ করিল। ম্যাসারিক চিরদিন সত্যের উপাসক ছিলেন। তিনি সমাগত যুবক শিক্ষার্থীগণের চিত্তে স্বদেশ প্রেম ও সত্যের মহিমা দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়া দিতেন। তাঁহার শিক্ষার স্থূল মর্ম্ম ছিল এই যে, অধ্যবসায়ের সহিত সত্যের অনুসন্ধান করিতে হইবে, কায়মনোবাক্যে সত্যের সম্মান করিতে হইবে; কারণ সত্যের আরাধনা ব্যতীত কোন ব্যক্তি বা জাতি কখনও স্বাধীন হইতে পারে না।

ক্রমে 'জেক'দিগের জাতীয় সমস্যা সম্বন্ধে ম্যাসারিক বিস্তৃত আলোচনা আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রচার করিলেন যে, জেকদিগের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য নৈতিক, মানসিক ও আর্থিক উন্নতি করা। কারণ এইরূপ সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ভিন্ন কোন জাতিই জগতে স্বীয় স্থান অধিকার করিতে পারে না। সত্যের উপাসক ম্যাসারিক দৃঢ়ভাবে প্রচার করিলেন যে, জাতীয় জীবনের ভিত্তি সত্যের উপরেই গড়িতে হইবে। আমাদের দেশে যেমন এক প্রকার স্বদেশ-প্রেমিকের দল আছে, যাহারা ভারতবর্ষের অতীত ও বর্ত্তমানের সকল জিনিসই মহান, পবিত্র ও সুন্দর বলিয়া কল্পনা করে, জেকদের মধ্যেও তখন অনুরূপ স্বদেশ-প্রেমিকের প্রভাব ছিল। তাঁহারা জেকদের অতীত কেবলই গরিমাময় বলিয়া প্রচার করিতেন, এবং যাহা কিছু জাতীয় জীবনে বর্ত্তমান তাহাই ন্যায়সঙ্গত বলিয়া চীৎকার করিতেন। ম্যাসারিক এই দলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন এবং তাহাদের ভণ্ডামির তীব্র প্রতিবাদ করিয়া দেশবাসীর বিরাগভাজন হইলেন। প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হইবার পরই এরূপ একটি ঘটনা ঘটে। কয়েকখানি প্রাচীন পুঁথি জেকজাতি বিশেষ সম্মানের চক্ষে নিরীক্ষণ করিত। তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, ইহা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতেই জেক জাতি সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল; এবং এই সভ্যতার জন্য তাহারা বিদেশীয়দিগের নিকট ঋণী নহে। ম্যাসারিক ঐতিহাসিক প্রণালীর অনুসরণ করিয়া দেখাইলেন যে, ঐ গ্রন্থগুলি প্রামাণ্য নহে, জাল। ঐই উপলক্ষে তিনি জলদগম্ভীরকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন যে, কোন জাতির রাজনীতি বা সভ্যতা কখনও প্রতারণা বা ভণ্ডামির

উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। দেশের লোক ম্যাসারিকের উপর বিষম চটিয়া গেল। যে সমুদায় গ্রন্থ তাহারা জাতীয় গৌরবের ভিত্তি বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে অন্যরূপ ধারণা করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং তাহারা ম্যাসারিককে দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক প্রভৃতি অভিধানে ভূষিত করিল। কিন্তু পরিণামে সত্যেরই জয় হইল—ম্যাসারিকের দৃঢ়তা, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি গুণ জেক জাতির মধ্যে তাঁহার প্রভাব বিস্তার করিল।

ম্যাসারিক এক নূতন দল গঠন করিলেন; তাহার নাম হইল 'Realist Party' বা 'বাস্তবপন্থী' দল। সামাজিক ও জাতীয় জীবনের চিত্রগুলি কল্পনায় বিকৃত না করিয়া যথার্থভাবে দেখা এবং তাহার সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান প্রচার করাই এই দলের উদ্দেশ্য ছিল। কথার মারপ্যাচে, সাময়িক উত্তেজনায়, এবং বক্তৃতার প্রভাবে দেশের সম্বন্ধে যে সমুদায় মতামত প্রচারিত হয়, তাহার অসারত্ব প্রতিপাদন করিয়া, ধীর ভাবে প্রকৃত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া, দেশের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করাই এই দলের লক্ষ্য ও আদর্শ ছিল। ম্যাসারিকের দৃঢ় সত্যানুরাগ, অকপট স্বদেশ প্রেম, অগাধ পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি শীঘ্রই তাঁহাকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে দেশনায়কের পদে প্রতিষ্ঠিত করিল।

যে সমুদায় যুবকবৃন্দ প্রথমে ম্যাসারিকের দলে যোগ দিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এডওয়ার্ড বেনেশ নামক এক কৃষকপুত্র সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি ম্যাসারিকের ছাত্র ছিলেন এবং প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ সমাপ্ত করিয়া প্যারিস, লণ্ডন ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। তিনি ম্যাসারিকের একজন অনুগত ভক্ত ছিলেন; এবং সর্ব্ববিধ কার্য্যে তাঁহার সহায়তা করিবার জন্যই জীবন উৎসর্গ করেন। এইরূপে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ম্যাসারিকের নায়কত্বে এবং বেনেশের ন্যায় একদল কর্ম্মীর সাহায্যে জেকদের মধ্যে নূতন ভাবে জাতীয় জীবনের উদ্বোধন হয়।

স্বাধীনতা লাভ—দুর্দ্ধর্ষ অষ্ট্রিয়হাঙ্গারীর বিরাট সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া জেক জাতির স্বাধীনতা লাভের প্রয়াস বাতুলতা মাত্র। ইহা জেক জাতি এবং পৃথিবীর সকলেই জানিত। কিন্তু মানুষ কল্পনায়ও যাহা আনিতে পারে না, ভগবানের অচিন্তনীয় বিধানে তাহাও সম্ভবপর হয়। যে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে চেষ্টা করে, ভগবান তাহাকে সাহায্য করেন। মানুষ অনেক সময় ইহা না বুঝিয়া, নিজের বুদ্ধি ও কল্পনা বলে যাহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, তাহাকে অসম্ভব স্থির করিয়াই তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়। জেক জাতির মধ্যে যাঁহারা বিজ্ঞ ও প্রবীণ ছিলেন, তাঁহারা আমাদের দেশের বিজ্ঞ বৃদ্ধ নেতৃগণের মতই শিরঃ সঞ্চালন পূর্ব্বক যুবকগণের এই নূতন উদ্যম ও অধ্যবসায়ের অসারতা প্রতিপাদন করিতে বিরত হইতেন না। ম্যাসারিক ও তাঁহার অনুচরগণও ভাবিতে পারেন নাই, কিরূপে তাঁহাদের চির-ঈপ্সিত স্বাধীনতা-লাভ সম্ভবপর হইবে। তথাপি তাঁহারা প্রাণপণে দেশে জাতীয় ভাবের উদ্বোধন করিয়া দেশকে স্বাধীনতার উপযোগী করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে অচিন্তনীয়রূপে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্ভাবনা ঘটিল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুন অষ্ট্রিয়ার যুবরাজ ফ্রান্সিস্ ফার্ডিনাণ্ড সেরাজেভো নামক সহরে আততায়ীর হস্তে নিহত হন। ইহার ফলে ইয়োরোপে যে ভীষণ সমরানল জ্বলিয়া উঠে, তাহার সর্ব্বধ্বংসী লীলার কথা সকলেই জানেন। কিন্তু জগতে অবিমিশ্র ভাল বা মন্দ কিছুই নাই। যে সমর-বহ্নিতে জার্ম্মাণি, অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ার বিশাল সাম্রাজ্য ভস্মসাৎ হইল, যাহার নির্ম্মম তাণ্ডবলীলার চিহ্ন এখনও ফ্রান্স ও বেলজিয়মে বিভীষিকার উৎপাদন করে, তাহারই কৃপায় আবার কত পরপদদলিত উৎপীড়িত জাতি শত শত বৎসর পরে স্বীয় স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইল। বড় বড় নদী যেমন এক দিকে ভাঙ্গে আর এক দিকে গড়ে, ইয়োরোপেও তেমনি এই যুদ্ধের ফলে এক দিকে বড় বড় সাম্রাজ্যের ধ্বংস আর এক দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছে। জেকো স্লোভেকিয়া এই সমুদায় নবপ্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র রাজ্যের অন্যতম।

যখন অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মাণি, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালি ও রাশিয়ার সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইল, তখনই জেকো-স্লোভেকিয়ার স্বদেশ-প্রেমিক নেতৃবর্গ মিত্রশক্তির সাহায্যে স্বাধীনতা লাভের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। উৎপীড়কের বিপদেই চিরদিন উৎপীড়িতের সুবর্ণ সুযোগ; তাই আয়র্লণ্ড এক দিন তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছিল, "England's necessity is Ireland's opportunity"। জেকো স্লোভেকিয়াও এই চিরপ্রচলিত নীতির অনুসরণ করিল।

জেকো-স্লোভেকিয়ার লোকেরা ফ্রান্স ও ইটালির সৈন্য-দলের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিল; আর তাহার নেতৃগণ ম্যাসারিক, বেনেশ ও সেনাপতি ষ্টিফানিক—ইয়োরোপের দেশে দেশে ঘুরিয়া স্বদেশের দুঃখদুর্দ্দশার কাহিনী প্রচার করিয়া সকলের সহানুভূতি আকর্ষণ করিলেন। অবশেষে চারি বৎসর যুদ্ধের পর যখন অষ্ট্রিয়া হীনবল হইয়া পড়িল, তখন ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর তারিখে—ম্যাসারিক ও তাঁহার সহকর্ম্মিদ্বয় প্যারি নগরে জেকো-স্লোভেকিয়ার স্বাধীনতা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিলেন। ধ্বংসোন্মুখ অষ্ট্রিয়ার গভর্ণমেণ্টও ২৭শে অক্টোবর তারিখে অগত্যা জেকো-স্লোভেকিয়ার স্বাধীনতার দাবী স্বীকার করিলেন। প্রায় ৩০০ বৎসর পরে আবার বোহিমিয়া স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইল। ফ্রান্সের ভার্সাই নগরে যে সার্ব্বজনীন সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে, তাহাতে জেকো-স্লোভেকিয়া একটি স্বাধীন রাজ্যরূপে গণ্য হইয়াছে। এই সন্ধিপত্রে এই নূতন রাজ্যের সীমানাও নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সীমা নির্দ্দেশ কার্য্যটি অবশ্য বড় সহজ হয় নাই। মিত্র পক্ষ যুদ্ধের সময় বরাবর প্রেসিডেণ্ট উইলসনের মতানুসারে বলিয়া আসিয়াছেন যে, যুদ্ধের পরে যে রাজ্যের ভাগ বাঁটোয়ারা হইবে তাহার মূলনীতি হইবে 'self-determination', অর্থাৎ তত্রত্য অধিবাসীগণের 'স্বাধীন নির্ব্বাচন'। যে জাতি যে রাজশক্তির অধীনে বাস করিতে চায় তাহাকে তাহারই অন্তর্ভুক্ত করা হইবে; কাহাকেও জোর করিয়া অন্য রাজশক্তির অধীন করা হইবে না। কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে 'মত' ও 'কার্য্যের' সমন্বয় করা বড়ই কঠিন। বোহিমিয়া প্রদেশের উত্তর পশ্চিম ভাগে বহু সংখ্যক জার্ম্মাণ জাতীয় লোক বাস করে। তাহারা অবশ্য অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টের অধীন থাকিতে চায়। অথচ তাহাদের অংশ বাদ দিলে, যে পর্ব্বতমালা বোহিমিয়ার সুনির্দ্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমা, তাহাই বাদ দিতে হয়—ইহাতে বোহিমিয়ার অবশিষ্ট অংশ এবং জার্ম্মাণি ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে কোন প্রাকৃতিক ব্যবধানই থাকে না। সুতরাং এই নূতন দেশের পক্ষে ইহার দুর্দ্ধর্ষ প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই সমুদায় বিবেচনা করিয়া বিজয়ী মিত্র-শক্তি 'জনগণের স্বাধীন নির্ব্বাচন' নীতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বোহিমিয়ার প্রাকৃতিক সীমাই গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ইহাতে আর এক গোলযোগ ঘটিল। প্রাকৃতিক সীমা গ্রহণ করায় বোহিমিয়ার পশ্চিম অংশে সুবিধা হইল; কিন্তু পূর্ব্বভাগে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হইল। কারণ হাঙ্গেরীর অধীন স্লোভেকিয়া প্রদেশে বহু স্লাভ জাতির বাস। এই প্রদেশ বোহিমিয়ার সঙ্গে যোগ না করিলে এই স্লাভদিগকে হাঙ্গেরীর অধীনই থাকিতে হয়। এখানে 'জনগণের স্বাধীন নির্ব্বাচন' এই নীতি অনুসারে প্রাকৃতিক সীমা লঙ্ঘন করিয়াও স্লোভেকিয়া প্রদেশ বোহিমিয়ার সহিত যুক্ত হইল। এইরূপে দুইটি বিরুদ্ধ নীতির অনুসরণ পূর্ব্বক জেকো-স্লোভেকিয়ার সীমা নির্দ্দিষ্ট হইল।

এই নব-প্রতিষ্ঠিত জেকো-স্লোভেকিয়া রাজ্যের পরিমাণ ৫৫,০০০ বর্গ মাইল; অর্থাৎ আয়তনে ইহা ইংলণ্ড ও ওয়েলসের সমতুল্য। ইহার অধিবাসীর সংখ্যা ১ কোটি ৪০ লক্ষ। ইহার মধ্যে ৩০ লক্ষ জার্ম্মাণ, সাড়ে সাত লক্ষ ম্যাগিয়ার ও ৫ লক্ষ রুথেনিয়ান; অর্থাৎ সমুদায় অধিবাসীর এক তৃতীয়াংশ, ভিন্ন জাতীয়। ইহাই এই নূতন দেশের একটি বিষম সমস্যা। ভূতপূর্ব্ব অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যেও এইরূপ বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল; কিন্তু সেখানে এই বিভিন্ন জাতি সংমিলিত না হইয়া পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদ হওয়াতেই অষ্ট্রিয়ার পতন হইল। এই নূতন রাজ্যের স্লাভ জাতি যদি অষ্ট্রিয়ার দৃষ্টান্তে সতর্ক হইয়া ক্ষুদ্র সংখ্যক জাতি সমূহের প্রতি ন্যায্য ব্যবহার করিতে পারেন, তবেই এই দেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবে। নচেৎ আত্ম-কলহে ইহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। এতদ্ব্যতীত এই বিভিন্ন জাতি-সমূহের শিক্ষা-দীক্ষাও ভিন্ন প্রকারের। কাহারও মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞানের খুবই প্রসার; আবার কোন কোন অঞ্চল অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে পরিপূর্ণ। মিলনের এই সমুদায় অন্তরায় দূর করিয়া জাতীয় জীবন গঠন করা বিশেষ দুরূহ ব্যাপার। এই দুই বিষয়ে বর্ত্তমান ভারতবর্ষের সহিত জেকো-স্লোভেকিয়ার বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

এই নূতন দেশের রাজ্য শাসন প্রণালী কিরূপ হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য ১৯১৮ সালের ১৩ই নবেম্বর রাজধানী প্রাগ সহরে এক জাতীয় সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। ইহাতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে, জেকো-স্লোভেকিয়া 'Republic' বা গণতন্ত্র অনুসারে শাসিত

হইবে এবং ম্যাসারিক ইহার প্রথম গণনায়ক (President) হইবেন। ১৯২০ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারী এই গণতন্ত্রের নূতন শাসন প্রণালী বিধিবদ্ধ হয়। ইহাতে স্থির হয় যে, গণনায়ক দুইটি সভার সাহায্যে সমুদায় শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। এই দুইটি সভার নাম (Senate) 'সিনেট', ও (Chamber of Deputies) 'চেম্বার অফ ডেপুটিজ'।

গণনায়ক সাত বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হইবেন। সাত বৎসরের পর তিনি আর একবার ৭ বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন। কিন্তু এই দ্বিতীয় বারের পর, সাত বৎসর অতীত না হইলে তিনি পুনরায় নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না। কেবল প্রথম গণনায়ক ম্যাসারিকের সম্বন্ধে এই নিয়ম খাটিবে না—তিনি একাদিক্রমে দুইবারের অধিক নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন। ম্যাসারিকের কার্য্যকাল অতীত হইলে, সিনেট ও চেম্বার অফ ডেপুটিজ এই দুই সভার সদস্যগণ একত্র হইয়া গণনায়ক নির্ব্বাচন করিবেন।

'চেম্বার অফ ডেপুটিজ'এর সভ্য সংখ্যা ৩০০। ইঁহারা ৬ বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হন। সিনেটের সভ্য সংখ্যা ১৫০। ইঁহারা ৮ বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হন। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিই যে কেবল ভোট দিতে পারে তাহা নহে, তাহারা আইনানুসারে ভোট দিতে বাধ্য। ভোট দেওয়া ও সদস্য হওয়া সম্বন্ধে স্ত্রীপুরুষের সমান অধিকার। ২১ বৎসর বয়স হইলেই 'চেম্বার অফ ডেপুটিজ' নির্ব্বাচনে ভোট দেওয়া যায়, এবং ২৬ বৎসর বয়স হইলেই ইহার সদস্য-পদ-প্রার্থী হওয়া যায়। সিনেটের বেলায় এই বয়সের পরিমাণ যথাক্রমে ২৬ ও ৪৫।

চেম্বার ও সিনেটের অধিকার সমান নহে। চেম্বার যে আইন প্রণয়ন করেন, সিনেট তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারেন—কিন্তু এই অগৃহীত প্রস্তাব যদি পুনরায় চেম্বারের মোট সভ্য-সংখ্যার অধিকাংশ দ্বারা সমর্থিত হয়, তবে তাহা সিনেটের বিপক্ষতা সত্ত্বেও আইন বলিয়া গণ্য হয়।

গণনায়ক মন্ত্রিসভার নির্ব্বাচন করেন; কিন্তু মন্ত্রিগণ তাঁহাদের কার্য্যের জন্য 'চেম্বার অফ ডেপুটিজ'এর নিকট দায়ী।

বৎসরে দুইবার চেম্বার ও সিনেটের সাধারণ অধিবেশন হয়। গণনায়ক প্রয়োজন বোধ করিলে, অথবা চেম্বার ও সিনেটের সভ্যগণের অধিকাংশ আবেদন করিলে বিশেষ অধিবেশন হয়। যে সময়ে এই দুই মহাসভার অধিবেশন স্থগিত থাকে, সেই সময়কার জন্য চেম্বারের ১৬ জন ও সিনেটের ৮জন লইয়া একটি সমিতি গঠিত হয়। বিশেষ জরুরী কারণ উপস্থিত হইলে, এই সমিতি মহাসভার ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারেন, এবং নূতন আইনও প্রণয়ন করিতে পারেন। তবে মহাসভার পরবর্ত্তী অধিবেশনে এই আইন পাশ না হইলে ইহা পরিত্যক্ত হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জেকো-স্লোভেকিয়ার অধিবাসীরা বিভিন্ন ভাষাবলম্বী। এই জন্য নিয়ম করা হইয়াছে যে, দেশের অন্ততঃ এক-পঞ্চমাংশ লোক যে ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে সেই ভাষা যে-কেহ সরকারী চিঠি-পত্রে ব্যবহার করিতে পারে; এবং সরকারী কর্ম্মচারীকেও সেই ভাষায় উত্তর দিতে হইবে। জেকো-স্লোভেকিয়ার অধিবাসীদের সর্ব্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। বক্তৃতা করা, সংবাদ-পত্র অথবা গ্রন্থ প্রকাশ, সভা সমিতি করা প্রভৃতি কোন বিষয়েই কোন বাধা নাই। যাহার যে ধর্ম্মে আস্থা, তাহাই সে পালন করিতে পারে—ইহাতেও আইনে কোন বাধা নাই।

এইরূপে নিপীড়িত স্লাভ জাতি একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজ্যের পত্তন করিয়াছে। আরম্ভটা খুবই আশাপ্রদ হইয়াছে। তবে ভবিষ্যৎ কিরূপ দাঁড়ায়, তাহার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে। এত দিন পর্য্যন্ত জেকো-স্লোভেকিয়া ও ভারতবর্ষ একই দুর্ভাগ্য বহন করিয়া আসিতেছিল; তাই জেকো-স্লোভেকিয়ার স্বাধীনতায় ভারতবাসীর মনে আশা ও আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে। পরাধীন জাতি ব্যতীত পরাধীনতার দুঃখ কেহ সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করে না। তাই ভারতবাসী মাত্রেই জেকো-স্লোভেকিয়ার স্বাধীনতা লাভে প্রাণভরা সহানুভূতি জানাইবে। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সমস্যার অনেকগুলি জেকো-স্লোভেকিয়ায় বর্ত্তমান। বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ভাষা সত্ত্বেও ক্ষুদ্র জেকো-স্লোভেকিয়া যদি নব-লব্ধ জাতীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া উন্নতি ও গৌরবের পথে অগ্রসর হইতে পারে—তবে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে নিরাশ হইবার কোনই কারণ নাই। এই হিসাবেও জেকোস্লোভেকিয়ার ভবিষ্যৎ ইতিহাস ভারতবাসীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

গরমিল

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(দ্বিতীয়াংশ)

২

লীলা মজুমদার মহাশয়ের খোলা চিঠিখানা হাতে করিয়া কমলার কাছে গিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল "বাবা, মা, দু'জনে তীর্থ-ভ্রমণ করতে যাচ্ছেন, যাবার পথে আমাদের বাড়ী হয়ে যাবেন লিখেছেন।"

"এখানে আসবেন? কবে রে?"

"কাল চিঠি লিখেছেন আজ ভোরে বেরুবেন। তা যদি বেরিয়ে থাকেন, তা' হ'লে বোধ হয় এখনি এসে পৌছবেন। চিঠিখানা এতো দেরীতে এলো যে কোন কিছু ব্যবস্থা করবার আর সময় নেই! এখন কি করি বৌদি বল তো? তাঁরা এসে পড়ে যদি এই রকমটা দেখেন—"

"নরেশকে বল্না।"

"আমি পার্ব্ব না!"

"তবে কে বল্বে?"

"তুমি বল।"

"আমি কেন বল্বো?—বা রে, বেশ মেয়েতো!" বলিতে বলিতে কমলা ডাক দিল, "ও নরেশ! লীলা তোমাকে কি একটা কথা বলবার জন্তে এসেছে—এদিকে শোন!"

লীলা ঘরে ঢুকিতেই নরেশ সেদিকে পিছন করিয়া তফাতের একটা জানালার ধারে সরিয়া দাঁড়াইয়া এতক্ষণ যেন এক-মনে আকাশের রঙ্গপটে মেঘের অভিনয় দেখিতে-ছিল। কমলার ডাক শুনিয়া সচকিতে ফিরিয়া দাঁড়াইল। লীলা তখন তাহার বৌদিদিকে চোখ রাঙাইয়া যেন বলিতেছিল "ও মাগো!—কি মিথ্যেবাদী গা তুমি!" নরেশ দ্বিধা ও সঙ্কোচের সহিত একটু একটু করিয়া কাছে আসিয়া একবার লীলার মুখের দিকে একবার কমলার মুখের দিকে অসহায়ের মত চাহিতে লাগিল! নরেশ কাছে আসিতেই লীলা মুখটি হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কমলা তখন তাহার সেই আনত মুখখানির চিবুক ধরিয়া উপর দিকে ঠেলিয়া তুলিয়া কহিল—"বল্না লো,—কি বল্বি!"

"যাও!" বলিয়া লীলা তাহার চিবুক হইতে কমলার হাতখানি সরাইয়া দিয়া তাহাদের দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল ও নত মুখে হাতের চিঠিখানা আবার মনে মনে পড়িতে লাগিল।

নরেশ কি করিবে স্থির করিতে পারিতেছিল না—এমন সময় কমলার চ'খের ইঙ্গিতে উৎসাহিত হইয়া সে আবার ঘুরিয়া লীলার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল এবং মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল "ব্যাপার কি? ও কার চিঠি?" লীলা চিঠিখানা নরেশের হাতে তুলিয়া দিয়া হেঁট হইয়াই বলিল "বাবার; তাঁরা সব এখানে আস্‌ছেন।"

"আমাদের বাড়ী?"

"হ্যাঁ।"

"কবে?"

"আজ। বোধ হয় এখনি এসে পৌছবেন।"

"বাঃ!—আর কেউ তোমরা সেটা এতক্ষণ আমাকে বলনি! ষ্টেসনে একটা লোক গেল না, একখানা গাড়ী গেল না, বেশ তো!" বলিয়াই নরেশ চিঠিখানা পড়িতে পড়িতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, এবং তৎক্ষণাৎ জুতো জামা পরিয়া আসিয়া চিঠিখানা কমলার হাতে ফেরত দিয়া বলিল "তা'হলে আমি এখন চল্লুম বৌদি। তাঁরা যে ক'দিন থাকেন, খুব আদর যত্ন করবে, দেখো যেন তাঁদের কোনও কষ্ট না হয়। ছটুকে গাড়ী নিয়ে ষ্টেসনে পাঠিয়ে দিলুম। খরচপত্র যদি হাতে বেশী না থাকে, তা'হলে এই নাও আরও শ'খানেক টাকা কাছে রেখে দাও। আমার কথা যদি জিজ্ঞাসা করেন, তাহ'লে বোলো যে, কারবারের দরুণ কি মাল-পত্র কিন্‌তে বিদেশে গেছে, ফিরতে দেরী

হবে—" নরেশের কথা শেষ হইবার আগেই ধীরে ধীরে লীলা আসিয়া তাহার হাত ধরিল। শরাহত পক্ষীর মত করুণ নেত্রে স্বামীর দিকে চাহিয়া রোদনরুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি থাক্‌বে না কেন? কোথা চ'লে যাচ্ছ?"

"যেদিকে দু'চক্ষু যায়! তাঁরা যখন এখানে আসছেন, তখন আমি আর কি ক'রে থাকি বল?—মনে নেই, যেদিন জোর করে তোমায় নিয়ে চলে এলুম, তাঁরা আর আমার মুখ দর্শন করবেন না বললেন? আর তুমিও তো সেদিন থেকে আমার মুখ দেখা বন্ধ করে দিয়েছো! তুমি আর তোমার বাপ মা আমার ওপর যে রকম সদয়, তাতে এ সময় আমার উপস্থিতিটা এখানে বোধ হয় তোমাদের কারুর পক্ষেই বিশেষ প্রীতিকর হ'বে বলে তো আমার মনে হচ্ছে না!"

"তা হোক্, তোমাকে থাক্‌তেই হবে।"

কমলাও লীলার সহিত যোগ দিয়া বলিল "নিশ্চয়! বাড়ীতে যখন অতিথি আস্‌ছে, তখন বাড়ীর কর্ত্তার কি পালানো উচিত?"

নরেশ বলিল, "তাঁরা তো এখন কিছু দিন এখানে থাক্‌বেন?"

লীলা বলিল, "থাক্‌বেন বই কি; এত দিন পরে যখন আস্‌ছেন এখানে, আমি কি তাঁদের শীগ্‌গীর ছেড়ে দেবো মনে করেছো? হাঁ—ভাল কথা; দেখ, তোমার যদি কোনও আপত্তি না থাকে, তাহ'লে ঐ দক্ষিণের বড় শোবার ঘরখানা তাঁদের জন্যে গুছিয়ে নিই।"

"তা বেশ তো, দাও না,—ও ঘরখানা হয়ে পর্য্যন্ত ত' আর তোমার অনুগ্রহে ব্যবহার করা ঘটে উঠেনি। তুমি ত এ বাড়ীতে ঢুকে অবধি বৌদির ঘরেই আস্তানা নিয়েছো, আর আমিও নিরুপায় হ'য়ে বৈঠকখানায় আড্ডা গেড়েছি!"

কমলা বলিল "ওঁরা এলে যেন আর বৈঠকখানায় শুতে যেয়ো না।" নরেশ হাসিতে হাসিতে বলিল, "তবে কি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবো বৌদি?"

"কেন, রাস্তায় রাস্তায়ই বা ঘুরতে যাবে কেন। আমার ঘরেই এক দিন তোমরা দু'জনে শোবে। আমি ওই পূবের দালানটায় একখানা মাদুর বিছিয়ে আমার ব্যবস্থা করে নেবো এখন, সে সব ঠিক বন্দোবস্ত করে ফেল্‌ছি আমি —" বলিতে বলিতে কমলা সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। নরেশ তখন পাশের একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া লীলাকে বলিল "দেখ, আমি তবে তোমাকে সব কথা খুলে বলি শোনো, রাগ কোরো না যেন। অনেক দিন বাপ মাকে দেখনি, তাঁদের ছেড়ে এসে পর্য্যন্ত এক দিনের জন্যেও আমার কাছে তোমার মন টিক্‌ছে না,—আজ যখন তাঁরা নিজেরাই তোমার কাছে আসছেন, তাঁদের দু' দিন আটকে রাখ্‌বে, ভাল করে খাওয়াবে-দাওয়াবে, আদর-যত্ন করবে—এটা খুবই স্বাভাবিক—আর সব মেয়েরই করা উচিত। কিন্তু আমি হলুম কি জানো, তাঁদের এখন ত্যাজ্যপুত্র-জামাই! আমার ওপর তাঁরা রেগে আছেন; সুতরাং আমাকে দেখলে যে তাঁরা আরও চটে যাবেন, এটাও ঠিক। সুতরাং আমার এ ক'টা দিন বাড়ী থেকে সরে থাকাই ভালো। তবে এখুনি তাড়াতাড়ি চলে যেতে হচ্ছে বলেই যা একটু অসুবিধে হবে, আর কিছু নয়। এটাও হোতো না—যদি তুমি দয়া ক'রে দু'দিন আগে এ খবরটা আমায় দিতে! যাক্ এখনও সময় আছে। কিন্তু আমার বোধ হচ্ছে, তাঁরা ঠিক তোমার সঙ্গে দেখা করতেই আসছেন না, বোধ হয় তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যেই আস্‌ছেন, আর তুমিও যে তাঁদের কাছে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে বসে আছো, সে বিষয়েও আমার কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার অবস্থাটা যে কতদূর শোচনীয় হবে, তা বোধ হয় একবারও ভেবে দেখনি? এই সবে নতুন ঘর-বাড়ী ফেঁদে বসিছি। এ সব ভাসিয়ে দিয়ে চলে যাওয়া হয় ত' তোমার পক্ষে কিছুই নয়; কিন্তু সে ব্যাপারে আমার প্রাণটা যে কত বড় ঘা খাবে, এটা তো অন্ততঃ তোমার একবার ভেবে দেখা উচিত ছিল! ফস্ ক'রে আমাকে না ব'লে ক'য়ে একেবারে তাঁদের এখানে নিয়ে আসবার যে কি দরকার পড়েছিল, তা তো আমি এখনও বুঝতে পাচ্ছিনি। আর আন্‌লেই যদি, তা ছাই আমাকে একটু আগে থাক্‌তে সেটা বলা উচিত ছিল তো—আমাকেও তো আবার এ দিকের সব গোছগাছ করতে হবে?"

লীলা প্রায় কাঁদো কাঁদো হইয়া বলিল, "আমি তো আজ এই মাত্র তাঁদের চিঠি পেয়ে জান্‌তে পারলুম যে, তাঁরা আস্‌ছেন। আমি তো তাঁদের এখানে আস্‌বার জন্যে এক দিনও কিছু লিখিনি!"

নরেশ বলিল, "আস্‌বার জন্যে না লিখলেও, অন্ততঃ তোমার যে এখানে মন টিঁক্‌ছে না—থাকতে খুবই কষ্ট হচ্ছে, অসুবিধে হচ্ছে—এ সব বোধ হয় প্রতি হপ্তায় লিখতে?—তাঁরা ক্রমাগত সেই সব শুনে ব্যস্ত হ'য়ে তোমায় নিয়ে যেতে আসছেন বোধ হয়।"

"আমি আজ পর্য্যন্ত চিঠিতে তাঁদের কাছে কখনও কোনও কষ্টের কথাই লিখি নি!"

"তবে বোধ হয় তোমার আমার দাম্পত্য-জীবনের বর্ত্তমান অবস্থাটা উপস্থিত যে রকম দাঁড়িয়েছে, তার সঠিক সংবাদটুকু তাঁদের কাছে পাঠিয়েছিলে?"

"এক দিনও তা জানাই নি।"

"সে কি?—সত্যি? তবে রোজ যে এক খানা ক'রে চিঠি রাজনগরে যেতো, তাতে কি তুমি লিখ্‌তে বল তো?"

"বিশেষ কিছুই না। আমরা সব এখানে বেশ ভাল আছি, কোনও কষ্ট হচ্ছে না, বৌদি খুব যত্ন করছেন —এই সব।"

নরেশ অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বল কি লীলা? শুধু এই কথা লিখ্‌তে? আর কিছু না? সত্যি বলছো?—আজ এই এক বছর ধরে তুমি এখানে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছো, কোনও কষ্ট হচ্ছে না—এই রকম সুখবরই তাঁদের বরাবর দিয়ে এসেছো? বাঃ! লীলা! তুমি দেখছি তা হ'লে তাঁদের কাছে আমার মুখ রক্ষে করেছো,—আমায় মাপ কর, আমি তোমার ওপর অন্যায় করেছিলুম!"

"আমি আমাদের পরস্পরের এই মনের অবস্থা আর আমাদের ভিতরের এই শোচনীয় বিরোধটা তাঁদের কিছু-মাত্র জানতে দিইনি, এই জন্যে যে, পাছে তা শুনে তাঁদের মনে আরও বেশি কষ্ট হয়।"

"ওঃ! তাই বল। পাছে তাঁদের আরও কষ্ট হয় এই জন্যে জানাওনি, তা বেশ করেছো—কিন্তু এইবার তো তাঁরা এসে স্বচক্ষে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাটা দেখে যাবেন?"

"তাঁরা তো এখানে বেশি দিন থাক্‌বেন না। তীর্থ ভ্রমণ করতে বেরিয়েছেন—দু' এক দিন পরেই চলে যাবেন।"

"তোমাকেও কি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবেন?"

"তা জানি নি; যদি নিয়ে যান তা হ'লে তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে কি?"

"আমি যাব?—হাঃ হাঃ হাঃ,—তুমি হাসালে লীলা! আমাকে তাঁরা নিয়ে যাবেন কেন?—আমি যে এখন তাঁদের দু' চক্ষের বিষ!—কিন্তু তুমি—তুমি কি তবে সত্যিই তাঁদের সঙ্গে চলে যাবে ঠিক করেছো?—তা যেয়ো —কিন্তু আমার দুর্দ্দশা কি হবে তাই ভাব্‌ছি।—একলাটি পড়ে থাক্‌তে হবে বোধ হয়! তাই তো!—কে সব দেখবে শুন্‌বে করবে কর্ম্মাবে?—নাঃ, বৌদি থাক্‌বে নিশ্চয়, সে কখনই আমাকে একলা ফেলে রেখে চলে যাবে না। উঃ—বৌদি না থাক্‌লে আমি কি এত দিন এ বাড়ীতে এক বেলাও তিষ্ঠুতে পারতুম?—তুমি তো এখানে থেকেও নেই, সেই তো আমার সমস্ত সংসারটাকে ঘাড়ে ক'রে রেখেছে! ভাগ্যি বৌদি তখন আমাদের সঙ্গে এসেছিল, নইলে কি হ'তো বল তো?—সেই 'গরীবের মেয়ে' ব'লে নতুন উপন্যাসখানার—স্বামী-স্ত্রীর মতো আমাদের দুর্দ্দশা হ'তো আর কি!"

লীলা যেন হঠাৎ শিহরিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি বলিল, "না—না, তা হতেই পারে না,—বৌদিকে তাঁদের সঙ্গে যেতেই হবে। তাঁরা লিখেছেন যে ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন।"

নরেশ উত্তেজিত ভাবে বলিল, "বাঃ! তা কি ক'রে হবে? এখানে তাহ'লে কে দেখবে শুনবে? একজন না থাক্‌লে কি চলে?"

অভিমান করিয়া লীলা বলিল, "তুমি দেখছি তাহ'লে আমার যাওয়াটা বন্ধ করতে চাও?"

নরেশ চোখ দু'টি কপালে তুলিয়া একপ্রকার ভীত মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, "বাপরে! সে কি আমি বারণ করতে পারি? একেই তো বারোমাস মুখ ভার করে রয়েছো; আমায় তো এক রকম 'তাল্লাক্' দিয়েছো বল্লেই হয়। তার ওপোর আবার তীর্থে যাওয়া বন্ধ করলে কি রক্ষে আছে? কোন দিন শেষ কেরাসিন তেলের যজ্ঞ করে বস্‌বে? তোমার যাবার ইচ্ছে থাকে নিশ্চয় যাবে; আর আমি তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর করে কিছু করছিনি! একবার স্বামীগিরি ফলাতে গিয়ে যে শাস্তিটা এখনও ভোগ করছি—আর কি ভুলেও সে কাজ করি?

কিন্তু বৌদিকে আমি কিছুতেই যেতে দেবো না। বৌদি না থাক্‌লে এক দিনও আমার সংসার চলবে না। তুমি যেতে চাও যাও, কিন্তু বৌদির যাওয়া কিছুতেই হ'তে পারে না।"

রাগে অভিমানে অপমানে আঘাতে লীলার ঠোঁট দু'খানি ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। তীব্র অনুযোগের কণ্ঠে সে বলিতে লাগিল, "তা আমি জানি, তুমি আর আমাকে এখানে রাখ্‌তে চাওনা, সরিয়ে দিতে পারলেই যেন বাঁচো! আমি ছাড়া আর যে কেউ হোক্ তোমার সংসার বেশ চালাতে পার্ব্বে; কেন না আমি এখন তোমার সংসারের বোঝা হ'য়ে উঠেছি কি না?—কিন্তু শুনে তুমি ভারি হতাশ হবে—যে আমি এখন তাঁদের সঙ্গে কোথাও যাচ্ছিনি! এইখানেই থাক্‌বো ঠিক করিছি!"

লীলার এই অপ্রত্যাশিত নূতন রূপ দেখিয়া নরেশ অতি মাত্র বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "সে কি! তুমি যাবে না? এইখানেই থাকবে ঠিক করেছো? আমার কাছেই? এই বাড়ীতে, না ওখানে?"

"ওখানে গিয়ে থাক্‌লেই বোধ হয় তুমি খুসী হও; তোমার বেশ সুবিধে হয়, না? কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আমিও এ বাড়ী থেকে নড়ছিনি! এইখানেই থাক্‌বো মনে করছি,—বুঝলে?"

নরেশ অধিকতর বিস্ময়ে ও সন্দেহে আন্দোলিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "তাই না কি? বটে! তুমি যে আমাকে আজ অবাক্ করে দিচ্ছ! হঠাৎ তোমার এ সুমতি হ'ল কি ক'রে? তাঁরা বোধ হয় তোমাকে এই রকম উপদেশ দিয়েছেন, না? বাপ মার কথা রাখতে, তাঁদের ইচ্ছে অনুসারেই বোধ হয় কৃপা করে তুমি আমার ওপর এই অনুগ্রহটুকু করতে রাজি হয়েছো?"

লীলা ইহার উত্তরে বেশ জোর করিয়াই বলিল, "আমি আমার নিজের ইচ্ছেতেই এখানে থাক্‌ছি। কারুর উপদেশে বা অনুরোধে নয়, আর এরকম উপদেশও কেউ আমাকে দেয় নি।"

নরেশ আনন্দে বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া লীলার মুখের দিকে বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া রহিল। এমন সময় কমলা সেখানে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "তাঁদের থাক্‌বার সব বন্দোবিস্ত করে ফেললুম। তুমি আমার ঘরেই শোবে, তোমার খাট-খানা বাইরে থেকে চাকরদের দিয়ে আনিয়ে নিয়েছি। আর ও ঘরের বড় পালঙ্কখানাতে তাঁদের জন্যে বিছানা করিয়ে রাখলুম। এখন তুমি যেন শ্বশুরের ভয়ে পালিয়ো না।" বলিয়া কমলা খুব হাসিয়া উঠিল।

নরেশ লীলার দিকে চাহিয়া বলিল, "তা আমি যে সেটা এখনও ঠিক করতে পারছিনি! তুমি কি বল? আমার তো মনে হয় এ ক'টা দিন গা ঢাকা দিতে পারলেই ভালো হয়।"

এবার কমলা রাগ করিয়া বলিল, "বেশ, যাও, তাহ'লে আমিও এইবেলা সরে পড়ি। একখানা ভাড়া গাড়ী ডেকে আনুক, শিবপুরে আমার ন'মামার কাছে এ ক'টা দিন থাকিগে!"

লীলা যেন বিরক্ত হইয়া বলিল, "বৌদি! তুমি সরে যাবো বল্‌ছো কিসের জন্যে শুনি?"

নরেশও লীলার সহিত যোগ দিয়া বলিল "তা বই কি! তুমিও সরে যাবে কি রকম?"

কমলা বলিল "আমি বাপু তোমাদের এসব গণ্ড-গোলের ভেতর থাক্‌তে চাইনে! একবার কর্ত্তা জিজ্ঞেসা করবেন 'ব্যাপার কি?' একবার গিন্নী জান্‌তে চাইবেন—'কি হ'য়েছে গা বৌমা?' আমি বাপু তোমাদের জন্যে তাঁদের কাছে সাত সতেরো মিছে কথা বলতে পার্ব্বো না! আর ও মেয়েটী যে রকম কেলেঙ্কেরে, হয়ত' কখন কি বলে ফেল্‌বে, আর আমার অপদস্থর সীমা থাক্‌বে না!"

নরেশ বলিল "না বৌদি! লীলাকে তুমি অতটা আহাম্মুক ঠাউরো না। তুমি যখন ওর গুরু, হাতে ক'রে ওকে গড়ে পিটে যখন মানুষ করেছো—" লীলা ইহাতে তীব্র আপত্তি প্রকাশ করিয়া বলিল—"উনি কেন আমার গুরু হ'তে যাবেন? পোড়া কপাল আর কি!—আমাকে আবার হাতে ক'রে উনি গ'ড়ে পিটে মানুষ করলেন কবে?"

লীলার এই অশিষ্ট প্রতিবাদে অপ্রতিভ হইয়া নরেশ বলিতে লাগিল, "তা সে না হ'লেও উনি তোমাকে কিন্তু খুব স্নেহ করেন লীলা! সাধ্যমত তোমার গায়ে একটি আঁচড়ও লাগতে দেন না। বৌদির মত শুভাকাঙ্ক্ষীও বোধ হয় আর তোমার কেউ নেই।"

রাগে মুখ বিকৃত করিয়া লীলা বলিল, "ছাই! শালুক

চিনেছেন গোপালঠাকুর! যার মুখে মিষ্টি ভেতরে ছুরি, সে আবার শুভাকাঙ্ক্ষী!"

হঠাৎ লীলার এই তীব্র উষ্মার কোনও সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া নরেশ যেন হতভম্ব হইয়া গেল! কমলার প্রতি লীলা যে অবিচার করিতেছে, এজন্য বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়া খুব ধীরে ধীরে নরেশ বলিল, "তুমি এ ভারি অন্যায় কথা বল্‌ছো লীলা! বৌদি তো কখনও তোমার সঙ্গে কোনও প্রবঞ্চনা করেন নি। এক দিনও তোমার কিছু অনিষ্ট করেন নি—"

নরেশের কথায় বাধা দিয়া অধৈর্য্য ভাবে লীলা বলিয়া উঠিল, "অনিষ্ট করেনি?—কি জানো তুমি? কার জন্যে আজ আমার এই অবস্থা? ওর দোষেই তো আমার জীবনটা এমন অসুখী হয়ে উঠেছে!"

নরেশ তাড়াতাড়ি লীলার মুখে হাত চাপা দিয়া বলিল, "ছিঃ ছিঃ! চুপ কর; কি বলছ' তুমি লীলা?"

লীলা নরেশের হাত সরাইয়া দিয়া বলিল, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ, জানি, তুমি তো ওর দোষ দেখতে পাবে না। ওর ওপোর যে তোমার টানটা বড্ড বেশি—তুমি তো ওর হয়ে বল্‌বেই—কিন্তু আমি তো ভুলিনি যে কার পরামর্শ পেয়ে আমি বিবাহে মত দিয়েছিলুম! কে আমার কাণে বিষমন্ত্র দিয়ে আমাকে আজ এই অসহ্য যন্ত্রণার ভেতর টেনে এনেছে! ওর কথা যদি আমি তখন না শুনতুম, তা হ'লে তো আজ আমাকে বাপ মার আশ্রয় ছেড়ে এসে এই পরের বাড়ী অন্যের গলগ্রহ হ'য়ে থাকতে হোত না? তাড়াতাড়ি আমার বে' দেবার জন্যে ও যে কেন তখন অমন উঠে পড়ে লেগেছিল, এখন আমি তার আসল কারণ কতকটা বুঝতে পেরিছি। কত দিন আর ও আমার চখে ধূলো দিয়ে রাখবে? ও যে বল্‌তে না বল্‌তে পুঁটলি পাঁটলা বেঁধে আমার সঙ্গে এখানে চলে এসেছে, সে কি তুমি মনে কর কেবল আমাকে দেখবার শোন্‌বার জন্যে, না আমার নতুন ঘর-কন্না গুছিয়ে দেবার জন্যে? সে সবই ওর ছল! ও নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে এখানে এসেছে—সে কি আমি জানি নি? আমাকে যত দেখুক না দেখুক, দিনরাত তোমার পরিচর্য্যা নিয়েই তো ও ব্যস্ত থাকে দেখতে পাই! কেন, আমার চেয়ে তোমার ওপর কি ওর বেশি টান? অত দরদ তোমার ওপর ওর কেন, সে কি আমি বুঝতে পারিনি মনে কর? তোমরা দুজনে মিলে রাতদিন আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছো! আমি সব টের পেয়েছি। তোমরা যে আমাকে ছেলেমানুষ মনে করে আমাকে নিয়ে যা তা করবে, সে আর আমি হ'তে দিচ্ছিনি। উনি যে মৎলবে আজ একখানা বটতলার পচা বই এনে আমাকে পড়ে শুনিয়ে ভয় দেখাচ্ছিলেন যে, শেষটা আমাদেরও অবস্থা দাঁড়াবে ওই রকম, তাতে আমি একটুও ভয় পাই নি। যদি তাই হয় হোক্ না—আমার তাতে কিছুই যায় আসে না। কিন্তু এটা তোমরা ঠিক জেনো যে, আর একজনের ভালবাসা পাবার জন্যে কাঙাল ভিক্ষুকের মতো লালায়িত হ'য়ে বেড়াবার আগে আমি বিষ খেয়ে মরবো। আমি কখনই তোমাদের মনের বাসনা পূর্ণ হ'তে দিচ্ছিনি। এখনি মা আসবেন বাবা আসবেন—তাঁরা এসে যখন চখের উপর এই সব কাণ্ড দেখ্‌বেন, তখন বেশ হবে, আমি তাই চাই, তবেই যদি তোমরা জব্দ হও—" বলিতে বলিতে লীলা কাঁদিয়া ফেলিল, মুখের ভিতর আঁচল পুরিয়া দিয়া ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে সে ঘর হইতে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

নরেশ স্তম্ভিত হইয়া অনেকক্ষণ সেদিকে চাহিয়া থাকিয়া তার পর কমলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "লীলার এ কি রকম কাণ্ডকারখানা বৌদি?"

কমলা কিন্তু লীলার এই কাণ্ডকারখানা দেখিয়া মনে মনে খুসিই হইয়াছিল। লীলার সমস্ত অনুযোগ সে চুপটি করিয়া শুনিয়াছে এবং তাহার অজ্ঞাতসারে কেবলই মুখ টিপিয়া হাসিয়াছে,—একটি সামান্য প্রতিবাদও করে নাই। নরেশের প্রশ্ন শুনিয়া হাসি মুখেই কমলা উত্তর দিল—"আমাকেও আর দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারে না।"

"সে কি! ক'দ্দিন?"

"প্রায় এ বাড়ীতে আসবার পর থেকেই—দিন দিন আমি ওর দু' চক্ষের বিষ হ'য়ে উঠিছি!"

"না—না; সত্যি বল; যথার্থই কি ও তোমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছে?"

"অন্ততঃ তোমার চেয়েও আমার ওপর বেশি সন্তুষ্ট নয়।"

"সে কি কমলা! তোমাকে অত ভালবাস্‌তো ও!"

"এখন তেমনি ঘৃণা করে! আমার ওপর ওর এখন দস্তুর মত একটা আক্রোশ হয়েছে!"

"তোমাকেও যেন একটু সন্দেহের চক্ষে দেখে বলে মনে হ'ল ."

"একটু নয়—ভয়ানক রকম!"

"কি আশ্চর্য্য! তোমার উপরেও ওর সন্দেহ!"

"নইলে আর কার উপর হবে?"

এ প্রশ্ন শুনিয়া নরেশ অনেকক্ষণ কমলার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। তাহার ভাবগতিক দেখিয়া কমলার অধর কোণে হাসির গোপন রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে তখন মুখখানি অন্য দিকে ফিরাইয়া লইল। নরেশ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ইতস্ততঃ করিয়া বলিতে লাগিল "কিন্তু তার এরকম মনে হবার কোনও কারণ তো কোনও দিন ঘটেনি!—সন্দেহের ছায়ামাত্র যেখানে কখনও—"

নরেশের কথা শেষ হইবার আগেই হাসি মুখখানি তাহার দিকে ফিরাইয়া কমলা বলিল, "সে জন্যে আর তোমার এতো দুর্ভাবনা কেন? তোমার তো বরং এতে খুসি হবারই কথা! ও যে আমাকে সন্দেহ ক'রে একটু চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে, এর ফলে তোমারই তো শেষটা ভাল হবে!"

"বল কি কমলা! লীলার এ রকম অকারণ সন্দেহ করা খুবই অন্যায়! তা ছাড়া এটা এতবড় একটা লজ্জার বিষয়! এর পরিণাম তো আমি কিছুতেই ভাল ব'লে বুঝ্‌ছিনি!"

"তোমরা হ'লে বেটাছেলে, মেয়ে মানুষের মনের কথা আমরা তোমাদের বুঝিয়ে না দিলে কি তোমরা কোনও দিন বুঝ্‌তে পারো?—এই যে আমার ওপোর ওর একটা সন্দেহ হ'য়েছে, এই সন্দেহ তার মনে আমার বিরুদ্ধে একটা বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলেছে। সেই বিদ্বেষ ওকে এখন উন্মত্ত করে তুলেছে—আমাকে অতিক্রম ক'রে তোমাকে সব দিক দিয়ে জয় কর্ব্বার জন্যে! এইবার ও তোমাকে সত্যিই ভালবাসতে সুরু করেছে!"

"এ্যাদ্দিনে?"

"হ্যাঁ, এ্যাদ্দিনে। বে'র আগে তোমার প্রতি ওর যে ভালবাসাটুকু ছিল, সেটা হ'চ্ছে বাইরের জিনিস, সেদিন অন্তরের সঙ্গে তার কোনও যোগ হ'য়ে ওঠেনি। আজ আমার উপর তার এই সন্দেহজনিত বিদ্বেষের আক্রোশ ওর বাইরের সঙ্গে অন্তরের একটা নিবিড় যোগ সাধন ক'রে দিয়েছে। প্রেমের গভীরতা অনেক সময় এই পথেই প্রাণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করবার সুযোগ পায়! কোনও জিনিস যখন আমরা হারাতে বসি নরেশদা, তখনই সেটার ওপর আমাদের মায়া যেন সবচেয়ে প্রবল হ'য়ে ওঠে, অথচ তার আগের মুহূর্ত্তে পর্য্যন্ত হয়ত আমরা তাকে নিতান্ত অনাদর ক'রেই এসেছি! লীলারও আজ মনের অবস্থা তাই। তোমাকে সে যতদিন পেয়েছিল, অবহেলাই ক'রে এসেছে। কিন্তু আজ তার সন্দেহ হয়েছে বুঝি বা তোমাকে হারায়। তাই সে তোমার জন্যে আশঙ্কায় সজাগ হ'য়ে উঠেছে! আমার ওপর ওর এই বিদ্বেষ তোমার প্রতি ওর আন্তরিক আকর্ষণেরই একটা রূপান্তর বইতো নয়!"

কমলার প্রতি কৃতজ্ঞতায় নরেশের দুই চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া নরেশ বলিল "বুঝেছি কমলা, আমার লীলা এইবার সবদিক দিয়ে আমার কাছে ধরা দেবে; আমার এই বিড়ম্বিত জীবন এইবার সার্থকতার চরম আনন্দ লাভে চরিতার্থ হ'বে—কিন্তু ভাই এর অসম্ভব মূল্য যে তোমাকে দিতে হচ্ছে তোমার অপযশের বিনিময়ে! এতবড় ক্ষতিও কি তুমি সহ্য করবে এই অভাগার জন্যে?"

ম্লান হাসি হাসিয়া কমলা বলিল "জীবনের কারবারে হাত দিতে না দিতে যার ভরাডুবি হ'য়ে গেছে নরেশদা, তোমাদের প্রেমের মহাজনি করে তাকে যদি দেউলেই হ'তে হয়—তাতে আর তার এমন কি বেশি ক্ষতি হ'বে ভাই?"

মমতায়, বেদনায়, প্রশংসায় নরেশের হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অনেকক্ষণ সে আর কোন কথা কহিতে পারিল না। তার'পর অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত বলিল, "যদি কিছু না মনে কর, তাহ'লে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।"

"কি বল?"

"জীবনে কখনও ভালবাসার যথার্থ আস্বাদ পেয়েছিলে কি?"

অভিমন্যু

শিল্পী— শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রশ্ন শুনিয়া কমলা যেন শিহরিয়া উঠিল! অনেকক্ষণ কি ভাবিয়া, একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "হ্যাঁ ভাই, আমিও এক দিন একজনকে ভালবেসেছিলুম আমার সমস্ত জীবন দিয়ে।"

"অসুখী হয়েছিলে নিশ্চয়।"

"সুখী হতে পারিনি বটে, কিন্তু এ কথা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করবার উদ্দেশ্য কি তোমার?"

"দেখ, আমার ধারণা, যারা ভালবাসার আগুনে পুড়েছে, কেবল তাদেরই মন থেকে স্বার্থের বিষাক্ত অজগরটা জলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়; আর তাদের দ্বারাই কেবল জগতের যথার্থ কল্যাণ সাধিত হতে পারে।"

"তোমার ধারণা মিথ্যে নয়; ভালবাসা জীবনের একটা মস্ত বড় অভিষেক—যা মানুষের মনের সমস্ত ক্ষুদ্রতার অগ্নিসংস্কার ক'রে তাকে উদার ও মহৎ ক'রে তোলে। কিন্তু সে যে কেবল এই পথ ধরেই চলে, এই দিক দিয়েই শুধু জগতের উপকার করে, তা যেন মনে কোর না।"

"না—না, সে আমি জানি; আর এও জানি যে, অনেক সময় তারা কেবল জগতের যন্ত্রণা আর দুঃখই বাড়িয়ে তোলে—শান্তি ও আনন্দের ব্যাঘাত উৎপাদন করে!"

"তা ক'রে বটে, কিন্তু সে কারা জানো?—যাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব বলে জিনিসটা আর থাকে না, লালসা যাদের গর্ব্বকে পঙ্কিল করে দিয়েছে, যারা আত্মসম্মান হারিয়েছে।"

আনন্দে বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া নরেশ বলিতে লাগিল, "আশ্চর্য্য! যতই তোমার অন্তরের পরিচয় পাচ্ছি,—যতদূর নিবিড় ভাবে তোমার ভেতরটা দেখ্‌তে পাচ্ছি—যতটুকু স্পষ্ট ক'রে তোমায় জান্‌ছি—ততই যেন মনে হচ্ছে, আরও কত আছে তোমার মধ্যে জান্‌বার, বোঝ্‌বার, শেখবার! তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ ভাবে পরিচিত হওয়া বুঝি জন্মজন্মান্তরের কাজ! আর কেবলই ভাব্‌ছি—কি ভাব্‌ছি জানো?—ভাবছি সে কি হতভাগ্য, যে তোমার অমূল্য প্রেমের মর্য্যাদা বুঝ্‌তে না পেরে, তোমাকে হেলায় প্রত্যাখ্যান করেছে!"

"আমি কিন্তু সেই জন্যেই তার কাছে আরও চিরকৃতজ্ঞ হ'য়ে আছি নরেশদা! সে যদি আমাকে গ্রহণ করতে চাইতো, তা'হ'লে আমার যে কি সর্ব্বনাশ হোতো, সে কারুর ধারণাই হবে না ভাই। প্রেমের সার্থকতাটাই সব সময়ে জীবনের সাফল্য এনে দেয় না,—সে ধ্বংসও করে। তাই আমিও সেটাকে বিশেষ ক'রে কোন দিনই চাই নি।"

"তুমি তবে কি চেয়েছিলে কমলা?"

"আমি যা চেয়েছিলুম, তা যারা চায়, তারা কেউই সেটা কোনও দিন ঠিক বুঝিয়ে বল্‌তে পারে না। অনেক সময় তারা নিজেরাই হয় ত নিশ্চয় করে বুঝ্‌তে পারে না যে, তারা যথার্থই কি চাইছে! আমিও বোধ হয় সেদিন কি চেয়েছিলুম, তা কোন দিনই বুঝ্‌তে পারতুম না, যদি না দয়া করে সে আমাকে প্রত্যাখ্যান কর্‌তো!"

"আচ্ছা, আর একটি কথা বল্‌বে?"

"বল।"

"সেদিনের স্মৃতি কি তোমাকে কোনও দিন চঞ্চল করে তোলে না? সেই পুরোনো আশা-আকাঙ্ক্ষার জ্বালা-যন্ত্রণা কি একেবারে চিরদিনের মতো জুড়িয়ে গেছে? উত্তেজনার অসহ্য আঘাত লেগে তোমার ক্ষত মর্ম্মস্থল কি আর সেদিনের মতো রক্তাক্ত ও বেদনাতুর হ'য়ে ওঠে না? কোনও সাধ—কোনও বাসনার বিষাক্ত নাগিনী কি তোমার বুকের ভেতর গরলের ফণা তুলে আর এক দিনও গর্জ্জে ওঠে না? দেহের দৈত্যগুলোও কি সব তোমার পূত শুভ্র রূপোর কাঠির স্পর্শে অসাড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে কমলা?"

"পূত শুভ্র নিরাভরণ বেশ যদি মনের রাঙা রংটাকে বদ্‌লে দিতে পারতো নরেশদা,—তা হ'লে আমাদের সমাজের অনেক গ্লানি, অনেক অধঃপতন পাপের তালিকায় কোনও দিনই দেখ্‌তে পাওয়া যেতো না! গৈরিক যেমন সন্ন্যাসীকে কেবল সতর্ক করে রাখে মাত্র, আমাদেরও এই বিধবার বেশ তার চেয়ে বেশী কিছু করতে পারে না। তবে যদি বল তবু আমাদের পদস্খলন হয় কেন, তার কারণ আমরা সংসার-ত্যাগী বৈরাগী নয় বলে। পারিপার্শ্বিক সহস্র প্রলোভনের সঙ্গে যাদের নিত্য দ্বন্দ্ব করতে হয়, দেহ ও মনের অসংখ্য দুর্ব্বলতা প্রায়ই তাদের ললাটে পরাজয়ের কলঙ্ক-রেখাই এঁকে দিয়ে যায়! তা

বলে তুমি যেন মনে কোর না যে, আমরা সবাই এম্‌নি দুর্ব্বল !"

"তোমাকে যে দেখেছে, সে কোনও দিনই ও কথা মনে করতে পার্ব্বে না কমলা !"

"আচ্ছা, ও সব বাজে কথা থাক্‌। এখন আমি তোমায় একটা অনুরোধ করতে চাই, রাখ্‌বে কি ?"

"সে কথা জিজ্ঞেস করবার তো কোনও প্রয়োজন নেই, শুধু আদেশের অপেক্ষা মাত্র।"

"তাই না কি ? বেশ, তাহ'লে আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি কর যে, হাজার দোষে দুষী হ'লেও লীলাকে কোনও দিন ত্যাগ করবে না। সে এখনও নিতান্ত বালিকা, অটল ধৈর্য্যের সঙ্গে তাকে জীবনের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে হবে,—তবে সে এক দিন তোমার জীবনের কোনও নির্ম্মল প্রভাতে সর্ব্বসন্তাপহরা প্রেমের শান্ত স্নিগ্ধ ছায়াময় নিভৃত উপকূল দিয়ে মহিমময়ী নারীত্বের গৌরব-শিখরে পৌঁছতে পারবে !"

"এর জন্যে আর বিশেষ ক'রে অনুরোধ কেন কমলা ! তুমি কি জানো না—তার জন্যে আমি কি না করছি, কতখানি সহ্য ক'রে আছি ?"

"সে কথা জানি বলেই তো আরও আমি তোমাকে একটা বন্ধনের মধ্যে বেঁধে রেখে যেতে চাই,—নইলে তীর্থে গিয়েও যে আমি শান্তি পাব না। তোমার মত প্রকৃতির লোকেরা যখন বেঁকে দাঁড়ায়, তখন কিছুতেই কোনও প্রলোভনেই আর তাদের উল্টো দিকে নোয়ানো যায় না। তাই ভয় হয়, পাছে অধীর হ'য়ে তুমি কোন দিন লীলার দিক থেকে বুঝি বা তোমার মুখ ফিরিয়ে নেবে ! তোমার কাছ থেকে সে বিষয়ের একটা নিশ্চিত আশ্বাস না পেলে আমি যে নিশ্চিন্ত হয়ে বেরুতে পার্ব্বো না !—অথচ আমাকে যেতেই হবে, এই বেলা এই সুযোগে। এখন যদি বেরিয়ে পড়তে না পারি, তাহ'লে হয় ত চিরকালের মতো জড়িয়ে পড়বো সংসারের পাঁকে,—জীবনে আর কখন বোধ হয় তফাৎ হ'তে পার্ব্ব না !"

"আমার মুখ থেকে সে কথা শুনলেই যদি তুমি নিশ্চিন্ত হও, তাহ'লে যাও তুমি, নিশ্চিন্ত হয়েই তোমার জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন করগে। লীলার জন্যে কোনও [illegible] জীবনে কখনও দুঃখ দেবো না—এই তোমার গা ছুঁয়ে শপথ করছি।" বলিতে বলিতে নরেশ সাগ্রহে কমলার একখানি হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে মুঠা করিয়া ধরিল। কি জানি কেন—কমলা এবার আর তাহার হাত সরাইয়া লইবার কোনও চেষ্টাই করিল না। হাসি মুখে যেন বিশেষ প্রীত হইয়াই বলিল, "কিন্তু আমি তো তোমাদের বনিবনাও না দেখে যেতে পাচ্ছি নি নরেশদা ! আমরা তিন জনেই যে অসুখী হ'য়ে থাক্‌বো, এ আমি কিছুতেই হ'তে দিচ্ছি নি ! আমি যদিও ঠিক অসুখী নই, কিন্তু তোমাদের অসুখী দেখ্‌লে তো আমি কোথাও গিয়ে এক দিনের জন্যেও স্বোয়াস্তি পাবো না। অথচ এই বেলা পালাতে না পারলেও কিন্তু আমার মুক্তি নেই।"

"বেশ তো, কি করলে তুমি নিশ্চিন্ত হও বল।"

ব্যাকুল মিনতির সহিত কমলা বলিল, "তুমি বাড়ীতে থাকো লক্ষ্মী ভাইটী আমার,—তাঁরা আসছেন ব'লে কোথাও পালিও না। নিজে থেকে তাঁদের আদর অভ্যর্থনা, খাতির যত্ন কর। লীলার সঙ্গে আজ থেকে এমন ব্যবহার কর, যেন তোমাদের মধ্যে কোনও দিনই কোনও মনোমালিন্য ছিল না। তাহ'লে নিশ্চয় দেখো, লীলাও তার বাপ মার কাছে কিছু ভাঙ্‌বে না।"

"সে বিষয়ে তুমি এতটা নিশ্চয় হচ্ছ কি ক'রে ?"

"কারণ, আমিই যে সেটা তার পক্ষে আজ অসম্ভব ক'রে তুলিছি।"

"কি রকম ?"

"অনেক দিন আগে তুমি একবার আমাকে এই কাজটাই যে ভাবে করবার জন্যে অনুরোধ করেছিলে, আমি তখন তোমার কাছে সেটা করতে অস্বীকৃত হলেও, কাজটা আমার চেষ্টাতেই আজ সম্পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু ঠিক সে ভাবে নয় ! আমি একটু উল্টো পথ ধরে চ'লে, সোজা দিকটাই বেছে নিয়েছি !"

"তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবার প্রথম দিন থেকেই কি এই রকম উল্টো পথ ধরে চলেছো কমলা ?"

"না ভাই, তখন ঠিক সিধে পথ ধরেই এগিয়ে যাচ্ছিলুম ; কিন্তু অল্প দূর যেতে না যেতেই পথ হারিয়ে ফেলেছি। তা সেদিনের কথা আজ ভুলে যাও নরেশদা ! সেদিন আমরা কেউই পথ চিন্‌তে পারিনি। তা ছাড়া অ-

কারণও যে অনেক ছিল ভাই। এখন যে পথে এতটা চলে এসেছি, সে সোজাই হোক আর বাঁকাই হোক্, এগিয়ে যেতে হবে। এখন আর পিছনে তাকিয়ে কোনও ফল নেই,—শুধু আপশোষ হ'বে, বুঝলে ?"

নরেশ কমলার হাতখানা আরও জোরে চাপিয়া ধরিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিতে লাগিল—"কমলা, তুই যে আমার চেয়ে কত উঁচুতে চলে গেছিস, তোর প্রাণটা যে কত বড়, আজ তার অনাবৃত মূর্ত্তি দেখে বিস্ময়ে পুলকে শ্রদ্ধায় তোর কাছে আমার মাথা নত হ'য়ে পড়ছে! আজ যেন সমস্ত অন্তরের মধ্যে অনুভব করতে পারছি—কী ভুলই সেদিন করেছিলুম আমরা! আমরা যা চাই—আমার মন, আমার প্রাণ, আমার অন্তরাত্মা যা পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তোরই ভেতর তারা যেন সবাই একসঙ্গে ভিড় ক'রে লুকিয়ে রয়েছে!—আমার সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি যেন তোরই ওই অন্তরনিঃসৃত অনন্ত-সুধা-সিঞ্চিত স্নেহধারার মধ্যে আজন্মকাল নিহিত হ'য়ে রয়েছে! আজ যেন আমি প্রথম ঘুম ভেঙে উঠে, আমারই মাথার শিয়রে আমার চিরদিনের ঈপ্সিত কামনার ধন—"

হঠাৎ শিহরিয়া উঠিয়া, সজোরে হাতটা ছিনাইয়া লইয়া কমলা বলিয়া উঠিল, "শীগ্গীর যাও তুমি—ঐ বোধ হয় তাঁরা এলেন, বাড়ীর সামনে যেন গাড়ী দাঁড়াবার শব্দ পেলুম!"

নরেশও চমকাইয়া উঠিয়া বলিল, "এ্যাঁ!—এসে পড়েছেন না কি? তাই তো! কি হবে—তা হ'লে—"

অধীর হইয়া কমলা বলিল—"যাও, যাও,—এখনি ছুটে গিয়ে—তাঁদের খাতির করে গাড়ী থেকে নামিয়ে নিয়ে এসগে। ওই বোধ হয় লীলা নেমে যাচ্ছে—যাও চট্ করে—ওর সঙ্গে গিয়ে দু'জনে হাসি মুখে খুসী হয়ে ওঁদের তুলে নিয়ে এসো—"

নরেশ তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। পিছন হইতে কমলা আবার বলিয়া দিল, "ষ্টেসনে ওঁদের নিজে আনতে যেতে পারোনি ব'লে একটা কিছু সঙ্গত কারণ দেখিও, বুঝলে?"

সিঁড়ির সব-শেষ ধাপ হইতে নরেশ উত্তর দিল "আচ্ছা।" কমলা তখন ঘরের ভিতরের একখানা কৌচের উপর অবসন্নের মত বসিয়া পড়িয়া বলিল, "যাক—বড্ড সময়ে ওঁরা এসে পড়েছেন!" কমলার সর্ব্বশরীর তখনও কাঁপিতেছিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার উঠিয়া পড়িয়া, প্রায় ছুটিতে ছুটিতে সেও নীচে নামিয়া গেল।

(শেষ)

নরেশ ও লীলা যখন কর্ত্তা-গিন্নীকে গাড়ী হইতে নামাইয়া আনিল, কমলা তখন বাহিরের দরজায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাঁহারা প্রবেশ করিবামাত্র, সে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া, তাঁহাদের পায়ের ধূলা মাথায় লইল। গৃহিণী হাত বাড়াইয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া, সেই হাত আবার আপন ওষ্ঠে স্পর্শ করিয়া, একটা অস্পষ্ট চুম্বনের ধ্বনি করিলেন। আমাদের ছেলেমেয়েরা শৈশব অতিক্রম করিলেই জননী ও জননী-স্থানীয়দের নিকট হইতে মায়ের সে গালভরা স্নেহ-চুম্বন লাভে বঞ্চিত হয়। তখন হইতে জননীদের সে অকৃত্রিম স্নেহ-সম্ভাষণের এই একটুখানি শুষ্ক বিশ্রী অভিনয় পাইয়াই তাহাদের সন্তুষ্ট থাকিতে হয়!

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছ বৌমা? বড্ড রোগা দেখছি যে!" কমলা প্রণামান্তে উঠিয়া মাথার ও গায়ের কাপড়টা টানিয়া-টুনিয়া ঠিক করিতে করিতে হাসিমুখে বলিল, "বেশ আছি মা, রোগা কোথায়! ঠাকুরঝির আদর-যত্নে বরং গায়ে একটু গত্তি লেগেছে বলুন।"

নরেশ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আগে চল বৌদি, এঁদের ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসাই গে। তার পর কথাবার্ত্তা হবে'খন।"

কমলা বলিল, "তোমরা নিয়ে চল ভাই,—আমি ততক্ষণ ওঁদের চা আর জলখাবারটা গুছিয়ে নিয়ে আসি—" বলিয়া কমলা অন্য দিকে চলিয়া গেল।

ড্রয়িং-রুমের বড় ইজিচেয়ারখানিতে শ্বশুরকে খাতির করিয়া বসাইয়া নরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "গাড়ীতে আপনাদের কোনও কষ্ট হয় নি ত?"

"না, বেশ একখানি খালি গাড়ী পেয়েছিলুম।"

"মাকে যেন বড় দুর্ব্বল দেখছি!—ওঁর কাসিটা কি এখনও সারেনি?"

"না, একেবারে সারেনি, এখনও একটু আছে। তবে

সে অতি সামান্য। তবু আমি ওকে খুব সাবধানে চ'খে চ'খে রেখেছি,—একটুও ঠাণ্ডা লাগাতে দিইনি। তোমরা বেশ ভালো আছো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনাদের আশীর্ব্বাদে কেটে যাচ্ছে এক রকম।" গৃহিণী এতক্ষণ ঘরের চারিদিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিলেন। তাড়াতাড়ি কর্ত্তাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওগো, দেখছ একবার জামায়ের কাণ্ডকারখানা?"

কর্ত্তা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "না,—কি বল ত?"

"একবার ঘরখানার চারদিকে চোখ চেয়ে দেখ না, —এ যেন আমরা আবার আমাদের নিজের বাড়ীতেই এসে বসিছি বলে মনে হচ্ছে!"

কর্ত্তা এবার ভাল করিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, "তাই তো! এ যে ঠিক অবিকল আমাদের ড্রয়িংরুমের মতনই সাজানো দেখছি! মেঝেয় সেই রকমই কার্পেট পাতা—জান্‌লা দরজায় সেই ধরণেরই পর্দ্দা দেওয়া। সেই রকমেরই টেবিল, চেয়ার, আর্শী, ফুলদান, কৌচ, কেদারা! আবার ঠিক তেমনি করে সাজানও রয়েছে দেখ্‌ছি! দেয়ালের গায়ে ছবিগুলো পর্য্যন্তও যে একই রকমের!"

"তবে আর বল্‌ছি কি,—আমাদের বাড়ীর যেখানকার যেটি সেখানকার সেটি এখানে একেবারে ঠিক্ হুবহু বজায়!" বলিতে বলিতে গৃহিণী নরেশের নিকট উঠিয়া আসিয়া সস্নেহে বলিলেন, "বেঁচে থাকো বাবা, রাজা হও; তুমি যে আমাদের লিলিকে সুখী করবার জন্যে এতটা করেছো, এ দেখে আজ বড় খুসি হলুম।" কর্ত্তাও প্রীত হইয়া বলিলেন, "হাঁ, ছোক্‌রার বাহাদুরী আছে বটে! খুঁজে খুঁজে সব যোগাড় করেছে তো ঠিক্! ওকে তারিফ্ করা উচিত।"

গৃহিণী এবার কন্যার দিকে ফিরিয়া কৃত্রিম কোপের সহিত বলিলেন, "লিলি! তুই কি নেমখারাম মেয়ে বল্ তো? একখানা চিঠিতেও কি লিখ্‌তে নেই—যে ঘরবাড়ী তোর এমন মনের মতো ক'রে জামাই আমার সাজিয়ে দিয়েছে!"

লীলা হাসিতে হাসিতে বলিল, "বাঃ, আগে লিখ্‌লে কি আর এমন মজা হোতো?"

"বটে! তোর পেটে পেটে এত দুষ্টুমী? এক বছরেই যে বেশ সেয়ানা হ'য়ে উঠেছিস্ দেখ্‌ছি!" বলিয়া গৃহিণী কন্যার চিবুকটি ধরিয়া নাড়িয়া দিলেন।

কমলা চায়ের সরঞ্জাম ও জলখাবার হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিল। গৃহিণীর কথাবার্ত্তা সে বাহির হইতে শুনিতে পাইয়াছিল, তাই ভিতরে আসিয়াই বলিল, "শুধু কি এই একখানা ঘর মা? সমস্ত বাড়ীখানা ও ঠিক আমাদের সে বাড়ীর মতো ক'রে সাজিয়েছে, পাছে লীলার নতুন যায়গায় এসে কোনও কষ্ট হয়! কী ভালোই যে বাসে ও আমাদের লিলিকে তা আর কি বল্‌বো!"

গৃহিণী একগাল হাসিয়া বলিলেন "বটে! তবে তো ভালো!"

কর্ত্তাও হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "দেখো, আমি তোমার জামায়ের বুদ্ধিরও যথেষ্ট প্রশংসা না ক'রে থাক্‌তে পার্চ্ছিনি। নববিবাহিতা পত্নীকে সুখে রাখবার জন্যে এর চেয়ে ভালো উপায় বোধ হয় আজ পর্য্যন্ত আর কেউ আবিষ্কার করেনি!"

গৃহিণী বলিলেন, "আমি শুধু ভাব্‌ছি—মেয়েটা কি দুষ্টু! রোজ চিঠি দিতো, কিন্তু এক দিনও এ খবরটা দ্যায়নি গা! যা হোক্ মেয়েটার বরাত ভালো বলতে হবে। এমন স্বামী যার সে যথার্থই সৌভাগ্যবতী। নিজের চেষ্টায় নিজের উপার্জ্জনে যে স্বামী তার স্ত্রীর জন্যে এতটা ক'রে, সে স্ত্রীর গৌরব বোধ করবার কথা। আশীর্ব্বাদ করি মা—স্বামীর এই রকম অনুরাগ যেন তুই আজীবন অটুট রেখে চলতে পারিস!" কমলা বলিল, "তা ও পারবে মা,—মেয়েটি আপনার ভারি চালাক চতুর হ'য়ে উঠেছে!"

"কিন্তু চিঠিতে ওর এ বিষয়টা আমাদের লেখা উচিত ছিল তো!—তা নয়, এদানি ওর চিঠিতে থাক্‌তো কেবল যত আগ্‌ড়োম-বাগ্‌ড়োম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব কথার অনুশীলন—"

লীলা ছুটিয়া আসিয়া জননীর মুখে হাত চাপা দিয়া বলিল "মা!" চখের কোণে তাহার সুস্পষ্ট নিষেধের মিনতি!

গৃহিণী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "জামাই যেমন তোকে সুখী করবার জন্যে এতটা করেছে, তুইও যদি তেমনি এখন ও ছাই-ভস্ম আধ্যাত্মিক আলোচনা ছেড়ে তাকে সুখী করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করিস্ খুকী,

তবেই তোদের দু'জনের ভালবাসা অক্ষয় হয়ে থাকবে—বুঝ্‌লি !"

"ফের যদি তুমি ও সব কথা কইবে, তা হ'লে এখুনি আমি এখান থেকে উঠে যাবো কিন্তু!" বলিয়া লীলা তাহার মুখখানি ভার করিয়া বসিল।

গৃহিণী আরও হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কেন কি আর দোষের কথাটা বলিছি আমি? আমার জামায়ের একটু সুখ্যাতি করিছি বই তো নয়! তুমি চিঠিতে তার কথা কিছুই আমাদের লিখ্‌তে না তা বল্‌বো না আমি?"

"ছিঃ, তোমার কি ভীমরতি ধরেছে? এখানে বাবা রয়েছেন না? আর তো কখনো তোমাকে আমি চিঠি লিখ্‌বো না, দেখো দিখিনি!"

কমলা এক একটি করিয়া সকলের হাতে চায়ের পেয়ালা তুলিয়া দিয়া বলিল, "ভাগ্যিস তোমরা এলে মা, তাই তো স্বচক্ষে এ সব দেখে চক্ষু সার্থক করলে!"

"আসা কি আর হোতো বৌ মা! যে ক'রে এসেছি তা আমিই জানি! তোমার শ্বশুর তো কিছুতেই জামাই-বাড়ী আস্‌তে চান না। অনেক সাধ্য-সাধনা ক'রে তবে ওঁকে রাজি করিয়েছি! বলি, হ্যাঁগা, তীর্থ দর্শন করতে বেরিয়েছি, মানুষের শরীর গতিক তো বলা যায় না! আর ফিরি কি না ফিরি, একবার মেয়ে জামাইকে না দেখে যেতে পারি কি? ওই একটা শিবরাত্রির শল্‌তে এখনও মিট্‌ মিট্‌ করছে বইতো নয়,—আর সবগুলোকেই তো রাক্ষুসীর মত পেটে পুরিছি।" বলিতে বলিতে গৃহিণী আঁচল দিয়া চোখ মুছিলেন।

কর্ত্তা চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বলিলেন, "বাস্তবিকই আজ এখানে এসে আমরা বড় আনন্দ পেলুম। আমি আস্‌তে চাই নি কিছুতেই, লীলার মা একরকম জোর করেই আমাকে এখানে টেনে নিয়ে এসেছে। এখন মনে হচ্ছে ভাগ্যে এসেছিলুম, নইলে এ আনন্দটুকু থেকে তো আমাকে বঞ্চিত হ'তে হোতো। এখানে আস্‌বার আগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমার ধারণা ছিল যে, লীলা যতই কেন লিখুক না সে ভালো আছে আর সুখে আছে,—নিশ্চয়ই সে এখানে কষ্ট পাচ্ছে! কেন না লীলাকে নিয়ে আস্‌বার সময় নরেশের যে রকম জেদ্‌ আর একগুঁয়েমি দেখেছিলুম, তাতে আমার ধারণা হ'য়েছিল যে, সে নিশ্চয় মেয়েটাকে নিয়ে গিয়ে তার অশেষ দুর্গতি করবে। তাই সঠিক খবর জান্‌বার জন্যে কমলাকে আমি পত্র দিই। সে লিখেছিল বটে যে, তোমরা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছো, কিন্তু হঠাৎ এক দিন ঝুপ্‌ করে এসে দেখে যাবার জন্যেও বিশেষ ক'রে অনুরোধ করেছিল। আমরাও তাই খুব শেষ মুহূর্ত্তে তোমাদের সংবাদ দিয়ে একেবারে চিঠির সঙ্গে সঙ্গেই এসে হাজির হয়েছি! কিন্তু এসে আমাদের দুঃখিত হওয়া দূরে থাক্‌, আমরা আশাতিরিক্ত সুখী হয়েছি! বিশেষ ক'রে আজ নরেশ, তোমার মহৎ হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে আমি ধন্য হলুম। তোমার ওপর আমার যে অন্যায় সন্দেহ ছিল, আজ তা শুধু দূর হয়ে যাওয়া নয়,—উপযুক্ত পাত্রে কন্যাদান করিছি জেনে আমি আজ একটা তৃপ্তি ও গর্ব্ব অনুভব করছি!" বলিতে বলিতে কর্ত্তা উঠিয়া দাঁড়াইয়া নরেশের সহিত ইংরেজি ধরণে বেশ হৃদ্যতার সহিত করমর্দ্দন করিলেন।

শ্বশুর ও জামাতার মধ্যে সম্প্রতি যে অপ্রিয় মনান্তরের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহারই ঘন মেঘ অপসারিত হইয়া উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব ও প্রীতির পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইতে দেখিয়া, আনন্দে গদগদ কণ্ঠে গৃহিণী বলিলেন, "এইবার আমার একটী অনুরোধ তোমাকে রাখ্‌তে হবে বাবা! তুমি আমার এই একগুঁয়ে বদ্‌-মেজাজি রোকা মেয়েটিকে তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোর ক'রে আমাদের ওখান থেকে নিয়ে আস্‌বার পর, সে তোমার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করেছিল, আমি সেটী সব শুন্‌তে চাই!"

শঙ্কা ও সরমে অপ্রতিভ লীলা জননীর দিকে কাতর দৃষ্টি ফিরাইয়া মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে ডাকিল, "মা!"

হাসিতে হাসিতে গৃহিণী বলিলেন, "তুই যেমন আমাদের সব খবর দিস্‌নি, তেমনি তোকে আমরা আজ জব্দ করবো। জামায়ের কাছ থেকে আজ তোমার গুণের কথা সব একটি একটি করে শুনবো! বল তো বাবা!"

নরেশ একবার চকিতের ন্যায় লীলাকে দেখিয়া লইয়া, কমলার মুখের পানে বিপন্নের মতো চাহিয়া রহিল। নিরুপায় নরেশের চোখের সে অসহায় করুণ দৃষ্টি দেখিয়া কমলা তৎক্ষণাৎ তাহার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিল; এবং আঁখির ইঙ্গিতে নরেশকে যা হোক্‌ কিছু গুছাইয়া বলিবার জন্য ইসারা করিয়া কমলা বলিল, "না'ও তাহ'লে কথক-

ঠাকুর, তোমার মহাভারত সুরু কর, আমি ততক্ষণ এঁদের নাওয়া খাওয়ার ব্যবস্থা করিগে, বেলা হ'য়ে যাচ্ছে" বলিতে বলিতে কমলা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। লীলাও তাহার পিছু পিছু উঠিয়া পলাইতেছিল, কর্ত্তা তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "তা হচ্ছে না খুকী, এইখানে তোমাকে ব'সে থাকতে হবে! যেমন বাপমার কাছে ভাল খবরগুলি লুকিয়ে রেখেছিলে, তেম্‌নি এই তোমার শাস্তি! বল তো নরেশ, বেটীর দুষ্টুমীগুলো সব খুঁটিয়ে,—কিছু বাদ দিয়ো না।" গৃহিণী বলিলেন, "দেখো বাছা, দোষ বল্‌তে ব'সে যেন গুণ গাইতে সুরু করো না।"

নরেশ সকৌতুক মৃদুহাস্যে লীলার দিকে চাহিয়া গৃহিণীকে বলিল, "কিন্তু মা, যার কথা বল্‌বো, তার যদি এতে আপত্তি থাকে, তাহ'লে কি ক'রে সব কথা বলা চল্‌বে ?"

"ওর আপত্তি শুন্‌ছে কে ? তুমি নির্ভয়ে বলে যাও।"

লীলা অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বিড় বিড়্ করিয়া বলিতেছিল, "যে বল্‌বে সে আমার মরা মুখ দেখবে—তার অতি বড়—"

গৃহিণী তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া বলিলেন, "তবে রে দুষ্টু মেয়ে! রোস্ তো! ফের যদি ওকে দিব্যি দিলেসা দিবি—তা'হলে কিন্তু তোর বাড়ীতে আমরা আর এক-দণ্ডও থাক্‌বো না।"

নরেশ বলিল, "দেখুন মা, আমি সব বল্‌তে রাজি আছি; কিন্তু এই কড়ারে যে, আমার যদি কোথাও কিছু বল্‌তে ভুল হয়, তা হ'লে ওকে সেটা শুধ্‌রে নিতে হবে!"

কর্ত্তা বলিলেন, "নিশ্চয়! এ বেটীকে এখানে ধরে রাখলুমই ত সেই জন্যে; তোমার ভুল সব ও ধরিয়ে দেবে।"

গৃহিণী বলিলেন, "হ্যাঁ, তা'হলে আর তোমাকে আমাদের জেরা কর্‌তে হবে না।"

"বেশ, তা'হলে সব বলি শুনুন।" নরেশ বলিতে লাগিল, "আপনাদের ওখান থেকে তো রাগারাগি ক'রে ওকে নিয়ে আসা হোলো ব'লে গাড়ীতে পা দিয়েই ও আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বস্‌লো। সেদিন থেকে ও এক রকম আমার মুখ দেখাই বন্ধ করে দিলে। দিনরাত কান্নাকাটি, ঝগ্‌ড়াঝাঁটি, রাগারাগি। ভাগ্যে বৌদি বুদ্ধি ক'রে সঙ্গে এসেছিলেন তাই রক্ষে! তিনি ওকে কত ভুলিয়ে ভালিয়ে বুঝিয়ে সুজিয়ে ঠাণ্ডা করলেন—তবে ও খেতে দেতে সুরু করলে, নইলে—আমার এখানে ও জলস্পর্শ করবে না বলেছিল! ভারি মুস্কিলে পড়েছিলুম, বুঝলেন,—সেই বোমার দলের ছেলেদের জেলের ভিতর না খাওয়ার ধর্ম্মঘট গোছ ক'রে তুলেছিল আর কি!" নরেশের এই কথায় সকলে খুব হাসিয়া উঠিলেন। নরেশ বলিতে লাগিল, "ঝোঁকের ওপর ওকে এখানে এনে ফেলে তার পর কিন্তু আমার মনে ভারি অনুতাপ হ'তে লাগল! ওর সেই অসহায় কাতর অবস্থাটা যতই ভাবতে লাগলুম, ততই আমার নিজের হঠকারিতাটাকে একটা অমানুষিক নিষ্ঠুরতা বলে মনে হতে লাগলো! সত্যি কথা বল্‌তে কি, ওর তখনকার সেই ভীষণ মনের অবস্থা দেখে আমার প্রাণের ভেতর কেমন যেন একটা আতঙ্ক হয়েছিল! আমি তখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম যে, যেমন করে পারি আমি আমার এই অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করবো! ওর মুখে হাসি দেখে তবে আমার অন্য কাজ! প্রথমেই আমার চেষ্টা হ'ল যে, আজন্ম যেখানে লালিত, পালিত, বর্দ্ধিত হয়েছে,—ওকে যে আজ সে বাড়ী থেকে অন্য এক-যায়গায় আনা হয়েছে, এইটে ওকে আগে ভোলাতে হবে! দেখতেই পাচ্ছেন—আমার সে উদ্দেশ্য আমি কতদূর কার্য্যে পরিণত করেছি! আমার এ কাজটায় ও ভারি খুসি হোলো!—প্রথম চেষ্টাতেই অর্দ্ধেক বাজী মাৎ হলো দেখে আমার উৎসাহ আরও বেড়ে গেল! তার পর ওর বাক্স থেকে এক দিন আপনাদের ফটোগ্রাফ দু'খানা চুপি চুপি বার করে নিয়ে গিয়ে আমি যেদিন এই দু'খানা বড় বড় অয়েল পেণ্টিং করিয়ে নিয়ে এলুম, সেদিন ওর মুখে শুধু একটা তৃপ্তির হাসিই নয়,—কৃতজ্ঞতায় ভরা দুটী চোখের দৃষ্টিতে নীরব নিবিড় ধন্যবাদ পেয়ে আমি সেদিন চরিতার্থ হয়েছিলুম! প্রথমটা দিনকতক ও আমাকে দেখলেই অন্য ঘরে সরে যেতো, আমার সামনেই থাকতো না! কিন্তু তার পর থেকে ও আমার সে শাস্তিটা মাফ্ ক'রে দিলে, তবে কথাবার্ত্তা বলা তখনও বন্ধ রেখেছিল। কিন্তু আমার প্রতি ওর স্নেহ যত্ন আমি প্রতি দিন সহস্র রকমে অনুভব করতুম। আমার জিনিস-পত্রগুলি সমস্ত যথাস্থানে গুছিয়ে রাখা, আমার কাজকর্ম্মের টেবিলটি পরিষ্কার

পরিচ্ছন্ন রাখা, আমার বইটইগুলি ঝাড়া মোছা, দু'বেলা আমার চা, জলখাবার ইত্যাদি ঠিক আমার পছন্দ মতো তৈরি করে দেওয়া, আমার জামা কাপড় সব প্রতি হপ্তায় নিয়ম মত ঠিক করে বার করে দেওয়া, এমনিই সব ছোট খাটো হাজার রকমের খুচরো কাজে আমি নিত্য ওর সেবাপরায়ণ হাত দুখানির স্পর্শ পেয়ে ওর এই ক্ষমাপ্রবণ কোমল হৃদয়ের অযাচিত করুণাধারায় অভিষিক্ত হতে লাগলুম !"

লীলা আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। নরেশের কথা শুনিতে শুনিতে অপরাধের অনুতাপ ও মিথ্যা প্রশংসায় লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিয়া লীলা বলিল, "না গো, আমি ওসব কিছু করিনি।" নরেশ ব্যস্ত হইয়া বলিতে লাগিল—"ওর কথা শুনবেন না—ও ভারি লাজুক। আমার সঙ্গে কথা বন্ধ ক'রে দিয়েছিল ব'লে লজ্জার খাতিরে ইচ্ছে থাকলেও কিছুতেই আগে কথা কইতে পারেনি! যা হোক্, এই রকমে ক্রমে ক্রমে আমাদের দু'জনের মাঝখান থেকে সমস্ত দ্বন্দ্ব, সকল বিরোধ দূর হ'তে লাগলো। তার পর অবশিষ্ট অন্ধকারের কালো ছায়াটুকু অপসারিত হ'যে এক দিন নির্ম্মল উষার স্নিগ্ধ আলোক ভেসে এলো—মনের বনে বনে যেন বসন্তের শত সুগন্ধ ফুল ফুটে উঠলো; পাখীর কলতান নদীর জলগান যেন প্রকৃতির সমস্ত শোভা-সম্পদ নিয়ে এসে আমাদের নূতন গৃহখানিকে আমোদিত করে তুললে! আমার নিষ্ঠা, আমার সাধনা, আমার ঐকান্তিক অনুরাগ সিদ্ধির আনন্দে সার্থক হ'য়ে উঠলো। প্রতিদিনের কর্ম্মশেষে শ্রান্ত কলেবরে যখন গৃহে ফিরি, দু'টি স্নেহব্যাকুল ব্যগ্র বাহুর উদ্‌গ্রীব স্পর্শ আমার সকল ক্লান্তি অপনোদন করে দেয়! কাজের ভিড়ে রাতের পর রাত বিনিদ্র বসে আমি যখন কারবারের • হিসেবপত্র দেখি, সারাক্ষণ আমার আশে পাশে থেকে শত প্রকারেও আমার শ্রম-লাঘবের চেষ্টায় শশব্যস্ত হ'য়ে থাকে। মাঝে মাঝে কাজের হাঙ্গামে কিছু দিনের জন্যে যখন আমি মফস্বলে যাই, ওর অনুরাগ-সিঞ্চিত দীর্ঘ সুন্দর পত্রগুলি 'আমার প্রবাসের সকল ক্লেশ মুছিয়ে দেয়! তার পর যখন সেই সামান্য ক'দিনের অনুপস্থিতির পর আবার গৃহে ফিরে আসি, আমার একান্ত অনুরক্ত স্ত্রী তার উদ্গত আনন্দাশ্রু গোপন করতে না পেরে বিহ্বল হয়ে ছুটে এসে গৃহদ্বার থেকে আমায় অভ্যর্থনা করে নিয়ে যায়! যেন কত দিনের পর সেই আমাদের প্রথম দেখা!"

গৃহিণী এক গাল হাসিয়া কর্ত্তাকে বলিলেন—"শুনছো গা!—খুকী আমাদের একেবারে পাকা গিন্নীটি হ'য়ে উঠেছে!"

হাসিতে হাসিতে কমলা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "সে আর বলবেন না মা! ওর গিন্নীপনার জ্বালায় লোকজন চাকর-বামুন সবাই তটস্থ! বাড়ীর কর্ত্তা থেকে আরম্ভ ক'রে পোষা কুকুরটির ওপোর পর্য্যন্ত ওর অপ্রতিহত প্রভাব! ও যে এত শীগ্‌গীর এমন একজন কাজের লোক হ'য়ে উঠবে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি!"

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যাঁ নরেশ! পোড়ার-মুখী কত দিন বাদে তোমার সঙ্গে কথা কইলে—বল তো?"

নরেশ হাসিতে হাসিতে বলিল, "তা মা আমার ঠিক মনে নেই; তবে সেই রূপকথার গল্পের মতো আমার সে দিন মনে হয়েছিল—যেন সে কত যুগযুগান্তরের পর বিজন রাজপুরীর এক পাষাণ-প্রতিমা হঠাৎ যাদু মন্ত্রে সজীব হ'য়ে উঠ্‌লো!"

"তাহ'লে তোমাদের মিটমাট হ'তে দস্তুরমত সময় লেগেছিল দেখ্‌ছি!"

"অন্ততঃ আমার তো তাই মনে হ'য়েছিল, কি বল বৌদি?"

"আর খুকী পোড়ারমুখী কি না এ কথার এক বর্ণও আমাদের জানায় নি। কি দুষ্টু গা! এমন মুখ-টেপা মেয়ে তো আমি কখন দেখিনি?"

"না মা, সে জন্যে ওর কোনও দোষ ধরবেন না। বরং ও যে কেন আপনাদের সে সব কথা কিছু লেখেনি, তা যদি শোনেন, তা হ'লে ওকে ক্ষমা না ক'রে থাক্‌তে পারবেন না! পাছে আমাদের সেই অস্থায়ী মনোমালিন্য—যা ও নিশ্চয় জান্‌তো যে এক দিন না এক দিন মিটে যাবেই, —সে অপ্রিয় সংবাদ শুনে অকারণ আপনারা কেন কষ্ট পান এই ভেবে অসীম বুদ্ধিমতী এই মেয়েটি আপনাদের সে কথা কিছু লেখেনি। তা ছাড়া একেই আপনাদের অবাধ্য হওয়ায় সেদিন আপনারা আমার ওপর বিশেষ ক্ষুব্ধ হয়ে-ছিলেন; সেই সঙ্গে আবার ঐ রকম দুঃসংবাদ পেলে

আপনারা হয়ত' আমার ওপোর একেবারে খড়্গহস্ত হ'য়ে উঠতেন! তাই আমাকে বাঁচাবার জন্যেই ও আরো বিশেষ করে সে কথা আপনাদের কিছু জানতে দেয়নি। সেইখানেই তো আমি ওর অন্তরের প্রকৃত পরিচয় পেয়েছি! তার পর থেকে শত প্রকারে ও আমাকে অপরিশোধনীয় ঋণজালে আবদ্ধ করে ফেলেছে! এক দিন যখন আমাদের পরস্পরের বিরূপ মনোভাব চরম অবস্থায় এসে পৌছেছিল, সে দিন আমরা দু'জনেই একখানা নব-প্রকাশিত উপন্যাস প'ড়ে আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে উভয়েই শঙ্কিত হ'য়ে, পরস্পরকে সভয়ে অবলম্বন করবার জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে উঠি! সেদিন একটী বিমুখ অন্তর আর একটি উন্মুখ চিত্তের অন্তর্মুখীন হ'য়ে অনন্ত কালের জন্যে একত্র সম্মিলিত হয়ে গেছে! আপনারা আজ সর্ব্বান্তঃকরণে তাদের আর একবার আশীর্ব্বাদ করুন, যেন তারা আর কোনও দিন এমনতর পথহারা না হয়!"

কর্ত্তা, লীলার লজ্জানত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, "নরেশের কিছু ভুল ধরতে পারলিনি খুকী?—ও কি সব ঠিক ঠাক বল্‌তে পেরেছে?"

লীলা ঘাড় নাড়িয়া অস্পষ্ট জড়িত কণ্ঠে বলিল "উঁহুঁ!"

গৃহিণী উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, "কি ভুল করেছে রে জামাই? বল্ তো! দে তো ছোক্‌রাকে ধরিয়ে!"

লীলা সরমে রাঙা হইয়া উঠিয়া বলিল, "বৌদি সব জানে। বৌদিকে বল্‌তে বল না।"

"না,—আমরা তোর কাছে শুন্‌বো!"

লীলা আরও খানিকটা ইতস্ততঃ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল—"কেন যে জানিনি, কিসের একটা আকর্ষণ আমাকে বাড়ীর দিকে এমন ক'রে টেনে রেখেছিল যে কিছুতেই সেদিক থেকে আমার মনটাকে ফিরিয়ে নিয়ে আমার নিজের ঘর-সংসারের ওপোর প্রতিষ্ঠিত করতে পারছিলুম না! স্বামীর সকল চেষ্টা, সকল যত্ন ব্যর্থ ক'রে দিয়ে, তাঁর অযাচিত অগাধ ভালবাসাকেও অবহেলা ক'রে, তাঁর অপরিসীম স্নেহ ও ধৈর্য্যকে তুচ্ছ ক'রে, আমার সমস্ত দেহ-মন শৈশবের সেই গত দিনগুলির জন্যে হাহাকার ক'রে ফিরতো! ছেলেবেলার সেই চিরপরিচিত আবাস-ভূমিটি ছেড়ে এসে নীড়চ্যুত পক্ষিণীর মতো আমার অন্তর এখানে কাতর হয়ে ছট্‌ফট্ করতে লাগ্‌ল!—আমি তখন ও পর্য্যন্ত পিতামাতার স্নেহপালিতা দুহিতা হয়েই যে থাকতে চেয়েছিলেম। আমি যে এখন একজনের পত্নী, স্বামীর অজস্র আদর সোহাগ, রমণী জীবনের যা চিরবাঞ্ছিত সম্পদ—আমি যে আজ সেই অমূল্য ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী, নারীর মর্য্যাদার সেই গৌরব-শিখরে দাঁড়িয়েও নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার দোষে আমি অনেক দিন সে সম্মান গ্রহণ করতে পারি নি! স্বেচ্ছায় নিজেকে তা' থেকে বঞ্চিত ক'রে রেখে আমার দেবতুল্য স্বামীর শুধু অপমান নয়—প্রতি দিন তাঁর নির্য্যাতনও করেছি! তার পর হঠাৎ এক দিন আমার চারিদিকে চেয়ে দেখলাম্ আমি আর শুধু পিতামাতার স্নেহরসে পরিপুষ্ট হতে পারছি নি! তাঁদের আদর যত্নে আমার স্নেহের ক্ষুধার তৃপ্তি হ'লেও অন্তরের হাহাকার নিবৃত্তি পায় না। বুঝ্‌তে পারলুম, অতীত জীবনকে অতিক্রম করে আমি এখন নূতন রাজ্যে উপস্থিত হয়েছি। এখানে তো আর নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে থাক্‌লে চলবে না! শুকিয়ে ঝ'রে ধুলায় প'ড়ে নিষ্পেষিত হতে হবে। জীবন চাই!—নবরাজ্য অধিকার করতে হবে, অনেক বিলম্ব ক'রে ফেলিছি, আর দেরী হ'য়ে গেলে হয়ত সব হারাবো! ভয় হ'ল এ আমি কি করছি!—হাতের মুঠোয় যে মাণিক পেয়েছি—হেলা ক'রে আজ তা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে—শেষে কি অন্যের দ্বারে গিয়ে কাঙাল ভিক্ষুকের মতো হাত পেতে দাঁড়াতে হবে?—সে তো আমি প্রাণ থাক্‌তে পার্ব্ব না! সেদিন সেই স্মরণীয় মুহূর্ত্তে আমার দুর্ব্বল চিত্তে নারীর অপূর্ব্ব মহিমা তার সমস্ত শক্তি নিয়ে জেগে উঠলো। আকুল আগ্রহে সে তার নির্দ্দিষ্ট জীবনকে তেম্‌নি করেই বরণ ক'রে নিলে, যেমন করে বারে বারে, যুগে যুগে, অসংখ্য জন্ম-জন্মান্তরে নিয়েছিল।"

"বেশ গো বেশ! সঙ্গ দোষে দেখ্‌ছি তুমিও ঠিক ওর মতন বক্তৃতা করতে শিখেছো!" বলিয়া কমলা খুব হাসিতে লাগিল।

গৃহিণী কর্ত্তার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কে বল্‌বে যে এ লিলি আমাদের সেই খুকী! শুন্‌লে তো মুখ দিয়ে যেন একেবারে খৈ ফুটছে!"

কমলা বলিল "আপনাদের জামাই কিন্তু মা, এখনও কথায় কথায় বলে যে, 'লীলা আমার এখনও তেমনিই ছেলেমানুষটি আছে'।"

নরেশ বলিয়া উঠিল, "আশীর্ব্বাদ কর বৌদি, ওর ওই শিশুর মত সারল্য নিয়ে ও যেন চিরদিন অমনি ছেলে-মানুষটিই থাকে।"

তখন লীলা সরিয়া আসিয়া নরেশের কাণে কাণে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিতে লাগিল, "দেখ, আমি সত্যিই বড় নির্ব্বোধ,—তুমি তো জানই,—বৌদির মতো অতটা চালাক চতুর নই; কিন্তু তবু আমি যে তোমার ওই গভীর প্রেমের অমূল্য মর্য্যাদা কতকটা বুঝতে পেরেছি, তাতে যেন তোমায় আর কোনও সন্দেহ না থাকে—"

কর্ত্তা গৃহিণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "চুপি চুপি ওদের কি পরামর্শ হচ্ছে? আজই রাত্রে কিন্তু আমি বেরিয়ে পড়তে চাই—গাড়ী 'রিজার্ভ' করিয়ে এসেছি।"

নরেশ কথাটা শুনিতে পাইয়া বলিল, "সে আমি টেলিফোঁ ক'রে বাতিল ক'রে দিচ্ছি! আজকে কিছুতেই যাওয়া হবে না। এখন দিন কতক এখানে থাক্‌তে হবে।"

"না হে, সে হবে না, অনেক ঘুরতে হবে আমাদের,—এখানে বসে সময় নষ্ট করা চলবেনা। বৌমা, তোমার সব জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও,—তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবো।"

লীলা আবার নরেশের কাণে কাণে বলিল, "ওঁদের রাখবার জন্যে বেশি পীড়াপীড়ি কোরো না।"

নরেশ অবাক্ হইয়া লীলার মুখের দিকে চাহিয়া চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি! দু'দিন যে তুমি ওঁদের এখানে ধরে রাখতে চেয়েছিলে?"

লীলা নরেশের কাণের কাছে তাহার মুখখানি আরও সরাইয়া লইয়া গিয়া অমৃত-নিষিক্ত গোপন-কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "আজ আমি তোমায় এই প্রথম আমার অন্তরের মধ্যে নূতন করে পেয়েছি! সেখানে আর অন্য কাউকে আমি আজ সহ্য করতে পারবো না! আজকের এ শুভক্ষণে আমি শুধু তোমাকে চাই—একাকী সম্পূর্ণ করে আমার নিজের কাছটিতে!"

গৃহিণী নরেশকে ডাকিয়া বলিলেন, "পোড়ারমুখী তোমার কাণে কাণে কী কু'মন্ত্র ফোস্‌লাচ্ছে? গাড়ীটা যাতে ফেল হই তার বন্দোবস্ত করতে ব'লছে বোধ হয়! ওকে আর বিশ্বাস নেই, ও সব করতে পারে।"

লীলা তাড়াতাড়ি বলিল "না মা, তা নয়,—আমি বলছিলুম, আপনারা যদি বৌদি'কেও নিয়ে যান, তা' হলে আমাদের ভারি মুস্কিল হবে; বৌদির যাতে না যাওয়া হয়—তাই করতে বলছিলুম—তা উনি বলছেন বৌদিরও নাকি তীর্থে যাবার বড্ড ঝোঁক হয়েছে; আপনারা যাচ্ছেন শুনে অবধি বৌদি যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছে। তাই আপনাদের সঙ্গে বৌদিরও আজই যাবার ব্যবস্থা করে দিতে চাচ্ছেন।"

কমলা পরিহাস করিয়া বলিল, "তা তো উনি দেবেনই! এত দিন যে কেন দয়া ক'রে বৌদিকে তাড়িয়ে দেন নি—এই আমার ভাগ্যি!—কথায় বলে—

কাজের বেলায় কাজি—
কাজ ফুরুলেই পাজি!"

গৃহিণী ইহাতে আপত্তি করিয়া বলিলেন, "না বৌমা! তোমার নন্দাই সে রকম প্রকৃতির নয়। জামাই আমার খুব ভালো।"

নরেশ সুযোগ বুঝিয়া অনুযোগের কণ্ঠে বলিল "দেখুন তো মা! বৌদি কেবল আমার নিন্দে পেলে আর কিছু চায় না। শুধু শুধু কেবল আমাকে যাচ্ছেতাই বলে।"

লীলা কমলার নিকট আসিয়া দুই হাতে তাহার গলাটি জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল, "বৌদি, আমায় মাপ কর্ ভাই, কত অসদ্ব্যবহার করিছি, কত অকথা কুকথা বলিছি, কিছু মনে করিস্‌নি ভাই! আমি তোকে চিনতে পারিনি, ওঁকেও চিন্‌তে পারিনি—বড় ভুল করিছিলুম,—ছোট বোনের কোনও অপরাধ নিস্‌নি দিদি, আজ আমি সব বুঝতে পেরেছি—"

ঘাড় নাড়িয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে কমলা বলিল, "উহুঁ—সব ঠিক বুঝ্‌তে পারিস্‌নি দেখ্‌ছি!"

"অন্ততঃ আমি এটুকু বুঝতে পেরেছি বৌদি, যে, তোমার দয়াতেই আমি আজ স্বামীকে ফিরে পেয়েছি,—নইলে তো আমি ওঁকে পেয়েও হারিয়েছিলুম ভাই!"

"সেটা কতকটা ঠিক কথা বটে!"

"বৌদি, তোমার ঋণ জীবনে বোধ হয় শুধ্‌তে পারবো না!"

"আশীর্ব্বাদ করি চিরদিন যেন এমনিই সুখে থাকো।"

নরেশ শশব্যস্তে তাহাদের নিকট সরিয়া আসিয়া

হাসিতে হাসিতে কমলাকে বলিল, "আবার ওকে শুদ্ধ তীর্থে নিয়ে যাবার জন্যে কোসলাচ্ছ নাকি? বা রে!—নিজে যেতে চাও যাও না—আবার ওকে টান্‌ছ কেন?"

কমলা নরেশের দিকে রহস্যাবৃত ভ্রূকুটী করিয়া বলিল, "নিজে তো যাবোই, দু দণ্ড বুঝি তোমার আর তর সইছে না! গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেবে না কি—? —সেই যে বলে—

'তোমার আমার ঘর,—
আরতো সবাই পর,—

তোমরা যে দেখছি তাই!—আচ্ছা দাঁড়াও—সবুর কর আগে—তীর্থ দর্শন ক'রে ফিরে আসি—তার পর যে বইখানা লিখ্‌বো সেখানা আমার 'গরীবের মেয়েকে'ও টেক্কা দেবে! "লীলা ও নরেশ বিদ্যুৎ চমকের মতো কাঁপিয়া উঠিয়া এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল "গরীবের মেয়ের তোমারই লেখা বুঝি?"

"চলুন আপনারা—কাপড় চোপড় ছেড়ে স্নানটান্ সেরে নেবেন চলুন,—রান্না বান্না সব তৈরি!—"বলিতে বলিতে—সহাস্যমুখে কমলা শ্বশুর শাশুড়ীকে সঙ্গে করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

(সমাপ্ত)

গান্ধীজী

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

বন্যা যবে নেমে আসে পর্ব্বতের গুহা-গর্ভ হ'তে,
উচ্ছ্বসিত স্ফীত মুক্ত স্রোতে,
ভেসে যায় শুষ্ক শীর্ণ ধরণীর পুঞ্জীকৃত বিস্তীর্ণ জঞ্জাল।
ছন্দের বন্ধন হারা ভৈরবের বিষাণ ভয়াল
বাজে তার পথে পথে; মন্দ্র-মন্ত্রে বিস্ফারিত শ্লোক
গুরু গর্জ্জে উচ্চকিয়া তোলে সপ্তলোক
নিদ্রাতন্দ্রাহীন।
চিরদিন
শ্যেনের গতির মত বিদ্যুৎ-বিক্ষিপ্ত গতি তার,
দুর্দ্দম দুর্ব্বার।

মানুষের মনের পাথারে
এই বন্যা নেমে আসে এক দিন অকস্মাৎ নিঃশব্দ সঞ্চারে;—
তার পর দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে
বেগ তার উচ্ছ্বসিয়া উদ্বেলিয়া উল্লঙ্ঘিয়া চলে
সীমাবদ্ধ হৃদয়ের তট-তল রেখা।
হীনতার ভীরুতার জড়তার শৃঙ্খলের লেখা,
যত ক্লেদ-গ্লানি
ধুয়ে মুছে নিয়ে যায়,—দিয়ে যায় টানি
তার পরে বিস্মৃতির ধূসর অচ্ছেদ্য আচ্ছাদন।—
জানি—তাও জানি—
দুঃখ দেয়—মৃত্যু দেয়—অসহ্য বেদনা দেয় আনি;
তবু তারি সাথে সাথে আসে—
শুভ্র শুদ্ধ মুক্ত আত্মা অপূর্ব্ব উল্লাসে;
আসে গ্লানি-মুক্ত তৃপ্ত তরুণ জীবন।

ওরে মোর ভারতের ত্রিশ কোটি মন,
ওরে মুগ্ধ, ওরে মূঢ়, ওরে সুপ্তি-ভরা,
শ্রান্ত ক্লান্ত জীবনের পথ প্রান্তে তোর যে দুর্জ্জয় জরা
ঘনায়ে নেমেছে আজ,
হানিতেছে মুহুর্মুহু ঘৃণা আর বিদ্রূপের বাজ
সদম্ভ কৌতুকে,
তারি বুকে
ঐ দেখ জাগিয়াছে প্লাবনের দুর্দ্ধর্ষ প্রলয়।

—'জয় ধ্বংস-দেবতার জয়'—
ঐ শোন্ দিকে দিকে সহস্র শঙ্খের নাদে উঠিছে গুনিয়া।
এ ধ্বংসের বন্যা-মুখে কে আজ রহিবে আঁকড়িয়া
প্রাচীন বিধ্বস্ত জীর্ণ কম্পমান দীর্ণ গৃহতল?
হারে দীন, আশাহত, শুষ্ক-মূক—ভয়ার্ত্ত-চঞ্চল,
হারে অবিশ্বাসী,
এর পতাকার তলে নত নেত্রে যুক্তকরে দাঁড়া তোরা আসি

ঊর্দ্ধে তুলি উচ্চ শির বল—'নাহি ভয়—
জয় ধ্বংস-দেবতার জয় !'

ঝঞ্ঝার গর্জ্জনে বাজে ঐ শোন্ মঞ্জীর ঝঞ্ঝনা,
এ বন্যার তালে তালে দুলে ওঠে যৌবনের অজস্র কল্পনা,
এর প্রবাহের ধারা ধেয়ে চলে দিক্ হ'তে দিক্ দিগন্তরে,
সমুদ্র ছাড়ায়ে তাহা পশিয়াছে ধরণীর শিখরে গহ্বরে
দূরে কাছে জলে স্থলে,
এর খড়্গ চূর্ণ করি ভিন্ন করি চলে
অসত্যের নাগপাশ, অন্যায়ের অন্ধ অহমিকা ;
হোমের বহ্নির মত এর দীপ্ত স্ফুরদগ্নিশিখা
দীপ্তি পায় অন্তরের অন্তর প্রদেশে।
নাহি অস্ত্র, রক্তপাত।—হৃদয়ের রক্ত ঢালি আনন্দে নিঃশেষে
কণ্ঠে এর জেগে ওঠে আত্মহারা প্রেমের আহ্বান,
বিশ্বের কল্যাণ লাগি বিশ্বাসের গান।

ঐ ছাখ্ হানাহানি,
সভ্যতার নাম করি মদমত্ত রাক্ষসের রক্ত-সিক্ত পাণি,
ওরে অমৃতের পুত্র, তোরি পরে বাড়ায়েছে হাত।
মানবের অন্তর্লোকে বাধিয়াছে দারুণ সংঘাত
দানবের সাথে,
সংগ্রাম চলেছে সেথা সত্যে ও মিথ্যাতে,
স্বার্থে প্রেমে, কল্যাণে হিংসায়।
মুষ্টিমেয় সবলের নিষ্ঠুর ক্ষুধায়
দুর্ব্বলের পঞ্জরের অস্থিরাশি পথের ধূলার মত করে
খসে টুটে চূর্ণ হ'য়ে দিগ্বিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।
অশ্রু তবু নাহি কারো চোখে,
দুঃখে শোকে
কারো বুকে বাজে না বেদনা !
এই স্তব্ধ কঙ্কাল-সমুদ্র মাঝে মানবের বীভৎস জল্পনা
ভাসায়ে চলেছে তবু সংখ্যাতীত বিলাসের ভেলা !
তবু তার প্রগল্‌ভ উচ্ছ্বাসভরা খেলা
চলিয়াছে চির রাত্রিদিন !
আর স্পন্দহীন,
চিত্তের দেবতা এই স্বার্থ-ক্ষিপ্ত সিন্ধুর বেলায়
রক্ত-ফেন-মাল্য পরি' অন্তর্গূঢ় রূঢ় তীব্র নিষ্ঠুর ব্যথায়,
দীন নেত্রে চায় !

ওরে অন্ধ,—অন্তরের দেবতারে করিয়া বিমুখ
তৃপ্তি নাহি পাওয়া যায়,—নাহি মিলে সুখ,
ক্ষুধার উপরে শুধু ক্ষুধা বেড়ে ওঠে,
অতৃপ্তির নেশা নাহি ছোটে,
কেবল চিত্তের দ্বারে গুরু-ভার পাহাড়ের মত
জমে ওঠে বিঘ্ন শত শত,
বন্ধ করে দিয়ে যায় সেই চির আনন্দের মুক্ত ধারাটিরে—
জীবনের বৃন্তখানি ঘিরে
যে আনন্দ ফুটে ওঠে সুন্দর অম্লান পদ্মসম,
রূপে রসে স্পর্শে গন্ধে নিত্য নিরুপম !

ও ত নহে পথ,—অহিংস ঋষির মন্ত্র তোরে
আজ কেঁদে ডাকিতেছে অন্য দিকে অন্য পথ 'পরে।
ঐ শোন্ নৈযুজ্যের আহ্বান তাহার ;
—পাপ যাহা, মিথ্যা যাহা, যার মাঝে জেগে আছে
লোভের অধৈর্য্য অনাচার
তার সাথে আর নহে যোগ।
পাশবিক শক্তির সম্ভোগ—
অন্যায়ের বল-দৃপ্ত ঔদ্ধত্যের কাছে
পশুই নোয়ায় শির,—চিত্তে যার আছে
মানুষের মনুষ্যত্ব, সত্য-শিব-সুন্দরের অপূর্ব্ব প্রেরণা,
সে কখনো তার কাছে শির নোয়ায়ো না।
তাহে যদি দুঃখ পাও—বজ্র নেমে আসে,
দুলে ওঠে মৃত্যু-সিন্ধু স্পন্দিত নিঃশ্বাসে,—
তটেরে ছাপায়ে চলে যায়,
মন্থনের অবসানে সেই দুঃখ—সেই মৃত্যু অমৃত-ধারায়
সিক্ত করি দিয়ে যাবে ধরণীর বন্ধুর কর্কশ মরুভূমি।
আমি তুমি
যেখানে মানুষ আছ, আজ তারি লাগি
কঠোর তপস্যা মাঝে ওঠ সবে জাগি।—

এ ত নহে বাণী শুধু—এ যে ভীম বন্যার প্লাবন,
দিগ্বিদিকে বিস্ফারিয়া এ যে মাগে শঙ্কাহীন রক্তহীন রণ
ভোগের স্পর্দ্ধার সাথে।
কোনো অস্ত্র নাহি এর শূন্য-রিক্ত হাতে ;

তবু শোন্ কামানের গর্জ্জনের গান
স্তব্ধ করি, এরি কণ্ঠ আজি কম্পমান
নিখিলের তারায় তারায়।
যেখানে অন্যায়
তোলে তার রক্ত-ধ্বজা দম্ভ-ভরা উদ্ধত আক্রোশে,
অত্যাচার সর্প সম ফোঁসে,
তারি মাঝে এর বরাভয়
গাহে—'জয়—জয় ধ্বংস-দেবতার জয়।'

ওরে ম্লান, অবিশ্বাসী,
প্রাচ্যের প্রান্তর হ'তে নগ্ন দীন নিরস্ত্র সন্ন্যাসী
এমনি করিয়া চিরদিন,
জীর্ণ জরাগ্রস্ত ধরা করিয়াছে তরুণ নবীন
ধ্বংসের অমোঘ অস্ত্রহানি;
ঝঞ্ঝার পঞ্জর হ'তে বজ্রটারে ফেলিয়াছে টানি,
করিয়াছে শান্তি-মন্ত্র পাঠ,
আপনার নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল ললাট
মৃত্যুর মুকুট পরি' রক্তের কলঙ্কে ভরিয়াছে;
তবু সে দিয়াছে
অমৃতের পুত্রদেরে অমৃত লাভের অধিকার।
রুদ্র দেবতার
যে খড়্গ বিদ্যুৎসম অকস্মাৎ উঠেছে দুলিয়া
ধরার মাথার 'পরে, তারি তলে শির পাতি দিয়া
তাহারে করেছে পরাজয়।
একান্ত নির্ভয়
যাহার যজ্ঞের ঘোড়া ছুটিয়াছে তাহাদেরি দ্বার হ'তে দ্বারে,
যারা ক্রূর রূঢ় অত্যাচারে
ধরার চোখের 'পরে জাগায়েছে অশ্রুর সাগর;
সেথা সে নিজেরে বলি দিয়া সুন্দরেরে করেছে অমর,
সত্যারে রেখেছে অমলিন।
ওরে মিথ্যা-অভিমানী, ওরে জ্ঞানহীন,
ইহাদেরি বাণী,
হিম-শীর্ণ জড়তার পাণ্ডুর বিবর্ণ বক্ষখানি
দীর্ণ করি ফুটায়েছে বসন্তের নব পুষ্পদল;
এনেছে বর্ষার মেঘ স্নিগ্ধকান্ত শ্যামল সজল
রৌদ্র-দগ্ধ বৈশাখের উদ্দীপ্ত অন্তর বিদারিয়া।

বজ্র হাতে নিয়া
যে ধ্বংস এসেছে নামি, ধরণীরে করেনি সে জয়,
সে ত শুধু দেখায়েছে ভয়
ত্রস্ত ক্ষুব্ধ ধরিত্রীর দুর্ব্বল সন্তানে।
ধ্বংস দানবের এই দৃপ্ত অভিযানে
ধ্বংসের যে দেবতার হাসি
ব্যর্থ করি ফুটায়েছে অম্লান আনন্দ পুষ্পরাশি,
তারি পায়ে
বিশ্বের দম্ভের মাথা চিরদিন পড়েছে লুটায়ে
অপূর্ব্ব বিস্ময়ে শিহরিয়া।
ওরে স্পর্দ্ধা-সঙ্কুচিত হিয়া,
সেই দেবতার গান,
তোদেরি তোরণতলে আজি স্পন্দমান।
তপঃক্লিষ্ট তপস্বীর দ্বিধাহীন দীপ্ত কণ্ঠস্বর
তোদেরি চিত্তের দ্বারে মুহুর্মুহু হানিতেছে কর।
পথের ধূলার তলে নোয়াইয়া শির
তারি অভিনব মন্ত্রে ভরি লহ অন্তর বাহির।
জাগুক্ তোদেরি মনে এ যুগের প্রথম প্রলয়।—
'জয় ধ্বংস—দেবতার জয়!'

যশোহর

শ্রীস্বজননাথ মিত্র মুস্তৌফী

(আলোক-চিত্র—শ্রীললিতাপ্রসাদ দত্ত, এম-আর-এ-এস্ মহাশয়ের সৌজন্যে)

(১)

পাঠ্যাবস্থায় স্বদেশীর যুগে লোকের মুখে মুখে ভারত-চন্দ্রের কবিতার আবৃত্তি শুনিতাম :—

"যশোর নগর ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম,
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতসায়, কেহ নাহি আঁটে তায়,
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ॥
বরপুত্র ভবানীর, প্রিয়তম পৃথিবীর,
বায়ান্ন হাজার যার ঢালী।
ষোড়শ হলকা হাতি, অযুত তুরঙ্গ সাতি,
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী॥"

ডামরাইল—কালিন্দীর কর্দ্দমময় তীর

তখন ক্ষীরোদ বাবুর "প্রতাপাদিত্য" অভিনয়ের রজনীতে রঙ্গালয়ে লোক ধরিত না। তখন শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিতের "বঙ্গের শেষ বীর" যুবক সম্প্রদায়ের প্রিয় ছিল। তদবধি মহারাজা প্রতাপাদিত্যের কীর্ত্তিগুলি স্বচক্ষে দেখিয়া এ বাঙ্গালী জীবন সার্থক করিবার বাসনা মনে ছিল। গত দুই বৎসরের চেষ্টার ফলে এবার গুড্ ফ্রাইডের বন্ধে বাঙ্গালী হিন্দু মাত্রেরই তীর্থ যশোহর দেখিবার সুযোগ ঘটিল। অনুসন্ধানের ফলে প্রতাপাদিত্যের রাজধানীর এক অংশ ঈশ্বরীপুরের ৺যশোরেশ্বরী ঠাকুরাণীর অন্যতম সেবাএত শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র অধিকারীর এবং মহারাজা প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায়ের অন্যতম বংশধর নূরনগর কাটুনিয়া নিবাসী রাজা যতীন্দ্রমোহন রায়ের ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগকে পত্র দিলাম। শ্রীশবাবু দ্রষ্টব্য স্থানগুলির তালিকাসহ কোন্ পথে কি উপায়ে সেগুলি দেখিতে হইবে, যান-বাহনের কত ভাড়া ও কোন্ সময় কোথায় পঁহুছিয়া কাহার নিকট আশ্রয় পাওয়া যাইবে, তাহা পত্রে লিখিয়া পাঠাইলেন। ঈশ্বরীপুর যাইবার সোজা রাস্তা—কলিকাতা হইতে মার্টিনের লাইট রেলে হাসানাবাদ পর্য্যন্ত গিয়া নৌকা-যোগে কালীগঞ্জে যাইতে হয় ও তথা হইতে গো-যানে ঈশ্বরীপুরে যাইতে হয়। বর্ষা কালে কালীগঞ্জ হইতে নৌকাযোগে ঈশ্বরীপুরের সন্নিকটে যাওয়া যায়। কিন্তু আমাদিগকে মাত্র চারি দিনের মধ্যে দেখা শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে বলিয়া, তিনি হাসানাবাদ হইতে ডামরাইল ও তথা হইতে মুকুন্দপুর ও গোপালপুর হইয়া ঈশ্বরীপুরে যাওয়ার ব্যবস্থা দিলেন। তৎপরে এক দিন সন্ধ্যাকালে পূজনীয় ললিতা দাদার উদ্যোগে তাঁহার সহিত সাহিত্য-পরিষৎ-ভবনে যাইয়া টাকীর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুন্সী মহাশয়ের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া স্থির করিয়া আসা গেল যে, আমাদের যাহাতে কোন প্রকার অসুবিধা না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য তিনি ঈশ্বরীপুরের শ্রীশবাবুকে এবং তাঁহার কর্ম্মচারি-বৃন্দকে পত্র দিবেন।

গুড্ফ্রাইডের বন্ধের পূর্ব্ব দিন ৯ই এপ্রেল বৃহস্পতিবারে সন্ধ্যার পূর্ব্বে বারাসত-বসিরহাট রেলের বেলগাছিয়ার ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম, এবং হাসানাবাদের টিকিট কাটিয়া ললিতা দাদা, সুবোধ ও একজন লোক সহ ৬টা ৩৫ মিনিটের ট্রেণে যাত্রা করিলাম। ট্রেণ স্বরূপনগরে দাঁড়াইলে শুনিলাম যে, ঐ স্থানের কিঞ্চিৎ পশ্চিমে কচুয়া গ্রামে বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারী ঠাকুরের জন্মস্থান। ধানকুড়িয়া ষ্টেসনে গাড়ী থামিলে দেখিলাম যে, ষ্টেসনের পার্শ্বে বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের মধ্যে বল্লভদিগের ইংরাজী ফ্যাসানের বৃহৎ ও মনোরম বাটী দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

কুলীনগ্রামে গাড়ী থামিলে শুনিলাম যে, ঐ গ্রামে রামকৃষ্ণমিশনের সন্ন্যাসী রাখাল মহারাজের পৈত্রিক বাসস্থান। তৎপরে বসিরহাট, টাকী প্রভৃতি বিখ্যাত ষ্টেসন অতিক্রম করিয়া রাত্রি ১২॥ টার সময় হাসানাবাদে পৌছিলাম।

হাসানাবাদ ষ্টেসনে টাকীর যতীন্দ্রবাবুর একজন কর্ম্মচারী আমাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, এবং কাটুনিয়ার রাজা যতীন্দ্রমোহন আমাদিগকে লইবার জন্য টাপুরে নৌকা পাঠাইয়াছিলেন, তাহার একজন মাঝি ঐ সঙ্গে উপস্থিত ছিল। আমরা উক্ত নৌকায় আরোহণ করিলে রাত্রি অনুমান ২টার সময় ভাঁটার টানে মাঝি নৌকা খুলিয়া দিল। জ্যোৎস্না-পুলকিত নদী-বক্ষে আমাদের নৌকা দক্ষিণ দিকে চলিল।

এতদঞ্চলের নদী নালা ও খাল বিলে প্রবল জোয়ার-ভাঁটা হয়; জোয়ার-ভাঁটার বশে নৌকা সকল যাতায়াত করে। জল অত্যন্ত লবণাক্ত; উহাতে কুম্ভীর এবং হাঙ্গর জাতীয় কামটের উপদ্রব আছে।

১০ই এপ্রেল শুক্রবার প্রত্যুষে ৪॥ টার সময় নিদ্রাভঙ্গে চাহিয়া দেখিলাম যে, আমরা বসন্তপুরের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়াছি। প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত রাজা বসন্তরায় গৌড় হইতে আসিয়া বন কাটাইয়া এই বসন্তপুরে সর্ব্ব প্রথম যশোর রাজ্যের প্রথম গ্রাম পত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহারই নামানুসারে এই গ্রামের নাম বসন্তপুর হইয়াছে। এখানে এক্ষণে কলিকাতার বিখ্যাত বাবু হরিমোহন ও পিয়ারীমোহন রায়দিগের জমিদারী কাছারী আছে এবং একটি বাজার আছে। এই স্থানে নদীর ত্রিমোহনা আছে। কালিন্দী নদী বসন্তপুরের পশ্চিম দিক দিয়া দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইতেছে; এবং যমুনা ও ইচ্ছামতী নদীদ্বয় গোবরডাঙ্গার সন্নিকটস্থ টিপি নামক স্থানে একত্র মিলিত হইয়া এই বসন্তপুরের পূর্ব্ব দিক দিয়া দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়াছে ও ঈশ্বরীপুরের পার্শ্ববর্ত্তী বংশীপুরের প্রাচীন দুর্গের কিঞ্চিৎ উত্তর-পশ্চিমে পরস্পর হইতে পৃথক হইয়া বিভিন্ন দিকে গিয়াছে। যতদূর পর্য্যন্ত যমুনা ও ইচ্ছামতী একত্র প্রবাহিত হইয়াছে, ততদূর পর্য্যন্ত এই সংযুক্ত নদীর ডাইন পার যমুনা এবং বাম পার ইচ্ছামতী বলিয়া বিবেচিত হয়। ডাইন পার দিয়া যমুনা প্রবাহিত হইতেছে বিবেচনায় ঐ পারটি অপর পার অপেক্ষা পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়, এবং সে কারণে এতদঞ্চলের অবস্থাপন্ন লোকে আত্মীয়-স্বজনের মৃতদেহ নদীর ডাইন পারে দাহ করিয়া থাকেন। প্রতাপাদিত্যের সময় যমুনা প্রবলা নদী ছিল এবং কালিন্দী খাল মাত্র ছিল। এক্ষণে কালিন্দী প্রবলা নদী হইয়াছে। বসন্তপুরের কিঞ্চিৎ উত্তর-পূর্ব্ব

ডামরাইল বা মুস্তাফাপুরের কাছারী বাটী

দিকে যমুনা-ইচ্ছামতী হইতে কাকশিয়ালী নামক একটি খাল বাহির হইয়া এক্ষণে প্রবলা নদীর আকার ধারণ করিয়া পূর্ব্ব দিকে গিয়াছে।

আমাদের নৌকা কালিন্দী নদী দিয়া চলিল। বেলা ৩॥ টার সময় ডামরাইলের নবরত্ন মন্দির হইতে এক মাইল দূরে কালিন্দীর পূর্ব্ব তীরে অবস্থিত কলিকাতা ভবানীপুরের

ডামরাইলের ভগ্ন নবরত্ন মন্দির

শ্রীযুক্ত তারাপদ ঘোষের কাছারি বাটীর সম্মুখে নৌকা হইতে অবতরণ করিলাম। এই স্থানকে মুস্তাফাপুর কহে। এক্ষণে ভাঁটা হওয়ায় নদীর জলের কিনারা হইতে ৪০।৫০ হাত কাদা ভাঙ্গিয়া পাড়ের উপরে উঠিতে হইবে। এতদঞ্চলে ভাঁটার সময় প্রায় ২০।২৫ হাত জল নামিয়া যায়। নৌকা হইতে যেই মাত্র কাদার উপর নগ্নপদে অবতরণ করিলাম, অমনি আমাদিগের উরুদ্বয় পর্য্যন্ত কাদার মধ্যে বসিয়া গেল। পরিধেয় বস্ত্র বাঁচাইতে গেলে দিগম্বর হইতে হয়। এদিকে ক্রমেই কাদার মধ্যে নিমজ্জিত হইতেছি দেখিয়া মাঝির সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইল। মাঝিদ্বয় বাবুদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে নিকটে আসিয়া হাত ধরিয়া টানিয়া পাড়ে তুলিয়া দিল। কৃষ্ণবর্ণের কাদায় মাখামাখি হইয়া আমাদের যে অপূর্ব্ব রূপ দেখা দিয়াছিল, তাহা উপভোগ্য। নিকটবর্ত্তী খালের জলে কাদা ধুইয়া উক্ত কাছারিতে উপস্থিত হইলাম। সামান্য পরিধেয় বস্ত্রাদি সঙ্গে রাখিয়া বাকী দ্রব্যগুলি নৌকায় করিয়া কাটুনিয়ার রাজ-বাটীতে পঁহুছাইয়া দিতে মাঝিকে বলিয়া দিলাম। আমাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য মুকুন্দপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণচন্দ্র রায়ের একজন লোক ও তাঁহার আত্মীয় মথুরেশপুরের পোষ্টমাষ্টার মহাশয় এই কাছারি-বাটীতে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। উক্ত কাছারির জনৈক নবীন কর্ম্মচারীর যত্নে তথায় কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আমরা ডামরাইলের নবরত্ন মন্দির দেখিতে চলিলাম।

উন্মুক্ত ধানের মাঠের মধ্য দিয়া উত্তর-পূর্ব্ব দিকে চলিলাম। জুতা খুলিয়া দুইটি খাল পার হইয়া উক্ত কাছারি হইতে প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত নবরত্ন মন্দিরের নিকটে উপস্থিত হইলাম। এই স্থানকে ডামরাইল পরগণার অন্তর্গত মুস্তাফাপুর কহে। শুনিলাম যে, এই সম্পত্তি হুগলী জেলার চুপি কাঁকশিয়ালীর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বসুর জমিদারীর অন্তর্গত; এবং ইহা এক্ষণে ভবানীপুরের শ্রীযুক্ত তারাপদ ঘোষের পত্তনী মহালভুক্ত হইয়াছে। মুকুন্দপুরের বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র রায়ের পিতা নন্দকুমার বাবু যখন এই সম্পত্তির জমিদার ছিলেন, তখন ৮০।৮৫ বৎসর পূর্ব্বে তিনি এই স্থানের বন কাটিয়া আবাদ করিবার সময় এই মন্দির আবিষ্কার করেন।

কালিন্দীর তীর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে ধানের মাঠের মধ্যে এই ধ্বংসোন্মুখ বৃহৎ মন্দিরটি পথিকের মনে অতীতের

কথা জাগাইয়া দিবার জন্য যুগযুগান্ত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মন্দিরটি দেখিতে পশ্চিম-বঙ্গের গঙ্গাতীরের সাধারণ শিব-মন্দিরের ন্যায়; কিন্তু আয়তনে অনেক বড়, এই মাত্র পার্থক্য। মন্দিরটি চতুষ্কোণ। গর্ভ-মন্দিরটির চতুর্দ্দিকে খিলান-করা ছাদযুক্ত বারান্দা আছে। মন্দিরের ছাদের উপরের গাঁথনির ইট খসিয়া যাইতেছে ও তথায় অশ্বত্থ ও অন্যান্য পরগাছা জন্মিয়াছে; উপরের চূড়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মন্দিরের বহির্দ্দেশে উত্তর দিক ব্যতীত অন্য তিন দিকের দেওয়ালের সর্ব্বাঙ্গে ও ললাটে ইটের উপর নানা প্রকার কারুকার্য্য ও মূর্ত্তি ছিল; এক্ষণে তাহার অধিকাংশই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কতক লোনা লাগিয়া খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে, কতক লোকে খুলিয়া লইয়া গিয়াছে। উত্তর দিকের দেওয়ালে কারুকার্য্য অতি সামান্য ছিল বলিয়া বোধ হয়। মন্দিরের

মুকুন্দপুর—রায় মহাশয়দিগের শিব ও কালীমন্দির
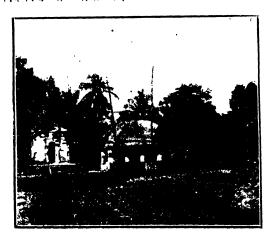
চতুর্দ্দিকের ললাটে কতকগুলি ছোট ছোট পুত্তলিকার সারি এখনও আছে। মন্দিরের বহির্দ্দেশে উত্তর দিকের দেওয়ালে একটি ভগ্ন স্থান আছে, উহা দেখিতে দ্বারের ন্যায়। অন্য তিন দিকের দ্বার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মন্দিরের বহির্দ্দেশের মাপ প্রত্যেক দিকে প্রায় ২২½ হাত, উচ্চতা প্রায় ৩২ হাত। পশ্চিম এবং দক্ষিণ দিকের বারান্দার সম্মুখে দুইটি করিয়া গোলাকার স্তম্ভ ছিল, এখনও মেঝের উপর তাহার ভিত্তির গাঁথনি বর্ত্তমান রহিয়াছে। স্তম্ভদ্বয়ের মধ্য স্থলে একটি বড় দ্বার এবং উহাদের দুই পার্শ্বে দুইটি করিয়া অপেক্ষাকৃত ছোট খিলান-করা দ্বার ছিল, অর্থাৎ দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের বারান্দার সম্মুখে তিনটি করিয়া খিলান-করা দ্বারা বিভক্ত ছিল। গর্ভ-মন্দিরের বাহিরে চতুর্দ্দিকে যে আচ্ছাদিত বারান্দা আছে, উহা ৩ হাত প্রশস্ত।

কাটুনিয়া—৺গোবিন্দজীউ

বারান্দায় দাঁড়াইয়া উপর দিকে চাহিলে ছাদের খিলান দেখিতে হস্তী-পৃষ্ঠের ন্যায়, কিন্তু সরু ও দীর্ঘ। বারান্দার চারিটি কোণা এরূপ ভাবে উপর দিকে খিলান করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে যে, দেখিলে মনে হয় উহারা চারিটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। এই প্রকোষ্ঠের ন্যায় কোণাগুলির দেওয়াল
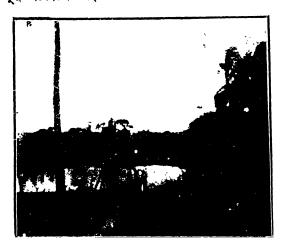
গোপালপুর—দীঘি

বারান্দার অন্য অংশের দেওয়াল অপেক্ষা স্থূলতর হওয়ায় ও উহাদের প্রত্যেকের যে দুই দিকে মন্দিরের বারান্দা

খিলান-করা দেওয়াল থাকায়, এই চারিটি কোণা হঠাৎ দেখিলে প্রকোষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। ওম্যালি সাহেব তাঁহার "খুলনা ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে" ইহাদিগকে প্রকোষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রকোষ্ঠের ন্যায় কোণা-গুলির প্রত্যেকের মাপ অনুমান ৩×২৮ হাত। ভিতরে দাঁড়াইয়া ইহাদের ছাদের খিলান দেখিতে ছোট চ্যাপ্টা গুম্বজের ভিতর দিকের ন্যায়। উক্ত বারান্দা কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া যে গর্ভ-মন্দিরটি আছে, উহার ভিতরের মেঝের মাপ প্রায় ৬৷৷×৬৷৷ হাত ও উহার দেওয়াল প্রায় ৩ হাত স্থূল। সুরকীর সহিত ঝিনুক ও শঙ্খ প্রভৃতির চূণ মিশাইয়া উহার মধ্যে দ্বার বন্ধ করিবার হুড়কার কাষ্ঠ-দণ্ড প্রবিষ্ট থাকিত। দক্ষিণ দিকের দ্বারটির উচ্চতা প্রায় ৫ হাত; কিন্তু পশ্চিম দিকের দ্বারটির উচ্চতা প্রায় ৬ হাত। সম্ভবতঃ পশ্চিম দিকেই এই মন্দিরের সদর ছিল। গর্ভ-মন্দিরের পশ্চিম দিকের দেওয়ালের বহির্দ্দেশে দ্বারের কিঞ্চিৎ উপরে স্মৃতি-ফলকে বাঙ্গালা অক্ষরে কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় যাহা লিখিত আছে, তাহার কতকাংশ অস্পষ্ট হইয়া যাওয়ায় উহা পাঠ করিতে পারা গেল না। উক্ত স্মৃতি-ফলকের সে পাঠ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র তাঁহার 'যশোহর খুলনার ইতিহাসে' লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহা এই—

কাটুনিয়া—৺গোবিন্দজীউর নূতন বাটীর উর্দ্ধভাগ ও গুম্বজ

"শাকে বেদসমাযুক্তে বিন্দুবাণেন্দু সংমিতে।
মঠোঽয়ং স্বর্গসোপানং শ্রীকৃষ্ণেন কৃতঃ স্বয়ম্॥"

গাঁথনির মসলা প্রস্তুত হইয়াছিল। মন্দিরের গাঁথনি এখনও 'বজ্রের ন্যায়' শক্ত। গর্ভ-মন্দিরের গুম্বজটির অভ্যন্তর দেখিতে অনেকটা কলিকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের গুম্বজের অভ্যন্তরের ন্যায় গোলাকার। মন্দিরাভ্যন্তরে পূর্ব্ব দিকের দেওয়ালে একটি ও পশ্চিম দিকের দেওয়ালে দ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটি কুলুঙ্গী আছে। গর্ভ-মন্দিরের উত্তর ও পূর্ব্ব দিকে কোন দ্বার নাই। দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে একটি করিয়া খিলান-করা দ্বার আছে; কিন্তু দ্বারের উপরিভাগের কিয়দংশ কে বা কাহারা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। দ্বারের দুই পার্শ্বে দেওয়ালের মধ্যে সুদীর্ঘ গর্ত্ত রহিয়াছে,

এই মন্দির ১৫০৪ শকাব্দা = ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। গর্ভ-মন্দিরের বহির্দ্দেশে পশ্চিম-দিকের দেওয়ালের গাত্রে ইটের উপরে পদ্মপুষ্প, নানা প্রকারের কারুকার্য্য ও পুত্তলিকা আছে। গর্ভ-মন্দিরের দক্ষিণ দিকের দেওয়ালের বহির্দ্দেশেও ঐরূপ কারুকার্য্যাদি আছে; এবং দ্বারের কিঞ্চিৎ উপরে দেওয়ালে একটি গরুড়-মূর্ত্তির পৃষ্ঠে রাধা-কৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি আছে। উহা এক্ষণে মসীবর্ণ ধারণ করিয়াছে।

মন্দিরের উত্তর-পূর্ব্ব কোণায় প্রায় ৩ রশি=২৪০ হাত দূরে একটি স্থানে সামান্য জঙ্গলের মধ্যে ভগ্ন অট্টালিকার একটি ছোট ইষ্টকময় স্তূপ আছে। সম্ভবতঃ ঐ স্থানে পূর্ব্বে কোন মন্দির ছিল। মন্দিরের দক্ষিণ দিকে অনুমান ১৬০ হাত দূরে কতকটা স্থান ইট দিয়া বাঁধান আছে। উহা প্রায় ২॥০৩ হাত উচ্চ। উহার উপরে একটি তেঁতুলের গাছ জন্মিয়াছে এবং উহার পার্শ্বে একটি ছাদের খিলান ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আছে। আমাদের পথ-প্রদর্শক কহিলেন যে, এই স্থানে পূর্ব্বে দোল-মন্দির ছিল। নবরত্ন মন্দিরের সম্মুখ বা পশ্চিম দিকে ৮।১০ হাত দূরে একটি অনুচ্চ ও ক্ষুদ্র ইষ্টকময় ছিল। মন্দির হইতে প্রত্যেক দিকে প্রায় ২৪০ হস্ত পরিমিত ভূমি চতুঃপার্শ্বস্থ ধান্যক্ষেত্র অপেক্ষা উচ্চ এবং তাহাতে ভগ্ন ইষ্টকখণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই স্থানে পূর্ব্বে যে সকল মন্দির বা অট্টালিকা ছিল, তাহার চতুর্দ্দিকে প্রাচীরের বেষ্টনী ছিল বলিয়া মনে হয়। এই সকল মন্দিরে যে সকল ইষ্টক ব্যবহৃত হইয়াছে, উহাদের মাপ এক প্রকারের নহে।
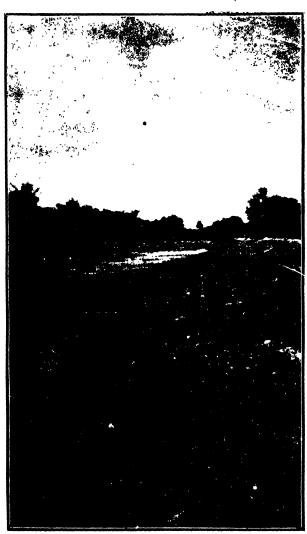
মুকুন্দপুরের গড়ের খাত

উক্ত মন্দির দেখিলেই মনে হয় যে, উহা কোন দেবতার এবং সম্ভবতঃ ৺কৃষ্ণের মন্দির ছিল। উহার ঊর্দ্ধদেশ দেখিয়া মনে হয় না যে, উহার ৯টি চূড়া ছিল। মন্দিরের চারি কোণায় যে চারিটি প্রকোষ্ঠের উপরে গুম্বজের ন্যায় খিলান আছে, উহাদের বহির্দ্দেশে ছাদের উপরে যে চূড়া ছিল, তাহা মন্দিরের এখনকার অবস্থা হইতে ঠিক বুঝা যায় না। কিন্তু এতদঞ্চলের লোকে বলিয়া থাকেন, এবং শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র ও ওম্যালি সাহেব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, ইহা প্রতাপাদিত্যের পিতা রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন বা নয় চূড়া-বিশিষ্ট সমাজ-মন্দির। কথিত আছে যে, যশোহর রাজ্য স্থাপন করিয়া প্রতাপাদিত্যের পিতা রাজা বিক্রমাদিত্য নানা স্থান হইতে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থাদি নানা জাতির লোক আনাইয়া যশোহরে বাস করাইয়াছিলেন, এবং স্বয়ং সমাজপতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্যের একটি নবরত্ন সভা ছিল। এই নবরত্ন-মন্দিরে উহার অধিবেশন হইত। সতীশবাবু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, এই নবরত্নের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন,—কাশ্যপ গোত্রীয় কমলনয়ন চট্টোপাধ্যায় তর্কপঞ্চানন। কিন্তু পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী তাঁহার "প্রতাপাদিত্যের জীবনচরিতে" এবং শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় তাঁহার "প্রতাপাদিত্যে" তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন লিখিয়াছেন। কোন কোন লোকের মুখে শুনা যায় যে, এইরূপ চারিটি নবরত্ন সমাজ-মন্দির ছিল; উহাতে চারিটি প্রধান সমাজের অধিবেশন হইত। রাজা বিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তিচিহ্ন এই বৃহৎ মন্দিরটি ক্রত

যত না ক্ষতি করিয়াছে, লোকে ইহার ইট ভাঙ্গিয়া লইয়া গিয়া তদপেক্ষা অধিক ক্ষতি করিয়াছে। দেখিয়া বোধ হইল যে জমিদার, পত্তনীদার, জনসাধারণ বা রাজ-কর্ম্মচারিগণ কেহই বাঙ্গালীর গৌরব এই প্রাচীন কীর্ত্তিটির রক্ষাকল্পে যত্নবান্ নহেন।

বেলা ৮৸০ টার সময় ধানের মাঠের মধ্য দিয়া মুকুন্দপুর উদ্দেশে পূর্ব্ব দিকে চলিলাম। গোবেড়ের খালের ধার দিয়া কামারের আবাদ নামক ক্ষুদ্র গ্রাম অতিক্রম করিয়া জন-মানবহীন এক অতি বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্য দিয়া হাঁটিয়া চলিলাম। প্রবল বেগে বায়ু বহিতেছে; বটেরের ঝাঁকের আনন্দ-কিলকিলা ও কদাচিৎ কোন বৃক্ষে উপবিষ্ট চিলের তীক্ষ্ণ কম্পিত স্বর ভাসিয়া আসিতেছে। আমরা মাঠ ও খাল আদি অতিক্রম করিয়া, এক ক্রোশের অধিক পথ হাঁটিয়া, গোবিন্দপুর নামক গ্রামের ভিতর দিয়া, উহার উত্তর-পূর্ব্ব কোণায় অবস্থিত মুকুন্দপুর গ্রামে প্রবেশ করিয়া, জমিদার শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণচন্দ্র রায়ের বাটীতে উপস্থিত হইলাম।

লক্ষ্মণবাবুর বাটীর দক্ষিণে মুকুন্দপুরের বি, দে, মিড্‌ল ইংলিস স্কুল আছে। উহাই এ অঞ্চলের সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্কুল। স্কুলের ছাত্রসংখ্যা প্রায় ১০০। গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সাহায্য পাইলেও স্কুলের তত্ত্বাবধান, ও অর্থের অনাটন হইলে তাহার ব্যবস্থা, জমিদার রায় মহাশয়গণ করিয়া থাকেন। স্কুলের উত্তরে রাস্তার অপর পার্শ্বে রায় মহাশয়দিগের একটি শিব-মন্দির ও কালী ঠাকুরাণীর কোঠা ঘর আছে। এই সকলের কিঞ্চিৎ উত্তরে রায় মহাশয়দিগের দক্ষিণদ্বারী বহির্ব্বাটী। বহির্ব্বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলে সম্মুখে উঠান। উঠানের পূর্ব্ব দিকে বৈঠকখানার কোঠা-ঘর। এই ঘরে আমরা আশ্রয় পাইয়াছিলাম। উঠানের উত্তর দিকে চণ্ডীমণ্ডপের সুন্দর চালা আছে। পূর্ব্বে এই স্থানে কাঁঠাল কাঠের উপর সূক্ষ্ম কারুকার্য্য-মণ্ডিত যে চণ্ডীমণ্ডপের বাঙ্গলা-ঘর ছিল, উহা এতদঞ্চলের একটি গৌরবের সামগ্রী ছিল। এক্ষণে সেই বাঙ্গলা-ঘরের কারুকার্য্য-খচিত ও মূর্ত্তি-বিমণ্ডিত কয়েকখণ্ড কাষ্ঠ অতীতের স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ রক্ষিত হইয়াছে মাত্র। বহির্ব্বাটীর উত্তরে রায় মহাশয়দিগের অন্দরমহল। বহির্ব্বাটীর পূর্ব্ব দিকে একটি স্থানে শনি ও মঙ্গলবারে হাট হয়। উহারই পূর্ব্ব দিকে রায় মহাশয়দিগের দীঘি। এখানে একটি বাজার আছে। তথায় ময়রা, মনোহারী, মুদী প্রভৃতির ৫।৭টি দোকান আছে। রায় মহাশয়দিগের বাটী এবং দীঘি, গড়-বেষ্টিত গড়মুকুন্দপুরের দুর্গের ঠিক দক্ষিণ দিকে অবস্থিত।

কাটুনিয়া—রাজা যতীন্দ্রমোহন ও তাঁহার পুত্রত্রয়
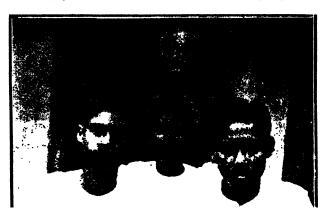
বেলা অধিক হইলেও সময় সংক্ষেপ বশতঃ লক্ষ্মণবাবুর বাটীতে দ্রব্যাদি রাখিয়াই আমরা পূর্ব্বোক্ত দীঘির পূর্ব্বপাড় দিয়া গড়মুকুন্দপুরের গড় দেখিতে চলিলাম। উত্তর দিকে কিয়দ্দূর যাইয়া আমরা দুর্গের দক্ষিণ দিকের গড়ের-শুষ্ক খাতের মধ্য দিয়া চলিলাম। এই দিকের গড়টি প্রায় ৩০ হাত প্রশস্ত। তৎপরে আমরা দুর্গের পূর্ব্বদিকের

গড়ের প্রান্ত দিয়া কালীগঞ্জ-নূরনগর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড রাস্তায় উঠিয়া উত্তর দিকে চলিলাম। এই পূর্ব্বদিকের গড়ের দুইটি স্থানে এখনও জল আছে। একটি বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডের চতুর্দ্দিকে এইরূপ গড় আছে। উহার খাত সুগভীর ও তাহার স্থানে স্থানে জল আছে। এই গড়-বেষ্টিত ভূমিখণ্ডে এক্ষণে বৃক্ষাদি আছে, প্রাচীনকালের গৃহাদি কিছুই নাই। রামরাম বসুর "রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে" উল্লিখিত হইয়াছে যে, ৫।৬ ক্রোশ দীর্ঘপ্রস্থ স্থানের জঙ্গল কাটাইয়া, নদী-নালার উপর পুলবন্দী করাইয়া "তাহার মধ্যস্থলে ক্রোশাধিক চারিদিকে আয়তন গড় কাটাইয়া পুরির আরম্ভ হইল। সদর মফসল ক্রমে তিন চারি বেহদ্দে এমারত সমস্ত তৈয়ার হইয়া দিব্য ব্যবস্থিত পুরি প্রস্তুত হইল। চতুঃপার্শ্বে গোলাগঞ্জ সহর বাজার নগর চাতর ও বাগ বাগিচা।" ইহাই বোধ হয় গড়মুকুন্দপুরের বর্ণনা। প্রবাদ আছে যে, বসন্ত রায় এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন ও এই স্থানে যশোহর রাজ্যের প্রথম রাজধানী স্থাপন করেন। এই মুকুন্দপুর অঞ্চলে বিক্রমাদিত্যের যে রাজধানী ছিল তথা হইতে কিছু দূরে ধুমঘাটে প্রতাপাদিত্য পরে নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। অনুমান ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে গৌড়েশ্বর দায়ুদের যাবতীয় ধন-রত্ন তাঁহার পতনের পূর্ব্বে এইস্থানে প্রেরিত তথাকার বহু অধিবাসী এতদঞ্চলে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। গৌড়ের সমৃদ্ধি হরণ করিয়া এই স্থান সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল বলিয়া এই স্থান ও ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান "যশোহর" নামে অভিহিত হইত বলিয়া অনেকে মনে করেন। এখন গড় মুকুন্দপুর সামান্য গ্রাম মাত্র। গড়ের উত্তর-পূর্ব্ব কোণায় দাস মহাশয়দিগের একটি ক্ষুদ্র বাজার আছে। উহাতে মুদী, ময়রা প্রভৃতির ৪।৫টা দোকান আছে এবং এইখানে সোম ও শুক্রবারে মাছ, তরী-তরকারী ও ফলমূলের হাট বসে।

আমরা গড়মুকুন্দপুরের মসজিদের পশ্চাৎ বা পশ্চিম ও উত্তর দিক বেষ্টন করিয়া উহার পূর্ব্ব দিকে উপস্থিত হইলাম। পুরাকালে মসজিদের পূর্ব্ব দিক সদর ছিল। এক্ষণে সেদিকে ইষ্টকের স্তূপ ও বন-জঙ্গল হইয়া পড়ায় দক্ষিণ দিক সদর রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। মসজিদের চতুর্দ্দিকের দেওয়ালের গাত্রে ইটের উপর নানাপ্রকার কারুকার্য্য আছে; কিন্তু কোন প্রকার মূর্ত্তি বা পুত্তলিকা নাই। পশ্চিম দিকে একটি বৃহৎ গুম্বজযুক্ত উপাসনার বড় ঘর আছে, ও উহার পূর্ব্ব দিকে একটী আচ্ছাদিত বারান্দা আছে। পশ্চিম দিকের পূর্ব্বোক্ত উপাসনার ঘরটির উত্তর ও দক্ষিণ দিকে এক একটি বড় দ্বার আছে। উহাদের

কাটুনিয়া—রাজা যতীন্দ্রমোহনের বাটীর দৃশ্য

খিলানের স্থূলতা প্রায় ৪ হাত। কিন্তু খিলানের বহির্দ্দেশে দেওয়ালের গাত্রে যে কারুকার্য্য ও গাঁথনি আছে, তাহার স্থূলতা আরও ১ হাত হইবে। এই ঘরের পূর্ব্ব দিকে পূর্ব্বোক্ত যে বারান্দা আছে, উহাতে যাইবার জন্ত তিনটি দ্বার আছে। তন্মধ্যে মধ্যেরটি বড় এবং অপর দুইটি অপেক্ষাকৃত ছোট। এই দ্বারগুলি মুসলমানী ধরণের

গোপালপুর—৺গোবিন্দদেবের ত্যক্ত প্রাচীন বনাকীর্ণ ভগ্ন মন্দির

উপাসনা গৃহের গুম্বজটি অতি বৃহৎ ও দেখিতে মনোরম। গুম্বজের নীচের দিকে যেখান হইতে গুম্বজের খিলান আরম্ভ হইয়াছে, সেইখানে ঘরের চারি কোণায় চারিটি সুশ্রী ঢালু খিলান আছে। এই শ্রেণীর গুম্বজ ও কোণার খিলান ডামরাইলের নবরত্ন মন্দিরে এবং গোপালপুরের গোবিন্দজীউর ত্যক্ত মন্দিরে দেখিয়াছি। উপাসনার ঘরের মেঝের মাপ প্রত্যেক দিকে প্রায় ১৪॥ হাত। মেঝে হইতে গুম্বজের উচ্চতা প্রায় ১৯।২০ হাত হইবে। উপাসনা-গৃহের মধ্যে পশ্চিম দিকের দেওয়ালে তিনটি খিলান-করা কুলুঙ্গীর ন্যায় আছে। তন্মধ্যে মধ্যেরটি অপেক্ষাকৃত বড়। ইহাকে 'মেম্বর' কহে। পূর্ব্বে মসজিদের অভ্যন্তরের দেওয়ালে পঙ্খের কাজ করা ছিল, এখনও স্থানে স্থানে তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। বালির সহিত শঙ্খ ও ঝিনুকের চূ মিশ্রিত করিয়া গাঁথনির মসলা প্রস্তুত করা হইয়াছিল। এই মসজিদের গাঁথনি অতি সুন্দর ও অতি দৃঢ়। উপাসনা-গৃহের পূর্ব্ব দিকে যে পূর্ব্বোক্ত বারান্দা আছে, উহার মেঝের মাপ প্রায় ১৭ × ৩।৹ হাত; ও তাহার পূর্ব্ব দিকে যে তিনটি দ্বার আছে, তন্মধ্যে মধ্যেরটি অপেক্ষাকৃত বড়। ঠিক ঐরূপ তিনটি দ্বার বারান্দার পশ্চিম দিকে আছে। বারান্দার পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকের মাঝের বড় দ্বার দুইটির প্রত্যেকের মাপ অনুমান ৫ × ৩ হাত এবং পশ্চিম দিকের দ্বারটির খিলানের গাঁথনি ও দেওয়াল প্রায় ৪ হাত স্থূল। বারান্দার ভিতরের মাপ প্রায় ১৭ × ৩।৹ হাত। বারান্দার উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তদ্বয় দেখিতে দুইটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের ন্যায়। এই প্রকোষ্ঠদ্বয়ের উপরে এবং বারান্দার মধ্যস্থলের উপরিভাগে এক একটি ছোট চ্যাপ্টা গুম্বজ আছে —উহারা দেখিতে ডামরাইলের মন্দিরের চারিটি কোণার গুম্বজ চতুষ্টয়ের ন্যায়। প্রকোষ্ঠ দুইটির গুম্বজের উপরিভাগ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে এই সুন্দর মসজিদের উপাসনার বড় ঘরটির ছাদে চারি কোণায় চারিটি এবং উহার পূর্ব্বদিকের বারান্দার ছাদের উত্তর-পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণায় এক একটি মিনার ছিল, তাহা এক্ষণে আর নাই। মসজিদের ছাদের উপরে ইট ভাঙ্গিয়া স্তূপাকার হইয়া আছে ও তথায় নানা প্রকারের আগাছা জন্মিয়াছে। মসজিদের বহির্দ্দেশের মাপ পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় ৩৪।৩৫ হাত এবং উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ২৫।২৬ হাত হইবে। মসজিদটির চতুর্দ্দিকে ইষ্টকের স্তূপের উপর বন জঙ্গল হইয়া আছে।

পূর্ব্ব কালে এই মসজিদের অদূরে পূর্ব্ব দিক দিয়া যমুনা

প্রবাহিত হইত, এখন তাহার শুষ্ক খাত মাত্র আছে। মসজিদটি দেখিয়া মনে হইল, যেন ইহা ডামরাইলের নবরত্ন মন্দিরের এবং গোপালপুরের গোবিন্দদেবের মন্দিরের কিঞ্চিৎ পরে প্রস্তুত হইয়াছে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রীর "প্রতাপাদিত্যের জীবন চরিতে" উল্লিখিত হইয়াছে যে, এই মসজিদটি প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছিল; কিন্তু শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্রের "যশোহর খুলনার ইতিহাসে" উক্ত হইয়াছে যে, এই স্থানে পাঠান সেনা দলের একটি ছাউনি ছিল, তাহাদিগের উপাসনার জন্য বিক্রমাদিত্যের সময় এই মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। মসজিদটি এক্ষণে একজন কাজির তত্ত্বাবধানে আছে। এই ক্ষুদ্র গ্রামে ১৫।১৬ ঘর মুসলমানের বাস আছে; একটি প্রাইমারি স্কুল কায়ক্লেশে চলিতেছে।

অতঃপর বেলা প্রায় ১২৷৷০ টার সময় লক্ষ্মণ বাবুর বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্রাম লাভ করিলাম। গোবিন্দপুর, মুকুন্দপুর ও গড়মুকুন্দপুর এই তিনখানি পাশাপাশি গ্রামে মোট প্রায় ৩০০ ঘর লোকের বাস আছে। মুকুন্দপুরে বিভিন্ন জাতির অনেকগুলি শিক্ষিত লোক আছেন। এখানে কোন দাতব্য চিকিৎসালয় নাই, ক্যাম্বেলের পাশ করা দুইজন ডাক্তার ও একজন কবিরাজ আছেন। মুকুন্দপুরে যে পোষ্টাফিস আছে উহার নাম মথুরেশপুর। মুকুন্দপুরের এম্. ই, স্কুল ছাড়া গোবিন্দপুরে একটি এল, পি, স্কুল আছে, উহার ছাত্র সংখ্যা প্রায় ৪০ জন।

একখানি গো-যানে আমাদের দ্রব্যাদি তুলিয়া দিয়া বৈকাল ৫৷৷ টার সময় পদব্রজে কাটুনিয়া-নুরনগর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। গ্রামপ্রান্তে আসিয়া কালীগঞ্জ-নুরনগর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা দিয়া দক্ষিণ দিকে চলিলাম। এই রাস্তার পূর্ব্ব দিকে কিঞ্চিৎ দূরে মাঠের মধ্যে একটি অতি প্রাচীন পুকুর আছে, উহার নাম তালপুকুর। উহাতে সামান্য জল আছে। পুকুরটি প্রায় ২০ বিঘা জমির উপর অবস্থিত। স্থানীয় লোকে বলেন যে, ইহা রাজা বিক্রমাদিত্যের সময়ের পুকুর। এই রাস্তার পশ্চিম দিকে কিঞ্চিৎ দূরে বিক্রমাদিত্যের কাছারি-বাটীর পতিত ভিটা আছে। তথায় ইষ্টকাদি পড়িয়া আছে। এই কাছারি-বাটীর ভিটার নীচে যমুনার সুবিস্তৃত ত্যক্ত খাত পড়িয়া

প্রায় এক ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া দেখিলাম যে, রাস্তার পূর্ব্ব দিকে কেবল ধানের মাঠ এবং পশ্চিম দিকে লোণা জলে সিক্ত কর্দ্দমময় কৃষ্ণাভ প্রান্তর পড়িয়া আছে। উহার মধ্যে দূরে দূরে এক একটি খেজুর গাছ ভূতের মত দাঁড়াইয়া আছে। পূর্ব্বে এগুলি ধানের মাঠ ছিল, বাঁধ ভাঙ্গিয়া লোণা জল প্রবেশ করিয়া সমস্ত নষ্ট করিয়া দিয়াছে—এখন আর এই সকল মাঠে ফসল হয় না। প্রতি বৎসরেই সহস্র সহস্র বিঘা ফসলের জমি ফসল সহ লোণা জলের প্লাবনে নষ্ট হইতেছে। এজন্য বহু অবস্থাপন্ন লোক পথের ভিখারী হইয়াছেন—দরিদ্র চাষীদিগের ত কথাই নাই। রাস্তার প্রায় উপরিভাগ পর্য্যন্ত জোয়ারের সময় লোণা জল উঠিয়া থাকে, তাহার চিহ্ন রহিয়াছে। কোন কোন স্থানে রাস্তার নীচের মাটী ভেদ করিয়া লোণা জল রাস্তার এক দিক হইতে অপর দিকে যাইতেছে। এ অঞ্চলের লোক লোণা জলের আক্রমণ হইতে আপন আপন জমি ও পানীয় জলের পুকুর রক্ষা করিতে সর্ব্বদাই চিন্তিত। এই সকল মাঠ হইতে ভাঁটার সময় জল নামিয়া যাইবার যে শব্দ শুনিয়াছি, উহা শুনিতে ক্রুদ্ধ জনতার কোলাহলের ন্যায়।

প্রায় ৩ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া রাত ৮টার সময় কাটু-নিয়ার রাজবাটীতে উপস্থিত হইলাম। রাজবাটীর জমির সম্মুখ দিয়া যে সরকারি রাস্তা আছে, উহাকে রাজ-বাঁধ কহে। প্রতাপাদিত্যের সময় এই রাস্তা দিয়া সৈন্য যাতায়াত করিত। সেই সময় হইতে এই সুদীর্ঘ রাস্তার পার্শ্বে স্থানে স্থানে পানীয় বা মিঠা জলের পুকুর আছে। এই রাজ-বাঁধ রাস্তা হইতে একটি ছোট রাস্তা দিয়া রাজবাটীতে উপস্থিত হইলাম। রাজবাটীতে যাইতে বাম দিকে বিস্তৃত মাঠের মধ্যে দুইটি উচ্চ চতুষ্কোণ দোল-মঞ্চ আছে, তন্মধ্যে একটি অপরটি অপেক্ষা বড়। বড় দোল-মঞ্চে ৺গোবিন্দজীউ ঠাকুরের এবং ছোটটিতে ৺রাধাকান্ত দেবের দোল হয়। দোলের সময় এখানে সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হয়। উক্ত ছোট রাস্তার অপর পার্শ্বে রাজা যতীন্দ্রমোহনের বাটী আছে। বাটীর সম্মুখে পুকুর, তৎপরে রাজার বহির্ব্বাটীর বৃহৎ চালা ঘর, উহার পশ্চাতের উঠানের পার্শ্বে ৺গোবিন্দজীউর গুম্বজযুক্ত মন্দির। মন্দির মধ্যে প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক উড়িষ্যা হইতে আনীত ৺গোবিন্

দেব এবং রাজা বিক্রমাদিত্যের পৈত্রিক গৃহদেবতা ৺রাধাকান্ত দেব অবস্থান করেন। "যশোহর খুলনার ইতিহাসে" লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, এই মন্দির শ্রীপুর গ্রামের শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ নিজ ব্যয়ে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এই উঠানের পশ্চাতে রাজার অন্দরমহল।

৺গোবিন্দদেবের মূর্ত্তি কৃষ্ণ প্রস্তরের সুশ্রী মূর্ত্তি, প্রায় ৮০ হাত উচ্চ, বিগ্রহের বামে অপেক্ষাকৃত অনেক ছোট অষ্টধাতুর রাধিকা আছেন। প্রবাদ আছে যে, খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায় কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া প্রতাপাদিত্য উড়িষ্যা বিজয় করিয়া উৎকলেশ্বর নামক একটি বিখ্যাত শিবলিঙ্গ এবং রাধিকাসহ এই গোবিন্দদেব বিগ্রহ লইয়া আসেন। পথিমধ্যে সুবর্ণরেখার জলে রাধিকাটি পড়িয়া গিয়া হারাইয়া যায়। রাধিকা না পাওয়া যাওয়ায় বসন্ত রায়ের নির্দ্দেশ মত ক্রমে ক্রমে কয়েকটি রাধিকা গঠিত ও পরিত্যক্ত হয়; কারণ গোবিন্দদেব বসন্ত রায়কে স্বপ্নাদেশ দিয়াছিলেন যে, ঐ সকল রাধিকাগুলি তাঁহার পছন্দ হয় নাই। সর্ব্বশেষে বর্ত্তমান রাধিকা গোবিন্দদেবের মনোমত হইলে উহাই তাঁহার পার্শ্বে স্থাপিত হয়। কথিত আছে যে, গোবিন্দ দেবের অমনোনীত রাধিকাগুলি বিভিন্ন লোককে বিতরণ করিয়া, ঐ রাধিকাগুলির জন্য কৃষ্ণ মূর্ত্তি গড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

প্রায় ৮৬:বৎসর পূর্ব্বে লিখিত রামগোপাল রায়ের কৃত "সারতত্ত্ব তরঙ্গিণীতে" গোবিন্দদেব সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে—

"নীলাচল হইতে গোবিন্দজীকে আনি।
রাখিলেন কীর্ত্তি যশ ঘোষয়ে ধরণী॥
মারহাট্টা সনে তাহে যুদ্ধ বহুতর।
কতেক লিখিব সেই লিখিতে বিস্তর॥
জলেশ্বর পাটনায় হইল সংগ্রাম।
জিনি মহারাষ্ট্রীগণে রাখিলেক নাম॥"

রায় মহাশয়, গোবিন্দদেবকে আনিবার সময় প্রতাপের সহিত মহারাষ্ট্রীগণের যুদ্ধ হইয়াছিল—এই অবিশ্বাস্য কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "যশোহর খুলনার ইতিহাসে" লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার পাঠানগণ বিদ্রোহী হইলে, বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা মানসিংহের সহকারী

মানচিত্র
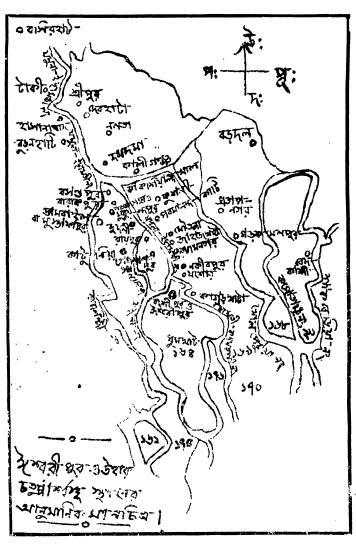
সৈয়দ খাঁ সামন্ত রাজাদিগকে পাঠান দমনের জন্য আহ্বান করিলেন। এই উপলক্ষে প্রতাপ যখন উড়িষ্যায় যুদ্ধ যাত্রা করেন, তখন বসন্ত রায় প্রতাপকে তাঁহার জন্য একটি শ্রীবিগ্রহ আনিতে বলেন। সুবর্ণরেখার তীরে পাঠানগণ যুদ্ধে পরাজিত হইলে, প্রতাপ মানসিংহের সহিত পুরী দর্শন

করিতে যান। এই সময় পুরী ও খুরদার রাজা পাঠানের পক্ষ অবলম্বন করায়, মোগল সৈন্য কর্ত্তৃক যখন তাঁহার রাজ্য আক্রান্ত হইয়াছিল, সেই সময় প্রতাপ গোবিন্দদেব বিগ্রহ ও উৎকলেশ্বর শিবলিঙ্গ সংগ্রহ করিয়া আনেন এবং গোবিন্দ-দেবের সেবার জন্য বল্লভাচার্য্য নামক একজন ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া আসেন। বসন্তরায় গোপালপুরে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া উহাতে গোবিন্দদেবকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং প্রতাপের পতনের পরে বসন্তরায়ের পুত্র চাঁদরায় রাজ্যলাভ করিয়া উক্ত বল্লভাচার্য্যের কনিষ্ঠ পুত্র রাঘবেন্দ্রকে ১০১৬ সালের ২১শে চৈত্র ২৮৬/ বিঘা দেবোত্তর জমির সনন্দ দান করেন। "বিশ্বকোষে" লিখিত হইয়াছে যে, প্রতাপ মানসিংহের সাহায্যার্থ উড়িষ্যায় গিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় তাঁহার "প্রতাপাদিত্য" নামক গ্রন্থে তাঁহার এই অনুমান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, প্রতাপ তাঁহার পিতৃবন্ধু কতলু খাঁর সাহায্যার্থ উড়িষ্যায় উপস্থিত হইয়া উড়িয়া এবং মোগলদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি গোবিন্দদেব এবং উৎকলেশ্বরকে সঙ্গে লইয়া আসিবার কালে উড়িয়াদিগের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল। পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী তাঁহার "প্রতাপাদিত্যের জীবন চরিতে" লিখিয়াছেন যে, প্রতাপ স্বাধীনতা লাভার্থ পার্শ্ববর্ত্তী রাজাদিগের সহিত মিলিত হইবার জন্য ও উড়িয়াদিগের শক্তি অবগত হইবার জন্য তীর্থযাত্রার ছলে জগন্নাথক্ষেত্রে গমন করেন। সেই সময় বসন্তরায় তাঁহাকে উড়িয়াদিগের পরম দেবতা উৎকলেশ্বর এবং গোবিন্দদেবকে লইয়া আসিতে বলেন। প্রতাপ পূজারীগণকে ধন দ্বারা বশীভূত করিয়া দেবতাদ্বয়কে লইয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রাকালে পথি মধ্যে সুবর্ণরেখার তীরে উড়িয়া রাজন্যবর্গকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধের ব্যস্ততার সময় সুবর্ণরেখা পার হইবার কালে রাধিকা নদী মধ্যে পতিত হন, বহু অনুসন্ধানেও তাঁহাকে আর পাওয়া যায় নাই।

গোবিন্দদেব ও উৎকলেশ্বর যশোহরে পঁহুছিলে বসন্তরায়ের উদ্যোগে গোবিন্দদেব গোপালপুরের মন্দিরে এবং উৎকলেশ্বর অধুনা সুন্দর বনের কুক্ষিগত বেতকাশীতে প্রতিষ্ঠিত হন। প্রতাপাদিত্যের পতনের কিছুকাল পরে বসন্তরায়ের পৌত্র রাজারাম গোবিন্দদেব বিগ্রহসহ আঁধার-মাণিক গ্রামে কিছুকাল বাস করেন; তৎপরে রাজারামের পুত্র শ্যামসুন্দর গোবিন্দদেব সহ পরমানন্দ কাঠি নামক গ্রামে বাস করিয়া তথায় মন্দির নির্ম্মাণ করেন। শেষ কালে গোবিন্দদেব রায়পুর গ্রামে অধিকারীর বাটীতে ছিলেন। রাজা যতীন্দ্রমোহনের উদ্যম ও কার্য্যকুশলতার গুণে ১৩১১ সনের ফাল্গুন মাসের অমাবস্যার রাত্রি হইতে তিনি কাটুনিয়ার রাজবাটীতে বাস করিতেছেন। এই প্রাচীন বিগ্রহটির জন্য উক্ত রাজাকে অনেক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে এবং দীর্ঘকাল যাবৎ অনেক মামলা মোকদ্দমায় লিপ্ত হইয়া বহু অর্থ নষ্ট করিতে হইয়াছে। বাবু নগেন্দ্রনাথ বসুর "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের" দ্বিতীয় ভাগে একটি প্রবাদের উল্লেখ আছে যে, প্রতাপাদিত্য স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া পূর্ব্ববঙ্গের কোটালিপাড়ায় শিবরাম ভট্টাচার্য্যের বাটীতে গোবিন্দদেবকে প্রেরণ করিয়াছিলেন ও সেই হইতে গোবিন্দদেব তাঁহার বংশধর-গণের বাটীতে বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু যশোহরের লোকে এই প্রবাদটিকে ভিত্তিহীন বলিয়া থাকেন।

গোবিন্দদেবের মন্দিরে যে রাধাকান্ত নামক কৃষ্ণ বিগ্রহ আছেন, উহা অনুমান অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত দীর্ঘ। প্রবাদ আছে যে এই বিগ্রহটী অতি প্রাচীন; প্রতাপাদিত্যের প্রপিতামহ রামচন্দ্র গুহ যখন হালিসহরে বাস করিতেন ইহা সেই সময়ের।

১১ই এপ্রেল প্রাতে ৮৷৹ টার সময় কাটুনিয়া ত্যাগ করিয়া ক্রমে নুরনগর ও রামনগরের ভিতর দিয়া গোপালপুর উদ্দেশে পূর্ব্ব দিকে চলিলাম। চড়কের ঢাকের শব্দে গ্রাম মুখরিত। রামনগর গ্রামের সরকারি রাস্তার উত্তর পার্শ্বে প্রশস্ত ভূমিখণ্ডের উপর ১৩৩০ সালে স্থাপিত রামকৃষ্ণ মঠ ও ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বৃহৎ চালাঘর রহিয়াছে। রামনগর গ্রামটি কাটুনিয়ার ১ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এই স্থানে একটি মাইনর স্কুল ও নুরনগর পোষ্টাফিস আছে।

রামনগরের প্রান্তভাগে কুল্যান বা কল্যাণী নদীর তীরে আসিলাম। তখন ভাঁটা হইয়াছে, নদীতে জল নাই। সম্মুখে সুবিস্তৃত কর্দ্দমময় খাত পার হইতে গিয়া প্রায় কটিদেশ পর্য্যন্ত কাদার মধ্যে বসিয়া গেল। কাটুনিয়া হইতে যে মুটিয়াদ্বয় সঙ্গে আসিয়াছিল, উহাদিগের সাহায্যে

কোন প্রকারে এই কর্দ্দম-সমুদ্র মন্থন করিয়া পরপারে উপস্থিত হইলাম। তখন বেলা ৯॥০ টা। আমাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য ঈশ্বরীপুরের শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক প্রেরিত দুইটি গরুর-গাড়ী শেষ রাত্রি হইতে নদীর এই পারে অপেক্ষা করিতেছিল। নিকটবর্ত্তী খালের জলে কাদা ধুইয়া বেলা ১০টার সময় গো-যানে আরোহণ করিয়া পূর্ব্বদিকে গোপালপুর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। চতুর্দ্দিকে উন্মুক্ত প্রান্তর। প্রবল বাতাস থাকায় গ্রীষ্মের সূর্য্যের উত্তাপ অনুভূত হইতেছে না। বেলা ১১টার সময় ছোয়ালি গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে লবণাক্ত জোয়ারের জলে প্লাবিত কালনাগা নামক খালের জলে প্রায় কটিদেশ পর্য্যন্ত নিমজ্জিত করিয়া হাঁটিয়া খাল পার হইলাম। গাড়োয়ান দ্বয় দ্রব্যাদি বহন করিয়া অপর পারে রাখিয়া গিয়া গরু সহিত গাড়ী দুইটি জলে নামাইয়া পার করিয়া আনিল। তৎপরে অপেক্ষাকৃত ছোট আরও দুইটি খাল পার হইয়া আমরা বেলা ১২ টার সময় গোপালপুরে প্রবেশ করিলাম।

গোপালপুরের মধ্য দিয়া যে সরকারি রাস্তা শ্যামনগর থানার দিকে গিয়াছে, ঐ রাস্তার উত্তর দিকে গ্রামের উত্তর প্রান্তে গোপালপুরের দীঘি আছে। দীঘিটি গোপালপুরের গোবিন্দদেবের মন্দিরের ৭০০।৮০০ হাত উত্তরে অবস্থিত। দীঘির পাড়ে স্থানে স্থানে কেয়াবন ও জলের মধ্যে নল খাগড়ার বন হইয়াছে। জলের উপরিভাগ দাম ও শৈবাল দল দ্বারা আচ্ছাদিত। ইহার স্থানে স্থানে ৪।৫ হাত গভীর জল আছে। "Ancient Monuments in Bengal" নামক গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে, এই দীঘিটি প্রায় ১০০ বিঘা জমির উপর অবস্থিত এবং ইহা প্রতাপাদিত্য কাটাইয়াছিলেন। এক কালে এই দীঘি খুলনা জেলার একটি গৌরবের সামগ্রী ছিল, কিন্তু এক্ষণে ইহার ধ্বংসাবস্থা। দীঘির পাড়ে ৩।৪ ঘর লোকের বাস আছে। দীঘিটি এক্ষণে কলিকাতা বহুবাজারের বাবু শ্রীনাথ দাসের বংশধরগণের সম্পত্তি।

তৎপরে আমরা উক্ত দীঘির দক্ষিণ দিকের সরকারি রাস্তা হইতে নামিয়া মাঠ অতিক্রম করিয়া গ্রামের পূর্ব্ব প্রান্তে একটি অতি উচ্চ ভগ্নস্তূপের পশ্চিম দিকে উপস্থিত হইলাম। এই স্তূপসমষ্টির পূর্ব্ব প্রান্তে একটি উচ্চ স্থানে ভগ্ন ইষ্টকরাশি ও কাঁটা-বনের মধ্যে গোবিন্দদেবের ভগ্ন মন্দির দণ্ডায়মান আছে। আমরা মন্দিরের পশ্চিম দিক হইতে দক্ষিণ দিক বেষ্টন করিয়া অতি কষ্টে ভগ্নস্তূপ ও কাঁটা বনের ভিতর দিয়া ছিন্ন বস্ত্র ও ক্ষতবিক্ষত দেহে পূর্ব্বদিকের দ্বার দিয়া গোবিন্দদেবের মন্দির মধ্যে উপস্থিত হইলাম। অতি উচ্চ পোতার উপরে মন্দিরটি অবস্থিত। মন্দিরের নীচে পশ্চিম দিকে উঠানের স্থানটি এক্ষণে ইষ্টকময় ও বনাকীর্ণ হইয়া আছে। এই উঠানের উত্তর দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে এক একটি বৃহৎ ভগ্নস্তূপ আছে। তথায় পূর্ব্বে মন্দির ছিল—পশ্চিম দিকের স্তূপটি দোল-মন্দির ছিল। উঠানের পশ্চিমের স্তূপের পশ্চিমে আর একটি স্তূপ আছে। উঠানের পূর্ব্ব দিকে গোবিন্দদেবের বৃহৎ মন্দিরটি মাত্র অর্দ্ধভগ্ন অবস্থায় দণ্ডায়মান আছে। এই মন্দিরটি পূর্ব্বে দ্বিতল ছিল। দ্বিতলে গোবিন্দদেব বিশ্রাম করিতেন, কিন্তু এক্ষণে উহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। তাহার ফলে একতালার ছাদের উপরে ইষ্টকরাশি স্তূপীকৃত হইয়া আছে এবং অশ্বত্থ, তেঁতুল ও অন্য আগাছা জন্মিয়াছে। মন্দিরের সম্মুখ বা পশ্চিম দিকের দেওয়ালের বহির্দ্দেশে সর্ব্বস্থানে ইটের উপর যে নানা প্রকার কারুকার্য্য ও পুত্তলিকাদি ছিল, তাহার অধিকাংশই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অপর তিন দিকের দেওয়ালে যে সকল কারুকার্য্যাদি ছিল, তাহারও অধিকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মন্দিরের পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিকে এক একটি দ্বার আছে, পশ্চিম দিকেরটি সদর দ্বার। দ্বারের খিলানের মাপ প্রায় ৬।০ × ৩।০ হাত। মন্দিরের অভ্যন্তরে উত্তর দিকের দেওয়ালের কতকটা স্থানের ইষ্টক কে বা কাহারা ভাঙ্গিয়া লইয়াছে। উপরে একটি বৃহৎ গুম্বজ আছে ও গুম্বজের নীচে চারিটি কোণায় ঢালু খিলান আছে। এই মন্দিরের অভ্যন্তরের গঠন-প্রণালীর সহিত ডামারাইলের মন্দিরের এবং পরবাজপুরের মসজিদের অভ্যন্তরের গঠন-প্রণালীর সাদৃশ্য আছে। এই মন্দিরের দেওয়ালের গাঁথনি স্থানে স্থানে কাদার বলিয়া মনে হইল। ইহার গাঁথনি বিশেষ মজবুদ নহে। যে সকল স্থানে খিলান আছে, তথায় ইটের খাদরি করিয়া চূণ ও বালি মিশ্রিত মসলা দিয়া মজবুদ করিয়া গাঁথা হইয়াছে। মন্দিরাভ্যন্তরে পূর্ব্ব দিকের দেওয়ালের দক্ষিণ দিকে একটি খিলান-করা দ্বার আছে ও তাহার পশ্চাতে একটি ভগ্ন প্রকোষ্ঠের ন্যায় আছে। সম্ভবতঃ

এই স্থানে দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ি ছিল। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে পূর্ব্বে উচ্চ বারান্দা ছিল বলিয়া মনে হয়। মন্দিরের অভ্যন্তরের মাপ প্রত্যেক দিকে প্রায় ১১৷৷০ হাত; দেওয়ালের স্থূলতা অনুমান ৫৷৷০ হাত। যে সকল ইষ্টক ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাদের মাপ এক প্রকার নহে। কোন কোন ইষ্টকের মাপ ৬"×৬"×২"। প্রবাদ আছে যে প্রতাপাদিত্য উড়িষ্যা হইতে গোবিন্দদেব বিগ্রহ আনিলে, বসন্তরায়ের উদ্যোগে এই মন্দির গোবিন্দদেবের জন্য নির্ম্মিত হয়। ইহাই যশোহর রাজ্যে গোবিন্দদেবের প্রথম মন্দির। এই মন্দিরে গোবিন্দদেবের প্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মণ-ভোজনের সময় ঝড় উঠিয়া চন্দ্রাতপের দণ্ড উৎপাটিত হইবার উপক্রম হইলে, চাঁচড়ার বর্ত্তমান রাজবংশের পূর্ব্ব-পুরুষ যজ্ঞেশ্বর রায়, ব্রাহ্মণ ভোজন পণ্ড হয় দেখিয়া, নিজের সকল শক্তি নিয়োগ করিয়া চন্দ্রাতপের দণ্ড যথাস্থানে স্থির রাখিয়া, ব্রাহ্মণ ভোজনে কোন বিঘ্ন ঘটিতে দেন নাই। এজন্য তিনি পুরস্কৃত হইয়াছিলেন বলিয়া একটি প্রবাদ আছে। "Ancient Monuments in Bengal" এবং "A list of objects of Antiquerian interest in the lower provinces of Bengal" নামক পুস্তকে উল্লিখিত আছে যে, এই মন্দির রাজা প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মন্দিরটি এক্ষণে কলিকাতা বহুবাজারের বাবু শ্রীনাথ দাসের বংশধরগণের জমিদারী মধ্যে অবস্থিত। শুনিলাম যে, কিছু দিন পূর্ব্বে একজন কনট্রাক্টর ইহার ইট ভাঙ্গিয়া লইতেছিলেন। দুঃখের বিষয়, এই জীর্ণ মন্দিরটির রক্ষাকল্পে কেহই মনোযোগী নহেন। গোপালপুর গ্রামটি বেশী বড় নহে; এখানে ৩০।৩৫ ঘর লোকের বাস আছে।

মন্দির দেখা শেষ করিয়া বেলা ২৷৷০ টার সময় আমরা ঈশ্বরীপুর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। এই রাস্তা শ্যামনগর থানার নিকটে যেখানে কালীগঞ্জ-সাতক্ষীরা ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড রাস্তায় মিশিয়াছে, তথায় ইচ্ছামতী-যমুনার শুষ্ক খাতের মধ্যে মাটী ফেলিয়া এই রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে। এই প্রকারের বাঁধের জন্য যমুনার ক্ষতি হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে—এই প্রকারের যথেচ্ছ বাঁধ দেওয়ার ফলে এতদঞ্চলে কালাজ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে এবং এতদঞ্চলে জলপথে যাতায়াতের বিঘ্ন উৎপাদন করা হইয়াছে। ঈশ্বরীপুরের ও কালীগঞ্জের একাধিক ব্যক্তির নিকট এই কথা শুনিয়াছি। শ্যামনগরের থানার নিকট উপস্থিত হইয়া আমরা ডাইন দিকে বাঁকিয়া কালীগঞ্জ-সাতক্ষীরা রোড দিয়া দক্ষিণ দিকে ঈশ্বরীপুর অভিমুখে চলিলাম। এই সঙ্গমস্থলের রাস্তার দুই পার্শ্বে কয়েকখানি দোকান আছে। দক্ষিণ দিকে যাইতে রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে যমুনা-ইচ্ছামতীর সুবিস্তৃত শুষ্ক খাত পড়িয়া আছে। এই রাস্তা দিয়া অনেক দূর যাইয়া অপরাহ্নে অনুমান ৩৷৷০ টার সময় আমরা ঈশ্বরীপুরের পশ্চিম দিকে উপস্থিত হইলাম। (ক্রমশঃ)
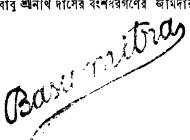
দ্বন্দ্ব

শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

১২

একটা অজ্ঞাত বিষাদের ভার হৃদয়ে লইয়া লীলা বাড়ী ফিরিল। কিরণকে সে গ্রাহ্য করে না, সে কথা তো সে তাহার মুখের উপরই শুনাইয়া দিয়া আসিল, তবু তাহার মনের ভার যায় না কেন? একটা প্রবল অশ্রুর উচ্ছ্বাস কেবলই বুকের ভিতর হইতে ঠেলিয়া ঠেলিয়া উঠিতেছে!

বাড়ীতে লীলার সুখ-দুঃখের সঙ্গী কেহ ছিল না। সে সকলের নিকট হইতেই দূরে থাকিত;—তার প্রিয় কুকুরটিই ছিল তার একমাত্র সঙ্গী। লীলার যাহা কিছু বক্তব্য থাকিত, সে সবই সে তাহার জিম্‌কে শুনাইত। জিমও এ সময়ে গম্ভীর ভাবে কথাগুলি বুঝিবার চেষ্টা করিত।

বাড়ী ফিরিয়া লীলা আহত হৃদয়ে নিজের ঘরে গিয়া তাহার টেরিয়ারকে কোলে তুলিয়া লইল। সে কিরণের উপর রাগ করিয়া তাহাকে ভুলিবার চেষ্টা করিবার জন্য জিমের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিল, যাক্, তুমি যে আমার কাছে আছো, এই ভালো—কিরণ উচ্ছন্নয়

যাক্ গে! কেনই বা তার জন্তে ভেবে মরা? কি বলো? সে না হলে কি আমার আর দিন চলবেই না?

জিম এ কথায় তাহার সম্মতি জানাইবার জন্য একবার ঘক করিয়া ডাকিয়া লেজ নাড়িল। লীলা বলিতে লাগিল, তার কথা আমি আর মনে আনতে চাই না, আমার আর একটি নতুন বন্ধু হয়েছে জানো? তোমায় নিয়ে যাব এক দিন তার কাছে! সে বড় ভালো! বুঝেছ ত? সে তোমায় খুব ভালবাসবে! তুমিও তাকে ভালবেসো—কেমন?

জিম লীলার হাত চাটিয়া এ কথায় সায় দিল। তার পর একটি দীর্ঘ হাই তুলিয়া কথাগুলি ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল।

লীলা মুখে যাই বলুক, সমস্ত দিন লজ্জা তার মনে গুরু ভারের মত চাপিয়া রহিল। সে যথার্থই একটা অন্যায় কাজ করিয়াছে! এ কথা সে আগে বুঝিল না কেন?

কিরণের সম্মুখে সে তাহার সহিত যথেষ্ট তর্ক করিয়াছে। তাহার এ কাজে যে কোন দোষ নাই, সদিচ্ছা-প্রণোদিত হইয়াই যে সে এ কাজ করিয়াছে, তাহা সে বার বার প্রমাণ করিয়াছে। কিন্তু এখন একলা ঘরে বসিয়া নিজের মনে সে আজ সকালের ব্যাপার যতই আলোচনা করিতে লাগিল, ততই নিজের প্রতি লজ্জা ও ধিক্কারে সে যেন মাটির সহিত মিশিয়া যাইতে লাগিল।

সে যে দিকটা হইতে এক রকম ভাবে এই কাজটার সম্বন্ধে বিচার করিতেছে, সামাজিক হিসাবে অপর কেহই সে ভাবে ইহাকে দেখিবে না। সমাজের লোকে কোন বিষয়ের উদ্দেশ্য দেখিয়া বিচার করে না। তাহারা শুধু বাহিরের কাজটাই দেখে, আর দেখে, সমাজে যে সব ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, কাজটা ঠিক সেই ব্যবস্থা মত হইয়াছে কি না। লীলা ত এত দিন এই সব তুচ্ছ বিধি, ব্যবস্থা, সংস্কার সব উড়াইয়া দিয়া নিজের মতে সদর্পে চলিয়াছে, কিন্তু আজ তাহার সব দিক হইতে এ কি পরাজয়! সেই সংস্কারের লজ্জাই তো আজ তাহাকে এত পীড়া দিতেছে!

কিরণ সত্য কথাই বলিয়াছে। সে নিজে উপযাচিকা হইয়া একজন অপরিচিত যুবকের কাছে গিয়াছে এবং প্রতারণা করিয়া তার ভালবাসা ও আদর গ্রহণ করিয়াছে! লীলা একলা ঘরে আরক্ত হইয়া দুই হাতের ভিতর মুখ লুকাইল! যে এ কথা শুনিবে, কি বলিবে সে? তাহার মা যদি শোনেন?

লীলা শিহরিয়া উঠিল! কি খেয়াল যে তখন তাহার মাথায় চাপিয়াছিল। কি করিয়া সে এমন অসম্মানের কাজ করিতে পারিল! তাহার মা তাহাকে সর্ব্বক্ষণ নিলজ্জ ও অভব্য বলিয়া শাসন করেন; কিন্তু সেই নির্লজ্জতার সীমা যে কতদূর সে অতিক্রম করিতে পারে, ও করিয়াছে, তাহা তিনি হয়ত স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন না! লীলা চিরদিন বীণা ও তাহার মত অন্য সমস্ত মেয়েদের নির্জ্জীব পুতুল বলিয়া ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য করিয়া বেড়াইত, আজ তাহার ফল ফলিল! তাহারা এমন কাজ করা দূরের কথা—কখনো মনেও আনিতে পারে না! এ কথা প্রকাশ হইলে সে কেমন করিয়া সমাজে মুখ দেখাইবে? আজ সর্ব্ব প্রথম নিজের উদ্দাম ও একরোখা স্বভাবের কথা মনে করিয়া লীলা লজ্জা ও বেদনা অনুভব করিল।

কিন্তু যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা হইতে ফিরিয়া আসিবার আর কোন উপায় নাই! এক যদি বীণা ফেরে, তবেই সব ঢাকা পড়িয়া যায়! কিম্বা তাহার উদ্দেশ্য বুঝিয়া অরুণ যদি তাহাকে ক্ষমা করে! লীলা ত তাহার বঞ্চনার মূল্য শেষ পর্য্যন্ত দিতে সম্মত আছে!

অরুণের কথা মনে আসিতেই লীলার মনের সমস্ত দ্বিধা, সমস্ত লজ্জা ধীরে দূর হইয়া আসিল। অরুণের সেই হর্ষে, পুলকে, আনন্দে উজ্জ্বল মুখের ছবি মনে পড়িয়া তাহার নিজের মনও একলা বসিয়া বসিয়া এই নির্জ্জন ঘরে কোন্ অজানিত ভাবের প্রভাবে আবিষ্ট হইয়া উঠিল! সে অরুণকে ভালবাসে! আজ সে তাহার জন্য নিজের অন্তরে যে ভাব অনুভব করিতেছে, আগে ত কখনও আর কোন পুরুষের জন্য সে এমন করিয়া ভাবে নাই।

অন্ধ অক্ষম অরুণকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া সে তাহার জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখের সহিত নিজেকে মিলাইয়া তাহার ভার বহন করিয়া সংসার পথে চলিয়াছে,—কল্পনানেত্রে এ দৃশ্য দেখিয়া লীলার চিত্ত অপার আনন্দে ও করুণায় ভরিয়া গেল! আহা! সে দুঃখী, সে অসহায়! আজ বিপদের দিনে তাহার চারিদিকের বন্ধুত্ব, ভালবাসা, সহানুভূতি প্রেম—সব বন্ধন এক মুহূর্ত্তে খসিয়া পড়িয়াছে! আজ সে সংসারে একলা—নির্ব্বান্ধব, অসহায়! লীলা নিজের ইচ্ছায় তাহা

কাছে গিয়া তাহাকে বরণ করিয়া লইয়াছে, তাহার হৃদয়ের অটল ও একনিষ্ঠ প্রেমের আশ্রয়ে সে আবার অরুণের নিরাশ অন্ধকার জীবনে আশা ও প্রেমের আলো জ্বালাইয়া তাহাকে বাঁচাইয়া তুলিবে! ইহাতে আর কাহারও কোন কথা বলিবার কি অধিকার?

লীলার অন্তর হইতে কেবল একটি মাত্র কথা বার বার ঠেলিয়া উঠিতে চাহিতেছিল! সে নিজের মনে চক্ষু মুদিয়া অস্পষ্ট স্বরে মনের সেই কথাটাই স্পষ্ট করিয়া লইয়া বলিল, অরুণ আমার! সত্যই একান্ত আমার সে! সমাজের শাসনে বা অন্য কোন কিছুর জন্যে কোন দিন আমি তাকে ত্যাগ করতে পারবো না। আমি যা করেছি, তার জন্যে কোন দিন লজ্জা বোধ করব না! সকলের কাছে অকুণ্ঠ ভাবে এ কথা, দরকার হলে, স্বীকার করবো!"

'অরুণ আমার!' এ কথা স্পষ্ট ভাবে স্বীকার করিয়া লইবামাত্র লীলা নব-উন্মেষিত প্রেমের আবেগে ও পুলকে শিহরিয়া উঠিল! তাহার হৃদয়ের রক্ত খরবেগে বহিল! তাহার মনের সমস্ত লজ্জা ও ধিক্কার এক মুহূর্ত্তে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল! এবং এই প্লাবনে তাহার এতক্ষণের লোকলজ্জা, পিতামাতার ভয়, কিরণের ক্রোধ ইত্যাদির চিন্তা কোথায় ভাসিয়া গেল, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না!

সেদিন অপরাহ্নে লীলা টেনিসকোর্টে বীণা ও আর দুইটি বন্ধুর সহিত টেনিস খেলিতেছিল। তাহার নিজের মনের সব সংশয় ও দ্বিধা ঘুচিয়া মন নির্ম্মল হইয়া গিয়াছে। এখন শুধু কিরণকে এমনই করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারিলেই সব গোল মিটিয়া সে নিশ্চিন্ত হয়। অথচ কয়েক ঘণ্টা আগে সে নিজের আহত অভিমানের গর্ব্বে কিরণকে একেবারে নস্যাৎ করিয়া দিয়াছিল!

লীলা খেলার মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে চকিত হইয়া উঠিতেছিল। একটি পরিচিত প্রিয় পদধ্বনি, একটি পরিচিত কণ্ঠের চিরপরিচিত স্বর শুনিবার জন্য তাহার মন সর্ব্বক্ষণ উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে! কিন্তু বেলা যে ক্রমেই শেষ হইয়া আসিল, কিরণ ত এখনো কই আসিল না!

সকালে কিরণ যখন কোনমতেই তাহার সহিত একমত হইল না, বরং তাহাকে কঠোর তিরস্কার করিয়া অত্যন্ত অপমানজনক অনেক কথা শুনাইয়া দিল, তখন বাড়ী আসিয়া রাগে ও অপমানে লীলা তাহার উপর বিষম বিমুখ হইয়া উঠিল! সে যদি এত সহজে তাহার এত দিনের বন্ধুত্বের অবসান করিয়া দিতে পারে, তবে লীলারই বা এত গরজ কিসের? তাহারি যেন আর কিরণকে না হইলে দিন চলিবে না! ইহার পরে কিরণ যদি আবার দুদিন পরে সাধিয়া নিজে তাহার কাছে আসে, তবু সে আর তাহার নাম করিবে না!

তাহার পর দিনের বেলা যখন সে তাহার নিজ কৃত কার্য্যের বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতেছিল, তখন একবার তাহার মনে হইল, কিরণ যাহা বলিয়াছে, তাহাই সত্য, দোষ তাহারই! সে দোষ করিয়া আবার অনর্থক তাহার উপর রাগ করিতেছে! তাহার রাগ করিবার কোন অধিকার নাই! কিন্তু তাহার পরেই অরুণের প্রতি নব অনুরাগের স্রোতে এ সব চিন্তা ও অস্থিরতা ভাসাইয়া দিল! সে আর কিছু তখন ভাবিতে পারিল না! কিন্তু বৈকালে লীলা নিজে নিজেই ভাবিল, সে যাহা করিয়াছে তাহাতে দোষ ত বিশেষ কিছু নাই; তবে তাহা লইয়া যে বৃথা কিরণের সঙ্গে তাহার মনান্তর স্থায়ী হইয়া থাকিবে, সেটা ভাল নয়! তাহাদের এত দিনের বন্ধুত্বের বন্ধন—এ কি এক কথায় উড়াইয়া দিতে পারা যায়? কিরণ যদি একবার আসে, তাহা হইলে ব্যাপারটা এখনি মিটিয়া যায়! লীলা তাহার জন্য অস্থির হইয়া ঘুরিতে লাগিল, কিন্তু কিরণ আসিল না। অবশেষে অধৈর্য্য হইয়া লীলা ক্লবে আসিল। কিরণ রাগ করিয়া তাহার কাছে না আসুক, ক্লবে খেলিতে নিশ্চয় আসিবে তো? সেখানেই লীলা তাহাকে সমস্ত বিষয় জানাইবে ও বুঝাইয়া বলিবে! কিরণের বিশ্বাস, লীলা অরুণকে ভালবাসে না! সেই বিশ্বাসেই সে অত রাগ করিয়াছে! এই কথাটা তাহাকে কোন রকমে একবার বুঝাইতে পারিলেই সব সন্দেহ মিটিয়া যায়! কিরণ তাহাকে যে সব কঠোর কথা বলিয়াছে, সে সবই ভুলিয়া লীলা একবার তাহার দেখা পাইবার জন্য আকুল হইয়া ফিরিতে লাগিল।

খেলা শেষ হইল, কিরণ তখনো আসিল না। অন্ধকার হইয়া আসিতে সকলে একে একে ঘরের ভিতর উঠিয়া গেল। অনেকে বাড়ী ফিরিবার উদ্যোগও করিতেছিল। লীলা তাহাদের সঙ্গ ছাড়িয়া নিঃশব্দে বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহার মনের উদ্বেগ অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। কিরণ কি তবে সত্যই আর আসিবে না? সে কি তবে সত্যই লীলার সহিত সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করিল?

ঘরের ভিতর যাইতে লীলার প্রবৃত্তি ছিল না। যেদিন সে গান গাহিয়াছিল, সেই দিন হইতে তাহার গুণমুগ্ধ অসংখ্য ভক্ত ক্লবে জুটিয়া গিয়াছিল। তাহাদের অজস্র চাটুবাদে বিরক্ত হইয়া সে সাধ্যমত আর ক্লবে আসিত না, আসিলেও তাহাদের পরিহার করিয়া চলিত।

বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া লীলা একমনে কিরণের সহিত প্রথম সাক্ষাতের দিনের কথা ভাবিতেছিল। যখন সে লণ্ডন হইতে ফিরিয়া আসে, তাহার পর হইতে এক দিনও কিরণের সঙ্গে তাহার বিচ্ছেদ হয় নাই! প্রতি দিন প্রভাতে লীলা অশ্বারোহণে বেড়াইতে বাহির হইত, কিরণ অর্দ্ধপথে আসিয়া তাহার সহিত যোগ দিত। তাহার পরে দুইজনে একসঙ্গে কত—কতদূর পর্য্যন্ত ঘোড়া ছুটাইয়া বেড়াইত! এ অঞ্চলে যেখানে যতদূরে নিভৃত নির্জ্জন বেড়াইবার স্থান আছে, সবই তাহাদের দুজনের পরিচিত। এক এক দিন এক এক স্থানে বনভোজনের আয়োজন করিয়া তাহারা দুইজনে কত দীর্ঘ দিন গানে, গল্পে-আমোদে কাটাইয়াছে! কত দিন কিরণ কোন ছায়াশীতল কুঞ্জবনে বিবিধ বিচিত্র আহার্য্যের প্রচুর আয়োজন করিয়া রাখিত, লীলা বহুদূর ভ্রমণের ফলে প্রবলা ক্ষুধা সঞ্চয় করিয়া ফিরিয়া সেগুলির বিধিমত সদ্ব্যবহার করিয়া বাড়ীতে কিছু খাইতে পারিত না। মিসেস রায় তাহার অবস্থা দেখিয়া গম্ভীর ভাবে বিজ্ঞ চিকিৎসকের মত বলিতেন, তাহার যকৃতের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তখনি তাহার জন্য একটা টনিকের ব্যবস্থা হইয়া যাইত। বিকালে কিরণের সঙ্গে দেখা হইলে সেই কথা বলিয়া দুজনে হাসিয়া লুটাইয়া পড়িত! কত দিনের কত গল্প, কত গভীর বিষয়ের আলোচনা, কত সুখময় দিন, কত সুখময় সান্ধ্য আমোদের প্রীতিপূর্ণ স্মৃতি লীলার হৃদয়ে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে! আজ তবে সে সবই শেষ হইল!

একটা অবর্ণনীয় যন্ত্রণা যেন শত শত সূচীর মত লীলার হৃদয় বিদ্ধ করিতে লাগিল! যাহার সহিত এক মুহূর্ত্তের বিচ্ছেদ অসহ্য ও অসম্ভব বলিয়া মনে হইত, আজ এক দিনের একটা সামান্য ঘটনায় সে অতি সহজে লীলার জীবন-পথ হইতে বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে। লীলার নবীন প্রেমের নবলব্ধ আনন্দ তাহার এখনকার ব্যথা-কাতর চিত্তকে কোন সান্ত্বনা দিতে পারিল না! অতীতের ছোট বড় নানা স্মৃতি তাহার ব্যথিত চিত্ত মথিত করিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

অনুরোধ

শ্রীরামেন্দু দত্ত

সন্তান তব ভ্রম করি' যদি
আঁধারেই ভ্রমিয়াছে,
তাহারে কি আর দেখাইয়া আলো
ডাকিবে না তব কাছে?

সে শুধু ব্যর্থ প্রয়াসে জীবন
বৃথা এতদিন করেছে যাপন,
চপল ভুলের আলেয়া তাহারে
চিরদুখে টানিয়াছে!

এখনো তাহার চেতনা হয় নি
এখনো জাগেনি সে,
তোমার করের বজ্র-পরশ
পরাণে লাগেনি যে!

কঠোর কণ্ঠে ভাঙো তার ঘুম,
কোলে টেনে নিয়ে দাও তারে চুম,
তোমার আলোয় দেখাও তাহারে
কোথায় অমৃত আছে!

বোধন

অধ্যাপক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার

রাজপ্রাসাদের মায়া, ততোঽধিক, সহধর্ম্মিণী ও প্রাণাপেক্ষা পুত্রের মায়া সিদ্ধার্থকে মায়াপাশে বন্ধন করিয়া রাখিতে পারিল না। নরপতি শুদ্ধোধন, কুমার যাহাতে অলক্ষিতে নগর পরিত্যাগ করিতে না পারেন, তজ্জন্য সুদৃঢ়, উচ্চ প্রাচীর দ্বারা নগর বেষ্টন করিয়াছিলেন। প্রাচীরে মাত্র একটী দ্বার ছিল—অর্গল উদ্ঘাটন করিয়া দ্বার উন্মুক্ত করিতে শতাধিক লোকের প্রয়োজন হইত; এবং উহাতে এরূপ ভীষণ শব্দ হইত, যে অর্দ্ধযোজনের পথ দূরের লোকও দ্বারোন্মোচনের শব্দে জাগরিত হইত। উপযুক্ত প্রহরীবর্গ দিবারাত্রি এই অর্গলবদ্ধ দ্বার রক্ষা করিত। কঠোর রাজাজ্ঞা—রাজপুত্র আদেশ করিলেও দ্বার উন্মোচন করা হইবে না।

কপিলাবস্তু পরিত্যাগ

কিন্তু, সিদ্ধার্থ যে মহাব্রত সাধনের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার নিকট এ সকল বাধা-বিপত্তি ত' কিছুই নহে। তাই তাঁহার অগ্রসর হইবার কালে এ নিগড়বদ্ধ দ্বার আপনা হইতেই উন্মোচিত হইল। তাঁহার প্রিয় সারথি ছন্দক তাঁহার প্রিয়তম অশ্ব কন্থককে লইয়া তাঁহার আদেশানুসারে তথায় উপস্থিত হইল। কিন্তু রাজপুত্রের রাজধানী ও রাজ্য পরিত্যাগের আদেশ শ্রবণ করিয়া চিরানুগত ভৃত্যও আশ্চর্য্যান্বিত হইল। "সে কি! রমণীয়া, বিকশিত পদ্মের ন্যায় লোচনবিশিষ্টা, বিচিত্র হারশোভিতা, মণিরত্ন-বিভূষিতা, এবং মেঘ-নির্ম্মুক্ত আকাশে সমুদিত চপলার ন্যায় প্রভাব-শালিনী, মনোহরা, শয়ন-গতা পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া আপনি কোথায় যাইবেন? জন্মজন্মান্তর তপস্যা করিয়া তবে লোকে কপিলাবস্তুর ন্যায় সমৃদ্ধিশালী রাজ্যের নরপতি হইতে পারেন। আর আপনি স্বেচ্ছায় এই সকল কেন উপেক্ষা করিতে চাহিতেছেন?"

রাজপুত্র দৃঢ়স্বরে প্রত্যুত্তর করিলেন, "আমি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—সকল কাম্যবস্তু ইহলোক ও দেবলোকে অপরিমিত অনন্ত কল্প কাল ধরিয়া ভোগ করিয়াছি, কিন্তু, কিছুতেই তৃপ্তি পাই নাই। আমার শিরে বজ্রপাত হউক, আমি আর পশ্চাৎপদ হইব না; কুঠারাঘাতে আমাকে আর প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিবে না; শরবিদ্ধ হইলেও আমি আর গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিব না; প্রস্ত

বর্ষণ, বা বিদ্যুতের ন্যায় জ্বলিত লৌহা-ঘাত হইলেও বা আগ্নেয় - গিরি - শিখর আমার মস্তকে পতিত হইলেও, আমি আর গৃহে প্রতিগমন করিব না।" সারথির কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং মার আসিয়াও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিল না। অতুল, অগাধ রাজৈশ্বর্য্যের প্রলোভনেও তিনি নিজ পরিত্যাগ করিলেন না। যিনি অনিত্য সংসার ত্যাগ করিয়া নিত্য-বস্তুর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন—তাঁহাকে কে রোধ করিবে? তিনি দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।
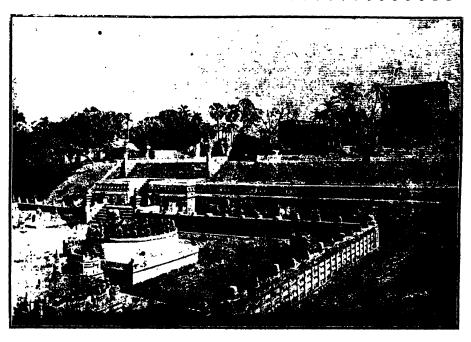
মন্দির-প্রাঙ্গণ

বজ্রাসন

রাত্রি প্রভাত হইল। অৰ্দ্ধ রাত্রিকালে পুষ্যানক্ষত্র যোগে পূর্ণিমায় তিনি গৃহ-পরিত্যাগ করিয়া, রাত্রি-মধ্যেই বহু যোজন অতিক্রম করিয়া শুভ প্রভাতে অণিমা নদীতীরে উপনীত হইয়া নিজ মস্তক হইতে স্বহস্তে চূড়া অপসারিত করিয়া ফেলিলেন; আভরণ ও অশ্বসহ রোরুদ্যমান ছন্দককে গৃহে প্রত্যাগমনের আদেশ প্রদান করিলেন, এবং কাষায় বস্ত্র পরিহিত একজন ব্যাধকে দেখিতে পাইয়া উহার কাষায় বস্ত্রের সহিত নিজ বহুমূল্য, বারাণসীতে প্রস্তুত কৌষিক পট্টবস্ত্রের বিনিময় করিলেন।

কোথায় যাইবেন? কিছুই জানেন না! কি প্রকারে শান্তি পাইবেন? সকল জীবের উদ্ধারের জন্য তিনি পথ

আবিষ্কার করিবেন বলিয়া গৃহ পরিত্যাগ করিলেন—কিন্তু, কি ভাবে, কি উপায়ে তিনি সিদ্ধকাম হইবেন? অপরিজ্ঞাত পথে একাকী তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যেখানে তিনি কোন ঋষির কথা শ্রবণ করেন, তথায় যাইয়াই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মনে করেন, দীক্ষা গ্রহণ

ভূমিস্পর্শমুদ্রা

করিলেই পথ পাইবেন। কিন্তু, তিনি তৃপ্তি পাইলেন না। এই সকল ঋষিই ক্লেশকর জপ করেন, উদ্দেশ্য—স্বর্গে যাইবেন। স্বর্গে দুঃখ ক্লেশ নাই। কিন্তু সিদ্ধার্থের সে উদ্দেশ্য নহে। তিনি নিজের জন্য নয়—সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ-কামনায় উন্মত্ত। মানুষের দুঃখ দূর করিতে হইবে, মুক্তিলোক আবিষ্কার করিতে হইবে,—তিনি স্বর্গসুখ চাহেন না। তাই তিনি ঋষিদের সাহচর্য্য পরিত্যাগ করিলেন।

ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি মগধের রাজধানী রাজগৃহে আসিয়া উপনীত হইলেন। উদরান্নের জন্য রাজপথে
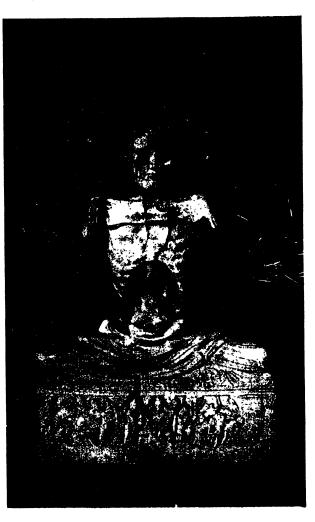
বুদ্ধদেব
(ছয় বৎসর তপস্যার পর)

ভ্রাম্যমান তাঁহার রমণীয় মূর্ত্তি দর্শনে নরপতি বিম্বিসার মনে করিলেন যে, ইনি নিশ্চয়ই দেবতা। পরিচয় পাইয়া রাজা সাগ্রহে তাঁহাকে সমগ্র রাজ্য দান করিতে উদ্যত হইলেন—প্রভৃত কাম্য বস্তু ভোগের জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু, রাজপুত্র উত্তর করিলেন, "হে রাজন্!

আমি কাম্যসুখ চাহি না। কামনা বিষ। কামেরই বশে লোক নরক, প্রেত, তির্য্যগ ইত্যাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। আমি উহা শ্লেষ্মাপিণ্ডের ন্যায় ত্যাগ করিয়াছি।" সিদ্ধার্থ সেই স্থান বর্জ্জন করিলেন।

পরিভ্রমণ করিতে করিতে সিদ্ধার্থ গয়া জেলার সন্নিকটস্থ উরুবিল্বে উপনীত হইয়া কঠোর তপস্যায় ব্রতী হইলেন; নিজ চিত্ত ও দেহকে সংযত করিতে প্রয়াস পাইলেন। তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হইল; ক্রমে তাঁহার কর্ণের ছিদ্র-পথ রুদ্ধ হইল। তিনি তৎপরে আহার সংযত করিতে লাগিলেন। দিনান্তে একটী মাত্র তণ্ডুলকণা গ্রহণে দেহ-রক্ষা করিতে লাগিলেন। সুদীর্ঘ ছয় বৎসরের তপস্যায় তাঁহার আর সে রাজকান্তি থাকিল না; শরীরে কয়েকখানি অস্থি ব্যতীত আর কিছুই থাকিল না; চক্ষু কোটরে প্রবিষ্ট হইল -দেহে ত্বক আর মাংসের কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। কিন্তু, যে জন্য তিনি এই কৃচ্ছ্রসাধনায় ব্রতী হইয়াছিলেন, তাহার কোন উপায় হইল না।

সিদ্ধার্থ তখন অনাহার ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এই সময়ে তিনি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ত্রিতন্ত্রী লইয়া তাঁহার সম্মুখে। একটী তন্ত্রী সুদৃঢ়রূপে বাঁধা—তাই তাহাতে আঘাত করিবামাত্র বিকৃত ধ্বনি হইল। তৃতীয় তন্ত্রী অত্যন্ত শিথিল ছিল; তাহাতে আঘাত করিলেও কোন স্বরই বাহির হইল না। মধ্যবর্ত্তী তন্ত্রী না দৃঢ়, না শিথিল—তাহা হইতে পবিত্র মধুর স্বর বাহির হইল। সিদ্ধার্থ সম্যক্‌রূপে বুঝিলেন, ভোগবিলাসে কিছু হইবে না; কঠোর তপস্যায় কিছু হইবে না—মধ্যপন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। তাই তিনি উরুবিল্বনিবাসী সেনাপতি-দুহিতা সুজাতা-দত্ত পরমান্ন গ্রহণে বলীয়ান হইয়া বোধিবৃক্ষমূলে ধ্যানাসীন হইলেন। স্বস্তিক নামক এক ব্যক্তি তাঁহাকে নবীন তৃণরাশি প্রদান করিল। তিনি বোধিদ্রুমমূলে এই তৃণ বিস্তীর্ণ করিয়া সুখাসনে সমাসীন হইলেন। স্থির করিলেন, যাহাই হৌক, যে জন্য তিনি রাজসংসার, স্ত্রী, পুত্র, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা লাভ করিতে হইবেই হইবে। "শরীর শুকাইয়া যায় যাউক, ত্বক, অস্থি, মাংস,—সব ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় হউক, তথাপি বহুকল্প দুর্লভ, বোধিত্ব লাভ না করিয়া আমি আর এই আসন ত্যাগ করিব না।" ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। হৃদয়ের মধ্যে যেন কে বলিতেছিলেন, "হে সাধক, হে বরেণ্য, মাহেন্দ্রক্ষণ সমাগত-প্রায়, তুমি মহাসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া কল্যাণের আকর আবিষ্কার কর।" তখন কুমার স্থির করিলেন, "পর্ব্বতরাজ মেরুস্থানচ্যুত হইলেও, সমস্ত জগৎ শূন্যে মিশিয়া গেলেও, সমস্ত নক্ষত্র, জ্যোতিষ্ক ও ইন্দ্রের সহিত আকাশ হইতে ভূমিতে পতিত হইলেও, বিশ্বের সকল জীব একমত হইলেও, এমন কি মহাসাগর শুষ্ক হইলেও, আমি এই মহাদ্রুমমূল হইতে বিচলিত হইব না।"

বোধন শেষ হইয়া মহাপূজা আরম্ভ হইল।

প্রাবৃট

শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

হেরিনু দাঁড়ায়ে বর্ষা কালিন্দীর তীরে—
প্রাবৃট ঘনাল দূর নভো-বৃন্দাবনে,
সিক্ত হ'ল শ্যাম গোষ্ঠ সুশীতল নীরে,
রাঙ্গিয়া উঠিল হর্ষ রক্ত গুঞ্জা বনে।
কদম্বের গন্ধ-ভরা বনবীথিতল—
ব্যাকুল বাতাস বহে বিটপি কম্পনে,
কলাপ প্রসারে শিখী দীপ্ত ঝলমল,
সুদূর নিরালা হ'তে বাঁশী যেন স্বনে।
বিরহিণী বুঝি আজ চলে অভিসারে
কুমুদ কহ্লারে ডালি সাজায়ে মোহন,
বিরহ ডুবিবে আজি মিলনান্ত-ধারে।
হর্ষে উছলিতা শ্যাম কুঞ্জ-নিকেতন।
নিবিড় প্রাবৃটে হেরি নব বৃন্দাবনে
হরষ ছুটেছে যেন যুগল মিলনে।

পিয়ারী

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল্

১৩

পাপিয়া ঘরের কোণে বসিয়া ষ্টোভ জ্বালিয়া খাবার তৈরী করিতেছিল ; অমল বিছানায় চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। হঠাৎ সে ডাকিল,—চপলা...

পাপিয়া শিহরিয়া চাহিয়া দেখিল। অমল দুই হাত বাড়াইয়া আবার ডাকিল,—শুন্‌চো চপলা ?

পাপিয়া হাতের কাজ রাখিয়া উঠিয়া অমলের কাছে আসিল, মৃদু কণ্ঠে কহিল,—কি ?

—একটু আমার কাছে বসতে পারবে ?

পাপিয়া কহিল,—কেন ?

—একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো।

—বল।

—আমি বাড়ী এসেচি...আজ ক'দিন ?

—পাঁচ দিন।

—এই পাঁচ দিন তুমি যে সর্ব্বক্ষণই এখানে আছো··· এর মানে ? অমল একটু থামিল।

একটু পরে সে আবার কহিল,—তুমি কি এর মধ্যে বাড়ী যাওনি, একবারও না...?

গাঢ় স্বরে পাপিয়া কহিল,—না।

—কেন যাওনি, চপলা...?

চোখের জল মুছিয়া পাপিয়া কহিল,—কি করে যাবো...তোমায় একলা ফেলে···!

—কিন্তু আমার তো এ দু-একদিনের রোগ নয় !··· হয়তো, আজন্মই অন্ধ হয়ে থাক্‌বো। আর তুমি...?

—আমাকেও তা হলে আজন্ম এখানে থাকতে হবে...!

সুগভীর বিস্ময়ে অমল কহিল—না, না, তা হতেই পারে না !

পাপিয়া বেশ স্থির হইয়াই জবাব দিল,—কেন হতে পারে না ?

অমল একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—তা হতে পারে না, চপলা। একটা অন্ধ আতুরের জন্য তুমি তোমার এত বড় নাম, অমন কীর্ত্তি, সব ত্যাগ করবে !···তা ছাড়া এই বিশ্রী বদ্ আবহাওয়ার মধ্যে থাকো তুমি, তোমার প্রাসাদ, ঐশ্বর্য্য সব ছেড়ে, এই নির্ব্বাসন মাথায় বয়ে···এ হবে না, হতে দেবো না আমি...

পাপিয়ার বুক অসহ্য বেদনায় টলমল করিতেছিল। দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া সে কহিল,—তোমায় দেখবে কে···?

অমল কহিল,—ঐ যে পথে কত অন্ধ আতুর ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের কে দেখে, চপলা...?

পাপিয়া কহিল,—তাদের যে-ই দেখুক, সে খপর আমি জানতে চাই না। তবে এটুকু জানি, তোমায় না দেখা ছাড়া আমার উপায় নেই...

অমল আশ্চর্য্য হইয়া গেল ; কোন কথা কহিল না।

পাপিয়া কহিল,—আমার জন্যেই তোমার এ দশা, আজ !...তুমি যদি থিয়েটার দেখতে না যেতে !...এখন তোমায় না দেখলে আমার যে পাপ হবে···তোমায় দেখা আমার কর্ত্তব্য আজ...!

অমল একটু বেদনা পাইল, কহিল,—শুধুই কি কর্ত্তব্য এ...?

পাপিয়ার দুই চোখে জল ঠেলিয়া আসিল। ভগবান, ভগবান, এ যে অসহ্য ! এমনি করিয়া চপলা সাজিয়া তাহারি উদ্দেশে অমলের প্রাণের যা-কিছু আবেদন-নিবেদন এমন করিয়া শোনা, গ্রহণ করা···এ যে কতখানি মর্ম্মান্তিক...! সে আঁচলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অমল আবার ডাকিল,—চপলা···

গাঢ় স্বরে পাপিয়া কহিল,—কেন ?

অমল কহিল,—তুমি বাড়ী যাও...কখনো-কখনো এক-আধবার আমায় নয় দেখতে এসো, তা হলেই আমার ঢের পাওয়া হবে !...

পাপিয়া কোন কথা কহিল না। অমল উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিতে লাগিল,—সেই তোমায় দেখি,…শ্রীরাধা সেজে বিশ্বের বিরহ বুকে নিয়ে তোমার সেই কাতর অশ্রু…সে অশ্রু আমার বুকে এখনো টলটল্ করছে…তোমার সে ছবি কখনো ভুলবো না!…এই বিজনে বসে সেই ছবি ধ্যান করে আমি প্রাণের গান গাই…তা তুচ্ছ, জানি…তবু গেয়ে কি সুখ যে পাই…! আমার জীবনের সান্ত্বনা, আমার এই এক সম্বল, এ নিয়ে কি সুখে আছি। এ দুঃখ-দারিদ্র্য আমায় টলাতেও পারে না…এতটুকুও না!… আমি আমার মন নিয়ে বিভোর হয়ে আছি! আমার চারিধারে দুনিয়াও আমার স্বপ্নের রঙে রঙীন হয়ে আছে!…অমল হাসিল, হাসিয়া কহিল,—আমার এ স্বপ্ন যে এমন করে সফল হবে, এ কল্পনা করতেও ভরসা হয় নি কখনো আমার! চপলা…

ক্ষুব্ধ বেদনায় প্রাণ ভাঙ্গিয়া গেলেও পাপিয়া অবিচল কণ্ঠে সাড়া দিল,—উঁ…

—সেদিন আমার দুর্দ্দিন নয়, চপলা, সুদিন—যেদিন মোটরের ধাক্কায় পথে পড়ে মরতে বসেছিলুম…যেদিন চোখের দৃষ্টি হারিয়ে অন্ধ হয়েচি…অমল আবেগের উচ্ছ্বাসে পাপিয়ার স্বর লক্ষ্য করিয়া একটা হাত বাড়াইয়া দিল। পাপিয়া তাহা দেখিল। চোখে তার অশ্রুর আর বিরাম ছিল না। মন্ত্র-চালিতের মত সেও অমলের হাত ধরিল। অমল পাপিয়ার হাতখানি নিজের হাতে চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—না হলে এ হাতের এই সেবা তো কখনো পেতুম না!…

অমল স্থির হইল। তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিল,—এক পিশাচিনী…সে কি বল্‌তো, জানো…?

পাপিয়ার বুক কাঁপিয়া উঠিল; দুই চোখ অশ্রুতে ভরা থাকিলেও বিপুল শিহরণে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। সে তার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সজাগ করিয়া অমলের কথার জন্য উদ্‌গ্রীব রহিল। অমল কহিল,—সে বল্‌তো, তুমি পাষাণী, শয়তানী…

পাপিয়া আর আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিল না; উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে ফাটিয়া পড়িয়া একেবারে হাহাকার করিয়া উঠিল,—ওগো থামো, থামো,—আমি জানি, জানি… সে যে তোমার প্রেম কামনা করে উন্মাদ হয়ে গেছে… সে যে কত বড় দুর্ভাগিনী, তা আমি জানি…বলিতে বলিতে পাপিয়া শিহরিয়া উঠিল—এ কি, এ সে কি করিতেছে! এই ছদ্ম ভূমিকায় ছলনার মাঝ দিয়া যদি তার কামনাকে আজ অমলের সেবায় সার্থক করিয়া তুলিবার অবসর পাইয়াছে, তো মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় এ সে কি করিতেছে! সে যে বাতাসে প্রাসাদ রচনা করিতেছে, বালির বাঁধ দিয়া সাগরের উচ্ছ্বসিত বারি-রাশি বাঁধিতে বসিয়াছে, তা সে জানে…তবু এই অতর্কিত কথার ঘায় সে প্রাসাদ, সে বাঁধ এমন করিয়া নিজের হাতেই ভাঙ্গিয়া চুর করিয়া দিতেছে! সর্ব্বনাশ! তা হইলে যে তার আর কোন উপায় থাকিবে না!… তাড়াতাড়ি নিজেকে সে সম্বরণ করিয়া কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল—এ সব কথা আর নয়!…

অমলের বিস্ময়-কৌতুহলের আর সীমা রহিল না।… সে মাথা তুলিল; এবং ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিল,—তুমি সত্যিই চপলা…?

পাপিয়া আপনাকে প্রাণপণ বলে চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—হ্যাঁ।…বলিয়া আতঙ্কে-অধীর চোখে সে অমলের পানে চাহিল। অমল কহিল,—ও কথায় তুমি কষ্ট পেলে! তার কথায় অমন আকুল হয়ে উঠলে যে!

পাপিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল,—সে যত-বড় পিশাচিনীই হোক, আমার ছোট বোনের মত! তা ছাড়া আমি যে তাকে জানি…

—কি জানো, চপলা?

—এই জানি, যে, সে তোমার জন্যে সমস্ত পৃথিবীটাকে পায়ের ঠোক্করে হঠিয়ে সব ছেড়ে চলে আসতে পারে…

অমল একটু চুপ করিয়া বসিল, তার পর মৃদু হাসিয়া মৃদু-কণ্ঠে কহিল,—পাগল…! আমি তো এই…

পাপিয়া স্থিরভাবে তাকে লক্ষ্য করিল। মনে মনে বলিল, তুমি যা, তাই—তবু সে মরিয়াছে! কি করিয়া মরিল, তা ভাবিয়া নিজেই সে অবাক হইয়া আছে…!

অমল কহিল,—ও কথা থাক্!…এখন আমার একটা কথা শুনবে?

পাপিয়া কহিল,—কি?

অমল একটু সঙ্কোচ-ভরে কহিল,—আমার সে খাতা-

খানা আনবে...? একটু পড়বে?...তোমারি উদ্দেশে প্রাণের গান গেয়েচি...সে কিছুই নয়—তবু তোমারই জন্তে গাওয়া...! আমার তো ক্ষমতা নেই...থাকলে নিজেই তোমায় পড়ে শোনাতুম...!...সেগুলি যদি পড়, আমার সামনে...

পাপিয়া দেখিল, ছলনার পথে পরীক্ষা কত, আর সে পরীক্ষা কি নির্ম্মম, কি অকরুণ!—তবু তা সহিতেই হইবে! সে তো সব সহিবার জন্যই নিজেকে প্রস্তুত করিয়া এখানে আসিয়াছে...এখন আর ভাবিয়া ফল নাই! এ সর্ব্বনেশে খেলার সূত্রপাত সে-ই করিয়াছে—এখন এ খেলা ফেলিয়া হঠিবারো উপায় নাই...উপায় থাকিলেও শক্তি নাই...!

পাপিয়া বলিল,—পড়বো। কিন্তু খাবার তৈরী করছিলুম—সেগুলো শেষ করে আসি। এসে পড়বো!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অমল কহিল,—তাই হবে। ..

পাপিয়া অমলের পানে আর একবার চাহিয়া ষ্টোভের পাশে গিয়া বসিল। তার দুই চোখে তখনো জল ঝরিতেছিল। আঁচলে চোখের জল মুছিয়া সে ষ্টোভে ছোট কড়াখানা চাপাইয়া দিল, ও কড়ায় খানিকটা তেল ঢালিয়া আলু ছাড়িয়া দিল। এমন সময় দ্বারের পাশে শিবু আসিয়া দেখা দিল। হাতের ইঙ্গিতে তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া কড়ায় তরকারী চাপাইয়া পাপিয়া উঠিয়া শিবুর কাছে আসিল ও তাহাকে ডাকিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

শিবু বলিল,—বাবু তো তুলকালাম্ লাগিয়ে দেছেন, মা। বাগানেও এসেছিলেন,...মালীকে এই মারতে যান্ তো এই মারতে যান্! তা মালী ঠিক আছে...সে বলেছে, মা-জী এধারে আসেনও নি, ক'দিন! তা বাবু বললেন, বেশ, এধারে যে-বাড়ীতে সে-রাত্রে মা-জী ছিল, সেই বাড়ী দেখিয়ে দে! তা মালী নাকি ওদিককার একটা কোন্ পোড়ো বাড়ী দেখিয়ে দিয়েছিল!...

পাপিয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে শিবুর কথা শুনিল; তার পর ভাবনায় একেবারে পাথরের মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া গেল! তার চোখের সামনে সমস্ত দিক উচ্ছ্বসিত নদীর তরঙ্গে ভরিয়া উঠিল। এ তরঙ্গ কি করিয়া সে ঠেলিয়া রাখিবে!...কতকাল এখন এমনি পড়িয়া থাকিতে হইবে...! এখান হইতে মুক্তি! সে চায়ওনা—চাহিবে যে, তার কোন সম্ভাবনাও নাই! মানগোবিন্দকেও তো সে চেনে।...এই পাঁচ দিনের অদর্শনে সে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে!...এবং পাপিয়াকে ফিরিয়া পাইবার জন্য তার দুঃসাহসেরও অন্ত থাকিবে না!—যদি হুড়মুড় করিয়া এইখানেই আসিয়া পড়ে! এখান হইতে কতটুকু পথই বা! মালীর কথায় অবিশ্বাস করিয়া এখানে ঘরে ঘরে যদি সে সন্ধান করিয়া বেড়ায়...! সর্ব্বনাশ! কি করিয়া ওদিককার সমস্ত ক্রুদ্ধ আক্রমণকে ব্যর্থ করিয়া রাখা যায়!...

নিশ্চল মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া এই কথাই সে ভাবিতে লাগিল। তার মুখে গভীর হতাশা ফুটিয়া উঠিল। শিবু তাহা লক্ষ্য করিল, লক্ষ্য করিয়া বলিল,—এখানে ক'দিন তুমি লুকিয়ে থাকবে মা!...বাড়ীতেও সব তচ্‌নচ্ হয়ে পড়ে আছে। বাবু ঝড়ের মত আসচেন যাচ্ছেন—তাঁর আপিস তো উঠেই গেছে! তিনি পাগল হবার মত হয়েছেন!...

হোন্! পাপিয়ার তাহাতে ক্ষোভ নাই। এতকাল তার জীবনটাকে নিংড়াইয়া প্রাণের যা-কিছু রস, তার এই পুষ্পিত যৌবনের যা-কিছু মধু নিঃশেষে মানগোবিন্দকে সে উপহার দিয়াছে, ফেনিল রক্ত মদিরার মতই তাকে তা পান করাইয়াছে! নিজের পানে ফিরিয়াও চাহে নাই...মান-গোবিন্দর সখের পুতুলটি হইয়া, শুধু তার খেলার সুখেই সে মত্ত ছিল! বুকের মধ্যে এত-বড় যে প্রাণটা পড়িয়া ছিল, সে প্রাণটারও যে ক্ষুধা আছে, তৃষ্ণা আছে, এ তার চোখেও পড়ে নাই!...আজ তা চোখে পড়িয়াছে এবং ভালো করিয়াই পড়িয়াছে। আজ সে-সব তুচ্ছ খেলা ফেলিয়া তার প্রাণ সার্থকতার তৃষ্ণায় ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে! এখন এ শুষ্কপ্রাণ লইয়া সে ছেলেখেলা, সেই মন-না-দিয়াও মন জোগাইবার প্রবৃত্তি নাই! সে প্রবৃত্তির কথা মনে হইলেও লজ্জায় ঘৃণায় সে যেন এতটুকু হইয়া যায়! সত্য, এ সব সত্য...কিন্তু অতদিনকার কঠিন বাঁধন,...কাটিতে গেলে তারা তা কাটিতে দিবে কেন! এ বাঁধন শিথিল হইবার সম্ভাবনায় তারা যে সেটাকে আরো কষিয়া টানিবে...দয়া-মায়া বিসর্জ্জন দিয়া, নিজেদের দিক দেখিয়া তারা বড় জোরে এ বাঁধন শক্ত করিবার জন্য কষিয়া টানিবে! পাপিয়ার হাড়-পাঁজরাগুলা সে-টানে ভাঙ্গিয়া ছিঁড়িয়া

গেলেও তারা ছাড়ান্ দিবে না! এ যে জীবন-পণ সংগ্রাম বাধিবে···তাহা হইতে বাঁচিবার উপায় কি!···

পাপিয়া ডাকিল,—শিবু...

—কেন মা?

—দূরে, খুব দূরে, নিরালার একটা ছোট-খাটো বাড়ী দেখতে পারিস···?

—কেন মা?

—এখানে থাকা হবে না, বাবু জানতে পারবে। জানতে পারলে ধরে নিয়ে যাবে, কোন কথা শুনবে না·· আর এ অজ্ঞাতবাসে ক'দিন এমন করে চলবে...

—তার চেয়ে বাড়ী চল না, মা...

—বলিস কি শিবু···! একে ফেলে? এই অন্ধ, অসহায় বেচারাকে ফেলে...?

—কে এ মা, যার জন্যে তুমি সব ছেড়ে এমন ভিখারিণীর মত পড়ে আছো...এত কষ্ট করছো!

—কে...! সহসা তার কণ্ঠ গর্জ্জিয়া উঠিল, সে কহিল, —কে! তার দুই চোখ জ্বলিয়া উঠিল—কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই নিজেকে সংযত করিয়া শান্ত স্বরে কহিল,—আমার খুব আপনার লোক, শিবু! এতদিন সন্ধান পাইনি। যখন পেলুম, তখন ওর মহাদুর্দ্দিন! যতদিন দেখিনি, বেশ ছিলুম। এখন একে দেখে, একে ফেলতে পারি নে শিবু, কিছুতে না—রাজার সিংহাসন পেলেও নয়! বলিতে বলিতে আবার তার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। আঁচলে চোখের জল মুছিতে মুছিতে সে ভাবিল, এ সে কি করিতেছে—শিবুর কাছে এ সব কি বলিতেছে! ছি!···

শিবু বলিল—তাহলে উপায়?

—কোনো উপায় দেখচি না, বাবা। এক, এ-বাড়ী ত্যাগ করে অন্য বাড়ীতে যাওয়া ছাড়া...

শিবু কহিল,—আমাদের কলকাতার বাড়ীতে নিয়ে গেলে হয় না মা? সেখানে চোখের চিকিৎসাও তো চলতে পারে!

—তা পারে, তবে সে বাড়ী...না...দিন-রাত পাঁচ-জনের আনাগোনা, জ্বালাতন করা···তার মধ্যে রোগীর সেবা চলে কখনো...!

—তাহলে একটা বাড়ীই দেখি, মা!...বাবু কিন্তু ওদিকে একেবারে পাগল হয়ে উঠেচেন...তোমার জন্যে তাঁর একদণ্ড স্বাচ্ছন্দ্য নেই···

পাপিয়া হাসিল, কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু শিবুর পানে চাহিয়া থামিয়া গেল। তার মনে হইতেছিল, ভোগ-বিলাসী পুরুষের স্বাচ্ছন্দ্য!...চোখের নেশা···! বাগানে ফুলের অভাব নাই···একটা ফুল ঝরিয়া গেলে আরো লক্ষ ফুল আছে...! এরা মধুর কাঙাল বৈ তো নয়! যেখানে হোক, মধু-ভরা ফুল পাইলেই হইল!...

পাপিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—তুই মালীকে আরো পাঁচটা টাকা দি'গে যা, বলিস, খুব হুঁসিয়ার! আরো বকশিস্ পাবে।···

আঁচল খুলিয়া পাঁচটা টাকা বাহির করিয়া শিবুর হাতে দিয়া পাপিয়া কহিল,—একবার সেখানে আমায় যেতেও হবে, শিবু—কিছু টাকার দরকার।...তবে সাবধানে যেতে হবে···তুই বাবুকে নিয়ে আর কোথাও আমার খোঁজে বেরুবি, সেই ফাঁকে একবার গিয়ে কিছু টাকা আনতে হবে।

পাপিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল; আসিয়া তরকারীর দিকে মনঃসংযোগ করিল। তারপর খাবার তৈরী হইয়া গেলে অমলকে খাওয়াইয়া তার কাছে আসিয়া বসিল। অমল কহিল,—এবারে পড়বে?

—পড়বো···বলিয়া পাপিয়া খাতা খুলিল।

অমল কহিল,—তোমার হাতটা দাও, চপলা...

পাপিয়া হাত বাড়াইয়া দিল। অমল তার হাতখানা বেশ করিয়া নিজের দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—পড়।

পাপিয়া হাতের পানে একবার চাহিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল, তারপর বুকটা কতক হাল্কা করিয়া লইয়া কবিতা পড়িতে লাগিল। (ক্রমশঃ)

বাংলার মেয়েদের সম্বন্ধে

শ্রী"দরদী"

আজকাল যে-কোন বাংলা মাসিক খুল্‌লেই দেখ্‌তে পাই, মেয়েদের সম্বন্ধে একটা না একটা প্রবন্ধ আছে—তাও আবার বেশীর ভাগ মেয়েরাই লেখেন। আমার ত "নারী" বিষয়ক প্রবন্ধ পড়্‌তে ইচ্ছে হয় না—কি হয় লিখে? এত যে লেখালেখি, আলোচনা, তার কোন ফল দাঁড়াচ্ছে কি? মেয়েরা এ রকম লেখালেখি করাতে, আমি এক দলকে বল্‌তে শুনেছি "এ সব এঁচোড়ে পাকামি—দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারি না। লেখাপড়া শিখে মেয়ে-মর্দ্দানি কর্‌ছেন,—প্রবন্ধ লিখ্‌ছেন,—পুরুষদের টেক্কা দিতে যাচ্ছেন! আরে বাপু, তোরা যতই লাফাই-ঝাঁপাই কর্—পুরুষের জুতোর তলায়ই তোদের আদত্ জায়গা।" আর একদল প্রকাশ্যে দেখান—যেন মেয়েদের পুরুষেরা মাথায় করে রেখেছেন! হাতের রুমাল পড়ে গেলে শশব্যস্তে তুলে দেন,—মেয়েদের দেখ্‌লেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান,—আরও কত রকমে মেয়েদের সম্মান দেখান। আর বাড়ী ঢুক্‌লেই, তাঁরই বিকট মুখভঙ্গীতে, অপরূপ ব্যবহারে, অত্যাচারে মা, বোন, স্ত্রী সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকেন। সবই সমান। কয়েকখানা "ভারতবর্ষ" পেলাম, সখ হল—মেয়েদের সম্বন্ধে লেখাগুলো পড়্‌লাম। পড়ে কয়েকটা কথা লিখ্‌বার বড় ইচ্ছে হচ্ছে—লেখক লেখিকাগণ আমার বক্তব্য বুঝে যেন আমার উপর দোষারোপ করেন্। আমি অন্যায় কিছুই বলিনি।

গত বছরের শ্রাবণ মাসের ভারতবর্ষে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী "নারীর কথা"য় নারীর উত্তরাধিকার সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন। সমাজে নারীকে নিয়ে আজ এত রকমের সমস্যা উঠেছে যে, তাতে "নারীর উত্তরাধিকার" সমস্যার প্রথমেই মীমাংসা করবার দরকার হয় না। ন্যায়বান (!) সমাজ-পতিরা নারীকে বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমি দিতেও যে স্থানে বিমুখ, সেখানে নারীরা কোন্ সাহসে মহামান্য শাস্ত্র-কারদের বিধান উল্টাতে চায়? শ্রদ্ধেয়া লেখিকা যা বলেছেন, সে সব কথার একটীও আমি অস্বীকার করি না; কিন্তু একটা কথা আমি বলি (জানি না তাঁর সঙ্গে মতের মিল হবে কি না), যেখানে অনুরোধ-মিনতি করে, আক্ষেপ জানিয়ে, ব্যথা প্রকাশ করে কোন ফল হয়নি, সেখানে দশের কাছে সে সব শুনিয়ে কি কিছু লাভ হয়? পুরুষদের কাছ থেকে "আহা" "উহু" ছাড়া নারীরা আর কিছুই পাবে না। নারীর সমস্যা যদি নারীরা সমাধান না করে, তবে আর কারুর সাধ্য নেই, কর্‌তে পারে। নারী আগে প্রকৃত শিক্ষিত হোক। শিক্ষা মানে শুধু বি-এ, এম-এ পাশ নয়। জীবনে যখন যে কাজ কর্‌বার দরকার বা সুযোগ হবে, তাই হাসিমুখে নিপুণতার সঙ্গে করিতে পারাই প্রকৃত শিক্ষা-লাভ করা। সন্তান-পালন (তার শারীরিক ও মানসিক উন্নতি-বিধান), গৃহকর্ম্ম থেকে আরম্ভ করে, বাইরের দশের কাজ সুসম্পন্ন করতে পারাই প্রকৃত শিক্ষিত হওয়া। "আমাদের অধিকার দাও" বলে পুরুষদের কাছে ভিক্ষা

চাইবার কোন দরকার দেখি না। সুসন্তানের উপযুক্ত মা হও, সংসারে সুগৃহিণী হও, দেশের ও দশের কাজে আদর্শ ভগিনী হয়ে সগর্ব্বে একবার দাঁড়াও,—"অধিকার" "সম্মান" আপনি আস্‌বে।

বাঙ্গালী-সমাজ চিরকালই পুরুষ অপেক্ষা নারীকে হেয় জ্ঞান কর্‌বে—তা নারী যতই কেন পুরুষের মত সমস্ত বিষয়ে অধিকার লাভ করুক না। নারী পিতার সম্পত্তির সমান অধিকার পেলেও কর্‌বে। মেয়েকে পিতামাতা কিছু চির-কাল নিজের কাছে রাখ্‌বেন না,—তার বিয়ে দিয়ে তাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাবেন। সে দু'দিনের জন্যে এসেছে,—পিতৃ-সম্পদের উত্তরাধিকারিণী হলেও দু'দিন পরেই চলে যাবে। কন্যার উপর এই একটা "আহা" ভাবই অধিকাংশ পিতা-মাতার থাকবে। পুত্র—সে যে টাকা উপায় কর্‌বে, ভবিষ্যতের আশ্রয়স্থল,—তার উপর স্নেহের আকর্ষণ বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। তা সে যত কুপুত্রই হোক না কেন, স্নেহ-মমতার রাজ্য সে যেন একচেটিয়া করে নিয়েছে। মেয়ে-দের টাকা উপায় করা—সে যেন এক অমার্জ্জনীয় অপরাধ! লেখাপড়া শেখা, গানবাজনা শেখা মেয়েদের এক মস্ত অপরাধের কাজ হয়ে পড়েছে। আজ "মাসিকে" "মাসিকে" "নারীর অধিকার" "স্ত্রী-স্বাধীনতা" ইত্যাদি দেখে দেখে কান ঝালাপালা হ'বার যোগাড়, প্রাণেও হাঁফ ধরে গেল। কি রে বাপু! "অধিকার দাও" বলে যে মেয়েরা চেঁচাচ্ছ,—কার কাছে চেঁচাচ্ছ শুনি? যাঁ'রা জেগে ঘুমোয়, তাদের ঘুম যে হাজার চেঁচালেও ভাঙ্গে না,—তা কি নারীরা জানে না? যতক্ষণ তারা ঘুমোয়, ততক্ষণ নিজেদের তৈরী করে নেও না কেন? শুধু গা ছেড়ে দিয়ে চেঁচালে কোন ফল হবে না। আর চাইব কা'র কাছে—পুরুষের হাতের মধ্যে সব তোলা রয়েছে না কি?

"স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা" প্রবন্ধে শ্রদ্ধেয়া অনুরূপা দেবী স্বাধীনতা বিষয়ে মোটামুটি যা লিখেছেন, তা সংক্ষেপে এই যে, স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে সমান শিক্ষালাভ করে চাক্‌রী কর্‌লে, ঘর-সংসারের দুরবস্থা হয়, সন্তান পালন হয় না, পারিবারিক বিশৃঙ্খলা ঘটে ইত্যাদি। এই সব কারণে তিনি মেয়েদের চাক্‌রী করার একেবারেই বিপক্ষে। আর লেখাপড়া কি সকলেই চাক্‌রী করার উদ্দেশ্যে শেখে? স্ত্রী-স্বাধীনতা বল্লে কি চাক্‌রী করা বোঝায়? বেশ, সব বুঝ্‌লাম। তবে একটা কথা—বাংলায় বিধবা, স্বামী-পরিত্যক্তা, পিতৃগৃহ-বিতাড়িতা ও দরিদ্রা নারীর সংখ্যা খুব বেশী। কিন্তু তাদের অধিকাংশই সংসারের আবর্জ্জনা হয়ে, আত্মীয়-স্বজনের বোঝা হয়ে, অক্লান্ত পরিশ্রম করে, আধপেটা খেয়ে কিংবা অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। তারা যদি অর্থের জন্য চাক্‌রী কর্‌তে যায় (অনেকে হয়ত শিক্ষিতাও,) তাতে কি দোষ হবে আমাকে বল্‌তে পারেন? কুটীর-শিল্প দ্বারা অর্থাগমও বেশী হয় না; কারণ, ইহার আদর আর বড় নেই। যে কয়টী শিল্পাশ্রম আছে, তাও অর্থাভাবে ও লোকের সহানুভূতির অভাবে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় পতিত হয়েছে। পুরুষেরা ত আমাকে তেড়ে-মেড়ে উঠ্‌বেন—কারণ বিনা পয়সার দাসীটি যে হাতছাড়া হয়ে গেল। কিন্তু মেয়েরা—তোমরা বুঝিয়ে দাও দেখি—তোমরা কি চিরকাল ঐ রকম মুখ গুঁজে অসহ্য গঞ্জনা শুনে দিন কাটাবে, না কি করবে? এ আমি বলি না যে, সকল দুর্ভাগিনীর এ অবস্থা ঘটে। চোখের সাম্‌নে এ রকম যত দেখেছি, ২।১টী ছাড়া সকলেরই কপালে অসহ্য লাঞ্ছনা। যাঁরা লেখাপড়া জানেন, তাঁদের অনেককে আমি বল্‌তে শুনেছি—"বাইরে চাক্‌রী বাক্‌রী কিছু যে একটা কর্‌ব, তারও উপায় নেই,—বাড়ীর ও পাড়ার পুরুষেরা অমনি তেড়ে এসে বল্‌বে, আমাদের এতে মান যাবে, খবর্দ্দার আর যেন এমন কথা কখনও না শুনি।" জোর করে যায়—পাঁচ রকম কলঙ্ক অমনি তার নামের সঙ্গে জড়িয়ে যাবে। ব্যস্, তবে আর কি? মেয়েরা সভয়ে অমনি চুপ হয়ে গেল। যাঁরা অশিক্ষিতা (ভদ্রঘরের মধ্যে অনেক পাওয়া যায়) তাঁরা বলেন "লেখাপড়া যদি জানতুম, তবে এ বাঁদীগিরির হাত থেকে রক্ষে পেতুম,—চাক্‌রী করে খেতুম,—ছেলে মানুষ কর্ত্তুম, ইত্যাদি।" শিক্ষাবিদ্বেষীগণ এ কথা শুনে খুবই আনন্দ পাচ্ছেন বোধ হয়।

স্বামী ও স্ত্রী উভয়কে চাক্‌রী কর্‌তে আমিও দেখেছি। স্বামী বিদেশে চাক্‌রী কর্‌তে গেছেন। অল্প আয়ে স্বামীর বিদেশের খরচ, স্ত্রী ও তিনটী সন্তানের খরচ একেবারেই কুলোয় না। স্ত্রীকে বাধ্য হয়ে চাকরের জিম্মায় সন্তানদের রেখে চাক্‌রী কর্‌তে যেতে হয়। এতে সন্তানদের কষ্ট হ'লেও, চাক্‌রী না করে মায়ের উপায় নেই। মা সন্তানের কষ্ট বরং সইতে পারেন, কিন্তু তাদের

অর্দ্ধাহারে শুকিয়ে মরাটা ত আর দেখ্‌তে পারেন না। ইনি উচ্চ-শিক্ষিতা বলেই চাকরী কর্‌তে পার্‌ছেন; কিন্তু অশিক্ষিতা হ'লে ত আর পারতেন না। তবেই দেখুন, অশিক্ষিতা মায়ের ছেলেরা সে যায়গায় না খেয়ে শুকোত। "স্ত্রীশিক্ষার" নানান্ দোষ লেখিকা দেখিয়েছেন—হ্যাঁ বুঝ্‌লাম, আধুনিক শিক্ষা-প্রণালী বাঙ্গালী মেয়েদের সম্পূর্ণ অযোগ্য। বেশ ত, যোগ্য প্রণালী কি তাই বলুন—শুধু বক্তৃতা দিলেই হয় না,—সে কাজ অনেকেই বেশ কর্‌তে পারেন। শ্রদ্ধেয়া লেখিকা যদি নিজ হাতে কয়েকজনকে শিখিয়ে দিয়ে যেতে পারেন, তবে নারীসমাজ তাঁর কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ হয়ে থাক্‌বে।

অধ্যাপক শ্রীসত্যশরণ সিংহ মহাশয় মেয়েদের কি রকম শিক্ষা হওয়া উচিত, তারই একটা তালিকা দিয়েছেন (ভারতবর্ষ, পৌষ—১৩৩০)। উপায় বের হ'ল—এখন কাজে হ'লেই ত বেশ হয়। উপায় ঢের হ'ল যদিবা—এখন বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবার লোকের অভাব হচ্ছে।

নারীর অন্দরের অবস্থা সকলেই জানেন—কিন্তু স্বীকার করেন কয়জনে? বেশ, স্বীকার না হয় নাই কর্‌লে; কিন্তু তার প্রতিকারের চেষ্টাও যে কেউ করে না, এইটেই যে অত্যন্ত দুঃখের কথা। কিন্তু কেউ যদি একবার বলেন "আহা, অধিকাংশ বাঙ্গালী মেয়েদের মত দুরবস্থা জগতে আর কোথাও নেই" ইত্যাদি—অমনি চারদিক দিয়ে ভিড় করে শাস্ত্র আওড়ে সকলে বলে উঠ্‌বেন "এঁ্যা, সে কি, নারীদের আমরা সেই সনাতনকাল থেকে দেবী বলে আস্‌ছি,—তাঁদের আমরা লাঞ্ছনা অবজ্ঞা করি, অসম্ভব! আমাদের দেশের মত এমন উচ্চ আদর্শ আর কোথাও নেই। শাস্ত্রে বলেছে, নারীর যেখানে অসম্মান, সেখানে লক্ষ্মী থাকেন না। তাঁরা যে সংসারে কষ্টে অপমানে চোখের জল ফেলেন, সে সংসার উচ্ছন্ন যায়। এ সব জেনে কি আর আমরা তাঁদের অপমান করি?" একবার স্মরণ করে দেখুন ষ্টেসনের অবস্থা! প্লাটফরমে একটী মেয়ের (সুন্দরী হলে ত কথাই নেই) আবির্ভাবে সমস্ত পুরুষের লালসাদীপ্ত ও কৌতূহলী চক্ষু কোন্ দিকে থাকে! "দেবী" কি না, তাই তার পূজা বা সম্মান স্বরূপ মেয়েদের ইহা অবশ্য প্রাপ্য। একাকিনী বা অসহায়া মেয়েকে পেলে তার কপালে যে কি থাকে, তাহা আর বলিবার কথা নয়। "দেবী" বলেই বুঝি এই সব সম্মান! 'এটা জান না,—বেশীর ভাগ বাঙ্গালী মেয়ের চোখের জল না ফেলে দিন যায় না। বাঙ্গালী মেয়েদের মত মনের বল, সহিষ্ণুতা খুব কম আছে। আর তাদের মত উৎপীড়িতাও বুঝি জগতে খুব কম। এই মনের বল ও সহিষ্ণুতা আছে বলেই বাংলার আজ মুখ রক্ষা; তা না হ'লে "জহর ব্রত" আরম্ভ করতে হত।

মহারাজ যশোবন্ত সিংহ যখন যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে নিজরাজ্যে ফিরে এসেছিলেন, তখন তাঁর পত্নী মহামায়া বলেছিলেন, "যিনি যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে এসেছেন, তিনি আমার স্বামী ন'ন। যশোবন্ত নামধারী কোন ছদ্মবেশী এসেছে—রাজ্যে ইহার স্থান নেই। রক্ষী, প্রাসাদের দ্বার রুদ্ধ কর।" চমৎকার! স্ত্রীর কি সুন্দর তেজস্বিতা, আত্মমর্য্যাদা! ইঁহার সঙ্গে বাঙ্গালী মেয়ের তুলনা করে দেখা যাক্। শ্রদ্ধেয়া অনুরূপা দেবী বলেছেন, "নারীর মধ্যে যদি শক্তি থাকে, যথার্থই তিনি যদি ধার্ম্মিকা হন, যদি অন্তরের বিতৃষ্ণায় হীন সঙ্গ করিতে না পারেন, তিনি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নিজ-গৃহে আগত মহারাজ যশোবন্ত সিংহের মহিষীর ন্যায় স্বধর্ম্মত্যাগী (ক্ষত্রিয়ের পক্ষে পৃষ্ঠপ্রদর্শন মহাপাতক) স্বামীর সহিত অপরিচিতবৎ ব্যবহার করিতে পারেন......" ইত্যাদি। "হীন সঙ্গ" করিতে অনিচ্ছুক মেয়ে বাংলায় অজস্র পাওয়া যাবে; কিন্তু তাদের সাধ্য কি—স্বামীর সহিত ওরূপ "অপরিচিতবৎ" ব্যবহার করে! মনে করুন, মাতাল, চরিত্রহীন স্বামী (এ ত আজ ঘরে ঘরে) সমস্ত রাত প্রায় বাইরে কাটিয়ে শেষ রাতে বাড়ী ফির্‌ছেন। তেজস্বিনী স্ত্রী দড়াম করে বাড়ীর দরজা বন্ধ করে বল্লেন, "এ মাতাল, ব্যভিচারী লোক আমার স্বামী নয়; এ বাড়ীতে তার স্থান নেই।" পরদিন স্বামী মহাশয় বাড়ী ঢুকে তাঁর তেজস্বিনী স্ত্রীটিকে যখন বাড়ী থেকে ঘাড় ধরে বের করে দেবেন, তখন স্ত্রী দাঁড়ায় কোথা? স্বামী তাড়িয়েছে—পিতৃগৃহ, আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতেও তাঁর স্থান হবে না। শেষ পর্য্যন্ত তার মান-ইজ্জত রক্ষা করাও কঠিন হয়ে পড়্‌বে। রাগান্ধ, কামান্ধ ও অত্যাচারী স্বামীর সম্বন্ধেও এই একই কথা। তখনকার দিনে ধর্ম্ম বলে একটা জিনিস ছিল—আজকাল নামটা শুন্‌তে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কার্য্যে দেখ্‌তে পাওয়া যায়

বনফুল

না। সেজন্য "তখন" ও "এখন"এর সঙ্গে কোন তুলনা হতে পারে না। সমাজ কি কেবল নারীকে নিয়ে? পুরুষ ও নারী উভয়েই যখন সমাজের অধীন, তখন পুরুষের পাপের দণ্ড কেন তারা পায় না? যত শাস্তি মেয়েদের জন্য শাস্ত্রকারগণ তৈরী করেছেন! শাস্ত্রে পুরুষের শাস্তির কথারও উল্লেখ আছে শুনছি। অথচ তাঁদের বেলায় "সমাজ নেই আজকাল" (অনুরূপা দেবী)—এ কি রকম কথা? মেয়েদের সমাজ আছে, পুরুষদের সমাজ উঠে গেল কেন? তাই বলে এ আমি বলি না, পুরুষেরা ব্যভিচারী হ'লে মেয়েরাও কেন তার দাবী না কর্‌বে। মেয়েরা তা চায়ও না, তারা এ বিষয়ে পুরুষের সঙ্গে কখনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা কর্‌বে না। "পুরুষের বাইজী নিয়ে" মাতামাতি কর্‌বার সখ হলেই যে মেয়েরাও "বাবুজি নিয়ে রাস্তায় বেরুবে" এমন কোন কথা নেই। ভয় নেই, একজন যদি ঘরে আগুন দেয়, অমনি আমাকেও যে তাই কর্‌তে হবে, এমন ধারণা করাই ভুল। নারীগণ, আজ তোমরা সকলে এক মনপ্রাণ হয়ে জাগ দেখি,—নিজেদের সকল অপবাদ দূর করে নিজেরা শক্তিময়ী হও। হতাশ হয়ো না—অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়্‌তে গেলে প্রথমে অনেক আঘাত পেতে হবে, অনেক অপবাদ সইতে হবে। সাহস কর—পিছিয়ে "জহরব্রত" অবলম্বন করে নিজেরা আরও অন্ধকারে ডুবো না। অবশ্য শ্রাবণের (১৩৩১) ভারতবর্ষে মনোরমা দেবী পরামর্শ দিয়েছেন "সাহস হয় ত ঘোর প্রতিবাদ কর, নয়ত জহর-ব্রতের পুনরভিনয় করা যাক্, তাহলে যদি পুরুষদের চৈতন্য হয়।" মর, মর, পুড়ে মর, গলায় দড়ি দিয়ে মর, জলে ডুবে মর, বিষ খেয়ে মর, তেতলা থেকে পড়ে মর, কিছুতে কিছু হবে না। পুরুষদের চৈতন্য নারীরা মর্‌লে হবে না। মেয়েরা তোমরা প্রতিবাদ কর, আত্মরক্ষা কর্‌তে শেখ, শুদ্ধ থেকে পুরুষদের মিথ্যা অপবাদ দুর্নামকে অগ্রাহ্য করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াও—তাহ'লে যদি পুরুষদের চৈতন্য হয়!

'সখী—সচিব' শুন্‌তে মুখে, দেখ্‌ছো তো কেউ নও কো তা।

"সাধ্বী—সতী পতিব্রতার যোগ্য মানে রও কোথা?"

"সত্য যেটা ধর্‌বে জোরে, প্রাপ্য যেটা কাড়্‌বে তা,
অপমানের বইলে বোঝা, ক্রমাগতই বাড়্‌বে তা!
আত্ম-অবিশ্বাস ভোল গো, কুণ্ঠা, ভীতি, লজ্জাভার,
সব সঙ্কোচ সরিয়ে দূরে, বেরিয়ে দাঁড়াও একটিবার।"

* * * *

"অকাল-মৃত্যু ও বাল্যবিবাহ"র (অনুরূপা দেবী) বাদ-প্রতিবাদ নানান্ মাসিক পত্রিকায় এত বেরিয়েছে, যে, আমার নূতন করে কিছু বলা সাজে না। তবে মূল প্রবন্ধের ও দুই একটী প্রতিবাদের কিছু আলোচনা করিব। শ্রদ্ধেয়া লেখিকা বাল্য-বিবাহের অত্যন্ত পক্ষপাতী। বাল্যবিবাহের সহিত অকালমৃত্যুর কোনই সংস্রব নাই—ইহাই তাঁহার ধারণা, এবং তিনি তাঁহার নিজের ও ঠাকুরবাড়ীর দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। কিন্তু ২।১টী পরিবার নিয়েই কি সমস্ত বাংলা দেশ? বেশ ধরুন, না হয় বাল্যবিবাহ সংসারে খুব উপকারী। তাঁর মতে ১০।১১ বৎসরে মেয়েদের যখন "নারীত্ব" দেখা দেয়, সেই বয়সই বিয়ের উপযুক্ত ও তখন বিয়ে দেওয়াও কর্ত্তব্য। বিয়ের পর উভয়ের ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে থাকতে হবে—অন্ততঃ ১৬ বৎসর যত দিন না হয়। আজকাল এঁচোড়ে-পাকা ছেলেমেয়েদের নিকট নাটক-নভেল-প্লাবিত দেশে এই বিধি জারী করা যে কত কঠিন (কঠিন নয়—একরূপ অসম্ভব), তাহা কি লেখিকার মনে উদয় হয় নি? আজকাল শতকরা আটানব্বুই জন ছেলে যেখানে সর্ব্ব বিষয়ে অসংযত, মেয়েদের মধ্যেও অধিকাংশ তাই, তখন তাহারা একই গৃহে যে কেমন "ব্রহ্মচর্য্য" পালন কর্‌বে, তা একটু ভাবলেই বোঝা যায়। সেকালে (সত্যযুগ, পৌরাণিক যুগ নয়,—১০০।১৫০ বছর আগে) বাল্যবিবাহ সম্ভবপর নানা কারণে ছিল—একান্নবর্ত্তী পরিবার ছিল, মেয়েদের লেখাপড়ার বালাই ছিল না, তখনকার লোকেরা নীতিপরায়ণ ও সংযত ছিল, দেশে সমস্ত জিনিস ও তাহার মূল্যাদি অত্যন্ত সুলভ ছিল।

"ব্রহ্মচর্য্য" পালনই যখন সম্ভবপর নয়, তখন বাল্যবিবাহ হওয়াও কোনমতে উচিত নয়। উভয়ের একত্র বাস অথচ ব্রহ্মচর্য্য—দুই একসঙ্গে হয় না বলিয়াই, আগেকার দিনে গুরুর আশ্রমে গিয়া ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা, পরে গার্হস্থ্য জীবনের উল্লেখ আছে। মেয়েদের শিক্ষালাভ পিত্রালয়েই সুবিধাজনক ও চিরকাল তাহাই হয়ে থাকে; শ্বশুরবাড়ীতে (২।১ ঘরে হ'তে পারে) নানারূপ অসুবিধা হয়। মেয়েদের "নারীত্ব" দেখা

চর্ব্বিত। বোধ হয় ওখানি চা ছাঁকা ও গায়ে দেওয়া দু কাজেই লাগে। ছোকরাটি বেহারী কি বাঙালী বুঝিতে পারিলাম না। কারণ শিক্ষিত বা অশিক্ষিত ভদ্র বেহারীরা বাঙালীকে চাননা বটে কিন্তু বাঙালীর পোষাক আর চালচলনটা চান ;—ভবিষ্যৎ অন্ধকার নয়।

চেয়ার দুখানি খালি থাকায় পায়া আছে কি না দেখিয়া ধূলা ঝাড়িয়া বসিলাম। ছোকরাটি চায়ের কাপ তিনটি বাবুদের সম্মুখ হইতে তুলিয়া লইয়া অন্দরে অন্তর্ধান হইল। সেই ঘর সংলগ্ন একটি দ্বারে চটের একখানি ছেঁড়া পর্দা—শত ছিদ্র লইয়া একাকারের বিরুদ্ধে যুঝিতেছিল।

দুই তিন মিনিটেই বুঝিলাম বাবুত্রয় কেন বেঞ্চে গিয়া বসিয়াছেন এবং বাঙালীর বদনে এতক্ষণস্থায়ী হাস্যভাবই বা কিরূপে সম্ভব হইয়াছে। চেয়ার দুখানি ছারপোকার ধর্ম্মশালা! এতকাল পরে শিবু পণ্ডিতকে মনে পড়িল। বাল্যকালে তিনি কয়েক বার জলবিচুটির ইন্‌জেক্‌শন (injection) দিয়া না রাখিলে এ কামড়ে আর রক্ষা ছিল না—মরিয়াই যাইতাম।

জয়হরি 'বাপরে' বলিয়াই একলাফে রাস্তায় হাজির! বলিলাম—"ও কি, এস' চা এসে গেছে।"

জয়হরির দুই-হাতই তখন একটা গ্রাম্য অভ্যাসে নিযুক্ত, সে বলিল "ও দু'কাপই আপনি খান মশাই। ওঃ ভাগ্যিস লেখা পড়া শিখিনি ; তা-হলেই চাকরী করতে হ'ত, গিছলুম আর কি!"

বলিলাম—"কারণ?"

সে বলিল, 'আজ্ঞে, চেয়ারে বসতে হ'ত ত,' ওরে বাপারে—মা সরস্বতী রক্ষে করেছেন। এখন কত নেবে জানি না।"

বলিলাম, "কেন? কে কত নেবে।"

সে বলিল, "আর কে—মুচি! গেরো একেই বলে,—প্যাঁড়া খেলেই হ'ত।"

এইবার বাবু তিনটি হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। অনেক বলায় জয়হরি রোয়াকে উঠিল—ঘরে আর ঢুকিল না।

ছোকরাটি চা লইয়া আসিতেই আমি দাঁড়াইয়া বাঁচিলাম ও বলিলাম, "টেবিলে রেখো না, হাতে দাও।" এক কাপ বাহিরে জয়হরির হাতে দিয়া দ্বিতীয়টি নিজে লইলাম। প্রথম দাঁড়া চুমুক মুখে লইতেই তাহা বহির্ম্মুখী হইয়া পড়িল,—যেমন বিট্‌কেল্ স্বাদ তেমনিই একটা ন্যাতা-নিংড়োনো গন্ধ। তুলনা-রহিত,—বোধ হয় ব্রহ্মদেশের নাপ্পীর বাপ্পী! আহারে অদ্বিতীয় নির্ব্বিকার সর্ব্বভুক জয়হরিও দেখি থু থু করিতেছে। ফেলিয়া দিতে যাইতেছি দেখিয়া ছোকরাটি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"ফেলবেননাই মশাই, আমাকে দ্যান," বলিয়াই পূর্ণ কাপ দুইটি লইয়াই চট্ ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। পরক্ষণেই আসিয়া বলিল "ছাগলের দুধ দেওয়া হয় কি না—তাই আপনকারদের ভাল লাগে নাই। কুণ্ডু মশাই বলেন ওটা ভারী উপকারী, চায়ের অপকারিতা ত নষ্ট করেই, তাছাড়া 'থাইসিস্' হতে দ্যায় না। তেনা যে ডাক্তার গো বাবু।"

জ্বালায়, মনোভঙ্গে, প্রাণটা বিস্বাদ হইয়া গিয়াছিল, বলিলাম, "আমরা ত ডাক্তারখানায় আসি নাই বাবা। আচ্ছা তাঁকে একবার ডাক' ত বাপু, দুটো উপদেশ নেওয়া যাক্।"

ছোকরা বলিল, "তেনার কি এখানে থাকলে চলে বাবু, ক্যাল্ (call) এসে কত! একটা "ব্লড-মিক্‌চার" (Blood mixture) বেনিয়েছেন, তাই হপ্তায় একদিন এখানে আসতি হয়—কাট্‌তি কত বাবু!"

বলিলাম "এটা কি ব্লড-মিক্‌শ্চারের কারখানা?"

ছোকরা বলিল, "এজ্ঞে—এই খেনেই বানান।"

জয়হরি চটিয়াছিল, বলিল,—"বুঝছেন না,—ও আমাদেরই ব্লডের মিক্‌শ্চার মশাই ; ওই সজারু-মার্কা চেয়ারেই ত' ব্লড-মিক্‌শ্চারের বীজ তয়ের হয়ে থাকচে ; তিনি এসে কেবল বাছা বাছা পাটনেয়ে ছারপোকাগুলি ঝেড়ে নিয়ে চায়ের কেটলিতে ফুটিয়ে শিশি ভর্ত্তি করেন। তা-নাত' চায়ের অমন সুতার!"

জয়হরি যে ভাবেই কথাগুলি ব্যক্ত করিয়া থাকুক, তাহা স্থান কাল পাত্র হিসাবে কাহারও কানে বেসুরো বা অসম্ভব ঠেকিল না। বাবু তিনটি অর্থপূর্ণ মুখ চাওয়া চাওয়ি করিলেন।

আমি বলিলাম, "হ্যাঁহে বাপু, ওই যে ঠাকুরদের দেখানো পাঁচকাপ থাইসিসের ওষুধ ভাঁড়ারে ঢোকালে তবেও কিছু চলে নাকি?"

ছোকরা বলিল, "আজ্ঞে না মশাই, পাঁটিটে আবার গৰ্ব্বিনী কি না,—ওই খায় বলেই দু'বেলা দেড় সের দুধ পাওয়া যায়, বুড়ো হয়েছে—ওই খেয়েই থাকে।"

বলিলাম, "দিন কত কাপ বানাও ?"

ছোকরা বলিল "এজ্ঞে, চাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ হবে।"

"বল কি হে" বলিয়া ভাবিতে লাগিলাম 'সবটাই ত দেখছি পাঁটীর পেটে যায় !'

জয়হরির রাগ পড়ে নাই, কারণ তখনো তাহার দুই হাতই দ্রুত চলিতেছিল, সে বলিল, "শোনেন কেন মশাই, অত চা খেলে সে হ্যাট মাথায় দিয়ে বেড়াত, ভ্যা-ভ্যা করত না, ড্যাম্-ড্যাম্ করতো! ওই এক কেট্‌লি গাঁদালের ঝোল তয়ের হয়, সেইটে সারাদিন ঘর-বার যাতায়াত করে,—রাত্রে পাঁটীর পেটে যায়, আবার সকালে দুধ হয়ে বেরোয়। জল বাষ্প হয়ে আকাশে গে মেঘ হয় আবার বৃষ্টি হয়ে ফিরে আসে। চোর ব্যাটারা ফিজিকেল জিওগ্রাফি (Physical geography) পুষেছে! ঠক্ ব্যাটারা জাতও নিলে একপুরু ছালও নিলে।"

বাবুরা আবার হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "It defeats Dickens" (ডিকেন্সকেও হার মানিয়েছেন)।

ভাবিলাম ছোকরা বুঝি চটে, কিন্তু পাঁচ জন লোকের একই রায় পাইয়া সে আম্‌তা আম্‌তা করিতে লাগিল। বেচারাকে দেখিয়া দুঃখ হইল, এক বাক্স কাঁচি-মার্কা সিগারেট্ দিতে বলিলাম।

বাক্স হইতে সিগারেট বাহির করিতেছি, একটি বাবু বলিলেন "দেখে খাবেন।" আমি তাঁহাদের এক একটি offer করিলাম। তাঁহারা হাতে লইয়াই হাসিলেন। দেখি সিগারেটগুলির উপর লেখা "red lamp !" তাঁহাদের দিকে চাহিতেই হাসিটা আওয়াজ দিয়া উঠিল।

বলিলাম, "মাপ করবেন মশাই, আমি ভাবতুম কাঁচি সিগারেটের আদি স্বত্বাধিকারী নিশ্চয়ই যুধিষ্ঠিরের বংশের higher dilution (হায়ার ডাইল্যুশন্) হবেন, তাই সিগারেটের পূর্ব্বে "কাঁচি" কথাটি যোগ করে ধর্ম্ম-রক্ষা করতে ভোলেননি ; কারণ—কাঁচি আর কাঁচি-সিগারেট উভয়েই পকেট মারতে মজবুত। আরও জানা ছিল—ওরা উভয়েই সম্পাদকদের প্রিয় সহচর। এটা জানতুম্ না যে দ্বিতীয়টি "red lamp" ও দেখায়—..."

জয়হরির হাত-কামাই ছিল না, সে উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "দেখাবে না,—"লালবাতি" (red lamp) দেখান ত' আরও ঢের আগেই উচিত ছিল।"

জয়হরির উত্তরোত্তর উন্নতি দেখিয়া আমি ত' ভীত হইলাম, বাবুরা কিন্তু হাসিয়া উঠিলেন। ছোকরাটি অতি কিন্তু হইয়া বলিল "আমি কি করব' বাবু, ওসব কুণ্ডু মশাই জানেন।"

জয়হরি বলিল "ঢের ঢের কুণ্ডু দেখেছি, কাশী যে অমন "কুণ্ডু"-প্রধান স্থান—"অগস্ত" থেকে আরম্ভ করে এণ্ডার কুণ্ডুর দৌড় রয়েছে, কিন্তু তাদের এমন মোক্ষম কামড় নেই মশাই, কেউ এমন biting কুণ্ডু নয়। বাপ্—এক একটা যেন কচ্ছপের বাচ্চা। ইংরেজরা মিথ্যে কথা কবার লোক নয়,—ও জাতকে ওরা তাই বাগ (bug) বলে—তফাৎ কেবল ঘাড়ের রক্ত খায়না।"

আমি তাহাকে বিষয়ান্তরে লইয়া যাইবার আশায় বলিলাম "B. N. W. রেলে কখনও যাতায়াত করেছ জয়হরি ?"

জয়হরি বলিল, "হ্যাঁ ধরেছেন ঠিক! কিন্তু তাতে একটা বাঁচোয়া আছে মশাই; বৃহৎ কাষ্ট—এক মাইল দৌড়,—কামড়গুলো দুহাজার লোকের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যায়। আর একটা সুবিধে—ওটার নামই হচ্ছে "কুলী-লাইন",—পোড়া কাঠের মত যত অনাহারী ভুখো কঙ্কাল চা-বাগানে চালান যায়, তাদের শরীরে রক্ত খুঁজতে গিয়ে হাড়ে হুল ঠেকে ঠেকে বাবাজীরে ভোঁতা মেরে বসে আছেন। আর এখানে যে বাবু-বেঁধা বেওনেট্ মশাই।"

বাবু তিনটি বেজায় হাসিতে লাগিলেন। ভাবিলাম জ্বালায় জয়হরিকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে—আমার নিজের অবস্থাও নিতান্ত খাটো নয়। তবে একটা লাভও করিলাম, বুঝিলাম চটিলেই জয়হরির সরস দিকটা দেখা দেয়—মাথা খোলে।

বলিলাম "নিখরচায় পাঁটী পোষা দেখে একটা কথা মনে পড়ল, সেইটে বলাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। ওই B. N. W. রেলের অনেকগুলো ইষ্টিসানেই উপোস বিক্রির খাসা বন্দোবস্ত আছে। রেলের ফিরিওলাদের বোধহয় দূর থেকেই আসতে হয়, সকালে গরম পুরী, ত্যালাকুচো সেদ্ধ আর দেওয়ালীর-পাঁপড়া নিয়ে আসে। সে পূরীর

নামই "গরম-পুরী", কারণ রাত নটা পর্য্যন্ত সে ওই নামেই চলে। অত রাতে বাড়ী ফিরতে হয় তাই দুটো কুকুরও সঙ্গে আসে, তারা রাতে তার বাড়ী চৌকী দেয়, আর তার প্রহরী হয়ে সঙ্গে আসে যায়;—খায় কিন্তু রেল-যাত্রী খরিদ্দারদের! কারণ সে পুরী আর প্যাঁড়া এমন মাল-মশলায় তৈরী যে খরিদ্দারেরা ক্ষিধের চোটে কিনলেও কামড় মেরেই ফেলে দেয়। পরিণামদর্শী কুকুরগুলো মুকিয়েই থাকে,—এক টুকরোও নষ্ট হতে দেয় না। এ নতুন নয় জয়হরি, সব দেশেই আছে। বায়স্কোপে দেখাচ্ছে একটা লোক সার্সী মেরামতের কাজ করত; সে একটি কুড়োনো ছেলে পুষেছিল; ছেলেটি পালক বাপকে সাহায্য করে তাঁর কায ফ্যালাও করবার জন্যে রাস্তায় রাস্তায় খেলাচ্ছলে ইট ছুঁড়ে বড় বড় বাড়ীর সার্সী ভেঙ্গে ব্যাড়াত', তাতে পালক-বাপের কাজের মরসুম লেগে থাকত, পয়সাও বিলক্ষণ আসত! সে ছিল কিড্ (Kid) এ না হয় পাঁটী—গোত্র নাম্নে বিনিয়োগঃ।

"যাক্ বেলা হয়েছে, এ অমৃতকুণ্ডু থেকে উঠে পড়" বলিয়া ছোকরাটির পাওনা চুকাইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম—বাবু তিনটিও উঠিলেন। দু'পা অগ্রসর হইতেই শুনিলাম জয়হরি বলিতেছে "দেখো বাবা—আজকালের গোঁফ ফেলা পেলব প্যাটার্ণের মূর্ত্তি এ অমৃতকুণ্ডে পড়লেই সাবাড় যাবে। ও বিষ এক কাপ্ পেটে গেলে ত বাঁচবেই না—চাই কি তার আগেই ছারপোকায় ছুব্‌লে মেরে ফেলবে। তুমি গরীবের ছেলে সাবধান! কুণ্ডু ত' ক্যালে (callএ) থাকেন, দেখছি জ্যালের (Jailএর) ভার তোমার, জ্যালে থাকবে তুমিই। সরে পড়, সরে পড়।"

ছোকরার মুখে চোখে ভয়ের ভাব সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, সে বলিতেছে, "যাক্ মশাই ছ'টাকা,—আমি তাই করব, এ চাকরি আর নয়।

ফিরিয়া দেখি, বেচারার মুখ এতটুকু হইয়া গিয়াছে। জয়হরিকে ধমক দিয়া ডাকিলাম। বিকেলে আবার আসছি বলে ওকে একটু encourage করছিলুম—'মশাই' বলিতে বলিতে সে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ভগবান্ আমাকে কি অদ্ভুত সঙ্গীই জুটিয়ে দিয়েছেন!

বাবু তিনটি হাসিমুখে বলিলেন, "সত্যি আসছেন কি? তাহলে কখন আসবেন বলুন, আমরাও আসি।"

বলিলাম, "বৈদ্যনাথে কি "হত্যা" মানসিক আছে?"

একজন বলিলেন, "আজ্ঞে না, সেটার লোভ একেবারেই নেই; আর আমাদের যে কাজে এখানে আসা, তাতে এক মিনিটও নষ্ট করা চলে না—পাপ আছে। কিন্তু আপনাদের পাবার লোভটাও যে ত্যাগ করতে পারছি না।"

বলিলাম, "বেশ ত', অবস্থাটা যদি এতই সঙ্কট দাঁড়িয়ে থাকে, আমি আমার সঙ্গীটিকে দুদিনের তরে পোষাণি দিতে রাজি আছি—নে যাননা।"

একজন বলিলেন "gladly—এখ্‌খুনি।"

বলিলাম, "আচ্ছা, আগে বলুন ত' এখানে আপনাদের এমন কি কাজে আসা যাতে এক মিনিট নষ্ট করলেও পাপ,—বাবার মন্দিরে বসে নিত্য একলক্ষ জপ!"

তিনি বলিলেন "আজ্ঞে তার চেয়েও কঠিন। তাতে ত' আর কারুক্কে হিসেব দিতে হয় না। কেউ টাকাও চায় না, টাকাও দেয় না,—বল্‌লেই হ'ল লক্ষ জপ করে উঠলুম। শিবকে ফাঁকি দেওয়া ত শক্ত নয়—তিনি হচ্ছেন মঙ্গলময়,—আমাদের কারবার যে জীবকে নিয়ে মশাই, যিনি হচ্ছেন শুভঙ্কর—হিসেবের হিকমতখাঁ।"

এই সময় এমন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, যেখানে আর দুইটি রাস্তা আসিয়া মিলিয়া পথিকদের বিচ্ছেদের ব্যবস্থা সহজ করিয়া দিয়াছে।

বক্তা বাবুটি বলিলেন—"তাইত! বেলাও হয়েছে, আমাদের এই বাঁ দিক্‌টাই যে ধরতে হবে।"

জয়হরির জঠর বোধহয় কঠোর তাগাদা লাগাইয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি বলিল, "আমাদেরও এই ডান দিকেই ডান হাতের ব্যবস্থা।"

বাবুটি বলিলেন, "সেকি—আপনাকে তো আজ আমরা নে' যাব।"

জয়হরি আমার দিকে চাহিল। বলিলাম, "ভয় কি, ওঁরা ত আর pound keeper (খোঁড় রক্ষক) নন।" সে যেন একটু মুস্কিলে পড়িল, ধীরে বলিল,—"কিন্তু রাঙা আলু—"

বলিলাম, "হ্যাঁ—তা কি হয়েছে?"

জয়হরি বিলোমপদে বলিল, "হয়নি—যদি হয়।" বলিয়াই বাবুগুলিকে সবিনয়ে জানাইল "বাসার ঠিকানাটা বলুন, ভাববেননা, আমি নিজেই গিয়ে হাজির হব। ও-বাসার

খবরটা একবার নিয়ে আসি, মনটা বড় চঞ্চল হয়ে আছে।”

বাবুটি ব্যস্তভাবে বলিলেন, “কেন, কারুর অসুখ নাকি? তাহলে আজ না হয় থাক, কাল কিন্তু ছাড়ছিনে।” এই বলিয়া তিনি বাসার বায়ানাক্কা বুঝাইয়া দিলেন ও আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “তাইত —আমাদের কাজটার কথা বলার ত আজ সময় হ’ল না,— সেটা এক কথায়—দেশের উপকার, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ঘরের ভদ্রমহিলাদের—যাঁরা দু’পায়ে অচল। আমরা কিন্তু তাঁদের দুপেয়ে বাইসিকিল বানাবার ব্যবস্থা নিয়ে বেরিয়েছি। কাল রবিবার, অনুগ্রহ করে স্কুল হলে হাজির হবেন, সেইখানে বেলা আটটার সময় আমাদের বক্তব্যটা শুনবেন; আর আপনাদের কর্ত্তব্যটাও করবেন।” এই বলিয়া তাঁহারা ত্রিপদী পথটার দীর্ঘ দিকটা ধরিলেন, আমরা লঘু লেনটার সাহায্যে বাসায় উপস্থিত হইলাম।

স্নানাহার সমাপনান্তে জয়হরি উদাস-ভাবে বলিয়া উঠিল—“যাকৃগে আমরা আর কি করব!”

বলিলাম—“কিসের কি?”

সে সেই নির্লিপ্ত ভাবেই উত্তর দিল “সেই অপয়া Red potato (রাঙা আলু) গুলো! যাক্ ইঁদুরে বাঁদরেই খাবে দেখছি!”

আমি আর কথা কহিলাম না।

আশুতোষ

শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী

আশুর কেম্ব্রিজে থাকা কালে তাহার পূর্ব্ব-বন্ধু রো সাহেব বিলাতে ছিলেন। তিনি অবকাশ সময়ে আশুকে তাঁহার গৃহে যাইয়া ছুটী অতিবাহিত করিতে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। মিঃ রো বড় আমোদ-প্রিয়, সরল-হৃদয় ব্যক্তি। আশুর নিকট হইতে পত্রের উত্তর পাইয়াই তিনি তাঁহার ভগিনী কুমারী এমি রো’কে আশুর সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, “আমার যুবক বন্ধু আশুতোষ চৌধুরী Indian। রীতিমত Red Indianএর মত ব্যবহার না হইলেও প্রায় সেই প্রকারের। তবে আমার সহিত বহুকালের বন্ধুত্ব থাকায়, আমি তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে আনিতেছি। তুমি তাহাকে দেখিয়া কোনরূপ লজ্জিত হইবে না। Lady-like ব্যবহার করিবে।” মিস রো ভ্রাতার এই বাক্যে অত্যন্ত ভীতা হইয়া গৃহের পরিচারিকাদিগের সহিত গোপনে অনেক পরামর্শ করিতে লাগিলেন। আশু ইহার কিছুই জানিত না। সে যথাকালে মিঃ রো’র গৃহে উপনীত হইলে, মিঃ রো আনন্দে অধীর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ভগিনীকে আশুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। তিনি Red Indianএর ভয়ে বাহিরে আসিতে চান না। তখন মিঃ রো শয়ন-কক্ষের পর্দ্দা উঠাইয়া একেবারে আশুকে সেখানে লইয়া গিয়া হাজির করেন। মিস্ রো ত সৌম্য-মূর্ত্তি ভদ্রবেশী ভারতবর্ষীয় যুবককে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, এবং বাৎসল্য ভাবে তাহার দুই হস্ত ধরিয়া অভিবাদন করিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন; বলিতে লাগিলেন, “আশু তোমা অপেক্ষা সুশ্রী, পোষাক পরিচ্ছদ অতিশয় সভ্য; তোমা অপেক্ষা সম্ভবতঃ সুপণ্ডিত। আজ হইতে আমি তাহাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া মনে করিব।” তখন হাস্যরবে গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিল। পরিচারিকাগণ পর্য্যন্ত আসিয়া, সে আনন্দে যোগদান করিয়া, আশুর সহিত পরিচিত হইয়া, বাক্যালাপ করিতে লাগিল। বিলাত প্রবাসকালে প্রতি বৎসরই বড়-দিনের ছুটীর সময় তাঁহাদিগের গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া যাইয়াই আশু অবসর কাল অতিবাহিত করিয়া আসিত। আশুর Cambridgeএর বন্ধু—ব্যঙ্গরসিক গ্রন্থকার Swiftএর পৌত্র একবার তাহার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করাইবার জন্য আশুকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের গৃহের সুব্যবস্থা, পুত্রের প্রতি জননীর (Mrs. Swiftএর) তখনও কড়া ব্যবহার এবং সময়োচিত সকল কাজ-কর্ম্মের সুপ্রণালী দেখিয়া আশুও আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। এক দিন চা

পানের টেবিলে Mr. Swift (২২।২৩ বৎসরের যুবা) তাড়াতাড়ি চটি জুতা পরিয়া আসায় তাহার মাতা, নিমন্ত্রিত অতিথির প্রতি অসম্মান দেখান হইল মনে করিয়া, তৎক্ষণাৎ পুত্রকে তৎকালে ব্যবহার্য্য জুতা পরিয়া আসিবার জন্য টেবিল হইতে উঠাইয়া দেন। সুশিক্ষিত পুত্র মাতার এই আদেশ হাস্য মুখে পালন করিয়াছিলেন। সেকালে বিলাতের অনেক ভদ্র পরিবারে ও সমাজে আশুরা নিমন্ত্রিত হইয়া যাইত। তাহাদের সহিত সমান ভাবে মেশামেশি করিতে কেহই কিছু আপত্তি করিত না। আজিকার লর্ড সিংহ, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, সুদক্ষ চিকিৎসক উমাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺লোকেন্দ্র নাথ পালিত—সকলেরই সহিত সকলের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। সার তারকনাথের পত্নী পুত্রবৎ স্নেহে সকলকে যত্ন-আদর করিতেন। দ্বিজু ও তাহার ভ্রাতা হরেন্দ্র লাল প্রভৃতি আশুর চিরবন্ধু (D. L. Roy—দ্বিজেন্দ্র) তখন বিলাত যাইয়া অনেক দিন আশুর সঙ্গে বাস করেন। বাল্য-বন্ধু দ্বিজু আশুকে বড় ভালবাসিতেন।

বিলাত গমন কালে কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ভ্রাতৃপ্রতিম সত্যপ্রকাশ গাঙ্গুলীর সহিত আশুর জাহাজে আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। তাহার পর সেই আলাপ সুখময় কুটুম্বিতায় পরিণত হয়। বিলাত-প্রবাসী বন্ধুদিগের সহিত এ দিনেও আশুর এমন আত্মীয়তা ছিল যে, আমরণ কোন প্রকারে তাহার একটুও ব্যতিক্রম কিম্বা দূরত্ব ঘটে নাই। সেকালে বিলাতে ভারতীয় ছাত্র-জীবন বড় সুখের ছিল। আর সকলেই সুশিক্ষিত ও কার্য্যক্ষম হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। এখন আর সে দিন নাই—চারি দিকেই নানা অশান্তি। "কালস্য কুটিলা গতিঃ।"

আশু Cambridgeএর B. A, Bar-at-law. L L. B, এবং অঙ্ক শাস্ত্রে Tripos পাশ। পূর্ণ পাঁচ বৎসর কাল বিলাত প্রবাসে থাকিয়া আশুতোষ অন্যান্য অনেক বিষয়ে বহু জ্ঞান লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হয়। আশুর গৃহে আসিবার সংবাদ পাইয়া পিতৃদেব ময়মনসিংহ হইতে এক সপ্তাহের ছুটি লইয়া কৃষ্ণনগরে আসিয়াছিলেন এবং হাবড়া হইতে পুত্রকে অতি সমাদরে সঙ্গে করিয়া পরিবারের মধ্যে আনয়ন করেন। বিজ্ঞ লোকেরা মনে করিয়াছিলেন যে, পিতৃদেব আশুকে পৃথক্ রাখিয়া দিয়া গোপনে রাত্রে তাহার সহিত আহারাদি করিয়া জাতি রক্ষা করিবেন। তাহা আর হইয়া উঠিল না,—দেশে আমরা "একঘরে" হইয়া গেলাম। বিলাত-প্রত্যাগতদিগের মধ্যে আশুই সর্ব্ব প্রথম ধুতি-চাদর পরিধান পূর্ব্বক বন্ধু-বান্ধব ও গুরুজনদিগকে পরিতুষ্ট করিয়াছিল।

তাহার এই নূতন ব্যবহারে কৃষ্ণনগরে একটা প্রশংসার স্রোত বহিয়া গেল। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর বিলাতে থাকার কোন চিহ্ন-ই তাহাতে না দেখিয়া, সবাই অবাক হইয়া আশুর অতিশয় সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন। আশু অনেক গৃহে আহারের নিমন্ত্রণ পাইতে লাগিল।

তৎকালে কৃষ্ণনগরে এক বিলাত-ফেরত ম্যাজিষ্ট্রেট আশুকে রাত্রি-ভোজের নিমন্ত্রণ করেন। আশু ইংরাজের "নৈশ ভোজের" পোষাকের পরিবর্ত্তে স্বদেশী ধুতি চাদর পরিয়া আহারে যায়। সেই সাহেব বাবু তাহা দেখিয়া মনে মনে অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু আশুকে বাড়ী হইতে বিদায় করিয়া দেন নাই। অনেক সাহেব মেম সে রাত্রের ভোজে নিমন্ত্রিত থাকায়, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আশুকে লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আহারান্তে সকলে চলিয়া গেলে, সাহেব বাবু আশুকে মুখের উপর বলিয়া দিলেন, "তুমি এরূপ সাজে কখন Dinner Partyতে যাইবে না। এরূপ স্বদেশী কাপড়ে নিমন্ত্রণে যাওয়া আমি নৈতিক ভারুতা (moral cowardice) মনে করি।"

তাঁহার এই অযাচিত অপমান, উপদেশ ও বাৎসল্য ভাবে আশুর মনে কোনই অপমান বোধ হয় নাই। পর দিন আশু পিতৃদেবকে সমস্ত বলিলে, তিনি বলিলেন, "তুমি আর কখন ঐ প্রকার সাহেব-গৃহে নিমন্ত্রণে যাইবে না, এবং সাক্ষাৎ হইলে বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিবে—তাঁহার বাবা, জ্যেঠা, কাকারা কি কাপড় পড়িয়া থাকেন।" সে দিনের আশুকে যিনি ধুতি চাদরের জন্য অপমানসূচক বাক্য বলিয়াছিলেন, এ দিনের সেই ধুতি-চাদর-পরা আশুর গৃহে তাঁহার নিমন্ত্রণ না হইলে, মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া বন্ধুভাবে নিজেই যাচিয়া নিমন্ত্রণ লইতেন এবং ঐ ধুতি-চাদর-পরিহিত আশু ও তাহার ভ্রাতৃগণের মুখের উপরে কত পরিতোষ-বাক্য বলিয়া তাহাদিগকে পরিতুষ্ট করিতেন। তখন আর "নৈতিক ভীরুতা"র কথা মুখেও আনিতেন না।

ইংরাজ জাতি যথার্থ স্বদেশভক্ত। রাজকার্য্যের জন্য

যাহাই করুন না কেন, তাঁহারা স্বদেশভক্তের সম্মান রক্ষা করিতে জানেন। আশুর ঐ ধুতি-চাদর তাঁহাদিগের নিকট সর্ব্বদাই "অতি শোভন পরিচ্ছদ" বলিয়া আদর পাইয়াছে। পোষাকে তাহার মান ছিল না। তাহার মনুষ্যত্বই সম্মান লাভ করিয়া গিয়াছে। পিতৃঠাকুর ছুটীতে কলিকাতায় আসিয়া আশুর জন্য মট্‌স্ লেনে একটী ছোটখাট বাসা-বাটী স্থির করিয়া Barristerএর সরঞ্জাম সকল দিয়া যান। আশু ভ্রাতৃগণ সহ সেই বাড়ীতে থাকিয়া নিজ ব্যবসার নিমিত্ত অসাধারণ পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। হাইকোর্টে নূতন যুবা Barristerএর কোন সুবিধা ছিল না। ব্রিফ্‌লেস্ অবস্থা, অর্থের টানাটানি—অথচ সমাজে নাম রাখিয়া চলিতে হয়। এই প্রকার নানা অসুবিধায় পড়িয়া আশু সিটি (City) কলেজে ল পড়াইবার কার্য্য গ্রহণ করিয়াছিল। অযোগ্য বেতন, অতি খাটুনি, তবুও কতক সাহায্যের আশায় সে সেখানে কাজ করিতে লাগিল। তাহার উপর ইংরাজির পরীক্ষা-পুস্তকের নোট, ট্রিগ্‌নোমেট্রী (Trigonometry) লিখিয়া বাল্য বন্ধু * শরৎ লাহিড়ীকে দিয়া কিছু কিছু পাইতে লাগিল। দিন চলে, অবস্থা অসুবিধাজনক—অতি সাবধানে ব্যয় নির্ব্বাহ না করিলে কষ্টে পড়িতে হইত। ব্যয় সঙ্কোচ (যেটা চৌধুরী বংশের ধাতে নাই) অপরিহার্য্য। কাজে কাজেই ইচ্ছানুরূপ কোন কার্য্যই হইত না। তথাপি, আশু খুব প্রফুল্ল চিত্তে কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে কখন ত্রুটি করে নাই।

* শরৎ লাহিড়ী (S. K. Lahiri) সাধু রামতনু লাহিড়ীর মধ্যম পুত্র। কৃষ্ণনগর থাকা কালে আমাদের উভয় পরিবারে বড় ঘনিষ্ঠতা ছিল। সদা সর্ব্বদা আসা যাওয়া, আপদ বিপদে দেখা শুনা চলিত। একবার ম্যালেরিয়া জ্বরে শরৎ অতিশয় কাতর হইয়া প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে না পারায় আশুর মাতৃদেবী তাহাকে গৃহে আনিয়া সেবা শুশ্রূষায় আরোগ্য করিয়া পরীক্ষায় পাঠান। শরৎ পাস হইয়াছিলেন এবং আজীবন তাঁহার অনুগত সন্তানবৎ ছিলেন। তিনি আশুকে সহোদর সম মনেকরিতেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত *

(শ্রীম)

পঞ্চম ভাগ

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ভক্ত-সঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

তান্ত্রিক ভক্ত ও সংসার। নির্লিপ্তেরও ভয়।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে নিজের ঘরে আহারান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়াছেন। অধর ও মাষ্টার আসিয়া প্রণাম করিলেন। একটী তান্ত্রিক ভক্তও আসিয়াছেন। রাখাল, হাজরা, রামলাল প্রভৃতি ঠাকুরের কাছে আজকাল থাকেন। আজ রবিবার ১৭ই জুন ১৮৮৩ খৃঃ। জ্যৈষ্ঠ-শুক্লা দ্বাদশী।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। সংসারে হবে না কেন? তবে বড় কঠিন। জনকাদি জ্ঞান লাভ করে সংসারে এসেছিল। তবুও ভয়। নিষ্কাম সংসারীরও ভয়। ভৈরবীকে দেখে জনক মুখ হেঁট করেছিল; স্ত্রী দর্শনে সঙ্কোচ হয়েছে। ভৈরবী বল্লে, জনক! তোমার দেখছি এখনও জ্ঞান হয় নাই; তোমার এখনও স্ত্রী পুরুষ বোধ রয়েছে।

"কাজলের ঘরে যতই সেয়ানা হওনা কেন, একটু না একটু কাল দাগ গায়ে লাগবে।"

"দেখেছি, সংসারী ভক্ত যখন পূজা কচ্ছে গরদ পরে তখন বেশ ভাবটী। এমন কি জল-যোগ পর্য্যন্ত এক ভাব। তার পর নিজ মূর্ত্তি; আবার রজঃ তমঃ।

"সত্ত্ব গুণে ভক্তি হয়। কিন্তু ভক্তির সত্ত্ব, ভক্তির রজঃ, ভক্তির তমঃ আছে। ভক্তির সত্ত্ব, বিশুদ্ধ সত্ত্ব; এ হলে—ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুতেই মন থাকে না, কেবল দেহটা যাতে রক্ষা হয় ঐটুকু শরীরের উপর মন থাকে।

[পরমহংস ত্রিগুণাতীত ও কর্ম্মফলের অতীত। পাপ-পুণ্যের অতীত।]*

"পরমহংস তিন গুণের অতীত। তার ভিতর তিন গুণ আছে, আবার নাই। ঠিক বালক; কোন গুণের বশ নয়। তাই ছোট ছোট ছেলেদের পরমহংসরা কাছে আস্‌তে দেয়, তাদের স্বভাব আরোপ করবে বলে।

"পরমহংস সঞ্চয় করতে পারে না। এটা সংসারীদের পক্ষে নয়, তাদের পরিবারদের জন্য সঞ্চয় করতে হয়।

তান্ত্রিক ভক্ত। পরমহংসের কি পাপ-পুণ্য বোধ থাকে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেশব সেন ঐ কথা জিজ্ঞাসা করে-ছিল। আমি বল্লাম, আর ও বল্লে তোমার দল টল থাকবে না। কেশব বল্লে, তবে থাক্‌ মহাশয়।

"কি জান? তিনিই সুমতি দেন—তিনিই কুমতি দেন। তিতো মিঠে ফল কি নেই? কোন গাছে মিষ্ট ফল, কোন গাছে তিতো বা টক ফল। তিনি মিষ্ট আম গাছও করেছেন। আবার টক আমড়া গাছও করেছেন।"

তান্ত্রিক ভক্ত। আজ্ঞা হাঁ; পাহাড়ের উপর দেখা যায় গোলাপের ক্ষেত। যতদূর চক্ষু যায় কেবল গোলাপের ক্ষেত।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এ সব তাঁর মায়ার ঐশ্বর্য্য। সৎ, অসৎ; ভাল, মন্দ; পাপ, পুণ্য।

[তান্ত্রিক ভক্ত ও কর্ম্মফল, পাপপুণ্য, Sin and Responsibility.]

তান্ত্রিক ভক্ত। তবে কর্ম্মফল আছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাও আছে। ভাল কর্ম্ম করলে সুফল, মন্দ কর্ম্ম করলে কুফল; লঙ্কা খেসে ঝাল লাগবে না? এ সব তাঁর লীলা, খেলা।

তান্ত্রিক ভক্ত। আমাদের উপায় কি? কর্ম্মের ফল তো আছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। থাকলেই বা। তাঁর ভক্তের আলাদা কথা।

গান।

মনরে কৃষি কাজ জান না।
কালী নামের দাও রে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছে তো যম ঘেঁসে না॥
গুরুদত্ত বীজ রোপণ করে, ভক্তি বারি সেচে দেনা।
একা যদি না পারিস মন, রামপ্রসাদকে সঙ্গে নেনা॥

আবার গান গাইতেছেন।

গান।

শমন আসবার পথ ঘুচেছে।
আমার মনের সন্দ দূরে গেছে॥
ওরে আমার ঘরের নবদ্বারে চারি শিব চৌকি রয়েছে॥
এক খুঁটিতে ঘর রয়েছে, তিন রজ্জুতে বাঁধা আছে।
সহস্রদল কমলে শ্রীনাথ, অভয় দিয়ে বসে আছে॥

"কাশীতে ব্রাহ্মণই মরুক আর বেশ্যাই মরুক শিব হবে।

"যখন হরি নামে, কালী নামে, রাম নামে, চক্ষে জল আসে তখনই সন্ধ্যা কবচাদি কিছুই প্রয়োজন নাই। কর্ম্ম ত্যাগ হয়ে যায়। কর্ম্মের ফল তার কাছে যায় না।

ঠাকুর আবার গান গাইতেছেন।

গান।

ভাবিলে ভাবের উদয় হয়,
যেমনি ভাব, তেমনি লাভ, মূল সে প্রত্যয়।
কালীপদ সুধা হ্রদে চিত্ত যদি রয়, যদি চিত্ত ডুবে রয়।
তবে পূজা হোম যাগ যজ্ঞ কিছুই কিছু নয়।

ঠাকুর আবার গাইতেছেন—

গান

ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়;
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফিরে, কভু সন্ধি নাহি পায়।
গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চি কেবা চায়।
কালী কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফুরায়॥

"তাঁতে মগ্ন হলে আর অসৎ বুদ্ধি, পাপবুদ্ধি থাকে না।"

---

* মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
সগুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥
গীতা, গুণত্রয়বিভাগযোগ।

তান্ত্রিক ভক্ত। আপনি যা বলেছেন, 'বিদ্যার আমি' থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বিদ্যার আমি, ভক্তের আমি, দাস আমি, ভাল আমি থাকে। 'বজ্জাৎ আমি' চলে যায়। (হাস্য)

তান্ত্রিক ভক্ত। আজ্ঞা, আমাদের অনেক সংশয় চলে গেল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আত্মার সাক্ষাৎকার হলে সব সন্দেহ ভঞ্জন হয়।

[তান্ত্রিক ভক্ত ও ভক্তির তমঃ; ও অষ্ট সিদ্ধি]

"ভক্তির তমঃ আনো। বলো, কি! রাম বলেছি, কালী বলেছি, আমার আবার বন্ধন, আমার আবার কর্ম্মফল?"

ঠাকুর আবার গান গাইতেছেন—

গান

আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি,
আখেরে এ দীনে না তারো
কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী।
নাশি গো ব্রাহ্মণ হত্যা করি ভ্রূণ,
সুরাপান আদি বিনাশি নারী;
এ সব পাতক না ভাবি তিলেক
(ওমা) ব্রহ্মপদ নিতে পারি।

শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বলছেন—"**বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস**! গুরু বলে দিয়েছেন, রামই সব হয়ে রয়েছেন; 'ওহি রাম ঘট্ ঘট্‌মে লেটা।' কুকুর রুটী খেয়ে যাচ্ছে, ভক্তটী ঘিয়ের ভাঁড় হাতে করে দৌড়ুতে দৌড়ুতে বলছে, রাম! দাঁড়াও দাঁড়াও; রুটীতে ঘি মেখে দিই। এম্‌নি গুরু বাক্যে বিশ্বাস।"

"হাবাতে গুলোর বিশ্বাস হয় না। সর্ব্বাদাই সংশয়। আত্মার সাক্ষাৎকার না হলে সব সংশয় যায় না।*

"শুদ্ধা-ভক্তি, কোন কামনা থাকবে না; সেই ভক্তি দ্বারা তাঁকে শীঘ্র পাওয়া যায়।

"অণিমাদি সিদ্ধি, এ সব কামনা। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেছিলেন,—ভাই, অণিমাদি সিদ্ধাই একটীও থাক্‌লে ঈশ্বর লাভ হয় না; একটু শক্তি বাড়তে পারে।

তান্ত্রিক ভক্ত। আজ্ঞে, তান্ত্রিক ক্রিয়া আজকাল কেন ফলে না?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সর্ব্বাঙ্গীন হয় না; আর ভক্তিপূর্ব্বক হয় না; তাই ফলে না।

এইবার ঠাকুর কথা সাঙ্গ করিতেছেন। বলিতেছেন, **ভক্তিই সার**; ঠিক ভক্তের কোন ভয় ভাবনা নাই। মা সব জানে। বিড়াল ইঁদুরকে ধরে এক রকম করে; কিন্তু নিজের ছানাকে আর এক রকম করে ধরে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের মন্দিরে, রাখাল, মাষ্টার প্রভৃতি সঙ্গে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আজ কলিকাতায় বলরামের বাটীতে শুভাগমন করিয়াছেন। মাষ্টার কাছে বসিয়া আছেন; রাখালও আছেন। ঠাকুরের ভাবাবেশ হইয়াছে। আজ জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণা পঞ্চমী; সোমবার ২৫শে জুন, ১৮৮৩ খৃঃ, বেলা প্রায় ৫টা হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবাবিষ্ট)। দেখ, আন্তরিক ডাক্‌লে স্বস্বরূপকে দেখা যায়। কিন্তু যতটুকু বিষয় ভোগের বাসনা থাকে, ততটুকু কম পড়ে যায়।

মাষ্টার। আজ্ঞা, আপনি যেমন বলেন, ঝাঁপ দিতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (আনন্দিত হইয়া)। হঁয়া!

সকলে চুপ করিয়া আছেন, ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। দেখ, সকলেরই আত্মদর্শন হতে পারে।

মাষ্টার। আজ্ঞা, তবে ঈশ্বর কর্ত্তা, তিনি যে ঘরে যেমন করাচ্ছেন। কারুকে চৈতন্য কচ্ছেন, কারুকে অজ্ঞান করে রেখেছেন।

স্ব স্বরূপ দর্শন বা আত্ম দর্শনের উপায়, আন্তরিক প্রার্থনা। নিত্যলীলা যোগ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না। তাঁকে ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা করতে হয়। আন্তরিক হলে তিনি প্রার্থনা শুনবেনই শুনবেন।

* 'ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে'।

একজন ভক্ত। আজ্ঞা হাঁ, 'আমি' যে রয়েছে, তাই প্রার্থনা করতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। লীলা ধরে ধরে নিত্যে যেতে হয়। যেমন সিঁড়ি ধরে ধরে ছাদে উঠা। তার পর নিত্য থেকে লীলায় এসে থাকতে হয়। ভক্তি ভক্ত নিয়ে। এইটী পাকা মত।

"তাঁর নানা রূপ, নানা লীলা। ঈশ্বর লীলা, দেবলীলা, নরলীলা, জগৎলীলা ; তিনি মানুষ হয়ে, অবতার হয়ে, যুগে যুগে আসেন। প্রেম ভক্তি শিখাবার জন্য। দেখনা চৈতন্য দেব। অবতারের ভিতরেই তাঁর প্রেম ভক্তি আস্বাদন করা যায়। তাঁর অনন্ত লীলা—কিন্তু আমার দরকার প্রেম, ভক্তি। আমার ক্ষীরটুকু দরকার। গাভীর বাঁট দিয়েই ক্ষীর আসে। অবতার গাভীর বাঁট।

ঠাকুর কি বলিতেছেন, যে আমি অবতীর্ণ হইয়াছি। আমাকে দর্শন করলেই ঈশ্বর দর্শন করা হয়? চৈতন্য দেবের কথা বলিয়া ঠাকুর কি নিজের কথা ইঙ্গিত করিতেছেন?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নানাভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ও ভক্তমন্দিরে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর দেবালয়ে, শিব মন্দিরের সিঁড়িতে বসিয়া আছেন। জ্যৈষ্ঠ মাস, খুব গরম পড়িয়াছে। একটু পরে সন্ধ্যা হইবে। বরফ ইত্যাদি লইয়া মাষ্টার আসিয়াছেন, ও ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পাদ মূলে শিব মন্দিরের সিঁড়িতে বসিলেন।

[J. S. Mill and Sri Ramakrishna, Limitation of Man, a conditioned being]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। মণি মল্লিকের নাত জামাই এসেছিল। সে কি বয়ে * পড়েছে যে ঈশ্বরকে তেমন জ্ঞানী, সর্ব্বজ্ঞ বলে বোধ হয় না। তা হলে এত দুঃখ কেন? আর এই যে জীবের মৃত্যু হয়, একেবারে মেরে ফেল্‌লেই হয়, ক্রমে ক্রমে অনেক কষ্ট দিয়ে মারা কেন? যে বই লিখেছে সে নাকি বলেছে, যে আমি হলে এর চেয়ে ভাল সৃষ্টি কত্তে পারতাম।

মাষ্টার হাঁ করিয়া ঠাকুরের কথা শুনিতেছেন, ও চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। তাঁকে কি বুঝা যায় গা? আমিও কখন তাঁকে ভাবি ভাল, কখন ভাবি মন্দ। তাঁর মহামায়ার ভিতর আমাদের রেখেছে। কখন তিনি হুঁস করেন, কখন তিনি অজ্ঞান করেন। একবার অজ্ঞানটা চলে যায়; আবার ঘিরে ফেলে। পুকুরে পানা ঢাকা, ঢিল মারলে, খানিকটা জল দেখা যায়। আবার খানিকক্ষণ পরে পানা নাচতে নাচতে এসে সে জলটুকুও ঢেকে ফেলে।

"যতক্ষণ দেহবুদ্ধি ততক্ষণই সুখ দুঃখ, জন্ম মৃত্যু, রোগ শোক। দেহেরই এই সব, আত্মার নয়। দেহের মৃত্যুর পর তিনি হয় তো ভাল জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন—যেমন প্রসব বেদনার পর সন্তান লাভ। আত্ম জ্ঞান হলে সুখ দুঃখ, জন্ম মৃত্যু, স্বপ্নবৎ বোধ হবে।

"আমরা কি বুঝবো! এক সের ঘটীতে কি দশ সের দুধ ধরে? নুণের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়ে আর খপর দেয় না।

ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়া তস্মিন্‌দৃষ্টে পরাবরে।

সন্ধ্যা হইল; ঠাকুরদের আরতি হইতেছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘরে ছোট খাটটীতে বসিয়া জগৎ-মাতার চিন্তা করিতেছেন। রাখাল, লাটু, রামলাল, কিশোরী, প্রভৃতি ভক্তেরা আছেন; মাষ্টার আজ রাত্রে থাকিবেন। ঘরের উত্তরের ছোট বারাণ্ডায় ঠাকুর একটী ভক্তের সহিত নিভৃতে কথা কহিতেছেন। বলিতেছেন, 'প্রত্যূষে ও শেষ রাত্রে ধ্যান করা ভাল, ও প্রত্যহ সন্ধ্যার পর। কিরূপ ধ্যান করিতে হয় সাকার ধ্যান, অরূপ ধ্যান, সে সব বলিতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর পশ্চিমের গোল বারাণ্ডাটীতে বসিয়া আছেন, রাত্রি ৯টা হইবে। মাষ্টার কাছে বসিয়া আছেন, রাখাল প্রভৃতি এক একবার ঘরের ভিতর যাতায়াত করিতেছেন।

* John Stuart Mill's Auto-biography,

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। দেখ, এখানে যারা যারা আসবে সকলের সংশয় মিটে যাবে, কি বল ?

মাষ্টার। আজ্ঞা হাঁ।

এমন সময় গঙ্গাবক্ষে অনেক দূরে মাঝি নৌকা লইয়া যাইতেছে ও গান ধরিয়াছে। সেই গীত-ধ্বনি, মধুর অনাহত ধ্বনির ন্যায় অনন্ত আকাশের ভিতর দিয়া গঙ্গার প্রশস্ত বক্ষ যেন স্পর্শ করিয়া ঠাকুরের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিল। ঠাকুর অমনি ভাবাবিষ্ট! সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইয়াছে। ঠাকুর মাষ্টারের হাত ধরিয়া বলিতেছেন—"দেখ দেখ আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে! আমার গায়ে হাত দিয়ে দেখ?" তিনি সেই প্রেমাবিষ্ট কণ্টকিত দেহ স্পর্শ করিয়া অবাক হইয়া রহিলেন। 'পুলকে পূরিত অঙ্গ'। উপনিষদে যাঁর কথা আছে যে তিনি বিশ্বে আকাশে 'ওত প্রোত' হয়ে আছেন, তিনিই কি শব্দরূপে শ্রীরামকৃষ্ণকে স্পর্শ করিতেছেন! এই কি শব্দ ব্রহ্ম? *

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। যারা যারা এখানে আসে তাদের সংস্কার আছে; কি বল?

মাষ্টার। আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। অধরের সংস্কার ছিল।

মাষ্টার। তা আর বলতে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সরল হলে, ঈশ্বরকে শীঘ্র পাওয়া যায়। আর দুটো পথ আছে, সৎ অসৎ। সৎ পথ দিয়ে চলে যেতে হয়।

মাষ্টার। আজ্ঞা হাঁ, সুতোর একটু আঁস থাকলে সূচের ভিতর যাবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। খাবারের সঙ্গে চুল জিবে পড়লে মুখ থেকে সব শুদ্ধ ফেলে দিতে হয়।

মাষ্টার। তবে আপনি যেমন বলেন, যিনি ভগবান দর্শন করেছেন, তাঁকে অসৎ সঙ্গ কিছু করতে পারে না। খুব জ্ঞানাগ্নিতে কলা গাছটা পর্য্যন্ত জ্বলে যায়।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীকবিকঙ্কণ। অধরের বাটীতে চণ্ডীর গান।]

আর এক দিন ঠাকুর কলিকাতায় বেনেটোলায় অধরের বাড়ীতে আসিয়াছেন। আষাঢ় শুক্লা দশমী ১৪ই জুলাই, অধর ঠাকুরকে রাজনারাণের চণ্ডীর গান শুনাইবেন। রাখাল, মাষ্টার প্রভৃতি সঙ্গে আছেন। ঠাকুরদালানে গান হইতেছে। রাজনারাণ গান ধরিলেন—

গান।

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি।
আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি॥
কালী নাম মহামন্ত্র আত্মশির শিখায় বেঁধেছি।
আমি দেহ বেচে ভবের হাটে শ্রীদুর্গা নাম কিনে এনেছি॥
কালীনাম কল্পতরু হৃদয়ে রোপণ করেছি।
এবার শমন এলে হৃদয় খুলে দেখাবো তাই বসে আছি॥
দেহের মাঝে ছজন কুজন তাদের ঘরে দূর করেছি।
আমি জয়দুর্গা শ্রীদুর্গা বলে, যাত্রা করে বসে আছি॥

ঠাকুর খানিক শুনিতে শুনিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছেন ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগ দিয়া গান গাইতেছেন।

ঠাকুর আঁখর দিতেছেন, "ওমা, রাখ মা!" আঁখর দিতে দিতে একেবারে সমাধিস্থ! বাহ্য শূন্য, নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন! আবার গায়ক গাহিতেছেন—

গান।

রণে এসেছে কার কামিনী।
সজল-জলদ জিনিয়া অঙ্গ,
দশনে দোলে দামিনী॥

ঠাকুর আবার সমাধিস্থ!

গান সমাপ্ত হইলে ঠাকুরদালান হইতে গিয়া অধরের দ্বিতল বৈঠকখানায় ভক্ত সঙ্গে বসিলেন। নানা ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। কোন কোন ভক্ত অন্তঃসার ফল্গুনদী, উপরে ভাবের কোন প্রকাশ নাই, এ-সব কথাও হইতেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

[বলরামমন্দিরে ঈশ্বরদর্শন কথা। জীবনের উদ্দেশ্য।]

আর এক দিন বৈকালে বলরামের বাড়ী আসিয়াছেন। ঠাকুর অবতার-তত্ত্ব বুঝাইতেছেন।

---

* 'এতস্মিন্ নু খলু অক্ষরে গার্গি আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ।'
বৃহদারণ্যক্

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। অবতার লোক-শিক্ষার জন্য ভক্তি ভক্ত নিয়ে থাকে। যেমন ছাদে উঠে সিঁড়িতে আনাগোনা করা। অন্য মানুষ ছাদে উঠবার জন্য ভক্তিপথে থাকবে; যতক্ষণ না জ্ঞান লাভ হয়, যতক্ষণ না সব বাসনা যায়। সব বাসনা গেলেই ছাদে উঠা যায়। দোকানদার যতক্ষণ না হিসাব মেটে ততক্ষণ ঘুমায় না। খাতার হিসাব ঠিক করে তবে ঘুমায়।

(মাষ্টারের প্রতি) "ঝাঁপ দিলে হবেই হবে। ঝাঁপ দিলে হবেই হবে।"

"আচ্ছা, কেশব সেন শিবনাথ এরা যে উপাসনা করে তোমার কিরূপ বোধ হয়?

মাষ্টার। আজ্ঞা, আপনি যেমন বলেন, তাঁরা বাগান বর্ণনাই করেন, কিন্তু বাগানের মালিককে দর্শন করার কথা খুব কমই বলেন। প্রায় বাগান বর্ণনায় আরম্ভ আর উহাতেই শেষ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠিক! বাগানের মালিককে খোঁজা আর তাঁর সঙ্গে আলাপ করা এইটেই কাজ। **ঈশ্বর দর্শনই জীবনের উদ্দেশ্য।***

বলরামের বাড়ী হইয়া অধরের বাড়ী আসিয়াছেন। সন্ধ্যার পর অধরের বৈঠকখানায় নাম সঙ্কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতেছেন। বৈষ্ণবচরণ কীর্ত্তনীয়া গান গাইতেছেন। অধর, মাষ্টার, রাখাল প্রভৃতি উপস্থিত আছেন।

অধরের বাড়ীতে কীর্ত্তনানন্দ ও অধরের প্রতি উপদেশ।

কীর্ত্তনান্তে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া বসিয়াছেন, রাখালকে বলিতেছেন, "এখানকার শ্রাবণ মাসের জল নয়। শ্রাবণ মাসের জল খুব হুড়-হুড় করে আসে আবার বেরিয়ে যায়। এখানে পাতাল ফোড়া শিব, বসান শিব নয়। তুই রাগ করে দক্ষিণেশ্বর থেকে চলে এলি; আমি মাকে বল্লুম, মা এর অপরাধ নিস্‌নি।" শ্রীরামকৃষ্ণ কি অবতার? পাতাল ফোড়া শিব?

আবার অধরকে ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন—বাপু! তুমি যে নাম করেছিলে তাই ধ্যান কোরো। এই বলিয়া অধরের জিহ্বা অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিলেন ও জিহ্বাতে কি লিখিয়া দিলেন। এই কি অধরের দীক্ষা হইল?

আর এক দিন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে দক্ষিণ-পূর্ব্ব বারাণ্ডার সিঁড়িতে বসিয়া আছেন। সঙ্গে রাখাল, মাষ্টার, হাজরা। ঠাকুর রহস্য করিতে করিতে বাল্যকালের অনেক কথা বলিতেছেন।

[দক্ষিণেশ্বরে সমাধিস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার জগন্মাতার সঙ্গে কথা।]

ঠাকুর **সমাধিস্থ**। সন্ধ্যা হইয়াছে। নিজের ঘরে ছোট খাটটীতে বসিয়া আছেন ও জগৎ মাতার সহিত কথা কহিতেছেন। বলিতেছেন, 'মা! এত হাঙ্গাম করিস কেন? মা ওখানে কি যাব? আমায় নিয়ে যাস্ তো যাব।"

ঠাকুরের কোন ভক্তের বাড়ী যাবার কথা হইয়াছিল। তাই কি জগন্মাতার আজ্ঞার জন্য এইরূপ বলিতেছেন?

জগৎ-মাতার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ আবার কথা কহিতেছেন। এবার কোন অন্তরঙ্গ ভক্তের জন্য বুঝি প্রার্থনা করিতেছেন। বলিতেছেন—"মা, ওকে নিখাদ করো। আচ্ছা মা, ওকে এক কলা দিলি কেন?

ঠাকুর একটু চুপ করিয়াছেন। আবার বলিতেছেন, 'ও! বুঝেছি, এতেই তোর কাজ হবে।' যোলকলার এক কলা শক্তিতে তোর কাজ অর্থাৎ লোকশিক্ষা হবে এই কথা কি বলিতেছেন?

এইবার ভাবাবিষ্ট অবস্থায় মাষ্টার প্রভৃতিকে আদ্যাশক্তি ও অবতার-তত্ত্ব বলিতেছেন।

"**যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি**। তাঁকেই মা বলে ডাকি। যখন তিনি নিষ্ক্রিয় তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি, আবার যখন সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার কার্য্য করেন, তখন তাঁকে শক্তি বলি। যেমন স্থির জল, আর জলের ঢেউ হয়েছে। শক্তি লীলাতেই অবতার। অবতার প্রেমভক্তি শিখাতে আসেন। অবতার যেন গাভীর বাঁট। দুগ্ধ, বাঁটের ভিতর থেকেই পাওয়া যায়।

"মানুষে তিনি অবতীর্ণ হন। যেমন ঘুটীর ভিতর মাছ এসে জমে।

ভক্তেরা কেহ কেহ ভাবিতেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ কি অবতার পুরুষ? যেমন শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্যদেব, Christ?

---

* 'আত্মা বা আর দ্রষ্টব্যো, শ্রোতব্যো, মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ'
—বৃহদারণ্যক।

হাইফেন

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩)

বিকালবেলা মলয় ও বিলোপ সমুদ্রতীরে বেড়াইতে আসিল। সমুদ্রবেলায় পা দিয়াই মলয় বলিয়া উঠিল—দূরাদ্ অয়শ্চক্রনিভশ্চ তন্বী আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশের্...

বাধা দিয়া হাসিয়া বিলোপ বলিল—থাক, আর সংস্কৃত কপ্‌চাতে হবে না। ভাগ্যে বঙ্কিম-বাবু ঐ শ্লোকটা কপালকুণ্ডলায় তুলেছিলেন তাই সস্তায় সংস্কৃত কাব্যের বিদ্যা জাহির কর্‌ছ!

মলয় হাসিয়া বলিল—রবি-বাবু যদিও রাজা ও রাণীর দেবদত্তকে দিয়ে বলিয়েছেন—"অনুস্বর ধনুঃশর নহে মহারাজ, কেবল টঙ্কার মাত্র!" কিন্তু ঐ টঙ্কারেই ধনুষ্টঙ্কার হবার জোগাড় হয়, কাছে ঘেঁষি কি করে'!

বিলোপ উৎসুক দৃষ্টি বুলাইয়া বেলাভূমিতে সঞ্চরমান নরনারীদের মধ্যে কাহাকে যেন খুঁজিতে খুঁজিতে অন্যমনস্ক ভাবে বলিল—হুঁ।

মলয় বিলোপের পিঠে এক চাপড় মারিয়া বলিল—হুঁ কি? হুঁশ লোপ পেয়ে গেল সমুদ্র দেখে!

বিলোপের চমক ভাঙিল, সে হাসিয়া বলিল—না, বেহুঁশ এখনো হই নি। দেখ্‌ছিলাম কোনো চেনা লোক কাউকে দেখ্‌তে পাই কি না।

মলয় বলিয়া উঠিল—দোহাই তোমার, সেই বুড়ো-ফুড়ো জুটিয়ে জ্বালাতন কোরো না......

বিলোপ আবার সমুদ্রবেলার দুই দিকে চোখ বুলাইয়া বলিল—"ভয় নাই ওরে ভয় নাই. কিছু নাই তোর ভাবনা!"

দুই বন্ধু হাসিতে লাগিল। কিন্তু বিলোপের হাসির অন্তরালে হতাশার একটু বিষাদ গা-ঢাকা হইয়া লুকাইয়া ছিল, সে যাহাকে দেখিতে পাইবার আশা করিয়া আসিয়াছিল তাহাকে সে কোথাও দেখিতে পাইল না। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিয়া উভয়ে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

পরদিন প্রত্যূষে বিলোপ আবার সমুদ্রতীরে গিয়া উপস্থিত হইল; বহু নরনারী সূর্য্যোদয়ের অপেক্ষা করিতেছিল; সে অপেক্ষা করিতে লাগিল অপর কাহারো উদয়ের। কিছুক্ষণ প্রতীক্ষার পর সে দেখিল দূরে ত্রিলোক-বাবু ও মৃদুলার আবছায়া আকৃতি উদয় হইয়া অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। বিলোপ উৎফুল্ল হইয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া চলিল। ত্রিলোক ও মৃদুলার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সে দুইজনকেই পরে পরে নমস্কার করিল। ত্রিলোক প্রতিনমস্কার করিয়া বলিলেন—খুব ভোরে ওঠার অভ্যাস আছে দেখ্‌ছি! বন্ধুর ঘুম আজও ভাঙে নি?

বিলোপ হাসিয়া বলিল—না।

মৃদুলাও মৃদু হাস্য করিল।

ঠিক এই সময় পূর্ব্ব চক্রবালে সমুদ্রের জলের উপর নিকষপাষাণে সুবর্ণরেখার ন্যায় অরুণোদয়ের স্বর্ণপ্রভা প্রকাশমান হয়ে উঠ্‌ল এবং অম্‌নি কে একজন পুরুষ স্ত্রীকণ্ঠের ন্যায় সূক্ষ্ম উচ্চ অথচ কোমল মিষ্ট স্বরে গাহিয়া উঠিল—"বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি!"

এই গানের প্রথম পংক্তিটি শুনিয়াই ত্রিলোক বলিয়া উঠিলেন—বেদের মধ্যে উষার বর্ণনাতেও ঠিক এই রকম কথাই বলা হয়েছে—নর্ত্তকীর ন্যায় শোভনভূষণা উষা বক্ষাবরণ উন্মোচন কর্‌ছে......

বিলোপ বলিল—সমুদ্রে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত দেখ্‌লে অকবিও কবি হয়ে ওঠে।

ত্রিলোক জিজ্ঞাসা করিলেন—কাল সন্ধ্যায় কি এখানে আসা হয়েছিল?

ত্রিলোক বিলোপের সঙ্গে কথোপকথনে কাল হইতেই কৌশলে আপনি ও তুমি সর্ব্বনাম পরিহার করিয়া কর্ম্মবাচ্য ও ভাববাচ্য প্রয়োগ করিতেছেন দেখিয়া বিলোপ মনে মনে হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ এসেছিলাম। আপনাদের ত দেখ্‌তে পাই নি?

ত্রিলোক বলিলেন—কাল্‌ প্রথম শ্রীক্ষেত্রে এসেছি, কাল সকালেও পুরুষোত্তম-দর্শনে গিয়েছিলাম, সন্ধ্যাকালেও গিয়েছিলাম, তাই এদিকে আস্‌তে পারি নি।......সূর্য্যাস্ত দেখা হয়ে উঠ্‌বে না বোধ হয়, তখন মন্দিরে আরতি দেখ্‌তে যেতে হয়·····

বিলোপের মনে পড়িল গুরু নানকের গানের রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ—

"তাঁরে আরতি করে চন্দ্র তপন,
দেব মনুজ বন্দে চরণ,
আসীন সেই বিশ্বশরণ
তাঁর জগত-মন্দিরে!"

বিলোপকে নীরব থাকিতে দেখিয়া ত্রিলোক জিজ্ঞাসা করিলেন—বাবাজীর আমাদের বাড়ীতে কখন শুভাগমন হবে?

বিলোপ একটু কুণ্ঠিতভাবে হাসিয়া বলিল—আমার বন্ধুটিকে রাজী করা যাচ্ছে না।

ত্রিলোক আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন?

মৃদুলার দৃষ্টিতেও কৌতূহল ফুটিয়া উঠিল।

বিলোপ কুণ্ঠিত ভাবে বলিল—সে ভারি মুখচোরা কুণো ধরণের লোক; নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ কর্‌তে ভয় পায়······

ত্রিলোক অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। মৃদুলাও মৃদু হাস্য করিল। বিলোপ লজ্জিত হইল।

ত্রিলোক বলিলেন—আচ্ছা, তা হলে আমিই একদিন গিয়ে তাঁর নতুনের ভয় ভাঙিয়ে দেবো। রবীন্দ্রনাথ যে যুগের কবি সে যুগের যুবকেরা নতুনকে ভয় করে এ বড় অসঙ্গত!

ত্রিলোক আবার অট্টহাস্য করিলেন।

বিলোপ বলিল—আপনি রবীন্দ্রনাথেরও খবর রাখেন?

ত্রিলোক বিস্ময়পূর্ণ স্বরে বলিলেন—রাখ্‌ব না? অত বড় কবি কোনো কালে কোনো দেশে জন্মেছে, না শীঘ্র জন্মাবার সম্ভাবনা আছে? বাংলার প্রতি ভগবানের বিশেষ আশীর্ব্বাদ রবীন্দ্রনাথ রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন!

বৃদ্ধের মুখে তারুণ্যের পুরোহিত কবীন্দ্রের প্রশংসা শুনে বিলোপ যেমন আশ্চর্য্য হইল তেমনি আনন্দিতও হইল। সে বলিল—আপনি আমাদের বাসায় আগে আস্‌বেন তা হতে পারে না। আমার বন্ধুকে যদি না নিয়ে যেতে পারি ত আমি একলাই যাব; তার পর না হয় আপনি একদিন আমাদের পায়ের ধূলো দিতে যাবেন।

ত্রিলোক বলিলেন—তা হলে এখনই একসঙ্গে যাওয়া যাক না। এতে কি আপত্তি আছে।

বিলোপ মৃদুলার হাস্যোৎফুল্ল মুখের দিকে চকিতে একবার চাহিয়া লইয়া বলিল—না, আমার আর আপত্তি কি?

ত্রিলোক ও মৃদুলা চলিতে আরম্ভ করিল। বিলোপ সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

(৪)

বিলোপ মৃদুলার ছায়ার মতন মৃদুলা ও ত্রিলোকের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বাড়ীতে গিয়া পৌঁছিল। বাড়ীর বৈঠকখানায় গিয়া ত্রিলোক বিলোপকে বলিলেন—বসো বাবা বসো। পুরীতে যতদিন থাকা হবে, ততদিন রোজই আস্‌তে হবে।

বিলোপ ত্রিলোকের কথা শুনিয়া কেবল একটু হাসিল। ত্রিলোক ও মৃদুলা মনে করিল তাহা সম্মতির হাস্য; কিন্তু বিলোপ হাসিল অন্য কারণে;—ত্রিলোক বরাবর তাহার সহিত প্রথম পুরুষে কথা কহিয়া আসিতেছেন, কিন্তু তাহাকে বসিতে অনুরোধ করিবার বেলা মধ্যম পুরুষের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াও তুমি কর্ত্তাপদটিকে উহ্য রাখিয়া দিলেন এবং পরের বাক্যেই আবার প্রথম পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; তিনি কিছুতেই সঙ্কোচ কাটাইয়া বিলোপকে স্পষ্ট তুমি বলিয়া সম্বোধন করিতে পারিতেছেন না, ইহা বিলোপের নিকট বিশেষ কৌতুককর মনে হইল।

ত্রিলোক বিলোপকে নির্ব্বাক্‌ দেখিয়া মৃদুলাকে বলিলেন—মৃদুল, বিলোপবাবুকে তোমার বেদ-সম্বন্ধে থিসিস্‌টা দেখাও, আমি এখনই আস্‌ছি।

ত্রিলোক ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। বিলোপের মনের মধ্যে একটু মৃদু আন্দোলন বহিয়া গেল—মৃদুলার

সঙ্গে সে একা এক ঘরে আছে। মৃদুলা ঘরের অপর পার্শ্বে অবস্থিত একটি বইএর তাকের কাঁছে লীলামন্থর গতিতে অগ্রসর হইয়া গেল। যাইবার সময় মৃদুলার এলো চুলের খোঁপা হইতে একটি লোহার কাঁটা খসিয়া মেঝেতে পাতা শতরঞ্জীর উপর নিঃশব্দে পড়িয়া গেল। বিলোপ একবার পিছন দিকে ও আশে-পাশে চকিতে চাহিয়া দেখিল কেহ কোথাও নাই, তার পর মৃদুলার দিকে দেখিল সে নত হইয়া বইএর স্তূপের তলা হইতে এক তাড়া কাগজের ফাইল টানিয়া বাহির করিতে ব্যাপৃত আছে; তখন বিলোপ চেয়ার হইতে ঝুঁকিয়া টপ করিয়া সেই কবরীচ্যুত কাঁটাটি তুলিয়া লইয়া পকেটে পূরিল এবং নিতান্ত ভালোমানুষটির মতন বসিয়া রহিল, কিন্তু চুরি করিয়া তাহার হৃৎপিণ্ড ধক্-ধক্ করিতেছিল, মৃদুলার চুলের কাঁটা বিলোপের পকেটে থাকিয়াও তাহার মনে বিঁধিতেছিল।

মৃদুলা এক তাড়া কাগজের ফাইল বাহির করিয়া লজ্জাকুণ্ঠিত মুখে বিলোপের সম্মুখে আসিয়া সেই কাগজগুলি টেবিলের উপর রাখিল। বিলোপ মুগ্ধ দৃষ্টিতে একবার মৃদুলার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—অনেক লিখেছেন ত!

মৃদুলা হাসিমুখে নম্র-কুণ্ঠিত-কণ্ঠে বলিল—যার ধার থাকে না তাকে ভারে কাট্‌তে হয়।

বিলোপ হাসিয়া বলিল—কিন্তু তা ত ঠিক নয়, এতে quantityর সঙ্গে qualityর মণিকাঞ্চন যোগ হয়েছে।

মৃদুলা কৌতুক অনুভব করিয়া বলিল—আপনি না পড়েই যে আমাকে মস্ত সার্টিফিকেট দিয়ে দিলেন। এ যেন খবরের কাগজওয়ালাদের পুস্তক সমালোচনা।

বিলোপ লজ্জা পাইয়া বলিল—না না, আমি ত পড়্‌বই সবটা...

মৃদুলা আবার হাসিয়া বলিল—না না, সবটা আপনাকে পড়্‌তে হবে না—সে যে ভয়ানক infliction হবে। আপনি ভব্যতার খাতিরে কিছু বল্‌তে পার্‌বেন না, কিন্তু মনে মনে ভাব্‌বেন ভালো এক "বৈকুণ্ঠের খাতা"র পাল্লায় পড়েছি। কারো সঙ্গে আলাপ হলেই বাবা তাঁকে ধরে' আমার এই আবর্জ্জনা না ঘাঁটিয়ে ছাড়্‌বেন না—তিনি ভাবেন তাঁর মেয়ে তাঁর প্রিয় বলে' আর সকলেরই প্রিয়; আর তার সব-কিছু সকলেরই ভালো লাগ্‌বে। বাবার সঙ্গে আপনার দৈবাৎ পরিচয় হয়ে গেছে; আপনি একটু সাবধান থাক্‌বেন, তাঁর মেয়ের গুণগরিমার গল্প শুন্‌তে শুন্‌তে আপনার কান ঝালাপালা হয়ে যাবে।

মৃদুলা তাহার বাক্য সমাপ্ত করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বিলোপ এতক্ষণ মুগ্ধ স্মিত দৃষ্টিতে মৃদুলার বাক্‌পটু মুখের দিকে তাকাইয়া ছিল; সে হাসিয়া বলিল—আপনার প্রবন্ধটি আমাকে পড়্‌তেই হবে, আপনার বাবার ভালো লাগে বলে' নয়, আমার ভালো লাগ্‌বে বলে'...

বিলোপ এই কথা বলিয়াই নিজের কথা শুনিয়া নিজেই চম্‌কাইয়া উঠিল, ইহা তাহার কানে যেন প্রণয় প্রকাশের মতন শুনাইল; তখন সে মৃদুলাও পাছে ঐরূপ মনে করে এই ভয়ে তাড়াতাড়ি পূর্ব্ব কথার উপসংহার-স্বরূপ বলিল—আমার নিজের পরীক্ষার পাঠ্য বিষয় সম্বন্ধে আমার আগ্রহ আর কৌতূহল হওয়া ত স্বাভাবিক।

এই সময় ত্রিলোক সেই ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে বলিলেন—হ্যাঁ, ওতে অনেক তথ্য একত্র সংগৃহীত পাওয়া যাবে; দেশ-বিদেশের যত পণ্ডিত বেদ সম্বন্ধে যা-কিছু বলেছেন...

মৃদুলা বিলোপের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—আপনি বসুন, আমি আপনার জন্যে চা নিয়ে আসি।

মৃদুলা সাবলীল গতিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ত্রিলোক বলিতে লাগিলেন—সেই সমস্ত তথ্যই মৃদু এই প্রবন্ধে একত্র করেছে, তাঁদের মত আলোচনা করেছে এবং নিজের মতও বহু স্থলে প্রকাশ করেছে। এটি মনোযোগ করে' পড়্‌লে বিশেষ উপকার হবার কথা।

বিলোপ ত্রিলোকের কথা শুনিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিল এবং মৃদুলার প্রবন্ধের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিল—আমি প্রত্যহ এসে ক্রমশঃ এর সমস্তটাই পড়্‌ব।

ত্রিলোক পরম পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন—আমি প্রথম আলাপেই জান্‌তে পেরেছি যে একজন যথার্থ বিদ্যানুরাগীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হবার সৌভাগ্য ঘট্‌ল। প্রত্যহ এসে এটি পড়লে আমরা অত্যন্ত সন্তোষ লাভ কর্‌ব।

মৃদুলা একটা কাঠের ট্রেতে বসাইয়া এক বাটি চা ও এক রেকাবি জলখাবার লইয়া সেই ঘরে ফিরিয়া আসিতেছে

দেখিয়া বিলোপ হাসিয়া বলিল—আমার নিত্য আস্‌বার প্রলোভন ক্রমশই বেশী হয়ে উঠ্‌ছে।

মৃদুলা ঘরে প্রবেশ করিয়া বিলোপের দিকে চাহিয়া হাসিল; এবং কন্যাকে খাদ্য পানীয় লইয়া উপস্থিত হইতে দেখিয়া ত্রিলোক অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন।

বিলোপ চা ও মিষ্টান্নের সদ্‌ব্যবহার করিয়া বলিল—আজ এখন আমি আসি, আমার সেই বন্ধুটি আমার অপেক্ষায় বসে' থাক্‌বেন। কাল থেকে তাঁকে বলে' আমি নিয়মিত আস্‌ব।

ত্রিলোক বলিলেন—তাঁকে সুদ্ধ নিয়ে এলেই ত বেশ হয়।

বিলোপ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ নেই। তবে এখানে আরও যে-সব মধুর সামগ্রীর স্বাদ আমি পেলাম তাদের সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ পক্ষপাত আছে। কিন্তু আমার সেই খেয়ালী বন্ধুটির ভালো-লাগা যেমন প্রবল, ভালো-না-লাগাও আবার তেমনি প্রবল; কাজেই এখন বল্‌তে পার্‌ছি না ভালো-লাগা আর ভালো-না-লাগা ছুটো তুল্য-প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে শেষকালে কে জয়ী হবে।

ত্রিলোক হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—তাঁর কথা যতই শুন্‌ছি ততই তাঁকে দেখ্‌বার আগ্রহ বাড়্‌ছে। আচ্ছা, পর্ব্বত যদি মহম্মদের কাছে নিতান্তই না আসেন তবে মহম্মদই পর্ব্বতের কাছে যাবেন, এ কথা তাঁকে জানিয়ে রাখা হয় যেন।

বিলোপ হাসিমুখে ত্রিলোক ও মৃদুলাকে নমস্কার করিয়া সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। সেখান হইতে বাহির হইয়াই সে মৃদুলার মাথার কাঁটাটি পকেট হইতে বাহির করিয়া একবার দুই হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিল এবং তার পরে নিজের বুকের পকেটে রাখিয়া দিল। হোটেল পর্য্যন্ত সমস্ত পথটাই তার দৃষ্টিতে ও চিন্তায় মৃদুলার রূপ ও কথাই প্রধান হইয়া রহিল।

(ক্রমশঃ)

বিবিধ-প্রসঙ্গ

গৃহ-চিকিৎসা

ডাক্তার শ্রীনিবারণচন্দ্র মিত্র, এম-বি

প্রথম ভাগ—ফার্ষ্ট এড (First Aid)

নারী-শিক্ষা-সমিতি ও ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের ট্রেনিং বিভাগের পাঠ্য বিষয় ফার্ষ্ট এড ও হাইজিন, বিদ্যাসাগর বাণী-ভবনের নার্সিং বিভাগের জন্য এবং সেণ্ট জন এম্বুল্যান্সএর পরীক্ষক রূপে এই বিষয়গুলি গত চারি বৎসর যাবৎ আলোচনা করিতে হইয়াছিল। তাহাই এখন প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইল। যে সব স্থানে ডাক্তার দুর্লভ বা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে চিকিৎসকের সাহায্য পাওয়া যায় না, সেই সব স্থলের অসুবিধার উপর লক্ষ্য রাখিয়া অনেক বিষয় নির্ব্বাচিত পাঠ্য তালিকা হইতে ছাড়াইয়া যাইতে হইয়াছে।

শারীরিক বিপদের প্রথম অবস্থায় যাহা ব্যবস্থা করা যায়, তাহাকে ফার্ষ্ট এড (First aid) বলা হয়। যদিও ইহা পুরা রকমের ডাক্তারী নয়, তথাপি এই ব্যবস্থাই সময়ে সময়ে রোগীর জীবন রক্ষা করে। কিন্তু এই প্রকার ব্যবস্থা করিতে গেলে শরীরের গঠন বিষয়ে কিছু জ্ঞান থাকা চাই। আকস্মিক বিপদের সময় নিম্নলিখিত কথাগুলি মনে রাখিবে:—

১ নিজের মন স্থির রাখিবে।

২ অবস্থা বিশেষে ব্যবস্থা করিবে।

৩ রোগীকে আশ্বাস দিবে এবং

৪ দরকার বুঝিলে ডাক্তার ডাকাইবে।

কিন্তু এই সব ব্যবস্থা সুচারুরূপে করিতে হইলে, শরীরে কোথায় কি আছে অর্থাৎ এনাটমির (anatomy) জ্ঞান ও উহারা কি কাজ করিতেছে অর্থাৎ ফিজিয়লজীর (Physiology) জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

শারীর-তত্ত্ব (anatomy)

আমাদের শরীর নিম্নলিখিত উপাদানে গঠিত; যথা:—

(১) অস্থিকঙ্কাল ও তাহাদের সন্ধিস্থল।

(২) মাংসপেশী যাহার দ্বারা অঙ্গচালনা সম্ভব হয়।

(৩) মস্তিষ্ক ও নাড়ীসমূহ যেখানে কার্য্য, ইচ্ছা ও অনুভব করিবার শক্তি নিহিত আছে।

এই সব কাজ শরীরের মধ্যে সর্ব্বদাই চলিতেছে। যন্ত্র সর্ব্বক্ষণ চলিলে কিছু কিছু ক্ষয় হয়। এই ক্ষয় পূরণ করা যেমন দরকার, তেমনই ক্ষয়প্রাপ্ত ময়লাগুলি যাহাতে শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা থাকা চাই। আমাদের নিত্য আহার্য্য বস্তু হইতে প্রস্তুত রক্ত শরীরে চলাফেরা করিয়া দেহের যাবতীয় অংশের পরিপুষ্টি করে। এই কাজ

(৪) হৃৎপিণ্ড (Heart—হার্ট) ও শিরা (Blood vessels—ব্লড ভেসেলস্) সমূহের দ্বারা সম্পাদিত হয়। তথা হইতে

(৫) রক্ত ফুসফুসে (Lungs—লঙ্গ্‌স্) গিয়া প্রতিক্ষণে নিশ্বাসের সহিত গৃহীত বায়ুস্থিত অক্সিজেন দ্বারা পরিস্কৃত হয়।

(৬) যে প্রণালী দিয়া শরীরের ময়লা মলমূত্রাদি বাহির হইয়া যায়। ইহা ছাড়া (৭) সন্তানোৎপাদনের যন্ত্র।

ও পরিশেষে (৮) চর্ম্ম—যাহা আমাদের শরীরের আচ্ছাদনের কাজ করে, তাপ রক্ষা করে এবং লোমকূপ দিয়া ঘর্ম্মরূপে ময়লা বাহির হইবার সুবিধা করিয়া দেয়।

শরীরের অস্থি—ইংরাজীতে অস্থিকে 'বোন' (Bone) বলে। লম্বা, ছোট, চওড়া সোজা বাঁকা ইত্যাদি নানা রকমের মোট ২০৬টী হাড় আছে ; যথা :—

মাথার খুলি ও মুখের হাড়	স্কাল (Skull)	২২
মেরুদণ্ডের ছোট ছোট হাড়	স্পাইন বা ব্যাকবোন	২৬
পাঁজরা (১২টি করিয়া দুইদিকে	(Spine বা Backbone)	২৪
ষ্টার্ণাম (Sternum) বুকের সম্মুখ ভাগের হাড়		১
হায়অয়েড (Hyoid) বা গলার হাড় বিশেষ		১
হাতের		৬৪
পায়ের		৬২
কাণের ভিতরকার ছোট ২ হাড়		৬
		২০৬
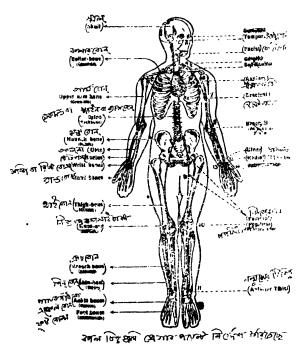
শরীরের অস্থি ও শিরা এবং তাহাদের নাম

জয়েণ্ট (Joint).—দুই বা ততোধিক হাড়ের সংযোগ স্থলকে জয়েণ্ট বা সন্ধিস্থল এবং বন্ধনীগুলাকে লিগামেণ্ট (ligament) বলে।

এইবার যন্ত্রগুলির বিষয়ে আলোচনা করা যাউক।

রক্ত চলাচলের যন্ত্র ও তাহার ক্রিয়া। ইহার মধ্যে (ক) হৃৎপিণ্ড, (খ) রক্তবহ নালী ও (গ) রক্তই প্রধান বিষয়।

হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস
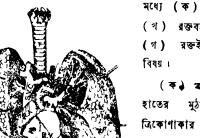
(ক) হৃৎপিণ্ড—হাতের মুঠার প্রমাণ ত্রিকোণাকার একটা থলিয়া। ইহার সম্মুখ ভাগে ষ্টার্ণাম, পশ্চাতে মেরুদণ্ড এবং দুই পাশে ফুসফুস। ইহা মিনিটে ৭২ বার স্পন্দিত হয়—যেন একটা কল চলিতেছে। ইহার বাম ও দক্ষিণ এই দুই ভাগ আছে। দক্ষিণ দিকে দূষিত রক্ত আসিয়া জমা হয় ও পরে ফুসফুসে পরিষ্কার হইবার জন্য চলিয়া যায় ; তথা হইতে পরিষ্কৃত হইয়া বাম ভাগে আসে এবং প্রতি স্পন্দনের জোরে শরীরের সর্ব্বস্থানে ছড়াইয়া পড়ে।

(খ) শিরা—হৃৎপিণ্ড হইতে অনেকগুলা নল বাহির হইয়াছে। তাহার ভিতর দিয়া রক্ত চলাফেরা করে। ইহা তিন প্রকার : যথা :—

(১) আর্টারী (artery) ইহাতে পরিস্কৃত রক্ত থাকে।

(২) ভেন (vein) „ দূষিত „ থাকে।

(৩) ক্যাপিলারী (capillary)—ইহারা খুব ছোট ছোট—চুলের ন্যায় সরু।

(গ) রক্ত—লাল রঙের তরল পদার্থ। শিরা হইতে বাহির হইলে জমিয়া যায়। রক্তের সহিত যতক্ষণ অক্সিজেন (oxygen) মিশ্রিত থাকে, ততক্ষণ তাহা লাল ; এবং অক্সিজেন অভাবে নীলাভ হইয়া পড়ে।

আমাদের শরীরের দুইটি অভাব পূরণের নিমিত্ত রক্ত চলাচলের প্রয়োজন হয়। প্রথমটি খাদ্য দ্রব্য সরবরাহ করা ; আর দ্বিতীয়টি অক্সিজেন যোগান। আমরা নিশ্বাসের দ্বারা প্রতিমুহূর্ত্তে বাতাস হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করি।

রক্ত চলাচলের সময় শিরার ভিতর রক্তের ঢেউ উঠে। আমরা ইহার স্পন্দন অঙ্গুলী দ্বারা অনুভব করিতে পারি; অর্থাৎ চলিত কথায় যাহাকে নাড়ি দেখা বলা হয়। ইহা বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন প্রকার হয়; যথা—

নবজাত শিশুর	প্রতি মিনিটে	১৪০
দুই বৎসরের „	„ „	১১০
৫ „	„ „	১০০
১২।১৩		৮৬

ইহার পর ক্রমশঃ কম হইয়া ২০।২১ বৎসরে প্রতি মিনিটে ৭২ বার হয়। ইহা সাধারণের নাড়ীর বেগ। ভয়, মানসিক উত্তেজনা, শারীরিক পরিশ্রমে নাড়ীর গতি দ্রুত হয়।

নিশ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্র ও তাহার ক্রিয়া

নিশ্বাস নাক বা মুখের ভিতর দিয়া গলার বাতাসের নলীর মধ্যে প্রবেশ করে। সেখান হইতে ফুসফুসে যায়। ফুসফুস দেখিতে কতকটা ধুন্দুলের শুষ্ক ছোবড়ার বা স্পঞ্জের ন্যায়। হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেক স্পন্দনের সঙ্গে উহার দক্ষিণ ভাগ হইতে শরীরের দূষিত রক্ত আসিয়া তথায় জমা হয়। এই রক্তে অক্সিজেন নাই। আমরা নিশ্বাসের সহিত বায়ু হইতে অক্সিজেন লইয়া এই ফুসফুসের রক্তের সহিত মিশাইয়া দিই। তখন রক্ত আবার লাল আকার ধারণ করিয়া বিশুদ্ধ অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের বাম দিকে ফিরিয়া যায় এবং প্রত্যেক স্পন্দনের সহিত বিশুদ্ধ রক্ত শরীরের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। আমরা সাধারণতঃ মিনিটে ১৫—১৮ বার নিশ্বাস লইয়া থাকি। সদ্যোজাত শিশুর নিশ্বাস প্রতি মিনিটে ২৫—৩০ বার।

মস্তিষ্ক ও নাড়ী

মস্তিষ্ক বা মাথার ঘি এবং মেরুদণ্ডের দুই পাশ দিয়া টেলিগ্রাফের তারের ন্যায় কতকগুলা সাদা সূতা বা নার্ভ (nerve) বাহির হইয়াছে। ইহাই নাড়ী। ইহা দুই প্রকার (ক) যাহারা সংবাদ বহন করিয়া আনে এবং (খ) যাহারা আজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করে। মস্তিষ্ক মাথার খুলির ভিতর থাকে। এই মস্তিষ্কই আমাদের সকল কার্য্য, ইচ্ছা ও শক্তির অনুভূতির মূল; আমরা এইখানেই শরীরের যাবতীয় অংশ হইতে নাড়ী দ্বারা আনীত সংবাদ অনুভব করি এবং তদনুযায়ী কার্য্য করি। পায়ে মশা বসিয়াছে; আমরা তাহা না দেখিলেও বুঝিতে পারি; এবং বসিবামাত্রই এই খবর পাই। তখন মস্তিষ্ক হাতের উপর হুকুম পাঠায়—মশাটাকে মারিয়া ফেল।

খাদ্য পরিপাকের যন্ত্র ও তাহার ক্রিয়া

খাদ্য মুখ হইতে গলার নলী দিয়া পাকাশয়ে (Stomach—ষ্টম্যাক্) গিয়া পড়ে। সেখান হইতে ১৮ হাত ব্যাপী লম্বা অন্ত্রের (intestines—ইন্টেষ্টাইন্স) ভিতর পরিপাক হইয়া, প্রয়োজনীয় খাদ্যাংশ গৃহীত হইবার পর, বাকীটুকু মলমূত্রাদির আকার ধারণ করিয়া দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। সম্পূর্ণরূপে পরিপাক করিতে গেলে খাদ্যদ্রব্য প্রথমে ভাল করিয়া চিবান দরকার। ইহাতে খাদ্য দ্রব্য মুখের লালার সহিত মিশ্রিত হইয়া গিলিবার ও কথঞ্চিৎ পরিমাণে হজম করিবার সাহায্য করে। চর্ব্বিত খাদ্য পাকাশয়ে আসিলে
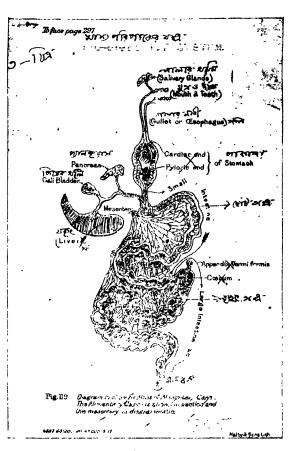
খাদ্য পরিপাকের যন্ত্র

সেখানে সাধারণতঃ দেড় ঘণ্টা কাল থাকে। সেই সময় বিশেষরূপে জীর্ণ হয়। পরে অন্ত্রের প্রথম ভাগে যকৃত হইতে পিত্ত ও প্যান্‌ক্রিয়াস (Pancreas) হইতে আর এক প্রকার রস আসিয়া পড়ে। তখন হজমের মাত্রা পূর্ণ হয়। এই পরিপক্ক অন্ন অন্ত্রের ভিতর দিয়া নিম্নে আসিতে থাকিলে, উহার সারাংশ শরীর আকর্ষণ করিয়া লয় এবং বাকী অংশটুকু মল-মূত্ররূপে বাহির হইয়া যায়। এই ব্যাপার প্রায় ২৪ ঘণ্টায় শেষ হয়।
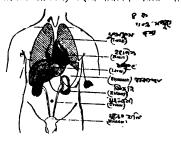
সম্মুখের দৃশ্য

শরীরের ভিতরটা দুই ভাগে ভাগ করা যায়। উপর তলায়

হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস, নীচের তলায় যকৃৎ (Liver—লিভার) প্লীহা (Spleen—স্প্লীন), পাকাশয়, অন্ত্র, ও মূত্রের যন্ত্র (Kidney—কিড্‌নী) এই দুই তলার মধ্যে ডায়াফ্রাম (Diaphragm) নামে একটা মোটা পর্দ্দা আছে। এই ডায়াফ্রামের বিশেষ প্রদাহ হইলে হিক্কা হয়।
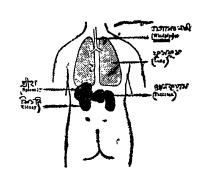
পশ্চাৎভাগের দৃশ্য

রক্তস্রাব বা হেমারেজ (Hœmorrhage)

ইহা তিন প্রকার—

(১) আর্টারি হইতে
(২) ভেন „
(৩) ক্যাপিলারি হইতে

আর্টারির রক্ত ফিন্‌কি দিয়া জোরে বাহির হয়। ভেন ও ক্যাপিলারির রক্ত গা গড়াইয়া পড়ে। রক্ত বাহির হইলে ফিনকি দিয়া পড়িতেছে কি আস্তে আস্তে পড়িতেছে এই দেখিলেই চলিবে। যদি ফিনকি দিয়া বেগে রক্ত পড়ে, তবে কাটার একটু উপরে জোরে বাঁধিয়া দিবে। কাটা মুখে বরফ, বা ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া পরিষ্কার ন্যাকড়া চাপা দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিবে। যদি বাঁধিবার সুবিধা না হয়, কাটা স্থান অঙ্গুলী দিয়াও টিপিয়া রাখা যায়; এবং সেই আর্টারি কোথা হইতে আসিতেছে জানা থাকিলে, সেই সব স্থলে ডিজিটাল প্রেসার (Digital pressure) বা আঙ্গুল দিয়া জোরে টিপিয়া ধরিলে রক্তপড়া বন্ধ হইবে। তাহা হইলে, কাটিয়া গেলে সেই স্থল টিপিয়া ধরিবে বা

আঙ্গুলের চাপ বা ডিজিটাল প্রেসার

বাঁধিবে; এবং শেষে কাটামুখে পরিষ্কার কাপড় ঠাণ্ডা জলে

টুর্নিকেট্ বাঁধা
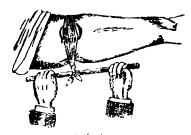
ভিজাইয়া পট্টি বাঁধিয়া দিবে। আর এক প্রকার প্রেসার দেওয়া যায়। তাহাকে টুর্নিকেট্ বাঁধা বলে।

কতকগুলা বিশেষ রক্তস্রাবের নাম, লক্ষণ ও ব্যবস্থা

১ হিমপ্‌টিসিস্ Hæmoptysis	ফুসফুস হইতে মুখ দিয়া রক্ত উঠে	কাসিতে কাসিতে রক্ত বাহির হয়	রক্ত লাল টকটকে ফেনাযুক্ত	ধীরভাবে শোয়াইবে, বরফ চুষিতে দিবে।
২ হিমেটেমেসিস Hæmetemesis	পেট হইতে রক্ত মুখ দিয়া বমির সহিত বাহির হয়	বমীর সহিত বাহির হয়	রক্ত কাল ফেনা নাই	„ „ „
৩ মেলিনা * Melœna	মলদ্বার দিয়া রক্ত বাহির হয়	মলের সহিত বাহির হয়	রক্ত কাল ও জমা	„ „ „ „
৪ এপিসটাক্‌সিস Epistaxis	নাসিকা হইতে রক্ত পড়ে	চোট লাগিলে বা রোগ বিশেষে	রক্ত লাল	মাথায় বরফ বা ঠাণ্ডা জলের পটী দিবে। নাসিকা দ্বারা ঠাণ্ডা জল টানিবে।

* রোগ বিশেষে রক্ত, যথা—রক্তামাশয়ের রক্ত লাল হয়।

ব্যাণ্ডেজিং (Bandaging) বা পটী বাঁধা

ইহা তিন প্রকার যথা—

(১) ট্রায়াঙ্গুলার (Triangular) বা ত্রিকোণাকার কাপড়ের টুকরা দ্বারা

(২) রোলার (Roller) বা ফিতার মতন জড়ান

(৩) বিশেষ বিশেষ স্থানের জন্য
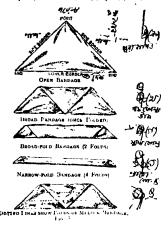
(১) ত্রিকোণাকার ব্যাণ্ডেজ একখানা কাপড়ের তৈয়ারি। ইহার সুবিধা এই যে তাড়াতাড়ি একটা যায়গায় বাঁধা যায় এবং ফার্ষ্ট এডের পক্ষে যথেষ্ট। ইহা ভাঁজ করিয়া ইচ্ছামত ছোট বড় করা যায়। নিম্নলিখিত কয়েকটি স্থানের বাঁধিবার নিয়ম

ত্রিকোণাকার বা ট্রায়াঙ্গুলার ব্যাণ্ডেজ

দেওয়া গেল। বাঁধার শেষে রিফ নট বা গাঁট দিতে হয়। ইহা দুই প্রকার—

(ক) গ্র্যানি নট (Granny Knot)

(খ) রিফ নট (Reef knot)

গ্র্যানিনট্ (Granny-knot) রিফ নট্ (Reef-knot)
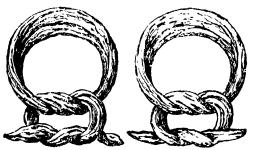
মস্তক। বড় ফোল্ড দিয়া বাঁধিবে। বড় দিক কপালের উপর এবং পয়েণ্ট পশ্চাতে রাখ। দুই পাশ প্রথমে পশ্চাতে বাঁধ এবং সম্মুখ দিকে ঘুরাইয়া আনিয়া গাঁট দাও। পরে পয়েণ্ট সম্মুখ দিকে টানিয়া সেফটিপিন দিয়া আটিয়া দাও।

মস্তকের ব্যাণ্ডেজ

স্কন্ধ। স্মলে ফোল্ড দিয়া বাঁধিবে। বড় দিক কাঁধের উপর থাকিবে এবং পয়েণ্ট নীচে ঝুলিবে। দুই পাশ হাতের ভিতর দিয়া আনিয়া সম্মুখে বাঁধিয়া দিবে। পরে পয়েণ্ট তুলিয়া আটকাইয়া দিবে।

উপরকার হাত—স্মল ফোল্ড ব্যবহার করিবে।

স্কন্ধের ব্যাণ্ডেজ

কলার বোন (ক) ট্রায়াঙ্গুলার ব্যাণ্ডেজ খ) রোলার ব্যাণ্ডেজ

কনুই—
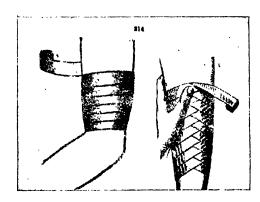
আর্ম (খ) স্পাইরাল ও রিভার্স ব্যাণ্ডেজ

কনুই (ক) ট্রায়াঙ্গুলার
: (খ) রোলার-ফিগার অফ এইট্

আর্ম (ক) ট্রায়াঙ্গুলার (খ) রোলার, স্পাইরাল, রিভার্স ব্যাণ্ডেজ

হাত—হাত মুটা করিয়া বাঁধিবে।

হাত বা হ্যাণ্ড-ব্যাণ্ডেজ

কোমর—দুইটা কাপড়ের দরকার। কোমরের জন্য স্মল ফোল্ড এবং জঙ্ঘার জন্য বড় ফোল্ড।

বুকের সম্মুখ ও পশ্চাৎ—ফুট বা পা—একটা বড় ফোল্ড পাতিবে এবং তাহার উপর বড় দিকে পা রাখিয়া বাঁধিবে।

(ক) ট্রায়াঙ্গুলা

(খ) রোলার স্পাইরেল

স্লিঙ্গ (Sling) বা ঝুলান। ইহা দুই প্রকার—

(ক) ন্যারো ফোল্ড দিয়া বাঁধা

(খ) বড় " " " বা সেণ্টজন্সের স্লিঙ্গ

পা বা ফুট ব্যাণ্ডেজ

(২) রোলার—ইহা ফিতার ন্যায় জড়াইতে হয়। ইহাতে অনেক কাপড় লাগে এবং ইহা বাঁধা সময় সাপেক্ষ। ইহা দুই প্রকার ; যথা (ক) সিম্পল স্পাইরেল (Simple Spiral) (খ) রিভার্স (Reverse) স্পাইরেল বা উল্টাইয়া বাঁধা।

(৩) (ক) স্পাইকা (Spica)—ইহার বিশেষ প্রয়োগ—পা ও কোমর বা স্কন্ধদেশের কোন ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে হইলে দরকার হয়। (খ) "T" ইংরাজী "টি" অক্ষরের ন্যায়। কৌপীন পরার মতন ব্যবহার করিতে হয়।

কলার বোন দুইদিক ভাঙ্গিলে

(গ) ফিগার অফ্ এইট (Figure of 8) বা ইংরাজী ৮এর ন্যায়। ঘোড়ের উপর বাঁধিতে গেলে দরকার হয়।

(ঘ) বুক, পিঠ, ইত্যাদি চওড়া যায়গা রোগীকে না নড়াইয়া বাঁধা হয়। ইহাকে মেনি টেল্ড (many tailed) ব্যাণ্ডেজ বলে। ইহা কতকগুলা ৪ আঙ্গুল চওড়া টুকরা কাপড়। একটার উপর আর মধ্যে শোয়াইয়া দুই পাশের একটী করিয়া টেল বা ল্যাজ সম্মুখে আনিয়া রাখিতে হয় এবং সর্ব্ব শেষের টেলটা পিন করিয়া দিতে হয়।

চুয়াল বা "জ" ব্যাণ্ডেজ

উপরকার হাত বা আর্ম্মের ফ্রাক্‌চার

(৬) নিম্ন চুয়ালে কোন আঘাত লাগিলে বা হাড় ভাঙ্গিয়া গেলে ইহার প্রয়োজন হয়। ইহাকে "জ" (jaw) ব্যাণ্ডেজ বলা হয়।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার পূর্ব্বে একটা কথা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, ঘা বা কাটা স্থান বাঁধিতে গেলে হাত বেশ পরিষ্কার থাকা উচিত। কার্ব্বলিক সাবান বা ফেনাইল জলে হাত ধুইয়া ফেলিলে ভাল হয়। নখ ছোট ছোট করিয়া কাটা থাকা দরকার ও নির্ম্মল হওয়া উচিত। যদি কোন কাপড়ের দরকার হয় এবং বিলাতী তুলা না থাকে, তবে ধোয়া কাপড় জলে ফুটাইয়া সিদ্ধ করিয়া লইলে কোন দোষ থাকে না। ব্যাণ্ডেজের কাপড় পরিষ্কার হইলেই হ'ল, ফুটাইবার দরকার নাই।

স্প্রেন (sprain) বা মচকান। লক্ষণ—ব্যথা, ফোলা, গাঁটের নিকট নাড়িবার ক্ষমতা রহিত—

ব্যবস্থা—জলপটী বা ঠাণ্ডা জল এবং সুবিধা হইলে বরফ দিয়া সেই স্থান ভিজাইয়া বাঁধিয়া দিবে। এইরূপ ২৪ ঘণ্টাকাল ভিজাইয়া রাখিবে। পরে সরিষার তৈল গরম করিয়া এবং তাহাতে অল্প কর্পূর দিয়া বা সমপরিমাণ তারপিনের তৈল দিয়া মালিষ করিবে।

ডিসলোকেশান (Dislocation) বা হাড় সরিয়া যাওয়া। লক্ষণ—গাঁটের কাছে হয়। ফোলা এবং অন্যান্য সব লক্ষণ স্প্রেনের ন্যায়—

ব্যবস্থা—ডাক্তার ডাকাইবে। হাড় বসাইবার পর স্প্রেনের ন্যায় ব্যবস্থা করিবে। ডাক্তার আসিতে দেরী হইলে স্প্রেনের ন্যায় ব্যবস্থা করিবে।

ফ্র্যাক্‌চার (Fracture)—ইহা তিন প্রকার ; যথা—

(ক) সিম্পেল (Simple)—ইহাতে কেবল হাড়ই ভাঙ্গে ; উপরকার চামড়ার কোন ক্ষতি হয় না।

(খ) কম্পাউণ্ড (Compound)—ইহাতে হাড় ভাঙ্গিয়া চামড়া ফুটা করিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

(গ) কম্প্লিকেটেড্ (Complicated)—ইহাতে শরীরের

লক্ষণ—ব্যথা, নাড়িবার ক্ষমতা হীন, আকারের বিকৃতি, ফোলা ভগ্নস্থান অসমান দেখান; এবং নাড়া পাইলে ভাঙ্গা হাড়ের খটখট্ শব্দ।

ব্যবস্থা—(ক) ভগ্ন স্থান নিশ্চল করিয়া রাখিবে। (খ) চামড়া ফুটা হইয়া গেলে সেই স্থান খুব পরিষ্কার কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে, যেন ধূলা না পড়ে।

(গ) ডাক্তার ডাকাইবে।

(ঘ) যদি সুলভ হয়, পাতলা কাটের তক্তা, চুরুটের বাক্স ভাঙ্গা, ছাতা, ছড়ি, লাঠী, বাঁশের চেঁচাড়ী ইত্যাদি দিয়া বাড় বাঁধিয়া দিবে। এই সবগুলি তুলা বা কাপড় জড়াইয়া বাঁধিলে রোগীর আরাম হয়।

কলার বোন, আর্ম বা ফোর আর্মের হাড় ভাঙ্গিলে রীতিমত পটী বাঁধার পর বড় স্লিঙ্গে হাত ঝুলাইয়া দিবে। কতকগুলা স্থান বিশেষে ব্যবস্থা। কলার বোন—বগলের ভিতর কাপড় গুঁজ করিয়া গুঁজিয়া একটু উঁচু করিয়া দিবে এবং বড় স্লিঙ্গে হাত ঝুলাইয়া দিবে।

আর্ম—তক্তার উপর তুলা বা নরম কিছু বিছাইয়া বাঁধিয়া দিবে।

ফোর আর্ম

ফোর আর্মের ফ্রাক্চার

আর্মের স্থায়

হাতের হাড় ভাঙ্গা

হাণ্ড „ „ „ „

থাই বোন ভাঙ্গা

থাইবোন „ „ „ „

মালাইচাকী বা নিক্যাপ্ ভাঙ্গা

মালাই চাকি বা নিক্যাপ „ „ „ „

পায়ের (ফুট) হাড় ভাঙ্গা

পা বা ফুট

একজনে তোলা

রোগীকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবার নিয়ম

দুইজনে তোলা

রোগীকে নানা প্রকারে তোলা বা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সরান যাইতে পারে; যথা—

(ক) একজনে পীঠে করিয়া বা কাঁধের উপর রাখিতে পারে। ইহা বলিষ্ঠ ব্যক্তি ব্যতীত একজনের দ্বারা সম্ভব হয় না।

(খ) দুইজনে ধরাধরি করিয়া তোলা বা হাণ্ড গ্রীপ্ (Hand grip)।
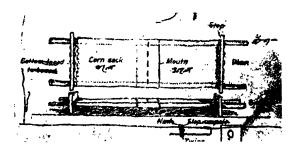
ষ্ট্রেচার

(গ) ষ্ট্রেচারে করিয়া তোলা। ইহা দুইজনে সম্ভব হয়। তাড়াতাড়ি ষ্ট্রেচার তৈয়ার করিতে গেলে চারি হাত লম্বা দুইটা

বাঁশ এবং দুইটা চটের থলের দরকার। দুইটা থলে মুখোমুখি রাখিয়া দুই পাশ দিয়া বাঁশ চালাইয়া দিলে পায়াহীন খাটিয়ার ন্যায় ষ্ট্রেচার হইবে। দুইটা থলে হইলে একজন মানুষ বেশ শুইয়া যাইতে পারে।

নিশ্বাস লওয়া

প্রশ্বাস লওয়া

শেফারের মতে কৃত্রিম উপায়ে

রোগীকে ষ্ট্রেচারে তোলা

কাটিয়া গেলে—(Cuts—কটস্) ফুটান জল বা পরিষ্কার জলে ধুলা কাদা ধুইয়া রক্ত বন্ধ করিবার চেষ্টা করিবে। কাটা যায়গায় পুরু করিয়া কাপড় বা বিলাতী তুলা অর্থাৎ বোরিক কটন (Boric cotton) দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিবে। যদি বাড়ীতে টিংচার আইডিন্ (Tincture Iodine) বা টিংচার বেনজোইন (Tincture Benzoin) থাকে বা সুলভ হয়, তবে প্রথমে কাটা মুখে তুলি দিয়া লাগাইয়া পরে তুলা দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিবে। কাটা ২।৩ দিনের হইলে তাহার মুখে রক্তের চাপ জমিয়া থাকে। তাহা তুলিবার চেষ্টা করিবে না, ধীরে ধীরে গরম জলে ভিজাইয়া কাপড় তুলিবে এবং ক্ষতস্থান পরিষ্কার করিয়া নুতন কাপড় বা তুলা দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিবে। চোখের ভিতর টিংচার আইডিন বা বেনজোইন না লাগে, সে বিষয়ে সাবধান থাকিবে।

ছেঁচিয়া গেলে—(Bruise—ব্রুজ) পরিষ্কার জলে ধুলা কাদা ধোয়াইয়া বরফ অভাবে ঠাণ্ডা জলের পটি তথায় বাঁধিয়া দিবে। অথবা ধোবার পর একটু তুলা টিংচার বেনজোইনে ভিজাইয়া ছেঁচা স্থানে আটকাইয়া দেওয়া যায়। ইহা লাগিয়া থাকে এবং ছোট ছোট যায়গায় ব্যাণ্ডেজ না বাঁধাও চলে। ঘা শুকাইলে তুলা আপনি উঠিয়া যাইবে।

মচকাইয়া গেলে—(Sprains—স্প্রেন) বরফ অভাবে ঠাণ্ডা জলে কাপড় ভিজাইয়া জড়াইয়া দিবে। এই ভাবে অন্ততঃ এক দিন ভিজাইয়া রাখা দরকার। পটী বদলাইবার দরকার নাই। পর দিন হইতে গরম সেক বা গরম সরিষার তৈলে একটু কর্পূর দিয়া মালিষ করিয়া দিবে।

পুড়িয়া গেলে—পোড়ার চিকিৎসা করিতে গেলে প্রথমে কতকগুলি কথা মনে রাখা দরকার।

(১) পোড়া যায়গায় জল দিবে না।

(২) যত শীঘ্র সম্ভব বাঁধিয়া দিবে—যেন বাতাস না লাগে।

(৩) অনেক স্থান ব্যাপিয়া পুড়িলে ছোট ছোট কাপড়ের টুকরা দিয়া বাঁধিবে।

স্কল্ড (Scald)—গরম তরল পদার্থ যেমন দুধ, চায়ের জল, ফেন, তৈল ইত্যাদি গায়ে লাগিয়া যে ঘা হয়, তাহাকে স্কল্ড বলা হয়। ব্যবস্থা—তৎক্ষণাৎ নারিকেল তৈল সমপরিমাণ চুণের জলে ফেনাইয়া লইবে। তাহাতে পরিষ্কার কাপড় ভিজাইয়া পোড়া স্থান বাঁধিয়া দিবে। অভাবে রেড়ীর তৈলে কাপড় ভিজাইয়া বাঁধিলেও চলিবে।

বার্ণ (Burn)—আগুনে পুড়িয়া যাওয়াকে বার্ণ বলে। পুড়িয়া গেলে প্রথমে চামড়া লাল হইয়া উঠে ; পরে তাহাতে ফোস্কা পড়ে। এমন কি সময়ে সময়ে হাড় মাস পর্য্যন্ত পুড়িয়া যাইতে পারে।

ব্যবস্থা—হাড় মাস বা চোখ পুড়িয়া গেলে ডাক্তার ডাকাইবে। প্রথমে ২৪ ঘণ্টা স্কল্ডের অনুরূপ ব্যবস্থা করিবে। পর দিন কাঁচি পোড়াইয়া বিশুদ্ধ করিয়া ঠাণ্ডা হইলে ফোস্কার জল বাহির করিয়া দিবে। ঔষধ প্রথম দিনের মতই চলিবে। সামান্য পোড়া এই ব্যবস্থায় সারিয়া যাইবে। ঘা হইলে চায়ের ছোট চামচের এক চামচ বোরিক এসিড (Boric acid) আধসের জলে ফুটাইয়া লইয়া সেই জল দিয়া ঘা ধুইয়া দিবে। ঘায়ে কোনরূপ দুর্গন্ধ হইলে এক চামচ পরিমাণ টিংচার আইডিন আধ সের গরম জলে দিয়া সেই জল দিয়া ঘা ধোয়াইয়া দিবে। মনে রাখা দরকার —অনেকটা জায়গা পুড়িয়া গেলে লম্বা কাপড় না দিয়া ছোট ছোট টুকরা কাপড় দিয়া ঢাকিবে। ধুইবার সময় এক এক টুকরা উঠাইয়া, ধুইয়া পরিষ্কার কাপড় দিয়া পুনরায় ঢাকিয়া, পরে অন্য স্থানের কাপড়

সরাইবে। ঘা পরিষ্কার ও লাল হইলে ঘি ফুটাইয়া পান বা কলাপাতা দিয়া ঢাকিবে এবং ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিবে।

চোখে কুটো পড়িলে—চোখ না রগড়াইয়া প্রথমে জলের ঝাপ্‌টা দিবে। তাহার পর কাপড়ের বা রুমালের একটা খুঁট তুলির মত পাকাইয়া তাহার সাহায্যে কুটা তুলিবার চেষ্টা করিবে; পরে এক ফোটা রেড়ীর তেল দিবে। কাঠের বা লোহার কুচী বিঁধিয়া গেলে ডাক্তার ডাকার প্রয়োজন।

কাণের ও নাকের ভিতরের জিনিস—ছোট ছেলেরা প্রায় এই সব স্থানে মটর ইত্যাদি জিনিষ গুঁজিয়া দেয়। এইরূপ অবস্থায় মাথার কাঁটা দিয়া বাহির করিয়া দিবে।

দম আটকাইয়া গেলে—কোন শক্ত জিনিস গলায় বাধিয়া গেলে দম বন্ধ হয়। দেখিতে পাইলে আঙ্গুল বেঁকাইয়া বাহির করিয়া দিবে। গ্যাস বা ধোঁয়ায় নিশ্বাস বন্ধ হইলে প্রথম সেই স্থান হইতে সরাইয়া খোলা যায়গায় লইয়া যাইবে। পরে মুখে জলের ছিটা দিবে।

গলায় দড়ি—দড়ি কাটিয়া নামাইয়া মুখে চোখে জলের ছিটা দিবে এবং নিশ্বাস বন্ধ হইলে কৃত্রিম উপায়ে নিশ্বাস প্রশ্বাস আনয়ন করিবার চেষ্টা করিবে।

বজ্রাঘাত—ধীর ভাবে শোয়াইয়া রাখিবে; হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া গেলে গরম সেক দিবে। মুখে ঠাণ্ডা জলের ছিটা দেওয়া দরকার।

ইলেক্‌ট্রিকের ধাক্কা বা শক্ (Shock) ইলেক্‌ট্রিকের তারে হাত দিলে হাতে একটা ধাক্কা অনুভব করা যায়; সময়ে সময়ে তারে হাত আটকাইয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তিকে হাত বা কোনরূপ ধাতুর দ্রব্যের দ্বারা স্পর্শ করা উচিত নয়। তাহাকে ছড়ি, অথবা অভাবে একটা কাঠের কোন লম্বা জিনিস দিয়া সজোরে ঠেলিয়া দিবে।

মশা, মাছি কামড়াইলে—নেবুর তৈল, অথবা নেবুর তৈল ও কেরাসিন তৈল সমান ভাগে মিশাইয়া লাগাইলে জ্বালা দূর হয়।

মৌমাছি, বিছা, ভিমরুল—সেই স্থানে পেঁয়াজের রস বা এমোনিয়া, যাহা স্মেলিং সল্টের (Smelling Salt) শিশিতে থাকে, লাগাইয়া দিবে।

জোঁক ধরিলে—জোঁকের মুখে নুন দিলে আপনি ছাড়িয়া দেয়। অনেক সময় ঐ স্থান হইতে রক্ত পড়ে। জলপটী বা খয়ের টিপিয়া দিলে রক্ত বন্ধ হইবে। অনেক সময় রক্ত বাহির করিবার জন্য জোঁক ধরান হয়। স্থানটি ধুইয়া দুধ লাগাইয়া জোঁক বসাইয়া দিতে হয়।

কুকুর শেয়াল কামড়াইলে—কাটা স্থানে গরম লোহা পোড়াইয়া ছেঁকা দিবে। যদি সহজে মিলে তবে নাইট্রিক এসিড (Nitric acid) তুলি করিয়া দষ্ট স্থানে লাগাইয়া দিবে। পরে কুকুরটা ক্ষেপা কি না অনুসন্ধান করিবে বা ১৫ দিবস যাবৎ সেই কুকুরের কোন পাগলের লক্ষণ পাইয়াছে কি না সে বিষয়ে খবর রাখিবে এবং ডাক্তারের সহিত পরামর্শ করিবে।

সর্পাঘাত—ডাক্তার আসিবার পূর্ব্বেই দষ্ট স্থানের দুই আঙ্গুল উপরে খুব জোর করিয়া তাগা বাঁধিয়া দিবে, এবং সেই বাঁধার চারি আঙ্গুল উপরে আর একটা তাগা বাঁধিবে। তাহার পর সাপ যে যায়গায় কামড়াইয়াছে, সে যায়গায় ছুরী দিয়া একটু চিরিয়া রক্ত বাহির করিয়া দিবে। অনেকে এই ক্ষতস্থানে মুখ দিয়া চুষিতে বলেন। ইহা বিপজ্জনক। কাটার মুখে পটাশ প্যারমাঙ্গানেটের দানা প্রবেশ করাইয়া দিবে। বিষের ক্রিয়ায় মানুষ নিস্তেজ হইয়া পড়ে। পরে চৈতন্য লোপ, নিশ্বাসের কষ্ট এবং হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া যায়। এই সময় রোগীকে গরম কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে এবং গরম সেক দিবে। বিষের ক্রিয়া শরীর হইতে সম্পূর্ণরূপে না যাওয়া অবধি বাঁধন খুলিবে না—বন্ধনজনিত ফোলা বা বেদনা, এই সব বিষয়ে চিন্তা করিবে না।

বমি করা—সুবিধা হইলে রোগীকে বসাইবে। মাথা ঠাণ্ডা জলে ধোয়াইয়া দিবে। বরফের টুকরা না পাইলে ঠাণ্ডা জলে মৌরী ভিজাইয়া সেই জল অথবা ডাবের জল অল্প খাইতে দিবে। সোডার জল পাইলে খাওয়ান চলে।

মদ খাইয়া অচৈতন্য হইলে—রোগীকে পাশ ফিরাইয়া শোয়াইবে। এবং যাহাতে বমী হয় সে বিষয়ে সচেষ্ট হইবে। মুখে চোখে জলের ছিটা দিবে।

মাথা ঘুরিয়া পড়া (Fainting fit)—রোগীকে শোয়াইয়া রাখিবে, মুখে জলের ঝাপটা দিবে। মাথায় বালিস দেওয়া নিষেধ।

মৃগীরোগ (Epilepsy—এপিলেপ্সি)—মাথা ঘোরার ন্যায় ব্যবস্থা। এবং যদি কোথাও আঘাত লাগিয়া থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিবে।

পক্ষাঘাত (Apoplexy—এপোপ্লেক্সি) স্থিরভাবে রোগীকে একটি নির্জ্জন অন্ধকার ঘরে শোয়াইয়া রাখিবে; মাথায় বালিস দিবে। যে অঙ্গ অসাড় হইয়া পড়ে, তাহা ধরিয়া রোগীকে পাশ ফিরাইবে। ডাক্তার ডাকাইবে।

মাথায় চোট লাগা—অচৈতন্য হইলে পক্ষাঘাতের ন্যায় ব্যবস্থা এবং মাথার আঘাতে ব্যবস্থা করিতে হইবে।

অজ্ঞান অবস্থার চিকিৎসা—ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইবে। রোগীকে স্থিরভাবে শোয়াইবে এবং মুখে জলের ছিটা দিবে। তাহার পর কারণ অনুসন্ধান করিবে। এই কয়টি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে:—

মাথায় আঘাত—আঘাতের চিহ্ন থাকিবে।

মৃগী—যদি পূর্ব্বে দুই একবার হইয়া থাকে, তবে ভয়ের কোন কারণ নাই।

পক্ষাঘাত—কোন একটা অঙ্গ অসাড় হইয়া যাইবে।

মদের নেশা—চোখ লাল হয়, মুখে গন্ধ থাকিবে। বমি করাইবে।

আফিম, গাঁজা ইত্যাদির নেশা—আফিম ও গাঁজার ঘোরে এই অবস্থা হয়। আফিমের নেশায় চোখের মণি খুব ছোট হইয়া যায়। বিষের চিকিৎসা দেখ।

সর্দ্দিগর্মি দিনের বেলা হয়।

রোগ বিশেষের লক্ষণ, যথা—হৃদরোগে, মূত্র রোগ ইত্যাদি।

সর্দ্দিগর্মী ও "লু" লাগা—রোগীকে ছায়ায় লইয়া যাইবে। গায়ের কাপড় খুলিয়া ঢিলা করিয়া দিবে। মাথায় গায়ে ঠাণ্ডা জল দিবে। শরীরের তাপ বৃদ্ধি হইলে বরফ বা ঠাণ্ডা জলে গা মুছাইয়া বা স্নান করাইয়া দিবে। পাখার বাতাস করিবে।

জলে ডুবা—জলে ডুবিলে লোকে খুব বেশী জল খাইয়া শেষে দম আটকাইয়া মারা যায়। অতএব জলে ডুবা ব্যক্তির পেট হইতে জল বাহির করাই প্রথম কর্ত্তব্য। যদি নিশ্বাস বন্ধ হইয়া গিয়া থাকে, পুনরানয়নের চেষ্টা করিবে। শীতকালে ঠাণ্ডা জলে থাকিবার জন্য হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া যায়। সে অবস্থায় রোগীকে গরম রাখিবে।

জল বাহির করার ব্যবস্থা—(১) নাক, মুখের কাদা, ঘাস ইত্যাদি পরিষ্কার করিবে। (২) গলায় আঙ্গুল দিয়া নুন জল বা জিঙ্ক সালফেট (Zinc Sulphate) দিয়া বমি করাইবে।

(৩) রোগী শিশু হইলে তাহার পা ধরিয়া মাথা নীচে করিয়া ঘুরাইলে মুখ দিয়া জল বাহির হইয়া যাইবে।

কৃত্রিম উপায়ে নিশ্বাস প্রশ্বাসের চেষ্টা—(১) রোগীকে উপুড় করিয়া শোয়াইবে এবং বুকের নীচে একটা বালিষ বা মোটা কিছু ভাঁজ করিয়া উঁচু করিয়া দিবে। মুখ এক পাশ করিয়া রাখিবে। তাহার পর একজন তাহার বাঁ পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিবে, এবং রোগীর পাঁজরার দুই পাশে হাত রাখিয়া তাহার উপর শরীরের সমস্ত ভার চাপাইয়া দিবে এবং পরক্ষণেই হাত না সরাইয়াই ভার

সিলভেষ্টারের মতে কৃত্রিম উপায়ে

লাঘব করিয়া দিবে। এইরূপে একবার চাপা একবার ছাড়া দিলে নিশ্বাস বহিতে আরম্ভ হইবে। এই রকম মিনিটে ৮।১০ বার করা উচিত। ইহা সিলভেষ্টার (Silvester) সাহেবের মত। (২) রোগীকে চিৎ করিয়া শোয়াইবে। একজন বলিষ্ঠ লোক রোগীর মাথার নিকট দাঁড়াইয়া বা বসিয়া রোগীর দুই কুনুই নিজের দুই হাতে ধরিবে এবং পরক্ষণেই পাঁজরার দুই পাশে চাপিয়া ধরিবে। এইরূপ একবার টানা এবং চাপ দিলে রোগী নিশ্বাস ফেলিতে আরম্ভ করিবে।

নিশ্বাস ও প্রশ্বাস লওয়া

প্রতি মিনিটে ৮।১০ বার এইরূপ করিতে হইবে। অনেক সময় ২।৩ ঘণ্টা এইরূপ করিতে হয়। ইহা শেফার (Schfer) সাহেবের মত।

বিষ, বিষপানের লক্ষণ ও তাহার চিকিৎসা।

১ করোসিভ (Corrosive) যাহা পুড়াইয়া দেয়—(ক) এসিড (Acid) জাতীয়—সালফিউরিক (Sulphuric) নাইট্রিক (Nitric) কার্ব্বলিক (Carbolic)

(খ) আলকালি (Alkali) বা ক্ষার জাতীয়

} বমি করাইবে না। অগুলাল রেড়ীর তৈল, চূণের জল খাইতে দিবে। ডাক্তার ডাকিবে।

২ ইরিট্যাণ্ট (Irritant) যাহা প্রদাহ জন্মায়—একোনাইট aconite (মিঠা বিষ)
আর্সেনিক arsenic (সেঁকো বিষ)
ফসফরাস phosphorus
পারা বা মার্কারি mercury
করবী
কুঁচফল

} নিম্নলিখিত উপায়ে বমি করাইবে। গলায় আঙ্গুল, নুনজল, জিঙ্ক সালফেট (৩০ গ্রেণ আধ ছটাক জলে) গুলিয়া খাওয়াইবে। অনেক সময় বার বার ভেদবমি হইয়া রোগীর হাত পা ঠাণ্ডা হয়। তখন তাহাকে গরম সেক দিবে। ডাক্তার ডাকিবে।

কাচচূর্ণ — বমি করাইবে না। ভাত, রুটী বা পাঁউরুটির শাঁস খাইতে দিবে।

৩ সিস্টেমিক (Systemic)—শরীরের সর্ব্বত্র কাজ করে।

(ক) নারকটিক (Narcotic)—যাহা মস্তিষ্কে কাজ করে এবং নেশা করায়; যথা আফিম ইত্যাদি।

(খ) জেনারেল (General) বা সর্ব্বশরীরে কাজ করে; যথা কুচিলা বা নক্সভমিকা (Nuxvomica) ও তাহার সার পদার্থ ষ্ট্রিক্‌নাইন (Strychnine)

বমি করাইবে। আফিম খাইলে রোগীকে জাগাইয়া রাখিবে সিলভেষ্টারের মতে কৃত্রিম উপায়ে (ক) নিশ্বাস ও (খ) প্রশ্বাস লওয়ান। পটাশ পারমাঙ্গানেটের দানা জলে গুলিয়া সেই জল পেট ভরিয়া খাওয়াইবে এবং পরক্ষণেই বমি করাইবে। বিষ থাকার জন্য এই লাল জল কালচে হইয়া বমি হয়। পরে বিষ কমিয়া আসিলে লাল জল খাওয়াইলে লাল থাকিতেই বমি হয়। বলা বাহুল্য যতক্ষণ না এই অবস্থা হয়, ততক্ষণ ঐ জল খাওয়াইবে। তাহার পর কড়া চা বা কফী খাইতে দিবে। শ্বাস বন্ধ হইলে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাস আনয়ন করিবার চেষ্টা করিবে। ডাক্তার ডাকাইবে। হাত পা ঠাণ্ডা হইলে গরম রাখিবে।

অমৃত ও গরল

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায় বি-এস্‌সি

অমৃত ও গরল জিনিস দুইটা দুই নামে অভিহিত হইলেও, বৈজ্ঞানিকের চক্ষে তাহারা একাসনই জুড়িয়া আছে। যাহা গরল, বৈজ্ঞানিকের হাতে পরিবর্ত্তিত হইয়া তাহাই আবার সুধাতে পরিণত হয়। সুধাকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বিষে পরিণত করিতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপ মানবের পাকযন্ত্রের নানা জটিল ব্যাপার একবার ভাবিয়া দেখা যাউক্। নানা মুখরোচক খাদ্যকে গলাধঃকরণ করিয়া আমরা তো সেগুলিকে পাকাশয়ে পাঠাইয়া দিই। পাকাশয়ে এবং অন্ত্রে তাহারা নানা জারক-রসে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। এই বিশ্লিষ্ট দ্রব্যগুলির মধ্যে এমন্ অনেক জিনিস উৎপন্ন হইয়া পড়ে, যেগুলি শরীরের পক্ষে বিশেষ হানিকর; সুতরাং প্রকৃত পক্ষে বিষ ছাড়া আর কিছুই নহে। তবুও এই বিষেরা শরীরে কিছুক্ষণের জন্য স্থান পায়; এবং আরও জটিল পরিবর্ত্তন-ধারার মধ্য দিয়া পরিচালিত হইয়া তাহারা পরিশেষে শরীর কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়। শরীরের এই পরিত্যজ্য এবং পরিত্যক্ত জিনিসগুলি আমাদের খাদ্য হইতেই উৎপন্ন। এটা হইতেছে, রসায়ন-প্রক্রিয়ায় (chemical change) এক দ্রব্য হইতে অন্য দ্রব্যে পরিবর্ত্তন-লীলার একটি প্রকাশ। তা' ছাড়া নিছক্ গরল মাত্রা হিসাবে অনেক সময়ে নিছক্ অমৃতের কাজ করিয়া থাকে। চিকিৎসা-শাস্ত্রের ঔষধ তালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। মদ্য ও আফিং জিনিসটা শরীরের খুবই হানি করিয়া থাকে; কিন্তু তবুও চিকিৎসকগণ সময় বিশেষে রুগ্ন ব্যক্তিকে ইহার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। সুতরাং রসায়ন-শাস্ত্রে ও ও চিকিৎসা-শাস্ত্রে অমৃত ও বিষের ঐক্যমূলক উদাহরণ ছড়াইয়া আছে। বলিতে গেলে, রসায়ন ও চিকিৎসা-শাস্ত্রের মূলমন্ত্র এক ছাড়া দুই নহে।

রসায়ন-শাস্ত্রের মূল হইতেছে যাদুবিদ্যার মত এক জিনিস হইতে আর এক জিনিসে পরিবর্ত্তন দেখানো। অঙ্গার, হাইড্রোজেন্ ও অক্সিজেন্‌কে লইয়া রাসায়নিক যে ভেল্কিবাজি দেখাইয়া থাকেন, তাহাতে ঐ তিনটি জিনিসের অণুর পরস্পরের অবস্থান ও সংখ্যার তারতম্যই প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। এই অত্যাশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ধারার ভেল্কিবাজিতে অঙ্গার, হাইড্রোজেন্ ও অক্সিজেনের পরস্পরের অবস্থান ঠিক থাকে না। কখনো অক্সিজেন্ ছুটিয়া গিয়া হাইড্রোজেনের স্থান অধিকার করিয়া বসে; স্বস্থানচ্যুত হাইড্রোজেন্ বেচারী তখন লুকোচুরী খেলার মতো ছুটিয়া গিয়া অঙ্গারকে এক ঠেলা দেয়। অঙ্গার ভয়ে ভয়ে নিজের স্থান ছাড়িয়া অক্সিজেনের পরিত্যক্ত স্থানে বসিয়া পড়ে। তখন হাইড্রোজেন্ অঙ্গারের আসনে রাজার মতো বসিয়া পড়ে। রসায়নশাস্ত্রে রাজ্য ভাঙ্গা গড়ার মত জিনিস ভাঙ্গা গড়া অনবরত চলিতেছে এবং কত অণু কত রকমে যে স্থানচ্যুত হইয়া কত নূতন নূতন জিনিসের সৃষ্টি করিতেছে তাহার ইয়ত্তা হয় না। রাজার সিংহাসন যেমন বিশেষ কোনো এক নামধারী রাজার জন্য চিরকালের জন্য পাতা থাকে না, রসায়নেও তদ্রূপ বিশেষ কোন এক অণুর জন্য বিশেষ কোন একটি স্থান চিরকালের জন্য নির্দ্দিষ্ট নাই। একই অণু কত রকমে স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া নানা জিনিস তৈয়ারি করিয়া দেয়। রাজ্যের বেলায় রাজার সংখ্যা সাধারণতঃ একটাই দেখা যায়; কিন্তু অণুদের বেলায় অণুর সংখ্যার স্থিরতা নাই। এক, দুই, তিন হইতে আরম্ভ করিয়া শতাধিক সংখ্যার একই অণু এক একটি জিনিসের উপাদান রূপে স্থান পাইতেছে এমন উদাহরণও আছে।

উদাহরণ স্বরূপ, পূর্ব্বোক্ত অঙ্গার, হাইড্রোজেন্ ও অক্সিজেনের অণুদের লইয়া ভেল্কির কথাটা দেখা যাউক। এই তিনটি জিনিসের অণুদের পরস্পরের অবস্থান ও সংখ্যার তারতম্যে, তাহারা তিনটিতে মিলিয়া একবার সুমিষ্ট চিনি ও অন্যবার গরল সদৃশ মদ্য প্রস্তুত করিয়া দর্শকগণের তাক লাগাইয়া দেয়। আবার কখনো এসিটিক্ এ্যাসিড্ (Acetic Acid) নামক অম্ল পদার্থে পরিণত হইয়া তাহারা আরও অবাক্ করিয়া দেয়। এই এসিটিক্ এ্যাসিড্‌টা একপ্রকার এ্যাসিড্ বা অম্ল জিনিস,—পিঁপড়ে কামড়াইলে যে জ্বলুনি দেখা দেয়, তাহার মূলে এই অম্ল পদার্থ রহিয়াছে। পিঁপড়েরা কামড়াইয়াই ক্ষতস্থানে এই এ্যাসিড্ ঢালিয়া দেয়। ইহাও অঙ্গার, হাইড্রোজেন্ ও অক্সিজেনের অণুর সংমিশ্রণে প্রস্তুত। এই চিনি, মদ ও এ্যাসিড্ জিনিস তিনটি যে পৃথক্ পৃথক্ গুণসম্পন্ন তা' আমরা জানি। চিনি জিনিসটা হইতেছে অতি উপাদেয় সুমিষ্ট খাদ্য, মদ্য জিনিসটা হইতেছে শরীরের পক্ষে গরল বা বিষ এবং এ্যাসিটিক্ এ্যাসিড্‌ও হইতেছে, শরীরের পক্ষে হানিকর জিনিস। অথচ ইহাদের গঠনোপাদানে ঐ তিনটি

অণুর অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। তথাপি ইহারা পৃথক্ জিনিস ও পৃথক্ গুণসম্পন্ন কেন—জিজ্ঞাসা করিলে, আগের মতই বলিতে হয় যে, তাহাদের সাজানোর কায়দা ও অণুর সংখ্যার ব্যতিক্রম ছাড়া আর কোনই কারণ নাই।

রসায়নের এই সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার কেবল যে বৈজ্ঞানিকের পক্ষে একান্ত আবশ্যক তাহা নহে, সাধারণ গৃহস্থদেরও এ সকল বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। লোনাজল (Brine) জিনিসটা সুস্থ শরীরের পক্ষে হানিকর ; কিন্তু কলেরা রোগীর শরীরে সেই জলকেই অপরাপর ঔষধের সহিত মিশাইয়া প্রবেশ করাইলে অমৃতের ন্যায় কার্য্য করে। ঔষধ মাত্রেরই এই ধর্ম্ম। সুতরাং সুস্থ শরীরে যে সব ঔষধ বিষ, অসুস্থ হইলে তাহারাই আবার অমৃতের কার্য্য করে। তবে ঔষধের মাত্রা (Dose) এবং রোগীর অবস্থাই হইতেছে এই সব বিষের প্রয়োগ বিষয়ে একমাত্র সাবধানতার উপায়। মাত্রা ঠিক্ রাখিয়া এবং রোগীর অবস্থা বুঝিয়া সেই জন্যই চিকিৎসকগণ নির্ভাবনায় ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারেন। চিকিৎসা-শাস্ত্রের মূলমন্ত্র হইতেছে, শরীরের হানি না করিয়া এমন্ ঔষধ দিবে যাহা রোগ-বীজাণুকে জখম করিবে·বা মারিয়া ফেলিবে, কিন্তু শরীরকে অক্ষত অবস্থায় রাখিবে। কথাটা ঘুরাইয়া বলিলে দাঁড়ায় এইরূপ,—এমন্ ভাবে এবং এমনতর ঔষধের ব্যবস্থা করিবে, যাহা মানবের শরীরে বিষের কার্য্য না করিয়া অমৃতের কার্য্য করিবে ; কিন্তু রোগবীজাণুদের উপর ঠিক্ তাহার উল্টা অর্থাৎ অমৃতের কার্য্য না করিয়া বিষের কার্য্য করিতে থাকিবে। সুতরাং যে জিনিসটা শরীরের ক্ষেত্রে অমৃত, ক্ষেত্রান্তরে রোগবীজাণুদের পক্ষে তাহাই গরল সদৃশ। সুতরাং ধীর ভাবে বিচার করিলে, অমৃত ও গরলকে এক বলিলে নেহাৎ ভুল বলা হয় না—অন্ততঃ রাসায়নিক ও চিকিৎসকগণের চক্ষে তাহারা যে একই জিনিস তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। আজ আমরা এইরূপ একটি অমৃত বা গরলের বিষয় আলোচনা করিতে যাইতেছি ; জিনিসটি হইতেছে, বায়ুর কার্ব্বন্ ডাইঅক্‌সাইড্ বাষ্প (Carbon Dioxide gas)। এই বাষ্পকেই আমরা সোডা ওয়াটার বোতলের মধ্যে আবদ্ধ অবস্থায় দেখিতে পাই ; এবং বোতল খুলিলেই ইহার উপরকার চাপ্ হঠাৎ কমিয়া যাওয়ায়, বাষ্পটা বুদ্‌বুদ্ ও ফেণার (Froth) আকারে বাহির হইয়া পড়ে। যে কোনো ভালো সোডাওয়াটার বা লিমনেডের ছিপি খুলিলেই তাহা ধরা পড়ে। মদের ফেণাও এই গ্যাস্ হইতে উৎপন্ন হয়। বাষ্পটা যে বিষাক্ত তাহা নিঃসন্দেহ। বিষাক্ত এই হিসাবে বলিতেছি যে, অধিক পরিমাণে ইহাকে নিঃশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিলে মানুষ মরিয়া যায়। কিন্তু পাকাশয়ে ইহা কোন ক্ষতি করে না।

এমন অনেক রোগী দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের ফুস্‌ফুস্ ও Lungsএ এই বাষ্প বেশী মাত্রায় জমা হইয়া পড়ে ; এবং শোণিতের সহিত মিশ্রিত হইয়া মস্তিষ্কে পরিচালিত হয়। সেই জন্যই মানুষ অজ্ঞান হইয়া পড়ে। তখন ইহার বিপরীত গুণসম্পন্ন অক্সিজেন্ বাষ্পের জন্য ডাক্ পড়িয়া যায় এবং ডাক্তার আসিয়া পাম্প চালাইয়া ফুস্‌ফুসের মধ্যে এই অক্সিজেন্ বাষ্প ঢুকাইয়া দেন। আগেই বলিয়াছি, কেবলমাত্র ফুস্‌ফুসের মধ্যেই এই বাষ্পের বিষ-ক্রিয়া লক্ষিত হয় ; পাকাশয় বা অন্ত্রে এই বাষ্পের কোন বিষ-ক্রিয়া নাই। এই জন্যই সোডাওয়াটারের সহিত এই বাষ্প খুব বেশী মাত্রায় মিশিয়া থাকিলেও, সোডাওয়াটার খাইলে আমরা কখনো অজ্ঞান হইয়া পড়ি না।

বিজ্ঞানের হিসাবে কাঃ ডাইঅক্‌সাইড্ একটি বিষ এবং অক্সিজেন্ ঠিক্ ইহার বিপরীতধর্ম্মী অমৃত তুল্য। শ্বাস-প্রক্রিয়ায় (Respiration) কিরূপে এই গরল ও অমৃত পাশাপাশি থাকিয়া শোণিতকে নিয়ত পরিশুদ্ধ করিয়া দিতেছে, তাহা খুবই আশ্চর্য্য ব্যাপার। নদ-নদীর ঘোলা জল পাম্পের টানে হু হু শব্দে বড় বড় চৌবাচ্চায় বোঝাই হইয়া পড়ে এবং নানা পদ্ধতিতে পরিশুদ্ধ হইয়া সহরের গৃহে গৃহে প্রেরিত হয়, ইহা আমরা সকলেই জানি। শরীরের দুষ্ট নীলাভ রক্ত ও লাল তাজা রক্ত হৃৎপিণ্ডের (Heart এর) প্রসারণকালে, পাম্পের টানে বা বিপ্রকর্ষণ শক্তিতে শিরা উপশিরা দিয়া হু হু শব্দে হৃৎপিণ্ডের পাশাপাশি দুই খোপে একই সময়ে জমা হইয়া থাকে। তাহার পর হৃৎপিণ্ডটা যখন হঠাৎ কুঁচকাইয়া একবার পাম্প করিয়া দেয়, তখন হৃৎপিণ্ডের তাজা শোণিত ধমনী দিয়া মস্তিষ্ক ও শরীরের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া যায়, এবং দুষ্ট শোণিত শিরা বাহিয়া ফুস্‌ফুসে আসিয়া উপস্থিত হয়।

দুষ্ট শোণিতকে সজোরে পাম্প করিয়া হৃৎপিণ্ড কি জন্য ফুস্‌ফুসে পাঠাইয়া দেয়, এ প্রশ্ন করিলে দেখা যায় যে, ফুস্‌ফুসে গিয়া নীলাভ দুষ্ট শোণিত পরিশুদ্ধ হইয়া তাজা হয় ও তাহার রং আগের মত টক্‌টকে লাল হইয়া উঠে। হৃৎপিণ্ড যে সময় পাম্পের দ্বারা ঠেলা দিয়া দুষ্ট শোণিতকে ফুস্‌ফুসে পাঠাইয়া দেয়, ফুস্‌ফুস্‌ও তখন বসিয়া থাকে না। দুইটী ফুস্‌ফুসই এক সঙ্গে ফুলিয়া উঠিয়া ঐ দুষ্ট রক্তকে টানিয়া লয়। সুতরাং হৃৎপিণ্ড যখন শিরা দিয়া দুষ্ট শোণিতকে ফুস্‌ফুসে পাঠাইয়া দেয়, ফুস্‌ফুসও তখন বসিয়া থাকে না ; দুইটা ফুস্‌ফুসই ফুলিয়া উঠিয়া তাহাকে আহ্বান করিয়া আনে। সুতরাং ফুস্‌ফুস্ ও হৃৎপিণ্ডের আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ শক্তিতে আমাদের রক্ত-সঞ্চালন (circulation) অনবরত গানের সুরের মত তালে তালে চলিতেছে। ইহার এক মিনিটও বিরাম নাই ; এবং এক মিনিটও এই অপরূপ হৃৎ-ছন্দের গাথা বন্ধ হয় না। বুকের ওঠানামা যেমন তালে তালে চলিতে থাকে, বুকের হৃৎপিণ্ডের গতিও তেমনি তালে তালে চলে।

মৌচাকের ঘরের মতো আমাদের ফুস্‌ফুসেও অনেক বায়ুকোষ বা ALVEOLI আছে। এই বায়ুকোষগুলি একত্র সম্মিলিত হইয়া আবার এক্ একটি বায়ুকোষ নল বা Bronchial Tube গঠিত করে ধমনী (artery) ও শিরার (Vein) সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তন্তু জাল (Capillaries) এই সকল বায়ুকোষকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। সুতরাং ফুস্‌ফুসের দুষ্ট শোণিত নিশ্বাসের টাট্‌কা বায়ুর (Fresh air) সহিত সহজেই মিশিবার সুযোগ পায়। টাট্‌কা বলিতে অক্সিজেন-

ওয়ালা বায়ুকেই বলিতেছি। সুতরাং নীলাভ দুষ্ট শোণিত 'নিঃশ্বাসের টাট্‌কা বায়ু হইতে অক্সিজেন্ বাষ্পকে সংগ্রহ করিয়া তাজা (Fresh) হইয়া উঠে; এবং তখন তাহার বর্ণ টক্‌টকে লাল হইয়া উঠে। ফুস্‌ফুসের অক্সিজেন্ সংস্পর্শে দুষ্ট শোণিত শোধিত এবং লাল হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ফুস্‌ফুসেই বিষাক্ত কাঃডাইঅক্সাইড্ বাষ্প ছাড়িয়া দেয়। এই বিষাক্ত কাঃ ডাইঅক্সাইড্ আমরা ফুস্‌ফুস্ হইতে অনবরত প্রশ্বাসের সহিত পরিত্যাগ করিয়া থাকি। তাহা হইলে দাঁড়াইল এই যে, নিঃশ্বাস রূপে আমরা অক্সিজেন মিশ্রিত যে টাট্‌কা বাতাস ফুস্‌ফুসে পাঠাইয়া দিই, তাহা ফুস্‌ফুসের শোণিতকে পরিশুদ্ধ করে; এবং প্রশ্বাসরূপে আমরা যে দুষ্ট বাতাসকে পরিত্যাগ করিয়া থাকি, তাহা ফুস্‌ফুসের দুষ্ট শোণিত হইতে কাঃ ডাইঅক্সাইড্ বাষ্পকে টানিয়া আনে। পাম্পের ন্যায় হৃৎপিণ্ড যেমন অনবরতই ধপ্ ধপ্ শব্দ করিতেছে, কামারের হাপরের মতো আমাদের ফুস্‌ফুসও একবার ফুলিয়া উঠে ও পুনর্ব্বার সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। তবে একটা নিঃশ্বাস লইতে যতটা সময় আবশ্যক, সেই সময়ের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের অনেকগুলি পাম্পিং (Pumping) হইয়া যায়। সাধারণতঃ মিনিটে ৭৫ বার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন দেখা যায়, নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসের সংখ্যা মিনিটে পনেরোবারের অধিক হয় না। সুতরাং একটী নিঃশ্বাস গ্রহণ করিবার সময় পাঁচটি স্পন্দন হইয়া যায়। তা'ছাড়া মনে রাখা আবশ্যক যে, ফুস্‌ফুস্ ও হৃৎপিণ্ডের কার্য্য পরস্পর যোগে আবদ্ধ হইয়া আছে। ঘন ঘন নিশ্বাস লইলে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনও দ্রুত হইয়া উঠে এবং ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস লইলে হৃৎপিণ্ডের গতিও ধীর হয়। আমরা সাধারণতঃ যাহাকে নাড়ী বা "PULSE" বলি, তাহা মিনিটে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন সংখ্যাই নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। শরীর রুগ্ন হইলে ও জ্বরাক্রান্ত হইলে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের সংখ্যা বাড়িয়া যায়। এই সব ক্ষেত্রে যেখানে মিনিটে ৭৫ বার হৃৎস্পন্দন হইত সেখানে ১০০ বার হৃৎস্পন্দন দেখা যায়।

কি উপায়ে নিঃশ্বাসের অক্সিজেন্ মিশানো টাট্‌কা বাতাস ফুস্‌ফুসে গিয়া তথাকার নীলাভ দুষ্ট রক্তের কাঃ ডাইঅক্সাইড্ বাষ্পকে টানিয়া লইয়া রক্তকে শোধিত করিয়া টক্‌টকে লাল বর্ণে পরিণত করে, তাহা আলোচনার বিষয়। পদার্থ-বিজ্ঞানের "Diffusion" বা "বহির্মিলন" নামক ধর্ম্মই ইহার মূলীভূত কারণ। এই "বহির্মিলন" ব্যাপারটি একটু পরিষ্কার করিয়া প্রকাশ করা যাউক্। একটী জিনিস অপর আর এক জিনিসের সহিত নানা উপায়ে মিলিতে পারে। প্রথমতঃ Mixture বা সাধারণ সংমিশ্রণে, দ্বিতীয়তঃ Osmosis বা অতি সূক্ষ্ম আবরণের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত বিভিন্ন ঘনতাময় (Concentrated) দুইটি জলীয় বা বায়বীয় পদার্থের পরস্পর সংমিশ্রণের বিশেষ এক প্রণালীতে এবং তৃতীয়তঃ পূর্ব্বোক্ত Osmosis সংমিশ্রণ-প্রণালীরই অন্য এক প্রণালীবিশেষের কথা উল্লেখযোগ্য। ইহার নাম হইতেছে, Diffusion বা পরিব্যাপ্তিগত মিলন। যে উপায়ে ফুস্‌ফুসের অক্সিজেন্ রক্তের সহিত মিশিয়া থাকে, তাহা হইতেছে এই "ডিফিউসান্" বা পরিব্যাপ্তিগত মিলনের নিয়ম অনুসারে। নিয়মটা খুবই সোজা; একমাত্র চাপের তারতম্যের উপরই ইহার স্থিতি। ফুস্‌ফুসে লাল রক্ত ও দুষ্ট রক্তের ধমনী ও শিরাজাল এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাকে জালের সহিত (net work) উপমা দেওয়া চলে। এই ছোট ছোট বিভক্ত শিরার পাৎলা আবরণের মধ্য দিয়াই বেশী চাপের অক্সিজেন্ অপেক্ষাকৃত স্বল্পতর চাপের দূষিত কাঃ ডাইঅক্সাইড্ বাষ্পের দিকে ছুটিয়া চলে ও অল্পতর চাপের কাঃ ডাইঅক্সাইড্ বাষ্প বেশী চাপের অক্সিজেনের দিকে যাইতে না পারিয়া চুপ্ করিয়া থামিয়া দাঁড়ায়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত দুই দিকের চাপ্ সমান না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই ব্যাপার চলিতে থাকে। কিন্তু ইতিমধ্যে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন হইয়া যায়; সুতরাং রক্তও অক্সিজেন লইয়া শোধিত হইয়া তাড়াতাড়ি ফুস্‌ফুস্ হইতে হৃৎপিণ্ডের দিকে ছুটিয়া চলে। এইরূপে শরীরের দূষিত শোণিত শোধিত হইয়া থাকে।

মানুষের শোণিতের যে কয়টি প্রধান উপাদান আছে, তন্মধ্যে হিমোগ্লোবিনই (Hæmoglobin) হইতেছে প্রধান। ইহাই রক্তের লাল রঙ্গের একমাত্র কারণ। হিমোগ্লোবিনে পূর্ব্বোক্ত অঙ্গার, হাইড্রোজেন্ ও অক্সিজেন্ ছাড়া নাইট্রোজেন্ ও দুই অণু পরিমাণ গন্ধকের সহিত লৌহের একটি যৌগিক (Sulphate of Iron) দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে ৭১২ পরিমাণ অণু অঙ্গার, ১১৩০ পরিমাণ অণু হাইড্রোজেন্ ও ২৪৫ পরিমাণ অণু অক্সিজেন্ দেখিতে পাওয়া যায়। তা' ছাড়া দুই অণু পরিমাণ গন্ধকের সহিত লৌহের যে যৌগিকটির কথার উল্লেখ করিলাম, তাহার অণুর সংখ্যা হইতেছে মাত্র একটি। সুতরাং হিমোগ্লোবিনে মোট অণুর সংখ্যা হইতেছে দুই হাজার তিন শত দুই। ব্যাপারটি বড় সোজা নহে। এত অধিক সংখ্যক অণু লইয়া আর কোন জিনিসই জৈব-রসায়নে (Organic Chemistry) নাই। দুই হাজার তিনশত দুই সংখ্যক অণু একটি পদার্থের উপাদান হওয়া একমাত্র হিমোগ্লোবিনেই সম্ভব। সুতরাং ইহার রাসায়নিক সাঙ্কেতিক চিহ্ন হইতেছে,—

$$C_{712}\ H_{1130}\ N_{214}\ Fes_2\ O_{245}.$$

এই হিমোগ্লোবিনই ফুস্‌ফুসের বাতাস হইতে অক্সিজেন্ বাষ্প টানিয়া লইয়া রক্তকে শোধিত করে এবং দূষিত রক্ত হইতে কাঃ ডাইঅক্সাইড্ বাষ্প ছাড়িয়া দেয়। কেবল মাত্র হিমোগ্লোবিন্ জিনিসটা রক্তের পক্ষে উপকারী নহে; কারণ শুধু হিমোগ্লোবিনের ধর্ম্মই এই যে, তাহা যতটা অক্সিজেন্ টানিয়া লয় তাহার সিকি পরিমাণও কাঃ ডাইঅক্সাইড্ বাষ্প ত্যাগ করিতে পারে না। সুতরাং নিছক্ হিমোগ্লোবিন্ কৃপণ—সে কেবল নিতেই জানে দিতে জানে না। কিন্তু রক্তের সহিত পোটেসিয়ম্ (Potassium) ও কাঃ ডাইঅক্সাইড্ বাষ্প নিজেই একটু বেশী তাপে থাকে বলিয়া, হিমোগ্লোবিনের অক্সিজেন্ গ্রহণের পরিমাণ ও কাঃ ডাইঅক্সাইড্ বাষ্প ত্যাগের পরিমাণের মাত্রাটা কতকটা সমান সমান হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং

কাঃ ডাইঅক্সাইড্ বাষ্প স্বয়ং শোণিতে বর্ত্তমান্ থাকিয়া শোণিতের অক্সিজেন্ গ্রহণ ও কাঃ ডাইঅক্সাইড্ তাদের পরিমাণ সমান করিয়া দিতেছে। কাঃ ডাইঅক্সাইড্ বাষ্প গরল হইয়াও শোণিতে মিশিয়া থাকে এবং সেখানে তাহা অমৃতের কাজ করিতেছে। কাঃ ডাই-অক্সাইড্ বাষ্প বিষয়ে ইহাই আমার বক্তব্য।

হিন্দীভাষা ও কবি-সমাদর

শ্রীসূর্য্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী

২

কবি এবং কাব্য যে হিন্দীভাষাভাষিগণের নিকটে কি মহা সমাদরের সামগ্রী, তা হিন্দী ভাষার ইতিহাস একটু আলোচনা কল্লেই চোখে ধরা দেয়। কবিরা নিত্য নব নব আনন্দদাতা, লোকশিক্ষক, দেশের মহা গৌরবস্থল,—তা যেন প্রত্যেক লোকেই বিশেষ করে জানত।

কবিবর বিহারীলাল জয়পুরের মহারাজা জয়সিংহের সভাকবি ছিলেন। তাঁর রচিত কবিতা যেমনি সুললিত তেমনি উচ্চ ধরণের।

মহারাজা জয়সিংহ যৌবনে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। নবাগতা তরুণী রাণীর রূপে মুগ্ধ হয়ে, রাজকার্য্য পরিত্যাগ করে, তিনি সর্ব্বদা রাণীকে নিয়ে প্রাসাদের অন্দর মহলে থাকতেন; অন্দরমহলের বাইরে আর বের হতেন না। রাজকার্য্য সতর্কতার সহিত সুপরিচালিত না হওয়ায় রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটল। নানা প্রকারের গোলমাল ও অত্যাচার আরম্ভ হোলো। মহারাজার এদিকে মোটেই লক্ষ্য ছিল না। তিনি মন্ত্রীকে পর্য্যন্ত দর্শন দিতেন না। অবশেষে কবিবর বিহারীলাল একটি কবিতা রচনা করে জনৈক রাজ-পরিচারিকার মারফতে মহারাজার নিকট পাঠিয়ে দেন। কবিতা পড়ে মহারাজার হারানো জ্ঞান ফিরে এলো। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রাসাদের বাইরে এসে পুনরায় রাজকার্য্য পরিচালনে মনসংযোগ করলেন। ক্রমে রাজ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হোলো। জনসাধারণ ও আমীর ওমরাহ সকলেই খুশী হয়ে কবিকে নানা প্রকারের পুরস্কার প্রদান করলেন।

মহারাজা কবি বিহারীলালের কবিতাটি পড়ে এতদূর আনন্দিত হয়েছিলেন যে, কবিকে প্রতি দিন একটি করে আসরফী (মোহর) দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। রাজকার্য্য পরিচালনে আর কখনও মহারাজের অমনোযোগ দেখা যায় নি।

জয়পুরে অবস্থান কালেই বিহারীলাল "সত্‌সই" নামক বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থের কবিতাবলী এক নূতন ছন্দে রচিত। "সত্‌সই" গ্রন্থের অনেকগুলি টীকা বেরিয়েছে। অল্প দিন হোলো হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন "সত্‌সই" গ্রন্থের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টীকাকার পণ্ডিত পদ্মসিংহ শর্ম্মাকে ১২০০৲ (মঙ্গলাপ্রসাদ পারিতোষিক) পুরস্কার দিয়েছেন।

মহাকবি চন্দ্‌বরদাই ভারতের শেষ হিন্দু সম্রাট অতুল প্রতাপশালী পৃথীরাজ [illegible] ছিলেন। [illegible] নিকট চন্দ্‌বরদাই "চাঁদকবি" নামে অভিহিত। তাই ৺সত্যেন্দ্র দত্ত "দিল্লীনামা" শীর্ষক বিখ্যাত কবিতায় লিখেছেন,

"চাঁদকবি গান শুনায়েছে তোরে,
পদ নখে তোর চাঁদের কণা।"

চন্দবরদাইকে পৃথ্বীরাজের সভাকবি বলিলে তাঁহার ঠিক পরিচয় দেওয়া হয় না। চাঁদকবি ছিলেন পৃথ্বীরাজের অভিন্নহৃদয়, অন্তরঙ্গ সুহৃদ্। চাঁদকবি সর্ব্বক্ষণ সম্রাটের নিকটেই থাক্‌তেন। একত্র উপবেশন ও একত্র ভোজন পর্য্যন্ত করতেন; এমন কি হিন্দীভাষার ইতিহাসে ইহাও দেখা যায় যে, উভয়ের জন্ম ও মৃত্যু এক দিনে, এক সময়েই হয়েছিল।

পৃথ্বীরাজের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনের সমস্ত ঘটনার বিবরণ, অসংখ্য অভিযানের বর্ণনা চন্দ্‌বরদাই রচিত বিখ্যাত "রাসো" গ্রন্থে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনা যেমনই লালিত্যময়, তেমনই মনোহারী। কথিত আছে, চাঁদের মৃত্যুর পরের লেখাগুলি চাঁদের পুত্র জহ্লন রচনা করেছিলেন। চন্দকবি ইচ্ছা করলেই বহু অর্থ ও মান পেতে পারতেন; কিন্তু তাঁর সেদিকে আদৌ নজর ছিল না—এমনি মহাপ্রাণ কবি তিনি ছিলেন।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে উল্লিখিত চিন্তামণি (মহাকবি ভূষণের ভ্রাতা) রাজপুতানার প্রায় সমস্ত রাজার নিকট হতে বহু অর্থ, জায়গীর, রথ, অশ্ব ও গজ পুরস্কার পেয়েছিলেন। তিনি একজন হিন্দী ভাষার বিখ্যাত কবি। নাগপুরের সূর্য্যবংশীয় ভোঁসলা মকরন্দ শাহ চিন্তামণির কবিতার খ্যাতি শুনে তাঁকে তাঁর সভাকবি নিযুক্ত করেন।

কবিবর বৃন্দ আওরঙ্গজেব বাদশার সভাকবি ছিলেন।

আওরঙ্গজেব বাদশার পৌত্র আজিম ওশান বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার ছিলেন এবং তাঁর রাজধানী ঢাকা সহরে অবস্থিত ছিল। শাহজাদা আজিম ওশান বৃন্দ কবির কবিতা শুনে এত মুগ্ধ হন যে, তাঁকে আওরঙ্গজেব বাদশার নিকট থেকে চেয়ে ঢাকায় নিয়ে এসে তাঁর নিজের সভাকবি নিযুক্ত করে নেন্। শাহজাদা নিজে ব্রজভাষার বিখ্যাত কবি ছিলেন।

হিন্দী ভাষায় একটি প্রসিদ্ধ কবিতা আছে,—

"সুর সুবজ, তুলসী শশী; উড়সান কেশোদাস,
অব কে কবি খদ্যোৎসম যহাঁ তহাঁ হোত প্রকাশ।"

অর্থাৎ সুরদাস হিন্দী সাহিত্য-গগনের সূর্য্য, তুলসীদাস চন্দ্র ও কেশোদাস তারকার ন্যায় বিরাজমান। আর আজকালকার কবিরা খদ্যোৎসদৃশ,—যথা-তথা একটু আলোক বিকীরণ করে চিরতরে নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

হিন্দীভাষায় দুইজন দেবতার প্রভাব নিয়েই অনেক কাব্য রচিত হয়েছে। রামচন্দ্র আর শ্রীকৃষ্ণের কথা আর ফুরায় না। মহাত্মা সুরদাস কৃষ্ণযশ ও গোস্বামী তুলসীদাস রামচন্দ্রের যশ নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। লীলাময় ভগবানকে নিয়ে কোনো ভাষায় বোধ হয় এত কবিতা রচিত হয়নি। সুরদাস ও তুলসী উভয়েই আজন্ম ভক্ত ও

সাধক। মৃত্যু পর্য্যন্তও তাঁদের সাধনার বিরাম হয়নি। অল্প দিন হোলো "প্রবাসী" মাসিকপত্রে অধ্যাপক শ্রীঅমৃতলাল শীল এম-এ মহাশয় বেশ সরস একটি প্রবন্ধে গোস্বামী তুলসীদাসের বিস্তৃত জীবন-কথার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছিলেন।

দেশের ধনী ব্যক্তিগণ, রাজা-মহারাজা, মায় "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" আকবর বাদশা পর্য্যন্ত বহুবার অগাধ অর্থ, প্রচুর মান ও জায়গীর উক্ত কবিদের দেবার চেষ্টা করেও বিফলমনোরথ হয়েছিলেন। তাঁদের সাধনা চলেছিল কাব্যের ভিতরে দিয়ে এবং সে সাধনা জয়যুক্ত হয়েছিল। অর্থ, যশ, মান হেলায় উপেক্ষা করে দারিদ্র্যব্রতী সন্ন্যাসী সেজে তুলসীদাস কাব্য রচনা করেছেন।

সুরদাসকে কেউ বলেন জন্মান্ধ; আবার কেউ বলেন তিনি নিজে ইচ্ছা করেই দৃষ্টিহীন হয়েছিলেন।

এরূপ কথিত আছে যে, একবার পথে বেড়াবার সময় সুরদাসের দৃষ্টি এক পরমা সুন্দরী যুবতীর উপর পড়ে। তিনি অনেকক্ষণ নিষ্পলক নেত্রে তার দিকে চেয়েছিলেন। সুন্দরী মেয়েটি তা দেখে ভাবলে যে, বোধহয় সুরদাস তাকে ডাকছেন। সে নিকটে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস্ কর্লে "কেন আমায় ডেকেছেন?" এতে সুরদাস অত্যন্ত লজ্জিত হলেন এবং বল্লেন, "মা, তুমি আমার চোখ দুটি ছুঁচ দিয়ে ফুঁড়ে দৃষ্টিহীন করে দেও।" মেয়েটি প্রথমে তাতে স্বীকৃত হোলো না। সুরদাস তাকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে অবশেষে রাজী কর্লেন—মেয়েটি ছুঁচ দিয়ে ফুঁড়ে মহাকবি সুরদাসের চোখ দুটি চিরদিনের মত দৃষ্টিহীন করে দিলে।

আর এক দিক্ দিয়ে দেখ্তে গেলে দেখা যাবে এতে, সুরদাসের বাইরের চোখ দৃষ্টিহীন হয়ে গেলেও, ভিতরে জ্ঞান-চোখের দৃষ্টি শত-শত গুণে বর্দ্ধিত হয়ে গেছলো। তারি ফলে দেশ সুরদাসের নিকট হতে অতুল অক্ষয় সম্পদ তাঁর গ্রন্থরাজি পেয়েছে।

ভক্তমাল গ্রন্থে সুরদাসকে জন্মান্ধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

তুলসীদাস ও সুরদাসের বিচিত্র জীবন-কথা নানা লোকের নিকটে নানা রকমে শুনতে পাওয়া যায়। কেশোদাসের কিছু পরিচয় পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেওয়া হয়েছে।

হিন্দী কবিগণের মধ্যে সুরদাস ও তুলসীদাসের আসন অতি উঁচুতে। এঁরা এত লোকপ্রিয় যে, এঁদের কীর্ত্তিকাহিনী ও সঙ্গীত সকল হিন্দীভাষাভাষীর মুখে শোনা যায়। আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের হাটে, মাঠে, ঘাটে, ধনীর প্রাসাদে ও দরিদ্রের পর্ণকুটীরে, সর্ব্বত্র এঁদের রচিত সঙ্গীতাবলী শুনে মন মুগ্ধ হয়ে যায়। সুরদাসের "ভজন" অনেক বাঙ্গালীও গেয়ে থাকেন। তুলসীদাসী রামায়ণ অনেক বঙ্গমহিলাকে ভক্তিভরে পড়তে দেখেছি।

অযোধ্যার লোকে সুরদাস ও তুলসীদাসকে ভগবানের অবতারের ন্যায় ভক্তি করে। সুরদাসের লেখা পড়তে গেলেই মনে হয়, যেন দ্বিতীয় বাল্মীকি জন্মগ্রহণ করেছেন।

কবীন্দ্র উদয়নাথ আমেঠীর রাজার নিকটে থাকতেন এবং রাজপুত্রের প্রিয় সখা ছিলেন। যুবরাজকে প্রত্যহ নূতন কবিতা শুনিয়ে প্রচুর পুরস্কার পেতেন।

রেওয়ার মহারাজা বিশ্বনাথ সিংহও বিখ্যাত কবি ছিলেন। তাঁর সভায় কবিদের খুব প্রতিষ্ঠা ও সম্মান ছিল। কবিদের তিনি লাখ-লাখ টাকা পুরস্কার বিতরণ কর্ত্তেন এবং বহু দরিদ্র কবি-পরিবারের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থাদি হিন্দী সাহিত্যের গৌরব।

শুকদেব মিশ্র আর একজন বড় কবি। ইনি আওরঙ্গজেব বাদশার মন্ত্রী ফাজিল আলি ও আমেঠীর মহারাজা হিম্মৎ সিংহের কাছ থেকে বহুবার কবিতা শুনিয়ে প্রচুর পুরস্কার পেয়েছেন।

রাজপুতানার অন্তর্গত কৃষ্ণগড়ের রাজা নাগরী দাস হিন্দীভাষার একজন বড় কবি ছিলেন এবং কবিদের বিশেষ সম্মানের চোখে দেখতেন। ইনি যেমনি অসাধারণ কবি ছিলেন, তেমনি মহা বলবান, ভীমকায় পুরুষ ছিলেন। বারো বৎসর বয়সের সময় এক মত্ত মাতঙ্গকে বিদলিত করে দিয়েছিলেন। পঁচিশ বছর বয়সের সময় নাগরীদাস একটি প্রকাণ্ড সিংহকে তরবারি দিয়ে নিহত করেছিলেন। বুঁদীর রাজা জৈতসিংহকে বাইশ বৎসর বয়সের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে পরাস্ত করে, বিজয়মাল্যে বিভূষিত হয়ে বাড়ী ফিরে এসেছিলেন।

রাজা নাগরীদাস একজন বড় কবি ছিলেন। তাঁর রচিত কবিতা যেমনি মধুর, তেমনি কবিত্বপূর্ণ।

রাজা নাগরীদাসের প্রধানাতম পরিচারিকা বনীঠনীজীও একজন বড় কবি। উভয়ে মিলিত হয়েও অনেক কবিতা রচনা করেছেন। নানা প্রকারের সাংসারিক বিপৎপাতে অধীর হয়ে রাজা নাগরীদাস স্বীয় পরিচারিকা বনীঠনীজীকে সঙ্গে নিয়ে রাজ্য ছেড়ে বৃন্দাবনে গমন করেন, এবং সেখানে বল্লভাচার্য্যের নিকটে দীক্ষিত হন।

পদ্মাকর হিন্দীভাষার একজন মহাকবি। শৃঙ্গার রসের কবিতা তাঁর মত নাকি কেউ রচনা করতে পারে নি। জয়পুরাধিপ মহারাজা জগৎসিংহ এঁর কবিতা শুনে মুগ্ধ হয়ে, তাঁকে তাঁর সভাপতি নিযুক্ত করেন। মহাকবি পদ্মাকর দেশের রাজা-মহারাজা ও ধনী ব্যক্তিদের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা পুরস্কার পেয়েছেন।

তিনি চল্তেন ঠিক রাজা-মহারাজার মত; হাতী, ঘোড়া, পালকী, রথ ও বহু লোক সঙ্গে নিয়ে দেশ-বিদেশে যেতেন।

কবীরসাহেব, মীরাবাই, দাদুদয়াল, মলুকদাস, সুরদাস, তুলসীদাস প্রভৃতি মহাকবিগণ অগাধ অর্থ, অপরিসীম সম্মান ও সর্ব্বপ্রকারের সাংসারিক সুখ তৃণবৎ তুচ্ছ মনে করে, নিস্পৃহ হয়ে, দারিদ্র্যব্রতী জ্ঞানভিক্ষু সেজে সাহিত্যের সেবা করে গেছেন; নব নব কাব্য, মহাকাব্য, কবিতা রচনা করে হিন্দীভাষাকে শ্রী সম্পন্ন করে গেছেন। আর সমগ্র দেশবাসী মুগ্ধ হয়ে তাঁদের রচিত গ্রন্থরাজি মাথায় করে নিয়েছে—নিজেরা ধন্য হয়েছে।

সন্ন্যাসী

শ্রীঅজয়কুমার সেন

একদিন বিকালবেলায় ঘুরিতে ঘুরিতে একটি জরাজীর্ণ মন্দিরের নিকটে আসিয়া পৌছিলাম। মন্দিরটি এমন নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত যে দেখিলে মনের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার হয়।

অস্তমান সূর্য্যের লোহিত কিরণজাল মন্দির-সম্মুখবর্ত্তী সরোবরের জলের উপর পড়িয়া বিচিত্র বর্ণের সমাবেশ করিয়াছিল, মন্দিরের একটি ভগ্ন বেদিকার উপর বসিয়া, তাহাই তন্ময় হইয়া দেখিতেছিলাম।

হঠাৎ দূরে যেন কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইলাম। মনে করিলাম—মন্দিরের পূজারী হয় ত সন্ধ্যা দিবার জন্য আসিতেছেন।

ক্রমে পায়ের শব্দ আরো যেন নিকট হইতেছে বলিয়া মনে হইতে লাগিল। পিছন ফিরিয়া দেখিলাম—জনমানবের চিহ্ন নাই; কেবল আমিই একাকী বসিয়া আছি।

হঠাৎ কেন যেন আমার মাথাটা ঘুরিয়া উঠিল—বসিয়া থাকিতে পারিলাম না; মন্দিরের ভগ্ন-বেদিকার উপর শুইয়া পড়িলাম।

কতক্ষণ যে ঐ ভাবে অজ্ঞান অবস্থায় ছিলাম, তাহা বলিতে পারি না।

জ্ঞানসঞ্চার হইলে চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিলাম—চাঁদের গলিত রজত-ধারা মন্দিরের সর্ব্বাঙ্গ দিয়া পিছলাইয়া পড়িতেছে।

এই নির্জ্জন, জনমানবশূন্য, পরিত্যক্ত মন্দিরের ধারে একাকী এতক্ষণ পড়িয়া আছি ভাবিয়া মনের মধ্যে এক আতঙ্কের সৃষ্টি করিল।

আমি উঠিবার চেষ্টা করিলাম—হাত পা নাড়িতে পারিলাম না—সব যেন অবশ বোধ হইতে লাগিল। এমন সময় কাহার মৃদুস্পর্শে চাহিয়া দেখিলাম—আমার সম্মুখে গৈরিকবসন-পরিহিত, জটাজূটসমন্বিত এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী।

আমাকে চোখ মেলিতে দেখিয়া, জলদগম্ভীর স্বরে সন্ন্যাসী কহিলেন—'তুমি বড় শ্রান্ত হইয়াছ?'

উত্তরে বলিলাম, "হাঁ।"

সন্ন্যাসী তাঁহার কমণ্ডলু হইতে জলের মত কি যেন আমার মুখে ঢালিয়া দিয়া বলিলেন, "ওঠ।"

আমি উঠিয়া বসিলাম।

কিছুকাল মৌন থাকিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "কেন তুমি এখানে এসেছ?"

আমি বলিলাম "আমি ঐ সহরে থাকি। এদিকে বড় একটা আসি না। আজ হঠাৎ খেয়াল হোলো, তাই এখানে এলাম। এসেই যেন শরীরটা কেমন অবসন্ন বোধ হলো, তাই শুয়ে পড়েছিলাম। কেন জানিনে, আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম।"

সন্ন্যাসী এতক্ষণ স্থির ভাবেই আমার কথা শুনিতেছিলেন। সহসা তাঁহার ভাবান্তর হইল। তিনি আমাকে কোলের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—"বাবা, তোরই জন্য আজ কুড়ি বছর প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় এখানে ব'সে অপেক্ষা করেছি। আজ তোকে পেলাম।"

আমি ত অবাক্—বৃদ্ধ সন্ন্যাসী এ কি বলেন? আমার ভয় হইল—লোকটা উন্মাদ নয় ত! আমি কি যে বলিব, ভাবিয়া পাইলাম না।

সন্ন্যাসী আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন, বলিলেন "ভয় নেই বাবা! আমি পাগলই বটে, কিন্তু সে তোরই জন্য।" এই বলিয়া তিনি আমাকে আরও দৃঢ় ভাবে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন "আঃ, তেইশ বছর পরে আমার বুক জুড়িয়ে গেল! গুরুদেব, আমার বাসনা পূর্ণ হয়েছে। এইবার ডেকে নেও।"

আমি বলিলাম "আপনি এ সব কি বল্‌ছেন, আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি নে। কে আপনি? কুড়ি বছর আমার জন্য এখানে অপেক্ষা করছেন, এরই বা অর্থ কি?"

সন্ন্যাসী বলিলেন "বাবা, সংসারে আমার এখন কেউ নেই। ছাব্বিশ বছর আগে আমার সহধর্ম্মিণী একটী পুত্র প্রসব করে সেই দিনই মারা যান। আমি কত কষ্টে যে তিন বছর ছেলেটীকে লালন পালন করেছিলাম, তা আর তোকে কি বল্‌ব বাবা! আমার সবই ছিল ঐ ছেলেটী। কিন্তু বিধাতার কি বিধান বাবা, তিন বছর বয়সের সময় ছেলেটী হঠাৎ একদিন মারা গেল!—অসুখ নয়, কিছু নয়—দম্ বন্ধ হ'য়ে আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন চলে গেল। আমি চারিদিক অন্ধকার দেখ্‌লাম। ঘরে আর মন বস্‌ল না, কার জন্য সংসার? সব ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। মনে করলাম তীর্থ ভ্রমণ ক'রে, সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মিশে আমার সেই সোনারচাঁদের মুখখানি ভুলব।" এই বলিয়াই তিনি আমার মুখখানি চাঁদের দিকে ফিরিয়ে, দুই হাতে আমার মুখখানি চেপে ধ'রে বল্‌লেন "এই সেই মুখ বাবা! তুই-ই আমার সেই হারানিধি।"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম "আপনি এ সব কি বল্‌ছেন?"

সন্ন্যাসী আমার হাত ধরিয়া সেই মন্দিরের সোপানে বসাইলেন এবং আমার পার্শ্বে বসিয়া বলিলেন "ভুল হয়নি বাব', ঠিক বল্‌ছি। শোন্ আমার কথা। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে তিন বছর কত তীর্থে ঘুরেছি, কত সাধু দেখেছি, কত উপদেশ শুনেছি। কিন্তু সব বৃথা; কিছুতেই আমার মন বসে না—আমার বুক জুড়ে রয়েছে সেই তিন বছরের ছেলেটীর মুখখানি—আমি দিন-রাত সেই মুখই দেখি, সেই আমার ধ্যান-জ্ঞান। এই সময় এক সাধু আমাকে দয়া করলেন। তিনিই আমার গুরু। তিনি বল্‌লেন, তোর এখন ধর্ম্ম-কর্ম্ম হবে না। যার জন্য তুই পাগল, তাকে একবার সশরীরে না দেখ্‌লে তোর মন স্থির হবে না! তুই তাকে দেখ্‌তে পাবি! সে জন্মগ্রহণ করেছে। কোথায়, তা তোকে বল্‌ব না; কবে দেখা হবে, তাও বল্‌ব না; কোথায় দেখা হবে, তা ব'লে দিচ্ছি! একবার মাত্র দেখা হবে; তার পরই তোর সব শেষ হবে। তিনিই আমাকে এই মন্দিরের কথা বলেছিলেন। এইখানেই একদিন সন্ধ্যার পর আমি তাকে দেখ্‌তে পাব, এই কথা গুরুদেব বলেছিলেন। সেই থেকে আজ কুড়ি বছর প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় আমি এই মন্দিরে তোরই মুখ দেখবার জন্য অপেক্ষা করেছি! ঝড় হোক বৃষ্টি হোক, আমি প্রত্যহ এখানে এসেছি; কি জানি যে দিন আমি অনুপস্থিত থাকব, সেই দিনই হয় ত সে এসে ফিরে যাবে; এই ভয়ে কুড়ি বছরের এক দিনও এখানে আস্‌তে ত্রুটী করিনি। সারাদিন এদিক ওদিক ঘুরি, সন্ধ্যা হোলেই এখানে আসি। কুড়ি বছর বাবা আমার, কুড়ি বছর পরে আজ—" কথা আর শেষ হইল না, সন্ন্যাসীর সংজ্ঞা-শূন্য মস্তক আমার কোলের উপর নত হইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে আমারও চৈতন্য লোপ হইল।

কতক্ষণ এ ভাবে ছিলাম জানি না, হঠাৎ আমার চৈতন্য সঞ্চার হইল। চাহিয়া দেখি, কোথাও কেহ নাই। সন্ন্যাসী কোথায় গেলেন? চারিদিকে খুঁজিয়া দেখিলাম, জনমানবের সম্পর্ক নাই। মনে হইল, এ কি সত্য ঘটনা, না স্বপ্ন?

বাসায় যখন ফিরিয়া আসিলাম, তখন রাত্রি বারটা। তাহার পর এতদিন চলিয়া গিয়াছে, আমি কিন্তু সেই দিনের কথা ভুলি নাই। এখনও মনে হয় এ কি সত্য ঘটনা, না স্বপ্ন!

নৃতত্ত্বে জাতিনির্ণয়

ডাঃ শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ, পিএইচ-ডি (বার্লিন)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(২)

অষ্ট্রেলিয়ার নিকট টাসমেনিয়া নামক ক্ষুদ্র দ্বীপ বিরাজ করিতেছে। কিন্তু ইহার প্রাচীন অধিবাসীরা অষ্ট্রেলিয় জাতি-সম্পর্কীয় ছিল না। টাসমেনিয়ার বিগত আদিম অধিবাসীরা মেলানেসিয় জাতিদের সদৃশ ছিল বলিয়া বোধ হয়। ইহারা "বিগত", কারণ, শ্বেত ঔপ-নিবেশিকেরা ইহাদের নির্ব্বংশ করিয়া দিয়াছে। ১৮২৪ খৃঃ "Colonel Arthur's famous black war" দ্বারা ইহারা বিধ্বংস হইয়াছে। এই যুদ্ধে ধৃত একটি বালিকা, যাহার আসল নাম ট্রুকানিন্নি (Trukaninni), কিন্তু যাহার ইংরেজি নাম লালারুক (Lala Rookh) রাখা হইয়াছিল, তিনি ১৮৭৬ খৃঃ বিগত হন, এবং এই সঙ্গে এই জাতির শেষ চিহ্ন ইহজগৎ হইতে বিলুপ্ত হয়। ইহাদের বিষয়ে যাহা কিছু সংবাদ পাওয়া যায় তাহা Ling-Roth সংগ্রহ করিয়াছেন ; কিন্তু তাহাতে সন্তোষজনক কিছু সংবাদ পাওয়া যায় না। টাসমেনিয় জাতির মাথার হাড় (skull) ও তাহাদের কর্কন্ধুর ন্যায় spiral চুল দেখিয়া বৈজ্ঞানিকেরা তাহাদের মেলানেসিয়-পাপুয়ান (Melanesian Papuan) নিগ্রো সদৃশ কৃষ্ণকায় জাতীয় বলিয়া অনুমান করেন। আর লালারুকের মুখের ফটোগ্রাফ দেখিয়া তাহাই প্রতীয়মান হয়। লুসান বলেন যে, প্রাচীন প্রস্তর-যুগের মানবের লক্ষণসমূহ এবং বিশেষতঃ La Chapelle an ausc Saints নামক স্থানে প্রাপ্ত মাথার খুলিতে যে সব লক্ষণ দেখা যায়, তাহা লালারুকের মুখের ফটোতে দৃষ্ট হয়।

ওসেনিয়া (Oceania)

অষ্ট্রেলিয়া নামক ক্ষুদ্র মহাদ্বীপের পূর্ব্বে ও প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ অংশে মেলানেসিয়া (Melanesia), পলিনেসিয়া (Polynesia), মিক্রোনেসিয়া (Micronesia) নামক তিনটি দ্বীপপুঞ্জ বিরাজ করিতেছে। ইহাদের মধ্যে নিউজিলণ্ড, নিউগিনির ন্যায় বৃহৎ দ্বীপ হইতে

Coralreef দ্বারা সৃষ্ট মিক্রোনেসিয়ার অন্তর্গত ক্ষুদ্র দ্বীপও আছে। বহু সহস্র দ্বীপসম্বলিত পৃথিবীর এই অংশকে "ওসেনিয়া" নামে অভিহিত করা হয়।

এই দ্বীপসমূহে বিভিন্ন প্রকারের মানবজাতি বাস করে। এই ভূখণ্ডের মানব নিজের ভাষাকে লেখনীর দ্বারা ব্যক্ত করিবার জন্য কোন লিপির উদ্ভব করিতে পারে নাই; ইহারা ধাতুর ব্যবহারও জানে না এবং ceramik শিল্প কার্য্য ও তাঁতে বুনার কার্য্যও তাহাদের নিকট অজ্ঞাত। কিন্তু জলযান-নির্ম্মাণ-নৈপুণ্যে তাহারা বিশেষ পারদর্শী। এই জাতিদের মধ্যে পলিনেসিয়েরা—যাহাদের ইণ্ডোনেসিয় (Indonesian) নামেও অভিহিত করা হয়—বুদ্ধিজীবী ও সভ্য। তাহারা এক সময়ে লৌহের ব্যবহার জানিত কি না ও তৎপরে তাহা বিস্মৃত হইয়াছে কি না, এ বিষয়ে একটা সমস্যা আছে। কারণ, লুসান বলেন, ম্যাটি দ্বীপে (Matty island) যে সব অস্ত্র ও যন্ত্রাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, ১৮৯৫ খৃঃ তাহার বর্ণনাকালে একটি অস্ত্র দেখিয়া তাঁহার মনে উপরিউক্ত সমস্যার উদয় হয়।

ওসেনিয়া দ্বীপসমূহে দুই প্রকার জাতি বাস করে; কৃষ্ণকায় মেলানেসিয়-পাপুয়ান জাতি ও গৌরবর্ণ পলিনেসিয় বা ইণ্ডোনেসিয় জাতি। পলিনেসিয় জাতি নিউজিলণ্ড, হাওয়াই, টঙ্গা, সামোয়া, টাহিটি, মারকয়েসাস, হইয়া দক্ষিণ আমেরিকার চিলি দেশের সমুদ্রতীরের নিকটবর্ত্তী দক্ষিণ সমুদ্রের (south sea) শেষস্থিত ওষ্টার দ্বীপ (Oster island) পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া বসবাস করে। এই জাতি এতটা দূর বিচ্ছিন্ন ভাবে বসবাস করিলেও ভাষার ঐক্য বজায় রাখিয়াছে, যদিচ ভাষাতত্ত্বের "shifting of the consonant" নিয়মানুসারে বিভিন্ন dialectএ বিভক্ত হইয়াছে। এই পলিনেসিয় জাতির মস্তক গোলাকৃতি, লম্বা অথবা কোঁকড়ান চুল (lockform)। গাত্রের রং দক্ষিণ ইয়োরোপীয় অথবা হাঙ্গারিয় জাতির গায়ের রংএর ন্যায়। পর্য্যটকেরা বলেন যে, ইহাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও পাওয়া যায়, যাহার গাত্রের রং উত্তর ইয়োরোপীয়ের ন্যায়। ইহাদের দেখিলে রুষ দেশের কৃষক (Mujik) সদৃশ বলিয়া প্রতীত হয়। ইয়োরোপীয় পর্য্যটকেরা বলেন যেন ইহাদের দেখিলে ইহারা ইয়োরোপীয় জাতি-সম্পর্কীয় বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। আবার এই জাতির মধ্যে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের (dark-brown) লোকও পাওয়া যায়। ইয়োরোপীয় সদৃশ বলিয়াই বিখ্যাত ফরাসী লেখক Pierre Loti টাহিটি সুন্দরীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, ও তৎস্থানের ভাষায় নিজের ছদ্মবেশী নাম লোটি (Loti) গ্রহণ করিয়াছিলেন!

এই জাতির যে অংশ নিউজিলণ্ডে বাস করে, তাহারা বোধ হয় খৃষ্টীয় শতাব্দী-গণনার অন্তর্গত কোন সময়ে এই দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ইহারা বুদ্ধিজীবী এবং মস্তিষ্কের প্রাখর্য্যে বর্ত্তমানকালের ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের সহিত সমকক্ষতা করে। পলিনেসিয় জাতির মধ্যে নানা প্রকার কিংবদন্তী, প্রাচীন জাতীয় ইতিহাসের জনশ্রুতি, ধর্ম্মের রূপক বর্ণনা প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। ইহাদের জাতীয় গল্পগুলির (Mythology) মধ্যে একটি গল্প—গ্রীক কবি হোমারের বর্ণিত পারিশ কর্ত্তৃক হেলেনার অপহরণ ও তাহার উদ্ধারের জন্য গ্রীক যোদ্ধাদের ট্রয় অবরোধের বর্ণনার ন্যায়। এই পলিনেশিয় হেলেনার অবরুদ্ধ অবস্থার একটি বর্ণনার সহিত গ্রীক বর্ণনার কথায় কথায় মিল দৃষ্ট হয়; যথা, যে প্রকারে গ্রীক হেলেনা ট্রয়ের প্রাসাদোপরি দণ্ডায়মান হইয়া তাহার গ্রীক উদ্ধারকারীদের চল্লিশ জাহাজে আগমন নিরীক্ষণ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "সকলেই আসিল, কেবল আমার ভ্রাতৃদ্বয় কাষ্টর ও পোলাক্স আসিল না!" তদ্রূপ পলিনেসিয় হেলেনাও বন্দিনী অবস্থায় তাঁহার উদ্ধারকারীদের জাহাজে আগমন করিবার কালে তাহাদের নিরীক্ষণ করিয়া উক্ত প্রকারে বলিয়াছিলেন, কেবল আমার ভ্রাতৃদ্বয় ব্যতীত, সকলেই আসিল।" লুসান বলেন, পলিনেসিয়দের জনশ্রুতিতে কতকটা পশ্চিম এসিয়া ও গ্রীক প্রভাব লক্ষিত হয়। অর্থাৎ কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, পলিনেসিয় হেলেনা-হরণ গল্প গ্রীক হেলেনা-হরণের গল্প হইতে গৃহীত। কিন্তু আমেরিকার সমাজতত্ত্ববিদদের মত অন্য প্রকার। তাঁহারা এই গল্পটির মূলে "parallelism in history" রূপ ঘটনা নিরীক্ষণ করেন; অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের মানবের মন এক প্রকারের অবস্থায় পতিত হইলে সম প্রকারেরই চিন্তার পথে ধাবিত হয়, ও সমপ্রকারেরই ঘটনার উদ্ভব করে। পলিনেসিয় জাতির কারু কার্য্য ও শিল্প অতি উচ্চ দরের

এবং জলপোত-নির্ম্মাণ-নৈপুণ্যও অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক। এই বুদ্ধিজীবী ও সভ্য জাতিদের বিরুদ্ধে একবার একজন জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টের প্রধান অমাত্য (Von Bulow), সামোয়া দ্বীপ সম্বন্ধে জার্ম্মাণ পার্লামেণ্টে (রাইস্‌টাগ) তর্ক উপস্থিত হইলে বলিয়াছিলেন, "ভদ্র মহোদয়েরা, আপনারা সামোয়ার এই মুষ্টিমেয় জঙ্গলি লোক লইয়া কি করিবেন (কারণ সামোয়া দ্বীপ তৎকালে জার্ম্মাণির অধীনে ছিল)।" তাহার উত্তরে লুসান বলেন যে, এই উক্তি অতি লজ্জার কথা কারণ "আমরা জানি সামোয়ার লোকেরা সভ্যতার একটি বিশিষ্ট শিখরে আরোহণ করিয়াছে, তাহাদের সমাজে বারো প্রকারের শ্রম-বিভাগ (division of labour) বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাদের ভাষায় "ভদ্র মহিলা" অর্থ জ্ঞাপক চারটি বা পাঁচটি শব্দ বিদ্যমান আছে ; কিন্তু "বেশ্যা" অর্থ পরিচায়ক একটি শব্দেরও অভাব! এই জাতির কারুকার্য্যের বিশেষ পরিচয় জানিতে চাহিলে পাঠক A. Hamilton—The Art-work manship of the Maori-Race in New zealand, Duned in 1896" নামক পুস্তক পাঠে তাহা অবগত হইবেন।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে—এই পলিনেসিয় বা ইণ্ডোনেসিয় জাতি অস্ট্রেলিয় সদৃশও (অস্ট্রোলয়ও) নহে, অথবা নিগ্রো-সদৃশও (নিগ্রোয়ও) নহে ; ইহারা দেখিতে অনেকটা পূর্ব্ব-ইয়োরোপীয়দের ন্যায় (অবশ্য ইংরেজ ঔপনিবেশিকেরা ইহাদের রঙ্গিণ (colored) মানব বলে।) ইহারা এই জগতের এক প্রান্তে দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জে কি প্রকারে আসিল? ইহারা কি এই স্থলের স্থানীয় উৎপত্তির পরিচয় দিতেছে, অথবা অন্য কোন দেশ হইতে আগত? এ বিষয় আজ পর্য্যন্ত অজ্ঞাত।

পলিনেসিয়দের প্রতিবাসী দ্বীপপুঞ্জে মেলানেসিয় দ্বীপ-সমূহে মেলানেসিয়-পাপুয়া জাতি বাস করিতেছে। ইহারা নিগ্রো সদৃশ, অর্থাৎ ইহাদের গাত্রের বর্ণ নিগ্রোদের ন্যায় গভীর কৃষ্ণবর্ণ, মস্তকের গঠন লম্বা, নাক চেপ্টা, পুরু বাহির-করা ঠোঁঠ, মাথার চুল পশমের ন্যায়, শরীরের আকৃতি লম্বা। আফ্রিকার নিগ্রোদের সর্ব্ব লক্ষণের সহিত নিউ গিনি ও নিকটবর্ত্তী দ্বীপসমূহের মেলানেসিয় জাতির শারীরিক লক্ষণের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এমন কি অনেক পারদর্শী পর্য্যবেক্ষক উভয় দেশের লোকদের পৃথক্ করিতে পারেন না। নিজেদের ভাষায় ইহারা নিজেদের "পাপুয়া" নামে অভিহিত করে। ইহারা সভ্যতার অতি নিম্ন স্তরে অবস্থিতি করিতেছে। ইহাদের মধ্যে আবার বামনাকৃতি নিগৃটো (negrito) সদৃশ ব্যক্তি পাওয়া যায়, যাহাদের আফ্রিকার জঙ্গলের বামন (pygmy) জাতির সহিত কোন প্রকারের বিভেদ নাই! মেলানেসিয়ায় বেশী নিগৃটো পাওয়া যায় না ; কিন্তু ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জে, বঙ্গোপসাগরের আণ্ডামান দ্বীপসমূহে নিগৃটো জাতির অস্তিত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। নিগৃটোরা আকৃতিতে বামন, কৃষ্ণকায়, মস্তকের গঠন গোলাকৃত ; কিন্তু চুল, নাক ও ঠোঁট নিগ্রোদের ন্যায়। এই বামন নিগ্রো বা নিগৃটো জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক প্রকারের মত ও তর্ক আছে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আফ্রিকায় যেরূপ লম্বাকৃতি লম্বামাথা নিগ্রো জাতি ও বামন নিগ্রিল্লো (negrillo) জাতি বিদ্যমান আছে, ওসেনিয়ায়ও তদ্রূপ লম্বাকৃতি পাপুয়া-নিগ্রো ও বামন-নিগৃটো বর্ত্তমান আছে! কেহ কেহ এই উভয় স্থানের কৃষ্ণকায় বামন জাতিকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করিবার জন্য আফ্রিকাস্থিত বামন-দের negrillo বলেন এবং এসিয়া ও ওসেনিয়াস্থিত কৃষ্ণকায় বামনদের negrito বলেন।

এই জন্যই দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর দ্বীপপুঞ্জের নৃ-তত্ত্ব অতি রহস্যপূর্ণ। এই ভূখণ্ডে অস্ট্রেলিয়, নিগ্রো, পলিনেসিয়, নিগৃটো ও ইহাদের পূর্ব্বভাগে মালয়দ্বীপসমূহে মালয় জাতি অবস্থিতি করিতেছে ; অথচ বিভিন্ন জাতির বিশেষ রক্ত-সংমিশ্রণও হয় নাই ; এবং মিক্রোনেসিয়ায় যে স্থলে উভয় জাতি বসবাস করে এবং যে স্থলে বহু শতাব্দি ধরিয়া পলিনেসিয় ও পাপুয়া জাতিদ্বয়ের রক্ত সংমিশ্রণ হইতেছে তথায় একটি নব জাতির উদ্ভব না হইয়া মেণ্ডেলের জীবতাত্ত্বিক আইনানুসারে (mendelism) বর্ণ সঙ্করেরা দুই ভাগ হইয়া এক দল বাপের লক্ষণাক্রান্ত ও আর এক দল মায়ের লক্ষণাক্রান্ত হইতেছে (homo zygotic dominant ও homo zygotie recessive) অর্থাৎ বর্ণসঙ্করেরা একটা নূতন জাতির সৃষ্টি করিতেছে না।

জগতের এই প্রান্তে এত প্রকারের প্রাচীন লক্ষণাক্রান্ত

জাতিসমূহ কোথা হইতে আসিল? ইহার নির্দ্ধারণ কে করিবে? বিজ্ঞান আজ পর্য্যন্ত পারে নাই। অষ্ট্রেলিয় জাতি এই অঞ্চলের সর্ব্ব প্রথম প্রাচীন লক্ষণাক্রান্ত জাতি, কিন্তু এ স্থলে নিগ্রো, নিগ্রুটো ও গৌরবর্ণ পলিনেসিয় কোথা হইতে আসিল? ইহারা নিশ্চয়ই আকাশে উড়িয়া আসে নাই। এককালে নিশ্চয়ই এসিয়া ও আফ্রিকার সহিত এ অঞ্চলের সংযোগ ছিল।

কেহ কেহ মনে করেন, পলিনেসিয় বা ইণ্ডোনেসিয় (জাতিতাত্ত্বিক Keane যাহাদের Eastern Caucasians নামে অভিহিত করিয়াছেন) জাতি ভারতের দিক হইতে বর্ম্মা ও শ্যামের উত্তর দিক দিয়া এ অঞ্চলে আগমন করিয়াছে। (অবশ্য ইহাতে কেহ যেন—পলিনেসিয়েরা ভারতীয় বা হিন্দুবংশীয় বা আর্য্য বলিয়া অনুমান না করেন যদিচ এ প্রকারের মূর্খামির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে!) পলিনেসিয় ভাষায় alii নামে একটি শব্দ আছে; তাহার অর্থ আভিজাত্য বা উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তি। কেহ কেহ এই আলিইকে আর্য্য শব্দের অর্থে গ্রহণ করিয়া সামোয়া বা দক্ষিণ সমুদ্রে "আর্য্য জাতির" উৎপত্তি স্থান বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন। একজন অজ্ঞাতনামা ফরাসী নৃতাত্ত্বিক লেখক টাহিটি দ্বীপের অভিজাত বর্গের শ্রেণী পরিচায়ক alii নামের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, "এই জাতির অভিজাতবৃন্দ alii বলিয়া পরিচয় দেয়" এবং এই সূত্র ধরিয়া তিনি ইহাদের মধ্যে ভারতীয় আর্য্যদের দেবতা ও কিংবদন্তির অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন! ভারতীয়দের সহিত ওসেনিয়ার কোন জাতির কোনপ্রকারে জাতি তত্ত্ব বা নৃ-তত্ত্ব সংক্রান্ত সম্পর্ক নাই। এই কথার এই স্থানে উল্লেখ করিলাম, যেহেতু, যে প্রকার জার্ম্মাণিতে একদল pengermanists আছেন, যাঁহারা সর্ব্বত্র কটা চুল নীল চক্ষু (blond) টিউটন জাতির অস্তিত্বের পরিচয় পান, আমাদের দেশেও তদ্রূপ একদল আছেন যাঁহারা সর্ব্বত্র ভারতীয় "আর্য্যের" উপনিবেশের অস্তিত্ব পান; যথা টেম্‌স্‌ তমসা, দোনাও বা দানিউব দানবী, ভল্গা ভল্লুকী, গোয়াটিমালা—গৌতমমালা, জার্ম্মাণ—শর্ম্মাণ, স্কনডিয়া বা স্কানডিনেভিয়—স্কন্দনাভি ইত্যাদি।

যাহাই হউক, যদি পাপুয়া জাতির সহিত আফ্রিকার নিগ্রোর সম্পর্ক সংস্থাপিত হইল, তবে পলিনেসিয়েরা কোথা হইতে আসিল? ভারত হইতে নিশ্চয়ই নহে। লুসান বলেন, যেহেতু ইহারা পূর্ব্ব-ইয়োরোপীয় শ্লাভ জাতির সদৃশ, তখন ইহারা বোধ হয় অতীতের কোন সময়ে মধ্য এসিয়া হইতে এস্থলে স্থলপথেই আগমন করিয়াছে। কিন্তু এই সব জাতির ভাষার বিষয়ে এখনও বিশেষ কিছু জানা যায় নাই।

এই রহস্যপূর্ণ স্থলে নানা প্রকারের মনুষ্য জাতি বাস করিতেছে বলিয়া হেকেল এই স্থলে লিমারিয়া (Lemuria) নামক অতীতের একটী বিস্তৃত দ্বীপ—যাহা এই অঞ্চলকে এসিয়া ও আফ্রিকার সহিত সংযুক্ত করিয়াছিল, তাহার—কল্পনা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, এই স্থলপথের উপর দিয়াই মানবজাতি বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করিত। কিন্তু এককালে সেই দ্বীপ সমুদ্রতলে গমন করায় এসিয়া ও আফ্রিকার সহিত এ অঞ্চলের সম্পর্ক ঘুচিয়া যায়। কিন্তু হেকেলের এ কল্পনাকে বৈজ্ঞানিকেরা গ্রহণ করেন না, যদিচ Gustav Fritsche বলেন যে, এ কল্পনার পশ্চাতে কিছু মানে আছে।

শেষে ইহাই বক্তব্য যে, এই অঞ্চলের জাতিতত্ত্ব বিচারে আমরা ইহাই দেখিলাম যে, এস্থানে অষ্ট্রোলয় নামে একটী আদিম মানবের লক্ষণাক্রান্ত জাতি বিদ্যমান আছে; তৎপরে অতি প্রাচীন বামন-নিগ্রুটো; নিগ্রো পাপুয়া; পলিনেসিয় জাতি সমুদায় এ অঞ্চলে বসবাস করিতেছে। ইহারা অনেকেই প্রাচীন জাতি। কেহ কেহ বলেন যে, মানব জাতির সৃষ্টি এই স্থলেই হইয়াছিল, কারণ, এই স্থলে বিভিন্ন প্রকারের মানব জাতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু নৃ-বিজ্ঞান বা জাতি-বিজ্ঞান এসব বিষয়ের সমাধান এখনও করিতে পারে নাই; কেবল বাস্তব যাহা বিদ্যমান রহিয়াছে তাহারই অনুসন্ধান করিতেছে। জাতিতত্ত্ববিদেরা ইহাদের মধ্যে পলিনেসিয়দের উচ্চ সভ্যতাশালী ও বুদ্ধিমান জাতি বলিয়া গণ্য করেন। এই প্রবন্ধের সর্ব্বশেষে ইহা দ্রষ্টব্য যে, পৃথিবীর প্রাচীন মানবের লক্ষণাক্রান্ত জাতির নিদর্শন আজ পর্য্যন্ত যাহা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা লুসান-কথিত জিব্রাল্টার-অষ্ট্রেলিয়া লাইনের মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ডেই প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান

শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত বি-এ

অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের ক্ষেত্র অত্যন্ত বিস্তৃত। Psychical Science বা অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান বলিলে Psyche বা আত্মা সম্বন্ধীয় সমস্ত বিজ্ঞানই বুঝায়। অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকদের মতে জাগতিক সমস্ত ব্যাপারই আত্মার ক্রিয়ার বিকাশ মাত্র। জড়বাদীরা যেমন জড় হইতে সমস্ত জগতের উৎপত্তি নির্দ্দেশ করেন, অধ্যাত্মবাদীরা সেইরূপ আত্মা (Soul, Spirit, Idea) হইতে সমস্ত জগতের উৎপত্তির ব্যাখ্যা করেন। জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদের এই বিবাদ দর্শনের জন্ম হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই বিতর্কের কবে মীমাংসা হইবে, কখনও হইবে কি না, বলা যায় না। প্রত্যক্ষ ভাবে এখানে সেই তর্কজালের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া, যতটুকু আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজন, ততটুকুই আলোচিত হইবে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আত্ম-বাদী দার্শনিকদের মতে আত্মার শক্তি অসীম; সুতরাং অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রও প্রকৃতপক্ষে অসীম। জড়বিজ্ঞানানুমোদিত পন্থায়, অথবা সাধারণের উপযোগী সহজসাধ্য উপায়ে, ঐ বিজ্ঞানের যতটুকু আলোচনা হইয়াছে তাহার মোটামুটী পরিচয় দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। এই বহু-বিস্তৃত বিজ্ঞানের কিয়ৎপরিমাণ মাত্র আমাদের আয়ত্তাধীনে আসিয়াছে, এবং ক্রমশঃ নূতন নূতন বিষয় আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে।

এ বিষয়ে আর অধিক অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে, অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের মূলে যে দার্শনিক মতবাদ আছে, সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের দার্শনিকগণকে মোটামুটী দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়,—জড়বাদী ও চৈতন্যবাদী। জড়বাদীদের মতে এই জগৎ জড়প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আধুনিক কালের অনেক জড়বাদী পাশ্চাত্য দার্শনিকই অভিব্যক্তি-বাদী—অন্ততঃ তাঁহাদের মতবাদের ব্যাখ্যাকালে তাঁহারা অভিব্যক্তিবাদের (Evolution Theory) সাহায্য গ্রহণ করেন। তাঁহাদের মতে স্বতঃক্রিয়মান অচেতন প্রকৃতি হইতে এই জড় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। হিন্দু সাঙ্খ্যদর্শন হইতে 'পুরুষ'কে বাদ দিলে অনেকটা এই মতবাদের ধারা বুঝা যায়। কিন্তু উভয় মতবাদের মধ্যে তবুও অনেক পার্থক্য ও দূরত্ব থাকে। যাহা হউক, জড়বাদীদের মতে ক্রমোন্নতির ধারায় চলিয়া জড়জগৎ হইতে প্রথমতঃ প্রাণীজগতের সৃষ্টি হইল, এবং সেই প্রাণেরই উচ্চতম অভিব্যক্তি 'Soul' বা 'আত্মা'। অবশ্য কিরূপে অচেতন জড়পদার্থ হইতে প্রাণের সঞ্চার হয় এবং কিরূপে সেই প্রাণই 'আত্মা' রূপে উন্নীত হয়, তাহার খুব সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। আমাদের দেশেও বার্হস্পত্য দর্শন জড়বাদা।

অধ্যাত্মবাদী অথবা চৈতন্যবাদী (Idealist, Spiritualist) দার্শনিকগণ এ কথা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে এক চৈতন্যময় সত্ত্বা হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে; অথবা এই জগৎই ভগবানের একটা বহির্বিকাশ-মাত্র (The Eternal Idea is realising itself in and Through the manifestation of the world)। এ অবশ্য এক সম্প্রদায়ের কথা। চৈতন্যবাদী দার্শনিকদের মধ্যেও বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিভিন্ন মতবাদ আছে। চৈতন্যসত্ত্বা হইতে জড়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁহারা যে ব্যাখ্যা দেন, তাহার সবগুলি খুব সন্তোষজনক নয়। সেই সমস্ত বিভিন্ন মতবাদ ও ব্যাখ্যার মধ্যে প্রবেশ করিবার আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। তবে তাঁহাদের সাধারণ মিলনভূমি চৈতন্যবাদ। জগতের মূলে এক চরম চৈতন্যসত্ত্বা বিদ্যমান আছেন, এই মত তাঁহারা সকলেই স্বীকার করেন।

এ গেল পাশ্চাত্য অধ্যাত্মবাদীদের কথা। হিন্দু দর্শনেও জড়বাদের স্থান আছে। আমাদের দেশের বার্হস্পত্য দর্শন জড়বাদী,—তাঁহারা দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। বার্হস্পত্য দর্শন চরমপন্থী জড়বাদী।

কিন্তু, প্রায় সকল হিন্দু দর্শনই চৈতন্যবাদী। যে সাঙ্খ্য-দর্শনকে 'নাস্তিক' (হিন্দু মতে নয়, পাশ্চাত্য মতে—Atheist) বলা হয়, সেই সাঙ্খ্যকারও চৈতন্যময় 'পুরুষের' অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। বেদান্ত মতে "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা জীবঃ ব্রহ্মৈব না পরঃ।"—বেদান্ত চরমপন্থী চৈতন্যবাদী, আর হিন্দু চিন্তাকে এই বেদান্তের মতবাদ যতখানি পরিচালিত করে, অন্য কোনও দর্শন ততখানি করে না। 'হিন্দু অধ্যাত্মবাদী',—এ কথার অর্থ এই যে, হিন্দু চিন্তাধারায় জড়বাদের স্থান অতি অল্পই আছে। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে অধ্যাত্মবাদ থাকা সত্ত্বেও জড়বাদেরই প্রাধান্য। হিন্দু তাঁহার দার্শনিক মতবাদকে যেমন ভাবে আপনার করিয়া লইতে পারিয়াছেন, যেরূপ ভাবে ইহা সাধারণের মধ্যে প্রচারিত ও পরিগৃহীত, এমন ভাবে অন্য দেশে নয়। ম্যাক্সমূলার ঠিকই বলিয়াছেন যে, হিন্দু দর্শন কোন ব্যক্তি-বিশেষের মতবাদ নয়, উহা সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি। এই দর্শন আবার চৈতন্যবাদী, তাই হিন্দু চিন্তাধারার মধ্যে আমরা এই চৈতন্যবাদ, অধ্যাত্মবাদ এত বেশী পরিমাণে পাই। আর এই জন্যই ভারতবাসী অধ্যাত্মবাদের মতগুলি এমন নির্ব্বিবাদে স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে।

এ বিষয়ে আর অগ্রসর হইবার প্রয়োজন নাই। মোটের উপর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অধ্যাত্মবাদীদের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য পাইলাম। তাহা এই যে,—জগতের মূলে এক চৈতন্যময় সত্তা বর্ত্তমান আছেন।

অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের আলোচনার সময় আমাদিগকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দর্শনের ব্যবহৃত শব্দাবলীর সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। এ বিষয়ে একটা বিশেষ অসুবিধা এই যে, উভয় দর্শনের, অথবা বিভিন্ন জাতির চিন্তাধারার বিভিন্নতা এবং সেই বিভিন্নতাসূচক শব্দাবলী। প্রকৃত পক্ষে এক জাতির দর্শন অন্য জাতির ভাষায় অনুবাদ করা যায় না। ম্যাক্স মূলারও হিন্দু দর্শনে ব্যবহৃত শব্দগুলিকে ইংরাজীতে অনুবাদ করিতে যাইয়া একটু মুস্কিলে পড়িয়াছেন। অনেক সময় ইংরেজী ব্যতীত অন্য ভাষার সাহায্য লইয়াও তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। পাশ্চাত্য দর্শনে ব্যবহৃত শব্দসমূহের বাংলাতে অনুবাদ করিতেও ঠিক সেই অসুবিধা হয়। সংস্কৃত ভাষার সহিত নিকট সম্বন্ধ আছে বলিয়া কোনও কোনও সময় এই অসুবিধার বৃদ্ধিও হয়। উদাহরণ স্বরূপ 'Mind' শব্দটী ধরা যাউক। উহার বাংলা অনুবাদ 'মন'। কিন্তু এই ইংরেজী 'Mind' শব্দটী বাংলা 'মন' হইলেও হইতে পারে, কিন্তু সংস্কৃত 'মনস্' কিছুতেই নয়। সংস্কৃত 'মনস্' একটা ইন্দ্রিয় মাত্র। অবশ্য বাংলা মতেও মনকে ইন্দ্রিয়ের রাজা বলা হয়। কিন্তু ইংরেজী 'Mind' ত ইন্দ্রিয় নয়ই, বরং 'Mind' অভিব্যক্তির ক্রমানুসারে 'soul' এ পর্য্যন্ত উন্নীত হইতে পারে। কিন্তু সংস্কৃত দর্শনের 'মনস্'এর সে সৌভাগ্য লাভের সম্ভাবনা নাই; সাঙ্খ্যকার ত 'মনস্'এর সমজাতীয় পদার্থকে একেবারে 'প্রকৃতি'র এলাকাধীন করিয়া দিয়াছেন!

আমরা যে ভাবে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের আলোচনা করিতেছি, তাহাতে পাশ্চাত্য দর্শনের শব্দ ও ভাবধারার সাহায্য গ্রহণ করা আবশ্যক হইবে। এই শব্দসমূহের বাংলা ভাষায়ও অনুবাদ করার প্রয়োজন। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানে ব্যবহৃত প্রধান শব্দ—'আত্মাঃ' 'মনঃ' ইত্যাদি। সুতরাং এই সকল এবং আনুষঙ্গিক শব্দাবলীর ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ এই শব্দসমূহের ব্যবহার না করিয়া আলোচনায় অগ্রসর হওয়াও অসম্ভব।

এ সম্বন্ধে বিশেষ তর্ক-বিতর্কের মধ্যে না গিয়া আমাদের আলোচনার উপযোগী কয়েকটী শব্দের নিম্নলিখিত ভাবে প্রতিশব্দ গ্রহণ করিলাম। গতবারে কয়েকটী শব্দ সম্বন্ধে আলোচনা করা গিয়াছে। ইংরেজী Psychologyর বাংলা অনুবাদ করা হয় 'মনোবিজ্ঞান'। 'মন' শব্দ সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে ইংরেজী 'Mind' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ 'মন' গ্রহণ করা যায়। কিন্তু এই ইংরেজী 'Mind'কে আবার 'Rational Mind' 'Empirical Mind' প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত করা হয়, এবং 'Rational Mind' 'soul' সম শ্রেণীর বস্তু। ঐখানেই গোল। 'Psychology is the science of mind'—এ হিসাবে Psychologyর বাংলা অনুবাদ 'মনোবিজ্ঞান' হইতে পারে। কিন্তু soul অর্থে 'Mind' গ্রহণ করিলে আর 'মনোবিজ্ঞান' দ্বারা অনুবাদ করা চলে না। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান Psychology হইতে বহু উচ্চে অবস্থিত এবং অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রও মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্র হইতে

মেঘ-সঞ্চার

শিল্পী—এ, আর, আসুধর

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

বহুগুণ বিস্তৃত। যাহা হউক, বর্ত্তমানে আমরা নিম্নলিখিত শব্দ ও প্রতিশব্দ গ্রহণ করিলাম, যদিও সবগুলিকে একেবারে নির্ভুল বলিতে পারি না। কেহ এ বিষয়ে ত্রুটী প্রদর্শন করিলে উপকৃত বোধ করিব।

Mind = মন ; Soul = আত্মা ; Psychology = মনোবিজ্ঞান ; Psychical science = অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান ; Idea — চৈতন্যসত্ত্বা ; Idealism = অধ্যাত্মবাদ, চৈতন্যবাদ ; Materialism, Naturalism = জড়বাদ, প্রকৃতিবাদ ; 'Matter'কে আমরা ব্যবহারিক হিসাবে 'জড়' বলিয়া গ্রহণ করিব, যদিও প্রকৃতপক্ষে 'জড়' বলিয়া কিছু নাই। Consciousness = চৈতন্য ; Subconsciousness, Subliminal Consciousness = সুপ্ত চৈতন্য, অর্থাৎ যাহা প্রত্যক্ষভাবে ক্রিয়াশীল নয়, চেতন নয়, কিন্তু অবস্থা বিশেষে সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় চেতন হয়, তাহাই সুপ্ত চৈতন্য। অথবা ইহাকে অৰ্দ্ধ-চৈতন্যও হয়তঃ বলা যাইতে পারে।

অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান বলিতে আমরা কি বুঝি, তাহার একটু আভাষ দেওয়া যাউক। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান = আত্মা সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে, অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানেরই নামান্তর। কিন্তু অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান এবং ব্রহ্মজ্ঞানের মধ্যে আমরা একটু পার্থক্য অনুভব করি। মনোবিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের মধ্যে, হিন্দু দর্শনের দিক দিয়া, যে জাতীয় যতটুকু পার্থক্য বর্ত্তমান, অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞানের মধ্যে সেই জাতীয় ততটুকু পার্থক্য বর্ত্তমান না থাকিলেও একটা পার্থক্য আছে। 'অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান'— জীবদেহধারী আত্মা সম্বন্ধীয় জ্ঞান ; আর 'ব্রহ্মজ্ঞান'— পূর্ণব্রহ্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান। হিন্দু মতানুসারে ব্রহ্ম ও আত্মা সমজাতীয় হইলেও, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান আছে। মানুষ যে পর্য্যন্ত না আপনার মধ্যস্থিত অনন্তত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে পারিয়াছে, যে পর্য্যন্ত না সে স্ব-স্বরূপে, আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে পারিয়াছে, সে পর্য্যন্ত মানুষ—বদ্ধ জীব মাত্র। মানুষকে স্বরূপতঃ ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিলেও যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে শরীর ও ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে সান্ত, সসীম জীব,—তাহার আত্মার ক্রিয়া-শক্তিও তদনুরূপ সান্ত ও সসীম। কিন্তু ব্রহ্ম সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। তাই, আত্মাতে ব্রহ্মের প্রকাশ—আত্মার শক্তি ব্রহ্মেরই শক্তি—স্বীকার করিয়াও, জীবকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক ভাবে দেখা যায়। সেই অনুসারে 'অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান' ও 'ব্রহ্মজ্ঞানের' মধ্যে পার্থক্য আছে, এবং ব্রহ্ম ও আত্মার মূল অভেদত্বের দিক দিয়া অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞানে সাদৃশ্যও আছে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে—অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞানে যদি অভেদত্বই থাকে, তাহা হইলে 'অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান' সংজ্ঞা গ্রহণ করা কি সঙ্গত ? বিজ্ঞান বলিতে আমরা সাধারণতঃ Experimental science অথবা যন্ত্রপাতির সাহায্যে লব্ধ এবং প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-সিদ্ধ জ্ঞানকেই বুঝিয়া থাকি। আত্মার উপরে কি Experiment করা চলে ? এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, আত্মজ্ঞান বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা যন্ত্রপাতির সাহায্যে লাভ করা যায় না সত্য, এবং তাহার সম্বন্ধে (অন্যের পক্ষে) প্রত্যক্ষ প্রমাণ হয়ত কিছুই নাই, কিন্তু আত্মার ক্রিয়া—যাহা আমরা বাহ্য জগতে দর্শন করি, এবং যে উপায়ে আত্মার বিভিন্ন শক্তির বিকাশ সাধন হয় তাহা—অন্য জড়-বিজ্ঞানের ন্যায়ই প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-সিদ্ধ। আর, আত্মার যে সমস্ত শক্তির খেলা বহির্জগতের লোকেরও গোচরীভূত হইতে পারে, এবং যে সমস্ত শক্তি, সর্ব্বসাধারণে অন্যান্য জড়-বিজ্ঞানের ন্যায়ই আয়ত্ত করিতে পারেন,—আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের সেই অংশকেই আমরা 'অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান' নামে অভিহিত করিয়াছি। উপযুক্ত সাধনার দ্বারা আত্মার উন্নতি বিধান করিয়া মানুষ যে সমস্ত শক্তির অধিকারী হইতে পারে, তাহা অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। আত্মার শক্তি অসীম ; সুতরাং অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রও প্রকৃতপক্ষে বহু-বিস্তৃত। আমরা যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিব। এখন অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের দু'একটী মূল নীতির (Fundamental Principles) আলোচনা করা যাউক।

এই বিশ্ব এক বিরাট চৈতন্য-সত্ত্বার বহিপ্র্রকাশ। সমস্ত জগৎ এই চৈতন্যের শক্তিতে পরিচালিত। সমস্ত বস্তুতে এই চৈতন্য বর্ত্তমান। জগতে প্রকৃতপক্ষে 'জড়' বলিয়া কোন বস্তু নাই। ব্যবহারিক হিসাবে আমরা এই কলমকে 'জড়' বলি, প্রকৃতপক্ষে উহাতেও চৈতন্য বর্ত্তমান আছে। আমার এই কলম বা কাগজ যদি জড় হয়, তাহা হইলে আমি নিজেও জড়। ভারতের ঋষিগণ সাধন-বলে

এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন ; এবং তাঁহাদের সুসন্তান ভারতগৌরব শ্রীযুক্ত জগদীশ বসু তথাকথিত জড়-বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহা প্রমাণিত করিয়াছেন।

জগতের মূলে এই সমতা ও একত্ব আছে বলিয়াই, আমরা একজন অন্যজনকে অথবা কোনও বস্তুকে জানিতে পারি। জগতের মূলে এক চৈতন্যসত্তা আছেন বলিয়াই, অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের আলোচনা সম্ভবপর হইয়াছে। এ সম্বন্ধে যথাস্থানে আলোচনা করা যাইবে।

মানুষ এই অনন্ত চৈতন্যসত্তা হইতে উদ্ভূত বলিয়া, উপযুক্ত সাধনা দ্বারা সে তাহার শক্তিকে প্রভূত পরিমাণে বর্দ্ধিত করিতে পারে। হিন্দু দর্শন মতে মানুষ এই মোহ, অজ্ঞানতা, মায়াকে দূরীভূত করিয়া আবার স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে—আত্মারাম হইতে—পারে। হিন্দু ঋষিগণ তাহা অবগত ছিলেন এবং উপযুক্ত উপায় অবলম্বনে বহুবিধ শক্তির অধিকারী হইতেন। এই সমস্ত মূলতঃ আত্মারই শক্তি। মন ও শরীর আত্মার অনুষঙ্গী ও বাহন। তাই অনেক অধ্যাত্মশক্তি, মন ও শরীরের শক্তি বলিয়া প্রতিভাত হয়। তাই, ব্যবহারিক হিসাবে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান-লব্ধ শক্তিকে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক এই তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। এই তিন বিভাগের বিবরণ যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে।

অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের গোড়ার কথা—আত্মার অবিনশ্বরত্ব। আত্মার অবিনশ্বরত্ব হিন্দুদিগের নিকট স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া পরিগৃহীত। উপনিষদ, গীতা প্রভৃতি অধ্যাত্ম-শাস্ত্র, আত্মার অবিনশ্বরত্ব আদিকাল হইতে ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন। দেহাতিরিক্ত আত্মা আছেন, দেহের ধ্বংসে আত্মার ধ্বংস হয় না, এই সত্যটী এমন ভাবে আমাদের হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ আছে যে, ভারতে দেহাত্মবাদী দর্শনের প্রচার কোন সময়েই সহজসাধ্য হয় নাই। আমাদের দেশে জড়বাদী দর্শন, পুস্তকেই আবদ্ধ আছে—মানুষের হৃদয়ের উপর তাহার কোন প্রভাব নাই বলিলেই হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে দেহাত্মবাদী দর্শনের একটা স্থান আছে, এবং তাহা অধ্যাত্ম-দর্শনের সমশ্রেণীর প্রতিযোগী বলিয়া গৃহীত হয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তা-ধারা ও সভ্যতার এই পার্থক্যটুকুও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

দেহাতিরিক্ত আত্মা আছে কি না, এবং দেহের ধ্বংসে আত্মার বিনাশ হয় কি না—এ বিচারে আমাদের প্রবেশ করিবার প্রয়োজন নাই। আত্মার অবিনশ্বরত্ব সম্বন্ধে আপ্তবাক্য উদ্ধৃত করিতে হইলে, একখানা স্বতন্ত্র গ্রন্থ হইয়া পড়ে। সুতরাং বিচার-বিতর্ক অথবা আপ্তবাক্য (Authority) এ দুয়ের কোনটাই উপস্থিত করিব না। এ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অথবা প্রত্যক্ষ-তুল্য যে সমস্ত প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাই আমরা যথেষ্ট বলিয়া মনে করি ; এবং অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের আলোচনা প্রসঙ্গে তাহাই পাঠক-পাঠিকাদিগের নিকটে উপস্থিত করিব। যুক্তি, তর্ক ও শাস্ত্রবিচার অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে কিন্তু সকল মানুষ তাহা নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। প্রত্যক্ষের সাহায্যে ধর্ম্মবিজ্ঞানের সত্যগুলিকে প্রমাণিত করাই নব অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের একটা লক্ষ্য।

যে বস্তু যে পরিমাণে সূক্ষ্ম, তাহার শক্তি সেই পরিমাণে বেশী। আবার সূক্ষ্ম বস্তু স্থূল বস্তুর সংস্রবে আসিলে তাহার শক্তিরও হ্রাস হয়। আমাদের সূক্ষ্ম আত্মা স্থূল শরীরের সংস্পর্শে আসাতে তাহার শক্তি-হ্রাস হয়। অবশ্য এই 'স্থূলত্ব' ও 'সূক্ষ্মত্বে'র সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা শক্ত। বিদেহী আত্মার শক্তি দেহস্থিত আত্মার শক্তি অপেক্ষা অনেক বেশী। আবার যিনি এই দেহে থাকিয়াই দেহাতীত অবস্থা লাভ করেন, তাঁহার শক্তিও সাধারণ মানুষের চেয়ে বহুগুণ বেশী। স্থূলের উপরে কি উপায়ে সূক্ষ্ম জয়লাভ করিতে পারে, তাহার আলোচনাই অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের একটা প্রধান উদ্দেশ্য।

আমাদের দেশের যোগিগণ উন্নত যোগ-পন্থায় নানাবিধ শক্তি লাভ করিতেন ; এবং জগতের হিতের জন্য সেই শক্তির প্রয়োগ করিতেন। কিন্তু সেই যোগ-প্রণালী অত্যন্ত দুরূহ এবং সাধারণের পক্ষে সহজলভ্যও নয়। তাই বর্ত্তমান বিজ্ঞানানুমোদিত পন্থায় কিরূপে এই সমস্ত শক্তি লাভ করা যায় তাহাও নব অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের লক্ষ্য।

উচ্চ শ্রেণীর আধ্যাত্মিক শক্তি যে কেবল আমাদের দেশের সাধু-মহাত্মগণই লাভ করিতেন বা করেন, তাহা নয়। অন্যান্য দেশেরও অনেক সাধুর আশ্চর্য্য জীবন-কাহিনী পাওয়া যায়। তবে আমাদের দেশে ইহা যেরূপ উন্নত অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল, এবং সাধারণে তাহা যেমন ঐশ্বরিক শক্তি বলিয়া গ্রহণ করিত, অন্য দেশে সেরূপ

হয় নাই। বরং এরূপ শক্তির অধিকারী হইলে, সাধককে সাধারণ লোকের, কখনও বা রাজশক্তির, নির্য্যাতন ভোগ করিয়া, অথবা অস্ত্রের সাহায্যে তাহার উচ্চ সাধনার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত! এরূপ সাধক বা আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারীকে witch বা ডাকিনী নামে অভিহিত করা হইত। আমরা যাঁহাকে দেবতার বিশেষ অনুগ্রহ-ভাজন বলিয়া ভক্তি করি, পাশ্চাত্য দেশ তাঁহাকেই শয়তানের অনুচর বলিয়া পৃথিবী হইতে বিদায় লইতে বাধ্য করিত। উভয় দেশের পার্থক্য এইখানে, এবং এই পার্থক্যের কারণও পূর্ব্বে একটু বলা হইয়াছে।

পাতঞ্জল-দর্শনের আলোচনা করিতে যাইয়া, একজন যোগীর অধ্যাত্ম-শক্তির বর্ণনার সমালোচনা উপলক্ষে ম্যাক্সমূলার এক জায়গায় লিখিয়াছেন—"Of course, we know that such things as the miracle here related are impossible, but it seems almost as great a miracle in human nature, that such things should ever have been believed, and should still continue to be believed." তাহার পরে, কিরূপে এই যোগশক্তির প্রতি লোকের বিশ্বাস উৎপন্ন হইল, সে বিষয়ে তিনি এক Theory দিয়াছেন। আরও অর্দ্ধ শতাব্দী বাঁচিয়া থাকিলে অথবা ভারতের সহিত আরও ঘনিষ্ঠতর সংশ্রবে আসিলে, তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হইত কি না, বলা যায় না। আমাদের দেশের সাধুসন্ন্যাসীদের বিশ্বস্ত জীবনী পাঠ করিতে পারিলে, তাঁহার মত কিরূপ দাঁড়াইত তাহা বলিতে পারি না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পার্থক্যটুকু দেখাইবার জন্য এ কথার উল্লেখ করিলাম। তিনি যোগীদিগকে Miraclemonger (অর্থাৎ বুজরুকি করাই যাহাদের উদ্দেশ্য) নামেও অভিহিত করিয়াছেন!

আমাদের দেশের যোগীদের অনেক অদ্ভুত অধ্যাত্ম-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সমস্ত শক্তির অধিকাংশই যে কঠিন যোগ-প্রণালীর সাহায্য গ্রহণ না করিয়াই অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য উপায়ে লাভ করা যাইতে পারে, তাহা আমরা পূর্ব্বে জানিতাম না। বরং একটু ভয়ে-ভক্তিতে ঐ সকল হইতে একটু দূরেই থাকিতাম। আমাদিগকে এখন সেই প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডারের সন্ধান লইতে হইবে, এবং যাহাতে আমরা আমাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষের অর্জ্জিত ধন উপভোগ করিতে পারি, তাহার উপায় বিধান করিতে হইবে।

নব অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের আলোকে আমাদিগের পুরাণ-তন্ত্রাদি অনুসন্ধান করিলে অনেক তথ্য পাওয়া যাইতে পারে। এই সমস্ত গ্রন্থাদিতে বর্ণিত অনেক বিষয় নিতান্ত গঞ্জিকাসেবীর প্রলাপ বলিয়া বিবেচিত না হইতেও পারে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা এখানে বলা আবশ্যক। পুরাণাদির কথার উল্লেখ করিলেও, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বিষয় মাত্রেই অভ্রান্ত বলিয়া আমরা মনে করি না। পুরাণাদির মধ্যে রূপক, আখ্যায়িকা, অতিরঞ্জন প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে আছে। কিন্তু তাই বলিয়া উহা একেবারেই নিছক "উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা" নয়। কোন বিষয় গ্রহণ করিবার সময় যেমন আমরা সাবধানতার সহিত যুক্তি বিচারের সাহায্যে গ্রহণ করি, কিছু পরিবর্জ্জনের সময়ও ঠিক তাহাই করিতে হইবে। আমি বুঝি না, বা বিশ্বাস করি না বলিয়াই উড়াইয়া দেওয়া সঙ্গত নয়। সে যাহা হউক, এখন আমাদের আলোচ্য বিষয়ে ফিরিয়া আসা যাউক।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের ক্ষেত্র অত্যন্ত বিস্তৃত। সেই বিজ্ঞানের যে অংশ আমাদিগের আয়ত্তাধীনে আসিয়াছে, তাহারই আলোচনা করিব। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগের বিবরণ দিবার পূর্ব্বে সাধারণভাবে মনোবিজ্ঞানের একটু আলোচনা করা আবশ্যক।

ভাসমান হিমশিলার (floating Iceberg) ন্যায় মনের অতি সামান্য অংশই আমাদের চৈতন্যের অন্তর্ভুক্ত থাকে। বাকী সবই অর্দ্ধ-চৈতন্যের (subconsciousness, in the region of subliminal consciousness) এলাকাধীন থাকে। এই অর্দ্ধ-চৈতন্য অথবা সুপ্ত-চৈতন্যের শক্তি অত্যন্ত অধিক। এই সুপ্ত-চৈতন্য অংশকে (region of subconsciousness) মনের ভাণ্ডার-গৃহ বলা যায়। আমাদিগের যত অভিজ্ঞতা, যাহা আমরা সর্ব্বদা অনুভব করি না, কিন্তু অবস্থানুসারে যাহা স্মৃতিপথে উদিত হয়, সে সমস্তই আমাদের এই 'সুপ্ত চৈতন্য' ভাঁড়ার-ঘরে মজুত থাকে। প্রয়োজনমত জিনিসপত্র ভাঁড়ার-ঘর হইতে বাহির করিয়া আনিলেই হয়।

আমাদের মানসিক সূক্ষ্মশক্তিসমূহের নিবাস-স্থান—এই সুপ্ত-চৈতন্য-অংশ। চৈতন্য অবস্থায় (In conscious

state) যাহা আমরা করিতে পারি না, সুপ্ত-চৈতন্য অবস্থায় (subconscious) তাহা করিতে পারি—ইহার অনেক প্রমাণ আছে। মনের এই সুপ্ত-চৈতন্য-অংশের উপযুক্ত পরিচালনায় মানুষ অনেক শক্তিলাভ করিতে পারে। আমাদের জন্মজন্মান্তরের অভিজ্ঞতা এই সুপ্ত-চৈতন্যের মধ্যে সঞ্চিত থাকে। এই সুপ্ত-চৈতন্য অংশকে পূর্ণভাবে জাগরিত করিতে পারিলে, মানুষের জ্ঞান বহু দূর বিস্তৃত হয়, মানুষ বহু শক্তির অধিকারী হয়। যথাস্থানে তাহার আলোচনা হইবে।

মনোবিজ্ঞানবিদগণ মনের তিনটী শক্তি স্বীকার করেন—চিন্তাশক্তি, (Thinking) অনুভব শক্তি (Feeling) ইচ্ছা শক্তি (willing)। মনের এই ত্রিবিধ শক্তির উপযুক্ত বিকাশ সাধন করিলে, মানুষ সাধারণের অসাধ্য অনেক কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন। মনের সহিত শরীরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হেতু মন ও শরীরের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলে, এবং একটীর পরিবর্ত্তন হইলে অন্যটীরও পরিবর্ত্তন হয়।

শরীর, মন ও আত্মার বিবিধ শক্তির ইহকাল ও পরকালের আলোচনা করাই অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের লক্ষ্য।

কবির দুঃখ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

ভালবাস তারে সে ভালবাসিবে
ঘৃণা কর নাহি রাগ গো,
দীন ভেবে দয়া দেখাতে এসো না,
তাতে পায় বড় দাগ গো।

অনশনে রয় তাতে দুঃখী নয়
ধনীর দুয়ারে যায় না,
দয়া করে মান কি করিবে দান
কবি সে করুণা চায় না।

দুখ সাগরের সে যে রে ডুবারী
লোভ তার শুধু মুক্তায়,
শঙ্খ শামুক লইতে বিমুখ
দংশিলে নাহি দুখ তায়।

সে যে জগতের পাগল হরিণ
মানে নাক কোনো তর্ক,
সুদূর বাঁশীতে প্রাণ আনচান্
বুক পেতে লয় শর গো।

টুক্‌রা ফিতার করে না ক' লোভ
চায় না রাজার পাঞ্জা,
রাজার রাজার কৃপার ভিখারী
তাঁরি দাস হতে বাঞ্ছা।

কোথায় কে তার নিন্দা করিছে,
করিছে কে তারে তুচ্ছ—
ক্ষেপা খেয়ালীর খেয়াল নাহিক
দৃষ্টি যে তার উচ্চ।

ঘর নাই বলে ঘৃণা কর পিকে
রূপ নাই কর দুঃখ,
আম মুকুলের গন্ধে পাগল
গান গাওয়া তার সুখ গো।

কখন মাধব কোন্ দিকে আসে
সেই সন্ধানে ফিরছে,
তোমরা কজন ভাবিয়া আকুল—
রচিলনা কই নীড় যে!

পেচক তাহারে নির্ব্বোধ বলে
দরিদ্র বলে গৃধ্র,
বিজ্ঞ বাদুড় চক্ষু মুদিয়া
খুঁজিছে তাহার ছিদ্র,

সে তখন বসি মাধবীকুঞ্জে
কণ্ঠের সুধা ঢাল্‌ছে,
চিত্রার ঊষা জাগিছে সে ডাকে,
সরমে কপোল লাল্‌চে।

সুখী তার সম কে আছে ধরায়
কাহার এমন ভাগ্য।
বিদুরের ক্ষুদ হরি তার সনে
নিজে করে লন ভাগ্ গো।

মানের কাঙ্গালী যশের ভিখারী
নামের ব্যাপারী নয় সে,
ভগবান ছাড়া দুনিয়ার মাঝে
করে না কারেও ভয় সে।

দৈত্য দানার ভ্রূকুটী ভীষণ
বৈরীর ষড়যন্ত্র.
গ্রাহ্য করে না—বুকে যে পেয়েছে
বাণীর অভয় মন্ত্র!

দীন সেইজন, যেজন তাহারে
দীন বলে আহা ভাব্‌বে,
কোন্ জন হায় পুণ্যকে কাঠায়
তাহার পুলক মাপ্‌বে!

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীসৌরেন্দ্রচন্দ্র দেব বি-এস্‌সি

প্রাচীন মিশরের নিদর্শন

মিশরের তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বের অধিপতি টুটেন খামেনের সমাধিসৌধের মধ্যে আবার দ্বিতীয়বার অনুসন্ধান

হাওয়ার্ড কার্টার্

আরম্ভ হ'য়েছে। এবার অনুসন্ধানকারীদের মধ্যে প্রধান হ'চ্ছেন হাওয়ার্ড কার্টার (Howard Carter) সাহেব। সম্রাট জীবিতাবস্থায় যে সকল দ্রব্য ব্যবহার ক'রতেন, সেগুলি তাঁর কবরের আশে পাশে বিভিন্ন কক্ষে স্থাপিত ছিল। কার্টার সাহেব সেগুলি সব অভগ্ন অবস্থায় আবিষ্কার ক'রেছেন। এই আবিষ্কারে বর্ত্তমান জগতে প্রাচীন মিশর-সভ্যতার এক অপূর্ব্ব নিদর্শন উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।
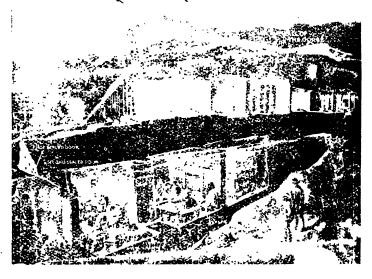
কবরের ভিতকার দৃশ্য ("ক" চিহ্নিত ঘরে টুট'ন্ খামেনের 'বসিবার ঘরের' ও "খ" চিহ্নিত ঘরে 'শয়ন ঘরের' আসবাবগুলি সজ্জিত রয়েছে। "গ" চিহ্নিত কক্ষে শবাধার বসান রয়েছে

টুটান খামেনের প্রতিমূর্ত্তি

স্তরের উপর উৎকীর্ণ প্রতিলিপি (টুটান্ খামেনের সমাধি-কক্ষের চতুর্দ্দিকে প্রস্তর নির্ম্মিত [illegible])

প্রপাতের পরিচর্য্যা

জগদ্বিখ্যাত নায়াগ্রা-প্রপাত আজ বিজ্ঞান ও মানবের কৃতিত্বের কাছে মস্তক অবনত ক'রেছে। তার ফেনিল তরঙ্গ আজ মানবের বিলাসিতার পরিচর্য্যা ক'রছে। লহরীর পর লহরী একটি পার্শ্বস্থিত তাড়িৎশক্তি-উৎপাদন গৃহের (Power House) মধ্যে গিয়ে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন ক'রে সহরের পর সহরকে বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সমুজ্জ্বল ক'রছে।
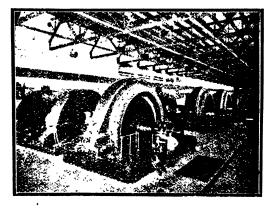
বৈদ্যাতিকশক্তি-উৎপাদনকারী যন্ত্র (এই যন্ত্রে নায়াগ্রা প্রপাত হ'তে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হয়)
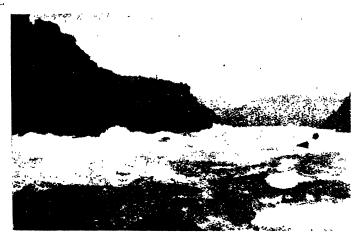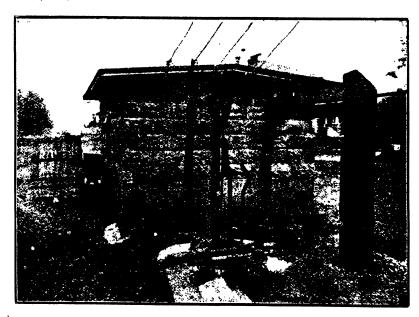
নায়াগ্রা প্রপাতের নিম্নাংশ

বিদ্যুৎভাণ্ডার (এই স্থান থেকে বিদ্যুৎশক্তি চতুর্দ্দিকে সরবরাহ করা হয়)

নায়াগ্রা প্রপাত

বৈদ্যুতিক শক্তি বলে এই ডেয়ারী‍তে দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রস্তুত হচ্চে

বৈদ্যুতিক-শক্তি উৎপাদন-গৃহ (নায়াগ্রা প্রপাতের এই স্থানে বৈদ্যুতিক শক্তি-উৎপাদন-গৃহে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করা হয়)

বৈদ্যুতিক শক্তি-উৎপাদন-গৃহের অভ্যন্তর
(বৈদ্যুতিক শক্তি-উৎপাদন-গৃহে বিভিন্ন যন্ত্রের সমবায়ে কিরূপে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়)

জলমগ্ন পর্ব্বতের সন্ধান

সাগরগর্ভস্থ পর্ব্বতে আঘাতপ্রাপ্ত হ'য়ে যা'তে কোনও জাহাজ জলমগ্ন না হয় সেজন্য রেমণ্ড ফ্রান্সিস্ (Raymond Francis) নামক মার্কিন নৌবিভাগের একজন অধ্যক্ষ একটি নূতন ধরণের অদ্ভুত যন্ত্র উদ্ভাবন ক'রেছেন। এই যন্ত্রের দ্বারা তিনি তরঙ্গের গতি ও সঞ্চাপন নিরূপণ ক'রে, জাহাজের কত নীচে বা কত দূরে জলমগ্ন পর্ব্বত আত্ম-গোপন ক'রে আছে, তা' নির্দ্দেশ ক'রতে পারেন; এবং তদনুযায়ী সাবধান হয়ে জাহাজের গতি বিভিন্ন পথে চালিত করেন।
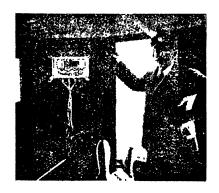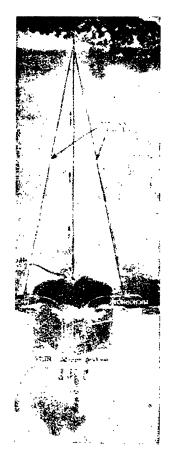
রেমণ্ড সাহেব (রেমণ্ড সাহেব তাঁর নবোদ্ভাবিত যন্ত্রের কার্য্যকারিতা পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌ছেন)

জলমগ্ন পর্ব্বতের সন্ধান (গতিশীল জাহাজ তরঙ্গের গতি ও সঞ্চাপন পরীক্ষা ক'রতে ক'রতে অগ্রসর হ'চ্ছে)

মানুষের মালিক

মানবের শরীরে যে সপ্তপ্রকার গ্রন্থি বা রসকোষ (gland) আছে, তদ্দ্বারা মানবের প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে থাকে। এই বিভিন্ন গ্রন্থির ভিন্ন ভিন্ন প্রভাবে কেহ কবি,

প্রকৃতি-বিচার (কোন কোন গ্রন্থি মানবকে কোন কোন প্রকৃতির (গুণের) অধিকারী ক'রে থাকে)

গ্রন্থি-চিকিৎসা (ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির গ্রন্থি-চিকিৎসা ক'রে তা'কে নিরাময় ক'রবার চেষ্টা ক'রা হ'চ্ছে)

কেহ বীর, কেহ ধীর, কেহ উদ্দাম চঞ্চল হয়ে উঠে। এই ব্যাপারে বৈজ্ঞানিকগণ নিজেদের মস্তিষ্ক চালনা ক'রতে গিয়ে শুধু ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা অনুক্রম করে থাকেন।

নিরাপদ পথ

বর্ত্তমানে বহুপ্রসিদ্ধ সহরের পথ দিবারাত্রি লোকে লোকারণ্য হ'য়ে থাকে বলে মোটর বা অন্যান্য গাড়ীর আঘাতে মৃত্যুর হার প্রতি দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হ'চ্ছে। এই অপঘাতের করাল কবল থেকে মানুষকে বাঁচাবার জন্য Malthus নামক একজন বৈজ্ঞানিক একরকম তিনতলা রাস্তার নক্‌সা ক'রেছেন, যা'তে মানুষ সহজেই অদূর-ভবিষ্যতে অপঘাত মৃত্যুর হাত থেকে নিজেদের প্রাণ রক্ষা ক'রতে পারবে।
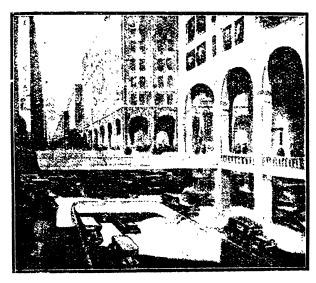
তিনতলা রাস্তার আনুমানিক চিত্র

রাজপথে মোটর গাড়ীর ভীড়

দগ্ধের জীবনরক্ষা

অর্দ্ধদগ্ধ মানুষকে মৃত্যুমুখ থেকে রক্ষা ক'রবার জন্য সম্প্রতি Prof. Yandell Handisen নামক একজন বৈজ্ঞানিক একপ্রকার নূতন ধরণের অম্লজান মুখোষ (oxygen mask) নির্ম্মাণ ক'রেছেন। সেটি

চিকিৎসা (নবোদ্ভাবিত অম্লজান মুখোষের

দুর্ঘটনা ঘটবামাত্রই অর্দ্ধদগ্ধ ব্যক্তির মুখে সংলগ্ন ক'রে দিয়ে তাকে শয্যায় শয়ন করিয়ে দেওয়া হয়। তখন রোগী ধীরে ধীরে সেই যন্ত্রের সাহায্যে নিশ্বাসবায়ু গ্রহণ ক'রে প্রাণে বাঁচে।

সাগর-পান

পানীয় জলের অভাবে সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী অনেক দেশ অনেক সময়ে কষ্টভোগ ক'রে। এই কষ্ট দূর ক'রবার জন্য কয়েকজন বৈজ্ঞানিক কঠোর পরিশ্রম ক'রে একটি নূতন ধরণের বৈদ্যুতিক যন্ত্র উদ্ভাবন ক'রেছেন, যদ্দ্বারা তাঁরা সমুদ্রগর্ভ হ'তে লবণাক্ত জল গ্রহণ ক'রে সেই জল পানীয় জলে পরিণত ক'রতে পারেন।

অম্লজান মুখোষ (এই মুখোষ পরিধান ক'রে প্রায় দুই ঘণ্টা এঞ্জিন ঘরে কাজ করা যায়)

নিশ্বাসবায়ু গ্রহণ
(কিরূপে পৃষ্ঠস্থিত জলীয় অম্লজানের আধার থেকে অম্লজান নিশ্বাসবায়ু হিসাবে গ্রহণ ক'রতে হয়)

পরীক্ষা ক্ষেত্রে (বৈজ্ঞানিকগণ সমুদ্রের তলে বসিয়া যন্ত্রের পরীক্ষা ক'রছেন) বৈদ্যুতিক প্রদীপ। এই বৈদ্যুতিক প্রদীপের সাহায্যে বৈজ্ঞানিকগণ সমুদ্রের তলদেশে কার্য্য করেন)

জলীয় অম্লজান (একটি পাত্রে জলীয় অম্লজান ঢালা হচ্ছে)

কার্য্যক্ষেত্রে
(জলীয় অম্লজানের পাত্র পৃষ্ঠের উপর রেখে কারিগর এঞ্জিনঘরে কাজ ক'রতে যাচ্ছে)

অতিরিক্ত শ্বাসাধার

বড় বড় কারখানার এঞ্জিনঘরে এত ভীষণ তাপ যে, সেখানে নিশ্বাসবায়ু গ্রহণ করা অসম্ভব, অথচ সেখানে কাজ

না করিলেই নয়। এই অসুবিধা দূর ক'রবার জন্য Dr. Bernhard Draeger নামক Lubeck সহরের একজন বৈজ্ঞানিক একপ্রকার জলীয় অম্লজান তৈয়ারী ক'রেছেন। সেটি কোনও পাত্রে পূ'রে পৃষ্ঠের উপর রেখে নলের সাহায্যে অনায়াসে নিশ্বাসবায়ু গ্রহণ ক'রতে পারা যায়।

কলের গানে গলার সুর

কোনও সৌখীন মার্কিণ ভদ্রলোক ফনোগ্রাফের সঙ্গীতও যাতে নির্দ্দোষ ও মিষ্ট শুনায়, তার একটী সুন্দর উপায় উদ্ভাবন ক'রেছেন। তিনি ষ্টেন্‌ট্রোফোন (Stentrophone) নামক এক অভিনব ধরণের ফনোগ্রাফ নির্ম্মাণ ক'রেছেন, যা'র হর্ণটী ভিতর দিকে থাকে; এবং সঙ্গীত যখন ভিতর হইতে বাহিরে আসে, তখন নানারূপ যন্ত্র সাহায্যে সঙ্গীতের যন্ত্রোত্থিত কর্কশ ও অস্বাভাবিক ভাব দূরীভূত হ'য়ে একটী সহজ সুমিষ্ট কোমল সুরের সৃষ্টি হয়।
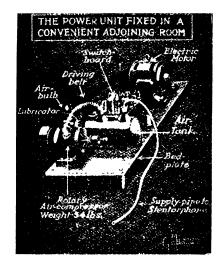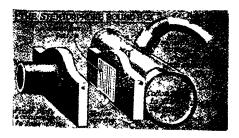
ষ্টেনটোফোন চালাবার যন্ত্র
(নিকটবর্ত্তী কোনও একটি ঘরে এই যন্ত্র রেখে এর সাহায্যে ষ্টেনটোফোন বাজাতে হয়)

ষ্টেনটোফোনের নাদযন্ত্র (sound box)

ষ্টেনটোফোন

রাজপুরী

(দৃশ্য-কাব্য)
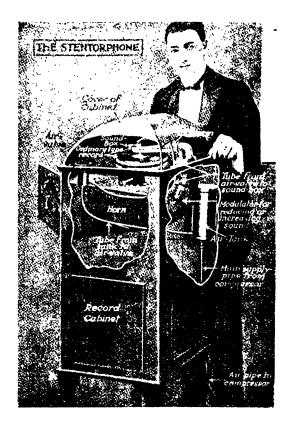
মন্মথ রায়

কোশল-রাজধানী শ্রাবস্তী। রাজা প্রসেনজিৎএর রাজ-প্রাসাদ-মধ্যস্থ মহাসমারোহে-সজ্জিত উদ্যান-ভবন। বাহিরে পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-স্নাত কুঞ্জ-বীথি। সম্মুখে শ্বেত-পাথরের অঙ্গনে ঝর্ণা। কক্ষ মধ্যে সহস্র প্রদীপের পূর্ণদীপ্তি।

চৈত্র মাসের বসন্ত-উৎসব। আজ কনিষ্ঠ কুমার রাজশেখরের তৃতীয় বার্ষিক জন্মতিথি বলিয়া বসন্তোৎসবের বিচিত্র গরিমা সমধিক বর্দ্ধিত।

কুঞ্জ-বীথির অন্তরালে, ঝর্ণার চারি পাশে, প্রাসাদ-কক্ষের মধ্যে আবির কুস্কুম ও রং লইয়া রাজান্তঃপুরের নরনারী উৎসবমত্ত।

দৃশ্য-পট উত্তোলিত হইলে দেখা গেল সেই পরিপূর্ণ উৎসবের উন্মত্ত বিশৃঙ্খলতা,—আর শোনা গেল অজস্র কণ্ঠের বিচিত্র কলগান। সহসা ভেরী ও দামামা বাজিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ পুরুষগণ "রাজা" "রাজা" এবং নারীগণ "রাণী" "রাণী" বলিয়া চীৎকার করিয়া সকলে কক্ষ মধ্যে যথাশীঘ্র সমবেত হইলেন।

কক্ষের তিনটি দরজা। দক্ষিণের ও বামের দরজা দুইটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র · কিন্তু মধ্যের দরজাটি সুবিশাল। মধ্যের এই সুবিশাল দরজাটি ধীরে ধীরে খুলিয়া গেল। এই দরজা দিয়া রাণী বাসবক্ষত্রিয়া তাঁহার তিন বৎসর বয়স্ক শিশু পুত্র কুমার রাজশেখরকে দুই হস্তে ঊর্দ্ধে ধারণ পূর্ব্বক নাচাইতে নাচাইতে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতেই ছিলেন রাজা প্রসেনজিৎ...তাঁহার হাতে ছিল একটি স্বর্ণ-পেটিকা। রাজা ও রাণী কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেই তাঁহাদের এক পার্শ্বে পুরুষগণ ও অন্য পার্শ্বে নারীগণ রংএর পিচকারি হস্তে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং রং-ক্রীড়া করিতে করিতে গান করিতে লাগিলেন।

—গান শেষ হইলে সকলেই আভূমি নত হইয়া রাজা-রাণীকে অভিবাদন করিলেন।

রাজা। [দুই হস্ত দুই দিকে প্রসারিত করিয়া দিয়া] স্বস্তি! স্বস্তি! স্বস্তি!

[তাহার পর]—উৎসব এখনো সম্পূর্ণ হয় নাই। তোমাদের জন্য ভগবান বুদ্ধের শ্রীচরণে আবির কুস্কুম নিবেদন ক'রে সেই চরণাশীষ এনিছি। রাণী! কুমারকে আমার ক্রোড়ে দিয়ে তুমি এই চরণাশীষের ডালি নাও... সবার কপালে এই মঙ্গল-ধূলির টিপ্ দিয়ে দাও......

রাণী। [চমকিয়া উঠিয়া] আমি!

রাজা। হাঁ, তুমি।

রাণী। না রাজা,—তুমিই দাও.....,চেয়ে দেখ রাজশেখর এই রংএর খেলা দেখে কেমন খুসী হয়ে উঠেছে!...ওর এই পদ্ম-আঁখি দুটিতে কেমন হাসি ফুটে উঠেছে!—কি চোখ!—কি সুন্দর! [কুমারের চোখে চুম্বন করিতে লাগিলেন।]

পুরুষগণ। —দিন্...আমাদের মাথায় ভগবানের চরণ-ধূলি দিন্......

নারীগণ। রাণীমা!—আমাদের কপালে ভগবানের ঐ চরণ-ধূলির টিপ্ পরিয়ে দিন্......

রাজা। রাণী!—কুমারকে আমার হাতে দিয়ে এই ডালি ধর...

রাণী। রাজা!—রাজশেখর আমার পানে চেয়ে আছে!...অপলক চোখে চেয়ে আছে!—চরণ-ধূলি তুমিই বিলিয়ে দাও... শেখর! আমার সোনা! আমার মাণিক!

[কুমারকে পুনরায় চুম্বন-বন্যায় ভাসাইয়া দিলেন।]

রাজা। কিন্তু রাণী, এ মঙ্গলাশীষ তোমার পুণ্য-হস্তেই বিতরিত হয়...স্বয়ং ভগবানের ইচ্ছা!

রাণী। আমার পুণ্য-হস্তে! [কাঁপিয়া উঠিলেন।] [সংযত হইয়া কুমারের পানে অপলক দৃষ্টিতে...] না রাজা! আমাকে ক্ষমা কর।—আমি পার্ব্ব না...আমার মাণিক আমার পানে তাকিয়ে আছে...আমার এটুকু তৃপ্তি...থাক্ না!

রাজা। কিন্তু, তুমি যে রাণী শাক্য-কুল-দুহিতা...! ভগবান বুদ্ধের পুণ্য-বংশের পূত-রক্তে তোমার জন্ম! ভারতবর্ষের সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাক্যবংশে তুমি জন্মগ্রহণ করেছ বলে ভগবান বুদ্ধের প্রসাদ বিতরণের জন্য সকলে যে তোমার মুখের দিকেই চেয়ে থাকে!

রাণী। আর এই শেখর!...সে কি আমার মুখের দিকে চেয়ে নাই?—না রাজা, শেখর ভয় পেয়েছে... সে কেঁপে উঠেছে···তার আঁখিতারা ভয়ে মিট্ মিট্ কর্ছে··· ও কেঁদে উঠবে!—আমি ওকে নিয়ে বাইরে ঐ ঝর্ণার ধারে চললুম···।—শেখর! আমার সোণা! আমার মাণিক! আমার লক্ষী!

[তাহাকে চুম্বন করিতে করিতে অঙ্গনের পথে ঝর্ণার দিকে প্রস্থান।]

রাজা। রাণী কুমারকে নিয়েই পাগল। আমি এ চরণাশীষ তুলে রাখলুম··রাণী অন্য সময় তোমাদের এ প্রসাদ দেবেন। চল, আমরা কলা-ভবনে যাই। কুমারের জন্ম-তিথি উপলক্ষে রাণী কপিলাবস্তু হতে তাঁর পিতা শাক্যরাজার সভাকবি কবিশেখরকে নিমন্ত্রণ করে এনেছেন— তাঁর গীতিকাব্য, তাঁর গান···সুন্দর···অতি সুন্দর। যাও, তোমরা সেই সঙ্গীত-সুধায় স্নান করে ধন্য হয়ে এস...রাণীকে সঙ্গে নিয়ে আমিও এখনি যাবো···

[অঙ্গনের পথে রাজা ভিন্ন সকলের প্রস্থান।]

[রাজা ধীরে ধীরে অঙ্গনের পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাণীকে ডাকিবেন, কি, নিজে রাণীর নিকট যাইবেন চিন্তা করিতে করিতে রাণীকেই ডাক দিলেন···]—রাণী!

রাণী। [প্রাঙ্গণ হইতেই] আমায় ডাকছো?

রাজা। ডেকে কি কোন দোষ করলুম? [এমন সময় কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া রাণী রাজার নিকট কক্ষমধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন।]

রাণী। [রাজার প্রতি]—রাগ করেছ বুঝি?—কিন্তু, র'সো······,—মল্লিকা! [দক্ষিণের দ্বারপথে রাণীর সহচরী মল্লিকার প্রবেশ] জলতরঙ্গের বাদ্য এনে বাজা··· শেখরের চোখে ঘুমের পরী উড়ে এসে চুমো দিক্··· [কুমারকে চুম্বন করিয়া মল্লিকার ক্রোড়ে দিলেন। মল্লিকা তাহাকে লইয়া দক্ষিণের দ্বারপথে পার্শ্বস্থ কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। এবং শীঘ্রই জলতরঙ্গের বাদ্য আরম্ভ হইল। সেই মৃদু স্বর-লহরীর মধ্যেই রাজা রাণী কথোপকথন করিতে লাগিলেন] খুব রাগ করেছ, না?

রাজা। আমি হয় ত রাগ করিনি·· কিন্তু, পুরবাসীরা ক্ষুব্ধ হয়েছে। তোমার ঐ কল্যাণহস্তের মঙ্গলস্পর্শ হতে তাদের বঞ্চিত কর্লে কেন রাণী?

রাণী। রাজা!—আজ তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্ব।—ঠিক্ উত্তর দেবে?

রাজা। কি রাণী?

রাণী। আমাকে তুমি কি ভাবো?—আমি মানুষ, না, দেবী?

রাজা। তুমি দেবী...স্বয়ং ভগবানের পূত রক্ত তোমার শিরায় ধমনীতে প্রবাহিত...

রাণী। এবং সেই জন্যই, বৌদ্ধসঙ্ঘে কৌলিন্য লাভের সহজ পন্থা স্বরূপ তুমি তোমার সামন্ত শাক্যরাজকে তোমার রক্তচক্ষুতে বশীভূত করে আমাকে তোমার সহধর্ম্মিণীরূপে গ্রহণ করেছ,—কেমন?

রাজা। ঠিক্।

রাণী।—বেশ.। কিন্তু, এই আমি যদি ঐ শাক্য কুলে জন্মগ্রহণ না করতুম, তবে...আমার এই সাধারণ রূপ-সম্পদ নিয়ে এ জীবনে হয়ত তোমার দৃষ্টিই আকর্ষণ কর্ত্তে পার্ত্তুম না···

রাজা। পদ্ম কি তার নিজের রূপ নিজে উপলব্ধি কর্ত্তে পারে?

রাণী।—ও উত্তরে আর কাউকে ভোলাতে পার··· কিন্তু, তোমার সত্যিকার উত্তর আমি বেশ জানি। তবে তোমার এ সংসারে আমার জন্মের ভিত্তিটুকুর উপরই আমি দাঁড়িয়ে আছি। সেই জন্যই আমি দেবী···সেই জন্যই আমি সহধর্ম্মিণী। কিন্তু, রাজা, এমনি করেই কি আমাকে দূরে ঠেলতে হয়?

রাজা। তার অর্থ?

রাণী। আমাকে কি তুমি শুধু মানুষ বলে ভাবছে

পার না? তুমিও মানুষ, আমিও মানুষ···জন্ম আমাদের যা-ই হোক্ না কেন!

রাজা। কিন্তু তোমার এই জন্ম-গৌরবের উপরই যে বৌদ্ধ-সঙ্ঘে আমার সকল সম্মানের প্রতিষ্ঠা! আজকে সেই পুরানো কথাটি মনে পড়ছে। ষোল বছর পূর্ব্বে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সঙ্ঘে আমি তাঁদের জন্য আহার্য্য পাঠাতুম। কিন্তু, দেখতুম, তাঁরা তা শ্রদ্ধায় গ্রহণ কর্ত্তেন না। এক দিন আমি নিজে স্বয়ং ভগবানের নিকট গিয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলুম। ভগবান বল্লেন "বন্ধুত্বের দান ভিন্ন আমরা অন্য দান গ্রহণ করি না।" শুনলুম "জ্ঞাতিবন্ধুই শ্রেষ্ঠ বন্ধু।"

রাণী। তার পর আমাকে গ্রহণ করে সেই জ্ঞাতিত্ব অর্জ্জন করেছ। কিন্তু রসাতলে যাক্ সেই সমাজ···যে সমাজে বন্ধুত্ব জ্ঞাতিত্বের চোরাবালির উপর নির্ভর করে!

রাজা। রাণী! তুমি হঠাৎ এমন উত্তেজিত হয়ে উঠছ কেন?

রাণী। [রাজার প্রতি অতি করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া] আমি এখন রাত্রিতে ঘুমাতেও যে পারি না রাজা!

রাজা। সে আমি দেখেছি। কিন্তু কেন রাণী?

রাণী। আমি ভাবি...সারাক্ষণ ভাবি!...আমি ভয় পাই···ইচ্ছা হয়···ইচ্ছা হয়—

রাজা। কি ইচ্ছা হয় রাণী?

রাণী। আমি হয় ত পাগল হব! হব কি, হয়ত হয়েছি,—না রাজা?

রাজা। তোমার কি ইচ্ছা হয় রাণী?

রাণী। হাসবে না?

রাজা। হাসবো কেন!

রাণী। কাঁদবে না?

রাজা। কাঁদবো কেন! ছিঃ রাণী!

রাণী। রাগ কর্ব্বে না?

রাজা। [রাণীর হাত দুখানি ধরিয়া] তোমার কি ইচ্ছা হয় রাণী?

রাণী। [অপ্রকৃতিস্থ ভাবে]—আমি আমার এই বসন ভূষণ ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলব···

রাজা। [হাসিয়া] আমার এক রাজ্যখণ্ড-মূল্যে এর চাইতে সহস্রগুণে গরিমাময় বসন ভূষণ তোমায় আমি পরিয়ে দেব···

রাণী। না রাজা। সেদিন কাশী হতে এক নর্ত্তকী এসে আমাদের সম্মুখে নৃত্য করেছিল—নৃত্য কর্ত্তে কর্ত্তে সে বিবসনা হয়ে পড়েছিল। আমি তার সেই অসভ্যতার জন্য তোমার চোখের সম্মুখেই তার মস্তক মুণ্ডন করে দিতে আদেশ দিয়েছিলুম।—মনে পড়ে?

রাজা। হাঁ, তুমি তাকে কিছুতেই ক্ষমা কর্লে না···

রাণী। [নিম্নস্বরে চারিদিকে চাহিয়া] এখন আমার ইচ্ছা হয়···আমিই তার সেই নগ্ন নাচ নাচি...দেহের এই মিথ্যা আবরণ ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলি···আত্মার উলঙ্গ মূর্ত্তি নিয়ে তোমার চোখের সম্মুখে দাঁড়াই!—রাজা! রাগ কর্লে?

রাজা। রাণী!—রাজসভায় চল···তোমার পিত্রালয়ের সভা-কবি কবিশেখর এসেছেন,—তিনি গান কর্ব্বেন··· হয়ত আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছেন।

রাণী। [রাজার মুখে কবিশেখরের নাম শুনিয়াই চমকিয়া উঠিয়া তৎক্ষণাৎ আত্মসম্বরণ পূর্ব্বক, সহজ সংযত স্বরে] কবিশেখর! হাঁ, সে আমার নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছে। এসেছে,—না?—কিন্তু, আমি যে আমার বিরূধকের প্রতীক্ষা করছি···তারও তো কবিশেখরের সঙ্গেই শ্রাবস্তীতে ফিরে আসার কথা...

রাজা। কুমার বিরূধক আর কবিশেখর এক সঙ্গেই কপিলাবস্তু হতে রওনা হয়েছিলেন। কিন্তু, সৈন্যদলের নদী পার হ'তে একটু বিলম্ব হওয়াতে যুবরাজের পুর-প্রবেশেও একটু বিলম্ব হবে। তবু, খুব সম্ভবতঃ সে আজ রাত্রিতেই এসে পড়বে...

রাণী। আমি বিরূধকের সঙ্গে দেখা না করে কোনখানে যেতে পার্ব্ব না···

রাজা। এলেই দেখা হবে···

রাণী। না, কারো সঙ্গে 'তার দেখা হওয়ার পূর্ব্বে আমি তার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে চাই···

রাজা। বেশ্...তা-ই ক'রো...। এখন চল...

রাণী। না, আমি যাব না। আমি তার সঙ্গে সবার আগে গোপনে দেখা কর্ব্ব...

রাজা। কেন রাণী?

রাণী। [হাসিয়া] কৌতূহল, শুধু কৌতূহল। ছোট বেলাতে সে এসে আমাকে জ্বালাতন কর্ত্ত "মা, আর সব

রাজপুত্রদের মামার বাড়ী হতে কত উপহার আর উপঢৌকন আসে।—আমার আসে না কেন?" আমি বলতুম "তোমার মামার বাড়ী, সেই কপিলাবস্তু—কত দূ—র! তাই তোমার দাদামশায় বা দিদিমা কিছু পাঠাতে পারেন না।" তার পর এই ষোল বছর বয়সে যুবরাজ হয়েই সে জিদ্ ধরল সে কপিলাবস্তুতে যাবে। আমি বাধা দিতে পারলুম না—...

রাজা। বাধা দিবেই বা কেন। তোমার বাবা মা তাকে দেখে না জানি কত খুসী-ই হয়েছেন...কত আদর-যত্নই না জানি তাকে করেছেন!

রাণী। সেই কথা শোনবার জন্যই তো আমি ছট্‌ফট্ কর্ছি।—তুমি যাও রাজা...রাজশেখর একলাটি ঘুমিয়ে রয়েছে তাকে ফেলে আমি যেতে পার্ব্ব না...

রাজা। কিন্তু তোমাকে রেখে আমি একলাটি রাজসভায় গেলে কবিশেখরের গান জমবে তো? [রসিকতার হাসিটুকু হাসিয়া বামপার্শ্বস্থ দরজা দিয়া প্রস্থান।] [রাণীও দক্ষিণের দরজা দিয়া কক্ষান্তরে প্রস্থান করিতেছিলেন. এমন সময় সহসা বাহিরে অতি তীব্রভাবে ভেরীবাদ্য হইতে লাগিল। রাণী চমকিয়া উঠিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন। জলতরঙ্গের বাদ্য বন্ধ হইয়া গেল।]

রাণী। মল্লিকা...

[মল্লিকার প্রবেশ]

মল্লিকা। মা!

রাণী। [উত্তেজিত ভাবে] অকস্মাৎ এই ভেরীবাদ্য কেন?

মল্লিকা। তা তো জানি না মা...

রাণী। [ভয়-মিশ্রিত চাঞ্চল্য ও উত্তেজনায়]—হয় ত বিরূধক এসেছে!—নিশ্চয়! নিশ্চয়!

[কবিশেখরের প্রবেশ]

কবি। না, সে এখনো আসে নি—

রাণী। [ক্রমে, চেষ্টা করিয়া সংযত ও শান্ত হইয়া সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থভাবে] তবে ও বুঝি তোমারি অভিনন্দন?

কবি। আমার অভিনন্দন তোমার ঐ দৃষ্টি-প্রসাদে।

রাণী। [অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া] বটে! হুঁ। [ভেরীবাদ্য] তবে ও কি?

কবি। যুদ্ধের আশঙ্কা।

রাণী। যুদ্ধ?

কবি। হাঁ, খণ্ডযুদ্ধ। আজ বসন্তোৎসব আ[র] কুমারের জন্মতিথি উপলক্ষে নগরবাসী প্রমোদোন্মত্ত জে[নে] গুপ্ত বিদ্রোহ মাথা তুলে দাঁড়াবে খবর পাওয়া গেছে সেনাপতির এই সংবাদে এই মাত্র রাজা স্বয়ং দুর্গে চ[লে] গেলেন। তোমার সঙ্গে দেখা করার আর সময় না পে[য়ে] আমাকে দিয়ে তিনি তোমাকে এ খবর পাঠিয়ে দিলেন—

রাণী। [পরিপূর্ণ ঔৎসুক্যে] শেখর!—আমা[র] বিরূধক?

কবি। ভয় নেই। সে নিরাপদ। তার নিকট খব[র] গেছে। নগরের বাইরে সে সুগুপ্তভাবে অবস্থান কর্ব্বে।

রাণী। কিন্তু সে নগরে প্রবেশ করার পর—

কবি। রাজা বলে গেলেন কোনই আশঙ্কা নেই। বিদ্রোহীরা ঐ ভেরীবাদ্যে রাজধানী সতর্ক রয়েছে বুঝতে পেরে খুব সম্ভবতঃ আর আত্ম-প্রকাশই করবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক—

রাণী। [দারুণ উত্তেজনায়] সম্মুখে বিরূধক...তবু আমি নিশ্চিন্ত! কবি! এবার কি তবে শুধু ব্যঙ্গ কর্ত্তেই এসেছ?

কবি। কেন রাণী?

রাণী। আমি মাঝে মাঝে বিস্মিত হই তোমার স্পর্দ্ধা দেখে..আবার পরক্ষণেই তোমার ঐ চোখের দিকে যেই চাই—আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়ি—!

কবি। আমি তোমাকে রাজার খবর দিতে এসেছিলাম, এইবার তবে কলা-ভবনে যাই...

রাণী। —দাঁড়াও...

কবি। —বল...

রাণী। কাছে এস...আরো কাছে এস...

কবি। [অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাছে আসিয়া]— বল ..

রাণী। [চারিদিকে চাহিয়া নিম্ন স্বরে] বিরূধক কি কিছু জেনে এসেছে?

কবি। সে পথ তো তুমি পূর্ব্ব হতেই রুদ্ধ করে রেখেছিলে—.

রাণী। তবু...যদি কারো বিন্দুমাত্র অসাবধানতায়—

কবি। —না, তা হয় নি।—হ'লে আমি শুনতে পেতাম।

রাণী। কবিশেখর!

কবি। রাণী!

রাণী। —আর যে আমি পারি না!—এ যে অসহ্য!

কবি। চল, আমি গান গাইব···তুমি শুনবে...

রাণী। কিন্তু, তার পূর্ব্বে আজ আমার গানখানি শোন...শুনবে?

কবি। —গাও...

রাণী। —তোমার সেই কালো পাখীটি ভালো আছে?

কবি। কালো পাখী?

রাণী। —তোমার বৌ...সেই "কোকিল"...

কবি। তার নাম তো কোকিল নয়···

রাণী। ও...তবে, তবে. হাঁ, "কাক"; না?

কবি। তার নাম "কাকলী।" আমি চললুম...

[প্রস্থানোদ্যত···]

রাণী। না, না, রাগ ক'রো না। আমি ভুলে গিয়েছিলুম। তা, তার চোখ ভালো হয়েছে?

কবি। —সে এখন সম্পূর্ণ অন্ধ...

রাণী। এখনো তুমি তাকে···তেমনি ভালোবাসো··—না?

কবি। [পরিপূর্ণ বিরক্তিতে চলিয়া যাইতে যাইতেই সহসা ফিরিয়া] তোমার কি মনে হয়?

রাণী। —আমাকে ক্ষমা কর। হাঁ, ভালো কথা, তোমার মেয়ে ভালো আছে?

কবি। —আছে।

রাণী। সে দেখতে কেমন হয়েছে কবি?

কবি। কালো হলেও সে আমাদের কুটীরখানি আলো করে রেখেছে রাণী!

রাণী। কবি! আর একটি প্রশ্ন তোমায় জিজ্ঞাসা কর্ব্ব...রাগ কর্ব্বে না?

কবি। বল রাণী···

রাণী। তোমার মেয়ে দেখতে কার মতো হয়েছে কবি?

কবি। [একটু ভাবিয়া] কেমন করে বলব!

রাণী। এই ধর, তোমার মতো...কি তার মা কাকলীর মতো...কিম্বা...

কবি। ...কিম্বা—

রাণী। ···[একটু ইতস্ততঃ করিয়া] এই আমার মতো...

কবি। তার রং হয়েছে তার মার মতো...আর মুখ হয়েছে বোধহয় কতকটা আমারি মতো...

রাণী। শেখর! শেখর! আমার মতো কি তার কিছুই হয়নি···এতটুকুও না?

কবি। —অপরূপ তোমার রূপ!—সে রূপসী হয় নি রাণী!

রাণী। —হুঁ। তার চোখ দুটি ঠিক্ তোমারি মত হয়েছে, না?

কবি। —হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু, একরত্তি ঐ মেয়েটির উপর তোমারি বা এত আক্রোশ কেন?

রাণী। ...তোমার ঐ চোখ...ও যে অতুল!... অনুপম!—এখন কি ভাবি জানো?

কবি। —কি ভাবো রাণী?

রাণী। —প্রকৃতির প্রতিশোধ।

কবি। কিরূপ?

রাণী। আমি তোমার ঐ চোখদুটির পানে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতুম · কিন্তু তুমি আমার পানে ফিরেও তাকাও নি ..আজ তোমার ঐ কাকলীই তার শোধ নিয়েছে...

কবি। আজ আর সে পুরানো কথা কেন?

রাণী। —আজ নয়ই বা কেন? আজ একটা শেষ বোঝা-পড়া হয়ে যাক্।···তোমার ঐ চোখ দুটি আমার বড়ই ভাল লাগতো...মনে করে দেখ সেই কিশোর কালের কথা। আমাদের রাজসভায় তুমি গান গাইতে...আমি কখনো বা নাচতুম কখনো বা বীণা বাজাতুম।...আমার নৃত্যের তালে তালে তোমার গান অগ্নিশিখার মত খেলতো...আমার সুরের ঝঙ্কারে তোমার ·চোখে মুখে বিদ্যুৎ চমকাতো...

কবি। —মনে আছে। তুমিই আমার কণ্ঠে সুর দিয়েছিলে, প্রাণে গান দিয়েছিলে...

রাণী। [শ্লেষ হাস্যে]—দিয়েছিলুম,...সত্যি?—কিন্তু তার চাইতেও তো আরো বেশী কিছু দিতে চেয়েছিলুম...তবে আমার সে বরমাল্য প্রত্যাখ্যান কর্লে কেন

কবি?...তোমার সেই বালিকা-বধূ...সেই গ্রাম্যবালা··· সেই দৃষ্টিহীনা কালো বৌ-টি···সে কি···

কবি। —রাণী, ক্ষমা কর,...আমি আসি...

[প্রস্থানোদ্যত...]

রাণী। [হঠাৎ আদেশসূচক স্বরে] না, যেতে পার্ব্বে না···দাঁড়াও...

কবি [চমকিয়া উঠিয়া...সবিস্ময়ে]—এ কি! ও হাঁ...তুমি রাণী...কি আদেশ?

রাণী। —হাঁ, আমি রাণীই বটে···কিন্তু, এ মণি-মুকুট আমি চাই নি...আমি চেয়েছিলুম তোমার ভাঙা-ঘরের চাঁদের আলো। আমি তো রাজশক্তির দিব্যদৃষ্টি চাই নি···আমি তোমার ঐ পদ্ম-চক্ষুর দৃষ্টিপ্রসাদ চেয়েছিলুম। তুমি বলেছিলে কাকলী কি মনে কর্ব্বে... আমি বলেছিলুম কাকলী যে আকাশের তলে বাস করে সেই একই আকাশে চাঁদও ওঠে···সূর্য্যও ওঠে···ওঠে না?—বল তুমি···

কবি। —ওঠে। কিন্তু সে ছিল কালো, তার উপর সে ছিল দৃষ্টি-হীনা, তারো উপর সে ছিল শিক্ষাশূন্যা। তার এই অনন্ত দৈন্যকে আমি তো এক দিনও তার দৈন্য মনে কর্ত্তে দিই নি...সে তাই পরিপূর্ণ নির্ভরে আমার উপর নির্ভর করে ছিল। রাজকন্যাকে তার পাশে এনে দাঁড় করালে সে মনে কর্ত্ত জীবন তার ব্যর্থ...আমি তার রিক্ততা ঐ রাজকন্যাকে দিয়ে পূর্ণ করে নিলুম...

রাণী। হাঁ, তাকে দয়া করে গেলে, কিন্তু আমাকে দয়া কর্ত্তে তোমার হাত উঠলো না। আমিও প্রতিশোধ নিলুম। তারা যখন জোর করে আমার মাথায় কোশলের রাজমুকুট তুলে দিল, আমি আপত্তি কর্ল্ুম না। আজ আমি তো সেই রাণী!

কবি। —কল্পনাতীত সুখেই তো রয়েছ রাণী!

রাণী। —সুখে আছি! আর যদি কেউ এই কথা আমায় বলতো...আমি স্বহস্তে তার বুকে ছুরি বসিয়ে দিতুম!

কবি। —এ পক্ষপাত আমার উপর না হয় না-ই করলে!

রাণী। —তোমার ঐ চোখ...তোমার ঐ চোখ··· ---আমি সব ভুলে যাই। [বলিয়াই যেন লজ্জা পাইলেন। পরে সংযত হইয়া]—আমি কি অপ্রকৃতিস্থ হয়েছি শেখর?

কবি। অপ্রকৃতিস্থ হবে কেন রাণী?

রাণী। —আচ্ছা কবি, আমার এই নূতন রূপ দেখে কি বুঝছ?

কবি। —তুমি বসন্তের রাণী বাসন্তী!

রাণী। —রংএ লাল হয়েছি, না? মূর্খ! এ রং নয়!···এ রক্ত! তাজা রক্ত! টাট্‌কা রক্ত! এ আমার দৈনন্দিন ক্ষরণ!—আর কত যুদ্ধ কর্ব্ব! আর কতদিনই বা যুদ্ধ কর্ত্তে পারি!···শেখর! আমায় বাঁচাও···আমাকে নিয়ে পালিয়ে চল...আমাকে মুক্তি দাও···আমায় হাত ধরে নিয়ে বাইরে চল—

[কবির প্রতি হস্ত প্রসারণ করিয়া দিলেন...]

কবি। —[বিচলিত হইয়া]—কিন্তু রাণী, সে যে এখন সম্পূর্ণ অন্ধ! আঘাত যদি সে পায়, তবে এখনি যে সে সব চাইতে বেশী পাবে!

রাণী। [করুণ নেত্রে] শেখর!

কবি। শোন রাণী! জীবনের পুরানো পাতাগুলি ছিঁড়ে ফেলে নূতন পাতায় নূতন পুঁথি লেখ···শান্তি পাবে··· মুক্তি পাবে...

রাণী। —কিন্তু এখন তা সম্পূর্ণ অসম্ভব! না শেখর, আমার এই প্রসারিত হস্ত গ্রহণ করে সত্যের সম্মান রক্ষা কর...

কবি। ...ভুলে যাও...ভুলে যাও রাণী...আমাকে ভুলে যাও···

রাণী। অসম্ভব! অসম্ভব! ভুলে যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। কেমন করে ভুলি! আমার রক্তমাংসে তুমি জড়িয়ে রয়েছ। আমার এই নগ্ন সত্যকে মিথ্যার আবরণে আর কত দিন ঢেকে রাখতে পারি?

কবি। মনে কর আমি মৃত। আর তা-ও যদি না পারো রাণী,...ঐ হাতে একখানি অস্ত্র এনে দাও···এখনি আমি তা সাগ্রহে গ্রহণ করে আমার মৃত্যুর প্রত্যক্ষ সত্যকে তোমার চোখের সম্মুখে ধরি...

রাণী। [কিয়ৎক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়া] তুমি জান না! তুমি দেখ নি!···তা-ই।... কবি! ক্ষণেক অপেক্ষা কর···আমার কুমার হয়ত জেগে

উঠে কাঁদছে . আমি তাকে নিয়ে আসি। তুমি তাকে দেখ নি, না কবি ?

কবি। —দেখতে আর অবসর পেলুম কই রাণী ?

রাণী। এই সময় তার ঘুম ভেঙ্গে যায়...আমি এখানেই তাকে নিয়ে আসি। [প্রাঙ্গণে কে গান গাহিয়া যাইতেছিল...] তুমি ততক্ষণ গান শোন...

কবি। ও কে গাইছে রাণী ?

রাণী। ও বলে ও "চৈত্র রাতের উদাসী"...দেখো এখন...এখানেই আসবে···

[দক্ষিণের দ্বার দিয়া প্রস্থান]

[কবি উঠিয়া অঙ্গনের সম্মুখে গেলেন। উদাসী গান গাহিয়া যাইতেছিল...তাহাকে ইঙ্গিতে আহ্বান করিলেন। উদাসী গাহিতে গাহিতে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল—গাহিতে গাহিতেই উদাসী ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। কবি বাতায়ন পার্শ্বে যাইয়া বাহিরে তাকাইয়া রহিলেন।]

[ধীর পদসঞ্চারে রাণী কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া কবির পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন...]

রাণী। ...কবি !

কবি। [চমকিয়া উঠিয়া] রাণী !

রাণী। বল দেখি এ কে ! [কুমারকে কবির সম্মুখে ধরিলেন···]

কবি। তোমার কুমার···

রাণী। এ তুমি। এই পরিপূর্ণ দীপালোকে এস... [এক হাত দিয়া কবিকে প্রদীপের সম্মুখে টানিয়া আনিলেন।]···এই আমার সন্তান...কিন্তু এ কার মুখ ? —রাজার নয়···আমারও নয়...তোমার। এ কার চোখ ? রাজার নয়, আমার নয়···তোমার। কার মতো এর রং ? —রাজার মতো নয়, আমারো মতো নয়...ঠিক্ তোমার মতো। তোমার ঐ নাক···তোমার ঐ ভ্রূ...পরিপূর্ণ ভাবে এই মুখে আত্মপ্রকাশ করেছে। তোমার চোখের মধ্যমণিতে একটি তিল আছে···দেখ এর চোখেও সেটি বাদ যায় নি···

কবি। [দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া] রাণী ! রাণী ! এ আমি কি দেখছি ! এ আমি কি দেখলুম !

রাণী। দেখলে সত্যের নগ্ন-মূর্ত্তি। রাজার সন্তান আমার গর্ভে ছিল···তুমি আমার মনের সকল চিন্তা জুড়ে ছিলে...সে তোমার রূপ ধরে আমার নিকট মূর্ত্তিমান হয়ে এল ! এর নাম রেখেছি কি জানো ?

কবি। [স্বপ্নাবিষ্ট ভাবে] কি ?

রাণী। "শেখর" ! "রাজশেখর" ! তুমি কবিশেখর ...এ আমার রাজশেখর।

কবি। নরক ! নরক ! আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে ! আমার চোখ জ্বলে গেল !

রাণী। আমারো নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে !—আমার হাত ধরো...চল বাইরে চল...

কবি। না রাণী . এ চোখে আর তোমার দিকে চাইবো না...ঐ শিশুর পানে চেয়ে আমার চোখ জ্বলে যাচ্ছে...আমি চললুম···কারো সাধ্যি নেই আমাকে ধরে রাখে !...

[অঙ্গনের পথে দ্রুত প্রস্থান। রাণী আরক্তিম চোখে সেই দিকে তাকাইয়া রহিলেন। পরে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতে করিতে পাদচারণা করিতে লাগিলেন...অস্ফুট ধ্বনিতে কি সঙ্কল্প আঁটিয়া লইলেন।]

রাণী। মল্লিকা ! [দক্ষিণের দ্বারপথে মল্লিকার প্রবেশ।]···কুমার। [মল্লিকার ক্রোড়ে কুমারকে দিলেন ও তাহাকে চলিয়া যাওয়ার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। মল্লিকা চলিয়া গেল।]...দাসী !—[বাম পার্শ্বের দরজা পথে দাসীর প্রবেশ]···আমার সেই মূক ক্রীতদাস—[দাসী চলিয়া গেল।] [পাদচারণা করিতে করিতে] হাঁ, শুধু তার ঐ চোখ দুটি যদি না থাক্‌তো ! কি সুন্দর ঐ চোখ দুটি ! ঐ পদ্ম-আঁখির মণি-তারা আমার সমস্ত জীবনটাকেই মিথ্যা করে দিয়েছে !...ঐ চোখ দুটি...ঐ চোখ দুটি [ভেরী বাদ্য]...ঐ যুদ্ধ-বাদ্য ! প্রতিহিংসার ঐ রুদ্র-আহ্বান ! —ক্রীতদাস ! ক্রীতদাস ! [বাম পার্শ্বের দরজা দিয়া বিকট-দর্শন কৃষ্ণবর্ণ মূক ক্রীতদাস ছুটিয়া আসিয়া রাণীর সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে লুণ্ঠিত হইল। প্রচণ্ড শক্তিমান···ভীতিব্যঞ্জক, অতিকায় তাহার শরীর। এক হস্তে সুদীর্ঘ শাণিত ছুরিকা।] [রাণী তাহাকে দেখিয়া কি এক অজ্ঞাত ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়া পশ্চাৎ সরিয়া গেলেন...ও অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন]...না...না, প্রয়োজন নেই...আমার দৃষ্টির আড়ালে চলে যাও...[ক্রীতদাস উঠিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।]—যা—ও...

[ক্রুতদাস তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল] [কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলিয়া] না, থাক্। বিশ্বের সে এক অপরূপ সৌন্দর্য্য! অক্ষয় হোক্...অমর হোক্...[ধীরে ধীরে, আবেগে,] —ঐ চোখদুটির পানে কতদিন অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকেছি...তবু তৃপ্তি পাই নি! ঐ আঁখিপাতে শুধু একটী চুম্বনরেখা এঁকে দিতে চেয়েছি···কিন্তু, পাইনি, পারিনি .. [ভেরীবাদ্য]—[ভেরীবাদ্য শুনিয়াই চমকিয়া উঠিলেন] —ঐ আবার! [বিষম উত্তেজনায় যেন নাচিয়া উঠিলেন] আবার আবার সেই আহ্বান...[সপদদাপে] ক্রুতদাস— [পূর্ব্ববৎ ক্রুতদাস ছুটিয়া আসিয়া তাহার চরণতলে লুটাইয়া পড়িল।] ওঠো...[ক্রুতদাস উঠিয়া দাঁড়াইল] এসো— [তাহাকে লইয়া প্রাঙ্গণের দিকে অগ্রসর হইলেন] কিন্তু আবার পা টলে কেন? বুক কাঁপে কেন!—দাসী! [দাসীর প্রবেশ।] জলতরঙ্গ বাজাও দেখি দাসী! আমি তার তরঙ্গের তালে তালে অগ্রসর হব···[দাসী চলিয়া যাইয়াই জলতরঙ্গ বাজাইতে লাগিল।] [সহসা ক্রুতদাসের দিকে ফিরিয়া তাকাইয়া] এইবার এসো তুমি...[তাহাকে লইয়া অঙ্গনের এক কুঞ্জবীথির ধারে গেলেন—এবং নিম্নস্বরে তাহাকে কি আদেশ দিতে লাগিলেন। ক্রুতদাস ইঙ্গিতে তাঁহার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিবে···আভাস দিল! এবং পরে তাঁহার চরণধূলি লইয়া দৃপ্তচোখে দৃশ্যের অন্তরালে চলিয়া যাইতেছিল...এমন সময় রাণী ঐ কুঞ্জবীথির পার্শ্ব হইতেই চাপা গলায়, কিন্তু, জোরে বলিয়া উঠিলেন] —চিনেছ? [ক্রুতদাস ইঙ্গিতে বুঝাইল চিনিয়াছে।] তার নাম? [ক্রুতদাস নাম বলিতে চেষ্টা করিল···কিন্তু পারিল না]—"শেখর"... "শেখর"...যাও—[ক্রুতদাস চক্ষুর অন্তরালে চলিয়া গেল। রাণী দৃপ্তচরণে অঙ্গন হইতে কক্ষ মধ্যে উঠিয়া আসিলেন। এবং ইঙ্গিতে জলতরঙ্গ বাদ্য বন্ধ করিয়া দিলেন।] [বাম পার্শ্বের দরজা হইতে কে ডাকিল 'মা']

রাণী। কে? [উত্তর আসিল "প্রতিহারী"।]— ভেতরে এস। কি খবর···

প্রতিহারী। মহারাজ খবর পাঠালেন, বিদ্রোহীদের সঙ্গে রাজসৈন্যের খণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে—তিনি আজ রাত্রি দুর্গে যাপন কর্ব্বেন...

রাণী। উত্তম। যাও—[প্রতিহারী অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।] তবে আজ কি প্রলয়ের রাত্রি! আজ না বসন্তোৎসব! আজ না রংএর খেলা!—রংএর খেলাই খেলব।···জমাট রক্তের আবির দিয়ে, টাটকা রক্তের পিচকারিতে আমার হোরী-খেলা হাঃ হাঃ হাঃ [বিকট হাস্য...কিন্তু পরক্ষণেই অঙ্গনের সম্মুখে দৃষ্টি পড়িতেই ভয়ে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া যাহাকে দেখিলেন তাহাকে দেখিয়া] এ কি! কে!—তুমি! [দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন।]

[কবিশেখরের প্রবেশ]

কবি। হাঁ, আমি। তুমি আমার চোখ চেয়েছ রাণী?

রাণী। [দুই হাতে মুখ ঢাকিয়াই রহিলেন।]

কবি। —যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। আমি তোমার এখান হতে চলে যেয়েই খবর পেলুম, একদল বিদ্রোহী তোমার এই প্রাসাদ-উদ্যানেব দিকে গুপ্তভাবে অগ্রসর হচ্ছে— তোমাকে সতর্ক কর্ত্তে ছুটে এলুম...এসে দেখি, আমার পাশের এক কুঞ্জবীথিতে তুমি তোমার এক ক্রুতদাসকে আমার এই চোখ দুটি উপড়ে নিতে আদেশ দিচ্ছ...আমি থমকে দাঁড়ালুম...সব শুনলুম...অপলক দৃষ্টিতে তোমাকে শেষ দেখা দেখে নিলুম...তার পর তোমার ক্রুতদাস ছুটে চলল...আমার সম্মুখ দিয়েই সে ছুটে গেল...আমাকে দেখ্‌ল—কিন্তু আমাকে চিনতে পার্‌ল না...

রাণী। [ছুটিয়া আসিয়া কবির হাত দুখানি ধরিয়া] শেখর! শেখর! সে তবে তোমায় চেনে নি?

কবি। —না, সে আমাকে চিনতে পারে নি···

রাণী। আমি তাকে পূজা কর্ব্ব···আমি তাকে রাজ্য দেব···আমি তাকে—আমি তাকে—

[আবেগে আর বাক্যস্ফুরণ হইল না]

কবি। আমি ভাবলুম সে ভুল করেছে...তার সেই ভুল ভেঙে দিতে আমিও তার পশ্চাতে পশ্চাতে চললুম। গিয়ে কি দেখলুম জানো?

রাণী। —কি শেখর!

কবি। সে তোমার ঐ দক্ষিণের শয়নকক্ষের বাতায়নে উঠেছে...প্রথমে তার উদ্দেশ্য বুঝতে পার্‌লুম না···পরে হঠাৎ মনে পড়ে গেল—তার নামও তুমি শেখরই রেখেছ...

রাণী। [আর্ত্তনাদ করিয়া] শেখর! শেখর!—ঠিক্...ঠিক্......ও-হো হো...তবে আমি কি করলুম!—এতক্ষণে বুঝি সব শেষ!

[মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।]

কবি। —দাসী—দাসী—[দাসীর প্রবেশ] রাণী মূর্চ্ছিত...তাঁর জ্ঞানসঞ্চার কর......

[দক্ষিণের দ্বার পথ দিয়া, দ্রুত, শয়নকক্ষের দিকে প্রস্থান।]

[দাসী জল আনিয়া চোখে জল দিল ও বাতাস করিতে লাগিল। ক্রমে রাণীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল।]

রাণী। না, সরে যাও...আমার কিছু হয় নি...আমি হোরী খেলছি! জমাট রক্তের আবির দিয়ে, টাট্‌কা রক্তের পিচকারিতে, আজকে আমার বসন্তোৎসব! উঃ পিপাসা! বড় পিপাসা! রক্তের জন্য আমার জিহ্বা লক্‌লক্ করছে! [দাসী জল দিল] [পানপাত্র সম্মুখে ধরিয়া] এ কি জল! না রক্ত? হোক রক্ত, আমি খাব। [জল পান করিলেন।] উঃ বাঁচলুম...যাও দাসী...আমায় বিরক্ত ক'রো না...আমি সম্পূর্ণ সুস্থ! আমি নাচতে পারি থিয়া তাথৈ...থিয়া তাথৈ...থিয়া তাথৈ...আমি হাসতে পারি হাঃ হাঃ হাঃ [দক্ষিণের দ্বারে মল্লিকার প্রবেশ।]

মল্লিকা। দাসী!—

দাসী। কি ঠাকরুণ!

রাণী। [মূর্চ্ছাভঙ্গে উঠিয়া বসিয়াছিলেন—মল্লিকার স্বর শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও একদৃষ্টে মল্লিকার পানে তাকাইয়া রহিলেন।]

মল্লিকা। আমি কি এখন রাণীমার সম্মুখে আসতে পারি?

রাণী। [অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া, সভয়ে] না-না-না কথ্খনো না—[মল্লিকার প্রতি একহস্ত প্রসারিত করিয়া দিয়া অন্যহস্তে তাঁহার চোখমুখ আবৃত করিলেন।]

মল্লিকা।—কিন্তু, না এসেও যে পারি না মা...

রাণী। [তদ্রূপ অবস্থাতেই]—দূর হও তুমি...

মল্লিকা। আমি তাঁকে নিয়ে এসেছি...

রাণী। [বাতায়ন পার্শ্বে যাইয়া বাহিরে তাকাইয়া] —দাসী! শুনে যা [দাসী নিকটে আসিল] শোন্... [কাণে কাণে কি কহিলেন।] [দাসী মল্লিকার পাশে যাইয়া দরজাপথে উঁকি দিয়া কি দেখিল...ও পরক্ষণেই রাণীর নিকট ছুটিয়া গেল...]...[পরিপূর্ণ ব্যাকুলতায়] কে? কে দাসী?

দাসী।—শেখর...

রাণী। [রাগিয়া উঠিয়া, সপদদাপে] কোন্ শেখর...?

দাসী।—কুমার।

রাণী। তার চোখের দিকে চেয়েছিলি?

দাসী। হাঁ, সেই পদ্ম চক্ষু অঘোরে নিদ্রা যাচ্ছে...

রাণী। [ছুটিয়া মল্লিকাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া ভিতর হইতে কুমারকে তুলিয়া আনিয়া তাহার চক্ষু চুম্বন-বন্যায় ভাসাইতে লাগিলেন।]

মল্লিকা। [রাণীর সম্মুখে আসিয়া] ওকে দাসীর কোলে দিন...দাসী ওকে ঘুম পাড়িয়ে রাখুক। বাইরের ঐ ভেরীবাদ্যে কুমার ভয় পাবেন......

রাণী। যাও মাণিক...দাসীর কোলে ঘুমিয়ে পড়... [দাসীর হস্তে কুমারকে দিলেন। দাসী কুমারকে লইয়া দক্ষিণের দ্বার দিয়া চলিয়া গেল]—কিন্তু মল্লিকা, একটা কথা...!—জিজ্ঞাসা কর্ত্তে শিউরে উঠ্‌ছি!

মল্লিকা।—কি কথা বলুন মা...

রাণী। [সভয়ে, অতি সন্তর্পণে] সে কোথায়?

মল্লিকা। কে?

রাণী। কবিশেখর?

মল্লিকা। তিনি দেশে চলে গেছেন...

রাণী।—চলে গেছে?

মল্লিকা। হাঁ, আপনাকে তাঁর জন্মের মত বিদায় জানিয়ে চলে গেছেন...

রাণী। ঘৃণায় হয়তো দেখাটি পর্য্যন্ত করে গেল না,—না?

মল্লিকা। ও কথা বলবেন না মা...তিনি দেবতা... আপনার পাপ হবে...

রাণী। হু।—আর সেই কৃতদাস?

মল্লিকা। তিনি তাকে বধ করে তবেই তো কুমারকে রক্ষা করেছেন...। কুমারকে রক্ষা করে আমার হাতে সঁপে দিয়েই তিনি আপনাকে তাঁর শেষ অর্ঘ্য নিবেদন করে চলে গেলেন...

রাণী।—অর্ঘ্য!

মল্লিকা। হাঁ, অর্ঘ্য। আমি রেখে দিয়েছি।

রাণী।—আমি দেখব···আমি এখনি তা দেখব···

মল্লিকা।—আসুন···

[মল্লিকার সঙ্গে রাণী চলিয়া যাইতেছিলেন এমন সময় পশ্চাৎ হইতে অঙ্গনের পথ দিয়া রাজা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।]

রাজা।—রাণী!

রাণী।—[চমকিয়া উঠিয়া] কি রাজা!

[অঙ্গনে জনতার বিরাট কোলাহল শ্রুত হইতে লাগিল।]

রাজা।—রাণী! বাইরে ঐ উন্মত্ত প্রজাসঙ্ঘ। আমি গুপ্ত বিদ্রোহ দমন করে এসেছি। কিন্তু ওদের দমন কর তুমি...

রাণী। আমি!

রাজা। হাঁ, তুমি। তাদের এক অভিযোগ আছে।

রাণী। কি অভিযোগ...?

রাজা। আর সে অভিযোগ তোমারি বিরুদ্ধে...

রাণী।—আমার বিরুদ্ধে!

রাজা। হাঁ, তোমার বিরুদ্ধে।

রাণী। কিন্তু অভিযোগ শোনবার কি এই সময়?—বেশ! তবু শুনি···দেনা পাওনা না হয় চুকিয়েই যাই···

রাজা। তারা বলে এ রাজ্যে আজকে এই যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়েছে...এ শুধু আজ রাত্রে এই প্রাসাদে ভগবানের চরণধূলির অমর্য্যাদা করার দরুণ...

রাণী। কি অমর্য্যাদা হয়েছে শুনি···

রাজা। তুমি ভগবানের জ্ঞাতিকন্যা হয়েও তাঁর চরণধূলি স্পর্শ করনি···। ভগবদ্বংশে তোমার জন্ম... বংশ-গৌরবে তুমি মহামহিমময়ী···। সদাচারের মধ্যে তোমার শিক্ষা দীক্ষা···ধর্ম্মক্রিয়ায় তোমার শ্রেষ্ঠ অধিকার —তুমি আমার রাজপুরীর সেই শ্রেষ্ঠ পূজারিণী হয়েও স্বধর্ম্মে অশ্রদ্ধা দেখিয়েছ······

রাণী।—তা আমাকে কি কর্ত্তে হবে?

রাজা।—সেই চরণ-ধূলি তুমি এখন ঐ উন্মত্ত জনসঙ্ঘের ললাটে স্পর্শ করবে...

রাণী।—[ক্ষণকাল কি ভাবিলেন। তাহার পর,] কিন্তু, তার পূর্ব্বে আমার এক অভিযোগ আছে···তার বিচার কর···

রাজা।—আমার আপত্তি নেই। কি তোমার অভিযোগ?

রাণী।—ব্যভিচারের অভিযোগ।

রাজা।—কার বিরুদ্ধে?

রাণী।—সুবিচার পাবো?

রাজা।—কবে না পেয়েছ?

রাণী।—কিন্তু আজ যার নামে অভিযোগ কর্ছি···সে তোমারি এক প্রেয়সী...তাইতেই আশঙ্কা হয়......

রাজা। আমার বিচারকে পক্ষপাত দোষে কলঙ্কিত করেছি...শত্রুতেও তো এ কথা বলে না···

রাণী। তবে শোন রাজা···এই রাজপুরীতে তোমারি এক প্রেয়সী রক্ষিতা অতি গুপ্তভাবে আমাদের এই সুখের সংসারকে তার বিরাট ব্যভিচারে কলঙ্কিত করেছে···সে এক দাসীকন্যা···কিন্তু সে কথা গোপন রেখে উচ্চকুলজাত বলে তার পরিচয় দিয়ে তোমার অন্তঃপুরে এসেছিল... পরে সে তোমার প্রীতির জন্য, আমাকে দিয়ে ধর্ম্মানুষ্ঠান যা কিছু করিয়েছে...সে সবই করেছে......ধর্ম্মের, আচারের এত বড় অনিয়ম আমি কিছুতেই সহ্য কর্ত্তে পাচ্ছিনে··· আর সেই জন্যই আজকে ঐ চরণ-ধূলি বিতরণ করবার মাঙ্গলিক-অনুষ্ঠানে আমার হাত ওঠে নি......! রাজা, আমার বিচার কর্ত্তে ছুটে এসেছ···কিন্তু, কর দেখি এইবার তোমার সেই রক্ষিতার বিচার......

রাজা।—কে সে?

রাণী।—নাম আগে বলব না·· আগে দণ্ড উচ্চারণ কর—

রাজা। আমি তার নির্ব্বাসন দণ্ড বিধান করলুম—আজ রাত্রিতেই সে এ নির্ব্বাসন গ্রহণ করুক......

রাণী। রাজবিধান জয়যুক্ত হোক্। আমি এখনি গিয়ে তাকে তার এই দণ্ড জ্ঞাপন করে আসি—[প্রস্থানোদ্যত···]

রাজা। কিন্তু প্রজাসঙ্ঘ ভগবানের চরণধূলির জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছে ..

রাণী। আগে রাজপুরী পবিত্র হোক্···শুদ্ধ হোক্··· সত্য হোক্...তার পর—

[দক্ষিণের দ্বার দিয়া প্রস্থান।]

[বাহিরে প্রজাসঙ্ঘ "ভগবানের চরণ ধূলি" "ভগবানের চরণ-ধূলি" বলিয়া কোলাহল করিতে লাগিল।

রাজা। [একটি আলো লইয়া বাতায়ন পার্শ্বে যাইয়া আলোটি নিজের মুখের সম্মুখে ধরিয়া]—প্রজাগণ!

প্রজাসঙ্ঘ। "রাজা" "রাজা" "চুপ্ চুপ্"—"সকলে চুপ কর" "শোন" ইত্যাদি।

রাজা। প্রসাদের জন্য আর একটু অপেক্ষা কর…

প্রজাসঙ্ঘ। কেন?

রাজা। আগে রাজপুরী পবিত্র হোক্…

প্রজাসঙ্ঘ। [সমস্বরে]…পবিত্র হোক্—

রাজা। শুদ্ধ হোক্…

প্রজাসঙ্ঘ। [সমস্বরে]—শুদ্ধ হোক্…

রাজা। সত্য হোক্…

প্রজাসঙ্ঘ। [সমস্বরে]—সত্য হোক্।

রাজা। তোমরা রাজপ্রাসাদের সম্মুখে গিয়ে অপেক্ষা কর…আমি রাণীকে নিয়ে যাচ্ছি…বুদ্ধের জয় হোক্ …ধর্ম্মের জয় হোক্…সংঘের জয় হোক্ ..

প্রজাসঙ্ঘ। বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি
সংঘং শরণং গচ্ছামি…

[জয়ধ্বনি করিতে করিতে দৃশ্যের অন্তরালে প্রস্থান।

[দুর্গে পুনরায় তিনবার ভেরীবাদ্য।]

রাজা। ঐ সেই সঙ্কেত…যুবরাজ পুর-প্রবেশ করেছে। দাসী! [দাসীর প্রবেশ] রাণী এলে তাঁকে বলো আমি এখনি ফিরে আসছি…

[বাম দরজা দিয়া প্রস্থান।

দাসী। কুমার জেগে উঠে দুধের জন্য কাঁদছেন… রাণীমা আসেন না কেন!—ঐ যে—

[দক্ষিণের দ্বারপথে রাণীর প্রবেশ। একমনে অতি সন্তর্পণে তাহার হস্তস্থিত স্বর্ণ পেটিকায় কি দেখিতে দেখিতে আসিতেছিলেন। পার্শ্বে মল্লিকা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া আসিতেছিল।]

রাণী। [পেটিকা হইতে দৃষ্টি অপসারিত না করিয়াই] এই তার অর্ঘ্য?

মল্লিকা। হাঁ, ঐ তাঁর অর্ঘ্য।

রাণী। [মল্লিকার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া] পদ্মফুল, না?

মল্লিকা। [নীরব রহিল।]

রাণী। এই পদ্ম দুটি আমি উপড়ে নিতে চেয়েছিলুম… পারি নি।—আজ সে তা আমাকে স্বেচ্ছায় দিয়ে গেল… কেন, কেন মল্লিকা?

মল্লিকা। জানি না মা…

রাণী। ভালো।—না জানা ভালো। জীবনের এই প্রহেলিকা চিরন্তনী হয়ে থাক্। চলে আয়…তুই আমার সঙ্গে চলে আয়…এ চোখের দিকে চাইবো পরে…,—আগে পবিত্র করি…শুদ্ধ করি…সত্য করি…[মল্লিকার দেহে ভর দিয়া ধীরে ধীরে বাম দরজা দিয়া প্রস্থান করিতেছিলেন—এমন সময় দাসী তাঁহাকে ডাক দিল…]

দাসী। মা!

রাণী। [তাহার দিকে না তাকাইয়া] কে মল্লিকা?

মল্লিকা। দাসী…।

রাণী। কি চায়?

মল্লিকা। কি চাস দাসী?

দাসী। কুমার জেগে উঠেছেন, কাঁদছেন—দুধ চান…

রাণী। [হঠাৎ বিকট হাস্য] হাঃ হাঃ হাঃ দুধ—আগে রাজপুরী পবিত্র হোক্—শুদ্ধ হোক্…সত্য হোক্… [বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টবৎ সচকিত হইয়া হঠাৎ মল্লিকার হাত ধরিয়া এক টান দিয়া চকিতে বাম দরজা দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।]

দাসী। [বিস্ময়ান্তে]—এ কি! রাণীমার আজ হয়েছে কি! [বাম দরজা পথে তাকাইয়া রহিল।]

[যুবরাজ বিরূধক সহ প্রাঙ্গণের পথে রাজার প্রবেশ]

রাজা। বিরূধক—তুমি কি অপ্রকৃতিস্থ হয়েছ?

বিরূধক। না পিতা, আমি সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ। মাতামহ আমাকে খুবই সমাদর করে কপিলাবস্তুতে অভ্যর্থনা করে নিলেন। কিন্তু, আমার মাতামহীকে দেখতে পেলুম না…শুনলুম তিনি স্বর্গারোহণ করেছেন…

রাজা। কই, আমরা তো সে খবর পাই নি…

বিরূধক। আমিও তাঁদের সেই কথাই বললুম… উত্তর পেলুম, মা সে খবর পেলে শোকাতুরা হবেন বলে কৌশলে তা গোপন রাখা হয়েছে—

রাজা। তার পর ?

বিরূধক। তার পর দেখলুম, রাজপুরীতে আমাকে প্রণাম করবার জন্য আমার বয়ঃকনিষ্ঠেরা কেউ নেই—শুনলুম তারা সপ্তাহকাল পূর্ব্বে মৃগয়ায় গেছে। তখনো আমার মনে কোন সন্দেহ হয় নি—

রাজা। তার পর...

বিরূধক। তার পর কোশলে ফিরে আসবার দিন আমরা হাতীতে উঠেছি···এমন সময় হঠাৎ আমার মনে পড়ল, আমার শয়নকক্ষে আমার মাতৃ-দত্ত অঙ্গুরীয়ক ফেলে এসেছি...কক্ষে ফিরে যেয়ে দেখি...এক বৃদ্ধা দাসী দুধ-জল দিয়ে আমার সেই কক্ষের যাবতীয় আসবাব ধুয়ে ফেলছে ·· আমি তাকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলুম...সে আমাকে চিনতে না পেরে বললো, এক দাসীপুত্র,—আমাদের রাজার নাচওয়ালীর নাতি—এই ঘরে বাস করে গেছে...তাই দুধজলে এই ঘর ধুয়ে ঘর শুদ্ধ করছি !

রাজা। বিরূধক! বিরূধক!—সে যে মিথ্যা বলে নি · বা পরিহাস করেনি · তার প্রমাণ ?

বিরূধক। তখনি আমি ঘর হতে ছুটে বের হয়ে রাজপুরীর বাইরে এসে গ্রামে গ্রামে সন্ধান নিলুম। দেখলুম সব শাক্যই এ খবর জানে। তারা বললো "কোশলরাজ তরোয়ালের জোরে শাক্যবংশের মেয়ে বিয়ে করে কুলীন হবার ফন্দী এঁটেছিলেন···একটা নাচওয়ালীর মেয়ে দিয়ে তাকে খুব ঠকানো গেছে..."

রাজা। . এতদুর! এতদুর!

বিরূধক।—আমিও তখনি তরবারি স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করলুম, "ঐ দুধজল আমি শাক্যদের রক্ত দিয়ে মুছে ফেলব। মিথ্যাবাদী শঠদের রক্ত দিয়ে ঐ মিথ্যা পুরীকে সত্য আর শুদ্ধ কর্ব্ব।"

রাজা।—কিন্তু, আমি ভাবছি এই রাণীর কথা। মিথ্যা মূর্ত্তিমতী হয়ে একদিন নয়, দুদিন নয়, এই ষোলটি বছর আমার চোখে ধূলি দিয়ে আছে! অথচ—আজ এখনি একটি পুরনারীর বিরুদ্ধে সে ঠিক এমনি এক অভিযোগ এনে নিজে তাকে নির্ব্বাসন দণ্ড দিতে গেছে—স্পর্দ্ধা তার!—দাসী, কোথায় সে ..ডাকো তাকে...

[দাসীর বাম দরজা দিয়া প্রস্থান।]

বিরূধক।—ঐ নির্ব্বাসন দণ্ড তাকে দিন...আজই...এই মুহূর্ত্তে...

রাজা।—অবশ্য দেব, অবশ্য দেব—

বিরূধক। অন্য শাক্যদের ভার নিলুম আমি। জানেন পিতা, পুর প্রবেশ করেই আমি সেই শঠকুলচূড়ামণি শাক্যমুনি বুদ্ধের আশ্রম শাক্যের রক্তে ভাসিয়ে দিতে আদেশ দিয়ে এসেছি · হত্যাকাণ্ড হয়তো এতক্ষণ আরম্ভ হয়েছে ..

রাজা।...না...না···সে কি করেছ!—ভগবান যে স্বয়ং শাক্য--

বিরূধক। তাঁর ছিন্ন মস্তক আমি আজ রাত্রেই স্বর্ণ পাত্রে নিয়ে আসতে আদেশ দিয়েছি···

রাজা।—না···না···সে হয় না, সে হবে না...

বিরূধক।—অবশ্য হবে।—সেই হবে আমার প্রথম ও প্রধান গৌরব...

রাজা। আগে রাণীর নির্ব্বাসন-দণ্ড ব্যবস্থা কর রাজপুত্র...তার পর—

[বাম দরজা পথে মল্লিকার প্রবেশ]

এই যে মল্লিকা!—রাণী কোথায় শীঘ্র বল...

মল্লিকা। তিনি রাজপুরী হতে নির্ব্বাসন-দণ্ড গ্রহণ করে শ্রীবুদ্ধের আশ্রমে চিরপ্রস্থান করেছেন —

রাজা।—আমি তো এখনো তাকে সে দণ্ড বিধান করি নি ··

মল্লিকা। আপনি বহু পূর্ব্বেই, স্বয়ং তাঁকে সে দণ্ডদান করেছেন—

রাজা। কিরূপ!

মল্লিকা। তিনি আপনার নিকট এক পুরনারীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ আনয়ন করেছিলেন ··

রাজা।—তবে সে পুরনারী রাণী স্বয়ং!

[মল্লিকা নীরব রহিল।]

এখন বুঝছি কি নিদারুণ ঝড় এই ষোলটি বছর তার উপর দিয়ে বয়ে গেছে—বিরূধক! বিরূধক! সে শেষে রাত্রে ঘুমাতেও পার্ত্তো না···আমি আজ বুঝতে পাচ্ছি তার সেই অন্তর্যুদ্ধের গভীরতা।—কিন্তু সে তবে সেই যুদ্ধে শেষকালে জয়লাভ করেছিল।—বিরূধক! আর আমার ক্ষোভ নেই —আমি তাকে ক্ষমা কর্ত্তে পার্ব্ব!

বিরূধক।—নিজের বিরুদ্ধে নিজে অভিযোগ এনে স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসন-দণ্ড গ্রহণ করেছেন!—পিতা, আমি আশ্রমে চললুম...আমার সেই সত্যকুলজাতা...সেই সত্যাশ্রয়ী মাকে ফিরিয়ে এনে তাঁকে তাঁর সেই রাজলক্ষ্মীর আসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত কর্ব্ব···

রাজা।—চল বৎস...আমিও যাব...

[অঙ্গনের দ্বারপথে প্রতিহারীর প্রবেশ]

কি সংবাদ?

প্রতিহারী। [অভিবাদনান্তে] যুবরাজের এক দেহরক্ষী স্বর্ণপাত্রে এক ছিন্ন মস্তক নিয়ে যুবরাজের দর্শন প্রার্থী—

বিরূধক। হাঃ হাঃ হাঃ—সেই শাক্য-মুনির ছিন্ন-মস্তক!—যাও, অবিলম্বে তাকে এখানে উপস্থিত কর—

[অভিবাদনান্তে প্রতিহারীর প্রস্থান।]

* * *

[সহসা ঝড় উঠিল। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল]

রাজা। বিরূধক! বিরূধক!—ঝড় উঠেছে এ তো প্রলয়ের কাল-বৈশাখী নয়? ঐ বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে··· ঐ—ঐ—

[প্রাঙ্গণে বজ্রপাত হইল]

উঃ উঃ—[চোখ বুজিয়া কাণে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।]

[দেহরক্ষীর প্রবেশ—হাতে তাহার এক স্বর্ণথালা... তাহার উপর এক ছিন্ন মস্তক। আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল—* * *]

বিরূধক। [বিদ্যুতালোকের সুতীব্র দীপ্তিতে সেই ছিন্ন মস্তক দেখিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিলেন—]

এ কি! মা!···আমার মা!

[দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া পিছাইয়া আসিলেন]

দেহরক্ষী। আশ্রমের প্রথম হত্যা···

বিরূধক।—আশ্রমের শেষ হত্যা—··

মা! মা! [সেই ছিন্ন মস্তকের উপর আছড়াইয়া পড়িলেন। সম্মুখে পুনরায় বজ্রপাত হইল।]

যবনিকা।

দেশবন্ধু-বিয়োগে

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

সারা দেহে বর্ম্ম আঁটা, স্বেদসিক্ত বদন তোমার,
অশ্ব হতে সদ্য অবতরি,
রণশ্রান্ত হে বীরেন্দ্র কোথা যাও এখনি আবার
অগ্নিময় জ্যোতির্বর্ম্ম ধরি।

২

শৌর্য্যের প্রতাপসিংহ অনবদ্য যোদ্ধা স্বরাজের,
নবীন চাণক্য খুরধার,
চিত্ত তুমি মধুব্রত ভারতের চিত্ত-সরোজের
নিষ্কলঙ্ক বঙ্গের 'আর্থার'!

৩

ঐশ্বর্য্যের অতি কাছে রেখেছিল লোটা ও কম্বল
তোমার কৌপীন-পরা প্রাণ;
মিলনের পূর্ণকুম্ভে সব ত্যজি উত্তরী সম্বল
হে উদাসী হলে আগুয়ান!

৪

গেয়েছিলে যবে তুমি 'সাগর সঙ্গীত' হে কবি-পূজারি
আমরা তখন নাহি জানি,
বরণের পাণিশঙ্খ পাঞ্চজন্য করি লবে হরি
কম্বু ক্ষীর অম্বুদের বাণী।

৫

বিরাটের পুর হতে চীরধারী তেজঃপুঞ্জ-কায়
যবে তুমি এলে বাহিরিয়া,
যশের সপ্তাশ্ব রথে সমুজ্জ্বল ত্যাগে তপস্যায়
করুণায় ঢলঢল হিয়া,

৬

তখনো ভাবিনি মোরা তব মহাপ্রস্থানের দিন
এত কাছে এত সন্নিকট,
মধ্যাহ্ন ভাস্কর হবে নিশার তিমির-অঙ্কে লীন
ঝলসিবে এ অক্ষয় বট!

৭

ক্ষুদ্রতার চির বৈরী বরেণ্য যে তুমি পৃথিবীর—
উদয়াস্ত সমান উদার,
লহ আজি, মহাদ্যুতি, হে বৈষ্ণব, হে প্রশান্ত ধীর—
'ভারতবর্ষে'র নমস্কার!

মনের পরশ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(৬)

সাউথেণ্ড সহরটি সমুদ্রের ঠিক্ উপরেই। রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—বিলেতের অন্য সব সমুদ্রতীরের সহর গুলিরই মতন। মিষ্টার আর্চিবল্ড্ টমাসের বাড়ীটি সমুদ্র থেকে পাঁচ মিনিটের পথ।...দোতলা থেকে সমুদ্র দেখা যায়।...বাড়ীর আশে পাশে সুন্দর সুন্দর বেড়াবার রাস্তা প্রচুর। বিশেষতঃ সাউথেণ্ড pierটির মতন লম্বা ও সুরম্য pier জগতে অতি কম ও বেড়াবার পক্ষে এমন সুন্দর স্থানও অতি বিরল। Pierটি হচ্ছে প্রায় আধ মাইল লম্বা; একটা কাঠের ব্রিজ সমুদ্রের ভিতরে গিয়ে পড়েছে। সুতরাং সেখানে বসে থাকা অনেকটা সমুদ্রের মধ্যে বিরাজ করারই সামিল।

তার ওপর মিষ্টার টমাসের বাড়ীটির সামনে তিনি একটি সুন্দর বাগান ও সবুজ 'লন' (lawn) রেখে-ছিলেন।...পল্লব হঠাৎ এই খোলা সমুদ্রের শীকরসম্পৃক্ত বায়ু ও উদ্যান মধ্যস্থিত বাড়ী পেয়ে একটা ভারি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌ল। ..বিলাতী ভদ্রগৃহস্থের এই ফুলের বাগান ও 'লন' রাখার প্রথা তার বড় ভাল লাগ্‌ত। সঙ্গে সঙ্গে তার ক্ষোভ হত যে অবস্থাপন্ন বাঙালী কেন বাগান কর্ত্তে শেখে না। এতে জীবনে কতটা মুক্ত আলো হাওয়ার মলয় পরশ পাওয়া যায়! সমগ্র অন্তরাত্মা যেন অন্য কোথাও থেকে বাড়ী ফিরলেই পরম পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বল্‌তে চায় "আঃ, কি সুন্দর!"

পল্লব দেশে থাকৃতে শুনেছিল যে বিলেতের গৃহস্থ অতিথির কাছ থেকে টাকা নেয়। তার কাছে কথাটা বড় খারাপ ঠেকেছিল।...অতিথির কাছ থেকে আবার টাকা নেওয়া কি! এ নিয়ে কেম্ব্রিজে মোহনলালের সঙ্গে তার ও কুঙ্কুমের প্রায়ই তর্ক হ'ত। মোহনলাল এ বিলাতী কায়দাকে একটু সমর্থন করবার চেষ্টা করলেই কুঙ্কুম বল্‌ত:—'তোমার ও কথা শুনি না মোহনলাল। আমরা যে অতিথিকে দেবতা ভাবি! তার কাছ থেকে টাকা নিলে যে সব আতিথ্য সৎকারই মাটি!'...পল্লব সোৎসাহে সায় দিয়ে বল্‌ত:—'ঠিক্ কথা। কেন না আতিথ্য সৎকারের সঙ্গে অর্থের সংশ্রব এলেই তার সব মাধুর্য্য বিষিয়ে না উঠেই পারে না।' তবে পল্লব মনে মনে ভাব্‌ত যে বিলিতি সভ্যতার দস্তুরই এই, তাই অনুযোগ করে ফল কি? এ অর্থপ্রাণ জড়বাদী জাত বোঝে কেবল টাকা আনা পাই।...সাধে কি নেপোলিয়ন ইংরেজকে বেণের জাত বলেছিলেন!

বিশেষ ক'রে ইংরেজের অর্থলোভকে হেয় মনে করতে চেষ্টা পেয়ে সে বেশী তৃপ্তি পেত ব'লেই তার মনটি নেপো-লিয়নের ইংরেজের উপর কটূক্তি মনে ক'রে একটা বিচিত্র রকমের আনন্দ পেতে চাইত। তাই এ তৃপ্তি পাবার সময়ে সে প্রায়ই ভেবে দেখ্‌ত না যে এ অর্থপূজা য়ুরোপের কোনও জাতির মধ্যেই কম নেই। কিন্তু যেটা সব য়ুরোপীয় জাতিরই একটা বিশিষ্ট দোষ সেজন্য খালি ইংরেজকে দোষী করার অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে সে তখনও অবধি ভাল করে ভেবে দেখ্‌বার সময় পায় নি।

মিষ্টার টমাসের গৃহে অতিথি হ'য়ে সে প্রথম এ টাকা-নেওয়া ব্যাপারটাকে একটা নতুন চোখে দেখ্‌তে আরম্ভ করল। সে দেখ্‌ল যে এ টাকা-নেওয়া ব্যাপারটা দূর থেকে তার কাছে যত নিন্দনীয় মনে হয়েছিল আসলে প্রথাটা তত দূষ্য নয়।...কারণ টাকার লেন-দেনে অভ্যস্ত হ'য়ে গেলে সহৃদয় আতিথ্যের মধ্যে টাকা-আনা-পাইয়ের সে বিশ্রী ইঙ্গিতটার অস্তিত্ব প্রায়ই থাকে না। সেজন্য টাকা দেওয়া সত্ত্বেও অতিথি অনেক সময়েই গৃহকর্ত্তা বা গৃহকর্ত্রীর সাদর আতিথ্য সৎকারের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা বোধ করতে পারে।...মোহনলাল এ সম্পর্কে প্রায়ই একটা ইংরাজী প্রবচন প্রয়োগ করত,—যে স্ব

শয়তানও যত কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত হয়ে থাকেন তিনি বস্তুতঃ তত কৃষ্ণবর্ণ নন।* এখানে তার মাঝে মাঝেই এ কথাটা মনে হ'ত।

তাছাড়া পল্লব দেখ্‌ল যে য়ুরোপে মধ্যবিত্তদের আয়ও যেমন—ব্যয়ও তেম্‌নি বেশি। এক কথায় য়ুরোপে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মানদণ্ড (Standard of living) আমাদের দেশের চেয়ে অনেক উঁচুতে। সুতরাং য়ুরোপীয়দের পক্ষে একজন বাইরের অতিথিকে ঠিক্ তাদের মানদণ্ড অনুসারে স্বাচ্ছন্দ্য দিতে হ'লে সেজন্য সাজসরঞ্জাম নিতান্ত কম রাখ্‌তে হয় না।...ফলে খরচও হয় বেশি। যেমন সেখানে মেজেয় গালিচা না হ'লে হয় না; আহারের সময় একরাশ বাসন না হ'লে চলে না; দুয়ার জান্‌লায় পরদা থাকা চাই; অতিথিকে বিছানা বালিশ কম্বল সব দেওয়া চাই; প্রতি বস্‌বার ঘরে গৃহচুল্লী (fire place) থাকা চাই; প্রতি বৈঠকখানায় পিয়ানো রাখা চাই; আহারের সময় মদ্য সরবরাহ করা চাই ইত্যাদি। কাজেই তাদের দেশে অনেক সময়ে কারুর নিকটাত্মীয় এসে থাক্‌লেও সে প্রতি সপ্তাহে নিজের খরচ বাবদ কিছু কিছু দিয়ে থাকে। কেন না সে দেশের এই রকম উল্‌টো প্রথা। তবে পল্লব ক্রমে বুঝ্‌ল যে সোজা-উল্‌টোর ধারণাটা প্রায়শঃই স্বদেশীয় লোকাচার কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট হ'য়ে থাকে। সুতরাং উল্‌টো দেশে সোজা প্রথাই উল্‌টো মনে হয়।...এই সব দেখে শুনে পল্লবের মনে হ'তে লাগল যে বিদেশীর আচার ব্যবহার বুঝতে হ'লে তাদের অবস্থা ও পারিপার্শ্বিকের মধ্যে নিজেকে কল্পনায় ফেলে বিচার কর্‌লেও সম্যক্ ফল হয় না; তাদের মধ্যে থাকা দরকার।

পল্লব প্রথম প্রথম নূতন পরিবারের মধ্যে থাকতে স্বতঃই একটু অসুবিধা বোধ করত। কেন না সম্পূর্ণ অপরিচিতের পরিবারভুক্ত হ'য়ে থাকা তার এই প্রথম। তবে মিষ্টার টমাস ও তাঁর পরিবারস্থ সকলের সহজ ভদ্র ব্যবহারে পল্লব দুচারদিনের মধ্যেই বেশ স্বস্থ বোধ কর্‌ল। সে একজন বড় ইংরেজ লেখকের লেখায় একবার পড়েছিল যে আমাদের হৃদয়ের পরিসর স্বতঃই সঙ্কীর্ণ ব'লে আমরা প্রায়ই সকলের প্রতি সমান ভাবে স্নেহ বা প্রীতি বর্ষণ করতে পারি না; ভদ্রতার মহৎ উদ্দেশ্যটি হচ্ছে—ছোট খাট ব্যাপারে সাদর ব্যবহারের স্নিগ্ধ পরশে আমাদের হৃদয়ের সেই বড় অসম্পূর্ণতার খানিকটা ক্ষতিপূরণ করা মাত্র।'...* মিষ্টার টমাস ও তাঁর পরিবারভুক্ত সকলের সদা-সতর্ক সাদর ব্যবহারে সে প্রায়ই ভুলে যেত যে বস্তুতঃ সে তাঁদের পরিবারেরই একজন নয়, বিদেশী অতিথি মাত্র। অপরিচিতের ভদ্রতা যে তার সহজতা গুণে তাকে একবারও ভুলিয়ে দিতে পারে যে সে তাঁদের আত্মীয় নয়, এজন্য পল্লব এ য়ুরোপীয় সৌজন্যের কাছে কৃতজ্ঞতা বোধ না ক'রেই পার্‌ত না।...সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হ'ত যে য়ুরোপীয়দের ভদ্রতাকে মৌখিক কপট, প্রভৃতি ব'লে গালি দিয়ে সে এতদিন তাদের সুশীলতার প্রতি কম অবিচার করে নি।

মিষ্টার টমাস লণ্ডনের একটি ভাল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ছিলেন। সেজন্য তাঁকে আপিসে পরিশ্রম করতে হ'ত নিতান্ত কম নয়। তার ওপর সাউথেণ্ড থেকে লণ্ডনে রোজ ডেলি প্যাসেঞ্জারি করতে হ'ত। কাজেই তাঁর খাটুনি একটু বেশিই পড়ত। কিন্তু তবু প্রত্যহ ৮।৯ ঘণ্টা পরিশ্রম করা সত্ত্বেও তিনি সন্ধ্যাবেলা যখন ফিরতেন তখন তাঁর গতিভঙ্গীর স্বচ্ছন্দতা বা চোখের জ্যোতির সরসতা একবিন্দুও কম্‌ত না।...তিনি প্রতি সন্ধ্যায় স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রভৃতি সকলের সঙ্গে এক টেবিলে ব'সে সানন্দে গল্প করতে কর্‌তে আহার করতেন। পল্লবের তাঁর সদা-সতেজ ভাবটি বড় ভাল লাগত। তার মনে হ'ত যারা দৈনন্দিন পরিশ্রমকে এ ভাবে গ্রহণ করতে পারে তারাই জীবন থেকে যথার্থ রসের খোরাক সঞ্চয় করে। নইলে আমরা অধিকাংশই ত বাঁচি না—(তা যতই কেন না আধ্যাত্মিকতার বড়াই করি)—দিনগত পাপক্ষয় করে যাই মাত্র।...

পল্লব দেখত মিষ্টার টমাস তাঁর ছেলেমেয়েদের নানা ছলে ভারি সুন্দর শিক্ষা দিতেন।...তাদের সঙ্গে সর্ব্বদাই এমন ভাবে মিশতেন যে তারা মনে করত যেন তিনি তাদেরই একজন। রবিবার বা অন্য কোনও ছুটির দিনে তিনি প্রায়ই তাদের নিয়ে ও পল্লবকে সঙ্গে করে গল্প কর্‌তে কর্‌তে অনেক দূর অবধি বেড়াতে যেতেন। অনেক

* The devil is not as black as he is painted.

* Essays on Elia.........Charles Lamb.

সময় ছেলেপিলেদের সঙ্গে অবাধে দৌড়াদৌড়ি ও হাসি-গল্প করতেন। পল্লব এতবড় পণ্ডিতকে এ ভাবে ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশ্‌তে দেখে প্রথমে একটু চমৎকৃত না হ'য়েই পারে নি। কারণ সে দেশে বরাবর দেখে এসেছিল যে পিতা সচরাচর সন্তানকে "বাজীবৎ শতহস্তেন" নীতি অনুসারেই লালন-পালন করে থাকেন। সেটা দেশে তার ভাল লাগ্‌ত না, কিন্তু মনে হ'ত যে, এ রকম না করলে হয়ত সন্তানের কাছে সম্‌হি হারাতে হয়।...কিন্তু মিষ্টার টমাসের চরিত্রের এ দিক্‌টা দেখে তার ক্রমশঃ মনে হ'তে লাগল যে এই-ই ঠিক্‌, স্বাভাবিক, এবং সন্তানের সম্‌হি পাবার জন্য যে তাদের স্নেহকে দূরে রাখতে হবে এমন কোনও আপ্তবাক্য নেই। অর্থাৎ স্নেহ ও শ্রদ্ধাভক্তি পরস্পর বিরোধী হবেই এমন কোনও কথা নেই। তাছাড়া তার মনে হ'ত যে পিতামাতা ত শুদ্ধ সন্তানের শুভাকাঙ্ক্ষী ও উপদেষ্টা মাত্র নন, তাদের স্নেহাস্পদও ত বটে। সুতরাং তাঁরা গল্পের বন্ধুই বা হ'তে না পারবেন কেন? এই-ই ত ঠিক্‌। এই-ই ত সুন্দর।

মিষ্টার টমাস পল্লবকে এক দিন বলেছিলেন যে, তিনি বাড়ীতে নানা জাতীয় অতিথি নিমন্ত্রণ করেন অনেকটা সন্তানের শিক্ষার জন্যও বটে। কারণ, (তিনি বল্‌তেন) শিশু-চরিত্র এমনই বিচিত্র ও সুন্দর যে, অতি অল্পেই সে জাতীয়তার অভিমানের গণ্ডী কাটিয়ে যেতে পারে—ও তা আবার নিজের অজ্ঞাতসারে। অর্থাৎ বাল্যাবধি বিদেশীর সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেলে শিশু অতি সহজেই মানুষের সঙ্গে মানুষের কল্পিত ব্যবধান অতিক্রম করতে শেখে, যেটা পরিণত বয়সে মানুষের পক্ষে এত কঠিন হ'য়ে না উঠেই পারে না।...পল্লব তাঁর এই উদার মতামতের সঙ্গে মিসেস নর্টনের মতামতের একটা সাদৃশ্য পেত। তার মনে হ'ত সম্ভবতঃ মিসেস নর্টন এ বিষয়ে মিষ্টার টমাসের কাছে খানিকটা ঋণী।

পল্লব মিষ্টার টমাসের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে অল্প একটু মিশেই বুঝতে পারল যে, মিষ্টার টমাস যা বলেছিলেন সেটা মিথ্যা নয়। কারণ পল্লব কখনও তাদের কথাবার্ত্তায় আকার ইঙ্গিতেও এমন খোঁচা পায় নি যে, সে বিদেশী, অতএব অবজ্ঞেয় বা অনুরূপ কোনও অভদ্র উক্তি।...সে দেখ্‌ল যে এ কয়টি শিশুর হৃদয়ে সে সত্যই প্রথম থেকেই তার মানুষ পরিচয়েই প্রীতির আসন পেয়েছে। হৃদয়ের আদানপ্রদান করবার সময়ে তারা কেউ তার জাতির পরিচয় নিতে ভুলেও মাথা ঘামায় নি। তারা এটা ভুলেই গিয়েছিল। তাদের পিতার ফরাসী, রুষ, জার্ম্মান, ইতালীয়ান প্রভৃতি নানা জাতীয় অতিথি-বন্ধুর কথা বল্‌তে বল্‌তে তারা যে ভাবে সহজ উৎসাহ-গর্ব্বে মুখর হ'য়ে উঠ্‌ত, তাতে পল্লব তার এ ধারণার খুব বড় সমর্থন পেত। তার আদর্শপন্থী মনটি এতে একটা গভীর তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌ত।...এবং সে মনে মনে আশ্চর্য্য হ'ত যে, বিদেশী-বিদ্বেষের মতন অস্বাভাবিক জিনিষকেও মানুষ শুধু স্বাভাবিক নয় কেমন আদর্শীভূত ক'রে দাঁড় করিয়েছে!

টমাস-পরিবারের ছেলেমেয়েদের আর একটা স্বাভাবিক ব্যবহার তার বড় ভাল লাগ্‌ত। তারা প্রায়ই বাড়ীর বাগান থেকে 'ষ্ট্রবেরি' বা 'রাস্পবেরি' 'পেয়ার' প্রভৃতি বিলাতি ফল তাকে এনে দিত; বা কখনও সে তাদের কাউকে চকলেট-লবেঞ্চুষ কিনে দিলে তারা তা সকলের মধ্যে ভাগ ক'রে নেবার সময় তাকেও ভাগ দিতে ভুল্‌ত না।...কখনও হয়ত তারা নিঃসঙ্কোচে তার মুখেই লবেঞ্চুষ পুরে দিত, যেন সে তাদেরই একজন।...দেশে থাক্‌তে পল্লব দু একজন বিজ্ঞ বাগ্মীর কাছে মাঝে মাঝে হিন্দুধর্ম্মের খাওয়া-ছোঁওয়া বিচারের আধ্যাত্মিক, অপিচ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শুন্‌ত। কিন্তু বিদেশে ম্লেচ্ছ শিশুর স্পৃষ্ট বস্তু এ ভাবে একত্রে খাওয়াটা তার কাছে এতই স্বাভাবিক মনে হ'ত যে তার দেশের লোকাচারের এ সম্বন্ধে লম্বা লম্বা বুলি তার মনকে স্পর্শও করতে পার্‌ত না।...দেশে কই সে ত বিদেশী বিধর্ম্মীর সঙ্গে এরূপ অন্তরঙ্গ ভাবে খাওয়ার সহজ সৌন্দর্য্যটি এ ভাবে উপলব্ধি কর্‌তে পারে নি!...এই সব ছোটখাট অভিজ্ঞতা সত্যই তাকে ছুৎমার্গের অসারত্ব সম্বন্ধে বড় কম আলো দেয় নি। দেশে থাক্‌তেও তার মনটি খাওয়া-ছোঁওয়া বিচারের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় সাড়া দিত না বটে;—কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশে সে ছোট জাতের হাতে খেলে তার দরুণ কেমন যেন একটা পৌরুষ বোধ কর্‌ত। তাই তার মনে হ'ত, যে নানা জাতির হাতে খাওয়াটা যে মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ হৃদ্যতার একটা সামান্য অভিব্যক্তি মাত্র সেটা সে

স্বদেশের আবহাওয়ায় কখনও এমন সহজ সরল ভাবে উপলব্ধি করে নি। কারণ বিলেতের এসব ছোটখাট (অথচ মূল্যবান্) অভিজ্ঞতা তাকে যেন নিয়ত চোখে আঙুল দিয়েই দেখিয়ে দিত যে মানুষ কোনও কিছু করার দরুণ যত দিন একটা নিহিত গর্ব্ব অনুভব করে, ততদিন সে কৃত কর্ম্মের মধ্য দিয়ে কিছুতেই সে কর্ম্মসাধনার চরম সার্থকতাটুকু পেতে পারে না।—যখন কৃত কর্ম্মটি এতই স্বাভাবিক মনে হয় যে, তার দরুণ গৌরবের কথা মনেও আসে না, কেবল তখনই সে কর্ম্মটি যথার্থ সাধিত হ'য়ে থাকে।...

টমাস-পরিবারের শিশুদের সঙ্গে সংস্পর্শে এসে সে পূর্ব্বোক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল বটে, কিন্তু এ লাভটা সে তখন-তখনই এত স্পষ্ট ভাবে অনুভব করে নি। কারণ মানুষের অধিকাংশ ছোটবড় উপলব্ধিই অনেকটা অজ্ঞাতসারে ও ধীরে ধীরে গ'ড়ে উঠ্‌তে থাকে—শেষে সে এক দিন হঠাৎ তার প্রতি সচেতন হয়ে পড়ে মাত্র।

মিষ্টার টমাসের বয়স ছিল ৬৭।৬৮। কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য বেশ ভালই ছিল ও পরিশ্রমের ক্ষমতাও ছিল অসাধারণ। চোখ দুটি বুদ্ধি-উজ্জ্বল, ললাট প্রশস্ত ও দেহ বলিষ্ঠ। কেবল আজীবন টেবিলে বসে কাজ করার জন্য তিনি একটু সাম্‌নের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন।... তাঁর পড়াশুনো ছিল আশ্চর্য্য রকমের। তিনি দুটো তিনটে বিদেশী ভাষা জান্‌তেন ও ভাল ভাল ফরাসী, ইতালীয়ান ও জার্ম্মান মাসিকার গ্রাহক ছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি সেগুলি নিয়মিত ভাবে পড়তেন।...

পল্লব মাঝে মাঝে সত্যই এই ভেবে আশ্চর্য্য হ'ত যে, ব্যাঙ্কের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি সত্ত্বেও তিনি কেমন ক'রে তাঁর জ্ঞান ও ভাষা-চর্চ্চা করবার সময় পেতেন!···সে এক দিন তাঁকে এ প্রশ্ন করেছিল। তাতে তিনি মৃদু হেসে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রসিকতার সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন, "বাকৃচি, মানুষের জীবনটা যে কত লম্বা তা বুঝতে পারে কেবল তারা, যারা তার কাছ থেকে সব চেয়ে বেশি আদায় করে নিতে চায়। যারা কিছুই করে না তারাই শুধু সময় নেই সময় নেই বলে হাঁহাঁধ্বনি ক'রে কিছুরই সময় পেয়ে ওঠে না। আমার একটি খুব ধনী বন্ধু আছেন। তাঁর কিছুই করতে হয় না এক খরগোষ শিকার করা ছাড়া। বাকী সময়টা কি ক'রে কাটান জিজ্ঞাসা করাতে তিনি এক দিন আমাকে বলেছিলেন যে, হাই তুলে ও আড়া-মোড়া ছাড়তে ছাড়তে তিনি ঠাহর করতেই পারেন না যে এ ছাড়া জীবনে আর কিছু করা যেতে পারে।" পল্লব সেদিন এ কথা শুনে খুব হেসে উঠেছিল বটে, কিন্তু পরে সে দেখেছিল যে মিষ্টার টমাস নিতান্ত পরিহাসচ্ছলে কথাটি বলেন নি।···তার কেম্‌ব্রিজের ইংরেজ সতীর্থ দু'চারজন তাদের জীবনে যে মিষ্টার টমাসের কথাটির সমর্থন ক'রে দেখিয়েছিল সে কথা সে পরে বেশি ক'রে হৃদয়ঙ্গম করেছিল। কারণ তারা শত খেলাধুলা ও তর্কবিতর্ক করা, নানান্ জাতির ও দেশের খবর রাখা, এবং নানাপ্রকার সংবাদপত্রাদি পড়ার মাঝেও নিজেদের পরীক্ষা ভাল ক'রেই পাশ করত।...সে আর্চিবল্ড্ এঙ্গেল ব'লে একটি ছেলেকে তার গণিতের শেষ পরীক্ষার কিছু দিন আগেও একবার চা খেতে নিমন্ত্রণ ক'রেছিল। আসন্ন পরীক্ষার ওজরেও এঙ্গেল তার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে নি। শুধু তাই নয়, এসে ঘণ্টা দুই দাবাও খেলেছিল। এঙ্গেল চোখ বেঁধে দুজনের সঙ্গে একত্রে গৈবী দাবা খেল্‌তে পারত। এত উচ্চদরের দাবাড়ু হ'তে তার কত সময়ই না ব্যয় করতে হয়েছে। তবু সে প্রায় কোনও সামাজিক নিমন্ত্রণই পরীক্ষার অজুহাতে প্রত্যাখ্যান করত না।... পল্লব স্বচক্ষে না দেখ্‌লে হয়ত এটা বিশ্বাস করত না। কারণ সে শুনেছিল এঙ্গেল পড়াশুনায় অত্যন্ত ভাল ছেলে। তবে তা শোনা সত্ত্বেও সে নিশ্চিত ভেবে রেখেছিল যে এঙ্গেল এত আড্ডা দেওয়ার পর কখনই পরীক্ষা ভাল ক'রে পাশ করতে পারবে না। কিন্তু সে ট্রাইপসে বি ও তারা মার্ক পেল *। এ রকম আরও অনেকগুলি আড্ডাধারী ভাল ছেলের কথা সে শুনেছিল। তার পরিচিত আর্থার জোন্স ব'লে আর একটি ইংরেজ ছেলে সমস্ত বৎসর মহা উৎসাহে টেনিস ও ক্রিকেটে খেলে ও উভয় খেলায়

---

* কেম্‌ব্রিজে গণিতের ট্রাইপসে যারা দুচারটে বেশি বিষয় অধ্যয়ন করে তারা ট্রাইপস ছাড়া সে দু তিনটে বিষয়ে পরীক্ষা দেয় এবং পাশ করলে Wrangler B এই সম্মানচিহ্ন পায়। এই উপরি বিষয় গুলোতে যদি বিশেষ ভাল করা হয় তবে B * (বি ও তারা মার্কা) পায়। কেম্‌ব্রিজের গণিত পরীক্ষায় এই সর্ব্বোচ্চ সম্মান।

blue † পেয়েও এক বৎসরেই ইংরাজী ট্রাইপসে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হ'য়েছিল।·· এই দুটি ছেলের কাজে মিষ্টার টমাসের কথার সমর্থন পেয়ে পল্লব ভাবত যে ঠিক, যারা ইচ্ছে করে সময় নষ্ট করে তারাই সময়ের অভাবের দোহাই দিতে সব চেয়ে ব্যস্তবাগীশ হ'য়ে কলরব ক'রে থাকে।··· মিষ্টার টমাস ব্যাঙ্কের গুরুতর কাজের চাপের মধ্যেও যে জগতের কত খবর রাখ্‌তেন, নানা সভাসমিতিতে কত ভাল বক্তৃতাদি শুনতে যেতেন, নানা ভাষার মাসিকা পড়্‌তেন,···সেটা সে না দেখ্‌লে বোধ হয় সম্ভব ব'লে বিশ্বাসই কর্‌তে পার্‌ত না।...

পল্লব ক্রমে দেখ্‌ল যে মিষ্টার টমাস যে শুধু য়ুরোপের খবর রাখেন তাই নয়, তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও নিতান্ত কম জানেন না।...পল্লব ভাব্‌ত যে কোনও ভারতীয় সনাতনী ধর্ম্মধ্বজ এসে তাঁকে 'ভারত আধ্যাত্মিক, য়ুরোপ জড়বাদী' ইত্যাকার বিজ্ঞম্মন্য উক্তি (platitude) বল্‌লে মিষ্টার টমাসের সস্মিত ও শান্ত যুক্তির বাণে না জানি তাঁর কি দুর্দ্দশাই হয়।···কারণ মিষ্টার টমাস আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষের নারীজাতিকে চাবি দিয়ে সতী ক'রে রাখা; বালিকা বিধবাকে গ্রীষ্মে একাদশীতে জলাভাবে কণ্ঠাগতপ্রাণ ক'রে সংযম শিক্ষা দেওয়া; অথচ লোলচর্ম্ম বৃদ্ধের চতুর্থ পক্ষে তরুণী ভার্য্যাকে বরণ ক'রেও সমাজের স্তম্ভ স্বরূপে বজায় থাকা; অস্পৃশ্য জাতির ছায়া মাড়ালেও প্রায়শ্চিত্ত করার প্রথা; বালিকা বধূর প্রতি-বৎসর ক্ষীণজীবী সন্তানের জন্ম দেওয়া—এ সবেরই খবর বিলক্ষণ রাখ্‌তেন। কাজেই দু'চারটে লম্বা লম্বা বুলি আওড়ে তাঁর চোখে ধূলো দেওয়া খুব সহজ ছিল না।

এ কথা সে ঠেকে শিখেছিল ব'লেই এ আশঙ্কা তার মনে এমন ভাবে উদয় হ'ত। এক দিন পল্লব তাঁর কাছে স্বদেশ সম্বন্ধে তার উৎসাহের ঝোঁকে একটু বাড়াবাড়ি রকম কথা ব'লে বড় অপ্রস্তুত হয়েছিল ও বুঝেছিল যে তাঁর কাছে বাজে কথা ব'লে পার পাওয়া কত কঠিন। ব্যাপারটা এই :

এক দিন সন্ধ্যায় মিষ্টার টমাস পল্লবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে হিন্দু সমাজস্তম্ভগণ কেমন ক'রে আশা করেন যে যুবতী বিধবাকে বরাবর জোর ক'রে দেবী হ'তে বল্‌লেই তাদের প্রবৃত্তিকে তারা চিরকাল দমন ক'রে রাখ্‌তে পারবে। তরুণ পল্লব উত্তরে সগর্ব্বে ব'লেছিল যে সনাতন হিন্দু আদর্শে গড়ে ওঠার দরুণ তাদের দেশের মেয়েপুরুষ প্রায়ই য়ুরোপের চেয়ে ঢের বেশি সংযত ও জিতেন্দ্রিয়, কাজেই য়ুরোপ এ সব বিষয়ে ভারতকে বুঝতে পারে না ইত্যাদি। এ কথা শুনে মিষ্টার টমাস আর কিছু না ব'লে একটা ভারতীয় সংবাদপত্র তাকে এনে দেন। তাতে লেখা ছিল যে বালিকা বধূর সহবাস সম্মতির বয়স ১২ থেকে ১৪ করবার প্রস্তাবে অধিকাংশ হিন্দু বক্তাই ঘোর আপত্তি ক'রেছেন ও একজন এমন গভীর আশঙ্কাও ব্যক্ত ক'রেছেন যে তাহ'লে অধিকাংশ স্বামীকেই শ্রীঘর দর্শন ক'রে আস্‌তে হবে। পল্লবের এ কথা প'ড়ে লজ্জায় যেন মাথা কাটা গিয়েছিল যে এই তাদের সংযমী, সনাতনী হিন্দুর নৈতিক অবস্থা! তবে সেই থেকে সে মিষ্টার টমাসের সঙ্গে একটু সাবধান হ'য়ে কথাবার্ত্তা কইত।

রবিবার বা অন্য কোন ছুটির দিন মিষ্টার টমাস ছেলে-মেয়েদের সকলকে নিয়ে লম্বা বেড়াতে যেতেন ও তখন প্রায়ই তাদের সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি ও হাসিঠাট্টা কর্‌তেন।... অন্য সময়ে যিনি এত গম্ভীর ও সংযত, তিনি যে হঠাৎ ছেলেমেয়েদের সংস্পর্শে এসে এতটা প্রাণখুলে তাদের সঙ্গে মিশতে পারতেন কেমন ক'রে এটা ভেবে পল্লব প্রথম প্রথম একটু আশ্চর্য্য বোধ না ক'রেই পার্‌ত না। কিন্তু ক্রমে তার মনে হ'তে লাগ্‌ল যে এইটেই ত হওয়া উচিত! এই-ই ত সুন্দর, স্বাভাবিক! পিতামাতা সন্তানের শুভাকাঙ্ক্ষী ও উপদেষ্টা মাত্র নন, তাঁরা তাদের খেলারও সঙ্গী, গল্পেরও বন্ধু। আর সঙ্গে সঙ্গে সে ভাব্‌ত যে তার দেশের পিতামাতারা এটা কেন উপলব্ধি করেন না!

প্রত্যহ সান্ধ্যভোজনের সময়ে পরিবারস্থ সকলকে নিয়ে মিষ্টার ও মিসেস টমাস একত্রে গল্পালাপ কর্‌তে কর্‌তে ধীরে ধীরে আহার কর্‌তেন। তাঁরা এত ধীরে ধীরে খেতেন যে পল্লবের প্রথম প্রথম মনে হ'ত যেন তাঁদের কাছে খাওয়াটা উপলক্ষ মাত্র, আসল উদ্দেশ্যটা হচ্ছে—গল্পালাপের রসভোগ।

† কেম্ব্রিজে ছাত্রদের মধ্যে যারা কোনও খেলায় খুব বেশি কৃতিত্ব দেখায়, তারা অক্স্‌ফোর্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলার জন্য মনোনীত হয় ও তাদের blue এই পদবী দেওয়া হয়।

এ প্রথাটির ভিতরে পল্লব অল্প দিনের মধ্যেই একটা মনোজ্ঞ সৌকুমার্য্য ও সৌন্দর্য্যসৃষ্টির আভাষ পেল। যেন আহারকে এরা মূলতঃ অসুন্দর ভাবে ও তাই সে নিত্য-কর্ম্মটিকে এরা যতদূর পারে ঢেকেঢুকে নিয়ে সুন্দর ক'রে দাঁড় করাবার দিকে সচেষ্ট। তাই যেন আহারের সময়ে সকলেই চেষ্টা করে—মনোযোগটা অন্য দিকে আকৃষ্ট করতে। য়ুরোপীয়দের এ সতর্কতাকে পল্লব তার দেশের প্রথার সঙ্গে তুলনা ক'রে একটু বেশি বড় ক'রে না দেখেই পারত না। দেশে থাকতে পণ্ডিতদের ভোজনবিলাস বা মেয়েদের সাতান্ন রকমের ব্যঞ্জন রাঁধতে গলদ্‌ঘর্ম্ম-কলেবর হওয়াটা তার চোখে খারাপ লাগত না। বরং স্থানে অস্থানে সময়ে অসময়ে অতিথিকে ঘটা ক'রে জলযোগ করানোটাও সে হৃদ্যতা প্রকাশের একটা মস্ত উপায় মনে করত। বিলেতে এসে কিন্তু তার এ বিষয়ে মতামত এর মধ্যেই অনেকটা বদলে গিয়েছিল।

য়ুরোপীয় সামাজিকতায় সর্ব্বত্র খাওয়ানো-দাওয়ানোকে উপলক্ষ হিসেবেই গণ্য ক'রে মেলামেশা ও আলোচনাকেই বড় ক'রে দেখার মধ্যে সে একটা নূতন সৌন্দর্য্য ও সৌকুমার্য্য দেখতে আরম্ভ করল। য়ুরোপীয় সমাজে খাওয়াবার জন্য কেউ অতিথিকে যে পীড়াপীড়ি করে না; লজ্জা না করার সমীচীনতা সম্বন্ধে কেউ নিরন্তর উপদেশ দেয় না; অতিথিকে আর চাই কিনা একবারের বেশি কেউ জিজ্ঞাসা করে না ইত্যাদি সব প্রবণতাকেই তার সুষ্ঠু মনে হ'ত। আর সঙ্গে সঙ্গে তার স্বদেশবাসীর সর্ব্বপ্রকার সামাজিক মেলামেশাতে অপরিমিত খাওয়ানোকেই সব চেয়ে বড় ক'রে দেখার প্রবৃত্তির মধ্যেকার একটা অসুন্দরতা তার চোখে ঠেকত। তার আরও মনে হ'ত যে যদি বা খাওয়ানোর প্রবৃত্তিকে সমর্থন করা যায়, কিন্তু নিমন্ত্রিতদের কদলীপত্রের সামনে কায়মনোবাক্যে, কথা-বার্ত্তা না ক'য়ে ব্যস্ত ভাবে খাওয়ার মধ্যে যেন মানুষের আদিম অসভ্যতার একটা জের টেনে আনা হয়েছে। কারণ সত্যকার সভ্য কারা?—যারা সুন্দর পারিপার্শ্বিকের মধ্যে, টেবিলের উপর ফুলদানির সুগন্ধের মাঝখানে বসে, হল্লা না ক'রে, সানন্দে ধীরে ধীরে সরস কথাবার্ত্তার রসানের দ্বারা ভোজনবিলাসের চরিতার্থতা সাধন করে তারা? না—'হারায়িত-চটিজুতাময়, এপাতে-ওপাতে-ময়, কি-চাই-কি-চাই-রূপ-অট্টপ্রশ্নময়, নিবিষ্টচিত্ত-শাপ্‌শুপ্-ধ্বনিময় আবহাওয়ার মাঝে উদ্‌গ্রীবভাবে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা? তার ক্রমেই বার বার মনে হ'ত যে জীবনের সব অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে সৌকুমার্য্য, শীলতা, সংযম ও সৌষ্ঠবজ্ঞান আনাটা আধ্যাত্মিকতার পরাকাষ্ঠা হয়ত না হ'তে পারে, কিন্তু সত্য সভ্যতার সঙ্গে সম্বন্ধ তার দুশ্ছেদ্য নিশ্চয়ই।

সান্ধ্যভোজন সমাপন হওয়ার পর ছেলেমেয়েরা পিতা-মাতাকে শুভরাত্রি জ্ঞাপন ক'রে চুম্বন করে রাত্রের জন্য শয়নকক্ষে আশ্রয় নিত। এ প্রথাটিও পল্লবের ভারি ভাল লাগত। তার মনে হ'ত যে পিতামাতার প্রতি সন্তানের এ ভাবে নিত্য ভালবাসা জ্ঞাপন হয়ত ক্রমে নিছক্ লৌকিক আচারে পরিণত হ'তে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সমাজে স্নেহপ্রীতির প্রকাশের এরূপ একটা আধটা সমাজের অনুমোদিত প্রথার দাম আছেই আছে। কেন না এরূপ প্রথা আন্তরিকতার অভাবে শুষ্ক হ'য়ে পড়লেও আন্তরিক লোকের ব্যবহারের মধ্যে একটা সরসতা দেবেই দেবে। অথচ এরূপ প্রথা একেবারেই না থাকলে ক্রমে মানুষ নিজের হৃদয়ানুরাগের ইচ্ছা থাকলেও তাকে প্রকাশ করতে সঙ্কুচিত ও লজ্জিত হ'য়ে না প'ড়েই পারে না। সমাজের অনুশাসনের প্রভাব মানুষের মনের ওপর এতই বেশি!

ছেলেমেয়েরা শুতে গেলে পল্লব মিষ্টার ও মিসেস টমাসের সঙ্গে ড্রয়িংরুমে এসে কফি পান করতে করতে বিশ্রম্ভালাপ করত। কখনও কখনও মিষ্টার টমাস তার কাছ থেকে ভারতবর্ষের এত তথ্য জানতে চাইতেন, যে সব প্রশ্নের সাধ্যমত উত্তর দিতে অনেক রাত্রি হ'য়ে যেত। কিন্তু পল্লব আশ্চর্য্য হ'ত যে সারাদিনের পরিশ্রমের পরও মিষ্টার টমাস দূর ভারত সম্বন্ধে তার কাছ থেকে নানা তথ্য জানতে ও নানা গভীর বিষয়ের আলোচনা করতে ক্লান্তি বোধ করতেন না। সে পরে দেখেছিল যে য়ুরোপের উচ্চ-শিক্ষিতদের মধ্যে প্রায়ই একটা সত্যকার জ্ঞানান্বেষণের দীপ জ্বলে—যেটা ক্ষীণপ্রাণ ভারতের উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে প্রায় নির্ব্বাণোন্মুখ হ'য়েই থাকে। তাই তার ক্রমশঃই সন্দেহ হ'ত যে বাস্তবিকই কি য়ুরোপ অবিমিশ্র জড়বাদী ও ভারতই আধ্যাত্মিকতার একচেটিয়া ব্যবসা ক'রে বসে আছে!

সেদিন রবিবার। সান্ধ্যভোজনের পর ড্রয়িংরুমে কফিতে চুমুক দিতে দিতে মিসেস টমাস পল্লবকে জিজ্ঞাসা করলেন: "মিষ্টার বাক্‌চি, শুনেছি আপনারা ভারি স্নেহপ্রবণ, গৃহপ্রিয় জাতি?"

পল্লব নিঃসন্দিগ্ধভাবে ঘাড় নেড়ে বল্‌ল: "হাঁ—ভারি। য়ুরোপের গৃহস্থের মতন আমরা জীবনের বেশির ভাগ অবসর সময়টা ক্লাব বা আমোদ-প্রমোদের হলে কাটাই না।" ব'লে সে মনের মধ্যে কেমন যেন একটা ছোটখাট যুদ্ধজয়ের তৃপ্তি অনুভব কর্‌ল। অর্থাৎ ভাবটা এই যে য়ুরোপের বাইরের চাক্‌চিক্যে মোহিত হ'য়ে স্বদেশের গভীর গুণগুলির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হবার পাত্র আর যেই হোন্ না কেন পল্লব শর্ম্মা নন!

মিষ্টার টমাস বল্‌লেন: "আমরাও আগে কাটাতাম না বাক্‌চি। আমরাও এক সময়ে স্নেহপ্রবণ, গৃহপ্রিয় জাত ছিলাম। তবে একটা কথা তুমি ভুলো না। ক্লাব-জীবনের প্রচলনটা সহরে লোকের মধ্যেই বেশি হয়েছে। এখনও ইংলণ্ডের ছোট ছোট সহর ও গ্রামে ক্লাব ও বাইরের আমোদ আহ্লাদ লোককে তত টান্‌তে পারে নি।"

পল্লব বিজ্ঞভাবে বল্‌ল: "কিন্তু আপনাদের গৃহজীবন (home-life) তেমন নয় যেমন আমাদের। আপনাদের দেশে ত কত লোক দেখি দিনের পর দিন দুবেলা হোটেলে খায় ও সন্ধ্যাটা ক্লাবে কাটায়! ডিকেন্সের লেখায় আপনাদের গৃহচুল্লীর (fire-place) চারদিকে পরিবার-পরিজন-পরিবেষ্টিত হ'য়ে গল্পগুজব করার যে বিবরণ পড়ি সেটা আপনাদের আজকালকার সভ্যতায় ত বড় দেখ্‌তে পাই না।"

পল্লব কথাটা ব'লেই ভাব্‌ল সে মস্ত একটা তথ্য আবিষ্কার করেছে। কৈশোর ও পূর্ণ-যৌবনের সন্ধিস্থলে মানুষ যখন অল্প অল্প ক'রে একটু স্বাধীনভাবে ভাব্‌তে শেখে, তখন সে অনেক জানা কথাই নূতন ক'রে উপলব্ধি করার সময় মনে ক'রে বসে যে সে মনোজগতের মস্ত মস্ত তথ্য ও তত্ত্বের আবিষ্কর্ত্তা।

মিষ্টার টমাস কিন্তু তাকে একটু নিরুৎসাহ ক'রে দিলেন এই কথা ব'লে: "বাক্‌চি, তুমি যা বল্‌ছ তার মধ্যে অনেকটা সত্য আছে বটে। কিন্তু একটা কথা তুমি ভুলো না যে যন্ত্রদৈত্যের আমদানীর আগে মানুষের জীবন যে ভাবে গৃহকে কেন্দ্র ক'রে ঘুরতে পার্‌ত, ও রাক্ষসের অভ্যাগমের পর সেটা অসম্ভব না হ'য়েই পারে না।"

পল্লব জিজ্ঞাসা কর্‌ল: "কেন?" উত্তরে মিষ্টার টমাস বল্‌লেন: "কারণ মানুষের বাইরের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান-গুলির ওপর তার মনস্তত্ত্বও বড় কম নির্ভর করে না। অথচ আশ্চর্য্য এই যে এ কথা আমরা প্রায়ই ভুলে গিয়ে মানুষের মনকে তার পারিপার্শ্বিক-নিরপেক্ষ ভেবে ভুল করে বসি—যেমন তুমি এইমাত্র করেছ। ডিকেন্সের লেখায় তুমি আমাদের গৃহজীবনের প্রতি অনুরাগ সম্বন্ধে যা পড়েছ সেটা যখনকার সামাজিক অবস্থা ছিল তখন যন্ত্র-সভ্যতার (industrial civilization) স্রোত এত দ্রুত বইতে আরম্ভ করে নি। তার পর আমাদের সমাজে কল-কারখানার ভাঙন ধর্‌ল ও সেই থেকে আমাদের সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার একটা বিপ্লব ঘটে গেছে। তোমাদের দেশেও ঠিক্ তাই হবে, যদি এখনও না হ'য়ে থাকে।"

পল্লব সজোরে ঘাড় নেড়ে বল্‌ল: "কখ্‌খনো না। আমাদের সভ্যতায় পারিবারিক স্নেহমমতার স্থান এত ওপরে যে—"

মিষ্টার টমাস বাধা দিয়ে একটু সান্ত্বনার সুরে বল্‌লেন: "বাক্‌চি, কিছু মনে কোরো না। অল্প বয়সে আমরা প্রায়ই পুরুষকার, স্বাধীন ইচ্ছা (free will) প্রভৃতি বড় বড় কথায় নিতান্ত সরল ভাবে বিশ্বাস করি। কিন্তু একটু বড় হ'লেই আমাদের চোখ ফুটতে থাকে যে মানুষ তার পারিপার্শ্বিক, জন্মার্জ্জিত সংস্কার, মনের প্রবণতা প্রভৃতির কতখানি দাস। বিগত মহাযুদ্ধের আগে এ কথা বল্‌লে লোকে হেসে উড়িয়ে দিত। কিন্তু এখন লোকের অন্ততঃ সব বিষয়ে আগেকার সে সবজান্তা-ভাবটা একটু কমেছে। যন্ত্রসভ্যতাকে অনেকটা প্রকৃতির দুর্নিবার স্রোতের মতনই মনে হয়। তাই তার আমদানী আমরা ঠিক্ ইচ্ছে ক'রে না করলেও, তাতে আমাদের রাজি হ'তে হ'য়েছে। এর ফলে আমরা অপরাপর জাতিকে উৎপীড়ন ক'রেছি; অপর দেশে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন ক'রেছি; এবং অপরের রাজ্যে গিয়ে স্বযূথের মধ্যে থাক্‌তে হ'য়েছে ব'লে গৃহের দাবীকে অনেকটা জোর ক'রেই অবজ্ঞা করতে বাধ্য হ'য়েছি ও ক্লাব-জীবনের সৃষ্টি না ক'রেই পারি নি।"

মিসেস টমাস তাঁর স্বামীর এরূপ খোলাখুলি আলোচনায় বড় প্রীত হ'তেন না, কারণ তিনি স্বজাতির গৌরবকে বড় ক'রে দেখারই পক্ষপাতী ছিলেন। তাই তিনি একটু উষ্ণ স্বরে ব'লে উঠলেন: "আর্চিবল্ড, এ তোমার বাজে কথা। গৃহের দাবী-দাওয়া দিই নে—আমরা? আমরা কি ফরাসীদের মতন উচ্ছৃঙ্খল?"

মিষ্টার টমাস শান্তস্বরে তাঁর তর্জ্জনীটি তুলে বল্লেন: "আইরিণ, তুমি একটা মস্ত ভুল কর্‌ছ যেটা আমাদের ইংরেজ জাতির অনেকটা জাতিগত দোষ বল্লেই চলে। অর্থাৎ—অপর দেশকে না জেনেই তার সম্বন্ধে সজোরে মতামত প্রকাশ করা।"

পল্লব সোৎসাহে ব'লে উঠ্‌ল: "ঠিক্ ব'লেছেন মিষ্টার টমাস। ইংরেজ জাত অপর কোনও জাতের মধ্যে দীর্ঘকাল বাস কর্‌লেও তাকে জান্‌তে চায় না। আমার পিতৃবন্ধু এক সাহেব সিভিলিয়ান ২৫ বৎসর আমাদের দেশে বাস ক'রে একটা ভারতীয় ভাষা শেখাও কখনও দরকার মনে করেন নি। অপর জাতকে জানাটা আপনারা যেমন নিষ্প্রয়োজন মনে করেন বোধ হয় জগতের অন্য কোনও জাত তেমন করে না।"

কথাটা ব'লেই পল্লবের মনে হ'ল যে মিষ্টার টমাসকে এত উৎসাহের সঙ্গে তাঁর স্বজাতিনিন্দাটা না শোনালেই বোধ হয় সেটা শীলতা-সঙ্গত হ'ত। কারণ পল্লব নিজে একটু অভিমানী প্রকৃতির লোক ছিল ব'লে অপরের অভিমানকে খুব সতর্ক ভাবে বাঁচিয়ে চল্‌তে জান্‌ত। কেবল ইংরেজ জাতির বিরুদ্ধ সমালোচনায় তার তরুণ মনটি উৎসাহের ছন্দে একটু বেশি দূর না গিয়েই পার্‌ত না।

মিষ্টার টমাস বল্লেন: "এটা সত্যি কথা। অন্ততঃ এর মধ্যে যে অনেকখানি সত্য আছে তাতে সন্দেহ নেই। তবে কি জান বাক্‌চি! আমরা দ্বীপাবদ্ধ (insular) জাতি ব'লে আমাদের গোটাকতক সঙ্কীর্ণতা না জন্মিয়েই পারে নি। আমাদের দেশের অনেক চিন্তাশীল লোকের মত এই যে ইংলণ্ডের সঙ্গে য়ুরোপের 'নাড়ীর যোগ নেই। * ফলে ব্যাপারটা এক সময়ে এমন সঙীন দাঁড়িয়েছিল যে ডীন ইঞ্জ বল্‌ছেন যে আগে আমরা স্পানিশ বা রুষ রাজপ্রতিনিধিকে (ambassador) চু'চক্ষে দেখ্‌তে পার্‌তাম না; এবং এর কারণ ছিল শুধু এইমাত্র যে তারা ইংরেজ নয়। *"

মিসেস টমাস একটু রাগতঃ ভাবে ব'লে উঠলেন: "কে ডীন ইঞ্জ?—ওঃ—যাঁকে লোকে dismal dean বলে তিনি? তাঁর আবার কথা। সে এক স্বজাতিদ্বেষী, দুঃখবাদী (pessimist)—"

মিষ্টার টমাস এবার একটু কঠিন স্বরে বাধা দিয়ে বল্লেন: "ও কথা বোলো না আইরিণ। ডীন ইঞ্জ চিন্তাশীল লোক। তিনি দুঃখবাদী এ কথা অবশ্য বল্‌তে পার, কিন্তু তুমি কি জান না যে সহৃদয় লোকই সংসারে সচরাচর দুঃখবাদী হয়, হৃদয়হীন লোকে জগতের দুঃখকষ্টের দৃশ্যে ভ্রূক্ষেপও না ক'রে সহজেই সুখবাদী (optimist) হ'তে পারে?"

পল্লব বিজ্ঞ ভাবে একটা জ্ঞানগর্ভ প্রবচন উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ কর্‌তে পার্‌ল না। সে বল্‌ল: "তা বটে মিষ্টার টমাস। ইংরাজীতে একটা কথা আছে না 'অনেক রঙীন আশাভরসায় ঘা পড়লে তবেই মানুষ সব তাতেই সন্দেহ কর্‌তে প্রবৃত্ত হয়?'" (Cynicism is sentimentalism disillusioned.)

মিষ্টার টমাস হেসে বল্লেন: "কিন্তু সব সময়ে নয় বাক্‌চি। বার্টরাণ্ড রাসেল লিখেছেন না যে অনেক সময়ে বদ্‌হজমের জন্যও মানুষ সব তাতে সংশয়ী (cynic) হ'য়ে পড়ে?" †

পল্লব একটু অনুযোগের সুরে বলল: "ও ত গেল ঠাট্টার কথা।"

মিষ্টার টমাস বল্লেন: "না বাক্‌চি, সম্পূর্ণ ঠাট্টা নয়। দেখ, অনেক দৃশ্যতঃ ঠাট্টার মধ্যেও অনেক সময়ে গভীর সত্য ছদ্মবেশে বিরাজ করে। আমাদের মনের বিশ্বাস, মতামত প্রভৃতি যে অনেক সময়েই আমাদের স্বাস্থ্যের ওপর কম নির্ভর করে না, ও ঠাট্টাটি কেবল এই কথাটিই ঘুরিয়ে বল্‌ছে মাত্র।...কিন্তু আমরা একটু অবান্তর কথা

* Economic Consequences of the Peace by John

* Outspoken Essays by Dean Inge.

† Principles of Social Reconstruction...Bertrand Russel.

এনে ফেলেছি। আমি যা বল্‌তে চেয়েছিল্যাম সেটা এই যে, এই যন্ত্রপাতির চাপে মানুষের অন্তরাত্মা যেমন ভাবে শুকিয়ে যায়, তেমন ভাবে বোধ হয় আর কিছুতেই যায় না।"

পল্লব একটু বিস্মিত ভাবে বল্‌ল: "কিন্তু যন্ত্রপাতি, কলকারখানা এ সব ত বাইরের জিনিষ! তাই এর চাপে মানুষের কোমল প্রবৃত্তি শুকিয়ে যায়, এ কথার মানে কি?"

মিষ্টার টমাস বল্‌লেন: "মানুষ যে তার পারিপার্শ্বিকের বড় বেশি রকম দাস এই কথাটি একটু আগেই বল্‌ছিলাম না? কলকারখানা বাইরের জিনিষ হ'লেও আমাদের পারিপার্শ্বিককে সে বড় কম বদ্‌লে দেয় না। তার ফলে একদল মানুষের হৃদয় অত্যধিক পরিশ্রমে, পানদোষে ও সর্ব্বদা চাকরি যাবার ভয়ে শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে যায়। এদের বলা যায়—শ্রমিক। অপর দল এদের প্রতি উত্তরোত্তর বেশি অত্যাচার কর্‌তে থাকে। এদের বলা যায়—ক্যাপিটালিষ্ট। এদের দুয়ের সংঘর্ষে মানুষের আসল সভ্যতাটি যেতে বসেছে। কেন না মানুষের সত্যকার সভ্যতা জিনিষটি বড়ই ক্ষণভঙ্গুর।"

পল্লব বল্‌ল: "তার মানে?"

মিষ্টার টমাস বল্‌লেন; "কি জানো বাক্‌চি? এটা ত জানোই যে আমাদের হৃদয়ের কোনও গুণ বা প্রবৃত্তিকে বহুদিন উপবাসী রাখলে তার মৃত্যু ঠেকানো যায় না—যেমন শরীরের একটা অঙ্গ অনেক দিন ব্যবহার না করলে সেটা অচল হ'য়ে পড়ে। জীবন-সংগ্রাম প্রতি দিন বিপর্য্যয় বেড়ে চ'লেছে এটাও ত দেখতে পাচ্ছ। সুতরাং মানুষের শুধু বাঁচতে ক্রমে এত শ্রমস্বীকার কর্‌তে হচ্ছে যে তাতে তার হৃদয়ের কোমল প্রবৃত্তির চর্চ্চা করা দুঃসাধ্য হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। ফলে মানুষ হৃদয়-রাজ্যে উদ্বৃত্ত বড় বিশেষ কিছু রাখতে পার্‌ছে না।...কলকারখানার আগের যুগে কৃষকের না হ'লেও মধ্যবিত্তের অনেকটা অবসর ছিল। তাই তখন শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জীবনে আনন্দের খোরাক যোগাড় করার উৎসাহ ছিল, প্রাণশক্তিও বেশি ছিল। ফলে আমাদের সৃষ্টির প্রেরণাও বেশি মিল্‌ত ও আমরা সুকুমার প্রবৃত্তির চর্চ্চাও বেশী কর্‌তে পার্‌তাম।...এক কথায় মনের ঘরে আড্ডা দেবার তখন আমাদের সময় ও স্ফুর্ত্তি দুই-ই ছিল, যেটার আজ ক্রমশঃই বড় অভাব হ'য়ে পড়ছে। পরিণামে আমরা অবসর সময়টা সস্তা উত্তেজনা, বাজে আমোদ-আহ্লাদ ও অসার ক্লাব-জীবনের চর্চ্চায় ব্যয় করি।"

পল্লব বল্‌ল: "তা সময়টা ভাল জিনিষের চর্চ্চায়ই বা ব্যয় করেন না কেন? অবসর সময়টা আপনারা ভাল ভাবে ক্ষেপণ করেন না সে দোষও কি যুগধর্ম্মের?"

মিষ্টার টমাস ধীরে ধীরে থেমে থেমে বলতে লাগ্‌লেন: "না ঠিক্ তা নয়।...তবে কি জান বাক্‌চি!...জীবন-সংগ্রাম খুব হাড়ভাঙ্গা গোছের হ'লে যে সময়টুকু উদ্বৃত্ত থাকে সে সময়টুকু ভাল ভাবে ক্ষেপণ করার উৎসাহ বা স্ফুর্ত্তিও মানুষের থাকে না। অথচ এটা ত নিতান্ত জানা কথা যে এই উদ্বৃত্ত সময়ের সদ্ব্যবহারের ফলেই আমাদের ললিত-কলা, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির জন্ম। তা ছাড়া অবশ্য আমাদের কাম্যবস্তুর ধারণাও যে বদ্‌লে যাচ্ছে এটাও ঠিক্! অথচ এই লোকমতের ওপরই নির্ভর ক'রে আমাদের সভ্যতার দিক্ নির্ণয় করা ছাড়া গতিও ত দেখা যাচ্ছে না। কোথায় পড়েছিলাম যে ইতালিতে রেনেসাঁস যুগে একজন চিত্রকর ধনীর চেয়ে বেশি সম্মানিত হ'ত। ফলে সেখানে চিত্রকরই বেশী লোকচক্ষুর সাম্‌নে আসত। অপর পক্ষে, আমেরিকায় আজ সব চেয়ে বেশি আদর—কোটিপতির। তাই সে দেশে আজ চিত্রকরের স্থলে কোটীপতিই বেশি জন্মাচ্ছে। অবশ্য অর্থপূজার আদর্শের জন্য শুধু আমেরিকাই দায়ী নয়। এ পক্ষে আমরাও বড় কম যাই না। কারণ আমরা মুখে যাই বলি না কেন, মনে মনে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থাগম,—দৈহিক-স্বাচ্ছন্দ্যবিধান, ও বিলাসোপকরণের বন্যা বহানর আদর্শকে আমেরিকার চেয়ে কম বড় ক'রে দেখি না। "ভোগ-কর-বা-না-কর উৎপাদন-কর" রূপ আদর্শে য়ুরোপের কোন্ জাতি যে কম সাড়া দেয় তা বলা কঠিন। তবে সে যাই হোক্, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে আমাদের হৃদয়ের সুকুমার প্রবৃত্তির যে অনুশীলন হচ্ছে না এটা ধ্রুব। হচ্ছে কেবল—অসম্ভব উচ্চাশার প্রশ্রয়দান, ক্ষমতার মদমত্ততায় আসক্তি-বৃদ্ধি ও জাতীয় অভিমানের খোরাক যোগানো।"

পল্লব হঠাৎ লক্ষ্য কর্‌ল যে মিসেস টমাসের গৌরবর্ণ মুখ লাল হ'য়ে উঠেছে। তিনি না ব'লে থাকতে পার্‌লেন না:

"কিন্তু আর্চিবল্ড্, সভ্যতার মানেই ত ক্ষমতার বিকাশ করা, প্রকৃতিকে মানুষের দাস করা, জগতের উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি করা! নইলে যারা দিন আনে দিন খায় তারাই কি জীবনে পরম বস্তুর চর্চ্চায় নিযুক্ত আছে বল্‌তে হবে?"

মিষ্টার টমাস একটু চিন্তিতভাবে বল্‌লেন: "না তা আমি বলি না। প্রকৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তার যে য়ুরোপীয় সভ্যতার একটা মস্ত কীর্ত্তি এ কথা আমি মানি।...কিন্তু শুধু এই আধিপত্যই ত লক্ষ্যস্থল নয়!...প্রকৃতিকে বশে আনা বৃথা যদি সে বশে-আনার সদ্ব্যবহার সম্বন্ধেও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চোখ না ফোটে!...শুধু বৃথা নয়—এতে বিপদ্ সমূহ। কারণ সব বড় ক্ষমতা লাভেরই একটা দায়িত্ব আছে যার নাম হচ্ছে প্রয়োগজ্ঞান। প্রকৃতির ওপর প্রভুত্বের ক্ষমতার সম্বন্ধেও তাই। অর্থাৎ তার প্রয়োগজ্ঞানও না জান্‌লে সে ক্ষমতা আমাদের জীবনীশক্তির সহায় না হয়ে পরিপন্থীই হবে।"

মিসেস টমাস উত্তপ্ত স্বরে বল্‌লেন: "তা কখনও হ'তে পারে? প্রমাণ কই? দেখ আমরা আজ জগতের ওপর কেমন অপ্রতিহত-প্রভাবে রাজত্ব করছি। আমাদের প্রভাব কি আজ বিন্দুমাত্রও কমেছে? Rule Britannia rule the waves—"

মিষ্টার টমাস এবার একটু বিরক্ত হ'য়ে বাধা দিয়ে বল্‌লেন: "আইরিণ, তোমাকে আমি কতবার বলেছি যে এই অহঙ্কারেই আমাদের পতন হবে। দেখ, আমার নানা জাতির মধ্যে বন্ধু আছে। তাই আমি বেশ ভালই জানি যে আমাদের অনেকে মুখে সুখ্যাতি কর্‌লেও মনে কেউই ভালবাসে না। জগতে সর্ব্বত্র ইংরেজের যে রকম গর্ব্বিত জাতি ব'লে অপবাদ আছে তেমন আর কোনও জাতিরই নেই।"

মিসেস টমাস মুখটি অন্ধকার ক'রে বলে উঠলেন: "সে হিংসে।"

পল্লবও হঠাৎ ব'লে বস্‌ল: "সব সময়ে হিংসেও নয় মিসেস টমাস। উৎপীড়িত জাতি যে আপনাদের পতন কামনা করে তার কারণ হিংসে নয়, তার কারণ অনেক সময়ে—আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি।"

কথাটা ব'লেই তার খানিক আগের সঙ্কোচ আবার উদয় হ'ল যে মিসেস টমাসকে কেন এরূপ অপ্রিয় সত্য ব'লে মনে ব্যথা দেওয়া? এতে কি-ই বা ফল হবে? তবু এরূপ স্থলে সে প্রায়ই ঝোঁকের মাথায় রসনা-সংযম করতে অক্ষম হ'য়ে পড়ত।

মিসেস টমাস সবিস্ময়ে ব'লে উঠলেন: "অত্যাচার আমরা করি! আমরা কি জার্ম্মাণ? কখনই না। আমরা বরং অসভ্য জাতির মধ্যে সভ্যতার বিস্তার করি; অজ্ঞানতার রাজ্যে জ্ঞানের আলো এনে দেই—"

এবার মিষ্টার টমাস একটু উদ্দীপ্ত ভাবে বাধা দিয়ে ব'লে উঠ্‌লেন: "—ব'লে যাও আইরিণ, কোনও দেশে উপনিবেশ স্থাপন করলে তার আদিম অধিবাসীদের নির্ম্মূল করি, যেমন আমেরিকায় ও অষ্ট্রেলিয়ায় করেছিলাম; অপরের রাজ্যে আমাদের বাণিজ্যের বিস্তার করতে না দিলে জাহাজ নিয়ে গিয়ে তাঁদের দরজা গোলার আঘাতে খুলে ফেলি, যেমন জাপানে প্রথমে ক'রেছিলাম; আর নিরীহ শান্তিপ্রিয় জাতিকে জাপানের মতন নিজেদের হত্যাবৃত্তিতে দীক্ষিত ক'রে নিতে না পারলে তাদের ধন-সম্পত্তি ভাগাভাগি ক'রে নেই—যেমন চীনে কর্‌ছি।—কত বল্‌ব? আইরিণ, এই স্বদোষ-অন্ধতা ও জাতীয় গর্ব্বই আমাদের সর্ব্বনাশ কর্‌বে—যদি দিন থাকতে সাবধান না হই।"

মিসেস টমাস উত্তেজিত হ'য়ে আরও কি একটা কথা বল্‌তে গিয়ে কি ভেবে হঠাৎ থেমে গেলেন। কারণ তাঁর নারীসুলভ সহজ-অনুভূতির আলোতে তিনি বুঝেছিলেন যে এ কথা নিয়ে আরও তর্ক করলে তাঁর দুর্ব্বলতা আরও বেশি প্রকট হয়ে পড়্‌বে। অন্য সময়ে হ'লে হয়ত সে চিন্তায় তিনি তাঁর প্রত্যুত্তর দেবার প্রবল প্রবৃত্তিকে সংযত কর্‌তে পার্‌তেন না। কিন্তু একজন ভারতীয়ের সাম্‌নে স্বামী-স্ত্রীর জাতীয়ত্ব নিয়ে উদ্দীপ্ত তর্ক?—ছি ছি!

পল্লব বুঝেছিল যে এ প্রসঙ্গ আর বেশি দূর গড়াতে দেওয়া মিসেস টমাসের ইচ্ছা নয়। কারণ বিদেশীর কাছে স্বজাতির মহিমাকীর্ত্তন করা যে তিনি একটা কর্ত্তব্য মনে করতেন এ কথা পল্লব জানত। অন্য সময়ে হ'লে হয়ত সে তাঁর এ ইচ্ছার সঙ্গে কোনও সহানুভূতি বোধ করত না। কিন্তু আজ তাঁকে হঠাৎ কি একটা কথা উত্তেজিত ভাবে বল্‌তে গিয়ে আত্মসংযম করতে দেখে তার মনে মিসেস টমাসের বেদনার সঙ্গে কেমন যেন একটা অনির্দ্দেশ্য

সমবেদনার উদয় হ'ল। সে প্রসঙ্গান্তরের অবতারণার জন্য মিষ্টার টমাসকে বল্‌ল: "যাক্‌ ও কথা। আমি আজ আপনার কাছে একটা পরামর্শ জিজ্ঞাসা করতে চাই মিষ্টার টমাস।"

মিষ্টার টমাস একটু হেসে বল্‌লেন: "বল কি বাক্‌চি? তুমি এত দিন ধ'রে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ কেম্ব্রিজের ছাত্রদের সঙ্গে মিশেও বয়োজ্যেষ্ঠের কাছে কিছু শেখার আছে ব'লে মনে কর? দেখেছ, তবু বাইব্‌লে বলে যে অলৌকিক ঘটনার (miracle) যুগ গত! তবে তোমায় একটু সাবধান ক'রে দেই। তুমি যে জীবনে একবারও কোনও বয়োজ্যেষ্ঠের পরামর্শ চেয়ে ফেলেছ এ কথা যেন তোমার কেম্ব্রিজের সবজান্তা বন্ধুদের ভুলেও ব'লে ফেল না। তারা তাহলে তোমাকে আর কল্‌কে দেবে না, বল্‌বে তুমি নিতান্ত সেকেলে ও reactionary." মিষ্টার টমাস মাঝে মাঝেই কেম্ব্রিজ ও অক্‌স্‌ফোর্ডের ছাত্রদের snob আখ্যায় অভিহিত করে তাদের উদ্দেশে এইরূপ বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করতেন।

পল্লব হেসে উঠ্‌ল; মিসেস টমাসও সে হাসিতে যোগ দিলেন। এ হাসির হাওয়ায় তাঁর খানিক আগের উত্তেজনা যেন স্নিগ্ধ হয়ে গেল। পল্লব এতে ভারি তৃপ্তি বোধ করল। কারণ মিসেস টমাস হঠাৎ আত্মসংবরণ করার দরুণ ঘরের মধ্যে কেমন যেন একটা অস্বস্তির বাষ্প নিবিড় হ'য়ে উঠেছিল। মিষ্টার টমাসের সময়োপযোগী এ পরিহাসে সে বাষ্পটি জল হয়ে নেমে গেল। মিষ্টার টমাস তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রসিকতার শীকরস্পর্শে অনেক সময়েই তর্কাতর্কির উষ্মা এইভাবে স্নিগ্ধ ক'রে নিতেন। একই লোকের মধ্যে গাম্ভীর্য্য ও রসিকতার যোগাযোগ পল্লবের ভারি ভাল লাগ্‌ত। পরে সে দেখেছিল যে এরূপ সমন্বয় সুসভ্য শিক্ষিত ইংরাজজাতির একটা চরিত্রলক্ষণই বলা যেতে পারে। সাধে কি ইংরাজ জাতি রসিকতায় এত বড় বড় সাহিত্যিকের জন্ম দিয়েছে! জাতীয় বৈশিষ্ট্যই জাতির শ্রেষ্ঠ মানুষের মধ্যে নিবিড়ভাবে মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে। সে নিজের সঙ্গীত শেখার ইচ্ছার কথা বল্‌ল ও সব কথাই খুলে বল্‌ল। হয়ত সে কিছু দিন আগে এত খোলাখুলি ভাবে কোনও ইংরাজকে নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বল্‌তে পারত না। কিন্তু আজ সে হঠাৎ মিষ্টার টমাসের সত্যনিষ্ঠা ও উদারতার এমন একটা গভীর পরিচয় পেয়েছিল যার স্পর্শে তার হৃদয়ের দুয়ার যেন তার অজ্ঞাতেই খুলে গেল। দেশে থাক্‌তে সে ভাব্‌ত বুঝি সব ইংরাজই দর্পান্ধ ও সঙ্কীর্ণচিত্ত। কিন্তু এ কয় মাসে মিসেস নর্টন ও মিষ্টার টমাসের সঙ্গে একটু নিকট সংস্পর্শে এসে তার সে ধারণা অনেকটা বদ্‌লে গিয়েছিল। এবং বোধ হয় আজ হঠাৎ সেই ধারণার প্রতিক্রিয়ায়ই সে মিষ্টার টমাসের মতন অল্প দিনের পরিচিত বিদেশীকেও অকপটে নিজের মনের অনেক কামনা বাসনার কথা খুলে বল্‌তে পারল।

মিষ্টার টমাস মন দিয়ে পল্লবের সব কথা শুন্‌লেন। পল্লবের কথা শেষ হ'লে তিনি একটু থেমে বল্‌লেন: "বাক্‌চি, এ কয় দিনেই আমি তোমার অন্তঃকরণটির অনেকটা পরিচয় পেয়েছি জেনো। যদিও তুমি এখনও ছেলে মানুষ আছ—কিন্তু—রাগ কোরো না বাক্‌চি—আমি—"

পল্লব এবার সত্যিই রাগ করেনি। সে ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌ল: "না না সে কি কথা মিষ্টার টমাস! রাগ করব কেন?"

মিষ্টার টমাস অল্প হেসে বল্‌লেন: "এই জন্যে যে ছেলেমানুষকে ছেলেমানুষ বল্‌লে সে যত চটে ন্যুব্জদেহ কুব্জশ্রেষ্ঠকে কার্ত্তিক পুরুষ নয় বল্‌লেও সে তত চটে না। তবে ঠাট্টার কথা যাক্‌। আমি বলছিলাম কি যে তোমার মনটি এখনও গ'ড়ে না উঠ্‌লেও আমার মনে হয় যে সাহিত্য, ললিতকলা প্রভৃতির দিকে তোমার একটা সহজ প্রবণতা আছে।"

মিসেস টমাস এ কথায় ব'লে উঠলেন: "আর্চিবল্‌ড্‌, তুমি মিষ্টার বাক্‌চির পিয়ানো শোন নি? তিনি খুব উৎসাহের সঙ্গে পিয়ানো শিখ্‌ছেন যে!"

মিষ্টার টমাস পল্লবের দিকে একটু উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: "তাই নাকি? এ কথা ত কই তুমি আমায় এত দিন বল নি বাক্‌চি। তা সে যাক্‌। তুমি এটা খুব ভাল কাজই করছ। কারণ আমাদের 'হার্মনি'টা কি বস্তু তা জান্‌তে হ'লে পিয়ানো শেখা ও 'সিম্‌ফনি কন্সার্ট' শোনা বিশেষ দরকার। দেখেছ বাক্‌চি, আমি তোমার পিয়ানো অভ্যাস করার কথা ইতিপূর্ব্বে কখনও না শোনা সত্ত্বেও কেমন ধ'রেছি যে ললিতকলার

প্রতি তোমার একটা স্বাভাবিক অনুরাগ আছে ? তাই আমার মনে হয় তুমি যদি জীবনে একজন খুব বড় দরের এঞ্জিনিয়ারও হও তাহ'লেও তুমি তার মধ্যে কোনও সত্যিকার সার্থকতা পাবে না।"

পল্লব বল্‌ল: "কেন ?"

মিষ্টার টমাস বল্‌লেন: "কারণ বড় এঞ্জিনিয়ার হ'তে হ'লে তোমাকে স্বতঃই হৃদয়ের ললিতকলার প্রতি সহজ অনুরাগকে মোটের ওপর উপবাসীই রাখ্‌তে হবে।"

—"কিন্তু এঞ্জিনিয়ার হ'য়েও ত আমি গানবাজনার চর্চ্চা রাখ্‌তে পারি ?"

—"তা পার বটে—কিন্তু সে সামান্য চর্চ্চা। এবং আমার মনে হয় যে তোমার হৃদয়ের শিল্পের প্রতি অনুরাগ যতখানি প্রবল তাতে তুমি সে সামান্য চর্চ্চায় সুখী হবে না। কারণ আমি নিজের ক্ষেত্রে জানি যে এই মোটা মাইনে পেয়ে ও নিরাপদ্‌ চাক্‌রি ক'রে আমার জীবনের একটা মস্ত অপূর্ণতা থেকে গেছে।"

পল্লব একটু উৎসুক ভাবেই জিজ্ঞাসা কর্‌ল: "কি রকম! আমি ত দেখি আপনি বেশ চমৎকার আছেন!"

মিষ্টার টমাস একটি ছোট্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লেন: "জান ত আমাদের মধ্যে একটা প্রবচন আছে যা চক্‌ চক্‌ করে তাই সোণা নয়।...আমার বাল্যকাল থেকে জাহাজে ক'রে পিয়ের লোতির মতন দেশে দেশে ঘোরা ও adventureএর মধ্যে দিয়ে জীবনকে পুষ্ট করার একটা গভীর আগ্রহ ছিল। তবে যাক্‌ সে কথা।...আমি হঠাৎ নিজের একটা অপূর্ণতার কথার উল্লেখ কর্‌লাম এই জন্যে যে আমার এ অভিজ্ঞতা শুনলে হয়ত তোমার একটু অভিজ্ঞতা বাড়্‌তে পারে। আমি জীবন দিয়ে বুঝেছি যে জীবনের একটা গভীর সার্থকতা কেবল তখনই মিল্‌তে পারে যখন মানুষ নিজের সহজ অনুরাগগুলিকে কম-বেশি সার্থক ক'রে তোলার সুযোগ পায়।"

পল্লবের মনটি এ কথায় সাড়া দিল। তার মনে হ'ল তার পিতার জীবনে চাকরির জন্য গভীর মনস্তাপের কথা। সে বল্‌ল: "কিন্তু আমাদের দেশে যে গান-বাজনায় অর্থাগম নেই মিষ্টার টমাস ? অথচ অর্থাগম না হ'লে শুধু যে জীবনযাত্রায় নানা অসুবিধা ঘটে তাই নয়, দেশের কোনও কাজও যে হয় না। এটা আমার কাছে একটা মস্ত বড় সমস্যা মনে হয়।"...

(ক্রমশঃ)

পথ

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক

এই যে আমার পায়ের তলার পথ
এই যে পথের চরণ-রেখাগুলি,
দিন রজনী এদের মায়া নিয়েই
চলি আমি আকাশ বাতাস ভুলি।

পিছন-চাওয়া বুকের ব্যথা নিয়ে
পান্থ যত গেল এ পথ দিয়ে
তাদের পায়ের রুধির-ধারা পিয়ে
রাঙা বরণ হলো পথের ধূলি!

আবার জানি, গিয়েছিলাম কবে
এই পথেরি দীর্ঘ-রেখা টানে
বহু দূরের সাগর কলরবে
কোন্‌ অচিনের সর্ব্বনাশা-গানে!

গেছে যারা কেউ ফেরেনি আর,
গ্রাস করেছে অতল পারাবার,
এই পথে আজ আমার অভিসার,
মরণ-ছাওয়া গানের ধ্বনি তুলি!

ব্রিটিশ আফ্রিকা

শ্রীনরেন্দ্র দেব

সত্তর বৎসর পূর্ব্বে আফ্রিকা মহাদেশ ইংরাজের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিতই ছিল। সে তখন কেবলমাত্র আফ্রিকার চারিপার্শ্বের উপকূলের পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধান অবগত ছিল বটে, কিন্তু আফ্রিকার অন্তঃপুরে প্রবেশ করবার তখনও পর্য্যন্ত তার সাহসে কুলায়নি।

তারপর লিভিংষ্টোন্, ষ্ট্যান্লী, ক্যামেরণ, স্পেক্, গ্র্যান্ট্, বার্টন, ও টমসন্ প্রভৃতি ইংরাজ ভূ-আবিষ্কারকের দল একে একে আফ্রিকার দুর্ভেদ্য অভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রে তার ভিতরকার রহস্য সাধারণের নিকট উদ্ঘাটিত ক'রে দেখিয়েছেন।

ব্রিটিশ আফ্রিকার অন্তঃপুরে। (সমবেত কাফ্রী প্রজাবৃন্দকে ইংরাজ-রাজ-প্রতিনিধি সম্রাটের ঘোষণাপত্র শোনাচ্ছেন!)

আজ আর আফ্রিকা সম্বন্ধে কারুর কিছু অজানিত নেই। কাফ্রিদের সঙ্গে আমাদের নৃতত্ত্বমূলক সম্বন্ধ কতটা, তাদের রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, তাদের প্রতিদিনের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের নানা বিধি-ব্যবস্থা, তাদের ভাষা ও ধর্ম্ম-পদ্ধতি প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারের এত বেশী পরিচয় পাওয়া গেছে যে, তার সবিস্তার বর্ণনা করতে গেলে ভারতবর্ষের সব-কখানি পৃষ্ঠাতেও শেষ হ'য়ে উঠবে না। অল্প কথায় তাদের সম্বন্ধে সব কিছু গুছিয়ে বলবার চেষ্টা করাও একটা দুরূহ কাজ!

ছেলেবেলা থেকে আমাদের অনেকেরই মনে আফ্রিকা সম্বন্ধে কতকগুলো ভুল ধারণা বদ্ধমূল হ'য়েছিল, যেমন, আমরা জানতুম যে আফ্রিকার লোকেরা সবাই নিগ্রো কাফ্রী! তারা নরমাংসভোজী রাক্ষস। আরব ও তুরস্কে তারা ক্রীতদাস সরবরাহ ক'রে। আফ্রিকা দেশটা বেশীর ভাগই মরুভূমি আর ভীষণ জঙ্গলে পরিপূর্ণ। আফ্রিকায় নিবিড় বনে ব্যাঘ্র, ভল্লুক, সিংহ, হস্তী ও অজগর সর্প প্রভৃতি হিংস্র অতিকায় ও ভয়াবহ জীবজন্তুর বাস।

শৈশবের এই সব ধারণার অনেকগুলি যে সত্য নয়,

সে কথা বলাই বাহুল্য! উত্তর আফ্রিকা প্রদেশে ত' কাফ্রী বা নিগ্রো বলে কোনও জাতই নেই। আফ্রিকা মহাদেশের এই অংশে আরব বর্ব্বর ও হামাইতরা বাস করে। এরা অনেকেই আজ কাল মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকাতেও বিস্তৃত হ'য়ে পড়েছে। আফ্রিকার এই উত্তরাংশের স্যুদান প্রদেশটিই কেবল ইংরাজের অধীন। স্যুদানের কতক অংশ আবার আরবদের অধিকৃত।

মাদুর ও চ্যাটাই বোনা।

(নাইগেরীয়ার মেয়েরা এই কাজে সবিশেষ পটু। এরা কাপড় পরে না বটে, কিন্তু গয়না পরে ওজনে ঢের বেশী।)

আরব-অধিকৃত স্যুদান প্রদেশের লোক-সংখ্যা অত্যন্ত কম। অধিকাংশ ভূভাগ মরুভূমি মাত্র! অধিবাসীরা সকলেই মুসলমান, এরা 'মাহেদী' নামেই বিখ্যাত হ'য়ে পড়েছে। ধর্ম্মান্ধতায় উন্মত্ত হ'য়ে এরা অনেকবার ইংরাজদের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ ক'রেছিল। এই যুদ্ধে তারা যে অদ্ভুত সাহস ও বীরত্ব দেখিয়েছিল, তা জগতের লোকের প্রশংসা অর্জ্জন ক'রছে। বারম্বার এই সংঘর্ষের ফলে তাদের লোক-সংখ্যা নব্বুই লক্ষ থেকে একেবারে বিশ লক্ষেরও নীচেয় নেমে এসেছে!

পশ্চিম স্যুদানের বালুকাময় জলাশয়হীন মরুপ্রদেশের একমাত্র যান-বাহন ছিল উষ্ট্র। ঘোড়ার চেয়েও ক্ষিপ্র-গতিতে এরা মানুষ ও মালের বোঝা পিঠে নিয়ে বহু দূর অতিক্রম করে যেতে পারে। এখানকার যাযাবর সম্প্রদায়

ক'নে। (বিবাহের জন্য সুসজ্জিত নাইগেরীয় তরুণী।)

যে ভাবে বাস করে, সেরূপ কঠোর কষ্টকর জীবন যাপন করা আমাদের কাছে অসম্ভব বলে মনে হবে। তাদের থাকবার চালাগুলোকে কুঁড়ে ঘর বলেও উল্লেখ করা চলে না। মরুভূমির বালুকাময় উত্তপ্ত ঝঞ্ঝাবায়ু চখের ও গলার পক্ষে এতই অনিষ্টকর যে, সে দেশের লোক মুখে একটা কাপড় চাপা দিয়ে চলতে বাধ্য হয়। এইটেই মরুগুণ্ঠন (Desert Veil) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। অতি যৎসামান্য দানাপানি খেয়ে এদের দীর্ঘকাল জীবন

ধারণ করতে হয়। স্নান এরা কদাচ করে। এদের প্রধান উপজীবিকা হচ্ছে পশুপালন।

এই সব আরব ও অন্যান্য এশিয়াবাসী ছাড়া স্যুদানের পশ্চিমে ও কেনীয়া অঞ্চলে একদল আধা-কাফ্রী জাত আছে! এরা নিগ্রো ও এশিয়াবাসীদের সংমিশ্রণে উৎপন্ন

এশা গাঁয়ের গৃহিণী।

(এরা মাথার খোঁপা বছরে একবার বাঁধে, বার মাসের মধ্যে সে খোঁপা আর খোলে না। কিন্তু পরিধেয় বস্ত্র অতি চমৎকার বোনে।)

হ'য়েছে। এরা আচার-ব্যবহারে কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে প্রাচ্য পূর্ব্বপুরুষদেরই অনুসরণ ক'রে চলে। এদের জাতটার নাম হ'চ্ছে 'হামাইত'। কিন্তু এদের মধ্যে সোমালী, গাল্লা, মাশাই, নান্দিয়া প্রভৃতি শক্তিশালী জাতেরও

সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। এদেরও উপজীবিকা পশুপালন এবং এরাও যাযাবর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

এদের মধ্যে পশুপাল নিয়ে প্রায়ই দাঙ্গা হয়, কাজে-কাজেই এরা সর্ব্বদাই মারামারী করবার জন্য প্রস্তুত থাকে। এই "জোর যার মুল্লুক তার" নীতি এখানে প্রচলিত থাকায় যে-দলের বাহুবল বেশী, তারাই এদের মধ্যে প্রধান হ'য়ে ওঠে। অনেক স্থলে দেখতে পাওয়া যায় যে, এরা দেশের আদিম নিগ্রো জাতির সঙ্গে সংঘর্ষে পরাভূত হয়ে তাদের অধীনতা স্বীকার ক'রেছে। কিন্তু তা'বলে তারা নিজেদের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে নিগ্রোদের সঙ্গে মিশে যায়নি। পশ্চিম-

বোণ্ডুর বাদ্যকর। (এরা নহবৎ ও শানাই বাজায়।)

আফ্রিকায় ফুলানীদের মতো, কিম্বা উগাণ্ডার বাহিমাদের মতো তারা নিজেরাই অশেষ দুঃখ-কষ্ট ভোগ ক'রে পশু-পালন করুক বা নিগ্রো সর্দ্দারদের অধীনে রাখালী কাজ করতে বাধ্য হোক্, তবু নিজেদের রীতি প্রকৃতির তারা পরিবর্ত্তন করে না।

এদের একমাত্র ধ্যান, জ্ঞান, জপতপ হচ্ছে নিজেদের

গৃহের চাল নির্ম্মাণ।

হাতে তৈরি বাড়ী। (গৃহ নির্ম্মাণের জন্য এরা কোনও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে না। হাতের সাহায্যেই ভিত্তি থেকে চূড়া পর্য্যন্ত তৈরি করে ফেলে।)

পালিত পশুর দল। এই পশুদের নিয়েই তারা সারা জীবন কাটিয়ে দেয়। পশু-পালের সঙ্গেই দিবারাত্রি অবস্থান করে। এদেরই মধ্যে তাদের শয়ন, ভোজন, বিশ্রাম ও বিলাস। জগতে আর কিছুই তারা এর চেয়ে মূল্যবান বলে মনে করে না। এই পশুপালের রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য পরস্পরের সঙ্গে দাঙ্গা ক'রে তারা অবহেলায় প্রাণ দেয়! তাদের কাছে জমি-জমার কোনও দামই নেই, তাদের পশুপাল চরাবার জন্য ঘাস-জমীর প্রয়োজন ছাড়া, জমীর আর কোনও ব্যবহার তারা জানে না। তাদের প্রধান খাদ্য হচ্ছে, দুগ্ধ ও মাংস!

পূর্ব্ব-আফ্রিকার সর্ব্বত্রই প্রায় মাশায়ী-আধিপত্য দেখতে পাওয়া যায়। এরা ক্রমে জার্ম্মান আফ্রিকার তাঙ্গানীকা পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। মাশায়ীরাই হচ্ছে আফ্রিকার মধ্যে সবচেয়ে ভাল জাত। এদের মধ্যে একটা সামরিক শৃঙ্খলা বিদ্যমান দেখতে পাওয়া যায়। এ জাতটাও লড়া'য়ে জাত। এরা যুদ্ধ করতে খুবই ভালবাসে। "এল্‌মোরান্" বা যুবক যোদ্ধারা অবিবাহিতা বালিকাদের সঙ্গে বিবাহের পূর্ব্বে একত্র এক বাসাতেই বসবাস ক'রে পালিত পশুদের রক্ষণাবেক্ষণ করে। মাঝে-মাঝে এই তরুণ-সঙ্ঘ যুগ্ম-ফলক বিশিষ্ট সুশাণিত বর্শা হাতে নিয়ে

কাফ্রদের নির্ম্মিত সেতু।

মাটীর ঘর। (কাফ্রীরা গৃহ নির্ম্মাণের জন্য মৃত্তিকা সংগ্রহ করছে।)

দলে দলে বেরিয়ে পড়ে, এবং যাদেরই সম্মুখে পায়, তাদেরই আক্রমণ করে। কারণ তাদের মাথায় তখন খুন চেপে যায়! আফ্রিকায় ইংরাজ অধিকার স্থাপিত হবার পূর্ব্বে পশুপাল নিয়ে তাদের মধ্যে এই দাঙ্গা-হাঙ্গামা প্রায় প্রত্যেক দিনই লেগে থাকতো।

পুরুষেরা যখন এই রকম লড়া'য়ে ব্যস্ত থাকতো, মেয়েরা কিন্তু তখন তাদের জন্য রসদ সংগ্রহে ব্যস্ত থাকতো। কীকুয়ু ও ওয়াকাম্বা প্রভৃতি সীমান্তবাসীদের কাছে তারা পশু-চর্ম্ম ও দুগ্ধ প্রভৃতির বিনিময়ে শস্য ও সব্জী সংগ্রহ ক'রে আন্‌তো। যুদ্ধের সময় কোনও পক্ষই হ'য়ে পড়ে। সে সময় শোকে, দুঃখে, অনাহারে ও অভাবে তারা দলে দলে মারা পড়েছিল। মাশায়ীদের সঙ্গে বাহিমারাও এই বিপদে প'ড়ে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং জাতি হিসাবে তাদের উভয়েরই শক্তি নষ্ট হ'য়ে যায়! সে ধ্বংসের মুখ এখনও বন্ধ হয়নি। এই দুর্ঘটনার সুযোগ পাওয়ায় ইংরাজদের আফ্রিকা অধিকার ক'রতে বিশেষ কষ্ট পেতে হয়নি। মাশায়ীরা এভাবে অকস্মাৎ বজ্রাহত নাহ'লে বিনা রক্তপাতে মাশায়ীরা শ্বেতাঙ্গদের এক-সূচ্যগ্র মাত্র ভূমিও অধিকার ক'রতে দিতো না।

বাহিমারা যদিও খুব একটা দুর্দ্ধর্ষ ও লড়াই-প্রিয় জাত

কয়লা মজুরণীর দল। (অধিকাংশই উলঙ্গ। আফ্রিকার টিনের খনিতে কাজ ক'রছে)

স্ত্রীলোকদের উপর অত্যাচার ক'রতো না। এ নিয়ম তাদের মধ্যে সকল দলই মেনে চলে।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তরুণ-সঙ্ঘ ছেড়ে দিয়ে বয়স্কেরা "এলমোর্লো" বা প্রবীণের দলে ঢোকে, কারণ বয়সের অনুপাতেই তাদের ওখানে জাতির শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট হয়। তরুণ-সঙ্ঘ ছাড়বার পর মাশায়ীরা বিবাহ ক'রে সংসারী হয়।

১৮৯০ সালে হঠাৎ মাশায়ীদের পশুপালের মধ্যে গো-বসন্ত প্রভৃতি ভীষণ চর্ম্ম-রোগের মড়ক আবির্ভাব হওয়ায় তাদের সর্ব্বনাশ হ'য়ে যায়। তারা সকলেই প্রায় পশুহীন নয়, তবু তারা উনীয়োরো, উগাণ্ডা ও আঙ্কোলী প্রভৃতি তিনটি প্রদেশে তাদের স্বজাতীয় আধিপত্য স্থাপন ক'রতে পেরেছিল। কিন্তু এখন একমাত্র আঙকোলী ছাড়া আর কোথাও তারা ঠিক শাসক-শক্তিরূপে নেই। বরং উগাণ্ডার সঙ্গে তাদের এখন অনেকটা সামন্ত সম্বন্ধ! নিগ্রোদের অধীনে যদিও এরা রাখাল বা পশু-পালকের কার্য্য ক'রে, কিন্তু তাদের সঙ্গে নিগ্রোরা কোনও দিন ভৃত্য বা ক্রীতদাসের মতো ব্যবহার করতে সাহস করে না; বরং বেশ একটু সসম্মান ব্যবহার করে। এমন কি নিগ্রোরা তাদের এই বেতনভোগী ভৃত্যদের রাজ-বংশীয়দের

ব্যবহার-উপযোগী চিতাবাঘের চামড়ার তৈরি চটীজুতা পায়ে দিয়েই কাজ ক'রতে অনুমতি দেয়।

উগাণ্ডার 'কাবাকা' বা রাজা শ্রীল মোয়াংগা, এবং উনীয়োরোর নৃপতি শ্রীল কাবারেগা, উভয়েই গর্ব্ব করেন যে, তাঁদের ধমনীতে প্রাচীন বাহিমা শোণিত প্রবাহিত হ'চ্ছে। আঙ্কোলীর বাহিমারাজ এন্তালী আফ্রিকার মুসলমান শক্তির নিকট পরাজিত উগাণ্ডার খৃষ্টানদের আশ্রয় দিয়ে ও অতিথির ন্যায় পরিচর্য্যা ক'রে তাদের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার ক'রতে সাহায্য ক'রেছিলেন। শোমালীদের সঙ্গে

হাউশা নারী। (বিদেশী রেশমী পোষাক পরেছে)

বাহিমাদের একটা আকৃতিগত সৌসাদৃশ্য আছে। বাহিমারা শোমালীদের ন্যায়ই শ্যামবর্ণ এবং তাদের নাসিকাও বেশ দীর্ঘ খড়্গাকার।

শোমালীদের কথা আমরা অনেকেই জানি, কারণ এরা অনেকবার ইংরাজদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে তাদের ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেছিল। বিশেষ "ক্ষ্যাপা মোল্লা"র হাতে ইংরাজ বাহিনীর পরাজয়ের কথা এখনও অনেকেরই স্মরণ আছে। গত ১৯২০ সালে এই ইংরাজ বিজয়ী "ক্ষ্যাপামোল্লা" শত্রুর গোলায় নিহত হ'য়েছে। মোল্লার মৃত্যু কাহিনী বড় করুণ। শেষ যুদ্ধে ইংরাজ সৈন্যের আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে ক্ষ্যাপামোল্লা তার নিকট আত্মীয়দের এবং প্রধান অনুচর ও

বর-বধূ। (আফ্রিকার কোনও কোনও শ্রেণীর মধ্যে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত আছে।)

বন্ধুদের সঙ্গে একটা মরুভূমি উত্তীর্ণ হ'য়ে পলায়ন করছিল। অর্দ্ধ পথ অগ্রসর হ'য়ে তারা দেখতে পেলে দূরে আকাশের কোলে এক বৃহৎ বিমানপোত উড়ে আসছে! এই বিমান-

আবকা রমণীদের শির-শোভা।

(এরা দেহ বস্ত্রাবৃত করে না বটে, কিন্তু মাথায় একটি মুকুট পরে। এই মুকুটগুলি সময়ে সময়ে ওদেশের শিল্প কার্য্যের চরম নিদর্শন বলে গণ্য হ'তে পারে।)

দেখবামাত্র মাহদী বা ক্ষ্যাপামোল্লা তার সঙ্গীদের বল্লে "আর ভয় নেই, ওই দেখ আল্লার দূত আমাদের বিজয়-বার্ত্তা বহন করে নিয়ে আসছে!" মোল্লার কথা শুনে

তার সঙ্গীরা আর অগ্রসর না হয়ে সেই খানেই বিস্তীর্ণ মরুভূমির বালুরাশির উপর একখানি শ্বেতাস্তরণ প্রসারিত ক'রে তদুপরি সকলে সমবেত হ'য়ে নতজানু ও কৃতাঞ্জলি-পুটে ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে রইল দেবদূতের নিকট বিজয়বার্ত্তা গ্রহণ করবার জন্য। দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানি ছিল ইংরাজেরই সামরিক বিমান পোত; তারা উপর হ'তে এতগুলি শত্রু-পক্ষীয় লোককে একত্র সমবেত দেখে, অতি যত্নে লক্ষ্য স্থির করে, তাদের মধ্যে একটা ভীষণ বোমা নিক্ষেপ করে দিয়ে

যমজ পুত্রের জননী।

(আফ্রিকার কোনও কোনও অঞ্চলে যমজ পুত্র হওয়াটা অত্যন্ত সৌভাগ্যের লক্ষণ বলে পরিগণিত হয়। কিন্তু নাইগেরীয় প্রভৃতি অঞ্চলে এটাকে এতই অলক্ষণ ব'লে বিবেচনা করা হয়, যে যমজ সন্তান ভূমিষ্ঠ হবামাত্র তাদের মেরে ফেলা হয় এবং যমজ পুত্রের জননীকে নির্ব্বাসিত করা হয়।)

চলে গেল। সেই কালান্তক বিস্ফোটকের আঘাতে ক্ষ্যাপা-মোল্লার শেষ সঙ্গীরা সকলেই তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হ'ল, কেবল মাহ্‌দী একা জীবিত রইল; কিন্তু তারও আঘাত এত গুরুতর হয়েছিল যে শীঘ্রই ক্ষ্যাপামোল্লারও মৃত্যু-সংবাদ জানতে পারা গেল!

শোমালীস্থানের কিয়দংশ ফরাসীর অধিকারে, কিয়দংশ ইটালীর অধীন ও কিয়দংশ ইংরাজের অধিকারভুক্ত। ব্রিটীশ পূর্ব্ব আফ্রিকার জুবা নদের সীমানা পর্য্যন্ত শোমালী-স্থান বিস্তৃত। শোমালীরা কায়িক পরিশ্রমে তেমন পটু নয় বটে, তবু তাদেরই সাহায্যে ফরাসী রেলপথের অধিকাংশ নির্ম্মিত হয়েছে। শোমালীস্থানের জীবুষ্টি থেকে আবিসিনীয়ায় হাব্‌সীদের রাজধানী 'আদ্দিস্ আব্বাব' পর্য্যন্ত ফরাসী রেল-পথ বিস্তৃত হ'য়েছে। শোমালীরা বেশ চতুর ও বুদ্ধিমান জাত, তারা সাহসী, বিশ্বাসী এবং দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন লোক।

শোকোতো অশ্বারোহী।

(এদের মন্ত্রপূত প্রকাণ্ড ঢাল শত্রুর বর্শাকে প্রতিরোধ ক'রতে পারে বলে এদের বিশ্বাস!)

কাফ্রী চিকিৎসা।

(ব্যাধির প্রতিকারার্থ কাফ্রী চিকিৎসকেরা যে সব অমানুষিক নিষ্ঠুরতার অনুষ্ঠান করেন, তা কেবল কাফ্রীরাই সহ্য করতে সমর্থ।)

শোমালীস্থানের সবটাই প্রায় মরু ও পর্ব্বতাকীর্ণ। এখান থেকে য়ুরোপের প্রয়োজনীয় বস্তু খুব অল্পই উৎপন্ন হয়। যা কিছু মাল রপ্তানী হয়, তার মধ্যে প্রধান হ'চ্ছে চামড়া

কোনও অংশেও আজকাল তারা ছড়িয়ে পড়েছে।

ফুলানীদের সম্বন্ধে দু'কথায় কিছু ব'লে শেষ করা চ'লবে না, কারণ আফ্রিকার ইতিহাস ফুলানী-দের অতীত কাহিনীর সঙ্গে এত বেশী জড়িত এবং এই ফুলানীদের প্রভাব আফ্রিকায় এখনও এত বেশী যে, তাদের অগ্রাহ্য ক'রে যাওয়া অসম্ভব। ফুলানী জাতটার উৎপত্তি নিয়ে নানা ঐতিহাসিকের নানা মত আছে; সুতরাং সে গোলযোগের মধ্যে না গিয়ে শুধু এখন এদের অবস্থারই আলোচনা করা যাক্। বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভের দিকে ওশ্‌মান্ দীন ফিদিয়া নামক জনৈক ধর্ম্মসংস্কারক আফ্রিকার ইস্‌লাম ধর্ম্মের গৌরব ও উন্নতি বর্দ্ধন করেন। তিনি উত্তর নাইগেরীয়ার সমস্ত প্রদেশ জয় করেছিলেন। তাঁর সৈন্য বাহিনীর যারা পতাকা-বাহী নায়ক ছিল, তারা সবাই এক একজন স্বাধীন আমীর বলে নিজেদের ঘোষণা করে দিলে, কেবল 'শোকোতো'কে তারা ধর্ম্মগুরু বলে স্বীকার করে নিলে।

তারাই ক্রমে দেশের শাসক সম্প্রদায় হ'য়ে উঠল। যদিও যোগ্যতা ও তীক্ষ্ণ বিষয়বুদ্ধির দিক

কাটশেনার আমীর। (ইনি উত্তর নাইগেরীয়ার অধিপতি। ১৯০১ সালে বিলেত গেছলেন। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ বহুক্ষণ এঁর সঙ্গে আলাপ করেছিলেন। ইনি বেশ শিক্ষিত। এঁর সঙ্গে এঁর বালক পুত্র ও ভ্রাতা রয়েছেন। লিভারপুলের এক হোটেলের সামনে ইনি নগ্নপদে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।)

আর ঘৃত! ইংরাজ অধিকৃত শোমালীস্থানের লোক সংখ্যা তিন লক্ষ মাত্র!

পূর্ব্ব আফ্রিকার নান্দী, তুর্কানা, শুক প্রভৃতি অন্যান্য যাযাবর জাতিদের কথা পরে আলোচনা করা যাবে। পশ্চিম আফ্রিকার নাইগেরীয়া অঞ্চলে ফুলানী আর শুবাদের প্রতিপত্তিই বেশী। শুবারা অসাধারণ মেধাবী ও বুদ্ধিমান জাত, এরা সকলেই চোস্ত আরব ভাষায় কথা কয়। এদের কেবলমাত্র ব্রিটিশ আফ্রিকার বোর্ণু ও চাদ-হ্রদাঞ্চলেই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। ভূতপূর্ব্ব জার্ম্মাণ আফ্রিকার ক্যামারণ ও ফরাসীর অধিকৃত আফ্রিকার কোনও
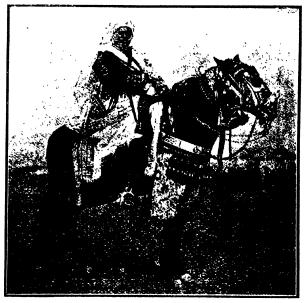
থেকে তাদের খুব বড় জাত বলা যেতে পারে, কিন্তু তাদের শাসনকালের প্রধান কলঙ্ক হচ্ছে যে তারা ক্রীতদাস ব্যবসায়ের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিল। ফলে এক একটা গ্রাম একেবারে জনশূন্য হয়ে পড়তে লাগল; কারণ দাসব্যবসায়ী গভর্মেন্টের লোক এসে জোর করে বাড়ীর জোয়ান ছেলে মেয়েদের সবাইকে ধরে নিয়ে এসে দাসব্যবসায়ের জন্য চালান দিতে সুরু করলে। ক্রমে তারা এমন বিলাসিতার দাস হ'য়ে পড়ল এবং এমনভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করতে আরম্ভ করে দিলে যে, ১৯০৩ সালে ইংরেজরা তাদের

নৌকা নির্ম্মাণ (নাইগেরীয়ার কাফ্রি মেয়েরা অতি সুন্দর নৌকা তৈরী করে।)

তৃণাচ্ছাদন। (নাইগেরিয়ানরা তাদের গৃহের চালের তৃণাচ্ছাদন বুনছে। এই কাজে তারা পৃথিবীর সমস্ত বয়ন-শিল্পীদের পরাস্ত করেছে।)

য়্যাম্ বা কাফ্রি আলু। (হাউশা চাষীরা তাদের ক্ষেতে উৎপন্ন য়্যাম্ সংগ্রহ ক'রছে।)

কাছ থেকে শাসনরশ্মি জোর ক'রে কেড়ে নিতে বাধ্য হ'ল। অবশ্য ফুলানীরাই রাজ্যের কর্ত্তা হ'য়ে রইল; কিন্তু কলকাঠি সমস্তই রইল ইংরেজের হাতে; অর্থাৎ ব্রিটিশদের পরামর্শ ও নির্দ্দেশ ব্যতীত তারা একপা'ও নড়তে পারবে না। তারা ইংরেজের এ বিশ্বাসের সম্পূর্ণ যোগ্য বলে নিজেদের পরিচয় দিয়েছে। তাদের নিজেদের বিচারালয়ে মুসলমান ধর্ম্মানুমোদিত বিধি-বিধানজ্ঞ কাজীরা বেশ নিরপেক্ষ সূক্ষ্ম সুবিচার করে।

জুজু'! (ছেলেরা দেখে ভয় পেলেও 'জুজু' তাদের ভয় দেখাবার ভূত নয়—কাফ্রিদের দেববিগ্রহ।)
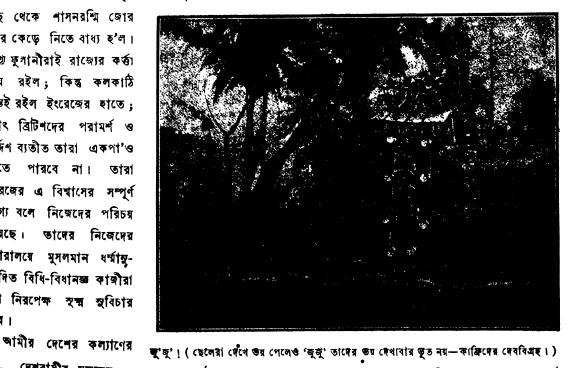
আমীর দেশের কল্যাণের জন্য, দেশবাসীর মঙ্গলের জন্য সতত সচেষ্ট থাকেন। আমীর কাটশেনা সম্প্রতি ইংলণ্ড পরিভ্রমণ করে এসেছেন। তিনি দেশে অনেকগুলি ভাল ভাল রাস্তা নির্ম্মাণ ক'রে দিয়েছেন। এখানে তিনিই প্রথম মোটর-গাড়ীর প্রচলন ক'রেছেন। জলকষ্ট নিবারণের জন্য কূপ খনন ও জাতীয় উন্নতির জন্য শিক্ষা-বিস্তার প্রভৃতিরও ব্যবস্থা হ'য়েছে। তথাপি এখনও ফুলানীদের অধিকাংশ লোকই—পশুপালন ও যাযাবর জীবন

যাপন করাটাই অধিক পছন্দ করে। এরা চাষবাসের ধার ধারে না; অথচ চাষীদের ক্ষেতের উপর দিয়ে অবাধে নিজেদের পশুপাল চরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। চাষের কাজ হাউশারাই করে, কিন্তু তাদের ক্ষেতের উপর ফুলানীদের পশু চরানোতে হাউশারা কোনই আপত্তি করে না। এই পশুপালক ফুলানীরা য়ুরোপীয়দের কোনও সংশ্রবেই আসতে চায় না। বর্ত্তমান সভ্যতারও তারা কোনই তোয়াক্কা রাখে না। পশু চর্ম্মই তাঁদের অঙ্গবাস। তারা অধিক দিন এক স্থানে বাস করে না ব'লে, এপর্য্যন্ত তাদের কোনও গ্রাম বা পল্লী গ'ড়ে ওঠ্‌বার প্রয়োজন হয়নি।

এইত গেল উত্তর আফ্রিকা প্রবাসী এশিয়াবাসীর কথা এবং তাদের সংমিশ্রণে সম্ভূত সঙ্কর জাতিদের বিবরণ। কিন্তু আফ্রিকার আসল অধিবাসী হ'চ্ছে বিশ্বের ঘৃণিত নিগ্রোরা। তারা মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকার অধিকাংশ স্থানই দখল করে আছে। এই নিগ্রোর দলও যে পুরাকালে কোনও সময় অপর কোনও জাতির সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়েছিল, তা বেশ বুঝ্‌তে পারা যায় এদের বহু বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য ক'রে!

যারা খাঁটি নিগ্রো তারা এখনও আফ্রিকার অগম্য প্রদেশে ও দুর্ভেদ্য স্থানে বাস করে। বিশেষতঃ পশ্চিম আফ্রিকার বিষুব-রেখান্তর্গত প্রদেশে, কঙ্গোর নিবিড় অরণ্যে ও দক্ষিণ আফ্রিকার জলশূন্য মরুপ্রদেশে যে সব নিগ্রোদের এখনও দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তারা অতি প্রাচীন ও অভ্রষ্ট কাফ্‌রী। প্রথমোক্ত প্রদেশের আসল কাফ্রিরা সবাই বেঁটে বর্ব্বরের দল; আর শেষোক্ত প্রদেশের কাফ্রিরা একেবারেই জঙ্‌লী!

এই জঙ্‌লী কাফ্রিদের দেখ্‌লে মানুষ বলে মনে হয় না। এদের থাকা খাওয়া, চলা ফেরা, আচার ব্যবহার সমস্তই জানোয়ারদের মতো! এদের ভাষা এমন কতকগুলো বিট্‌কেল আওয়াজের সমষ্টি যে, শুন্‌লে বানরের কচ্‌কচি বলে মনে হবে! এরা বন্য পশুপক্ষী শিকার ক'রে এনে প্রাণরক্ষা করে। এদের দেশে জলাশয় নেই বটে, কিন্তু জলের সন্ধান রাখতে এরা আশ্চর্য্য রকম পটু। 'বাওবাব' বৃক্ষের ফোঁপ্‌রা কাণ্ডের ভিতরে কোথায় কতটুকু জল পাওয়া যেতে পারে, তা একেবারে এদের নখদর্পণে! বালির চরের কোনখানটা খুঁড়লে নিশ্চয় জল পাওয়া যাবার সম্ভাবনা আছে, তা সহজেই তারা বুঝ্‌তে পারে; এবং সামান্য একটা পেঁপের ডালের মতো ফাঁপা নলের সাহায্যে সেখান থেকে চোঁ চোঁ করে জল টেনে নিয়ে পান করে। যখন 'বাওবাব' ভাণ্ডার নিঃশেষিত হ'য়ে আসে, এবং বালুকাবৃত ফল্গুনীরেরও সন্ধান পাওয়া যায় না, তখন তারা

শেহু রাজ-ঐশ্বর্য্য। (চাদ হ্রদ-তীরের বোর্ণু প্রদেশে এই শেহুদের প্রাচীন সাম্রাজ্য ছিল। কথিত আছে যে এক সময়ে এদের ঐশ্বর্য্য-সম্পদ এত বেশী ছিল যে এদের কুকুরের গলায় পর্য্যন্ত সোণার বগলশ পরানো থাকৃতো।)

তরমুজ জাতীয় এক রকম ফল খেয়ে পিপাসা দূর করে। ভগবানের অনুগ্রহে এই জলভরা ফল নির্জ্জলা মরুভূমি অঞ্চলে প্রচুর জন্মায়।

নিগ্রোদের মধ্যে বাণ্ডু বংশীয়েরাই সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত পরিবার। বাণ্ডুরা মধ্য-আফ্রিকার উগাণ্ডাস্থ বাগান্দা অঞ্চলে এবং দক্ষিণে বেচুয়ানা ও জুলু প্রদেশে অধিক সংখ্যায় বাস করে। নিগ্রোরা সুগঠিত ভীমকায় ও বলিষ্ঠ জাতি। এরা বহুকাল থেকে মস্তকে ভার বহন ক'রে চল্‌তে অভ্যস্ত। শারীরিক পরিশ্রম ও কষ্ট সহিষ্ণুতার দিক দিয়ে এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কোনও শ্বেতাঙ্গই পেরে উঠে না। এদের অতিক্রম করতে পারে কেবল হিমালয়ের লেপ্‌চা ও ভুটানী কুলিরা এবং চীনের মজুররা।

কাফ্রিদের বাইরেটা দেখে অনেকেই এদের ঘৃণা করে বটে, কিন্তু তারা জানে না যে ওই বিশ্রী কালো চেহারার ভিতরে কি দুর্লভ সৌন্দর্য্য লুকানো আছে। যারা এদের ভাষা শিক্ষা করেছে এবং এদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে মেশবার সুযোগ পেয়েছে, সেই সব য়ুরোপীয়েরা এদের সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে। এদের প্রবল স্নেহ-প্রবণ হৃদয়, এদের অসীম সাহস, এদের সুগভীর শ্রদ্ধা, ভক্তি ও পরম নিষ্ঠা প্রত্যেক জাতিরই অনুকরণীয়। জীবনকে যদিও এরা নিতান্ত তুচ্ছ জ্ঞান করে তবু এদের প্রকৃতি নিষ্ঠুর নয়। প্রাচীর বহু পাশবিক পাপের পরিচয় তাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না। এদের মধ্যে রসবোধ করবার শক্তি ও হাস্য-পরিহাসের প্রবৃত্তি যথেষ্ট আছে। আমোদ প্রমোদ ও খেলাধূলার এরা খুবই পক্ষপাতী। সঙ্গীতে ও বক্তৃতায় এদের দক্ষতা পৃথিবীর কোনও জাতের চেয়েই কম নয়। এরা স্বভাবতই উদার মহৎ ও দাতা, নীচতা বা সঙ্কীর্ণতা এদের কারুর মধ্যে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। এদের মধ্যে যারা উচ্চশিক্ষা লাভ করেছে, তারা সবাই আফ্রিকার কৃতী সন্তান বলে পরিচিত হ'য়েছে।

ভ্রষ্ট-লগ্ন

শ্রীপ্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়

(এক)

বিয়ে কর্‌বি কি না বল?

না।

কেন?

আমার ইচ্ছে।

পূর্ণিমার চাঁদ পাহাড়ের আড়াল থেকে লাফিয়ে উঠে মহুয়া গাছের ভিতর দিয়ে উঁকি মেরে চারিদিক সভয় দৃষ্টিতে দেখছে। চাঁদ যেন মহুয়া গাছে আটক খেয়ে গলা-সোনার মত চারিদিকে ছড়িয়ে প'ড়েছে। মহুয়া গন্ধে মাতাল বাতাস এলো-মেলো হ'য়ে গাছের পাতা দুলিয়ে দিচ্ছে। পাহাড়তলীর বস্তীতে চাঁদের আলো তখনো সম্পূর্ণ আলো কর্‌তে পারেনি। অন্ধকারের পিছনে আলোর তাড়া করা ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে।

বস্তী থেকে কিছু দূরে এই মহুয়া গাছের চন্দ্রাতপ-তলে যেখানে জমী ঢালু হ'য়ে নেমে গেছে, সেই ঢালু জায়গায় বসে' দুই পাহাড়ী তরুণ তরুণী তাদের জীবনের একটা বড় সমস্যার মীমাংসা করছিল। দু'জনেই কিছু গম্ভীর।

চম্পা এই পাহাড়তলীর বস্তীর সর্দ্দারের মেয়ে, আর ভগ্‌লুও এই বস্তীর অন্য এক পরিবারের ছেলে। ছোট বেলা হতেই তাদের দু'জনের ভারী ভাব। দু'জনে এক-দণ্ডও কেউ কাউকে ছেড়ে থাক্‌তে পারতো না। বেশীর ভাগ সময়ই ভগ্‌লু চম্পাদের বাড়ীতে কাটাতো। চম্পার সকল আদর আব্দার ভগ্‌লুকেই রাখ্‌তে হ'তো। এমনি করেই সারা ছেলে-বেলাটা তা'রা কাটিয়ে দিয়েছে।

তার পর যেদিন যৌবন-বসন্ত তাদের দু'জনের প্রাণের উপরকার সকল পুষ্পগুলিকে ফুটিয়ে তোল্‌বার জন্য আকুল করে' তুল্‌লে, সেদিন থেকে তাদের ভালবাসা আরো গভীর হ'তে চল্‌লো। এমন কি তাদের দুজনের যে বিয়ে

হ'বে, এটাও বস্তীর মধ্যে মৃদু গুঞ্জনে গুঞ্জরিত হ'য়ে উঠলো। তাদের মনও নেচে উঠলো।

চম্পা ও ভগ্‌লু দু'জনেই প্রায় এক সঙ্গে থাক্‌তো। ভগ্‌লু শিকার করতে যেতো, চম্পাও তা'র সাথী হ'তো। বেলা শেষে শিকার-শ্রান্ত ভগ্‌লু পাহাড়ের উপর শ্রম লাঘবের জন্য বস্‌তো, আর চম্পা হয় একটা বড় পাতা নয় তা'র নিজের অঞ্চলের চঞ্চল আন্দোলনে তা'কে বাতাস কর্‌তো। আবার কত বসন্ত সন্ধ্যায়, যখন মহুয়া গাছে মৌমাছির দল মাতাল হ'য়ে উঠ্‌তো, কৃষ্ণচূড়ার গাছে রক্তের আগুন লেগে যেতো, তখন ভগ্‌লু চম্পাকে নিজের মনের মত করে' কৃষ্ণচূড়ার রক্ত-রাঙা ফুল দিয়ে সাজিয়ে দিতো।—চম্পার সৌন্দর্য্য শতগুণে বেড়ে যেতো। তা'র নিটোল কষ্টি-পাথরের খোদা দেহখানির উপর দিয়ে ঘুরিয়ে এঁটে-সেঁটে কাপড়খানি সে পর্‌তো। বসনের শাসন না মেনে যৌবন-পুষ্ট দেহের এখান-সেখান সলাজ দৃষ্টিতে যেন বাইরে উঁকি মার্‌তো। মাথার চুল পেটো পেড়ে কপালের উপর দিয়ে নামিয়ে এঁটে বাধা। চোখে তা'র কাজলের রেখার টান। ভগ্‌লু নিজেকে হারিয়ে বসে' বসে' এই তরুণীর শ্যাম সৌন্দর্য্য আকুল হ'য়ে পান কর্‌তো।

আবার কত বর্ষার বর্ষণরত দিনে তা'রা ময়ূর ময়ূরীর মত চঞ্চল চরণে দ্রুত নৃত্যভঙ্গীতে পাহাড়ের উপর ছুটোছুটি কর্‌তো। কত উৎসব রজনীতে নৃত্যের সময় যখন চম্পার এলায়িত তনুখানি নৃত্যের চঞ্চল আন্দোলনে নেচে নেচে উঠ্‌তো, ভগ্‌লু তখন উৎসব-নৃত্যের তাল কেটে ফেলে মুগ্ধ বিস্ময়ে তা'র নৃত্যভঙ্গিমা দেখ্‌তো।

ঠিক পাহাড়ে নদীটির মতই চম্পার হৃদয় ছিল। এই সে শীর্ণ ক্ষীণকায়া, পরক্ষণেই সে উদ্দাম স্রোতে চঞ্চল নৃত্য করে', দুকূল চঞ্চল চরণের নৃত্যাঘাতে মুখরিত করে' ব'য়ে চলেছে। হয়তো, সেটা—যৌবনের অসতর্ক শুভাগমনের জন্য কস্তুরী মৃগ যেমন নিজের গন্ধে পাগল হ'য়ে ও'ঠে, চম্পাও তেমনি হ'য়ে উঠেছিল। সে ঠিক কর্‌তে পার্‌ছিল না যে, সে কি করবে। অথচ এটা সে ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছিল যে, একটা কিছু তা'কে কর্‌তেই হ'বে। মনে যখন বেশী আনন্দ হয়, তখন ঠিক এই রকমই হয়। কিছুই বোঝা যায় না যে, কি করা উচিত আর কি করা অনুচিত। সেই সময়ই জীবনের ধারা বদল হ'য়ে যায়। ঠিক এমনি সময়ই চম্পা ও ভগ্‌লুর জীবনের গতিও ফিরে দাঁড়ালো ভিন্নমুখী হ'য়ে।

সুখন ভিন্ বস্তী থেকে উৎপীড়িত হ'য়ে বাস উঠিয়ে এই বস্তীতে এসে আশ্রয় পেলে চম্পার বাপের কাছেই। সুখনের সমুন্নত ঋজু দেহ ও মিষ্ট স্বভাবের জন্য সকলেই তা'কে ভালবাস্‌তে লাগ্‌লো। চম্পাও তা'কে প্রথম প্রথম খুব যত্ন কর্‌তে লাগ্‌লো। ভাব্‌তো, আহা, নিঃসহায়, সে না দেখ্‌লে কে দেখ্‌বে। তাদের আশ্রয়েই তো এসে পড়েছে। সে তো 'আহার' পাত্র। কিন্তু একদিন পুষ্পধন্বার মহিমায় এই আহা-টুকু বেশ গাঢ় হ'য়ে দু'জনের জীবনের সঙ্গে এমন জটিল হ'য়ে উঠ্‌লো যে, দু'জনেই আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল; খুসীও যে না হ'লো এমন বলা যায় না।

ভগ্‌লু কিন্তু এ ব্যাপারটা চট্‌ করে ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পার্‌লে না। সে যখনই চম্পার সঙ্গলাভের আশায় তা'র বাড়ীতে যেতো, তখনি সে শুন্‌তে পেতো যে, চম্পা সুখন্‌কে নিয়ে কোথায় বেড়াতে গেছে। ঈর্ষায় তা'র অন্তর জ্বলে উঠ্‌তো। অথচ কোথা দিয়ে কেমন একটা সঙ্কোচ তা'র মনের ভিতর পল্লবিত হ'য়ে উঠ্‌তো, যাতে করে' সে সুখন্‌কে বা চম্পাকে কিছুই বল্‌তে পার্‌তো না। এই জন্যেই আরো তা'র মনের ভিতর অসহ্য যন্ত্রণার প্রদাহ হ'তো। মুখ ফুটে বল্‌লে হয়তো সে অনেক স্বস্তি পেতো। কিন্তু বুকের মধ্যে সকল ব্যথা উদ্গত হ'য়ে উঠ্‌তো, মুখে সেগুলো পুষ্পিত হ'তে পার্‌তো না। পুষ্পিত হবার উপক্রমেই সেগুলি সকলের অলক্ষিতে হৃদয়ের কোন্ গোপন প্রান্তরে ঝরে পড়্‌তো, কেউ তা'র খোঁজ পেতো না।—এই অস্ফুট ও অব্যক্ত বেদনার যাতনা তা'কে আরো বেশী করে' পীড়ন কর্‌তো। এমনি করেই ভগ্‌লু নিজের আগুন বুকে করে' নিজেই নিঃশেষে পুড়ে ছাই হ'য়ে যেতে লাগ্‌লো, ঠিক জ্বলন্ত কাঠের মতই। শেষ পড়্‌তে লাগলো শুধু কতকগুলো ছাই।

(দুই)

সেদিন তাদের কি একটা উৎসব ছিল। তরুণের দল তরুণীদের মনের মত করে' ফুল দিয়ে সাজিয়ে দেবে। তারপর রাত্রে নাচ গান চল্‌বে। ভোর হ'তে না হ'তেই

ভগ্‌লু বেরিয়ে পড়্‌লো ফুল তুলে আন্‌বার জন্যে, ভয় পাছে সুখন্ তা'র আগে ফুল এনে চম্পাকে সাজিয়ে দেয়। সুখনের কথা মনে পড়তেই অন্তর তার রাগে রি রি করে' উঠ্‌লো। কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসে' তা'র হক্কের দাবীকে নাকচ্ করতে বসেছে সে। এক এক বার তা'র পেশী-বহুল সবল শরীর রাগে ফুলে উঠ্‌তো সুখনের গলাটা দু'হাতে টিপি দিয়ে তা'র দাবী দাওয়ার সকল জের মিটিয়ে দেবার জন্য। কত নিশুতি রাতে চোরের মত সে বেরিয়েছে সুখন্‌কে মার্‌বার জন্যে। কত দিন নিজের অজান্‌তে হাতের ধনুকে আপনা হ'তে শর যোজনা হয়েছে। কিন্তু কিছুতেই সুখনের নাগাল ধর্‌তে পারেনি। চম্পা তা'কে আগ্‌লে নিয়ে বেড়াতো, যেমন পক্ষীমাতা তা'র শাবককে আগ্‌লে নিয়ে বেড়ায়। এই জন্যে আরো বেশী করে' ভগ্‌লু রেগে যেতো। কোথাকার কে, তা'কে অত যত্ন কেন রে বাপু?

সেই দিনই হলো তরুণের দলের পত্নী নির্ব্বাচনের একটা দিন। যে যার প্রিয়াদের ফুল দিয়ে সাজিয়ে দেবে। আজকের দিনেই সকলেই বিশেষ করে' জান্‌বে কে কাকে ভালবাসে, কা'র সঙ্গে কা'র বিয়ে হ'বে।

ভগ্‌লু নিজের মনের মত নানা রকম ফুল বন থেকে তুলে বুকে চেপে ধরে' নিয়ে এলো। মনে তা'র বিশ্বাস হ'লো, সুখন্ নিশ্চয়ই তা'র আগে যেতে পারেনি। আজ সেই জয়ী হ'বে। আর চম্পা তো তারই স্বকীয়া, তা'র আশৈশবের দাবী তো তারই উপর।"

ভগ্‌লু ফুল নিয়ে চম্পার দোরে এসে কম্পিত কণ্ঠে ডাক্‌লে—চম্পা! আজ তা'র স্বর কেঁপে উঠলো। সহজ সুরে চম্পাকে ডাক্‌তে পার্‌লে না।

ভগ্‌লুর ডাক শুনে চম্পা ঘর হ'তে বেরিয়ে এলো, ঠিক কোন্ এক বসন্তের ফুলরাণীর মত। ফুলে তা'র সকল অঙ্গ শোভিত। মুখে তার মৃদু হাসির রেখা। চোখে তা'র ভাব-বিভোর ভাব। অঙ্গে তার অপরূপ লীলায়িত ছন্দ। ভগ্‌লু চম্‌কে উঠ্‌লো। সমস্ত শরীর তা'র পাথরের মত অবশ হ'য়ে গেল। তা'র সকল চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়ে গেছে।

চম্পার ঠিক পিছন পিছন সুখন্ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চম্পার পাশে দাঁড়ালো। তা'র মুখে সাফল্যের হাসি। ভগ্‌লুর তা'কে দেখেই রাগে দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি লেগে গেল। ফুল-শুদ্ধ হাত মুষ্টিবদ্ধ হ'য়ে উঠ্‌লো। ফুলগুলো হাতের চাপে চট্‌কে গেল। ঠিক এম্‌নি সময় চম্পা বল্‌লে,—আমায় কেমন মানিয়েছে ভগ্‌লু? চম্পার কথার মোহন স্পর্শে ভগ্‌লুর সমস্ত রাগ চলে গেল। সে চম্পার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, চম্পার মুখের উপর তা'র ব্যথা-ভরা সজল চোখের দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে মাথা নত ক'রে ধীরে ধীরে নিজের কুটীরে ফিরে এলো, ফুলগুলোকে তেমনি ভাবে বুকে জড়িয়ে। যেন চম্পার যে মূর্ত্তি তা'র হৃদয়ে অঙ্কিত হয়েছে তা'র পায়েই সে এই ফুল অঞ্জলি দিয়ে কৃতার্থ ও তৃপ্ত হ'তে চায়। ঘরে এসে ফুলগুলো মাটিতে ফেলে দিলে। নিজেও সেই ফুলের উপর লুটিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌লো। আজ তা'র সকল রকমে পরাজয়।

রাত্রে নাচের সময় সে নিজের অনিচ্ছায় দেহকে টেনে নিয়ে নাচের জায়গায় গেল। না গেলে পাছে তা'র পরাজয়ের বার্ত্তা লোকের মুখে মুখে বেশী করে' ফেনিয়ে ওঠে। সেখানে গিয়েও সে কিন্তু স্বস্তি পেলে না। দলে দলে তরুণ-তরুণী পুষ্প-সজ্জায় সজ্জিত হ'য়ে, যেন বসন্তের রাজ্যে ফুলের মেলা বসিয়ে দিয়েছে। তাদের অন্তরে বাহিরে পুষ্প-পেলব মাধুর্য্য। আর তা'র বুকের ভিতর বজ্রের কঠোরতা, প্রলয়-বিষাণের তীব্র হুঙ্কার। যখনই কোনো তরুণ-তরুণী চুপি-চুপি কথা কইছে, তখনই ভগ্‌লুর মনে হয়েছে যে, হয় তো তা'রা তা'র ব্যর্থতাকেই লক্ষ্য করে' কথা কইছে। সে নিজেকে দূরে দূরে রাখ্‌তে লাগ্‌লো। কোথায় যেন কি একটা বেতালা বেসুরো বাজনা আজ তা'র প্রাণের ভিতর বাজ্‌ছে।

সে নিজেকে একলা রাখ্‌বার জন্যে উৎসব-নৃত্য হ'তে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এলো। পা' দুটো তাদের নিজের ইচ্ছানুযায়ী চল্‌তে চল্‌তে তা'কে এনে ফেল্‌লে একেবারে তা'র চির-প্রিয় মহুয়া-কুঞ্জতলে। সে থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল। এই খানে সে কত দিন এমনি কত আষাঢ়ের মেঘে-ঢাকা ঘোমটা-দেওয়া আবছায়া জ্যোৎস্নায় চম্পার হাত ধরে' বসে আবোল তাবোল গল্পে সময় কাটিয়ে দিয়েছে। আজও সব তেমনি আছে। কেবল তাদের দু'য়ের মাঝেই একটা জমাট কালো মেঘ পর্দ্দা টেনে দিয়েছে।

হঠাৎ সে দেখ্‌লে সেই মহুয়া-কুঞ্জ-তলে আলো-আঁধারের

খেলার মাঝে চম্পা আধ-শোয়া হ'য়ে বসে' আছে। মুখে এসে পড়েছে পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদের ছিন্ন আলো। তা'র পাশে বসে সুখন্ চম্পার হাত নিজের মুঠোর ভিতর নিলে। ভগ্লুর চোখের সাম্‌নে সব ধোঁয়া হ'য়ে মিলিয়ে গেল। সে নিজের উচ্ছ্বসিত অশ্রু ও উদ্গত দীর্ঘনিঃশ্বাস অসীম বলে বুকে চেপে মাতালের মত টল্‌তে টল্‌তে সেখান হ'তে চলে' গেল।

(তিন)

ভগ্লু ক'দিন ধ'রে চম্পাকে একলা পাবার জন্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল; কিন্তু কিছুতেই একলা তা'র নাগাল ধর্‌তে পার্‌ছিল না। চম্পা যেন আরও বেশী করে' দেখিয়ে দেখিয়ে সুখনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াচ্ছিল। ভগ্লু যতই তাদের দেখ্‌ছিল, তার অন্তর ততই রোষে ক্ষোভে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিল। এমন কাল বৈশাখীর আঁধার-করা ঝড়ের ঝাপ্‌টা যে তা'র প্রাণে এসে কোনো দিন লাগ্‌বে, এ কি সে কখন ধারণা কর্‌তেও পেরেছিল। তা'র সরল চিত্ত দু'দিন আগেও জান্‌তো চম্পা তা'র—একেবারে মৌরসী পাট্টার দখলীকার সে। আর কোনো ওয়ারিশান্ যে হঠাৎ এসে মধ্যে থেকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে তা'র মৌরসীর দখল কাঁচিয়ে দেবে এ সে ভুলেও ভাব্‌তে পারে নি। প্রাণের মাঝে বসন্তের ঘুম ভাঙ্‌তে না ভাঙ্‌তে অকাল-গ্রীষ্ম এসে সকল নব-পুষ্পিত নব-মঞ্জরিত গাছগুলিকে রিক্ত নগ্নতায় ডাঁটা-সার করে' দিলে। অসহ্য, অসহ্য এ যন্ত্রণা! হাতের কাছে এর মুক্তির উপায় রয়েছে,—সুখনকে শেষ করে' দিতে পারে,—হত্যা তো তাদের ছেলে-খেলা। কিন্তু কোথা থেকে এতটুকু দুর্ব্বলতা উঁকি মেরে সমস্ত পণ্ড করে দিচ্ছিল। চম্পাকেও তো শেষ করে' দিয়ে সব গোল চুকিয়ে দিতে পারে। তা'তে বরং সে বেশী খুশী হ'বে। কিন্তু—এই কিন্তুই হলো তা'র কাল।

মন তা'র বড় খারাপ হ'য়ে গেল। মনকে শান্ত কর্‌বার জন্যে সে সন্ধ্যাবেলা একলা তা'র সেই প্রিয় মহুয়া-কুঞ্জের তলে এলো। দেখ্‌লে কেউ নেই সেখানে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে একটা গাছের গোড়ায় হেলান দিয়ে বস্‌লো। ঝিঁঝিঁ-পোকা তখন সন্ধ্যা-বন্দনার তান ধরেছে। বড় বড় মহুয়া গাছগুলো বাতাসের ঘা খেয়ে যেন শ্বস্‌তে লেগেছে। সে চুপ করে' বসে' রইলো।

কিছুক্ষণ এমনি অবস্থায় কাট্‌বার পর হঠাৎ সে কার পায়ের সাড়া পেলে শুক্‌নো পাতার উপর। মুখ তুলে চাইতেই দেখ্‌তে পেলে সাম্‌নে দাঁড়িয়ে চম্পা, অপ্রতিভ হয়ে ও থতমত খেয়ে। ভগ্লুও আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল।

চম্পা নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে একটু হেসে বল্‌লে—কিরে ভগ্লু, এখানে একলা বসে? তোর চেহারা বড় শুকিয়ে গেছে। অসুখ করেছে? বলে' তা'র পাশে বস্‌লো।

ভগ্লু তা'র সে কথার জবাব না দিয়ে মাথা ঝেড়ে লম্বা চুলগুলো মুখের উপর থেকে সরিয়ে দিয়ে, চম্পার হাতটা জোরে চেপে ধরে' উদ্ধত স্বরে বল্‌লে—তুই আমায় বিয়ে কর্‌বি কি না বল? নিঃশ্বাস তা'র গর্জ্জে উঠ্‌লো। চোখ তার' হিংস্র পশুর লালসার দীপ্তিতে জ্বলে উঠ্‌লো।

চম্পা চম্‌কে উঠ্‌লো তা'র এই মূর্ত্তি দেখে। একটু পরে সেও জোর দিয়ে বল্‌লে—না।

ভগ্লু তেমনি ভাবে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, কেন?

চম্পা জোরে তা'র হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঘাড় অন্য দিকে ফিরিয়ে বল্‌লে—আমার ইচ্ছে।

ভগ্লু দাঁতে দাঁত চেপে পায়ের নীচের দিকে চাইলে। পায়ের নীচে যেখানে ঢালু শেষ হয়েছে, সেখান দিয়ে বয়ে চলেছে ধরিত্রীর শাড়ীর গেরুয়া পাড়ের মত পাহাড়ে খরস্রোতা নদীটি।

ভগ্লু ভাব্‌লে এক ঠেলায় তো চম্পার সকল জবাবের সমাধান হ'য়ে যায়, তা'র চিহ্নও থাকে না। সে লাফিয়ে উঠে ধনুকে তীর জুড়ে চম্পার দিকে লক্ষ্য করে' চেঁচিয়ে বলে' উঠ্‌লো,—এই কাঁড়ে বিঁধে তোর বিয়ে করার সাধ মিটিয়ে দেবো আজ।

চম্পা ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই মুখের উপর ঠোঁটের কোণে মোহন হাসি ফুটিয়ে চপল চোখে তা'র দিকে চেয়ে বল্‌লে—বেশ তো, মার্ না। পার্‌লেই ভাল। বলে ঘাড় বেঁকিয়ে আঁচলটা একটু দুলিয়ে তেমনি হাসি মুখে হেল্‌তে দুল্‌তে সেখান হ'তে চলে' গেল, যেন কিছুই হয়নি। আর ভগ্লু স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইলো।

আজ চম্পা ও সুখনের বিয়ে। ভগ্লু সমস্ত দিন ঘরে শুয়ে শুয়ে কেঁদেছে। কি দোষ সে করেছে যে, চম্পা তা'কে এমন শাস্তি দিলে। যত দেব দৈত্যের নাম তা'র জানা ছিল, সে সকলের কাছেই মানত কর্‌লে, প্রার্থনা কর্‌লে, ওগো, তোমরা সবাই মিলে এই বিয়েতে বিঘ্ন ঘটিয়ে দাও। সেও যেমন জ্বল্‌ছে, চম্পাকেও তেমনি জ্বলিয়ে পুড়িয়ে দাও। না, না, সে তা চায় না। চম্পা সুখী হোক, সুখে থাক। তোমরা সবাই তা'কে আজ আশীর্ব্বাদ করো।

যতই সন্ধ্যা ঘনিয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো, ততই যেন তা'র বক্ষের স্পন্দন থেমে আস্‌তে লাগ্‌লো। যে ক্ষীণ আশা সে এতক্ষণ জোর করে' প্রাণের ভিতর ধরে' রেখে-ছিল, তা আর কয়েক মুহূর্ত্তেই লোপ পেয়ে যাবে।

উৎসবের মাদল বেজে উঠলো। তরুণীদের মিলিত কণ্ঠে মঙ্গল-গীতের সুর বাতাসের সঙ্গে সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়্‌লো।

ভগ্লুর অন্তর নিদারুণ হাহাকারে আর্ত্তনাদ করে' উঠ্‌লো। সে আর নিজেকে সাম্‌লে রাখতে পার্‌লে না। বুকের ভিতর অসহ্য যন্ত্রণা হ'তে লাগ্‌লে। খানিক পরে দু'হাতে বুক চেপে মাটীতে লুটিয়ে পড়্‌লো। মুখ মাটীতে থুব্‌ড়ে গেল। দেহ অসাড় নিস্পন্দ।
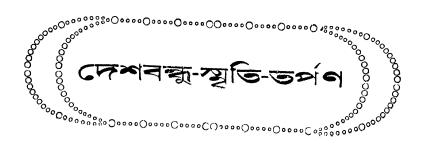
এসেছিলে সাথে লয়ে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।

—রবীন্দ্রনাথ

—'মহাপ্রস্থান'—

[মৃত্যুর পাঁচ ঘণ্টা পরে গৃহীত ফটোগ্রাফ]

[ফটোগ্রাফার মিঃ এম, সেনের অনুগ্রহে

দেশবন্ধু—চিত্তরঞ্জন

[আলোক-চিত্র—মিউনিসিপাল গেজেটের অনুগ্রহে ।

এস আমার মৃত্যুঞ্জয়! এস অবিনাশি!
বুকের মাঝে বাজিয়ে দাও অভয় তোমার বাঁশী!
ভয় ত্রাস ঘুচে গেছে চিরদিনের তরে!
নাইক আর আঁধার কোন আমার আঁখির পরে। —(অন্তর্যামী)

আসন্ন আষাঢ়ের ঘনায়িত মেঘের মায়ায় দিনের দীপ্ত সূর্য্য ঢাকিয়া গিয়াছে। ঝঞ্ঝার দোলায় হাহাকারের মন্দ্র-মন্দ্র স্তনিত হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালার বুকের দুলাল,—অনাথের আশ্রয়,—দীনের সম্বল—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন অসীমের পথে মহাযাত্রা করিয়াছেন।

আষাঢ়ের মেঘ গগন-পবন প্রতিধ্বনিত করিয়া, হিমালয়ের অভ্রভেদী শৃঙ্গ নিনাদিত করিয়া আর্ত্ত-নাদ করিতেছে—চিত্ত-রঞ্জন নাই—দেশবন্ধু নাই—অনাথবন্ধু নাই। ভারতের প্রতি গ্রাম, নগর, পল্লী কাতর কণ্ঠে বলিতেছে—বাঙ্গালার চিত্তরঞ্জন—যুগপ্রবর্ত্তক দেশবন্ধু নাই! কিন্তু হৃদয় তাহাতে সায় দিতেছে না। সংবাদপত্র অশ্রু-সজল ভাষায় প্রচার করিতেছে—চিত্ত নাই; কিন্তু, সে মর্ম্মভেদী বার্ত্তা বিশ্বাস করিতে প্রাণ যে চায় না। স্বচক্ষে সেই মহামানবের দেহ চিতায় ভস্মশেষ হইতে দেখিয়াছি, জাহ্নবীতীরে মহাশ্মশানের সে অগ্নি এখনও হৃদয়ের পরতে-পরতে দাবদাহের সৃষ্টি করিতেছে; শ্মশান-যাত্রায় লক্ষ লক্ষ নরনারীর অশ্রু-বন্যার বিরাট প্লাবন দেখিয়াছি;

ভবিষ্যৎ দেশবন্ধু (বয়স—৮ বৎসর)
[প্রফেসর এস, সি, মহালানবিশের অনুগ্রহে প্রাপ্ত]

তবুও—তবুও হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে আশার বাণী আসিতেছে—না, না, চিত্তরঞ্জন আছে —চিত্তরঞ্জন আছে!

দুই দিন আগেও যে ছিল—এমন ভাবে ছিল যে, সারা দেশ সমস্ত প্রাণ দিয়া তাহার সত্ত্বা অনুভব করিয়াছে—তাহার বাণীর স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে নিজের নাড়ীর স্পন্দন—তাহার কাজের ভিতরে নিজের গতি-বেগের সাড়া অনুভব করিয়াছে; দেশের—দশের—স্বরাজ-রথের সেই মহা সারথি চিত্তরঞ্জন নাই। চোখে দেখিয়াও মোহ টুটিতেছে না—অবিশ্বাসের ক্ষেত্রে আসিয়া বিশ্বাস অভিভূত হইয়া পড়িতেছে।

বৈশাখের ঝড় যেমন এক মুহূর্ত্তে ধূলি উড়াইয়া, ঘূর্ণী জাগাইয়া, গাছ-পালার মাথা ভাঙ্গিয়া, বিশ্বের বুকের উপর দিয়া, দেখিতে না দেখিতে ধ্বংসের বান ডাকাইয়া চলিয়া যায়, বাঙ্গালার বুকের উপর দিয়াও প্রলয়ের ঝঞ্ঝা এক মুহূর্ত্তে কেমন করিয়া যে তাহার উদ্দাম নৃত্য নাচিয়া চলিয়া গেল, কেহ তাহার ধারণাও করিতে পারিল না। ঝড় যখন শেষ হইল, তখন দেখা গেল, প্রাণের প্রাচুর্য্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার

নিঃশেষ হইয়াছে ;—উল্কা নহে—তারা নহে—বাঙ্গালার দীপ্ত সূর্য্য খসিয়া পড়িয়াছে—সমস্ত দেশের উপর এক অন্ধকার যবনিকা বিস্তৃত হইয়াছে—একটা আর্ত্তনাদ হা-হা করিয়া ফিরিতেছে!

চিত্তরঞ্জন বাঙ্গালার যে কি ছিল, তাহার পরিচয় দেওয়া সহজ নয়। প্রাণের পরিপূর্ণ পরিচয় কে কবে দিতে পারিয়াছে? চিত্তরঞ্জন ছিল বাঙ্গালার চিত্তের আনন্দ—অন্তরের অন্তর্গূঢ় বেদনা; সে ছিল তাহার অতীতের আদর্শের মূর্ত্ত বিগ্রহ এবং ভবিষ্যতের আশার অপর্য্যাপ্ত

দেশবন্ধুর পিতা-মাতা

উচ্ছ্বসিত অভিব্যক্তি। সে যে কি ছিল, আর কি ছিল না, তাহার ছবি আঁকিতে বসিয়া শিল্পীর তুলিকা থামিয়া যায়, কবির লেখনী স্তম্ভিত হয়, বাগ্মীর রসনা বিহ্বল হয়। তখন বলিতে হয় চিত্তরঞ্জন—চিত্তরঞ্জন! ইহাই তাহার বিরাট মনুষ্যত্বের ছবি!

দরিদ্রের হাহাকার যেখানে ক্ষুধার তাড়নায় ধন-সমুদ্রের পাষাণ-বেলায় আঘাত করিয়া প্রহত হইয়াছে, সেখানে আমরা দেশবন্ধুকে দীনবন্ধুর মূর্ত্তিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। প্রথম জীবনে দুঃখের সহিত অক্লান্ত ভাবে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে জয়লাভ করিতে হইয়াছিল। পরিণত জীবনের প্রাচুর্য্যের ভিতর তাই তাঁহার দ্বার হইতে প্রার্থী কখনও রিক্ত-হস্তে প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই; তাঁহার দ্বার দীন দরিদ্রের জন্য অহর্নিশি মুক্ত ছিল। দরিদ্রের বন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেশসেবা ও দরিদ্র-নারায়ণের সেবাই একমাত্র কার্য্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন!

ভারতবর্ষের দীর্ঘ পরাধীনতা-পুষ্ট নির্জ্জীব ক্লীবত্বের ভিতর দেশবন্ধুর দীপ্তি ছিল 'জ্বলদর্চ্চি রেখা'র ন্যায় জ্বালাময়। অত্যাচারীর অন্যায় যেখানে অনাথের উপর নির্ম্মম হইয়া উঠিয়াছে, সেখানে তাঁহার নিঃশঙ্ক নির্ভীক বাহু বিপন্নের প্রতি আশ্রয়ের ছায়া বিস্তার করিতে কখনও কুণ্ঠা বোধ করে নাই;—সেখানে তিনি নীলকণ্ঠের ন্যায় বিপদের বিষ আকণ্ঠপূর্ণ করিয়া পান করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের মুক্তির যুদ্ধে তাঁহার পাঞ্চজন্য দেশবাসীকে কেবলমাত্র আহ্বানই করে নাই, জাগরণের অপূর্ব্ব উন্মাদনায় তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। দেশাত্মবোধ ছিল চিত্তরঞ্জনের চিত্তের সহজ স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তাই, দেশের আহ্বান কাণে আসিয়া পৌঁছিতেই ঘর ছাড়িয়া তিনি পথের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইতে দ্বিধা করেন নাই। নিষ্ঠার দ্বারা বাধাকে—ত্যাগের দ্বারা ভোগকে তিনি জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বস্ব-ত্যাগের গৌরব পৃথিবীর ইতিহাসে নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছে। সেই কত কাল পূর্ব্বে এক দিন নরনারীর মুক্তির পথ খুঁজিবার জন্য এক রাজপুত্র সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া পথে দাঁড়াইয়াছিলেন; আজও সেই মহাপুরুষ সিদ্ধার্থের অবদান সমগ্র বিশ্বের সসম্ভ্রম প্রণতি লাভ করিতেছে!—আর এত কাল পরে মহাবিত্তশালী চিত্তরঞ্জনের দেশের নরনারীর কল্যাণের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ সেই অতীতের পবিত্র স্মৃতিই পুনরাবৃত্ত করিতেছে—বিশ্ববাসী তাঁহাদের এই সর্ব্বস্বত্যাগী, বিজয়ী বীরকে সসম্ভ্রমে, ভক্তিনম্র-শিরে অভিবাদন করিতেছে।

ভগীরথের সাধনা ভস্মস্তূপের ভিতর হইতে সগর-বংশের উদ্ধারের পথ আবিষ্কার করিয়াছিল,—দেশবন্ধুর সাধনা জড়, নিস্পন্দ জাতির ভিতর হইতে মাতৃপূজার সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান ঋত্বিক দলের সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহার প্রতিভায়—তাঁহার চেষ্টায়—তাঁহার কর্ম্মশক্তিতে স্বরাজ্য-

দলের সেবকসঙ্ঘ গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষের রাজনীতি-ক্ষেত্রে তাঁহার প্রভাব আজ তড়িৎ-চমকের মতই দীপ্তি বিস্তার করিতেছে।

বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য বিদেশী শিক্ষার মোহ ভেদ করিয়া পুরাতনের সহিত চিত্তরঞ্জনের চিত্তের নিবিড় সংযোগ-সাধন করিয়াছিল। তাই, ঐশ্বর্য্যের মোহ এই ত্যাগের অবতারকে একটু মাত্রও বিচলিত করিতে পারে নাই;—তাই, ত্যাগের প্রয়োজনের সময় ঐশ্বর্য্যের নাগপাশ জীর্ণ বস্ত্র-খণ্ডের মতই তাঁহার মনের চারিপাশ হইতে খসিয়া পড়িয়াছিল। বৎসরে যিনি দুই লক্ষেরও অধিক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, সে সমস্ত ত্যাগ করিয়া কপর্দ্দকহীন অবস্থায় পথের প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইতে তিনি একটুও ইতস্ততঃ করেন নাই। তাঁহার যাহা কিছু ছিল, সমস্ত দান করিয়া ভোলানাথের মত তিনি ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিলেন—সে ভিক্ষাও নিজের উদরান্নের জন্য নহে—দেশের দীনদরিদ্র অনাথ-আতুর ক্ষুধার্ত্ত নরনারীর জন্য—পরপদপিষ্ট, লাঞ্ছিত, অবজ্ঞাত, ঘৃণিত, বিড়ম্বিত অসংখ্য নরনারীর জন্য!

জীবনের সাগর-বেলায় সায়াহ্নের অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। এই দীর্ঘকাল ধরিয়া কত মানুষের সহিত মিশিয়াছি, ছোট বড় ধনী নির্ধন ক্ষুদ্র মহৎ কত লোককে দেখিয়াছি; কিন্তু এমন অপূর্ব্ব—এমন কুসুমের মত কোমল অথচ বজ্রের মত কঠোর আর কাহাকেও দেখি নাই;—প্রাণের প্রাচুর্য্যের এমন অদ্ভুত লীলা আর কখনও চক্ষে পড়ে নাই। স্বর্গে নহে—মানুষের মনের ভিতরেই যে দেবতার আসন পাতা থাকে, চিত্তরঞ্জনকে দেখিয়াই তাহা বুঝিয়াছি।

বাঙ্গালার মাথার উপর দুর্য্যোগের মেঘ দিনের পর দিন ঘনাইয়া আসিতেছে;—ঝঞ্ঝা হাঁকিতেছে—বজ্র গর্জ্জিতেছে। এই দুর্য্যোগে আলোক-বর্ত্তিকা হাতে পথের সন্ধান যে দিতে পারিত, বীরের মত—হিমালয়ের মত অটলভাবে যে বুক পাতিয়া দিতে পারিত, বাঙ্গালা আজ তাহাকেই হারাইয়া বসিয়াছে। তাই বাঙ্গালার নয়ন আজ অশ্রু-সিক্ত;—তাহার রাষ্ট্র-তরণী স্বাধীনতা-সংগ্রামের সমুদ্রের মাঝখানে আজ কর্ণধারহীন—তরঙ্গাভিঘাত-বিপন্ন। তাই হাহাকারে তাহার দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে—তাই বাঙ্গালার শোক আজ কোথাও কূল কিনারা খুঁজিয়া পাইতেছে না। দেশবন্ধু, তুমি যেখানেই থাক, আজ তোমার বাঙ্গালা দেশকে মঙ্গলের পথে, কল্যাণের পথে নিয়ন্ত্রিত কর।

অক্সফোর্ডে—ছাত্র জীবন

মহাপ্রস্থান

এইবার সেই নিদারুণ মর্ম্মভেদী কথা বলিতে হইবে। প্রায় বৎসরাধিক কাল হইতে চিত্তরঞ্জনের শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল; অতিরিক্ত পরিশ্রম, অবিরত চিন্তা তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু, তাহাতেও কার্য্যে বিরতি ছিল না;—কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, অক্লান্তকর্ম্মী চিত্তরঞ্জন যতক্ষণ পারিতেন, শারীরিক দৌর্ব্বল্য উপেক্ষা করিয়া অবহিত চিত্তে কার্য্য করিতেন। শেষে সকলের পরামর্শে

তিনি কিছু দিনের জন্য পাটনায় তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রবাস-গৃহে বিশ্রাম লাভের জন্য গিয়াছিলেন। কিন্তু, সেখানেও বিশ্রাম ছিল না—সেখানেও দিনরাত তাঁহাকে কাজ করিতে হইত। শরীর অসুস্থ ছিল বলিয়া তিনি মুন্সীগঞ্জের সাহিত্য-সম্মেলনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিত্ব করিতে পারিলেন না; কিন্তু তাহার পর ফরিদপুর রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে তাঁহাকে যাইতেই হইল—এ কর্ত্তব্য তিনি উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। ফরিদপুর হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া চারি দিন পরেই তিনি দার্জ্জিলিং চলিয়া গেলেন। সেখানে তাঁহার শরীর ক্রমেই সুস্থ হইতেছে সংবাদ পাইয়া সকলেই আশ্বস্ত হইতে লাগিলেন। কিন্তু ঐ যে একটু জ্বর, তাহা আর কিছুতেই ছাড়ে না; প্রতি রবিবার সন্ধ্যার সময় জ্বর আসে, আবার সোমবারে ছাড়িয়া যায়। এই ভাবেই কয়েক দিন গেল।

তাহার পরই সর্ব্বনাশের সূচনা হইল। ৩১শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার তিনি সারা দিন বেশ থাকিলেন, প্রায় দুই মাইলের উপর বেড়াইয়া আসিলেন। সন্ধ্যার পর জ্বর আসিবার সময়,—জ্বর আসিল না; সকলেই মনে করিলেন, এইবার জ্বর ছাড়িয়া গেল—আর জ্বর আসিবে না। কাহারও মনে তখন এ কথা আসিল না,—এ চির-নির্ব্বাণের পূর্ব্বে দীপশিখার অত্যধিক প্রজ্বলন—কেহ ভাবিতে পারিলেন না, এ সব শেষ হইবার ইঙ্গিত।

রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত চিত্তরঞ্জন সকলের সঙ্গে কথায়-বার্ত্তায় ও বাঙ্গালা পুস্তক পাঠে কাটাইলেন। তাহার পর শয়ন করিলেন। কিছুক্ষণ পরেই কম্প দিয়া জ্বর আসিল। পূর্ব্বের অপেক্ষা অধিকতর বেগে জ্বর আসিল, সঙ্গে সঙ্গে গাত্রজ্বালা।

পর দিন সোমবার ডাক্তার শ্রীযুক্ত ডি, এন, রায় আসিলেন। চিত্তরঞ্জন কলিকাতাতেও রায় মহাশয়েরই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাধীন ছিলেন। ডাক্তার ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। জ্বর একটু কমিল, কিন্তু গাত্রদাহ সমভাবেই থাকিল, অস্থিরতা গেল না। এই ভাবে ১লা

সাগর-সঙ্গীতের কবি

আষাঢ় সোমবার সারাদিন গেল। তখনও কেহ মনে করেন নাই—এই শেষ। সোমবার রাত্রিতে যন্ত্রণা আরও বাড়িল; সকলে সভয়ে দেখিলেন যে, চিত্তরঞ্জনের পদদ্বয় একটু স্ফীত হইয়াছে।

কারামুক্তির পর

কোন রকমে রাত্রি কাটিয়া গেল—কাল ২রা আষাঢ় আসিল। প্রাতঃকালেই ডাক্তার আসিলেন; দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত রোগ-শান্তির চেষ্টা হইল; চিকিৎসক চিন্তিত হইলেন। তিনি আবার তিনটার সময় আসিলেন; রোগী দেখিয়া বলিলেন, আর আশা নাই।

কলিকাতার প্রথম মেয়র

[Photo by—Mr. T. P. Sen.

তখনই—সেই তিনটার সময়ই কলিকাতায় তার আসিল, দেশবন্ধুর অবস্থা অতীব সঙ্কটজনক, শীঘ্র ডাক্তার পাঠাও। তখনও কিন্তু এ সংবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র হয় নাই। সেই রাত্রির মেলেই ডাক্তার পাঠাইবার ব্যবস্থা হইতে লাগিল।

আর কিছুই করিতে হইল না—পাঁচটার সময় তাড়িৎ-বার্ত্তা আসিল—দেশবন্ধু নাই! দেখিতে দেখিতে এই নিদারুণ সংবাদ সহরময় প্রচারিত হইল। প্রথমে অনেকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না;—চারি দিকে ছুটাছুটি লাগিয়া গেল। শেষে সকলেই নিশ্চিত জানিতে পারিলেন—দেশবন্ধু অনন্ত-ধামে চলিয়া গিয়াছেন।

দারজিলিংয়ে

দারজিলিংয়ে যাঁহারা ছিলেন—ইংরাজ, বাঙ্গালী, উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারীগণ, প্রবাসী ভদ্রাভদ্র সকলেই এই সংবাদ পাইয়া দলে দলে দেশবন্ধুর প্রবাস-ভবনে ষ্টেপ এসাইডে (Step Aside) সমবেত হইতে লাগিলেন। আমাদের বন্ধু শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় দারজিলিংয়ে ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"কলিকাতার বিপুল জনতার সঙ্গে তুলনা না হইলেও এই পাহাড়ে যাহা দেখিয়াছি, তাহাও অতুলনীয় মনে হয়। মৃত্যুর দিন রাত প্রায় দশটা পর্য্যন্ত আমি Step Asideএ উপস্থিত ছিলাম। দেশবন্ধুর দেহকে শেষ দর্শনের জন্য অবিরত জনস্রোত বহিতেছিল, সে স্রোতের আর বিরাম ছিল না। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান—পাহাড়ী, নেপালী, ভুটিয়া, বাঙ্গালী, মাড়োয়ারী কোন জাতির লোক বাদ যায় নাই। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, নির্ধন সকলকেই দেখিয়াছি—যেন দেবদর্শনে আসিতেছে!

সকলেরই কি শোকাকুল ভাব! দেশবন্ধুর মৃতদেহ পালঙ্কের উপর শায়িত, পার্শ্বের জানালা খোলা রহিয়াছে। পদতলে বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি আলুলায়িত-কুন্তলা বাসন্তীদেবী কোন-রূপে বসিয়া রহিয়াছেন। দেশবন্ধুর মুখে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ, মুখের ভাব দৃঢ়তাব্যঞ্জক, চক্ষু তখনও সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয় নাই, মনে হইতেছে যেন তিনি তন্দ্রামগ্ন। কে বলিবে তাঁহার দেহ প্রাণহীন! এ দৃশ্য দেখিয়া কে চোখের জল নিবারণ করিতে পারে? দলে দলে লোক এক দিক দিয়া জানালার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেছে, দেশবন্ধুর শেষ দর্শন লাভ করিতেছে, তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিতেছে, চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া অপর দিক দিয়া নীরবে বাহির হইয়া যাইতেছে। কি অদ্ভুত নীরবতা! এত জনসমাগম, তথাপি মনে হইতেছে যেন বাড়ীতে জনপ্রাণীও নাই। সে দৃশ্যের সম্পূর্ণ বর্ণনা করা লেখকের সাধ্যাতীত।

প্রথমে বাসন্তী দেবী ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, দার্জ্জিলিংয়েই তাঁহার স্বামীর মৃতদেহের সৎকার করা হোক। পরে সকলের পরামর্শে স্থির হয় যে, পরদিন মেলে দেহ কলিকাতায় লইয়া গিয়া সেইখানেই সৎকার করা হইবে। বাঙ্গলার শাসন-পরিষদের সদস্য মাননীয় মহারাজা ক্ষৌণীশ-চন্দ্র রায় বাহাদুর গভর্ণর বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দেশবন্ধুর অকস্মাৎ দেহত্যাগের বিষয় জ্ঞাপন করেন। গভর্ণর বাহাদুর বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়া এ সময়ে তাঁহার দ্বারা

মিস্ত্রী লাগাইয়া দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে একটী শবাধার প্রস্তুত করিয়া দেন। দেহ বহন করিয়া লইয়া যাইবার সুবিধার জন্য শবাধারের চারি কোণে চারিটি হাতলের ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল।

দেহ কলিকাতায় বৃহস্পতিবার (১৮ই জুন) সকালে পৌছিবে, সেজন্য যাহাতে খারাপ হইয়া না যায় তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। রাত দশটার পর স্থানীয় কয়েকজন চিকিৎসক মিলিয়া রাসায়নিক দ্রব্যাদি দিয়া শবদেহের

মেয়রের বসিবার ঘর

[Photo by—Mr. T. P. Sen.

কি সাহায্য হইতে পারে জিজ্ঞাসা করেন। মহারাজা দেশবন্ধুর দেহ কলিকাতায় পাঠাইবার সুবন্দোবস্তের জন্য বলেন। গভর্ণর বাহাদুর তৎক্ষণাৎ রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এ বিষয়ে তার করিয়া দেন।

দেহ কলিকাতায় পাঠান স্থির হইলে, সে সম্বন্ধে উদ্যোগ আরম্ভ হয়। রেলওয়ে আইন অনুসারে মৃতদেহ "কফিনে" করিয়া লইয়া যাইবার নিয়ম। দার্জ্জিলিংয়ের জেনারল এঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী স্বেচ্ছায় ভার লইয়া, রাত্রেই বহু

সংস্কার করেন। সে সময় ঘণ্টাখানেকের জন্য সাধারণে দর্শন হইতে বঞ্চিত ছিল। পাহাড়ে শীতের দেশে রাত ১টা পর্য্যন্ত সমভাবে লোকের সমাগম হইয়াছিল।

রাত ২৷৷০ টার সময় বাটীর দরজায় আবার লোকের সাড়া পাওয়া যায়। একদল পাহাড়ী নরনারী দার্জ্জিলিংয়ের ১৩ মাইল দূরবর্ত্তী রঙ্গিত নামক স্থান হইতে দর্শনের জন্য আসিয়া উপস্থিত। সহর হইতে ফিরিয়া গিয়া কোন লোক সেখানে দেশবন্ধুর মৃত্যু সংবাদ দেওয়াতে, তাহারা

সেই গভীর রাত্রেই এতটা পাহাড়ে পথ অতিক্রম করিয়া একবার শেষ দর্শনের জন্য আসিয়াছে। বাসন্তীদেবী সংবাদ পাইয়া তখনই তাহাদিগকে উপরে আনিতে বলেন। দেশবন্ধুর মৃতদেহ দর্শন করিয়া, তাহাদের সে ক্রন্দন ও সে সময়ের ভাব অবর্ণনীয়!

ভোর তিনটা হইতে একজন পাহাড়ী সাধু শবদেহের নিকটে বসিয়া গীতা পাঠ করিতে থাকেন। আবার অতি প্রত্যুষ হইতেই দর্শনের জন্য জনসমাগম হইতে আরম্ভ হয়। গোস্বামী দারজিলিংয়ে দেশবন্ধুর তত্ত্বাবধারক ছিলেন। অনুপের কাঁধেই—দারজিলিংয়ের বন্ধুগণের কাঁধেই তাঁহাকে যাইতে হইল। শব বহনের নবনির্ম্মিত আধারটীও খদ্দরে যথারীতি মুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল! শোভাযাত্রায় ও সমস্ত পথে লোকের বিষম ভীড় হইয়াছিল। ভীড়ের জন্য শবদেহ ষ্টেসনে পৌছাইতে ১৫ মিনিটের স্থলে প্রায় ১ ঘণ্টা লাগিয়া যায়। বহনকারীগণ কীর্ত্তন গাইতে গাইতে গিয়াছিলেন।

মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বে, দার্জ্জিলিং কার্টরোডে দেশবন্ধু ও মহাত্মা গান্ধি

[Photo by—Rev. Traser ; Darjeeling.

বুধবার (১৭ই জুন) সকাল ৭৷৷৹টার সময় তাঁহার শবদেহ খদ্দরে ভূষিত ও পুষ্প-সম্ভারে সজ্জিত করিয়া ষ্টেসনে লইয়া যাওয়া হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার পর জ্বর বাড়িবার সময় চিত্তরঞ্জন শ্রীমতী বাসন্তী দেবীকে বলিয়াছিলেন "ভোলা আমায় ডাকছে, আমি অনুপের কাঁধেই যাব।" ভোলা তাঁহার প্রিয়তম কনিষ্ঠ ভ্রাতার ডাকনাম। তিনি দারজিলিংয়েই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, অনুপলাল ষ্টেসন পূর্ব্ব হইতেই লোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। শবদেহ লইয়া শোভাযাত্রা আসিয়া পৌছায় চারিদিক একেবারে লোকে লোকারণ্য হইয়া যায়। মুহুর্মুহু হরিধ্বনি ও বন্দেমাতরম্ চীৎকারের মধ্যে আধারসহ শবদেহ নির্দ্দিষ্ট একখানি নূতন মাল গাড়িতে তুলিয়া দেওয়া হয়। সেই সময়ে একবার আবার সাধারণকে দর্শনের সুযোগ দেওয়া হয়, কিন্তু ভীড় এত অধিক হইয়া

ছিল যে, সে সুযোগলাভ অধিকাংশেরই পক্ষে সম্ভব হয় নাই। নানা কারণে গাড়ী ছাড়িতে বিলম্ব হইয়া যায়। ট্রেণ নির্দ্দিষ্ট সময়ের অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে দার্জ্জিলিং ষ্টেসন ছাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে হরিবোল ও বন্দেমাতরম শব্দে চারিদিক মুখর হইয়া উঠে। শবদেহের সঙ্গে সেই গাড়িতেই এবং অন্য গাড়িতে ও ফুটবোর্ডে ঝুলিয়া বহুলোকে পরবর্ত্তী ঘুম ষ্টেসন পর্য্যন্ত গমন করেন। অনেকে কাসিয়াং পর্য্যন্তও গিয়াছিলেন।

দেশী কম্বল বিতরণ করা হয়। রাত্রে দার্জ্জিলিংয়ের বহু সহরবাসীকেই নিমন্ত্রণ করিয়া পরিতোষ সহকারে ভোজন করান হয়। এই ভোজের একটী বিশেষত্ব এই ছিল যে, দেশবন্ধুর প্রিয় ভোজ্য সামগ্রীই পরিবেশন করা হইয়াছিল। এ দিনের সমস্ত ব্যয়ভার দেশবন্ধুর ভ্রাতুষ্পুত্রী, ডাক্তার অজিতমোহন বসুর সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী মায়া বসু একাই বহন করিয়াছিলেন।

—"ষ্টেপাসাইড"—বাঙ্গালার তীর্থ—
[সম্মুখের ত্রিতল গৃহেই দেশবন্ধু দেহত্যাগ করেন।]

[Photo by—Rabin Gupta ; Darjeeling

বাসন্তী দেবী তদীয় কন্যা ও জামাতা প্রভৃতি পার্শ্ববর্ত্তী একটি গাড়িতে ছিলেন, তাঁহাদের তত্ত্বাবধানের জন্য ডাক্তার এস, সি, দাস মহাশয় তাঁহাদের সঙ্গে কলিকাতা পর্য্যন্ত গমন করেন।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর দশম দিনে "Step Aside" ভবনে কীর্ত্তন ও কাঙ্গালী বিদায়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বহু কাঙ্গালীকেই চাউল, পয়সা ও একখানি করিয়া

কলিকাতায়

মঙ্গলবার রাত্রিতেই অনেক স্থানে এই দুঃসংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। বুধবার প্রাতঃকালে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত দেশবন্ধুর মহা-প্রয়াণের কথা প্রচারিত হইয়া গেল। তাঁহার শবদেহ বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে শিয়ালদহে পৌছিবে, এ সংবাদও সকলে জানিতে পারিলেন। মহাত্মা গান্ধী মঙ্গলবার রাত্রিতে

বরিশাল ত্যাগ করিয়া ষ্টীমার যোগে খুলনায় আসিতেছিলেন। শেষ রাত্রিতে যখন ষ্টীমার খুলনার ঘাটে আসিয়া পৌছিল, তখনই আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের নিকট ষ্টীমারের উপর তারের সংবাদ আসিল। তিনি আর এ সংবাদ মহাত্মাকে দিতে পারিলেন না; তারগুলি তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। মহাত্মা কিছুতেই সহজে বিচলিত হন না; কিন্তু এই নিদারুণ সংবাদ পাইয়া তিনি ষ্টীমারের ডেকের উপর শুইয়া পড়িলেন—একটী কথাও বলিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ পরেই তিনি খুলনার সমস্ত ব্যবস্থা সঙ্কোচ করিয়া যাহাতে মধ্যাহ্ণেই কলিকাতায় যাত্রা করিতে পারেন, তাহারই আদেশ প্রদান করিলেন। খুলনার বক্তৃতায় তিনি শুধু দেশবন্ধুর কথাই বলিলেন। তাহার পরই তাঁহার বড় আদরের চিত্তরঞ্জনকে জীবনের শেষ দর্শন করিবার জন্য কলিকাতায় যাত্রা করিলেন এবং সন্ধ্যার পরই কলিকাতায় আসিয়া পৌছিলেন।

বৃহস্পতিবার সারাদিন কলিকাতায় যাহা হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা করা সাধ্যাতীত। প্রাতে সাড়ে ছয়টায় সময় দারজিলিং মেল শিয়ালদহে পৌছিবার কথা। এদিকে কিন্তু রাত্রি তিনটা হইতেই সহস্র সহস্র লোক শিয়ালদহ ষ্টেসন অভিমুখে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে লাগিল। শুধু কি কলিকাতা ও তাহার উপকণ্ঠের জনমণ্ডলীই আকুল আগ্রহে দেশবন্ধুর দেহ দর্শন করিবার জন্য ছুটিয়াছিল? তাহা নহে, দূর-দূরান্তর হইতে অসংখ্য লোক কলিকাতায় আসিয়াছিল। ভোর পাঁচটার সময় দেখা গেল শিয়ালদহের ষ্টেসন ও সম্মুখস্থ বিস্তৃত প্রাঙ্গণে আর তিল ধারণের স্থান নাই। তখনও দলে দলে হাজারে হাজারে লোক ষ্টেসনের দিকে ছুটিতেছে। সারকুলার রোড, হারিসন রোড একেবারে লোকে পূর্ণ হইয়া গেল। ষ্টেসনের প্ল্যাটফরমেও বিপুল জনতা হইল, শত সহস্র নরনারী নগ্নপদে অশ্রুপূর্ণ নয়নে গাড়ীর প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

দেশবন্ধুর শবদেহ লইয়া শোভাযাত্রা; দার্জ্জিলিং

[Photo by—Rabin Gupta ; Darjeeling,

সাড়ে ছয়টায় গাড়ী আসিবার কথা—কিন্তু কোথা গাড়ী। পথের মধ্যে—প্রত্যেক ষ্টেসনে বিপুল জনতা। তাহারা একবার তাহাদের দেশবন্ধু—তাহাদের চিত্তরঞ্জনকে শেষ দেখা দেখিবে। গাড়ীর বিলম্ব হইতে লাগিল। মহাত্মা গান্ধী ভোরের সময় মোটরযোগে বারাকপুরে

সর্ব্বাগ্রে দেশবন্ধুর শবদেহের অভ্যর্থনার জন্য চলিয়া গিয়াছিলেন। বারাকপুরে মেল পৌছিলে পশ্চাৎদিকে সংলগ্ন গাড়ী কয়েকখানি কাটিয়া লওয়া হইল, মেল কলিকাতায় চলিয়া আসিল। তাহার পর অন্য ইঞ্জিন ঘুড়িয়া দেশবন্ধুর গাড়ী শিয়ালদহে আনীত হইল,—তখন সাড়ে সাতটা। পথের মধ্যে কত স্থানে যে গাড়ী থামাইতে হইয়াছিল,—তাহা বলা যায় না।

শিয়ালদহে গাড়ী পৌছিলে মহাত্মার আদেশে শবাধার দাঁড়াইয়াছে। সাড়ে সাতটার সময় শিয়ালদহ ষ্টেসন হইতে মহাযাত্রা আরম্ভ হইল; সম্মুখে নিশানধারী স্বেচ্ছাসেবকদল; বহু হরি-সংকীর্ত্তনের দল, আর অগণিত নরনারী! মধ্যে মধ্যে সুধু—"বল হরি, হরিবোল!"

এই মহাযাত্রা শিয়ালদহ হইতে বাহির হইয়া কলিকাতার কয়েকটী বড় রাস্তা অতিক্রম করিয়া কালীঘাট কেওড়াতলা শ্মশান ঘাটের দিকে অগ্রসর হইল। পথের

দর্শন-কামনায় উদ্‌গ্রীব দার্জ্জিলিংয়ের অধিবাসীবৃন্দ

[Photo by—Rabin Gupta ; Darjeeling

গাড়ী হইতে বাহির করা হইল। প্ল্যাটফরমেই পুষ্পদাম, মাল্য-ভূষিত খাটের উপর সেই দেবদেহ রক্ষিত হইল। তাহার পরই মহাযাত্রা। এই যে বিপুল জনসঙ্ঘ—কাহারও মুখে কথা নাই, সকলেই নগ্নপদ, বিষাদমগ্ন। তাহার পর যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহা অবর্ণনীয়। এমন জন-সমাগম কলিকাতায় কেন বাঙ্গলাদেশে কেহ কখন দেখে নাই। মনে হইল, সমস্ত সহর যেন রাস্তায় আসিয়া দুই পার্শ্বে, পথের মধ্যে, দুই দিকের বাড়ীগুলির সর্ব্বস্থানে অসংখ্য নরনারী নির্ব্বাক্ হইয়া এই মহাযাত্রা দেখিতে লাগিল। স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে পারিল না—পারা অসম্ভব;—সকলেই যে একবার তাহাদের চিত্তরঞ্জনকে শেষ দেখা দেখিতে চায়। হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান—কোন ভেদ নাই,—চৌরঙ্গীতে শ্বেতাঙ্গ নরনারীগণ শিরস্ত্রাণ উন্মোচন করিয়া নগ্নশিরে

শবদেহের প্রতি সসম্ভ্রম অভিবাদন করিতে লাগিল। লক্ষাধিক লোক শবদেহের অনুসরণ করিতে লাগিল।

পূর্ব্বাহ্ণ সাড়ে সাতটায় শিয়ালদহ হইতে মহাযাত্রা আরম্ভ হয়, আর অপরাহ্ণ তিনটার সময় মৃতদেহ কালীঘাট কেওড়াতলার মহা শ্মশানে সমাগত। এই সুদীর্ঘ সময় লক্ষ লক্ষ নরনারী পথের পার্শ্বে, শ্মশানক্ষেত্রে নীরবে অবস্থান করিয়াছিল।

চিত্তরঞ্জনের পবিত্র দেহ শ্মশানে আনীত হইলে হিন্দু শাস্ত্রানুসারে যথারীতি অনুষ্ঠান সম্পাদিত হওয়ার পর তাঁহার দেহ চন্দন কাষ্ঠের চিতার উপর স্থাপিত হইল; এক মাত্র পুত্র শ্রীমান চিররঞ্জন মুখাগ্নি করিলেন। তাহার পরই চিতা প্রজ্বালিত হইল,—ভারতের মহাপুরুষ—বাঙ্গালার মুকুটমণি দীনবন্ধু, অনাথনাথ দেশবন্ধুর নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া গেল। মুহুর্মুহু হরিধ্বনির মধ্যে শোকাচ্ছন্ন অসংখ্য নরনারী চিতাভস্ম সাদরে গ্রহণ করিয়া গৃহে ফিরিলেন। এ দৃশ্যের বর্ণনা করা যায় না;—যাঁহারা এ দৃশ্য দেখিয়াছেন, তাঁহারা মরণান্ত পর্য্যন্ত এই পবিত্র দৃশ্যের কথা স্মরণ রাখিবেন।

শিয়ালদহ ষ্টেশনে শববাহী ট্রে

[Photo—Art Film Syndicate.

জীবন-কথা

বাঙ্গলার পল্লীমায়ের শ্যামাঞ্চলচ্ছায়ায়, নদনদীবিধৌত প্রকৃতির রম্যলীলাভূমি বাঙ্গলার এক সময়ের গৌরবময় রাজধানী বঙ্গবিক্রমাধার সার্থকনামা বিক্রমপুর। সেই বিক্রমপুরের অন্তর্গত তেলীরবাগ গ্রাম সুবিখ্যাত দাশ বংশের পিতৃভূমি। বৈদ্য জাতীয় এই দাশেরা ইদানীং কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই বংশের ভুবনমোহন দাশ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র চিত্তরঞ্জন ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ৫ই নবেম্বর কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি ভবানীপুরের লণ্ডন মিশনারী কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন, এবং ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে সেখান হইতে বি-এ পরীক্ষা দিয়া ডিগ্রী গ্রহণ করেন। কলেজে অধ্যয়ন কাল হইতেই তাঁহার

প্রতিভার বিকাশ ও বক্তৃতাশক্তির উন্মেষ হইতে আরম্ভ হয়। গ্র্যাজুয়েট হইবার পর চিত্তরঞ্জন বিলাত যাত্রা করেন, এবং সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন। কিন্তু সরকারী চাকুরী করা বিধাতা তাঁহার অদৃষ্টে লিখেন নাই। বাঙ্গলার অপর কয়েকজন মনীষীর ন্যায় চিত্তরঞ্জনও সিবিলসার্ব্বিস পরীক্ষা দিয়াও সিবিলিয়ান হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের মত তিনিও দেশমাতার সেবায় আত্ম-বিনিয়োগ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। চাকুরীতে উপযুক্ত ছাঁচে গঠিত ছিল না। তাঁহার প্রকৃতি ভিন্ন ধাতুতে গঠিত ছিল। তৎকালে স্বর্গীয় দাদাভাই নৌরোজী বিলাতে নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইয়া যে আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, চিত্তরঞ্জন মনে প্রাণে সেই আন্দোলনে যোগ দেন। এইরূপে তিনি অল্পকাল মধ্যে তথায় খ্যাতিলাভ করেন। তৎকালে মিঃ জন ম্যাকলীন নামক পার্লামেণ্টের একজন সদস্য ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের বিরুদ্ধে কটূক্তি বর্ষণ করেন। চিত্তরঞ্জন বিলাত-প্রবাসী ভারতীয়-

ষ্টেশনে দর্শন-কামনায় উদ্‌গ্রীব জনতা

[Photo—Art Film Syndicate.

প্রবেশ করিলে আমরা বোধ হয় তাঁহাদিগকে দেশের কার্য্যে পাইতাম না। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ ও স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জনের অদৃষ্টলিপি একই ছাঁচে ঢালা। তিনজনেই সিবিলসার্ব্বিস পরীক্ষা দিতে গিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও, সিবিলিয়ান হন নাই—হইয়াছেন বঙ্গজননীর অকৃত্রিম সেবক। ইহা আমাদের পক্ষে কম লাভ নহে।

চিত্তরঞ্জনের সিবিলিয়ান না হইবার একটু কারণও ঘটিয়াছিল। চিত্তরঞ্জনের চিত্ত সরকারী চাকুরী করিবার গণকে লইয়া একটী সভা করিয়া মিঃ ম্যাকলীনের ঐ সকল কটূক্তির এরূপ সতেজ প্রতিবাদ করেন যে, মিঃ ম্যাকলীনকে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পার্লামেণ্টের সদস্য পদে ইস্তফা দিতে বাধ্য হইতে হয়। তৎপরে মিঃ গ্লাডষ্টোনের সভাপতিত্বে একটী সভায় চিত্তরঞ্জন ভারত প্রসঙ্গে বক্তৃতা করিতে আহূত হন। তাঁহার এই বক্তৃতা হইতেই, তাঁহার চিত্ত যে সিবিলিয়ানী ধাতুতে গঠিত নহে, তাহা বেশ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ফলে তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেও শিক্ষানবীশ রূপে গৃহীত হইলেন না। অগত্যা চিত্তরঞ্জন ব্যারিষ্টারী

পড়িতে আরম্ভ করিলেন। এবং যথাসময়ে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

চিত্তরঞ্জনের পিতা ভুবনমোহন দাশ মহাশয় এটর্নী ছিলেন। তা'ছাড়া তিনি "ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন" নামক একখানি সংবাদপত্রের ও সম্পাদক ছিলেন। দাশ বংশ যেরূপ সম্ভ্রান্ত, ভুবনমোহন বাবুর প্রকৃতিও তদ্রূপ উন্নত ছিল। হাইকোর্টে এটর্ণীগিরি করিয়া তিনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। তাঁহার দান ধ্যান বিলক্ষণ ছিল। প্রার্থীরা কখনও তাঁহার কাছে নিরাশ হইত না। আত্মীয় স্বজন ত তাঁহার সাহায্য পাইতই—অপর সাধারণ লোক'ও সাধ্য পক্ষে তাঁহার সাহায্য লাভে বঞ্চিত হইত না। এইরূপ অপরিমিত দানশীলতার ফলে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াও ভুবনমোহন বাবু ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। নিজে ঋণ করিয়া দান করিবার

[Photo by—Mr. T. P. Sen.

ষ্টেশনের বাহিরে জনস্রোত

প্রবৃত্তি বিদ্যাসাগর মহাশয়েরও ছিল। তবে বিদ্যাসাগর মহাশয় মৃত্যুকালে এক পয়সাও ঋণ রাখিয়া যান নাই। কিন্তু ভুবনমোহন বাবু অঋণী হইয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি ঋণদায়ে বিব্রত হইয়া অক্ষমঋণী (Insolvent) হন। এবং এই ঘটনা উপলক্ষে চিত্তরঞ্জনের চরিত্রের একটা দিক—তাঁহার মহত্ত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ভুবনমোহন বাবু ঋণ পরিশোধ করিবার উপায় না দেখিয়া দেউলিয়া আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। কর্ম্মজীবনে প্রবৃত্ত হইয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া চিত্তরঞ্জন পিতৃঋণ স্বীকার করিয়া অনুসারে ভুবন বাবুও হয় ত প্রথমটা স্বর্গলাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু পুত্র চিত্তরঞ্জন পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়া উপযুক্ত পুত্রের কাজ করিয়া পিতার স্বর্গবাসের পথ প্রশস্ত করিয়া দেন। চিত্তরঞ্জনের ধর্ম্মপ্রবণ চিত্তের একটা দিক ইহাতে উজ্জ্বল হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহার ফলে তখন হইতেই তিনি খুব জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং সর্ব্বসাধারণের কাছে প্রশংসাভাজনও হইয়াছিলেন।

আইন-ব্যবসায়

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে বিলাত হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন

ভক্তি-প্রবাহে

[Photo by—The Photographic store.

সেই ঋণ কড়ায় গণ্ডায় পরিশোধ করেন। দেউলিয়া পিতার ঋণের জন্য চিত্তরঞ্জন আইনের কাছে একটুও দায়ী ছিলেন না। কিন্তু ধর্ম্মের কাছে তিনি নিজেকে কিছুতেই দায়িত্বহীন মনে করিতে পারেন নাই। পিতার উপযুক্ত পুত্রের কর্ত্তব্য তিনি সম্পাদন করিয়াছিলেন। হিন্দু-ধর্ম্ম-বিশ্বাস অনুসারে ঋণী ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিলে স্বর্গলাভের অধিকারী হয় না। এই বিশ্বাস করিয়া চিত্তরঞ্জন কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু প্রথম প্রথম জুনিয়ার ব্যারিষ্টারদের যে সকল অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, চিত্তরঞ্জনও তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। মুরুব্বির জোর না থাকিলে ব্যারিষ্টারীর ন্যায় স্বাধীন ব্যবসায়েও বিশেষ সুবিধা করিতে পারা যায় না। চিত্তরঞ্জনের মুরুব্বির জোর তেমন কিছুই ছিল না। তাহার

[Photo by—Ratan & Co.

হ্যারিসন রোড—শোভাযাত্রা
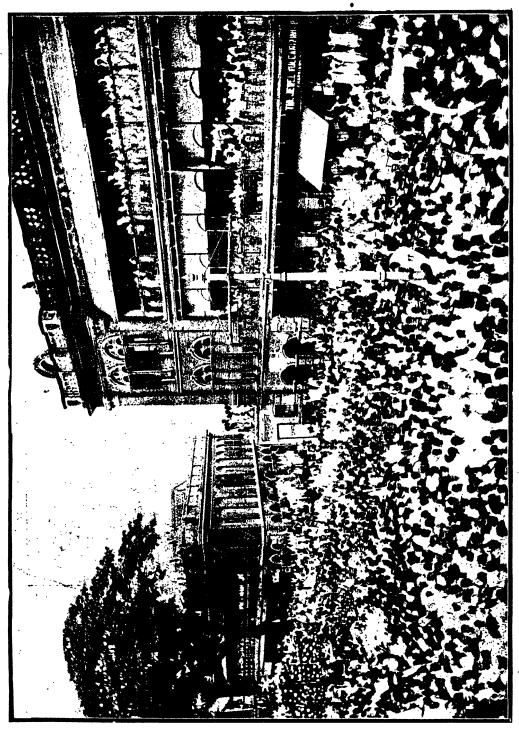
উপর, তিনি দেউলিয়া পিতার পুত্র। কাজেই অসুবিধা বিলক্ষণ ছিল। চিত্তরঞ্জনের সম্বলের মধ্যে তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা, অনন্যসাধারণ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও অসাধারণ আইন-জ্ঞান। এই তিনটী মূলধন স্বরূপ অবলম্বন করিয়া তিনি কর্ম্মসমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। কয়েক বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টার পর ভাগ্য তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইলেন। ১৯০৮ সালে আলিপুরের

বোমার মামলা উপস্থিত হইল। এই মামলায় চিত্তরঞ্জন আসামী পক্ষ সমর্থন করিতে নিযুক্ত হইলেন। এত দিন পরে তাঁহার প্রতিভা প্রকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র লাভ হইল এই মামলায় অসামান্য আইন-জ্ঞানের পরিচয় দিয়া, মামলাটিকে সুপরিচালিত করিয়া তিনি পরিণামে জয়যুক্ত হইলেন। এই মামলার অন্যতম আসামী সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ চিত্তরঞ্জনের অনন্যসাধারণ প্রতিভাগুণে মুক্তিলাভ করিলেন। এই মামলা পরিচালন করিতে

এই সময় হইতে বড় বড় জটিল মোকদ্দমায় চিত্তরঞ্জন কোন না কোন পক্ষে নিযুক্ত হইতে লাগিলেন। বিশেষ করিয়া রাজনীতিক মামলার আসামীগণের পক্ষ সমর্থন করিবার ভার তাঁহার উপর পড়িতে লাগিল, এবং তিনিও প্রায়ই তাহাদের রক্ষা করিতে লাগিলেন। এ সময়ে না কি তিনি প্রত্যহ সহস্র মুদ্রা উপার্জ্জন করিতেন।

কিন্তু দানশৌণ্ডতা এই দাশ-বংশের একটা

কলেজ ষ্ট্রীট—শোভাযাত্রা

[Photo by—Photographic stores.

চিত্তরঞ্জনকে যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, তদনুপাতে প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু মামলায় জয়লাভ করার পর তাঁহার যশে দেশ পূর্ণ হইল। সেই হইতে ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে তাঁহার জলের মত অর্থাগম হইতে লাগিল। তাহা ছাড়া, এই মামলার বিচার ফলে অরবিন্দের নির্দ্দোষিতা যেমন প্রতিপন্ন হইল, সেইরূপ বাঙ্গলার দুই মনীষাসম্পন্ন সন্তান—অরবিন্দ ও চিত্তরঞ্জন চির-বন্ধুতাপাশে আবদ্ধ হইলেন।

বিশেষত্ব—তাঁহারা বংশানুক্রমে দাতা। চিত্তরঞ্জনে এই গুণটি চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। চিত্তরঞ্জন যেরূপ প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন, সেইরূপ অপরিমিত দানও করিতে লাগিলেন। অজস্র অর্থ উপার্জ্জন করা সত্ত্বেও তিনিও পিতার ন্যায় ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন। অবশেষে মৃত্যুর অল্প দিন পূর্ব্বে দানপত্র রেজিষ্ট্রি করিয় তিনি তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব স্বদেশের কল্যাণ কল্পে দান করিয়া স্বয়ং নিঃস্ব হন। যথাসর্ব্বস্ব দান বাঙ্গলায় আরও দুই

একজন করিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু সে তাঁহাদের মৃত্যুর পর। জীবিত থাকিতে থাকিতে যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়া নিঃস্ব সাজিতে একমাত্র চিত্তরঞ্জনই পারিয়াছেন।

ধর্ম্মমত

ইংরেজি শিক্ষা এদেশে প্রথম প্রবর্ত্তিত হইবার পর একটা ছোটখাট ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। তৎকালীন বঙ্গের কয়েকজন মনীষী পিতৃপুরুষের ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া

ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে—শোভাযাত্রা

[Photo by—Photographic stores.

খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তার পর রাজা রামমোহন আবির্ভূত হইয়া খৃষ্টান হওয়ার গতিরোধ করেন ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন। শিক্ষিত সমাজ দলে দলে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে থাকেন। ভুবনমোহন এই প্রভাব হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিতে পারেন নাই। তিনি এবং তাঁহার বংশীয় আরও অনেকে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ব্রাহ্ম পিতার পুত্র বলিয়া চিত্তরঞ্জনও সুতরাং ব্রাহ্ম ছিলেন। কিন্তু হিন্দুত্ব তাঁহার অন্তরে অন্তরে ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান ছিল।

রাজা রামমোহনকে চিত্তরঞ্জন অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু পিতার ন্যায় তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতি পূর্ণ অনুরাগী ছিলেন না। ধর্ম্ম সংক্রান্ত সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গিয়াই রাজা রামমোহন ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সৃষ্টি করেন। চিত্তরঞ্জনও ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধবাদী—ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদার মতের পোষক ছিলেন। কিন্তু তবু তিনি রামমোহনের ধর্ম্ম পুরাপুরি অনুমোদন করিতে পারেন নাই। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, রাজার ধর্ম্মমত আরও বিচার-বিতর্কের দ্বারা পরিশোধিত হওয়া উচিত। কারণ এই ধর্ম্ম বড় বেশী পরিমাণে পাশ্চাত্য সভ্যতার ছাঁচে ঢালা—উহা প্রাচ্য দেশের ঠিক উপযোগী নহে। উহাকে প্রতীচ্য প্রভাব হইতে রক্ষা করিয়া প্রাচ্য প্রভাবান্বিত করার প্রয়োজন ছিল।

বাল্যকাল হইতেই চিত্তরঞ্জনের মনে স্বদেশানুরাগ প্রবল ছিল। রাজনীতিক ভারতকে পাশ্চাত্য প্রভাব হইতে রক্ষা করিবার জন্য ছাত্রাবস্থা হইতেই তিনি সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিল। ভারতীয় ধর্ম্মের, ভারতীয় সভ্যতার, ভারতীয় জাতীয়তার যে নিজের একটা বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা যাহাতে রক্ষা পায় ইহাই তাঁহার কামনা ছিল। বিলাত যাইলে ত

করপোরেশনে—মেয়রের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

[Photo by—Mr. T. P. Sen.
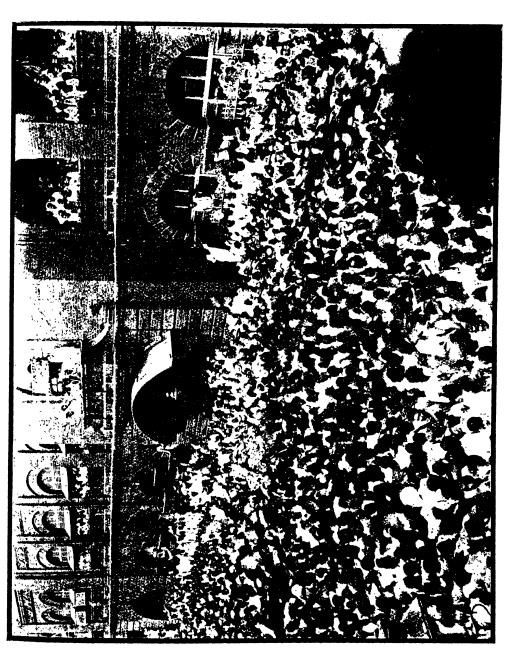
করিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম পাশ্চাত্য ছাঁচে ঢালা বলিয়া তিনি উহাকে অন্তরের সহিত অনুমোদন করিতে পারেন নাই। প্রবল স্বদেশানুরাগই এ পক্ষে তাঁহার মত নিয়ন্ত্রিত কথাই নাই—এখানে থাকিয়াই কিঞ্চিৎ উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া অনেকের মাথা বিগড়াইয়া যায়—আহারে বিহারে কথায় বার্ত্তায় পোষাক পরিচ্ছদে চাল চলনে অনেকেই সাহেব

বনিয়া যান। চিত্তরঞ্জন ইহার ঘোর বিরোধী ছিলেন। কি ব্যষ্টি হিসাবে, কি জাতি হিসাবে তিনি পুরাপুরি ভারতীয়ানা রক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। তাই রাজা রামমোহনের উদার ধর্ম্মমতটিকে পশ্চিমের প্রভাবান্বিত হইতে দেখিয়া তিনি অন্তরে অন্তরে ব্যথা অনুভব করিতেন—কিছুতেই তিনি ইহার সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারেন নাই। সকল জাতির নিজ নিজ বিশিষ্টতা রক্ষার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। কোন একটা জাতি নিজের বিশিষ্টতা ভুলিয়া রাজনীতিক ধারণা মাত্র নহে। আমার মতে, প্রত্যেক জাতি উন্নতিশীল। তাহাকে অগ্রসর হইতেই হইবে; কারণ, অগ্রসর হওয়া ভিন্ন তাহার আর অন্য উপায় নাই। ভগবানের বিশ্বরাজ্যে মানব-জীবনে বৈচিত্র্যের অভাব নাই। প্রত্যেক জাতি সেইরূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ বহু জীবনের একটী সঙ্ঘ। জীবনের অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক জাতিকেই বিস্তৃতি লাভ করিতে হইবে। আমি নিজে যে জাতির অন্তর্ভুক্ত, সে জাতিকেও কাজে কাজেই অগ্রসর হইতে
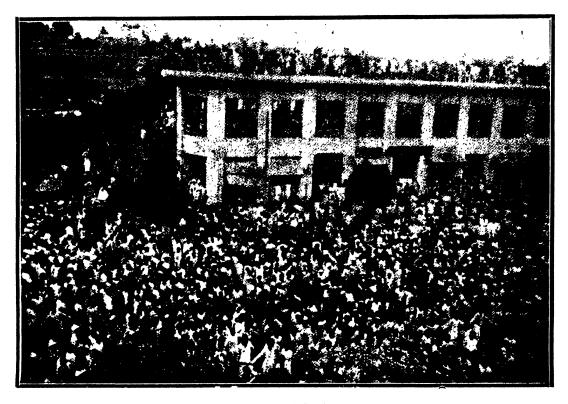
রসারোডে—শোভাযাত্রা

[Poato by—Mr. T. P. Sen.

বা ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ ভাবে অপর কোন জাতির অনুকরণ করে, ইহা তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না। কোন নিম্ন স্তরে অবস্থিত জাতি কোন উন্নততর অবস্থাপন্ন জাতির সদ্‌-গুণাবলী গ্রহণ করিয়া নিজে উন্নত হয়, ইহাতে অবশ্য তাঁহার আপত্তি ছিল না—কিন্তু সেটা করা চাই নিজের বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া। এ সম্বন্ধে তাঁহার মত তিনি বেশ স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন; বলিয়াছেন, "আমার মতে, জাতীয়তা অর্থে পাশ্চাত্য দর্শন হইতে ধার করা একটা হইবে। আমরা কেবল তাহার সেই বিস্তৃতিতে সাহায্য করিব মাত্র। আমি নিরপেক্ষতাকে এবং ধর্ম্মকে যেরূপ শ্রদ্ধা করি, জাতীয়তায় এই নীতিকেও আমি তদ্রূপ শ্রদ্ধা করি। দেশের কাজ করা, জাতির কাজ করা মনুষ্যত্বের সাধনা। মনুষ্যত্বের সাধনা ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য করা।"

চিত্তরঞ্জনের এই উক্তি হইতে তাঁহার ধর্ম্মমতও কতকটা পরিস্ফুট হইতেছে। তাঁহার ঈশ্বর শুধু কল্পনার বিষয়ীভূত নন। তিনি ভগবানকে এমন ভাবে পাইতে চাহেন, যাহার

জন্য তিনি তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারেন। তাঁহার ভগবানের রক্ত-মাংসের দেহ ধারণ করিয়া অবতার রূপে অবতীর্ণ হওয়া চাই। কাজেই ব্রাহ্ম সমাজের নিরাকার-বাদে তাঁহার আত্মার তৃপ্তি হইতে পারে না। তাই তিনি বোধ হয় দেশ-মাতৃকাকেই তাঁহার উপাস্য দেবীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি তাঁহার অন্তরের সকল স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব যেমন সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়া ধন্য হন, তিনিও সেইরূপ দেশমাতৃকার চরণে তাঁহার সমস্ত—নিজেকে পর্য্যন্ত অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মত ভ্রান্তই হউক আর অভ্রান্তই হউক, সে পরের কথা। কিন্তু তাহাতে যে কপটতার লেশমাত্র ছিল না—তিনি যে মনে-প্রাণে তাহা বিশ্বাস করিতেন, সে পক্ষেও সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। আর তাঁহার ন্যায় তাঁহার মতে অন্য লোকেও যে দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করিত, তাহার প্রমাণ তাঁহার অসংখ্য অনুরাগিবৃন্দ। রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার মতের অনুসরণকারীর সংখ্যা ছিল না। বিভিন্ন প্রদেশের বহু জননেতা তাঁহার রাজনীতিক মতের অনুসরণ করিয়া স্বরাজ্য-দলভুক্ত হইয়াছিলেন; প্রত্যেক প্রদেশেই স্বরাজ্যদল প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। অথচ তিনি নিজে প্রাধান্য লাভের জন্য কোন দিনই আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। তিনি নিজেকে মহাত্মাজীর দক্ষিণহস্ত স্বরূপ বিবেচনা করিতেন; রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি যাহা কিছু করিতে চাহিতেন, প্রথমে তাহা মহাত্মাজীকে দিয়া অনুমোদন করাইয়া লইতেন।

দাশ মহাশয়ের আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম এইরূপ। তাঁহার লৌকিক ও সামাজিক ধর্ম্ম কিরূপ ছিল তাহাও বিবেচ্য। তিনি ব্রাহ্ম পিতার পুত্র; কাজেই নিজেও স্বভাবতই ব্রাহ্ম ছিলেন। পিতার জীবদ্দশাতেই তিনি এক প্রসিদ্ধ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম-পরিবারে বিবাহ করেন। পিতা ভুবনমোহনের মৃত্যু হইলে চিত্তরঞ্জন হিন্দু মতেই পিতৃশ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া দায়মুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহও তিনি হিন্দুমতে শালগ্রাম শিলার সম্মুখে সমস্ত ক্রিয়া দিয়াছিলেন। অনেকেই জানেন, চিত্তরঞ্জন বৈষ্ণব ধর্ম্মে প্রগাঢ় ভক্তিমান ছিলেন, বৈষ্ণব সাধুগণের বিষয়ে তিনি সর্ব্বদা আলোচনা করিতেন। তিনি অনেক সময় কীর্ত্তনানন্দে বিভোর হইয়া যাইতেন।

দেশবন্ধুর পরিত্যক্ত প্রাসাদ সম্মুখে শেষ-দর্শনাভিলাষে আত্মীয়-স্বজন পরিবৃতা—বাসন্তীদেবী

সাহিত্য-সাধনা

চিত্তরঞ্জন আমাদের সাহিত্য-বন্ধু ছিলেন। ১৮৯৪ কি ১৮৯৫ সালে "মালঞ্চ" নামক একখানি গীতিকাব্য লইয়া তিনি সর্ব্বপ্রথম সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। মালঞ্চের কবি যেমন তেজস্বী, তাঁহার কবিতাগুলিও তদ্রূপ প্রাণময় ছিল। ইহাতে তিনি যেরূপ চিন্তার স্বাধীনতার পরিচয় দিয়াছিলেন, কবিতাগুলি সেইরূপ বাস্তবতার পরিচায়ক ছিল। বাঙ্গলা সাহিত্যে তৎপূর্ব্বে এরূপ ধরণের কবিতা

আর রচিত হয় নাই। ১৯১৫ সালে তিনি তাঁহার "নারায়ণ" মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রখানি কয়েক বৎসর প্রকাশিত হইবার পর বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু এই কয় বৎসরেই তাহা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, এবং প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রের সম্মান অর্জ্জন করিয়াছিল। তাহাতে যে সব রচনা প্রকাশিত হইত, তাহাতে লেখকগণের এবং ততোধিক সম্পাদক মহাশয়ের সম্পাদন-ক্ষমতা দর্শনে বাঙ্গলার সাহিত্যিক সমাজ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল। তৎপরে ক্রমান্বয়ে সাহিত্য যে তাঁহার মনের উপর অখণ্ড প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহাতে আর লেশমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। "সাগর-সঙ্গীতে" কবি সাগরের আধ্যাত্মিকতার পরিচয় লইয়াছিলেন। এই কাব্যখানি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন এই 'ভারতবর্ষে'ই তাহার বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং তাহার সম্বন্ধে অধিক কিছু বলা বাহুল্য মাত্র। বাঁকিপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মেলনের যে অধিবেশন হয়, চিত্তরঞ্জন তাহার সাহিত্য-শাখার সভাপতিরূপে যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহাতে

শ্মশান-সান্নিধ্যে

[Photo—Art Film Syndicate.

মালা, অন্তর্য্যামী, কিশোর-কিশোরী ও সাগর-সঙ্গীত নামে তাঁহার চারিখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহাদের মধ্যে প্রথম তিনখানি বৈষ্ণব-ধর্ম্মমূলক কবিতায় গ্রথিত। ইহাদের ভাবের নবীনতা, ভাষার ও মতের প্রাঞ্জলতা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। বৈষ্ণব কবিতা প্রধানতঃ বিনয় ও প্রেমমূলক। এই সকল কবিতা হইতে, কবির মনের গতি কোন্ দিকে প্রধাবিত হইত, তাহা বুঝিতে কাহারও অসুবিধা হয় নাই বৈষ্ণব-তাঁহার বৈষ্ণব-সাহিত্য সম্বন্ধে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। ঢাকায় যে সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন হয়, তাহাতে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পদে বৃত হন। তাঁহার সে প্রাণস্পর্শী অভ্যর্থনা বক্তৃতা এখনও আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে। বিগত বর্ষে বঙ্কিম-চন্দ্রের জন্মস্থান কাঁঠালপাড়ায় যে বঙ্কিম-সম্মেলন হয়, তাহাতে চিত্তরঞ্জন সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার জন্য অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন।

তাঁহার ওজস্বিনী আহ্বানে সভাস্থলেই অনেক অর্থ সংগৃহীত হয়। এই সেদিন মুন্‌সীগঞ্জে যে সাহিত্য-সম্মেলন হইয়া গেল, তাহাতেও তাঁহারই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইবার কথা ছিল। কিন্তু, সে সময়ে তিনি বাঁকীপুরে রোগ-শয্যাশায়ী ছিলেন; তাই সম্মেলনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। যখন তিনি সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিয়া নিঃস্ব হন, সে সময় তিনি তাঁহার এতকালের সযত্ন-সংগৃহীত বহুমূল্য বৈষ্ণব গ্রন্থগুলি ও দুষ্প্রাপ্য পুঁথিসকল বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে দান করিয়া তাঁহার সাহিত্য-প্রীতির পরিচয় প্রদান

প্রয়োজন। চিত্তরঞ্জনকে ঠিক মত বুঝিতে হইলে রাজনীতিক চিত্তরঞ্জনকে বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

চিত্তরঞ্জনের প্রতিভা যেরূপ সর্ব্বতোমুখী, বুদ্ধি যেরূপ তীক্ষ্ণ, বিচার ও বিশ্লেষণশক্তি যেরূপ প্রখর ছিল, তাহাতে তিনি যে কোন বিষয়েই আত্মবিনিয়োগ করিতেন, তাহাতেই তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেন। ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে তিনি কিরূপ সফলতা, যশঃ ও অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সাহিত্যিক রূপেও তিনি অল্প প্রতিষ্ঠালাভ করেন নাই।

শোকমগনা

[Photo—Art Film Syndicate.

করেন। প্রকাশ্যে, গোপনে তিনি যে কত দুস্থ সাহিত্য-সেবককে অর্থ দ্বারা, পরামর্শ দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না।

রাজনীতিক্ষেত্রে

চিত্তরঞ্জনের সর্ব্বপ্রধান প্রতিষ্ঠা রাজনীতিক্ষেত্রে। তিনি রাজনীতিকেই যে তাঁহার ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ পূর্ব্বেই দিয়াছি। কিন্তু কিরূপে এমন অঘটন ঘটিল, তাহার একটু বিস্তৃত আলোচনার

কিন্তু আজ যে চিত্তরঞ্জনের বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠা, তিনি সাহিত্যিক চিত্তরঞ্জন নহেন, ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জনও নহেন। এই প্রতিষ্ঠা রাজনীতিক চিত্তরঞ্জনের।

ছাত্রাবস্থায় বিলাত-প্রবাসকালে দাদাভাই নৌরোজীর পার্লামেণ্টের সদস্য নির্ব্বাচন আন্দোলন উপলক্ষে রাজনীতিক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জনের হাতে-খড়ি হয়। কিন্তু ইহার পর অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহাতে রাজনীতিক চিত্তরঞ্জনের কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। ১৯০৭।৮ সালে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ

উপলক্ষে দেশব্যাপী আন্দোলন, উত্তেজনা উপস্থিত হইলে, আমরা চিত্তরঞ্জনকে সর্ব্বপ্রথম রাজনীতি-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে দেখি। তৎকালে সুবোধচন্দ্র মল্লিক, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা প্রভৃতি মিলিত হইয়া চরমপন্থী বা গরমদল গঠন করেন। সে সময়ে সন্ধ্যা, নবশক্তি, স্বরাজ, নবযুগ, ইংরেজী বন্দে মাতরম্ প্রভৃতি গরমদলের কয়েকখানি সংবাদপত্র বাহির হইতে আরম্ভ হয়। চিত্তরঞ্জন কতকটা পরোক্ষভাবে এই দলে যোগ দিয়া বন্দেমাতরম্ পত্র পরিচালনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। তার পর মাণিকতলায় বোমা প্রভৃতির আবিষ্কার হইলে যে বিরাট রাজনীতিক মামলা উপস্থিত হয়, তাহাতে চিত্তরঞ্জন শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষের পক্ষে নিযুক্ত হইয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়কে নিরপরাধ প্রতিপন্ন করেন। এই মামলায় তিনি দেশবিখ্যাত হইয়া পড়েন। তৎপরে এত মামলায় তাঁহাকে নিযুক্ত হইতে হইত যে, রাজনীতির চর্চ্চা করিবার তিনি আদৌ অবসরই পাইতেন না।

তার পর রৌলট বিল পাশ হইলে সমগ্র ভারতবর্ষময় আন্দোলনের তরঙ্গ উত্থিত হয়। এই সময়ে মহাত্মাজী রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং সত্যাগ্রহ ব্রতের প্রচার করেন। অতঃপর পঞ্জাবে হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। জেনারেল ডায়ারের প্ররোচনায় অমৃতসরে গুলি-বিভ্রাটে বহুলোক হতাহত হয়। এই সকল ঘটনার তদন্ত জন্য কংগ্রেসের তরফ হইতে একটী কমিটি গঠিত হইলে, দাশ মহাশয় সেই কমিটির অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হন। অনন্তর কলিকাতায় কংগ্রেসের একটী বিশেষ অধিবেশনে লালা লজপৎ রায়ের নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন উত্থিত হয়, এবং কাউন্সিল বর্জ্জন, আদালত বর্জ্জন প্রভৃতির প্রস্তাব উঠে। কিন্তু চিত্তরঞ্জন তখনও এই আন্দোলনে যোগ দেন নাই। তার পর নাগপুরে কংগ্রেস বৈঠকে মহাত্মাজীর সহিত দাশ মহাশয়ের কথোপকথনের ফলে নাগপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া চিত্তরঞ্জন এক কথায় ব্যারিষ্টারি ব্যবসায় ছাড়িয়া দেন। তখন হইতেই তিনি সম্পূর্ণরূপে মনে প্রাণে রাজনীতিক্ষেত্রে যোগ দেন। তখন হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতবর্ষ রাজনীতিক চিত্তরঞ্জনকে বক্ষে ধারণ করিতে পাইয়া ধন্য হইয়াছে।

দর্শন আগ্রহে

[Photo—Art Film Syndicate.

রাজনীতিক্ষেত্রে প্রকৃত প্রস্তাবে যোগদানের পর সমস্ত রাজনীতিক ব্যাপারেই তিনি পরমোৎসাহে লিপ্ত হইয়াছিলেন। আমাদের যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্ ভারত-ভ্রমণে আসিলে তাঁহার অভ্যর্থনা বয়কট করিবার প্রস্তাব হয়। চিত্তরঞ্জন পূর্ণোদ্যমে এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন। বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট যখন বাঙ্গলায় স্বেচ্ছাসেবক দলকে বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করেন, তখন চিত্তরঞ্জন উচ্চ কণ্ঠে ইহার প্রতিবাদ করিয়া প্রচার করেন যে, গবর্মেণ্টের এই আদেশই বেআইনী। কিন্তু তিনি দেশবাসীকে শান্ত পদে নির্ব্বাচিত হন। এই সভাপতির আসন হইতে তিনি কাউন্সিল বর্জ্জন পরিহার করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু তাহা সভায় গ্রাহ্য হয় নাই। তার পরই তিনি স্বরাজ্য দল গঠন করেন, এবং অচিরকাল মধ্যে এই দল প্রভাব-শালী হইয়া উঠে। তার পর দিল্লীর বিশেষ কংগ্রেসে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে কাউন্সিলে প্রবেশের প্রস্তাব গ্রাহ্য হয়। এবং কোকনদ কংগ্রেসে মৌলানা মহম্মদ আলির সভাপতিত্বে উক্ত প্রস্তাব সমর্থিত হয়। তাহার পর হইতে স্বরাজ্যদল কাউন্সিলে প্রবেশ

শ্মশানে—শবদেহ অপেক্ষায় মহাত্মা

[Calcutta Municipal Gazette.

সংযত থাকিতে উপদেশ দেন ; উত্তেজনার কারণ ঘটিলেও যাহাতে তাহারা বিচলিত ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া না পড়ে, সেজন্য তিনি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন। ১৯২১ সালের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে তিনি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল প্রভৃতির সহিত গ্রেপ্তার হন। তৎপূর্ব্বে তিনি আমেদাবাদ কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কারাগার হইতে মুক্তিলাভের পর দাশ মহাশয় গয়া কংগ্রেসের সভাপতির করিতে আরম্ভ করেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় দাশ মহাশয়ের পরিচালনে স্বরাজ্যদল মন্ত্রীদের বেতন মঞ্জুরের প্রস্তাব উপলক্ষে গবর্মেণ্টকে দুইবার পরাজিত করেন। তাহার পরিণামে এই সেদিন বড়লাট লর্ড লীটন ঘোষণা প্রচার করিয়া বঙ্গদেশে শাসনসংস্কার রহিত করিয়া পূর্ব্বকালের শাসন-প্রথার পুনঃ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু মৃত্যুর অল্প দিন পূর্ব্বে দাশ মহাশয়ের মত কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। ফরিদপুর প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশনে তিনি

কয়েকটী সর্ত্তে গবর্মেণ্টের সহিত সহযোগিতা (Honourable Co-operation) করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। এবং তাহার কয়েকদিন পূর্ব্বে এবং ফরিদপুরের অধিবেশনেও তিনি দৃঢ়তার সহিত গুপ্ত ষড়যন্ত্র ও হিংসাবাদের নিন্দা করিয়াছিলেন এবং সকলকে হিংস্র নীতি বর্জ্জন করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন।

চিত্তরঞ্জনের কাব্যগ্রন্থগুলি হইতে আমরা তাঁহার ধর্ম্মমত বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। এইবার তাঁহার বক্তৃতা ও রচনা হইতে তাঁহার রাজনীতিক মত বুঝিতে চেষ্টা করিব।

ঐ বক্তৃতাতেই তিনি তাঁহার এই মত আরও পরিস্ফুট করিয়া বলিয়াছেন—"আমরা একটা সুমহান সভ্যতার উত্তরসাধক। আমাদের বাণী সমগ্র বিশ্বকে শুনাইতে হইবে। আমাদের পূর্ব্বকালের জ্ঞানের অগ্নি পুনঃ প্রজ্বালিত করিতে হইবে। ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিকে পুনঃ সঞ্জীবিত করিয়া তাহার আলোকে পৃথিবীকে উদ্ভাসিত করিতে হইবে।"

এত দিন এদেশের রাজনীতি গতানুগতিক ন্যায়ানুসারে পরিচালিত হইতেছিল। লোকে রাজনীতির কিছুই বুঝিত

চির-বিদায়

[Photo—Art Film syndicate.

১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে মৈমনসিংহে একটী বক্তৃতায় চিত্তরঞ্জন বলেন, "আমার মতে, ইয়োরোপীয় রাজনীতির অনুসরণ করিলেই দেশের কাজ করা হয় না। দেশের কাজ আমার ধর্ম্মের অঙ্গীভূত। দেশ-সেবা আমার জীবনের সকল আদর্শের একটা অংশ। আমার দেশই আমার ঈশ্বর। দেশের কাজ—জাতির কাজই আমার কাছে মনুষ্যত্ব। নরনারায়ণের সেবাই আমার ভগবানের সেবা।"

না (এখনও বড় বুঝে না)—কেবল গড্ডালিকা প্রবাহবৎ তথাকথিত নেতাদের অন্ধভাবে অনুসরণ করিয়া চলিত। চিত্তরঞ্জন স্বীয় প্রতিভাবলে রাজনীতি-ক্ষেত্রে নবজীবন সঞ্চার করিলেন। এবং যেহেতু তিনি স্বার্থ-পরিচালিত হইয়া রাজনীতির চর্চ্চা করেন নাই, সেইজন্য অচিরকাল মধ্যে তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করিলেন। বস্তুতঃ, তাঁহার রাজনীতিক জীবন বেশী দিনের নহে এবং এত অল্প সময়ের মধ্যে অপর কেহ রাজনীতি ক্ষেত্রে এমন বিরাট বিশ্বব্যাপী

প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিয়াছেন বলিয়াও জানা যায় না। তাঁহার সম্বন্ধে এ কথা স্বচ্ছন্দে বলা যায়—"veni, vidi, vici!" বস্তুতঃ রাজনীতি যেন তাঁহারই অপেক্ষায় বসিয়া ছিল—দেশমাতা যেন স্নেহাঞ্চল পাতিয়া তাঁহার প্রিয়তম সন্তানের প্রতীক্ষায় ছিলেন—দেশবাসী যেন তাহাদের বক্ষের অভ্যন্তরে তাঁহার জন্য স্ফটিক সিংহাসন পাতিয়া সজ্জিত করিয়া অপেক্ষা করিতেছিল।

এই কথাটি তিনি পুনঃ পুনঃ প্রচার করিয়াছেন—কখনও ক্লান্তি বোধ করেন নাই—যে, ভারত কখনও বিজিত হয় নাই, এবং ঈশ্বরেচ্ছায় কোন কালেই বিজিত হইবেও না। ভারত তাহার সভ্যতা, তাহার আদর্শ, তাহার জ্ঞান-বিজ্ঞান এক দিন সমস্ত বিশ্বকে গ্রহণ করাইবেই করাইবে। আজ সে কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এই কাজ দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিবে। ভারতের বাণী এক দিন সমস্ত বিশ্বকে শুনিতেই হইবে।

কি অনন্ত বিশ্বাস! এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বলিয়াই তিনি যথার্থ সাধক হইতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ রাজনীতিকই—শুধু রাজনীতিক কেন, সকল নীতিকই—মুখে যাহা বলেন, যাহা করিতে লোককে উপদেশ দেন, তাহাতে তাঁহাদের নিজেদের মনে এতটুকু বিশ্বাস নাই। এদেশে রাজনীতি-চর্চ্চা ত স্বার্থ-সাধনের একটা ছদ্ম উপায় মাত্র। সমাজ-সংস্কারকেরা সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে লোককে যে উপদেশ দেন, যদি নিজেদের করিয়া-কর্ম্মিয়া তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইত, তাহা হইলে অনেক সমাজ-সংস্কারককেই আসর হইতে সরিয়া পড়িতে হইত। লোক-মতের বিরুদ্ধে চলিতে গিয়া যে সকল বিপদ ও অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, সে সকল ফাঁড়া অপরের উপর দিয়া কাটিয়া যায়—ইহাই প্রধানতঃ সমাজ-সংস্কারকদিগের অভিপ্রায়। অন্য সকল ক্ষেত্রেও এই একই অবস্থা। জাতীয় শিক্ষার উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তার কথা যাঁহারা সহস্র কণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন, তাঁহারাই নিজেদের পুত্র-কন্যাগণকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাই দিয়া যাইতেছেন। মুখে জাতীয় শিক্ষার সমর্থন করিলেও অন্তরে তাহার উপর তাঁহাদের এতটুকু বিশ্বাস নাই। যেখানে আন্তরিকতার এতটা দুর্ভিক্ষ, সেক্ষেত্রে কতখানি কাজের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? কিন্তু চিত্তরঞ্জন ভিন্ন ধাতুতে গড়া। তিনি যাহা বিশ্বাস করিতেন, কার্য্যেও তাহাই করিতেন। দেশের কাজ করিতে গেলে সন্ন্যাসীর কঠোর সাধনা চাই—এই সত্যটি যখন তিনি হৃদয়ঙ্গম করিলেন, তখনই তিনি তাঁহার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। ইহা আমাদের দেশের নিজস্ব বিশেষত্ব। বহু কাল পূর্ব্ব হইতেই, যখনই যিনিই দেশ-সেবা—নরনারায়ণের সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখনই তিনিই নিজেকে নিঃস্ব রিক্ত করিয়া বিলাইয়া দিয়াছেন। বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক প্রভৃতি ধর্ম্মবীরগণের

সব শেষ
[Photo—Art Film Syndicate

কথা ছাড়িয়া দিলেও, এ যুগের মহাত্মা গান্ধি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নাম ভারতের ত্যাগের ইতিহাসে চির উজ্জ্বল হইয়া রহিবে। যাঁহারা এতটুকু স্বার্থ ছাড়িতে রাজী নন, অথচ, দেশ-সেবারূপ এত বড় মহান্ ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ভণ্ড ছাড়া আর কি বলিতে পারা যায়? মহাত্মাজী ও দেশবন্ধুর জীবন হইতে, একটু চিন্তা করিলেই, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, ত্যাগ-মাহাত্ম্য, অন্ততঃ এদেশে কখনও অপুরস্কৃত থাকে না—এদেশবাসী অকৃতজ্ঞ নহে।

প্রথম প্রথম চিত্তরঞ্জন যে active politicsএ যোগ দান করেন নাই, তাহার কারণ তাঁহার ঔদাসীন্য নহে,—চিত্তরঞ্জনের ন্যায় মনোভাব যাঁহার, তিনি কখনও দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থায় উদাসীন বা নিরপেক্ষ থাকিতে পারেন না। তবে তিনি যে রাজনীতিক ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকিতেন, আমাদের মনে হয়, তাহার কারণ—তিনি ভণ্ড ছিলেন না বলিয়া। বিষয়-কর্ম্মও করিব, এবং অবসর মত সৌখিন রাজনীতি-চর্চ্চা করিব—ডুড্‌ও খাব টামাকও খাব—এ দুই-ই কখনও একসঙ্গে চলিতে পারে না। সেই জন্য আমাদের রাজনীতি পদে পদে ব্যাহত, বিফল হইয়াছে। বন্দে মাতরম্ মন্ত্রদ্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কয়েক খানি উপন্যাস—আনন্দমঠ, দেবী-চৌধুরাণী, সীতারাম প্রভৃতিতে বারে বারে এই তত্ত্বের ইঙ্গিত করিয়াছেন। সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে চাহেন। কিন্তু মহেন্দ্র স্ত্রী-কন্যাকে ত্যাগ না করিলে তিনি তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারেন না। পরিবারের সঙ্গে সংস্রব রাখিলে দেশ-সেবা হইবে না। ভবানী পাঠক তাঁহার কল্পিত স্বাধীন রাজ্যের একজন অধিরাণী চাহেন। তিনি সম্পূর্ণ সন্ন্যাসিনী হইবেন। সেইজন্য প্রফুল্লকে অত সাধনা করিতে হইয়াছিল,—সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিতে হইয়াছিল,—নির্লিপ্ত সন্ন্যাসিনী হইতে হইয়াছিল। সীতারাম বাহুবলে হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিলেন, কিন্তু তিনি ত্যাগী নহেন, ভোগী—সন্ন্যাসী নহেন, বিলাসী, তাই অর্জ্জিত রাজ্য রক্ষা করিতে
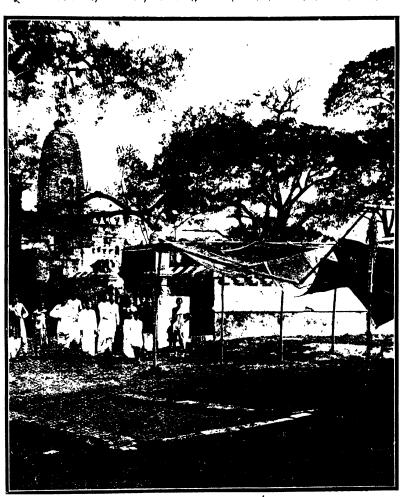
তীর্থপীঠ

[Photo by—D. Ratan & Co.

পারিলেন না। রাজ্য যেমন সহজে অর্জ্জিত হইয়াছিল, তেমনি সহজেই তাহা তাঁহার হস্ত-স্খলিত হইল। চিত্তরঞ্জন তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, দেশ-সেবা করিতে হইলে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে হইবে; সংসারের সকল বন্ধন-মুক্ত না হইতে পারিলে দেশসেবক হওয়া চলিবে না। কিন্তু

হঠাৎ তিনি তাহা করিতে পারেন না। তিনি প্রকাশ্যে পিতৃঋণ স্বীকার করিয়াছেন। সে ঋণ যতদিন না পরিশোধ করিতে পারিবেন, ততদিন তাঁহার মুক্তি নাই। বীরপুরুষ তিনি—সত্য রক্ষা করিলেন—নিজে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া পিতৃঋণ পরিশোধ করিলেন। তার পর যে দিন তিনি বুঝিলেন, দেশসেবা আরম্ভ করিতে হইবে, সেই দিনই তিনি তাঁহার অমন লাভের ব্যারিষ্টারি ব্যবসায় দানপত্র রেজিষ্টি করিয়া যথার্থই তাঁহার সকল সম্পত্তি দেশসেবার্থ দান করিলেন, তখন আর কাহারও মুখে একটীও কথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই।

সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপে দেশসেবায় আত্ম-বিনিয়োগের কল্পনা কখন চিত্তরঞ্জনের মনে উদয় হইয়াছিল, তাহাও কতকটা অনুমান করা যায়। ১৯১৭ সালের ২০শে আগষ্ট তদানীন্তন ভারত-সচিব যে ঘোষণা বাণীর

শেষদান

[Photo by—Mr. T. P. Sen.

এক কথায় ছাড়িয়া দিলেন, বিষয় সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন। বিষয়ী লোকে তাঁহার বিষয়-ত্যাগের সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া মনে মনে হাসিয়াছিল। তাহাদের সঙ্কীর্ণ মনোভাবের প্রভাবে বলিয়াছিল, উহা মৌখিক স্তোকবাক্য—চিত্তরঞ্জন মুখে ঐ কথা বলিতেছেন বটে, কিন্তু কার্য্যে কখনও পরিণত করিতে পারিবেন না। কিন্তু অচিরে তাঁহাদের ভ্রম ঘুচিয়াছিল—যখন চিত্তরঞ্জন প্রচার করেন, তাহার পর হইতেই সমগ্র ভারতবর্ষ গাঝাড়া দিয়া উঠে। এ যাবৎ কংগ্রেস-কনফারেন্সের মারফৎ ভারতবর্ষ লেফাফাদুরস্ত ভাবে স্বায়ত্ত-শাসনের দাবী করিয়া আসিতেছিল। সে স্বায়ত্তশাসনের ধারা কেমন হইবে, সে সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত ছিল, এবং কোন মতই তেমন স্পষ্ট ছিল না। সর্ব্বোপরি কাহারও দাবীতে এতটুকু আন্তরিকতা ছিল না। কর্ত্তৃপক্ষও কাজেই

বরাবরই সে দাবী উপেক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। তৎপূর্ব্বে মর্লে-মিন্টো শাসন-সংস্কার আমরা পাইয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাহাতে দেশে এতটা সাড়া পড়িয়া যায় নাই। কংগ্রেসে তখন এত দলাদলিও ছিল না। রাজনীতিক দল বলিতে তখন নরম ও গরম এই দুইটী মাত্র দল ছিল। নরম দল ছিল পুরাতন; আর বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের সময় হইতে স্বতন্ত্র ভাবে গরমদলের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহাদের দাবীরও বড় বেশী পার্থক্য ছিল না। মডারেট বা নরম দল মর্লে-মিন্টো শাসন-সংস্কার সাদরে গ্রহণ করিলেন, এবং বলিলেন, বাকী ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন যখন তোমাদের সুবিধা হইবে তখনই দিও। একেবারে না পার, কিস্তী-বন্দী করিয়া দিও—তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু গরমদল বলিলেন, যাহা আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য, সে সবটা একেবারে চাই, এবং তাহা এখনই দিতে হইবে—বিলম্ব সহ্য হইবে না।

কিন্তু ১৯১৪ সালে ইয়োরোপে মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইবার পর সমগ্র পৃথিবীর চেহারা একেবারে বদলাইয়া গেল। ইয়োরোপীয় রণক্ষেত্রের কামানের গর্জ্জনে সমস্ত পৃথিবী জাগিয়া উঠিল। সকলেই নিজের নিজের অবস্থা বুঝিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। দেশে বিদেশে ব্যাঙের ছাতার মত রাজনীতিক দল ও রাজনীতিক সভাসমিতি গজাইয়া উঠিতে লাগিল। ভারতেরও কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল। ভারতেও বহু রাজনীতিক দলের সৃষ্টি হইল। কেবল তাহাই নহে। এ দেশের বহু সম্প্রদায় ও জাতি নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষার্থ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সকলেই নিজ নিজ দাবী পেশ করিতে আরম্ভ করিল। তখন মিঃ মন্টেগু ছিলেন আমাদের ভারত-সচিব। তিনি সকল দলকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য, সকল দলের দাবী যথাসাধ্য মিটাইবার অভিপ্রায়ে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ডের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া মন্টফোর্ড স্কীম পার্লামেন্টে পাশ করাইয়া লইলেন। তাহার ফলে আমরা পাইলাম—dyarchy ওরফে দোয়ারকি। কিন্তু সকল দলকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে গেলেই কথামালা বা ঈসপ্‌স্ ফেব্‌লসের অশ্ব-বিক্রেতার দশা ঘটে। এক্ষেত্রেও তাহাই হইল—নূতন সংস্কৃত শাসন-ব্যবস্থায় কেহই বড় একটা সন্তুষ্ট হইতে পারিল না।

সিপাহী-বিদ্রোহের পর মহারাণীর ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা-বাণী হইতে আরম্ভ করিয়া বৃটিশ-রাজ ও বৃটিশজাতি ভারতবাসীকে অনেক আশার বাণী শুনাইয়াছেন। কিন্তু সেগুলি কার্য্যে পরিণত হয় নাই—দেশের লোকের মনে এই ধারণা ক্রমে দৃঢ়মূল হইতেছিল। এমনি সময়ে আমাদের সম্রাট ভারত-ভ্রমণে আসিয়া দিল্লীর দরবারে ভারতবাসীকে আবার আশার বাণী শুনাইয়া গেলেন। রাজমুখ-নিঃসৃত সেই স্বরাজের বাণী শুনিয়া ভারতবাসী আবার আশ্বস্ত হইল। তার পর বিলাতী গবর্মেণ্ট সম্রাটের উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া আমাদিগকে স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার দিতে চাহিলেন। দিল্লীতে বড়লাট বাহাদুরও তাহার প্রতিধ্বনি করিলেন। তখন ভারতের সকল দলকে সম্মিলিত করিয়া, একবাক্যে, তাহাদের জন্মগত অধিকার—পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনের দাবী করিবার প্রস্তাব হইল। বড়লাট বাহাদুর ভারত-সচিবের উক্তর প্রতিধ্বনি করিয়া ভারতবর্ষকে স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এই—আমি আমার কাউন্সিলের কাছে দুইটী প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলাম (১) ভারতে বৃটিশ শাসনের চরম লক্ষ্য কি? এবং (২) সেই লক্ষ্যে পৌঁছিবার পন্থা কি? সে লক্ষ্য হচ্চে—ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত থাকিয়া নিজেদের শাসন-কার্য্য নিজেরাই নির্ব্বাহ করিবে। আর সে লক্ষ্যে পৌঁছিবার পন্থা তিনটি—(১) গ্রাম্য, পল্লী, সহর ও মিউনিসিপ্যাল স্বায়ত্ত শাসন; (২) সরকারী কার্য্যে অধিক সংখ্যায় ভারতবাসীর নিয়োগ; এবং (৩) ব্যবস্থাপক সভা।

বৃটিশজাতির উপর ভারতবাসীর কোন বিদ্বেষ নাই; কিন্তু ভারত-শাসন-ব্যবস্থাতেই তাহাদের যত আপত্তি। এখন কর্তৃপক্ষের মুখে এই আশ্বাসবাণী শুনিয়া ভারতবাসী মনে করিল, শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে। এ বিষয়ে দেশবন্ধুর মতামত জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি উত্তর দেন, না, হইবে না। ১৯১৭ সালের ৭ই অক্টোবর অন্তরীণের প্রতিবাদ কল্পে একটী জনসভায় চিত্তরঞ্জন এই ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন, বৃটিশ গবর্মেণ্ট তাঁহাদের ভারত-শাসন-নীতি বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহারা বুঝিয়াছেন, কোন না কোন আকারে ভারতকে স্বায়ত্ত-

চতুর্থী শ্রাদ্ধ

[Photo by—D. Ratan & Co.
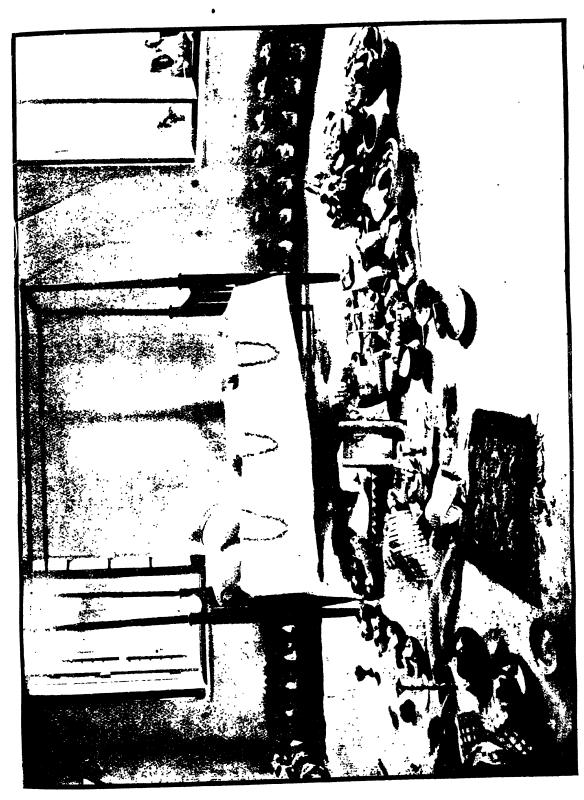
শাসন না দিলে আর চলিতেছে না; সাম্রাজ্য-রক্ষার্থ ভারতে কোন রকম দায়িত্বমূলক শাসনের প্রবর্ত্তন করা আবশ্যক; এবং বড়লাট বাহাদুর বলিয়াছেন, এই সন্ধিক্ষণে ভারতবাসীর শান্ত সংযত থাকা আবশ্যক। তখন, জনমতের বিরুদ্ধে এই এতগুলি লোককে অন্তরীণে আবদ্ধ করিয়া রাখা কি ঠিক? ইহাদিগকে এমন একটা আইনের দোহাই দিয়া আটকাইয়া রাখা হইয়াছে, যে আইন বিলাত ও ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা বেআইনী আইন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। যে আইনের বলে এই সকল লোককে আটক করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহাদের আটকের কারণ অন্যবিধ—উক্ত আইনের বহির্ভূত ব্যাপার।

পরে যখন কলিকাতা টাউন হলে ১৯১৮ অব্দের ৫ই মার্চ্চ আবার অন্তরাণ-প্রতিবাদ-সভা হয়, সেখানেও দেশবন্ধু পুনরায় দেশবাসীকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, গবর্মেণ্টের মত বদলায় নাই—বিপ্লববাদের কারণানুসন্ধানের তাঁহারা কোন চেষ্টাই করেন নাই। দেশবন্ধু আরও বলেন—আমি ইহাদের (বিপ্লববাদীদের) কথা অন্য লোকের অপেক্ষা অনেক বেশী জানি। আমি বিপ্লববাদীদের অনেক মামলায় তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছি। আমি তাহাদের মনের ভাব সবিশেষ অবগত আছি। আমি জানি, বিপ্লববাদের একমাত্র কারণ—স্বাধীনতা লাভের স্পৃহা। আমাদের শিক্ষিত যুবকেরা দেখিতেছে—পৃথিবীর সকল জাতিই স্বাধীন। তাহারা অন্যান্য জাতির অবস্থার সঙ্গে নিজেদের অবস্থার তুলনা করে ও আপনা আপনির মধ্যে বলাবলি করে—আমরা কেন পরাধীন থাকিব? আমরাও স্বাধীনতা চাই। যৌবনোচিত উৎসাহ, উদ্যম, উদ্দীপনায় তাহারা অনুভব করে যে, তাহাদের নিজেদের দেশের শাসন-ব্যাপারে তাহাদের নিজেদের ন্যায়সঙ্গত অংশ গ্রহণ করিবার কোন সুযোগ তাহাদিগকে দেওয়া হয় নাই, তাহাদের জাতীয় জীবন নিয়ন্ত্রিত করিবার কোন সুযোগ তাহারা পায় নাই। আজ তাহাদের সেই অধিকার দাও,—আর তোমাদিগকে বিপ্লববাদের কথা শুনিতে হইবে না। দাও—দাও—দাও তাহাদিগকে সেই অধিকার। ডাকিয়া বল এ দেশের লোকদের যে, 'এই নাও তোমাদের প্রার্থিত অধিকার। আমরা শাসন প্রণালী বদলাইতে চাই। গবর্মেণ্ট এখন তোমাদের হইল। তোমরা শাসনভার গ্রহণ কর, নিজেরা নিজেদের দ্বারা শাসিত হও। দেশের মঙ্গলজনক কাজ কর। তোমাদের জাতি গঠন করিয়া লও। তোমাদের ইতিহাসের গতি নূতন পথে পরিচালিত কর।' এই অধিকার দেওয়া হইলে, আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, বিপ্লববাদের অস্তিত্ব থাকিবে না।

যুদ্ধের জন্য তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী মহাশয় যখন ভারতবর্ষ হইতে আরও সৈন্য চাহিলেন, তখন, মিঃ দাশ পুনর্ব্বার অন্তরীণগণকে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। তাঁহার নিজের কথা এই—তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও; তাহাদিগকে বুঝিতে দাও যে এটা তাহাদেরই দেশ। এ দেশের গবর্মেণ্ট তাহাদের কথা ভাবে।—তোমরা কি মনে কর যে, যে দেশের লোক বহু বৎসর ধরিয়া রাজনীতিক অধিকার লাভের জন্য সংগ্রাম করিতেছে, যে দেশে প্রত্যেক বারই তাহাদের প্রার্থনা ঘৃণার সহিত নামঞ্জুর হইয়াছে—সেই দেশে—তোমরা কি মনে কর, উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি না করিয়া—তাহাদিগকে এই কথা অনুভব না করাইয়া যে, তাহারা নিজেদের জন্যই যুদ্ধ করিতেছে—তোমরা প্রচুর সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিবে? তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও; তার পর দেখ, বাঙ্গলা দেশ কত না সৈন্য তোমাদিগকে দিতে পারে। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি ছয় মাসের জন্য ব্যারিষ্টারী ব্যবসা ছাড়িয়া দিব, এবং সমস্ত দেশ ঘুরিয়া দেশের লোককে হাজারে হাজারে সেনাদলে যোগ দিতে অনুরোধ করিব। কিন্তু তাহা ত হইবার নয়। ব্যুরোক্রাসি দেশের লোককে সন্দেহ করেন যে। আমরা পুনঃ পুনঃ গবর্মেণ্টকে জানাইয়াছি—বলিতে বলিতে আমাদের গলা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—আমি এখনও আবার বলিতেছি—যে, আমি এ দেশের লোকদের জানি। এ দেশে এমন একজনও বিপ্লববাদী নাই, যে অপর একটা বিদেশী শক্তিকে এ দেশে আনিতে ইচ্ছা করে। আমরা এখানে আমাদের কর্ত্তব্য পালন করিতে আসিয়াছি। তোমরাও তোমাদের কর্ত্তব্য পালন কর; অগ্রসর হইয়া এস; তোমাদের জাতিগত কুসংস্কার ও স্পর্দ্ধা ভুলিয়া যাও—আমাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াও; আমাদের হাতে হাত দাও। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা আমাদের রাজনীতিক অধিকার লাভের সংগ্রাম মুলতুবা রাখিব। আমি আগামী কল্যের—আমাদের

ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন দেখিতে থাকিব—এবং আমাদের উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করিব। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কথা আর আমি মনে রাখিব না—ভুলিয়া যাইব। আমি নীরবে ধৈর্য্যসহকারে অপেক্ষা করিব। আমাদিগকে যে কোন ত্যাগ স্বীকার করিতে বলিবে, তাহাই আমরা করিব।

গবর্মেণ্ট মিঃ দাশের এই আবেদনের উত্তরে কিছুই বলেন নাই।

ভারতের আদর্শ কি হওয়া উচিত, তাহা দেশবন্ধু তাঁহার খণ্ডন হইবে না। ব্যক্তিগত ভাবে কাহারও উপর আমার আক্রোশ নাই। আমি বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীর বিরোধী। ইহা মন্দ প্রণালী। এক সময় হয় ত ইহার প্রয়োজনীয়তা ছিল। সে প্রয়োজন এখন আর নাই—এ প্রণালীর কাজ শেষ হইয়াছে। এখন ইহা আমাদের পরিণতির পক্ষে অন্তরায় হইয়া পড়িয়াছে। যাহাই আমাদের জাতিগঠনের বিরোধী হইবে, তাহাকেই আমি মন্দ বলিতে কুণ্ঠিত হইব না। এখন এই শাসন-প্রণালী বদলাইবার সময় আসিয়াছে।
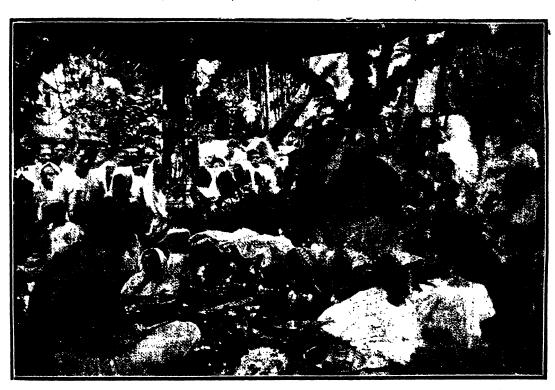
বৃষোৎসর্গ বেদী

[Photo by—Mr. T. P. Sen.

বহু বক্তৃতায় বিবৃত করিয়াছেন। শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা মোটামুটি এইরূপ ছিল যে, এমন শাসন ব্যবস্থা চাই, যাহার দ্বারা সরকারী কর্ম্মচারীরা দেশের শাসিত প্রজাবর্গের কাছে দায়ী থাকিবেন। যে শাসন সংস্কারে এরূপ ব্যবস্থা না থাকিবে, তাহার আলোচনা করিয়া কোন ফল নাই। ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে মৈমনসিংহের বক্তৃতায় তিনি এই কথাই বলিয়াছেন—সমগ্র সিবিল সার্ভ্বিসে বাঙ্গালী নিয়োগ করিলেই আমার আপত্তির

১৯১৭ অব্দের ৭ই অক্টোবর কলিকাতার জনসভায় তিনি বলিয়াছিলেন, যে শাসন-ব্যবস্থায় ভারতের কোটী কোটী প্রজার কোন অংশ নাই, সে শাসন-প্রণালী যত ভালই হউক না কেন, আমি তাহা চাই না। স্বায়ত্ত-শাসন বা 'হোম রুলে'র নাম করিয়া একটা ব্যুরোক্রাসির বদলে আর একটা ব্যুরোক্রাসি দিতে চাহিলে আমি তাহা লইব না। দেশীই হউক আর বিলাতীই হউক, ব্যুরোক্রাসি চিরকাল ব্যুরোক্রাসিই থাকিবে। ব্যুরোক্রাসি আমরা

চাই না। আমরা চাই 'হোমরুল'—গণশাসন। এই শাসনে দেশের প্রত্যেক লোকের অংশ থাকিবে—প্রত্যেকের কথা বলিবার, মত প্রকাশ করিবার অধিকার থাকিবে। ভারতের কোটী কোটী প্রজার ইচ্ছানুসারে দেশের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ হইবে—এমন 'হোমরুল' আমি চাই। ভারতে যাহারা বাস করিতে আসিয়াছে—জাতি বর্ণ ধর্ম্ম নির্ব্বিচারে তাহাদিগকেই ভারতবর্ষ সাদরে স্থান দিয়াছে। ভারতের ইতিহাসে এ কথা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। সুতরাং ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন—গণশাসন প্রবর্ত্তিত হইলে—জনসংখ্যায় যাহারা কম এমন কোন সম্প্রদায়ের ভীত হইবার কারণ নাই।

ভারত-প্রবাসী এ্যাঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় ভারতের মুরুব্বি সাজিয়া যখন তখন লম্বা চওড়া কথায় উপদেশ দেন যে, ভারতবর্ষ এখনও স্বায়ত্তশাসন লাভের যোগ্য হয় নাই—এইটী দেশবন্ধু আদৌ সহ্য করিতে পারিতেন না। কিন্তু ভারতের প্রকৃত হিতকামী ইংরেজদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করিতে তিনি কখনও ইতস্ততঃ করেন নাই।

ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগু যখন ভারতে সংস্কৃত শাসন প্রবর্ত্তন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, তখন পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনাধিকার পাইব ভাবিয়া দেশের লোকে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। মিঃ সি, আর, দাশের দৃঢ় ধারণা ছিল যে, ভারতবর্ষ এখনই পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন লাভের উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে। কিস্তীবন্দী হিসাবে ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া স্বরাজ লাভের প্রতিশ্রুতিতে তিনি আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। তাঁহার বিশ্বাস ছিল—দেশের লোক অশিক্ষিত হইলেও নির্ব্বাচনাধিকার পরিচালনে সমর্থ। বর্ত্তমান সংস্কৃত শাসন-ব্যবস্থানুমোদিত নির্ব্বাচন ব্যাপারে দেশবন্ধুর ধারণা সত্য বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়াছে। অশিক্ষিত ও অর্দ্ধ শিক্ষিত লোকেরাও যে তাহাদের অধিকারের মর্য্যাদা বুঝিয়াছে, তাহারা যে বিবেচনাপূর্ব্বক উপযুক্ত লোককেই কাউন্সিলের সদস্য পদে নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ, তাহা এই সেদিনকার দুইটী উপনির্ব্বাচন ব্যাপারেই বুঝা গিয়াছে। অর্ডিন্যান্স ও ৩নং রেগুলেশন অনুসারে যে সকল লোক গ্রেপ্তার হইয়া বন্দী হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যে দুইজন ব্যবস্থাপক সভার সদস্য আছেন, তাঁহাদের স্থলে নূতন লোক নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু নির্ব্বাচকেরা আবার সেই দুইজনকেই তাহাদের প্রতিনিধি বলিয়া নির্ব্বাচিত করিয়াছে।

শাসনসংস্কার দেওয়া যখন স্থির হইল, তখন, কি চাহিতে হইবে, কি লইতে হইবে, কি বর্জ্জন করিতে হইবে—এ সকল কথা দেশবন্ধু ১৯১৭ সালের ১১ই অক্টোবর ঢাকায় একটা বড় সভায় স্পষ্ট বাক্যে দেশের লোককে বুঝাইয়া দেন। সেটা অপর কিছু নয়—শুধু দায়িত্বমূলক শাসন। তিনি সকল দলকে মিলিত হইয়া একবাক্যে এই দাবী করিবার পরামর্শ দেন। তাঁহার প্রধান দাবী ছিল—প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য। প্রত্যেক প্রদেশের বিশেষত্ব অনুযায়ী স্বতন্ত্র আদর্শে স্বতন্ত্র শাসন ব্যবস্থা হওয়া উচিত—ইহাই ছিল তাঁহার মত। পল্লী গঠন এবং পল্লীবাসীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার এই শাসনের প্রধানতম কর্ত্তব্য। কেবল ধনী জমিদারদের লইয়া শাসন করিলে চলিবে না—দরিদ্রতম গ্রামবাসীদেরও শাসনাধিকার দিতে হইবে।

দেশবন্ধু এক দিকে যেমন প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী ছিলেন, পক্ষান্তরে, তিনি সমগ্র ভারতের এক জাতীয়তার কথাও ভুলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠসূত্রে আবদ্ধ হইতেছে—সমগ্র ভারতে এক বিরাট ভারতীয় জাতি গড়িয়া উঠিতেছে—এ কথাটি ভুলিলে চলিবে না। প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট সমূহের যোগসূত্র স্বরূপ একটী কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট বা রাষ্ট্রীয় গবর্মেণ্টও চাই। এইটী হইলে আর সমগ্র ভারতের এক জাতীয়ত্ব উপেক্ষিত হইবে না। প্রত্যেক প্রদেশের যেমন এক একটী বিশেষত্ব আছে, তদ্রূপ সম্মিলিত ভাবে সমগ্র ভারতেরও একটা বিরাট বিশাল বিশেষত্ব রহিয়াছে। এই কথাটি তিনি সকলকে বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখিতে বলিয়াছেন। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের লোককে এক একটী স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া ধরিলেও, এবং ইহাদের পরস্পরের মধ্যে নানা প্রকারে যথেষ্ট পার্থক্য থাকিলেও, সমষ্টি হিসাবে তাহারা একটী মাত্র ভারতীয় জাতি। বিদেশে তাহারা বাঙ্গালী নয়, বিহারী নয়, ওড়িয়া নয়, মান্দ্রাজী নয়, সিন্ধী নয়, পাঞ্জাবী নয়—তাহারা শুধু ইণ্ডিয়ান, আর কিছু নয়। প্রদেশবাসী হিসাবে যথেষ্ট

পার্থক্য থাকিলেও ভারতবাসী হিসাবে আমাদের মধ্যে ঐক্যও কম নয়। আমাদের শিক্ষা, সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, আচার-ব্যবহার অনেকটাই একই প্রকার। যুগযুগান্ত ধরিয়া ভারতের ইতিহাস সমগ্র ভারতের এক-জাতীয়ত্বের পরিচয় দিয়া আসিতেছে। বিভিন্ন দেশের তুলনায় ভারতেও সেইরূপ একটী ইম্পীরিয়াল ফেডারেটেড গবর্মেণ্ট থাকা আবশুক।

মিঃ দাশ দেশবাসীকে সাহস পূর্ব্বক তাহাদের দাবী পেশ করিতে উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন, যাহারা চাহিতে জানে, চাহিতে পারে, তাহারাই পায়। যাহারা চাহিতে জানে না, চাহিতে পারে না, তাহারা পায়ও না, পাইবার যোগ্যও নয়।

অধিকার আমাদিগকে লাভ করিতেই হইবে। অধিকার লাভের জন্ম দাবীও করিতেই হইবে। এবং সেজন্ম সংগ্রামও চালাইতেই হইবে। দাবী যতদিন না পূর্ণ মাত্রায় পূরণ হয়, তত দিন দাবী করিতে, রাজনীতিক সংগ্রাম চালাইতে ছাড়িব না। দাবীর সঙ্গতি অসঙ্গতির বিচার আমরা করিব না। এ দাবী অসঙ্গত, ইহা গবর্মেণ্ট পূরণ করিবেন না, অতএব এ দাবী করা বৃথা; এ দাবী সঙ্গত, গবর্মেণ্ট ইহা পূর্ণ করিতেও পারেন, অতএব এই দাবী করিব—এ সকল বিষয়ের বিচারের ভার আমাদের নহে—গবর্মেণ্টের। গবর্মেণ্ট কি দিবেন, কি দিবেন না—তাহা তাঁহারা বুঝিবেন। আমাদিগকে কেবল বুঝিয়া দেখিতে হইবে, কিসে আমাদের জাতির পরিপুষ্টি হয়। তদনুসারে আমরা আমাদের দাবী নিয়ন্ত্রিত করিব। আর সে দাবী ভারত গবর্মেণ্টের কাছে করিলেও চলিবে না—ভারতের ব্যুরোক্রাসী আমাদিগকে সারবান কিছুই দিবেন না।

শ্রাদ্ধবাসর

[Photo by—Mr. T. P. Sen.

যতবার আমাদিগকে অধিকার দিবার কথা উঠিয়াছে, ততবারই ব্যুরোক্রাসী তাহাতে বাধা দিয়া প্রস্তাব পণ্ড করিয়া দিয়াছেন। আমরা বিলাতে গিয়া খোদ বৃটিশ জাতির কাছে দাবী করিব। আমাদের প্রতিনিধিরা বিলাতে গিয়া বৃটিশ জাতিকে বলিবে, আমরা ভারতীয় জাতি গঠন করিতে চাই। আমাদিগকে তদুপযোগী শাসন ব্যবস্থা দাও। আমাদিগকে মানুষ হইতে দাও। আমাদিগকে আত্মনির্ভরশীল হইতে হইবে। আমরা অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে যাইব না। যাহা আমাদের জন্মগত, ন্যায়-

সঙ্গত অধিকার, আমরা তাহারই দাবী করিব। এ বিষয়ে কেহই আমাদিগকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না।

যুক্তিমূলক তর্কে মিঃ দাশ অদ্বিতীয় ছিলেন বলিলেই হয়। কি হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারি ব্যবসায় পরিচালন কালে, কি রাজনীতি-ক্ষেত্রে, তর্ক উপস্থিত হইলে মিঃ দাশের প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিতে হইত।

রিফর্ম্ম এ্যাক্ট অবশেষে যখন পার্লামেন্টে পাশ হইয়া গেল, তখন মহাত্মাজী ও অন্যান্য নেতারা আইনটিকে সফল করিবার জন্য গবর্মেন্টের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু, ইহা মিঃ দাশের দাবীর সমতুল্য নহে বলিয়া তিনি গোড়া হইতেই ইহার বিরোধী হইলেন।

তার পর অবস্থার গতিকে অসহযোগ আন্দোলন উপস্থিত হইল। মিঃ দাশ তৎক্ষণাৎ তাহাতে যোগ দিলেন। এবং কি ভাবে অসহযোগ করিতে হইবে, তাহাও এই ভাবে বুঝাইয়া দিলেন যে, গবর্মেন্টের শাসন ব্যাপারে আমরা কোনরূপ সাহায্য করিব না। উকীলরূপে, ডাক্তাররূপে, কেরানীরূপে, পুলিশকর্ম্মচারীরূপে, জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে আমরা এ যাবৎ শাসন ব্যাপারে সাহায্য করিয়া আসিতেছি। এ সকলই আমাদিগকে বন্ধ করিতে হইবে।

তিনি নিজে তাঁহার কথা অনুসারে কাজ করিয়াছিলেন। অসহযোগ ব্রত গ্রহণ করিবার পর হইতে তিনি আর কোন নূতন মামলা গ্রহণ করেন নাই। যে সকল নূতন মামলা তাঁহার হাতে আসিয়াছিল, সমস্তই তিনি ফিরাইয়া দিয়াছিলেন।

চিত্তরঞ্জন এমন ধাতুতে গড়া ছিলেন যে, যখনই যে কাজে হাত দিতেন, তাহাতে সম্পূর্ণরূপে আত্মবিনিয়োগ করিতেন। কোন কাজ তিনি অসম্পূর্ণ রাখিয়া ছাড়িয়া দিতেন না, কাজে কোন ত্রুটিও থাকিতে দিতেন না। অসহযোগ ব্রত গ্রহণ করিবার পর তিনি ব্যারিষ্টারী ছাড়িয়া দিলেন, অহিংসা ব্রত প্রচার করিতে লাগিলেন, এবং চরকার মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। স্বর্গীয় উপাধ্যায় মহাশয় যখন সন্ধ্যার সাপ্তাহিক সংস্করণ হিসাবে "স্বরাজ" পত্র বাহির করিতে আরম্ভ করেন, তখন তিনি স্বরাজ শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন—আপনাতে আপনি বিরাজ করার নাম স্বরাজ। চিত্তরঞ্জনও ঠিক ঐ কথাই বলিয়া গিয়াছেন। লোকে যখন তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিল—চরকা কেমন করিয়া আমাদিগকে স্বরাজ দিতে পারে? তখন তিনি বলিলেন, স্বরাজ অর্থে আপনাতে আপনি বিরাজ করা। আমরা আজ গোলামীতে পরিপক্ক হইয়া উঠিয়াছি। আমাদের বাণিজ্যঘটিত গোলামী রাজনীতিক গোলামীর অপেক্ষা অনেক বড়। আজ যদি ম্যাঞ্চেষ্টার বা লঙ্কাসায়র বস্ত্র পাঠাইতে বিরত হয়, তাহা হইলে এদেশের নরনারীকে উলঙ্গ থাকিতে হইবে। ইহা যে কত বড় পরাধীনতা, কত বড় গোলামী তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। আগে এই গোলামীর শৃঙ্খল ভাঙ্গিতে হইবে। যদি আমরা একবার বাণিজ্যগত স্বাধীনতা লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই, যাহা আমাদের বাণিজ্যোন্নতিতে বাধা দিতে পারে। এই স্বাধীনতা লাভ করিবার এক মাত্র উপায় চরকা। আমরা জনে জনে চরকায় সূতা কাটিব, সেই সূতায় কাপড় বুনিয়া পরিব—বস্ত্রের জন্য ম্যাঞ্চেষ্টারের বা লঙ্কাসায়রের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিব না। আমরা আপনাতে আপনি বিরাজ করিব; নিজেদের সকল অভাব নিজেরাই পূরণ করিব। ইহাই আমাদের স্বরাজ।

অসহযোগ ও চরকা পরস্পরের সঙ্গে এমন অঙ্গাঙ্গী ভাবে বিজড়িত যে, একটাকে ছাড়িয়া আর একটাকে ধরিয়া রাখা যায় না। অসহযোগ ব্রত বড় কঠিন। পূর্ণ ভাবে অহিংস ভাব রক্ষা করিতে না পারিলে এ ব্রত রক্ষা করাও অসম্ভব। সেইজন্য দেশরঞ্জন চিত্তরঞ্জন দেশবাসীকে পুনঃপুনঃ অহিংস থাকিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার মত ছিল খুব স্পষ্ট। কার্য্যে অহিংস ভাব বজায় রাখিলেই তাঁহার বিবেচনায় যথেষ্ট ছিল না—কায়মনোবাক্যে অহিংস হইতে হইবে—ইহাই ছিল তাঁহার উপদেশ। মনে মনে হিংসার ভাব পোষণ করাও তিনি অন্যায় বিবেচনা করিতেন। সে কালের মুনিঋষিদের ব্রত ভঙ্গ করাইবার জন্য উদ্যোগ আয়োজন বড় কম হইত না। প্রলোভনও বড় কম দেখানো হইত না। সে সব প্রলোভন সকলে জয় করিতে পারিতেন না—কাহারও কাহারও পদস্খলন হইত। এ যুগের অহিংস অসহযোগীদের ব্রত ভঙ্গেরও বড় কম চেষ্টা হয় নাই। সেইজন্য চিত্তরঞ্জন উপদেশ দিয়াছিলেন যে, even under provocation অর্থাৎ উত্তেজনার কারণ ঘটিলেও অহিংস থাকিতে হইবে।

অসহযোগীদের উপর অনেক অন্যায় অত্যাচার হইতেও পারে; তথাপি কেহ হিংসা করিও না। জেলে যাইতে হইবে, অনেক বিপদে পড়িতে হইবে; কিন্তু কোন বিপদেই বিচলিত হওয়া চলিবে না—সমস্তই অম্লান বদনে সহ্য করিতে হইবে। পড়িয়া মার খাইতে হইলেও অসহযোগীরা বাধা দিতে পারিবে না; দিলেই ব্রত ভঙ্গ হইবে। এইরূপে কঠোর সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে পারিলে তবে যথার্থ দেশসেবা করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারা যাইবে।

তাঁহার পতাকাতলে আসিয়া সমবেত হইল, তখন তিনি তাহাদিগকে ন্যাশনাল কলেজে ভর্ত্তি করিয়া লইলেন, এবং কলেজের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নিজের সমস্ত সম্পত্তির আয় অর্পণ করিলেন। সে এক দিন গিয়াছে। সে কি উৎসাহ! কি উদ্দীপনা! সে দৃশ্য যে দেখিয়াছে সে কখনও ভুলিতে পারিবে না।

সকল দেশেই ভবিষ্যতের আশা ভরসার স্থল ছাত্রসমাজ। সেই জন্য রাজনীতিকেরা দেশের কাজের জন্য ছাত্রদিগের উপর অনেকাংশে নির্ভর করিয়া থাকেন।

স্মৃতি-তর্পণ—বিরাট জনসমুদ্রে

[Photo by—Mr. T. P. Sen.

অসহযোগ ব্রত যাহাতে পূর্ণরূপে পালিত হয়, সে দিকে চিত্তরঞ্জনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। কাউন্সিল বর্জ্জন, ওকালতী বর্জ্জন, স্কুল কলেজ বর্জ্জন প্রভৃতি ছিল অসহযোগের অঙ্গ। চিত্তরঞ্জন নিজে ব্যারিষ্টারী ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তার পর তিনি ছাত্রসমাজকে স্কুল কলেজ বর্জ্জন করিতে আহ্বান করিলেন। ছাত্রসমাজ সে আহ্বানে কেমন সাড়া দিয়াছিল, তাহা জানিতে আজ বোধ হয় কাহারও বাকী নাই। ছাত্রেরা যখন কলেজ ছাড়িয়া

ছাত্রগণকে দেশসেবার উপযুক্ত করিতে হইলে তাহাদিগকে মানুষ গড়িয়া লইতে হয়। আমাদের দেশে মনুষ্যত্ব শিক্ষার ও স্বরাজ লাভের উপাদান চরকা বলিয়া স্থির হইয়াছে। জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এদেশের ছাত্রসমাজকে হাতে পাইয়া তাহাদিগকে লইয়া মানুষ গড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন। জাতীয় শিক্ষার প্রথম পাঠ হইল ছেলেদের চরকা ঘোরানো। সে জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু অন্যান্য বিদ্যালয়ের অনেকগুলিতে

এখন চরকা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং আশা করা যায়, আমাদের ছেলেরা একেবারে অমানুষ হইবে না—অন্ততঃ তাহাদের কিয়দংশ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিবে। এবং আমাদের স্বরাজ লাভের আশাও আকাশকুসুমে পরিণত হইবে না।

কিন্তু সে কত দিনে? সে অবশ্য আজ নয়; হয় ত কালও নয়। সে কাজে অবশ্যই কিছু সময় লাগিবে। হয় ত আমরা বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে তাহা দেখিয়া যাইতে পারিব না। সাধারণ মানুষ এরূপ অবস্থায় নিরাশ হইতে পারেন। কিন্তু চিত্তরঞ্জন নিরাশ হইবার লোক ছিলেন না। ভবিষ্যতে স্বরাজ লাভের আশায় তিনি কতখানি আশান্বিত ছিলেন, তাহা তিনি স্বয়ং একটী বক্তৃতায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন; বলিয়াছেন—আমার অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক না কেন, তাহাতে কিছুই যায় আসে না। বর্ত্তমান যুগের মানুষের অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক না কেন, তাহাতেও কিছু আসে যায় না। আজিকার শিক্ষিত সমাজের অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক, তাহাতেও বিচলিত হইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমার একমাত্র কামনা—জাতিকে মানুষ গড়িয়া তোলা। আমি সেই সময়ের দিকে চাহিয়া আছি, যখন আমাদের জাতি উত্থিত হইয়া সকল গৌরবমণ্ডিত হইয়া দাঁড়াইবে। সে সময়ে আমি জীবিতই থাকি অথবা মরিয়াই যাই, আমি তাহা গ্রাহ্য করি না। সে সময়ে আমার সন্তানেরা জীবিত থাকুক আর নাই থাকুক, তাহাও আমার গ্রাহ্যের বিষয় নহে। কিন্তু সেই শুভক্ষণ আসিবে, যখন জগদীশ্বরের অনুগ্রহে একটা জাতিরূপে আমরা আমাদের অস্তিত্ব অনুভূত করাইব এবং সকল শক্তির আধাররূপে দণ্ডায়মান হইয়া সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইব। আসিবে সে দিন আসিবে। ইহাই আমার আদর্শ। আমি আমার জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তে এই আদর্শ লক্ষ্য করিয়া চলিতেছি। আমি আমার অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতেছি, ইহাই আমার জন্য নির্দ্ধারিত কাজ। এই কার্য্য সাধনের জন্য আমার যা কিছু আছে সে সমস্তই আমি বিনিয়োগ করিব। আর এই চেষ্টাতেই যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলেই বা কি? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি এই দেশেই আবার—আবার জন্মগ্রহণ করিব। ইহারই জন্য আমি জীবিত থাকিব; ইহারই আশা করিতে থাকিব; আমার সকল জীবনীশক্তি প্রয়োগ করিয়া আমি এই লক্ষ্য সাধনের জন্য সাধনা করিব। যত দিন না আমার আশা পূর্ণ হয়, যত দিন না আমার আদর্শ লাভ হয়, তত দিন আমি সাধনায় বিরত হইব না।

কি পরিপূর্ণ আশা! কি জলন্ত বিশ্বাস! কি নিঃস্বার্থপরতা! ভবিষ্যতে লক্ষ্য সিদ্ধির আশা না থাকিলে মানুষ কোন কাজই করিতে পারে না। আমার অবর্ত্তমানে যদি আমার লক্ষ্যসিদ্ধি হয়, তবে আমি তাহার অমৃতময় ফল ভোগ করিতে না পারিলেও আমার জাতি ত তাহা ভোগ করিবে! তাহা হইলেই তাহা আমারও ভোগে আসিল। নিজেকে জাতির মধ্যে এমনি করিয়া মিশাইয়া বিলাইয়া দিতে না পারিলে বুঝি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ হওয়া যায় না!!! স্বর্গীয় উপাধ্যায়ও মৃত্যুর অল্প দিন পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছিলেন—আমি আবার আসিব! আবার এই দেশেই জন্মগ্রহণ করিয়া আমার চিরাকাঙ্ক্ষিত স্বরাজ-ফল ভোগ করিব! তিনি আবার আসিয়াছেন কি না জানি না; যদি না আসিয়া থাকেন, আসিবেন যে নিশ্চয়, এ বিশ্বাস আমাদের আছে। চিত্তরঞ্জন আজ নাই! কিন্তু তিনিও আবার আসিবেন—এ কথা আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি।

ফরিদপুরের প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপতিরূপে চিত্তরঞ্জন যাহা বলিয়াছিলেন, সেই তাঁহার শেষ কথা। তাহার পরই তিনি দারজিলিং চলিয়া গেলেন, আর ফিরিলেন না। তাঁহার সেই শেষ বাণী উদ্ধৃত করিয়া দিয়াই আজ আমরা চিত্তরঞ্জনের রাজনীতির কথা আপাততঃ শেষ করিব।

ফরিদপুরে তিনি বলিয়াছিলেন—"জাতীয়তা একটা উপায়—যাহা অবলম্বন করিয়া মানবাত্মা গতি-মুখে ক্রমে ক্রমে উৎকর্ষতা লাভ করিতে পারে। জাতীয়তার বিকাশ এই জন্য প্রয়োজন যে—ইহার মধ্য দিয়া সমগ্র মানবজাতি উত্তরোত্তর উন্নতির পথে আরোহণ করিতে পারে। জাতীয়তাই শেষ কথা নয়। এবং আমি তোমাদিগকে বিনয় করিয়া বলিতেছি যে, যখন তোমরা মিলনের সর্ত্ত-গুলিকে বিবেচনা করিবার জন্য আহূত হইব—তখন জাতীয়তার গৌরবে অন্ধ হইয়া সমগ্র মানবজাতির যে

ভিটের মায়া

শিল্পী—শ্রীযুক্ত চারু সেন

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

ভারতবর্ষ

ভাদ্র, ১৩৩২

প্রথম খণ্ড | ত্রয়োদশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

জীব ও ঈশ্বরের ভেদ ও অভেদ

আচার্য্য শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ

বহু দিন হইতেই শুনিতেছি যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় জীব ও ঈশ্বরের অচিন্ত্যভেদাভেদ বাদী; অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত জীবের তত্ত্বতঃ ভেদ ও অভেদ উভয়ই আছে; এবং সেই ভেদ ও অভেদ অচিন্ত্য অর্থাৎ তর্কের অগোচর। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের ব্যাখ্যাতা সুপণ্ডিত বৈষ্ণবগণও ঐ কথাই বলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আধুনিক টীপ্পনীকারগণও ঐ ভাবের কথাই লিখিয়াছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার সম্প্রদায়রক্ষক গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিকগণ মধ্বাচার্য্যের মতানুসারে জীব ও ঈশ্বরের ঐকান্তিকভেদবাদী। মধ্বাচার্য্যের ন্যায় তাঁহারা জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদ স্বীকার করেন নাই, প্রত্যুত স্বরূপতঃ ভেদই স্বীকার করিয়াছেন। পরে ইহার কারণ বলিব। এক্ষণে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিকগণ যে অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদী—ইহা কিরূপে বুঝা যায়? এ বিষয়ে মাননীয় গোস্বামী পণ্ডিতগণের কথা কি—তাহাই প্রথমে আলোচনা করিব।

বহু জিজ্ঞাসা ও বহু অনুসন্ধানের পর একজন অতিবৃদ্ধ বহুদর্শী সুপণ্ডিত গোস্বামী মহোদয়ের নিকটে শুনিয়াছি যে, শ্রীধরস্বামী শ্রীমদ্‌ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকের দ্বিতীয় পাদের টীকায় কল্পান্তরে যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ব্রহ্মরূপ বস্তুর অংশ জীব এবং ব্রহ্মের শক্তি মায়া, ও ব্রহ্মের কার্য্য জগৎ ও এই সমস্ত ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে—এই সিদ্ধান্তই বুঝা যায়। সেই ভাগবতের শ্লোকাংশ এই—"বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্", এবং তাহার টীকা যথা—"যদ্বা বাস্তবশব্দেন বস্তুনোঽংশো জীবঃ, বস্তুনঃ শক্তিঃ মায়া চ, বস্তুনঃ কার্য্যং জগৎ চ, তৎসর্ব্বং বস্তেব, ন ততঃ পৃথক্ ইতি বেদ্যম্ অযত্নেনৈব জ্ঞাতুং শক্যম্ ইত্যর্থঃ।"

এখানে "ব্যাখ্যালেশ"কার শ্রীধরস্বামীর তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়া শ্রীধর স্বামীর মতে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ ও অভেদ উভয়ই যে তত্ত্ব তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। তদনুসারে শ্রীচৈতন্যদেবও জীবেশ্বরের ভেদাভেদবাদী ইহা কথিত হয়। "ব্যাখ্যালেশ" গ্রন্থখানি এখনও মুদ্রিত হয় নাই। আর

শ্রীমদ্ভাগবতাদি অনেক গ্রন্থেই যখন জীবকে ঈশ্বরের অংশ বলা হইয়াছে, তখন জীব ও ঈশ্বরের অংশাংশিভাবে ভেদ ও অভেদ, উভয়ই সিদ্ধান্ত বলিয়া বুঝা যায়।

পরন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য প্রভুপাদ শ্রীজীব গোস্বামী মহাশয় স্বীয় তত্ত্বসন্দর্ভে ব্রহ্মতত্ত্বকে জীবস্বরূপ হইতে অভিন্ন বলিয়াছেন। তিনি পরমাত্মসন্দর্ভে ও শাস্ত্রে জীব ও ঈশ্বরের ভেদনির্দ্দেশ ও অভেদনির্দ্দেশের উপপাদন করিয়াছেন, এবং ইহাও বলিয়াছেন যে, যাঁহারা জ্ঞানলিপ্সু, তাঁহাদিগের জন্যই শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে জীব ও ব্রহ্মের অভেদের উপদেশ আছে, আর যাঁহারা ভক্তিলিপ্সু, তাঁহাদিগের জন্য শাস্ত্রে জীব ও ব্রহ্মের ভেদের উপদেশ আছে। সুতরাং শ্রীজীব গোস্বামীর ঐ সকল কথার দ্বারা তিনি যে জীব ও ব্রহ্মের ভেদের ন্যায় অভেদও স্বীকার করিয়াছেন ইহা বুঝা যায়। তাহার পর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে পাওয়া যায়, শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার প্রিয় ভক্ত শ্রীসনাতন গোস্বামীকে উপদেশ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন—

জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণের দাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥
(ম, খ, ২০ প)

এই শ্লোকে জীবের স্বরূপ বলিতে "ভেদাভেদপ্রকাশ" এই কথার দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের ভেদ ও অভেদ উভয়ই তত্ত্ব এবং ইহাই শ্রীচৈতন্যদেবের সম্মত ইহাই বুঝা যায়। এইরূপে শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার সম্প্রদায়রক্ষক গোস্বামি-পাদগণ জীব ও ব্রহ্মের অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদী—ইহাই প্রসিদ্ধ আছে—আর ইহাই উক্ত অতিবৃদ্ধ গোস্বামিপাদের নিকট আমি শুনিয়াছি।

পূর্ব্বোক্ত কথায় আমার বক্তব্য এই যে, যদিও শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীধরস্বামিপাদকে অমান্য করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি যে, শ্রীধরস্বামিপাদের ব্যাখ্যা ও সমস্ত মতই গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা বলা যায় না। কারণ, শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রথম শ্লোকের টীকায় "তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গো মৃষা" এই তৃতীয় চরণের ব্যাখ্যা করিতে শেষ কল্পে মায়াবাদেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন—ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় এবং শ্রীমদ্ভাগবতের আরও বহু স্থলে তিনি যে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সমর্থিত মায়াবাদ বা অদ্বৈতবাদেরই স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন—ইহা অস্বীকার করা যাইবে না। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব উক্ত মত গ্রহণ করেন নাই। এমন কি তিনি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকটে মায়াবাদের খণ্ডন ও নিন্দা করিতে ইহাও বলিয়াছিলেন -

"মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ"
(চৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য-ষষ্ঠ পঃ)

সুতরাং শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকের টীকায় শেষ কল্পে ভেদাভেদবাদের ব্যাখ্যা করিলেও উহার দ্বারা শ্রীচৈতন্যদেবের মত নির্ণয় করা যায় না। পরন্তু শ্রীধরস্বামিপাদ যে ঐ স্থলে ভেদাভেদবাদেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন—ইহাও আমাদিগের মনে হয় না। তিনি ঐ স্থলে জীবাদির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—"তৎসর্ব্বং বস্ত্বেব ন ততঃ পৃথক্"—এই কথার দ্বারা জীবাদি সমস্তই ব্রহ্মরূপ "বস্তু" হইতে পৃথক্ নহে, অর্থাৎ ব্রহ্মের সত্তা হইতে জীবাদির বাস্তব পৃথক্ সত্তা নাই, এই অদ্বৈতবাদও আমরা বুঝিতে পারি। "বস্ত্বেব" এই বাক্যে "এব" শব্দের দ্বারা যে তাহাই প্রকটিত হইয়াছে—ইহাই মনে হয়। শ্রীধরস্বামিপাদের শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রথম শ্লোকের শেষ কল্পের ব্যাখ্যার সহিত মিলাইয়া দ্বিতীয় শ্লোকের শেষ কল্পের ব্যাখ্যারও ঐরূপ তাৎপর্য্য মনে হয়।

দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, শ্রীমদ্ভাগবতাদি নানা শাস্ত্র গ্রন্থে জীব ঈশ্বরের অংশ, ইহা কথিত হইলেও, তদ্দ্বারা শ্রীচৈতন্য-দেবের মতেও জীব ও ঈশ্বরের যে স্বরূপতঃই ভেদ ও অভেদ উভয়ই আছে, ইহা নিশ্চয় করা যায় না।

কারণ, মধ্বাচার্য্যের মতানুসারে জীব ঈশ্বরের বিভিন্নাংশ হইলে তাহাতে স্বরূপতঃ ঈশ্বরের অভেদ নাই, ইহা বলা যাইতে পারে। যেহেতু তিনি বেদান্ত দর্শনের "অংশো নানাব্যপদেশাৎ" (২।৩।৪৩) ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে প্রথমে জীব ঈশ্বরের অংশ এ বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া, পরে জীব ঈশ্বরের অংশ নহে, এ বিষয়েও শ্রুতিপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া, পূর্ব্বপক্ষ সূচনা করতঃ পরে অন্যান্য শ্রুতি ও বরাহ-পুরাণের বচন প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়া জীব ঈশ্বরের অংশ—ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং জীব ঈশ্বরের অংশ নহে—এতদ্বোধক শ্রুতির উপপত্তির জন্য বরাহপুরাণের "স্বাংশশ্চাথ বিভিন্নাংশ ইতি দ্বেধাংশ ইষ্যতে" ইত্যাদি বচন

উদ্ধৃত করিয়া জীবকে ঈশ্বরের বিভিন্নাংশ বলিয়াছেন এবং মৎস্যকূর্ম্মবরাহপ্রভৃতি অবতারকে ঈশ্বরের স্বাংশ বলিয়াছেন।

তাহার পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে "ভেদাভেদ প্রকাশ" এই কথার দ্বারাও জীব ও ঈশ্বরের যে স্বরূপতঃ ভেদাভেদ সম্বন্ধ তাহা বুঝা যায় না। উহার অর্থ—শাস্ত্রে যেমন জীব ও ঈশ্বরের ভেদ প্রকাশ আছে, তদ্রূপ অভেদেরও প্রকাশ আছে এই মাত্র। আর এই অভেদও তত্ত্বতঃ অভেদ নহে, কিন্তু জীব ও ঈশ্বরের একজাতীয়ত্বপ্রযুক্ত অভেদ। শাস্ত্রে ঐরূপ অভেদ নির্দ্দেশের উদ্দেশ্য আছে। ইহা পরে ব্যক্ত করা যাইতেছে।

পরন্তু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকটে অদ্বৈতবাদখণ্ডন করিতে শ্রীচৈতন্যদেব যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে আছে—

মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন জীবে ঈশ্বর সহ করহ অভেদ॥
গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি মানে।
হেন জীবে অভেদ কহ ঈশ্বরের সনে॥ (ম, খ, ৬প)

ইহাতে জীব ও ঈশ্বরের যে স্বরূপতঃ অভেদ নাই—ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। প্রথম শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বর মায়ার অধীশ অর্থাৎ মায়া তাঁহার অধীন, কিন্তু জীব মায়ার অধীন; সুতরাং জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদ হইতেই পারে না। কারণ, জীবেশ্বরের তত্ত্বতঃ অভেদ থাকিলে ঈশ্বরকেও মায়ার অধীন বলিতে হয়। ঈশ্বরেরও জীবগত দোষের আপত্তি হয়। দ্বিতীয় শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, জীব ঈশ্বরের পরাপ্রকৃতি অর্থাৎ প্রধান শক্তি বলিয়াই ভগবদ্গীতায় কথিত হইয়াছে। সুতরাং তাদৃশ জীবকে ঈশ্বরের সহিত স্বরূপতঃ অভিন্ন বলা যায় না। কারণ, জীব ঈশ্বরের শক্তি হইলে ঈশ্বর আশ্রয় আর শক্তি তাঁহার আশ্রিত। আশ্রয় ও আশ্রিত সর্ব্বত্র স্বরূপতঃ ভিন্ন পদার্থই হয়। অতএব শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ হইতেও জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ভেদ ও অভেদ উভয়ই প্রতিপন্ন হয় না, কেবল ভেদই প্রতিপন্ন হয়।

এখানে আর একটি কথা অবশ্য বক্তব্য এই যে, নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবমহাত্মা শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয় নিম্বার্কভাষ্যের যে বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে ৩৬৫ পৃষ্ঠায় তিনি শ্রীচৈতন্যদেবও যে নিম্বার্ক-মতানুসারে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ভেদাভেদবাদী ছিলেন, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পূর্ব্বোক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় শ্লোকের পরার্দ্ধে "হেন জীবে ভেদ কর ঈশ্বরের সনে?" এইরূপ পাঠ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন পুস্তকে এবং পরে যে বহু বিজ্ঞ গোস্বামি পণ্ডিতগণের সাহায্যে সংশোধনপূর্ব্বক ব্যাখ্যাসহ "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে "হেন জীবে অভেদ কর ঈশ্বরের সনে?" এইরূপ পাঠই আছে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রাচীন পুঁথি-শালায় সংরক্ষিত হস্তলিখিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থেও দেখিয়াছি—হেন জীবে অভেদ কহ ঈশ্বরের সনে" এইরূপ পাঠই রহিয়াছে। উহার লিপিকাল ১০৮০ বঙ্গাব্দ।

বস্তুতঃ ঐ স্থলে প্রণিধান করা আবশ্যক যে, অদ্বৈতবাদী সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীচৈতন্যদেবের নিকটে অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা করিতে জীব ও ঈশ্বরের বাস্তব ভেদ বলেন নাই, বাস্তব অভেদই বলিয়াছেন; সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে "হেন জীবে ভেদ কর ঈশ্বরের সনে?" এইরূপ কথা বলিতে পারেন না, সুতরাং ঐ পাঠ প্রকৃত নহে।

মহাপ্রভু আরও বলিয়াছেন—

কাহা পূর্ণানন্দৈশ্বর্য্য কৃষ্ণ মায়েশ্বর।
কাহা ক্ষুদ্র জীব দুঃখী মায়ার কিঙ্কর॥ (অন্ত্যখণ্ড ৫প)

সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেবের মতে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদেরই নিষেধ করা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের "ভেদাভেদ প্রকাশ" এই কথার দ্বারা শাস্ত্রে ঈশ্বরের সহিত জীবের ভেদপ্রকাশ ও অভেদপ্রকাশ আছে, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ শ্রীজীবগোস্বামী যে "অভেদনির্দ্দেশ" বলিয়া উহার উপপাদন করিয়াছেন, তাহাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে "অভেদপ্রকাশ" বলিয়া কথিত হইয়াছে।

যদি বলা যায়, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে ঈশ্বরকে প্রজ্বলিত অগ্নিসদৃশ এবং জীবকে স্ফুলিঙ্গকণা সদৃশ বলিয়া উল্লেখ আছে, সুতরাং অগ্নিরূপ তত্ত্বাংশে স্বরূপতঃ জীব ও ঈশ্বর অভিন্ন? কিন্তু তাহাও সঙ্গত হইবে না। কারণ, উক্ত গ্রন্থেরই অন্যান্য শ্লোকে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদ নাই—তাহা ইতিপূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে। অতএব ঈশ্বর ও জীবের, অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গের ন্যায় যথাসম্ভব

সাদৃশ্যই বুঝিতে হইবে, অসম্ভব সাদৃশ্য বুঝা যাইবে না। জীবচৈতন্য নিত্য পদার্থ, সুতরাং উহা ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন না হওয়ায় এবং উহার বিনাশ সম্ভব না হওয়ায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সহিত উহার অনেক অংশে সাদৃশ্য সম্ভবও নহে। তাহার পর জীব ঈশ্বরের শক্তিবিশেষ, এ জন্যই জীব ভিন্ন পদার্থ হইয়াও ঈশ্বরের অংশ বলিয়া কথিত হইয়াছে। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও ইহাই বলিয়াছেন। যথা—

"স চ তদ্‌ভিন্নোঽপি তচ্ছক্তিরূপত্বাৎ তদংশো নিগদ্যতে"

ইত্যাদি। সিদ্ধান্তরত্ন ৮ম পাদ।

এবং তিনিও গোবিন্দ ভাষ্যে মাধ্বমতানুসারেই জীবকে ঈশ্বরের বিভিন্নাংশ বলিয়াছেন। আর সেই জন্যই ঈশ্বরের সহিত জীবের স্বরূপতঃ অভেদ নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও ঈশ্বরাবতারগণ তাঁহার স্বাংশ এবং জীব তাঁহার বিভিন্নাংশ ইহা কথিত হইয়াছে, যথা—

স্বাংশবিস্তার চতুর্ব্যূহ অবতারগণ।

বিভিন্নাংশ জীব তাঁর শক্তিতে গণন॥ (মধ্য ২২প)

অতএব জীব ঈশ্বরের বিভিন্নাংশ শক্তিরূপ বলিয়া অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গের ন্যায় জীবেশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদ স্বীকার্য্য নহে। আর স্ফুলিঙ্গ ও অগ্নিতে অগ্নিত্বরূপে অভেদ থাকিলেও তাহাকে ব্যক্তিগত অভেদ বলা যায় না। এইরূপ সূর্য্য ও তাহার প্রভাসম ঈশ্বর ও জীবের সম্বন্ধ, ইহাও বহুস্থলে বৈষ্ণবগ্রন্থে দেখা যায়। কিন্তু তদ্দ্বারাও শ্রীচৈতন্যদেবের মতে যে, জীব ও ঈশ্বরের ব্যক্তিগত অভেদও আছে ইহা বুঝা যায় না। কারণ, মধ্বাচার্য্য জীবকে ঈশ্বরের অংশ বলিয়া স্বীকার করিয়াও যে জীব ও ঈশ্বরের ঐকান্তিক ভেদই সমর্থন করিয়াছেন তাহাই শ্রীচৈতন্যদেবও স্বীকার করিয়াছেন। বেদান্তদর্শনের গোবিন্দভাষ্যকার শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের গ্রন্থের দ্বারাও ইহা আমরা বুঝিতে পারি। গোবিন্দভাষ্যের টীকার প্রারম্ভে আমরা দেখিতে পাই—

"অথ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যহরিস্বীকৃতমধ্বমুনিমতানুসারতো ব্রহ্মসূত্রাণি ব্যাচিখ্যাসু ভাষ্যকারঃ শ্রীগোবিন্দৈকান্তী বিদ্যাভূষণাপরনামা বলদেবঃ" ইত্যাদি।

উদ্ধৃত টীকাসন্দর্ভে প্রথমে মধ্বমুনির মত যে শ্রীচৈতন্যদেবের স্বীকৃত এবং ঐ মধ্বমতানুসারেই শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় বেদান্তদর্শনের ভাষ্য করিয়াছেন—ইহা স্পষ্টই কথিত হইয়াছে—ইহা লক্ষ্য করা আবশ্যক। শ্রীযুক্ত বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় গোবিন্দভাষ্য নির্ম্মাণ করিয়া পরে নিজেই উহার টীকা করিয়াছেন—ইহাই অনেকের ধারণা। ফলকথা বেদান্তদর্শনের গোবিন্দভাষ্য নির্ম্মাণ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সংরক্ষক শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের কথা যে পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে প্রধান প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে—ইহা স্বীকার্য্য। উক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রভুপাদ শ্রীজীব গোস্বামীর "তত্ত্বসন্দর্ভে"র টীকা করিয়াও তাঁহার যে তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও দ্রষ্টব্য।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় শ্রীজীবগোস্বামিপাদের তত্ত্বসন্দর্ভের টীকার প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণের প্রথম শ্লোকে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিয়া দ্বিতীয় শ্লোকে তুল্যভাবে মধ্বাচার্য্যের প্রতিও ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি সেখানে নিম্বার্ক অথবা অন্য কোন বৈষ্ণবাচার্য্যের নামোল্লেখ করেন নাই। শ্রীজীবগোস্বামী মহাশয়ও তত্ত্বসন্দর্ভে "শ্রীমধ্বাচার্য্যচরণৈঃ" ইত্যাদি এবং "তত্ত্ববাদগুরূণাং… শ্রীমধ্বাচার্য্যচরণানাং" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা মধ্বাচার্য্যের প্রতি অত্যাদর প্রকাশ করিয়াছেন। এখানে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই অত্যাদরের কারণ বলিয়াছেন "স্বপূর্ব্বাচার্য্যত্বাৎ"। সুতরাং তাঁহার ঐ কথার দ্বারাও শ্রীজীবগোস্বামী যে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ঐকান্তিক ভেদ বিষয়ে তাঁহার পূর্ব্বাচার্য্য মধ্বমুনির মতই সাদরে গ্রহণ করিয়া সমর্থন করিয়াছেন—ইহা বুঝা যায়। বিদ্যাভূষণ মহাশয়রচিত সিদ্ধান্তরত্নের বিজ্ঞতম টীকাকার মহাশয়ও শেষ শ্লোকের টীকায় শ্রীবলদেবকে "মাধ্বান্বয়দীক্ষিত ভগবৎকৃষ্ণচৈতন্যমতস্থ" বলিয়াছেন। অবশ্য পরতত্ত্ব বিষয়ে মধ্বাচার্য্যের মত হইতে শ্রীচৈতন্যদেবের মত যে কিঞ্চিৎ বিশিষ্ট তাহার বহু প্রমাণ আছে। শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায় প্রভুপাদ শ্রীজীবগোস্বামী প্রভৃতিও গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যমতে কিন্তু বিষ্ণুই পরতত্ত্ব। কিন্তু তাঁহারা জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ কেবল ভেদই আছে—এই মাধ্বমতেরই সমর্থন করিয়াছেন বুঝা যায়। অবশ্য শ্রীজীব গোস্বামী মহাশয় তত্ত্বসন্দর্ভে জীবস্বরূপবর্ণনের পর বলিয়াছেন যে,—

"এবম্ভূতানাং জীবানাং চিন্মাত্রং যৎস্বরূপং তদৈবাকৃত্যা তদংশিত্বেন চ তদভিন্নং যৎতত্ত্বং তদত্র বাচ্যম্ ইতি ব্যষ্টিনির্দ্দেশদ্বারা প্রোক্তাম্।"

অর্থাৎ এবম্ভূত জীবসমূহের চিন্মাত্র যে স্বরূপ, তাহার সজাতীয়ত্ব ও অংশিত্ববশতঃ সেই জীবস্বরূপ হইতে অভিন্ন যে ব্রহ্মতত্ত্ব তাহা এই গ্রন্থে বাচ্য। কিন্তু এই স্থলে ব্রহ্ম জীবের সজাতীয়ত্ব ও অংশিত্ববশতঃই জীব হইতে অভিন্ন ইহাই বলা হইয়াছে। জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপতঃ অভেদ বলা হয় নাই। তাহা হইলে শ্রীজীব গোস্বামী মহাশয় ঐ স্থলে "স্বরূপতস্তদভিন্নং" এই কথা না বলিয়া "তয়ৈব আকৃত্যা তদংশিত্বেন চ তদভিন্নম্" এইরূপ কথা বলিবেন কেন? টীকাকার বিদ্যাভূষণ মহাশয় উহার টীকায় বলিয়াছেন "অংশঃ খলু অংশিনো ন ভিদ্যতে পুরুষাদ্ ইব দণ্ডিনো দণ্ডঃ" অর্থাৎ দণ্ডী পুরুষ যেমন তাহার বিশেষণ দণ্ড হইতে বিযুক্ত হয় না, তাহা হইলে তাহাকে দণ্ডী বলা যায় না, তদ্রূপ ঈশ্বর তাঁহার নিত্য বিশেষণ জীবশক্তি হইতে কখনই বিযুক্ত হন না। তাই ঈশ্বরকে অংশী বলিয়া জীবশক্তিকে তাঁহার অংশ বলা হইয়াছে। কিন্তু দণ্ড ও কেবল পুরুষ যেমন ঐকান্তিক ভিন্ন জীব ও ঈশ্বরও তদ্রূপ ভিন্ন। এখন যদি অংশ ও অংশীর স্বরূপতঃ ভেদই তাঁহার সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে উদ্ধৃত টীকাসন্দর্ভে "ন ভিদ্যতে" এই বাক্যের ব্যাখ্যা বুঝিতে হইবে "ন বিযুজ্যতে"। বিয়োগ বা বিভাগ অর্থেও ভিদ্ ধাতুর প্রয়োগ দেখা যায়। অতএব শ্রীজীবগোস্বামী মহাশয়ের তত্ত্বসন্দর্ভের পূর্ব্বোক্ত কথার দ্বারাও তাঁহার মতে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদ নাই—ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। পরন্তু শ্রীজীবগোস্বামী মহাশয় শাস্ত্রে জীব ও ঈশ্বরের অভেদ-নির্দ্দেশের যে সকল হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার টীকার শেষকালে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"তথা চাত্র ঈশজীবয়োঃ স্বরূপাভেদো নাস্তি ইতি সিদ্ধম্"

অর্থাৎ তাহা হইলে ঈশ্বর ও জীবের স্বরূপতঃ, অর্থাৎ ব্যক্তিগত অভেদ নাই—ইহা সিদ্ধ হইল। ঐ স্থলেই তিনি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়াছেন যে, যেমন গৌরবর্ণ ও শ্যামবর্ণ ব্রাহ্মণদ্বয়ের অথবা যুবক ও বালক ব্রাহ্মণদ্বয়ের ব্রাহ্মণস্বরূপে ঐক্য থাকায় জাতিরূপে অভেদ আছে, কিন্তু ব্যক্তিদ্বয়ের অভেদ নাই, তদ্রূপ জীবও চৈতন্যস্বরূপ এবং ঈশ্বরও চৈতন্য স্বরূপ—উভয়েই চিৎস্বরূপ এক জাতীয় কিন্তু ব্যক্তিতঃ তাঁহাদের ভেদই আছে। অতএব জীব ও ঈশ্বরের যে স্বরূপতঃ অভেদ নাই—ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত স্পষ্ট বুঝা যায়। পরন্তু শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাহার সিদ্ধান্তরত্ন গ্রন্থের অষ্টম পাদে ভেদাভেদবাদের উল্লেখ করিয়া তাহার খণ্ডনই করিয়াছেন এবং স্বরূপতঃ অভেদের দোষও বলিয়াছেন; যথা—

"যদি জীবেশয়োঃ স্বরূপেণৈব অভেদঃ তর্হি ঈশস্যাপি আংশিকসুখদুঃখভোগঃ, জীবস্য চ জগৎকর্ত্তৃত্বাদি" ইত্যাদি।

সিদ্ধান্তরত্ন ৮ম পাদ।

অর্থাৎ জীবেশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদ যদি হয়, তবে ঈশ্বরেরও আংশিক সুখদুঃখভোগ হউক এবং জীবেরও জগৎকর্ত্তৃত্বাদি হউক, ইত্যাদি।

পরন্তু যদি কেবল প্রভুপাদ শ্রীজীবগোস্বামী মহাশয়ের গ্রন্থের দ্বারাই আমরা তাঁহার মত নির্ণয় করিতে যাই, তাহা হইলেও, তিনি যে স্পষ্ট করিয়া জীব ও ঈশ্বরের সর্ব্বথা ভেদই বলিয়াছেন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি। কারণ, তিনি তাঁহার "পরমাত্মসন্দর্ভে"র অনুব্যাখ্যা—"সর্ব্বসংবাদিনী" গ্রন্থে জীব ও ঈশ্বরের ঐকান্তিক ভেদবাদই বিচারপূর্ব্বক সমর্থন করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন—

"তস্মাৎ তত্তদসম্ভাবাদ্ ব্রহ্মণো ভিন্নান্যেব জীবচৈতন্যানি ইত্যায়াতম্"। অন্যত্র আবার বলিয়াছেন—"তস্মাৎ সর্ব্বথা ভেদ এব জীবপরয়োঃ"।—উক্ত বাক্যে তিনি "এব" শব্দ এবং "সর্ব্বথা" শব্দের দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের যে স্বরূপতঃ অর্থাৎ ব্যক্তিগত অভেদ একেবারেই নাই—ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন বুঝা যায়।

পরন্তু উক্ত গ্রন্থে অন্যত্র তিনি "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি অভেদবোধক বাক্যের সহিত তাঁহার সমর্থিত সিদ্ধান্তের বিরোধ পরিহারের জন্য বলিয়াছেন—

"তদেবমভেদং বাক্যং দ্বয়োশ্চিদ্রূপত্বাদিনৈব একাকারত্বং বোধয়তি উপাসনাবিশেষার্থং, নতু বস্ত্বৈক্যম্"।

অর্থাৎ "তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি জীব ও ব্রহ্মের অভেদ বোধক যে সমস্ত বাক্য আছে, তাহা জ্ঞানার্থী অধিকারিবিশেষের উপাসনাবিশেষের জন্য; জীব ও ঈশ্বরের চৈতন্যস্বরূপতা প্রভৃতি কারণবশতঃই ঐ উভয়ের একাকারত্ব অর্থাৎ একজাতীয়ত্বের বোধক, বস্তুর ঐক্য বোধক নহে। অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বর যে তত্ত্বতঃ একই বস্তু, ইহা, ঐ সমস্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য নহে। এখানে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, শ্রীজীবগোস্বামী "ন বস্ত্বৈক্যং" এই বাক্যের

দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অর্থাৎ ব্যক্তিগত অভেদ স্বীকার করেন নাই, একজাতীয়ত্বরূপ অভেদই স্বীকার করিয়াছেন। আর তিনি "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যের কষ্টকল্পনা করিয়া অন্যরূপ কোন নূতন ব্যাখ্যাও করেন নাই। পরন্তু জ্ঞানার্থী অধিকারিবিশেষের জন্য অহংগ্রহ উপাসনাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। ভক্ত সাযুজ্যের অধিকারী নহেন, কারণ, তিনি সাযুজ্য চাহেন না। সুতরাং তিনি অভেদ উপাসনা করেন না, করিতেও পারেন না—ইত্যাদি কথাও শ্রীজীবগোস্বামী বলিয়াছেন। তিনি সাযুজ্য মুক্তি ও অধিকারিবিশেষের পক্ষে উহার অনুকূল উপাসনা ও তত্ত্বজ্ঞান-প্রভৃতিকে অশাস্ত্রীয় বলেন নাই। উহার নিন্দাও করেন নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও আমরা দেখিতে পাই—

"নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ম্ময়।
সাযুজ্যের অধিকারী তাহে পায় লয়॥"

আদি ৫ম পঃ।

মূলকথা, আমরা প্রভুপাদ শ্রীজীবগোস্বামীর "সর্ব্ব-সংবাদিনী" গ্রন্থের দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, তিনি মধ্বাচার্য্যের মতানুসারে জীব ও ঈশ্বরের ঐকান্তিক ভেদ-সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন; অচিন্ত্যভেদাভেদ সমর্থন করেন নাই। কিন্তু তিনি ঐ গ্রন্থে উপাদানকারণ ও কার্য্যের ভেদ, অভেদ ও ভেদাভেদপ্রভৃতি বিষয়ে নানা-মতের উল্লেখ করিয়া, কোন সম্প্রদায় যে ঐ অচিন্ত্যভেদা-ভেদ স্বীকার করেন, ইহা বলিয়াছেন, এবং পরে লিখিয়াছেন —"স্বমতে তু অচিন্ত্যভেদাভেদাবেব অচিন্ত্যশক্তিময়ত্বাৎ" অর্থাৎ ঈশ্বর অচিন্ত্যশক্তিময়, তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে তাহাতে তাঁহার কার্য্য জগতের ভেদ ও অভেদ এই উভয়ই আছে, উহা বিরুদ্ধ হয় না। সুতরাং আমা-দিগের মতে ঈশ্বর ও তাঁহার কার্য্য জগতের ভেদ ও অভেদ উভয়ই স্বীকৃত হইয়াছে, উহা অচিন্ত্য অর্থাৎ তর্কের অগোচর। এখানে জানা আবশ্যক যে, শ্রীজীবগোস্বামী প্রত্যুক্ত মণিদৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া জগৎকে ঈশ্বরের বাস্তব পরিণাম বলিয়াই সমর্থন করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-গণের উহাই সিদ্ধান্ত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও ঐ সিদ্ধান্ত কথিত হইয়াছে; যথা—

"মণি যৈছে অবিকৃতে প্রসবে হেমভার।
জগদ্রূপ হন্ কৃষ্ণ তবু অবিকার" ইত্যাদি।

অর্থাৎ "চিন্তামণি" নামক মণিবিশেষ যেমন নিজের অচিন্ত্যশক্তিবশতঃ কিছুমাত্র বিকৃত না হইয়াও স্বর্ণ প্রসব করে, তদ্রূপ ঈশ্বরও তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিবশতঃ কিছুমাত্র বিকৃত না হইয়াই জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন। সুতরাং জগৎ তাঁহার সত্য পরিণাম,—রজ্জুসর্পের ন্যায় বিবর্ত্ত বা মিথ্যা নহে। কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপ পরিণামবাদে ঈশ্বর ও জগতের অচিন্ত্য ভেদ ও অভেদ অনেকে স্বীকার করিলেও, এবং শ্রীজীবগোস্বামী "সর্ব্বসংবাদিনী" গ্রন্থে উহা সমর্থন করিলেও, জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধে তিনি ঐ কথা বলেন নাই। পরন্তু তিনি মধ্বাচার্য্যের মতানুসারে জীব ও ঈশ্বরের ঐকান্তিক ভেদ সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন—পূর্ব্বে তাহা বলিয়াছি। তাঁহার মতে ঈশ্বর জগৎরূপে পরিণত হইলেও জীবরূপে পরিণত হন নাই। জীব, ঈশ্বরের পরিণাম নহে, জীবচৈতন্য নিত্য, উহা ঈশ্বরের পরিণাম হইতে পারে না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত যুক্তির দ্বারা ঈশ্বরের সহিত জীবের অভেদ তিনি সমর্থন করিতে পারেন না—ইহাও প্রণিধান করা আবশ্যক।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, সকল সম্প্রদায়ের আপত্তি খণ্ডন করিয়া মধ্বাচার্য্যের মত সমর্থন করা আমার উদ্দেশ্য নহে, তাহা সম্ভবও নহে। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার সম্প্রদায়রক্ষক প্রভুপাদ শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভৃতি যে অনেক বিষয়ে মাধ্বমত গ্রহণ না করিলেও মাধ্বমতানু-সারে জীব ও ঈশ্বরের ঐকান্তিক ভেদই সমর্থন করিয়াছেন, তাঁহারা জীব ও ঈশ্বরের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী নহেন, —ইহা বলাই আমার উদ্দেশ্য। এজন্য আমি গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের গ্রন্থ হইতে যে সকল সন্দর্ভ পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি, উহা দেখিয়া সুধী পাঠকগণ পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের প্রকৃত মত কি—তাহা নির্ণয় করিবেন। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, জীব ও ঈশ্বরের ব্যক্তিগত ভেদ ও অভেদ উভয়ই বাস্তব, ইহা স্বীকার না করিলে নিম্বার্কমতানুসারে জীব ও ঈশ্বরের ভেদাভেদবাদ বলা যায় না। শ্রীজীবগোস্বামীপ্রভৃতি জীব ও ঈশ্বরের একজাতীয়ত্বাদিরূপে যে অভেদ বলিয়াছেন, উহা জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদ অর্থাৎ ব্যক্তিগত অভেদ নহে। তাঁহারা স্পষ্ট ভাষায় জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদের নিষেধই করিয়াছেন।

দ্বন্দ্ব

শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩
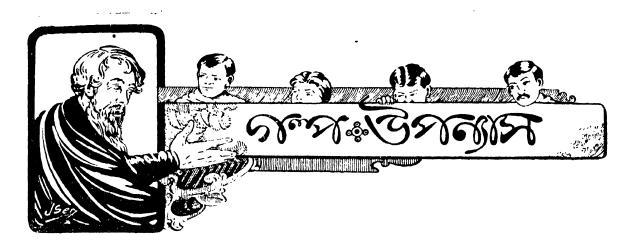
অনিবার্য্য হৃদয়ের আবেগে সে-রাত্রে বিছানায় পড়িয়া লীলা স্থির করিল, কাল সকালে সে বসন্তপুরে কিরণের বাড়ী গিয়া, তাহার সঙ্গে নিজেই দেখা করিয়া ব্যাপারটা মিটমাট করিয়া আসিবে। অরুণকে দেখিতে এখন মাঝে মাঝে তাহাকে ত সেখানে যাইতে হইবে, অথচ সে যাহার বাড়ী যাইবে, তাহার সঙ্গেই এমন অসদ্ভাব হইয়া থাকিবে, এ কি একটা বিসদৃশ ব্যাপার! যেমন করিয়াই হউক, কিরণের সঙ্গে ভাব না করিলে কিছুতেই তাহার চলিবে না। বিশেষ প্রথম প্রথম লীলার নিজের মনে মনেই এ বিষয় লইয়া কুণ্ঠা ও সঙ্কোচ ছিল। কিন্তু এখন যখন সে এ সম্বন্ধে শেষ নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিয়াছে, ও তাহার নিজের সমস্ত দ্বিধা কাটিয়া গিয়াছে, তখন কিরণ কেন একটা অমূলক ধারণা মনে বদ্ধমূল রাখিয়া এমন দূরে দূরে থাকিবে। এর বিহিত করিতেই হইবে।

প্রত্যূষে উঠিয়াই লীলা, ঘোড়া ছুটাইয়া বসন্তপুরের দিকে চলিল। বেলা হইলে কিরণ বাহিরে চলিয়া যাইতে পারে! কিন্তু দেখা হইলে লীলা আগে কি বলিবে? এখন তো আর আগের মত ছুটিয়া গিয়া তাহার হাত ধরা যায় না! যদি তাহাকে দেখিয়া কিরণ মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়! লীলা নিজের মনে কত কথাই তোলাপাড়া করিতে করিতে যাইতেছিল।

সহিস তাহার অশ্ব আস্তাবলে লইয়া গেলে, বেহারা জানাইল, তাহার প্রভু বাড়ী নাই। বাহিরে যাইবার সময় তিনি বলিয়া গিয়াছেন—মিসবাবা আসিবেন, তাঁহার অভ্যর্থনার যেন কোন ত্রুটী না হয়। সুতরাং তাঁহার সেবার জন্য তাহারা প্রস্তুত রহিয়াছে। পাছে লীলার সঙ্গে দেখা হয়, তাই সে এত সকালে বাহিরে চলিয়া গিয়াছে! কিরণ নাই! লীলা স্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ তাহার আর কোন কথা ভাবিবার বা কোন কিছু করিবার শক্তি রহিল না।

কিরণ সত্য সত্যই তবে তাহাকে একেবারে ত্যাগ করিল! সে আর কোন দিন তাহার সহিত দেখা পর্য্যন্ত করিবে না! লীলা অনেক আশা করিয়া আসিয়াছিল,—এ আঘাত তাহার বুকে বড় বিষম বাজিল। প্রভাতের নির্ম্মল আকাশ তাহার সমস্ত শোভা-বৈচিত্র্য লইয়া তাহার চোখের সামনে ম্লান হইয়া গেল! লীলার মনে হইল, তাহার এখানকার দেনা-পাওনা সব নিঃশেষে চুকিয়া গিয়াছে! আর কিছু তাহার করিবার নাই!

বেহারা বিস্মিত ভাবে কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া শেষে নিঃশব্দে চলিয়া গেল!

কিছুক্ষণ এই ভাবে কাটিবার পর লীলার নিস্পন্দ

দেহে ও মনে চেতনা ফিরিয়া আসিল। সে শুনিল, ঘরের ভিতর হইতে অরুণ ডাকিতেছে, বীণা! বীণা!

লীলা চমকিয়া উঠিল। অরুণের স্বরে তাহার মনের নির্জ্জীবতা নিমেষে ছুটিয়া গেল। সে এখানে দাঁড়াইয়া এতক্ষণ কি ভাবিতেছিল!

টেবিলের ধারে চৌকিতে বসিয়া অরুণ অত্যন্ত অধীর ভাবে লীলার আসার প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহার চোখে মুখে কি আকুলতা! একটা অধীর আকাঙ্ক্ষা ও উদ্বেগ তাহার দৃষ্টিহীন অসহায় মুখের উপর ফুটিয়া উঠিয়াছিল! সে মুখ দেখিয়াই লীলার মনের সমস্ত অশান্তি ও বেদনা নিমেষের মধ্যে দূর হইয়া গেল।

সে অরুণের কাছে দাঁড়াইতেই, অতি মৃদু, অতি কোমল স্বরে অরুণ বলিল, এসেছ বীণা? তোমার ঘোড়ার পায়ের শব্দ আমি কাল থেকে চিনে রেখেছিলুম। আজ যেমন তুমি গেটের কাছে এসেছ, তখনই আমি জানতে পেরেছি! তার পর থেকে কতক্ষণ ধরে যে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি,—এক একটা মুহূর্ত্ত যেন এক একটা যুগ বলে মনে হচ্ছিল!"

লীলার নিজের প্রতি অত্যন্ত ধিক্কার ও বিতৃষ্ণা ধরিয়া গেল! তাহার আজ কি হইয়াছে! নিরর্থক এইবেচারাকে এত কষ্ট দিয়া সে এতক্ষণ কোন্ চিন্তায় মগ্ন হইয়া ছিল!

অনুতপ্ত চিত্তে সে নিকটে আসিয়া তাহার হাত ধরিল। বলিল, আজ ত আমি কালকের চেয়ে সকালেই এসেছি অরুণ, বেশি দেরি হয়েছে কি?

অরুণ তাহার কোমল হাতখানি নিজের দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল। বলিল, তা হয় ত এসেছ! তোমাদের হিসেবে হয় ত দেরি হয় নি! আমার নিজের হিসেব যে আজকাল একবারে আলাদা ধরণের হয়ে গেছে! কাল তোমার যাবার পর থেকে আমি কি করে যে মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা গুণে গুণে আজকের এই সময়টির প্রতীক্ষা করে কাটিয়েছি, সে তুমি বুঝতে পারবে না বীণা, কোন চক্ষুষ্মান্ লোকেই তা পারবে না! এসো! আরো কাছে এসো আমার! আমার চোখ নেই ত, যে, তোমায় আমি দেখবো!' আমার সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে আমার সকল ইন্দ্রিয় দিয়ে আমি শুধু তোমার সান্নিধ্য অনুভব করতে চাই!

দুইজনে পরস্পরের হাত ধরিয়া বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। হৃদয় যখন ভাবের আবেগে উচ্ছ্বসিত ও পূর্ণ হইয়া ওঠে, তখন মুখে সে ভাব প্রকাশ করিবার ভাষা থাকে না, প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তিও হয় না। অরুণ তাহার একমাত্র প্রিয় বস্তুকে নিকটে পাইয়া আনন্দে আত্মহারা, লীলার মনও তখন অরুণের প্রতি অপরিমেয় ভালবাসায় পূর্ণ। সে তখন ভাবিতেছিল, অরুণ তাহার ভবিষ্যৎ স্বামী, তাহার কাছে এ ভাবে আসায় তাহার কোন দোষ নাই! সে যে কাল এখান হইতে যাইবার পর কিরূপে অরুণকে হারাইয়া কিরণের চিন্তায় বিভোর হইয়া কাটাইয়াছে, তাহাই ভাবিয়া সে অবাক হইতেছিল। কতক্ষণ পরে অরুণ ডাকিল, বীণা!

'অরুণ!—অরুণ!'

কবে আমি তোমায় একেবারে আমার কাছে পাব? তোমাকে 'আমার' বলবার অধিকার কবে আমার হবে?

লীলা সস্নেহে তাহার উৎকণ্ঠিত ব্যগ্র মুখের দিকে চাহিল, এত ব্যস্ত কেন অরুণ? এই ত তুমি আমারি কাছে রয়েছ! এখনো কি আমার কথায় তোমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হচ্ছে না?

সে জন্য নয় বীণা! তোমার কথায় আমার কোন সন্দেহ নেই। স্বর্গের দেবী তুমি, মিথ্যার দিক দিয়ে তুমি যেতে পারো না, তা আমি জানি। কিন্তু আমি যে আর থাকতে পারছি না। যখন জানতুম—তোমাকে পাবার আমার কোন আশাই নেই, তখন অনেক কষ্টে মন সংযত করেছিলুম, সংসারে মানুষ যখন তার সব আশা ভরসা হারিয়ে একবারে সর্ব্বস্বান্ত হয়,—তখন তার মনের অবস্থাও হয়ে যায় সেই রকম, কিছুতেই তার আর সুখ দুঃখ বোধ থাকে না, সেই হতাশ অবস্থা তখন আমারও হয়েছিল, তাই অত সহজে তোমার ওপর সব দাবি চুকিয়ে দিতে পেরেছিলুম। কিন্তু কাল থেকে যখন আবার বুঝেছি সংসারে এখনো আমার আশা করবার জিনিস আছে, আর সে তুমি, যাকে আমি আমার প্রথম যৌবনের অদম্য উচ্ছ্বাসে প্রাণ ভরে ভালবেসেছি, তখন থেকে মন যে আমার কি অধীর হয়ে উঠেছে, সে তোমায় বোঝাতে পারবো না! সারা দিন সারা রাত ধরে

অধীর আগ্রহে অপেক্ষার পর দু এক ঘণ্টার জন্যে তোমায় পাওয়া এইটুকুতে আমার মন তৃপ্ত হচ্ছে না। যদি আমায় এত ভালবেসেছ, তবে আর দূরে থেকো না বীণা! তোমায় ছেড়ে এক মুহূর্ত্তও আমার অসহ্য বলে মনে হচ্ছে!"

—তাই হবে অরুণ! আমি যত শীঘ্র পারি—এ কথা বাবাকে বোলবো, তারপরে আর বেশি দিন অপেক্ষা করতে হবে না! কিন্তু তার আগে যে আমার তোমাকে অনেক কথা বলতে হবে—এক দিন সময় মত সেগুলো শোন। তার পর শুনেও যদি—

বাধা দিয়া অরুণ বলিল, তুমি যে কথা আমায় বলতে চাও, যখনি বলবে তখনি শুনবো। তার আবার সময় অসময় কি? তবে আমার নিজের কথা এই যে, আমি এখন কিছুই বলতে বা কোন কিছু করতে চাই না। ইচ্ছা করে, কেবল নিঃশব্দে কিছু দিন তোমার কাছে পড়ে থাকি। তোমার মনে আছে হয় ত, আগে যখন আমি তোমার কাছে থাকতুম, তোমার প্রতি একটা উন্মাদ ভালবাসায় আমায় কি মুখর করে তুলতো! কিন্তু এখন? চোখ হারিয়ে সে সবই আমার গেছে! বাইরের জগৎ থেকে রূপ রস শোভা সম্পদ—যা কিছু গ্রহণ করবার, সে সবই এখন আমার কাছে মৃত। এখন শুধু অনুভূতিই আমার সম্বল, সেইটুকু নিয়েই আমি বেঁচে আছি। আমি এখন আর কিছুই চাই না, শুধু এমনি করে তোমার হাতে হাত রেখে, তুমি যে আমার কাছে রয়েছ, এইটুকু জেনে নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে থাকি। জীবনে আর সব সুখ থেকেই সমাধি হয়েছে আমার! শুধু এইটুকু থেকে আমায় বঞ্চিত কোর না বীণা! ও কি! কাঁদছো? কাঁদো কেন বীণা?

অরুণের কথা শুনিতে শুনিতে বেদনা ও করুণায় লীলার হৃদয় ফুলিয়া উঠিতেছিল। সে চোখের জল মুছিয়া বলিল, অমন করে বলো না তুমি! আমার বড় কষ্ট হয়! কেন তুমি এত হতাশ হয়ে পড়ছো? যখন আমরা দুজনে একসঙ্গে থাকবো, তখন তুমি দেখবে—আমাদের সুখের কোন কিছুই নষ্ট হয় নি!

নিজের রুমালে অরুণ সাদরে সস্নেহে লীলার চোখ মুছাইয়া দিল। বলিল, তোমার এই চোখের জল আমার এ দগ্ধমরু জীবনে শান্তিবারি! এখনো আমার জন্যে একজনের মনে এত ভালবাসা, এত করুণা সঞ্চিত রয়েছে, তা জেনেই ত আমার মনে আবার বাঁচবার সাধ ও আশা ফিরে এসেছে! আমার সবই ত গিয়েছিল বীণা! তুমিই ত আবার আমায় ফিরিয়ে আনলে!

লীলা মুগ্ধ-নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া ছিল। তাহার প্রফুল্ল মুখ ও প্রেমের উচ্ছ্বাসপূর্ণ আলাপে তাহার মনের আনন্দ ও আশা প্রকাশ পাইতেছিল। লীলা মনে মনে ভাবিল, তোমাকে সুখী করাই আমার জীবনের একমাত্র কাজ হবে! স্বেচ্ছাচার করেছি বলে আমাকে যে যতই গালাগালি দিক্—আমি কিছুতেই তোমায় ছাড়বো না।

কথায় গল্পে সেদিন দুই ঘণ্টা কাটিয়া গেল। লীলা উঠিবার সময় টেবিলের উপর একখানা খাতা পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল, এ খাতাখানা তোমার না কি? তুমি এখন লিখতে পারো অরুণ?

অরুণ ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, যখন একলা থাকি, তখন আঁচড় কাটি। একটা কিছু করে সময় কাটাতে হবে ত। তাকে আর লেখা বলতে পারা যায় না!

লীলা খাতাখানি তুলিয়া কিছুক্ষণ উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া বলিল, কিন্তু তোমার লেখা ত বাঁকা-চোরা হয় নি? অল্প একটু যা দোষ আছে, আমার মনে হয়, যদি তুমি বসে বসে আরো কিছু দিন অভ্যাস করো, তা হলে বোধ হয় আর এটুকুও থাকবে না, বেশ চলনসই লেখা হয়ে যাবে।

অরুণ বলিল, আমি ত বরাবরই অভ্যাস করছি। প্রথম প্রথম বড় বাঁকা-চোরা হত। লিজি কত দিন আমার হাত ধরে ধরে লেখা অভ্যাস করিয়েছে। তার কথা সব তোমাকে আর এক দিন বোলবো বীণা! আমি যে আজ আবার এমন ভাবে দেশে ফিরে এসেছি, এ শুধু তারই সেবা ও যত্নের গুণে। এখনো হয় ত সে আমার কথা মনে করে কত কষ্ট পাচ্ছে।

লীলা গভীর সম্ভ্রমের সহিত বলিল, তোমার কাছে তাঁর কথা শুনে অবধি তাঁর প্রতি আমার যে কি শ্রদ্ধা হয়েছে, সে আর কি বোলবো? আমরা যখন একসঙ্গে থাকবো, তখন তুমি চিঠিতে পরিচয় করে দিও, আমি তাঁকে চিঠি লিখবো। কিন্তু অরুণ! তুমি কি সুন্দর

লিখতে পারো! কি চমৎকার তোমার লেখবার শক্তি! তোমার লেখা পড়তে আমার এত ভাল লাগে!

অরুণের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল, সত্যি বীণা? আমি কি এত ভাল লিখি, যে তোমার ও পড়তে ভাল লাগে? তা হলে আমার লিখতে শেখা আজ সার্থক হলো বলতে হবে!

লীলা বলিল, সত্যিই বলছি—তোমার বেশ ক্ষমতা আছে লেখবার! দেখ অরুণ! আমার একটা কথা মনে আসছে! তুমি একখানা উপন্যাস লেখ না কেন? যদি কিছু দিন একটা টাইপিষ্ট রেখে টাইপ-রাইটিং শিখে নিতে পার, তা হলে ত লেখবার কোন ভাবনাই থাকে না। বিলেতে অন্ধরা সব টাইপ রাইটিং এর সাহায্যে অনর্গল লিখছে—দেখে এলুম। তারা কেউ অক্ষম অকর্ম্মণ্য নয়। তুমি যদি এটা কর, তোমার মনের সমস্ত চিন্তা, কল্পনা—তুমি এ রকমে প্রকাশ করবার সুযোগ পাবে। আর তখন এই দিকে তোমার মন এমনি রত থাকবে যে বাইরের কোন অভাব বা চোখের অভাব তোমার মনেই আসবে না। উপস্থিত তুমি আর কিছু দিন লেখা অভ্যাস করে' হাতেও লিখতে পারো। যা কিছু ভুল থাকবে, আমি মাঝে মাঝে এসে সেগুলো তোমায় পড়ে শোনাব। তখন তুমি আবার শুধরে দেবে। এই রকমে দুজনের চেষ্টায় বেশ চমৎকার একটা বই তৈরি হবে।

অরুণের মুখ আশায় আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল, তুমি আজ আমায় একটা নতুন পথ দেখালে বীণা! আমি কখনো এ কথা ভেবে দেখে নি! বাইরে কাজ করবার যে শক্তি থেকে আমি বঞ্চিত হয়েছি, সেই রুদ্ধ শক্তি—যদি এটা সম্ভব হয়, তা হলে—আর এক দিক থেকে প্রকাশ করবার ক্ষেত্র পাব আমি! আমি নিশ্চয় তোমার কথামত কাজ করতে চেষ্টা করবো! আজকে কিরণ বাড়ী ফিরলে তার সঙ্গেও এ বিষয়ে কথা বলে দেখবো, সেই বা কি বলে।

১৪

মিঃ রায়ের গৃহে সেদিন অপরাহ্ণে একটা পার্টি উপলক্ষ্যে মহা উৎসবের আয়োজন হইয়াছে। সহরের সমস্ত সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষগণ, জমীদারবর্গ, ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়া এই উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। বিস্তৃত বাগানের এক দিকে বড় বড় তাঁবু খাটাইয়া অতিথিগণের জলযোগের আয়োজন হইয়াছে। অন্য দিকে, দূরে টেনিসকোর্টে টেনিস ও ব্যাডমিণ্টন খেলা চলিতেছিল। অস্তোন্মুখ সূর্য্যের কিরণজাল সুবৃহৎ বট ও অশ্বত্থের ঘন পাতার ফাঁকে ফাঁকে মাঠে ও লনে পড়িয়া রাঙাইয়া তুলিয়াছিল। বাগানের অন্যদিকে সমবেত জনগণকে আনন্দ দিবার জন্য একদল বাদ্যকর তাহাদের ব্যাণ্ডে প্রচলিত সুর সকল আলাপ করিতেছিল।

বীণা সুচারু বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া তাহার পিতার অতিথিদের সম্বর্দ্ধনা করিয়া বেড়াইতেছিল। নীল রংএর বেনারসী সাড়ী তাহার সুগৌর কমনীয় তনু বেষ্টন করিয়া ঝলমল করিতেছে, সুঠাম শুভ্র বাহুর উপর স্বর্ণখচিত ব্লাউসের কারুকার্য্য তাহার গাত্রবর্ণের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। তাহার অনাবৃত শুভ্র কণ্ঠে হীরক-জড়িত নেকলেস্—কাণে ছোট দুটি মুক্তার ইয়ারিং, সুগোল মণিবন্ধে রত্নময় স্বর্ণাভরণ ঝলমল করিতেছিল। সে মৃদু মিষ্ট হাসি ও শোভন ভব্যতার সহিত ঘুরিয়া ফিরিয়া সকলের সহিত আলাপ করিয়া বেড়াইতেছিল। যখন যেদিকে সে যাইতেছে—সেইদিক হইতেই অস্ফুট প্রশংসার গুঞ্জন উঠিয়া তাহাকে সমধিক প্রীত ও গর্ব্বিত করিয়া তুলিতেছিল।

লীলা এ সব পার্টির পক্ষপাতী নয়। এই সংযত ভদ্রতা ও সব সময় হিসাব করিয়া চলা তাহার পক্ষে অসম্ভব; তাই সে যথাসম্ভব শীঘ্র নিমন্ত্রণ-সভা ত্যাগ করিয়াছে ও বীণার উপর আতিথ্যের ভার দিয়া সে টেনিসকোর্টে তাহার খেলার সঙ্গীদের লইয়া খেলা জমাইয়া তুলিয়াছে।

সুপরিচ্ছদধারী খানসামারা চা, কেক, ও অন্যান্য মিষ্টান্নপূর্ণ পাত্র লইয়া সকলের কাছে ঘুরিতেছিল। মিসেস্ রায়ের বন্ধু একটি মহিলা এক পেয়ালা চা তুলিয়া লইয়া বলিলেন, আপনার ছোট মেয়েটিকে তো দেখতে পাচ্ছি না?

মিসেস রায় একদৃষ্টে বীণার অকুণ্ঠ সহজ গতি, ও তাহার সকলের সঙ্গে সমান ভাবে সামাজিকতা রক্ষা করিয়া আলাপ করিবার ক্ষমতা মুগ্ধনেত্রে দেখিতেছিলেন। গর্ব্বময় আনন্দে তাঁহার মাতৃহৃদয় উচ্ছলিত হইয়া উঠিতে-

ছিল। লীলার প্রসঙ্গ উঠায় তাঁহার মুখে বিরক্তির ছায়া পড়িল। তিনি বলিলেন, লীলা বড় অস্থির ও খামখেয়ালী মেয়ে,—সে এই একটু আগে টেনিস খেলতে চলে গেছে। আর তার উপর এ সব ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত থাকতেও ত পারি না। সে যেমন আমার বীণা,—কোন কথা তাকে শেখাতে হয় না, সকল দিকে সমান!

চায়ের পেয়ালায় একটি চুমুক দিয়া মিসেস দত্ত বলিলেন, তা যা বলেছেন! আপনার এ মেয়েটি রূপে গুণে সমান। আমি ত তাই সবাইকে বলি, বীণার মত মেয়ে আমাদের সমাজে ত আর দেখা যায় না। ভাল কথা—বোসেদের বাড়ীর খবর শুনেছেন কিছু। সুধীর বোস—ডাক্তার? আজ ভোরে যে সেখানে মহা কাণ্ড হয়ে গেছে!

মিসেস রায় বলিলেন, কি হয়েছে? কই, আমি কিছুই শুনি নি ত?

সেন-গৃহিণী এতক্ষণ তাঁহার বিপুল দেহভার একখানা ইজিচেয়ারে ন্যস্ত করিয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত পিষ্টকের মধুর রসের আস্বাদনে ব্যস্ত ছিলেন। ডাক্তারের বাড়ীর কথা কর্ণে যাইবামাত্র, তিনি উৎকর্ণ হইয়া উঠিয়া সচকিতে বলিলেন, কেন? কেন? কি হয়েছে সুধীর বাবুর বাড়ী? তিনি ত কাল সকালেও আমায় দেখতে আমাদের বাড়ী গিছলেন!

মিসেস দত্ত একটু বিজ্ঞজনোচিত হাসির সহিত বলিলেন, হুঁঃ! কাল সকালে! এখন বলে দু' এক ঘণ্টার মধ্যে কত যুগ উল্টে যাচ্ছে, আর আপনি বল্লেন, কাল সকালকার কথা! ব্যাপারটা ঘটেছে আজ ভোরে। কাল সকালে কি আর কেউ এ কথা জানতো? আজকাল দিন কাল বড়ই খারাপ পড়েছে দিদি! বড়ই মন্দ সময় পড়েছে! কার ঘরে কখন যে কি ঘটবে, তা কেউ বলতে পারে না! এ যেন অষ্ট প্রহর মাথার উপর খাঁড়া ঝুলছে, কখন কার মাথায় পড়ে, এমনি সশঙ্কিত হয়ে থাকা!

উপস্থিত মহিলাগণ এরূপ একটা আসন্ন বিপদের করাল ছায়ার সান্নিধ্যে মনে মনে উদ্বেগ ও ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিলেন! ব্যাপারটা কি? নিশ্চয়ই একটা কিছু গুরুতর বিষয় ঘটিয়াছে! মিসেস দত্ত সহরের সব খবরই রাখিয়া থাকেন। তিনি যখন বলিতেছেন, তখন তো আর অবিশ্বাস করা যায় না। একটি মহিলা শুষ্কমুখে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, তা কি হয়েছে—ডাক্তার বাবুর বাড়ী? আপনি কি আজ সকালে সেখানে গিয়েছিলেন?

মিসেস দত্ত একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, উপস্থিত সকলেরই মুখে আগ্রহ ও কৌতূহলের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে। তখন তিনি হৃষ্টচিত্তে আরম্ভ করিলেন, যাবার কি আর যো ছিল তখন সেখানে? একেবারে বাড়ীর চার পাশ তখন পুলিশে ঘিরে ফেলেছে,—ডেপুটি কমিশনার, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ইনস্পেক্টর—যত সব পুলিশের বড় বড় অফিসার, আর লাল পাগড়ীর দল—গিস্ গিস্ করছে! সে কি কাণ্ড! রাস্তার মোড় পর্য্যন্ত লোকে লোকারণ্য! ঐ যে নলিন, ডাক্তার বাবুর বড় ছেলে, এবার বি-এ পাশ করে বেরোল? আপনারা ত সকলেই তাকে দেখেছেন? কতদিন খেলতেও এসেছে এখানে! এদিকে ত অত ভদ্র—শিষ্ট শান্ত ছেলে—তা কে আর ভেবেছে বলুন—? অমন ছেলে এনার্কিষ্টের দলে মিশেছে!

এনার্কিষ্ট! সকলে ভয়ে বিস্ময়ে একবারে স্তব্ধ! কিছুক্ষণের জন্য স্থানটি নিস্তব্ধ হইয়া গেল। মিসেস রায় জজ-গৃহিণী,—জেলার সর্ব্বপ্রধান রাজপুরুষের পত্নী,—তাঁহার কোন বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করা বা কোন বিষয়ে ব্যগ্রভাব শোভা পায় না! তিনি সর্ব্বক্ষণ তাঁহার পদোচিত মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতেন। কিন্তু এ কথার পর তিনিও আর তাঁর অভ্যস্ত গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। সবিস্ময়ে বলিলেন, নলিন এনার্কিষ্টের দলে মিশেছে? এ যে বড় আশ্চর্য্য ও অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে! পুলিশ কি তার বিপক্ষে প্রমাণ পেয়েছে কিছু?

তা আর পায়নি? তারা তলে তলে সব সন্ধান রাখছে কতদিন ধরে! না হলে খামখা গিয়ে ধরতে পারে? তারা বাড়ী সার্চ্চ করেই ত রিভলভার, বোমা, টোটা—কত কি সব পেয়েছে। শুনলুম—নলিনের নামের খানকতক চিঠিপত্র যা পাওয়া গেছে, তা থেকে নাকি আরো সব ভয়ানক কাণ্ডের খবর বেরিয়ে পড়েছে। কাল সকালের কাগজে সব খবরই পাবেন এখন।

মিসেস রায় চিন্তিত ভাবে বলিলেন, গোপনীয় কিছু যদি সত্যই প্রকাশ হয়ে থাকে, সে কি আর কাগজে বেরুবে! কাগজে শুধু মোটামুটি খবরটাই পাওয়া যায়।

যাই হোক, ক্রমে ক্রমে দেশের কি অবস্থা হতে চললো? এই জনকতক মাথা-পাগলা ছোকরা,—এরাই সব গোটা-কতক বোমা ফেলে, আর দুটো দশটা লোক মেরে, এত বড় প্রবল-প্রতাপ ব্রিটিশ রাজত্বটা উড়িয়ে দেবে ভেবেছে না কি? এতে ইংরেজের কোন ক্ষতিই হবে না, মরতে ওরা শুধু নিজেরাই মরবে বই তো নয়! আর এত অসন্তোষটাই যে কিসের, তাও ত আমি কিছু বুঝি না। ইংরেজের রাজত্বে আজ আমরা যে শান্তি, সুখ, মান, সম্ভ্রম পেয়েছি, ও ভোগ করছি, এ সব পূর্ব্বে ছিল কখনো! আমি অবাক্ হয়ে ভাবি, এই সব ছেলেরা লেখাপড়া শিখে, মানুষ হয়ে কি করে এমন ভুল পথে যাচ্ছে?

মিসেস দত্ত গম্ভীর মুখে বলিলেন, তবে আর একটু আগে আমি বলছিলুম কি? যত সব ভাল ভাল ছেলে,—যারাই দুটো চারটে পাশ করেছে,—সে সবই প্রায় এই দলে,—আজকালকার ছেলেদের মধ্যে এই এক কি হাওয়া ঢুকেছে! তাই ত বলি, আমাদের সবাইয়ের ছেলে পুলেই ত পড়ছে শুনছে, বাইরে থেকে দেখতে শুনতে বেশ ভালই, কিন্তু কে যে ভিতরে ভিতরে কি কাণ্ড করছে—তা কিছুই বলা যায় না! যেদিন যে ধরা পড়বে, সেই দিন তার কথা সবাই জানবে। এই যে নলিনের কথা নিয়ে আজ সহরে হুলস্থুল পড়ে গেছে,—অন্যের কথা দূরে থাক্, তার মা বাপই কি এ সব ঘুণাক্ষরে জানতো! আজ বিকেলে খবর পেয়ে যখন তাদের বাড়ী গেলুম, তার মা তখন কেঁদে লুটোপুটি! তাকে দুটো কথা বোলবো কি—নিজেই আমি কেঁদে মরি!

মিসেস দত্ত কথা শেষ করিয়া রুমালখানি তুলিয়া নিজের শুষ্ক চক্ষু দুটি একবার মার্জ্জনা করিয়া ফেলিলেন।

মহিলাদের মধ্যে অনেকেই এ সংবাদে যথার্থই সশঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন—তাঁহাদের মনে বার বার এই কথাটাই জাগিয়া উঠিতেছিল—কোন্ দিন বা কাহার ঘরে সুধীর বাবুর বাড়ীর কাণ্ডের পুনরভিনয় হয়।

মাঠের অন্য দিকের তাঁবুতে মিঃ রায় অন্যান্য রাজপুরুষ ও তাঁহার বন্ধুবান্ধবদের সহিত আলাপ করিতেছিলেন। দেশের সাময়িক অবস্থা. বর্ত্তমান যুদ্ধের বিষয় ও যুদ্ধের পর জগতের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ইত্যাদি গুরুতর বিষয়ের চর্চ্চায় তাঁহাদের সভাও বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল।

বীণা ক্রমশঃ চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। বৈকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেবল অবান্তর গল্প শুনিয়া ও ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছে।

সুযোগ বুঝিয়া সে একবার সভা ত্যাগ করিয়া মাঠে আসিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণে ক্ষণে সে কাহার আশায় গেটের দিকে চাহিতেছিল।

টেনিসকোর্ট হইতে মাঝে মাঝে উচ্চ চীৎকার-ধ্বনি ও হাসির শব্দ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। লীলার উপর তাহার বিষম রাগ ও হিংসা হইতে লাগিল। সে কেমন সহজে এ সব সামাজিকতা ত্যাগ করিয়া খোলা মাঠের হাওয়ায় খেলার আনন্দ উপভোগ করিতেছে! আর বীণা? বেচারা সমস্ত বিকালটা কতকগুলো বাজে লোকের সহিত বাজে কথা বকিয়া বকিয়া হায়রাণ! যেন যত গরজ তাহারই! লীলা শুধু স্ফূর্ত্তি করিতেই মজবুত! ঝঞ্ঝাট দেখিলেই অমনি সরিয়া পড়ে!

হেমন্তের স্বল্পাবশেষ বেলা ক্রমেই অবসান হইয়া আসিতেছিল। ম্লান রৌদ্রের রক্তিম আভা তখনো অট্টালিকার উচ্চ চূড়ায়, উন্নত তরুশিরে চিক্ চিক্ করিতেছে।

মাঠের খোলা হাওয়ায় দাঁড়াইয়া বীণা কিরণের কথা ভাবিতেছিল। সে আজ এখনো আসিল না কেন? সমস্ত বৈকালটা সে তাহার জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে, তবু তাহার দেখা নাই। আর এই চৌধুরী, দত্ত, গাঙ্গুলী, সেন ইহাদের অযাচিত আলাপ ও স্তুতি প্রশংসার জ্বালায় প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে! যাহাদের দরকার নাই, তাহারাই কেবল ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাছে আসে, আর যাহাকে সর্ব্বদা খোঁজা যায়, তাহার দেখা পাওয়া যায় না।

মাঠের অন্য প্রান্তে ব্যাণ্ডে একটি প্রেমের গানের গৎ বাজিতেছিল, বীণা এক মুহূর্ত্ত স্থির ভাবে সেই সুরটি শুনিল। তার পর বিরক্ত ভাবে নিজের অঞ্চলে গাঁথা একটি গোলাপ ফুল খুলিয়া লইয়া, তাহার আঘ্রাণ লইয়া নিজের মনে বলিল, সন্ধ্যা হয়ে গেল—সে আর এল না দেখছি।

যতদিন হইতে তাহাদের প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছে,—

বরাবরই কিরণের এইরূপ উদাসীন ভাব! সে চিরদিনই সংযত ও গম্ভীর; তাহার স্বভাবে লঘুতা বা চাঞ্চল্য কখনো দেখা যাইত না। শারীরিক সামর্থ্যে ও সুগঠিত অঙ্গ-সৌষ্ঠবে তাহার প্রায় ছয় ফুট দীর্ঘ দেহ ভরপুর। ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, পোলো ইত্যাদি খেলায় ও শিকারে তাহার মত দক্ষ যুবক সে জেলায় আর কেহ ছিল না। তাহার হৃদয় কোমল,—দয়া মায়া স্নেহে পরিপূর্ণ; কিন্তু সে অসীম মানসিক বলে বলীয়ান্। শিশুদের সে অত্যন্ত ভাল-বাসিত। যখন সে তাহাদের সঙ্গে খেলায় যোগ দেয়, তখন সেও যেন তাহাদেরই মত শিশু হইয়া পড়ে। কাছাকাছি দুই মাইলের ভিতর যত ছোট শিশু ছিল—কিরণ তাহাদের সকলের বন্ধু। তাহাদের প্রত্যেকের জন্মদিনে কিরণ বাড়ী বহিয়া তাহাদের জন্য উপহার লইয়া ফিরিত। ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গ পাইলে সে নিজের সব কাজকর্ম্ম একবারে ভুলিয়া যাইত।

জেলার মধ্যে সে সর্ব্বজনপ্রিয় ও সুপরিচিত ছিল। তাহার উচ্চ শিক্ষা, অতুল ঐশ্বর্য্য, সংযত ভদ্র স্বভাব তাহাকে সকলের মধ্যে উচ্চ প্রতিষ্ঠা দিয়াছিল।

মহিলাদের মধ্যেও তাহার বেশ প্রতিষ্ঠা ছিল। তাঁহাদের প্রতি তার ব্যবহার সর্ব্বদা নম্র সৌজন্যে পূর্ণ ছিল। তবুও তাহার নামে চর্চ্চার ত্রুটী হইত না। সৌন্দর্য্যের প্রতি অনাসক্তিই এই চর্চ্চার অন্যতম কারণ। সে তরুণীদের সহিত অবাধে মিশিত, তাহাদের সমস্ত আবদার অনুরোধ রক্ষা করিয়া চলিত; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কাহারও প্রতি তাহার কোন পক্ষপাত দেখা যায় নাই।

বীণা এখানে আসিলে যখন প্রথম তাহার সহিত পরিচয় হয়, তখন সে মনে স্থির জানিত, কিরণের এত দিনের সমস্ত অনাসক্তি ও গর্ব্ব তাহার কাছে খর্ব্ব হইবেই। এ পর্য্যন্ত কোনখানে তাহার সৌন্দর্য্য ও শক্তির পরাজয় ঘটে নাই,—সেজন্য বীণা নিজেকে অজেয় বলিয়াই জানিত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ঘটনা অন্যরূপ দাঁড়াইল।

দিনের পর দিন যায়, কিন্তু কিরণের ব্যবহারে কোন বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। সে বীণার সঙ্গে অকুণ্ঠ ভাবে মেশে, তাহার অন্য ভক্তদের মত তাহার রূপেরও প্রশংসা করে, তাহার সঙ্গে গান গায়, গল্প করে,—কিন্তু তাহার মনের ভিতর বীণা প্রবেশ করিতে পারিল না।

তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য, তাহার মনে ঈর্ষা জাগাই-বার জন্য বীণা কতবার তাহার সম্মুখে অন্য যুবকদের সঙ্গে অতিমাত্রায় ঘনিষ্ঠতা করিয়া দেখিয়াছে—কিন্তু কিরণ অচল, অটল। বরং সে কোন অপরিচিতকে দেখিলে নিজ হইতেই তাহাকে স্থান ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়ায়।

বীণা কিরণের সম্বন্ধে যতই অকৃতকার্য্য হইতে লাগিল, ততই কিরণ যেন তাহার কাছে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিতে-ছিল। বিশেষ, মেয়েরা আর সব হয় ত সহ্য করিতে পারে,—কেবল তাহাদের প্রতি ঔদাসীন্য তাহাদের অসহ্য। ইহাতে তাহাদের সংকল্প ও প্রতিশোধস্পৃহা আরও বাড়িয়া ওঠে; যেমন করিয়াই হোক্—অহঙ্কারীকে বশ করিতেই হইবে।

সেইজন্য কিরণকে শেষ পর্য্যন্ত জব্দ করিবার একটা একান্ত বাসনা বীণার মনে সর্ব্বক্ষণ জাগিয়া থাকিত। ইতিমধ্যে এক দিন সহসা অরুণের সঙ্গে তাহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল, ও সর্ব্বপ্রথম কিরণই বন্ধুর সাদর অভিনন্দন অত্যন্ত প্রফুল্লচিত্তে জানাইয়া গেল।

কিন্তু লীলা ফিরিয়া আসিতেই কিরণের যেন সমস্ত প্রকৃতি ওলট-পালট হইয়া গেল। তাহার সমস্ত গাম্ভীর্য্য, মেয়েদের প্রতি অনাসক্তি, ও উদাসীন ভাব—সব বদলাইয়া সে যেন একেবারে নূতন মানুষ হইয়া গেল।

দুই চার দিনের মধ্যেই তাহারা অন্তরঙ্গ বন্ধুর ন্যায় পরস্পরের নাম ধরিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়া দিল। সমস্ত দিন ও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খাবার সময় ছাড়া কেহ কাহারও সঙ্গ ছাড়িত না। এক সঙ্গে বেড়ান, হাসি, গল্প, গানে তাহারা একবারে মস্‌গুল!

লীলার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা বীণার চক্ষুশূল হইয়া উঠিতেছিল। শুধু বীণা নয়—সমাজের সমস্ত মেয়েরাই কিরণের এইরূপ রুচি-পরিবর্ত্তন দেখিয়া রাগে ও হিংসার আক্রোশে জ্বলিয়া যাইত! লীলাকে লইয়া চব্বিশ ঘণ্টা এত বাড়াবাড়ি! লীলার আছে কি?

অরুণের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যাইবার পর হইতে বীণা কিরণকে আবার নিজের আয়ত্তে আনিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু কোন দিনই তাহাকে সুবিধামত নিকটে পাইত না বলিয়া তাহার আক্রোশ ও গাত্রদাহের সীমা ছিল না। লীলা কি বেহায়া ও নির্লজ্জ!

অষ্ট প্রহর কিরণকে দখল করিয়া বসিয়া আছে! একবার তাহার সহিত একটা কথা কহিবারও উপায় নাই!

আজ হয় ত একটা সুযোগ মিলিতে পারে, বীণা আশা করিতেছিল। লীলা টেনিসকোর্টে,—সে সন্ধ্যার আগে ফিরিবে না,— এই সময় যদি কিরণ আসে!

অনেকক্ষণ একা মাঠে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে বীণা নিরাশ চিত্তে আবার তাঁবুতে ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল। আজিকার দিনটা বৃথা! একটা অতৃপ্তি ও অবসাদে তাহার চিত্ত ভরিয়া উঠিতেছিল।

সেই সময় গেটের কাছে কাহার মোটরের হর্ণ বাজিয়া উঠিল। বীণার মুহ্যমান মন আবার আনন্দে ও উৎসাহে পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে দেখিল—কিরণ মিসেস্ রায়ের সহিত কথা বলিতেছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত *

(শ্রীম-কথিত)

পঞ্চম ভাগ

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ রাখাল স্বামী ব্রহ্মানন্দ, অধর, হরি (স্বামী তুরীয়ানন্দ) প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

৺ফলহারিণী পূজা ও বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেই পূর্ব্ব-পরিচিত ঘরে বসিয়া আছেন; বেলা ১১টা হইয়াছে। রাখাল, মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তেরা সেই ঘরে উপস্থিত আছেন। গত রাত্রে ফল-হারিণী পূজা হইয়া গিয়াছে; সেই উৎসব উপলক্ষে নাট-মন্দিরে শেষ-রাত্রি হইতে যাত্রা হইয়াছে—বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা। শ্রীরামকৃষ্ণ সকালে মন্দিরে মাকে দর্শন করিতে গিয়া একটু যাত্রাও শুনিয়াছেন। যাত্রাওয়ালারা স্নানান্তে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন।

আজ শনিবার ১২ই জ্যৈষ্ঠ ২৪শে মে ১৮৮৪ খৃঃ, অমাবস্যা।

যে গৌরবর্ণ ছোকরাটী বিদ্যা সাজিয়াছিলেন, তিনি সুন্দর অভিনয় করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সহিত আনন্দে অনেক ঈশ্বরীয় কথা কহিতেছেন; ভক্তেরা আগ্রহের সহিত সমস্ত শুনিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিদ্যা অভিনেতার প্রতি)। তোমার অভিনয়টী বেশ হয়েছে। যদি কেউ গাইতে, বাজাতে, নাচতে, কি একটা কোন বিদ্যাতে ভাল হয়, সে যদি চেষ্টা করে শীঘ্রই ঈশ্বর লাভ করতে পারে।

[যাত্রাওয়ালাকে ও চানকের সিপাইদিগকে শিক্ষা—অভ্যাস যোগ; 'মৃত্যু স্মরণ কর।']

"আর তোমরা যেমন অনেক অভ্যাস করে গাইতে, বাজাতে বা নাচতে শিখ, সেইরূপ ঈশ্বরেতে মনের যোগ অভ্যাস করতে হয়; পূজা জপ ধ্যান এ সব নিয়মিত অভ্যাস করতে হয়।

বিদ্যা। যাত্রাতেও দেখা যায় মাথায় কলসী রেখেছে অথচ নাচছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সংসার করবে, অথচ মাথার কলসী ঠিক রাখবে, অর্থাৎ ঈশ্বরের দিকে মন ঠিক রাখবে।

"আমি চানকে পল্টনের সিপাইদিগকে বলেছিলাম

তোমরা সংসারের কাজ করবে, কিন্তু কালরূপ (মৃত্যুরূপ) ঢেঁকী হাতে পড়বে, এটী হুঁস রেখো।

"ওদেশে ছুতোরদের মেয়েরা ঢেঁকী দিয়ে চিড়ে কাঁড়ে। একজন পা দিয়ে ঢেঁকা টেপে, আর একজন নেড়ে চেড়ে দেয়; যে নেড়ে চেড়ে দেয় সে হুঁস রাখে যাতে ঢেঁকীর মুষলটা হাতের উপর না পড়ে। এদিকে ছেলেকে মাই দেয়, আর এক হাতে ভিজে ধান খোলায় ভেজে লয়, আবার খদ্দেরের সঙ্গে কথা কচ্চে, 'তোমার কাছে এত বাকী পাওনা আছে দিয়ে যেয়ো।'

"ঈশ্বরেতে মন রেখে তেমনি সংসারে নানা কাজ করতে পার। কিন্তু অভ্যাস চাই; আর হুঁসিয়ার হওয়া চাই; তবে দুদিক রাখা হয়।"

[যাত্রাওয়ালাকে আত্মদর্শনের উপদেশ। ঈশ্বর দর্শনের উপায় কি? প্রমাণ কি?]

বিদ্যা। আজ্ঞা, আত্মা যে দেহ থেকে পৃথক তার প্রমাণ কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ। প্রমাণ? ঈশ্বরকে দেখা যায়; তপস্যা করলে তাঁর কৃপায় ঈশ্বর দর্শন হয়। ঋষিরা আত্মার সাক্ষাৎকার করেছিলেন। সায়েন্স্‌এ (science) ঈশ্বরতত্ত্ব জানা যায় না, তাতে কেবল এটার সঙ্গে ওটা মিশালে এই হয়; আর ওটার সঙ্গে এটা মিশালে এই হয়; এই সব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিষের খবর পাওয়া যায়।

"তাই এ বুদ্ধির দ্বারা এ সব বুঝা যায় না; সাধু-সঙ্গ করতে হয়। বৈদ্যের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে নাড়ী টেপা শেখা যায়।

বিদ্যা। আজ্ঞা, এইবার বুঝেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তপস্যা চাই, তবে বস্তু লাভ হবে। শাস্ত্রের শ্লোক মুখস্থ করলেও কিছু হবে না। 'সিদ্ধি সিদ্ধি' মুখে বললে নেশা হয় না। সিদ্ধি খেতে হয়।

"ঈশ্বর দর্শনের কথা লোককে বোঝান যায় না। পাঁচ বৎসরের বালককে স্বামী স্ত্রীর মিলনের আনন্দের কথা বোঝান যায় না।"

বিদ্যা (শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতি)। আজ্ঞা, আত্মদর্শন কি উপায়ে হতে পারে?

[রাখালের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের গোপাল ভাব।]

এই সময়ে রাখাল ঘরের মধ্যে আহার করিতে বসিতেছেন। কিন্তু অনেকে ঘরে আছেন বলিয়া ইতস্ততঃ করিতেছেন। ঠাকুর আজকাল রাখালকে গোপালের ভাবে পালন করিতেছেন; ঠিক যেমন মা যশোদার বাৎসল্য ভাব!

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাখালের প্রতি)। খানা রে! এরা না হয় উঠে দাঁড়াক্।

(একজন ভক্তপ্রতি) রাখালের জন্য বরফ রাখো। (রাখালের প্রতি) বন্‌হুগ্‌লি তুই আবার যাবি? রৌদ্রে যাস্‌নি।

রাখাল আহার করিতে বসিলেন। ঠাকুর আবার বিদ্যা-অভিনেতা যাত্রাওয়ালা ছোক্‌রাটীর সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিদ্যার প্রতি)। তোমরা সকলে ঠাকুর-বাড়ীতে প্রসাদ পেলে না কেন? এখানে খেলেই হতো।

বিদ্যা। আজ্ঞা, সবাইয়ের মত ত সমান নয়, তাই আলাদা রান্নাবাড়া হচ্ছে। সকলে অতিথিশালায় খেতে চায় না।

রাখাল খাইতে বসিয়াছেন। ঠাকুর ভক্ত সঙ্গে বারান্দায় বসিয়া আবার কথা কহিতেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[যাত্রাওয়ালা ও সংসারে সাধনা। ঈশ্বর দর্শনের উপায়।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিদ্যা অভিনেতার প্রতি)। উপায় ব্যাকুলতা। কায়মনোবাক্যে তাঁহাকে পাবার চেষ্টা। যখন অনেক পিত্ত জমে তখন ন্যাবা লাগে; সকল জিনিষ হল্‌দে দেখায়। হল্‌দে ছাড়া কোন রং দেখা যায় না।

"তোমাদের যাত্রাওয়ালাদের ভিতর যারা কেবল মেয়ে সাজে তাদের প্রকৃতি ভাব হয়ে যায়। মেয়েকে চিন্তা করে মেয়ের মত হাব ভাব সব হয়। সেইরূপ ঈশ্বরকে রাতদিন চিন্তা করলে তাঁরই সত্তা পেয়ে যায়।

"মনকে যে রঙ্গে ছোপাবে সেই রং হয়ে যায়। মন ধোপা-ঘরের কাপড়।

বিদ্যা। তবে একবার ধোপাবাড়ী দিতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, আগে চিত্তশুদ্ধি; তারপর মনকে যদি ঈশ্বর চিন্তাতে ফেলে রাখ তবে সেই রংই হবে। আবার যদি সংসার করা, যাত্রাওয়ালার কাজ করা,—এতে ফেলে রাখো, তাহলে সেই রকমই হয়ে যাবে।

"তোমার কি বিবাহ হয়েছে? ছেলে পুলে?

বিদ্যা। আজ্ঞা, একটী কন্যা গত; আরো একটী সন্তান হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এর মধ্যে হোলো, গেল! তোমার এই কম বয়স! বলে—'সাঁজ সকালে ভাতার মলো কাঁদব কত রাত'! (সকলের হাস্য)

"সংসারে সুখ ত দেখছ! যেমন আম্ড়া, কেবল আঁটি আর চাম্ড়া। খেলে হয় অম্ল-শূল।

"যাত্রাওয়ালার কাজ করছ, তা বেশ! কিন্তু বড় যন্ত্রণা। এখন কম বয়স, তাই গোলগাল চেহারা। তার পর সব তুবড়ে যাবে! যাত্রাওয়ালারা প্রায় ঐ রকমই হয়। গাল তোবড়া, পেট মোটা, হাতে তাগা। (সকলের হাস্য)

"আমি কেন বিদ্যাসুন্দর শুনলাম? দেখলাম—তাল, মান, গান বেশ। তারপর মা দেখিয়ে দিলেন যে নারায়ণই এই যাত্রাওয়ালাদের রূপ ধারণ করে যাত্রা করছেন।

বিদ্যা। আজ্ঞা, কাম আর কামনা তফাত্ কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কাম যেন গাছের মূল, কামনা যেন ডালপালা।

"এই কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি ছয় রিপু একবারে ত যাবে না; তাই ঈশ্বরের দিকে মোড় ফিরিয়ে দিতে হবে। যদি কামনা করতে হয়, লোভ করতে হয়, তবে ঈশ্বরের ভক্তি-কামনা করতে হয়, আর তাঁকে পাবার লোভ করতে হয়। যদি মদ অর্থাৎ মত্ততা করতে হয়, অহঙ্কার করতে হয়, তাহলে আমি ঈশ্বরের দাস, ঈশ্বরের সন্তান, এই বলে মত্ততা, অহঙ্কার করতে হয়।

"সব মন তাঁকে না দিলে তাঁকে দর্শন হয় না।

[ভোগান্তে যোগ ভ্রাতৃস্নেহ ও সংসার।]

"কামিনী কাঞ্চনে মনের বাজে-খরচ হয়। এই দেখ না ছেলেমেয়ে, যাত্রা করা—এই সব নানা কাজে ঈশ্বরেতে মনের যোগ হয় না।

"ভোগ থাকলেই যোগ কমে যায়। ভোগ থাকলেই আবার জ্বালা। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—অবধূত চীলকে চব্বিশ গুরুর মধ্যে একজন করেছিল। চীলের মুখে মাছ ছিল, তাই হাজার কাক তাকে ঘিরে ফেল্লে; যে দিকে চীল মাছ-মুখে যায় সেই দিকে কাকগুলো পেছনে পেছনে কা কা করতে করতে যায়। যখন চীলের মুখ থেকে মাছটা আপনি হঠাৎ পড়ে গেল, তখন যত কাক মাছের দিকে গেল, চীলের দিকে আর গেল না।

"মাছ অর্থাৎ ভোগের বস্তু। কাকগুলো ভাবনা চিন্তা। যেখানে ভোগ সেখানেই ভাবনা চিন্তা; ভোগ ত্যাগ হয়ে গেলেই শান্তি।

"আবার দেখ, অর্থই আবার অনর্থ হয়। তোমরা ভাই ভাই বেশ আছ, কিন্তু ভাইয়ে ভাইয়ে হিস্যে নিয়ে গোল হয়। কুকুররা গা চাটা-চাটি করছে, পরস্পর বেশ ভাব। কিন্তু গৃহস্থ যদি ভাত দুটী ফেলে দেয় তাহলে পরস্পর কাম্ড়াকাম্ড়ি করবে।

"মাঝে মাঝে এখানে আসবে (মাষ্টার প্রভৃতিকে দেখাইয়া) এঁরা আসেন। রবিবার কিম্বা অন্য ছুটীতে আসেন।

বিদ্যা। আমাদের রবিবার তিন মাস। শ্রাবণ, ভাদ্র আর পৌষ। বর্ষা আর ধান কাটবার সময়। আজ্ঞা, আপনার কাছে আসব সেত আমাদের ভাগ্য।

"দক্ষিণেশ্বরে আসবার সময় দুজনের কথা শুনেছিলাম—আপনার আর জ্ঞানার্ণবের।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ভাইয়েদের সঙ্গে মিল হয়ে থাকবে। মিল থাকলেই দেখতে শুনতে সব ভাল। যাত্রাতে দেখ নাই? চারজন গান গাইছে কিন্তু প্রত্যেকে যদি ভিন্ন সুর ধরে তাহলে যাত্রা ভেঙ্গে যায়।

বিদ্যা। জালের নীচে অনেক পাখী পড়েছে, যদি একসঙ্গে চেষ্টা কোরে একদিকে জালটা নিয়ে যায় তাহলে

অনেকটা রক্ষা হয়। কিন্তু নানাদিকে যদি নানান পাখী উড়বার চেষ্টা করে তা হলে হয় না।

যাত্রাওয়ালা ও ঈশ্বর 'কল্পতরু'। সকাম প্রার্থনার বিপৎ।

"আজ্ঞা, আপনি ভোগের কথা যা বল্লেন, তা ঠিক। ঈশ্বরের কাছে ভোগের কামনা করলে শেষকালে বিপদে পড়তে হয়। মনে কত রকম কামনা বাসনা উঠছে, সব কামনাতে ত মঙ্গল হয় না। ঈশ্বর কল্পতরু, তাঁর কাছে যা কামনা করে চাইবে তা এসে পড়বে। এখন মনে যদি উঠে ইনি কল্পতরু, আচ্ছা দেখি বাঘ যদি আসে। বাঘকে মনে করতে বাঘ এসে পড়ল; আর লোকটাকে খেয়ে ফেল্লে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, ঐ বোধ, যে বাঘ্ আসে।

"আর কি বলব, ঐদিকে মন রেখো, ঈশ্বরকে ভুলো না—সরল ভাবে তাঁকে ডাকলে তিনি দেখা দিবেন।

"আর একটী কথা,—যাত্রা শেষে কিছু হরিনাম করে উঠো। তা হলে যারা গায় এবং যারা শুনে সকলে ঈশ্বর চিন্তা করতে করতে নিজ নিজ স্থানে যাবে।"

যাত্রাওয়ালারা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও গৃহস্থাশ্রমে ভক্ত-বধূগণের প্রতি উপদেশ।]

দুটী ভক্তদের পরিবারেরা আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। তাঁহারা ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন, এই জন্য উপবাস করিয়া আছেন। দুই জা অবগুণ্ঠনবতী, দুই ভায়ের বধূ। বয়স ২২।২৩এর মধ্যে, দুই জনেই ছেলেদের মা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বধূদিগের প্রতি)। দেখ, তোমরা শিব পূজা কোরো। কি করে পূজা করতে হয় 'নিত্য কর্ম্ম' বলে বই আছে, সেই বই পড়ে দেখে লবে। ঠাকুর পূজা করতে হলে ঠাকুরের কাজ অনেকক্ষণ ধরে করতে পারবে। ফুল তোলা, চন্দন ঘষা, ঠাকুরের বাসন মাজা, ঠাকুরের জল-খাবার সাজান, এই সকল করতে হলে ঐ দিকেই মন থাকবে। হীন বুদ্ধি, রাগ হিংসা এ সব চলে যাবে। দুই জায়ে যখন কথাবার্ত্তা কইবে, তখন ঠাকুরদেরই কথাবার্ত্তা কইবে।

[Sri Ramkrishno and the value of Image worship.]

"কোন রকম করে ঈশ্বরেতে মনের যোগ করা। এক-বারও যেন তাঁকে ভোলা না হয়, যেমন তেলের ধারা, তার ভিতর ফাঁক নাই। একটা ইটকে বা পাথরকে ঈশ্বর বলে যদি ভক্তি ভাবে পূজা কর, তাতেও তাঁর কৃপায় ঈশ্বর দর্শন হতে পারে।

"আগে যা বল্লুম শিব পূজা—এই সব পূজা করতে হয়। তার পর পাকা হয়ে গেলে বেশীদিন পূজা করতে হয় না। তখন সর্ব্বদাই মনের যোগ হয়ে থাকে; সর্ব্বদাই স্মরণ মনন থাকে।

বড় বধূ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। আমাদের কি একটু কিছু বলে দিবেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে)। আমি তো মন্ত্র দিই না। মন্ত্র দিলে শিষ্যের পাপ তাপ নিতে হয়। মা আমায় বালকের অবস্থায় রেখেছেন। এখন শিব পূজা যা বলে দিলাম তাই কোরো। মাঝে মাঝে আসবে—পরে ঈশ্বরের ইচ্ছায় যা হয় হবে। স্নানযাত্রার দিন আবার আসবার চেষ্টা করবে।

বাড়ীতে হরিনাম করতে আমি যে বলেছিলাম, তা কি হচ্ছে?

বধূ। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমরা উপবাস কো'রে এসেছ কেন? খেয়ে আসতে হয়।

"মেয়েরা আমার মার এক একটী রূপ কি না; তাই তাদের কষ্ট আমি দেখতে পারি না; জগন্মাতার এক একটী রূপ। খেয়ে আসবে, আনন্দে থাকবে।

এই বলিয়া শ্রীযুক্ত রামলালকে বধূদের বসাইয়া জল খাওয়াইতে আদেশ করিলেন। ফলহারিণী পূজার প্রসাদ লুচি, নানাবিধ ফল, গ্লাস ভরিয়া চিনির পানা, ও মিষ্টান্নাদি তাঁহারা পাইলেন।

ঠাকুর বলিলেন, তোমরা কিছু খেলে এখন আমার মনটা শীতল হলো; আমি মেয়েদের উপবাসী দেখতে পারি না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হরি (তুরীয়ানন্দ) নারাণ প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে।

শ্রীরামকৃষ্ণ একটু বিশ্রাম করিতে না করিতেই কলিকাতা হইতে হরি, নারাণ, নরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আসিয়া তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। নরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় Presidency College এর সংস্কৃত অধ্যাপকের পুত্র। বাড়ীতে বনিবনাও না হওয়াতে শ্যামপুকুরে আলাদা বাসা করিয়' স্ত্রী পুত্র লইয়' আছেন। লোকটী ভারী সরল। এক্ষণে বয়স ২৯।৩০ হইবে। শেষ জীবনে তিনি এলাহাবাদে বাস করিয়াছিলেন। ৫৮ বৎসর বয়সে তাঁর শরীর ত্যাগ হইয়াছিল।

তিনি ধ্যানের সময় ঘণ্টা-নিনাদ প্রভৃতি অনেক রকম শুনিতে ও দেখিতে পাইতেন। ভূটান, উত্তর পশ্চিমে ও নানা স্থানে অনেক ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ঠাকুরকে মাঝে মাঝে দর্শন করিতে আসিতেন।

হরি (অর্থাৎ স্বামী তুরীয়ানন্দ) তখন তাঁর বাগবাজারের বাড়ীতে ভায়েদের সঙ্গে থাকিতেন। General Assemblyতে প্রবেশিকা পর্য্যন্ত পড়িয়া আপাততঃ বাড়ীতে ঈশ্বর-চিন্তা শাস্ত্র-পাঠ ও যোগাভ্যাস করিতেন। মাঝে মাঝে শ্রীরামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া দর্শন করিতেন। ঠাকুর বাগবাজারের বলরামের বাটীতে গমন করিলে তাঁহাকে কখনও কখনও ডাকাইয়া পাঠাইতেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের কথা। ব্রহ্ম বোধ-স্বরূপ। তোতা-পুরীর ঠাকুরকে শিক্ষা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ভক্তদের প্রতি) বুদ্ধদেবের কথা অনেক শুনেছি, তিনি দশাবতারের ভিতর একজন অবতার। ব্রহ্ম অচল অটল নিষ্ক্রিয় বোধ-স্বরূপ। বুদ্ধি যখন এই বোধ-স্বরূপে লয় হয় তখন ব্রহ্ম-জ্ঞান হয়; তখন মানুষ বুদ্ধ হয়ে যায়।

"ন্যাংটা বলত, মনের লয় বুদ্ধিতে, বুদ্ধির লয় বোধ-স্বরূপে।"

"যতক্ষণ অহং থাকে ততক্ষণ ব্রহ্ম-জ্ঞান হয় না। ব্রহ্ম-জ্ঞান হলে, ঈশ্বরকে দর্শন হলে, তবে অহং নিজের বশে আসে; তা না হলে অহংকে বশ করা যায় না। নিজের ছায়াকে ধরা শক্ত; তবে সূর্য্য মাথার উপর এলে ছায়া আধ হাতের মধ্যে থাকে।

[বন্দ্যোপাধ্যায়কে শিক্ষা—ঈশ্বর দর্শন কি; উপায় সাধুসঙ্গ।]

ভক্ত। ঈশ্বর দর্শন কিরূপ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। Theatre দেখ নাই? লোক সব পরস্পর কথা কচ্ছে, এমন সময় পর্দ্দা উঠে গেল; তখন সকলের সমস্ত মনটা অভিনয়ে যায়; আর বাহ্য দৃষ্টি থাকে না—এরই নাম সমাধিস্থ হওয়া।

"আবার পর্দ্দা পড়ে গেলে বাহিরে দৃষ্টি। মায়ারূপ যবনিকা পড়ে গেলে আবার মানুষ বহির্মুখ হয়।

(নরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি) তুমি অনেক ভ্রমণ করেছ, সাধুদের কিছু গল্প কর।

বন্দ্যোপাধ্যায় ভূটানে দুইজন যোগী দেখেছিলেন, তাঁহারা আধ সের নিমের রস খান; এই সব গল্প করিতেছেন। আবার নর্ম্মদাতীরে সাধুর আশ্রমে গিয়াছিলেন। সেই আশ্রমের সাধু পেণ্টেলুন-পরা বাঙ্গালী বাবুকে দেখে বলেছিলেন 'ইস্‌কা পেট মে ছুরি হ্যায়'।

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেখ, সাধুদের ছবি ঘরে রাখ্‌তে হয়; তাহলে সর্ব্বদা ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়।

বন্দ্যোপাধ্যায়। আপনার ছবি ঘরে রেখেছি; আর পাহাড়ে সাধুর ছবি, হাতে গাঁজার কল্‌কেতে আগুন দেওয়া।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ; সাধুদের ছবি দেখলে উদ্দীপন হয়। শোলার আতা দেখলে যেমন সত্যকার আতার উদ্দীপন হয়; যুবতী স্ত্রীলোক দেখলে লোকের যেমন ভোগের উদ্দীপন হয়।

"তাই তোমাদের বলি সর্ব্বদাই সাধুসঙ্গ দরকার।

(বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি) সংসারের জ্বালা ত দেখছ। ভোগ নিতে গেলেই জ্বালা। চীলের মুখে যতক্ষণ মাছ ছিল, ততক্ষণ ঝাঁকে ঝাঁকে কাক এসে তাকে জ্বালাতন করেছিল।

"সাধুসঙ্গে শান্তি হয়; কুম্ভীর জলে অনেকক্ষণ থাকে;

এক একবার জলে ভাসে, নিশ্বাস লবার জন্য। তখন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

শ্রীরামকৃষ্ণ এইবার পশ্চিমের গোল বারাণ্ডায় আসিয়া বসিয়াছেন। বন্দ্যোপাধ্যায়, হরি, মাষ্টার প্রভৃতি সকলে কাছে বসিয়া আছেন। বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংসারের কষ্ট ঠাকুর সব জানেন।

[বন্দ্যোপাধ্যায়কে শিক্ষা। ভার্য্যা সংসারের কারণ; শরণাগত হও]

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেখ, এক কপ্নিকো আস্তে যত কষ্ট। বিবাহ করে, ছেলে পুলে হ'য়েছে, চাকরী করতে হয়; সাধু কপ্নি লয়ে ব্যস্ত; সংসারী ভার্য্যা লয়ে। আবার বাড়ীর সঙ্গে বনিবনাও নাই, তাই—আলাদা বাসা করতে হয়েছে। (সহাস্যে) চৈতন্যদেব নিতাইকে বলেছিলেন, "শুন শুন নিত্যানন্দ ভাই, সংসারী জীবের কভু গতি নাই।"

(মাষ্টারকে দেখাইয়া, সহাস্যে) ইনিও আলাদা বাসা করে আছেন। তুমি কে, না আমি বিদেশিনী; আর তুমি কে, না 'আমি বিরহিনী'। (সকলের হাস্য) বেশ মিল হবে।

"তবে তাঁর শরণাগত হলে আর ভয় নাই। তিনিই রক্ষা করবেন।

হরি প্রভৃতি। আচ্ছা, অনেকের তাঁকে লাভ করতে অত দেরী হয় কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি জানো, ভোগ আর কর্ম্ম শেষ না হলে ব্যাকুলতা আসে না। বৈদ্য বলে দিন কাটুক, তার পর সামান্য ঔষধে উপকার হবে।

"নারদ রামকে বল্লেন, 'রাম! তুমি অযোধ্যায় বসে রইলে, রাবণ-বধ কেমন করে হবে? তুমি যে সেই জন্য অবতীর্ণ হয়েছ!' রাম বল্লেন, নারদ! সময় হউক, রাবণের কর্ম্ম-ক্ষয় হোক্, তবে তার বধের উদ্যোগ হবে।

The Problem of Evil and Hari (Turianananda). ঠাকুরের বিজ্ঞানীর অবস্থা।

হরি। আচ্ছা, সংসারে এত দুঃখ কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। এ সংসার তাঁর লীলা; খেলার মত। এই লীলায় সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, জ্ঞান অজ্ঞান, ভাল মন্দ, সব আছে। দুঃখ, পাপ এ সব গেলে লীলা চলে না।

"চোর চোর খেলায় বুড়ীকে ছুঁতে হয়। খেলার গোড়াতেই বুড়ী ছুঁলে বুড়ী সন্তুষ্ট হয় না। ঈশ্বরের (বুড়ীর) ইচ্ছা যে খেলাটা খানিকক্ষণ চলে। তারপর—

'ঘুড়ীর লক্ষের দুটা একটা কাটে
হেসে দাও মা, হাত-চাপড়ী!'

"অর্থাৎ ঈশ্বর দর্শন করে দুই একজন মুক্ত হয়ে যায়, অনেক তপস্যার পর, তাঁর কৃপায়। তখন মা আনন্দে হাত তালি দেন, 'ভো! কাটা!' এই বলে।

হরি। খেলায় যে আমাদের প্রাণ যায়!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। তুমি কে, বল দেখি। ঈশ্বরই সব হয়ে রয়েছেন—মায়া, জীব, জগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব।

'সাপ হয়ে খাই আবার রোজা হয়ে ঝাড়ি।' তিনি বিদ্যা অবিদ্যা দুই-ই হয়ে রয়েছেন। অবিদ্যা মায়ায় অজ্ঞান হয়ে রয়েছেন; বিদ্যা মায়ায় ও গুরু রূপে রোজা হয়ে ঝাড়ছেন!

"অজ্ঞান, জ্ঞান, বিজ্ঞান। জ্ঞানী দেখেন তিনিই আছেন, তিনিই কর্ত্তা; সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার করছেন। বিজ্ঞানী দেখেন, তিনিই সব হয়ে রয়েছেন।

"মহাভাব, প্রেম হলে দেখে তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই!

"ভাবের কাছে ভক্তি ফিকে; ভাব পাকলে মহাভাব, প্রেম।

(বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি) "ধ্যানের সময় ঘণ্টাশব্দ এখনও কি শোনো?"

বন্দ্যো। রোজ শব্দ শোনা! আবার রূপদর্শন! একবার মন ধরলে কি আর বিরাম হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। হাঁ, কাঠে একবার আগুন ধরলে আর নেবে না। (ভক্তদের প্রতি) ইনি বিশ্বাসের কথা অনেক জানেন।

বন্দ্যো। আমার বিশ্বাসটা বড় বেশী।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কিছু বলি না।

বন্দ্যো। একজনকে গুরু গাঁড়োল মন্ত্র দিছলেন, আর বলেছিলেন, 'গাড়োলই তোর ইষ্ট।' গাড়োল মন্ত্র জপ করে সে সিদ্ধ হোলো।

"যেহুড়ে রাম নাম করে গঙ্গা পার হয়ে গিছল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমার বাড়ীর মেয়েদের বলরামের মেয়েদের সঙ্গে এনো।

বন্দ্যো। বলরাম কে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। বলরাম কে জানো না? বোসপাড়ায় বাড়ী।

সরলকে দেখিলে শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দে বিভোর হয়েন। বন্দ্যোপাধ্যায় খুব সরল; নিরঞ্জনকেও সরল বলে খুব ভালবাসেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। তোমায় নিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করতে বলছি কেন? সে সরল সত্য কি না, এইটী দেখবে বলে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভক্ত-সঙ্গে গুহ্য কথা। শ্রীযুক্ত কেশবসেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ শিবের সিঁড়িতে বসিয়া আছেন। বেলা অপরাহ্ণ ৫টা হইয়াছে; কাছে অধর ডাক্তার, নিতাই এবং মাষ্টার প্রভৃতি দু একটী ভক্ত বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। দেখ, আমার স্বভাব বদ্‌লে যাচ্ছে।

এইবার কি গুহ্য কথা বলিবেন বলিয়া সিঁড়ির এক ধাপ নামিয়া ভক্তদের কাছে বসিলেন। আবার কি বলিতেছেন—

[God's highest Manifestation in Man. The Mystery of Divine Incarnation.]

"ভক্ত তোমরা, তোমাদের বল্‌তে কি; আজকাল ঈশ্বরের চিন্ময় রূপ দর্শন হয় না। এখন সাকার নররূপ এইটে বলে দিচ্ছে। আমার স্বভাব ঈশ্বরের রূপ দর্শন স্পর্শন আলিঙ্গন করা। এখন বলে দিচ্ছে, 'তুমি দেহ ধারণ করেছ সাকার নররূপ লয়ে আনন্দ কর।'

"তিনি ত সকল ভূতেই আছেন; তবে মানুষের ভিতর বেশী প্রকাশ।"

"মানুষ কি কম গা? ঈশ্বর চিন্তা করতে পারে, অনন্তকে চিন্তা করতে পারে, অন্য জীব জন্তু পারে না।

"অন্য জীব জন্তুর ভিতরে ও গাছপালার ভিতরে তিনি সর্ব্বভূতে আছেন; কিন্তু মানুষে বেশী প্রকাশ।

"অগ্নি তত্ত্ব সর্ব্বভূতে আছে, সব জিনিষে আছে; কিন্তু কাষ্ঠে বেশী প্রকাশ।

"রাম লক্ষ্মণকে বলেছিলেন, ভাই, দেখ হাতী এত বড় জানোয়ার, কিন্তু ঈশ্বর চিন্তা করতে পারে না।

"আবার অবতারে বেশী প্রকাশ। রাম লক্ষ্মণকে বলেছিলেন, ভাই যে মানুষে দেখবে উর্জিতা ভক্তি; ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায় সেইখানে আমি আছি।

ঠাকুর আবার চুপ করিয়া আছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার কথা কহিতেছেন।

[Influence of Sri Ramakrishna on Sj Keshav Chandra Sen.]

শ্রীরামকৃষ্ণ। আচ্ছা, কেশব সেন খুব আস্‌ত। এখানে এসে অনেক বদ্‌লে গেল। ইদানীং খুব লোক হয়েছিল। এখানে অনেকবার এসেছিল দল বল নিয়ে। আবার একলা একলা আসবার ইচ্ছা ছিল।

"আগে তেমন সাধুসঙ্গ হয় নাই।

"কলুটোলার বাড়ীতে দেখা হোলো; হৃদে সঙ্গে ছিল। কেশব সেন যে ঘরে ছিল, সেই ঘরে আমাদের বসালে। টেবিলে কি লিখ্‌ছিল, অনেকক্ষণ পরে কলম ছেড়ে কেদারা থেকে নেমে বস্‌ল; তা আমাদের নমস্কার টমস্কার করা নাই।

"এখানে মাঝে মাঝে আস্‌ত। আমি একদিন ভাবাবস্থাতে বল্‌লাম সাধুর সম্মুখে পা তুলতে নাই। ওতে রজোগুণ বৃদ্ধি হয়। আমি তারা এলেই নমস্কার করতুম, তখন ওরা ক্রমে ভূমিষ্ঠ হয়ে নমস্কার করতে শিখলে।"

[ব্রাহ্মসমাজে হরিনাম ও মার নাম। ভক্ত-হৃদয়ে ঈশ্বরদর্শন]

"আর কেশবকে বল্লাম, 'তোমরা হরিনাম করো, কলিতে তাঁর নাম গুণ কীর্ত্তন করতে হয়।' তখন ওরা খোল করতাল নিয়ে হরিনাম ধরলে।

"হরি নামে বিশ্বাস আমার আরও হলো কেন? এই ঠাকুরবাড়ীতে সাধুরা মাঝে মাঝে আসে; একটী মুলতানের সাধু এসেছিল; গঙ্গাসাগরের লোকের জন্য অপেক্ষা কর্‌ছিল। (মাষ্টারকে দেখাইয়া) এদের বয়সের সাধু। সেই বলেছিল, 'উপায় নারদীয় ভক্তি।'

[কেশবকে উপদেশ—বিষয় আঁসচুপড়ী, সাধুসঙ্গ ফুলের গন্ধ। মাঝে মাঝে নির্জ্জনে সাধন।]

"কেশব একদিন এসেছিল ; রাত্ দশটা পর্য্যন্ত ছিল। প্রতাপ আর কেউ কেউ বল্লে, আজ থেকে যাব ; সব বটতলায় (পঞ্চবটীতে) বসে। কেশব বল্লে, না কাজ আছে, যেতে হবে।

"তখন আমি হেসে বল্লাম, আঁস চুপড়ীর গন্ধ না হলে কি ঘুম হবে না ? একজন মেছুনী মালীর বাড়ীতে অতিথি হয়েছিল ; মাছ বিক্রি করে আস্‌ছে ; চুপড়ী হাতে আছে, তাকে ফুলের ঘরে শুতে দেওয়া হল। অনেক রাত্ পর্য্যন্ত ফুলের গন্ধে ঘুম হচ্ছে না ; বাড়ীর গিন্নী সেই অবস্থা দেখে বল্লে, কি গো, তুই ছট্‌ফট্ করছিস্ কেন ? সে বল্লে, কে জানে বাবু, বুঝি এই ফুলের গন্ধে ঘুম হচ্ছেনা ; আমার আঁসচুপড়ীটা আনিয়ে দিতে পার ? তা হলে বোধ হয় ঘুম হতে পারে। শেষে আঁস চুপড়ী আনাতে, জল ছিটে দিয়ে নাকের কাছে রেখে, ভোস্ ভোস্ করে ঘুমোতে লাগল ! এই গল্প শুনে কেশবের দলের লোকেরা হো, হো, করে হাসতে লাগল।

"আর একদিন কেশবকে বল্লাম, সংসারী হওয়া বড় কঠিন—যে ঘরে আচার আর তেঁতুল আর জলের জালা, সেই ঘরেই বিকারী রোগী কেমন করে ভাল হয় ; তাই মাঝে মাঝে সাধন ভজন করবার জন্য নির্জ্জনে চলে যেতে হয়। গুঁড়ি মোটা হলে হাতী বেঁধে দেওয়া যায়, কিন্তু চারা গাছ ছাগলে গরুতে খেয়ে ফেলে। তাই কেশব লেক্‌চারে বল্লে, তোমরা পাকা হয়ে সংসারে থাক।"

"একদিন এখানে এসেছিল। সন্ধ্যার পর ঘাটে উপাসনা কল্লে। উপাসনার পর আমি কেশবকে বল্লুম, দেখ ভগবানই একরূপে ভাগবত হয়েছেন, তাই বেদ, পুরাণ তন্ত্র এসব পূজা করতে হয়। আবার একরূপে তিনি ভক্ত হয়েছেন, **ভক্তের হৃদয় তাঁর বৈঠক-খানা** ; বৈঠকখানায় গেলে যেমন বাবুকে অনায়াসে দেখা যায়। তাই ভক্তের পূজাতে ভগবানের পূজা হয়।

"কেশব আর তার দলের লোকগুলি এই কথাগুলি খুব মন দিয়ে শুনলে। চাঁদের আলোক গঙ্গাকূলে ; সিঁড়ির চাতালে সকলে বসে আছে। আমি বল্লাম, সকলে বল **'ভাগবত ভক্ত ভগবান'**

তখন সকলে এক সুরে বল্লে, 'ভাগবত ভক্ত ভগবান'। আবার বল্‌লাম, বল 'ব্রহ্মই শক্তি, শক্তিই ব্রহ্ম'। তারা আবার এক স্বরে বল্‌লে 'ব্রহ্মই শক্তি, শক্তিই ব্রহ্ম'। তাদের বল্লাম, যাকে তোমরা ব্রহ্ম বল, তাঁকেই আমি মা বলি ; মা বড় মধুর নাম।

"যখন আবার তাদের বল্‌লাম, আবার বল 'গুরুকৃষ্ণ বৈষ্ণব'। তখন কেশব বল্‌লে, মহাশয় অতদুর নয়! তাহলে সকলে আমাদের গোঁড়া বৈষ্ণব মনে করবে।

"কেশবকে মাঝে মাঝে বল্‌তাম, তোমরা যাঁকে ব্রহ্ম বল, তাঁকেই আমি শক্তি, আদ্যাশক্তি বলি। যখন বাক্য মনের অতীত, নির্গুণ নিষ্ক্রিয় তখন বেদে, তাঁকে ব্রহ্ম বলেছে। যখন দেখি যে তিনি সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কর্‌ছেন, তখন তাঁকে শক্তি, আদ্যাশক্তি এই সব বলি।

[অধর, মাষ্টার প্রভৃতিকে উপদেশ, 'এগিয়ে পড়'।]

"(ভক্তদের প্রতি), দেখ কেশব এত পণ্ডিত, ইংরাজিতে Lecture (লেক্‌চার) দিত, কত লোকে তাকে মান্‌ত, স্বয়ং Queen Victoria তার সঙ্গে বসে কথা কয়েছে! সে কিন্তু এখানে যখন আস্‌ত, শুধু গায়ে ; সাধুদর্শন করতে হলে হাতে কিছু আনতে হয়, তাই ফল হাতে করে আস্‌ত। একবারে অভিমানশূন্য!

"(অধরের প্রতি) দেখ, তুমি এত বিদ্বান আবার ডিপুটী, তবু তুমি খাঁদি ফাঁদির বশ। এগিয়ে পড়। চন্দন কাঠের পরেও আরও ভাল ভাল জিনিষ আছে ; রূপার খনি, তার পর সোণার খনি, তারপর হীরা মাণিক। কাঠুরে বনের কাঠ কাট্‌ছিল, তাই ব্রহ্মচারী তাকে বল্লে, 'এগিয়ে পড়'।

শিবের মন্দির হইতে অবতরণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাঙ্গণের মধ্য দিয়া নিজের ঘরের দিকে আসিতেছেন। সঙ্গে অধর, মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তেরা। এমন সময় বিষ্ণু-ঘরের সেবক পূজারী শ্রীযুক্ত রাম চাটুয্যে আসিয়া খবর দিলেন শ্রীশ্রীমার পরিচারিকার কলেরা হইয়াছে।

রাম চাটুয্যে (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। আমি ত দশটার সময় বল্‌লুম, আপনারা শুনলেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি কি করবো।

রাম চাটুয্যে। আপনি কি করবেন? রাখাল, রামলাল এরা সব ছিল, ওরা কেউ কিছু কল্লে না।

মাষ্টার। কিশোরী ঔষধ আন্‌তে গেছে, আল্‌ম-বাজারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি, একলা? কোথা থেকে আনবে?

মাষ্টার। আর কেহ সঙ্গে নাই। আল্‌মবাজার থেকে আনবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। যারা রোগীকে দেখ্‌ছে তাদের বলে দাও বাড়লে কি করতে হবে; কমলেই বা কি খাবে।

মাষ্টার। যে আজ্ঞা।

ভক্তবধূগণ এইবারে আসিয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহারা বিদায় গ্রহণ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের আবার বল্লেন, শিবপূজা যেমন বল্লাম ঐরূপ করবে। আর খেয়ে দেয়ে এসো, তা না হলে আমার কষ্ট হয়। স্নানযাত্রার দিন আবার আসবার চেষ্টা কোরো।

হাইফেন

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

(৫)

অনেক বেলায় বিলোপ বাসায় ফিরিয়া যাইতেই মলয় বলিয়া উঠিল—ভ্যালা যা হোক! কোথায় ডুব মেরেছিলে?

বিলোপ গাহিয়া উঠিল—"রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করি!"

মলয় কৃত্রিম বিরক্তিভরা স্বরে বলিয়া উঠিল—তোমার গান রাখো। তুমি রূপসাগরে ডুব দিয়েছিলে, আমি মনে ভাব্‌ছিলাম তুমি সাগরজলে ডুবে মরেছ।

বিলোপ গাহিতে লাগিল—

"ঘাটে ঘাটে ঘুর্‌ব না আর
ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী।
সময় যেন হয় রে এবার
ঢেউ খাওয়া সব চুকিয়ে দেবার,
সুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে
অমর হয়ে রব মরি?......"

মলয় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—তুমি ত মরে'ও অমর হবে, কিন্তু আমি যে খিদেয় যেন আছি মরি'। চলো খাবার খেয়ে আসি......

বিলোপ বলিল—না, আমি আর কিছু খাব না, আমি খেয়ে এসিছি।

মলয় আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—কোথা থেকে খেয়ে এলে আবার! লোণা জলে চুবুনি আর হাওয়া খাওয়া ছাড়া সাগরতীরে আর কিছু খেতে মেলে নাকি?

বিলোপ হাসিয়া বলিল—সেই বৃদ্ধ......

মলয় আঁৎকাইয়া উঠিল—ওরে বাপ রে! সেই বুড়োর পাল্লায় আবার পড়েছিলে?

বিলোপ হাসিয়া বলিল—তিনি এক দিন তোমাকে নিয়ে যেতে বলেছেন......

মলয় বলিয়া উঠিল—রক্ষা করো ভাই! বিদেশে এসে বুড়োর খপ্পরে ফেলে দিয়ো না।

বিলোপ হাসিতে হাসিতে বলিল—তিনি বলেছেন তুমি যদি না যাও ত তিনিই আস্‌বেন......

মলয় ভয়ের অভিনয় করিয়া বলিল—সর্ব্বনাশ! একেবারে মহম্মদ! পর্ব্বত যদি কাছে না যায় ত তিনিই পর্ব্বতের কাছে আস্‌বেন! কবে কখন আস্‌বেন আমায় আগে থাক্‌তে বোলো, আমি পালিয়ে থাক্‌ব!

বিলোপ বন্ধুকে ভয় দেখাইবার জন্য বলিল—তিনি কাল ভোরে আস্‌বেন যদি তুমি আজ বিকালে না যাও।

মলয় বলিল—কালকের ঘুমের সুখটানটা কপালে নেই দেখ্‌ছি! ভোরে উঠেই পালাতে হবে। বৃদ্ধ-দর্শনের চেয়ে তোমার সূর্য্যোদয় দর্শন ঢের ভালো—কাল ভোর-বেলা তুমি যখন উঠ্‌বে তখন আমাকে উঠিয়ে দিয়ো, আমিও তোমার সঙ্গ নেবো, বুড়োর কাছ থেকে পালানো ও সূর্য্যোদয় দেখা—এক ঢিলে দুই পাখী মারা যাবে। কিন্তু দোহাই ভাই, সমুদ্রতীর ত সুবিস্তৃত, আমাকে সেই দিকে নিয়ে যেয়ো যেদিকে তোমার সেই বুড়োর ছায়া মাড়াবার আশঙ্কা থাক্‌বে না।

বিলোপ সন্তুষ্ট হইয়া বলিল—আচ্ছা তাই হবে।

সেই দিন রাত্রিশেষে ভোর-বেলা বিলোপ শয্যা ত্যাগ করিয়া মলয়কে ডাকাডাকি আরম্ভ করিল, এবং ডাকা-ডাকিতে বিশেষে কোনো ফল না হওয়াতে বন্ধুকে ঠেলা দিতে লাগিল। মলয় অর্দ্ধজাগ্রত হইয়া জড়িত স্বরে বলিল—আঃ! রাত দুপুরে ঠেলাঠেলি লাগিয়েছ কেন?

বিলোপ বলিল—আরে ওঠো! ভোর হয়ে গেছে।

মলয় বিরক্ত স্বরে বলিল—হোক ভোর।

বিলোপ হাসিয়া বলিল—তা হলে থাকো তুমি, আমি চল্‌লাম। সেই বৃদ্ধ এসে একলা তোমায় পেয়ে……

মলয় চিত হইয়া শুইয়া একটু স্পষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—তুমি না থাক্‌লে সে আর আমায় চিন্‌বে কি করে'? সনাক্ত কর্‌বে কে?

বিলোপ হাসিতে হাসিতে বলিল—আমি যে তাঁকে ঘরের নম্বর আর তোমার চেহারার বর্ণনা বলে' এসেছি।

মলয় ভেঙ্‌চানো স্বরে বলিয়া উঠিল—বড় কাজ করেছ! আমার মাথা কিনেছ আর কি?

মলয়ের বিরক্তি দেখিয়া আমোদ অনুভব করিয়া বিলোপ হাসিতে লাগিল, কোনো কথা বলিল না।

মলয় বিলোপকে নীরব থাকিতে দেখিয়া মিনতিপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা ভাই সত্য করে' বলো, সেই বুড়ো আস্‌বে? না আমায় মিথ্যা ভয় দেখাচ্ছ!

বিলোপ গম্ভীর ভাব ধারণ করিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল—তিনি আস্‌বেন বলেছেন।

মলয় ধড়মড় করিয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া বলিয়া উঠিল—ধুত্তোর বুড়োর নেই তিন করেছে! আমার আজকের ঘুমটাই মাটি! চলো, আজ তোমার সখের সূর্য্যোদয় দেখা আমার কপালে লেখা আছে, কে খণ্ডাবে বলো। আজ সূর্য্যোদয় দেখা হয়ে যাবে; তার পর খেয়ে-দেয়ে এখান থেকে পলায়ন। বাপ্‌স্! যে-দেশে বুড়ো পেয়ে বস্‌বার ভয় নেই, সেই রকম একটা বিজন দেশে পালাতে হবে।

বিলোপ হাসিয়া বলিল—তুমি যে কেলিশীল জাতকের রাজা ব্রহ্মগুপ্তের মতন বৃদ্ধবিদ্বেষী দেখ্‌ছি? তুমিও ত একদিন বুড়ো হবে?

মলয় মোটা ভাঙা গলায় বেসুরা বেতালা গাহিয়া উঠিল—

"আমাদের পাক্‌বে না চুল গো,—
মোদের পাক্‌বে না চুল!"

বিলোপ হাসিয়া বলিল—তবে বলো না কেন—

"আমাদের ভয় কাহারে?
বুড়ো বুড়ো চোর ডাকাতে
কি আমাদের কর্‌তে পারে?"

মলয় গাহিয়া উঠিল—

"ওর ভাব দেখে যে পায় হাসি হায় হায় রে!
মরণ-আয়োজনের মাঝে
বসে' আছেন কিসের কাজে
প্রবীণ প্রাচীন প্রবাসী! হায় হায় রে!"

বিলোপ কৌতুক অনুভব করিয়া হাসিয়া বলিল—তবে আর বিলম্ব কোরো না, বেরিয়ে পড়ো; সেই বৃদ্ধ বলেছিলেন ভোরবেলা এসে তোমাকে নিয়ে সূর্য্যোদয় দেখ্‌তে যাবেন।

মলয় তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইতে হইতে বলিল—সর্ব্বনাশ!

দুই বন্ধুতে সমুদ্রবেলায় গিয়া উপস্থিত হইল। মলয় বিলোপকে বলিল—দেখ ভাই, সেই বুড়োকে দূরে দেখ্‌তে পেয়েই আমাকে ডেন্‌জার্ সিগ্‌ন্যাল্ দিয়ো, আমি উল্টো মুখে পিঠ্‌টান দেবো…দোহাই তোমার, বিশ্বাসঘাতকতা কোরো না, সেই বুড়োর খপ্পরে অতর্কিতে সঁপে দিয়ো না।

বিলোপ একবার উৎসুক দৃষ্টি সমস্ত তটভূমির উপর

বুলাইয়া লইয়া উদ্গত দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া বলিল—মা ভৈঃ! আজ তিনি আসেন নি দেখ্ছি।

মলয় বলিল—আঃ! পরম সুখবর! বাঁচা গেল! এখন নির্ব্বিঘ্নে গা মেলে বেড়াতে পার্ব।

অল্পদূর অগ্রসর হইয়াই মলয় দেখিল একটি শ্যামাঙ্গিনী তরুণী উদীয়মান অরুণচ্ছবির দিকে স্মিতমুখ ফিরাইয়া প্রশংসমান মুগ্ধ নয়ন দুটিকে সেই শোভার সম্ভারে ডুবাইয়া দিয়াছে; নবারুণের লালিমা সেই মুখের উপর পড়িয়া মুখখানিকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়া সুন্দরতর করিয়াছে। মলয় সেই মাধুর্য্যচ্ছবি দেখিবামাত্র প্রশংসাভরা স্বরে বলিয়া উঠিল—বাঃ!

বিলোপের দৃষ্টি নবোদিত সূর্য্যের দিকে নিবদ্ধ ছিল; সে মনে করিল তাহার বন্ধু সূর্য্যোদয়ের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া প্রশংসা করিতেছে, তাই সে সূর্য্যের দিক হইতে দৃষ্টি না ফিরাইয়াই বলিল—কেমন, সুন্দর নয়? এ সৌন্দর্য্য কি কল্পনায় উপলব্ধি করা যায়?

মলয় কৌতুকপূর্ণ স্বরে বলিল—নিশ্চয়ই না। ভাগ্যিস বুড়োর ভয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম, তাই ত অরুণের সঙ্গে সঙ্গে অরুণার দেখাও পেয়ে গেলাম!

মলয়ের কথায় বিলোপ মুখ ফিরাইয়াই মলয়ের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিল মৃদুলা সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহার পার্শ্বে তাহার পিতা, এবং তাহার পশ্চাতে এক রকম তাহাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে এক দল যুবক—যেন তাহারা সূর্য্যোদয়ের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে, কিন্তু বস্তুত তাহারা মৃদুলার মাধুর্য্যেই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইহারা আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়াছিল বলিয়া বিলোপ এতক্ষণ ত্রিলোক ও মৃদুলাকে দেখিতে পায় নাই। বিলোপের মনের মধ্যে ছাঁত করিয়া উঠিল, সে সহসা মলয়ের কথার উত্তরে কিছু বলিতে পারিল না।

মলয় বলিতে লাগিল—এই অসংখ্য নরনারীর মধ্য থেকে চোখ ওকেই বেছে বরণ করে' যখন নিলে, তখনই মন বলে' উঠ্ল—এই! এই আমার অচেনা প্রেয়সী! এরই প্রণয়ের টানে আমার এই শ্রীক্ষেত্র পর্য্যন্ত অভিসার-যাত্রা! আমি ত প্রেয়সীকে আবিষ্কার কর্লাম; তুমি এইবার ঘটকালি করো।

বিলোপের মনে আশঙ্কার আঘাত লাগিল, কিন্তু সে সেই বেদনা গোপন করিয়া বলিল—কিন্তু ওঁর সঙ্গে যে বুড়ো রয়েছেন।

মলয় ত্রিলোককে একবার দেখিয়া লইয়া আবার মৃদুলাকে দেখিয়া বিলোপকে বলিল—বুড়ো থাকে থাকুক, শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি!

বিলোপ হাসিয়া বলিল—তবে চলো, তোমার ঘটকালি শুরু করে' দি।

মলয় উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি করে' আলাপ করা যায় একটা কিছু ফন্দি ঠাউরেছ?

বিলোপ বলিল—খুব সোজা উপায়—সাম্নে গিয়ে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে' বল্ব—এই আমার বন্ধু........

মলয় ব্যস্ত হইয়া বলিল—না না, ঠাট্টা নয়। ওঁদের সঙ্গে কোনো রকমে আলাপ কর্তে হবে।

বিলোপ আশ্বাস দিয়া বলিল—তুমি আমার উপরে নির্ভর করে' থাকো, আমি তোমার সঙ্গে ঠিক আলাপ করিয়ে দিচ্ছি।

মলয় হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কিন্তু তুমি আমার সাম্নে দাঁড়িয়ে আমার প্রেয়সীর মনের সাম্নে থেকে আমাকে আড়াল করে' ফেল্বে না ত?

বিলোপ হাসিয়া বলিল—ভয় নেই, আমি ঘটকালি পাকা করে' দিয়ে সরে' পড়্ব। চলো।

মলয় কণ্ঠস্বরে সন্দেহ কৌতুহল ও কৌতুক ভরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—সত্যি আলাপ করবে নাকি?

বিলোপ বলিল—সত্যি না ত কি?

মলয়ের আগ্রহ সত্ত্বেও দ্বিধা ও সঙ্কোচ আর ঘুচে না; সে ইতস্তত করিতে করিতে বলিল—হঠাৎ গায়ে পড়ে' গিয়ে আলাপ কর্লে ওঁরা কি মনে কর্বেন......

বিলোপ হাসিয়া বলিল—ওঁরা মনে কর্বেন এর যখন এত আগ্রহ তখন এর প্রণয় ক্ষণিকের মোহ নয়।

মলয় সন্দেহভরে জিজ্ঞাসা করিল—কিন্তু আলাপ ত কর্বে তুমি, আর প্রণয়ের আগ্রহ থাক্বে আমার মনের গোপনে?

বিলোপ এই কথায় অত্যন্ত কৌতুক অনুভব করিল, কিন্তু সে ভাব গোপন রাখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—

আরে আমি ত তোমার উকিল মাত্র, উকিলের সব কথা, আর কাজের ফলভাগী হয় তার মক্কেল।

মলয় ইতস্তত করিতে করিতে বলিল—আচ্ছা, চলো তা হলে।

বিলোপ মলয়কে সঙ্গে করিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়া ত্রিলোককে নমস্কার করিয়া বলিল—এই আমার বন্ধু……

বিলোপ যেরূপ ভাবে মলয়কে পরিচিত করিয়া দিবে বলিয়াছিল, ঠিক সেইরূপ ভাবেই পরিচয় দিতেছে দেখিয়া মলয় ভয় পাইয়া ব্যস্ত হইয়া বিলোপের হাত চাপিয়া ধরিল ও মৃদুস্বরে তাহাকে ভৎর্সনা করিতে লাগিল—এই, এই, তুমি কর্‌ছ কি ! এ রকম………

ত্রিলোক ও মৃদুলা একসঙ্গে মলয়ের দিকে ফিরিয়া তাকাইতেই মলয় অপ্রতিভ হইয়া থামিয়া গেল; সে দেখিল তাহারা দুজনেই উৎসুক কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতেছে। মলয় অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল, বিলোপের উপর তাহার রাগ হইতে লাগিল—আহাম্মকটা আমাকে কী অপদস্থই কর্‌লে ! কিন্তু তাহাকে আর কিছু ভাবিবার অবসর না দিয়া ত্রিলোক বাবু অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন, মৃদুলার মুখ স্মিতহাস্যে বিকশিত হইয়া উঠিল। মলয়ের মনে হইল বিলোপের গালে এক চড় মারিয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া সকল লজ্জা হইতে পরিত্রাণ পায়—উহাদের ঐ হাস্য তাহাকেই ত উপহাস করিল। কিন্তু পরক্ষণেই ত্রিলোক বাবু তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—আজ সকালেই ঘুম ভেঙেছে তা হলে! জীবনে কি এই প্রথম সূর্য্যোদয় দর্শন ঘট্‌ল ?

ত্রিলোক আবার অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। মৃদুলার মুখ আবার হাস্যোদ্ভাসিত হইল।

মলয় ত্রিলোকের প্রশ্নে ও হাস্যে একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়িল; সে স্থির করিতে পারিতেছিল না ইহারা কি বলিতেছে, কেন বলিতেছে, এই বিদ্রূপের অর্থ কি। সে থতমত খাইয়া মূঢ়ের মতন বিলোপের মুখের দিকে চাহিল।

বিলোপ একবার মৃদুলাকে দেখিয়া লইয়া ত্রিলোককে বলিল—হ্যাঁ, আজ ওঁর জীবনে প্রথম অরুণালোক-সম্পাত হয়েছে!

ত্রিলোক আবার অট্টহাস্য করিয়া উঠিয়া মলয়কে চমকিত করিয়া দিলেন এবং হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—এমন অসম্ভব ঘটনা ঘট্‌ল কি করে' ?

বিলোপ বিমূঢ় বন্ধুর মুখের দিকে একবার ও মৃদুলার স্মিত মুখের দিকে একবার দেখিয়া লইয়া বলিল—ভবিতব্যের লেখা ! কপালে সূর্য্যোদয় দেখা লেখা আছে, কে খণ্ডাবে বলুন !

ত্রিলোকের আবার অট্টহাস্য। তিনি মলয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—বাবার নামটি কি ?

মলয় এই প্রশ্নে থতমত খাইয়া বলিল—আজ্ঞে আমার নাম ?

ত্রিলোক হাসিতে হাসিতে বলিলেন—হ্যাঁ, বিলোপ বাবুর সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়ে গেছে; তাঁর বন্ধুর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত খবর আমরা পেয়েছি; তার বেশী জান্‌তে পারি নি……

ত্রিলোকের আবার হাস্য।

মলয় বিলোপের দিকে অর্থভরা একটা কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া নম্রভাবে বলিল—আমার নাম শ্রীমলয়কুমার চট্টোপাধ্যায়।

মলয়ের নাম শুনিয়াই ত্রিলোক চমকিত হইয়া গম্ভীর হইয়া গেলেন, যেন কোনো হারানো আত্মীয়ের সন্ধান পাইয়াছেন এমনি ভাবে উন্মনস্ক হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—বাবার কি করা হয়।

মলয় বলিল—আমি এটর্ণির কাজ শিখ্‌ছি।

এই কথাতেও ত্রিলোক আর একবার চমকিয়া উঠিলেন, যেন সন্ধানের সূত্র ক্রমশ জট খুলিয়া বাহির হইতেছে; তিনি বিস্ময়-কৌতূহলভরা স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—এটর্ণির কাজ ! কোন্ এটর্ণির আপিসে ?

মলয় বলিল—আমার বাবার আপিসেই।

ত্রিলোক আবার চমকিত হইয়া গম্ভীরতর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—তাঁর নাম ?

মলয় বলিল—শ্রীযুক্ত আদিত্যকুমার……

ত্রিলোক অকস্মাৎ আবার উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিলেন—ও ! তুমি আদিত্যর ছেলে !

তারপর ত্রিলোক মৃদুলার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—মৃদু, সেই আমার সতীর্থ সুহৃদ আদিত্যর ছেলে মলয়।

ত্রিলোকের এই কথায় মলয় ও বিলোপের দৃষ্টি মৃদুলার মুখের উপর গিয়া পড়িল।

মৃদুলার মুখ আনন্দে ও লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল, সে মুখ নত করিয়া মৃদুস্বরে বলিল—বুঝেছি।

মলয়ের মনের মধ্যে মধুর ধ্বনিতে একটি মিষ্ট নাম বাজিতে লাগিল—মৃদু! মৃদু! মৃদু! এই মৃদুর কাছে সে একেবারে অপরিচিত নয়, এই পরম সৌভাগ্যে তাহার মন নৃত্য করিতেছিল।

ত্রিলোক মলয়কে বলিলেন—তুমি আমার অত্যন্ত আপনার লোক—তুমি আদিত্যর ছেলে! তোমাকে ত বাবা আমি হোটেলে থাক্‌তে দিতে পারিনে। আমি এখানে আছি, তুমি হোটেলে থাক্‌বে কি? তুমি এখনই আমাদের সঙ্গে চলো আমার বাড়ীতে। আমার বাড়ী বিলোপ বাবুর দেখা আছে, উনি গিয়ে জিনিসপত্তর সব হোটেল থেকে এখনই নিয়ে আসুন। বিলোপ বাবু, আমার আতিথ্য স্বীকার কর্‌তে হবে; কোনো কুণ্ঠা সঙ্কোচ করা চল্‌বে না, কারণ সম্বন্ধমাভাষণপূর্ব্বমাহুঃ! জিনিসপত্তর নিয়ে এখনি আসা হয় যেন, আমরা অপেক্ষা করে' থাক্‌ব, আমার বাড়ীতেই চা খাওয়া হবে। চলো বাবা মলয়, চলো, অনেক বেলা হয়ে গেল, চা-টা খাবে চলো।

এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে মলয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; মৃদুলার সঙ্গে এক বাড়ীতে থাকিবে, মৃদুলার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হইবার পরম সুযোগ উপস্থিত। কিন্তু মৃদুলা অবিবাহিত ত? এই কথা মনে হইতেই মলয় চকিতে একবার মৃদুলার সিঁথির দিকে ও বাঁ-হাতের দিকে দেখিয়া লইল—সিথিতে সিঁদুর নাই। তবে কি মৃদুলা বিধবা? এই কথা মনে করিতেই মলয়ের মনটা অস্থির উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। তাই হওয়া সম্ভব, নহিলে এত বয়স পর্য্যন্ত কোন্ হিন্দুর মেয়ে অবিবাহিতা থাকে? যদি হিন্দু না হয়? হিন্দু না হইলে তাহার পিতার সতীর্থ কখনই তাহাকে তাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিতেন না, তাঁহার জানা থাকার কথা তাঁহার সতীর্থ কিরূপ গোঁড়া হিন্দু।

মলয় যখন এইরূপ নানা চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া ছিল, তখন বিলোপ ভাবিতেছিল—মজা হইল মন্দ না! মৃদুলাকে প্রথম দর্শনেই আমার ভালো লাগিয়াছিল; মলয়েরও তাহাকেই ভালো লাগিল। আমি মলয়কে মৃদুলার সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিতে গেলাম, মলয় মৃদুলার পরমাত্মীয়, আমি এখন মলয়ের সঙ্গী বলিয়া তাহাদের অত্যাজ্য অতিথি, কিন্তু আমি অনাবশ্যক, হয়ত বা অনভীপ্সিত। আমি ত্রিলোক বাবুকে অনুরোধ করিয়াছিলাম আমাকে তুমি বলিয়া সম্বোধন করিতে, কিন্তু তিনি বরাবর প্রথম পুরুষে কথা চালাইয়া তুমি ও আপনি দুই-ই বাঁচাইয়া চলিতেছেন; আর মলয়ের সঙ্গে পরিচয় হইতে না হইতে তাহাকে অসঙ্কোচে তুমি বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন! এক যাত্রায় চমৎকার পৃথক্ ফল!

ত্রিলোকের আহ্বান শুনিয়া মলয় স্মিতমুখে বিলোপের দিকে চাহিল, তাহার মুখের ভাবে সে যেন বিলোপকে বলিতে চাহিতেছিল—মেঘ না চাহিতেই জল!

মলয়ের দৃষ্টির উত্তরে বিলোপ হাসিয়া বলিল—তুমি ওঁদের সঙ্গে যাও, আমি হোটেলের ডেরা-ডাণ্ডা তুলে নিয়ে আসি।

মলয় একটু কুণ্ঠিত হইয়া বলিতে যাইতেছিল—তোমার সঙ্গে আমিও......

অমনি ত্রিলোক বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন—বিলোপ বাবু একাই একশ! তোমার যাবার আর দরকার কি? বাসায় গিয়ে আমি বরং আমার চাকরকে পাঠিয়ে দিচ্ছি......

বিলোপও ত্রিলোকের সঙ্গে সঙ্গে মলয়কে বলিল—তুমি গিয়ে আর কর্‌বে কি? সবই ত আমিই কর্‌ব, তুমি শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌বে ত! কেবল দৃষ্টি দেবার জন্যে তোমার যাবার দরকার নেই।

ত্রিলোক বিলোপের কথা শুনিয়া খুসী হইয়া বলিলেন—আমি ত আগেই বলেছি, তোমার যাবার দর্‌কার হবে না। চলো তুমি আমাদের সঙ্গে। বিলোপ বাবু, বিলম্ব যেন না হয়, আমরা অপেক্ষা করে' বসে' থাক্‌ব......

বিলোপ চলিয়া যাইতে যাইতে হাসিমুখ ফিরাইয়া বলিল—আমি শীগ্‌গিরই আস্‌ব।

একাকী হোটেলে ফিরিয়া যাইতে যাইতে বিলোপ ভাবিতেছিল—এখন সে মলয়ের তল্পীদার। ত্রিলোক বাবু

তাঁর চাকর পাঠাইয়া দিবেন মলয়ের তল্পীদারকে সাহায্য করিতে। মলয় তাহার বন্ধু, তাহার কাজ করিতে তাহার অগৌরব হয় না, যদি সেই কাজ সে স্বেচ্ছায় করে। অপরিহার্য্য বলিয়া যেখানে তাহার নিমন্ত্রণ, সেখানে যাইতে তাহার মন সরিতেছিল না; কিন্তু সে যাইতে আপত্তি করিলে মলয়ের যাওয়াও হইবে না, এবং তাহাতে মলয়ের মন প্রসন্ন থাকিবে না; অতএব অরুচিকর হইলেও বন্ধুর প্রীতির খাতিরে সে ত্রিলোকের বাড়ীতে আতিথ্য স্বীকার করিয়া তাহার বাড়ীতে বাস করিবার আয়োজন করিতে চলিল। (ক্রমশঃ)

'নৌকার মাঝি শিল্পী—শ্রীরণদা উকিল

শিশু-পালন

ডাঃ শ্রীবামনদাস মুখোপাধ্যায়

শিশুর প্রয়োজনীয়তা।—শাস্ত্রে লিখিত আছে, "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা, পুত্রঃ পিণ্ড প্রয়োজনম্।" অর্থাৎ পিতৃপুরুষকে পিণ্ডদানের জন্যই পুত্রের প্রয়োজন। আধুনিক সমাজ ইহা বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন যে, শিশুই ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবনের প্রধান বল ও ভরসা। শিশু ভিন্ন অন্য কেহই বংশরক্ষা, জাতিরক্ষা বা দেশরক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। তাই শিশুর এত প্রয়োজন। কিন্তু যদি সেই শিশু সুস্থ ও বলিষ্ঠ না হইয়া রুগ্ন ও দুর্ব্বল হয়, তাহার দ্বারা বংশ-রক্ষা, জাতিরক্ষা বা দেশরক্ষা—কোন কাজই হয় না। যদি সে চরিত্রবান ও ধর্ম্মপ্রাণ না হইয়া চরিত্রহীন ও অধার্ম্মিক হয়, সে বংশের কলঙ্ক, জাতির কলঙ্ক, দেশের কলঙ্ক হইয়া দাঁড়ায়। সন্তান রুগ্ন, দুর্ব্বল, চরিত্রহীন ও অধার্ম্মিক হওয়া যে কি নিদারুণ, কি মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা—সে দুঃখ যে কি দুঃখ—পিতামাতার সে যে কি জীবন্ত-দহন—তাহা যাঁহাদের ঘটিয়াছে, তাঁহারাই জানেন—অন্যের ধারণা করা সম্ভবপর নয়। এখন প্রশ্ন হইতে পারে—শিশু এরূপ হয় কেন? শিক্ষার দোষে।

শিশুর শিক্ষা।—যে সন্তান জীবনের প্রথম হইতেই আহার, বিহার ইত্যাদি সর্ব্ববিষয়ে সৎশিক্ষা না পায় সে কখনও সুস্থ, বলিষ্ঠ, চরিত্রবান ও ধর্ম্মপ্রাণ হইতে পারে না। সন্তানকে মাত্র আহার ও পরিধান প্রদান করিলেই তাহাকে 'পালন' করা হয় না। সন্তান যথারীতি 'পালন' করিতে হইলে তাহার স্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র-গঠনের দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। পিতামাতা নিজে সৎ হইয়া সদ্দৃষ্টান্ত না দেখাইলে সন্তানও সৎ হয় না—হইতে পারে না। গর্ভধারিণী হওয়া সহজ, কিন্তু 'মা' হওয়া সহজ নয়। "জননি! যদি তুমি সুসন্তানের 'মা' হইতে চাও, প্রথমে নিজেকে সংশোধিত করিয়া পরে তোমার কোলের শিশুর শিক্ষা-বিধানে যত্নবতী হও।" বাল্যে মাতৃক্রোড়ে যে শিক্ষা আরম্ভ হয়, সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া তাহাই প্রতিভাত হইতে দেখা যায়। স্কুল-কলেজে অধ্যয়ন করিয়া তোমার সন্তান অর্থকরী বিদ্যায় কৃতবিদ্য হইতে পারে; কিন্তু যদি সে জীবনের প্রথম দিন হইতে সর্ব্ববিষয়ে নিয়মানুবর্ত্তিতা—সুশৃঙ্খলতা শিক্ষা না পায়, কালে সে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিবেই। তা'ই, আমার সকাতর নিবেদন—'মা' যদি তুমি সুস্থ, বলিষ্ঠ, চরিত্রবান ও ধর্ম্মপ্রাণ সন্তান লাভ করিতে চাও, যদি তোমার সন্তানকে বংশের গৌরব—জাতির গৌরব—দেশের গৌরবস্বরূপ দেখিতে চাও, তাহার জীবনের প্রথম দিন হইতেই তাহার আহার নিদ্রা প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ে বিশেষ সতর্ক হও। তুমি ধন্য হও, তোমার বংশ ধন্য হউক;

সঙ্গে সঙ্গে জন্মভূমির প্রতি গৃহ সুস্থ, বলিষ্ঠ, চরিত্রবান্ ও ধর্ম্মপ্রাণ সুসন্তানে পূর্ণ হউক।"

শিক্ষারম্ভের প্রকৃত কাল ও স্থান, প্রকৃত শিক্ষা, বাল্যের শিক্ষা।—আঁতুড়ে জীবনের প্রথম দিন হইতেই শিক্ষা আরম্ভ করিতে হয় এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সেই শিক্ষা চলে। পিতৃ-মাতৃ-সন্নিধান ও পরিজনবেষ্টিত নিজ আলয়ই প্রকৃত শিক্ষালয়। বাল্যকালে শিক্ষা যত সহজে হয়, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তত সহজে হয় না। ভাল বা মন্দ, বাল্যের শিক্ষা যত দীর্ঘস্থায়ী হয়, পরবর্ত্তীকালের শিক্ষা তত দীর্ঘস্থায়ী হয় না—হইতে পারে না। বাল্যের শিক্ষা জীবনের সঙ্গে একেবারে এক হইয়া যায়—সে শিক্ষা সহজে ভুলা যায় না—ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। স্কুল কলেজে অর্থকরী বিদ্যা ও সাধারণ জ্ঞানলাভ হইতে পারে। কিন্তু মনুষ্যত্ব লাভ হয় না। আজকাল পিতৃমাতৃ-সন্নিধানে ও নিজ পরিজন মধ্যে শিশু যে শিক্ষা পায়, অনেক ক্ষেত্রে তাহাতে সুফল অপেক্ষা কুফল হইতে দেখা যায়। কোন কোন বাড়ীতে দেখিয়াছি, শিশু যখনই যাহা চায়—সে যখনই যে আবদার ধরে, ভালমন্দ বিবেচনা না করিয়া, স্নেহবশতঃ পিতামাতা বা আত্মীয়স্বজন তখনই তাহাকে সেই দ্রব্য দিয়া থাকেন বা তাহার সেই আবদার পূর্ণ করিবার জন্য যথাসাধ্য যত্নপর হ'ন। এরূপ করিলে শিশুর লালসা ক্রমশই বাড়িয়া যায়, এবং তাহার ভবিষ্যৎ জীবন বড় ক্লেশময় হয়। বাল্যকাল হইতেই সন্তানকে সংযম শিক্ষা দিতে হইবে; দয়া, ক্ষমা, ভালবাসা প্রভৃতি বিভিন্ন সৎপ্রবৃত্তিগুলি প্রস্ফুটিত হইবার সুযোগ দিতে হইবে; এবং লোভ, ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি অসৎপ্রবৃত্তি যাহাতে তাহার মনে উদয় না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আজকাল পিতামাতা—আত্মীয় স্বজন তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে এই অসৎপ্রবৃত্তিগুলি শিশুর নির্ম্মল হৃদয়ে কিরূপ ভাবে জাগাইয়াছেন তাহা ক্রমশঃ বলিব।

শিশু যখন প্রথম পাঠশালায় যাইতে আরম্ভ করে, তখন তাহার চরিত্র-গঠনের দায়িত্ব গুরুমহাশয়ের উপরও কতকাংশে নির্ভর করে; কারণ তিনিও একজন বাল্যের অন্যতম শিক্ষক। পাঠশালাতে শিশুর গুরুকরণ আরম্ভ হয়। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে উপযুক্ত মাতৃগুণ লাভ করিবার পূর্ব্বেই যেমন অনেকে "মা" হইয়া পড়েন, দুঃখের বিষয় যথোপযুক্ত গুরুগুণ-বিহীন হইয়াও সেইরূপ অনেকেই গুরুপদবাচ্য হইয়া দাঁড়ান। "মা"ই হউন আর পাঠ-শালার গুরুমহাশয়ই হউন—যাঁহার নিজের চরিত্র গঠিত হয় নাই, তিনি অপরের, বিশেষতঃ ভাল-মন্দ-জ্ঞানশূন্য শিশুর, চরিত্র-গঠনের ভার লইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। যিনি নিজের কাম ক্রোধাদি রিপু দমন করিতে অক্ষম, তিনি অপরকে রিপুদমন করিতে শিক্ষা দিবেন কিরূপে? কেবলমাত্র মৌখিক উপদেশ দানে অপরের চরিত্র গঠন করা যায় না। অপরের চরিত্র গঠন করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়—নিজের চরিত্র গঠন করিয়া সেই চরিত্র অপরের সম্মুখে স্থাপন করা। পিতামাতা—আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি বাল্যের শিক্ষক-গণের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁহাদের চরিত্রই—তাঁহাদের শিক্ষাই, শিশুতে দর্পণে প্রতিবিম্ববৎ সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়। এ সম্বন্ধে আর আর যাহা বলিবার আছে "নৈতিক শিক্ষার" আলোচনাকালে তাহা বলা হইবে।

শিশুর স্বাস্থ্য।—শাস্ত্রে আছে "শরীরমাদ্যম্ খলু ধর্ম্মসাধনম্।" আমাদের যতগুলি কর্ত্তব্য আছে তন্মধ্যে শরীর অর্থাৎ স্বাস্থ্যরক্ষা করাই সর্ব্বাগ্রে। কেন না সুস্থ শরীরই ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের প্রধান সহায়। শিশুর স্বাস্থ্য ভাল রাখিবার সম্পূর্ণ ভার মায়ের উপরই বিশেষভাবে ন্যস্ত। সে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়। তখন তাহার শরীর রক্ষার জন্য যাহা কিছু করা দরকার, তৎসমস্তই মায়ের হাতে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত—উষ্ণ ইত্যাদি অভাব-কষ্ট শিশু কথা কহিয়া প্রকাশ করিতে পারে না। এমন কি—যদি মলমূত্র ত্যাগ করে, অন্যে যতক্ষণ পরিষ্কার করিয়া না দেয়, ততক্ষণ তাহাকে সেই অবস্থাতেই থাকিতে হয়—সে এত অসহায়। ক্ষুধার তাড়না, রোগের যাতনা, শীত-উষ্ণাদি দৈহিক ক্লেশ ব্যক্ত করিবার তাহার মাত্র এক অস্ত্র আছে। সে অস্ত্র—কান্না। এই কান্না মাতৃ-হৃদয়ে যেমন প্রতিঘাত দেয়, তেমন আর কোথাও হয় না। এই জন্যই বলিয়াছি সন্তানের রক্ষার্থই ভগবান্ একাধারে মাতৃ-হৃদয়ে বুকভরা স্নেহ, প্রাণ-ভরা ভালবাসা ও অপার্থিব আত্মত্যাগ পূর্ণমাত্রায় ঢালিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু অনভিজ্ঞা মা শিশু কাঁদিলেই মনে করেন যে, তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে। তাই শিশু যখনই

কাঁদে তখনই তিনি তাহাকে স্তন্য-পান করান বা দুধ খাওয়ান। এরূপ করা শিশু-স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অনিষ্ট-কর। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, উষ্ণ ইত্যাদি শিশুর যাবতীয় অভাব-কষ্ট, সে একমাত্র কান্না দ্বারাই প্রকাশ করে—এ সকল প্রকাশ করিবার তাহার অন্য উপায় নাই। এ কথা সকল মায়েরই সর্ব্বদা মনে রাখা দরকার। কেন না শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য 'মা' যত দায়ী, তত আর কেহই নন্। তাহাকে সুস্থ, বলিষ্ঠ, চরিত্রবান্ ও ধর্ম্মপ্রাণ করিয়া গঠিত করিতে হইলে মায়ের হৃদয় করুণ অথচ দৃঢ় হওয়া চাই। কথায় বলে "ছেলে মানুষ করিতে হইলে তাহাকে হাতের আন্দাজে খাওয়াও আর বাঘের নজরে দেখ।" যে মায়ের হৃদয় কেবল করুণ কিম্বা দৃঢ়, বুঝিতে হইবে, শিশু 'পালন' করিবার যোগ্যতা তাঁহার নাই। শিশুকে সুস্থকায় ও বলিষ্ঠ করিবার জন্য তাহার আহার পরিধানাদি বিষয়ে যে সকল নিয়ম পালন করা একান্ত প্রয়োজন তাহা ক্রমশঃ বলা হইবে।

পিয়ারী

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল্

১৪

দক্ষিণেশ্বরের কাছে গঙ্গার ঠিক উপরেই শিবু একখানি পরিষ্কার বাংলা দেখিয়া আসিয়া পাপিয়াকে খবর দিলে, পাপিয়া অমলের কাছে কথাটা পাড়িল, বলিল,—আমারি বাড়ী সেটা, এমনি পড়ে আছে—যাবে সেখানে ?

অমল কহিল,—তুমি যদি বল, তাহলে যেতেই হবে আমায়। কিন্তু, এখানে সব আমার চেনা—এই হাওয়া, ঐ নদীর ঢেউ, পাখীর গান—সেখানে অন্ধ আমি—এ-সবের সঙ্গে কোনো পরিচয়ই যে হবে না চপলা!

পাপিয়া কহিল,—তবে থাক্।

—রাগ করলে ?

—না।...

তার পর চুপচাপ! অমল কহিল,—একটা বড় সাধ ছিল, চপলা...

—কি ?

—তোমার নামে লেখা কবিতাগুলি বই করে ছাপাবো···ভেবেছিলুম, তোমার দৃষ্টি তো কোনদিন পড়বে আমার পানে···! আমার পানে তুমি চেয়ে দেখবে, এ যে বড় দুরাশার, বড় দুর্লভ আকাঙ্ক্ষা—সে আকাঙ্ক্ষা করার সাহস আমার ছিল না তো! তাই ভেবেছিলুম, কবিতাগুলি ছেপে একেবারে বই করে তোমায় পাঠাবো...কলকাতায় কত বইয়ের দোকান আছে, তারা লেখা নিয়ে ছাপে! তা আমি তো এ বইয়ের জন্যে এক পয়সার প্রত্যাশা করিনে···শুধু দুখানি ছাপা বই চাইতুম...একখানি তোমায় পাঠাতুম, আর একখানি আমি রাখতুম– বাকী বই, যারা ছাপতো, তারাই বেচে তাদের ছাপার দাম তুল্‌তো... কিন্তু তা হলো না···

—নাই বা হলো! আমি তো এসেছি, ধরা দিয়েছি... তোমার হাতে লেখা এই কবিতাও পেয়েছি তো! তোমার হাতে লেখা অক্ষরের চেয়ে কি ছাপার অক্ষরের দাম বেশী হতো ?

অমল একটা নিশ্বাস ফেলিল, ডাকিল,—চপলা—

পাপিয়া কহিল,—কেন ?

অমল কহিল,—ভগবান মানুষকে কখনো সব সুখে সুখী করেন না!···আমার দুর্লভকে পেলুম···তবে অন্ধ হয়ে! বলিয়া একটু থামিল, পরে হাসিল; হাসিয়া কহিল,—কিন্তু অন্ধ না হলে তোমারি কি দয়া হতো··· তুমি কি আসতে...!...তাই ভাবি, অন্ধ হয়ে আমার কোনো দুঃখ নেই--আমি তোমায় পেয়েচি...তুমিই আমার চোখের দীপ্তি, আমার আলো...

পাপিয়ার বুক দুঃখে ক্ষোভে অভিভূত হইয়া উঠিল! এ কি ঝড়ের সঙ্গে যে তার লড়াই চলিয়াছে, সর্ব্বক্ষণ! আর সেই চপলা...যার জন্য এ একেবারে উন্মাদ, অন্ধ হইয়াও যার চিন্তায় এত সুখী···সেই চপলা এখন···? হয়তো তার মাড়োয়ারী বাবুটার গায়ে ঢলিয়া তার মুখে বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া অপূর্ব্ব মায়া বিস্তার করিয়াছে, তুচ্ছ দু'খানা গহনার লোভে!...অভিনয়! চপলা ষ্টেজে

উঠিয়া শুধু দুই দণ্ড ও কি অভিনয় করে! পাপিয়া এখন যে অভিনয় করিতেছে এখানে, চব্বিশ ঘণ্টা, সর্ব্বক্ষণ, অবিরাম ...তার যে তুলনা নাই! এই সর্ব্বনেশে ভূমিকা লইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে বুকে ছুরির ঘা খাইয়া রক্তাক্ত হইয়া কি এ ভয়ঙ্কর অভিনয়...!

পাপিয়া কোন কথা কহিতে পারিল না—অশ্রুর বাষ্পে দুই চোখ তার ঝাপসা হইয়া আসিল। অমল কহিল,—একবার একটি মুহূর্ত্তের জন্যও যদি এ চোখের দৃষ্টি খোলে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও যদি তোমায় আমার ঘরে দেখতে পাই! তোমার স্পর্শ অনুভব করছি প্রতি মুহূর্ত্তে···তবু একবার যদি তোমায় এ ঘরের মাঝে দেখে তারপর জন্মের মত আমি অন্ধ হই,—যুগ-যুগ ধরে আমায় অন্ধ জীবন বইতে হয়, তাহলেও কোনো দুঃখ থাকবে না আমার!...তা যদি সম্ভব হতো...!

পাপিয়া শিহরিয়া উঠিল। চোখ চাহিয়া যদি অমল দেখিত, এ তার সাধের প্রাণের চপলা নয়, পাপিয়া... সর্ব্বনাশ! তাহা হইলে কি যে হইত, সে কথা ভাবিয়া পাপিয়া আবার শিহরিয়া উঠিল।

অমল কহিল,—কিন্তু তুমি কত কাল আমার এখানে পড়ে থাকবে চপলা?...কত দিন আমায় এখন বাঁচতে হবে, তার ঠিক নেই—কত দীর্ঘ দিন...আমার এই কুৎসিত অন্ধতার ভার এমনি করে বইবে তুমি···এ যে আমার প্রাণে সইচে না, চপলা—

—তার জন্যে তুমি ভেবো না...আমি তো স্বেচ্ছায় এ ভার নিয়েছি—এ ভারী বলেও মনে হচ্ছে না!... এতে আমি যে কি সুখ পাই! পাপিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল।

—সুখ...! অমল হাসিল; হাসিয়া কহিল,—কি বলচো তুমি চপলা! সুখ...?.

—হ্যাঁ, সুখ! অসহ্য সুখ! তোমার সেবায় প্রাণ ঢেলে অসহ্য সুখে আমি সুখী হয়েছি...

—কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি, তুমি···

—আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই···আমি নারী···নারীর কাজই যে সেবা, মমতা, স্নেহ...

—তুমি দেবী, চপলা...

রাক্ষসী, রাক্ষসী! পাপিয়ার মন ক্ষুব্ধ অভিমানে গর্জ্জিয়া উঠিল, তোমার চপলা দেবী নয়! সে যে কত বড় রাক্ষসী, অন্ধ তুমি, তার কি বুঝিবে!

পাপিয়া কহিল,—বেলা পড়ে এসেচে, তোমার খাবার সময় হলো।—

অমল কহিল,—শুধু সেবা?...যে রাজভোগ নিত্য মুখে তুলে দিচ্ছ, এর যে অনেক দাম···এত পয়সা তুমি আমার জন্যে খরচ করচো...

পাপিয়া সুদৃঢ় কণ্ঠে কহিল,—হ্যাঁ, করচি...কি তুচ্ছ খরচের কথা বলচো···! আমি...কথাটা বলিতে গিয়া সে থামিয়া পড়িল। এ সে কি বলিতেছিল? ছি! তার এ দুর্ব্বলতা কি কখনো ঘুচিবে না? এই অভিমান, এই ক্ষোভ, এই রোষ···নিজেকে এমন করিয়াই যদি সে বলি দিতে আসিয়াছে তো ছোট্ট অভিমানটুকুকে এখনো ছাড়িতে পারিবে না? এখনো সেটাকে আঁকড়াইয়া রহিবে? এ কি নীচ মন তার!...না, এ অভিমান আর নয়!

পাপিয়া ক্ষিপ্র পায়ে উঠিয়া গেল। অমল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। পাপিয়া অদূরে ঘরের কোণে বসিয়া ষ্টোভ জ্বালিল। তারপর তরকারী কুটিতে কুটিতে অমলের পানে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।—ও মুখ কি সার্থক-পুলকেই না প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে—কপালে দীপ্তির কি রেখা জ্বল্‌জ্বল্ করিয়া ফুটিয়াছে—অধরে হাসির রেখাতেও সে দীপ্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে···! সে একটা নিশ্বাস ফেলিল, হায় রে, তার মত দুর্ভাগিনী কি আর কেহ আছে!

দুই-চারিদিন পরে অমল পাপিয়াকে ধরিয়া কলিকাতার কয়েকটা বইয়ের দোকানে চিঠি লেখাইল; সঙ্গে সঙ্গে কবিতার নকল করিয়া খাতাও পাঠাইল, যদি তারা সেগুলা লইয়া বই ছাপায়। যথাসময়ে সকলেরই জবাব আসিল,—এ-সব পাগলামির ব্যাপারে মাথা ঘামাইবার তাদের মোটেই অবকাশ নাই!...এগুলা যা হইয়াছে, তা কবিতা নয়, উন্মাদের প্রলাপ! এ কথায় অমল একেবারে মুষড়াইয়া পড়িল—তার অন্ধ নয়নের কোণে জল-বিন্দু ফুটিয়া উঠিল। দেখিয়া পাপিয়ার প্রাণটাও হা-হা করিয়া উঠিল—কিন্তু তৃপ্তিও যে একটু না হইল, এমন নয়।...বেশ হইয়াছে! তোমার চপলার পূজা যে এমন ঘা খাইয়াছে—এ বেশ হইয়াছে!···

কিন্তু আর একটা জায়গা হইতে জবাব এখনো বাকী আছে।

অমল কহিল,—সত্যবান লাইব্রেরী এখনো কোনো জবাব দেয় নি...তারা বোধ হয় নিতে পারে—কি বল, চপলা?

পাপিয়া কহিল,—পারে বৈ কি। সবাই কি একরকম!

অমল কহিল,—কবিতাগুলো কি সত্যই কিছু হয়নি চপলা?...ওগুলো কি সত্যই উন্মাদের প্রলাপ? বল, তুমি বল...

পাপিয়া কহিল,—চমৎকার হয়েছে। কবিতা কি সকলের বোঝবার! তা হলে আর ভাবনা কি ছিল···

অমল হাসিয়া কহিল,—কবিত্বং দুর্লভং লোকে···

পাপিয়া কহিল—তা না তো কি!

তবু শেষ আঘাতটিকেও ঠেকাইয়া রাখা গেল না। সত্যবান লাইব্রেরীর চিঠিও আসিল। শুনিয়া অমল প্রদীপ্ত উৎসাহে কহিল,—পড়, পড়,—নিয়েচে কি না···

পাপিয়া চিঠি খুলিয়া পড়িল।—এও যে ছুরির ফলায় লেখা নির্ম্মম জবাব! সব-চেয়ে নির্ম্মম! সত্যবান লাইব্রেরী লিখিয়াছে,—

আপনার কবিতাগুলি ফেরত দিলাম। এ যে অমূল্য রচনা···এ ছাপিবার লোক এ দেশে মিলিবে না। বিলাতে পাঠাইবেন। একদিন ইহার জোরে নোবেল প্রাইজ আপনার হাতে আসিবে। ইতি...

অমল কহিল,—তুমি চুপ করে রইলে কেন? চেঁচিয়ে পড়···পড়চো না যে! এরাও ফেরত দেছে, না...? আমি তা জানি...নিরাশার কালো কালি তার মুখে যেন কে নিমেষে লেপিয়া দিল! সুগভীর ব্যথা এমন স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল যে পাপিয়া তাহা লক্ষ্য করিল! ঐ ব্যথিত চিত্তে আবার আঘাত লাগিবে...আহা! করুণায় তার প্রাণ ভরিয়া উঠিল। সে কহিল,—না, না, ভালো চিঠি···এরা বই ছাপবে...।

—ছাপবে···? অমলের মুখের কালি বিদ্যুতের আলোয় চকিতে কোথায় সরিয়া গেল!

পাপিয়া কহিল,—হ্যাঁ।

—কি লিখেচে, পড় পড়,···

পাপিয়া অমলের পানে একবার চাহিয়া দেখিল, তার পর পড়িল,—

মহাশয়, আপনার কবিতাগুলি সুন্দর হইয়াছে। আজ-কাল এমন কবিতা বড় দেখা যায় না। আপনার কবিতাগুলির অর্থ আছে এবং তার ভাবও খুব স্পষ্ট। এ বই আমরা ছাপিব। এ সম্বন্ধে আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। ইতি··· .

অমল সোচ্ছ্বাসে পাপিয়ার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া ডাকিল,—চপলা...

পাপিয়া কথা কহিল না—স্থির নেত্রে শুধু তার পানে চাহিয়া রহিল।

অমল কহিল,—আজ অন্ধ করে ভগবান আমায় এত সুখ দিচ্ছেন!...আমার সব কামনাই সার্থক হয়ে উঠচে... বলিয়া সে হাসিল, হাসিয়া বলিল,—আমার নীরব পূজা যখন তোমায় বিচলিত করেছে, তখনই তো তা সার্থক হয়েছে ··এ তো ফা'ও! ..তা তুমি তাদের লিখে দাও... আমি অনুমতি দিলুম। আমি এক পয়সা চাই না বইয়ের দামের জন্য! শুধু দু'খানি বই যেন তারা ছাপা হলেই পাঠিয়ে দেয়।···অমল আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। পাপিয়া অবিচল নেত্রে তার সে আনন্দোচ্ছ্বাস দেখিতে লাগিল।... তার চোখের সামনে হইতে সব আলো কোথায় যেন মিলাইয়া যাইতেছিল! এমনি খেলা খেলিয়াই তাকে বাকী জীবনটা কাটাইতে হইবে...শুধু মিথ্যা—আগাগোড়া মিথ্যা দিয়া! অথচ তার যেটুকু সত্য, যেটুকু খাঁটী—সেটুকু প্রাণপণে তাকে গোপন রাখিতে হইবে!...ভগবান, ভগবান, বুক যে ভাঙ্গিয়া যায়! এ কি দুশ্ছেদ্য বন্ধনে তাকে আঁটিয়া বাঁধিতেছ...! আর যে সহ্য যায় না, প্রভু! সহিবার সীমাও তো একটা আছে! সে সীমা···

১৫

পাপিয়াকে একবার বাড়ী ফিরিতে হইল। টাকার দরকার—আরো ছোট-খাট নানা দরকার আছে। শিবুকে দিয়া খপর লইয়া সতর্ক হইয়াই সে বাড়ী আসিল। বাড়ীর লোক অমনি সহস্র প্রশ্নে তাকে ঘিরিয়া ফেলিল,—মানগোবিন্দ পাগলের মত আসা-যাওয়া করিতেছে—এক মুহূর্ত সে সুস্থির হইতে পারে না...পাপিয়ার এ লুকোচুরি করার মানে কি?...পাপিয়া যেন হাঁফাইয়া উঠিল। সকলকে বিদায় দিয়া সে একবার একা নিজের নির্জ্জন ঘরে বসিয়া আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাকে বুঝিবার চেষ্টা করিল।

যে তাকে চায়না, তার পিছনে এমন সর্ব্বত্যাগী, এমন ভিক্ষুক হইয়া কেন সে ফিরিয়া মরিতেছে! তার একটু সুখের জন্ম, এতটুকু স্বাচ্ছন্দ্যের জন্ম এই যে গভীর কাতরতা,...কেন এ...! তার যা কামনা, তা তো কোন দিনই মিটিবে না! অথচ চপলার ছদ্ম আবরণে সোহাগের ঐ যে নানা কথা শোনা, আদর গ্রহণ করা...এতে বুক যে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে...পলে পলে মরণাধিক যন্ত্রণা সে ভোগ করিতেছে!...সে তো কতবার বলিয়াছে,—চপলা একটা তুচ্ছ গণিকা মাত্র, দাম লইয়া এই দেহ সে ভাড়ায় খাটাইয়াছে—যে আসিয়া পয়সা দিয়াছে, তারি কণ্ঠ ধরিয়া চপলা তার হইয়াছে—কত কুৎসিত, নীচ তার মন! ভান অভিনয়ে প্রেমের লীলা দেখাইয়া কত লোককে সে চমৎকৃত করিয়াছে, মুগ্ধ করিয়াছে, আবার যখনই তাদের দিক হইতে আদায়ের সামান্য ত্রুটি ঘটিয়াছে, অমনি রুদ্র মূর্ত্তিতে তাদের বিদায় দিয়াছে, এবং নূতন লোকের মন জোগাইবার জন্ম আবার সুচারু সাজে সাজিয়া, মিথ্যা কথার ফাঁদে নূতনকে ভালো করিয়াই বন্দী করিয়াছে!...এই মন-জোগানোর কাজে কোনো মিথ্যার আশ্রয় লইতে বাকী রাখে নাই! আগাগোড়া মিথ্যা অভিনয় করিয়া করিয়া তার ভিতরে সত্য যেটুকু ছিল, সেটুকুকে কবে যে সে বাহির করিয়া দিয়াছে, তার কোন ঠিকানাও নাই—এখন অন্তরে-বাহিরে মিথ্যাচারী হইয়াই সে পড়িয়া আছে! ...তবু এই মিথ্যাকেই অমল এমন করিয়া আদর করিবে, পূজা করিবে ...!

অমল তবু বলিতেছে—এই মিথ্যাই তার কাম্য, এই মিথ্যার পায়েই সে আপনাকে বিকাইয়া দিয়াছে, এই মিথ্যাই তার সব! এ মিথ্যা ছাড়িয়া এত বড় বিশ্বের কোথাও যদি এতবিন্দু সত্য থাকে, অমল তা চায় না, চায় না, চায় না!...এ কি সর্ব্বনেশে সৃষ্টিছাড়া মোহ অমলের!

...কিন্তু সে যাই হোক, নিজে যে সে শ্রান্ত হইয়া পড়িল,—সেবা করিয়া নয়, এই ছদ্ম মিথ্যা ভূমিকার অভিনয়ে তার দেহ-মন যে বিপুল শ্রান্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছে!...আর এ যে ভালো লাগে না, ভালো লাগে না গো...

পাপিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিতে বসিল।...ভাবিয়া সে শিহরিয়া উঠিল—না, তার দূরে থাকিবার উপায় নাই! তাকে ফিরিতেই হইবে! অমলের ঐ নিষ্ঠাই তাকে সেখানে আঁটিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে। হোক্ এ মিথ্যা অভিনয়, প্রকাণ্ড ছলনা... তবু ঐ অন্ধ ব্যথিতের কাছ হইতে এই ভূমিকার ছদ্ম বেশ পরিয়া চপলা সাজিয়া যেটুকু সে পায়, তা যে প্রাণের নিষ্ঠায় ভরপুর, তা যে সত্য, সার,...সেটা রূপ-বিলাসীর মোহ নয়, মাতালের নেশার ঘোর বা পয়সার পণ্যও নয়!...সেই খাঁটি বস্তুটুকু পাইবার জন্ম আহত রক্তাক্ত হইলেও তার মন সেইটুকুরই কাঙাল যে! এই নিষ্ঠাই যে তাকে বিচলিত করিয়াছে, তাকে বিপুল ঐশ্বর্য্যেভরা রাণীর আসন হইতে জীর্ণ কুটীরে ভিখারিণী দাসীর আসনে টানিয়া বসাইয়াছে! তাতেই সুখ!...তাতেই সে যে সুখ পাইয়াছে, তার আর তুলনা নাই!...মনটা মাঝে মাঝে নৈরাশ্যের ব্যথায় ঝরিয়া পড়িবার মত হয়, বেদনায় টাটাইয়া ওঠে, ক্ষোভের ঝড়ে মনটা কাণায়-কাণায় ভরিয়া যায়...তা হোক,...তবু উপায় নাই, কোন উপায় নাই।...

কিন্তু তার দিক হইতেও যে এতখানি নিষ্ঠা, এতখানি সত্য সেবায় অমলকে সে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, এর কি কোন দাম নাই!...অমল কি এটা বুঝিবে না...? তার চোখের দৃষ্টি রুদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু মন...? মন তো অন্ধতায় ঢাকিয়া যায় নাই! যদি সে কোনদিন বুঝিতে পারে, যাকে সে হেলায় অবজ্ঞায় উপেক্ষায় বিঁধিয়া কুকুরের মত তাড়াইয়া দিয়াছিল, সে উপেক্ষার ক্ষোভ গ্রাহ্য না করিয়া সে-ই আসিয়া তার এ দুর্দ্দিনে সেবায় তাকে তৃপ্ত করিয়াছে, কোনদিকে তার কোন অভাব রাখে নাই...এবং সে চপলা নয়, চপলা নয়, পাপিয়া... পিয়ারী বিবি! তার সেবায় নিজেকে ঢালিয়া দিতে পাপিয়া আজ সব ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে...আর এই সেবাই সে তার বাকী জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে ...স্বেচ্ছায়, আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছে...তাহা হইলেও কি তার প্রতি—সে যা তাই—এই পাপিয়ার প্রতি অমলের বিমুখ মন প্রসন্ন হইবে না...!...ভাবিতে ভাবিতে আশার পুলকচ্ছটায় পাপিয়ার মন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল!...

তা যদি হয়...আঃ! তাহা হইলে এই ছদ্ম ভূমিকার কুৎসিত খোলসটা টানিয়া দূরে ফেলিয়া প্রাণে মনে কেবলি সত্যের দাপ্ত রাগ মাখাইয়া তার সেবাকে সে আরো সুন্দর, আরো সার্থক করিয়া তুলিতে পারে...!

চপলার উপর তার রাগ ধরিল। এত-বড় পাষাণী সে—

বিলাসের যত-মন্ত উপাসনাই করুক, তবু সে নারী তো! নারীর প্রাণটাকে একেবারেই সে এই কুৎসিত জঘন্য লালাসার বিষে জর্জ্জরিত করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে…! পাষাণী, পাষাণী, শয়তানী সে…!…কিন্তু তার কথা যাক…! পাপিয়া এখন কি করিবে? কিসের আশায় সে এমন অন্ধ আবেগে সেখানে ছুটিতে চায়!…মরীচিকা… মরীচিকা—আলেয়ার আলোয় মাতিয়াই থাকিবে সে চিরদিন…!

পাপিয়া নিশ্বাস ফেলিল।…তাছাড়া উপায়ও তো নাই! বিলাসের আহ্বানে যে-পথে সে প্রথম যাত্রা সুরু করিয়াছিল, সে পথে শুধুই আলেয়া! ধন, জন, ঐশ্বর্য্য ..? কি তুচ্ছ বস্তু এগুলা!…মনকে তার যোগ্য খোরাকে বঞ্চিত করিয়া কি তুচ্ছ ধন-জনের পিছনেই সে ছুটিয়াছিল! প্রথম যৌবনে জীবন যখন প্রাণের মধ্যে দীপের শিখা জ্বালিয়া দিল, সে আলোয় চারিধার যে আলো হইয়া উঠিয়াছিল… হায় কোথায় গেল সে দীপের সে স্নিগ্ধ আলো!…ঝড়ের মত লোকের পর লোক আসিয়াছে, হাতে নগদ দাম লইয়া… আর সে এই জীবন-পুষ্পটিকে লইয়া চড়া দামে বাজারে বেসাতি করিয়াই চলিয়াছিল…! সেই সুন্দর শুভ্র প্রাণটাকে বাজারের ভিড়ে কি ধূলা, কি কালি মাখাইয়াই না মলিন কুৎসিত করিয়া ফেলিয়াছে…!

তার দুই চোখে জল ছাপাইয়া আসিল…সর্ব্বস্ব দিয়াও যদি আজ প্রথম যৌবনের সেই শুভ্র নির্ম্মল মুহূর্ত্তটিকে ফিরাইয়া পাওয়া যাইত, ভগবান! সে আজ দুর্লভ, অতীত, সুদূরের ..একটা জন্ম দিলেও বুঝি সে মুহূর্ত্তটিকে আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না!…

অবসাদে পাপিয়ার মন ভরিয়া উঠিল। নির্জীবের মত বালিশে শ্রান্ত শির রাখিয়া পাপিয়া বিছানায় লুটাইয়া পড়িল।…

তারপর বহুক্ষণ পরে চোখ মেলিয়া সে দেখে, কৌচে বসিয়া মানগোবিন্দ। মানগোবিন্দের চোখের দৃষ্টি বিষাদের ব্যথায় শুষ্ক, মলিন। পাপিয়া তাড়াতাড়ি চক্ষু মুদিল।… আবার সেই পুরানো নাগপাশের বাঁধন, বিলাসের শিকল তার দুই পা বাঁধিয়া ফেলিবার জন্য আগাইয়া আসিতেছে! ধড়-মড়িয়া সে উঠিয়া পড়িল। মানগোবিন্দ ডাকিল,— পিয়ারী…তার স্বর যেন কোন্ বহুদূরের অতল কোণ হইতে ভাসিয়া উঠিল।…হারানো স্মৃতির রেশের মতই সে ডাক!…

পাপিয়া কহিল,—কি?

মানগোবিন্দ উঠিয়া তার হাত ধরিল, করুণ আর্ত্তস্বরে কহিল,—আমি কি কোনো অপরাধ করেচি পিয়ারী যে, এ-ভাবে আমায় দগ্ধাচ্ছো!…

উচ্ছ্বসিত স্বরে পাপিয়া কহিল—না, না…তবে বলেচি তো ছুটী, ছুটী! ওগো দুদিনের ছুটী দাও আমায়! তোমার তৃপ্তির জন্য একেবারে কিছু না রেখে ঢেকে আমি আমার সব তোমায় সমর্পণ করেছি, তার জন্য দু'দিন আমায় ছুটী দাও। বাড়ীর চাকর-বাকরও দুদিন ছুটী চাইলে পায়…সে ছুটী আমি কি দুদিনের জন্যও পেতে পারি না…?

মানগোবিন্দ কহিল,—তাহলে এ বিচ্ছেদ চিরদিনের নয়…? বল,…আশা দাও…

পাপিয়া কহিল,—যদি বলি, না—বিশ্বাস করবে?

মানগোবিন্দ কহিল,—তোমার কথা বিশ্বাস করবো বৈ কি! কোনদিন অবিশ্বাস করেছি?

পাপিয়া চুপ করিয়া রহিল। সে জানে, এখানে এখন 'হাঁ' বলিলে মানগোবিন্দ একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিবে,— তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে এমন শিকলে বাঁধিবে যে, তার মুক্তির আর কোন আশা থাকিবে না! উপায়…?

সে বলিল,—আমাকে বিশ্বাস…? নিত্য যে ছলনার কারবার করচে—মিথ্যা দিয়ে যার আগাগোড়া ভরা… তাকে বিশ্বাস? এ যে পাগলের কথা…

মানগোবিন্দ স্থির দৃষ্টিতে পাপিয়ার পানে চাহিল, কহিল,—তবু তোমায় বিশ্বাস করবো! আমি যে তোমায় ভালবেসেছি পাপিয়া…শেষের দিকটায় মানগোবিন্দর স্বর আকুল উচ্ছ্বাসে কাঁপিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল।

পাপিয়া মানগোবিন্দর পানে চাহিল, পরে দৃঢ় কণ্ঠে কহিল,—বিশ্বাস যদি কর, তাহলে বাধা দিয়ো না। আমায় একটু একলা নিজের মনে থাকতে দাও।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মানগোবিন্দ কহিল,—তাই হোক পাপিয়া!…আমিও ঢের ভেবেচি এ সম্বন্ধে। ভেবে কি দেখেচি, জানো?…তোমায় যে এতদিন ভালোবেসে সুখী হয়েছি, সে সুখ তোমার জন্যে নয়, আমি যে

ভালবাসতে পাচ্ছি, এই ভেবে। তোমায় জিনিষ দিয়ে টাকা-কড়ি দিয়ে সুখ পেয়েছি এই ভেবে যে, তোমায় এ সব দেবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে—দিতে পারায় সেই তৃপ্তি! তোমার মুখে হাসি দেখে সুখী হয়েচি—কেন না, ও হাসি আমার ভালো লেগেচে বলে!—আমার প্রাণের বাসনা চরিতার্থ হচ্ছে, এই সুখেই আমি বিভোর ছিলুম। এ ক'দিনের অদর্শনে ভেবে দেখলুম, এই যে ভালো বেসেচি, সুখ পেয়েচি, এ তো নিজেকেই তৃপ্ত করেচি মাত্র··· যখনই দরকার বোধ করেচি, তোমার মুখ থেকে হাসি লুঠ করেছি. গহনা ঘুষ দিয়ে খুশী আদায় করেচি···কিন্তু এ কথা তো কখনো ভাবিনি যে তুমি এ প্রাণের হাসি হাসচো কি না, এ হাসি হাসতে তোমার কোথাও বাধচে কি না। মনে এ প্রশ্নও তুলিনি কোনদিন যে, এ হাসি বুকের রক্ত নিঙড়ে তুমি আমার ক্ষুধিত তৃষিত চোখের সামনে মনের সামনে ধরে দিচ্ছ! তোমায় দিয়ে নিজের সুখই পেয়েছি শুধু পাপিয়া, নিজের সুখ পেয়েই সব পেয়েচি—তোমার মুখের পানেও চাইনি, তোমার সুখও চাইনি কোনদিন···

মানগোবিন্দ আর একটা নিশ্বাস ফেলিল, ফেলিয়া পাপিয়ার পানে চাহিল।

পাপিয়া অবাক হইয়া গেল। মানগোবিন্দ এত বড়! ...এই যে মধুপিয়াসীর দল নিত্য আসিয়া ভিড় বাধাইয়া কাণের কাছে গুঞ্জন তোলে,—ভাবিয়া দেখিবার যাদের শক্তি নাই, শুধু মুখের গুঞ্জন-গানটাকেই যারা সর্ব্বস্ব বলিয়া জানে, তাই দিয়াই যাদের আগাগোড়া তৈরী...মানগোবিন্দ তাদের দলে নয়! তা নয় সে, সত্য! তা হইলে সে জোর করিয়া পাপিয়াকে করতলগত করিয়া রাখিত!...মানগোবিন্দর উপর শ্রদ্ধায় তার চিত্ত ভরিয়া উঠিল।

মানগোবিন্দ কহিল,—তুমি ছুটী চাইছো, আরামের জন্য...বেশ, ছুটী মঞ্জুর!...এতদিন আমায় কত সুখে যে সুখী করেছ, যে-ভাবে চেয়েছি, সেই ভাবে তৃপ্তি দিয়েছ... কখনো তোমার মনের দিকে তাকাইনি। সেখানে যে কোন অনুযোগ উঠতে পারে,তা ভাবিওনি!...এ কি ভালোবাসা ···শুধু দস্যুর মত তোমায় লুণ্ঠন করেছি, ক্রেতার মত মূল্য দিয়ে তোমার প্রীতি পণ্য ভেবে তা জোর করে কিনে উপভোগ করেছি...তুমি গণিকা, পয়সার দাসী, পয়সা ফেললেই তোমায় কায়-মনে অধিকার করবো...এই ভেবে তোমার ভিতরটাকে উপেক্ষা করে উপরটাকে নিয়েই তুষ্ট হয়েচি, তৃপ্তি পেয়েচি! ছি, এ কি মানুষের কাজ!...তুমি যে নারী, কোন দিন সে কথা আমি ভুলেও ভাবিনি। পাপিয়া, এই অদর্শনে তুমি আমার মনুষ্যত্বকে চেতনা দিয়ে জাগিয়ে তুলেছ, তার জন্য তোমায় শত শত ধন্যবাদ দি...তোমার ছুটী মঞ্জুর করলুম। আরো শোনো, তোমায় যা যা দিয়েছি, তোমার নারীত্বের মূল্য-হিসাবে তা কতটুকু, কত তুচ্ছ! এ সব তোমারই···তবে আমায় এটুকু অনুমতি দাও যে, এই ঘরে যেন শ্রান্ত হয়ে আমি জুড়োতে আসতে পারি···আর কখনো যদি মনে পড়ে, তাহলে আমার কাছে যাবার এসো! কোন দরকার মনে কর তো আমায় ডেকো!···জেনো, তোমায় খাঁটী ভালোবাসা বাসার জন্য একটা হৃদয় এখানে উন্মুখ প্রতীক্ষায় তোমার সে আহ্বানটুকু পাবার আশায় বসে থাকবে, চিরকাল, যুগ যুগ ধরে। ···দেহটা কিছু নয় পাপিয়া...তোমার ঐ মন যেদিন স্বচ্ছন্দ সহজভাবে গ্রহণ করার যোগ্য হবো, জানি, সেদিন তোমায় আমি প্রাণের মধ্যে সত্যই পাবো!...

পাপিয়া মানগোবিন্দর পানে চাহিয়া রহিল, তেমনি স্থির অবিচল দৃষ্টিতে!...এ কি সম্ভব! এই মানুষ, যাকে সে শুধু পয়সা আর গহনা উপার্জ্জনের একটা নির্জ্জীব যন্ত্র মাত্র মনে করিয়া চিরকাল ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে, মনের দ্বারেও যাকে ঘেঁষিতে দেয় নাই কোন দিন...এত বড় মানুষটা তারি বুকের কোণে লুকাইয়া ছিল!···হায়রে মধুপিয়াসীর দল, তোরা এমন মূঢ় যে, এ বুঝিস না, পতিতা, গণিকা হইলেও আমরা নারী! নারী পুরুষত্বের পায় চিরদিন নিজেকে বিকাইবার জন্য অধীর আগ্রহে পথ চাহিয়া বসিয়া আছে,—তোরা দেহটা লইয়া এমনি প্রমত্ত থাকিস যে দেহের আড়ালে মন বলিয়া যে একটা বস্তু আছে, তার খেয়ালও রাখিস না, সে-মনের সন্ধানও নিস না! পৈশাচিক তাণ্ডব লীলায় নারীর প্রাণ ছেঁচিয়া তার দেহের সৌরভ লুঠিতে আসিস, যৌবনের মধু আহরণ করিতে আসিস! মূঢ় বাতুলের দল..তার ফলে পাস্ কি? কঙ্কালের কুৎসিত অট্টহাস আঁর ঘৃণার জঘন্য পরশ! এ মুহূর্ত্তে কাছ হইতে চলিয়া গেলে পর-মুহূর্ত্তে তোদের স্মৃতিও এখানে পড়িয়া থাকে না—তোদের মত নূতন

অতিথির মূঢ়তার বুকের উপর আমরা চপল নৃত্য জুড়িয়া দি !...

মানগোবিন্দ বলিল,—কি ভাবচো পাপিয়া ?

পাপিয়া কহিল,—ভাবচি···তুমি এত বড়, তা তো এতদিন জানতে পারিনি...

মানগোবিন্দ কহিল,—আমি নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছি পাপিয়া, আমার মনের এ ভাব দেখে। আমি যে নিজের সুখ ছাড়া আর কারো সুখের কথা ভাবতে পারি, এ আমিও জানতুম না !...চিরদিন নিজের সুখ চেয়ে এসেছি, আর সে সুখ পাবার জন্য অপরকে মাড়িয়ে ঠেলে যদি ছুটতে হয় তো তা ছুটতে দ্বিধাও করিনি কোনদিন... কিন্তু তুমি এই ক'দিনের অদর্শনে আমায় নতুন করে গড়ে তুলেছ !...প্রথম প্রথম কি মনে হতো, জানো...? প্রশ্ন-ভরা দৃষ্টিতে মানগোবিন্দ পাপিয়ার পানে চাহিল।

পাপিয়া কহিল,—কি ?

মানগোবিন্দ বলিল,—ভাবতুম, দুনিয়া ওলোট-পালোট করে তোমায় খুঁজে বার করি···তারপর তোমায় সাজা দি ! রাজার ঐশ্বর্য্য এনে তোমার পায়ে ঢেলে দিচ্ছি, এত সুখে তোমায় রেখেছি আমি,—আর তুমি আমার পাশ কেটে সরে যাবে...! কিন্তু একটা ঘটনা হলো,—মনের এই জ্বালা নিয়ে যখন অস্থির আকুল, তখন আমার এক ছেলের খুব অসুখ হলো। আর সে অসুখে সে বায়না নিলে, আমায় তার চাই, সর্ব্বক্ষণ ! শিশুর সে অস্থিরতায় তার পাশেই পড়ে রইলুম...তার সে যাতনা দেখতে দেখতে মনটা কখন যে বদলে গেল···তোমার সন্ধানে নিবৃত্ত হলুম, ভাবলুম, যদি এততেও তাকে ধরে রাখতে না পারলুম,তাহলে এ টানা-হেঁচড়া করে কি ফল ! সে তাহলে পাবার নয় !...

পাপিয়ার দুই চোখে জল ছাপাইয়া আসিল। সে একেবারে মানগোবিন্দর পায়ের উপর পড়িয়া আর্ত্তস্বরে কহিল,—আমায় মাপ কর। তোমার দেওয়া সব তুমি ফিরিয়ে নাও গো···আমি বেইমান, বিশ্বাসঘাতক... তোমার এ দান গ্রহণের যোগ্যতা আমার নেই...এ দানের বোঝা নিয়ে তাঁর অপমান করারও আমার কোন অধিকার নেই !···

মানগোবিন্দ পাপিয়ার হাত ধরিয়া উঠাইল, কহিল,—না পাপিয়া, সে কথা তো আমি বলিনি। আমি শুধু বলচি, অন্ধতা ঘুচিয়ে তুমি আমার চোখ ফুটিয়েছ !···তোমার কাছে এসে, তোমায় পাশে পেয়ে, কত সুখই পেয়েছি আমি ! তবু আজ মনে হচ্ছে, সে সুখ কি ঠিক সুখ !...যার কাছ থেকে বন্যার মত এ সুখ পাচ্ছি, সে স্বেচ্ছায় সে-সুখ দিচ্ছে; না, সে-সুখ আমি জোর করে আদায় করছি !···তাতে সুখে সুখ থাকে না, পাপিয়া !...তাই বলছিলুম, যদি কোনদিন স্বেচ্ছায় আমার সুখের জন্যে নিজেকে তুমি আমার হাতে তুলে দিতে পারো···বলেচি তো, সেই সুখের আশায় আমি প্রতীক্ষা করে থাকবো !...যদি এই প্রতীক্ষা করেই আমার জীবনের সব দিন কেটে যায়, তবু কাতর হবো না··· নিরাশও হবো না আমি, পাপিয়া···করুণ প্রাণের এ অধীর আকুলতা কি ব্যর্থ হবার ?··· না।

পাপিয়া শিহরিয়া উঠিল। নয়, ব্যর্থ নয় ! প্রাণের অধীর আকুলতা তবে ব্যর্থ হয় না !···তার...তারও তবে আশা আছে !...

পাপিয়া মানগোবিন্দর পায়ের কাছে প্রণাম করিল, বলিল,—বেশ, আমিও কথা দিচ্ছি, যেদিন নির্ম্মল শুদ্ধ মন নিয়ে তোমার এ মনুষ্যত্বের পূজা করবার জন্য একটুও চঞ্চল হবো, সেদিন আসবো, তোমার পায়ে নিশ্চয় সেদিন ফিরে আসবো।...আর এই যে ছুটী আমায় দিলে তুমি, এর জন্য, নারী আমি, পতিতা নারী—তবু ভগবান যদি আমায় ঘৃণা না করে আমার ডাক শোনেন, তাহলে তাঁর পায়ে আমার অন্তরের প্রার্থনা জানাচ্ছি, তোমার জীবন সার্থক হোক্, পূর্ণ হোক, পরিতৃপ্ত হোক্ !...

কথাটা বলিয়া পাপিয়া চলিয়া যাইবার জন্য উদ্যত হইল। মানগোবিন্দ তার হাত ধরিয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিল,—তাহলে এ আমাদের চিরবিদায় নয়.. ?

পাপিয়া কম্পিত দৃষ্টিতে মানগোবিন্দর পানে চাহিল,—ও চোখে কি বিশ্বাস, কি তৃপ্তি···! সে কোন কথা না বলিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মানগোবিন্দ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তার পর শয্যায় দেহভার লুটাইয়া দিয়া অবোধ বালকের মত কাঁদিতে লাগিল। ক্রমশঃ

কোষ্ঠীর ফলাফল

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩৯)

অমৃতকুণ্ডে-পাওয়া ওভারকোট আঁটা, "লাগাম-লাগানো মোজা" পায়, স্বদেশ-প্রাণ বাবু তিনটির কর্ম্মপরিচয় পাইবার জন্য সত্যই একটু কৌতূহল ছিল। নির্দ্দিষ্ট স্কুলটিও ছিল আমাদের বাসার নিকটেই। বেলা আটটার মধ্যে প্রধান প্রাতঃকৃত্য—চা পানটা কচুরী অনুপান সহ সারিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। জয়হরিকে জিজ্ঞাসা করিলাম "যাবে কি?" সে বলিল "আমাকে ত' যেতেই হবে, এঁদের জন্যে ভদ্রলোকদের কাল ক্ষুণ্ণ করেছি, আজ কি আর না বলা চলে।"

বলিলাম, "এদের জন্যে কেন?"

"রাঙা আলু যে লোহার সিন্দুকে রাখবার জন্যে লোক কেনে তা কি করে বুঝব বলুন। যাক্—এরা এখন এলে হয়!"

পথে আর কথা বাড়াইলাম না। ইস্কুল কম্পাউণ্ডে পা দিয়া বলিলাম, "তাঁরা যদি আজ কিছু না বলেন ত' যেওনা।"

"সে কি মশাই, ভদ্রলোকের এক কথা—আবার বলবেন কি?"

তখন হলে ঢুকিয়া পড়িয়াছি। ও কথা বন্ধ করিতে হইল।

দেখি তিরিশ চল্লিশ জন ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁরা সবই পোষ্ট-আফিস মজলিশের মেম্বার; তদ্ভিন্ন ইস্কুল মাষ্টার প্রভৃতিও আছেন। চেয়ারগুলি সবই ভর্ত্তি, বেঞ্চে যথেষ্ট স্থান আছে। টেবিলের আস-পাশের চেয়ারে বাবু তিনটি উপস্থিত। বোধ হইল একজন কিছু বলিতেছিলেন, চোখোচোখি হইতেই সহাস্য ইঙ্গিতেই আহ্বান করিলেন। চেয়ারে বসিবার জন্য অনুরোধ করায় জয়হরি "বাপরে!" বলিয়া একটি ছোট্ট নমস্কার নিবেদন করিয়া টেবিলের নিকটস্থ বেঞ্চে বসিয়া পড়িল। আমি ধীরে জানাইলাম—"বড় কাহিল আছি, ফেরবার পথে "হোমো গ্লোবিউল্" নিয়ে যেতে হবে।" বলিয়া আমিও বেঞ্চ লইলাম। বাবুটি আর জেদ্ না করিয়া একটু হাসিয়া জানাইলেন, "এটা "কুণ্ড-কেবিন্" নয়!" তাহার পর তাঁহার প্রারব্ধ বক্তৃতা চলিল।

শুনিব কি, সামনের চেয়ার হইতে এক চেহারা এক সেলাম আর "একটু ভাল করে শুনে লবেন বাবু"—লাভ হইল। এই ঘটনায় ভাল করিয়া শোনা অপেক্ষা তাহাকে আমার ভাল করিয়া দেখার কাজটাই আরম্ভ হইয়া গেল। লোকটি গৌরবর্ণ, হাড় ও শিরা-প্রধান, বিরল কেশের উপর ফেজ ক্যাপ্, কটা গোঁপ দাড়ী—যেন গজাবার মুখেই বাধা পাইয়াছে ও স্থানে স্থানে ঝরিয়া গিয়াছে! কপাল কপোল মায় মুখ চোখের দুই পাশ গিলে করা,—বেশ Furrowed বা finely corrogated। গায়ে গরম খাকী কোট। এক হাতে হলদে পেড়ে নোট্ বুক, অন্য হাতে আধখানা পেন্সিল্।—বয়েস পঁয়ত্রিশও হতে পারে—পঞ্চান্ন বল্লেও কেউ সন্দেহ করবেন না।

আমি অবাক হইয়া তাহাকেই দেখিতে লাগিলাম। দেখি চক্ষু বুজিয়া নোট-বুক ভর্ত্তি করিয়া চলিয়াছে,—ক্ষমতা অসাধারণ! আবার লেখা অপেক্ষা পেন্সিল্ চলিতেছে গায়েই বেশী। কখনও দুই রগে, কখনও গালের দুই পাশে, কখনও গলায়; কখনও কানে, কখনও টুপীর ভিতর, কখনও আস্তিনের মধ্যে! আবার নোট-বুকে ফিরিয়া আসিতেছে। প্রতি মিনিটে সে এতগুলি কাজে ব্যস্ত। এ কে? এদিক ওদিক ফিরিয়া দেখি—লোকটি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। চুপি চুপি তাহার আলোচনাই চলিয়াছে। একজন বলিতেছেন, বুঝছেন না, লোকটা কোকেনের কুম্ভকর্ণ,—ও জিনিষের Symptomই ওই।" এমন সময় একটা জোর "hear" "hear" শব্দ হওয়ায় আমি বক্তৃতার দিকে কান দিলাম। বক্তা বলিতেছেন :—

"জগতে লোকে কি চায়,—শান্তি। ইংরাজীতে একটা সেরা কথা আছে—one who laughs last laughs best—মরবার সময় যে হাসতে পারে তার হাসিই হাসি ও সে-হাসি লাভের কাছে কাশীলাভও লাগে না। কিন্তু সে হাসি লাভ করবার উপায় আমাদের দেশের আনা লোকের জানা নেই। আমরা আমাদের গরীব দেশের দুস্থ ভ্রাতাদের জন্য সেই হাসির ব্যবস্থা করতে বেরিয়েছি। এখন আপনারা আমাদের হিতেচ্ছায় সহায় হউন, ভগবান আপনাদের সেই বুদ্ধি দিন—এই আমাদের প্রার্থনা। কয়েকটি দেশপ্রাণ হিতৈষীর হেফাজতে "দারিদ্র্য দমন বীমা সংঘ" নামে একটি খাঁটি স্বদেশী সংঘ খোলা হয়েছে, যার রাশ-নাম "স্বদেশী সোসিও ইকনমিক প্রপেগেণ্ডা।" এখন এগিয়ে আসুন, আমাদের এই সংঘে জীবন উৎসর্গ করে শান্তির সম্বল সঞ্চয় করুন। আর বৃথা সময় নষ্ট করবেন না। একটা Premium দিয়া (পিণ্ডদান করে) মলেও স্ত্রীপুত্র-দের হাসি মুখ দেখে,—দেশের টাকা দেশে রেখে, হাসতে হাসতে রওনা হতে পারবেন। আমরা অন্ততঃ দশ হাজার টাকা প্রত্যেকের হাতে তুলে দিতে বদ্ধপরিকর,—ডাকাতি করেও যা জমা করতে পারবেন না। দশহাজার টাকা হাতে তুলে দেয় এমন দেশ-প্রাণ লোক আর পাবেন না।

"মলেই টাকা। রবিবাবুর মত বিশ্বমানব তানাত কখনই বলতেন না "মরণরে তুহুঁ মম শ্যাম সমান।"

'মৃত্যু মৃত্যু বলে' পূর্ব্বে একটা মিছে ভয় ছিল বটে, কিন্তু বাঙলাদেশের লোক এখন বুঝেছে, মৃত্যুর মত বন্ধু আমাদের আর নাই। তারা বেশ জেনেছে, তারা জন্মেই মরে আছে, কেবল হাড় কখানা চরে বেড়ায় আর চোখের জলে সেগুলোকে জুড়বার বৃথা প্রয়াস পায়। তাই কবি বলেছেন—"মরে বেঁচে কিবা ফল—আগে চল—আগে চল।" এখানে আগে মানে উর্দ্ধে অর্থাৎ ঠিকানায়। (hear hear)

"আমার এই আজানুলম্বিত দক্ষিণহস্ত সম প্রিয় সহচর করুণানন্দ সেদিন সহসা শপথ করে বসেছে, এতেও যদি আপনাদের সুমতি না হয়, সে নারী বিদ্রোহ সৃষ্টি করবে। ভগবান্ আপনাদের সে বিপদ হতে রক্ষা করুন। আবার আমার করি-শুণ্ড-লাঞ্ছন রাম-হস্ত-সদৃশ এই যে রামকিঙ্কর চুপটি করে বসে রয়েছে, ওকে আপনারা চেনেন না। ও একটি ডিনামাইটের পুঁটুলি। আমাদের সদুদ্দেশ্য দেশের লোক যদি না বোঝে, আমাদের সদুপদেশ যদি না গ্রহণ করে, ও ঘরে-বাইরে আগুণ লাগাবে বলে কড়া প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ। যাক্—সে সব কথার এখন্ সময় আসেনি। না এলেই আপনাদের মঙ্গল।

"এখন আশা করি দেশের মুখ চেয়ে আর আপন আপন স্ত্রীপুত্রের মুখ চেয়ে আপনারা সকলেই এই বীমাকে বরণ করে নিয়ে শান্তিলাভ করতে অগ্রসর হবেন। মনে রাখবেন, যতদিন না আপনারা প্রত্যেকে মরচেন ততদিন দেশের—প্রধানতঃ স্ত্রীপুত্রের সুখ নাই, স্বস্তি নাই, শান্তি নাই। আমাদের একটি মাত্র Premium দিয়ে গেলেই হবে। আর ইতস্ততঃ করবেন না।" ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু।

চায়ের-দোকানে-পাওয়া এই ত্রিমূর্ত্তির দেশের কাজের পরিচয় পাইয়া, বিশেষতঃ করুণানন্দ ও রামকিঙ্করের নিদারুণ প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া ভাবিতেছি, এমন সময় মিটিং গা নাড়া দিল,—কারণ Post officeএ window deliveryর (চিঠি বিলির) সময় আসন্ন। একজন বায়ুভুক্ প্রৌঢ় উকীল দাঁড়াইয়া বলিলেন, "দেশে অল্পের মধ্যে এমন সুমধুর কাজের কথা কমই শোনা যায়। আপনাদের স্বদেশ-সেবা সফল হউক। আমাদের অর্থাৎ যাঁদের মৃত্যু কাম্য তাঁদের সম্পর্কে আপনাদের কাজ হয়েই গেল, এখন আপনাদের একটু কষ্ট স্বীকার করে লোকের বাড়ী বাড়ী যাওয়াটা আবশ্যক হবে। কারণ আমাদের জীবন-স্বত্বাধিকারী ও মরণ-উপস্বত্বভোগীরা সেখানে থাকেন। তাঁদের অনেকেই দশ হাজার টাকার bargainটা (দাঁওটা) সাগ্রহে এগিয়ে নেবার জন্যে আপনাদের সদুদ্দেশ্যের সম্যক্ সহায়তা করতে পারেন বলেই আমার বিশ্বাস। আমাদের কাছে তাঁদের ইচ্ছা ভগবৎ-ইচ্ছা অপেক্ষা বলবৎ;—আপনাদের বেশী কষ্ট পেতে হবে না। আমি আপনাদের কাজের মধ্যে খাঁটি মহাপ্রাণতার স্পষ্ট চেহারা দেখতে পাচ্ছি, কারণ আমাদেরও ওই কাজ। কোর্টে হলে এই পরামর্শটি ছাড়বার জন্যে চল্লিশটি টাকা নিতুম, কিন্তু কাকের মাংস কাকে খায় না। এখন আপনাদের ধন্যবাদান্তে আমরা চললুম।" এই বলিয়া তিনি স্বয়ং করতালি দিতেই

একটা করকাপাত হইয়া গেল। সভাও ভঙ্গ হইল।

(৪০)

সহসা আমার হাঁটুতে হস্তক্ষেপ! দেখি সেই মূর্ত্তি ব'লচে "মেহেরবাণী করে হু'মিনিট বসেন বাবুজী, বড় একটা বেওকুবী হয়ে গিছে, গল্‌তিটে শুধুরে লি।"

ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায় বল্‌লে "কর্ত্তা প্রাচীন লোক, আপনাকে কইতি আর সরম কি; বান্দা তো আপনার বাচ্চা! মোদের কাম রেতেই বেশী, লিদ্রের ফুরসদ্ নেই,—কামেরও ঠিকঠিকানা নেই।—সার্বেং (surveying), ফুটোগ্রাপী বি, টেলিগ্রাপী বি, এক্ষেনে সর্টহ্যাণ্ড রিপোর্টারের (shorthand reporterএর) কামে আস্‌ছি। বহুত ইলেম জান্তি হয় জনাব। আজ লিদ্রের ঝোঁকে হুঁস ছিল না। ইলেমে ইলেমে টক্কর লেগে সব গড়বড় করে দিছে। সর্টহ্যাণ্ড সুরু করলাম, তারপর ত্যাখছি টেলিগ্রাপীর "টরে টক্কা" লাগাইছি,—ইটার মধ্যে উটা ঘুসে গোল পাকিয়ে দিছে! হুটাই ইলেক্ আর লোক্তার ইলেম্ কি না, হুই শয়তানই এক দরজার! তোবা তোবা—ব্যাবাক টরে টরে টক্কায় নোটবুক ভরচি!"

অনেক কষ্টে হাসি চাপিয়া, মুখে চিন্তার ভাব আনিয়া বলিলাম "তাইত, এতটা পরিশ্রম বৃথা হয়ে গেল!"

সে বলিল "আপনাদের হুয়ায় আজ লাগাৎ বান্দার পরিশ্রম কখনো বৃথা হয় নি,—ও সব ঠিক্ করে লবার ইলেমও গোলাম আলি জানে। ও আর ভরে লতি কতক্ষণ! জনাব ত সব্ শুনেচেন। মেহেরবাণী করে হুচারটে কথা মদদ্ (সাহায্য) করলেই বাকী সব গোলাম লেগিয়ে লেবে। ও সব পুলিটিস্কেল বক্তারদের রা মোদের বহুত জানা আছে হুজুর,—একটা লেগিয়ে দিলেই চলে যায়। হুচারটে জবর জবর লবজ্ পালেই হবে।"

বলে কি! এতে পলিটিক্স্ পায় কোথায়! তাহাকে বলিলাম, "ওতে তো পলিটিক্সের কিছু পেলুম না; বক্তা তো বললেন 'সত্বর সকলে জীবনবীমা করে ফেলুন; মলেও স্ত্রীপুত্রের উপায় থাকবে। দশ হাজার টাকা ডাকাতি করেও মিলবে না। আবার যে যত শীঘ্র মরবে তার তত লাভ! ওঁদের—খাঁটি স্বদেশী সঙ্ঘ, দেশের মঙ্গলের জন্তে দেশপ্রাণ লোকদের ওই সঙ্ঘে জীবন উৎসর্গ করে শান্তিতে স্বর্গলাভ করবার দরকার হয়েছে। নচেৎ, ওঁর বন্ধু করুণানন্দ নারী বিদ্রোহ সৃষ্টি করতে বাধ্য হবেন, আর ওঁর দ্বিতীয় সঙ্গী রামকিঙ্করটি—একটি ডিনামাইটের পুঁটুলী, সে রাগলে লঙ্কাকাণ্ড করবেই। তবে তাঁদের সঙ্ঘের মারফত্ সকলে জীবন উৎসর্গ করলে দেশটা অগ্নিকাণ্ড এড়াতে পারে।"

গোলাম আলি বাধা দিয়া বলিল, "বহুত সেলাম বাবুজী—আর লয়; পেল্লায় মাল হাত লাগছে। ইতেই তাজমহল বন্‌তি পারে। সঙ্ঘ আছে, ত্যাশের মঙ্গল মজুদ্, জীবন উচ্ছগ্য আছে, ডাকাতী আছে, স্বর্গ লাভের লালচ আছে, ডিনামাইট রইছে, অগ্নিকাণ্ড রইছে—প্রতিজ্ঞাভি রইছে! আপনি পুলিটিক্স কারে কন কর্ত্তা? মোরা চেহারা দেখলিই মালুম পাই। এখন রিপোর্ট ছক্‌তি আধাঘণ্টাও লাগবেক না। বহুত স্যালাম বাবু।"

আমি মনে মনে ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "সাহেবের কোন ডিপার্টমেণ্টে কাজ করা হয়,—এ রিপোর্ট যাবে কোথায়?"

গোলাম আলি সাহেব বলিলেন "নসিব বাবু সাহেব—নসিব; কামের কি কদর আছে জনাব। খোদা মালিক, ইনাম্ থাক্‌লি জঙ্গলেও রুটি মিলবে! এখন প্রাইবেট্ কাম লিয়ে আছি। আকবরে রিপোর্ট পেটিয়ে দিই। জবর চিজ্ পালি বিশটাকাও মেলে। গোলামের উপর বড় বড় কাগজের এতবার আছে। তারা সমজদার আছে, লায়েক লোক চট্ চল্‌তি পারে। আপনাদের হুয়াতে ভালই চলে যায়। জনাবের ইখানে কোথা থাকা হয়? আপনি রিপোর্ট দেখলিই বান্দার ইলেম্ বুঝতি পারবেন,—একবার লয়ে যাব।"

জয়হরি উদ্‌গ্রীব হইয়া শুনিতেছিল, সে সত্বর ও সটান বলিল—"আমাদের বাসা খুঁজছেন? উইলিয়ম টাউনে জিজ্ঞ্সলেই হবে—রায় সাহেব কোথা থাকেন।"

লোকটা শুনিয়া হুহাতে সেলাম করিয়া বলিল, "গরীবের গোস্তাকী মাপ করবেন, বান্দার বহুত বেয়াদবী হয়ে গিছে,—তা আপনি তো মোদেরই বড় ভাইজান লাগেন্। বান্দা নিশ্চয় হাজির হবে। রিপোর্ট বেনিয়ে আজকের ডাকেই ভেজিয়ে দিব। এখন ইজাজত দেন।"

এই বলিয়াই লম্বা লম্বা সেলাম দিয়া সে চলিয়া গেল।

আমার ভাবনাটা দু-ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। জয়হরি যে এতটা বোঝে ও এমন জবাব দিতে পারে—সেটা এইমাত্র আমার কাছে ধরা পড়িল ও আমাকে আশ্চর্য্য করিয়া দিল। ততোধিক আশ্চর্য্য হইলাম ব্রাহ্মণীর বিচক্ষণতায়, তিনিই আমার রক্ষাকবচরূপে এই সহকারীর সিলেক্‌শন্‌ করিয়াছিলেন। গোলাম আলির সম্বন্ধে কিছুই বুঝিলাম না। লোকটা বোধ হয় পূর্ব্বে কোথাও ভাল চাকরি করিত, নানা ইলেমের গরমে সেটি খতম্‌ হওয়ায় মাথা খারাপ হইয়া থাকিবে। কাজটায় বোধ হয় তাহার খুব উৎসাহ ছিল—মজ্জাগত ধর্ম্মে দাঁড়াইয়াছিল, তাই অভ্যাসটা যায় নাই—অভিনয়েও আনন্দ পায়।

সে পশ্চাৎ ফিরিতেই জয়হরি ব্যস্ত ভাবে বলিল, "ওঁরা আমার জন্যে অপেক্ষা করচেন, আমি তবে চললুম;—আরও দুজন আছেন,—ব্যাপারটা খুব বড়িয়াই হবে দেখছি।"

বলিলাম "ওঁদের অপেক্ষা না করিয়ে এতক্ষণ গেলেই হত।"

জয়হরি বলিল, "বলেন কি মশাই। আপনাকে ওই গোলেবকাউলির পাল্লায় ফেলে,—ওকে বিশ্বাস আছে! মুখখানা যেন পটুপটির মাদুর; ও সোজা লোক নয় মশাই।"

তাহার এরূপ আশঙ্কার নিশ্চয়ই আরও সব অদ্ভুত অদ্ভুত কারণ ও প্রমাণ ছিল এবং তাহা শুনিতে উপভোগ্যও হইত; কিন্তু আমি সে লোভ সংবরণ করিয়া বলিলাম, "সকাল সকাল ফিরো—বেপরোয়ার মত খেও না।"

সে বলিল, "আপনি সে ভয় রাখবেন না। তবে যেরকম আহারটা হবে বুঝতে পারছি তাতে একটু গড়াতেই হবে। তারপর চায়ের সঙ্গে কিছু খাবার শেষ করেই ফিরব,—ধরুন সাড়ে চারটে। আপনি এখন সোজা বাসায় যান। দেখবেন ওঁরা যেন আজ উপরি হাঙ্গাম টাঙ্গাম না করে বসেন।"

বলিলাম "উপরি হাঙ্গামটা আবার কি?"

জয়হরি—"ওই সেই যে রেড্‌—"

বলিলাম "আচ্ছা এখন যাও।"

সে দ্রুত গিয়া দেশপ্রাণদের দলে মিশিল। দেখি সত্যিই আরও দুইটি যুবক জুটিয়াছে। তাহারা রওয়ানা হইবার পর আমিও বাসায় ফিরিলাম। রাঙা আলু যে কোন্‌ গুণে জয়হরির এতটা অস্বস্তির কারণ হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতেই পারিলাম না।

স্বর্ণ-বলয়

শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরু গোবিন্দ বসি আনন্দে
জপিছেন বিষ্ণু নাম।
শিষ্য আসিয়া হেনকালে তাঁর
চরণে করে প্রণাম।
নয়ন মেলিয়া কুশল প্রশ্ন
শুধালেন প্রভু তারে।
শিষ্য কহিল, গুরু তব ওই
দেব বাহু শোভিবারে—
দুর্লভ দুটী স্বর্ণ-বলয়—
এনেছি মূল্যবান।
কহিলেন গুরু, কিবা প্রয়োজন—
দীন-জনে কর দান।
জেদাজেদি করি শিষ্য ভক্ত
গুরুর যুগল করে—
দিল পরাইয়া সোণার কাঁকন।
একখানি হাত শূন্য তাঁহার,
বিনয়ে প্রভুরে বলে,
কোথা গেল প্রভু অপর বলয়?
কহিলেন প্রভু, জলে
পড়িয়া গিয়াছে আজিকে প্রভাতে
তটিনীতে গিয়া স্নানে।
জল হ'তে বালা তুলিতে শিষ্য
ডুবুরি ডাকিয়া আনে।
কহিলা বিনয়ে, কোথায় পড়িল
দিন প্রভু দেখাইয়া।
আনন্দে গুরু হাসিয়া তখন
অপর বলয় নিয়া,
ফেলিয়া গভীর তটিনী সলিলে,
কহিলা, হোথায় জলে।
লজ্জা পাইয়া শিষ্য লুটিল

ভারতের স্থাপত্য-শিল্প

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এ, এম, এ, ঈ ; এম, আর, এ, এস (লণ্ডন)

এ দেশের নিখিল সভ্যতার পরিচয় দেশের বেদে, পুরাণে, রামায়ণে, মহাভারতে ও ধর্ম্ম-দর্শন-ন্যায়-গণিতাদি যাবতীয় শাস্ত্রে এবং চিত্রাদি কলাবিদ্যায় পাওয়া যায়। তবে তাহার সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি এবং উৎকর্ষের অবিসম্বাদী প্রমাণ তাহার প্রাচীন কালের মন্দির, মসজিদ, দুর্গ ও প্রাসাদগুলির স্থাপত্যকলা হইতেই মিলিয়া থাকে। হিন্দুযুগের ভারতের প্রাচীন মন্দির ও সৌধাবলীর স্থাপত্যের, বাঈজান্তাইন স্থাপত্যকলা হইতে উদ্ভূত আরবীয় স্থাপত্যের এবং পারস্যের স্থাপত্যের আংশিক সংমিশ্রণে। তাজমহল সেই নব শিল্পের মুকুটমণি—মধ্যযুগের 'হিন্দু-মোস্লেম' সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন।

দক্ষিণ ভারতের তেলুগু, তামিল ও কানাড়ী প্রদেশের সুদূর জনপদে—বীরপ্রসূ রাজপুতানার ঊষর মরুপ্রাঙ্গণে—আরো দূরে, বহুদূরে, যথায়—অসিধারী মুসলমান সেনানীর
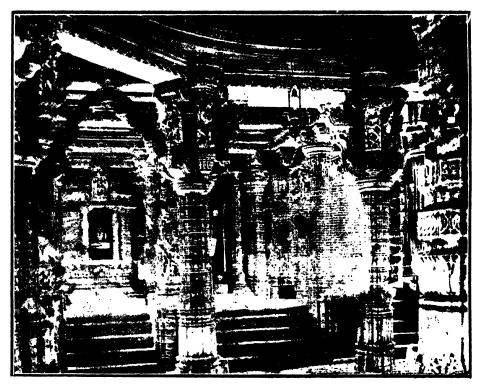
দিলবারা নাটমন্দির

অধিকাংশই তুর্কীদের ভারত লুণ্ঠনকালে এবং পরবর্ত্তী কালের পাঠান এবং মোগল বাদশাহদিগের ঈর্ষা এবং ধর্ম্মান্ধতার ফলে বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া কথিত। যে কয়টী রক্ষা পাইয়াছে, সেগুলি পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসে ভারতের হিন্দুযুগের অক্ষয় কীর্ত্তির কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছে। মোগলযুগে দেশী স্থাপত্যকলার একটি নূতন ধারা প্রবাহিত হয়—প্রধানতঃ হিন্দু-সমাগম হয় নাই, অথবা যে সকল নিরালা বেলাভূমিতে কালা পাহাড়ের ধ্বংসলীলা হিন্দুর দেবালয়ের বিলোপ সাধন করিতে সমর্থ নাই, অনন্যসাধারণ কারুকার্য্য সমন্বিত অশেষবিধ হর্ম্ম্যচূড়া, দেউল ও মঠ অদ্যাপি যে সকল স্থানে দেখা যায়—তাহাদের শিল্পের শোভা, পুণ্যের প্রভা পরিম্লান হয় নাই—তপোবনপ্রসূত, সাম গান বৌদ্ধ-জৈন, গাথা ও দ্রাবিড়ের মহাসঙ্গীত-মুখরিত, শঙ্খ ঘণ্টা

মঙ্গলারতির পূতস্মৃতি-বিজড়িত সেই অজন্তা ও এলোরা, মহাবলিপুর ও মদুরা ও জৈসল্‌মের ও আবু, খাজুরাহো ও ভুবনেশ্বর, দ্বারকা ও মুধেরা অদ্যাবধি আমাদের হিন্দুরাজত্বের ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈনযুগের পুণ্যকাহিনী স্মরণ করাইয়া দিতেছে। কেবল মাত্র ভারতে, সাঁচিস্তূপের মঙ্গলতোরণে, অথবা নীলাম্বুর তীরবর্ত্তী কোণার্কের সূর্য্যমন্দিরে ভারতের স্থাপত্যের সীমা আবদ্ধ নহে, বহির্ভারতের কাম্বোজের আঙ্কর থোম বা নগরধাম, অপিচ যবদ্বীপের বরবুদুর মন্দিরের অতুলনীয় কারুকার্য্য শিল্পের অন্যবিধ নিদর্শনের অস্তিত্ব আমাদের জানা ছিল না। সম্প্রতি ভারত সরকারের প্রাচীন-কীর্ত্তি-সংরক্ষণী বিভাগের অন্যতম প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ ও তাঁহার সহকারিগণ সিন্ধুদেশের লারকাণা জেলায় সিন্ধুনদতীরস্থ মোহেন্-জো-দড়ো নামক স্থান খনন করিয়া যাহা আবিষ্কার করিয়াছেন, তদ্দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, যে, খৃঃ পূঃ ত্রিসহস্র বর্ষ পূর্ব্বেও এদেশে বাস্তুশিল্পের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইয়াছিল। মোহেন্-জো-দড়োর মৃত্তিকা-স্তূপ ও পুরাতন ভিত্তি খনন করিয়া তিনি অগ্নি-

দিলবারা নাটমন্দিরের চন্দ্রাতপ
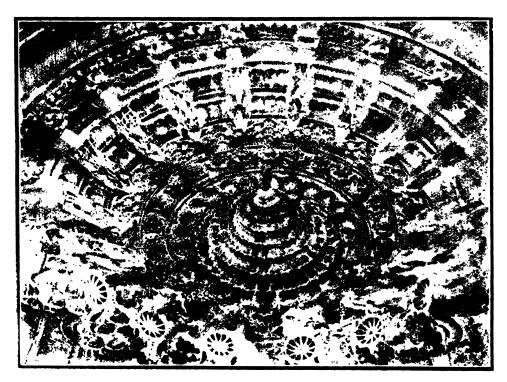
নিরীক্ষণ করিয়া পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী যে ভূয়সী প্রশংসাবাদ করিয়াছেন, সেই প্রশংসা উক্ত দেশদ্বয়ের সভ্যতার জননীর হিসাবে অন্ততঃ আংশিকভাবেও ভারতেরও প্রাপ্য। চীন, কোরিয়া ও জাপানী শিল্পেও ভারতের শিল্পের প্রভাব বিদ্যমান।

ভারতের সভ্যতা ও স্থাপত্যকলা বহু প্রাচীন কালের; কিন্তু, প্রাচীন শিল্পের আদর্শ স্বরূপ, খৃঃ পূঃ তৃতীয় অথবা চতুর্থ শতকের মৌর্য্যযুগের কয়েকটী মূর্ত্তি ও প্রাসাদ স্তম্ভাদির ভগ্নাবশেষ অপেক্ষা প্রাচীনতর স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য দগ্ধ-ইষ্টকে-নির্ম্মিত অট্টালিকা, সুমসৃণ টালি, সোপান ও মর্ম্মর-প্রস্তরাবৃত পয়ঃপ্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন। সেগুলি জটিল নির্ম্মাণ-কৌশলের পরিচায়ক। প্রাচীনতম বাবিলোনীয় বাস্তুশিল্পের সহিত তাহাদের আশ্চর্য্যজনক সাদৃশ্য লক্ষিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা অনুমিত হয় যে, ভারতের সিন্ধুতীরস্থ প্রাচীন সভ্যতা ও বাবিলোনীয় সভ্যতা পরস্পর সম্পৃক্ত। মোহেন্-জো-দড়ো ও দক্ষিণ পঞ্জাবের হারাপ্পা নগরের পুরাতন ভিটায় প্রাপ্ত এই যে সভ্যতার নিদর্শন আমরা পাই, তাহা আর্য্য জাতির সৃষ্ট নহে, আর্য্য-পূর্ব্বযুগে

দ্রাবিড়দের সৃষ্ট বলিয়াই মনে হয়। সরকারি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ স্যর জন মার্শাল বলিয়াছেন যে, পঞ্চসহস্র বৎসর পূর্ব্বেও সিন্ধু ও পঞ্চনদ প্রদেশের অধিবাসীরা সুগঠিত সহরে বাস করিতেন। তাঁহারা পরিণত সভ্যতার অধিকারী এবং উচ্চশ্রেণীর শিল্পী ছিলেন। তাঁহাদের লিখন-প্রণালীরও উৎকর্ষ সাধন হইয়াছিল।

দিলবারা মন্দিরের স্তম্ভ

ভারতের স্থাপত্য-শিল্পের প্রসঙ্গে মহামতি ফাগুসন বলিয়াছেন, "ভারতের শিল্পীরা অতীব বিশালকায় সৌধ নির্ম্মাণ করণেও বিমুখ হইতেন না। তাঁহারা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অথবা জটিলতম কারুকার্য্যগুলি অবলীলাক্রমে সমাধা করিতেন ...সৎ, চিৎ ও আনন্দের পরিকল্পনায় তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর শিল্পী সম্ভবতঃ পৃথিবীর অন্যত্র পরিদৃষ্ট হইবে না।"

হ্যাভেল প্রমুখ পণ্ডিতমণ্ডলী ভারতের স্থাপত্য-কলার প্রশংসা বহু উচ্চভাবে করিয়াছেন। ভারতের মুসলমান নরপতিগণ হিন্দু, তুর্কী, পাঠান, মোগল, শিখ প্রভৃতি ভারতবর্ষের সকল শ্রেণীর ব্যক্তির সমবেত মনের ভাব বাস্তু-শিল্পে ফুটাইয়াছিলেন। আগরা, দিল্লী ও রাজস্থানের কয়েকশত বৎসর পূর্ব্বেকার রাজপ্রাসাদগুলি এরূপ সুঠাম, সুন্দর ও কার্য্যের উপযোগী যে, দেশী বিদেশী সুধিমণ্ডলী সকলেই আমাদের জন্মভূমির এ নয়নাভিরাম স্থাপত্য-শিল্পের শোচনীয় অধঃপতন দেখিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া থাকেন। মোগল-যুগের সেই সকল প্রাসাদ, সৌধ ও বিভিন্ন প্রদেশের বহুবিধ প্রাচীন দেউল, মঠ, মসজিদ ও রাজভবন প্রভৃতি দেখিবার ও আধুনিক কালের নির্ম্মিত প্রাসাদ মন্দিরগুলির সহিত তুলনা করিয়া পর্য্যালোচনা করিবার সুযোগ লেখকের ঘটিয়াছিল। বড়োদার প্রসিদ্ধ লক্ষ্মীবিলাস ভবন রাজপ্রাসাদের প্রধান চূড়া, ইন্দোরের আধুনিক বিচার ভবন, সিন্ধিয়া রাজের উজ্জয়িনীস্থ রাজপ্রাসাদ, যোধপুরের 'রায়কা বাগ্ প্যালেস' রেলষ্টেসনের পশ্চাদ্বর্ত্তী সরকারি কার্য্যভবন, বীকানের মহারাজের নূতন 'পবলিক অফিস' ও সেনা-নিবাসগুলি, হায়দরাবাদস্থ নিজামের রাজপ্রাসাদ, মহীশূরের চিকিৎসাগার, মান্দালয় রাজপ্রাসাদের উপকণ্ঠবর্ত্তী সরকারি কার্য্য-গৃহ এবং এই ধরণের আধুনিক আবাসগুলি, প্রাচীন শিল্প শাস্ত্রানুমোদিত মনোরম মন্দির সৌধাদির তুলনায় নিকৃষ্ট দেখায়। উক্ত দেশের শাসক-সম্প্রদায় দেশীয় স্থপতিগণের সাহায্যে প্রাচীন আদর্শে ভবনগুলি নির্ম্মাণ করাইতে পারিতেন; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তাঁহারা বিদেশী এঞ্জিনীয়র এবং পাশ্চাত্য প্রণালীতে অর্দ্ধ-শিক্ষিত এদেশের ওভারসিয়র দ্বারা বিদেশী বাস্তু-শিল্পের সামঞ্জস্যহীন ব্যর্থ অনুকরণে প্রবৃত্ত

হইলেন। কিন্তু য়ুরোপ আমেরিকার শিক্ষিতেরা এই সকল নবীন সৌধের প্রতি দৃকপাত করেন না, তাঁহারা আগরা, উদয়পুর, জয়পুর, উজ্জয়িনীতে আসিয়া থাকেন খাঁটী দেশী সহরের নামে আকৃষ্ট হইয়া।

সুদূর ব্রহ্ম-চীন-সীমান্তের মিচিনা প্রদেশের ছায়া-শীতল আম্র-কাননের বৌদ্ধ সংঘারামে এবং তুষার-মৌসি হিমালয়ের ক্রোড়ে অবস্থিত মহাতীর্থ বদরীনারায়ণে—সর্ব্বত্রই য়ুরোপীয় আদর্শের বাসভবন পরিদৃষ্ট হয়। সমগ্র ভারতের মধ্যে কেবল মাত্র জৈসল্‌মেরই খাঁটী হিন্দু ধরণের সহর। সেটী ভীষণা 'থর' মরুভূমির ঠিক মধ্যস্থলে এবং বারমের রেলষ্টেসন হইতে ৯৮ মাইল দূরে বলিয়া মুসলমান অথবা ইংরাজ যুগের ছাপ লেখক সেখানে দেখেন নাই। করগেট লৌহ অথবা কাচের সার্সি দেখেন নাই। স্থানীয় ষ্টেট এঞ্জিনীয়র মহাশয় তাঁহার বন্ধু বিশেষ। কয়মাস পূর্ব্বে তিনি লোহার গুদাম নির্ম্মাণ করাইবার জন্য লেখকের পরামর্শ চাহিয়াছিলেন। লেখক বিশেষ করিয়া তাঁহাকে বিদেশী ছাপে সুন্দর সহরটীকে কলঙ্কিত না করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টান মিশনারীদের মত খ্রীষ্টান স্থাপত্য-শিল্প আসিয়া দেশের মানুষদের ও শিল্পের বংশলোপ করিতেছে। সভ্যতার অনুকরণে ভারতীয় শিল্পাত্মার কি বিসদৃশ পরিণামই হইয়াছে! দেশের শিল্প অধুনা পাশ্চাত্যের শিল্পের মিশ্রণে বিকৃত। ফলে, এ কালের রাজা নবাবদের প্রাসাদের এইরূপ অধঃপতন। লেখক গ্রীক, গথিক অথবা রেনেসাঁস যুগের শিল্প-রীতির নিন্দাবাদ করিতেছেন না। বিভিন্ন জাতীয় আদর্শ হিসাবে সেগুলি সত্যই নিখুঁত ও অতীব সুন্দর। তাহাদের আদর্শ এদেশে থাকিলে প্রতিযোগিতায় সুফল হইবে। তাহাদের ধ্যান করিলে ভারতের শিল্পীরা জ্ঞান লাভ

একটি ক্ষুদ্র মন্দিরের দ্বার—দিলবারা

সংমিশ্রণ জাত বর্ত্তমান কালীন অর্থবিহীন, শোভাহীন, বর্ণশঙ্কর অট্টালিকাসমূহই যে দেশ অধিকার করিয়া থাকিবে, ইহা ভারতবাসীর পক্ষে শ্লাঘার কথা নহে। কলিকাতার ধনকুবেরগণ কি কারণে পোর্টুগীজদের ও প্রথম যুগের ইংরাজদের আনীত য়ুরোপীয় আদর্শের অনুকরণে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া থাকেন? যেন তাঁহাদের নিজস্ব জাতীয় জিনিস কিছুই ছিল না—তাঁহারা বিদেশীর কাছেই গৃহ-নির্ম্মাণ করিতে শিখিয়াছেন! ভারত-শিল্পের অনুরাগী আমাদের অনেকে দেশী ধরণে গৃহ নির্ম্মাণ করিবেন মনস্থ করিয়াও দেশের বিশুদ্ধ স্থাপত্যকলা হইতে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন না। আবার আমাদেরই দেশের জিনিস ইংরাজ শিল্পীরা
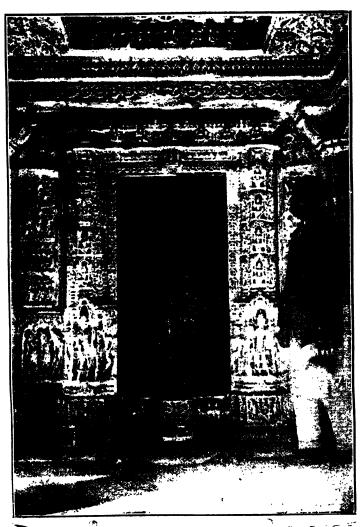
বিচিত্রিত করিয়া আমাদেরই বণ্টন করেন, তখন সেই কর্ম্মটী যুগপৎ দুঃখদায়ক ও হাস্যকর হইয়া পড়ে।

লেখক যখন বীকানের রাজার এঞ্জিনীয়র ছিলেন—মহারাজের আরাবল্লী পর্ব্বতশিখরস্থ আবুর রাজপ্রাসাদ তাঁহার অধীন ছিল। প্রাসাদটী হিন্দু ভাবের এবং আবুর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও রমণীয়। তৎপার্শ্বেই আলোয়ার মহারাজের প্রাসাদ। দার্জ্জিলিং সিমলার সাহেবী বাংলোর মত। তাহা এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ বিদেশী ধরণের অন্য বাড়ীগুলি বীকানের রাজপ্রাসাদের কাছে, এবং সন্নিকটের প্রসিদ্ধ দিলবারা মন্দিরের কাছে কিরূপ ম্লান দেখায়, তাহা যাঁহারা আবুতে গিয়াছেন তাঁহারা জানেন। লেখক শুনিয়াছিলেন যে, আবুতে আলোয়ারের মহারাজা বহু লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে তাঁহার নূতন প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইবেন এবং তাহার নক্সা ও ইঞ্জিনীয়র ঠিক করিতে বিলাত গিয়াছেন। সম্প্রতি সেই আবুর প্রাসাদ নির্ম্মাণ কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের জন্য সহকারী ইঞ্জিনীয়র আবশ্যক বলিয়া সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল। যদি বিদেশী ধরণের প্রাসাদ তৈরী হয় ত বড়ই দুঃখের কথা বলিতে হইবে। রাণা প্রতাপের আরাবল্লী,—তাহার শিখরে কুম্ভরাণার প্রতিষ্ঠিত অচলগড় দুর্গ ও গোপাল-মন্দির অদ্যাপি বর্ত্তমান। বিশ্ব-বিশ্রুত দিলবারা মন্দির এই আবুতেই। মহারাজা বাহাদুর সে মন্দির নিশ্চয়ই দেখিয়াছেন। রাজা যদি দেশের শিল্প রক্ষা না করেন, গরিব প্রজা কি করিবে?

দালানের ছাদে কারুকার্য্য

বিদেশী ধরণের নূতন শিল্প আসিয়া আমাদের পিতামহদের প্রিয় বাস্তুশিল্পের উচ্ছেদ সাধন করিতেছে। ম্যাঞ্চেষ্টারের বস্ত্র আসিয়া ঢাকাই মসলিনেরও এই অবস্থাই করিয়াছে। তাহারা আমাদের জাতীয় জীবনের সৌন্দর্য্য ও স্বাভাবিক গতি বিনষ্ট করিতেছে। আমাদের নূতন গৃহে আমাদের গৃহদেবতা আসিয়া অধিষ্ঠান করিতে পারেন এরূপ পীঠস্থান নাই। কলিকাতার ধনকুবেরগণ বহু অর্থব্যয়ে বাগানবাড়ী ও বাগান প্রস্তুত করাইয়াছেন। কিন্তু কই, সেই সকল বাগানে গমন করিলে প্রাচীন ভারতের বিলাস উদ্যানের কোনও প্রতিচ্ছবিই ত লক্ষিত হয় না! সংস্কৃত সাহিত্যে নরপতি ও শ্রেষ্ঠীদের বিলাস-ভবনের যে উজ্জ্বল বর্ণনা আছে, তাহাতে সমগ্র চিত্রটী চক্ষের সমক্ষে প্রতিফলিত হইয়া উঠে। অধুনাতন ভারতে সেই প্রাচীন উদ্যান বা বাসভবন প্রস্তুত করণের ধারা বিলুপ্ত হইতেছে। রাজপুতানায় প্রাচীন কালের উদ্যান-রচনার পদ্ধতি কিয়ৎপরিমাণে রক্ষিত হইয়াছিল। মোগলেরা আসিয়া তৎসহ পারস্যের ও মধ্যএসিয়ার উপাদান জুড়িয়া দিলেন। ফলে, মোগলযুগের অপূর্ব্ব শোভন উদ্যান রচনা—তাহার পরিচয় উত্তর ভারতের প্রাচীন

নগরীতে এখনও পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতের যন্ত্র-ধারাগৃহ, প্রেক্ষাগার, মণিশালাপট্ট, তমালবীথিকা, বেণুকুঞ্জ, মাধবীকুঞ্জ, পারাবত-রব-মুখরিত উদ্যান-বাটিকার বলভী, তাহাদের সংস্কৃত নামের মোহ মাধুরিমা লইয়া কেবলমাত্র সংস্কৃত গ্রন্থেই অধিষ্ঠিত আছে; কিন্তু মধ্যযুগের মোগল ভারতের বাগিচার ফোয়ারা, বারাদরী, আঙ্গুরীবাগ, যশ্‌মিনবাগ, আসমান-চবুত্রা, অটারী বা রেওটী, সেই প্রাচীন ভারতের উদ্যান-বাটীরই জিনিস—মাত্র ভিন্ন নামে সেই দিন পর্য্যন্ত আমাদের ধনীদের বাগানে বিরাজ করিত। ইংরাজি বাগানের, অর্থাৎ ইটালীয় ও ফরাসী খেয়ালের বাগানের অনুকরণে আমরা এই সব প্রাচীন ধারা বর্জ্জন করিয়াছি। সেইহেতু এক্ষণে ধনীদের উদ্যানে 'প্লাষ্টারে'র গ্রীক ধাঁজের মূর্ত্তি, জুতাপায়ে-উড্ডীয়মানা,—'সিমেণ্টের' পরী, লোহার 'রেলিং' লোহার 'বেঞ্চ,' গ্যাসপোষ্ট, কর্জ্জন গার্ডেনের 'কাষ্ট্‌ আয়রণের' বা ঢালাই-লোহার ফোয়ারা প্রভৃতি বিচিত্র বস্তুর বেসুরা সমাবেশ—যেন অধুনাতন বঙ্গরঙ্গমঞ্চের হস্তিনার রাজোদ্যানের দৃশ্যপট। উদয়পুরে, যোধপুরে (মন্দোর), বীকানেরে ও কাশীর রামনগরে—আজও পর্য্যন্ত প্রাচীন ধরণের উদ্যান আছে, যাহা আমাদিগকে চাঁদের আলোর স্বপ্নের রাজত্বে লইয়া যায়। কালে তাহারাও হয়ত লোপ পাইবে।

উদয়পুরের মহারাণার সূর্য্যমূর্ত্তি-বিচিহ্নিত, কিরীট-কলস-ঝরোখা-চবুত্রা-অলঙ্কৃত, রথাকৃতি, পাষাণ-প্রাসাদে, অথবা অতুলনীয় তাহার 'চিত্রশালায়' যে, সুগভীর বিশালতা, গাম্ভীর্য্য ও 'সৌন্দর্য্য গমগম্‌ করিতেছে, কলিকাতার মল্লিক-বাড়ীর 'করিন্থিয়ান ক্যাপিটল' সমন্বিত বিদেশী ফ্যাসানের মর্ম্মর-মূর্ত্তি ও ফরাসী চিত্রশোভিত হলঘরে তাহা অনুভূত হয় না। চিতোর দুর্গে, পদ্মিনীর জলপ্রাসাদের দীর্ঘিকা-বলোকনকারী ফুলদার গবাক্ষ পরিদর্শন করিয়া 'মার্ব্বেল প্যালেসের' লোহার রেলিং সংযুক্ত বারাণ্ডা দেখিলে প্রাণে ব্যথা লাগে। দিলবারার নাটমন্দিরের স্ফুটন্ত কমলের অনুকৃতি পাষাণ চন্দ্রাতপের নিম্নকার, অথবা বড়োদা-রাজের দরবার-গৃহের, পাষাণময়ী—সঙ্গীতমুখরা অপ্সরার হাস্য-লাস্য-ভঙ্গিমাভরা বন্ধনী বা 'ব্রাকেট'গুলি স্বর্গের সুষমা উৎসারিত করিয়া দিতেছে। আধুনিক প্রণালীতে প্রস্তুত ভারতীয় প্রাসাদের 'ষ্টেটরুম' বা 'ড্রয়িংরুমে' তাহার

আরাবল্লী পর্ব্বত

অভাব আছে। আমাদের উদ্যানে ঢালাই লোহার কৃত্রিম ফোয়ারা এবং গ্রীকদেবী আফ্রোদিতী বা ভিনাসের মর্ম্মরের মূর্ত্তি শোভা পায় না। তৎপরিবর্ত্তে কৃত্রিম হিমালয় হইতে উদ্ভূত 'গোমুখী জলধারা'রূপী গঙ্গা এবং মথুরার তক্ষণ-শিল্পীর ত্রিভঙ্গিমঠামে নৃত্যরতা 'মালবিকার' ভাস্কর্য্যই বাঞ্ছনীয়।

কাশী, গয়া, দিল্লী, শ্রীনগর, উদয়পুর, জয়পুর, জৈসলমের, আহম্মদাবাদ, মাদুরা, তাঞ্জোর প্রভৃতি প্রাচীন সহরের প্রাচীন মহল্লাতে যে মনোহর, প্রাচীন-ভারতীয় ভাবটী দেখা যায়, তাহা সেই সকল সহরের আধুনিক কালে গঠিত পল্লীতে অথবা কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি এ-যুগের সহরে পরিদৃষ্ট হয় না। উজ্জয়িনীর বিশাল প্রাচীর, উন্নত তোরণ—এবং সিন্দুররঞ্জিত, ও প্রজ্বলিত-গন্ধ-তৈল-প্রদীপের কালিমালিপ্ত কুলঙ্গি-সমন্বিত পাষাণের সিংহদ্বার পরিবেষ্টিত, বণিক মহল্লায় বা চৌকে উষ্ণীষধারী-গন্ধবিক্রেতাদের সারি সারি মনোহারী বিপণিশ্রেণী ও উজ্জয়িনীর সেই বক্র, সঙ্কীর্ণ, পাষাণ পথোপরি আলোক ও ছায়ার লুকোচুরি-খেলা এবং অলঙ্কার-পরিহিত, অর্দ্ধশয়ান বৃষবরের অলস নেত্র ও উন্নন রোমন্থন যিনি অবলোকন করিয়াছেন, তিনিই জানেন, ভারত-স্থাপত্যের, ভারতের Town Planningএর প্রাণ কোথায়!

বীকানের মহারাজের আবু প্রাসাদের গাড়িবারান্দা

ভারতের নূতন শহরে জীবনের স্পন্দন নাই, বারাণসীর কচুরিগলির প্রাণ-মাতানো দেশী ছাপ নাই, স্বাতন্ত্র্য নাই—তাহারা য়ুরোপের সস্তা সংস্করণ। বিংশ শতাব্দীর সৃষ্ট টাটার জেমশেদপুর শহরে যেন কেমন একটি একঘেয়ে ভাবই দেখিতে পাওয়া যায়। নাগরিকদের যেন সমাজ, ধর্ম্ম, আশা, আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ, চেতনা নাই। ইহাতে আধুনিক কলকারখানার সভ্যতার উৎকট তাণ্ডব আছে, তাণ্ডবান্তে অবসাদের ভাবও আছে,—নাই আনন্দ-কূজন, নাই সৌন্দর্য্য,—নাই স্নিগ্ধ ভাব। যেন ধরিত্রীর সঙ্গে শহরের সদ্ভাব নাই। সেই একঘেয়ে, সমান্তরাল, সোজা, বিস্তৃত পথ; একঘেয়ে বাংলো বাড়ী; রসবর্জ্জিত একঘেয়ে "এংগ্লো ইণ্ডিয়ান" ভাব। আলোক-স্তম্ভের বৈদ্যুতিক আলোক-শিখা দেশবাসীদের রুগ্ন চক্ষু ঝলসাইয়া দিতেছে। রাক্ষসের মত লোহার কারখানার ভয়াবহ চিমনীগুলি প্রতিনিয়ত ধূমোদ্গীরণ করিয়া শহরবাসীদের শাসাইতেছে। রৌদ্রাতপ হইতে পান্থদের রক্ষা করিবার জন্য রাজপথে পাদপ-বীথিকার সুবন্দোবস্ত হয় নাই। আমাদের কাশী, কাঞ্চী, উজ্জয়িনী-ধামই, বা বাংলাদেশের প্রাচীন শহর-গণ্ডগ্রামগুলিতে যেখানে পুরাতন পল্লী ও ইমারতাদি

জৈসলমের হ্রদ

জৈসলমের দুর্গ
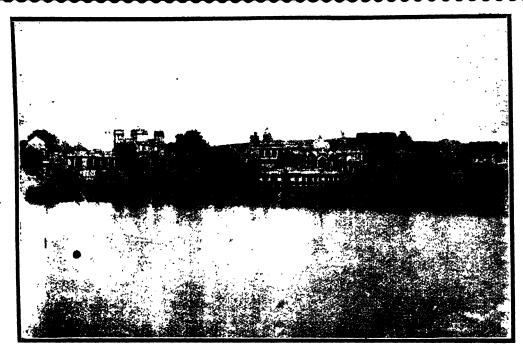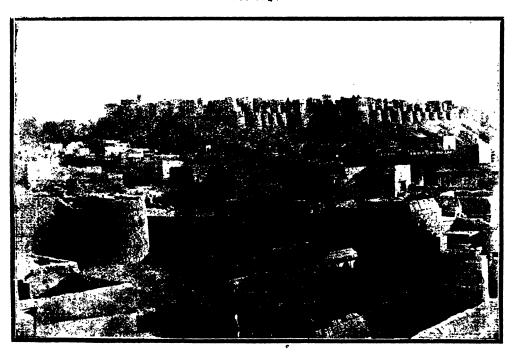
এখনও বিদ্যমান, সেইরূপ স্থানগুলিই, ভারতের জাতি-ধর্ম্মের, জলবায়ুর ও রৌদ্রতপ্তা প্রকৃতির অনুকূল।

ভারতবর্ষের নগরপালদিগের কার্য্যসভাগুলি শহরে এই বিংশ শতাব্দীর শ্রীসম্পদ ও স্বাস্থ্য আনয়ন করিবার জন্য উৎসাহের উচ্ছ্বাসে প্রাচীনকালের শত শত শতাব্দীর পরীক্ষিত, সুফলপ্রদ প্রণালীতে গঠিত আমাদের গৃহপল্লীগুলি

ভূমিসাৎ করিয়া নূতন ধরণের রাস্তা ঘাট, জলনিকাশ ও আলোকের ব্যবস্থা এবং কলিকাতা ও বোম্বাইএর বিশ্রী ধরণের অট্টালিকাসমূহ নির্ম্মাণ করাইতেছেন। ভিনিস, নেপলস্, ফ্রাঙ্কফোর্ট এবং এডিনবরা প্রভৃতি পাশ্চাত্য শহরের প্রাচীন কালের পল্লীগুলির সেই কালের ভাব অটুট রাখিয়া, তাহাদের একেবারে ভূমিসাৎ না করিয়া, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্ম যেরূপ অভিনব প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে বলিয়া শোনা যায়, এ দেশে এখনো সেরূপ ব্যবস্থা হয় নাই। নগরপালদিগের অনুষ্ঠানে এই প্রকারে যদি আরো অর্দ্ধ পথেই চলিয়াছি। আমাদের আধুনিক শিক্ষার প্রণালী ও আদর্শের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। যেটুকু পরিশ্রম করিয়া আমরা ফরাসী গথিক অথবা আধুনিক ইংরাজী স্থাপত্য-কলা শিক্ষা করিতেছি—বৌদ্ধ, জৈন, রাজপুত ও মোগলযুগের স্থাপত্য-রীতি শিক্ষা করিতে আমাদের তদপেক্ষা অধিক পরিশ্রম, কালক্ষেপ অথবা অর্থব্যয় করিতে হইবে না।

নগরের সৌধমালা হইতেই নাগরিকদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা উচ্ছ্বসিত হয়—তাহারা চিরসুন্দর এমন একটি পারিপার্শ্বিক ভাব সৃজন করে, যাহা নগরবাসীর মহতী আকাঙ্ক্ষার
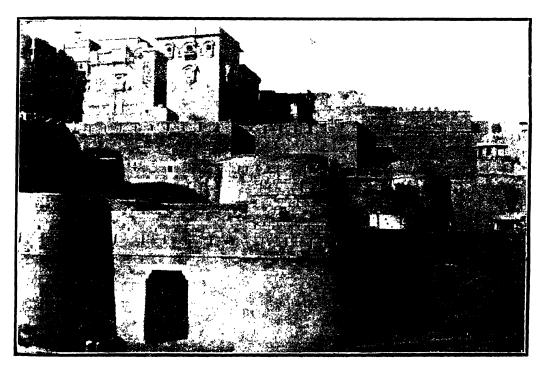
জৈসলমেরে দুর্গে রাণী-মহল

শত বর্ষ গত হয়, তাহা হইলে ভারতে দেশী পল্লী বলিতে কিছুই অবশিষ্ট রহিবে না—য়ুরোপীয় স্থাপত্য-রীতিতে রচিত বাটী-ঘরে ভারতবর্ষ নিজের শোভা, কৌলিন্য-মর্য্যাদা ও অস্তিত্বে বঞ্চিত হইয়া পড়িবে। যে ভারতবাসীদের পিতামহেরা আবু, ভুবনেশ্বর, তাজমহল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা শ্লাঘার বিষয় নহে।

কিন্তু তাহা হইতে পারিবে না। ভারতবাসীর মন পুনরায় তাহার পিতৃপুরুষ হইতে প্রাপ্ত রিক্থের দিকে ফিরিয়া আসিতেছে। আমরা বুঝিয়াছি যে, আমরা ক্রমশঃ ধ্বংসের পক্ষে তৃপ্তিকর। সৌধমালা হইতেই শিল্পী নগরবাসীদের আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যের অনুভূতি পরিব্যক্ত করেন।

বাংলার অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। দেশী ধরণের বাটী এ দেশে বিরল বলিলেই চলে। বাংলায় পাথর মিলে না। সেই কারণে, দুই চারিটি পাথরের মন্দির ব্যতীত, প্রাচীন যুগে বাংলার মন্দিরগুলি ইষ্টকে নির্ম্মিত ও ইষ্টকের উপর খোদাই মূর্ত্তি ও নক্সার দ্বারা শোভিত হইত। প্রাচীন কালের অধিকাংশ মন্দিরই এখন ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। তখনকার বাস-ভবন এবং কোনো কোনো মন্দির, কাষ্ঠেও

হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শন—লেখকের তত্ত্বাবধানে নির্ম্মিত
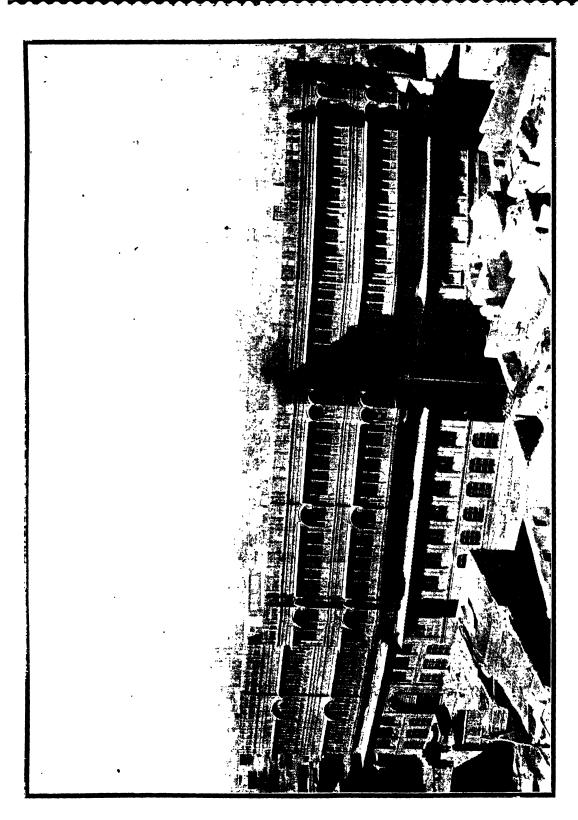
নির্ম্মিত এবং রমণীয় কারুকার্য্যে অলঙ্কৃত হইত। সেইরূপ কারুকার্য্য চণ্ডীমণ্ডপের দারুস্তম্ভে সে দিন অবধি আমরা ক্ষোদিত করাইয়াছি ভুবনেশ্বর ও তাজমহল বাংলায় নাই; সে কারণে বাঙালীকে অনুপ্রাণিত করিবার মত উচ্চশ্রেণীর দেশীয় স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন বাংলায় পাওয়া যায় না। পোর্ত্তুগীজেরা তাঁহাদের দেশের স্থাপত্য এ দেশে আনিয়াছিলেন, তাহা, এবং দক্ষিণ য়ুরোপীয় ধরণের আবাস-ভবন এখন বাংলা অধিকার করিয়া আছে।

নগরের সৌধমালা হইতে সকল দেশের স্থাপত্য-শিল্পের রাজপথে জাতীয় জীবনের অনুকূল ও ভারতীয় ভাবের উদ্দীপক আবহাওয়া নাই। প্রচুর অর্থব্যয়ে পাঁচ, ছয়, সাততলা অট্টালিকা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে ও হইতেছে বটে, কিন্তু মাত্র একখানি বাটী ব্যতীত অন্যান্য বাটীগুলি শ্রীহীন, অর্থহীন। লণ্ডন শহরের ব্যাঙ্ক ও সরকারি অফিস প্রভৃতির যে সকল চিত্র কলিকাতায় আসে, তাহাদের অনুকরণে এ সকল বাটী প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু অনুকরণ-বিস্থায় যে দোষ হয়, এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইতেছে। লণ্ডনের সেই সকল হর্ম্ম্যনিকেতনে যে সৌষ্ঠব, বিশালতা এবং বলিষ্ঠ ও

আধুনিক হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শন—লেখকের তত্ত্বাবধানে নির্ম্মিত

মনোহারী ভাব বিস্ফুরিত হইয়াছে, এই সকল অট্টালিকায় সে রকম ভাব কোথায়?
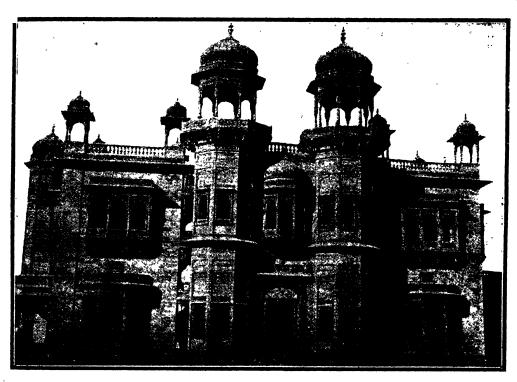
বিলাতের শিল্পীরা দেশ-বিদেশের স্থাপত্য-প্রণালীর ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়াছেন। তাঁহারা নানা দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন; এবং ধ্যান করিবার, ধারণা করিবার ও আরাধ্য বস্তুটী কার্য্যে পরিণত করিবার মত উচ্চ শিক্ষা, সংযম, শক্তি ও স্বাধীনতার অধিকারী তাঁহারা। পরাধীন ও দুর্ব্বল আমাদের "Architects, Builders or Contractors" মহাশয়েরা, শিখিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও, দুর্ভাগ্যক্রমে, ছাত্রেরা তাহাদের প্রাথমিক শিক্ষা ও নৈতিক জীবনের উপাদান গ্রহণ করিয়া থাকে। দেশী ধরণের বাটীতে শ্রীমানেরা বাস করুক এবং দেশী অট্টালিকার মাঝে যে রাজপথ তাহাতে বিচরণ করুক, তাহারা ভারত-প্রকৃতির অনুকূল হইবে, পিতামহদের মত সবল, দীর্ঘজীবী ও জ্ঞানী হইবে।

সে ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে কলিকাতা শহরের নূতন রাস্তা "সেণ্ট্রাল য়্যাভিনিউ"টি নিষ্ফল হইয়াছে। বাঙালী, হিন্দুস্থানী অথবা মাড়বারী কাহারও পক্ষে উক্ত

সুন্দরবনের জঙ্গল মধ্যে হিন্দু মন্দির

গোমুখী—ফোয়ারা—রাজপুতবেশে লেখক দণ্ডায়মান
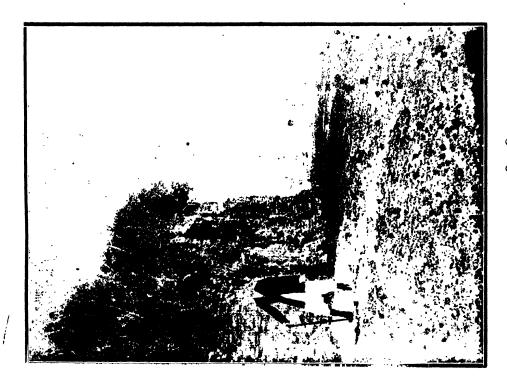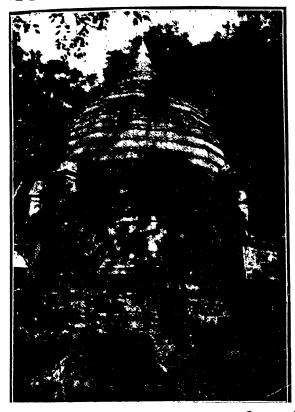
কামাখ্যার মন্দির

ইংরাজের অনুরূপ শিক্ষালাভের সুযোগ, বৃত্তি, বিদ্যালয় ও প্রেরণা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। তাঁহারা দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করেন না। সুতরাং বিদেশীয় ভবনের চিত্রের অথবা সাহেব শিল্পীর নক্সার নকল করা ব্যতীত তাঁহাদের গত্যন্তর নাই।

শিবপুরে অথবা সরকারি অন্যান্য এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে দেশীয় স্থাপত্য-বিদ্যা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা নাই। দেশের যুবক দেশের শিল্প শিক্ষা করিতে পাইলেন না—এতদপেক্ষা লজ্জার, পরিতাপের ও অপরাধের বিষয় আর কি হইতে পারে? বর্ত্তমান লেখক বড়োদার কলাভবন, জয়পুরের শিল্প-বিদ্যালয় প্রভৃতি দেশীয় অনুষ্ঠানগুলি পরিদর্শন করিয়া প্রীত হইয়াছিলেন। সেখানে দেশীয় স্থাপত্য আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়। তবে, সমগ্র ভারত-বর্ষের অভাব মোচন করিতে হইলে, ওইরূপ শিক্ষাগার অনেকগুলি স্থাপিত হওয়ার প্রয়োজন। বর্ষে বর্ষে সহস্র শিল্পীর কার্য্যক্ষেত্রে আসা চাই। সকল প্রদেশে সেরূপ অনুষ্ঠান করা ভারত সরকারের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। হ্যাভেল প্রমুখ ভারতের হিতৈষী অনেক মহাপ্রাণ ব্যক্তিই এ সম্বন্ধে বহুবার সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন।

বিষ্ণুপুরের মন্দির (১)

বিষ্ণুপুরের মন্দির (২)
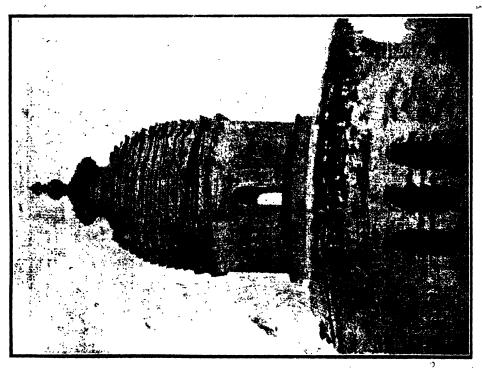
সরকার কিন্তু তাহাতে কর্ণপাত তো করেনই নাই, উপরন্তু অধিকতর উৎসাহেই নূতন নূতন বিদেশী ধরণের বাটীর প্রচলন করাইতেছেন, যদিও দেশবাসীর অর্থেই সরকারি বাটী নির্ম্মিত হয়। তবে লক্ষ্ণৌএর মেডিকেল কলেজ, মথুরার হাসপাতাল এবং বোম্বাই প্রিন্স অব ওয়েলস মিউ-জিয়ম প্রভৃতি কয়েকটী দেশী ধরণের অট্টালিকা প্রস্তুত করানো হইয়াছে বটে, কিন্তু কেবল এইটুকু করাইয়াই সরকার দেশবাসীকে নিরস্ত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। সেগুলিও বিশুদ্ধ ভারত-শিল্পের অনুযায়ী নহে, য়ুরোপীয় সম্ভবপর হইবে না। শিল্পীদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়াও কর্ত্তব্য। ভুবনেশ্বর ও তাজমহল যে মিস্ত্রীরা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরেরা আজ কৃষিকার্য্য করিতেছেন। লেখক আবু, ভুবনেশ্বর, জৈসলমের প্রভৃতি স্থান হইতে কয়েকজন বাস্তু ও তক্ষণ-শিল্পীর নাম ধাম লইয়া আসিয়াছেন। অতি উচ্চ শ্রেণীর শিল্পী তাঁহারা। আবুর মন্দিরের বন্ধনীর যে আলোক-চিত্রটী এই প্রবন্ধের সহিত মুদ্রিত হইল, সেটী আবুর উক্ত শিল্পীর প্রস্তুত। সরকার বাহাদুর তাঁহাদের দৈনিক এক টাকা দেড় টাকা
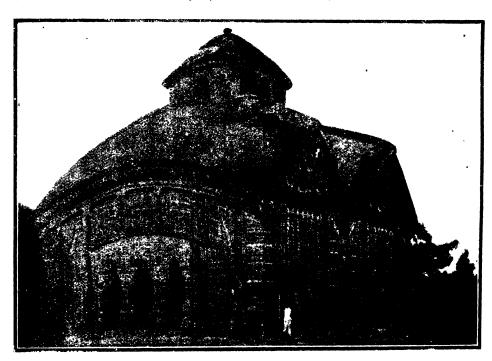
বিষ্ণুপুরের মন্দির (৩)

ভাবের সহিত মিশ্রিত। বড়োদা, জয়পুর, বীকানেরে এরূপ ধরণের অনেক বাটী আছে।

গভর্ণমেণ্টের পবলিক ওয়ার্কস বিভাগে এবং রেলওয়ে, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড অথবা ম্যুনিসিপালিটীতে কেবলমাত্র গভর্ণমেণ্ট এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের পাশ করা এঞ্জিনীয়ার নিযুক্ত করা হয়। জয়পুর, বড়োদার ছাত্রেরা সেখানে চাকরী পাইবেন না। এই প্রকার ব্যবস্থা করিয়া সরকার ভারত-স্থাপত্য-শিল্পকে নির্ম্মূল করিতেছেন। মাঝে মাঝে কেবল শিল্প প্রদর্শনী খুলিয়া দেশী শিল্পীকে রৌপ্যপদক দানে উৎসাহিত করিলেই সরকার বাহাদুরের দ্বারা দেশী শিল্প সংরক্ষণ হিসাবে বেতন দেন। দুই টাকা রোজ পাইলে তাঁহারা কলিকাতায় আসিতে পারেন। কলিকাতা ম্যুনিসিপালিটীর উচিত বড়োদা, জয়পুর, বোম্বাইএর জিজিভাই আর্ট স্কুলের ছাত্রদের ওভারসিয়র, এঞ্জিনীয়র রূপে এবং বিদেশী ও দেশীয় শিল্পে অভিজ্ঞ City Architect রূপে নিযুক্ত করা এবং দূর হইতে মিস্ত্রী আনাইয়া স্থানীয় মিস্ত্রীদের শিখানো। এইরূপে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইলে সিদ্ধিলাভ হইবে। কৌন্সিলররা কি করিতেছেন? তাঁহারা 'সংগঠনী শক্তি' দেখান! প্রত্যেক ভারতবাসীর এ বিষয়ে আন্দোলন করা উচিত। বেঙ্গল টেকনিকাল স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষেরা যাদবপুরের বাড়ীগুলি

পরিকল্পনা করিবার পূর্ব্বে কি বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের চিত্র ধ্যান করেন নাই ? রবীন্দ্রনাথ, অর্দ্ধেন্দুকুমার এ সম্বন্ধে কি করিতেছেন ? বাংলায় দেশী স্থাপত্য সম্বন্ধে একটি বিদ্যালয়, কয়েকখানি গ্রন্থ ও একখানি স্থাপত্যশিল্প সংক্রান্ত পত্রিকা বিশেষ আবশ্যক। পত্রিকায় গৌড়, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানের মন্দিরের ও বাংলার প্রাচীন কালের ঘর বাড়ীর আলোক-চিত্র সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা এবং সেগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত। কি কি মসলা কি পরিমাণে মিশাইয়া এবং কি ভাবে প্রাচীন কালে বাটী নির্ম্মিত হইত, বৃদ্ধ মিস্ত্রীদের ও দেশবাসীদের নিকট হইতে সেই সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত করা আবশ্যক। প্রাচীন কালের বাটী ও ছাদ এ কালের অপেক্ষা অধিকতর দৃঢ় ও স্থায়ী হইত। সরকারের বাড়ী নির্ম্মাণের ব্যবস্থা বা specificationগুলি বিলাতের specification এর অনুকরণ। এ দেশের জলহাওয়ায় তাহা প্রযোজ্য নহে। দেখা গিয়াছে যে, সরকারী বাড়ীর নূতন ছাদে জল চোয়ায়, খিলান ফাটিয়া যায়। সহস্র বৎসরেও কিন্তু সে কালের গাঁথুনি শিথিল হয় নাই। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার অজন্তা গুহা মন্দিরের চারুচিত্রাবলী অদ্যাপি মলিন হয় নাই।

বিষ্ণুপুরের মন্দির (৪)

কলিকাতা সহর ইংরাজী ধরণের বাটীতে পরিপূর্ণ। ইংরাজ এঞ্জিনীয়ররা তাঁহাদেরই দেশের স্থাপত্য-কলা শিক্ষা করিয়া এ দেশে চাকরী করিতে আসেন; তাঁহারা ইংরাজী ধরণেরই অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে পারেন। এ দেশী বাটী নির্ম্মাণ করাইবার পূর্ব্বে এ দেশীয় স্থাপত্য শিক্ষা করার প্রয়োজন। ইংরাজ স্থপতি এত পরিশ্রম করিবেন কেন? আর শুধু পুস্তক পাঠ করিলেই হইবে না, বাটী নির্ম্মাণ কালে দেশী সহকারীদের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে। তাহাতে তাঁহাদের আত্মগরিমা ক্ষুণ্ণ হইবে যে!

অনেকে ভাবেন যে, ভারতীয় ছাঁদের বাটী প্রস্তুত করিতে অধিক ব্যয় হয়। এবং প্রস্তর ব্যতিরেকে দেশী ধরণের বাটী নির্ম্মাণ করা সম্ভবপর নহে। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। লেখক সরকারি পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগে আট বৎসর ছিলেন। স্থাপত্য কার্য্যে তাঁহার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। বিশেষরূপে তিনি বিবেচনা ও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, Reinforced concrete সাহায্যে দেশী

ধরণের বাটী নির্ম্মাণ করিলে, বড় বাজারের মামুলি ধরণের অলঙ্কৃত, বাটী নির্ম্মাণের খরচের তুলনায় খরচ কমই হইবে। অথচ সুদৃঢ় ও সুদৃশ্য বাটী প্রস্তুত হইবে। তিনি কয়েকজন অভিজ্ঞ এঞ্জিনীয়রের সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদেরও সেই মত। দেশী ধরণের বাগান করানোও অসম্ভব অথবা বহুব্যয়সাপেক্ষ নহে।

বিদেশী শিক্ষা ও রাজনীতি কৌশলের ফলে আমাদের চিত্ত এতদূর বিকৃত হইয়াছে যে, সহজ কাজও আমার অসাধ্য বলিয়া ভাবি। আমরা ভায়ে ভায়ে মিলিত হইতে চাই না, পরস্পরকে সাহায্য করি না। সাহেবদের সে দোষ নাই, তাই তাঁরা এত বড়।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

মহাত্মা কবীর

শ্রীসীতেশচন্দ্র সান্যাল

কাশীধাম হিন্দুর পরম পবিত্র, তীর্থোত্তম স্থান। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল—ত্রিলোকে—হিন্দুর চক্ষে, হিন্দুর পক্ষে এমন পবিত্র স্থান আর নাই। কাশীধামে যাইবার জন্য, বাস করিবার জন্য, দেহপাত করিবার জন্য, হিন্দু লালায়িত।

কাশীধাম কেবল নরমানবের নয়, অমরগণেরও অভিলষিত স্থান; কাশীধাম কেবল নরমানবের নয়, অমরগণেরও আবাসভূমি। কাশীধামে কেবল মুনি ঋষি, যোগী তপস্বী, সাধু সজ্জন বাস করেন না, দেবগণও কাশীধামের অধিবাসী। এইজন্য কাশীধামে পাপ নাই, পুণ্য আছে, অধর্ম্ম নাই, ধর্ম্ম আছে, মলিনতা নাই, নির্ম্মলতা আছে, অপবিত্রতা নাই, পবিত্রতা আছে, সঙ্কীর্ণতা নাই, ঔদার্য্য আছে—এই জন্য কাশীধামে বাহ্যাভ্যন্তর সমস্তই শুচি, পূত, পবিত্র, সুন্দর, মনোরম। দূর হইতে "কাশী কাশী" বলিতে বলিতে নিষ্পাপ হইয়া সংসারী মানব যখন কাশীতে প্রবেশ করে, কলুষনাশিনী ত্রিতাপহারিণী, কাশীতলবাহিনী, সুখদা, মোক্ষদা, তরলতরঙ্গিণী সুরধুনীর সুমধুর নাম "যোজনানাম শতৈরপি" উচ্চারণ করিতে করিতে নিষ্পাপ সংসারী মানব কাশীধামে যাইয়া সেই পূত সলিলে যখন অবগাহন করে, বল দেখি, কাশীধামে পাপ রহিল কোথায়, কি প্রকারে? জন্মজন্মান্তরের কলুষরাশি কাশীধামে নাশ হয় বলিয়াই কাশীক্ষেত্র মহাশ্মশানক্ষেত্র, কাশীধামে দিব্যজ্ঞানজনিত পরম আনন্দ লাভ হয় বলিয়াই কাশীধাম আনন্দকানন।

কাশীধামে ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম প্রত্যেকেই প্রতিনিয়ত স্মরণ করাইয়া দেয়, দেখাইয়া দেয়,—শুনাইয়া দেয় সুদূর অতীতের পুণ্য পবিত্র কোন ঘটনা, ধর্ম্মবিজড়িত কোন অপূর্ব্ব কাহিনী, ইতিহাসবর্ণিত কোন অমর অধ্যায়। মণিকর্ণিকা ঘাট, দশাশ্বমেধ ঘাট, চতুঃষষ্টিযোগিনীর ঘাট, কেদারঘাট, হরিশ্চন্দ্র ঘাটে যাইলে, প্রহ্লাদ ঘাট, নারদ ঘাট, হনুমান ঘাট, তুলসী ঘাটে যাইলে, পঞ্চগঙ্গা ঘাট, ভোঁসলা ঘাট, মানমন্দির ঘাট, অহল্যা বাইয়ের ঘাট, শিবালা ঘাটে যাইলে, তোমার মনে কোন্ কথার উদয় হয় বল দেখি? কপিল ধারা, কোনার্ক কুণ্ড, অগস্ত্যকুণ্ড, সারনাথ, শঙ্করের মঠ, তুলসী দাসজীর অখাড়া, পঞ্চক্রোশির পথ, কবীরচৌরা—কাহার কথা মনে করাইয়া দেয়, বল দেখি? ফলতঃ, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—যুগচতুষ্টয়ের—কীর্ত্তিস্মৃতি, কীর্ত্তিচিহ্ন কাশীধামে বিদ্যমান। ফলতঃ, কাশীধামে অতীত বর্ত্তমানবৎ দণ্ডায়মান, ভূত চক্ষের সমক্ষে ভাসমান। কাশীধামে ভূত ও বর্ত্তমানের এই মিলন বড়ই মধুর, বড়ই প্রীতিপ্রদ—অপিচ হিন্দুর, ভারতবর্ষের, ভবিষ্যতের ভিত্তি।

উপরে যে কবীরচৌরার উল্লেখ করিলাম, তাহা কাশীধামের একটী মহল্লার নাম। সে মহল্লায় সুরম্য প্রাসাদশ্রেণী সুশোভিত যে শ্বেত সুপ্রশস্ত রাজপথ আছে, তাহার নামও কবীরচৌরা। চৌরা (চৌরাহ) অর্থ চৌপথ। মহাত্মা কবীরের নামে এই মহল্লা এবং পথের নাম—কবীরচৌরা।

এখন কবীর কি ছিলেন, কোন জাতি—হিন্দু না মুসলমান? নাম অনুসারে তিনি মুসলমান, জোলা জাতীয় মুসলমান ছিলেন। তাঁহার জাতি ও জন্ম সম্বন্ধে নানা মত। "ভক্তি মাহাত্ম্য" গ্রন্থমতে, পূর্ব্বজন্মে তিনি একজন সাধক ব্রাহ্মণ ছিলেন। সে জন্মে বস্ত্রক্রয়ার্থী হইয়া তিনি এক দিন এক জোলার বাড়ীতে যান। সেখানে বস্ত্র না পাইয়া নিজ আলয়ে ফিরিয়া আসেন। আসিয়া পীড়িত হন। কিছুদিন পর তাঁহার মৃত্যু হয়। অন্তকালে সেই বস্ত্রবিক্রেতা জোলার কথা স্মরণ করিতে করিতে তিনি তনুত্যাগ করেন। তাহাতেই পরজন্মে জোলাকুলে তাঁহার জন্ম হয়। অন্তকালে যে যে ভাবনা লইয়া মরে, পরজন্মে তাহার তদনুরূপ জন্ম হইয়া থাকে, ইহা কিছু বিচিত্র নয়।

রাজর্ষি ভরত তাঁহার প্রিয় মৃগশাবকের কথা স্মরণ করিতে করিতে তনুত্যাগ করিয়া পরজন্মে মৃগত্ব লাভ করেন। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

অন্তকালে চ মামেব স্মরণ্ মুক্ত্বা কলেবরম।
যঃ প্রযাতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৮।৫

মৃত্যুকালেও যিনি কেবল আমাকেই স্মরণ করিতে করিতে কলেবর ত্যাগ করেন, তিনি নিঃসন্দেহ আমারই স্বরূপত্ব লাভ করিয়া থাকেন।

কেবল কি তাহাই ?

যং যং বাপি স্মরণ্‌ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব ভাবিতঃ ॥ ৮।৬

হে কৌন্তেয়! মৃত্যুকালে কেবল যে আমাকে স্মরণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেই মদ্ভাব প্রাপ্তি ঘটে তাহা নয়। যে যে বিষয়ে স্মরণ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিবে, সেই চিরাভ্যস্ত ভাব লইয়া তনুত্যাগ নিবন্ধন সে সেই ভাবই পাইবে।

জীবদ্দশাতেও ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নয়, কাঁচপোকার ভয়ে ভীত হইয়া তৈলপায়িকা নিয়ত কাঁচপোকা ভাবিতে ভাবিতে জীবিতাবস্থাতেই নিজ কলেবর পরিত্যাগ করিয়া কাঁচপোকার ভাবাপন্ন হইয়া যায়। নন্দীকেশ্বর সদাশিব চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। কালে জীবিতাবস্থাতেই তিনি শিবরূপী হইয়াছিলেন। কবীরও বলিয়াছেন—

হরি সে লগ রহ ভাই।
তু বনত্ বনত্ বন যাই ॥
হরিতে লেগে থাক ভাই।
হ'তে হ'তে হ'য়ে যা'বে তাই ॥

যাহা হউক, কবীর জোলাকুলে জন্মগ্রহণ করেন।

আবার "ভক্তমাল" গ্রন্থে তাঁহার জন্ম সম্বন্ধে আর একটী বিবরণ পাওয়া যায়।

একদা বিখ্যাত বৈষ্ণব রামানন্দের এক ব্রাহ্মণ শিষ্য স্বীয় বালবিধবা কন্যাকে সঙ্গে লইয়া গুরুগৃহে যান। কন্যা প্রণতা হইলে, "পুত্রবতী হও" বলিয়া রামানন্দ কন্যাটীকে আশীর্ব্বাদ করেন। রামানন্দ জানিতেন না কন্যাটী বিধবা। কিন্তু ঋষি বাক্য অব্যর্থ। তিনি বলিলেন, তাঁহার আশীর্ব্বাদে কন্যাটী—হউক না কেন বিধবা—একটী পবিত্র গর্ভধারণ করিয়া এক পরম সাধু সন্তান প্রসব করিবে। যথাকালে কন্যা গর্ভবতী হইল, যথাকালে সন্তান প্রসূত হইল। কিন্তু লোকাপবাদ ভয়ে কন্যাটী সদ্য প্রসূত পুত্রটীকে কাশীর সমীপবর্ত্তী লহরতলাও নামে একটী সরোবরে নিক্ষেপ করিয়া দিল। পরে নিমা নাম্নী জনৈক মুসলমান জোলা রমণী পুত্রটীকে লইয়া লালন পালন করে। এই জোলা রমণী পুত্রটীর নাম রাখে কবীর।

কবীরপন্থীগণ কবীরের এই জন্মবৃত্তান্ত স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, কাশীর নিকট লহরতলাও সরোবরে পদ্মপত্রের উপর শিশুটী ভাসিতেছিল। কিন্তু পদ্মপত্রের উপর শিশুটী কখন, কি প্রকারে আসিল, তাহা জানিবার উপায় নাই, অথচ জানিতে কৌতূহল হয়। যাহা হউক, নুরী নামক জনৈক জোলা নিজপত্নী নিমাসহ ঐ তলাও-তট দিয়া যাইতেছিল। নিমা শিশুটীকে সরোবর হইতে লইয়া আসে। শিশু নিমাকে বলে—আমায় কাশীতে লইয়া চল। শিশুর বাক্যে নুরী ও নিমা তাহাকে কোন উপদেবতা ভাবিয়া ভয় পায় এবং তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। শিশু তাহাদের ভয় অপনোদন করিলে তাহারা তাহাকে নিজ আলয়ে আনিয়া তাহাকে লালন পালন করে।

জন্মবৃত্তান্ত যাহাই হউক, কবীর নিজে বলিয়াছেন, তিনি জোলাকুলোৎপন্ন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কবীর প্রাদুর্ভূত হন। ঠিক কোন সনে,—বৃদ্ধ ইতিহাস সে বিষয়ে নির্ব্বাক, অন্ততঃ অস্ফুটবাক। কাহারো কাহারো মতে সম্ভবতঃ ১৪৪০ সনে কাশীধামে বা তন্নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সে সময়ে ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বকাল। সে সময়ে মুসলমানগণ হিন্দুদিগকে ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী করিতে ব্যস্ত। একদিকে ধর্ম্ম জগতে সাদি, হাফিজ প্রভৃতি প্রগাঢ় দার্শনিক কবিগণের প্রবল প্রাধান্য ভারতবর্ষে বিস্তারিত হইতেছিল, অপরদিকে ভয়প্রদর্শন, দণ্ডবিধান, পদ ও অধিকার প্রদান, মুসলমানেতর জাতির নিকট হইতে জিজিয়া নামক কর গ্রহণ—এই প্রকার নানা উপায় অবলম্বিত হইতেছিল। এই কারণ-সমষ্টি উত্তর পশ্চিমের এবং বঙ্গদেশের নিম্ন শ্রেণীর বিস্তর হিন্দুকে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছিল।

হিন্দুর সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হইতেছে, হিন্দুসমাজ দিন দিন ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইতেছে, অপর ধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্মকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া হিন্দু বিপদ গণিলেন। হিন্দু তখন শাস্ত্র সঙ্কলন শাস্ত্রব্যাখ্যা, শাস্ত্রপ্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু জনসাধারণ দুর্ব্বোধ শাস্ত্রবাক্য বুঝিবে কেমন করিয়া? সুতরাং তাহাদিগকে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সরল ভাষায় বুঝাইবার জন্য যাঁহারা ব্রতী হইলেন, তাঁহাদের নাম হইল সন্ন্যাসী। এই সন্ন্যাসীদল গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, দেশে দেশে যাইয়া সাধারণ ও অসাধারণ সকলকেই বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন—সমস্ত ধর্ম্মই মূলতঃ এবং স্থূলতঃ একই, সমস্ত ধর্ম্মই একেশ্বরবাদী। প্রত্যেক ধর্ম্মের কর্ম্মকাণ্ড পরস্পর পৃথক, এমন কি বিরুদ্ধ, হইতে পারে, আচার অনুষ্ঠান পরস্পর পৃথক হইতে পারে; কারণ কর্ম্মকাণ্ডই বল, আর আচার অনুষ্ঠানই বল, উহা দেশকাল পাত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত, গুণ কর্ম্মানুসারে চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি ও বিভাগ; কিন্তু মূলতঃ এবং স্থূলতঃ যাবতীয় ধর্ম্মের লক্ষ্যই এক, পুরাণ ও কোরাণের একই উপদেশ—সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম প্রাপ্তি। যিনি অর্জ্জুনকে জ্ঞানচক্ষু প্রদান করিয়া স্বীয় বিরাট রূপ, অনন্ত রূপ প্রদর্শন করাইয়া চমৎকৃত করিয়াছিলেন, সে বিরাট রূপের মধ্যে কেবল হিন্দুস্থান ও আফগানিস্থান নয়, অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত—সেই বিরাট-রূপী, সেই অনন্ত-রূপী ভগবানকে রামই বল আর রহীমই

বল, ব্রহ্মই বল আর আল্লাই বল, তাহা কেবল নামান্তর মাত্র, পদার্থান্তর নয়; তাহা ভেদসূচক নয়, তাঁহার অসীমত্ব, অনন্তত্ব-সূচক, তাহা একেরই বহুনাম, বহুসংজ্ঞা। সন্ন্যাসীদল দেশময় সনাতন ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝাইয়া দিলে, ছড়াইয়া দিলে, তখনকার মত ধর্ম্মবিপ্লব থামিয়া গেল। এই সন্ন্যাসীদলের মধ্যে রামানন্দ স্বামী এবং তদীয় শিষ্য কবীরই প্রধান। উভয়েই বৈষ্ণব—বিষ্ণুর পরম ভক্ত। উত্তর-ভারতে উভয়েই বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়া, শ্রীরাম নাম প্রদান করিয়া, ধর্ম্মান্তর গ্রহণের গতিরোধ করিলেন, অপিচ ধর্ম্মজগতে একটী যুগান্তর উপস্থিত করিলেন।

কবিরের গুরু কাশীবাসী রামানন্দস্বামী। রামানন্দ হিন্দু, কবীর মুসলমান। হিন্দুর মধ্যে দীক্ষা গ্রহণ বাধ্যতামূলক। মুসলমানের মধ্যে এ প্রথা নাই। অথচ হিন্দুর নিকট একজন মুসলমান দীক্ষা গ্রহণ করিলেন, ইহা বিচিত্র নয় কি? বিশেষতঃ যে সময়ে মুসলমান হিন্দুকে ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী করিতেছিল, সেই সময়ে। এমন কি, কবীরকে হিন্দুভাবাপন্ন দেখিয়া তৎকালে দিল্লীশ্বর সিকন্দর লোদী তাঁহাকে নানাপ্রকার প্রাণহানিকর শাস্তি প্রদান করেন—কখনো গভীর নদীবক্ষে, কখনো জ্বলন্ত অনল মধ্যে, কখনো বা মত্ত মাতঙ্গের পদতলে তাঁহাকে নিক্ষেপ করা হয়। তাহাতেও কবীর একটুও বিচলিত না হওয়াতে—বরং প্রহ্লাদের স্থায় প্রতি বিপদ হইতে অক্ষত দেহে রক্ষা পাওয়াতে,—বাদশাহ বুঝিলেন, কবীর সিদ্ধ মহাপুরুষ। তখন তিনি কবীরের নিকটে ক্ষমা চাহিয়া তাঁহার সহিত সখ্য স্থাপন করিলেন। তাই বলিতেছিলাম, মুসলমান হইয়া হিন্দুর নিকট মন্ত্রগ্রহণাভিলাষী হওয়া বিচিত্র নয় কি? ভাবিয়া দেখিলে, আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া মনে হয় না। কবীর ব্রাহ্মণ-বিধবা-কন্যাজাত, এই ঘটনাটী স্বীকার না করিলেও, তিনি পূর্ব্বজন্মে সাধক ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইহা মানিয়া লইতে কোন আপত্তি দেখিতেছি না। হিন্দু জন্মান্তরবাদী, সুতরাং পূর্ব্বসংস্কারবাদী। পরজন্মে তন্তুবায়ের কুলে কবীরের জন্ম হইলেও, পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ তিনি অল্প বয়স হইতেই জ্ঞানপিপাসু, ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধিৎসু হইয়াছিলেন। এই পূর্ব্বসংস্কার হিন্দুর নিকটে মন্ত্র লইবার জন্য তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তোলে। তাই তিনি রামানন্দের নিকট মন্ত্র লইতে যান।

কিন্তু রামানন্দ যবনকে মন্ত্র দিতে অসম্মত হন। নিরুপায় হইয়া এক দিন রাত্রিতে কবীর রামানন্দের আশ্রম-দ্বারে যাইয়া শয়ন করেন। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে রামানন্দ স্নান উদ্দেশ্যে মণিকর্ণিকার ঘাটে যাইবেন বলিয়া আশ্রম হইতে যেমন বহির্গত হইলেন, অমনি তাঁহার পদযুগল যবনদেহ স্পর্শ করিল, নয়নযুগল যবনমুখ অবলোকন করিল। তিনি অমনি "রাম রাম" বলিলেন। যবন কবীর ভাবিলেন—ইহাই ত মন্ত্র, এই মন্ত্রই আমায় দিলেন। তখন রামানন্দকে গুরু সম্বোধন করিয়া তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন—

প্রথমহি রূপ্প জোলাহা কীন্হা।
চারিবরণ মোহি কাহু ন চীন্হা॥
রামানন্দ গুরু দীক্ষা দেহু।
গুরু পূজা কছু হমকো লেহু॥

জন্মাবধি আমার জোলার রূপ। সুতরাং চতুর্ব্বর্ণের কেহই আমায় চিনিতে পারে নাই। হে গুরু রামানন্দজী! আমায় দীক্ষা দিন এবং আমার নিকট হইতে গুরুপূজাস্বরূপ কিছু গ্রহণ করুন।

গুরু-শিষ্যে ধর্ম্মবিষয়ে প্রায় তর্ক-বিতর্ক হইত। তর্কে গুরু কখনো কখনো পরাজিত হইতেন, অন্ততঃ উভয়ের মধ্যে মতভেদ হইত। কালে মতভেদনিবন্ধন উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটে। কাহারো কাহারো এই মত। বিশেষ প্রমাণ অভাবে এই মতটাকে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত নয়। বিশেষতঃ গুরু ও ব্রহ্মে যাঁহার অভেদজ্ঞান, তিনি গুরুবিদ্বেষী কখনই হইতে পারেন না।

কবীর গুরুগোবিন্দ দ্বে এক হয় দুজা হয় আকার।
অংশমিটে হরিভজে তব পাওয়ে করতার॥

গুরু গোবিন্দ দুইই এক, কেবল আকার-ভেদ মাত্র। ভজন দ্বারা ভেদবুদ্ধি লোপ পাইলে একত্ব প্রাপ্তি ঘটে।

গুরুকো মানুষ জানত তে নর কহিয়ে অন্ধ।
হোয় দুখী সংসারমে আগে যমকা ফন্দ॥

গুরুকে যে ব্যক্তি মানুষ বলিয়া জানে, সে অন্ধ। এ সংসারে দুঃখ ভোগ করিয়া, পরে সে যমের ফান্দে পড়ে।

গুরু সমান দাতা নহি যাচক শিষ্য সমান।
চারলোককি সম্পদ সো গুরু দিনহি দান॥

গুরুর সমান দাতা এবং শিষ্যের সমান যাচক নাই। যে ভগবান চারিলোকের সম্পদ, গুরু শিষ্যকে সেই সম্পদ দান করিয়া থাকেন।

গুরু সম্বন্ধে যাঁহার এই জ্ঞান, তিনি কখনই গুরুবিদ্বেষী হইতে পারেন না। সাধনবলে শিষ্য উচ্চে উঠিলে, সে কি গুরুর প্রতি ভক্তিহীন হয়? বরং সে সততই ভাবে, তাহার উন্নতির মূলে গুরুচরণ, গুরুদত্ত মন্ত্র, গুরুদত্ত নেত্র। সে সততই ভাবে—যতই উচ্চে উঠিয়া থাকুক না কেন—গুরুপদতলই তাহার আশ্রয়, গুরুপ্রদত্ত জ্ঞানালোকই তাহার ইহকাল ও পরকালের পথপ্রদর্শক। শিষ্য জ্ঞানমার্গের শেষ সীমায় উপনীত হইয়া থাকিলেও, সে গুরুদাস। গুরুপ্রদত্ত ঐ জ্ঞানালোকটী নির্ব্বাপিত হইলে, শিষ্য—দিশাহারা, পথহারা, অন্ধ। সুতরাং উক্ত মতটী আমরা গ্রহণ করিতে অসমর্থ।

কৃচ্ছ্র জপ তপ, ধ্যান ধারণায় সাধারণ লোককে অশক্ত দেখিয়া কবীর শব্দযোগ শিক্ষা দেন। শব্দই ব্রহ্ম, অর্থাৎ ভগবান শব্দ রূপে সর্ব্বঘটে বিদ্যমান। সাধনবলে নিজ নিজ দেহ মধ্যেই সেই শব্দ শ্রবণগোচর হইতে পারে।

কবীর রগ রগ বোলে রামজী, রোম রোম ঝঙ্কার।
সহজই ধ্বনি লাগি রহে কহহি কবীর বিচার॥

কবীর বিচার করিয়া বলিতেছেন—তোমার প্রত্যেক শিরা, প্রত্যেক

লোমকূপ হইতে রামনাম ধ্বনিত হইতেছে, দেহমধ্যে রামনামের ঝঙ্কার নিয়ত লাগিয়াই রহিয়াছে।

শ্রীভগবানও বলিয়াছেন—

রসোঽহমপস্যু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু॥

গীতা ৭।৮

হে কৌন্তেয়! জলপদার্থের সারভূত যে রস, আমাকে সেই রস বলিয়াই জানিবে। চন্দ্রসূর্য্যে আমি প্রভা রূপে, সর্ব্ববেদে প্রণব রূপে, আকাশে শব্দরূপে, নরে পৌরুষরূপে আমি অবস্থিত।

"ইড়া পিঙ্গল সুষুম্না চ নাড়ী"—এ স্থলে স্মরণ করিলেই হয়।

তুমি যদি বধির অথবা অদত্তকর্ণ হও, তবে তুমি মন্দভাগ্য।

তুমি যেয়সা রাম পর, তুম পর তেয়সা রাম।
দাহিনে যাও ত দাহিনে যায়, বামে যাও ত বাম॥

শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি তোমার প্রীতি যদ্রূপ, তোমার প্রতিও তাঁহার প্রীতি তদ্রূপ। তুমি দক্ষিণে গেলে, তিনিও দক্ষিণে যাইবেন, তুমি বামে গেলে তিনিও বামে যাইবেন।

জপ সম্বন্ধে কবীর বলেন—

মালা তো করমে ফিরে, জিভ ফিরে মুখ মাহি।
মনুআ তো দহদিশ ফিরে, এতো সুমিরণ নাহি॥

মালা ফিরিতেছে করে, জিহ্বা ফিরিতেছে মুখমধ্যে, মন ফিরিতেছে দশদিক—ইহার নাম জপ নয়।

মালা ফেরত, মন খুশী, তাতে কছু ন হোয়।
মনমালাকো ফেরত, ঘট উজীয়ারী হোয়॥

মালা ফিরাইলে মনে আনন্দ হয় বটে, কিন্তু তাহাতে কোন লাভ নাই। মনমালা যদি ফিরাইতে পার, তবেই দেহাভ্যন্তর দীপ্তিশীল হইবে।

নামের শক্তি সম্বন্ধে কবীর বলেন—

নাম যো রত্তি এক হয়, পাপ যো রত্তি হাজার।
আধ রত্তি ঘট সঞ্চরে, জর করে সব ছার॥

নাম এক রতি, পাপ হাজার রতি। অর্দ্ধরতি নাম দেহে সঞ্চারিত হইলে পাপপুঞ্জ ভস্মীভূত হইয়া যায়।

সুতরাং—

নাম জপত কুষ্ঠী ভলা, চুই চুই পড়ে যো চাম।
কাঞ্চনদেহ কিস্ কিস্ কাম কি, যা মুখ নহি নাম॥

গলিত কুষ্ঠরোগী, যাহার দেহ হইতে চর্ম্ম খসিয়া পড়িতেছে, সে যদি নাম জপ করে, তবে সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ। স্বর্ণঅঙ্গ লইয়া যদি নাম জপ না করে, সে অঙ্গে কি প্রয়োজন?

কবীর বলেন ফলকামী সেবক সেবকই নয়।

ফল কারণ সেবা করে, ত্যজে ন মনসে কাম।
কহে কবীর সেবক নহি, চাহে চৌগুণা দাম॥

মন হইতে কামনা ত্যাগ না করিয়া ফল হেতু যে সেবা করে, সে সেবকই নয়—সেবার জন্য সে চতুর্গুণ মূল্য চাহিয়া থাকে।

নিন্দক সম্বন্ধে কবীর বলেন—

নিন্দক দূর ন কিজিয়ে, কিজৈ আদর মান।
নিরমল তনমন যা করে, ওয়াকে আনহি জান॥

নিন্দককে দূর করিয়া দিও না; বরং তাহার আদর সন্মান করিও। নিন্দা করিয়া সে লোকের দেহ মন নির্ম্মল করিয়া থাকে।

কবীর নিন্দক মত মরো; জীয়ো আদ জুগাদ।
হমতো সদগুরু পাওয়া, নিন্দককে প্রসাদ॥

নিন্দক! তুমি মরিও না; আদি অনাদিকাল বাঁচিয়া থাক। তোমার প্রসাদে আমার সদগুরু লাভ হইয়াছে।

নিন্দকের মৃত্যু সংবাদে কবীরের শোক—

নিন্দক বেচারা মর গিয়া, কবীরা বৈঠে রোয়।
পাপ সফা করতা ধোবী যেয়সা ময়লা ধোয়॥

নিন্দক বেচারা মরিয়া গেল, কবীর বসিয়া রোদন করিতেছেন। রজক যেমন মলিন বসন ধুইয়া দেয়, নিন্দকও তদ্রূপ আমার পাপ পরিষ্কার করিয়া দিত।

কবীর নিরামিস আহারের পক্ষপাতী, মৎস্য আহারের ঘোর বিরোধী।

তিলভর মছলী খায়কর, কোটি গৌ দে দান।
কাশীকর বটলে মরে, তওভি নরক নিদান॥

একতিল পরিমাণ মৎস্য আহার করিয়া এক কোটি গো দানই কর, আর কাশীবাস করিয়া কাশীতেই তনুত্যাগ কর—তোমার নরক অনিবার্য্য।

মহাত্মা কবীরের নিন্দক বিষয়ক উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। উক্ত উক্তি তাঁহার মনের দৃঢ়তা এবং চরিত্রবলব্যঞ্জক। তিনি যাহা কর্ত্তব্য বোধ করিতেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে কোন প্রকার কুণ্ঠা, সঙ্কোচ বা লোকাপবাদ ভীতি প্রদর্শন না করিয়া, তেজঃ, সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় দিতেন। কর্ত্তব্যের পথে লোকনিন্দাকে তিনি কণ্টক স্বরূপ জ্ঞান করিতেন না। যদি তাহাই করিতেন, তবে তাঁহার সদ্গুরু লাভ হইত না। এক দিকে লোক নিন্দা, অপর দিকে কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা। অবশেষে প্রবল কর্ত্তব্যনিষ্ঠার সমক্ষে, দুর্ব্বল লোকনিন্দা সঙ্কুচিত, পরাভূত, পলায়নপরায়ণ হইত, নিন্দা স্তুতিতে পরিণত হইত—নিন্দক স্তাবক হইত। "পাছে লোকে কি বলে"—এই একটা কথা প্রচলিত আছে। সঙ্কল্পের পূর্ব্বে সম্যক বিচার, বিবেচনা করিয়া দেখিবে, সঙ্কল্পটী এমন কিছু নয় ত যাহা কার্য্যে পরিণত করিলে "পাছে লোকে কি বলে।" কিন্তু সঙ্কল্প যখন স্থির করিয়াছি—হউক না কেন তোমার সঙ্কল্প সঙ্গত বা অসঙ্গত, তাহাতে কিছু আসে যায় না, তাহা মতভেদ মাত্র—তখন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড এক দিকে, তোমার সঙ্কল্প অপর দিকে; তখন যাবতীয় বাধা-বিঘ্ন এক দিকে, তোমার সঙ্কল্প অপর দিকে; তখন ভগবান এক দিকে, জীবদেব

বুলবুল্

শিল্পী—ইনায়েৎ হোসেন

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

অপর দিকে। তখন তোমার সঙ্কল্প হইতে পশ্চাদ্‌পদ হইবার তোমার অধিকার নাই, একটী আদর্শ জীবন হইতে জগৎকে বঞ্চিত করিবার তোমার অধিকার নাই—সঙ্কল্পভ্রষ্ট হইয়া হীন, কাপুরুষের চিত্র জগতের সমক্ষে উপস্থাপিত করিবার অধিকার নাই। জানিয়া রাখ, আরাম-কেদারা বা নরম-তাকিয়া সঙ্কল্পসিদ্ধির প্রতিকূল। কত সাধু-সঙ্কল্প নিন্দাবাক্যবিদ্ধ হইয়া জগতের অনিষ্ট সাধন করিয়াছে এবং করিতেছে, তাহা কে বলিতে পারে?

অথচ লোকনিন্দা বা নিন্দককে মহাত্মা কবীর উপেক্ষা বা অবজ্ঞাও করিতেন না, বরং তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও আদর করিতেন—ভীতিবশতঃ নয়, নিন্দককে তিনি মিত্র, হিতৈষী জ্ঞান করিতেন। স্তাবক—সমক্ষে বা পরোক্ষে—স্তুতি দ্বারা মানুষকে অধঃপাতিত করে; নিন্দক—সমক্ষে বা পরোক্ষে—নিন্দা দ্বারা মানুষকে উন্নত করে। স্তাবক স্তুতি দ্বারা মানুষের চিত্তে অহঙ্কার বহ্নি আরও প্রজ্জ্বালিত করিয়া দেয়—বলিয়া দেয়, তুমি কত বড়, উচ্চ, মহান; নিন্দক নিন্দা দ্বারা অহঙ্কার বহ্নিকে নির্ব্বাপিত করিয়া দেয়—বলিয়া দেয়, তুমি কত ছোট, হীন, জঘন্য, নগণ্য। স্তাবক মানুষের দোষ গোপন করিয়া রাখে, নিন্দক মানুষের দোষ উদ্‌ঘাটিত, প্রকাশিত করিয়া দেয়। স্তাবক শত্রু, সুতরাং পরিহর্ত্তব্য; নিন্দক বন্ধু, সুতরাং আদরযোগ্য। সুধিজন নিন্দকের বাক্যে সতর্ক, সাবধান, দোষসংস্কার-পরায়ণ হইয়া থাকেন। দোষ নাই কাহার? কিন্তু দোষ দেখাইয়া দেয় কে? সংশোধন করিয়া দেয় কে? মানুষকে মানুষ করিয়া দেয় কে? শুভ্র, স্বচ্ছ, নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক করিয়া দেয় কে? উচ্চ, উন্নত, উজ্জ্বল, করিয়া দেয় কে? কবীর করিয়া দেয় কে? রজক না মোদক? মহাত্মা কবীর বলিয়াছেন—রজক, নিন্দক।

কবীরের সময়ে তিনি একজন বিখ্যাত গায়ক ছিলেন। তাঁহার জ্ঞানভক্তিবিমিশ্রিত গান শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ, মাতোয়ারা হইতেন।

কবীরের দোঁহাবলী সরল হিন্দী ভাষায় রচিত। তাঁহার দোঁহাবলীতে উর্দ্দু শব্দ অতি বিরল, নাই বলিলেই হয়—অথচ তিনি মুসলমান ছিলেন। তাঁহার দোঁহাবলী কেবল জ্ঞান উপদেশ নয়—তাঁহার জ্ঞান ও অনুভূতির উচ্ছ্বাস। তিনি নিরক্ষর কবি ছিলেন। তন্ত তাঁহার জীবনোপায় ছিল। তিনি সরল, সাধারণ সংসারী ছিলেন। তিনি দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার সন্তান সন্ততি জন্মিয়াছিল। কিন্তু সংসারে বাস করিয়াও তিনি সংসারের বাহিরে বাস করিতেন। সংসারে বিচরণ করিলেও তিনি সংসারের বাহিরে ভ্রমণ করিতেন। ভূলোকবাসী হইলেও, নীড়নিবাসী বিহঙ্গের ন্যায়, তিনি গগনবিহারী ছিলেন। তাঁহার চিত্ত কেবল ক্ষুদ্র সংসারে লিপ্ত থাকিত না—তাঁহার চিত্ত নিয়ত ধাবিত হইত, বালককাল হইতেই, বিরাট, বিশাল ব্রহ্মাণ্ডপতির দিকে। তথাপি তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—"অরে দিল! প্রেমনগরকা অন্ত ন পাওয়া।" "রে মন! প্রেম নগরের অন্ত পাইলাম না।" হাতে তাঁহার তন্ত, মনে তাঁহার ব্রহ্ম। কালে হাতের তন্ত হাতেই থাকিত, মনের ব্রহ্ম বাহ্যাভ্যন্তরে তাঁহাকে ব্রহ্মই দেখাইত। সরল, নির্ম্মল না হইলে—অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি না ঘটিলে—ব্রহ্মদর্শন ঘটে না, ঘটিতে পারে না। যে সংসারের সরলতা তাঁহার শত্রুকে মিত্র করিয়া তুলিয়াছিল, তাঁহার প্রতি লোকের ঘৃণাকে শ্রদ্ধায় পরিণত করিয়াছিল, ভগবদ্‌জ্ঞানলাভের পথ প্রসারিত করিয়া দিয়াছিল, সেই সরলতা, নির্ম্মল নির্ঝরিণীর ন্যায়, তাঁহার দোঁহাবলীতে প্রবাহিত। সেইজন্য তাঁহার দোঁহাবলী হৃদয়স্পর্শী—উত্তর পশ্চিমে আদরের ধন, অমূল্য রত্ন, অমৃত-মধুর—ধর্ম্মপিপাসুর শান্তিবারি।

কিন্তু কবীর কেবল জ্ঞানী, কেবল ভক্ত, কেবল গায়ক, কেবল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ছিলেন না। তিনি দয়ার সাগর ছিলেন। সমস্ত গুণই ঔদার্য্যের সহচর—সমস্ত দোষই সঙ্কীর্ণতার সঙ্গী। এক দিনের ঘটনা বলিতেছি। তখন শীতকাল। এক দরিদ্র বৃদ্ধ শীতে কম্পান্বিত-কলেবর। কবীর একখানি বস্ত্র লইয়া বিক্রয় করিতে যাইতেছিলেন। দরিদ্র বৃদ্ধটী কবীরের নিকট বস্ত্রখানি চাহিল। কবীর তৎক্ষণাৎ তাহাকে বস্ত্রখানি দিলেন। দিয়া মনে হইল, আজ গৃহে ত অন্ন নাই। শূন্য হস্তে ফিরিয়া গিয়া মাকে কি দিব? যাহা হউক, আমাদের ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই হইবে, দরিদ্রের শীত নিবারণের ত একটা উপায় হইল। তাহাতেই আমার তৃপ্তি। কবীর গৃহে প্রত্যাগত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার মাতা রন্ধনাদি শেষ করিয়া পুত্রের অপেক্ষা করিতেছেন। কবীর দেখিয়া অবাক! জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা আমাদের ত আজ কিছুই ছিল না, তুমি এ সব সামগ্রী কোথায় পাইলে?"

মা। সে কি বাবা? তুমিই ত লোক দিয়া টাকা পাঠাইয়া দিয়াছ।

কবীর। মা, 'ধন্য' তুমি, ভক্তবৎসল ভগবান স্বয়ং আসিয়া তোমায় অর্থ দিয়া গিয়াছেন। দান কর, মা, দান কর—দীন দুঃখীজনকে মনের সাধে, দুই হাতে, দান কর। ধনে আমাদের কি প্রয়োজন মা?

মাতা তাহাই করিলেন।

কবীর কাশীবাসী সকলেরই ভক্তিভাজন হইলেন। কিন্তু এখনও কবীরের ইন্দ্রিয়সংযমের পরীক্ষা হয় নাই। এক দিন নৃত্য-গীতাদি-নিপুণা নানা-সুখ উপভোগার্থিনী একটী সুন্দরী রমণী তাঁহার আলয়ে আসিয়া স্বীয় ইচ্ছা ব্যক্ত করিল।

কবীর। আমি সুখভোগ জানি না। আমি বা পুরুষ, বা স্ত্রী। আমার নিকট তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না।

রমণী। বড় আশা করিয়া আসিয়াছিলাম, নিরাশ হইয়া অমনি কি ফিরিয়া যাইতে হইবে?

কবীর। না, তা কেন? আমার ঘরে শ্রীহরি আছেন। তুমি তাঁহাকে নৃত্যগীতাদি দ্বারা তুষ্ট করিতে পার।

কবীরের বাড়ীতে বাস করিয়া রমণী প্রত্যহ শ্রীহরিকে ভজন শুনাইতে আরম্ভ করিল। কিছু দিন পরে, কবীরের প্রতি তাহার ভোগ-বাসনা পুনরায় প্রবল হইয়া উঠিল। এক দিন গভীর নিশায়, কবীর যে

ঘরে নিদ্রিত ছিলেন, নিজ বাসনা চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে রমণী সেই ঘরে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়াই দেখিল—কবীর সে ঘরে নাই, সে ঘরে আছেন শ্রীহরি।

রমণীর চক্ষু ফুটিল, কামলিপ্সা তিরোহিত হইল, জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, সংসার পরিত্যাগ করিয়া সেই মুহূর্ত্তেই সে বনবাসিনী হইল—হরিনাম সার করিল। কবীরের পরীক্ষা শেষ হইল, আর সেই সঙ্গে একটী পতিতার উদ্ধার হইল। দৃঢ়নিষ্ঠ, স্থিতপ্রজ্ঞ, কনকোজ্জ্বলচেতা মহাপুরুষ অচল, অটল, অবিচলিত রহিলেন, রিপু-জয়ী মহাত্মার শুভ্রযশঃশৈল অম্বরচুম্বিত রজতগিরিসন্নিভ সমুন্নত, সমুজ্জ্বল দিক্‌দিগন্তব্যাপী হইয়া রহিল—আর সেই সঙ্গে একটী অঙ্গার অগ্নি-সন্নিধানে আসিয়া অগ্নিময় হইয়া গেল, সতের সঙ্গে সৎ হইল। "ক্ষণমপি সজ্জনসঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা" অর্থাৎ ক্ষণকালের জন্যও সাধু সঙ্গই সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র নৌকা-স্বরূপ, এই মহাবাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিল।

বৃদ্ধ বয়সে, ভগ্নস্বাস্থ্যে, ১৫১৮ সালে কবীরের তিরোভাব হয়। মৃত্যুকালে মণিকর্ণিকাঘাটে সকলে তাঁহার সহিত শেষ সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার শবদেহ লইয়া হিন্দু মুসলমানে বিবাদ হয়। যে বস্ত্র দ্বারা শবদেহ আবৃত ছিল, তাহা ঈষৎ উত্তোলন করিলে সকলে দেখিল, শব নাই, কতকগুলি ফুল পড়িয়া রহিয়াছে। তৎকালের কাশীনরেশ মহারাজ বীরসিংহ সেই ফুলের কতকগুলি দাহ করাইলেন। সেই পুষ্পভস্ম যে স্থানে সমাহিত হইল, তাহার নাম কবীর চৌরা। বক্রী ফুলগুলি পাঠানরাজ বিজলি খাঁ গোরক্ষপুরের নিকট কবীরের মৃত্যুভূমি মগরগ্রামে স্থাপন করাইয়া তদুপরি সমাধিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইলেন। শবজনিত বিবাদ থামিল। এমন মধুর বিবাদের কারণ জগতে হইতে পারিয়াছেন কয় জন?

আজি চারিশতাধিক বৎসর অতীত হইল, জলের ন্যায় ভাসিয়া গেল,—কবীরের নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়াছে—প্রাণ মিশিয়া গিয়াছে মহাপ্রাণে, সান্ত মিশিয়া গিয়াছে অনন্তে, জীবাত্মা মিশিয়া গিয়াছে পরমাত্মায়। রূপ গিয়াছে, নাম আছে—কবীর অমর। কবীর হিন্দু নহেন, কবীর মুসলমান নহেন, কোন জাতি বিশেষ নহেন—কবীর সর্ব্বজাতি বহির্ভূত। কবীর হিন্দুর নহেন, কবীর মুসলমানের নহেন, কোন জাতি বিশেষের নহেন—কবীর বিশ্বজগতের। যে ডাকিত কবীর তাহারই, যে না ডাকিবে, কবীর তাহারও। হিন্দু ডাকিয়াছে, কবীর হিন্দুর; মুসলমান ডাকিয়াছে, কবীর মুসলমানের। আর কেহ ডাকিতে চাও ডাকো, কবীর তাহারও। কোহিনুর হিন্দুর ঘর আলোকিত করিয়াছে, মুসলমানের ঘর আলোকিত করিয়াছে, খৃষ্টানের ঘর আলোকিত করিতেছে। কোহিনুরের ধর্ম্মই ঘর আলোকিত করা—যে ঘরেই যাউক না কেন। মন্দিরে আলোক জ্বলিতেছে, মসজিদে আলোক জ্বলিতেছে, গির্জ্জাগৃহে আলোক জ্বলিতেছে। আলোককে জিজ্ঞাসা কর—"আলোক, তুমি কি মন্দিরের, না মসজিদের, না গির্জ্জা ঘরের আলোক?" আলোক বলিবে—"যে আমায় বসাইবে আমি তাহারই, যে আমায় না বসাইবে আমি তাহারও। নাশ ও প্রকাশ করাই আমার ধর্ম্ম। জগতের অন্ধকার নাশ করিয়া, জগৎকে আমি আলোকিত করিয়া থাকি। আমার কাছে ভেদ নাই, সকলেই সমান। আমি কাহাকেও বঞ্চিত করি না,—কেহ আমায় ডাকুক বা না ডাকুক। আপনার কর্ম্ম, আপনার ধর্ম্ম, পালন করিয়া চলিতেছি, অথচ আমি কর্ম্ম ও ধর্ম্মের অতীত।"

কবীর বলিয়াছেন—"আমি পুরুষও নই, স্ত্রীও নই; আমি ধার্ম্মিকও নই, অধার্ম্মিকও নই; আমি বিধি-নিষেধের অতীত; আমি বক্তাও নই, শ্রোতাও নই; আমি প্রভুও নই, ভৃত্যও নই; আমি অধীনও নই, স্বাধীনও নই; আমি বদ্ধও নই, মুক্তও নই; আমি দূরেও নই, কাছেও নই; আমি নরকেও যাইব না; স্বর্গেও যাইবনা; আমি সমস্ত কর্ম্মের কর্ত্তা অথচ অকর্ত্তা; আমি দুর্জ্ঞেয়, কিন্তু যেজন আমায় জানিতে পারে, সে উদাসীন; কবীর কিছুই সংস্থাপিত বা ধ্বংস করিতে চায় না।"

কবীরের এই উক্তি এই অনুভূতি শ্রীমদ্‌শঙ্করাচার্য্য দেবের উক্তির প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে হয়:—

নাহং দেহো জন্মমৃত্যুঃ কুতো মে
নাহং প্রাণঃ ক্ষুৎপিপাসা কুতো মে
নাহং চিত্তং শোকমোহৌ কুতো মে
নাহং কর্ত্তা বন্ধমোক্ষৌ কুতো মে ॥
আত্মষটক।৬।

আমি দেহ নই, সুতরাং আমার জন্মমৃত্যু কোথায়? আমি প্রাণ নই, সুতরাং আমার ক্ষুৎপিপাসা কোথায়? আমি চিত্ত নই, সুতরাং আমার শোক মোহ কোথায়? আমি কর্ত্তা নই, সুতরাং আমার বন্ধন মোক্ষ কোথায়?

ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং
ন মন্ত্রং ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা
চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্॥
ন মে দ্বেষ্ রাগৌ ন মে লোভ মোহৌ
মদো নৈব মে নৈব মে নৈব মাৎসর্য্যভাবঃ
ন ধর্ম্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষ—
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্॥
ন মৃত্যু ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদাঃ
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধু র্ন মিত্রং গুরু র্নৈব শিষ্যঃ—
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্॥
অহং নির্ব্বিকল্পো নিরাকাররূপো
বিভুর্ব্যাপী সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়ানাম।
ন বা বন্ধনং নৈব মুক্তির্ন ভীতি—
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্॥

আমি পুণ্য, পাপ, সুখ, দুঃখ, মন্ত্র, তীর্থ, বেদ, যজ্ঞ, ভোজন, ভোজ্য, ভোক্তা নই, আমি জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ শিব। আমার দ্বেষ, রাগ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যভাব নাই, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ নাই ; আমি চিদানন্দ স্বরূপ শিব। আমার মৃত্যু, শঙ্কা, জাতি-ভেদ, পিতা, মাতা, জন্ম, বন্ধু, মিত্র, গুরু, শিষ্য কিছুই নাই ; আমি চিদানন্দ স্বরূপ শিব। আমি নির্ব্বিকল্প, নিরাকার, সকল ইন্দ্রিয়ের বিভু ও সর্ব্বব্যাপী ; আমার বন্ধন, মুক্তি, ভয় কিছুই নাই ; আমি চিদানন্দস্বরূপ শিব।

এই উক্তি, এই জ্ঞান, এই অনুভূতি যে জাতির, সে জাতিকে আর যাহা ইচ্ছা বল, পৌত্তলিক বা মূর্ত্তি-উপাসক বলিও না। বলিও না যে, হিন্দু নিজ হস্তে মাটীর মূর্ত্তি গড়িয়া তাহাকেই ভগবান ভাবে, তাহারই পূজা করে। শুনিয়া রাখ, জানিয়া রাখ—হিন্দু মূর্ত্তের মধ্যে অমূর্ত্ত, অমূর্ত্তের মধ্যে মূর্ত্তি ; সাকারে নিরাকার, নিরাকারে সাকার দর্শন, অনুভব করিয়া থাকে। মূর্ত্তির আরাধনা অন্তরানুভূতির সোপান মাত্র— হিন্দু কেবল মাটীর মূর্ত্তিকেই ভগবান ভাবে না। শিলা, ধাতু, বৃক্ষলতা, নদনদী, বায়ু অগ্নি, পশু পক্ষী, যাবতীয় ভূত পদার্থ—আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত জড় চৈতন্যময় জগৎ চরাচর হিন্দুর চক্ষে, হিন্দুর জ্ঞানে, হিন্দুর অনুভূতিতে সেই অনন্ত স্রষ্টার অনন্ত রূপ, সেই বিশ্বস্রষ্টার বিশ্ববিভা। মৃন্ময়, ধাতুময়, পাষাণময়, সমস্তই হিন্দুর নিকট চৈতন্যময়, আত্মাময়, ব্রহ্মময়। মৃন্মূর্ত্তি উপাসক ভগবানকে বলিয়া থাকে—ভগবন্! তুমিও নিয়ত মাটীর মূর্ত্তি গড়িতেছ, আমিও প্রত্যহ মাটীর মূর্ত্তি গড়িতেছি। তোমার নির্ম্মিত মূর্ত্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত আছে, আমার নির্ম্মিত মূর্ত্তিতেও প্রাণ প্রতিষ্ঠিত আছে। মূর্ত্তি লইয়া তোমার খেলা, আমারও খেলা। কিন্তু তোমার নির্ম্মিত মূর্ত্তি আর আমার নির্ম্মিত মূর্ত্তিতে প্রভেদ বিস্তর। তোমার নির্ম্মিত মূর্ত্তি অনিত্য, ক্ষণভঙ্গুর, আমার নির্ম্মিত মূর্ত্তি সৎ ও সনাতন, নিত্য ও সচেতন। তোমার নির্ম্মিত মূর্ত্তি কার্য্য, আমার নির্ম্মিত মূর্ত্তি কারণ। তোমার নির্ম্মিত মূর্ত্তি বিকার, আমার নির্ম্মিত মূর্ত্তি স্বরূপ। তোমার নির্ম্মিত মূর্ত্তি বদ্ধ, আমার নির্ম্মিত মূর্ত্তি মুক্ত। তোমার নির্ম্মিত মূর্ত্তি সগুণ, আমার নির্ম্মিত মূর্ত্তি নিগুর্ণ। তোমার নির্ম্মিত মূর্ত্তি দৃশ্য আমার নির্ম্মিত মূর্ত্তি দ্রষ্টা। তোমার নির্ম্মিত মূর্ত্তিকে কেহ জিজ্ঞাসা করে না, আমার নির্ম্মিত মূর্ত্তি জিজ্ঞাস্য, জ্ঞেয়, অজ্ঞেয়, ধ্যেয়, উপাস্য, প্রণম্য। তোমার নির্ম্মিত মূর্ত্তির বাসস্থান সংসার, আমার নির্ম্মিত মূর্ত্তির বাসস্থান হৃদয়। তোমার নির্ম্মিত মূর্ত্তির তুমি নিয়ত সেবা করিয়া থাক "খা-তা" দিয়া, আমার নির্ম্মিত মূর্ত্তির সেবা করিবার উপকরণ আমি খুঁজিয়া পাই না। তোমার নির্ম্মিত মূর্ত্তির নামের কোন গুরুত্ব নাই, আমার নির্ম্মিত মূর্ত্তির নাম মূর্ত্তি অপেক্ষাও কত বড়। তোমার নির্ম্মিত মূর্ত্তি সদা অভাবগ্রস্ত, সুতরাং বিষণ্ণবদন, আমার নির্ম্মিত মূর্ত্তি বিভু, সুতরাং আনন্দ স্বরূপ, বিশ্ব-বিমোহন। কি, অধোবদন যে ? লজ্জা পাইলে নাকি, ভগবন ? তোমারই গুণের কিছু ব্যাখ্যা করিলাম মাত্র। তোমার আবার লজ্জা ? হরি, হরি, তুমি ত নির্লজ্জ। তুমি লজ্জার অতীত। তোমাতে এ সব বিকার কি সম্ভব ? তুমি যে অবিকারী। তাই ঠিক আছে। আমাদের মত বিকারী হইলে, আমাদের যে দশা, তোমারও সেই দশা ঘটিত— দুই এক হইতাম। যাহা হউক, লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই। নিত্য হইতে অনিত্যের উৎপত্তি হয় না, অসম্ভব। আমার নির্ম্মিত মূর্ত্তির সত্তাই তোমার নির্ম্মিত মূর্ত্তির সত্তা। সুতরাং তোমার নির্ম্মিত মূর্ত্তি আর আমার নির্ম্মিত মূর্ত্তি একই—উহাদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নাই।

প্রাচীন কথা-সাহিত্য

ডাক্তার শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম-এ, বি-এল্, পিএইচ-ডি

রাজকুমারী নলিনীর কথা

পূর্ব্বকালে কাশিজনপদের উত্তরে হিমালয়ের পার্শ্বে সাহস্রনী নামে একটী আশ্রম ছিল। সেই আশ্রমে কাশ্যপ নামে একজন ঋষি বাস করিতেন। কাশ্যপ ঋষি এক দিন এক শিলার উপর মূত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই মূত্রে শুক্র মিশ্রিত ছিল। ঋতুমতী একটী হরিণী জলভ্রমে সেই শুক্রমিশ্রিত মূত্র পান করিয়া জিহ্বা দ্বারা যোনিপ্রদেশ লেহন করিল। ঋষির শুক্র হরিণীর উদরে প্রবেশ করাতে হরিণী গর্ভবতী হইল।

কালে হরিণীর একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। মনুষ্যাকৃতি হরিণ-শাবক দেখিয়া ঋষি ধ্যান-যোগে সমস্ত বিষয় জানিতে পারিলেন। অজিনের উপর বালকটীকে লইয়া ঋষি আশ্রমের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। হরিণীও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল। ঋষি সেই বালকের নাভিচ্ছেদন করিয়া তাহার গর্ভমল ধৌত করিলেন। হরিণী আশ্রমের চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিয়া মধ্যে মধ্যে বালকটীকে স্তন্য দান করিত। বালকটী ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। হরিণ-শৃঙ্গের ন্যায় তাহার একটী শৃঙ্গ উঠিয়াছিল বলিয়া ঋষি তাহার নাম রাখিলেন 'এক-শৃঙ্গ'। একশৃঙ্গ হরিণী ও হরিণ-শাবকদিগের সহিত বিচরণ করিয়া যথা সময়ে আশ্রমে ফিরিয়া আসিত। হরিণ, হরিণী ও পক্ষিগণ আশ্রমে তাহার সহিত ক্রীড়া করিত।

ঋষিকুমার একশৃঙ্গ বড় হইয়া আশ্রমে জল-সেচন করিত, আশ্রম সম্মার্জন করিত, এবং ফল মূল, পত্র ও কাষ্ঠ আহরণ করিয়া নানারূপে ঋষির সেবা করিত। অনন্তর মাতৃসেবা করিয়া স্বয়ং আহার করিত। ঋষি তাহাকে ধ্যান ও অভিজ্ঞা মার্গে উপদেশ দিতেন। ঋষিকুমার চতুর্ধ্যান ও পঞ্চাভিজ্ঞা লাভ করিয়া কৌমার ব্রহ্মচারিরূপে সকলের পূজিত হইলেন।

এদিকে বারাণসী নগরে অপুত্রক কাশিরাজ পুত্রলাভের জন্য নানারূপ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র জন্মিল না। কন্যা বড় হইয়াছিল। কাশিরাজ সেই কন্যা নলিনীকে সাহস্রনী আশ্রমের কাশ্যপ ঋষির পুত্র একশৃঙ্গের হস্তে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা

করিয়া রাজপুরোহিতের সহিত কন্যা নলিনীকে সাহপ্লনী আশ্রমে পাঠাইয়া দিলেন।

পুরোহিত নানাপ্রকার সুমিষ্ট ভোজ্য দ্রব্য লইয়া রাজকুমারী নলিনীর সহিত রথে আরোহণ করিয়া সাহপ্লনী আশ্রমের সমীপে উপস্থিত হইলেন। নলিনী সখিগণের সহিত সেই স্থানে নানারূপ ক্রীড়া করিতে লাগিল। তাহাদের আনন্দধ্বনি শুনিয়া মৃগ ও পক্ষিগণ ভয়ে চারিদিকে পলাইয়া গেল। ঋষিকুমার একশৃঙ্গ মৃগগণকে ভীত দেখিয়া কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে নলিনীর সমীপে উপস্থিত হইলেন। সখিগণের সহিত অলঙ্কৃতা মহার্ঘ বস্ত্রশোভিতা নলিনীকে দেখিয়া ঋষিপুত্র বলিলেন, সুন্দর এই সকল ঋষিপুত্র; সুন্দর ইহাদের জটা, সুন্দর ইহাদের অজিন, মেখলা ও কণ্ঠসূত্র। নলিনী ঋষিকুমারকে হস্তে ধারণ করিয়া মোদক ও পানীয় দান করিল। ঋষিকুমার বলিলেন—পরম রমণীয় তোমাদের ফল ও জল। আমাদের আশ্রমে এরূপ নাই। রাজকুমারী ঋষিকুমারকে নিজের রথ দেখাইয়া বলিল—এই আমাদের আশ্রম। আইস, আমরা ইহাতে আরোহণ করিয়া তোমাদের আশ্রমে প্রবেশ করি। ঋষিপুত্র স্বীয় মাতৃসদৃশাকৃতি রথের অশ্বগুলি দেখিয়া রথে আরোহণ করিলেন না। রাজকুমারী ঋষি পুত্রের কণ্ঠলগ্ন হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিলেন। ঋষিপুত্র তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বিস্মিত হইলেন। পরস্পর আলাপে উভয়ের মধ্যে প্রীতির উদ্ভব হইল। ঋষিকুমারকে নানারূপ ভোজ্য ও পানীয় দ্রব্য দ্বারা প্রলুব্ধ করিয়া রাজকুমারী রথারোহণে বারাণসী প্রত্যাগমন করিলেন।

ঋষিপুত্র নিজের আশ্রম প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মন রাজকুমারীর প্রতি আসক্ত হইল। রাজকুমারীর বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ঋষিকুমারের আর আশ্রমের ফলমূলাদি আহরণ ভাল লাগিল না। তিনি কাষ্ঠাহরণ, আশ্রম সম্মার্জন, প্রভৃতি পূর্ব্বাভ্যস্ত কার্য্য ত্যাগ করিলেন। কাশ্যপ ঋষি পুত্রকে চিন্তাপরায়ণ ও আশ্রমকার্য্যবিমুখ দেখিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ঋষিকুমার যথাযথ আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। ঋষি সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া পুত্রকে বুঝাইলেন যে উহারা ঋষিকুমার নহে। উহারা স্ত্রীজাতি। স্ত্রীলোকের সহিত ঋষিদিগের মিত্রতা ভাল নহে। উহারা তপস্যার বিঘ্ন উৎপাদন করে। সর্পের ন্যায়, বিষপত্রের ন্যায় উহাদিগকে ত্যাগ করা উচিত।

এদিকে রাজার আদেশে একটী বৃহৎ নৌকা সুন্দররূপে সজ্জিত করা হইল। নানারূপ পুষ্প ও ফলের বৃক্ষ নৌকার উপর স্থাপিত করা হইল। নৌকাটীকে একটী আশ্রমের ন্যায় দেখাইতে লাগিল। পুরোহিত নলিনীকে লইয়া নৌকায় আরোহণ করিয়া সাহপ্লনী আশ্রমের সমীপে উপস্থিত হইলেন। নলিনী নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন এবং আশ্রমবৃক্ষের ফুল ও পাতা ছিঁড়িতে লাগিলেন। মৃগপক্ষিগণ ত্রাসে শব্দ করিয়া চারিদিকে পলাইতে লাগিল। ঋষিকুমারও সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। রাজকুমারীকে দেখিয়া তাঁহার অত্যন্ত আনন্দ হইল। রাজকুমারী তাঁহাকে দেখিয়া পূর্ব্বের ন্যায় আলিঙ্গন ও চুম্বন করিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় অন্নপানাদির দ্বারা তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করিলেন। তাঁহাকে লইয়া জলচারী আশ্রমে অর্থাৎ নৌকায় প্রবেশ করিলেন। নৌকা যথা সময়ে বারাণসীতে পৌঁছিল। পুরোহিত নলিনীর সহিত ঋষিকুমারের বিবাহ দিলেন। ঋষিপুত্রও রাজকুমারীকে বয়স্য মনে করিয়া তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

ঋষিকুমার রাজকুমারী নলিনীর সহিত নৌকারোহণ করিয়া পুনরায় সাহপ্লনী আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। মৃগী ঋষিকুমারকে জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় গিয়াছিলে? ঋষিপুত্র বলিলেন—আমার এই বয়স্যের সহিত উহাদের আশ্রমে গিয়াছিলাম। আমি সেখানে বয়স্যকে অগ্নি-প্রদক্ষিণ করিয়া পাণি দ্বারা গ্রহণ করিয়াছি। মৃগী সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া মনে করিল—আমার পুত্র, পত্নী ও বয়স্যের ভেদ জানে না। কে উহাকে বুঝাইয়া দিবে—নলিনী তোমার বয়স্য নহে। কাশীরাজকন্যা এখন তোমার ভার্য্যা।

সাহপ্লনী আশ্রমপদের সমীপে গঙ্গাতীরে ব্রহ্মচারিণী তাপসীগণের একটী আশ্রম ছিল। ঋষিকুমার সেই আশ্রমে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে তাপসীরা বাধা দিয়া বলিল—এই আশ্রম স্ত্রীলোকদিগের। তুমি পুরুষ। তোমার এই আশ্রমে প্রবেশ নিষিদ্ধ। ঋষিকুমার স্ত্রী-পুরুষের ভেদ জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা স্ত্রীধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিল যে, নলিনী রাজকন্যা। সে ঋষিপুত্রের বয়স্য নহে, সে রমণী; এখন সে ঋষিকুমারের পত্নী। যখন তাহাদের বিবাহ হইয়াছে তখন পরস্পরকে ত্যাগ করা উচিত নহে।

ব্রহ্মচারিণীদের কথা শুনিয়া ঋষিকুমার রাজকুমারীর সহিত পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রকৃত কথা বলিলেন। কাশ্যপ ঋষি দেখিলেন, উভয়ের মধ্যে প্রীতির উদ্ভব হইয়াছে। অগ্নি সাক্ষী করিয়া বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। অতএব উহাদের আর পৃথক্ থাকা উচিত নহে। তখন ঋষির অনুমতি অনুসারে ঋষিকুমার একশৃঙ্গ, রাজকুমারী নলিনীর সহিত বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। কালে রাজার পরলোক প্রাপ্তি হইলে ঋষিকুমার একশৃঙ্গ বারাণসীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। নলিনীর গর্ভে ক্রমে তাঁহার ৩২টী যমজ পুত্র জন্মিয়াছিল। ধর্ম্মানুসারে রাজ্যপালন করিয়া একশৃঙ্গ কালে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। তপস্যার বলে তিনি চতুর্ধ্যান ও পঞ্চাভিজ্ঞা লাভ করিয়া মৃত্যুর পর ব্রহ্মদেব নিকেতনে গমন করিয়াছিলেন।

পুণ্যবন্ত জাতক

পূর্ব্বকালে কাশিজনপদে বারাণসীনগরে অঞ্জন নামে এক মহা-পরাক্রম রাজা রাজত্ব করিতেন। পুণ্যবন্ত নামে তাঁহার এক পুত্র ছিল। সে সর্ব্বদাই পুণ্যকার্য্যের প্রশংসা করিত। বীর্য্যবন্ত, শিল্পবন্ত, রূপবন্ত ও প্রজ্ঞাবন্ত নামে অমাত্য-পুত্রগণ তাহার বয়স্য

ছিল। তাহারাও যথাক্রমে বীর্য্য, শিল্প, রূপ ও প্রজ্ঞার প্রশংসা করিত।

এই পাঁচজন বন্ধু মিলিয়া, কে লোকের নিকট বিশেষ সমাদর প্রাপ্ত হয় দেখিবার জন্য, কাম্পিল্ল নগরে উপস্থিত হইল। তাহারা স্নানের জন্য গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিল, গঙ্গার স্রোতে একটা কাষ্ঠখণ্ড ভাসিয়া যাইতেছে। বীর্য্যবন্ত নিজের পরাক্রম দেখাইয়া সেই কাষ্ঠখণ্ড টানিয়া তীরে আনিয়া দেখিল, সামান্য কাষ্ঠ নহে, উহা চন্দন কাষ্ঠ। গান্ধিকদিগের নিকট সেই চন্দন কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া সে সহস্র পুরাণ লাভ করিল।

শিল্পবন্ত নিজের শিল্প কৌশল দেখাইতে লাগিল। সে এমন ভাবে বীণা বাজাইতে লাগিল, যে, কাম্পিল্লের লোকেরা তেমন বীণা কখনও শুনে নাই। বীণার একটা তার বাজাইতে বাজাইতে ছিন্ন হইল। বীণা কিন্তু একরূপ ভাবেই বাজিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে ছয়টা তার ছিন্ন হইল। বীণা সেই ভাবেই বাজিতে লাগিল। কাম্পিল্লের লোকেরা বিস্মিত হইয়া বীণা বাদন শুনিতে লাগিল। অবশেষে তাহারা শিল্পবন্তকে প্রচুর সুবর্ণ উপহার প্রদান করিল।

রূপবন্ত পণ্য-বীথিকায় ভ্রমণ করিতেছিল। নগরীর অগ্রগণিকা তাহাকে দেখিয়া তাহার রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাহার নিকট দাসী পাঠাইয়া দিল। অগ্রগণিকা রূপবন্তকে নানারূপে তুষ্ট করিয়া শত সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিল।

এক শ্রেষ্ঠিপুত্র অগ্রগণিকার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে লইয়া যাইতে চাহিল। গণিকা পূর্ব্বেই অপর এক জনের নিকট হইতে সুবর্ণ গ্রহণ করিয়াছিল। তাই সে দিন যাইতে পারিল না। পরদিন প্রত্যুষে শ্রেষ্ঠিপুত্রের নিকট উপস্থিত হইল। শ্রেষ্ঠিপুত্র রাত্রিতে স্বপ্নে তাহার সহিত বিহার করিয়াছে শুনিয়া, গণিকা ঐ স্বপ্ন-বিহারের জন্য সুবর্ণ চাহিয়া বসিল। শ্রেষ্ঠিপুত্র সুবর্ণ দিতে অস্বীকার করায়, উভয়ের মধ্যে বিবাদ বাধিয়া গেল। কিছুতেই সে বিবাদের নিষ্পত্তি হইল না। প্রজ্ঞাবন্ত এরূপ সময়ে সেখানে উপস্থিত হইলে, তাহাকেই মধ্যস্থ স্থির করা হইল। প্রজ্ঞাবন্ত সহস্র সুবর্ণ ও একখানা আয়না (আদর্শ) আনিতে বলিল। এবং আয়নার মধ্যে সুবর্ণের প্রতিবিম্ব দেখাইয়া গণিকাকে তাহা গ্রহণ করিতে বলিল। সকলেই তাহার বিচারে সন্তুষ্ট হইল। অগ্রগণিকা ভগ্নচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। শ্রেষ্ঠিপুত্র সুবিচারের জন্য প্রজ্ঞাবন্তকে প্রভূত সুবর্ণ উপহার দিল।

রাজপুত্র পুণ্যবন্তও অদৃষ্ট পরীক্ষার জন্য বহির্গত হইল। সে রাজপ্রাসাদের সমীপে বিচরণ করিতেছিল। কাম্পিল্লের অমাত্য-পুত্র তাহাকে দেখিয়া স্নেহপরবশ হৃদয়ে নানারূপ পান ভোজন দ্বারা তাহাকে তৃপ্ত করিল। ভোজনাবসানে পুণ্যবন্ত রাজকীয় যানশালায় নিদ্রিত হইয়া পড়িল। এমন সময়ে কাম্পিল্ল রাজকুমারী সেই যানশালায় প্রবেশ করিয়া অমাত্যপুত্রবোধে পুণ্যবন্তের জাগরণ অপেক্ষা করিতে লাগিল। পুণ্যবন্ত সুখে নিদ্রা যাইতেছিল। তাহার পড়িল। সূর্য্যোদয় হইলে অমাত্যগণ দেখিল রাজকুমারী যানশালা হইতে প্রাসাদে ফিরিয়া যাইতেছে। তখন অমাত্যগণ যানশালায় অনুসন্ধান করিয়া পুণ্যবন্তকে নিদ্রিত দেখিয়া রাজা ব্রহ্মদত্তের নিকট লইয়া গেল।

রাজকুমার পুণ্যবন্ত রাজার কাছে নিজের যথার্থ পরিচয় দিয়া সত্য ঘটনা বিবৃত করিল। অমাত্যপুত্র ও রাজকন্যা, তাহার কথারই সমর্থন করিল। তখন কাম্পিল্লরাজ রাজকুমার পুণ্যবন্তের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহার সহিত রাজকন্যার বিবাহ দিলেন। রাজার পুত্র ছিল না। তাই তিনি পুণ্যবন্তকেই তাঁহার সিংহাসনে বসাইলেন। রাজকুমার পুণ্যবন্ত পুণ্যবলে রাজকন্যা ও রাজ্য লাভ করিল।

পদ্মাবতীর কথা

পূর্ব্বকালে হিমালয় সমীপে এক মহারণ্য ছিল। সেই অরণ্যে মাণ্ডব্য ঋষির ফলপুষ্পপত্রযুক্ত মৃগপক্ষিসহস্র-নিষেবিত একটী আশ্রম ছিল। একদা গ্রীষ্মশেষে মাণ্ডব্য ঋষি উপলখণ্ডের উপর সশুক্র মূত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন। ঋতুমতী কোনও মৃগী সেই মূত্র পান করিয়া গর্ভবতী হইল। যথাকালে সেই মৃগী নবনীতপিণ্ড সদৃশ সুন্দরী একটী কন্যা প্রসব করিল। জ্ঞানী ঋষি ধ্যানযোগে সমস্ত জানিতে পারিয়া অজিনে ধারণ করিয়া কন্যাটীকে আশ্রমে লইয়া আসিলেন। মৃগীও সঙ্গে সঙ্গেই আসিল। মৃগীর স্তন্য পান ও ঋষিপ্রদত্ত ফল ভোজন করিয়া কন্যাটী দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যখন কন্যাটী হাঁটিতে শিখিল, তখন তাহার প্রতি পাদক্ষেপে পদ্ম প্রস্ফুটিত হইত। কন্যাটীও সেই সমস্ত পদ্ম লইয়া খেলা করিত। এই জন্য ঋষি তাহার নাম রাখিলেন পদ্মাবতী।

পদ্মাবতী আশ্রম সমীপে মৃগশিশুগণের সহিত বিচরণ ও ক্রীড়া করিত। মৃগী যেখানে যাইত পদ্মাবতীও তাহার সহিত সেই স্থানেই যাইত। আশ্রমে ফিরিয়া আসিলে ঋষি তাহাদিগকে ফলমূলাদি প্রদান করিতেন। পদ্মাবতী মৃগ-শাবকদিগকে ভোজন করাইয়া পরে নিজে আহার করিত। বড় হইয়া পদ্মাবতী আশ্রমের জন্য ফল মূল ও জল আনিত, আশ্রম পরিষ্কার রাখিত। ঋষিকে তেল মাখাইয়া দিত। এবং সর্ব্বদা মৃগ ও পক্ষিগণের সহিত খেলা করিত।

একদিন পদ্মাবতী মৃগ ও পক্ষিগণ পরিবৃত হইয়া জল আনিতে গিয়াছিল। সেই সময়ে কাম্পিল্লের রাজা ব্রহ্মদত্ত মৃগয়া প্রসঙ্গে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। রাজা কৃষ্ণাজিন-পরিহিত উদক-কুম্ভযুক্ত পদ্মহস্ত ঋষিকুমারীকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি ঋষিকুমারীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। পরিচয় জ্ঞাত হইয়া রাজা ঋষিকুমারীর হস্তে "মোদক" দিয়া বলিলেন, আমাদের আশ্রমের ফল খাইয়া দেখ। পদ্মাবতী পূর্ব্বে কখনও মোদক আস্বাদন করে নাই। এখন মোদকের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া বলিল— তোমাদের আশ্রমের ফল অতি সুমিষ্ট। আমাদের আশ্রমের ফল কটু

ভোজন করিতে পারিবে। পদ্মাবতী বলিল, আমি আশ্রমে জল রাখিয়া ঋষির অনুমতি লইয়া আসিতেছি। তখন রাজা তাহার হস্তে আরও মোদক দিয়া বলিলেন, ঋষিকে এই ফল দিয়া বলিও, এইরূপ ফল যাঁহার আশ্রমে আমি তাঁহার ভার্য্যা হইব।

ঋষিকুমারী আশ্রমে আসিয়া ঋষিকে সকল কথা যথাযথ বলিল। ঋষি সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, তুমি কামফল দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়াছ। ঋষিকুমারী মনে করিল, কাম নামক বৃক্ষ-বিশেষের ইহাই ফল। সে সেই ফলই ভোজন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল। বলিল সেই সুন্দরাজিনধারী ঋষিকুমার জলের ধারে মৃগের উপর অপেক্ষা করিতেছেন। ঋষি তখন পদ্মাবতীর সহিত অশ্বারূঢ় রাজা ব্রহ্মদত্তের নিকট উপস্থিত হইয়া পদ্মাবতীকে রাজার হস্তে সম্প্রদান করিলেন। রাজা ব্রহ্মদত্ত ঋষিকে অভিবাদন করিয়া পদ্মাবতীর সহিত অশ্বারোহণে কাম্পিল্ল নগরের দিকে প্রস্থান করিলেন। পথে রাজার সেনাগ্রভাগ উপস্থিত হইল। ব্রহ্মদত্ত অশ্ব পরিত্যাগ করিয়া হস্তীতে আরোহণ করিয়া কাম্পিল্ল নগরে উপস্থিত হইলেন। রাজা পদ্মাবতীর কাছে নগরের অট্টালিকাসমূহ উটজশ্রেণী ও নগরের কোলাহল বন্যপশুর শব্দ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। পদ্মাবতী সমস্তই বিশ্বাস করিল। রাজা পদ্মাবতীর সহিত উদ্যান-গৃহে উপস্থিত হইলেন।

পদ্মাবতী অগ্নিহোত্রের জন্য সমিধাদির প্রার্থনা করিলে, রাজা পুরোহিতকে ডাকাইয়া পদ্মাবতীর সহিত একত্র অগ্নিতে হোম করিলেন। নানালঙ্কার ভূষিতা সুন্দরবস্ত্রপরিহিতা পদ্মাবতীর সহিত রাজা ব্রহ্মদত্তের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইল। অগ্নি প্রদক্ষিণ কালে পদ্মাবতীর প্রতিপাদক্ষেপে পদ্মের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া প্রজাগণ বিস্মিত হইল। রাজা তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন।

কালে পদ্মাবতীর গর্ভ-সঞ্চার হইল। অন্য মহিষীগণ পদ্মাবতীর সমাদর দেখিয়া হিংসা করিতে লাগিল। প্রসবকালে তাহারা তাহার চক্ষু কাপড় দিয়া বাঁধিয়া দিল। যমজ পুত্র প্রসূত হইলে তাহাদিগকে মঞ্জুষা মধ্যে রাখিয়া রাজমুদ্রা চিহ্নিত করিয়া গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিল এবং পদ্মাবতী মুখে গর্ভমল মাখাইয়া দিল। পদ্মাবতী জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল যে দুইটী উদ্বক (ফুল) প্রসূত হইয়াছে। এই বলিয়া তাহারা ফুল দুইটী ফেলিয়া দিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল—দুইটী সন্তান প্রসূত হইয়াছিল। পদ্মাবতী ঐ দুইটীকেই ভক্ষণ করিয়াছে। রাজা মহিষীদের কথা শুনিয়া এবং পদ্মাবতীর মুখে রক্তের দাগ দেখিয়া তাহাকে পিশাচী মনে করিয়া তাহার মৃত্যুদণ্ড ব্যবস্থা করিলেন। মন্ত্রিগণ পদ্মাবতীকে গোপনে গৃহে রাখিয়া রাজাকে জানাইলেন, পদ্মাবতী নিহত হইয়াছে। অন্তঃপুরিকাগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইল। রাজা নানারূপ শান্তি স্বস্ত্যয়ন করাইলেন। অনন্তর মাণ্ডব্য ঋষির আরাধিত কোনও দেবতা দৈববাণী দ্বারা রাজাকে যথার্থ বিষয় জানাইলেন। রাজা অন্তঃ-পুরিকাদিগের নিকট অনুসন্ধান করিয়াও প্রকৃত ঘটনা জানিতে পারিলেন। তাঁহার মন আবার উদ্বিগ্ন হইল।

এদিকে কৈবর্ত্তেরা নদীতে মৎস্য ধরিবার কালে পুত্রদ্বয়পূর্ণ রাজমুদ্রাঙ্কিত মঞ্জুষা পাইয়া রাজার নিকট লইয়া আসিল। রাজাও মঞ্জুষা মধ্যে পুত্রদ্বয় দেখিতে পাইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। মন্ত্রিগণ রাজার এরূপ অবস্থা দেখিয়া সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিল এবং পদ্মাবতীকে গুপ্ত গৃহ হইতে আনিয়া রাজার সমীপে উপস্থিত করিল। রাজা মহা আদরের সহিত পদ্মাবতীকে গ্রহণ করিলেন ও অতীত ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন। পদ্মাবতী সমস্তই কর্ম্মফল মনে করিয়া ঋষির কথা স্মরণ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন।

ভারতীয় লিপির সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

শ্রীপ্রমথভূষণ পালচৌধুরী এম-এ, বি-এল

প্রাচীন ভারতের লিপিশিক্ষা সম্বন্ধে তিনটি মত প্রচলিত আছে। প্রিন্সেপ, সেনার্ট প্রভৃতির মতে ভারত গ্রীকদের নিকট লিপিব্যবহার শিক্ষার জন্য ঋণী। সার উইলিয়ম জোন্সের মতে ভারতীয় লিপি সেমেটীয় লিপিসম্ভূত। সার উইলিয়ম তাঁহার এই মত ১৮০৬ খৃঃ অব্দে প্রচার করেন। তাহার পর অনেক মনীষী তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিয়াছেন; কিন্তু এই ভারতীয় লিপি সেমেটীয় লিপির কোন্ শাখা হইতে উদ্ভূত, এ সম্বন্ধে তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচার করিয়াছেন। বুহ্‌লার, ওয়েবার প্রভৃতির মতে ভারতীয় লিপি প্রাচীন ফিনীসীয় লিপি হইতে জাত। তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে, প্রাচীনতম ভারতীয় অক্ষরাবলি কতিপয় 'আসুরীয় weights এর উপর লিখিত লিপি ও খৃঃ পূঃ সপ্তম ও নবম শতাব্দীর 'মেসা শিলালিপি'-খোদিত লিপির প্রায় অনুরূপ। সেই সময়ের তথাকথিত উত্তর সেমেটীয় অক্ষরের এক-তৃতীয়াংশ অক্ষর প্রাচীনতম ভারতীয় লিপির অবিকল অনুরূপ; অপর তৃতীয়াংশের সহিত ভারতীয় লিপির অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। অবশিষ্ট অক্ষরগুলিও যে একেবারে বিভিন্ন তাহা নহে। টেলর, ডক্টর ডেক প্রভৃতি কিন্তু ভারতীয় লিপির সহিত দক্ষিণ সেমেটীয় লিপির সম্বন্ধ স্থির করেন। রিস্ ডেভিড্‌স্ ভারতীয় লিপির সেমেটীয় উৎপত্তি স্বীকার করিলেও, উপরি-উক্ত দুইটি মতের কোনটিই সমীচীন মনে করেন না। ভারতীয় লোকের যে তৎকালে প্যালেষ্টাইন বা দক্ষিণ আরবের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় ছিল, তাহা তিনি মনে করেন না। তাঁহার মতে ভারতীয় লিপির জন্ম উত্তর বা দক্ষিণ সেমেটীয় লিপি নহে; যে প্রাক্‌সেমেটীয় লিপি হইতে উত্তর বা দক্ষিণ সেমেটীয় লিপি উদ্ভূত, সেই প্রাক্‌সেমেটীয় লিপিই ভারতীয় লিপির জননী। রিস্ ডেভিড্‌স্ দেখাইয়াছেন যে, খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে বা অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে ভারতীয় বণিকগণ ব্যাবিলনের সঙ্গে ব্যবসাসূত্রে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের অধিকাংশই অন্-আর্য্য, দ্রাবিড়-বংশোদ্ভূত; এই ব্যবসায়ীরা ব্যাবিলনে প্রচলিত 'আক্কাডীয়' নামে আদ্য প্রাক্‌সেমেটীয় জাতির ব্যবহৃত লিপি ভারতে আনয়ন করেন।

এই লিপিই বহুবর্ষ পরে ভারতের পরিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া 'ব্রাহ্মীলিপি' নামে পরিচিত হইয়া উঠে। নিজ মত সমর্থনার্থ রিস্ ডেভিড্‌স্ ১৮৯৮ খৃঃ অঃ রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির জার্ণেলে মিঃ কেনেডির প্রচারিত মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। মিঃ কেনেডি লিখিয়াছেন যে, ভারতের সহিত ব্যাবিলনের ব্যবসা সম্বন্ধ খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে পুরামাত্রায় প্রচলিত ছিল। ইহার বেশী পূর্ব্বে যে এরূপ ব্যবসা প্রচলিত থাকা সম্ভব, বা ভারতীয়েরা যে ব্যাবিলন ছাড়াইয়া দেশের আরও ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এ কথা তিনি স্বীকার করেন না।

ভারতীয় লিপি যে ভারতের নিজস্ব আবিষ্কার—ল্যাসেন এ কথা প্রথম প্রচার করেন। কানিংহাম সেই মতকে বেশ পরিপুষ্ট করেন। তাঁহার মতে অশোকীয় লিপি প্রাচীন ভারতের চিত্রলিপিরই পরবর্ত্তী অবস্থা। তাঁহার মতের পোষক প্রাচীন কোন চিত্রলিপিই কিন্তু একাল পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই,—অশোকীয় লিপিতেও প্রাচীন চিত্রলিপির কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। প্রফেসর ভাণ্ডারকর বলেন, ভারতীয় লিপি ভারতের নিজস্ব বটে, কিন্তু ইহার উৎপত্তি প্রাগ্‌ঐতিহাসিক মৃৎশিল্প-খোদিত অক্ষরে।

যাহা হউক, ভারতীয় লিপি যেখান হইতেই উদ্ভূত হউক, ভারত যে খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে লিপি ব্যবহার করিতে জানিত, সে কথা রিস্ ডেভিড্‌স্‌এর সেমেটীয় অক্ষরের সহিত ভারতীয় লিপির তুলনামূলক আলোচনা ব্যতীতও জানিতে পারা যায়। মহারাজ অশোকের শিলালিপিতে ভারতীয় লিপির উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। কোন কোন অক্ষর পাঁচ ছয় আকারে এই লিপিসমূহে ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়। বহু দিন ধরিয়া লিপির ব্যবহার প্রচলিত না থাকিলে, লিপির বহু আকৃতি সম্ভবপর নয়। প্রিয়দর্শী অশোকের পরবর্ত্তী পাঁচ ছয় শত বৎসরের শিলালিপির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে স্বতঃই মনে হয় যে, মহারাজ অশোকের অন্যূন তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতে লিপিব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল।

ভারতীয় সাহিত্য হইতেও লিপিব্যবহারের যুগ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। রিস্ ডেভিড্‌স্ বলেন, সর্ব্বপ্রথম লিপিব্যবহারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় বৌদ্ধ গ্রন্থে। বৌদ্ধ যুগান্তের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে যে ত্রয়োদশটি 'কথোপকথন' আছে, তাহার প্রত্যেকটিতে 'শীলাঃ' নামক পুস্তিকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ সংঘীয়েরা কি কি কার্য্য হইতে বিরত থাকিবেন, তাহার বর্ণনাই এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য। এই সকল নিষিদ্ধ কর্ম্মের মধ্যে 'অক্ষরিকা' ক্রীড়া অন্যতম বলিয়া লিখিত হইয়াছে। 'অক্ষরিকা' অর্থে শূন্যে বা ক্রীড়াসঙ্গীর পৃষ্ঠে অক্ষর লেখা। বালকের ক্রীড়াবর্ণনা প্রসঙ্গে 'অক্ষরিকা' নাম উল্লেখ থাকায়, ইহাও যে বালকের ক্রীড়াবিশেষ, তাহা অনুমিত হয়। এখন কথা এই যে, খুব প্রচলিত না হইলে লিপি-ব্যবহার বালকের ক্রীড়ার মধ্যে স্থান পাইতে পারে না। অতএব লিপির প্রচলন যে ভারতে 'শীলাঃ' পুস্তিকার বহু কাল পূর্ব্বে হইয়াছিল, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। 'শীলাঃ' পুস্তিকা উপরি-উক্ত কথোপকথনের প্রত্যেকটিতে উল্লিখিত হওয়ায়, ইহা যে 'কথোপকথনে'র পূর্ব্বরচিত তাহা বলা বাহুল্য। রিস্ ডেভিড্‌স্ ইহার যুগ নির্দ্দেশ করেন সার্দ্ধ চারিশত খৃষ্টপূর্ব্ব শতাব্দীতে। বৌদ্ধ 'জাতকা'বলি হইতেও জানা যায় যে, লিপির প্রচলন জাতকীয় যুগে খুব বেশী ছিল। সরকারী বে-সরকারী কাগজপত্রের কথা, স্বর্ণপাত্রক্ষোদিত লিপির কথা জাতকে উল্লিখিত হইয়াছে। বৌদ্ধ 'বিনয়পিটকে'ও 'লেখা'র কথা পুনঃ পুনঃ কথিত আছে। প্রফেসর ওল্ডেনবার্গএর মতে 'বিনয়পিটক' খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ষাট বৎসরের পূর্ব্বে রচিত।

ব্রাহ্মণীয় গ্রন্থেও লিপি ব্যবহারের উল্লেখ বিরল নহে। প্রফেসর ভাণ্ডারকর বলেন যে বেদেও লিপিব্যবহারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বেদে 'অক্ষর' প্রভৃতি শব্দ উল্লিখিত আছে। ইয়োরোপীয়েরা কিন্তু এ বিষয়ে বিরুদ্ধমতাবলম্বী। যাহা হউক, লিখিত কাগজ-পত্রের স্পষ্ট উল্লেখ 'বসিষ্ঠ ধর্ম্মসূত্রে' দেখিতে পাওয়া যায়। পাণিনির 'সিদ্ধান্ত-কৌমুদী'তেও লিপির কথা আছে। অধ্যাপক রমেশবাবু বসিষ্ঠ-ধর্ম্মসূত্রের রচনাকাল খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে নির্দ্দেশ করেন। পাণিনির সময় সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। প্রফেসর ভাণ্ডারকর তাঁহাকে খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীর সমসাময়িক বলিয়াছেন।

যাহা হউক, লিপি যে বসিষ্ঠ ধর্ম্মসূত্রের ও পাণিনির বহু কাল পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা এই সকল গ্রন্থ হইতেই জানা যায়। ভারতে লিপি-ব্যবহারের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে এখন আর সন্দেহ করা যায় না।

এখন আর এক কথা। এই যে ভারতে এত প্রাচীন যুগে লিপি-ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল, ভারত তাহা কোন কাযে লাগাইয়াছিল? প্রফেসর ম্যাকডোনেল ও রিস্ ডেভিড্‌স্ উভয়েই বলিয়াছেন যে, লিপির প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে ভারত তাহাকে কোন বৃহৎ গ্রন্থ প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিবার কাযে লাগায় নাই, প্রথম প্রথম লিপির ব্যবহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাদেশ প্রচার প্রভৃতি কাযেই আবদ্ধ ছিল।

রিস্ ডেভিড্‌স্ তাঁহার মত সমর্থনার্থ কতকগুলি যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি কয়েকটির উল্লেখ করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। ডেভিড্‌স্ সাহেবের প্রথম যুক্তি এই যে, আমরা বৌদ্ধ সংঘীয় বিধিনিচয়ে সংঘের ও সংঘভুক্ত সভ্যের সম্পত্তির যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পাই, তাহাতে গৃহস্থালীর সামান্য পাত্র পর্য্যন্ত উল্লিখিত হইলেও, কোথাও কোন পুস্তক বা হস্তলিখিত পুঁথির কথা দেখি না। তখন পুস্তকের প্রচলন থাকিলে নিশ্চয়ই তাহা এই তালিকাভুক্ত হইত। দ্বিতীয় কথা, অনেক পুস্তকে আমরা দেখিতে পাই যে, অনেক মূল সূত্র মুখস্থকারীর স্মৃতিপথে মাত্র বর্ত্তমান। অঙ্গুত্তরে এ বিষয়ের অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। এক স্থানে লিখিত আছে, যে 'ভিক্ষুরা অনেক শিখিয়াছেন, তাঁহারা অপরকে তাহা শিক্ষা দিতে শিথিলতা করিতে পারেন। এইরূপে তাঁহাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অনেক সূত্রান্ত আশ্রয়াভাবে মূল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে।' 'বিনয় পিটকে'ও এ বিষয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এক স্থলে 'বিনয়'

বলিতেছে যে, যদি ভিক্ষুদের কেহ 'পাতিমোক্ষে'র কথা না জানে, তবে সংঘ হইতে কাহাকেও অল্পবয়স্ক দেখিয়া পার্শ্ববর্ত্তী সংঘে তাহা শিক্ষা করিতে পাঠাইয়া দিবে। আর এক স্থানে আছে, যদি কোন ব্যক্তি বৌদ্ধসংঘে সংবাদ প্রেরণ করেন যে, কোন সুত্তান্ত তাঁহার নিকট না শিক্ষা করিলে তাহা চিরদিনের জন্য বিস্মৃতির অতল গর্ভে নিমজ্জিত হইবে, তবে সংঘ হইতে তাঁহার নিকট শ্রমণরা বর্ষাকালে ভ্রমণ করিতে নিষিদ্ধ হইলেও যাইতে পারেন। এ সময় পুস্তকের সমধিক প্রচলন থাকিলে, 'পাতিমোক্ষ' বা 'সুত্তান্ত' শিক্ষা পুস্তক হইতেই হইতে পারিত ; এরূপ লোক প্রেরণের কথা উত্থাপিতই হইত না। রিস্ ডেভিড্স্ আরও অনেক কথা বলিয়াছেন। লিপির ব্যবহার যখন ভারতে প্রথম প্রচলিত হয়, তখন ভারত অসীম জ্ঞানের অধিকারিণী, বেদের প্রভায় তখন ভারতের আকাশ সমুজ্জ্বল ; কিন্তু ভারতের এই সব জ্ঞানরত্ন তখন ভারতীয়েরা 'শ্রুতি' মাত্র অবলম্বনেই শিক্ষা করিত ও রক্ষা করিত তাহাদের স্মৃতির উজ্জ্বল মন্দিরে। যখন লিপির ব্যবহার প্রচলিত হইল, তখনও ভারতীয়েরা সেই সকল জ্ঞানভাণ্ডার পুস্তকের মধ্যে রক্ষা করিতে সাহসী না হইয়া পূর্ব্বমত স্মৃতির মন্দিরেই রাখিয়াছিল। আর সে সময় লেখনী বা লিখিবার দ্রব্য কিছুই সুলভ ছিল না। লেখনীর মধ্যে ছিল লৌহনির্ম্মিত ফলক। লেখা হইত বৃক্ষপত্রে। প্রথমে কালি পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। এইরূপ লেখার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কে আস্থাবান্ হইতে পারেন ? তাহার উপর ব্রাহ্মণেরা পবিত্র মন্ত্রনিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া সাধারণের গোচর করিতে বড়ই অনিচ্ছুক ছিলেন। গৌতম, মনু প্রভৃতি সকলেই শূদ্রের বেদে অনধিকারত্ব প্রচার করিয়াছেন। ব্রাহ্মণেরা তাই লিপি-ব্যবহারকে বেশ আনন্দের সঙ্গে তাঁহাদের বেদ প্রভৃতির রক্ষায় নিযুক্ত করিতে পারেন নাই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে লিপি-ব্যবহারের প্রচলন ভারতে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আর এই প্রভাব বিস্তারে সহায়তা করিয়াছিল সর্ব্বাপেক্ষা বৌদ্ধেরা, কেন না সাধারণ্যে ধর্ম্মপ্রচারই তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। শেষে ব্রাহ্মণেরাও লিপির ব্যবহার আরম্ভ করিয়া বেদ প্রভৃতি রক্ষার জন্য লিপির শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু সে অনেক পরে। বৌদ্ধেরাই এ বিষয়ে অগ্রণী।

ভগ্ন প্রাসাদ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

ফিকে হল্‌দে পালটি ডানার মত মেলে নদীর জলে গতি এঁকে, ঢেউ তুলে নৌকাখানা ছুটে চলেচে। উঁচু তীর ছুটির তরু-পল্লবে, নিবিড় লতাজালে, কচি ধান-মঞ্জরীর গায়ে গায়ে এই পাগলা হাওয়ার হাল্কা সুর। আমি তীর পানে চোখ মেলে "ছইয়ের" ওপর চুপ করে বসে,—পাশে আমার প্রৌঢ় আমীন।

হঠাৎ সামনে দক্ষিণ তীরে চোখ পড়ল—তরু-পুঞ্জের মাঝ থেকে একটা যেন দৈত্যপুরী সন্ধ্যার আকাশ পানে মাথা তুলে দাঁড়িয়েচে।

জিজ্ঞাসা করলুম—"ওই ওটা কোন্ গাঁ ?"

"দিলগঞ্জ—"

"আর ঐ বিরাট বাড়ীখানা ?"

"দিলগঞ্জের জমীদারদের—"

আর একটু কাছে এসে দেখলুম—বাড়ীটার পাঁজরায় পাঁজরায় প্রাচীনত্বের ছাপ ও রেখা,—না জানি তার বুকের মাঝে কত কি ঢাকা। 'রাক্ষসী নদী "পাউড়ী-ভাঙা" তার খানিকটা গ্রাস করে ফেলেচে, বাকিটুকুকেও হয়ত সে রেহাই দেবে না।

কৌতুহল জাগল, জিজ্ঞাসা করলুম—

"দিলগঞ্জ ত আজও আছে,—কিন্তু তার জমীদাররা কোথায়, যে বাড়ীটার এম্‌নি দশা ?—"

এ কথার কোন জবাব না দিয়ে তীর পানে আঙুল তুলে হেঁয়ালির ঢঙে আমীন বল্লে—"ওই যে গাঁয়ের পুব সীমানায় একটা ভিটে পড়ে—চারদিকে আম-কাঁঠালের বন, ঘন জঙ্গল, ঐ ভিটেতে বাস করত গাঁয়ের পুরুত দীন ভটচায। আর ওরই দক্ষিণে ঐ যে দেখচেন বাঁশঝাড়, তার কোলে কয়েকটা ছোট ছোট জীর্ণ কুঁড়ে; ওটা হচ্ছে চাঁড়ালপাড়া, এখন একেবারে শূন্য !"

"কেন ?"

"কেন না ওদের সেরা সেরা যে পাঁচজনের জেল ও আজীবন দ্বীপান্তর-বাসের শাস্তি হয়েছিল, তারা ত আর ফিরলই না,—কেউ কেউ আবার চিরকালের মত বাস উঠিয়েও ভিন্ গাঁয়ে চলে গেছে—"

আমি কিছু জিজ্ঞাসা করবার পূর্ব্বেই সে বলতে লাগল—

"শুনেচি ঐ দিলগঞ্জের জমীদারদের তিন পুরুষে

কারুরই কোন সন্তানের মুখ দেখবার সৌভাগ্য ঘটে নি। পরের ছেলেকে পোষ্য নিয়েই, আর কিছু না করুক, তারা তাদের বিস্তীর্ণ সম্পত্তি ঠেকিয়েচে। কেবল শেষ জমীদার ব্রজমুখুয্যের স্ত্রীর অল্প বয়সে একটী ছেলে হয়েছিল; কিন্তু সেটি বেশী দিন বাঁচে নি। ব্রজমুখুয্যে ছিল অতি-মাত্রায় স্বেচ্ছাচারী; সম্পত্তি ঠেকাবার গরজ তার একটুও ছিল না। তার স্ফূর্ত্তির হাওয়ায় সব সম্পত্তি কর্পূরের মত উবে যাচ্ছিল। ছেলেটি মারা যেতে কিছুকাল বাদে জমীদার-গৃহিনী খালি বুকটা ভরিয়ে তুলতে স্বামীর কাছে তাঁর বোনের একটী ছেলেকে পোষ্য নেবার অনুরোধ করে বস্‌লেন। প্রস্তাবটাকে ব্রজমুখুয্যে প্রথমটা তত আমল না দিলেও, পরে স্ত্রীর অনেক কাকুতি-মিনতিতে সম্মতি না দিয়ে পারলে না। ফলে একটী সুন্দর ও ফুটফুটে বছর আটেকের ছেলে মুখুয্যেদের ঘরে এল। এই ছেলেটির ওপর জমীদার-গৃহিনীর বরাবরই একটা আন্তরিক টান ছিল। তিনিই তার নাম দিয়েছিলেন—মনোজ।

যখনকার কথা বল্‌চি, দীন ভট্‌চায তখন জীবিত। কিন্তু তার একমাত্র সন্তান, মেয়ে পদ্ম যখন পাঁচ বছরের, তখন তিনি মারা যান। প্রতিবেশী চাঁড়ালরা ভট্‌চায পরিবারের অনুগত। দেখা-শোনার লোকাভাবে ভট্‌চায-গিন্নী, তাঁর যা কিছু বাগান জমী ছিল, সবই তাদেরই বন্দোবস্ত করে দিলেন। দীন ভট্‌চাযের মেয়ে পদ্মর চেহারাটি ছিল চমৎকার। লাল্‌চে রঙের ওপর সুগোল হাত পা, কেটে-বসানো মুখখানির কোলে বিদ্যুতের মত হাসির ঝিলিক, আর মিষ্টি স্বভাবটি তাকে সকলের প্রিয় করে তুলেছিল। মেয়েটিকে কোলে করে ভট্‌চায-গিন্নী মাঝে মাঝে জমীদার-বাড়ী বেড়াতে যেতেন। মনোজ আসবার পর থেকেই জমীদার-গৃহিনীর অনুরোধে তাঁর আসা-যাওয়াটা আরও বাড়্‌ল। তাতে ছেলে-মেয়ে দুটির নিঃসঙ্গ দিনগুলি হাসি খেলা, গল্প গান, দুষ্টুমির মধ্যে দিয়ে কেটে যেতে লাগল।

এমনি কোরে সাতটি বছর কেটে গেলে, পদ্ম যখন এগার বছরের—ভট্‌চায-গিন্নী তার বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লেন। দু' একটা সম্বন্ধ এল গেল, কিন্তু তার একটীও তাঁর পছন্দ হল না। এমন সময়ে একদা এক পথ-চল্‌তি গণৎকার গ্রামের মধ্যে দেখা দিলে। সে, পদ্মর হাত দেখে কি রূপ দেখে জানি না, বল্লে—এ মেয়ে রাজরাণী হবে। তার কোষ্ঠির গণনার সঙ্গে কথাটা একেবারে ঠিক ঠিক মিলে গেল। কিন্তু গল্পের রাজা-রাজড়ারা ত বহুকাল-হয়ে-গেছে এদেশ থেকে রাজ্য-পাট উঠিয়ে এই ছাপ-দেওয়া রাজা-বাদশার কালে গল্পের মতই অলীক হয়ে আছেন। তবে সেদিক দিয়ে কথাটা বিশ্বাসযোগ্য না হলেও, মনোজের সঙ্গে পদ্মর গাঢ় সখ্যতা গণনাটিতে বিশ্বাসের কারণ হয়ে উঠ্‌ল। আর তাই যদি না হবে তাহলে এদের—এই নিঃসম্পর্কীয় দুটির, মধ্যে এমন জমাট ভাবই বা কেন? সূতিকাগারে গভীর রাত্রে বসুধার সুপ্তির মাঝে বিধাতা পুরুষের অদৃশ্য হাতখানি যে কথা কটি লিখে রেখে গেছে, তা কি ভুল হতে পারে? কাযেই পদ্ম ও মনোজ এর পর থেকেই ভট্‌চায-গিন্নী এবং জমিদার-গৃহিনী এই উভয়ের কাছে বর-কনে রূপে পরিচিত হতে লাগল। কিন্তু ভট্‌চায-গিন্নী এই পাতানো সম্পর্কটিকে পাকাপাকি করবার দিকে একটুও ঝোঁক দিলেন না। তার একটা কারণ, জমীদার-গৃহিনীর সমীপে প্রস্তাবটি উত্থাপনে তাঁর সাহসের অভাব; অপরটি, যা হবার তা আপনিই হবে, তার জন্যে চেষ্টা শক্তির বাজে-খরচ মাত্র, এই ধারণা।

কিন্তু দু'বৎসরের মধ্যেই জমীদার-গৃহিনীর অকাল-মৃত্যুতে এই ভাবী রাণীটির রাজ্য-লাভ ত দুর্ঘট হয়ে উঠলই, এমন কি, ঘরেও আর তাকে স্নেহ, যত্ন, ভালবাসা দান করার মত কেউ রইল না। সে সারাদিন ভট্‌চায-গিন্নীর বাড়ীতেই কাটাতে সুরু করলে।

পত্নী-বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে ব্রজমুখুয্যের শয়তানিও যেন শতগুণে বেড়ে গেল। তার অত্যাচারে, উৎপীড়নে প্রজারা ক্ষিপ্তপ্রায়। গ্রামের পথে-ঘাটে বধূরা আর জল আন্‌তে কলসী কাঁখে চলে না। যার ঘরে সুন্দরী যুবতী—প্রহরীর মত সারারাত্রি সে জেগে কাটিয়ে দেয়। লোকের মনে স্ফূর্ত্তি নেই, সুখ নেই—চাষ-আবাদে তাদের মন বসে না—যেন কোন্ বর্ব্বর বিদেশীর ভয়ে সকলে সন্ত্রস্ত, পীড়িত। এমনি করে প্রজারা দিনে দিনে দরিদ্র হয়ে পড়তে লাগ্‌ল। একটীর পর একটী করে দোকানপাট, মহাজনী কারবারও বন্ধ হতে লাগল। যারা মায়া কাটাতে পারলে, তারা ভিটে ছেড়েই চলে গেল।

এই অত্যাচার ও অপমানের প্রথম সূত্রপাত ঐ চাঁড়াল-

পাড়ায়। যার একটুও মনুষ্যত্ব আছে, তার পক্ষে এ অপমান ভুলে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। কাজেই চাঁড়ালরা এর প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠল।...

ওদিকে পদ্ম ও মনোজের পাতানো সম্পর্কটি ও তাদের দেহ দুটি দিনে দিনে যে আকারে খাঁজে খাঁজে ফুটে উঠতে লাগল, তাতে দৈবের হাতে সম্বন্ধটা পাকাপাকি করবার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা ভট্‌চায-গিন্নীর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। কেন না, অঘটন ঘটাতে দৈবের মতন পাকা ওস্তাদ এ দুনিয়ায় আর একটিও নেই। তিনি মনস্থ করলেন—হয় এদের মিলনই হোক, অন্যথা এদের দুটিকে দুটি ফুলের মত এক বোঁটা থেকে নির্ম্মম ভাবে ছিঁড়ে দূরে রাখতে হবে। তিনি ব্রজমুখুয্যের কাছে কথাটি উত্থাপন করবার নানান্ জল্পনা করতে লাগলেন।

এক দিন বেলা পড়ে এলে, পদ্ম একলাটি ঘাট থেকে গা ধুয়ে, কলসী কাঁখে হাত দুলিয়ে, জমীদারদের আম-বাগানের মধ্য দিয়ে বাড়ী আস্‌চে। কাছে কিনারে কেউ কোথাও নেই। আনমনে সে চলেছে। কিন্তু সেই পথটা ঘুরে ফিরে একেবারে জমীদারদের অন্দরে চলে গেছে। তবে ইদানীং সেই বাঁকের মুখে আর একটী অস্পষ্ট পথ-রেখা পায়ে পায়ে ফুটে উঠে বাইরে ঘাটের আসল রাস্তাটার গায়ে মিশে গেছে। ঠিক সেই সন্ধিস্থলে এসে সে এক পা বাড়িয়ে বাইরের পথটা যেই ধরতে যাবে, অমনি পিছন থেকে ব্রজমুখুয্যে এসে, তার যে হাতখানি দুলছিল, সেখানিকে চেপে ধরেই, তৎক্ষণাৎ ছেড়ে দিয়ে নিমেষের মধ্যে অন্দরে গা ঢাকা দিলে। পদ্ম ভয়ে চমকে উঠে দেখলে, ব্রজমুখুয্যে চট কোরে সরে গেল, আর সামনে বড় রাস্তাটার ওপর দিয়ে চাঁড়াল পাড়ার বনমালী ও রতন তার দিকে ছুটে আস্‌চে। ব্যাপারটার আগাগোড়া তারা দেখতে পেয়েছিল। কাছে এসে বনমালী বল্লে—"পদ্মঠাকরুণ, কি সর্ব্বনাশটাই এখন হয়েছিল? এই হতভাগাটার বাড়ীর পথে পা দিতে আছে? চল, তোমায় বাড়ী রেখে আসি—"

ভয়ে পদ্মর মুখে কথা ছিল না,—সে নীরবে তাদের সঙ্গে বাড়ী চলে গেল।

পর দিন উঠোনটা রোদে ভরে যেতে না যেতে, লোক মারফতে ভট্‌চায-গিন্নীর জমীদার-বাড়ীতে ডাক পড়ল। পূর্ব্বদিনের ঘটনাটা তাঁর অবিদিত ছিল না। এই আচম্বিৎ ডাকে তাঁর মনে নানান্ দুশ্চিন্তা উঠ্‌তে লাগল। তিনি নারায়ণ স্মরণ করে ভয়ে ভয়ে বাড়ী থেকে বার হলেন।

ভটচায-গিন্নী উপস্থিত হলে ব্রজমুখুয্যেই প্রথমে কথা পাড়ল—"আপনাকে বিশেষ জরুরী কাজে ডেকে পাঠিয়েছি। আমার আত্মীয় স্বজন না থাকাতে নিজেকেই সে কথাটা বলতে হচ্ছে। আমি আবার বিবাহ করব, তার জন্যে পাত্রীও ঠিক,—এখন তার অভিভাবকের মতেরই যা অপেক্ষা—"

কথাটা বুঝলেও ভট্‌চায-গিন্নী ধীর স্বরে বল্লেন—"আমায় তাতে কি করতে হবে?"

"আপনিই ত সব। পদ্মকে বিবাহ করতে হলে আপনারই অনুমতি চাই—"

ক্ষণিক নীরব থেকে ভট্‌চায-গিন্নী বল্লেন—"কিন্তু তাতে একটা মস্ত বাধা আছে—"

"কি?"

"আমার মেয়ের সঙ্গে মনোজ সেই কচি বেলা থেকেই মিলে মিশে আস্‌ছে। এখন তারা বড় হয়েচে, তারা দুজনেই দুজনকে খুব ভালবাসে। আমার এবং তাদেরও ইচ্ছা যে, তাদের দুজনের মিলন হয়। কিন্তু কথাটা আপনার কাছে পাড়বার সুযোগ এত দিন হয়নি বলে, পাড়িনি। আপনি অনুমতি দিলে কাজটা—"

"দেখুন, ওসব হচ্ছে নেহাৎ বাজে কথা। মনোজ আমার ছেলে নয়, গিন্নী তাকে আদর-যত্ন করত এইমাত্র। তাকে এই জমীদারীর এক কণাও আমার দেবার ইচ্ছে নেই। কাযেই এক্ষেত্রে আমার সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ের কি বাধা থাকৃতে পারে?"

"আপনি তাকে ছেলে বলে স্বীকার না করলেও, সে মনে মনে আপনাকে পিতার তুল্যই ভাবে। পদ্মর ভাগ্যে তার সঙ্গে বিয়ে না ঘটলেও, আপনাকে কন্যাদান কিসে সম্ভব?"

"কিসে সম্ভব নয়? আমি বিয়ে করলে, মনোজ যদি তাই ভাবে, তাহলে তাদের মা ছেলের সম্বন্ধ দাঁড়াল। তখনও ওরা দুজনকে ঐ চোখে দেখবে!"

কথাটা শুনে লজ্জায় ভট্‌চায-গিন্নীর মাথাটা নুয়ে পড়ল।

"তা আমার শেষ কথা—যদি আপনি সম্মত থাকেন, কালই বিয়ে হবে—"

"কিন্তু আমার পক্ষে সেটা যে একেবারেই অসম্ভব—এ আমি মা হয়ে পারব না—"

"আচ্ছা, আপনি যেতে পারেন, আমি দেখচি—" বলেই ব্রজ মুখুয্যে দর্পের সঙ্গে অন্য ঘরে উঠে গেল। ভট্‌চায-গিন্নী একটা দারুণ সর্ব্বনাশের আশঙ্কা নিয়ে বাড়ী ফিরে এসে, বনমালীকে ডেকে সব কথা বিবৃত করে বল্লেন—"এখন কি করি বাবা বল? ভয়ে আমার হাত পা সেঁধিয়ে যাচ্ছে—"

বনমালীর চোখে মুখে কেমন একটা নিষ্ঠুর ভাব ফুটে উঠল, গলার স্বরটাও খাটো হয়ে গেল, বল্লে—"মা কালীর দিব্বি,—যদি পদ্মঠাকুরুণের গায়ে হাত পড়ে, তবে আমি ওর মাথা নেবই, নইলে চাঁড়ালের ছেলে নই—"

তার মুখের চেহারায় ও কথায় ভট্‌চায-গিন্নী শিউরে উঠে বল্লেন—"সর্ব্বনাশ! বলিস্ কি?"

"ঠাকরুণ! তুমি ঘরে যাও—" বলে সে চলে গেল। ভট্‌চায-গিন্নী এই নূতন দুর্ভাবনায় আরও অস্থির হয়ে উঠলেন।

বেলা তখন দশ এগারটা—মনোজ ভট্‌চায-বাড়ীতে এসে পদ্মকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বল্লে—"সব কথাই শুনেচ ত?"

"হুঁ—"

"আমি বাঁচবার একটা উপায় ঠাউরেছি।"

"কি?"

"আজই রাত্রে অন্ধকারে নদী পার হয়ে তিনজনেই চলে যাব—"

"কোথায়?"

"আমার মায়ের কাছে—"

"পথেই যদি ধরা পড়ি—?"

"সে ভয় নেই। কিন্তু আজই না গেলে—" কথাটা শেষ না করেই সে কিসের আশঙ্কায় যেন পদ্মর হাতখানা চেপে ধরলে।

কিছুক্ষণ বাদে বল্লে—"চল, তোমার মার সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করিগে—" পদ্ম নিজের মনের অবস্থা ঠিক ভাল মত বুঝে উঠতে পারছিল না,—সে নীরবে মনোজের অনুসরণ করলে।

প্রস্তাবটা শুনে ভট্‌চায-গিন্নী প্রথমটা তেমন সমর্থন না করলেও, সর্ব্বনাশের হাত হতে বাঁচবার এ ভিন্ন আর পথ নেই দেখে, সম্মত হয়ে বল্লেন—"বনমালীকে জানাই, সে কিছুদূর এগিয়ে রেখে আস্‌বে—"

কিছু দরকার নেই—আজ কিছু ঘটবার আশা নেই। সন্ধ্যার দিকে আমি আবার আসব—"বলে সে চলে গেল। মা ও মেয়েতে বুকের ব্যথা চেপে ভিটে ছাড়বার আয়োজন করতে লাগলেন।

সন্ধ্যার দিকে মনোজ এসে জানিয়ে গেল—ঘাটে ছয় দাঁড়ে ডিঙি প্রস্তুত, তার মাঝিমাল্লারা সবাই এক একজন ওস্তাদ লাঠিয়াল, তীরের মত নৌকা চালিয়ে রাত্রির অন্ধকারেই তাদের পাঁচখানা গাঁ পারে নি য় ফেলবে, ভয়ের কোন কারণ নেই।

রাত তখন গভীর। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না, পথ-চিহ্ন সব লুপ্ত। তারার মৃদু আলোয় গাছের তল দিয়ে তিনজনে তারা নিঃশব্দে ও সাবধানে চলেছে। নদী আর দূরে নেই! জলধারার শব্দ যেন কাণে আস্‌চে। তিনজনেই মুক্তির আনন্দে ভরপুর।

হঠাৎ একটা কালো প্রাচীর যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে তাদের ঘিরে ফেললে। সেটা তাদের সামান্য একটু শব্দ করবারও অবসর দিলে না। তাদের বাজের মত ছোঁ দিয়ে নিয়ে অন্ধকারের গায়ে মিলিয়ে গেল।

পর দিন সারা গ্রামখানা চঞ্চল হয়ে উঠল। জমীদার-বাড়ীতেও কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। তার বুকের মধ্যে কি যেন লুকান। ভট্‌চায-গিন্নী, পদ্ম ও মনোজের সহসা অন্তর্দ্ধানের কারণ কেউ খুঁজে পেলে না। ব্যাপারটা আগাগোড়াই যেন হেঁয়ালি!

সেই দিন রাত্রেই পাঁচশ লাঠিয়ালের পাহারার মধ্যে ব্রজ মুখুয্যের সঙ্গে পদ্মর বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের সময় পদ্মর সে কি কান্না! সে কান্না বোধ হয় সেখানে যারা উপস্থিত ছিল সকলকেই কাঁদিয়েছিল--অবশ্য গোপনে।

বিবাহান্তে অনেক রাত্রে, তখনও পদ্ম কাঁদচে, সান্ত্বনা দিতে ব্রজমুখুয্যে তাকে আলিঙ্গন করে তার সিক্ত গালটির ওপর একটু চুম্বন দিতে যেতেই, একখানি খেজুর-

গাছ-কাটা দা এসে ব্রজ মুখুয্যের মাথাটা প্রায় স্কন্ধচ্যুত করে ফেললে। তপ্ত রক্তে পদ্মর লাল চেলি, মুখখানা, মাথার চুলগুলি ছুপিয়ে গেল। সে উন্মাদের মত চীৎকার করে উঠল—"বনমালী, বনমালী—"

বনমালীরা পাঁচজনে যেমনি নিঃশব্দে এসেছিল, ঠিক তেমনিভাবে সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু বাইরের দরজার কাছেতার ধরা পড়ে গেল। অবশেষে বিচারে তাদের আজীবন দ্বীপান্তর বাস ও কারুর কারুর জেলের শাস্তি হল—" আমীন থামল।

জিজ্ঞাসা করলুম—"মনোজ ?"

"কেউ বলে, তাকে মনসাপুরের গভীর জঙ্গলে মেরে পুতে ফেলেচে, কেউ বলে, নদীর জলে সেই রাত্রেই গলায় পাথর বেঁধে ডুবিয়ে মেরেচে। তবে এটা সত্যি যে জমীদার-বাড়ীর বাইরের উঠোনে যে সাদা পাথরখানা পড়ে থাকত, —এরপর থেকে সেটাকে আর দেখ্‌তে পাওয়া যায় নি—

"ভট্‌চায-গিন্নী ও পদ্ম ?"

"তারা সেই রাত্রি থেকেই ঐ বাড়ীতে বাস করতে লাগল। সম্পত্তি সব পাঁচ জনে লুটে পুটে নিলে। বর্ত্তমানে দিলগঞ্জের মালিক "পাউড়ি ভাণ্ডার" দাশেরা। কিছুকাল বাদে ভট্‌চায-গিন্নী মারা গেলে মেয়েটা পাগল হয়ে গেল। ঐ বিশাল ছাদের এককোণে দাঁড়িয়ে সে সারাদিন নদীর পানে চেয়ে থাকত—মনে হ'ত মনোযোগ দিয়ে কি যেন দেখচে, কি যেন খুঁজচে। বহুকাল আগে এই নদী-পথে গভীর রাত্রে যারা আসা-যাওয়া কোরেচে, তারাই শুনেচে, কে যেন তীরে বসে কাঁদচে। সে কান্নার সুর সমুদ্র-কিনারে এক জাতীয় পাখীর উত্তাল তরঙ্গের পানে তাকিয়ে কান্নার মত তীক্ষ্ণ ও করুণ—"

কথাটা শেষ করেই সে যেন কিছু ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ল। আমি ফিরে দেখলুম—পিছনে রাত্রির কালো আঁচলখানি যবনিকার মত পৃথিবীর ওপর খসে পড়েচে, তার গা বেয়ে তারার ম্লান আলোকধারা আর নদীর দুটি কূল ভরে তারই মর্ম্মব্যথা মৃদু বেজে বেজে উঠ্‌চে!

চন্দননগরের আনন্দ উৎসব

শ্রীহরিহর শেঠ

আনন্দ উৎসবের উদ্দেশ্যে চন্দননগরে সাধারণ অনুষ্ঠান সকলের অভাব কখন হয় নাই। অপরাপর নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের তুলনায় এ বিষয়েও চন্দননগরের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। বহুকাল হইতে যে সকল উৎসব ও পূজাদি হইতেছে বা হইত, তাহার মধ্যে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা, শ্রীশ্রীকার্ত্তিক পূজা, শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা, রথ, স্নানযাত্রা, দ্বাদশ-গোপাল, পাঠভাঙ্গা, ঝাঁপান, পৌষ পার্ব্বণ, জন্মাষ্টমী ও রাধাষ্টমীর বাদাই, ফ্যান্তা ও গোস্বামীর ঘাটের মেলা বা খুন্তির মহোৎসব উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন বারোয়ারি পূজা এবং তদুপলক্ষে যাত্রা নাচ তামাসা দ্বারা আমোদ প্রমোদেরও এখানে পূর্ব্বে ব্যবস্থা খুব প্রচুর ছিল। অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে পৌষ পার্ব্বণ উপলক্ষে পূর্ব্বে এখানে বিশেষ ধুম ছিল।

এখানকার শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজার প্রসিদ্ধি যথেষ্ট এবং এরূপ মনোহর সাজে সজ্জিত প্রতিমা অন্যত্র বড় একটা দেখা যায় না। আজকাল গঞ্জে চাউলপটি ও কাপড়ে পটিতে দুইখানি এবং উড়েপাড়ায় একখানি বড় ঠাকুর পূজা হইয়া থাকে। পূর্ব্বে গোয়ালাপাড়া ও দাসপুকুর নামক স্থানে আর দুইখানি প্রকাণ্ড ঠাকুর পূজা হইত। দীঘির ধার নামক স্থানেও মধ্যে কয়েক বৎসর একখানি বড় ঠাকুর হইয়াছিল। উহার প্রধান উদ্যোগী মহেন্দ্রনাথ নন্দীর মৃত্যুর সহিত উহা বন্ধ হইয়া যায়। উক্ত ঠাকুরগুলির মধ্যে চাউলপটি এবং তৎপরে কাপড়ে-পটির পূজা বহু পুরাতন। বাজারে উক্ত ঠাকুরের নামে খরিদদারের নিকট হইতে প্রাপ্ত বৃত্তির টাকা হইতেই প্রধানতঃ পূজাদির ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার আরম্ভ কাল ও প্রতিষ্ঠার আদি কথা অভিবৃদ্ধ

ন্যায়, কাপড়েপটী ঠাকুরের প্রতিষ্ঠাতার নাম শ্রীধর বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি একজন বস্ত্র-ব্যবসায়ী ছিলেন। প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া তিনিই প্রথম এই পূজা আরম্ভ করেন। চাউলপটীর ঠাকুর সম্বন্ধে কেহ কেহ অনুমান করেন, এখানকার লক্ষীগঞ্জ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বা তাহার অল্প পরে উহার প্রতিষ্ঠা হয়।

এই পূজার বিশেষত্ব এই যে, গৃহস্থ সাধারণের পূজার ন্যায় এক দিনের পরিবর্ত্তে দুর্গোৎসবের ন্যায়, সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে তিন দিন পূজা হইয়া থাকে। তিন দিন নাচ গান এবং কাঙ্গালী বিদায় ও ভোজ অনুষ্ঠিত হইয়া অতি সমারোহের সহিত প্রতিমার বিসর্জ্জন হয়। ইহা দেখিবার জন্য গঙ্গার ধারের রাস্তায় স্থানীয় এবং দূরাগত বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীকার্ত্তিক ও শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা সংখ্যায় এখানে অনেক হইয়া থাকে এবং কতকগুলি বারোয়ারির বৃহদায়তন ঠাকুর খুব সুন্দর রূপে সজ্জিত করিয়া ভাসানের দিন বাহির করা হয়। সরস্বতী পূজার সংখ্যা ক্রমেই এখানে বৃদ্ধি পাইতেছে।

চন্দননগর এক্‌সপোজিসনে ফরাসী ভারতের গবর্ণর মসিঁয়ে মার্টিনো ও বাঙ্গলার গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল

হাটখোলার ভুবনেশ্বরী দেবীর পূজাও খুব প্রাচীন। ঠিক কোন্ সময়ে কাহার দ্বারা এবং কিরূপে এই পূজা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। কিংবদন্তী এইরূপ, শিলেটের বিশালাক্ষী দেবীর স্বপ্নাদেশে, এক ব্রাহ্মণ রথের দিন দেবী-মূর্ত্তি গড়িয়া প্রথম পূজা করেন। পূর্ব্বে এই পূজা উপলক্ষে একটি মেলা বসিত এবং এখনকার অপেক্ষা তখন লোক-সমাগম অনেক অধিক হইত। ইঁহার পূজা উপলক্ষ করিয়া এখনও একটি বাৎসরিক উৎসব হইয়া থাকে।

পালপাড়ার পালেদের রাসযাত্রা এবং খলিসানীর বসু মহাশয়দের এবং বোড়র প্রেমনারায়ণ বসু মহাশয়ের দোলযাত্রা উপলক্ষে পূর্ব্বে মহা ধূমধাম হইত। ইহা ব্যক্তি

বিশেষের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলেও, লোকে সাধারণের উৎসব মনে করিয়া উহাতে যোগদান করিত। উক্ত বসু মহাশয়দের দোলযাত্রার উৎসব এখনও সামান্য ভাবে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। পালেদের রাসযাত্রা বহু দিন হইল বন্ধ হইয়া গিয়াছে; সুবৃহৎ সুগঠিত রাসমঞ্চটি এখনও দণ্ডায়মান আছে মাত্র। ইহা ভিন্ন কালীতলা নামক পল্লীতে পূর্ব্বকালে মহা ধুমধামের সহিত দোল উৎসব সম্পন্ন হইত এবং প্রতি বৎসর একটি মেলা বসিত। ইহার প্রাচীনতার কথা কেহই জানেন না। তথায় কারুকার্য্যবিশিষ্ট যে দোলমঞ্চ ছিল, তাহার ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরী মাতা

রথ এখানকার একটি বড় উৎসব। বর্ত্তমানে ছোট বড় রথের সংখ্যা অধিক না থাকিলেও, যাদুঘোষের রথের প্রসিদ্ধি এখনও বহুদূর বিস্তৃত। এক মাহেশ ভিন্ন এতদঞ্চলে এত রথের ধুম আর কোথাও হয় না। যাদু ঘোষ মহাশয় একজন ধার্ম্মিক ও ভক্ত ছিলেন। কথিত আছে, তিনি পুরুষোত্তমে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শনে যাইতেছিলেন। তাঁহার উদ্যানস্থিত নিম্ব বৃক্ষ হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা ও রথ প্রতিষ্ঠার জন্য পথিমধ্যে উপর্য্যুপরি দুই দিন স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া, তিনি আদেশ মত মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া রথ প্রতিষ্ঠা করেন। কিংবদন্তী শুনা যায়, তিনি তাঁহার অর্থের অসচ্ছলতা বশতঃ কিরূপে দেবাদেশ পালন পূর্ব্বক পূজাদির ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন এই চিন্তায় ম্রিয়মাণ হওয়ায়, দেব নির্দ্দেশে স্বপ্নেই অবগত হন, নিম্ববৃক্ষ মূলেই অর্থ প্রোথিত আছে। এই অর্থেই তিনি রথ নির্ম্মাণ করেন এবং ইহা হইতেই তাঁহার সৌভাগ্য সূচিত হয়। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রথ ত্রয়োদশ চূড়া বিশিষ্ট এবং আকারে অতি বৃহৎ ছিল। পুনঃপুনঃ সংস্কারে এক্ষণে তাহার আকার কিছু ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, এবং এক্ষণে ১৩ চূড়ের পরিবর্ত্তে নব-চূড় করা হইয়াছে।

যাদু ঘোষের শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা ও দ্বাদশ গোপালের ধুমও পূর্ব্বে এখানে খুবই ছিল। সোজা রথ হইতে উল্টা রথ পর্য্যন্ত দ্বাদশ গোপালের সময়। পূর্ব্বে এই উপলক্ষে একটি ছোট মেলা বসিত। স্নানযাত্রায় এখনও একটি মেলা বসিয়া থাকে, কিন্তু পূর্ব্বের তুলনায় তাহা এখন সামান্য।

বৃটিশ ভারতে আইনের দ্বারা চড়কের সময় বাণফোঁড়া নিষিদ্ধ হওয়ার পরও অনেক দিন এখানে এই নিষ্ঠুর আমোদ প্রচলিত ছিল। ক্রমে ক্রমে উহা উঠিয়া গেলেও পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও চড়কের যথেষ্ট ধুম ছিল। তখনও বিবিরহাট, গঞ্জ, বারাশত ও পঞ্চাননতলায় চড়কের উৎসব হইত। এখন নামে মাত্র চড়ক পূজা হইয়া থাকে।

পাঠভাঙ্গার অবস্থাও সেই রূপ। শ্রীশ্রীবোড়াইচণ্ডী মাতার মন্দিরের সম্মুখে চৈত্র-সংক্রান্তিতে পূর্ব্বে পাঠভাঙ্গার যথেষ্ট ধুম হইত। তখন দ্বিতলের ছাদ অপেক্ষাও উচ্চ স্থান হইতে সন্ন্যাসীরা পাঠভাঙ্গা করিতেন। এই স্থানে পাঠভাঙ্গার উৎসব এখনও হইয়া থাকে। উহা দেখিবার জন্য অনেক লোকও জড় হয়, কিন্তু ইহার মধ্যে আর বিশেষত্ব কিছু নাই। একটি সামান্য উচ্চ মঞ্চ হইতে এখন পাঠ-ভাঙ্গা হইয়া থাকে। পঞ্চাননতলায় ধর্ম্ম গাজন উপলক্ষে ও দেবী সরকারের বাটীর নিকট পূর্ব্বে কতিপয় বৎসর পাঠভাঙ্গা হইয়াছিল।

ভাদ্র মাসে শ্রীশ্রীমনসা দেবীর পূজা উপলক্ষ করিয়া কলুপুকুর নামক পল্লীতে ঝাঁপান হইয়া থাকে। মালেদের সর্প লইয়া খেলা প্রদর্শন করাই এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ। ইহাতে ভদ্রলোক অপেক্ষা ইতর শ্রেণীর লোকের সমাগম অধিক হইয়া থাকে। পূর্ব্বের তুলনায় ঝাঁপানের আমোদও ক্রমে কমিয়া আসিতেছে।

পৌষ পার্ব্বণ বা পৌষ সংক্রান্তিতে পিঠা-পুলি খাওয়ার ও লোকজনকে খাওয়ানর আনন্দ পল্লীগ্রাম মাত্রেই বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল। এক সময় এ উৎসব বাঙ্গালী মাত্রেই আহ্লাদের সহিত পালন করিত, কিন্তু কাল ক্রমে সে আনন্দ অনেক কমিয়া গিয়াছে। যাহা আছে তাহা বরং সামান্য গৃহস্থ ও অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে; কিন্তু ধনবানদের গৃহে এ সব আমোদ প্রায় নাই বলিলেই হয়। পূর্ব্বে সাধারণ ভাবে চন্দননগরে পৌষ পার্ব্বণ উপলক্ষে বিশেষ ধুমধাম হইত এবং সংকীর্ত্তনের দল নগর পরিভ্রমণে বাহির হইত বলিয়া শুনা যায়।

স্নান যাত্রা

বাদাই বস্তুটি কি ছিল—আজকালের যুবকগণ অনেকে বুঝিতেই পারিবেন না। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চন্দননগরে ইহা একটি বাৎসরিক বিশেষ আমোদ-

উৎসব ছিল। নন্দোৎসবের অঙ্গ স্বরূপ এই উৎসব জন্মাষ্টমীর দিন বহু সম্প্রদায় কর্তৃক পালিত হইত। এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল, সাজসজ্জা করিয়া বিবিধ প্রকার সংএর দল বাহির করিয়া রাস্তায় রাস্তায় পরিভ্রমণ করা। ইহা এক কথায় ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল বা কলিকাতার চৈত্র সংক্রান্তির জেলেপাড়ার সংয়ের ছোট সংস্করণ মাত্র বলা যাইতে পারে।

চন্দননগরে এই উৎসবের আরম্ভ কবে হইয়াছিল, বা ইহা বহু পূর্ব্ব কাল হইতে প্রচলিত ছিল কি না, তাহা জানা যায় না। চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যে বাদাই হইত, তাহাতে সাজসজ্জার বাহুল্য ছিল না; কেবল নন্দ, যশোদা ও শ্রীকৃষ্ণ মাত্র সাজাইয়া একটি দল প্রস্তুত হইত। ক্রমে উহার সহিত হিজড়া, অতিরিক্ত ধোপা ইত্যাদি দুই একটি সং সংযোজিত হয়। তখন এই গীতটী সাধারণতঃ গীত হইত;—

"নন্দের আজ আনন্দ অন্তর
নন্দের কাদা মাখা কলেবর॥
হংস পৃষ্ঠে ব্রহ্মা এল, ঐরাবতে পুরন্দর,
গালে বাজায়ে এল হর॥
(বো বো বোম গালে বাজায়ে এল হর)॥"

ক্রমে দেশে যাত্রার অভিনবত্বে ও থিয়েটারের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধির সহিত লোকের রুচির পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। তখন পুরাতন একঘেয়ে ধরণের সং আর লোকের ভাল লাগিল না। ইংরাজি ১৮৮২ সাল হইতে ইহা নূতন ভাবে এবং সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হয়। এই সময় হইতে ঠাকুর দেবতার পালার সহিত "ভাগের মা গঙ্গা পায় না" "যম পুরি" "চার ইয়ার" "শাশুড়ি বোয়ের দ্বন্দ্ব" প্রভৃতি পালা এবং লহর টপ্পা, ময়ূর পঙ্খী, মাঝি, তূলা ধোনা প্রভৃতির সং কলিকাতা হইতে ভাল ভাল পরিচ্ছদাদি আনাইয়া সজ্জিত হইয়া বাহির হইতে আরম্ভ হয়। এই সময় গানের সহিত বক্তৃতা, কবির গান, নহবৎ, তক্কানামা প্রভৃতি থাকিত। কোন কোন পালার ভিতর দিয়া লোক শিক্ষার উপযোগী ছড়া ও সঙ্গীত গীত হইত। সময় সময় ব্যক্তিগত শ্লেষ বিদ্রুপও গানের মধ্যে থাকিত।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের ১৩৩১ সালের মেলা

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পাঁচ ছয় বৎসর বৈদ্যপাড়া, গোয়াবাগান, ভাকুণ্ডা ও হুগ্লেক্স্‌ পটি এই কয় স্থান হইতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়া মহাসমারোহের সহিত বাদাই হইত। প্রত্যেক সম্প্রদায় ৫।৭ দলে বিভক্ত হইয়া বাহির হইত। শ্রীকৃষ্ণের জন্মোপলক্ষে ব্রতানুষ্ঠান হিসাবেই বাদাইয়ের প্রথম উৎপত্তি হইলেও, ক্রমে বিভিন্ন পল্লী হইতে বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হইয়া জেদাজেদি ও রেষারেষিতে ভিন্নাকার ধারণ করিল। এবং কবি হাফ আখড়াইয়ের দলের ন্যায় এক পাড়ার সহিত অপর পাড়ার উত্তর

ফ্যান্সা

প্রত্যুত্তর সুরু হইয়া শেষে কুৎসা প্রচার আরম্ভ হইল। ইহার মধ্যে ব্যক্তিগত শ্লেষ এবং সামাজিক কুপ্রথা লক্ষ্য করিয়া অনেক সময় অনেক গীত রচিত হইত। সমাজের দুর্নীতি সংস্কার ও বিশিষ্ট লোকেদের বা সাধারণের চরিত্র সংশোধনের জন্য পাড়ার মধ্যে কেহ কেহ সমস্ত বৎসর একখানি পল্লীর লোকের সব বিশেষ বিশেষ দোষ লিখিয়া রাখিত। গান বাঁধিয়া পরে ঐ সম্বন্ধে বৎসরান্তে বাদাইয়ের দিনের সহিত তাহা গীত হইত। শুনা যায়, এই ব্যাপার শেষে আদালত পর্য্যন্ত গড়াইয়াছিল।

ইহার পর সামান্য ভাবে কয়েক বৎসর উৎসব হইয়াছিল। ২০।২৫ বৎসর হইতে এখানে বাদাই আর হয় না। যাঁহাদের উদ্যোগে এই সকল দল সৃষ্ট হইত, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের মৃত্যুর সহিত ইহা বিলুপ্ত হয়। নিকটবর্ত্তী স্থানের মধ্যে ভদ্রেশ্বর ও নবাবগঞ্জে বাদাইয়ের খুব ধুম হইত। কিন্তু চন্দননগরের মত সমারোহ এ প্রদেশে কোথাও হইত না। এখানে অনেক দূর, এমন কি কলিকাতা, হইতেও লোকে দেখিতে আসিত। শেষ সময়ে ইহার উদ্যোগিবর্গের মধ্যে ৺অম্বিকাচরণ নন্দী, ৺অম্বিকাচরণ দে, ৺ননিলাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীগোপালচন্দ্র নাগ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। *

জন্মাষ্টমীর বাদাইয়ের ধুম যখন হ্রাস হইয়া আসিয়াছে, সেই সময় বিবিরহাট নামক স্থান হইতে স্বর্গীয় রসিকলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উদ্যোগে এবং শ্রীমতিলাল পলশাই মহাশয়ের সহায়তায় চারি পাঁচ বৎসরের জন্য

* ৺অম্বিকাচরণ দে মহাশয়ের অপ্রকাশিত বিবরণ হইতে প্রধানতঃ ইহা সংগৃহীত হইল।

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমীর দিন বাদাই বাহির হইয়াছিল। ইহার গীতাদি প্রধানতঃ শ্রীরাধা বিষয়ক হইলেও, ইহার সহিত নূতন পাঁজি, তূলা ধোনা, দাই, হিজড়া, নাপিত, নাপিতানি প্রভৃতি সং বাহির হইত। †

নিম্নে জন্মাষ্টমীর কয়েকখানি গীত উদ্ধৃত করিয়া ইহার কথা শেষ করিতেছি।—

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বের গান।

"ইহলোক পরলোক ত্রিলোকেতে পূজে যায়,
গোলোক পরিহরি হরি ভূলোকেতে শোভা পায়।
ঐ শিশু হেরি গোপগণে (তারা) সবাই ভাবে মনে মনে।
বুঝি গোলোকপতি বালক-রূপে উদয় গোপনে ॥
(মনে জ্ঞান হয় গো)
কেহ বলে নন্দের কিবা সাধ্য ঐ সাধিলে গো কি অসাধ্য ;
দেখ দেবারাধ্য আবদ্ধ আজ তব নিকেতনে ॥
(গোপ শিশু ছলে হে)
কেহ ভুলিয়া বিষ্ণু মায়াতে, দেখ পদধূলি লয়ে হাতে
দিতেছে ঐ কৃষ্ণের মাথে উল্লসিত মনে ॥
(জীও জীও বলেরে)

গোস্বামী ঘাটের খুন্তীর মহোৎসব

ধন্য গো মা নন্দরাণী ধন্য পুণ্য করেছিলে ;
পূর্ণ ব্রহ্ম অবতীর্ণ আজি তব পুণ্য ফলে।
ব্রহ্মাণ্ডের পতি যিনি ডাকিবেন মা-মা বলে
অবহেলে পেলে মাগো ভব তরিবার উপায় ॥"

একখানি অতি প্রাচীন গান।

"(আজি) আনন্দের অবধি নাহি শ্রীনন্দ ভবনে
নাচে প্রেমানন্দে উপানন্দ শ্রীনন্দের সনে ॥

"ভাগের মা গঙ্গা পায় না"র একটি গীত,—

"যমের বাড়িতে তোমরা চল শীঘ্র চলরে।
এমন করে এ সংসারে বেঁচে কি ফল বলরে ॥
জননীকে দিসনে খেতে, জন্মেছিলি কোথা হতে,
সোনার বাউটি বেশ্যার হাতে, মরণ কেন না হ'লরে ॥
শ্বেত চামরের বাতাস দিয়ে, দিচ্চে তোদের ভূত ঝাড়িয়ে,
যেমন কুকুর মুগুর খেয়ে হ'স যদি তায় ভালরে ॥"

"চার ইয়ারের" একটি ছড়া,—

১ম—"আমি হিন্দুয়ানির অন্তর্জ্জলি এবার করেছি।
২য়—বামুন ভোজনের দফায় শূন্য দিয়েছি !

---

† শ্রীযুক্ত মতিলাল পলশাই মহাশয়ের নিকট হইতে শ্রীশ্রী-রাধাষ্টমীর বাদাইয়ের কথা অবগত হই।

৩য়—আমি দীক্ষা ছেড়ে ব্রাহ্ম হয়েছি !
উঃ ৪র্থ—এখন পড়েছে যে বিষম কাল
উল্টা ধারা হ'ল যে বাহাল,
হায় হায় এমনি মজার কলিকাল ॥"
ইত্যাদি—*

রাধাষ্টমীর বাদাইয়ের একটি গীতের অংশ,—
আমরা যাই চল ভাই রাজভবনে দেখতে উৎসবো।
হেরে সুখার্ণবে ভাসিবো ॥

যাদু ঘোষের রথ

হয়েছে রাজার সুতা, সর্ব্ব সুলক্ষণযুতা।
শুনিলাম সে রূপের কথা অতি অসম্ভবো ॥
* * * *"

ফ্যাস্তা ফরাসী প্রজাতন্ত্রের একটি জাতীয় বাৎসরিক উৎসব। ফরাসী ফেত্ কথা হইতে এই নামের উৎপত্তি। ফরাসীতে উহাকে Fete National বলে। প্রতি বৎসর ১৪ই জুলাই গভর্ণমেণ্ট ও স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি কর্ত্তৃক ম্যারের কর্ত্তৃত্বে উহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বাস্তিল (Bastile) নামক দুর্গ ধ্বংস করিয়া, ফরাসী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিনটি স্মরণীয় করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার আরম্ভ কাল দ্বিতীয়বার প্রজাতন্ত্র স্থাপনের পর। তোপদাগা, বাজি পোড়ান, বিবিধ ক্রীড়া-কৌতুক, নৌকার বাচখেলা, সরকারি স্থান সকল সজ্জিত করা এবং দীন দুঃখীদের দান করাই উৎসবের প্রধান অঙ্গ।

এই উৎসব আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে, যখন ফ্রান্সে রাজা ছিলেন, তখন তাঁহার জন্মদিন উপলক্ষ করিয়া প্রতি বৎসর ১৫ই আগষ্ট ফেত্ দে রোয়া (Fete du Roi) নামে এখানে আর একটি ফ্যাস্তা হইত। উহা ঠিক এখনকার ফ্যাস্তারই অনুরূপ একটি জাতীয় উৎসব ছিল। এখনকার মত তখনও পূর্ব্বের দিন সন্ধ্যায় এবং উৎসবের দিন প্রাতে ২১টি করিয়া তোপ পড়িত। রোসনাই, বাজি পোড়ান সবই হইত। অধিকন্তু তৎকালীন রাজ-আইনে ঐ দিনে এখানকার অন্য যাহা কিছু উৎসব সমুদায় বন্ধ রাখিতে হইত।

গোস্বামীঘাটের মেলা এখানকার একটি বাৎসরিক উৎসব। ইহার অপর নাম শ্রীশ্রীখুন্তীর মহোৎসব। উহা অগ্রহায়ণী পূর্ণিমার দিন আরম্ভ হইয়া এক পক্ষ কাল অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উহার উৎপত্তি সম্বন্ধে কথিত আছে, প্রায় চারি শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীনিমাই পণ্ডিতের আবির্ভাবে যখন শ্রীনবদ্বীপধাম হরিনামের বন্যায় প্লাবিত হয়, তখন তান্ত্রিকগণের অনাচার-স্রোত ক্রমে মন্দীভূত হইতে থাকে। সেই সময় তান্ত্রিক যাজকগণ মহাপ্রভুর কার্য্যে বাধা প্রদান করিবার জন্য কাজীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রথম প্রথম কাজী শ্রীগৌরাঙ্গদেবের হরিনাম সংকীর্ত্তনের দ্বারা নাম প্রচারে বাধা দেন। কিন্তু পরে তাঁহার উপদেশ প্রভাবে দ্রবীভূত হইয়া কাজী তাঁহার চরণে আত্ম-সমর্পণ করেন; এবং যাহাতে তাঁহার হরিনাম প্রচার কার্য্যে কেহ বাধা প্রদান করিতে না পারে, সে জন্য সম্রাট আকবর শাহের নাম স্বাক্ষরিত একখানি তাম্রলিপি শ্রীনিমাইকে দান করেন। উহা দেখিতে কতটা খুন্তীর মত ছিল বলিয়া লোকে উহাকে খুন্তী বলিয়া জানিত। এই হইতে সংকীর্ত্তনের দলের সহিত ঐ খুন্তীর অনুরূপ খুন্তী লইয়া ভ্রমণ প্রচলিত হয়।

* গীতগুলি ৺অম্বিকাচরণ দে মহাশয়ের লেখা হইতে পাইয়াছি।

এই সময় নবদ্বীপের শ্রীজগদীশ পণ্ডিত নামক একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত একখানি তাম্রলিপি করাইয়া লইয়াছিলেন। চন্দননগর গোস্বামীঘাটের বর্ত্তমান গোস্বামী মহাশয়দিগের আদিপুরুষ, শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী মহাশয় শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। তিনি পরে পণ্ডিতের নিকট হইতে খুন্তীখানি প্রাপ্ত হন। শ্রীরঘুনাথ একজন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের বংশধর শ্রীবীরভদ্র প্রভুর সহিত এই খুন্তীর ব্যবহার লইয়া খড়দহ গ্রামে তাঁহার বাদানুবাদ হয়; এবং ৯১০ সালের অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে তিনি উহা ভাগীরথী গর্ভে নিক্ষেপ করেন। এই খুন্তী অবিলম্বে উজান বাহিয়া এই স্থানে ভাসিয়া আইসে। সেই দিন হইতে অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমায় এই খুন্তীর পূজা আরম্ভ হয় এবং তদবধি এই স্থানের নাম শ্রীজগদীশ তীর্থ বলিয়া খ্যাত হয়। প্রথম প্রথম গোস্বামীগণের আদিদেবতা শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জীউর মন্দির-প্রাঙ্গণে সামান্য ভাবে মহোৎসবাদি হইত। পরে প্রধানতঃ স্বর্গীয় রাজেন্দ্রনাথ গোস্বামী, স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ গোস্বামী মহাশয়দিগের উদ্যোগে এবং বহু লোকের সহায়তায় ১২৯২ সাল হইতে শ্রীশ্রীখুন্তীর মহোৎসব নামে এই অগ্রহায়ণী মেলা সমারোহের সহিত আরম্ভ হইয়া প্রতি বৎসর নিয়মিত ভাবে হইয়া আসিতেছে। *

অন্যরূপ বিবরণ হইতে জানা যায়—পূর্ব্বকালে গোস্বামীদিগের পূর্ব্বপুরুষ আউল নামক একজন বৃদ্ধ তাঁহার জন্মস্থান মালপাড়া হইতে প্রত্যহ পদব্রজে গঙ্গাস্নান করিতে আসিতেন। কথিত আছে, তাঁহার আরাধ্য দেবতা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউ, তাঁহার প্রত্যহ দীর্ঘ-পথ-ভ্রমণ-জনিত শ্রান্তি প্রশমনার্থ তাঁহাকে স্বপ্নে জ্ঞাত করেন যে, গঙ্গার পরপারে ক্ষীরপাড়া পুষ্করিণীতে তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি লুকাইত আছে; এবং তাহা উঠাইয়া আনিয়া গঙ্গাতীরে প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবাদির ব্যবস্থা করিতে আদেশ করেন। তখন গোস্বামীজী সেই দেবমূর্ত্তি আনয়ন পূর্ব্বক এখানে প্রতিষ্ঠা করিয়া এই স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করেন। মেলার প্রথম হইতেই এই শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীউকে মঞ্চোপরি স্থাপিত করিয়া উৎসব হইতেছে। পরে বহু দিবসাবধি শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজীউকে ও শ্রীশ্রীগোপালজীউকেও উৎসব ক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হইত। পরে গৃহবিচ্ছেদের ফলে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রমোহন গোস্বামী কয়েক বৎসর ধরিয়া যখন স্বতন্ত্র

রথ যাত্রা

* শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ গোস্বামী মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে এই বিবরণী প্রেরণ করেন।

আর একটি মেলা করেন, তখন শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজীউ তথায় বিরাজ করিতেন ; এবং তদবধি পুরাতন মেলায় শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দজীই প্রতি বৎসর বিরাজ করিয়া থাকেন। † এ বৎসরও পুরাতন মেলার উত্তর দিকে নূতন মেলা হইয়াছিল। করা হয় ; এবং পুতুলের নাচ, যাত্রা, থিয়েটার, বায়স্কোপ প্রভৃতির অভাব থাকে না। কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে বহু দোকান-পত্র আসিয়া থাকে। পঞ্জিকার পৃষ্ঠায় এই মেলার কথার উল্লেখ দেখা যায়।

শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী-প্রতিমা

এ বৎসর গোস্বামীঘাটে চন্দননগরের প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের উদ্যোগে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন হইতে পনর দিন ব্যাপী এক মেলা ও প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ইহার মধ্যে বিশেষত্বের অভাব ছিল না। দক্ষিণেশ্বর হইতে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত ভাগীরথীর উভয় পার্শ্বের গ্রাম সকলের ধর্ম্ম, সাহিত্য, শিক্ষা, শিল্প প্রভৃতি দেখাইবার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছিল। চন্দননগরের দ্রষ্টব্য ও জ্ঞাতব্য বিষয় দেখাইবার ও জানাইবার জন্য একটু বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল। নরনারীদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জন্য যোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করিতে কর্ত্তৃপক্ষ চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। এই নব অনুষ্ঠানে অনেকগুলি স্বদেশী দ্রব্যের দোকান আসিয়াছিল এবং লোক-সমাগম যথেষ্ট হইয়াছিল।

চন্দননগরে ইতঃপূর্ব্বে ১৩১৬ ও ১৩২২ সালে আর দুইটি উৎসব ও প্রদর্শনী হইয়াছিল। প্রথমটির নাম সারস্বত উৎসব।

চন্দননগরের এই মেলার নাম বহুদূর পর্য্যন্ত খ্যাত। ইহাতে বহু প্রকার মাটির সঙ, পৌরাণিক ও বিবিধ শিক্ষণীয় দৃশ্যাদির সমাবেশ ও মেলাক্ষেত্র সাজসজ্জায় সজ্জিত

সারস্বত সম্প্রদায় ও কতিপয় স্থানীয় ভদ্রলোকের চেষ্টায় ১৩১৬ সালের শ্রীপঞ্চমীর সময় ৺নকুড়চন্দ্র কর মহাশয়ের বাগবাজারস্থ বাগানবাড়ীতে কলাবিদ্যাধিষ্ঠাত্রী, জ্ঞানবিদ্যাদায়িনী বাগ্‌দেবীর পূজা উপলক্ষ করিয়া ইহা অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে বিবিধ বিষয়, স্থানীয় শিল্পিগণের হস্ত-

† ৺রাজেন্দ্রনাথ গোস্বামী মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত তুলসীদাস গোস্বামীর [illegible]

প্রস্তুত বহু দ্রব্য, মহিলাবৃন্দের স্বহস্তচরিত কারুকার্য্য, স্থানীয় সাহিত্যিকগণের হস্তলিখিত ও প্রকাশিত পুস্তকাবলী, পুরাতন দলিলাদি এবং প্রসিদ্ধ স্থানসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী ও চিত্রাদি এবং অন্যান্য বহু চিত্র প্রভৃতি সংগৃহীত হইয়া একটি অভিনব ধরণের চিত্তাকর্ষক প্রদর্শনীর সৃষ্টি হইয়াছিল। এখানে এমন অনেক শিল্পীর হস্ত-প্রস্তুত সুন্দর শিল্পসম্ভার সংগৃহীত হইয়াছিল, যাঁহাদের কথা পূর্ব্বে অনেকের জানাই ছিল না। সুভাব, সুনির্ম্মিত প্রতিমা সান্নিধ্যে, সুচারুরূপে সজ্জিত,—বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, মধুসূদন প্রভৃতির সুগঠিত মৃন্মূর্ত্তি শোভিত মণ্ডপে বহুবিধ উৎসব আনন্দের এবং সঙ্গীত ও শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতাদির অভাব ছিল না। সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর সঙ্গীতাচার্য্য স্বর্গীয় বসন্তকুমার মিত্র মহোদয় 'কলাবিদ্যার আবশ্যকতা' সম্বন্ধে একটি জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় মহাশয় একটি তথ্যপূর্ণ বক্তৃতায় এখানকার সাহিত্য, শিল্পসাধনা, ঐতিহাসিক বিশেষত্ব প্রভৃতির কথা বিশদ ভাবে বলিয়াছিলেন।

এই উৎসব-ক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য কোন মূল্য লওয়া হয় নাই। উহা সপ্তাহ কাল খোলা ছিল। এই অভিনব, বিশিষ্টতাপূর্ণ সারস্বত উৎসবের কথা চন্দননগরবাসীর হৃদয়ে বহু দিন জাগরিত থাকিবে। ইহার মধ্যে প্রাণের পরিচয় ছিল। এ প্রদেশে এ ভাবের উৎসব করিবার বোধ হয় ইহাই প্রথম প্রচেষ্টা। এই অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন শ্রীযুত চারুচন্দ্র রায় ও শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র ঘোষ। তৎপরে শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র দে, মতিলাল রায়, নারায়ণচন্দ্র দে, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ও নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও উল্লেখযোগ্য। এ কার্য্যের জন্য যাঁহারা অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম অপ্রকাশিত আছে। ইহার মধ্যে একজন ৫।৬ শত টাকা ও একজন ৭০৲-৭৫৲ টাকা দিয়াছিলেন। আরও কতিপয় ব্যক্তি কিছু কিছু সাহায্য করিয়াছিলেন। *

বড় বড় সহরের বড় বড় প্রদর্শনীর তুলনায় ১৩২২ সালের চন্দননগর প্রদর্শনী অকিঞ্চিৎকর হইলেও, চন্দননগরের ইতিহাসে ইহা উল্লিখিত থাকিবার যোগ্য। ইয়োরোপের বিগত মহাযুদ্ধে আহত সৈনিকদিগের সাহায্য কল্পে অর্থ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে তদানীন্তন এড্‌মিনিষ্ট্রেটর মসিয়ে ভ্যাঁসার (Mons. C. Vincent) পৃষ্ঠপোষকতায় স্যার শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ১৩২২ সালের শীতকালে ডুপ্লে কলেজ ভবনে এই প্রদর্শনী ও উৎসব হইয়াছিল। ইহাতে কেবল যে কলিকাতার প্রসিদ্ধ

মাইকেল মধুসূদনের মৃন্মূর্ত্তি

দেশীয় ও বিদেশীয় ব্যবসায়ী ও কারখানাওয়ালারাই তাঁহাদের দ্রব্যাদি প্রদর্শন ও বিক্রয়ার্থ আনিয়াছিলেন, তাহা নহে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহুবিধ স্বদেশজাত দ্রব্য আসিয়াছিল। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত যামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ন্যায় জগৎ-প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পীর অঙ্কিত চিত্র এবং ঢাকা, কৃষ্ণনগর, বেনারস, কাশ্মীর, জয়পুর, মীর্জ্জাপুর, মোরাদাবাদ, কানপুর, খাগড়া প্রভৃতি

* ৫ই ফাল্গুনের "মাতৃভূমি" হইতে ইহার কোন কোন বিবরণ

দ্রব্য সমূহ আসিয়া ইহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিল। স্থানীয় শিল্পীদের প্রস্তুত দ্রব্যাদি, মহিলাদের নির্ম্মিত চারু শিল্প, কনভেণ্টের মেয়েদের তৈয়ারি বিবিধ কারুকার্য্য প্রভৃতিতেও ইহা শোভিত হইয়াছিল। মেশিন্ গান্, শেল্, শ্রাপ্নেল্, ও অন্যান্য বহু প্রকার যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ ও স্থানীয় পুলিশ কমিশনর মসিয়ে পোমের (Mons. Pomes) রচিত মৃত্তিকাদি নির্ম্মিত যুদ্ধক্ষেত্রের অপূর্ব্ব পরিখাদির আদর্শ, রাজপুতানার বহু পুরাতন ঐতিহাসিক স্মরণ-চিহ্ন প্রভৃতিতে এই প্রদর্শনীর বিশেষত্ব সূচিত হইয়াছিল। উৎসবের অঙ্গ স্বরূপ যাত্রা, থিয়েটার, ম্যাজিক্, বল্ নাচ, বায়স্কোপ্ প্রভৃতিরও অভাব ছিল না।

এই প্রদর্শনী খুলিয়া অর্থ-সংগ্রহের প্রথম প্রস্তাব করিয়াছিলেন তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি মসিয়ে দেলরিয়ে (M. Delrieu)। ইহার সাফল্যের জন্য স্থানীয় ভদ্রলোক, বিশিষ্ট ফরাসী কর্ম্মচারী ও গোন্দলপাড়া জুট মিলের ডিরেক্টর প্রভৃতি কুড়িজনকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছিল। তাহার সভাপতি ছিলেন ম্যার, সহকারী সভাপতি হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বসু, এবং শ্রীযুক্ত সাধুচরণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদক হইয়াছিলেন। প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছিলেন কলিকাতার ফরাসী কন্সুল মসিয়ে শার্ল্ বারে (Mons. Charles Barret)। ফরাসী ভারতের তদানীন্তন গভর্ণর মসিয়ে মার্টিনো (Mons. Martineau) ও তদানীন্তন বাঙ্গলার গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল নিমন্ত্রিত হইয়া এই প্রদর্শনী দেখিতে আসিয়াছিলেন।

বিবিধ স্বদেশজাত দ্রব্যসম্ভারে সুসজ্জিত, পুষ্পপল্লব-পতাকা ও বিজলী আলোকমালায় শোভিত নানা বাদ্য-মুখরিত এই প্রদর্শনী বাস্তবিকই চন্দননগরে অপূর্ব্ব হইয়াছিল এবং কিঞ্চিদধিক এক পক্ষ কাল চন্দননগরে একটা সজীবতা আনিয়া দিয়াছিল। উদ্বোধনকালে মসিয়ে বারে সত্যই বলিয়াছিলেন,—যেন শত বৎসরের পর আজি অকস্মাৎ চন্দননগর নব জাগরণ লাভ করিয়াছে। ইংলিশম্যান পত্রের লেখকও ইহার বিবরণ দিবার সময় এই কথারই যেন প্রতিধ্বনি করিয়াছিলেন। *

এই প্রদর্শনী গঠনের প্রাথমিক ব্যয় প্রধানতঃ কমিটির সভ্যদিগের প্রদত্ত চাঁদা হইতেই নির্ব্বাহ হইয়াছিল। সর্ব্বপ্রকারে মোট টাকা পাওয়া যায় অনূ্যন আট হাজার। ব্যয় বাদে মোট ফ্রাঁসে পাঠান হইয়াছিল কমবেশ চারি হাজার টাকা। এই অনুষ্ঠানে অল্প কিছু অর্থ সাহায্য অপরের প্রদত্ত চাঁদা হইতে পাওয়া গিয়াছিল। গোন্দলপাড়া জুট্ মিল হইতেও বিবিধ প্রকারে সহায়তা লাভ হইয়াছিল।*

এই ভাবের কোন প্রদর্শনী পূর্ব্বে এখানে কখনও হয় নাই। পূর্ব্বে এখানে কুঠির মাঠে ফ্যান্সি ফেয়ার নামক বিবিদের সখের বাজার হইত। স্থানীয় অনাথা ও দীনগণের সাহায্যার্থ ইয়োরোপীয় মহিলাগণ কর্ত্তৃক ইহা অনুষ্ঠিত হইত। তাঁহারা তাঁহাদের স্বহস্ত-নির্ম্মিত শিল্পদ্রব্যসমূহ বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেন। চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য ইহার সহিত নানাবিধ ক্রীড়া কৌতুক ও আমোদ আহ্লাদের ব্যবস্থা করা হইত। ব্যারাকপুর হইতে পল্টনের ব্যাণ্ড আসিত, সাহেব বিবিদের নাচ হইত, বালকগণের বিবিধ ক্রীড়ার আয়োজন হইত।† ৩৪।৩৫ বৎসর পূর্ব্বেও সমারোহের সহিত এই সখের বাজার বসিত বলিয়া আমার মনে পড়ে।

প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে মিত্রবাগান নামক পল্লীতে ৺ক্ষেত্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের উদ্যোগে ৪।৫ বৎসরের জন্য গুপ্ত বৃন্দাবন নামে একটি উৎসব হইয়াছিল। ইহা তখনকার কালে এখানে একটি ধর্ম্মভাবযুক্ত অভিনব উৎসব হইয়াছিল। ইহাতে বহু পরিমাণে চাউলের গুঁড়া রং করিয়া তদ্দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক মূর্ত্তি সকল অঙ্কিত করা হইত। এই উপলক্ষে বহু সংখ্যক হরি সংকীর্ত্তনের দল নাম গান করিবার জন্য সমবেত হইতেন। শুনা যায়, এই গুপ্ত বৃন্দাবনের উৎসব অবলম্বন করিয়াই গোস্বামীঘাটের মেলা প্রথম সৃষ্ট হয়।

এতদ্ভিন্ন চন্দননগরে ফ্রাঙ্কো প্রুশীয় যুদ্ধের পর, বিগত যুদ্ধের সন্ধির পর, প্রজাতন্ত্রের শতবার্ষিক উৎসবে, সরকার কর্ত্তৃক যথেষ্ট ধুমধাম হইয়াছে। ফ্যান্সার ন্যায় আজকাল প্রতি বৎসর সন্ধির বাৎসরিক উৎসব হইতেছে। রোম্যান ক্যাথলিকদের ও মুসলমানদের কোন কোন পর্ব্বেও সামান্য ভাবে উৎসবাদি হইতে দেখা যায়।

* The Englishman 1st Jan. 1916.

* ১৩২২ সালের ফাল্গুনে "চন্দননগর ও শিল্প-প্রদর্শনী" শীর্ষক উল্লিখিত প্রবন্ধে প্রদর্শনীর বিষয় বিশদরূপে লিখিত হইয়াছে।

† "প্রজাবন্ধু" ২০শে মাঘ ও ৯ই ফাল্গুন ১২৮৯ সাল।

বেদান্তে বৈদিক দেবতা

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এল্

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আচারবান্ হিন্দুদের মধ্যে এক প্রশ্ন উঠিয়াছিল, যে, সত্যসত্যই গঙ্গা কি এখনও পৃথিবীতে বর্ত্তমান আছেন, না, তিনি অন্তর্হিতা হইয়াছেন? কয়েক-জন পণ্ডিতে মিলিয়া হঠাৎ শাস্ত্রের এক বচন আবিষ্কার করিলেন যে,—

"কলের্দশ সহস্রানি বিষ্ণুস্তিষ্ঠতি ভূতলে।
তদর্দ্ধং জাহ্নবীতোয়ং তদর্দ্ধং গ্রামাদেবতা॥"

অর্থাৎ কলিযুগের দশহাজার বৎসর পর্য্যন্ত বিষ্ণু ভূতলে থাকিবেন। জাহ্নবী তার অর্দ্ধেক এবং গ্রাম্যদেবতা তারও অর্দ্ধেককাল থাকিবেন। বলা বাহুল্য, তার পর তাঁরা অন্তর্হিতা হইবেন।

তখন হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছিল যে, জাহ্নবীর যাওয়ার সময় হইয়াছে, এবং গ্রাম্য দেবতারা বহু পূর্ব্বেই অন্তর্হিত হইয়াছেন। এই আবিষ্কার হওয়া মাত্রেই সমাজে মহা আলোড়ন উপস্থিত হইল। তাহা হইলে গঙ্গাস্নানে আর ফল কি? আর গ্রামের বিবিধ দেবদেবীরা কিসের জোরে পূজা খাইতেছেন? তাঁহারা যে কেহই নাই!

ধর্ম্মজগতে অরাজকতার আশঙ্কা করিয়া সুধিবর্গ আবার গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া বরাহপুরাণের আর একটী বচন আবিষ্কৃত করিলেন এই যে,—

"পৃথিবী গঙ্গয়া হানা ভবিষ্যত্যন্তি মে কলৌ।
তদৈব বিষ্ণুস্ত্যজতি পৃথিবীং নরপুঙ্গব॥"

অর্থাৎ কলির অন্তিমেই গঙ্গা পৃথিবী ত্যাগ করিবেন এবং বিষ্ণুও সেই সময়ই যাইবেন। এখনও সে অন্তিমকাল আসে নাই। অতএব এখনও গঙ্গায় স্নান করিলে এবং বিষ্ণুর পূজা করিলে পুণ্যের সম্ভাবনা আছে।

ভাটপাড়ার পণ্ডিতমণ্ডলী ব্যবস্থা দিলেন—এবং সেই ব্যবস্থা প্রতি বৎসর পঞ্জিকার পৃষ্ঠে মুদ্রিত হইতে লাগিল—যে, বিভিন্ন বচনের একবাক্যতা সম্ভব হইলে, বাক্যভেদ কল্পনা করিবে না; অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত উভয় বচনের মধ্যে শেষোক্তটীই গ্রহণ করিবে।

এই ক্ষেত্রে ভাটপাড়ার পণ্ডিতদের একবাক্যতার ধারণাটা প্রশংসনীয় কি না, সে বিচার নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু একটা কথা ঠিক, যে, আচারবান্ হিন্দু বিষ্ণু, গঙ্গা প্রভৃতি দেবদেবীগণের তিরোভাবে বিশ্বাস করিতে চায় না। বৈদিক দেবতাগণ যে হিন্দুর জীবনে, তাহার চিন্তায় এবং ধর্ম্মে, এখনও লোপ পান নাই, ইহাই তাহার একমাত্র প্রমাণ নহে। কিন্তু এই আন্দোলন হইতেও বুঝা যায় যে, দেবতাতে বিশ্বাস বজায় রাখিবার জন্য আন্বীক্ষিকীর নিয়ম লঙ্ঘন করিতেও হিন্দু সব সময় কুণ্ঠিত হয় না।

প্রতীক-উপাসনা এখনও হিন্দুসমাজে বর্ত্তমান রহিয়াছে; এখনও গৃহে, মন্দিরে, তীর্থে হিন্দু মৃন্ময়, হিরণ্ময়, পাষাণ-ময়, কিংবা দারুময় বিবিধ মূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকে। এবং এখন বোধ হয় হিন্দুই জগতের একমাত্র সভ্যজাতি, যে, আজও মূর্ত্তির পূজা ত্যাগ করে নাই। সুতরাং দেবগণ এখনও মর্ত্ত্যে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আর, তাঁহাদের যাওয়ারও যে ঢের দেরী আছে, তাহাও পণ্ডিতমণ্ডলী বিরুদ্ধ বচন-সমূহের একবাক্যতা দ্বারা প্রমাণ করিয়া রাখিয়াছেন।

অবশ্যই, এক বিষ্ণু ছাড়া বৈদিক দেবতাদের মধ্যে আজকাল আর কেহ বড় পূজা পান কি না সন্দেহ। পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠার সময় বোধ হয় বরুণের পূজা হইয়া থাকে; তা'ছাড়া, ইন্দ্র, যম, অগ্নি, বিশ্ব-দেবগণ, মিত্র প্রভৃতি অনেকেই বিস্মৃতপ্রায়; এবং কেহ কেহ—যেমন অগ্নি—কালে-ভদ্রে এক-আধটু পূজা পাইয়া থাকেন মাত্র। শিব, দুর্গা, কালী, কৃষ্ণ প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া সত্যপীর, শনৈশ্চর, মনসা প্রভৃতি অনেক অবৈদিক, এমন কি, অনার্য্য দেবদেবী বৈদিক দেবগণের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছেন।

কিন্তু বর্ত্তমানে উপাসিত দেবগণ ঠিক বৈদিক দেবতা না হইলেও, এটা ঠিক যে, বহু-দেবতায় বিশ্বাস হিন্দুর অস্থিমজ্জায় মিশিয়া রহিয়াছে। এখন যাঁহারা উপাসিত হইতেছেন, সে সব দেবগণের কেহ বা খাঁটী বৈদিক; কেহ বা বেদের সময়ে অমূর্ত্ত কিংবা অস্ফুট-মূর্ত্তি ছিলেন, বর্ত্তমানে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন; আর কেহ বা, একেবারে বেদের বাহিরে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দুর জগৎ যে দেবগণশূন্য নহে, এটা ঠিক। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের জগৎপ্রপঞ্চে চেতন এবং জ্ঞানবান্ জীবসমূহের মধ্যে মানুষই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বশেষ। মানুষের উপরে, দেহ-বান্ কিংবা বিদেহ, অন্য কোন চেতন সত্তার অস্তিত্ব বিজ্ঞানবিদ্ বিদিত নহেন, এবং বিশ্বাসও করেন না। কিন্তু হিন্দুর বিশ্বাস—মানুষের উপরে এবং হয় ত বা মানুষের চেয়ে অনেক রকমে শ্রেষ্ঠ, অশরীরী কিংবা সূক্ষ্ম-শরীরবান্ আরও চেতন সত্তা বর্ত্তমান আছে। যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, প্রভৃতি যে শুধু লৌকিক উপকথার জীব, তা নয়; শিষ্ট সাহিত্যে—উজ্জয়িনী, পাটলিপুত্র প্রভৃতি রাজ-ধানীতে উৎপন্ন, শিক্ষিত সমাজের উপভোগ্য, কালিদাস প্রভৃতির রচনায়ও—এই সব জীবের অস্তিত্বের কথা শোনা যায়। আর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, প্রভৃতির চেয়েও বড় বিবিধ দেবদেবীরাও বিশ্বের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া রহিয়াছেন।

স্বর্গীয় দূত কিংবা angel প্রভৃতিতে বিশ্বাস ইহুদী, খ্রীষ্টান এবং মুসলমান ধর্ম্মেও রহিয়াছে। গেব্রিয়েল, মাইকেল প্রভৃতি স্বর্গের দূতেরা ধর্ম্মে এবং কাব্যে—জ্ঞানে এবং কার্য্যে—পাশ্চাত্য জগতে অনেকবার দেখা দিয়াছে। কিন্তু সে-সব দেশের বিজ্ঞান ও দর্শনের রশ্মিপাত সহ্য করিতে না পারিয়া স্বর্গীয় দূত প্রভৃতি কায়-হীন কিংবা অতিকায় বহুবিধ জীবই এখন অন্তর্হিত হইয়াছেন; এমন কি স্বয়ং স্বর্গাধিপতি ভগবানের সিংহাসনও কাঁপিয়া উঠিয়াছে। ভগবান্‌কে কোনও রূপে মানিতে রাজী হইলেও গ্রীকদের কিংবা হিন্দুদের মত বিশ্বময় দেবগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস পাশ্চাত্য জগৎ আর করিতে রাজী নয়, ইহা আমরা সর্ব্বদাই দেখিতেছি। গ্রীকদের এথিনি, জিউস্ প্রভৃতি দেবদেবীরা শুধু যে পৃথিবীর এপারে ওপারে যাওয়া-আসা করিতেন, তা নয়; প্রায়ই তাঁরা মানুষদের সঙ্গে মিশিতেন—এমন কি, কখন কখন বা বৈবাহিক সম্বন্ধও স্থাপন করিতেন; এবং সর্ব্বদাই তাঁরা মানুষের প্রদত্ত পূজা এবং সম্মান আকাঙ্ক্ষা করিতেন—এবং সেই জন্যই মানুষের ভাগ্যের উপর আধিপত্য করিতেও সচেষ্ট থাকিতেন। হিন্দুর দেবতারাও বেদের সময় হইতে ঠিক এমনই ভাবে মানুষের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু গ্রীস খ্রীষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া দেবতাদিগকে ত্যাগ করিয়াছে; গ্রীসে আর এখন মন্দিরে মন্দিরে এথিনি কিংবা এপোলোর পূজা হয় না। ভারত

শুধু আজও দেবতাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে;—ভারতেই শুধু এখনও দেবতার পূজা ও আরতি হইয়া আসিতেছে।

খ্রীষ্টান ধর্ম্ম ইয়োরোপে, গ্রীসের এবং রোমের দেবগণকে নির্ব্বাসিত করিয়াছে; আর, খ্রীষ্টান ধর্ম্মের ভিতর যে স্বর্গীয় দূত প্রভৃতি,—ঈশ্বরের চেয়ে ছোট অথচ মানুষের চেয়ে বড়,—জীব ছিল, তাহাদিগকে পরিপূর্ণ রূপে নির্ব্বাসিত করিয়াছে সে দেশের দর্শন এবং বিজ্ঞান। Swedenborg প্রভৃতি দু'এক জন সৃষ্টিছাড়া, দলছাড়া লোকের কথা বাদ দিলে, পাশ্চাত্য দেশের লোকদের মতে এখন এই বিশাল জগৎ একটা জড়ের সমষ্টি; অথবা একটা মানস-সৃষ্টি; এবং ইহার পিছনে ঈশ্বরের চৈতন্য অথবা অচেতন প্রাকৃতিক শক্তি রহিয়াছে; আর, এই প্রাকৃতিক শক্তি কিংবা ঐশ্বরিক শক্তি দ্বারাই এই জগৎ-প্রপঞ্চ চালিত হইতেছে। এই জগতের ভিতরে চেতন, অচেতন, মানুষ, অমানুষ, বহু প্রকার জীব এবং বহু প্রকার পদার্থ বর্ত্তমান রহিয়াছে; কিন্তু মানুষ এবং ঈশ্বর—এ উভয়ের মাঝামাঝি দেবজাতীয় আর কোনও সত্তা নাই। আকাশে যে মেঘ ডাকে, তাহার কারণ এবং কৈফিয়ৎ তাহারা জানে, কিন্তু কোন ইন্দ্র সেখানে বজ্র দ্বারা বৃত্রাসুর বধ করেন না। আগুণ যে দহন-শক্তি-সম্পন্ন, সে কথা তারা জানে; এবং কেন যে আগুণ পোড়ায়, তাহার রাসায়নিক কারণও তাহারা অবগত আছে; কিন্তু দেবতা ইহার মধ্যে থাকিয়া তাহাদের পূজার দাবী করিতে পারেন, ইহা তাহারা কল্পনা করিতে পারে না। সুতরাং হিন্দুর বিশ্বাসের বাহিরে, দেবতা আর নাই। হিন্দুর বিশ্বাসে কিন্তু তিনি এক রকম মৌরসী কায়মী পাট্টা লইয়া বসিয়াছেন; ভবিষ্য-পুরাণের মতে দেবতাদের যাওয়ার সময় হইয়া থাকিলেও, বায়ু-পুরাণের মতে আবার সেটা স্থগিত হইয়া যায়; এবং বরাহ-পুরাণের মতের সহিত একার্থতা রক্ষা করিতে হয় বলিয়া, তাঁহাদিগকে আমরা কিছুতেই যাইতে দিতে পারি না।

হিন্দু পৌত্তলিক, হিন্দু একেশ্বরবাদী নহে, সে বহু দেবতায় বিশ্বাস করে,—ইত্যাদি প্রকার অভিযোগ ইংরেজ-রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই খ্রীষ্টান মিশনরীরা করিতে আরম্ভ করিলেন। এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজা রামমোহন প্রভৃতি মনীষিগণ উপনিষদের "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম," "একমেবাদ্বিতীয়ম্" প্রভৃতি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বাক্‌যুদ্ধে মিশনরীদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, প্রকৃত পক্ষে হিন্দুও একেশ্বরবাদীই বটে; এবং বহু দেবতা শুধু সাধারণ লোকদের জন্য; ও বিশ্বাসটা ঠিক ধর্ম্ম নয়, ওটা একটা কুসংস্কার ভিন্ন আর কিছু নয় এবং ক্রমশঃ শিক্ষার আলোক বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এ কুসংস্কার দূর হইবে, সে আশাও তাঁরা করিতে লাগিলেন। এই শিক্ষার আলোক বিস্তারের চেষ্টা—এবং উপনিষদের ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্ত্তন হইতেই ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি কিরূপে হইয়াছে, তাহা এখনও বর্ত্তমান ছাড়াইয়া ঐতিহ্যে পরিণত হয় নাই; সুতরাং সে সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

একেশ্বর-বাদ এবং বহু-দেবতার উপাসনা, এ দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ, সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন এখন উত্থাপন করাই অর্ব্বাচীনতার পরিচায়ক হইবে। কিন্তু এটা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, ব্রহ্মকে এক এবং অদ্বিতীয় মনে করিয়াও বহু দেবতায় বিশ্বাস করা যায় কি না; এবং উপনিষদের ঋষিরা তা করিতেন কি না? এটা আমরা জিজ্ঞাসা করিতে অবশ্যই পারি যে, বেদান্তে ব্রহ্মবাদ প্রচারের ফলে, বৈদিক দেবতাদের গতি কি হইয়াছিল? ইয়োরোপে খৃষ্টান ধর্ম্মপ্রচারের পর হইতেই আস্তে আস্তে রোমীয় এবং গ্রীসীয় দেবতারা সব নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, এটা আমরা জানি; ভারতে যে বেদান্ত, ন্যায়, এমন কি বৌদ্ধ ও লোকায়ত মত প্রচারের ফলেও দেব-মন্দির সব ধ্বংস হইয়া যায় নাই, তাহাও ঠিক। কিন্তু বেদান্তে বৈদিক দেবতাদের গতি কি হইয়াছিল? বেদান্ত ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন কি? বেদান্তের অদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ, প্রভৃতির সহিত বেদের বহু-দেবতা-বাদের স্বভাবতঃই একটা বিরোধ আছে বলিয়া মনে হয়। এবং যাঁরা উপনিষদের ব্রহ্মবাদের উপর একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাঁরা উপনিষদকে এই অর্থেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং উপনিষদে বৈদিক দেবতাদের সমাধি হইয়া গিয়াছে—ইহাই তাঁহাদের ধারণা।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও অনেক সময় উপনিষদের ব্রহ্মবাদে

বৈদিক বহু দেবতার একীকরণ এবং তাঁহাদের পৃথক্ সত্তার বিলোপ দেখিয়া থাকেন; এবং এই মায়ামূলক জগতে মানুষের যতটুকু বাস্তবতা আছে, ততটুকু বাস্তবতাও বেদের দেবতা ইন্দ্র, যম, বরুণের আছে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ করিয়া থাকেন।

সূক্ষ্মদর্শী আচার্য্য ডয়সেন্ (Deussen) অবশ্যই খাঁটী কথাটা ধরিয়াছেন। তিনি ঠিকই বলিয়াছেন যে, Xenophanes যেমন গ্রীক দেবতাতে আস্থাহীন হইলেও তাহাদের অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করেন নাই, উপনিষদের ঋষিরাও তেমনই বৈদিক দেবতাতে ক্রমশঃ আস্থা হারাইয়া ফেলিলেও, তাহাদের অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু ব্রহ্মমূলক বিরাট জগৎ-প্রপঞ্চের মধ্যে দেবতাদের স্থান ঠিক কোথায়, সে বিচার ডয়সেন্ও করেন নাই। আবার, ডয়সেন যতটুকুতে দৃষ্টি দিয়াছেন, অনেকে ততটুকুও দেখেন নাই; এবং উপনিষদের ঋষিরা যে দেবতাদিগকে একেবারে বাতিল ও নামঞ্জুর না করিয়া বরং জগতের প্রপঞ্চের কোনও এক স্থানে তাঁহাদিগেরও থাকিবার স্থান করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহাদের সম্বন্ধেও যে তাঁরা চিন্তা করিয়াছেন, এ কথাটাই অনেকে মানেন না, কিংবা জানেন না।

তেরখানা প্রধান উপনিষদের অনুবাদ করিতে গিয়া Hume (১) বলিয়াছেন যে, অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠার ফলে উপনিষদে বৈদিক দেবগণে বিশ্বাস করিবার আর কোনও প্রয়োজন রহিল না। অর্থাৎ উপনিষদে সে বিশ্বাস দূর হইয়া গেল।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা যায় নাই। এত সব দর্শনের প্রচার সত্বেও যেমন হিন্দুর ধর্ম্ম ও সমাজ হইতে দেবতার পূজা লোপ পায় নাই, তেমনি ঔপনিষদিক অদ্বৈতবাদের ফলে উপনিষদেও দেবতার প্রতি বিশ্বাস একেবারে লোপ পাইয়া যায় নাই। ব্রহ্মের আবির্ভাবের পরেও ঋষিদের চিত্তে দেবগণ রহিয়া গেলেন। শুধু তাই নয়, মানুষের মুক্তির জন্য যেমন ঋষিরা শাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন, তেমনি এই দেবতাদের সম্বন্ধেও ঋষিরা কথঞ্চিৎ মাথা ঘামাইয়াছেন।

বেদে যেমন অগ্নি বরুণ প্রভৃতির নিকট প্রার্থনা করা হইত, উপনিষদেও সেটা একেবারে লোপ পায় নাই। যথা :—

(ক) ঈশা—'অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্' প্রভৃতি দ্বারা অগ্নির নিকট প্রার্থনা করিতেছেন!

(খ) তৈত্তিরীয় উপনিষদের শান্তিমন্ত্রে বেদের অনেক দেবতাকেই দেখিতে পাই :—

"শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবত্বর্য্যমা॥ শং নো ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ॥" ইত্যাদি।

বেদে যেমন দেবতাদের সঙ্গে মানুষের আদান-প্রদান চলিত, উপনিষদে তাহাও রহিয়াছে, যেমন নচিকেতা ও যমের সংবাদ। আর একটা সাধারণ সত্য আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের মোটেই লোপ পায় নাই। বরং অনেক সময় সেই সব যাগযজ্ঞের উপলক্ষ্যেই ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা হইত;—জনকের যজ্ঞে সমাগত ব্রাহ্মণদের সঙ্গেই যাজ্ঞবল্ক্যের দীর্ঘ বিচার হইয়াছিল (বৃহদ্ ৩য় অঃ)। সুতরাং ব্রহ্মতত্ত্বের আবিষ্কারের ফলে বৈদিক দেবতারা একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হন নাই; তাঁহারা পূজাও পাইতেন এবং প্রার্থনাও শুনিতে পারিতেন।

কিন্তু উপরে আর একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্ব-বীজ এবং সকলের অধিষ্ঠাতা স্বরূপ ব্রহ্মের আবির্ভাব হওয়াতে তাঁহাদের পদবী কিছু খাটো হইয়া গেল। মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হইলেও একেবারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আর তাঁরা রহিলেন না; শুধু উপাসিতব্য এবং শুধু প্রার্থয়িতব্য আর তাঁরা থাকিতে পারিলেন না। জাগতিক অন্যান্য পদার্থের ন্যায় তাঁহারাও আলোচ্য এবং বিচার্য্য বিষয় হইয়া পড়িলেন।

প্রশ্ন-উপনিষদে (২য় প্রঃ) ভার্গব বৈদর্ভি প্রশ্ন করিতেছেন: "ভগবন্ কত্যেব দেবাঃ প্রজাং বিধারয়ন্তে কতর এতৎ প্রকাশয়ন্তে কঃ পুনরেষাং বরিষ্ঠ ইতি। সকলের চেয়ে একজন বরিষ্ঠ দেবতার অনুসন্ধান চলিতেছে বটে, কিন্তু অন্যান্য দেবতারাও যে যার কর্ত্তব্য করিয়া যাইতেছেন। সূর্য্য, পর্জ্জন্য, বায়ু, পৃথিবী কেহই যান নাই তবে সকলেই একজন বরিষ্ঠের অধীন হইয়া পড়িয়াছেন এবং কাজেই এখন কাহার কি কাজ, তাহা বিচারের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে

(১) Thirteen Principal Upanishads : Hume. P. 52.

বৃহদারণ্যকেও জনকের সভায় সমাগত কর্ম্মবিদ্ শাকল্য যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিতেছেন—'কতি দেবা যাজ্ঞবল্ক্য ?' উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য একাধিক গণনাপদ্ধতির আভাস দিতেছেন। এক প্রকার গণনায় দেবতাদের সংখ্যা তিন শত তিন, প্রকারান্তরে তিন হাজার তিন; আবার তেত্রিশ, কিংবা ছয়, কিংবা অর্দ্ধ কিংবা একও তাহাদের সংখ্যা দেখানো যাইতে পারে। অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ইন্দ্র এবং প্রজাপতি—এই প্রধান কয়জনকে ধরিলে দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ হয়। অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরিক্ষ, আদিত্য এবং দ্যৌঃ—এই গণনায় তাঁহাদের সংখ্যা হয় ছয়। সর্ব্ব দেবতাই তিন লোকে বিভক্ত হইয়া আছেন; লোক-গণনায় তাঁদের সংখ্যা হয় তিন। আর সকলের প্রধান, সকলের আশ্রয়, সকলের অধিপতি 'প্রাণ' বা ব্রহ্মকে ধরিলে দেবতারা প্রকৃতপক্ষে এক বই দুই ন'ন। সেই ব্রহ্মকে 'ত্য' বা তিনি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। ইত্যাদি।

যাজ্ঞবল্ক্যের এই উত্তর হইতেও দেখা যায় যে, ব্রহ্ম আসিয়া সকল দেবতাকেই গ্রাস করিয়া বসিয়াছেন বটে, কিন্তু একেবারে হজম করিয়া ফেলিতে পারেন নাই। নাম ও রূপের বৈচিত্র্য মধ্যে এক ব্রহ্মই বিদ্যমান; কিন্তু দেবতাদের বিভিন্ন নাম এবং রূপও একেবারে ভিত্তিহীন বলিয়া পরিত্যক্ত হয় নাই।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে (১।৫) দেখিতে পাই যে, ব্রহ্মবিদের পক্ষেও দেবতারা একেবারে অস্তিত্বহীন হইয়া যান নাই; বরং তাঁরা তখনও বলি আবহন করিয়া থাকেন।—"স বেদ ব্রহ্ম। খর্ব্বেঽস্মৈ দেবা বলিমা বহন্তি।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দেবতার উপাসনা এবং দেবতায় বিশ্বাস উপনিষদে লোপ পায় নাই। কিন্তু তাঁদের অনাদিত্ব লোপ পাইয়াছে। তাঁরাও সৃষ্ট জীব। সমস্ত বিশ্ব যেমন এক ব্রহ্মের বিভূতি প্রকাশ করিতেছে, সেই বিশ্বেরই অংশ হিসাবে দেবতারাও তেমনই ব্রহ্মের মহিমা দ্যোতনা করিতেছেন। কিন্তু তাঁরা সকলেই তাঁদের অস্তিত্বের জন্য মানুষাদি হীনতর জীবের মত ব্রহ্মের নিকটই ঋণী। তাঁরা হয়ত পূর্ব্বে ভাবিতেন যে, যেহেতু তাঁরা নরের প্রদত্ত যজ্ঞীয় হবিঃ ভোগ করিতেন, সুতরাং তাঁরা সকলেই স্বয়ম্ভু এবং স্বয়ং প্রভু। কিন্তু কেন-উপনিষদে দেখিতে পাই যে, 'ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত ত ঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি।' কিন্তু ব্রহ্ম তাঁদের নিকট আবির্ভূত হইয়া প্রমাণ করিয়া দিলেন যে, দেবগণের দেবত্ব তাঁহা হইতেই উৎপন্ন; তাঁহার আদেশেই বিদ্যুৎ ঝলকে।

মুণ্ডকও বলিতেছেন যে, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে দেবগণও ব্রহ্ম হইতেই প্রসূত হইয়াছেন।—"তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সংপ্রসূতাঃ সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি। প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং বিধিশ্চ।" (২।১।৭)

বৃহদারণ্যক (২।১।২০) বলিতেছেন যে, যেমন উর্ণনাভ তন্তু দ্বারা চারিদিকে নিজেকে বিস্তৃত করে, যেমন অগ্নি হইতে চারিদিকে বিস্ফুলিঙ্গ ছড়াইয়া পড়ে, তেমনি "এতস্মাৎ আত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।" সমস্ত ভূতগণের সহিত দেবগণও ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন। ইঁহারাও সকলেই ব্রহ্মের সৃষ্টি। ঐতরেয় উপনিষৎও বলিতেছেন—"স ঈক্ষত ইমে নু লোকা লোকপালান্নু সৃজা ইতি"। তবে, অন্য সৃষ্টি হইতে দেবতা সৃষ্টিকে পৃথক্ করিতে হইলে বলিতে পারা যায় যে, উহা ব্রহ্মের অতি-সৃষ্টি—"সৈষা ব্রহ্মণোঽতি সৃষ্টিঃ" (বৃহদ্, ১।৪।৬)।

প্রজাপতির দুই সন্ততি—দেব এবং অসুর। "দ্বয়া হ প্রাজাপত্যা দেবাশ্চাসুরাশ্চ।" (বৃহদ্ ১।৩।১; ছান্দো ১।২)। ইহা হইতেও দেবতাদের সৃষ্টত্ব প্রমাণিত হয়।

প্রশ্ন-উপনিষৎ (১।৪) বলেন: "প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা স মিথুন মুৎপাদয়তে।" এই মিথুন আর কিছু নয়—আদিত্য এবং চন্দ্রমা।

দেবগণ যে শুধু ব্রহ্ম হইতে প্রসূত—ব্রহ্ম কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছেন, তাহা নহে। ব্রহ্মই তাঁহাদিগকে শাসনও করিয়া থাকেন। যথা কঠে—

"যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ প্রজতি নিঃসৃতং। ভয়াদস্য অগ্নি স্তপতি, ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যু র্ধাবতি পঞ্চমঃ।" (৬।৩)

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ও (২।৮) বলিতেছেন:—

"ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি সূর্য্যঃ॥
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ। মৃত্যু র্ধাবতি পঞ্চমঃ॥"

ব্রহ্মের ভয়েই যে সূর্য্য তাপ দেন, অগ্নি উত্তাপ দেন, বায়ু প্রবাহিত হন এবং ইন্দ্র প্রভৃতিও স্ব স্ব কার্য্য করিয়া থাকেন, ইহাই উপনিষদের বিশ্বাস। বৃহদারণ্যক এই কথাটাই আরও সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন (৩৷৮)—

"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমাসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবা পৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ—ইত্যাদি।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উপনিষদে বেদের দেবগণ সৃষ্ট জীব হইয়া পড়িয়াছেন; এবং অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর মত ব্রহ্মের শাসনের অধীন হইয়া পড়িয়াছেন। শুধু তাই নয়, তাঁহাদের ভিতরেও মানুষের ন্যায় বর্ণভেদ আছে;—সেখানেও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় প্রভৃতি তফাৎ রহিয়াছে। যথা, বৃহদারণ্যক (১৷৪৷১১) ইন্দ্র, বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জ্জন্য, যম, মৃত্যু এবং ঈশানকে দেবগণের মধ্যে ক্ষত্রিয় ('দেবত্রা ক্ষত্রাণি') বলিয়াছেন; আর, বসুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বিশ্বদেবগণ এবং মরুদ্‌গণকে বৈশ্য-দেবতা বলা হইয়াছে এবং পূষনকে শূদ্রবর্ণ বলা হইয়াছে।

দেবগণ মানুষের মত সৃষ্ট; লোকভেদে এবং বর্ণভেদে বিভক্ত; এবং মানুষেরই মত ব্রহ্মের শাসনের অধীন। কিন্তু মানুষের উপরের স্তরের জীব এঁরা; সুতরাং মানুষের উপর আধিপত্য ইহাদের যায় নাই। মানুষের বাহ্য জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ দেবতাদের অধিষ্ঠাতৃত্বেই হইয়া থাকে। ঐতরেয় উপনিষৎ (১৷২) বলেন যে, দেবগণ সৃষ্ট হইয়া মহৎ অর্ণবে পতিত হইলেন এবং ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁরা আত্মাকে কহিলেন, "আমাদের একটা দাঁড়াবার স্থান (আয়তন) করিয়া দিন, যেখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমরা অন্ন সংগ্রহ করিতে পারি।" তখন আত্মা তাঁহাদের কাছে ক্রমে, গো ও অশ্ব প্রভৃতি আনিয়া উপস্থিত করিলেন; কিন্তু তাঁরা বলিলেন 'ন বৈ নোঽয়ম্ অলমিতি'—এতে আমাদের কিছুই হইবে না।" তখন আত্মা মানুষকে সেখানে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। দেবতারা খুসী হইয়া বলিলেন 'বেশ হইয়াছে—সুকৃতং বত"। আত্মা কহিলেন, "তোমরা যে যার আয়তনে প্রবেশ কর। তখন অগ্নি বাক্য হইয়া মানুষের মুখে প্রবেশ করিলেন; বায়ু প্রাণ হইয়া নাসিকায় প্রবেশ করিলেন; আদিত্য দৃক্‌শক্তি হইয়া চক্ষে, দিক্ সমূহ শ্রোত্র হইয়া কর্ণে, ওষধি-বনস্পতিরা লোম হইয়া ত্বকে, এবং চন্দ্রমা মন হইয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন। ইত্যাদি। সুতরাং মানুষের উপর দেবতাদের আধিপত্যটা রহিয়াই গেল; মানুষ তাঁহাদের ভোগ্য হইয়াই রহিল।

কিন্তু এই এক বিষয়ে দেবতারা মানুষের চেয়ে বড় হইলেও, সব বিষয়ে নন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, তাঁরাও মানুষের মত সৃষ্ট, এবং মানুষেরই মত ব্রহ্মের অধীন এবং মানুষেরই মত ব্রহ্মের ভয়ে ভীত। ইহা ছাড়া আরও একটা গুরুতর বিষয়েও তাঁরা মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ন'ন। তাঁরাও অমুক্ত, তাঁরাও বিগ্রহবান্, এবং তাঁদেরও মুক্তির প্রয়োজন আছে। তাঁদেরও দেহেন্দ্রিয়াদি রহিয়াছে, তাঁদেরও ভোগ হয়, তাঁদেরও স্থানভেদ, স্বভাবভেদ এবং কার্য্য-ভেদ রহিয়াছে; এবং এই সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া তাঁদেরও মানুষেরই মত প্রয়োজনীয়।

জৈমিনি আচার্য্য বলিয়াছেন, 'ন দেবানাং দেবান্তরাভাবাৎ';—উপাস্য অন্য দেবতা আর নাই বলিয়া দেবতাদের কর্ম্মে অধিকার নাই। অধিকার বলিতে সামর্থ্য এবং অর্থিত্ব এই দুইটী জিনিস বুঝায়। কর্ম্মের সামর্থ্য দেবতাদের আছে বটে, কিন্তু কোন প্রয়োজন—কোন অর্থিত্ব—তাঁদের নাই; সুতরাং কর্ম্মের বিধি তাঁদের বেলা খাটে না। কিন্তু জ্ঞানের বেলা এ কথা প্রয়োজ্য নহে,—ইহাই বাদরায়ণ আচার্য্যের মত। বেদান্তজ্ঞানের অধিকার—তদ্বিষয়ে সামর্থ্য এবং অর্থিত্ব—শুধু মানুষেরই আছে এমন নয়। মানুষের মধ্যে সকলের, যথা শূদ্রের (বেদান্ত সূত্র ১৷৩৷৩৪), অবশ্যই উপনয়নে অধিকার নাই; সুতরাং বেদে ও বেদান্তেও অধিকার নাই। তথাপি মানুষের বেদান্তে অধিকার অবশ্যই আছে; কিন্তু শুধু মানুষেরই আছে, এমন নয়।

'তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ'—(বেদান্ত সূত্র ১৷৩৷২৬); মানুষের উপরিস্থ জীব দেবতাদেরও বেদান্ত জ্ঞানে অধিকার—অর্থিত্ব এবং সামর্থ্য—রহিয়াছে।

কর্ম্ম দ্বারা যাহা পাওয়া যায় তাহা তাঁরা পাইয়াছেন, সুতরাং কর্ম্মের প্রয়োজন তাঁদের নাই। কিন্তু জ্ঞান দ্বারা প্রাপ্তব্য মোক্ষ তাঁরা লাভ করেন নাই; সুতরাং জ্ঞানের প্রয়োজন তাঁদেরও রহিয়াছে।

শুধু যে অধিকার তাঁদের আছে, এমন নয়। দেখা যায়,

মাঝে মাঝে তাঁরা সে অধিকারের সদ্ব্যবহারও করিয়াছেন। ছান্দোগ্য উপনিষৎ (৮।১১।৩) বলেন যে, 'একশতং হ বৈ বর্ষাণি মঘবান্ প্রজাপতৌ ব্রহ্মচর্য্যমুবাস'—অর্থাৎ ইন্দ্র প্রজাপতির নিকট একশত বৎসর বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাহাতেও তিনি মুক্ত হইয়াছিলেন কি না, সন্দেহ; কেন না, এখনও আকাশে মেঘ ডাকে। তবে, তাঁহার যে মুক্তির প্রয়োজন আছে এবং সে বিষয়ে যে তাঁহার ইচ্ছার অভাব নাই, তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

কিন্তু এই অর্থিত্ব ও সামর্থ্য দেবতাদের আছে কি না—তাঁদেরও বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াই মুক্তিলাভ করিতে হইবে কি না—সে বিষয়ে স্পষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়। বাদরায়ণ একাধিক সূত্রের সাহায্যে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, তাঁদেরও সে প্রয়োজনটা রহিয়াছে। আর, সূত্রকারের অর্থ যেখানে স্পষ্ট, সেখানে টীকাকারদের মতভেদ হওয়া কঠিন; সুতরাং এ ক্ষেত্রে শঙ্কর, রামানুজ এবং বল্লভাচার্য্য প্রভৃতির মধ্যে কোন মতভেদ নাই। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন যে, দেবতারাও দেহী, তাঁদেরও ভোগ হয়; তবে, তাঁরা মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ স্তরের দেহী; এবং সেই জন্য একই সময়ে যুগপৎ একাধিক স্থানে তাঁরা পূজা গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু তথাপি মুক্তির প্রয়োজন তাঁদেরও রহিয়াছে।

বাদরায়ণ নিজেই বলিতেছেন যে, জৈমিনি আচার্য্য এই মত গ্রহণ করিতে নারাজ। (বেদান্তসূত্র ১।৩।৩১-৩২) কিন্তু বাদরায়ণ যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া বেদান্তে দেবগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে তুমুল চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁর সে সব যুক্তির বিশ্লেষণ এখানে করা সম্ভব হইবে না। কিন্তু একটা কথা ঠিক যে, বেদান্তে দেবগণের পদাবনতি ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁরা মোটেই লোপ পান নাই। পরাভূত পরাধীন জাতির মত তাঁরা ব্রহ্মের প্রশাসনে রহিয়াছেন; কিন্তু তথাপি রহিয়াছেন; এবং যে পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানলাভ দ্বারা মুক্ত না হইবেন, বাদরায়ণের মতে অন্ততঃ—সেই পর্য্যন্ত তাঁরা থাকিবেনই। আর, যাদের মতে মুক্তির কোন প্রয়োজন তাঁদের নাই, তাঁদের মতেও তাঁরা অবশ্যই থাকিবেন। সুতরাং দেবতারা মুক্তই হউন, আর অমুক্তই হউন, বেদে যেমন বেদান্তেও তেমনি তাঁরা বিদ্যমান রহিয়াছেন।

ব্রহ্মাদ্বৈতবাদের সঙ্গে বহু দেবতায় বিশ্বাস যে একেবারে করা যায় না, তা নয়। উপনিষদ্ অবশ্যই দেবতাদিগকে একেবারে চরম সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না; সেটা তাহার অদ্বৈতবাদের বিরোধী। বিশেষতঃ "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।" কিন্তু ব্রহ্মের একত্ব এবং অদ্বিতীয়তা সত্ত্বেও যেমন ব্যবহারিক জগতে বহুর প্রতীতি সম্ভব হইয়া থাকে, তেমনি সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মময় হইলেও এই বিশ্বেরই মাঝে তির্য্যগাদি বিভিন্ন যোনির জীবের অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে দেবগণের অস্তিত্বও সম্ভব হইয়াছে।

অতি বড় অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্যও ত্রিপুরাসুন্দরী গঙ্গা প্রভৃতি দেবতার স্তোত্র রচনা করিয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। যেমন পিতামাতা, গুরুশিষ্য, দেবদত্ত, যজ্ঞদত্ত প্রভৃতির ভেদ ব্যবহারিক জীবনে শঙ্করও স্বীকার করিয়াছিলেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে বহুবিধ দেবদেবীর ভেদও স্বীকার করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। অবশ্যই তাঁর মতে অন্তিমে যুষ্মদ্ অস্মদ প্রত্যয়মূলক সকল ভেদই যেমন অধ্যাস মাত্র, তেমনই বিভিন্ন দেবগণের নানাত্বও একটা ভ্রান্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু এ জগৎ প্রপঞ্চ যতটুকু সত্য, দেবগণ তার চেয়ে কম সত্য নহেন। বরং এই জগৎ-প্রপঞ্চ বলিতে আমরা যা বুঝি, তারই ঊর্দ্ধদেশে এই দেবগণের নিবাস।

সুতরাং কেহ যদি বলেন, বেদান্তে বৈদিক দেবতারা সব তিরোহিত হইয়াছেন—সূর্য্যের উদয়ে অন্ধকারের মত, ব্রহ্মের আবির্ভাবে তাঁরা সব যে কোথায় উধাও হইয়া গিয়াছেন, তার কোন ঠিকঠিকানা নাই—তাহা হইলে, তিনি যে ভুল বলিবেন, আশা করি, অতঃপর ইহা স্বীকৃত হইবে।

জ্যোতির্বিজ্ঞান

শ্রীঅমিয়া বসু

পৃথিবী প্রায় গোলাকার, ইহা বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই পূর্ব্ববর্ত্তী জ্যোতিষিগণ জানিতেন। অনেক উপায়েই তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

(১) একখানি জাহাজের প্রথমে তলদেশ, পরে সমস্ত অংশ, এবং তৎপরে উহার মাস্তল কিরূপে সমুদ্রতীরবর্ত্তী দর্শকের নয়নপথ হইতে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া যায়, তাহা সকলেই অবগত আছেন।

(২) গ্রহণের সময় চন্দ্রের উপর পৃথিবীর যে ছায়া পড়ে, তাহা সর্ব্বদাই গোলাকার দেখা যায়।

(৩) যদি প্রথমে উত্তরে এবং তৎপরে দক্ষিণে সমান দূরে যাওয়া যায়, তাহা হইলে কোন একটী নির্দ্দিষ্ট নক্ষত্রের ধ্রুবপোত বৃত্তীয় উচ্চতা (Meridian altitude) সমান ভাবে কম-বেশী হইয়া থাকে; পৃথিবী গোলাকার না হইলে এরূপ হইত না।

আমরা জানি, দুইটী সমান্তরাল সরল রেখা অনন্তে গিয়া মিলিত হয়। খগোলিক মেরুবিন্দু পৃথিবী অপেক্ষা এত দূরে অবস্থিত যে, সে দূরত্বের তুলনায় পৃথিবীর উপরিভাগের এক স্থান হইতে অন্য স্থানের দূরত্ব অতি সামান্য। সুতরাং যদি কোন দর্শক পৃথিবীর উপরে একস্থানে দণ্ডায়মান হয়, এবং তৎপরে সেই স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য স্থান গ্রহণ করে, এবং ওই উভয় স্থান হইতেই মেরুবিন্দু অভিমুখে দুইটী সরল রেখা অঙ্কিত করা হয়, তবে ওই রেখা দর্শকের নয়নে সমান্তরাল সরল রেখা বলিয়া প্রতীত হইবে। এইরূপ পৃথিবীর যে কোন বিভিন্ন স্থান হইতে যদি বহুবিধ রেখা মেরু অভিমুখে অঙ্কিত করা যায়, তবে, সে সকল রেখা সমান্তরাল সরল রেখা হইবে।

পৃথিবীর যে কেন্দ্র-রেখা খগোলিক মেরুবিন্দুর দিকে সর্ব্বদাই ফিরিয়া থাকে, তাহাকে পৃথিবীর মেরুদণ্ড বলে। এই মেরুদণ্ড পৃথিবীকে দুই প্রান্তে ভেদ করে; সে দুই প্রান্তকে, পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু বলা হয়। যে বৃহৎ বৃত্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া ও পৃথিবীর মেরুদণ্ডের উপর লম্বভাবে অঙ্কিত করা হয়, তাহাকে পৃথিবীর নাড়ীমণ্ডল কিম্বা ভৌগোলিক বিষুব রেখা বলা হয়। পৃথিবীর উভয় মেরু মধ্য দিয়া যে বৃহৎ বৃত্ত অঙ্কিত করা হয়, তাহাকে ভৌগোলিক ধ্রুবপোত বৃত্ত বলা হইয়া থাকে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, পৃথিবীর উপরিস্থ প্রতি স্থানেরই ধ্রুবপোত বৃত্ত আছে, এরূপ কল্পনা করা যায়। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান মতে গ্রীণউইচের ধ্রুবপোত বৃত্তকে প্রাথমিক ধ্রুবপোত বৃত্ত অথবা প্রাথমিক দ্রাঘিমা বলা হয়। কোন স্থানের ধ্রুবপোত বৃত্তের উপর যে কৌণিক দূরত্ব বিষুব রেখার উত্তর কিম্বা দক্ষিণে মাপ হয়, তাহাকে ঐ স্থানের ভৌগোলিক অক্ষাংশ বলা হয়। তদ্ভিন্ন প্রাথমিক দ্রাঘিমা কিম্বা ধ্রুবপোত বৃত্তের পূর্ব্ব অথবা পশ্চিমে, প্রাথমিক ধ্রুব-পোত বৃত্ত ও ঐ বিশিষ্ট স্থানের ধ্রুবপোত বৃত্তের মধ্যবর্ত্তী ভৌগোলিক বিষুব রেখাস্থ বৃত্তাংশ যে কোণ প্রদান করে, ঐ কৌণিক মাপকে ভৌগোলিক তুলাংশ বলা হইয়া থাকে। যে সকল স্থান বিষুব রেখার সহিত সমান্তরাল রেখায় অবস্থিত, তাহাদের সমান অক্ষাংশ, এবং যে সকল স্থানের এক ধ্রুবপোত বৃত্ত তাহাদের সমান তুলাংশ হইয়া থাকে। অক্ষাংশ উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে ০° ডিগ্রি হইতে ৯০° ডিগ্রি পর্য্যন্ত মাপা হয়, এবং তুলাংশ পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে ০° ডিগ্রি হইতে ১৮০° ডিগ্রি পর্য্যন্ত মাপা হয়।

নভোমণ্ডলে যেরূপ কর্কটমণ্ডল ও মকরমণ্ডল নামক দুইটী ক্ষুদ্র বৃত্ত কল্পনা করিয়া লওয়া হয়, ভূমণ্ডলে তদ্রূপ বিষুব রেখা হইতে ২৩° ডিগ্রি ২৮′ মিনিট দূরে দুইটী সমান্তরাল ক্ষুদ্রবৃত্ত কল্পনা করিয়া লওয়া হয়; এবং উহা-দিগকেও কর্কটমণ্ডল ও মকরমণ্ডল আখ্যা দেওয়া হয়। উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুর চতুর্দ্দিকে ২৩° ডিগ্রি ২৮′ মিনিট দূরে দুইটী বৃত্ত কল্পনা করা হয়, এবং উহাদিগকে যথাক্রমে সুমেরুবৃত্ত এবং কুমেরুবৃত্ত বলা হইয়া থাকে। পৃথিবীর যে অংশ কর্কটমণ্ডল ও মকরমণ্ডলের মধ্যে থাকে, তাহাকে উষ্ণমণ্ডল বলা হয়, এতদ্ভিন্ন কর্কটমণ্ডল, মকরমণ্ডল এবং

সুমেরু ও কুমেরু বৃত্তের মধ্যবর্ত্তী স্থানদ্বয়কে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল, ও যে অংশদ্বয় সুমেরু ও কুমেরু বৃত্ত এবং উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুর মধ্যে থাকে, তাহাদিগকে হিমমণ্ডল বলে।

পৃথিবীর ১° ডিগ্রি অক্ষাংশের দৈর্ঘ্য পরিমাণ বাহির করিতে হইলে একটী স্থান স্থির করিয়া লইতে হয়, এবং তৎপরে ঐ স্থানে মেরুবিন্দুর উচ্চতা মাপিয়া লইতে হয়। পরে আর এক স্থানে গিয়া ঐরূপ মাপ লইতে হয়, এবং এরূপ ভাবে ঐ স্থান নির্ণয় করিতে হয়, যাহাতে মেরুবিন্দুর উচ্চতা ১° ডিগ্রি কমিয়া কিম্বা বাড়িয়া যায়। এক্ষণে অঙ্কশাস্ত্র অনুসারে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, কোন এক স্থানের খগৌলিক মেরুবিন্দুর উচ্চতা, ঐ স্থানের অক্ষাংশের সমতুল; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত স্থানদ্বয়ের মেরুবিন্দুর উচ্চতা যে ঐ ঐ স্থানের অক্ষাংশের সমতুল, তাহা ইহা হইতেই প্রমাণিত হয়। অঙ্কশাস্ত্রের এই প্রমাণ অনুসারে সহজেই বুঝা যায় যে, দুই স্থানের মেরু বিন্দুর উচ্চতার যে পরিমাণ পরিবর্ত্তন হয়, সেই দুই স্থানের অক্ষাংশেরও সেই পরিমাণ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। সুতরাং পূর্ব্ব-বর্ণিত উপায়ে দুই স্থানের মধ্যবর্ত্তী মেরুবিন্দুর উচ্চতা পরিবর্ত্তন যখন ১° ডিগ্রি হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে, উহাদের মধ্যবর্ত্তী অক্ষাংশের পরিবর্ত্তনও ১° ডিগ্রি হইয়াছে। এক্ষণে যদি এই দুই স্থানের মধ্যবর্ত্তী ধ্রুবপোত বৃত্তের পরিমাপ লওয়া হয়, তবে দেখা যাইবে, উহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৬৯$\frac{১}{১৬}$ মাইল। ইহাই সাধারণতঃ ১° ডিগ্রির দৈর্ঘ্য মাপ বলিয়া ধরা হয়। বস্তুতঃ এইরূপ ভাবেই পৃথিবীর নানা স্থানে ১° ডিগ্রির মাপ লওয়া হইয়াছে; কিন্তু কোন স্থানেই পরস্পরের মধ্যে অধিক পার্থক্য দৃষ্ট হয় নাই। ইহা দ্বারা পৃথিবীর গোলত্বেরও সম্যক প্রমাণ হয়। উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুর নিকট-বর্ত্তী স্থানের ১° ডিগ্রির দৈর্ঘ্য পরিমাণ, বিষুব রেখার নিকট-বর্ত্তী স্থানের ১° ডিগ্রির দৈর্ঘ্য পরিমাণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক হইতে দেখা যায়; ইহাতে বুঝা যায়, পৃথিবীর উত্তর এবং দক্ষিণ প্রান্ত কমলা লেবুর ন্যায় কিঞ্চিৎ চাপা। সাধারণতঃ ১° ডিগ্রির পরিমাণ ৬৯$\frac{১}{১৬}$ মাইল। ইহা হইতে গণনা করিয়া পৃথিবীর পরিধি বাহির করা যায়। যথাঃ— ১° = ৬৯$\frac{১}{১৬}$ মাইল; অতএব, ৩৬০° ডিগ্রি প্রায় ২৫,০০০ মাইলের সমান। পৃথিবীর ব্যাস প্রায় ৮০০০ মাইল। দেখা গিয়াছে, বিষুব রেখার সমীপস্থ ব্যাস হইতে মেরুর সন্নিকটস্থ ব্যাস প্রায় ২৬ মাইল ছোট।

যদি কোন দর্শক বিষুব রেখার উত্তর কিম্বা দক্ষিণস্থ কোন স্থান হইতে, ঐ স্থানের ধ্রুবপোত বৃত্ত অবলম্বন করিয়া উত্তর কিম্বা দক্ষিণ অভিমুখে গমন করিতে থাকে, এবং অবশেষে উত্তর কিম্বা দক্ষিণ মেরুতে গিয়া উপস্থিত হয়, তবে সে দেখিতে পাইবে যে, খগৌলিক মেরুবিন্দু ঠিক তাহার মস্তকের উপর সর্ব্বোচ্চ বিন্দুতে (Zenith) বিরাজিত রহিয়াছে। তাহার দিঙ্‌মণ্ডল খগৌলিক বিষুব-রেখার সহিত মিশিয়া যাইবে; এবং নক্ষত্রের দৃশ্যমান আহ্নিক গতিকক্ষ দিঙ্‌মণ্ডলের সহিত সমান্তরাল ক্ষুদ্র বৃত্ত রূপে দেখা যাইবে। সুতরাং এই সকল নক্ষত্র মেরুকেন্দ্রীয় হইবে। যে সকল নক্ষত্র বিষুব রেখার দক্ষিণে কিম্বা উত্তরে থাকিবে, অর্থাৎ দর্শক বিষুব রেখার যে পার্শ্বে থাকিবে তাহার বিপরীত পার্শ্বে রহিবে, সে সকল নক্ষত্র তাহার দৃষ্টিগোচর হইবে না। উত্তর কিম্বা দক্ষিণ মেরুতে যে দর্শক অবস্থান করিবে, নভোমণ্ডলের অর্দ্ধাংশের অধিক তাহার নয়ন-পথে আসিবে না; কিন্তু যে অর্দ্ধাংশ দৃষ্টি-গোচর হইবে, তাহা কখনই অস্ত যাইবে না, এবং সর্ব্বদাই তাহার দৃষ্টি-পথে থাকিবে। সূর্য্য ২১শে মার্চ্চ হইতে ২৩শে জুন পর্য্যন্ত বিষুবরেখার উত্তরে থাকে বলিয়া, এই ছয় মাস উত্তর মেরুস্থ দর্শকের দিঙ্‌মণ্ডলের উপরে থাকিবে, এবং একেবারেই অস্ত যাইবে না। বৎসরের এই সময়ে দক্ষিণ মেরুস্থ দর্শক সূর্য্যকে একেবারেই দেখিতে পাইবে না। উত্তর মেরুতে এই সময়ে, সূর্য্য দিঙ্‌মণ্ডলের সহিত প্রায় সমান্তরাল বৃত্ত পথে ভ্রমণ করিবে, এবং ঠিক ২৪ ঘণ্টা সময়ে একটী সম্পূর্ণ বৃত্ত আবর্ত্তন করিবে। সূর্য্যের ক্রান্তির ক্রমাগত পরিবর্ত্তন না হইলে, এই ভ্রমণ-পথ দিঙ্‌মণ্ডলের সহিত একেবারেই সমান্তরাল হইত। সূর্য্যের উচ্চতা ২১শে জুন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়, এবং এই সময়ে ইহার পরিমাণ হয় ২৩° ডিগ্রি ২৮´ মিনিট। ইহার পর ছয় মাস সূর্য্য দিঙ্‌মণ্ডল হইতে নিম্নে অবস্থান করে; এবং ২১শে ডিসেম্বর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিম্নতা প্রাপ্ত হয়; এই সময়ে ইহার পরিমাণ ২৩° ডিগ্রি ২৮´ মিনিট হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, উত্তর মেরুতে ছয় মাস একাদিক্রমে দিবা এবং ছয় মাস রাত্রি থাকে। এই ছয় মাস রাত্রিতেও অনেক সময়েই

গোধূলির আলোক থাকে। উত্তর মেরুর এই ছয় মাস ব্যাপী রাত্রি থাকা কালে দক্ষিণ মেরুতে ছয় মাস ব্যাপী দিবা হইবে এবং উত্তর মেরুতে যখন ছয় মাস দিবা হইবে, দক্ষিণ মেরুতে তখন ছয় মাস রাত্রি হইবে।

যদি দর্শক বিষুবরেখার উপর অবস্থান করে, তবে দেখিবে, উত্তর মেরুবিন্দু উত্তর মেরুতে এবং দক্ষিণ মেরুবিন্দু দক্ষিণ মেরুর সহিত একেবারে মিলিত হইয়াছে। ঐ স্থানে খগোলিক বিষুবরেখা মস্তকের উপর সর্ব্বোচ বিন্দু (Zenith) এবং নিম্নে পাদবিন্দু (Nadir) দিয়া গমন করিবে। ইহা ছাড়া এই স্থানে বিষুবরেখা দিঙ্মণ্ডলকে লম্বভাবে কর্ত্তন করিবে। নক্ষত্রবর্গের পরিদৃশ্যমান দৈনিক কক্ষ খগোলিক বিষুবরেখার সহিত সমান্তরাল বলিয়া, দিঙ্মণ্ডল দ্বারা লম্বভাবে ও দুই সমভাবে বিভক্ত হইবে। অতএব এই স্থানে নক্ষত্রবৃন্দ দিঙ্মণ্ডলের উপরে ও নীচে ঠিক সমান সময়ে সমভাবে অবস্থান করিবে। ইহা ব্যতিরেকে কোন মেরুকেন্দ্রীয় তারকা নয়নগোচর হইবে না। প্রতি নক্ষত্রই প্রায় ১২ ঘণ্টা সময় দিঙ্মণ্ডলের উপরে অবস্থান করিবে এবং বৎসরের মধ্যে সমস্ত সময়েই দিবারাত্রি সমান হইবে।

এতক্ষণ আমরা কল্পনা করিয়া লইয়াছি যে, পৃথিবী স্থির ভাবে আছে, এবং সমস্ত গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্য্য উহার চতুর্দ্দিকে চক্রাকারে ভ্রমণ করিতেছে। পৃথিবীই যে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে স্বীয় মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিতেছে, এবং তাহাতেই যে এই সকল গ্রহ নক্ষত্র গতিশীল বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহা কয়েকটী উপায়ে সাব্যস্ত করা যায়।

(১) সহজ ভাবে—কোপার্নিকাসের সময়ে এই সমস্যা পূরণের একটী মাত্র ব্যবস্থা ছিল ; তাহা এই :—

সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রের পক্ষে এরূপ জটিল ভাবে অবস্থান করিয়া মেরুবিন্দু কেন্দ্র করিয়া ভ্রমণ করা অপেক্ষা পৃথিবীরই স্বীয় দণ্ডের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ এবং সম্ভব।

(২) তুলনা দ্বারা—১৬০৯ খৃঃ অব্দে দূরবীণ আবিষ্কারের পর, দূরবীণ দ্বারা দেখা গিয়াছে যে সূর্য্য, চন্দ্র এবং অনেক গ্রহ স্বীয় মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করিয়া থাকে ; তাহা দ্বারা অনুমান করা হয় যে, আমাদের পৃথিবীও স্বীয় দণ্ডের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করিতেছে।

(৩) মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দ্বারা—যদি সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ এবং নক্ষত্রগণ এরূপ বৃহৎ কক্ষ এক দিনে ভ্রমণ করিত, তবে ইহারা যাহাতে স্বীয় কক্ষ হইতে বিচ্যুত না হয়, সেই নিমিত্ত অত্যন্ত অধিক পরিমাণে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রয়োজন হইত। কিন্তু, কোন গ্রহ নক্ষত্রের এত অধিক মাধ্যাকর্ষণ শক্তি থাকিতে পারে না। অতএব সূর্য্য এবং গ্রহগণের পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে গতি কল্পনা করা অলীক বলিয়া বোধ হয়।

(৪) কোন উচ্চ স্থান হইতে প্রস্তর কিম্বা কোন ভারী জিনিস নিক্ষেপ করা :—নিউটন প্রথমে বলিয়াছিলেন যে, পৃথিবী যদি পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে ভ্রমণ করে, তবে কোন উচ্চ স্থান হইতে যদি কোন প্রস্তর নিক্ষেপ করা যায় এবং ঐ স্থান হইতে একটী লম্বরেখা পৃথিবীর উপর অঙ্কিত করা যায়, তবে উহা ঐ রেখার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে পতিত হইবে। কিন্তু বাস্তবিক এই পরীক্ষা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ; কারণ যত উচ্চ শিখরই হউক না কেন, পৃথিবীর কেন্দ্ররেখার তুলনায় তাহার উচ্চতা অত্যন্ত অল্প। বোলন এবং হ্যামবার্গে এই পরীক্ষাটী করা হইয়াছিল ; দেখা গিয়াছে, ২৫০ ফিট্ উচ্চ হইতে কোন প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে, উহা লম্বরেখার এক-তৃতীয়াংশ দূরে পতিত হয়।

তস্মিন্ তুষ্টে—

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

নটবরবাবু ফিলিপ জোন্স এণ্ড কোম্পানীর আফিসের বড়বাবু। অসীম প্রতাপ, ভীষণ প্রতিপত্তি; সাহেব একেবারে তাঁহার মুঠার মধ্যে। বড়বাবু যাহা বলেন, তাহাই হয়; যাহাকে রাখেন, সেই থাকে; তিনি বিরূপ হইলে ফিলিপ জোন্স-এর অন্ন তাহার উঠিয়া যায়।

বড়বাবুর বয়স বেশী নয়, বড় জোর পঁয়তাল্লিশ, ছেচল্লিশ হইবে। বেশ মোটা-সোটা দেহখানি; মাথায় কাঁচা-পাকা চুলের বেশ শোভা; গোঁফ দাড়ী কামান; তাহাতে বয়সের চেয়ে তাঁহাকে কম দেখায়। বিপত্নীক হইয়া নটবরবাবু একটি যুগ শুদ্ধাচারে ও শুদ্ধান্তঃকরণে স্বর্গগতা পত্নীর ধ্যান করিয়াছিলেন, সম্প্রতি বৎসর খানেক হইল, ধ্যান ভগ্ন হইয়াছে। নটবরবাবু এক বিগত-বৈভব সম্ভ্রান্ত বনিয়াদী ঘরের একটি বড়-সড় কন্যার কুমারীত্ব লোপ করিয়া, অঙ্কশায়িনী করিয়াছেন। এরূপ করিবার ইচ্ছা তাঁহার আদৌ ছিল না; নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই তাঁহাকে দ্বিতীয়বার টোপর ধারণ করিতে হইয়াছিল। আহা, সংসারে তাঁহার আপনার বলিতে যে কেহই ছিল না। বার বছর বড় কষ্টেই কাটিয়াছিল।

সেদিন 'বরষা ঝর ঝর ঝরে'—বড়বাবু ছাতাটি মাথায় দিয়া, পেণ্টলুনের পা দু'টি জানুর উপরে তুলিয়া, কাদায় চপ চপ করিতে করিতে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। পেয়ালা দুই গরম চা ও আনুষঙ্গিক যা'হক-কিছু গরম গলাধঃকরণ করিয়া শরীরটা তাতাইয়া লইয়া বড়বাবু বাহিরের ঘরে জুতা ও কর্দ্দমাক্ত পেণ্টলুন, কোট পরিত্যাগ করিয়া, দ্বিতলে উঠিলেন।

বড়বাবুর নবোঢ়া পত্নী ঘরের মধ্যে বসিয়া, একখানি মাসিক-পত্রিকার ছবি দেখিতেছিলেন, অথবা পড়িতে-ছিলেন ঠিক বলিতে পারি না, আড় নয়নে একবার বড়-বাবুকে দেখিয়া লইয়া পত্রিকাতেই মনোনিবেশ করিলেন।

শরীরটা তাতাইয়া লইবার যে উক্ত-প্রস্তাবটি মুখস্থ করিতে করিতে বড়বাবু দ্বিতলে উঠিয়াছিলেন, রুষ্ট-নেত্র পণ্ডিত-মহাশয়ের সম্মুখীন হইবামাত্র নিরীহ শিশু যেমন নিঃশেষ পাঠ ভুলিয়া যায়, তিনিও তদ্রূপ বিস্মৃত হইলেন। অভিজ্ঞতাটা এক বৎসরের মাত্র হইলেও, নটবরবাবু বুঝিলেন, আজ বরাতটা নিতান্তই মন্দ!

বাহিরে তখনও আকাশ হইতে বৃষ্টি ঝরিতেছিল।

নটবর স্ত্রীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, জিজ্ঞাসিলেন—ওটা কি পড়ছো গো?

তাঁহার পত্নীর নাম, বিমলপ্রভা! বিমল কথাটার মধ্যে কথঞ্চিৎ পৌরুষভাব মিশ্রিত থাকায়, নটবরবাবু প্রভা নামটিই পছন্দ করিয়া লইয়াছিলেন, সুতরাং আমরাও সেই নামে অভিহিত ক'রতে বাধ্য।

প্রভা বলিলেন—একখানা কাগজ! বলিয়া তিনি কাগজখানি মুড়িয়া বক্র-কটাক্ষে জিজ্ঞাসিলেন—আমার পিসতুতো ভাই সরোজ-দা পর্শু তোমার আফিসে গেছল?

নটবর বলিলেন—হ্যাঁ, গেছল।

একটা চাকরী ত খালি ছিল, তাঁকে দিলে কি তোমার মহাভারত নর্দমায় পড়ে যেত?

বড়বাবুর যুক্তি ছিল বলিবার যে, আফিসে আত্মীয়-কুটুম্বকে কর্ম দিতে নাই; তাহাতে শৃঙ্খলার হানি ঘটিয়া থাকে। কিন্তু রুষ্ট পণ্ডিতমহাশয় ও নিরীহ ছাত্রের অবস্থাটা সেখানেও বিদ্যমান। যুক্তি ভুলিয়া, কহিলেন—আমাদের আফিসে নিয়ম আছে, ম্যাট্রিকুলেশন পাশ না হলে লোক নেওয়া হয় না।

প্রভা জিজ্ঞাসিলেন—ম্যাট্রিকুলেসন কি? এন্‌ট্রেন্স?

বড়বাবু বলিলেন—তাই।

সরোজ দা এন্‌ট্রেন্স পাশ করে নি কে বল্লে তোমায়! সে ত এফ্‌-এ পর্য্যন্ত পড়েছে।

আফিসের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ বড়বাবু গৃহে চোরেরও অধম। মুখ দিয়া কথা সরিল না।

প্রভা রোষগম্ভীর ও দুঃখম্লান কণ্ঠে কহিলেন—তুমি তার কাগজপত্রগুলো দেখতে সময় পাও নি বুঝি?

প্রভার অনুমানটা কিন্তু মিথ্যা নয়। তবে তাহা কবুল করাও শক্ত।

প্রভা বলিলেন—তা দেখবে কেন? তার একটি চাকরী হ'লে যে আমার বাপ-মার উপকার হয় কি না! তা কি তুমি করতে পার? আমার বাবা বুড়ো মানুষ, ঐ সামান্য রোজগার, তাতে সরোজ-দা'দের তিন ভাইকে পুষতে হয়। তারা কিছু-কিছু আনতে পারলে বাবারই কাঁধটা একটু হাল্কা হোত! তুমি আবার ততখানি করবে! এক বছরের ওপর বিয়ে হয়েছে, কখনও একটা মুখের কথায়ও তাঁদের খবর নিয়েছ? অথচ আমার বাপ-মা কত আশা করেই না দোজবরে বুড়ো বরে কন্যাদান করেছিলেন।—বলিতে বলিতে শ্রীমতী বিমল-প্রভার গলাটা ধরিয়া আসিল এবং চক্ষু-তারকার পশ্চাতে জল টল টল করিতে লাগিল।

অন্যের অদৃশ্য স্থানে সে জল-রাশি অবস্থিত থাকিলেও দোজবরে ও বুড়ো বরের চক্ষে তাহা অতি সহজেই ধরা পড়িল। দোজবরে বরের মনটি ক্ষুণ্ণ ও বৃদ্ধ হৃদয় শঙ্কিত হইয়া উঠিল। কৃত কর্ম্মের অনুশোচনায় প্রাণ পুড়িতে লাগিল। বলিলেন, তোমার সরোজদা বুঝি শ্বশুর ম'শায়ের গলগ্রহ?

প্রভা কথা কহিলেন না। কতক্ষণে তারকার পশ্চাৎ নিহিত চোখের জলটা সামনে আসিয়া পড়ে, তাহারই প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

নটবর বলিলেন—সরোজকে কাল আফিসে যেতে বলো; কাজটি আজও খালি আছে।

প্রভা যে ইহাতেও সন্তুষ্ট হইলেন না, তাহা দোজবরে ও বৃদ্ধ বরের অজ্ঞাত রহিল না। নটবর তাই বলিলেন—আর ত কেউ কখনো আমার কাছে আসে নি, এলে কি আর সত্যিই কিছু করে' দিতে পারতুম না!

প্রভা বলিলেন—কোন্ সাহসে যাবে বল? তুমি যে আমার বাপ-মায়ের জামাই তা কোন দিন বুঝতে দিয়েছ? কখনও সে বাড়ীর পথ মাড়িয়েছ? কোন্ সাহসে, কোন্ মুখে লোক যাবে? বাবা ত প্রায়ই দুঃখ করে বলেন, কত সাধের বড় জামাইটি আমার, সময়ে অসময়ে কত উপকার পাব ভেবেছিলুম; এমনি বরাত যে জামাই এক-দিন চোখের দেখাও দেখে যান্ না। মা মুখে কিছু বলেন না বটে, তবে তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছেই!

দ্বিতীয় পক্ষের জননীর অশ্রুর সংবাদে নটবর বাবু দুঃখে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন এবং প্রভার চক্ষু-তারকার পিছন হইতে যে বারিরাশি বহু সাধ্য-সাধনাতেও অগ্রগমনে বিরত ছিল, তাহাই এখন নিঃসঙ্কোচে বাহির হইয়া আসিল। প্রভা বস্ত্রাঞ্চলে মুখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন- আমাদের বির (বৃহৎ) গোষ্ঠি, সবাই মা'কে ঠাট্টা করে, বলে, কৈ গো জামাই যে শ্বশুরবাড়ীর নামও করে না! মা আর কি জবাব দেবেন, জবাব দেবার আছেই বা কি!

অশ্রুর বেগ প্রবল হইল; প্রভা ঘন ঘন চক্ষু মুছিতে লাগিলেন।

নটবর বলিলেন—পশু' রবিবার; পশু'ই যাব। বড্ড অন্যায় হয়ে গেছে। কি জান, বড় ভুলো মানুষ, তুমি যদি একবার মনে করিয়ে দিতে…

—অমন অধর্ম্মের কথা বল না, আমি প্রথম প্রথম…

নটবর বলিলেন—আচ্ছা এই রবিবার থেকে তুমি দেখো, ফি রবিবার আর ছুটীর দিনে আমি যাই কি না! সরোজকে খবর দেবার কি হবে?

—সে কাল আসবে বলে গেছে।

—এলেই পাঠিয়ে দিও, বুঝলে?—বলিয়া নটবর পত্নীর পার্শ্বে পতিত পত্রিকাখানি তুলিয়া লইলেন।

২

শ্বশুরবাড়ীর গোষ্ঠিটা যে এত বৃহৎ আর তাহাতে এত বেকার ব্যক্তিও ছিল, নটবর সুদূর কল্পনাতেও তাহা জানিতেন না। নিয়মিত কয়েকটা রবিবারে পদার্পণ করিয়াই তাহা বুঝিলেন। প্রতি রবিবারেই, তাঁহার খাশুড়ীর জল খাবারের থালার সঙ্গে সঙ্গে একখানি দুইখানি করিয়া আবেদন-পত্র তাঁহার হস্তগত হইতে লাগিল। আবেদন-পত্রের রচয়িতারা কচিৎ তাঁহার সম্মুখীন হইত; তবে তাহাদের শর-সন্ধান যে অব্যর্থ, তাহা না বলিলেও বোধ হয় চলিতে পারে। শ্বশ্রূমাতার আশীর্ব্বচন ও অশ্রু তাহাদের হইয়া যে কার্য্য করিত, তাহারা বাবা-তারকনাথের মাথায় ফুল চড়াইয়াও ততটা করিতে পারিত কি না সন্দেহ।

ফিলিপ জোন্স এণ্ড কোম্পানীর আফিসে একটা আতঙ্কময় বায়ু প্রবাহিত হইয়াছিল। বাবুরা দুর্গা নাম স্মরণ করিয়া আফিসে আগেও ঢুকিতেন, তবে এখন সেই একবার মাত্র সে নাম স্মরণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না।

প্রতি ঘণ্টাতেই একবার দুইবার মা'র কাণে তাঁহাদের আকুল আহ্বান পৌছিতেছে। মা দুর্গা খুব দূরে থাকেন, ইহা জানিয়াই বোধ হয় বাবুরা উচ্চকণ্ঠেই আজকাল ডাকাডাকি করিতেছেন।

পুরাতন অনেকগুলি কর্ম্মচারীকে সসম্মানে বিদায় দেওয়া হইয়াছে। মা-দুর্গা তাহাদের জন্য কিছুই করিতে পারেন নাই বা করেন নাই, কথা একই! বিদায়কালে বাবুরা মনে মনে ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, এ-কালে দশভূজা দেবী দুর্গার অপেক্ষা দুই হাত দুই পায়ের মানুষ বড় বাবু অধিক শক্তির অধিকারী। গ্রাম বা সহরের আশে-পাশের বাড়ীতে মারী মড়ক উপস্থিত হইলে, অন্য লোকের মানসিক অবস্থা যে গতি প্রাপ্ত হয়, ফিলিপ জোন্স আফিসের বাবুদেরও মনের অবস্থা সেই গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন, যে দিনটি কাটে, সেই দিনটাই ভাল, অবস্থা এইরূপ!

নটবর বাবুর শ্বশুরবাড়ীর এক ক্ষণজন্মা আদি-পুরুষ ভারতে নবাবী রাজত্বের শেষ আমলে স্বীয় বুদ্ধি ও বিশেষ কোন বিদ্যার বলে বহু জমিদারী এবং সম্মানজনক রাজা খেতাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আজিও এত কাল পরেও, সেই বংশের বৃদ্ধ, যুবক ও বালকগণ "কুমার" আখ্যাধারী। সুতরাং নিতান্ত নির্বুদ্ধি লোকেও ইহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে আদি-পুরুষের বিদ্যা-বুদ্ধি-লব্ধ জমিদারী অন্যের করকবলিত এবং সমুদায় অর্থ পঙ্কোদ্ধের হওয়ায়, অন্যত্র উড্ডীন হইয়া গেলেও তাঁহাদের আভিজাত্য-গর্ব্বের লাঘব কিছুমাত্র হয় নাই। তাঁহারা, ফিলিপ জোন্স কোম্পানীর উর্দ্ধতন বহু পুরুষের মুখোজ্জ্বল করিয়া, কোম্পানীর অর্থ পকেটস্থ করিলেও, কেরানীর গাধা-খাটুনি খাটিতে ও ধূলা মাখিয়া ফাইল ঝাড়িতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহাদের সার্টের কপ্ উজ্জ্বল থাকিতে থাকিতেই ছিঁড়িয়া ঝুলিয়া পড়িত, কিন্তু ধূলা লাগিবার দুর্ভাগ্য তাহাদের হইত না। আর, তাহার প্রয়োজনও ছিল না। বিমলের স্বামী যেখানে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ বড় বাবু, দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, সেখানে অন্যে গাধা বা আরও নিম্নজাতির কোন পশুর যোগ্য খাটুনি খাটিতে পারে—তাঁহারা কেন খাটিবেন? বিশেষতঃ সাহেব বাবুরা নিঃসম্পর্কীয় কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ যখন সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের কাজ করিয়া দিয়া, তাঁহাদের তুষ্টি সাধনে তৎপর, তখন তাঁহারা টেবিলের ড্রয়ারে রক্ষিত আর্সি চিরুনী ও পকেটের রুমালের তত্ত্বাবধান করিয়া যদি কালাতিবাহন করেন, তবে তাঁহাদিগকেই বা অপরাধী করা যায় কিরূপে?

অপরাধ যাহারই হোক, কর্ম্মে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। এবং একদিন এমন একটা কাণ্ড ঘটিল, যে, বড় সাহেবকে সন্তুষ্ট করিতে নটবর বাবু প্রভার খুল্লতাতপুত্র কুমার মণীন্দ্রলালকে ডিশ্‌মিস করিতেও বাধ্য হইলেন। বড় সাহেব নিজে তাহাকে ধরিয়া লইয়া বড়বাবুর সম্মুখে ছাড়িয়া দিয়া, তাহার অপরাধের একটা দীর্ঘ ফিরিস্তি দাখিল করিয়া, বিচারফল জানিবার জন্যই যেন দাঁড়াইয়া ছিলেন। বড় বাবু কুমার বাহাদুরকে ইংরেজীতে ডিশ্‌মিস করিলেন ও বাঙ্গালায় ছুটির পর রাস্তায় সাক্ষাৎ করিতে কহিলেন। কিন্তু একঘর লোকের সামনে স্বয়ং ভগ্নীপতি কর্ত্তৃক এবম্প্রকারে অপমানিত হওয়ায় কুমার বাহাদুরের আভিজাত্য আহত হইয়াছিল, ছুটির পর বড় বাবু রাস্তায় পড়িয়া বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও আর তাঁহার দর্শন পাইলেন না।

দিন দুই পরে বড়বাবু আফিসে ঢুকিয়াই রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। মহাদেবের তাণ্ডব নৃত্যে পৃথিবী কাঁপিয়াছিল, নটবরের নৃত্যে আফিস টলটলায়মান। সেদিন চারজন বাবু কর্ম্ম হারাইয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে আফিস ত্যাগ করিলেন। বলা প্রয়োজন, আফিসের হিতৈষী বড়বাবু কাজের ক্ষতি সহিতে পারিতেন না, সেই দিনই চারজন লোক এপয়েণ্টেড হইল।

কিন্তু কুমার মণীন্দ্রনাথের চাকরী করিয়া দিতে, প্রবল প্রতাপান্বিত বড় বাবুও হার মানিলেন। বড় সাহেবটার ঐ কেমন এক গোঁ, চেনে না'ত চেনে না, একবার যদি চিনিল, তবে গোরে গিয়াও আর তাহাকে ভুলিবে না। একদিন মণীন্দ্রকে আফিসে ঢুকিতে দেখিয়াই তাহার ভগবতী-দেহ-পুষ্ট শরীর নড়িয়া উঠিল। বড়বাবুর কামরায় আসিয়া সেই লোকটা আবার কেন আসিয়াছে, সাহেব তাহার কৈফিয়ৎ চাহিল। নটবর শ্রেফ মিথ্যা বলিলেন, উহার কয়দিনের মাহিয়ানা বাকী ছিল; লইতে আসিয়াছে। সাহেব বলিল, এখনি দিয়া বিদায় কর।

প্রভা শয্যায় শায়িতা। মাথা ধরিয়াছে, পেট ব্যথা করিতেছে, জ্বর আসি-আসি হইয়াছে, সর্ব্বাঙ্গে বেদনাও হইয়া আসিল বলিয়া ;—বিশেষ বিলম্ব আর নাই।

একসঙ্গে এতগুলা উৎকট ব্যাধির যন্ত্রণায় প্রভা চক্ষু চাহিতেই পারিতেছে না, তা নটবরের সঙ্গে কথা কহিবে কি! নটবর মাথায় গায়ে—অবশেষে পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে উদ্যত হইলেন।

প্রভা বলিলেন, থাক্, অত সোহাগে আর কাজ নেই। মরছি আমি নিজের জ্বালায়, উনি আবার পায়ে হাত দিয়ে আমাকে নরকে পাঠাচ্ছেন!

নটবর জ্বালার শরীরে শান্তি ফিরাইয়া আনিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন, কহিলেন, ডাক্তার ডাকি! কি বল?

প্রভা বলিলেন, বলছি বকিও না, তবু ঘ্যানর ঘ্যানর করবে!

নটবর নিঃশব্দে প্রস্থানোদ্যত হইলেন। প্রভা বলিলেন,—থাক্ গো থাক্, খুব হয়েছে। আর ডাক্তার ডেকে টাকা দেখাতে হবে না! গরীব দুঃখীকে একটা পয়সা দিতে হলে বুক ফেটে যায়, উনি আবার ডাক্তার আনতে যাচ্ছেন।

নটবরের মুখ পাংশু হইয়া আসিল। অতি বড় শত্রু-তেও এই একটা অপবাদ দিতে পারিত না। গরীব দুঃখী হাত পাতিয়া নিষ্ফল তাঁহার কাছে কখনও হয় নাই। আফিসের মাহিনার দিন তিনি পনেরো কুড়ি টাকার চক-চকে পয়সা কারেন্সি আফিস হইতে ভাঙ্গাইয়া আনিতেন এবং সেগুলি পথের আতুর, ভিক্ষুকগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতেন। এই টাকা কটা ছাড়া সমস্তই তিনি অপব্যয় মনে করিতেন। কাজেই তীব্র প্রতিবাদ তিনি করিতে পারিতেন ; কিন্তু জ্বালার শরীরে জ্বালা বাড়াইতে পারে কোন্ হৃদয়হীন, কোন্ দোজবরে, কোন্ বৃদ্ধ?

প্রভা যন্ত্রণায় কাৎরাইতে কাৎরাইতে বলিলেন—আমার খুড়তুতো ভাই মণিকে চেন?

আকাশ যে কি বর্ণ ধরিতেছে, তাহা ভাবিতেও নট-বরের হৃৎকম্প উপস্থিত।

—বলি চেন, না, না?

—চিনি বৈ-কি!

—সে কাল তোমার সঙ্গে আফিসে দেখা করতে গেছল, দেখা কর নি, কেন?

বড়বাবু ব্যাপারটা স্মরণ করিয়া নীরবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

প্রভা ক্লিষ্ট স্বরে কহিলেন,—বাবাই তাকে চিঠি দিয়ে তোমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। নইলে সে যে ঘরের ছেলে, কারু কাছে হাত পাতবার আগে গলায় দড়ি দিত, আফিং খেত, আত্মহত্যে হ'ত!

বড়বাবু স্তব্ধ।

—তাদের নাকি বড্ডই অবস্থাটা খারাপ হয়ে পড়েছে, হাঁড়ী চড়ছে না বল্লেই হয়, তাই বাবার চিঠিখানা নিয়ে তোমার দরজায় গেছল।

ঈশ্বর জানেন, বড়বাবু এ সকলের বিন্দুবিসর্গও অবগত ছিলেন না ; কিন্তু দোজবরে বৃদ্ধ স্বামীর সত্য উক্তি কি কখনও কোন নবোঢ়ার নিকট আদৃত হয়? না, সত্য বলিয়া গৃহীত হয়? নটবর দেড় বৎসরের অভিজ্ঞতায় ইহা প্রণিধান করিয়াছেন।

জ্বালার শরীরে, জ্বলিতে জ্বলিতে প্রভা বলিলেন—অপমানটা ত আর তাকে করা হল না, আমার বাবারই অপমান হল! তাঁর চিঠি ছিঁড়ে কুচি কুচি করে…

কুচি কুচি? চিঠি? ওঃ! নটবর কি অপকর্ম্মটাই করিয়া ফেলিয়াছেন! সত্যবাদী কুমার বাহাদুর কি অল্প কষ্টে কথাগুলা জেঠতুতো ভগিনীর গোচর করিয়া গিয়াছেন!

প্রভা বলিলেন—ফেলে দেওয়া হল, এতে অপমানটা কি মণির হল! না, আমার বাবার মাথায় জুতো মারা হল?

নটবর ত্রস্তে কি একটা বলিতে গেলেন, প্রভা সে অবসর দিলেন না, বলিলেন—বাবারও যেমন মরণ হয় না, তাই বড়বাবু জামাইয়ের কাছে চিঠি পাঠাতে গেলেন! ওঃ, কি আমার জামাই গো! হ্যাঁ, প্রথম পক্ষের জামাই হত, প্রাণ দিয়ে শ্বশুরের মান রাখতো! দ্বিতীয় পক্ষের আবার বিয়ে! তার আবার জামাই! আসুন-না বাবা একবার এখানে, বেশ করে দশ কথা না শুনিয়ে দিই ত আমি তাঁর মেয়েই নই।

নটবর সে-রাত্রে মুহ্যমান হইয়া বিছানার পাশে পড়িয়া রহিলেন ; ঘুম হইল না। একা বিছানায় পড়িয়া ছট ফট করিতে লাগিলেন। পার্শ্বে অশেষ যন্ত্রণায় জ্বালায়

পুড়িয়া তাঁহার যুবতী স্ত্রী নিদ্রিতা হইয়াছেন। পাছে জ্বালা বাড়ে, যন্ত্রণা দেখা দেয়, কাতরাণি আরম্ভ হয়, তাহাকে ডাকিয়া তুলিয়া যে দু'টা কথা কহিবেন, তাহারও সাহস বা সুযোগ নটবরের হইল না।

৩

বড় সাহেব জোন্স বিলাত চলিয়া গেল; ফিলিপ বিলাতে ছিল, ফিরিয়া আফিস্ তরণীর হাল ধরিল। তাহার এক দিন পরেই কুমার মণি বাহাদুর পঞ্চাশটাকা মাহিনার একটি কর্ম পাইল।

ফিলিপ জোন্স কোম্পানীর আফিসটি খুব বড় নয়। জন বাইশ বাবু, একজন বড় বাবু, দুইটা সাহেব, একটা দরওয়ান, দুইটা বেহারা, ইহা লইয়াই আফিস। বর্ত্তমানে বাইশজন বাবুর মধ্যে বিশ জন বহুকালপূর্ব-লুপ্ত নবাবী আমলের অনুগৃহীত রাজা ও একটা সুবৃহৎ বংশ-প্রতিষ্ঠাতার বংশ হইতে সমুদ্গত। দুইজন পুরাণো বাবু যাঁহারা দুর্গা নাম স্মরিয়া এখনো টিকিয়া আছেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন, ক্যাসিয়ার। যে টাকা জমা দিয়া এই চাকরির চেয়ারটিতে বসিতে হয়, তাহা রাজ-বংশের আয়রণচেষ্টে আপাততঃ অবর্ত্তমান। অপর বাবুটি, বাজার-ম্যান্! বাজার তাঁহার নখ-দর্পণে! আর বাজারের উপরই আফিস অধিষ্ঠিত, বড়বাবু সেখানে হাত দিতে সাহস করেন নাই। বেহারা দুইজনের একজনকে চাকরী খোওয়াইয়া দেশে যাইতে হইয়াছে, তাহার স্থানে শ্বশুরবাটীর পুরাতন কালের একটি পাচিকা-পুত্র নিয়োজিত হইয়াছে।

আফিসের খবর ঐ; বাড়ীর খবর খুবই সুখপ্রদ। এখন নটবর জুতা না ছাড়িতেই চা পাইয়া থাকেন। আজকাল আর পাণের চূণে গণ্ড বিদগ্ধ হয় না এবং জামার বোতামের অভাবে আফিসের আলপিন গুঁজিয়া সদাই যাত্রার সং সাজিয়া থাকিতে হয় না। এখন আফিস বাহির হইবার সময় প্রিয়ার স্ব-হস্তে ভাজা ও শ্রীহস্তে কলাপাতা কাগজমোড়া খাবারের পুঁটুলি পকেটে ভারি হইয়া উঠে; টিফিনের সময় মোড়ক খুলিয়া, নিত্য নূতন তরকারী ও মিষ্টের সন্দর্শন লাভে বৃদ্ধ নটবরের যৌবন ফিরিয়া আসিতে লালায়িত হইয়া পড়ে।

ফিলিপ সাহেব এবার বিলাত হইতে আসিয়া অবধি আমাশয়ে ভুগিতেছে; মাঝে মাঝে সারে, আবার বাড়িয়া উঠে। তিন মাসে তাহার ওজন তের সের কমিয়া গিয়াছে ফিলিপ বড়ই চিন্তিত। বিলাত হইতে প্রতি মেলে ফিলিপ-পত্নী ফিলিপকে দেশে ফিরিতে লিখিতেছে; এখানকার বন্ধুরাও সেই পরামর্শ দিতেছে। তবু যে ফিলিপ যাইতেছে না, তাহার একমাত্র কারণ দেড় বৎসরের বিরহক্লিষ্ট জোন্স ছ' মাসের জন্য দেশে গিয়াছে, তাহাকে এত শীঘ্র ফিরাইয়া আনিয়া তাহার পত্নীর অভিশাপগ্রস্ত হইতে সে প্রস্তুত নহে।

কিন্তু আর উপায়ও নাই। ফিলিপ দুই একদিন রক্ত-বিন্দুও লক্ষ্য করিল। ডাক্তাররা বলিলেন—এখনই প্যাসেজ বুক কর, নহিলে হাড় ক'টা ড্যাম ইণ্ডিয়ার কালা মাটীতেই থাকিয়া যাইবে। অগত্যা ফিলিপ জোন্সকে তার করিল।

জোন্স দেশে ফিরিয়াই ডাইভোর্স কেসের প্রতিবাদী হইয়া কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহার সুন্দরী স্ত্রী দেড় বছরের বিরহে দ্বিগুণ সুন্দরী হইয়া যুদ্ধ-ফেরত এক কর্ণেলের সঙ্গে সুখ-বাস করিতেছে, স্বামীকে দেখিয়াই আদালতের আশ্রয় লইয়া আপনাকে মুক্ত করিয়া ফেলিল। জোন্স এই সময়েই, ফিলিপের তার পাইয়া ভারতবর্ষে রওনা হইল। বিবাহ আর করিবে না, নারী জাতির উপর তাহার অত্যন্ত ঘৃণা জন্মিয়া গিয়াছে। সে দারুণ ঘৃণা, বিরক্তি ও ক্রোধ লইয়া ভারতের মাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। ফিলিপ হাড় কখানাকে টানিতে টানিতে জাহাজে চড়িয়া চলিয়া গেল।

জোন্স আফিসে বসিল বটে, কিন্তু প্রথম কয়দিন কাজে তেমন মন দিতে পারিল না। তার পর ধাতটা বসিয়া গেল, জোন্স বলদের মত কাজে মাতিয়া উঠিল।

প্রথমেই নজর পড়িল, কুমার বাহাদুরের উপর। আজ আর সে বড়বাবুর ঘরে গিয়া তাঁহার চেয়ারের পার্শ্বে দাঁড়াইল না; ঘণ্টা বাজাইয়া বেহারা ডাকাইয়া সেলাম পৌছাইয়া দিল।

—ও লোকটাকে কে নিয়াছে?

বড় বাবু শুষ্কমুখে বলিলেন, আমিই নিয়াছি। বড় দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি, অত্যন্ত দরিদ্র...

সাহেব বলিল, আমি গীর্জার বক্তৃতা শুনিতে চাই না। আমি জানিতে চাই, আমি দুইবার উহাকে তাড়াইয়া দিয়াছি—তুমি জানিতে?

—জানিতাম।

—আবার তাহাকে লইয়া তুমি...

—অন্যায় হইয়া গেছে।

—আজই উহাকে তাড়াইয়া দাও।

—সাহেব...

—একটি কথাও নয়! মনে রাখিও, আফিস তোমার নয়, আমার! উহাকে ডাক...

বড়বাবু মণিকে ডাকিলেন। সাহেব বলিল—গেট্ আউট্! আভি নিকালো! তোমকো হাম নেহি মাংতা! মণি ভয়ে পলাইয়া গেল।

সাহেব বলিল, ফিলিপ আমাকে বলিয়া গেছে, আফিসের ষ্টাফ্ পরীক্ষা করিতে। তাহার বিশ্বাস, আফিসটা কতকগুলা অকর্ম্মণ্য জীবে ভরিয়া গিয়াছে। তাহার আরও বিশ্বাস, কোন লোকের আত্মীয় কুটুম্ব এত বাড়িয়া উঠিয়াছে যে আফিসে কাজের বদলে অকাজ বেশী হইতেছে। বড়বাবু, আমি সোমবার হইতে ষ্টাফ্ পরীক্ষা করিব। কে কাহার আত্মীয় ও কার কি কোয়ালিফিকেসন, তুমি সমস্ত ঠিক করিয়া লিখিয়া রাখিও! আমার মন কোন কারণে ভাল নাই, বেশী ঘাঁটাঘাটি যেন আমাকে না করিতে হয়, ইহার প্রতি তুমি লক্ষ্য রাখিও। বলিয়া জোন্স সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইল ও এক মুহূর্ত্তকাল বড়বাবুর মুখের পানে বক্র দৃষ্টিতে চাহিয়া, টুপি লইয়া শিস্ দিতে দিতে বাহির হইয়া গেল।

বড়বাবু ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে, আফিস খালি!

৪

পঞ্জিকাতে লেখা ছিল কি-না জানি না, লক্ষণ যাহা দেখা যাইতেছে, তাহাতে ইহা অবধারিত যে আজ প্রলয় হইবেই! প্রভা খুড়তুতো ভাই মণিকে সান্ত্বনা দিয়া বাড়ী পাঠাইয়া শয়ন-মন্দিরকে গোঁসা ঘরে রূপান্তরিত করিয়া বসিয়া রহিলেন।

যথাসময়ের অনেক পরে নটবর গৃহে ফিরিলেন। কোথায় বা চা! কোথায় বা কি! নটবর দ্বিতলে উঠিতে সাহস করিলেন না।

রাত্রের ভাত বামুন ঠাকুর বাহিরের ঘরেই দিয়া গেল; চারিটি মুখে তুলিয়া, হাতমুখ ধুইয়া নবমী পূজার সন্ধিক্ষণ স্মরিয়া দ্বিতলে উঠিলেন।

প্রথম সম্ভাষণ—বলি বেঁচে আছ? আমি ত সিঁদুর তোলবার যোগাড় করছিলুম।

নটবর নীরব।

দ্বিতীয় প্রেমালাপ—তুমি কি ভেবেছ আমাকে বলতে পার? তুমি আফিসের বড়বাবু, ছ'শ টাকা মাইনে পাও, আমাকে বিয়ে করে' আমার চোদ্দো পুরুষকে স্বর্গে তুলেছ! এই ত তোমার মনের ভাব!. থাক তুমি তাই নিয়ে, আমি আজ...এটা কি দেখ্‌ছ?

নটবর চাহিয়া দেখিলেন, এক আউন্সের শিশি! বড় বড় বাঙ্গালা অক্ষরে গায়ে আঁটা—বিষ!

তৃতীয় মধুরোক্তি—আর তোমাকে আমাদের জন্যে কষ্ট পেতে হবে না। আজ নিজের হাতেই তার শেষ করছি!—প্রভা শিশির ছিপি খুলিলেন।

নটবর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া বলিলেন—কি হয়েছে প্রভা? অমন করছ কেন?

প্রভা বলিলেন—অমন করছি কেন? এ কথা জিজ্ঞেস করতে তোমার মুখ খসে গেল না! না, না তোমার মুখ খসবে কেন? যে মুখে নিজের খুড়তুতো ভায়ের বাপ-মা তুলেছ...

—বাপ্ মা!

—শ্বশুর শাশুড়ী নিজের বাপ মারই সমান! তাদের গাল পাড়তেও যার মুখ খসে পড়ে না...

নটবর বলিলেন—কি পাগলের মত বকছ?

—মণির চাকরী গেছে?

—গেছে! শুধু তার নয়...

প্রভার হস্তধৃত শিশি মৃত্তিকা হইতে অর্দ্ধ ইঞ্চি উর্দ্ধে উত্থিত হইল। বলিলেন—শুধু তার নয়? তাহলে আরও গেছে? এ পোড়ারমুখ আমি বাপের বাড়ীর কাউকে দেখাব না, দেখাব না, দেখাব না! শুধু তার নয়? তবে আরও...

—হাঁ, আরও গেছে?

এই পৃথিবী ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে সকল কথা জানিয়া লওয়াই ভাল; নচেৎ আগ্রহ লইয়া অনন্তকাল ভ্রাম্যমান নরকের জীবের মত ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে। সুতরাং প্রভা জিজ্ঞাসিলেন—আর কার গেল?

নটবর আস্তে আস্তে বলিলেন—আর আমার!

—তোমার!

—হ্যাঁ!

—কেন?

যায় নি; ছেড়ে দিয়ে এলাম।

এত বড় চাকরি, দু'শ টাকা মাহিনা, ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছে শুনিয়া প্রভার সর্ব্বদেহ ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল; অতি কষ্টে জিজ্ঞাসিলেন—ছেড়ে দিয়ে এলে কেন?

তোমাকে সন্তুষ্ট করতে! নইলে আর উপায় ছিল না। সোমবারে তোমার আত্মীয়গুলির চাকরি যাবেই। আমার চাকরী থাকতে তাদের চাকরী গেলে—তুমি কি আর আমাকে জ্যান্ত রাখতে প্রভা? তোমাকে স্বামী-হত্যার পাতক থেকে বাঁচাবার জন্যেই আজ রেজিগ-নেসন লেটার লিখে বড় সাহেবের টেবিলে রেখে এসেছি।

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীসৌরেন্দ্রচন্দ্র দেব বি-এস্‌সি

মার্কনীর নূতন কীর্ত্তি

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যে সব অভূতপূর্ব্ব যন্ত্রের উদ্ভাবন হ'চ্ছে তা' দেখে জগতের লোক স্তম্ভিত হ'য়ে যা'চ্ছে। সম্প্রতি মার্কনি সাহেব ও তাঁর সহকারী W. C. Franklin সাহেব দুজনে মিলিত হয়ে এক রকম নূতন ধরণের বেতার সঙ্কেত উদ্ভাবন ক'রেছেন, যা'র ইঙ্গিত রাত্রিকালে অর্ণবপোতের কর্ণধারকে এমনভাবে সাবধান ক'রে দেবে যে, জাহাজের গতিশীল অবস্থায় জলমগ্ন পর্ব্বতে আঘাতপ্রাপ্ত হ'য়ে নিমজ্জিত হ'বার সম্ভাবনা একেবারেই থাক্‌বে না।
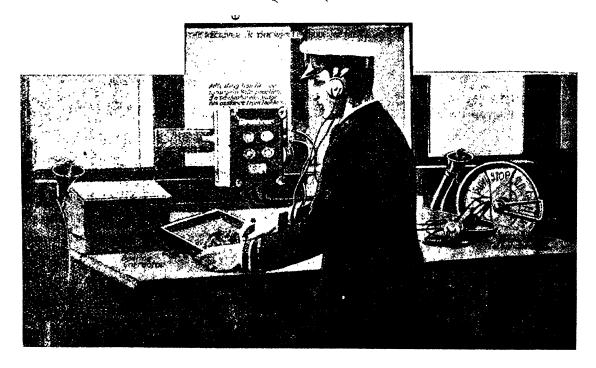
বার্ত্তা গ্রাহক (বেতার সঙ্কেত থেকে বার্ত্তা পেয়ে জাহাজের বার্ত্তা-গ্রাহক সেই বার্ত্তানুযায়ী জাহাজ চালাবার সঙ্কেত দিচ্ছে)
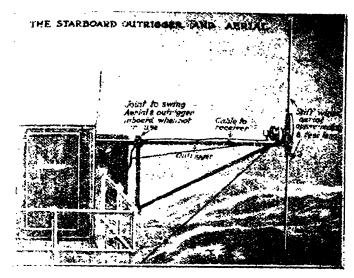
বেতার এরিয়াল (ærial)

বেতার সঙ্কেত
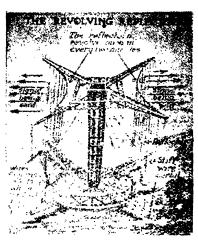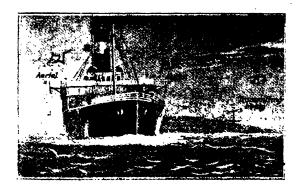
বেতার-সঙ্কেতের কার্য্য ('ক' চিহ্নিত স্থান থেকে বেতার-সঙ্কেত বার্ত্তা প্রেরণ ক'রছে আর জাহাজ 'খ' চিহ্নিত স্থানের সাহায্যে সেই বার্ত্তা গ্রহণ ক'রছে)
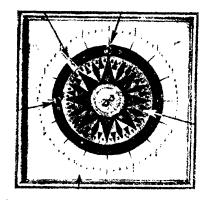
গতি পরিবর্ত্তনকারী (এই যন্ত্রের সাহায্যে বেতারবিদ্ জাহাজের গতি পরিবর্ত্তন ক'রে থাকেন)

স্বয়ংক্রিয় বেতার সঙ্কেত
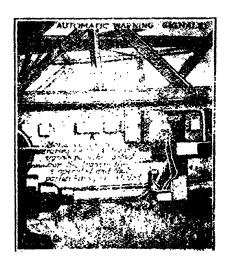
আগ্নেয়গিরির রূপান্তর

আগ্নেয়গিরি যা'তে আর ভবিষ্যতে মানবজাতিকে ধ্বংসের পথে নিয়ে না যেতে পারে সেজন্য দক্ষিণ মার্কিণ-রাজ্যের কয়েকজন বৈজ্ঞানিক কয়েক বৎসর ধরে ক্রমাগত তা'র পরীক্ষা ক'রছেন। তাঁদের পরীক্ষার সর্ব্বপ্রথম ও

সর্ব্বপ্রধান কার্য্য হ'চ্ছে আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎপাতকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করা এবং সেই বৈদ্যুতিক শক্তিকে মানবের দৈনিক কার্য্যে নিয়োজিত করা। তাঁরা আরও চেষ্টা ক'রছেন যা'তে আগ্নেয়গিরির ভস্মস্তূপ থেকে সহজ-দাহ্য পদার্থ তৈয়ারী করা যেতে পারে।

নব-রূপ (আগ্নেয়গিরির ভস্মস্তূপ থেকে সহজ-দাহ্য পদার্থ তৈয়ারী ক'রা যেতে পারে কি'না, তা' একজন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ক'রে দেখছেন)

আগ্নেয়গিরির রূপান্তর
(বৈজ্ঞানিক আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি তৈয়ারী ক'রবার চেষ্টা ক'রছেন)

পরশনের ভাষা

মূক ও বধির যাঁরা তাঁরা ভাষায় নিজের মনোভাব প্রকাশ ক'রতে অক্ষম। কিন্তু তাঁদের স্পর্শশক্তি এত তীক্ষ্ণ হ'য়ে থাকে যে, তাঁরা শুধু স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই নিজেদের মনোভাব প্রকাশ ক'রে থাকেন। সাধারণতঃ দেখা যায় যে এই শ্রেণীর লোকেরা বাক্‌শক্তির অভাবে তাঁদের পরশনের ভাষা প্রকাশের জন্য হস্তাঙ্গুলির অগ্রভাগই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ব্যবহার ক'রতে বাধ্য হ'ন। তা'র কারণ আর কিছুই নয়, মানুষের অঙ্গুলীর অগ্রভাগই স্পর্শ দ্বারা মনোভাব প্রকাশ ক'রবার একমাত্র বা সর্ব্বপ্রধান যন্ত্র। কারণ মানবের করাঙ্গুলীর অগ্রভাবে স্পর্শানুভূতি সংক্রান্ত স্নায়বিক শক্তিবিন্দুর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমাবেশ বলে বাক্‌শক্তিহীন মানুষ অঙ্গুলীর অগ্রভাগের স্পর্শের দ্বারাই মনোভাব ব্যক্ত ক'রতে পারে।

চোরধরা কল

অনেক সময়ে খুব চতুর অপরাধীকে প্রমাণাভাবে ধরা অসম্ভব হ'য়ে পড়ে; কিন্তু Mr. Albert Schneider নামক California সহরের একজন বৈজ্ঞানিক Third degree নাম দিয়ে যে যন্ত্রটি উদ্ভাবন ক'রেছেন, তা'র সাহায্যে

পরশনের ভাষা
(দু'জন মূক ও বধির নারী পরশনে পরস্পরের মনোভাব জান্‌ছে। একজন ঠোঁটের উপরে হাত দিয়ে ঠোঁটনাড়া দেখে তার কথা বুঝ্‌ছে; আর একজন বুকে হাত দিয়ে তার মর্ম্মের ভাষা বুঝ্‌ছে)

চোরধরা কল (বৈজ্ঞানিক যন্ত্র স্পর্শ ক'রে বিভিন্ন প্রকারের লিপির অনুভূতি লিপিবদ্ধ ক'রছেন)

প্রত্যেক অপরাধীকে ধরা এখন সহজসাধ্য হবে। এই যন্ত্রের একটি নিরূপিত স্থানে স্পর্শ ক'রলেই সেই স্পর্শের

অনুভূতি তৎক্ষণাৎ সেই যন্ত্রে লিপিবদ্ধ হ'য়ে যায়। পরে সেই অনুভূতি-লিপির বিশেষত্ব পরীক্ষা ক'রে বৈজ্ঞানিক তৎক্ষণাৎ অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ সপ্রমাণ ক'রে দিতে পারেন।

সূর্য্য-সারথি

সম্প্রতি Bernard A. Grossman নামক একজন নবীন মার্কিন বৈজ্ঞানিক একটি অদ্ভুত যন্ত্র নির্ম্মাণ ক'রেছেন, যা'র সাহায্যে তিনি সূর্য্যকিরণ প্রভাবে রেলগাড়ী চালাতে পা'রবেন। দিবাভাগে এই যন্ত্রটীর সাহায্যে যন্ত্রাধারে সূর্য্যরশ্মি সঞ্চিত ক'রে নিয়ে, সেই সূর্য্যরশ্মিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত ক'রে, সেই শক্তির সাহায্যে তিনি রেলগাড়ী চালাতে সমর্থ হ'য়েছেন।

সূর্য্যসারথি
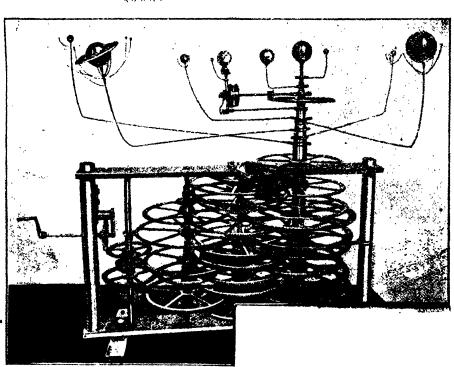
গ্রহাচার্য্যের ঘড়ি

বার্লিন সহরের Osward Schulz নামক একজন হোরা বৈজ্ঞানিক এমন একটি ঘড়ি নির্ম্মাণ ক'রেছেন, যা'র সাহায্যে তিনি সৌরজগতের সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রের সমাবেশ ও তা'দের প্রত্যেকের সূক্ষ্ম গতিবিধি পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ করতে পারেন। তিনি তাঁর উদ্ভাবিত ঘড়ির নাম দিয়াছেন শুল্জ্-ঘড়ি। এটি তিনি আমাদের ভারতীয় মানমন্দিরেরই হোরাচক্রের অনুকরণে প্রস্তুত ক'রেছেন।

ঘড়ির অন্তর্দৃশ্য

তাড়িত পত্রবাহক
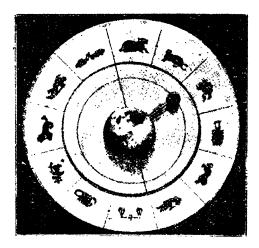
বৈদ্যুতিক শক্তি ও যন্ত্রসাহায্যে যাহাতে মানুষের হস্তাক্ষর এক স্থান থেকে স্থানান্তরে প্রেরণ করা যেতে পারে, সেজন্য বেলিন নামক একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক গত তিন বৎসর ধরে ক্রমাগত পরীক্ষা ক'রবার পর কতকটা সফল-কাম হ'য়েছেন। তাঁর নবোদ্ভাবিত যন্ত্র Belinogram এর সাহায্যে তিনি এক স্থান থেকে স্থানান্তরে হস্তাক্ষর প্রেরণে কৃতকার্য্য হয়েছেন।

লিপি প্রেরক (বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে স্থানান্তরে লিপি প্রেরণ ক'রছেন)

প্রতিকৃতি গ্রাহক (বৈজ্ঞানিক স্থানান্তর হ'তে আগত প্রতিকৃতি যন্ত্রে লিপিবদ্ধ ক'রছেন)

যন্ত্রের কার্য্যকলাপ

যন্ত্রের অন্তর্দৃশ্য

প্রতিকৃতি-প্রেরক (বৈজ্ঞানিক স্থানান্তরে প্রতিকৃতি প্রেরণ ক'রছেন)

তাড়িত-পত্রবাহক যন্ত্র

লিপি গ্রাহক (বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে স্থানান্তর থেকে লিপি গ্রহণ ক'রছেন)
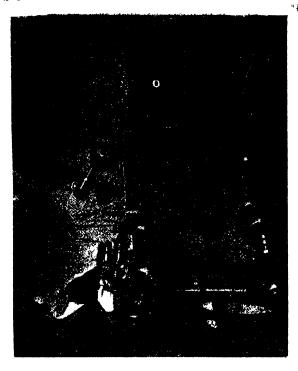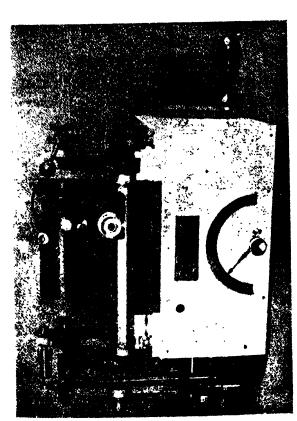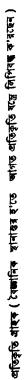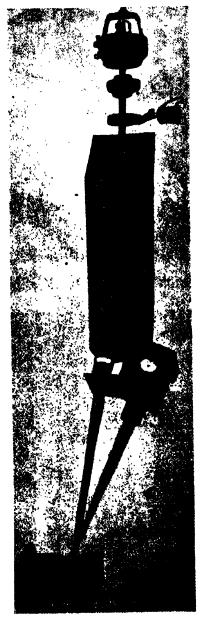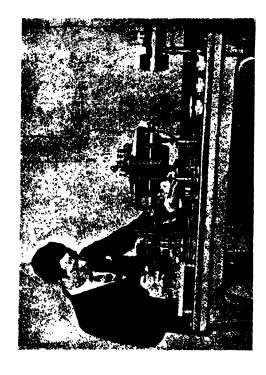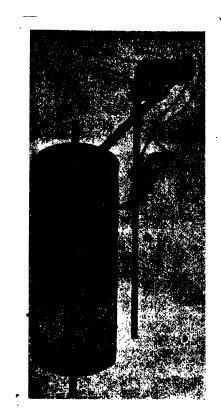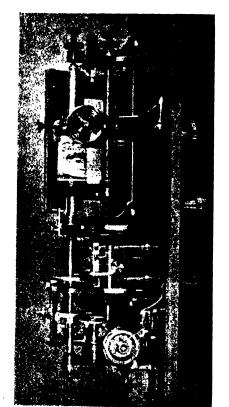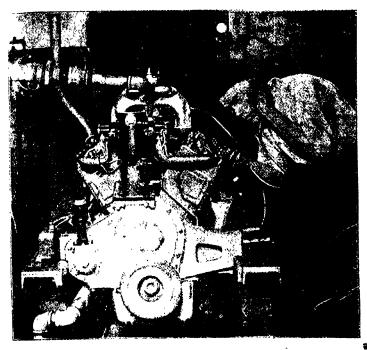
এঞ্জিনের অন্তর্বিচার (বৈজ্ঞানিক এঞ্জিনবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এঞ্জিন পরীক্ষা ক'রছেন)

এঞ্জিনের অন্তর্বিচার

মোটরগাড়ীর এঞ্জিন তৈয়ারী ক'রবার সময় অনবধানতাবশতঃ অনেক সময় এঞ্জিনের অনেক স্থানে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থেকে যায়। এই ছিদ্রগুলি গাড়ীখানি ব্যবহার ক'রতে ক'রতে ক্রমশঃ বৃহদাকার ধারণ ক'রে শেষে এঞ্জিনকে একেবারে বিকল ক'রে দেয়। এই অসুবিধা দূর ক'রবার জন্য একজন বৈজ্ঞানিক এক প্রকার হৃদ্‌বীক্ষণ যন্ত্রের মতো এঞ্জিন পরীক্ষার যন্ত্র আবিষ্কার ক'রেছেন যা'র সাহায্যে এঞ্জিনের কোথাও ছিদ্র আছে কি না তা' সুন্দর ভাবে নিরূপণ করা যায়।

হৃদ্‌পিণ্ড দর্শন

ব্যাধিগ্রস্ত হৃদ্‌পিণ্ডের অবস্থা যে হৃদ্‌বীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও সকল সময়ে সঠিক ভাবে জানা যায় না, এ কথা চিকিৎসক মাত্রেই জানেন। তাঁদের এই অসুবিধা দূর ক'রবার জন্যই British National Hospitalএর অধ্যক্ষ একটি নূতন ধরণের যন্ত্র নির্ম্মাণ ক'রেছেন। তা'র নাম "Orthiograph"। এই যন্ত্রের সাহায্যে তিনি রোগীর হৃদ্‌পিণ্ডের অবস্থা বাহির হইতেই সুন্দর ভাবে চিত্রিত ক'রে দেখাতে পারেন। তবে হৃদ্‌পিণ্ডের স্বরূপ প্রতিকৃতি পা'বার জন্য তাঁকে এই যন্ত্রের মধ্যে রণজেন রশ্মিও ব্যবহার ক'রতে হ'য়েছে।
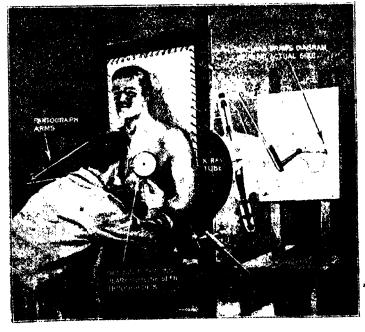
হৃদ্‌পিণ্ড দর্শন (বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে রোগীর হৃৎপিণ্ড চিত্রিত ক'রছেন)

সূর্য্যকরে ধাতুপিণ্ড

আকরিক ধাতু (ore) দ্রবীভূত ক'রতে হ'লে প্রচণ্ড তাপের প্রয়োজন এবং সেই তাপের সৃষ্টির উপযোগী যন্ত্রপাতি সমূহ ক্রয় ক'রতে হ'লে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। খনির মালিকদের এই অসুবিধা দূর করবার জন্য William Thomas নামক একজন বৈজ্ঞানিক একপ্রকার অভিনব যন্ত্র উদ্ভাবিত ক'রেছেন, যদ্দ্বারা তিনি সূর্য্যরশ্মিকে সমকেন্দ্রে ঘনীভূত ক'রে, তা'রই উত্তাপে আকরিক ধাতু অল্পব্যয়ে ও অনায়াসে বিদ্রাবিত ক'রতে পারেন।
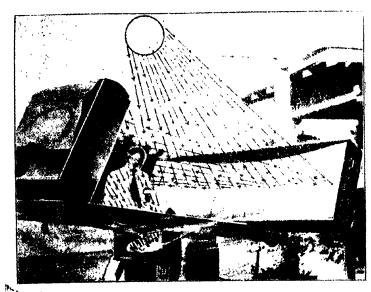
সূর্য্যকরে ধাতুপিণ্ড (বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে আকরিক ধাতু দ্রবীভূত ক'রছেন)

পাঠকের নিকট প্রার্থনা

একখানি অপ্রকাশিত কিন্তু বহুমূল্য পুঁথির সন্ধান পাইবার নিমিত্ত পাঠকের নিকট প্রার্থনা করিতেছি। পুঁথিখানি আমি দেখি নাই। একশত বৎসর পূর্ব্বে জন্ বেণ্ট্‌লি নামক এক সাহেবের চক্ষু ব্যতীত অদ্যাপি আর কাহারও দৃষ্টিতে পড়ে নাই। পুঁথিখানির নামও জানা নাই। কাজেই ইহার একটু বৃত্তান্ত দ্বারা বলিতে হইতেছে।

জন্ বেণ্ট্‌লি ভাগলপুরে ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি আমাদের জ্যোতিষের ইতিহাস চর্চ্চা করিয়া একখানি বই লেখেন। বইখানির নাম A Historical view of the Hindu Astronomy.

বইখানি এশিয়াটিক্ সোসাইটির দ্বারা প্রকাশিত হয়। এই বইতে তিনি সার অসার অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। ইয়ুরোপের দুই একজন জ্যোতির্বিদ্ তাঁহার মতামত বিচার করিয়া গিয়াছেন। এক দোষে বইখানি আমাদের নিকট অনাদৃত হইয়া রহিয়াছে। তিনি সংস্কৃত ভাষা জানিতেন না। তাঁহার যত কিছু আস্ফালন, তাহা পণ্ডিতের মুখে শুনিয়া নিজের কল্পনাতরঙ্গ ; পদে পদে ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষ জুটিয়া সত্য মিথ্যা মিশাইয়া ফেলিয়াছে।

তাঁহার বইতে একস্থলে এক বর্ষচক্রের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে। কোথা হইতে তিনি এই চক্র (cycle) পাইয়াছিলেন, তাহার কিছুমাত্র নিদর্শন দেন নাই। এতকাল কেহ এই চক্রের আলোচনাও করেন নাই। তিন বৎসর পূর্ব্বে বোম্বাই শ্রীবেঙ্কটেশ বাপুজী কেতকর মহাশয় এই বর্ষচক্র হইতে আমাদের জ্যোতিষের এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব ইতিহাস আবিষ্কার করিয়াছেন। এখন দেখা যাইতেছে, এই বর্ষচক্র এক অমূল্য বস্তু। ইহাকে উদ্ধার করিতে পারিলে আমাদের পঞ্জিকার প্রাচীন ইতিহাস প্রকাশিত হইবে।

আমাদের পাঁজিতে নিম্নলিখিত পুণ্যতিথিগুলির নাম সকলেই পড়িয়াছেন। যথা—আশ্বিন মাসে দুর্গাষষ্ঠী ; ইহার অপর নাম আদিকল্প। এই দিন দুর্গাপূজা আরম্ভ। অগ্রহায়ণ মাসে গুহষষ্ঠী, চৈত্রমাসে স্কন্দষষ্ঠী, জ্যৈষ্ঠমাসে অরণ্যষষ্ঠী, শ্রাবণ মাসে লুণ্ঠন বা শীতলা-ষষ্ঠী। পুনশ্চ, বৈশাখ মাসে জহ্নু সপ্তমী, আষাঢ় মাসে বিবস্বৎ সপ্তমী, ভাদ্র মাসে ললিতা সপ্তমী, মাঘ মাসে আরোগ্য, রথ, মিত্র বা মাকরী সপ্তমী। এই এই তিথি কেন প্রসিদ্ধ হইল, তাহার উত্তর অদ্যাপি অজ্ঞাত ছিল। পুরাণে অবশ্য তিথিগুলির বিধান ও মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। কিন্তু ইহার দ্বারা উৎপত্তি বুঝিতে পারা যায় না। বেণ্ট্‌লি সাহেব প্রাচীন বর্ষচক্রের অকস্মাৎ উল্লেখ না করিলে এই প্রার্থনা করিতে হইত না। কত ইতিহাস লুপ্ত হইয়াছে ; উপস্থিত বিষয় লুপ্তের প্রকোষ্ঠে ফেলা হইত। ২৪৭ সায়নবর্ষ ১ মাসে এক চক্র হইত। প্রথম চক্রের প্রথম তিথি আদিকল্পষষ্ঠী। ইহা খ্রিষ্টপূর্ব্ব ১১৯৩ সনে হইয়াছিল, আশ্বিন মাসে। দ্বিতীয় চক্রের আরম্ভ গুহষষ্ঠী। ইহা খ্রিষ্টপূর্ব্ব ৯৪৬ সনে হইয়াছিল, কার্ত্তিক মাসে। এই চক্র বিস্তার করিয়া এবং তাহার উপযোগ দেখাইয়া শ্রীযুত কেতকর মহাশয় আমাদের আগ্রহ আরও বাড়াইয়া দিয়াছেন। জিজ্ঞাসু পাঠক ১৩৩১ সালের আশ্বিন মাসের ভারতবর্ষে 'পঞ্জিকা-সংস্কার' নামক প্রবন্ধে দেখিতে পাইবেন।

আমার বোধ হইয়াছে এই বর্ষচক্র কোন প্রাচীন বাঙ্গালী জ্যোতির্বিদের আবিষ্কার। বেণ্ট্‌লি সাহেব বঙ্গদেশে ছিলেন। চক্রখানি প্রাচীন গ্রহাচার্য্যদিগের বাড়ীতে এখনও থাকিতে পারে। যদি পাঠক মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার গ্রামে অনুসন্ধান করেন, প্রাচীন বাঙ্গালীর লুপ্তকীর্ত্তি এখনও আবিষ্কৃত হইতে পারে। ২৪৭ বৎসর ১ মাস পরে পরে এবং নিয়ত শুক্ল সপ্তমী তিথিতে চক্র আরম্ভ হইত,—এইটুকু ধরিয়া অনুসন্ধান করিতে পারেন। ইতি

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।
বাঁকুড়া।

আশুতোষ

শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী

নানাবিধ আর্থিক অসুবিধার মধ্যে সহসা ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইলেন—দিনাজপুরে এক গরীব কেরাণীর তহবিল তসরূপ মোকদ্দমায় আশুকে তাহারা লইয়া গেল। আশু দক্ষতার সঙ্গে সেই মোকদ্দমায় জয়ী হইয়া অত্যন্ত সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইল। ক্রমে সেখানে অনেকগুলি মোকদ্দমা পাইলে চারিদিকে সুনাম বাহির হওয়ায়, হাইকোর্টেও ছোটখাট মোকদ্দমা জুটিতে লাগিল। খ্যাতনামা এটর্ণি অপূর্ব্ব গাঙ্গুলী মহাশয় আশুর হাতে প্রথমেই ব্রিফ্‌ দেন, ও সাহায্য করিতে থাকেন। দিনাজপুর হইতে ফিরিবার পথে আশু চুয়াডাঙ্গা নামিয়া সমস্ত ফিএর টাকা পিতৃদেবের পায় দিয়া প্রণাম করিলে, তিনি আনন্দাশ্রু বর্ষণে পুত্রকে বক্ষে ধারণ করিয়া, প্রায় সমস্ত টাকা তাহাকে প্রত্যর্পণ করেন। গরীব চাকর দাসীদিগকে মিষ্টান্ন দিবার নিমিত্ত সামান্য কয়েকটী টাকামাত্র মায়ের হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন। প্রতি সপ্তাহে আশু শনি রবিবারে পিতৃদেবের নিকট চুয়াডাঙ্গা আসিত। তিনি তখন চুয়াডাঙ্গার সাবডিভিসন্‌ অফিসার।

বিলাত-ফেরত যুবকগণের বিবাহের জন্য দলে-দলে কন্যার পিতা, মাতা, ভ্রাতৃগণ উপযাচক হইয়া থাকেন। ঘটক সমাগমের শেষ করা কঠিন। অথচ বিবাহ-বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের হাত হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। অবস্থা বিবাহের অনুকূল নহে—উমেদার ঢের। সেই বিলাতযাত্রার পথে রবিবাবু ও সত্যবাবুর সহিত যে বন্ধুত্ব হইয়াছিল, তাহাতে ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা প্রতিভার সহিত তাঁহারা আবার বিবাহের প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। ভ্রাতাতের মুখে সবিশেষ অবগত হইয়া মনোমত পাত্র বিবেচনায় প্রতিভাদেবী ও মনে মনে আশুকেই বিবাহ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। কথাটা ভ্রাতার কর্ণগোচর হইল। ক্রমে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। পিতৃদেবের মত না হইলে ত আশু বিবাহে সম্মত হইবে না। অবশেষে তাঁহার নিকট প্রস্তাব করা হইল। তিনি কন্যার রূপ গুণের সুখ্যাতি চারিদিকে শুনিয়া ঐ কন্যার সহিতই পুত্রের বিবাহে মত দিলেন। এ ক্ষেত্রে প্রতীক্ষা করিবার আর সময় পাওয়া গেল না ও বেশী দরদস্তুর হইল না। পিতৃদেবের অনুপস্থিতিতে শ্রীমান যোগেশ, কুমুদ, প্রমথ, মনো উপস্থিত থাকিয়া যোড়াসাঁকোর বাড়ীতে "দাদার" বিবাহ দিয়া নববধূ গৃহে আনিল। পিতৃদেব দিনাজপুরেই রহিয়া গেলেন। স্কট্‌স লেনের ক্ষুদ্র বাড়ীতে আশুরা তেমনি রহিল।

আজিকার দিনের দেনা পাওনার মত বন্দোবস্ত কিছুই করা হয় নাই। আবার এদিকে "marriage without dowry" (হাল ফ্যাসান) খবরের কাগজেও ঘোষিত হইল না। অমন ছেলের অমনি বিয়ে একটু আশ্চর্য্যের কথা—বৈষয়িক লোকদের অনেকেই মনে করিলেন—সব বাজে—বিশেষতঃ "ঠাকুর বাড়ীতে" যখন বিবাহ। ক্ষুদ্র স্কট্‌স লেনের বাটীতে চারি ভ্রাতা, নববধূ, শ্রীমতী মৃণালিনী ও প্রিয়ম্বদা, থাকিয়া বেথুন স্কুলে যাতায়াত করিয়া অধ্যয়ন করিতে লাগিল। সুনিপুণা সুশীলা প্রতিভা দেবীর গৃহিণীপণায় ক্ষুদ্র সংসারটী দিব্য চলিতে লাগিল। অনেক সময়ে অর্থাভাব ঘটিত; তাহাতে কেহই কষ্ট বোধ করিত না। আশু অতিশয় পরিশ্রম সহকারে কাজকর্ম্ম করিত। সেই সময়ে শ্রীমান যোগেশ এম্‌-এ পাশ করিয়া ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলেজে প্রফেসারের পদ গ্রহণ করে।

যোগেশের কাজে কতকটা সাংসারিক সুবিধা হইয়া গেল। পিতৃদেবের আজ্ঞানুসারে ও স্বইচ্ছায় সে উপার্জ্জনের সমস্তই বধূমাতার হস্তে দিয়া দিত। আমাদিগের পরিবারে টাকা কড়ি ও হিসাবপত্র সব বধূদিগের হস্তেই দিবার নিয়ম। পুরুষদিগের প্রয়োজন মত তাঁহারা বধূগণের নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া থাকেন। পূর্ব্বাপর এইরূপই চলিয়া আসিতেছে।

এই সময় আশু কয়েক সপ্তাহের জন্য Indian Association এর Secretary পদ প্রাপ্ত হইয়া অতি দক্ষতার সহিত

কাজ চালাইয়া ফললাভ করে। তাহার কার্য্যে মেম্বরগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। ৺দ্বারিকানাথ গাঙ্গুলী মহাশয় সহকারী ছিলেন। সেই হইতেই স্বদেশের উন্নতিকল্পে আশু নানাদিকে চেষ্টা করে। মহানগরী কলিকাতায় যখন কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, যুবক আশু তাহার একজন প্রধান সভ্য ছিল।

কংগ্রেসের সান্ধ্য সম্মিলনে আশু উৎসাহের সহিত কনিষ্ঠ সহোদর সুহৃদ ও অমিয়কে স্বদেশী পরিচ্ছদে সাজাইয়া সম্মিলনী দেখাইতে লইয়া গিয়াছিল। সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাবলে যে কাজেই অগ্রসর হইয়াছে, তাহাতেই সে আশাতীত সফলতা লাভ করিয়াছে। তখন হইতেই ব্যারিষ্টারীর আয় অপেক্ষাকৃত কতক বাড়িয়া যাওয়ায় ধর্ম্মতলায় আর একটী বড় বাড়ী ভাড়া লইয়া সকলে সেখানে উঠিয়া যায়। সেই হইতেই সভা সমিতিতে যাওয়া আসা, ছোটখাট বক্তৃতা দেওয়া, ছাত্রগণের সহিত মিলা মিশা করিতে সে আলস্য বোধ করিত না। সে তৎকালে ভারতীতে অতি সুন্দর সুন্দর অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া চিন্তাশীলতার পরিচয় দেয়। সে সমস্ত প্রবন্ধ এখনও ভারতীর অঙ্গ শোভা করিতেছে। সুলক্ষণা বধূ প্রতিভার সঙ্গীতে অসাধারণ প্রতিভায় আকৃষ্ট হইয়া সমস্ত বন্ধুগণ, ও প্রতিভার আত্মীয় স্বজনে শনি রবি বারে গৃহ পূর্ণ করিয়া ফেলিতেন। তৎকালে শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ও সত্যবাবু আশুর গৃহে সদাসর্ব্বদা আসিয়া ক্ষুদ্র গৃহটীকে আনন্দ নিকেতন করিয়া তুলিয়াছিলেন। তখন আমরাও তাহার কলিকাতাস্থ ভবনে আসিয়া সুখী হইতাম। মহর্ষিদেব আশুর সহিত পৌত্রীর বিবাহ দিয়া বড় আনন্দিত হইয়া বলিয়াছিলেন "আশু আমার একটা অর্জ্জন। অনেক সাধনায় প্রতিভা এমন পাত্রে পরিণীতা হইয়াছে।"

১৮৮৭ সালের ২৫শে আগষ্ট মহর্ষি দেবের গৃহে আশুতোষের প্রথম পুত্র প্রিয়দর্শন শ্রীমান আর্য্যকুমারের জন্ম হইয়াছিল। নাম—ঋষিপ্রতিম সত্যেন্দ্রবাবু দিয়াছিলেন। সুকুমার পুত্রের জন্মে পরিবারস্থ সকলেরই মনে অসীম আনন্দ হয়। যথাকালে শিশু পুত্র লইয়া বধূমাতা আবার নিজ বাসায় আসিয়াছিল। আমাদিগের দেশে মাতুলালয়ে অন্নপ্রাশন হইবার নিয়ম নাই। পিতৃ ঠাকুর কলিকাতার বাসা বাটীতে আসিয়া অতি সমারোহে পৌত্রের অন্নপ্রাশন দিয়াছিলেন। তাহার পরে ১৮৯২ সালে ২২শে ফেব্রুয়ারী, ধর্ম্মতলার বাসাতে দ্বিতীয় পুত্র ফুটফুটে সুন্দর অশ্বিনীকুমারের জন্ম হইয়াছিল।

পিতৃদেব পেন্সন লইয়া তখন কলিকাতায়। অশ্বিনীকুমারের জন্মের সময় তিনি সেই বাটীতেই উপস্থিত ছিলেন। সদ্যপ্রসূত দিব্য-কান্তি শিশুকে দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া তিনি অসীম আহ্লাদ প্রকাশ করেন। চিরজীবন দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকায় প্রবাসে প্রবাসে ঘুরিয়া কখন নবজাত শিশু দেখেন নাই,—এটা তাঁহার জীবনের একটা নবযুগ। তিনি দিবসের অধিকাংশ সময়েই সূতিকা-গৃহে বসিয়া বসিয়া শিশু পৌত্রকে দেখিতেন ও ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া সুখী হইতেন। মাও সেই জন্ম দিন হইতেই অশ্বিনীকুমারকে পুত্রাধিক অপার স্নেহে লালন-পালন করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন। শিশু অশ্বিনীও এক মুহূর্ত্ত তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না। "মা মণি" পিতামহী ও দাদাবাবুকে অত্যধিক ভালবসিয়া তাহাদের সঙ্গ কখন ছাড়িয়া কোনখানেই যাইত না। "অশ্বিনীকুমার" নাম পিতৃদেব নিজেই দিয়া শিশুর অন্নপ্রাশনের অন্ন নিজ হস্তে তাহার মুখে তুলিয়া দিয়াছিলেন। তখন পেন্সন লইয়াছিলেন জন্য শিশুর অন্নপ্রাশনে তেমন আর ধুমধাম করেন নাই। এই সময় আশু পিতৃ আজ্ঞায় শ্রীমান মন্মথকে ডাক্তারী পড়িতে বিলাত পাঠাইয়া দিয়াছিল ও সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যয় সানন্দচিত্তেই বহন করিত। তাহাতে কোন ত্রুটী কখন করে নাই। রাজ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের পর পিতৃঠাকুর একা কৃষ্ণনগরের বাড়ীতে আর বাস করিতে পারিলেন না। আশুতোষ আমাদিগের সবাইকে নিজের কাছে আনিয়া রাখিলেন। মন্মথর বিলাত-গমনের পরই ভগিনী মৃণালিনীর বিবাহ স্থির করা হয়। অধুনা সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীমান উমাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাহার বিবাহ আশুই দিয়াছে। উমাদাস আশুর পরম বন্ধু। কৈশোরে কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে উভয়ে এক সঙ্গে পড়াশুনা করিতেন। বিলাতেও দুইজন একত্র বাস করাতে সেই বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠ ভাবে আরও দৃঢ়তর হইয়াছিল। জীবনের কত সুখ দুঃখের মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে অতিশয় ভাল-বাসিত। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত সেই অকৃত্রিম ভালবাসা সমান ভাবেই রহিয়া যায়। ভগিনীর বিবাহ অন্তে আবার

আশু ভাগ্নিয়েয়ী প্রিয়ম্বদার বিবাহ তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের (উমাদাসের জ্যেষ্ঠ সহোদর) সহিত দিয়া সুখী হয়। তারাদাস একটা মানুষের মত মানুষ ছিলেন। তিনি সুপণ্ডিত, স্নেহশীল, বদান্য ছিলেন। মিষ্টভাষিতা ও জনপ্রিয়তাগুণে তাঁহার কাহারো সহিত কখনও মনোমালিন্য হয় নাই। সবাইকে তিনি আপনার বলিয়া জানিতেন। দেশানুরাগের এই চরমবাক্য সতত তাঁহার মুখে শুনা যাইত—"দেশের কুকুর পুজি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া"। তাঁহার অকাল মৃত্যু জনিত শোকে আশু নিতান্তই কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। সে সব অসহনীয় শোক দুঃখের কাহিনী আর বিশেষভাবে লেখা সাধ্যাতীত।

স্নানযাত্রা

শ্রীকামিনী রায় বি-এ

চমকিয়া নারী শুনিল, "উঠমা, শোভনা, আমার কন্যা,
পুণ্য তিথি আজ, গঙ্গায় নামি হও শুচি, হও ধন্যা।"
স্বপনে সে সতী, দেখা দিয়া গেছে, যার সুকোমল অঙ্কে
ফুটেছিল বালা অমল কুসুম। কেন সে ঝাঁপিল পঙ্কে,
কঠিন কুলিশ হানি মার বুকে, বহায়ে শোকের বন্যা?—
প্রতিবাসী কয়, "এমন কি হয় সতী জননীর কন্যা?
রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী, শেষে কলঙ্কিনী মাঝে গণ্যা!
এ কি সতী-মার কন্যা?"
জনক কহিল "মরিল না কেন?"—কুলের কলঙ্কে ক্রুদ্ধ,
অঝোরে ঝরিল মায়ের নয়ন, ব্যথায় বচন রুদ্ধ।
চির ক্ষমাশীল মায়ের হৃদয়, স্নেহের সুধায় পূর্ণ,
গর্বিত-ভার লজ্জার তলে পিষিয়া হইল চূর্ণ!

* * * *

সুদূর নগরে অভাগীর যদি বেদনা ভরিত চিত্ত,
ভুলিতে চাহিত দেখিয়া দেখিয়া সঞ্চিল কত বিত্ত
দেহ ভাড়া দিয়া, হাসিটি বেচিয়া, সুমোহন করি সজ্জা,
তুলিতনা কানে কে গেল শ্মশানে' সহিতে না পারি লজ্জা।
কত গেছে দিন গেছে বর্ষ মাস। আজি না পোহাতে রাত্রি
জাহ্নবী তীরে চলেছে যখন অগণ্য স্নানের যাত্রী,
কে গেল ডাকিয়া—"উঠমা, উঠমা, শোভনা, আমার কন্যা,
আজ পুণ্য তিথি, গঙ্গায় নামি হও শুচি, হও ধন্যা।"
শান্ত মহিমায় বলে পুনরায়—"শোভনা, আমার কন্যা,
শুদ্ধা যাহারা সুন্দরী তারা, ধরণীতে তারা ধন্যা।
এ শুভ উষায় আলোক ভূষায় উজ্জ্বল কর চিত্ত,
নূতন জনম, নূতন জীবন, লভিবে নূতন বিত্ত।"

পূরব আকাশে উষা হাসি ডাকে—"সতী জননীর কন্যা!"
ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী ডেকে কহে, "আজি সতী-সুতা হবে ধন্যা।"
"পড়েছিল বলে পড়েই রবেনা, সাধ্বী মায়ের কন্যা
লভিয়া আবার নূতন জনম সতীকুলে হবে গণ্যা—"
শান্ত সমীর শিরে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ যেন বর্ষে;
জাহ্নবী ধারা উছলি চলিছে যেন কি গভীর হর্ষে।
কেঁদে নারী বলে—"নামি নদীজলে দেহ করা যায় শুদ্ধ,
কে দিবে ধুইয়া কলঙ্কিত হিয়া, নিরন্ধ্র কারায় রুদ্ধ?"
তবুও উঠেছে, স্মরি মাতৃ মুখ, কহিছে—"মায়েরি জন্য,
মায়ের দেবতা মোরে দয়া ক'রো, ভরসা তো নাহি অন্য।"
পাছে পরিচিত কেহ চিনে ফেলে, চালায় চরণ ক্ষিপ্র;
দলে দলে চলে সধবা, বিধবা, দোকানী, পসারী বিপ্র।
বিলাসিনী মানি কহে একজন—"দিব স্নান-মন্ত্র' শিক্ষা
দরিদ্র ব্রাহ্মণ, বেশী নাহি চাই, অঙ্গুরীয় দিও ভিক্ষা।"
নীরবে সে চলে। দেখে, তার পানে পড়িছে যতেক দৃষ্টি
হয় ঘৃণা ঢালে, নয় হেসে হেসে করিছে কলুষ বৃষ্টি।
গূঢ় বেদনায় জলে নামি যায়, সে দৃষ্টির মলা অঙ্গে,
তারে ধুয়ে দিবে জাহ্নবী জলে, কারেও চাহেনা সঙ্গে।
তীর হতে যায় দূরে—আরো দূরে—"ডুবিল! ডুবিল!" শব্দ
কেহ জিজ্ঞাসিল—"জানে কি সাঁতার?" কেহবা রহিল স্তব্ধ।

মনের পরশ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীদিলীপকুমার রায়

মিষ্টার টমাস মুখ নীচু ক'রে গৃহচুল্লীর দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বল্‌লেন : "অর্থাগম একদম না হ'লে যে বাঁচা মুস্কিল এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। আমাদের জীবনে এ সত্যটিকে আমি সময়ে সময়ে খুব বড় রকমের ট্রাজিডি মনে না ক'রেই পারি না। কারণ একদিকে খৃষ্টের ফকীর হবার উপদেশও আমি ঠিক্ পরিপাক করতে পারি না। অপরদিকে আধুনিক সভ্যতার অভিঘাতে ও আলোতে যতদূর দেখা যায় তাতে মনে হয় যে আত্মসম্মান ও ভিক্ষোপজীবিকা এ দুয়ের সামঞ্জস্য সাধন করা অসাধ্য। তবে ওটা একটু অবান্তর কথা। তুমি যে সমস্যার কথা বল্‌লে সেটার সমাধান তুমি নিজেই খুঁজলে পাবে। অথচ এ প্রশ্নের মীমাংসা খুব সহজেই হয়ে যায় যদি তোমাদের দেশে গান গেয়ে নিতান্ত জীবনধারণের জন্য দরকার টাকাও রোজগার করা অসম্ভব হয়। অর্থাৎ কি না তাহ'লে গান ছেড়ে অন্য কোনও পেশা নিতে হয়। কারণ বাঁচাটা যে দরকার এ সম্বন্ধে বোধ হয় জগতে বড় বেশি মতভেদ নেই—এক বৌদ্ধদের মধ্যে ছাড়া।" শেষ কথাটি বলার সময় তিনি একটু মৃদু হাস্‌লেন।

মিসেস টমাস এ নিহিত ব্যঙ্গে আপত্তি ক'রে বল্‌লেন : "বৌদ্ধরা কি তাই বলে?"

মিষ্টার টমাস বল্‌লেন, "আমি অবশ্য বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে দু চারখানি মাত্র বই পড়েছি ও তাই এ বিষয়ে নিশ্চিত ক'রে কিছু বল্‌তে পারি না। তবে আমার যা মনে হয়েছে তাতে নির্ব্বাণ মানে আমি ত বুঝেছি annihilation বা শূন্যবাদ। কাজেই বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক নীতি ব্যবস্থা আমার কাছে আদর্শস্থানীয় মনে হলেও তার মধ্যে সুসঙ্গতি আমি একেবারেই দেখ্‌তে পাই না। কেন না যদি জীবনে শূন্যবাদই চরম সত্য হয় তবে তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করার প্রয়োজন ত বুঝি না। জীবন অশেষ দুঃখের আকর হ'তে পারে; কিন্তু শূন্যবাদ ত কল্পনারও অতীত ও সুতরাং 'নাস্তি'! তবু যদি 'নাস্তি'কেই চরম সত্য ব'লে ধ'রে নেওয়া যায়—যদিও সেটা অযৌক্তিক—তা'হলে সুখ দুঃখ অশ্রু হাসি মাখা জীবনও কি তার চেয়ে কাম্য নয়? এক কথায় বৌদ্ধদের মর্ম্মকথা 'বাঁচা কেবল মরার জন্য'; অথচ এ নীতিতে এক নিতান্ত cynic ছাড়া বোধ হয় আর কেউ সাড়া দেবে না।"

মিসেস টমাস বল্‌লেন : "কিন্তু আর্চিবল্ড্, এ রকম নীতি কি কোনও ধর্ম্মের ভিত্তি হ'তে পারে!"

উত্তরে মিষ্টার টমাস কি একটা বল্‌তে যাচ্ছিলেন। কিন্তু পল্লব বাধা দিয়ে বল্‌ল : "মাপ করবেন মিষ্টার টমাস, আমার বোধ হয় এ সম্বন্ধে আপনার ধারণাটা মূলতঃ ভ্রান্ত হবার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ যদিও আমি নিজে আজ পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ কিছু পড়িনি, তবু আমি আমার এক সুপণ্ডিত পিতৃবন্ধুর মুখে শুনেছিলাম যে, বৌদ্ধধর্ম্ম ও বেদান্তের ভিতরকার কথা একই।"

মিষ্টার টমাস বল্‌লেন "তা হ'তে পারে অবশ্য। আর আমার এখন মনে হচ্ছে যে, আমি সেদিন হঠাৎ তোমাদের দার্শনিক অরবিন্দের 'আর্য্যে' যোগবাদ সম্বন্ধে এই রকমই একটা কথা পড়ছিলাম বটে যে সমাধি ও নির্ব্বাণ একই উপলব্ধি।* তবে যেহেতু এ দুটোর একটারও সম্বন্ধে আমার কোনও স্পষ্ট ধারণা গ'ড়ে ওঠেনি, তাই এ বিষয়ে কিছু

---

* "Even the sense of being may disappear in an experience in which the word existence loses its sense and the Buddhistic symbol of Nirvana seems alone and sovereignly justified."

Essay on Samadhi......Synthesis of Yoga.

মান

শিল্পী—শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়   Bharatvarsha Halftone & Printing Works.
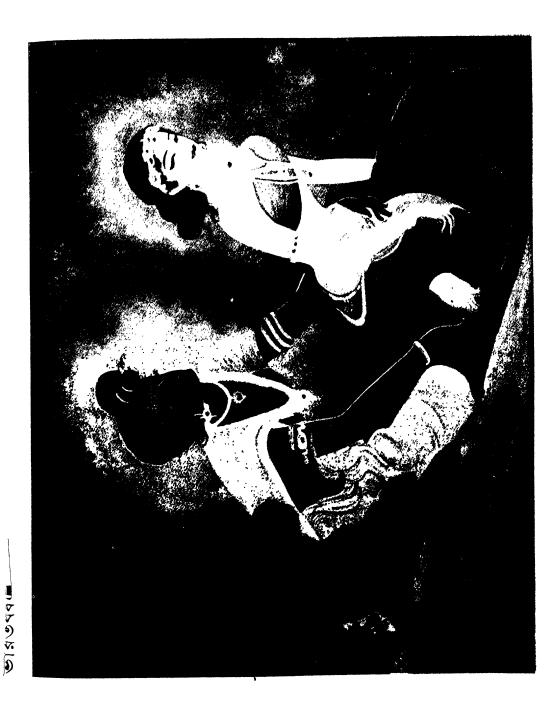
না বলাই ভাল। কেবল একটা কথা ব'লে রাখি যে, বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে আমি যা অল্পস্বল্প পড়েছি, তাতে আমার মনে হয়েছে যে, বেদান্ত একটা মস্ত দর্শন। যদিও সঙ্গে সঙ্গে ব'লে রাখি যে, বেদান্তের মায়াবাদে আমাদের মন একেবারেই সাড়া দেয় না। কিন্তু তা সত্বেও যে বেদান্তের আমি ভক্ত, তার অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথম কারণ, বেদান্তের মূল প্রতীতিগুলির মধ্যে আর যাই থাকুক না কেন, অযৌক্তিকতা কিছু নেই। দ্বিতীয় কারণ, তার মধ্যে আর যারই অভাব থাকুক না কেন, কল্পনার বিরাটত্বের অভাব নেই।"

মিসেস টমাস বল্‌লেন: "কিন্তু কাণ্ট, হেগেল—"

মিষ্টার টমাস বল্‌লেন: "তাদের চেয়ে বেদান্তকে আমি দর্শন হিসেবে অনেক বড় মনে করি। জান বাক্‌চি, তোমাদের দর্শনের মধ্যে একটা গুণ আমার বড় ভাল লাগে। সেটা এই যে তোমাদের দর্শন কাণ্ট হেগেল প্রমুখ অধিকাংশ য়ুরোপীয়ের দর্শনের মতন উড়ো আইডিয়ার সমষ্টি মাত্র নয়।"

মিসেস টমাস প্রাচ্যদর্শনের সঙ্গে এরূপ তুলনায় ও য়ুরোপীয় দর্শনের প্রতি কটাক্ষে আবার ঈষৎ আহত হয়ে আপত্তি কর্‌লেন: "তার মানে?"

মিষ্টার টমাস বল্‌লেন: "তার মানে ভারতীয় দর্শনের গভীরতম ধারণার উপলব্ধিরও একটা পন্থা নির্দিষ্ট আছে। আমাদের দর্শনে abstract আইডিয়া আছে; কিন্তু সেগুলোর প্রভাব যে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে কাজ করা দরকার এ কথা আমরা জানিই না।"

পল্লব বল্‌ল: "কথাটা ঠিক্ বুঝলাম না মিষ্টার টমাস।"

মিষ্টার টমাস বল্‌লেন: "এ কথা আমার এক জৈন দার্শনিক বন্ধু এক দিন আমাকে বলেছিলেন, যদিও তখন আমিও ঠিক্ কথাটা ধরতে পারিনি। কথাটা একটা দৃষ্টান্ত দিলেই পরিষ্কার হবে বোধ হয়। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, ভারতীয় দর্শনের মনোরাজ্যে উপলব্ধির নানান্ স্তর আছে। এবং পর পর এ সব স্তরে আরোহণ করার পদ্ধতিও ভারতীয় দর্শনে নির্দিষ্ট আছে।"

মিসেস টমাস বল্‌লেন "কিন্তু কাণ্ট—"

মিষ্টার টমাস বল্‌লেন, "Categorical Imperative বল্‌ছ ত? হাঁ, সেটা আছে বটে, তবে সে সব নীতি অনুসারে কোনও য়ুরোপীয়কে কি জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত কর্‌তে দেখা যায়? য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ মনও কম বেশি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে হয় খৃষ্টের মতন দু একজন নীতিবাদীর নীতিসূত্র দ্বারা, না হয় বিজ্ঞানের নিত্যনূতন আবিষ্কারের দ্বারা;—দার্শনিকের তত্ত্বকথা দ্বারা নয়। অর্থাৎ এক কথায় আমাদের জীবনে দর্শনের প্রভাব বড়ই কম। সুতরাং আমাদের সভ্যতায় দর্শন জীবন্ত হ'য়ে উঠবার সুযোগও পায় নি। কিন্তু ভারতে যোগ, তন্ত্র প্রভৃতি নানান্ সাধন-পদ্ধতির কথা আমার সেই দার্শনিক জৈন বন্ধুটির কাছে শুনে আমার মনে হ'ত যে, দর্শন শাস্ত্র জীবন্ত বোধ হয় এক ভারতবর্ষে।"

পল্লব বল্‌ল: "কিন্তু শুনেছি গ্রীক দার্শনিকগণ—"

মিষ্টার টমাস বল্‌লেন: "Neo-Platonistরা? হাঁ, য়ুরোপে যদি কেউ জীবন্ত দর্শন ভেবে থাকে, তবে তাঁরাই হচ্ছেন একমাত্র সম্প্রদায়। তবে তাঁরাও তাঁদের দর্শনের জন্য বোধ হয় ভারতের কাছেই প্রধানতঃ ঋণী। এ কথা শুধু যে আমার জৈন দার্শনিক বন্ধু বল্‌তেন তাই নয়, এ কথার একটা মস্ত প্রমাণ এই যে, গ্রীক সভ্যতার বহির্মুখ দিক্‌টা য়ুরোপের সভ্যতার ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার কর্‌লেও, তার অন্তর্মুখীনতা—যেমন প্লেটো বা neo-platonistদের আইডিয়া—রোমক সভ্যতার সময় থেকেই য়ুরোপ বর্জ্জন করে এসেছে।"

পল্লবের এ কথাগুলি ভারি ভাল লাগ্‌ল। সে এর আগে কখনও এমন কোনও ইংরাজের মুখে ভারতের অন্তর্মুখীনতার সম্বন্ধে এমন গভীর শ্রদ্ধার কথা শোনে নি। সঙ্গে সঙ্গে তার হঠাৎ একটু আশ্চর্য্য বোধ হ'ল এই ভেবে যে, মিষ্টার টমাসের মতন স্ফূর্ত্তি, রসিকতা, কর্ম্মশীলতা প্রভৃতি প্রাণশক্তিময় লোকও মনে মনে দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে এতটা ভেবে থাক্‌তে পারেন!

ঘরের মধ্যে কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবতা বিরাজ কর্‌ল। কারণ পল্লবও এ কথার উত্তরে কি বলা উচিত ভেবে পাচ্ছিল না, মিসেস টমাসও না। কি ভেবে মিসেস টমাস হঠাৎ কথাবার্ত্তার মোড় ফিরিয়ে দেবার জন্য বল্‌লেন:

"কিন্তু আর্চিবল্ড,—মিষ্টার বাক্‌চির আসল প্রশ্নের উত্তর, যে তোমার এ সব অবান্তর প্রসঙ্গে একেবারে চাপা পড়ে গেল!"

মিষ্টার টমাস একটু হেসে বল্লেন: "ঠিক্ ঠিক্। তবে জানই ত আইরিণ, তর্ক করতে গেলেই এরকম ধান ভান্তে শিবের গীত এসে পড়ে। হাঁ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসঙ্গ ওঠ্বার ঠিক্ আগেই আমি কি যেন বল্ছিলাম?—"

মিসেস টমাস বল্লেন: "বাঁচার ইতিকর্ত্তব্যতার কথা—"

মিষ্টার টমাস বল্লেন: "হাঁ হাঁ ঠিক্। আমি বল্তে যাচ্ছিলাম যে বাঁচাটা মোটের ওপর সুবুদ্ধিরই কাজ। সুতরাং বাঁচার ব্যবস্থা করাটাও যে কম সুবুদ্ধির কাজ নয়, এ কথা বোধ হয় তর্কশাস্ত্র অনুসারে সিদ্ধান্ত হিসেবে ধরা যেতে পারে? কি বল? কিন্তু একটা কথা আমাকে আগে ঠিক্ করে বল বাক্‌চি। তোমাদের দেশে কি সঙ্গীতকারের জীবিকা-উপার্জ্জন করা একেবারেই অসম্ভব?"

পল্লব বল্ল: "হাঁ, এক পেশাদার গাইয়ে বা বাইজীদের পক্ষে ছাড়া।"

মিসেস টমাস আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্লেন: "তাই নাকি!"

পল্লব বল্ল: "হাঁ মিসেস টমাস। আমাদের দেশে সঙ্গীতকলা অশিক্ষিত অসচ্চরিত্র পেশাদার ও বাইজীদের হাতে পড়ার দরুণ সঙ্গীত দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করা আজ এত হেয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কাজে কাজেই ভদ্রলোকের পক্ষে আমাদের দেশে গান গেয়ে টাকা রোজগার করা মহা কলঙ্কের কথা। তাছাড়া আমাদের দেশ গরীবও বটে। তাই গান শুনে টাকা দেবার লোক বড় বেশি নেই।"

মিষ্টার টমাস বল্লেন: "দেশ গরীব ব'লেই যে তোমাদের দেশে গান গেয়ে টাকা রোজগার অসম্ভব তা নয় বাক্‌চি। কারণ, ভেবে দেখ, তোমাদের ধনী ও মধ্যবিত্তদের কাছ থেকে কি ঘোড়দৌড়ের book-makerরা কম টাকা উপায় করে? এবং সম্ভবতঃ তাঁরা অন্য নানারকম বাজে খরচও ক'রে থাকেন। আমার মনে হয় আসল কথা হচ্ছে দাম দেওয়া নিয়ে। তোমাদের 'দেশের ধনীরা বা সঙ্গতিপন্নেরা গান প্রভৃতি শিল্পের দাম দিতে শেখে নি; শিখেছে হয়ত—ঘোড়দৌড়ে বাজি ফেলার বা বাগানবাড়ীতে ফুর্ত্তি, আড়ম্বর প্রভৃতি করার দাম দিতে! তাছাড়া দেখ না কেন, বিগত মহাযুদ্ধে তোমাদের দেশের লোকে কি কম চাঁদা ও ধার দিয়েছে? তোমাদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ এই যে, আমরা যুদ্ধে, চাঁদা দেওয়ায় ও বাজি ফেলায়ও অর্থ-ব্যয় করার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতেও অর্থব্যয় করি। তোমরা কেবল বাজি ফেলায় কর।"

পল্লব একটু ভেবে বল্ল: "বোধ হয় কথাটা সত্য। কিন্তু রোগের নিদান ত হ'ল। এখন অষুধ?"

মিষ্টার টমাস খানিক চুপ করে রইলেন। একটু পরে চিন্তাকুল ভাবে বল্লেন: "আমার মনে হয় তোমাদের দেশেও ক্রমে হাওয়া ফিরে যাবে ও আমাদের দেশের মতন অবস্থা হবে। ও তখন গান করে টাকা রোজগার করাটা ডাক্তারী বা ওকালতি ক'রে অর্থোপার্জ্জন করার মতনই ভদ্র পেশা ব'লে গণ্য হবে।"

পল্লব সন্দিগ্ধ ভাবে বল্ল: "তা কি হবে?"

মিষ্টার টমাস বল্লেন: "আমার বোধ হয় হবে। কারণ একটু ভেবে দেখ্‌লেই দেখা যায় যে, আমাদের দেশে চার পাঁচশ বছর আগে ললিতকলার যে অবস্থা ছিল আজ তোমাদের দেশের অবস্থা অনেকটা সেই রকম। তাই আমার বোধ হয় যে আমাদের দেশের অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থার সঙ্গে তোমাদের দেশের অবস্থার ভেদ—মূলগত বা প্রকৃতিগত নয়, সময়গত মাত্র।"

পল্লব সবিস্ময়ে বল্ল: "কি রকম?"

মিষ্টার টমাস বল্লেন: "জান বোধ হয় যে বিখ্যাত মাইকেল এঞ্জেলোর পিতা তাকে ধরে মারতেন যখন তিনি ভাস্কর হবার জন্য প্রথম বায়না ধরেছিলেন?"

পল্লব আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল: "সে কি!"

মিষ্টার টমাস বল্লেন: "অর্থাৎ তখনকার দিনে আমাদের য়ুরোপে শিল্পী তেম্‌নিই সমাদৃত হ'ত আজকের দিনে তোমাদের দেশে সঙ্গীতকার যেমন অবজ্ঞাত। মাইকেল এঞ্জেলোর পিতা বল্তেন, 'আমার উচ্চ বংশে কি না শেষে শিল্পচর্চ্চা!' কিন্তু আজ য়ুরোপে শিল্পের প্রতিপত্তি কতখানি একবার ভেবে দেখ দেখি! আজ য়ুরোপে কারুসো, শালিয়াপিন, ক্রাইস্‌লার, পাদরিউস্কি প্রভৃতি গায়ক বাদকদের সম্মান সত্যি বড় বড় রাজারাজড়ার চেয়েও কম নয়। এমন কি এ কথা বল্লেও বোধ হয়

বেশি বলা হবে না যে, আজ যদি বিধাতা হঠাৎ এসে কোনও সাধারণ যুবককে জিজ্ঞাসা করেন, সে কারুসো হবে, না স্পেনের রাজা হবে, তাহ'লে বোধ হয় সে কারুসো হবারই বর প্রার্থনা করবে।"

কথাগুলি পল্লবের হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত করল। তবু সে বল্‌ল: "কিন্তু আপনি আমার আসল প্রশ্নের উত্তর দিলেন না মিষ্টার টমাস। আমার অনেক দিন থেকে মনে হয়েছে যে যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করাটা একটা বড় জিনিষ, যেহেতু টাকা নইলে সংসারে কোনও বড় হিতকর অনুষ্ঠানই সম্ভবপর হয় না। অথচ গান বেছে নিলে অর্থোপার্জ্জনের আশা ছেড়ে দিতেই হয়, কারণ ত বলেইছি যে গানে আমাদের দেশে অর্থোপার্জ্জন সম্ভব নয়।"

মিষ্টার টমাস বল্‌লেন: "হাঁ—হাঁ। তুমি এ প্রশ্নটা করেছিলে বটে। কিন্তু আমিও বোধ হয় বলেছিলাম যে এ সমস্যার সমাধান তোমার নিজের মনের কাছে খুঁজলেই পাবে। তবে তুমি যখন এ বিষয়ে আমার মতামত জানতে চেয়েছ, তখন এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে একটু আলোচনা করি এসো। প্রথমতঃ দেখ, বেশি অর্থোপার্জ্জন করা জগতের বর্ত্তমান ব্যবস্থায় খুব কম লোকেরই ভাগ্যে ঘটতে পারে। অর্থাৎ মানুষের উৎপাদিকা শক্তির এখনও এত বৃদ্ধি হয় নি, যাতে ক'রে শতকরা দু একজনের বেশি লোক প্রচুর অর্থশালী হ'তে পারে। তার পর আর একটা কথা ভেবে দেখ। যদি বেশি অর্থ রোজগার করতে হয় তাহলে ব্যবসা-বাণিজ্য করা ছাড়া গতি নেই। অথচ এ উপায়ে যত লোককে অল্প মাইনেতে বিপর্য্যয় রকম খাটাতে হয়, তাতে সমাজে দুঃখ কষ্টের ও অত্যাচারের বড় কম প্রশ্রয় দেওয়া হয় না।"

পল্লব বল্‌ল: "কি রকম!"

মিষ্টার টমাস বল্‌লেন: "কাপিটালিস্‌মের বিরুদ্ধে সোশ্যালিষ্টদের প্রধান অভিযোগ হচ্ছে এই যে, মুষ্টিমেয় কয়েকজন অর্থপিপাসু লোকের জন্য লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে রাতদিন পশুর মতন খেটে পশু হ'য়ে যেতে হয়। তাই তাঁরা বলেন যে, কাপিটালিষ্টদের অত্যাচারে ও চাপে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রত্যহ মনুষ্যত্ব হারিয়ে নিষ্পিষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে। এ শোচনীয় দৃশ্য দেখে সত্যই কবির ভাষায় বলতে ইচ্ছে হয় না কি What man has made of man? অর্থাৎ এক কথায় সমস্যাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, বেশি অর্থ রোজগার করতে হ'লেই যখন বর্ত্তমান সামাজিক বিধি ব্যবস্থায় বিস্তর লোককে পদদলিত করে রাখতে হয়, তখন ব্যক্তিগত জীবনে কি উপার্জ্জিত অর্থ থেকে কিছু দান করলেই সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'তে পারে? দৃষ্টান্ত দিতে গেলে বলা যেতে পারে যে লক্ষপতি হ'তে হলে যত লোকের মনুষ্যত্ব খর্ব্ব করতে হয়, লক্ষপতি হয়ে বিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করলেও কি সে পাপের প্রতি-বিধান হয়?"

পল্লব বল্‌ল: "কিন্তু এ কথা মূলতঃ খাটে কাপিটা-লিষ্টদের সম্পর্কে। অথচ সংসারে ঢের লোক ত কাপিটা-লিস্‌ম্‌ ছাড়াও অন্য উপায়ে টাকা রোজগার করছে!"

মিষ্টার টমাস হেসে বল্‌লেন: "আমিও এক সময়ে তাই ভাবতাম বাক্‌চি। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই দেখা যায় যে, যে কোনও উপায়ে বেশি টাকা রোজগার করা যায় প্রায় সে সবেরই মূলে কাপিটালিস্‌মের প্রকাশ্য বা উহ্য উৎপীড়ন নিহিত আছে।"

মিসেস টমাস তাঁর উলবোনা রেখে মুখ তুলে সবিস্ময়ে বল্‌লেন: "এ কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না আর্চিবল্‌ড্‌। যে লণ্ডনে আট দশখানা বাড়ী ক'রে ধনী হয় তার পক্ষে, বা যে বই লিখে অর্থশালী হয় তার পক্ষে এ কথা কেমন ক'রে খাটতে পারে?"

মিষ্টার টমাস বল্‌লেন: "এ কথার উত্তর প্রিন্স ক্রপটকিন তাঁর Conquest of bread বইখানিতে বড় চমৎকার দিয়েছেন। আমরা একটু তলিয়ে ভেবে দেখি না ব'লেই এ বিষয়ে নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন হ'য়ে উঠতে পারি না!"

পল্লব বল্‌ল: "যথা?"

মিষ্টার টমাস বল্‌লেন: "যথা?—আচ্ছা যেটা আমরা আজকাল অর্থার্জ্জনের একটা খুব প্রশস্য পন্থা মনে করি সেইটেই নেওয়া যাক্‌। ধর বই লিখে টাকা করা। প্রিন্স ক্রপটকিন দেখিয়েছেন যে ছাপাখানার লোকেরা লেখকের বইয়ের জন্য রাতদিন পরিশ্রম করে অতি সামান্য পারিশ্রমিক নেয় ব'লেই তাঁর বই বিক্রি ক'রে বেশি লাভ হওয়া সম্ভব হয়। অথচ তারা কখনই লেখকের টাকা

সরবরাহ করার জন্য এ হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে রাজি হ'ত না যদি তাদের প্রাণ ধারণের জন্য এ ছাড়া অন্য কোনও উপায় থাকৃত। রাইডার হ্যাগার্ড She লিখে যে রাতারাতি বড়মানুষ হ'য়ে গেলেন সেটা কি She যারা ছেপেছিল তারা তাদের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের জন্য অতি সামান্য পারিশ্রমিক না নিলে সম্ভব হ'ত? যাঁরা লণ্ডনের মত বড় বড় সহরে বাড়ী ভাড়া দিয়ে বড়মানুষ, তাঁদের ধন সম্বন্ধেও ঐ কথা। অর্থাৎ যদি মজুরদের পর্য্যাপ্ত পরিশ্রমে পর্য্যাপ্ত ধনোপার্জ্জন সম্ভব হ'ত, তাহলে তারা অত্যন্ত কম টাকার জন্য দিনরাত খেটে বাড়ীওয়ালার বিলাসের জন্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করতে রাজি হ'ত না। প্রিন্স ক্রপটকিন এরূপ নানান উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে, ক্যাপিটালিস্‌মের রাজত্বে প্রায় কোনও সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে দুর্ব্বল ও অজ্ঞান শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার না ক'রেই পারেন না।"

পল্লবের কাণে কথাটা সম্পূর্ণ নূতন ঠেক্‌ল। সে তার এক প্রিয় রুষ লেখকের লেখায় একবার পড়েছিল যে, সংসারে যেখানে যা কিছু অত্যাচার বা উৎপীড়ন হয়, তার জন্য আমরা স্বীকার করি বা না করি প্রত্যেকেই দায়ী।* তখন সে কথাটার সদর্থ সে ঠিক্ পরিগ্রহ করতে পারে নি। আজ যেন তার মনে সে সত্যদ্রষ্টা শিল্পীর জ্ঞানগর্ভ বাণীর মর্ম্মার্থ বিদ্যুতের মতন চকিতে উজ্জ্বল হ'য়ে আত্মপ্রকাশ করল।

সে একটু চিন্তিতভাবে বল্‌ল "কথাটা এভাবে আমার কখনও মনে হয় নি মিষ্টার টমাস্।"

মিষ্টার টমাস একটু হেসে বল্‌লেন: "তার জন্য কুণ্ঠিত বোধ করবার কারণ নেই বাক্‌চি। তুমি ত ছেলেমানুষ। শতকরা নিরানব্বই জন জ্ঞানবৃদ্ধ প্রৌঢ়রাও মানুষের ব্যক্তিগত দায়িত্বের গুরুতর দিকটা এভাবে ভেবে দেখ্‌বার সময় পান না বা পেতেও চান না। যদি চাইতেন তাহ'লে সমাজ-সংস্কার ঢের সহজ হ'ত। মানুষের হৃদয়ে কল্পনার ধারা অতি ক্ষীণস্রোত ব'লেই জগতে দুঃখ কষ্ট আজ এত বেশি।"

পল্লব বল্‌ল: "কিন্তু দানের দ্বারা অর্থসঞ্চয়ের ছোট-বড় পাপের প্রায়শ্চিত্ত যদি না-ও হয়, তাহ'লেও দানের দ্বারা যে আত্মপ্রসাদ লাভ হয় সেটাকে ত ছোট করে দেখা চলে না!"

মিষ্টার টমাস বল্‌লেন: "তা সত্য। কিন্তু এ বিষয়েও একটা বড় রকমের 'কিন্তু' আছে। অর্থাৎ দানের মধ্যে একটা পবিত্র আত্মপ্রসাদের সার্থকতা মিলতে পারে 'যদি' সেটা যথার্থ দান হয়। তবে দুঃখের বিষয় এই যে এ 'যদি'র প্রতি বড় একটা কেউ ভ্রূক্ষেপ করে না। যীশুখৃষ্টের নীতি অনুসারে কটা লোক দান করে বল ত? অর্থাৎ কটা লোক দানের সময় 'বাঁ হাত ডান হাতের দান টের পাবে না' নীতি মেনে চলে বল ত! এ কথা বল্‌লে কি বেশি বলা হবে যে অধিকাংশ লোকই এ নীতি স্বীকার করা দূরে থাকুক নিজেদের তিলপ্রমাণ দানকে লোকের কাছে তালপ্রমাণ প্রতীয়মান করতেই বেশি সচেষ্ট হ'য়ে থাকে?"

পল্লব বল্‌ল: "কিন্তু তবু এতে খানিকটা চিত্তশুদ্ধি ত হয়! অন্ততঃ আমাদের শাস্ত্রে ত তাই বলে। প্রথম থেকেই নিষ্কাম ভাবে কটা লোকে দান করতে শেখে?"

মিষ্টার টমাস বল্‌লেন: "এ কথা আমি মানি। তবে শেষটায় চিত্তশুদ্ধি ও আত্মপ্রসাদের ওপরই যখন এতটা জোর দিতে চাচ্ছ তখনই দেখ বাক্‌চি, যে, তোমার অজ্ঞাতে তুমি গোড়ার কথায় এসে পড়েছ। এতক্ষণ তুমি জগতের হিতসাধন করা প্রভৃতি বড় বড় কথা বল্‌ছিলে—কিছু মনে কোরো না বাক্‌চি—অনেকটা আমেরিকান পাদ্রীর মতন। আমার মনে হয় আসল কথা হচ্ছে ঐ ব্যক্তিগত পরিশুদ্ধির কথা। তবে মুস্কিল হচ্ছে এই যে সব জিনিষেরই মত এটাও স্পষ্টভাবে চাওয়া দরকার, নইলে পাওয়া যায় না। খৃষ্ট একটা বড় মস্ত কথা বলেছেন যেটা আমার মনে হয় জগতে একটা চিরন্তন সত্য। সে কথাটা হচ্ছে 'খোঁজ, তাহ'লেই পাবে; চাও তাহ'লেই তোমাকে দেওয়া হবে; দুয়ারে আঘাত কর, তাহ'লেই দুয়ার খুলবে।"

পল্লব বল্‌ল: "কিন্তু আমার আসল প্রশ্নের—"

মিষ্টার টমাস বাধা দিয়ে বল্‌লেন: "—উত্তর এরই মধ্যে মিল্‌বে। কারণ আসলে প্রত্যেকেরই উপলব্ধি নির্ভর করে তার আন্তরিক চাওয়ার ওপর। তাই আসল সমস্যা দাঁড়াচ্ছে—তুমি কি চাও!—যদি নাম করতে চাও ও কয়েক বৎসরের জন্য একটা ক্ষণভঙ্গুর হৈ-চৈ করে যেতে

* Brothers Karamazov......Dostoievski.

চাও তবে মনে প্রাণে সাংসারিক হও, উচিত অনুচিতের চুলচেরা বিচার নিয়ে সময় নষ্ট করতে যেয়ো না ও দরকার হ'লে কুটিল পথের আশ্রয় নিও। কেবল এইটুকু জেনো যে তাতে শেষরক্ষা হবে না ও কোনও গভীর পরিতৃপ্তির স্বাদ মিল্‌বার সম্ভাবনা থাকবে না। তবে যদি এ রকম ক্ষণস্থায়ী দেহ-সুখের ও তরল অহমিকার চরিতার্থতা না চাও, যদি কোনও বড় সার্থকতার আস্বাদ পেতে চাও, এক কথায় যদি জীবনে কোনও গভীর উপলব্ধির রসধারা আকণ্ঠ পান করতে চাও—তা'হলে—তাহ'লে—কিছু মনে কোরো না বাকৃচি—তাহ'লে অগভীর আদর্শবাদের মোহে পড়ে নিজের গভীর প্রবণতা ও আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে যেয়ে না। কারণ—" ব'লে তিনি একটু থেমে গাঢ়স্বরে বল্‌লেন: "কারণ—জগতের হিতসাধন প্রভৃতি বড় বড় কথার মোহে প'ড়ে আমরা অনেক সময়েই লক্ষ্যভ্রষ্ট হই বাকৃচি। এটা আমার কথার কথা মনে কোরো না—আমার নিজের জীবনে ঠিক্ এ ট্রাজিডিটা হয়েছে বলেই আমি তোমাকে এ কথা এত জোর ক'রে বল্‌তে সাহসী হচ্ছি।"

এ কথা ব'লেই তিনি একটু ইতস্ততঃ ক'রে বল্‌লেন: "তবে আমার কথা থাক্। আমার মোট কথাটি এই যে, তোমার ক্ষেত্রে এ নীতির প্রয়োগ মানে এই যে, তোমার পক্ষে সঙ্গীত ছেড়ে বেশি অর্থ বা সস্তা যশের জন্ম আইন বা এঞ্জিনিয়ারিং লাইনে যাওয়া বোধ হয় আত্মহত্যারই সামিল হবে। অন্ততঃ তোমাকে আমি যতটুকু জানি তাতে আমার ত তাই মনে হয়। প্রত্যেকের অন্তরাত্মা তার প্রতি রক্তকণা দিয়ে যা কামনা করে মানুষ জোর্ করলেই তার কণ্ঠরোধ করতে পারে না। তবু আমাদের অহমিকা আমাদের চোখ ঠেরে বোঝাতে চেষ্টা পায় যে এটা পারা যায়। কিন্তু সে স্তোকবাক্যে ভুললে আখেরে আমাদের জীবন এক বিরাট্ ব্যর্থতায় ভ'রে না উঠেই পারে না।"

পল্লবের মনটা এ কথাগুলি শুনে কেমন যেন পরস্পর বিরোধী অস্পষ্ট ভাবে ভ'রে উঠ্‌ল। তার মনে এ রকম একটা ধারণা গত কয়মাস প্রায়ই আনাগোনা করত। তবে সে এরূপ ধারণাকে স্বার্থ-প্রণোদিত মনে করে বড় একটা আমল দিত না। তাই আজ মিষ্টার টমাসের কথাগুলি শুনে তার মনটি একদিকে যেমন সায়ও দিল, অপরদিকে তেমনি বিদ্রোহও করে বস্‌তে চাইল। সে বল্‌ল: "কিন্তু, মিষ্টার টমাস! মানুষের নিজের হৃদয় যা চায় তারই পেছনে ছোটাটা ত একটা মস্ত আদর্শ হ'তে পারে না। কারণ এটা কি নিতান্ত স্বার্থপরের মতনই কথা হ'ল না!"

মিষ্টার টমাস একটু হেসে তখনই আবার গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লেন: "তোমার এ ইতস্ততঃ করাটা তোমার অন্তরের একটা ভাল প্রবণতারই পরিচায়ক সন্দেহ নেই। কিন্তু একটু তলিয়ে বিচার ক'রে দেখ্‌তে গেলে কি আমরা দেখ্‌তে পাই না যে, সংসারে ছোট জিনিষও যেমন স্বার্থকেন্দ্র, বড় জিনিষও তাই? কথাটা ভুল বুঝো না। কারণ এ দুই ক্ষেত্রে স্বার্থের প্রকৃতি যে একরকম, তা অবশ্য আমি বল্‌ছি না। আমি বল্‌তে চাই কেবল এই কথা যে, মানুষের ছোট আদর্শ যেমন তার স্বার্থ সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণ ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত, বড় আদর্শও তেম্‌নি উদারতর স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ বড় স্বার্থ তার সার্থকতায় অন্য পাঁচজনকেও কমবেশি সার্থক ক'রে তোলে, যেখানে ছোট স্বার্থ তার পরিসরের সঙ্কীর্ণতার দরুণ এরূপ কোনও গভীর আনন্দের পরশ পায় না। এ কথা জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে খাটে ব'লেই আমার মনে হয়, যদিও উপর-উপর দেখ্‌লে এটা হয়ত ঠিক্ প্রতীয়মান হয় না। যেমন দেখ, আমরা অনেক সময়েই ভুল ক'রে বলি যে, বুদ্ধ পাঁচজনের দুঃখশোকের দৃশ্যে অশান্ত হ'য়ে রাজ্য ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। কিন্তু সত্যিই কি তাই? আসল কথাটা কি এই নয় যে বুদ্ধ বিলাসের মধ্যেও মানুষের দুঃখজ্বালার দৃশ্যে কোনও গভীর সান্ত্বনার অমৃতস্পর্শ পাচ্ছিলেন না বলেই সেটা খুঁজতে উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন? না, না বাকৃচি, স্বার্থ জিনিষটা খারাপ নয়—স্বার্থের ধারণাকে সঙ্কীর্ণ করাটাই অকর্ত্তব্য। কারণ সংসারে সব বড় উপলব্ধির ধর্ম্মই এই যে আত্মোৎকর্ষ-রূপ স্বার্থ তার প্রেরণা হ'লেও সে তার দানের গরিমায় পাঁচজনের মনের ওপরেও কমবেশি প্রভাব বিস্তার না ক'রেই পারে না। সঙ্গীত সম্বন্ধেও এ কথা সমান খাটে। Beethoven তাঁর Moonlight Sonata বা Ninth Symphony রচনা করেছিলেন অবশ্য মূলতঃ তাঁর সৃষ্টির প্রেরণায়। তাই এ প্রেরণার উৎস যে প্রকাশের প্রবৃত্তি চরিতার্থতারূপ স্বার্থ, সে কথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু সৌভাগ্য-ক্রমে জীবনের

মধ্যে একটা গভীর মিলের সুর আছে বলে Beethovenএর অনুপম সঙ্গীত সৃষ্টিতে শুধু তাঁর স্বার্থের সার্থকতাই মেলে নি, তাতে মানুষ একটা অভিনব রস-নির্ঝরের সন্ধানও পেয়েছে। জীবনে অশেষ দুঃখ দৈন্যের মাঝখানে এ মিলের সুরের রেশটি আমার কাছে পরম ও পবিত্র মনে হয়। তাই আমি কিছুতেই মনে করতে পারি না যে Beethovenএর সঙ্গীতচর্চ্চা ছেড়ে ব্যবসা করে লাখ দুই চার টাকা দেশের হিতের জন্য দান করাই কর্ত্তব্য ছিল।"

পল্লবের তখনকার প্রশ্নসঙ্কুল মনে মিষ্টার টমাসের গভীর কথাগুলি একটা অনপনেয় ছাপ অঙ্কিত ক'রে দিয়ে গিয়েছিল। কারণ চিন্তাশীল টমাস সাহেবের আন্তরিক কথাগুলি তার কাছে অনেকটা আকুল তৃষার্ত্তের সাম্‌নে বারির মতই মনে হ'য়েছিল।...সেদিন রাত্রে শুয়ে তার চোখে ঘুম আর আস্‌ছিল না।

সম্প্রতি একজন বড় মার্কিন দার্শনিকের কোনও প্রবন্ধে একটা কথা সে বুঝতে পারে নি। তিনি ব'লেছিলেন যে প্রতি মানুষই সমগ্র বিশ্বজগৎকে মাত্র নিজের বিকাশের খোরাক হিসেবে গণ্য কর্‌তে পারে। আজ যেন সে হঠাৎ এ গভীর কথাটির মর্ম্মস্থল অবধি দেখ্‌তে পেল।...সত্যিই ত। পরহিত, জ্ঞানের পরিধি বিস্তার, সমাজ স্থাপন এ সবই ত মানুষ ক'রেছে মূলতঃ নিজেরই জন্য।...কেবল আমরা দেখ্‌তে জানি না ব'লেই এ রকম গভীর সত্যকে স্বার্থের চশ্‌মার মধ্য দিয়ে বিকৃত ক'রে দেখি।...সঙ্গে সঙ্গে তার কাণে ক্রমাগতই মিষ্টার টমাসের কথাগুলি বাজছিল যে হৃদয়কে উপবাসী রাখ্‌লে দেশের বেশি হিতসাধন করা যায়, এর চেয়ে ভুল ধারণা আর হ'তে পারে না। তার মনে হ'ল যে ঠিক্ কথা, আমাদের প্রত্যেকের জীবনে সব বড় উপলব্ধিই একদিন না একদিন তার লাভ-লোকসানের খাতায় লাভের পাতায় অঙ্কপাত করে ব'লে আমরা সে সব উপলব্ধির মূল্য দেই। তাছাড়া তার ক্রমাগতই মনে হ'তে লাগ্‌ল যে, শিল্পকলার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও বড় সত্য ও উদার সার্থকতা আছে। কারণ তা যদি না থাকৃত তাহ'লে কেনই বা মানুষ সৃষ্টির আদিম কাল হ'তে অসংখ্য বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও শিল্পের মধ্য দিয়ে নিজের সৌন্দর্য্য-অনুভূতিকেই বারবার মূর্ত্ত ক'রে তুল্‌বার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম ক'রে এসেছে?

তবে সব চেয়ে বড় যুক্তি সে ক্রমশঃ পাচ্ছিল—তার হৃদয়ের কাছ থেকে, যা টমাস সাহেব বলেছিলেন যে সে পাবেই পাবে।...তার ক্রমেই মনে হ'তে লাগ্‌ল যে হৃদয়ের এই রঙীন কামনা ও দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে একটা মস্ত সার্থকতা না থাক্‌লে বিধাতা কখনই তার মধ্যে এ গভীর শিল্পানুরাগ এমন গভীরভাবে বপন করতেন না।...

তার ক্রমশঃই মনে হ'তে লাগ্‌ল যে তার কর্ত্তব্য মিষ্টার টমাস ঠিক্‌ই নির্ণয় করে দিয়েছেন। সঙ্গীত ছেড়ে অন্য কোনও পেশা নিলে সে সুখী হবে না।...সঙ্গীতের চর্চ্চায়ই তার জীবনের একটা সত্য সার্থকতা লাভ হবে, এ বিশ্বাস তার মনে উত্তরোত্তর বদ্ধমূল হ'য়ে আস্‌তে লাগ্‌ল।...কিন্তু তবু লোকমতের ভয়?...পল্লব ক্রমশঃই বুঝতে আরম্ভ কর্‌ল মানুষের হৃদয়ে লোকমতের কি দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ! সে অবশ্য তার মনের সবল মুহূর্ত্তে সহজেই কৃতনিশ্চয় হ'য়ে উঠ্‌ত যে লোকমতকে সে গ্রাহ্যই করে না। কিন্তু দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে তার কাছে যেন তার সবল মুহূর্ত্তের প্রতিচ্ছবি অপরিচিত ব'লে মনে হ'ত। কারণ সে সময়ে কোথায়ই বা থাকৃত তার উদ্যতফণা বিদ্রোহের ভাব, আর কোথায়ই বা থাকৃত তার নিশ্চিন্ত কৃতনিশ্চয়তার আত্মবিশ্বাস!...সে যে আত্মীয়-বন্ধুর আপত্তি ও অসার লোকনিন্দা কল্পনা ক'রেই সঙ্কুচিত হয়ে পড়্‌ত! তবে?... কল্পনায়ই যে সম্ভাবনার সাম্‌নে সে মাথা নীচু করতে বাধ্য হচ্ছে, বাস্তবে সে প্রভাব কি তাকে একেবারে নিষ্পিষ্ট ক'রে দেবে না?

সে সেদিনকার আলোচনার পর থেকে আর নিয়মিত পিয়ানো বাজাবার বা বই পড়বার ইচ্ছাও নিজের মনের মধ্যে খুঁজে পেত না। যেন কিছুতেই তার মন বসে না।... সে নানা যায়গায় বেড়াতে যেত, মিষ্টার টমাসের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে গল্পালাপ করত, মিসেস টমাসের সঙ্গে বেড়াতে যেত...এক কথায় সবই করত...তবু...যেন এ সবের মধ্যে সে আর কোনও রস খুঁজে পেত না।... এতটা বিচিত্র বিস্বাদরসে তার সমগ্র মনটি ভ'রে উঠ্‌ল।...

এমন সময়ে একদিন মিষ্টার টমাসের সঙ্গে সে Oscar Wildeএর বিখ্যাত Lady Windermere's Fan নাটকটি দেখ্‌তে গেল। নাটকটি তার মনে কেমন এক অভূতপূর্ব্ব ঝঙ্কার তুলল। বিশেষতঃ নাটকের শেষ অঙ্কে

নায়কের উচ্ছ্বসিত আবেদন তাকে মুগ্ধ করে দিয়েছিল যেখানে নায়ক তাঁর প্রণয়িনীকে বল্ছেন: "তুমি যদি আমাকে সত্য ভালবাস তবে স্বামীত্যাগ ক'রে আমার সঙ্গে পালিয়ে এসো। তবে আমি একটা কথা তোমাকে ব'লে রাখ্তে চাই। আমি তোমাকে এ স্তোকবাক্যে ভোলাতে চাই না যে এজন্য কলঙ্কের বোঝা মাথায় নেওয়ায় কিছু যায় আসে না। সমাজের মতামতে যায় আসে—খুবই যায় আসে। তবে তা সত্ত্বেও আমি বল্ব যে মানুষের জীবনে এমন সময় আসে যখন সে এরূপ গভীর কলঙ্ককেও বহন কর্তে সঙ্কুচিত ত হয়ই না, বরং তাকে বরণ করতেই আকুল হ'য়ে ওঠে। কারণ তখন সে বোঝে যে সমাজের জন্য যন্ত্রপুত্তলীর মতন জীবন যাপন করা এক জিনিষ—যার নাম ভণ্ডামি—আর যথার্থ 'বাঁচা' আর এক জিনিষ,—যার নাম সার্থকতা।"

এ কথাটি সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গের সূত্রে বলা হ'লেও, এবং নারীর কুলত্যাগিনী হওয়ার সপক্ষে প্রযুক্ত হ'লেও পল্লব এ কথাগুলির মধ্যে যেন একটা বড় সত্যের আভাস পেল। অথচ এ কথা স্বীকার কর্তেও তার মনে কেমন যেন একটা গ্লানি ও কুণ্ঠার ভাবের উদয় হ'তে লাগ্ল।...কারণ বাল্যকাল থেকে সে ছিল একটু puritan প্রকৃতির মানুষ, যে জন্য তার সহপাঠীরা তাকে অনেক সময়ে 'ব্রাহ্ম সুবোধ বালক' ব'লে ঠাট্টা কর্ত। তাই নারীর কুলত্যাগ করার স্বপক্ষে এ যুক্তিতে তার মন বিদ্রোহী হ'য়ে না উঠেই পারে নি। এমন কি এরূপ যুক্তি মন দিয়ে শোনাও সে দুর্নীতি মনে কর্ত।...কিন্তু সে ভারি আশ্চর্য্য বোধ কর্তে লাগ্ল যখন সে দেখ্ল যে তার মনটি তার বিদ্রোহ সত্ত্বেও এই যুক্তিগুলিকেই তার সৎসঙ্কল্পের স্বপক্ষে যুক্তি স্বরূপে খাড়া কর্তে প্রয়াসী!...তবে সে এই ব'লে নিজের মনকে সান্ত্বনা দিল যে মানুষের মনের এমন সময় আসে যখন সে নিজের প্রবণতার স্বপক্ষে যুক্তি যেন সব তাতেই খুঁজে পেতে চায়। অন্ততঃ সে এ সময়ে নানা সূত্রে, অপরের নানান্ চিন্তার মধ্যে সর্ব্বদা যেন নিজেরই তদানীন্তন সমস্যা প্রতিফলিত দেখ্তে লাগ্ল। অভিনয়টি দেখার পর তার মন তার কাণে কাণে বল্তে লাগ্ল: 'সত্য কথা। মানুষের জীবনে এমন মুহূর্ত্ত আসে যখন তার সত্যকার বাঁচার আদর্শের সঙ্গে সমাজ-আদিষ্ট জীবনযাপনের আদর্শের সংঘর্ষের একটা রফা নিষ্পত্তি না কর্লে চলে না।'...

এই সব সাত পাঁচ ভাব্তে ভাব্তে একদিন সে ভাব্ল যে তার পিতাকে তার সঙ্কল্প ও যুক্তির কথা বিস্তারিতভাবে লিখে জানানোর সময় হয়েছে। তার পত্রের উত্তরে অনুপম তাকে যা লিখেছিলেন সে কথা ইতিপূর্ব্বেই বর্ণিত হয়েছে।

পল্লব পিতার উত্তর পেয়ে মনস্থির করে ফেল্ল যে আর সে ইতস্ততঃ কর্বে না...বৎসর খানেক কেম্ব্রিজে 'হার্মনি' পড়বে ও পিয়ানো শিখ্বে; তারপর জার্ম্মানিতে বা ফ্রান্সে গান শিখ্তে যাবে। (অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে পিতার ইচ্ছামত ব্যারিষ্টারিটাও পাশ ক'রে যাবে।)

(৭)

পল্লব মাসাধিককাল মিষ্টার টমাসের বাড়ীতে থেকে কিছুদিন লণ্ডনে কাটাবার জন্য টমাস পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নিল। তার বিদায় নিতে আর ইচ্ছা করছিল না। কারণ কয় সপ্তাহে শুধু যে সে মিষ্টার টমাসের প্রতি একটা আন্তরিক টান অনুভব করছিল তাই নয়, তার এ কয়দিনের অভিজ্ঞতায়ই একটা কথা বড় বেশি ক'রে মনে হ'য়ে তার এ পরিবারের মনোজ্ঞ সাহচর্য্য ছেড়ে যেতে কষ্টবোধ হচ্ছিল। দেশে সে বরাবর ইংরাজকে একটা বিশেষ চশ্মার মধ্য দিয়ে দেখ্ত। তার মনে হ'ত যেন ইংরাজের ও ভারতীয়ের মনোজগতের মধ্যে একটা দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান আছে। মিষ্টার টমাসের সঙ্গে পরিচয়ের আগে বৎসরাধিককাল কেম্ব্রিজে থেকেও তার এ বিশ্বাস বিশেষ ক্ষীণমূল হ'য়ে আসে নি। সত্য বটে, মিসেস নর্টনের সঙ্গে তার প্রীতির সম্বন্ধটা একটা তৃপ্তিদ আন্তরিকতার রসে সিঞ্চিত হ'য়ে তার কাছে উজ্জ্বল হ'য়েই ধরা দিয়েছিল,—কিন্তু তবু পল্লব ইংরাজ রমণীর সঙ্গে সে আন্তরিক সৌহার্দ্দের সম্বন্ধকেও একটু অন্য চক্ষে না দেখে পার্ত না। কারণ সে কৈশোরে পদার্পণ করার সময় হ'তে একটা জিনিষ লক্ষ্য করে প্রায়ই কেমন যেন এক বিচিত্র অনুভূতির স্নিগ্ধতার পরশ পেত। সে বেশ স্পষ্ট অনুভব কর্ত যে নিকটাত্মীয়া নারীর সঙ্গেও যে স্নেহপ্রীতির সম্বন্ধটি স্থাপন করা যায় সেটা পুরুষ বন্ধু বা আত্মীয়ের সঙ্গে স্নেহপ্রীতির সম্বন্ধ হ'তে কেমন যেন একটু ভিন্ন প্রকৃতির

না হ'য়েই পারে না। কৈশোরে উপনীত হবার সময়ে এ আবিষ্কারে সে প্রথমটায় যথেষ্ট আশ্চর্য্য না হ'য়েই পারে নি। তবে তার এ আশ্চর্য্যের মাত্রা একটু বেশি হওয়ার একটু কারণও ছিল। দেশে থাক্‌তে সে নারীর সঙ্গে পুরুষের সম্বন্ধের ভিতরকার কথাটা নিয়ে বড় বেশি আলোচনা করার সুযোগ পায় নি; কেননা কুস্কুম মোহনলাল প্রভৃতির বন্ধুত্ব, পড়াশুনো ও খেলাধূলোই তার মনোযোগের ও চিন্তার বার-আনা অংশ অধিকার ক'রে থাকত। তবু দৈনিক জীবনেও নানান্ সামান্য ছোটবড় অভিজ্ঞতাই সময়ে সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে তার মনে পূর্ব্বোক্ত বিচিত্র অনুভূতিটি বহন ক'রে এনে দিত। অর্থাৎ সে অস্পষ্ট ভাবে হ'লেও অনেকবারই অনুভব না ক'রেই পারে নি যে নারীর সঙ্গে স্নেহপ্রীতির আদান প্রদানে চিরকালই এমন একটা কোমলতা বা মাধুর্য্যের রসধারা বিরাজ ক'রে থাকে যেটা নিতান্ত অন্তরঙ্গ পুরুষ বন্ধুর ভালবাসার মধ্যেও পাওয়া যায় না।

বিলেতে এসে মিসেস নর্টনকে অনেকটা কাছ থেকে পেয়ে পূর্ব্বোক্ত অভিজ্ঞতাটিই তার কাছে আরও বিচিত্রশ্রী হ'য়ে ধরা দিয়েছিল মাত্র। তাই, মিসেস নর্টনের সঙ্গে তার নিকট পরিচয়কে সে তাঁর নারীহৃদয়ের স্বাভাবিক সৌকুমার্য্য ও কোমলতার ওপরই আরোপ করত। এজন্য ইংরাজ জাতি সম্বন্ধে তার বরাবরকার ধারণা মূলতঃ অটুটই ছিল বলা যেতে পারে। কিন্তু তার এ ধারণায় সব চেয়ে বেশি নাড়া দিয়ে দিয়েছিলেন—মিষ্টার টমাস। তাঁর উদার সৌজন্যে ও সহজ প্রীতির ব্যবহারে পল্লবের মনের বহুদিনলালিত ইংরাজবিদ্বেষ যেন যাদুকরের মোহস্পর্শের মতনই নিমেষে অদৃশ্য হ'য়ে গিয়েছিল। তাই সে য়ুরোপে এ অভিজ্ঞতাটিকে খুব বড় ক'রে না দেখেই পারত না। তার এ কয়দিনে বিশেষ ক'রে মনে হ'ত একটা কথা। সেটা হচ্ছে—টমাস পরিবারের অপরিচিত জনকে অযাচিতভাবে এমন আপন ক'রে নেওয়ার একান্ত সহজ সৌজন্য। তার স্বদেশী কোনও ভদ্র পরিবারের মধ্যে কি কখনও এক অজ্ঞাতকুলশীল য়ুরোপীয় যুবকের এরূপ আন্তরিক সমাদর মেলা কল্পনাও করতে পারত? অথচ য়ুরোপে এটা প্রায়ই ঘটে থাকে।

টমাস পরিবারের নানান সদয় সস্নেহ ব্যবহারে এই কথাটাই তার মনে নিরন্তর নানা রূপে নানা ছন্দে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠ্‌ত। সে সঙ্গে সঙ্গে অনুতপ্ত বোধ করত যে না জেনে অতিথির কাছ থেকে টাকা-নেওয়া-রূপ প্রথাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে গিয়ে সে বিদেশীয়ের আতিথ্য সৎকারের এ মহনীয় দিক্‌টার প্রতি কি অবিচারই না করেছে! বিশেষতঃ যখন তার স্বদেশীয়দের এ বিষয়ে প্রথা-আচার এত পেছিয়ে পড়ে আছে!

সে ভারত আতিথ্য সৎকার জানে এক ভারতবাসী। কিন্তু সত্যই কি দুএকদিন অভ্যাগতকে উৎকৃষ্ট ভোজ্য-পানীয় দিলেই তার চরম সমাদর করা হয়? বিদেশীকে আপনার করে নেওয়া, তার সঙ্গে একত্র আহার বিহার করা, এমন কি তাকে নিজ-পরিবারের একজন ব'লে গণ্য করা,—এ সব কি ভারতের তথাকথিত অতিথিপূজার চেয়ে ঢের বড় জিনিষ নয়? হায়, একদেশদর্শী স্বদেশগর্ব্ব কত বড় অজ্ঞতার ও কূপমণ্ডুকতার পরিচায়ক!

(৮)

তবু পল্লব মিষ্টার টমাসের কাছ থেকে বিদায় নিল, কারণ, লণ্ডনে তার মিসেস ইভেলিন সিংহ ব'লে একটি বিধবা বর্ষীয়সী ইংরাজ রমণীর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ছিল। ইতিপূর্ব্বে অনেকবারই তিনি পল্লবকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, কিন্তু পল্লব এর আগের দুইটি ছুটি কুস্কুম ও মোহনলালের সঙ্গে একত্র কাটিয়েছিল। তাই এবার মাসখানেক সাউথেণ্ডে থাকার পর টমাস পরিবারে আরও কিছুদিন থাকার ইচ্ছা হ'লেও সে অনেকটা কর্ত্তব্যবোধেই তাঁদের সস্নেহ আতিথ্যের মায়া পরিত্যাগ করে লণ্ডনে যাওয়া স্থির করল।

'কর্ত্তব্যবোধে' কথাটির অর্থ একটু বিশদ করে তোলার দরকার আছে।

মিসেস সিংহ রণেন্দ্র সিংহ বলে একজন বাঙালী সিভিলিয়ানকে বিবাহ ক'রেছিলেন। পল্লবের পিতা যখন পাটনায় জজিয়তি করতেন, তখন রণেন্দ্র সিংহ ছিলেন সেখানকার কমিশনর। দুজনেই খুব সাহিত্যানুরাগী ছিলেন ব'লে তাঁদের মধ্যে সহজেই বন্ধুত্ব হয়েছিল। রণেন্দ্র প্রায়ই অনুপমের ওখানে আস্‌তেন ও অনুপমও মাঝে মাঝে রণেন্দ্রের ওখানে যেতেন। দুজনের মধ্যে প্রায়ই ঘণ্টার পর ঘণ্টা তর্ক চলত।

প্রতি মানুষেরই মেলামেশার ক্ষেত্রে প্রধানতঃ দুটি রূপ থাকে বলা যেতে পারে। একটা সে বাইরে যেভাবে প্রতীয়মান হয় সেই রূপ, ও আর একটা অন্তরঙ্গদের কাছে যেভাবে প্রাণ ও রসের আদান প্রদান করে সেই রূপ। এ দুটির মধ্যে প্রভেদ অনেক সময়ে গভীর হ'য়ে ওঠে, যেমন অনুপমের ক্ষেত্রে হয়েছিল। সচরাচর অল্পভাষী, সংযত-ব্যবহার ও গম্ভীরানন অনুপম রণেন্দ্রের সঙ্গে প্রাণখোলা তর্ক ও হাসির সময়ে এক অন্য রূপ ধারণ করতেন। তখন তাঁর কি উচ্চ হাস্য, কি টেবিলে করাঘাত, কি ঘণ্টার পর ঘণ্টা উদ্দীপ্ত বাক্যস্রোত ও যুক্তি প্রদর্শন—কিছুরই বিরাম ছিল না। অনেক সময়েই তর্ক গভীর রাত্রি পর্যান্ত চল্‌ত। পল্লব একেই বাল্যকাল থেকে তর্ক করতে ও শুন্‌তে একটু বিশেষ রকম ভালবাস্‌তে শিখেছিল। তার ওপর অনুপম তাকে মাঝে মাঝেই সঙ্গে ক'রে রণেন্দ্রের ওখানে নিয়ে যেতেন ব'লে সে ক্রমে অল্প বয়সেও ব'সে ব'সে অনেকক্ষণ ধরে নিবিষ্টচিত্তে পিতার ও রণেন্দ্রের তর্ক শুনতে অভ্যস্ত হ'য়ে উঠেছিল। তখন পল্লবের বয়স হবে ১৩।১৪। মিসেস সিংহ তাকে খুবই ভালবাস্‌তেন। নিজে অপুত্রবতী ছিলেন বলেই হোক্ বা স্নেহের তত্ত্ব দুর্জ্ঞেয় ব'লেই হোক্, পল্লবের ওপর তাঁর প্রথম থেকেই কেমন একটা বিশেষ মায়া প'ড়ে গিয়েছিল। মাতৃহীন পল্লবও তাঁকে বড় ভালবেসে ফেলেছিল। তার একটা প্রকাণ্ড কারণ ছিল এই যে, মিসেস সিংহ ছেলেদের নানাবিধ চকলেট ও হৃদয়স্পর্শী বিস্কুট বিতরণ করায় বিশ্বাস কর্‌তেন। পল্লবের শত চেষ্টা সত্ত্বেও সে এদিকে একটা দুরারোগ্য হৃদয়দৌর্ব্বল্য প্রায়ই প্রকট না ক'রেই পার্‌ত না। ফলে পল্লব দু চার দিন তাঁর কাছে না এলে তিনি অনেক সময়ে চাপরাশীর হাত দিয়ে তাকে পূর্ব্ববিধ হৃদয়গ্রাহী উপহার পাঠিয়ে দিতেন। পল্লবের পিতা এতে প্রথমটায় একটু আপত্তি কর্‌লেও এ আপত্তিতে পুত্রের সহানুভূতি একেবারেই না পেয়ে শেষটায় নিরস্ত হতে বাধ্য হ'য়েছিলেন। পরিণামে পল্লব তার শুভার্থিনী উপহারদাত্রীর এতই 'নেওটো' হ'য়ে পড়েছিল যে লোকে বল্‌ত পল্লব মিসেস সিংহের পোষ্যপুত্র। এতে পল্লব কেন যেন মনে মনে ভারি রাগ কর্‌ত। কিন্তু সে রাগের গভীরতা তার রসনাদৌর্ব্বল্যকে জয় করতে পার্‌ত না। সুতরাং এ সব তুচ্ছ রাগ তার মিসেস সিংহের কাছে সময়ে অসময়ে যাওয়ার প্রতিবন্ধক হ'য়ে উঠ্‌তে পারে নি।

এমন সময়ে একদিন রণেন্দ্র হঠাৎ সন্ন্যাসরোগে পরজগতের নৌকায় অজানার উদ্দেশে পাড়ি দিলেন। তখন মিসেস সিংহ বিলেত চ'লে আসেন। কারণ প্রথমতঃ তিনি আবাল্য বিলেতেই মানুষ ও দ্বিতীয়তঃ লণ্ডনে হাম্‌ষ্টেড্ নামক মনোজ্ঞ পল্লীতে মিষ্টার সিংহ তাঁর ইংরাজ পত্নীর জন্য একটি মনোজ্ঞ বাড়ী কিনে রেখেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল চাকুরী হ'তে অবসর গ্রহণ ক'রে তিনি এই বাড়ীতেই জীবনের শেষভাগ যাপন কর্‌বেন। কিন্তু কালের অভিলাষ তাঁর সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হ'তে দিল না। স্বামীশোকাতুরা সাশ্রুনেত্রে স্বামীর প্রিয় হর্ম্ম্যে এসে আশ্রয় নিলেন।

বিলেতে আস্‌বার সময়ে তিনি অনুপমকে বার বার ব'লে আসেন যেন পল্লবকে তিনি বি-এস্‌সি পাশ করার পরই লণ্ডনে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল পল্লব লণ্ডনে পড়ে ও তাঁর কাছে থাকে। কিন্তু পল্লব গেল কেম্ব্রিজে। তখন তিনি একটু নিরাশ হ'য়ে পল্লবকে দু'তিনবার নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠিয়েছিলেন—তাঁর কাছে একটা ছুটি যাপন করবার জন্য। পল্লবের নানা কারণে প্রথম বৎসরে দু' একদিনের জন্য ছাড়া লণ্ডনে আসা হ'য়ে ওঠে নি। তাই এবার চার মাস ব্যাপী লম্বা ছুটিতে সে স্থির করেছিল যে মিষ্টার টমাসের আতিথ্যে মাস দুই কাটিয়ে বাকী অর্দ্ধেক ছুটি মিসেস সিংহের ওখানে যাপন করবে।

তবে গম্ভীর সত্যের খাতিরে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে পল্লবের এ কর্ত্তব্যবোধের সঙ্গে স্বার্থও যে একেবারে বিজড়িত ছিল না এমন নয়। কারণ লণ্ডনে সে মাঝে মাঝে এক আধবার মিসেস সিংহের ওখানে যখনই দর্শন দিয়েছিল, তখনই তিনি তাকে তাঁর নিজের হাতের দুএকটা বাঙালীগৌরব ব্যঞ্জন রেঁধে খেতে দিতেন। য়ুরোপের রন্ধননৈপুণ্যের অভাবকে দার্শনিকের চোখে দেখার চেষ্টা করলেও পল্লব এ যাবৎ তাতে সফলতা লাভ কর্‌তে পারে নি। বিশেষতঃ দিনের পর দিন রন্ধন-অপটু বিলাতী রাঁধুনীর রান্না খেয়ে খেয়ে তার ক্লিষ্ট মনটি তার নৈতিক

আত্মশাসনকে বেমালুম উপেক্ষা ক'রে মিসেস সিংহের বাঙালী পরিবেষণের দিকে একটু বেশি রকমই ঝুঁকে পড়্‌ত। যদিও তাঁর অশিক্ষিতপটু হাতের বাঙালী রান্না অনেক সময়ে এক বিচিত্র ও অদ্ভুত মৌলিকতায় গরীয়ান্ হ'য়ে উঠ্‌ত, তবু সে অনত্যুচ্চ অঙ্গের রান্নাও সম্পূর্ণ কলা-কারু বিহীন ছিল না। বিশেষতঃ লবণ মশলা-সম্পর্ক-বিবর্জ্জিত, ব্যঞ্জন ঝোল লেশহীন সিদ্ধ-ভর্জ্জন মাত্র পর্য্যবসিত, দৃষ্টিমাত্রে-লালসা-সঞ্চারণে-অপটু, এক কথায় আধ্যাত্মিকতার-নামগন্ধ-বিরহিত বিলাতী রান্নার পর যে বাংলাদেশের যে-কোনও রান্না শুধু দেশভক্ত নয় দেশাত্মবোধহীন ভারতীয়ের রসনায়ও নিরপেক্ষভাবে অমৃত সিঞ্চন করতে বাধ্য এ কথা কোনও ব্যথার ব্যথীরই অগোচর থাক্‌তে পারে না।

মিসেস সিংহের ছবির মতন বাড়ীটি হাম্‌ষ্টেড হীথের খুব নিকটেই। সামনেই ছোট্ট বাগান। সে পল্লীতে প্রায় সব বাড়ীরই সংলগ্ন জমিতে ফুলের বাগান বা কেয়ারি। তার ওপর বাড়ীর মধ্যেও প্রতি ঘরে, সিঁড়িতে, কোণে নানা স্থলে সুন্দর সুন্দর ফুলের টব। ইংরাজ জাতির এই পুষ্পানুরাগ, বাস-পারিপাট্য ও সুন্দর গৃহসজ্জা পল্লবের বড় ভাল লাগ্‌ত। মিসেস সিংহ তাঁর বাড়ীর নীচের তলাটি ভাড়া দিয়ে ওপরের তলায় থাক্‌তেন। তাঁর ঘর ছিল মোটে চারটি। কিন্তু প্রতি ঘরই এমন পরিপাটি ও রুচিকর ভাবে সজ্জিত যে, তাতে পল্লব একটা ভারি নয়নারাম পেত। অথচ মিসেস সিংহ ধনী ছিলেন না বা গৃহসজ্জার বাহুল্য বা আড়ম্বরের এতটুকুও পক্ষপাতী ছিলেন না। তবু তিনি কেমন সুন্দর স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে বাস কর্‌তেন। পল্লবের ইংরাজদের এ পারিপাট্য-কুশলতা ক্রমেই বেশি ভাল লাগ্‌ছিল। তাদের বাসের সর্ব্বপ্রকার ধরণধারণের মধ্যেই একটা সুচারু সভ্যতা ও বহুদিন-বিকশিত সৌকুমার্য্য ফুটে উঠ্‌ত। এসব দেখ্‌তে দেখ্‌তে অজ্ঞাতে বাস-করার-মধ্যেকার কলাকারু সম্বন্ধে তার যেন ক্রমেই চোখ খুলছিল। সে দু'একবার কলিকাতায় দু'চারজন ধনী বাঙালী জমিদার ও অশিক্ষিত মাড়োয়ারির অজস্র অর্থব্যয় ক'রে ঘর সাজানো দেখেছিল। ইংরাজ মধ্যবিত্তের সান্ত উপকরণ-সম্ভারের সঙ্গে তাদের অনন্ত উপকরণ-সম্ভারের তুলনাই হ'তে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাধারণ সভ্য ইংরাজের গৃহসজ্জাকুশলতার মধ্যে পল্লব যে ভব্য মনটির পরশ পেত তার সঙ্গে তুলনায় ধনী মাড়োয়ারির উপকরণ আড়ম্বর যেন তার কাছে বর্ব্বরতারই পরিচায়ক ব'লে মনে হ'ত। পল্লব ক্রমেই উপলব্ধি করছিল যে সুরুচি বস্তুটি মানুষের হৃদয়ের সৌকুমার্য্যের এমন একটা কষ্টিপাথর—যার অভাব অর্থের কুচকাওয়াজ দিয়ে পূর্ণ করা যায় না।

মিসেস সিংহ বস্তুতঃ বড় স্নেহপ্রবণ রমণী ছিলেন। তাঁর স্বামীর প্রতি অনুরাগ তাঁর এই স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত স্নেহ-উৎসেরই একটি প্রধান ধারা মাত্র ছিল। কারণ বলা বাহুল্য তিনি হিন্দু নারীর মতন পতিকে পরম গুরু মনে করে নিজের নারীজীবনের সার্থকতা লাভের প্রয়াসী ছিলেন না। তিনি স্বামীকে সত্যই মনেপ্রাণে ভালবাস্‌তেন, তবে সে ভালবাসার মধ্যে অসাধারণত্ব বিশেষ কিছু ছিল না। কারণ তিনি মিসেস নটনের মতন গভীরচিত্ত ছিলেন না ও এক একটু বেশি স্নেহপ্রবণতা ছাড়া অন্য কোনও বিষয়েই অসাধারণত্বের দাবী করতে পার্‌তেন না।

ফলে স্বামীর মৃত্যুর পর হ'তে এ স্নেহশীলা নিঃসন্তানা নারী তার উচ্ছ্বসিত নারী-হৃদয়ের উদ্বেলিত স্নেহের একটি আধার খুঁজতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। অবশেষে অন্য কোনও আধার না পেয়ে শেষটা তাঁর এক আধ-পাগলা বোনকে তিনি পাগলাগারদ থেকে নিয়ে এসে দুই বোনে ভাঙা ঘরে নতুন করে সংসার পেতে বসেছিলেন। তাঁর শুভাখিনী অনেক প্রাতিবেশিনীই তাঁকে সদুপদেশ দিতে ত্রুটি করে নি, যে 'পাগল বোনকে কেন অনর্থক ঘাড়ে করা, দাও তোমার কৃতী ভাইদের কাছে পাঠিয়ে, না হয় পাগ্‌লা-গারদেই ফিরিয়ে'—ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু তিনি সে সব হিতাকাঙ্ক্ষিণীর হিতোপদেশে কর্ণপাত করেন নি।

বিলেতে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবারে মেয়েদের প্রায় সব গৃহকর্ম্মই নিজেদের করতে হয়। পল্লব দেশে থাক্‌তে ভাবত বুঝি বিলেতের মেয়েরা ইঙ্গবঙ্গ মেমসাহেবদের মতনই বিলাসিনী। কিন্তু বিলেতে এসে তার এ ভ্রম ভাঙ্‌তে দেরি হয় নি। সে দেখ্‌ত যে বড় বড় বাড়ীতেও একটির বেশি দাসী থাকে না—ভৃত্য ত থাকেই না। মেয়েরাই সেখানে বাজার করে, রাঁধে, সেলাই করে, ঘরদোর পরিষ্কার রাখে ইত্যাদি।...মিসেস সিংহও খুব পরিশ্রম করতে পারতেন। তিনি নিজহস্তেই

বাঁধতেন। তবে বিলাতে সচরাচর আমাদের দেশের সঙ্গতিপন্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মতন সাতসতের রকমের ব্যঞ্জন রান্না হয় না ব'লে রন্ধনকার্য্যে মেয়েদের বেশি সময় বা শ্রম ব্যয়িত হয় না। তবু সমাজে নানা রকম মেলামেশা ক'রেও যে মিসেস সিংহ কেমন ক'রে ঘরকন্নার কাজ এত সুচারু ভাবে সম্পন্ন করতেন, তা ভেবে পল্লব বিস্মিত না হ'য়েই পার্‌ত না।

কারণ মিসেস সিংহ সত্যই বরাবরই একটু বেশি মিশুক ছিলেন। তিনি চিরকাল ভারতবর্ষে চা, টেনিস, ডিনার প্রভৃতির পার্টি দিয়ে দিয়ে এত জনকোলাহলপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন যে শান্তরসাস্পদ হাম্‌ষ্টেড তাঁর একটু বেশি নির্জ্জন বোধ হ'ত। তাই তাঁর লণ্ডনের বাড়ীতেও তিনি প্রায়ই ভারতীয় ছাত্রদের ও ইংরাজ বন্ধুবান্ধবীদের চা, ডিনার প্রভৃতিতে নিমন্ত্রণ করতেন। তিনি নিজে কথাবার্ত্তায়, আদবকায়দায়, চেহারায় ও শিক্ষায় পুরোদস্তুর ইংরাজনারী হ'লেও তথাকথিত বঙ্কিমগ্রীবা মেমসাহেব ছিলেন না। তিনি ভারতীয়দের পর মনে করতেন না, বরং স্বামীর সম্বন্ধে মনে প্রাণে আত্মীয় ব'লেই গণ্য করতেন। এমন কি তিনি নিজেকে ভারতীয় ব'লেই পরিচয় দিতেন ও এক রন্ধনাদি গৃহকর্ম্মের সময়ে ছাড়া প্রায়ই শাড়ী পরতেন। এতে পল্লব মনে মনে বড়ই প্রীত হ'ত। বাঙালীর ইংরাজমহিলা বিবাহ ক'রে সুখী হওয়া সম্ভব নয় এ কথা সে বরাবরই দৃঢ় বিশ্বাস করত। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে অস্বীকার করতে পারত না যে, মিসেস সিংহ তাঁর বিবাহিত জীবন স্বামীর সঙ্গে সুখেই কাটিয়েছিলেন। তার প্রধান কারণ ছিল—তাঁর হৃদয়ে স্নেহের আধিক্য ও মেশ্‌বার ক্ষমতা। তাঁর উদারতা ও সমতন্ত্রবাদও তাঁর এই স্নেহকোমলতার দ্বারাই প্রণোদিত হ'ত। পল্লব তাঁকে একটু পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের লোক ব'লে মনে না ক'রেই পার্‌ত না। কারণ তার মনে হ'ত যে মিসেস সিংহের জীবন অনেকটা একটানা স্রোতেই ব'য়ে এসেছে—জীবনে অধুনাতন জটিলতা বা অসঙ্গতির আবর্ত্তে উদ্‌ভ্রান্ত হবার সুযোগ তিনি পান নি। সংসারে এক রকম শ্রেণীর লোক থাকে যারা জীবনটাকে আমরণ অবিমিশ্র ভাল চোখেই দেখে যায়। মিসেস সিংহ ছিলেন অনেকটা এই প্রকৃতির মানুষ। তিনি চাইতেন—সকলের সঙ্গে সদ্ভাব রাখতে, সব মানুষকে ভাল ভাবতে; জীবনে দুঃখের চেয়ে সুখকেই বড় ক'রে দেখতে। তিনি বলতেনও ভাল ভাল কথা, যথা :—'ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যই' 'মন্দ আছে শুধু ভালকেই উজ্জ্বল করে দেখাবার জন্য,' 'ব্যথার আগুনের মানে হচ্ছে এই যে তাতে মানুষের খাদটুকু পুড়ে গিয়ে সোণাটুকুই উজ্জ্বল হয়ে ধরা দেয়;' ইত্যাদি ইত্যাদি।

তাঁর সব আচরণেই তাঁর এই প্রবণতাটিই বেশি প্রকট হ'য়ে উঠত। যেমন তিনি চাইতেন, তাঁর অভ্যাগতদের সাম্‌নে পল্লব অহোরাত্র ভারতীয় গান করে। কেন না তাঁর বিশ্বাস ছিল তাতে ক'রে ইংরাজেরা ভারতীয় সঙ্গীতের গরিমা বুঝতে শিখ্‌বে। পল্লব তাঁর ভারতীয় অতিথিদের সাম্‌নে মন খুলে গান করতে সঙ্কোচ বোধ না করলেও ইংরাজ অতিথিদের উপস্থিতিতে গাইতে বড় একটা রাজি হ'ত না; কারণ সে দেখেছিল যে ইংরাজদের ভারতীয় গান ভাল লাগে না। এতে মিসেস সিংহ আপত্তি ক'রে বলতেন যে, ও তার ভুল ধারণা; যেহেতু সব ভাল জিনিষই সব ভাল লোকের ভাল লাগতে বাধ্য; শেক্সপীয়র বলেছেন যে, যে মানুষ গান ভালবাসে না সে সব করতে পারে, কার্লাইল বলেছেন যে গভীর ভাবে দেখ্‌লে সর্ব্বত্রই সঙ্গীতের ধ্বনি শোনা যায় ইত্যাদি ইত্যাদি।

পল্লব বলত যে সংসারের সমস্ত লোক ভাল ধ'রে নিলেও এ সিদ্ধান্ত করা চলে না যে সব রকম ভাল জিনিষ সব রকম ভাল লোকেরই ভাল লাগতে বাধ্য। এরূপ কথার উত্তরে মিসেস সিংহ বলতেন যে এরূপ ধারণা পল্লবের ভুল, যেহেতু মিসেস ড্রিঙ্কওয়াটার, মিষ্টার হেনপেক ও মিস জনষ্টনহিক্‌ কি প্রায়ই ভারতীয় গান শুনে সোৎসাহে করতালিতে ঘর মুখরিত করেন না,—ও 'কি চমৎকার', 'কি স্বর্গীয়', প্রভৃতি পুলকবচন অজস্র ব্যবহার করেন না? পল্লব এই সরলহৃদয়া সদাউৎসাহকম্পিতা মহিলার সঙ্গে প্রথম প্রথম সমান উৎসাহে তর্ক করত। কিন্তু সে অবিলম্বেই নিজের ভুল বুঝেছিল ও ক্রমেই তাঁর সঙ্গে তর্কের মাত্রা কমিয়ে এনেছিল। কারণ সে ক্রমশঃই বেশি করে উপলব্ধি করছিল যে সে নিজের অল্প অভিজ্ঞতায়ই সংসারের যতটা কুটিলতা ও ক্ষুদ্রতার সঙ্গে সংস্পর্শে এসেছে, এ সহৃদয়া নারী ততটা সঙ্কীর্ণতা ও অসারতার সঙ্গেও পরিচিত হবার সুযোগ

পান নি। যেন বরাবর সব জিনিষের মধ্যে ভালটাকেই বড় ক'রে দেখে দেখে মন্দের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হবার ক্ষমতাটিও তাঁর বিলুপ্তপ্রায় হ'য়ে এসেছিল।

তবু সে মাঝে মাঝে তর্ক না ক'রে থাক্‌তে পারত না। বিশেষতঃ যখন সে দেখ্‌ত যে ইংরাজের মৌখিক ও লৌকিক হাততালিকেও তিনি আন্তরিক ভাবতেন, তখন সে একটু চঞ্চল না হ'য়েই পার্‌ত না। সে বল্‌ত: "মিসেস সিংহ, আমি মাঝে মাঝে সত্যই আশ্চর্য্য হই যে আপনি সারা জীবন বিলেতে থেকেও এটা বোঝেন না যে এদেশে শিষ্টসমাজে প্রায়ই হাততালি দেয় নিছক লৌকিকতার খাতিরে।"

মিসেস সিংহ উত্তরে তাঁর সুশ্রী, সদয় ও সরল মুখখানিকে যৎপরোনাস্তি বিজ্ঞতামণ্ডিত ও গম্ভীর ক'রে তোল্‌বার বিফল প্রয়াস ক'রে বল্‌তেন: "না না পল্লব। এটা তোমার মস্ত ভুল। তুমি এখনও ছেলেমানুষ আছ কি না, তাই এই সাদা কথাটাও ঠিক্ ধর্‌তে পার্‌ছ না।"

পল্লব মনে মনে হাস্‌ত। এরূপ মনোভাব তার অপরিচিত ছিল না। কারণ কলিকাতায়ও তার এমন কয়েকটি বয়স্কা সরলা আত্মীয়া ছিলেন, যাঁরা খুব গম্ভীর ভাবে বিশ্বাস কর্‌তেন যে, বয়সের সঙ্গে পরিপক্ক বিজ্ঞতার বুঝি একটা স্বতঃসিদ্ধ সহজ অনুপাত না থেকেই পারে না। অথচ আজীবন গৃহজীবনের স্নেহমমতার অন্তরালে সন্তর্পণে মানুষ হওয়ার দরুন যে বস্তুতঃ এঁরাই সংসারের অসারতার স্বরূপটি জান্‌বার যথেষ্ট অবকাশ পান না, সে কথাটা এঁদের কৃপাপাত্র "ছেলেমানুষেরা" ইঙ্গিত কর্‌বারও অবকাশ পায় না। ফলে এই শ্রেণীর কোমলা, সরলা নারী তাঁদের সারল্য ও কোমলতার রঙীন চশ্‌মাকেই আসল সত্য দর্শনের অণুবীক্ষণ ব'লে ভুল ক'রে বসেন। পল্লব ভাব্‌ত যে সংসারের নিষ্ঠুর পরিচয়ের যে অভাবে শিশুর মনটি সরল বিশ্বাসকেই চরম সত্য ব'লে মনে ক'রে থাকে, সংসারের স্বরূপটি হ'তে অন্তরালে রাখ্‌তে পার্‌লে সে সারল্যকে বজায় রাখা মোটেই অসম্ভব হয় না। পল্লব মিসেস সিংহকে এই শ্রেণীর সরলপ্রাণা নারীর দলে ফেলেই তাঁর রাশি রাশি নীতিবাদের মনস্তত্বটি বুঝতে চাইত।

মিসেস সিংহের সব মতামতই তাঁর ঋজু, শুভ্র, অনভিজ্ঞ হৃদয়ের একরোখা ধারণার ফল ছিল। তাই তিনি কখনও কখনও বল্‌তেন যে ইংরাজ ও ভারতীয়দের মধ্যে যে মূঢ় ব্যবধানটি সৃষ্ট হয়েছে, সেটা আমরা একটু ইচ্ছে কর্‌লেই অপসৃত হ'তে পারে।

পল্লব বলত: "কিন্তু মিসেস সিংহ, খাদ্য ও খাদকের মধ্যে সহজ বন্ধুত্ব হওয়া কি মাত্র ভক্ষিতের সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করে?"

মিসেস সিংহ একটু সবিস্ময়ে ব্যথার সঙ্গে বল্‌তেন: "পল্লব, তোমার মুখে এই রকম কথা! তুমি কি সেই সরল উদার পল্লব! ছি ছি, অমন কথা বোলো না। ইংরাজ আমাদের ভক্ষক! আমরা কেবল একটু বেশি অভিমানী ও কোমল-হৃদয় ব'লে ওদের সহজ ব্যবহারকেও অপমান বা উৎপীড়ন মনে করি। তবে আমার মনে হয় যে আমাদের অনেকের মনে এ ধারণার জন্য দায়ী—প্রধানতঃ আমাদের জনকয়েক হিংসুক রাজনীতিক।"

পল্লব একটু হেসে বল্‌ত: "মিসেস সিংহ, পাটনায় আপনি যে পল্লবকে দেখেছিলেন, এই সুদূর লণ্ডনেও আপনি যে অবিকল সেই পল্লবকেই দেখ্‌ছেন, এটা আমি জোর করে আপনাকে কেমন ক'রে বল্‌ব?—বিশেষতঃ যখন দার্শনিকেরা বলেন শুন্‌তে পাই যে, মানুষ দুবার কখনও এক নদীতে স্নান করতে পারে না"—

—'তার মানে?"

"সে কথা না হয় থাকুক। এটা আমি একটা অবান্তর কথা বলে ফেল্‌লাম মিসেস সিংহ। কিন্তু আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—আমাদের দেশে পথেঘাটে, রেলেষ্টীমারে এমনকি গোরস্থানেও শ্বেত ও কৃষ্ণচর্ম্মের মধ্যে যে ভেদজ্ঞান বজায় রাখা হয়, সে জন্যেও কি দায়ী আমাদের হিংসাবাদী রাজনীতিকেরা?"

মিসেস সিংহ দুঃখিত হ'য়ে বল্‌তেন: "হাঁ, এরকম দুচারটে অন্যায় ওরা করে বটে, কিন্তু এ থাকবে না।"

পল্লব বল্‌ত: "আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক মিসেস সিংহ—এ ভেদজ্ঞানের অপমান থেকে যেন মানুষ শীঘ্রই মুক্তিলাভ করে। ব্যক্তিগত ভাবে আমিও বিশ্বাস করি যে এ জাতিবিরোধ থাক্‌বেনা। তবে কি জানেন মিসেস সিংহ? আমার মনে হয় যে এ ভেদজ্ঞান ওরা কেবল তখনই বর্জ্জন কর্‌বে, যখন আমরা স্বাধীনতা পেয়ে ওদের সমকক্ষ বলে গণ্য হব।"

হায়! পল্লব তখনও বোঝে নি যে মানুষের সঙ্গে মানুষের ভেদজ্ঞান যাওয়া এত সহজ নয়। কারণ সে তখনও কোনও খবর রাখ্‌ত না স্বাধীন জাতের মধ্যেও এ ভেদজ্ঞানের মূল কত দৃঢ়ভিত্তি!...মানুষের জাতীয় অভিমান ও শ্রেষ্ঠতায় অন্ধ বিশ্বাসের মনস্তত্ত্ব যে কত জটিল, তার কোনও খবর মিসেস সিংহও রাখ্‌তেন না পল্লবও না।...

যাই হ'ক, মিসেস সিংহ বল্‌তেন: "কিন্তু পল্লব, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমরা স্বাধীনতার যোগ্য হওয়া মাত্র ওরা আমাদের তা দিয়ে দেবে। অর্থাৎ আমরা যেদিন একতার দাম দিতে শিখ্‌ব, নিয়মানুগত্যের (discipline) মহিমা বুঝব ও জাতীয় দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হ'ব, সেই দিনই আমরা স্বাধীনতা লাভ ক'র্‌ব।"

পল্লব এ কথায় একটু সন্দিগ্ধ হাসি হাস্‌ত। তাতে মিসেস সিংহ একটু আহত বোধ ক'য়ে বলে উঠ্‌তেন: "কিন্তু এ সত্যি কথা পল্লব, এক বিন্দু বাড়ানো-কথা নয়। আমার অনেকগুলি সহৃদয় ইংরাজ বন্ধুবান্ধবীই আমাকে এ কথা বলেছেন।"

পল্লব তার হাসিতে মিসেস সিংহের ব্যথা পাওয়াটা টের পেয়ে একটু লজ্জিত হয়ে গম্ভীরভাবে বল্‌ত: "কিন্তু মাপ করবেন মিসেস সিংহ! রাজনীতিতে দুচারজন সহৃদয় মধ্যবিত্তের নির্ব্বিরোধী শুভেচ্ছায় যে বিশেষ ফল হয়, ইতিহাসের পাতা ওল্‌টালে ত তা মনে হয় না। তাছাড়া স্বাধীনতা না পেলে যে কোনও জাতির পক্ষে জাতীয় দায়িত্ব, নিয়মানুগত্য প্রভৃতি বড় বড় কথার মর্ম্মগ্রহণ করাই অসম্ভব হ'য়ে ওঠে! মানুষ ঠেকে তবে শেখে। পড়তে পড়তে তবে ওঠে। এ কথা ত মানেন? কাজেই আমরা রাতারাতি যোগ্য না হ'য়ে যেন কখনও স্বাধীনতার দাবী না করি এ কথা বলাও যা, সাঁতার না শিখে জলে নেমো না এ দোহাই দেওয়াও কি তাই নয়?"

মিসেস সিংহ এরূপ কথার উত্তরে প্রায়ই কয়েকটি ভাল ভাল কথা বল্‌তেন যে, "তা নয় গো তা নয়। ওরা ক্রমে আমাদের নিজে থেকেই এসব গুণ শিখিয়ে দিয়ে পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে চম্পট দেবে।" এ কথায় পল্লব সংশয় প্রকাশ কর্‌লে মিসেস সিংহ আরও ঘাড় নেড়ে বলতেন "না দিয়েই পারে না। আমাদের শেখাতেই হবে যেমন ইংরাজি শিখিয়েছে ও শেষে শেক্সপীয়র পড়্‌তে শিখিয়েছে। আমরা কি দেড়শ বৎসর ইংরাজের শাসনে থেকে ওদের কাছ থেকে অনেক ভাল জিনিষ শিখি নি? তবে বাকী গুলোই বা শিখে নিতে পার্‌ব না কেন? যাই বল না কেন, আশা করি এ কথা তুমি বল্‌বে না যে ওদের শাসনে আমাদের জাতীয় উন্নতি কিছুই হয় নি?"

পল্লব বল্‌ত: "আমার একজন প্রিয় বন্ধু এরকম যুক্তির একটি বড় সুন্দর উত্তর দিয়েছিলেন। একজন ইংরাজ তাঁকে কেম্ব্রিজে ঠিক্ এই প্রশ্নই করেছিল যে ইংরাজশাসনের আমরা দোষ দেখাই বটে, কিন্তু বুকে হাত দিয়ে এ কথা অস্বীকার কর্‌তে পারি কি যে ইংরাজশাসনে আমাদের জাতীয় জীবন অগ্রসর হয়েছে? উত্তরে বন্ধুবর বলেছিলেন যে, একজন লোক তার ছেলেকে তার ভাইয়ের কাছে রেখে যায়। ছেলেটির জন্য ভাইকে তিনি মাস মাস মাসোয়ারা পাঠাতেন। লক্ষ্মণ ভ্রাতা কিন্তু সে টাকার বার আনা আত্মসাৎ ক'রে মাত্র বাকি চার আনায় ভ্রাতুষ্পুত্রের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করতেন। ছেলেটি যথেষ্ট আহার বিহার ও শিক্ষা না পেয়ে রুগ্ন ও স্ফূর্ত্তিহীন হ'য়ে অতি ধীরে ধীরে বাড়তে লাগ্‌ল। সাত আট বৎসর পরে পিতা ফিরে এসে পুত্রের হ্রস্ব, রুগ্ন চেহারা দেখে তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে সব কথাই প্রকাশ ক'রে দেয়। তাতে ভাই মহা চ'টে বলে 'সব মিথ্যা কথা। দেখ দেখি এ আট বৎসরে ও কতটা বেড়েছে।' তাতে সে ছেলেটি ক্ষীণ হেসে উত্তর দেয় 'হাঁ কাকা, এ আট বছরে আমি আধ হাত বেড়েছি বটে, কেবল পুষ্টিকর জিনিষ খেতে পেলে এ সাত বৎসরে আধ হাতের যায়গায় দুহাত বাড়্‌তাম, এইমাত্র।'"

এরূপ কথায় মিসেস সিংহ আরও ব্যথিত হয়ে শেষটায় এরূপ সদিচ্ছা প্রকাশ ক'রে তর্ক সাঙ্গ কর্‌তেন যে, এরকমটা থাক্‌বে না। ওরা শীঘ্রই বুঝবে যে শাসক ও শাসিতের সম্বন্ধের চেয়ে ভাই ভাইয়ের সম্বন্ধ সংসারে ঢের বড় সত্য।

এরূপ শুভেচ্ছার বিরুদ্ধে আর কিছু বলা অনুচিত ও নিষ্ফল ভেবে পল্লবও চুপ ক'রে যেত।

(৯)

মিসেস সিংহের বাড়ীটি ছিল বড়। তাছাড়া আধপাগ্‌লা

বোনটিকে নিয়ে একা বাস করাও খুব নিরাপদ নয়। তাই তিনি নীচের তলা পল স্মিথ ব'লে এক ইংরাজ ভদ্রলোককে ভাড়া দিয়েছিলেন। পরিবারে প্রাণী—মাত্র তিনটি। স্বামী স্ত্রী ও একটি ১৯।২০ বছরের মেয়ে। পল্লব অল্পদিনের মধ্যেই স্মিথ পরিবারের সঙ্গে বেশ ভাব ক'রে নিল—বিশেষতঃ মিষ্টার স্মিথের সঙ্গে। সে মাঝে মাঝেই নীচের তলায় এসে তাঁর সঙ্গে গল্প কর্‌ত। সেই সূত্রে সে মিষ্টার স্মিথের জীবনের অনেক কথাই জান্‌তে পেরেছিল। মিষ্টার স্মিথের বয়স ৩৮।৩৯ হবে। বেশ বুদ্ধিমান্ লোক। যুদ্ধের আগে একটি ব্যাঙ্কের খাজাঞ্চির কাজ কর্‌তেন। যুদ্ধের পরে একটি সওদাগরি আফিসে হিসাবের কাজ নিয়েছিলেন। গত যুদ্ধে তিন বৎসর ফ্রান্সে যুদ্ধ করেছিলেন।

একদিন একটা গোলার একখণ্ড ইস্পাত লেগে তাঁর বামচক্ষুটি নষ্ট হ'য়ে যায়। সে চক্ষু-গহ্বরে তিনি কাচের চোখ বসিয়ে নিয়েছিলেন। তাছাড়া বিষাক্ত বাষ্প তাঁর ফুসফুসকে চিরকালের জন্য নষ্ট ক'রে দিয়েছিল। মাঝে মাঝেই বুকে তিনি একটা বেদনা বোধ কর্‌তেন। ডাক্তারে তাঁকে বলেছিল যে উত্তেজিত হওয়া তাঁর পক্ষে ভাল নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তর্কালোচনায় প্রায়ই উদ্দীপ্ত হ'য়ে পড়্‌তেন ও তাঁর স্ত্রীকে উদ্বিগ্ন ক'রে তুল্‌তেন! যুদ্ধের সম্বন্ধে তাঁর এক সময়ে খুব উৎসাহ ছিল; কিন্তু যুদ্ধের ভিতরকার চাতুরী, নিষ্ঠুরতা ও বর্ব্বরতাকে নিতান্ত কাছে থেকে দেখে দেখে তাঁর মোহ ভেঙে গিয়েছিল। সেই থেকে তিনি সময়ে অসময়ে যুদ্ধকে বিদ্রূপ করতেন ও যুদ্ধ-উৎসাহীদের উৎসাহকে অসার ব'লে প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পেতেন।

পল্লব কিন্তু দেখ্‌ত যে মিসেস স্মিথ ভুলেও এ সব বিষয়ে স্বামীর সঙ্গে সহানুভূতি প্রকাশ করতেন না—তাঁর সঙ্গে একমত হওয়া ত দূরের কথা। শুধু তাই নয়, মিষ্টার স্মিথ যখন বল্‌তেন যে বিগত যুদ্ধের জন্য প্রায় সব জাতিরই দায়িত্ব সমান, তখন তিনি বেশ একটু রুষ্ট হ'য়ে উঠ্‌তেন। কখনও কখনও এত রুষ্ট হ'য়ে উঠ্‌তেন যে পল্লবের সাম্‌নেই স্বামীর এরূপ মতামতের বিরুদ্ধে তর্ক না ক'রে থাকতে পারতেন না। নারী যে অনেক সময়ে যুদ্ধবিগ্রহের মতন নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের পৌরোহিত্য কার্য্যে পুরুষের চেয়ে বেশি উৎসাহ প্রকাশ কর্‌তে পারে, এ কথা পল্লব দুএকটি যুদ্ধ-প্রত্যাগত লেখকের গল্পে পড়েছিল। কিন্তু সে কথা তার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় নি; কারণ নারীকে কোমলতার আধার ব'লেই সে সম্মান করতে অভ্যস্ত হ'য়েছিল। এ শিক্ষা সে তার পিতার কাছ থেকে পেয়েছিল—কাজেই এ শিক্ষার মূল ছিল দৃঢ়ভিত্তি। কিন্তু মিসেস স্মিথ যখন তাঁর স্বামীর সঙ্গে যুদ্ধকে সমর্থন ক'রে উদ্দীপ্তভাবে তর্ক কর্‌তেন, তখন পল্লবের মনে হ'ত যে হয়ত এ বিষয়ে য়ুরোপীয় নারী ও ভারতীয় নারীর মনস্তত্ত্ব ভিন্ন প্রকৃতির। মিসেস টমাসের স্মৃতিও তাঁর এ বিশ্বাসের সমর্থক স্বরূপই হ'ত। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হত পূর্ব্বোক্ত গল্পটির নায়কের একটি কথা: 'অন্ততঃ আমরা অনেকে যুদ্ধ কর্‌তে গিয়াছিলাম শুধু স্ত্রীর কাছে কাপুরুষ ব'লে গণ্য হবার ভয়ে।'

মিস স্মিথ এ সব উদ্দীপ্ত তর্কে বড় একটা যোগদান কর্‌তেন না। তবে পল্লব লক্ষ্য করেছিল যে তিনি কখনও কখনও ছোটখাট দুই একটি মন্তব্য প্রকাশ কর্‌বার সময়ে ভুলেও পিতার পক্ষ নিতেন না, মাতার মতামতেরি সমর্থন কর্‌তেন। পল্লব ভাব্‌ত 'আশ্চর্য্য! যুদ্ধের মত হত্যা-কাণ্ডকে অনভিজ্ঞা নারী কেমন করে এমন নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রশংসা কর্‌তে পারে!'

মিস স্মিথের বয়স অল্পই,—উনিশ কুড়ির বেশী হবে না। তবে বয়সের তুলনায় তাঁর ভাবভঙ্গী ঢের বেশী পরিপক্ক হ'য়ে উঠেছিল। পল্লব শুনেছিল ও পড়েছিল যে বিলেতে ১৯।২০ বছরের মেয়েদের লোকে ছেলেমানুষ ব'লেই মনে ক'রে থাকে। বিলেতে এসে সে নানান্ ভদ্র পরিবারের কুমারী মেয়েদের চালচলন সম্বন্ধে এ অবধি যতটা লক্ষ্য করার অবকাশ পেয়েছিল, তাতে সে এ পর্য্যন্ত অন্য কোনওরূপ দেখেও নি। অর্থাৎ সে এ অবধি যতটুকু দেখেছিল তাতে তার মনে হয়েছিল যে ১৯।২০ বছরের মেয়েকে সাধারণ্যে School girl ব'লেই মনে ক'রে থাকে; এবং বিলেতে School girlএর মানে—এক কথায় পুরুষের চিত্তাকর্ষণের অনুপযুক্তা। কিন্তু মিস স্মিথকে পল্লবের এ সাধারণ নীতির একটা ব্যতিক্রম ব'লেই মনে হ'য়েছিল। তবে সে অনেক গবেষণা ক'রে স্থির কর্‌ত যে এর কারণ শুধু এই যে মিস স্মিথ প্রথমতঃ যুদ্ধের সময়

যার সঙ্গে মিউনিশন ফ্যাক্টরিতে পুরুষের কাজ করার দরুণ ও দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধের পর সিনেমা-অভিনেত্রী হওয়ার দরুণ নিশ্চয়ই এমন অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রে থাক্‌বেন, যার অভিঘাতে তিনি নিজের যৌবন-লাবণ্যের ক্ষমতা সম্বন্ধে এত শীঘ্র এতটা পূর্ণভাবে সচেতন হ'য়ে উঠেছিলেন। কারণ তিনি তাঁর মাদকতাপূর্ণ নীল চক্ষু দুটির সুপ্রয়োগ সম্বন্ধে এতই সজাগ হ'য়ে পড়েছিলেন যে, সেটা এ বিষয়ে পল্লবের মতন অসমজ্‌দারের দৃষ্টিও আকর্ষণ না ক'রে পারে নি। তবে পল্লবের মনে এজন্য একটা অনির্দ্দেশ্য কুণ্ঠার ভাব এলেও, সে এই ভেবে মিস্ স্মিথকে একটু সদয় ভাবে বিচার করতে প্রবৃত্ত হ'ত যে, য়ুরোপে ভদ্রঘরের মেয়েদের মধ্যেও নানারকম অপাঙ্গ-দৃষ্টির চর্চ্চা করাটা মোটেই বিরল নয়। সুতরাং (সে ভাব্‌ত) যে আচরণ কোনও সমাজে কমবেশি প্রচলিত, সে আচরণে একটু বেশি অগ্রসর হওয়াটা হয়ত বাইরে থেকে যত অশোভন মনে হয়, বস্তুতঃ ততটা অশোভন নয়। তবে ইতিমধ্যে মিসেস সিংহের দু'একটা পার্টিতে মিস্ স্মিথকে নানান্ পুরুষের সঙ্গে যতটা নিঃসঙ্কোচে হাসিঠাট্টা কর্‌তে দেখেছিল, তাতে তার শত চেষ্টা সত্ত্বেও সে তাঁর প্রতি মনে মনে একটু বিরূপ হ'য়ে না উঠেই পারে নি। তবে তার নিজের এ বিরূপ ভাবের আসল মনস্তত্ত্বটি যে কি, সে বিষয়ে পনর আনা নিগূঢ় তত্ত্বই তার অজ্ঞাত ছিল।...

একদিন মিসেস স্মিথ মিসেস সিংহ ও পল্লবকে সান্ধ্য-ভোজনে নিমন্ত্রণ কর্‌লেন। আহারের সময় মিস স্মিথের আসন পল্লবের পাশেই নির্দ্দিষ্ট হ'ল।

পল্লব এ পর্য্যন্ত ভেবে এসেছিল যে, মিস স্মিথের ওপর সে মনে মনে একটু দৃঢ়রকমই বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করে, ও সে-করাটা নিতান্ত অন্যায় নয়। কারণ মিস স্মিথের অনেক দৃষ্টি, কথাবার্ত্তার ভঙ্গী ও হাসিঠাট্টার ধরণধারণ তার কাছে একটু বিসদৃশ মনে হ'ত, যেজন্য তার ধর্ম্মবুদ্ধি যেন সগৌরবে দীপ্তি বিচ্ছুরিত কর্‌তে চাইত। কিন্তু আজ মিস্ স্মিথকে সর্ব্বপ্রথম নিজের এত নিকটে উপবিষ্ট দেখে ও তাঁর সঙ্গে একটু কাছ থেকে কথাবার্ত্তা কইবার সুযোগ পেয়ে হঠাৎ তার বক্ষস্পন্দন যেন সচকিত হ'য়ে উঠল। এরকম গতিশীলা, প্রাণচঞ্চলা, হাবভাবময়ী, চিত্তাকর্ষিণী কুমারীর সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ তার এ অবধি হয় নি। তাই যদিও সে মোহনলালের কাছে শুনেছিল যে, টেবিলে পার্শ্বোপবিষ্টা সঙ্গিনীর চিত্তরঞ্জন করা য়ুরোপের সভ্য-সমাজে প্রত্যেক পুরুষের কর্ত্তব্য ব'লে গণ্য হ'য়ে থাকে,—তবু সে নিজের মধ্যে একটা নিগূঢ় ইচ্ছা বোধ করা সত্ত্বেও মিস স্মিথের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে কথা-বার্ত্তা চালাতে পার্‌ছিল না। ফলে মিস স্মিথ দু'তিনবার নিজে থেকে তার সঙ্গে নানান্ প্রসঙ্গে আলাপ কর্‌তে চাইলেও, সে 'হাঁ না' ছাড়া বড় একটা কিছু বল্‌তেই সাহসী হ'তে পার্‌ল না। এজন্য তার মনের মধ্যে একটা অস্বচ্ছন্দ কুণ্ঠার ভাবের উদয় হওয়া সত্ত্বেও সে অনেক চেষ্টা ক'রেও সেটা দূর কর্‌তে পার্‌ল না।...অথচ তার মনে নানারকম পরস্পর বিরোধী ভাবের ভিড়ের মধ্যেও একটা অনুভূতি তার কাছে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল। সেটা এই যে মিস স্মিথের প্রতি তার বিরূপ ভাবটি কেমন যেন তার অতর্কিতে মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হ'য়ে গেছে! শুধু তাই নয়, সে তাঁকে নিজের কথাবার্ত্তায় আকৃষ্ট কর্ত্তে যথেষ্ট ব্যগ্র!...সঙ্গে সঙ্গে তার মনটি একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে লাগ্‌ল যে, তবে কি সে এতদিন মিস স্মিথের সাহচর্য্য না পাওয়ার দরুণই তাঁর হাবভাবের বিসদৃশ ভাব বড় ক'রে দেখত! অর্থাৎ অলভ্য দ্রাক্ষাফল বিস্বাদ ব'লেই কি সে অনধিগম্যা মিস স্মিথকে প্রগল্‌ভা ভাব্‌ত! না, না—তা কখনই নয়—এ কি অদ্ভুত চিন্তা! কিন্তু যদি তার এ আশঙ্কা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীনই হয়, তবে আজ মিস স্মিথের দুএকটি মাত্র সামান্য সহাস্য সম্ভাষণেই কেন তার সঞ্চিত বিরূপভাবের বাষ্প বিলীন হয়ে গেল! কেনই বা মিস স্মিথের দু'একটি সস্মিত কটাক্ষে তার রক্ত এক অভূতপূর্ব্ব উল্লাসে উতলা হ'য়ে উঠেছে যে কটাক্ষ তিনি অপরের প্রতি প্রয়োগ করলে সে সমস্ত ব্যাপারটাকে অত্যন্ত কঠিন ভাবে বিচার না ক'রেই থাক্‌তে পার্‌ত না! অবশ্য এত কথা সে ঠিক্ তখন তখনই এত স্পষ্ট ক'রে ভেবে দেখ্‌বার অবকাশ পায় নি। তবে সেদিন রাত্রে অনেকক্ষণ এই সব চিন্তা তার নিদ্রার ব্যাঘাত ক'রেছিল।

হঠাৎ মিসেস স্মিথ পল্লবের কুণ্ঠিত ভাবকে একটু পরিহাস ক'রে দূর ক'রে দেবার জন্য কন্যাকে লক্ষ্য ক'রে বল্‌লেন: "ডলি! মিষ্টার বাক্‌চির কাছ থেকে য়ুরোপী

পুরুষের মতন সাড়ম্বর ভদ্র ব্যবহারের প্রত্যাশা কোরো না। কারণ তাঁদের দেশের প্রথা অন্য রকম।”

মিস স্মিথ একটু কপট বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন: “কি রকম মিষ্টার বাক্‌চি! ও—বুঝেছি—তাই বুঝি আপনি আমার নানা প্রশ্নে এত সঙ্কোচের সঙ্গে উত্তর দিচ্ছিলেন!” পল্লব এ কথায় একটা ভব্যরকম উত্তর দেবার জন্য ব্যগ্র হ'য়ে ওঠা সত্ত্বেও, তার যেন বাক্যস্ফূর্ত্তি হ'ল না। শেষটা তার অবস্থা এমন কিংকর্ত্তব্যমূঢ় গোছের দেখাল যে, মিষ্টার স্মিথ হেসে তার রক্ষার্থে বল্‌লেন: “যদি তাই হয় তবে তাতে তুমি অত আশ্চর্য্য হ'লে মিষ্টার বাক্‌চিকে কি একটু বিব্রত বোধ করতে হয় না ডলি? অপরের দেশের প্রথাকে এভাবে ঠেশ দিয়ে কথা বলা কি উচিত?—তাঁদের দেশে মেয়েরা থাকে অন্দরে ও পুরুষরা মেশে সদরে। কাজে কাজেই এরকম সান্ধ্যভোজনের টেবিলে বিদেশিনী সুন্দরী তরুণীর সাহচর্য্যের দায়িত্ব সম্বন্ধে মিষ্টার বাক্‌চি যদি রাতারাতি সচেতন হ'য়ে না উঠেই থাকেন, তবে সেজন্য তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। কেমন এডিথ, যায় কি?” ব'লে তিনি স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে একটু চোখ ঠেরে হেসে ফেল্‌লেন।

পল্লব এ কথায় সঙ্কোচে যেন আরও জড়সড় হ'য়ে পড়্‌ল। পিতা যে বিবাহযোগ্যা কন্যাকে বিদেশী যুবকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে এ ভাবে ঠাট্টা কর্‌তে পারেন, ও তার ওপর এ ঠাট্টায় স্বয়ং তার মাতাকে মধ্যস্থ ডাক্‌তে পারেন, এ অভিজ্ঞতা তার আজ অবধি লাভ করার সুযোগ হয় নি।

মিস স্মিথও একটু রক্তিম হ'য়ে উঠ্‌লেন। কিন্তু পুরুষ সমাজে অনেকটা নিঃসঙ্কোচে মেশায় তিনি অভ্যস্ত ছিলেন ব'লে তখনই আত্মসংবরণ ক'রে নিলেন। হঠাৎ চোখ তুলে নত-আনন পল্লবকে কি একটা বলতে যাবা মাত্রই মিসেস স্মিথ বাধা দিয়ে স্বামীকে বললেন: “কি যে বল পল!—আর তা আবার মিষ্টার বাক্‌চির মতন ছেলেমানুষকে নিয়ে!”

আবার ছেলেমানুষ! একে ত সে আজ কেমন যেন কিছুতেই আত্মস্থ হ'তে পার্‌ছে না। তার ওপর—'মৃতের উপর এই খড়্গাঘাত!' তার জড়সড় ভাবকে সে যে প্রাণপণে কাটিয়ে উঠ্‌তে চেষ্টা করছিলই প্রধানতঃ এই ভেবে ... পল্লবের নিজ মন অকারণেই ক'রে বসল যে যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই কি সন্ধ্যে হয়! সঙ্গে সঙ্গে সময় দেবতার ওপর নিষ্ফল আক্রোশে তার ক্ষুব্ধ আত্মসম্মান যেন গুম্‌রে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।...কবে সে ছেলেমানুষির কোটা পার হ'য়ে প্রবীণতার রাজটীকা পর্‌তে পার্‌বে? হায়—কবে, কবে, কবে?...

মিসেস সিংহ তাঁর স্নেহের অন্তর্দৃষ্টিতে বুঝেছিলেন যে, পল্লব এরূপ আলোচনায় একটা গভীর অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ না ক'রেই পারে না। তাই তিনি প্রশ্নটিকে বদ্‌লে দেবার জন্য পরিহাসচ্ছলে ব'লে উঠলেন: “পল্লবকে যতটা ছেলেমানুষ ভাব্‌ছেন মিসেস স্মিথ, সে ততটা ছেলেমানুষ নয়। Things are not what they seem.” (কোনও কিছু বাইরে যা ব'লে প্রতীয়মান হয় আসলে তা নয়)

কিন্তু কথাবার্ত্তায় যে ইচ্ছামাত্রই প্রসঙ্গান্তরের অবতারণা করা যায় না,—এজন্য যথেষ্ট প্রয়োগকুশলতা থাকার প্রয়োজন—এ সহজ সত্যটি সরলহৃদয়া মিসেস স্মিথ ঠিক জান্‌তেন না। তাই তিনি তাঁর এ কথায় পল্লবকে আরও অস্বস্তির মধ্যে ফেল্‌লেন।

মিষ্টার স্মিথ এবার পল্লবের উদ্ধারে এলেন। কারণ তিনি দেখ্‌লেন যে পল্লব তাঁকেই কেন্দ্র ক'রে এরূপ আলোচনায় উত্তরোত্তর বেশি কুণ্ঠিত হ'য়ে পড়ছে।

তিনি হঠাৎ এই ব'লে কথাবার্ত্তার মোড় ফিরিয়ে দিলেন: “আমি এ কথা এডিথকে ব'লে ব'লে হাল ছেড়ে দিয়েছি। 'Things are not what they seem' এ কথার সদর্থ বুঝতে হ'লে একবার যুদ্ধে যাওয়া দরকার। কিন্তু—মাপ কর্‌বেন মিসেস সিংহ—যেহেতু মেয়েরা যুদ্ধে যায় না, সেহেতু তাদের এসব জ্ঞানগর্ভ কথা বোঝাতে যাওয়া বৃথা।”

মিসেস সিংহ সস্মিত মুখে বল্‌লেন: “তার মানে?”

মিষ্টার স্মিথ কথাটি মূলতঃ পরিহাসের ছলেই ব'লেছিলেন; কিন্তু মিসেস স্মিথ হঠাৎ ফোঁস ক'রে উঠ্‌লেন। যুদ্ধের বিরুদ্ধে অসুস্থ স্বামীর ব্যঙ্গোক্তি তিনি অনেক সময়েই নীরবে হজম ক'রে নিতেন বটে, কিন্তু ভারতীয়ের সাম্‌নে য়ুরোপীয়দের যুদ্ধপ্রবৃত্তির নিন্দায় তিনি একটু অসহিষ্ণু হ'য়ে না উঠেই থাক্‌তে পার্‌তেন না। তাই তিনি নিজের সংযম ভুলে হঠাৎ একটু তীব্র স্বরেই ব'লে উঠ্‌লেন: “তার মানে হচ্ছে এইমাত্র মিসেস সিংহ যে মেয়েদের

...অপরাধ তারা গত যুদ্ধে স্বদেশ রক্ষার জন্য অস্ত্র ধরার ...ন ক'রেছিল।"

মিষ্টার স্মিথ একটু গম্ভীর হ'য়ে বল্লেন: "এডিথ, ...মি জান যে ঠিক এ কথা আমি কখনও বলি নি বা বল্তে চাই নি। আমি বার বার বল্তে চেয়েছি শুধু এই কথাটি মাত্র যে 'যা চক্‌চক্ করে তাই সোনা নয়'।"

পল্লব এতক্ষণে প্রথম একটু স্বচ্ছন্দ বোধ করল, কারণ প্রসঙ্গটি এখন অন্য দিকে গিয়ে পড়েছিল। সে তৎক্ষণাৎ একটু ব্যগ্র ভাবে সহজ স্বরে জিজ্ঞাসা করল: "কি ...?"

মিষ্টার স্মিথ বল্লেন: "অর্থাৎ, যুদ্ধ কর, নরহত্যা কর ...ভাল কথা। কিন্তু কেবল call a spade a spade—যার যা নাম তাকে সেই নাম দাও, এই আমাদের বক্তব্য।"

মিসেস সিংহ বল্লেন: "কিন্তু নরহত্যা আমাদের করতে হয়েছে ত শুধু জার্ম্মাণদের জন্য মিষ্টার স্মিথ।"

মিষ্টার স্মিথ একটু ব্যঙ্গ হাস্যের সঙ্গে বললেন: "আমাদেরও প্রথমে তাই বোঝানো হয়েছিল বটে।"

মিসেস স্মিথ একটু বিরক্তির স্বরে বললেন: "অর্থাৎ? —তুমি কি বলতে চাও?"

মিষ্টার স্মিথ অবিচলিতভাবে উত্তর দিলেন: "—শুধু এই কথাটি মাত্র যে সত্যি কথা জান্‌তে পার্‌লে আমরা যুদ্ধ কর্‌তে যেতাম না। যুদ্ধের পুরোহিতদের কাছে এ কথা অগোচর ছিল না। তাই তাঁরা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিলেন।"

মিসেস সিংহ একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্লেন: "আপনি বেশ লোক মিষ্টার স্মিথ। আপনি কি বল্‌তে চান যে ...তা কথা জান্‌তে পার্‌লে আমরা স্বদেশের জন্য প্রাণ দিতে রাজি হ'তাম না?"

মিষ্টার স্মিথ একটু উত্তেজিত ভাবে বল্লেন: "না।"

মিস স্মিথ এবার একটু অসহিষ্ণু ভাবে ব'লে উঠ্‌লেন: "বাবা! কি যে বল তুমি—"

মিষ্টার স্মিথ হঠাৎ আরও একটু উত্তেজিত হয়ে তীব্র স্বরে ব'লে উঠ্‌লেন: "যে বিষয়ে কিছুই জানো না, সে বিষয়ে বিজ্ঞমত প্রকাশ কর্‌তে গেলে এক মূঢ়তাই প্রকাশ হ'য়ে পড়ে ডলি।"

অতিথির সাম্‌নে পিতার এরূপ অপ্রত্যাশিত রূঢ় ভাষায় মিস স্মিথ অপ্রতিভ হ'য়ে ক্ষোভে রক্তিম হ'য়ে উঠ্‌লেন। কারণ যদিও উপস্থিত কারুরই অগোচর ছিল না যে যুদ্ধের পর হ'তে মিষ্টার স্মিথের স্নায়ুমণ্ডলী একটুতেই উত্তেজিত হ'য়ে উঠ্‌ত, তবু নিমন্ত্রিতদের সাম্‌নে যে তিনি বয়স্থা কন্যাকে এ ভাবে ধমক দিতে পারেন এ কথা মিস স্মিথ স্বপ্নেও ভাবেন নি।

মুহূর্ত্তে ঘরের মধ্যে যেন এক অস্বস্তির বাষ্প জমাট হ'য়ে উঠ্‌ল। সেটা সত্বর দূর করার জন্য মিসেস স্মিথ খানিকটা অনুযোগ ও খানিকটা উৎকণ্ঠার স্বরে বল্‌লেন: "পল—"

মিষ্টার স্মিথ নিজের রূঢ়তার জন্য তৎক্ষণাৎই লজ্জিত হ'য়েছিলেন। স্ত্রীর অনুযোগের স্বরে তাঁর আরও চৈতন্য হ'ল। তিনি কন্যার একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে কোমল স্বরে বল্‌লেন: "কিছু মনে কোরো না ডলি, লক্ষ্মী মেয়ে। আজ আমার শরীরটা ভাল নেই।"

মিস স্মিথ মুখ নীচু ক'রে রইলেন। পল্লব লক্ষ্য কর্‌ল তিনি হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে জ্যাকেটের হাতায় চোখের দুই বিন্দু উচ্ছলিত অশ্রু গোপন ক'রে ফেল্‌লেন। মিসেস স্মিথ স্বামীর আরাম কেদারার পিছনে এসে তাঁর দুই স্কন্ধে দুটি হাত রেখে আরও উদ্বিগ্ন হ'য়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন: "পল, তোমার সেই বুকে বেদনাটা কি—"

মিষ্টার স্মিথ কথাবার্ত্তাকে একটু সহজ প্রণালীতে চালিত কর্‌বার জন্য কন্যার হাতটি ছেড়ে দিয়ে বল্‌লেন: "না—না—সামান্য একটু মাথা ধরা। ও কিছুই না। আজ আপিস থেকে ফেরবার সময় টিউবে বড় ভিড় ছিল—তাই বোধহয়।"

মিসেস স্মিথ বল্‌লেন: "তাহলে একটু aspirin দেব কি, না একটু কফি দেব?"

মিষ্টার স্মিথ বল্‌লেন: "না না aspirin দরকার নেই,—কফিই দাও।"

মিসেস স্মিথ কফি ঢাল্‌তে লাগ্‌লেন। আহার শেষ হয়ে গিয়েছিল। সকলে কফি পান করতে লাগ্‌লেন। ঘরের মধ্যে হঠাৎ এ অপ্রীতিকর আলোচনার দরুণ অস্বস্তির রুদ্ধ বাষ্প তখনও সহজতার বায়ু চলাচলে দূর হ'য়ে যায় নি। তাই কফি পরিবেষণ শেষ হ'লেও প্রত্যেকেই কমবেশি অস্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে পেয়ালাতে চুমুক দিতে লাগ্‌লেন।

ঘরের মধ্যে মিনিট দুই এই অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা বিরাজ করল। প্রত্যেকেই চেষ্টা করতে লাগল কিছু একটা ব'লে এই কুণ্ঠার গুরু ভার লাঘব ক'রে দেয়; কিন্তু কেউই যেন ভেবে পাচ্ছিল না কি বলা যায়। শেষটা মিষ্টার স্মিথ নিজের পূর্ব্ব রূঢ় আচরণের কারণ নির্দ্দেশ করতে গিয়ে বলে উঠলেন: "কি জানেন মিসেস সিংহ! আমাদের মেয়েরা—শুধু আমাদের কেন, সব দেশের মেয়েরাই—যুদ্ধের সম্বন্ধে কিছুই না জেনে, ঘরে বসে, আরাম কেদারায় শুয়ে, উল বুনতে বুনতে মনে করে যে দেশের জন্য যুদ্ধ একটা মস্ত জিনিষ—একটা রোম্যাণ্টিক ব্যাপার! তাদের যদি দিনের পর দিন পরিখার মধ্যে এক হাঁটু কাদায় ব'সে, হাড়-কাঁপানো আর্দ্র-বায়ুবিদ্ধ হ'য়ে, চারদিকের দানবী লীলার অট্টনাদের মধ্যে উদ্ভ্রান্ত ভাবে স্বদেশসেবা করতে হ'ত, তা হ'লে তারা বুঝত কত ধানে কত চাল। অবশ্য তাদের এ ভুল ধারণার জন্য আমি তাদের তত দোষ দিতাম না। কেননা সংবাদপত্র প্রভৃতিতে সৈন্যদের রোমাঞ্চকর বীরত্ব, শত্রুর জঘন্য পাশবিকতা, যুদ্ধের স্বর্গীয় স্বার্থত্যাগ প্রভৃতি সম্বন্ধে এত সুন্দর সুন্দর উপকথা লেখা হ'য়ে থাকে যে, অনভিজ্ঞা বিশ্বাসপ্রবণা রমণীর পক্ষে তা অবিশ্বাস করার কোনও কারণই থাকে না। এ কথা আমি জানি এবং মানি। কিন্তু আমাদের ক্ষোভ হয় যখন আমরা দেশে ফিরে হঠাৎ আবিষ্কার করি যে, যে আমরা যুদ্ধের অমানুষিক যন্ত্রণা বছরের পর বছর ভোগ ক'রে এসেছি ও হত্যাকাণ্ডের উষ্ণনিঃশ্বাস শয়নে স্বপনে উপভোগ করে এসেছি—সেই আমরা যুদ্ধের আসল রূপটি সম্বন্ধে কিছুই জানি নি, কিছুই শিখি নি।"

উত্তেজনার মাথায় হঠাৎ মিষ্টার স্মিথ একটু কাশতে লাগলেন। পল্লব তাঁকে ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার যুদ্ধের বিরুদ্ধে উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠতে দেখেছিল বটে, কিন্তু এতটা উত্তেজিত কখনও দেখে নি, যদিও মিসেস স্মিথ তাঁকে স্বামীর এরূপ প্রবণতার কথা দু'একবার কথাচ্ছলে বলেছিলেন।

মিষ্টার স্মিথ আজ যেন নিজের একটু আগের রূঢ় আচরণকে সমর্থন করতে গিয়ে আরও বেশি উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন। তাঁর কাশি একটু থামলে মিসেস স্মিথ স্বামীর অসুস্থতার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে একটু বাধা দিতে যাবা মাত্রই মিষ্টার স্মিথ আরও উষ্ণ হ'য়ে ব'লে উঠলেন "না না এডিথ, আমাকে কথাটা শেষ করতে দাও।.. আমি বলছিলাম কি মিসেস সিংহ! আমাদের ঘরের এ- সব আদরিণীগণ ভাবেন যে যুদ্ধ সম্বন্ধে জানেন কেব- তাঁরা—যাঁরা ঘরে পায়ের ওপর পা দিয়ে ব'সে নিজেদে- উচ্চ শ্রেণীর জীব ব'লে মনে ক'রে থাকেন, ও চা-পার্টি, নৃত্য-সভা প্রভৃতিতে সোৎসাহে প্রচার ক'রে থাকেন যে যুদ্ধের বিরুদ্ধে কোনও কথা বলা কাপুরুষতা, দেশদ্রোহিতা, ভণ্ডামি—"

মিসেস স্মিথ বললেন: "পল—তুমি বড় বেশি উত্তেজিত হয়েছ। নইলে আমাকে লক্ষ্য ক'রে এ রকম ভাষা প্রয়োগ করতে তুমি পারতে না। কারণ আমি ওরকম কথা যে কখনও বলি নি—"

মিষ্টার স্মিথ তাঁর অসুস্থ উত্তেজনায় বাধা দিয়ে ব'লে বসলেন: "ঠিক্ অবিকল ঐ কটি কথা উচ্চারণ না করলেই কি এরকম কথা বলা যায় না? ভাবে ভঙ্গীতে ও আকারে ইঙ্গিতে যে অনেক সময়ে কথার চতুর্গুণ বলা যায়, এ কথা কে না জানে? তোমরা যে ভাবে শত্রুর নিন্দা ও স্বজাতির প্রশংসা কর; যেভাবে যুদ্ধের স্বর্গীয়তা ও শান্তিপ্রিয় লোকের হেয়তা সম্বন্ধে ঢাক পেটাও; এক কথায় যেভাবে নরহত্যা সম্বন্ধে জ্বলন্ত উৎসাহ প্রকাশ কর;—তাতে আমার ত সময়ে সময়ে সত্যিই সন্দেহ হয়, মিসেস সিংহ, যে যুদ্ধ করেছে কারা? আমাদের মতন হৃতসর্ব্বস্ব, নষ্টস্বাস্থ্য ভ্রষ্টলক্ষ্য হতভাগারা, না সোফায় হেলায়িতা, পরচর্চ্চা-নিরতা পরিচারিকাসেবিতা সংবাদপত্র পাঠিকারা?"

মিস স্মিথ একটু অধীরভাবে না ব'লে থাকতে পারলেন না: "বাবা! তোমার মুখে কেবল ঐ কথাই শুনে আসছি। যেন সত্যিই আমাদের যুদ্ধের সময়ে সংবাদপত্র পড়া ও পরচর্চ্চা ছাড়া আর কিছুই করতে হয় নি! যুদ্ধের সময়ে ফ্যাক্টরিতে কাজও আমরা করি নি, ট্রাম- বাস্‌ও চালাই নি, রেলের টিকিটও বেচি নি,—শুধু শত্রু নিন্দা ও স্বজাতির স্তুতিবাদ ক'রেই দেশের দাবী-দাওয়া সম্পূর্ণ মর্য্যাদা রেখে এসেছি।"

মিসেস সিংহ বললেন: "সত্যি মিষ্টার স্মিথ, যুদ্ধের সময় মেয়েদেরও কি কিছু ভুগতে হয় নি?"

মিষ্টার স্মিথ একটু অবজ্ঞার হাসি হেসে বললেন

"সংসারে সুখের ন্যায় দুঃখও relative মিসেস সিংহ,—অর্থাৎ তার গুরুত্বের কমবেশির ওপর তার শোচনীয়ত্ব নির্ভর করে। যুদ্ধের কষ্ট যে কি তা যে নিজে জানে নি, তাকে বোঝাব কেমন ক'রে বলুন? জানেন ত The wearer only knows where the shoe pinches? শিশুকে কি পুত্রশোক বোঝানো যায়? আপনাদের কেমন করে বোঝাব বলুন যে শুধু যুদ্ধের অযোগ্য ব'লে গণ্য হবার আকাঙ্ক্ষায় কত শত লোক প্রত্যহ অঙ্গহানি কামনা করেছে? শুধু একবার শুভ্র শয্যায় শোবার স্বপ্নে অবসন্ন সৈনিক রোগ প্রার্থনা ক'রেছে? কামান গর্জ্জনের শব্দে উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে শুধু ঘণ্টাখানেকের জন্য নিস্তব্ধতা ভোগ করবার জন্য কত লোক বিধাতার কাছে বধিরতার বর চেয়েছে?···ফ্যাক্টরিতে কাজ করা ও ট্রাম চালানো?... ফুঃ! দিনের পর দিন পরিখায় বাস; মাসের পর মাস অর্দ্ধভুক্ত হয়ে থাকা; বছরের পর বছর শুধু যন্ত্রের মত চালিত হওয়া;—তার ওপর প্রত্যহ প্রিয় সহচর বন্ধুর হস্তপদ ও এমন কি ছিন্নমুণ্ড চোখের সাম্‌নে গোলার আঘাতে উড়ে যেতে দেখা—"

বল্‌তে বল্‌তে মিষ্টার স্মিথ হঠাৎ যেন শিউরে উঠ্‌লেন। মিসেস স্মিথ এবার সত্যিই উৎকণ্ঠিত হ'য়ে স্বামীর স্কন্ধে হস্তার্পণ ক'রে বল্‌লেন: "থাক্ থাক্ পল। তোমার শরীরের...ডাক্তার..."

মিষ্টার স্মিথ একটু আত্মসংবরণ ক'রে বল্‌লেন: "আমার চক্ষুটি নষ্ট হ'য়ে যখন আমি ভার্দাঁতে হাঁসপাতালে ছিলাম, মিসেস সিংহ, তখন আমার একটি প্রিয় বন্ধু বিকারের ঘোরে কি দেখ্‌ত জানেন? দেখ্‌ত যে তার দেশবাসীর কারুরই ধড়ে মুণ্ড নেই—সে যায়গায় আছে গ্রামোফোনের রেকর্ড—সেগুলো কেবল চীৎকার কর্‌ছে, শত্রুর মুণ্ডপাত করো, সর্ব মুণ্ডকে রেকর্ড ক'রে দাও। মুণ্ড আবার কি? ও ত বিধাতার সৃষ্টি। মানুষ যে তাঁর চেয়ে বড়। তাই মুণ্ড চল্‌বে না—তার স্থলে রেকর্ড'—"

মিসেস সিংহ এবার সত্যই কেমন ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁর "things are not what they seem" কথাটিই যে এরূপ ভীষণ আলোচনার জন্য দায়ভাগী হবে, এ কথা অবশ্য তিনি স্বপ্নেও ভাব্‌তে পারেন নি। তবু সান্ধ্য প্রীতি-ভোজনের পর এরূপ আলোচনার জন্য তিনি নিজেকে দোষ না দিয়েই পার্‌লেন না। তা ছাড়া যুদ্ধ-প্রত্যাগত কোনও সৈনিকের সঙ্গে যুদ্ধের সম্বন্ধে সাম্‌না সাম্‌নি এত ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ তাঁর এই প্রথম। কাজেই যুদ্ধ-প্রসঙ্গ তোলার সময়ে তাঁর একবারও মনে হয় নি যে, যুদ্ধ সম্বন্ধে দেশভক্তির জন্য বিখ্যাত ইংরাজ জাতি কখনও যুদ্ধের ও স্বজাতির বিরুদ্ধে এত তীব্র ভাষা প্রয়োগ কর্‌তে পারে। তাই তিনি কেমন যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে পড়লেন। মিসেস স্মিথ ও মিস স্মিথও ঠিক্ বুঝতে পারছিলেন না, আলোচনাটি কেমন ক'রে চাপা দেওয়া যায়।

এমন সময়ে হঠাৎ মিষ্টার স্মিথ দুহাত দিয়ে বুকটি চেপে ধ'রে বল্‌লেন: "দরজা খুলে দাও এডিথ—হাওয়া—হাওয়া—সেই বুকের ব্যথাটা আবার—"

বল্‌তে বল্‌তে তিনি চেয়ারের ওপর ঢ'লে পড়লেন। পল্লব চকিতে লাফিয়ে গিয়ে তাঁকে না ধরলে তিনি হয়ত মাটিতে পড়ে যেতেন।

ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে অর্দ্ধ-অচেতন স্মিথ সাহেবকে তাঁর শয্যায় শয়ন করিয়ে দেওয়া হ'ল।

পল্লব অনেক রাত্রি অবধি শুয়ে শুয়ে ভাব্‌তে লাগল "কি সামান্য পরিহাসের কি শোচনীয় পরিণতি!...একটি সামান্য কথার পরিণামে মানুষের জীবনে কি গভীর ট্রাজিডির সৃষ্টি হ'তে পারে, তারই কূলকিনারা আমরা ঠাহর কর্‌তে পারি নে...অথচ...ভাবি...যে আমরা সর্ব্বশক্তিমান্। মানুষ কি অসহায়···অথচ···কি দর্পান্ধ!' [ক্রমশঃ]

কলিকাতার গৃহ-সমস্যা

শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় বি-ই

২০ বৎসর পূর্ব্বে কিরূপে গরীবের বাসস্থান ও বস্তি সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যকর ভাবে রাখা যাইতে পারে, সেইজন্য কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী ও সাধারণ জমীদার-মণ্ডলী ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু আজকের দিনে কিরূপে মধ্যবিত্ত গৃহস্থকে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য-

নূতন ধরণের স্বাস্থ্যকর সস্তা বাড়ী
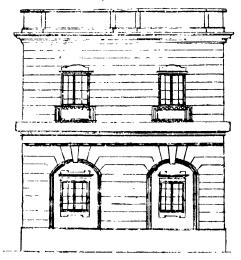
কর গৃহে রাখা যাইতে পারে, তাহাই চিন্তার ও ভাবনায় বিষয় হইয়াছে। এবং তাহাই সার্ব্বজনীন ভাবে বিবেচনার বিষয়ীভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সস্তা বাড়ীর নক্সা
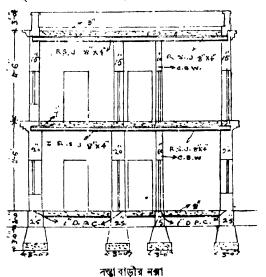
অধুনাতন স্বাস্থ্য বিষয় লইয়া প্রায়ই সকলেই চিন্তা করিতেছেন ও কিরূপে সাধারণ লোকে স্বাস্থ্যবান হইতে পারে তাহার উপায় উদ্ভাবনে ব্যাপৃত আছেন। যেমন খাদ্য সামগ্রী স্বাস্থ্য রক্ষার একটি প্রধান উপকরণ, তেমনই স্বাস্থ্যকর স্থানে বাসও একটি অপরিহার্য্য বিষয়।

ইহার মধ্যে দ্বিতীয়টীর সম্বন্ধে আমি নিম্নে কিছু বলিতে চাই।

যেরূপ দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্য সামগ্রীর দাম অসম্ভব বাড়িয়া যায়, সেইরূপ স্বাস্থ্যকর ভাল বাড়ী প্রচুর পরিমাণে
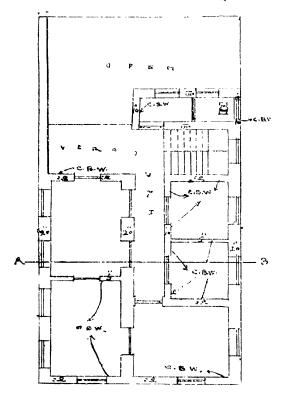
গ্রাউণ্ড প্ল্যান

না থাকায়, এই রকমের বাড়ীর ভাড়া অসম্ভব বাড়িয়া গিয়াছে। ফলে শতকরা ৯০ জন অস্বাস্থ্যকর ও বিপদ্‌জনক বাড়ীতে থাকিতে বাধ্য হয়। এবং বাড়ীওয়ালারাও যত কম জায়গার মধ্যে যত বেশী ঘর তৈয়ারী করিতে পারেন, তাহারই চেষ্টায় থাকেন। ফলে কোন ঘরেই হাওয়া আলো প্রবেশ করিবার পথ পায় না! কলিকাতার মধ্যে শতকরা ৫০ খানি বাড়ীতে এইরূপ অবস্থায় দিনের বেলায়ও আলো জ্বালিয়া রাখিতে হয়। ইহার

আলোর খেলা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত গোলোকচন্দ্র কর

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

অন্য ছেলেদের ভূমিষ্ঠ হওয়া থেকে ১০।১২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত জীবন্মৃত অবস্থায় থাকিতে হয়। এবং ইহারই জন্ত, যখন কোন মহামারী আরম্ভ হয়, তখনই মৃত্যু-সংখ্যা অসম্ভব বাড়িয়া যায়। এই অবস্থার পরিবর্ত্তন করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে, সস্তায় স্বাস্থ্যকর বাড়ী নির্ম্মাণ করা। তাহা হইলে বাড়ীওয়ালারাও তাঁহাদের টাকার ন্যায্য আয় পাইবেন, ভাড়াটিয়ারাও আয় অনুসারে ভাড়া দিতে পারিবেন।

এই ভাবে কার্য্য করিতে হইলে কেবল সাধারণ বাড়ীওয়ালাদের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না; কতকগুলি Co-operative society চালাইলে কার্য্য ভালরূপ হইতে পারে। এখন কলিকাতায় দুই-তিনটি society আছে, যাহারা এইরূপ বাড়ী তৈয়ারী করিয়া দিতেছে। তন্মধ্যে হিন্দুস্থান কো অপারেটিভ সোসাইটী এই ভাবে প্রচুর পরিমাণে বাড়ী তৈয়ার করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে।

এই সম্বন্ধে এঞ্জিনিয়ারদের উচিত, যত সস্তায় সম্ভব সেই ভাবে বাড়ীর design করা ও এইরূপ বাড়ী তৈয়ারী করিতে সাহায্য করা। আমি ঐ রূপ কতকগুলি বাড়ীর নক্সা ও নির্ম্মাণ খরচের হিসাব এই 'ভারতবর্ষে' দিয়াছিলাম। ঐ রূপ আর একটী বাড়ীর নক্সা নিম্নে দেওয়া গেল।

ইহাতে মোট ১ কাঠা ২০ ছটাক জমী আবশ্যক। বাড়ীটি দোতালা, নীচে ৩ খানি ঘর,—একটী রান্না ঘর ও একটী ভাঁড়ার ঘর, ও স্নানের ঘর ও পায়খানা।

উপরেও এই রূপই বন্দোবস্ত—কেবল রান্না ও ভাঁড়ার ঘরের উপর একটী মাত্র ঘর।

এই বাড়ীটি তৈয়ার করিতে মোট টাকা ৭০৫৯৲ খরচ হইবে; নিম্নে হিসাব দেওয়া গেল—

নম্বর	কার্য্যের তালিকা	মাপ	দর		মোট দাম
১।	মাটী কাটাই	১৬৫০ ঘনফুট	১০ টাকা প্রত্যেক শত ঘনফুট		১৬৲ টাকা
২।	বনিয়াদ ভরাই	১৩৩২ ঐ	১০৲	ঐ	১৩৲
৩।	চুণ খোয়া পেটাই	৫৫৬ ঐ	৪৫৲	ঐ	২৪৯৲
৪।	ভিতে গাঁথনির কাজ	১২৭০ ঐ	৪৮৲	ঐ	৬৫৮৲
৫।	একতলার গাঁথনি	২৫৭২ ঐ	৫০৲	ঐ	১২৮৫৲
৬।	দ্বিতলের ঐ	১৯৮২ ঐ	৫২৲	ঐ	১০২৮৲
৭।	সিমেণ্ট ড্যাম্পপ্রুফ কোর্স	২৪৩ বর্গফুট	১৫৲	ঐ	৩০৲
৮।	একতলার পার্টিসনের ৫ ইং সিমেণ্টের গাঁথুনি	১৬৮ ঐ	।৴০	বর্গ ফুট	৬৩৲
৯।	দ্বিতলের পার্টিসনের ৫ ইং সিমেণ্টের গাঁথুনি	১৬৮ ঐ	॥০	ঐ	৮৪৲ টাকা
১০।	বালী কাজ	৭৮০৮ ঐ	৪॥ প্রতি ১০০ বর্গ ফুট		৩৫২৲
১১।	তিন কোট চুণকাম্	৫৪২৬ ঐ	৸০	ঐ	৪০৲
১২।	এককোট অস্তরের উপর দু কোট জলের রং	২৭৬৩ ঐ	১৲	ঐ	২৭৲

৩৮৪৫৲

নম্বর	কার্য্যের তালিকা	মাপ	দর	মোট দাম
জের......				৩৮৪৫৲
১৩।	একখান ইটের উপর ৪ ইং টেরেশ কন্‌ক্রিট ফ্লোর	৬৬০ বর্গফুট	২৫৲ প্রতিশত বর্গফুট	১৬৪৲
১৪।	দ্বিতলে দু পরদা টাইলের উপর ৪ ইং টেরাস কন্‌ক্রিট ফ্লোর	৬৬০ ঐ	৪৫৲ ঐ	২৯৪৲
১৫।	দ্বিতলে দু পরদা টাইলের উপর ৬ ইং টেরাস কন্‌ক্রিট ছাদ,	৬৭৪ ঐ	৬০৲ ঐ	৪০৭৲
১৬।	একতলার চৌকাট এবং দ্বিতলের চৌকাট	৪৯ ঘন ফুট	৬ টাকা প্রতি ১০০ বর্গফুট	২৯৲
১৭।	নকল প্যানেল দরজা ও জানালা	৬৭৬ বর্গ ফুট	১৲	৬৭৬৲
১৮।	কড়ি (কন্টিনেণ্টাল)	২৫·৬ হন্দর	৮৲	২০৫৲
১৯।	টোনায়ন ও আরকিটেকচার	৭·৬ ঐ	১২৲	৯১৲
২০।	বরগা ২½″+২½″+⅛″ (কন্টিনেণ্টাল)	১৪·০ ঐ	৯৲	১২৬৲
২১।	জানালায় লোহার গরাদে	৮·৯ ঐ	১১৲	৫৪৲
২২।	৩ ইং পাইপ	১১০ রা ফুট	৸০	৮২৲
২৩।	১২ ইং কারনিস্	৯৯ ঐ	১॥০	১০৮৲
২৪।	৬ ইং প্যারা পেট্	১৩৮ রাঃ ফুট	॥০	৬৯৲
২৫।	লোহা ও কাঠে রংএর কাজ	২৬৭২ সোঃ ফুট	৫৲	১৩৪৲
২৬।	বেড় সেটাল্	২৪	২৲	৪৮৲
২৭।	ভেন্টি লেটার	২৪	॥০	১২৲
২৮।	সিঁড়ি	১টী		২০০৲
২৯।	সাইট ক্লিয়ার	১টী		৫০৲
৩০।	স্যানিটারী কাজ	১টী		২০০৲
				৭০৫৯৲

বাউটীর দোগারী (দারোগা পুলিশ !)

(২)

ইংরাজের অধীনে আসবার পর থেকে কাফ্রীরা ধীরে ধীরে সভ্যতার দিকে পা বাড়াচ্ছে। এখন তারা আইন আদালত মানতে শিখেছে। চুরি ডাকাতি ও খুন জখমের মামলার বিচার ও তার দণ্ড তারা গ্রহণ করেছে। কায়িক সাজা সেখানে প্রচলিত থাকলেও কাফ্রীরা ওটাকে তেমন গুরুতর বলে মনে করেনা, কিন্তু জনসমাজে অপমানিত বা হাস্যাস্পদ হওয়াটাকে তারা সব চেয়ে বেশী ভয় করে। এই জন্য গুরুতর অপরাধীদের কায়িক কোনও দণ্ড না দিয়ে তাদের প্রকাশ্যে অপমান করা হয়। এতে শাসককে শাসিতের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ ক'রতে হয়না ; অথচ দোষীর একেবারে মর্ম্মান্তিক সাজা হয়।

অতি সামান্য কারণে এদের মধ্যে এমন ভীষণ কলহ উপস্থিত হয় যে, সে কলহ অবিলম্বে একটা খুনোখুনি দাঙ্গা বা মারামারিতে পরিণত হয়। সময়মত এই ঝগড়া যদি নিবারণ করা না হয়, তা হ'লে সত্বর উভয় পক্ষের দলবৃদ্ধি হ'য়ে সেটা একটা প্রকাণ্ড যুদ্ধের ব্যাপার হয়ে ওঠে। তবে একটা সুরাহা এই যে, এরা মারামারি করতেও যেমন

বোনু'র কানুরী নর্ত্তকীদের নাচ।

তৎপর, আবার মিটমাট ক'রে ফেলতেও তেমনি উৎসাহী। এদের একটা মহৎগুণ এই যে, এরা কখনও কারুর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে রাখেনা। প্রতিহিংসা-পরায়ণতা বা

নাকাগার মুসলমান কাফ্রীগণ।

প্রতিশোধস্পৃহা এদের মধ্যে একেবারেই নেই। ঝগড়া বিবাদ এরা যখন করে, তখন করে ; কিন্তু তার পর সব ভুলে যায়।

বোর্নু'র কানুরী নর্ত্তকীদের নাচ।

অপকার এদের মনে থাকেনা বটে, কিন্তু উপকার এরা চিরদিন স্মরণে রাখে। শিশুর মত সরল ও দেবতার মত উদার প্রকৃতির এই জাতটা কিন্তু বিলাতী সভ্যতা ও পাশ্চাত্য জাতির সংস্পর্শে এসে নষ্ট হ'য়ে যেতে বসেছে। ব্রিটীশ আফ্রিকার বিষুব প্রদেশের অবস্থা এত বিভিন্ন রকমের যে, প্রত্যেক স্থানটি পরস্পরের সম্পূর্ণ বিপরীত। সুদান ও রুডলফ্ হ্রদের চারিপার্শ্বস্থ কেনীয়া প্রদেশের উত্তরাংশ এবং দক্ষিণে কালাহারী প্রদেশ একেবারে মরু স্থান বললেই চলে। পশ্চিমে অনবরত এমন আঁধী উড়ছে যে, এক শত গজ তফাতে আর কিছু সেখানে দেখা যায় না! এই পশ্চিমে বাতাস শুধুই যে কেবল ধুলো বালিতে ভরা তাই

বোর্নু'র কানুরী নর্ত্তকীদের নাচ

শোকোতোর সুলতান (কারুকার্য্যখচিত বিচিত্র পোষাকে সুলতান পশ্চাতে দাঁড়িয়ে আছেন, সম্মুখে তাঁর বিশ্বস্ত দেওয়ান শ্বেত পরিচ্ছদে দণ্ডায়মান)

নয়, এমন বিষম শুক্‌নো যে, এই বাতাসের টানে মোটা পিস্‌বোর্ডের বাঁধানো বই-গুলো পর্য্যন্ত গুটিয়ে কুঁকড়ে যায়। রাত্রে আবার এমন ঠাণ্ডা পড়ে যে, সাহারা সীমান্তবর্ত্তী চাদ হ্রদের সন্নিকটস্থ স্থানে মাঝে মাঝে তুষারপাত হ'তেও দেখা যায়! এই সকল প্রদেশের তুলনায় আবার বিষুবরেখান্তর্গত স্থানের তরল উত্তাপ ও মুষলধারে বৃষ্টি একেবারে সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থার পরিচয় দেয়। নাইগেরীয়ার উত্তর সীমান্তে গায়দাম অঞ্চলে মোটে পনর ইঞ্চি বৃষ্টি হয়; কিন্তু সেখান থেকে কিছু দূরে দক্ষিণের ফর্কেদো অঞ্চলে বৃষ্টি হয় একেবারে ১৬০ ইঞ্চি! সুতরাং আফ্রিকার কোথাও ঘন জঙ্গলাকীর্ণ ও তথায় প্রচুর শস্য উৎপাদিত হয় এবং কোথাও একেবা'র তৃণগুল্মহীন।

এই প্রাকৃতিক বৈপরীত্যই সেখান-কার আবহাওয়ার পার্থক্যের প্রধান কারণ। তা ছাড়া, স্থানের অত্যধিক উচ্চতা ও নিম্নতা এবং বড় বড় হ্রদের অবস্থানও এজন্য অনেকটা দায়ী। এক ভিক্টোরিয়া হ্রদই আয়তনে প্রায় সমগ্র আয়র্লণ্ডের সঙ্গে সমান। এই হ্রদটি সমুদ্রের সমতল থেকে প্রায় তিন হাজার ফিট উঁচু! এই হ্রদের ঠিক মধ্যভাগ

বোমুর্'র কামুরী নর্ত্তকীদের নাচ। (এদের কেবল মেয়েরা নাচে পুরুষেরা বাজায়। অন্যত্র কেবল পুরুষেরা নাচে ও মেয়েরা তালি দেয়। কোথাও আবার মেয়ে পুরুষ একত্রেও নাচে।)

দিয়েই আবার বিষুবরেখা চলে গেছে। এ ছাড়া এ্যালবার্ট, এডওয়ার্ড ও শীয়োগা নামক আরও তিনটি বড় বড় হ্রদ আছে। রুবেহোরী পর্ব্বতের তুষার-গলিত বারিরাশি এবং আফ্রিকার অসংখ্য নদনদী এসে এই হ্রদগুলিতে মিশে এদের পরিপুষ্ট করে তুলেছে। আবার এরাই হচ্ছে বিখ্যাত নীলনদের জন্মদাতা। আবিসিনীয়ার একাধিক পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনী ও পশ্চিমের দাফু'র নদের সংযোগে স্ফীত ও বলবান হ'য়ে নীলনদ আফ্রিকার মরুভূমি ভেদ করে মিশরের ভিতর দিয়ে সাগরে গিয়ে মিশেছে। আফ্রিকার প্রচণ্ড রৌদ্র তেজ ও মরুভূমির উত্তপ্ত সর্ব্ব শোষক বায়ুর প্রভাব সহ্য ক'রেও পশ্চিমে নাইগার্ ও কঙ্গো এবং দক্ষিণে জাম্বেশী নদী এখনও আফ্রিকার তিনটি প্রধান নদী বলে পরিচিত। জাম্বেশী জলপ্রপাত নায়েগ্রা প্রপাতের মতো অতটা বিস্তৃত না হ'লেও, এর পতনের দৈর্ঘ্য প্রায় নায়েগ্রা প্রপাতের দ্বিগুণ!

কিলীমা-নজারো, কেনীয়া ও রুবে-ঞ্জোরী এই তিনটিই হচ্ছে আফ্রিকার চিরতুষারাচ্ছন্ন অভ্রভেদী প্রসিদ্ধ

আফ্রিকার তরুণীদ্বয়

পর্ব্বতমালাও নিতান্ত কম নয়। এই সকল পর্ব্বতের সানুদেশ ও উপত্যকা ভূভাগ আগ্নেয়-গিরি-গর্ত্ত মৃত্তিকার উপযোগী উর্ব্বরতার জন্য বিখ্যাত। জার্ম্মাণরা এই সকল স্থানে য়ুরোপীয় মূলধনে রবার, কোকো এবং কলার চাষের কারবার খুলে বহু অর্থ ব্যয় করেছে। এই সকল চাষ আবাদের কাজে আধুনিক শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক উপায় সমস্ত অবলম্বিত হলেও জার্ম্মাণদের বাধ্যতামূলক শ্রম অর্থাৎ জোর করে মজুর সংগ্রহের ব্যবস্থা থাকাতে প্রায় গণ্ডগোল উপস্থিত হয়।

কাফ্রীদের সম্বন্ধে শোনা যেতো যে তারা বাড়ীতে নিতান্ত অলস ভাবে দিন যাপন করে। ষণ্ডামার্ক জোয়ান কাফ্রী সারাদিন শুয়েই কাটিয়ে দেয়—আর গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম যা কিছু সমস্তই, এমন কি বাজার করা, রান্না করা ছাড়া, মাটি খোঁড়া, ঘর মেরামত, বাগানের বা চাষের কাজ পর্য্যন্ত বাড়ীর মেয়েছেলেরাই করে। কিন্তু সে কথা সত্য নয়। যে কোনও একটি কাফ্রীদের গ্রামে গেলেই দেখা যায়—সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই যে যার পশুপাল নিয়ে গাঁয়ের ছেলেরা চরাতে চলে গেল। সারাদিন তারা মাঠে পশু চরিয়ে ফেরে, পাছে শত্রু কর্ত্তৃক পশুপাল আক্রান্ত হয় এই জন্য ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত হ'য়ে এক একজন বলিষ্ঠ পুরুষও উপস্থিত থাকে। গ্রামখানি যদি কৃষিপ্রধান হয় তা হ'লে তো গ্রামবাসীর কাজের আর সীমা থাকে না—সেই জমীতে লাঙল দেওয়া, মই টানা থেকে সুরু করে বীজ বোনা, চারা আজ্জানো এবং ধানকাটা, খড়তোলা পর্য্যন্ত কাজের আর অন্ত নেই। বাটীর বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা এই সব কাজে পুরুষদের সাহায্য করে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা চলতে শেখার সঙ্গে সঙ্গেই কাজ

আকুড়া জাতীয়া সুন্দরী। (এদের বসনের কারুকার্য্য অতি সুন্দর)

নমাজ পাঠ

ন্যুপের আটচালা (মধ্য-নায়গেরীয়ার উত্তরে ন্যুপ্‌জাতীয় কাফ্রীরা বাস করে। এরা সপরিবারে বাস করবার জন্য বিরাট আটচালা নির্ম্মাণ করে)

"কাতাম্বা।" (গৃহ-প্রবেশের তোরণ-দ্বারকে কাফ্রীরা 'কাতাম্বা' বলে। মাক্‌বা

ক'রতে শেখে। প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়, কালো পাথরে খোদা পুতুলের মতো উলঙ্গ ছেলেমেয়েগুলি কোথাও ছোট ছোট কুঁজো কলসী ক'রে খাবার জল তুলে আনছে, কোথাও উনুন ধরাবার জন্য শুকনো ডালপালা কুড়িয়ে আনছে, কোথাও বা তুলো সংগ্রহ ক'রছে।

গ্রামে শিল্পকার্য্যের মধ্যে তাঁত বোনা হয়, কাপড় রং হয়, কামারের কাজও চলে খুব। তীর ও বর্ষাফলক নির্ম্মাণই

বোর্ণুর বাজারে (হাটের দিন যে যার বলদের পিঠে মাল বোঝাই দিয়ে ব্যাপারীরা বোর্ণুর বাজারে এসেছে)

এদের প্রধান কাজ। চ্যাটাই ও চিয়াড়ীর ঝুড়ি ঝোড়া বোনাও একটা বড় শিল্প। যুলাওায় কিছু দিন পূর্ব্বেও গাছের ছাল পিটে কাফ্রীরা পরিধেয় বল্কল প্রস্তুত করতো। এ ছাড়া এক একটা গ্রাম যে এক একটা বিশেষ বিশেষ শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ হয়ে আছে, তাদের সে সুযশ অপহরণ করবার জন্য কেউই চেষ্টা করে না। যেমন

চ্যাটাইয়ের হাটে (বোর্ণুর হাটে বড় বড় চ্যাটাই বিক্রয় হয় এই চ্যাটাইগুলির বুনানী ভারি সুন্দর; নানা রঙীণ কারুকার্য্য করা)

একটা গ্রাম কেবল সুন্দর সুন্দর মাটির হাঁড়ী কলসী মালসা গামলা প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্য বিখ্যাত। একটা গ্রাম কেবল লোহার অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণের জন্য প্রসিদ্ধ। একটা গ্রাম কেবল চামড়ার কাজেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে উঠেছে! এই রকম অন্যান্য বিষয়েও।

চাষের কাজ শেষ হলেই তাদের বার্ষিক লম্বা ছুটা সুরু হয়। এই সময় তাদের মধ্যে কোনও কোনও জাত বৎসরের প্রয়োজনাতিরিক্ত চাউলে সুরা প্রস্তুত করে' পানোন্মত্ত হ'য়ে কাটিয়ে দেয়। এই পানোৎসবে কোনও কোনও স্থলে স্ত্রীলোকেরাও যোগ দিয়ে মত্ত পুরুষদের আনন্দ ও উৎসাহ বর্দ্ধন করেন।

আজকাল দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে, এই ছুটীর সময়টা অনেকেই কিছু উপরি রোজগার করবার চেষ্টায় থাকে। কেউ এই সময় নিকটস্থ

নাইগেরীয়ানদের গৃহ নির্ম্মাণ। (দেওয়াল তৈরী করবার জন্য মাটি মেখে কাদা তৈরী করা হচ্ছে)

আমীর-সম্মেলন (নববর্ষের দরবারে ব্রিটিশ আফ্রিকার বিভিন্ন প্রদেশের আমীরগণ সমবেত হয়েছেন। মধ্যস্থলে বোর্ণুর

কোনও য়ুরোপীয়দের খনিতে বা কারখানায় অস্থায়ীভাবে মজুরী করতে আসে, কেউ কোনও একটা ছোটখাটো ব্যবসাও করে। বিশেষ যাদের বার্ষিক কিছু খাজনা দিতে হয়, তাদের এই ছুটীর সময়টার একটা কিছু ক'রে সেই খাজনার টাকাটা সংগ্রহ ক'রতেই হয়। কারণ এইটুকু মেটাতে পারলেই সারা বছর সে আর কারুর তোয়াক্কা রাখে না! ঘরে তার পেটের ভাত সম্বৎসরের জন্য বাঁধা আছে।

ইংরাজ আফ্রিকায় পদার্পণ করবার পূর্ব্বে সেখানে এতটা নিরাপদে শান্তি উপভোগ করবার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। গাঁয়ে গাঁয়ে দলা-দলি, মারামারী লেগেই থাক্‌তো। এ তো গেলো নিজেদের ভিতরের দাঙ্গাহাঙ্গামার ফ্যাসাদ। এ ছাড়া দাস-ব্যবসায়ীদের অত্যাচারে তাদের সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত হয়ে থাক্‌তে হ'তো। কবে যে কার ছেলে বউকে টেনে নিয়ে যাবে, এই ভয়ে সদাই সশঙ্কিত ও সতর্ক হ'য়ে তাদের রাত্রিবাস করতে

'শল্লা' পর্ব্ব (ন্যাপের কাফ্রীরা সকলেই মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। 'শল্লা' পর্ব্বের দিন ন্যাপের সমস্ত মুসলমান আমীর সাহেবের সঙ্গে নমাজ পড়বার জন্য সমবেত হয়)

উত্তর নাইগেরীয়া (আমীরের অশ্বারোহী কর্ম্মচারিগণ)
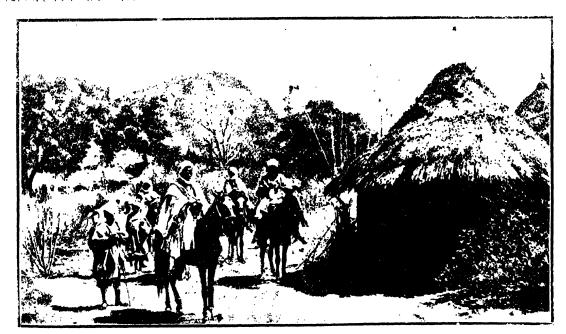
হ'তো। আরবদের নিষ্ঠুরতা স্মরণ ক'রে এখনও এদের অনেকেরই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। তারা যে কেবল ডাকাতের দলের মতো এসে পড়ে এক একটা গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে—গ্রামের সমস্ত জোয়ান স্ত্রীপুরুষ ও ছেলে মেয়েদের ধরে নিয়ে যেতো, এবং বুড়োদের মেরে আধমারা করে অনাহারে শুখিয়ে মারার জন্য বেঁধে ফেলে রেখে দিয়ে যেতো তাই নয়; যাদের তারা ধরে নিয়ে যেতো, তাদের প্রতিও পথে যে দারুণ অত্যাচার ক'র্‌তো, তা জগতের সমস্ত নিষ্ঠুরতা ও বর্ব্বরতাকে লজ্জা দিতে পারে! এসে হঠাৎ একটু মজা দেখবার সখ হ'ল। তারা ধৃত নরনারীদের সেই শরবন ও কুম্ভীরকুলের মাঝখানে ছেড়ে দিয়ে শরবনে আগুণ ধরিয়ে দিলে, এবং দূরে উচ্চ বৃক্ষচূড়ায় উঠে মজা দেখ্‌তে লাগ্‌ল যে, লোকগুলোর কি অবস্থা হয়। হতভাগ্য বন্দীরা যদি কুম্ভীরের গ্রাস থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য শরবনে এসে ঢোকে, তাহলে আগুনে পুড়ে মরবে; আর আগুনের ভয়ে যদি জলের দিকে যায়, তা হ'লে সেই অসংখ্য বুভুক্ষু কুম্ভীরের গ্রাসে তাদের জীবন দিতে হবে! বুঝুন তাদের কী অবস্থা! শয়তানেরা মহা

বেণু নদী-তীরে (বেণু নদীতীরে কাফ্রী জেলেদের গ্রাম দেখা যাচ্ছে। এরা মোটা মোটা কাঠের গুঁড়ি কুঁদে এক রকম ছোট ছোট নৌকা প্রস্তুত করে, এবং সেই নৌকা নিয়ে গিয়ে বেণু নদীতে জাল ফেলে মাছ ধরে)

একটা দৃষ্টান্ত আমরা পাঠকদের অবগতির জন্য এখানে তুলে দিচ্ছি—একবার এই নৃশংস আরব দস্যুদের একটা দল কোনও গ্রাম থেকে জনকতক তরুণ-বয়স্ক নরনারীকে দাস ব্যবসায়ের জন্য ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। যাবার সময় পথে তাদের ন্যায়সা হ্রদের নিকটবর্ত্তী একটা জলা ভূমি পার হ'য়ে যেতে হয়েছিল। এই জলাভূমির এক প্রান্তে বিস্তীর্ণ শর বন, অপর প্রান্তে অসংখ্য কুম্ভীর শুয়ে রৌদ্র তাপে দেহ উষ্ণ করে নিচ্ছিল। বর্ব্বরদের এই স্থানে উল্লাসে তাদের এই দুর্দ্দশা উপভোগ করতে লাগল! ওরই মধ্যে যে দু'একজন প্রাণ ভয়ে ছুটে প্রজ্বলিত শরবন ও কুম্ভীরের গ্রাস এড়িয়ে পথে উঠে আসছিল, নর পিশাচেরা গাছের উপর থেকে পশুর মতো তাদের গুলি ক'রে মারছিল। ইংরাজ আফ্রিকা দখল করে আর কিছু করুক আর নাই করুক, এই আরব দস্যুদের অমানুষিক অত্যাচার থেকে কাফ্রীদের রক্ষা করেছে।

দার্জ্জিলিংয়ে মহাত্মা গান্ধী

(চিত্তরঞ্জনের শেষ প্রবাস ভবন ষ্টেপ-এসাইডে ৫ই জুন গৃহীত)

Photo by—Sj. Subodh Dutta, Darjeeling.

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির মেয়র
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর ডেপুটী মেয়র ও অল বেঙ্গল ইয়ংমেন্স্ এসোসিয়েসনের প্রেসিডেণ্ট
শ্রীযুক্ত এইচ্, এস্ সারাওয়ার্দ্দি

এবার 'ভারতবর্ষ' যে মহাপুরুষের পবিত্র আলেখ্যে তাহার প্রচ্ছদ-পট সুশোভিত করিল, তাঁহার পরিচয় দিয়া ধৃষ্টতা প্রকাশ করা একেবারেই অনাবশ্যক। পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এখন বিশ্ববিদিত; এক সম্প্রদায় এখন তাঁহাকে অবতার জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহার চরণে ভক্তি-ভরে প্রণত হন। এই ভাদ্র মাসেই সেই মহাপুরুষের তিরোভাব হয়। আমরা ভক্তি-প্রণত হৃদয়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নাম স্মরণ করিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছি।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য যে ধন-ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে, তাহাতে এ পর্য্যন্ত সাড়ে ছয় লক্ষ টাকার উপর সংগৃহীত হইয়াছে। এখনও সাড়ে তিন লক্ষ টাকার দরকার। ভবানীপুরে যে বাড়ীতে চিত্তরঞ্জন বাস করিতেন, সে বাড়ী এক্ষণে দেনার দায়ে আবদ্ধ আছে। দশ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইলে সেই বাড়ী দায়মুক্ত করিয়া সেখানে রোগিনীদিগের জন্য একটী আশ্রম ও হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশবন্ধুর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। মহাত্মা গান্ধী মহোদয় এই ভাণ্ডারের অর্থ সংগ্রহের জন্য ভিক্ষাপাত্র হস্তে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেছেন; দেশের লোকও জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে এই ভাণ্ডারের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। মহাত্মা আগামী ইংরাজী মাসের প্রথমেই বাঙ্গালাদেশ ত্যাগ করিয়া যাইবেন। তৎপূর্ব্বেই যাহাতে এই দশ লক্ষ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হয়, ইহাই তাঁহার

বক্‌রিদ্‌-উৎসব—ধর্ম্মতলা মস্‌জিদ Photo by—Mr. T. P. Sen
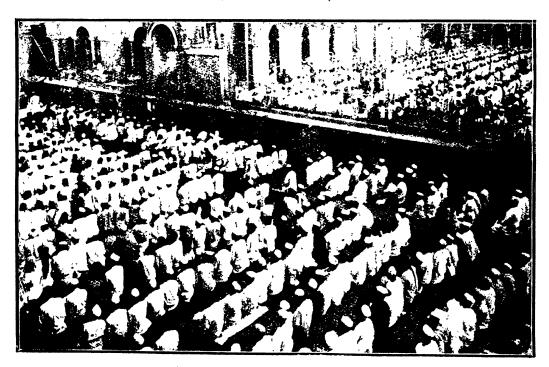
ইদ্‌ উপলক্ষে উপাসনা—নাখোদা মস্‌জিদ্‌ Photo by—Mr. T. P. Sen

বাসনা। আমাদের আশা আছে তাঁহার এ বাসনা পূর্ণ হইবে এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্মৃতি রক্ষিত হইবে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পরলোকগমনে কলিকাতা মিউনিসিপালিটির মেয়রের পদ শূন্য হইয়াছিল। অনেকে

ইদ উপলক্ষে ময়দানে উপাসনা (১)

Photo by—Mr. T. P. Sen

ইদ্ উপলক্ষে ময়দানে উপাসনা (২)

Photo by—Mr. T. P. Sen

উত্তরপাড়ায় হেমচন্দ্র-স্মৃতি-ফলক উন্মোচন

এ পদের প্রার্থী ছিলেন। মিউনিসিপাল কাউন্সিলগণের অধিকাংশের মতে স্বরাজ-নেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মহাশয় মেয়র পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তিনি ইতঃপূর্ব্বে কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর সংস্রবে ছিলেন না; এইজন্য প্রথমে তাঁহাকে অল্ডারম্যান নির্ব্বাচিত করিয়া পরে তাঁহাকে মেয়র পদ প্রদান করা হইয়াছে। আমরা শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত ও ডেপুটী মেয়র শ্রীযুক্ত সারাওয়ার্দ্দি মহাশয়দ্বয়কে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। আশা করি তাঁহারা পরলোকগত মেয়র দেশনায়ক চিত্তরঞ্জনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কলিকাতার জনসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

কিছুদিন হইল ভারত গবর্ণমেণ্ট একটী ট্যাক্স অনুসন্ধান কমিটি (Taxation Enquiry Committee) বসাইয়াছেন। কমিটির সদস্যগণ ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া অনেকের মতামত সংগ্রহ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে কোন ট্যাক্স কমানো বা বাড়ানো যাইতে পারে কি না, তাহা নির্দ্ধারণ করাই এই কমিটির উদ্দেশ্য। এই কমিটির নিকট কয়েকজন সাক্ষ্যদান সময়ে বলিয়াছেন যে, জমীদারী আয়ের উপর ট্যাক্স বসানো উচিত। এখনও কমিটির কোন রিপোর্ট প্রকাশিত হয় নাই; কিন্তু এই কয়েকজনের মন্তব্য শুনিয়াই একদল জমীদার ভীত হইয়াছেন। বঙ্গীয় জমিদার-সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এখনই এ সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্য এদেশের জমীদারগণকে সচেষ্ট হইতে অনুরোধ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে যে সভা আহুত হইয়াছিল, তাহাতে শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটী বড় পাকা কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"In this connection the landed classes must work with their tenantry in devising ways and means for the amelioration of the distress of all classes of people and in carrying further the banner of the social gospel of co-operation and its ideals so that every locality may feel interested in and try to solve its own problems." ইহার ভাবার্থ এই যে, জমীদারগণের কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা প্রজাগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া যাহাতে সকলের সর্ব্ববিষয়ে উন্নতি হয় তাহার চেষ্টা করা। ইহাই ত জমীদারগণের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যে অবহিত হইলেই দেশের দুর্দ্দিন নিশ্চয়ই ঘুচিয়া যাইবে।

৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে যে মহাপুরুষগণ নব্য-ভারতের জাগরণ-মন্ত্র প্রথম উচ্চারণ করিয়াছিলেন—যাঁহারা ভারতের নব-প্রতিষ্ঠার সূচনা করিয়াছিলেন—যাঁহাদের জীবনব্যাপী একনিষ্ঠ সাধনার বলে জাতীয় জীবনের দুন্দুভি-নিনাদে তন্দ্রাচ্ছন্ন ভারতবাসীর নয়ন উন্মীলিত হইয়াছিল, একে একে তাঁহাদের সকলেই সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন; অবশিষ্ট যিনি ছিলেন, তিনিও বিগত ২১শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ দেড়টার সময় বারাকপুরে ভাগীরথীতীরে, ৭৭ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করিয়াছেন;—তিনি বাঙ্গালার, ভারতের মুকুটমণি দেশপূজ্য **সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়।**

বিদ্যালয় তথা বাঙ্গালার শিক্ষা-সাধনার কর্ণধার সা আশুতোষ মুখোপাধ্যায় অতি অকস্মাৎ চলিয়া গেলেন—হাহাকারে দিঙমণ্ডল পূর্ণ হইল। মুখোপাধ্যায় আশুতো বাঙ্গালীর গৌরব ছিলেন, ভারতের স্পর্দ্ধার আধার ছিলেন; তাঁহার অভাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ক্ষতি হইল, বাঙ্গালী সমাজের যে মুকুটমণি খসিয়া পড়িল, আর কি তাহার পূরণ হইবে? তাহার পরই গেলেন ভূপেন্দ্রনাথ! স্থিরধী, কর্ত্তব্যপরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ, অধ্যবসায়ের মূর্ত্ত বিগ্রহ—ভূপেন্দ্রনাথ কত কাজ ফেলিয়া রাখিয়া অনন্ত-পথের যাত্রী হইলেন। তাহার পর এই সেদিন বিনামেঘে বজ্রপাত হইল, হিমালয়ের শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া পড়িল;—দারজিলিংয়ের

সুরেন্দ্রনাথের মৃতদেহ

সত্যসত্যই বাঙ্গলা দেশের আজ বড়ই দুর্দ্দিন! বিগত দেড় বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা দেশ কত রত্ন যে হারাইল, কত হৃদয়ভেদী হাহাকারে যে বাঙ্গালার গগন-পবন মুখর হইল, কত আশা-আকাঙ্ক্ষা যে ধূলায় লুণ্ঠিত হইল, তাহা ভাবিলেও শরীর অবসন্ন হয়, বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ চিন্তায় আকুল হইতে হয়। এই দেড় বৎসরের মধ্যে প্রথমে গেলেন সার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়; অমন ধীর স্থির শান্ত, মনীষী, স্বদেশপ্রেমিক কি আর মিলিবে? চৌধুরী আশুতোষের চিতাগ্নি নির্ব্বাপিত হইতে না হইতেই একেবারে বাঙ্গালীর মহাপুরুষ, প্রতিভার কাঞ্চনশৃঙ্গ, অনন্যসাধারণ কর্ম্মী, বাঙ্গালার বাঘ, কলিকাতা বিশ্ব-

শৈলশিখর বাঙ্গালীর সাধনার ধন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে যে গভীর নিদ্রায় অভিভূত করিল, সমগ্র দেশবাসী নর-নারীর আকুল ক্রন্দনে, হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদে সে নিদ্রা আর ভাঙ্গিল না; বাঙ্গালী চক্ষে অন্ধকার দেখিল। তাহার পরই বাঙ্গালার, ভারতের স্বদেশী মন্ত্রের পুরোহিত, সেকালের দেশনায়কগণের শেষ স্মৃতি সুরেন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন।

কিন্তু, এ সময়ে ত সুরেন্দ্রনাথের চলিয়া যাইবার কথা ছিল না। এই যে সেদিন, দুই মাস পূর্ব্বে যখন মহাত্মা গান্ধী বারাকপুরে সুরেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, তখন সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া

মহাত্মা গান্ধীকে বলিয়াছিলেন "আমি ৯১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কার্য্যক্ষম থাকিব," সে কথা ত স্থির রহিল না ;—দুই মাস যাইতে না যাইতেই মহাকালের আহ্বানে সুরেন্দ্রনাথকে পরপারে যাত্রা করিতে হইল। যে সকল সঙ্কল্প এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন, যাহা সংসাধনের জন্য এই ভগ্নস্বাস্থ্য বৃদ্ধ যুবকের ন্যায় উৎসাহ, উদ্যম, দৃঢ়তার সহিত কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা ত ঘটিল না ;—সকল আশা, সকল আকাঙ্ক্ষা সেদিন পুণ্যতোয়া ভাগীরথীতীরে ভস্মাবশেষ হইয়া গেল; বাঙ্গলার সুরেন্দ্রনাথ, বাঙ্গালীর সুরেন্দ্রনাথ, ইংরাজের Surrender Not সব ছাড়িয়া অনন্তধামে চলিয়া গেলেন ; বাঙ্গলা দেশের একটা দিক্‌পাল অন্তর্হিত হইলেন,—একটা তেজোময় জ্যোতিষ্ক আকাশের কোলে বিলীন হইয়া গেল।

মনে পড়ে, সেই বহুদিন পূর্ব্বের কথা, যখন সুরেন্দ্রনাথ, বিহারীলাল ও রমেশচন্দ্র সিবিল সার্ব্বিশ পরীক্ষা দিবার জন্য একসঙ্গে সমুদ্রপারে যাত্রা করেন এবং বিশেষ সম্মানের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনজনই সিবিলিয়ান হইয়া এদেশে প্রত্যাগমন করেন।

মনে পড়ে, শ্রীহট্টে দুই বৎসর কার্য্য করিবার পর সামান্য অপরাধে সুরেন্দ্রনাথকে কর্ম্মচ্যুত করা হয় ; তিনি নিতান্ত অসহায় অবস্থায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

মনে পড়ে, শুধু মনে পড়ে কেন, এখনও চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয় বিপন্ন সুরেন্দ্রনাথকে আশ্রয় প্রদান করেন; তাঁহাকে নিজের কলেজে দুইশত টাকা বেতনে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। আমরা তখন কলেজের ছাত্র।

মনে পড়ে, সুরেন্দ্রনাথের সেই বাগ্‌বিভূতি—সেই অতুলনীয় বাগ্মিতা, সেই উন্মাদনাময়ী বাক্যচ্ছটা। আমরা স্কুল কলেজের ছাত্রেরা তখন তাঁহার অস্ত্র। এই যুবকদলকে যেন তিনি মন্ত্রমুগ্ধবৎ চালিত করিতেন। তাঁহার সেই তেজস্বিনী বক্তৃতা শুনিবার জন্য দেশের যুবকমণ্ডলী কোথায় না গিয়াছে, কি কষ্ট না স্বীকার করিয়াছে। তিনি তখন বাঙ্গালীর যুবকদলের অধিনায়ক ছিলেন; তাঁহার সামান্য ইঙ্গিতে বাঙ্গালার যুবক সম্প্রদায় প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারিত। তিনি বাঙ্গালা দেশকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিলেন—সকলকে স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষা দান করিয়াছিলেন।

মনে পড়ে, ভারত-সভার (Indian Association) প্রতিষ্ঠা-দিনের কথা। যেদিন ভারত-সভার প্রতিষ্ঠা হইবে, সেই দিন পূর্ব্বাহ্ণে তাঁহার একমাত্র পুত্র পরলোকগত হইল। (শ্রীমান্ ভবশঙ্কর তখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই) এই সংবাদ কলিকাতায় প্রচারিত হইলে সকলে মনে করিলেন, সেদিন আর ভারত-সভার প্রতিষ্ঠা হইবে না। কিন্তু, যথাসময়ে সুরেন্দ্রনাথ সভায় উপস্থিত হইলেন। ভারত-সভার প্রতিষ্ঠা আগে - তাহার পর গৃহে গমন করিয়া হৃদয়ভেদী পুত্রশোকে অশ্রু বিসর্জ্জন! সকলে সবিস্ময়ে সুরেন্দ্রনাথের কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার সাধুবাদ করিতে লাগিলেন—সুরেন্দ্রনাথের সিংহাসন দেশবাসীর হৃদয়ে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ হইল।

মনে পড়ে, আদালত অবমাননার অপরাধে সুরেন্দ্রনাথের দুই মাসের জন্য কারাবাস! সে দৃশ্য যে এখনও আমাদের চক্ষের সম্মুখে জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে। সহস্র সহস্র লোক সেদিন হাইকোর্টে বিচারফল জানিবার জন্য উপস্থিত। অনেকেরই মনে হইয়াছিল, বিচারে তাঁহার সামান্য অর্থদণ্ড হইবে। তাই পাইকপাড়ার কুমার ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ মহাশয় লক্ষ টাকা সঙ্গে লইয়া হাইকোর্টে উপস্থিত। আরও কত মহানুভব ব্যক্তি টাকা লইয়া গিয়াছিলেন ;—যত টাকা জরিমানা হয়, তাহাই দিয়া দেশনায়ক সুরেন্দ্রনাথকে খালাস করিতে হইবে। তাহার পর যখন শুনিতে পাওয়া গেল, সুরেন্দ্রনাথের দুই মাসের জন্য দেওয়ানী কারাবাস হইল, তখন সে কি উত্তেজনা, কি অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য! সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তখন কলেজের ছাত্র। তাঁহাকে অগ্রণী করিয়া ছাত্রগণ ডফ্ কলেজে যে সভা করেন, সেই সভায় আশুতোষ যে উন্মাদনাময়ী বক্তৃতা করেন, তাহা এখনও আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে। তাহার পর সুরেন্দ্রনাথ কারামুক্ত হইলে সে যে কি উল্লাস! তাহারই ফলে জাতীয় ধনভাণ্ডার স্থাপন!

মনে পড়ে, জাতীয় মহাসমিতির কথা। ১৮৮৫ অব্দে স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে বোম্বাইয়ে প্রথম জাতীয় মহাসমিতির (Indian National Congress) অধিবেশন হয়। সুরেন্দ্রনাথ সে অধিবেশনে

উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাহার পর বৎসর ১৮৮৬ অব্দে কলিকাতায় কন্‌গ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের বক্তৃতার কথা কোন দিন আমরা ভুলিব না। সেই হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯১৭ অব্দ পর্য্যন্ত প্রত্যেক কংগ্রেসের অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথই তখন কংগ্রেস;—সুরেন্দ্রনাথ উপস্থিত না হইলে হয় ত অধিবেশনই পণ্ড হইত;—সমস্ত ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি তখন সুরেন্দ্রনাথের উপর নিবদ্ধ! সুরেন্দ্রনাথ তখন সত্যসত্যই জনগণ-মন-অধিনায়ক!

মনে পড়ে, বরিশালে প্রাদেশিক সমিতির কথা! সুরেন্দ্রনাথ তার স্বরে ঘোষণা করিলেন, বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেট ইমার্সন সাহেবের আদেশ অমান্য করিয়া "বন্দে-মাতরম্" গান করিয়া শোভাযাত্রা করিতেই হইবে। সুরেন্দ্রনাথ শোভাযাত্রার অধিনায়ক হইলেন; যুবকেরা আহত হইল; সুরেন্দ্রনাথ ধৃত হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে নীত হইলেন; তিনি সমস্ত দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করিলেন,—যে দণ্ড হয়, তাহাই স্বীকার করিবেন বলিলেন। সুরেন্দ্রনাথের জয়ধ্বনিতে দিঙ্‌মণ্ডল পূর্ণ হইল।

মনে পড়ে, লর্ড কার্জ্জনের বঙ্গভঙ্গের কথা। সে যে কি আন্দোলন! সে আন্দোলন, সে উন্মাদনার অধিনায়ক সুরেন্দ্রনাথ! সে স্বদেশী-মন্ত্রের হোতা সুরেন্দ্রনাথ! বাঙ্গালা দেশময় সে কি তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল! বিদেশী দ্রব্য ত্যাগের সে কি জ্বলন্ত উৎসাহ! আর সেই জন-প্রবাহের, সেই স্বদেশ-তরুণীর কর্ণধার সুরেন্দ্রনাথ! সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে সুরেন্দ্রনাথের বজ্রনির্ঘোষ! অবশেষে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ হইল। দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বিজয়ী বীরের মত দেশের শ্রদ্ধাঞ্জলি লাভ করিলেন—তাঁহাকে 'মুকুটহীন-রাজা' (Uncrowned King of Bengal) বলিয়া দেশবাসী অভিনন্দিত করিল।

তাহার পর—তাহার পর মনে পড়ে, এই সেদিনের কথা। মণ্টফোর্ড শাসন-সংস্কার বিধিবদ্ধ হইল। দেশের লোক এ সংস্কার গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল। ভবিষ্যৎ স্বরাজ লাভের প্রথম বায়না, প্রথম সূচনা বলিয়া সুরেন্দ্রনাথ এই সংস্কারকে সাদরে বরণ করিলেন; গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকেই মন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন;—তাঁহাকে 'সার' উপাধি প্রদান করিয়া সম্মানিত করিলেন। দেশের স্বরাজপন্থী-দল তাঁহাদের দেশনায়ক, তাঁহাদের স্বদেশ-তরণীর কর্ণধারের এই কার্য্য নীরবে গ্রহণ করিলেন না;—পঞ্চাশ বৎসরের অধিনায়ক সুরেন্দ্রনাথ অগ্রগামী দলের উন্মাদনায়, আশা আকাঙ্ক্ষার সহিত দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিলেন না—তাঁহাকে সরিয়া দাঁড়াইতে হইল।

তাহার পর—তাহার পর মনে পড়ে, বাঙ্গালাদেশের প্রতিনিধি-সভার সদস্যপদের জন্য ভোট সংগ্রামে সুরেন্দ্রনাথের শোচনীয় পরাজয়!

আজ কিন্তু সব শেষ! বাঙ্গলা-বিজয়ী রাষ্ট্রনেতা, অদ্বিতীয় বাগ্মী, মনস্বী সুরেন্দ্রনাথ চিরদিনের জন্য নীরব হইলেন;—ভাগীরথী তাঁহার প্রিয় পুত্রের শ্মশান-ভস্ম বুকে করিয়া সাগরাভিমুখে চলিয়া গেল;—রহিল সুরেন্দ্রনাথের অবদান! আজ তাঁহার অমর আত্মার উদ্দেশে আমরা ভক্তির অঞ্জলি প্রদান করিতেছি। ইংরাজ বীরের কথা পুনরুক্ত করিয়া বলিতেছি—

"Surendranath, with all thy faults we love thee still!"

পরলোকে হিরণ্ময়ী দেবী

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলাম যে, শিক্ষা-বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুত ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী হিরণ্ময়ী দেবী গত ১৩ই জুলাই সোমবার বালীগঞ্জস্থ ভবনে ইহলীলা সংবরণ করিয়াছেন। হিরণ্ময়ী দেবী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রথমা কন্যা। জীবিতকালে তিনি দেশহিতব্রতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় মহিলা শিল্পাশ্রমে কার্য্য করিয়া বর্ত্তমানে শতাধিক নিঃসহায় বিধবা তাঁহাদের জীবিকার্জ্জন করিতেছেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রেও তিনি বিশেষ যশোলাভ করিয়াছিলেন। এক সময়ে তিনি তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী সরলা দেবীর সহযোগে "ভারতী" পত্রিকার সম্পাদিকার কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

পুস্তক-পরিচয়

গড্ডলিকা, পরশুরাম-রচিত।—শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন-অঙ্কিত ২৯ চিত্র সহিত। দাম পাঁচ সিকা।

একজন লেখক মানবজাতিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন—গাধা ও শৃগাল। কিন্তু আমরা এই মত মানিতে পারি না, কারণ তাহা হইলে পরশুরামের স্থান হয় না। তিনি শৃগাল কর্তৃক প্রত্যহ সংসারে গাধা ভক্ষণ দেখিয়া হাসিতেছেন এবং আমাদের হাসাইতেছেন। জগতে কতপ্রকার মেকি চলিতেছে, পরের অর্থে বেশ হৃষ্টপুষ্ট হইতেছে; এবং আর সকলেই যেন গড্ডলিকার প্রবাহের ন্যায় কিছু না ভাবিয়া, যখন যে দিকে একজনের ঝোঁক হয়, সেই দিকে ছুটিয়া যায়,—ইহা পাঁচটি অতি রমণীয় ব্যঙ্গচিত্রে দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। "পরশুরামের" কুঠারের তীক্ষ্ণ ধারে বাটপাড় জয়েণ্টষ্টক কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা, হোমর-চোমরা ডাক্তার, ধর্ম্মধ্বজী বক মহাশয়, সূক্ষ্মদর্শী প্রেততত্ত্ববিদ্ দার্শনিক, আড্ডাধারী গুণী (খুড়ী, বিড়ী, সিগারেট) খোর, কেহই নিস্তার পায় নাই। অথচ তাঁহার নির্ম্মল সৌম্য হাস্যে কাহারই অন্তরে বেদনা রাখিয়া যায় না। এই জন্যই না কালিদাস পরশুরামকে—

"স-সোম ইব ধর্ম্ম দীধিতি"

অর্থাৎ একাধারে সূর্য্যের খর দীপ্তি ও চন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোতির সঙ্গে তুলনা দিয়াছেন। আমাদের পরশুরামও তাহাই। বঙ্গবাসীর জি, এন্, মুখুজ্যের পর এই গ্রন্থের "ভুশণ্ডীর মাঠে"র মত বিমল হাস্যের ভৌতিক গল্প আর পড়ি নাই; অথচ মধ্যে এক স্থলে "মাঠের কথা" (? অথবা "মহামায়া")র একটি বর্ণনার উপর গুপ্ত ছুরী মারাও হইয়াছে। লেখক মহাশয় রবির গদ্যপদ্যের রসে আপ্লুত, এবং সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রেরও বেশ অভিনব আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে প্রস্তুত। "বৃথা ছাগ"এর উপর টীকাটি কপিরাইট করা উচিত।

আমাদের অন্তঃপুরে "লম্বকর্ণ" বড় মিষ্ট লাগিয়াছে। আহা, বেচারার উপর সকলেরই লোলুপ দৃষ্টি। প্রবীণ আড্ডাধারী চাটুয্যে মহাশয় তাঁহার এনাটমিকাল্ পরীক্ষা করিয়া "খাসা কালিয়া" করিবার পাঁতি দিলেন; নবীন রায়জাদা ঘেণ্টু তাহার মেটুলী চাহিয়া রাখিল; অজানিত ভাবে একটা বিয়োগান্ত নাটক না হইয়া গেলে বেলেঘাটা কেরাসিন ব্যাণ্ড তাহাকে গন্ধর্ব্বলোকে পাঠাইত; বুকন্দর সিংহ তাহারই জন্য মুঙ্গেরী বন্দুকে বারুদ ভরিতে লাগিল; আর স্বয়ং রায়-বাঘিনী ("রায় বাহাদুরের স্ত্রী" ইত্যমরঃ) তাহাকে নির্ব্বাসন-দণ্ড দিলেন। কিন্তু কোষ্ঠী অবিশ্বাস করিবার কি ভীষণ ফল দেখুন,—সেই লম্বকর্ণই রায়বাহাদুর ও রায়-বাঘিনীর মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিয়া দিল, তাহার শিং সোনা দিয়া মোড়ান হইয়াছে, তাহার দাড়ি এখনও লম্বা হইতেছে! "আল্লা কালী যিশুর দিব্য" অথবা ততোধিক কোন "শক্তি"র ভয়ে কেহ তাহাকে ছুঁইতে পারে না। নিয়তি সর্ব্বত্র, হাল ফেসানের ইংরাজী শিক্ষিতেরা বিশ্বাস করুন আর না করুন।

লম্বকর্ণের দাড়ির মত এই গড্ডলিকার শ্রেণী আরও বাড়িতে থাকুক, বঙ্গীয় পাঠকের একাধারে আনন্দ ও শিক্ষা বৃদ্ধি হউক। আমি শুধু একটি দিকে পরশুরামের দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়া দিতেছি। সেটি ইঙ্গ-বঙ্গ স্বামীজীর দল। গেরুয়া রঙ্গের রেশমী মোজা ও আলখোল্লা, শৈলাবাসে পুরা সাহেবী পরিচ্ছদ (সোলার হ্যাট পর্য্যন্ত!) সুদূর প্রদেশে স্বামীজীর জন্য রেলে দুই দুই দিন পরে ইলিশ মাছ আসে, এবং কলিকাতা হইতে সপ্তাহে সপ্তাহে পার্শ্বেলে চেকোলেট আসিতেছে; আর বাঙ্গলার আমরা যত মধ্যবিত্ত শ্রমী লোক তাহার খরচ যোগাইবার জন্য চাঁদা দিতেছি। এক্ষেত্রে কি পরশুরাম নীরব থাকিবেন? না—

দুষ্ট সর্প ইব দণ্ডঘট্টনাৎ
রোষিতোস্মি তব বিক্রমশ্রবাৎ?

এই নব্য বাবাজীদের বিক্রম কম নয়; অনেক মোহন্তকে হার মানাইয়াছে। ত্রাহি পরশুরাম!

শ্রীযদুনাথ সরকার

শ্রীঅরবিন্দের গীতা।—শ্রীঅনিলবরণ রায় অনূদিত। মূল্য দেড় টাকা।—শ্রীযুত অনিলবরণ রায় প্রণীত "শ্রীঅরবিন্দের গীতা" আমি যত্ন সহকারে পাঠ করিয়াছি। স্বনামখ্যাত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যান ও বিবৃত্তি করিয়া যে ইংরাজি পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন, অনিলবরণ বাবুর গ্রন্থ সেই পুস্তকের অনুবাদ। এ অনুবাদ কার্য্যে গ্রন্থকার বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন; কারণ গ্রন্থ পড়িয়া অনেক স্থলেই ইহা অনুবাদ বলিয়া অনুভব হয় না। বর্ত্তমান যুগে আমাদের জাতীয় জীবন গঠনে গীতার বিশেষ উপযোগিতা আছে। অতএব গীতার যতই আলোচনা ও অনুশীলন হয় ততই ভাল। বিশেষতঃ সে আলোচনা যদি শ্রীঅরবিন্দের মত সাধনোজ্জ্বল বুদ্ধির দ্বারা সম্পন্ন হয়, তবে তাহার সার্থকতা সমধিক। জিজ্ঞাসু পাঠক এই গ্রন্থ পাঠে গীতার অনেক মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিতে পারিবেন এবং গীতা-রহস্যের অনেক প্রচ্ছন্ন গুহ্য নবালোকে উদ্ভাসিত দেখিবেন। একজন সৎপুরুষ গীতার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—It has several octaves of meaning (গীতার্থের কয়েকটী বিভিন্নান্তর বা গ্রাম আছে।) আমরা যেমন যেমন সাধনায় উচ্চতর গ্রামে উঠিব, গীতার নবতর ভাব তেমনি আমাদের চিত্তে ফুটিয়া উঠিবে। গীতা

সম্পর্কে শেষ কথা এখনও বলা হয় নাই—'শ্রীঅরবিন্দের গীতায়' অনেক নূতন কথা নূতন ভাবে বলা হইয়াছে।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

মুঘল বিদুষী।—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত। ২য় সংস্করণ, মূল্য ।৵০।

এই পুস্তকে বাবর-কন্যা গুলবদন বেগম এবং আওরংজীব-দুহিতা জেবউন্নিসার জীবনী এবং গ্রন্থ পরিচয় আছে। দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থের আকার বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং প্রথমবারকার রচনা আমূল সংশোধন এবং ইতিমধ্যে যে সব নূতন তথ্য জানা গিয়াছে, লেখক চিন্তার পর যে সব নূতন মতে উপনীত হইয়াছেন, তাহা সম্বলিত করিয়া গ্রন্থকে যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ করা হইয়াছে। ব্রজেন্দ্রনাথের সত্যান্বেষণের প্রগাঢ় চেষ্টা, প্রকৃত ইতিহাস রচনার পদ্ধতিতে অভিজ্ঞতা, এবং আশু-লভ্য খ্যাতি ও অর্থ ত্যাগ করিয়া গবেষণার সাধনায় সকল শক্তি নিয়োগের স্পৃহা তাঁহার গ্রন্থগুলিই বারবার প্রমাণ করিয়াছে। প্রতি নূতন সংস্করণে কষ্টসাধ্য আমূল সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি আবও দেখাইতেছেন যে সত্যপথের যাত্রীর বিশ্রাম নাই, ইতিহাস-চর্চ্চায় শেষ কথা কোথায়ও নাই; শুধু ক্রমোন্নতিই এই ব্রতের মূলমন্ত্র। বাঙ্গলায় এ দৃষ্টান্ত দেখান আবশ্যক হইয়াছে। চরিত দুটি বেশ সুপাঠ্য হইয়াছে এবং বাঙ্গালী পাঠকদের নিকট জ্ঞানের মন্দিরের একটী অপরিচিত মনোরম কক্ষ খুলিয়া দিয়াছে। ইংরাজী ও ফার্সীতে এ বিষয়ে যত উপাদান আছে তাহার কিছুই এই পুস্তকে বাদ যায় নাই। দেবের জীবনীটির ইংরাজী অনুবাদ হওয়া আবশ্যক।

শ্রীযদুনাথ সরকার

সাথী—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার প্রণীত। মূল্য ২৲ টাকা। ইহা একখানা গার্হস্থ্য উপন্যাস। বিজয়বাবু লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক; গল্প বলিবার ভঙ্গীতে তাঁহার নিজস্ব মাধুর্য্য আছে। গল্পের প্রতিপাদ্য বিষয়—নারী ধনরত্ন বিভব কিছুই চাহে না, চাহে কেবল হৃদয়। অগাধ ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী, দাসদাসীপরিবৃতা, কোন অভাবই নাই; অথচ যেখানে প্রেম নাই তাহাতে নারী তৃপ্ত থাকিতে পারে না। তাহার অতৃপ্ত হৃদয় ঘুরিয়া ফিরিয়া নানা ভাবে তাহার দয়িতকে পাইবার জন্যই দুটি ব্যাকুল বেদনাকাতর বাহু বিস্তার করে। এই বইখানি বাঙালী পাঠককে আনন্দ দিবে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। আর বাঙালী পাঠিকাদের সুশীলার করুণ কাহিনী পড়িতে পড়িতে একাধিকবার নয়ন সজল হইয়া উঠিবে।

বেদান্ত পরিচয়।—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ, বি এল প্রণীত। মূল্য এক টাকা চারি আনা। যিনি এই বেদান্তের পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার পরিচয় বা তাঁহার পুস্তকের পরিচয় প্রদান করা একান্তই অনাবশ্যক। মনীষী, পরম পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়কে জানেন না, বা তাঁহার লিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধাবলী পড়েন নাই, এমন শিক্ষিত বাঙ্গালী অতি কমই আছেন। নানা সাময়িক পত্রে তিনি যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাই সংগ্রহ করিয়া এই 'বেদান্ত পরিচয়' প্রকাশিত হইয়াছে। এমন করিয়া সংগ্রহ না করিলে পাঠকের পক্ষে বিভিন্ন সাময়িক পত্র হইতে এই জ্ঞানগর্ভ লেখাগুলি খুঁজিয়া পাঠ করা সহজসাধ্য হইত না। এই পুস্তকখানি যে বেদান্ত পাঠকের বিশেষ সহায়তা করিবে, এমন কি অনেকের অনেক অনুসন্ধিৎসা পূরণ করিবে, তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ মাত্র নাই। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুর কথারই পুনরুক্তি করিতেছি—বেদান্তবাক্য যত বার শুনা যায়, ততই শ্রেয়।

কার্পাস-শিল্প।—শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত প্রণীত। মূল্য বার আনা। কাহার পরিচয় আগে দিব—পুস্তক-লেখকের, না পুস্তকের? পুস্তকের কথাই আগে বলি। গ্রন্থকার এই পুস্তকে আমাদের দেশের কার্পাস-শিল্প বা বস্ত্র-শিল্পের অবনতির ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং কি করিলে ঐ শিল্পের পুনরুদ্ধার হয়, তাহারও কথা বলিয়াছেন। এক কথায়, যাহাতে ঘরে ঘরে চরখা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহারই জন্য বহু আয়াস স্বীকার করিয়া শ্রীযুক্ত সতীশবাবু এই গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন। আমাদের দেশের কার্পাস-শিল্পের ইতিহাস সত্যসত্যই জানিবার বিষয়। বিদেশী ব্যবসায়ীদিগের কৃপায় কেমন করিয়া এই শিল্পের ধ্বংস সাধিত হইয়াছে, তাহা পড়িলে কি যে মনে হয়, তাহা আর বলিয়া কাজ নাই। শ্রীযুক্ত সতীশবাবু এই চরখা ও খদ্দর প্রচারের জন্য একাগ্রচিত্তে কাজ করিতেছেন, বিষয়কর্ম্ম সমস্ত ত্যাগ করিয়া তিনি এই কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। এই প্রচেষ্টায় তিনিই মহাত্মা গান্ধী ও সার প্রফুল্লচন্দ্রের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ; আর এইখানি প্রতিষ্ঠানের জন্য তিনি বড় চাকুরী ত্যাগ করিয়া দারিদ্র্যকে বরণ করিয়াছেন। তাঁহারই অধ্যবসায়ের ফল এই কার্পাস-শিল্প। এমন বই ঘরে ঘরে থাকা চাই।

দেশভক্তি।—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার সম্পাদিত। মূল্য এক টাকা। এখানি অধ্যাপক সমাদ্দার সম্পাদিত স্বর্ণময়ী পর্য্যায়ের প্রথম গ্রন্থ। ইহাতে প্রকাশিত গল্পগুলি মূলতঃ বৈদেশিক ঘটনা হইতে গৃহীত হইলেও, দেশভক্তির গৌরবে সেগুলি উজ্জ্বল। গল্পগুলির লেখক যখন নাম প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক, তখন আমরাও নাম ধরিয়া প্রশংসা করিব না। লেখক যিনিই হউন, তিনি যে সুলেখক, তাহা এই দেশভক্তির যে কোন একটী গল্প পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। অধ্যাপক সমাদ্দারের এই স্বর্ণময়ী পর্য্যায় স্বর্ণমণ্ডিত হউক, ইহাই আমরা প্রার্থনা করি।

মিলনরাত্রি।—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। মূল্য দুই টাকা। শ্রদ্ধেয়া লেখিকা মহোদয়ার পরিচয় দিতে হইবে না, অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল হইতে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিতেছেন; এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি সেবা ত্যাগ করেন নাই। মিলনরাত্রি তাঁহার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফল। তিনি যে কথাটী যখনই বলিতে চান, তাহাই সরল, সুন্দর ও স্পষ্ট করিয়া বলেন, কোন ঘোর

পেঁচ রাখেন না। আর ভাষার কথা—তিনি সে বিষয়ে বাঙ্গালা সাহিত্যে অগ্রণীরূপেই অবস্থিতা। উপন্যাসখানির আখ্যান ভাগ স্বদেশী ব্যাপার; সুতরাং সকলেরই ভাল লাগিবে।

ঋণ-মোক্ষ।—শ্রীতারকনাথ সাধু প্রণীত। মূল্য দুই টাকা। শ্রীযুক্ত সাধু মহাশয়কে সাধুবাদ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তিনি সত্যসত্যই 'বাহাদুর' এবং 'সাধু'। বলিতে গেলে, দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার এই সাহিত্যিক মূর্ত্তি কেহই দেখিতে পান নাই; তিনি যে সাহিত্য-সেবার জন্য অবসর যাপন করিবেন, এ কথাও কেহ ভাবেন নাই। আর এখন কি না এই দুই বৎসরের মধ্যে তিনি তিন-তিনখানি সুবৃহৎ উপন্যাস লিখিয়া ফেলিলেন; এই ঋণ-মোক্ষ তাঁহার তৃতীয় উপন্যাস। ইহাতে তিনি সনাতন ভাবেরই প্রচার করিয়াছেন। গল্পের আখ্যানভাগ ভাল; সাধু মহাশয়ও প্রাণ খুলিয়া তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

বিসর্জ্জন।—শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত। মূল্য ১৷৹ টাকা। এই উপন্যাসখানি যখন পত্রান্তরে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল, তখনই আমরা পড়িয়াছিলাম। এই উপন্যাসে সরস্বতী মহাশয়ার পূর্ব্ব যশঃ অক্ষুন্ন আছে। কয়েকটী চরিত্রচিত্রন অতি সুন্দর হইয়াছে; সতীর চরিত্র বড়ই প্রাণস্পর্শী হইয়াছে। আমরা এই উপন্যাস পড়িয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি।

অবাক্।—শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত। মূল্য দেড় টাকা। গল্প-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠাপন্না লেখিকা এই উপন্যাসখানি লিখিয়াছেন। কাগজ, ছাপা, বাঁধাই, সব ভাল। পুস্তক বাজারে চলিবে।

সাঙ্খ্যতত্ত্ব।—শ্রীশিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিরচিত। মূল্য চারি আনা। এখানি শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতান্তর্গত সাঙ্খ্যযোগের আধ্যাত্মিক ভাবব্যাখ্যা। যাঁহারা ধর্ম্মপিপাসু, তাঁহাদের ভাল লাগিবে। ব্যাখ্যা সরল।

পিতা-পুত্র।—শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল প্রণীত। মূল্য ১৷৷৹ টাকা। সুপ্রসিদ্ধ লেখক ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত নরেশবাবু এই পিতা-পুত্র উপন্যাসে একটী গৃহস্থ ঘরের সুন্দর চিত্র দিয়াছেন। পিতার অমিতব্যয়িতা ও খামখেয়ালী পিতৃভক্ত পুত্র কেমন নীরবে, নতশিরে আজীবন সহ্য করিয়াছেন, তাহারই করুণ কাহিনী এই উপন্যাসে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পাকা হাতের পাকা লেখা; ইহার অধিক পরিচয় দিবার কি প্রয়োজন আছে? প্রত্যেক মধ্যবিত্ত গৃহস্থই যেন বইখানি পড়েন।

লালপতাকা।—শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত বি-এ প্রণীত। মূল্য এক টাকা। সকল দেশেই সকল যুগেই কতকগুলি খামখেয়ালী যুবক দেখিতে পাওয়া যায়—স্বদেশী আমলে এ দেশেও দেখা গিয়াছিল, এখনও দেখা যায়। তাহাদেরই মধ্যে এক জনের ছায়া লইয়া এই লালপতাকা লিখিত হইয়াছে। লেখক বেশী বাড়াবাড়ি করেন নাই, এই যা কথা।

কীর্ত্তিলতা।—মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত, মূল্য দেড় টাকা। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় যখন নেপাল গমন করেন, তখন সেখানকার দরবার পুস্তকালয় হইতে মহাকবি বিদ্যাপতি বিরচিত 'কীর্ত্তিলতা' ও 'কীর্ত্তিপতাকা' নামক দুইখানি পুরাতন পুঁথি নকল করিয়া আনেন। এ দুইখানিই মৈথিলী পুঁথি, শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় তাহারই একখানি—'কীর্ত্তিলতা'র মূল ও বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে এক অমূল্য সম্পদ দান করিয়াছেন, কারণ এ পুঁথির অস্তিত্ব দুই একজন ব্যতীত আর কাহারও কর্ণগোচরই হয় নাই, দৃষ্টিগোচর ত দূরের কথা। শাস্ত্রী মহাশয় বহু পরিশ্রম করিয়া এই কীর্ত্তিলতার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন; কিন্তু 'কীর্ত্তিপতাকা'র পাঠোদ্ধার এখনও হয় নাই। শাস্ত্রী মহাশয়কেই তাহা করিতে হইবে, পারিলাম না বলিয়া ছাড়িয়া দিলে আর কে সে কার্য্যে হস্তার্পণ করিবে। ডাক্তার শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় এই অমূল্য রত্নকে তাঁহার প্রকাশিত হৃষীকেশ পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া যথেষ্ট গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

ফল্গু।—শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী এম-এ, বি-এল্ বিরচিত। মূল্য এক টাকা। এখানি কবিতা পুস্তক। লেখক মহাশয় বিভিন্ন সাময়িক পত্রে যে সমস্ত কবিতা লিখিয়াছেন, তাহারই কয়েকটী এই সংগ্রহ পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। লেখক মহাশয় কবিতাগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন,—গৃহলক্ষ্মী, দেশমাতৃকা ও বিশ্বদেবতা। এই তিনটী নামকরণ সার্থক হইয়াছে। আমরা সকলগুলি কবিতাই আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি এবং পরিতৃপ্ত হইয়াছি। কবির উচ্চ হৃদয়ভাব ও আদর্শ প্রত্যেক কবিতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ঢেঁকির কীর্ত্তি।—শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত। মূল্য বার আনা। এখানি শিশুপাঠ্য গল্প পুস্তক; ভিতরে কয়েকখানি ছবি আছে। এই পুস্তকে দুইজন বিখ্যাত দস্যুর (বদে, বিশের) ও পল্লীগ্রামের একটা ডাংপিঠে ছেলের কয়েকটি গল্প আছে। গল্পগুলি যখন বুড়োদের ভাল লাগিয়াছে, তখন ছেলে মেয়েদের নিশ্চয়ই ভাল লাগিবে। পুস্তকখানির প্রধান বিশিষ্টতা—গল্পগুলি সত্য-ঘটনা-মূলক। সুতরাং এই ধরণের শিশুপাঠ্য গল্প পুস্তক বঙ্গ-সাহিত্যে পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে কি না স্মরণ হয় না। গ্রন্থকার মহাশয় ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "সেকালে পল্লীগ্রামের দুষ্ট ছেলেদের রুচি, প্রবৃত্তি, খেয়াল, দুষ্টামীর ধারা কিরূপ ছিল, একালের ছেলেদের তাহার ধারণা করা কঠিন হইয়াছে; তাই মনে হয় সাহিত্যেও এই গল্পগুলি স্থান পাইবার অযোগ্য নহে। ইহাতে সেকালের উদ্দাম পল্লীজীবনের কতকটা আভাস পাওয়া যায়; এবং ভাল হউক, মন্দ হউক, দোষে-গুণে খাঁটি মানুষটিকে ইহার মধ্যে দেখিতে পাই।" গ্রন্থকার উপসংহারে আশঙ্কা করিয়াছেন, "হয় ত সমালোচকেরা বলিবেন—ইহাও একটা বুড়ো ঢেঁকির কীর্ত্তি!" কিন্তু ঢেঁকির উপযোগিতা অস্বীকার করিবে—ভেতো বাঙ্গালীর মধ্যে তেমন সাহস কাহারও আছে কি?

ভবেশ।—শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য আড়াই টাকা। অনেক দিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত কালীপদ বাবু 'গৃহচিত্র' নামে একখানি গার্হস্থ্য উপন্যাস লিখিয়াছিলেন; আমরা সে সময় এই পুস্তকখানি পড়িয়াছিলাম। এতকাল পরে সেই পুস্তকখানিই সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া গ্রন্থের নায়কের নামানুসারে 'ভবেশ' নামে প্রকাশিত হইল। সনাতন হিন্দু আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই উপন্যাসখানি লিখিয়াছেন; ইহা সেই আদর্শবাদী পাঠকগণের নিকট সমাদরে গৃহীত হইবে। ইহার রচনাভঙ্গীও একালের দস্তুরমত নহে, পূর্ব্বকালের আদর্শে লিখিত। তাহা হইলেও প্রবীণ নবীন সকলেরই এই উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

ছত্রপতি শিবাজী।—শ্রীভবসিন্ধু দত্ত কর্তৃক বিরচিত। মূল্য দুই টাকা। ছত্রপতি শিবাজীর বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবন চরিতের বড়ই অভাব ছিল। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় একখানি জীবন চরিত লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পর ঐতিহাসিকগণের অনুসন্ধানে অনেক নূতন তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে, সেই জন্যই আমরা আর একখানি বিস্তৃত জীবন চরিত দেখিবার আশা করিতেছিলাম। শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত মহাশয় সে অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। তাঁহার লিপি-কৌশল, অনুসন্ধিৎসা ও ঘটনা-সংস্থান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আমরা এই জীবনচরিতখানির বহুল প্রচার কামনা করি। বইখানির অঙ্গসৌষ্ঠবও সুন্দর হইয়াছে।

ঝড়ের ফুল।—শ্রীনির্ম্মল দেব প্রণীত, দাম এক টাকা বার আনা। এখানি উপন্যাস। লেখক মহাশয় 'নবীন' হইলেও তাঁহার রচনা-চাতুর্য্যে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি; বর্ণনা এমনই সুন্দর যে, বারবার পড়িতে ইচ্ছা করে। তিনি গল্পের আখ্যানভাগেও বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, চরিত্র চিত্রণ মনোরম হইয়াছে; কোথাও জড়তা নাই। বইখানির ছাপা ও বাঁধাই অতি সুন্দর।

হরিদাস ঠাকুর।—শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র সঙ্কলিত, মূল্য এক টাকা। শ্রীযুক্ত সতীশ বাবু যশোহর খুলনার ইতিহাস লিখিয়া সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার মধ্যে যে প্রগাঢ় ধর্ম্মভাব, সাধনপরায়ণতা আছে, তাহা তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ ব্যতীত আর কেহ এত দিন জানিবার অবকাশ পান নাই। এইবার এই হরিদাস ঠাকুর পুস্তকে পাঠকগণ তাহার প্রমাণ পাইবেন। আমরা অতৃপ্ত হৃদয়ে একাধিক বার এই সুন্দর পুস্তকখানি পাঠ করিয়াছি এবং সতীশবাবুকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছি। যে উন্নত ধর্ম্মপ্রাণতা থাকিলে হরিদাস ঠাকুরের ন্যায় মহামানবের পবিত্র জীবন-কথা কীর্ত্তন করা যায়, সতীশ বাবুতে তাহা আছে। হরিদাস ঠাকুরের অপূর্ব্ব জীবন-কথা সকলেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।

ভারত-পথিক-সহায়।—শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত, মূল্য দুই টাকা। শ্রীযুক্ত সতীশ বাবু ভারতবর্ষের নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। যাঁহারা ভ্রমণ করিতে ভালবাসেন, তাঁহারা এই পুস্তকের সাহায্যে অনেক অসুবিধার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন। এ রকমের একখানি বইয়ের বিশেষ অভাব ছিল; সতীশবাবু সেই অভাব পূর্ণ করিয়া ভারত-পথিকগণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন, এবং যাঁহারা ঘরে বসিয়াই নানা স্থানের কথা জানিতে চান, তাঁহারাও এই পুস্তক পাঠে উপকৃত হইবেন।

দীপালী।—শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন প্রণীত, মূল্য কুড়ি আনা। বেশ বই, ছাপা, কাগজ, বাঁধাই, প্রচ্ছদপট একেবারে আর্টিষ্টিক; ভিতরটা আরও সুন্দর—গুর্জ্জর, মালব ও রাজওয়ারার কয়েকটী আদর্শ মহিলার জীবন-কথা লেখক অতি সুললিত মনোজ্ঞ ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা বইখানি দেখিয়া ও পড়িয়া প্রচুর আনন্দ লাভ করিয়াছি।

নমর মেয়ে।—ডাক্তার শ্রীপ্রতাপচন্দ্র গুহ রায় প্রণীত, মূল্য পাঁচসিকা। এই অস্পৃশ্য-সমস্যার দিনে প্রতাপবাবু এই উপন্যাসখানি লিখিয়া নমঃশূদ্র জাতির সম্বন্ধে উচ্চশ্রেণীর লোকের মনোভাবের সুন্দর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। নিম্ন শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করিয়াও যে অসংখ্য নরনারী দেবভাবাপন্ন হয়, আবার উচ্চশ্রেণীতে জন্মলাভ করিয়াও যে অনেকে চণ্ডালের অধম হয়, তাহা এই উপন্যাসখানিতে অতি সুন্দর ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

আত্ম-জীবন।—৺শ্রীকান্ত ভাদুড়ী মহাশয়ের প্রাণপত্নী, মূল্য ।• । ৺শ্রীকান্ত ভাদুড়ী মহাশয় স্কুলের শিক্ষক ছিলেন, সুতরাং তাঁহার আত্ম-জীবন চরিতে যে বড় বড় কথা থাকিবে, তাহা কেহই আশা করিতে পারেন না। ইহাতে আছে, একটী অসহায় বালক বহুকাল পূর্ব্বে, ইংরাজী শিক্ষার প্রথম আমলে কেমন করিয়া নিজের অধ্যবসায়-বলে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন; আর আছে, সেকালে পূর্ব্ববঙ্গের পল্লী-সমাজের সুন্দর চিত্র। আমরা এই বইখানি পড়িয়া প্রীত হইয়াছি।

জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি।—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত, মূল্য বার আনা। এখানি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপদেশ-সংগ্রহ। এই অমূল্য উপদেশগুলি একত্র সংগ্রহ করিয়া ক্ষিতীন্দ্র বাবু সত্যধর্ম্ম-পিপাসুগণের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। সমস্ত জীবন সাধনা করিয়া মহর্ষিদেব যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা যে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণের পরম আদরণীয়, সে কথা আর বলিতে হইবে না।

কিরণ লেখা।—শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য এক টাকা। এখানি ছোট উপন্যাস; কিন্তু ছোট হইলেও লেখকের লিপি-কৌশলের বাহাদুরী আছে। তিনি বেশ গোছাইয়া একটী পতিতা রমণীর জীবন-কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আরও একটা কথা এই যে, লেখক মহাশয় ঠিক ধরিতে পারিয়াছেন, কতদূর

তিনি অগ্রসর হইতে পারেন; তিনি সীমারেখা ভুলিয়া যান নাই। এই জন্যই আমরা কিরণ-লেখার প্রশংসা করিতেছি।

লিচ্ছবি জাতি।—ডাক্তার শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম এ, বি-এল্, পি এইচ্-ডি প্রণীত। মূল্য পাঁচ সিকা —প্রাক্ মৌর্য্যযুগে লিচ্ছবি জাতি আপনার বৈশিষ্ট্য ইতিহাসের পৃষ্ঠায় রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই জাতির ধারাবাহিক সম্পূর্ণ ইতিহাস বিবৃত করিবার চেষ্টা ইতঃপূর্ব্বে কেহই করেন নাই। ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা মহাশয় সেই চেষ্টা করিয়াছেন, এবং বর্ত্তমান সময়ে যতদূর সম্ভব, কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। তাঁহাকে বাধ্য হইয়া সাহিত্যিক ইতিকথা ও কাহিনীর সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে; কারণ ঐগুলি ব্যতীত এই ইতিহাস সঙ্কলনে গত্যন্তর নাই। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থের একটী ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস-চর্চ্চা করেন, এই সুন্দর পুস্তকখানি তাঁহাদের বিশেষ সহায়তা করিবে। এমন সুন্দর, এমন উৎকৃষ্ট ছাপা বাঁধাই পুস্তকের মূল্য এক টাকা নির্দ্ধারিত করিয়া লাহা মহাশয় ভাল কাজই করিয়াছেন।

ভট্টাচার্য্য-পরিবার।—শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য পাঁচ সিকা। বহুকাল পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত অক্ষয়বাবু এই উপন্যাস-খানি প্রকাশিত করিয়াছিলেন, সেই সময়ে অল্প দিনের মধ্যেই প্রথম সংস্করণ ফুরাইয়া গিয়াছিল। তাহার পর এই সুদীর্ঘকাল আর তিনি দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপিবার অবকাশ পান নাই। অথচ এই সুন্দর পুস্তকখানি পড়িবার আগ্রহ অনেকেরই ছিল। এতদিন পরে লেখক মহাশয় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিলেন; আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন যে, এটি Goldsmithএর Vicar of Wakefieldএর ঘটনার অনুসরণে লিখিত; কিন্তু, না বলিয়া দিলে তাহা ধরিবার উপায় ছিল না; কারণ তিনি ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ভাবে দেশী করিয়া ফেলিয়াছেন, কোন স্থানেই বিলাতীর সামান্য ছাপও নাই; ইহা কম কৃতিত্বের কথা নহে।

গোরুর গাড়ী।—শ্রীভোলানাথ সেনগুপ্ত বিরচিত, মূল্য ছয় আনা। একে গোরুর গাড়ী, তাহে কাব্য—পড়িবার লোভ সংবরণ করা একেবারে অসাধ্য। পড়িয়া দেখিলাম গাড়োয়ান সত্য সত্যই বাহাদুর পুরুষ, তিনি কাব্য লিখিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন। আমরা গোরুর গাড়ীর প্রশংসা করিতেছি। সবটা তুলিয়া দিতে ইচ্ছা করিতেছে, কিন্তু স্থানাভাব। তাই চারিটি লাইন মাত্র তুলিয়া দিলাম; ইহা হইতেই কবির ক্ষমতা বুঝিতে পারা যাইবে:—

অল্পমতি অলস গতি বুদ্ধি মোটামুটি,
নাই আসক্তি কিংবা শক্তি করতে ছোটাছুটি;
পথ চিনে সেই অচিন্ পথে চলতে যদি চাই,
গোরুর গাড়ী ভিন্ন আমার অন্য উপায় নাই।

মনের কথা।—শ্রীসরসীলাল সরকার প্রণীত; মূল্য বার গণ্ডা। এই গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী 'ভারতবর্ষে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। মনস্তত্ত্ব-শাস্ত্র-রসজ্ঞ ডাক্তার শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু এই গ্রন্থের একটী সারগর্ভ ভূমিকা লিখিয়াছেন এবং সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেন প্রচ্ছদপটের সুদৃশ্য ছবিখানি অঙ্কিত করিয়াছেন, সুতরাং বইখানিতে মণিকাঞ্চন যোগ হইয়াছে।

কীট-পতঙ্গ!—৺দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত, দাম দেড় টাকা। পরলোকগত দ্বিজেন্দ্র বাবু সহজ ও সরল ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার অকাল-মৃত্যুতে সত্যসত্যই একটা প্রকাণ্ড ক্ষতি হইয়াছে। এই কীট-পতঙ্গের কাহিনী দ্বিজেন্দ্রবাবু বিশেষ যত্নের সহিত লিখিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোক-গমনের পর তাঁহার ভাগিনেয়...প্রথিতনামা সাহিত্যিক শ্রীমান্ প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এই প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে ছাপাইয়া সুধু শিশু-সাহিত্যের কেন, প্রৌঢ় সাহিত্যেরও মহোপকার সাধন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু-সঙ্গ।—শ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারী লিখিত, মূল্য ২৲। এখানি 'শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু-সঙ্গ' পুস্তকের চতুর্থ খণ্ড। শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়ের দেহাশ্রিত অবস্থার কতক সময়ের দৈনন্দিন বৃত্তান্ত। ইহা ১২৯৯ সালের ডায়েরী। ব্রহ্মচারী মহাশয় গোস্বামী মহোদয়ের সঙ্গী ছিলেন এবং যখন যাহা দেখিয়া শুনিয়াছিলেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাই আমরা এখন এমন পবিত্র জীবনের কতক দিনের ঘটনা জানিতে পারিতেছি। গোস্বামী প্রভুর শিষ্যেরাই যে কেবল এ গ্রন্থের সমাদর করিবেন তাহা নহে, বাঙ্গালী মাত্রেরই নিকট এই খণ্ড পূর্ব্ব তিনখানির ন্যায় আদৃত হইবে এবং পরম ভক্তিভরে পঠিত হইবে।

ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধ ও আত্মচিকিৎসা;—ডাক্তার শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম-বি কর্ত্তৃক প্রকাশিত; মূল্য দশ পয়সা। এই পুস্তিকাখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও গুরুত্বে কম নয়। ইহাতে ম্যালেরিয়া জ্বরের কোষ্ঠিপত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায় বা প্রতিষেধ, এবং আত্মচিকিৎসার কথা বিবৃত হইয়াছে। এখন বর্ষাকাল—বাঙ্গলার ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া; এই ম্যালেরিয়ার সঙ্গে সংগ্রাম করিবার জন্য ডাক্তার কার্ত্তিক বাবুর এই গ্রন্থ প্রকাশ খুব সময়োপযোগী হইয়াছে। পাঠকেরা লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ চিকিৎসকের উপদেশাবলীর অনুসরণ করিলে উপকৃত হইবেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

ব্রজাঙ্গনা ও বীরাঙ্গনা।—রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর বি-এ, এম-বি কর্ত্তৃক সম্পাদিত। মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীযুক্ত সান্যাল মহাশয় মাইকেলের পরম ভক্ত; তাঁহার ন্যায় এমন করিয়া মাইকেলের প্রত্যেক লাইন কবিতা কেহ পাঠ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। মেঘনাদবধের তিনি যে ব্যাখ্যা-যুক্ত সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। তিনি এক্ষণে ব্রজাঙ্গনা ও বীরাঙ্গনার ব্যাখ্যা করিয়া, এই অভাবনীয় সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন।

কেমন অভিনিবেশ সহকারে এই দুইখানি কাব্যের প্রত্যেক শব্দটীর আলোচনা করিয়াছেন। সান্যাল মহাশয় মেঘনাদবধ ও বর্ত্তমান পুস্তকখানি সম্পাদন করিয়া বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছেন। এই ভাবে মহাকবিদিগের সম্বন্ধে বিশিষ্ট আলোচনা এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা আশা করি, এইখানিও মেঘনাদবধ কাব্যের ন্যায় পরম আদরে গৃহীত হইবে।

পথিক।—শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ প্রণীত; মূল্য সাড়ে তিন টাকা। এখানি সুবৃহৎ উপন্যাস, ৫২৫ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। অনেক দিন এমন সুন্দর উপন্যাস পড়ি নাই। এমন করিয়া প্রাণ ঢালিয়া চরিত্র-চিত্রণ বাস্তবিকই প্রাণস্পর্শী হয়। ঘটনা-সংস্থানও অতি সুন্দর, কোন স্থানে জড়তা বা আড়ষ্ট ভাব নাই; গোকুলবাবুর কল্পনা-স্রোত অপ্রতিহত গতিতে ছুটিতেছে, অথচ কোথাও অনাবিলতার নাম গন্ধও নাই। উপসংহারের কয়েকটী লাইন উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।—"মানুষের পায়ে-চলা পথের দিকে মায়া তাকাইয়া থাকে, পথ-যাত্রীদের দেখে আর ভাবে, ঐ অনন্ত পথ, ঐ অনন্ত-যাত্রীদের মধ্যেই লুকাইয়া আছে তাহার পথিক বন্ধু! প্রতিদিন সে তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে। ঐ পথ ধরিয়া যদি সেও বাহির হইয়া পড়ে তাহার সন্ধানে, তবে দেখা কি হইবে না কোন দিন? কে জানে?—" এই পথিক! ইহাই এই পথিক উপন্যাসের প্রাণবস্তু। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কথায় বলি "পথ কি নিজের শেষকে জানে? যেখানে সমস্ত লুপ্ত-ফুল আর স্তব্ধ-গান পৌঁচল, যেখানে তারার আলোর অনির্ব্বাণ-বেদনার দেওয়ালি-উৎসব হচ্চে!"

নীলিমা।—শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ প্রণীত; মূল্য এক টাকা। এখানি কবিতা-সংগ্রহ। শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন বাবু পূর্ব্বে অনেক সাময়িক পত্রে কবিতা লিখিতেন, আমরাও পরম আগ্রহভরে সেই সকল কবিতা পাঠ করিতাম। কিন্তু কিছুদিন হইতে কবি তারাপ্রসন্ন একেবারে নীরব হইয়াছিলেন; আমরা মনে করিয়াছিলাম, তিনি শৈল-শিখরে ধ্যানমগ্ন। এখন এই নীলিমা দেখিয়া বুঝিলাম, তিনি বাণী সেবা ত্যাগ করেন নাই; তাঁহার ভাবরাজ্যের নির্ম্মল কুসুম চয়ন করিয়া এই নীলিমা আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। কবিতাগুলি সমস্তই সুন্দর, সরল ও প্রাণস্পর্শী।

প্রভাতী।—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত; মূল্য বার আনা। ইহা একখানি গদ্য পদ্যের গীতিকাব্য। প্রভাতে উঠিয়া জীবন যেমন কর্ম্মসাধনে অগ্রসর হয়, তেমনি প্রভাতে উঠিয়া চিত্তক্ষেত্রেও নানাবিধ চিন্তা জাগ্রত হইয়া উঠে। শ্রীযুক্ত ঠাকুর মহাশয়ের চিত্তে প্রভাতে যে সকল ভাব জাগ্রত হয়, তাহারই কয়েকটী তিনি একত্র গ্রথিত করিয়া এই 'প্রভাতী' লিখিয়াছেন। ইহা তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মপ্রাণ মনীষী ব্যক্তির নিকটই আশা করা যাইতে পারে। তিনি এই প্রভাতের চিন্তায় অনেক বহুমূল্য কথা বলিয়াছেন। এই ছোট বইখানি সকলেরই সমাদরে পাঠযোগ্য।

সাহিত্য-সংবাদ

রায় শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর প্রণীত "আলোকে-আঁধারে" উপন্যাস শীঘ্র প্রকাশিত হইবে; মূল্য—১॥০

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত "রাজপথ" সুবৃহৎ উপন্যাস শীঘ্র প্রকাশিত হইবে; মূল্য—৩৲

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত "ভারতে হিন্দু-মুসলমান" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য—॥০

শ্রীবরদাকান্ত দাশগুপ্ত প্রণীত "ডালিম" নাটক প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য—॥০

শ্রীকানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "ভগ্নব্রত" নাটক প্রকাশিত হইল; মূল্য—১৲

শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "সংসারী" উপন্যাস প্রকাশিত হইল; মূল্য—১।০

শ্রীক্ষুদিরাম গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত "স্বরূপা" উপন্যাস প্রকাশিত হইল। মূল্য—১॥০

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "বউভাত" উপন্যাস প্রকাশিত হইল; মূল্য—১॥০

শ্রীহরনারায়ণ সেনগুপ্ত প্রণীত "প্রেমের-পরশ" উপন্যাস প্রকাশিত হইল; মূল্য—১৲

শ্রীব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "বিয়ের রাত" উপন্যাস প্রকাশিত হইল; মূল্য—১॥০

শ্রীকালিদাস রায় প্রণীত "লাজাঞ্জলি" কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইল; মূল্য—॥৵০

ডাক্তার শ্রীবিমলাচরণ লাহা প্রণীত "লিচ্ছবি জাতি" প্রকাশিত হইল; মূল্য—১০

শ্রীহরিদাস বিদ্যাবাগীশ প্রণীত "ব্রহ্মসূত্রম্" প্রকাশিত হইল; মূল্য—২॥০

শ্রীভোলানাথ সেনগুপ্ত প্রণীত "গোরুর গাড়ী" কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইল; মূল্য—।৵০

শ্রীসত্যচরণ সেন প্রণীত "হরনাথ চরিতামৃত" প্রকাশিত হইল; মূল্য—১৲

শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত প্রণীত "কার্পাস-শিল্প" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য—৸০

শ্রীঅরুণেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত "রয়েল অক্সান ব্রিজ" (বাঙ্গলায়) প্রকাশিত হইল; মূল্য—১৲

শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ সাহিত্যরত্ন প্রণীত "বঙ্গে চালতত্ত্ব" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য—৩৲

শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত "নর্ম্মদা" গীতাভিনয় প্রকাশিত হইল; মূল্য—১।০

শ্রীভবসিন্ধু দত্ত প্রণীত "ছত্রপতি শিবাজী" প্রকাশিত হইল; মূল্য—২৲

শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত "ভারতীয় স্বাস্থ্যবিদ্যা" প্রকাশিত হইল; মূল্য—২৲

বুদ্ধের-গৃহত্যাগ

অরুণ তোমার তরুণ অধর
করুণ তোমার আঁখি,
ঘুমাইছ তুমি নিখিল নয়নে
জাগিয়া উঠিবে বিরহ স্বপনে।"—রবীন্দ্রনাথ

আশ্বিন, ১৩৩২

প্রথম খণ্ড | ত্রয়োদশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

পঞ্জিকা-সংস্কার

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

(২)

গত বৎসর আশ্বিন মাসের ভারতবর্ষে পঞ্জিকা-সংস্কার সম্বন্ধে প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে অশ্বিন্যাদি নির্ণয়ে চিত্রা পক্ষের যুক্তি প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা বোম্বাইর শ্রীযুত বেঙ্কটেশ বাপুজী কেতকর মহাশয়ের মরাঠী প্রবন্ধের বাঙ্গালা অনুবাদ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ সেন এম্-এ মহাশয় যত্ন পূর্ব্বক অনুবাদ করিয়া দিয়া আমাকে ও বঙ্গীয় পাঠককে অনুগৃহীত করিয়াছেন। আমার যৎকিঞ্চিৎ মরাঠী ভাষা-জ্ঞানে নিঃসন্দিগ্ধ অনুবাদ সম্ভব হইত না, বিচারের ভাষায় দোষ থাকিলে সে দোষ পূর্বপক্ষে গিয়া পড়িত।

উক্ত প্রবন্ধে কয়েকটি মুদ্রাকর-প্রমাদ ঘটিয়াছে। পাঠক-মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক শুদ্ধ করিয়া লইবেন।

পৃঃ	স্তম্ভ	পংঃ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫২৫	২	২৯	৩৪৭	৭৪৭
৫২৬	১	২৪	মুখংত	মুখত
„	২	১৭, ১৮	বিষ্ণু সম্পাত	বিষুব সম্পাত
„	„	৩১	সাপার্ধে	সার্পার্ধে
৫২৯	১	২৬	৪৮৫৬৭	৪৮'৫৬৭
„	২	৩১	৪৩০	৪৭০
৫৩১	১	৮	শত নক্ষত্র	পুষ্য নক্ষত্র
„	„	২৭, ২৮	একতারতম্যেন	একতারম্যেন

আমি প্রথম প্রবন্ধে নিজের মত ব্যক্ত করি নাই কেতকর মহাশয় বলেন, চিত্রা তারার সম্মুখস্থ বিন্দু, অশ্বিনী নক্ষত্রের আরম্ভ। এই মত সমীচীন কি না, তাহা বিবেচনা করিতে সময় লাগিয়াছে। তাঁহার সহিত পত্র ব্যবহার করিতে হইয়াছে। এক ক্ষুদ্র বিষয়ে তাঁহার সহিত আম

অমিল হইয়াছে, সে কথা পরে বলিব। প্রথমে বিচার্য বিষয়ের গুরুত্ব দেখাইতেছি।

আমরা পাঁজি দেখি তিন প্রয়োজনে, (১) লোক-ব্যবহার (২) স্মৃতি শাস্ত্রের ব্যবস্থা, (৩) ফল্য জ্যোতিষে আস্থা। আজ ১৩৩১ সালের আশ্বিন মাসের ২১শে,—এই যে বৎসর মাস ও দিন নির্দেশ, ইহা ব্যতীত লোকব্যবহার চলে না। * বঙ্গদেশে এই রীতি। ভারতের অন্য প্রদেশে অন্য রীতি। ভারতের বাহিরে দেশে দেশে অন্যান্য রীতি আছে। কিন্তু যে দেশে যে কালমান চলিত আছে, সে দেশের সকলকেই সে মান মানিতে হইবে; যে না মানিবে, সে কষ্টে পড়িবে। লোকব্যবহারে সপ্তাহে বার-গণনাও এইরূপ আবশ্যক। প্রভেদ এই, বৎসর, মাস, দিন বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন; কিন্তু বার-গণনা সর্বত্র এক। সর্বত্র সূর্য চন্দ্র মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি,—এই বার-পরম্পরা এক, যদিও বার-প্রবৃত্তি এককালে ধরা হয় না। সূর্যোদয় হইতে আমরা বার গণনা করি। ইংরেজরা করেন, পূর্ববর্তী মধ্যরাত্রি হইতে। তেমনই দিন গণনা। সূর্যোদয় হইলে আমরা দিনের আরম্ভ ধরি। এই দিনের নাম সাবন দিন। সকল স্থানে একই কালে সূর্যোদয় হয় না, সাবন দিনের আরম্ভও একই কালে হয় না, সাবন দিনের দণ্ডপলাদি বিভাগও সমকালিক হয় না। দিবামানও সর্বত্র সমান হয় না, মুহূর্ত বিভাগও হয় না। কারণ দিবামানের পঞ্চদশাংশের নাম মুহূর্ত। যদি দিবামান ত্রিশ দণ্ড হয়, তবেই মুহূর্তের মান দুই দণ্ড, অন্যথায় নয়।

কিন্তু এই যে ১৩৩১ সাল বলিতেছি, ইহার প্রমাণ কি? প্রমাণ কিছুই নাই। লোকে বলিতেছে, তাই বলিতেছি। লোকে এক, দুই, তিন করিয়া গণিয়া আসিতেছে, টুকিয়া রাখিতেছে। আজ যদি ভুলিয়া যায়, পাঁজি হারাইয়া যায়, চন্দ্র সূর্য দেখিয়া আবিষ্কার করিতে পারা যাইবে না। বারও এইরূপ। কোনও নৈসর্গিক ব্যাপার নাই, যাহা দেখিয়া নষ্ট বার উদ্ধার করিতে পারা যাইবে। কিন্তু আজ আশ্বিন মাস কিনা, আশ্বিনের ২১শে কিনা, তাহা পাঁজিতে লেখা না থাকিলেও আকাশে সূর্য কোথায় আছে, তাহা দেখিয়া বা মাপিয়া নির্ণয় করিতে পারি। কারণ "আশ্বিন মাস," এই সংজ্ঞার অর্থ জানি। সূর্যপথ বা ক্রান্তিবৃত্ত ১২ ভাগে ভাগ করিলে এক এক ভাগের নাম রাশি; এক এক রাশিতে ত্রিশ ত্রিশ অংশ। প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি রাশির নাম যথাক্রমে মেষ, বৃষ, মিথুন ইত্যাদি। আজ সূর্য কোন রাশিতে? যদি পাঁজি লেখা ঠিক হয়, তাহা হইলে দেখিব, সূর্য পাঁচ রাশি ভোগ করিয়া এখন ষষ্ঠ রাশিতে আছে। যবে ষষ্ঠ রাশিতে (কন্যা রাশিতে) সংক্রমণ করিয়াছিল, তার পর কুড়ি দিন গত হইয়াছে।

কিন্তু আকাশের কোথায়, সূর্যপথের কোন্ বিন্দুতে মেষ রাশির আরম্ভ? যদি পথের আরম্ভ জানা না থাকে, তাহা হইলে পথ মাপা চলিবে না, আজ সূর্য কোন্ রাশির কোন্ অংশে, আজ আশ্বিন মাসের ২১শে কি না, কিছুই বলিতে পারা যাইবে না। অবশ্য একটা বিন্দুকে আরম্ভ মানা হইতেছে। কিন্তু দেশের সর্বত্র একই বিন্দুকে মানা হইতেছে না। দেশের সব পাঁজিতে আজ ২১শে আশ্বিন না হইতে পারে। লোকব্যবহারে ইহা বিষম কথা। কেহ ২০শে, কেহ ২১শে, কেহ ২২শে গণিলে বৈষয়িক কর্ম অচল। স্মার্ত পণ্ডিতের আরও চিন্তা। এক এক রাশির সংক্রান্তিতে পুণ্যকৃত্য আছে;—যেমন চৈত্র মাসের শেষে মেষ রাশিতে সূর্যের প্রবেশ সময়ে স্নান দানাদি পুণ্যকর্ম আছে, শক্তু ও জলপূর্ণ ঘট দান আছে। অদিনে কৃত্য করিলে ফল হইবে না।

দ্বাদশ রাশিতে বিভক্ত সূর্যপথের নাম রাশিচক্র, অর্থাৎ রাশিময় বৃত্ত। ইহার আরম্ভ স্থান, মেষাদি বিন্দু। সূর্যপথ বা ক্রান্তিবৃত্ত ২৭ ভাগ করিলে যে এক এক ভাগ হয়, তাহার নাম নক্ষত্র। প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি নক্ষত্র বিভাগের নাম যথাক্রমে অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা ইত্যাদি। নক্ষত্র দ্বারা বিভক্ত সূর্যপথের নাম নক্ষত্রচক্র। বলা বাহুল্য, নক্ষত্রচক্রের যেখানে আরম্ভ, রাশিচক্রের ও সেখানে আরম্ভ। অতএব মেষাদি বিন্দু ও অশ্বিন্যাদি বিন্দু একই, একেরই দুই নাম। রাশি বারটা, নক্ষত্র সাতাইশটা। সুতরাং এক রাশি = ২¼ নক্ষত্র। এক নক্ষত্র = ১৩⅓ অংশ।

অশ্বিন্যাদি নির্ণয়ের নানা উপায় আছে। এখানে একটা বলা যাইতেছে। সূর্য স্বীয় পথের যে বিন্দুতে আসিলে

* গত বৎসর আশ্বিন মাসে এই প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। কিন্তু নানা কারণে এত দিন পড়িয়া ছিল।

দিবারাত্রি সমান হয়, সে বিন্দুর নাম বিষুব। এমন দুইটি বিন্দু আছে,—একটা বাসন্ত বিষুব, অপরটা শারদ। ইংরেজী-শিক্ষিত মাত্রেই জানেন, ২১শে মার্চ ও ২২শে সেপ্টেম্বর দুই দিন বিষুব দিন। ঐ দুই দিন সূর্য বিষুব বিন্দুতে থাকে। অশ্বিন্যাদি-বিন্দু বিষুব-বিন্দু হইতে কত দূরে? কিন্তু বিষুব-বিন্দু স্থির নহে, পশ্চিম দিকে একটু একটু সরিয়া যাইতেছে, ৭২ বৎসরে প্রায় এক অংশ। তারা-সমূহ স্ব স্ব স্থানে চিরকাল আছে, বিষুবও সেইরূপ স্থির থাকিলে আমাদের এই বর্তমান চিন্তা থাকিত না। গুপ্ত-প্রেস পাঁজি বলিতেছেন, এ বৎসর (১৩৩২ সাল) বিষুব হইতে অশ্বিন্যাদি বিন্দু ২১ অংশ ২২ কলা ৩০ বিকলা পূর্ব দিকে; বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত পাঁজির মতে ২২।৪০।২৯; কেতকরের পাঁজির মতে ২২।৪৭।৮। ইহার অধিকও আছে। এই যে অন্তর, ইহার নাম অয়নাংশ। অশ্বিন্যাদি-বিন্দু অচল, বিষুব চলিষ্ণু। এককালে উভয়ে এক স্থানে ছিল, অর্থাৎ সূর্য অশ্বিন্যাদি বিন্দুতে আসিলে দিবারাত্রি সমান হইত। এখন আর হইতেছে না। ভিন্ন ভিন্ন পাঁজিতে অয়নাংশের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন। ইহাতে বুঝি, রাশি বা নক্ষত্র চক্রের আরম্ভ ঠিক জানা নাই। কিন্তু দেখা যাইতেছে, সূর্যের গতি গণিতে ভুল না হইলেও এই আরম্ভ স্থানের অনৈক্য হেতু রাশি সংক্রমণ কালে ও দিন সংখ্যায় অনৈক্য হইবে। ক্লক ঘড়ীর দ্বারা কথাটা স্পষ্ট করিতেছি। ক্লকটি দক্ষিণ মুখে আছে। উহার ১, ২, ৩ ইত্যাদি অঙ্ক ১২ ভাগ ১২ রাশি। ছোট কাঁটা সূর্য, বড় কাঁটা চন্দ্র। ক্লকের এক এক ভাগে মাত্র পাঁচটি মিনিটের দাগ আছে, পাঁচটিতে রাশির ত্রিশ অংশ হইয়াছে। সুতরাং এক এক মিনিট দাগে ছয় ছয় অংশ বুঝিতে হইবে। কেহ বলিতেছেন, ১২টার দাগে মেষাদি বিন্দু; কেহ বলিতেছেন, উহার কিছু পশ্চিমে; কেহ বলিতেছেন, কিছু পূর্বে। ফলে রাশি ভাগ গুলিও তত পশ্চিমে পশ্চিমে কিংবা পূর্বে পূর্বে পড়িবে, ১টার দাগে বৃষ আরম্ভ না হইয়া আরও পশ্চিমে কিংবা পূর্বে হইবে। এইরূপ অপর রাশি। ফলে এক পক্ষের মতে যখন বৈশাখ মাস শেষ হইবে, তখন দ্বিতীয় পক্ষের মতে দুই একদিন বাকি থাকিবে। ইহাতে সংক্রান্তি ও তারিখ গণনায় অনৈক্য ঘটিবে।

তিথি গণনায় মেষাদি বিন্দুর বালাই নাই। কারণ সূর্য হইতে চন্দ্রের প্রতি ১২ অংশ অন্তরে তিথি। ছোট কাঁটা ও বড় কাঁটা ঘুরিতে ঘুরিতে একত্র হইলেই অমাবস্যা। তারপর বড় কাঁটা চন্দ্রের বেগাধিক্য হেতু ছোট কাঁটা সূর্য হইতে বাহির হইয়া পড়ে এবং অন্তর যেমনই ১২ অংশ (২ মিনিট দাগে) হয়, শুক্ল প্রতিপদ তেমনই সমাপ্ত হয়। ২৪ অংশ হইলে দ্বিতীয়া শেষ। ১৮০ অংশ (৩০ মিনিট দাগে) হইলে চন্দ্র সূর্য আকাশের বিপরীত দিকে সমসূত্রে থাকে, পূর্ণিমা হয়। এইরূপে তিথি বাড়িতে বাড়িতে আবার অমাবস্যা আসে। অবশ্য তিথি গণিতে গেলে সূর্য কত অংশে চন্দ্র কত অংশে জানিতে হয়। এত অংশে বলিতে গেলেই কোন এক বিন্দুকে আরম্ভ ধরিতে হয়। কিন্তু সে আরম্ভ সেখানেই ধরি, সূর্য হইতে চন্দ্রের অন্তর একই থাকে। অতএব সকল পাঁজিতে তিথির ঐক্য না থাকিলে বুঝি, গণনায় ভুল হইয়াছে। যিনি চন্দ্র সূর্যের অন্তর মাপিতে জানেন, তিনি সেই ভুল প্রত্যক্ষ করাইতে পারেন। চন্দ্র সূর্য গ্রহণের সময় অক্লেশে সকলেরই প্রত্যক্ষ হয়।

আজ উদয়কালে সূর্য এত অংশে, চন্দ্র এত অংশে ছিল। কেবল অংশে না বলিয়া অমুক রাশির এত অংশে কিংবা অমুক নক্ষত্রের এত অংশে ছিল বলিতে পারি। এ সব যেন আধুলি, সিকি দুয়ানি দিয়া টাকা গণা। এক পাঁজিতে আছে, আজ উদয়কালে সূর্য ১৭০·২৭ অংশে, চন্দ্র ২৭৭·৩৯ অংশে ছিল। অতএব তখন তিথি ছিল,—(২৭৭·৩৯—১৭০·২৭)÷১২=৮·৯ অর্থাৎ অষ্টমী গতে নবমীরও $\frac{9}{10}$ ভাগ গত, $\frac{1}{10}$ ভাগ অবশিষ্ট। সূর্য-নক্ষত্র =১৭০·২৭ ÷ ১৩$\frac{1}{3}$=১২·৮; অর্থাৎ তের নক্ষত্রে হস্তার $\frac{2}{10}$ অংশ বাকি। চন্দ্র নক্ষত্র=২৭৭·৩৯÷১৩$\frac{1}{3}$=২০·৮; অর্থাৎ ২১ নক্ষত্র উত্তরাষাঢ়ার $\frac{2}{10}$ অংশ বাকি। । সূর্য-নক্ষত্র ও চন্দ্র-নক্ষত্রের যোগফল=১২·৮+২০·৮=৩৩·৬। যোগ ২৭টা; সুতরাং তখনকার যোগ ৩৩·৮—২৭=৬·৬; অর্থাৎ ৭ যোগ সুকর্ম যোগের $\frac{4}{10}$ অংশ বাকি। এই সকল উদাহরণ হইতে দেখা যাইতেছে, নক্ষত্র-গণনাতে নক্ষত্র-চক্রের আদিবিন্দু নির্ণয় আবশ্যক। নইলে নক্ষত্র-গণনায় ভুল হইবে, এবং তাহাতে ভুল থাকিলে যোগে ভুল বাড়িবে। আজ কি নক্ষত্র বলিলে বুঝি, চন্দ্র-নক্ষত্র। চন্দ্র-নক্ষত্র দ্বারা চন্দ্রের স্থান পাই। তিথি দ্বারা চন্দ্র

সূর্যের অন্তর পাই। সুতরাং তিথি ও নক্ষত্র পাইলে চন্দ্র ও সূর্যের স্থান জানা পড়ে। যোগ একটা অঙ্ক মাত্র। গণিত-জ্যোতিষ অনাবশ্যক। তিথির অর্ধাংশ করণ। সুতরাং মাসের ত্রিশ তিথিতে ৬০টা করণ। তিথি গণনায় মেষাদি বা অশ্বিন্যাদির ভুলে যেমন ভুল হয় না, করণ-গণনাতেও তেমন হয় না।

কিন্তু তিথি বলি নক্ষত্র বলি, কোন্ মাসে সে তিথি বা নক্ষত্র তাহা না বলিলে চন্দ্র সূর্যের স্থান জানা যাইবে না। অমাবস্যা হইতে অমাবস্যা এক চান্দ্র মাস; ইহার পরিমাণ প্রায় ২৯½ দিন। বৎসরে ১২ চান্দ্রমাসে প্রায় ৩৫৪ দিন, ১২ সৌর মাসে প্রায় ৩৬৫ দিন। সুতরাং প্রতি বৎসর ১১টা তিথি অধিক হয়। ফলে ঘটে এই, প্রায় ৩২½ সৌর মাসে ১টা, এবং প্রায় ১৯ বৎসরে ৭টা চান্দ্র মাস অধিক হয়। যে বৎসর ১৩টা চান্দ্রমাস হয়, সে বৎসর একটা চান্দ্রমাস গণ্য হয় না। কারণ ১২টা বই মাস নাই। যে চান্দ্রমাসে সূর্য মেষ রাশিতে সংক্রমণ করে, তাহার নাম চৈত্র; যে চান্দ্রমাসে বৃষ রাশিতে করে, তাহার নাম বৈশাখ ইত্যাদি। * যে চান্দ্রমাসে সংক্রমণ হয় না, সেটা অধিক। সেটার নাম, ও পরবর্তী মাসের নাম একই। কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রে প্রথমটা ধর্ম কর্মে অশুদ্ধ। এই হেতু এই বর্জ্য মাসের নাম মলমাস। তেমনই যদি কোন চান্দ্রমাসে দুইবার সংক্রমণ হয়, তাহা হইলে সে মাসের দুইটা নামের মধ্যে প্রথমটা রাখিয়া দ্বিতীয়টা ত্যাগ করা হয়। এই বর্জ্য মাস ক্ষয়মাস। ক্ষয়মাস কালে ভদ্রে ঘটে।

এখানে স্মৃতির ব্যবস্থা বিবেচ্য নহে। বিবেচ্য এই যে, রাশিভাগ ও চান্দ্রমাসের এই সম্বন্ধ হেতু রাশিভাগে ভুল হইলে অর্থাৎ রাশির আরম্ভ স্থান ঠিক ধরিতে না পারিলে মলমাসে ভুল হইবে। চান্দ্রমাস নৈসর্গিক; সৌরমাস কৃত্রিম। সৌরমাসের আরম্ভ ধরিতে একটু এদিক ওদিক হইলে চান্দ্রমাস নামে এদিক ওদিক হইতে পারে। গত বৎসর (১৩৩০ সাল) কোন মতে শ্রাবণ, কোন মতে জ্যৈষ্ঠ মলমাস হইয়াছিল। গণনায় ভুল না থাকিলেও অয়নাংশের অনৈক্যহেতু এইরূপ বিসম্বাদ ঘটিতে পারে। স্মার্ত ব্যবস্থায় ইহা এক বিষম কথা। মলমাস গণনায় অনৈক্যহেতু সময় সময় তীর্থযাত্রীর ক্লেশ হইয়া থাকে। আষাঢ় মাসে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা হয়। কিন্তু মলমাসে হইতে পারে না। মনে করুন, কোন বৎসর বঙ্গের পাঁজিতে আষাঢ় মলমাস হইল না; ওড়িষ্যার পাঁজিতে হইল। বাঙ্গালী যাত্রী এই ভেদ না জানিয়া পুরীধামে বৃথা কষ্টভোগ করিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিল। ধর্ম কর্মের কালে অনৈক্য থাকা ভয়ানক কথা। তার উপর একই হিন্দুর দেশভেদে কালের ভেদ ঘটিলে ধর্মনিষ্ঠ লোকের কি মনঃকষ্ট হয়, তাহা হৃদয়বান পাঠক অনুমান করিতে পারেন।

কেবল অয়নাংশের অনৈক্যহেতু পঞ্জিকা-গণনায় অনৈক্য নহে। চন্দ্র সূর্য সর্বদা ঘড়ীর কাঁটার মতন সমবেগে ঘুরিতে থাকিলে পঞ্জিকা-গণকের কষ্ট হইত না। উহারা স্ব স্ব পথের কোন স্থানে মন্দ মন্দ কোন স্থানে শীঘ্র শীঘ্র চলিতে থাকে। সূর্যপথের যেখানটা মিথুন রাশি সেখানে ৩০ অংশ যেন ৩০ মাইল পথ যাইতে সূর্যের ৩১.৬৪ দিন লাগে। আর ধনুরাশির ৩০ মাইল ২৯.২[illegible] দিনে সমাপ্ত হয়। যদি মিথুনরাশি ও ধনুরাশির আরম্ভ একটু পূর্বে কিংবা একটু পশ্চিমে ধরি, তাহা হইলে রাশি ভোগের কাল পরিমাণে অর্থাৎ সৌর-মাস গণনায় প্রভেদ ঘটিবে। চন্দ্রের নক্ষত্রভোগ সম্বন্ধেও এইরূপ। দ্বিতীয়তঃ গতিবেগ ধরিতেও ভুল থাকিতে পারে। পূর্বকালে যে বেগ নির্ণীত হইয়াছিল, সে বেগ যে এখনও আছে, কিংবা সূক্ষ্মরূপে নির্ণীত হইতে পারিয়াছিল, তাহাও নহে। ফলে মাস তিথি নক্ষত্র যোগ করণ, পঞ্জিকার পঞ্চাঙ্গ অশুদ্ধ হইতে পারে। তৃতীয়তঃ, গণিত জ্ঞানের অভাবে ভুল হইতে পারে। তিথি গণনায় অয়নাংশের গোল নাই; অথচ দেখি, ইংরেজা নাবিক পঞ্জিকা ধরিয়া যে তিথিকাল পাই, আমাদের পাঁজির সহিত তাহার ঐক্য হয় না। আমাদের পাঁজির চন্দ্র-সূর্য-গ্রহণ কাল প্রত্যক্ষের সহিত মেলে না। অতএব কেবল অয়নাংশের স্কন্ধে সব দোষ চাপাইলে চলিবে না।

আর একটা উদাহরণ দিই। চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা-স

* আমরা বলি চৈত্র সংক্রান্তি। ইহার অর্থ, চৈত্র চান্দ্রমাসে সূর্যের যে রাশি সংক্রমণ হয় অর্থাৎ মেষ মাস। বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসের নাম বস্তুতঃ চান্দ্র। পূর্ব্বকালে সৌর মাসের অন্ত নাম ছিল।

লিত আকাশ প্রত্যহ একবার ঘুরিতেছে। ইহা স্থূল কথা। কারণ চন্দ্র সূর্য গ্রহদিগের স্ব স্ব গতিও আছে; নাই তারার। কোন তারার এক উদয় হইতে পর উদয় কাল পর্য্যন্ত যে সময় লাগে, তাহার নাম নাক্ষত্র দিবস। রাশি- বা নক্ষত্র-চক্র দৃশ্য হইলে আমরা দেখিতাম ইহার প্রত্যেক অংশ তারার ন্যায় পূর্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিমে অস্ত হইতেছে। উদয় হইতে উদয় এক নাক্ষত্র দিবসে (প্রায় ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিটে) হইতেছে। যে সময়ে যে অংশ উদিত হইতেছে, সে সময়ে সে অংশ ক্ষিতিজে লগ্ন দেখায়। এই হেতু সেই অংশকে লগ্ন বলে। বিবাহাদি শুভকর্মে ও জ্যোতিষিক ফল গণনায় লগ্ন নির্ণয় একটা প্রধান কর্তব্য। লগ্ন সম্বন্ধে দুই প্রকার প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। যথা,—(১) কলিকাতায় আজ এখন বেলা ৫টা, লগ্ন কি? (২) কলিকাতায় আজ কয়টার সময় অমুক অংশ লগ্ন হইবে? দেখা যাইতেছে, যখনই রাশিচক্রের অংশবিশেষ খুজি, তখনই আদিও খুজিতে হয়। অয়নাংশে দুই এক অংশ ভুল থাকিলে লগ্নেও ভুল হইবে। দ্বিতীয়তঃ, পূর্বকালে আমাদের সিদ্ধান্ত-গণিতে লিখিত হইয়াছিল, সূর্য পূর্বদিক হইতে ২৪ অংশ উত্তরে ও ২৪ অংশ দক্ষিণে গেলে অয়ন নিবৃত্তি হয়। এখন দেখিতেছি ২৩৷৷০ অংশে হইতেছে। অতএব এখন ২৪ অংশ ধরিলে লগ্ন গণনায় ভুল হইবে। তৃতীয়তঃ, গণিতকর্ম লঘু করিতে গিয়া প্রথমে এক এক রাশির লগ্নমান গণনা করা হইতেছে। তাহার পর অনুপাত দ্বারা লগ্ন অংশ বাহির করা হইতেছে। এইরূপে প্রাপ্ত লগ্ন কদাচিৎ ঠিক হইতে পারে। ফল-গণকেরা লগ্নরাশি জানিয়া তুষ্ট হন না। তাঁহারা রাশির অর্ধাংশ, চতুর্থাংশ, নবমাংশ, দ্বাদশাংশ, এমন কি ত্রিংশাংশ পর্যন্ত জানিতে চান। কোন্ রাশি লগ্ন, আর কোন্ রাশির কোন্ অংশ লগ্ন, এই দুয়ে অনেক প্রভেদ। ইহার সহিত যদি সাবনকাল ও নাক্ষত্রকাল, সূর্যোদয়কাল ও সূর্যের উদয় কালের লগ্ন ধরিতে ভুল হয়, তাহা হইলে সকল পরিশ্রমই পণ্ড।

দেখা গেল, কি লোক-ব্যবহারে, কি ধর্মকার্য্যে, কি ফল-গণনায় তিনেই সংশয়ের হেতু ঘটিয়াছে। যিনি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের পাঁজির তুলনা করিবেন, তিনি সংশয়ে পড়িবেন। যিনি ইংরেজী নাবিক-পঞ্জিকার সহিত করিবেন তিনিও পড়িবেন।

'তবে পঞ্জিকা-সংস্কার হইতেছে না কেন? পূর্বে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি নাই। বোধ হয়, এখন পারি। সংশয়ে পড়িয়াছেন জনকয়েক। কোটি কোটি লোকের সংশয় নাই। ইহাদের সবাই মূর্খ কিংবা অহিন্দুও নহে। সংশয়ীদিগের মধ্যেও সকলের সংশয় সমান নয়। যথাকালে এই কৃত্য, এই ধর্মানুষ্ঠান না করিলে যে ফল হয় না, কিংবা অমুক লগ্নে অমুক তিথি নক্ষত্রে বিবাহ বা যাত্রা না করিলে যে অনিষ্ট হয়, কিংবা জাতকের কোষ্ঠীর ফল যে সত্য সত্য মিলিবে, এ বিশ্বাস নাই। অবিশ্বাসী বলিবেন, বাঁচা গিয়াছে; হাঁচি ও টিকটিকি, কালবেলা ও বারবেলা, যোগিনী ও দিক্‌শূল, ত্র্যহস্পর্শ ও মঘা যে দেশছাড়া হইতেছে, দেশের পরম মঙ্গল। কথাটা সত্য হইলে বোধ হয় বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী সকলেই হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিতেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাসটা আছে মনের ভিতরে, অবিশ্বাসটা মনের বাহিরে। দেখিতেছি, রেল ও ষ্টীমার কিছুই মানিতেছে না, অথচ অগস্ত্য যাত্রাও হইতেছে না, যাত্রীরা সুস্থদেহে সুস্থমনে বাড়ী ফিরিতেছে, শুভকর্ম নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতেছে। তথাপি কি জানি! যাঁহারা ফলাফল বিচার করিতেছেন, তাঁহাদেরও বিশ্বাস যদি থাকিত, তাহা হইলে একই পাঁজিতে মঙ্গলের উষা বুধে পা, ও শিবজ্ঞানমতে মাহেন্দ্র ও অমৃত যোগ, এবং যাত্রা-ব্যবস্থায় তিথি নক্ষত্র বিচার, যোগ ও যোগিনী, বারবেলা কালবেলা দিক্‌শূল বিচার কদাপি লেখা হইতে পারিত না। কারণ তখন চিন্তা হইত, কোন্‌টা সত্য?

দ্বিতীয় কারণ, ব্রাহ্মণ উদাসীন। হিন্দুর ধর্ম ও কৃত্য, শুভ ও ইষ্ট তাঁহাদের হাতে। তাঁহারা স্মৃতির ব্যাখ্যা করিতেছেন, শাস্ত্র দেখিয়া ব্যবস্থা লিখিতেছেন, বিচার করিতেছেন। কিন্তু শাস্ত্রের চক্ষুঃস্বরূপ যে গ্রহগতি, তৎপ্রতি দৃষ্টি করিতেছেন না। পঞ্জিকাগণক যথামতি যথাসাধ্য পঞ্জিকা গণনা করিতেছেন। পরে স্মার্ত ভট্টাচার্য ব্যবস্থা লিখিতেছেন। এখানে কর্মবিভাগ আবশ্যক বটে, কিন্তু যখন দুইজনই দায়ী, তখন একের কর্ম অন্যেরও দেখা কর্তব্য। লক্ষ লক্ষ হিন্দু একাদশী তিথিতে উপবাস করিতেছে, পাঁজিতে একাদশী দেখিতেছে, মানিয়া লইতেছে। যখন এই কথা মনে হয়, তখন ভাবি, কি গুরুভার স্মৃতির ব্যবস্থাপক গ্রহণ করিয়াছেন! তিনি জানেন না, তিনি

হিন্দুর অন্তর নিজের মুঠায় ধরিয়া রাখিয়াছেন। কাহারও সাধ্য নাই, মুঠা খুলিয়া পলায়ন করে।

তৃতীয় কারণ, আমাদের হিন্দুরাজা নাই। আমাদের নীতিশাস্ত্রমতে প্রজাপুঞ্জের শক্তির নাম রাজা। স্বাধীন দেশমাত্রেই তাই। কিন্তু পরাধীন দেশের প্রজা, রাজাকে নিজের শক্তি দিতে চায় না, মাত্র করগ্রাহক করিয়া রাখে। আমাদের রাজা এ দেশীয় ও হিন্দু হইলে পঞ্জিকার সংস্কার একদিনে হইতে পারিত, আকুমারিকা-হিমাচল এক পাঁজি মানিয়া চলিত। অন্ততঃ লোকব্যবহারে পাঁজির যে প্রয়োজন, তাহা নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইত। ইংরেজ রাজা বলেন নাই, ইংরেজী সন ও তারিখ দিয়া পত্র ব্যবহার করিবে। কিন্তু এমনই রাজ-মাহাত্ম্য, হাতে পাঁজি থাকিতেও আমরা ইংরেজী সন তারিখ দিয়া তুষ্ট হইতেছি। এককালে মনে করিতাম, লোকমত সংগ্রহ করিয়া সকলকে মানাইয়া পঞ্জিকা-সংস্কার কর্তব্য। এখন বুঝিতেছি, সে আশা নিস্ফল, এবং সে উপায়ে কখনও কোনও সংস্কার হয় না। জীবরাজ্যে কোনও জীব দলকে দল বাঁধিয়া উন্নত বা অবনত হয় না। সেখানে যেমন যোগ্যের জয়, যতোধর্ম স্ততোজয়ঃ, যার গুণ আছে তাহারই জয় হয়, সামাজিক ব্যাপারে তাই, পঞ্জিকা-সংস্কারেও তাই।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, বঙ্গদেশে "বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা" ৩৫ বৎসর প্রকাশিত হইতেছে। তেমন চলে নাই কেন? ইহার উত্তর উক্ত পঞ্জিকার কর্তারা দিতে পারেন। কিন্তু এটুকু জানি, উহার প্রবর্তক ৺মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার গণিত নির্ভয়ে প্রকাশ করিতে পারিতেন না। ইহাতে আশ্চর্যের কথা ছিল না। ভাবুন, কাশীর ৺সুধাকর দ্বিবেদীর তুল্য জ্যোতিষ-পারঙ্গত মহামহোপাধ্যায় সেখানকার এক পণ্ডিত সভায় বলিয়াছিলেন, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহণ ও সূর্যোদয়াদির কাল প্রত্যক্ষের সহিত মিলিলেই হইল; তিথি নক্ষত্রাদি না মিলিলে কোন ক্ষতি নাই। গতানুগতিকতা ত্যাগ করিয়া নূতন মার্গ ধরিতে গেলেই নানা দুশ্চিন্তা আসে। দ্বিবেদী মহাশয়ের গুরু কাশীর বিখ্যাত বাপুদেব শাস্ত্রী, ইংরেজী নাবিক পঞ্জিকা ধরিয়া পাঁজি প্রকাশ করিতেছিলেন। ইহাঁর পাঁজি ছিল, পুরাতন পাঁজিও ছিল। এইরূপ মান্দ্রাজে বোম্বাইতে নূতন ও পুরাতনে সংগ্রাম চলিতেছে। বঙ্গদেশেও মাধববাবুর পাঁজি ও গুপ্তপ্রেসের পাঁজির সংগ্রাম চলিতেছে। কারণ যেটা চলিতেছিল, সেটা চলিতে থাকে। ইহা জড়বস্তুর পক্ষে সত্য, মানবমনের পক্ষেও সত্য। অধিকাংশ দেশাচারের স্থায়িত্বের কারণই এই। কেবল ওড়িয়ায় চন্দ্রশেখরের পাঁজির প্রচলনে কষ্ট হয় নাই। সেখানে তাঁহার অসামান্য প্রতিভার নিকট সামান্য গণকের দাঁড়াইবার যোগ্যতা ছিল না। পঞ্জিকা গণনা যেমন তেমন কর্ম নয়। সম্যক্ জ্ঞান ব্যতীত অসাধারণ পরিশ্রম ও অবধান প্রত্যেক উক্তিতে আবশ্যক হয়। কিন্তু কে পঞ্জিকা গণনার ও মুদ্রণের ব্যয় যোগাইতেছে? দেশীয় রাজা থাকিলে সমস্ত ব্যয় রাজকোষ হইতে দেওয়া হইত। কারণ পঞ্জিকা নইলে দেশ আদৌ চলিতে পারে না। পঞ্জিকার শুদ্ধতা রক্ষা রাজার কর্তব্য। কিন্তু দেশের ভাগ্যদোষে পঞ্জিকা হইয়াছে, কাপড়-চোপড়ের ন্যায় পণ্যদ্রব্য। হাঁকডাক করিয়া ক্রেতা ভুলাইয়া ব্যয় তুলিতে হইতেছে। এইরূপ স্থলে পঞ্জিকা সংস্কার শীঘ্র ঘটিবার আশা নাই। যদি বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সংস্কার বিষয়ে একমত হইতে পারেন, তাহা হইলে কালই সংস্কার সম্পাদিত হইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা একমত হইতে পারিবেন কি?

দ্বন্দ্ব

শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

১৫

কিরণ নিকটে আসিলে বীণা হাসিয়া তাহার অভ্যর্থনা করিল, "আপনাকে ত আর দেখাই যায় না, কোথায় ছিলেন এত দিন ?"

কিরণ তাহার পাশের চৌকিতে বসিয়া পড়িল ; বলিল, আমার বাড়ীতে একজন অতিথি এসেছে—শুনেছেন বোধ হয় ? সে ত বাইরে বেরোতে পারে না, তাই আমি আজকাল বাড়ীতেই থাকি।

বীণা চাহিয়া দেখিল, এই কয় দিনে কিরণ যেন একটু ম্লান ও শীর্ণ হইয়া গিয়াছে ; তাহার চোখে-মুখে কেমন একটা ক্লান্তি ও বিষণ্ণতার ছায়া।

কিরণ নিশ্চয় অরুণের সঙ্গে দিন রাত বদ্ধ ঘরের মধ্যে থাকিয়া তাহার সেবায় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। সে একটু ব্যথা বোধ করিল, কিন্তু এখন তাহার এ সব কথা ভাবিবার সময় নাই। আজ তাহার অনেক কাজ !

সে বলিল, আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে ! কিন্তু তার আগে আমি একটা বিষয় বলতে চাই। আপনি ত আমাদের পরিবারের এত ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ বন্ধু, তবু আমার সঙ্গে এত লৌকিকতা বজায় রেখে চলেন কেন ? আপনার সঙ্গে ত আমাদের দুদিনের পরিচয় নয় ?

কিরণ একটু বিস্মিত ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, পরে হাসিয়া বলিল, এত দিন পরে আজ এ কথা কেন মিস রায় ? দোষটা কি শুধু আমারই ? আপনিও ত আমায় সম্মান দেখিয়ে দূরেই রেখে দিয়েছেন ?

বীণার মুখ লাল হইয়া উঠিল, না ! না ! আপনি যে—না—সে হয় না ! আপনি অনেক বড় ! আপনাকে ও রকম ভাবে কথা বলতে আমার বড় লজ্জা করে ! কিন্তু আপনার এবার থেকে আমাকে নাম ধরে ও তুমি বলে কথা বলতে হবে ! অনেক দিন থেকেই এ কথা বলবো ভেবেছি—তা—সে আর সময় হয় না !

কিরণ তাহার মুখের উপর দৃষ্টি স্থির রাখিয়া বলিল, আমি বলতে এখুনি রাজি আছি, কিন্তু একটি সর্ত্তে !

বীণা মুখ তুলিল। কিরণের সঙ্গে দৃষ্টি মিলিতেই সে তখনি চোখ নামাইয়া লইল। বলিল, কি সর্ত্তে ?

—তুমিও আমায় কিরণ বলে ডাকবে, আর তুমি বলে কথা বলবে—শুধু এই সর্ত্ত ! জানো ত ? আমি বড় একরোখা লোক,—যা একবার বলি, তাই করি !

গম্ভীরপ্রকৃতি কিরণকে আজ এত লঘু ভাবে কথা বলিতে ও হাসিতে দেখিয়া বীণা মনে মনে আশ্বস্ত হইল। এবার তবে হয় ত তাহার চেষ্টা সফল হইতেও পারে ! সে বলিল, যাই হোক—আজকে আপনার—না—তোমার,

এমন ভাবে লুকিয়ে থাকা বড় অন্যায়! তুমি না থাকলে সব আমোদই মাটি হয়ে যায়!

—আমার জন্যে? শুনেও সুখ আছে? কিন্তু যদি আমার জন্যে তোমার আমোদ নষ্ট হয়ে যায়, তা হলে ওদের দশাটা কি হবে? কিরণ বীণার মুগ্ধ উপাসকদের দিকে আঙুল দেখাইয়া হাসিতে লাগিল।

যাও তুমি! বীণা তর্জ্জন করিয়া বলিল, ওদের কি হবে—না হবে—তা আমি কি জানি?

—আহা! বেচারারা! তুমি নিশ্চয়ই তাদের ভুলে যাওনি! ওই যে নতুন সিভিলিয়ানটি—কি নাম—ভাল—দত্ত বুঝি? হাঁ! মিঃ দত্ত ত তুমি ব্রীজ্ খেলা ভালবাস না বলে সে খেলাই ছেড়ে দিলে!

—মিথ্যে কথা! সে রোজই লীলার সঙ্গে খেলে! কিরণ হাসিয়া বলিল, তার পর—ঐ চৌধুরী—বেচারার শরীর কত খারাপ—তবু ছুটি নিয়ে দেশে যেতে পারে না—সে কার জন্যে? আর ঐ ব্যারিষ্টারটি? তুমি সেদিন চৌধুরীর সঙ্গে হেসে কথা বলছিলে বলে' বেচারা পোলো খেলতে খেলতে আর একটু হ'লে খুন হয়েছিল আর কি!

বীণা লজ্জা ও বিরক্তিতে লাল হইয়া উঠিয়া বলিল, আঃ! থামো না তুমি! কি যে সব বল! ওরা যদি ছেলেমানুষী বা পাগলামি করে, সে কি আমার দোষ? আমি ওদের ঘৃণা করি!

—তাই না কি? আমি ত জানতুম, কিছু দিন আগে তুমি অন্ততঃ একজনকে ঘৃণা করতে না!

বীণা মুখ নত করিল। সে জানিত, তাহার বিবাহ-ভঙ্গের কথা লইয়া সকলেই আলোচনা করিতেছে। কিরণের এ বিষয়ে কি মত জানিতে তাহার আগ্রহ জন্মিল।

—তুমি যার কথা বোলছো, সে আমি বুঝেছি! আমারো বলবার অনেক কথা আছে। এসো! উঠে একটু বেড়ান যাক্!

তাহারা দুইজনে উঠিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে টেনিস কোর্টের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দূরে ব্যাণ্ড বাজিতেছিল।

বীণা গম্ভীর হইয়া বলিল, তুমি শুনেছ বোধ হয়, অরুণের কাছ থেকে আমি একখানা চিঠি পেয়েছি। সে তার অবস্থার কথা সব আমায় লিখেছিল, আর আমাদের বিবাহের সম্বন্ধ ভেঙে দেবার জন্য অনুরোধ করেছিল। তুমি ত জান, আমাদের মধ্যে এ সম্বন্ধ মোটে তিন মাস আগে হয়েছিল—তবু সে যদি নিজে এ প্রস্তাব না করতো, তা হলে আমি নিজে থেকে কখনো তাকে ছাড়তে পারতুম না। কিন্তু তরি মন বড় উঁচু, সে নিজেই এ প্রস্তাব করে পাঠালে,—আমার ওপর এত বড় অবিচার করতে পারলে না সে। মা'ও এটা শ্রেয়ঃ মনে করলেন, কারণ আমি এ সব বিষয়ে বড় দুর্ব্বল! তার চোখ দৃষ্টিহীন হয়ে গেছে—এ চিন্তা আমায় যেন পাগল করে তুলেছিল! আমি একেবারে বিপর্য্যস্ত হয়ে গিয়েছিলুম!

কোর্ট হইতে লীলার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তাহার সঙ্গীদের উচ্চ চীৎকার ও পরিহাস ও লীলার মধুর হাসির শব্দ কাণে আসিতেই কিরণ আত্মবিস্মৃতের মত উৎকর্ণ হইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল। বীণা কি বলিতেছে, সে কথা আর তাহার কাণে গেল না।

লীলা ব্যাট হাতে তখন ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছিল। খেলা শেষ হইয়া গিয়াছে। কিরণ মুগ্ধ অতৃপ্ত নেত্রে তাহার ঘর্ম্মাক্ত রাগ-রক্তিম মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কত দিন সে যেন লীলাকে দেখে নাই, কত দিন যেন সে তাহার স্বর শোনে নাই, এমনি পিপাসিত বুভুক্ষিত দৃষ্টি!

ফিরিবার মুখে লীলার দৃষ্টি কিরণের উপর পড়িল। তাহার মুখ সেই মুহূর্ত্তে আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহাদের মধ্যের মনান্তর ও বিচ্ছেদের কথা ভুলিয়া সে আগের মতই ঘনিষ্ঠ ভাবে চীৎকার করিয়া বলিল, এই যে কিরণ! কখন এলে? সে কথা শেষ করিয়াই ছুটিয়া আসিতেছিল, কিন্তু কিরণ তখনি গম্ভীর হইয়া গেল।

সে কোন কথা না বলিয়া টুপি তুলিয়া কেবল একটু হাসিল, ও তখনি বীণার সঙ্গে বাগানের অন্য দিকে ফিরিয়া গেল।

তাহাদের এ ভাব বীণার চক্ষু এড়ায় নাই। সে আজ কিরণকে সম্পূর্ণরূপে নিজের আয়ত্তে পাইয়াছে জানিয়া অত্যন্ত প্রীত হইল।

পূর্ব্বকথার সূত্র ধরিয়া কিরণ বলিল, তা হলে অরুণকে তুমি সত্য সত্যই একেবারে ত্যাগ করলে? অবশ্য আমার এ বিষয়ে বলবার কিছু নেই! আমি শুধু জিজ্ঞেস করছি!

বীণা চলিতে চলিতে দাঁড়াইয়া তাহার মুখে নিজের

গাঢ়-কৃষ্ণ চোখের স্থির দৃষ্টি তুলিয়া ধরিল। বলিল, তোমার বলবার অধিকার নিশ্চয়ই আছে। তুমি কি তার বিশ্বাসী বন্ধু নও? আমি এ সম্বন্ধ ভঙ্গ করে তাকে চিঠি দিয়েছি। সুতরাং আমাদের মধ্যে সব সম্বন্ধ শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু কিরণ! তুমি শুধু তার বন্ধু নও, আমাদের পরিবারেরও তুমি বিশেষ বন্ধু! তুমি সত্য করে বল, এতে আমার অন্যায় কিছু হয়েছে?

কিরণ তখনি কোন উত্তর দিতে পারিল না, সে নীরবে ভাবিতে লাগিল। লীলা অরুণের সঙ্গে যে ব্যবহার করিয়া চলিয়াছে, তাহাতে তাহার মন ঘৃণা ও রাগে দগ্ধ হইতেছিল। এখন বীণা যদি মত বদলায়, তবেই সব দিক রক্ষা হয়। নয় ত সে ব্যাপারের শেষ যাহা দাঁড়াইবে, তাহা মনে ভাবিবারও তাহার শক্তি ও সাহস ছিল না। আজ সে বীণার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলিয়া তাহার মন ফিরাইবার চেষ্টা করিয়া দেখিবে বলিয়াই প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু বীণা যখন তাহাকেই এ বিষয়ে প্রশ্ন করিল, তখন সহসা সে কোন উত্তর দিতে পারিল না।

তাহাকে নীরব দেখিয়া বীণা আবার বলিল, "আমি জানি, লোকে এ জন্যে আমায় যথেষ্ট নিন্দা করছে, কিন্তু আমার দোষটা কি? আমি সরল ভাবে নিজের অক্ষমতা স্বীকার করে নিয়ে তাকে সত্য কথা জানিয়েছি, এই ত? মানুষের মনের ওপর ত কারো জোর চলে না। আমার মন যখন তাকে এ অবস্থায় স্বামী বলে স্বীকার করে নিতে পারলে না, তখন লোকলজ্জার খাতিরে সে অস্বীকারকে চেপে রেখে আমি যদি তাকে বিয়ে করতুম, ও তার ফলে আমাদের দুজনেরই জীবন নষ্ট হয়ে যেতো, সেইটাই কি ভাল হত?

কিরণ এবার কথা বলিল। তাহার ন্যায়নিষ্ঠ ও কর্তব্য-পরায়ণ চিত্ত স্বার্থের জন্য অন্যায় কথা বলিতে পারিল না। সে বলিল, যদি কেউ এ জন্যে তোমায় দোষ দেয়, সে তার ভুল। আমি কখনো তোমার এ কাজ অন্যায় হয়েছে বলতে পারি না। এটা মানুষের সম্পূর্ণ নিজস্ব বিষয়, এখানে কোন বাইরের জোর চলতে পারে না।

বীণার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল, 'জানি আমি! তুমি কখনো আমায় সারা জীবনের মত একটা ভুল করতে বলতে পারো না! এর মধ্যে আরো একটা কথা আছে। কিছু দিন থেকে আমি বুঝেছি, আমাদের এ সম্বন্ধটা ভুল হয়েছিল।

"তাই না কি?" কিরণ একটু আশ্চর্য্য ভাবে বীণার মুখের দিকে চাহিল।

বীণা মাথা হেঁট করিল। বলিল, সত্যই তাই। আমাদের সম্বন্ধ বড় তাড়াতাড়ি হয়ে গিয়েছিল। তখন আমি নিজের মন বুঝতে পারি নি, এখন বুঝেছি—অরুণকে আমি কখনো এ ভাবে ভালবাসতে পারি না।

কিরণ বলিল, তা হলে এটা ভেঙে গিয়ে সব দিক থেকেই ভাল হয়েছে বলতে হবে! তুমি যে এত ব্যাপার চেপে না রেখে একটা নিষ্পত্তি করে ফেলেছ, তাতে আমি খুব খুসি হলুম।

কিরণ মুখে এ কথা বলিলেও তাহার অন্তর নিরাশ হইয়া গেল। সে জানিল—তাহার আর কোন আশা নাই। অরুণের নিকট হইতে লীলাকে ফিরাইয়া লইবার আর কোন উপায় রহিল না।

তাহারা তাঁবুর কাছাকাছি আসিয়া পড়িল। বিদ্যুতের উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় আলোয় চারিদিক উদ্ভাসিত, ভিতর হইতে পিয়ানোর মধুর সুর ভাসিয়া আসিতেছিল।

বীণা বলিল, তোমার সঙ্গে এ সম্বন্ধে একটা কথা হয়ে গেল, ভালই হয়েছে। এত দিন এটা যেন আমার মনে একটা ভারের মত চেপে ছিল। তোমার কথা ভেবে আমার এত ভয় হত—সে আর কি বোলবো!

কিরণ বীণার কথার অর্থ ঠিক বুঝিতে পারিল না। সে একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, আমার জন্য ভয় হত? তার মানে? আমি ত তোমার এ কথাটা ঠিক বুঝতে পারলুম না!

অর্থাৎ, আমি ভেবেছিলুম—যে তুমি—তুমি—বীণার কথা বাধিয়া গেল। সে অত্যন্ত কুণ্ঠিত ও লজ্জিত ভাবে মুখ নত করিল। তার পর একটু থামিয়া ঢোঁক গিলিয়া বলিল, আমি ভাবতুম, তুমিও হয়ত এর পরে আমার সম্বন্ধে একটা মন্দ ধারণা করবে। অন্য সবাই যেমন বলছে, হয় ত তোমারও মত সেই রকম হবে, তাই ভেবে আমার বড় ভয় হ'ত।

কিরণ বিষণ্ণ ভাবে হাসিল। একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস তাহার বুকের ভিতর হইতে উঠিয়া ধীরে মিলাইয়া

গেল। তাহার মতামতে কাহার কি যায় আসে? এই ত সেদিন লীলা তাহার সমস্ত অনুরোধ, যুক্তি-তর্ক সবই অগ্রাহ্য করিয়া কি ব্যবহারই তাহার সহিত করিতেছে!

সে বলিল, তুমি এ কথা এ রকম ভাবে ভেবে কষ্ট পেয়েছ, শুনে আমার বড় আশ্চর্য্য মনে হচ্ছে। আমার বিশ্বাস ছিল—আমার ধারণা বা মতামতে কারো কিছু যায় আসে না। এই তুচ্ছ বিষয়ের জন্য এত কষ্ট পেয়েছ কেন বীণা? কিরণ এবার একটু বিশেষ মনোযোগের সহিত বীণার মুখের দিকে চাহিল।

বীণা তাঁবুর সামনে উজ্জ্বল আলোর মধ্যে দাঁড়াইয়া ছিল, কিরণের দৃষ্টি ও কথার কোমলতায় সে লজ্জিত সুখাবেশে সিঁদুরের মত রাঙিয়া উঠিল। এত দিনে বুঝি বা তাহার চেষ্টা সফল হয়! তাহার সত্যই আজ অত্যন্ত লজ্জা হইতেছিল। তবু সে জোর করিয়া মুখ তুলিল। তাহার যাহা বলিবার আছে, তাহা আজি যে বলিতেই হইবে! সময় ও সুযোগ ত সব দিন আসে না!

"আমি যদি বলি,—আমার কাছে তোমার ধারণা বা মতামত অমূল্য—তা হলে—তা হলে কি তুমি খুবই আশ্চর্য্য হবে?" কথাটা শেষ করিয়াই সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া একটা আলোর দিকে চাহিয়া রহিল।

কিরণ আজ কিছুক্ষণ মুগ্ধনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। সৌন্দর্য্যের বশ সংসারে সকলেই, বিশেষ যদি সেই রূপের প্রতিমা তাহার মনের অনুরাগ নিজের মুখে কোন পুরুষকে জানায়। সে সময় মন সংযত করিয়া রাখা পুরুষের পক্ষে অসাধ্য। বীণার কথার মর্ম্ম বুঝিতে কিরণের বিলম্ব হয় নাই। সে আজ অরুণের সম্বন্ধে বীণার মনের ভাব বুঝিতে আসিয়াছিল। তাহার পরিবর্ত্তে সে যে আভাষ পাইল, তাহা সে কোন দিন মনে করে নাই। কথাটা সহসা শুনিয়া সে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল।

বীণাও কথাটা বলিয়া ফেলিয়া লজ্জিত ও কুণ্ঠিত মুখে দাঁড়াইয়া ঘামিতেছিল। আর সকলের সহিত সে অসঙ্কোচে এমন আলাপ করিতে পারে, কিন্তু কিরণের সঙ্গে এ ভাবে কথা বলা—কি লজ্জাকর! আগে সে এতটা বুঝিতে পারে নাই।

সন্ধ্যার শীতল বাতাস তাহার চূর্ণ কুন্তল উড়াইয়া শির শির শব্দে বহিয়া গেল। অন্ধকার আকাশে দুই একটি করিয়া তারা ফুটিয়া তাহাদের দিকে স্তিমিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

সহসা কিরণ সচকিত ভাবে নিজেকে সংযত করিয়া বীণার দিকে চাহিল। তাহার কথার উত্তরে সে শুধু খুব সহজ ও কোমল স্বরে বলিল, আমার তুচ্ছ ধারণার যে সংসারে একজনের কাছেও কোন মূল্য আছে, তা জেনে বড় খুসি হলুম বীণা! তুমি এ সব আর ভেবো না। আমি ত আগেই বলেছি—এখানে বাইরের লোকের মতামত চলতে পারে না, এ মানুষের সম্পূর্ণ নিজস্ব জিনিস।

তাহারা দুইজনে জলযোগের জন্য তাঁবুর ভিতর প্রবেশ করিল। (ক্রমশঃ)

মন্দির-প্রতিষ্ঠা

শ্রীকামিনী রায় বি-এ

বলেছিল রাজা—"প্রাসাদ-উদ্যানে তোমরা দেখিছ বটে,
সকল অঙ্গের পরিপূর্ণ শোভা প্রতিমায়, চিত্রপটে;
কিন্তু কোনোখানে এক নারী-দেহে এত কি সৌন্দর্য্য থাকে?
চিত্রকর লয়ে বিচিত্র তুলিকা কল্পনার রঙ্গে আঁকে।
বহু সুন্দরীর খুঁত ছেড়ে ছেড়ে, সৌন্দর্য্য যা পায় তাই
শিল্পী গড়ে' তোলে—নিখুঁত প্রতিমা,
কোথাও যেমন নাই।"

"কোথাও যা নাই? মানি না এ কথা"—
কহে এক পার্শ্বচর—
"হুজুরের আছে কর্ম্মচারী এক, খুঁজিলে তাহার ঘর
মিলিবে সুন্দরী, বর্ণে কি গঠনে কারো কাছে নহে কম—
পটে বা পাথরে এখানে যা আছে, অনিন্দ্য ও অনুপম।
বরঞ্চ কঠিন পাষাণের নারী, সুকোমল দেহ তার,
আজ্ঞা যদি হয়, চিন্তা চেষ্টা করি লয়ে আসি একবার।

দেখুন না তারে ? হেয়ালেন, সাইকি, চাই কি
ভিনাস দেবী—
তাদের মতন না হলে গঠন, বৃথা মহারাজে সেবি।"

করিলা মন্ত্রণা কুসঙ্গীরা মিলি—"এ কাজ কঠিন নয়,
রাজার নিকট নিতে যদি পারি টাকা শত পাঁচ ছয়।
গোপালেরে তার অল্প কিছু দিয়া করিতে পারিব বশ ;
মোরা শতকরা নব্বই রাখিয়া দিব শতকরা দশ।"

*   *   *   *

প্রভুর প্রসাদ, বিনাশ্রমে ধন, দুই লাভ হবে জানি,
গোপাল একদা প্রমোদ-উদ্যানে ভগিনীরে দিল আনি।
"পূজার লাগিয়া কত ফুল চাস ? রাজার বাগানে গিয়া
যত খুসি ফুল তুলে নিবি আয়"—এই বলি ভুলাইয়া।
বাহির দুয়ার গেছে রুদ্ধ হয়ে। "ভিতরে ঠাকুর আছে"—
বলি হাত ধরে রেখে গেল তারে একলা রাজার কাছে।
সে রূপ নেহারি চমকিলা রাজা। চিত্রের প্রতিমা তার
আসিল কি নামি লভিয়া জীবন ?—নয়ন ফেরে না আর!
এ কি নারী? এ কি ? ত্রাসে কম্পমানা
ভাসিয়া চোখের জলে
ভূমে পড়ি, তার ধরিয়া চরণ, রুদ্ধকণ্ঠে এ কি বলে ?—
"প্রজার পালক, রাজা বাহাদুর, পায়ে পড়ি, ভিক্ষা চাই,
আমারে বাঁচাও বিপদ-সাগরে, আমার যে কেহ নাই!
আমি যে অনাথা। পিতা পতি স্বামী সব গেছে।
ছিল ভাই,
বিশ্বাসঘাতক সে দেছে ঠেলিয়া, অকূলে যে ভেসে যাই!
পিতা নাই যার তার পিতা হ'য়ে রাখ জাতি কুল মান,
আশ্রয়বিহীনা অবলা বিধবা কে তারে করিবে ত্রাণ
তুমি ছাড়া ?—তুমি রাজা আমাদের"—
কাঁদিয়া আবার কয়
"তুমি পিতা, ওগো আমি কন্যা তব"—জমীদার সবিস্ময়
রহিল চাহিয়া সে মুখের পানে। অতুল সৌন্দর্য্য তার!
রূপসী রমণী অনেক দেখেছে, এমন দেখেনি আর!
সতীত্বের শিখা রূপরাশি তার করিয়াছে জ্যোতিষ্মান,
সূর্য্যরশ্মি স্বর্ণমন্দির-চূড়ায় করে যথা দীপ্তি দান।
চকিত সে রাজা। প্রজার পালক ? কে রক্ষক বিধবার ?
বিধাতা দেছেন কারে গৌরবের এই মহা অধিকার ?

এ কি কথা আজ শুনাইলা বালা ? আহা কি করুণ মুখ!
এই কিশোরীর পিতা যে আছিল, কি ছিল তাহার দুখ!
প্রজার আলয়ে অপূর্ব্ব রূপসী আছে কেহ যদি জানে,
কুসঙ্গীরা তার প্রসাদ লভিতে তাহারে ধরিয়া আনে।
এমন করিয়া জাগায় নি কেহ সুষুপ্ত করুণা তার,
বহু অবলার সাধি সর্ব্বনাশ, করেছে সে অহঙ্কার।
লজ্জা জেগে উঠে। অতীত জীবনে ঘৃণা এল মুহূর্ত্তেকে,
কহিল হৃদয়, পিতৃহীনাদের পিতা আমি, আজ থেকে।

হৃদয়ে উচ্ছ্বসি উঠিছে মমতা, আনন্দ-কম্পিত স্বর
দাঁড়ায় সে রাজা, আনত মস্তকে, ভক্তসম জুড়ি কর,
কহে—"কন্যা মোর তুমি, ওগো দেবী,
কি চাহ আমার কাছে ?
তোমারে বাঁচাতে আমি দিতে পারি,
আমার যা' কিছু আছে।
উঠ, মা আমার। কোথা হতে এলে ?
কি পুণ্য করেছি, তাই
সন্তানবিহীন এ পাপ জীবনে তোর মত কন্যা পাই ?
কি তোর বিপদ ? কে তোরে কাঁদায় ? তোর একগাছি চুল
স্পর্শ যে করিবে, আমার এ হাতে মরিবে সে, নাহি ভুল।
চল্ মা আমার—" বলি হাতে ধরে বাহির অঙ্গনে গিয়া
ভৃত্য ও অমাত্য যারা সেথা ছিল আনিলেন ডাকাইয়া ;
কহিলেন—"দেখ এই মা আমার, বড় আদরের মেয়ে,
নিঃসন্তান ছিনু, হতভাগ্য আমি, ভাগ্যবান্ এঁরে পেয়ে।
তোমরা জানিবে জননী বলিয়া, মানিবে দেবতা বলি"—
বলিলেন ডাকি কুসঙ্গীর দলে "দেশ ছাড়ি যাও চলি।
আমি জমীদার, আমি স্বেচ্ছাচারী, এখনও মানুষ আছি,
কন্যা, ভগিনীর, মায়ের সম্মান করিব য'দিন বাঁচি।"
বৃদ্ধ দ্বারপালে কহিলেন—"যাও, রাণীজির কাছে চলি ;
মোর নিবেদন জানাবে বিনয়ে, যোড়হাতে, এই বলি—
বাগানে নূতন হবে দেবালয় করিতে সে আয়োজন,
মোরে দয়া করি, সত্বরে হেথায় হোক্ তাঁর আগমন।"
নিশীথে সংবাদ গেল অন্তঃপুরে, অতীব বিস্মিতা রাণী,
চির-অনাদৃতা কহে মনে মনে "এ কি খেলা নাহি জানি।"
আসিলেন রাণী। শিবিকা খুলিয়া নামালেন তাঁরে স্বামী,
কন্যা আসি ধীরে প্রণমিলা যবে, কহিলেন—"তুমি আমি

আজিকে পেয়েছি প্রথম সন্তান, সতীর প্রতিমা মেয়ে,
পবিত্র হয়েছে এই পাপভূমি এঁর পদধূলি পেয়ে।
হেথায় উঠিবে নূতন মন্দির, সতীর পূজার তরে
শাস্ত্রের বিধানে প্রতিষ্ঠা করিয়া তার পর যাব ঘরে।"

* * * *

উঠেছে মন্দির সতী দেবতার, জগদ্ধাত্রী যাঁর নাম—
ভিখারী ভোলার ঘরণী শঙ্করী, অন্নদা সিদ্ধির ধাম।
মন্দিরের পিছে অতিথি-নিবাস, বিলাস-ভবন সেই;
মর্ম্মর মুরতি তৈল-চিত্রাবলী আগেকার মত নেই।
হবে চিত্রপট—মৃতা দক্ষসুতা; উমা ও ভিখারী বর;
বনে স্মিতমুখী সীতারে লইয়া দুই ভাই জটাধর।
অন্ধ পতি পাশে আবৃতনয়না গান্ধার-দুহিতা আছে;
এক বস্ত্রভাগে আবরিয়া তনু বৈদর্ভী নলের পাছে;
মৃত্যু সাবিত্রীরে দিয়া যায় বর, বেঁচে উঠে সত্যবান্;
ম্লেচ্ছ জয় শুনি রাজপুত নারী অনলে ঢালিছে প্রাণ;
শিশুদের লয়ে চলিতেছে পথ সাঁওতাল নারী নর;
ঊষার আলোকে গাভী ও লাঙ্গল লয়ে চাষা ছাড়ে ঘর;
দিবা দ্বিপ্রহরে কৃষাণী এসেছে বেঁধে লয়ে অন্ন জল।—
থালায় লোটায় ভরা কি অমৃত? স্বর্গ কি এ তরুতল?
রাজার আদেশে চিত্র এইমত ভবন প্রাচীর ছাইছে,
নারী পুরুষের প্রেমের মহিমা বর্ণ-তুলিকায় গাইছে।

হোথায় সুপ্রিয়া মুষ্টিভিক্ষা লাগি দ্বার হতে যায় দ্বার,
শিল্পী দেছে মুখে অপূর্ব্ব মাধুরী আশাভরা করুণার।
যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বিত্ত আপনার দুই ভাগে দিয়া যায়
কহিছে মৈত্রেয়ী—"অমৃতা না হলে কি
হবে এ নিয়া হায়!"
মহা প্রজাবতী গোতমী কাতরে বুদ্ধ মুখ চাহি কয়
"নির্ব্বাণের পথ মায়েরে দেখাতে নাই কি, করুণাময়?"
ভাবিছেন রাজা "শ্রেষ্ঠ নারী নর যতেক নয়নে পড়ে
সবার প্রাণের সৌন্দর্য্য লইয়া মানুষে দেবতা গড়ে।"

* * * *

মিথ্যা গল্প নাহি কহিনু তোমারে। আশ্চর্য্য মানব প্রাণ;
দেখ মনে মানি, স্বর্গ ও নরকে মুহূর্ত্তের ব্যবধান।

মিলন-পূর্ণিমা

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম-এ, ডি-এল্

(১)

সৌরীন্দ্র তখন এম-এ পড়ে। পড়াশুনায় তার নিষ্ঠা ছাত্র-মহলে একটা খুব আলোচনার বিষয় ছিল। সে কেবল কলেজের পাঠ্য বই পড়িত না, সে রাজ্যের বই পড়িত। সে এম-এ পড়িত অর্থনীতি-শাস্ত্রে। কিন্তু এমন বিষয় ছিল না যার সম্বন্ধে বই সে লাইব্রেরী ঘাঁটিয়া বাহির করিয়া পড়িত না। বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি, ইতিহাস, সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের যে সব বিশিষ্ট সাময়িক পত্রিকা বাহির হয়, তাহার সবগুলি সে দারুণ বুভুক্ষার সহিত পড়িত। জ্ঞানার্জ্জন বিষয়ে তার এমন একটা সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা ছিল যে, তাহা ইউনিভারসিটিতে সকলেরই চোখে পড়িত। সে সামাজিকতা হিসাবে খুব নামজাদা ছিল না। অন্তরঙ্গ বন্ধু-সমাজে সে বেশ কথাবার্ত্তা বলিত, হাসি তামাসা করিত, কিন্তু গায়ে পড়িয়া লোকের সঙ্গে ভাব করিতে বা অপরিচিতের সঙ্গে চট্ করিয়া আলাপ করিতে সে সমান অপারগ ছিল। তাই তার অবসর যথেষ্ট ছিল; আর সে অবসরটা, সে প্রায় সম্পূর্ণ নিয়োগ করিত নিষ্ঠা ও তিতিক্ষার সহিত জ্ঞানার্জ্জনে।

কিন্তু এম-এর দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে উঠিবার কিছুদিন পর হইতে তার এই একাগ্র নিষ্ঠার ভিতর আর একটা বস্তু আসিয়া চট্ করিয়া একটা বড় রকমের ভাগ বসাইয়া ফেলিল। রেখা এই বৎসর এম-এ'র প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে আসিয়া ভর্ত্তি হইল। রেখা মেয়েটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ একটু সাড়া তুলিয়া দিয়াছিল। সে ম্যাট্রিকুলেশন হইতে আরম্ভ করিয়া বরাবরই বেশ কৃতিত্বের সহিত

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছে ; কিন্তু বি-এ'তে আসিয়া সে অর্থনীতিতে হঠাৎ প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া একটা খুব সোরগোল তুলিয়া দিয়াছিল। তাই যে দিন রেখা দ্বারভাঙ্গা-গৃহে প্রথম আসিয়া এম-এ'র প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে আপনার স্থানটিতে গিয়া বসিল, তখন অনেক ছেলে তার দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তার মধ্যে সৌরীন্দ্রও ছিল।

ইহার পর হইতেই সৌরীন্দ্রের পাঠে নিষ্ঠার কতকটা অভাব হইতে লাগিল। ক্রমে লাইব্রেরীতে বসিয়া বই খুলিয়া সে পুঁথির পাতায় পাতায় শ্রীমতী রেখা দেবীর মুখ দেখিতে লাগিল। মাঝে মাঝে যে সময় পূর্ব্বে লাইব্রেরীর বাহিরে তাহাকে দেখা যাইত না, সে সময় তাহাকে দ্বারভাঙ্গা-নিকেতনের দ্বারদেশের কাছে অন্যমনস্ক ভাবে পাদচারণ করিতেও দেখা যাইতে লাগিল ;—আর এই সময়টা ঠিক রেখার কলেজে আসিবার সময়।

ক্রমে ইউনিভারসিটির কতকগুলি দুষ্ট ছেলে রেখার উপর বড় উৎপাত করিতে আরম্ভ করিল। তার ক্লাশের বোর্ডে দুই এক দিন তার সম্বন্ধে এমন সব অসঙ্গত কথা লেখা দেখা গেল যে, প্রফেসার ক্লাশে আসিয়াই রেখা আসিবার পূর্ব্বেই তাড়াতাড়ি তাহা মুছিয়া ফেলিলেন। রেখার টেবিলের উপরও নানা রকম বিশ্রী লেখা দেখা যাইতে লাগিল। তা' ছাড়া, যখন রেখা বারান্দা দিয়া যাতায়াত করিত, তখন কেবল যে ইহারা হাঁ করিয়া তাকাইয়া দেখিত তাহা নহে, অনেকে দূর হইতে পরস্পরের ভিতর উচ্চৈঃস্বরে এমন সব কথা বলাবলি করিত যে, রেখার কর্ণমূল পর্য্যন্ত তাহা শুনিয়া লাল হইয়া যাইত।

একদিন সৌরীন্দ্র দেখিতে পাইল যে, রেখা যাইবার সময় একটা ছেলে নিতান্তই ইচ্ছা করিয়া এমন করিয়া হোঁচট্‌ খাইল যে, সে হুড়মুড় করিয়া রেখার গায়ের উপর পড়িয়া গেল। রেখা সরিয়া গেল—একটু সামান্য রকম ভ্রুকুঞ্চিত করিল—তার পর সে অত্যন্ত প্রশান্ততার সহিত আপনার গন্তব্য স্থানে চলিল। সৌরীন্দ্রের গায়ে তেমন কিছু শক্তি ছিল না, তবে সে দুর্ব্বলও ছিল না। সে সেই ছেলেটাকে তাড়া করিয়া গেল, এবং খুব উত্তেজিত কণ্ঠে তাহার অসভ্যতার জন্য তাহাকে গালাগালি করিল। সে ছেলেটি ছাড়িবার পাত্র নয়, সে আস্তিন গুটাইয়া অগ্রসর হইল। সৌরীন্দ্র বই ফেলিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি আস্তিন গুটাইয়া লইল। এমন সময় তার পিঠে একটা কোমল হাতের সঙ্কুচিত স্পর্শ সে অনুভব করিল ; একটি কোমল কণ্ঠ তার কাণের কাছে যেন সুধা ঢালিয়া গেল। সে ফিরিয়া দেখিল রেখা।

রেখা বলিল, "দেখুন, আপনি ক্ষান্ত হন।" সৌরীনের কাণে বীণা বাজিয়া উঠিল, সে রাগ ভুলিয়া গেল। এক মুহূর্ত্ত সে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হইল। তার পর সে ভয়ানক সঙ্কুচিত হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আপনি এখানে ফিরে এসেছেন কেন? আপনি—"

তার প্রতিদ্বন্দ্বী রেখাকে এই যুদ্ধস্থলে হঠাৎ এমনি আসিতে দেখিয়া একেবারে চোঁচা দৌড় মারিয়াছিল। তার সকল শৌর্য্য ও তেজ এই ছোট্ট মেয়েটির দৃষ্টির সামনে হঠাৎ উবিয়া গিয়া তাহাকে মর্ম্মান্তিক লজ্জায় ডুবাইয়া ফেলিল।

রেখা বলিল, "আপনার কাছে আমি যে কত কৃতজ্ঞ তা' আমি ব'লতে পারি না। কিন্তু দয়া করে' আপনি মনে রাখবেন যে, যাঁরা আমাকে এমনি করে' অপমান ও লাঞ্ছনা করতে চান, তাঁদের যদি আপনি বাধা দিতে চান, তাতে আমার উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী হ'বে। কেবল চুপ করে' সয়ে' থাকলেই আপনা আপনি এ সব লোপ পায়। এর প্রতিরোধের চেষ্টা করলেই বিপদ আরও বেড়ে যায়। লড়তে গেলে এরাও তেড়ে আসবে, আর কেবল অগ্রাহ্য ক'রলে ক্রমে মুশড়ে' সরে যাবে।"

সৌরীন্দ্র বলিল, "ঠিক ব'লেছেন আপনি, আমার ভুল হ'য়েছিল। ক্ষমা করবেন।"

"ও কথা বলে' আমায় লজ্জা দেবেন না। আপনি আমার পরম বন্ধুর কাজ ক'রেছেন। মানুষের মত কাজ ক'রেছেন আপনি,—এতে ক্ষমা চাইবার কোনও কথাই নেই।"

"মিস সান্যাল, যদি অপরাধ গ্রহণ না করেন, তবে একটা কথা বলি। আপনার এমনি একলা আসাটা কি ভাল? আপনার ভাই কি কেউ—"

একটু হাসিয়া রেখা বলিল, "আমার এ অভ্যাস হ'য়ে গেছে। আমার সঙ্গে আসবার কেউ নেই কি না।"

এ হাসির ভিতর যে কত বড় একটা প্রকাণ্ড ব্যথা লুকান ছিল, তাহা সৌরীন্দ্রের সহৃদয়তার কাছে ধরা পড়িয়া গেল। তার মনে যে কথা আসিল সে কথা সে চট করিয়া বলিতে সাহস করিল না, কিন্তু সে মনে করিল যে রেখা যদি বাড়ী হইতে যাতায়াত করিতে তার সঙ্গ গ্রহণ করে, তবে সৌরীন্দ্র তাহা একটা মস্ত বড় সৌভাগ্য বলিয়া গণনা করিবে। কিন্তু সে কথা সে না বলিয়া চুপ করিয়া গেল।

তখন তারা দুই জনে সেই বারান্দা দিয়া রেখার ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। এটা ওটা বাজে কথা বলিয়া তাহারা অশোভন নীরবতা ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিল। দুয়ারের কাছে আসিয়া রেখা যখন সলজ্জ হাস্যে বিদায় গ্রহণ করিল, তখন সৌরীন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার ক'টায় ছুটি?"

রেখা তেমনি হাসিয়া বলিল, "সাড়ে তিনটায়।" সৌরীন নমস্কার করিয়া বলিল, "তখন আবার দেখা হ'বে।"

"আচ্ছা" বলিয়া প্রতিনমস্কার করিয়া রেখা ঘরে প্রবেশ করিল।

তিনটা বাজিবার কিছুক্ষণ পরেই সৌরীন্দ্র আসিয়া সেই বারান্দায় দাঁড়াইল। রেখা ঘর হইতে বাহির হইয়া তাহাকে স্মিত মুখে সম্ভাষণ করিল। তার পর উভয়ে আলাপ করিতে করিতে অগ্রসর হইল। চারিদিকে ছেলের দল চক্ষুময় হইয়া চাহিয়া রহিল; অনেকে মুখ টিপিয়া হাসিল, পরস্পরের প্রতি চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল—দুই একজন সৌরীনকে শুনাইয়া শুনাইয়া এক আধটা ঠাট্টা করিতেও ছাড়িল না। যখন রেখা ট্রামে উঠিল, তখন সৌরীন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া বসিল। রেখা নামিলে সে সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া রেখাকে তার বাড়ীর দুয়ার পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিল। দুয়ারে আসিয়া প্রবেশ করিবার সময় রেখা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। বলি বলি করিয়াও যেন সে একটা কথা বলিবে কি না ঠিক করিতে পারিতেছিল না। শেষে সে বলিয়া ফেলিল, "আপনি আসবেন একবার বাড়ীতে? একবার মার সঙ্গে দেখা করে' যাবেন না? এতদূর যখন কষ্ট করে' এসেছেন?"

সৌরীন বলিল, "না, না, আপনি এখন ক্লান্ত হ'য়ে এসেছেন। বিশ্রাম ক'রবেন, আমি আর আপনাকে বিরক্ত ক'রবো না। আমি শুধু আপনাকে পৌঁছে দিতে এসেছি।"

রেখা বলিল, "না—না, আমার জন্য ভাববেন না, আপনি চলুন, একটু চা খেয়ে মার সঙ্গে আলাপ করে' যাবেন। এতটা যখন কষ্ট করে' এসেছেন তখন এ কষ্টটা ক'রতে হ'বে।"

"এমন কষ্ট করা আমার ভাগ্যে সর্ব্বদা ঘটে না ব'লে আপনার কথাটা রাখতেই হ'চ্ছে।"

রেখা গরীব ব্রাহ্মের কন্যা। তার বাপ ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচারক ছিলেন, তিনি কয়েক বৎসর হইল স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তার মা সামান্য কিছু উপার্জ্জন করিয়া আর একটী ব্রাহ্ম-পরিবারের বাড়ীতে দুটী ঘর লইয়া বাস করেন। কায়ক্লেশে তাদের কোনও মতে গ্রাসাচ্ছাদন চলে। রেখা ছেলে বয়স হইতেই বৃত্তি পাইয়া তার নিজের পড়ার খরচ চালাইয়াছে। ইদানীং তার বৃত্তির অর্থে সে তার মাকে অনেকটা সাহায্য করিতে পারে।

সৌরীনকে বাড়ীর দুয়ারে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া রেখা ছুটিয়া উপরে গেল এবং অল্পক্ষণ বাদেই সে তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গেল। বাড়ীটি পুরাতন, অনেকটা জীর্ণ। ইহার দ্বিতলে সিঁড়ির একপাশে ছোট একখানি ঘরে রেখা সৌরীনকে লইয়া বসাইল। রেখার মা আসিয়া তাহাকে অভিবাদন করিলেন।

ঘরখানি ছোটো, দৈন্যের লক্ষণ তাহাতে পরিস্ফুট। কিন্তু ইহা আগাগোড়া ছিমছাম ফিটফাট। ঘরের এক পাশে একখানা পাইন কাঠের টেবিলের উপর রেখার কয়েকখানা বই খাতাপত্র প্রভৃতি খুব পরিচ্ছন্ন ভাবে গুছান রহিয়াছে। তার এক পাশে একটি ছোট জীর্ণ আলমারীর ভিতর অনেকগুলি বই খুব পরিষ্কার ভাবে সাজান আছে। অপর এক দিকে একটি ছোট্ট পাইনের টেবিল ও তার পাশে একটি শেল্‌ফ্‌, তাহার উপর বাসনপত্র এমন সুন্দরভাবে সাজান রহিয়াছে—তার সবগুলি নির্ম্মল ঝকঝকে। টেবিলের উপর একখানা সুন্দর সূচিকার্য্যখচিত ঢাকনা দেওয়া আছে, ইহা রেখার নিজের হাতের সেলাই। একটি আলনায় কাপড় চোপড় গোছান রহিয়াছে, তার তলায় রেখা ও তার মার মাত্র

দুই যোড়া জুতা। রেখা উপরে আসিয়াই তার জুতা মোজা খুলিয়া ফেলিয়াছিল।

ঘরে আসিয়া সৌরীন্দ্রের চক্ষু তৃপ্ত হইয়া গেল। রেখার মার কথাবার্ত্তায় সে আরও তৃপ্ত হইল। সবার উপর সে আনন্দিত হইল রেখাকে দেখিয়া ও তার কথাবার্ত্তায়। যতক্ষণ সে বসিয়া ছিল, তার অধিকাংশ সময় রেখা কাজে ব্যস্ত ছিল। সে পাঁউরুটি টোষ্ট ডিমের পোচ ও চা তৈয়ার করিয়া পরিবেশন করিয়া বলিল, "আপনাকে বড্ড কষ্ট দিলাম, এই সামান্য খাওয়ার জন্য এতক্ষণ আপনাকে বসিয়ে রাখলাম।"

সৌরীন বলিল, "এটা যে কত বড় দামী জিনিস, তা' আপনি বুঝতে পারছেন না। দুর্ভাগ্যক্রমে এমন করে কেউ তো এখানে আমার জন্য খাবার তৈয়ার করে না।"

রেখার মা বলিলেন, "কেন?"

"হোষ্টেলে থাকি, বাজারের খাবার খাই, আমাদের এ সৌভাগ্য কোথা থেকে হ'বে বলুন।"

"ও—তাই" বলিয়া রেখা হাসিল।

খাওয়া হইলে রেখা বাসনগুলি সরাইয়া লইয়া গেল। তার কয়েক মিনিটের মধ্যে সেগুলি সে ধুইয়া মুছিয়া নির্ম্মল করিয়া আনিয়া সেই সেলফের উপর সাজাইয়া রাখিল।

তার পর সামান্য কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়া সে আবার উঠিয়া গেল, আবার কিছুক্ষণ বাদে আসিয়া উপস্থিত হইল। তার মা চুপি চুপি রেখাকে যাহা বলিলেন, অনিচ্ছাসত্ত্বেও সৌরীন সে কথা শুনিয়া বুঝিল যে, রেখা রান্না চড়াইয়া আসিল।

সৌরীন বসিয়া থাকিতে থাকিতেই রেখা এমনি মাঝে মাঝে উঠিয়া গিয়া চক্ষের পলকে আরও অনেক গৃহকর্ম্ম সারিয়া আসিল। কিন্তু সৌরীন্দ্র দেখিয়া মুগ্ধ হইল যে, সব কাজের ভিতর রেখা এমনি পরিচ্ছন্ন ভাবে আছে যে, যেন সে কেবল সাজিয়া গুজিয়া কলেজের পড়া করা ছাড়া আর কিছুই করে না।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে সৌরীন্দ্র আপনাকে একরকম ছিঁড়িয়া লইয়া বিদায় হইল।

রেখা তখন বাতি জ্বালিয়া ঘরটা ঝাঁট দিয়া ফেলিল। তার পর একটা ঝাড়ন দিয়া আসবাবপত্র ঝাড়িয়া ফেলিয়া পড়িতে বসিল। তার মা রান্না শেষ করিতে গেলেন।

(ক্রমশঃ)

শেষ দান

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

১

অধরে নেমেছে মৃত্যু-কালিমা
দেরী নাই বেশী আর,
মোর পানে প্রিয়া বারেক তুলিল
করুণ নয়ন তার।
বিদ্যুৎহানা বিশাল নয়ন,
টানা কালো সেই ভুরু
নমিয়া পড়েছে, চির নিদ্রার
তন্দ্রা হয়েছে সুরু।
অঞ্চলে বাঁধা চাবি রিং তার
দিল মোর পদতলে,
ভ-দৃষ্টির সে চারি নয়ন
ভরিয়া উঠিল জলে।

২

সে চাবি তাহার বড় আদরের
ক্যাস-বাক্সের চাবি,
কোন দিন মোর উহার উপরে
চলিত না কোনো দাবী।
যক্ষপুরীর এ সোণার কাঠী
নিয়ত রাখিত কাছে;
চাহিলে কখনো পাই নাই তাহা,
ভাবিতাম কি যে আছে!
কতই তামাসা কত বিদ্রূপ
করেছি ইহার লাগি,
তবুও কখনো পাই নাই এটী,
বকিয়াছি কত রাগি।

আজ দিয়ে গেল শেষ সঞ্চয়
সকলের শেষ দান ;
দানের ভঙ্গী দাতার মিনতি
ব্যাকুল করিছে প্রাণ !

৩

চলে গেছে প্রিয়া বরষ কেটেছে
চোখের বরষা লয়ে,
শূন্য সায়রে গুমরে ভ্রমর
পদ্ম-পরাগ ব'য়ে।
বিজন দুপুর, উদাসী পরাণ,
হাতে নাহি কোনো কাজ,
বাক্স তাহার কাছেতে আনিয়া
খুলিয়া দেখিনু আজ।

৪

রহিয়াছে তার আশীর্ব্বাদীর
ইয়ারিং একযোড়া,
ঠাকুমার দে'য়া প্রাচীন ঝুমকা
লাল কৌটায় ভরা।
হার একগাছি ভরা বক্ষের
গুমর মাখানো তাতে ;
বিয়ের নোলক রূপের ঝলক
জড়ানো রয়েছে যাতে।
শাঁখার সোণার পাত একটুকু,
ক'টী কাঁচপোকা টিপ,
লাবণীর নভে সাঁজের তারকা
সুষমার হেমদীপ।
বিবাহের সেই অধিবাসে পাওয়া
তিনটী পুতুল ছোটো,
প্রীতি-উপহার দুইখানি' আর
বধূ ও বরের ফটো।

তারি সাথে আছে চিঠি এক তাড়া
অনেক দিনের লেখা,
নব অনুরাগ- রঞ্জিত লিপি,—
আজ পড়িতেছি একা।
পুঁতির মতন ছোট সুখ দুঃখ
গাঁথা আছে তার মাঝে,
ফুলশয্যার শুষ্ক কুসুমে
অতীত সুরভি রাজে।
যৌবন হেথা বাঁধা পড়িয়াছে
দেখে মনে হয় ভুল,
কুড়ানো উপলে পাই যে আবার
ঝরণারি কুলুকুল।
ক্ষুদ্র ঝিনুকে প্রেম-সাগরের
খপর দিতেছে ভাই,
চরণ সিঁদুরে দেবী প্রতিমার
কৃপায় আভাষ পাই।

৫

দেখি আর কাঁদি কত শরতের
গত উৎসব স্মরি,
শত গোলাপের আলিঙ্গনের
আমেজ রয়েছে মরি।
হায় আঙ্গুরের বাক্সে আবার
কে রাখিল হীরাচূড়,
লক্ষ্মীর ঝাঁপি করিল কে মোর
বেদনায় ভরপুর !
পূজারিণী যবে খুলে দিয়ে গেল
প্রেম-মন্দির-দ্বার,
দেখি, আছে ধূপ বিল্বপত্র,—
প্রতিমা যে নাহি আর !

পারুল

শ্রীগোপাল হালদার

আমাদের গাঁয়ে আজ একটা বড়-রকমের এ্যান্ট্রান্স ইস্কুল চলিতেছে; কিন্তু এমন দিনও ছিল যখন এখানে একটি মধ্য ইংরেজি ইস্কুলও ছিল না। প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে মিশনারীদের চেষ্টায় আমাদের গাঁয়ে প্রথম মধ্য-ইংরেজি ইস্কুল স্থাপিত হয়; দিন কতক সে ইস্কুল থেকে মিশনারীদের কাছে শিক্ষা পাইয়া কোনো কোনো ছেলে প্রাইভেট্ এ্যান্ট্রান্সও পাশ করিয়াছিল। আমি আমাদের গাঁয়ের সে কালের ছেলেদের একজন।

রেভারেণ্ড জন্ প্রতাপচন্দ্র রায় নামে এক বাঙালী পাদ্রী প্রথম আমাদের এখানে ইস্কুল খুলিলেন। তিনি খৃষ্টান, কিন্তু কাজ কর্ম্মে একেবারে বাঙালী। দিন কত তাঁহার ইস্কুলে কোনো ছেলেই গেল না, খৃষ্টানী ইস্কুলের ছায়াও কেহ মাড়াইতে চাহিল না। কিন্তু, মাস তিনের মধ্যে তিনি আমাদের কয়জনকে ছাত্র জুটাইয়া ফেলিলেন। তার কারণ, আমরা কেহই উচ্চবর্ণের ছেলে নই। আমাদের মধ্যে দুজন চাষার ছেলে, বাকী তিনজনও নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর, যাহাদের সমাজে 'জল চল' নাই। মাষ্টার মহাশয় আমাদিগকে 'বর্ণ-পরিচয়' হইতে পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। মাস তিন পরে আমাদের সঙ্গে আর দুটি ছেলে পড়িতে আসিল, তাহাদের একজন ব্রাহ্মণ ও অপরটি কায়স্থ। এদের অক্ষর-পরিচয় বাড়ীতেই হইয়াছিল। কিন্তু খৃষ্টানী ইস্কুলে পড়িবার জন্য ইহাদের পিতাদের কম লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয় নাই; তবে শহরে কাজকর্ম্ম করিতেন বলিয়া তাঁহারা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ইংরেজি না শিখিলে আর চলিবে না। তাই, তাঁহারা কিছুতেই দমিলেন না।

আমাদের এই সাতজনকে লইয়া মাষ্টার মহাশয়ের ইস্কুল দুই বছর চলিল। তার পরে, একটি একটি করিয়া আরো ছাত্র বাড়িতে লাগিল।

মাষ্টার মহাশয় ছিলেন খৃষ্টান; কিন্তু আমরা তাঁহার মুখে কোনো দিন অন্য ধর্ম্মের নিন্দা শুনি নাই। তিনি আমাদের সমস্ত প্রাণ দিয়া ভালোবাসিতেন। বর্ষার সময়ে ছাতা কিনিয়া দিতেন; গ্রীষ্মের দিনে বিকাল পর্য্যন্ত রাখিয়া নানা রকমের ফল দিয়া আমাদের খাওয়াইয়া ছাড়িতেন। আমরা তাঁর খৃষ্টানীর ভয়ে সর্ব্বদাই সজাগ থাকিতাম; তিনি কিন্তু কোনো দিন আমাদের বাইবেলখানা পড়াইবার জন্যও জেদ্ করেন নাই। মাঝে মাঝে দু-একটি উপদেশপূর্ণ আখ্যায়িকা বলিতেন;—আমরা কোনো দিন জানি নাই, সেগুলো তিনি কোথায় পাইলেন। আমাদের কারুর অসুখ হইলে তিনি তাকে দেখিতে আসিতেন;—ঘর থেকে মেয়েরা জলের কলস প্রভৃতি বাহির করিয়া না লওয়া পর্য্যন্ত বাহিরে অপেক্ষা করিতেন; তার পরে সেই অন্ধকার ঘরে ঢুকিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা হয় ত ছেঁড়া মাদুরের উপরে বসিয়া কাটাইতেন। কখনো বা সম্ভব হইলে দূর শহর হইতে এক-আধটুকু ঔষধ আনাইয়া দিতেন। ইহা ছাড়া নানা রকমের খেলানা, বড় বড় ছবি আর ছবির বই ত আমরা মাসে-মাসেই পাইতাম।

আসল কথা, তিনি খৃষ্টান, কিন্তু তাঁর খৃষ্টানের গোঁড়ামি ছিল না, বরং সকলের প্রতিই তাঁর সমান দরদ ছিল। সে দরদ তাঁর শত কাজেই ফুটিয়া বাহির হইত,—তাঁর মধুর হাসিতে, তাঁর কোমল কথায়, তাঁর ছোট কুশলবার্ত্তাটি জিজ্ঞাসায় পর্য্যন্ত।

কিন্তু মাষ্টার মহাশয়ের স্ত্রী ছিলেন মিসেস রে। তিনি আমাদের ততটা স্নেহের চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। আমাদের সামাজিক অগৌরব, আমাদের দারিদ্র্য ও আনুষঙ্গিক শত অপরাধ, সর্ব্বোপরি আমাদের কুসংস্কার তাঁকে পীড়িত করিত। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর এই মানসিক ক্লেশটা অনেক সময়ে তাঁর মুখেও ফুটিয়া বাহির হইত, কখনো হয় ত একটি বিরক্তিপূর্ণ ভ্রূকুটিতে, কখনো বা

একটি ঝাঁঝালো জবাবে। আমরাও তাই তাঁর কাছে বড় বেশী ঘেঁসিতাম না।

মিসেস্ রে'র অপ্রসন্ন হওয়ার আরো একটি কারণ ছিল;—তাঁর একমাত্র সন্তান ভায়োলেট আমাদের সঙ্গে বড় বেশী মিশিত।

ভায়োলেটের বয়স ছিল বছর আট। নিতান্তই বালিকা,—সে না বুঝিত তার নিজের ধর্ম্মের মহিমা, না বুঝিত তার নিজের জন্মগত মর্য্যাদা, না জানিত আমাদের সামাজিক অগৌরবের কথা। আমরা কেহ বা তাহার চেয়ে বছর দুই-এর, কেহ বা বছর তিনের বড়। তাই সে অসংকোচে আমাদের উপর দৌরাত্ম্য করিয়া ফিরিত। আমাদের বই লুকাইত, পেন্সিল ভাঙ্গিয়া দিত, শত রকমে জ্বালাতন করিত। আবার হয় ত তার রঙীন ছবির বইগুলি লইয়া আসিয়া আমাদের সঙ্গেই কোনো গাছতলায় ধুলায় বসিয়া পড়িতে সুরু করিত, হয় ত বা শেষ পর্য্যন্ত আমাদের কাউকে বইখানা উপহার দিত। মিসেস্ রে তাঁর একমাত্র মেয়ের এরূপ আচরণ মোটেই ভালো মনে করিতেন না। এজন্য তিনি মাষ্টার মহাশয়কে অনেক সময়ে অনুযোগ দিতেন, কিন্তু মাষ্টার মহাশয় তাহা শুনিতেন না। তিনি বলিতেন, 'কেন—এরা ত সবাই ভালো ছেলে।' মিসেস্ রে বলিতে চাহিতেন, আমরা ছোট লোক, আমাদের হৃদয় উদার নয়, আমাদের বেশভূষায়, আচরণে নোংরামি থাকিবেই; আর সে নোংরামি তাঁর মেয়েকেও স্পর্শ করিবে। মাষ্টার মহাশয় শুধু বলিতেন, 'এরা গরীব, কিন্তু নোংরা নয়।'

এখন বুঝিতেছি, মাষ্টার মহাশয়েরই ভুল হইয়াছিল। আমাদের অনেকেরই দেহের আবরণ ছিল না; থাকিলেও তাহা এত ছিন্ন যে তাহাতে ভদ্র সমাজ সন্তুষ্ট হইতে পারে না। তার উপরে তাহাকে নির্দ্দিষ্ট দিনে রজকালয়ে পাঠাইয়া দুগ্ধ-শুভ্র করিয়া আনা ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাই, আমাদের কেহ নোংরা ঠাওরাইলে মোটেই অন্যায় করিতেন না। কিন্তু তখন বয়স কাঁচা ছিল, তাই ভাবিতাম, মিসেস্ রে আমাদের উপর অবিচার করিতেছেন।

আসল কথা, আমরা ছিলুম স্নেহের কাঙাল,—জীবনের ওই বয়সটায় মানুষ স্নেহ জিনিসটার বড়ই প্রয়োজন বোধ করে। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের সামাজিক বেষ্টনী এতই সঙ্কীর্ণ ও জটিল ছিল যে, সেখানকার কোনো মেয়ের কাছেই আমরা তা প্রত্যাশা করিতে পারিতাম না। মিসেস্ রে' যদি আমাদের উপর এতটা অপ্রসন্ন না হইতেন, তাহা হইলে তিনি আমাদের হৃদয়ে মাষ্টার মহাশয়ের মতই একটি ভক্তি ও ভালোবাসার স্থান জুটাইয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু তাহা হইল না; আমাদের প্রাণের খালি যায়গাটুকু জুড়িয়া বসিল তাঁর মেয়ে ভায়োলেট্। তার একটি কারণ, সে প্রায় আমাদের সম-বয়সী। তা ছাড়া, আমাদের সমাজের মেয়েদের দেখিয়াছিলাম এ বয়সে হয় তারা পাকা বউ, নয় বেহায়া মেয়ে হইয়া দাঁড়ায়। এটি অবশ্য তাদের চারদিককার আব্‌হাওয়ারই দোষে। ভায়োলেটের এর কোনোটি হওয়ার মতই কারণ ছিল না। সে তখনো কাঁচা, নিতান্ত কাঁচা; তাই চরিত্রটি যেমন চঞ্চল, তেমনি সরল, সরস ও মধুর ছিল। সে ছুটিয়া ফিরিত, আমাদের পিছন হইতে একটি ছোট কিল বা চড় দিয়া যাইত, আবার রাগ করিত, অভিমানে কাঁদিত, তার পরই হয় ত আবার হাসিয়া গলা জড়াইয়া ধরিত।

স্বভাবতই আমরা তাকে ভালোবাসিয়া ফেলিলাম।

এক দিকে আমরা তাকে যেমনি স্নেহ করিতাম, আর দিকে তেমনি তাহাকে সম্ভ্রমও করিতাম। তার মনটি তখনো শুভ্র, কোমল; তাই আমরা সর্ব্বদা সাবধান থাকিতাম যেন তাহাতে না দিই কোনো কালির আঁচড়, না করি কোনো আঘাত।

ভায়োলেট আমাদের কাছে একটা নতুন নামও পাইয়াছিল;—কি করিয়া বলিতেছি। আমরা তখন থার্ড কি সেকেণ্ডক্লাশ আন্দাজ পড়ি। মিশনের সাহেব শহর থেকে আমাদের পুরাতন ছাত্র কয়জনার ফটো চাহিলেন। শহর হইতে ফটোগ্রাফার আসিল। আমরা সাতজনে সা'র বাঁধিয়া দাঁড়াইলাম। ভায়োলেট একটু দূরে যন্ত্রটির আশে পাশে ঘুরিতেছিল,—ইচ্ছা আমাদের পাশে সেও দাঁড়ায়। আমাদের মনটাও একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল।

হরনাথ ছিল পড়াশোনায় সবচেয়ে ভালো;—আজ সে সদরে কি একটা কেরাণী হইয়াছে। ভায়োলেট পিছনে গিয়া তাহাকে যেন চুপি চুপি কি বলিল। একটু পরেই হরনাথ কহিল,—

'মাষ্টার মশায়, হয় আপনি এসে আমাদের মাঝে বসুন, নয় ভায়োলেটকে আমাদের সঙ্গে দাঁড় করিয়ে দিন।'

'কেন? তোমাদের কি হইল?'

'আমরা সাতজনে দাঁড়াইলে বিশ্রী হইবে।'

মাষ্টার মহাশয় কিছুতেই রাজি হন না, শেষে হরনাথ কহিল, 'তবে আমি দাঁড়াইব না।' অগত্যা ভায়োলেট্‌কেই আমাদের মধ্যে দাঁড়াইবার অনুমতি দেওয়া হইল। নাচিতে নাচিতে সে আসিয়া দাঁড়াইল। ফটো উঠিয়া গেল। যথা সময়ে আমরা প্রত্যেকে তার একখানা করিয়া পাইলামও।—আমাদের বড় আহ্লাদ হইল; আমরা সেই সাতটি ছেলে! সকলে শপথ করিলাম, এ ফটো আজীবন সযত্নে রাখিব।

কেশব ছেলেটির মনটা অল্পেতেই ভিজিয়া উঠে। সে ছিল যুগীর ছেলে, পুরুষানুক্রমে বৈষ্ণব। শুনিয়াছি এই অসহযোগ আন্দোলনে সে তার পঁয়তাল্লিশ টাকা বেতনের সরকারী ইস্কুলের চাকরীটি ছাড়িয়া দিয়াছে। সে বেশ মোলায়েম স্বরে কহিল,

"এসো আমরা এই ছবির নাম রাখি We are Seven"—

এই নামের কবিতাটি আমরা কয় দিন পূর্ব্বে পড়িয়াছিলাম। নামটি আমাদের ভালো ঠেকিল; আমরা বলিলাম, 'বেশ'।

হরিপদ ছেলেটি একটু বেশী কাল্পনিক। সে পোষ্টাফিসে এখন ভালো চাকুরী করে,—বেতন পায় ষাট টাকা। দুই একবার এক আধটি কবিতা ছাপাইবার অসাধ্য সাধনার পর সে এখন বুঝিয়াছে যে মণি অর্ডারের হিসাব রাখা এর চেয়ে অনেক সহজ। সে সেদিন কহিল,

"কিন্তু আমরা ত শুধু সাতজনই নই। আমাদের মাঝে যে ভায়োলেট্‌ও আছে।"

আমরা বলিলাম, "তাই ত, তবে কি নাম রাখব!"

"এসো আমরা এর নাম দিই—'সাত ভাই চম্পা আর বোন্ পারুল,"—তার একটি মাত্র বোন্ ছিল, সে অল্প কিছু দিন আগে মারা গিয়াছে। আমরা তাহা জানিতাম।

নামটি আমরা গ্রহণ করিলাম। মাষ্টার মহাশয়ও শুনিলেন, পারুলও শুনিল। তাঁরা দুজনেই বেশ খুসী হইলেন। মিসেস্ রে কিন্তু মোটেই প্রসন্ন হইলেন না; এ সব উপকথার সঙ্গে তাঁর মেয়েকে জড়ানো তিনি পছন্দ করিলেন না।

কিন্তু, উপায় ছিল না, ভায়োলেটও তার নতুন নাম ছাড়া অন্য নামে ডাকিলে সাড়া দিত না, আমাদেরও অন্য কোনো নামে ডাকিবার ইচ্ছা ছিল না। কাজেই, নতুন নাম বহাল হইয়া গেল—অন্তত আমাদের মধ্যে।

কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এক দিন যা সত্য থাকে, আর দিন তা ভুল হইয়া দাঁড়ায়। এক দিন যে পারুল ছিল, সে আবার ভায়োলেট্ হইল।

আমরা সেবার এণ্ট্রান্স দিব। মাষ্টার মহাশয়কে সাহায্য করিবার জন্য শহরের পরিচালকদের কথামত একজন নতুন শিক্ষক আসিয়াছিলেন। মিষ্টার শ'এর বয়স পঁচিশের মত; তিনি কলিকাতার একটা ফিরিঙ্গী ইস্কুলে পড়াশোনা করিতেন। এখানকার কয়েকটি ক্লাশের ছেলেদের পড়ানোর ভার তাঁর উপর পড়িল। মিষ্টার শ'এর দুই একটি বিশেষত্ব আমাদের বেশ চম্‌কাইয়া দিল। একটি তাঁর অতিদ্রুত ইংরেজি বলা, ইংরেজি ছাড়া বাংলা অবশ্য তিনি জানিতেন না,—আরটি তাঁর ধুতি-কাপড়ের প্রতি অশ্রদ্ধা।—যদিও তাঁর রং ততটা ফর্সা নয়, তবু তিনি ছিলেন পাকা সাহেব।

ইস্কুলের মধ্যে আমরাই ছিলুম বড়। আমরা ইংরেজিতে কিছু কিছু কথাবার্ত্তা কহিতে পারিতাম। তাই মিষ্টার শ দুই-এক সময় দয়া করিয়া আমাদের সঙ্গে কথা কহিতেন। খৃষ্টধর্ম্মে তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাসের কথা তিনি প্রায় সব সময়েই আমাদের শুনাইতেন এবং অন্যান্য ধর্ম্মের দোষগুলিও তেমনি তীব্রতার সঙ্গেই বুঝাইতেন। সব চেয়ে বেশী বলিতেন তিনি কলিকাতার গল্প। সে গল্পগুলিতে কিন্তু তাঁর খৃষ্টধর্ম্মানুরাগের কোনও পরিচয়ই পাওয়া যাইত না।

মিষ্টার শ মিসেস্ রে'র কাছে খুব ভালো ছেলে বনিয়া গেলেন। তাঁর চাল-চলন ভালো, তাঁর মন আলোক-প্রাপ্ত, আর তাঁর খৃষ্টধর্ম্মে প্রগাঢ় বিশ্বাস। মিসেস্ রে তাঁর হাতে তাঁর কন্যার শিক্ষার ভার দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

এক দিন মিষ্টার শ'-এর সঙ্গে আমাদের বেশ ঝগড়া

হইয়া গেল। তিনি কলিকাতার গল্প করিতেছিলেন। কলিকাতা খুব মজার শহর, ফূর্ত্তির জায়গা; নাচ গান, হাসি গল্প,—কত কি আছে।

আমরা ফূর্ত্তিটার স্বরূপ জানিতে চাহিলাম।

মিষ্টার শ'এর মেজাজটি সেদিন খুব খোস্ ছিল, তিনি বলিলেন, "কেন? সেখানকার মজলিস্ আছে, হোটেল আছে, খানাপিনা আছে, বিকাল সন্ধ্যায় বেড়ানো আছে, সবার উপরে আছে যুবতীকুল।"

এরূপ ইঙ্গিত আগেও তিনি দুই একবার করিয়াছিলেন। কিন্তু, আমাদের এরূপ সঙ্কোচহীন নির্লজ্জতা ভালো লাগিত না। আমাদের মধ্যে কে একজন বলিল, "মেয়েদের সম্বন্ধে এরূপ কথা বল্‌তে আপনার লজ্জা করে না?"

মিষ্টার শ হাসিয়া জবাব দিলেন

"You silly ass! girls are not angels!"

"এসব বাজে মিথ্যা কথা।"

মিষ্টার শ একটু থামিলেন, গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিথ্যা কথা! তুমি কোনো মেয়েকে দেখেছ যে এসব চায় না, খোঁজে না?"

"আমাদের বিশ্বাস কোনো ভালো মেয়েই এসবকে ঘৃণা না করে থাক্‌তে পারে না।"

"শুনি নাম তেমন কোনো মেয়ের?"

আমরা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, কাহার নাম করিব। কে একজন শেষটা বলিল, "পারুল।"

আসলে, পারুলই একমাত্র মেয়ে যাকে আমরা সকলে জানিতাম, এবং যার সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই ধারণা ছিল উচ্চ।

মিষ্টার শ'এর মুখে যে বাঁকা হাসি দেখিলাম, তেমন অবজ্ঞার হাসি আমি তার পূর্ব্বে আর দেখি নাই। তিনি বলিলেন, "ভায়োলেট্! ভায়োলেট্! এক টুকরা মেয়ে! একটা ফুৎকারে যে সে ধূলায় লুঠিয়ে পড়বে।"

আমরা ক্ষেপিয়া গেলাম। মিষ্টার শ'কে খুব করিয়া শাসাইলাম।

মিষ্টার শ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তার পরে উঠিয়া বলিলেন, "গুড্‌বাই।" গম্ভীর ভাবে পা ফেলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

আমরা সকলে মিলিয়া তখন তাঁহার বিরুদ্ধে নিজেদের যত রাগ প্রাণ খুলিয়া পরস্পরকে শুনাইলাম।

মিষ্টার শ'এর সঙ্গে পারুলের ভাব হঠাৎ বেশ জমিয়া উঠিল। পারুল আমাদের কাছ থেকে সরিয়া যাইতে লাগিল। মিসেস্ রে আরামের নিশ্বাস ফেলিলেন। কিন্তু, আমরা ঠিক জানিতাম মিষ্টার শ'এর মত লোকের সঙ্গে তার ভাব বেশী দিন টিকিবে না। তবু আমাদের মন দমিয়া গেল। যে পারুল আগে গাউন বড় একটা পরিত না, সে এখন বাঙালী শাড়ি একেবারে ছাড়িয়া দিল।

মাষ্টার মহাশয়ের বসিবার ঘরের ঠিক উল্টা দিকেই ছিল মিষ্টার শ'এর ঘর। সেদিন মাষ্টার মহাশয়ের পড়াইতে পড়াইতে সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। পড়া তৈরী করিতে বলিয়া তিনি কিছুক্ষণের জন্য প্রার্থনা করিতে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে উল্টা দিকের বন্ধ কাচের জানালার ভিতর দিয়া দেখিলাম একটি যুবক ও একটি যুবতী। যুবকটি মেয়েটির চুল ধরিয়া তার গালে টোকা দিয়া তাহাকে আদর করিতেছে! মেয়েটি বিনিময়ে তাকে একটি চুম্বন দিয়াই একেবারে ছুটিয়া লজ্জায় জানালার কাছে চলিয়া আসিল। মুহূর্ত্তমধ্যে সাত যোড়া চোখের বিস্ময়বিমূঢ় দৃষ্টি তাকে একেবারে স্তব্ধ করিয়া দিল।—মনে হইল, পারিলে সে তখন মাটীতে মিশিয়া যাইত। কিন্তু, পরক্ষণেই সে মুখ ফিরাইয়া সদর্পে যুবকটির পাশে গিয়া দাঁড়াইল, এবং আমাদের বিস্মিত করিয়া তাহার গালে আর একটি চুম্বন দিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। তার চোখে যে কী ঘৃণা, ও কী স্পর্দ্ধা ফুটিয়া উঠিতেছিল তাহা আর বলা যায় না।

আমরা বিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলাম।

পড়া শেষ হইলে যখন আমরা বাড়ী চলিয়াছি, তখন দেখিলাম পারুল একটু দূরে একা-একা ঘুরিতেছে।

আমাদের একজন ডাকিল, "পারুল!"

"কেন?" বলিয়া সে সদর্পে আসিয়া সম্মুখে ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইল।

"হয়ত আমাদের ভুল হইতে পারে, কিন্তু—" মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া সে বলিল,

"মোটেই না। তার পর?"

আমরা হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম।

"মিষ্টার শ'কে বোধ হয় তুমি চেন নাই।"

"খুব চিনি। তিনি ফুর্ত্তিবাজ,—না? তা নয় ত তোমাদের মত গম্ভীর প্যাঁচা হবেন নাকি?" বলিয়া সে গট্-গট্ করিয়া চলিয়া যাইতেছিল।

"হয় ত তোমার এ জন্য অনেক আফশোষ করতে হবে।" রাগে পারুলের চোখ জ্বলিয়া উঠিল—

"কেন? বাবাকে তোমরা বলে দেবে, না? তার জন্য আমি তৈরী আছি। হিতৈষী brutes যত!"

ক্রোধভরে সে আর ফিরিয়া দেখিল না,—দ্রুতপদে চলিয়া গেল। আমাদের অনেকেই কাঁদ-কাঁদ হইয়া গেলাম। সেই পারুল আমাদের আজ এমনি করিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল, বলিয়া গেল 'brutes!'

পারুলের সঙ্গে আমাদের আর কথা হয় নাই। এর পরে আমরা সাতজন শহরে পরীক্ষা দিতে গেলাম। মাষ্টার মহাশয় আমাদের অভিভাবক রূপে সঙ্গে ছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম, পারুল মিষ্টার শ'এর সঙ্গে পলাইয়া গিয়াছে। মাষ্টার মহাশয়ের কাছে আগেই এই সংবাদ পৌছিয়াছিল। তিনি শহরে থাকিতেই ইস্কুলের জন্য নতুন শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া ছয় মাসের ছুটির বন্দোবস্ত করিয়া আসিলেন।

অনেক কাঁদিয়া আমরা তাঁকে বিদায় দিলাম। সেদিন গাঁয়ের অনেক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণও তাঁকে নিজেদের পুত্রদের শিক্ষার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইল।

যেমন ভাবিয়াছিলাম, ছয় মাস পরেও তিনি আর ফিরিলেন না। কিন্তু, অনেক দিন তাঁর চিঠি পাইয়াছি, তাঁকে চিঠিও লিখিয়াছি। শেষে ভুলিয়া গেলাম। শুধু অনেক বৎসর পর্য্যন্ত বৎসরান্তে দেখিতাম, তাঁর শুভেচ্ছাসূচক একখানা "খৃষ্টমাস্" কার্ড আসিত।

আজ গাঁয়ের ইস্কুলে কত ছাত্র! আমাদের মিশনারী ইস্কুল উঠিয়া গিয়াছে, আমরা সাতজনে সাতখানে ছড়াইয়া পড়িয়াছি। রহিয়াছে শুধু সেই ফটোখানি—'সাত ভাই চম্পা, আর তার বোন্ পারুল।"

কিন্তু, বহু বৎসরে যাহাদের কথা সরিতে সরিতে মনের একটা অনাদৃত কোণে গিয়া জমা হইয়াছিল, এ পৃথিবীতে হঠাৎ তাদেরও এক-আধজন সেখান হইতে বিনা নিমন্ত্রণে আসিয়া উপস্থিত হইয়া জানায় যে, কাল তাদের একেবারে ঝাঁটাইয়া মন হইতে বাহির করিয়া দিতে পারে নাই। ঠিক তাহাই হইল। পৃথিবীতে এত লোক থাকিতেও হাওড়া ষ্টেশনে দেখা হইয়া গেল—ভায়োলেটের সঙ্গে। ভিড় কম দেখিয়া আমি য়ুরোপীয়দের জন্য নির্দ্দিষ্ট একটা কামরায় ভুলে উঠিয়া পড়িয়াছিলাম। যথা-সময়ে একটা ফিরিঙ্গী ছোকরা এ ভুলটা বেশ সরস করিয়া দেখাইয়া দিল। কিন্তু, আমি ভুল শুধ্রাইব না ঠিক করিলাম। বলা বাহুল্য, একটু গোলমাল হইল; এবং একটি সাহেব কর্ম্মচারী আসিয়া আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া ষ্টেশনের একটি ঘরে লইয়া গিয়া নামধাম লিখিতে লাগিলেন। আমার চারিদিকে অনেক বাঙালী ও ফিরিঙ্গী জড় হইয়াছিলেন। তাঁরা একদল সদুপদেশ দিতেছিলেন, আর দল শাসাইতেছিলেন। একে-একে সবাই চলিয়া গেল, রহিলাম আমি আর সাহেবটি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এখন আমাকে লইয়া তোমরা করিবে কি?" এমন সময় একটি ফিরিঙ্গী মেয়ে-টিকেট-কলেক্টর ঘরে ঢুকিয়া বেশ একটু মোহন হাসি হাসিয়া মিষ্টি সুরে সাহেবটিকে বলিলেন, "মিষ্টার ক্রেগি! আমি এঁকে ছেড়ে দিতে বললে নিশ্চয় তুমি আপত্তি করবে না?"

"না করতেও পারি, যদি বলো যে কেন হঠাৎ এর উপর সুনজর পড়ল।"

"ওঃ! এ যে আমার একজন পুরোনো বন্ধু।"

"আঃ! পুরোনো বন্ধু অনেকটা পুরোনো মদের মত, না?—তা' আপনি যেতে পারেন।"

আমি অবাক হইয়া বলিলাম "আমি যে মহিলাটিকে কোনো কালেও চিনি না।"

"বটে? চিনবে, চিনবে। ভায়োলেটকে মনে পড়ে? —ভায়োলেট্—রেভারেণ্ড রে'র মেয়ে?"

"রেভারেণ্ড রে'র মেয়ে?—তুমি পারুল এখানে?"

"হাঁ, চলো, আমাদের বিশ্রামঘরে—সেখানে কথা হবে।" সে ফিরিয়া সাহেবটিকে বলিল, "ধন্যবাদ তোমায় ক্রেগি।" সাহেব চোখের কোণে বেশ একটু হাসিয়া বলিল, "আশা করি, সময়টা তোমার ভালোই কাটবে, মিস্ রে।"

বিশ্রাম ঘরে বসিতেই পারুল বলিল,

"তার পর, বেশ ফ্যাসাদ ত বাধিয়ে বসেছিলে।"

"কিন্তু তুমি এখানে কবে থেকে? মাষ্টার মশায় কোথায়?"

"খৃষ্টানের আকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুই তিনি লাভ করেছেন। ছোটনাগপুরে সাঁওতালদের ভিতরে পাঁচবছর হল তিনি মারা গেছেন ”

"আর তুমি? তুমিও আশা করি, খৃষ্টানের আকাঙ্ক্ষিত জীবনই যাপন করছ।—ভালো, তুমি এখনো মিস্? তা হলে তোমার এখনো বিয়ে হয় নাই?"

"বিয়ে হবে কি?—আমি কি এখনি বুড়ী হয়েছি যে আমায় একজন খাওয়াবার লোকের দরকার?"

"আমরা ভেবেছিলুম মিষ্টার শ-এর সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে।"

"মিষ্টার শ?—তোমাদের যেমন কথা—তার সঙ্গে ত আমার অল্প কয়মাস পরেই ছাড়াছাড়ি হয়।"

"দেখ, বলেছিলুম না আমরা, তুমি মিষ্টার শ'কে চেন নাই,—সে একটা অপদার্থ 'ফ্লার্ট'।"

"ঠিক তাই।—আমি তা জানতুমও। তবে কি জানো,—We always like a flirt, for he understands—ফ্লার্টদের সবাই ভালবাসে,—তারা যে আমাদের ধাৎ চেনে।"

"তবে ছাড়াছাড়ি হল কেন?"

"তারও বোঝা টান্‌বার মত সাধ ছিল না, আমারও কারুর বোঝা হওয়ার মত সাধ ছিল না।"

আমি আর দাঁড়াইলাম না।—একটি ট্রেণের বাঁশী বাজিয়াছিল। আমি বলিলাম, 'এ কোন্ গাড়ী?' সে নাম বলিল। বলিলাম, "ক্ষমা করো, এ গাড়ীটায় আমার না গেলেই নয়। চললুম।"

"কিন্তু, তুমি কি করছ, কোথা থাক—কিছুই বললে না যে।"

"সে সময় আজ আর নেই। ক্ষমা করো।"

"আচ্ছা, তবে গুড্‌বাই—কাল দেখা হবে,—বিকেলের সেই গাড়ীতে?"

"গুড্‌বাই পারুল—গুড্‌বাই ভায়োলেট। দেখা না হতেও পারে। কিন্তু, তুমি আমায় রক্ষা করেছ। আমার আন্তরিক ধন্যবাদ নিয়ো।" বলিয়া আমি তাড়াতাড়ি ছুটিয়া পলাইলাম।

বাড়ী ফিরিয়াও দেখিতেছি, সেই ফটোর মধ্যে সাতটি বালক ও একটি বালিকা তেমনি আগেকার মত হাসিতেছে!

পরাস্ত-প্রভাত

শ্রীনরেন্দ্র দেব

ব্যর্থ নিশার ব্যথার বেদন যত
বুদ্‌বুদেরই মতো
নৃত্য-চপল চরণ-তলে জয়োল্লাসে দ'লে
আস্‌তো যেন চলে
রাতের পরে রাত
দিগ্বিজয়ী দস্যুসম নিত্য অকস্মাৎ
তার জীবনের চমক-ভাঙা দিন—
প্রফুল্ল নবীন!
ভোরের হাওয়ায় ঢেউয়ের তালে ভেসে
উঠ্‌তো রোজই হেসে
তরুণ রবি অসীম আকাশ বেড়ে;
অরুণ-রাঙা উত্তরী তার দিগন্তরে নেড়ে
আলোর নিশান হেন
ব'ল্‌তো—"সখি, ঘুমিয়ে আছ কেন,
উঠবে না কি আজ?
গা' তোলো গো, রাত পোহালো, খোলো মলিন-সাজ।

চেয়ে দেখনা পদ্ম-আঁখি মেলি
পাঠিয়েছেন এই ঊষা রাণী
রাজেন্দ্রাণী
আবির-গোলা আশ্‌মানী তাঁর চেলী!
ঘর ছেড়ে ওই আঙিনাতে বেরিয়ে এস বালা,
কণ্ঠে তোমার দুলিয়ে দেবো কিরণ-কমল-মালা!
নীল গগনের গৌরী-শৃঙ্গে—
সূর্য্যসুধার উৎসারিত ধারায়
ঝাঁপিয়ে প'ড়ে জ্যোতির কণা পথ বুঝি বা হারায়!

ঘুরছে তারা ব্যাকুল হ'য়ে চতুর্দ্দিকে ওই,
তোমায় খুঁজে সই,
সাত-রঙা কোন্ সাগর-তলে আলোক হ্রদে ডুবে
দিগ্বধূদের মুখ উঠেছে লাল্‌চে আভায় ছুবে!
ওই দেখনা বনাঙ্গনা যত
প্রভাতের ওই তীর্থ-নীরে স্নান ক'রে সব পূজারিণীর মতো
এলিয়ে দিয়ে পিঠের ওপর শিশির-ভেজা চুল
তুলছে এসে ফুল,
দেবার্চ্চনের স্বর্ণ-সাজি পূর্ণ সবার হাতে;
ধরণী তার দূর্ব্বা-শ্যামল কোমল আঁচলখানি
তোমার দু'টি চরণ ত'লে বিছিয়ে দিয়ে রাণী,
দাঁড়িয়ে আছে অধীর হ'য়ে আকুল অপেক্ষাতে!
শুন্‌ছো নাকি বাতায়নের দ্বারে—
ডাক দিয়ে ওই ফিরছে বারে বারে,
অতিথি আজ কত?
কণ্ঠে তাদের বাজ্‌ছে অবিরত
ভোরাই সুরে নিশি শেষের তান
দল বেঁধে যে গাইছে তারা, তোমারই আজ আগমনীর গান!
সুন্দরী লো, শুধু তোমার লাগি
রাত পোহাবার আগেই তারা উঠেছে সব জাগি;
সবাইকে সই হতাশ ক'রে
থাকবে কি গো দূরে স'রে
এমনি ক'রে দিনের পরে দিন
তরুণ তোমার জীবনটাকে ক'রবে শুধুই ক্ষীণ
বঞ্চনা আর ত্যাগের কশাঘাতে!
কী অধিকার আছে তোমার তাতে?
অপ্সরী এই ধরণী তার নিয়ে সকল শোভা
ওগো মনোলোভা,
চাইছে তোমায় বাসতে শুধুই ভালো;
রুদ্ধ তোমার আঁধার ঘরে
একটি শুধু নিমেষ তরে—
প'ড়বে না কি হায়,
দীপ্ত-প্রাণের তৃপ্ত-করা আলো?

রক্ত-রাঙা রঙ্‌মহলের খুল্‌বে না কি রহস্যময় দ্বার,
কে নিয়েছে ছিনিয়ে তোমার বাদ্‌শাজাদীর বিপুল অহঙ্কার?
হৃদয়ের এই আদিম সূর্য্যোদয়ে
কোন্ অবিচার অত্যাচারের ভয়ে,
লুকিয়েছো সই, স্নেহের পরশ হ'তে
যৌবনের এই উৎসবময় শ্রেষ্ঠ-তোরণ পথে
কে ছড়ালো এমন ক'রে নিষেধের এই তীক্ষ্ণ কুটিল কাঁটা?
তাই বুঝি আজ সকল দুয়ার আঁটা;
তোমার ঘরে লুকিয়ে আছে দুখের পারাবার!
দৃষ্টিহীনের সৃষ্টিছাড়া গভীর অন্ধকার
নিবিড় কুজ্ঝটিকা—
আড়াল ক'রে ফেল্‌ছে তোমার জীবনদীপের শিখা?
চারপাশে আজ তাই কি অনিবার
তীব্র নিরাশার
গুমরে মরা জমাট অশ্রু যত
উঠ্‌ছে কেবল জমেই ক্রমাগত?
শাসন-শেলের শূলের আঘাত তীক্ষ্ণ সূচীর ধার
কঠোর অত্যাচার
নিত্য নব নব
সহ্য ক'রে অকাতরে তরুণ হৃদয় তব
অনির্দ্দিষ্ট পরকালের কাছে
ব্যর্থতারই সার্থকতা আপন-ভুলে সঙ্গোপনে যাচে!

* * * *

প্রভাত অরুণ দারুণ হতাশায়
সারা দিনটাই কাটিয়ে অপেক্ষায়
ম্লানমুখে হায়, নিত্য ফেরে অস্তাচলের পানে;
বেলা শেষের গানে
গোধূলি যায় সোণার গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে দ্বারে;
রুদ্ধ বুকের অর্গলিত তোরণ-সীমার পারে
ঝল্‌মলিয়ে উঠ্‌ছে শুধু বৃথাই বারম্বার
সন্ধ্যারাণীর উতল করা উজ্জ্বল উপহার!

পিয়ারী

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল

১৬

বেলা তখন পড়িয়া আসিয়াছে, অমল ডাকিল,—চপলা...

পাপিয়া কহিল,—কি ?

অমল কহিল,—আমার হাত ধরে একটু গঙ্গার ধারে নিয়ে যাবে ? সেই যে বড় জামগাছটার নীচে একটা ভাঙ্গা চাতালের মত আছে···সেইখানে একটু বসবো...

পাপিয়া কহিল,—চল।

অমলের হাত ধরিয়া পাপিয়া বাহিরে গঙ্গার তীরে চাতালে আসিয়া বসিল। নদীতে ভাঁটা পড়িয়াছে, জলের সে কলরব থামিয়া গিয়াছে—শান্ত মৃদু উচ্ছ্বসিত ছোট ঢেউগুলি···জোয়ারের খেলার পর বায়ুস্পর্শে যেন শ্রান্তিতে ঝিমাইয়া পড়িয়াছে !...

অমল বলিল,—এমন করে কেন তুমি বন্দী হয়ে রইলে চপল!···একটা অন্ধ কাঙালের সেবায় সব ত্যাগ করলে !

পাপিয়া কহিল,—এ ত্যাগের মধ্যে সুখ পাচ্ছি বলেই না পড়ে আছি !

—কিন্তু আমি যে পদে পদে ক্ষুণ্ণ হচ্ছি, আমার যে বেদনার সীমা থাকচে না।...আমি ভাবতুম, সেজে যারা অভিনয় করে, তাদের প্রাণ নেই, মন নেই...নানা ভূমিকার ছদ্মবেশে মানুষকে ছলনায় প্রতারিত করাই তাদের একমাত্র কাজ ! মানুষের সুখ-দুঃখের পানে তারা ফিরেও চায় না...নিজেদের যশ আর অর্থই তাদের জীবনের কাম্য···

পাপিয়া নিশ্বাস চাপিয়া কহিল,—সে কথা মিথ্যেও নয়···

—কিন্তু তুমি তা মিথ্যে প্রমাণ করেছ !...

পাপিয়া বক্র কটাক্ষে অমলের পানে চাহিল, তার পর কহিল,—এ জেনেও আমার উদ্দেশে তোমার মনকে এমন ছন্দে গানে ভরিয়ে তুলেছিলে ?

অমল কহিল,—কি জানি, তোমার কথা মনে হলেই কে যেন আমায় বলতো, তুমি ওদের মত নও,—তুমি ওদের ঢের উর্দ্ধে, ওদের সঙ্গে তোমার কোথাও মেলে না।···তুমি মন দিয়ে অপরের মন বোঝো, তোমার চোখের দৃষ্টি মানুষের বাইরেটাকে ফুঁড়ে ভেতর অবধি যায়, তার বিপুল দরদ আর সহানুভূতি নিয়ে তার ভিতরকার সমস্ত জিনিষ, তার দোষ-গুণ, তার যা কিছু খুঁটিনাটি সব নিরীক্ষণ করতে, বুঝতে,...তা না হলে অভিনয়ে এতখানি কৃতিত্ব কি তোমার সম্ভব হতো ! যে নিজেকে ভুলে পর হয়ে পরকে মনে-প্রাণে না নিতে পারে, আত্মভোলা-ভাবে পরের সুখ-দুঃখের অমন জীবন্ত ছবি সে কখনো ফুটিয়ে দেখাতে পারে !...

পাপিয়ার বুকে অমলের প্রতি কথা তীক্ষ্ণ ছুঁচের মত ফুটিতে লাগিল—বুক তার রক্তে রক্তময় হইয়া উঠিল। এত দরদ, এত শ্রদ্ধা !...চপলা পরের সুখ-দুঃখ বোঝে ?...বটে ! আর পাপিয়া,...যার পানে নির্ম্মম নিয়তির মত তোমার ঐ ক্রূর উপেক্ষার দৃষ্টি...সে পাষাণ, পাষাণ, পাষাণই বটে ! ...হায় অন্ধ, তুমি আজ চোখ হারাইয়া অন্ধ হও নাই, চোখ থাকিতেও তুমি অন্ধ ছিলে, চিরদিন অন্ধ ছিলে, নহিলে সেই শয়তানীর জয়-গানে আজো তোমার কণ্ঠ এমন উচ্ছ্বসিত হয় !

অমল কহিল,—এ কি আমার ভুল, চপলা ?···প্রশ্ন করিয়া সে হাসিল। পরে কহিল,—ভুল নয়। না হলে আমার তুচ্ছ দুটো কবিতা তোমায় এত মুগ্ধ করেচে যে তুমি তোমার প্রাসাদ ছেড়ে ভোগ-বিলাস ছেড়ে এখানে এসেচ ! অন্ধতাকে ঘিরে এমন করে পড়ে থাকো !...আমি অন্ধ বটে, কিন্তু মন আমার আলোয় ভরপুর ··

পাপিয়া বলিল,—কিন্তু এ তো শুধু দয়া নয়...

অধীর আবেগে অমল কহিল,—তবে···তবে এ কি চপল ?

পাপিয়া কহিল,—আমি তোমায় ভালোবাসি।...অধীর

হয়ো না, সত্যই ভালোবাসি। তুমি অন্ধ, তুমি কাঙাল,...রূপ, যৌবন, শ্রী...তোমার চেয়ে অন্য পুরুষের আরো মধুর হয়তো .. কিন্তু এ-সবের জন্যে ভালোবাসিনি, তোমার কবিত্বে মুগ্ধ হয়েও তোমায় আমি ভালোবাসিনি···শুষ্ক নিশ্বাসে পাপিয়া এতখানি বলিয়া যেন ফুঁসিতে লাগিল। আর অমল? তার বুকের মধ্যে যেন প্রলয়ের রোল···বুক বুঝি ফাটিয়া যাইবে! এ কি, আনন্দ, না, উত্তেজনা, না, কি এ···!

অমল কহিল,—বল, চপল, বল, কেন তবে ভালো-বেসেচো?···আমি তো তোমার ভালবাসার যোগ্যও নই···তবু তোমার এ ভালোবাসা···

দলিত মনের রুদ্ধ অভিমান ঝড়ের বেগে গর্জ্জিয়া উঠিল। উত্তেজিতভাবেই পাপিয়া কহিল,—তা জানি, তুমি যে এ ভালোবাসার যোগ্য নও, তা জানি...তবু যে ভালোবেসেচি, তবু যে তোমার পাশ ছেড়ে নড়তে পারি না, এ তোমার নিষ্ঠায়...যে-আশা পূর্ণ হবার কোন সম্ভাবনা নেই, সেই আশাকে সম্বল করে এমন ভাবে একান্ত নিষ্ঠায় ধ্যানমগ্ন থাকা...ওঃ ভগবান্, এ পাগল ছাড়া আর কেউ করে না!···বলিতে বলিতে তার মন সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া আর্ত্ত হাহাকারে ফাটিয়া পড়িল, তার প্রাণের কূল ভাঙ্গিয়া, তাকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া...।

পাপিয়া বলিল,—এ পাগলকে ভালোবাসা...আমারো এ পাগলামি ছাড়া আর কি! পাগল! এই নিষ্ঠাই আমায় পাগল করেছে,...আমায় ধুলোয় লুটিয়ে দেছে! না হলে আমার একটা ভ্রূভঙ্গীর জন্য, আমার এক ফোঁটা হাসির জন্য কত রাজা-মহারাজা এসে আমার পায়ে কেঁদে পড়েছে ...আমি ফিরে চাইনি! আর আজ...? আমি পাগল। পাগল না হলে এমন হয় ...!

বলিতে বলিতে পাপিয়া শিহরিয়া উঠিল, এ কি, এ সে কি বলিতেছে!···এ-সব কথায় আত্মবিস্মৃতির ঘোরে এখনি যে সে নিজেকে মুক্ত প্রকাশ করিয়া ফেলিবে, আর তাহা হইলে এই প্রীতি, এই আদর কোথায় উবিয়া যাইবে বাষ্পের মত! সঙ্গে সঙ্গে তাকেও এই দণ্ডে উপেক্ষার বাণে জর্জ্জরিত হইয়া দূরে সরিয়া যাইতে হইবে!···

অমল বিস্ময়ে অভিভূত হইল। এ নারীর এই সেবা, এই প্রীতি-ভালোবাসা, তার মধ্যে এ কি এ এক-কোণে মাথা গুঁজিয়া আছে' এর এ ভালোবাসা, এ কি তবে পাগলের খেয়াল?···

অমল ক্ষুণ্ণ হইল। এ সেবা তবে সে নিঃস্ব বলিয়া নয়, অন্ধ বলিয়া নয়—এ সেবা দরদী চিত্তের স্বতঃ-উৎসারিত দরদের জন্যও নয়! এক বাতুল নারীর বাতুলতা মাত্র, খেয়াল শুধু? এই খেয়ালকেই অন্ধ সে এ-ভাবে নির্ভর করিয়া আঁটিয়া ধরিতেছে!···তার পর জোয়ারের উচ্ছ্বসিত জলের মতই ঐ নারীর এ খেয়াল যখন চলিয়া যাইবে, তখন সে আরো নিঃস্ব আরো কাঙাল হইয়া একেবারে দুর্ভাগ্যের রসাতলে গড়াইয়া পড়িবে যে!···

অমল কহিল,—আমায় মাপ কর, চপলা!...এ খেয়াল তোমার শান্ত কর। অন্ধ আমি, কৃপার পাত্র। তোমার ভালোবাসা কামনা করবো, এত-বড় ভাগ্যও করিনি আমি!...তবু অন্ধ কাঙাল বলে এইটুকু দরদ কর আমায়, যে, মিথ্যা মরীচিকার পিছনে আমার লুব্ধ মনকে আর অগ্রসর হতে দিয়ো না—তাতে আমার ক্ষোভের সীমা থাকবে না!...আমি কাঙাল, আমার এ অন্ধতা নিয়ে আমার এই জীর্ণ ঘরে একলা পড়ে থাকি, তাই আমায় থাকতে দাও, তোমার প্রসাদের লোভে আমায় ক্ষিপ্ত করে তুলো না আর!...নিরাশায় আমি মরে যাব, বুক ফেটে মরে যাবো··এটুকু দয়া কর...। আমি তোমার কাছে কোনো অপরাধ করিনি তো ..তুমি যাও, এ হীন দারিদ্র্য, এ কুৎসিত আবহাওয়া ছেড়ে ফিরে যাও তুমি তোমার ঐশ্বর্য্য-ঘেরা যশের সৌরভে-ভরা তোমার সোনার প্রাসাদে,...

অমলের প্রাণের কাতরতা তার নিরুপায় অসহায় অন্ধতার বেদনা এ কথার মুখে অঝোরে ঝরিয়া পড়িল। পাপিয়া নিজেকে কশাঘাত করিল। নিজের প্রেমের দর্পে এমনি স্পর্দ্ধিতা তুই নারী, যে পরের ভূমিকায় দুর্ভাগ্যের রসাতলে পড়িয়াও এই রোষের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছিটাইতে তোর ভরসা হয়!···তুই চোর, চুরি করিয়া এ কথা এভাবে আদায় করিতেছিস্, ধরা পড়িলে তোর যে আর গতি থাকিবে না!...তা ছাড়া এ কি অন্ধকে প্রীত করিবার জন্যই তুই এখানে পড়িয়া তার সেবায় নিজেকে আজ জুড়িয়া দিয়াছিস্, না, এ সেবায় নিজে তুই

তৃপ্তি পাস!...আর শুধু কি তাই? এ তো হিংসা, তোর প্রবল হিংসা তোকে এখানে আটকাইয়া রাখিয়াছে। পাছে চপলা কোনো মুহূর্ত্তে এখানে আসিয়া এই প্রেম, এই প্রীতি পুরাপুরি ভোগ করিয়া তার কালিমাখা জন্মটার কালি মুছিয়া সাফ করিয়া তাকে চরম সার্থকতায় ভরিয়া তোলে, এই হিংসাতেই না তোর এখানে পড়িয়া থাকা! ইহার জন্য আবার চোখ রাঙাইয়া পরকে অনুযোগ জানাস্! হারে দুর্ভাগিনী, মূঢ় নারী!

মানগোবিন্দর কথা অমনি তার মনে পড়িয়া গেল। পরকে তৃপ্তি দিয়া তবে নিজের তৃপ্তি! ঠিক্, এই তো প্রেম, ইহাকেই তো বলে ভালোবাসা। না হইলে নিজের সুখ কে না চায়, নিজেকে ভালো কে না বাসে! নিজের কথা ভুলিয়া পরকে ভালো যে বাসিতে পারে, সেই তো প্রেমিক, সেই তো ভালোবাসিবার অধিকারী, ভালোবাসা পাইবার অধিকারও শুধু তারই আছে!...ঠিক, ঠিক! পাপিয়া সবলে নিজের মনকে চাপিয়া মাড়াইয়া ধরিল! তার পর ঝড়ের মত একটা মস্ত নিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল—আমায় মাপ কর, ক্ষমা কর, আমার অপরাধ হয়েছে। ওগো, আমি মিথ্যা অভিমানে মিথ্যা কথা বলেছি। তোমায় আমি ভালোবাসি, ভালোবাসি, প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি। আমি মলে তুমি যদি সুখী হও, তাহলে এই দণ্ডে মরতেও আমি প্রস্তুত আছি···

অমল কহিল,—অভিমান!...কিসের অভিমান চপল?

পাপিয়া হাঁফাইয়া উঠিয়াছিল। সে শ্রান্তি-ভরা আর্ত্তস্বরে কহিল,—কিছু না, ওগো, আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করো না··কিছু না। আমি নিজেকে বুঝতে পারছি না। ...আমার আমি বলে কিছু আর রাখতে চাই না। আমি তোমার, তোমার দাসী, সেবিকা,...তোমার ঐ পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে থাকবার ধুলো-মাটী আমি···

অমল কহিল,—আজ আমার বড় দুঃখ হচ্ছে চপলা, যে, আমি অন্ধ, আমার চক্ষু হারিয়েছি। আজ যদি দৃষ্টি থাকতো, তাহলে আমার বুকের উপর তোমার ঐ মুখখানি তুলে নিয়ে দেখতুম, মুখের কথা বন্ধ রেখে আকুল চোখে শুধু তোমায় দেখতুম···ভগবান চক্ষু কেড়ে নিয়ে তবে তোমায় এনে দিলেন!...এ তাঁর কি নিষ্ঠুরতা, চপল!···

চক্ষু! দৃষ্টি! সর্ব্বনাশ! এ কথা মনে হইতেই পাপিয়ার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। ঐ চোখে দৃষ্টি থাকিলে, আজ কোথায় থাকিত সে, আর অমলই বা এ প্রীতির উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইতে পারিত কি! দুইজনকেই নৈরাশ্যে পীড়িত হইতে হইত! একজন ঘরের কোণে বসিয়া নৈরাশ্যে দহিয়া দহিয়া কবিতা লিখিত, আর একজন...সে যে কি করিত, তা সে বুঝিয়া পাইল না! ঐ হট্টগোল, ঐ কোলাহল···না, না, সেখানে থাকা সম্ভবও ছিল না! সে... সে তাহা হইলে পাগল হইয়া যাইত, হয়তো নিজের গলা টিপিয়া নিজেকে হত্যা করিত! এত-বড় নৈরাশ্যের কথা মনে হইলে পৃথিবী যেন পায়ের তলা হইতে সরিয়া যায়—একটা গহ্বর...তার বিরাট অতলতার মাঝে তাকে যেন গ্রাস করিতে চায়!

অমল কহিল,—চোখ কি হয় না আমার, চপলা?··· এমন কি কেউ নেই...আমি তো জন্মান্ধ নই! তা যদি পারো চপলা, আমার এ দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে—তাহলে তুমি যেই হও, আমি তোমার পায়ে আজীবন বিকিয়ে থাকি!

আবার শিহরণ!...পাপিয়া কহিল,—আমি যে-ই হই...? তার বুক সঘন স্পন্দিত হইল। সে বলিল—যদি চোখ মেলে দ্যাখো, আমি তোমার সে ধ্যানের চপলা নই···? আমি...আমি···

না, না, ওরে মূঢ়, ওরে বাতুল, ও নামও নয় এখনি সংশয়ের বানে তোর সব যাইবে।

অমল হাসিয়া কহিল—কে তুমি?

প্রাণপণ-শক্তিতে কণ্ঠস্বর সহজ করিয়া পাপিয়া কহিল —যে-ই হই—যদি চপলা না হই···?

হাসিয়া অমল কহিল,—যে হও তুমি, আমি তোমার এই সেবা, এই দরদ, এতেও যদি আমি নিজেকে তোমার হাতে সমর্পণ না করি, তাহলে কি আমি মানুষ থাকবো চপলা? একটা কৃতজ্ঞতাও কি নেই আমার···?

পাপিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল,—কৃতজ্ঞতা!

অমল কহিল,—কথার কথা বলছি! কিন্তু এ তো কৃতজ্ঞতা নয়—এ ভালোবাসাই। এত দিন একসঙ্গে থেকে আমরা দুজনে দুজনকে যেমন চিনেছি, এমন চেনা অনেক স্বামী-স্ত্রীরও ঘটে না যে!...তবে আমি দুঃখী, কাঙাল·· আমার তো কোনো দামই নেই, গ্রহণ করার যোগ্য আমি নই!

পাপিয়া কহিল,—মানুষ মানুষকে গ্রহণ করে বুঝি তার টাকাকড়ি আর প্রাসাদ-ভবন দেখেই?···না। মনই মানুষের একমাত্র দাম!...এক-একজন মানুষের মনের দাম এত বড় যে তার পাশে বড় বড় রাজার রাজকোষও মলিন তুচ্ছ হয়ে পড়ে...অবশ্য নারীর কাছে, নারীর প্রেমের কাছে!

অমল কহিল,—আর তুমিও সেই নারী, যার মন কেনবার মত মূল্য কোনো মহারাজের রত্ন-ভাণ্ডারও জুগিয়ে তুলতে পারে না!···তুমি যেই হও চপলা, তুমি নারী, আমার বন্ধু, আমার প্রাণের একমাত্র স্বজন···আমি অন্ধই থাকি, আর আমার চোখই ফুটুক, তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে জেনো, আমি তোমার চির-জীবনের সাথীই থাকবো।...

—থাকবে? থাকবে?...সত্য বলছো? অধীর উত্তেজনায় পাপিয়া যেন পাগল হইয়া উঠিল।

অমল কহিল,—এর চেয়ে বড় সত্য আর নেই!···

—বেশ, তাই হবে। আজ থেকে আমার এক লক্ষ্য, কি করে তোমার ঐ দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনবো...

অমল স্তব্ধ হইল। সে ভাবিল, তবে কি এ চপলা নয়, সত্যই?...না হইলে, এ-সব প্রশ্ন? এ প্রশ্নের অর্থ কি?... কিন্তু কে এমন বাতুল নারী আছে, যে তার মত অন্ধ কাঙালকে এমন ভালবাসিয়া তার সেবায় নিজেকে এমন উৎসর্গ করিয়া দিয়াছে!...অথচ, এ নারী অগাধ পয়সার মালিক! অমলকে রাজার সুখে রাজার ঐশ্বর্য্যে রাখিয়াছে! ...অমলের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না।...

১৭

পরের দিনের কথা। অমলকে খাওয়াইয়া নিজে কোনমতে মুখে দুটী ভাত গুঁজিয়া পাপিয়া বাহির হইল কলিকাতায় ডাক্তারের সন্ধানে। অত করিয়া বলিয়াছে, যদি চোখ সারে! আহা অন্ধ, বেচারা! সেই সঙ্গে এ কথাও মনে হইল, চোখের দৃষ্টি ফিরিলে তার জীবনের সাধ যদি একেবারে চূর্ণ হইয়া যায়? সেবার এ আনন্দ ধূলায় লুটাইবে। জন্মের মত এ ঘর হইতে তাকে বিদায় লইতে হইবে!...হোক্ তা! তাই বলিয়া স্বার্থপরের মত শুধু নিজের তৃপ্তি-সুখের জন্য ইহাকে অন্ধ রাখিয়াই দিবে। দিবানিশি এ ছলনার ছদ্মবেশে অভিনয় করাতেও আর রুচি নাই। তার চেয়ে কঠিন সত্য যদি আঘাতে চূর্ণ করিয়া দেয়, সেও ঢের ভালো!

কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে সে নিজের গৃহে গেল—পরে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া একটা লোক সঙ্গে করিয়া একেবারে মেডিকেল কলেজে আসিয়া উঠিল।...চোখের হাসপাতালে খোঁজ করিয়া, কলিকাতায় যতগুলি চোখের ডাক্তার আছেন সকলকে ডাকিয়া দেখাইবে, যিনি সারাইতে পারিবেন, তাঁর পায়ে অনেক টাকা সে ঢালিয়া দিবে!···

সেই দিনই চার-পাঁচজনের সঙ্গে সে কথাবার্ত্তা কহিয়া আসিল, কাল তাঁরা সকালে কাশীপুরে গিয়া রোগী দেখিয়া আসিবেন।···

যথাসময়ে ডাক্তারেরা আসিয়া চক্ষু পরীক্ষা করিলেন। তাঁরা বলিলেন, একটা অস্ত্র করিলে সারিতে পারে। তবে বলা যায় না, হয় সারিবে, নয়তো জন্মান্ধই থাকিয়া যাইবে।...আশঙ্কা আছে—তবু এখন যা আছে জন্মান্ধ হইলে তার চেয়ে বেশী ক্ষতিই বা কি হইবে!...পরামর্শ করিয়া সকলে স্থির করিলেন, বাড়ীতে এত-বড় অস্ত্র করায় খরচ ঢের হইবে, তাছাড়া তাতে অসুবিধাও আছে বিস্তর!

পাপিয়া কহিল,—তা হাসপাতালে আলাদা ঘর তো ভাড়া নেওয়া যেতে পারে?

ডাক্তার বলিলেন,—পারে।

পাপিয়া কহিল,—তার বন্দোবস্ত তবে করুন; যত টাকা খরচ লাগে...

তাহাই ঠিক হইল। কটেজ হাসপাতালে দোতলা কামরা ভাড়া লওয়া হইল। এবং অমলকে লইয়া পাপিয়া একদিন সেখানে আসিল।...তারপর অস্ত্র!···

অমল ডাকিল,—চপলা···

পাপিয়ার বুক উদ্বেগে আশঙ্কায় কাঁপিতেছিল। কোনমতে সে কহিল,—কি? ইহার বেশী আর একটা কথাও তার মুখে ফুটিল না।...সে শুধু সকাতরে ভগবানকে ডাকিতেছিল—হে ঠাকুর, রক্ষা কর।

অমল বলিল,—যদি এই সঙ্গে জন্মের মত জ্ঞান হারাই, আর জ্ঞান ফিরে না আসে···?

পাপিয়া কাতরভাবে অমলকে জড়াইয়া ধরিল, আর্ত্ত

স্বরে কহিল,—ওগো, না, না, অমন কথা বলো না গো! আমার এ সাধনা কি নিষ্ফল হবে?···

—যদি হয়···?

—না, না, হবে না তা! পাপিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিল।—তা হতে পারে না। আমার প্রাণ বলচে, তুমি সেরে উঠবে—চোখে অজস্র আলো নিয়ে, নতুন দীপ্তি নিয়ে তুমি জেগে উঠবে—ওগো, আমি যে কাতরভাবে তাঁকে ডাকচি। তাঁর পায়ে কি সে ডাক পৌঁছুবে না? সত্যই তিনি বিমুখ হবেন?···না, না, এত নির্দ্দয় তিনি হতে পারেন না! তিনি যে দয়াময়, বিশ্বের ভগবান তিনি—

—তাই হোক্ চপলা! অমল একটা নিশ্বাস ফেলিল। তারপর ডাকিল—চপলা—

—কেন?

—আমার একটা কথা রাখবে...?

—কি...?

—আমার মন বড় ব্যাকুল হয়েছে, তার স্পর্দ্ধাও সীমা লঙ্ঘন করতে চায়, চপলা······

পাপিয়া বিস্ময়াকুল নেত্রে অমলের পানে চাহিল।

অমল কহিল,—জীবনের এ চরম ক্ষণ, চপলা। তাই······

পাপিয়া কোন কথা বলিল না, স্থির দৃষ্টিতে শুধু অমলের পানে চাহিয়া রহিল।

অমল বলিল,—যদি যেতেই হয়, তো পাথেয় কিছু দাও, যা পেয়ে মনে ভাবতে পারি, এ জীবনটা আমার একেবারে ব্যর্থ হয় নি······তার অন্তিম ক্ষণটুকু সার্থকতায় ভরে উঠেছিল...

পাপিয়া অমলের পাশেই দাঁড়াইয়াছিল। অমল হাত বাড়াইয়া পাপিয়াকে আঁকড়িয়া ধরিল। তার পর বিপুল আবেগে তাকে বুকের মধ্যে টানিয়া তার অধরে চুম্বনের পর চুম্বন করিল। পাপিয়া নড়িল না, বাধা দিল না—তার চেতনা যেন বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। সে যেন কোন্ আশার অতীত স্বপ্নলোকে উধাও ভাসিয়া চলিয়াছিল!...তার নারীত্ব সার্থকতায় ভরিয়া বিপুল মহিমায় তাকে এ ধূলি-জর্জ্জর মলিন মর্ত্ত্যলোক হইতে অনেক উর্দ্ধে তুলিয়া লইয়াছিল!···

ডাক্তার আসিয়া রোগীকে অচেতন করিয়া তার চোখে অস্ত্র করিলেন। সে এক ভীষণ মুহূর্ত্ত!···পাপিয়া আর্ত্তের মত দাঁড়াইয়া ছটফট্ করিতে লাগিল, চোখে তার এক বিন্দু জল নাই!...সে কেবলি ডাকিতেছিল, ঠাকুর, হে ঠাকুর, রক্ষা কর!

অস্ত্র শেষ হইলে ডাক্তার রোগীর চোখে পটি বাঁধিয়া দিলেন। পাপিয়াকে বলিলেন,—আলো জালবেন, খুব সাবধানে! চোখে আলো লাগলে জন্মের মত চোখ যাবে! আশা হয়, দৃষ্টি ফিরিয়ে পাবেন!···

পাইবেন! ঐ চোখ তার পুরানো দীপ্তিতে আবার ভরিয়া উঠিবে! এই সুন্দর পৃথিবী তার অমল শ্যামল শোভায় ঝল্‌মল্ করিয়া আবার অমলের চোখের সাম্‌নে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, তার প্রাণখানিকে মুগ্ধ আবিষ্ট করিবে! ..

কিন্তু সে...? কঠিন নিয়তি তার ভাগ্যে কি দুঃখই না আনিয়া দিবে! আজ অমল অন্ধ, তাই তার এ সুখ... সে তো জানে, পাপিয়ার নামে কতখানি ঘৃণার বিষ অমলের অন্তরে পুঞ্জিত হইয়া ওঠে! সে কুহকিনী, মায়াবিনী, ডাকিনী, এই মাত্র তার পরিচয় অমলের কাছে! আর চপলা? ক্ষুব্ধ অভিমানের ব্যথায় বুক তার টন্‌টন্ করিয়া উঠিল!... দুই চোখে জলও যেন ঠেলিয়া ঠেলিয়া আসিতেছিল! ··

সংজ্ঞা পাইয়া অমল ডাকিল,—চপল...

পাপিয়া তার হাতে হাত রাখিয়া বলিল—এই যে আমি...

অমল কহিল,—এ যে আরো অন্ধকার, চপল...

পাপিয়া কহিল,—চোখ যে বেঁধে দেছেন ওঁরা...

—কতদিন এমন বাঁধা থাকবে?

—প্রায় একমাস।

—একমাস!...তারপর চোখে দেখতে পাবো...

—পাবে। ওঁরা তো সেই আশাই দিলেন। ওঁরা বললেন, আরো আগে কেন অস্ত্র করা হলো না, তাহলে এত দীর্ঘ দিন কষ্ট করে থাকতে হতো না!

—কিন্তু অন্ধ হয়ে আমার তো কোন কষ্ট ছিল না, চপল,···অমল থামিল, তারপর মৃদু হাসিয়া কহিল,—অন্ধ হয়ে তোমায় পেয়েচি চপল...তুমি আমার এ অন্ধ-নয়নে নয়নের তারা যে...

পাপিয়ার চোখে আবার জলের স্রোত দেখা দিল। এ কান্না কি কোনদিন ঘুচিবে না, ভগবান? এ জীবনটা

বিদায়-ব্যথা (দিবস-সন্ধ্যা)

শিল্পী—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেনগুপ্ত

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

শুধু কাঁদিতেই পাঠাইয়াছিলে!...তখনি মনে হইল, কাঁদিতে হইবে না তো কি! অন্ধ যৌবনের দর্পে প্রাণ লইয়া কি পৈশাচিক খেলাই খেলিয়াছিস্, নারী! নিজের মনটার পানেও ফিরিয়া চাস্ নি! তার যে মৌন আহ্বান ধীরে ধীরে জাগিয়াছিল, তা কানেও শুনিস্ নাই! না শুনিয়া যৌবনটাকে লইয়া ছিনিমিনি খেলিয়াছিস্, নারীত্বকে খর্ব্ব করিয়া লজ্জিত করিয়া কেবলি কালির পঙ্কে ডুবাইয়া ধরিয়াছিস্! শুধু বিলাস-কৌতুক আর টাকাকড়িকেই সম্বল করিয়াছিলি! তার ফল কোথায় যাইবে! নারীত্ব তার সে শোধ আজ কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া লইবে না?...নারীত্ব কি পণ্য, নারীত্ব কি লোকের সাম্‌নে এমনি করিয়া বিকাইবার, না, বিলাইবার বস্তু!...

অমল কহিল—কথা কচ্ছ না যে?

পাপিয়া কহিল,—এই যে আমি।

—তুমি কাঁদচো ·?

গাঢ় স্বরে পাপিয়া কহিল—না। বলিয়া সে চোখ মুছিল।

অমল কহিল,—দেখি...বলিয়া হাত বাড়াইয়া চপলার মুখ স্পর্শ করিল। তার মুখে-চোখে-গালে হাত বুলাইয়া কহিল,—এই যে গাল ঠাণ্ডা, ভিজে বলে মনে হচ্ছে ..

পাপিয়ার চোখ এ কথায় আরো যেন বান ডাকাইল। নিজেকে কষ্টে সম্বরণ করিয়া পাপিয়া কহিল,—না, ও আগে কেঁদেছিলুম...

—কেন কেঁদেছিলে?

—ভাবনা হয়েছিল যে···তোমায় ওঁরা অজ্ঞান করে-ছিলেন যে...যদি জ্ঞান না হয়, তাই···

অমল হাসিল, হাসিয়া কহিল,—তুমি আমার কে যে ছিলে, জানি না। কিন্তু এখন তুমি আমার চোখ, তুমি আমার প্রাণ, তুমি আমার সব!···যদি চোখ ফিরে পাই তো সে তোমারি দয়ায়। তোমার এ ঋণ কি দিয়ে শোধ হবে, চপল?

—শোধ দিতে হবে না গো। ও-সব কথা বলো না আর!···আমার জন্তেই যে তোমার এ দশা, তুমি অন্ধ, এ কথা মনে হলে বুক আমার ফেটে যায়। ইচ্ছে হয়, এ দুই চোখ আমার উপড়ে ছিঁড়ে অত-বড় অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করি···

অমল কহিল,—ছি, তোমার জন্তে আমার চোখ যাবে কেন! আমার অন্ধ আবেগে আমি যদি তখন গাড়ীর পেছনে অমন করে না তাকাতুম, তাহলে বেহুঁসিয়ার হয়ে গাড়ী চাপা পড়তুম না তো!...

—সেও তো ঐ আমাকে দেখবার জন্তেই!...যদি সে রাত্রে তোমায় টিকিট দিয়ে থিয়েটারে না নিয়ে যেতুম...

—তা হোক চপলা, সে আমার জীবনের সুদিন। তোমার করুণা পেয়েছি তাই...এ যে অন্ধ হয়েও দুনিয়া আমি আলোয় আলো দেখচি!···আমার সাধনার ধন, আমার ধ্যানের ধন চপলাকে আমার পাশে অহরহ পেয়েছি···

—আমি সর্ব্বনাশী পোড়ারমুখী, আমাকে অমন করে বলো না, তোমার পায়ে পড়ি।···

—আচ্ছা, সে কথা থাক। যা বলছিলুম···আমার কি মনে হচ্ছে, জানো? কবে এই একমাস পূর্ণ হবে, ডাক্তার চোখের বাঁধন খুলে দেবেন!···আঃ, সে দিন···যেদিন এই চোখের বাঁধন খুলে প্রথম তোমায় দেখতে পাবো···তোমার মুখ, তোমার হাসি...তারপর দিনের আলো, নীল আকাশ···

পাপিয়া কোন কথা বলিল না। হায়, সে সুদিন তার ভাগ্যে কি যে সঞ্চিত রাখিয়াছে, নৈরাশ্যের লাঞ্ছনার ঘৃণার কি অসীম অসহ্য বেদনা!...

অমল কহিল,—এই একমাস এখানেই থাকতে হবে?

পাপিয়া কহিল,—না, অন্তত দিন পনেরো······

অমল কহিল,—তুমি বই আনাও, পড়বে, আমি শুন্‌বো······

পাপিয়া কহিল,—কি পড়বো, বল?

অমল কহিল,—যা হয়...যা তোমার ভালো লাগে···

পাপিয়া কহিল,—বেশ, বেয়ারাকে বলবো,—একটা ফর্দ্দ কর...দোকানে তাকে পাঠাবো। তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে ফর্দ্দ লিখবো......কেমন?

অমল কহিল,—আচ্ছা।

(ক্রমশঃ)

ডালহাউসী ও চাম্বা

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ

ডালহাউসী যাইব বলিয়া এক নিদাঘের অপরাহ্ণে আমরা লাহোর হইতে যাত্রা করিলাম। বাসা হইতে যখন বাহির হইলাম তখন ৮টা বাজিয়া গিয়াছে, কিন্তু লাহোরে তখনও সন্ধ্যা হয় নাই! মোজাংএর বস্তি পার হইয়া, মল্ (Mall) বা "ঠাণ্ডি সড়ক্" পার হইয়া আমরা ষ্টেসনের রাস্তা ধরিলাম। সমস্ত দিন প্রবল গ্রীষ্মাভিতপ্ত হইয়া প্রদোষকালে নাগরিকগণ অগণিত টাঙ্গা এবং মোটরকারে চড়িয়া বায়ুসেবনার্থ লরেন্স গার্ডেন উপবন অভিমুখে চলিয়াছে। টাঙ্গাগুলি ঢং ঢং শব্দ করিয়া ছুটিয়াছে,

ডালহাউসীর একটি বাড়ী (গ্রীষ্মকালে)

মোটরের হর্ণ অনবরত বাজিতেছে, কচিৎ কোন মোটর অত্যন্ত কর্কশ উদ্ধত চীৎকারে পদাতিকগণকে সচকিত করিয়া বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া যাইতেছে। যখন ষ্টেশনে পৌঁছিলাম, তখনও ট্রেণ ছাড়িতে অনেক বিলম্ব। ধীরে সুস্থে টিকিট করিয়া পুল (overbridge) দিয়া বিশাল লাহোর ষ্টেশনের প্লাটফরমগুলি অতিক্রম করিয়া ট্রেণের নির্দিষ্ট কক্ষে আশ্রয় লইলাম।

ডালহাউসী হিমালয় পাহাড়ের উপর একটি শৈলনিবাস। ইহা লাহোরের উত্তরে অবস্থিত। লাহোর হইতে পাঠানকোট পর্য্যন্ত ১০০ মাইল রেলে আসিতে হয়। পাঠানকোট হইতে ডালহাউসী পর্য্যন্ত ৫২ মাইল পার্ব্বত্য পথ, মোটর বা টমটমে আসিতে হয়। ডালহাউসী গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত একটি মহকুমা (subdivision)। ডালহাউসীর চারিদিকে চাম্বারাজ্য। পূর্ব্বে ডালহাউসী পাহাড়টিও চাম্বা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। স্থানটি স্বাস্থ্যকর বলিয়া ইংরেজ সরকার চাম্বারাজ কর্ত্তৃক দেয় রাজকর কমাইয়া তাহার পরিবর্ত্তে স্থানটি অধিকার করিয়া লইয়াছেন। ডালহাউসীর অন্তর্গত বিভিন্ন স্থানের উচ্চতা ৬৫০০ ফিট হইতে ৮০০০ ফিট, অর্থাৎ প্রায় দার্জিলিংএর সমান। ধওলাধর নামক হিমালয়ের অন্তর্গত চিরতুষারাবৃত শৈল-শ্রেণী হইতে যে সকল শাখা পর্ব্বত বিভিন্ন দিকে নামিয়া গিয়াছে, তাহারই পশ্চিম দিকের পাহাড়ের উপর ডালহাউসী অবস্থিত। এই ধওলাধরের শিখরগুলি ১৭০০০-

১৮০০০ ফিট উচ্চ। ইহার এক দিকে চাম্বারাজ্য, অপর দিকে কাঙ্গড়া (প্রাচীন নগরকোট রাজ্য)।

রাত্রি ১০টার পর আমাদের ট্রেণ ছাড়িল। অমৃতসর পর্য্যন্ত Main line ধরিয়া আসিয়া অমৃতসর হইতে পাঠানকোট পর্য্যন্ত ট্রেণ শাখা লাইনে চলিল। যখন পাঠানকোট পৌঁছিলাম, তখনও প্রভাত হয় নাই। প্রভাত পর্য্যন্ত ট্রেণেই বিশ্রাম করিলাম। পাঠানকোট গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত হিমালয়ের পাদদেশস্থিত একটি তহশিল। এখানে যে সকল প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহা দেখিয়া কানিংহাম সাহেব স্থির করিয়াছেন যে, প্রাচীনকালে ১৫ মাইল পূর্বে ডেরানানক নামক স্থানে শিখধর্ম্মের প্রবর্ত্তক নানক শেষ জীবনে বাস করিতেন। এইখানেই তিনি দেহত্যাগ করেন।

পাঠানকোটে স্নান এবং জলযোগ সারিয়া আমরা মোটরে উঠিলাম। দেখিতে দেখিতে ক্ষুদ্র নগরটি ছাড়াইয়া গেলাম। পথের দুই ধারে সুবিন্যস্ত বৃক্ষশ্রেণী। দূরে আকাশের গায়ে পর্বতশ্রেণী দেখা যাইতেছিল। পাঠানকোট হইতে ৬ মাইল দূরে আসিয়া একটি পথ কাঙ্গড়া অভিমুখে, অপর পথ ডালহাউসী অভিমুখে গিয়াছে। এইবার সমতলভূমি ছাড়িয়া পার্বত্য প্রদেশে উপস্থিত হইলাম।
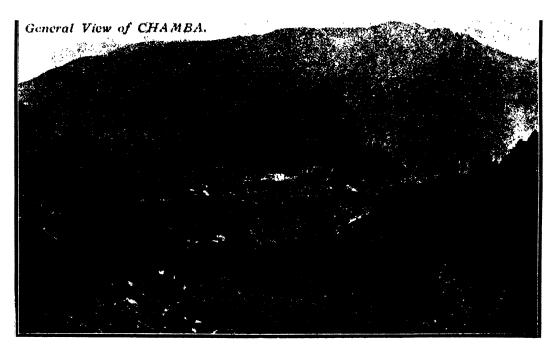
দূর হইতে চাম্বা

উদুম্বরেরা এখানে বাস করিত। তাহারা পুরাণোল্লিখিত ত্রৈগর্ত্তের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। তাহাদের রাজধানী ছিল নূরপুর। পাঠানকোট হইতে কাঙ্গড়া যাইবার পথে প্রাচীন নূরপুর দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। নূরপুরের রাজপুত রাজাদের উপাধি ছিল পাঠানিয়া। তাহা হইতেই পাঠানকোট নামের উৎপত্তি। পাঠানকোট হইতে ৬ মাইল দূরে শাপুরের নিকট রাবী নদীর তীরে গুহার মধ্যে মুখেশ্বরের মন্দির আছে। প্রবাদ এই যে পাণ্ডবগণ ইহা নির্মাণ করিয়াছিলেন। পাঠানকোটের হিমালয়ের পাদদেশে যে অনুচ্চ শৈলশ্রেণী হিমালয়ের সহিত সমান্তরাল ভাবে বিস্তৃত আছে, তাহা শিবালিক পাহাড় নামে পরিচিত। বাঙ্গলা দেশে শিবালিক পাহাড় দেখা যায় না; হরিদ্বারে আসিলে দেখা যায়। আমরা ক্রমে ক্রমে শিবালিকের দুইটি শ্রেণী (ridge) অতিক্রম করিলাম। আমাদের মোটর অনবরত আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিতেছিল; কখনও উপরে উঠিতেছিল, কখনও নীচে নামিতেছিল। চারিদিকে পাহাড়। পথের ধারে কোথাও গভীর খাত দেখা যাইতেছিল। এক স্থান হইতে বহু দূরে

পর্বতের ক্রোড়ে রাবী নদীর প্রবাহ দেখিতে পাইলাম। ঝগুওয়াল, ধর প্রভৃতি ছোট ছোট স্থান অতিক্রম করিয়া বেলা ৯টার পর আমরা দুনেরায় উপস্থিত হইলাম। এ পর্য্যন্ত পথ এত আঁকাবাঁকা যে মোটরের বেগে বমনের উদ্রেক হয়। দুনেরা পাঠানকোট হইতে ২৯ মাইল, এবং ডালহাউসী হইতে ২৩ মাইল। এখান হইতে ডালহাউসী খুব বেশী রকম চড়াই; তাহার উপর পথ অতিশয় সঙ্কীর্ণ। এ জন্য দুইটি মোটর পাশাপাশি যাওয়া বিপদ্‌জনক। সকাল ৮টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত এই পথে মোটর নামিতে পারে, কিন্তু উঠিতে দেওয়া হয় না; ১১টা হইতে ২টা দেবতার মন্দির আছে। এখানে আষাঢ় মাসে একটি বড় মেলা বসে। আমরা যে পাহাড়গুলি অতিক্রম করিলাম, সেগুলি প্রস্তরময়, এবং প্রায় বৃক্ষলতাদিহীন। পথের ধারে বহু নিম্নে একটী স্রোত প্রস্তরাকীর্ণ পথের উপর দিয়া ঝির ঝির করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। পাহাড়ের গায়ে সুবিন্যস্ত সোপান শ্রেণীর ন্যায় ছোট ছোট ক্ষেতগুলি, এবং তাহার পাশে দুই চারিটি কৃষকদের ক্ষুদ্র কুটীর দেখা যাইতেছিল। পথের ধারে মাঝে মাঝে দুই চারিটি দোকানঘর। বেলা ১টার পর আমরা দূর হইতে নিবিড় বৃক্ষলতাসমাচ্ছন্ন ডালহাউসী পাহাড় দেখিতে পাইলাম।

ছা:নি হইতে ডালহাউসী

পর্য্যন্ত মোটর উঠিতে পারে, নামিতে দেওয়া হয় না। এ জন্য দুনেরার ডাক বাঙ্গলোতে আমাদিগকে দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইল। বেলা প্রায় ১১টার সময় উপর হইতে মোটর ও লরি নামিল; তখন আমরা উঠিতে আরম্ভ করিলাম। মোটর বহু আয়াস সহকারে পাহাড়ের পাশ দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপরে উঠিতেছিল। পাহাড়টির শীর্ষে উঠিয়া আবার একটু নামিয়া অপর একটী পাহাড়ে উঠিতে লাগিল। এই ভাবে বাকলো, নাইনিখত, চাণ্ডিয়ারা, ও ভানিখেত অতিক্রম করিলাম। বাকলোতে গোরা পল্টনের একটি ছাউনি আছে। ভানিখেতে প্রাচীন নাগ-

একটু পরে মোটর হইতে নামিয়া পদব্রজে মাইল খানেক পথ গিয়া পূর্ব হইতে স্থিরীকৃত বাসায় উপস্থিত হইলাম।

পোট্রেন, টেহ্‌রা বা মোতিটিব্বা এবং বকরোটা এই তিনটি পাহাড়ের শিরোদেশে ডালহাউসী নগর অবস্থিত ডালহাউসী দার্জ্জিলিংয়ের ন্যায় উচ্চ হইলেও গ্রীষ্মকালে তত ঠাণ্ডা হয় না। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে গ্রীষ্মকালে পঞ্জাবের সমতলভূমি বাঙ্গলাদেশ অপেক্ষা অনেক বেশী গরম হয়। স্থানটি বেশ নির্জন। উপরিউক্ত তিনটি পাহাড়ের চারিদিক বেষ্টন করিয়া তিনটি পথ আছে; সেগুলি মল্ (Mall) নামে অভিহিত। কোথাও

পথ হইতে পঞ্জাবের সমতলভূমি চিত্রিতের ন্যায় দেখা যায়। দুইটি নদী পাহাড়ের পাদদেশ দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া শিবালিক শৈলশ্রেণী ভেদ করিয়া বনানী-শোভিত সমতল-ভূমির উপর দিয়া বিচিত্র গতিতে প্রবাহিত হইয়া দূর দিগন্তে গিয়া মিলাইয়া গিয়াছে। একটি নদীর নাম রাবী—এই রাবী নদীর উপর লাহোর অবস্থিত। অপর নদীর নাম চক্কি। চক্কি বিয়াস বা বিপাশা নদীর একটি উপনদী। চক্কি যেখানে বিপাশার সহিত মিশিয়াছে, সে স্থানটিও এখান হইতে দেখা যায়। খুব পরিষ্কার দিনে পাঞ্জাবের আরও দুইটি বড় নদী—শতদ্রু ও চন্দ্রভাগা (Sutledje) এবং Chenab)ও এখান হইতে দেখা যায়। কখন কখনও বরষার মেঘমালা দক্ষিণ হইতে ভাসিয়া আসিয়া এই সুন্দর দৃশ্যটি ঢাকিয়া ফেলে। আবার বর্ষণের পর সমতলভূমি নূতন সৌন্দর্য্যে প্রকাশিত হয়। তখন সমতলভূমি ঈষৎ নীলাভ বর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়া দিগন্ত-বিস্তৃত সমুদ্রের জলরাশির ন্যায় প্রতিভাত হয়। কোন স্থান হইতে তুষারশ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। চির-তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গগুলি আকাশের গায়ে চিত্রিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সূর্য্যালোকে বরফগুলি ঝলমল করিতেছে। বরফের পাহাড় এখান হইতে বেশী দূর নহে। পর্বত-শিখরস্থ বরফ হইতে মধ্যে মধ্যে স্রোত নামিয়া আসিয়াছে দেখা যায়। স্থানে স্থানে বিশাল বরফের হ্রদ রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। নিম্নে গভীর খদ, তাহার মধ্য দিয়া একটা স্রোত আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে। স্রোতের তীরে এবং নিকটবর্ত্তী পাহাড়ের উপর গৃহ এবং ক্ষেত্র। দূর হইতে গৃহগুলি অতিশয় ক্ষুদ্র খেলার ঘরের ন্যায় বোধ হয়। চারিদিকে বৃহৎ পর্বতগুলি তরঙ্গায়িত।

খজিয়ারের হ্রদ (হ্রদের মধ্যে ভাসমান দ্বীপ)

আমরা এক দিন দুই ক্রোশ দূরে পঞ্চপলু নামক স্রোত দেখিতে গিয়াছিলাম। পাহাড়ের ধার দিয়া পথটি ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিয়াছে, উপরে ও নীচে ঘন বৃক্ষশ্রেণী। চিউ বৃক্ষের লাল ফুলগুলি পাহাড় আলো করিয়া রাখিয়াছিল। ছোট ছোট পাহাড়ী বালিকা দুর্গম পর্বত-গাত্রে আরোহণ করিয়া গরু, ভেড়া ও ছাগল চরাইতেছিল। পথে সাত-ধারা নামক স্থানে পাথরে বাঁধান ঝরণা হইতে ক্ষীণ জলধারা পড়িতেছে দেখিলাম। শুনা যায়, এই জল খুব উপকারী। আরও কিছু দূর গিয়া আমরা পঞ্চপুলের নিকট উপস্থিত হইলাম। এখানে দুইটি পাহাড় মিশিয়াছে এবং সঙ্গমস্থলে দুইটি ঝরণা নামিয়া আসিয়াছে। প্রায় চারিদিকে পাহাড়। পাহাড়ের উপর অসংখ্য বৃক্ষ এবং

বড় বড় পাথর। নিঝরের কলধ্বনি এবং বিহগকাকলীতে স্থানটি মুখরিত হইয়াছিল। এখানে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিলে চিত্ত স্থির হয়। আমরা যখন ফিরিলাম, তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। পাহাড়ের উপর আলোক ম্লান হইয়া আসিয়াছিল। নীচে একটী পার্বত্য পল্লীতে মৃত্তিকা-লিপ্ত সমতল ছাদের উপর বসিয়া কয়েকটি পাহাড়ী বালক খেলা করিতেছিল।

ডালহাউসীর নিকট ডাইনকুণ্ড * নামক একটী শৈলশৃঙ্গ আছে, উহা ৯০০০ ফিট উচ্চ। আমরা এক দিন প্রাতঃকালে ডাইনকুণ্ড দেখিতে চলিলাম। টেহরা পাহাড় পার হইয়া বকরোটার চড়াই উঠিতে লাগিলাম। এই চড়াই উঠিতে বেশ বেগ পাইতে হয়। এখান হইতে নীচে বাথরু উপত্যকা এবং উপরে বরফের পাহাড় সুন্দর দেখায়। চড়াই উঠিয়া তার পর সমতল রাস্তা। এই রাস্তা প্রায় তিন মাইল দীর্ঘ, বকরোটার চারিদিকে ঘুরিয়াছে। এই পথ দিয়া বকরোটার অপর প্রান্তে পৌঁছিলাম। সেখান হইতে চাম্বা যাইবার পথ ধরিলাম। দুই পাশে চীড় এবং দেওদার গাছ। তাহার মধ্য দিয়া পথটি বেশ রমণীয়।

* ডাইনকুণ্ড নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে জনশ্রুতি শুনিলাম যে, বহু দিন পূর্বে এখানে একটি ঋষির আশ্রম ছিল। এই ঋষি সর্বদা ধ্যান করিতেন বলিয়া পাহাড়ের নাম ধ্যানকুণ্ড বা ডাইনকুণ্ড হইয়াছে।

প্রায়ই মেঘ আসিয়া অন্ধকার করিতেছিল; কিন্তু সৌভাগ্য-ক্রমে বৃষ্টি হয় নাই। পাহাড়ীরা পিঠে ঝুড়ি বোঝাই করিয়া দুধ, কয়লা, আপেল, কলাইশুঁটি প্রভৃতি বিক্রয় করিতে আসিতেছিল। কোথাও কোন পাহাড়ী বালক বা রমণী গরু ভেড়া প্রভৃতি চরাইতেছিল। কদাচিৎ পথের ধারে দুই একটি দোকান দেখা যাইতেছিল। আমরা ইংরাজ রাজ্য ছাড়াইয়া চাম্বা রাজ্যের মধ্য দিয়া যাইতেছিলাম। এক স্থানে পথ দুর্গম বলিয়া অশ্বারোহীকে অশ্ব হইতে নামিয়া হাঁটিয়া যাইতে বলা হইল। সেখানে পথ অতি

গিরিবর্ত্ম

সঙ্কীর্ণ। এক দিকে গভীর খদ, অপর দিকে অত্যুচ্চ পাহাড়। আমাদের পথ ধীরে ধীরে উচ্চে উঠিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে আমরা লক্কড়মণ্ডী নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। এখানে কয়েকটি কাঠের গুদাম আছে। স্থানটি ইংরাজীতে যাহাকে বলে saddle—দুই দিকে উচ্চ পর্বতশৃঙ্গ, তাহার মধ্যে পর্বতপৃষ্ঠ। এখান হইতে চাম্বা যাইবার রাস্তা ছাড়িয়া আমরা ডাইনকুণ্ড পাহাড়ে চড়িতে লাগিলাম। সে পথ অতিশয় সঙ্কীর্ণ—পর্বতের উপর ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়া প্রস্তরাকীর্ণ পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। কিছুদূর গিয়া দেখিলাম, পথের পাশ দিয়া একটি স্রোত ঝর ঝর শব্দ করিতে করিতে নামিয়া গিয়াছে। সেখানে কোন লোকালয় নাই,—উপরে আকাশ, নীচে পাহাড় ও অরণ্য। মনে হইল যেন প্রকৃতি দেবী লোকালয় হইতে

বহু দূরে আসিয়া একান্ত নিভৃতে বসিয়া হৃদয় খুলিয়া তাঁহার মর্ম্মের করুণ কাহিনী গাইতেছেন,—কোন্ সুদূর অতীতে সে গান আরম্ভ হইয়াছে, আবার কবে তাহার শেষ হইবে কে বলিতে পারে?

প্রকার লাল ফল ধরিয়াছে, পাকিলে কাল হয়, খাইতে কতকটা জামের মত। অবশেষে আমরা পাহাড়ের প্রায় চূড়ার উপর উঠিলাম। এখানে খানিকটা সমতল যায়গা আছে, কিন্তু গাছপালা একেবারে নাই। জঙ্গল হইতে কাঠ

ডালহাউসীর পথে

দুই একজন পাহাড়ী এই দুর্গম স্থানে গরু মহিষ প্রভৃতি চরাইতেছিল। বনে ছোট ছোট ঝোপে এক

কুড়াইয়া, পাথরের উনান করিয়া কাঠেই আগুন ধরান হইল। খিচুড়ি, আলু ও কড়াইশুঁটির তরকারি ও

সেনানিবাস—ডালহাউসী

কয়েকটা ভাজা হইল। রৌদ্রে বড় কষ্ট হইতেছিল। দুইটা বড় পাথরের উপর একটা কম্বল টাঙ্গান হইল। কেহ কেহ তাহার নীচে বসিয়া, কেহ বা ছাতা মাথায় দিয়া খাইতে বসিলাম। মধ্যে মধ্যে নীচের দিক হইতে মেঘ ভাসিয়া আসিতেছিল—সিক্ত ও শীতল সমীরণ স্পর্শে আমাদের রৌদ্রতপ্ত শরীর জুড়াইয়া যাইতেছিল।

আকাশ পরিষ্কার থাকিলে ডাইনকুণ্ডের উপর হইতে চারিদিকের দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়। দক্ষিণ পশ্চিম মুখে দাঁড়াইলে, ডানদিকে কালা টোপ (৯০০০ ফিট) এবং বকরোটা, টেহরা, পোট্রেন, কাটলাগ প্রভৃতি ডালহাউসীর উত্তরের দিকে চাহিলে পাহাড়, অরণ্য, উপত্যকা এবং স্রোত একটী সুন্দর দৃশ্য উদ্ঘাটিত করে। পশ্চিমে কুণ্ড-কপিলাশ এবং দাগনিধর পাহাড়। তাহাদের পশ্চাতে জম্মুরাজ্যের অন্তর্গত ভদ্রাওয়া এবং বলেশার বরফাবৃত পাহাড়। দুইটি তুষারাবৃত শৈল-শিখরশ্রেণী দেখা যায় একটির নাম পঙ্গি—ইহা উত্তর-পশ্চিম দিকে; অপরটির নাম ধওলাধর—ইহা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে।

ডালহাউসী হইতে চাম্বানগরী ১৯ মাইল। পার্বত্য পথ। ঘোড়া এবং ডাণ্ডি ব্যতীত অপর কোন যান চলে না। অর্দ্ধপথে গাজিয়াম নামক স্থানে বিশ্রাম করা যায়।

ক্লাবঘর হইতে ডালহাউসী
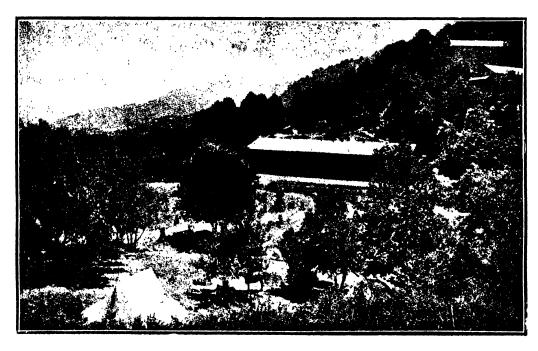
পাহাড়গুলি রাবীর দিকে নামিয়া গিয়াছে দেখা যায়। বামে—বেশী দূরে—বাক্‌লোর ছাউনি। তাহার পর শিবালিকের পাহাড় এবং উপত্যকা। চক্কি নদী যেখানে সমতল ভূমিতে নামিয়াছে, তাহার নিকটে পাঠানকোট। পাঠানকোটের উত্তর পশ্চিমে রাবীর তীরে শাপুর। শিবালিকের মধ্য দিয়া দুইটি সমান্তরাল নদী। পূর্বের নদীর নাম চক্কি—উহা বিপাশায় পড়িয়াছে। পশ্চিমের নদীর নাম রাবী। তাহা ছাড়া সমতল ভূমির উপর শতদ্রু, বিপাশা, এবং চন্দ্রভাগা (Sutledge, Beas and Ravi) দেখা যায়। এজন্য সমস্ত পথটি হাঁটিয়া যাওয়াও বিশেষ কঠিন নহে।

আমরা যেদিন চাম্বা যাইব ঠিক করিয়াছিলাম, সেদিন সকালে উঠিয়া দেখিলাম, আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন, মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি পড়িতেছে। আমরা যাইবার আশা ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া রহিলাম। অপরাহ্নে আকাশ একটু পরিষ্কার দেখিয়া ভরসা করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। ডালহাউসী হইতে খজিয়ার দশ মাইল। লকড়মণ্ডি পর্য্যন্ত ৫ মাইল চড়াই। সেখান হইতে ৫ মাইল উতরাই। পার্বত্য পথ-ঘন জঙ্গলাবৃত। এক পাশে উচ্চ পাহাড়, অপর দিকে খদ

কখনও নীচে উপত্যকা দেখা যায়, কখনও ঊর্দ্ধে বরফের পাহাড় দেখা যায়। মধ্যে মধ্যে ঝরণা পাহাড়ের উপর হইতে আসিয়া নীচে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। পথে কদাচিৎ দুই একটি পথিকের সহিত দেখা হইল। পর্বতের সুগভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মধ্যে মধ্যে বিহগ-কাকলী শোনা যাইতেছিল। এই ভাবে ১০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পূর্ব্বে আমরা খজিয়ারে পৌছিলাম। খজিয়ারের সমতল ভূমিখণ্ড যখন প্রথম দৃষ্টিগোচর হয়, তখন মনে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দের উদয় হয়। চারিদিকে পাহাড় দিয়া ঘেরা কিঞ্চিৎ সমতল হ্রদের মধ্যস্থলে ১৫ ফিট গভীর জল। এখানে লোকেরা বলিল জলের তল পাওয়া যায় না। তাহারা এক আজগুবি গল্প বলে যে, একজন সাধু একটি জাঁতাতে দড়ি বাঁধিয়া ৬ মাস ধরিয়া অনবরত দড়ি ফেলিয়া গিয়াছিলেন, তল পান নাই। হ্রদে যেখানে গভীর জল, সেখানে একটি ভাসমান দ্বীপ দেখিলাম। বলা বাহুল্য, দ্বীপটি অতিশয় ক্ষুদ্র—দূর হইতে দেখিতে কতকগুলি দীর্ঘাকার জলজ উদ্ভিদের সমষ্টিমাত্র। দ্বীপটি হাওয়াতে কখনও এদিকে কখনও ওদিকে অতি ধীরে ধীরে ভাসিয়া যাইতেছে। হ্রদের চারিদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত শ্যামলশস্পাবৃত নয়নাভিরাম
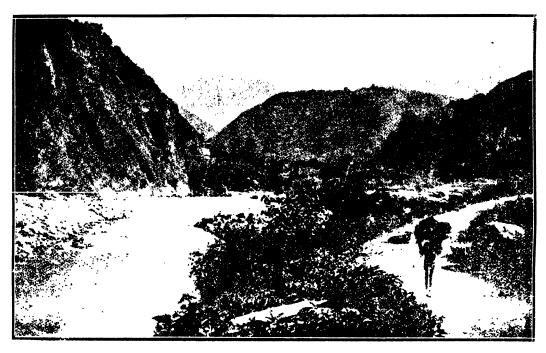
বাবীর পুল হইতে দৃশ্য—চাম্বা

ভূমিখণ্ড মধ্যস্থল অভিমুখে ঢালু হইয়া গিয়াছে। পাহাড়গুলি ঘনবৃক্ষরাজি-সমাবৃত। বৃক্ষশ্রেণী পাহাড়গুলি সমাচ্ছন্ন করিয়া সমতল ভূমির কিয়দংশ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। সমতল ভূমির মধ্যস্থলে একটী ক্ষুদ্র হ্রদ—এ দেশের ভাষায় ডাল। হ্রদের চারিদিক জলজগুল্ম-সমাচ্ছন্ন। গুল্মরাজির নীচে গভীর পাঁক। পাঁকের উপর গাছের গুঁড়ি ফেলিয়া একটী সঙ্কীর্ণ পথ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। পথের উপর দিয়া সন্তর্পণে চলিলাম। শুনিলাম, পাঁকে পড়িলে উদ্ধার পাওয়া কঠিন। ইংরাজি বহিতে লেখা আছে যে, হরিদ্বর্ণের মাঠ—কে যেন অতিশয় কোমল একটী নূতন গালিচা পাতিয়া রাখিয়াছে। মাঠের উপর ইতস্ততঃ ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া চরিতেছে। মাঠের মধ্য দিয়া চাম্বা যাইবার পথটি আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। পথের উপর দুই চারিটি পথিক ভিজিতে ভিজিতে চাম্বা অভিমুখে চলিয়াছে। কাহারও মাথায় বা পিঠে বোঝা—কেহ বা গরু ভেড়া ও ছাগলের দল লইয়া চলিয়াছে।

হ্রদের অনতিদূরে—একটু উচ্চে একটি মন্দির। মন্দিরের ছাদ শ্লেটপাথরে আচ্ছাদিত—চারিদিক হইতে ঢালু

ত্রিকোণ ছাদগুলি উর্দ্ধে যেখানে মিশিয়াছে তাহার উপর একটি পিত্তল কলস। মন্দির-সংলগ্ন একটী বৃহৎ গৃহ—তাহার মধ্যে সারি সারি কাঠের স্তম্ভ—চারিপাশ প্রায় খোলা—যাত্রীরা এখানে বিশ্রাম করে। মন্দিরটি খাজি নাগের। অন্ধকার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে একটি দণ্ডায়মান কৃষ্ণ-প্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। মন্দিরের বাহিরে দুই চারিটি প্রস্তরোৎকীর্ণ মূর্ত্তি—কাঠের উপরেও খোদাই-করা মূর্ত্তি, ফুল-লতা-পাতা প্রভৃতি রহিয়াছে। মন্দিরের পাশেই একটি দোকান এবং দুই চারিটি ঘর। ইহার কিছু উর্দ্ধে ডাক-বাঙ্গলা। ডাকবাঙ্গলাটি কাঠের তৈয়ারী, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বলা বাহুল্য, খজিয়ার চাম্বা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।

পাহাড়ের উপর হইতে চাম্বা নগরী দেখিতে পাওয়া গেল। আমরা কিছুক্ষণ বসিয়া অসাধারণ সুন্দর দৃশ্যটি দেখিতে লাগিলাম। বহু নিম্নে চারি দিকে উচ্চ-পাহাড়ে-ঘেরা ক্ষুদ্র একখণ্ড সমতল ভূমি—তাহার উপর নগরের গৃহগুলি দূরত্ববশতঃ অতিশয় ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হইতেছে। নগরের পাশ দিয়া রাবী নদী রজতধারার ন্যায় দেখাই-তেছে। মেঘদূতের অলকানগরীর বর্ণনা মনে পড়িল

তস্যোৎসঙ্গে প্রণয়িন ইব স্রস্ত গঙ্গা দুকূলাং
ন ত্বং দৃষ্ট্বা ন পুনরলকাং জ্ঞাস্যসে কামচারিন্
যা বঃ কালে বহতি সলিলোদ্গারমুচ্চৈর্বিমানা
মুক্তাজালগ্রথিতমলকং কামিনী বাভ্রবৃন্দম্॥

ক্রমে যত নীচে যাইতে লাগিলাম, ততই চাম্বানগরী

ডালহাউসীর একখানি বাড়ী (শীতকালে বরফে ঢাকা পড়িয়াছে)

রাত্রে লেপ গায়ে দিয়াও যেন শীত করিতেছিল। খজিয়ার ৬,৬০০ ফিট উচ্চ—অর্থাৎ প্রায় ডালহাউসীর সমান উচ্চ। হ্রদটি নিকটে থাকায় আর্দ্রতা খুব বেশী। চারিপাশে জঙ্গলে বাঘ ভালুক আছে শুনিলাম। পর দিন আহারাদির পর আমরা চাম্বা যাত্রা করিলাম। চাম্বার উচ্চতা ৩,৩০০ ফিট, পথ অনবরত উতরাই। দুই পাশে অনেক কৃষিক্ষেত্র এবং কৃষক-পল্লী দেখিতে পাইলাম। খজিয়ার হইতে চাম্বা ৮ মাইল পথ। প্রায় চার মাইল পথ আসিয়া একটা

আরও সুন্দর দেখাইতে লাগিল। নিকট হইতে রাবী নদী ক্রমশঃ বড় দেখাইল; তাহার জলের বেগ, তরঙ্গের আস্ফালন স্পষ্ট দেখা গেল। নদীর শব্দ প্রথমে মর্ম্মর-ধ্বনি রূপে, পরে প্রচণ্ড গর্জন রূপে শোনা গেল। কিছুক্ষণ পরে আমরা নদীর তীরে আসিয়া পৌছিলাম। সেখানে দাঁড়াইয়া বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া নদীর দিকে চাহিয়া রহিলাম। দুই পাশে উচ্চ তীরের মধ্য দিয়া রাবীর ঈষৎ আবিল জলরাশি বৃহৎ তরঙ্গ তুলিয়া প্রচণ্ড আস্ফালন

করিয়া ঘোর রবে গর্জন করিতে করিতে প্রবল বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। চারিদিকে বিপুলকায় পাহাড়গুলি নীরবে দাঁড়াইয়া শৈলদুহিতার এই উদ্দাম চঞ্চলতার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে। কি মধুর সে স্রোতস্বিনীর চঞ্চলতা! কি গভীর সে পর্বতমালার নিস্তব্ধতা! লছমনঝোলার নিকট গঙ্গার যে শোভা, দার্জিলিংএর সানুদেশে তিস্তা ও রঙ্গিতের যে শোভা, এখানে রাবীর সেই শোভা। পৃথিবীতে বোধ হয় এই দুই দৃশ্য সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক,—তীর হইতে সমুদ্রের শোভা, এবং পর্বতমালা-বেষ্টিত স্থানে নদীর উদ্দাম প্রবাহ।

করিতে করিতে নদী ছুটিয়া আসিয়া এখানে সম্মুখে এক বিশাল পর্বতে অবরুদ্ধ হইয়া ক্ষণকালের জন্য স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—

মার্গাচলাব্যতিকরাকুলিতেব সিন্ধুঃ
শৈলাধিরাজতনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ—

তাহার পর নদী একটু ঘুরিয়া আসিয়া আবার উন্মুক্ত পথ পাইয়া সুদূরবর্ত্তী আরবসাগরের সন্ধানে পূর্ব্বের ন্যায় লাফাইতে লাফাইতে পাগলিনীর ন্যায় ছুটিয়া চলিয়াছে। যেন এক মুহূর্ত্তের বিলম্বও সহ্য হয় না। এত চপলতা,

তুষারশ্রেণী—ডালহাউসী হইতে

নদীর তীর ধরিয়া আমরা চলিলাম। একটী সদ্যোবর্ষণপুষ্ট স্রোত রাবীর সহিত মিলিত হইয়াছে। তাহার উপর একটি ছোট পোল আছে। ইহা পার হইবার একটু পরে রাবীর উপর একটী বৃহৎ সেতু আছে। ইহা একটি Suspension Bridge। দুই পাশে দুইটি তোরণ হইতে দুই সুবৃহৎ লৌহ-শৃঙ্খল ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সেই শৃঙ্খল হইতে বহুসংখ্যক লৌহদণ্ড লম্বমান হইয়া কাষ্ঠনির্মিত সেতুটি ধারণ করিয়া রহিয়াছে। আমরা এই সেতু দিয়া নদী পার হইলাম। এখানে নদী অত্যন্ত খরগতিতে প্রবাহিত হইয়াছে। প্রচণ্ড আস্ফালন

এত অশোভন ব্যস্ততা দেখিয়া লোকে কি বলিবে তাহার জন্য ভ্রূক্ষেপ পর্য্যন্ত নাই।

সেতু পার হইয়া আমরা চাম্বানগরীতে প্রবেশ করিলাম। সেতুর দুইটি পাশে দুই ফটক। ফটক পার হইয়া টোলঘর। যে সকল জিনিস আমদানি-রপ্তানি হয়, এখানে তাহাদের উপর মাশুল সংগ্রহ করা হয়। এখান হইতে সহরে যাইতে হইলে অনেকখানি চড়াই উঠিতে হয়। কিছু দূর উঠিয়া বৃহৎ চৌগাঁও তোরণের নিকট উপস্থিত হইলাম। এই তোরণের পার্শ্বেই একটি সুগঠিত মন্দির দেখিতে পাইলাম। মন্দিরটি প্রস্তর-নির্মিত। ইহা

বন্ধুরায়ের (শ্রীকৃষ্ণের) মন্দির। এই তোরণটি পার হইয়া চৌগাঁও মাঠ। পার্বত্য অঞ্চলে এতখানি বিস্তৃত সমতল ভূমি সচরাচর দেখা যায় না। এই মাঠটির চারিপাশে হাসপাতাল, মিউজিয়াম, কাছারি, Guest House, Post Office, প্রভৃতি বাড়ী এবং সারি সারি দোকানঘর আছে। চাম্বাতে আমরা দুই দিন ছিলাম। এখানে বেশ সুন্দর দোতালা ডাকবাঙ্গলো আছে। সহরের একপাশে, হাসপাতালের পশ্চাতে এই ডাকবাঙ্গলো অবস্থিত। এখান হইতে সর্বদা রাবী নদীর শব্দ শোনা যায়। ডাকবাঙ্গলোতে অনেক রকম গাছের মধ্যে আঙ্গুর গাছ দেখিলাম। তাহাতে গুচ্ছে গুচ্ছে আঙ্গুর ধরিয়া রহিয়াছে।

চৌগাঁওয়ের একটু উপরে সুবৃহৎ রাজপ্রাসাদ। রাজপ্রাসাদের পার্শ্বেই একটি প্রাচীর-বেষ্টিত সুদীর্ঘ প্রাঙ্গণে পাশাপাশি ছয়টি মন্দির রহিয়াছে। তিনটি বিষ্ণুমন্দির এবং তিনটি শিবালয়। মন্দিরগুলির নাম লছমীনারায়ণ, রাধাকৃষ্ণ, চন্দ্রগুপ্ত (শিবালয়), পঞ্চমুখ শিবলিঙ্গ, গৌরী-শঙ্কর, লছমী, দামোদর। এতদ্ভিন্ন প্রাঙ্গণে নানা স্থানে কতকগুলি বিগ্রহ আছে,—হনূমান, নন্দী প্রভৃতির। মন্দিরগুলি প্রস্তরনির্মিত এবং সুগঠিত। লছমীনারায়ণের মন্দিরটি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ—নারায়ণের বিগ্রহটিও খুব বড়, এবং শ্বেতমর্মর নির্মিত; লছমীর বিগ্রহটি ছোট। অন্যান্য বিগ্রহগুলি পাথরের; কেবল গৌরীশঙ্করের বিগ্রহ দুইটি পিতলের। দুর্গার মুখের ভাব খুব সুন্দর। মন্দিরগুলির বাহিরের দিকে দেওয়ালের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর-নির্মিত দেবদেবীর মূর্ত্তি, পৌরাণিক ঘটনার ছবি প্রভৃতি দেখিতে পাইলাম। প্রাঙ্গণের চারিদিকে যাত্রীদের জন্য বিশ্রামের স্থান, পূজারিদের থাকিবার ঘর প্রভৃতি আছে। শিবালয়-গুলির উপর ত্রিশূল এবং বিষ্ণুমন্দিরগুলির উপর চক্র আছে। সব মন্দিরের উপরে কাঠের বৃহৎ ছাতার ন্যায় আছে, বোধ হয় বৃষ্টি এবং তুষারপাত হইতে মন্দিরগুলি রক্ষা করিবার জন্য এগুলি নির্মিত হইয়াছে।

খজিয়ার

চাম্বাতে আরও কতকগুলি মন্দির আছে। চম্পাবতী বা চামেশনির মন্দিরটিও সহরের মধ্যে—রাজ-আফিসের উপরে অবস্থিত। এই মন্দিরটিও প্রস্তর-নির্মিত এবং সুগঠিত। ইহার মধ্যে মহিষমর্দ্দিনী দুর্গার মূর্ত্তি পূজিত হয়। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল পূর্ব্বে ব্রহ্মপুর। ৯২০ খৃঃ অব্দে রাজা সহিল বর্ম্মা রাজধানী ব্রহ্মপুর হইতে চাম্বাতে আনেন। রাজার কন্যা চম্পাবতী এই স্থানটি মনোনীত করিয়াছিলেন বলিয়া নগরীর নাম হইল চাম্বা। কথিত

আছে যে, চম্পাবতী অতিশয় ধর্মানুরাগিণী ছিলেন। ধর্মালাপ করিবার জন্য তিনি প্রত্যহ এক সাধুর নিকট

চাম্বার নিকট রাবী

যাইতেন ইহাতে রাজার মনে সন্দেহের উদয় হয়। এক দিন তিনি উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে রাজকন্যার পশ্চাদগামী

হন। সাধুর গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিলেন, গৃহ শূন্য। সহসা রাজা এক আকাশবাণী শুনিতে পাইলেন। ঐ আকাশবাণী রাজকন্যার উপর সন্দেহ করার জন্য রাজাকে ভর্ৎসনা করিল এবং বলিল যে, ইহার শাস্তি স্বরূপ
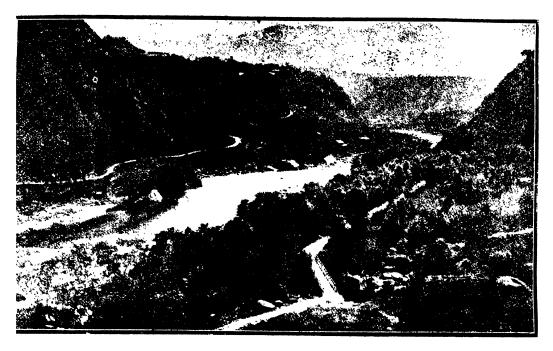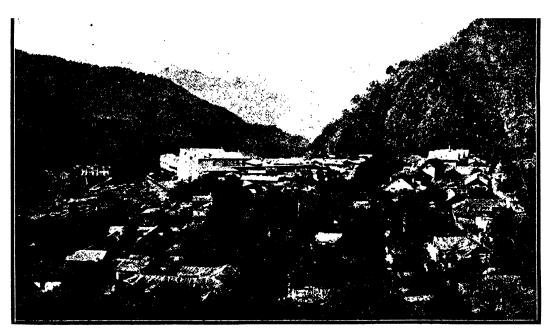
চাম্বা নগরী (বামে চৌগাঁও মাঠ)

তিনি আর রাজকন্যাকে ফিরিয়া পাইবেন না। আকাশবাণী রাজাকে ঐ স্থানে একটি মন্দির নির্মাণ করিতে আদেশ করিল। রাজা তদনুসারে এই চম্পাবতীর মন্দির নির্মাণ করিলেন। এখানে চম্পাবতী দেবীরূপে পূজিতা হন। বৈশাখ মাসে এই মন্দিরে একটি মেলা বসে।

চাম্বা নগরীর উর্দ্ধে পাহাড়ের উপর চামুণ্ডাদেবীর মন্দির আছে। পাহাড়ের উপর সুদীর্ঘ প্রস্তরময়
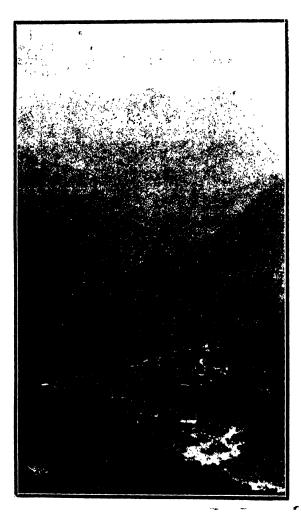
বাথরু উপত্যকা—ডালহাউসী হইতে

সোপানাবলি আরোহণ করিয়া এই মন্দিরে যাইতে হয়। এই মন্দিরে উঠিবার পথে নরসিংহের মন্দির আছে। চামুণ্ডার মন্দির এবং নরসিংহের মন্দির পার্বত্য প্রথায় নির্মিত—এগুলি অনতিউচ্চ ক্ষুদ্র গৃহবিশেষ। মধ্যস্থলে একটী কক্ষ যাহার মধ্যে বিগ্রহ থাকে, চারিদিকে বারাণ্ডা, বারাণ্ডার উপরে ঢালু ছাদ কাঠ বা শ্লেটপাথরে নির্মিত। চামুণ্ডার মন্দিরে প্রস্তরময়ী কালীমূর্ত্তি। এখানে পশুবলি হয়। এই মন্দিরের নিকট দাঁড়াইলে বহু নিম্নে নগর, চৌগাঁও মাঠ, রাবী নদী এবং চারিদিকের পাহাড় বেশ সুন্দর দেখায়।

চাম্বানগরীর নিকট পাহাড়ের উপর আর একটি মন্দির আছে। এই মন্দিরের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি করুণ কাহিনী শোনা যায়। রাজধানী যখন ব্রহ্মপুর হইতে চাম্বাতে স্থানান্তরিত হয়, তখন চাম্বানগরীর জল সরবরাহের জন্য সরোভ নামক স্রোত হইতে শাহ মাদার পাহাড়ের উপর দিয়া একটি প্রস্তরের পয়ঃপ্রণালী নির্মিত হয়। কিন্তু জল এই প্রণালীতে চলিল না। ব্রাহ্মণেরা বলিলেন * হয় রাণী নয় তাঁহার কোন পুত্রকে বলি দিলে জল এই প্রণালীতে চলিবে। রাণী নিজেকে বলি দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাজা সহিল বর্ম্মা ইহাতে মত করেন নাই। কিন্তু রাণী জেদ করিতে থাকেন এবং শেষ পর্য্যন্ত রাণীর মতই গ্রহণ করা হয়। দাসীগণ-পরিবৃত হইয়া রাণী ধীর পাদবিক্ষেপে পাহাড়ের উপর উঠিতে লাগিলেন। সতী হইবার সময় রমণীগণ যেরূপ অনাবৃত মস্তকে যায়, রাণীও সেইরূপ চলিলেন। যেখানে জল স্রোত হইতে প্রণালীর মধ্যে প্রবেশ করিবে, সেখানে একটি সমাধি প্রস্তুত হইল। রাণী জীবন্ত প্রোথিত হইলেন। কথিত আছে যে, সেই হইতে স্রোতের জল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রণালীর মধ্য দিয়া চাম্বা অভিমুখে প্রবাহিত হইল। সহিল বর্ম্মার পুত্র যুগাকরের এক তাম্র-শাসনে এই রাণীর উল্লেখ আছে। তাঁহার নাম নেনা দেবী। রাণী পাহাড়ের উপর যেখানে বসিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন, রাজা সহিল বর্ম্মা সেখানে এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর ১৫ই চৈত্র হইতে ১লা বৈশাখ পর্য্যন্ত এই মন্দিরে মেলা বসে। মেলার নাম সুহি মেলা কেবল রমণী এবং শিশুরা এই মেলায় যায়। মন্দিরের নিকটে গিয়া তাহারা রাণীর প্রশংসাসূচক গান গায় এবং ফুল উপহার দেয়। ১৮০০ খৃঃ অব্দে রাজা অজিত সিংহের রাণী সারদা দেবী পাহাড়ে উঠিবার জন্য মন্দির

* পর এক প্রবাদ এই যে, রাজা স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন।

পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত সোপানশ্রেণী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বহুদূর হইতে এই সোপানগুলি দেখিতে পাওয়া যায়।

চাম্বাতে আরও কয়েকটি মন্দির আছে। চৌগাঁও তোরণের পার্শ্বে হরি রায়ের মন্দিরের উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। রাজবাড়ীর নিকটে বংশীগোপালের একটি মন্দির আছে! মন্দিরগুলি ব্যতীত এখানকার যাদুঘর (Museum) একটি দেখিবার জিনিস। ভূতপূর্ব্ব রাজা স্যর ভূরিসিংহ এই যাদুঘরটির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এজন্য ইহা ভূরিসিংহ মিউজিয়ম নামে পরিচিত। চৌগাঁও মাঠের পার্শ্বে একটি সুন্দর দ্বিতল গৃহে এই মিউজিয়মটি রক্ষিত হইয়াছে। এখানে কয়েকটি প্রাচীন প্রস্তরলিপি দেখিতে

শীতকালে পাহাড়ের দৃশ্য (ডালহাউসী)

পাইলাম। চাম্বানগরের এবং রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন স্থানের বহুসংখ্যক মন্দির দুর্গ প্রভৃতির অনেকগুলি সুন্দর আলোকচিত্র (Photograph) এখানে দেখিলাম। তদ্ভিন্ন এখানে বহুসংখ্যক প্রাচীন চিত্র রক্ষিত হইয়াছে। চিত্রগুলি বহুবর্ণে সুরঞ্জিত এবং নিপুণ ভাবে অঙ্কিত। অধিকাংশ চিত্রই পৌরাণিক ঘটনা বিষয়ক। রামায়ণের প্রায় সব প্রধান ঘটনাগুলি চিত্রে অঙ্কিত আছে। শ্রীকৃষ্ণের অনেক লীলারও ছবি আছে। এই সকল চিত্র দেখিয়া বোঝা যায়, প্রাচীন কালে কাঙ্গড়াতে যেরূপ চিত্র-বিদ্যার চর্চ্চা হইত, চাম্বাতেও প্রায় সেইরূপ হইত। মিউজিয়মে প্রাচীন অস্ত্র-শস্ত্রও কতকগুলি দেখিলাম।

চাম্বার রাজগণ সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়। ইঁহারা শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশের বংশধর বলিয়া নিজেদের পরিচয় দেন। অনুমান ৫৫০ খৃঃ ব্রহ্মপুরে প্রথম রাজ্যস্থাপন হইয়াছিল। চাম্বার রাজগণের মধ্যে সহিল বর্ম্মার নাম সমধিক বিখ্যাত। ইঁহার রাণী নেনা দেবীর আত্মোৎসর্গের কথা এবং কন্যা চম্পাবতীর অন্তর্ধানের কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। কথিত আছে যে, ইঁহার প্রথমে সন্তান হয় নাই। একবার ৮৪ জন সন্ন্যাসী ব্রহ্মপুরে আসেন এবং রাজার অতিথি সৎকারে সন্তুষ্ট হইয়া বর দেন। তাহাতে রাজার দশ পুত্র এবং এক কন্যা হয়। এই কন্যাই চম্পাবতী। দশ পুত্রের মধ্যে নয় পুত্র নারায়ণের বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিবার জন্য বিন্ধ্যগিরি হইতে মর্ম্মর-প্রস্তর আনিতে গিয়া দস্যুহস্তে প্রাণ হারায়। তখন রাজা অবশিষ্ট পুত্রকে পাঠাইয়া মর্ম্মর প্রস্তর আনিয়া বিগ্রহ প্রস্তুত করেন। এই বিগ্রহই নাকি লছমীনারায়ণের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছে। সহিলবর্ম্মা রাজ্য বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তার করিয়াছিলেন, এবং রাজধানী চাম্বাতে উঠাইয়া আনেন। তাঁহার গুরুর নাম চর্পটনাথ। চাম্বাতে চর্পটনাথের একটি ছোট মন্দির আছে। সহিলবর্ম্মা

তুরকীদের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন, এইরূপ একটি বিবরণ শিলালিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়। বৃদ্ধবয়সে তিনি যুগাকরকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করিয়া গুরু চর্পটনাথের সহিত ব্রহ্মপুরে যান এবং সেখানে অপর সাধুদের সহিত সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবন যাপন করেন। ১৫৮৯ খৃঃ বলভদ্র নামক একজন রাজা ছিলেন। তিনি

পঙ্কপুলের ঝরণা—ডালহাউসী

খুব দান করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছিল বলিকর্ণ। রাজকর্মচারিগণ তাঁহাকে এত দান করিতে নিষেধ করিত। তিনি তাহাদের কথা শুনিলেন না। রাজকোষে অর্থাভাব ঘটিল। অবশেষে কর্মচারিদের অনুরোধে বলভদ্রের পুত্র জনার্দন রাজা হইলেন। জনার্দন পিতাকে রাবীর অপর তীরে জমি এবং গৃহ দিলেন তথাপি বলভদ্র পূর্বের ন্যায় দান না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। জমি ফুরাইল। রোজ বাড়ীর এক হাত করিয়া দান করিতেন। ক্রমে বাড়ীও ফুরাইল। রাজা মাঠে অনশনে রহিলেন। তখন পুত্র আরও জমি এবং বাড়ী দিল।

চাম্বার রাজা একজন Ruling Chief (করদ রাজা)। রাজ্যের আয় বৎসরে ৮৷১০ লক্ষ টাকা। ইংরেজ সরকারের ডাক টিকিটের উপর Chamba State এরূপ ছাপ দিয়া চাম্বারাজ্যে ব্যবহৃত হয়। চাম্বারাজ্য সবই পাহাড়। এখানকার অরণ্যগুলি খুব মূল্যবান। বর্ত্তমান রাজা কাশ্মীরের মহারাজার ভাগিনেয়ীকে বিবাহ করিয়াছেন। চাম্বার রাজার ভগিনীর সহিত কাশ্মীরের যুবরাজ স্যর হরি সিংহের বিবাহ হইয়াছিল। সে ভগিনী মারা গিয়াছেন। চাম্বাতে পূর্বে কয়েকজন বাঙ্গালী কর্মচারী ছিলেন। এখন একজন মাত্র বাঙ্গালী ভদ্রলোক এখানে চাকুরি করেন। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত বরদানন্দন সরকার। ইনি ইংরেজ সরকারের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ১৫ বৎসর যাবৎ চাম্বারাজ্যে কর্ম করিতেছেন। ইঁহার আদর যত্নে আমরা অত্যন্ত আপ্যায়িত হইয়াছিলাম। ইঁহার নিকট শুনিলাম যে চাম্বাতে বাঙ্গালী কদাচিৎ বেড়াইতে আসে।

চাম্বারাজ্যের প্রাচীন রাজধানী ব্রহ্মপুর (আধুনিক বরমুর) চাম্বা হইতে ৪৬ মাইল দূরে। এখানে লক্ষ্মণাদেবী, গণেশ, মণি মহেশ এবং নরসিংহের মন্দিরগুলি বিখ্যাত। ব্রহ্মপুর যাইবার পথে ছত্রারি একটি তীর্থস্থান। এখানে শক্তিদেবীর একটি প্রাচীন মন্দির আছে। ব্রহ্মপুরের মন্দির-নির্মাতা বিখ্যাত শিল্পী গগ্গা শক্তি-মন্দিরটিও নির্মাণ করিয়াছিল, এইরূপ প্রবাদ শোনা যায়। ব্রহ্মপুর হইতে দুই দিনের পথ যাইলে মণিমহেশ হ্রদ! ইহা এতদঞ্চলের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। ইহা ১৩০০০ ফিট উচ্চ। কৈলাসশৃঙ্গের পাদদেশে এই হ্রদ। ভাদ্র আশ্বিন মাসে এখানে একটি বড় মেলা বসে। ব্রহ্মপুরের অপর দিকে ত্রিলোকীনাথ হিন্দু ও বৌদ্ধদের একটি তীর্থস্থান। তিব্বত হইতে এখানে তীর্থযাত্রী আসে। চাম্বা হইতে হাঁটিয়া কাশ্মীর যাইবার পথ আছে। বলা বাহুল্য, এই পথের দৃশ্য অতি মনোহর। চাম্বা হইতে ফিরিবার সময় খজিয়ারে একটি বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর সহিত

দেখা হয়। ইনি কাশ্মীরের বিখ্যাত অমরনাথ তীর্থে চলিয়াছেন।

সন্ধ্যাবেলা চৌগাঁও মাঠের ধারে বেঞ্চের উপর বসিয়া থাকিতে বেশ ভাল লাগে। বৈদ্যুতিক আলোকে প্রাসাদ, রাজপথ প্রভৃতি আলোকিত হয়। শ্যামল শষ্পাবৃত মাঠের উপর নাগরিকগণ বেড়াইতে বাহির হন। নীচে অনেক বাড়ী। তাহার নীচে রাবী নদী। নদীর গর্জ্জন শোনা যাইতেছিল। রাজপ্রাসাদের সম্মুখে ব্যাণ্ড বাজিতেছিল। নাতিশীতোষ্ণ সমীরণ শরীর স্নিগ্ধ করিয়া দিতেছিল।

দুই দিন চাম্বাতে থাকিয়া আমরা পুনরায় খজিয়ার হইয়া ডালহাউসীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

বাউল

রিক্তা

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

আষাঢ়ের মেঘ-মেদুর আকাশ সারা রাত ধরে ধারা-যন্ত্রটাকে চালিয়ে চালিয়ে ভোরের দিকে একটু ঝিমিয়ে পড়্‌তেই, ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে আলোর টুক্‌রো-গুলো সদ্য-জাগরিত ধরিত্রীর বুকের ওপর নেমে পড়্‌ল। সাবিত্রী অনেকক্ষণ আগেই বিছানার মায়া পরিত্যাগ করে' উঠে পড়েছিল। এইবার সে ঘরে ঢুকে জানালাগুলো খুলে দিতেই, বিছানার ভেতর হ'তে প্রতিভা ডাক্‌লে —দিদি!

—কি ভাই!

—বাইরে বেশ রোদ উঠেছে, না?

—হ্যাঁ, এই যে ঘর একেবারে রোদে রোদে ভরে গেছে।

—ভোরের রোদ খুব মিষ্টি, চোখে না দেখ্‌লেও তার স্পর্শে তাকে বোঝা যায়।

সাবিত্রী উত্তর দিল—যে জিনিসটা সত্য, তার স্বভাবই এই; তাকে চোখে ধরা না গেলেও স্পর্শে ধরা যায়; আর স্পর্শে ধরা না গেলেও মনের ভেতর তার ছাপ পড়ে।

—হৃদয়ে তো ভাই, অনেক জিনিসেরই ছাপ পড়ে। কিন্তু তাই বলে তার সবই যদি সত্য হ'ত তবে—হঠাৎ একটা দীর্ঘ নিশ্বাসে তার ম্লান হাসিটা ঠিক কান্নার মতই করুণ হয়ে উঠল।

সাবিত্রী দুহাতে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বল্‌লে—হৃদয়ে যার ছাপ পড়ে, আমার অনুরোধ প্রতিভা, তাকে যাচাই কর্‌তে গিয়ে অনর্থক দুঃখের পাথার বাড়িয়ে তুলিস্‌নে। জানিস্‌, কোথাও না কোথাও তার ভেতর সত্য আছেই, আর তুই তাকে ধর্‌তে পার্‌ছিস্‌নে বলেই তা তোকে বেদনা দিচ্ছে। আর সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে রাখিস্‌, সত্যের চারদিক আগুনের বর্ম্ম দিয়ে ঘেরা; সেই আগুনকে যারা সইতে পারে, সত্য কেবল তাদের কাছেই প্রত্যক্ষ হ'য়ে ওঠে।—একটু থেমে সাবিত্রী আবার বল্‌লে—এ আমার মনগড়া কথা নয় ভাই। সত্য যে কত বড় নির্ম্মম ও কত ভয়ঙ্কর রকমের সুন্দর, তার পরিচয় আমি নিজের ভেতর পেয়েছি বলেই আজ এ কথা তোকে বল্‌তে সাহস পাচ্ছি। কিন্তু তাও বলি, তুই তো ভাই, সত্যের সাক্ষাৎ পেয়েছিস্‌, তোর এই ক্যাঙ্‌লাপনা কেন বল্ তো! প্রভাত যে তোকে ভালোবাসে তার তো এতটুকু ভুল নেই।

প্রতিভা একটু করুণ হেসে বল্‌লে—হ্যাঁ ভাই, অন্ধকে নাকি আবার কখনো ভালোবাসা যায়!—

যে প্রভাতের ভালোবাসা নিয়ে কথা হচ্ছে, সে প্রভাতকে সাবিত্রী বেশ ভাল করেই জান্‌ত। প্রথম যৌবনে আপনাকে বিকিয়ে দেবার নেশায় তার মন যখন মশ্‌গুল, তখনি এক দিন তরুণ প্রভাতে এই প্রভাতকে ঘিরেই তার চিত্তবীণা হাজার ছন্দে ছন্দিত হয়ে উঠেছিল। প্রেমের পদ্মটি তার অন্তরের বৃন্ত ঘিরে ফুটে উঠ্‌ল। প্রেমের দেবতাকে সে তা দিয়ে পূজাও করে' গেল। যে প্রভাত তার চারদিকে একেবারে শিকারীর মত ফাঁদ পেতে বসে ছিল, তার কাছে হৃদয়ের এই খুন-ঝরা আত্মনিবেদনের কথা যে গোপন ছিল তাও নয়। কিন্তু তথাপি যখন তার খুড়তুত বোন্ প্রতিভা এসে আসরে 'বার' দিতেই প্রভাত তারি গলায় বরণ-মাল্য দুলিয়ে দিল, তখন তা নিয়ে বাইরে সে কোনো রকমের জোর জবরদস্তি জানালে না বটে, কিন্তু মনে মনে সে এ কথাটাও না বলে পারলে না যে,—তার টাট্‌কা তাজা শোণিতাক্ত হৃদয়কে দলিত, মথিত, পিষ্ট করে যারা চলে গেল, তারাই কি সুখী হতে পার্‌বে?

তার এই একান্ত বেদনার দ্বারা উচ্ছ্বসিত অভিব্যক্তির ভেতর হয় তো কোন ইচ্ছাকৃত অভিশাপের ছাপ ছিল না, কিন্তু বিয়ের বছরখানেক পরেই একটা কঠিন রোগ ভোগ

করে প্রতিভা যখন অন্ধ হ'য়ে গেল, এবং প্রভাত বিলেতে ডাক্তারী পড়্তে গিয়ে যুদ্ধের পরেকার উদ্বেলিত উচ্ছৃঙ্খলতার ভেতর গা ভাসিয়ে দিলে, তখন সাবিত্রী নিজের বুকের বেদনার নিক্তিতে প্রতিভার দুঃখের মাত্রাটা ওজন কর্‌তে গিয়ে শিউরে উঠ্‌ল। তার কেবলই মনে হতে লাগ্‌ল, এ বুঝি তারি অভিশাপের ফল ;—তার মনের চারদিক ঘিরে যে আগুনের শিখা সেদিন জ্বলে উঠেছিল, তাই বুঝি এই তরুণ-তরুণীর সুখের নীড়টাকে ভস্ম, ধ্বংস, বিধ্বস্ত করে দিতে উদ্যত হয়েছে। নিজের অসহিষ্ণুতা এবং অনুশোচনার বেদনায় সাবিত্রীর নারী-হৃদয় কান্নার বিপুল অশ্রু-ভারে ভারি হ'য়ে উঠ্‌ল। সে মনে মনে শপথ করে বল্‌ল—যত দিন পর্য্যন্ত প্রভাতের মনের হাওয়া বদ্‌লে না যায়, তত দিন পর্য্যন্ত, পক্ষীমাতা ঝড়ের রাতে যেমন করে তার দুর্ব্বল অসহায় শিশুটিকে পক্ষপুট দিয়ে প্রাণপণে ঢেকে রাখে, তেমনি করে সেও সমস্ত দুঃখ হতে প্রতিভাকে আড়াল করে রাখ্‌বে—যেমন করেই হোক্—যেমন করেই হোক।

সুতরাং প্রতিভা যখন বল্‌লে, হ্যাঁ ভাই, অন্ধকে নাকি আবার ভালোবাসা যায়, সাবিত্রীর মুখ একেবারে ব্যথার বেদনায় ম্লান হ'য়ে উঠ্‌ল। কিন্তু তবু সে কণ্ঠস্বরের ভেতর হাসির একটু সুর টেনে এনে বল্‌লে,—শোন একবার কথা! ভালোবাসা নাকি অন্ধ কানা কালা খোঁড়ার কিছু বাছ-বিচার করে! ইংরাজী সাহিত্যে এই জন্যেই প্রেমের দেবতাকে অন্ধ বলে কল্পনা করা হয়েছে। এই দেবতাটি যাকে একবার অনুগ্রহ করেন তার না কি আর পরিত্রাণ আছে! আচ্ছা প্রভাতের ভালোবাসার পরিচয় কি এখনো তুই পাসনি? এই যে সেদিন সে তাকে চিঠি লিখেছে—আমিই তো পড়ে শোনালুম,—কি মমতা, কি বেদনা, কি ভালোবাসা জড়ানো রয়েছে তার ছত্রে ছত্রে!

প্রতিভার মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল। সে তাড়াতাড়ি বালিশের তলটা একবার একান্ত আগ্রহে হাতড়িয়ে নিল। সেখানে লুকানো প্রভাতের চিঠির স্পর্শ তাকে ঠিক প্রভাতের স্পর্শের মত করেই পুলকিত করে তুলল।

সাবিত্রী সেই আনন্দ-উজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে ভাব্‌তে লাগল,—হায় পুরুষ, প্রেম তোমাদের কাছে কেবল খেলার জিনিস। কিন্তু নারীর কাছে সে তো কেবল খেলার নয়,—সে যে তার দেহ, মন, হৃদয়,—তার যথাসর্ব্বস্ব। নিজের বুকের ভিতরের দিকেও তাকিয়ে সে দেখ্‌লে। সেখানে যে হাহাকার উঠেছে, তাতেও সে সেই কথারি সায় পেলে। তার হৃদয়ের হাহাকার কাকেও জানাবার নয় ; কিন্তু তাই বলে তার ব্যথার ঝাঁঝ এতটুকুও কম ছিল না।

২

সেদিন 'মেল ডে'—বিলেতের চিঠি আস্‌বার দিন। জানালার ধারে বসে প্রতিভা রাস্তার লোকের পায়ের শব্দগুলো শুন্‌ছিল—একটির পরে একটি করে। কই কেউ তো তাদের দোরের কড়া নাড়্‌ছে না! একবার চাকরটাকে ডেকে জেনে নিলে, কটা বেজেছে। তার পর আবার সেই জানালায় তার প্রতীক্ষার পালা সুরু হ'য়ে গেল। খানিক-ক্ষণ পরে উদ্গত অশ্রু দমন কর্‌তে কর্‌তে সাবিত্রী ঘরে ঢুকে বল্‌লে—তুই কিসের জন্যে অপেক্ষা কর্‌ছিস্ বল্ তো?

প্রতিভা বল্‌লে—অপেক্ষা আবার কিসের? জান্‌লার ধারে বস্‌লে তবু মনে হয় যে আলোর স্পর্শ পাচ্ছি, কিন্তু ঘরের অন্ধকার যে আর আমার সহ্য হয় না। প্রতিভার চোখ্ সজল হয়ে উঠ্‌ল।

সাবিত্রী তাড়াতাড়ি তাকে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে বল্‌লে—হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওসব চালাকি আমি বুঝি। এই নে প্রভাতের চিঠি। কিসের জন্যে সকাল থেকে এখানে এসে বসা হয়েছে, তা বুঝি আর আমি বুঝিনে।

প্রতিভা সলজ্জ দীপ্ত মুখে বল্‌লে—কিন্তু দিদি, কই, পিয়নের আসার শব্দ তো আমি পেলুম না।

—শব্দ পাবি কোথেকে, সকালে উঠেই আমি যে পরেশকে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম পোষ্ট আফিসে। তোর যে আর সবুর সইছে না, সে তো আমি জানিই।

প্রতিভা একান্ত কৃতজ্ঞতাভরা চোখ-দুটি তুলে চিঠিখানা একবার হাতের ভেতর টেনে নিয়ে তখনি ফিরিয়ে দিয়ে বল্‌লে—দিদি পড়্‌বিনে?

সাবিত্রীর কণ্ঠ কুণ্ঠায় ম্লান হয়ে এল, তথাপি সে জোর করে তা দমন করে দীপ্ত সুরে পড়্‌তে সুরু কর্‌লে—

আমার দৃষ্টিহীনা প্রিয়তমা—

লণ্ডনের আকাশ কুজ্ঝটিকায় ভরে গেছে। তার এই

অন্ধকারের ভিতর দিয়ে আমার অন্ধ প্রিয়তমার তনুদেহের স্পর্শটুকু দুলচে—বাতাস সমুদ্রের বুকে যেমন করে দোলা খেয়ে বেড়ায় তেমনি করে। লণ্ডনের অন্ধ প্রকৃতি আজ আমায় তোমাকে আবার নতুন রূপে মনে পড়িয়ে দিল।

আলোর জন্যে মানুষের মন উন্মুখ হ'য়ে ওঠে কেন—আমি আজ তার কারণ খুঁজে পাচ্ছিনে। এই গাঢ় ঘন নিবিড় অন্ধকার—এই আকাশ-পাতাল-স্বর্গ-এক-করে'-দেওয়া আনন্দ, এর চাইতে কি আলোকের মাপা—নিঃশেষে-সবটুকু-ফুটিয়ে-তোলা আনন্দ ভালো? যারা ভালো বলে তারা অন্ধকারের রূপ দেখে নি। ওগো আমার অন্ধকারের প্রতিমা, অন্ধকারের ভেতরেই যে আমি তোমাকে নিত্য নতুন মূর্ত্তিতে লাভ করি। সুতরাং তোমার চোখে যে দৃষ্টি নেই, তার দুঃখ আমাকে এতটুকু আঘাত কর্‌তে পারে নি।

আমার প্রতিভার চোখের ওপর অন্ধত্বের নীল মেঘ যে অন্ধকারের কাজল টেনে দিয়েছে, আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি, আমার স্মৃতির বিদ্যুৎ তারি ওপর দিয়ে আঁকা-বাঁকা রেখা লিখে চলেছে। সেখানে আর কেউ নেই—আর কিছুই নেই। একজনের মনের ওপর এমনি করে দাবীর অধিকার স্থায়ী করে নেওয়া—তার আনন্দে আমার মন মশ্‌গুল হয়ে উঠেছে। প্রিয়া, তোমার চোখ্‌ যদি আজ দৃষ্টি হারিয়ে না ফেলত, তবে একান্ত আমার একেলার এই অপূর্ব্ব হৃদয়টি আমি কোথায় পেতুম? দুনিয়ার অজস্র সৌন্দর্য্যের ভেতর সে হয় তো মাঝে মাঝে আপনাকে হারিয়ে ফেল্‌ত—বিশ্বের বিক্ষিপ্ত বিপুল আকর্ষণে হয় তো চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ত। এই ধ্যান-বিহ্বল চিত্তটি—এ তো এমন করে সর্ব্বস্ব দিয়ে আমাকে বরণ করে নিতো না। তোমার অন্ধত্ব আমার কোনো ক্ষতি করে নি; বরং আমার মত কাঙালকে সম্পদের সীমান্ত-সীমায় প্রতিষ্ঠিত করে' গেছে।

হয় তো তুমি আমাকে স্বার্থপর বলে মনে কর্‌ছ। স্বার্থশূন্য প্রেম কবির কল্পনায় হয় তো থাক্‌তে পারে, কিন্তু দুনিয়ায় কোথাও তার অস্তিত্ব আছে কি না জানি না। কিন্তু ওগো আমার মানস-লোকের ধ্যানের দেবতা, আমার প্রেম স্বার্থপর হলেও তা আমাকে সার্থক করে তুলেছে, 'নিজেকে বিকিয়ে দেওয়ার গৌরব হতেও সে আমাকে বঞ্চিত করে নি। এই চোখে আমার যে আলোর ধারার বিপুল প্লাবন জেগে আছে, সেই আলো দিয়ে আমি তোমার অন্ধকার ভরিয়ে তুল্‌ব। জগতের যে শোভা, যে সৌন্দর্য্য হ'তে তুমি বঞ্চিত হয়েছ, তোমার জন্যই সে শোভা সে সৌন্দর্য্যকে আমার চোখের পাতায় পাতায় ভরে' নিতে হ'বে। তার পর আমার স্পর্শের ভেতর দিয়ে, আমার ভাষার ভেতর দিয়ে, আমার ব্যথা-বেদনা-আনন্দ-উচ্ছ্বাসের ভেতর দিয়ে তা তোমারই দেহের অণু-পরমাণুতে সঞ্চারিত হবে, তোমার নিথর-নিবিড় অন্ধকারকে অন্তর্লোকের আলোর ধারায় উদ্ভাসিত করে তুলবে। চোখে-দেখা আলোর চাইতে প্রিয়তমের দৃষ্টির ভেতর এই যে আলোর স্পর্শ, এর আনন্দ—এর গৌরব ঢের বেশী—ঢের বেশী!

মহাভারতের গান্ধারীর ত্যাগ আমাদের মনের ওপর একটা বড় রকমের গৌরবের আসন অধিকার করে বসেছে। গৌরবের যে কিছু নেই তার ভেতর, তা আমি বল্‌ছি নে; কিন্তু আমি জানি আমার সাধনা তার চাইতেও বড়। আমার সাধনা আপনাকে বঞ্চিত কর্‌বার সাধনা নয়—আমার সাধনা অন্ধ প্রিয়তমার চোখে দৃষ্টি ফিরিয়ে আন্‌বার সাধনা। প্রিয়তমের মৃত্যুর পর যারা আত্মহত্যা করে, তারা যে কোনো সাধনাই করে নি তা নয়, তারা অন্ততঃ মরণ-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছে। কিন্তু তার সাধনাই বড়, যে বেহুলার মত মৃত পতির দেহে প্রাণ ফিরিয়ে আন্‌তে পারে। ওগো আমার অন্ধকারের রাণী, আমার এই চোখের আলো দিয়েই আমি তোমার অন্ধ চোখে দৃষ্টির আলো ফিরিয়ে আন্‌ব, আমার ভেতর দিয়েই তুমি তরুণী ধরণীর অপরূপ সৌন্দর্য্যের লীলার আনন্দ অনুভব কর্‌বে।

আজ এই লণ্ডনের অন্ধকার আমার মুখের ওপর তোমার অন্ধকার দুটি চক্ষুর মতই তাকিয়ে আছে। আমার মন কাঁপছে, দেহ টল্‌ছে, রক্ত-কণিকার ভেতর ঢেউয়ের মাতন সুরু হয়েছে। আমার প্রিয়া—আমার প্রিয়তমা!......

চিঠির সুর প্রতিভার রক্তের কণিকার ভেতরেও ঢেউয়ের মাতন সুরু করে দিলে। সে দু' হাত দিয়ে বুকটা চেপে ধরে মূর্চ্ছাহতের মত চুপ করে খানিকক্ষণ পড়ে রইল; তার পর অশ্রুভেজা সুরে সাবিত্রীকে ডাক্‌লে—দিদি!

—কেন ভাই!

—এই অন্ধ আতুরকে তিনি কেন এত ভালো-বাস্‌লেন? এর স্রোত যে দুকূল ছাপিয়ে ছুটে চলেছে—এর বেগ তো সইবার শক্তি আমার হবে না।

—ভালবাসা তো কোনো দিনই তীরের তলে তলে বইতে পারে না, সে তো চিরদিনই কূল ছাপিয়ে চলে বোন!

—কিন্তু তুমি হয় তো লক্ষ্য করে দেখনি, এচিঠিগুলোর সঙ্গে আমার চোখ থাকতে যে চিঠিগুলো পেয়েছি তার কত তফাৎ। বিলেত যাবার পর-পরই যে চিঠিগুলো লিখেছেন, তাতে বরং এই ধরণের একটা আবেগের উচ্ছ্বাস আছে—কিন্তু......

—সে তো কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয় প্রতিভা, পড়া-শুনোর যে চাপ তখন তার মাথার ওপর আষাঢ়ের মেঘের মতই ভেঙে পড়েছিল!

—আমিও তাই বল্‌তুম্, কিন্তু তোমরাই তাকে সন্দেহ করে বলেছ, সে বিগড়ে গেছে—উচ্ছন্ন গেছে—এমনি কত কি!

—ভুল করেছিলুম ভাই, ভুল করেছিলুম! তোর প্রেমের গাঢ়তা কি আমি তখন জানতুম! জান্‌লে তোর ঐ উদ্বেলিত হৃদয়কে আঘাত করতে কখনো সাহস করতুম না।

সাবিত্রীর দুই চোখ ছাপিয়ে উদ্গত অশ্রুর ধারা তার গণ্ড ভাসিয়ে ঝর্‌ঝর্ করে তার বুকের কাপড়ের ওপর ঝরে' পড়্‌তে লাগ্‌ল। দু'হাত দিয়ে উচ্ছ্বসিত হৃদয়টা চেপে ধরে সে মনে মনে বল্‌লে—হায় রে হতভাগী!

৩

সেদিন দুপুর না যেতেই বর্ষার মাতন সুরু হ'য়ে গেছে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের চোখ্-ঝলসানো দিনের দীপ্তির ওপর আষাঢ়ের মেঘের সজল স্নিগ্ধচ্ছায়া কালো কাজলের প্রলেপের মত ছড়িয়ে পড়েছে একটা অপূর্ব্ব মায়ালোকের সৃষ্টি করে'। বারি ঝর্‌ছে—ঝর্ ঝর্ ঝর্। এই অফুরন্ত ঝরার গান তরুণী ধরার বুকের ওপর বীণার ঝঙ্কার তুলে যেন কাঁপ্‌ছিল। মিলনের ভেতর যে বিদ্যুৎ আছে, মেঘের সঙ্গে মেঘের আলিঙ্গনের ভেতর দিয়ে তারি ক্ষণিক বিকাশ আকাশের এক প্রান্ত হ'তে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত উচ্চকিত করে তুল্‌ছিল। পথের প্রান্তে জন-কোলাহলের অশ্রান্ত প্রবাহ থেমে গেছে। বিরহের একটা অফুরন্ত স্বপ্নের মাঝখানে পৃথিবী যেন ঝিমিয়ে পড়েছে, একান্ত অসহায় নীড়হারা পক্ষীশাবকটির মত।

বাদ্‌লার দিনের এই মায়ালোকের ভেতর অভিসারিকার মন নিয়ে প্রতিভা জানালার-ধারে চুপ্‌টি করে বসে ছিল। মেঘের মায়ার স্নিগ্ধ-সজল আভা সে চোখে দেখ্‌তে পাচ্ছিল না বটে, কিন্তু তার তুলির স্পর্শ সে সর্ব্বদেহেই অনুভব কর্‌ছিল। এমনি বাদলা দিনের কত মেঘ-ভারনত সন্ধ্যায় প্রভাত আর সে মুখোমুখি হ'য়ে ঘরের কোণে বসে কত সুরের কান্নার সৃষ্টি করেছে। বর্ষার নীলাঞ্জন আকাশের গায়ে ছড়িয়ে পড়্‌তেই ঘরের নিরালা কোণটিতে বসে রবীন্দ্রনাথের বর্ষার কবিতা পড়া আর বর্ষার গান গাওয়াই ছিল তাদের দুজনের কাজ। মানস-লোকের কেয়াফুলের রেণু এবং নবীন নীপের গন্ধ এই দুটি তরুণ-তরুণীর মনকে নাড়া দিয়ে তখনকার দিনে যেমন করে আকুল করে তুল্‌ত, প্রতিভা মনের পুঁজির পাতার পর পাতা উল্‌টিয়ে তারি লেখাগুলি পড়ে নিচ্ছিল। তার মনে হল, মেঘের সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে প্রভাত মাতাল ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গাইছে

"শ্রাবণ মেঘের আধেক দুয়ার ঐ খোলা,
আড়াল থেকে দেয় দেখা কোন্ পথ-ভোলা।
ঐ যে পূরব গগন জুড়ে
উত্তরী তার যায় যে উড়ে,
সজল হাওয়ার হিন্দোলাতে দেয় দোলা।"

ঐ তার গলা পর্দ্দার পর পর্দ্দা তুলে গান ছেড়ে আবৃত্তির সুরে বুঝি হাঁক্‌লে—

"ঐ আসে, ঐ অতি ভৈরব হরষে
জল-সিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ-রভসে
ঘন গৌরবে নব-যৌবনা বরষা
শ্যাম গম্ভীর সরসা।
গুরু গর্জ্জনে নীল অরণ্য শিহরে
উতলা কলাপী কেকা কলরবে বিহরে;
নিখিল চিত্ত-হরষা
ঘন গৌরবে আসিছে মত্ত বরষা।"

হঠাৎ বর্ষার সুরের ঝঞ্ঝনা থেমে গিয়ে বুঝি সুরু হ'ল মেঘের অবগুণ্ঠনের অন্তরাল থেকে বিরহী বিশ্ব-প্রকৃতির অশ্রুঝরা ব্যথার গোঙানী—

"এ সখি হামার দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর—
শূন্য মন্দির মোর।
কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া।"

সত্যই তো তার 'ছাতিয়া' ফেটে যাচ্ছে, চারিপাশের নিবিড় ঘন অফুরন্ত অন্ধকারের মাঝখানে। হায় রে অন্ধ, মিলনের দিনে যে জিনিসগুলো মিলনকে নিবিড়তর মধুরতর করে তুলেছিল, আজ বিরহের দিনে তাদের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌বার অধিকারটুকুও তার নেই!

এমনি করে জীবনের পেছনের পাতাগুলি প্রতিভা উল্টে উল্টে দেখ্‌ছিল। সাবিত্রী ঘরে ঢুকেই তার জল-ভরা দৃষ্টিহীন চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে জোর করে একটু হেসে বলে উঠ্‌ল—প্রতিভা রাণীর আজ বুঝি দেয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জল-ঝরার 'রিহার্সেল' চল্‌ছে?

—না ভাই দিদি, কেন জানিনে আজ মিছিমিছি......

—মিছিমিছি নয় ভাই, বাদ্‌লার সন্ধ্যায় আজ বুঝি রৌদ্র-দীপ্ত দিনের প্রভাতকে মনে পড়েছে। কখন্ যে তোর তাকে মনে পড়ে, আর কখন্ যে পড়ে না, তা তো জানি না।

প্রতিভা ম্লান হেসে বল্‌ল—মনে পড়্‌বার না পড়বার মালিক কি আমি! কেন তিনি বিদেশে পড়ে থাকেন—কিসের অভাবে শুনি! কিন্তু সে কথা যাক্ দিদি, আমাকে গোটা দুই বর্ষার কবিতা পড়ে শোনা—এইখান্‌টাতে বসে ঠিক তেমনি সুরে, যেমন করে তিনি পড়্‌তেন। কি আশ্চর্য্য ভাই তোর গলার সুর অনুকরণ কর্‌বার ক্ষমতা! তোর পড়া শুনে মনে হয়, তাঁরি সুরের মূর্চ্ছনা বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

সাবিত্রী রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থখানি টেনে নিয়ে পড়্‌তে সুরু কর্‌লে। তার সুর কোথাও অশ্রুতে ভিজে, কোথাও আনন্দে উছলে উঠে, কোথাও ঝঞ্জার গর্জ্জনে মন্ত্রিত হয়ে ঝরে পড়্‌তে লাগ্‌ল। সে সুর কখনো থেমে, কখনো কেঁপে, কখনো দীর্ঘায়ত মেঘের ডাকের মত ছন্দের 'পর ছন্দ টেনে চলেছে। দু'একটা কবিতা প্রতিভা বেশ মনোযোগ দিয়ে শুন্‌লেও। কিন্তু তার পরেই আর তার শোন্‌বার দিকে মন রইল না। সাবিত্রীর সুর এসে তার কাণে বাজ্‌তে লাগ্‌ল, কিন্তু সে যে কোথায় কত দূর হ'তে ভেসে আস্‌ছে, সে এপারের কি ওপারের তটপ্রান্তের গান, যে পড়্‌ছে তার হৃদয়ের কোন্ নাড়ীটির কতটা রক্ত নিংড়ে তার উচ্চারণ দানা বেঁধে উঠ্‌ছে, সে সব প্রতিভার বিমুখ-বিহ্বল মনের তারে কোনো রকমের ঘা দিতে পার্‌লে না। পড়্‌তে পড়্‌তে হঠাৎ এক সময়ে সাবিত্রী প্রতিভার নিঃসাড় মুখের দিকে তাকিয়ে একটা লাইনের মাঝখানে থেমে পড়্‌ল, তার পরেই লজ্জিত হ'য়ে বলে উঠ্‌ল,—তোর বুঝি ভালো লাগ্‌ছে না প্রতিভা?

অকস্মাৎ কোনো একটা অন্যায়ের মাঝখানে ধরা পড়ে' গেলে মানুষের মন যেমন লজ্জায় অভিভূত হ'য়ে পড়ে, সাবিত্রীর কথায় প্রতিভার মুখ তেম্‌নি করে লজ্জায় রাঙ্গা হ'য়ে উঠ্‌ল। ব্যথিত করুণ কণ্ঠে সে বল্‌লে—হ্যাঁ ভাই, একটা লোক আর একজনের সর্ব্বস্ব কেড়ে নেয়, নিজের বল্‌তে কিছুই রেখে যায় না, এ জোর মানুষ কোথা হ'তে পায় বল্‌তে পারিস্? এই গ্যাখ, তোর মত করে কবিতা পড়্‌তে আর কেউ পারে কি না জানি না, কিন্তু তবু তোর কবিতার ভেতর মন বসাতে পার্‌লুম না—আমার মন ডুবে গেল তাঁরি পড়ার বিশেষ ভঙ্গীগুলোর দিকে। কবে কোন্ লাইনটার ওপর তিনি কেমন করে জোর দিয়েছিলেন, কোন্ কথাটার উচ্চারণ তিনি কোন্ বিশেষ ভঙ্গীতে কর্‌তেন, এই সব কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে অমন চমৎকার কবিতাগুলো আমার কাছে একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল। অত দূরে দূরে থেকেও মানুষ মানুষকে এমন প্রবল বেগে কি করে যে টানে......

সাবিত্রী হাস্‌বার ভান করে বল্‌ল—শোন কথা,—এ অবস্থা না কি একা ওরই নতুন! চাঁদ ওঠে ঐ আকাশে, কিন্তু প্লাবন জাগে লাখো যোজন দূরের সমুদ্রটাতে। মনের সমুদ্রের ওপর জ্যোৎস্না যখন পড়ে, সে এমনি করেই কূল ছাপিয়ে ওঠে। প্রভাতের ওপর তোর যে ভালোবাসা, সে তো ঐ সমুদ্রের মতই। দূরের কাছের কথাটার সুতরাং কোনো দামই নেই।

সাবিত্রী চুপ কর্‌ল। তার অন্তরের দুকূল ছাপিয়ে যে রোদন জেগে উঠ্‌ল, তার আভাষটাও সে প্রতিভাকে জান্‌তে দিলে না। সমুদ্রকে কেবল মাত্র জ্যোৎস্নাই যে

নাচিয়ে তোলে না, মেঘও যে তাকে নাচিয়ে ক্ষেপিয়ে মাতাল করে তোলে, সে কথাটা কতবার কত রকম করে বল্‌বার সুযোগ এসেছে সাবিত্রীর, কিন্তু মেঘের ভেতরকার এই পুঞ্জীভূত বিদ্যুৎকে জ্যোৎস্নার আড়ালে লোপ করে দেওয়ার সাধনাই যে ছিল তার সাধনা। সুতরাং তা নিয়ে নালিশ বা অভিযোগ কর্‌বার মত মনের অবস্থা তার ছিল না।

একটুখানি সময়ের জন্য চুপ করে থেকে সাবিত্রী আবার বলে উঠ্‌ল—জানিস্ প্রতিভা, নরেন কি লিখেছে প্রভাতের সম্বন্ধে?

উৎসুক ব্যগ্র অন্ধ চোখের দৃষ্টিহীন তারা দুটি সাবিত্রীর মুখের দিকে ফিরিয়ে তুলে ধর্‌তেই সাবিত্রী হেসে বল্‌লে—ওরে ভয় নেই, তোর ভয় নেই, আমি কোনো দুঃসংবাদ দিচ্ছিনে। নরেন লিখেছে—প্রভাত আবার জার্ম্মাণীতে চল্‌ল, সেখানে কে না কি একজন ডাক্তার চোখের চিকিৎসা সম্বন্ধে একটা নূতন পদ্ধতির আবিষ্কার করেছেন, তাই আয়ত্ত করে আন্‌বার জন্যে। চোখের চিকিৎসা নিয়ে প্রভাত যা কর্‌ছে তা একেবারে অদ্ভুত। এমন ভাবে এই চিকিৎসা-শাস্ত্রটার ওপর সে ঝোঁক দিয়েছে যে, সেকালের মহাবিলাসী প্রভাত বিলাসের কথা তো ভুলেইছে, স্নানাহারের কথাও তার মনে থাকে না। যে প্রভাত প্রত্যেক দিন দাড়ির বংশ ধ্বংস না করে ঘরের বা'র হতো না, সেই প্রভাতের মুখ আজকাল দাড়ি-গোঁফের অরণ্যে ভরে গেছে। আমি তাকে সেদিন জিজ্ঞাসা করেছিলুম—হঠাৎ এ ধরণের জানোয়ার সাজ্‌বার রোখ তার চাপ্‌ল কেন?—সে তাতে উত্তর দিলে,—জানোয়ার সাজ্‌লে কাজের ঢের সময় পাওয়া যায়; কেবল চেহারায় নয়, প্রকৃতিতেও জানোয়ার সাজ্‌বার চেষ্টায় আছি, তোমাদের মত বন্ধু-বান্ধবদের হাত হ'তে মুক্তিলাভের জন্যে। আমার ঢের সময় নষ্ট করেছ ভাই, এখন ওঠ,—এই Experimentটা আমাকে এই বেলাতেই শেষ কর্‌তে হবে। এই রূঢ় কথাগুলো এক নিশ্বাসে শেষ করে থাম্‌তেই দেখি, তার চোখের কোণে জলের রেখা চক্ চক্ কর্‌ছে। আর কেউ হ'লে তার ব্যথা না বুঝে হয় তো তার ওপর রাগ কর্‌ত; কিন্তু আমি তার বেদনায় চোখের কোলে এক কলস জল ভরে' নিয়ে বাড়ী ফিরে এলুম।

প্রতিভা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে' উঠল,—তোমার পায়ে পড়ি সাবিত্রীদি', তুমি তাঁকে বাড়ী ফিরে আস্‌তে লিখে দাও। আমার জন্যে কেন তিনি এমন করে দুঃখ সহ্য কর্‌বেন? তাঁর শরীর তো কোনো দিনই দুঃখ সহ্য কর্‌বার মত বিশেষ পটু ছিল না। বিদেশ বিভুঁয়ে এই অন্ধের জন্যে তিনি যদি কোনো কঠিন রোগে পড়েন……

—আমি লিখ্‌লেই কি ভাই প্রভাত ফিরে আস্‌বে? সে যে তোকে চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেবার জন্যেই তপস্যা কর্‌ছে। তুই কি ভাব্‌ছিস তাকে ফিরে আস্‌বার জন্যে কেউ অনুরোধ করে নি? অনুরোধ অনেকেই করেছে, কিন্তু সে তার উত্তরে কি বলেছে জানিস্? সে বলেছে—ভালোবাসার জন্যে তপস্যা করার দৃষ্টান্ত তো আমাদের দেশে বিরল নয়। এই তপস্যা করেই তো সাবিত্রী সত্যবানকে জীবন দিয়েছিল, বেহুলা মৃত পতিকে মৃত্যুপুরীর দ্বার হ'তে ফিরিয়ে এনেছিল। তারা যদি মৃতের দেহে প্রাণসঞ্চার কর্‌তে পেরে থাকে, আমি কি আমার প্রতিভার চোখের দৃষ্টিটাও ফিরিয়ে দিতে পার্‌ব না? প্রেমের জন্যে তপস্যা কি কেবল নারীরাই কর্‌বে—ভালোবাসার জন্যে প্রাণপাত কর্‌বার অধিকার কি কেবল নারীরই আছে, পুরুষের নেই? পুরুষ তার স্বার্থপরতা দিয়ে প্রেমের দেবতার কাছে যুগ যুগ ধরে যে অপরাধ জমিয়ে তুলেছে, আমি ত তারি প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ছি।

আনন্দে এবং বেদনায় প্রতিভার চোখের পাতায় জলের ধারাগুলো উছ্‌লে উঠে গণ্ড গড়িয়ে ঝরে পড়্‌তে লাগল। আর সাবিত্রী সেই ঝর্ণার ধারার দিকে তাকিয়ে কি যে ভাবতে লাগল সেই জানে।

৪

সেদিন কি একটা কাজে সাবিত্রী বাড়ীতে নেই। প্রতিভা জানালার ধারে তার দৃষ্টিহীন আঁখি দুটি বাইরের পানে মেলে দিয়ে নিত্যিকার মতই বসে ছিল। হঠাৎ তার সাম্‌নে এসেই পিয়ন হাঁক্‌লে—মায়ি চিঠি।

হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা নিতেই তার মনে হ'ল, এ হয় তো বিলেতের ডাক। একটা আগ্রহভরা আনন্দে তার অন্তর্লোকের মাঝখানটায় দোলা দিতে সুরু করে' দিলে। চিঠিখানা হা'তে নিয়ে সে প্রথমটায় বুকের ভেতর চেপে ধর্‌লে, তার পর লজ্জায় রাঙা হ'য়ে উঠে মৃদুকণ্ঠে হাঁক্‌লে—দিদি!

সাবিত্রীর পরিবর্ত্তে তার ছোট ভাই মণ্টু এসে বল্‌লে—দিদি ডাকছ ?

—সাবিত্রী-দি'কে একবার পাঠিয়ে দে না লক্ষ্মী ভাইটি।

মণ্টু তার দিদির কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আব্দারের সুরে বল্‌লে—তোমার কি কাজ বল না দিদি ভাই, আমিই করে দিচ্ছি। সাবিত্রীদি' সেই ভোরে উঠে কোথায় গেছেন, বলে গেছেন, তাঁর ফির্‌তে দেরী হবে।

—হাঁরে মণ্টু, তুই বুঝি হাতের লেখা পড়্‌তে পারিস্‌নে। এত বড় হলি তবু......

দশ এগারো বছরের বালকের বিদ্যার ওপর এই সন্দেহের বাণ হান্‌তেই সে একেবারে খাপ্পা হ'য়ে বলে উঠ্‌লো—দিদি, তুমি কিচ্ছু জানো না, আমি ছাপার লেখা, হাতের লেখা সব পড়্‌তে পারি। বিশ্বাস না করো......

প্রতিভা হাতের চিঠিখানা তার হাতে দিয়ে বল্‌লে—পারিস্‌ তো বল্‌ দেখি এখানা কার চিঠি ?

চিঠির দিকে চোখ ফিরিয়েই মণ্টু লজ্জায় ম্লান হ'য়ে বল্‌লে,—ও যে ইংরিজিতে লেখা, আমি তো ইংরিজী পড়্‌তে পারি না দিদি ভাই !

ভাইকে আদরে কোলের ওপর টেনে নিয়ে প্রতিভা বল্‌লে—আচ্ছা চিঠিখানা খুলে ফেলে দেখ্‌, হয় তো ওর ভেতরে বাংলা লেখাও আছে।

মণ্টু তাড়াতাড়ি খামখানা ছিঁড়ে ফেলে পত্রখানা খুলেই চীৎকার করে বলে উঠ্‌ল—হ্যাঁ দিদি, এ যে বাংলাতেই লেখা—এ আমি নিশ্চয় পড়্‌তে পার্‌ব।—রোসো—এ চিঠি হচ্ছে সাবিত্রী দিদির, আর লিখেছেন প্রভাতবাবু।—পড়্‌ব ?

প্রতিভার বুকের ভেতর হৃদ্‌পিণ্ডটা দপ্‌ দপ্‌ কর্‌তে লাগল। কেবল মাত্র একটুখানি নড়ে বসে সে মণ্টুকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরে বল্‌লে—পড়্‌।

মণ্ট পড়্‌তে লাগ্‌ল—

সাবিত্রী,

তোমার সাবিত্রী নামটা আজ ভারি মিষ্টি লাগ্‌ছে ; মনটাও মশ্‌গুল হ'য়ে আছে। তোমার চিঠির জবাব দেবার ঝোঁকে তাই যখন আজ আমাকে পেয়ে বস্‌ল, তখন আর 'তাকে সামলে রাখ্‌বার প্রয়োজন বোধ কর্‌ছিনে।

জীবন-সমুদ্রে কি ঢেউ উঠেছে এখানে তা যদি দেখতে—উচ্ছল, চঞ্চল, ফেনিল, আনন্দের আবেশে ভরপুর। বাংলার বৈচিত্র্যহীন জীবনের সঙ্গে এর কোনোখানে কোনো মিল নেই। তোমাদের ধাতে এ জীবন সইবে না জানি—তোমরা হয় তো একে বল্‌বে উচ্ছৃঙ্খলতা। কিন্তু ও তো কেবল দুর্ব্বলের বাঁধা গৎ। যারা জীবনকে ভোগ কর্‌তে জানে না, অন্তরাত্মাকে উপবাসী রেখে হত্যা করেছে, তারাই জীবনের এই উদ্দাম সম্ভোগকে ঘৃণা করে। স্রোতের মত জীবনের দিনগুলো কেটে যাচ্ছে হাস্যে লাস্যে, গানে গল্পে, তাসের আসরে আড্ডা জমিয়ে, আর পেগের পর পেগ উড়িয়ে। বিলাসেরও একটা উদ্দাম রূপ আছে! সেই রূপ আমি আকণ্ঠ ভরে পান কর্‌ছি—জীবনটাকে দুটো মুঠোর ভেতর পুরে নিয়ে যদৃচ্ছা ছড়িয়ে দিচ্ছি। চার পাশে আমার ফুলের মেলা বসে গেছে। এই সব রক্ত-মাংসের ফুলের হাসি কুড়িয়ে নিয়ে আমার ধন-ভাণ্ডারে যে রত্ন জমে উঠেছে, তোমাদের নাকি-কান্নার ঝুটো মুক্তো তা কি আমাকে কখনো কোনো কালে দিতে পার্‌ত ?

অনেকগুলো চিঠি তুমি আমাকে লিখেছ—জবাব দিইনি, জবাব দেবার ফুরসুৎ পাইনি। প্রতিভার কথা ভাবছিনে, তোমার প্রত্যেক চিঠি আমার কাছে কেবল এই একই অনুযোগের ফিরিস্তি খুলে বসে আছে। কে প্রতিভা—কেন তার কথা নিয়ে মাথা ঘামাব ? আমার জীবনের বর্ত্তমান বা ভবিষ্যতের সঙ্গে তার কোথাও কোনো যোগ আছে কি ? মানুষ চিনে-মাটির পুতুল নিয়ে খেলা করে ; তার পর ভেঙে গেলে সেটা ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। প্রতিভা এক দিন আমার পথে এসে পড়েছিল, দু'দণ্ড তাকে নিয়ে হাসি-খেলার মাতামাতিতে কেটে গেছে—বাস্‌! সেই খানেই তো যবনিকা পড়ে গেছে—আবার কেন ? জোসি, জুয়েল, মিলি, মার্থা—পথে এমনি কত জনের সঙ্গে তো দেখা হ'ল—কারো মুখে হাসি হীরের টুক্‌রোর মত জ্বল্‌ জ্বল্‌ করছে, আধ-ফোটা গোলাপের মত কারো রূপ গ্রীবার বৃন্ত ঘিরে ফুটে রয়েছে। দুদিন—তার পরেই আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের মতই তো তারা খসে পড়্‌ছে আমার পথের প্রান্ত থেকে। কই, তাদের কেউ তো অভিযোগের খাতা খুলে বসে নাই!

তোমাদের বঙ্কিমচন্দ্র কানা ফুলওয়ালী রজনীকে নিয়ে অনেক কাণ্ড করেছিলেন। হয় তো তারি 'প্লটটা' তোমার

মাথার ভেতর ঘোরালো হয়ে ঘুরছে। কিন্তু মনে রেখো গল্প—গল্প। বাস্তব জীবনের অফুরন্ত বস্তু সম্ভোগের ভেতর অসম্ভব উচ্ছ্বাসের কোনো দামই নেই। প্রতিভা দৃষ্টি হারিয়ে অন্ধ হয়েছে, তার জন্যে দুঃখ হয়। কিন্তু দুঃখ করা ছাড়া আমার দ্বারা তার তো আর কোনো উপকারই হ'তে পারে না।

কিন্তু আমি ভাবছি, তুমি চিঠির ভেতর তোমার নিজের কথা একেবারে গোপন করে রেখেছ কেন? আমি তো জানি, তোমাদের পুষ্পধন্বা দেবতাটি আমাকে উপলক্ষ করেই তোমার বুকেও এক দিন তাঁর তীক্ষ্ণ শায়কটি অব্যর্থ হাতেই সন্ধান করেছিলেন। তোমার মুখের গ্রাসটি আচম্কা এসে নিজের অজ্ঞাতসারে কেড়ে নিলেও প্রতিভার ওপর সেদিন যে তুমি খুশী হয়ে ওঠ নি, তার প্রমাণ আমি অনেকবার অনেক রকমে পেয়েছি। ভয় ও পরাজয়ের খোঁচা সেদিন মনের দোরে মাথা উঁচিয়ে ছিল বলে আমি সাফ্ সে সব কথা চেপে গেছলুম। তুমি যে কেন চুপ করে ছিলে, তা তুমিই বল্‌তে পার। হয় তো নিশ্চিত পরাজয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করায় কোনোই লাভ নেই মনে করেই সেদিন তুমি রণে অগ্রসর হ'তে সাহস পাও নি। কিন্তু আজ তো আর সে আশঙ্কা নেই। আজ যদি প্রতিভার কথাটা না লিখে তোমার নিজের কথাটাই একটু বেশী করে লিখ্‌তে, তবে এর চেয়ে ঢের বেশী খুশী হতুম। নেশাটাও তা হ'লে হয় তো আরো একটু জমে ওঠার অবকাশ পেতো। তবে তাও বলে রাখ্‌চি, দুনিয়ার রূপ-ভাণ্ডারের কাছে যার মন বাঁধা পড়েছে, আজ জোসেফাইন, কাল নেলী, পরশু রীণী যার গলায় বাহুর মালা দুলিয়ে চলে যায়, তোমার নীল সমুদ্রের মত ঐ দুটো চোখও তার গলায় বন্ধনের শৃঙ্খল জড়িয়ে দিতে পার্‌ত না।

ভেবেছিলুম দু' লাইনে চিঠিখানা শেষ করব। কিন্তু মাতালের অত্যুক্তি দেখ্‌ছি এর ভেতরেও এসে পড়েছে। মাতালের আর যাই দোষ থাক্—সত্য কথা সে অত্যন্ত সোজা ভাবেই বলে যায়। আমার চিঠি পড়ে ঘা পাবেই। কিন্তু কোথাও যদি অনর্থক ঘা দিয়ে থাকি, মাপ করো ভাই, মাপ করো।

মণ্ট পত্র পড়ার আনন্দেই মশ্‌গুল হ'য়ে ছিল। তাই সে তার দিদির দিকে এতক্ষণ একবারও তাকিয়ে দেখে নি। 'এইবার পত্র শেষ করে আদর কাড়বার লোভে দিদির দিকে ফিরে তাকাতেই সে দেখ্‌তে পেলে; তারি কোলের পাশটাতে তার দিদি মূর্চ্ছাহতের মত পড়ে রয়েছে। তার মুখের দীপ্তি নিভে গেছে, একটা বেদনার ছাপ সেই রক্তহীন ফ্যাকাশে মুখের ওপর এমন ভাবেই ফুটে উঠেছে যে, মণ্টুর মত ছেলেমানুষের চোখেও দুঃখের তীব্রতার ইঙ্গিতটুকু ছাপা রইল না। সে তাড়াতাড়ি দিদির মাথাটা কোলের ওপর তুলে ধরে' চীৎকার করে ডাক্‌লে—সাবিত্রী-দি!

৫

দোলপূর্ণিমার রাত! বসন্তের যৌবনশ্রীর সমস্ত আনন্দ মদের ফেণার মত উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠে আকাশে যে বান ডাকিয়েছে, মানুষের মন তারি খানিকটা পান করে একেবারে মাতাল হ'য়ে উঠেছে। বাতাসের ভেতর মায়াপুরীর মনোহরণের বাঁশী বাজ্‌ছে। জ্যোৎস্নার সমুদ্রের ঢেউগুলোর ওপর দিয়ে রহস্য-লোকের মায়া-কন্যারা নেচে চলেছে কোথায় কোন্ মনোরাজ্য জয় কর্‌বার জন্যে, কে জানে! রাত ঘন হ'তে ঘনতর হয়ে উঠ্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে জ্যোৎস্নার ভেতরকার নেশাও যেন জমাট বেঁধে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। বিছানার ভেতর প্রতিভা অনেকক্ষণ ধরে ঘুমের ভান করে পড়ে ছিল, নির্জ্জীব আড়ষ্টের মত। কিন্তু ঘুমহীনার ঘুমের ভান করে পড়ে থাক্‌বার মত দুঃখ আর নেই—বিশেষতঃ এমন রাত্রিতে যখন মনের দোলায় সমুদ্রের কাঁপন জেগে ওঠে।

প্রতিভা নিঃশব্দে শয্যা ত্যাগ করে' তার জানালার তলে এসে দাঁড়াল। প্রতি দিনের অভ্যাসের ফলে এই হতভাগিনীর কাছে কেবলমাত্র এই রাস্তাটুকুই পরিচিত হয়ে উঠেছিল। জানালার ধারে বসে দৃষ্টিহীন চোখ্ মেলে বাইরের দিকে তাকাতেই তার কানে এসে বাজ্‌ল পাড়ার হিন্দুস্থানীদের হোলীর গান—হো হো নন্দদুলালা—

কি আনন্দ উৎসবের রেশ লেগেছে এদের মনে, দমকা হাওয়ার মত তাদের গতি লঘু হ'য়ে উঠেছে। সমস্ত দিন রাত্রি ধরে তাদের চলারো বিরাম নেই—গানেরো বিরাম নেই। ফাগের রেণুতে পথের ধূলি রাঙা হ'য়ে উঠেছে, দেহ রাঙিয়ে গেছে, মনের মেঘেও রাঙা বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে।' তাতে আলো আছে কিন্তু বজ্রের জ্বালা নেই।

প্রতিভার মনে হ'ল ফাল্‌গুনের এই বসন্ত রাত্রিটি তার চিত্তের দুয়ারেও কতবার কত রকম করে নেমে এসেছে। কত রেখা এঁকে গেছে তার মনের ওপরে, একটির পর একটি করে স্মৃতির পুঁথিখানা মনের চোখের সাম্‌নে মেলে ধরে সে তাই পড়্‌তে লাগল। সে যে কেবল হাসি গান আর উৎসবের অভিসারের কথা।

তার মনে হ'ল জ্যোৎস্নার অফুরন্ত জোয়ারের ভেতর প্রভাতের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে বসে ফাগুন পূর্ণিমার গান—

"ফাগুন লেগেছে বনে বনে,
ডালে ডালে ফুলে ফুলে পাতায় পাতায় গো
আড়ালে আড়ালে কোণে কোণে।"

আকাশ হয় তো আজও রঙিন হয়ে উঠেছে, গানে-গানে হয় তো উদাস নিখিলের অন্তরও ভরে গেছে। কিন্তু কই, ত'ার মনে মনে চল-চঞ্চল নব-পল্লব দলের মর্ম্মর তো জাগ্‌ছে না!

কেন জাগ্‌বে—কেন জাগ্‌বে?

"যার ছোঁয়া লাগ্‌লে পরে
একটুকুতেই কাঁপন ধরে"

'যার কানে কানে একটি কথায় সকল কথা' ভুলিয়ে নে যায়, তার মনের সেই দখিণ হাওয়া—পথিক হাওয়ার সাড়া তো আজ তার কাছে আসে নি! আসে তো নাই-ই—কখনো যে আস্‌বে তারো সম্ভাবনা নেই।

ফাগুন তো এলো, গন্ধে উদাস হাওয়ায় তার উত্তরী খুল্‌ছে, হয় তো কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী তার কানে, তার হাসির আড়ালে যে আগুন ঢাকা রয়েছে তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু অন্ধের কাছে তার কিসের দাম আছে! ফাগুনে দেখা পাবার আশায় কত দিন ধরে সে যে বসে ছিল পথ চেয়ে আর কাল গুণে। হঠাৎ এই বসন্ত পূর্ণিমার রাত্রিতেই যে তার আকাশ এমন করে বজ্রের জ্বালায় জ্বলে উঠ্‌বে সে কি তা জান্‌তো?

কেন জানে নাই—সে তো তারি দোষ। সত্যই তো অন্ধকে নিয়ে কে কবে জীবনের উচ্ছ্বসিত যৌবনকে ব্যর্থ করেছে? তার যাচ্‌না যদি স্বার্থপর হ'তে পেরে থাকে, তবে সে স্বার্থের ছাপ অন্তের অন্তরেই বা থাকবে না কেন?

হঠাৎ তার মনে হ'ল—এ এক রকম বেশ ভালোই হয়েছে। মিথ্যার যে নাগপাশ এত দিন ধরে তাকে 'অক্টোপাশে'র মত হাজার বাহু মেলে জড়িয়ে ছিল, তার হাত থেকে সে যে মুক্তিলাভ করেছে, সে তো তার দুঃখ নয়, সেই তো তার পরম লাভ। কত বড় অবাস্তব কল্পনার পাখায় ভর দিয়ে সে যে এত দিন মাতামাতি করেছে, তাই মনে পড়ে, সেই নির্জ্জন রাত্রিতেও প্রতিভার মুখ লজ্জায় রাঙা হ'য়ে উঠল।

সত্যের দেখা না পাওয়া পর্য্যন্তই মানুষ তাকে ভয় করে' চলে। কিন্তু একবার দেখা পেলে, তা যত বড়ই নির্ম্মম হোক্ না কেন, মানুষের মন তার ভেতরই আশ্রয় লাভ করে' নিশ্চিন্ত হ'য়ে ওঠে। নিজের দিক থেকে সত্যের এই রূপটা প্রতিভার কাছে সত্য হ'য়ে উঠ্‌তেই, তার মনে পড়্‌ল সাবিত্রীর কথা। কি অপূর্ব্ব ত্যাগ ও মনের দৃঢ়তা কুসুমের মত কোমল এই মমতাময়ী রমণীটির। প্রেমাস্পদকে কাছে পায়নি বলে সে যখন দুঃখের চিতার জ্বালা নিজের বুকের ভেতর অনুভব করে অধীর হ'য়ে উঠ্‌ছিল, সাবিত্রী তখন তার নিজের প্রেমাস্পদকেই তার কাছে এনে দেবার চেষ্টা করেছে। আপনাকে এমনভাবে আহুতি দেবার সাধনা যখন মানুষ চোখের সাম্‌নে দেখে, তখন তার দুঃখ তুলনায় সত্য-সত্যই হাল্কা হ'য়ে পড়ে। দু' হাত তুলে প্রতিভা মনে মনে সাবিত্রীকে প্রণাম ক'রে তার অন্তরের দেবতাকে বল্‌লে—হে ঠাকুর, তুমি নিষ্ঠুর, তুমি আমাকে অনেক দুঃখ দিয়েছ, কিন্তু আশ্রয় দিতেও দ্বিধা কর নি—তোমারি জয় হোক্!

তার পর সে মৃদুকণ্ঠে ডাক্‌লে—দিদি, জেগে আছ? সাবিত্রী জেগেই ছিল। প্রতিভা ডাক্‌তেই সে তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে তাকে দু'হাত দিয়ে বুকের ভেতর জড়িয়ে নিয়ে বল্‌লে—চল্ ভাই, একটু ঘুমুবি চল। রাত যে তিন পহর গড়ে গেছে।

—ঘুম কি আমারি একার দরকার দিদি! কিন্তু তুই ঘুমুস্‌নি বলে আমি তোকে কোনো রকমের অনুযোগ করছিনে—আজ যে জেগে থাকবারই রাত। ঐ শোন্, ও-পাড়ার হিন্দুস্থানীগুলো এখনো কল্লোড় করছে।

—আজ যে দোল-পূর্ণিমা, ওদের উৎসব, তাই তো ওরা ঘুমুতে পার্‌ছে না।

—দোল-পূর্ণিমার উৎসব কেবল তো ওদের নয় দিদি,

বিশ্ব-মানবের। আকাশে জ্যোৎস্নার বান ডেকেছে না দিদি? আমি চোখে দেখ্‌তে পাচ্ছি নে; কিন্তু তুই ভালো করে চেয়ে দেখ,—ও বান রিক্ততার বান। এত রিক্ততার মাঝে কি কেউ ঘুমোতে পারে?

—ওরে থাম্, থাম! আর বলিস্ নে, আমি যে আর সইতে পারছি নে।

প্রতিভা দুটো হাত দিয়ে সাবিত্রীকে আরো একটু নিবিড় করে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বল্‌লে—ছিঃ দিদি, তুই কাঁদ্‌ছিস্! রিক্ততা মানেই তো দুঃখ নয়। ঐ যে চাঁদ, ও তো আপনাকে একেবারে রিক্ত করেই দিয়ে যাচ্ছে। তবু ও তো কাঁদ্‌ছে না; ওর হাসির পাথারেই জোয়ার জেগেছে। নিজে তুই আপনাকে এমন ভাবে রিক্ত করে' দিয়েছিস যে, তা জান্‌বারও সুযোগ দিলিনে—তবু রিক্ততার নামে তোর চোখে জল আসে?

—কিন্তু তবু তো তোকে সুখী কর্‌তে পার্‌লুম না।

—সুখের চেয়ে ঢের বড় জিনিস যে তুই দিয়েছিল্, তাই তো সুখী কর্‌তে পার্‌লি নে। সুখটা নেহাৎ আমাদের এই মাটির বস্তু। কিন্তু তুই যা দিয়েছিস্ তা যে মাটির ঢের ওপরের জিনিস। জানিস্ দিদি, আমার আজ কি মনে হচ্ছে? আমার মনে হচ্ছে, এ-জন্মে আমি তোর বোন্ হয়েছি, কিন্তু আর-জন্মে তুই আমার মা ছিলি।

সাবিত্রী একেবারে কান্নায় ফেটে পড়ে বলে উঠ্‌ল—সর্ব্বনাশি, এতেও তোর সাধ মেটেনি! তুই আমার বুকটাকে মুচ্‌ড়িয়ে, দুম্‌ড়িয়ে ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো করে দিতে চাস্!

বৃষ্টির পর রৌদ্র পড়ে আর্দ্র ভেজা পল্লবগুলো যেমন হাস্‌তে থাকে, অথচ সেই হাসির ভেতর হ'তে করুণ বেদনার রেখাটাও একেবারে মুছে যায় না—অশ্রু-ছলছল্ অন্ধ চোখ দুটো হাসিতে ভরে নিয়ে প্রতিভা বল্‌লে—না দিদি, আর তোকে দুঃখ দেব না, এইবার চল্ ঘুমুতে যাই।

উদাসিনী

সুন্দরবনের প্রাচীন ইতিহাস

শ্রীকালিদাস দত্ত

নিম্নবঙ্গের দক্ষিণাংশে সুন্দরবনের মধ্যে যে সকল অতি-প্রাচীন স্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে, বর্ত্তমান ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার অধীন মথুরাপুর থানার উত্তর-পূর্ব্বাংশ প্রদেশ তন্মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা এক্ষণে মহানগরী কলিকাতার প্রায় ৩২ মাইল দক্ষিণে উত্তর হাতীয়াঘর ও খাড়ী পরগণার মধ্যে লালপুর, জলঘাটা, নালুয়া, ছত্রভোগ, কৃষ্ণচন্দ্রপুর, বড়াশী, মাদপুর, কাশীনগর, খাড়ী, রাধাকান্তপুর, বকুলতলা, বাড়ীভাঙ্গা, রায়দীঘি, কঙ্কনদীঘি, ও জটা প্রভৃতি বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী রূপে প্রাচীন আদি গঙ্গার শুষ্ক গর্ভ-গঙ্গার বাদা নামক নিম্নভূমির উভয় তীরে অবস্থিত; এবং উত্তরে আদি গঙ্গার শুষ্ক খাত গঙ্গার বাদা ও পূর্ব্বে নালুয়ার গঙ্গা বা মনী নদী দ্বারা সীমাবদ্ধ। প্রায় ৮০।৯০ বৎসর হইল, উক্ত প্রদেশ ক্রমশঃ হাসিল হইয়া, তথায় ইদানীং উক্ত পল্লী সকল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। তৎপূর্ব্বে উহা সুন্দরবনের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া রাজব্যাঘ্র, ও গণ্ডার প্রভৃতি ভীষণ শ্বাপদকুলের আশ্রয় স্থান ছিল। কথিত আছে যে, জঙ্গল হাসিলের পর, সেখানে অনেকগুলি নীলকুঠীর ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল; এবং ঐ সকল নীলকুঠীর সন্নিকটে কোন কোন স্থানে নীল চাষের চিহ্নও বর্ত্তমান ছিল। ঐরূপ দুইটী নীল প্রস্তুত করিবার গৃহের ভগ্নাবশেষ আজিও ছত্রভোগে বিদ্যমান আছে। প্রবাদ এই যে, প্রাচীন কালে তথায় আদি গঙ্গার উপরে যে সকল লোকালয় ছিল, তাহা খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বন্যায়, ভূমিকম্পে ও মগ-ফিরিঙ্গীগণের ভীষণ অত্যাচারে ধ্বংস হইলে, উক্ত প্রদেশ জনশূন্য হইয়া ক্রমশঃ ঐরূপ নিবিড় অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল। অধুনা তথায় উক্ত শুষ্ক খাত ব্যতীত ভাগীরথী নদীর আদিম প্রবাহের চিহ্ন স্বরূপ লালাপুরে শঙ্খদোনা ও কাশীনগরে চক্রতীর্থ নামে দুইটী প্রাচীন গঙ্গা ও ভগীরথ সম্পর্কীয় তীর্থস্থান বিদ্যমান আছে; এবং ঐ তীর্থস্থান দুইটী সম্বন্ধে তথায় এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, ভগীরথ গঙ্গাকে লইয়া যাইতে যাইতে উক্ত স্থান দুইটীতে তাঁহাকে আর চিনিতে পারেন নাই। সে কারণ তিনি তথায় ভগীরথকে স্বীয় হস্তস্থিত শঙ্খ ও চক্র দেখাইয়া নিজ স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। এক্ষণে উক্ত চক্রতীর্থে ভাগীরথীর শুষ্ক গর্ভের উপর চক্রকুণ্ড, গোপালকুণ্ড ও মনীকুণ্ড নামে যে তিনটি পুষ্করিণী আছে, তথায় স্নানযাত্রা উপলক্ষে প্রতি বৎসর চৈত্রের শুক্লা প্রতিপদে নন্দার মেলা নামে তিন দিন ব্যাপী একটী বিখ্যাত মেলা বসিয়া থাকে, এবং উহাতে প্রায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়। বৃদ্ধ লোকেরা বলিয়া থাকেন যে, কলিকাতার নিম্নে গঙ্গা কাটা অবধি, ভাগীরথীর উক্ত প্রবাহ তথা হইতে সরিয়া গিয়া কলিকাতার নিম্নে কাটা গঙ্গা দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। তাঁহাদের মতে সেইজন্যই কলিকাতার নিম্নে হুগলী নদীতে স্নান করিলে গঙ্গা-স্নানের ফল হয় না বলিয়া হিন্দুগণ বিশ্বাস করেন। এক্ষণে কালীঘাটের উপর টালীস্ নালা (Tolly's Nullha) নামে ভাগীরথীর যে প্রবাহ বর্ত্তমান আছে, উহাই প্রাচীন কালে ভাগীরথী নদীর আদিম ও প্রধান প্রবাহ ছিল। উহা তখন বর্ত্তমান কলিকাতার দক্ষিণে অবস্থিত গড়িয়া নামক স্থানের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিক হইতে রাজপুর, বারুইপুর, মাইনগর, মুণ্টী, দক্ষিণ বারাসাত, জয়নগর ও বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানের উপর দিয়া আসিয়া উক্ত প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত। (১) উহার শুষ্ক খাত—গঙ্গার বাদা বা মজা গঙ্গা নামে যাহা আজিও ঐ সকল গ্রামের মধ্য বর্ত্তমান আছে, তাহা দেখিলে এখনও বেশ বুঝা যায় যে, প্রাচীনকালে ভাগীরথী নদী সূর্য্যপুরের নিম্ন হইতে দক্ষিণ মুখে আসিয়া বিষ্ণুপুর হইতে পূর্ব্বমুখে প্রবাহিত হইয়াছিলেন এবং তথা হইতে লালপুরের মধ্যস্থিত পূর্ব্বোক্ত শঙ্খদোনা দিয়া জলঘাটার সান্নিধ্য হইতে পুনরায় দক্ষিণমুখী হইয়া ছত্রভোগ, কৃষ্ণচন্দ্রপুর, বড়াশী, মাদপুর, কাশীনগর প্রভৃতি গ্রাম পশ্চিমে ও নালুয়া, রাধাকান্তপুর, খাড়ী ও রায়দীঘি প্রভৃতি স্থান পূর্ব্বে রাখিয়া রায়দীঘির সন্নিকট হইতে বহু মুখে বিভক্ত হইয়া সাগরে মিশিয়াছিলেন। স্থানীয় লোকেরা সেইজন্য এখনও প্রাচীন ভাগীরথী-প্রবাহের ঐ সকল শুষ্ক খাত ও তৎপার্শ্বস্থ নিম্নভূমির উপর শবদাহ করে, এবং তথাকার পুষ্করিণীর জল পবিত্র বলিয়া ব্যবহৃত হয়। কোন্ সময় হইতে তথায় ভাগীরথী নদীর আদিম প্রবাহ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা আজিও ঠিক নির্দ্ধারিত হয় নাই। রেনেল সাহেবের মানচিত্র দেখিলে বুঝা যায় যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতেই উহার জল দক্ষিণে ছত্রভোগ প্রভৃতি গ্রামের দিকে না আসিয়া উহার উত্তর-পূর্ব্ব পার্শ্বস্থ বেলুয়ার গাঙ্গ দিয়া পূর্ব্ব-দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়াছিল। (২) চৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থে দেখা যায় যে, মহাপ্রভু

(১) Statistical Account of 24 Perganas. W. W. Hunter, Pages 29.

(২) The Ganges river in Bengal, Rennel.

…দেবের নীলাচল যাত্রাকালেও ছত্রভোগের দক্ষিণে অম্বুলিঙ্গ …দেবের সন্নিকটে গঙ্গার শত মুখ বিদ্যমান ছিল। (৩) উহা হইতে …য়মান হয় যে, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর …ভাগের পূর্ব্বেই তথায় ভাগীরথীর প্রবাহ লুপ্ত হইয়াছিল। …রও কাহারও মতে ১০০১ সালের জলপ্লাবনের সময় নালুয়ার

নীলকুঠী

…রা মনীনদীর সৃষ্টি হইলে ভাগীরথীর জল তৎকাল হইতেই ছ…ভোগের দক্ষিণে না গিয়া উক্ত নদী দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল। (৪) বর্ত্তমান সময়ে উক্ত প্রদেশের প্রাচীনত্বের নিদর্শনসমূহের মধ্যে …রথী নদীর পশ্চিমকূলে বড়াশীতে অম্বুলিঙ্গ (৫) ছত্রভোগে ত্রিপুরা-সুন্দরী (৬) ও অন্ধ মুনি প্রভৃতি নামে কতকগুলি প্রাচীন হিন্দু তীর্থক্ষেত্র বিদ্যমান আছে। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে পূর্ব্বোক্ত নন্দার মেলা ব্যতীত জ্যৈষ্ঠ ও মাঘ মাসে তথায় ত্রিপুরাসুন্দরীর ও অন্ধমুনির জাত নামে অন্য দুইটী মেলা হইয়া থাকে। কথিত আছে যে, পূর্ব্বে খাড়ীর দক্ষিণে কপিলমুনি নামক আর একটী প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র ছিল; এবং সেখানেও প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরের মেলার সমকালে কপিলমুনির পূজা

---

(৩) এই মত প্রভু জাহ্নবীর কূলে কূলে।
আইলেন ছত্রভোগে মহা কুতূহলে॥
সেই ছত্রভোগে গঙ্গা হইয়া শতমুখী।
বহিতে আছয়ে সর্ব্বলোকে করে সুখী॥
জলময় শিবলিঙ্গ আছে সেই স্থানে।
অম্বুলিঙ্গ ঘাট করি বলে সর্ব্বজনে॥
চৈতন্য ভাগবত অন্তঃ খণ্ড দ্বিতীয় অধ্যায়।

(৪) কুমুদানন্দ। শ্রীনকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য—পৃষ্ঠা ৩০।

(৫) অম্বুলিঙ্গের বর্ত্তমান নাম বদরিকানাথ। উহা এক্ষণে …র জাঙ্গালের পশ্চিমে বড়াশী গ্রামে বিদ্যমান। অধুনা তথায় যে …র আছে, উহা তথাকার প্রাচীন মন্দির নহে। কথিত আছে যে, তথাকার প্রাচীন মন্দির বহু দিন পূর্ব্বে ভূমিকম্পে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বড়াশীতে প্রবাদ যে, উহা কালীঘাটের নকুলেশ্বর ভৈরবের ন্যায় অনাদি লিঙ্গ।

(৬) ত্রিপুরাসুন্দরী তীর্থক্ষেত্রে এক্ষণে ত্রিপুরবালা ভৈরবী নাম্নী এক দারুময়ী দেবী-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা আছেন। এই দেবালয়ের পুরোহিতগণ বলেন যে, উহা একটী পীঠস্থান. এবং দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী শক্তি ও বড়াশীর অম্বুলিঙ্গ ভৈরব। সাধারণের বিশ্বাস, তথায় দেবীর বক্ষঃস্থল (বুকের ছাতি) পড়িয়াছিল। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শ্রীমন্ত সদাগর সিংহল যাত্রাকালে ছত্রভোগে নামিয়া তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, উক্ত ত্রিপুরা-সুন্দরী দেবীর মন্দির বহু বহু প্রাচীনকালে কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রামের নিকটবর্ত্তী কাটান দীঘি নামক স্থানে ছিল। পরে উহা তথা হইতে ছত্রভোগে স্থানান্তরিত হয়। এক্ষণে যে দেবীগৃহ ছত্রভোগে বর্ত্তমান

ও তদুপলক্ষে মেলা হইত। লোকে তখন সেখানে নানারূপ মানসিক করিত ও ঢিল বাঁধিত (৭)। উহা ব্যতীত কৃষ্ণচন্দ্রপুর

ত্রিপুরাসুন্দরী

ছত্রভোগ, খাড়ী, নাড়ীভাঙ্গা ও কঙ্কন দীঘি (৮) প্রভৃতি গ্রামে বহু ইষ্টকপূর্ণ স্থান, ভাঙে বহু ইষ্টক-নির্ম্মিত অট্টালিকা ও ভগ্ন

আছে, উহাও তথাকার প্রাচীন মন্দির নহে। ১২৭১ সালের ঝড় উক্ত প্রাচীন মন্দির পড়িয়া যাইবার পরে, ইদানীন্তন মন্দির-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। বৃদ্ধলোকেরা বলিয়া থাকেন যে, তথাকার পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন মন্দির আকারে অতিশয় বৃহৎ ছিল। আজিও প্রাচীন দেবীগৃহের ভগ্ন ভিত্তি বর্ত্তমান: মন্দিরের চতুর্দ্দিকে যে অসংখ্য ইষ্টকরাশি স্তূপাকারে পড়িয়া আছে, তাহা দেখিলে, উহা বেশ স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। উক্ত ইষ্টক স্তূপ ও তদন্তর্গত প্রাচীন মন্দিরের ভগ্ন ভিত্তি হইতে বড় বড় কতকগুলি চতুষ্কোণবিশিষ্ট প্রস্তরখণ্ড বাহির হইয়াছে। উক্ত দেবালয়ের মধ্যে এক্ষণে একটী প্রস্তরের নৃসিংহ-মূর্ত্তি ও একটী শিবলিঙ্গ রক্ষিত আছে। ঐ মূর্ত্তি দুইটীও উহার সন্নিকটস্থ একটী পুষ্করিণী খননকালে পাওয়া গিয়াছে। উহার দক্ষিণে প্রাচীন রাঘব দত্তের দীর্ঘিকা অবস্থিত। উক্ত দীর্ঘিকার চারি কোণে চারিটী ভগ্ন ইষ্টক-নির্ম্মিত ঘাট চৈত্র বৈশাখ মাসে জলের নিম্নে আজিও দেখিতে পাওয়া যায়।

গৃহের ভিত্তি ও অনেক পুরাতন ইষ্টক-নির্ম্মিত ঘাটের ভগ্ন অংশ প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তথাকার নানা স্থানে পুষ্করিণী খনন কা-

ভূগর্ভ হইতে বহু সংখ্যক প্রস্তর-নির্ম্মিত শিবলিঙ্গ, বিষ্ণু, মহাদেব, কালী, বুদ্ধ ও নৃসিংহ মূর্ত্তি (৯) জাহাজের জীর্ণ মাস্তুল, তক্তা ও লোহার

(৭) বঙ্গদেশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

(বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনের বিজ্ঞান শাখায় পঠিত প্রবন্ধ।)—শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত

(৮) কঙ্কন দীঘি বর্ত্তমান খাড়ী পরগণার মধ্যে রায় দীঘির পূর্ব্ব পার্শ্বে অবস্থিত এবং প্রায় ৪০ বৎসর হইল হাসিল হইয়াছে। এক্ষণে উহার উত্তরাংশ প্রদেশ খনন কালে বহু সংখ্যক প্রাচীন গৃহের ভিত্তি ও ইষ্টকরাশি বাহির হইতেছে, এবং ৭।৮টী জঙ্গলাবৃত পুরাতন অট্টালিকার ভগ্ন স্তূপ ও অনেকগুলি বড় বড় মজা দীর্ঘিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে; তন্মধ্যে শ্বেত রাজার বাটী, পিলখানার বাটী, গজগিরি বাটী, ও ঝড়ীর মার বাটী নামক স্তূপগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন সেখানে অনেকগুলি প্রস্তর নির্ম্মিত দেব-দেবী মূর্ত্তি ও থামের অংশ প্রভৃতি বাহির হইয়াছে। তন্মধ্যে একটী বিষ্ণু মূর্ত্তি ও একটী কালী-মূর্ত্তি তথাকার জমীদার শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসা রায় চৌধুরি মহাশয়ের রায় দীঘির কাছারীর সম্মুখস্থ ঠাকুর-ঘরে রক্ষিত আছে।

(৯) ঐ মূর্ত্তিগুলির মধ্যে বিষ্ণু-মূর্ত্তিরই সংখ্যা অধিক। এ প্রবন্ধ মধ্যে উল্লিখিত ও প্রকাশিত, দেবমূর্ত্তিগুলি ব্যতীত জলঘাটা পুষ্করিণী হইতে তিনটী বিষ্ণু-মূর্ত্তি ও নল গোঁড়ায় ও রায় দীঘিতে দুইটী বুদ্ধ ও একটী বড় বিষ্ণু মূর্ত্তি, ছত্রভোগের কুণ্ডের পুষ্করিণী হইতে একটী

অম্বুলিঙ্গ

টা দেউল নামে বিরাট উত্তুঙ্গ মন্দির (১০) রায়দীঘিতে ও দক্ষিণে দীর্ঘ প্রায় ১০০/০ বিঘা স্থান ব্যাপী ঐ নামে একটী প্রকাণ্ড জলাশয় ও উক্ত প্রদেশের পার্শ্বস্থ মনী নদীর উপর মনির টাটে ক্রোশ ব্যাপী সুবৃহৎ গড় (১১) ও তৎপার্শ্বে বাইশ:হাট্টায়

...মূর্ত্তি, গজমুরী গ্রামে একটী বিষ্ণু-মূর্ত্তি ও কঙ্কন দীঘিতে একটী ...র্ত্তির অংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এরূপ আরো বহু দেবমূর্ত্তি ...র নানা স্থানে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানা যাইতেছে; কিন্তু ...র ঠিক সংবাদ সংগ্রহ করিতে না পারায় এখানে তাহাদের ... করা হইল না।

(১০) জটা প্রায় ৫০ বৎসর হইল হাসিল হইয়াছে। প্রবাদ এই ...থায় অরণ্য মধ্যে একটী ভীষণ ব্যাঘ্রের মস্তকে জটা ছিল বলিয়া ...ঙ্গল, ও দুইখানি প্রাচীন তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ...খানি মহারাজা লক্ষ্মণ সেন দেবের ও অন্যখানি ৮৯৭ শকাব্দে ...র্ণ রাজা জয়ন্তচন্দ্রের। এতদ্ভিন্ন তথাকার অরণ্য মধ্য ...ে জঙ্গল হাসিলের পর কঙ্কন দীঘির পূর্ব্ব পার্শ্বে অবস্থিত জটায়, ঐ স্থান উক্ত নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এবং সেখানে আবিষ্কৃত উক্ত দেউলও সেইজন্য জটার দেউল নামে অভিহিত হইয়াছে। উহা এক্ষণে তথায় প্রায় দুই বিঘা স্থান ব্যাপী ২০।২৫ হাত উচ্চ ভগ্ন ইষ্টকের ও মাটীর স্তূপের উপর অবস্থিত। প্রবাদ, বহু পূর্ব্বে Smiths নামক জনৈক ইংরাজ পুরুষ গুপ্ত ধনের আশায় মন্দিরটীর মস্তক ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন। সে কারণ উহা ঠিক কত উচ্চ ছিল, তাহা নির্দ্ধারিত হয় নাই। বর্ত্তমান সময়ে উহার উচ্চতা প্রায় ১০০ ফিট হইবে। কিছু দিন পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক Ancient Monuments Actএর বিধান অনুসারে উহা গৃহীত হইবার পরে উহার ইদানীন্তন চূড়াটী প্রস্তুত হইয়াছে। মন্দিরটী পূর্ব্বদ্বারী এবং উহার অভ্যন্তর-ভাগ প্রায় ৮।৯ ফিট নিম্নে অবস্থিত। সিঁড়ী দিয়া নামিয়া উহার মধ্যে যাইতে হয়। এক্ষণে উহার উত্তর-পূর্ব্ব পার্শ্বে একটী বড় কূয়ার চিহ্ন ও উত্তরাংশে বহু সংখ্যক ইষ্টকরাশি স্তূপাকারে বিদ্যমান আছে। পূর্ব্বে তথায় মাটীর নিম্নে একটি ভগ্ন গৃহ ছিল বলিয়া জানা যায়। অরণ্য হাসিল কালে উহার মধ্য হইতে দুইখানি শিলালিপি বাহির হইয়াছে। তন্মধ্যে একটিতে কতকগুলি মূর্ত্তি খোদিত ছিল। তাহা এক্ষণে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। উহা এক্ষণে তথাকার জমিদারের কাছারী-বাটীর মধ্যে একটি বৃক্ষের নিম্নে রক্ষিত আছে। স্থানীয় লোকেরা তথায় উহার পূজা করিয়া থাকে। উক্ত মন্দিরটী সেখানে বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু মন্দির বলিয়া প্রসিদ্ধ; কিন্তু উহা ভাল করিয়া দেখিলে বৌদ্ধ মন্দির বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।

(১১) অধুনা উক্ত গড়ের কতকাংশ মনির টাটের ও নল গোঁড়ার মধ্যে ও কতকাংশ রাধাকান্তপুরের মধ্যে বিদ্যমান আছে। আজিও উহা দৈর্ঘ্যে প্রায় দুই ক্রোশ, প্রস্থে প্রায় ১৫০ ফিট ও উচ্চতায় প্রায় ৩০।৩৫ ফিট হইবে। পূর্ব্বে উহা সম্পূর্ণরূপে জঙ্গলাবৃত হইয়া অরণ্য মধ্যে ছিল। জঙ্গল হাসিলের পর হইতে, স্থানে স্থানে উহার দুই পার্শ্বে বহু পুরাতন বয়ড়া, হরিতকী, বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষের সারি দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। এক্ষণে উহার উপরে দুই ধারে বহু লোকের বসতি হইয়াছে। উহাকে তিন খণ্ডে বিভক্ত করিয়া উহার মধ্য দিয়া মনী নদী প্রবাহিত হইতেছে। গড়ের দক্ষিণে রায় দীঘির পুষ্করিণী, কঙ্কন দীঘির প্রাচীন জনপদের ধ্বংসাবশেষ ও জটার দেউল অবস্থিত।

ও নল গোঁড়ায় মঠ বাড়ী নামে তিনটী বৃহৎ ভগ্নস্তূপ (১২) ও ছত্রভোগ হইতে রায় দীঘি পর্য্যন্ত ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে স্থানে স্থানে একটী প্রশস্ত প্রাচীন রাস্তার অংশও আবিষ্কৃত হইয়াছে। উক্ত পথই এক্ষণে দ্বারির জাঙ্গাল নামে প্রসিদ্ধ। (১৩) রেনেল সাহেবের গাঙ্গেয় উপদ্বীপের মানচিত্র দেখিলে বুঝা যায় যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে উহারই উত্তরাংশ নালুয়া হইতে কালীঘাট পর্য্যন্ত গঙ্গাতীর দিয়া সুগম পথ ছিল। প্রবাদ, প্রাচীন কালে উহাই হরিদ্বার-গঙ্গাসাগর রাস্তা নামে অভিহিত হইত, এবং হাঁটা পথে গঙ্গাসাগর আসিবার উহাই একমাত্র পথ ছিল। কাহারও কাহারও মতে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে নীলাচল যাত্রাকালে উক্ত পথ দিয়াই জাহ্নবীর কূলে-কূলে ছত্রভোগে শুভাগমন করিয়াছিলেন।

এক্ষণে তথায় আবিষ্কৃত ও প্রাপ্ত ঐ সকল প্রাচীন জনপদের ধ্বংসাবশেষগুলি দেখিলে ইহা বেশ স্পষ্ট বুঝা যায় যে, উক্ত প্রদেশ বহু পুরাকাল হইতেই সুন্দরবন মধ্যে একটী বিশেষ সমৃদ্ধিশালী জনপদরূপে বর্ত্তমান ছিল। ভাগীরথী নদীর মূল প্রবাহ উহার উপর দিয়া সুদূর অতীত কাল হইতে সাগর-সলিলে আত্ম বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন বলিয়াই তথায় প্রাচীন কাল হইতে ঐ সকল প্রসিদ্ধ দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রধান কারণ ঘটিয়াছিল। কিন্তু প্রাচীন কালে উক্ত প্রদেশের অবস্থা ঠিক কিরূপ ছিল, এবং তথায় আবিষ্কৃত ঐ সকল লোকালয়ের ভগ্নাবশেষসমূহের প্রাচীনত্ব কত দিনের তাহা আজিও ঠিক নির্দ্ধারিত না হওয়ায় তৎসম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। এ বিষয়ে এক্ষণে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে জটার দেউলের সন্নিকটে অরণ্য হাসিলের সময় তথাকার তৎকালীন

কৃষ্ণচন্দ্রপুরের ভগ্ন মূর্ত্তি

ভুম্যধিকারী বাবু দুর্গাপ্রসাদ চৌধুরী মহাশয় জটার দেউল প্রা[illegible] সময় পূর্ব্বোল্লিখিত যে তাম্রফলকখানি প্রাপ্ত হন, উহাই এ পর্য্যন্ত যে সকল প্রাচীন কাল-নির্দ্দেশক নিদর্শনাদি পাওয়া [illegible]

(১২) খাড়ীর উত্তরে নালুয়া নামক স্থানের প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্ব দিকে, বাইশ হাট্টার মঠ-বাড়ীর স্তূপ দুইটী বর্ত্তমান। তন্মধ্যে বৃহত্তর স্তূপটী আকারে প্রায় ৪০।৪৫ ফিট উচ্চ, এবং প্রায় দেড় বিঘা স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত ও অসংখ্য ইষ্টকরাশিতে ও বহু বৃক্ষাদিতে পূর্ণ। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে উহার পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত ছোট স্তূপটীর একাংশ খনন করাইবার সময় উহার মধ্য হইতে প্রস্তর-নির্ম্মিত চৌকাটের অংশ ও প্রস্তর-ফলক প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া জানা যায়। মেজর রেনেল কৃত অষ্টাদশ শতাব্দীর গাঙ্গেয় উপদ্বীপের মানচিত্রে নালুয়া, গাঙ্গের উত্তরে একটী চতুষ্কোণ চিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত এবং প্যাগোডা বলিয়া লিখিত আছে। আমাদের বোধ হয়, রেনেল সাহেবের জরিপ কালে উহা বর্ত্তমান সময়ের মত একেবারে ভূমিসাৎ হয় নাই; তখনও অরণ্য মধ্যে প্যাগোডারই আকারে ভগ্ন অবস্থায় ছিল। সেই জন্যই সম্ভবতঃ প্যাগোডা বলিয়া মানচিত্রে লিখিত হইয়াছিল। উক্ত স্তূপ দুইটী আজিও তথাকার অধিবাসিগণের নিকট মঠ বাড়ী নামে পরিচিত। কেন যে উহা তথায় ঐ নামে বিখ্যাত, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। আমাদের বিশ্বাস উক্ত প্যাগোডা হইতে উহা মঠ বাড়ী নামে পরিচিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ উহা কোন প্রাচীন বৌদ্ধ মঠের ভগ্নাবশেষ।

(১৩) উক্ত পথ আজিও বারুইপুরের সন্নিকট হইতে রায় দীঘি পর্য্যন্ত ডায়মণ্ড হারবার ও সদর লোক্যাল বোর্ডের অধীনে বিদ্যমান আছে। এতৎসম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, প্রাচীন কালে দ্বারি নামে জনৈক ধনী বিধবা স্ত্রীলোক রাজমহলের নবাবের হস্তে রাস্তা নি[illegible] জন্য প্রচুর অর্থ দান করিয়াছিলেন। তাঁহারি অর্থে তাঁহার রাজমহলের নবাব ঐ রাস্তা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন এবং সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। (১৪) বর্ত্তমান সময়ে প্রথমে ঐ স্থানে এবং তৎপরে রায় দীঘিতে, ও

জলঘাটার প্রস্তর মূর্ত্তি

নল গোঁড়ায় দুইটী প্রাচীন বুদ্ধ-মূর্ত্তির আবিষ্কার হইতে (১৫) অবগত হওয়া যায় যে, সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধ যুগেও তথায় ঐ সকল সমৃদ্ধিশালী জনপদের অস্তিত্ব ছিল, এবং তৎকালে সেখানেও বৌদ্ধ প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। জটার উক্ত তাম্রফলকে লিখিত আছে যে, ৮৯৭ শকাব্দে (৯৭৫ খৃষ্টাব্দ) রাজা জয়ন্তচন্দ্র জটার উক্ত মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই রাজা জয়ন্তচন্দ্র কে ছিলেন, তাহা এক্ষণে ঠিক জানা যায় না। প্রাচীন বিবরণাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঐ সময় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পাল-সম্রাটগণের অধীন ছিল। (১৬) তখন সমগ্র দেশ তাঁহাদের অধীন বহু ভূঁইয়া বা সামন্ত নরপতিগণের দ্বারা শাসিত হইত। (১৭) আমাদের বোধ হয় তিনি সম্ভবতঃ তৎকালীন

জলঘাটার আর একটী প্রস্তর মূর্ত্তি

পাল-নরপতিগণের অধীন ঐরূপ কোন একজন ভূঁইয়া বা সামন্ত নরপতি ছিলেন; এবং তাঁহার দ্বারাই তখন এতদ্দেশের শাসন-দণ্ড পরিচালিত হইত। পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, ঐ সময় সেখানে বৌদ্ধদিগের বিহার ছিল। বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা যে তখন তথায় পুঁথি-পাঁজী লিখিতেন, প্রজ্ঞাপারমিতার চর্চ্চা করিতেন ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার

---

(১৪) "A copper-plate discovered in a place little north of Jater Deul fixes the date of the erection of the temple by Raja Jayanta Chandra in the year 897 of the Bengali Sak Era corresponding to A.D. 975. It was discovered at the clearing of the jungle by the Grantee Durga Prasad Chaudhuri. The inscription is in Sanskrit and the date as usual was given in an enigma with the name of the founder."

From a report of the Deputy Collector of Diamond Harbour. Published in the list of ancient monuments in the Presidency Division. Page 3

(১৫) বঙ্গদেশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।—শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত

(১৬) Later Hindu Civilisation. R. C. Dutt. Page 42.

(১৭) প্রতাপাদিত্য।—শ্রীনিখিলনাথ রায়, পৃষ্ঠা ৪৫

করিতেন, তাহারও নিদর্শন পাওয়া যায়। (১৮) ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ও অনুমান করেন যে, বৌদ্ধ যুগে তথায় যে বিহার ছিল, পাল রাজত্বের পূর্ব্বে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বিখ্যাত চীন পরিব্রাজক হুয়েং-সাং সমতটে যে সকল বিহার দেখিয়া-

জাতের দেউল

ছিলেন, উহা তাহাদের অন্যতম। (১৯) তাঁহার মতে ঐ যুগেই কর্ণ-সুবর্ণের বিখ্যাত বৌদ্ধধর্ম্মবিদ্বেষী শৈব নরপতি শশাঙ্ক বা নরেন্দ্র গুপ্তের রাজত্বকালে অথবা তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী সময়ে বড়াশীর পূর্ব্বোক্ত অম্বুলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা হয়। (২০) ইহার পর উক্ত পাল সাম্রাজ্যের পতন ও তাহার সহিত বৌদ্ধ-যুগের অবসান হইলে, উক্ত প্রদেশও পশ্চিম-বঙ্গের অন্যান্য প্রদেশের সহিত সেন রাজগণের শাসনাধীনে আসিয়াছিল বলিয়া জানা যায়। কিছু দিন পূর্ব্বে কাশীনগরের দক্ষিণে বকুলতলা গ্রামে একটী পুষ্করিণী খনন কালে মজিলপুরনিবাসী জমিদার স্বর্গীয় হরিদাস দত্ত মহাশয় লক্ষ্মণ সেন দেবের যে তাম্রশাসন প্রাপ্ত হন, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই সময় উহা তৎকালীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্ত্যন্তঃপাতী খাড়ী মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত ছিল ও বর্ত্তমান

শ্রীশ্রীনীলমাধব

কাশীনগরের দক্ষিণে অবস্থিত খাড়ী নামক স্থানেরই নামানুসারে উক্ত খাড়ী মণ্ডল প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। (২১) এই মণ্ডল অতি প্রাচীন সংস্কৃত শব্দ, বৈদিক গ্রন্থাদিতেও ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বিস্তৃতি বিষয়ে ইহা ভুক্তি অপেক্ষা ছোট; এবং তদ্দ্বারা বর্ত্তমান কালের জেলার ন্যায় এক একটী

(১৮) কলিকাতা বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনীর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ। মানসী পত্রিকা ১৩২১ সাল, বৈশাখ সংখ্যা।

(১৯) (২০) যশোহর খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ৬১।১৭১।

(২১) উক্ত তাম্রশাসনখানি এক্ষণে কোথায় আছে তাহা ঠিক জানা যায় না। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে উহার একটী প্রতিলিপি বাবু হরিদাস দত্ত মহাশয়ের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব" নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকের পরিশিষ্টে প্রকাশিত করেন। উহা হইতে জানা যায় যে, উক্ত তাম্র শাসন দ্বিতীয় লক্ষ্মণাব্দের ১০ই মাঘ তারিখে উৎকীর্ণ হইয়াছিল এবং তদ্দ্বারা পরম বৈষ্ণব, পরম ভট্টারক "মহারাজা লক্ষ্মণ

…দেশিক বিভাগকে বুঝাইত (২২)। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত …ক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এই মণ্ডল শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ভরত অমর টীকায় ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মেদিনী কোষেও "মণ্ডল" দ্বাদশ রাজক বলিয়া উল্লিখিত আছে। মণ্ডলের শাসনকর্ত্তা

রায়দীঘি

"বিধে মণ্ডল শব্দের বিবিধার্থ, বিজ্ঞাপনার্থ যাহা উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে সে কালের "মণ্ডল" নামক বিভাগ দ্বাদশ রাজক নামে কথিত হইত বলিয়া জানা যায়; যথা

"…মণ্ডলে দ্বাদশ রাজকে চ।
দেশে চ বিম্বে চ বন্দবৃ…ক চ॥"

"মণ্ডলেশ" "মণ্ডলাধিপতি" "মণ্ডলেশ্বর" প্রভৃতি নামে কথিত হইতেন। অভিধানে তাঁহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কামন্দকীয় নীতিসারে

শ্রীশ্রীকালী মাতা

[৮১] দেখিতে পাওয়া যায়, মণ্ডলাধিপেরও কোষ, দণ্ড, অমাত্য, মন্ত্রী ও দুর্গাদি সহায় ছিল। যথা—

…সেন দেব উক্ত পৌণ্ড্র-বর্দ্ধন ভুক্ত্যন্তঃপাতী খাড়ী মণ্ডলিকার অন্তর্গত …পুর চতুরক গ্রামে তিন দ্রোণ ভূমি জগদ্ধর দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র নারায়ণধর দেব শর্ম্মার পৌত্র নরসিংহ ধর দেবশর্ম্মার পুত্র গর্গ গোত্রীয় অঙ্গিরা বৃহস্পতি শীল গর্গ ভরদ্বাজ প্রবর" ঋগ্বেদাশ্বালায়ন শাখা-…ধ্যায়ী শ্রীকৃষ্ণধর দেবশর্ম্মাকে দান করিয়াছিলেন। এবং উহার …জস্ব পঞ্চাশ পুরান ধার্য্য হইয়াছিল ও উহা উগ্র মাধবীয় মুদ্রাঙ্কিত …দশাধিক হস্ত দ্বারা মাপ করা হইয়াছিল। উক্ত তাম্রশাসনে প্রদত্ত …মির চতুঃসীমা এইরূপে লিখিত আছে—পূর্ব্বে শান্ত-শারিক প্রভা…সনসীমা। দক্ষিণে চিতাড়ী খাতার্দ্ধ সীমা। পশ্চিমে শান্তশারিক …মদেব শাসন পূর্ব্ব সীমা। উত্তরে বিষ্ণুপাণী গাড়োলী ও কেশব …ড়োলীর ভূমী সীমা। উক্ত চিতাড়ীর খাত আজিও তথায় চিতাড়ীর …ল নামে বিদ্যমান আছে।

(২২) বিস্তৃতি বিষয়ে ভুক্তি অপেক্ষা মণ্ডল ছোট। এবং মণ্ডল …পেক্ষা খণ্ডল ছোট। বর্ত্তমান সময়ের ডিভিসান, জেলা এবং …ডিভিসন স্মরণীয়।

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক, সাহিত্য ১৩১৯, ভাদ্র সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৩৯৫।

উপেতঃ কোষ দণ্ডাভ্যাং সামাত্যঃ সহ মন্ত্রিভিঃ।

দুর্গস্থ চিন্তয়েৎ সূক্ষ্মং মণ্ডলং মণ্ডলাধিপঃ॥

ইহাতে "মণ্ডলাধিপতি" দুর্গস্থ থাকিয়া মণ্ডল শাসন করিতেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ডে [৮৬ অধ্যায়ে] দেখিতে পাওয়া যায়, "মণ্ডলেশ্বরের" পদমর্য্যাদা নৃপশব্দবাচক সাধারণ রাজ-রাজন্যকের পদ-মর্য্যাদা অপেক্ষা অধিক ছিল। যথা—

চতুর্যোজন পর্য্যন্ত মধিকারং নৃপস্য চ।

যো রাজা তচ্ছতগুণঃ সএব মণ্ডলেশ্বরঃ॥

এই বচনের প্রমাণে মণ্ডলেশ্বরও "রাজ"-পদ-বাচ্য ছিলেন বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু তাঁহার অধিকার সাধারণ "রাজ"-পদ-বাচ্য ব্যক্তির অধিকার অপেক্ষা শতগুণ অধিক ছিল। মণ্ডলাধিপতিগণ "পরমেশ্বর," "পরম ভট্টারক রাজাধিরাজের" "সামন্ত" মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। সেকালের শাসন-ব্যবস্থায় রাজাধিরাজ "পরম ভট্টারক" ছিলেন। তাঁহার পরেই মণ্ডলাধিপতির স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। (২৩) ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, খাড়ী নিম্ন বঙ্গে পূর্ব্বোক্ত পাল-রাজত্ব-কালের পরে সুন্দরবনের পশ্চিমাংশের সদর স্থান রূপেই ভাগীরথীর উপর অবস্থিত ছিল। তৎকালে উক্ত খাড়ী মণ্ডল ইদানীন্তন কালের জেলার ন্যায় বহু-বিস্তৃত ছিল। উক্ত প্রদেশ ও উহার চতুঃপার্শ্বস্থ বর্ত্তমান নল গোঁড়া, মনির টাট, বাইশহাটা প্রভৃতি স্থান সকলও উক্ত খাড়ী মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া ঐরূপ কোন একজন মণ্ডলাধীশেরই শাসনাধীন ছিল। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় বলেন যে, তথায় এক্ষণে যে সকল সুন্দর চতুর্ভুজ বিষ্ণু-মূর্ত্তিগুলি পাওয়া যাইতেছে, তাহারও কতক এই সময়ই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। (২৪)

সেন রাজত্ব কালের পর নিম্নবঙ্গে মুসলমান শাসন সময়েও উক্ত প্রদেশের উপর দিয়া পতিতপাবনী গঙ্গার আদিম প্রবাহ শতমুখে প্রবাহিতা হইয়া বিদ্যমান ছিলেন। তখনও তথায় উহার উভয় তীরে ঐ সকল গ্রাম, নগর ও বহু তীর্থাদি বিরাজিত ছিল,—অনেক প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাদিতে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

চৈতন্য ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহাপ্রভু চৈতন্যদেব নীলাচল যাত্রাকালে ভাগীরথীর কূলে-কূলে আসিয়া, তথাকার তৎকালীন অন্যতম প্রধান তীর্থ ছত্রভোগে উপস্থিত হইয়া, সেখানে শতমুখী গঙ্গা ও অম্বুলিঙ্গ নামে শিব দর্শন করিয়াছিলেন। তখন ঐ প্রদেশ রামচন্দ্র খাঁ নামক এক ব্যক্তির শাসনাধীনে ছিল। তিনি সে সময় ছত্রভোগে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। (২৫) এই রামচন্দ্র খাঁর রাজ্য তৎকালে যশোহর হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

বৈশাটা মঠবাড়ী

(২৩) সাহিত্য, সন ১৩২০ সাল, বৈশাখ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৪০।৪১।

(২৪) যশোহর খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭৮।

(২৫) ছত্রভোগে গেলা প্রভু অম্বুলিঙ্গ ঘাট।
শতমুখী গঙ্গা, প্রভু দেখিলা নিকট॥
দেখিয়া হইলা প্রভু আনন্দে বিহ্বল।
হরি বলি হুঙ্কার করেন কোলাহল॥
সেই গ্রামে অধিকারী রামচন্দ্র খান।
যদ্যপি বিষয়ী তবু মহা ভাগ্যবান॥

তিনি গৌড়েশ্বর হুসেন সাহার একজন বিশেষ অনুগৃহীত ব্যক্তি ছিলেন। সে কারণ তাঁহাকে ঐ প্রদেশের জন্য কর দিতে হইত না। তিনি সাধারণতঃ রামচন্দ্র খাঁ নামে পরিচিত, কিন্তু উহা তাঁহার প্রকৃত নাম নহে। শান্তিধর নামক তিনি একজন ব্রাহ্মণ-তনয় ছিলেন। তিনি শৈশবকাল হইতে হুসেন সাহার নিকট প্রতিপালিত হন, এবং তাঁহার নিকট হইতেই রাম খাঁ উপাধি পান। এই রাম খাঁ উপাধিই শেষে রামচন্দ্র খাঁ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বর্ত্তমান খুলনা জেলার বেনাপোলের সন্নিকটে কাগজ-পুকুরিয়া নামক স্থানে তাঁহার নিবাস ছিল। আজিও তথায় তাঁহার বিস্তীর্ণ রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। (২৬) চৈতন্য ভাগবত ব্যতীত কবিকঙ্কণ চণ্ডী পাঠেও অবগত হওয়া যায় যে, তখন তথায় ভাগীরথী তীরে অম্বুলিঙ্গ, ত্রিপুরাসুন্দরী, নীলমাধব ও সঙ্কেত মাধব প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র সকলও বিদ্যমান ছিল। (২৭) ধনপতি ও শ্রীমন্ত সদাগর সিংহল যাত্রাকালে কালীঘাট ত্যাগ করিয়া নদীপথে তথায় আসিয়া অম্বুলিঙ্গের, ত্রিপুরাসুন্দরীর ও নীলমাধবের (২৮) পূজা করিয়াছিলেন।
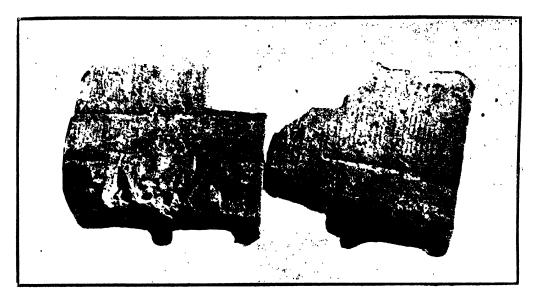
জটার দেউলে আবিষ্কৃত প্রস্তরখণ্ড

অন্যথা প্রভুর সঙ্গে তান দেখা কেনে।
দৈবগতি আসিয়া মিলিলা সেই স্থানে ॥
দেখিয়া প্রভুর তেজ ভয় হইল মনে।
দোলা হইতে সত্বর নামিলা সেইখানে ॥
দণ্ডবত হইয়া পড়িলা ভূমিতলে।
প্রভুর নাইক বাহ্য. প্রেমানন্দ জলে ॥
কিছু স্থির হইয়া বৈকুণ্ঠের চুড়ামনী।
রামচন্দ্র খাঁনে জিজ্ঞাসিলেন কে তুমি ॥
সম্ভ্রমে করিয়া দণ্ডবত কর জোড়।
বলে প্রভু দাস অনুদাস মুঞি তোর ॥
তবে শেষে সর্ব্বলোকে লাগিলা কহিতে।
এই অধিকারী প্রভু দক্ষিণ রাজ্যেতে ॥

চৈতন্য ভাগবত। অন্ত খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়

(২৬) যশোহর খুলনার ইতিহাস।

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র—১ম খণ্ড—পৃষ্ঠা ৩৭০।

(২৭) নাচনগাছা বৈষ্ণবঘাটা বাম দিগে থুইয়া।
দক্ষিণেতে বারাশত গ্রাম এড়াইয়া ॥
ডাহিনে অনেক গ্রাম রাখে সাধুবালা।
ছত্রভোগে উত্তরিলা অবসান বেলা ॥
ত্রিপুরা পুজিয়া সাধু চলিলা সত্বর।
অম্বুলিঙ্গে গিয়া উত্তরিলা সদাগর ॥
শ্রীনীল মাধব পূজা করেন তৎপর।
তাহার মেলানে সাধু পাইল হাতে বর ॥

*　　*　　*　　*

ডাহিনে বামে এড়াইল কত শত দেশ।
সঙ্কেত মাধবে দেখে সোনার মহেশ ॥
প্রণমিয়া সঙ্কেত মাধবে প্রদক্ষিণ।
ডিঙ্গা মেলি সদাগর চলে রাত্রি দিন ॥

কবিকঙ্কণ চণ্ডী। এলাহাবাদ সংস্করণ।

পৃষ্ঠা—২০৪।২০৫।২৩৫।

(২৮) এক্ষণে নিজ খাড়ীর উত্তরে মাদপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত ভূতনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে উক্ত শ্রীশ্রীনীলমাধব বিগ্রহ একটী জীর্ণ কুটীর মধ্যে রক্ষিত আছেন। কথিত আছে যে, তাঁহার প্রাচীন মন্দির

এবং উক্ত সঙ্কেত মাধব, সোনার মহেশ প্রতিষ্ঠিত দেখিয়াছিলেন। (২৯) আইনী আকবরীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঐ সময় উক্ত প্রদেশ তৎকালীন সরকার সাতগাঁর (৩০) অধীন হাতীয়াগর পরগণার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। প্রাচীন বিবরণাদি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, মুসলমান শাসন সময় হইতে পুরাতন মণ্ডল-বিভাগগুলি ঐরূপ বহু পরিগণায় বিভক্ত হইয়াছিল (৩১)। আমাদের বোধ হয় পূর্ব্বোক্ত খাড়ী মণ্ডলও এই সময় হইতে বিভক্ত হইয়া উক্ত হাতীয়াগর, বরিদ-হাটী প্রভৃতি পরগণায় পরিণত হইয়া গিয়াছিল। উহা ব্যতীত খৃষ্টের পর চোদ্দ শত, পনর শত বৎসরের যে সকল মনসার ভাসান ও চণ্ডীর গান পাওয়া যায়, তৎসমুদয়ে হইতেও জানা যায় যে, সেকালের লোকেরা ছত্রভোগ হইয়া সমুদ্রে যাইত। উহা তখন সমুদ্রযাত্রী-দিগের প্রধান বন্দর বলিয়া পরিগণিত ছিল। (৩২) এক্ষণে তথায় যে সকল লোহার শিকল জীর্ণ জাহাজের তক্তা ও মাস্তল প্রভৃতি পাওয়া যাইতেছে, ঐগুলি বোধ হয় তথাকার উক্ত প্রাচীন বন্দরেরই নিদর্শন।

পূর্ব্বে চক্রতীর্থে বিদ্যমান ছিল। পরে উহা সুন্দরবনের জলপ্লাবন ও ভূমিকম্পে বিনষ্ট হইয়া যায়। উক্ত মন্দিরের স্থান আজিও তথায় মাধবের পুরী নামে প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ বলেন যে, উক্ত মাধবের নামানুসারে উক্ত গ্রামের নাম প্রাচীনকালে মাধবপুর ছিল। এবং উহা হইতে এক্ষণে ঐ নাম মাদপুরে পরিণত হইয়াছে।

(২৯) শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় স্থির করিয়াছেন যে, নিজ খাড়ীর প্রায় ১ মাইল দক্ষিণে উক্ত সঙ্কেত মাধব অবস্থিত ছিল। —বঙ্গদেশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটী কথা, বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে বিজ্ঞান শাখায় পঠিত প্রবন্ধ।

(৩০) This Sarker Satgaon derives its name from the town of Satgaon or Saptagram (seven villages) which was a place of importance till the 16th century. In the early period of the Mahomedan rule it was seat of the governors of lower Bengal and a mint town. In 1582 it was divided into 53 mehals, paying a revenue of rupees 418118. It extended from Hatiagarh in the south to a little above Plassey on the Bhagirathi, in the north and from the Kabadak in the east to beyond the Hugli. But the greater portion lay east of the Hugli within the modern district of 24 Perganas and Nadia.

Hunter's Statistical Account of Bengal. Vol. I, Pages 360 62.

(৩১) ঢাকার ইতিহাস। শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়—২য় খণ্ড—পৃষ্ঠা—১৬।

(৩২) মেদিনীপুর পরিষদে সভাপতির কথা—নারায়ণ—১৩২৪ ভাদ্র সংখ্যা।

রূপান্তর

শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন সকালে অরুণ যখন হার্ডিঞ্জ হোষ্টেলে আপনার রুমে বসে Hindu Lawর নোট মুখস্থ করিতেছিল, বন্ধু দেবেন একখানা মাসিকপত্র হাতে তাহার ঘরে ঢুকিয়া কহিল, "এই, রেখা দেবী তোর প্রবন্ধের কি রকম সমালোচনা করে বিশ্রী জবাব দিয়েছে, পড়েছিস ?"

অরুণ মাথা না তুলিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, "না, পড়িনি।"

"এই পড়ে দেখ্। তার গেল মাসের লেখা দেখেই আমি বুঝেছিলুম যে, মেয়েটা ভারি দাম্ভিক আর পুরুষ-বিদ্বেষী। এ মাসে তার চেহারা কাগজে ছেপেছে, মিলিয়ে নে আমার ধারণা সত্যি কি না।"

অরুণ মাসিক পত্রখানা হাতে লইয়া "পুরুষের স্বার্থ-পরতা" নামক প্রবন্ধটা পড়িতে লাগিল।

দেবেন হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "কি রকম তোকে personal attack করেছে দেখেছিস্ ? এবারে এর একটা দস্তুর মত কড়া জবাব দিতে হবে।"

অরুণ গম্ভীর ভাবে বলিল, "না, আমি আর লিখব না।"

"বলিস কি ? তাহলে সাহিত্য-ক্ষেত্রে অরুণ গাঙ্গুলীকে আর কেউ মানবে না, যদি এই গালাগাল বেমালুম হজম করা যায়। দেখেছিস চেহারাটায় কি রকম গর্ব্ব ফুটে বেরুচ্ছে ! আর কি ভয়ানক Stylish ! এর স্বামী

বেচারীর জন্যে আমার দুঃখু হচ্ছে, তার অবস্থাটা বোধ হয় খুবই কাহিল !” অরুণ এতক্ষণ ছবিখানার প্রতি অনিমেষে চাহিয়া ছিল ! কতকটা অন্যমনস্ক ভাবে কহিল, “ইনি কুমারী !”

“তুই জানলি কি করে ? তোর সঙ্গে আলাপ পরিচয় আছে নাকি ?” অরুণ কোন কথা কহিল না !

“কিরে, চুপ করে রইলি যে ?”

“এখন নাই, আট বছর আগে ছিল !”

দেবেন মুখখানা বিকৃত করিয়া কহিল “ওঃ, আচ্ছা দেখি সেই ফটোখানা—” কোন সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া দেবেন বালিসের নীচে হইতে চাবির রিংটা লইয়া অরুণের ট্রাঙ্ক খুলিতেই সে বলিয়া উঠিল, “জিনিসগুলো ঘাঁটিসনি বলছি—”

দেবেন ততক্ষণে একখানি ফটো বাহির করিয়া মাসিক-পত্রে প্রকাশিত ছবির সহিত মিলাইতে লাগিল। ফটোতে যার চেহারা আছে সে একটি তের বছরের মেয়ে ; সহজ সরল ভঙ্গী, মাথায় একরাশ কালো কোঁকড়ানো চুল, বড় টানা চোখ দুটিতে স্নিগ্ধ মধুর দৃষ্টি ! আর মাসিকপত্রের ছবি একটি ২০।২১ বছরের মেয়ের। দেবেন ঈষৎ হাস্যে কহিল “কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন !”

অরুণ কোন কথা কহিল না।

দেবেন ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, “ইনি কে বট হে ?”

অরুণ মৃদু হাস্যে কহিল, “অত খোঁজে তোর দরকার ? চিনি এই পর্য্যন্ত জেনে রাখ !”

“আমার দরকার কিছুমাত্র নেই। তবে তোমার সঙ্গে জানাশোনা আছে বলছ, তাইতেই যা ভাবনার কথা ! বাবু, এঁর সঙ্গে কি সূত্রে কোথায় আলাপ শুনি ?”

“ভাগলপুরে মামার ওখানে ! সে সব অনেক কথা, তুই কি শুনবি ! থাক্ !”

দেবেন অরুণের হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, “দেখ্, যদি না বলিস্ ভাল হবে না বলছি, বল্ শিগ্‌গির—”

“আচ্ছা শোন্ ! তুই ত জানিস, আমি মামার কাছেই থাকতুম। তাঁর কোন ছেলে মেয়ে ছিল না ! মা মারা যাবার পর মামীমাই আমাকে মানুষ করেছেন ! আমি যেবার ম্যাট্রিক পাশ করি, মামীমা সেই বছর মারা যান ! সেই সময় মামীর এক আত্মীয়া বিধবা, সকল আশ্রয় হারিয়ে অনেক দুঃখ শোক পেয়ে একটি ছোট মেয়ে নিয়ে মামার ওখানে আসেন ! সে সময় তাঁর আসাতে আমাদের ভারী উপকার হল ! আমি এখানে এসে কলেজে ভর্ত্তি হলুম ! তারপর মামা মারা যাবার বছর তিনেক পরেই রেখার মা মারা গেলেন ! রেখার বয়স তখন বছর তের। সেই আমার সঙ্গে তার শেষ দেখা ! এখন হয়ত সে আমায় চিনতেই পারবে না।”

“তার এখন অভিভাবক কে ?”

মামার এক বন্ধু এটর্নী আছেন ; তিনিই দেখা শোনা করেন। রেখা এতদিন বেথুন বোর্ডিংয়ে ছিল, সম্প্রতি বি-এ পাশ করে বালীগঞ্জে মামার যে বাড়ী ছিল সেখানেই আছে। আর মামার বিষয় এটর্নীর কাছ থেকে বুঝে নিয়েছে।”

“তোর মামার যখন কোন ছেলে মেয়ে ছিল না, তখন তুই ত হচ্ছিস তাঁর legal heir !”

“হ্যাঁ, আমিই মামার বিষয়ের একমাত্র উত্তরাধিকারী।”

“তবে তুই বিষয় claim করিসনি কেন ?”

অরুণ ম্লান হাস্যে কহিল, “ ‘কেন’র কোন জবাব নেই ! তবে ওরা স্ত্রীলোক, সহায়হীনা, আর এতদিন ভোগ দখল করছে, বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছে, আমি মাঝখান থেকে ধূমকেতুর মতন উদয় হতে যাই কেন !”

দেবেন গভীর বিস্ময়ে অরুণের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। অরুণের এই শুষ্ক কঠোর জীবনের অন্তরালে যে এতবড় এক স্নেহশীল মহৎ হৃদয় আছে, দেবেন তাহা জানিত না। তাহার অন্তঃকরণ অরুণের প্রতি শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে ভরিয়া উঠিল ! আর এই মেয়েটার উপর তাহার রাগ হইতে লাগিল। যে “ত্যাগের” কথা অরুণ প্রবন্ধে লিখিয়াছে, সে তা’র বাস্তব জীবনে তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে, আর এই মেয়েটা কি না তাহাই লইয়া মাসিক পত্রের সাহায্যে অরুণকে গালাগালি দিতেছে ! দেবেন অরুণকে কহিল, “দাঁড়া, আমি এই প্রবন্ধটার এবার একটা মুখের মত জবাব দিচ্ছি ! এমন জব্দ করব !”

অরুণ ক্ষীণ হাস্যে কহিল—“দরকার নেই !”

২

বালিগঞ্জ...নম্বর সুন্দর বাড়ীর দোতালার ঘরে যে মেয়েটি টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া বসিয়া ছিল সে রেখা।

তাহার জীবনের প্রভাতের আলো যে এমন করিয়া মেঘে ঢাকা পড়িতে পারে, ইহা সে কোন দিন কল্পনা করে নাই। রেখা সহসা উঠিয়া বসিল এবং টেবিলের উপর হইতে মাসিকপত্রখানা লইয়া তাড়াতাড়ি কয়েক পৃষ্ঠা উল্টাইয়া এক স্থানে তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল: "স্বার্থত্যাগ করিতে হইলে চিত্তের সংযমের প্রয়োজন! সংযম শিক্ষার বস্তু! কলেজে আমাদের সে শিক্ষা হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্তা বিদুষী নারী মাত্রেই যে সংযমী, তাহা মানিয়া লওয়া যায় না। স্বার্থের মূর্ত্তিমতী সৃষ্টি হইতেছে নারী। নারীর যে "ত্যাগ"কে লেখিকা "স্বার্থত্যাগ" বলিয়া গর্ব্ব করিয়াছেন, আসলে তাহা ত্যাগ-স্বীকার নহে; তাহা স্বার্থ-পরতারই ভিন্ন রূপ! পুরুষের মহনীয়তাই নারীর স্বার্থকে পরিপুষ্ট করিয়া দিয়াছে। লেখিকা বোধ হয় অবগত নন যে, যে ঐশ্বর্য্যের শিখরে বসিয়া তিনি পুরুষকে অত্যাচারী, স্বার্থপর, কামনার দাস বলিয়া গালি দিয়া লেখনী কলঙ্কিত করিতেছেন, সে ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারিণী তিনি নহেন, একজন পুরুষ! ইচ্ছা করিলে এই পুরুষ তাঁহাকে ওই স্থান হইতে নামাইয়া আনিয়া বলিতে পারে—নারী তোমার ওখানে কোন অধিকার নাই! কিন্তু পুরুষ স্বার্থপর নহে বলিয়াই বোধ হয় অনুকম্পা ভরে তাহা করে নাই! এই নির্ম্মম সত্য তাঁহার এটর্ণীকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন! আশা করি ভবিষ্যতে লেখিকা আর ব্যক্তিগত ভাবে কাহাকেও আক্রমণ করিবেন না। তাঁহাকে জানাইতে বাধ্য হইতেছি যে "নারীর অধিকার" প্রবন্ধের লেখক অরুণ গাঙ্গুলীই হচ্ছেন এই সম্পত্তির মালিক,—মৃত অঘোর বাবুর ভাগিনেয়!"

বেয়ারা আসিয়া সংবাদ দিল, এটর্ণী রামশরণ বাবু আসিয়াছেন।

"তিনি এসেছেন? নিয়ে এস!"

বৃদ্ধ রামশরণ বাবু ঘরে ঢুকিতেই, রেখা প্রণাম করিল।

"আমায় ডেকে পাঠিয়েছ কেন মা?"

"বসুন কাকা বাবু, বলছি। আচ্ছা কাকাবাবু, আমি যে এই পিশে মহাশয়ের বিষয় ভোগ করছি, এতে কি আমার সত্যিকারের কোন অধিকার নেই? এর কি আর কেউ উত্তরাধিকারী আছে?"

রামশরণ বাবু গভীর বিস্ময়ে রেখার মুখের পানে চাহিয়া কহিলেন, "এ কথা আজ এত দিন পরে জিজ্ঞাসা করছ কেন মা?"

"আপনি বলুন না, এর কি কেউ যথার্থ উত্তরাধিকারী আছে?"

রামশরণ বাবু একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন "হ্যাঁ—না—কিন্তু কি হয়েছে—এ সব জানতে চাইছ কেন?"

রেখা মাসিকপত্র খানা রামশরণ বাবুর সম্মুখে ধরিয়া ক্রন্দন-জড়িত কণ্ঠে কহিল "পড়ুন, এরা সব কি লিখেছে!"

রামশরণ বাবু চশমা বাহির করিয়া প্রবন্ধটি পাঠ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি মুখ তুলিলে রেখা কহিল, "এই অরুণ গাঙ্গুলী কে?" "অরুণ অঘোরের ভাগনে। কিন্তু সে যে এ রকম লিখেছে, এ আমার বিশ্বাস হয় না মা! সে যখন খুব ছোট ছিল, তখন থেকেই আমি তাকে জানি। বিশেষতঃ অঘোর মারা যাবার পর আমি খোঁজ করে তার সঙ্গে দেখা করেছিলুম। এ সম্বন্ধে তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। সে বলেছিল, এ বিষয়ের ওপর সে কখনও দাবী করবে না! তার চরিত্রের একটা দিক আমি ভাল রকম জানি মা, যে তার কথার কখনও নড়চড় হয় না। সে ভারী জেদী, যা বলে তাই করে।"

রেখা মৃদু কণ্ঠে কহিল "কিন্তু কারুর ন্যায্য অধিকার থেকে—"

রামশরণ বাবু বাধা দিয়া কহিলেন, "না মা, ও সব বাজে কথা! কারুকেই তুমি বঞ্চিত করনি! অঘোর উইল করে রেখে যায়নি বলেই কি বুঝতে হবে সে তোমায় বিষয় দিত না। তোমার ওপর অতখানি ভালবাসা, অগাধ স্নেহ কি কিছুই নয়? হ্যাঁ, তবে অরুণকে সে খুবই ভালবাসত। কিন্তু হলে কি হবে মা, সেটা যে একেবারে পাগলাটে, সংসারের উপর তার কোনই টান নেই! এক-বার ত রামকৃষ্ণ মঠে চলে গিয়েছিল, ওই অঘোরের স্ত্রী আবার গিয়ে কান্নাকাটি করে ফিরিয়ে নিয়ে আসে! ও তুমি কিছু ভেব না মা! এ কোন বদলোক তোমায় ভয় দেখাবার জন্য লিখেছে! আমি জানি অরুণ এ নিয়ে কখনও হাঙ্গামা করবে না!"

রেখা ভাবিল, কি গভীর বিশ্বাস!

"আজ তাহ'লে উঠি মা, একটু তাড়াতাড়ি আছে।"

"একটু চা খেয়ে যাবেন না?"

"না-মা, আজ থাক্, আমি বরং রবিবারে আসব!"

"কিন্তু সেদিন সকালে এখানে খেতে হবে কাকাবাবু, আমি নিজে রাঁধবো।" রামশরণ বাবু হাসিয়া কহিলেন, "আচ্ছা রে বেটী, তাই হবে।"

বৃদ্ধ চলিয়া গেলে রেখা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। আজ তাহার মনে হইতেছিল, এই বিরাট বিশ্বের মাঝে সে একটা উপহাসের বস্তু! এই বাড়ী, ঘর, আসবাব কিছুতেই তাহার সত্যিকারের অধিকার নাই, কোন দিন ছিল না। সে শুধু এতদিন অতিবড় মিথ্যাকে রঙ্গীন তুলি দিয়া রূপ দিতেছিল, আর তাহারই অন্তরালে একটি ক্ষুদ্র সত্য নীরবে মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল! আজ সেই হাসির নগ্ন রূপ রেখাকে বেশ ব্যঙ্গ করিতেছে। গৃহের প্রত্যেক বস্তুটি যেন আজ একসঙ্গে বিদ্রোহী হইয়া তাহাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। সে কোন দিন পরাভব স্বীকার করে নাই; কিন্তু আজ পরাভবই তাহার একমাত্র আশ্রয়! নতুবা এ বাটীতে তাহার স্থান নাই; এ গৃহের কোন জিনিসে তাহার অধিকার নাই, এমন কি পরনের এই শাড়ীখানা পর্য্যন্ত তার নয়! অতীত তার সমস্ত গরিমা নিয়ে স্বপ্ন-রাজ্যের মত মিলাইয়া গেছে,—যাহা আছে, তাহা বর্ত্তমানের কঠোর নির্ম্মম সত্য—"পরাভব!" আপনার দাম্ভিকতার মর্য্যাদা রাখিতে যাইয়া প্রবন্ধে সে যাহাকে নানা ছলে ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ করিতে দ্বিধা করে নাই, নিজের সতেজ মতামতগুলি কুণ্ঠাশূন্য ভাষায় প্রকাশ করিতে যাইয়া যাহাকে "স্বার্থপর পুরুষ তুমি" বলিয়া সম্বোধন করিতে ত্রুটি বোধ করে নাই, আজ তাহারই নিঃস্বার্থ দয়ার উপরে তাহার দাম্ভিকতার ভিত্তি স্থাপিত। তাহারই স্বার্থত্যাগের মহিমা, তাহারই দয়ার প্রতি অণু-পরমাণু এই গৃহের সম্পদ। ক্ষমতা দু'পায়ে যে অনুগ্রহকে ঠেলিয়া দিয়াছে, অক্ষমতা তাহাই ব্যগ্রহস্তে কুড়াইয়া লইয়াছে। রেখার চোখে জল আসিল! সারা অন্তর তাহার নিজের প্রতি ঘৃণা ও বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল। এমন সময় বেয়ারা একটা স্লিপ লইয়া আসিল। রেখা দেখিল, তাহাতে লেখা, "অরুণ গাঙ্গুলী"! নামটা দেখিয়া সে চমকিত হইল; তাহার সর্ব্ব শরীরে একটা শিহরণ আনিয়া দিল। সে দেখা করিবে কি করিবে না, যখন এমনি দোলায় মন দুলিতেছিল, গভীর উত্তেজনায় অরুণ তখন একেবারে ঘরের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইল। রেখা মুখ তুলিয়া চাহিতেই অরুণ একটা নমস্কার করিয়া কহিল, "আমারই নাম অরুণ গাঙ্গুলী! আমি এইমাত্র "দীপালী" কাগজে আপনার সম্বন্ধে যা বেরিয়েছে, পড়লুম। আপনি হয়ত মনে করেছেন এসব আমি লিখেছি, কিন্তু সত্যি বলছি আপনাকে, আমায় বিশ্বাস করুন,—আমি এর কিছুই জানি না। আমার এক বন্ধু অমল, সেই rascal এসব লিখেছে। তাকে একবার দেখ্‌তে পেলে,—যাক, আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি।"

রেখা অরুণের পানে চাহিয়া ছিল। তাহার পরনের খদ্দর হইতে আরম্ভ করিয়া মাথার রুক্ষ বড় চুল, ফর্সা মুখের অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা, এমন কি অরুণের হাতের মোটা লাঠিটা পর্য্যন্ত সে মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিতে-ছিল। মৃদুকণ্ঠে কহিল, "বসুন, আমারও এ-সম্বন্ধে কিছু বলবার আছে। আপনি না এলে আমাকেই আপনার কাছে ছুটতে হত। যে সত্য আপনার বন্ধু কাগজে প্রকাশ করেছেন, সেটা আমার কাছে অজ্ঞাত ছিল! আমি না জেনেই এতকাল আপনাকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছি—এর জন্য আমার অনুতাপও যথেষ্ট হয়েছে। এখন আপনি আমায় এসব থেকে অব্যাহতি দিন! আমার এটর্ণী আপনাকে সব—"

অরুণ বাধা দিয়া ব্যস্তভাবে কহিল, "না—না, এসব আপনাকে কিছুই করতে হবে না—আমার আবার অধিকার—হ্যাঁঃ! আর থাকলেই বা কি—আপনি কি যে বলেন! কে একজন scoundrel লিখেছে বলেই আপনি Estate ছেড়ে দেবেন? আর আমিও তাই নেব?" বলিয়া অরুণ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। রেখা শুদ্ধ বিস্ময়ে অরুণের পানে চাহিল। তাহার শিক্ষিত অন্তঃ-করণ এই লোকটির পায়ের কাছে মাথা নোয়াইতে চাহিল। কিন্তু চির-প্রশ্রয়প্রাপ্ত গর্ব্ব যখন তাহাকে বুঝাইয়া দিল, ইহা ভিক্ষা, ইহা অবহেলার দান, তখন রেখা শুষ্কস্বরে কহিল, "আপনার জিনিস আপনি নেবেন না কেন? প্রথমেই আপনার আসা উচিত ছিল! আপনি কি পূর্ব্বে জানতেন না?" অরুণ মৃদুকণ্ঠে কহিল, "জানতুম।" "তবে?—আপনি এসে claim করেন নি

কেন?" অরুণ সহাস্যে কহিল, "কোন দিন দরকারে আস্‌বে না বলে... ।" আর আমার চিরকালটা যে রকম ভাবে কেটেছে, আজ নতুন করে এসব···আমি ভোগ করলে যা সুখী হতুম, এখনও তার চেয়ে কম সুখী নই।" রেখা দেখিল, অরুণ তাহার পানে চাহিয়া আছে। এ দৃষ্টি সে এর আগে আর কাহারও চোখে দেখে নাই। ইহা সম্পূর্ণ নূতন! ইহা যেন কি বলিতে চায়, বলিতে পারে না, প্রাণের ভিতরে কি যেন খুঁজিয়া বেড়ায়!

রেখা দৃষ্টি নত করিল। যে কথাগুলো সে বলিবে মনে করিয়াছিল, তাহার কিছুই বলা হইল না, সমস্ত ওলট-পালট হইয়া গেল। কেন এ পরিবর্ত্তন? রেখা মৃদুকণ্ঠে কহিল, "আপনি কাকাবাবুকে নিশ্চয়ই চেনেন?"

"কে, রামশরণ বাবু ত?"

"যদি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করেন—"

"কেন? বিষয় বুঝে নিতে? ক্ষমা করবেন, আমার দ্বারা সেটি হবে না।"

"না—না, সে কি—কেন হবে না? না জেনে যেটুকু অন্যায় করেছি···তার লজ্জাতেই মরে যাচ্ছি, ক্ষতিপূরণ যে দেব আমার এমন কিছুই নাই, তার ওপর আবার·····আর আপনি দিলেই বা আমি কোন অধিকারে..."

"অধিকার ত আপনার আছেই,...আর সে অধিকার আজকের দেওয়া নয়···অনেক দিন আগেই······যাক্ সে কথা! যদি লৌকিক হিসাবে কিছু অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয়, তাহলে যেটুকু করা দরকার, আমি রামবাবুর কাছে গিয়ে করে দিয়ে আসতে পারি।"

রেখার হৃদয় এক অজানা আনন্দের তালে দুলিয়া ফুলিয়া উঠিল! সে অরুণের মুখের উপর তাহার সজল চোখের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ চাহনি ফেলিতেই অরুণ কহিল, "আর ত তোমার সন্দেহ নেই?"

"না, কিন্তু তোমার কাছ থেকে এত নেব, আমার সে যোগ্যতা কোথায়? বল, কিছু বল,...চুপ করে থেক না, নিজেকে রিক্ত করে, দুঃখ দিয়ে আমার অপরাধের বোঝা আরও ভারী করে তুলো না...তাহলে এ নিষ্ঠুরতার আঘাত আমার বুকে চিরদিন বাজবে।"

রেখা আর বলিতে পারিল না, অরুণের দুই পায়ের মধ্যে মুখ লুকাইল! অরুণ তাহার মাথার চুলগুলির মধ্যে হাত রাখিয়া উদ্বেলিত কণ্ঠে ডাকিল,—"রেখা"—

কৃষ্ণের কংস-বধ *

শ্রীগৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(অভিনব)

(দ্বিতীয় পর্ব্ব)

গঙ্গাতীরে গোবিন্দপুর গণ্ডগ্রাম; গদাধর গোকুলে সেথায় বাড়িতেছিলেন, এমন সময় কংস-বধার্থে তাঁহার আহ্বান পঁহুছিল। অক্রুরের রথে উঠিয়া তিনি অত্যাচারী কংসের নিধনে যাত্রা করিলেন। এখন, এ কোন্ গোবিন্দপুর? পূর্ব্ব প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে **কলিকাতাই** সেই **গোবিন্দপুর**। ইহার প্রমাণের অভাব নাই, এমন কি বৃক্ষ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে। উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্‌গণ-সাহায্য প্রমাণ-প্রয়োগ ছাড়াও, অন্যান্য যে সব প্রমাণ উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহাও প্রায় অকাট্য,—হিন্দু হইয়া তাহাতে সন্দিহান হইলে ধর্ম্মের রসাতলে যাইবার বড় বেশী বাকী থাকিবে না! সূতানুটী ও গোবিন্দপুরই আদি কলিকাতা। তবে কলিকাতার

* জেমসেদপুর সাহিত্য সভার বিশেষ অধিবেশনে "মিলনী" গৃহে, রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর মহাশয়ের সভাপতিত্বে পঠিত।

কালিদাস বাঙালী তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। বেদব্যাসের জন্মস্থান সিংভূম, সুতরাং তিনিও বাঙালী,—বর্ত্তমান লেখক "ভারতবর্ষ" মারফত পূর্ব্বে তাহা দেখাইয়াছেন। বাল্মীকি সম্বন্ধে কেহ কোন চেষ্টাই করেন নাই,—দুঃখের বিষয়! কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রথমাংশে ("ভারতবর্ষ"—কার্ত্তিক ১৩৩১) যাহা প্রমাণিত হইয়াছে তাহাতে নিঃসন্দেহে সমস্ত ক্ষতি পূরণ হইয়া গিয়াছে।—লেখক।

নামকরণ সম্বন্ধে কালীঘাটের যে সম্পর্কটুকু আপনারা সাধারণতঃ বলিয়া থাকেন, তাহা ঠিক নহে! আসল ব্যাপার এই যে স্থানটীর প্রকৃত নাম ছিল 'কালাঘাট' বা 'কালোঘাটা'—'কোল্‌কাতা' তাহারই অপভ্রংশ।

শ্রীযুক্ত নন্দলাল ঘোষ মহাশয় শ্যামবাজারের শ্যামপুকুর পল্লীর গোয়ালাপাড়ার খাঁটী বাঙালী গোয়ালা। শ্রীমান্ শ্যামচাঁদ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁরই পালক পুত্র,—সুতরাং তিনিও বাঙালী,—নেহাৎপক্ষে Settler, না হয় domiciled তো বটেই! বাঙালী চিরকালই বীরের জাতি। শক্তিপূজা বা Hero-worshipএর তাহারা চিরদিনই পক্ষপাতী। দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী পূজা তাহার প্রমাণ। যুদ্ধে চিরদিনই তাহারা অগ্রগামী। বাংলার সান্নিধ্য হেতুই, বিশ্ববিজয়ী বীর সের-শেকন্দর (Alexander the Great) পর্য্যন্ত মগধ আক্রমণে ভয় পাইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে বিজয়সিংহ বঙ্গদেশ হইতে সিংহল বিজয়ে যাত্রা করিয়াছিলেন। লোকে বলে ইহাই নাকি বাংলা দেশ হইতে প্রথম অভিযান। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে আপনারা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন যে, তাঁহারও বহুপূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের "কংস-অভিযান" বাংলা হইতেই যাত্রা করিয়াছিল! ধন্য বাংলা ও ধন্য বাঙালী!

শ্রীকৃষ্ণ কংস-অভিযানে যাওয়ায় গোবিন্দপুরে বিরহিণী গোপিনীদের মধ্যে হাহাকার উপস্থিত। অবস্থা শেষে এমন হইয়া পড়ে যে শ্রীকৃষ্ণকে বুঝি নারী-হত্যার পাপে ডুবিতে হয়! তিনি কালবিলম্ব না করিয়া ভক্ত ত্রিকালদর্শী নারদকে স্মরণ করিয়া উপদেশ দিলেন—বিরহকাতরা গোপিনীদের এবং আর যাহারা আসিতে চায়, শীঘ্র তাহাদের লইয়া আইস। নারদ গোপিনীদের লইয়া কিভাবে গোবিন্দপুর হইতে রওনা হইয়া অবশেষে হাবড়ায় পৌছিলেন ও কিরূপেই বা হাবড়ার এরূপ নামকরণ হইল তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে গোপিনীদের হাওড়ায় রাখিয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি! এখন পুনরায় সেইখানেই যাওয়া যাক।

শ্রীকৃষ্ণ যে পথে কংস বধার্থ গিয়াছেন নারদও ঠিক সেই পথেই চলিলেন। শ্রীকৃষ্ণের রথ বনজঙ্গল ভাঙ্গিয়া রাস্তা করিয়াই গিয়াছিল; সুতরাং ইঁহাদের আর রাস্তা চিনিবার বা বনজঙ্গল ভাঙ্গিবার আবশ্যক হইল না। শ্রীকৃষ্ণের সে রাস্তা বরাবরই ছিল, এবং তাহাই ধরিয়া বেঙ্গল নাগপুরে রেল কোম্পানি তাঁহাদের লাইন লইয়া গেলেন। "মহাজনস্য গতো যেন সঃ পন্থাঃ"।*

হাবড়া হইতে নারদ সকলকে লইয়া পশ্চিমাভিমুখে চলিলেন। প্রায় দুই ক্রোশ গিয়া তাঁহারা বিশ্রামার্থে একস্থানে উপবেশন করিলেন; তথায় বৃক্ষশাখায় অনেক হনুমান বসিয়াছিল। একজন নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ঠাকুর, এ কোন্ স্থান?" নারদ উত্তর করিলেন "এই স্থানে পরে অনেক লোকের বসতি হইবে। শ্রীকৃষ্ণ সেদিন যখন এই পথে যাইতেছিলেন, তখন বীর হনুমান আসিয়া দণ্ডবৎ করিয়া পথ আগুলিয়া বলিল, 'এ পথে দাঁড়ায়ে হনু।' ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু গোবিন্দ হনুকে দেখিয়া আহ্লাদে কহিলেন 'কি হে, সে যুগে রাবণ বধে গিয়াছিলে, এ যুগে কংস বধে যাইবে কি?' হনু বলিল,—'আবশ্যক নাই। প্রভু তুমি একাই যথেষ্ট। আমি শুধু একবার তোমায় রাজবেশে দর্শন করিতে আসিয়াছি।' শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। সেই দিন হইতে এই স্থান রামরাজাতলা নামে খ্যাত হইয়াছে।"

রৌদ্রের তেজ তখনও কমে নাই। বিরহিণীরা ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। আরও আধ ক্রোশ আসিয়া তাঁহারা সেখায়ই সে দিনের মত থাকিবার বাসনা করিলেন। রান্নাবাড়া করিতে সকলকেই নারাজ দেখিয়া নারদ বলিলেন,—"তবে এই অসংখ্য সান্তারা বৃক্ষ (কমলা লেবুকে এ অঞ্চলে সান্তারা বলে, নাগপুর অঞ্চলে যথেষ্ট হয়) হইতে কিছু সান্তারা সংগ্রহ করিয়া আজিকার মত চালানো যাক।" তাহাই হইল। সেই অম্লমধুর ফলে সকলেই তৃপ্ত হইলেন। পরদিন নারদ বলিলেন "আমাদের, এই স্থানে রাত্রিবাস, সান্তারা গ্রহণ ও সান্তারা গাছের আধিক্য হেতু আজ হইতে এই স্থান সান্তারাগাছী বা সাঁতরাগাছী হইল।" বলা বাহুল্য এখন পাপীদের আমলে ২।১টী গোঁড়া ও পাতি লেবুর গাছ ব্যতীত আর সব লেবু গাছ লোপ পাইয়াছে।

---

* হাবড়ার পর যতগুলি স্থানের নাম লিখিত হইয়াছে তাহার প্রায় সকলগুলিই বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ও ষ্টেসন। যেগুলি রেলষ্টেসন নহে তাহাদের একটু করিয়া পরিচয় নামের সহিত প্রদত্ত হইল।

পরদিবস অন্য এক গ্রামে আসিয়া, যত দিন না কৃষ্ণের সহিত মিলিত হন, ততদিনের জন্য, তাঁহারা অনশন বা আজকালকার Hunger strike আরম্ভ করেন। নারদ অনেক বুঝাইয়া তাঁহাদিগকে পুনরায় আহারে প্রবৃত্ত করান। কিন্তু সেই অবধি সে গ্রামের নাম রহিল "অনশনি" বা বর্ত্তমান **উনসনি**, হাওড়া হইতে সাড়ে তিন ক্রোশ।

সেদিন দোলপূর্ণিমা। তৎপরে তাঁহারা যেখানে উপস্থিত হন, সেই স্থানে নানা প্রকার কুঞ্জবন দেখিয়া সকলের শ্রীকৃষ্ণের সহিত মোহনবাগানে ফাগ খেলা ও দোলনায় দোলা মনে পড়িয়া গেল। তাঁহারা নারদকে বলিলেন "আমাদের দোলনায় ঝুলিতে সাধ হইতেছে, তুমি দোলনার ব্যবস্থা করিতে পার কি?" নারদ মনে মনে চটিয়াই গেল, ভাবিলেন, একটু পরে সব না বলিয়া বসে "ঝিনুকে করিয়া দুধ খাইতে সাধ হইতেছে।" কিন্তু প্রভু পাছে রাগ করেন এজন্য মুখে কিছু না বলিয়া তদ্রূপই ব্যবস্থা করিলেন। তখন সকলে হল্লা জুড়িল দে-দোল, আন-দোল। সেই অবধি সেই গ্রামের নাম হইল, **আন-দোল** বর্ত্তমানে "**আন্দুল**"। সেই স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে যাইতে একখানি গ্রাম দেখাইয়া নারদ বলিলেন "দেখ, এই গ্রামে গোবিন্দ উপস্থিত হইবামাত্র গ্রামবাসীরা সকলে তাঁহাকে কংস-বিজয়ী বীর বোধে অসংখ্য শঙ্খধ্বনি সহকারে অভ্যর্থনা করেন; এজন্য শ্রীকৃষ্ণ খুসী হইয়া ইহার নামকরণ করেন "**শঙ্খরোল**"।—এখন ইহা উচ্চারণ দোষে ক্রমশঃ শঙ্খরেল বা "**শাখরেল**" হইয়া পড়িয়াছে।

অনেক বন-জঙ্গল অতিক্রম করিয়া বেলা দ্বিপ্রহরে তাঁহারা এক স্থানে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলেন। কেহ বা রান্না চাপাইলেন এবং কেহ বা মুড়ি মুড়কীর সদ্ব্যবহারে মনোনিবেশ করিলেন। নারদ বলিলেন "তোমরা সকলে এই উপবনে মনের আনন্দে বেড়াইতে পার। গোবিন্দও সেদিন এই স্থানে বেশ আনন্দ করিয়াছিলেন।" সকলেই সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করিল—সে কিরূপ। তখন নারদ বলিতে লাগিলেন "গোবিন্দ এই স্থানে আসিয়া সঙ্গীদের বলিলেন, "বাঃ, খাসা উপবন দেখ্‌চি। এখানে একটু বেড়ান যাক।" তলদা বাঁশের ঝাড় সেখানে যথেষ্ট। একজন একটা বাঁশের বাঁশরী তৈয়ারি করিয়া কৃষ্ণকে বাজাইতে দিল এবং সকলে একত্র হইয়া শুনিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে শ্রীকৃষ্ণ রথে ফিরিয়া আসিলেন; কিন্তু সঙ্গীরা এদিক ওদিক ঘুরিতেই লাগিল, আহ্বান সত্ত্বেও আসিল না। তখন শ্রীকৃষ্ণ কুপিত হইয়া, যাহা "বাজালে বাঁশি আর ফিরুলে কোঁৎকা", সেই বংশযন্ত্র দ্বারা ২।১ ঘা দিতেই তাহারা সব "ঠেঙ্গাইল, ঠেঙ্গাইল" করিতে করিতে দে ছুট। সেই জন্য এই স্থানের নাম হয় 'ঠেঙ্গাইল'। তাহা হইতে ক্রমশঃ এখন "**চেঙ্গাইল**" হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

আরও কিছুদুর অগ্রসর হইয়া নারদ বলিলেন, "এই যে গ্রাম দেখিতেছ ইহার নাম 'ফুলেশ্বর'; এবং ঐ যে গ্রাম উহা 'উলুবেড়িয়া। গ্রামবাসীরা প্রাণ ভরিয়া ভগবানকে পুষ্পসাজে সাজাইয়া তাঁহাকে ফুলেশ্বর বলিয়া অভিবাদন করেন বলিয়া এ গ্রামের নাম "**ফুলেশ্বর**" ও পুরনারীগণ তাঁহাকে ঘেরিয়া বা বেড়িয়া উলু বা হুলুধ্বনি করেন বলিয়া ও গ্রামের নাম হয় "**উলু-বেড়িয়া**।"

সেখান হইতে ক্রমশঃ তাঁহারা এক নদীতটে উপস্থিত হইলে সকলে নারদকে জিজ্ঞাসা করিল "এ কোন্ নদী?" নারদ বলিলেন "এ নদী নহে, নদ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে এক রাত্রি বিশ্রাম করেন; অশ্বদ্বয় অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পড়ায় তিনি নিকটবর্ত্তী গ্রামে জল চাহিয়া পাঠান। তখন অনেক লোক আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিয়া তাহাদের জলকষ্টের কথা নিবেদন করে, ও তিনি মহাবীর ও শ্রেষ্ঠ পুরুষ, ইচ্ছা করিলেই তাহাদের এ অভাব দুর করিতে পারেন ইত্যাদি স্তবস্তুতিতে সন্তুষ্ট করে। ভগবান তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া এই নদ সৃষ্টি করেন ও গ্রামবাসীদের ইচ্ছামত তাঁহারই নামে ইহার নামকরণ করেন '**দামোদর**'। কলিতে যখনই অধর্ম্মের আধিক্য ইহার নয়নগোচর হইবে, তখনই, প্রভু দামোদরের মতই, বন্যার ক্ষুরধারায় সমস্ত কলঙ্ক ধৌত বিধৌত করিয়া ইহা প্রবাহিত হইবে। তোমরা সকলে ইহার পবিত্র সলিলে অবগাহন করিয়া তৃপ্ত হও। ও আজ এইখানেই বিশ্রাম কর।"

পর দিন কিছু দুর অগ্রসর হইয়াই তাঁহারা আর এক নদতটে পৌছিলেন। নারদ বলিলেন "ইহাই 'রূপনারায়ণ'। ইহার জল স্পর্শ করিয়া ধন্য হও। অক্রুর এই স্থানে পৌছিয়া ভগবানকে বলেন যে, "আপনি

বিশ্বের গুরু। পৃথিবীকে নিষ্কলঙ্ক করিবার জন্য কংসবধে চলিয়াছেন, ইহাতে আপনার পক্ষে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। যে বিশ্বকে আপনি হেলায় বহন করিতে পারেন, যে বিশ্ব একমাত্র আপনারই মধ্যে বর্ত্তমান, আপনি যাহার পূর্ণ প্রতিবিম্ব, সেই বিশ্বের পূর্ণ রূপ, আপনার সেই চিদ্ঘন, সচ্চিদানন্দ বিশ্বরূপ আমাকে একবার দর্শন করাইয়া কৃতকৃতার্থ করুন। আপনার এরূপ ভাবে সঙ্গলাভ আমার অদৃষ্টে আর হয়ত হইবে না। ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।" ভক্তবৎসল গোবিন্দ অক্রূরের এই বক্তৃতা শুনিয়া এই পবিত্র ঘাটে জলমধ্যে অর্থাৎ বারিনারায়ণে দণ্ডায়মান হইয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। সেই দিন হইতে এই ঘাট কালাঘাট ও নদ 'রূপনারায়ণ' নামে খ্যাত হইয়াছে। কলিতে জিহ্বার জড়তা হেতু লোকে ইহাকে 'কোলাঘাট' বলিয়া অভিহিত করিবে।"

সন্ধ্যার সময় সকলে খড়্গাপুরে পৌছিলেন ও সেই রাত্রিটা সেই স্থানেই যাপন করিলেন। আহারাদির পর সকলে নারদকে ঘিরিয়া বসিলেন। নারদ বলিতে লাগিলেন,—"দেখ, এই খড়্গাপুর; প্রভু এই স্থানে তাঁহার প্রথম শিবির সন্নিবেশ করেন। চারিদিকে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। যুদ্ধের পূর্ব্বে অস্ত্রশস্ত্রাদির পূজা করা আবশ্যক। প্রভু এই স্থানে মহাসমারোহে খড়্গের পূজা করেন,—এজন্য ইহার নাম হয়—"খড়্গাপুর"। চারিদিক হইতে রাজারাজড়ারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তাঁহাদের রথচক্র-নিনাদে চারিদিক কাঁপিয়া উঠিল। তাহারই প্রতিধ্বনি ঘোর কলিতেও সকলকে স্মরণ করাইবার জন্য রেল কোম্পানীর কলের রথের চক্রনির্ঘোষ এই স্থানে সদা-সর্ব্বদা শ্রুত হইবে। লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের অনেক লীলার চিহ্ন এ প্রদেশে প্রকটিত। ঐ দেখ, পূর্ব্ব দিকে কিছু দূরে "ভোগপুর।" অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ করিলে লীলাময় তথায় বিশ্রামার্থ গমন করিতেন। ঐ দেখ "রাধামোহনপুর"—ঐ স্থানে প্রভু হঠাৎ এক দিন রাধাপ্রেমের উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া আর একজনকে রাধার সাজে সাজাইয়া বিশ্বপ্রেমের সার্থকতা সম্পাদন করেন!' হাতের কাছে "জাকপুর" বা 'জাগপুরে' রণজয়ার্থ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়।

"এই খড়্গাপুর হইতে ভারতের চারিদিকে পথ গিয়াছে। ঐ দেখ রামেশ্বরের পথ, ঐ পথের ধারে "বেণুপুর"। যখন ইচ্ছা হইত তখনই প্রভু এখানে বেণুবনে আসিয়া মোহন তানে সকলকে মাতাইয়া তুলিতেন। যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্রাদি যাহা কিছু আবশ্যক, অধিকাংশই এই স্থানে প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। এজন্য কতকগুলি গড়ও নির্ম্মিত হয়। ঐ দেখ বেনুপুরের নিকটেই "নারায়ণগড়"।

"এ দিকে চাহিয়া দেখ, ঐ বারাণসীর পথে প্রথমেই "গোকুলপুর"। লীলাময়ের হঠাৎ গরু চরাইবার সখ হয়, তৎক্ষণাৎ তিনি বিরাট রাজাকে এ সংবাদ প্রেরণ করেন। এ সব বিরাটের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত। বিরাট তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার আদেশ পালন করেন। বিরাটের গো-গৃহ কলিতেও সকলে "গোপ" গ্রামে মৃত্তিকাভ্যন্তরে দেখিতে পাইবে। (লোকে বলে তাহা ঐ ভাবে এখনও বর্ত্তমান)।

"গোকুলপুর" ও 'গোপে'র অর্থাৎ গোষ্ঠের মাঝে কপিশা নদী। গরুগুলি চরিবার জন্য গোকুলপুর হইতে নদী সাঁতরাইয়া পার হইয়া গোপে বা গোষ্ঠে আসিত। কলিতে লোকে কপিশা নদীকে বলিবে "কাঁসাই" এবং মূর্খেরা বলিবে কংসাবতী। তাহারা ভাবিয়াও দেখিবে না যে, বিরাটের দেশে দুরাচার কংসের নামে নদীর নামকরণ হইতেই পারে না। কংসের দেশ এখান হইতে বহু দূরে, তাহা তোমরা বুঝিতেই পারিতেছ। (মৎস্য-পুরাণে বর্ণিত আছে—বিরাট রাজ্যের মধ্যস্থলে প্রবাহিতা নদীর নাম কপিশা, সুতরাং কাঁসাই-ই সেই কপিশা! কাযেই 'কংসাবতী' দেখিয়াই কাহারও এ দেশকে কংসের দেশ বলিয়া ভুল করা উচিত নহে)।

"গোকুলপুর ও গোপের পার্শ্বেই দেখ, "মেদিনীপুর"। এইখানেই ভগবানের ইচ্ছায় প্রথম জগৎ বা মেদিনী সৃষ্ট হয়। তখন সমস্ত পৃথিবীতে শুধু জল ছিল। ভগবান, 'মধু' ও 'কৈটভ' নামক দুই অসুরকে গন্ধর্ব্বলোকে যুদ্ধে নিহত করেন। তাহাদের 'মেদ' এই স্থানে নিপতিত হইয়া ক্রমশঃ স্থলরূপে পরিণত হয়। ইহাই মেদিনীর উৎপত্তিসূত্র—

—"মধুকৈটভয়োরাসীৎ মেদসৈব পরিপ্লুতাঃ।"

—ইতি মেদিনী।

"ইহারই অদূরে আবার 'মাদ' বা 'মেদপুর'।

এই মেদিনীপুরেরই সন্নিকটে পূর্ব্বকালে শ্রীকৃষ্ণ বকাসুর বধ করেন। সেই "বকাসুরের হাড়" * কলিতেও পরিদৃষ্ট হইয়া 'লেখকাসুর'গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। তাহার পর আরও প্রাচীন কথা আছে। ঐ দেখ **বালিচক**। ঐ মৌজাখানির, ভগবান তাঁহার রাম-অবতারে বালি-বধের বিজয়-স্মৃতিরূপে, এইরূপ নামকরণ করেন।"

"মেদিনীপুরের সন্নিকটেই আবার '**গদাপিয়াশাল**'—ভগবানের আর এক প্রিয় নিকুঞ্জ। এই জঙ্গলেরই প্রকাণ্ড পিয়াশালের সুদৃঢ় গদাঘাতে বকাসুরের পরিসমাপ্তি হয়। (বড় বড় পিয়াশাল গাছ এখনও সেখানে প্রচুর)। কলিতে লোকে আগ্রহভরে এই সকল কথার আলোচনা করিবে। এই স্থান তখন অহরহ বাষ্পীয়রথের বংশীধ্বনিতে মুখরিত থাকিবে। খড়্গপুর কৃষ্ণলীলার অন্যতম লীলাক্ষেত্র, তাহা তোমরা বুঝিতেই পারিতেছ।

(৬)

পরদিন প্রত্যুষে সকলে নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৃষ্ণ আর কতদূর? কোথায় তাঁহার বর্ত্তমান শিবির?" উত্তরে ঋষিশ্রেষ্ঠ বলিলেন, "ধৈর্য্যম্, ধৈর্য্যম্,—প্রায় অর্দ্ধপথ আসিয়াছি, শীঘ্রই তাঁহার সহিত মিলিত হইব।" সকলে জয় প্রভু গোপীনাথজী কী জয়! জয় প্রভু শ্রীগোপীবল্লভজী কী জয়!! বলিয়া যাত্রা করিলেন। কিয়দ্দূর আসিয়া নারদ বলিলেন, "ঐ যে আমরা পশ্চাতে নির্ম্মল বারিপূর্ণ দীর্ঘিকা ফেলিয়া আসিলাম, উহার নাম **কালাকুণ্ড**। উহার কালো জলে শ্রীকৃষ্ণ নিজের ঘনশ্যাম রূপ দেখিয়া শ্রীরাধার ভবিষ্যৎ কল্পনা করিয়াছেন। জটিলা ও কুটিলার কুপরামর্শে আয়ান ঘোষ যখন শ্রীমতীর সতীত্ব পরীক্ষার জন্য সচ্ছিদ্র কুম্ভ তাঁহাকে জলপূর্ণ করিয়া আনিতে বলিবেন, তখন কি উপায়ে কালা সেই ছিদ্রপথে নিজে বসিয়া তাঁহার মানরক্ষা করিবেন, কুণ্ডের জলে নিজের সেই ছায়া দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা আবিষ্কার করেন। সেই দিন হইতে ঐ কুণ্ড কালাকুণ্ড নাম ধারণ করিয়াছে এবং সন্নিকটবর্ত্তী গ্রামখানিও কালাকুণ্ড নাম ধারণ করিয়া ধন্য হইয়াছে। ভবিষ্যতে উহাকে লোকে **কালাইকুণ্ডা** অর্থাৎ কালারই কুণ্ডা বলিয়া অভিহিত করিবে।

"সম্মুখের ঐ গ্রামে শ্রীকৃষ্ণ ননী অভাবে খাঁটী গব্যদুগ্ধের সর দিয়া জলযোগ করেন। এজন্য উহার নাম **সরদিয়া**। ঐ দেখ কিছু দূরে ঝড়গ্রাম। ঐ স্থানে পৌছিয়া প্রভু ঝড়ে কিছু বিব্রত হইয়া পড়েন এবং এজন্য তথায়ই রাত্রি যাপন করেন। যাইবার সময় উহার নাম রাখিয়া যান "ঝড়গ্রাম", লোকে ক্রমশঃ উহাকে **ঝাড়গ্রাম** বলিয়া অভিহিত করিবে।"

পরদিন নারদ **ঘাটশিলায়** আসিয়া সকলকে সুবর্ণরেখার রজতধারায় অবগাহন করিতে বলিলেন এবং সে দিন সেই স্থানেই কাটাইবার ব্যবস্থা করিলেন। গোপিনীরা তাঁহার এরূপ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "প্রভুও এ স্থানে বাস করিয়া গিয়াছেন। এ স্থান তাঁহার অতীব প্রিয়। বিন্ধ্যাচলের শাখাপ্রশাখা-পরিশোভিত, সুন্দর সুরম্য নদী-গিরি-প্রান্তর-ঘেরা এই স্থানে শ্যাম ও কৃষ্ণের ঢেউ খেলিয়া গিয়াছে। প্রিয় পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসের জন্য এই স্থান তিনি তাঁহার দৈনন্দিন পুঁথিতে (ডায়েরিতে) লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। কালীয় দমনের কথা হঠাৎ তাঁহার স্মৃতিপথে উদয় হওয়ায় এখানে তাহারও অভিনয় করিয়াছিলেন। ঐ দেখ ঐ কালীয় হ্রদ ও ঐ স্থানে সেই নাগের প্রতিমূর্ত্তি বিরাজিত।* এই স্থানে তিনি লীলারও অভিনয় করেন। এজন্য ইহাকে স্বাস্থ্যকর স্থানের মধ্যে স্থান দিয়াছেন। পর্দ্দার আড়াল এখানে নাই। মুক্ত বায়ু স্পর্শে ইহা মশগুল। কলিতে পরিবর্ত্তনপ্রয়াসী 'বাবু' নামক জীবের দল সেই বায়ু সেবন উদ্দেশ্যে এই স্থানে ছুটিয়া আসিবে। আর মিস্-কালো, মসীবর্ণ, স্থানীয় আদিম অধিবাসীরা পর্ব্বাদি উপলক্ষে লীলা-রঙ্গ-রসে মাতিয়া মহা-রাস—মহাদোলের অভিনয় করিবে।" †

পর দিন তাঁহারা হাওড়া হইতে ৭১ ক্রোশ দূরে এক স্থানে উপনীত হইলেন। নারদ বলিলেন, "কল্য আমরা প্রভুর সহিত মিলিত হইব। আহা, তিনি আমাদের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন। এখন তোমরা যতই অগ্রসর

* "বকাসুরের হাড়"—ভারতবর্ষ ১৩২৫—ফাল্গুন, ৩৩২ পৃঃ। —লেখকাসুর শ্রীযুত সত্যেশচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ।

* ঘাটশিলার 'পঞ্চপাণ্ডব' ও 'কালীয়দমন' এখনও বর্ত্তমান।

† বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখকের "অজ্ঞাতপর্ব্ব"—'ভারতবর্ষ' চৈত্র ১৩৩১।

হইবে, ততই তাঁহার লীলার নিকেতনস্বরূপ নানা স্থান দেখিতে পাইবে।"

গোপিনীরা সব আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিল, বলিল, "ঠাকুর, তুমি আমাদের আজ যে আশার বাণী শুনাইলে, তজ্জন্য তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তোমাকে আর বেশী কি বলিব, আমাদের অনুরোধ, এই আশার বাণী সকলের স্মৃতিপথে জাগরুক রাখিবার নিমিত্ত, এবং আমাদের সকল দুঃখের সকল কষ্টের আসান সম্ভাবনা হেতু, আজ হইতে এই স্থান **আশার-বাণী** বা **আসানবাণী** বলিয়া খ্যাত হউক।" নারদ বলিলেন "তথাস্তু।"

তৎপর দিবস তাঁহারা বেলা দ্বিপ্রহর নাগাদ এক স্থানে পৌঁছিয়া দেখিলেন, যেন রথের মেলা বসিয়া গিয়াছে। সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন "হে নারদ, ও কোন্ স্থান।" নারদ বলিলেন, "ঐ স্থানেই প্রভু আমাদের অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়াইয়া আছেন। আরও কিঞ্চিৎ দূরে তাঁহার শিবির। ঐ যে তিনি আমাদের অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাইবার জন্য আসিতেছেন।"

(৭)

দেখিতে দেখিতে শ্রীকৃষ্ণ, কেশব-কংসারি মুকুন্দ-মুরারি মধুকৈটভারি, শ্রীবিষ্ণুদেব চক্রপাণি, বাহু প্রসারিত করিয়া সকলকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। চারিদিকে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। কেহ তাঁহার চরণ স্পর্শ করিল, কেহ ভূমে গড়াগড়ি দিল, কেহ যাদুমণি, নয়নমণি বলিয়া অভ্যর্থনা করিল। আনন্দাশ্রু অবিরলধারে ঝরিয়া ঝরিয়া খরস্রোতা "**খরকাই**" (জেমসেদপুরের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিতা নদী) সৃজন করিল।

গোবিন্দ নারদকে ডাকিয়া বলিলেন, "নারদ, তুমি আজ যে কাজ করিলে তাহাতে আমি তোমার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। এখন সকলকে উপস্থিত কদম্ব-কাননে লইয়া যাও। পরে ক্রমশঃ ইহাদিগকে আমার এই নূতন নগরী দেখাইয়া দিও। আমি এখন '**বিষ্ণুপুরে**' (জেমসেদপুরের আদি নাম, উপস্থিত সহরের ঠিক কেন্দ্রস্থল) চলিলাম। তথায় কংসবধার্থ উদ্যোগ আয়োজন কিরূপ হইতেছে তাহা একবার দেখিতে হইবে।" শ্রীকৃষ্ণ রথ হাঁকাইয়া প্রস্থান করিলেন। নারদ তাঁহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট কদম্ব-কানন শিবিরে উপস্থিত হইয়া বিশ্রাম করিলেন। তৎপরে সকলকে শ্রীকৃষ্ণের নূতন নগরী দেখাইতে বাহির হইলেন। কয়েকখানি রথ তাঁহাদের জন্য সজ্জিত ছিল। তাঁহারা তাহাতে আরোহণ করিয়া আস্তে আস্তে চলিতে লাগিলেন। নারদ বলিলেন "দেখ, আজ আমরা রথারোহণে এই নগর পরিদর্শনে বাহির হইয়াছি, কিন্তু দিন কখনও সমান যায় না। কলিতে এই নগরীর আমূল পরিবর্ত্তন হইবে। সে সময় কেহ রথ হাঁকাইলে লোকে বলিবে টমটম হাঁকাইতেছে। তখন এই ভাবে নগর দেখিতে বাহির হইলে, সৌখীন হাম্‌বড়া অল্পজীবীরা অহঙ্কারে মত্ত হইয়া হাওয়া গাড়ী নামক অন্য এক প্রকার রথের আশ্রয় লইবে ও তাহারই গর্ব্বে তিন দিন অনাহারে কাটাইয়া দিবে—"শফরী ফরফরায়তে"। অহঙ্কারে মত্ত হইয়া ভগবানের এই সকল স্থানের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া অন্যান্য নাম প্রচলিত করিবে।

"যেস্থানে ভগবান আমাদের জন্য দাঁড়াইয়া ছিলেন, সে স্থান তোমরা দেখিয়াছ ; তাহার নাম '**কালামাটী**'। কৃষ্ণ কালো, তমাল কালো বলিয়া উন্মনা হইবার কারণ নাই।—এখানে সবই কালো। মানুষ গরু কিছুই বাদ যায় না (তাও কি সে আবার যেমন তেমন কালো!—"কাক কালো, তোমরা কালো, আমরা কালো, তোমরা কালো, মুচি, মিস্ত্রী ভোমরা কালো।" আবার—"অমাবস্যার নিশি কালো, কালি কালো, মিসি কালো, গদাধরের পিসি কালো, কিন্তু তার চেয়েও কালো সেই কালো বরণ। এখানে পাহাড় ও লোহা কালো ; কল-কারখানার কুলী কালো ; বাবু কালো, সাহেব কালো—মায় কেলে কুকুরটা পর্য্যন্ত দ্বিগুণ কালো) কালার সংস্পর্শে সবই কালো, তাই ইহার নাম 'কালামাটী'। কলিতে কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকে ইহাকে 'কালিমাটী' বলিবে, ও বুঝাইতে চাহিবে যে, কালার সহিত ইহার সংস্রব নাই, এখানকার মাটী কালো অর্থাৎ কালী বা মসীবর্ণ। অজ্ঞেরা ভাবিবে না যে, তাহা হইলে এ দেশের ভাষা অনুযায়ী ইহা "শিহাই মাটী" হইত। তদ্ভিন্ন এখানে মাটী বাস্তবিক কালো নহে। অথবা এ মাটী হইতে যে কালি প্রস্তুত হয়—এমন মনে করিবারও কোন কারণ থাকিবে না। প্রকৃতপক্ষে কালার সহিত সম্বন্ধ ভিন্ন এরূপ হইতেই পারে না। এ দেশের কোন আদিমকে কৃষ্ণ সাজাইয়া হাতে

বাঁশী দিলে যেমন মানায়, এমন কোথাও দেশেই নয়। (তাই বোধ হয় তাঁহারা গালার বাঁশীর এত ভক্ত ; কাজ করিতে করিতেই কেহ বাঁশীতে তান দেন, কর্ম্মঅন্তে তো কথাই নাই, সারা পথ বাঁশীতে ফু দিয়াই চলিতে থাকেন)। শ্রীকৃষ্ণের চরণরেণুতে এ স্থান পবিত্র। দিগ্‌দিগন্ত হইতে নানালোক "ভকত মহৎ পদরেণুপ্রয়াসা" হইয়া এখানে ছুটিয়া আসিবে। অবশ্য **"কালীমাটী"** নামেই ইহা খ্যাত হইবে। কেহ বলিবে কালিমিটি, আবার কেহ বা বলিবে কলিমিটি। বার বার কেহ এইরূপ 'কালামিটি' 'কালামিটি করিলে সে 'কালামিটি' (Calamity) অবশ্য শেষে তাহারই ঘাড়ে চাপিয়া বসিবে। যেমন হরি বল্ হরি বল্ বলিতে বলিতে অধিক 'চাল' দেখাইতে গিয়া কেহ শেষে 'হরিবল্' 'হরিবল্' বলিয়া বসিলে সে 'হরিবল্' (Horrible) তাঁহারই অদৃষ্টে গিয়া ঠেকে ! প্রভুর সঙ্গেও 'চাল'! (এ যে চালবাজী ও বুজরুকিরই দেশ !—ছোট বড় কেউ এতে কম ন'ন।) ঘোর কলি ! ঘোর কলি !! অবশেষে যখন হিংসা-দ্বেষ-পাপে, দেশটা ভাজিয়া পুড়িয়া খররৌদ্রে টা-টা করিতে থাকিবে, তখন এ স্থানের নাম হইবে (টা-টা) **"টাটানগর"** * আর দেশবিদেশ হইতে টো-টো সম্প্রদায়ের (টো-টো কোম্পানীর) অকালপক্ক লোক এখানে টা-টা সম্প্রদায়ের সভ্য হইবে।

"অয়ি কৃষ্ণ প্রিয়াবৃন্দে, যে কদম্বকাননে তোমাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা, ভবিষ্যতে পাপীদের আমলে কদমবৃক্ষ শূন্য হইলেও কদমা বা **"কদমা"** (জেমসেদপুরের একটি পল্লী) নামে অভিহিত হইয়া তোমাদের এই প্রেমাভিনয় সকলকে জ্ঞাত করাইবে (অবশ্য সেই সব পুরাতন বৃক্ষের ২।১টী এখনও স্থলবিশেষে বর্ত্তমান, যথা হাসপাতাল)। কালীমাটীর অনতিদুরে হরিদ্রা পুষ্করিণী বা **"হলুদপুকুর"**।—শ্যামচাঁদের দোললীলা উপলক্ষে ফাগের ফাগুয়ারা। তাহারই কাছে" **"কিষণপুর"** (একখানি পল্লী)।—তথায় নানারূপ শিলামূর্ত্তি সঞ্চিত থাকিয়া তোমাদের কথা সকলের স্মৃতিপথে আনয়ন করিবে। (এ সব এখনও আছে, আপনারা দেখিয়া আসিতে পারেন—সেগুলির ভাস্কর্য্য অনুপম)। "ঐ দেখ **'বিষ্টুপুর'** (জেমসেদপুরের কেন্দ্রস্থল—হট্টমন্দির)। ভগবান বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণ "কেশব" কংসারিরূপে আজ এখানে যুদ্ধের জন্য কতই না আয়োজন করিতেছেন। ভবিষ্যতেও ইহা বিষ্টুপুর নামেই পরিচিত হইবে। কলিতে নামেই মুক্তি, হরের্নামৈব কেবলম,—তাই পাপীরা এখানকার হট্টমন্দিরে ভিড় করিয়া একতানে একমনে "কেশবের" নিকট দেহি দেহি রবে দয়া ভিক্ষা করিয়া বলিবে- কেশব কুরু করুণা দীনে। (কেশবের অন্নসত্র অর্থাৎ হোটেল ভিন্ন কাহারও গতি থাকিবে না)—নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

"এই স্থান হইতে আড়াই যোজন দুরে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে **বেণুপুর**।—বেণুকুঞ্জে ভগবানের শান্তি-কানন। তথাকার অসংখ্য দেবমন্দির, দেবমূর্ত্তি, সরোবর ও তন্মধ্যস্থিত বহুবিধ দ্রষ্টব্য কলিতে সকলর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে ও ঐতিহাসিকগণ তাহার বিশদ বিবরণ ও তদ্ সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণায় ব্রতী হইবেন।

"হে কৃষ্ণ-ভামিনীগণ, অন্য দিকে চাহিয়া দেখ, তোমাদের নয়ন সমক্ষে এই সুন্দর গ্রাম ; ভগবান তোমাদের এই মহাপ্রেমের প্লাবনে প্লাবিত হইয়া তোমাদের অসীম ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া তাহাতে হাবুডুবু খাইয়া তোমাদের এই ভালবাসার নিদর্শনস্বরূপ ইহার নাম রাখিয়াছেন **"ভালবাসা"**। আহা, কি চমৎকার নাম ! (ভালবাসা গ্রাম জেমসেদপুরের এল্ টাউনের নিকট।) মূর্খ অজ্ঞ নাস্তিকেরা সপ্রমাণ করিতে চাহিবে ইহা "ভালুবাসা" অর্থাৎ ভালুকের বাসা বলিয়া এইরূপ নাম হইয়াছে। পক্ষান্তরে জ্ঞানী ভক্ত আস্তিকেরা ইহা অনায়াসেই অপ্রমাণ করিবে। কিন্তু কলিতে পাপ মন, এ মহাপ্রেমের মহাতরঙ্গের মহিমময় মহাভাবের মহদুদ্দেশ্য মনের কোণেও ঠাঁই দিতে পারিবে না, এই যা দুঃখ। তবে না পারিলেও বাহ্যিক ভাব-তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত, আলোড়ন-বিলোড়ন অবশ্যম্ভাবী। পল্লীতে পল্লীতে নূপুর নিক্কনের নিবিড় গুঞ্জনায় চারিদিক মুখরিত হইবে। অভিনয়ে অভিনয়ে চারিদিক প্রকম্পিত হইবে। তানে গানে কাণ ঝালাপালা হইবে। পথে ঘাটে মহারাসের মহালীলার নিত্য-নূতন সংস্করণ চক্ষের জ্বালা উৎপাদন করিবে। দোলের দোলাদুলি, হোলির ঢলাঢলি চারিদিক হৈ-চৈ

---

* জেমসেদপুরের রেল ষ্টেশন টাটানগর ; পূর্ব্বনাম কালিমাটী।

সত্যনারায়ণ

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বাক্‌চী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.
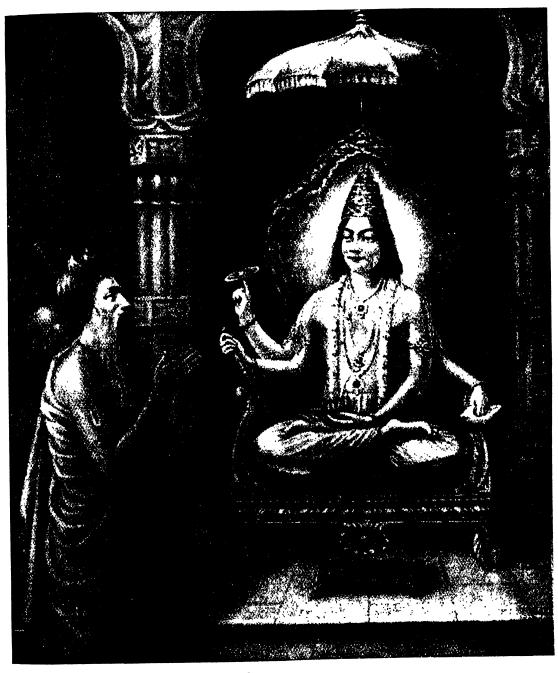
করিবে। তোমাদের এই উন্মুক্ত প্রেমের প্রবল প্রবাহ পথে-ঘাটে প্রকটিত হইবে। কিন্তু হায়, "এই মহামানবের মহাপ্রেমের মহাপ্লাবনের মহান মহত্ব কয়জন হৃদয়ঙ্গম করিবে? হয় ত কেহ করিবে না। তবে আমার এই সান্ত্বনা যে, একটি মাত্র গবেষণা ভবিষ্যতে এই সমস্ত কথা উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে। এই মহাপ্রেমের উন্মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়াইয়া এই মহামিলনের মহাসাক্ষ্য প্রদান করিবে—"মিলনী" (বাঙালী ক্লাব)। আর এই সমগ্র স্থানটি (জেমসেদপুর) এক ব্রহ্মাগ্নির্ভক্ত মহাপুরুষের (অগ্নি-উপাসক জেমসেদজী টাটার) নামে পরিচিত হইবে (জেমসেদপুর)।

গোপিনীগণ, এইবার তোমরা যুদ্ধপর্ব্ব দর্শন ও শ্রবণ কর। ঐ দেখ, যুদ্ধের জন্য ঐ গড়ে গদা মুষল ইত্যাদি প্রস্তুত হইতেছে। গড়ের অপর নাম বেড়। এজন্য ঐ স্থানের নাম মুসলবেড়া বা মযুলবেড়া। কলিতে স্থান ও দেশবিশেষে 'স' লোপ পাইয়া 'হ' থাকিবে। সিন্ধু হিন্দু হইবে—আরও কত। এই মযুলবেড়াও ক্রমে 'মহুলবেড়া'য় পরিণত হইবে (মহুলবেড়া জেমসেদ-পুরের একখানি পল্লী)।

"ঐ দেখ রণসাজে সজ্জিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে চলিয়াছেন। দেখিয়া নয়ন-মন সার্থক কর। হাতে পাঞ্চজন্য শঙ্খ। ঐ শুন শঙ্খের গম্ভীর চীৎকার, শুনিয়া বুক দুরু দুরু করিতেছে। যে স্থান হইতে তিনি শঙ্খ বাজাইতেছেন, এই স্থান শঙ্খের চীৎকার হেতু শঙ্খচিঃ নামে খ্যাত হইবে; পরিশেষে প্রাদেশিকতার পাল্লায় পড়িয়া হইবে 'শাঁখচি' (জেমসেদপুরের একখানি পল্লী; ও সন ১৩২৫ সাল ও তৎপূর্ব্বে অর্থাৎ বড়লাটের ঘোষণার পূর্ব্বে সমগ্র জেমসেদপুরের নাম)। প্রহরে প্রহরে কৃষ্ণ আজ শঙ্খ বাজাইতেছেন; কলিতেও এই স্থানে প্রহরে প্রহরে শঙ্খের শব্দের ন্যায় শব্দ শ্রুত হইবে (কার-খানার ভোঁ)। ঐ শোন—

"গরজি গরজি শঙ্খ তাঁহার
গুমরি গুমরি উঠিছে আবার"—

"ঐ দূর গ্রাম প্রান্তর অবধি যে গুরু-গম্ভীর শব্দ গুমরিয়া গুমরিয়া ফিরিতেছে, সেইজন্য উহার নাম হইবে গুমরিয়া বা 'গামারিয়া' (টাটানগরের পরবর্ত্তী রেল ষ্টেশন)। ঐ দেখ "মহালিমারূপ" (পরবর্ত্তী ষ্টেশন) হইতে তিনি স্বরূপ ধারণ ধরিয়া, শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম লইয়া 'বড়াবাম্বো' (রেলষ্টেসন) হইতে প্রকৃত লড়াই আরম্ভ করিলেন।

"দেখ দেখ কি ভীষণ যুদ্ধ! হায় হায়! হরি বুঝি হারিলেন! উঃ কি ভীষণ! কি ভীষণ!!! ঐ দেখ, পাহাড়ের উপর দুইজনে লোটাপুটি খাইতেছেন। ঐ যে কে আবার লুটাইয়া পড়িলেন। আহা বলরাম গেলেন কোথা! ঐ যে প্রভু উঠিয়াছেন। যাই হোক, আজ হইতে ঐ স্থানের নাম হইল "লোটাপাহাড়" (চক্রধরপুরের পরে পাহাড়ময় ষ্টেসন)।

"উঃ, পাপিষ্ঠ কংসের মস্তক কি কঠিন! ভগবানের গদাপ্রহারেও তাহা চূর্ণ হইল না! দুরাত্মা সৈন্যসামন্ত লইয়া ঐ দেখ, লোটাপাহাড়ের মাথার উপর দাঁড়াইয়া আছে, আর প্রভু পিছাইয়া আসিতেছেন। কিন্তু আর নিস্তার নাই। ঐ যে ভগবান এইবার সুদর্শন চক্র প্রয়োগ করিলেন। চক্র প্রবল বেগে ঘূর্ণায়মান। বৈদ্যুতিক শক্তিক্রিয়া তাহাতে সম্পূর্ণ বর্ত্তমান, প্রতি মুহূর্ত্তে তাহা তিন সহস্র বার আবর্ত্তিত হইতেছে (3000 r. p. m.)। মহাবেগে চক্র ছুটিয়া চলিয়াছে। ঐ দেখ কংসের ছিন্নমুণ্ড চক্রের নির্ঘোষ তাড়নায় তিন যোজন দূরে নিপতিত হইল। যে স্থান হইতে প্রভু চক্র প্রয়োগ করিলেন তাহা অদ্যাবধি 'চক্রধরপুর' এবং যেথায় কংসের ছিন্নমুণ্ড (ভাল্) ধরা চুম্বন করিল, তাহা 'কংস ভাল' বা প্রাদেশিকতায় 'কন্‌স ভাল' (রেলষ্টেসন) হইয়া চিরকাল এই কীর্ত্তিকাহিনী সকলের মনে জাগরূক রাখিবে।

"ঐ দেখ, দেবগণ দুন্দুভিধ্বনি সহকারে উপর হইতে শ্রীকৃষ্ণের উপর পুনঃপুনঃ পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন। জগতে শান্তিধারা প্রবাহিত হইতেছে।

"ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি!

কোষ্ঠীর ফলাফল

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সর্ব্বক্ষণের সঙ্গীরা মামুলী মাল হইয়া দাঁড়ায়; আমরা তাহাদের বিশেষত্ব বুঝি না, কদরও করি না; তাহারাও কদর কি আদরের নজর রাখে না। জয়হরিকে বিদায় দিয়া যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিতে লাগিল। বাসায় ফিরিয়া সংবাদটা দেওয়ায়—কাজটা কেহই অনুমোদন করিলেন না। কর্ত্তা ও বাড়ীর মেয়েরা বলিলেন—"অমন সাদাসিদে হাবাগোবা লোককে এই অজানা জায়গায় অচেনা মানুষের হাতে ছেড়ে দেওয়া ভাল হয় নি।" দেখি বাণেশ্বরেরও সেই মত!

আজ রান্নাঘরের কাজকর্ম্ম সহসা শিথিল হইয়া গেল। উনুন দুইটা সকাল সকাল নিভিয়া বাঁচিল। আহারের সময়টা সকলেরই বেশ আনন্দে কাটিত, অন্য দিনের পাঁচ কোয়ার্টারের কাজ আজ পনের মিনিটেই শেষ হইয়া গেল। নূতন কিছু প্রস্তুত করিয়া বা গরম গরম মাছ ভাজা লইয়া মেয়েদের ছুটাছুটি—জয়হরিকে ঠকাইবার প্রয়াস,—কলহাস্য প্রভৃতি উপভোগ্য বিষয় হইতে আজ সকলকেই বঞ্চিত হইতে হইল। আজ যেন সব—"কাজ-সরা" মাত্র!

আহারান্তে বাহিরে আসিয়াও স্বস্তি নাই। কর্ত্তা মাঝে মাঝে আসেন আর বলেন,—"নাঃ—কাজ ভাল করেন নি।" শুইয়া শুইয়া সিগারেট টানিতে লাগিলাম। সেটা আজ ডবল ভোজে চলিল। কোন্ জিনিসের মূল্য যে কোন্ অবস্থায় বাড়ে কমে তা বোঝা কঠিন। আজ জয়হরির নাসিকা-ধ্বনির অভাবে আমি চোখ বুজিতে পারিলাম না! তার ব্যক্তিত্বটা যে কোন্ সময়ে আমার অজ্ঞাতে সহসা এত বড় হইয়া দাঁড়াইয়াছে—সে আমাদের এতখানি দখল করিয়া লইয়াছে, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

আবার কর্ত্তার চটির শব্দ! আসিয়াই বলিলেন, "দেখুন দিকি, তিনটে বেজে গেল, এখনও দেখা নেই! এ তো তৃতীয় প্রহরে আদ্য শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন খাওয়া নয়। এঁরা বলেছেন, জয়হরিবাবু এলে তবে চায়ের জল চড়াবেন।" বুঝিলাম, তাঁহাদের সকলেরই ইচ্ছা—অপরাধের সাজা হিসাবে তাহাকে খুঁজিয়া আনিতে এখনি আমার বাহির হইয়া পড়া উচিত এবং সেটা চাই-ই। বলিলাম, "সে বলেছে, বৈকালে জলযোগ আর চা সেইখানে সেরে সাড়ে চারটার মধ্যে ফিরবে।"

কর্ত্তা চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন,—"সাড়ে চারটে! শীতকালের বেলা—তাহলে সন্ধ্যে বলুন! তখন চাকরকে উদ্দেশ করিয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন, "ওরে বাগেশ্রী—সব লাণ্ঠান কটাই তয়ের করে ফ্যাল্, আর আমার সেই তেজ্ বলের লাঠি গাছটা বার করে রাখ,—বুঝলি?"

বাণেশ্বর বলিল, "কেন বাবু—আজ নাগপঞ্চমী নাকি? এখানে খুব সাপটাপ বেরয় বুঝি? ওরে বাপ্‌রে! মা মনসা! দেশে গিয়ে দুধকলা দেব মা!" বলিয়া দুই হাত কপালে ঠেকাইল।

কর্ত্তা আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "শুনলেন হারামজাদার কথা। ওরে ব্যাটা, এই যে মাইফেলে মজলিশে বত্রিশটে ঝাড় লাণ্ঠান জ্বালে,—সাপ বেরুবে বলে রে পাজী,—না দুটোর বেশী লাণ্ঠান জ্বাললেই নাগ-পঞ্চমী হয়!"

জয়হরির অভাবে আমি পূর্ব্ব হইতেই অন্তরে একটা অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতেছিলাম, তাহার উপর বাড়ীশুদ্ধ লোকের ভাব দেখিয়া ও কথা শুনিয়া নিজের কাছেই নিজের অপরাধ ক্রমশঃই যেন সুস্পষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং জয়হরির জন্য একটা ভাবনা ও চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল। এই অবস্থায় প্রভু-ভৃত্য সংবাদ আরম্ভ হইতে দেখিয়া ভয় পাইলাম,—কারণ প্রভুর এই প্রিয় প্রসঙ্গ সহজে থামিতে চায় না। বেশ বুঝিলাম, জয়হরির কথা

ভুলিয়া নাগপঞ্চমীতে ঝুঁকিতে তাঁর আর অধিক বিলম্ব নাই। কাজেই ঘড়িটা খুলিয়া বলিলাম "এটা দেখছি ভারি ফাষ্ট যাচ্ছে—এর মধ্যে চারটে বেজে বসে আছে।" তিনি চমকিত ভাবে বলিলেন "অ্যাঁ,—বলেন কি,—এ ব্যাটা ত নড়বে না!"

"ওকে আর নড়তে হবে না, আমিই এই নড়লুম" বলিয়াই উঠিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। কিন্তু যাই কোথা, ঠিকানা ত মনে নাই! তাহা সত্ত্বেও চলিতে কিন্তু হইবে—তাই চলিলাম। এই অবস্থায় পা কখন তাহার পরিচিত পথ বাছিয়া লইয়াছে—বাজারের পথই ধরিয়াছি!

কয়েক মিনিট পরেই হঠাৎ কানে আসিল—"আমি এইখানে!" গলাটা ঠিক জয়হরির না হইলেও সুরের সাদৃশ্য থাকায় এদিক ওদিক চাহিতেই দেখি, জয়হরিই ত' বটে! সম্মুখে শূন্য শালপাতা—পার্শ্বে এক-লোটা জল! আমাকে দেখিতে পাইয়া পাতে যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাড়াতাড়ি তাহা মুখে পূরিয়া যথাস্থানে জমা দিবার কসরতে সে ব্যস্ত! তাহার সেই অবস্থার আওয়াজটা বেসুরো শুনাইয়াছিল। "তাড়াতাড়ি কেন ধীরে ধীরে খাও" বলিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলাম,—"ব্যাপার কি, এটা ভোজন না ভোজবাজী! নিশ্চয়ই কিছু পূর্ব্বে নিমন্ত্রণ ও নিমন্ত্রণ-কর্ত্তা উভয়কেই সারিয়া আসিয়াছে, আবার এ কি!"

জয়হরি কোন দিনই গম্ভীর নয়। মুখে সর্ব্বক্ষণই একটা নিশ্চিন্ত ভাবের অন্তরালে আনন্দাভাস থাকে। আজ তাহার চোখমুখ বেশ ভারী ভারী। এক-লোটা জল টানিয়া, মাঝারি একটা উদ্‌গারের সহিত উঠিয়া সে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিলাম "দোকান-দারকে পয়সা দেওয়া হয়েছে?" জয়হরি নীরবেই ঘাড় নাড়িয়া জানাইল "হয়েছে।" চাহিয়া দেখি, মুখে একটা মলিন ছায়া পড়িয়াছে, দৃষ্টি উদাস, কোথাও তাহার স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তির লেশমাত্রও নাই। নিশ্চয় কিছু একটা ঘটিয়াছে।

পথে পড়িয়া উভয়ে দু' এক মিনিট নীরবে চলিবার পর বলিলাম, "চল—এখন বাসাতেই যেতে হবে, সকলেই তোমার তরে উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছেন। তোমাকে একলা ছেড়ে দেওয়ায় সারাদিন সকলেই আমাকে দুষছেন,—মায় বাণেশ্বর। সকালে আজ আর তাঁরা আহারের কোন আড়ম্বরই করেন নি। সকলেই ভাবছেন, সকলেরই মন-মরা ভাব। আমি সারাদিনটা অপরাধীর মত কাটিয়েছি। তোমাকে না হাজির করলে তাঁরা চা পর্য্যন্ত চড়াবেন না।"

জয়হরি আমার পশ্চাতেই ছিল। স্নেহের এই পরোক্ষ পরশেই সে বালকের মত ফোঁপাইয়া উঠিল। চমকিয়া ফিরিয়া দেখি—চোখের জলে তাহার বুক ভাসিয়া যাই-তেছে। আমি তাহার গায়ে হাত দিয়া বলিলাম, "এ কি! কি হয়েছে জয়হরি?" সে কথা না কহিয়া হাঁটুর কাপড় তুলিয়া ধরিতেই দেখিলাম—তাহা রক্তরঞ্জিত এবং কটি হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নে পাড় পর্য্যন্ত পিঁজিয়া, ছিঁড়িয়া সম্পূর্ণ অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে; ডানদিকের অবস্থাও প্রায় তাই। তদ্ভিন্ন দুই পা-ই ক্ষত-বিক্ষত!

দেখিয়া ভয়ে ভাবনায় সমবেদনায় আমি কেমন হইয়া গেলাম। পরে তাহার পিঠে হাত দিয়া 'চল' বলিয়া তাহাকে লইয়া নিকটস্থ "ভিক্টোরিয়া হলে" ঢুকিয়া সেখানকার অভিজ্ঞদের দ্বারা যথা কর্ত্তব্য করাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে গিয়া স্কুল কম্পাউণ্ডে ঢুকিলাম,—তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। কম্পাউণ্ডের এক স্থানে ভূগর্ভোত্থিত একখানি প্রস্তরের উপর তাহাকে বসাইয়া নিজেও বসিলাম।

(৪২)

উভয়েই দু'এক মিনিট নীরব থাকিবার পর, সস্নেহে জয়হরির নিকট ব্যাপারটা জানিতে চাহিলাম। তাহার পর অর্দ্ধঘণ্টাকাল অবাক্ হইয়া যাহা শুনিলাম, তাহাতে সেই সন্ধ্যার মেঘের মতই আমারও ভিতরটা নানা ভাবান্তরের মধ্য দিয়া—শেষ আঁধার মলিন হইয়াই গেল। শুনিলাম—

বাসায় পৌঁছিয়াই দেশপ্রাণদের দ্বিতীয় করুণানন্দটি সহাস্যে বলেন "আমাকে এখন ঘণ্টা দেড়েকের ছুটী দিতে হবে। মটন্‌টা যখন মনের মতন মিলেছে তখন সেটা আনাড়ীর হাতে দিয়ে মাটী কর্‌তে পার্‌ব না। আপনারা ততক্ষণ দেশের কাজ এগিয়ে ফেলুন। আমি কালিয়া-দমনটা সেরেই আসছি—আর খানকতক কাশ্মীরী কিমা। হ্যাণ্ড ব্যাগটা নিয়েই যাই, নম্বর থ্রী থার্ম্মমিটার দরকার হবে, heat regulateএর ওপরেই ওর জান।"

দলপতি—আমাদের পরিচিত বক্তা দয়াল দফাদার U. G. (অর্থাৎ under graduate) বলিলেন,—এঁদের পরীক্ষাটা সেরে গেলে হতনা !"

"উত্তীর্ণ বলেই ধরে রাখুন না,—বন্ধুদের নিরাশ করতে হবে না কি। ততক্ষণ গ্রামোফোন্ চলুক, আমি বলুম বলে।"

দলের এই দ্বিতীয়—আমাদের সেই আজানুলম্বিত দক্ষিণ হস্ত সদৃশ করুণানন্দ আবার নাকি একজন অদ্বিতীয় M.D. তিনি সর্ব্বসাধারণের কার্য্য-সৌকার্য্যার্থ তাঁর roaring practice শুরুগর্জ্জনশীল—ফ্যালাও ব্যবসা ফেলে দেশসেবার জন্য ভুখো ভ্রাম্যমান ভৈরব হয়ে দাঁড়াচ্ছেন। পেল্লায় প্রাক্‌টিস্ পায়ে ঠেলে পরিব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন। ইতিপূর্ব্বে ঢাকায় এক নবাব সংসারে নিযুক্ত ছিলেন, বংশলোপ আসন্ন দেখে তাঁরা প্রসন্নচিত্তে পন্সেন্ অর্থাৎ বিদায় দিয়েছেন। এই শেষোক্ত সংবাদটি আমরা পরে পাই।

দলপতি দয়াল দফাদার মহা চৌকোস্ চ্যাপ ; তিনি হাস্যমুখে সামনে দু প্যাকেট্ কাঁচি সিগারেট আর একটা দেশলায়ের বাক্স পটাপট্ ফেলে দিয়ে বল্লেন্ "নিন্ ধোঁয়া-টোটা ভাল, ক্রমে ধুমাৎ বহ্নি—অর্থাৎ চন্‌চনে ক্ষুধা।" তার পর নিজেও একটা ধরাতে ধরাতে বল্লেন "এইবার গ্রামোফোন চলুক। এ যা শুনবেন তা সকলের জন্যে নয়। অতবড় কলকাতা সহরে এ জিনিসটি মিলবে না। এর একটু ইতিহাস আছে। বর্দ্ধমান ছেড়ে আমরা একদম বৃন্দাবনে যাই,—সময়টা ছিল রাসের, সুতরাং হতাশের মধ্যেই পড়ে গেলুম। হরিনাম শুনি আর পরিণাম ভাবি। যমুনার জলটুকু কচ্ছপে দখল করে ঘোলাচ্ছে,—শীতকাল, মশা ডাকবার আশাও নেই, উইল্ করে পা বাড়াতে হয়। না নেয়ে নেয়ে তিনজনের মাথাই অশ্বত্থামার মাথা হয়ে দাঁড়াল।

রামদাসের প্রতিভা ছিল পঞ্চমুখী, এখানে এসে তার উপর সিদ্ধিটাও বৃদ্ধি পেলে। তার দাদামশাই ছিলেন পরম ভক্ত। তাঁর state ছিল হুঁকো, কলকে, জপের মালা, চশমা, ভক্তমাল, মকরধ্বজ, মধু আর খল। এক দিন তিনি ভক্তমাল পড়ছিলেন আর চোখ মুছছিলেন. এমন সময় হঠাৎ একটা জরুরী কাজে তাঁকে যেতে হয়—গ্রন্থ-খানি মোড়বার মত সময়ও পান নি। যাক্,—তিনি খেতেন মকরধ্বজ আর প্রিয় রামদাস খেতেন দু চার ফোঁটা মধু। সে নাকি তখন তিন বছরের। কিন্তু বুদ্ধিটি ধরত ঢের বড়। দাদামশায়ের জরুরী ডাকের ফাঁকে সে তার মধুভাণ্ডটি নিয়ে যে কাণ্ডটি করে বসে, তাতে ভক্তমালের পাতা ভক্তিরসে না হলেও, সরস হয়ে পড়ে। ফলে অনেকগুলি ভক্তসহ তিন পাতা মধুমাখা ভক্তমালও তাকে উদরস্থ করতে হয়। দাদামশাই-ই বলেন—'ওই ছেলে হতেই তাঁদের বংশ ধন্য হবে, যে জিনিস ওর পেটে পৌঁচেছে তা এক একটি ব্রহ্ম-বীজ—সে এক দিন ফুটবেই ফুটবে।"

কিন্তু এতবড় অভিব্যক্তিটা দেখবার জন্যে তিনি তো অপেক্ষা করে বসে রইলেন না, সেই বীজ ফুটলো ব্রজের মাটিতে আর দেখতে হল আমাদেরই।

"কাজ কর্ম্ম না থাকায় দিনে ভোগ আর ঘুম, সন্ধ্যায় সংকীর্ত্তন শোনার ধূম চলতে লাগল। বলা নেই কওয়া নেই রামদাস হঠাৎ একদিন হাত তুলে join করে ফেললে,—তারপর আছাড় খায় আর গড়াগড়ি দেয়। আচমকা ছুঁচোবাজীর মত সোঁ করে লোকের পায়ের মধ্যে ঢুকেও পড়ে। ক্রমে রামদাসের ভাবাবেশ সুরু হ'ল। কুঞ্জে—পুঞ্জে পুঞ্জে ভক্তের ভিড় লাগল—পায়ের ধুলোর জন্যে। তাঁদের পায়ের ধুলোয় ছোট আঙিনাটি কুস্তীর আখড়ার মত এক হাঁটু খাস্তা হয়ে দাঁড়াল,—মূলোর চাষ চলে। ভালর মধ্যে আল্‌পো মাল্‌পো মিলতে লাগল। রামদাসের পেটে যাঁরা মধুর অনুপান হয়ে ঢুকে পড়েছিলেন তাঁদের আবির্ভাব হতে লাগলো।"

"রেকর্ড করতে জানতুম, Plate পরিষ্কার করে রাখলুম। প্রভু নিত্যানন্দের আবির্ভাব হলেই তাঁর দুর্লভ বাণীর অক্ষয় ছাপ লাভ করতেই হবে। পূর্ণিমার সন্ধ্যায়" এই পর্য্যন্ত বলেই দফাদার সজোরে শিউরে নমস্কার করে বললেন—"ঠাকুরের আবির্ভাব হ'ল। উঃ! সে কি ভাব! রেকর্ড Plate বাগানই ছিল, মহাপুরুষের শ্রীমুখ হতে সুধা বর্ষণ সুরু হতেই রেকর্ডেও তার স্পর্শণ ঘর্ষণ, তার সোণার কাঠি বুলিয়ে চলল। সে আর এ অধমের মুখে শুনে কায নেই।" এই বলেই U. G. দফাদার তাঁর গ্রামোফোনে পিন্ পরিয়ে দীনের উদাস ভাব নিলেন।

প্রভুও আওয়াজ দিলেন,—"হে প্রিয় ভক্তগণ, তোমাদের ইচ্ছা আমি অবগত আছি। যাতে মনুষ্য-জন্মের চরম সার্থকতা তা তোমরা শুনতে চাও। আমার সময় অল্প—সারটুকু শুনে নাও। যখন আচার্য্য গোঁসাই মহাপ্রভুকে জানালেন—"এ হাটে না বিকায় চাউল"—তার অর্থ ছিল—লোকের চাল কেনবার পয়সা নেই, দেশ গরীব হয়ে আসছে। অন্নচিন্তার চাপে ধর্ম্ম চাপা পড়ে যাচ্ছে। পরবর্ত্তী মহাজনেরা প্রচার করলেন—জীব মাত্রেই নারায়ণ,—তাদের সেবাই নারায়ণের সেবা! সেই হচ্ছে ধর্ম্মের সেরা। শিক্ষিতেরা সেটা বাহবা দিয়ে স্বীকার করে নিলেন। তার পর অবাক হয়ে দেখেন—নারায়ণ বটে কিন্তু সব দরিদ্র নারায়ণ!—এ নারায়ণে ভারত ভরাট। আবার বাংলার শিক্ষিত ভদ্রলোকদের বাড়ী-গুলির বারআনাই দরিদ্রনারায়ণদের অজ্ঞাতবাসের বিরাট-ভবন। উপায়? শ্রীভগবান বহু পূর্ব্বেই ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে পথ বানিয়ে রাখেন। ভগীরথকে দিয়ে গঙ্গা আনিয়ে পাতক ধোবার পন্থা করে রাখেন—পেল্লেয়ে" পেল্লেয়ে সব পাতকী এসে পৌঁছুবার পূর্ব্বেই। দয়াময়ের সব কাযেই দূরদর্শিতা পাবে। তোমরা ভক্ত—ভক্তি-পথ দ্বৈতের পথ—যেমন তুমি-আমি, স্ত্রী-পুরুষ, চা-চপ, এক কথায় ডেয়াকি। ধর্ম্ম-অর্থও তেমনি এক ব্রাকেটের জিনিস। তাই অর্থ-ছাড়া ধর্ম্মও এ যুগের জন্য নয়। অর্থ সংযোগেই সেটা ঘোরাল হয়—সার্থক হয়। সে অর্থ পাবার সহজ উপায়ও তিনি আনিয়ে দিয়েছেন,—সেটি—জীবনবীমা; এ কথাটি ভুলোনা; তবে, যে যেমন অধিকারী। তোমাদের সুমতি হোক।" গ্রামোফোন থামতেই দয়াল গড় হয়ে প্রণাম করলেন।

রামদাস কোথা থেকে এসে বলে উঠলেন "বাড়ী নোটিস্ দিচ্ছে, নাও ফরম্গুলো (form) দেগে ফেল। আজ করুণানন্দ যে কাণ্ড করেছে—আহারের পর তো সব অজগর!

"তা বটে" বলেই দফাদার কালী কলম আর ফরম্ তিনজনকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "নিন্ লিখে ফেলুন। আপনারা শিক্ষিত লোক—ফরম ধরতে পাঁচ মিনিট। পেট ভরতে বটে পাকা দেড় ঘণ্টা নেবে। করুণানন্দের হাতে পাতের প্রোগ্রাম্ শেষ হতে জানে না।" হ্যাঁ ভাল কথা—ডাক্তারের ফী আপনাদের লাগবে না। আমাদের সব্বই তা suffer করবে। এ যে দেশের কায রে brother!"

(৪৩)

জয়হরি আগাগোড়া মাটির মানুষের মত নির্ব্বাক বসিয়া ছিল। বোলের ও কলের বক্তৃতাগুলা তাহার কাণে পৌঁছিতেছিল প্রাণে প্রবেশ করে নাই। আজ তাহার প্রাণে যাহা প্রবেশ করিতেছিল তাহা নাসারন্ধ্র দিয়া। তাহার সারা প্রাণটা পড়িয়া ছিল রন্ধনশালায়। দেওঘরে আসিয়া পর্য্যন্ত মাংসের মুখ না দেখিয়া সে প্রায় মহাপ্রভুর বংশধর দাঁড়াইয়া যাইতেছিল।

করুণানন্দের কালিয়াদমন কাব্যের অমৃতাক্ষর শুনিয়া পর্য্যন্ত সে একপ্রকার তন্ময়ই ছিল। মনে মনে সেই সুধা স্মরণে কয়দিনের ক্ষতিপূরণের মত ক্ষুধা সঞ্চয়ও করিয়া আনিয়াছিল। এই ঘটন ঘটনের মন্ত্রের মধ্যে, খালিপেটে কালি কলম কাগজ ঢুকিয়া তাহার মগজ বিগড়াইয়া দিল। "জাফরাণ শুঁকিয়ে দলিল দস্তখত করাতে চায়,—এরা মানুষ ভাল নয়।" সে ভয়ে রাগে নৈরাশ্যে সব ভুলিয়া গেল। পৈতাটা কানে দিতে দিতে 'আসছি' বলিয়া বাহির হইয়া পড়িল। এ সঙ্কেতের উপর কাহারও প্রশ্ন চলে না। উপনয়নের পনের বৎসর পরে পৈতাটা আজ কাজে লাগিল। সেটার উপকারিতা বোধ হয় আজ সে প্রথম উপলব্ধি করিল।

বাসাটা ছিল বড় রাস্তার ধারেই। জয়হরি মোটর লরির সাড়া পাইয়াই গা-ঝাড়া দিয়াছিল। সেখানা তখন সামনে আসিয়া পড়িয়াছে। জয়হরি প্রাণপণে ছুটিয়া তাহার হাতল ধরিয়া "চলো" বলিতে বলিতে কোনও প্রকারে বিপদ কাটাইয়া উঠিয়া পড়ে। আঘাত পাইলেও সেদিকে তাহার লক্ষ্যই ছিল না। হাওয়ায় দাঁড়াইয়া সে সামলাইতে থাকে।

মানসিক বিকারের আকস্মিক উত্তেজনায় ঘটিলেও জয়হরির এই ত্যাগ-স্বীকারটি যে কত বড় ছিল তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। রাজ্যত্যাগ, বিত্তত্যাগ, গৃহত্যাগ প্রভৃতির পশ্চাতে একটা পরমার্থাদি লাভের প্রতি লোকের লক্ষ্য থাকে। দধীচি হাড় ছাড়িয়াছিলেন,—জয়হরির মাস-ছাড়াটা তদপেক্ষা ছোট ত্যাগ ছিলনা; সেটা সমজদারে সহজেই স্বীকার করিবেন।

আমাদের বাসটা দেওঘর ষ্টেশনের নিকটেই ছিল। লরী আসিয়া প্রত্যহই সেখানে দাঁড়াইত ও যাত্রী লইয়া ছুমকা পর্য্যন্ত যাতায়াত করিত। সত্বর বোমার সীমা এড়াইয়া বাসায় পৌছিবার আশায় জয়হরি লরী ধরিয়াছিল। একটু সামলাইয়া চাহিয়া দেখে চারিদিকে জনশূন্য প্রান্তর! যখন মন্দির চূড়াও নজরে পড়িলনা তখন সে চঞ্চলভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"আমরা কোথায় চলেছি?" একজন মাড়ওয়ারী কালেক্টার বলিয়া উঠিল, "ছুমকা,—তুম্ কাঁহা যাওগে!"

"দেওঘর ইষ্টিশান"।

"পাগল হো! সাড়ে চার মীল্ মুফত আয়ে! দেও—রূপেয়া নিকালো।"

তাহার কথা শেষ না হইতেই দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য জয়হরি লাফ মারিল। মাংস ত্যাগ করিয়া প্রাণত্যাগে সে বোধ হয় কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। তাহারা গাড়ী না থামাইয়া হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। আরোহী কয়টি ছিলেন 'গো-মাতার' ভক্ত সেবক; গাঁয়ে গাঁয়ে দুধ ঘি সংগ্রহ করিয়া শোধনার্থ কারখানায় চালান দেন;—গোরক্ষার জন্য অশ্রুমিশ্রিত বক্তৃতাও করেন। মিশ্রণটাই তাঁহাদের ধর্ম্মের ও কর্ম্মের সেরা মসলা। নরনারায়ণ দুধ দেয় না!

রাস্তার ধারে একপাল গরু চরিতেছিল, সে তাহারই একটির উপর গিয়া পড়ে। পৃষ্ঠোপরি এই আড়াই মুণি জীবটির সবেগ পতনে, আহত ও ভীত গাভীটি সলম্ফ বিকট চীৎকারে রাস্তা হইতে মাঠে পড়িয়া উর্দ্ধশ্বাসে নিরুদ্দেশ রওনা হয়। গাভীটির সশঙ্ক লম্ফনের শূন্যপথেই জয়হরির সবেগ উৎক্ষিপ্ত পতন ও দেড়গজ ঘর্ষণ এবং মাঠের মধ্যেই বীরশয্যা গ্রহণ একই সময়ে সমাধা হয়। মরণের সহিত পূর্ব্বপরিচয় না থাকায় বিমূঢ় জয়হরি ভাবিয়াছিল সে মরিয়া গিয়াছে। চেতনার যা একটু আভাষ মাত্র ছিল তাহার সাহায্যে সে বহুক্ষণ ঠিক করিতেই পারে নাই—সে আছে কি না,—এটা তার পারলৌকিক অবস্থা কি না! তাহার বুদ্ধি ও স্মৃতি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। অনেক এলোমেলো চিন্তার পর হঠাৎ সে নিজের গায়ে চিম্‌টি কাটিয়া দেখিল—লাগে। তখন—

"ওরে বাবারে! পোড়ালে সইতে পারব না!" বলিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসে ও সভয়ে চারিদিকে চাহিতে থাকে। কেহ কোথাও নাই দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া লরী (Lorry) যেপথে আসিয়াছিল সেই পথ ধরে। বেদনা কি আঘাতের প্রতি তাহার লক্ষ্য ছিল না।

অর্দ্ধাধিক পথ অতিক্রম করিবার পর পথের ধারে একটি কূয়ায় একটি সাঁওতাল স্ত্রীলোককে জল তুলিতে দেখিয়া সে দীনের মত গিয়া দাঁড়ায়। তাহার অবস্থাই ছিল তাহার আবেদনের original copy। স্ত্রীলোকটি জল তুলিয়া তাহার সম্মুখে ধরে ও তাহাকে হাত পা ধুইয়া ফেলিতে বলে। সারাদিনের নিদ্দিষ্ট রুঢ়তায় সে শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছিল। রমণীর এই প্রস্তাবের ভিতরকার স্নেহটুকু সহজেই তাহার প্রাণে পৌছিল। সে হাত পা ধুইতে গিয়া তাড়াতাড়ি চোখের জলটাও ধুইল। এক স্থানে ব্যথার সঞ্চার হইতেই তাহার নিজের শরীরের ব্যথাও স্পষ্ট হইয়া উঠিল। জল খাইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল "মন্দির কত দূর।" "বেশী দূর নয়—ওই চূড়া দেখা যাচ্ছে" বলিয়া স্ত্রীলোকটি অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইয়া দিল।

জয়হরি ধীরে ধীরে রওনা হইল। বুঝিল এখন তাহার সর্ব্বপ্রধান আবশ্যক—পেটে কিছু দেওয়া,—নচেৎ বাসায় পৌছিতে পারিবে না, পথেই গা ঢালিতে হইবে। তাই সে মন্দির-চূড়ায় লক্ষ্য রাখিয়া চূড়ার আড্ডায় গিয়া পড়ে। ট্যাঁকে যে দশগণ্ডা পয়সা পুঁজি ছিল নিঃশেষে তাহা ওঝা ঠাকুরের হাতে দিয়া পাতে ভরপেট বোঝা চাপাইবার অর্ডার দেয়। ওঝারাই এই তীর্থস্থানের ক্ষুধাদষ্ট যাত্রীদের রোজা। এই ফলারের final blow বা সর্ব্বগ্রাসের সময়েই আমার সহিত তাহার সাক্ষাৎ। পরিশিষ্টটা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

সব শুনিয়া আমি কেবল জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি এতটা ভয় পেলে কেন! প্রাণটা যে গিছল!"

সে উত্তেজিত ভাবে বলিল, "ভয় পাবনা, আপনি বলেন কি! ঠাকুর্দ্দা মশাইকে খেতে বলে পাঁচজনে খত সই করিয়ে নেয়। তার ফলে সর্ব্বস্বান্ত হতে হয়—মায় জেলে যাবার জোগাড়।"

আমি আর কথা না বাড়াইয়া বলিলাম, "ভগবান রক্ষে করেছেন, চল বাসায় যাই, সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে রয়ে-

ছেন,—অত্যন্ত ভাবছেন। আজ আর খাবে না তো—চা খেয়েই শুয়ে পড়বে চল।"

জয়হরি কোন কথা কহিল না—ধীরে ধীরে চলিল।

পথেই কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ। তিনি আমাদের খুঁজিতে বাহির হইয়াছিলেন। হাতে তেজবলের লাঠি, সঙ্গে—লাঠান-হাতে বাণেশ্বর। আমাদের দেখিতে পাইয়া তিনি উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"জয় বৈদ্যনাথ! ওঃ কি দুর্ভাবনাতেই সকলের দিন কেটেছে! বাঁচলুম,—খবর ভাল ত'!"

বলিলাম, "হাঁ—চিন্তার কোনও কারণ নাই।"

"চলুন তবে বাসায় গিয়ে শোনা যাবে—চায়ের জল চড়ানই আছে।" তাহার পর বাণেশ্বরকে কি বলিলেন, শেষটা কাণে আসিল, "ফটকের পাশে সেই চতুরি চোবের দোকান,—মনে থাক্‌বে ত!"

"তা আর থাকবেকনি বাবু!"

"তা আর থাকবেকনি! উঠনো চলছে যে! তোর ভাত খাওয়া কমে গেছে সেটা কি আর লক্ষ্য করিনি রে হারামজাদা। আচ্ছা যা,—পাঁচসিকের বুঝ্‌লি!" সে কোনও কথা না কহিয়া চলিয়া গেল, আমরা বাসায় আসিয়া পৌছিলাম।

(৪৪)

জয়হরিকে দেখিবার জন্য বৈঠকখানার দোর-জানালায় মেয়েদের সাগ্রহ চক্ষুগুলি চোদ্দ-পিদ্দীমের মত জ্বলিয়া উঠিল;—সে সহসা যেন দ্বীপান্তর হইতে ফিরিয়াছে!

আমি দিনের দুর্ঘটনা-গুলা দুচার কথায় শেষ করিয়া দিলাম। রাত্রের আহারটা যাহাতে বাদ পড়ে সেই আশাতেই ফলারের কথাটাও বলিতে বাধ্য হইলাম। কৈফিয়ৎ হিসাবে বলিলাম,—নচেৎ তাহার পক্ষে বাসায় পৌছান অসম্ভব ছিল।

"ছেলেমানুষ পেয়ে,"—"ভালমানুষ দেখে,"—"জোচ্চোরের পাল্লায়,"—"আহা,—আ মরি মরি,"—"প্রাণটা নিতো,"—"মা দুর্গা রক্ষে করেছেন,"—"পরের ছেলে," ইত্যাদি কড়ি-মধ্যমের উচ্ছ্বাসগুলাই কানে আসিল।

মাধুরী আসিয়া বলিল—"দিদিমা বলচেন—বাবা বদ্দিনাথের পূজো—কাল সকালেই পাঠানো চাই।"

"সে ভাবনা ওঁর ভাবতে হবে না; শুধু সকালে কেন,—দু'বেলাই তা পৌঁচুচ্ছে! পেয়ারসী বেটা সকাল-সন্ধেই চড়াচ্ছে।"

"সে আবার কে!"

"বিলেত থেকে এলি যে!—তোদের গুণধর চাকর রে! কলকেতার আসেপাশের ছেলেরা এল্‌-এ ফেল্‌ ক'রে রেল্‌ আপিস ধ'রে;—যাদের কড়া জান্‌—তারা তোদের তরে উপুসী-উপন্যাস লেখে! এ চোর বেটা দেখচি—"ঘরে বাইরে" না পড়ে বাড়ী ছাড়েনি! দেখছিসনা—বেটার ভাত খাওয়া ক্রমেই কমে আসছে। তা দেখ্‌বে কেন!"

"ওমা—কমচে কি বলো! কোন্‌দিন তিন বার ক'রে না নেয়! দই দিলে চারবার চাই!"

"বলিস কি,—এ বোকোস্‌ পোষা কেন? দূর ক'রে দাও—দূর করে দাও, সর্ব্বস্ব খেলে যে! আর তোদেরি বা দই আনতে বলে কে! আজ থেকে সেরেফ্‌ দুধ চলবে,—বলে দিস্‌।"

"কাকে—চাকরকে?"

"তা না তো আবার কা'কে! বেটা দই খেয়েছে—দুধ খাবে না! ওর বাবা খাবে। মজা দেখুক একবার—"

"কি বলেন?" বলিয়া আমার দিকে চাহিলেন। বলিলাম "আলবৎ খাবে,—ঠিক্‌ সাজা হয়েছে! এই ত ন্যায়নিষ্ঠের কাজ, তাঁরা নিজের জাতকে এই রকম কড়া সাজা না দিয়ে ছাড়েন না। মেকলে সাহেব ত আর ফির্‌চেন না, আর সবাই কিছু রঘুনন্দন নন,—পুরানো পেনাল-কোড্‌খানার পঙ্কোদ্ধারে যদি লেগে পড়েন তো একটা রদ্দি জিনিস রক্ষা পায়। দেশ সুদ্ধ লোক জেলে গিয়ে সুধরে আসতে পারি।"

তিনি হাসিয়া বলিলেন—"না—না আপনি তামাসা করছেন। বরং পঞ্চাশ পেরিয়ে জঙ্গলে যাওয়াটাই দরকার ছিল;—এখন বুঝি আর হয় না—সাতান্নয় পৌঁছে গিছি।"

"হবে না কেন,—তবে, সস্ত্রীক যেতে হয়।"

"কেন—সেখানে ত বাঘের কম্‌তি ছিল না! তারা সব মরে গেছে নাকি!"

জানালার ওপারে চাপা গলা শোনা গেল—"মিন্‌সেকে বাজে বক্‌তে বারণ কর তো মাধুরি। মাথার ঠিক্‌ আছে কি—দইটে রোজ আনে কে!"

কর্ত্তা আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"শুনলেন, —আচ্ছা আপনিই বলুন, যদি দই-ই না খেলুম তো বৈদ্যনাথে কি করতে আসা! বলুন ?"

আমাকে আর বলিতে হইল না,—নেপথ্যে শোনা গেল—"ছেলেটার সারাদিন খাওয়া নেই, সে চিন্তা চুলোয় গেল,—ওঁর গুরুপুত্তুর দই খাবেন কি দুধ খাবেন তারি ঘোঁট চললো!—আয়—চলে আয় মাধুরি।"

"সে কি কথা,—খাবেন বই কি ; কে বলেছে খাবেন না। কি খাবেন বলুন তো জয়হরি বাবু!"

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম—"আজ আর ওঁর জলস্পর্শ নয়। এই সন্ধ্যার মুখে ওঝার হোটেলে দশ আনার চিঁড়ের বোঝা নিয়েছেন, এক একটি সাঁওতালী চিঁড়ে ফুলুরির মত ফুলবে। এক কাপ চা খেয়ে শুয়ে পড়ুক।"

"তা কি হয়,—সে কি হয়,—রাত উপোসে হাতী মারা যায়"—

জয়হরি নিজেই বলিল—"না—উপোসই দি।—গা-গতোর ব্যথা হলে দাদামশাইও উপোস করতে বলতেন আর দাওয়াই দিতেন—গরম গরম লুচি আর হালুয়া। তা'তে খুব উপকার হোতো কিন্তু।"

"ঠিক্-ঠিক্—ঠিকই তো। ওর দাওয়াই-ই তো ওই। ও যে ভারি ওস্তাদ।—আর বেশী দিন নয়,—সব ভুল হতে আরম্ভ হয়েছে! ওটা যে আমার জানা জিনিস,—ঠিকই তো। সেই ভালো,—আজ উপোসই দিন।"

এই বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন। আমি চুপ্‌চাপ্ বিরক্তিটা গায়ে মারিয়া বলিলাম—"ফেরবার ইচ্ছে নেই বুঝি!"

সে বলিল "কাশী যাই চলুন।"

কর্ত্তা আসিয়া পড়িয়াছিলেন, বলিলেন—"কি—কি,—কাশী? কেন? আচ্ছা সে কথা পরে হবে। হরিরলুঠ হয়ে গেছে,—প্রসাদ আর চা-টা আগে চলুকতো। জয়হরিবাবু দু-কাপ্ খান।"

* * * *

"হ্যাঁ—এইবার বলুন তো,—কাশী যাবার কথাটা হঠাৎ উঠলো যে! বাইরে বেরুলে অনেক কষ্ট, বহু অসুবিধা ভোগ করতে হয়। সেটা বুঝেছি—"

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম—"না—না, রামঃ, ও আপনি কি বলছেন। জয়হরি ওই দেশপ্রাণদের ভদ্রবেশী বেদের দল বলে ঠাউরেছে! কেন জানিনা ওদের সম্বন্ধে ওর একটা অস্বাভাবিক ত্রাস এসে গেছে। ঐ U.C. দফাদারটি নাকি দফা-রফার father বা সর্দ্দার! ওর ভ— ওরা খুঁজে এসে ধরবে। পূর্ণিয়ার ঠিকানাও জেনেছে, তাই কাশী যেতে চাচ্ছে। ওর ধারণা—চোখোচোখি হলে,—তাদের প্রভাব ও এড়াতে পারবেনা। ওর রাশি নাকি ভারি পাতলা;—আজ শুনলুম—মেষরাশি! আমার ধারণা ছিল—কুম্ভ।"

কর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন—"আমার সিংহরাশি হে জয়হরিবাবু! তাই বনের দিকেই ঝোঁকটা বেশী। কি বলবো, একটু গাফিলিতে—এক গোধূলিলগ্নে গোয়ালে পূরে ফেলেছে,—প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ! যাক্,—এদিকে কেউ ঘেঁশবেনা, সে ভার আমার।"

"এই ভয়ে কাশী যেতে চান! এমন ভুল করবেন না, বরং বাগেরহাটে মাঠে বেফিকির্ পড়ে থাকতে পারেন। গত বৎসর পূজার পর ভারি অরুচি ধোরলো, মুখ বদলাতে কাশী গিয়ে এক বন্ধুর বাসায় ডেরা ডালি। বাসাটি তাঁর ভেলুপুরে। গা-ঘেঁশে থানা আর জলের কল সর্ব্বদাই সজাগ;—বেশ সশঙ্ক করে রাখে,—সতর্ক থাকতে হয়। কাশী ব'লে ভ্রম হবার যো নেই। ভদ্রলোকের ভিড় না থাকায়—মৌখিকতার মন্ত্র, কি বাঘমারার কাহিনী—একদম বন্ধ। মিছে কথার নম্বর ক্রমেই কমে আসতে লাগলো। জুতো জোড়াটা যে মল্টিথের সিনিয়ার মিস্ত্রীর স্বপাক,—অনেকদিনের কষ্টমার্ বলেই সতেরো টাকায় পেয়েছি,—এ কথাটা জানিয়ে দি এমন লোকও জোটেনা। রোজই মনে হয়—দশাশ্বমেধ ঘেঁশে গঙ্গার ঘাটে না বসতে পারলে, এ সব ক্ষতিপূরণের সম্ভাবনা দেখিনা। কিন্তু অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই, সে যাত্রা সে সুযোগ আর হল না। যাক্—

"হরিশ্চন্দ্র ঘাটটাই আমার দিকে এগিয়েছিল,—সাহস বাড়াবার জন্যেই হোক বা গা-সওয়া করে রাখবার জন্যেই হোক, সেই ঘাটেই ঝুঁকলুম। সে দিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে,—অন্ধকার পক্ষ। শ্রদ্ধেয় শরৎবাবু বলেছেন—অন্ধকারের রূপ আছে, তাই বোধহয় রাস্তার আলোগুলো—অন্ধকার দেখবার জন্যে দূরে দূরে গা-ঢাকা হয়ে উঁকি

মরছে। আমি প্র্যাক্‌টিস্ বজায় করে ফিরছি। সহসা খুব একটা চেনা গলা—কাণে যেন শলার মত আঘাত করলে—"হিন্দু পাঁউরুটি বিস্কুট্!"

"নাঃ—তা' কি সম্ভব,"—চাল্ বজায় রেখেই চললুম। প্রারব্ধ রোখে না,—একটা পানের দোকানের বেশ প্রদীপ্ত আলোর সামনে হু'জনের চোখোচোখি! একদম বাঘের দেখা,—দু'জনেই অপলক! মুখ থেকে বেরিয়ে গেল—"কি—কেশব নাকি! চাকরি করছিলে না?" সে একটু নীরস হাসি টেনে, সপ্রতিভ ভাবেই বললে—"চাকরিও করি।"

"তবে?—সংসার বেড়েছে নাকি,—না ডবল্ প্রোমোসন্ নিয়েছ?"

"না—Life Insure (জীবনে বীমা) করেছি, অর্থাৎ করতেই হয়েছে। উকীলের কাছে মামলা পড়ে; ডাক্তার-বদ্যির হাতে জান্ পড়ে; মাষ্টার-প্রফেসারের হাতে ছেলে পড়ে; বেকারের হাতে অন্ধকারের সুযোগ পড়ে; U. G.দের হাতে ছেলের টিউসনী পড়ে; অফিসের বাবুদের হাতে চাকরি তো পড়েই আছে; দোকানে ধার পড়ে; এখানে সবাই এজেন্ট্, এড়াই কাকে?

যিনি অসময়ের রসময়,—ধারে দেন, উঠ্‌নো পাই,—তাঁর সদুপদেশ অগ্রাহ্য করতে সাহস হ'লনা। মাসে মাসে সাড়ে সাত টাকা দেবার কড়ারে—গিন্নির আঁচলে তিন হাজার টাকা বেঁধে দিলুম। আমি মলেই মিলবে! এটা সেই সাড়ে সাতের উপায়!"

মা ধান ভেনে চাল বার করেন। পুত্রাধম হয়ে রাসকেলের মাষ্টার আবার মুকিয়ে রয়েছে,—আমেরিকা থেকে মঞ্জুরি এলেই তিনি মা'র পা দু'খানা ইনসিওর করে দেবেন। পায়ে পক্ষাঘাত হলে, ঘরে বোসে দেড় হাজার মিলবে! খরচ নামমাত্র—মাসে মাসে পাঁচ সিকে ছাড়লেই বাস্! তাই প্যায়দায় পথ বাত্‌লে দিলে। চক্কোত্তি মশায় দোকানে গিয়ে এই night duty নিয়েছি। এতে দু'দুটো prospect রয়েছে—গাড়ী চাপা, না হয় heart fail দুটোতেই তিন হাজার, plus Bonus. কাজে ঢুকে same featherএর (এক জাতের) বহুৎ বন্ধু মিলে গেল,—অর্থাৎ যে দিকে ফিরাই আঁখি—

এই দু'হপ্তা আগে বিশু মুকুয্যে বললে—"মার দিয়া!" জিজ্ঞাসা করলুম,—অর্থাৎ?

"অর্থাৎ—রক্ত উঠ্‌ছে,—অর্থাৎ—সাড়ে এক হাজার!"

হিমালয়ের পত্র

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এ-এম-এ-ঈ, এম-আর-এ-এস (লণ্ডন)

দেবপ্রয়াগ

১৩ই মে ১৯২৪ সাল।

...দিদি

আজ পনেরো দিন হ'ল আমি কলকাতা ছেড়েচি। আমার হিমালয়-ভ্রমণ-কাহিনী আপনাকে লিখে পাঠাবো বলেছিলাম। এখানে দুদিন থাকবো, লেখার এই অবসর।

আসবার পথে কাশীতে দুদিন ছিলাম। পরে হরিদ্বারে। হরিদ্বারের উত্তরে, পুবে ও পশ্চিমে হিমালয় পাহাড়। উত্তর হতে গঙ্গা নেমেচেন। গঙ্গা বেশী চওড়া নয়। জল নীল, শীতল, সুপেয় এবং স্বাস্থ্যপ্রদ। স্রোত বড় বেশী। সহরটী ছোট এবং গঙ্গার পশ্চিম তীরে।

যাত্রীরা পাণ্ডার বাড়ীতে অথবা ধর্ম্মশালায় থাকতে পারেন। বড় বড় ধর্ম্মশালা আছে। সেখানে জলের, পাকশালার ও পায়খানার ভাল বন্দোবস্ত আছে। আমরা রায়বাহাদুর সুরযমল ও শিবপ্রসাদ ঝুনঝুনওয়ালার ধর্ম্ম-শালায় ছিলাম।

হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ড ও অন্যান্য মন্দির দেখে কনখলে যাই। সেখানে দক্ষরাজার যজ্ঞশালা আছে—যথায় পতিনিন্দা শুনে সতী দেহত্যাগ করেছিলেন। কনখল্ পরিষ্কার সহর। উঁচু-প্রাচীরে-ঘেরা ফুলের ও ফলের বাগান। রক্তবর্ণ ইটের বড় বড় বাড়ী আছে। কিন্তু সহরটী নিঝুম। যেন সে সব বাড়ীতে জনমানব নাই। গঙ্গার তীরে মন্দির। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। গঙ্গায় বড় বড় মাছ খেলা করচে—মানুষকে ভয় করে না।

হরিদ্বার হতে টোঙ্গায় চেপে হৃষীকেশ যাত্রা। পথটী সুন্দর, পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে। হৃষীকেশে শিখ ধর্ম্মশালায় একরাত্রি ছিলাম। গঙ্গাস্নান—রামচন্দ্রের ও ভরতজীর
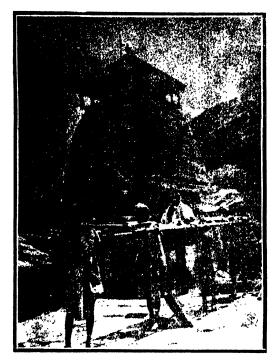
ঝাঁপানে বঙ্গমহিলা

মন্দির দর্শন। শেষোক্ত মন্দিরটী প্রাচীন হিন্দু স্থাপত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

পদব্রজে হিমালয়ে ওঠা হৃষীকেশ হ'তে সুরু হ'ল। সহরের প্রান্তে মালপত্র ওজন ও কুলী নিযুক্ত করলাম। কেদার ও বদ্রীনাথ হয়ে অনেকটা নীচে এসে গাঢ়োয়াল রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত মেহেলচৌরী পর্য্যন্ত—অর্থাৎ প্রায় তিন ভাগের দু ভাগ রাস্তার—কুলি (কাণ্ডি) ভাড়া মণ প্রতি ৩৫৲। ডাণ্ডী (পালকী) ও ঝাঁপান (চৌকী) ভাড়া, মেহেলচৌরী পর্য্যন্ত ২০০৲ টাকা। সেখান থেকে রামনগর রেলওয়ে ষ্টেসনে আসতে অন্য পালকী ও কুলি এবং গরুর গাড়ীর বন্দোবস্ত করতে হবে। সে বাবদ খরচ প্রায় ৫০৲ টাকা।

চৌকীতে মা উঠলেন। আমি কুলীদের সঙ্গে লয়ে, পদব্রজে, নিবিড়, ছায়াশীতল বনানি ও প্রসিদ্ধ সেতু লছমন্‌-ঝোলা পার হ'লাম। পূর্ব্বে সেটা দড়ির ছিল, অধুনা লোহার পুল (suspension bridge)। পুলের অনেক নীচে সুনীল, খরস্রোতা, ভাগীরথী। এপাশে ওপাশে চারিদিকে আকাশচুম্বী পর্ব্বত-শ্রেণী—তরঙ্গের মত। নদীর সুউচ্চ তীরে দেবালয়। ঋষিদের তপোবন। ওখানে ঋষিরা যেখানে থাকেন, সে স্থানটীর নাম "তপোবন"। আশ্রমগুলি আমবাগানের মধ্যে। গোময়লিপ্ত মেটে দেওয়ালের উপরে টোপরের আকৃতি খড়ের চাল। বাছুর বেড়াচ্চে। শান্তি বিরাজমান। বশিষ্ঠের আশ্রমের, কণ্ব মুনির আশ্রমের কথা, শকুন্তলার কথা, আশ্রম-মৃগের কথা মনে পড়লো।

এক একটি শৃঙ্গের তলদেশ থেকে শৃঙ্গের গা বেয়ে শিখরে উঠে আবার ধীরে ধীরে তার ওপাশে, তলদেশে এসে একটা পুলের উপর দিয়ে গঙ্গা পেরিয়ে আবার আর একটা শৃঙ্গ ওই রকমে অতিক্রম কোরে আমরা যাচ্চি। এরূপে অনেকগুলি শৃঙ্গ উঠেচি নেমেচি। প্রধানতঃ গঙ্গার তীর দিয়েই যাচ্চি। বরাবর যদি গঙ্গার কিনারা দিয়ে

অরণ্য মাঝারে ডাণ্ডী পৃষ্ঠে বঙ্গমহিলা

যাবার সুবিধা থাকত, এত কষ্ট কোরে আমাদের উঠতে নামতে হতো না। মনে করুন, একটা শৃঙ্গের ডান পাশ থেকে বাঁ পাশে আমাদের যেতে হবে ; গঙ্গা শৃঙ্গটীর পাদদেশ

ঘিরে গিয়েছে। ফুটপাথের মত যদি গঙ্গার পাশে রাস্তা করবার উপায় থাকতো, তা'হলে শৃঙ্গের গা কেটে চড়াই (উঁচু) ও উৎরাই (নীচু) পথ তৈরী করতে হত না। হরিদ্বার হতে কেদার ও বদ্রী দর্শনানন্তর রামনগরে আসতে ৪১৭ মাইল পথ পর্য্যটন করতে হয়। কলকাতা হ'তে কাশী ঠিক এতটা পথ। বরাবর গঙ্গার তীর দিয়ে রাস্তা করতে পারলে, হয়ত এই ৪১৭ মাইলের পরিবর্ত্তে ১৫০ মাইলের বেশী যেতে হত না।

অফুরন্ত গঙ্গা ও হিমালয় দেখে মুগ্ধ হলাম। নানারূপ
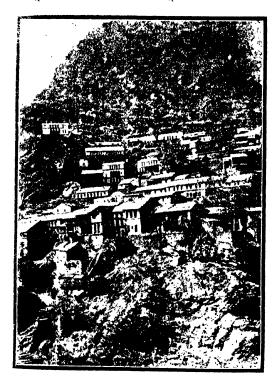
দেবপ্রয়াগ

দৃশ্য। কি রকম এঁকে-বেঁকে, কল্লোল হিল্লোল, উত্তাল ফেনিল তরঙ্গ তুলে, কত ছোট বড় উপলখণ্ডে আছড়ে পড়ে সফেণ তরঙ্গ ছড়িয়ে পতিতপাবনী চলেছেন। তিন থাক উঁচু পাহাড়ের মধ্যদেশ দিয়ে দুটী নদী এসে এক স্থানে মিশেছে। আমরা প্রায় হাজার ফিট অর্থাৎ সাতটা মনুমেণ্টের মত উঁচু রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে, বামদিকে, নীচের সে দৃশ্য দেখলাম। একেবারে খাড়া পাহাড়ের গা কেটে রাস্তাটি তৈরী, মাত্র তিন হাত চওড়া, কর্কশ, মসৃণ, পাথুরে রাস্তা—পা হড়কে যদি বাঁ দিকে পড়ি, নদীগর্ভে পৌছাবার।

জলপ্রপাত

হিমালয়ের কৃষিক্ষেত্র

আগেই দম বন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের শিরোভাগে, অর্থাৎ বারাণ্ডার মত রাস্তার খানিকটা উপরে, হাত তিনেক চওড়া কার্ণিসের মত বেরিয়ে আছে, যেন বারাণ্ডার ছাদ। পাহাড়ের এমন বিচিত্র গঠন। রাস্তা টুন, আবার্স, মেহগনি গাছ—পীতাভ আলো, রং-বেরঙের পাতা। উই-ঢিবি আছে। ঝড়ে বড় বড় গাছ উন্মূলিত হ'য়ে পড়ে পথ বন্ধ করে আছে। মাঝে মাঝে হনুমান, বানর, শিয়াল, নেউল, মুরগী দেখলাম। স্থানে স্থানে চমৎকার

অলকানন্দার লৌহসেতু—দেবপ্রয়াগ

কৃষক-পল্লী
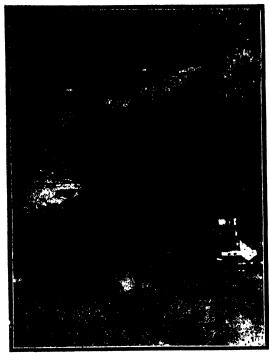
বড়ই ঢালু। উঠলে হাঁফাতে হয়, আর ভয় হয়—বুঝি পিছলে যাই। সেই রাস্তা ধরে খানিকটা এসে, একটা বাঁকের মুখে পাহাড়ের আর একটা চূড়া পেলাম। উভয়ের মধ্যে পাথরের সেতু। ডানদিকে, যেখানে শৃঙ্গ দুটি একটি সূক্ষ্ম কোণের স্রজনা কোরেচে, সেখানে একটি জল-প্রপাত কালো, নিবিড় পাতাওলা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এসে সশব্দে সেতুর নীচে দিয়ে গঙ্গাতে পড়েচে। গভীর অরণ্য দেখলাম। গাছগুলির নাম লিখে রাখলাম। অরণ্যের মধ্যে হরিতকী, বহেড়া, তেজপাত, ভূর্জ্জপত্র, বাদাম, আমলকী, বট, শাল, সেগুন, পাইন,

চটী
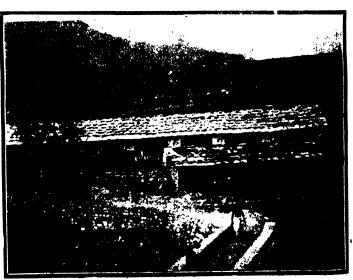
বাগান। আম, জাম, কলা, পেঁপে, কুল, বেল, ... লেবু, দাড়িম, গোলাপ, কামিনী, বকুল, টগর, ...কে, করবী, চামেলী, বন-চামেলী ও গন্ধে-ভরা চাঁপা ...র একত্র সমাবেশ বৃহৎ এক উপবনে। অম্লমধুর গৌরী ..., কলা, পেঁপে, কুল, বেল ও আম ফলেচে। ফুলের গন্ধে উপবন আমোদিত। গাছ থেকে ফুল নিলাম, লেবু নিলাম, গৌরী ফল ও পেয়ারা খেলাম। এখানে 'ফুলবাড়ি' চটি আছে।

নানাবিধ পাখী। "চোখ গেলো" "বৌ কথা কও" "গৃহস্থের খোকা হোক" "পাপ দেহো" "ফটিক জল"—... পাখীর গান। একসঙ্গে নানা পাখী ডাক্‌ছে। হরেক রঙের ছোট-বড় পাখী। ফুরফুর করে উড়চে।

গঙ্গা পেরোবার দড়ির ঝোলা—দেবপ্রয়াগ

...র ও বৃহৎ পাহাড়ে বুলবুল। কোকিলের ...। মন উদাস হয়ে যায়। বটগাছতলে শুয়ে ...ম করলাম। নদীর গান—গাছের গান—পাখীর গান। জলপ্রপাত হতে ঝরঝর শব্দে জল পড়চে।... হিমালয় শান্তির নিকেতন। ডাহুকীর ডাক শুনলাম—করুণ, মর্ম্মস্পর্শী। ঘুঘুর খেদ। প্রিয়তমকে হারিয়ে বিলাপ
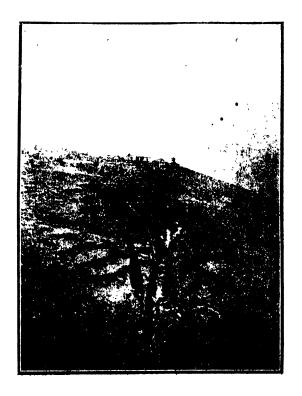
হিমালয়ের দৃশ্য—কেদার পথে

করছেন। এই অরণ্যে হয় ত শিশু ধ্রুব শ্রীহরির সন্ধানে ঘুরে বেড়াতেন—বনদেবী তাঁকে কোলে শুইয়ে ঘুম পাড়াতেন। অলস নেত্রে বাঘ বসে চৌকী দিত। লক্ষ্মণঝোলার গঙ্গাতটে তাঁর নামেই কি ওই 'ধ্রুবঘাট' অবস্থিত? গতকল্য কাণ্ডা চটিতে আমাদের ঘরে কুমীরের বাচ্চার মত বড় একটি গিরগিটী এসেছিল।

জলখাবারের জন্য কিস্‌মিস্‌, বাদাম, পেস্তা, মিছরি, খেজুর প্রভৃতি এনেছি। পকেটে সঙ্গে সঙ্গে থাকে। কয়েকপ্রকার ওষুধ এনেছি। দুক্রোশ তিনক্রোশ অন্তর চটী ও তৎসংলগ্ন মুদীর দোকান পাওয়া যায়। মেটে ঘর, খোড়ো চাল।

মুদী বা চটীওলা যাত্রীদের রান্নার বাসন ধার দেয়; ও বিনা-ভাড়ায় ঘর দেয়,—যদি তারা তার নিকট হ'তে সওদা করে। চাল, ডাল, ভেলিগুড়, চিনী, ঘী, আটা, লবণ, আলু, কুমড়া, সরিষার তেল, কেরোসিন এবং দেশলাই প্রভৃতি পাওয়া যায়। চাল ৮০ হতে ১৲ সের, চিনি ২৲, ঘী ৩৲ হতে ৪৲, আলু।৵০, কেরোসিন বোতল ৮০। নীচের দিকে দাম একটু কম। পণ্য না কিনলে মাথা পিছু ৵০ ঘর ভাড়া। যেখানে নদী অথবা প্রস্রবণ আছে, সেখানে চটী নির্ম্মাণ করা হয়। মাঝে মাঝে জলসত্র বা "পিয়ো" আছে। পথের ধারে একটি কুঁড়ে ঘরে একজন লোক তৃষ্ণার্ত্তের নিমিত্ত এক কলসী জল লয়ে বসে থাকে।

আজ দেব-প্রয়োগে এসেচি। এ স্থানে প্রায় সম-কোণে গঙ্গার সহিত অলকানন্দা মিশেছেন। গঙ্গার বাম তীরে সহরের এক অংশ ও রামচন্দ্রের মন্দির। সেই স্থান হ'তে দড়ির পুল পেরিয়ে গঙ্গার ডান তীরে, অর্থাৎ ওপারে গেলে, গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী যাবার উত্তরগামী পথ মেলে। অলকানন্দার ডান তীরে সহরের পূর্ব্বকথিত অংশ ও মন্দির, যেটা গঙ্গার বাম তীরে। সেখান থেকে বৃহৎ একটা লোহার পুলের উপর দিয়ে অলকানন্দা পেরিয়ে এলে সহরের অন্য অংশে আসা যায়। সেখানে বাজার, পোষ্ট অফিস, অনেক বাড়ীঘর ও মহাত্মা কালি কমলীর ধর্ম্মশালা আছে। ধর্ম্মশালার পাশ দিয়ে উত্তর-পূর্ব্ব মুখে কেদার-নাথে যাবার রাস্তা।

সহরের বাড়ীগুলি লালরঙের এবং দোতলা ও তিন-তলা। খুব ঘেঁসাঘেঁসি বাড়ী। যেন তারা ভিড় করে দাঁড়িয়ে নীচের নদী সঙ্গম দেখচে। বাজারে মোটামুটী সব জিনিসই পাওয়া যায়। সহরে অনেক লোকের বাস—রাস্তায় ভিড়। মনে হয় না যে, সভ্যজগৎ হরিদ্বার থেকে ত্রিশ ক্রোশ দূরে হিমালয়-শৃঙ্গে আছি।

এলাহাবাদের প্রয়াগের মত দেবপ্রয়াগও মহাতীর্থ। এখানে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করতে হয়। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই পথে মহাপ্রস্থান করেছিলেন। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য এখানে শৈবধর্ম্মের প্রচার করেছিলেন। গণেশ ও পার্ব্বতীর মূর্ত্তিসহ ছোট একটি শিবমন্দির আছে। শিবের মূর্ত্তিটি দেখিলে কিন্তু শঙ্কর-যুগের পূর্ব্বেকার বলেই বোধ হয়। রামচন্দ্রের মন্দিরটী বহু প্রাচীন।

এখানকার স্ত্রীপুরুষ সকলেই কষ্টসহিষ্ণু, মিষ্টভাষী ও প্রফুল্লচিত্ত। পুরুষরা দেখতে সুন্দর নয়; কিন্তু মেয়েদের মোটের উপর সুন্দরী বলতে হবে। তাদের রং ফর্সা, নাক একটু চেপ্টা। নাকে দুটো মুক্তোওলা বৃহৎ নথ পরে।

সহরের অনেক নীচে নদী। পাহাড়ের গা অথবা পাথরের সিঁড়ি দিয়ে নামতে হয়। সূর্য্যাস্ত কালে পুলের উপর থেকে গঙ্গার, অলকানন্দার ও পাহাড়ের শোভা দেখ্‌লাম। গিরিরাজের শিরোভাগে সোণালি রংএর মেঘ জমেছিল।

গঙ্গার ওপরকার দড়ির পুল পেরিয়ে গঙ্গোত্রী যাবার রাস্তায় খানিকটা বেড়িয়ে এসেছি। পা দিবামাত্র পুলটী লাফায়। আগে লক্ষ্মণঝোলায় এরূপ দড়ির পুল ছিল। অসাবধানী অনেক যাত্রী নাকি গঙ্গা-গর্ভে পড়ে' প্রাণ হারাতো।

আজ দিদি এ পর্য্যন্ত। কেদার থেকে চিঠি লিখ্‌বো।*

---

* লেখকের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চন্দ্র ওরফে বেচা চন্দর মহাশয় কেদার ভ্রমণকালে এই প্রবন্ধের আলোক-চিত্রগুলি লইয়াছিলেন—এবং এগুলি ব্যবহার করিতে দিয়া তিনি লেখককে কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। শরৎবাবু সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছেন।

তারা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আকাশ ভরা তারার মাঝে আমার তারা কই ?
ওই হবে কি ওই ?
রাঙা আভার আভাস মাঝে, সন্ধ্যা-রবির রাগে
সিন্ধু-পারের ঢেউয়ের ছিটে ওই যাহারে লাগে,
ওই যে লাজুক আলোখানি, ওই যে গো নাম-হারা,
ওই কি আমার হবে আপন তারা ?

জোয়ার ভাঁটার স্রোতের টানে আমার বেলা কাটে
কেবল ঘাটে ঘাটে।
এম্‌নি ক'রে পথে পথে অনেক হ'লো খোঁজা,
এম্‌নি ক'রে হাটে হাটে জম্‌লো অনেক বোঝা ;—
ইমনে আজ বাঁশি বাজে, মন যে কেমন করে
আকাশে মোর আপন তারার তরে।

দূরে এসে তা'র ভাষা কি ভুলেছি কোন্‌-খনে ?
প'ড়্‌বে না কি মনে ?
ঘরে-ফেরার প্রদীপ আমার রাখ্‌লো কোথায় জ্বেলে
পথে-চাওয়া করুণ চোখের কিরণখানি মেলে ?
কোন রাতে যে মেটাবে মোর তপ্ত দিনের তৃষা
খুঁজে খুঁজে পাবো না তা'র দিশা ?

ক্ষণে ক্ষণে কাজের মাঝে দেয়নি কি দ্বার নাড়া—
পাই নি কি তা'র সাড়া ?
বাতায়নের মুক্ত-পথে স্বচ্ছ শরৎ রাতে
তা'র আলোটি মেশেনি কি মোর স্বপনের সাথে ?
হঠাৎ তা'রি সুরখানি কি ফাগুন হাওয়া বেয়ে
আসেনি মোর গানের পরে ধেয়ে ?

কানে-কানে কথাটি তা'র অনেক সুখে দুখে
বেজেছে মোর বুকে।
মাঝে মাঝে তা'রি বাতাস আমার পালে এসে
নিয়ে গেছে হঠাৎ আমায় আন্‌-মনাদের দেশে,
পথ-হারানো বনের ছায়ায় কোন্ মায়াতে ভুলে
গেঁথেছি হার নাম-না-জানা ফুলে।

আমার তারার মন্ত্র নিয়ে এলেম ধরাতলে
লক্ষ্য-হারার দলে।
বাসায় এলো পথের হাওয়া, কাজের মাঝে খেলা,
ভাস্‌লো ভিড়ের মুখর স্রোতে একলা প্রাণের ভেলা,
বিচ্ছেদেরি লাগ্‌লো বাদল মিলন-ঘন রাতে
বাঁধন-হারা শ্রাবণ-ধারা পাতে।

ফিরে যাবার সময় হ'লো তাইতো চেয়ে রই,
আমার তারা কই ?
গভীর রাতে প্রদীপগুলি নিবেছে এই পারে
বাসা-হারা গন্ধ বেড়ায় বনের অন্ধকারে ;
সুর ঘুমালো নীরব নীড়ে, গান হ'লো মোর সারা,
কোন্ আকাশে আমার আপন তারা ?

আণ্ডেস জাহাজ,
১ নভেম্বর, ১৯২৪।

খাঁচার পাখী

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ, বি-টি

১

হাতে ঝুলাইয়া গোটা-কয়েক তেলাকুচার পাকা ফল লইয়া অতি সন্তর্পণে নিতাই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। রোয়াকের উপর খেলাঘর পাতিয়া রাশিকৃত খেলাঘরের হাঁড়িকুড়ি হাতাখুন্তি ইত্যাদি লইয়া একটি ছয়-সাত বৎসরের মেয়ে খেলা করিতেছিল। নিতাই তাহাকে ইসারা করিয়া ডাকিল।

মেয়েটির নাম অন্নপূর্ণা। সে তখন খুন্তি দিয়া একটি হাঁড়ি ঘন ঘন নাড়িতেছিল। উহারি মধ্যে সে একটু অবকাশ করিয়া লইয়া বলিল—"তরকারি পুড়ে যাবে, আমি এখন উঠ্‌তে পার্‌বো না।"

অন্য সময় হইলে নিতাই রাগ করিয়া হয়ত হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিত, নয়ত একটি চড় কসাইয়া দিত। কিন্তু তাহার একটু ভয় ও গরজ আছে, সেজন্য সে বেশ শান্ত-ভাবে বলিল—"একটিবার শোন্‌না ভাই।"

হাঁড়ি না ভাঙ্গিয়া এবং কোনরকম শাসন না করিয়া নিতাই যে মিষ্ট কথায় তাহাকে ডাকিয়াছে, ইহাতে অন্ন খুসী হইয়া উঠিয়া পড়িল এবং নিতাইয়ের কাছে আসিয়া বলিল "কি বল ?"

নিতাই চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "কাকা কোথায় ?"

"বাবা তো কল্‌কাতা চলে গেছেন।" অন্নপূর্ণা উত্তর দিল।

নিতাইয়ের চেহারা তৎক্ষণাৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সে এক লাফে রোয়াকের উপর উঠিয়া বলিল, "এই দেখ কি এনেছি।"

অন্ন এতক্ষণ লক্ষ্য করে নাই যে, নিতাইয়ের ডান হাত-খানি কাপড়ের মধ্যে লুকান ছিল। হাতখানা বাহিরে আনিতেই অন্নপূর্ণা সবিস্ময়ে দেখিল—একটি ছোট পাখী !

"ও হরি ! এ যে পাখী ! ও শৈলী, দাদা পাখী এনেছে দেখ্‌সে"—অন্নপূর্ণা আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল।

শৈলীর আসল নাম শৈলেন্দ্র—শৈলজা নহে। শৈলেন্দ্র অন্নপূর্ণার ছোট ভাই।

শৈলী ছুটিয়া আসিয়া পাখী দেখিয়াই আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল—"ওলে, আমাদেল পাকী এয়েচে লে ; কি মজা লে !"

নিতাই তাহার আনন্দে একটু বাধা দিয়া বলিল—"পাখীর গায়ে যেন হাত দিতে যাস্‌নে শৈলী। পাখী উড়ে গেলে কিন্তু মেরে ফেল্‌ব।"

শৈলী পাখীর চাকচিক্কণ দেহের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিল—"না হাত দেব না।" মনটায় কিন্তু তাহার হইতেছিল, দুই হাত দিয়া পাখীটাকে একবার বেশ করিয়া জাপ্‌টাইয়া ধরে।

উঠানের এক কোণে একটা ঝুড়ি পড়িয়া ছিল। নিতাই চট্‌ করিয়া ঝুড়িটা তুলিয়া আনিয়া পাখীটিকে ঢাকা দিয়া বলিল—"খবরদার, কেউ যেন ঝুড়ি তুলিস্‌নে। আমি এখনি খাঁচা তৈরি করে আন্‌চি দাঁড়া।"

ক্ষণ-পরেই হুড়মুড় করিয়া একটা শব্দ হইতে নিতাইয়ের মা ভাঁড়ার-ঘর হইতে বলিলেন—"কে কি ভাঙ্গলি রে ? নিত্তে বুঝি ? হতভাগা ছেলে যদি দুদণ্ড স্থির হয়ে থাক্‌বে।"

একটু পরেই দেবদারু কাঠের একটা মুখভাঙ্গা বাক্স সশব্দে উঠানে ফেলিয়া নিতাই চাৎকার করিয়া বলিল—"ওরে বাপরে! কত বড় একটা বিচে দেখসে ও মা, ও খুড়ি মা

নিতায়ের মা ও খুড়িমা দুজনেই ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। অন্ন ও শৈলী দুজনে দূর হইতে সভয়ে বিছা দেখিতে লাগিল।

নিতাইয়ের মা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"কত বড় বিছে! মার্—মার্, একখানা ইট দিয়ে এথ্‌খুনি মেরে ফেল্।"

নিতাই মারিবার কোন লক্ষণ না দেখাইতে, অন্ন একখানা ছোট ইঁট হাতে লইতে, নিতাই তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"না না—খবরদার মারিস্‌নে।"

অন্নকে নিরস্ত করিয়া মার পানে চাহিয়া নিতাই বলিল,—"বিছে যে মা কালার পায়ে থাকে জান না বুঝি মা! ও মারতে আছে?"

এই সুযোগে বিছাটি রোয়াকের মধ্যেকার একটা গর্ত্তে সযত্নে আত্মগোপন করিল।

বড়বৌ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"হয়েছে তো! তোকেই কামড়াবে এক দিন, দেখিস্ তখন।'

"হ্যাঁ, কামড়াবে বৈ কি! আমি ওকে বাঁচিয়ে দিলাম, আবার আমাকে কামড়াবে?"

বলিয়া নিতাই বাক্‌সটা উঠাইয়া লইয়া কি একটা মতলবে অন্যত্র চলিয়া গেল।

মেজবৌ (অন্নপূর্ণার মা) বলিলেন—"বিছে সাপ এখন কোথায় আর নেই বল দিদি? তা বলে কামড়াবে এক দিন—এ কথা বলতে নেই।"

বড়বৌ চটিয়া গিয়া বলিলেন—"ওর তো এক রকম দুষ্টুমি নয়, হাজার রকম দুষ্টুমি! আর তোমাদের আস্কারাতে আরও বাড়ছে।"

বলিয়া বড়বৌ অপ্রসন্ন মুখে ঘরের ভিতর চলিয়া গেলেন। মেজবৌও আর কিছু না বলিয়া রন্ধনগৃহে প্রবেশ করিলেন।

আধঘণ্টাটাক পরে নিতাই সেই মুখখোলা কাঠের বাক্‌সটার মুখে পেরেক ও খানকয়েক বাঁখারি দিয়া বন্ধ করিয়া আনিয়া পাখীটাকে তাহার ভিতর ছাড়িয়া দিল।

অন্নপূর্ণা বলিল—"দাদা, এখেন দিয়ে যে পাখী পালাবে?"

নিতাই মাথা নাড়িয়া বলিল—"ওটা যে দুয়োর থাক্‌বে।—এই দেখ কি করি।"

বলিয়া পকেট হইতে একখানা হাত-বাকস-ভাঙ্গা কাঠ বাহির করিয়া খোলা জায়গাটায় চাপাইয়া দিল।

ছেলের সাড়া পাইয়া বড়বৌ বলিলেন—"হ্যাঁরে হতভাগা, পাখী নিয়ে থাক্‌বি, ইস্কুলে যেতে হবে না? আর ও হচ্চে কি—ও কি খাঁচা হয়েছে? ওতে কি কখন পাখী থাকে?

"কেন থাকবে না? খাবার বেশী করে দিলেই থাক্‌বে।" নিতাই খুব বিজ্ঞের মত বলিল।

পাখীটাকে জোর করিয়া কিছু দুধ খাওয়াইয়া আবার বাক্সের ভিতর রাখিয়া নিতাই মায়ের তাড়নায় ভাত খাইতে বসিল। স্কুলের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল মনে হওয়ায় ভাত কটি নাকে মুখে গুঁজিয়া নিতাই স্কুলের পানে ছুটিল।

স্কুলে আসিতে দেরী হওয়ায় তাহাকে যে শাস্তি পাইতে হইয়াছিল, এবং যে সব পড়া হইয়াছিল, সে সকলের কিছুই তাহার অন্তর স্পর্শ করিতে পারে নাই। সমস্তক্ষণ সে পাখীর কথা ভাবিয়াছে এবং শিক্ষক পরিবর্ত্তনের সময় কেবল পাখীর গল্প করিয়াছে।

ললিত বলিয়া একটি ছেলের সহিত তাহার বেশী বন্ধুত্ব ছিল। সে বলিল—"পাখীকে রাখ্‌তে হয় আসল খাঁচায়, নইলে পাখী বাঁচে না।"

নিতাই বলিল—"খাঁচা তো নেই আমার।"

ললিত উদার ভাবে বলিল—"আমাদের তিনটে খাচা আছে। দুটোতে পাখী থাকে, একটা খালি থাকে। সেইটে তোকে দেব, নিবি?"

নিতাই সাগ্রহে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

ছুটির পরে নিতাই একটা বাঁশের খাঁচা হাতে ঝুলাইয়া মহানন্দে বাড়ী ফিরিল।

(২)

সকালে নিতাই যাঁহাকে ফাঁকি দিবার জন্য শুনাইয়া শুনাইয়া পড়িতেছিল—If two sides of a triangle are equal to two sides of the other, আর একটা কাঠির আগায় ছাতু মাখাইয়া পাখীকে খাওয়াইতেছিল, তিনি নিতাইয়ের অজ্ঞাতসারে পিছন হইতে সমস্ত লক্ষ্য করিতেছিলেন। নিতাইয়ের যখন হুঁস্ হইল খালি two sidesএ আর বেশীক্ষণ চলিবে না, তখন বইখানা তুলিয়া লইয়া বাকি ছত্র কয়টি পড়িতে গেল। হঠাৎ পিছন দিকে একবার দৃষ্টি পড়ায় সেখানে কাকাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া খানিকক্ষণের জন্য নিতাই হতবুদ্ধি হইয়া গেল।

ত্রিভুজের বাহুদ্বয় কি পাখীটাকে দেখিবে স্থির করিতে না পারিয়া ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল।

নিতাইয়ের কাকা গম্ভীরমুখে বলিলেন—"এই রকম পড়া হচ্ছে তোমার? দাঁড়াও, তোমার পাখী পোষা বার কচ্ছি।"

বলিয়া গম্ভীর মুখে সেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

নিতাইও তাড়াতাড়ি পাখীর সঙ্গ ফেলিয়া দূরে সরিয়া আসিয়াই পড়ায় মন দিল—যদিও তাহার অবাধ্য মন মাঝে মাঝে সেই অৰ্দ্ধভুক্ত পাখীটির পানে ফিরিয়া ফিরিয়া যাইতেছিল।

বাড়ীর মধ্যে এই কাকাকে ছাড়া নিতাই আর কাহাকেও বড়-একটা গ্রাহ্য করিত না। বাড়ীতে তাহার বিধবা মাতাকে সকলে মানিয়া চলিলেও সে চলিত না।

তাহার পিতা নাকি বড় বিদ্বান্ ছিলেন এবং তাহারও সেজন্য বিদ্বান্ হওয়া উচিত—এই কথাই তাহার কাকা যখন তখন বলিয়া তাহাকে পড়িবার জন্য তাগাদা দিয়া থাকেন।

বাপ পয়সা উপার্জ্জন করিয়া গেলে ছেলে পয়সা উপায় না করিলেও যখন বেশ চলিয়া যায়, বাপ বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া গেলে ছেলের কেন তাহাতে চলিবে না—এ কথাটা নিতাই ভাল করিয়া বুঝিত না। কিন্তু না বুঝিলেও সে মা ও খুড়িমাকে মাঝে মাঝে এ কথাটা শুনাইয়া দিত।

পড়ার জন্য আপনার প্রিয় পাখীটাকে ক্ষুধার সময় ছাতু খাওয়াইবার জো নাই—এই অবিচারে তাহার আজও ঐ কথাটাই মনে হইতেছিল; তবু তাহাকে ঐ নীরস ত্রিভুজের অপ্রিয় বাহু দুটি লইয়াই পড়িয়া থাকিতে হইল।

ঘণ্টাখানেকের পর ৮॥০ টার ট্রেণ ধরিবার জন্য কাকা বাহির হইবামাত্র নিতাই হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। তথাপি বুদ্ধিমান্ নিতাই কাকার মোড় পার হওয়া পর্য্যন্ত বেশ জোর গলায় পড়িতে লাগিল। যখন মনে হইল কাকা এতক্ষণ দ্বিতীয় রাস্তার মাঝামাঝি পৌছিয়াছেন, তখন তড়াক করিয়া এক লাফ দিয়া পাখীর খাঁচাটা তুলিয়া লইয়া বারান্দায় আসিল।

সম্মুখেই কুণ্ডুদের 'শেওলা পড়া' উচ্চ প্রাচীরের গায়ে কয়েকটি পাকা তেলাকুচা নিতাইয়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল।

খাঁচাটা বারান্দার উপর রাখিয়াই নিতাই সিঁড়ি দিয়া ছাদের উপর উঠিল; পাশেই একটা কাঁঠাল গাছ; সেই গাছ বাহিয়া নিতাই কুণ্ডুদের প্রাচীরের উপর নামিল। লাল টুকটুকে তেলাকুচো ফল গোটা আষ্টেক তুলিতেই তাহার দুটি হাত ভরিয়া গেল। সেই ফলগুলি শুদ্ধ নীচে লাফ দিলে পাছে সেগুলি গলিয়া যায় এই জন্য নিতাই অন্নপূর্ণাকে ডাক দিল। ডাক শুনিয়া অন্ন ও শৈলী দুজনেই আসিয়া পৌছিল।

"অন্ন, এগুলো আস্তে আস্তে কুড়িয়ে উপরে রাখ্‌তো"—বলিয়া নিতাই উপর হইতে ঘাসের উপর সাবধানে ফলগুলি এক এক করিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল এবং অন্ন ও শৈল দুই ভাই বোনে মিলিয়া সেগুলি কুড়াইয়া বারান্দার উপর রাখিল।

নিতাই বাছিয়া বাছিয়া আরও গোটাকয়েক পাকা ফল তুলিতেছে, এমন সময় অন্ন চীৎকার করিয়া উঠিল—"ও দাদা, শৈলী পাখী উড়িয়ে দিলে।"

বিদ্যুৎ বেগে নিতাই মুখ ফিরাইয়া দেখিল, পাখীটী পাকা ফলের লোভ পরিত্যাগ করিয়া একলাফে খাঁচার উপর উঠিল; পরমুহূর্ত্তে সেখান হইতে পক্ষ বিস্তার করিল।

প্রাচীর হইতে এক লাফ দিয়া নিতাই মাটির উপর পড়িল। ছুটিয়া যখন খাঁচার কাছে আসিল, পাখী তখন উড়িয়া গিয়াছে।

ক্রোধে অন্ধ হইয়া নিতাই শৈলর গালে এক চড় কসাইয়া দিল। শৈল চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কান্না শুনিয়া নিতাইয়ের মা সর্ব্বাগ্রে আসিয়া পড়িলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"শৈলী কাঁদছিল কেন?"

"দাদা মেরেছে"—শৈল চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে বলিল।

"মারবে না! তুই আমার পাখী উড়িয়ে দিলি কেন?" নিতাই ক্রুদ্ধস্বরে বলিল।

অন্নপূর্ণা বলিল—"না জেঠাই মা, শৈলী ইচ্ছে করে উড়িয়ে দেয়নি। খাঁচার দোরটা খুলে তেলাকুচো দিতে গেছে, আর পাখীটা উড়ে গেল।"

নিতাই অন্নপূর্ণার দিকে চোখ মুখ রাঙ্গাইয়া বলিল—"কে ওকে খাঁচার দোর্ খুল্‌তে বলেছিল ?"

"তা বলে তুই ছেলেমানুষকে মারবি ? বুড়ো ধেড়ে ছেলে !"—মা বলিলেন।

রাগে গজগজ করিতে করিতে নিতাই বলিল—"মারবে না, সন্দেশ খেতে দেবে ? আমার পাখী এনে দিক, নইলে আমি ওকে আবার মার্‌ব।"

"তবে রে হতভাগা ছেলে, আমার সঙ্গে সমান উত্তর !" বলিয়া নিতায়ের মা নিতাইয়ের পৃষ্ঠে গোটাকয়েক চড় বসাইয়া দিলেন।

নিতাই রাগে অভিমানে ফুলিতে ফুলিতে একটু দূরে সরিয়া গেল।

"আমার পাখী উড়িয়ে দিলে, আমায় আবার মার !" বলিয়া নিতাই রাগে শৈলকে ঘুঁসি দেখাইয়া বলিল—"আমার পাখী না এনে দিলে তোকে খুন করে ফেল্‌ব—দেখিস্।"

"হতভাগা ছেলে—ফের রোক কচ্ছিস ?"—বলিয়া মা নিতাইকে ধরিতে আসিলেন। নিতাই ছুটিয়া পলাইল।

মা বলিলেন "আচ্ছা, তোর কাকা আসুক্। সব কথা আজ বলে দিচ্ছি। বিকেলেই সে আজ ফির্‌বে।"

কথাটা নিতায়ের কানে গেল। সে লুকাইয়া পার্শ্ববর্ত্তী কুণ্ডুদের প্রাচীরের নীচে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল।

মনে পড়িল, আজ শনিবার; কাকা তিনটার মধ্যে আজ ফিরিবেন বটে। অন্ন হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"ও জ্যাঠাইমা, ওই দেখ দাদার পাখী। ও দাদা, দাদা, তোমার পাখী বাবুদের ঐ জামগাছে—দেখসে।"

নিতাই সাড়া দিল না; কিন্তু অতি সন্তর্পণে প্রাচীরের উপর উঠিল। সেখান হইতে কুণ্ডুদের ছাদ, তার পর বাবুদের ভাঙ্গা ছাদ; সেখান হইতে নাচে।

কাছেই জামগাছ—নিতাই তাহার নীচে আসিয়া দাঁড়াইল।

ঐ যে মগ্‌ডালে একটা পাখী—ঠিক সেই রকমই তো বটে !

নিতাই জামগাছে উঠিতে লাগিল।

(৩)

বর্ষার আসন্ন সন্ধ্যা। সোণারপুর গ্রামের ছেলেরা সব ঘরে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে। ছাতা মুড়ি দিয়া বাহিরের অনেকেই ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে।

নিতাই নদীর ধার দিয়া একা ভিজিতে ভিজিতে বাড়ীর দিকে ফিরিতেছে। ক্ষুধা ও ক্লান্তিতে তাহার শরীর অবসন্ন। মাথার উপর ও চক্ষে জলধারা।

সেই সকাল হইতে একটা পাখীর পিছনে পিছনে নিতাই সমস্ত দিন ঘুরিয়াছে, ধরিতে পারে নাই। প্রথমে তাহাদের বাড়ীর পিছনের জামগাছে উঠিতেই পাখীটা উড়িয়া পাশের বাড়ীর চিলে কোঠায় বসে। একটা ঢিল মারিতে সম্মুখের বাগানে চলিয়া যায়। বাগানে গিয়া কত গাছেই তাহাকে উঠিতে হইয়াছে, গা ছড়িয়া গিয়াছে, কাপড় ছিঁড়িয়াছে—তবুও সে চেষ্টা ছাড়ে নাই। এগাছ ওগাছ করিয়া নদীর ধারের বাগানে গিয়া পৌঁছিয়াছে। এত করিয়াও পাখীটিকে ধরা দূরে থাক, ভাল করিয়া দেখিতেও পায় নাই। শেষে অন্ধকার হইয়া আসিল। পাখীটা কোন্ দিকে গেল তাহা সে বুঝিতেও পারিল না।

এমন সুন্দর পাখীটি। দুই মাস ধরিয়া পুষিয়া পোষ মানাইয়া শেষটা হারাইতে হইল। ললিতের দাদা বলিয়াছিল গাংশালিক খুব ভাল পড়ে। কেমন সুন্দর ছাতু খাইতে শিখিয়াছিল ! কি সুন্দর তেলাকুচা খাইত ! কতকগুলা পাকা তেলাকুচা তোলা রহিয়াছে—সব ফেলিয়া দিতে হইবে। আর এই জল-ঝড়ে অতটুকু পাখী কি আর বাঁচিবে !

এই সব ভাবিতে নিতাইয়ের চক্ষে জল আসিল। নিতাই কাঁদিতে কাঁদিতে পা টিপিয়া টিপিয়া বাড়ীর পথ ধরিল।

কাকা এতক্ষণে নিশ্চয়ই বাড়ী আসিয়াছেন। দরজাতেই যদি কাকার সঙ্গে দেখা হয় ! নিতাই বাবুদের ভাঙ্গা বাড়ীতে খানিকক্ষণ আশ্রয় লইল। সেখান হইতে নিতাই বাড়ীর কোন কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইল না। আবার গাছ বাহিয়া ছাদে উঠিয়া নিতাই কুণ্ডুদের বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। সেখানে কুণ্ডুদের ধানের বস্তা গাদা দেওয়া ছিল। তাহার উপর উঠিয়া একটা বস্তার আড়ালে বসিয়া নিতাই কাণ পাতিয়া রহিল। প্রথমে কিছু বুঝিতে পারিল

না। পরে দেখিতে পাইল লণ্ঠন লইয়া কে একজন বাড়ীর এধার ওধার ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। চুপিচুপি জন কয়েক কি বলাবলি করিতে লাগিল। আবার খানিক চুপচাপ। এই ভাবে ঘণ্টা খানেক কাটিয়া গেল।

খানিক পরে নিতাই দেখিল, তাহার কাকা ছাতা মাথায় লণ্ঠন হাতে রাস্তার দিক হইতে আসিতেছেন। বাড়ী ঢুকিয়াই তিনি বলিলেন,—"কোথাও তো দেখ্‌তে পেলাম না। রাণু জেলে বল্লে, দুপুর বেলা তাকে নদীর ধার দিয়ে যেতে দেখেছিল। নদীর ধার, বাগান, এমন কি নদী পার হয়ে পর্য্যন্ত খোঁজ করে এলাম। তুমিই বা বৌদিদি ছেলেটাকে কেন মিছিমিছি মার্‌তে গেলে। ওর পাখী উড়িয়ে দিয়েছে, ও একটা চড় মেরেছে;—তার জন্য তুমি আবার কেন মার্‌তে গেলে, বক্‌তেই বা কেন গেলে?"

নিতাইয়ের মা কান্নার সুরে কি একটা কথা বলিলেন;—নিতাই তাহা ভাল শুনিতে পাইল না। কিন্তু কাকার কথা শুনিয়া তাহার চোখে জল আসিল। বেশ হইয়াছে। এবার মা বেশ জব্দ হইয়াছেন। এখন কাঁদিয়া মরুন্।

নিতাই তাহার খুড়িমার গলা শুনিল—"বাড়ীর চারিধারে ছাদের উপর আর একবার দেখ দিকি বেশ করে। সেবারও তো বাড়ীতে লুকিয়ে ছিল।

৩,৪ টা লণ্ঠন লইয়া ৩,৪ জন লোক আবার চারিদিকে খুঁজিতে লাগিয়া গেল। একজন ছাদের উপরে গিয়া খুঁজিতে লাগিল। নিতাইয়ের মা এতক্ষণ ভিতরে ভিতরে ছট্‌ফট্ করিলেও মুখে তেমন কিছু বলেন নাই। সারাদিন ঘুরিয়া ছেলেকে পাওয়া গেল না! নদী ভরা জল! শেষটা কি বাছা—

মা কাঁদিয়া উঠিয়া ডাকিতে লাগিলেন—"ও বাবা নিতাই, ফিরে আয় বাপ!"

এমন কি শৈল পর্য্যন্ত কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকিতে লাগিল। বাড়ীময় একটা দুঃখ ও আতঙ্কের ঢেউ বহিতে লাগিল। কান্না শুনিয়া অশ্রুবাষ্পে নিতাইয়েরও কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল।

যে-ঘরে খাঁচাটা তুলিয়া রাখা হইয়াছিল, অন্নপূর্ণা একটা লণ্ঠন লইয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল। সেখান হইতে হঠাৎ সে চীৎকার করিয়া উঠিল—"ও জেঠাইমা, এই যে দাদার পাখী; খাঁচায় আপনি ফিরে এসেছে।"

অনেকে সেই ঘরের দিকে আসিল। পাখীটি দাঁড়ে ঠোঁট দুখানি রাখিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমাইতেছে। খাঁচার দুয়ার খোলা। কখন যে সে খাঁচার মায়ায় খাঁচার ভিতর ফিরিয়া আসিয়াছে তাহা কেহই জানে না।

নিতাইয়ের কাণেও সে কথা প্রবেশ করিয়া তাহাকে আর স্থির থাকিতে দিল না। ধীরে ধীরে বস্তা হইতে নামিয়া নিতাই তাহাদের বাড়ীর পাশের প্রাচীরের উপর দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল—এখন কি করিবে। হারানো পাখী দেখিবার জন্য তাহার প্রাণ তখন ছট্‌ফট্ করিতেছিল।

এমন সময় সম্মুখের দিক হইতে কে আলোক উঁচু করিয়া তাহার মুখের উপর ফেলিল। তাহার কাকার গলা শুনা গেল—"কে দাঁড়িয়ে পাঁচীলে?"

নিতাই অর্দ্ধেক ভয়ে ও অর্দ্ধেক আনন্দে কহিল—"আমি!"

কিছুক্ষণ পায়ের শব্দ শোনা গেল। আলো আগাইয়া আসিল। কাকা বলিলেন—"নেমে আয়, বোকা ছেলে! কি ভোগান্‌টাই ভুগিয়েছিস্ আজ।"

নিতাই প্রাচীর হইতে নামিল। কাকা তাহার হাত ধরিয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া গেলেন।

নিতাইয়ের মা ছুটিয়া আসিয়া ছেলেকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন।

নিতাইয়ের কাকা ডাকিয়া বলিলেন—"ছেলেটা সমস্ত দিন খায়নি; হাত পা ধুইয়ে আগে ওকে কিছু খেতে দাও।"

অন্নপূর্ণা সব-আগে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া পাখীশুদ্ধ খাঁচাটা দাদার সম্মুখে রাখিল।

বিরিঞ্চি বাবা

পরশুরাম রচিত :: নারদ বিচিত্রিত

চৌদ্দ নম্বর হাবশীবাগান লেনের মেসটি ছোট কিন্তু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কারণ ম্যানেজার নিবারণ মাষ্টার খুব আমুদে লোক হইলেও সর্বদিকে তার কড়া নজর আছে। মেসের অধিবাসী পাঁচ-ছয়জন মাত্র এবং সকলেরই অবস্থা ভাল। বসিবার জন্য একটি আলাদা ঘর, তাতে ঢালা ফরাস এবং অনেক রকম বাদ্যযন্ত্র, দাবা, তাস, পাশা ও অন্যান্য খেলার সরঞ্জাম, কতকগুলি মাসিকপত্রিকা প্রভৃতি চিত্তবিনোদনের উপকরণ সজ্জিত আছে। কাল হইতে পূজার বন্ধ, সেজন্য মেসের অনেকে দেশে চলিয়া গিয়াছে। বাকী আছে কেবল নিবারণ ও পরমার্থ। ইহারা কোথাও যাইবে না, কারণ দুজনেরই শ্বশুরবাড়ীর সকলে কলিকাতায় আসিতেছেন।

নিবারণ কলেজে পড়ায়। পরমার্থ ইন্‌শিওরান্সের দালালি, হঠযোগ এবং থিয়সফির চর্চ্চা করে। আজ সন্ধ্যায় মেসের বৈঠকখানায় ইহারা দুইজন এবং পাশের বাড়ীর নিতাইবাবু আড্ডা দিতেছেন। নিতাইবাবু নিত্যই এখানে আসেন। তাঁর একটু বয়স হইয়াছে, সেজন্য মেসের ছোকরার দল তাঁকে একটু সমীহ করে, অর্থাৎ পিছন ফিরিয়া সিগারেট খায়।

নিতাইবাবু বলিতেছিলেন—"চিত্তে সুখ নেই দাদা। ঝি-বেটী পালিয়েচে, খুকীটার জ্বর, গিন্নি খিট্‌খিট্‌ করচেন, অফিসে গিয়েও যে দুদণ্ড ঘুমুব তার জো নেই, নতুন ছোট সায়েব ব্যাটা যেন চরকী ঘুরচে।"

পরমার্থ বলিল—"কেন, আপনাদের অফিসে ত বেশ ভাল ব্যবস্থা আছে।"

নিতাই। সেদিন আর নেই রে ভাই। ছিল বটে মেকেঞ্জি সায়েবের আমলে। বরদা-খুড়োকে জান ত? শ্যামনগরের বরদা মুখুয্যে। খুড়ো ছুটোর সময় আফিম খেতেন, আড়াইটা থেকে সাড়ে চারটে পর্য্যন্ত ঘুমুতেন। আমরা সবাই পালা করে টিফিন-ঘরে গড়িয়ে নিতুম, কিন্তু খুড়ো চেয়ার ছাড়তেন না। একদিন হয়েচে কি— লেজারে টিক দিতে দিতে যেমনি পাতার নীচে পৌঁছেচেন

মনি ঘুম এল। নড়ন-চড়ন নেই, নাক-ডাকা নেই, াড় একটু ঝুঁকল না, লেজারে টোটালের যায়গায় হাতের লমটি ঠিক ধরা আছে। অসাধারণ ক্ষমতা—দূর থেকে দখলে কে বল্‌বে খুড়ো ঘুমুচ্চে। এমন সময় মেকেঞ্জি ায়েব ঘরে এল,—সকলে শশব্যস্ত। সায়েব খুড়োর াছে গিয়ে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করে খুড়োর কাঁধে একটি চম্‌টি কাটলে। খুড়ো একটু মিট্‌মিটিয়ে চেয়েই বিড়্‌বিড়্‌ রে আরম্ভ করলে—সাঁইত্রিশের সাত নাবে তিনে-কত্তি

"তিনে-কত্তি তিন"

তিন। সায়েব হেসে বল্লে—হ্যাভ এ কপ্‌ অভ্‌ টী বাবু। এখন সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। সংসারে ঘেন্না ধরে গেছে। একটি ভাল সাধু-সন্ন্যাসী পাই ত ব ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

পরমার্থ। জগন্নাথ-ঘাটে আজ একটি সাধুকে দেখে এলুম—আশ্চর্য্য ব্যাপার। লোকে তাঁকে বলে মিরচাই-বাবা। তিনি কেবল লংকা খেয়ে থাকেন,—ভাত নয়, রুটি নয়, ছাতু নয়,—স্রেফ লংকা। লক্ষ লক্ষ লোক ওষুধ নিতে আসচে, একটি করে লংকা মন্ত্রপূত করে দিচ্চেন, তাই খেয়ে সব ভাল হয়ে যাচ্চে। শুনেচি তাঁর আবার যিনি গুরু আছেন, তাঁর সাধনা আরো উঁচুদরের। তিনি খান স্রেফ করাতের গুঁড়ো।

নিতাই। ওহে মাষ্টার, তুমি ত ফিলজফিতে এম-এ পাশ করেচ,—লংকা, করাতের গুঁড়ো, এ সবের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য কি বল ত? তোমার পাখোয়াজ বন্ধ কর বাপু, কাণ ঝালা-পালা হল।

নিবারণ প্রথমে একটা মাসিকপত্রিকা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল। তাতে যে পাঁচটি গল্প আছে, তার প্রত্যেকের নায়িকা এক-একটি সতী সাধ্বী বারাঙ্গনা। অবশেষে নিবারণ পত্রিকাটি ফেলিয়া দিয়া একটা পাখোয়াজ কোলে লইয়া মাঝে মাঝে বেতালা চাঁটি মারিতেছিল। নিতাইবাবুর কথায় বাজনা থামাইয়া বলিল—"ও সব হচ্চে ভিন্ন ভিন্ন সাধনার মার্গ। যেমন জ্ঞান-মার্গ, কর্ম্ম-মার্গ, ভক্তি-মার্গ,—তেম্‌নি মিরচাই মার্গ, করাত-মার্গ, পেরেক-মার্গ, একাদশী-মার্গ, গোবর-মার্গ, টিকি-মার্গ, দাড়ি-মার্গ, স্ফাটিক-মার্গ, কাগ-মার্গ—"

নিতাই। কাগ-মার্গ কি রকম?

নিবারণ। জানেন না? গেল বছর হরিহর ছত্রের মেলায় গিয়েছিলুম। এক যায়গায় দেখি একটা প্রকাণ্ড বাঁশের খাঁচায় শো-দুই কাগ ঝামেলা করচে। পাশে একটা লোক হাঁকচে—দো-দো আনে কৌয়ে, দো-দো আনে। ভাবলুম বুঝি পেশোয়ারী কি মুলতানী কাগ হবে, নিশ্চয় পড়্‌তে জানে। একটা ধাড়ি-গোছ কাগের কাছে গিয়ে শিষ দিয়ে বল্লুম—পড়ো ময়না, চিত্রকোট কি ঘাট পর্—সীতারাম—রাধাকিষণ বোলো,—চুচ্চঃ। বেটা ঠোক্‌রাতে এল। কাগ-ওলা বল্লে, বাবু কৌয়া নহি পঢ়্‌তা। তবে কি করে বাপু? কাগের মাংস ত শুন্‌তে পাই তেতো, লোকে বুঝি শুক্ত বানাবার জন্য কেনে? বল্লে—তাও নয়। এই কাগ খাঁচায় কয়েদ রয়েচে, দু-দু আনা খরচ করে যতগুনি ইচ্ছে কিনে নিয়ে জীবকে বন্ধন-দশা হতে মুক্তি দাও, তোমারও মুক্তি হবে। ভাবলুম মোক্ষের মার্গ কি বিচিত্র! অন্য লোকে মুক্তি পাবে তাই এই গরীব কাগ-ওলা বেচারা নিজের পরকাল নষ্ট করচে। একেই বলে conservation of virtue, একজন পাপ না করলে আর একজনের পুণ্য হবার যো নেই।

এই সময় একটি হ্যাট-কোট-ধারী বাইশ-তেইশ

বছরের ছেলে ঘরে আসিয়া পাথার রেগুলেটার শেষ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া দিয়া হ্যাট্‌টি আছড়াইয়া ফেলিয়া ফরাসের উপর থপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়িল। এর নাম সত্যব্রত, সম্প্রতি লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়া কাজকর্ম্মের চেষ্টা দেখিতেছে। সত্যব্রত হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল— "ওঃ, কি মুস্কিলেই পড়া গেছে!"

সত্য প্রায়ই মুস্কিলে পড়িয়া থাকে, সেজন্য তার কথায় কেহ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিল না। অগত্যা সে আপন মনে বলিতে লাগিল—"সমস্ত দিন অফিসের হাড়ভাঙা খাটুনি, বিকেলে যে একটু স্ফূর্ত্তি করব তারও যো নেই। ভাবলুম আজ ম্যাটিনিতে সীতা দেখে আসি। অমনি পিসীমা বলে বসলেন—সতে, তুই বোকে যাচ্চিস, আমার সঙ্গে চল্‌, সাণ্ডেল-মশায়ের বক্তৃতা শুনবি। কি করি, যেতে হল। কিন্তু সব মিথ্যে। সাণ্ডেল-মশায় বলচেন ধর্ম্মজীবনের মধুরতা, আর আমি ভাবচি আরসোলা।

নিতাই। আরসোলা?

সত্য। তিন টন্‌ আরসোলা। ফরওয়ার্ড কণ্ট্রাক্ট আছে, নভেম্বর-ডিসেম্বর শিপমেণ্ট, চাল্লিশ পাউণ্ড পনেরো শিলিং টন্‌, সি-আই-এফ হংকং। চায়নায় লড়াই বাধবে কি না, তাই আগে থাকতে সংগ্রহ কচ্চে। বড়-সায়েবের হুকুম—এক মাসের মধ্যে সমস্ত মাল পিপে-বন্দী হওয়া চাই। কোত্থেকে পাই বলুন ত? ওঃ, কি বিপদ!

নিতাই। হ্যাঁরে সতে, তুই না বেম্মজ্ঞানী, তোদের না মিথ্যে কথা বল্‌তে নেই?

সত্য। কেন বল্‌তে নেই। পিসীমার কাছে না বল্লেই হল।

নিবারণ। সতে, তোর সন্ধানে ভাল বাবাজি কি স্বামীজি আছে?

সত্য। ক'টা চাই?

নিতাই। যা যাঃ, ইয়ার্কি করিস্‌ নি। তোরা মন্ত্র-তন্ত্রই মানিস না তা আবার বাবাজি।

সত্য। কেন মান্‌ব না। পিসীমার দাঁত কনকন্‌ করছিল, খেতে পারেন না, ঘুমুতে পারেন না, কথা কইতে পারেন না, কেবল পিসে-মশায়কে ধমক দেন। বাড়ীশুদ্ধ লোক ভয়ে অস্থির। পিপারমিণ্ট, এস্পিরিণ, মাদুলী, জলপড়া, দাঁতের পোকা বার কো-ও-রি, কিছুতে কিছু হয় না। তখন পিসে-মশায় এসে জোর প্রার্থনা আরম্ভ করলেন যে তিন দিনের দিন দাঁত পড়ে গেল।

পরমার্থ চটিয়া উঠিয়া বলিল—"দেখ সত্য, তুমি যা বোঝো না তা নিয়ে ফাজলামি কোরো না। প্রার্থনাও যা, মন্ত্র-সাধনাও তা। মন্ত্র-সাধনায় প্রচণ্ড এনার্জি উৎপন্ন হয় তা মানো?"

সত্য। আলবৎ মানি। তার সাক্ষী রাজশাহীর তড়িতানন্দ ঠাকুর, কলেজের ছেলেরা যাঁকে বলে রেডিয়ো-বাবা। বাবার দুই টিকি, একটি পজিটিভ, একটি নেগেটিভ। আকাশ থেকে ইলেকট্রিসিটি শুষে নেন। স্পার্ক ঝাড়েন এক-একটি আঠারো ইঞ্চি লম্বা। কাছে এগোয় কার সাধ্য,—সিল্কের চাদর মুড়ি দিয়ে দেখা করতে হয়।

নিবারণ। নাঃ, মিরচাই, বেদান্ত, ইলেক্‌ট্রিসিটি এর একটাও নিতাই-দার ধাতে সইবে না। যদি কোনো নিরীহ বাবাজি সন্ধানে থাকে ত বল। কিন্তু কেরামতি চাই, শুধু ভক্তিতত্ত্বে চলবে না। কি বলেন নিতাই-দা?

পরমার্থ। তবে দমদমায় গুরুপদবাবুর বাগানে চলুন বিরিঞ্চি-বাবার কাছে।

নিবারণ। আলিপুরের উকীল গুরুপদবাবু? আমাদের প্রফেসার ননীর শ্বশুর? তিনি আবার বাবাজি জোটালেন কোথা থেকে? সত্য, তুই জানিস কিছু?

সত্য। ননী-দার কাছে শুনেছিলুম বটে গুরুপদবাবু সম্প্রতি একটি গুরুর পাল্লায় পড়েছেন। স্ত্রী মারা গিয়ে অব্‌ধি ভদ্রলোক একবারে বদ্‌লে গেছেন। আগে কিছুই মানতেন না।

নিবারণ। গুরুপদবাবুর আর একটি আইবড় মেয়ে আছে না?

সত্য। বুচ্‌কী, ননী-দার শালী।

নিবারণ। তারপর পরমার্থ, বাবাজিটি কেমন?

পরমার্থ। আশ্চর্য্য! কেউ বলে তাঁর বয়স পাঁচ বৎসর, কেউ বলে পাঁচ হাজার, অথচ দেখতে এই নিতাই-দার বয়সী বোধ হয়। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে একটু হেসে বলেন—বয়স ব'লে কোনো জিনিষই নেই সমস্ত কাল—একই কাল, সমস্ত স্থান—একই স্থান। যিনি সিদ্ধ, তিনি ত্রিকাল ত্রিলোক একসঙ্গেই ভোগ করেন এই ধর—এখন সেপ্টেম্বর ১৯২৫, তুমি হাবশীবাগানে

আছ। বিরিঞ্চি-বাবা ইচ্ছে করলে এখনি তোমাকে আকবরের টাইমে আগ্রাতে অথবা ফোর্থ্ সেঞ্চুরি বি-সিতে পাটলীপুত্র নগরে এনে ফেল্‌তে পারেন। সমস্তই আপেক্ষিক কিনা।

নিবারণ। আইনষ্টাইনের পসার একবারে মাটি?

পরমার্থ। আরে আইনষ্টাইন্ শিখ্‌লে কোত্থেকে? শুনেচি বিরিঞ্চি-বাবা যখন চেকো-স্লোভাকিয়ায় তপস্যা করতেন, তখন আইনষ্টাইন্ তাঁর কাছে গতায়াত করত। তবে তার বিদ্যে রিলেটিভিটির বেশী এগোয়নি।

নিতাইবাবু উদ্‌গ্রীব হইয়া সমস্ত শুনিতেছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা, আইনষ্টাইনের থিওরিটা কি বল ত?"

পরমার্থ। কি জানেন,—স্থান কাল আর পাত্র এরা পরস্পরের ওপর নির্ভর করে। যদি স্থান কিম্বা কাল বদলায়, তবে পাত্রও বদলাবে।

সত্য। ও হ'ল না, আমি সহজ করে বলচি শুনুন। ধরুন আপনি একজন ভারিক্কে লোক, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে গেছেন, তখন আপনার ওজন ২ মণ ১০ সের। সেখান থেকে গেলেন মৈড়াতলা কংগ্রেস কমিটীতে,—সেখানে ওজন হ'ল মাত্র ৫ ছটাক, ফুঁয়ে উড়ে গেলেন।

নিবারণ। ঠিক। জনার্দ্দন ঠাকুর পটলডাঙ্গায় কেনে আড়াই সের আলু, আর মেসে এলেই হয়ে যায় ন-পো।

নিতাই। আচ্ছা পরমার্থ, বিরিঞ্চি-বাবা নিজে ত ত্রিকালসিদ্ধ পুরুষ। ভক্তদের কোনো সুবিধে করে দেন কি?

পরমার্থ। তেমন তেমন ভক্ত হলে করেন বৈকি। এই সেদিন মেকিরাম আগরওয়ালার বরাত ফিরিয়ে দিলেন। তিনদিনের জন্যে তাকে নাইণ্টিন ফোর্টিনে নিয়ে গেলেন, ঠিক লড়ায়ের আগে। মেকিরাম পাঁচ-হাজার টন্ লোহার কড়ি কিনে ফেল্লে—ছ টাকা হন্দর। তার পরেই তাকে একমাস নাইণ্টিন নাইণ্টিনে রাখলেন। মেকিরাম বেচে দিলে একুশ টাকা দরে। তখন আবার তাকে হাল আমলে ফিরিয়ে আনলেন। মেকিরাম এখন পনের লাখ টাকার মালিক। না বিশ্বাস হয় অঙ্ক কসে দেখ।

নিতাইবাবু পরমার্থের দুই হাত ধরিয়া গদ-গদ-স্বরে বলিলেন—"পরমার্থ ভাই রে, আমায় এক্ষুনি নিয়ে চল্ বিরিঞ্চি-বাবার কাছে। বাবার পায়ে ধরে হত্যা দেব। খরচা যা লাগে সব দেব, ঘটি-বাটি বিক্রি করব, গিন্নির হাতে পায়ে ধরে সেই দশ ভরির গোট-ছড়াটা বন্ধক দেব। বাবার দয়ায় যদি হপ্তা-খানেক নাইণ্টিন ফোর্টিনে ঘুরে আস্‌তে পারি, তবে তোমায় ভুলব না পরমার্থ। টেন পার্সেণ্ট,—বুঝ্‌লে? হায় ভগবান্, হায় রে লোহা!"

নিবারণ। গুরুপদবাবু কিছু গুছিয়ে নিতে পারলেন?

পরমার্থ। তাঁর ইহকালের কোনো চিন্তাই নেই। শুনেচি বিষয়-সম্পত্তি সমস্তই গুরুকে দেবেন।

নিবারণ। এতদূর গড়িয়েচে? হ্যাঁরে সত্য, তোর ননী-দা, তোর বৌদি, এঁরা কিছু বলচেন না?

সত্য। ননী-দাকে ত জানই, হ্যালা-খ্যাপা লোক, নিজের এক্স্‌পেরিমেণ্ট নিয়েই আছেন। আর বৌদি নিতান্ত ভালমানুষ। ওঁদের দ্বারা কিছু হবে না। কিছু করতে হয় ত তুমি আর আমি। কিন্তু দেরী নয়।

নিবারণ। তবে এক্ষুনি ননীর কাছে চল্। ব্যাপারটা ভাল করে জেনে নিয়ে তারপর দমদমায় যাওয়া যাবে।

নিতাইবাবু কাগজ-পেন্সিল লইয়া লোহার হিসাব কসিতেছিলেন। দমদমা যাওয়ার কথা শুনিয়া বলিলেন—"তোমরাও বাবার কাছে যাবে নাকি? সেটা কি ভাল হবে? এত লোক গিয়ে আবদার করলে বাবা ভড়্‌কে যেতে পারেন। সত্যটা একে বেহ্ম তায় বিশ্বকাট, ওর গিয়ে লাভ নেই। কেন বাপু, তোদের অমন খাসা ব্রাহ্মসমাজ রয়েচে, সেখানে গিয়ে হত্যে দে না, আমাদের ঠাকুর-দেবতার ওপর নজর দিস কেন? আমি বলি কি, আগে আমি আর পরমার্থ যাই। তারপর আর একদিন না হয় নিবারণ যেও।"

নিবারণ। না না, আপনার কোনো ভয় নেই, আমরা মোটেই আবদার করব না, শুধু একটু শাস্ত্রালাপ করব। সুবিধে হয় ত কাল বিকেলেই সব একসঙ্গে যাওয়া যাবে।

প্রফেসার ননী কোনো কালে প্রফেসারি করে নাই, কিন্তু অনেকগুলি পাশ করিয়াছে। সে বাড়ীতে নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিয়া থাকে, সেজন্য বন্ধুবর্গ

তাকে প্রফেসার আখ্যা দিয়াছে। রোজগারের চিন্তা নাই, কারণ পৈত্রিক সম্পত্তি কিছু আছে। ননী গুরুপদবাবুর জামাতা, সত্যব্রতের দূরসম্পর্কীয় ভ্রাতা এবং নিবারণের ক্লাস-ফ্রেণ্ড।

উনানের উপর প্রকাণ্ড ডেক্‌চিতে সবুজ রঙের কোনো পদার্থ সিদ্ধ হইতেছে, ননীর স্ত্রী নিরুপমা তাহা কাঠি দিয়া ঘাঁটিতেছে। পাশের বারান্দায় একটা হার্মোনিয়ম আছে, তাহা হইতে একটা রবারের নল আসিয়া ডেক্‌চির ভিতরে

নিরুপমা ও প্রফেসার ননী

নিবারণ ও সত্যব্রত যখন ননীর বাড়ীতে পৌছিল, তখন রাত্রি আটটা। বাহিরের ঘরে কেহ নাই, চাকর বলিল বাবু এবং বহুমা ভিতরের উঠানে আছেন। নিবারণ ও সত্য অন্দরে গিয়া দেখিল উঠানের এক পাশে একটী প্রবেশ করিয়াছে। প্রফেসার ননী মালকোচা মারিয়া কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

নিবারণ বলিল—"একি বৌদি, এত শাগের ঘণ্ট কার জন্যে রাঁধচেন?"

নিরুপমা বলিল—"শাগ নয়, ঘাস সেদ্ধ হচ্চে। ওঁর কত রকম খেয়াল হয় জানেন ত।"

নিবারণ। সেদ্ধ হচ্ছে? কেন, ননীর বুঝি কাঁচা ঘাস আর হজম হয় না?

ননী বলিল—"নিবারণ, ইয়ার্কি নয়। পৃথিবীতে আর অন্নাভাব থাকবে না।"

নিবারণ। সকলেই ত প্রফেসার ননী বা রোমন্থক জীব নয় যে ঘাস খেয়ে বাঁচবে।

ননী। আরে ও কি আর ঘাস থাকবে? প্রোটীন সিন্থেসিস্ হচ্চে। ঘাস হাইড্রোলাইজ হয়ে কার্ব্বোহাইড্রেট হবে। তাতে দুটো এমিনো গ্রুপ জুড়ে দিলেই বস্। হেক্সা-হাইড্রক্সি-ডাই-এমিনো—

নিবারণ। থাক্, থাক্। হার্মোনিয়মটা কি জন্যে?

ননী। বুঝলে না? অক্সিডাইজ করবার জন্যে। নিরু, হার্মোনিয়মটা বাজাও ত।

নিরুপমা হার্মোনিয়মের পেডাল চালাইল। সুর বাহির হইল না, রবারের নল দিয়া হাওয়া আসিয়া ডেক্‌চির ভিতর বগ্‌বগ্ করিতে লাগিল।

নিবারণ। সুধুই ভুড়ভুড়ি? আমি ভাবলুম বুঝি সঙ্গীত-রস রবারের নল বয়ে ঘাসের সঙ্গে মিশে সবুজ-অমৃতের চ্যাঙড় সৃষ্টি করবে। যাক্—বৌদি, বাবার খবর কি বলুন ত।

নিরুপমা ম্লানমুখে বলিল—"শোনেন নি কিছু? মা যাওয়ার পর থেকেই কেমন এক রকম হয়ে গেছেন। গণেশ-মামা কোথা থেকে এক গুরু জুটিয়ে দিলেন, তাঁকে নিয়েই একবারে তন্ময়। বাহ্যজ্ঞান নেই বল্লেই হয়, গুরু-গুরু-গুরু। অনেক কান্নাকাটি করেচি কোনো ফল হয়নি। শুনচি টাকাকড়ি সবই গুরুকে দেবেন। বুঁচ্‌কীটার জন্যেই ভাবনা। তার কাছেই গিয়ে থাকতুম, কিন্তু শ্বাশুড়ীর অসুখ, এ বাড়ী ছেড়ে যেতে পারচি না।

সত্য বলিল—"আচ্ছা ননী-দা, তুমি ত বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলতে পার?"

ননী। তা কখনো পারি? শ্বশুর-মশায় ভাববেন ব্যাটা সম্পত্তির লোভে আমার ধর্ম্মকর্ম্মের ব্যাঘাত করতে এসেচে।

সত্য। তবে হুকুম দাও, প্রহারেণ ধনঞ্জয় করে দি।

নিরুপমা। না না, জুলুম যদি কর তবে সেটা বাবার ওপরেই পড়বে। বাবাকে কষ্ট না দিয়ে যদি কিছু করতে পার ত দেখ।

সত্য। বড় শক্ত কথা। আচ্ছা বৌদি, বিরিঞ্চি-বাবার ব্যাপারটা কি রকম বলুন ত।

নিরুপমা। ব্যাপার প্রায় মাসখানেক থেকে চলচে। দমদমার বাগানে আছেন, সঙ্গে আছে তাঁর চেলা ছোট মহারাজ কেবলানন্দ। গণেশ-মামা খিদমৎ করচেন। বাবা দিনরাত সেখানেই পড়ে আছেন। রোজ দু-তিনশ ভক্ত গিয়ে ধর্ণা দিচ্চে, বিরিঞ্চি-বাবার অদ্ভুত কথাবার্ত্তা শোনবার জন্যে হাঁ করে আছে। প্রতি রবিবার রাত্রে হোম হচ্চে, তা থেকে এক-একদিন এক-একটি দেবতার আবির্ভাব হচ্চে। কোনো দিন রামচন্দ্র, কোনো দিন ব্রহ্মা, কোনো দিন বিষ্ণু, কোনো দিন শ্রীচৈতন্য। যাকে তাকে হোম ঘরে ঢুকতে দেওয়া হয় না, যারা খুব বেশী ভক্ত তারাই যেতে পায়। ব্রহ্মা বেরুনোর দিন আমি ছিলুম।

সত্য। কি—কি রকম দেখলেন?

নিরুপমা। আমি কি ছাই ভাল করে দেখেচি? অন্ধকার ঘরে হোমকুণ্ডুর পিছনে আবছায়ার মত প্রকাণ্ড মূর্ত্তি, চারটে মুণ্ডু, লম্বা লম্বা দাড়ি। আমার ত দেখেই দাঁতে দাঁত লেগে ফিট্ হ'ল। গণেশ-মামা ঘর থেকে টেনে বার করে দিলেন। বুঁচকীর বরং সাহস আছে, প্রায়ই দেখচে কি না। কাল নাকি মহাদেব বার হবেন।

নিবারণ। কাল একবার আমরা বিরিঞ্চি-বাবার চরণ দর্শন করে আসি, যদি তাঁর দয়া হয় তবে কপালে হয় ত মহাদেব-দর্শনও হবে।

নিরুপমা। গণেশ-মামাকে বশ করুন,—তিনি হুকুম না দিলে হোমঘরে ঢুকতে পাবেন না।

নিবারণ। সে আমি করে নেব। কিন্তু সতে, তোকে নিয়ে যেতে সাহস হয় না, তোর মুখ বড় আল্‌গা, তুই হেসে ফেলবি।

সত্য তার সমস্ত দেহ নাড়িয়া বলিল—"কথ্‌খনো নয়, তুমি দেখে নিও, হাসে কোন্ শা—ইলল্!"

নিবারণ। ও কি, জিভ বার কল্লি যে?

সত্য। বেগ্ ইওর পার্ডন বৌদি, খুব সাম্‌লে নিয়েচি। পিসীমার সামনে হলে রক্ষে থাকত না।

নিবারণ। তবে আজ আমরা চলি। হ্যাঁ, ভালকথা। ননী, এমন কিছু বল্‌তে পার যাতে খুব ধোঁয়া হয় ?

ননী। কি রকম ধোঁয়া ? যদি লাল ধোঁয়া চাও তবে নাইট্রিক এসিড এণ্ড তামা, যদি বেগ্‌নি চাও তবে আয়োডিন ভেপার, যদি সবুজ চাও—

নিবারণ। আরে না না। প্লেন ধোঁয়া চাই।

ননী। তাহলে ট্রাই-নাইট্রো-ডাই-মিথাইল—

নিবারণ কাণ চাপিয়া বলিল—"আবার আরম্ভ করলে রে!' বৌদি, এটাকে নিয়ে আপনার চলে কি করে ?"

নিরুপমা হাসিয়া বলিল—"মামার বাড়ীতে দেখেচি গোয়াল-ঘরে ভিজে খড় জ্বালে, খুব ধোঁয়া হয়।"

নিবারণ। ইউরেকা! বৌদি, আপনিই নোবেল প্রাইজ পাবেন, ননেটার কিছু হবে না।

নিরুপমা। ধোঁয়া দিয়ে করবেন কি ?

নিবারণ। ছুঁচোর উপদ্রব হয়েচে, দেখি তাড়াতে পারি কি না।

গুরুপদবাবুর দমদমার বাগানবাড়ী পূর্ব্বে বেশ সুসজ্জিত ছিল, কিন্তু তাঁর পত্নী গত হওয়া অবধি হতশ্রী হইয়াছে। সম্প্রতি বিরিঞ্চি-বাবার অধিষ্ঠান-হেতু বাড়ীটি মেরামত করানো হইয়াছে এবং জঙ্গলও কিছু কিছু সাফ হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বের গৌরব ফিরিয়া আসে নাই। গুরুপদবাবু সংসারের কোনো খবর রাখেন না, তাঁর শ্যালক গণেশই এখন সপরিবারে আধিপত্য করিতেছেন।

বৈকালে পাঁচটার সময় নিবারণ, সত্যব্রত, পরমার্থ এবং নিতাইবাবু আসিয়া পৌঁছিলেন। বাড়ীর নীচে একটি বড় ঘরে সতরঞ্চ বিছাইয়া ভক্তবৃন্দের বসিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তার একপাশে একটি তক্তাপোষে গদি এবং বাঘের ছাপ মারা রগের উপর বিরিঞ্চি-বাবার আসন। পাশের ঘরে ভক্ত মহিলাগণের স্থান। বাবাজি এখনও তাঁর সাধন-কক্ষ হইতে নামেন নাই। ভক্তের দল উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া আছে এবং মৃদুস্বরে বাবার মহিমা গুঞ্জন করিতেছে। একটি সাহেবী পোষাক-পরা প্রৌঢ় ব্যক্তি অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া পা মুড়িয়া বসিয়া আছেন এবং অধীর হইয়া মাঝে মাঝে তাঁর কামানো গোঁফে পাক দিতেছেন। ইনি মিষ্টার ও-কে-সেন, বার-এট-ল। সম্প্রতি কয়লার খনিতে অনেক টাকা লোকসান দিয়া ধর্ম্মকর্ম্মে মন দিয়াছেন।

পরমার্থ ও নিতাইবাবুকে ঘরে বসাইয়া নিবারণ ও সত্যব্রত বাহিরে আসিল এবং বাগানের চারিদিক প্রদক্ষিণ করিয়া ফটকের কাছে উপস্থিত হইল। ফটকের পাশেই একসার টালি-ছাওয়া ঘর, তাতে আস্তাবল এবং কোচ-মান, দরোয়ান, মালী ইত্যাদির থাকিবার স্থান।

আস্তাবলের সম্মুখে একটি ভাঙা বেঞ্চে বসিয়া মৌলভি বছিরুদ্দি, কোচমান ঝোঁটি মিঞা এবং দরোয়ান ফেকু পাঁড়ের সঙ্গে গল্প করিতেছেন। মৌলভি সাহেবের নিবাস ফরিদপুর, ইনি গুরুপদবাবুর অন্যতম মুহুরি। গুরুপদবাবু ওকালতি ত্যাগ করায় বছিরুদ্দির উপার্জ্জন কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনো তিনি নিয়মিত মাসহারা পাইয়া থাকেন, সেজন্য প্রায়ই মনিবকে সেলাম করিতে আসেন।

মৌলভি সাহেব ফরিদপুরী উর্দ্দিতে দুনিয়ার বর্ত্তমান দুরবস্থা বিবৃত করিতেছিলেন, কোচমান ও দরোয়ান মাথা নাড়িয়া সায় দিতেছিল। অদূরে সহিস ঘোড়ার অঙ্গ ডলিতেছে এবং মাঝে মাঝে চঞ্চল ঘোড়ার পেটে সশব্দে থাবড়া মারিয়া বলিতেছে—"আরে ঠহ্‌র্‌ যা উল্লু।" সামনের মাঠে একটি স্থূলকায় বিড়াল মুখভঙ্গী করিয়া ঘাস খাইতেছে,—মধ্যাহ্নে বিরিঞ্চি-বাবার ভুক্তাবশিষ্ট মাছের মুড়া খাইয়া তার গরহজম হইয়াছে।

সত্যব্রত বলিল—"আদাব মৌলভি সাহেব, মেজাজ ত দিব্যি সরীফ ? পর্‌ণাম পাঁড়েজি। কোচমানজি আচ্ছা হ্যায় ত ? এঁকে চেন না বুঝি ? ইনি নিবারণবাবু, জামাইবাবুর দোস্ত। পুজোর জন্যে কিছু ভেট এনেচেন,— কিছু মনে করবেন না মৌলভি সাহেব,—আপনার দশ টাকা, পাঁড়েজি আর কোচমানজির পাঁচ-পাঁচ, সহিস-মালী এদের আরো পাঁচ।"

সৌজন্যে অভিভূত হইয়া বছিরুদ্দি, ফেকু এবং ঝোঁটি দন্তবিকাশ করিয়া বার বার সেলাম করিল এবং খোদা ও কালীমায়ীর নিকট বাবুজিদের তরক্কী প্রার্থনা করিল।

মৌলভি বলিলেন—"আর বাবু-মশয়, সেসব দিন ক্যান

কম্‌নে চ'লে গেছে। মা ঠাকরোণ বেহস্ত্‌ পঁওয়া ইস্তক মোদের বাবুসাহেবের জান্‌ডা কলেজায় নেই। অত করে বল্‌লাম হুজুর অমন পসারডা নষ্ট করবেন না। তা কে শোনে?—খোদার মর্জি।

নিবারণ বলিল—"ও বাবাজিটাই যত নষ্টের গোড়া।"

ফেকু পাঁড়ে ভরসা পাইয়া মত প্রকাশ করিল—বিরিঞ্চি-বাবা বাবাজি থোড়াই আছেন। তাঁর জনৌ ভি নাই, জটাভি নাই। তিনি মছরি খান, বক্‌ড়ির গোস্তভি খান। দোনো সাঁঝ চা-বিস্কুট না হইলে তাঁর চলে না। এ সব বংগালি বাবাজি বিলকুল জুয়াচোর। আর ছোটা মহারাজ যিনি আছেন তিনি ত একটি বিচ্ছু, ফেকু পাঁড়েকে পর্য্যন্ত দংশন করিতে তাঁর সাহস হয়। তিনি জানেন না যে উক্ত ফেকু পাঁড়ে মিউটিনিমে তলোয়ার খেলায়া থা (যদিও ফেকু তখনও জন্মান নাই)। একবার যদি মনিব হুকুম দেন, তবে লাঠীর চোটে বাবাজিদের হড্ডি চুর করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

মৌলভি জানাইলেন যে তাঁকেও কম অপমান সহ্য করিতে হয় নাই। মামাবাবু (গণেশ) যে তাঁর উপর লম্বাই চওড়াই করিবে তা তিনি বরদাস্ত করিবেন না। তিনি খানদানী মনিষ্যি, তাঁর ধমনীতে মোগলাই রক্ত প্রবাহিত হইতেছে। যদিও লোকে তাঁকে বছিরুদ্দি বলে, কিন্তু তাঁর আদৎ নাম ব্রেদম্‌ খাঁ। তাঁর পিতার নাম জাঁহাবাজ খাঁ, পিতামহের নাম আবদুল জব্বর, তাঁদের আদিনিবাস ফরিদপুরে নয়,—আরব দেশে, যাকে বলে ভুর্খ। সেখানে সকলেই উর্দ্দ বলে, কেবল পেটের দায়ে তাঁকে বাংলা শিখিতে হইয়াছে। সেই আরব দেশের নধ্যিখেনে ইস্তাম্বুল, তার বাঁয়ে শহর বোগ্‌দাদ। এই কলকাতা সহরডা তার কাছে একেবারেই তুশ্চ। বোগদাদের দখিন-বাগে মক্কা-সরীফ, সেখানকার পবিত্র কুঁয়ার জল আব এ-জম্‌-জম্‌ তাঁর কাছে এক শিশি আছে। মনিব যদি হুকুম দেন, তবে সেই জল ছিটাইয়া হালার-পো-হালা ইব্‌লিসের বাচ্ছা দুই বাবাজি মায় মামাবাবুকে তিনি হা—ই সাত দরিয়ার পারে জাহান্নমের চৌমাথায় পৌঁছাইয়া দিতে পারেন।

নিবারণ বলিল—"দেখুন মৌলভি সাহেব, আমরা বাবাজি দুটোকে তাড়াবই তাড়াব। যদি সুবিধে হয় ত আজই। কিন্তু একলা পেরে উঠব না। আপনি, দারোয়ানজি সঙ্গে থাকা চাই।"

ফেকু। মার পিট হোবে?

নিবারণ। আরে না না। তোমাদের কোনো ভয় নেই। কেবল একটু চিল্লা-চিল্লি করতে হবে। পারবে ত?

জরুর। আলবৎ। জান কবুল। কিন্তু মনিব যদি গোসা হন? নিবারণ বুঝাইল, মনিবের চটিবার কোন কারণই থাকিবে না। একটু পরে সে আসিয়া যথাকর্ত্তব্য বাৎলাইয়া দিবে।

নিবারণ ও সত্যব্রত বিরিঞ্চি-বাবার দরবার অভিমুখে চলিল। পথে গণেশ-মামার সঙ্গে দেখা,—তিনি ব্যস্ত হইয়া হোমের আয়োজন করিতে যাইতেছেন। নিবারণ ও সত্যব্রতকে দেখিয়া বলিলেন—"এই যে, তোমরাও এসেচ দেখচি, বেশ বেশ। হেঁ-হেঁ, তার পর—বাড়ীর সব হেঁ-হেঁ? নিবারণ তোমার বাবা বেশ হেঁ-হেঁ। তোমার মা এখন একটু হেঁ-হেঁ? তোমার ছোট বোনটি হেঁ-হেঁ? সত্য তোমার পিসেমশায় পিসীমা সক্কলে—"

নিবারণের স্বজনবর্গ সকলেই হেঁ-হেঁ। সত্যব্রতেরও তদ্রূপ। সমস্তই গণেশ-মামার আশীর্ব্বাদের ফল। মামাবাবুর ভাবনায় ঘুম হইতেছিল না, এখন কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইলেন।

সত্য বলিল—"মামা, আপনার ছোট জামাইটির চাকরি হয়েচে? যদি না হয়ে থাকে তবে ছুটির পরেই আমাদের অফিসে একবার পাঠাবেন, একটা ভেকান্সি আছে।"

গণেশ। বেঁচে থাক বাবা বেঁচে থাক। তোমরা হলে আপনার লোক, তোমরা চেষ্টা না করলে কি কিছু হয়? অফিস খুল্লেই সে তোমার সঙ্গে দেখা করবে।

নিবারণ। মামাবাবু, একটি নিবেদন আছে। দেবদর্শন করিয়ে দিতে হবে।

গণেশ। তা যাও না বাবার কাছে। সকলেই ত গেছে।

নিবারণ। ও দেবতা ত দেখবই। আসল দেবতা দেখতে চাই,—হোমঘরে।

গণেশ-মামা সভয়ে জিভ্‌ কাটিয়া বলিলেন—"বাপ্‌ রে, সেকি হয়। কত সাধ্যসাধনা করে তবে অধিকার

জন্মায়। আর আমাদের সত্য ত—এই—এই—যাকে বলে—"

নিবারণ। বেহ্মজ্ঞানী। কিন্তু ওর ব্রহ্মজ্ঞান এখনো হয়নি। সত্য হচ্চে দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ, হিঁদুয়ানিটা ঠিক বজায় রেখেচে। ও গীতা পড়ে, থিয়েটার দেখে, সত্যনারায়ণের সিন্নি, মদনমোহনের খিচুড়ি-ভোগ, কালীঘাটের কালিয়া সমস্ত খায়। আর বলতে নেই, আপনি হলেন নেহাৎ গুরুজন,—নইলে ওর দু-চারটে বোল-চাল শুনলে বুঝতেন যে ও বড় বড় হিঁদুর কাণ কাটতে পারে।'

গণেশ। যাই করুক, জাত গেলে আর ফিরে আসে না। তুমিও ত শুনতে পাই অখাদ্য খাও।

নিবারণ। সে ত সব্বাই খায়। গুরুপদবাবুও ঢের খেয়েচেন। তা হলে দেবদর্শন হবে না? নিতান্তই নিরাশ করবেন? আচ্ছা, তবে চল্লুম।

সত্য। প্রণাম মামাবাবু। হ্যাঁ, একটা কথা—আমি বলি কি, আপনার জামাইটি এখন মাস চার-পাঁচ টাইপ-রাইটিং শিখুক। একবারে আনাড়ি, তাকে ঢুকিয়ে দিয়ে আমিই সায়েবের কাছে অপদস্থ হব। নেক্সট্ ভেকান্সিতে বরং চেষ্টা করা যাবে।

গণেশ। আরে না না না। চাকরি একবার ফস্কে গেলে কি আর সহজে মেলে? না সত্য, লক্ষ্মী বাবা আমার, চাকরিটি করে দিতেই হবে। হ্যাঁ—কি বলছিলে? তুমি এখন গীতা টিতা পড়ে থাক? খুব ভাল। তা—হোমঘরে গেলে তেমন দোষ হবে না। একটু গঙ্গাজল মাথায় দিয়ে যেও,—দুগ্‌গানেই। আচ্ছা,—তাহলে জামাইটির কথা ভুলো না।

গণেশ-মামা তফাতে গেলে নিবারণ বলিল—"এখন পর্য্যন্ত ত বেশ আশাজনক বোধ হচ্চে, শেষ রক্ষা হলেই হয়। অমূল্য, হাবলা এরা সব এসেচে?

সত্য। হ্যাঁ, তারা দরবারে রয়েচে। ঠিক সময় হাজির হবে। আচ্ছা নিবারণ-দা, মামাবাবুর কিছু খবর আছে নাকি?

নিবারণ। ভগবান জানেন। তবে গুরুপদবাবু যতদিন সংসারে নির্লিপ্ত থাকেন, মামাবাবুর ততদিনই সুবিধে।

বিরিঞ্চি-বাবা সভা অলঙ্কৃত করিয়া বসিয়াছেন। তাঁর চেহারাটি বেশ লম্বা-চওড়া, গৌরবর্ণ মুণ্ডিত মুখ, সুপুষ্ট গালের আড়াল হইতে দুটি উজ্জ্বল চোখ উঁকি মারিতেছে। দু-পয়সা দামের সিঙ্গাড়ার মত সুবৃহৎ নাক, মৃদু হাস্যমণ্ডিত প্রশস্ত ঠোঁট, তার নীচে খাঁজে খাঁজে চিবুকের স্তর নামিয়াছে। স্বামীগিরির উপযুক্ত মূর্ত্তি। অঙ্গে গৈরিক-রঞ্জিত আলখাল্লা, মস্তকে ঐরূপে কাণ-ঢাকা টুপী। বয়স ঠিক পাঁচ হাজার বলিয়া বোধ হয় না, যেন পঞ্চাশ কি পঞ্চান্ন। বাবার বেদীর নীচে ডানদিকে ছোট মহারাজ কেবলানন্দ বিরাজ করিতেছেন। ইঁহার বয়স কয় শতাব্দী তাহা ভক্তগণ এখনো নির্ণয় করেন নাই, তবে দেখিতে বেশ জোয়ান বলিয়াই মনে হয়। ইনিও গুরুর অনুরূপ বেশধারী, তবে কাপড়টা সস্তাদরের। বেদীর নীচে বাঁ-দিকে শীর্ণকায় গুরুপদবাবু বেদীতে মাথা ঠেকাইয়া অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় আছেন, জাগ্রত কি নিদ্রিত বুঝিতে পারা যায় না। পাশের ঘরে মহিলাগণের প্রথম শ্রেণীতে একটি ষোল-সতের বছরের মেয়ে লাল সাড়ীর উপর এলো-চুল মেলিয়া বসিয়া আছে এবং মাঝে মাঝে গুরুপদবাবুর দিকে করুণনয়নে চাহিতেছে। সে বঁচকী, গুরুপদবাবুর কনিষ্ঠা কন্যা। ভক্তবৃন্দের অনেকে সটান লম্বা অবস্থায় উপুড় হইয়া যুক্তকর সম্মুখে প্রসারিত করিয়া পড়িয়া আছেন। অবশিষ্ট সকলে হাতজোড় করিয়া পা ঢাকিয়া বাবার বচনামৃত পানের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া আছেন।

সত্য ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া ভক্তমণ্ডলীর ভিতরে বসিয়া পড়িল। নিবারণ ছোট-মহারাজের বাধা অগ্রাহ্য করিয়া একবারে বিরিঞ্চি-বাবার পা জড়াইয়া ধরিল। বাবা প্রসন্ন হাস্যে বলিলেন—"চেনা চেনা বোধ হচ্চে।"

নিবারণ। অধমের নাম নিবারণচন্দ্র।

বিরিঞ্চি। নিবারণ? ও, এখন বুঝি তোমার ওই নাম? কোথা যেন দেখেছি তোমায়,—নেপালে? উঁহু, মুরশিদাবাদে। তোমার মনে থাকবার কথা নয়। জগৎশেঠের কুঠীতে, তার মায়ের শ্রাদ্ধের দিন। অনেক লোক ছিল,—রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রায়-রায়ান্ জানকীপ্রসাদ, নবাবের সিপাহ-সলার খান্-খানান্ মহব্বৎ জং, সুতোনুটির আমিরচন্দ—হিন্দিতে যাকে বলে উমিচাঁদ। তুমি শেঠজির

খাতাঞ্চি ছিলে, তোমার নাম ছিল—রোসো—মোতিরাম। উঃ, শেঠজি খুব খাইয়েছিল, কেবল সুতোনুটির বাবুদের পাতে মণ্ডা কম পড়ে, তারা গালাগাল দিয়ে চলে যায়। তা মোতিরাম, উঁহু—নিবারণচন্দ্র, তুমি ধূর্জ্জটি-মন্ত্র জপ করতে শেখ, তাতে তোমার সুবিধে হবে। রোজ ভোরে উঠেই একশ-আটবার বল্‌বে—ধূর্জ্জটি—ধূর্জ্জটি—ধূর্জ্জটি—খুব তাড়াতাড়ি। আচ্ছা, এখন বস গিয়ে।

নিবারণ পুনরায় পায়ের ধূলা লইল এবং তাহা চাটিবার ভাণ করিয়া ভক্তদের মধ্যে গিয়া বসিল।

নিতাইবাবু চুপি চুপি পরমার্থকে বলিলেন—"ব্যাপার দেখ্‌লে? নিবারণটা আসবামাত্র বাবার নজরে পড়ে গেল, আর আমি ব্যাটা দেড় ঘণ্টা হাঁ করে বসে আছি। একেই বলে বরাত। এইবার একবার উঠে গিয়ে পা জড়িয়ে ধরব, যা থাকে কপালে।"

যাঁরা ভূমিসাৎ হইয়া পড়িয়াছিলেন তাঁদের মধ্যে একটি স্থূলকায় বৃদ্ধ ছিলেন। তাঁর পরিধানে মিহি জরী-পাড় ধুতি, গিলে-করা আদ্ধির পাঞ্জাবি, তার ভিতর দিয়া মরু সোনার হার দেখা যাইতেছে। ইনি বিখ্যাত মুৎসুদ্দি গোবর্দ্ধন মল্লিক, সম্প্রতি তৃতীয় পক্ষ ঘরে আনিয়াছেন। গোবর্দ্ধনবাবু আস্তে আস্তে উঠিয়া করজোড়ে নিবেদন করিলেন—"বাবা, প্রবৃত্তিমার্গ আর নিবৃত্তিমার্গ এর কোন্‌টা ভাল?"

বাবা ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন—"ঠিক ঐ কথা তুলসীদাস আমায় জিজ্ঞেস করেছিল। আমরা আহার গ্রহণ করি। কেন করি? ক্ষুধা পায় বলে। কি আহার করি? অন্নব্যঞ্জন ফলমূল মৎস্য মাংসাদি। আহার করলে কি হয়? ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়। ক্ষুধা একটা প্রবৃত্তি, আহারে তার নিবৃত্তি। অতএব ভোগের মূলে হচ্চে প্রবৃত্তি, ভোগের ফল হচ্চে নিবৃত্তি। তুলসী ছিল সন্ন্যাসী। আমি বল্লুম—বাপু, ভোগ না হলে ত তোমার নিবৃত্তি হবে না। তার রামায়ণ লেখা শেষ হলে তাকে রাজা মানসিং করে দিলুম। অনেক বিষয়-সম্পত্তি করেছিল, কিন্তু কিছু রইল না। তার ব্যাটা জগৎসিংহ বাঙালীর মেয়ে বে করে সমস্ত উড়িয়ে দিলে। বঙ্কিম তার বইএ সেকথা আর লেখেনি।

ব্যারিষ্টার ও-কে-সেন বলিলেন—"ওয়াণ্ডার ফুল!"

নিতাইবাবু আর থাকিতে পারিলেন না। ছুটিয়া গিয়া বাবার সম্মুখে গলবস্ত্র হইয়া বলিলেন—"দয়া কর প্রভু!"

বাবা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"কি চাই তোমার?"

নিতাইবাবু থতমত খাইয়া বলিলেন—"নাইন্টিন ফোর্টিন।"

সত্যব্রতের একটা মহৎ রোগ—সে হাসি সামলাইতে পারে না। সে নিজে বেশ গম্ভীর হইয়া পরিহাস করিতে পারে, কিন্তু অপরের মুখে অদ্ভুত কথা শুনিলে তার গাম্ভীর্য্য-রক্ষা কঠিন হয়। হাস্য দমনের জন্য সত্য একটি মুষ্টিযোগ ব্যবহার করিয়া থাকে। গুরুজনের সমক্ষে হাসির কারণ উপস্থিত হইলে সে কোনো ভয়াবহ অবস্থার কল্পনা করে। তবে সব সময় তাতে উপকার হয় না।

বিরিঞ্চি-বাবা বলিলেন—"নাইন্টিন ফোর্টিন? সে কি?"

নিবারণ চুপি চুপি বলিল—"ওয়ান-নাইন-ওয়ান-ফোর, ক্যালকাটা। নো রিপ্লাই? ট্রাই এগেন মিস্।"

সত্যব্রত ধ্যান করিতে লাগিল—ছুতার মিস্ত্রি তার পিঠের উপর রাঁদা চালাইতেছে। চোকলা চোকলা চামড়া উঠিয়া যাইতেছে। ওঃ সে কি অসহ্য যন্ত্রণা!

নিতাইবাবু বলিলেন—"সাতটি দিনের জন্যে আমায় লড়ায়ের আগে নিয়ে যান বাবা, সস্তায় লোহা কিনব,—দোহাই বাবা!"

বিরিঞ্চি। তোমার কি করা হয়?

নিতাই। আজ্ঞে ভলচার ব্রাদার্সের আপিসে লেজার-কিপার, কুল্লে দেড়শ টাকা মাইনে, সংসার চলে না।

বিরিঞ্চি। ষড়ৈশ্বর্য্য সস্তায় হয় না বাপু, কঠোর সাধনা চাই। মূলাধার চক্রে ঠেলা দিয়ে কুলকুণ্ডলিনীকে আজ্ঞা-চক্রে আনতে হবে, তারপর তাকে সহস্রার পদ্মে তুলতে হবে। সহস্রারই হচ্চেন সূর্য্য। এই সূর্য্যকে পিছু হাঁটাতে হবে। সূর্য্যবিজ্ঞান আয়ত্ত না হলে কালস্তম্ভ করা যায় না। তাতে বিস্তর খরচ,—তোমার কর্ম্ম নয়। তুমি আপাতক কিছুদিন মার্ত্তণ্ড-মন্ত্র জপ কর। ঠিক দুকুর বেলা সূর্য্যের দিকে চেয়ে একশ আটবার বল্‌বে—মার্ত্তণ্ড-মার্ত্তণ্ড-মার্ত্তণ্ড,—খুব তাড়াতাড়ি। কিন্তু খবরদার,

চোখের পাতা না পড়ে, জিভ জড়িয়ে না যায়,—তা'হলেই মরবে।

নিতাইবাবু বিরস বদনে ফিরিয়া আসিলেন।

বিরিঞ্চি-বাবা বলিলেন—"ধন-দৌলৎ সকলেই চায়, কিন্তু উপযুক্ত পাত্রে পড়া চাই। এই নিয়েই ত যিশুর সঙ্গে আমার ঝগড়া। যিশু বল্‌ত, ধনীর কখনো স্বর্গ-রাজ্য লাভ হবে না। আমি বলতুম—তা কেন? অর্থের সদ্‌ব্যবহার করলেই হবে। আহা, বেচারা বেঘোরে প্রাণটা খোয়ালে।"

মিষ্টার সেন সবিস্ময়ে বলিলেন—"এক্স্‌কিউজ মি প্রভু, আপনি কি জিসস্‌ ক্রাইষ্টকে জানতেন?"

বিরিঞ্চি। হাঃ হাঃ, যিশু ত সেদিনকার ছেলে।

মিষ্টার সেন। মাই ঘড!

"মাই ঘড্‌"

(সত্যের কাণের ভিতর গঙ্গাফড়িং, নাকের ভিতর গুবরে পোকা—কুরিয়া কুরিয়া খাইতেছে।)

মিষ্টার সেন নিবারণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইনি তা হলে গৌটামা বুড্‌ঢাকেও জানতেন?"

নিবারণ। নিশ্চয়। গৌতম বুদ্ধ কোন্‌ ছার, প্রভু মনু-পরাশরের সঙ্গে এক ছিলিমে গাঁজা খেতেন। সব্বার সঙ্গে ওঁর আলাপ ছিল। ভগীরথ, টুটেন খামেন, নেবু-চাড-নাজার, হাম্মুরাব্বি, নিওলিথিক ম্যান, পিথে-কান্থ্রোপস্‌ ইরেক্টস্‌, মায় মিসিং লিঙ্ক।

মিষ্টার সেন চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন—"মাঃই!"

(সাতটা বাঘ সত্যর পিছনে তাড়া করিয়াছে। সামনে তিনটা ভালুক থাবা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে।)

বিরিঞ্চি-বাবা কহিলেন—"একবার মহাপ্রলয়ের পর বৈবস্বত আমায় বল্লে—নীল-লোহিত কল্পে কি? না, শ্বেতবরাহ কল্প তখন সবে সুরু হয়েচে। বৈবস্বত বল্লে—মানুষ ত সৃষ্টি কল্লুম, কিন্তু ব্যাটারা দাঁড়াবে কোথা, খাবে কি?—চারদিকে জল থৈ থৈ করচে। আমি বল্লুম—ভয় কি বিবু, আমি আছি, সূর্য্যবিজ্ঞান আমার মুঠোর মধ্যে। সূর্য্যের তেজ বাড়িয়ে দিলুম, চোঁ করে জল শুখিয়ে গেল, বসুন্ধরা ধন-ধান্যে ভরে উঠ্‌ল। চন্দ্র-সূর্য্য চালাবার ভার আমারই ওপর কিনা।"

মিষ্টার সেন কেবল মুখব্যাদান করিলেন।

সত্য মরিয়া গিয়াছে। পঞ্জাব মেলের সঙ্গে দার্জ্জিলিং মেলের কলিশন—রক্তারক্তি—পিসীমা—

কিছুতেই কিছু হইল না। পুঞ্জীকৃত হাসি সত্যব্রতের চোখ নাক মুখ ফাটিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিল। সত্য তখন নিরুপায় হইয়া বিপুল চেষ্টায় হাসিকে কান্নায় পরিবর্ত্তিত করিল এবং দু হাতে মুখ ঢাকিয়া ভেউ ভেউ করিয়া উঠিল।

বিরঞ্চি-বাবা বলিলেন—"কি হয়েচে, কি হয়েচে—আহা, ওকে আস্‌তে দাও আমার কাছে।"

সত্য নিকটে গিয়া বলিল—"উদ্ধার কর বাবা, মানব জন্মে ঘেন্না ধরে গেছে। আমায় হরিণ করে সেই ত্রেতা যুগে কণ্ব মুনির আশ্রমে ছেড়ে দাও বাবা। অর্থ চাই না, মান চাই না, স্বর্গও চাই না। শুধু চাট্টি কচি ঘাস, শকুন্তলার নিজের হাতে ছেঁড়া। আর এক জোড়া বড় শিং দিও প্রভু, দুষ্মন্তটাকে যাতে গুঁতিয়ে দিতে পারি।"

নিবারণ বেগতিক দেখিয়া বলিল—"ছেলেটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে বাবা। বিস্তর শোক পেয়েচে কিনা।"

ঘড়িতে সাতটা বাজিল। দৈনিক পদ্ধতি অনুসারে এই সময় বিরিঞ্চি-বাবা হঠাৎ তুরীয় অবস্থাপ্রাপ্ত হইলেন। তিনি চক্ষু বুঁজিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া রহিলেন, কেবল তাঁর ঠোঁট দুটি ঈষৎ নড়িতে লাগিল। মাম্মবাবু, চেলা-মহারাজ এবং দুইজন ভক্ত বাবার শ্রীবপু চ্যাংদোলা করিয়া

সাধনকক্ষে লইয়া গেলেন। সভা আজকার মত ভঙ্গ হইল। ভক্তগণ ক্রমশঃ বিদায় হইতে লাগিলেন।

নিতাইবাবু বলিলেন—"বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই কুলোপানা চক্কর। এ রকম বাবাজি আমার পোষাবে না। ক্ষ্যামতা যদি থাকে তবে দুচারটে নমুনা দেখানা বাপু, তা নয়, সত্যযুগে কি করেছিলেন তারই ব্যাখ্যান। চল পরমার্থ, সাতটা কুড়ির ট্রেন এখনো পাওয়া যাবে। নিবারণ আর সতেটার খোঁজে দরকার নেই। তারা নিজের নিজের পথ দেখ্‌বে। দেখ পরমার্থ, কাল না হয় মিরচাই-বাবার কাছেই নিয়ে চল।"

সত্যব্রত বুঁচকীকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া বলিল—"দেখুন, একটু চা খাওয়াতে পারেন? নিবারণ-দাও আসবে এখনি। ওঃ, গলাটা বড্ড চিরে গেছে।"

বুঁচ্‌কী বলিল—"চিরবে না?—যা চেঁচাচ্ছিলেন! জল চড়িয়ে দিচ্চি, বসুন একটু। আচ্ছা, আমার বাবার সামনে কি কাণ্ডটা করলেন বলুন ত? কি ভাববেন তিনি?"

সত্য মনে মনে বলিল, তোমার বাবা ত বেহুঁস ছিলেন। প্রকাশ্যে বলিল—"একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেচি, নয়? ভারি অন্যায় হয়ে গেছে, আর কখ্‌খনো অমন হবে না। আপনার বাবার কাছে মাফ চেয়ে তাঁকে খুশী করে তবে বাড়ী ফিরব।"

বুঁচ্‌কী। বাবার আবার খুশী-অখুশী। বেঁচে আছেন এই পর্য্যন্ত, কে কি করচে বলচে তা জানতেও পারচেন না।

সত্য। থাকবে না, এমন দিন থাকবে না। আপনি দেখে নেবেন।—ওই যে, নিবারণ-দা আসচে।

রাত্রি ন'টা। হোম আরম্ভ হইয়াছে। ভক্তের দল পূর্ব্বেই বিদায় হইয়াছে, হোমঘরে আছেন কেবল বিরিঞ্চি-বাবা, গুরুপদবাবু, বুঁচ্‌কী, মামাবাবু, নিবারণ, সত্যব্রত এবং গোবর্দ্ধনবাবু। ইনি একজন বিশিষ্ট ভক্ত, বাবার জন্য তেতলা আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ঘরটি ছোট, দরজা-জানালা প্রায় সমস্তই বন্ধ, প্রবেশের পথ মামাবাবু আগলাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ছোট-মহারাজ অর্থাৎ কেবলানন্দ, বাবার নৈশ-আহার চরু প্রস্তুত করিবার জন্য অন্যত্র ব্যস্ত আছেন। ঘরটি অন্ধকার, একটি মাত্র ঘৃত প্রদীপ মিট্‌ মিট্‌ করিতেছে। বিরিঞ্চি-বাবা যোগাসনে ধ্যানমগ্ন, সম্মুখে হোমকুণ্ড। পিছনে গুরুপদবাবু ও তাঁর কন্যা উপবিষ্ট। তাঁদের একপাশে নিবারণ ও সত্যব্রত, অপর পাশে গোবর্দ্ধনবাবু বসিয়া আছেন।

অনেকক্ষণ ধ্যানস্থ থাকিয়া বিরিঞ্চি-বাবা কোষা হইতে জল লইয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিলেন। ঘৃত প্রদীপ নিবিয়া গেল। হোমাগ্নির শিখা নাই, কেবল কয়েকখণ্ড অঙ্গার আরক্ত হইয়া আছে। বিরিঞ্চি-বাবা তখন মুখের উপর হাত কাঁপাইয়া ভীষণ গালবাদ্য আরম্ভ করিলেন। সেই গম্ভীর বু-বু-বু-বু নিনাদে ক্ষুদ্র গৃহ কম্পিত হইতে লাগিল।

সত্যব্রত বুঁচকীর কাণে কাণে বলিল—"বুঁচু, ভয় কচ্চে?" বুঁচকী বলিল—"না।"

সহসা হোমকুণ্ড হইতে নীলাভ অগ্নিশিখা নির্গত হইল। সেই ক্ষীণ অস্পষ্ট আলোকে সকলে দেখিলেন—মহাদেবই ত বটে!—হোমকুণ্ডের পশ্চাতে ব্যাঘ্রচর্ম্মধারী হাড়-মালা-বিভূষিত পিনাকডমরুপানি ধবলকান্তি দন্তুরমত্ত মহাদেব।

গুরুপদবাবু নির্ব্বাক নিশ্চল। গোবর্দ্ধন মল্লিক তাঁর কারবার এবং তৃতীয়পক্ষ সংক্রান্ত অভাব অভিযোগ করুণ স্বরে দেবাদিদেবকে নিবেদন করিতে লাগিলেন। গণেশ-মামা শিবস্তোত্র আবৃত্তি করিতে লাগিলেন,—যেটি তাঁর ছোট মেয়ে মহাকালী পাঠশালায় শিখিয়াছে।

সত্যব্রত নিবারণকে চুপিচুপি বলিল—"এইবার।" নিবারণ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল—"বম্‌ বাবা মহাদেব!"

একটু পরে হঠাৎ বাহিরে একটা কলরব উঠিল। তারপর চীৎকার করিয়া কে বলিল—"আগ লাগা হ্যায়।"

বিরিঞ্চি-বাবার গালবাদ্য থামিল। তিনি চঞ্চল হইয়া ইতস্ততঃ চাহিতে লাগিলেন। মামাবাবু ব্যস্ত হইয়া বাহিরে গেলেন।

"আগুন—আগুন—বেরিয়ে আসুন শীগ্‌গির—" ঘন ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া ঘরে ঢুকিতে লাগিল। বিরিঞ্চি-বাবা এক লাফে গৃহত্যাগ করিলেন। গোবর্দ্ধনবাবু চীৎকার করিতে করিতে বাবার পদানুসরণ করিলেন। বুঁচকী পিতার হাত ধরিয়া বলিল—"বাবা, বাবা, ওঠ!" নিবারণ কহিল—"এখন যাবেন না, একটু বসুন, কোনো ভয় নেই।"

মহাদেবের টনক নড়িল। তিনি উসখুস্ করিতে লাগিলেন। নিবারণ একটা বাতি জ্বালিল। মহাদেব পিছনের দরজা দিয়া পলায়নের উপক্রম করিলেন—অমনি সত্যব্রত জাপ্‌টাইয়া ধরিল।

মহাদেব বলিলেন—"আঃ, ছাড়—ছাড় লাগে, মাইরি এখন ইয়ার্কি ভাল লাগে না—চাদ্দিকে আগুন—ছেড়ে দাও বলচি।"

সত্যব্রত বলিল—"আরে অত ব্যস্ত কেন। একটু আলাপ পরিচয় হোক। তারপর ক্যাবলরাম, কদ্দিন থেকে দেবতাগিরি করা হচ্চে?"

"আঃ ছাড়—ছাড়—লাগে"

বাহির হইতে দু-চারজন লোক হোমঘরে প্রবেশ করিল। ফেকু পাঁড়ের জিম্মায় কেবলানন্দকে দিয়া নিবারণ ও সত্যব্রত বিস্ময়বিমূঢ় গুরুপদবাবু ও তাঁর কন্যাকে বাহিরে আনিল।

বাড়ীতে আগুন লাগে নাই। পাশের ঘরে খানিকটা ভিজা-খড় কে জ্বালাইয়া দিয়াছিল। দরোয়ান, মৌলভি সাহেব, কোচমান এবং অমূল্য হাবলা প্রভৃতি সত্যব্রতের অনুচরবৃন্দ মিথ্যা হল্লা করিয়াছে।

বিরিঞ্চি-বাবা ভাঙেন কিন্তু মচ্‌কান না। বলিলেন—"কেমন গুরুপদ, এখন আশা মিট্‌ল ত? যে নাস্তিক তার দিব্যদৃষ্টি হবে কেন? তাই তোমার কপালে দেবতা দেখা দিয়েও দিলেন না। শেষটায় মানুষের মূর্ত্তি ধরে বিদ্রূপ করলেন।"

সত্যব্রত বলিল—"বিদ্রূপ ব'লে বিদ্রূপ! মহাদেব পচে গিয়ে বেরুল ক্যাব্‌লা। বিরিঞ্চি-বাবা হয়ে গেলেন জোচ্চোর।"

গোবর্দ্ধনবাবু বলিলেন—"ব্যাটা আমার সঙ্গে চালাকি? গোবর্দ্ধন মল্লিক পাঁচটা হৌসের মুচ্ছুদ্দি, বড় বড় ইংরেজ চরিয়ে খায়,—তাকে তুমি ঠকাবে? মারো শালেকো দুই থাব্‌ড়া।"

গুরুপদবাবু এতক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। বলিলেন—"না না, যেতে দাও, যেতে দাও। সত্য, গাড়ীটা জুতিয়ে এঁদের ষ্টেশনে পাঠাবার ব্যবস্থা কর। কেউ যেন কিছু না বলে।"

তল্পিতল্পা গুছানো হইলে সত্য সশিষ্য বিরিঞ্চি-বাবাকে

গাড়ীতে তুলিয়া দিল। বিদায়কালে বলিল—"প্রভু, তাহলে নিতান্তই চল্লেন? চন্দ্র-সূর্য্য আপনার জিম্মায় রইল, দেখবেন যেন ঠিক চলে। দম দিতে ভুলবেন না, আর মধ্যে মধ্যে অয়েল করবেন।"

ভিড় কমিলে গুরুপদবাবু বলিলেন—"বাবা নিবারণ, বাবা সত্য, তোমরা আমায় রক্ষা করেচ,—এ উপকার আমি ভুলব না। আজ তোমরা এখানেই খাওয়া-দাওয়া করে থাক, অনেক রাত হয়েচে।—একি সত্য, তোমার হাতে রক্ত কেন?"

সত্য। ও কিছু নয়, ধস্তাধস্তির সময় মহাদেব একটু কাম্‌ড়ে দিয়েছিলেন। আপনি ব্যস্ত হবেন না, বিশ্রাম করুন গিয়ে।

গুরুপদ। তবে তুমি আমার সঙ্গে এস, বুঁচ্‌কী অল্প টিংচার আয়োডিন দিয়ে বেঁধে দেবে এখন।

আহারান্তে সত্য বলিল—"ওঃ, কি মুস্কিলেই পড়া গেছে।"

নিবারণ বলিল—"আবার কি হল রে?"

সত্য। নিবারণ-দা!

নিবারণ। বল্ না কি।

সত্য। নিবারণ-দা!

নিবারণ। বলেই ফেল্ না কি।

সত্য। আমি বুঁচ্‌কীকে বে করব।

নিবারণ। তা'ত বুঝ্‌তেই পারচি। কিন্তু তোর সঙ্গে বিয়ে যদি না দেয়?

সত্য। আলবৎ দেবে, বুঁচ্‌কীর বাপ দেবে।

নিবারণ। বাপ না হয় রাজি হল, কিন্তু মেয়ে কি বলে?

সত্য। বড্ড গোলমেলে জবাব দিচ্চে।

নিবারণ। কি বল্লে বুঁচ্‌কী?

যাঃ

সত্য। বল্লে—যাঃ।

নিবারণ। দূর্ গাধা, যাঃ মানেই হ্যাঁঃ।

মনের পরশ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(১০)
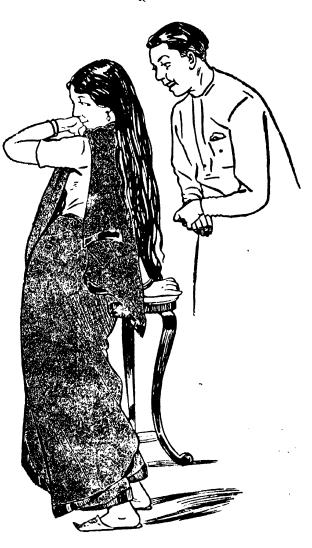
ডাক্তার ব'লে গেলেন যে ভবিষ্যতে আর এরূপ উত্তেজিত হলে মিষ্টার স্মিথের হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হ'য়ে যেতে পারে। এবার তিনি ভাগ্যবলে বেঁচে গেছেন বটে, কিন্তু মাস দুই সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে।

মিষ্টার স্মিথ আপিস থেকে ছুটি নিলেন। সমস্ত দিনই তিনি বাড়ী ব'সে থাক্‌তেন, কেবল সন্ধ্যার সময়ে একবার হাম্‌ষ্টেড হীথে ধীরে ধীরে বেড়িয়ে আস্‌তেন। বেশি চলাফেরা করলেই তাঁর বুকের বেদনা বেড়ে যেত।

দশ বার দিনের মধ্যে তিনি সুস্থ হ'য়ে উঠ্‌লেন। কিন্তু দুর্ব্বলতা গেল না। পল্লবকে তিনি প্রায়ই ডেকে পাঠাতেন ও ধীরে ধীরে নানা বিষয়ে তার সঙ্গে গল্পালাপ কর্‌তেন। পল্লব সতর্ক থাক্‌ত যাতে যুদ্ধের প্রসঙ্গ না ওঠে। কিন্তু তার আপত্তি সত্ত্বেও মিষ্টার স্মিথ মাঝে মাঝে যুদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা উত্থাপন কর্‌তেন। পল্লবের অবশ্য এ প্রসঙ্গে নানা কথা জান্‌বার কৌতূহলের কমি ছিল না, কিন্তু তবু সে ভয় পেত পাছে মিষ্টার স্মিথ আবার উত্তেজিত হ'য়ে ওঠেন। মিষ্টার স্মিথ ম্লান হেসে তাকে প্রায়ই এই ব'লে রগড় কর্‌তেন যে তাঁর জীবনের আর কটা দিন! তাই যদি দুদিন আগেই শেষদিন ঘনিয়ে আসে তবে তাতেই বা ক্ষতি কি?

মিষ্টার স্মিথ যে স্ত্রীর বা কন্যার কাছ থেকে সহানুভূতি না পাওয়ার দরুণই এতটা হতাশভাবে কথা বল্‌তেন তা পল্লব বুঝ্‌ত। কাজেই পল্লব মিষ্টার স্মিথের আক্ষেপের উত্তরে যে কি বল্‌বে ভেবে পেত না।

বেশির ভাগ লোকেই অবশ্য সংসারে নারীর কাছ থেকে স্নেহ ও সেবা ছাড়া অন্য বিশেষ কিছু পাবার আশা রাখে না। কিন্তু মিষ্টার স্মিথ সে শ্রেণীর লোক ছিলেন না। তিনি স্ত্রীকন্যার কাছ থেকে তাঁর উদার মতামতের সহানুভূতিরও দাবী-দাওয়া রাখ্‌তেন ব'লে এ আশা পূরণের অভাবে ব্যথিত না হ'য়েই পার্‌তেন না। অথচ এরূপ ট্রাজিডিতে অপরের মৌখিক সান্ত্বনা দিতে যাওয়াও বিড়ম্বনা।

তিনি সেদিন রাত্রে অসুস্থ হ'য়ে পড়ার পর থেকে স্ত্রীর সাম্‌নে কখনও পল্লবের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহ নিয়ে আলোচনা কর্‌তেন না। পল্লব বুঝ্‌ত যে স্ত্রীকে নিজমতে টেনে আনা বিষয়ে তিনি এখন সত্য সত্যই হাল ছেড়ে দিয়েছেন। সেই নিরাশার প্রতিক্রিয়ার জন্যই হোক্‌ বা পল্লবের কাছ থেকে সহানুভূতি পেতেন ব'লেই হোক্‌, তিনি পল্লবকে একলা পেলে মাঝে মাঝে নিজের অনেক সুখদুঃখের কথাই বল্‌তেন। পল্লবের বরাবরই ধারণা ছিল যে ইংরাজ জাতি বড় চাপা। কিন্তু মিসেস নর্টন, মিষ্টার টমাস ও মিষ্টার স্মিথের সঙ্গে একটু নিকট-সংস্পর্শে আসার পর থেকে তার মনে হ'ত যে হয়ত বস্তুতঃ তার ধারণা ভ্রান্ত। কারণ অন্ততঃ সে যে বৎসর-খানেকের মধ্যেই দু তিন জনের একটু মনের নাগাল পেয়েছিল, একথা ত আর সে অস্বীকার কর্‌তে পারে না! তাই সে ভাব্‌ত যে হয়ত একটু কাছ থেকে মেশ্‌বার চেষ্টা কর্‌লে এমন কি ভারতীয়ের পক্ষেও ইংরাজকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে পাওয়া অসম্ভব না হ'তে পারে। কিন্তু তবু সে মিষ্টার স্মিথের সাদর গল্পালাপের আমন্ত্রণকে একটু অবিশ্বাসের চোখে দেখত। নিজের মনেরও ক্ষুদ্রতার সঙ্গে সে তর্ক করতে ছাড়্‌ত না বটে, কিন্তু তাতে তার মনের সংশয়ের ভাব বিশেষ কাট্‌ত না।

অসুস্থ অবস্থায় মানুষের মস্তিষ্ক অনেক সময়ে বেশি সজাগ থাকে। পল্লব ভাবে-ভঙ্গীতে তার অবিশ্বাসের ভাবকে প্রকাশ না করলেও মিষ্টার স্মিথের বুঝতে বেশি দেরি হয় নি যে পল্লব তাঁর আহ্বানকে একটু দূরে দূরে রাখবার চেষ্টা কর্‌ছে। শেষটা একদিন তিনি পল্লবকে কারণ জিজ্ঞাসা করে বস্‌লেন।

এ খোলাখুলি প্রশ্নে পল্লব যে প্রথমটায় একটু বিব্রত বোধ না ক'রেই পারেনি সেটা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু

বস্তুতঃ সে নিজে খোলাখুলি ব্যবহারেরই পক্ষপাতী ছিল ব'লে একটু ইতস্ততঃ ক'রেই অস্পষ্টভাবে উত্তর দিল যে, চাপা প্রকৃতি ইংরাজের মনটি ভাল ক'রে না বুঝে হৃদ্যতা করতে যাওয়াটা হয়ত বিদেশীর পক্ষে খুব সমীচীন নয়।

মিষ্টার স্মিথ এ উত্তরে প্রথমটায় যেন একটু আশ্চর্য্য হ'লেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ সরল উত্তরে তিনি যে খুসীও হয়েছিলেন, সেটা পল্লবের চোখ এড়ায় নি। তিনি বল্লেন :—

"আমরা সত্য সত্যই যে চাপা প্রকৃতির লোক, তা নয় মিষ্টার বাক্‌চি। তবে কি জানেন? আমাদের বিদেশীর সঙ্গে মিশতে একটু সময় লাগে। কিন্তু একবার প্রথম পরিচয়ের আড়ষ্ট ভাবটা যদি বিদেশী অপনীত কর্‌বার ভার নেয়, তাহ'লে আমরা খুব মিশতে পারি। আপনাকে একটা গল্প বলি শুনুন।

"যুদ্ধের সময় আমার এক বন্ধু আহত ও বন্দী হ'য়ে বার্লিনে একটি হাসপাতালে মাস তিনেক শয্যাগত ছিলেন। এক জার্ম্মাণ ডাক্তার তাঁকে দেখতে আস্‌তেন। ডাক্তারটি বড় ভাল লোক ছিলেন। তিনি বন্ধুবরের সঙ্গে রোজই একটু ক'রে আলাপ পরিচয় করার চেষ্টা পেতেন। কিন্তু আমার বন্ধুবরের বরাবরই মস্ত অভিমান ছিল যে, তিনি মনেপ্রাণে খাঁটি ইংরেজ ; অর্থাৎ কি না—দেশভক্ত, গর্ব্বিত ও বিজাতিবিদ্বেষী।"

ব'লে মিষ্টার স্মিথ একটু সবিদ্রূপ হাস্‌লেন। সে হাসির সঙ্গে একটু তিক্ততারও আমেজ ছিল।

"তার ওপর তিনি বন্দী। কাজেই ডাক্তার সাহেবের ভাব করার সরল চেষ্টায় তিনি যে কি রকম সাড়া দিতেন, তা বোধ হয় বেশি করে বল্‌তে হবে না। ডাক্তারটি এতে দুঃখিত হ'তেন, কিন্তু তাঁর সদয় প্রশ্নাবলীর উত্তরে বন্ধুবরের নীরবতা বা 'হাঁ না' রূপ ছোট ছোট উত্তরের রূঢ়তা তিনি গায়ে মাখ্‌তেন না।

"একদিন শীতের সায়াহ্নে বন্ধুবর ঘুমোচ্ছিলেন। হঠাৎ গায়ের কম্বলের ওপর একটি হস্তস্পর্শেই তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। গৃহচুল্লী (fireplace) থেকে ছোট একখণ্ড জলন্ত কাঠ হঠাৎ তাঁর কম্বলের ওপর এসে প'ড়েছিল। ডাক্তার সাহেব তাড়াতাড়ি সেটি সরাতে গিয়ে হাতের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী পুড়িয়ে ফেলেন। "উঃ" ব'লে তাড়াতাড়ি হাতটি সরিয়ে নেবার সময় তাঁর হাতের কনুইটি কেমন ক'রে বন্ধুবরের গায়ে লেগে যায়। বন্ধুবর জেগে ওঠ্‌বামাত্র 'উঃ' শব্দটি শুন্‌তে পান। এ সামান্য ঘটনাটি তাঁকে যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল যে, জর্ম্মাণ ডাক্তারটি কত সহৃদয়, ও তিনি তাঁর সহৃদয় ব্যবহারের প্রতিদানে এতদিন কি বর্ব্বরের মতনই ব্যবহার না ক'রে এসেছেন! অথচ ডাক্তার মহোদয় এজন্য একবারও তাঁর কাছে অনুযোগ করেন নি, বা একদিনও তাঁর প্রতি স্নেহের পরিবর্ত্তে অবজ্ঞা প্রকাশ করেন নি—যেটা করা তাঁর পক্ষে খুবই সহজ ও স্বাভাবিক ছিল। দৃশ্যতঃ একটা সামান্য ঘটনাও মানুষকে অনেক সময়ে কি আশ্চর্য্য রকম বদ্‌লে দিয়ে থাকে মিষ্টার বাক্‌চি! সেইদিন থেকে আমার বন্ধুবর যেন আর একটা মানুষ হ'য়ে গেলেন ও সেইদিন থেকে যাকে বলে the ice was broken. তার পর ক্রমে জার্ম্মাণ ডাক্তারটির সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মায়। আজও তাঁরা পরস্পরকে স্নেহপূর্ণ চিঠিপত্র লেখেন।"

একটু দম নিয়ে মিষ্টার স্মিথ আবার বল্‌তে লাগ্‌লেন : "আমি এ দৃষ্টান্তটি দিলাম শুধু এই কথাটি বোঝাতে যে বিদেশীর সঙ্গে বন্ধুত্ব কর্‌তে হয়ত আমাদের অন্য জাতির চেয়ে দেরি হয়। কিন্তু যখন করি, তখন আমরা মন খুলেই বন্ধুত্ব করি। তবে এ সূত্রে আরও একটা কথা ভেবে দেখুন মিষ্টার বাক্‌চি, যে কত সময়েই না আমরা শত্রুকে দানব শয়তান প্রভৃতি ভেবে মানুষের মনুষ্যত্বের অপমান করে থাকি! যুদ্ধের সময়ে বন্দী হ'য়েছিলেন এমন অনেক ইংরাজ ও ফরাসী সৈনিকের কাছে আমি শুনেছি যে, তারা জার্ম্মাণ প্রহরীদের কাছে যেমন অনেক ক্ষেত্রে মন্দ ব্যবহার পেয়েছে তেম্‌নি অনেক ক্ষেত্রে আবার ভাল ব্যবহারও পেয়েছে। অথচ আমরা শত্রুকে 'পাষণ্ড', 'দানব', 'মনুষ্যনামের কলঙ্ক' প্রভৃতি বিশেষণে বর্ণনা করার সময়ে তাদের ভাল দিক্‌টা তোফা ভুলে গিয়ে মন্দ দিক্‌টাকেই চতুর্গুণ বড় ক'রে দেখি। অথচ আশ্চর্য্য এই যে নির্জ্জলা মিথ্যা ও সস্তা আত্মপ্রবঞ্চনার সাহায্যে শত্রুকে হেয় প্রতিপন্ন করতে যাওয়ার সময়ে একবারও ভাবি না যে এতে ক'রে নিজের মনুষ্যত্বের খুব পরাকাষ্ঠা দেখানো হয় না। নয় কি মিষ্টার বাক্‌চি?"

পল্লবের এ সব কথা ভারি ভাল লাগত। কারণ তার

তরুণ মনটি আদর্শবাদের সমর্থক যুক্তি পেলে যেমন খুসি হ'ত তেমন আর কিছুতে হ'ত না। তাই যুদ্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে দুপক্ষের নিষ্ঠুরতা ও হিংসার দৃষ্টান্তের চেয়ে তাদের প্রীতি, সদ্‌গুণ ও দয়ামায়ার উদাহরণগুলিই সে বেশি মন দিয়ে শুন্‌ত। এবং তা থেকে মানুষের দেবত্বটাই বড় জিনিষ, পশুত্বটাই অজ্ঞানতার ফল—শিক্ষা হ'লেই লোপ পাবে—ইত্যাদি সান্ত্বনায় মনকে ভোলাতে চেষ্টা কর্‌ত। তবে তার আশ্চর্য্য মনে হ'ত যে এ সব তথ্য স্বামীর কাছ থেকে প্রায়ই শোনা সত্ত্বেও মিসেস্ স্মিথ কেন তাঁর বিজাতি-বিদ্বেষ ও জাতীয় সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ কর্‌তে পেরে ওঠেন নি।

সে একদিন এ সব কথা সবিস্তারে মিষ্টার টমাসকে লিখে তার বিস্ময় জ্ঞাপন করেছিল। উত্তরে মিষ্টার টমাস তাকে লিখেছিলেন, "মানুষ একই ঘটনা থেকে তার প্রকৃতি ও প্রবণতা অনুসারে সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারে ও অনেক সময়েই পৌঁছিয়ে থাকে দেখা যায়। আমার এক লিথুয়ানিয়ান ও রুষ বন্ধু এক সঙ্গেই যুদ্ধ ক'রেছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন আমাকে ব'লেছিলেন, ঈশ্বর ব'লে কিছু যে থাক্‌তেই পারে না সেটা যদি কিছুতে নিশ্চিতরূপে প্রমাণ হয় তবে সেটা হচ্ছে—এই বিগত যুদ্ধের হাহাকারের দৃশ্য।' আর একজন বল্‌লেন, 'ঈশ্বর যে আছেন তার যদি কেউ জলন্ত প্রমাণ চায় তবে যেন সে এই যুদ্ধের পাপের শাস্তির কথা ভেবে দেখে।' সুতরাং মিসেস স্মিথ যে মিষ্টার স্মিথের শত প্রমাণ সত্ত্বেও যুদ্ধ জিনিষটি মন্দ ব'লে মনে কর্‌তে পারেন নি তাতে বিস্মিত হ'য়ে লাভ কি? মানুষ অনেক সময়ে তার প্রকৃতি অনুসারেই সত্যকে কল্পনা ক'রে নিয়ে থাকে।"

কথাগুলি পল্লবকে স্পর্শ কর্‌ল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মন প্রশ্ন ক'রে বস্‌ল যে তাহ'লে সত্য ব'লে কি কিছু নেই?—অর্থাৎ বাস্তবিক এমন সত্য কি কিছু নেই যাকে বিশ্বজনীন বলা যেতে পারে? নইলে নিতান্ত নিকট বন্ধুদের মধ্যেই যদি সত্য সম্বন্ধে মূলগত মতভেদ থাকে তবে এ বিরাট্ জনবহুল জগতে সাম্য ও স্বাধীনতার নীতি প্রচারে কি বিষময় ফল ফল্‌বার সম্ভাবনাই বেশি হ'য়ে ওঠে না? এ প্রশ্নের উত্তরে তার আবার মনে হ'ত 'মতভেদ হ'লই বা! তাতে জগতে বৈচিত্র্য বাড়বে বৈ ত কম্‌বে না?' সেটা হয় ত বাঞ্ছনীয় বলেই জগতের নিয়মে এত বিরোধ ও মতভেদের বৈষম্য...কে জানে? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার তার মনটা ব'লে উঠ্‌ত যে বৈষম্যই যদি ক্রমে সত্য হয়, তাহ'লে সমাজ গ'ড়ে ওঠে কেমন ক'রে? অন্ততঃ গুটিকয়েক মূল বিষয়ে ত একমত হ'য়ে ওঠা দরকার! যেমন নৈতিক জগতে। অর্থাৎ নৈতিক শুভাশুভের ধারণা, আত্মসংযম.. কর্ত্তব্যবোধ...এ স- নইলেও ত সমাজের শুভ হ'তে পারে না? হায়, তখনও সে জান্‌ত না যে নৈতিক উচিত-অনুচিতের মাপকাটি তৈরি করা এত সহজ নয়;—যদিও তরুণ যৌবনের নিঃসংশয় আত্মবিশ্বাসের মোহে মানুষ সহজেই দুরূহতম জিনিষকেও নিতান্ত সুসাধ্য মনে ক'রে বসে। পল্লবের বরাবরই মনে হ'ত যে সুনীতির মাপকাটি স্থির করা বুঝি অতি সহজ। কিন্তু শীঘ্রই তার চোখের সাম্‌নে মানব-হৃদয়রাজ্যের এমন একটি বিচিত্র নাটক অভিনীত হ'য়ে গেল, যার অভিঘাতে তার মনের সুনীতি দুর্নীতির এমন অনেক ধারণাই টলমল ক'রে উঠ্‌ল যা সে এতদিন বরাবরই বিজ্ঞভাবে অনড় অচল মনে ক'রে এসেছিল। ব্যাপারটা একটু গোড়া থেকে বলা দরকার।

(১১)

মিষ্টার স্মিথের সঙ্গে তাঁর ঘ'রে ব'সে গল্পালাপ করার সময় পল্লবের মাঝে মাঝেই মিস স্মিথের সঙ্গে দেখা হ'ত। কারণ মিষ্টার স্মিথের অসুস্থতার দরুণ প্রায়ই তাঁর কাছে হয় মিসেস্ স্মিথ না হয় মিস স্মিথকে ব'সে থাক্‌তে হ'ত। মিসেস্ স্মিথকেই বেশিরভাগ ঘরকন্নার কাজ দেখ্‌তে শুন্‌তে হ'ত ব'লে মিস স্মিথ সম্প্রতি সিনেমার কাজ থেকে কিছু দিনের জন্য ছুটি নিয়েছিলেন। তিনি প্রায়ই পল্লব ও মিষ্টার স্মিথের গল্পালাপের সময় চুপ করে পিতার ড্রয়িংরুমের এক কোণে ব'সে উল বুন্‌তেন।

পল্লবের হঠাৎ একদিন মনে হ'ল যে সে প্রায়ই নীচে আসে শুধু যে মিষ্টার স্মিথের কাছে যুদ্ধের সম্বন্ধে গল্প শোনার জন্য তা নয়। তার নিজের কাছে হঠাৎ ধরা প'ড়ে গেল যে মিস স্মিথের সুন্দর মুখখানি ও চটুল চাহনি তাকে ক্রমশঃই আকৃষ্ট করাটাও তার ঘন ঘন নীচে আসার অন্যতম কারণ। নিজের মনের এই চাতুরী খেলার আবিষ্কারকে সে প্রথমটায় আমল দিতে রাজি না হ'লেও

শীঘ্রই সে দেখ্‌ল যে যেদিন ঘরের কোণে মিস' স্মিথ বসে উল না বুনতেন, সেদিন তার গল্পালাপের আগ্রহও যেন একটু মন্দা হয়ে আস্‌ত। তাছাড়া সে আরও লক্ষ্য কর্‌ল যে মিস স্মিথের নানারূপ প্রগল্‌ভতা, চকিত চাহনি প্রভৃতি—যাকে সে এতদিন নীতিবাগীশের মতন অন্যায় মনে ক'রে সুগম্ভীরভাবে শিরঃসঞ্চালন করে এসেছে—তার ক্রমশঃ আর তেমন বিসদৃশ মনে হ'ত না। শুধু তাই নয়—বরং যেন ভালই লাগ্‌ত। এমন কি তাঁর গালে রঙ মাখা ও প্রকাশ্যে সিগারেট খাওয়াও যেন তার সহ্য হয়ে আস্‌ছিল। এতে অবশ্য সময়ে সময়ে সে মনে মনে বড়ই বিস্ময় বোধ না ক'রেই পার্‌ত না, কারণ বিলেতে শিক্ষিতা মেয়েদের সিগারেট খাওয়ার প্রথাকে সে বরাবর বন্ধুমহলে সোৎসাহে নিন্দা করেই এসেছিল! কিন্তু তবু তার ক্রমশঃ মনে হ'তে লাগ্‌ল যে মিস স্মিথের সিগারেট খাওয়াটা যেন তেমন অশোভন দেখায় না যেমন অন্য মেয়েদের দেখায়! মনের পক্ষপাতের কি বিচিত্র গতি!

তার নিজের মনকে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া কর্‌বার সহজ প্রবণতা ছিল ব'লেই নিজের মধ্যে এ সব অসঙ্গতির প্রতি সে বেশিদিন চোখ বুঁজে থাক্‌তে পারে নি। তাই একটা সত্য তার কাছে ক্রমশঃই স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ছিল যে মিস স্মিথের সঙ্গে একটু আলাপ পরিচয় করার ইচ্ছাটা তার দিনদিনই যেন বেড়ে উঠ্‌ছিল। তার ভাগ্যবশতঃই হোক বা দুর্ভাগ্যবশতঃই হোক, সেদিন টেবিলে মিষ্টার স্মিথের পাশে ব'সে গল্প করার পর থেকে তাঁর সঙ্গে তার আলাপ করার সুযোগ আর হয় নি। কারণ হ'লে সে হয়ত এবার তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ক'রে বস্‌বার মতন সাহস খুঁজে পেত। মনে মনে সে এই সুযোগের কামনাও কর্‌ছিল; কিন্তু মিস স্মিথের সঙ্গে তার দেখা হ'ত কেবল তাঁর পিতার সাম্‌নে। সে শুনেছিল বটে যে বিলেতে মেয়েদের থিয়েটার বায়স্কোপ দেখ্‌তে নিমন্ত্রণ করা যায়। তাই এক একবার ভাবত মিস স্মিথকে কোনও থিয়েটারে নিমন্ত্রণ করলে বেশ হয়। তবে এরূপ ক্ষেত্রে কি ভাবে নিমন্ত্রণ করা যে শোভন ও দস্তর, সে সম্বন্ধে তার কোনই স্পষ্ট ধারণা ছিল না। কাজেই সে মিস স্মিথকে এক একদিন তার সঙ্গে থিয়েটার দেখ্‌তে যাবার নিমন্ত্রণ করার ইচ্ছা বোধ কর্‌লেও ঠিক্ সাহস পেত না। তাছাড়া সে শুনেছিল যে তরুণী সমাজে মেশার বিপদ্‌ও বড় কম নয়! তাই সে ভাব্‌ত, কাজ কি? কে কি বল্‌বে—কি রকম দেখাবে?...

কিন্তু এ সব সমীচীনতা বা শোভন-অশোভনের চিন্তাই যে তার মিস স্মিথের সঙ্গে মেলামেশার আকাঙ্ক্ষার সব চেয়ে বড় প্রতিবন্ধক ছিল তা বলা যায় না। তার সব চেয়ে বড় প্রতিষেধক ছিল বোধ হয় কুঙ্কুমের প্রভাব। কুঙ্কুমের একটা কথা তার প্রায়ই মনে হত, 'আগুন নিয়ে খেলা করা কিছু নয়।' পল্লব নিজে একটু রঙীন প্রকৃতির লোক হ'লেও কুঙ্কুমের সন্ন্যাসীর মতন চরিত্রের প্রভাব তার ওপর বড় কম হয় নি! সে এ প্রভাব হ'তে পরে জার্ম্মানিতে অনেকটা মুক্তিলাভ ক'রেছিল বটে, কিন্তু এখনও অবধি তার বেশির ভাগ সময় কুঙ্কুমের নিকট সাহচর্য্যে কেটে এসেছিল। তাই কোনও চিত্তাকর্ষিণী মেয়ের সঙ্গে মিশ্‌বার একটু ইচ্ছা হ'লেই তার নির্ম্মল ভাস্বর-চরিত্র বন্ধুর কথা মনে প'ড়ে যেত। এবারও মূলতঃ কুঙ্কুমের প্রভাবই তার ইতস্ততঃ ভাবের প্রধান কারণ হ'য়ে উঠেছিল।

কাজেই, যদিও সে অজ্ঞাতে ক্রমাগতই কুঙ্কুমের এ প্রভাব কাটিয়ে ওঠ্‌বার চেষ্টা পেত, তবু সে মনকে বোঝাত "কাজ নেই। কুঙ্কুম ঠিক্‌ই বলেছে, আগুন নিয়ে নাড়াচাড়া করা কিছু নয়। গোড়া থেকে সাবধান হওয়াই শ্রেষ্ঠ পন্থা।" পরে অবশ্য সে বুঝেছিল যে সাবধান হব মনে করা যত সহজ কার্য্যক্ষেত্রে হওয়া ঠিক্ তত সহজ নয়। তবে বাইরের ঘটনাচক্র অনুকূল না হ'লে যে মানুষ অনেক সময়েই দৃঢ় সঙ্কল্প সত্ত্বেও পাকে-চক্রে প'ড়ে প্রলোভনের মধ্যে পা বাড়িয়ে দিতে বাধ্য হয় এ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন কর্‌বার তার তখনও অবধি সুযোগ হয় নি। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও ঘটনাচক্র অনেকটা তার সহায় হয়েছিল ব'লেই সে মিস স্মিথের মোহ হ'তে আত্মরক্ষা কর্‌বার সুযোগ পেয়েছিল; কারণ মিস স্মিথের সঙ্গে একা আলাপের সুযোগ তার সাম্‌নে উপস্থিত হয় নি এবং কোমর বেঁধে এ সুযোগ সৃষ্টি ক'রে নেওয়ার মতন না ছিল তার শক্তি, না ছিল তার অভিজ্ঞতা।

তবু মিস স্মিথের মোহকর হাবভাবের প্রভাব ক্রমশঃ তার মনের ওপর অজ্ঞাতে বেড়েই চ'লেছিল। তা ছাড়া তার

মনে হ'ত যে সেদিন সন্ধ্যায় মিস স্মিথের পাশে মুখচোরা সুবোধ বালকের মতন কুণ্ঠিত হ'য়ে বসে থাকার দরুণ তিনি তাকে যেন একটু কৃপার চক্ষেই দেখ্‌তে আরম্ভ ক'রেছেন। যেন সেদিনকার পর থেকে মিস স্মিথ তার প্রতি গভীরভাবে উদাসীন হ'য়ে পড়েছেন। এতে সে ব্যথা পেত কিন্তু এ ব্যথা পাওয়ার জন্য সে নিজের ওপর রাগ না ক'রেই পার্‌ত না। তার ক্ষুব্ধ মন তাকে অনুযোগ ক'রে বল্‌ত যে, মিস্ স্মিথ তার কে যে তাঁর চিত্তাকর্ষণ করার সে এত মূল্য ধার্য্য করছে? কেনই বা সে তাঁর চিত্তাকর্ষণ কর্‌তে না পার্‌লে ক্ষুব্ধ হচ্ছে? ছি ছি—এ বিড়ম্বনা কেন! কিন্তু সে ভেবে দেখে নি যে এ বিড়ম্বনার একটা নিহিত কারণ ছিল। বিলেতের আবহাওয়ার মধ্যে এসে প'ড়ে অবধি তার মধ্যে পৌরুষ গর্ব্বের অহমিকা ক্রমেই বেশি ক'রে আশ্রয় নিচ্ছিল। তার এই পৌরুষ গর্ব্ব প্রকারান্তরে তার মনকে যেন এই কথা বোঝাবার চেষ্টা পেত যে মিস স্মিথের প্রতি উদাসীন হবার অধিকারটা তার একচেটে, কিন্তু তাই ব'লে তিনি কেন তার প্রতি উদাসীন হবেন? তার সন্তপ্ত মন ব'লে উঠ্‌ত, না, না, এ হ'তেই পারে না, তার যে মিস স্মিথকে দেখাতেই হবে যে সে কি ধাতুতে গড়া।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মনটা ভাবৃত কুঙ্কুমের কথা।... এখনও কুঙ্কুমের কথা মনে হ'লেই তার বিদ্রোহ উদ্যত মনটি মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত নত হ'য়ে পড়্‌ত। কিন্তু অব্যবহিত পরেই তার মনে হ'ত যে এ সব সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে নির্দ্দোষ আলাপ কর্‌লেই বা ক্ষতি কি?...কুঙ্কুম কি এরূপভাবে নিজের চিত্তকে উপবাসী রেখে চরিত্রের একটা মস্ত সম্পূর্ণতা সাধনে বঞ্চিত হচ্ছে না? অথচ উত্তরে তার সজাগ মনটি সন্দেহ করে উঠ্‌ত।...এরূপ তরলচিত্ত মেয়েদের সঙ্গে মেশার নিহিত মনস্তত্ত্বটি কি? সেটা কি শুধু নারীসঙ্গের জন্য পুরুষের মনের দুর্দ্দম্য আকাঙ্ক্ষার আংশিক চরিতার্থতা সাধন করা মাত্র নয়? ...কারণ এদের মতন অগভীর প্রগল্‌ভা মেয়েদের কি কিছু দেবার থাকতে পারে?...কাজেই চরিত্রের সম্পূর্ণতা সাধন করা, হৃদয়কে নারীসঙ্গের রসধারায় বিকশিত করা, এ সব যুক্তিকে লম্বা লম্বা বাজে কথা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? অতএব কুঙ্কুম ঠিকই বলে যে 'এ দেশের মেয়েদের সঙ্গে মনের Intellectual খোরাক জোগাড় কর্‌বার জন্য মেলামেশা সব—আত্মপ্রবঞ্চনা। কারণ ওদের সঙ্গে আমরা যে মিশ্‌তে যাই তার একই কারণ, দু' কারণ নেই।'

কুঙ্কুম নিজের জীবনে বরাবরই এ নীতি অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'রে এসেছিল। তাই পল্লবের মনের নিভৃত স্তরে কুঙ্কুমের প্রতি শ্রদ্ধা পুঞ্জীভূত হ'য়ে ছিল। সে মনের অনেক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তেই কুঙ্কুমের দৃষ্টান্ত মনে ক'রে তার নিহিত দুর্ব্বলতাকে জয় কর্‌বার চেষ্টা পেত। কারণ মজ্জমানের মতন, দুর্ব্বল মানুষ অনেক সময়েই সবল মানুষের শক্তিকে অবলম্বন করতে ভালবাসে। তবে পল্লব তখনও অবধি এ কথাটি ঠেকে শিখবার তেমন সুযোগ পায় নি যে কোনও দিকে পরের শক্তিকে আঁকড়ে ধ'রে তীরে ওঠা যায় না যদি তার নিজের সে দিকে একটা সহজ শক্তি না থাকে। মানুষের এ অভিজ্ঞতাটি লাভ করতে একটু বিলম্ব না হ'য়েই পারে না যে অপরের স্বাতন্ত্র্যের ওজরে কারুর নিজের নিজের প্রকৃতি-স্বাতন্ত্র্যের মোড় ফেরাবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা। (অবশ্য যার একটা বিশেষ স্বাতন্ত্র্য আছে তার ক্ষেত্রে—কারণ অধিকাংশ মানুষেরই কোনও বিশিষ্ট স্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য থাকে না।) তার অজ্ঞাতে এ উপলব্ধিটি ক্রমেই তার মনের মধ্যে রূপগ্রহণ করছিল। তাই বেশিদিন এ দ্বন্দ্বের মধ্যে থাক্‌লে, তার শিল্পী মনটি যে কিভাবে ঝুঁকে পড়্‌ত তা বলা কঠিন। কিন্তু এমন সময়ে হঠাৎ ঘটনাচক্র তার অনুকূল হ'য়ে তাকে এ দ্বিধা-প্রলোভনের হাত থেকে মুক্তি দিল। ব্যাপারটি এই:

মিসেস সিংহকে পল্লব মাঝে মাঝেই তার অন্তরঙ্গ বন্ধুদ্বয়ের কথা বল্‌ত। পল্লবের মুখে প্রায়ই তার যুগলবন্ধুর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনে শুনে মিসেস সিংহের স্বতঃই উচ্ছ্বাসপ্রিয় স্নেহপ্রবণ হৃদয়টি তাদের পরিচয় লাভ কর্‌তে উৎসুক হয়ে উঠেছিল। একদিন তিনি পল্লবকে বল্‌লেন যে পল্লব যদি ইচ্ছা করে তবে তিনি সানন্দে তার বন্ধুদ্বয়কে ১৫।২০ দিন লণ্ডনে এসে তাঁর আতিথ্য স্বীকার কর্‌তে নিমন্ত্রণ করতে চান। মিসেস সিংহ পাঁচজনের সঙ্গে মিলেমিশে থাক্‌তে ভালবাস্‌তেন। এমন কি সেজন্য নানান্ ছোটখাটো অসুবিধাকেও তিনি

শিল্পী—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

গুহক-মিলন

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

হাসিমুখে সহ্য করতেন। তা ছাড়া কারুর প্রশংসা শুন্‌লেই তিনি তার সঙ্গে আলাপ করতে চাইতেন। বল্‌তেন ভাল লোকের সঙ্গে আলাপ করা ভাল, তাতে কত শেখা যায়, সৎসঙ্গ মানুষকে তার অজ্ঞাতে ভাল দিকে টেনে নিয়ে যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য পল্লব মিসেস সিংহের এ সৌজন্যে অত্যন্ত খুসি হ'ল। তবে ছুটিতে কুস্কুম আইল অফ ওয়াইটে গিয়েছিল। কাজেই পল্লব মিসেস সিংহকে বল্‌ল যে এযাত্রা কুস্কুম আস্‌তে পারবে না বোধ হয়। তবে মোহনলালকে নিমন্ত্রণ করলে সে সম্ভবতঃ আস্‌তে পারবে। মিসেস সিংহ তার কথামত মোহনলালকে নিমন্ত্রণ করলেন।

মোহনলাল সহজেই রাজি হ'ল। সে ছুটিতেও দেড় মাস কেম্ব্রিজের ল্যাবরেটরিতে কাজ কর্‌বার অনুমতি নিয়েছিল। কয়েক মাস নিয়মিতভাবে পড়াশুনা ক'রে সে ভাব্‌ল যে বাকি ছুটিটা লণ্ডনে পল্লবের সঙ্গে থিয়েটার বায়স্কোপ প্রভৃতি দেখে কাটানো মন্দ কি? সে মিসেস সিংহকে তাঁর নিমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে লণ্ডনে এসে পল্লবের সঙ্গে যোগ দিল। দুই বন্ধু রাত্রে এক ঘরেই শুত। গভীর রাত্রি অবধি গল্পালাপ কর্‌ত। পল্লব তাকে মিষ্টার টমাসের সম্বন্ধে সব কথাই বল্‌ল ও প্রস্তাব কর্‌ল একদিন তাকে সাউথেণ্ডে তাঁদের পরিবারে নিয়ে যাবে। সে মিষ্টার স্মিথের উদারতা ও যুদ্ধবিরাগ সম্বন্ধেও সব কথাই বল্‌ল। কেবল মিস স্মিথের সম্বন্ধে বিশেষ উচ্চবাচ্য কর্‌ল না।

সে মহা উৎসাহে মিষ্টার স্মিথের সঙ্গে মোহনলালের আলাপ করিয়ে দিল। বিশেষতঃ য়ুরোপ সম্বন্ধে মোহনলালের তার চেয়ে বেশি অভিজ্ঞতা থাকার দরুণ সে ভেবেছিল যে মোহনলাল মিষ্টার স্মিথের সঙ্গে বেশি বুদ্ধিমানের মতন কথা কইতে পার্‌বে—বিশেষতঃ যখন সে বুদ্ধিতেও তার চেয়ে যথেষ্ট শ্রেষ্ঠ।

পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই কিন্তু তার মনে হ'তে লাগ্‌ল যে মোহনলাল যেন মিষ্টার স্মিথের চেয়ে 'মিসে'রই বেশি গুণ-পক্ষপাতী হয়ে পড়ছে। কারণ তার একটু একটু ক'রে চোখে পড়্‌ল যে মোহনলাল প্রায়ই নানা ছুতোয় উপরতলা থেকে নীচে এসে মিস স্মিথের সঙ্গে দুদশ মিনিট ক'রে গল্পালাপ ক'রে যেত। পল্লব প্রথম দু'একদিন মনে করেছিল বটে যে মোহনলাল নীচে গিয়ে তারই মতন মিষ্টার স্মিথের সঙ্গেই গল্প ক'রে থাকে। কিন্তু সে ভ্রম ভাঙ্‌তে তার দেরি হয় নি। সে দেখ্‌ল যে মোহনলাল নানা ছুতা নাতায় প্রায়ই এমন সময়ে স্মিথপরিবারের ড্রয়িংরুমে আস্‌ত যখন—হয় তিনি মিস স্মিথকে বাড়ীতে রেখে সস্ত্রীক হীথে বেড়াতে বেরিয়েছেন, না হয় অন্য ঘরে নিজের কোনও কাজে ব্যস্ত থাক্‌তেন। সে দুএকদিন বাইরে বেরিয়ে যাবার সময় মিষ্টার স্মিথের ড্রয়িংরুমে মোহনলাল ও মিস স্মিথের হাসি ঠাট্টাও শুনতে পেয়েছিল। তাছাড়া মাঝে মাঝে তাদের সকলের একত্র ব'সে গল্পালাপের সময়ে তার আর একটা কথাও বেশি ক'রে মনে না হ'য়েই পারে নি। সেটা এই যে মিস স্মিথ তার প্রতি সম্প্রতি যতটা ঔদাসীন্য দেখিয়েছেন, মোহনলালের প্রতি তিনি মোটেই সেরূপ উদাসীন নন। অবশ্য মোহনলালের সুন্দর বলিষ্ঠ দেহ ও বুদ্ধি-উজ্জ্বল আনন যে সহজেই নারীর দৃষ্টি আকর্ষণ কর্‌তে পারে সেটা সে ইতিপূর্ব্বেই কেম্ব্রিজে ও অন্যত্র দু একটি ভদ্রপরিবারে ডিনার-পার্টি প্রভৃতি উপলক্ষে লক্ষ্য ক'রেছিল। কিন্তু তবু তার মনে হ'ত যেন মিস স্মিথ মোহনলালের প্রতি নানাচ্ছলে একটু অশোভন মনোযোগ দেখাতে আরম্ভ করেছেন। তার আন্তরিকতার দাবী এক একবার তাকে তিরস্কার কর্‌ত যে এ কি বিসদৃশ চিন্তা! হয়ত সে তার প্রতি মিস স্মিথের ঔদাসীন্যে একটু আহত বোধ করার দরুণই মোহনলালের প্রতি তাঁর সহজ সৌজন্যকে সন্দেহের চক্ষে দেখ্‌ছে!...কে জানে!...তবে নিজের মনকে এ ভাবে তিরস্কার করা সত্বেও মিস স্মিথের অনেকগুলি ব্যবহার তার চোখ এড়াতে পার্‌ত না: যথা, মোহনলালের রসিকতায় তিনি মন খুলে হাস্‌তেন, তার সম্ভাষণে সদা সজাগ ভাবে সাড়া দিতেন, এমন কি তার আগমনে তাঁর চক্ষু দুটিও যেন উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ত।

এই সূত্রে পল্লবের মোহনলালের একটা ক্ষমতা বিশেষ ক'রে চোখে পড়্‌ল। সেটা এই যে মোহনলাল মিস স্মিথের সঙ্গে তার চেয়ে কত সহজে, কত নিঃসঙ্কোচে মিশ্‌তে পার্‌ত। বিলেতের জলহাওয়া গায়ে লাগ্‌লে যে মোহনলালের মতন লাজুক ছেলেও এতটা বদ্‌লে যেতে পারে সেটা সে এর আগে কখনও ভাব্‌তে পারে নি। এই কি সেই মোহনলাল যে দেশে থাক্‌তে অনাত্মীয়া

মেয়েদের সঙ্গে মিশ্‌তে তার চেয়েও বেশি সঙ্কুচিত হ'ত! একদিন সে তার এক বিবাহিতা পিস্‌তুত বোনের ওখানে মোহনলালকে নিয়ে গিয়েছিল। তার সপ্রতিভ বোনটির সহজ সম্ভাষণে মোহনলাল যে সেদিন কি রকম অপ্রতিভ হয়েছিল সেটা আর যারই অবিদিত থাকুক পল্লবের ত অগোচর ছিল না! মোহনলাল তার মিশুক বোন্‌টির অকুণ্ঠ প্রশ্নাবলীর যেরূপ সসম্ভ্রম উত্তর দিচ্ছিল সে দৃশ্য যে তার চোখের সাম্‌নে আজও ভাস্‌ছে! শুধু তাই নয়।... পরে সে বাক্‌পটু মোহনলালের এ রকম অপ্রত্যাশিত লাজুকতার জন্য তাকে পরিহাস করায় সে কি রকম কুণ্ঠিত হ'য়ে পড়েছিল!...আর আজ!...মানুষের এত সহজে এত গভীর পরিবর্ত্তন হ'তে পারে!...সঙ্গে সঙ্গে সে মোহনলালের এ সপ্রতিভ ভাবে মেশার ক্ষমতাকে একটু ঈর্ষার চোখে না দেখেও পারত না। তবে তার অভিমান তাকে এই ব'লে সান্ত্বনা দিত যে তার অনেক আগে বিলেতে আসার দরুণ বিলাতী মেয়েমহলে মোহনলাল তার চেয়ে ঢের বেশি মেশ্‌বার সময় ও সুযোগ পেয়েছে। ...কাজেই সে আজ এত সপ্রতিভ হয়ে উঠেছে।... তবে সেই লাজুক মোহনলালের যখন এ প্রকাণ্ড পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভবপর হ'য়েছে তখন পল্লবও নিশ্চয়ই তার মতন বেশি দিন বিলেতে থাক্‌লে এ বিষয়ে তার সমকক্ষ হবে, যদি শ্রেষ্ঠ না-ও হয়।

কিন্তু মোহনলালের মিস স্মিথের প্রতি পক্ষপাতিত্ব যেন একটু বেশি রকম দ্রুত রেটে বেড়ে চল্‌ল।...প্রথম প্রথম পল্লব মোহনলালের তরুণী-সঙ্গের প্রতি এতটা অনুরক্তি যেন দেখেও দেখ্‌তে চায় নি। কারণ মিস স্মিথ তার চোখের ওপরে তাকে লক্ষ্য না ক'রে যে মোহনলালের প্রতি কৃপাকটাক্ষ বর্ষণ করতে পারে এ কথা মেনে নিতে তার পৌরুষ-অভিমানের ওপর ঘা পড়ত। কাজে কাজেই সে অজ্ঞাতসারে নিজের মনকে বোঝাতে চেষ্টা পেত যেন এটা হ'তেই পারে না। তবে কোনও তরুণী যে তাকে অবজ্ঞা করে মোহনলালকে এতখানি স্নেহচক্ষে দেখ্‌তে পারে এ কথা তার পৌরুষ-গর্ব্ব স্বীকার করতে না চাইলেও —তার আন্তরিক মুহূর্ত্তে স্বীকার করতেই হ'ত। কারণ শীঘ্রই তার চোখে পড়ল যে মোহনলালের এই জয়গৌরবকে খর্ব্ব করা বা অবিশ্বাস করার প্রবৃত্তির মনস্তত্ত্বই হচ্ছে এই যে এ পরাজয়ে তার মন এক তিক্ত গ্লানিমায় ভ'রে উঠেছে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে সে যে নিজের এ অবিশ্বাস্য ক্ষুদ্রতার জন্য ক্ষুব্ধ বোধ না করত তা নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তার ঈর্ষাকে সম্পূর্ণ জয় করতে পেরে উঠ্‌ত না। ফলে হ'ত কেবল এই যে সে একটু বেশি ক'রে উদার হবার জন্যই নিজের মনকে বোঝাবার চেষ্টা পেত যে মোহনলালের প্রতি তার সন্দেহ তার দুষ্ট মনেরই কারফের; মোহনলালের সঙ্গে মিস স্মিথের সম্বন্ধ মাত্র সহজ প্রীতির সম্বন্ধ; কেবল সে-ই এ সহজ সম্বন্ধকে নিজের ঈর্ষাক্ষুব্ধ মন দিয়ে বিচার করছে বলেই অবিশ্বাস ক'রে বস্‌ছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু ক্রমশঃ যখন সে দেখ্‌ল যে মোহনলাল নানা অজুহাতে মাঝে মাঝেই তাকে এড়িয়ে মিস স্মিথের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে যাচ্ছে তখন তার শত ঔদার্য্যের দাবী সত্ত্বেও সে তার সন্দেহকে আর চেপে রাখ্‌তে পারল না। সে সঙ্কল্প কর্‌ল মোহনলালের কাছে একদিন কথাটা পাড়বে।

একদিন রাত্রে শোবার সময়ে সে মোহনলালকে সহজ পরিহাসের সুরে জিজ্ঞাসা কর্‌ল যে বরাবরকার ভাল ছেলে হ'য়ে সে আজ হঠাৎ এমন উড়ু-উড়ু কর্‌ছে কেন? এরূপ প্রসঙ্গ গম্ভীর ভাবে অবতারণা করার কুণ্ঠা সে অতিক্রম করতে পারে নি। তাই সে পরিহাস-ছলের আশ্রয় নিয়েছিল। মোহনলাল তার প্রশ্নে একটু বিব্রত হ'য়ে বল্‌ল "কি যে বল পল্লব তার ঠিকানা নেই।" ব'লেই সে কথাটা চাপা দিয়ে পাশ ফিরে শুল। কিন্তু পল্লব ঠিক্ ক'রেছিল যে সে আজ সহজে ছাড়বে না। সে বল্‌ল, "আহা মোহনলাল, রাগ কর কেন ভাই, খুলেই বল না হে, তোমার মৎলবটি কি?"

মোহনলাল এবার একটু বিরক্তির সুরে তার দিকে ফিরে বল্‌ল, "মৎলব আবার কি? ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে কি কোনও গূঢ় মৎলব নইলে মেশা যায় না নাকি?"

পল্লব মোহনলালকে স্মরণ করিয়ে দিতে পার্‌ত যে এককালে সে-ও ত মেয়েদের সম্বন্ধে কুঙ্কুমের মতেরই সমর্থন কর্‌ত; কিন্তু সম্প্রতি সে নিজেই কুঙ্কুমের প্রভাব হ'তে একটু মুক্তি পেতে চাচ্ছিল ব'লে এ কথায় খানিকটা সায় দিয়েই বল্‌ল, "না, তা অবশ্য আমি বল্‌তে চাই না। কেবল দেখো ভাই যেন শেষটা কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে

সাপ না বেরোয়!” মোহনলাল একটু কৃত্রিম সহজ সুরে বল্‌ল “দূর্, তা কখনও হয়!” ব’লে আর বাক্য ব্যয় না ক’রে আবার পাশ ফিরে শুল।

পল্লব দেখ্‌ল মোহনলাল এ বিষয়ে আলোচনা কর্‌তে বিশেষ আগ্রহশীল নয়। তাই সে-ও আর কিছু বল্‌ল না। তা ছাড়া তার নিজেরও মোহনলালের চরিত্রবলের ওপর প্রগাঢ় আস্থা ছিল। দেশেও সে মোহনলালকে অনেকদিন থেকে জানে। নারীসঙ্গের প্রতি মোহনলালের এ পক্ষপাতিত্ব তাকে প্রথমে একটু আশ্চর্য্য কর্‌লেও সে মোহনলালের কথা মোটের ওপর বিশ্বাস করতেই চেয়েছিল। সে ভাব্‌ল যে মোহনলাল ঠিক্‌ই ব’লেছে এতে দূষ্য কিছু থাক্‌তেই পারে না। এটাকে সন্দেহের চক্ষে দেখা কেবল ক্ষুদ্র মনের পক্ষেই সম্ভব। পল্লব দেশে মোহনলালের সঙ্গে দীর্ঘ বন্ধুত্বের মধ্যেও এদিকে কখনও তার কোনও দুর্ব্বলতা দেখেনি। মোহনলাল ও কুঙ্কুম তাকে বল্‌ত যে তারা বিবাহ করবে না, কারণ তাহ’লে দেশের কাজ করা যায় না, মানুষ সংসারের গণ্ডীর মধ্যে সঙ্কীর্ণ হ’য়ে পড়ে, নানারকম পরিণামচিন্তা এসে পড়ে ইত্যাদি ইত্যাদি। বিলেতে এসেও মোহনলাল হঠাৎ একদিনে সিবিল সার্বিস ছেড়ে দিয়ে দেশের সেবার জন্য কৃষি শিখ্‌তে লেগে গেল; ধনী-সন্তান হ’য়েও সে পড়াশুনোয় বরাবর খুবই ভাল ছেলে ছিল; বিলেতেও সে দুএকটি পরীক্ষা ইতিমধ্যেই বিশেষ সম্মানের সঙ্গে পাশ ক’রেছিল;—এসব নানা কারণে মোহনলালের মনের দৃঢ়তা বা চরিত্রবল যে সাধারণের চেয়ে অনেক বেশি সে বিষয়ে পল্লবের বা কুঙ্কুমের কেন, তাদের সহপাঠীদেরও কারুরই সন্দেহ ছিল না।

হায়! পল্লব তখনও জান্‌ত না যে মনের দৃঢ়তার মতন ক্ষণভঙ্গুর বস্তু জগতে অল্পই আছে—বিশেষতঃ যৌবনের ও পূর্ণ মনুষ্যত্বের সন্ধিস্থলে।

১২

কিন্তু মোহনলাল মিস স্মিথের সঙ্গে এত আশ্চর্য্য রকম অল্প সময়ের মধ্যে এত গভীর রকমের ঘনিষ্ঠতা করে ফেল্‌ল যে সেটা শুধু মিষ্টার ও মিসেস স্মিথ নয়, মিসেস সিংহের মতন সরলা রমণীরও দৃষ্টি আকর্ষণ কর্‌ল। মিষ্টার স্মিথ ভাব্‌তেন ক্ষতি কি? মোহনলাল ত সব বিষয়েই বাঞ্ছনীয় বলে গণ্য হ’তে পারে। কিন্তু মিসেস স্মিথ তাঁর ইংরাজ জাতীয়ত্বের অভিমানে মোহনলালের সঙ্গে কন্যার বিবাহের খুব পক্ষপাতী না হ’লেও উপার্জ্জনক্ষম স্বাধীন মেয়ের স্বনির্ব্বাচিত ঘনিষ্ঠতায় জোর ক’রে বাধা দিতে চাইতেন না। তা ছাড়া বাধা দিলেই বা শুন্‌ছে কে? তার ওপর তিনি পল্লবের কাছে শুনেছিলেন যে মোহনলাল ধনী পিতার একমাত্র সন্তান। তাই তিনি সাত পাঁচ ভেবে একরকম চুপ করে থাকাই ঠিক্ করেছিলেন—বিশেষতঃ যখন স্বামীর কাছে এ বিবাহের প্রতিপক্ষতা সম্বন্ধে সহানুভূতি পাবার তাঁর কোনও আশাই ছিল না। এ সব কথা পল্লব মিসেস সিংহের কাছে পরে শুনেছিল।

আর মিসেস সিংহ? তিনি পার্টি, হাঁসপাতাল, সভাসমিতি প্রভৃতি নিয়ে সচরাচর এতই ব্যস্ত থাক্‌তেন যে এ ব্যাপারটার ভালমন্দ সম্বন্ধে বেশি ভাব্‌বার সময় তাঁর সত্যই ছিল না। তাছাড়া সুশীলা ইংরাজ মহিলার মতন তিনি আরও ভাবতেন যে এ সম্পর্কে তাঁর কোনও কথা কওয়া উচিত নয়। তবে বহুভাষিণী মিসেস স্মিথ যখন তাঁকে ডেকে এ ব্যাপারটার অসমীচীনতা সম্বন্ধে একান্ত গোপনে নানা রকম আক্ষেপ জানাতে আরম্ভ কর্‌লেন (অবশ্য যেন কাউকে না বলেন এই শপথ করিয়ে নিয়ে) তখন মিসেস সিংহ আর তাঁর অনধিকার-চর্চ্চার অকর্ত্তব্যতা ভেবে চুপ ক’রে থাক্‌তে পার্‌লেন না। তিনি মিসেস জনষ্টন হিক, মিস উড্‌ষ্টক ও মিসেস ড্রিঙ্কওয়াটার প্রভৃতি বিজ্ঞশিরোমণি মহিলাদের কাছে চক্ষু বিস্ফারিত ক’রে কথাটা ব’লে ফেল্‌লেন। (অবশ্য প্রত্যেককেই তিনি বারবার তর্জ্জনীহেলনপুরঃসর শপথ করিয়ে নিলেন যেন তাঁরাও কাউকে না বলেন।) তাঁরা কেউ বল্‌লেন ‘বেশ ত,’ কেউ বল্‌লেন ‘উঁহঃ কথাটা ভাল ঠেক্‌ছে না গো,’ কেউ বল্‌লেন ‘মিষ্টার নন্দীর কাছ থেকে জানা দরকার তাঁর আসল মৎলবটি কি’ ইত্যাদি ইত্যাদি।

মিসেস সিংহ ভাব্‌লেন কথাটা ঠিক্। তাই তিনি শেষটায় একদিন পল্লবের কাছে কথাটা ভাঙ্‌লেন। তিনি মহা উদ্বিগ্ন স্বরে গম্ভীর মুখে তাকে বল্‌লেন, “পল্লব, কাউকে যদি না বল ত একটা কথা তোমায় বলি।” পল্লবকে কোনও গুহ্য কথা শোনাতে হ’লেই তার দেশের অনেক নিকটাত্মীয়া তাকে দিয়ে আগে এভাবে শপথ করিয়ে নিত।

মিসেস সিংহের উৎসাহিত অথচ গোপনতারক্ষায় অসমর্থ ভাব দেখে পল্লবের তার দেশের সেই সব আত্মীয়াদের কথা মনে প'ড়ে গেল। সে মনে মনে হেসে ভাব্‌ল, যে স্ত্রীচরিত্র কি সব দেশেই একরকম? মুখে কিন্তু কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য টেনে এনে বল্‌ল "কখনই বল্‌ব না মিসেস সিংহ, কোনও গোপনীয় কথা কি পুরুষদের দ্বারা প্রকাশ হয়?" সরলহৃদয়া মিসেস সিংহ পল্লবের কথার মধ্যেকার ব্যঙ্গটি ধর্‌তে না পেরে সব কথাই বলে ফেল্‌লেন ও শেষে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন: "তোমার বন্ধু কি মিস স্মিথের সঙ্গে বিবাহপণে আবদ্ধ হয়েছেন বল্‌তে পার?"

পল্লব সশঙ্কিত স্বরে বলে উঠ্‌ল; "না, না। তা কখনও হয়?" ভারতীয়ের মেম বিবাহ করার বিরুদ্ধে সে দেশে এতই শুনে এসেছিল যে পরিচিত কারুর ভাগ্যে এরূপ সম্ভাবনার কথা মনে হ'লেও তার সমস্ত মনটা বিস্বাদ হ'য়ে না উঠেই পার্‌ত না। বিশেষতঃ হাবভাবপূর্ণ, রুজমাখা, বিলোলনয়না মিস স্মিথের সঙ্গে তার প্রিয় বন্ধু, দেশভক্ত, বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বলরত্ন, আদর্শচরিত্র মোহনলালের বিবাহ!...এও কি সম্ভব! হায়, সে তখনও জান্‌ত না যে সম্ভব ও অসম্ভবের মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান আমরা কল্পনা করে থাকি তার অন্ততঃ বার আনার মূল আমাদের দেশজ সংস্কার ও বাল্যের শিক্ষা।

তবু মোহনলাল যে মিস স্মিথের প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে প'ড়েছে এ সত্যটির প্রতি যেন মিসেস সিংহের ছোট্ট প্রশ্নটি তার সমস্ত চেতনার চোখ ফুটিয়ে দিল। সে এতদিন নিজের বিবর্দ্ধমান সংশয়কে বার বার বলে এসেছে: 'না, না, এও কি হ'তে পারে? মোহনলালের মতন ছেলে কি কখনও একটা এরকম তরলচিত্তা, বেশভূষাপ্রাণা অভিনেত্রীর মোহে এতটা কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন হ'য়ে পড়্‌তে পারে যে শেষটা সে তাকে বিবাহ কর্‌তে ব্যগ্র হ'য়ে উঠ্‌বে?...যদি মিসেস নর্টনের মতন কোনও মেয়ে হ'ত তা'হলেও বা বোঝা যেত!...না, না, মোহনলাল যে মিস স্মিথের প্রকৃতির মেয়েকে জীবনসঙ্গিনী কর্‌লে সুখী হ'তেই পারেনা একথা সে না বুঝেই পারে না। অবশ্য মোহনলাল ধনীর সন্তান ও শ্বেতহস্তী পোষবার সামর্থ্য তার আছে। কিন্তু বিবাহ ত শুধু ভরণপোষণের সমস্যা নয়!...মিস স্মিথকে বিবাহ কর্‌লে যে তার সমস্ত জীবনটা ব্যর্থ হ'য়ে যাবে!...সব উচ্চাশা ও আবাল্যপুষ্ট আদর্শবাদকে জলাঞ্জলি দিতে হবে! শুধু একটা তুচ্ছ মোহের জন্য সমাজ, কর্ত্তব্য, জীবনের সব মহৎ আকাঙ্ক্ষা...সব কি ছাড়া উচিত?'

হায়! পল্লব তখনও অবধি জানে নি যে এ তুচ্ছ মোহকে সে যত তুচ্ছ মনে কর্‌ছে সেটা তত তাচ্ছিল্যের বিষয় নয়। পরে একদিন জার্ম্মাণিতে একথা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছিল; কিন্তু তখনও অবধি সে উপলব্ধি করার সুযোগ পায় নি যে উচিত-অনুচিতের বাধা, বিচারবুদ্ধির নিষেধ, লোকমতের প্রবল প্রতাপ, ও এমন কি বাল্যশিক্ষার গভীর প্রভাবও অনেক সময়ে এ তুচ্ছ (?) মোহের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার গতিরোধ কর্‌তে পারে না।

(ক্রমশঃ)

সর্ব্ব-স্বত্ব সংরক্ষিত

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

১

কীট বলে 'আমি যেথা-সেথা যাই গুটী পাকাইয়া মরি,
মানুষের লাগি রেশম তসর গোটা প্রাণ দিয়া গড়ি।
কপাল মন্দ নাহিক সন্দ কার্য্য কেবলি বেঁধা,
পাতা খাই বটে, যেই পাতে খাই সে পাত করিনে ছেঁদা।'

২

পশু বলে 'আমি বহি নর নারী, খাটি তাহাদের লাগি,
গায়ের পশম দান করে দেই, প্রতিদান নাহি মাগি।
আবার কখনো বাগে পেলে তারে ঘাড় মট্‌কায়ে মারি,
প্রাণ নিই বটে, ধন মান তার লইনে কখনো কাড়ি।'

৩

পাখী বলে 'আমি গান গেয়ে ফিরি, পিঁজরায় রাখে ধরি,
নির্ব্বোধ নই, যত্ন করিয়া পড়াইলে আমি পড়ি।
সুরটা কিন্তু পাল্টাতে নারি দিক্‌ না বহুৎ টাকা,
এ সব স্বত্ব সংরক্ষিত মানুষের তরে একা।'

ব্রিটিশ আফ্রিকা

শ্রীনরেন্দ্র দেব

আরব দস্যুদের অত্যাচার নিবারিত হ'লেও আফ্রিকায় এখনও সর্দ্দারদের দৌরাত্ম্য বড় কম নয়। সর্দ্দারদের অধীনে যারা থাকে, তাদের অবস্থা বিশেষ সুবিধের নয়। এক ত' সর্দ্দারদের অধীনে তাদের এক রকম দাসত্বই ক'রতে

প্রকাণ্ড ডুমুর গাছ (ইহা পথিকদিগের বিশ্রাম স্থান)

হয়; এর উপর আবার সর্দ্দার বা তাঁর কোনও প্রতিনিধি দয়া ক'রে যদি এক দিন কোনও গ্রাম পর্য্যবেক্ষণ ক'রতে আসেন, তা হলে তিনি গ্রামের যে কোনও ভাল জিনিস পছন্দ করে নিয়ে যান! শস্য ও উৎকৃষ্ট গো-মেষাদি ত নিয়ে যানই; তা ছাড়া, সেই গ্রামের কোনও সুন্দরী (?) যুবতীকে পছন্দ হ'লেও সর্দ্দারের ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্য তাকে সর্দ্দারের নিকট আত্মদান ক'রতে হয়। ইংরাজ-শাসনের গুণে এখন এটাও রোধ হয়েছে।

ব্রিটিশ আফ্রিকা সমগ্র ইংলাণ্ড ও ওয়েলস্ অপেক্ষা আয়তনে প্রায় পঁয়তাল্লিশ গুণ বড়। ব্রিটিশ আফ্রিকার লোক-সংখ্যাও প্রায় সাড়ে তিন কোটী!

অন্ধ নিগ্রো মুসলমান

(মরুবাত্যায় উৎক্ষিপ্ত তপ্ত বালুকার আঘাতে উত্তর নাইজেরিয়ার অনেকেরই চক্ষু অন্ধ হ'য়ে যায়।)

আরবদের অত্যাচারে এক একটা গ্রাম জনশূন্য হ'য়ে না পড়লে, আজ আফ্রিকায় লোকসংখ্যা এর চতুর্গুণ বেশী হ'তে পারতো। ইংরাজ শাসনাধীনে এসে কাফ্রীদের যেমন কতকগুলো বিশেষ উপকার সাধিত হয়েছে, তেমনি সর্ব্বনাশও হয়েছে বিস্তর! আরব দস্যুদের অত্যাচার ও সর্দ্দারদের অন্যায় প্রতিপত্তি দূর হয়েছে বটে, কিন্তু মিথ্যাচার, চুরি, দুর্নীতি

প্রভৃতি বহু পাপ তাদের মধ্যে প্রবেশ ক'রেছে। ইংরাজী সভ্যতার পরিবর্ত্তে তাই এখনও বৃদ্ধ কাফ্রীরা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে—"আগে বেশ ছিলুম।"

সুআশা অন্তরীপ থেকে আরম্ভ করে আফ্রিকা ব্রিটীশ সাম্রাজ্য জাম্বেশী নদীর অপর পারে বিষুবরেখা অতিক্রম করে কেণীয়ার পার্ব্বত্য প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃ

কুমোর বাড়ী

ফান্তির কুমোরশালা

রাজসূয় নৃত্য

(যাবার ভূপতি রাজবেশে নৃত্য করছেন)

কুমাশীর হাট

(আশান্তির বড়বাজার হ'চ্ছে এই কুমাশীর হাট। আশান্তি রাজ্যের যা কিছু কৃষি শিল্প সম্বন্ধীয় সামগ্রী তা সমস্তই পাওয়া যায় এই কুমাশীর হাটে।
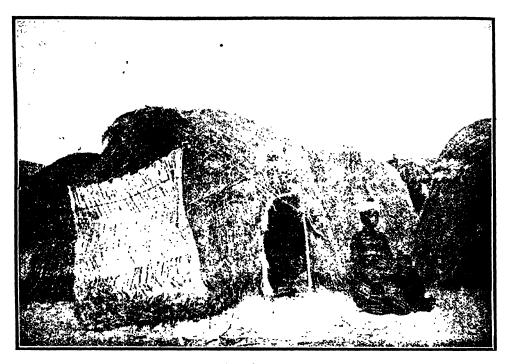
হাউশা কুটীর

(বাঁশ ও ঘাস দিয়ে তৈরী হাউশাদের এই কুটীর নির্ম্মাণ করতে মাত্র দু'ঘণ্টার বেশী সময় লাগে না।)

কানো সহরের মেটে বাড়ী
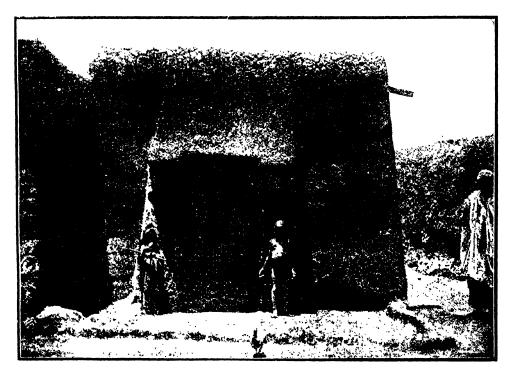
হাউশা তরুণীদ্বয়

লোকোজার মুসলমান কাফ্রী সর্দারের পুত্র ও তার দুই পত্নী

এক নম্বর কানো। (এখানে রাস্তার নাম নেই। কানো সহরে প্রায় তিরিশ হাজার লোকের বাস ; সুতরাং এখানে সাড়ে ছ'হাজার মোট বাড়ী আছে। প্রত্যেক বাড়ীখানির নম্বর দেওয়া। শেষ বাড়ীটির ঠিকানা হচ্ছে ৬৩৩১নং কানো।)

এক কথায় আফ্রিকার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ইংরাজের অধীন। মিশর, রোডেশীয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার উপনিবেশ বাদ দিলেও, আফ্রিকায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আয়তন ভারতবর্ষের প্রায় দ্বিগুণ। কিন্তু লোক-সংখ্যা ভারতবর্ষের এক-অষ্টমাংশ মাত্র! দক্ষিণ আফ্রিকার উপনিবেশ

অশ্বারোহণে গোম্বীর আমীর ও তাঁহার পার্শ্বচরগণ

রোডেশীয়া, ও মিশর সম্বন্ধে পৃথকভাবে আলোচনা করবার ইচ্ছা আছে। ব্রিটীশ আফ্রিকা, গ্রেট ব্রিটেন—অর্থাৎ ইংলাণ্ড স্কটলাণ্ড ও আয়ারলাণ্ডের মিলিত আয়তন অপেক্ষা চৌত্রিশগুণ বড় হ'লেও লোক-সংখ্যা প্রায় উভয়েরই সমান!

আফ্রিকা যে শীঘ্রই ইংরাজের একটী সমৃদ্ধিশালী সাম্রাজ্য হ'য়ে উঠবে, তাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। এখন হ'তেই তার সূত্রপাত দেখা দিয়েছে। কাফ্রীদের মধ্যে একটা সভ্যতার প্রচণ্ড আন্দোলন উপস্থিত হয়েছে। ঘরোয়া বিবাদ, বহিঃশত্রুর আক্রমণ, বাধ্যতামূলক মজুরী, দাস-ব্যবসায়ের অভিশাপ ও সর্দ্দারদের অত্যাচার বিদূরিত হ'য়ে তাদের মধ্যে একটা শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তির ভরসা দেখা দিয়েছে। দলবিশেষের প্রাধান্য ও বর্ব্বর রীতি-

বিলাত-ফেরত কাফ্রী ডাক্তার

(নাইগেরীয়া অঞ্চলের লাগো অধিবাসী ডাক্তার সাপায়া বিলাতে অধ্যয়ন করে ডাক্তারী পরীক্ষায় পাশ হয়ে এসেছেন। কিন্তু বিলাত ফেরতদের মতো সাহেব সাজেননি; তিনি বলেন গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ঢিলে ঢালা পোষাকই স্বাস্থ্যকর।)

নীতি, প্রথা-পদ্ধতি ও পরিচ্ছদ ক্রমেই আফ্রিকা থেকে উঠে যাচ্ছে।

ব্রিটিশ আফ্রিকার পশ্চিমাঞ্চলেই লোক-সংখ্যা অন্য সব প্রদেশের চেয়ে বেশী। পশ্চিম আফ্রিকা গাম্বীয়া থেকে কামারুণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এখানে নদীর চরে ও নদীমুখস্থ 'ব' দ্বীপে জঙ্গলে ও পর্ব্বতে একদল কাল বর্ব্বর কৃষ্ণবর্ণ জাত দেখতে পাওয়া যায়, যারা, পুতুল পূজা কোন্ ছার—ইট পাথর পর্য্যন্ত পূজা করে! এই অঞ্চলেই আবার এমন সব

স্বর্ণতীরের মৎস্যশিকারী

(স্বর্ণতীরের কিশোরী ও যুবতী জেলেনীরা নদীতে নৌকা নিয়ে মাছ ধরে। সন্তরণে এরা মৎস্যকেও পরাস্ত করে

মাটির রূপান্তর।
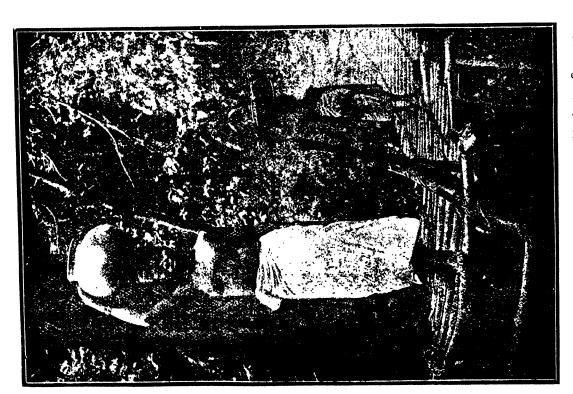
জলবাহী বালা। (সুবর্ণ-তীর-বাসিনী (Gold Coast District) বালিকাদেরও দেহের গঠন ভাস্কর খোদিত-প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় সুগঠিত।)

দাহোমীয়া তরুণীদ্বয়।

(আক্‌ড়া ও বোলুতা নদীর মাঝখানে দাহোমীয়া জাতীয় কাফ্রীরা বাস করে। এদের মেয়েদের শরীরের গঠন অতি সুন্দর।)

ফান্তিবালার বেণীরচনা

বৃদ্ধ নিগ্রো। (৭০ বৎসর বয়ঃক্রম)

নাইগেরীয়াবাসীদের মাছধরা জাল।

বৃদ্ধের সম্মান (বয়োবৃদ্ধ প্রাচীনদের প্রতি সম্মান দেখাবার জন্য হাউশার মুসলমান কাফ্রীদের মধ্যে জুতা খুলে নতজানু হ'য়ে অভিবাদন করবার নিয়ম আছে।

শিক্ষিত কাফ্রী আছে, যাদের অন্য সবপ্রদেশে দেখতে পাওয়া যায় না। তারা অনেকেই ইংলাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি অর্জ্জন করে দেশে ফিরে এসেছে, কেউ আইন ব্যবসায়, কেউ চিকিৎসা ব্যবসায়, কেউ ধর্ম্মতত্ত্ব ও দর্শন শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে এসেছেন।

এইখানেই আবার সেই মিশ্রজাতি 'হাউশারা' ও বিখ্যা
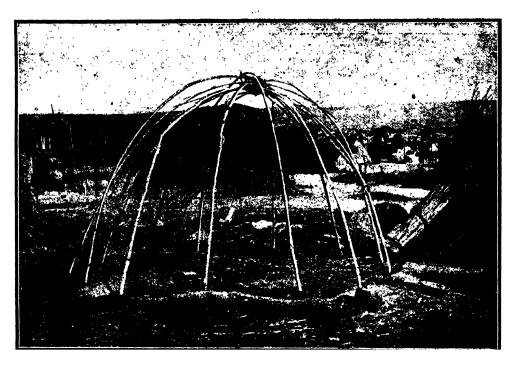
হাউশা কুটীরের কঙ্কাল।

আশান্তি কিশোরী

নাইগেরীয়ার চৌকীদারগণ।

...দের দোকান। (গাছগাছড়া, ফলমূল, লতাপাতা প্রভৃতি ভেষজ ও নানা দ্রব্যগুণে রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থাই এখনও এখানে প্রচলিত।)

'ফুলানীদের' বসবাস। এরা বহুকাল কাফ্রীদের উপর সর্দ্দারী ক'রে এসেছে। নানা বৈচিত্র্য এবং ঐতিহাসিক তত্ত্বের জন্য পশ্চিম ব্রিটীশ আফ্রিকা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই অঞ্চলকে আফ্রিকার একেবারে খাঁটি অয়নান্তবৃত্ত প্রদেশ বলা যেতে পারে। সমুদ্র থেকে উচ্চ ধাপে ...া স্তরে স্তরে ক্রমেই চড়াই হ'য়ে উঠে এ স্থান একেবারে প্রখর সূর্য্যকরোত্তপ্ত উচ্চ ভূমিতে পরিণত হয়েছে। সমুদ্রতীরে ...ন ছোট ছোট পাহাড়ের পাড় সাজানো। ...চলো মাথা, চ্যাপ্টা, ঢিপির মতো নানা আকারের শিশু শৈলরাজি সমুদ্রবেলাকে ...াদের বহু সন্তানবতী জননীর মতো আঁকড়ে ধরে আছে। এখানে সমুদ্রের ...লও এত গভীর যে একটা তরঙ্গ বিক্ষোভও দেখ্‌তে পাওয়া যায় না! অথচ এই সব চোরা পর্ব্বত-শিশুর ভয়ে জাহাজও সেখানে আসতে সাহস করে না. ...জে। কাজেই সেখানে এ পর্য্যন্ত কোনও

কাফ্রি পরিবারের গৃহ-প্রাঙ্গণ

জল নিয়ে ফিরছে
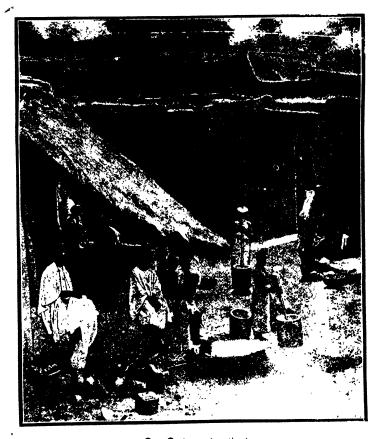
বন্দর তৈরি হ'য়ে ওঠেনি। এখানকার স্থলসীমার দৃশ্য হচ্ছে একটি শ্বেত শষ্প-রেখার পার্শ্বে পীত বর্ণের বালুক পটি ও তার পরই একেবারে আঁধার ঘন জঙ্গলের বিরাট কৃষ্ণ যবনিকা!

এই যবনিকা ভেদ ক'রে বড় বড় নদনদী বালুর পাড় ও শ্বেত শষ্প-রেখা অতিক্রম ক'রে সমুদ্রে এসে পড়েছে বটে, কিন্তু সেজন্য ওখানকার স্থলসীমার সেই অপূর্ব্ব সুন্দর দৃশ্য কোথাও একটুও ক্ষুণ্ণ হয়নি। এই-খানেই এখনও সব জঙ্গলের খোঁজের মধ্যে বিপদসঙ্কুল স্থানে বর্ব্বর কাফ্রী নর-রাক্ষসেরা অবস্থান করে। সাগর-ডুবী জাহাজের শ্বেতাঙ্গ আরোহীদের নিয়ে এদের মাঝে মাঝে বেশ বিরাট নরমাংস ভোজের আয়োজন হয়। পশ্চিম আফ্রিকার এই জঙ্গল প্রায় আড়াই শত মাইল গভীর। নারিকেল
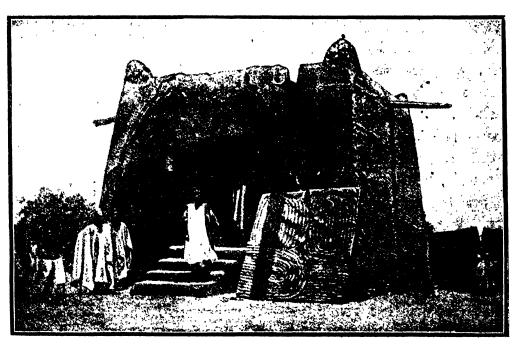
কানোর কাজীর বাড়ী। (কাজীকে এরা বলে 'আলকালি'। এদের যে-কিছু দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা—এই আলকালিরাই কোরাণের অনুশাসন অনুসারে তার বিচার করে।)

কুম্ভকার কুমারী (সুবর্ণতীর-বাসিনীরা মৃত্তিকার তৈজস্ নির্ম্মাণে সুপ্রসিদ্ধা। এখানে জনৈকা কুম্ভকার-কুমারী মৃত্তিকা মন্থন করছেন।)

ক্রেডোবা সুন্দরীর কেশ প্রসাধন।

আকাবের বুনো কাফ্রীদের সমাধিস্তূপ।
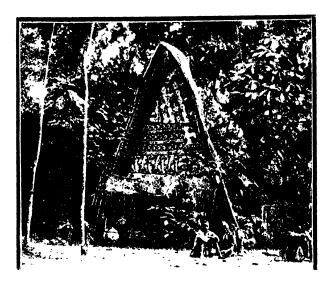
জলের কল।

(ব্রিটিশ আফ্রিকার আকড়া সহরে যেমন রাস্তাঘাট ঘরবাড়ী সব আধুনিক সভ্যজগতের অনুরূপ করে নেওয়া হয়েছে, তেমনি জলের কলও সেখানকার কাফ্রীদের কাছে এক নূতন জিনিস। আকড়ার মেয়েরা এখন সবাই কলের জল তুলে নিয়ে যায়।)

এরা বড় হীন; নিতান্তই জড়-উপাসকে
জাত! এদের মধ্যে ভূত প্রেত ও ডাইনি
বিত্তার প্রচলন খুব বেশী। নরবলি
নরমাংস ভোজন এরা এখনও পরিত্যাগ
করেনি। অরণ্য সম্পদে আফ্রিকার মধ্যে
এরাই সকলের চেয়ে ধনী বলে এদের অবস্থা
বেশ সচ্ছল।
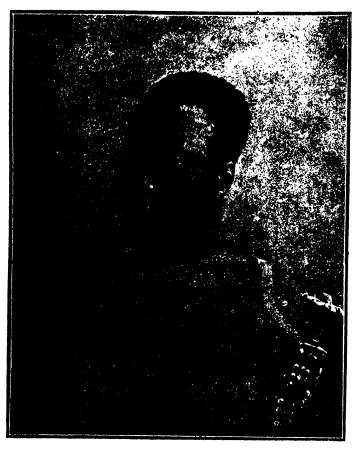
আশান্তিরাজ প্রেম্পে!
(আশান্তি কাফ্রীদের ইনিই শেষ নরপতি! এঁর অঙ্গে স্বদেশের প্রস্তুত মোটা গাত্রাবাস। ইনি এখনও রথে চড়ে ভ্রমণ করেন। এঁর বসবার আসন স্বর্ণমণ্ডিত।)

সমুদ্রের ধারে ধারে অসংখ্য শৈলজালের ফাঁকে ফাঁকে সুঁদরী ও গরাণের জঙ্গলের মধ্যে একদল বুনো জাতের কাফ্রী বাস করে। এদের কঞ্চি ও বাঁখারীর তৈরী বাড়ীগুলো সব কাদা মাটি লেপা ও বিশ্রী রং করা হ'লেও সেগুলোর গড়নের একটা বিশেষ রূপ আছে। এদের দেবতা হ'চ্ছেন সেই 'জু-জু'। 'জু-জু'র মন্দির ও বলিদানের বেদী এই পল্লীর একটা প্রধান দ্রষ্টব্য ব্যাপার। মৎস্য ধরাই হ'চ্ছে এদের উপজীবিকা এবং মাছই এদের প্রধান খাদ্য বটে তবু মধ্যে মধ্যে জু জুর অর্চ্চনা উৎসবে নরবলি দিয়ে এরা সেই নরমাংস ভোজনে মুখটা বদ্‌লে নেয়। অজগর সর্প, হাঙ্গর, কুম্ভীর, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বানর সুপারীও উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ এই জঙ্গল থেকে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হয়।

পশ্চিম আফ্রিকার উত্তরাংশ এত জঙ্গলাকীর্ণ নয়, কারণ সেখানে একটু জলাভাব। তবে সেদিকে শাবানা ঘাসের বিস্তীর্ণ প্রান্তর বাতাসে দোল খাচ্ছে দেখা যায়। কাফ্রীদের বড় বড় পশুপাল এই শাবানার ময়দানে সারাদিন চ'রে বেড়িয়ে পরিপুষ্ট ও সুচিকণ নধরকান্তি হয়ে ওঠে! এখানকার সমুদ্রতীরবাসী কাফ্রীরা নাইগার অঞ্চলের পশ্চিমদিকটাতেই খুব বেশী ভিড় ক'রে বসবাস ক'রছে। এরা সবাই এখনও সেই বর্ব্বর যুগের আদিম অসভ্য অবস্থাতেই রয়েছে। এদের মধ্যে প্রধান হ'চ্ছে আইবো জাতের নিগ্রোরা।

পশ্চিম আফ্রিকার বুনো কাফ্রী ওবিরীয়োদের সমাধি মঞ্চ।

স্বর্ণতীরবাসিনী তরুণীরা জল নিতে এসেছে।

নাইজেরীয়ার সুন্দরীদের কুণ্ডল-শোভা।
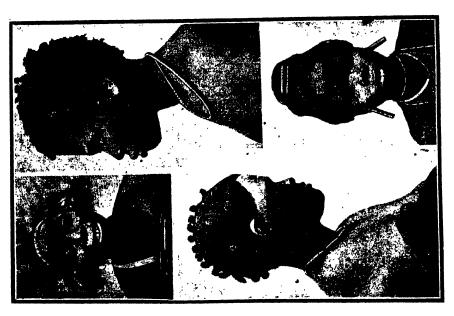
প্রভৃতি ভীষণ হিংস্র ও অত্যাচারী জীবজন্তু তাদের প্রতিবেশী, কিন্তু এদের তারা গ্রাহ্যই করে না। খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মযাজকেরা এদের অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যাবার জন্ম যথেষ্ট চেষ্টা করা সত্ত্বেও এরা এদের আদিম বর্ব্বর পৈশাচিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেনি।

নাইগারের পশ্চিম অঞ্চলে সেই নামজাদা 'বে'নীর কাফ্রীরা বাস করে। এরা খুব বুদ্ধিমান সুচতুর জাত। ব্রঞ্জ শিল্পে এরা বুশোঙ্গো কাফ্রীদের সঙ্গে সমান। এদের জনপদের নাম 'বেনীন্'। 'বেনীন' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'শোণিত-নগর'। বেনীনে এরা প্রতিদিন মহাসমারোহে নরবলি দিতো। ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে ইংরাজ সৈন্য এদের আক্রমণ ক'রে এদের নরমাংস লোলুপ রাজাকে বিনাশ ক'রে এখানকার নরহত্যা অনেকটা বন্ধ ক'রেছে। বেনীনের এই নরশোণিতোৎসবের বীভৎসতা চারিদিকে এমন একটা আতঙ্ক ও ভীতির সৃষ্টি করেছিল যে, আশেপাশের অনেকগুলো জাত এই বেনীরাজের নৃশংস শাসন সভয়ে মেনে নিয়েছিল। লাগোর পশ্চাদ্দেশস্থ উর্ব্বর উচ্চ ভূমিতে যে যোরুবাস জাতি বাস ক'রতো তারা বেনী-রাজের ভয়ে সর্ব্বদা তটস্থ হয়ে থাকতো; কিন্তু ইংরাজ সৈন্য বেনীন্ জয় করবার পর তারা সে আতঙ্কপাশ থেকে মুক্তি-লাভ করে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছে!

যোরুবাসরা শান্তিপ্রিয় জাত। তারা চাষবাস করে এবং ব্যবসা বাণিজ্যও করে। কিন্তু তাদের আশেপাশে চতুর্দ্দিকে দাঙ্গাবাজ লড়ায়ে জাত থাকায় তাদের বাধ্য হয়ে আত্মরক্ষার জন্য এক এক জায়গায় দলবদ্ধ হ'য়ে বাস কর'তে হোতো। এরই ফলে কা'ফ্রীদের আফ্রিকায় একাধিক বড় বড় জনপদ স্থাপিত হয়েছে। ছবির মতো সুদৃশ্য ও শান্তিপূর্ণ সহর ওইয়োতে যোরুবাসদের রাজা আলাফিন্ বাস করেন। এই আলাফিনকে, যোরুবাসরা দেবতার সাক্ষাৎ অবতার বলে মনে করে। দেবতার বিগ্রহের মতই তারা আলাফিন্‌কে ভক্তি করে, পূজা করে। আলাফিনের রাজপ্রাসাদ, মাটির দেয়াল ও তৃণাচ্ছাদনে তৈরী হ'লেও সেটি খুব প্রকাণ্ড। রাজবাড়ীর মধ্যে অনেকগুলি বড় বড় প্রাঙ্গণ আছে। নৃপতি আলাফিনের অধীনস্থ প্রদেশসমূহের কোনও কোনও শাসনকর্ত্তা মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হ'য়েছেন বটে, কিন্তু এখনও সার্ব্বভৌম রাজাকে সম্মান দেখাবার জন্য তাঁদের এক একটা প্রাচীন ধর্ম্মানুষ্ঠানের আয়োজন করতে হয়। কারণ সেখানে রাজা কেবল তাঁদের রাষ্ট্রপতি নন তিনি তাদের আধ্যাত্মিক রাজ্যেরও ধর্ম্মগুরু। উৎকৃষ্ট জমিদারীর বন্দোবস্ত ও সুবিধি প্রবর্ত্তিত থাকায় যোরুবা রাজ্য বেশ সুশাসিত এবং এর ভবিষ্যতও খুব উজ্জ্বল।

মালা

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

আমি সখি তার তরে
কত না যতন করে
গেঁথেছিনু মালা।
বিফল আশায় মাতি
কাটানু সারাটি রাতি
এল না গো কালা।
নিভিল আশার বাতি
মলিন চাঁদের ভাতি
বাড়িল রে জ্বালা।
মনেরে ভুলাতে ছলে
পরিনু আপন গলে
গাঁথিনু যে মালা।
প্রভাত অরুণ আঁখি
মেলিল, চাহিয়া দেখি
শুখায়েছে মালা।
মুছিনু গো আঁখি লোর
ছিঁড়ি ফেলি মোহ ডোর
ফেলে দিনু মালা।
ভাল যদি নাহি বাসে
কিবা তায় যায় আসে
বোঝা শোধা যন্ত্রণা।

হাসি মুখে গৃহ সাজে
কত মত নিজ কাজে
কেটে গেল বেলা।
আবার আসিল রাতি
ফুটিল কৌমুদী পাতি
যাতি যূথ বেলা।
মনে পড়ে সেই কথা
কুসুমে দিনু লো ব্যথা
কি নিঠুর খেলা।
অফোটা কলিকাগুলি
নিদয় করেতে তুলি
গেঁথেছিনু মালা।
বিঁধিনু কোমল প্রাণে
বিঁধিনু কঠোর টানে
দুখ দিনু বালা।
তুচ্ছ কুসুম তরে
কেন আঁখি জলে ভরে
কেন প্রাণে জ্বালা।
বৃথা কেন করি ছল
শুখাবে না আঁখিজল
নাহি এলে কালা।

হাইফেন

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

(৬)

বিলোপ হোটেল হইতে নিজেদের জিনিস-পত্র লইয়া ত্রিলোকের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল ত্রিলোক, মৃদুলা ও মলয় এক ঘরে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছে। বিলোপকে ফিরিতে দেখিয়াই মলয় লজ্জিত ভাবে তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বিলোপের নিকটে গেল এবং কুণ্ঠার সহিত হাসিয়া মৃদু স্বরে বন্ধুকে বলিল—ভাই, একলা তোমাকে দিয়ে মুটের কাজ করিয়ে কষ্ট দিলাম, কিছু মনে কোরো না; যে চুম্বকের কাছে এনে ছেড়ে দিয়ে গেলে, আমি আর তার আকর্ষণ ছাড়াতে পারলাম না।

বিলোপ বাক্স বিছানা প্রভৃতির মোটগুলি গাড়ী হইতে নামাইবার তদারক করিতে করিতে হাসিয়া বলিল—কিন্তু চুম্বকের পিতা হচ্ছেন সেই বুড়ো! বুড়োর বিকর্ষণ কাটিয়েও চুম্বকের আকর্ষণ তোমার কাছে এক দিনেই প্রবল হয়ে উঠল এ ভারি আশ্চর্য্য ব্যাপার!

মলয় হাসিতে হাসিতে বলিল—চন্দ্রের সুধা তার কলঙ্ককে ছাপিয়ে থাকে; যে বুড়োর এমন সুন্দর মেয়ে সে অপ্রধৃষ্যশ্চাভিগম্যশ্চ যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ!

বিলোপ জিনিসপত্র লইয়া আসিয়াছে দেখিয়া মলয়ের পিছনে পিছনে ত্রিলোক ও মৃদুলাও বাহিরে আসিল। ত্রিলোক বিলোপ ও মলয়ের কাছে আসিতেই তাঁহার কর্ণে মলয়ের বাক্যের শেষাংশ প্রবেশ করিল—যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ। মলয়ের মুখে সংস্কৃত বাক্য শুনিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিলেন—হ্যাঁ বাবা মলয়, কালিদাস অর্ণবকে যথার্থ বর্ণনা করেছেন, সে বাস্তবিকই অধৃষ্যশ্চাভিগম্যশ্চ। তোমার সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ দেখে পরম প্রীত হলাম। তোমার বন্ধু আমাকে বলছিলেন সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি তোমার বিশেষ আকর্ষণ নেই। কিন্তু দেখ্‌ছি তাঁর সে অনুমান ত ঠিক নয়…

তিনি উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

মলয় চকিতে একবার মৃদুলার মুখের দিকে কটাক্ষপাত করে' লজ্জিত হয়ে বললে—একে ঠিক অনুরাগ বলে না; কেবল দু-একটা কথার বুক্‌নি…

বিলোপ হাসিয়া মৃদুলার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—এইবার অনুরাগ হবে…সরস্বতীর বীণার হৃদয়তন্ত্রী বেজে উঠলে আর ত উদাসীন থাক্‌বার জো থাকে না…

মলয় আনন্দভরা প্রণয়কোপে ভ্রূকুটি করিল; মৃদুলার মুখ লজ্জারুণ হইয়া উঠিল; কিন্তু সরল ত্রিলোক মুগ্ধ গদ্গদ স্বরে বলিলেন—বাঃ! চমৎকার কথা! বিলোপবাবু যেন কবিত্বসুধাহ্রদের মরাল! তাঁর স্বভাব কবিত্বময়, বাক্য কবিত্বময়, ব্যবহার কবিত্বময়।

বিলোপ অকস্মাৎ প্রশংসা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অপ্রস্তুত ভাবে সেখান হইতে পলায়ন করিয়া জিনিসপত্রগুলি ঘরের মধ্যে তুলিয়া রাখিতে ব্যস্ত হইল।

মলয় বন্ধুর প্রশংসায় আনন্দিত হইয়া বলিল—কেবল ওর কর্ম্মটা মোটেই কবিত্বময় নয়, মুটেগিরি আর গিন্নিপনা কর্‌তেই ও ওস্তাদ।

মৃদুলা হাসিয়া বিলোপকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—আপনি ওগুলো ছেড়ে দিন না, চাকরেরা তুলে রাখ্‌ছে। আপনি এখন চা খাবেন আসুন।

বিলোপ জিনিসগুলি গুছাইয়া রাখিতে রাখিতে বলিল—আমার বন্ধুর এলোমেলোর মেলাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা কি চাকরদের কাজ!

মৃদুলা কণ্ঠস্বরে জেদ প্রকাশ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—আচ্ছা, আপনি এখন আসুন ত, আমি এক সময় সব গুছিয়ে দেবো।

বিলোপ জিনিস সজ্জিত করা ছাড়িয়া ঘর হইতে বাহিরে আসিতে আসিতে বলিল—অমন কর্ম্মটি করবেন না, দোহাই আপনার!…

বিলোপের এই কথা শুনিয়া মৃদুলা আশ্চর্য্য হইয়া বিলোপের মুখের দিকে চাহিল; যখন দেখিল তাহার মুখ কৌতুকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে তখন আশ্বস্ত হইয়া নিজেও কৌতুক অনুভব করিয়া বিলোপের অবশিষ্ট কথা শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল।

বিলোপ বলিতে লাগিল—কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখাবেন না। লক্ষ্মীর হাতের সেবার আস্বাদ একবার পেলে ঐ লক্ষ্মীছাড়াটার লোভ বেড়ে যাবে, আর সঙ্গে সঙ্গে আপনারও পরিশ্রম বেড়ে যাবে। খবরদার! খবরদার!

মৃদুলা লজ্জা পাইয়া অপাঙ্গে একবার মলয়কে দেখিয়া লইয়া মুখ নত করিল। মলয় একবার মৃদুলার লজ্জাসজ্জিত শ্রী দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল ভ্রূকুটি করিয়া বিলোপের দিকে চাহিল। ত্রিলোক উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন—আজ থেকে তোমার বিলোপ নাম বিলোপ করে' দিয়ে তোমার নূতন নাম রাখ্‌লাম চারুবাক্‌।

এতদিন পরে ত্রিলোক বিলোপকে তুমি বলাতে মনে মনে খুশী হইয়া বিলোপ বলিল—কিন্তু আমি চার্ব্বাক মোটেই নই।

বিলোপের উত্তর দিবার তৎপরতা দেখিয়া মৃদুলা ও মলয় মৃদু হাস্য করিল এবং ত্রিলোক উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

মৃদুলা বলিল—চার্ব্বাক এখন চা'র বাটিতে চুমুক দেবেন চলুন ত।

বিলোপ মলয়ের কাছে ঘেঁসিয়া কানে কানে বলিল—আমার ভাগ্যে চায়ের বাটিতে চুমুক দেবার ব্যবস্থা, কিন্তু তোমার বেলা চুমুকের স্বার্থে ক লোপ হয়ে যাবে তার আর বেশী বিলম্ব নেই।

মলয় গোপনে বিলোপকে জোরে একটা চিম্‌টি কাটিয়া দিল। বিলোপ অতর্কিত আঘাত পাইয়া চম্‌কাইয়া উঠিল। ত্রিলোক তাহা দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি? কি হলো?

বিলোপ হাসিয়া বলিল—আজ্ঞে না, কিছু না।

মৃদুলা কিছু বুঝিতে না পারিলেও দুই বন্ধুর গোপন কথার রঙ্গরহস্যে নিজেকে বিজড়িত মনে করিয়া লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল এবং সেই লজ্জা তাহাদের নিকট গোপন করিবার জন্য সে ফিরিয়া ঘরের মধ্যে চলিল। তখন ত্রিলোকও কন্যার অনুসরণ করিতে করিতে মলয় ও বিলোপকে ডাকিলেন—এসো বাবা এসো, অনেক বেলা হয়ে গেল, চা খাবে এসো।

মলয় ও বিলোপ প্রফুল্ল মুখে তাঁহার অনুগমন করিল।

৭

পর দিন প্রত্যুষে মলয় বিলোপের পূর্ব্বেই শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিল এবং প্রাতর্ভ্রমণে নির্গত হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। ঘরের মধ্যে মলয়ের সঞ্চরণের সাড়া পাইয়া বিলোপের ঘুম ভাঙিয়া গেল; বিলোপ শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া হাসিমুখে বলিল—কি! আজ যে এত ভোরেই ঘুম ভেঙে গেছে! একেবারে অভিসার-বেশে প্রস্তুত!

মলয় লজ্জা পাইয়া কৃত্রিম ভর্ৎসনার স্বরে বলিল—আঃ! কি যে সব কথা বলো! কেউ শুন্‌তে পাবে।

বিলোপ বলিল—কেউ যে দেখ্‌ছি এরই মধ্যে প্রাণের মধ্যে ঢেউ তুলেছে, বেশ! সেই ঢেউয়ে বুড়োর উপর বিরাগও বোধ হয় ভেসে গেলো?

মলয় আবার লজ্জিত হইয়া বলিল—তোমার সকল তাতেই ঠাট্টা। আমি রঙ্গ করে' বুড়োর ভয় দেখাতাম বৈ তো নয়, তাকেই তুমি সত্যি ভেবে নিয়েছো? আচ্ছা বোকা তো'!

বিলোপ ঘর হইতে বাহিরে যাইতে যাইতে হাসিমুখে বলিয়া গেল—বিজ্ঞ লোকেরাই মত পরিবর্ত্তন ক'রে থাকে।

অল্পক্ষণ পরেই ত্রিলোক আসিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং মলয়কে জাগ্রত দেখিয়া আনন্দিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"এই যে মলয়ের ঘুম ভেঙে গেছে! বিলোপ তোমাকে জাগিয়ে দিয়েছে বুঝি? নইলে তো এত ভোরে তোমার ঘুম আপনা হতে ভাঙ্‌বার কথা নয়!" ত্রিলোক উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

মলয় লজ্জিত হইয়া নীরবে মৃদু হাস্য করিল।

ত্রিলোক মলয়কে বলিলেন—বিলোপ কোথায় গেলেন? চলো আমরা বেড়াতে বেরিয়ে পড়ি—মৃদুর শরীরটা ভালো বোধ হচ্ছে না বললে, সে আজ আর বেড়াতে যাবে না।

মলয়ের বেড়াইতে যাইবার সমস্ত উৎসাহ তৎক্ষণাৎ উবিয়া গেল; সে কুণ্ঠিত স্বরে ইতস্ততঃ করিতে করিতে

বলিল—আমার তো ভোরে ওঠা অভ্যাস নেই, ঠাণ্ডা সহ্য হবে কি না ভয় হচ্ছে; আস্তে আস্তে সইয়ে সইয়ে ঠাণ্ডা লাগানো ভালো।

ত্রিলোক ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, অভ্যাসের বিরুদ্ধে একেবারে হঠাৎ কিছু করা ঠিক নয়; তোমারও বেড়াতে গিয়ে কাজ নেই। মৃদুর তো চিরকাল ঠাণ্ডা সওয়া অভ্যাস, কিন্তু তারই কেমন করে' ঠাণ্ডা লেগে গেছে......এই যে বিলোপ, চলো বেড়াতে বেরিয়ে পড়া যাক—আজ আমাদের দুজনকেই যেতে হবে—মৃদুর শরীরটা ভালো নেই......

বিলোপ শাল গায়ে দিয়া জুতা পরিতে পরিতে মলয়ের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—মলয় যাবে না?

মলয় লজ্জিত হইয়া নিরুত্তর রহিল। ত্রিলোক বলিলেন—না, না, ওরও গিয়ে কাজ নেই—ওর সকালে ওঠা কিংবা ভোরের ঠাণ্ডা লাগানো তো অভ্যাস নেই। আহা বিলোপ, তুমি ওর ঘুমটি কেন ভাঙিয়ে দিয়েছো? .....মলয়, তুমি ঢাকা-চুকি দিয়ে শুয়ে থাকো, এখনও সকাল হতে বিলক্ষণ বিলম্ব আছে......

বিলোপ অর্থভরা হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করিয়া মলয়ের দিকে চাহিতে চাহিতে ত্রিলোকের সহিত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মলয় বিছানার উপর শুইয়া পড়িয়া লেপটা টানিয়া গায়ে ঢাকা দিল।

সমুদ্রতীরে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিয়া ত্রিলোক বিলোপকে বলিলেন—চলো বাবা, একবার শ্রীমুখ দর্শন করে' আসা যাক।

বিলোপ বলিল—চলুন আপনাকে মন্দির পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি; আমি মন্দিরে যাবো না, আমার বাসী কাপড়।

ত্রিলোক বলিলেন—তা হলে তুমি আর অতদুর কষ্ট করে' যাবে কেন। তুমি বরং এইখানে বেড়াও কি বাড়ী ফিরে যাও, আমি দর্শন করে' আসি।

বিলোপ বলিল—না, চলুন, আপনাকে মন্দিরে পৌঁছে দিয়েই আমি বাড়ীতে ফিরবো।

বিলোপ ত্রিলোক-বাবুকে মন্দিরের দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া বাসায় ফিরিয়া চলিল। বাসার পথে যাইতে যাইতে সে দূর হইতেই দেখিল ত্রিলোক-বাবুর বাড়ীর হাতার বাগানে মলয় ও মৃদুলা পাশাপাশি ভ্রমণ করিতেছে। ইহা দেখিয়াই বিলোপ নিজের অজ্ঞাতসারেই হঠাৎ থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া গেল; সে দেখিল—মলয় ও মৃদুলা বেড়াইতে বেড়াইতে একটি ফুলন্ত গোলাপ গাছের নিকটে গিয়া দাঁড়াইল, এবং লাল গোলাপগুলির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মলয় কি বলিল; মলয়ের কথা শুনিবার জন্য মৃদুলা তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়াছিল, মলয়ের কথা শুনিয়া সে নত হইয়া পাতাসুদ্ধ একটি বড় গোলাপ গাছ হইতে ছিঁড়িয়া তুলিয়া মলয়ের হাতে দিল; মলয় সেই গোলাপটি মৃদুলার হাত হইতে নিজের হাতে লইয়া একবার নাকের নীচে ধরিল—দূর হইতে বিলোপ বুঝিতে পারিল না মলয় সেই গোলাপটির গন্ধ আঘ্রাণ করিল অথবা মৃদুলার মুখের প্রতিকৃতি মনে করিয়া সেই গোলাপটিকে চুম্বন করিল; মলয় গোলাপটিকে জামার বোতামের ছিদ্রে গুঁজিয়া রাখিল—মলয়ের বুকের উপর সেই গোলাপটি মৃদুলার প্রণয়ে আরক্ত তাহারই হৃদয়ের মতন শোভা পাইতে লাগিল। মলয় এবং মৃদুলা পুনরায় বাগানের কেয়ারীর পাশে পাশে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল এবং বিলোপ তাড়াতাড়ি পিছন ফিরিয়া ছাতা মুড়ি দিয়া যে পথে আসিয়াছিল সেই পথে ফিরিয়া চলিল। পাছে মলয় কিংবা মৃদুলা তাহাকে দেখিতে পাইলে তাহাদের অবাধ মিলনে বাধা ঘটে এই আশঙ্কায় বিলোপ উহাদের দৃষ্টিপথ হইতে দূরে পলায়ন করিতে লাগিল। সে অন্যপথ দিয়া ঘুরিয়া সমুদ্রতীরে গেল এবং একেবারে জলের ধারে বালির উপর বসিয়া পড়িল; সে উদাস দৃষ্টিতে সমুদ্রের অনন্ত বিস্তারের দিকে চাহিয়া ছিল কিন্তু কিছুই দেখিতেছিল না, তাহার মানস-দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া বিচরণ করিতেছিল পুষ্পিত উদ্যানের মধ্যবর্ত্তী মলয় ও মৃদুলার যুগলমূর্ত্তি; সেই দৃশ্য স্মৃতিপটে উদিত হইবামাত্রই তাহার মনে হইল—এই মিলনের সুযোগ সৃজন করিবার জন্যই কি মৃদুলা অসুখের ছল করিয়া বেড়াইতে বাহির হয় নাই? মৃদুলা হয়ত মনে করিয়াছিল বেলা করিয়া উঠিতে অভ্যস্ত মলয় তো তাহাদের সহিত অত ভোরে বেড়াইতে বাহির হইতে পারিবে না, তাই সেও আজ বেড়াইতে বাহির হইতে চাহে নাই; সে

বুঝিতে পারে নাই যে প্রণয়ের আবেগ আজন্মের অভ্যাসকেও অতিক্রম করিতে পারে এবং বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাইতে অভ্যস্ত আয়েসী মলয়ের আরামের ঘুম সকলের আগে ভাঙাইয়া অভিসারের জন্য তাহাকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে পারে; এবং মৃদুলা ইহাও বোধ হয় অনুমান করিতে পারে নাই যে একদিনের পরিচয়েই মলয় তাহার প্রণয়ে এমন করিয়া ডুবিয়া তলাইয়া যাইতে পারে। এই কথা চিন্তা করিয়া বিলোপেরও অত্যন্ত বিস্ময় বোধ হইল—রসশাস্ত্রে যাহাকে প্রথম দর্শনেই প্রণয় সঞ্চার বলে মলয় তাহারই' দৃষ্টান্ত। সেও ত প্রথম দর্শনেই মৃদুলাকে ভালোবাসিয়াছে, কিন্তু মৃদুলা ত তাহাকে ভালোবাসে নাই, মলয়কে ভালোবাসিয়াছে; তাই মলয় পাইল মৃদুলার হাতের উপহার গন্ধবিধুর রঙীন গোলাপ, আর সে পাইয়াছে একটা কাঁটা তাহাও চুরি করিয়া।

চিন্তায় আর রৌদ্রতাপে বিলোপের মাথা যখন গরম হইয়া উঠিল তখন তাহার মনে হইল বাসায় ফিরিতে হইবে। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার আবার মনে হইল সে গিয়া মলয় ও মৃদুলার মিলনে ব্যাঘাত ঘটাইবে না তো। অনেকক্ষণ সমুদ্রতীরে ইতস্ততঃ সঞ্চরণে বিলম্ব করিতে করিতে যখন তাহার মনে হইল এতক্ষণে ত্রিলোকবাবু নিশ্চয়ই মন্দির হইতে বাড়ীতে ফিরিয়াছেন তখন বিলোপ ধীরমন্থরপদে বাসায় ফিরিল। সে বাড়ীতে আসিতেই মলয় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—এতক্ষণ কোথায় ছিলে? জ্যেঠা মশায়কে মন্দিরে পৌঁছে দিয়ে তুমি আবার কোথায় গিয়েছিলে?

বিলোপ হাসিমুখে বলিল—বাড়ী পর্য্যন্ত এসে আবার ফিরে সমুদ্রের ধারে চলে গিয়েছিলাম।

মলয় জিজ্ঞাসা করিল—কেন? সমুদ্র কি তোমার এতই ভালো লেগেছে?

বিলোপ হাসিতে হাসিতে বলিল—সমুদ্র ভালো লেগেছে ব'লেই ঠিক যাই নি, আমি তখন বাড়ীতে ফিরে এলে তোমাদের ভালো লাগ্‌ত না বলে'ই গিয়েছিলাম।

মলয় বিলোপের কথার তাৎপর্য্য হঠাৎ বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—সে কি রকম?

বিলোপ বলিল—"Two's company, three's none" দুইয়ে মধুসঙ্গ, তিনে রসভঙ্গ!

বিলোপের কথা শুনিয়া মলয়ের মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল, সে কুণ্ঠিত ভাবে হাসিয়া বিলোপকে জিজ্ঞাসা করিল —তুমি সত্যি বাড়ীতে এসেছিলে নাকি, অ্যাঁ? না চালাকি করে' ধাপ্পা দিচ্ছ?

বিলোপ হাসিতে হাসিতে বলিল—আমার কথা যে চালাকি ধাপ্পাবাজী নয় তা তোমার প্রশ্নের ধরণেই ধরা পড়ে' গেছে;—আর আমার সাক্ষী আছে তোমার বুকের উপর ঐ লাল গোলাপ আর তোমার বুকের ভিতরে রসামৃত মূর্ত্তি অন্তর্যামী।

বিলোপের কথা শুনিয়া মলয় লজ্জিত হইল; সে ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া মুখ তুলিয়া বিলোপকে লজ্জিত হাসিমুখে বলিল—শ্রীক্ষেত্রে এসে আমি শ্রীর সাক্ষাৎ পেয়েছি; এখানে আসবার আগে তুমি ঘটকালি করবে বলেছিলে, এইবার তোমার সেই প্রতিশ্রুতি পালনের সময় এসেছে।

বিলোপ গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—মৃদুলার মনের ভাব কিছু জান্‌তে পেরেছ?

মলয়ের মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং সে বলিল —আমার ভাই পরম সৌভাগ্য—যাকে ভালোবেসেছি তারও ভালোবাসা পেয়েছি!

বিলোপ অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—এ বাড়ীতে পা' দিতে না দিতে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দু—দুটো হৃদয় জয় হয়ে গেল এ তো বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার! তুমি যে দেখ্‌ছি দ্বিতীয় জুলিয়াস্ সিজার—তুমিও তাঁর মতন বল্‌তে পারো —ভিনি ভিডি ভিসি—এলাম দেখলাম জয় করলাম!

মলয়ের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, সে কোনো কথাই কহিতে পারিল না।

বিলোপ পুনরায় মলয়কে জিজ্ঞাসা করিল—মৃদুলার মনের ভাব যে তোমার অনুমানের অনুকূল তার প্রমাণ কি?

মলয় লজ্জাকুণ্ঠিতস্বরে বলিল—আমি আজ সকাল বেলা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে তিনি আমাকে তাঁর জীবনের সহায়রূপে গ্রহণ করতে পারেন কি না; তাতে তিনি লজ্জারুণ হাসিমুখে মৃদুস্বরে বল্লেন "সে-সব আমি জানি না, আপনি বাবাকে বল্‌বেন।" এর পর অবশ্য আর কোনো কথা হয় নি, কিন্তু বেড়াতে বেড়াতে আমি যখন

এই গোলাপটির প্রশংসা করলাম, তথন তিনি এইটি নিজের হাতে তুলে আমাকে দিলেন.........

বিলোপ গম্ভীরমুখে বলিল—এবং গোলাপফুল অনু-রাগের চিহ্ন।......

বিলোপ অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল—আচ্ছা, আমি তোমার ঘটকালির ভার নিলাম···

সফলতার আশায় মলয়ের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

বিলোপ আর কোনো কথা না বলিয়া চট্ করিয়া উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল; সে বাড়ী হইতেই বাহির হইয়া যাইতেছিল, কিন্তু মৃদুলা পিছন হইতে তাহাকে ডাকিল—আবার কোথায় বের হয়ে যাচ্ছেন?

পিছনে মৃদুলার মধুরকণ্ঠধ্বনি শুনিয়া বিলোপ মুখ ফিরাইতেই মৃদুলা আবার বলিল—চা তৈরী হয়েছে, খাবেন আসুন।

বিলোপ বলিল—আমার শরীরটা আজ ভালো নেই, এখন আর কিছু খাবো না, যদি ভালো বোধ হয় তো একেবারে ভাত খাবো।

মৃদুলা বিলোপের কথা শুনিয়া বিলোপের মুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিল বিলোপের মুখ শুষ্ক ও ম্লান, সদানন্দ বিলোপের মুখে হাসি নাই। মৃদুলা উৎকণ্ঠিতস্বরে বলিল—অসুখ করছে যদি তবে আবার এই রৌদ্রে কোথায় বেরোচ্ছেন?

বিলোপ শুষ্কমুখে ম্লান হেসে বল্লে—আমি এখনি ফিরে আসছি।

বিলোপ মৃদুলার আর কোনো কথা শুনিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। সে আবার সমুদ্রের তীরে গিয়া উপস্থিত হইল। বালির উপর তোলা একখানা নৌকার পাশে ছায়ায় গিয়া সে বসিল। সে ভাবিতে লাগিল—সেও তো প্রথম দর্শনেই মৃদুলাকে ভালোবাসিয়াছে, এবং মলয়ের আগেই সে মৃদুলাকে দেখিয়াছিল। কিন্তু তাহার সহিত মলয়ের অবস্থার পার্থক্য এই যে মলয় মৃদুলার ভালোবাসার প্রতি-দান পাইয়াছে, সে তাহাতে বঞ্চিত; অধিকন্তু সে শূদ্র, মলয় ব্রাহ্মণ—মৃদুলাকে পাইবার পথ তাহার পক্ষে রুদ্ধ এবং মলয়ের পক্ষে মুক্ত। এ দেশের মনোভবও অনেক সময় জাতের ভয়ে অজাতের কাছে শীঘ্র ঘেঁষিতে চাহে না; সেইজন্যই কি ব্রাহ্মণ মলয়ের ভাগ্যে জুটিল অনুরাগরক্ত গোলাপফুল এবং শূদ্র তাহার ভাগ্যে জুটিল লোহার কাঁটা! বেশ, এই লোহার কাঁটাই তাহার চিরজীবনের সম্বল হইয়া থাকিবে; বন্ধুর সহিত সে প্রণয়ের ক্ষেত্রেও প্রতিযোগিতা করিবে না। কিন্তু মৃদুলার মাথার লোহার কাঁটাটিও তাহার রাখিবার তো কোনো অধিকার নাই, ইহাও তো পরস্ব; ইহাও সে তাহার বন্ধুকেই উপহার দিবে। তাহার অনুরাগের আভাসও সে মৃদুলা বা মলয়ের নিকটে কখনই প্রকাশ পাইতে দিবে না।

বিলোপ অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া এই সঙ্কল্পে যখন উপনীত হইল তখন সে গাঝাড়া দিয়া উঠিয়া পড়িল এবং বাসার দিকে ফিরিয়া চলিল।

সে বাসায় আসিতেই মৃদুলা উৎসুক আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—শরীরটা এখন কেমন বোধ হচ্ছে?

বিলোপ প্রসন্নহাস্যমুখে বলিল—সব অসুখ সমুদ্রের খোলা হাওয়ায় উড়িয়ে ভাসিয়ে দিয়ে এসেছি......

মৃদুলা নিশ্চিন্তভাব ধারণ করিয়া বলিল—সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয় নি, যাই আমি সকাল সকাল খাওয়ার জোগাড় করি গে'। (ক্রমশঃ)

জাগরণ

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল্

গরমের ছুটিতে গ্রামে থাকিতেই সতীশ বি-এ ফেলের খবর পেয়েছিল। ক্লাসে সে ছেলে ভালই ছিল, এবং ইতিপূর্ব্বে সে ফেল কখনও হয়নি, সুতরাং এই ফেলের সংবাদ তাকে যেন অনেকটা অবসন্ন করে দিয়েছিল।

ছুটি ফুরতে সে আবার কলকাতায় ফিরে এল। আবার সেই পুরানো পড়া পড়তে হবে। ছুতোরপাড়ার মলিন মেসটি তার কাছে যেন আরও মলিনতর বোধ হ'তে লাগল। যে নীরস বইগুলোর হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে বলে সে ভরসা করেছিল, সেই-গুলোই আবার ক'রে বার করতে তার চোখে জল এল! যে পাঠ-গুলো সে ইতিপূর্ব্বে বহুবার ক'রে পড়েছে, সেই-গুলো পুনরায় তাকে নতুন ক'রে সুরু করতে হবে! তার বহুদিনের সঙ্গীরা যখন আনন্দোজ্জ্বল মুখে উঁচু ক্লাসে গিয়ে বসবে, তখন তার লজ্জা সে কেমন করে ঢাকবে?

অথচ কত তার চেয়ে খারাপ ছেলে পার হ'য়ে গেল, এবং সে,—যার ওপর তার অধ্যাপকরা বিশেষ আশা রেখেছিলেন—সেই হ'য়ে গেল ফেল! কেমন করে যে সে ফেল হ'ল সে এখনও তা বুঝতে পারে না! তার মনে হ'ল যে পরীক্ষাটা যেন একটা পাশা খেলা, তার দান পড়ার ওপর মানুষের কোন হাত নেই। যদি ভাল দান পড়ল ত' ভালই, নইলে আবার কেঁচে সুরু করতে হবে, আবার সেই পাশা ছুঁড়ে ফেলে অপেক্ষা করতে হবে, এবার ভাগ্যে কি দান ওঠে!

প্রিন্সিপ্যাল বলেছেন তার ফেল হওয়া সম্বন্ধে তিনি রীতিমত অনুসন্ধান করবেন; কিন্তু অনুসন্ধানের কোনও সুফল এখনও পাওয়া যায়নি, এবং সে সম্বন্ধে যে ক্ষীণ আশাটুকু সতীশ মনে মনে পোষণ করত তাও বিলীন হ'য়ে গেছে।

এই ফেল হওয়ার দুঃখ যখন তার মর্ম্মকে আচ্ছন্ন ক'রে দিয়েছিল, তখন মাঝে মাঝে সে সান্ত্বনার আশায় তৃষ্ণার্ত্ত হ'য়ে উঠ্‌ত। অথচ এ সান্ত্বনা হয়ত দুর্লভও ছিল না। দুই বৎসর আগে তার বিবাহ হ'য়েছে। শ্বশুর-বাড়ী জোড়াসাঁকোয়। শ্বশুর বড়-লোক, এবং তার নিজের অবস্থা তেমন ভাল নয়, সেই জন্যে সে মেসে থাকাই পছন্দ করত। নিমন্ত্রণ উপলক্ষে সে মাঝে মাঝে শ্বশুরবাটী গিয়াছে বটে, কিন্তু সে বড় বেশী নয়। এবং তার স্ত্রী ইন্দু যে ঠিক কেমন লোকটি সে এখনও তেমন ভাল করে বুঝে উঠ্‌তে পারে নি। বড়লোকের মেয়ের সম্বন্ধে তার একটা আন্তরিক ভয় যে না ছিল এমন নয়, কিন্তু সে মনে মনে আশা করত যে তার স্ত্রীকে যে দিন সে ঠিক বুঝতে পারবে সে দিন দেখবে যে তার এ ভয় একেবারে ভিত্তিহীন। দুঃখের সময় তার মন বোধ করি এই সান্ত্বনাটুকুর দিকেই ফিরে ফিরে চাইছিল।

সুযোগও হ'ল, সে-দিন সকালে তার শ্যালক এসে তাকে সন্ধ্যায় নিমন্ত্রণ ক'রে গেল।

২

সন্ধ্যার সময় সে শ্বশুর-বাড়ী গিয়ে পুরুষ মানুষ কাউকেই দেখতে পেলে না। সে-দিন শিল্ডের খেলায় মোহনবাগানের সঙ্গে ম্যাচ ছিল, সুতরাং ছেলের দল তাই দেখতে গেছে। কর্ত্তা বেড়াতে গেছেন।

প্রথম যার সঙ্গে দেখা হোল, সে তার স্ত্রী ইন্দু। ইন্দু তাকে দেখেই মুখ অত্যন্ত কঠিন করে বল্লে "এখানে এলে যে! ফেল হ'য়েছো, লজ্জা করে না?"

স্ত্রীর বোধ করি অধিকার আছে সেই জন্যে সে মর্ম্মান্তিক কথাগুলো শোভনতার কোনও আচ্ছাদন না দিয়েই এমনি ক'রে বলতে পারে। কথাগুলো এক নিমেষে তীক্ষ্ণ শরের মত গিয়ে সতীশের অন্তরের আর্দ্র কোমল স্থানটুকুতে বিঁধে সমস্ত হৃদয়টা যেন রক্তাক্ত ক'রে দিলে, আর সেই মুহূর্ত্তে তার মুখ থেকে সমস্ত রক্ত স'রে গিয়ে

একেবারে ফ্যাকাশে হ'য়ে উঠ্ল। সে কি আশা করেই না এসেছিল!

সামলে নিতে খানিকক্ষণ গেল। তার পর মৃদু কণ্ঠে সতীশ বললে, 'নেমন্তন্ন হ'য়েছিল যে!'

কোমলতার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তেমনি কঠিন কণ্ঠে ইন্দু বললে "নেমন্তন্ন হ'লেই কি ছুটে আসতে হবে! একটা মান-অপমান লজ্জা আছে ত'!"

কারুর কারুর জীবনে এমন এক একটা সময় আসে যখন তাকে কঠিন কথার মোহ পেয়ে বসে। মর্ম্ম-ভেদী বাক্যের দ্বারা অপরের মর্ম্মে আঘাত করাটা তাদের শুধু আনন্দ দেয় না, যেন গৌরবও দান করে!

বিজয়ী বীরের মত ইন্দু যখন চ'লে গেল, তখন সতীশ কাঠের মত খানিকক্ষণ চুপচাপ ব'সে রইল। এই ঘরের প্রত্যেক বিলাস-সরঞ্জাম তাকে বেদনা দিতে লাগল, এবং মনে হ'তে লাগল দেওয়ালের উপর ঘড়িটা টক্ টক্ ক'রে প্রতি নিমেষেই তাকে টিটকারী দিচ্ছে!

খানিক পরে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে অপরের অলক্ষ্যে সতীশ সে বাড়ী ছেড়ে রাস্তায় গিয়ে উঠ্ল।

রাত্রে তার শ্বশুর-বাড়ীতে একবার সতীশের খোঁজ হ'য়েছিল বটে, কিন্তু ইন্দু যখন বললে যে সে শরীর খারাপ ব'লে চ'লে গেছে, তখন তার বড়লোক শ্বশুর-শ্বাশুড়ী সেইটেই যথেষ্ট কারণ বলে মনে করলেন।

৩

রাস্তায় সতীশ পা দুটোকে টেনে টেনে চলতে লাগল। তারা যেন যেতে চায় না, এমনি অবশ হ'য়ে গেছে! সমস্ত পৃথিবীর ওপর থেকে আনন্দ যেন নিঃশেষে মুছে গিয়ে একটা কালো যবনিকা পড়ে গিয়েছে। সে কি আশা ক'রে গিয়েছিল, আর কি পেয়ে ফিরলো! তার অন্তরের মাঝখানে এই ঘটনা যে গভীর কালো ছাপ দিয়ে গেল, তারই কালিমা তার কাছে সমস্ত ভবিষ্যৎটা মসীময় করে দিলে! কি হবে পাশ ক'রে—কার জন্যে? পাশই হোক বা ফেলই হোক, তার পথের কাঁটার তীক্ষ্ণতা ত' কোনও দিন কমবে না!

গোলদীঘিতে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হোল, একজন বললে ইস্, তোমার চেহারা ত' বড্ড খারাপ দেখাচ্ছে, একজন সান্ত্বনা দিয়ে গেল এই বলে যে পাশ ফেল ত' মানুষের ভাগ্য, তার জন্যে এত দুঃখ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তৃতীয় বন্ধুর সঙ্গে দেখা হ'লে সে বললে, আজকের খেলার খবর জান?

সতীশ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে, কি?

বন্ধু বললে, মোহনবাগান হেরেছে।

সতীশের মুখে স্পষ্ট বেদনার চিহ্ন জেগে উঠল, সে বল্লে, ফার্ষ্ট রাউণ্ডেই?

বন্ধু জিহ্বার একটা অস্পষ্ট শব্দ ক'রে বল্লে, হাঁ।

খবরটা তাকে আরও দমিয়ে দিলে। কেন সে ঠিক জানে না, তবু মোহন-বাগানের জয়কে সে দেশের জয় মনে ক'রে তাকে একটা পরম আকাঙ্ক্ষ্য বস্তু বলে ভাব্ত। কবে মান্ধাতার আমলে মোহন-বাগান একবার শিল্ড পেয়ে তার এই আকাঙ্ক্ষাটিকে নিত্য জাগরুক ক'রে রেখেছিল,—প্রতি বৎসরই সে ভরসা করত এইবার মোহনবাগান আবার জয়-লাভ ক'রে তার জয় যে আকস্মিক নয়, পরন্তু তারই একান্ত প্রাপ্য এইটে সপ্রমাণ করবে। কিন্তু প্রতি বৎসরই সে যখন নিরাশ হোত, তখন ভাগ্যের ওপর দোষ দিয়ে সে আবার পর বৎসরের দিকে চেয়ে থাকতো! এবারও সে ভেবেছিল যে ভাগ্যের আকস্মিকতাকে পরাস্ত করে মোহন-বাগান তার যোগ্যতাকে লোক-চক্ষুর সামনে অভ্রান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করবে। কিন্তু ফার্ষ্ট রাউণ্ডেই তার পরাজয়ের সংবাদ তাকে একেবারে বসিয়ে দিলে।

বেদনাতুর তার মন এই নূতন ব্যথা পেয়ে শ্রাবণের মেঘের মত ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠ্ল, তার কোথাও একটু-খানি ফাঁক পর্য্যন্ত নেই! ব্যথা যেমন ক'রে যেদিক থেকেই আসুক না কেন, সে ব্যথা ভিন্ন আর কিছু নয়। সে চুপটি করে একটা বেঞ্চের ওপর ব'সে ব'সে ভাবতে লাগল। জীবন-যাত্রা-পথের এই নবীন পথিকটি যতই ভবিষ্যতের দিকে দেখতে লাগল, ততই অন্ধকার ভিন্ন তার চোখে আর কিছুই পড়ল না! বসে বসে যেন তার শ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে আসতে লাগলো, নিরানন্দ যেন মূর্ত্তি ধ'রে এসে তাকে ভ্রূকুটি করতে লাগলো।

কতক্ষণ এমনি ক'রে বসে ছিল তার জ্ঞান নেই, যখন জ্ঞান হোল তখন অনেক রাত হ'য়েছে—গোলদীঘি প্রায় খালি। আস্তে আস্তে সে উঠে মেসের পথে চললো।

বেদনার আতিশয্য মানুষের দৃষ্টিকে রুদ্ধ করে দেয়, মনে

হয় বর্ত্তমানের এই যে দুঃখ এইটেই সব এবং ইহাই তার জীবনকে পরিপূর্ণ ব্যথাময় ক'রে তুলেছে। এই কল্পনাই তাকে এমন অসম্ভব কাজে প্রবৃত্ত করায়, যা অন্য সময়ে নিশ্চয়ই তার একান্ত প্রকৃতি-বিরুদ্ধ।

এমনি একটা অসম্ভব সঙ্কল্প করে সে মোড়ের আফিমের দোকানের সামনে দাঁড়াল। একবার ভাব্‌লে, তার পর-মুহূর্ত্তেই তার বেদনার প্রবলতা তাকে ঠেলে নিয়ে চল্লো।

দোকানের গুপ্তদ্বার দিয়ে ভিতরে গিয়ে বল্লে এক-ভরি আফিং দিও ত'।

দোকানী পাতায় মুড়ে এক ভরি আফিং দিয়ে দামের জন্যে হাত বাড়ালে।

এক ভরি আফিঙের দাম সে জানত না, তবে ধারণা ছিল এক টাকার বেশী। পকেট থেকে দুটো টাকা বার ক'রে ফেলে দিয়ে সে চল্‌লো। হয়ত বা বাকী পয়সা কিছু ফিরত, কিন্তু যে জীবনের হিসাব-কিতাব শেষ করতে চলেছে তার কাছে কটা পয়সার কি দাম?

দোকানী একবার টাকা দুটোর দিকে দেখলে, তার-পর ঐ উদাসীন বাবুটির দিকে চেয়ে ডাকলে, "বাবু, অ—বাবু?"

সতীশ ফিরে আসতে দোকানী বল্লে, "কত চেয়ে-ছিলেন, এক ভরি না? কিছু কম আছে, দিন দিকিনি," বলে সেই আফিঙের মোড়কটা নিলে, তারপর ওজন করে আরও একটু বড় একটা মোড়ক দিয়ে বল্লে, "বাকী আট আনা পয়সা নিলেন না?"

সতীশ বল্লে, ওঃ, তা দেও। বলে সে মেসে ফিরল।

৪

মেসে ফিরে দেখলে যে তার রুম-মেট অর্থাৎ গৃহ-সঙ্গী অনিল শুয়ে পড়েছে। তখনও বোধ করি তার ঘুম আসে নি, সতীশের পায়ের শব্দে তন্দ্রা ভেঙ্গে যাওয়াতে অনিল জড়িত-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, এত দেরী যে সতীশ! তার পর নিজেই বল্লে, ও নেমন্তন্ন ছিল যে শ্বশুর-বাড়ীতে, কথায় বলে সারং শ্বশুর-মন্দিরং। এই মন্দির ছেড়ে এত রাত্রে এই নরক-ক্ষেত্রে ফিরলে যে? স্বর্গে অরুচি হোলো নাকি?

সতীশ বল্লে, মনে কর তাই!

অনিল বল্লে, বাবা দাঁত থাকতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝছো না; আমি কিন্তু দন্তোদ্গম হবার আগেই অর্থাৎ বিয়ে না হ'তেই তার ষোল আনা মর্য্যাদা হৃদয়ঙ্গম করে ফেলেছি। পোড়াকপাল আইবুড়োদের—ভুলে একজন কেউ নেমন্তন্নও করে না গা!

ব'লে সতীশ উত্তর দেবার আগেই তার নাসিকা গর্জ্জন করতে লাগলো।

সতীশ বিছানায় শুয়ে খানিকটা অপেক্ষা করলে, যাতে অনিল গভীর নিদ্রাভিভূত হয়। তার পর উঠে একখানা সংক্ষিপ্ত চিঠি লিখ্‌লে, লিখতে লিখতে তার দু' চোখ জলে ভরে উঠ্‌ল। চিঠি ইন্দুর উদ্দেশে। চিঠি লিখে যখন তার বুক অভিমান ও দুঃখে কানায় কানায় পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল, তখন সে সেই মোড়কটি খুলে, সমস্ত বস্তুটি দৃঢ় সঙ্কল্পের সঙ্গে গলাধঃকরণ করে, ঝাপ্‌সা চোখে একবার ভেতর-বাইরে দেখে নিয়ে, বোধ করি দেশে তার মার উদ্দেশে একবার প্রণাম করে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

খানিক পরে মনে হ'ল দেহের সমস্ত রক্তের ভেতর যেন একটা ছুটোছুটি প'ড়ে গেছে—মাথার ভেতর ঝিম ঝিম করছে, শরীর অসাড় হ'য়ে যাচ্ছে। একবার অস্ফুট-কণ্ঠে 'মা' বলে ডেকে সে পাশ ফিরে শুল।

* * * *

সকাল-বেলা উঠে অনিল দেখলে যে সতীশ ঘুমুচ্ছে। টেবিল থেকে দাঁতের মাজনের কৌটা নিতে গিয়ে দেখলে, টেবিলে একটা চিঠি লেখা রয়েছে, শিরোনামা শ্রীমতী ইন্দুমতী দেবী! এবং তার পর তার ঠিকানা।

মনে মনে সে বললে, রাস্কেল, সমস্ত রাত ধ'রে বউকে চিঠি লেখা হ'য়েছে। এত যদি প্রেম ত' শ্বশুর-বাড়ীতে থাকলেই হ'ত।

মাজনের কৌটো রইল, চিঠিটা ত' পড়া চাই। চিঠি খুলে পড়লে—

ইন্দু!

যখন এই চিঠি পাবে, তখন আমি পাশ-ফেলের বাইরে! আমার কাছে সমস্ত পৃথিবী তুমি নিরানন্দ ক'রেছো। আমি আফিং খেলুম।

সতীশ।

চিঠিখানা পড়ে অনিলের সমস্ত দেহটা থরথর করে কাঁপতে লাগলো, সে একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল! এ কি

…। মুহূর্ত্তে সব মেসের ছেলেদের কাছে খবর পৌছল। …ন ট্যাক্সি ক'রে জোড়াসাঁকোয় ছুটলো, আর একজন … ডাক্তার ডাকতে।

৫

মিনিট কুড়ির ভেতরেই জোড়াসাঁকো থেকে সতীশের …-শাশুড়ী, ইন্দু আর সতীশের শ্যালক এসে উপস্থিত …। সতীশের শাশুড়ী কাঁদতে লাগলেন, ইন্দু যেন …ঠ হ'য়ে গিয়েছিল। তার কালকের ব্যবহার যে ভাল …নি সে তা' অনুভব করলেও, তার জন্যে যে এতবড় শাস্তি …কে পেতে হবে, সে তা কল্পনাও করেনি।

দুঃখের মত এত বড় পরশ-পাথর আর নেই! সে …র তীব্র আগুনে পুড়িয়ে লোহাকেও সোণা করে! …ই ইন্দুর বুকের ভেতরকার লোহার যখন সোণা হবার …ন্মম দহন চলছিল, তখন সে তার মুখ তার স্বামীর পায়ের …পর রেখে অশ্রু-জলে তাকে সিক্ত করতে করতে …য়মনোবাক্যে বলছিল, মা দুর্গা, এই একটিবার আমাকে …প্ করো, আর কোনও দিন আমি অপরাধ করব না। …টিবার ফিরিয়ে দেও মা!

ডাক্তার এসে বললেন, যে শীঘ্র প্রচুর পরিমাণে গরম …ল চাই। কয়েকজন ছেলে তারি জন্যে ছুটল। অনিলের …কে চেয়ে বল্লেন, কাছাকাছি আফিঙের দোকান …থাকে ত' একবার দোকানীকে ডেকে নিয়ে আসুন, …ত' ছেলেটি সেই দোকান থেকেই আফিং কিনেছে— …খানি কিনেছিল, কতক্ষণ কিনেছে, এ সব জান্‌তে …লে কিছু সুবিধে হ'তে পারে।

…োড়ের ওপরেই দোকান, দোকানীর আসতে দেরী …ল না। সে আসতেই ডাক্তার বাবু তাকে প্রশ্ন করলেন, …োমার দোকান থেকেই এ ছেলেটি আফিং কিনেছিল?

…দোকানী সতীশের দিকে চেয়ে দেখলে, তার-পর হেসে …ল্লে, হাঁ।

এই দুঃখের সময় তার এই হাসি এতই অশোভন … হ'ল, যে সকলেই এর নির্ম্মমতা দেখে স্তম্ভিত … গেল।

…ড়া দোকানীর প্রত্যেক কথাটি শোনবার জন্যে ইন্দুর আগ্রহ-দৃষ্টি দেখে দোকানীর বুঝতে দেরী হোল না —ইন্দু কে'। সে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বল্লে, মা ভয় নেই, কাঁদিসনে।

ডাক্তার বাবু একটু বিরক্ত হ'লেন, বল্লেন, তুমিই বিক্রী করেছিলে? কতখানি? কখন?

দোকানী বল্লে;—"কাল রাত নটায়, একভরি, কিন্তু,—ডাক্তার বাবু তালু ও জিহ্বায় একটা আওয়াজ ক'রে বললেন, রাত নটা? এক ভরি?—Hopeless!

ইন্দু জিজ্ঞাসা করলে—কিন্তু কি?' কিন্তু কি বল্‌ছিলে?

দোকানী হেসে বল্লে, ওইটেই ত' আসল মা,— বলছিলাম কি, সে আফিং নয় খয়ের।

সতীশের শ্বশুর জিজ্ঞাসা করলেন, খয়ের কি রকম?

দোকানী হেসে বল্লে, গোড়ায় আফিং দিয়েছিলাম বটে, কিন্তু ছেলেটির ধরণ-ধারণ দেখে সন্দেহ হওয়ায় বদ্‌লে খয়ের দিয়েছি।

শুনে ডাক্তার বাবু আর মেসের ছেলেরা হো হো ক'রে হেসে উঠলেন, বাকী সকলে আনন্দে স্মিত-হাস্য করলেন, কিন্তু ইন্দুর অশ্রু উচ্ছ্বসিত হ'য়ে সতীশের পা দুটি ভিজিয়ে দিতে লাগল; আর তার সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠল এই কৃতজ্ঞতার ভারে, যে তার কাতর প্রাণের করুণ প্রার্থনা মা-দুর্গার চরণ-পদ্মে এত শীঘ্র পৌছল!

এ যেন রঙ্গমঞ্চে ভেল্কীর মত! এই মেঘ-গর্জ্জন, অশনি-সম্পাৎ, চিকুরের তীক্ষ্ণ দ্যুতি, হঠাৎ সব বদলে গিয়ে প্রকৃতির স্নিগ্ধ প্রসন্ন হাসি, প্রাতঃসূর্য্যের শান্ত কনক-রশ্মি!

খানিকটা আগেই সতীশের ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল; কিন্তু ব্যাপার যে কি, তা সে কিছুই বুঝতে পারছিল না। তার মনে হচ্ছিল, তার আত্মা দেহের জীর্ণবাস ত্যাগ করে গিয়েছে এবং এ তার পরলোকের অনুভূতি, সে বইএও না কি এইরূপ পড়েছিল। কিন্তু দোকানীর কথা শুনে তার ভুল ভেঙ্গে গেল, এবং যদিও সে মনে মনে অত্যন্ত লজ্জা অনুভব করতে লাগলো, তথাপি সমস্ত বুক জুড়ে যেন একটা অপরূপ স্বস্তির আনন্দ তাকে আরাম দিতে লাগল। কিন্তু সহসা সে চোখই বা খোলে কি ক'রে?

ডাক্তার বাবু খানিকটা এমোনিয়া শুঁকিয়ে দিতেই সতীশ উঠে বসলো।

সতীশের শ্বশুর পকেট থেকে এক তাড়া নোট বার ক'রে দোকানীকে দিতে গেলেন। সে হাতযোড় করে বললে—আমাকে মাপ করতে হবে।

সতীশের শ্বশুর বললেন, তুমি যা উপকার ক'রেছ তার তুলনা হয় না। তুমি যদি ঐ বুদ্ধিটুকু না করতে ত' কি কাণ্ডই হোত! তোমার সে ঋণ শোধ হয় না, এ ত' সামান্য মাত্র! দোকানী ইন্দুকে দেখিয়ে বল্লে, মার মুখে যে হাসি ফুটে উঠেছে, এই আমার সব চেয়ে বড় পুরস্কার। আমরা ছোট ব্যবসা করি, এমনটি দেখা ত' কপালে ঘটে না!

দুঃখের মধ্যে যারা এসেছিল, তারা আনন্দের মধ্যে বিদায় নিলে। সতীশের শ্বশুর ওঠবার উপক্রম করচেন দেখে ইন্দু চুপি চুপি তার মাকে বল্লে "মা, সঙ্গে নিয়ে গেলে হয় না।"

মা বল্লেন, হাঁ, যাবে বৈ কি, সতীশ আমাদের সঙ্গেই যাবে। চল বাবা।

সতীশের যেন বাসর-ঘরের পালা পড়েছিল। সে একেবারে জমাট হ'য়ে গিয়েছিল।

এমন সময় বাইরে একজন হাঁক দিলে—বাবু, চিঠি। চিঠি নিয়ে দেখা গেল, প্রিন্সিপ্যালের চিঠি। তিনি আনন্দের সঙ্গে খবর দিয়েছেন যে, সংবাদ পাওয়া গিয়েছে যে, সতীশ ফার্ষ্ট ক্লাস অনার্স নিয়ে পাশ হ'য়েছে এবং তার একটা পেপার হারিয়ে যাওয়াতেই এই গোলযোগ।

আনন্দ পরিপূর্ণ হ'ল। সতীশের শ্বশুর সমস্ত মেসের ছেলেদের তাঁর বাড়ীতে সেইদিন সন্ধ্যায় নিমন্ত্রণ করলেন।

* * * *

শোবার সময় ইন্দু এসে সতীশের পায়ের ধুলো নিয়ে বল্লে, আজ আমার নতুন ক'রে জাগা হোল, এতদিন ঘুমিয়ে ছিলাম, কিন্তু ওঃ কি দুঃখের জাগা!

সতীশ বল্লে, ইন্দু, শুধু তোমার নয়। আমারও এক নতুন সুন্দর রাজ্যে ঘুম ভাঙ্গল!

ইন্দু তার স্নিগ্ধ সুন্দর চোখ দুটি সতীশের মুখের দিকে তুলে বল্লে, আমায় মাপ করেছো?

সতীশ আজ স্পষ্ট বুঝতে পারলে রুদ্রের অপর নাম শিবম কেন।

নারীর কাজ

শ্রীসৌরেন্দ্রচন্দ্র দেব বি-এস্‌সি

বাস্কেট বল খেলায়
(নিউইয়র্ক সহরের কলেজের মেয়েরা বাস্কেটবল খেলবার পর বিশ্রাম করছে)

নারীর কাজ
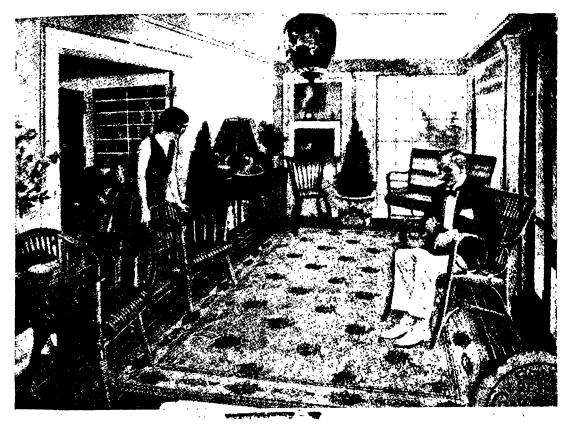
গৃহস্থালীতে।

তেজারতি কারবারে

(Mrs. Liacon স্বামীর সহিত তাঁর প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্কের কার্য্য পরিচালন করছেন)

টাইপরাইটিং।

বনরক্ষায়

(Oregan ও Washington প্রদেশে বনে মাঝে মাঝে ভীষণ দাবানল জ্বলে ওঠে। এই দাবানলের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য কর্তৃপক্ষগণ কয়েকজন বিশেষজ্ঞের অনুসন্ধান করেন এবং যে কয়েকটি বিশেষজ্ঞের সন্ধান পাইয়াছিলেন তন্মধ্যে কয়েকজন রমণীও ছিলেন। সেইরূপ একদল বিশেষজ্ঞ নারী যন্ত্রসাহায্যে বনের চতুর্দিক নিরীক্ষণ ক'রছেন)

অস্ত্রচিকিৎসায় (নারী চিকিৎসক রোগীর হস্তে অস্ত্রোপচার করবার পর ব্যাণ্ডেজ বাঁধবার যোগাড় ক'রছেন)

বক্তৃতায়

(Mrs. Harriet Taylor Upton Kentucy congressএর একটি বিশেষ অধিবেশনে বক্তৃতা দিচ্ছেন।)

অশ্বচালনায় (Mrs. Mary Margaret নিউইয়র্ক সহরের একটি ঘোড়দৌড় খেলায় জকি নির্ব্বাচিত হ'য়েছেন)

বর্ণ প্রলেপনে

হকিখেলায়
(Vassar সহরের মাঠে মেয়েরা হকি খেল্‌ছে ।)

জজিয়তীতে
(Odio সহরের Florence E. Alle
নারী দিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম জজ
হয়ে বিচারাসনে বসেন)

ইতিহাস

(Mrs Harriet ইতিহাসে জগতের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন)

পুলিশের কাজে

(মেয়ে পুলিশের গোয়েন্দা Mrs. Mary E. Hamilter একজন নবনিযুক্ত কর্ম্মীকে কার্য্যের ভার বুঝিয়ে দিচ্ছেন)

শুশ্রূষায়

(টোকিও সহরে ভীষণ ভূমিকম্পের পর St. Luke হাসপাতালে মেয়েরা আহতদিগের শুশ্রূষা ক'রছে)

পূর্ত্ত-বিভাগে

(Miss Ross Valentine একা অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে একখানি মোটরগাড়ী তৈয়ারী ক রছেন)

দস্যু ব্যবসায়ে।

(S'ophie Lyons মার্কিন রাজ্যের একজন প্রসিদ্ধ দস্যুরমণী)

ঔপন্যাসিক

(Rebeca West মার্কিনরাজ্যের একজন প্রসিদ্ধ উপন্যাস লেখিকা)

ছায়াচিত্রে

কংগ্রেসে

(Illinois নগরের Mrs. Winifred Mason Huck কংগ্রেসে সর্ব্বপ্রথম সভ্য নির্ব্বাচিত হয়েন)

প্রিয়া সচীব.........

কাব্যে

(Mrs Nellie Burget Miller মার্কিন রাজ্যের Poet-laureate.)

ধর্ম্মযাজক

(প্রসিদ্ধ ইংরাজ ধর্ম্মযাজক Maude Rayden)

টেনিস খেলায়

(Miss Hellen Wills কালিফোর্ণিয়া সহরের টেনিস খেলায় সর্ব্ববিজয়িনী হয়েছেন)

চিত্রশিল্পে

(তুর্ক রমণীরা চিত্রশালায় চিত্রবিদ্যা শিখ্‌ছে)

মমতায়

যৌনতত্ত্বে

(Sheila Kaye Smith যৌনতত্ত্বের উপর কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখে মার্কিন রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন)

এটর্নীগিরিতে

Mrs. Willibrandt মার্কিন রাজ্যে Attorney General নির্বাচিত হ'য়েছেন এবং এর মধ্যে তাঁর উদ্ভাবিত দশটী কানুন মার্কিন রাজ্য প্রচলিত হয়েছে)

স্বরাজনেতৃত্বে

(Mrs. Emily Newell Blair প্রজাতন্ত্রের জন্য রাষ্ট্রতন্ত্রের সহিত তর্ক ক'রছেন)

রক্তগোলাপের জন্মকথা

শ্রীসুকুমার ভাদুড়ী

প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা বিক্রমসেন সেদিন সন্ধ্যায় [illegible]র উদ্যানে বিচরণ করছিলেন, আর মনে মনে ভাবছিলেন —পাশের রাজ্যটাকে জয় করে তাঁর বিরাট সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে কতখানি শক্তির প্রয়োজন।... ..

উদ্যানের ঠিক মাঝখানে স্বচ্ছ এক সরোবর, আর তারই পাশে পাশে সহস্র বিচিত্র রঙের ফুলে ভরা অসংখ্য [illegible], গুল্ম, বৃক্ষ, কুঞ্জ—এই সব।

সামনের বৃক্ষসারির পানে দৃষ্টি রেখে রাজা তাঁর [illegible]ন্তান্বিত মন নিয়ে সরোবরের বেদীতে এসে বসলেন। প্রকৃতির শ্যাম অঙ্গে তখন বসন্ত তার জাগ্রত যৌবনের [illegible] হাসিটুকু মাখিয়ে দিচ্ছিল—আর তারই গায়ে প্রতিফলিত সায়াহ্ন-সূর্য্যের শেষ রক্তরশ্মিটুকু মনে হচ্ছিল যেন—শ্যামাঙ্গিনীর কচিমুখে লজ্জার অরুণিমা।......

ঠিক সামনের একটা গাছে বসেছিল একজোড়া পাখী;—গা তার সমুদ্রের ফেনার মত সাদা,—ঠোঁটদুটি ফাগুয়ার ফাগের মত রাঙা, চোখ দুটি উজ্জ্বল স্ফটিকের মত স্বচ্ছ।

মুখোমুখি দুজনে তারা চুপ করে বসে ছিল—আর মাঝে মাঝে এমন করে উভয়ে উভয়কে স্পর্শ করছিল তাদের সেই রক্ত-রাঙা ঠোঁট দিয়ে যে—মনে হচ্ছিল যেন তারা তাদের বুকের সমস্ত গোপনতাটুকু ঐ নিবিড় স্পর্শের মধ্যে দিয়ে বিনিময় করতে চায় শুধু চোখের মূক ভাষায়।

রাজার হঠাৎ চোখ পড়ল সেই পাখীর পানে।

বারকয়েক তাদের পানে চেয়ে চেয়ে রাজা হাঁক্‌লেন,—মালী!

ছুটে এসে কুর্ণীশ করে মালী উত্তর দিল,—মহারাজ!

রক্ত চক্ষে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে রাজা হুকুম দিলেন,—ঐ যে গাছের ওপর একজোড়া পাখী—ওদের একটাকে আমি চাই।

বিদায়ের কুর্ণীশ ঠুকে মালী তখনই ছুটে চললো আরও কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে রাজার হুকুম তামিল করতে।......

দু'ঘণ্টা পরে তারা রাজার অন্দরে পাখী এনে হাজির করলে। রাজার হুকুমে এক সোণায় মোড়া লোহার খাঁচায় সোণার শিক্‌লিতে তাকে বেঁধে রাখা হল। ভাল ভাল মেওয়া, ক্ষীর-সর-নবনী, এই সব বরাদ্দ হ'ল তার আহারের জন্যে।

কিন্তু প্রত্যূষে উঠে এসে রাজা দেখলেন—রাত্রের সমস্ত খাদ্যই পাখীর খাঁচায় ঠিক তেমনিই পড়ে আছে—পাখী তার কিছুই স্পর্শও করেনি।

আর একটা জিনিসও তিনি লক্ষ্য করলেন। কাল সন্ধ্যায় তিনি ঐ খাঁচার পাখীর সঙ্গে যে দ্বিতীয় পাখীটা দেখেছিলেন—সেইটাই যেন বোধ হল এইমাত্র ঐ খাঁচার পাশ থেকে উড়ে গেল।

সত্যই তাই!

সন্ধ্যার পর থেকে বাইরের পাখী তার সাথীকে খুঁজেছে—সারারাত বিনিয়ে বিনিয়ে কেঁদেচে—কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পায়নি। হঠাৎ আজ ভোরেই তার ডাক শুনে সে এখানে তার সন্ধান পেয়েছে।

পাখী এসে চীৎকার করে উঠ্‌লো,—আমি যে কাল সারারাত ধরে তোমায় কত খুঁজেছি—তোমার জন্যে কত কেঁদেছি।

খাঁচার পাখী বললে,—কি করব ভাই! রাজার মালী তার মনিবের হুকুমে আমার এই দশা করেছে।

বাইরের পাখী বললে,—আহা! মানুষ ত ভারি নিষ্ঠুর ভাই! তোমার মুক্তিটুকু কেড়ে নিয়ে কি লাভ হল তার?

খাঁচার পাখী উত্তর দিল,—প্রবলের খেয়াল! তারা যে ভাই বন্ধনের জীব। তাই বন্ধনকেই তারা বড় বলে ভাবে। তাই আকাশকে আড়াল করে তারা মাথার উপর ছাদ বানায়—বাহিরকে পৃথক করে তারা নিজের চারিদিকে দেয়াল তোলে।......মুক্ত আকাশের কাছে সোণার খাঁচা!—কী বিশ্রী ভাই! সোণা-রূপোর প্রতি অণু-পরমাণু বন্ধনের এক একটা বিকট গ্রন্থি—তা ত' জানে না তারা!

বাইরের পাখী বললে,—ঐ খাঁচা জোর করে ভেঙ্গে ফেল তুমি,—বেরিয়ে এস এই মুক্ত আকাশের তলে;—আবার চল তেমনি করে গান গেয়ে হেসে খেলে আমোদ করে বেড়াই। মুক্তির মধ্যে দিয়ে সত্যিকার জীবনটাকে উপভোগ করে নিই।

খাঁচার পাখী বললে,—কেমন করে যাব ভাই? ভাঙ্গতে

ত পারব না আমি এ রুদ্ধ খাঁচার কঠিন আবরণ!..... তুমি যাও—শীগ্‌গির চলে যাও! সেই রাজা হয়ত এখুনি আমায় দেখ্‌তে আসবে। তোমায় দেখলে হয় ত তোমাকেও ধরবে! চলে যাও তুমি!

বাইরের পাখী বললে,—তবে আমি কেমন করে থাক্‌ব? শূন্য নীড়ে একলা আমার মন ত টিঁক্‌বে না ভাই! আমি যে শুধুই কাঁদবো তোমার জন্যে। না, আমি পারব না,—কিছুতেই পারব না তোমায় ছেড়ে থাক্‌তে।

খাঁচার পাখী মিনতি করে বল্‌লে,—পারতেই যে হবে ভাই! আমিও এ খাঁচায় আর বেশী দিন থাকবো না। মুক্তি আমি নেবোই,—কিন্তু সে মুক্তি শুধু এ খাঁচা থেকেই নয়—আমার এই রক্ত-মাংসের খাঁচা থেকেও।

বাইরের পাখী চাৎকার করে উঠ্‌লো—সে কি ভাই?

খাঁচার পাখী উত্তর দিল,—সেই ত' হল আসল মুক্তি! কিন্তু ঐ রাজার ঘুমভাঙ্গার শব্দ—শীগ্‌গির যাও তুমি!

খাঁচার পাখীকে খাঁচায় রেখে বাইরের পাখী উড়ে গেল।

রুদ্ধ দরজায় মাথা খুঁড়ে রাজার সামনে মিনতি জানিয়ে খাঁচার পাখী ককিয়ে উঠ্‌ল,—ক্যাঁ—ক্যাঁ—ক্যাঁ!—

ওগো রাজা! আমায় মুক্তি দাও, মুক্তি দাও! ঐ যে সামনের নীল উদার আকাশ—বাইরের ঐ যে উন্মুক্ত শ্যাম প্রান্তর—প্রান্তরের ঐ যে বাধাহীন মুক্ত বাতাস,—গভীর বনানীর ঐ যে সবুজ কচি পাতা, তাদের ফাঁকে থাকে ঐ যে ছোট-বড় ছায়া—ওরা যে আমার প্রতিমুহূর্ত্তে ডাকছে—ওদের বুকে আবার আমায় ফিরে যেতে দাও! খুলে দাও—খুলে দাও আমার এই হেম-শিকলের নিঠুর বাঁধন!—খুলে দাও—খুলে দাও তোমার এই সোণার খাঁচার রুদ্ধ দুয়ার! উড়ে যাই আমি আমার আজীবনের চিরপ্রিয় মুক্তির কোমল কোলে। সে যে চিরদিনই আমার জন্যে কোল পেতে বসে আছে।

কিন্তু পাখীর সে অবোধ্য ভাষা রাজা কিছুই বুঝলেন না! দেখার পিপাসা মিটে গেলে রাজা তাঁর নিজের কাজে চলে গেলেন।

পিঞ্জরের চিররুদ্ধ প্রাণীর কাছে মুক্তির গান চিরদিনই এমনিধারা অবোধ্য!......

দিনের পর রাত, রাতের পর দিন এমনি করেই কেটে গেল। এত ভাল মেওয়া, এত ক্ষীর সর,—পাখী তা কিছুই খায় না। বন্ধনের নির্ম্মম পীড়নে পাখী ক্রমে নিস্তেজ হয়ে আসতে লাগল।

হঠাৎ এক দিন সকালে উঠে রাজা দেখ্‌লেন—তাঁর সাধের পাখী তাঁর কাছ থেকে চিরবিদায় নিয়েছে। খাঁচার মধ্যে পড়ে আছে শুধু তার প্রাণহীন পার্থিব খোলসটা।

পার্থিব মুক্তির জন্য বারবার ব্যর্থ আবেদনে ব্যথিত হয়ে পাখী আজ চিরমুক্তি গ্রহণ করেছে।......

ভৃত্যকে ডেকে রাজা হুকুম দিলেন,—বাগানে সরোবরের এক কোণে পাখীর কবর দাও!

রাজার আজ্ঞায় সোণার খাঁচার পরিবর্ত্তে আজ পাখীর দেহের স্থান হ'ল মাটীর নীচে।

পর দিন প্রত্যুষে আর এক কাণ্ড দেখে রাজা অবাক হয়ে গেলেন। রাজা দেখ্‌লেন—পাখীর সমাধির ওপর পড়ে আছে বাইরের সেই পাখীটা। প্রাণহীন—সর্ব্বাঙ্গে রক্ত মাখান; দেহের একটু স্পন্দনতাও আর তখন দেখা যায় না। * * *

পূর্ণ একটি বছর পরে বসন্ত আবার তার সমস্ত সৌন্দর্য্য নিয়ে ফিরে এল সমস্ত বিশ্বের বুকে হাসির দীপ্তি ছড়িয়ে। রাজা দেখ্‌লেন—খাঁচার পাখীর সমাধির ওপর এক কাঁটা-গাছে একটি সুন্দর ফুল ফুটেছে—রং তার নিবিড় লাল।

অপূর্ব্ব এই নূতন ফুলের পানে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে রাজা তাঁর কবিকে ডেকে বললেন,—বল ত কবি, এটা কি ফুল?

কবি উত্তর দিলেন,—আজ্ঞে মহারাজ—রক্তগোলাপ।

রাজা বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—অত লাল?

কবি বললে,—মরমীর বুকের রক্ত এমনই লাল মহারাজ!

রাজা চিন্তিত ভাবে বললেন,—বুঝলাম না। আচ্ছা যাক্, কিন্তু ওর নীচে অত কাঁটা কেন?

—মানুষের নিষ্ঠুরতাকে এড়িয়ে চল্‌তে মহারাজ! ওর বিকাশ ও বিলোপ,—ও দুই-ই চায় পরিপূর্ণ মুক্তির মধ্য দিয়ে লাভ করতে।

রাজা বললেন—তাও বুঝলাম না।—মরুক্ গে ওসব কবিত্বের ভাব!—মন্ত্রী, যুদ্ধের আয়োজন কতদূর এগুলো?

মন্ত্রীর উত্তর এল,—আর এক সপ্তাহ মহারাজ!......

সাময়িকী

সের 'ভারতবর্ষে'র প্রচ্ছদপটে যাঁহার প্রতিকৃতি শিত হইল তিনি স্বনামখ্যাত পরলোকগত প্যারিচরণ র মহাশয়। বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিবার সময় মে যেমন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বর্ণপরিচয়' সকলকেই ত করিতে হইয়াছে, তেমনি ইংরাজী ভাষার বর্ণমালা খবার জন্য এ যাবৎ আমাদের দেশে শিক্ষার্থীকে খ্যাত-

মাননীয় কুমার শ্রীশিবশেখরেশ্বর রায়

(বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভার সভাপতি)

মা প্যারিচরণ সরকারের 'ফার্ষ্ট বুক' হাতে করিতে ইয়াছে, এখনও হয়। এই 'ফার্ষ্ট বুক' 'সেকেণ্ড বুক' ভৃতির জন্যই যে সরকার মহাশয় স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন হে নহে; বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আমলে যাঁহারা স্বদেশের ঙ্গল কামনায় অগ্রণী ছিলেন, স্বর্গীয় প্যারিচরণ সরকার হাশয় তাঁহাদের অন্যতম। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার আর একটী প্রধান গুণের কথা এখন অনেকে ভুলিয়া গেলেও আমরা ভুলি নাই। এ দেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রথম আমলে শিক্ষার্থীদিগের একটা ভ্রম সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, ইংরেজী শিক্ষার সহিত মদ্যপান অপরিহার্য্য সম্বন্ধে আবদ্ধ; সেই জন্য সেকালের অনেক ইংরেজী-শিক্ষিত মনস্বী ব্যক্তিরও পানদোষ অভ্যাস হইয়াছিল। প্যারিচরণ সরকার মহাশয় সেকালের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও পানদোষের শত্রু ছিলেন। তিনি সেই সময়ে 'মদ্যপান নিবারণী' সভার প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই দোষ নিবারণের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন। আমরা ভক্তিভরে তাঁহার পবিত্র স্মৃতির তর্পণ করিতেছি।

আমাদের এই ব্যবস্থা পরিষদ্ যখন প্রথম স্থাপিত হয়, তখন আইন অনুসারে গবর্ণর বাহাদুর এই পরিষদের সভাপতি মনোনীত করিবার অধিকার পান, বড় লাটের ব্যবস্থা-পরিষদেও এই নিয়ম অনুসৃত হয়। সেই জন্য বাঙ্গালার ব্যবস্থা-পরিষদে প্রথম সভাপতি মনোনীত হন নবাব সামশুল হুদা বাহাদুর; কিন্তু, তিনি কিছুদিন কার্য্য করিয়াই শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন কার্য্য ত্যাগ করেন; তখন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় বিনা বেতনে অস্থায়ী ভাবে কয়েক মাস সভাপতির কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তাহার পর গবর্ণর বাহাদুর বিলাত হইতে শ্রীযুক্ত কটন সাহেবকে (ইনি সুবিখ্যাত সিবিলিয়ান্ সার হেনরী কটনের পুত্র) সভাপতি করিয়া আনয়ন করেন। তাঁহার কার্য্যকাল সেদিন শেষ হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে লাট বাহাদুরদিগের মনোনয়নের অধিকারও আইনের বিধান অনুসারে লোপ পাইয়াছে। এখন ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যদিগের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরই সভাপতির আসন প্রাপ্য। তদনুসারে উত্তর বঙ্গের তাহিরপুরের নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ রাজা শ্রীযুক্ত শিবশেখরেশ্বর রায় বাহাদুরের সুযোগ্য পুত্র, পিতারই মত

নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, পিতারই মত ব্রাহ্মণোচিত তেজস্বিতা ও কোমলতা-সমন্বিত কুমার শ্রীযুক্ত শিবশেখরেশ্বর রায় মহোদয় অধিকাংশ সদস্যের মতানুসারে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সভাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। আমরা তাঁহার ন্যায় সর্ব্বাংশে উপযুক্ত মহোদয়কে অভিনন্দিত করিতেছি। ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে তিনি যে তেজস্বিতা ও নিরপেক্ষতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, সভাপতিরূপেও তাহারই পরিচয় প্রদান করিবেন, এ বিশ্বাস দেশবাসীর আছে।

রক্ষার কার্য্যে আহ্বান করিয়াছিলেন। ছাত্রগণও সানন্দে এই দুরূহ কার্য্যে যোগদান করিয়া—অতিশয় যোগ্যতা সহকারে তাহা সম্পাদন করিয়াছিল। দর্শক ও জনসাধারণ এবং স্বয়ং পুলিশের বড় কর্ত্তা তাঁহাদিগের কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরাই এই কার্য্যে বিশেষ অগ্রণী ছিলেন। তন্মধ্যে জগন্নাথ হল হইতেই অধিকাংশ ছাত্র যোগদান করিয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে এক দল স্বেচ্ছাসেবকের চিত্র সন্নিবিষ্ট হইল। দেশের যুবকবৃন্দ স্বেচ্ছায় এইরূপ দুরূহ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া

ঢাকায় জন্মাষ্টমীর মিছিলের স্বেচ্ছাসেবকগণ
(ঢাকা জগন্নাথ হলের একদল)
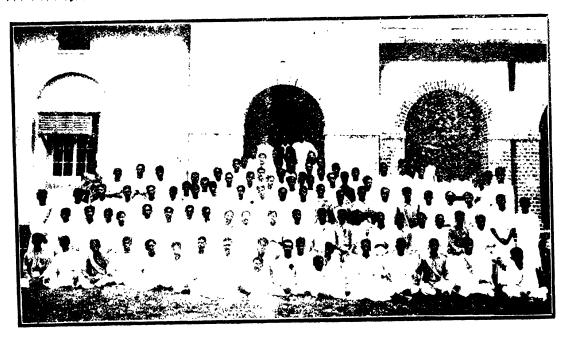
ঢাকা নগরীতে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে যে বিরাট শোভা-যাত্রা বাহির হইয়া থাকে, তাহা বঙ্গবাসী মাত্রেই অবগত আছেন। এই উপলক্ষে দেশ দেশান্তর হইতে লক্ষ লক্ষ লোক ঢাকায় আগমন করিয়া থাকেন। যে রাস্তা দিয়া শোভা-যাত্রা বাহির হয়, তাহার দুই পার্শ্বে যে প্রকার জনসমাগম হয়, তাহার কল্পনা করাও কঠিন। বিশেষতঃ শিশু ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক হওয়ায় এই জন-সমুদ্রের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা করা বিশেষ দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠে। এতদিন পুলিশের সাহায্যেই এই কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। এ বৎসর পুলিশের বড় কর্ত্তা স্বয়ং ছাত্রদিগকে এই শান্তি-

তাহা সুসম্পন্ন করিতেছেন, ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়; এবং ইহার দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, আমাদের স্কুল কলেজের ছাত্রগণ সুপরিচালিত হইলে শুধু শান্তি-রক্ষা কেন, তদপেক্ষা গুরুতর কার্য্যও সুসম্পন্ন করিতে পারে; উত্তর বঙ্গের বন্যা, দামোদরের বান, গঙ্গাস্নানাদিতে শান্তি-রক্ষা প্রভৃতিতে তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আমরা ঢাকার যুবকগণকে এই কর্ত্তব্য সুসম্পাদনের জন্য ধন্যবাদ করিতেছি; এবং প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক, ছাত্রবন্ধু শ্রীমান রমেশচন্দ্র মজুমদার যে আমাদের চিত্রে প্রদর্শিত দলের অগ্রণী ছিলেন, তাহা আমাদের সংবাদদাতা না প্রকাশ করিলেও, আমরা তাহা

..তে পারিয়াছি, এবং এই উপলক্ষে তাঁহাকেও ধন্যবাদ ..তেছি। অধ্যাপক ও ছাত্রগণের এই সম্মেলন, এই ..ত চেষ্টা যে ক্লাসে পড়ানো অপেক্ষা অধিক কার্য্যকরী, .. বলাই অনাবশ্যক।

মহাত্মা গান্ধী বিগত ১লা মে তারিখে বাঙ্গালাদেশে ..র ও চরকা প্রচলনে উৎসাহ প্রদান করিবার জন্য ..গমন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশের প্রত্যেক জেলা

দারজিলিংয়ে ষ্টেপ-এসাইডের পথে মহাত্মা গান্ধী, সঙ্গে শ্রীমতী বাসন্তী দেবী

[Photo by Mr. Subodh Dutt—Darjeeling

..ও বড় বড় গ্রামে তিনি গমন করিয়াছিলেন এবং অসংখ্য ..নারীকে খদ্দর গ্রহণে ব্রতী ও উৎসাহিত করিয়াছিলেন। ..তার বাঙ্গালা দেশ ভ্রমণ প্রায় শেষ হইবার সময় বিনা ..ঘে বজ্রাঘাত হইল——দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পরলোকগমন ..রিলেন। মহাত্মা তখন দেশবন্ধুর স্মৃতিরক্ষার জন্য বদ্ধ-..রিকর হইলেন, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে লাগিলেন; ..ই মাস বাঙ্গালা দেশে তাঁহার অবস্থানের কথা ছিল, ..রি মাস হইয়া গেল; এক দিনের জন্যও বিশ্রাম না ..রিয়া তিনি দেশবন্ধুর স্মৃতি রক্ষা কার্য্যে ব্রতী হইলেন।

দারজিলিংয়ে নৃপেন্দ্রনারায়ণ হলে মহিলা সমিতিতে মহাত্মা গান্ধী

[Photo by Mr. Subodh Dutt—Darjeeling

দারজিলিংয়ের জনসভায় মহাত্মা গান্ধী

[Photo by Mr. Sobodh Dutt—Darjeeling

প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় স্মৃতি-ভাণ্ডারে প্রায় আট লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। তাঁহার প্রিয় চরকা ও খদ্দরের প্রচলনও বাঙ্গালা দেশে বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। তিনি বিগত ১লা সেপ্টেম্বর ঠিক চারি মাস পরে তাঁহার আশ্রমে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি পূজার পূর্ব্বেই পুনরায় বিহার প্রদেশে আগমন করিবেন, এবং বিহারের প্রত্যেক জেলার বড় বড় সহরে ও গ্রামে চরকা ও খদ্দর প্রচলনের চেষ্টা করিবেন। বাঙ্গালা দেশের প্রত্যেক নগরে ও গ্রামে তিনি যে ভাবে ও ভক্তিভরে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন, বিহার প্রদেশেও যে তাঁহার সেইরূপ অভ্যর্থনা হইবে, এখনই বিপুল আয়োজন দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। দেশবন্ধুকে দেখিবার জন্য মহাত্মাজি দারজিলিংয়ে যে সময় অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ের তিন খানি আলোক-চিত্র এখানে প্রকাশিত হইল।

আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু, সুকবি মুণীন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় পরলোকগত হইয়াছেন শুনিয়া আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। মুণীন্দ্রনাথের সুন্দর কবিতাবলি সেকালের সাহিত্য, ভারতী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পত্রিকায় সাদরে প্রকাশিত হইত; এখনকার ও সমস্ত লব্ধপ্রতিষ্ঠ মাসিক-পত্রে তাঁহার অনেক সুললিত কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে, আমাদের ভারতবর্ষের পাঠক-পাঠিকাগণও মুণীন্দ্রনাথের কবিতার সহিত পরিচিত। মুণীন্দ্রনাথ অনেকদিন 'হিতবাদী'র সম্পাদকীয় বিভাগে বিশেষ যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার পর অবস্থা বিপর্য্যয়ে তাঁহার শরীর ও মন একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে; তিনি একেবারে উদাসীন হইয়া পড়েন। এই অবস্থাতেও তাঁহার কবিত্বশক্তি লোপ পায় নাই। এতদিন পরে মুণীন্দ্রনাথের সকল জ্বালা যন্ত্রণার অবসান হইল। আমরা তাঁহার সন্তপ্ত আত্মীয়-স্বজনের গভীর শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

সাহিত্য-সংবাদ

ডাঃ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কতকগুলি মনোরম কবিতা 'পূরবী' নাম দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই মাসের ভারতবর্ষে প্রকাশিত 'তারা' শীর্ষক কবিতাটীও উক্ত কবিতা-সংগ্রহে স্থান পাইয়াছে। মূল্য দুই টাকা ছয় আনা।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত "শরতের ফুল" বাহির হইল। মূল্য আড়াই টাকা। রবীন্দ্র বাবু, শরৎ বাবু, প্রভাত বাবু, অমৃতলাল বাবু, জলধর বাবু, অনুরূপা দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া প্রভৃতি বিশ জন সুপ্রসিদ্ধ লেখক-লেখিকার গল্প 'শরতের ফুলে' বাহির হইয়াছে।

রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুরের পূজার উপহার নূতন উপন্যাস 'ভবিতব্য' প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীনরেন্দ্র দেব প্রণীত "গরমিল" উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত সুবৃহৎ উপন্যাস "রাজপথ" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য তিন টাকা।

রায় শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর ডি, লিট প্রণীত সচিত্র পত্রোপন্যাস "আলোকে আঁধারে" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত গল্পপুস্তক 'ঐন্দ্রজালিক' প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য পাঁচ সিকা।

শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত গল্প পুস্তক "অনুভূতি" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য এক টাকা দশ আনা।

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "বাংলার মেয়ে" প্রকাশিত হইল; মূল্য দুই টাকা।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বার-এট-ল প্রণীত "বঙ্গাঙ্গনা কাব্য ও নব মেঘদূত" প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য এক টাকা।

শ্রীরজনীকান্ত ভাদুড়ী সঙ্কলিত "আত্ম-জীবন" প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য আট আনা।

অধ্যাপক শ্রীদুর্গামোহন [illegible] প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "শান্তি-পথ" প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য দেড় টাকা।

শ্রী[illegible]নাথ [illegible]ভূষণ সংগৃহীত জ্যোতিষ গ্রন্থ "বৃহৎ যবন-সংহিতা" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য এক টাকা।

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ বি-এ প্রণীত "সন্ধ্যা সৌদামিনী" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য আড়াই টাকা।

শ্রীদুর্গানাথ ঘোষ তত্ত্বভূষণ প্রণীত "উপাসিকা-চরিত" (মোদাব্রাহ্মিকার জীবনবৃত্ত) প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য দুই টাকা।

শ্রীবিধুভূষণ বসু প্রণীত সামাজিক গীতিনাট্য "ব্রহ্মচারিণী" ও "দান" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য প্রত্যেক খানির এক টাকা।

শ্রীহেমচন্দ্র [illegible] বি-এ প্রণীত উপন্যাস "মৃণাল" ও "বাংলার বাঘ" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য যথাক্রমে দেড় টাকা ও আট আনা।

শ্রীচৈতন্যচরণ বড়াল প্রণীত উপন্যাস "কনক" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য এক টাকা।

শ্রীসুশীলকুমার শীল প্রণীত উপন্যাস "রূপের নেশা" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য পাঁচ সিকা।

Publisher—**Sudhanshusekhar Chatterjea.**
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA

Printer—**Narendranath Kunar,**
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1 Cornwallis Street. CALCUTTA

গোদাবরী-তীরে

শিল্পী—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সিংহ

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

কার্ত্তিক, ১৩৩২

প্রথম খণ্ড | ত্রয়োদশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

বেদ ও বিজ্ঞান

অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

বেদের নানা স্থান হইতে মন্ত্র উদ্ধার করিয়া অগ্নির সর্ব্ব-ব্যাপিত্ব সম্বন্ধে আপনাদের একটা প্রত্যয় জন্মানর চেষ্টা করিয়াছি। সর্ব্বভূতেই প্রতিনিয়ত যজ্ঞ বা অগ্নিকাণ্ড চলিতেছে—এ কথাটার প্রমাণ যথাসম্ভব নব্য বিজ্ঞানের ভাণ্ডার হইতে সরবরাহ করিতে কসুর করি নাই। অগ্নিকে তাপ ভাবিলে কথাটা চলিয়া যাইতে পারে,—সৌদামিনী ভাবিলে ত আর কথাই নাই। নব্য বিজ্ঞানে একেশ্বরবাদ প্রায় খাড়া হইয়া উঠিতেছে, এবং বিজ্ঞান যে এক দেবতার অর্চ্চনায় সম্প্রতি মন-প্রাণ সবই ঢালিয়া দিতেছেন, সে দেবতা সৌদামিনী। এই বিদ্যুৎ বা সৌদামিনীর এলেকার বাহিরে কোনও জগৎ মানিতে বিজ্ঞান যেন গররাজি! অণুগুলার প্রসূতিও এই সৌদামিনী। অগ্নিকে তাড়িত ভাবে লইলে, অণুগুলার অন্দরমহলেও অগ্নিকাণ্ড প্রতি-নিয়ত চলিতেছে। এই অগ্নিকাণ্ডের নাম radiation বা তেজোবিকীরণ। সেদিন অগ্নির তিনটি শৃঙ্গ বুঝিতে গিয়া আমরা এই আণবিক অগ্নিকাণ্ডের কতকটা সমাচার লইয়াছিলাম। রেডিও-একটিভ পদার্থগুলিতে তেজো-বিকীরণের মুখ্য ত্রিধারা আমরা বিশেষভাবে ধরিতে পারি। সেদিন সেই মুখ্য ত্রিধারার নক্সা আঁকিয়া আপনাদের দেখাইয়াছিলাম। এই আণবিক অগ্নিকাণ্ডের ফলে অণু-গুলা খণ্ডিত, বিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে। স্বয়ং রেডিয়াম বোধ হয় এই বিশ্বব্যাপী পুত্রেষ্টি যজ্ঞের কল্যাণে ইউ-রেনিয়াম নামক পদার্থান্তর হইতে জন্মিয়াছেন। তাঁহার ভিতরেও যজ্ঞ অবিরত চলিতেছে; ফলে তিনিও অন্ত-কিছু হইয়া ভূমিষ্ঠ হইতেছেন। এই বিরাট যজ্ঞ না হইলে সৃষ্টি, স্থিতি, লয় হয় না। কারণ, রেডিয়াম, থোরিয়াম পলোনিয়াম প্রভৃতি দু'চারিটা জিনিসেই এই আণবিক অগ্নিকাণ্ড এবং ঢালাই গড়ন আবদ্ধ নহে। বৈজ্ঞানিকেরা মনে করিতেছেন, অল্পাধিক মাত্রায় এই কাণ্ড-কারখান সম্ভবতঃ নিখিল পদার্থের অন্দর-মহলেই চলিতেছে। শুধু

দ্বিজ বলিয়া নহে, প্রত্যেক ভূতই সাগ্নিক। অগ্নিকে কেবল তাপ (heat) ভাবিলে এতখানি ব্যাপক ভাবে দেখা আমাদের সম্ভব হইত না ; কিন্তু তাড়িত মনে করিলে আর কোথাও আমাদের "প্রবেশ নিষেধ" নাই। তাপ জোর মলিকিউল, অণুগুলা কাঁপাইয়া পার পায় ; কিন্তু তাড়িত শুধু পাখা ঘুরাইয়া, আলো জ্বালিয়া, ট্রাম চালাইয়া পার পান না—অণুর ভিতরেও একটা ছোটখাট জগৎ চালাইতেছেন। এর বিশেষ বিবরণ আমার শ্রোতৃবৃন্দ পূর্ব্ব হইতেই রাখেন। এখন, প্রত্যেক ভূতেই যে তেজোবিকারণ হইতেছে, সুতরাং প্রত্যেক ভূতেরই যে নূতন ভাবে ঢালাই-গড়ন হইতেছে, এ কথার কিঞ্চিৎ প্রমাণ আপনারা বিজ্ঞান হইতে লইয়া রাখুন। এ-ভূত ও-ভূত লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া দেখার প্রবৃত্তি বা সুযোগ আমাদের নাই ; তবে শিষ্ট বৈজ্ঞানিকদের উক্তি শুনাইলে আপনাদের প্রত্যয় হইবার কথা। Whetham বলিতেছেন—'it is impossible to resist wondering whether the process of change, so far observed to an appreciable extent only in a few radio-active bodies, may not in reality be a general property of matter, though in other cases possessed in such infinitesimal degree that it almost transcends the delicate means of detection that are now at our disposal. As we have seen, experimental evidence is not altogether wanting in favour of such a supposition." Sir Ernest Rutherford সাহেব এ শাস্ত্রে পারদর্শী। তিনি এবং আরও অনেকে, পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে—"ordinary matter is radio-active to a slight degree" অর্থাৎ সাধারণ সমস্ত ভূতেই তেজোবিকীরণ ব্যাপারটা একটু আধটু চলিতেছে। তাঁহার প্রসিদ্ধ প্রামাণিক গ্রন্থের ৫৩৯ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিতেছেন—"A number of experiments have been made by J. J. Thomson, N. R. Compell, and A. Wood in the Cavendish Laboratory to examine whether radio-activity observed in ordinary matter is a specific property of such matter or is due to the presence of some radio-active impurity. An account of these experiments was given by Professor J. J. Thomson in a discussion on the Radio-activity of Ordinary Matter at the British Association meeting at Cambridge, 1904. The results, as a whole, support the view that each substance gives out a characteristic type or types of radiation and that radiation is a specific property of the substance." পুনশ্চ, ৫৪২ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন—"While the experiments, already referred to, afford strong evidence that ordinary matter does possess the property of radio-activity to a feeble degree, it must not be forgotten that the activity observed is excessively minute, compared even with a weak radio-active substance like uranium or thorium." অর্থাৎ নিখিল বস্তুজাতের মধ্যেই আণবিক বিপ্লব ও তেজোবিকীরণের একটা পরিচয় আমরা নিঃসন্দেহ রূপে পাই বটে, কিন্তু সাধারণতঃ অনেক পদার্থেই সেটা খুবই মৃদু। মাটি, জল, বাতাস—সর্ব্বত্রই দেখি এই গুপ্ত অগ্নিকাণ্ড চলিতেছে ; কিন্তু সব ক্ষেত্রে এখনও জোর করিয়া বলা যায় না—আগুণটা ভিতর হইতেই জ্বলিয়াছে, অথবা বাহির হইতে আসিয়া লাগিয়াছে। ধরুন, বাতাস পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম তাহা রেডিও-একটিভ, অর্থাৎ, তাহা হইতে প্রধানতঃ তিনটি ধারায় তেজোবিকীরণ হইতেছে। মনে প্রশ্ন উঠে—এ তেজ কি বাতাসের নিজের ; অথবা ইহা আগন্তুক বাতাসে রেডিয়াম প্রভৃতি ভেজাল জিনিসের তৈজস কণাগুলি ছড়াইয়া পড়িতেছে, এবং সেই ছড়ানো তেজটাকে আমরা বাতাসেরই নিজস্ব মনে করিতেছি কি ? চাঁদের নিজের কিরণ নাই, তিনি সূর্য্য হইতে ধার করিয়া বসন্ত ঋতুর মধুমাসে এত বাহার দিতেছেন বাতাসের অবস্থাও কি এইরূপ নয় ? পুষ্প-পরিমল বহন করেন বলিয়া বাতাস ত গন্ধবহ হইয়াছেন ; বাতাসে ক

পাইয়া সে গন্ধ বাতাসেরই মনে করিয়া তাঁহার 'সুগন্ধি' এই বিশেষণ দিতে গেলে বৈয়াকরণেরা এখনই আমার কাণ মলিয়া দিতে উদ্যত হইবেন। গন্ধের বেলা যেমন চুরি, রেডিও-একটিভিটির বেলাও তেম্‌নি চুরি নয় ত? এ সমস্যার সমাধান যে শক্ত, তাহা রাদারফোর্ড-প্রমুখ সাহেবেরা স্বীকার করিয়াছেন; কতকটা যে চুরি সে পক্ষে সন্দেহ নাই; কিন্তু 'উপরি' বাদ দিলেও পবনঠাকুরের ন্যায্যগণ্ডা স্বরূপ কিছু তেজ থাকে না কি? বোধ হয় থাকে, ইহাই বৈজ্ঞানিকদের অনুমান। শুধু বায়ু নহেন, জল পৃথিবী প্রভৃতি আমাদের বৈদিক দেবতারা সত্য সত্যই স্বাধীন ভাবে কতখানি দেবতা (কি না, "দ্যুতিমান্") তাহা লইয়া বৈজ্ঞানিকেরা বিস্তর সওয়াল-জবাব করিতেছেন। অবশ্য, তাঁহাদের দৃষ্টিতে 'দ্যুতি' বা 'তেজ' মানে বৈদ্যুত-শক্তি-বিকীরণ-সামর্থ্য। ক্যাভেন্‌ডিশ্‌ ল্যাবরেটারি হইতে সর্দার চেলার (রাদারফোর্ড সাহেবের) বাণী আমরা সংগ্রহ করিলাম; এইবার স্বয়ং গুরু-মহারাজের (জে, জে, টম্‌সন সাহেবের) "আদেশ" শুনুন। তাঁহার প্রসিদ্ধ Conduction of Electricity through gases নামক গ্রন্থের একটা অধ্যায়ই হইতেছে—The power of the elements in general to emit ionising radiation. সেই অধ্যায়ের প্রায় গোড়াতেই তিনি প্রশ্ন তুলিতেছেন—"The question arises—is the property of emitting radiations of this character Confined to these elements, or is it possessed, though to a very much smaller extent, by the elements in general? Of late years a considerable amount of attention has been given to this question, resulting in the collection of a large amount of evidence in favour of the view that this property is possessed to some extent by all bodies, although there seems to be a great gap between the amount of radiation emitted by the least active of the recognised radio-active elements and the most active of the others." ফল কথা, অল্প হউক বিস্তর হউক, নিখিল ভূতের মধ্যেই এই প্রকার অন্তর্বিপ্লব ও তেজোবিকীরণ চলিতেছে; তবে সর্ব্বত্র সমান ভাবে নহে। আর অধিক মতোদ্ধার করিয়া কাজ নাই, হালের প্রায় সকল বিজ্ঞান-গ্রন্থ হইতেই এই জাতীয় উক্তি রাশি রাশি আপনাদের শুনান যাইতে পারে।

এই তেজোবিকীরণ যে পদার্থের মধ্যে ঘরওয়া বিপ্লবের ফল, একেবারে আগন্তুক কোনও ব্যাপার নহে, এ কথার প্রমাণ বৈজ্ঞানিকেরা একরূপ দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। অর্থাৎ, বেদ যে অগ্নিকে জলে, স্থলে, বাতাসে, অন্তরীক্ষে, ওষধি সমূহে, দ্যুলোকে "নিগূঢ়" ভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন, সে অগ্নির কাণ্ডকারখানা শুধু স্থূল জগতে নয়, অণুর মধ্যেও বিজ্ঞান সম্প্রতি আবিষ্কার করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতেছেন। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে যাঁহাদের বিশেষ জানিবার কৌতূহল আছে, তাঁহারা রাদারফোর্ড সাহেবের Radio-activity নামক গ্রন্থ, সডি সাহেবের Interpretation of Radium and the Chemistry of the Radio elements নামক গ্রন্থদ্বয়, অথবা Makower's Radio-active substances নামক গ্রন্থ পড়িয়া দেখিবেন। পদার্থ-নিচয়ের ভিতর হইতে এই যে তেজোবিকীরণ, তাহা অণুর ব্যাপার বলিয়া, যেন আপনারা তুচ্ছ ভাবিবেন না। অণুর রাজ্যে হইলে কি হইবে, ইহাদের তেজ মহান্। জনৈক গ্রন্থকার লিখিতেছেন—"In mechanical units the energy available for radiation in one ounce of radium is sufficient to raise a weight of something like ten tons and tons one mile high." পুনশ্চ—"it is possible to calculate the energy liberated by a given amount of radio-active change. This energy is at least five hundred thousand times, and may be ten million times greater than that involved in the most energetic chemical action known." একটা টর্‌পেডো বা মাইন ফাটিয়া পুরু ইস্পাতে মোড়া একখানা প্রকাণ্ড রণতরীকে ছাতু করিয়া উড়াইয়া দিতে পারে; কামানের একটা গোলা আসিয়া পড়িয়া গ্রামকে গ্রাম উজাড় করিয়া দিতে পারে। এই গেল খুব তেজাল রকমের কেমিকাল একশন্। কিন্তু সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম এটমের মধ্যে যে শক্তি থাকিয়া বিপ্লব ঘটাইতেছে এবং তেজো-

বিকীরণ করিতেছে, সে শক্তির বিপুলতার কাছে টর্পেডো মাইন বা গোলার মাহাত্ম্য একরূপ 'নাই' হইয়া যায়। সামান্য এক রত্তি রেডিয়াম এত প্রচুর তাপ (heat) জাগাইয়া রাখিতে পারে যে, শুনিলে আমরা বিস্ময়ে 'হতভম্ব' হইয়া যাই। পরিমাণ আপনাদের এখন না হয় নাই শুনাইলাম।

অতি সূক্ষ্মের মধ্যে অতি বিপুলকে আবিষ্কার করিতে পারিয়া নব্য-বিজ্ঞান বোধ হয় মানব-জাতির সাধনার একটা নূতন অধ্যায়ের পত্তন করিয়া দিতেছে। সামান্য একটু পদার্থের মধ্যেই, এমন কি একটা রেণু বা অণুর মধ্যেও, এমন বিরাট শক্তি রহিয়াছে যে, আগে স্বপ্নেও এমন একটা কাণ্ড কল্পনা করিতে কেহ সাহস করিত না। এটম এত ছোট যে, খুব সম্ভবতঃ এক গ্র্যাম্ ওজনের কোনও কঠিন বস্তুতে $১০^{২০}$ (দশের পিঠে কুড়িটা শূন্য দিলে যত হয় তত) এটম রহিয়াছে। এটমের চেয়ে দু'দশ হাজার গুণ ছোট ইলেক্‌ট্রনগুলা সেই এটমের ভিতরে ছন্দোবদ্ধ ভাবে পাক খাইতেছে; সময়ে সময়ে বা মেজাজ হারাইয়া ছট্‌কাইয়া আসিতেছে; এইরূপ ভাবে ছট্‌কাইয়া আসিলে এটমের মধ্যে বিপ্লব হইল, এবং এই ব্যাপারটাকে আমরা মোটামুটি radio activity বলিতেছি। ভাল; কিন্তু ঐ ইলেক্‌ট্রনদের বা হিলিয়াম এটমদের গতির বেগ ভীষণ! প্রায় আলোকের বেগের কাছাকাছি যায়; আলোকের বেগ সেকেণ্ডে প্রায় দু'লাখ মাইল; আইন্‌ষ্টাইন্ প্রভৃতির হিসাবে এর চাইতে বেশী নাকি জড় পদার্থের বেগ হয় না। যা হউক, কতখানি কার্য্যকরী শক্তি (kinetic energy) এটমের ভিতর খেলিয়া যাইতেছে, তাহার একটা আভাস পাইলেন ত? যে সব বৈজ্ঞানিকদের নাম আমি মাঝে মাঝে করিতেছি তাঁহারা এবং আরও অনেকে, উক্ত কাইনেটিক্ এনার্জির হিসাব, পরীক্ষা ও গণাগাঁথা করিয়া, তৈয়ারি করিয়াছেন; আমরা আনাড়ী—সে হিসাব অডিট্ করার দুঃসাহস রাখি না। তবে স্বীকার করিয়া রাখি যে, হিসাবের অঙ্কগুলার পানে তাকাইয়া আমাদের 'চক্ষুস্থির' হইয়া গিয়াছে। একটা রেণুর মধ্যে এ কি কাণ্ডকারখানা, কত বিপুল শক্তির বিলাস! এইটা বিজ্ঞান সম্প্রতি ধরিতে পারিয়াছে বলিয়া, মানুষের চিন্তা ও সাধনার মোড় ফিরিবার উপক্রম বুঝি হইয়াছে, এবং বোধ হয় বেদে ও বিজ্ঞানে, সেকেলে ঋষিতে আর একেলে 'সাভাণ্টে' কোলাকুলি হইয়া যাইবার আর বড় বেশী বিলম্ব নাই।

বর্ত্তমান যুগে পাথুরে কয়লা মুখ্যত আমাদের শক্তি যোগাইতেছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সেদিন অগ্নিতত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে এই পাথুরে কয়লার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলাম। এখন বোধ হয় এই বিংশ শতাব্দীতে মানুষের দৃষ্টি শক্তি সাধনা ও শক্তি-সঞ্চয়ের জন্য নূতন একটা দিকে ফিরিবে। ইলেক্‌ট্রন, রেডিয়াম প্রভৃতি আসরে নামিয়া সে সম্ভাবনা করিয়া দিয়াছে। মানুষ এখন ভাবিবে—অণুর ভিতরে যে বিরাট শক্তির খেলা হইতেছে, সে শক্তির সন্ধান ত পাইলাম; এখন সে শক্তিকে ব্যবহারে লাগাইব কি উপায়ে? একটা ধূলির ভাণ্ডারে এতখানি শক্তি মজুত যে সেই শক্তিকে আমার আয়ত্তাধীন করিতে পারিলে আমি প্রায় একজন ব্রহ্মা বা বিষ্ণু বা মহেশ্বর হইয়া বসিতে পারি। এটা বৈদিক বা পৌরাণিক আজগুবি কল্পনা নহে, আধুনিক বিজ্ঞানেরই একটা রীতিমত চিন্তার বিষয়। অণুর ভিতর শক্তির বিপুলতা যে কেমন, তাহার কতকটা আভাস আমি পূর্ব্বেই আপনাদের দিয়া রাখিয়াছি। এই বিশ বছরের মধ্যে এত পরীক্ষা ও গণাগাঁথা হইয়াছে যে, সে পক্ষে আমাদের আর সন্দেহ নাই। কিন্তু মুস্কিলের কথা এই যে, সাংখ্যের পুরুষের মত এই অক্ষুরন্ত শক্তির ভাণ্ডার আমরা শুধু দেখিতেই পাইতেছি; এ ভাণ্ডার আমাদের প্রয়োজনে নিয়োগ করার কোনও উপায় বিজ্ঞান এখনও ঠাওরাইয়া উঠিতে পারেন নাই। এ শক্তির ব্যবহার শিখিলে বিজ্ঞান পাথুরে কয়লা পোড়াইয়া এমন সুন্দর পৃথিবীটাকে আর নোংরা করিবে না। তার প্রয়োজন হইবে না। পিপা পিপা পেট্রল পোড়াইয়া মোটর, এরোপ্লেন প্রভৃতি চালানর হাঙ্গামাও চুকিয়া যাইবে। আমাদের যা কিছু কাজ, জলে হউক স্থলে হউক, আর অন্তরীক্ষে হউক, চলিবে ঐ আণবিক শক্তির সাহায্যে। এ ছাড়া আরও অনেক অসাধ্য-সাধন বিজ্ঞান করিতে পারিবে ঐ আণবিক শক্তির কল্যাণে। ইতিমধ্যেই পশ্চিম দেশের কল্পনাকুশল লেখকেরা এই শতাব্দীর শেষভাগে পৃথিবীর চেহারা যে কি ভাবে কতখানি বদ্‌লাইয়া যাইবে, তার আন্দাজ

করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমাদের এই কলিকাতা সহরে এবং গঙ্গার দুই ধারে অনেক দূর পর্য্যন্ত সংখ্যাতীত মিলের চিম্‌নি অনবরত কৃষ্ণ ধূম উদ্গীরণ করিয়া আমাদের এই সোণার বাঙ্গলার প্রসন্ন স্নিগ্ধ আকাশ বাতাসকে কতই না নোংরা করিয়া ফেলিয়াছে; কিছুকাল পূর্ব্বে জাহ্নবী-সলিলে অবগাহন করিতে আসিয়া, চারিদিকে চাহিয়া প্রাচীনেরা সত্য সত্যই অনুভব করিতে পারিতেন সেই ঋগ্বেদের আকাশ, বাতাস, সরিৎ—যাহারা মধুক্ষরণ করিতে কৃপণতা জানিত না। দেশের মাটি, হাওয়া, জল হইতে যে মধু ক্ষরিত হইত, তাহাতে মানুষের দেহে স্বাস্থ্য ও লাবণ্য, প্রাণে অভয় ও আশা, মনে সন্তোষ ও আনন্দ এবং বুদ্ধিতে নির্ম্মলতা ও ধৈর্য্য সঞ্চার করিয়া দিত। "তে হি নো দিবসা গতাঃ"—বৃথা আপ্‌শোষ করিয়া কি হইবে? কিন্তু সম্প্রতি বিজ্ঞান শক্তির যে নূতন হদিশ পাইয়াছে, তাহাতে আবার প্রাণে আশা হয়—বুঝি বা সেকাল নূতন সাজে ফিরিয়া আসিবে; পাথুরে কয়লার খনিগুলা জলে ভরিয়া যাইবে; মিল-ফ্যাক্টরীর লম্বা লম্বা চিম্‌নিগুলা লজ্জায় মাটিতে লুটাইয়া পড়িবে।

এ সবই সম্ভবপর হয়, যদি কোনও উপায়ে আমরা অণুর ভিতরকার শক্তিটাকে আমাদের আয়ত্তের মধ্যে আনিতে পারি। বিজ্ঞান এ শক্তির সন্ধান পাইলেও, ইহার ব্যবহার এখন পর্য্যন্ত শিখিতে পারে নাই। এক টুক্‌রা রেডিয়ামে যে শক্তির খেলা চলিতেছে, তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করার কোনই উপায় এখনও আমরা খুঁজিয়া পাই নাই। রাদারফোর্ড সাহেব রেডিও-একটিভিটির লক্ষণ দিতে গিয়া বলিতেছেন, ইহা পদার্থের মধ্যে এক প্রকার স্বাভাবিক (Spontaneous) বিপ্লব ও তেজোবিকীরণ। X-rays, ultra-violet rays প্রভৃতির কতকটা বাহাদুরী আছে বটে, কিন্তু সাধারণতঃ পদার্থের মধ্যে এই বিপ্লব ও তেজোবিকীরণ ঘটাইয়া দিবার সামর্থ্য আমাদের নাই; যেখানে স্বভাবতই হইতেছে, সেখানেও আমরা হিসাব লইয়াই খালাস; সেখানে আমরা আমাদের শাসন বা হুকুম চালাইতে পারি না। এই বিপ্লব বাড়াইয়া দিব বা কমাইয়া দিব অথবা একেবারে থামাইয়া দিব, এমনটা অধিকার আমরা এখনও পাই নাই। সাহেব লিখিতেছেন—"We are led to refer the energy liberated (in radio-active changes) to transformations in the chemical atoms, and to recognise clearly, what has long been suspected, that the store of energy in the atoms themselves enormously transcends the energy involved in ordinary physical or chemical changes, in which the atoms suffer no alteration. This internal atomic energy must be looked on as the source of the heat detected experimentally by Curie in the neighbourhood of a radium compound." Atomic energy বা আণবিক শক্তির পরিমাণও খুবই শুনিলাম, কিন্তু মুস্কিল ইহাই যে, ইহাকে নিজেদের আয়ত্তের মধ্যে আনিতে পারিতেছি না। সাধারণ সমস্ত রাসায়নিক সংযোগ বিয়োগে এবং তাপ প্রভৃতি যাবতীয় জড়শক্তির নিয়োগে, এই অণুর অন্দরের ব্যাপারটার কোনই পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া যায় না। রাসায়নিক ক্রিয়ার সাড়া অণুর অন্দর পর্য্যন্ত পৌঁছায় না বোধ হয়; রাসায়নিক ক্রিয়া (Chemical action) আস্ত আস্ত অণুগুলাকে লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া কারবার করে; অণুর ভিতরকার জগৎ তার এলাকার বাহিরে। অণুকে এখানেই রাখ আর ওখানেই রাখ, এর সঙ্গেই জুড়িয়া দাও আর ওর সঙ্গেই জুড়িয়া দাও, তার ভিতরের যজ্ঞটা নিরুপদ্রবে চলিয়া যায়। বাহিরের জগৎটা অবশ্য সে যজ্ঞের ফলভাগী হইতেছে; কিন্তু বাহির যেন সে ভিতরের যজ্ঞের সহায়তা কোন মতেই করিতে পারিতেছে না; বাহির ভিতরের দান গ্রহণ করিতেছে, কিন্তু ভিতরকে যেন কিছুতেই প্রতিগ্রহ করাইতে পারিতেছে না। কথাটা শুনিতে হেঁয়ালির মতন, কিন্তু সত্য। অণুর অন্দরের হোমের ফলে বাহিরে তাপ, আরও কত কি, অজস্র ছড়াইয়া পড়িতেছে; কিন্তু বাহিরের তাপ, আলোক, রাসায়নিক ক্রিয়া প্রভৃতি কোন ব্যাপারই ভিতরের ব্যাপারটার সাধক বা বাধক হইতে পারিতেছে না। রহস্য ইহাই। তাপের খবরটা নিন। "An alteration in the physical conditions, such as temperature, which always largely influence the course of ordinary physical and chemical

changes, seems, throughout an extended range, to be entirely without effect on the processes involved in radio-activity. Heating to redness, or exposure to the extreme cold of liquid air, equally leave the activities we are considering untouched. অণুর সংসারের যিনি মালিক তিনি কেমনধারা শীতোষ্ণ-দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু, তাহা শুনিলেন ত? ভীষণ উত্তাপে অথবা ভীষণ শীতে অণুর মর্ম্মস্থলে কোনই চাঞ্চল্য হয় না। তরল হাওয়া বেজায় ঠাণ্ডা; তার চেয়েও বেশী ঠাণ্ডায় অণুর ভিতরে কোন রকম কাঁপুনি দেখা যায় কি না, তাহার পরীক্ষার জন্য রেডিয়ামের আবিষ্কর্ত্তা কুরি ১৯০৩ সালে বিলাতে রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউসনে আসিয়া কিছু খাটিয়াছিলেন। তরল হাইড্রোজেন তরল হাওয়ার চাইতেও ঠাণ্ডা। এই তরল হাইড্রোজেনে রেডিয়ামের কাজের কোনও পরিবর্ত্তন হয় কি না, ইহাই দেখার সাধ ছিল। খুব সামান্য একটু পরিবর্ত্তন হয় বলিয়া পরীক্ষকেরা রায় দিয়াছেন। ফলে ব্যাপারটা দাঁড়াইতেছে এইরূপ—"Whether or not the increase they then observed be confirmed by further experiments, it seems certain that, till we thus approach the absolute zero (that is,—273°C) all the activities of radium are quite independent of temperature. Such extra-ordinary results as these point to a deep-seated difference in kind between the radio-active processes and all chemical and physical operations hitherto investigated." রেডিয়াম জাতীয় পদার্থসমূহের যে তেজোবিকীরণ (এবং যে তেজোবিকীরণ অনবরত ভাবে নিখিল সামগ্রাই করিতেছে বোধ হয়), তাহা যেন একটা সম্পূর্ণ নূতন রকমের ব্যাপার। আমরা এতদিন পদার্থ-বিজ্ঞানে যে সব রকম ব্যাপার লইয়া ঘাঁটিতেছি, ইহা যেন মোটেই সে রকমের নয়। ইহা অণুর ভিতরে সৃষ্টি ও সংহার লীলা। সে কথায় পরে আসিতেছি, এখন প্রশ্ন এই—আণবিক শক্তি খুবই প্রচুর; আবার না কি ভারি স্বাধীন মেজাজের; বিজ্ঞানাগারে কোন উপায়েই তাহাকে বাগ মানাইয়া বশে আনিতে পারিতেছি না। যেদিন পারিব সে দিন পৃথিবীর চেহারা বদ্‌লাইয়া যাইবে; বোধ হয় অণিমা লঘিমা প্রভৃতি কোন সিদ্ধিই মানুষের করায়ত্ত না হইয়া থাকিবে না। কিন্তু উপায় কি করা যায়? বৈজ্ঞানিকেরা ভয়ে ভয়ে আশা অনেকই করিতেছেন। "It seems unlikely that radium will ever be cheap enough for us to use its energy to develop mechanical power, but it is just possible that the phosphorescence of sensitive screens in the neighbourhood of a radio active body may some day be employed as an effective source of light. In this way luminous effects would be obtained directly from a store of energy self-contained and practically inexhaustible, whereas, in all our present arrangements, light is derived from a hot body, and large quantities of energy are necessarily wasted in maintaining the incandescence." এখন সামান্য একটু আলো জ্বালিতে হইলে অনেকটা শক্তির অপব্যয় করিতে হয়; কিন্তু আণবিক শক্তিকে যদি আলো জ্বালানর কাজে লাগাইয়া দিতে পারি, তবে লাভ হইবে দুই দফা। প্রথমতঃ, এমন একটা ভাণ্ডার পাইলাম, যেথান হইতে যত খুসি খরচ কর, ভাণ্ডার রিক্ত হইবে না। অণুর ভাণ্ডার অফুরন্ত ভাণ্ডার। দ্বিতীয়তঃ, কয়লা পোড়াইয়া বা বাতি পোড়াইয়া আলো হয় বটে, কিন্তু আলোর সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা তাপও হয় এবং সে তাপটা নিষ্কর্ম্মা ভাবেই চারিধারে ছড়াইয়া পড়ে। অর্থাৎ, কয়লা পোড়াইয়া যতখানি শক্তি জাগাইলাম, তার সামান্য এক ভগ্নাংশ আমার আলো জ্বালিয়া দেয়, তার বেশীর ভাগই বাজে খরচ হইয়া যায়। কিন্তু আণবিক শক্তি দ্বারা রোশ্‌নাই করিতে পারিলে এতটা বাজে খরচ না হইবার কথা। উদাহরণ সামান্য জোনাকি পোকা। সারা রাত্রি ঝোপ-জঙ্গলের ভিতর জোনাকি রোশনাই করিতেছে, যেখানে যাইতেছে রোশ্‌নাই অঙ্গে মাখিয়া যাইতেছে। এক পয়সা তেলের খরচ নাই। সে রোশ্‌নাইএ আঁচ নাই,

তাত নাই। তুমি আমি মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা গণিয়া দিয়া দুচার ঘণ্টার জন্য যে রোশ্‌নাই পাই, তার ঝাঁজই বা কত, তাতই বা কত! জোনাকি পোকা বোধ হয় যাদু জানে। সে না কি আণবিক শক্তিকে নিত্য ব্যবহারে আনিতে শিখিয়াছে। রেডিয়ামের তেজোবিকীরণের পথে একটা উপযুক্ত পর্দ্দা (sensitive screen) টাঙ্গাইয়া, আমরাও কথঞ্চিৎ এই প্রকার তাপহীন-আলোক-সৃষ্টির যাদু দেখাইতে পারি। ইহাকে phosphorescent effect বলে। সার ওলিভার লজের নাম শুনিলেই ভূতুড়ে কাণ্ড সাব্যস্ত করিয়া বসিবেন না। তিনি জাঁদরেল বৈজ্ঞানিক, কিছুদিন পূর্ব্বেও British Associationএর president ছিলেন। তিনি জোনাকির যাদুবিদ্যা সম্বন্ধে কি লিখিতেছেন শুনুন (Modern Views of Electricity, p. 473)—Can it be that the light emitted by the glowworm—which is true light and not technical radio-activity and yet which accompanied by something which can penetrate black paper and affect a light-screened photographic plate—is emitted because the insect has learnt how to control the breaking-down of atoms, so as to enable their internal energy in the act of transmutation to take the form of useful light instead of the useless form of an insignificant amount of heat or other kind of radiative effect; the faint residual penetrating emissions being a secondary but elucidatory and instructive appendage to the main luminosity?" জোনাকি পোকার আলোর সঙ্গে রেডিয়াম জাতীয় পদার্থের তেজোবিকীরণের কোন কোন অংশে সাদৃশ্য সাহেব দেখাইলেন; দেখাইয়া প্রশ্ন তুলিলেন—জোনাকির কলেবরে যে আণবিক বিপ্লব চলিতেছে, যে আণবিক শক্তির খেলা চলিতেছে, তাহাকে কোনও উপায়ে ব্যবহারে আনিতে পারিয়াছে বলিয়া কি জোনাকির অঙ্গে অমন অপরূপ স্নিগ্ধচ্ছটা? নইলে এমন কোমল, স্নিগ্ধ রোশ্‌নাই ফুটিয়া উঠে কিরূপে? জোনাকি লইয়া প্রশ্ন বটে, কিন্তু প্রশ্নের গুরুত্ব নিতান্ত সামান্য নহে। মানবের কর্ম্মধারা বা সাধনা এখন কোন্ প্রণালীতে চলিবে, ইহাই সমস্যা। ভাবিয়া চিন্তিয়া কোনই কূল-কিনারা পাইতেছি না। পশ্চিমদেশের সভ্যতা অন্ধকারে পথ হাতড়াইয়া চলিতেছে। শ্রেয়ের পথ বড়ই গহন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এত দিন কেমিকাল ও মেকানিকাল শক্তি লইয়া আস্ফালন চলিতেছিল; এখন দেখা যাইতেছে যে তাহা মানুষকে বাহিরের গোলাম, সুতরাং প্রকৃতপ্রস্তাবে, অশক্তই করিয়া ফেলে। ওপথে শান্তি নাই, কল্যাণ নাই। এই সমস্যার মুখে রেডিয়ামের অবতার হইয়াছে। রেডিয়াম যেন শ্রীভগবানের কূর্ম্মাবতার। কূর্ম্ম হাত-পা গুটাইয়া একটা নিরীহ মাটির ঢেলার মত পড়িয়া আছে, কিন্তু ঐ শক্ত খোলার মধ্যে প্রাণ আছে, বেদনা আছে, শক্তি আছে, সব আছে। আমরা এত দিন পার্টিকেল, মলিকিউল, এটম প্রভৃতি সূক্ষ্ম ভূতগুলাকে "ছোটলোক" ভাবিয়া অবজ্ঞা করিতেছিলাম; একটা ধূলিরেণু—সে আবার একটা "মানুষ", তাকে আবার গ্রাহ্য করিতে হইবে! কিন্তু রেডিয়াম-অবতার অবতীর্ণ হইয়া আমাদের দুটি চোখেরই ঠুলি ক্রমশঃ খুলিয়া দিতেছেন। এক চোখে আমরা দেখিতেছি—ধূলিরেণু বা এটমের মধ্যে এত বড় একটা শক্তির ভাণ্ডার রহিয়াছে। তার সাহায্যে একটা সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহগুলাকে লইয়া চরাইয়া বেড়ান যায়। ইহার নাম atomic energy, ইহার বিশালতার অবধি নাই বলিলেই হয়। আর এক চোখে আমরা দেখিতেছি—প্রত্যেক পদার্থের রেণুতে রেণুতে যে অগ্নিকাণ্ড, যজ্ঞ বা বিপ্লব চলিতেছে, তাহার ফলে এক জাতীয় পদার্থ ভাঙ্গিয়া কালে অন্য জাতীয় পদার্থ হইয়া পড়িতেছে। অর্থাৎ, অগ্নিকাণ্ড নিখিল ভূতের অন্তঃপুরে অহর্নিশ একটা সৃষ্টি ও সংহারের লীলা জাগাইয়া রাখিয়াছে। স্থূল বা সূক্ষ্ম কোন ভূতই অজর অমর নহে; সকলের মধ্যেই, ধীরে-সুস্থেই হউক আর তাড়াতাড়িই হউক, একটা ভাঙ্গন গড়ন চলিতেছে—এক ভাঙ্গিতেছে, আর কিছু গড়িয়া উঠিতেছে। এই ভাঙ্গন-গড়ন (নিত্য সৃষ্টি ও নিত্য সংহার) এরই বৈজ্ঞানিক পরিভাষা—রেডিও-একটিভিটি।

আচ্ছা, চোখের ঠুলি ত খুলিল, এদিকে মনে সাধও হইয়াছে—এই নিত্য সৃষ্টি ও নিত্য সংহার ব্যাপারে ব্রহ্মা ও মহেশ্বর আমরা হইব। অর্থাৎ, আণবিক শক্তিভাণ্ডার হইতে আমরা শক্তি সঞ্চয় করিব—শুধু ভাঁড়ার দেখিয়া আর চলে না। এ ভাণ্ডার লুটিতে পারিলে আমরা পাথুরে কয়লা, পেট্রল, আরও ছাইভস্ম কত-কি'র হাত হইতে রেহাই পাইব। কেমিকাল ও মেকানিকাল শক্তির দাসখৎ ছিঁড়িয়া ফেলিব। সিদ্ধ পুরুষের মত একটুখানি

ধুনির ছাই বা ধূলো লইয়া, তাহার ভিতর হইতেই শক্তির উদ্বোধন করিয়া, সকল কাজ হাঁসিল করিব। বর্ত্তমান যুগে ইহাই আমাদের সাধ ও সমস্যা। পাথুরে কয়লা প্রভৃতিতে অরুচিও হইয়াছে, অণুর ভাণ্ডারের দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপও ত করিতেছি; কিন্তু উপায় কি? এ আঁধারে গহন বনে পথ খুঁজিয়া লইব কিসের আলোয়? ঐ জোনাকির কি? প্রশ্ন শুনিয়া হাসিবেন না। আমাদের দেশের যোগীরা প্রকৃতির পশুপক্ষীদের কাছ হইতে অনেক গুহ্য যোগ-রহস্য শিখিয়াছিলেন। ভেক প্রভৃতি সরীসৃপেরা শীতের দিনে গর্ত্তের ভিতর কেমন করিয়া নিরাহারে অসাড় হইয়া পড়িয়া থাকে, তাহা দেখিয়া এবং তাহারই অনুশীলন করিয়া, যোগীরা কুম্ভক, খেচরী মুদ্রা, জড় সমাধি প্রভৃতি কত অদ্ভুত কাণ্ড সম্ভাবনার মধ্যে আনিয়া গিয়াছেন। জোনাকিও আমাদের গুরু হইতে পারে। সার ওলিভার লজ হয় ত বর্ত্তমান যুগকে গুরু-পরিচয় করাইয়া দিলেন। ইহার প্রয়োজনও হইয়াছে—বর্ত্তমান যুগের আকাঙ্ক্ষা ও সমস্যার কথা আমরা খোলসা করিয়াই বলিয়াছি। রেডিয়াম অবতারের কথা এবং শ্রীমতী জোনাকির রূপচ্ছটার কথা আপনাদিগকে বিজ্ঞানাগার হইতেই শুনাইলাম। এইবার চলুন সিদ্ধাশ্রমে। বিজ্ঞানাগারে যাহা শিখিলেন তাহা যেন ভুলিবেন না।

কুলবধূ

মিলন-পূর্ণিমা

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল্

(২)
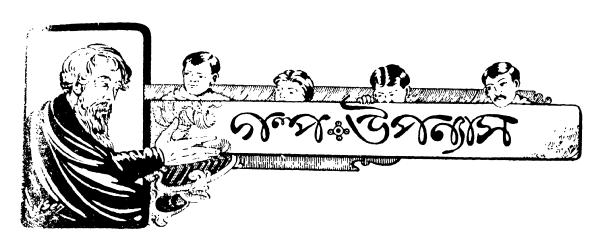
...তে বসিয়া রেখার মন আজ কিছুতেই তার বইয়ের ...বসিল না। আজকার দিনের সমস্ত ঘটনা কেবলি ...ফিরিয়া তার মনের ভিতর তোলপাড় করিতে ...ল। বায়স্কোপের ছবির মত সৌরীনের চলন্ত চিত্র তার ...নে সেই আততায়ী যুবকের দিকে তাড়া করিয়া গেল, ...র সম্মুখে আস্তিন গুটাইয়া দাঁড়াইল, তার সম্মুখে ...ের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া মিষ্ট সম্ভাষণে তাকে পরিতৃপ্ত ...তে লাগিল, রেখার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া তাহাকে রক্ষা ...তে লাগিল, তার সঙ্গে ট্রামে আসিল, তার সঙ্গে বসিয়া ...খাইল। বারে বারে ঘুরিয়া ফিরিয়া সে চক্ষের সম্মুখে ...চিত্রের পুনরভিনয় করিয়া গেল—তার ক্লান্তি হইল না, ...হইল না।

রেখার রূপের দাবী মোটেই নাই। সে রীতিমত ...লো। তার মুখশ্রী ও অঙ্গসৌষ্ঠবের মধ্যে যে লাবণ্য ...ছে, তাহা তার কালো বক্ষে এতটা চাপা পড়িয়া গিয়াছে সহসা তাহা কারও নজরে পড়ে না। শৈশবে তার ...মা তাকে সুন্দরী বলিতেন, এবং সেই জন্য তার একটু ...র গর্ব্ব ছিল। কিন্তু স্কুল কলেজে মেয়েদের সঙ্গে মিশিয়া ...ন সে দেখিল যে, সবাই কথায়-বার্ত্তায় আচার-ব্যবহারে ...দাই তাকে রূপহীনা বা এমন কি কুরূপার দলে ফেলে, তখন তার সে গর্ব্ব এমন পরিপূর্ণ রূপে মুছিয়া গেল যে, সে আপনাকে কুৎসিত জানিয়া যথাসম্ভব আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া চলিত। লেখাপড়ায় ভাল হইলেও সে কোনও দিন কোনও শিক্ষয়িত্রী বা ছাত্রীর favourite হইতে পারে নাই। কাহারও কাছে সে অগ্রসর হইতেই সাহস করিত না; তার কেবলি মনে হইত যে তাহাকে কুরূপা বলিয়া সবাই ঘৃণা করে।

যখন সে বড় হইল, তখন স্কুল ও কলেজে মেয়েরা কত কথা বলিত। এক একটি মেয়ের বিবাহ হইয়া যাইত, তাহারা আসিয়া তাহাদের স্বামীর সোহাগের কথা বলিত, অন্য মেয়েরা তাদের প্রণয়ীর গল্প করিত—সে সব কথা তার কাণে বিষের মত লাগিত। তার তো কোনও দিন সে সৌভাগ্য হইবে না—কোনও পুরুষ তাহাকে ভালবাসিতে পারিবে না—ইহা জানিয়া সে একরকম নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছিল। এ কথা ভাবিতে তার অন্তরে বড় ব্যথা লাগিত। তাই সে মেয়েদের সঙ্গেও ভাল করিয়া মিশিত না, আপনা আপনি সঙ্কুচিত হইয়া সে সম্পূর্ণ রূপে বই ও খাতার কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল।

কিন্তু আজ এ কি বিপর্য্যয় ঘটিল তার অন্তরে! কি আনন্দ কোলাহলে তার অন্তর মুখরিত হইয়া উঠিল! এই

বীর—এই দিব্যকান্তি পুরুষ এক ধাপে তার হৃদয়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ আপনার বলিয়া দাবী প্রচার করিয়া গেল, আর রেখা তার সব বিদ্যা, সকল গৌরব, সকল অহঙ্কার, সকল দৈন্য লইয়া তার এই দাবী তার সমস্ত অন্তর দিয়া স্বীকার করিয়া লইল। এ কি দৈন্য তার? এ কি আনন্দ! ভালবাসিবার অপূর্ব্ব পুলকে তার সকল শরীর মন উল্লসিত হইয়া উঠিল। একটি পুরুষের কাছে পরিপূর্ণ রূপে আত্মসমর্পণের আনন্দময় দানতার গৌরবে তার সমস্ত অন্তর চঞ্চল ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে নিতান্ত সামান্য নারীর মত ভালবাসার স্রোতে আপনাকে সম্পূর্ণ রূপে ভাসাইয়া দিল।

রেখার মা যখন রান্না সারিয়া একটা সেলাই লইয়া রেখার পাশে আসিয়া বসিলেন, তখন রেখা তার বইখানা সম্মুখে লইয়া পেনসিল দিয়া অলস ভাবে তার খাতার উপর সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক ভাবে আঁচড় কাটিতেছিল। যখন সে মায়ের সান্নিধ্য অনুভব করিল, তখন সে তাড়াতাড়ি ব্যস্ত ভাবে বইয়ের পাতাটা উল্টাইয়া গম্ভীর ভাবে পড়িতে লাগিল। সে দুই পাতা সমান পড়িয়া গেল, কিন্তু একটি কথার অর্থও তার মাথায় ঢুকিল না, সে সমস্ত ক্ষণ ভাবিতে লাগিল সৌরীন্দ্রের কথা।

সৌরীন্দ্র কে? সে কার ছেলে? তার অবস্থা কেমন? কিছুই সে জানে না কিন্তু সে [illegible] প্রশ্নের নানা রকম [illegible] কল্পনা [illegible] কল্প [illegible] স্বা[illegible] সে কল্পনা [illegible] বা [illegible] কাছে রেখাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিতেছে —পিতামাতা তাহাকে তিরস্কার করিতেছেন। সৌরীন্দ্র নানা মতে তাঁহাদিগকে সম্মত করিবার চেষ্টা করিতেছে—কিছুতেই তাঁহারা মানিলেন না। পিতা শেষে তাহাকে ত্যাজ্যপুত্র করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন—সৌরীন্দ্র মাথা খাড়া করিয়া রেখাকে জড়াইয়া ধরিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিল। রেখা তার হাতে পায়ে ধরিয়া অনুনয় করিল, বলিল, "আমার জন্য তুমি সর্ব্বস্ব ছেড়ো না।" সৌরীন্দ্র তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া বলিল, "তুমিই আমার সর্ব্বস্ব।" তার পর রেখা অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সৌরীন্দ্রের সেবা করিয়া, তাকে সমস্ত অন্তরের অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিয়া, তার এত বড় ত্যাগের প্রতিদান দিবার চেষ্টা করিল—

"দূর ছাই! কি যে ভাবি তার ঠিক নাই। আমাকে সে ভালবাসতে যাবে কেন?" এই ভাবিয়া রেখা তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিল, তার রূপ নাই, এমন কোনও গুণও নাই যাতে সে পুরুষের মন হরণ করিতে পারে। সে যে শুধু লেখাপড়াই শিখিয়াছে—আর তো কিছুই শেখে নাই! কি আছে তার যাতে সৌরীন তাকে ভালবাসিবে? অসম্ভব! তাকে অসহায় দেখিয়া সৌরীন কেবল তার স্বভাবজাত মহত্ত্বের গুণে দয়া করিয়া তার রক্ষার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে বই তো নয়। তাহাকে দুইটা ভদ্রতার কথা, সৌজন্যের কথা বলিয়াছে বই তো নয়। তাই বলিয়া কি সে রেখার মত কালো কুৎসিত একটা মেয়েকে ভালবাসিতে পারে? অসম্ভব!

আবার মনে হইল যে, যদি সৌরীন আবার আসে? আর যদি সে ঠিক তেমনি করিয়াই তার সঙ্গে সম্ভাষণ করে? রেখা কি তবে মাথা ঠিক রাখিয়া তার সঙ্গে কথা কহিতে পারিবে? না—সে একেবারে আত্মহারা হইয়া তার পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িবে? হয় তো বা সে তার মনের কথা তার কাছে প্রকাশ করিয়া ফেলিবে। নেশার ঘোরে সে হয় তো বুদ্ধিশুদ্ধি খোয়াইয়া সৌরীনকে বলিয়াই বসিবে "আমি তোমায় [illegible]" যদি তাই করে [illegible] কি [illegible] কি? পুরুষ [illegible], [illegible] কিন্তু যদি সৌরীন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠে? যদি তার মত কুরূপার পক্ষে সৌরীনকে ভালবাসিবার স্পর্দ্ধায় সে তাকে পরিহাস করে? তবে কি লজ্জা! মরিয়াও যে রেখা সে লজ্জা লুকাইতে পারিবে না।

আর যদি সৌরীন তা' না করে? যদি সেও ভালবাসে—যদি সে রেখাকে তার প্রেমালিঙ্গনে বাঁধিয়া ফেলে? তবে—কি আনন্দ!—কিন্তু পুরুষ মানুষ তো এমন অনেক সময় করে যে একটি নারীকে মুগ্ধ করিয়া কিছু দিন তার সঙ্গে প্রেমের খেলাধূলা করিয়া শেষে তাকে ফেলিয়া পলায়? সৌরীন তো তাও পারে? যদি তাই করে? যদি সে তাকে শেষ পর্য্যন্ত বিবাহ করিতে অস্বীকার

করে? কি সর্ব্বনাশ!—তাই সম্ভব! না! তার মত কুরূপার সত্য প্রেমের স্বপ্ন দেখা বাতুলতা। সে এ কথা ভাবিবে না।

রেখা পড়িয়া গেল The value of money depends upon more factors than the quantity theory makes allowance for. The rapidity of circulation—আচ্ছা সৌরীন্দ্রের কত টাকা আছে? সে কি খুব বড়লোক? তা যদি হয় তবে তো তার রেখার মত গরীব রূপহীনাকে গ্রাহ্য করিবার কথা নয়। তা না হইলেই বা কি? রেখাকে কে ভালবাসিতে যাইবে? নাঃ—The value of money depends—

তার মা ডাকিলেন "রেখা!"

রেখা যেন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিল, স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "কি মা?"

"এই যে সৌরীন ছোকরাকে আজ নিয়ে এসেছিলি, এ কে জানিস?"

"এ খুব ভাল ছেলে মা। বরাবর ফার্ষ্ট হ'য়ে গেছে। আর এ অন্য সব ছেলের চেয়ে ঢের বেশী জানে—কত বই ও প'ড়েছে। আমাদের কলেজের বেলার কাছে শুনেছি যে, ও যা' জানে ওর অনেক প্রফেসার তা জানে না।"

"সে তো বুঝলাম। কিন্তু ও কে? বাড়ী কোথায়? কার ছেলে?"

"তা জানি না মা।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া রেখার মা বলিলেন, "তাই আমি ভাবছিলাম। তার কিছু জানি না শুনি না, তাকে তুই একেবারে বাড়ীতে নিয়ে এসে ভাল করিস নি। কে জানে ও কেমন লোক?"

তার মার সৌরীন সম্বন্ধে এই সন্দেহ রেখার কাছে এত অন্যায় বোধ হইল যে, কথাটা যেন তার কাণে কাঁটার মত বিঁধিল। সে কেবল বলিল, "না, উনি খুব ভাল লোক।"

হাসিয়া রেখার মা বলিলেন, "শোন পাগল মেয়ের কথা! এক দিনের আলাপে যাকে ভাল ব'লে মনে হয়, অনেক সময় দেখা যায় যে, তারাই সব চেয়ে ভয়ানক লোক!"

কি অন্যায় কথা! মা এ সব কথা কি বলিয়া বলেন! রেখার ভয়ানক রাগ হইতে লাগিল। কিন্তু সে অনুভব করিল যে, ইহার উত্তরে তার এমন কোনও কথাই বলিবার নাই, যাহাতে তার মার সন্দেহ একেবারে অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া যাইবে। তাই সে কেবল রাগিয়াই রহিল; আর মুখ ভার করিয়া বলিল, "বেশ, তবে আর ওঁকে আসতে বলবো না।"

মেয়ের কথার সুরে মা তার মনের অভিমানের বেশ স্পষ্ট আভাস পাইলেন। তাঁর অন্তরে একটু ব্যথা লাগিল, স্নিগ্ধকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "রাগ করলি মা?"

রেখা বই বন্ধ করিয়া একেবারে ঘুরিয়া বসিয়া বলিল, "না, কিন্তু তুমি আমাকে কি ভাব বল দিকি নি! আমি—আমি—আমাকে কখনও তেমন দেখেছ?"

বলিয়া হঠাৎ রেখা উঠিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল। তার চক্ষে জল আসিতেছিল। পাশের ঘরে গিয়া সে চোখ মুছিতে মুছিতে দম দম করিয়া বারান্দায় যেখানে উনান পাতা ছিল সেখানে গেল। তার পর উনান হইতে ভাত নামাইয়া সে তাড়াতাড়ি ভাত বাড়িয়া লইয়া খাইতে বসিল।

মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া আসিলেন। রেখা নীরবে খুব তাড়াতাড়ি ভাত খাইতে লাগিল, তার মা একাগ্র ভাবে তার দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন।

খাইয়া উঠিয়া রেখা অভ্যাসমত সে স্থান পরিষ্কার করিয়া এঁঠো বাসন ও মুখ হাত ধুইয়া ধপ করিয়া বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। মা তখন দুয়ার বন্ধ করিয়া বাতি নিভাইয়া পাশে আসিয়া শুইলেন। একখানা চওড়া তক্তপোষের উপর তাঁরা দুজনে শুইতেন।

শুইয়া শুইয়া রেখার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে তার মা বলিলেন, "রাগ করিস নে মা আমার কথায়। আমি তোকে সন্দেহ করে' কোনও কথাই বলিনি। কিন্তু মা, এত দিন তোকে বলবার দরকার হয় নি তাই বলি নি। বেশ করে না জেনে না শুনে কোনও পুরুষ মানুষের সঙ্গে আলাপ করাটা তোদের বয়সের মেয়েদের পক্ষে বড় ভয়ের কথা। খুব সাবধানে না থাকলে আমাদের নাকি পদে পদে বিপদ, তাই তোকে একটু সাবধান করে' দিচ্ছি।"

রেখা একটু হাসিয়া যথা সম্ভব শান্ত ভাবে বলিল, "মা,

তুমি কি আমাকে এখনো তোমার সেই কচি খুকীটি মনে ক'রছো। আমার যে বিশ বছর বয়স হ'য়েছে মা; আমি বি-এ পাশ ক'রেছি। এই সেদিন মহিলা মহায়তনের কর্ত্তারা আমাকে সেখানকার কর্ত্রী হবার জন্য নিমন্ত্রণ করে' পাঠিয়েছিলেন। বাঙ্গলা দেশের এতবড় সব গণ্য-মান্য লোক তাঁদের সব মেয়েদের ভার আমার হাতে দিয়ে ভরসা পান; আর তুমি তোমার মেয়েটির ভার আমাকে ছেড়ে দিতে ভরসা পাও না ?"

"ভরসা আমি খুবই পাই। নইলে কি তোকে কলেজে গিয়ে এতগুলো ছেলের সঙ্গে একলা পড়তে দি। কিন্তু তোর সাহসের তো কথা হ'চ্ছে না; কথাটা অন্য লোকের স্বভাবের। লোক ভাল করে' চেনবার ক্ষমতা তোর এখনও হয় নি, কেন না তুই যতই পাশ করিস, পুরুষ মানুষ এখনও বলতে গেলে দেখিসই নি।"

"রোজ আমি এক হাজার ছেলের সামনে আনাগোনা করি, আমি মানুষ দেখিনি ? বল কি মা ?"

"যাক, সে কথায় কাজ নেই। এই সৌরীনের কথা"—

"আর সে কথা কেন বলছো মা ? আমি তাকে ডেকে এনেছিলাম, অন্যায় করেছি—আর ডাকবো না।"

"তুই তো ডাকবি না, কিন্তু এখন সে যদি নিজে এসে জোটে।"

"সে আসবে না।" জোর করিয়া কথাটা বলিয়াই রেখার মনে হইল, সৌরীনের সম্বন্ধে এমন করিয়া জোর করিয়া বলিবার তার কোনও অধিকার নাই। তাই সে বলিল, "আর যদি আসে, তুমি তাকে বলে' দিও—আর যেননা আসে।"

"না—না, সে কি হয় ? ভদ্রলোকের ছেলেকে তো অমন করে' অপমান করা যায় না। আমি শুধু এইটুকু তোকে বলতে চাই যে, তুই খুব সাবধান থাকিস। কথায়-বার্ত্তায় কাজ-কর্ম্মে কিছুতে যেন তাকে প্রশ্রয় দিস না।"

"আচ্ছা দেব না। এখন চুপ কর, আমি ঘুমোই "বলিয়া রেখা পাশ ফিরিয়া শুইল—কিন্তু ঘুমাইল না। জাগিয়া জাগিয়া সে অনেকক্ষণ অনেক স্বপ্ন দেখিল; তার পর যখন সে সত্য সত্যই ঘুমাইল, তখনও সে স্বপ্ন দেখিতে লাগিল সৌরীনের কথা।

পরের দিন রেখা সঙ্কল্প করিয়া গেল যে, মায়ের অন্যায় সন্দেহের জন্য সে প্রতিশোধ লইবে সৌরীনকে একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া। আজ যদি সৌরীনের সঙ্গে দেখা হয়, তবে সে তার সঙ্গে কথা তো কহিবেই না—তাকে নমস্কার পর্য্যন্ত করিবে না—এমন করিয়া চলিয়া যাইবে যে যেন সে তাকে চেনেই না। তাতে অবশ্য সৌরীনের কিছুই হইবে না, কেন না সৌরীনের কাছে রেখা তো কিছুই নয়। সৌরীন তো আর রেখাকে ভালও বাসে না, তার জন্য তার কিছু বহিয়াও যায় না। কিন্তু সৌরীন নিশ্চয় খুব আশ্চর্য্য হইবে, আর ভাবিবে, এই মেয়েটা কি অভদ্র ও অকৃতজ্ঞ! সে রেখাকে ঘৃণা করিবে। বেশ হইবে! তাহা হইলেই তার পক্ষে মায়ের অপমানের উপযুক্ত প্রতিশোধ লওয়া হইবে।

সেদিন কলেজ যাইবার সময় যখন রেখা নীচে নামিয়া আসিল, তখন তার মনে একটা অসম্ভব আশা হইতেছিল যে, বুঝি বা সে সৌরীনকে দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিবে। এমন মনে করিবার তার কোনও হেতুই ছিল না, তবু তার মনে হইতেছিল যে, বুঝি সৌরীন এখানে আসিয়া তাহার সঙ্গে কলেজ পর্য্যন্ত যাইবে। যখন দ্বারে আসিয়া সে সৌরীনকে দেখিতে পাইল না, তখন সে বেশ একটু নিরাশ হইল।

ট্রাম আসিলে রেখা উঠিয়া বসিল। না—কোনও দিকে সৌরীনের চিহ্নও নাই। কিন্তু ট্রাম আর খানিকটা অগ্রসর হইতেই রেখা দেখিতে পাইল যে, হঠাৎ যেন আকাশ হইতে পড়িয়া সৌরীন চট্ করিয়া চলন্ত ট্রামে উঠিয়া বসিল। রেখার প্রাণমন নাচিয়া উঠিল। কিন্তু সৌরীন তার দিকে চাহিল না। রেখার পশ্চাতের একটা বেঞ্চে বসিয়া সে নিবিষ্ট ভাবে একটি ছেলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা সুরু করিয়া দিল।

গোলদীঘির সামনে আসিয়া রেখা ট্রাম হইতে নামিয়া একবার সৌরীনের দিকে চাহিল। কিন্তু সৌরীন ভয়ানক কথায় ব্যস্ত। সেই বন্ধুটীর সঙ্গে সে নামিয়া গম্ভীর ভাবে আলাপ করিতে করিতে রেখার খানিকটা পশ্চাতে পশ্চাতে দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংএর দিকে অগ্রসর হইল। রেখা যখন তার ক্লাশে গিয়া বসিল, তখন তার সম্মুখ দিয়াই সেই দুই বন্ধু চলিয়া গেল; কিন্তু সৌরীন একবার সে ক্লাশের দিকে ফিরিয়াও চাহিল না।

সেদিন রেখা প্রফেসারের বক্তৃতার এক বর্ণও শুনিতে পাইল না। বারে বারে তার বুক ঠেলিয়া কান্না আসিতে লাগিল, বারে বারে চক্ষু ঝাপসা হইয়া উঠিল। সৌরীন আজ ইচ্ছা করিয়াই তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়াছে, সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ রহিল না। কাল সে যে সহৃদয়তা দেখাইয়াছিল, সে জন্য রেখা তাকে যে সমাদর করিয়াছে, সৌরীন তাহাতে নিশ্চয় মনে করিয়াছে যে, রেখা তার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, এবং সৌরীনকে সে মুগ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে। কাল সৌরীন ভদ্রতার খাতিরে রেখার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিয়া গিয়াছে; কিন্তু রেখা যে ভুল বুঝিয়াছে, এবং সৌরীন যে বাস্তবিক তাহাকে গ্রাহ্য করে না, এই কথাটা তাহাকে পরোক্ষ ভাবে বুঝাইবার জন্যই সৌরীন এই সঙ্কেত অবলম্বন করিয়াছে—পাছে রেখা আরও বেশী দূর অগ্রসর হয়। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া রেখা ইহাই সৌরীনের ব্যবহারের একমাত্র সঙ্গত অর্থ সাব্যস্ত করিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে ব্যথিত, অপমানিত ও লজ্জিত হইয়া উঠিল।

বাড়ী ফিরিবার সময় রেখা দেখিল, সৌরীন ফটকের অপর দিকে প্রেসিডেন্সী কলেজের ফিজিক্যাল ল্যাবরেটারীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটি বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিতেছে। একবার সে রেখার দিকে চাহিল, তার পরই চক্ষু ফিরাইল, যেন সে রেখাকে চিনিতে পারে নাই। ট্রামে উঠিয়া রেখা দেখিল যে, যার সঙ্গে সৌরীন আলাপ করিতেছিল, সে বন্ধুটি রেখার পিছু পিছু ট্রামে উঠিয়া বসিল, সৌরীনকে দেখা গেল না।

ক্ষোভে অভিমানে ফুলিতে ফুলিতে রেখা বাড়ীতে গিয়া একেবারে শুইয়া পড়িল। ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া মা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতে রেখা বলিল, "মাথা ধরেছে।"

ইহার পর দুই চার দিন অন্তরই রেখা সৌরীনকে কলেজ যাইবার সময় বা আসিবার সময় দেখিতে পাইত; কিন্তু কোনও দিনই সৌরীন পরিচয়ের চিহ্নমাত্র প্রকাশ করিত না।

(ক্রমশঃ)

শিল্প-বাণিজ্যে বঙ্গে চন্দননগরের স্থান

শ্রীহরিহর শেঠ

বাঙ্গলার পুরাতন সাহিত্যে ও বহু ইংরাজি ও ফরাসী ইতিহাসে চন্দননগরের নাম উল্লিখিত থাকিলেও, ইংরাজ ও ফরাসী ইষ্ট্ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আদি যুগে, উভয় জাতির ভারতভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার এবং প্রাধান্য লাভ ও সাম্রাজ্য স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা হইতে যে যুদ্ধ-বিগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার কথাই প্রধানতঃ ইতিহাসের বিষয়ীভূত হইলেও, উহার বিশিষ্টতা ছিল উহার শিল্প ও ব্যবসায়ে।

ব্যবসায় ও শিল্পে চন্দননগর কোন দিন বাঙ্গলার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শীর্ষস্থান পাইয়াছিল কি না জানি না, কিন্তু ইহা যে বিশেষ উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল এবং এখনও অনেক স্থানের অপেক্ষা এ বিষয়ে বড় তাহাতে সন্দেহ নাই। এখানকার এক বস্ত্র-শিল্পই সম্ভবতঃ ফরাসী জাতিকে আকর্ষণ করিয়া এই স্থানে আনিয়াছিল। এবং এই বস্ত্র-শিল্পই ভারতের বাহিরে এমন কি সুদূর পাশ্চাত্য দেশ সমূহেও চন্দননগরের অস্তিত্ব জানাইয়া দিয়াছে। মহামতি ডুপ্লের সময় যখন ইংরাজ, ডাচ্ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় বৈদেশিক বণিকগণের হিংসার কারণ হইয়া চন্দননগর গৌরবের শীর্ষ সীমায় উপনীত হয়, তখন এখানকার শিল্প-ব্যবসায়ই সে গৌরবের প্রধান উপকরণ হইয়াছিল। ডুপ্লে চন্দননগর ত্যাগ করিয়া যাইবার পরও ইহার ব্যবসা-সমৃদ্ধির বৃদ্ধি হইয়াছিল। তখনও বসোরা, চীন, পেগু, জেড্ডা, সুরাট, মোচা, তিব্বত, পারস্য প্রভৃতি স্থান সকলের সহিত চন্দননগরের বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল। তখনও শস্য, অহিফেন, রেশম, মসলিন্ প্রভৃতি পণ্যের প্রচুর আমদানী রপ্তানী হইত। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে যখন ইহা উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, তখন ইহা কলিকাতার অপেক্ষা বড় ব্যবসা কেন্দ্র ছিল। (১) ক্লাইভ এই স্থানকে

(১) A brief History of the Hughly District.

খুব আড়ম্বর পূর্ণ এবং ধনসম্পদশালী উপনিবেশ বলিয়াছেন। (২) ইহাকে তিনি ভারতের শস্যাগার (The granary of the islands) বলিতেন। (৩)

দেড়শতাধিক বৎসর হইতে চন্দননগরের সেই প্রাচীন কালের বাণিজ্যশ্রী বিলুপ্ত হইলেও এখনও ইহা এ প্রদেশের মধ্যে একটি ব্যবসা-প্রধান নগর এবং বাঙ্গলার মধ্যে একটি বিশিষ্ট শিল্প-কেন্দ্র। সূক্ষ্ম বস্ত্র-শিল্প, কাঠের কাজ, মৃৎ-শিল্প,

ফরাসডাঙ্গার কাপড়ের খ্যাতি এখনও সর্ব্বত্র প্রচারিত থাকিলেও, সুপ্রসিদ্ধ সূক্ষ্ম বস্ত্র সকল যাহা ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বিলাসি সমাজে বিশেষ আদরণীয় ছিল,—রুমালের জন্য লাল গিলে, কাল গিলে নামক চেক কাপড়, খাসা নামক কোরা লংক্লথ, (৪) গাউনের কাপড় প্রভৃতি শিল্প এখন যে কারণেই হৌক লুপ্ত হইয়াছে। চুরুট, আরসি, চট, গালা, রঞ্জনের কাজ, মখমলের উপর জরির কাজ,
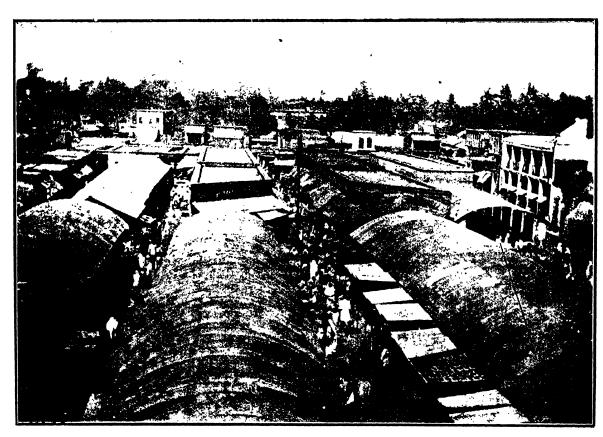
বর্ত্তমান লক্ষ্মীগঞ্জ। (উপর হইতে)

দড়ির কাজ, শাঁখা, রূলি প্রভৃতির কাজ এখনও এখানে নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকল এমন কি বাঙ্গলার বহু স্থানের তুলনায় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া থাকিলেও এক মাত্র দারু-শিল্প ভিন্ন অপর সকলের পূর্ব্ব গৌরব অনেক পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। এ কাজটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

কাশ্মারি কারিগর দ্বারা প্রস্তুত শাল প্রভৃতি যাহা একসময় এখানে উৎপন্ন হইয়া বিদেশে প্রেরিত হইত, তাহার কথা এখন উপকথায় পরিণত হইয়াছে। (৫)

পূর্ব্বে এখানকার উৎপন্ন এবং অন্যান্য স্থান হইতে

(২) The life of Lord Clive Vol. 1.

(৩) Selections from unpublished Records of the Government for the year 1748 to 1767.

(৪) চন্দননগরের শিল্প।—স্বরাজ ১০ম সংখ্যা ১ম বর্ষ।

(৫) দশভুজা সাহিত্যমন্দিরের ৩য় বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত "চন্দননগরের মুসলমান উপনিবেশ" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে এখানে শাল প্রস্তুতের কথা জানিতে পারি।

আমদানী দ্রব্যের খরিদ-বিক্রী ও রপ্তানীতে ইহা একটি বিশেষ বাণিজ্য-প্রধান স্থান হইয়া উঠিয়াছিল। তখন রেল পথ সৃষ্টি হয় নাই, জলপথেই এখানে গমনাগমন সহজসাধ্য ছিল এবং বাণিজ্য পণ্য বহন করিয়া বহু শত নৌকা ও অর্ণবপোত গমনাগমন করিত। (৬) ফরাসী কোম্পানী চন্দননগরে কেন্দ্র স্থাপন করিয়াই বাঙ্গলার অন্যান্য স্থানে কুঠি স্থাপন করিয়াছিলেন। ইংরাজ কর্ত্তৃক সহর অবরোধের দশ বার বৎসর পূর্ব্বেও ইহা কলিকাতা অপেক্ষা সমৃদ্ধ ব্যবসা-কেন্দ্র ছিল বলিয়া জানা যায়। (৭) (৮) সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতেই এখানে রপ্তানী ব্যবসায়ের সূত্রপাত হয়। তখন পণ্ডিচারীর সমস্ত আবশ্যক দ্রব্য সরবরাহের ইহাই কেন্দ্র ছিল। (৯) ইংরাজ নথি হইতে জানা যায়, মোগল বাদশার পাকা অনুমতি পাইবার পূর্ব্বে কুঠি নির্ম্মাণ না হইতেই ফরাসী কোম্পানীর এই নূতন উপনিবেশে ব্যবসার উন্নতি হইতে থাকে। (১০) এই সময় বস্ত্র, সোরা, বেত, চন্দনকাষ্ঠ, গালা, মোম, রেসম, মরিচ প্রভৃতি এই স্থান হইতে সচরাচর রপ্তানী হইত। পার্ল দোরিয়ঁ (Perle d'orient) ফেলিপো (Phelypeaux)

শন হইতে সুতুলি দড়ি প্রস্তুত হইতেছে।

প্রভৃতি এক এক খানি জাহাজে প্রচুর পরিমাণে উক্ত সব মালপত্র চালান হইত বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। (১১)

এখান হইতে মসলিন্ ও অন্যান্য সূক্ষ্ম বস্ত্র সকল রপ্তানী হইত বলিয়া জানা যায়। এই মসলিন্ তখন এই স্থানেই

ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এ স্থানে আগমনের পূর্ব্ববর্ত্তী বা তাঁহাদের কুঠি স্থাপনের অব্যবহিত পরের এখানকার ব্যবসা ও শিল্পের ইতিহাস আমার অনুসন্ধানে কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে কোম্পানীর এবং এই স্থানের অবস্থা খুব সামান্য থাকিলেও।

(৬) চন্দননগরের শিল্প।—স্বরাজ ১০ম সংখ্যা, ১ম বর্ষ।

(৭) A brief History of the Hughly District.

(৮) La mission du Bengale Occidental vol. I ও A brief History of the Hughli District.

(৯) La compagnie Des Indes Orientales.

(১০) Storia Do Mogor vol.—II- Introduction.

(১১) La Compagnie des Indes Orientales.

দড়ি গুটাইবার যন্ত্র।

সেগুন কাষ্ঠে নির্ম্মিত শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি।
উচ্চে ৮ ইঞ্চ মাত্র।

শিল্পী—৺নীলমণি নাথ।

উৎপন্ন হইত বলিয়া বিবেচনা করিবার কারণ আছে। কারণ ১৭২৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ফরাসীদের ঢাকার সহিত ব্যবসা সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই। (১২) চন্দননগরের বস্ত্রাদি যে উৎকৃষ্ট হইত, তাহা পরবর্ত্তীকালে পণ্ডিচারীতে বিক্রীত বস্ত্রাদির লাভের তালিকা হইতে বুঝিতে পারা যায়। উহা হইতে যখন শতকরা ৮০৲।৯০৲ টাকা লাভ হইয়াছিল, তখন অন্যত্র উৎপন্ন বস্ত্রাদির লাভের অনুপাত শতকরা ২০৲ ২৫৲ বা ৫০৲ টাকার অধিক ছিল না। (১৩)

কোম্পানীর প্রথম ডিরেক্টর চন্দননগরে ফরাসি উপনিবেশ প্রতিষ্ঠাতা দেসলান্দের (Andre Boureau Deslandes) চেষ্টা ও উৎসাহে প্রথম কয়েক বৎসর ব্যবসার বিশেষ উন্নতি হইলেও, উপযুক্ত অর্থাভাবে ইহার অবস্থা শীঘ্রই অত্যন্ত খারাপ হইতে থাকে। ১৭০০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে দেসলান্দ এই স্থান হইতে চলিয়া যাইবার পর

(১২) A Descriptive and Historical account of the cotton manufacture of Dacca in Bengal.

(১৩) The private diary of Anandaranga Pillai vol. I.

তিন বৎসরেরও উপর ফ্রান্সের ডিরেক্টরগণ কোন অর্থ পাঠান নাই। এখানকার তদানীন্তন প্রধান কর্ম্মচারী ডুলিভে (Du Livier) অপরাপর কর্ম্মচারী প্রভৃতিদের নিকট হইতে দেনা করিয়া কোনরূপে কুঠি বজায় রাখিয়া,

রামনগর—কাশী।

চিত্রশিল্পী—শ্রীযুত আশুতোষ মিত্র কর্ত্তৃক অঙ্কিত জলের রংয়ের ছবি।

১৭০৪ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের কর্ত্তৃপক্ষকে লেখেন—দেনা পরিশোধ ও উপযুক্ত মূলধন ব্যতিরেকে বাঙ্গলায় ফরাসীদের বাণিজ্যের কোন আশা নাই। ইহাতেও কোন ফলোদয় হয় নাই। পর বৎসর ডিসেম্বর মাসে কোম্পানীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়। এই সময় ফ্রান্সের কর্ত্তারা এখানকার ক্ষতির পরিমাণ চিন্তা না করিয়াই, একেবারে এখানকার

দেড় শতাধিক বৎসর পূর্ব্বের প্রস্তুত কারুকার্য্য বিশিষ্ট চৌকি।
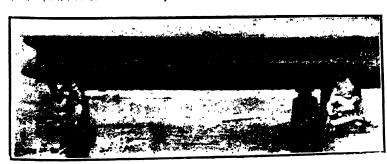
কুঠি বন্ধ করিবার ইচ্ছা করেন। কার্য্যতঃ ইহা হয় নাই বা তৎপরেও বহু দিন পর্য্যন্ত বিশেষ কোন অর্থ প্রেরণের ব্যবস্থাও হয় নাই। ক্রমে ক্রমে কোম্পানীর দেনার পরিমাণ ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে মোট ৩০০০০ পাউণ্ড হইয়াছিল। এই সময় কোম্পানীর অন্যান্য ভারতীয় উপনিবেশগুলিও প্রায় ধ্বংস মুখে পতিত হয়, কিন্তু তখনও চন্দননগরই ফ্রান্সের ভারতীয় প্রধান ব্যবসা-কেন্দ্র ছিল। (১৪) ইহার পর দীর্ঘ কালের মধ্যেও কোম্পানীর বাণিজ্যের বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই। জানা যায়, ১৭২৩ হইতে ১৭২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে গড়ে প্রায় দেড় মিলিয়ন পাউণ্ডের কারবার হইয়াছিল এবং ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে আড়াই মিলিয়ন পাউণ্ডের কারবার হয়, তন্মধ্যে ১০ লক্ষ

শ্রীযুত প্রভাসচন্দ্র শেঠের দ্বারা নির্ম্মিত নেম ব্রুচ্।
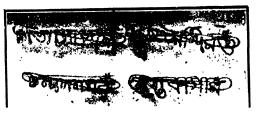
টাকার মাল চন্দননগর হইতেই রপ্তানী হয়। (১৫)

পণ্য বহনের জন্য তখনকার যে সব জাহাজের নাম পাওয়া যায়, তাহা সেণ্ট্ জন্ (St. Jean), পষ্টিলন (Pastillon), পঁসারট্যাঁ (Pont chartran) ফেলিপো (Phelypeaux) পার্ল্‌দোরিয়ঁা (Perle-d'orient), সেণ্ট লুই (Saint Louis), গাইয়ার (Gaillard) লা-পণ্ডিচারী (Le Pondichery) ইত্যাদি। (১৬)

এতাবৎ কোম্পানীর ব্যবসা কখন কম কখন সামান্য বেশি ভাবে চলিয়াছিল। ১৭৩১ খৃষ্টাব্দেডুপ্লের আগমনের পর হইতে উহা উল্লেখযোগ্য রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তাঁহার চেষ্টায় ক্রমে ক্রমে ভারতের মধ্যে নানা দূরদেশ ও বাহিরের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এই সময়েই এখানে অন্যান্য স্থান হইতে বহু লোক ব্যবসায় দ্বারা সৌভাগ্য লাভ করিবার ও অনেকাংশে নিরাপদ হইবার মানসে আগমন করিয়া

(১৪) Le Compagnie des Indes Orientales.
(১৫) ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী—প্রবর্ত্তক ৭ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা।
(১৬) Le Compagnie des Indes Orientales.

বাস করিতে আরম্ভ করেন। তখন ক্রমে ব্যবসাশ্রীতে স্তব্ধ পল্লী মুখরিত হইয়া উঠিল, গঙ্গাবক্ষ পণ্য-পূর্ণ বহু তরণী ও জাহাজে শোভিত হইল। বহির্বাণিজ্যে ও অন্তর্বাণিজ্যে চন্দননগর বাঙ্গলার মধ্যে একটি প্রধান নগর বলিয়া পরিচিত হইল এবং কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের আহার্য্য শস্যাদি সরবরাহের প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠিল। (১৭) প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাই চন্দননগরের স্বর্ণ-যুগ। যেন কোন মায়াবিনীর ইন্দ্রজালে সহসা কয়েক বৎসরের মধ্যে চন্দননগর নূতন শ্রী ধারণ করিয়া শোভা-সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

১৭৪১ খৃষ্টাব্দে ডুপ্লে চলিয়া যাইবার পরও এখানে ব্যবসা বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি বর্ত্তমান ছিল। এইরূপে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত ফরাসীদের বাণিজ্য যথেষ্ট বর্দ্ধিত হয় (১৮)। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ্চ, ইংরাজের সহিত যুদ্ধফলে চন্দননগরের পতনের সহিত ফরাসীদের ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা নির্ম্মূল হইল এবং সেই সঙ্গে তাঁহাদের ব্যবসা বাণিজ্য চির-বিলুপ্ত হইল। এই শতাব্দীর শেষভাগে ব্যবসা বলিতে চন্দননগরে প্রায় কিছু ছিল না। (১৯) তৎপূর্ব্বেই ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী লোপ পাইয়াছিল। (২০)

চন্দননগরের গৌরব-যুগে ফরাসী কোম্পানীর বাণিজ্য-শ্রীবৃদ্ধির সহিত এখানকার এবং ভিন্ন দেশাগত জনগণেরও যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। তৎকালে ফরাসীদের অদৃষ্টের সহিত যাঁহাদিগের ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কোন সম্পর্ক ছিল, তাঁহারাও যথেষ্ট সৌভাগ্য অর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন। কোম্পানির কর্ম্মচারিদের মধ্যেও ইহার কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। স্বয়ং ডুপ্লেও এই সুযোগের ফল গ্রহণে বিরত ছিলেন না।
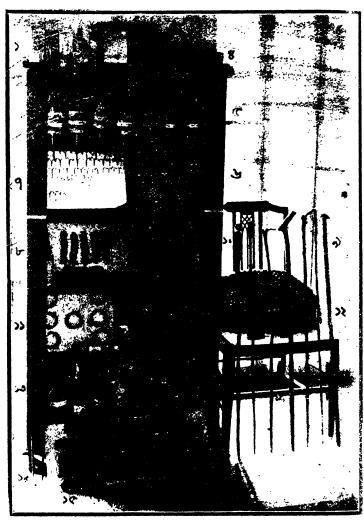
চন্দননগরে প্রস্তুত বিবিধ দ্রব্য।

(১) এসেন্স, পমেটম, টুথপাউডার ইত্যাদি। (২) চন্দননগরে প্রস্তুত আরসি। (৩) শ্রীগৌরচাঁদ দের তালা। (৪) শ্রীসন্তোষনাথ শেঠের প্রস্তুত পকেট হুঁকা। (৫) ৺দীননাথ চন্দ্রের কারখানায় প্রস্তুত বিবিধ টিকার। (৬) কাচের চুড়ি। (৭) বঁড়সি। (৮) রংকরা সুতা। (৯) শ্রীবিপিনচন্দ্র সরকারের প্রস্তুত ছড়ি। (১০) হোমিওপ্যাথি ঔষধের কৌটা। (১১) কলি। (১২) পাপোস। (১৩) পেটেণ্ট ঔষধ, বার্ণী প্রভৃতি। (১) শ্রীউমাচরণ কর্ম্মকারের প্রস্তুত কাতুরি। (১৫) শনের দড়ি।

স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে ফরাসী ভাগ্যলক্ষ্মীর সহিত যাঁহাদের সম্বন্ধ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল, তন্মধ্যে ইন্দ্রনারায়

(১৭) Le Compagnie des Indes Orientales.
(১৮) Bengal District Gazetteers—Hughly.
(১৯) Bengal District Gazetteers—Hughly.
(২০) History of India—By David Sinclair M. A., ও La Compagnie Francaise Des Indes (1604-1875)

চৌধুরীর নামই প্রধানতঃ উল্লেখযোগ্য। দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বলিয়া তাঁহার নাম অনেক স্থলে উল্লিখিত হইলেও ফরাসী কোম্পানীর দেওয়ান বলিয়া কোন পদ ছিল না। তিনি ২০৲ টাকা বেতনে চাকুরি আরম্ভ করিয়া, কোম্পানীর কুর্ত্তিয়ে (courtier) অর্থাৎ দালাল, পণ্য-সরবরাহকার এবং ইজারদার হইয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বতন্ত্র নিজ ব্যবসা ও তেজারতি দ্বারা বিপুল সঙ্গতি ও প্রতিপত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। (২১) অবশ্য এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ডুপ্লেও প্রধানতঃ তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই এখানে অসাধ্য-সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইন্দ্রনারায়ণ সম্ভবতঃ যুদ্ধের পূর্ব্ব বৎসর ইহধাম পরিত্যাগ করেন। ফরাসিদের সহিত সম্পর্কিত হইয়া তিনি যেমন স্বল্পকাল মধ্যে অসাধারণ সম্পদ ও প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন, আশ্চর্য্যের বিষয় ফরাসীদের পতনের সহিত ইংরাজের ক্রোধে তাঁহারও সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হয়। এমন কি তাঁহার বাসের সুবৃহৎ অট্টালিকাও সেই সঙ্গে ইংরাজদের গোলায় ধূলিসাৎ হয়। সমগ্র চন্দননগর লুণ্ঠন করিয়া ১০০০০০১ ষ্টার্লিং সম্পত্তি ক্লাইব লইয়া যান। (২২) কথিত আছে তন্মধ্যে ইন্দ্রনারায়ণের সম্পত্তিই ছিল প্রায় ৬৫ লক্ষ টাকার। (২৩)

কোম্পানীর সম্পর্কে থাকিয়া এখানকার অপর কাহারও বিশেষ ধনশালী হওয়ার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ এক্ষণে নির্ণয় করিতে না পারা গেলেও, অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারা যায়,—এখানকার অনেকের পূর্ব্বপুরুষেরা চন্দননগরের এই উন্নতির সময়ই অন্য স্থান হইতে এখানে আগমন করিয়াছিলেন।

চন্দননগরে প্রস্তুত আসবাব পত্র।

এখানকার সুবিখ্যাত লক্ষ্মীগঞ্জ নামক বাজারটির ডুপ্লের সময়ই সূত্রপাত হয় (২৪) এবং পুরাতন লক্ষ্মীগঞ্জের বড় বড় গুদামগুলিও সেই সময়ে নির্ম্মিত হয়। পুরাতন গঞ্জের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে ধান চাউলের কাজই খুব বেশি ছিল। উহা কলিকাতার ও নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের চাউল সরবরাহের প্রধান গঞ্জ ছিল বলিয়া শুনা যায়।

(২১) ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী—প্রবর্ত্তক, জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ সাল।

(২২) Orme's Military Transactions of the British nation in Indostan.

(২৩) ৺ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী—প্রবর্ত্তক, ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

(২৪) ৺ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী—প্রবর্ত্তক, ৭ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা।

চাউলের ব্যবসা হইতেই লক্ষ্মীগঞ্জ নামের উৎপত্তি। এ অঞ্চলের মধ্যে ভদ্রেশ্বরে তামাক পাট ও বুট ভিন্ন সর্ব্ববিধ দ্রব্যাদির জন্য এখনও এত বড় বাজার আর নাই। পাইকারগণ নিকটবর্ত্তী কল বাজার ও পল্লীগ্রামের হাটে বিক্রয়ার্থ এখান হইতে প্রত্যহ অনেক শাক সব্জি তরিতরকারি প্রভৃতি লইয়া যায়। প্রতি বৃহস্পতিবার কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে মনোহারী দ্রব্য, চুড়ি ও অন্যান্য বহু প্রকার সামগ্রী বিক্রয়ার্থ বহু পরিমাণে আসিয়া থাকে এবং অনেক টাকার দ্রব্যাদি বিক্রীত হইয়া থাকে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই বাজারে প্রতি বৃহস্পতিবারে বিস্তর টাকার কাচের চুড়ি বিক্রীত হইত।

এখানে সাবিনাড়ার বাজার নামে দুইশত বৎসর পূর্ব্বে একটি বাজার ছিল বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। (২৫) আজকাল হাটখোলা নামক পল্লীতে যে বাজার আছে, জানি না উহাই পূর্ব্বে সাবিনাড়ার বাজার বলিয়া খ্যাত ছিল কি না। এখানে বাগবাজার নামক একটি পল্লী আছে, বহু পূর্ব্বে এই স্থানেও একটি বাজার ছিল বলিয়া শুনা যায় এবং পল্লীর নাম হইতেও তাহা মনে হয়। শুনিয়াছি অষ্টেণ্ড কোম্পানির এক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী বাঁকাশ্যাম পাল নামক এক ব্যক্তি এই বাজার বসাইয়াছিলেন, তাঁহার নাম হইতেই বাগবাজার নাম হয়। (২৬) অষ্টেণ্ড কোম্পানির কর্ম্মস্থান ছিল ভাগীরথীর পরপারে বাঁকিবাজার নামক স্থানে। এই নামের সহিত উক্ত বাঁকাশ্যাম পালের নামের যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। জানি না ইহা নামোৎপত্তির সহিত পাল মহাশয়ের নামের কোন সম্বন্ধ আছে কি না।

ঘোষপাড়ায় সতীমার দীক্ষা। অক্ষয় তৃতীয়ার মেলার জন্য মাটির প্রস্তুত।

পূর্ব্বে বড়বাজারে একটি স্থানীয় প্রস্তুত কাপড়ের হাট বসিত এবং তথায় বিবিধ প্রকার বস্ত্র প্রচুর পরিমাণে বিক্রীত হইত এবং উহা জাহাজে করিয়া বিদেশে প্রেরিত

(২৫) যুদ্ধের সময়ে ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর চন্দননগর ইজারা লওয়া সংক্রান্ত চন্দননগর রেকর্ডের অপ্রকাশিত দলিল।

(২৬) ইহার সত্যাসত্য ঠিক মত অবগত নহি। শ্রীযুক্ত বি... নাথ পাল মহাশয়ের নিকট হইতে শুনিয়াছি।

হইত। (২৭) বিবির হাট এবং খলিসানী নামক স্থানে আর দুইটি বাজার ছিল। প্রথমোক্তটিও যে বহু পুরাতন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। (২৮) বিশ বৎসর পূর্ব্বেও ইহার সামান্য অস্তিত্ব ছিল। লালবাগানে টিনবাজার নামক পল্লীতেও একটি ছোট বাজার ছিল। এক্ষণে লক্ষ্মীগঞ্জ ও হাটখোলা ভিন্ন বারাসতেও একটি ছোট বাজার আছে।

পূর্ব্বে বড় বড় চাউল ব্যবসায়ী এখানে অনেক ছিলেন। তন্মধ্যে গুরুচরণ সাহার আড়তের নাম এখানে সমধিক এক ব্যক্তির এখানে খুব বড় ধান চাউলের কাজ ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর নরসিংহ ভকত নামক এক ব্যক্তি ঐ আড়ত খরিদ করেন। এই সময় গুরুচরণ বাবু পূর্ব্বোক্ত আড়ত ছাড়িয়া তাঁহার ব্যাপারী রূপে চাউল আমদানী করিতে থাকেন। নরসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার মাতুল রামগোপাল ও পরে মাতুল-পুত্র শশিভূষণ চৌধুরী এই আড়ত চালাইয়াছিলেন। পরিশেষে গুরুবাবু ইহা খরিদ করেন এবং প্রায় ৩০ বৎসর কাল খুব জোরের সহিত কাজ করিয়াছিলেন।

রামপ্রসাদ সেন ও নবাব সিরাজউদ্দৌলা। অক্ষয় তৃতীয়ার মেলার জন্য মাটির প্রস্তুত।
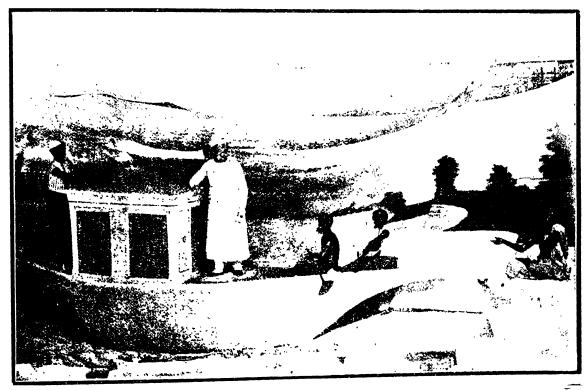
প্রসিদ্ধ। গুরুচরণ বাবু যশোহরের বীরকুচ্ছগ্রাম হইতে আসিয়া প্রথমে তদানীন্তন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী বিশ্বম্ভর নায়েক মহাশয়ের আড়তে ব্যাপারী রূপে কিছু কিছু চাউলের কার্য্য আরম্ভ করেন। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে মার্কণ্ড চন্দ্র নামক

এই সময় এখানে পূর্ব্ব বঙ্গের এবং নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ফরিদপুর, বগুড়া প্রভৃতি স্থানের বহু ব্যাপারী বিস্তর চাউল বিক্রয়ার্থ আনিতেন। দিনাজপুরের মুগি (২৯) চাউল যথেষ্ট পরিমাণে আমদানী হইত। শুনা যায় সে সময় লক্ষ্মীগঞ্জের ঘাটে ছোট বড় ৭০।৮০ খানি নৌকা সর্ব্বদ

(২৭) শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয়ের নিকট হইতে জানিতে পারি।

(২৮) পণ্ডিচারী দপ্তরের অপ্রকাশিত ১৭৬৩-৭৯ খৃষ্টাব্দের মানচিত্রে বিবিরহাটের উল্লেখ পাওয়া যায়।

(২৯) বাঁড়ো সমেত পূর্ব্ব দেশের আমদানী চাউলকে মুগি চাউল বলিত।

বাঁধা থাকিত। কেবল মাত্র গুরুবাবুর গুদামেই প্রায় লক্ষ মণ চাউল মজুত থাকিত। (৩০) ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও এখানে পুরুবি চাউলের আমদানা যথেষ্ট ছিল দেখিয়াছি।

এখানকার পুরাতন বড় চাউল-ব্যবসায়ীদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ রথ-প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য যাদু ঘোষ, রামচাঁদ কুণ্ডু, কানাই সরকারের ঘাট-প্রতিষ্ঠাতা রাম কানাই সরকার, মার্কণ্ডচন্দ্র, জানকীনাথ মুখোপাধ্যায়, ভগবান পাল, বিশ্বম্ভর নায়েক, গদাধর মণ্ডল প্রভৃতির নাম শুনা যায়। কেহ কেহ বলেন, বৈদ্যবাটীর নিমাই তীর্থের ও চন্দননগরের কাশী কুণ্ডুর ঘাট-প্রতিষ্ঠাতা সুপ্রসিদ্ধ কাশীনাথ কুণ্ডু মহাশয়েরও বড় চাউলের কায ছিল।
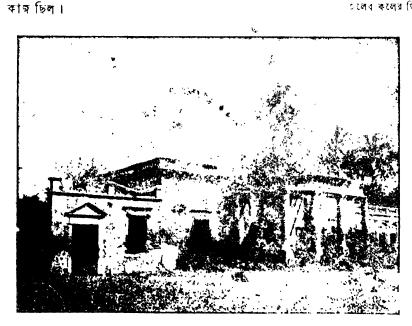
চাউলের দর সম্বন্ধে যতদূর জানা যায়, শত বৎসর পূর্ব্বে এখানে এক মণের দাম প্রায় এক টাকা ছিল। (৩১) ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ২৲ হিসাবে মণ ছিল; দুর্ভিক্ষ হওয়ায় দর এক টাকা বৃদ্ধি পায়। (৩২) এখানকার প্রচলিত ওজন ৮২৸৵০ আনায় এক সের।

তেলের কলের ভিতরের দৃশ্য।

পূর্ব্বে অনুরূপ ওজন প্রচলিত ছিল কি না জানি না।

এখানে এক সময় গুড় হইতে দেশীয় প্রথায় দোলো চিনির কাজও খুব ছিল। হাটখোলার ধাড়াদের চিনির কারবার বড় ছিল। চকনিবাসী রাম কুণ্ডুর চিনির কাজও উল্লেখ-যোগ্য। এখন এ কাজ আর নাই। ডাচেদের বাটেভিয়ার উৎপন্ন বা বিলাতি চিনির আমদানী হইতেই এ ব্যবসা ক্রমে দেশ হইতে লোপ পাইতে থাকে।

গালাবাড়ি—এই স্থানে পূর্ব্বে বড় গালার কারখানা ছিল।

ঘানির তৈলের কাজ এখানে কম নহে। পূর্ব্বে কলুপুকুর অঞ্চলে বিস্তর কলুর বাস ছিল। তাঁহারা সকলেই তাঁহাদের জাতি-ব্যবসা

(৩০) ব্যবসা বিষয়ক বিবিধ গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার শেঠ মহাশয়ের নিকট হইতে গুরুবাবুর বিষয় জানিতে পারি।

(৩১) [illegible]

(৩২) Commite de Bienfaisanceএর পুরাতন কাগজ পত্রে দেখা যায়।

করিতেন। এখানে সর্ব্ব প্রথমে রেড়ির তৈলের কল স্থাপন করিয়াছিলেন জয়গোপাল নন্দী ও পূর্ণচন্দ্র পাল। গঞ্জে নিচেপটীতে তাঁহাদের কল ছিল। (৩৩)

দ্বিতীয় সেণ্ট লুই গির্জ্জা।—এই স্থানে পরে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রাপ্ত অহিফেন ও লবণ রাখা হইত।

এক সময়ে এই স্থান যেমন একটি বাণিজ্য-প্রধান নগর হইয়া উঠিয়াছিল, সেইরূপ শিল্প-গৌরবেও ইহা বঙ্গে বহু স্থান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এই প্রাধান্য এখানে অনেক দিন ধরিয়া বিদ্যমান ছিল এবং তুলনায় এখনও কলিকাতার পর বহু স্থান অপেক্ষা শিল্প-প্রধান বলিয়া ইহার খ্যাতি আছে। এ স্থানের পূর্ব্বেকার যে সব শিল্পের পরিচয় এখনও পাওয়া যায়, তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত শিল্পগুলি ভিন্ন দড়ি, চট, বস্ত্র, চুরুট, গালা, কাষ্ঠের কাজ, মৃৎ-শিল্প, কাগজ, চিকন, রাম্ মদ, দেশী মদ, নৌকা প্রস্তুত, মাদুর বোনা, সূতা রং করা, শঙ্খের কাজ উল্লেখযোগ্য। এখানকার বস্ত্র-শিল্পের কথা ছাড়িয়া দিলেও, দড়ি, চট ও গালার কাজ এখানে যথেষ্ট ছিল।

চন্দননগর হইতে বালি পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে পাট ও শনের দড়ির কারখানা এখনও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। (৩৪) পূর্ব্বে চন্দননগরেই এই কাজ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। কলিকাতার অধিকাংশ মাল এই স্থান হইতেই সরবরাহ হইত। এখানে অনেক বড় বড় দড়ির কারখানা ছিল। তাহার চিহ্ন স্বরূপ রু করদেরি নামে এখনও একটি রাস্তা রহিয়াছে। হাজিনগর নামক পল্লীর এক বাগান বাটীতে লুই বোনো (Louis Bonnaud) নামক এক সাহেবের বড় দড়ির কারখানা ছিল। উহা পরে ভস্মীভূত হইয়া যায়। (৩৫) চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বীরচাঁদ বড়াল ও হরচন্দ্র দত্তের একটি যৌথ দড়ির কারবার ছিল। এই কারখানা হইতে করাচিতে দড়ি প্রেরিত হইত। তৎ-পূর্ব্বে গঙ্গমোহন দাসের এই কাজও উল্লেখযোগ্য। এখনও

শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ দাসের দ্বারা নির্ম্মিত ডাক্তারি যন্ত্রাদি।
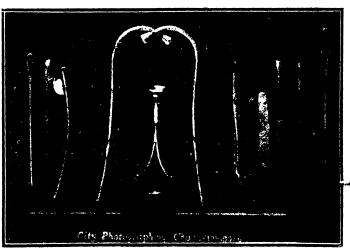
সুখসনাতনতলা নামক পল্লীতে অনেক পরিমাণে শনের

(৩৩) শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সাধু মহাশয়ের নিকট হইতে জানিতে পারি।

(৩৪) The District Gagetteers—Hughly গ্রন্থেও উহা উল্লেখ আছে।

(৩৫) Good Old days of Honourable John Company.

দড়ি প্রস্তুত হইয়া কলিকাতায় চালান হইয়া থাকে। (৩৬)

প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে চুঁচুড়ায় এক ওলন্দাজ কোম্পানীর একটি বড় চুরুটের কারখানার উল্লেখ পাওয়া গেলেও (৩৭) এই স্থানের চুরুটই সুবিখ্যাত 'চিনসুরা সিগার' নামে পৃথিবীর নানা স্থানে বিক্রীত হইত। উদ্-

শ্রীযুত অনুকূলচন্দ্র সরকারের [illegible] ([illegible])

বাজারে ইহার কাজ অধিক ছিল। (৩৮) নন্দনগরের ভূতপূর্ব্ব মার মসিয়ে টার্ডিভ্যাল Tardivel) সাহেবের পূর্ব্বপুরুষদের একটি, রূপচাঁদদের একটি এবং বাঁকা পালের একটি বড় চুরুটের কারখানা ছিল। এই কাজ এক্ষণে একেবারে লোপ পাইয়াছে। প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বেও ইহা এখানকার একটি বিশেষ শিল্প ছিল। এই কাজের জন্য যন্ত্রাদির বিশেষ প্রয়োজন হইত না এবং অতি অল্প মূলধনে ব্যবসা করা চলিত বলিয়া উহা তখনকার একটি গৃহ-শিল্পের মধ্যে পরিগণিত ছিল এবং দরিদ্রদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষে ঘরে-ঘরে চুরুট প্রস্তুত করিত। বোধ হয় পাঁচ ছয় শত লোক এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল। (৩৯)

এখানে পূর্ব্বে আরও অনেক প্রকার ছোট ছোট উটজ শিল্প প্রচলিত ছিল এবং তাহা প্রধানতঃ স্ত্রীলোকদের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। এই সকলের মধ্যে শাঁখার উপর ফুল কাটা, প্রতিমা সাজের জন্য কাঠের মালার উপর জরি জড়ান, রুলি তৈয়ারি করা, ছেলেদের খেলিবার পুতুল তৈয়ারি, ঘুনসি তৈয়ারি, সূতা কাটা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। জলুইকাটা তৈয়ারি, সূতা রং করা প্রভৃতিও এখানে খুব বেশি হইত। এই সকলের মধ্যে কিছু কিছু জলুইকাটা ও রুলি প্রস্তুত ভিন্ন আর সব লোপ পাইয়াছে। শাঁখার ফুলকাটা ভিন্ন এখানে শাঁখা প্রস্তুতের কাজও ছিল এবং উহার রীতি-মত ব্যবসা ছিল। প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে এখানে শাঁখার কাজ ছিল তাহা জানিতে পারা যায়। (৪০) এখনও এখানে সামান্য ভাবে এই কাজ হইয়া থাকে।

এখানে যে সব গালার কারখানা ছিল, তাহার কাঁচা মাল বাহির হইতে আসিয়া, এখানে উহা ব্যবসার উপযোগী হইয়া রপ্তানী হইত। বর্ত্তমান সরকারি হাসপাতালের

(৩৬) বস্ত্র ও চট সম্বন্ধে উল্লিখিত "চন্দননগরের বয়ন শিল্প" প্রবন্ধে সবিশেষ লিখিত হওয়ায়, এ স্থলে এ বিষয়ে কিছু লেখা হইল না।

(৩৭) Bengal District Gazetteers—Hughly.

(৩৮) সঙ্গীতজ্ঞ স্বর্গীয় বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্ত-লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়।

(৩৯) চন্দননগরের শিল্প :—স্বরাজ ১ম বর্ষ ১০ সংখ্যা।

(৪০) চন্দননগর ইংরাজ সংক্রান্ত দুপ্লে ও ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর স্বাক্ষরিত দলিল।

ভরা-ভাদর মাস

শিল্পী—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেনগুপ্ত

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

পশ্চিমে, যে স্থানে এক্ষণে শ্রীযুক্ত রূপলাল নন্দী মহাশয় একটি বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ঠিক ঐ স্থানে গালাবাড়ি নামে একটি বড় গালার কারখানার ভগ্নাবশেষ নূতন বাটি নির্ম্মাণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পরিদৃষ্ট হইত। এখনও গালা রাখিবার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জালাগুলি ঐ স্থানে পড়িয়া আছে। শুনা যায়, পালপাড়ার দে মহাশয়েরা উহার স্বত্বাধিকারী ছিলেন। গঙ্গানারায়ণ ভড় নামে এক ব্যক্তির গালার কারখানা ছিল বলিয়া শুনা যায়।

৭০।৭৫ বৎসর পূর্ব্বেও মাডাঙ্গা অঞ্চলে অনেক কাগজীর বাস ছিল, তাহারা দেশী কাগজ প্রস্তুত করিত। তাহারা যে স্থানে থাকিত তাহাকে কাগজী পাড়া বলিত। (৪১) নন্দলাল পাল নামক একজন দেশী কাগজের বড় ব্যবসাদার ছিলেন। এখানে অনেক মাদুরের কাজ ছিল। কপালিরা এই কাজ করিত। মুসলমানপাড়ায় বহুসংখ্যক মুসলমানের বাস ছিল, তাহাদের মধ্যে এক সম্প্রদায় চিকনের কাজ করিত। বিদেশীয় বণিকগণ তাহার গ্রাহক ছিলেন। (৪২)

জন পিপ্ দ্বারা লিখিত নীল সম্বন্ধে একখানি পুস্তকে পাওয়া যায়, যে নীল এক সময় বাঙ্গলার নিজস্ব সম্পদ ছিল। প্রথম ইয়োরোপীয় যিনি এদেশে সেই নীলের চাষ ও কারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন, তিনি চন্দননগরবাসী ছিলেন। তাঁহার নাম লুইবোনো (Louis Bonnaud); ইনি ফ্রান্সের মার্শেইএর অধিবাসী। প্রথম ওয়েষ্ট্ ইণ্ডিজ এবং তৎপরে বুরবঁ দ্বীপে কিছু কাল থাকার পর, ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথম এখানে আগমন করেন এবং এই স্থানেই বাস করেন। ১৭৭৯-৮০ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নীলের কাজ প্রথম আরম্ভ হয়। বোনো সাহেবের এই ব্যবসার সূত্রপাতও এই সময়। তিনি প্রথম তালডাঙ্গায়, পরে তাঁহার হাজিনগরের বাগানে নীলের কাজ করেন। শেষোক্ত বাগানেই তাঁহার একটি চট্ ক্যাম্বিশ দড়ির কারখানা ছিল। উহা ভস্মীভূত হইয়া যাইবার পর, তিনি মালদহে এক ধনী ইংরাজের সহিত একত্র মিলিত হইয়া বৃহদায়তনের নীলের কাজ আরম্ভ করেন এবং তদ্দ্বারা বহু অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। (৪৩)

কোন সময় গোন্দলপাড়ায় আর একটি নীলকুঠি ছিল। (৪৪) চন্দননগরের দুমন্ত্ (Dumont) নামক এক সাহেব তাঁহার উৎপন্ন নীল ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে বিলাত চালান করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহা প্রতি পাউণ্ড ১১ শিলিং দরে বিক্রয় হইয়াছিল। (৪৫)
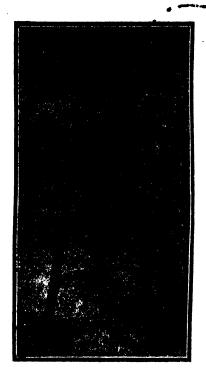
শিল্পী—৺হরিগোপাল দাস দ্বারা নির্ম্মিত।

চন্দননগরের আশে পাশে ন-পাড়া, খুসিগঞ্জ প্রভৃতি স্থানেও নীলের কাজ ছিল। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ্চ খুসিগঞ্জে ব্লুম (Blume) নামক এক সাহেবের নীলের কারখানা নীলামে বিক্রয় হইয়াছিল জানা যায়। (৪৬)

---

(৪১) বঙ্গভূমি সাহিত্য মন্দিরের তৃতীয় বাৎসরিক অধিবেশনে পঠিত "চন্দননগরে মুসলমান উপনিবেশ" প্রবন্ধ।

(৪২) বঙ্গভূমি সাহিত্য মন্দিরের তৃতীয় বাৎসরিক অধিবেশনে পঠিত "চন্দননগরে মুসলমান উপনিবেশ" প্রবন্ধ।

(৪৩) Carey's Good old days of Honourable John Company.

(৪৪) চন্দননগরের সার্ভে ম্যাপ ১৮৭০—৭১

(৪৫) Selections from Calcutta Gazette 1789—97.

(৪৬) Selections from Calcutta Gazette 1795-1805.

দেশী মদের জন্ত চন্দননগরের একটু নাম আছে তাহা অনেকেই জানেন। পূর্ব্ব কালের এক পর্য্যটকের (P. de Montalembert) বর্ণনা হইতে জানা যায়, এখানে

বর্ত্তমান সময়ের প্রস্তুত রাইটিং টেবিল ও চেয়ার। ফরিপাড় শাড়ি ও টেবিল ক্লথ্ যাহা সম্মুখে রহিয়াছে উহা বটকৃষ্ণ ঘোষমহাশয়ের কলে প্রস্তুত।

মদ সে সময় মহার্ঘ ছিল না এবং লোকে সর্ব্বদা ব্যবহার করিত না। (৪৭) প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে যখন দেশীয় প্রস্তুত রম্ নামক মদ্য এদেশ হইতে ইয়োরোপে এবং অষ্ট্রেলিয়ায় রপ্তানী হইত, সেই সময় এখানে রম্ মদ্য চোলাইয়ের কারখানা ছিল। (৪৮) ফ্রেসেঞ্জেস (Fressenges) নামক এক সাহেব এখানে একটি চোলাই-খানার স্বত্বাধিকারী ছিলেন। (৪৯)

এখানে দেশী মদ ক্রমেই প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। উহা গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা তাহাদের চোলাইখানায় প্রস্তুত হইয়া প্রায় ছয় টাকা প্রতি গ্যালন হিসাবে ডিউটি লইয়া ইজারদারকে দেওয়া হয়। প্রতি বৎসর উহার ডাক হয়। এই বৎসর চোলাই-খানা ১৩৯০০৲ এবং মদের দোকান (মোট ২৪ খানি) ১১১৬০৮৲ টাকায় ডাক হইয়া বিলি হইয়াছে। মদের ডিউটি ও এই ডাকের টাকা গভর্ণমেণ্টের এখানকার সর্ব্ব-প্রধান আয়। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে মদের উপর ডিউটি স্থাপিত হয়। উহার পূর্ব্বে ইজারদার নিজ ইচ্ছা মত আপন আপন চোলাইখানায় মদ্য প্রস্তুত করিয়া লইতেন। বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের আইনে এখানকার মদ্য সহরের বাহিরে লইয়া যাওয়া নিষিদ্ধ। এই কারণ বাহির হইতে মদ্যপায়িগণ দলে দলে এখানে আসিয়া থাকে।

এখানে যে কয়েকটি চোলাই-খানা আছে তন্মধ্যে এখানকার ভূতপূর্ব্ব ম্যার ডাক্তার দীননাথ চন্দ্র মহাশয় প্রতিষ্ঠিত কারখানাটি অপর কারণে উল্লেখযোগ্য। বিলাতি টিঞ্চার প্রভৃতি ঔষধাদি প্রস্তুতের কারখানা হিসাবেই ইহার প্রতিষ্ঠা হয়। তখন লণ্ডন মেডিক্যাল এজেন্সি নাম দিয়া এখানকার উৎপন্ন ঔষধ

চন্দননগরে গঙ্গাতীরের একটি দৃশ্য।

সকল কলিকাতা ও মফঃস্বলের অনেক স্থানে বিক্রীত হইত। দীনবাবুর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রদ্বয় কিছু দিন ইহা চালাইয়াছিলেন। তৎপরে ফ্র্যাঙ্কো-ইণ্ডিয়ান মিস্‌লেনি নামেও তাঁহারা কিছু দিন সামান্য ভাবে ঔষধের কাজ চালাইয়াছিলেন। এখন

(৪৭) a brief history of the Hughly District.

(৪৮) Bengal District Gazetteers—Hughly.

(৪৯) a Sketch of the administration of Hughly District.

উক্ত চোলাইখানায় কেবল মদ্যই প্রস্তুত হইয়া থাকে।

দীন বাবুর এই ঔষধের কারখানা প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব কম নহে। আজকাল বাঙ্গলায় কতিপয় ঔষধের কারখানা হইয়াছে, কিন্তু যখন বেঙ্গল কেমিক্যাল্ ওয়ার্কস, ইণ্ডিয়ান ড্রাগস্, টেক্নো-কেমিক্যাল্ ওয়ার্কস প্রভৃতি খ্যাতনামা ঔষধের কারখানাগুলির কথা বড় কেহ জানিতেন না, তখন তিনি নিজ বুদ্ধিবলে এই কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে তাঁহাকে এই কাজের একজন অগ্রণী বলা যাইতে পারে।

অহিফেন, গুলি, চরোস, চণ্ডু প্রভৃতি আবগারির অন্যান্য দ্রব্যও এখানে কিছু বেশি চলে। পূর্ব্বে এখানে আফিমের কাজ অধিক ছিল, এমন কি আফিম এখানকার একটি প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ছিল, ইহারও উল্লেখ পাওয়া যায়। (৫০) এখানে আফিংয়ের চাষ হইত—ইহার স্বপক্ষে আর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ব্যবস্থা দ্বারা এখানে অহিফেন প্রস্তুত নিষিদ্ধ হয়, এইরূপ উল্লেখ পাওয়ায়, (৫১) এখানে উহা উৎপন্ন হইত বলিয়াই মনে হয়। আবার ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে পাটনার নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর নিকট হইতে ফরাসিদের প্রাপ্ত পরওয়ানায়, পাটনা হইতে বাঙ্গলায় অহিফেন আনিবার অনুমতি দৃষ্টে বুঝা যায়, তথা হইতেই উহা আসিত। (৫২) যাহা হউক যে সময় হইতে অহিফেন প্রস্তুত বন্ধ হয়, তখন হইতে প্রতি সেরে (দুই পাউণ্ড) ২৪৲ টাকা হিসাবে ডিউটি নির্দ্ধারিত হয়। তৎপরে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদের নিকট হইতে শেষবার চন্দননগর ফরাসীদের হস্তে আসার সময়ের চুক্তি অনুসারে ফরাসী গভর্ণমেণ্ট বাৎসরিক মোট ৩০০ বাক্স অহিফেন ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কলিকাতার মাসিক বিক্রীর গড়পড়তা দরে পাইয়া আসিতেছিলেন। (৫৩) এই ব্যবস্থারও পরে পরিবর্ত্তন হইয়া ইংরাজি ১৮৮৪ সালের ১লা জানুয়ারি হইতে বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ফরাসী গভর্ণমেণ্টকে বাৎসরিক তিন সহস্র টাকা দেওয়া স্থির হয়। (৫৬) আর অবৈধ আমদানী রপ্তানী দমনার্থ আরও দুই সহস্র টাকা বাৎসরিক দিবার ব্যবস্থা হয়। (৫৫) এক্ষণে ঐ টাকার পরিমাণ মোট ৮০০০৲ টাকা হইয়াছে। মদ্যের ন্যায় আফিংয়েরও প্রতি বৎসর ডাক হইয়া থাকে এবং যে ব্যক্তি ইজারা লয়, সেই এখানে একমাত্র উহা বিক্রয় করিবার অধিকারী। ইজারদার বৎসরে বার মণ আফিং কিনিতে পান। এই বৎসর আফিংএর ডাক হইয়াছিল ৩৬০১০৲ টাকা।

অহিফেনের ন্যায় পূর্ব্বে লবণও কেহ এখানে প্রস্তুত করিতে পারিবেন না এই সর্ত্তে উহা বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পাওয়া যাইত। বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রাপ্ত অহিফেন ও লবণ যে প্রকাণ্ড গুদামে রক্ষিত হইত, তাহা ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিল। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের চুক্তি অনুসারে ঐ বৎসরের ১লা আগষ্ট হইতে লবণের পরিবর্ত্তে বৎসরে ২০০০০৲ টাকা দিবার ব্যবস্থা হয়।

(৫০) Gazetteer of the World.

(৫১) The administration of the East India Company.

(৫২) ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দের আলিবর্দ্দী খাঁর পরওয়ানা।—পণ্ডিচারীর অপ্রকাশিত রেকর্ড।

(৫৩) The administration of the East India Company.

(৫৪) Treaties Engagements and Sanads.

(৫৫) Imperial Gazetteer.

অভিশপ্ত

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

নন্দলালের পিতা হরলাল মিত্র সদ্বংশে জন্মগ্রহণ ক'রে, বিপুল সম্পদের অধিকারী হলেও, স্বেচ্ছাচারিতার দুর্দ্দমনীয় নেশায় মৃত্যুকালে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন কেবল লোক-নিন্দার তীব্র জ্বালা। অর্থের সদ্ব্যবহার ক'রে যাঁর পূর্ব্ব-পুরুষগণ বংশ-গৌরবের অক্ষয় কীর্ত্তি-স্তম্ভ স্থাপন করে গিয়েছিলেন, তিনি—অপব্যয়ের কঠোর অত্যাচারে সেই কীর্ত্তি পথের ধূলায় লুটিয়ে দিতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ জীবনে কোন দিনই করেন নি।

পিতৃ-অপবাদে ব্যথিত পুত্র নন্দলাল—পিতার মৃত্যুর পর, বংশের সম্মান পুনঃ প্রতিষ্ঠা করবার সঙ্কল্প ক'রে সংসারের পথে পা দিল; —ভাগ্য-বিধাতা অলক্ষ্যে বসে হাসলেন! দু দিন গেল না—পিতৃব্য ধেয়ে এলেন সম্পত্তির দাবী করে। মামলা মকর্দ্দমার করাল নিষ্পেষণ হতে আত্ম-রক্ষা করতে না করতেই—যাকে সহযাত্রী ক'রে সে বড় আশায় বুক বেঁধে সংসারের কণ্টকময় পথে পা বাড়িয়ে-ছিল, সেই প্রিয়তমা পত্নী—সামান্য অভিমানের প্রতিশোধ নিতে এক দিন আত্মহত্যা করে', নন্দলালের সকল দৃঢ়তা, —সকল সঙ্কল্প এমনই ওলট-পালট ক'রে দিয়ে গেল, যে, মাতার সান্ত্বনা, পরিজনের অনুরোধ, পূর্ব্বপুরুষদের আশীর্ব্বাদ সে তীব্র বেদনার উপশম করতে সমর্থ হল না। জীবনের অতি প্রত্যুষেই ভাগ্য-বিধাতার নির্ম্মম হস্তে তার যে আশা-আকাঙ্ক্ষার অট্টালিকা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল, সেই ধ্বংসের স্তূপে দাঁড়িয়ে মনকে দৃঢ় করা নন্দলালের পক্ষে অসম্ভব হ'ল। সংসারের ওপর, স্ত্রী-চরিত্রের ওপর তার এমনই একটা বিতৃষ্ণা জন্মাল যে, হৃদয়ের সেই জ্বালাময়ী বিষদাহ নির্ব্বাপিত করতে—সুরার গরলধারা গলায় ঢেলে সে বিষে বিষক্ষয় করতে প্রয়াস পেল! ধীরে ধীরে দিনের পর দিন সেই বিষ তাকে গ্রাস করে বসল। পিতার যে অপবাদ মোচন করবার প্রতিজ্ঞা করে' সে সংসারে প্রবেশ করেছিল, উত্তরাধিকার-সূত্রে সেই অপবাদের ক্ষতই তার সর্ব্বাঙ্গ ছেয়ে ফেলল। ইতর-ভদ্র, ছোট-বড় সকলের কাছে যে নন্দলাল অতি প্রিয় ছিল, সে অল্প দিনের মধ্যেই মানুষের ঘৃণ্য, সংসারের উপেক্ষিত—রাস্তার মাতালে পরিণত হল।

বর্ষার নিবিড় মেঘে সেদিন আকাশ আচ্ছন্ন। মদের আড্ডা থেকে বেরিয়ে নন্দলাল যখন রাস্তার ওপর এসে দাঁড়াল, তখন রাত অনেকখানি হয়েছিল! পথিক-বিরল রাজপথে কেবল ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধের মত—জলে-ভেজা গ্যাস-পোষ্টগুলা তখনও দাঁড়িয়ে কোন রকমে কর্ত্তব্য সম্পাদন করছিল। সঙ্গীহীন নন্দলাল স্খলিত পদে বাড়ীর দিকে ছুটে চলল। পিছিল পথ পদে পদে তাকে লাঞ্ছিত করছিল, কিন্তু তার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। বাড়ীতে তাকে যেতেই হবে। মা হয়ত তখনও তার খাবারগুলি আগলে বসে আছেন; বাড়ী না ফিরলে দুরন্ত পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় হয়ত সারা রাত্রি ঘুমুতে পারবেন না। পৃথিবীর মধ্যে নন্দলালের ঐ একজন মাত্র আপনার জন ছিল—মা! যিনি তার প্রত্যেক নিশ্বাসটি পর্য্যন্ত আপনার বুকে অনুভব করতেন।

টল্‌তে টল্‌তে দু' তিনটে রাস্তা পার হয়ে নন্দলাল বড় রাস্তায় পা দিয়েই দেখলে—সুমুখে দু' তিনজন পুলিস। সে অবস্থায় তাদের সম্মুখীন হলে অদৃষ্টে যে সারারাত্রি হাজতবাস সুনিশ্চিত এবং সেই সঙ্গে যে সারারাত্রি মাকে তার দুশ্চিন্তার আগুনে পুড়তে হবে, সেটুকু বোঝবার মত জ্ঞান তখনও নন্দলালের ছিল। পুলিশের চোখ এড়াতে সে তাড়াতাড়ি পাশের একটা সরু গলির ভেতর ঢুকে পড়ল। অন্ধকারে আত্মগোপন করতে নন্দলাল গলির ভেতরের দিকে খানিকটা এগিয়ে যেতেই—পাশের একটা বাড়ীর দরজা থেকে কে একজন বলল—"আসুন না মশাই"—

কণ্ঠস্বর রমণীর! আকস্মিক ডাকে চমকে উঠে নন্দলাল পাশের দিকে তাকাতেই দেখল,—একজন হতভাগিনী তাকেই আহ্বান করছে। রমণীর দিকে দু'পা এগিয়ে গিয়ে নন্দলাল জামার পকেটে হাত দিয়ে একটু চিন্তা করল। তার পর গা-ঢাকা দেবার উৎকৃষ্ট উপায়

বিবেচনা করে, বাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়ে বলল—"চল, তোমার ঘরে।"

রমণী আগে আগে পথ দেখিয়ে তাকে নীচেকার একটা ঘরের সুমুখে নিয়ে এসে, তালা খুলে ভেতরে প্রবেশ করতে বলল। ছোট ঘর, এক পাশে একখানা তক্তাপোষের ওপর শয্যা; অপর পার্শ্বে ব্যবহার্য্য জিনিসপত্র। দেওয়ালের গায়ে একটা দেয়ালগিরি, মিটমিট করে জ্বলছিল। রমণী সেটাকে বাড়িয়ে দিয়ে নন্দলালকে শয্যার ওপর উঠে বসতে বলল। শয্যার ওপর বসে নন্দলাল ঘরের চারদিকে তাকিয়ে বলে উঠ্‌ল—"বাপ্‌রে! ঘরখানা যে একেবারে ঠাকুরঘর করে তুলেছ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর হতে আরম্ভ করে তেত্রিশ কোটী দেবতার কেউ বাদ নেই দেখছি—মায় মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু পর্য্যন্ত!

নন্দলালের কথায় রমণীর পাণ্ডুর মুখ রাঙা হয়ে উঠ্‌ল। সে স্থির-কণ্ঠে বলল—"কেন বাবু, আমাদের কি ঠাকুর-দেবতা থাকতে নেই?"

"না না—তা বলছি না। তবে সাধারণতঃ মেয়ে-মানুষদের ঘরে এ সব ছবি দেখা যায় না কি না—তাই বলছিলাম।"

"সব মেয়েমানুষ কি সমান হয় বাবু- সবাই কি আর সখ করে এ পথে পা বাড়ায়"—

রমণীর কথায় নন্দলালের বড়ই কৌতূহল হল। সে বেশ একটু ব্যঙ্গ-স্বরে বলল—"তুমি কি তা হলে দায়ে পড়ে ভেক্‌ নিয়েছ?"

নন্দলালের মুখের ওপর রমণী তার নিষ্প্রভ চোখ দুটো রেখে ধীরে ধীরে বলল——"থাক্‌ বাবু, ওসব কথায় কাজ নেই। আপনি বড় মাতাল হয়ে পড়েছেন—শুয়ে পড়ুন, আমি আপনার মাথায় বাতাস করি।"

রমণীর কথার উত্তরে নন্দলাল উত্তেজিত স্বরে বলল—"না, আমায় বলতেই হবে—কেন তুমি এ পথে দাঁড়িয়েছ। না বললে আমি কিছুতেই ছাড়ব না।" নন্দলাল বিছানার ওপর উঠে বসে রমণীর হাত চেপে ধরল।

করুণ কণ্ঠে রমণী বলল—"পুরাতনকে নেড়ে কোন ফল নেই বাবু"—কথাটা বলতে বলতেই রমণীর স্বর গাঢ় হয়ে এসেছিল, সে নীচের দিকে চেয়ে আত্ম-সম্বরণ করে নিল।

রমণীর দিকে খানিকক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে, নন্দলাল জামার পকেট থেকে একটা মদের শিশি বার করে খানিকটা গলায় ঢেলে বলল,—"বেশ—বলতে যদি তোমার আপত্তি থাকে—তবে থাক্‌—বলে কাজ নেই"—

"বলতে আপত্তি কিছুই নেই,—তবে শুনে কোন লাভ নেই। আজ দশ বছর কত লোকের কাছেই না বললাম, কিন্তু—এতটুকু সহানুভূতিও কারুর কাছে পাই নি—তাই—বলতে"—রমণীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে নন্দলাল বলে উঠল—"এখনিই না বলছিলে—সব মেয়েমানুষ—সমান নয়! সব পুরুষই কি সমান?" বলতে বলতে নন্দলালের মুখ কঠিন হয়ে উঠল, সে আরও কি একটা রূঢ় কথা বলতে যাচ্ছিল—কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলল—"তা হলে থাক্‌—বলে কাজ নেই।" কথা কটা বলেই সে বিছানা থেকে লাফিয়ে নীচেয় নেমে, পকেট থেকে দুটো টাকা ঝনাৎ করে মেঝের ওপর ফেলে দিয়ে—পুনরায় বলল—"তাহলে চল্লাম—আবার আর একদিন আসব"—

নন্দলালের ব্যবহারে রমণী এতক্ষণ স্তম্ভিতা হয়ে বসে ছিল।—টাকার আওয়াজে চমক ভেঙ্গে সে দেখল, নন্দলাল টল্‌তে টল্‌তে দরজার কাছে গিয়ে পৌচেছে। সে ছুটে গিয়ে নন্দলালের হাত দুটো চেপে ধরে ব্যথিত স্বরে বলল—"না—না—আপনি রাগ করে যাবেন না—আমি বলছি—আপনি দুঃখ করবেন না। আমি বড় হতভাগিনী তাই"—রমণী আর আপনাকে সামলে রাখতে পারল না, তার দুই চোখ দিয়ে দর দর করে জল পড়তে লাগল।

বিস্মিত নন্দলালের আর পা উঠ্‌ল না—ফিরে এসে সে পুনরায় বিছানার ওপর বসে পড়ল।

রমণী ঘরের দরজা বন্ধ করে এসে, শয্যার এক পার্শ্বে বসে বলতে লাগল,—

"আমাদের বাড়ী ছিল প্রয়াগে। ঘটনা-চক্রে কলকাতায় এসে কলকাতাবাসী হয়ে পড়েছি। আমার মা ছিলেন প্রয়াগের এক পাণ্ডার মেয়ে। অল্প বয়সে বিধবা হওয়ায় তিনি বাপের বাড়ীতেই বাস করতেন। কলকাতার এক ধনী বাঙ্গালী-বাবু প্রয়াগে বেড়াতে গিয়ে মা'দেরই একখানা বাড়ী ভাড়া নিয়েছিলেন। সেই বাড়ীখানি ছিল—মা যে বাড়ীতে থাকতেন, ঠিক তারই সুমুখে। পশ্চিমের

মেয়েরা বাঙ্গালীর মেয়েদের মত অত পর্দ্দানশিন নয়। কাজেই বাবুটির সঙ্গে মায়ের রোজই দেখা-সাক্ষাৎ হত। বাবুটি অর্থবলে ধনী হলেও—চরিত্র-বলে বড়ই দরিদ্র ছিলেন। মায়ের ওপর তাঁর নজর পড়ল,—মায়ের রূপ-যৌবন তাঁকে আত্মহারা করে দিল। তিনি মাকে তাঁর ব্যভিচারের ফাঁদে ফেলবার নানা চেষ্টা করতে লাগলেন। টাকার অসাধ্য পৃথিবীতে কিছুই নেই; টাকার ভেল্কিতে বাবুটি মায়ের পিতার চোখ এমনই ধাঁধিয়ে দিলেন, যে, অতবড় শয়তানকে তিনি পরমাত্মীয়ের মতন অন্দরে পর্য্যন্ত প্রবেশাধিকার দিলেন।

হিংস্র জন্তু কৃতজ্ঞতার ধার ধারে না। মায়ের পিতার অতখানি বিশ্বাসের প্রতিদানে বাবুটি তাঁর বড় আদরের একমাত্র কন্যাটিকে আলেয়ার মিথ্যা আলোয় পথ ভুলিয়ে সর্ব্বনাশের পথে টেনে নিয়ে গেলেন। ব্যর্থজীবন নারী যখন আশা আকাঙ্ক্ষার ভরা জোয়ারে ভেসে চলে, তখন ধূর্ত্ত শঠ পুরুষ যে তাকে ভুলিয়ে ঘূর্ণাবর্ত্তে ফেলবে, তার আর আশ্চর্য্য কি! হতভাগিনী মা আমার কপট পুরুষের ছলনায় সর্ব্বস্ব হারিয়ে ফেলল! বিপথের কাঁটার আঘাতে যখন তাঁর জ্ঞান হল, তখন পেছনের আলো নিভে গিয়ে সেখানেও ঘোর অন্ধকারের সৃষ্টি করে ফেলেছিল,—হতভাগিনী আমি--বিশ্বের আর কোথাও ঠাঁই না পেয়ে মায়ের গর্ভে এসে আশ্রয় নিয়েছিলাম। অঙ্কুরেই পাপ বিনষ্ট করতে বাবুটি পরামর্শ দিলেন। কিন্তু—মায়ের আমার প্রাণ ভরে উঠেছিল; শিশুর মধুমাখা হাসিটুকু কল্পনা করে' মাতৃ-হৃদয়ের অফুরন্ত স্নেহের ফল্গু তাঁর হৃদয়ের কন্দরে কন্দরে ছুটে চলেছিল। তাই মা বাবুটির কথা মত কাজ করতে অস্বীকার করলেন। বাবুটি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অনেক যুক্তি-তর্কেও মাকে বোঝাতে না পেরে' কলঙ্ক প্রকাশের আগেই বাবুটি একদিন গা-ঢাকা দিলেন—মাকে আমার অকূল পাথারে ভাসিয়ে দিয়ে। মায়ের সর্ব্বনাশের কথা বাড়ীর লোকের জানতে দেরী হল না। বাড়ীশুদ্ধ সকলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। অনেক চিন্তার পর জাতি-কুল রক্ষা করতে, গত্যন্তর না দেখে, মায়ের পিতাও বাবুটির মত নৃশংস প্রস্তাব করলেন। মা কারুর কথাই কাণে তুললেন না। বাপের কথা অমান্য করায় মায়ের ওপর নানা প্রকার নির্য্যাতন আরম্ভ হল। তবু—তবু—এই হতভাগিনীর মায়ায়—এই তুচ্ছ সন্তানের মায়ায়—মা আমার সব কষ্ট মুখ বুজে সহ্য করতেন। কিন্তু—অবশেষে সে অত্যাচার অসহ্য হয়ে উঠ্‌ল। হতভাগিনী শেষে অদৃষ্টের ওপর নির্ভর করে, নির্য্যাতনের হাত হতে আপনাকে মুক্ত করতে, এক বাল্য-বন্ধুর হাত ধরে অত সাধের---অত আপনার গৃহ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। মায়ের বন্ধু তাঁর দুঃখের কাহিনী শুনে মাকে রক্ষা করতে সম্মত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু সেই উপকারের ঋণ শোধ করতে হয়েছিল মাকে আত্ম-বিক্রয় করে। স্বার্থপর সংসারে বিচারের আশা না দেখে, দিশেহারা মা আমার সেই বাল্য-বন্ধুকেই কাণ্ডারী করে' জীবনতরী ভাসিয়ে দিয়েছিলেন—বিশ্বের অকূল পাথারে! জন্মাবধি আমি মায়ের সেই বাল্যবন্ধুকেই পিতা বলে জানতাম!

সুখ দুঃখের মধ্যে দিয়ে আমাদের দিন একরকম কেটে যাচ্ছিল। আমাদের অভিভাবক রেলে চাকরী করতেন, মাইনে খুব বেশী না হ'লেও মোটা পাওনা ছিল। আমাদের অবস্থা বেশ সচ্ছলই ছিল। কিন্তু বিধাতার মনে তাও সইল না। বিধাতারই বা দোষ কি—অদৃষ্টের ফল ফলবেই। আমার বয়স তখন দশ বছর, হঠাৎ এক দিন আমাদের একমাত্র অভিভাবকটি জ্বর নিয়ে কর্ম্মস্থল হতে বাড়ী ফিরে এলেন। চিকিৎসা-যত্নের ত্রুটী ছিল না; কিন্তু সব ব্যর্থ হয়ে গেল। তিন দিনের জ্বরে তিনি আমাদের নিকট হতে চিরদিনের মত বিদায় নিলেন। তাঁর মৃত্যুতে মা খুবই মুসড়ে পড়লেন, তবে সময়ে সব সহ্য হয়—আমাদেরও সয়ে গেল। মায়ের হাতে কিছু টাকা ছিল, গহনাপত্রও মন্দ ছিল না,—তাই নেড়ে-চেড়ে মা আমাদের দুজনার অন্ন সংস্থান করতেন। আমি স্কুলে পড়তাম। মায়ের ইচ্ছা ছিল—লেখা পড়া শিখে যাতে আমি আমার আপন জীবিকার পন্থা খুঁজে নিতে পারি। আমি পড়তাম, খেলা করে বেড়াতাম, বেশ নিশ্চিন্ত মনে মায়ের বুকে মাথা রেখে দিন কাটিয়ে দিতাম। সংসারের কোন কথা জানতামও না—ধারও ধারতাম না। দেখতে দেখতে দু'তিন বছর কেটে গেল,—বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমার রূপ-যৌবনের তীব্রতা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। অনেক বড়লোক আমাকে পাবার জন্য মাকে প্রলোভন দেখাতে লাগল, অনেক লোক আত্মীয়তা করতে এল; কিন্তু মা কোন

প্রলোভনেই ভুললেন না। একটা ভুলের ধাক্কা সামলাতে যাকে সারা জীবন ব্যর্থতার পাষাণে আছড়ে মরতে হচ্ছে, সে কি মানুষের কথায় আর ভোলে!

মানুষের বিষ-নজর থেকে আমাকে রক্ষা করতে, মা স্কুল থেকে আমার নাম কাটিয়ে দিলেন। বাড়ীতে বসেই লেখা পড়া করতাম, আর মাকে সাংসারিক কাজ-কর্ম্মে সাহায্য করতাম। কিন্তু মার কপাল চিরে বিধাতা-পুরুষ শুধু দুঃখের আঁচড়ই টেনে রেখেছেন,—তাঁর সুখ কোথায়! মানুষের চোখ এড়িয়ে ঘরের কোণে বসে থাকলে ত' আর ভাগ্য-বিধাতার চোখ এড়ান যায় না! সহরের মধ্যে এত লোক থাকতে বেছে বেছে মাকেই আমার কাল বসন্ত রোগ এসে আক্রমণ করল। মাকে বাঁচিয়ে তুলতে জীবন মরণ পণ করে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করলাম; কিন্তু মায়ের আমার দুনিয়ার মেয়াদ ফুরিয়েছিল—কিছুতেই ধরে রাখতে পারলাম না।—যে একটু আলোর শিখা আমার ভবিষ্যৎ জীবনের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তাও চিরদিনের মত নিভে গেল!

মরবার আগে রোগ-শয্যায় শুয়ে শুয়ে মা আমাকে তাঁর জীবনের সকল ইতিহাস বলে গিয়েছিলেন। আমার জন্মদাতার পরিচয় আমি সেই সময় পাই। জন্মদাতা পিতাকে চক্ষে কোন দিন দেখিনি।—একখানা ছবি ছিল, মা এত দিন ইচ্ছা করেই আমাকে সেখানা দেখতে দেন নি। মরবার পূর্ব্বে সেই ছবিখানা আমায় দিয়ে বলে গিয়েছিলেন—আমার পিতা কলকাতার বিখ্যাত ধনী, তাঁর দ্বারস্থ হয়ে তাঁকে সকল কথা বলতে পারলে—পিতা তিনি—নিশ্চয় আমার একটা পথ দেখিয়ে দেবেন।

পিতার ছবিখানা বুকে ধরে মায়ের আশীর্ব্বাদ মাথায় করে কতদিন চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিলাম। সহায়-হীনা একলা মেয়ে মানুষ—রূপ যৌবন নিয়ে কি করে কলকাতায় গিয়ে পিতার সন্ধান করব! ভেবে অস্থির হয়ে পড়লাম। আমাদের বাসার ঠিক সামনে এক পণ্ডিত বাস করতেন। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ—ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ না করে জল গ্রহণ করতেন না।—তাঁর পায়ে আছড়ে পড়ে সব কথা বললাম। আমার দুঃখে সহানুভূতি দেখিয়ে তিনি আমাকে অভয় দিলেন।—অকূল পাথারে কূল পেয়ে বড়ই আনন্দিত হলাম। নিজের সব শোক দুঃখ ভুলে, তাঁর কথামত যা-কিছু ছিল সব বেচে কিনে, তাঁর সঙ্গে কলকাতায় এলাম—পিতার সন্ধান করতে। কি সে আশা—কি সে উৎসাহ!

কলকাতায় এসে আমরা একটা হোটেলে আশ্রয় নিলাম। সেই হোটেলে থেকে পাঁচ-সাত দিন পণ্ডিত মহাশয়—সারা কলকাতা সহরে পিতার খোঁজ করে বেড়ালেন; কিন্তু কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। আমাকে বোঝালেন—এত বড় সহরে শুধু নাম আর একখানা ছবি নিয়ে মানুষকে খুঁজে বের করা তাঁর মত একজন বিদেশীর পক্ষে সহজসাধ্য নয়! যা বোঝালেন তাই বুঝলাম। হোটেলে বেশী দিন বাস করায় নানা অসুবিধা হতে লাগল। তাঁর পরামর্শ মত একটা বাড়ীর দুটো ঘর ভাড়া নিয়ে সেইখানে গিয়ে বাস করতে লাগলাম। বড় আশায় বুক বেঁধে ছিলাম,—কিন্তু এক এক দিন করে বছর কেটে গেল—সুদিন আর এল না। অদৃষ্টের চক্র আরও একপাক ঘুরে গেল। ক্রমে ক্রমে পিতার আশায় হতাশ হয়ে পড়লাম।

বলতে লজ্জায় জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে ওঠে, হৃদপিণ্ডের গতি স্তব্ধ হয়ে যায়—সেই ব্রাহ্মণ নামধারী ভণ্ড, চণ্ডাল দিনের পর দিন এই সুদীর্ঘ সময় মাকড়সার মত তার কুটিলতার জালে আমাকে জড়িয়ে ফেলছিল—আমি বুঝতে পারি নি! শোকে, দুঃখে, ভবিষ্যৎ চিন্তায় আমার বোঝবার ক্ষমতাও তখন ছিল না। তার কূট কথায় বিশ্বাস করে' তার সেই পৈশাচিক বেষ্টনার মধ্যে আত্ম-সমর্পণ করলাম। আমাকে আর্য্য-সমাজের মতে বিবাহ করবার প্রলোভন দেখিয়ে ধীরে ধীরে সে আমাকে পাপের পঙ্কিল আবর্ত্তে নিক্ষেপ করল। তখন আর আমার উপায় ছিল না;—সংসার-জ্ঞানশূন্যা একাকিনী বালিকা আমি—সাধুর আবরণে ঢাকা শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধে তখন আমি সর্ব্বস্বহারা!

এক এক করে অর্থ, অলঙ্কার সব লোপ পেতে লাগল—তবু পিতার সন্ধান পেলাম না। শয়তান যে আমাকে এত দিন মাত্র স্তোকবাক্যে ভুলিয়ে রেখেছিল—সেটা সেই দিন বুঝতে পারলাম, যে দিন সে বিবাহ করা দূরের কথা—তস্করের মত আমার সর্ব্বস্ব অপহরণ করে, আমাকে হিংস্র সংসারের করাল গ্রাসে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেল! উঃ—কি ভয়ঙ্কর সেই দিন! হাতে একটি পয়সা নেই—সহায়

সম্পদ কিছুই নেই—একা আমি! ভবিষ্যতের ঘোর অন্ধকারে আমি দিশেহারা। কি সে ভয়ঙ্কর দিন; দু' তিন মাসের ভাড়া পাওনা ছিল, বাড়ীওয়ালা দূর দূর করে রাস্তায় বের করে দিল। যা জীবনে কোন দিন করি নাই—লোকের কাছে ভিক্ষার জন্য হাত পাতলাম। দোরে দোরে দাসীবৃত্তি করে ফিরলাম। মাতার শেষ অনুরোধ—সৎ-ভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করতে প্রাণপণ করলাম; কিন্তু সব ব্যর্থ হয়ে গেল! দুর্ব্বলকে রক্ষা করতে—অসহায়কে আশ্রয় দিতে কেউ মাথা ঘামায় না,—আর্ত্তের আর্ত্তনাদ- অরণ্যে রোদন! সংসারের কূটচক্র হতে আপনাকে রক্ষা করতে পারলাম না। দুরদৃষ্টের ঘাত প্রতিঘাতে আজ এইখানে এসে পৌছিচি—এর পর কোথায় যাব—ভাগ্য-বিধাতাই জানেন।"——অশ্রুজলে রমণীর কণ্ঠ-রোধ হয়ে গেল। রমণী চুপ করতেই—নন্দলাল বিছানার ওপর সোজা হয়ে বসে উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল,—"তোমার বাপের সেই ছবিখানা এখনও কি তোমার কাছে আছে?—আমাকে একবার দেখাতে পার?—আমি একবার চেষ্টা করে দেখি সেই পাষণ্ডকে।—"

"দেখ্‌বেন?—সত্যি দেখ্‌বেন? আর এমনভাবে জীবন কাটাতে পারি না—আর এমন করে"—রমণীর মুখ দিয়ে আর একটা কথাও বেরুল না। সে কম্পিত হস্তে নন্দলালের হাত দুখানা চেপে ধরে নীরবে অশ্রুপাত করতে লাগল।

উত্তেজিত নন্দলাল রমণীর কথার উত্তরে উচ্চৈঃস্বরে বলল "নিশ্চয় দেখব! দেখাও দিকি ছবিখানা—আর বল—কি তার নাম!"

অতি আগ্রহে রমণী ট্রাঙ্কের ভেতর থেকে কাপড়ে জড়ান একখানা ফটো বার করে এনে নন্দলালের হাতে দিল। বহুদিনের পুরাতন ছবি, কালের ছোপ ধরে প্রায় অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আলোর কাছে ছবিখানা ধরে' নন্দলাল ছবিখানার দিকে তাকিয়ে চম্‌কে উঠ্‌ল। তার মনে হল, সারা পৃথিবী যেন তার পায়ের তলায় দুলে উঠেছে—কি এক দারুণ সঙ্কোচে তার সমস্ত রক্তস্রোত যেন হৃদ্‌পিণ্ডের দ্বারে এসে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়াল!—এ কার ছবি রমণী লজ্জার আবরণে জড়িয়ে তার হাতে তুলে দিল! ঘৃণিত-মস্তক নন্দলাল আর্ত্ত, জড়িত-কণ্ঠে—রমণীকে জিজ্ঞাসা করল —"এ কে?—কি এঁর নাম?"—

"মায়ের কাছে শুনেছিলাম—হরলাল মিত্র।"

"উঃ!"—একটা বজ্রবেদনার আঘাতে নন্দলালের সর্ব্ব-শরীর কেঁপে উঠ্‌ল—একটা বুক-ফাটা আর্ত্তনাদ তার হৃদয়কে চৌচির করে বেরিয়ে এল! উঃ!—ভগবান! এমনি করেই কি পিতার অকীর্ত্তির বোঝা পুত্রের মাথায় চাপিয়ে দিতে হয়!

নন্দলালের আকস্মিক পরিবর্ত্তনে বিস্মিতা রমণী জিজ্ঞাসা করল—"আপনি কি এঁকে চেনেন ——উনি কে?"

কে? কে?—অট্টহাস্যে ঘরের চারদিক থেকে প্রতি-ধ্বনি উঠ্‌ল—কে? কে?—

আশুতোষ

শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী

আশুর ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যয় ভার বাড়িয়া গেল। সেই হইতেই আশু প্রকাশ্যে ও গোপনে গরীব ছাত্রগণকে সাহায্য করিতে লাগিল। সমস্ত সংসারই তাহার উপর। যত্র আয় তত্র ব্যয়। তখন হইত ক্রমে ক্রমে ভ্রাতৃগণ বিলাত যাইতে লাগিল। পিতৃদেব ইন্‌কাম ট্যাক্সে ভাগলপুরে অনেক গরীবকে ছাড়িয়ে দেওয়ায় সরকার বাহাদুর নাকি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হওয়াতে ৮০০৲ শত টাকার গ্রেডে ৫০০৲ শত টাকা বেতন। নামে Senior হইয়াও ঐ junior-এর বেতনের টাকার বেশী পান নাই।

সেই হিসাবে পেন্সন ২৫০৲ টাকা মঞ্জুর হইয়া যায়। শ্রীমান যোগেশ তখন ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলেজ হইতে ছুটী লইয়া বিলাত গমন করে ও অক্সফোর্ডে ভর্ত্তি হয়। প্রমথ সেই সময়েই বিলাতে ব্যারিষ্টারী পড়িতে গিয়াছিল। আশুর পরিশ্রমের একশেষ ও চারিদিকে ভাবনা; এবং নানা প্রকারে উদ্বেগের কারণ থাকিত। দুর্ভাগ্যবশতঃ

পরে সেই সময় পিতৃদেব পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত হইয়া শয্যাগত হইয়া পড়িলেন। চিকিৎসা সেবা কোন্ দিকেই কোনরূপ ত্রুটী হয় নাই।

আশু হাইকোর্টের পর গৃহে প্রত্যাগত হইয়া পিতৃদেবের নিকটেই বসিয়া প্রত্যহ তাঁহার পদসেবা করিত। বধূমাতা প্রতিভাদেবী শ্বশুরদেবের সেবা শুশ্রূষায় নিয়ত ব্যাপৃত থাকিতেন। পিতৃদেব বধূমাতাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। বধূমাতার সুশীল নম্র ব্যবহারে তাঁহার মনে আনন্দ হইত। তিনি শ্বশুরকে প্রতিদিন সায়াহ্নে ব্রহ্মসঙ্গীত শুনাইতেন ও সর্ব্বদাই কাছে কাছেই থাকিতেন। এমন কঠিন রোগেও পিতৃদেবের মন কিছুমাত্র দমিয়া যায় নাই, প্রফুল্লচিত্তে তিনি সমস্ত ব্যাধির কষ্ট সহ্য করিতেন।

জ্যেষ্ঠতাত ৺রামকৃষ্ণ চৌধুরী মহাশয়ও ঐ পক্ষাঘাত রোগেই এক বৎসর নয় মাস শয্যাগত থাকিয়া লোকান্তরে যান। উভয় ভ্রাতার—পিতৃদেব ও জ্যেঠা মহাশয়ের কিছুমাত্র মৃত্যু-ভয় না থাকায়, তাঁহারা কখনই কোন প্রকারে উদ্বিগ্ন হইতেন না। দেখিতে দেখিতে পিতৃদেবের পীড়া বাড়িয়া যাইতে লাগিল; তিনিও সেই জ্যেঠামহাশয়ের মত এক বৎসর নয় মাসের মধ্যে লোকান্তরে গমন করিলেন। তখন তাঁহার বয়স ৬৪।৬৫ বৎসর। পুরুষের পক্ষে ইহাকে অকাল ও অসময় মনে করা যায়। তিন ভাই বিলাত প্রবাসে,—স্নেহশীল পিতৃবিয়োগে আশু একেবারে কাতর হইয়া পড়িলেও, কাহারও নিকট সান্ত্বনা পাইবার জন্য প্রয়াস করিত না।

আশু আদি-সমাজের দীক্ষিত ব্রাহ্ম হইয়াও মাতৃআজ্ঞায় পিতৃশ্রাদ্ধ হিন্দু ধর্ম্মানুসারে করিয়াছিল। ইহা পিতৃমাতৃ-ভক্ত পুত্রের উপযুক্ত কাজই হইয়াছিল বলিয়া মহর্ষিদেব মনে করেন।

পিতৃদেবের লোকান্তর গমনে আশু অতিশয় শোকাকুল হইয়া ধর্ম্মতলার বাটী পরিত্যাগ করিয়া আবার লোয়ার সারকুলার রোডে একটী বৃহৎ দোতালা-তিনতালা রকমের বাটীতে উঠিয়া যায়। এই অদ্ভুত বাড়ীতে ভৃত্যগণ অনেক ভূত দেখিত—সব সাহেব মেম। শুনিতে পাওয়া যায়, এই বাড়ীতে নাকি লর্ড ক্লাইব পূর্ব্বে বাস করিয়াছিলেন, তাই ভৃত্যেরা বিদেশী ভূত কল্পনা করিত। সে বাটীটী এক্ষণে "সরকারী" ছাপাখানা।

এখন হইতে আশুর ব্যারিষ্টারী ব্যবসা দ্রুতবেগে বাড়িয়া যাইতে লাগিল। তখন আশু মফঃস্বলে যাতায়াত করিত। এই গৃহেই তৃতীয় পুত্র সুদর্শন শিবকুমারের জন্ম হয়। শ্রীমান কুমুদও তাহার পরেই বিলাত যাত্রা করে। ক্রমে চারি ভ্রাতা প্রবাসে চলিয়া যাওয়াতে আশু একা হইয়াই পড়ে।

উদ্‌যোগী পুরুষসিংহ আশুর পরিশ্রমে কোনরূপ বিরাম ছিল না—তাহার উপর সভা সমিতিতে সর্ব্বদাই যোগ দিত। যে যেখানে ডাকিয়াছে, আশু হাস্যমুখে সেখানেই যাইয়া উপস্থিত হইয়াছে। বর্দ্ধমানের প্রাদেশিক সমিতির সভাপতির আসনের শোভা বর্দ্ধন করিয়া অভিভাষণে আশু মুক্ত কণ্ঠে বলিয়াছিল "বিজিত জাতির রাজনীতি নাই" ("A subject race has no politics")। এই মহাবাক্য তাহার মুখ হইতে বাহির হইবামাত্র সভায় একটা অভূতপূর্ব্ব জনকোলাহলের তরঙ্গ বহিয়া যায়,—যুবা, বৃদ্ধ, কলেজ-স্কুলের ছাত্রবর্গের করতালিতে সভা মুখরিত হইয়া উঠে। "ভিক্ষানীতির" বিরুদ্ধে এই প্রথম নির্ভীক প্রতিবাদ। এই বাক্যে বঙ্গদেশের গ্রাম, পল্লী, সহর—চারিদিক দাবাগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। এই আন্দোলনে "ইংলিশম্যান" প্রভৃতি সংবাদপত্র নানা প্রকার অপ্রিয় সমালোচনায় "Vile sedition" বলিয়া আক্রোশ প্রকাশ করিতেও ছাড়িল না। সে সময় স্বদেশী আন্দোলনে মাননীয় সুরেন্দ্রনাথের সহকর্ম্মী ছিল আশু। তিনিও পূর্ণমাত্রায় সকল দিক হইতে আশুর সাহায্য পাইয়াছিলেন।

নানা স্বদেশী কলকারখানার সাহায্য-কল্পে প্রচুর অর্থ দানে আশু কখনও পশ্চাৎপদ হয় নাই। প্রধানতঃ তাহারই উদ্‌যোগে প্রথম স্বদেশী কাপড়ের কল "বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্" প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় ভাবে প্রণোদিত হইয়া আশু "National Council of Education" (জাতীয় শিক্ষা পরিষদ) প্রতিষ্ঠা করে। অর্থ সামর্থ্য দানে প্রাণপণ চেষ্টায় আশু তাহার উন্নতি করিতে লাগিল। তাহার গৃহে যে সব আত্মীয় ছাত্র থাকিয়া তাহারই অর্থ-সাহায্যে বিদ্যাভ্যাস করিত, আশু তাহাদিগের অনেককেই সেখানে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া সাহায্য করে। আজীবন জাতীয় প্রচেষ্টায় আত্ম-নিয়োগ করিয়া কর্ম্মবীর আশুতোষ নিজ হস্তে এই সেদিন যাদবপুরে বিরাট

কর্ম্মশালার ভিত্তি স্থাপন করিয়া মহাসমারোহে মাতৃপূজার আয়োজন করিয়াছিল। আজ সেই মহাযজ্ঞের হোতা কোথায়? ভিত্তি স্থাপনের পূর্ব্ব হইতেই শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু দেশ-মাতৃকার একনিষ্ঠ পুত্র ও সেবক আশুতোষকে স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে কেহ বাধা দিতে পারিলেন না। সেই ভগ্ন শরীরে যাদবপুরে যাইয়া আশু অমিত পরিশ্রমে জাতীয় শিক্ষা পরিষদকে উপযুক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিল। তাহার আশা ছিল, নিজ হস্তে যে বীজ রোপণ করিল, সেই বীজ হইতে কালে প্রকাণ্ড মহারক্ষ উৎপন্ন হইয়া শাখাপ্রশাখা বিস্তারপূর্ব্বক ফল পুষ্পে সমস্ত দেশ সুশোভিত করিবে; এবং আশু তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া সার্থক-মনোরথ হইয়া যাইবে। বঙ্গ জননীর দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার সে আশা ফলবতী হইতে পারিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গ-ভাষা প্রবর্ত্তনের সময় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে চৌধুরী আশুতোষ কায়মনোবাক্যে সাহায্য করে এবং দুই আশু একত্র হইয়া ভাতৃবৎ সখ্যতায় কার্য্য করিয়াছিল।

"Bengal Landholders' Association" তাহার জীবনের অন্যতম কীর্ত্তি! পূর্ব্বে অনেক সময়েই সরকারী কর্ম্মচারী দ্বারা বনিয়াদি জমীদারবর্গ লাঞ্ছিত হইতেন ও আত্মমর্য্যাদা ভুলিয়া গিয়া তোষামোদে উহাদিগের নিকট যুক্ত করে থাকিতেন। তাঁহাদিগের এই দুর্গতি মোচনার্থ আশুতোষ বাঙ্গালার জমীদারবর্গকে আহ্বান করিয়া স্বাধীনচেতা মহারাজা সূর্য্যকান্তের সাহায্যে "Landholders' Association" এর সভ্য করিয়া লইলেন। বৃটিশ ইণ্ডিয়ানে তাঁহার মান রক্ষা হয় নাই। তখন অতি উৎসাহের সহিত এই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে লাগিল। এই সমিতি এমন সুদৃঢ় রূপে গঠিত হয় যে, বড়-ছোট লাট মহোদয়গণ সমিতির কার্য্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে প্রস্তুত ছিলেন। ১৯০৫ সালের আগষ্ট মাসে বঙ্গ-ভঙ্গের আদেশ প্রচারিত হইলে, বঙ্গবাসীগণ ক্ষোভে দুঃখে একেবারে আত্মহারা হইয়া যান। তখন শ্রীযুত (স্যার) আশুতোষ বাঙ্গালার জমীদার-পক্ষ হইতে যে প্রতিবাদ লিখিয়া পাঠান, তাহাতে লর্ড কার্জ্জনের মত Viceroyকেও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, "It was the ablest and strongest produced by the opposition." ১৯০৬ সালে বঙ্গ-ভঙ্গের প্রতিবাদ করিতে টাউন হলে যে মহতী সভা হয়, তাহাতে শ্রীমান যোগেশ অশ্বারোহণে ছাত্রবর্গ ও আশুতোষের বাড়ীর ছোট ছোট বালক ও আত্মীয়-স্বজনগণকে সঙ্গে করিয়া সভায় যোগদান করিতে যায়। মুহূর্ত্ত মধ্যে চতুর্দ্দিকে এই অলীক সমাচার প্রচারিত হইয়া গেল যে, পুলিসে তাহাদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইবে। এই আদেশ সরকার হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

হাইফেন

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

(৮)

বিকালবেলা বিলোপ ত্রিলোককে বলিল—জ্যাঠামশায়, বেড়াতে যাবেন?

মলয় ত্রিলোককে জ্যাঠামশায় বলিতেছে দেখিয়া বিলোপও তাঁহাকে জ্যাঠামশায় বলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ত্রিলোক বলিলেন—তোমার সকালবেলা অসুখ করছিলো............

বিলোপ ত্রিলোককে কথা সমাপ্ত করিতে না দিয়াই হাসিয়া বলিল—সে কিছু নয়—ও নোনাজলের সামান্য একটু উপদ্রব!

বিলোপ অশ্রুজলকেই নোনাজল বলিল, কিন্তু তাহার এই শ্লেষ কেহই বুঝিতে পারিল না। ত্রিলোক কিছুই না বুঝিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিলেন, এবং সেই ভদ্রেই মলয় ও মৃদুলা হাসিল।

ত্রিলোকবাবুর হাসি থামিলে তিনি মলয় ও মৃদুলার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—চলো তবে একটু বেড়িয়ে আসা যাক্।

বিলোপ বলিল—না না, ওঁদের বেড়াতে গিয়ে কাজ নেই, মলয়টা একদম হাঁটতে পারে না, আর মিস্ ভট্টাচার্য্যের শরীরটা কাল থেকে ভালো নেই।

মৃদুলা এই কথাতে লজ্জা পাইয়া মুখ লাল করিয়া তুলিয়া বলিল—অসুখ তো আপনারও করেছিলো।

বিলোপ হাসিমুখে বলিল—আমায় আর আপনাতে ঢের তফাৎ—আমি বজ্রাদপি কঠোর, আর আপনি মৃদুলা কুসুমাদপি।

বিলোপের এই কথারও শ্লেষ কেহ পরিষ্কার বুঝিতে পারিল না, তথাপি ত্রিলোক উচ্চহাস্য করিলেন, মৃদুলা লজ্জিত মুখ নত করিল এবং মলয় কি করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া বোকার মতন হাসিভরা মুখে এক একবার সকলের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল।

ত্রিলোক বলিলেন—তবে চলো বাবা আমরা দুজনেই বেরিয়ে পড়ি।

বিলোপ যবে থেকে ত্রিলোককে জ্যাঠামশায় বলিতে আরম্ভ করিয়াছে তবে থেকে ত্রিলোকও তাহাকে স্বচ্ছন্দে তুমি বলিয়া সম্বোধন করিতে পারিতেছেন।

ত্রিলোক ও বিলোপ বেড়াইতে চলিলেন। মৃদুলা তাহাদের সঙ্গে যাইবার আগ্রহ আর দ্বিতীয়বার প্রকাশ করিল না, এবং মলয় তো একবার ভদ্রতার খাতিরেও যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করে নাই, কারণ সে বুঝিতে পারিয়াছিল বিলোপ ত্রিলোক-বাবুকে লইয়া একান্তে গিয়া তাহাদেরই বিবাহের ঘটকালি করিবে; এবং কিছুক্ষণের জন্য সে মৃদুলার নিকটে একাকী থাকিবার সুযোগ পাইবে এ প্রলোভনটাও অবহেলা করিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না।

বিলোপ বেড়াইতে বেড়াইতে ত্রিলোককে জিজ্ঞাসা করিল—আপনি এখানে আর কতদিন থাক্‌বেন?

ত্রিলোক বলিলেন—যতকাল জগন্নাথ আমাকে রাখ্‌বেন। এখানে থাক্‌লে অনন্ত আকাশ আর অনন্ত সমুদ্রের বিরাট্ মন্দিরে জগন্নাথের দর্শন পাই, তাই এ জায়গা ছেড়ে আর কোথাও যেতে ইচ্ছা করে না; এবারকার জীবনযাত্রাটা এইখানেই শেষ কর্‌বার ইচ্ছা আছে।

বিলোপ বলিল—এখন আপনার গেলে তো চল্‌বে না, আপনার মেয়ের বিয়ে দিয়ে তাঁকে সংসারী না করা পর্য্যন্ত তো আপনার ছুটি মিল্‌বে না।

ত্রিলোক ফাঁকা রকমে হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—আমার সুবিধা-অসুবিধার দিকে তো মৃত্যু লক্ষ্য কর্‌বে না…...

বিলোপ ত্রিলোকের কথা অন্য দিকে চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া তাঁহার কথার মাঝখানেই বলিল—সেইজন্যেই তো ওঁর বিয়ের জোগাড় এখন থেকেই করা উচিত; আপনি যদি অনুমতি করেন তা হলে আমি ঘটকালি করি, আমার সন্ধানে একটি বেশ ভালো পাত্র আছে।

ত্রিলোক বিস্ময়-ও-কৌতূহল-মিশ্রিত দৃষ্টিতে বিলোপের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন—একটি সৎপাত্র আমিও অনেকদিন থেকে মনে মনে ঠিক করে' রেখেছি; সেই বর বা বরকর্ত্তার দিক্ থেকে আমার মেয়েকে বধূরূপে বরণ করে' নেবার আগ্রহের পরিচয় পেলেই আমি আমার মৃদুলাকে তাঁদের হাতে সমর্পণ করে' নিশ্চিন্ত হয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা কর্‌তে পার্‌ব।

বিলোপ বলিল—কিন্তু আপনি আপনার কন্যাকে যথেষ্ট শিক্ষা দিয়ে তাঁর মননশক্তি বিকশিত করে' তুলেছেন, তাঁর নিজের ভালোমন্দ বিচার কর্‌বার মতন বয়স পর্য্যন্ত আপনি তাঁকে অনূঢ়া রেখেছেন; এখন তাঁর নিজের অনুরাগ বিরাগ অনুসারেই তাঁর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করা উচিত।

ত্রিলোক বলিলেন—তা' তো নিশ্চয়ই। আমি যে পাত্রটিকে নির্ব্বাচন ক'রে রেখেছি তার প্রতি মৃদুলারও অনুরাগের পরিচয় আমি মাঝে মাঝে পেয়েছি।

বিলোপ বলিল—একের প্রতি অনুরাগ যে অপরের প্রতি অনুরাগের দ্বারা আচ্ছন্ন এমন কি বিদূরিতও হতে পারে তো।

ত্রিলোক বলিলেন—তা পারে। কিন্তু হিন্দুর মেয়ের সংস্কার এমন প্রবল এবং তাদের সতীত্বের ধারণা এমন বদ্ধমূল যে তারা বাগ্‌দত্ত স্বামীর প্রতি সর্ব্বান্তঃকরণে অনুরক্ত হয়ে থাকে।

বিলোপ বলিল—কিন্তু শিক্ষার ফলে চিত্ত সংস্কার-মুক্ত হয়ে থাকে, এবং আপনার কন্যাকে আপনি যে শিক্ষা দিয়েছেন। আমি জান্‌তে পেরেছি তাঁর চিত্ত বাগ্‌দত্ত পাত্রের দিকে বিমুখ হয়ে অন্য পাত্রে ন্যস্ত হয়েছে। আমি তাঁদের উভয়ের সম্মতিক্রমে ঘটকালি কর্‌বার ভার নিয়েছি।

ত্রিলোক কৌতূহলে উৎসুক হইয়া বিলোপের মুখের দিকে চাহিয়া ব্যগ্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—এই পাত্রটি কে ?

বিলোপ বলিল—মলয়।

ত্রিলোক সন্দেহ-মুক্তির আনন্দে উচ্চ-হাস্য করিয়া বলিলেন—মৃদুলার বাগ্‌দত্ত পাত্রও ঐ মলয়।

ত্রিলোকের এই কথা শুনিয়া বিলোপের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না, সে বলিয়া উঠিল—সে কি রকম ?

ত্রিলোক বলিতে লাগিলেন—মলয়ের বাবা আর আমি ছেলেবেলা থেকে এম্‌-এ পাশ করা পর্য্যন্ত এক সঙ্গে পড়েছিলাম। আমাদের যখন বিবাহ হয় তখন একদিন আদিত্য কথায় কথায় আমাকে বলে—'দেখো ত্রিলোক, আমাদের দুজনের মধ্যে যার ছেলে বড় হবে তাকে অন্যের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে।' আমিও তার এই প্রস্তাবে আনন্দে সম্মতি দিয়েছিলাম। তার পর আমি স্কুলমাষ্টার হয়ে কলম্বো চলে' যাই। অনেকদূরে গিয়ে পড়েছিলাম বলে' দেশে আসার সুযোগ প্রায়ই ঘটতো না। প্রথম প্রথম কিছুদিন আদিত্যের সঙ্গে চিঠিপত্র লেখা-লেখি হতো। আদিত্যের চিঠিতেই খবর পেয়েছিলাম যে সে এটর্নী হয়েছে, তার একটি ছেলে হয়েছে, তার নাম রেখেছে মলয়, আমার মেয়ে হলে সেই মলয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দেবে। কিছুদিন পরে মৃদুলার জন্ম হয়, আর মৃদুলাও মাতৃহীন হয়। সেই থেকে দেশে আর ফিরে আসি নি, সেখানেই মৃদুলাকে অনেক কষ্টে মানুষ করে' তুলেছি, লেখাপড়া শিখিয়েছি। ক্রমশঃ আদিত্যের চিঠি দুর্লভ হতে হতে একেবারে বন্ধ হয়ে গেলো। আমি সম্প্রতি কর্ম্ম থেকে অবসর নিয়ে দেশে ফিরে এসেছি শুধু আদিত্যের ছেলে মলয়ের সন্ধান নেবার জন্যে। মলয় যদি শিক্ষিত সচ্চরিত্র হয় আর এখনো যদি তার বিয়ে না হয়ে থাকে এবং আদিত্যেরও যদি আগ্রহ দেখি তা হলে মলয়ের সঙ্গেই মৃদুলার বিয়ে দেবো, নতুবা অন্য একটি সৎপাত্র সন্ধান কর্‌বো এই ছিলো আমার দেশে ফিরে আসার প্রধান উদ্দেশ্য। এখানে এসে তোমার কল্যাণে মলয়কে অপ্রত্যাশিত রকমে পেয়ে গেলাম। মৃদুলা ছেলেবেলা থেকেই মলয়কেই তার বাগ্‌দত্ত স্বামী বলে' জানে। এখন যদি মলয় মৃদুলাকে পছন্দ করে, আর আদিত্য এদের মিলন অনুমোদন করেন তা হলে আমি মৃদুলাকে উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করে' নিশ্চিন্ত হতে পারি।

ত্রিলোকের মুখ চির-পোষিত আশার সফলতা সম্ভাবনায় আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

ত্রিলোকের কথা শুনিতে শুনিতে বিলোপের মনে হইল—আ হরি! সমস্তই আগে হইতে ঠিক হইয়া আছে, আমার ঘটকালি একেবারে পণ্ডশ্রম, আমি এদের মিলনের মধ্যে একেবারেই অনাবশ্যক! আগে হইতেই সমস্ত ঠিক হইয়া আছে বলিয়া মৃদুলা এতো সহজে মলয়ের প্রতি অনুরাগিনী হইয়াছে এবং মলয়ও মৃদুলার অনুরাগের আকর্ষণে তাহার প্রতি অধিকতর অনুরক্ত হইয়াছে! মলয়ের পক্ষ হইতে মনোভব যে ঘটকালি আরম্ভ করিয়াছিল, মৃদুলার পক্ষ হইতে স্বয়ং প্রজাপতি সেই ঘটকালিকে প্রণয় হইতে একেবারে পরিণয়ে পরিণত করিয়া তুলিবার ভার লইয়াছেন!

বিলোপ ত্রিলোককে বলিল—তা হলে আপনি মলয়ের বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে' বিবাহের প্রস্তাব কর্‌লেই তো শুভকর্ম্ম সত্বর সম্পন্ন হয়ে' যায়।

ত্রিলোক হাসিমুখে বলিলেন—না বাবা, আমার মেয়ে বলে'ই বরপক্ষের অনুগ্রহ প্রার্থনার গরজ আমার নেই। ন রত্নম্ অন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ। অধিকন্তু আমাদের পুত্রকন্যার বিবাহের প্রথম প্রস্তাব করেছিলেন আদিত্য, আমি তাতে সম্মতি দিয়েছিলাম; আমার প্রতিজ্ঞার অংশ আমি পালন করেছি—আমার মেয়েকে আমি যথাসম্ভব শিক্ষা দীক্ষা দিয়ে আজ পর্য্যন্ত তাঁরই পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার প্রতীক্ষায় তাকে অবিবাহিত রেখেছি, এবং যতদিন না তাঁর পুত্রের বিবাহ হচ্ছে ততদিন আমার কন্যার বিবাহের জন্য অন্য পাত্র সন্ধান কর্‌বো না স্থির করে' রেখেছি।

ত্রিলোকের এই কথা শুনিয়া বিলোপ কথঞ্চিৎ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল এই ভাবিয়া যে তবে মলয় ও মৃদুলার মিলন ঘটাইতে তারও কিঞ্চিৎ আবশ্যক আছে; ত্রিলোকবাবুর কাছে ঘটকালি করিতে আসিয়া সে অনাবশ্যক হইয়া গেলেও তাহার আবশ্যকতা একেবারে নিঃশেষ হইয়া ফুরাইয়া যায় নাই, মলয়ের পিতার নিকট প্রজাপতির দৌত্য করিবার জন্য তাহাকে প্রয়োজন হইবে। মলয় ও মৃদুলা সমাসবদ্ধ হইবার জন্য যদি পরস্পরের সন্নিহিত হইয়া

থাকে, সে হাইফেন হইয়া উহাদিগকে যোগযুক্ত করিয়া দিবে; বন্ধুকে সুখী করিতে পারিলেই তাহার জীবন সার্থক হইবে।

বিলোপ তাহার এই সঙ্কল্প ত্রিলোকবাবুর কাছে প্রকাশ করিল না, সে চুপ করিয়া রহিল।

বিলোপকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া ত্রিলোকও ঐ প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া অন্য কথা আরম্ভ করিলেন।

(৯)

ত্রিলোকবাবু আর বিলোপ বেড়াইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিবার পর মলয় বিলোপকে প্রথম একলা পাইয়াই প্রথম কথা জিজ্ঞাসা করিল—তোমার ঘটকালির কি হল?

বিলোপ হাসিমুখে বলিল—লাইন ক্লিয়ার। কেবল পরের ষ্টেশনের ডিস্‌ট্যান্ট্ সিগ্‌ন্যাল্ ডাউন্ কর্‌তে পার্‌লেই তোমাদের দু'জনের গাঁটছড়া বাঁধা স্পেশাল ট্রেণ ডেষ্টিনেশনে পৌঁছে যাবে।

মলয় উৎফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—ডিস্‌ট্যান্ট্ সিগ্‌ন্যালটা কি বা কে?

বিলোপ বলিল—তিনি তোমার বাবা।

মলয় মৃদুলাকে লাভ করিবার আগ্রহে ভুলিয়াই গিয়াছিল যে তাহার নিজের বাড়ীর দিক্ হইতেও এই মিলনের বাধা আসিতে পারে; তাই এই অপ্রত্যাশিত আশঙ্কার কথা বিলোপ স্মরণ করাইয়া দিতেই তাহার মুখ শুখাইয়া উঠিল। কথামালার একচক্ষু হরিণের মতন যেদিক্ হইতে সে বিপদের আশঙ্কা করিয়াছিল সেদিক্ হইতে কোনো বিপদ আসিল না, কিন্তু যেদিক্ হইতে কোনো বিপদের সম্ভাবনার কথাও তাহার মনে উদিত হয় নাই সেই দিক্ হইতেই বিপদের আশঙ্কা তাহাকে বিমনা করিয়া তুলিল। তাই সে ভয় ও আগ্রহের ঝোঁকে বলিয়া ফেলিল—বাবা যদি মৃদুলার সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে আপত্তি করেন সে আপত্তি আমি মান্‌বো না; আমি মৃদুকেই বিয়ে কর্‌বো, তার জন্যে বাবা যদি আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করেন তাতেও আমি ক্ষান্ত হবো না।

মলয়ের প্রণয়াবেগ দেখিয়া বিলোপ ঈষৎ হাসিয়া বলিল—তোমার বাবার আপত্তি হবারও কোনো ভয় নেই। মৃদুলা তোমার বাগ্‌দত্তা পত্নী; তোমাদের জন্মের পূর্ব্বে দুই বন্ধু স্বীকার করিয়াছিলেন তাঁদের পুত্রকন্যা হলে তাদের বিবাহ দেবেন। মৃদুলার পিতা তোমার জন্যেই মৃদুলাকে শিক্ষায় অলঙ্কৃত করে' এত বয়স পর্য্যন্ত অপেক্ষা করছেন। মেয়ে যে ছেলের চেয়ে কোনো অংশে হীন নয় এই ধারণা থেকে মেয়ের পিতা ছেলের পিতার কাছে নিজের কন্যার বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করবেন না স্থির করেছেন। তোমার বাবা মৃদুলাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ কর্‌বার ইচ্ছা প্রকাশ কর্‌বামাত্রই কন্যার পিতা সম্মতি দেবেন। তোমার বাবার সম্মতি নেবার ভার আমার উপরেই রেখে তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো।

বিলোপের কথায় মলয়ের মুখে সন্তোষের ও বিস্ময়ের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল, সে প্রফুল্ল-মুখে বলিল—এ যে একেবারে রীতিমতো নভেল! আমরা দুজনে বাগ্‌দত্ত, অথচ এতদিন আমরা কেউ সেই খবরের বিন্দুবিসর্গও জান্‌তে পারি নি!

বিলোপ বলিল—মৃদুলা জানে। মৃদুলার বাবা কন্যাকে তার ভাবী স্বামীর পরিচয় দিয়ে স্বামীর ভাবটিকে ভালো-বাস্‌তে শিখিয়ে রেখেছেন।

বিলোপের এই কথা শুনিয়া মলয়ের মুখ পুনর্ব্বার ম্লান হইয়া উঠিল এই ভাবিয়া যে এত বড় একটা কথা গোপন করিয়া রাখিবার নয়, তথাপি তাহার পিতা যে কখনও এ কথা ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ করেন নাই তাহার কারণ হয়তো পূর্ব্বের অঙ্গীকার অস্বীকার করিবার ইচ্ছা। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মুখ আবার প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, সে বলিল—তাহলে তো আমারই জিত।......

—আপনার আবার কিসে জিত হলো? এই কথা বলিতে বলিতে মৃদুলা হাসিমুখে সেই ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

মলয় মৃদুলার মুখের দিকে চাহিয়া উৎফুল্ল মুখে উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিল—তুমি আমাকে তোমার বাগদত্ত স্বামী বলে' জেনে' যে ভালোবাসা অদেখা আমাকে দিয়ে রেখেছিলে সেই ভালোবাসাই দেখা আমাকে সমর্পণ করেছো। আর আমি তোমাকে কেবল তুমি বলে' জেনেই ভালোবেসেছি, তোমাকে আমার পত্নীত্বে বরণ কর্‌তে চেয়েছি। এতে আমারই জিত্!

মৃদুলা মলয়ের কথার আরম্ভেই লজ্জা পাইয়া দ্বারের নিকটে থমকিয়া দাঁড়াইয়াছিলো, মলয়ের কথা শেষ হইতেই সে লজ্জারুণ স্মিত-মুখে একবার চকিতে দুই বন্ধুর মুখের দিকে তাকাইয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেলো।

(ক্রমশঃ)

সাইকেলে দার্জ্জিলিং

শ্রীবিমল মুখোপাধ্যায়

এবার বেরুবার সময় আমাদের ভয়ানক লোকাভাব হয়ে পড়েছিল। অন্যান্য বার আমরা ১০।১১ জনের কম বেরুতুম না; কিন্তু এবার গ্রীষ্মের ছুটী পড়ে যাওয়ায়, ক্লাবের মেম্বররা বেশীর ভাগই এখানে ছিল না। এখানে ব'লে রাখা ভাল যে, সাইকেলে দূরে বেড়াতে যাবার জন্যে

পাঁচজন সাইকেল আরোহী (বামদিক হইতে শ্রীমান্ বিমল মুখোপাধ্যায় (কাপ্তেন), শ্রীমান্ বিদ্যুৎকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীমান্ রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমান্ কৃষ্ণকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীমান্ শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

আমাদের একটা ক্লাব আছে—তার নাম হচ্ছে "টুরিষ্টস্ ক্লাব"। কলকাতার দৈনন্দিন বাঁধাধরা জীবনের শুষ্কতাটাকে অন্ততঃ দিন কতকের জন্যে নির্জ্জলা (undiluted) স্বাধীনতা দিয়ে ভিজিয়ে নেবার জন্যে আমরা প্রত্যেক বছরেই একবার ক'রে দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ি।

যখন ঠিক হ'ল যে এবার দার্জিলিং যাওয়া হবে, তখন আমরা তিনজন মাত্র এখানে ছিলুম। অবশ্য লোক কম বলে প্রথমে একটু ইতস্ততঃ কচ্ছিলুম; কিন্তু এই আইডিয়াটা আমাদের নেশার মত পেয়ে বসেছিল; তাই কোন বাধা-বিঘ্ন না মেনে বেরিয়ে পড়াই ঠিক করা হল। দার্জিলিংটাই আমাদের গন্তব্য স্থান ঠিক করেছিলুম; তার কারণ হচ্ছে এই যে, সেখানে যেতে হলে অনেক মাইল পাহাড়ের ওপোর দিয়ে উঠে যেতে হয়—কাজেই সাইকেলে যাওয়া বেজায় শক্ত। তা না হ'লে এই গত বছরেই তো আমরা জন কয়েক মিলে দিল্লী অবধি গেছলুম—কিন্তু সেটা অপেক্ষাকৃত

Plain sailing ; এ রাস্তাটা খুব wild কি না তাই আমাদের খুব appeal করলে।

হাবি, বনা আর আমি তিনজনে—বুধবার, ২৯শে এপ্রিল কলকাতা থেকে ৬॥০ টার সময় দুর্গা নাম করে

তিনপাহাড়ের উপর থেকে দৃশ্য

বেরিয়ে পড়লুম। কোন্ রাস্তা দিয়ে যাব, তা আগেই ঠিক করা হয়েছিল। প্রথমেই হাওড়া ব্রিজের কাছে খানিকটা আটকে যেতে হ'ল ; কারণ তখন পুল খোলা ছিল। কাজেই পাণ্ডুয়া যেতে ১১ টা বেজে গেল। পাণ্ডুয়া হচ্ছে এখান থেকে ৪২ মাইল। সেখানে ঘণ্টা দুই বিশ্রাম না করে আর যাওয়া গেল না। কেন না, সে সময় এত অসহ্য গরম যে, সেই রোদে সাইকেল চালানো ভয়ানক কষ্টকর। সে গরমে অবশ্য আমাদের বাধ্য হয়ে বেরুতে হয়েছিল ; কেন না যখন দার্জ্জিলিংয়ের পাহাড়েই উঠব, তখন তো শীতে জমে যেতে হবে—শীতকালে গেলে। গরম কাপড়ও তো বেশী সঙ্গে নেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই যতক্ষণ অসমতল ভূমিতে ছিলুম, ততক্ষণ গরমে, বিষ্টিতে আমাদের প্রাণ বেরুবার জোগাড় হয়েছিল। যাই হোক, জলযোগ সেরে বর্দ্ধমানে (৭৩ মাইল) ৪॥০ টার সময় পৌঁছে গেলুম। সেখানে শ্রীযুক্ত শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী গিয়ে উৎপাত করেছিলুম।

আমাদের রাস্তা যা ঠিক হয়েছিল, তাতে রামপুরহাট দিয়ে ছাড়া যাবার উপায় নেই। আবার বর্দ্ধমান থেকে রামপুরহাট (৬০ মাইল) কোন রাস্তা নেই।—কাজেই আমাদের ট্রেণের শরণাপন্ন হ'তে হল। সেই দিনই ট্রেণে রামপুরহাট পৌঁছুলুম—রাত তখন ১১টা। সে রাত্তিরটা ষ্টেশনেই কাটান হল।

ওখান থেকে বেরুনোর পর যা রাস্তা পেলুম, তাতে ভদ্রলোকের সাইকেল চালানো এক রকম অসম্ভব। তার ওপোর কি দারুণ রোদ আর হাওয়া। ৫ মিনিট যাবার পর খানিক থেমে জল না খেয়ে যাওয়া অসম্ভব। আবার

হারাধনের তিনটী ছেলে—একটা তোলা ফটো

জলও দুষ্প্রাপ্য—রাস্তার ধারে কোন কুয়ো নেই—লোকের বাড়ীও অনেক দূরে দূরে। Grand Trunk Roadএর মত তো ডাক বাংলো নেই—কাজেই সে দিনটা যে কি করে কেটেছে তা আমরাই জানি। রামপুরহাট থেকে

মোটে ৪০ মাইল দূরে নয়াদুমকা। সেখানে পৌছুতেই আমাদের রাত হয়ে গেল। ওখানে একটা ডাক বাংলা ছিল, তাইতে আশ্রয় নিলুম। সেখানে পৌছে আর কারুর দাঁড়াবার ক্ষমতা ছিল না।

নয়াদুমকা থেকে ৮টায় বেরিয়ে হান্সদিয়া (২৩ মাইল)তে পৌছুলুম ১১ টায়। সেখানে Tea Labourer's Associationএর Mr. Martin আমাদের চা' টা ইত্যাদি যথেষ্ট খাইয়েছিলেন। তার আগের দুদিন রদ্দুরে পুড়ে আমাদের শিক্ষা হয়ে গেছল; কাজেই দিনের বেলায় আর না বেরিয়ে সমস্ত দিনটা সেইখানেই কাটালুম। সন্ধ্যা ৬টার সময় ওখান থেকে বেরিয়ে রাত্তির

কার্শিয়ংয়ের উপর থেকে দৃশ্য
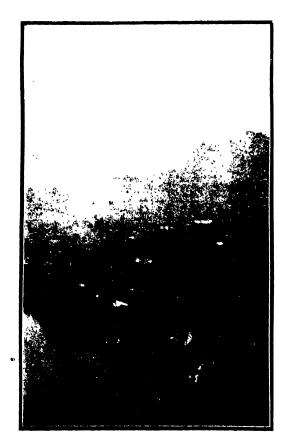
প্রায় ২টার সময় ভাগলপুরে (৬৩ মাইল) পা দিলুম। ওখানের রাস্তাও মোটেই ভাল নয়; কাজেই ২ টার আগে কিছুতেই আসা গেল না। সে রাতটা রাস্তায় ঘুরে ঘুরে কাটাতে হয়েছিল। সকাল বেলা নবীন সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী আমাদের খুব আদর করে তাঁর বাড়ী নিয়ে গেলেন; আর বলা বাহুল্য যে, একটু বাদে আমাদে বেল্টগুলো আল্‌গা করে দেবার দরকার হয়ে পড়েছিল তাঁদের আদর-আপ্যায়ন ছেড়ে আমাদের যেতে মন

অদূরে তিস্তা নদী
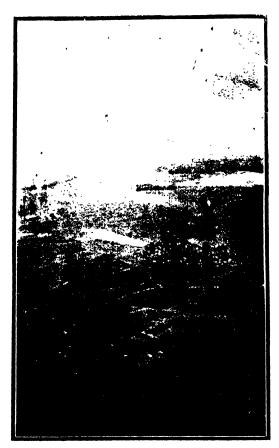
সর্‌ছিল না।—আর সেখানকার দুটী ছেলে—সানু আর রামু আমাদের সঙ্গে যেতে চাইলে—তাদের তৈরী হবার সময় দেবার জন্যে সে দিনটা আমাদের সেখানেই থাকতে হল। আমরা যে এতটা ঘুরে এলুম তার কারণ হচ্ছে, ক্যারাগোলা ঘাট থেকে Ganges Darjeeling Road আরম্ভ হয়েছে। এ রাস্তা ছাড়া দার্জিলিংএ সোজা যাবার কোন সোজা রাস্তা নেই।

তার পর দিন ফেরী ষ্টীমারে বেলা ১টার সময় গঙ্গা পার হয়ে ক্যারাগোলা ঘাটের রাস্তায় পড়লুম। এ রাস্তাটা বেশ ভাল।—তবে এদিকে যেমন আমরা রোদে পুড়েছি, গঙ্গা পার হয়ে আবার তেমনি বিষ্টি আর ঝড়। কোন

রকমে পুর্ণিয়া (৪০ মাইল) পৌঁছে ষ্টেশনে আশ্রয় নিয়ে বাঁচলুম।

পর দিন যখন পুর্ণিয়া থেকে বেরুলুম—আবার সেই বিশ্রী রাস্তা। এই রাস্তাটা মোটে কেউ ব্যবহার করে

নদীতে জল নাই—বালি খুঁড়ে তৃষ্ণা নিবারণ

বলে তো বোধ হল না। রাস্তার মাঝখানে সব গাছ জন্মে গেছে। কোন্ মান্ধাতার আমলে সেখানে পাথর ঢেলে গিয়েছে, কিন্তু বসান হয় নি। ইসলামপুর ডাক বাংলোতে খাওয়া দাওয়া করে সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর কিষেণগঞ্জে (৩) সন্ধ্যার সময় পৌঁছোন গেল। শুধু খারাপ রাস্তা আর বিষ্টির জন্যে আমরা মোটে এগোতেই পাচ্ছিলুম না।

সকালে ওখান থেকে তিতুলিয়া ডাক বাংলো (৬২ মাইল)তে গিয়ে উঠলুম। সে ডাকবাংলোটা ভারী চমৎকার জায়গার ওপোর দাঁড়িয়ে আছে। সামনে দিয়ে মহানন্দা নদী বয়ে যাচ্ছে। ভারী চমৎকার। দেশী নৌকা একখানি যোগাড় করে নদী পার হলুম। তিতুলিয়া থেকে শিলিগুড়ি ১৬ মাইল। এই রাস্তাটুকু সব চাইতে ভাল। সে দিন সব শুদ্ধ ৬৪ মাইল এসেছিলুম।

ষ্টেশনে রাত্তিরটা কাটিয়ে সকালে জামা কাপড় সব বদলে নিলুম। Mr. S. N. Bhattacharjeeর বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া সেরে বেলা ১১ টার সময় শিলিগুড়ি ছাড়লুম। ওখান থেকে সুকনা (৯ মাইল) প্লেন রাস্তা; কাজেই খুব চট্ করে পৌঁছে গেলুম। দূর থেকে সেই উঁচু পাহাড় দেখে সকলেই একটু দমে গেল। মনে হল, এর ওপোর ওঠা বোধ হয় সম্ভব হবে না। তবে খানিকটা ওঠবার পর মনে হতে লাগল যে, হয় তো উঠ্‌তে পারব।

শিলাস্তূপ
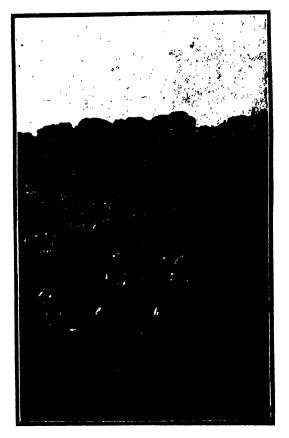
বেশী দূর এক সঙ্গে ওঠা অসম্ভব সেখানে। খানিকটা কোন রকমে তেড়ে উঠে flat হয়ে শুয়ে পড়তে হচ্ছিল। কোন রকমে যখন তিনধারিয়ার (৩০০০ ফিট) কাছাকাছি পৌঁছেছি, এমন সময় কি প্রচণ্ড বিষ্টি! একেবারে ভিজে

বেরাল হয়ে সেখানে ষ্টেশনে উঠলুম। তিনদরিয়ার রেল-কর্ম্মচারীরা আমাদের খুব আদর যত্ন করেছিলেন। সেখানকাঁর বাবু নেপালচন্দ্র চ্যাটার্জির বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া করে রাত কাটান হল।

সাঁওতাল সুন্দরী

তার পর দিন তিনদরিয়া থেকে বেরিয়ে কার্শিয়ং (৪৫০০ ফিট) যেতে আমাদের বিশেষ কষ্ট হয় নি। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যে ট্রেণ যাচ্ছিল, তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে দিতে ১১টার সময় কার্শিয়ং আসা গেল। খানিক বিশ্রাম করে আবার এগুতে আরম্ভ কল্লুম। চারিদিকের পাহাড়ের বিচিত্র সৌন্দর্য্য আমাদের কষ্টকে লাঘব করে দিচ্ছিল। আর আমরা যে এতটা উঠতে পেরেছিলুম, সেই আনন্দে দিব্যি এগিয়ে চলেছিলুম। আশা হচ্ছিল, এই রকমে চল্‌লে সেই রাত্রেই দার্জিলিং পৌঁছে যাব। কিন্তু weather ভারী বিচ্ছিরি হয়ে গেল। ঝড়, বৃষ্টি, কুয়াশা আর শীত এক সঙ্গে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে! কোন ক্রমে সোনাদা ষ্টেশনে (৬৫৫২ ফিট) এসে পড়লুম—রাত তখন প্রায় ৮৷৷০। দার্জিলিং ওখান থেকে মোটে ১০ মাইল—আর তার অর্দ্ধেক প্রয়ে নেবে যেতে হয় ঘুম ষ্টেশন থেকে। কিন্তু কুয়াশায় আর বৃষ্টিতে আমাদের আলো কোন কাজই কচ্ছিল না, কাজেই ভরসা হল না। সে রাত্তিরটা যে কি ভয়ানক কষ্টে কেটেছে, সে আর কি বলব। জামা কাপড় সব তো ভিজে—এদিকে দারুণ শীত। সমস্ত রাত্তির দস্তুর মতন ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে হয়েচে।

তার পরদিন কুয়াশা কেটে যেতে ৭৷৷০টা বাজল। আমরা বেরিয়ে ৯ টার সময় ঘুম ষ্টেশনে (৭৪০২ ফিট) এলুম। সেখান থেকে দার্জিলিংএর রাস্তা বরাবর নেমে গেছে। কাজেই খুব শীগ্‌গির সেখান থেকে বেরিয়ে ১০টার সময় দার্জিলিং পৌঁছে গেলুম। আমরা পাহাড়ে ওঠ্‌বার সময় যে সব ট্রেণ আমাদের পেরিয়ে এসেছিল, সেই সব লোকদের দৌলতে আমাদের আসার খবরটা সেখানে খুব প্রচার হয়ে গেছল; কাজেই আমাদের খুব আদর আপ্যায়নের অভাব হয় নি।

ওখানে মিত্র বোর্ডিংয়ে দিন কতক থেকে আমরা সাইকেলেই শিলিগুড়ি অবধি নেবে গেলুম—মোটে ৪৷৷০ ঘণ্টা লেগেছিল। তার পর কলকাতায় এলুম অবিশ্যি ট্রেণে।

দ্বন্দ্ব

শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

১৬

মিঃ ঘোষ তাঁহার ঘরের সামনের বারাণ্ডায় একা বসিয়া ছিলেন। আসন্ন সন্ধ্যার মৌন অন্ধকার তখন ধীরে ধীরে চারিদিকে তাহার ছায়া বিস্তার করিতেছিল।

মিঃ ঘোষ স্তব্ধ হৃদয়ে ভাবিতেছিলেন, বহু দিন পূর্ব্বের তাঁহার নিজের জীবনের কথা। অতীতের যে সব ছোট-বড় নানা ঘটনার স্মৃতি মনের মধ্যে অস্পষ্ট হইয়া মিলাইয়া আসিয়াছিল, সেদিনের একটি ঘটনায় সে সব কাহিনী আবার উজ্জ্বল হইয়া তাঁহার মানস-পটে জাগিয়া উঠিয়াছে।

পিতার মৃত্যুতে যে দিন তিনি বিস্তীর্ণ জমিদারীর উত্তরাধিকারী হইলেন, তখন তাঁহার বয়স নিতান্তই অল্প। সেদিন তাঁহার চারিদিকে যে সব হীনবুদ্ধি কুটিল অনুচরবর্গ জুটিয়াছিল, তাহাদের প্রভাব এড়াইয়া নিজের মতে চলিবার মত মনের শক্তি তখন তাঁহার ছিল না। সে সময়কার তরল মস্তিষ্কের ফলে সর্ব্বক্ষণ আমোদ প্রমোদে ব্যস্ত থাকায়, সেই সুযোগে তাঁহার কর্ম্মচারিগণ তাঁহার নামে প্রজাদের উপর যথেচ্ছাচার করিয়া তাহাদের শোষণ করিতেছিল। তাহাদের সুব্যবস্থার গুণে প্রজাদের কোন অভাব অভিযোগ তাঁহার গোচরে আসিতে পারিত না, আসিলেও তাহারা তাঁহাকে সমস্ত বিষয় এমন সুকৌশলে বুঝাইয়া দিত যে, তিনি তাহাদের কূট চক্রান্তের বিষয় কিছুতেই ধরিতে পারিতেন না। ফলে অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার অধিকারে সর্ব্বত্র হাহাকার পড়িয়া গেল।

তাঁহার বিষয় প্রাপ্তির প্রায় দুই বৎসর পরে এক দিন তিনি তাঁহার অন্তঃপুর সংলগ্ন উদ্যানে সন্ধ্যার সময়ে একা বাঁধান চত্বরে বসিয়া ছিলেন। সম্মুখে স্বচ্ছসলিলা পুষ্করিণী, ঘাটের চারিধারের তাল ও নারিকেল-শ্রেণীর ছায়া বুকে লইয়া ধীর সমীরণে কাঁপিতেছিল। চত্বরের দুই ধারে দুইটি পুষ্পিত চাঁপার গাছ। চম্পকের তীব্র-মধুর সুবাসে সেখানকার বাতাস ঘন ও মদির-সৌরভময় হইয়া ফিরিতেছিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার যখন গভীর হইয়া আসিয়াছে, সেই সময়ে নিঃশব্দে এক দীর্ঘাকার পুরুষ পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষের শাখান্তরাল হইতে বাহির হইয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

সহসা সম্মুখে এই ব্যাপার দেখিয়া চমকিত ভাবে তিনি একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। অনুচরবর্গ তখনো কেহ আসিয়া জোটে নাই। তিনি বলিলেন--কে তুমি? বাড়ীর ভিতরের বাগানে কি সাহসে প্রবেশ করেছ?

সে ব্যক্তি বলিল, ভয় নেই হুজুর! আমি কোন কুমতলবে এখানে আসিনি। আমি হুজুরের অধীন মণ্ডলগড় পরগণার রামগোবিন্দ দত্ত। দুঃখী প্রজাদের পক্ষ থেকে দুটো কথা নিবেদন করতে এসেছি। অনেক চেষ্টা করেও তো আপনার সঙ্গে নিরালায় দেখা করবার কোন সুবিধে করতে পারিনি, অগত্যা এই উপায় গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হলো।

সেই দিন তাঁহার জীবনের মধ্যে এক বিশেষ স্মরণীয় দিন। তাহার পর হইতে মণ্ডলগড় পরগণা লইয়া কত বিরোধ, মামলা-মোকর্দ্দমা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলিল। সর্ব্বশেষে তাঁহার সেই দুরপনেয় কলঙ্ক,—এক মুহূর্ত্তের মোহের তাঁহার সেই বিষম ভ্রম—যাহা তাঁহার সমস্ত জীবনকে একেবারে বিপর্য্যস্ত, বিধ্বস্ত করিয়া দিল।

মিঃ ঘোষ ভাবিতেছিলেন, পাপের বীজ একবার বপন করিলে তাহার পর শত চেষ্টায়ও আর তাহা নির্ম্মূল করিতে পারা যায় না। সময়ে সে পত্রে-পুষ্পে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিবেই,—তাহা রোধ করা বুঝি মানুষের সাধ্যের অতীত। নতুবা পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে এক দিনের দুর্ব্বলতায় তিনি যে অন্যায় করিয়াছিলেন,—যে সব বিষয় বহু দিন হইল সকলের মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে,—এত দিন পরে আবার তাহা নূতন রূপ ধরিয়া কেমন করিয়া তাঁহারই সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল?

অন্ধকার আকাশে একটি মাত্র তারা ফুটিয়া উঠিয়া তাঁহার মাথার উপর জলজল করিতেছিল।

মিঃ ঘোষ সেই সন্ধ্যা তারার প্রতি স্থির দৃষ্টি রাখিয়া নিজের মনে অস্ফুট স্বরে বলিলেন, ওঃ! ঠিক সেই তারই মত দীর্ঘ সুগঠিত আকার! ঠিক তেমনি ধীর অথচ দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখচ্ছবি! আর তারি মত সেই অগ্নিময় মর্ম্মভেদী দৃষ্টি! সে ঠিক তার বাপেরই অনুরূপ প্রতিকৃতি! আমি মূর্খ—নিতান্ত অন্ধ আমি! তাই তাকে দেখেও কোন সন্দেহ আমার মনে জাগে নি! আমি একেবারে এ সব কথা ভুলে গিয়েছিলুম!

তাঁহার পরিচয় পাইবামাত্র অসিতের নয়নে যে রুদ্রাগ্নির শিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহা স্মরণে আসিবামাত্র মিঃ ঘোষ সহসা শিহরিয়া উঠিলেন।

এখন সেই বহু দিন পূর্ব্বের অনুষ্ঠিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার সময় আসিয়াছে! তিনি যে কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহার ফল ভোগ অনিবার্য্য। কিন্তু হায়! নির্ম্মলা? সে যে তাঁহাকে ছাড়া আর কিছুই জানে না! তাহার উপায় কি হইবে?

সেই সময় অন্ধকার বারান্দায় একটি অস্পষ্ট মনুষ্য-মূর্ত্তি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। মিঃ ঘোষের দৃষ্টি সে দিকে পড়িবামাত্র তিনি সহসা চৌকি ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, এই! কে ওখানে? কে আসছে?" তেওয়ারি! তেওয়ারি! বেহারা—

"বাবা! বাবা! আমি! আমি যে! তুমি হঠাৎ এত ভয় পেলে কেন বাবা? আমি ছাড়া এখানে আর কে আসবে? নির্ম্মলা ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল।

"ওঃ! তুই? মিলু তুই? আঃ! তাই ভাল! অন্ধকারে আমি ঠিক বুঝতে পারি নি—সত্যিই বড় চমকে উঠে ভয় পেয়েছিলুম!" বলিতে বলিতে অত্যন্ত শ্রান্ত ভাবে মিঃ ঘোষ আবার চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার শ্বাস প্রবলবেগে বহিতেছিল।

নির্ম্মলা সংশয় ও বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া, নিঃশব্দে তাঁহার গায়ে হাত বুলাইয়া তাঁহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ইহার পর হইতে ধীরে ধীরে মিঃ ঘোষের জীবনে ঘোর অশান্তি ও উদ্বেগের ছায়া ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। অনেক সময় তিনি নিজের মনে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিতেন; নির্ম্মলা অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে পূর্ব্বের মত সুস্থ ও প্রফুল্ল করিতে পারিত না; ভয়ে ও উদ্বেগে সেও দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছিল। অথচ কি যে এ অশান্তির কারণ, তাহা সে কিছুই জানিতে পারিল না।

শুধু সে লক্ষ্য করিয়াছিল, অতি অল্প কারণে মিঃ ঘোষ আজকাল চমকাইয়া উঠিতেন। সন্ধ্যার পর নিজে সমস্ত দরজা-জানালা পরীক্ষা করিয়া দেখা ও তেওয়ারিকে সাবধান থাকিতে উপদেশ দেওয়া তাঁহার নিত্য কর্ম্মের মধ্যে হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সর্ব্বক্ষণ কিসের যেন একটা আতঙ্কে তিনি আচ্ছন্ন হইয়া থাকিতেন। বাড়ীর অন্য কেহ তাঁহার এরূপ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য না করিলেও, নির্ম্মলার দৃষ্টি হইতে কিছুই এড়ায় নাই। কিন্তু কিসের এ ভয়? কেন এ উদ্বেগ? এত দিন ত এ সব অশান্তির কোন আভাস ছিল না? তিনি কি সর্ব্বক্ষণ কোন অজ্ঞাত শত্রুর ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া থাকেন? এত কাল পরে এমন শত্রু বা তাঁহার কোথা হইতে আসিল? নির্ম্মলা কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ভাবিত, তাঁহার হয়তো মস্তিষ্ক-বিকৃতি রোগ হইয়াছে; কিছু দিন পরে হয়তো তিনি উন্মাদ হইয়া যাইবেন।

সকালে চা ঢালিতে ঢালিতে নির্ম্মলা বলিল, বাবা! আজ আমি তোমার কোন কথা শুনবো না। আজ এখনি তেওয়ারিকে পাঠিয়ে আমি অনিল বাবুকে ডেকে পাঠাব। তোমার শরীর যে কত খারাপ হয়েছে, সে তুমি কিছুই বুঝছো না।

—ডাক্তার আমার কি করবে মিলু? আমার তো শরীরে কোন অসুখ নেই? আমি তো ভালই আছি মা?

—ভাল আর কই আছ? এই ক'দিনে তুমি কি রকম শুকিয়ে গেছ—একবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখ দেখি? খালি সব সময়ে কি ভাবছো, -আর থেকে থেকে চমকে ওঠো,—আর জিজ্ঞেস করলে শুধু বল—আমি তো ভাল আছি! সে দিন রাত্রে ঘুমোতে ঘুমোতে তুমি ঠিক কালকের মত চেঁচিয়ে উঠেছিলে! আমি ঘুম ভেঙ্গে ছুটে গিয়ে দেখি—তুমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কি সব বকছো!

—তাই না কি? কই! আমার তো কিছু মনে

নেই নির্ম্মল? কি বলছিলুম আমি—বল তো? মিঃ ঘোষ উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

নির্ম্মলা বলিল, কি বলছিলে, তা আমি বুঝতে পারি নি। বিজ বিজ করে জড়িয়ে জড়িয়ে কি সব বল্লে, তার পর পাশ ফিরে আবার তখনি ঘুমিয়ে পড়লে। আমি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শেষে চলে এলুম। তোমার তো এ রকম কখনো কিছু ছিল না! নিশ্চয় এ সব শরীর খারাপ হবার পূর্ব্ব-লক্ষণ! তোমার সময় থাকতে সাবধান হওয়া উচিত। তা তো তুমি কিছুতে শুনবে না।

মিঃ ঘোষ আশ্বস্ত চিত্তে বলিলেন, ওঃ! তা হবে! কিছু স্বপ্ন টপ্ন দেখে থাকবো হয় তো! সত্যি, আজ কয়েক দিন থেকে আমার মনটা ভাল নেই—নির্ম্মল! একটুতেই কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি, নানা ভাবনায় মাথাটা ঘুলোতে থাকে। তাতেই তোরা ভাবছিস—আমার শরীর খারাপ হয়েছে, কিন্তু সে সব কিছু নয়। কিন্তু তুইও তো মা! আর আজকাল আমার কাছে মোটেই আসিস না,—সব সময় আমায় একলা ফেলে নিজেও একা একা ঘুরিস, তাতেই তো আমার আরও খারাপ লাগে!

নির্ম্মলা অভিমান-ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, হ্যাঁ! তুমি এখন তাই বলবে বৈ কি? আমি সব সময় এসে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আবার ফিরে চলে যাই,—তুমি যে কি ভাবতে থাক, তা তুমিই জানো,—একবারও আমায় কাছে ডাক না। কালও তো আমি কতক্ষণ ধরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলুম। মনে করলুম, তুমি দেখতে পেলে আমায় ডাকবে। শেষে তুমি আর ডাকলে না দেখে যেমন একটু এগিয়েছি, আর তুমি অমনি চেঁচিয়ে উঠলে। আজকাল তুমি আমার কথা আর কিচ্ছু ভাব না। নির্ম্মলা চোখের জল গোপন করিবার জন্য মুখ ফিরাইয়া লইল।

মিঃ ঘোষ তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার মাথাটা বুকে টানিয়া লইলেন। বলিলেন, ও কি? কাঁদছো তুমি? কি পাগলামী দেখ? তোমার কথা ছাড়া আমার সংসারে আর কি ভাববার কথা আছে নির্ম্মল? সে তো তুমি জানই—তবু এত অভিমান? দু'দিন একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলুম—তাই—না হলে তুমি ছাড়া আর আমার কে আছে মা? তাঁহার কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া নির্ম্মলা কাঁদিতে লাগিল।

নির্ম্মলা একটু শান্ত হইলে মিঃ ঘোষ তাহাকে প্রফুল্ল করিবার জন্য বলিলেন, আমাদের নতুন বাগানে তোমার পার্টির কি ব্যবস্থা করছো নির্ম্মল? তোমার হাত তো এখন বেশ সেরে গেছে,—আর মিছে দেরী করে কি হবে? এইবার এক দিন তার যোগাড়-যন্ত্র করা যাক, কি বলো?

নির্ম্মলা আজ আর এ প্রস্তাবে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিল না। সে উদাসীন ভাবে বলিল, না বাবা! এখন আর ও সব হাঙ্গামায় কোন দরকার নেই। তার চেয়ে চলো—আমরা কোথাও কিছু দিনের জন্যে বেড়িয়ে আসি। তাতে তোমার শরীরও সুস্থ হবে, মনও ভাল থাকবে। এখানে বসে বসে তো তোমার অনেক দিনই কাটলো!

মিঃ ঘোষ বলিলেন, সে তো ভাল কথা! চল, কিছু দিন বাইরে ঘুরে আসা যাক্। আমার তাতে কিছু আপত্তি নেই! কিন্তু তা বলে তোমার বন্ধুদের এ আনন্দ থেকে কেন বঞ্চিত করবে মা? তারা তোমাকে অত করে ধরেছিল, এক দিন তাদের সবাইকে ডেকে আমোদ আহ্লাদ করো,—তার পর যাওয়ার কথা ভাবা যাবে, কেমন?

মিঃ ঘোষ এত সহজে এ প্রস্তাবে সম্মত হওয়ায় নির্ম্মলার হৃদয়ভার অনেক লঘু হইয়া গেল। সে বলিল, তা বেশ! আমি তা হলে আজ দুপুর বেলা বসে কাকে কাকে বলতে হবে, তার একটা লিষ্ট করে তোমায় দেবো। তার পর তুমি সব বন্দোবস্ত করো। ভাল কথা—অসিত বাবুরা তো এক দিনও এলেন না? সে বাড়ীটা ছাড়া আর তাঁদের কোথায় পাওয়া যাবে, সেটা তো তুমি সে দিন জেনে নিয়েছিলে, না? না হলে তাঁদের বলা হবে কি করে?

যেখানে বেদনা—না জানিয়া নির্ম্মলা ঠিক সেই স্থানেই আঘাত করিল। মিঃ ঘোষের মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল। নির্ম্মলা তবে এখনো তাহাদের ভুলিতে পারে নাই! মাত্র দুই ঘণ্টা যাহাদের সহিত দেখা হইয়াছিল, আজ এক মাস ধরিয়া তাহাদের স্মৃতি কেন সে মনে মনে জাগাইয়া রাখিয়াছে? তিনি আরও লক্ষ্য করিয়াছেন, সে পরেশের বিশেষ নাম করে না, অসিতের সংবাদ জানিবার জন্যই তাহার মন উন্মুখ হইয়া আছে।

তিনি বলিলেন, তারা বোধ হয় আমাদের সঙ্গে মিশতে

রাজি নয় নির্ম্মল! এখানে আসবার জন্যে তাদের কত করে আমরা বলে এলুম, সে তো তুমি জানোই, তবু যখন তারা এক দিনও এলো না, বা কোন খোঁজ খবর করলে না, তখন আবার নতুন করে তাদের সঙ্গে সদ্ভাব করতে যাওয়া আর আমাদের বোধ হয় উচিত হবে না, কি বলো?

এ উত্তর নির্ম্মলার মনঃপূত হইল না। সে একটু ভাবিয়া বলিল, তাঁরা আমাদের সঙ্গে মিশতে চান না, এ কথা সত্য বলে আমার তো মনে হয় না বাবা! তবে যে আসেন নি এত দিন—তার হয় তো অন্য কারণ থাকতে পারে। সেটা যতক্ষণ না জানা যায়, ততক্ষণ কি করে এমন একটা কথা বিশ্বাস করা যাবে? আর একবার তাঁদের গার্ডেন-পার্টির দিন নিমন্ত্রণ করে দেখা যাক! বিশেষ সে দিন যখন তুমি নিজেই তাঁদের এ কথা বলেছিলে! পরিচয় হলো, সে দিন তাঁদের কাছে অত উপকার পাওয়া গেল, এখন না বলা কি ভাল দেখায়?

ভাল যে দেখায় না, তাহা তো মিঃ ঘোষ বেশ ভালই জানেন, কিন্তু তাহা ছাড়াও আর যাহা কিছু তিনি জানেন, তাহা তো নির্ম্মলাকে বলা চলে না। সুতরাং কি বলিয়া তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবেন—তাহা তিনি ভাবিয়া পাইলেন না।

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া শেষে মিঃ ঘোষ বলিলেন, বলা উচিত হলেও তাদের বলবার কোন উপায় নেই নির্ম্মল। তাদের ঠিকানার কথা সেদিন জিজ্ঞেস করেছিলুম। কিন্তু তখন অন্য কথা এসে পড়ায় সে কথার আর উত্তর পাই নি। কাজেই…

বাধা দিয়া নির্ম্মলা বলিল, এটা কিন্তু ঠিক হোল না বাবা! আজ বিকেলে চলো—লিলিদের ক্লাবে যাওয়া যাক। কিরণ বাবুকে জিজ্ঞাসা করে দেখবো, যদি তিনি কিছু জানেন।

(ক্রমশঃ)

বাদল-ধারা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

রিম্ ঝিম্ বারি ঝরে রবি আজ জাগেনি,
বাজে মেঘ-মল্লার রাগিণী;
থই থই করে জল অবিরল কলকল
বল কার বুকে ঢেউ লাগেনি?

ফুটিয়াছে ঝোপে ঝাড়ে রাশি রাশি কেতকী,
ফোটে ফুল মধুমাসে এত কি?
ঝর ঝর ওই সুর হৃদি করে ভরপুর,
গুঞ্জনে ভোলে বোল চাতকী।

ডুবে গেল ঘাট মাঠ সোহাগের পাথারে
এমন দরদী পাই কোথা রে!
হংসেরা দলে দলে ভাসিছে নূতন জলে
আকুল চায়না কূল সাঁতারে।

ভরে গেল নালা খাল শিশু-নৌ-বহরে
ভাসে ডিঙ্গা মধুকর লহরে,
যাত্রী সে অজানার, কোথায় সিংহল তার,
কমলে-কামিনী কালীদহ রে।

ভুবন ভরিয়া আজ চলে কাজ বপনের;
গগন গড়িছে পুরী স্বপনের;
পবনে যূথীর বাস সুদূরের অধিবাস,
মনে আজ আগমন গোপনের।

দেখে না কমল মুখ সরসীর মুকুরে;
সন্ধ্যা লেগেছে দিন দুপুরে;
রিম ঝিম রিম সনে জাগে গান বেণু বনে,
বাঁশরীর সুর মেশে নূপুরে।

তরল এ মেঘদূত পড়ি আয় সখি রে,
রাতি ভ্রমে কাছে চকাচকীরে;
পথিক-বধূর হায় আঁখি পাখা কোথা ধায়,
হত আশা পথ কব লোকি রে।

বরষা যে উৎসব মৌনীর পূজনের,
অবসর নাই হেথা কূজনের,
বরষার পরিধিতে ঠাঁই নাই পরে দিতে
কুলায়ে কুলাবে শুধু দুজনের।

বরষার মধু সুর মধু পুর লোটেরে
ফোটে রাধাপদ্মিনী ফোটে রে;
শিখীর জোটার বোল তমালেতে দেয় দোল,
যমুনায় কল্লোল উঠে রে।

এ বরষা বৈষ্ণব কবিদের ভারতী;
প্রেম আঁখিজল এর সারথি!
তুলনা যে নাহি এর, ঝুলনা এ প্রণয়ের,
বুকে এর যুগলের আরতি।

বাল্যবিবাহ ও অকালমৃত্যু

শ্রীগোকুলবিহারী দাস বি-এ

গত আষাঢ় মাসের "ভারতবর্ষে" শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র মহাশয় বাল্য-বিবাহের সহিত অকালমৃত্যুর সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বাল্যবিবাহ অকালমৃত্যুর কারণ হইতে পারে না; বরং বাল্যকালে বিবাহ না হইলে অত্যাচারের ফলে শরীর বহুবিধ দুষ্ট রোগের আকর হইয়া অকালে খসিয়া পড়ে। তিনি বাল্য-বিবাহের সহিত—সামাজিক, নৈতিক, দার্শনিক যে সকল প্রশ্ন উঠিতে পারে, সে সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া, কেবল অকালমৃত্যুর দিক্ দিয়াই বাল্যবিবাহ কতটুকু দায়ী, তাহারই বিচার করিয়াছেন। প্রাচীন রামায়ণ, মহাভারতাদির যুগে যে সকল আচার, বিধি, ব্যবস্থা ছিল, তাহাতে তাঁহার যেরূপ আস্থা দেখা যায়, তাহাতে মনে হয়, তিনি ঐ যুগের যে কোন আচার নির্বিচারে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। তাঁহার ধারণা—ভারতের ওই গৌরবময় যুগে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। সুতরাং ঐ ভুল ধারণা দূর করা আমাদের প্রথম চেষ্টা হইবে। তবে আমরা বলিয়া রাখি যে, কোন যুগ জ্ঞান-গরিমা-বরিষ্ঠ হইলেই যে সে যুগের যাহা কিছু সমস্তই অভ্রান্ত হইতে হইবে, বা সেই যুগের পক্ষে যাহা উপযোগী ছিল সকল যুগের পক্ষেই তাহা উপযোগী হইবে, এরূপ বিশ্বাস আমাদের নাই। প্রাচীনকালে যদিই বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলেও আমরা তাহার অনুমোদন করিতে পারিতাম না। ভারতবাসী প্রায় অনেকেই আমাদের এই অতীত যুগকে একেবারে অভ্রান্ত মনে করে। দূরত্বের একটা মহিমা আছে, কিন্তু আমাদের দেশে এইরূপ হইবার একটা ঐতিহাসিক কারণ আছে। পরাধীন জাতির আত্ম-প্রসারণ-ক্ষমতা বাহিরের চাপে রুদ্ধ হইলে, তাহাদের আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় সংরক্ষণশীলতা। আয় হইতে ব্যয় করিলে কোন দোষ হয় না; কিন্তু আয় না থাকিলে পূর্ব্বার্জ্জিত সম্পত্তিকে কৃপণের ন্যায় আগলাইয়া থাকিতে হয়। এই জন্যই আমরা পুরাতনকে আঁকড়াইয়া থাকিতে চাই; কেন না, নবীনকে বরণ করিয়া লইবার আমাদের শক্তি নাই। শুধু তাহাই নহে,—যখন বাহিরের অবজ্ঞা মানুষকে পায়ে ঠেলে, তখন অন্তরের পুঞ্জীভূত অভিমান একমাত্র গৌরবের বস্তুকে সম্বল করে। বর্ত্তমানে যখন আমাদের গৌরব করিবার কিছু নাই, তখন ভূতের উপর আমাদিগকে বেশী করিয়া ভর করিতে হয়। কিন্তু ভূতের কোন নির্দ্দিষ্ট, পরিমিত আকৃতি নাই; বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট ইহা বিভিন্ন বেশে আসিয়া থাকে; ইহাকে ছুঁইয়াও ছুঁইতে পারা যায় না; ধরিয়াও ধরিতে পারা যায় না। সেই জন্যই আবার ইহার আকর্ষণী-শক্তি বেশী। যাহা হউক, আমরা এই ভূতকে যেরূপ দেখিয়াছি, সেইরূপ বর্ণনা করিব।

"বাল্যবিবাহ ও অকালমৃত্যু"র লেখক অতীত ভারতে যৌবন-বিবাহের সমর্থক আচার বা উক্তি দেখিতে পান নাই। যে কয়টা প্রসিদ্ধ, সর্ব্ববিদিত উদাহরণ আছে, তাহা তিনি সাধারণ জনসমাজের দর্পণ স্বরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি মনে করেন, বিশেষ বিশেষ কারণের জন্য কেবল ঐ ঐ ক্ষেত্রে ঐরূপ বিবাহ ঘটিয়াছিল, অন্যত্র নহে। এইজন্য শকুন্তলা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, দময়ন্তী, সুভদ্রার উদাহরণ তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট নহে। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন পুস্তকগুলি যদি চোখ মেলিয়া পড়া যায়—তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, কেবল ঐ কয়টী পূত মহিলার যৌবন-বিবাহেই এই পুস্তক লব্ধ আখ্যায়িকার সমাপ্তি হয় নাই। রুক্মিণী, কাশীরাজের কন্যা অম্বা, অম্বিকা, অম্বালিকা; দুর্য্যোধনের পত্নী চিত্রাঙ্গদা; পাণ্ডুর পত্নী কুন্তী ও মাদ্রী; যুধিষ্ঠিরের পত্নী গোবাসনের দুহিতা দেবিকা; সহদেবের পত্নী মদ্রাধিপতির কন্যা বিজয়া; নারদের পত্নী সৃঞ্জয়ের

যুবতী কন্যা প্রভৃতি সকলেই যৌবনাবস্থায় বা স্বয়ম্বরে পতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঋচীক মুনি বিশ্বামিত্রের ভগিনী যুবতী সত্যবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মনুর পুত্র শর্যাতির সুকন্যা নামে এক কন্যা ছিল। প্রাপ্ত-যৌবন সেই কন্যাকে চ্যবন ঋষি বিবাহ করেন। যৌবন-বিবাহের উদাহরণ প্রাচীন পুস্তকগুলির সর্ব্বত্র বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ক্ষত্রিয়দিগের গান্ধর্ব্ব-বিবাহই প্রশস্ত বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছে। সুতরাং অনুমান করিয়া লইতে পারা যায় যে, এই গান্ধর্ব্ব-বিবাহ কেবলমাত্র ক্ষত্রিয় রাজাদিগের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না; পরন্ত, ক্ষুদ্র সৈনিক প্রভৃতি সমস্ত ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যেই পরিব্যাপ্ত ছিল। গান্ধর্ব্ব-বিবাহ কখনও অল্পবয়স্কা বালিকার পক্ষে সম্ভব নহে; যৌবনের পূর্ব্বে কখনও ঐরূপ পরিণয় হইতে পারে না। বড় বড় রাজারা স্বয়ম্বরে কন্যালাভ করিতেন; কিন্তু সামান্য ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে তাহা প্রাংশুলভ্য ফলের ন্যায় দুর্লভ ছিল। রামায়ণে আমরা প্রাচীন আর্য্যদিগের মধ্যে আধুনিক ইয়োরোপীয়দিগের ন্যায় একটী প্রথা দেখিতে পাই। সেটী হচ্ছে এই:—সন্ধ্যাকালে অবিবাহিতা কন্যাগণ সাজসজ্জা করিয়া ও স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া নগরের স্থানে স্থানে রক্ষিত উদ্যানে ভ্রমণ করিতে যাইত। ঐরূপ উদ্যান-ভ্রমণকালে বায়ু কতকগুলি কন্যার পাণি-প্রার্থনা করিয়াছিল। আমাদের মনে হয়, সাধারণ ক্ষত্রিয়-কন্যাদিগের courtship ঐরূপ ভ্রমণের সময়েই হইত। এই ত গেল ক্ষত্রিয়দিগের কথা। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও যৌবন বিবাহের উদাহরণ বিরল নহে। ক্ষত্রিয়দিগের কথা রামায়ণ, পুরাণাদিতে যেরূপ বিস্তৃত ভাবে আছে, ব্রাহ্মণ প্রভৃতির কথা সেরূপ নাই। তথাপি খুঁজিয়া দেখিলে উদাহরণের অপ্রতুলতা হইবে না। দেবযানীকে অসুরদিগের মধ্যে পালিতা বলিয়া ছাড়িয়া দিলেও, আরও উদাহরণ পাওয়া যাইবে। ঔর্ব্বমুনি অতি তেজস্বী ও বিখ্যাত ব্রাহ্মণ ছিলেন। যখন ক্ষত্রিয়দিগের অত্যাচারে অনেক ব্রাহ্মণ-বালক নিহত হয়, তখন কোন ব্রাহ্মণীর উরুদেশ হইতে ঔর্ব্বের জন্ম হয়। এই বালক ঔর্ব্বের তেজে ক্ষত্রিয়গণ অত্যাচার হইতে ক্ষান্ত হয়। এই ঔর্ব্বের কন্যা কন্দলী। এক দিন দুর্ব্বাসা ঋষি যখন কোন পর্ব্বত-কন্দরে তপস্যায় রত ছিলেন, তখন ঔর্ব্বমুনি প্রাপ্তযৌবনা এই কন্যাকে লইয়া দুর্ব্বাসার সমীপে উপনীত হন। দুর্ব্বাসা ঐ কন্যার সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া উহাকে বিবাহ করেন। মহাভারতে ভৃগুপত্নী পুলোমার সম্বন্ধে যে আখ্যান আছে, তাহাতে দেখা যায়, পুলোমার সহিত ভৃগুর বিবাহ হইবার পূর্ব্বে এক রাক্ষস পুলোমার মনোমুগ্ধকারিণী আকৃতি দর্শন করিয়া পুলোমার পিতার নিকট পুলোমাকে প্রার্থনা করে; কিন্তু ব্রাহ্মণ তাহাতে সম্মত হন নাই। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, পুলোমার সহিত ভৃগুর যখন বিবাহ হইয়াছিল, তখন পুলোমা পূর্ণযৌবনা। শুক্রাচার্য্যের দেবযানী ছাড়া আর একটী কন্যা ছিল; তাহার নাম অরজা। এক দিন দণ্ড রাজা শুক্রাচার্য্যের তপোবনে প্রবেশ করিয়া যুবতী, অবিবাহিতা অরজার উপর অত্যাচার করেন। সুতরাং বিবাহের পূর্ব্বে অরজা যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহাভারতে বর্ণিত আছে, অষ্টাবক্রমুনি মহর্ষি বদান্যের সুপ্রভা নাম্নী কন্যার রূপ-লাবণ্য দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন। এইরূপে দেখা যাইবে—ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও যৌবন-বিবাহ প্রচলিত ছিল; এবং উহা নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত না। দাসরাজ-কন্যা সত্যবতী যৌবনাবস্থায় পরিণীতা হইয়াছিল। নাভাগ এক বৈশ্যকন্যার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল। সুতরাং যৌবন-বিবাহ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলের মধ্যেই প্রচলিত ছিল।

প্রাচীন কালে যৌবন-বিবাহ ছিল এবং সেই যৌবন-বিবাহের অস্তিত্বসূচক তাহার যে অপব্যবহার তাহাও ছিল। যে সব দেশে যৌবনবিবাহের প্রচলন থাকে, সেই সব দেশে মাঝে মাঝে কানীন সন্তান প্রসূত হওয়ার কথা শুনা যায়। দাসরাজ-কন্যা সত্যবতী ও পাণ্ডব-জননী কুন্তী তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আবার গান্ধর্ব্ব-বিবাহ থাকিলে সকল সময় পাত্র ও পাত্রীর বয়সের পার্থক্যের সীমা রক্ষিত হয় না। কখনও কখনও কন্যার বয়স পাত্রের অপেক্ষা অধিক হয়। জ্যামঘ নামক এক নরপতি ছিলেন, তাঁহার পত্নীর নাম শৈব্যা। জ্যামঘ নিঃসন্তান ছিলেন, তথাপি তিনি ভার্য্যার ভয়ে পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিতে পারেন নাই। তিনি এক দিন শত্রু-ভবন হইতে ভোজ্যা নাম্নী একটী কন্যা হরণ করিয়া আনিতেছিলেন। সেই কন্যাকে দেখিয়া শৈব্যা ক্রুদ্ধা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কে? কাহাকে রথে করিয়া আনিতেছ?" রাজা বলিলেন, "এ তোমার স্নুষা।" রাণী বলিলেন, "আমার সন্তান নাই, স্নুষা কোথা হইতে হইবে?" রাজা বলিলেন, "এই কন্যা তোমার ভাবী সন্তানের বধূ হইবে।" পরে শৈব্যার বিদর্ভ নামে এক পুত্র হয় এবং সেই পুত্রের সহিত ঐ কন্যার বিবাহ হয়। এখানে দেখা যাইতেছে, কন্যার বয়স পাত্রের বয়সকে অতিক্রম করিয়াছে। কৃষ্ণের পুত্র অনিরুদ্ধ এইরূপ আপনা অপেক্ষা বয়োবৃদ্ধা মায়াবতীকে বিবাহ করিয়াছিল। স্বায়ম্ভুব মনু স্বীয় কন্যা আকূতিকে প্রজাপতি রুচির হস্তে সমর্পণ করেন। আকূতির যমজ সন্তান প্রসূত হয়; এক পুত্র, নাম যজ্ঞপুরুষ ও এক কন্যা, নাম দক্ষিণা। মনু দৌহিত্র যজ্ঞপুরুষকে স্বীয় আলয়ে লইয়া আসিয়া পালন করেন। যজ্ঞপুরুষ বড় হইলে, দক্ষিণা স্বীয় ভ্রাতাকে স্বামিত্বে বরণ করে। এখানে ভ্রাতা-ভগিনীতে বিবাহ হইয়াছে। কখনও কখনও দেখা যাইবে, উপযুক্ত পাত্রের অভাবে বা জ্ঞানালোচনার সুবিধার জন্য কোন কোন কন্যা আজীবন কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়াছে। এই ঘটনাগুলি পর্য্যালোচনা করিলে মনে কোনই সন্দেহ থাকে না যে, পূর্ব্বে হিন্দুসমাজে যৌবন-বিবাহ সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল।

যদিও রামায়ণে সীতা যেখানে ছদ্মবেশী রাবণকে স্বীয় পরিচয় দিতেছেন সেখানকার বর্ণনা হইতে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, সীতা ছয় বা সাত বৎসরের সময় বিবাহিতা হইয়াছিলেন, তথাপি সমস্ত রামায়ণ খানি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া, সীতার বিবাহের আনুষঙ্গিক ক্রিয়াগুলির আলোচনা করিলে, সীতা যে বিবাহকালে যৌবন প্রাপ্ত হইয়া

ছিলেন, সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ থাকে না। রাজা জনক রামকে সীতার পরিচয় প্রদান কালে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে, সীতা যৌবন-দশায় উপনীত হইলে, চতুর্দ্দিক হইতে মহীপালগণ আসিয়া সীতাকে লাভ করিবার বাসনা করিয়াছিল ; কিন্তু বীর্য্যশুল্ক প্রদানে অসমর্থ হইয়া তাহারা প্রস্থান করে। সীতাও অরুন্ধতী প্রভৃতিকে নিজের বিবাহ সম্বন্ধে এই কথাই বলিয়াছেন। এই সকল কথার আলোচনা করিলে এবং সীতা স্বয়ম্বরা হইয়াছিলেন এই বিষয় মনে রাখিলে, রামায়ণে বর্ণিত এই পরস্পর বিপরীত কোন্ বিবরণটী সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারা যায়? সীতার স্বয়ম্বর যখন রামায়ণের একটী প্রধান ঘটনা, তখন ৬ বা ৭ বৎসরে সীতার বিবাহ হওয়ার কথা যে অসঙ্গত ও পরবর্ত্তী কালের যোজনা, বা interpolation সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকে না। আবার সীতা, মাণ্ডবী প্রভৃতি চারি সদ্য-বিবাহিতা কন্যার সহিত জনক রাজা ৪০০ সখী দিয়াছিলেন। সীতার বয়স ৬ বা ৭ হইলে এই সকল সখীদিগের বয়সও উহার অধিক হইতে পারে না। জনক রাজা নিশ্চয়ই দশরথকে ভারাক্রান্ত করিবার জন্য এই দুগ্ধপোষ্য শিশুগুলিকে দান করেন নাই। প্রাচীনকালে দুই একটী বাল্য বিবাহ হইয়াছে, ইহা দেখাইয়া দিলেই কখনও প্রমাণিত হয় না যে বাল্যবিবাহ তখনকার সাধারণ প্রথা ছিল। ইয়োরোপেও অনেকে অল্প বয়সে বিবাহ করিয়া থাকে, কিন্তু ইয়োরোপের বিবাহপ্রথাকে কেহ সেই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বাল্যবিবাহের কোঠায় ফেলিতে চেষ্টা করেন না। সেইরূপ উত্তরা যদি অল্প বয়সেই বিবাহিতা হইয়া থাকে, তাহাকে আমরা সমাজের মানদণ্ডরূপে খাড়া করিতে পারি না। উত্তরার সন্তান পরীক্ষিৎ ৬০ বৎসর জীবিত ছিলেন ; তাহা হইতে লেখক প্রমাণ করিতে চান যে, বাল্য-বিবাহের ফল পরীক্ষিৎ যখন দীর্ঘজীবী হইয়াছেন, তখন বাল্যবিবাহ অকালমৃত্যুর কারণ হইতে পারে না। কোন মদ্য-পানরত, বেশ্যাসক্ত ব্যক্তি যদি দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকে, তখন তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া লেখক কি বলিবেন, বেশ্যালয়-গমন বা মদ্যপান শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর নহে? পরীক্ষিতের সম্বন্ধে আবার একটু "কিন্তু" আছে। পরীক্ষিৎ ৬০ বৎসর বাঁচিলেও তিনি মাতৃ-গর্ভে একবার নিহত হইয়াছিলেন এবং কৃষ্ণের যত্নে পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছিলেন এবং ক্ষীণতা হেতুই তিনি পরীক্ষিৎ নাম পাইয়া-ছিলেন। সুতরাং পরীক্ষিতের উদাহরণ দীর্ঘজীবনের পোষকরূপে উপস্থিত করা চলে না, চলিলেও তাহা দ্বারা লেখকের কথা প্রমাণিত হয় না। লেখক আরও দুই একটী আত্মীয় সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধেও আমাদের বক্তব্য ঐ একই। সকল সাধারণ নীতিরই ব্যতিক্রম আছে এবং সেই ব্যতিক্রম স্থানবিশেষে ও ব্যক্তিবিশেষে খাটিয়া থাকে। প্রাচীন কালের কথা আর অধিক বলিবার আবশ্যক নাই। দৃষ্টান্ত অনেক দেওয়া হইয়াছে ; ইহার পর কতকগুলি প্রাসঙ্গিক প্রাচীন উক্তি তুলিয়া দেওয়া হইল :—যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "পিতামহ, শাস্ত্রে কথিত আছে যে, পুরুষ শতায়ু ও মহাবলপরাক্রান্ত হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে, তবে কি নিমিত্ত তাহারা অকালে কালকবলে নিপতিত হয়?" তদুত্তরে ভীষ্ম দীর্ঘ-জীবনের জন্য যাহা যাহা আবশ্যক, তাহা বলিতে বলিতে এক স্থানে বলিয়াছেন :—

"মহাকুলে প্রসূতাঞ্চ প্রশস্তাং লক্ষণৈস্তথা।
বয়স্থাঞ্চ মহাপ্রাজ্ঞঃ কন্যামাবোঢ়ুমর্হতি।"

আর এক স্থানে

"সুরূপাং সুনিতম্বাঞ্চ নাকুলীনাং কদাচন।"

সুশ্রুত সংহিতায়—

"পূর্ণষোড়শবর্ষা স্ত্রী পূর্ণত্রিংশেন সঙ্গতা।
শুদ্ধেগর্ভাশয়ে মার্গে রক্তে শুক্রেঽনিলে হৃদি॥
বীর্য্যবন্তং সুতম্ সূতে ততোন্যূনা বদয়োঃ পুনঃ।
রোগ্যাল্পায়ুরধন্যো বা গর্ভো ভবতি নৈব বা॥"

অন্যত্র

"ত্রিংশবর্ষঃ ষোড়শবর্ষাং ভার্য্যাং বিন্দেত নগ্নিকাং।" (মনু)

মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে মহর্ষি কৃশরাজা বীরদ্যুম্নকে বলিতেছেন, "লোকে যে আশার প্রভাবে কৃতঘ্ন, নৃশংস, অলস ও পরোপকারী ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে উপকার লাভের চেষ্টা করে, যাহার প্রভাবে পিতা একমাত্র পুত্র নষ্ট বা প্রোষিত হইলে না পাইয়াও সন্দর্শন-লাভে যত্নবান্ হয়েন, যে আশা বৃদ্ধরমণীগণকে পুত্র প্রসবে সচেষ্ট করে এবং যাহার প্রভাবে পরিণয়াকাঙ্ক্ষিণী কামিনীগণ প্রাপ্তবয়স্ক পাত্রলাভের কথামাত্র শ্রবণ করিয়া আহ্লাদ সাগরে নিমগ্ন হয়, সেই আশা আমা অপেক্ষা কৃশতর।" ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এইরূপ উক্ত হইয়াছে— "কন্যাগণ অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিলে রজস্বলা যুবতীও গর্ভবতী হইবে। সংবৎসর অতীত হইতে না হইতেই আর একটী প্রসব করিবে এবং ষোড়শবর্ষে শরীর জরাজীর্ণ হইয়া পড়িবে।" কলিযুগ সম্বন্ধে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে বাল্য-বিবাহের সম্বন্ধে সে যুগের ধারণা কিরূপ ছিল। কন্যাগণকে দুহিতা বলা হয় ; পূর্ব্বে পিতৃ গৃহে অবস্থানকালে তাহাদিগকে গাভী দোহন করিতে হইত বলিয়া তাহারা দুহিতা। দোহনকার্য্য অল্পবয়স্কা বালিকা দ্বারা সম্ভব নহে। ইহা হইতেও অনুমান হয় যে, কন্যাদিগের বিবাহ বয়স অল্প ছিল না। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদির যুগের পরও বহুকাল পর্য্যন্ত যৌবন-বিবাহ প্রচলিত ছিল। কালিদাসের "শকুন্তলা," "কুমারসম্ভব," ভবভূতির "মালতীমাধব," "বীরচরিত" প্রভৃতি কাব্য, বাণভট্টের "কাদম্বরী," "রত্নাবলী" প্রভৃতি বহু সংস্কৃত কাব্য, নাটক ও উপন্যাস এ বিষয়ে সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। ইতিহাসেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় :—পৃথ্বীরাজের পত্নী সংযুক্তা, রাজপুতগৌরব কৃষ্ণকুমারী প্রভৃতি সকলে বিবাহের পূর্ব্বেই প্রাপ্তযৌবনা হইয়াছিলেন। বহু প্রাচীন সংস্কৃত প্রশস্তিতে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও যৌবন-বিবাহের উল্লেখ আছে।

পর্দ্দা বা অবরোধের শৃঙ্খল যত দৃঢ় হইয়াছে, জাতিভেদের নিগড় যত দেশের উপর চাপিয়া বসিয়াছে, স্ত্রীলোকদিগের অধিকার যত

সঙ্কীর্ণ হইয়াছে এবং শিক্ষা, জ্ঞান, স্বাধীনতা, আলো ও বায়ু যত স্ত্রীলোকদিগের নিকট হইতে সরিয়া গিয়াছে, ততই তাহার আনুষঙ্গিক রূপে যৌবন-বিবাহও দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। যৌবন-বিবাহ থাকিলে যুবতী কন্যাকে নির্ব্বাচনের ক্ষমতা অর্পণ করিতে হইবে; আর এই নির্ব্বাচন প্রণয়ের দ্বারা চালিত হইয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সম্বন্ধে ভেদ মানিবে না। কাজেই বর্ত্তমান জাতি-ভেদের সময় হইতেই স্ত্রীলোকদিগের যৌবন-বিবাহও লোপ পাইয়াছে। আর এই যৌবন-বিবাহ স্থায়ী করিতে হইলে যে স্বাধীন আবেষ্টনীর আবশ্যক, যে শিক্ষা ও অধিকারের আবশ্যক, সেই আবেষ্টনী ও শিক্ষা ক্রম-অবনতিশীল হিন্দু স্মৃতির দ্বারা রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। এই সকল কারণে যখন যৌবন-বিবাহ আপনা হইতেই তিরোহিত হইতে-ছিল, তখন বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্মের ও তান্ত্রিকদিগের কুমারী-পূজার বাহুল্যে কুমারীদিগকে বেশী দিন অবিবাহিতা রাখা নিরাপদ না হওয়ায়, বাল্য-বিবাহ যৌবন-বিবাহকে একেবারে স্থানচ্যুত করিল। আলোচনা একটু বিস্তৃত হইয়া পড়িল; কিন্তু বর্ত্তমানকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে অতীতকেও বুঝিতে হইবে। এইজন্যই রোমানরা বৎসরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা Janus-এর দুইটী মুখ কল্পনা করিয়াছেন। একটী মুখ অতীতের অভিমুখে আর একটী ভবিষ্যতের অভিমুখে পরাবর্ত্তিত। বর্ত্তমান এই দুইয়ের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান।

এক্ষণে বাল্য-বিবাহকে যুক্তির ওজনে মাপিয়া দেখা যাক্। ১৯১১ সালের আদম সুমারি হইতে অঙ্ক উদ্ধৃত করিয়া লেখক দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, যে সকল জেলায় বালিকা-বিবাহ অধিক সে সকল জেলায় শিশু-মৃত্যুর হার অধিক নহে। প্রকৃতপক্ষে উদ্ধৃত অঙ্কগুলি হইতে এরূপ বিচারে উপনীত হইবার যথেষ্ট উপাদান নাই। যে দেশে সর্ব্বত্রই বাল্য-বিবাহ প্রচলিত, সে দেশে একটী জেলাকে অন্য জেলা অপেক্ষা বাল্য-বিবাহে অগ্রণী মনে করিবার কোন কারণ নাই। তিনি দেখাইয়াছেন যে, হাজারকরা ৫ হইতে ১০ বৎসরের বালিকার বিবাহ যে সকল জেলায় অধিক, সেখানকার ১ বৎসরের ন্যূন ও ১ বৎসর বয়স্ক শিশুমৃত্যুর হার যে সকল জেলায় ঐরূপ বিবাহ কম তথাকার ঐ বয়স্ক শিশুমৃত্যুর হার, অপেক্ষা অধিক নহে। কিন্তু কেবল দশ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স গণনা করিয়াই এক জেলাকে অপর জেলা অপেক্ষা বাল্য-বিবাহে অগ্রসর বা পশ্চাৎপদ বলা চলে না। আমরা মনে করি ১৫ বৎসর বয়স বাল্য-বিবাহের কোঠায় আসা উচিত। ঐ বয়সে বাংলা দেশের সর্ব্বত্রই প্রায় সকল বালিকারই বিবাহ হইয়া যায়। তাহ যদি হয়, তাহা হইলে এই জেলায় বালিকা বিবাহ অধিক, ঐ জেলায় কম এরূপ প্রশ্ন আসিতে পারে না এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে চারুবাবু যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন সে তালিকারও কোন মূল্য থাকে না। এই সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা এই যে ১ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক শিশুর মৃত্যু-সংখ্যা হইতে কোন্ জেলায় শিশু-মৃত্যু অধিক কোন্ জেলায় কম তাহা নির্ণীত হইতে পারে না। ১ বৎসরের অধিক বয়সেও শিশু-মৃত্যু হইতে পারে; সুতরাং ঠিক ভাবে বাল্যবিবাহের প্রভাবে শিশু-মৃত্যু কোথায় কিরূপ ঘটিতেছে তাহা জানিতে হইলে ১ বৎসর বয়স্ক শিশুদিগকেই গণনা করিলে চলিবে না, আরও উর্দ্ধ দিকে যাইতে হইবে। অতএব এখানেও চারুবাবুর তালিকা হইতে কোনও যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। তৃতীয়তঃ শিশুমৃত্যুর একমাত্র বাল্যবিবাহের ফল হইবে এমন নহে; সমস্ত জেলার সাধারণ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, রোগ-প্রতিষেধের ক্ষমতা প্রভৃতি সমস্তই বিচার করিতে হয়। সেগুলিও এক প্রকার মৃত্যু। সেরূপ ভাবে যদি আমরা বিচার করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব, গত ৫০ বৎসরের মধ্যে ঢাকায় শতকরা ৭৭, ময়মনসিংহে ১০৫, পাবনায় ১৫, দিনাজপুরে ২০ নোয়াখালিতে ৭৫ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। লেখকের গণনা অনুসারে এই জেলাগুলিতে ৫ হইতে ১০ বৎসর বয়স্কা বালিকার বিবাহ সংখ্যা অতি অল্প। আবার বাঁকুড়ায় শতকরা ৫, মেদিনীপুরে ৫, মুর্শিদাবাদে ৪, বৃদ্ধি হইয়াছে এবং বর্দ্ধমানে ৩, বীরভূমে ৪৫, হুগলিতে ৩ ও নদীয়ায় ৩ হ্রাস পাইয়াছে। লেখকের উদ্ধৃত অঙ্ক হইতে এই জেলাগুলিতে ১০ বৎসরের ন্যূনবয়স্কা বালিকার সংখ্যা উপরিউক্ত জেলাগুলি অপেক্ষা অনেক বেশী। সুতরাং মোটের উপর দেখা যায় যে, বাল্য-বিবাহে লোকক্ষয় হইতেছে। কেবল ১ বৎসরের শিশুদিগের মৃত্যু হইতে কোন ইতরবিশেষ ধরা না পড়িতে পারে (কেন না, বাল্য-বিবাহের ফল কেবল ১ বৎসরের শিশুর মরা বাঁচাতেই সমস্ত নহে); কিন্তু সমস্ত ক্ষয় বৃদ্ধির আলোচনা করিলে ইহাতে কোন সন্দেহ থাকে না। কলিকাতার শিশুমৃত্যু সম্বন্ধে লেখক যে সকল অঙ্ক উদ্ধৃত করিয়াছেন সে সম্বন্ধেও আমাদের বক্তব্য ঐ একই। খৃষ্টান ও মুসলমান-প্রধান ওয়ার্ডগুলিতে যদি শিশুমৃত্যুর সংখ্যা বেশী হয় তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই; কেন না তাহাদিগের অনেকেই হিন্দু হইতে নূতন ঐ ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছে এবং ঐ সকল নূতন ধর্ম্মাবলম্বীগণ প্রায়ই নীচ হিন্দুজাতি হইতে উদ্ভূত। সুতরাং তাহাদিগের অনেক দোষ হিন্দুদিগেরই প্রাপ্য। লেখক ইহাও বলিতে চান যে, কলিকাতায় ইয়োরোপীয়দিগের মধ্যে শিশুমৃত্যুর হার হিন্দু-দিগের অপেক্ষাও অধিক। তিনি যে সকল অঙ্ক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে খৃষ্টানদিগের সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে; তাহাদিগের মধ্যে কতগুলি দেশী খৃষ্টান ও কতগুলি ইয়োরোপীয় তাহা বুঝিবার উপায় নাই। কাজেই কলিকাতায় ইয়োরোপীয়দিগের শিশুমৃত্যুর হার ধরিতে পারা গেল না। আবার যেখানে হিন্দু, মুসলমান, দেশী খৃষ্টান ও ইয়োরোপীয়গণ বাস করে সেখানে যদি শিশুমৃত্যুর হার বেশী হয় এবং ইয়োরোপীয় স্ত্রীর সংখ্যারই আধিক্য প্রমাণিত হয় তথাপি তাহা হইতে ইয়োরোপীয়দিগের মধ্যে শিশুমৃত্যুর হার অধিক এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় না; কেন না এখানে সংখ্যার আধিক্য খুবই বেশী নহে। দ্বিতীয়তঃ ইয়োরোপীয়দিগের মধ্যে অনেক স্ত্রীই অবিবাহিতা অবস্থায় থাকে। তৃতীয়তঃ সন্তান প্রসব বিষয়ে আমাদের দেশের মেয়েরা ইয়োরোপীয়দিগকে অনেক পশ্চাতে ফেলিয়াছে। আমাদের দেশে যত অল্প সময় অন্তর ছেলে জন্মে, ইয়োরোপীয় দিগের মধ্যে তাহা নহে।

অধ্যাপক বিনয়নারায়ণের পুস্তকে তাহা দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইহার কারণ বোধ হয় আমাদের তুলনায় ইয়োরোপীয়েরা অধিক শিক্ষিত ও ধনী। J. B. S. Haldane তাঁহার Eugenics and Social Reforms" নামক পুস্তকে বলিয়াছেন,—"There is no doubt that the richer classes breed much more slowly than the poorer......A thousand married teachers under fiftyfive annually beget 95 children, a thousand doctors 103, carpenters 150, general labourers 267. Thus the unskilled workers are breeding much faster than the skilled classes, and in view of the demands for intellectual and manual skill in modern civilization, this is an evil." যেখানে ইংলণ্ডে হাজারকরা শিশু ৩০ জন মরে সেখানে ভারতবর্ষে ২০০ জন মরে। সুতরাং কলিকাতায় ইংরাজদিগের মধ্যে শিশুমৃত্যু হিন্দু অপেক্ষা অধিক হইবার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই জন্যই বলিতেছিলাম, কোন্ ওয়ার্ডে কোন্ ধর্ম্মাবলম্বীর বা কোন্ জাতির শিশুমৃত্যু কত হইল তাহা জানিতে হইলে কোন্ জাতির কত শিশু জন্মিয়াছিল এবং কত মরিল, তাহা সঠিক্ জানা চাই; কেবল কোন্ জাতি কত বাস করে বলিলে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। তবে যদি কোন জাতির সংখ্যা অন্যান্য জাতিগুলি অপেক্ষা অনেক বেশী হয়, তাহা হইলে সেই জাতির শিশুই যে মৃত্যুর হারের পরিমাণের নিয়ামক, তাহা এক প্রকার বলিতে পারা যায়।

যাহা হউক, আমরা মোটের উপর দেখিলাম যে, শিশুমৃত্যু আমাদের দেশে বাড়িয়া চলিয়াছে এবং যে সকল দেশে বালিকাবিবাহ অধিক সেই সকল দেশেই লোকসংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা লোকক্ষয়ের একটী কারণ। বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগে জন্মের কয়েক সপ্তাহ মধ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শিশুর মৃত্যু হয়; শিশুর মাতা রুগ্ন না হইলে এরূপ ঘটিতে পারে না। বাল্যবিবাহ এই রুগ্নতার একটী কারণ। মৃত শিশুদিগের শতকরা ৫০জনের মৃত্যুর হেতু দৌর্ব্বল্য। এই দৌর্ব্বল্য পিতামাতার অপরিণতির হেতুই অধিক হইয়া থাকে।

ইহার পর স্ত্রীমৃত্যু বিচার করিয়া দেখা যাউক্। চারুবাবু বলিতেছেন যে, বিহারপ্রদেশে যেখানে পুরুষদের ১০০ মরে, সেখানে স্ত্রীমৃত্যু ৮৯.২, বাঙ্গালায় ৯১.২, সমস্ত ইয়োরোপের average ১০৫। বাঙ্গালার পুরুষের মৃত্যুতুলনায় স্ত্রীমৃত্যু ইয়োরোপের পুরুষের মৃত্যুতুলনায় স্ত্রীমৃত্যুর সমানুপাতে ঘটিয়া থাকে বলিয়া এরূপ প্রমাণিত হয় না যে বাল্যবিবাহের দরুণ বাংলায় স্বাস্থ্যহানি হইতেছে না। স্ত্রীদিগের বাঁচিবার শক্তি পুরুষদের অপেক্ষা অনেক বেশী। "The male mortality is greater than the female at every age." (See Bertillion, art. "Mortality")। সেইজন্য সকল দেশে স্ত্রীমৃত্যুর হার পুরুষমৃত্যুর হারের অপেক্ষা কম। আমাদের দেশে স্ত্রীরাও যেরূপ ক্ষীণায়ু হইয়া আসিতেছে, পুরুষরাও সেইরূপ ক্ষীণজীবী হইতেছে। এই নিমিত্তই স্ত্রীমৃত্যুর সহিত পুরুষমৃত্যুর অনুপাত ইয়োরোপীয় দেশগুলির সহিত সমান রহিয়াছে। সুতরাং এই সমান অনুপাত আমাদের দেশের ভাল স্বাস্থ্যের পরিচায়ক নহে। ইংলণ্ডে পুরুষের গড় আয়ু ৪৬.৫৬ ও স্ত্রীলোকদিগের ৫২.৩০। আমাদের দেশে পুরুষের গড় আয়ু ২২.৫১ ও স্ত্রীলোকদিগের ২৩.৩১। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে আমরা কিরূপ দশা প্রাপ্ত হইয়াছি। চারুবাবুর মনোগত অভিপ্রায় এই যে, আমাদের দেশে যখন স্ত্রীলোকদেরই বাল্য-বিবাহ হইয়া থাকে, তখন তাহার ফলে স্ত্রীলোকদেরই বেশী ক্ষতি হওয়া উচিত। কিন্তু পুরুষের মৃত্যুতুলনায় স্ত্রীলোকদিগের মৃত্যুহার গণনা করিলে যখন সে ক্ষতি লক্ষিত হয় না, তখন বাল্য-বিবাহ ক্ষতিকর নহে। আমরা পরে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, স্ত্রীলোকেরা কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে; কিন্তু এক্ষণে কেবল কয়েকটী বিষয়ে চারুবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। প্রথমতঃ, মাতা দুর্ব্বল হইলে সন্তানও দুর্ব্বল হইবে। সুতরাং বালিকা-বিবাহে কেবল স্ত্রীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় এরূপ নহে, স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সমস্ত জাতিটিই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের দেশে পুরুষদিগের মধ্যেও বাল্য-বিবাহ অপ্রচুর নহে। তৃতীয়তঃ, এদেশে পুরুষরা প্রায়ই দুইবার, তিনবার বিবাহ করে, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা একবার বিধবা হইলে পুনর্ব্বার বিবাহ করে না। এই কথাগুলি বিবেচনা করিলে পুরুষমৃত্যু-হারের সহিত স্ত্রীমৃত্যুহারের অনুপাত অন্যান্য দেশের সহিত সমান কেন আছে তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইবে।

লেখকের দ্বিতীয় যুক্তি—Sir Edward Gait সাহেব বলিয়াছেন যে, হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের বাঁচিবার সম্ভাবনা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের চেয়ে বেশী। Gait সাহেব ইহার কারণও নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন হিন্দুদিগের মধ্যে বিধবার আতিশয্যই ইহার কারণ। লেখক এই কারণ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নন। তিনি বলেন যে হিন্দুদিগের মধ্যে বিধবার সংখ্যা অধিক হইলেও অবিবাহিতার সংখ্যা অতি অল্প; অন্যান্য ধর্ম্মীদিগের মধ্যে বিধবার সংখ্যা অল্প হইলেও অবিবাহিতার সংখ্যা অনেক বেশী। অনুপাতে হিন্দুবিধবা ও অবিবাহিতার সংখ্যা একত্রে অন্যান্য ধর্ম্মীদিগের অবিবাহিতা ও বিধবার সংখ্যার সমান বা কিছু কম। সুতরাং লেখকের মতে হিন্দুবিধবার আতিশয্য হিন্দুরমণীদিগের বাঁচিবার সম্ভাবনার কারণ নহে। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, বিধবার সংখ্যাধিক্যই যদি হিন্দুরমণীদিগের vitalityর কারণ না হয় তাহা হইলে অন্য কোনও কারণ আছে, এবং সেই কারণটী যে হিন্দুদিগের বাল্যবিবাহ নহে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। তাহাই যদি হইবে, তাহা হইলে একই অবস্থার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতি বাস করিলেও হিন্দুরা সংখ্যায় হ্রাস পাইতেছে কেন? হিন্দুরমণীদিগের মধ্যে vitalityর আধিক্য সম্বন্ধে আমরা কয়েকটী suggestion করিতে পারি। প্রথম,—ভারতীয় খৃষ্টান অধিকাংশই হিন্দু এবং অতি অল্পকালই ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে; এই সকল হিন্দু আবার প্রায়ই নিম্নশ্রেণীর। সুতরাং খৃষ্টান রমণীদিগের অপেক্ষা হিন্দুরমণীর

vitality অধিক হওয়া আশ্চর্য্য নহে। মুসলমানদিগের সম্বন্ধেও সেই একই কথা; অসংখ্য নিম্নশ্রেণীর হিন্দু মুসলমান হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ,—হিন্দুবিধবাদিগের সহিত অন্যান্য জাতীয় বিধবার তুলনা করা যায় না; যেহেতু অন্যান্য জাতীয় বিধবাগুলি সেই সেই সময়ে বিধবা থাকিলেও ইহার পূর্ব্বে দুই একবার বিবাহিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু হিন্দুবিধবাদিগের সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না। অবিবাহিতাদিগের সংখ্যাও অনেকটা misleading; যেহেতু, খৃষ্টান ও মুসলমানদিগের মধ্যে অনেকে অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকে, গণনার অল্পকাল মধ্যে তাহারা বিবাহিতা হইয়া পড়িতে পারে। তৃতীয়তঃ,—হিন্দুবিধবাগণ অধিকতর সংযমী, বার, ব্রত, উপবাস তাহাদের শরীরকে ঘাতসহ করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে মদ্য, মাংস, তামাক প্রভৃতি স্বাস্থ্যহানিকর দ্রব্যের ব্যবহার একেবারেই নাই। তাহাদের শক্তি কয়েকটী সুনির্দ্দিষ্ট পথে নিয়োজিত হইয়া অযথা ব্যয় বা ক্ষয় হইতে রক্ষা পায়।

সুতরাং চারুবাবু স্ত্রী মৃত্যু সম্বন্ধে যে দুইটী যুক্তির কথা বলিয়াছেন তাহার একটীও বাল্য-বিবাহ স্ত্রীমৃত্যুর কারণ নহে এরূপ প্রমাণ করে না। আমরা বরং দেখিতে পাই যে, আমাদের দেশে স্ত্রীগণ এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জাতি ধ্বংসের পথে গমন করিতেছে। Martin বলিয়াছেন, "In Calcutta and in Bombay child birth in 1921, entailed death for 25 mothers out of every thousand as compared with less than 4 per thousand in England." ইহা হইতে দেখা যায়, আমাদের দেশের স্ত্রীলোকগণ কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। এই প্রসূতিমৃত্যু ১৫ হইতে ১৭ বৎসরের বালিকাদের মধ্যেই অধিক লক্ষিত হয়। আবার, স্ত্রীলোকদিগের সংখ্যা কিরূপ কমিয়া আসিতেছে দেখুন। বঙ্গদেশে প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা:—

১৮৭১,	১৯০১,	১৯১১,	১৯২১
৯৭৩	৯৬০	৯৪৫	৯৩৪

স্ত্রীলোকদিগের সংখ্যা এরূপভাবে হ্রাস পাইতেছে কেন, তাহা ভাবিবার বিষয়। সাধারণতঃ দেখা যায়, স্ত্রী দুর্ব্বল হইলেই কন্যা অল্প জন্ম গ্রহণ করে। Dr. R. T. Trall বলিয়াছেন, "If the male is older and stronger than the female, the offspring will be more of males than females. It the females are most vigorous the offspring will contain more females." আমাদের দেশে স্বামী স্ত্রী অপেক্ষা বয়সে চিরকালই বড়; পূর্ব্বে বরং বয়সের পার্থক্য যতটা অধিক থাকিত, এক্ষণে স্ত্রী পুরুষে সেরূপ বয়সের পার্থক্য থাকে না। সুতরাং আজকাল কন্যা জন্মানরই অধিক সম্ভাবনা। তাহার পরিবর্ত্তে কন্যার জন্মের সংখ্যা কমিয়া আসিতেছে। তাহা হইতে বুঝা যায় যে, স্ত্রীলোকগণ পুরুষ অপেক্ষা দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। কলিকাতায় যক্ষ্মা রোগের তালিকা হইতে দেখা যাইবে, স্ত্রীলোকদিগের জীবনী-শক্তি কিরূপ ভাবে কমিয়া আসিতেছে। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী অধিক সংখ্যায় যক্ষ্মারোগে হারাইতেছে।

বয়স	হাজার করা পুরুষের মৃত্যু	হাজার করা স্ত্রীলোকের মৃত্যু
১০-১৫	·৪৭	২.১
১৫-২০	১·৪	৭·১
২০-৩০	১.৭	৬.২
৩০-৪০	২·১	৪,৯
সকল বয়সের	১.৬	৩.৭

কেহ কেহ বলিবেন, কলিকাতায় মেয়েদিগের পর্দ্দাই ইহার একমাত্র কারণ। সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু বাল্য-বিবাহও যে ইহার একটী হেতু, তাহা বেশ বুঝা যায়। কেন না ১০ হইতে ১৫ বৎসরের বালিকাগণ খুব অল্পকালই পর্দ্দায় আটকা পড়িয়াছে বলিতে হইবে; তথাপি তাহাদিগের মৃত্যুর হার ঐ বয়স্ক বালকদিগের অপেক্ষা ৫ গুণ বেশী দেখা যাইতেছে। ইহাতে মনে হয় না কি, যে, বালিকাদিগের অধিকতর বাল্য-বিবাহও এইরূপ মৃত্যুর একটী অন্যতম কারণ? (ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে সাধারণতঃ স্ত্রীলোকদিগের জীবনীশক্তি পুরুষদিগের জীবনীশক্তি অপেক্ষা অধিক।)

আমরা দেখিলাম যে প্রকৃতপক্ষে বাল্য-বিবাহে স্ত্রীলোকদিগের জীবনীশক্তি ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইতেছে। সেই সঙ্গে সমস্ত জাতিটাই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। আরও দুই একটী প্রমাণ হইতে তাহা স্পষ্টতর করা যাউক। হিন্দু ও মুসলমান আমাদের দেশে একই অবস্থায় বাস করিতেছে, তথাপি হিন্দুদিগের অপেক্ষা মুসলমানদিগের মৃত্যুর হার অল্প। ইহার এক কারণ, অনেক হিন্দু মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছে। কিন্তু মুসলমানগণ মধ্যে হিন্দুদিগের অপেক্ষা বাল্য-বিবাহ কম হয়, তাহাও একটী কারণ। কেননা যে সকল স্থানে মুসলমান হিন্দু অপেক্ষা দুই গুণ, তিন গুণ বেশী সেই সব স্থানেই লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং যে সকল স্থানে হিন্দু, মুসলমান অপেক্ষা সংখ্যায় তিন গুণ, চারি গুণ, পাঁচ গুণ বেশী, সে সকল স্থানে লোকসংখ্যা অনেক হ্রাস পাইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে কেবল হিন্দুদিগের মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণই মুসলমানদিগের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ নহে। কিরূপ হারে হিন্দু ও মুসলমানগণ মৃত্যুমুখে পতিত হয় দেখুন:—

হাজার করা হিন্দু ও মুসলমানের মৃত্যুর হার:—

বৎসর	হিন্দু	মুসলমান
১৯১১	৩৩.৪	২৯.৫
১৯১২	৩০.৪	২৭.৬
১৯১৩	২৯.০	২৮.৪
১৯১৪	৩০.১	৩০.
১৯১৫	২৯.১	৩২
১৯১৬	২৯.২	২৮.৩

বৎসর	হিন্দু	মুসলমান
১৯১৭	৩৩.৩	৩১.৯
১৯১৮	৬৪.৬	৫৬.১
১৯১৯	৩৬.৪	৩৩.৬
১৯২০	৩১.০	৬০.০

আর একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে হিন্দুদিগের মধ্যে যে সকল জাতির অধিকতর অল্পবয়সে বিবাহ হইয়া থাকে তাহারা অতি দ্রুতহারে ক্ষয় পাইতেছে

শতকরা লোক সংখ্যার হ্রাস—

	তাঁতি	কুমার	সদ্‌গোপ	গোয়ালা
৩.৮	১.০	২.১	৩.১	৯.১

চারুবাবু স্বীয় মত প্রমাণ করিবার জন্ম একটী কৌতুকজনক যুক্তি উত্থাপিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, ১৮৭০ সালে এদেশে যখন প্রথম বিলাতি জীবন-বীমা প্রচলিত হয়, তখন এদেশবাসী অপেক্ষা ইয়োরোপীয়দিগের পরমায়ু অধিক এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কর্তৃপক্ষগণ এদেশবাসীর নিকট হইতে অধিক premium গ্রহণ করিতে থাকেন। কিন্তু ২০, ২৫ বৎসরের মৃত্যুর হার খতাইয়া যখন তাঁহারা দেখিলেন যে এদেশবাসী ও ইয়োরোপীয়গণ সমকালই বাঁচিয়া থাকে তখন তাঁহারা উভয়ের হার সমান করিয়া দিলেন। জীবন-বীমা কেবল সেই সকল লোকই করিতে পারে যাহারা ডাক্তারি পরীক্ষায় অতি স্বাস্থ্যবান্ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। সুতরাং স্বাস্থ্যবান্ ভারতবাসী ও ইয়োরোপীয় সমসংখ্যক কাল বাঁচিয়া থাকে, ইহাতে আর কি আশ্চর্য্য আছে? যদি এরূপ প্রমাণিত হইত যে, ভারতবাসীর শতকরা যত লোক ডাক্তারি পরীক্ষায় জীবন বীমা করিবার উপযুক্ত বিবেচিত হয়, তাহাদের সংখ্যা ঐরূপে নির্দ্ধারিত ইয়োরোপীয় সংখ্যার সমান, তাহা হইলে আমরা স্বীকার করিতাম যে, এদেশবাসীর স্বাস্থ্য ইয়োরোপীয়দিগের অপেক্ষা ন্যূন নহে। ইয়োরোপীয়েরা ভারতবাসী অপেক্ষা অনেক দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকে, তাহা অনেকবার প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে; সুতরাং লেখকের এইরূপ অসম্ভাবিতরূপে তাহা অপ্রমাণিত করিবার চেষ্টা বৃথা।

এক্ষণে দেখা যাউক, শরীরতত্ত্ববিদ্ বিশেষজ্ঞগণ এ সম্বন্ধে কি বলিয়া থাকেন। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি সুশ্রুত সংহিতার মত এ সম্বন্ধে কি। সুশ্রুত বলেন, পূর্ণ ষোড়শবর্ষা স্ত্রীর সহিত ত্রিংশৎবর্ষ বয়স্ক পুরুষের মিলন হওয়া আবশ্যক। ইহা অপেক্ষা উহাদের বয়স ন্যূন হইলে নবজাত সন্তান রোগী, অল্পায়ু বা অধন্য হইয়া থাকে; কিংবা গর্ভ একেবারেই হয় না। বর্ত্তমান কালেও চিকিৎসা-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই কথা বলিয়া থাকেন। বিখ্যাত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, যাঁহার উদ্যোগে এদেশে বিজ্ঞান আলোচনার জন্ম Indian Association for the Cultivation of Science স্থাপিত হয়, তিনিও ঐ মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি সেই জন্ম বাল্য-বিবাহ রহিত করিবার বহু প্রয়াস করিয়াছিলেন। ইহার কারণ বুঝা কঠিন নহে—শরীর ও মন যত দিন পরিণত ও পরিপক্ব না হয় তত দিন তাহার ফলও পরিপুষ্ট ও নির্দ্দোষ হয় না। চারুবাবু বলিয়াছেন যে, Dr Weismann বহু পর্য্যবেক্ষণের ফলে এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে যে সকল জীবকোষ শরীর গঠন ও তাহার পুষ্টিসাধন করে আর যে জীবকোষ সন্তানোৎপাদন করে তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত। ইহা হইতে চারুবাবু এই অনুমান করেন যে যখন পুষ্টিসাধক কোষ সন্তানোৎপাদক কোষ হইতে বিভিন্ন, তখন সন্তানোৎপাদনের বয়স হইতে সন্তান উৎপাদন আরম্ভ করিলে শরীরের কোন অনিষ্ট হইতে পারে না। সন্তানোৎপাদক জীবকোষ ও পুষ্টিসাধক জীবকোষ ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু একটী জীবকোষ অপর জীবকোষটীকে সাহায্য করিতেছে না এরূপ মনে করিবার কি আছে? তাহাই যদি না হইবে তাহা হইলে, শরীর পুষ্ট থাকিলে, সবল থাকিলে, নীরোগ থাকিলে সবল ও নীরোগ সন্তান জন্মগ্রহণ করে কেন? যে পিতামাতা ক্ষীণ তাহাদের সন্তান ক্ষীণ হয় কেন? পিতা বা মাতা জীবনের মধ্য বয়সে (যখন প্রথম সন্তান উৎপাদন করিবার বয়স তাহারা অতিক্রম করিয়াছে অর্থাৎ প্রকৃতিদত্ত সন্তান উৎপাদিকা শক্তি জন্মিবার পর) কোন কঠিন রোগের দ্বারা আক্রান্ত হইলে সেই রোগ সন্তানে সংক্রামিত হয় কিরূপে? আবার শরীর পুষ্টির সহিত শুক্র ক্ষয়ের সম্পর্ক না থাকিলে "ব্রহ্মচর্য্য কর, ব্রহ্মচর্য্য কর" একথা উঠে কেন?

"মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণা।
তস্মাদতি প্রযত্নেন কুরুতে বিন্দুধারণং॥"

এ কথাই বা আসিল কোথা হইতে? Gait সাহেব হিন্দুরমণী-দিগের বাঁচিবার সম্ভাবনা অধিক ইহার কারণ প্রদর্শনে হিন্দুরমণীদিগের বিধবার সংখ্যাধিক্যের কথা তুলিয়া ঐ একই বিশ্বাস প্রদর্শন করিতে-ছেন না কি? শুক্রক্ষয়ে যখন শরীরের ক্ষয় হয় তখন শরীরের পুষ্টিতে যে শুক্রের পুষ্টি হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। আবার পিতামাতার মানসিক অবস্থাও যে সন্তানে বর্ত্তে তাহাতে সন্দেহ নাই। কোন পিতার সুস্থ অবস্থায় কোন সন্তান হইলে দেখা যাইবে সে সন্তানও সুস্থ; আবার সেই পিতা পাগল হইলে পাগল অবস্থায় যে সন্তান হয় তাহাকেও পাগল হইতে দেখা যায়। সুতরাং পিতার মানসিক অবস্থা সন্তানকে আক্রমণ করে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে কিরূপ কন্যা বিবাহ করিতে হইবে সেই সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, "ঐ কন্যা যেন রোগশূন্যা ও অনমান কুলগোত্রসম্পন্না হয় এবং উহার যেন কোন অঙ্গ বিকৃত না হয়।" ইহাতে বুঝা যায়, মাতার অঙ্গের বিকার সন্তান পাইতে পারে। ইহাতে আরও উক্ত হইয়াছে যে "প্রসূতির ভুক্ত পীত অন্নরসাদি গর্ভস্থ জীবের উদরস্থ হইয়া থাকে—" প্রসূতি যদি ক্ষীণাহারী ও অজীর্ণরোগী হয় তাহা হইলে কি গর্ভস্থ সন্তানের সুস্থতার ব্যাঘাত হইবে না? মাতার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা সন্তানকে বিশেষরূপে আক্রমণ করে বলিয়াই গর্ভিণীকে অতি সাবধানে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা সকল সমাজেই লক্ষিত হইবে। গর্ভিণীকে যাহাতে অল্প শ্রম করিতে হয়, গর্ভিণী যাহাতে মনের আনন্দে থাকে—তাহারে আয়োজন করা

হয়। এই জন্যই কোন ছেলেকে লোভী হইতে দেখিলে লোকে বলিয়া থাকে যে, গর্ভাবস্থায় উহার মা কিছু খাইতে ইচ্ছা করিয়া পায় নাই। মনুও এইজন্য বলিয়াছেন যে, সন্তানের জন্য যখন স্ত্রী স্বামীর সহিত মিলিত হইবে, তখন সে পান খাইয়া সাজসজ্জা করিয়া প্রফুল্লমনে স্বামীর নিকট যাইবে। ডাক্তার কার্পেণ্টার বলেন, "That a strong mental impression made upon the female by a particular male will give the offspring a resemblance to him, even though he has had no sexual intercourse with him." মহাভারতে আমরা দেখিতে পাই যে অভিমন্যুও মাতার গর্ভে অবস্থান কালীন ব্যূহ ভেদ করিবার কৌশল শ্রবণ করিয়াছিল, কিন্তু নির্গমনের কথা শুনে নাই; সেইজন্য সে যুদ্ধকালে জয়দ্রথরক্ষিত ব্যূহ ভেদ করিয়া প্রবেশ করিতে পারিয়াছিল কিন্তু বাহির হইতে পারে নাই। সেইরূপ শুকদেব ও কপিল মুনিও গর্ভে থাকিবার কালেই সমস্ত শাস্ত্র অবগত হইতে পারিয়াছিলেন। এই সকল হইতে বুঝা যাইবে যে, আর্য্যগণ অনেক পূর্ব্বেই জানিতেন যে, পিতামাতার স্বাস্থ্য ও জ্ঞান সন্তানে সংক্রামিত হয়। ইহা হইতে প্রমাণিত হইবে যে, স্ত্রী ও পুরুষের শারীরিক ও মানসিক পরিণতির পূর্ব্বেই সন্তান হইলে তাহাতে অনেক দোষ থাকিবার সম্ভাবনা থাকে। প্রকৃতি দ্বারা কোন শক্তি জাগরিত হইয়া উঠিলেই যে সেই শক্তি ব্যবহার করিতে হইবে, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। শক্তিটী সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত, বর্দ্ধিত ও বশীভূত করা আবশ্যক। নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইবার ইচ্ছা প্রকৃতি হইতেই হয় এবং নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইলে নড়াচড়ার দরুণ যে শক্তি ক্ষয় হয়, তাহা প্রকৃতির দ্বারাই পূরণ হয়। তাহা বুঝিলাম, কিন্তু যেখানে সেই শক্তি সন্তান রূপে অন্য এক ফল প্রসব করিবে, সেখানে এই অপরিপক্ক শক্তিকে অপরিপক্ক সন্তান উৎপাদনে নিযুক্ত করিয়া সেই শক্তির বৃদ্ধি করিতে হইবে, প্রকৃতির অভিপ্রায় এইরূপ নহে। যেমন সকল বিষয়েই মানুষের প্রলোভন আছে এখানেও সেইরূপ। যদি কেহ কোন নূতন শক্তি লাভ করে তাহার সাধারণতঃ ইচ্ছা হয় যে সে সেই শক্তির ব্যবহার করে। যে নূতন কোন পদবী লাভ করিয়াছে, সে সেই পদবীর আনুষঙ্গিক শক্তি হেতু একটা চাঞ্চল্য অনুভব করে। মানুষও কৈশোর অবস্থায় এইরূপ দ্বন্দ্বের মধ্যে পতিত হয়। সে একটা উত্তেজনা অনুভব করে, কিন্তু সেই উত্তেজনার বশীভূত হওয়া তাহার পক্ষে কখনই সমীচীন নহে। সেই শক্তির সহিত একটা প্রবৃত্তি জড়িত থাকে। এবং সকল সময়েই মনে রাখিতে হইবে যে, এই শক্তি বীজস্বরূপ; ইহা হইতে অন্য বৃক্ষ ফলিবে; সুতরাং এই বীজ যাহাতে অসময়ে অপরিপক্ক অবস্থায়, অস্থানে উপ্ত না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ইহার পর লেখক সাদৃশ্য ন্যায়ের সাহায্যে বিষয়টী বুঝিবার বা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে সাদৃশ্য ন্যায়ের সাহায্য লইয়া সত্যশরণ সিংহ মহাশয় এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে "কাঁচা বেগুনের বীজে গাছ পুঁতিলে গাছ বড় হলে কুঁকড়ে যায়। তাহাতে ফল ধরে না। নারিকেল, তাল প্রভৃতি গাছের প্রথম বছরের ফুলে ফল ধরে না। গরু ঘোড়া প্রভৃতির প্রথম বিয়ানের ছানাগুলি হয় মরে যায়, না হয় চিরকাল রুগ্ন অবস্থায় বেঁচে থাকে।" এখানে কাঁচা বেগুন অপরিপক্ক বীজের সহিত তুলিত হইতেছে এবং আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি অপরিপক্ক বীজ অপরিণত অবস্থায় গর্ভনিষেকের পরিণাম। সুতরাং তাহার ফল কুঁকড়ান গাছের মতই অঙ্গহীন হইবে। আবার নারিকেল, তাল প্রভৃতি বৃক্ষের প্রথম ফুলে সন্তান হয় না। ইহা হইতে মনে হয় স্ত্রীলোকগণ প্রথম রজোদর্শন করিলেই যে পুরুষের সহিত তাহাকে সঙ্গত হইতে হইবে প্রকৃতির এরূপ উদ্দেশ্য নয়। রজোদর্শনের পরও তাহার শক্তি সঞ্চয়ের আবশ্যক হয়। সকল ফুলেই ফল হয় না বলিয়া যে লেখক এখানে আপত্তি তুলিয়াছেন তাহা খাটে না। প্রথম বারের ফুলে একেবারেই কেন ফল হয় না তাহা বিবেচ্য। প্রথম বিয়ানো গরু, ঘোড়া প্রভৃতি রুগ্ন হয়, এ কথা লেখক স্বীকার না করিলেও, তিনি যদি লক্ষ্য করেন, তবে দেখিতে পাইবেন, বাঙ্গালীদিগের গৃহে গৃহে প্রথম গর্ভ নষ্ট হইয়া যায়। অনেকে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, যে বৃক্ষে অতি অল্পবয়সে ফল ফলিতে আরম্ভ হয় সে বৃক্ষ আর অধিক বৃদ্ধি পায় না; প্রথম যে ফল উৎপন্ন হয় তাহা আশানুযায়ী বড় হয় না এবং প্রথমবারে অধিক ফলও ফলে না। অনেক সময় কোন কোন বৃক্ষে ফল ধরিবার আগে তাহার ডালপালাগুলি কাটিয়া দিলে সেই সকল বৃক্ষে প্রচুর ফল ফলিয়া থাকে। প্রথমে ফল হইতে না দিয়া তাহাকে বর্দ্ধিত করিবার জন্যই এরূপ ব্যবস্থা করা হয়। অনেক পেঁপে গাছে ফুল হয় কিন্তু ফল হয় না; সেই সকল পেঁপে গাছের মাথা কাটিয়া দিলে তাহাতে ফল ফলিয়া থাকে। যথেষ্ট বৃদ্ধি না পাইয়া ফুল প্রসব করাই ইহার বন্ধ্যাত্বের হেতু বলিয়া মনে হয়। কাজেই সাদৃশ্য ন্যায়ও বাল্য বিবাহের অনুকূল নহে। কিন্তু প্রকৃতির সহিত মানুষের সম্বন্ধ ঠিক পশুপক্ষী, গাছপালার ন্যায় নহে। প্রকৃতিকে মানুষ প্রতিপদে অতিক্রম করিতেছে, এবং সেই অতিক্রমের ফলে প্রকৃতির এই বিদ্রোহী সন্তানটী পশুপক্ষী হইতে একটী বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে। মানুষের স্বভাব পশুপক্ষীর স্বভাব হইতে বিভিন্ন। মানুষ ঘর নির্ম্মাণ করে, খাদ্য পাক করে, রোগ হইলে ঔষধ প্রয়োগ করে। সেইজন্য সে পশু পক্ষীর ন্যায় উদাসভাবে নিজেকে প্রকৃতির অন্ধশক্তির অধীনে ছাড়িয়া দিতে পারে না। প্রকৃতি চালিত জীবজন্তু উত্তেজনা হইলেই গর্ভনিষেক করিয়া থাকে, মানুষকে নিজের প্রকৃতির গঠন বুঝিয়া অপেক্ষা করিতে হয়। পশুপক্ষী যেখানে সেখানে গর্ভনিষেক করে, মানুষ তাহা পারে না। মানুষ জানে, নিকট আত্মীয়ের সহিত মৈথুন বংশনাশকর। বিজ্ঞান বলে, যদি একই রক্ত চিরকাল মিশ্রিত হয়, তাহা হইলে সেই রক্তের সজীবতা ও নবীনতা শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়; এরূপ রক্ত হইতে যে সন্তান জন্মে সে সন্তান নিকৃষ্টতা প্রাপ্ত হয়। "One cause of human deterioration is family marriages. It has almost extinguished most of the royal families of Europe." হিন্দুরাও এ কথা জানিতেন; সেই জন্যই সগোত্রে

বিবাহ নিষিদ্ধ। পশুপাখী, জীবজন্তুগণ এ সব নিয়ম মানিয়া চলে না। তাহারা মৈথুন বিষয়ে পিতামাতা, ভ্রাতা-ভগিনী, নিকট দূর কিছুই গ্রাহ্য করে না। মানুষের এ কার্য্য এখানে নির্দ্দিষ্ট. সীমাবদ্ধ। পশুর ন্যায় সকল সময় সে প্রকৃতির অনুবর্ত্তন করিতে পারে না। মানুষের মধ্যে দুইটী প্রকৃতি রহিয়াছে :—একটী স্বভাবজ প্রবৃত্তি, আর একটী চৈতন্যময়ী বিবেকসম্পন্ন বিচারশক্তি। এই দুইটী শক্তির সমন্বয়ে মানুষ; মানুষের শরীরে দুইটীই কার্য্য করিতেছে। সে অন্যান্য জীবজন্তু হইতে একটু বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং সেইজন্যই যে পশু-প্রকৃতি অন্যান্য পশুর পক্ষে অমঙ্গলকর নহে, সেই পশু-প্রকৃতি মানুষের ধাতের সহিত খাপ খায় না। শরীরের উপর যেমন শারীরিক যন্ত্রের আধিপত্য আছে, সেইরূপ মানুষের মনের অনুভূতি প্রভৃতিও কার্য্য করিয়া থাকে। এই অনুভূতির বলেই মানুষ নিজের আত্মীয়স্বজনের সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে না। অনুভূতিকে উপেক্ষা করা চলে না; অনুভূতি বহুকালকার সঞ্চিত ন্যাস; তাহার দ্বারা মানুষের system অনেকটা গঠিত। যেখানে পাশবিক উত্তেজনার ফলে কোন পশু মৈথুন কার্য্য করিয়া একটা আনন্দ পাইয়া থাকে, সেখানে সেই প্রবৃত্তিই আবার সেই পাশবতার দ্বারাই মানুষের মনে প্রতিক্রিয়া আনয়ন করে। সেই প্রতিক্রিয়া শরীরের পক্ষেও অমঙ্গলকর। বিজ্ঞান পরীক্ষাগারে যে খুব delicate balance থাকে, তাহাতে অতি সূক্ষ্ম জিনিষেরও ভার ধরা পড়ে; ধান ওজনের পাল্লাতে একসের ধান দিলেও তাহার কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না। মানুষের শরীরটী নানা কারণে এইরূপ একটী delicate balance; নানারূপ জটিল, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ভাব, অনুভূতি, মনন, ধ্যান প্রভৃতির সহিত জড়িত। সেইজন্য যদি পশু-পক্ষী প্রবৃত্তির তাড়নায় কোন কাজ করে, তাহাতে তাহাদের যে অনিষ্ট হয়, তাহা অতি অল্প; অনেক সময় চোখে ধরা পড়ে না। কিন্তু মানুষ সেই কাজ করিলে তাহার জটিল যন্ত্রটী বিকল হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। সাদৃশ্য ন্যায়ের সাহায্য লইবার সময় এই কথাগুলি বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। প্রকৃতির দিকে চাহিলে আর একটী সত্য সকলের দৃষ্টিগোচর হইবে। যে প্রাণী যত দেরীতে গর্ভধারণ করে, তাহারা তত উচ্চশ্রেণীর প্রাণী। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎকুণ প্রভৃতি জন্মাবার অতি অল্পকাল পরেই গর্ভধারণ করিয়া থাকে; কুকুর, বিড়াল আরও কিছু বেশী সময় লয়; গরু, ঘোড়া, হাতী তাহা অপেক্ষাও অধিক সময় লয়, মানুষ প্রথম গর্ভধারণ করে অনেক পরে। আবার এই গর্ভের স্থিতিকাল ও একই কালে প্রসবের সংখ্যার তারতম্যেও নিম্ন ও উচ্চ-শ্রেণীর জীবের মধ্যে পার্থক্য দৃষ্ট হইবে। মানুষ গর্ভধারণ করিয়া এক-কালে কেবল একটী সন্তান প্রসব করিয়া থাকে। মানুষের ছেলের হাঁটিতে বা চলিতে শিখিতেও বেশী সময় লাগে। ইহার কারণ বোঝা কিছু কষ্টকর নহে; একটী উচ্চাঙ্গের প্রাণীকে জন্ম দিতে হইলে অধিক শক্তিসঞ্চয়ের প্রয়োজন হয়। আমাদের প্রাচীন পুরাণাদিতেও এইরূপ ধারণার অস্তিত্ব আছে। যেখানেই কার্ত্তিক প্রভৃতি বীরের জন্মবিষয়ে বর্ণনা আছে, সেইখানেই দেখা যাইবে, গর্ভ বহুকাল পরে হইয়াছিল ও বহুকাল স্থায়ী হইয়াছিল। মানুষ বিবর্ত্তনের ফল; সে ক্রমে ক্রমে নিজের শক্তির চালনার দ্বারা নিজেকে পরিবর্ত্তিত করিয়া অসীমের দিকে চলিয়াছে। তাহার যেমন গর্ভধারণ করিতে অধিক সময় লাগে, সেইরূপ অন্য জীবজন্তু প্রথম গর্ভধারণ শক্তিলাভের পর যত শীঘ্র গর্ভধারণ করিতে রত হয়, মানুষ ঐ শক্তিলাভের পর তাহা অপেক্ষা অধিক সময় অপেক্ষা করে।

আর অধিক আলোচনা আবশ্যক বোধ হয় না। চীন, জাপান, রাসিয়া, তুর্কী ও মাউরী প্রভৃতির কথা লেখক তুলিয়াছেন; কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা অল্প স্থানের মধ্যে অসম্ভব। অতএব দুই একটী কথা বলিয়াই নিরস্ত হইব। যদিও ঐ সকল জাতির মধ্যে অল্পবিস্তর বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল বা আছে, তথাপি তাহারা নিজেরাই উদ্যোগী হইয়া ঐ অনিষ্টকর প্রথার উচ্ছেদ করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। রাসিয়ার সর্ব্বত্র বাল্যবিবাহ প্রচলিত নয়;—জাপান বাল্যবিবাহ তুলিয়া দিয়াছে, তুরস্ক বাল্যবিবাহ তুলিয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, সুতরাং এই সকল জাতি প্রকারান্তরে বাল্যবিবাহের অনিষ্টকারিতা স্বীকার করিয়াছে। চীনাদের সৈন্য দুর্দ্ধর্ষ হইলেই যে সমস্ত চীন দেশটি সবল, সুস্থ ও দীর্ঘজীবী, ইহা মনে করিবার কারণ নাই। মাউরীজাতি বন্য ও পরিশ্রমী; সুতরাং স্বভাবতঃ তাহাদের দেহের গঠন শক্ত হইবে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে মৃত্যুহার বেশী নয়, বা বাল্য-বিবাহ না থাকিলে তাহারা যেরূপ সুস্থ ও উন্নতিশীল জাতি হইতে পারিত, তাহা কে নির্ণয় করিয়াছে? আমাদের দেশে বাগ্দী, বাউরি, প্রভৃতি জাতি শারীরিক শক্তিতে ভদ্রলোকশ্রেণী অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ; তথাপি তাহাদের মৃত্যুর হার ভদ্রলোকদিগের অপেক্ষা বেশী। বাগ্দী জাতি শতকরা ১১·৮ ও বাউরি জাতি ৩·৪ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। আবার কোন সময় বিশেষে কোন জাতির সৈন্য দ্বারা দেশ বিশেষ জয় করিলেই যে সেই বিজেতৃজাতি সুস্থ ও সবল বা বাল্যবিবাহ না থাকিলে যেরূপ সুস্থ ও সবল হইতে পারিত সেইরূপ আদর্শানুমোদিত এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। সৈন্যের বহরেই সমস্ত দেশের সাধারণ শক্তির বিচার করা যায় না। এই বিষয় ঠিক্ ভাবে বিচার করিতে হইলে চীন, জাপান প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল তথ্য উপস্থিত করা আবশ্যক ছিল, লেখক তাহা করেন নাই। এদিকে আবার লেখক যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগকে বেশী বয়সে বিবাহের সহিত সম্পর্কিত করিয়াছেন। বড় বড় সহর, কলকারখানা, বদ্ধ বায়ু, পর্দ্দা, ব্রহ্মচর্য্যের অভাব, রোগের সংক্রমণতা—ইহারাই হইল যক্ষ্মারোগের জন্মদাতা। এ সকল কথা ছাড়িয়া দিয়া লেখক কেবল নিজের সুবিধার জন্য অন্য কারণ নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

যাহা হউক, যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতেই বাল্য-বিবাহের দোষ অনেকটা পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। অকালমৃত্যু ছাড়া, বাল্যবিবাহ অকালমৃত্যু অপেক্ষাও অনেক অধিক দোষের আকর। মানুষের যাহাতে

সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল, তাহা একটী দ্বাদশবর্ষবয়স্কা, সংসারজ্ঞানহীনা বালিকাকে বহন করিতে নিয়োজিত করার ন্যায় পাপ আর নাই। সে সকল কথা নাই তুলিলাম; কিন্তু অনেক অকালমৃত্যুও কি এই অবিবেচক বালিকাদিগের অজ্ঞতা, সংযমহীনতা, দায়িত্ব-বোধহীনতারই ফল নহে? ছেলে যদিই বা আঁতুড় ঘর হইতে জীবন লইয়া বাহির হইতে পারে—তথাপি কি সে মাতার অপটু নায়কত্বে দুশ্চরিত্র, মদ্যপানাসক্ত হইয়া অকালমৃত্যু ও জীবন্ত মৃত্যু প্রাপ্ত হয় না? সে সকল বিষয় এ প্রবন্ধের আলোচ্য নহে বলিয়া, আমরা এইখানেই ক্ষান্ত হইলাম। শেষে কেবল বলিতে চাই, দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, অপরিচ্ছন্নতার সহিত বাল্যবিবাহও বাঙ্গালীর অকালমৃত্যুর একটী প্রধানতম হেতু। এ কথা অস্বীকার করিলে শত্রুবেষ্টিত শশকের ন্যায় গর্ত্তের মধ্যে মুখ পুরিয়া নিজেকে নিরাপদ ভাবার ন্যায় হইবে।

পিয়ারী

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল

১৮

পাপিয়া বহি পড়িতেছিল; আর অমল বিছানায় শুইয়া শুনিতেছিল। একটা উপন্যাস। নায়িকা প্রাণ ঢালিয়া ভালো বাসিয়াও নায়কের মন পাইতেছে না,—নায়ক এক পাষাণীর প্রাণের দ্বারে মাথা কুটিয়া মরিতেছে—তবু সে পাষাণী ফিরিয়া দেখিতেছে না। যখন পাষাণীর কাছে লাঞ্ছনার একশেষ পাইয়া নাকাল, তখন হঠাৎ পথে কে গাহিয়া উঠিয়াছে—

কাছে আছে দেখিতে না পাও,
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও!

নায়ক তখন বিহ্বল চিত্তে ভাবিতে লাগিল, কে এ... কাছে কে আছে!...

এইখানটা পড়িতে পড়িতে পাপিয়ার বুক বেদনায় ভারী হইয়া আসিল, তার কণ্ঠ যেন কে চাপিয়া ধরিল!... দুই চোখ বহিয়া ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছিল। এত দুঃখ সত্যই তবে কেহ সহিয়াছিল···তারি মত, এমন প্রচণ্ড, এমনি তীব্র বহ্নি-দাহ!...মহাপুরুষ, মহাপুরুষ এ বইয়ের লেখক, নারীর অন্তরের বেদনা এমন করিয়াও জানিয়াছেন! না জানিলে নায়িকার এই অসহ্য দুঃখ তুলির রেখায় এমন করিয়া কখনো লিখিতে পারিতেন না! এ যে তার সঙ্গে হুবহু মিলিয়া যাইতেছে—নায়িকার অতি-ক্ষুদ্র দীর্ঘনিঃশ্বাসটুকু অবধি!...

চোখের জলে বইয়ের পাতা এমন অস্পষ্ট ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল যে আর পড়া চলে না।

পাপিয়া বই পড়া থামাইয়া কাঁদিতে বসিল। প্রাণ ভরিয়া কাঁদিল।

অমল বলিল,—থামলে যে চপলা...

পাপিয়া কহিল,—আর পড়তে পাচ্ছি না। কমলার এত দুঃখ.. বড় কষ্ট হয় যে! চেষ্টা করিয়াও পাপিয়া তার স্বরে অশ্রুবারির জড়তাটা ঘুচাইতে পারিল না।

হাসিয়া অমল কহিল—এ যে বইয়ের গল্প পড়চো! এ কি সত্যি...?

পাপিয়া কহিল,—হোক গল্প—তবু জীবনেও তো এমন হয়!

অমল আবার হাসিল, হাসিয়া কহিল,—তুমি পাগল হয়েছ!

—না গো, পাগল নই আমি। আমি যে মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের দুঃখ তুমি তো···

—তোমাকেও কি এমন দুঃখ পেতে হয়েছে না কি...?

পাপিয়া শরাহতের মত চমকিয়া অমলের পানে চাহিল—অমলের ঠোঁটের কোণে হাসির বিদ্যুৎ তখনো মিলাইয়া যায় নাই।...নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর···পাইতে হইয়াছে কি! পলে পলে যে বেদনা সে সহিতেছে, তাহা তোমার অতি চমকপ্রদ কোনো উপন্যাসে আজ পর্য্যন্ত কোনো লেখক তুলির লেখায় ফুটাইয়া তোলে নাই! ফুটাইবার সাধ্য কি! কালির আঁচড়ে এ বেদনা ফুটানো যায় না···এ বেদনা

ফুটাইয়া দেখাইতে গেলে বুকের মাঝে শির ছেঁড়া রক্তে তুলি রঞ্জিত করিতে হইবে যে !...

অমল কহিল,—এইতেই ধরা পড়ে যাচ্ছ চপলা... তোমার মন যে কতখানি কোমল, কি দরদে ভরা,— উপন্যাসে লেখা মিথ্যা নরনারীর দুঃখে এত বিচলিত হও—! সত্যই তুমি দেবী...

কি ক্রূর পরিহাস, অদৃষ্টের এ কি মর্ম্মঘাতী নিদারুণ ব্যঙ্গ !...তবু এ কি নাগপাশেই যে তাকে আঁটিয়া বাঁধিয়াছে, মুক্তি নাই, মুক্তি নাই...এ বাঁধন কাটিয়া পলাইবার তার কোন উপায়ও নাই। সে জানে, আর ক'টা দিন মাত্র... তারপর তার প্রকাণ্ড ছলনা ধরা পড়িয়া যাইবে, আর সে... অদৃষ্টে যাই থাক, সুধার পাত্র যখন অধরের সামনে এমন করিয়া ধরা আছে, তখন মৃত্যু আসন্ন বলিয়া ভয়ে কাতর হওয়া নয়,...এ সুধা যতটা পারি পান করিয়া ধন্য হই।—

অমল বলিল,—পড়তে কষ্ট হয় তো থাক্—আর পড়ো না।...মোদ্দা লেখাটা ভালো এমন জায়গায় থেমে থাকলে ভারী অস্থির থাকতে হয়—কি হলো শেষে, বেচারী কমলার...

উছলিত আগ্রহে পাপিয়া কহিল,—তোমার দুঃখ হচ্ছে না কমলার দুঃখে—?

অমল কহিল,—তা হচ্ছে বৈ কি। তা বলে তোমার মত কাঁদবো—এ তো রচা গল্প কথা চপলা...

তারপর মৃদু হাসিয়া কহিল,—এ তো আমার চপলা নয়, আমার জীবনের একমাত্র সত্য...যে তার দুঃখে আমার চোখে জল পড়বে !...তবে দুঃখ হয়। বড় লিখিয়ের লেখার শক্তিই এই, তাঁর কল্পিত নরনারীর সুখে আমরা আনন্দ পাই, তাদের দুঃখে আমাদের প্রাণ বেদনায় ভরে ওঠে !...

পাপিয়া কহিল, তুমি আমায় তো ভালবাসো...পাপিয়ার কথা বাধিয়া গেল। আর সে কিছু বলিতে পারিল না।

অমল কহিল। বাসি তো...তারপর...? বল...

পাপিয়া কহিল,—আমি যদি এই দুঃখ ভোগ করি, নৈরাশ্যের এমন তীব্র যাতনা...তাহলে...পাপিয়ার যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল। সে আর কিছু বলিতে পারিল না—বেদনা তার কণ্ঠরোধ করিয়া ধরিল।

অমল কহিল,—তাহলে আমি কি করি জানো...? যে হতভাগার জন্যে তুমি এত দুঃখ পাচ্ছ, ঠিকানা পেলে আমি গিয়ে তার কা'ণ দুটা আচ্ছা করে মলে দি...আর চাবুকের ঘায়ে তাকে এনে তোমার পায়ের উপর তার মুখখানা গুঁজড়ে ধরি...

পাপিয়ার আর সহ্য হইল না, এ বেদনার যে সীমা নাই গো!...পাছে সব গোপনতা ভাসিয়া আসল সত্যটা প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই ভয়ে সে ঘর হইতে ছুটিয়া বাহিরে বারান্দায় আসিয়া পড়িল এবং বারান্দার এক কোণে পড়িয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল—ওগো, সত্যই কি তাই!— সত্যই কি পাপিয়ার বেদনা তুমি বুঝবে, এমনি দরদ করিয়া এমনি সহানুভূতির পুঞ্জিত ধারায়...তবে কি সত্যই আজ তোমায় প্রকাশ করিয়া বলিব গো, এই ছদ্মবেশ, ছলনার পূর্ণ প্রকাণ্ড জাল ছিঁড়িয়া চূর্ণ করিয়া—কে আমি!... হায়, তুমি কি তা বিশ্বাস করিবে—যে পাপিয়া তোমার একটু ছোট্ট সুখের জন্য আজ হাসিমুখে মরণের কোলে ঝাঁপ দিতে পারে—আর যে চপলার জন্য তুমি পাগল, সে কতবড় পাষাণী...! এ ছদ্ম অভিনয়ে তোমায় ভুলাইয়া রাখিতে পাপিয়ার বুক যে আজ ভাঙ্গিয়া খান্‌খান্ হইয়া যাইতেছে—তার নারীত্ব যেটুকু শুভ্র মহিমায় কালি বাঁচাইয়া মর্ম্মের এককোণে লুকাইয়া পড়িয়া ছিল, সেটুকু যে এ ভাণ, এ মিথ্যার আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে!... মানুষের প্রাণ তো...কত সয় আর!...

কিন্তু না, সে কি পাগল হইয়াছে! এ তো উপন্যাস নয়, এ যে জীবন—নির্ম্মম কঠিন ভীষণ জীবন!..এখানে একফোঁটা অশ্রুজলে মানুষের মন ফেরে না, একটা কাতর দীর্ঘশ্বাসে আর একটা প্রাণের গতিও বাঁকিয়া অন্য পথে ছুটিয়া চলে না!...চোখের জল এখানে শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে, দীর্ঘশ্বাস নীরবে বাতাসে মিলাইয়া যায়; সত্যকার জীবনে তার কোন মূল্যও নাই...! তা যদি থাকিত তাহা হইলে এই পৃথিবীই আজ স্বর্গ হইত, বেদনার মেঘও আজ পৃথিবীর বুকে কালো দাগের মত তাকে মলিন করিয়া রাখিত না...!...

রাত্রে অমল বলিল,—আর ক'দিন আছে চপলা?

পাপিয়া কহিল,—আজ সতেরো দিন হলো।

অমল কহিল—আর তেরো দিন পরে তোমায় দেখতে পাবো।...

পাপিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

অমল কহিল,—এই তেরোটা দিন যদি এই আজ রাত্রের একটি ঘুমে কাটিয়ে দেওয়া যেতো চপলা...অমল হাত বাড়াইল। পাপিয়া বুঝিল, অমল তাহাকে পাশে চাহিতেছে!...তার মন ক্ষুব্ধ হইল, কিন্তু মনকে কেন আর এ আকাশ-কুসুমের স্বপ্ন দেখানো, এ মরীচিকায় প্রলুব্ধ করা বৈ তো নয়!—তবু তেরোটা দিন! দীর্ঘকাল! হায় রে! অমল চাহিতেছে এই একটা রাত্রির মাঝেই যে তেরোটা দিনের অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া যায়। আর সে...? সে চায় এই তেরোটা দিন যেন আর শেষ না হয়...!

অমল কহিল,—কাছে এসো চপল...আমার হাতে হাত দাও...

পাপিয়া তাই করিল—অমলের হাতে হাত রাখিল। অমল তাকে টানিয়া বুকের কাছে আনিল,ডাকিল,—চপল...

পাপিয়া কহিল,—কি বলছো?

অমল কহিল,—আমার অন্ধতা ঘুচলে আমায় তুমি ফেলে যাবে!...বল—বল—তা যদি যাও তো কাজ নেই আমার চোখের দৃষ্টি ফিরিয়া এনে—আমি যেন চির-অন্ধ হয়েই থাকি!

পাপিয়া কহিল, ছি, ও কথা কি বলতে আছে...আমি তুচ্ছ নারী...

অমল কহিল,—তুচ্ছ নারী...! তুমি দেবী...

পাপিয়া কহিল—দেবীই বটে! স্বর্গ আমায় কামনা করছে!

অমল কহিল,—আসবেই তো অন্ধের প্রতি পূর্ণ মমতায়; ভগবানও তো অন্ধ নয়! পাপিয়া কথা কহিল না।

অমল কহিল,—কিন্তু একটা কথা চপল! আমার চোঁখ সারবে, আমি রোজ রোজ তোমায় দেখবো, এ আশায় আমার যে আনন্দ ধরচে না—কিন্তু তুমি কেন সে রকম আনন্দ প্রকাশ করছো না;—তুমি কেন দূরে সরে সরে যাচ্ছো...তবে কি আমায় তুমি ছেড়ে যাবে...আমার এ অসহায়তা ঘুচলে...

পাপিয়া কহিল,—তুমি যদি তাড়িয়ে না দাও, তো আমি কোথাও যাবো না—কোথাও না—স্বর্গ পেলেও নড়বো না। কিন্তু তুমি কি আমায় সহ্য করতে পারবে—এই ভয়েই আমি শিউরে শিউরে উঠচি......

অমল কহিল,—ও কথা বলো না—আমি এত বড় অকৃতজ্ঞ নই যে......

পাপিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিল,—আমি যে কত বড় ছলনাময়ী, কত বড় ছলনা অন্ধ অবস্থায় পেতে তোমাকে কি মোহেই ভুলিয়েছি, এ জানতে পারলে তুমি আমার গলা টিপে মেরে ফেলবে;......

ক্ষুব্ধ অভিমানে অমল কহিল,—আবার!...মোহ, ছলনা—এমনি মোহে আমায় তুমি চিরদিন ভুলিয়ে রাখো—এ ছলনা আমার যে আজ কাম্য......

হায় অন্ধ, সত্যই তুমি অন্ধ বেচারা!

১৯

একমাস কাটিয়া গিয়াছে। কাল সকালে অমলের চোখের ব্যাণ্ডেজ খোলা হইবে। আনন্দের উল্লাসে, উত্তেজনায় অমলের চিত্ত মুহুর্মুহু আন্দোলিত হইতেছে—আর পাপিয়া...ঝরা ফুলের মত তার মুখ শুকাইয়া ম্লান, মুখে তার কথা নাই—চোখের দৃষ্টি উদাস, অসহ্য কাতরতায় ভরা। এ কয়দিনে সে এমনি শীর্ণ হইয়া গিয়াছে যে, তাকে দেখিলে মনে হয় কোন্ দুশ্চর তপস্যায় তনু তার ক্ষীণ, যৌবনোজ্জ্বল জীবন্ত পাপিয়ার এক বিবর্ণ ছায়ার মত সে এই জীর্ণ গৃহে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে!...আর এই একটা রাত্রি! আজ মহীয়সীর পরিপূর্ণ মহিমায় ভরিয়া ওঠা চাই...তারপর কাল সকালে জীর্ণ মলিন রিক্তের মত তাকে পথে বাহির হইতে হইবে! এই একটি রাত্রি যা রাজাসংহাসনের রাণীর মহিমায়...কাল সকালে সর্ব্বহারা নিঃস্ব ভিখারিণী...!

অমল বারবার অনুযোগ করিতেছিল, চপলা যেন তাকে ছাড়িবার উদ্যোগ করিতেছে—এ আনন্দের মাঝখানে তাকে যেন সে ভুলিয়া যাইতেছে...! এ দুঃখ যে অমলের বড় বাজিতেছে—চোখ ফুটিলেও যে তার সব আনন্দ উবিয়া যাইতেছে!......

পাপিয়া কহিল,—কিন্তু অন্ধ ছিলে বলেই না তুমি আমায় সহায় চেয়েছিলে! আর এখন তো সহায়ের দরকার নেই!...তার পর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, এই অন্ধতার আবরণ ছিল বলিয়াই না তাকে অমল মালিন্য-কলঙ্কের স্পর্শলেশহীন শুধু নারী বলিয়াই ভাবিতে পারিয়াছে। কাল চোখ চাহিয়া যখন দেখিবে, এ নারীর সর্ব্ব অবয়বে পাপের গভীর কালি তাকে কি কালো

করিয়া রাখিয়াছে, মুখে চোখে কালির গভীর রেখা! মন তার নারীত্বের লাঞ্ছনায় পাথর হইয়া আছে…… তখন… ?

অমল কহিল—তুমি যেই হও,…যদি তুমি আপত্তি না কর, তা হলে তোমায় আমি চির দিন এমনি পাশটিতে রেখে আমার জীবনকে সার্থক করবো।…আর কিছু না হোক, অকৃতজ্ঞতার পাপেও যে আমি লিপ্ত হতে চাই না—এত বড় সেবায় কি কৃতজ্ঞতাও কিছু নেই চপলা, যে, তুমি বার বার এই সব যা-তা ভেবে আমায় ক্ষুণ্ণ করছো, অপমানিত করছো…

পাপিয়া কহিল,—কিন্তু এই ভয়েই যে আমি সর্ব্বক্ষণ শিউরে কুণ্ঠিত হয়ে আছি…

—না, না—কোন কুণ্ঠা, কোন ভয় নেই, চপলা। সমাজ তার ভ্রূকুটি নিয়ে এলেও, আমি তার সামনে দাঁড়িয়ে দম্ভভরে বলতে পারি, এই নারী আমার সেবায় তার প্রাণ পণ করেছিল…এ নারী যেই হোক, সমাজের চোখে সে যতই লাঞ্ছনার যোগ্য হোক্—আমার কাছে দেবী। যদি তার আপত্তি না থাকে, তো এই নারীকে আমি বিবাহ করবো—এবং আমার ক্ষুদ্র জীবনে তাকেই সঙ্গিনী করে সহধর্ম্মিণী করে আমার যা ক্ষুদ্র কর্ত্তব্যটুকু, তা সযত্নে পালন করবো।…সমাজ শত ধিক্কার দিলেও, এই আমার পণ…

পাপিয়া অবিচল চিত্তে অমলের কথাগুলি শুনিল।…তবু ভয় কি ঘোচে…এ যে কত বড় ছলনার অন্তরালে দাঁড়াইয়া সে এ সেবা করিয়াছে—সে ছলনার কি শাস্তি নাই!…

তবু রাত্রি নিবিড় হইয়া আসিল। পাপিয়াকে জোর করিয়া কে সাজাইয়া অমলের কাছে পাঠাইয়া দিল। এই একটি রাত্রির জন্ত তার জীবন আলোয় প্রদীপ্ত হইয়া উঠুক, যৌবন বসন্তের পরিপূর্ণ শ্রীতে ভরিয়া উঠুক, দেহ মন এই একমাত্র পুরুষকে সেবা করিয়া, তাকে তৃপ্তি দিয়া সার্থক হউক…নৈরাশ্যের অকূল সমুদ্র—কা'ল তো সে সমুদ্রে ভাসিতেই হইবে। তবু কালিকার সে দুর্ভাবনায় আজিকার এ আগত পুলককে ঠেলিয়া নাই রাখিলাম! আপনাকে সে অসঙ্কোচে অমলের হাতে সঁপিয়া দিল—নাও বঁধু, আমায় নাও…আমার জীবনের আজিকার এ শেষ পূজা তুমি গ্রহণ কর, গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হও, প্রসন্ন হও…! কা'ল অন্ধকার আসিবে বলিয়া আজ এ আলোর দীপ্তিকে তো অন্ধ হইয়া ঠেলিয়া রাখা যায় না!

রাত্রির অন্ধকার ঠেলিয়া আলোর ছটা ফুটাইয়া পাখীর গানে দশ দিক ভরাইয়া প্রভাত আসিয়া দেখা দিল। পাপিয়া কম্পিত বক্ষে গিয়া গঙ্গায় স্নান করিয়া আসিল। তার পর অমলের মুখ হাত ধোয়াইয়া তার জন্য জলখাবার আনিয়া দিল।

অমল কহিল,—আর এ কতটুকু সময়…তার পর… চপলা—আজ আমার পুনর্জ্জন্ম! সব দৈন্য ঘুচিয়ে আজ আমায় তুমি রাজাসনে বসিয়ে দেবে! ‥

পাপিয়া দৃঢ় অটল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, কোন কথা কহিল না। কথা কহিবার তার শক্তিও ছিল না। সে পাষাণ মূর্ত্তির মত নিশ্চল! শুধু দম খাওয়া পুতুলের মতই নিত্যকার কাজ করিতেছে! মনের ভিতর তার কোন অনুভূতি নাই—চিন্তার প্রচণ্ড আঘাতে মন তার সত্যই পাষাণ হইয়া গিয়াছে!…

বেলা আটটা—ঐ ডাক্তারের গাড়ী! পাপিয়ার মনে হইল, মৃত্যুর আহ্বান আপনা হইতে ঘনাইয়া আসিতেছে—তবু তার কর্ত্তব্য—বড় কঠিন, তবু এ বড় কর্ত্তব্য!…নিজের হাতে নিজের মৃত্যুবাণ সে আগাইয়া দিয়াছে! অনুশোচনায় সে অস্থির হইয়া উঠিল। সে তো বেশ ছিল এই অন্ধকে লইয়া; এই ঘন ছায়ার অন্তরালে—সে যে সকল সুখে সুখী ছিল। নিজের প্রাণে তৃপ্তির যে সীমা ছিল না!…তবু… না—মানগোবিন্দই তাকে শিখাইয়াছে, যাকে ভালবাসো তার তৃপ্তি আগে খোঁজো, নিজের সুখ বলি দিয়াও, তাকে সুখী কর!…বেশ! সেই ভালবাসাই তার লক্ষ্য হউক! বেদনা—সে তো পাইতেই হইবে! এ যে কত পাপের শাস্তি!…প্রায়শ্চিত্ত কি নাই তার!…

ডাক্তার আসিয়া বলিলেন—এবার চোখ খুলবো—

পাপিয়া অবিচল মূর্ত্তিতে ডাক্তারের কাজে সাহায্য করিল—তার পর ডাক্তার চোখের ব্যাণ্ডেজ খুলিতে লাগিলেন। পাপিয়ার সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল, পায়ের নীচে পৃথিবী ভূমিকম্পের প্রচণ্ড দোলে দুলিয়া উঠিল টলিতে টলিতে সে সে-ঘর হইতে আসিয়া পাশের ঘরে মূর্চ্ছিতের মত মেঝেয় লুঠাইয়া পড়িল। বুকের মধ্যটা এমনি দুলিতেছিল, এমনি তার প্রচণ্ড শব্দ, ধ্বক্-ধ্বক্…

যে পাপিয়া আর সব ভুলিয়া গেল। সেই শব্দটাই তার কাণের কাছে ভীষণ হুঙ্কারে গর্জ্জন করিতে লাগিল। যেন এ শব্দ ছাড়া দুনিয়ায় আর কিছু নাই, রূপ রস স্পর্শ, কি তাদের কিছু মাত্র না......

ঐ পাশের ঘরে কার হাসির উচ্ছ্বাস—না? না বাতাসের গর্জ্জন!...ঐ—না বাহিরে পাখী ডাকিতেছে! ঐ যে। ঐ যে...না গঙ্গার বুকে নৌকার দাঁড় পড়িতেছে! ওঃ ভগবান, ভগবান, এ কি রকম মুহূর্ত্ত যার বেদনায় জর্জ্জরিত করিবার জন্য তাকে আজও বাঁধিয়া রাখিয়াছে!—

সত্যই সে চরম ক্ষণ আসিল।...অমল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিল—আলো, আলো—চপলা কোথায় তুমি, আমার কাছে এসো, তোমায় আমি দেখি।

ডাক্তার বাইরে আসিলেন। তাঁর পয়সা কড়ি আগের দিন তাঁকে পাঠানো হইয়াছিল—এত দূরে আসিয়াছেন—তিনি আর দাঁড়াইলেন না, কি কয়টা ফর্দ্দ করিয়া দিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। ঐ তাঁর মোটরের হর্ণ...ঐ গাড়ী চলিয়া গেল! পাপিয়ার মনে হইল, গাড়ীটা যেন বুকের উপর দিয়ে তার বুকের হাড় পাঁজরা কখানাকে ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিয়া দিয়া গেল!—তার যেন সব শেষ হইয়া গিয়াছে...মৃত্যু, মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ তাকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। এই যে হাত-পা অবশ! নড়ে না—কে যেন পেরেক আঁটিয়া তাকে এই মেঝের সঙ্গে আঁটিয়া দিয়া গিয়াছে!...

—চপলা—চপলা—অমলের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর!—হারে দুর্ভাগিনী!

অমল বাহিরে আসিল—কোথায় তুমি, কোথায় গেলে?...

অমল আসিয়া পাশে দাঁড়াইল। মুচ্ছিতের মত লুণ্ঠিত পাপিয়াকে ধরিয়া তুলিয়া ডাকিল, চপলা—

পাপিয়া অমলের পানে চাহিল। অমল শিহরিয়া উঠিল,—তুই...

সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

পাপিয়া আকুল চোখে অমলের পানে চাহিল!

অমল চলিয়া গেল, নিজের ঘরগুলা খুঁজিল। কোথায় চপলা...?

ক্রোধে ক্ষেপিয়া সে আবার ফিরিয়া আসিয়া উত্তেজিত স্বরে কহিল—কোথায় সে—চপলা! কোথায় তাকে লুকিয়ে রেখেছিস্, বল...

পাপিয়া কোন কথা কহিল না। নির্জ্জীবের মত উদাস-নেত্রে অমলের পানে চাহিল।

অমল কহিল,—তুই তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিস্—শয়তানী...

পাপিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া অমলের পায়ে হাত দিল, কহিল!—আমায় মাপ কর...

অমল গর্জ্জন করিল—তাকে কোথায় তাড়ালে, বল, বল এখনি...

পাপিয়া কাতর কণ্ঠে কহিল,—তাকে তো তাড়াইনি ..

অমল কহিল—তবে সে গেল কোথায়?

—কে?

—চপলা।

পাপিয়া সজোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিল। কহিল,—চপলা এখানে ছিল না—কোন দিন তো আসেও নি এখানে!

আসেনি! অমল বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইল।...তাও কি সম্ভব!...তার পরে কহিল,—মিথ্যা কথা। এই সেবা, এ যত্ন,.. আমার অন্ধতায় তার ঐ দরদ—তারপর আমায় সারিয়ে তোলার জন্য এই চেষ্টা, এই অজস্র পয়সা ব্যয়...

পাপিয়ার মন অভিমানে ফুলিয়া উঠিল; সে আর মনের আবেগ চাপিয়া রাখিতে পারিল না, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল,—সে আসেনি গো, কোনদিনই আসেনি সে......

—তবে?

—আমি পোড়ারমুখীই...তার ছদ্মনাম নিয়ে অন্ধ তুমি, তোমার সঙ্গে ছলনা করেছি..... বরাবর, এতদিন...সে তোমার জন্য থিয়েটারের টিকিটও পাঠায়নি...তারপর তোমায় দেখবে বলে সে রাত্রে মোটর গাড়ীতে অনেক সেধেছি—সে ফিরেও চায়নি! আমিই তোমার তখনকার ঐ ব্যাকুল-ব্যথিত দৃষ্টি দেখে তার মর্ম্মও বুঝেছিলুম।—কিন্তু......পাপিয়া হাঁফাইতে লাগিল।

অমল কহিল,—ছলনা, ছদ্মনাম......তাহলে চপলা আমার সেবা করেনি,...সে তুমি...?

—সে আমি, সে আমি গো!...সেদিন পিছনে হৈ হৈ

শব্দ উঠলো—আমি গাড়ী দাঁড় করিয়ে চাকরকে পাঠালুম। সে যে খবর দিলে...আমি স্থির থাকতে পারলুম না···তার পরে যা হলো, তুমি সব জানো...অন্ধ তুমি, কে তোমায় দেখবে, তাই আমি এসেছিলুম.. কিন্তু আমার পরিচয় পেলে যদি আমার সেবা না নাও, তাই, শুধু তাই গো, তার নামে পরিচয় দিয়েছিলুম......

অমল কহিল,—কিন্তু এর কারণ জানতে পারি কি ?

পাপিয়া কহিল,—অন্ধ, অসহায় তুমি,—কে দেখবে, তাই ! তাই···

অমল কহিল,—তাই···?

পাপিয়া কহিল,—হাঁ,—তার বেশী—সে যে দুরাশা—তার লোভও হয়েছিল, কিন্তু সে অনেক পরে। প্রথমে এ দুরাশার কথা মনে ছিল না—তোমার আদরে ও প্রশ্রয়ে তা দেখা দেছে—আজ তুমি সেরে উঠেছ—আজ আর আমায় সাহায্য করতে হবে না...বেশ, চলে যাচ্ছি—হাসপাতালেই থাকতে যদি, কি বাড়ীতেই থাকতে যদি তো একটা দাসী কি চাকরের সাহায্য তো দরকার হতো ···ভেবো আমি সেই দাসী কি চাকরেরই কাজ করেছি। তুমি যে দৃষ্টি ফিরে পেয়েছ, তাই আমার চূড়ান্ত পুরস্কার ! —এর বেশী তোমার কাছে প্রত্যাশাও করিনি কখনো, তার কামনার দুরাশাও আমার নেই। ছলনা করে যে অপরাধ করেছি, তার জন্য মাপ করো—ছলনাময়ী গণিকা আমি—ছলনাই ব্যবসা আমাদের······

অমল স্থির হইয়া সব কথা শুনিল ; তারপর ধীরে ধীরে গমনোদ্যত হইল।—পাপিয়া কহিল,—কোথা যাচ্ছ ?

অমল কহিল,—চপলার সন্ধানে। তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারলুম না···

অমল চলিয়া গেল, পাপিয়া কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া তাহা দেখিল।

(ক্রমশঃ)

হিমালয়ের পত্র

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এ-এম-এ-ঈ, এম- আর-এ-এস (লণ্ডন)

(দ্বিতীয় পত্র)

৺কেদারনাথ ধাম
২৬ শে মে ১৯২৪

দিদি,

দেবপ্রয়াগ হ'তে আপনাকে পত্র লিখেছিলাম। আজ আমি ৺কেদারনাথে—বারো হাজার ফিট উঁচু, তুষার-মৌলি হিমালয়ের উপত্যকায়। দার্জ্জিলিং প্রায় ছয় হাজার ফিট উঁচু। সেই অনুপাতে আমি কত উঁচুতে আছি বুঝুন। হরিদ্বার হ'তে আশী ক্রোশ পদব্রজে এসেছি। এখান থেকে সত্তর ক্রোশ রাস্তা হেঁটে বদরিকায় যাবো।

লক্ষ্মণঝোলা হ'তে দেবপ্রয়াগ পর্য্যন্ত গঙ্গাকে বামে রেখে এসেছিলাম, সেখান থেকে রুদ্রপ্রয়াগ পর্য্যন্ত অলকানন্দাকে বামে রেখে এসেছি। রুদ্রপ্রয়াগে অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর সঙ্গম হ'য়েছে। বৃহৎ লৌহসেতু (suspension bridge) হ'তে সফেণ বিক্ষুব্ধ নদী সঙ্গমের ও স্বল্প-বৃক্ষ পর্ব্বতমালার দৃশ্য দেখলাম। কেদার ও বদরিকার রাস্তা দুটীরও সঙ্গম হ'য়েছে এখানে। এক রাস্তায় অলকানন্দাকে বরাবর বামে রেখে উত্তর-পূর্ব্বে অনেকদূর গেলে বদরীনারায়ণ মেলে। অন্য রাস্তাটী লৌহসেতু পেরিয়ে মন্দাকিনীর তীর দিয়ে, ক্ষুদ্র সহরটীর মধ্য দিয়ে, ঠিক উত্তর মুখে কেদারে গেছে। আমরা সেই রাস্তায় কেদারে এসেছি।

মসৃণ রাস্তার দু'ধারে একশ' দেড়শ'খানি একতালা দোতালা বাড়ী ; দোকান, ডাক-বাংলা, ধর্ম্মশালা, পোষ্ট এবং টেলিগ্রাফ অফিস এবং ক্ষুদ্র কয়টী মন্দির ও আম গাছ ল'য়ে রুদ্রপ্রয়াগ সহর। প্রাচীন মন্দিরটী কয়েক বছর আগে বন্যায় ভেসে গেছে। সহর থেকে অনেকগুলি

পাথরের ধাপ নেমে মন্দাকিনীর শীতল জল পান করলাম।

মহাপ্রস্থান কালে ভীম সেন যেখানে দেহত্যাগ করে-ছিলেন, সেখানে মন্দাকিনীর পুল পেরোলাম। মন্দাকিনীকে বরাবর ডান দিকে রেখে আমরা এখানে এসেছি।

আপনাকে লিখেছি যে পাহাড়ের গা কেটে রাস্তা তৈরী হয়েছে। সেই উঁচু-নীচু রাস্তা দিয়ে আমরা এ-পাহাড়, ও-পাহাড়, এ-নদী, ও-নদী এবং ছোট-বড় অনেক জলপ্রপাত অতিক্রম করে এসেছি। কি মিষ্ট, শীতল ও হজমী জল এই দেশে! দশ ক্রোশ হেঁটে এসে দু আঁজলা জল খেলে সমস্ত শ্রমের অপনোদন হয়, ক্ষুধা পায় এবং গভীর নিদ্রায় দেখতে দেখতে রাত্রি কেটে যায়। নির্ঝরিণীর কলগানে, পাখীর কূজনে যাত্রী জেগে ওঠে। পুস্তকে লেখা আছে এবং অনেকের মুখে শুনেছি, যে, এপথে ঝরণার জল খেলে পেটের অসুখ হয়। কেউ কেউ গঙ্গাজলও ফুটিয়ে নিয়ে পান করতে বলেন। ঔষধ-পত্র, আহার্য্য, শয্যা এবং গাত্রবস্ত্রের যে ফর্দ্দগুলি তাঁরা পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন, তা' পড়লে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। সাধারণ গৃহস্থেরা অত ব্যয় করতে পারবেন না ভেবে কেদার-যাত্রার সঙ্কল্প ত্যাগ করেন। আমার কিন্তু ওষুধ সুরা, চা বিস্কুট, ওভার-কোট নেই। আঁজলা আঁজলা ঝরণার জল, বনের কুল, ছোলা গুড়, মোটা রুটী ও একঘেয়ে কুমড়ার তরকারী খেয়েছি, বিশ মাইল চড়াই উৎরাই অতিক্রম করেছি, অথচ আমার এক দিনের জন্যও সর্দ্দি হয় নি, পা ফোলে নি বা মাথা ধরে নি। ব্রহ্ম-চীন সীমান্তের অরণ্য মাঝারে একছড়া কলা ও একটি আধপাকা পেঁপে খেয়ে এক দিন ছিলাম। মাঘের রাত্রি জৈসলমের মরুভূমিতে আকাশ-তলে শুয়ে কাটিয়েছি,—পথ হারিয়ে-ছিলাম, চটি পাইনি। টাকা ফুরিয়ে গি'ছলো, এবং কলকাতা থেকে টাকা যেতে দেরী হচ্ছিলো। অগত্যা মৈসুরে আমি, কর্জন পার্কের সন্নিকটবর্ত্তী "পূর্ণেয়ার চৌলট্রী" নামে অতিথি ভিখিরীদের জন্য যে অন্নসত্র নির্দ্দিষ্ট আছে, তথায় ভিক্ষান্নে তিন দিন প্রাণধারণ করে অন্ধের পাশে শুয়ে রাত কাটিয়েছিলাম—কৈ সরঞ্জামের অভাবে এক দিনের জন্যও তো আমার ভ্রমণ বন্ধ করতে হয়নি! সন্ন্যাসী খোলা গায়ে কেদারে এসেছেন। আলস্য ও বিলাসিতার প্রভাবে আমরা দুর্ব্বল হ'তে দুর্ব্বলতর হ'য়ে পড়ছি—বাড়ী থেকে বেরুলেই ঠাণ্ডা লাগবার ভয় করি। Murray's Guide Bookএর সরঞ্জামের তালিকা অথবা Shackletonএর দক্ষিণ মেরুর অভিযানের রসদপত্র স্বাধীন জাতির পক্ষে প্রযোজ্য,—পরাধীন ভারতবাসীর পক্ষে নহে।

মহাপ্রস্থানকালে ভীম যেখানে দেহত্যাগ করেন, মন্দাকিনী-তীরের সেই ভিরি চটীতে ভীমের মন্দির আছে। সেথা আমরা এক রাত কাটাই। অর্জ্জুন বিশ্ব কেদারে কিরাত-

বিশ্বনাথের মন্দির, ত্রিযুগীনারায়ণ

বেশী মহাদেবের প্রসাদে পাশুপত অস্ত্র লাভ করেন সেখানে গিছলাম। ত্রিযুগী নারায়ণ-তীর্থে গিছলাম খাড়া চড়াই, দুর্গম রাস্তা। বনের মধ্যে। সেখানে হরগৌরীর বিবাহ হয়। বিশ্বনাথ মন্দিরে বিবাহের যজ্ঞকুণ্ড আছে। কুণ্ডে বিবাহের কাল হ'তে অদ্যাবধি, ত্রিযু ধরে, হোমানল জলছে—সন্ন্যাসীরা অহোরাত্র হো করছেন—সে অনলের নির্ব্বাণ নেই! কাঠের পর কা দেওয়া হচ্ছে। আমিও দিলাম। দেবীর বিবাহের বে সমন্বিত বিশ্বনাথ মন্দিরের আলোক-চিত্র নিয়েছি। ত্রিযু

নারায়ণ জনপদটী হিমালয়ের একটি উচ্চ উপত্যকায় অবস্থিত। অনেকটা সমতল ক্ষেত্র, শস্য-শ্যামল। যব, তামাক, গম হয়েছে। গ্রামের পিছনে—আকাশ-চুম্বী তুষার-কিরীটিনী পাহাড়। কে যেন পাহাড়ের উপরে রাশি রাশি চূর্ণ ছড়িয়ে রেখে দিয়েছে। তদুপরি যখন মধ্যাহ্নের রবি-কিরণ প্রতিফলিত হয়—এমন চক্ চক্ করে

চড়াই পথ

সে শৃঙ্গ—কি বলবো! চোখ ঝল্‌সে যায়। স্থানটী মনোরম, নির্জ্জন। বিহঙ্গের কল-গানে উপবন মুখরিত। মেয়েদের চাঁদমুখ। গৌরী হিমালয়ের কন্যা উমা বলেই বোধ হয়। কিন্তু ফটো নিতে দিল না।

হিমালয়ে আমি বাংলার মত সমতল, শস্যশ্যামল, এবং বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে কয়টী রমণীয় উপত্যকা দেখেছি, "অগস্ত্যমুনি" তন্মধ্যে একটি। মখমলের মত উজ্জ্বল শ্যামল। ধান, গম প্রভৃতির ক্ষেত। কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে যাত্রী যাবার রাস্তা। মেটে নরম রাস্তা। রাস্তার দুই পাশে বুক ভোর উঁচু প্রাচীর—রাশি রাশি ছোট বড় নুড়ি জড় করা প্রাচীর। কথিত আছে, এখানে একটি হ্রদ ছিল। প্রাকৃতিক অবস্থা দেখে তাই অনুমান হয়। ভূতত্ত্ববিদেরা বলেন,—সমগ্র হিমালয়ই একদা সমুদ্রের গর্ভে নিমজ্জিত ছিল। কেবল দক্ষিণ-ভারত তখন ছিল সেই জলধি-বক্ষে দ্বীপের মত ভাসমান। পরে আরাবল্লী বা অর্ব্বুদ পর্ব্বত (আবু) সমুদ্র ভেদ করে ওঠে। তৎপরে হিমালয়। কাশ্মীর অঞ্চলে সামুদ্রিক জীবজন্তুর কঙ্কাল পাওয়া গেছে। হিমালয় যে সমুদ্র-গর্ভে ছিল তার অন্যান্য প্রমাণ আছে। সুতরাং 'অগস্ত্যমুনির' হ্রদ নিয়ে থাকা বিচিত্র নয়।

স্থান-মাহাত্ম্য, কৌলিন্য, প্রাচীনতা এবং ভয়াবহ ও সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য হিসাবে 'উখী মঠ' ও 'গুপ্ত কাশীই' কেদারের নীচে।

অনন্তের আভাস

দুই সারি অতি দীর্ঘ, অতি উচ্চ তরঙ্গায়িত হিমশৃঙ্গ, প্রায় সমান্তরাল, উভয়ের পাদ দেশের ব্যবধান শত হস্তের অধিক নয়, স্কন্ধ ভাগের ব্যবধান এক ক্রোশ হবে। উভয়ের মধ্যে বিশটা মনুমেণ্টের মত গভীর খদ। পূর্ব্ব-দিকের সেই তরঙ্গায়িত পর্ব্বত বক্ষে উখীমঠ অবস্থিত। যাঁরা লাসার ছবি দেখেছেন তাঁরা উখী মঠের চিত্র অনুধাবন

ক'রতে পারবেন। শীতের ছ'মাস কেদারনাথের মন্দির বরফে ঢাকা থাকে। সে সময়ে ৺কেদারনাথ উখী মঠে এসে অধিষ্ঠান করেন। উখী মঠ হ'তে খদের ওপারে অর্থাৎ পশ্চিমে মেঘের আকৃতি পর্ব্বতের বক্ষদেশে গুপ্ত কাশীর বাড়ীগুলি অতি ক্ষুদ্র ব'লে মনে হয়। উভয় স্থান ঠিক সামনা-সামনি। মনে হয় কাছে। কিন্তু তিন হাজার ফিট উৎরাই ও খাড়া চড়াই পথে খদ অতিক্রম করে ওই স্থানে যেতে অনেক পরিশ্রম হয়। পাহাড়ীরা বোঝা লয়ে অবলীলাক্রমে যাতায়াত করে কিন্তু!

তুঙ্গনাথ

গুপ্ত কাশীতে এবং তাহার উপকণ্ঠবর্ত্তী 'নালা'তে বৌদ্ধ যুগের এবং ব্রাহ্মণ্যযুগের—শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের—নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। স্তূপ, বোধিসত্ব, এবং হিন্দু দেবদেবীর মন্দির ও মূর্ত্তি, শিলালিপি, ও বিবিধ কারু-কার্য্য ও অলঙ্কার খোদিত তক্ষণ মূর্ত্তি আছে। আলোক-চিত্র নিয়েছিলাম। সেগুলি পরিস্ফুট হয়নি। কয়টী হিন্দু মন্দির আছে, তাদের গঠন দেখলে স্তূপ বলে ভ্রম হয়। উদয়গিরির যেরূপ 'ইন্দ্রকিল্লা' আছে, নালার মন্দিরগুলির পশ্চাতে সেরূপ একটি চত্বর বিদ্যমান। তার পাশে 'খুজা পথ' নামে নিম্নমুখী রাস্তা। এক প্রান্তে উঁচু কাঠের দোলা আছে, প্রাচীন শিল্পের নিদর্শন। একটি পাথরের বেদী বা গদি আছে। এই জনপদ বহু প্রাচীনকাল থেকেই ধর্ম্মের কেন্দ্রস্থল।

দার্জ্জিলিং, শিলং, মেমিয়োতে যেরূপ নর্দ্দামা ও পানীয় জলের পাইপের সুবন্দোবস্ত দেখেছি এবং সে সব দেশের কৃষিক্ষেত্রে জলসরবরাহের জন্য যেরূপ পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মিত হয়েছে—বিশেষতঃ মৈসুর রাজ্যে—অতি প্রাচীনকালে গুপ্ত কাশীতেও সেরূপ ব্যবস্থা ছিল। এই প্রবন্ধের সহিত মুদ্রিত গুপ্ত কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরের চিত্রের নিম্নে দেখুন—কুণ্ডতে বা চৌবাচ্ছায় দুটী পিতলের গোমুখ দিয়ে ঝরণার জল পড়ছে। সেই জলকুণ্ডের এবং মন্দির-প্রাঙ্গণের তলদেশ দিয়ে এবং মন্দিরের সিংহ-দ্বারের সম্মুখস্থ যাত্রীপথের নিম্ন ভাগ দিয়ে নর্দ্দামার মত, অতঃপর জলপ্রপাতের মত, ধাপে ধাপে পাষাণ-গাত্র প্লাবিত ক'রে সেই ধারা অবশেষে সেই গভীর খদে পড়ছে।

ছবির পশ্চাতে, অর্থাৎ পশ্চিমে, পাহাড় দেখছেন। পূবে, অর্থাৎ মন্দিরের সম্মুখে, যাত্রী যাবার রাস্তা, তার পরে খদ—ওপারে উখীমঠের বাড়ীগুলি তাসের খেলাঘরের মত দৃশ্যমান। মন্দিরের ডাইনে ও বামে, অর্থাৎ উত্তর দক্ষিণে লম্বা গুপ্তকাশী সহর। অল্পবিস্তর নক্সা করা কাঠের থামওলা ঘেঁসাঘেঁসি পাথরের বাড়ী। সবই প্রায় বসত বাড়ী। তাদেরি সংলগ্ন দোকানঘর, গোয়ালঘর, কামার-শালা, মদের দোকান, ধর্ম্মশালা, পোষ্ট অফিস প্রভৃতি দোতালা বাড়ীগুলির উপর তলে বাসগৃহ, নীচে কাপড়ের বাসনের, মুদীর ও মনোহারী দোকান প্রভৃতি। প্রাচীন কালে ভারতবাসীরা সামাজিক ও ধর্ম্মসঙ্গত ক্রিয়া উপলক্ষে মন্দিরে অথবা সংঘারামে মিলিত হতেন। অপরাধী বিচার, সামাজিক সমস্যার সমাধান, উৎসব পার্ব্বণ, ধর্ম্ম কর্ম্ম, ভোজনের ব্যবস্থা ও সমাপন, সাপুড়ের সাপ খেলানো যাত্রা, কথকতা, ছেলের কর্ণবেধ, শিক্ষা প্রচার সমস্ত নাকি সেখানে সম্পন্ন হ'ত। রেঙ্গুনের শোয়েডেগু প্যাগোডায় এবং শাণ-কাচিন-চীন দেশের ফুঙ্গা চঙে আমি একালেও তাহার কিছু কিছু লক্ষ্য করেছি। মারাঠীরা ভবানী মন্দিরে 'কথা' উপলক্ষ করে রাজনৈতিক গুপ্ত মন্ত্রণা করতেন। দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলি

[উ]জ্জয়িনীর মহাকাল মন্দির, জৈসলমেরের জৈনমন্দির, [ক]ামাখ্যার মন্দির ঐরূপ উৎসব পার্ব্বণে মুখরিত। গুপ্ত [ক]াশীর বিশ্বনাথ মন্দিরেও তাই। নানা দিক্ দেশ হ'তে [স]মাগত যাত্রীরা, জটা-কৌপীনধারী সন্ন্যাসীরা, নানা কাজে [ম]ন্দিরের প্রাঙ্গণে ও প্রকোষ্ঠে নিযুক্ত। কেহ কুণ্ডে স্নান, [ব]িশ্বনাথের অর্চ্চনা করছেন। দ্বারী নাটমন্দিরের ছাদে [ঝ]োলান ঘণ্টাটি ঢং ঢং করে বাজাচ্ছে—সামগানে মন্দির ও হিমালয় মুখরিত। শত সহস্র বছর ধরে গোমুখ দিয়ে ঝর

গুপ্তকাশীর পথে শ্রীশরৎচন্দ্র চন্দ্র

[ঝ]র করে জল পড়ছে। চসমাধারী কেদারখণ্ড পড়ছেন—[ন]ানা শ্রেণীর যাত্রী তাঁর সম্মুখে বসে। জননী ছেলেকে [ক]োলে শুইয়ে তার মাথা চাপড়ে ঘুম পাড়াচ্ছেন। ধর্ম্ম [ক]থাও শুনছেন। কেহ শাস্ত্রের তর্ক করছেন। কেহ [চ]ালকুটীর ব্যবস্থা করছেন। কেদার থেকে যাত্রী নেমে [এ]সেছেন। তাঁরা সেই ভয়াবহ স্থানের দুর্গমতা ও প্রচণ্ড [শ]ীতের কথা—সকালে বরফ কেটে কিরূপে চটীগুলির দরজা [খ]োলা হয় তার কথার উল্লেখ করছেন। উনি দোকান [থ]েকে সওদা করে এলেন। তিনটা বাজলো। "কেদার-নাথ স্বামী কি জয়" বলে বৃদ্ধা লাঠি ধরে উঠলেন। কেদার যাবেন। তাঁর কন্যা পুটলি মাথায় তুলে তাঁর সঙ্গ নিলেন। একে একে অনেকেই উঠলেন। সকলেরই চোখে উৎসাহ। মন্দিরের প্রাঙ্গণটী প্রায় ষাট হাত লম্বা এবং ত্রিশ হাত চওড়া। তার পশ্চাতে প্রাচীর ও পাহাড়—আর তিন ধারে যাত্রী থাকার ঘর, দালান, এবং ঠিক মধ্যস্থলে পেরেক-মারা বৃহৎ সিংহদ্বার আছে। আমরা একটি দালানে ছিলাম। সঙ্গে ক'জনা বাঙ্গালী বৈষ্ণবী ছিলেন—বৃন্দাবন থেকে এসেছেন। আমরা তিন দিন গুপ্ত কাশীতে ছিলাম। সেই অবকাশে সাবান দিয়ে কাপড় কেচে নিই। ক্যামেরার পায়া সেরে নিই এবং কম্বল কিনি। সহযাত্রী ফ্লানেলের জামা তৈরী করিয়ে নিলেন। যদি কিনতে হয়, আমার মতে কলকাতা থেকে

নীহারস্রোত, কেদারনাথ

কম্বল প্রভৃতি ভারী বোঝা সঙ্গে নিয়ে আসবার দরকার নেই। গুপ্ত কাশীতে সবই পাওয়া যায়। এ পথে এক এক সের জিনিস নিয়ে আসতে প্রায় ২৲ হিসাবে ভাড়া দিতে হয়েছে, ঝঞ্ঝাটও অনেক। পূর্ব্বে আমরা বেশী শীত পাইনি। গুপ্ত কাশী থেকে শীত আরম্ভ হ'ল। ২॥০

টাকা সেরের ঘী এবং কিছু আটা ও চিনি কিনে নিলাম। কেদারে দাম বেশী হবে। কলকাতা হ'তে যে আহার্য্য দ্রব্য আনা গিছলো তা' ফুরিয়ে আসার দরুণ কাণ্ডীওলার বোঝা ক্রমেই কমে আসছে। সুতরাং ঘী প্রভৃতি নিতে কাণ্ডীওলা আপত্তি করবেনা। কাণ্ডী ঝাঁপানওলারা মোটা রুটী ও নুন খেয়ে জীবন ধারণ করে। আমাদের কাছ থেকে হলুদ, লঙ্কা, আচার, ছুঁচ, সুতা প্রভৃতি চায়। পেলে বড় খুশী হয়। তারা কষ্টসহিষ্ণু ও প্রফুল্লচিত্ত।

গুপ্ত কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির

বিশ্বনাথের পাশে অর্দ্ধনারীর মন্দির আছে। মন্দির-গুলি সহস্রবর্ষাধিক প্রাচীন হ'বে। গর্ভ-মন্দিরটী কিরীট-কলস-শোভিত। তৎসমক্ষে নাট-মন্দির। গঠন ও স্থাপত্য খাঁটি হিন্দু ভাবের, তবে বরফের দেশ বলে ছাদগুলি ভিন্ন ধরণের, যা কেবলমাত্র হিমালয় প্রদেশেই দেখা যায়।

সহরের এক প্রান্তে একেবারে পাতাল-স্পর্শী খদের ধারেই একটি বৃহৎ বাংলা বাটী আছে। যাত্রীদের মধ্যে বিশেষ ধনী ও রাজারা সে বাটীতে থাকেন। সেখান থেকে হিমালয়ের যে বিরাট শোভা দেখা যায়, তা ভোলবার নয়। আমার শ্রদ্ধেয়, শিক্ষিত বন্ধু শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চন্দ্র ওরফে "বেচাচন্দ্র" মহাশয় দাসদাসী আত্মীয় স্বজন সমভিব্যাহারে সে বাটীতে ছিলেন। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ পর্য্যটন করেছেন। এই প্রবন্ধের সমস্ত আলোক চিত্রগুলি তাঁরই তোলা। 'নালা' হতে একটি রাস্তা খদের মধ্যে নেমে ও পুনরায় চড়াই পথে উঠে উখীমঠের ভিতর দিয়ে বদরীনাথে গেছে।

নানা স্থান হতে বরফের পাহাড়ের বিচিত্র দৃশ্য দেখেছি। খুব উঁচুতে উঠেছিলাম—বন্ধুর, পিচ্ছিল ও অতীব সঙ্কীর্ণ পথে। স্থল বিশেষে পথ দেড় হাতের অধিক চওড়া নয়। মনে করুন, দেড় হাত চওড়া পথ, মসৃণ পাথরের, প্রতি পদক্ষেপে হড়কাবার ভয়। ডাইনে গভীর খদ। সে খদ অন্ততঃ বিশটা মনুমেণ্টের মত গভীর। বামে আমাদের ঠিক পাশেই যে শৃঙ্গটী একেবারে খাড়া বা সোজা ভাবে দণ্ডায়মান, তার শিখর দেখা যায় না। বহু নিম্নে মন্দাকিনী। খদের মধ্যে বায়ু-প্রবাহ ছুটেছে—যেন দূর থেকে পাঞ্জাব মেলের শব্দ আসছে। ওপাশের পাহাড়ে নানা আকারের জলপ্রপাত। এদিকে আমি কয়টী জলপ্রপাতের ওপরকার সেতু দিয়ে এসেছি। স্থান বিশেষে স্বচ্ছতোয়া নির্ঝরিণী আমাদের যাবার রাস্তা দিয়েই চলেছেন। এ পাথর থেকে ও পাথরে, ও পাথর থেকে সে পাথরে এমনি কোরে পার হ'লাম। গুহার মধ্য দিয়ে পথ—বৃহৎ, গভীর গুহা। অতিক্রম কালে—মাথার উপরিভাগের

গুহার ফাটল চুয়ে বারিধারার মত অতি শীতল জল প'ড়ল।

ওক, আখরোট, খোবানী, তেজপাতা ও লাঠির বাঁশের অরণ্য মধ্যে এসেছি। সে অরণ্য মাঝারে গোলাপ, চামেলী,

তুষারের দৃশ্য
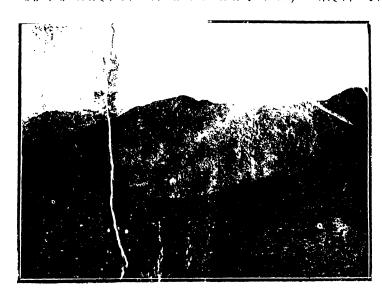
কাঠমল্লিকা ও অজানা সুগন্ধি ফুলের কুঞ্জ। রাশি রাশি ফুল। প্রাণ মাতোয়ারা করে দেয়। আমার অজানা, অদেখা কত রকম গাছ আছে। বিশল্যকরণী ও ওষধি-লতা। গোলঞ্চ দেখলাম। অম্ল-মধুর গৌরী ফলের ও বুনো কুলের গাছগুলি ফলের ভারে অবনত। ফল খেলে তৃষ্ণা দূর হয়। আখরোটের কাঁচা ফল পাড়লাম। নখ দিয়ে খুঁটে শুঁকে দেখলাম, কর্পূর ও জায়ফল একত্রে মেশালে যেরূপ গন্ধ হয় সেরূপ গন্ধ।

সেই বিরাট বনস্পতির রঙীন পাতার ফাঁকের মধ্য দিয়ে, তার অতি ঊর্দ্ধে ঝুলন্ত বেতসীলতার বৃহৎ পত্রপুষ্পের এবং দোদুল্যমান অর্কিডের মধ্য দিয়ে ঈষৎ পীতাভ আলোকমালা চুপি সাড়ে এসে এক ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করেছে। পলাশের মত ঘোর লাল ফুলের গাছ—করবী ফুলের পাতার মত তার সরু সরু লম্বা লম্বা পাতাগুলো শাখায় এমনি নেপ্‌টে থাকে যে, দেখলে মনে হয় যে, লক্ষ ফড়িং ডানা গুটিয়ে ঘুমুচ্ছে। এই ফুল সাহেবদের বড় প্রিয়—নাম Rhododendron। এই ফুল কাশ্মীর উপত্যকায় অত্যধিক পরিমাণে জন্মায়। ঝাউ গাছ ব্যতীত এমন একটিও গাছ দেখলাম না, যা ঢালু পাহাড়ের গায়ে ঠিক সোজা ভাবে দাঁড়িয়ে।—প্রত্যেকেই সেই খদের বা আলোকের দিকে হেলে আছে। কেউ কেউ বেজায় হেলে আছে—হিমালয় যেন হাত বাড়িয়ে আছেন। কেউ বা বৃহৎ প্রস্তর শিকড় দিয়ে আঁকড়ে ধরে আছে। একটি গাছের কাঁধে অন্য গাছ এবং শাখাগুলির গায়ে শেওলা ও শুঁয়ো পোকার মত লতাগুল্ম। উই-ঢিবি দেখলাম। ক্ষীণকায়া প্রস্রবণ ঢেকে দাঁড়িয়ে ছোটো ছোটো গাছের শ্রেণী—শাখাগুলির মাঝে মাকড়সার জাল। স্যাঁৎসেঁতে, আধো-আঁধার স্থান, সোঁদা গন্ধ।

নানাবর্ণের ফুলফল, লতাপাতাওলা এক আখরোট জঙ্গলে,—দু'হাত চওড়া বন-বীথিকার ধারে, শৈবাল-মাখা পাথরের উপরে, পা ছড়িয়ে বসে আমি বিশ্রাম করলাম এবং গাছে হেলান দিয়ে আলো ও ছায়ার, ফুলের ও পাতার

বরফের নদী—'মামা' কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ

লুকোচুরি খেলা দেখলাম। আর নির্ঝরিণীর কলতান ও পাখীর আবাহন গান শুনলাম। সকাল—বেলা আটটা বেজেছে। "বৌ কথা কও", বুলবুল, ডাহুকী, কোকিল, পাপিয়ার ঐক্যগান। সে গানের, সে শীসের বিরাম নাই। বেলা বাড়ছে—বসন্তের আলো, বসন্তের অনিল।

তন্ময় হ'য়ে বসেই আছি—নির্জ্জন সেই বনবীথিকায়, সঞ্চারিণী দীপশিখার মত, দুইজন পার্ব্বত্য রমণী, তাঁ'দের রূপের প্রভায় বনপ্রান্ত আলোকিত করে গুটি গুটি আমার সকাশে এলেন। * * * মার নাম রত্নী, মেয়ের নাম হীয়ুঁলী। মা'র নাকে দু'টী মুক্তার নথ—মেয়ের মাথায়

বৃদ্ধ মহিলা কাণ্ডী মধ্যে

শীষফুল নামে মন্দিরের চূড়ার মত অলঙ্কার দেখলাম। কিচমিচ ও মিছরি পেয়ে তারা খুসী হ'ল। ছুঁচ সুতা চেয়েছিলো।

একদল হনুমান দেখলাম। ছোটো কালো মুখ, সাদা দাড়ী, লোমে শরীর আবৃত। গরীলার মত চাউনি। ঈগল দেখলাম, বৃহৎ চিলের মত। বাংলায় চিল-শকুনি আমাদের মাথার উপরেই আকাশে ওড়ে—এদেশে দেখা যায় চিল আমাদের নীচে উড়ছে—যেহেতু আমরা খুব উঁচু দিয়ে যাচ্ছি। এদেশে চিলের গলা সাদা হয়—গয়ার চিলের মত। দাঁড়কাক দেখেছি। সেদিন পাহাড়ে ময়না ও প্রসিদ্ধ সুন্দর নন্দন পাখী দেখলাম। এখানে এক রকম পাখী আছে তারা বলে "যা—আত্রী (যাত্রী) ধীরি ধীরি।" তাদের দে'খতে পাওয়া শক্ত। ছোট্টো, কালো পাখী, পাতার আড়ালে থাকে।

হিমালয়ে নানা প্রকার পাথর আছে। কলকাতার যাদুঘরে তাদের কয়েক প্রকারের নমুনা দেখা যায়—সবগুলির নয়। শিবালিক শ্রেণীর প্রসিদ্ধ পাথর দেখলাম—অতি প্রাচীনকালে তার উদ্ভব হয়েছিল। চূণাপাথর, বেলে পাথর লোহার পাথর, গ্রাণাইট, শ্লেট ও কোয়ার্জাইট দেখলাম। অধিকাংশ চটি ও অট্টালিকার ছাদগুলি শ্লেটে ঢাকা। তামা, কয়লা ও রূপার অস্তিত্বের কথা সরকারি একজন সাহেব ইঞ্জিনীয়রের মুখে শুনেছি, তবে চোখে দেখিনি। অভ্রের পাহাড় দেখলাম। বড় বড় অভ্রের চাঁই। গুঁড়া অভ্রে রাস্তা ঢাকা, তদুপরি রোদ পড়ে চক্‌চক্ করছে। সীসার পাথরের পাহাড়ের উপর দিয়ে এসেছি। সাদা, ঈষৎ নীল ও হলুদ বর্ণের মার্ব্বেল দেখেছি। লালসাঙ্গার নদীতীরে একই স্থানে নীল ও সাদা মার্ব্বেল দেখলাম। প্রত্যেক পাথরের নমুনা লয়েছি। যদি সুদূর, দুর্গম পথ না হ'ত, আমার বোধ হয় লোকে এখান থেকে সে সকল পাথর চালান দিয়ে ব্যবসা ক'রতেন। পুরাকালে হিমালয়ের আগ্নেয়গিরি হ'তে গলিত প্রস্তর ও ভস্মরাশি উদ্গত হ'ত। এখন তাহা নির্ব্বাপিত। কিন্তু সে পাথর ও ভস্মরাশি এখনো আছে—শিয়াল কাঁটা ও কয় প্রকার আগাছা ব্যতীত সে উপত্যকায় অন্য বৃক্ষ নাই। সে স্থান অতিক্রম করে যাত্রীদের যেতে হয়। কালো ভস্মরাশি। বহুদিন ধরে জমে শক্ত হয়ে গেছে। বৃক্ষলতাহীন এরূপ কালো কালো পাথরের পাহাড় দক্ষিণ ভারতের কোলার সোণার খনির উপত্যকায় দেখা যায়—সেও অগ্ন্যুৎপাতের ফল—কিন্তু সে স্থান দেখতে ভীষণ।

গুপ্তকাশী ও কেদারের মধ্যে কেবল গৌরীকুণ্ড তীর্থটীর উল্লেখ করি। গৌরী দেবী এখানকার কুণ্ডে স্নান করেছিলেন। পাথরের কুণ্ডে অথবা চৌবাচ্ছায় পিতলের গোমুখ দিয়ে উষ্ণ প্রস্রবণের ফুটন্ত জল পড়ছে। এবং নর্দ্দামার ভিতর দিয়ে গিয়ে ঠিক পাশেরই নদী

মন্দাকিনীতে মিশে যাচ্ছে। বালতি করে মন্দাকিনীর বরফ জল এনে গোমুখের ফুটন্ত জল মিশিয়ে স্নান করলাম। জল আস্বাদন করলে প্রথমে মিষ্ট ও পরে কষা লাগে। হরপার্ব্বতীর মন্দিরে পূজা করলাম। মন্দাকিনীর পাশেই একটি দোতালা চটীতে ছিলাম। এ পর্য্যন্ত প্রত্যেক চটিতে মাছির উৎপাত ছিল, এখান থেকে মাছির হাত হ'তে অব্যাহতি পাই। রাত্রে অত্যন্ত শীত অনুভব করেছিলাম। দেবদারু ও cedar বৃক্ষের সারি দেখলাম।

গৌরীকুণ্ড হ'তে কয়টী চটীর পরে রামবাড়া এবং তার পরে কেদারনাথ। সমস্ত রাস্তাটা ভীষণ চড়াই। বিশেষতঃ রামবাড়া হ'তে কেদারের চার ক্রোশ পথ। এই চার ক্রোশ একেবারে খাড়া চড়াই ও বিপদসঙ্কুল। কয়েক স্থানে পথ এতই সঙ্কীর্ণ ও ঢালু যে পথ নাই বলিলেই চলে। বারাণসীর কেদারঘাটে ওঠবার কালে হাঁফাতে হয়; কিন্তু সেটা মোটে শত ফিট উঁচু। এই পথ অনুমান ছয় সাত হাজার ফিট উঁচু হ'বে। যাবার কালে ডানদিকে, নীচে, নদী পর্য্যন্ত তাকালে মাথা ঘুরে যায়। হয়ত আপনি হাত দেড়েক চওড়া আলসের মত পাথরের উপর দাঁড়িয়ে আছেন—বামে আপনার ঠিক পাশেই খাড়া পাহাড়, ডাইনে খদ। অর্থাৎ দেড় হাত চওড়া ঝুলন্ত রাস্তায় আপনি দণ্ডায়মান—আকাশ পাতালের মাঝখানে। আমি দেখেছি আমার হাতের দেড় হাত চওড়া রাস্তা। যাঁরা ডাণ্ডী, কাণ্ডী অথবা ঝাঁপানে বসে যান, তাঁদের এসব রাস্তায় নামতে হয়; বাহকেরা তাঁদের ধরে উপরে তুলে নিয়ে যায়। ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসী ধর্ম্মের জন্য প্রাণকে কতই তুচ্ছ জ্ঞান করেন দেখলাম। এই পথে ওঠবার কালে তাঁদের ভীত মুখের চেহারা আমার স্মরণ থাকবে।

হিমালয়ের চির-তুষারমণ্ডিত শীর্ষদেশে আমরা যাচ্ছি—ভস্মাচ্ছাদিত মহাদেবের মত বরফের চূড়াগুলির নৃত্য দে'খতে দে'খতে। আমার জননী ঝাঁপানে চেপে এগিয়ে যাচ্ছেন—দূরে আছেন। অন্যান্য যাত্রীরা ঝাঁপানে, ডাণ্ডীতে অথবা পদব্রজে আসছেন, আমার পিছনে।

তখন অপরাহ্ন ৪টা। হঠাৎ মেঘ করে এলো, ঝড় উঠলো,—সে এক ভয়াবহ দৃশ্য! বারি পতন। সবেগে অগ্রসর হ'লাম। একটা মুদীর দোকানের সামনে: ঝাঁপানওলারা মাকে বাইরে রেখে নিজেরা দোকানের ভিড়ের মধ্যে বসেছিল। গিয়ে দেখলাম, মা বাইরে বসে ভিজচেন। ঝড়ে তাঁর ছাতা ভেঙ্গে গেছে। আমার ছাতাটী তাঁকে জোর করে দিলাম এবং আমার বর্ষাতিতে বা ওয়াটার প্রুফে তাঁকে আচ্ছাদিত করে তাঁকে সেখানে রেখে, তাঁর স্নেহের নিষেধ সত্ত্বেও আমি এগোলাম। আমার গাত্রে কলকাতার শীতকালের সাধারণ জামা। আমি যদি তাঁদের যাবার আগে কেদারে গিয়ে তাঁদের জন্য আগুণ করে না রাখি, তাঁরা কষ্ট পাবেন, এই ভেবে আমি চল্লাম।

বরফের উপরে বঙ্গমহিলা

সে প্রান্তরে কেবলমাত্র সেই একটি দোকান ছাড়া অন্য লোকালয় নাই। ঝড়বৃষ্টি মাথায় করে একা আমি চল্লাম। সঙ্গীরা কেউ দোকানে, কেউ সন্ন্যাসীর গুহার মধ্যে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের সমক্ষে আশ্রয় লয়েছিলেন। একবার আমার পদস্খলন হ'ল। পড়িনি। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে পাহাড়ের কোণে একটি বাঁকের মুখে বামে ফিরতেই—! কি ভয়াবহ অপরূপ দৃশ্য! খুব পাশাপাশি দুটি শৃঙ্গের মধ্যে বরফের জমাট নদীই বলুন বা নীহার-স্ফোট (avalanche) বলুন, তাই। উচ্চ শৃঙ্গ থেকে

আমার পাদদেশ পর্য্যন্ত বিষম ঢালু বরফের নদী, হাত-পঞ্চাশ চওড়া। তার উপর দিয়ে যেতে হবে। নদীর মাঝখানে কূপের মত দুটী গহ্বর দেখলাম। চোরাবালির উপর দিয়ে যাবার কালে কোনও পথিক ভূগর্ভে সেঁধিয়ে গেলে যেমন গর্ত্ত হয়, সেই চোরা নদীর উপরে সেইরকম গর্ত্ত। লাঠি জোরে চেপে চেপে, পিছলাতে পিছলাতে গর্ত্তের পাশ দিয়ে সভয়ে সাবধানে নদী পার হ'লাম।

কেদারনাথ—সম্মুখে লেখক দণ্ডায়মান

বরফের নীচে জলের স্রোত আছে এবং জলপ্রপাত রূপে, আমার ডানদিকে, মন্দাকিনী বক্ষে ঝাঁপ দিচ্ছে বহু সহস্র ফিট উপর থেকে। আমার মা ও সঙ্গীরা সেখানে এসে কেউ কেউ কেঁদে ফেলেছিলেন শুনলাম। দুজনা পড়েও গিছলেন। দিনকয়েক পূর্ব্বে একজন যাত্রী সেখানে মারা যান।

আমার চারিধারে, উপরে, নীচে তুষারের রাশি। উপত্যকার যেখানে ভাঁজ আছে—উঁচু নীচুর জন্য—সেখানকার নালা দিয়ে গলিত তুষারের ধারা বয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ যে দিকেই তাকাই—হয় জমাট তুষারের চাদর, নতুবা বরফজলের লক্ষ ধারা! তুষার পরীক্ষা করলাম। ঠিক যেন দোবরা চিনি জলসিক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। ডেলা পাকিয়ে খেলাম! দাঁত যে বেশী কনকন করলো তা নয়। সেখানকার বাতাসে যেরূপ শৈত্য, তার চেয়ে একটুখানি বেশী ঠাণ্ডা লাগলো, মুখের ভিতর গরম কি না! হাতে বেশী ঠাণ্ডা লাগলো না।

কেদারে পৌঁছবার শেষের আধ-ক্রোশ পথে বেজায় কাদা। গভীর কর্দ্দম ভেঙ্গে যেতে হয়। প্রতি পদে পিছলাবার আশঙ্কা। দূর থেকে ৺কেদারনাথের মন্দির দেখলাম। প্রাণ নেচে উঠলো। জয় কেদারনাথ স্বামী কি জয়!

স্থানটী কি রকম কল্পনা করুন,—তিন চার ক্রোশ লম্বা এবং এক পোয়া আন্দাজ চওড়া একটি সালতী নৌকা। তার পিছনটা খোলা বা কাটা। কেদার উপত্যকাটী সেরূপ একটি বরফের নৌকার মেঝের মত। তার সামনে অত্যুচ্চ কেদারনাথ শৃঙ্গ। দু'পাশে উনুনের ঝিঁকের মত শত শত, ঘেঁসাঘেঁসি, আকাশচুম্বী বরফের টোপর। হাজার হাজার ফিট উঁচু। সামনেকার "কেদারনাথ" রূপী মুকুটটী ও আমি যেথায় দাঁড়িয়েছিলাম, সেই উপত্যকাটী, সমুদ্রতীর হ'তে যথাক্রমে ২২,৮৫৩ এবং ১১৭৫৩ ফিট উঁচু। অর্থাৎ "কেদারনাথ" শৃঙ্গটী (২২৮৫৩—১১৭৫৩—) ১১,১০০ ফিট উঁচু খাড়া বরফের চাঁই। এরূপ একেবারে এত উঁচু খাড়া শৃঙ্গ না কি হিমালয়ে আর নাই। সেই শৃঙ্গের পাদস্পর্শ করে কেদারমন্দির। দুপাশের অন্য শৃঙ্গগুলি তত উঁচু নয়, তবে সবাই খাড়া। ঘুরে

দেখলে মনে হয় যেন কেদারনাথ মহেশ্বরের দুই হাত ধরে দু'সারি ভূত প্রেত দাঁড়িয়ে। দু'সারি ভূতের পাদ মধ্যবর্ত্তী আধমাইল স্থানে লোকালয় ও মন্দির আছে। কেদারনাথ শৃঙ্গ হ'তেই মন্দাকিনী নেমেছেন। এবং মন্দিরের পাদ প্রক্ষালন করে, লোকালয়ে প্রবেশের জন্য পাথরের যে ক্ষুদ্র সেতু আছে, তার নীচে দিয়ে খরবেগে চলেছেন, নৌকারূপী উপত্যকার খোলা পশ্চাদ্ভাগের দিকে—যেখান থেকে ব্যোমযানে উঠলে হয়ত তরঙ্গায়িত পর্ব্বতমালার দক্ষিণে ভারতের নিম্নভূমি দেখা যায়।

কাদা ভেঙ্গে উত্তরমুখে গেলাম; পরে পূর্ব্বমুখে সেতু পেলাম। আবার উত্তরদিকে গ্রামের রাস্তা। সেতু থেকে মন্দির পর্য্যন্ত সেই একটিমাত্র রাস্তা,—দশ হাত চওড়া, তিনশ' হাত লম্বা হ'বে। সেতু থেকেই গ্রাম আরম্ভ, মন্দিরে গিয়ে শেষ। রাস্তার দু'পাশে অর্থাৎ পূবে ও পশ্চিমে ছোট ছোট একতালা দোতালা ৫০।৬০ খানি পাথরের বাড়ী। শ্লেটের ছাদ খড়ে ছাওয়া, তদুপরি তুষার জমেছে।

সিক্তবস্ত্রে গ্রামে গেলাম। রাস্তার ডান অর্থাৎ পূব'দকে বাঙালীর প্রতিষ্ঠিত কয়টী পান্থশালা দেখলাম—প্রতিষ্ঠাতার নাম ধাম কাষ্ঠফলকে লেখা। সন্ধান করে পাণ্ডার বাড়ী গেলাম। দোকানই বাড়ী। দ্বিতলে এবড়ো খেবড়ো মাটির মেঝের উপরে কাঠের আগুন জ্বালিয়ে বসলাম। হাত পা জমে যাচ্ছিলো। দু'খানি আট হাত লম্বা ও ছ' হাত চওড়া ঘরের মধ্যভাগে নীচে নামবার উঁচু উঁচু ধাপের পাথরের সিঁড়ি। দুই ঘরে দুটী ক্ষুদ্র জানালা আছে। রাস্তার দিকে। উপরের ডান দিককার ঘরের নীচের ঘরে মুদীর দোকান, বাম দিককার ঘরের নীচের ঘরে আমাদের বাহকেরা আগুন জ্বেলে থাকবে। এই চারখানি ঘর লয়ে বাড়ী। মুদীরই বাড়ী। তার কাছ থেকে আহার্য্য কিনবো, সেজন্য বাড়ীর ভাড়া লবে না।

সন্ধ্যার সময় বৃষ্টি থামলো। মা ও সঙ্গীরা এলেন। আগুনের ধারে বসলেন। ছোটো দু'টী ঘরে আট জনে থাকবো। একজন সঙ্গীকে এক ঘণ্টার উপর ঘী মালিস ও সেক করতে হ'ল। কাঠের ধুমে শ্বাসরোধ হবার উপক্রম। রাত্রে দোকানদারের প্রস্তুত লুচি, আলুর তরকারি ও চিনি ভক্ষণ এবং শয়ন। চাল ১॥০, ঘী ৪৲, আলু ॥০ ও চিনি ২৲ সের। কথা ছিল কেদারে দু দিন বিশ্রাম ক'রব এবং নিজেরাই রান্না করে খাবো। কিন্তু সঙ্গীরা এতই ভীত হয়েছিলেন যে, ঠাকুর দর্শন করে পরদিন প্রাতেই পালাবার জন্য সঙ্কল্প জানালেন। পাণ্ডারা যাত্রীদের লেপ সরবরাহ করেন। সমস্ত রাত ঘরে আগুন জ্বল্‌ল।

প্রাতে বরফ কেটে নীচেকার দরজা খোলা হ'ল। গরম জলে মুখ ধোয়া ও কাপড় ছেড়ে পাণ্ডা সমেত মন্দিরে গিয়ে দেব দর্শন, ফটো তোলা এবং টাকা নিতে ক্ষুদ্র পোষ্ট অফিসে গমন। সে নাবালক পোষ্ট অফিসের মাষ্টার মশায় একজন পাণ্ডা। তিনি তখন যাত্রী লয়ে মন্দাকিনীতে গেছেন।

মন্দিরটী প্রাচীন। স্থাপত্যে মোগল প্রভাব দেখলাম না। সুদৃশ্য মন্দির। গর্ভ-মন্দিরে লিঙ্গ-মূর্ত্তি ও নাটমন্দিরে পঞ্চ পাণ্ডবের মূর্ত্তি আছে। মন্দিরের পুরোভাগে ও দ্বারের চারিদিকে যে কুলুঙ্গিগুলি আছে, তন্মধ্যে দেবমূর্ত্তি আছে। সুন্দর মূর্ত্তি, প্রাচীন ভাবের। মন্দিরের সদাব্রতে অতিথি, ভিখারীরা প্রসাদ পান। কালী কমলীর ধর্ম্মশালা ও সদাব্রতও আছে।

কাল বৈকালে যখন এখানে আসছিলাম, আমার সামনে পাহাড়ের উপর থেকে একটা পাথর খসে পড়েছিল। নীহারস্ফোট বা avalancheএর ক্ষীণ গুড় গুড় শব্দ শুনেছিলাম। আজও শুনতে পাচ্ছি। নচেৎ প্রকৃতি মৃতের ন্যায় নীরব। লোকের কোলাহলও নাই।

সকালে যখন মেঘ-নির্ম্মুক্ত নীল আকাশে রোদ উঠল, প্রকৃতি হাস্যময়ী। মধ্যাহ্নে যখন কেদারনাথের মুকুটে রবিকিরণ প্রতিফলিত হ'ল—তখন সেদিকে তাকাতে পারা যায় না, চোখ ঝল্‌সে যায়। রোদ দেখে যাত্রীরা শান্ত হ'লেন।

এ দেশে উদ্ভিদ তো দূরের কথা, একগাছি তৃণ পর্য্যন্ত দেখি নি—কেবল বরফ আর বরফ। যেখানে বরফ নাই, সেখানে কেবল ধূসরবর্ণ প্রস্তর। শীতের ছয় মাস কাল মন্দির ও বাটীগুলি বরফে ঢাকা থাকে। তাদেরই মধ্যে দ্রব্য সামগ্রী রেখে গৃহস্থেরা নিম্নভূমে যান। ৺কেদারনাথ উখী মঠে বিরাজ করেন। গৃহস্থেরা গ্রীষ্মকালে আবার আগমন করেন। জিনিসপত্র অবিকৃত অবস্থায় পান। এখন এ সময়েও প্রত্যেক ছাদ বরফে ঢাকা। রোদের প্রকোপে একটু একটু করে বরফ গলে, ছাদ বেয়ে টস্ টস্ করে জল পড়ে। একটু মেঘ করলো কিম্বা একটু জোরে হাওয়া দিল, তো পুরু বরফ জমে গেল।

অদূরে ভৈরব ঝম্প নামক একটি খদ আছে। সেকালে সন্ন্যাসীরা সেখানে ঝম্প প্রদানে শিবলোকে যেতেন।

যুধিষ্ঠির মহাপ্রস্থান কালে এখানে এসেছিলেন। শঙ্করাচার্য্য এই কেদার ধামে মোক্ষ লাভ করেন। (?) কেদারনাথের মন্দির তাঁরই প্রতিষ্ঠিত।

আজ এ পর্য্যন্ত। আবার লিখবো। * * *

স্নেহের ভাই
শ্রীশ।

মনের পরশ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(১৩)

পল্লব মুখে মিসেস সিংহকে যতই কেন না জোর ক'রে 'হ'তেই পারে না', 'অসম্ভব' প্রভৃতি বলুক, মিসেস সিংহের প্রশ্নে তার আশঙ্কা যেন চতুর্গুণ বেড়ে উঠ্‌ল। বিশেষতঃ সম্প্রতি মোহনলাল প্রায়ই অনেক রাত্রে বাড়ী ফির্‌ত ও পল্লবের ঘুম না ভাঙিয়েই তার পাশের বিছানায় শুয়ে পড়্‌ত। সে জিজ্ঞাসা কর্‌লে সে বিরস স্বরে বল্‌ত থিয়েটারে গিয়েছিলাম, বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম্‌ ইত্যাদি।

এমন সময়ে পল্লব একদিন হাম্‌ষ্টেড্‌ হীথে চিন্তাকুল ভাবে বেড়াতে বেড়াতে এক নিভৃত কুঞ্জে মোহনলাল ও মিস স্মিথকে একটি বেঞ্চির ওপর বসে গভীর আলাপে মগ্ন দেখে। তারা এমন আলাপমগ্ন ছিল যে পল্লব তাদের দেখতে পেলেও তারা পল্লবকে দেখ্‌তে পায় নি।

পল্লব অনেক কথাই ভাব্‌ত। মোহনলাল মিস স্মিথের স্বামী হ'লে কি রকম ভাবে কথা কইবে, তার ও কুঙ্কুমের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করবে এ সম্বন্ধে নানান্‌ জল্পনা কল্পনাই করত। কিন্তু তখনই আবার নিজের এই উধাও কল্পনার রশ্মি সংযত ক'রে নিজের মনকে বোঝাত যে 'না না। এ মোহনলালের সাময়িক মোহ।' যদিও তার আদর্শস্থানীয় বন্ধুযুগলের একজনের এরূপ সাময়িক পতনে সে আঘাত না পেয়েই পারে নি, তবু সে বিজ্ঞভাবে নভেলের ভাষায় নিজের মনকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা পেত: 'হাজার হোক্‌ মানুষের মন ত! তাই এরকম দুর্ব্বলতা কখন কাকে অতর্কিতে এসে আক্রমণ করে কে বল্‌তে পারে?' ইত্যাদি। কিন্তু যেহেতু সে জীবনে এ যাবৎ কোনও অনুরূপ পরীক্ষায় পড়ে নি সেহেতু এ সব কথার মধ্যেকার মঙ্গল-স্পর্শ সে পেত না। তার কাছে এসব কথা যেন অনেকটা মুখস্থ বুলি আওড়ানোরই সামিল হ'য়ে উঠ্‌ত।...... সে সময়ে সময়ে ভাব্‌ত মোহনলালকে তীব্রভাবে তিরস্কার করবে। কিন্তু মোহনলালের প্রতি তার বাল্যের সম্ভ্রম এখনও মুছে যায় নি। তাই সে মনস্থির করতে পার্‌ত না।...সে প্রায়ই আশা করত যে মোহনলাল তাকে নিজেই একদিন সব কথা বল্‌বে। কিন্তু মোহনলাল তার সেদিন রাত্রের সামান্য ঠাট্টার পর থেকে তাকে আরও এড়িয়ে চল্‌তে আরম্ভ করেছিল। এমন কি পল্লবের দিকে বড় একটা চোখ তুলে চাইতও না। পল্লব বুঝ্‌ত যে এতে সে যেমন ব্যথা পাচ্ছে তার বাল্যবন্ধুও তার চেয়ে বড় কম ব্যথা পাচ্ছে না। কিন্তু কোন উপায় ত সে দেখ্‌তে পেত না।...সুতরাং এ ব্যথার প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেও সে ইতস্ততঃ না ক'রে পার্‌ত না।

তবু মানুষ আশা ছাড়ে না। পল্লব ভাব্‌ত যে মোহনলাল একদিন না একদিন তাকে নিভৃতে বল্‌বেই বল্‌বে যে সে তার মোহকে মন থেকে আমূল উপ্‌ড়ে ফেলে দিয়েছে। একা মোহনলালই একদিনের সঙ্কল্পে তা পারে। কারণ তার মনের জোর যে অসাধারণ!... এরূপ আশায় ও সন্দেহে দোলায়মান অবস্থায় সে কাল কাটাতে লাগ্‌ল।

এমন সময়ে একদিন গভীর রাত্রে শোবার সময়ে মোহনলাল তাকে হঠাৎ একটু অদ্ভুত রকম হেসে বল্‌ল: "ভাই পল্লব তোমার কথাই ফল্‌ল। আমি ও মিস স্মিথ আজ বিবাহপণে আবদ্ধ হ'য়ে এসেছি।" ব'লে সে বিছানার উপর ধপ ক'রে বসে প'ড়ে দুই করতলে নিজের গণ্ডদ্বয় ন্যস্ত কর্‌ল।

পল্লব বিছানায় শুয়ে একটা বই পড়ছিল। সে বই ফেলে তড়িৎস্পৃষ্টের মতন লাফিয়ে উঠে ব'সে বল্‌ল: "সেকি!!!"

বন্ধুর সঙ্গে অনেকদিন ধ'রে সত্যগোপন ক'রে আসার দরুণ মোহনলালের হৃদয়ে ব্যথা পুঞ্জীভূত হ'য়ে ছিল। আজ তার সে নিরুদ্ধ বেদনা পল্লবের স্নেহত্রস্ত মুখ ও কাতর দৃষ্টির স্পর্শে উচ্ছলিত হ'য়ে উঠ্‌ল। সে বল্‌তে আরম্ভ

কর্‌ল কেমন ক'রে সে আসক্ত হয়ে পড়্‌ল।...মোহনলাল বল্‌তে লাগ্‌ল: "ভাই পল্লব এই প্রথম। প্রেম—সত্যকার প্রেম।...অবশ্য তুমি বা কুঙ্কুম হয়ত বল্‌বে যে এ প্রেম নয়, ক্ষণিক চোখের মোহ মাত্র।...কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। কেন না সত্য প্রেম যে কি বস্তু তা আমি এর আগে উপলব্ধি করি নি। তাই এ আসক্তি সত্য কি ভেজাল পরীক্ষা করব কোন্ কষ্টিপাথরে? তবে সে কথা যাক্। আসল কথা হচ্ছে এই যে এ উন্মাদনা আমার জীবনে এই প্রথম। তাই ইতিপূর্ব্বে আমি এ প্রথম উন্মাদনার শক্তি সম্বন্ধে নানারকম প'ড়ে শুনে থাক্‌লেও অভিজ্ঞতায় কিছুই জান্‌তাম না। কারণ জ্ঞান ত যে সব বিষয়েই মনের ওপরে শোনা-কথার প্রভাব একরকম ও হৃদয় দিয়ে বোঝার প্রভাব আর এক রকম হ'য়ে থাকে। তাই মিস স্মিথের যৌবনলাবণ্য ও হাবভাব আমাকে প্রথম থেকেই একটু আকৃষ্ট করলেও আমি তাঁর সঙ্গে মিশ্‌তে গিয়েছিলাম কোনও দুষ্য মৎলবে নয়। আমি মনকে বোঝাতাম যে, দোষ কি? এদের দেশে ত এরকম মেয়েপুরুষের নির্দ্দোষ মেলামেশা বিরল নয়!... হায় তখন যদি আমার কোনও ধারণা থাকৃত যে এ আকর্ষণ অলক্ষিতে দুদিনেই কি প্রবল ও দুর্দ্দম্য হ'য়ে উঠ্‌তে পারে! তাহ'লে হয় ত—হয়ত আমি আমার নিজের আশাচিত্র অনুসারে নিজের ভবিষ্যৎ গ'ড়ে তুল্‌তে পারতাম। কিন্তু এখন...এখন...আর হয় না।" বল্‌তে বল্‌তে সে দুহাতে মুখ ঢেকে চুপ কর্‌ল।

পল্লব বিস্ময়ে ক্ষোভে ব'লে উঠ্‌ল: "মোহনলাল, এ আমি কিছুতেই হ'তে দেব না, কিছুতেই না। তোমার বাবা মা কি ভাব্‌বেন? তুমি তাঁদের এক ছেলে। তোমার বন্ধুবান্ধব সকলে কি বল্‌বে? আর, আর—সব চেয়ে যেটা বড় কথা—তোমার জীবনকে এভাবে নষ্ট হ'তে দেওয়া...না না মোহনলাল, তুমি হয়ত আজ মোহে প'ড়ে বুঝতে পারছ না যে মিস স্মিথ প্রথম থেকেই তোমাকে ধনীর সন্তান জেনে ফাঁদ পেতেছিলেন; কিন্তু এ সত্যটি আর কারুরই চোখ এড়ায় নি।"

কথাটা ব'লেই পল্লবের মনে হ'ল যে সে সম্পূর্ণ সত্য বলে নি। কারণ মিস স্মিথ যে প্রথম দিন থেকেই মোহনলালের প্রতি আকৃষ্ট হ'য়েছিলেন একথা আর যারই অগোচর থাকুক না কেন পল্লবের অগোচর ছিল না। এবং তখন মোহনলালের অবস্থার কথা তিনি জান্‌তেন না।

পল্লবের শেষ কথাটির মধ্যেকার খোঁচা খেয়ে মোহনলালের সুগৌর মুখখানি অল্প রক্তিম হ'য়ে উঠ্‌ল। তবে সে তৎক্ষণাৎ খোঁচাটিকে পরিপাক ক'রে নিয়ে বল্‌ল: "পল্লব, তুমি যা বল্‌ছ হয়ত সবই ঠিক্,—কেবল আমি যে ভবিষ্যৎ ভাবি নি তোমার এ ধারণাটি ছাড়া। আমি হয়ত দেশে আর না-ও ফিরতে পারি। কারণ এদেশের মেয়েকে বিবাহ ক'রে দেশে ফিরলে অসুবিধে ও অশান্তি যে কত সে নিয়ে আমি নিজেই তোমার সঙ্গে কত আলোচনা ক'রেছি। তবে কি জান পল্লব? তর্কে জানা এক, আর তদনুসারে কাজ করা আর। বিশেষতঃ এরূপ প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে।"

পল্লব মোহনলালের একটি হাত চেপে ধরে বল্‌ল: "কিন্তু ভাই, তোমার মনের জোর যে অসাধারণ ব'লে জান্‌তাম!"

মোহনলাল একটু বিষাদের হাসি হেসে বল্‌ল: "ভাই, মনের জোরের কথা আর বোলো না। আমরা সময়ে অসময়ে চিত্তজয়ের গৌরব করি বটে, কিন্তু তখন ভেবে দেখি না যে ভাল ছেলেদের মধ্যেও শতকরা নিরানব্বই জন 'ভাল ছেলে' থাকে শুধু সুযোগের অভাবে।"

পল্লব অজ্ঞাতে একটু আহত হ'য়ে বল্‌ল: "মোহনলাল, এ ভাই তোমার বাজে কথা।"

মোহনলাল বল্‌ল, "ভাই পল্লব ভগবান্ না করুন—তবে তুমি যদি কখনও মোহে পড় তখন আমার কথার মর্ম্মটা বুঝবে। তাই আজ আমার অনুরোধ কেবল এইটুকু মাত্র যে তুমি মনে কোরো না আমি তোমাকে ভোলাবার জন্য এভাবে আত্মসমর্থন করছি।"

পল্লব গাঢ়স্বরে বল্‌ল: "তা কি আমি মনে করতে পারি মোহনলাল। তোমাকে আমি কতখানি শ্রদ্ধা করি তা হয়ত তুমি—"

মোহনলাল একটু কুণ্ঠিত হয়ে বাধা দিয়ে বল্‌ল: "জানি ভাই পল্লব। তবু কি জান? আমাদের অভিমান বস্তুটা এমনই বিশ্বাসঘাতক যে কখন কোন্ ফাঁকে প্রবেশ ক'রে যে আমাদের সত্যনিষ্ঠার মোড় ফিরিয়ে দেয় তা কেউ বল্‌তে পারে না। যাক্, আমি যা বল্‌ছিলাম। 'ভাল

ছেলে'র ভালত্ব সম্বন্ধে এখনি যা বল্‌লাম তা যে একবিন্দুও অতিরঞ্জিত নয় একথা তুমি অবিশ্বাস কোরো না। আমি আমাদের দেশের 'ভালছেলে' সম্প্রদায়ের সঙ্গে খুব বেশি মিশেছি ব'লেই একথাটা এত জোর ক'রে বল্‌তে পারি। বাবাকে মফঃস্বলে তাঁর জমিদারী দেখ্‌তে হ'ত ব'লে আমাকে বরাবর কল্‌কাতায় হষ্টেলে থেকে পড়তে হ'য়েছিল। তাই আমাদের দেশের ভাল মন্দ দুই রকম ছেলের সঙ্গেই একটু ঘনিষ্ঠতা করার আমার সুযোগ হ'য়েছিল। তাই আমি তোমাকে বল্‌ছি যে আমাকে তুমি বিশ্বাস কর যে বাইরে যারা খুব ভাল ছেলে ব'লে খ্যাত প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে ভেতরে তারা বাস্তবিকই আশ্চর্য্য রকম দুর্ব্বল। কতখানি দুর্ব্বল তা তুমি—"

পল্লব বাধা দিয়ে বল্‌ল: "একথা ভাই সহজে বিশ্বাস হয় না। কারণ তুমি যা বল্‌ছ তা যদি ভাল ছেলের ক্ষেত্রেও সত্যি হ'ত তাহ'লে 'অন্যে পরে কা কথা'।"

মোহনলাল একটু দৃঢ় স্বরে বল্‌ল: "ভাই পল্লব, তুমি আমার একথা নির্ভয়ে বিশ্বাস কর্‌তে পার। দশে গিয়ে খোঁজ কর্‌লে জান্‌তে পার্‌বে যে আমার ভুল হয় নি। তোমাকে যে লোকে ছেলেমানুষ বলে সেটা ভাই—রাগ কোরো না—নিতান্ত মিথ্যা নয়। তোমার বাবা তোমাকে বরাবর বড় সন্তর্পণে নিরালায় তাঁর স্নেহচ্ছায়ে মানুষ ক'রেছেন। তাই তোমার বয়সের পক্ষে তুমি এখনও যে কতটা ছেলেমানুষ রয়েছ সেকথা আজ তুমি নিজেই জান না।...হয়ত একদিন তুমি বুঝবে যে এ বয়সে তুমি জীবনের একটা মস্ত দিক্ সম্বন্ধে কত কম জান্‌তে। এই জন্যই—"

পল্লব বাধা দিয়ে বল্‌ল: "দেখ তোমার এ ধারণাটা কিন্তু—"

মোহনলাল বল্‌ল: "আমাকে আমার কথাটা শেষ কর্ত্তে দাও পল্লব। আজ আমার মনটা তার সঞ্চিত গুরুভারটা হাল্‌কা না করলে আর নিঃশ্বাস ফেল্‌তে পারছে না। তাই আজ তোমাকে গোটাকতক কথা বলি শুনে' যাও। কেবল আমার আবোল তাবোল শুনলে আশ্চর্য্য হ'য়ো না এইটুকু গোড়াতে তোমায় বলে রাখি। কুসুম বা আমাদের কলেজের সেই স্বর্ণেন্দুর মতন দুএকজন সত্যিকার অসাধারণ বলীয়ান্ ছেলেকে ব্যতিক্রম হিসেবেই গণ্য করা যেতে পারে বোধ হয়। তাই একথা নির্ভয়ে বলা চলে যে অধিকাংশ আদর্শ স্থানীয় ছেলেরাও অনেক সময়েই যাকে বলি নিষ্কলঙ্ক থাকে শুধু সুযোগ অভাবে।"

পল্লব একটু বেদনা বোধ ক'রে কি একটা বল্‌তে যাবামাত্র মোহনলাল তাড়াতাড়ি বল্‌ল: "ভাই পল্লব, তুমি একথাটা যে সহজে পরিপাক করতে পারবে না তা আমি জানি। এ সত্যটি সম্বন্ধে যখন আমার প্রথম চোখ ফোটে তখন আমিও তোমার মতনই ব্যথা পেয়েছিলাম। কিন্তু ভেবে দেখ্‌লে দেখা যায় যে, এতে বেশী ব্যথা পাবার কিছু নেই। কারণ 'ভাল ছেলেরা' কর্‌বে কি বল ত? তাদেরও ত বিধাতা মানুষ ক'রে গড়েছেন? তাই আমরা জোর করে তাদের যোগী ক'রে তুলে ধর্‌বার চেষ্টা কর্‌লে কি হবে? দেহের এ আকাঙ্ক্ষার স্থান যে তার দুর্নিবারতার ক্ষুধাতৃষ্ণার পরেই, একথা কে না জানে? অথচ আশ্চর্য্য এই যে কার্য্যক্ষেত্রে ভালছেলে ও মন্দছেলের মধ্যে এক স্বকল্পিত গণ্ডী কেটে আমরা একের ক্ষেত্রে এ তৃষ্ণার কথা স্বতঃসিদ্ধ ব'লে ধ'রে নিয়ে, অপরের ক্ষেত্রে এর অস্তিত্বও স্বীকার করতে রক্তিম হয়ে উঠি। ভাল ছেলের পানাহারের দরকার কি মন্দছেলের চেয়ে এক বিন্দুও কম? নয় ত; তাহ'লে দৈহিক আকাঙ্ক্ষার বেলায়ই বা একে অস্বীকার করি কোন্ যুক্তিবলে?"

পল্লব বল্‌ল: "ভাই মোহনলাল। তুমি যখন এত কথা বল্‌লে তখন আমাকেও দুএকটা কথা বল্‌তে হয়। আমি এ সব বিষয়ে আলোচনা করতে বরাবরই একটু সঙ্কুচিত হ'য়ে থাকি। কিন্তু ভেবে দেখেছি যে তার মূল কারণ হচ্ছে যাকে ইংরাজীতে বলে prudery অর্থাৎ পাছে অপরে কি মনে করে এই নিহিত আশঙ্কায়ই আমি এ বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা কর্ত্তে সঙ্কুচিত হই। অনেকটা এই জন্যই তোমরা অনেকে মনে কর যে আমি ছেলেমানুষ সরল, অনভিজ্ঞ ইত্যাদি। কিন্তু বস্তুতঃ তোমাদের এ রকম ধারণা যে সম্পূর্ণ ভুল তা আমি জোর ক'রেই বল্‌তে পারি কারণ এ বিষয়ে আমি যথেষ্ট ভেবেছি ও নানাক্ষেত্রে দেখেওছি নিতান্ত কম নয়। কাজেই তুমি সহজেই বিশ্বাস করতে পার যে আমি নিজেও জানি যে এবিষয়ে যাদের লোকে মন্দছেলে বলে থাকে তাদের চেয়ে বিশেষ সব নই। দৈহিক আকাঙ্ক্ষার শক্তি যে কতখানি প্রব

সেটা আমি যথেষ্ট উপলব্ধি করছি জেনো। তবে আসল কথা কি জান? আমি নিজে এ বিষয়ে দুর্ব্বল হবার দরুণ তোমার বা কুঙ্কুমের দৃষ্টান্তে বরাবর নিজের মনের বলের খোরাক সঞ্চয় ক'রে আস্‌তে চেয়েছি। এইমাত্র। অর্থাৎ আমি সর্ব্বদা মনেপ্রাণে বিশ্বাস ক'রে আস্‌তে চেয়েছি যে তোমাদের মতন ভাল ছেলেরা আমাদের চেয়ে অনেক সহজে এ তৃষ্ণাকে জয় করতে পারে। এ বিশ্বাস আমার এখনও যায় নি। যেহেতু তোমাদের মনের জোর সাধারণ ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশি একথা বোধ হয় বস্তুতঃ অসত্য নয়। তাই তুমি বা কুঙ্কুম যখন বলতে বিবাহ করবে না তখন সে কথা অবিশ্বাস করার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি।"

মোহনলাল গম্ভীরস্বরে বল্‌ল: "পল্লব, তুমি যখন বিবাহের কথাই পাড়্‌লে তখন এ ক্ষেত্রে একটা কথা বলি শোন। একথাটা আমার ক্রমেই বেশি ক'রে মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় নিচ্ছে। আমার মনে হয় যে আমাদের দেশে স্বামী বিবেকানন্দ, পরমহংসদেব, সাধু সন্ন্যাসী প্রভৃতির আদর্শ এজন্য অনেকটা দায়ী। আমরা যখন প্রবৃত্তির তাড়নার শক্তি সম্বন্ধে কিছুই জানিনা বা বুঝি না তখন এই সব সত্যিকার মস্ত মস্ত চরিত্রের দৃষ্টান্ত দেখে ও তাঁদের উপদেশ প'ড়ে মনে ক'রে বসি বুঝি আমরাও তাঁদের মতন শক্তি ধরি। তাই এত চিরকুমার সভায় নাম লেখানো ও শেষে একে একে লুকিয়ে সে সভার খাতা থেকে নাম কাটানোর বিড়ম্বনা।"

পল্লব বল্‌ল: "তার মানে তুমি কি বলতে চাও যে এ সব আদর্শে ক্রমে আমাদের মন্দ হয়েছে?"

মোহনলাল মুখ নীচু ক'রে বল্‌ল: "না ঠিক্ তা আমি বলি না—যদিও আমার দুই একজন উপভোগবাদী বন্ধুর তাই মত। আমার নিজের মনে হয় এরূপ আদর্শের প্রভাবে বাল্যজীবন গ'ড়ে ওঠাটা অনেক দিক্ দিয়ে বাঞ্ছনীয়। কারণ কিছুদিন এ আদর্শ অনুসরণ করলেও এর জন্য মনের মধ্যে যে একটা ছাপ থেকে যায় পরে এ আদর্শ হ'তে স্খলিত হ'লেও সে ছাপ সম্পূর্ণ মুছে যায় না। কাজেই এ সব আদর্শের স্বাদ যে একবারও পায় নি তার চেয়ে যে একবারও এ স্বাদ পেয়েছে সে খতিয়ে বড় থেকে যায় বলেই আমার মনে হয়। এক কথায়, এ রকম আদর্শকে একবারও যে লক্ষ্য ক'রে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছে তার চলার পথ যে একবারও চায় নি তার পথের চেয়ে উঁচু না হয়েই পারে না। তবে তা সত্ত্বেও আমার এ আদর্শের দোষ ধরার উদ্দেশ্য—কেবল এই কথাটি মাত্র বলা যে এ সব আদর্শকে অনুসরণ করার সঙ্গে সঙ্গে নিজের চরিত্রবলের স্বরূপটি সম্বন্ধে একটু সচেতন হ'লে ভাল হয়। আমরা ছেলেবেলায় প্রায়ই মনে করে বসি আমরা এক এক রামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দ। এইটে না মনে করলেই আমাদের লম্বা লম্বা কথা বলাটা বোধ হয় একটু কমে ও নিজের যথার্থ প্রবৃত্তিটির সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি একটু বাড়ে।"

পল্লব চুপ করে রইল। মোহনলাল একটু থেমে আবার বলতে লাগ্‌ল: "সেদিন এখানকার একজন মস্ত বৈজ্ঞানিকের লেখা পড়ছিলাম। তিনি বলেছেন যে 'আমরা বিশ্বাসের মহিমা প্রায়ই বড় গলা ক'রে প্রচার ক'রে থাকি বটে—কিন্তু বস্তুতঃ অবিশ্বাসের মহিমাও যে নিতান্ত কম নয় সেটা বড় একটা ভেবে দেখি না।' কথাটা আমার বড় ভাল লেগেছিল পল্লব।"

পল্লব একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্‌ল: "অবিশ্বাস করার মহিমা...তার মানে?"

মোহনলাল বল্‌ল: "মানে আর কিছুই নয়, মানে শুধু এই যে সত্য কি সেটা আমার পক্ষে অবিশ্বাস করাটাও একটা মস্ত পন্থা হ'তে পারে। যেমন, ধর না কেন যে কথা বলছিলাম যে—ব্যক্তিগত জীবনে নিজেদের সম্বন্ধে নিজেদের দৃঢ় ধারণাগুলিকে অবিশ্বাস ক'রে চলাটা অনেক সময় আমাদের বড় কম আলো দেয় না। কথাটা একটু পরিষ্কার ক'রে বলি।—একটু ভেবে দেখ দেখি, কত সময়েই না আমরা দেখ্‌তে পাই যে অশৈশব দারুণ ভীষ্মব্রতধারী ব্রহ্মচারী বিলেতে আস্‌তে না আস্‌তে আবিষ্কার করেন যে তিনি আসলে ভীষ্মর ছায়াও মাড়ান নি। নয় কি? বরাবর নিজেকে বিবেকানন্দ মনে ক'রে আসার দরুণ কত ছেলেই না আগুন নিয়ে খেলা করতে যায়। এঁদের যদি নিজেদের চরিত্রবল সম্বন্ধে আত্মম্ভরিতা অভ্রভেদী না হ'ত তাহ'লে হয়ত এঁদের জীবনে অনেক সময় লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ে ধ্বংস হ'তে হ'ত না।...পল্লব, নিজের সম্বন্ধে নিজের ধারণাকে প্রথম থেকে একটু অবিশ্বাস ক'রে চলতে শেখার মত বন্ধু জগতে কমই আছে।"

ব'লেই মোহনলাল একটু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্‌ল: "তবে হয়ত এ কথাও ঠিক্ যে এটা ভুক্তভোগী না হ'লে ঠিক্ বোঝা যায় না। তাই এরূপ ক্ষেত্রে যে ঠেকে নি সে বোধ হয় দেখে শিখ্‌তে পারে না,—তা আমরা যতই কেন না উপদেশ দেই।"

পল্লব একটু চুপ ক'রে চিন্তাকুল স্বরে বল্‌ল: "মোহনলাল, তোমার কথার মধ্যে অনেকটা সত্য আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এরূপ অবিশ্বাসের কি একটা মন্দ দিক্‌ও নেই? আমার ত মনে হয় যে নিজের দৃঢ়তাকে সর্ব্বদা অবিশ্বাসের চোখে দেখার একটা মস্ত কুফলও ফল্‌তে পারে। সেটা এই যে এর ফলে হয়ত আমরা এই সব দৈহিক প্রবৃত্তিকেই চরম ব'লে স্বীকার ক'রে উচ্ছৃঙ্খলতায় গা ভাসিয়ে দিতে পারি। নয় কি?"

মোহনলাল চিন্তিতভাবে বল্‌ল: "এ আশঙ্কা তোমার সম্পূর্ণ অমূলক নয়। কারণ নিজের মনের জোরকে বড় ক'রে দেখ্‌বার অভ্যাসের ফলে যে আমাদের একটুও লাভ হয় না তা আমি বলি না। তবে কি জান? আমার মোটমাট বক্তব্য এই মাত্র যে নিজের প্রবৃত্তিকে নিজের কাছে ছদ্মবেশ পরিয়ে বেশিদিন জাহির করা চলে না। তুমি ত জান যে আমি নিজে দেশে থাক্‌তে কখনও থিয়েটারে যেতাম না, নাটক নভেল পড়তাম না, মেয়েদের ছায়াও মাড়াতাম না ইত্যাদি। কিন্তু এখন ত বুঝতে পারছি যে এ ভাবে উপবাসে রাখ্‌লেই নারী সঙ্গলাভের দুর্জ্জয় বাসনাকে শুকিয়ে মারা যায় না!"

পল্লব ধীরে ধীরে বল্‌ল: "কিন্তু···ঐটা উচিত কি না..."

মোহনলাল বল্‌ল: "ভাই সে সমস্যা নিয়ে কি আমি একটুও মাথা ঘামাই নি ভাবছ? তবে আমার এখন মনে হয় যে এরূপ স্থলে উচিত-অনুচিতের যুক্তিতর্ক মানুষকে বড় ঠেকাতে পারে না।"

পল্লব বল্‌ল:—"তবে কিসে পারে?"

মোহনলাল একটু চিন্তাকুলস্বরে বল্‌ল: "ভাই, কিসে যে পারে তা বলার চেয়ে কঠিন কাজ বোধ হয় সংসারে কমই আছে।...এ সম্বন্ধে নানা রকম তুকতাক্—যা এক সময়ে এ সব প্রবৃত্তির অমোঘ ঔষধ ব'লে আমার মনে হ'ত—নিজের ও অপরের ক্ষেত্রে একে একে ব্যর্থ হ'তে দেখেছি।...হয়ত বাল্যকাল থেকে পুরাকালের যোগীদের মতন অরণ্যে বাস, জপতপ করা—এ সবে এ প্রবৃত্তিকে খানিকটা জয় করা যায়।···কিন্তু যদি সংসারে প্রতিদিন নারীর চাহনি, স্পর্শ, সেবা প্রভৃতি স্নেহের দানের প্রভাবে গড়ে উঠ্‌তে হয় তাহ'লে বোধহয় আমাদের মনটিকে নারীর মাধুর্য্যমোহ হ'তে মুক্ত রাখা অসম্ভব হ'য়ে না উঠেই পারে না।"

পল্লব ক্ষুব্ধস্বরে বল্‌ল: "মোহনলাল···এ ত দেখ্‌ছি নিছক্ নিরাশার বাণী! শেষটা তোমার এই হ'ল? নারীর প্রভাব হ'তে মানুষের উচ্চাশা মুক্তিলাভ কর্‌তে পারবেই না এই-ই কি মেনে নিতে হবে? না, কোনও প্রতিষেধকই নেই এই-ই মানুষের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার চরম কথা?"

মোহনলাল বল্‌ল: "না চরম কথা নয়। চরম কথা যদি কিছু থাকে তবে সেটা বোধহয়—মানুষ এজন্য যে পন্থা অবলম্বন করেছে সেই পন্থাই অবলম্বন করা। অর্থাৎ—বিবাহ করা রূপ টীকে নেওয়া। নইলে বোধহয় নারী-সঙ্গের নানারূপ ছোট বড় আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই স্তূপীকৃত হ'য়ে শেষটা সব যুক্তি-তর্ক, বাধা-নিষেধ, শাস্ত্রবাক্য-বিবেক, প্রভৃতি বড় বড় ঠেকানে-ওয়ালাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। অন্ততঃ জীবনে পনর আনা তিন পাই লোকের ক্ষেত্রে ত প্রত্যহ এই-ই হ'য়ে আস্‌ছে দেখ্‌তে পাই।···অবশ্য লোক-নিন্দার ভয়ও অনেকটা কাজ করে একথা মানি। তবে জীবনের অভিজ্ঞতার প্রতি পৃষ্ঠায় যা দেখ্‌তে পাওয়া যায় তাতে ত মনে হয় যে বিবাহরূপ টীকে না নিলে এ মোহের বীজাণুকে শুধু বিবেক ও লোকনিন্দা দিয়ে বড় বেশিদিন ঠেকানো যায় না।"

পল্লব এ কথায় একটু স্তম্ভিত হ'য়ে বল্‌ল: "মোহন-লাল! তোমার চিরকালকার আদর্শবাদের আজ এই পরিণাম! শুধু চিরকুমার ব্রত বিসর্জ্জন দিয়ে তুমি ক্ষান্ত নও বিবাহের মতন পবিত্র বন্ধনকে শুধু মোহের বীজাণুর বিরুদ্ধে টীকে-দেওয়া ব'লে প্রচার করছ? আশ্চর্য্য! প্রথম মোহ মানুষকে এত বদ্‌লে দিতে পারে! তুমি কি সেই মোহনলাল?"

মোহনলাল একটু সন্তপ্ত স্বরে বল্‌ল: "হয়ত আমার বর্ত্তমান স্বপ্নভঙ্গের বা disillusionmentএর অবস্থায়

বিবাহকে আমি ঠিকমত দেখ্‌তে পারছি না। তবে এটা আমার আসল বক্তব্য ছিল না ভেবে হয়ত তুমি এ কথাটিকে মাফ করতে অসম্মত হবে না। যদিও আমি বল্‌তে বাধ্য যে অধিকাংশ লোকেই শুধু প্রবৃত্তির রাশ ছেড়ে দেবার জন্যই প্রথমটা বিবাহ করে। তবে হয়ত শেষটায় সে বিবাহটা যাকে তুমি বলছ 'পবিত্র বন্ধন' তাই হ'য়ে দাঁড়ায়। সে বিষয়ে এখ আমি জোর ক'রে না বল্‌তে চাই না; কেননা এ বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই, আর পরের মুখে ঝাল খাওয়াটা আমি অনুচিত মনে করি।...কিন্তু সে কথা যাক্‌। আমি আজ তোমায় যা বল্‌ছিলাম।...মনে কোরো না যে আমি আজ নিজে মোহে পড়ে গেছি ব'লেই সব ভাল ছেলের ভালত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ ক'রে ব'সে নিজেকে সমর্থন করতে চাইছি। আমি সত্যিই দেশে ও এখানে আমাদের দেশের অনেক তথাকথিত ভাল ছেলের আচরণের খবর রাখি। আমি দেখেছি যে আমাদের মধ্যে অধিকাংশই মনের দিক্ দিে না হোক্ দেহের দিক্ দিয়ে যাকে বলি ভাল ছেলে থাকি শুধু—প্রলোভনের অভাবে। অথচ এজন্য আমাদের অহমিকার আর সীমা থাকে না।...পরে একদিন যখন নিয়তি হেসে আমাদের অহঙ্কারের দুর্গের নীচে থেকে একখানি মাত্র পাথর খুলে নেন, তখন আমরা উপলব্ধি করি যে আমাদের কল্পিত গাঁথুনি বস্তুতঃ কত দুর্ব্বল। বিশেষতঃ আমাদের দেশের আদর্শবাদ জীবনের যথার্থ স্বরূপের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে না ব'লে দু একটি ঘা খেলেই গোড়া থেকে টলমল করে।"

পল্লব বল্‌ল: "'বিশেষতঃ আমাদের দেশে' কথাটি বলার মানে? অর্থাৎ তুমি কি বল্‌তে চাও যে এ সব দেশে বরাবর আদর্শবাদ বজায় রাখা বেশি সহজ?"

মোহনলাল বল্‌ল: "আমার আগে তা মনে হ'ত না' কিন্তু আজকাল ক্রমেই বেশি ক'রে মনে হচ্ছে। মনে কোরো না যে আমার মোহমুগ্ধ হওয়াটাই আমার এ গভীর পরিবর্ত্তনের মূল। এ পরিবর্ত্তন আমার অনেকদিন ধরেই ধীরে ধীরে হচ্ছিল, আজ কেবল সেটা পর্ব্বতের চূড়ার মতন সহসা প্রকাশ হয়েছে মাত্র।...দেখ পল্লব আমি তোমার আমার বছর দেড়েক আগে এসেছি। তাছাড়া আমাকে এসেই কেম্ব্রিজে ভর্ত্তি হ'তে হয় নি, লণ্ডন এডিনবরা প্রভৃতি পর্য্যটন ক'রে বেড়াতে হয়েছিল। ফলে, এদেশে আমাদের ছেলেরা কি রকম ভাবে জীবন কাটায় সে সম্বন্ধে আমার ভাগ্যে অনেকের চেয়ে একটু বেশি অভিজ্ঞতা লাভ ঘটেছিল। এমন কি সম্প্রতি দু তিন জন অতি সচ্চরিত্র ছেলের পদস্খলনের ভিতরকার ইতিহাস জান্‌বার আমার সুযোগ হ'য়েছিল। এ সব দেখে শুনে আমার একটা কথা বার বার মনে হ'য়েছে। সেটা এই যে আমাদের এদেশে এসে একবার পদস্খলন হ'লে যে আর কিছু ধ'রে উঠে দাঁড়াবার শক্তি থাকে না তার প্রধান কারণ—আমরা ছেলেবেলা থেকে মেয়েদের সঙ্গ ও সাহচর্য্য থেকে বঞ্চিত থাকি।"

পল্লব বল্‌ল: "কথাটা একটু পরিষ্কার ক'রে বল্‌লে ভাল হয়।"

মোহনলাল বল্‌ল: "অর্থাৎ আমার মোট বক্তব্যটি শুধু এই মাত্র যে ছেলেবেলা থেকে অল্পবিস্তর মেয়েদের সঙ্গে মেশাটা হচ্ছে যৌবনে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার একটা মস্ত প্রতিষেধক। এ কথার মস্ত প্রমাণ—এদেশের ভাল ছেলেদের দৃষ্টান্ত। যৌবনের মোহে এরা যথেষ্ট পড়ে। কিন্তু সেজন্য এরা জীবনকে ধ্বংস হ'তে দেয় না। কেমন ক'রে এরা এ শক্তি পেল এ কথা আমি অনেকদিন ভেবেছি। শেষটায় আমার মনে হয়েছে যে কারণ শুধু এই যে ছেলেবেলা থেকে নারীর সঙ্গ কমবেশী পেয়ে আসার দরুণ সেটার মোহ এদের কাছে নিষিদ্ধ ফলের মতন দুর্দ্দম্য হ'য়ে ওঠে না; এবং তার ফলে এরা যৌবনে নারীর সঙ্গে মিশ্‌তে গিয়ে যদি স্খলিতও হয় তা হ'লেও তাতে তত বিচলিত হয় না, নিজের কাজটা ক'রে যায়। অপর পক্ষে আমরা ছেলেবেলা থেকে বাধ্য হ'য়ে নারীসঙ্গ থেকে বঞ্চিত থাকি ব'লে হঠাৎ যখন এদেশের ললনাগণের সঙ্গে মেলামেশার অনেকটা অবাধ স্বাধীনতা পাই তখন আর টাল সাম্‌লাতে পারি না।"

পল্লব সন্দিগ্ধভাবে বল্‌ল: "তার মানে এরা পারে?"

মোহনলাল বল্‌ল: "আমার বোধহয় অনেকটা পারে। এ কথাটা তোমাকে আজ সাধ্যমত একটু বিশদ ক'রে বল্‌বার চেষ্টা করব। তোমাকে কিন্তু একটু ধৈর্য্য ধ'রে শুনতে হবে পল্লব।"

"বৎসরখানেক আগে একজন মস্ত নরওয়ের লেখকের উপন্যাসে একটি কথা আমাকে এ বিষয়ে প্রথমে ভাবিয়ে

দেয়। তিনি এক যায়গায় লিখেছেন যে এ সংসারে কে এমন 'মূর্খ' আছে যে কোনও না কোনও সময়ে নীতির শত নিষেধ সত্ত্বেও প্রবৃত্তির চরিতার্থতায় গা-ভাসান দেয় নি! 'মূর্খ' কথাটির ব্যবহার লক্ষ্য কোরো। চিন্তাশীল লোকের লেখায় এ রকম দায়িত্বহীন কথা প'ড়ে আমার মনটা যে বেশ একটু বিচলিত হ'য়েছিল তা এখনও পরিষ্কার মনে আছে। কারণ এ সম্পর্কে তাঁর মূর্খ কথাটি ব্যবহার করার সদর্থ কি শুধু এই নয় যে 'সংসারে এরকমটা শুধু হ'য়ে থাকে তাই নয়, এ অসংযমের অভিজ্ঞতাটা হওয়াটা বাঞ্ছনীয়? তবে এ উচ্ছৃঙ্খল সিদ্ধান্তটি যখন প্রথম পড়ি তখন আমার মনের পূর্ব্ববিশ্বাস এতটা দৃঢ় ছিল যে এ কথাটায় আমার মনকে একটু নাড়া দিয়ে দিয়েছিল মাত্র। অর্থাৎ আমি এ দায়িত্বহীন কথাটাকে খুব গভীরভাবে বিচারযোগ্য ব'লে মনে করি নি। কিন্তু ক্রমশঃ য়ুরোপের আরও দুচারজন চিন্তাশীল লোকের চিন্তাধারা আলোচনা ক'রেছি ও এদের দেশের অনেক 'ভাল ছেলের' সঙ্গেও এ বিষয়ে আলাপ করেছি। ফলে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌছেছি যে এরা Puritanismকে শুধু যে মুখে ঠাট্টা করে তাই নয় মনে মনেও হাস্যাস্পদ মনে ক'রে থাকে। কাজে কাজেই এরা মেয়ে পুরুষের আচরণে পান থেকে চূণ খস্‌লেই আর্ত্তনাদ করে ওঠে না, বা নৈতিক পবিত্রতা সম্বন্ধে গোড়া থেকে অসম্ভব রকম ধনুর্ভঙ্গ পণ ক'রে বসে থাকে না।"

পল্লব কুঙ্কুমের সঙ্গে প্রায়ই মোহনলালের য়ুরোপীয় সভ্যতার গুণপক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে তর্ক কর্‌ত। কিন্তু এ যাবৎ অন্ততঃ পল্লব অনেকটা তর্কের খাতিরেই তর্ক কর্‌ত। কারণ মনে মনে সে কখনও ভাবেনি যে মোহনলালের য়ুরোপপ্রীতির কোনও কুফল ফল্‌তে পারে। আজ তার হঠাৎ মনে হ'ল যে হয়ত বিলেতে এসে মোহনলালের মনটির পরিবর্ত্তনটির গভীরতা যে কতখানি তা সে এতদিন ঠিকমত ঠাহর কর্‌তে পারে নি। এ সন্দেহ তাকে একটু বেশি বেদনা না দিয়েই পারল না। যাকে বরাবর নিকট-বন্ধু মনে ক'রে আসা গেছে হঠাৎ একদিন তার হৃদয়টি অপরিচিত ব'লে মনে হ'লে বন্ধুত্বের অভিমান ব্যথা না পেয়েই পারে না। তাই পল্লব একটু ক্ষুব্ধ হ'য়ে অল্প উষ্মার সুরে ব'লে উঠ্‌ল:—"তাই ব'লে কি সেটা ভাল বল্‌তে হবে?" না জীবন ও নীতি সম্বন্ধে এদের মূলসূত্রগুলিই অকাট্য ব'লে ধ'রে নিতে হবে? মোহনলাল! আজ তোমার মুখে এই সব কথা শুনে আমার মনে যে কি রকম ভাবের উদয় হচ্ছে তা ব'লে বোঝানো সহজ নয়। ......নৈতিক পবিত্রতা বজায় রাখ্‌তে খুব বেশির ভাগ লোকই অক্ষম,—মানি। প্রলোভনের হাত থেকে আত্ম-রক্ষা করতে পারা-না-পারা বিষয়ে ভালছেলে মন্দছেলে সব সমান একথাও না হয় মেনে নিতে পারি। কিন্তু তাই ব'লে আমাদের দেশের 'নৈতিক পবিত্রতা', 'বৈরাগ্য' 'মরালিটি' প্রভৃতির আদর্শের ওপরেও গায়ের ঝাল ঝাড়াটা আমি ঠিক্ পরিপাক কর্‌তে পারছি না। কার্য্যক্ষেত্রে নৈতিক পদস্খলনকে মার্জ্জনা করা এক, আর আদর্শজগতে কালাপাহাড়ি আর। একথা তোমার মুখেই বারবার শুনেছি। তাই তোমার মুখে আজ সব উল্‌টো উল্‌টো কথা শুনে—"

মোহনলাল উত্তেজিত পল্লবের কাঁধে একটি হাত দিয়ে বলে উঠ্‌ল:—"শোন শোন পল্লব। তুমি আমাকে উত্তেজনার মাথায় একটু ভুল বুঝেছ। নৈতিক পবিত্রতার 'আদর্শে'র সঙ্গে আমার বিবাদ নেই। প্রয়োগ নিয়েই আজ আমার মাথাব্যথা। কারণ আদর্শ হিসাবে যে নৈতিক পবিত্রতার আদর্শ একটা বড় আদর্শ একথা কে না মান্‌বে?"

পল্লব একটু ব্যঙ্গের সুরে বল্‌ল: "কেন—তোমার অনেক তথাকথিত চিন্তাশীল লোকেই ত মানেন না দেখ্‌তে পাই, বিশেষতঃ এদেশে!"

মোহনলাল বল্‌ল:—"তুমি বোধ হয় Oscar Wilde, Shaw, Ludovici, Russel, Anatole France প্রমুখ দুচারজন লেখকের কথা মনে ক'রে এ রকম রুষ্ট ভাষা ব্যবহার করছ, না?......কিন্তু দেখ আমার মনে হয় যে এঁরা আসল পবিত্রতার ভাণকেই ব্যঙ্গ ক'রেছেন, খাঁটি পবিত্রতা বা আদর্শবাদকে করেন নি। আর যদি তা ক'রেও থাকেন, তাহ'লেও বলা চলে না যে এ সব আদর্শের এদের মনো-রাজ্যে কোনও প্রভাবই নেই।"

পল্লব একটু সবিদ্রূপ হেসে বল্‌ল:—"অর্থাৎ?" তার ক্ষোভ তখনও যায় নি। সে কেমন যেন অজ্ঞাতে মোহন-লালের অনেক সরল উক্তিকে নিজের প্রতি কটাক্ষপাত হিসেবেই গ্রহণ না ক'রে পারছিল না।

মোহনলাল বল্ল: "অর্থাৎ সব দেশেই আদর্শবাদে সত্য সত্য সাড়া দেয় কম লোক। তাদের এক কথায় একটা জাতির choice spirits বলা যেতে পারে। কাজে কাজেই যদি এদের দেশের choice spiritsরাও আদর্শবাদ দ্বারা তাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করতে অক্ষম হ'য়ে ওঠে, কেবল তখনই বলা যেতে পারে যে এদের সভ্যতায় আদর্শবাদের প্রভাব নেই। এখন দেখ, এদের দেশে কত লোক যুদ্ধের সময় সত্যই দেশের মঙ্গলের জন্য প্রাণ দিয়েছে—স্বার্থের জন্য নয়। কত Quaker শত বাধা সত্বেও খৃষ্টের নীতি অনুসারে জীবন যাপন ক'রে থাকে, যেমন যখন তারা conscientious objector হ'য়ে জেলেও গেছে কিন্তু দেশের জন্য অস্ত্র ধরে নি; কত সাহিত্যিক দৈন্যদারিদ্র্যের মধ্যেও লোকপ্রিয় হবার জন্য আর্টকে জলাঞ্জলি দেয় নি; কত বৈজ্ঞানিক আমরণ দেহসুখ, বিলাস ত্যাগ করে লেবরেটরিতে একাগ্রচিত্তে সত্যের সাধনা ক'রে গেছে। তবে এ সব একটু অবান্তর কথা এসে পড়ল। যে কথা বলছিলাম।......

"আমি বলছিলাম কি যে তুমি আমার উপর একটু অবিচার করেছ; অর্থাৎ আমাকে ভুল বুঝেছ। কারণ আমি আদর্শজগতে নৈতিক পবিত্রতা, বৈরাগ্য প্রভৃতিকে বড় জিনিষ ব'লে এখনও অবধি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি।—হাজার হোক্ আমাদের দেশে ব্রহ্মচর্য্য, সন্ন্যাস প্রভৃতি আদর্শের যে tradition যুগ যুগ ধ'রে চ'লে আসছে দু-চার বৎসর বিলেতে থাকলেই কিছু সে আদর্শের প্রভাব মন থেকে একেবারে দূর ক'রে দেওয়া যায় না। নৈতিক স্খলনের বিষময় ফলের কথাও আমার অগোচর নেই। তবে তা সত্বেও আমি বলতে বাধ্য যে নৈতিক পবিত্রতা সম্বন্ধে নিছক আদর্শকে সর্ব্বেসর্ব্বা ক'রে দেখারও একটা কুফল অনেক সময়ে ফ'লে থাকে। সেটা এই যে এ সব দেশে এসে—বা আমাদের নিজেদের দেশেও—আমাদের একবার পতন হ'লে আমরা স্বতঃই মনে ক'রে বসি যে সব গেল। আমি সম্প্রতি অনেকগুলি......সত্যিকার মহৎচরিত্র আদর্শবাদী ছেলেকে...সামান্য ভুলের জন্য এভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'তে দেখেছি ব'লে একথা আরও এতটা জোর দিয়ে বলতে পারছি।"

বলতে বলতে মোহনলালের স্বর গাঢ় হ'য়ে এসেছিল। এমন কি পল্লবের মনে হ'ল যে শেষ কথাটি বলবার সময় যেন মোহনলালকে দু'তিনবার একটু ইতস্ততঃ ভাবের মধ্যে প'ড়ে যেতে হ'ল। সে কি একটা প্রতিবাদ করতে উদ্যত হ'তেই মোহনলাল তাকে বাধা দিয়ে বল্ল: "পল্লব, আজ আমার কথাগুলিকে তুমি তর্ক হিসেবে নিয়ে ভুল কোরো না এই আমার অনুরোধ। আমি আজ যতটা আন্তরিক ভাবে তোমার কাছে নিজের হৃদয়ের দুয়ার খুলে দিয়ে কথা বলছি সেই ভাবটা ধরতে চেষ্টা কর। সুযুক্তি প্রয়োগ ক'রে বুদ্ধি জাহির করার ক্ষেত্র এ নয়—একথা তুমি বিশ্বাস কর। বোধ হয় একদিন বুঝবে যে জীবনে এরকম অকপট স্বীকারোক্তি করাটা যেমন লাভ সেটা শুনতে পাওয়াও তার চেয়ে বড় কম লাভ নয়। তাই আমার আজকের কথাগুলি তুমি একটু বিশেষ চেষ্টা ক'রে বুঝতে চেষ্টা কর এইই তোমার বন্ধুর মিনতি। শোন পল্লব, তুমি সত্যি একথা নির্ভয়ে বিশ্বাস করতে পার যে অসম্ভব বড় আদর্শ সমাজের সাধারণের কাছে ধরার একটা মস্ত বড় দায়িত্ব আছে। হয়ত সেই জন্যই আমাদের দেশে অধিকারীভেদ ব'লে একটা কথার ওপর আমাদের দার্শনিক, নীতিবাদী সাধু সন্ন্যাসী প্রভৃতি এত জোর দিয়েছেন। অবশ্য উচ্চ নৈতিক আদর্শ অনুসারে চলবার চেষ্টা করারও যে একটা উলটো খারাপ দিক্ আছে একথা শুনলে মনে প্রথমটায় ধাক্কা লাগা অস্বাভাবিক নয়। যখন একথাটা আমার প্রথম মনে উদয় হয় তখন আমার নিজেরও খুবই ধাক্কা লেগেছিল। তবে সত্যই যখন জগতের নিয়ন্তা তখন তাকে যত শীঘ্র মেনে নেওয়া যায় ততই ভাল। তাই আমি মনে করি যে একথা শান্তভাবে স্বীকার ক'রে নেওয়াই বাঞ্ছনীয় যে আদর্শ জগতে এদের নৈতিক নিষ্কলঙ্কতার মানদণ্ড আমাদের মতন সূক্ষ্ম না হওয়া সত্বেও কার্য্যক্ষেত্রে তাতে এদের বিশেষ ক্ষতি হয় নি।"

পল্লব বল্ল:—"কেমন ক'রে? নৈতিক নিষ্কলঙ্কতার মধ্যে যে একটা সত্যিকার বড় তৃপ্তি আছে একথা তুমি কি অস্বীকার কর?"

মোহনলাল বল্ল: "করি—যদি তুমি নৈতিক নিষ্কলঙ্কতা বলতে সাধারণে যা মনে করে, তাই মনে ক'রে থাক। অর্থাৎ, আমি নিছক্ দৈহিক নিষ্কলঙ্কতার উপকারিতা অস্বীকার না করলেও সেটা যে একটা positive উপলব্ধি

তা ম'নে করি না, যদি সঙ্গে সঙ্গে চিত্তশুদ্ধি না থাকে। এবং চিত্তশুদ্ধি যে কত কঠিন ব্যাপার তা তুমি নিশ্চয়ই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব ক'রে থাক্‌বে। একথা যদি তুমি স্বীকার কর তাহ'লে তোমার এ-ও স্বীকার করতে হবে যে যে আদর্শকে আমাদের দেশে লক্ষের মধ্যেও একজনকে উপলব্ধি করতে দেখা যায় কি না সন্দেহ, সেটাকে খুব বড় ক'রে না দেখ্‌লেও কার্য্যক্ষেত্রে তত ক্ষতি হয় না। শুধু তাই নয়, কার্য্যক্ষেত্রে এ আদর্শকে অনধিগম্য মনে ক'রে চল্‌লেও তাতে সমাজের সৃষ্টিশক্তির বা গতিশক্তির তেমন লোকসান হয় না। অর্থাৎ একটা জাতির sex সম্বন্ধে নৈতিক শৈথিল্য থাকা সত্ত্বেও সত্যকার দানে মস্ত হবার তার কোনও বাধা নেই।"

পল্লব বল্‌ল: "এটা অতি অসার ।।"

মোহনলাল বল্‌ল: "একটু ভেবে দেখলে দেখ্‌তে পাবে যে অনেক দৃশ্যতঃ অসার কথার মধ্যে অনেক সময় গভীর সত্য নিহিত থাকে। আমার কথাটা বোঝবার একটু চেষ্টা করলে হয়ত এ কথাটা তোমার কাছে তত অসার মনে হবে না। নৈতিক নিষ্কলঙ্কতাকে খুব বড় করে না-দেখার যে সুফলও থাকতে পারে এটা আমাদের প্রথমটায় অসার কথা মনে হ'তে পারে বটে। ছেলেবেলা থেকে কোনও আইডিয়াকে প্রকাণ্ড, মহান্‌, গরীয়ান্‌ ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত ক'রে দেখার ও শুনে-আসার অভ্যাসের ফলে মনটা অনেক সময়েই এ সব বিশেষণের hypnotismএর মধ্যে প'ড়ে যায়। ফলে হয় এই, যে এ সম্বন্ধে অন্য কোনওরূপ ধারণা যে পোষণ করা চলে সে সম্বন্ধে আমরা স্বতঃই যথেষ্ট সচেতন থাকতে পারি না। সেই জন্যই নীতিরাজ্যে দুর্দ্ধর্ষ আদর্শ পোষণ-না-করারও যে একটা ভাল দিক্‌ থাকতে পারে এ কথাটা স্বীকার করতে তুমি আজ কুণ্ঠিত হচ্ছ। কিন্তু একটু ভেবে দেখ্‌লে হয়ত পরে এর মধ্যেকার সত্যটুকু তুমি গ্রহণ না ক'রেই পারবে না।"

পল্লব বল্‌ল: "সে ভাল দিক্‌টা কি শুনি?"

মোহনলাল বল্‌ল: "সে ভাল দিক্‌টা এই যে যৌবনে এ সব ছোটখাট নৈতিক স্খলনকে এরা সত্যিই তত গুরুতর মনে করে না ব'লে এদের ভাল ছেলে মন্দ ছেলে কেউই এ রকম দুচারটে পদস্খলনে বিশেষ বিচলিত হয় না। তারা এ সব গুলোকে জীবনের একটা অভিজ্ঞতা বলে মনে ক'রে—শুধু ছেলেরাই যে করে তাই নয়—বুড়োরাও করে। তার একটা প্রমাণ দে তে পাবে এরা প্রায়ই যৌবনের ছোটোখাট অবিচার গুলোকে sowing of wild oats ব'লে ক্ষমা ক'রে থাকে।"

পল্লব বল্‌ল: "এ কথা আমিও লক্ষ্য করেছি। তবে আমার মনে হয় যে এদের দেশের প্রধানেরা প্রায়ই নবীনদের এ সব বিষয়ে অতিচার ক্ষমা করেন এই ভেবে যে তাঁরাও যখন নবীন ছিলেন তখন তাঁদেরও এ গুণে ঘাট ছিল না।" শেষ কথাটির মধ্যে সে ইচ্ছে ক'রেই একটু ব্যঙ্গের সুর এনেছিল। মোহনলাল এ ব্যঙ্গের রেশটি বুঝলেও সেটাকে গায়ে না মেখে ভালমানুষি সুরে বল্‌ল: "এ কথা তোমার সম্পূর্ণ মিথ্যা নয় পল্লব। তবে কি জান? এ সব বিষয়ে এদের স্খলনকে ব্যঙ্গ করবার সময় আমরা অতি সহজেই এ সাদা সত্যটি ভুলে যাই যে নৈতিক আচরণে বস্তুতঃ আমরাও নিতান্ত কেও-কেটা নই। আমাদের পতন হয়ত গুন্‌তিতে এদের চেয়ে কিছু কম হ'তে পারে, কিন্তু তার প্রধান কারণ আমাদের সুযোগ সুবিধের অভাব—সদিচ্ছার অভাব নয়। সুযোগ পেলে যে আমাদের পক্ষেও বাইরণ বা Louis XIVকে টেক্কা দেওয়া মোটেই অসম্ভব নয় সে বিষয়ে আমাদের উচ্চ-বংশীয়েরা ও রাজারাজড়া জমিদার প্রভুরা জলন্ত প্রমাণ। তবে যা বল্‌ছিলাম সেই প্রসঙ্গেই ফিরে আসা যাক্‌।... হ্যাঁ...আমি বল্‌ছিলাম কি যে নৈতিক অসংযমকে এরা অনেকটা সাদা চোখে দেখে ব'লেই এদের ভাল ছেলেরা দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের স্খলনে আমাদের ভাল ছেলেদের মতন অবলীলাক্রমে আত্মসম্মান হারিয়ে বসে না বা অধঃপতনের চূড়ান্ত ক'রে টিটিকার ক'রে ফেলে না। তার অবশ্য অন্য কারণও যে নেই তা নয়। এদের জীবনের মধ্যেকার প্রাণশক্তি বা vitalityর স্রোতটা এদের একটা সত্য সম্পদ্‌। তার সামনে এ সব অসংযমের পাহাড় প্রমাণ আবর্জ্জনাও অনেক সময় মুছে ভেসে যায়, যেখানে আমাদের স্রোতহীন জীবনে খড় কুটোটিও জলকে পঙ্কিল ক'রে তোলার পক্ষে যথেষ্ট হ'য়ে থাকে। তবে এ কারণের কথা এখন থাকুক, কেন না আজ আমি এদের ও আমাদের আদর্শের প্রয়োগ নিয়েই তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে

চাই। প্রথমতঃ আমার ত খুবই মনে হয় যে sex বিষয়ে মূলতঃ আমাদের প্রবৃত্তিও যা এদের প্রবৃত্তিও তাই—প্রভেদ যা কিছু আচার ও সুযোগ নিয়ে। তবে এ রকম সাদা সত্যকেও যে আজ জোর ক'রে বল্‌তে হচ্ছে তার কারণ, আমরা অতি সহজেই মনকে চোখ ঠেরে নিজেদের এক অদ্ভুত আধ্যাত্মিক ও ধর্ম্মধ্বজ জাতি ব'লে প্রচার করতে ভালবাসি। যেন সত্যিই ওরা ব্রহ্মার পা থেকে জন্মেছিল ও একা আমরাই তাঁর হৃদয়পদ্ম হ'তে জন্মলাভ করেছি। যিনিই আমাদের মেস হষ্টেল প্রভৃতি ছেলেদের আচরণের বিষয়ে ভেতরকার খবর রাখেন তিনিই জানেন বস্তুতঃ আমাদের ছেলেদের প্রকৃতির সঙ্গে ওদের ছেলেদের প্রকৃতির পার্থক্য আমাদের কতখানি স্বকপোলকল্পিত।...তবে এরূপ ক্ষেত্রে আমরা প্রায়ই একটা গোলমাল ক'রে বসি। সেটা হচ্ছে আদর্শ নিয়ে। এদের ও আমাদের মধ্যে sex বিষয়ে 'আচরণে' বিশেষ পার্থক্য না থাক্‌লেও 'আদর্শে' আছে এ কথাটা বোধ হয় সত্য। প্রভেদটা কি রকম একটু পরিষ্কার ক'রে বলি। আমাদের কোনও ভাল ছেলে দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে অসংযত হ'য়ে পড়্‌লেও সত্যি সত্যিই মনে মনে সেটা গুরুতর অন্যায় ব'লে বিশ্বাস করে। কারণ আমাদের দেশের ব্রহ্মচর্য্য, বৈরাগ্য, চিত্ত-শুদ্ধি প্রভৃতির আদর্শ আমাদের শ্রেষ্ঠ ছেলেদের মনের ওপর অলক্ষিতে কম প্রভাব বিস্তার করে না। কিন্তু এদের দেশের শ্রেষ্ঠ মনের উপরও খৃষ্ট, সেণ্ট পল বা সেণ্ট ফ্রান্সিসের প্রভাব প্রায় নেই বল্‌লেই হয়—এবং যেটুকু ছিল, science, psycho-analysis প্রভৃতির প্রচারে অতি দ্রুতবেগে ক'মে আস্‌ছে। (এখানে অবশ্য আমি উচ্চ-শিক্ষিতদের কথা বল্‌ছি। কারণ উচ্চশিক্ষিতেরা আজ যা বল্‌বে অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিতেরা কাল সেই কথা বল্‌বে।) এখন দেখ, মেয়ে পুরুষের মেলামেশা সম্বন্ধে এদের কুণ্ঠা সঙ্কোচ ক্রমেই কমে যাওয়ার পরিণাম কি হয়েছে?—হয়েছে এই যে এরা এ সব বিষয়ে একটু বেশি সাহসী ও সত্যবাদী হ'তে পেরেছে। কাজেই যে আচরণে আমাদের দেশের ভাল ছেলেদের মন একেবারে নুয়ে পড়ে—তাদের সত্যগোপন ও অনেক সময়ে প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিতে হয় ব'লে—ঠিক্ সেই আচরণে এদের মনের প্রসার তেমন কম্‌তে পারে না।"

পল্লব বল্‌ল: "কথাটা ঠিক্ বুঝলাম না মোহনলাল।"

মোহনলাল বল্‌ল: "আমার বোধ হয় কথাটা একটু পরিষ্কার ক'রে বলার দরকার আছে। গোড়া থেকে বলি। আমার মনে হয় যে আমরা অনেক সময়ে একটা আচরণের ন্যায়-অন্যায় বিচার করতে গিয়ে একটা ভুল ক'রে বসি। কোনও আচরণ ভাল কি মন্দ সেটা নির্ভর করে আমাদের মনের উপর তার কি রকম ছাপ পড়ে তার উপর। নয় কি? কিন্তু আমরা প্রায়ই ভুলে যাই যে একটা আচরণ বা ব্যবহারের গুরুত্ব দেশকালপাত্রভেদে একই রকম থাকে না। অর্থাৎ কিনা একের কাছে যে আচরণ অশোভন বা অন্যায় অন্যের কাছে তা শোভন ও ন্যায়সঙ্গতও হ'তে পারে।

পল্লব বল্‌ল: "তা ত বটেই। একটা শিশুর আচরণে যা সুন্দর তা যুবকের আচরণে অসুন্দর ত হ'তেই পারে।"

মোহনলাল বল্‌ল: "ঠিক কথা। তবে এই কথাটা আরও একটু বেশি সাধারণ ভাবে বল্‌তে গেলেই গোল বাধে। অর্থাৎ যদি আমি বলি যে আমাদের কাছে একটা নৈতিক স্খলন যত গুরুতর য়ুরোপীয়দের কাছে সেটা তার চেয়ে ঢের কম গুরুতর হ'তে পারে, তাহ'লে সম্ভবতঃ নীতিবাগীশেরা মহা কলরব করে উঠ্‌বেন। তাঁরা বলবেন যা পাপ তা সর্ব্বদাই ও সর্ব্বত্রই পাপ ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সত্যি তা নয়। আমার সম্প্রতি বিশেষ করেই মনে হয়েছে যে যাকে আমরা নৈতিক স্খলন বলে গালি দেই সেটা ক্ষতিকর হ'য়ে ওঠে কাজটির জন্যে তত নয় যত তার দরুণ মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিতে বাধ্য হওয়ার জন্যে। তাই আমাদের দেশে ওর কুফল যত গুরুতর হ'য়ে থাকে এদেশে তা হয় না।"

পল্লব বল্‌ল: "কথাটা ঠিক্ বুঝলাম না মোহনলাল। অমিতাচারের কি physical কুফলও যথেষ্ট নেই? আর তার দরুণ স্বাস্থ্যভঙ্গ প্রভৃতিও কি নিন্দনীয় নয়?"

মোহনলাল বল্‌ল: "এ কথাটা একটু অবান্তর হ'য়ে পড়্‌ল। তাছাড়া 'নিন্দনীয়' কথাটি ব্যবহার করার দরুণ তুমি একটা মস্ত প্রশ্ন তুল্‌লে। তবে যখন জিজ্ঞাসা করলে তখন এ প্রশ্নটির সম্বন্ধে আমি যে দুচারটি কথা ভেবেছি তা নিয়ে একটু আলোচনা করা মন্দ নয়।

"প্রথমতঃ দেখ, কোনও কাজ সমাজে নিন্দনীয় হ'লেই

যে বস্তুতঃ গর্হিত হবেই হবে একথা বলা চলে না। এ সম্বন্ধে চরম কষ্টিপাথর হওয়া উচিত—নিজের উচিত-অনুচিত বোধ, সমাজের নয়। নইলে সমাজ অনড়, অচল, স্রোতহীন হয়ে পড়ে। উচিত-অনুচিত সম্বন্ধে সমাজের আদেশ যে ব্যক্তিগত জীবনে প্রায়ই লঙ্ঘন করা কর্ত্তব্য হ'য়ে থাকে, সে সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আমার মতভেদ হবে না। উদাহরণতঃ সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, সমুদ্রযাত্রা, ছুৎমার্গ প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের সমাজের বিধি নেওয়া যেতে পারে। তাই কোনও কাজ নিন্দনীয় বল্‌তে তুমি কি বল্‌তে চাচ্ছ সেটা প্রথমতঃ স্পষ্ট ক'রে বল্‌তে হবে। অর্থাৎ সমাজের চক্ষে নিন্দনীয় না ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির মানদণ্ডে নিন্দনীয়। যদি বল সমাজের চক্ষে, তাহ'লে আমি বল্‌ব যে সমাজ অনেক সময়েই কোনও আচরণকে নিন্দা করে সমাজের মঙ্গলের কথা ভেবে নয়, গতানুগতিকতার প্রভাবে। নয় কি?"

পল্লব বল্‌ল: "তাই কি সত্য? একটা কাজ নিন্দনীয় দাঁড়ায় কি মূলতঃ তাতে সমাজের হানি হওয়ার দরুণই নয়?"

মোহনলাল বল্‌ল: "না, সব সময়ে নয়। আমরা সচরাচর অসংযমকে নিন্দা ক'রে থাকি—খানিকটা, পাঁচজনের সঙ্গে মত দিলে জীবনে অনেকটা অসুবিধের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় ব'লে, ও খানিকটা, অপরের নিন্দা করবামাত্র অজ্ঞাতে নিজের শ্রেষ্ঠতার কথা মনে হ'য়ে আনন্দ হয় ব'লে।"

পল্লব বল্‌ল: "মানুষ এত লঘুচিত্ত তা স্বীকার করা—"

মোহনলাল বল্‌ল: "পল্লব একথা শুনলে মনে ব্যথা পাওয়া স্বাভাবিক, মানি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা স্বীকার না ক'রেই উপায় নেই যেহেতু এটা সত্য।"

পল্লব একটু উষ্ণভাবে বল্‌ল: "কারণ তুমি বল্‌ছ সত্য—এই ত?"

মোহনলাল বল্‌ল: "ভাই পল্লব রাগ কোরো না। আমার যুক্তি অন্ততঃ এতটা অসার নয়, যে আমি শুধু আমার বিশ্বাসের বলে তোমাকে বিশ্বাস করাবার চেষ্টা পাব। তবে তুমি যখন নেহাৎ প্রমাণ চাচ্ছ তখন দু একটা কঠিন উদাহরণ নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। তবে আমার দৃষ্টান্ত-থেকেই ব'লে রাখ্‌ছি।...আমি বল্‌ছি এই কথা যে আমরা নৈতিক শিথিলতাকে সচরাচর নিন্দা ক'রে থাকি অহমিকতা চরিতার্থ করার জন্য ও যূথমতের প্রভাব বশে, যাকে ইংরাজীতে বলে herd-instinct...তুমি বল্‌ছ 'না অসংযমটা দোষের ও তার ফলে অসংযমীর স্বাস্থ্যহানিটাও দুঃখের বিষয় ব'লেই সমাজ তাকে দূষ্য মনে করে।' তোমার এ ধারণা যে যুক্তিসঙ্গত নয় তার একটা মস্ত প্রমাণ এই যে, যে সমাজ অবিবাহিতা নারীর সঙ্গে সামান্য অশোভন আচরণের ওপরেও অগ্নিশর্ম্মা ও খড়্গহস্ত হ'য়ে থাকে, সেই সমাজই পরিণীতা পত্নীর সঙ্গে শতগুণ অসংযমকেও দেখেও দেখে না। অসংযম যদি পাপ হয় তবে রুগ্ন স্ত্রীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও বছর বছর রুগ্ন সন্তানের জন্ম দেওয়াটা কেন কেউই পাপ মনে করে না! এরূপ সন্তানের জন্মদাতাকে কেন আমরা একঘরে করি না? অবিবাহিত অবস্থায় অমিতাচারে যতখানি স্বাস্থ্যহানি হয়, পুরোহিতের দুটো মন্ত্র উচ্চারণের পরই কি সে অসংযম মিতাচারের পরাকাষ্ঠা হ'য়ে দাঁড়ায়?...তাছাড়া, যদি স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়াটাই অসংযত জীবনের হেয়তার একটা মস্ত হেতু হয় তাহ'লে কি বলা যেতে পারে না যে একটু বুঝে সুঝে চল্‌লে নৈতিক শিথিলতা সত্ত্বেও অন্য পাঁচজনের মতনই স্বাস্থ্য বজায় রেখে চলা মোটেই অসম্ভব নয়? তুমি মাতাল ও লম্পটের মধ্যে এ রকম খুব সুস্থ লোক দেখ নি? না, তাহ'লে বল্‌বে যে তাদের অসচ্চরিত্রতা ততটা দোষের নয়? তা যদি বল তাহ'লে ত তুমি আমার কালাপাহাড়িকেও হার মানালে। কাজেই তোমার স্বীকার না ক'রেই উপায় নেই যে নৈতিক শিথিলতার বাড়াবাড়িটা physical দিক্ দিয়েও দূষ্য হ'লেও এ শৈথিল্যের কুফল সম্বন্ধে সেইটেই চরম যুক্তি নয়। আসল কথা—মন নিয়ে, ও সেইটেই হওয়া উচিত। কারণ আদর্শ হিসেবেও দেহের চেয়ে যে মনের স্থান উচ্চে এটা 'কাল্‌চারে'র গোড়াকার কথা।"

পল্লব চিন্তাক্লিষ্ট মুখে বল্‌ল: "তা বটে।" তার পায়ের নীচে যেন সে মাটির নাগাল পাচ্ছিল না। তার অনেক-দিনের যত্নপুষ্ট অনড় ধারণাগুলির ভিত্তি আজ টলমল করে ওঠাতে সে ভেবেই পাচ্ছিল না মোহনলালের যুক্তিগুলিকে

মোহনলাল বল্‌ল: "তাহ'লেই দেখ, যাকে আমরা immorality বলি সেটা সত্য সত্য অন্যায় হ'তে পারে যদি তার দরুণ আমাদের মনের ওপর একটা বিশ্রী ছাপ পড়ে। কারণ প্রতি আচরণ আমাদের মনের গায়ে কি ভাবে রঙ ফলায় তার ওপরেই তার ভালমন্দ নির্ভর করা উচিত।... একথা যদি অস্বীকার না কর তাহ'লে আমি যা বল্‌ছিলাম সেটার সদর্থও বুঝতে পারবে। দেখ না কেন, যাকে আমরা নৈতিক স্খলন বলি সেটা দূষণীয় হ'য়ে দাঁড়ায় প্রধানতঃ লোকমতের প্রভাবে, নয় কি? এটা হ'য়ে দাঁড়ায় এই জন্যে যে সচরাচর মানুষের সুনীতি-দুর্নীতির ধারণা, উচিত-অনুচিতের বিচার—এক কথায় জীবনের মোটা outlookটি —গড়ে ওঠে তার নিজের সমাজের লোকমতের প্রভাবে। এখন আমাদের দেশে sex সম্বন্ধে আমাদের সমাজের লোকমতের প্রভাব কি রকম ভাবে পরিণতি লাভ করেছে একটু ভেবে দেখ। Sex সম্বন্ধে আমাদের দেশে ঢাক ঢাক গুড় গুড় নীতি এসব দেশের চেয়ে ঢের বেশি অনুসৃত হ'য়ে থাকে ও পান থেকে চূণ খস্‌লে লোকমত ঢের বেশি রক্তচক্ষু হ'য়ে ওঠে। সুতরাং সাধারণ মানুষ প্রবৃত্তির তাড়নায় স্খলিত হ'লে সেটা ঢাক্‌বার জন্য অম্লান-বদনে মিথ্যা বলে, নিঃসঙ্কোচে প্রবঞ্চনার আশ্রয় নেয় ইত্যাদি। আমার মনে হয় যে একটা পদস্খলনের জন্য মানুষের ইচ্ছাশক্তির বা নৈতিক স্বাস্থ্যের যতখানি হানি হয়, এই সদাসন্ত্রস্ত ভাব ও মিথ্যা প্রবঞ্চনার মুখোষ পরে থাকার দরুণ তার চেয়ে ঢের বেশি নৈতিক অবনতি হয়। কিন্তু য়ুরোপের লোকমত এ বিষয়ে ঢের বেশী সহিষ্ণু ব'লে নৈতিক স্খলনের জন্য তাদের আমাদের মতন ভীতত্রস্ত হ'য়ে কাল কাটাতে হয় না। একজন শ্রেষ্ঠ য়ুরোপীয়ের নৈতিক স্খলনে একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালীর নৈতিক স্খলনের চেয়ে কম অপকার হয়—এই কারণে। এই কথাটি বুঝলে আমরা য়ুরোপীয়দের নৈতিক শিথিলতাকে অনেকটা ঠিক্ চোখে দেখ্‌তে পার্‌তাম ব'লে মনে হয়। আমার মনে আছে আমি একদিন ভারি আঘাত পেয়েছিলাম যখন আমার এক শ্রদ্ধেয় ইংরাজ সতীর্থ আমাকে নিঃসঙ্কোচে আন্তরিক ভাবে বলেছিলেন যে মেয়েদের সঙ্গে flirt করা—যেমন তাদের চুম্বন করা প্রভৃতি—তিনি সত্যিই অন্যায় মনে করেন না। কিন্তু পরে মনে হয়েছে যে তিনি মূলতঃ খুব অন্যায় কথা বলেন নি।"

পল্লব আদর্শস্থানীয় বন্ধু মোহনলালের মুখে এতটা বাড়াবাড়ি রকমের নির্লজ্জ উক্তির জন্য প্রস্তুত ছিল না। তার কর্ণমূল আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। সে সজোরে ঘাড় নেড়ে বল্‌ল: "মোহনলাল...একথাও কি আমাকে...তোমার মতে···মেনে নিতে "সে কথাটা শেষ কর্‌তে পার্‌ল না।

মোহনলাল তাড়াতাড়ি বল্‌ল: "পল্লব, আমার মতন গোঁড়া puritanও যে আজ নিঃসঙ্কোচে এরূপ মতামত প্রকাশ কর্‌ছে এটা তোমার আশ্চর্য্য ঠেক্‌তে পারে সন্দেহ নেই। তবে···তবে..." ব'লে সে একটু ইতস্ততঃ ক'রে বল্‌ল: "মনে কোরো না যে আমি নিজে আজ জড়িয়ে পড়েছি ব'লেই এমন সব উচ্ছৃঙ্খলতার ওকালতি করতে চেষ্টা পাচ্ছি। কারণ বিশ্বাস কর যে আমার এসব মতামত মিস স্মিথের প্রতি আসক্ত হবার অনেক আগেই আমার মনের মধ্যে গ'ড়ে উঠ্‌ছিল। কাজেই তুমি আমাকে ভুল বুঝবে যদি মনে কর যে এসব যুক্তিপ্রয়োগ আমার আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে ভেবে দেখ্‌লে হয় ত তুমি আমার আজকের কথাগুলির মর্ম্মার্থ ধরতে পারবে। ভেবে দেখ, কুঙ্কুমের বা স্বর্ণেন্দুর দু-একটা পদস্খলন হ'লে তাদের হঠাৎ যেভাবে নিরবলম্বন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা, আমার ইংরাজ বন্ধুটির সেরকম কোনও পদস্খলনে কি সেরূপভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাক্‌তে পারে? পারে না ত? কিন্তু কেন পারে না সেটা ভেবে দেখেছ কি?—পারে না এইজন্য যে নৈতিক পবিত্রতার কাম্যতা সম্বন্ধে তার ধারণা কুঙ্কুম বা স্বর্ণেন্দুর মতন দৃঢ় নয়।......তাছাড়া শুধু সে ছেলেটি ব'লে বল্‌ছি না, এদেশে সর্ব্ববিষয়ে উচ্চহৃদয় বুদ্ধিমান্ যুবকের ক্ষেত্রেও এরূপ দুচারটে পদস্খলনকে লোকমত ধর্ত্তব্য ব'লেই মনে করে না। বর্ত্তমান সময়ের একজন মস্ত চিন্তাশীল ইংরাজ লিখেছেন যে যেখানে একজন যুবক ও যুবতী বিবাহ না ক'রেও মিলিত হয় সেখানে সমাজের ন্যায়তঃ কিছুই বল্‌বার থাক্‌তে পারে না যদি তার পরিণামে সন্তান সম্ভাবনা নিবারণ করা যায়। আর একজন মহৎ ফরাসী লেখক লিখেছেন যে শক্তিমান্ হৃদয়ের কাছে পদস্খলন ব'লে কোনও কিছু থাক্‌তেই পারে না। এরক

দৃশুতঃ দুর্নীতিমূলক নীতি এদের আরও অনেক বড় বড় লোকের লেখা থেকে উদ্ধৃত করতে পারি। তাই এটা একটা সত্যি কথা যে এদের শ্রেষ্ঠ মনেরও আজকাল মনোগত বিশ্বাসটা অনেকটা এইরকমই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণের ত কথাই নেই। সাধারণের মধ্যে flirtation সম্বন্ধে কিরূপ শিথিল ধারণা প্রচলিত সে সম্বন্ধে একটা উদাহরণ দেই। আমার পরিচিতা একটি ধনী উচ্চশিক্ষিতা ফরাসী বিধবা একদিন আমার সামনে তাঁর প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকে ঠাট্টা করে বলছিলেন যে সে যখন স্কুলে পড়ত তখন থেকে সে flirtation রূপ প্রথাটির একটু বেশি পক্ষপাতী ছিল। ভাব ত আমাদের দেশে কোনও মার মুখে ছেলের সম্বন্ধে এরকম ঠাট্টা কেমন শোনায়! এদেশে কিন্তু মা ছেলেকে, ভাই বোনকে ও বাপ মেয়েকেও flirt ব'লে ঠাট্টা করতে কুণ্ঠিত হয় না। এসব ধরণ-ধারণই এদের এ সম্বন্ধে মূল ধারণাটিই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় না কি? অর্থাৎ এরা যাদের শ্রদ্ধা করে ও ভালবাসে তাদেরও flirt করতে দেখলে বিশেষ ত্রস্ত বা লজ্জিত হয় না। কারণ এরা ভাবে এটা যৌবনের ধর্ম্ম—বেশীদূর না গড়ালে এতে বেদ অশুদ্ধ হয় না। আর আমরা? আমরা নৈতিক পবিত্রতা হারালে ভাবি বুঝি সব গেল। (এখানে অবশ্য আমি আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনের outlookএর কথাই বলছি মনে রেখো, কারণ প্রতি সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার জনসাধারণের সম্পত্তি বলে আমি বিশ্বাস করি না। সব বড় জিনিষই অন্ততঃ আজ অবধি মুষ্টিমেয় লোকের দ্বারাই উপলব্ধ হয়ে এসেছে।) যাক্ সে কথা। যা বলছিলাম। আমাদের শ্রেষ্ঠ ছেলেরা বাল্যকাল থেকে সময়ে অসময়ে শুনতে শুনতে শেষটা নৈতিক পবিত্রতার অত্যন্ত বেশিরকম মূল্য ধার্য্য না ক'রেই পারে না। কিন্তু মূল্য ধার্য্য করা এক আর মূল্য দিতে পারা আর। কাজে কাজেই ছেলেবেলা থেকে দেশে প্রলোভন ও সুযোগের অভাবে অনেক সময়েই হয় এই যে আমরা কায়ক্লেশে দৈহিক পবিত্রতাটি মাত্র বজায় রেখে আসি। কিন্তু পরীক্ষাশুদ্ধি না হ'লে মানুষ নিজেকে চিনতে পারে না তাই বরাবর নিজেকে একরকম ভেবে এসে যখন হঠাৎ কোনও প্রলোভনের মধ্যে প'ড়ে টাল সামলাতে না পারি তখন ভাঙাহাল নৌকার মতনই দিশেহারা হ'য়ে পড়ি।"

পল্লব একটু চুপ ক'রে থেকে হঠাৎ মুখ তুলে বলল: "অর্থাৎ তুমি বলতে চাও যে এরা পড়ে না?"

মোহনলাল বলল: ঐ যে বললাম সচরাচর সুস্থ শক্তিমান লোকে পড়ে না, এবং না-পড়ার কারণও খুব স্পষ্ট। অর্থাৎ, এরা পবিত্রতার আদর্শকে প্রথম হতে এত উঁচুতে তুলে ধ'রে থাকে না ব'লে এ সব পতনকে প্রথম থেকেই অনেকটা অবশ্যম্ভাবী ব'লে মনে ক'রে থাকে; তার জন্য নিজের জীবনকে ব্যর্থ হ'তে দেয় না। উদাহরণতঃ দেখ এদের বড় বড় লেখক, শিল্পী, চিত্রকর, সঙ্গীতকার প্রভৃতি কেউই প্রায় অল্পবয়সে দুর্নীতির কবল হ'তে রক্ষা পান নি, অথচ সেজন্য এখানকার লোকমত তাঁদের ভ্রমেও দোষ দেয় না। আর আমরা? আমরা সাধু মহাত্মারও যৌবনের দোষ ত্রুটির খোঁজ পাবার জন্য কি উৎসুকই না হয়ে থাকি! এবং তাদের কোনও দোষত্রুটি ভুলভ্রান্তির সন্ধান পেলে তা নিয়ে কায়মনোবাক্যে কি আনন্দেই না চর্চ্চা করি! এক কথায় এদেশে ও আমাদের দেশে লোকমত এ বিষয়ে সম্পূর্ণ আলাদা রকমের।"

পল্লব বলল: "তবে কি তুমি বলতে চাও যে এই রকমের লোকমতই বাঞ্ছনীয়? পবিত্রতার কোনই দাম নেই?"

মোহনলাল বলল: "সে কথা আমি জোর ক'রে বলতে চাই না। কারণ আমি ত খানিক আগেই বললাম যে দেহে ও মনে পবিত্র হ'তে পারাটা একটা মস্ত জিনিষ যদিও মনে পবিত্র থাকতে পারার চেয়ে কঠিন কাজ সংসারে অতি কমই আছে। তবে সঙ্গে সঙ্গে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে আদর্শ চিত্তশুদ্ধি যখন সব দেশেই এত একান্তভাবে বিরল তখন এ তর্ক নিয়ে এত মাথা-ফাটাফাটির কি দরকার? জীবনকে নির্ভয়ে দেখতে শিখলে তবেই সত্যের দর্শন মেলে, নইলে নয়। এরা জীবনকে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি সত্যনিষ্ঠা ও নির্ভীকতার সঙ্গে বুঝতে চেষ্টা করেছে—অন্ততঃ বর্ত্তমান যুগে। তার ফলও এরা হাতে হাতে পেয়েছে। নইলে যদি এদের সভ্যতা সত্যসত্যই মহা অসচ্চরিত্রতার পরিপোষক ও আমাদের সভ্যতা মহা আধ্যাত্মিকতার জন্মদাতা হয় তাহ'লে আজ জ্ঞান, চিন্তা ও কর্ম্মজগতে

এদের ও আমাদের মধ্যে এত বড় একটা ব্যবধান কেমন ক'রে গ'ড়ে উঠ্‌ল এটাও কি একটা ভাব্‌বার বিষয় নয়? এই সব কথা গত দুতিনবছর ধ'রে আমার মনে জমে উঠেছে। তাই আমি আজ এদের নৈতিক ধারণার স্বপক্ষে কি কি বল্‌বার আছে সে সম্বন্ধে তোমায় এতক্ষণ ধ'রে লেকচার দিলাম। কিছু মনে কোরো না পল্লব।

"আমাদের সভ্যতা বা outlookকে যে হেয় প্রতিপন্ন করা আমার উদ্দেশ্য হতেই পারে না তা তোমার চেয়ে বেশি কেউই জানে না। তবে কি জান? আমরা কথায় কথায় য়ুরোপকে দুর্নীতির আঁস্তাকুড় ও আমাদের দেশকে আধ্যাত্মিকতার একমাত্র নিকেতন ব'লে প্রচার ক'রে থাকি। এরূপ আত্মম্ভরিতা যে বস্তুতঃ কত অসার ও হাস্যকর সেইটেই আজ আমার নিজের পদস্খলনের প্রসঙ্গে একটু বেরিয়ে পড়্‌ল।"

মোহনলাল আশৈশব পুরুষকারবাদী ছিল। তাই আজ বার বার তার মুখে 'নিয়তি', 'পদস্খলন', 'মোহের গর্ত্ত' প্রভৃতি নিরাশার বাণী শুন্‌তে শুন্‌তে পল্লবের মনে হঠাৎ একটা সন্দেহের উদয় হ'ল। কিন্তু সে কথা সে মুখে আন্‌তে পার্‌ল না।…'না, না তা কখনও হ'তে পারে? মোহনলালের মতন তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বিবেচক, চরিত্রবান্‌ ছেলের পক্ষে?…অসম্ভব।"

তবু সে না ব'লে থাক্‌তে পার্‌ল না: "মোহনলাল, যে তুমি এত বোঝ, এত ভাব, এত মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে পটু, সেই তুমি কি না—মাপ কোরো ভাই—মিস স্মিথের মতন একজন অসারচিত্ত সিনেমা-একট্রেসকে বরণ কর্‌লে? তুমি যদি মতিস্থৈর্য্য হারিয়ে তার গুণগানে ভরপুর হ'য়ে উঠ্‌তে, বা অন্যরকম আবোল তাবোল বকতে তাহ'লেও না-হয় আমি তোমার এ সঙ্কল্পকে অনেকটা বুঝতে পার্‌তাম। কারণ তখন আমার অন্ততঃ এইটুকু সান্ত্বনা থাক্‌ত যে মোহের কুয়াসার মধ্যে প'ড়ে তোমার দিগ্‌ভ্রম হ'য়েছে। কিন্তু সব বুঝে সুঝে সব দেখে শুনে কি না শেষে তুমি—"

মোহনলাল একটু করুণ হেসে বল্‌ল: "ভাই তোমাকে ত একটু আগেই বলেছি যে বোঝা এক ও প্রবৃত্তিকে রুখ্‌তে না পারা আর। তুমি কি খুব বুদ্ধিমান্‌, সহৃদয় লোককেও মাতাল হ'য়ে বর্ব্বরের মতন ব্যবহার কর্‌তে দেখ নি? আবার তার পরেই কি তুমি দেখ নি যে নেশা কেটে গেলে অবসাদের গভীর গহ্বরের মধ্যে প'ড়ে সে কি রকম আন্তরিক অনুতপ্ত হয় ও শপথ করে যে জীবনে আর মদ ছোঁবে না? কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই কি সে আবার এ সব জেনেশুনেও মদ খায় না?"

পল্লব দুঃখিত হ'য়ে বল্‌ল: "তাই মোহনলাল যে তোমার মনের জোর, অধ্যবসায় প্রভৃতি আমাদের আদর্শ ছিল বল্‌লেই হয় সে তোমার মুখে এরকম হতাশ বিলাপ, দুঃখতন্ত্র ও ক্ষুব্ধ অদৃষ্টবাদের কথা শুনব কখনও ভাবি নি। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে যেন তুমি সব জেনেশুনেই তোমার অমূল্য জীবনটাকে চিরদিনের জন্য নষ্ট কর্‌তে কৃতসঙ্কল্প হ'য়ে উঠেছ।"

মোহনলাল একটু হেসে তখনই আবার গম্ভীর হ'য়ে বল্‌ল: "সম্পূর্ণ নষ্ট হবেই একথা মনে স্থির জেনেও কোনও গুরুতর কাজ করা অবশ্য সহজ নয়। কারণ জানত যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ ব'লে একটা ভারি শাস্ত্রসম্মত প্রবচন চল্‌তি আছে। তবে আমাদের মতন প্রকৃতির লোকের পক্ষে যে ইংরেজ মেয়ে বিবাহ করার পরিণাম খুব শুভ হবার সম্ভাবনা কম একথা আমি অস্বীকার করতে পারি না—বিশেষতঃ…বিশেষতঃ…মিস স্মিথের মতন…লঘুচিত্ত…বিলাসপ্রিয়…মেয়েকে বিবাহ কর্‌লে।"

মোহনলালের মুখে এরূপ বিষাদের কথা শুনে পল্লব তার হাতদুখানি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বল্‌ল: "এতটা যখন তুমি বুঝেছ তখন আমি তোমার অমূল্য জীবনকে কিছুতেই এভাবে নষ্ট হ'তে দেব না। এদেশে বিবাহের চুক্তি ভঙ্গ হয়। না হয় তার জন্য কিছু জরিমানা হবে ও লোকে নিন্দা কর্‌বে। কিন্তু সেটা দুদিনের কলঙ্ক। একটা জীবন নষ্ট হওয়ার চেয়ে সেটা লক্ষগুণে শ্রেয়ঃ। এ বিবাহ তোমাকে ভঙ্গ কর্‌তেই হবে।"

মোহনলাল তার কণ্ঠস্বরের মধ্যে এক অশ্রুতপূর্ব্ব গভীর বিষাদের রেশ টেনে এনে বল্‌ল: "এখন আর তা হয় না পল্লব।" ব'লে সে মুখ ফিরিয়ে জানালার বাহিরের অন্ধকারের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

মোহনলালের মুখে এরূপ একান্ত হতাশা ও বিষাদের স্বর পল্লব আজ অবধি কখনও শোনে নি। সে এ আর্ত্তস্বরে চম্‌কে একটু উত্তেজিত স্বরে ব'লে উঠল:

"নিশ্চয়ই হয় মোহনলাল ও তাই হবে এ আমি তোমাকে ব'লে রাখ্‌ছি।"

মোহনলাল এবার আর কোনও কথা না ব'লে দুহাতে তার মুখ ঢাক্‌ল।

পল্লবের মনে এবার হঠাৎ বিদ্যুতের মতন তার খানিক আগেকার গাঢ় সংশয়টি খেলে গেল।...

তবে কি সত্যই...তার আশঙ্কা...না, না...মোহনলালের মতন সচ্চরিত্র, সংযমী ছেলের পক্ষে...তা যে কল্পনাতীত!...

কিন্তু সে আর থাক্‌তে পার্‌ল না, আকুল স্বরে মোহনলালকে জিজ্ঞাসা ক'রে বস্‌ল: "মোহনলাল...তবে কি...তবে কি...তুমি তাকে..." প্রশ্নটি সমাপ্ত করবার কথা সে খুঁজে পেল না।

মোহনলাল দুই হাতের মধ্যেই মুখ রেখে রুদ্ধকণ্ঠে অস্ফুট স্বরে উত্তর দিল: "হাঁ তাই...তাই...পল্লব। মুহূর্ত্তের উন্মাদনা আমার সমস্ত জীবনের গতি বদ্‌লে দিয়েছে। এখন মিস স্মিথকে বিবাহ করা ছাড়া আমার আত্মসম্মান বজায় রাখার আর পথ নেই।" (ক্রমশঃ)

গৃহ-চিকিৎসা

ডাক্তার শ্রীনিবারণচন্দ্র মিত্র এম-বি

(২)

রোগে শুশ্রূষা

রোগের চিকিৎসা কার্য্যে বাড়ীর লোকেরা ডাক্তারকে রীতিমতই সাহায্য করিতে পারেন; তবে রোগের লক্ষণগুলি বাড়ীর লোকের আগে জানা থাকিলে ডাক্তার ও রোগী উভয়ের পক্ষে সুবিধা হয়। পাশকরা বা পাকা নার্সের অভাবে নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলির দিকে লক্ষ্য রাখিলে রোগীর রোগ নিরাময়ের যথেষ্ট সাহায্য করা হইবে।

রোগীর ঘর—রোগীর ঘর সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবে। সাধারণতঃ প্রত্যেক লোকের জন্য ৮ হাত লম্বা ৪ হাত চওড়া একটি ঘর আবশ্যক। এরূপ ঘরে যে পরিমাণ বায়ু চলাচল করে, সুস্থ লোকের পক্ষে তাহা যথেষ্ট। ইহা হইতে সহজেই অনুমেয় যে, রোগীর ঘর ইহা অপেক্ষা বড় হওয়া দরকার। ঘরের মেঝে পাকা, অভাবে মাটী দিয়া ভাল করিয়া নিকান হইবে। ঘরে আসবাবপত্র যত কম থাকে ততই ভাল। ছোঁয়াচে বা সংক্রামক রোগ হইলে, সমস্ত আসবাব, এমন কি দেওয়ালের ছবি পর্য্যন্ত সরান উচিত। সামনাসামনি দুইটা দরজা বা জানালা থাকিলে খুবই ভাল। রোগীকে তক্তাপোষে বা খাটে শোয়ান ভাল। ঘরের জানালা দিবারাত্রি খোলা রাখিবে; তবে বর্ষার দিনে নয়। রোগীকে গরম কাপড় ঢাকা দিয়া শীতকালেও জানালা খোলা রাখিবে। ঘরে লোকজন যত কম আসে ততই ভাল। রোগীর ঘরে কেরোসিনের আলো না জ্বালাইয়া তৈলের প্রদীপ জ্বালান ভাল। প্রদীপ একটী কাচের লণ্ঠনের ভিতর রাখিলে বাতাসে নিভিবে না। ইলেক্‌ট্রিক্‌ লাইটের সুবিধা অনেক তবে ইহার তীব্র আলোক অনেক সময় রোগীর চোখে লাগে। তখন হয় নিভাইয়া দেওয়া বা সবুজ কি নীল রঙ্গের কাপড় দিয়া আলোটা ঢাকিয়া দেওয়া ভাল।

রোগীর বিছানা—গরম হওয়া চাই বিশেষতঃ যখন রোগীকে অনেক দিন রোগ-শয্যায় থাকিতে হয়। তবে বিছানা যেন এরূপ না হয় যে মাঝখানে ঝুলিয়া পড়ে। মেরুদণ্ডের হাড় ভাঙ্গিয়া গেলে বিছানা তক্তাপোষের ন্যায় সমান এবং শক্ত যায়গায় হইলেই ভাল অনেক সময় বিছানার নীচে তক্তার ছোট টুকরা দেওয়া হয়, ইহাকে ফ্র্যাকচার বেড (Fracture bed) বলা হয় ভগ্ন স্থানে পাছে পুনরায় কোনরূপ আঘাত লাগে, অথ

বিছানা বা কম্বল, লেপের টানাটানিতে রোগীর পাছে কষ্ট হয়, সে জন্য ভগ্ন স্থানের উপর একটা কাঠের বা তারের খাঁচা ঢাকা দিলে তাহার উপর দিয়া লেপ বা কম্বলের নাড়াচাড়ায় কোন কষ্ট হইবে না। ইহাকে বেড্ ক্রেডেল্ (Bed cradle) বলে। শিশুদের বেতের ঝুড়িতে দোলা বিছানা করা যায়। ইহাদের বিছানা নরম হইবে, আর যাহাতে বেশ গরমে থাকিতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অনেক সময় বালিশ বেশী নরম হইলে, মাথা নীচে নামিয়া পড়ায়, মুখ গুঁজিয়া নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। অনেক রোগ আছে যাহার জন্য রোগীকে বহু দিবস বিছানায় নিশ্চল ভাবে শুইয়া থাকিতে হয়। সেই সময় পীঠের চামড়া, বিশেষতঃ যে সব যায়গার হাড় উঁচু হইয়া আছে, সেই সকল স্থানে শরীরের ভারে ফাটিয়া ঘা হইয়া পড়ে। ইহাকে বেড্সোর বা বিছানার ঘা বলে। ইহার প্রতীকার—(১) রোগীকে মাঝে মাঝে পাশ ফিরাইয়া শোয়ান। আবশ্যক হইলে পীঠে বালিশ দিয়া রোগীকে হেলান দিয়া উঁচু করিয়া দেওয়া। (২) গায়ের চামড়া একেবারে শুক্‌না রাখা অর্থাৎ ঘাম বা জল যাহাতে না বসে সে দিকে দৃষ্টি রাখা। (৩) প্রত্যহ দুইবার এবং প্রত্যেকবার ভিজিয়া যাইবার পর অল্প স্পিরীট দিয়া ঘষিয়া মুখে মাখিবার পাউডার ছড়িয়ে দেওয়া। এবং (৪) পীঠের মাপের অনুযায়ী স্বতন্ত্র একটা ছোট তুলার গদি প্রস্তুত করিয়া দেওয়া বা বাতাসের বা জলের গদি ব্যবহার করা। এই তুলার গদির সেলাই হইবে না; কেবল দুই ভাঁজ কাপড়ের মধ্যে তুলা থাকিবে। এই তুলা খুলিয়া প্রত্যহ পিঁজিয়া দিতে হইবে। যদি একান্ত বেড সোর হইয়া পড়ে, তখন পটাশ পারমাঙ্গানেটের লোসানে লিণ্ট তুলা ভিজাইয়া ক্ষত স্থানে চাপ দিবে। এবং তাহার চারি পাশে পূর্ব্বের নির্দ্দেশ মত স্পিরিট ও পাউডার লাগাইবে। যে সব রোগে মল মূত্রাদির জন্য বার বার বিছানার চাদর না বদলাইলে চলে না, সে সব ক্ষেত্রে ড্রশীট (Draw sheet) ব্যবহার করিলে খুব সুবিধা হয়। রোগীর বিছানার চাদরের উপর প্রথমে এক টুক্‌রা অয়েলক্লথ পাতিবে। সেটা রোগীর পীঠ হইতে হাঁটুর নীচে পর্য্যন্ত থাকিলেই চলিবে। পরে তাহার পর একখানা টুক্‌রা বিছানার চাদর পাতিয়া তবে রোগীকে শোয়াইবে। এই উপায় অবলম্বন করিলে একমাত্র ড্রশীট ছাড়া রোগীর বিছানা ভিজিবার কোনই আশঙ্কা থাকিবে না। ফলে রোগীর পীঠও ভিজিতে পাইবে না, তাহাকে বার বার নাড়াচাড়া করিবার প্রয়োজন হইবে না। রোগীকে একটু তুলিয়া ধরিলে আর একজন চট্ করিয়া ভেজা ড্রশীটখানি সরাইয়া আর একখানি পাতিয়া দিতে পারিবে।

নাড়ী দেখা—কব্জির কাছে রেডিয়াল আর্টারি থাকে। এখানে আঙ্গুল রাখিলে যে স্পন্দন অনুভব করা যায় তাহাকে পাল্‌স্ (pulse) বলে। নাড়ীর প্রতি মিনিটে কয়বার স্পন্দন হয়, তাহাই সচরাচর দেখা হয়। আবার নাড়ী আছে কি না ইহাঁও দেখিবার বিষয়। জ্বরে, পরিশ্রমে ও মানসিক উদ্বেগে ও উত্তেজনায় নাড়ীর গতি দ্রুত হইতে পারে।

জ্বর দেখা—গায়ে হাত দিলেই বুঝা যায় গা গরম হইয়াছে কি না। তবে গরমের মাত্রা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে জ্বরের কাঠী বা থার্ম্মমিটার (Thermometer) ব্যবহার করিতে হয়। ইহা একটা কাচের নল বিশেষ। ইহার উপর ছোট বড় দুই রকম দাগ কাটা আছে এবং একটি তীর অঙ্কিত আছে। বড় দাগগুলার নিকট একটি করিয়া সংখ্যা আছে; যথা ৯৮, ৯৯, ১০০ ইত্যাদি। দুটি বড় দাগের মাঝখানে ৪টি ছোট দাঁড়ি আছে। বড় দাগগুলিকে ডিগ্রি বলে। এই ডিগ্রি ১০ পয়েণ্টে বা বিন্দুতে বিভক্ত। প্রত্যেক ছোট দাঁড়ি ২ পয়েণ্ট করিয়া হিসাব করিতে হয়। থার্ম্মমিটারের এক দিকে কিছু পারা আছে। উত্তাপ লাগিলেই সেই পারা নলের ভিতরের সরু ছিদ্র দিয়া উপরে উঠিতে থাকে; এবং যে দাগের কাছে গিয়া থামিয়া যায় সেই দাগ দেখিলেই বুঝা যায়, জ্বর কত ডিগ্রী এবং কত পয়েণ্ট। গায়ের সাধারণ উত্তাপ তীরের নিকট। ইহা ৯৮ এবং ৯৯এর মাঝখানে অতএব ৯৮·৪। পারা ইহার উপরে যাইলে জ্বর এবং নিম্নে থাকিলে বুঝিতে হইবে বিজ্বর অবস্থা। এই উপায়ে জ্বর ঠিক করিতে হইলে যন্ত্রটি রোগীর জিভের নীচে অথবা বগলে দিতে হয়। কতক্ষণ সময় দিতে হইবে তাহা থার্ম্মমিটারের গায়ে লেখা থাকে। বাজারে আধ হইতে ৫ মিনিটের পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। প্রথমে যন্ত্রটি নাড়িয়া দেখিতে হইবে যেন পারা নীচে থাকে; অর্থাৎ ৯৬এর নীচে।

রোগীর বগলে ঘাম থাকিলে তাহা মুছাইয়া তবে থার্মমিটার দিবে এবং দেখিবে যেন চাপ বেশী বা অসমান না হয় এবং সমুদায় পারার ভাগটা যেন বগলে চাপা পড়ে। মুখ হইতে বগলের উত্তাপ আধ ডিগ্রি কম; অর্থাৎ মুখে যদি ৯৯ হয় বগলে তখন ৯৮.৪ বা নর্ম্মাল (normal) বা সাধারণ তাপ। বগলে বা মুখে দিবার পর থার্মমিটার ধুইয়া রাখিবে বা কার্ব্বলিক লোসানে পুঁছিয়া লইবে।

নিঃশ্বাস গণনা করা—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে পূর্ণবয়স্ক লোক মিনিটে ১৪—১৮ বার এবং সদ্যোজাত শিশু মিনিটে ইহার দ্বিগুণ নিঃশ্বাস ফেলে। ঘড়ি দেখিয়া প্রতি মিনিটে নিঃশ্বাসের সংখ্যা নিরূপণ করিতে হইবে। নিঃশ্বাস স্বাভাবিক ভাবে পড়িতেছে, কি নিঃশ্বাস লইতে কষ্ট হইতেছে, সে দিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। বাতাসের অক্সিজেন আমাদের শরীরে গিয়া কাজ করিতেছে কি না, তাহা জানিবার সহজ উপায় আঙ্গুলের নখের দিকে লক্ষ্য রাখা। সহজ অবস্থায় ইহার রং গোলাপী। কোনও কারণে অক্সিজেন শরীরে প্রবেশ করিতে না পাইলে নখের রং ক্রমশ পাংশুবর্ণ ধারণ করিবে।

রোগীর ঘুম—রোগীর ঘুমের কোন ঠিক নাই। একবার ঘুম আসিলে তাহাকে জাগান উচিত নহে, এমন কি ঔষধ খাওয়াইবার জন্যও নহে। রাত্রে ঘুম হয় কি না সে বিষয়ে খবর রাখা দরকার। রোগীর ঘরে দুই একজন বিশেষ ব্যক্তি ছাড়া বাহিরের লোকজনের আসা বন্ধ করা উচিত এবং বেশী কথা কহাইয়া রোগীকে ক্লান্ত করা উচিত নহে। রাত্রে ঘুম না হওয়া, ভুল বকা, বিছানা হইতে উঠিয়া পড়া বা চমকাইয়া উঠা ইত্যাদি, জ্বরের সময় এই সব উপসর্গ হইলে, বিশেষতঃ বেশি জ্বরে ভুল বকিলে, ঠাণ্ডা জলে রোগীর মাথা ধুইয়া দিলে বা কপালে জলপটি অথবা আবশ্যক হইলে বরফ দিলে উপশম হয়।

মল মূত্রাদি পরীক্ষা—দিনে কতবার, রং ও পরিমাণ, এই সব সাধারণ খবর রাখা আবশ্যক। মলে রক্ত, আম বা ক্রীমি আছে কি না, রক্ত মলের সহিত মিশ্রিত থাকে বা মলত্যাগের পর পড়ে, ইহা জানা দরকার। মূত্র দিনে রাতে কয়বার হয়, রাত্রে মূত্র ত্যাগের জন্য ঘুম হইতে কয়বার জাগিতে হয় ও ২৪ ঘণ্টায় মূত্রের কি পরিমাণ তাহা জানা কর্ত্তব্য।

কাশি ও কফ—কাশি কোন সময় বেশি হয়, শুইয়া থাকিলে বা পাশ ফিরিলে হয় কি না জানার প্রয়োজন। অল্প কাশিলেই কফ উঠে কিনা অথবা প্রত্যেক কাশির চেষ্টার সহিত কফ পড়ে কি না, কফে রক্ত আছে কি না এবং সে রক্তের কি রং, অর্থাৎ টকটকে লাল বা কালচে, আর ফেণাযুক্ত কি না, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে। কাশির জন্য ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিতেছে কি না তাহা জানা দরকার।

রোগীর স্নান।—তিন প্রকার (ক) কেবলমাত্র গা মুছাইয়া দেওয়া—যাহাকে ইংরাজীতে স্পঞ্জ (sponge) করা বলে।

(খ) সাধারণ স্নান।

(গ) রোগবিশেষে ঠাণ্ডা বা বরফ জলে কাপড় ভিজাইয়া রোগীর আপাদ মস্তক জড়াইয়া দেওয়া। ইহাকে ইংরাজীতে ওয়েট প্যাক (wet pack) বলে। স্নান করাইতে গেলে বিছানায় একটা অয়েল ক্লথ পাতিয়া লইবে। ইহাতে বিছানা ভিজিতে পাইবে না।

(ক) এমন কোন রোগই নাই যাহাতে এক দিন অন্তর রোগীকে গা মুছাইয়া না দেওয়া যায়। নিম্নলিখিত ভাবে ব্যবস্থা করিবে।

(১) ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিবে।

(২) সাহায্য করিবার জন্য দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রয়োজন।

(৩) সমান পরিমাণে গরম ও ঠাণ্ডা জল লইবে।

(৪) মাথায় দিবার জন্য একঘটী ঠাণ্ডা জল রাখিবে।

(৫) দুইখানা তোয়ালে বা গামছা যোগাড় করিয়া রাখিবে।

এককালীন এক একটি মাত্র অঙ্গ মুছাইয়া দিবে; সঙ্গে সঙ্গে ঢাকিয়া দিবে; পুনরায় আর একটি অঙ্গ মুছাইতে আরম্ভ করিবে।

(৬) কাঁচা পাকা জলে গামছা বা তোয়ালে আধা নিঙড়াইয়া একজন রোগীর গা মুছাইবে এবং অপর একজন অপর একখানা শুক্‌না গামছা বা তোয়ালে দিয়া সেই ভিজা স্থান মুছাইয়া দিবে।

(৭) যাহাতে রোগীকে বার বার নাড়াচাড়া না করিতে হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে। রোগী চিৎ হইয়া শুইয়া থাকিলে পর পর মুখ, দুই হাত, বুক, পেট, দুই পা মুছাইবে। শেষে রোগীকে এক পাশ করিয়া তাহার পিঠের

মিলন

শিল্পী—শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

দিক মুছাইয়া দিবে; আর এই সুযোগে রোগীর বিছানার চাদর বদলাইয়া লইবে। ময়লা চাদর লম্বাভাবে রোগীর পিঠ পর্য্যন্ত গুটাইবে এবং সেই স্থানে শুকনা চাদর পাতিবে; পরে রোগীকে চিৎ করিয়া দিলে গুটান ময়লা চাদর বাহির করিয়া দিবে এবং পরিষ্কার চাদর টানিয়া ঠিক করিয়া দিবে। অন্য সময়েও এইরূপে চাদর বদলান যায়।

(৮) রোগীর মাথায় কখনও গরম জল দিবে না। ঠাণ্ডা জলে গামছা নিঙড়াইয়া মুছাইয়া দিবে।

(৯) স্নানের পর রোগীকে একটি জামা পরাইয়া দিবে। জামা এইরূপ হওয়া দরকার, যেন পরাইতে খুলিতে কোন কষ্ট না হয়।

(১০) স্নানের ১৫ মিনিট পরে একটা জানলা পরে অপর জানালা ও দরজা খুলিয়া দিবে।

স্নানের বা গা মুছাইবার জল সহ্যমত গরম হইলেই চলিবে। ঠাণ্ডা জল কল, পাতকুয়া বা পুষ্করিণীর হইলেই ভাল। ডাক্তারের পরামর্শ না লইয়া বরফ জলে স্নান বা ভিজা কাপড় জড়ান অনুচিত। বহুকাল স্থায়ী জ্বর ছাড়িবার ১০ দিনের পর রোগীকে পূরা ঠাণ্ডা জলে স্নান করাইবে। অবশ্য তাহার পূর্ব্বে গরম জলের সহিত ঠাণ্ডা জলের মাত্রা অল্প অল্প করিয়া বাড়াইতে হইবে।

হাত পা টেপা বা মাসাজ (massage)।—সময়-বিশেষে ইহা পরম উপকারী। হাত পা টেপার নানা পদ্ধতি আছে; যথা—(১) এফ্লিউরাজ (Eppleurage) হাতের তালুর সাহায্যে একদিকে মালিষ করা অর্থাৎ উপর হইতে নীচে অথবা নীচে হইতে উপর দিকে ধীরে ধীরে যাইবে।

(২) পেট্রিসাজ (Petrissage) বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর সাহায্যে ছোট ছোট চিমটী কাটা।

(৩) তাপোতমঁা (Tapotement) ধীরে ধীরে ঘুসী মারা।

প্রত্যেক পদ্ধতিরই উদ্দেশ্য স্থানবিশেষের রক্ত চলাচলের সাহায্য করা। নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করা বিধেয়। যে কোন প্রকারের মাসাজের প্রয়োজন হউক না কেন, ধীরে ধীরে করিতে হইবে। হাতে সরিষার তেল (সহ্য না হইলে অলিভ্ অয়েল) লাগাইয়া লইলে ভাল হয়। উপর হইতে নীচে আসিবার সময় জোরে এবং নীচে হইতে উপরে যাইবার সময় মৃদু চাপ দিবে।

তৃষ্ণা।—রোগীর জ্বরভোগের সময় তৃষ্ণা একটী প্রধান লক্ষণ। ডাক্তারের নিষেধ না থাকিলে ইচ্ছামত রোগীকে ঠাণ্ডা জল পান করিতে দিবে। জলে তৃষ্ণা না যাইলে জলে নেবুর রস মিশাইয়া খাইতে দিলে তৃষ্ণার অনেকটা উপশম হয়। যাহাদের ক্লোরোফর্ম্ম করিয়া অস্ত্র করা হয়, তাহারা জ্ঞান হইবার সময় বিশেষ তৃষ্ণা অনুভব করে। এই সময় কেবল বরফ চুষিতে দিবে। অভাবে ঈষৎ গরম জল অল্প অল্প খাইতে দিলে তৃষ্ণার লাঘব হয়।

রোগীকে খাওয়ান।—রোগীকে অনেক প্রকারে খাওয়ান যাইতে পারে—(ক) মুখের সাহায্যে (খ) নাকের ভিতর নল দিয়া (গ) মল দ্বার দিয়া (ডুস—dauche দিবার মতন করিয়া)। কেবলমাত্র প্রথমোক্ত উপায়েই রোগীকে খাওয়াইবে। অপর দুইটি উপায়ে খাওয়ানর প্রয়োজন হইলে একমাত্র ডাক্তারই ব্যবস্থা করিবেন। অনেক সময় রোগী চিৎ হইয়া খাইতে পারে না। তখন হয় ঘাড় একটু উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া অথবা পাশ ফিরাইয়া নলযুক্ত বাটী বা ফিডিং কাপের (Feeding cup) সাহায্যে খাওয়াইয়া দিবে। বলা বাহুল্য, এই উপায়ে একমাত্র তরল পদার্থই, যেমন দুধ—রোগীকে খাওয়ান সম্ভব। অজ্ঞান অবস্থায় রোগী খাইতে পারে না। সে সময় খাদ্যাদি মুখে আটকাইয়া থাকে; এরূপ ক্ষেত্রে নাসিকা অল্প টিপিয়া নিঃশ্বাস বন্ধ করাইলে রোগী খাদ্য গিলিতে বাধ্য হইবে। প্রত্যেকবার অল্প পরিমাণে ঝিনুক বা ছোট চামচের সাহায্যে অল্প অল্প করিয়া রোগীকে আহার করাইবে।

রোগীর পথ্য।—জল, বার্লীর জল, সাবু, শটী, ছানার জল, ঘোল, অণ্ডলালের জল বা এলবুমেন ওয়াটার (albumen water), দুধ, ফিকা চা, এগ্‌ফিলিপ্ (eggfillip) চিঁড়ার বা খইয়ের মণ্ড ইত্যাদিই রোগীকে দেওয়া যাইতে পারে।

(ক) জল—ঠাণ্ডা জলই ব্যবহার করিবে; আবশ্যক হইলে অল্প গরম জলও দেওয়া যাইতে পারে।

(খ) বার্লীর জল—চায়ের চামচের এক চামচ গুঁড়া বার্লী সেই পরিমাণে ঠাণ্ডা জলে মিশাইয়া কাদার মত

করিবে। আধসের আন্দাজ জল ফুটাইয়া তাহাতে সেই কাদার মত বার্লী অল্প অল্প করিয়া মিশাইবে এবং ঘন ঘন নাড়িতে থাকিবে। মিশানোর পর ৫ মিনিট কাল ফুটাইয়াই নামাইয়া লইবে, তাহার পর ছাঁকিয়া রুচিমত লেবুর রস ও নুন অথবা চিনি বা মিছরী দিয়া রোগীকে খাইতে দিবে। দানা বা পার্ল বার্লীর বেলা ১ ঘণ্টা জ্বাল দিলে রোগীর পথ্য বার্লীর জল তৈয়ার হইবে।

(গ) সাবু, শটী—খোরের ন্যায় এক ঘণ্টা কাল ফুটাইয়া ছাঁকিয়া লইবে।

(ঘ) ছানার জল—এক পোয়া দুধ গরম করিবে। দুধ ফুটিলে তাহাতে আধখানা পাতী লেবুর রস দিবে। দেখিবে দুধ ছিঁড়িয়া ছানা এবং জল আলাদা হইয়া গিয়াছে। এই জল ছাঁকিয়া লইয়া ঠাণ্ডা করিয়া খাইতে দিবে।

(ঙ) ঘোল—ভাল চিনিপাতা দই ঘরে পাতিয়া লইবে। অভাবে বিশ্বস্ত দোকান হইতে এক ছটাক দই আনিলেও চলিবে। এক পোয়া জলে অল্প অল্প মিশাইয়া ঘন ঘন নাড়িতে থাকিবে। নাড়িবার কল থাকিলে তাহাও ব্যবহার করা যাইতে পারে। খুব সমান ভাবে মিশিয়া গেলে ছাঁকিয়া লইয়া রোগীর রুচি অনুযায়ী চিনি অথবা নুন ও লেবু দিয়া খাইতে দিবে।

(চ) দুগ্ধ—রোগীর পেটের কোন গোল না থাকিলে অধিকাংশ রোগেরই পথ্য দুধ। দুধ জ্বাল দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে এবং সহজ অবস্থায় খাওয়া অভ্যাস না থাকিলে বার্লী শটী বা সাবু আধা আধা অথবা এক ভাগ দুধ দুই ভাগ বার্লী শটী বা সাবু মিশাইয়া লইবে। ছোট ছেলেদের পেটের অসুখে অনেক সময় একটু করিয়া চুনের জল মিশাইয়া দিতে হয়। এক ছটাক দুধে ছোট চামচের এক চামচ বা ৬০ ফোঁটা চুনের জল দিলেই যথেষ্ট।

(ছ) আলবুমেনের জল (albumen water)

একটি ডিমের সাদা অংশটি লইয়া একছটাক ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে মিশাইবে। ইহা সহজে জলের সঙ্গে মিশে না বলিয়া এক বড় চামচের সাহায্যে ঘনঘন নাড়িতে হয়। যখন দুধের ন্যায় সমান ভাবে মিশিয়া যাইবে, তখন আর একটু জল দিয়া পুনরায় নাড়িতে থাকিবে। এই রকম করিয়া একপোয়া পর্য্যন্ত জল মিশাইতে হইবে। পরে উহা পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। এইরূপে প্রত্যহ দুইটা ডিমের জল দেওয়া যাইতে পারে।

(জ) ফিকা চা—ফুটন্ত জলে প্রয়োজন মত চা দিয়া মাত্র ৫ মিনিটকাল রাখিলেই যথেষ্ট। ঠাণ্ডা চা পুনরায় গরম করিয়া খাওয়া অথবা বেশীক্ষণ ফুটান চা রোগীর পক্ষে অনিষ্টকর। একবার, অথবা সহজ অবস্থায় অনেক-বার খাওয়া অভ্যাস থাকিলে দুইবার এইরূপ চা দেওয়া যাইতে পারে।

(ঝ) এগ্‌ফিলিপ (Eggfillip)—একটা ডিমের হল্‌দে অংশটি লইবে। এক ছটাক গরম দুধের সহিত তাহা মিশাইবে এবং ঘন ঘন নাড়িতে থাকিবে। পুনরায় আর এক ছটাক দুধ ইহাতে মিশাইয়া নাড়িবে। এইরূপে মোট এক পোওয়া দুধ দিবে। পরে ডাক্তারের নির্দ্দেশমত ছোট চামচের এক চামচ ব্র্যাণ্ডি মিশাইবে, সুবাসিত করিবার প্রয়োজন হইলে ইহাতে জায়ফল ঘষা জল দুই ফোঁটা ফেলিয়া দিবে। রোগীকে প্রত্যহ দুইটী পর্য্যন্ত ডিম দেওয়া যাইতে পারে।

(ঞ) চিড়ার মণ্ড—ভাল চিঁড়া এক ঘণ্টাকাল ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া রাখিবে। খুব নরম হইয়া গেলে একটি পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। ক্বাথের ন্যায় যাহা বাহির হইবে তাহাকে পুনরায় সমান করিয়া মাখিয়া লইবে এবং রুচি অনুসারে মাছের ঝোল নুন ও লেবু দিয়া খাইতে দিবে।

(ট) খইয়ের মণ্ড—ধান বাছিয়া চিঁড়ার ন্যায় খই ভিজাইতে হয়। ৫।১০ মিনিটের মধ্যে খই নরম হইয়া যায়। তাহার পর চিঁড়ার মণ্ডের ন্যায় তৈয়ার করিবে এবং তদনুরূপ খাইতে দিবে।

(ঠ) শটি তৈয়ার করিবার নিয়ম বার্লীর অনুরূপ। ইহা এক প্রকার মূল। শুষ্ক করিয়া গুঁড়া করিয়া লইতে হয়। বাজারে তৈয়ারি জিনিষ বিক্রয় হয়। দেখিতে গুঁড়া বার্লীর ন্যায় সাদা। ইহা বার্লী বা সাবুর মত পুষ্টিকর, বলকারক এবং পরিমাণ বিশেষে শিশুদের মলরোধক। ইহা সব সময়েই দেওয়া চলে। ইহাতে দুধ মিশাইয়া রোগীকে দেওয়া যাইতে পারে। দুধ চিনি দিয়া শটি জ্বাল দিয়া পাত্রটি ঠাণ্ডা জলে রাখিলে শটি জমিয়া যায়। তখন বরফির মতন কাটিয়া রোগীর সুস্বাদু পথ্যরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

সাধারণ দেশী ও বিলাতী ওজন ও মাপ।

৬০ ফোঁটায় এক ড্রাম বা ছোট চায়ের চামচের এক চামচ
৮ চামচে এক আউন্স বা প্রায় আধ ছটাক
১৬ আউন্সে এক পাউণ্ড বা প্রায় আধ সের
২ পাউণ্ডে প্রায় এক সের

কতকগুলা সাধারণ ঔষধ ও ব্যবস্থা এবং তাহার ব্যবহার

আইডিনের জল—এক ড্রাম টিংচার আইডিন আধ সের ফুটন্ত জলে মিশাইলে আইডিনের জল প্রস্তুত হইবে। ইহা ঘা ধোয়াইবার সময় ব্যবহৃত হয়।

বোরিকের জল—দুই ড্রাম বোরিক এসিড ফুটন্ত জলে অল্প অল্প করিয়া মিশাইয়া নাড়িতে থাকিবে। বেশ যখন গলিয়া মিশিয়া যাইবে, তখন সেই জল ব্যবহার করিবে। চোখ ধোয়াইবার সময় এই জল ব্যবহৃত হয়।

"বেলেস্তারা" বা ব্লিষ্টার—(Blister) যে সব ঔষধ বেদনাযুক্ত বা ফুলা স্থানের রস টানিয়া বাহির করে, তাহার নাম কাউণ্টার ইরিট্যাণ্টস্ (Counter irritants)। যেখানে এই ঔষধ লাগান হয়, সেই স্থান লাল হইয়া উঠে এবং পরে সেখানে ফোস্কা পড়ে। ভিতরকার রসই এই ফোস্কার জল ; অতএব ইহা ইচ্ছাকৃত। রাই সরিষা (মাষ্টার্ড) গুঁড়া করিয়া ঠাণ্ডা জলে প্রলেপের মতন করিয়া গুলিয়া কাপড়ের বা কাগজের টুকরায় লাগাইয়া ১০ মিনিট-কাল দরকার মতন স্থানে লাগাইয়া রাখিবে। তাহার পর উঠাইয়া লইবে এবং সেই স্থান মুছিয়া তুলা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। ফোস্কা হইলে তাহাকে ইংরাজীতে ব্লিষ্টার (Blister) বলে। হাত ধুইয়া ছুঁচ আগুনে পুড়াইয়া ঠাণ্ডা হইলে সেই ফোস্কা গালিয়া দিবে। তাহার পর সেইখানে পাউডার ছড়াইয়া তুলা দিয়া বাঁধিয়া দিবে। ক্যান্থেরাইডিজের (Cantharides) বেলেস্তারা এইরূপেই দিতে হয়। কিন্তু বেলেডোনার বেলেস্তারার ব্যবহার অন্যরূপ। ইহা দেখিতে চিঠা গুড়ের ন্যায় এবং কাপড়ে লাগান অবস্থায় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়। আবশ্যক মত মাপ লিখিয়া আনাইয়া লইতে হয়, এবং ঈষৎ গরম করিয়া বেদনাযুক্ত স্থানে আটকাইয়া দেওয়া নিয়ম। এইরূপ বেলেস্তারা এক বা দুই সপ্তাহ পর্য্যন্ত থাকিতে দেওয়া হয়। বেলেস্তারা লাগাইয়া তাহার উপর তুলা দিয়া পটি বাঁধিয়া দিবে। স্নান করিবার সময় সেই স্থানটি ভাল করিয়া ঢাকিয়া স্নান করিতে হইবে।

পুল্টিস্—ঠাণ্ডা বা গরম ভেদে দুই প্রকার—

(ক) ঠাণ্ডা পুলটিস তোকমারীর দ্বারা তৈয়ার হয়। তোকমারী জলে ভিজাইলে হড়হড়ে ভাব ধারণ করে। সেইটা একটা কাপড়ে লাগাইবে, এবং সেই পটিটা ফোড়ার উপর বসাইয়া দিবে। দিনে একবার বদলাইবে। ইহা যে কোন ফোড়া ফাটাইবার সুবিধা করিয়া দেয়।

(খ) গরম তিসি অথবা মসিনার পুলটিস। কড়ায় অল্প জল দিয়া তিসি অথবা মসিনা বাঁটা ভাজিবে। একটু কাদার মতন হইলে কড়া নাবাইবে। দুই ভাঁজ করা একটা মোটা কাপড়ের এক দিকে গরম তিসি ঢালিয়া অপর ভাঁজ দিয়া ঢাকিয়া তাহা বেদনার স্থানে লাগাইবে। ইহা বেশীক্ষণ গরম থাকে না। তবে দুই ঘণ্টা অন্তর বদলাইলে রোগীর বিশেষ উপকার হয়। নিউমোনিয়ায় বুকের বেদনায় ইহা শুধু উপকারী নহে, পরন্তু আরামদায়ক। ইহা ফোড়ার যন্ত্রণারও বিশেষ উপশম করে।

বোরিক কম্প্রেস্—(Boric compress) ডাক্তারখানা হইতে বোরিক লিণ্ট কিনিয়া আনাইবে (লিণ্ট তুলা জমান মোটা কাপড় বিশেষ)। এই কাপড় আবশ্যক মত এক টুক্‌রা কাটিয়া উহা গামছা বা পাতলা তোয়ালের এক কোণে মুড়িয়া এক পাত্র জলে ডুবাইবে এবং এই জল আগুনে ফুটাইবে। জল ফুটিলেই গামছার খোঁট তুলিয়া দুই দিক ধরিয়া বেশ নিঙড়াইবে, যেন একটুও জল না থাকে। তাহার পর গামছার কোণ হইতে গরম লিণ্ট বাহির করিয়া যে যায়গায় বেদনা সেই যায়গায় লাগাইয়া দিবে। লাগাইবার সঙ্গে সঙ্গে একটা গোটা পাণ বা কলাপাতা চাপা দিবে এবং সর্ব্বশেষে তাহার উপর শুকনা তুলা দিয়া ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিবে। এই পাণ ও শুক্‌না তুলা যেন হাতের কাছেই থাকে। ইহা ফোড়া পাকাইয়া তোলে এবং অস্ত্র করার পরও ব্যবহার করা চলে।

তারপীনের সেঁক—৫ সের ফুটন্ত জলে এক আউন্স তারপিন তেল ঢালিয়া দিবে। একটুক্‌রা ফ্লানেল সেই জলে ভিজাইয়া বেশ করিয়া নিঙড়াইয়া সেঁক দিবে। সেঁক দিবার সময় ঘর বন্ধ রাখা দরকার। এই প্রক্রিয়ায়

পেট ব্যথা ও ফাঁপার খুব উপকার হয়। অবশ্য জল যতক্ষণ গরম থাকিবে ততক্ষণ সেঁক দেওয়া চলিবে।

গরম বোতলের সেঁক। বোতলে বা রবারের থলের ভিতর গরম জল পুরিয়া ছিপি আঁটিবে। গামছা বা পাতলা তোয়ালে দিয়া গরম জলের বোতলটা মুড়িয়া রোগীর পায়ের তলায়, বুকের কাছে পেটের উপর অথবা যে কোন বেদনার স্থানে লাগাইবে। যখন রোগীকে কেবল গরম রাখাই উদ্দেশ্য, তখন বিছানায় এইরূপ ৩।৪টা গরম জলের বোতল রাখিয়া গরম কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দিবে।

মাথায় বরফ দেওয়া। আইস ব্যাগ বা বরফ দিবার রবারের থলের মধ্যে বরফ ছোট ছোট টুকরা করিয়া ভরিয়া বাতাস বাহির করিয়া দিয়া থলের মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। যদি রবারের থলে একটি মাত্র থাকে, তবে রোগীর ঘাড়ের নীচে দেওয়াই উচিত। বলা বাহুল্য, বিছানার উপর একটা অয়েল-ক্লথ পাতিয়া রাখিলে, বরফ জল গলিয়া আর বিছানা বালিশ ভিজিতে পারিবে না। মাঝে মাঝে থলের মুখের চাকৃতি খুলিয়া টিপিয়া থলের ভিতর হইতে বাতাস ও জল বাহির করিয়া দিবে; কারণ, বরফ গলিতে আরম্ভ হইলে, থলে বাতাসে ফুলিয়া থাকে বলিয়া, বরফ রোগীর ঘাড়ে বা মাথায় লাগিতে পায় না। বরফ ব্যবহার করিবার পর রোগীর মাথা মুছাইবার সময় একবার দেখিয়া লইবে যে ঘাড়ের কাছে জামা বা বিছানা বালিশ ভিজিয়া গিয়াছে কি না। ভিজিয়া থাকিলে তাহা বদলান আবশ্যক। শরীরের তাপ কমাইবার জন্য বা অল্প জ্বরে ভুল বকার জন্য মাথায় বরফ দেওয়া হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ১০৩এর উপর জ্বর উঠিলে বরফ দিবে। অনেক সময় অল্প জ্বরেও রোগী ভুল বকে। সে সময়েও ইহার প্রয়োজন হয়। হিমেটেমেসিস বা পেট হইতে বমির সহিত রক্ত উঠিলে এইরূপ একটা বরফের থলে পেটের উপর বসাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

ক্ষতস্থান ধুইবার ব্যবস্থা। টিংচার আইডিনের জলে বোরিক তুলা ভিজাইয়া তাহার সাহায্যে ক্ষতস্থান ধুইয়া দিবে। তাহার পর ডাক্তারী যে কোন মলম পরিষ্কার কাপড়ে বা লিণ্টে লাগাইয়া ক্ষতস্থানে লাগাইয়া বেশ করিয়া তুলা দিয়া বাঁধিয়া দিবে। দুর্গন্ধযুক্ত বা পচা ঘা হইলে এই আইডিনের জলে ক্ষতস্থান আধ ঘণ্টাকাল ভিজাইয়া (জল গরম হওয়া চাই এবং ঠাণ্ডা হইয়া গেলে পুনরায় গরম জল ও আইডিন দিবে) রাখিবে। পরে মুছাইয়া শুষ্ক করিয়া পটি বাঁধিয়া দিবে। ইহা ঘায়ের দুর্গন্ধ নাশ করিয়া শীঘ্র আরোগ্য লাভের সহায়তা করে।

কাণের ঔষধ বা ইয়ার্ ড্রপ্ (Ear drop)। গ্লিসারিন চামচে বা ঝিনুকে গরম করিয়া ৪।৫ ফোঁটা কাণে ঢালিয়া দিলে অনেক সময় উপকার হয়। ঔষধ দিবার সময় পূর্ণবয়স্ক লোকের মাথা এক পাশে করিয়া কাণটা উপর দিকে এবং শিশুদের পিছন দিকে একটু টানিলেই ঔষধ কাণের মধ্যে অনেক দূর গড়াইয়া যাইবে। পরে কাণে একটু তুলা গুঁজিয়া দিবে।

কুলি করা বা গার্গল (Gargle) পটাশ পারমাঙ্গানেটের কিছু দানা জলে দিলে, জলের রং লাল হয়। সেই জলে কুলি করিলে ঘা-জনিত মুখের দুর্গন্ধ দূরীভূত হয়। এক ড্রাম পটাশ পারমাঙ্গানেট একসের জলের পক্ষে যথেষ্ট হয়। এইরূপে ফট্কিরি বা অন্য কোনও দ্রব্যের লোসান করা যায়।

গলায় ঔষধ লাগান। চামচের সাহায্যে জিভ চাপিয়া এবং রোগীকে "আ" বলিতে বলিয়া তুলি করিয়া ঔষধ গলার ভিতর চারিপাশে লাগাইয়া দিবে।

ভেপা (vapour) **বা ভাপরা লওয়া।** ষ্টোভ্ বা উনুনে জল ফুটিতে থাকিলে তাহাতে এক ড্রাম ইউক্যালিপ্টাসের তৈল বা টিংচার বেন্জোইন্ ঢালিয়া দিবে। একটা মোটা চাদরে মাথা ঢাকিয়া বা মশারির ভিতর এবং শিশু হইলে তাহার ঢাকার ভিতর নল চালাইয়া দিয়া ভাপ্রা দিবে। এই ভাপ্রা নাক মুখ দিয়া যত যায় ততই ভাল। কেবল জলের ভাপ্রা লইলেও অনেক উপকার হয়। সর্দ্দি, কাসি, স্বরভঙ্গ, ইন্ফুলুয়েঞ্জার প্রথম অবস্থা। ছেলে বুড়া সকলের পক্ষেই এই ব্যবস্থা। ভাপ্রা লইবার জন্য লম্বা নল দেওয়া টিনের কেতলি পাওয়া যায়। অভাবে বাড়ীতে চায়ের কেত্লির মুখে কাগজের লম্বা নল পাকাইয়া লইলেও হয়।

গ্লিসারিন পিচ্কারী। আগে রোগীর পীঠের নীচে অয়েল ক্লথ পাতিবে এবং নিকটেই বেড্

প্যান (Bed pan) অভাবে কাগজ বা পুরান কাপ রাখিবে। পরে রোগীকে বামপাশে শোয়াইবে। আধ আউন্স অল্প গরম জলে আধ আউন্স গ্লিসারিণ মিশাইয়া লইয়া তাহা একটা দুই আউন্সের পিচ্‌কারীতে ভরিবে। পরে মলদ্বারে একটু গ্লিসারিন বা সাবান জল মাখাইয়া পিচ্‌কারীর নল প্রবেশ করাইয়া দিবে। মলদ্বারের মুখ ১ মিনিট কাল আঙল দিয়া চাপিয়া বন্ধ করিয়া রাখিবে। ইহার অল্পক্ষণ পরেই রোগী মলত্যাগ করিবে। অনেক সময় ডাক্তার গ্লিসারিণের সাপোজিটারি (Suppository) (অর্থাৎ গ্লিসারিণ ও মোম মিশ্রিত করিয়া জমান এবং আকারে ও মাপে প্রায় কনিষ্ঠাঙ্গুলীর ন্যায়) ব্যবহার করিতে বলেন। বাহ্যে করাইতে গেলে রোগীকে বামপাশে শোয়াইয়া এই বস্তুটি মলদ্বারের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়। পরে শরীরের গরমে মোম গলিলে গ্লিসারিনের কাজ আরম্ভ হয়।

ডুস্ (Douche) দেওয়া। ঔষধযুক্ত জল বা কেবলমাত্র জল দিয়া ধোয়াইবার নামকে ডুস দেওয়া বলে। ইহা কাচের বা এনামেলের একটি পাত্র, এবং তলা হইতে ৬ ফিট দীর্ঘ রবারের নল দেওয়া। নলের শেষে নানা আকারের কল দেওয়া কাঠের বা কাচের নল লাগান থাকে। এই কল ঘুরাইলে জল পড়িবে। বাহ্যে করাইবার জন্য ব্যবহার করিতে হইলে রোগীর নীচে অয়েল ক্লথ পাতিবে এবং বেড্‌ প্যান হাতের কাছে রাখিবে। রোগীকে বামপাশে কাত করাইবে এবং আন্দাজ দুই সের জলে গায়ে মাখিবার সাবান গুলিবে। ফেণাযুক্ত হইলে পাত্রে ঢালিবে এবং কল খুলিয়া দেখিয়া লইবে নল দিয়া সাবান জল পড়িতেছে কি না। পরে মলদ্বারে নল প্রবেশ করাইয়া দিয়া, ২ হাত উচু হইতে ধীরে ধীরে জল ছাড়িতে থাকিবে এবং এক সের আন্দাজ জল প্রবেশ করাইয়া দিবে। পরে রোগীকে চিৎ করিয়া পাছার নীচে বেড্‌ প্যান দিয়া দিবে। এই নিয়মে কলেরা রোগে নুন জল (১ ড্রাম নুন, আধসের জল), প্রয়োজন হইলে খাদ্য দ্রব্য মিশ্রিত জলীয় আহার, যথা, ঔষধ মিশ্রিত দুগ্ধ ইত্যাদি মলদ্বার দিয়া রোগীকে খাওয়ান যাইতে পারে। তখন নুন জল বা আহার যাহাতে অতি ধীরে এবং ফোঁটা ফোটা করিয়া যায় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে।

প্রস্রাব করান।

তলপেটে গরম বোতলের সেক দিলে প্রস্রাব হয়। না হইলে ক্যাথিটার দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই। ক্যাথিটার প্রস্রাব করাইবার একটি যন্ত্রবিশেষ। ধাতুর বা রবারের নল বিশেষ স্ত্রী পুরুষ ভেদে ভিন্ন আকারের হয়। ডাক্তার ভিন্ন অপর কাহারও ইহার ব্যবহার করা উচিত নহে। তবে রবারের ক্যাথিটারের ব্যবহার একবার দেখিলে ডাক্তার ভিন্ন অপর ব্যক্তিও ব্যবহার করিলে কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু এই কথাগুলি মনে রাখিবে—

(ক) হাত পরিষ্কার থাকিবে।

(খ) ক্যাথিটার ফুটাইয়া লইবে।

(গ) অল্প অলিভ তৈলও গরম করিয়া লইবে।

(ঘ) প্রস্রাবের দ্বার বোরিক লোসান দিয়া মুছাইয়া দিবে এবং ক্যাথিটারের মুখ অলিভ অয়েলে ডুবাইয়া লইবে এবং ধীরে ধীরে প্রবেশ করাইবে।

(ঙ) বলপ্রয়োগ করিবে না।

(চ) প্রস্রাব একটি বোতলে বা হাঁড়িতে ধরিবে।

(ছ) প্রস্রাবান্তে ক্যাথিটারের মুখ টিপিয়া ধীরে ধীরে বাহির করিয়া লইবে। ইহাতে বিছানা ভিজিবে না।

ঔষধ খাওয়ান।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখিতে হইবে—

(ক) নির্দ্দিষ্ট শিশি হইতে খাওয়াইবে।

(খ) ঠিক দাগ মত দিবে।

(গ) নাড়িয়া লইবে।

(ঘ) সময় মত দিবে।

(ঙ) হাতের কাছে একটু জল, লবঙ্গ, এলাচ ইত্যাদি রাখিবে।

(চ) তিক্ত ঔষধ খাওয়াইবার পূর্ব্বে মুখে এক টুকরা হরিতকী বা সুপারি চিবাইলে তিক্ত স্বাদ লাগে না।

(ছ) অনেক রোগী চিৎ হইয়া কিছুই গিলিতে পারে না। রোগীকে পাশ ফিরাইয়া বা ঘাড় উঁচু করিয়া ধরিলে গিলিবার অনেক সুবিধা হয়।

(জ) অজ্ঞান অবস্থায় অনেক রোগী ঔষধ খাইতে পারে না, সময় সময় মুখও খোলে না। সে সময় নাক টিপিয়া নিশ্বাস রোধ করিবার মতন করিলে রোগী আপনি মুখ খুলিবে এবং ঔষধ গিলিয়া ফেলিবে। বিশেষ কারণ

না থাকিলে ডাক্তারের অনুমতি ব্যতীত এইরূপে বারবার ঔষধ খাওয়াইবে না।

(ঝ) কোনরূপ বারণ না থাকিলে ঝাঁজযুক্ত ঔষধ অল্প জল মিশাইয়া খাওয়াইবে।

(ঞ) রেড়ীর তেল একেবারেই গালে ঢালিয়া দিবে এবং রোগীকে একেবারেই গিলিয়া ফেলিতে বলিবে। (অনেকে নাক বন্ধ করিয়া রেড়ীর তেল খাইয়া থাকেন।) অথবা এইরূপ ভাবে খাওয়াইবে—প্রথমে ঔষধ খাওয়াইবার ছোট গ্লাসে অল্প জল লইবে। তাহাতে পুদিনা বা আদার রস দিবে। তাহার উপর শিশি হইতে প্রয়োজন অনুযায়ী রেড়ীর তেল ঢালিয়া লইবে। পুদিনা বা আদার রস জনিত গন্ধে তেলের গন্ধ ঢাকিয়া যাইবে, এবং জলের উপর তেল ভাসিলে শীঘ্র মুখে ঢালিয়া দিবার সুবিধা হইবে।

(ট) পেটেণ্ট ঔষধ বা অন্য কোন ঔষধ ডাক্তারের বিনানুমতিতে খাইবে না। অনেক সময় ডাক্তারকে না জানাইয়া অনেকে পেটেণ্ট ঔষধ খাইয়া থাকেন। তাহাতে কুফল ফলিলে রোগী নিজেকে ও ডাক্তারকেও বিপদে ফেলেন। কারণ অনেক পেটেণ্ট ঔষধের উপাদান জানা থাকে না; এবং তাহাদের বিষময় ফলের কোন প্রতীকার করা যায় না।

রোগের বীজাণুনাশক ও দুর্গন্ধনাশক দ্রব্যাদি।

ক্ষতস্থানে রোগের বীজাণু না আসিতে দেওয়ার নাম আসেপ্‌সিস্ (asepsis)। অস্ত্র করিবার সময় আবশ্যক দ্রব্যাদি ফুটাইয়া, পোড়াইয়া লইলে আর কোন ভয় থাকে না। বলা বাহুল্য অস্ত্র-চিকিৎসকের হাত বিশেষভাবে পরিষ্কার থাকা উচিত। কাপড় তোয়ালে জল ইত্যাদি ফুটাইয়া লওয়া যায়। গামলা ইত্যাদি যাহা লাগে, তাহাতে একটু স্পিরিট ঢালিয়া দেশলাই ধরাইয়া দিলে জ্বলিয়া উঠিবে। এইরূপে ছুরী কাঁচিও জলে ফুটাইয়া বা পোড়াইয়া লওয়া যায়। কাচের জিনিষ বা রবারের জিনিস কেবল জলে ফুটানই চলিতে পারে। অপর পক্ষে ক্ষতস্থানে যদি কোন কারণে বীজাণু দেখা দেয়, সে সময় যে পদ্ধতিতে তাহার প্রতীকার করা যায়, তাহাকে আণ্টিসেপসিস্ (antisepsis) বলা হয়। এই সময় রোগের বীজাণুনাশক লোসান গুঁড়া ইত্যাদি ব্যবহার করিতে হয়; যথা, আইডোফরম (Iodoform), কার্ব্বলিক লোসান ইত্যাদি।

বীজাণু ও দুর্গন্ধনাশক দ্রব্যাদি সাধারণতঃ দুই প্রকার হইয়া থাকে; যথা, (ক) শুক্‌না গুঁড়া ইত্যাদি।

(খ) তরল পদার্থ।

(ক) দুর্গন্ধযুক্ত স্থানে বা পদার্থে পাথুরে চূণ বা চূণকাম করিবার ঘুটিং চূণ ছড়াইয়া দিলে রোগের জীবাণু নষ্ট হয় ও দুর্গন্ধ যায়।

(খ) ফেনাইল (Phenyle) জলের সহিত মিশাইয়া হাত ধুইবার বা ঘর-দোর পরিষ্কার করিবার জন্য জল তৈয়ার করা যায়।

মল, মূত্র, কফ, রোগীর বিছানা আদির ব্যবস্থা।

মল—চূণ বা ফেনাইল দিয়া অবিলম্বে ফেলিয়া দিবে। তখনি তখনি ফেলিবার সুবিধা না হইলে ঢাকিয়া রাখিবে।

মূত্র—মলের ন্যায় ব্যবস্থা।

কফ—রোগীর পাশে একটি পাত্রে ফেনাইল জল দিয়া রাখিবে। রোগী কাসিয়া তাহাতেই কফ ফেলিবে।

রোগীর বিছানা—কম্বল তোষক ইত্যাদি ফেনাইল জলে ধুইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া এবং ২।৩ দিন রৌদ্রে ফেলিয়া রাখিয়া তবে ঘরে উঠাইবে। চাদর, বালিশের ওয়াড় জলে ফুটাইয়া লইবে। পরে ধোপার বাড়ী দিবে।

বাড়ীতে হঠাৎ কোন অস্ত্র করিবার প্রয়োজন হইলে এইরূপ ব্যবস্থা করিবে—

(ক) আলো ও বাতাসপূর্ণ ঘরে একটা তক্তাপোষ পাতিয়া রাখিবে এবং ৮খান ইট হাতের কাছে রাখিবে। মেঝে এবং মেঝে হইতে ৪ হাত উঁচু দেওয়াল ফেনাইল জলে ধুইয়া রাখিবে।

(খ) পিতল কাঁসার বা এলুমিনিয়মের পাত্রে কিছু জল ফুটাইয়া ভাল করিয়া মুখ ঢাকিয়া রাখিবে।

(গ) যদি কোন অস্ত্র বা কাপড় ফুটাইয়া সিদ্ধ করিয়া লইতে হয় তবে সেই পাত্রের ভিতর অথবা স্বতন্ত্র একটা পাত্রে তাহা ফুটাইবে এবং তাহারই ভিতর মুখ ঢাকিয়া রাখিয়া দিবে।

(ঘ) রোগীকে স্নান করাইয়া বা গা মুছাইয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিবে।

(ঙ) লোমযুক্ত স্থান পরিষ্কার করিবার জন্য একটা ক্ষুর ও সাবান রাখিবে।

(চ) হাত ধুইবার সাবান ও গামছা ঠিক করিয়া রাখিবে।

শেষ কথা এই—শুশ্রূষাকারীর যেমন রোগীর প্রতি গভীর কর্ত্তব্য আছে, সেইরূপ নিজের স্বাস্থ্যের দিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত।

অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান

সুরেশচন্দ্র গুপ্ত, বি-এ

(৩)

গতবারে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের মতবাদ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছি। উহা মানব-সমাজের কি ভাবে, কিরূপ উপকার করিতেছে, সে সম্বন্ধেই আজ দু-একটী কথা বলিব।

পাশ্চাত্য দেশে অতি সামান্য একটী ঘটনা অবলম্বন করিয়া এই বিজ্ঞানের জন্ম হয়, তাহা পূর্ব্বেই (ভারতবর্ষ, চৈত্র) বলা হইয়াছে। এই ঘটনা—জড়বস্তুর সাহায্যে ইহলোকের ও পরলোকের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান। এই সূত্র ধরিয়াই অনুসন্ধান আরম্ভ হয়। আত্মিক যদি জড় বস্তুর সাহায্যে সংবাদ প্রেরণ করিতে পারেন, তবে পৃথিবীর সহিত পরলোকের আরও নিকটতর সম্বন্ধ রাখা কি সম্ভবপর নয়? ক্রমশঃ পরলোকের সংবাদ আনয়ন, আত্মা আনয়ন, আত্মিক চক্র প্রভৃতির অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। পরলোকগত আত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দেহ ধারণ করিয়া আত্মীয়-স্বজনকে দেখা দিতে লাগিলেন, ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে মিলন-সেতু প্রস্তুত হইল।

এই ইহকাল পরকালের কথার মধ্যে সব চেয়ে বড় জিনিস যাহা পাওয়া গেল—তাহা আত্মার অবিনশ্বরত্ব: মানুষ প্রকৃত পক্ষে মরে না, মরিতে পারে না। মৃত্যু অবস্থান্তর প্রাপ্তি মাত্র, মৃত্যুর পরেও জীবন আছে,—প্রত্যক্ষ ভাবে তাহা প্রমাণিত হইল। কিন্তু কি সেই শক্তি, যাহা এই আপাত-প্রতীয়মান ধ্বংসের মধ্যে আপনার সত্তা বজায় রাখিতে পারে? মানুষের শারীরিক মৃত্যুর পরেও বিদেহী অবস্থায় যে বস্তু বর্ত্তমান থাকে, যে এমন বিশাল শক্তিশালী, সেই বস্তু মানুষের শরীরের মধ্যে থাকিয়া কোন্ ক্রিয়া সম্পাদন করে? বিদেহী অবস্থায় আত্মা যে শক্তির অধিকারী হয়, দেহে থাকিয়া কি সে তাহা লাভ করিতে পারে না? এই সকল অনুসন্ধানের ফলে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখারও সন্ধান পাওয়া যাইতে লাগিল। বৈজ্ঞানিকগণের স্বর্গীয়-অতৃপ্তি (Devine discontentment) তাঁহাদিগকে সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া দিতে লাগিল। 'আরও অগ্রসর হইতে হইবে'—ইহাই তাঁহাদের মূলমন্ত্র। সেই

মন্ত্রের সাধনায় তাঁহারা যে সত্য লাভ করিলেন, তাহা শোক তাপ-দগ্ধ মানব-চিত্তে অমৃত সেচন করিল।

আমাদের দেশের জ্ঞানিগণ যোগ-পন্থায় যাহা লাভ করিয়াছিলেন, সেই জ্ঞানই তাঁহারা সাধারণের সহজসাধ্য উপায়ে বাহির করিতে লাগিলেন। যাহা জন-কয়েক শক্তি-শালী লোকের বিশেষ অধিকার বলিয়া বিবেচিত হইত, জনসাধারণ তাহা লাভ করিয়া ধন্য হইল।

অবশ্য আমাদের দেশের যোগিগণ অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের আলোচনায় যেরূপ উচ্চস্তরে উন্নীত হইয়াছিলেন, পাশ্চাত্য-দেশজাত এই নব-অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান এখনও তাহা হইতে দূরে আছে সত্য, কিন্তু ভবিষ্যতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পন্থার মিলনে, জনসাধারণের উপযোগী, উচ্চস্তরে আরোহণ করিবার সহজসাধ্য উপায় আবিষ্কৃত হইবে, আমরা এ আশা করিতে পারি।

ইতোমধ্যে মেস্‌মেরিজম, হিপ্‌নটিজম, প্রভৃতি বিদ্যার যথেষ্ট আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। তদ্দ্বারা মানুষের শরীর ও মনের মধ্যে সুপ্ত বহু শক্তির সন্ধান পাওয়া গেল। (Spiritualism বা আত্মিক-বিজ্ঞানের সহিত এই গুলির অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ না থাকিলেও সমস্তই Occult Science বা 'গুপ্ত-বিদ্যা' বলিয়া এক পর্য্যায়ে আসন পাইল। ক্রমশঃ দেখা গেল, অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের (Psychical Scienceএর) সহিত উহাদের ও ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের বিস্তৃত ক্ষেত্রের পরিচয় পূর্ণভাবে এক প্রবন্ধে দেওয়া অসম্ভব। আমরা এই প্রবন্ধে কয়েকটী শাখার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব। তাহা হইতেই পাঠক পাঠিকা দেখিতে পাইবেন যে, অন্যান্য বিজ্ঞানের দানের চেয়ে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের দান কোন অংশে ছোট তো নয়ই, বরং অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান শোক-তাপ-দগ্ধ মানব হৃদয়ে যে শান্তি দিতে পারে তাহার তুলনা নাই। আমাদের দেশে আত্মা ও পরলোক সম্বন্ধে পরম্পরাক্রমে যে বিশ্বাস ও ধারণা চলিয়া আসিতেছে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই নব-বিজ্ঞানের আলোচনায় পাওয়া যাইবে।

অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান লব্ধ শক্তিগুলি মূলতঃ আত্মার শক্তি হইলেও, ব্যবহারিক হিসাবে উহাদিগকে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক, এই তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। এক শক্তির অন্য শক্তির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে বিশেষ কোন বিভাগ হিসাবে আলোচনা করা সম্ভবপর হইবে না। মোটামুটী ভাবে কয়েকটী শক্তির পরিচয় দিব।

ইচ্ছা-শক্তি (Will Force)

প্রথমেই আমরা ইচ্ছাশক্তির (Will Power, Will Force) কথা বলিব। কারণ অন্যান্য অনেক শক্তি লাভের মূলে এই ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া বর্ত্তমান থাকে। মনকে একাগ্র-ভাবে কোন কার্য্যে নিযুক্ত না করিলে সফলতা লাভ অসম্ভব। আবার মনের এই শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিতে পারিলে তাহার দ্বারা অসাধ্য সাধন হয়।

মনের সুপ্ত-চৈতন্য অংশ (subliminal consciousness) মানুষের জন্ম-জন্মান্তরের অর্জ্জিত অভিজ্ঞতার ভাঁড়ার-ঘর। সুপ্ত চৈতন্যকে জাগরিত করিতে পারিলে মানুষের দিব্য-দৃষ্টি লাভ হয়। আমরা যাহা করি, যাহা ভাবি, তাহার কিছুই নষ্ট হয় না। এই সমস্তই 'ধারণা' (Impression) অথবা 'ভাব'রূপে মনের সুপ্ত চৈতন্য অংশে সঞ্চিত হয়। বিশেষ বিশেষ কারণ বশতঃ বহুকাল-বিস্মৃত ঘটনাও আমাদের মনে জাগরুক হয়। তাহারা কোথায় ছিল? মানুষ আকস্মিক ঘটনার উপর নির্ভর না করিয়া যখন ইচ্ছামাত্র তাহার পূর্ব্বজীবনের বিস্মৃত ঘটনাকে মনে জাগাইয়া তুলিতে পারে তখনই তাহার এই দিকের মানসিক সাধনা সম্পূর্ণ হইয়াছে বলা যায়।

কিন্তু ইহা ইচ্ছা-শক্তির একটা দিক মাত্র। মনের সঙ্গে শরীরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়া মন শরীরের উপর ক্রিয়া করিতে পারে। আমাদের অন্তরস্থ ইচ্ছা বহির্জ্জগতে ক্রিয়ারূপে প্রকাশ পায়। এই ইচ্ছাশক্তি যেরূপ মানুষের নিজের উপর, ঠিক সেইরূপ অন্য লোকের উপর ও প্রকৃতির উপরেও ক্রিয়া প্রকাশ করে। নিজের উপর ইচ্ছাশক্তির চালনায় মানুষ আপনাকে অনন্ত উন্নতি বা চরম অধঃপতনের পথে লইয়া যাইতে পারে। 'Man is his own maker' (মানুষ নিজেই নিজকে তৈয়ার করে)—এই বাক্যটী বহু পরিমাণে সত্য। শ্রীমদ্‌শঙ্করাচার্য্যের ভাষায় বলা যায়—'যিনি মনকে জয় করিয়াছেন, তিনি জগৎকে জয় করিয়াছেন।' এই ইচ্ছাশক্তির উপযুক্ত চালনায় মানুষ আপনার ভাগ্য গড়িয়া তুলিতে পারে, স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য লাভ করিতে পারে, নিজের রোগ আরোগ্য করিতে পারে। অধ্যাত্ম

বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার আলোচনার সময়ও ইচ্ছাশক্তির সম্বন্ধে বলিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন এই যে,—মানুষের মন ও শরীর একত্র সম্বন্ধ আছে ; সুতরাং মানুষের মনের শক্তিতে তাহার শরীর যেন চালিত হইল। কিন্তু এক জনের ইচ্ছাশক্তিতে অন্য লোকের মন ও শরীর চালিত হয় কিরূপে ?

যে কারণে এক মন অন্য মনকে জানিতে পারে (telepathy, thought-reading আলোচনার সময় বিশেষভাবে বলা যাইবে), যে কারণে মানুষ ইচ্ছাশক্তির বলে তাহার নিজের শরীরকে পরিচালিত করিতে পারে, ঠিক সেই কারণেই এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির উপর ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিতে পারে। সমস্ত বিশ্ব সেই এক অনন্ত শক্তির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। জগতের মূলে আছেন সেই এক পরম চৈতন্য-সত্ত্বা ; বিশ্বের সমস্তই 'সূত্রে মণি গণাইব' একত্র বিধৃত আছে। সকলের ভিতরেই একটা সমত্বের যোগ আছে। তাই একমন অন্য মনকে জানিতে পারে, এক মন অন্য মনকে পরিচালিত করিতে পারে। কারণ প্রত্যেক মনই সেই বৃহত্তর মনঃশক্তির তরঙ্গ মাত্র। বিশেষ কোন ব্যক্তির উপর ইচ্ছাশক্তি চালনা করার অর্থ—সেই বৃহৎ মনঃসমুদ্রের মধ্যে আঘাত করায় যে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, সেই তরঙ্গকে বিশেষ একটা দিকে (যেমন নির্দ্দিষ্ট কোন মানুষের, Subjectএর, দিকে) পরিচালিত করা। সেই ইচ্ছা-তরঙ্গ সাবজেক্টের (Subjectএর কি বাংলা প্রতিশব্দ হইতে পারে ?) মনের মধ্যে প্রেরকের অভিপ্রায়ানুরূপ ইচ্ছা উদ্রিক্ত করে। সুতরাং সাব্‌জেক্ট (Subject) নিজের ইচ্ছানুরূপ কাজ করিতেছে ভাবিয়া প্রেরকের ইচ্ছা জ্ঞাপন করে। কিন্তু যখন Subjectএর ইচ্ছাশক্তি, প্রেরকের ইচ্ছাশক্তির চেয়ে প্রবল থাকে, তখন প্রেরিত ইচ্ছাশক্তি প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে।

সমত্বহেতু এক মন যেন অন্য মনকে জানিতে পারে বা এক মন অন্য মনের উপর ক্রিয়া করে। কিন্তু জড়জগৎ সম্বন্ধে, প্রকৃতির রাজ্য সম্বন্ধেও কি এই নিয়ম প্রযোজ্য ? অধ্যাত্মবাদীদের মতে জগতে প্রকৃত পক্ষে জড় বলিয়া কিছু নাই—সমস্তই সেই চৈতন্যময় পরম সত্তার বিকাশ মাত্র। সুতরাং যাহাকে আমরা ব্যবহারিক ভাবে জড় বলি, মূলতঃ তাহা চৈতন্যসত্তায় পূর্ণ। তাই, চৈতন্যের আহ্বানে সাড়া দেয়। তাই, জড় প্রকৃতিও মানুষের ইচ্ছাশক্তির নিকট মাথা নত করে। জড়জগৎ, ধাতু পর্য্যন্ত যে উত্তেজনায় সাড়া দেয়, তাহা ভারত-গৌরব শ্রীযুক্ত জগদীশ বসু মহাশয় প্রত্যক্ষ প্রমাণের সাহায্যে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

ইচ্ছাশক্তির বিকাশে ও উপযুক্ত পরিচালনায় মানুষের অসাধ্য প্রায় কিছু থাকে না। মানুষ অনন্তের সন্তান, অমৃতের অধিকারী। উপযুক্ত সাধনা বলে, ও সাধনলব্ধ শক্তির উপযুক্ত ব্যবহারে, মানুষ অমৃতের অধিকারী হয়। মানুষ মূলতঃ চৈতন্যস্বরূপ। চারিদিকের বেড়াজাল ও বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিলে সে স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষ সীমার মাঝে অসীম। সুতরাং পূর্ণ মানুষের অসাধ্য প্রায় কিছুই থাকে না। ভারতবর্ষে এমন সব মহাত্মাদের সংবাদ পাওয়া যায়, যাঁহাদের কার্য্যকলাপের বিষয় আলোচনা করিলে তাঁহাদিগকে অতিমানুষ বলিয়া মনে করা ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা আমাদেরই একজন, শক্তিবিকাশের পার্থক্য হেতু আমাদের মধ্যে এই পার্থক্য জন্মিয়াছে। আমরাও অতি-মানুষ বা পূর্ণ-মানুষ হইতে পারি।

কিন্তু এখানে একটী কথা বলার প্রয়োজন। অনেকেই নানা ভাবে নানা কার্য্যে নিজেদের ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করেন; কিন্তু সকলেই তো সফলকাম হয়েন না, কাহার-কাহারও জীবন কেবল মাত্র ব্যর্থতায় পূর্ণ। ইহার কারণ কি ?

এই ব্যর্থতা বা সফলতার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে দুইটী জিনিস আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমতঃ, শক্তি বিকাশের তারতম্য ; দ্বিতীয়তঃ, শক্তি পরিচালনার ধারা। সকলেই নিজের ইচ্ছাশক্তির উপযুক্ত পরিমাণে বিকাশ করিতে পারেন না। মানুষের মধ্যেই যে অনন্ত শক্তির ভাণ্ডার রহিয়াছে, তাহার সংবাদ পর্য্যন্ত অনেকে জানেন না। সুতরাং কি উপায়ে শক্তিলাভ করিতে হয়, তাহা তাঁহারা অবগত নহেন। শক্তি লাভের জন্য সাধনা না করিয়া, তাহার ফল লাভ করা সম্ভবপর নয়।

দ্বিতীয়তঃ, শক্তি লাভ করিয়াও শক্তি চালনার প্রকৃষ্ট উপায় না জানিলে সফলতা লাভ সম্ভবপর নয়। বিশ্ব একটী বিশেষ নীতিতে পরিচালিত। এই নীতির পশ্চাতে ভগবানের শক্তি বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,

ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করার অর্থ—সেই বিশ্বব্যাপী মূল শক্তি-সমুদ্রে আঘাত করা; এবং সেই আঘাতের ফলে যে শক্তি-তরঙ্গ উত্থিত হয়, তাহা নির্দ্দিষ্ট একদিকে পরিচালনা করা। সেই বিশ্বমঙ্গলনীতির অনুগামী যে ইচ্ছাশক্তি, তাহা অনুকূল শক্তির সাহায্যে সফলতা লাভ করে; পক্ষান্তরে, প্রতিকূল শক্তির সঙ্ঘর্ষে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। আমাদের কোন ইচ্ছা পূর্ণ হয়, কোন ইচ্ছা পূর্ণ হয় না,—ইহাই তাহার একটা বড় কারণ। অবশ্য তাহা ছাড়াও ইচ্ছাকারীর যোগ্যতা প্রভৃতি নানাবিধ কারণ আছে। কোন কোন সময় অতি হেয় ইচ্ছার সফলতা দেখিতে পাই, কিন্তু পূর্ব্বাপর সমস্ত পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সে ইচ্ছার ফল, ইচ্ছাকারীর পর্য্যন্ত ভয়ানক অনিষ্ট করিয়াছে।

ইচ্ছাশক্তি সাধারণতঃ দুই প্রকারে প্রয়োগ করা হয়; ইচ্ছাকারীর জ্ঞাতসারে, ও অজ্ঞাতসারে। জ্ঞাতসারে যে শক্তি প্রয়োগ করা হয়, তাহা উপরে বলা হইল। আপাত-দৃষ্টিতে অনেকের কোনরূপ ইচ্ছাশক্তি আছে বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু তাঁহাদের বাসনা কামনা অপূর্ণ প্রায়ই থাকে না। এই শ্রেণীর লোকের প্রধান কথা—ঈশ্বর যা করেন তাই হবে। পথে ঘাটে আমরা কর্ম্মবিমুখ অলস ব্যক্তির মুখে যে অদৃষ্টের কথা শুনিতে পাই—ইহা সেই অদৃষ্টবাদ নয়। এই শ্রেণীর লোকেরা কর্ম্মবিমুখ নহেন। তাঁহারা কর্ম্ম করেন বটে, কিন্তু গীতার উপদেশ অনুযায়ী ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া জীবন-পথে চলিতে চেষ্টা করেন। তাঁহারা প্রত্যক্ষ ভাবে ইচ্ছাশক্তির বিকাশের জন্য কোনরূপ চেষ্টা করেন না সত্য, কিন্তু অজ্ঞাতসারে তাঁহাদিগের অবলম্বিত কর্ম্মপ্রণালীর মধ্য দিয়া তাঁহাদের ইচ্ছাশক্তি সেই বিশ্বশক্তির সহিত মিলিত হইতে থাকে। তাঁহাদের মন ভগবদভিমুখী হওয়ায় তাঁহাদের বাসনা কামনাও উর্দ্ধমুখী হয়। তাই প্রত্যক্ষ ভাবে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ না করিলেও তাঁহাদের বাসনা প্রায় আপনা-আপনিই পূর্ণ হইয়া যায়।

ইচ্ছাশক্তির উপযুক্ত প্রয়োগে মানব সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করা যায়। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার আলোচনার সময়ও এই ইচ্ছাশক্তির উল্লেখ করার প্রয়োজন হইবে। অন্যান্য সকল শক্তিলাভের মূলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে এই ইচ্ছাশক্তি নিহিত আছে। তাই প্রথমেই এই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইল। এই ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে মানুষের কিরূপ মঙ্গল সাধিত হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করিয়া অন্যান্য বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

ইচ্ছাকারী নিজের নানাবিধ উন্নতিসাধন করিতে পারেন। শারীরিক মানসিক, আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে সহজসাধ্য হয়। ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে নিজের বা অপরের রোগ আরোগ্য করা যায়। এ বিষয় Psychopathy (বিনা ঔষধে চিকিৎসা বিদ্যা) সম্বন্ধে আলোচনাকালে বিশেষভাবে বলা হইবে। ইচ্ছা শক্তির প্রয়োগে কুচরিত্রের সংশোধন করা যায়—কত মানুষকে অধঃপতনের অধস্তন স্তর হইতে ফিরাইয়া আনিয়া তাহাদিগকে জনসমাজের অগ্রণী করা যায়। যাহারা সমাজের ব্যাধিস্বরূপ, তাহারাই আবার দেবভাবের মূর্ত্ত বিগ্রহ হইতে পারে। নানাবিধ কুঅভ্যাস ইহার সাহায্যে দূর করা যায়, এবং সন্তানের চরিত্রকে ইচ্ছামত গড়িয়া তুলিতে পারা যায়। পারিবারিক, সামাজিক নানাবিধ মঙ্গল বিধানে সুসংযত ইচ্ছাশক্তি মহদুপকার সাধন করে।

যাঁহারা উপযুক্ত পরিমাণে ইচ্ছাশক্তির বিকাশ সাধন করিয়াছেন, তাঁহারা জগতের নানাবিধ মঙ্গলের জন্য তাহা প্রয়োগ করিতে পারেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—প্রকৃতিও মানবের শক্তির নিকট মাথা নত করে। জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী মহাত্মগণ জগতের কল্যাণ কামনায় নানাবিধ মঙ্গলজনক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন—তাহার দৃষ্টান্ত জগতে দুর্লভ নয়। আমাদের ইতিহাসে বর্ণিত জীবন্মুক্ত মহাত্মগণ জগতের মঙ্গলের জন্য পৃথিবীতে থাকিয়া কর্ম্ম করেন;—তাঁহাদিগের সেই কর্ম্ম ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ মাত্র। আমাদের দেশের যোগশাস্ত্রোক্ত 'কামবসায়িতা' সিদ্ধি এই ইচ্ছাশক্তির পূর্ণ বিকাশ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মানুষ মূলতঃ অনন্তের সন্তান, অসীম শক্তির অধিকারী। উপযুক্ত সাধনায় সে তাহার শক্তিকে অসীম পরিমাণে বর্দ্ধিত করিতে পারে—পূর্ণ হইতে পারে। ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে এই কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। মানুষ সাধনবলে আপনার শক্তিকে বিশ্বশক্তির সহিত মিলিত করিতে পারিলে, সে ইচ্ছামাত্র সেই শক্তি-সমুদ্রে তরঙ্গ উৎপাদন করিতে পারে। সমস্ত বিশ্বে এক শক্তিই অনুস্যূত রহিয়াছে, তাই ইচ্ছাশক্তি

সর্ব্বত্র কার্য্যকরী হয়। সাধনবলে মানুষ এই দেশ কালের গণ্ডীর বাহিরে যাইতে পারে—আপনার পূর্ণত্ব উপলব্ধি করিতে পারে। তাই আমাদের দর্শনসমূহে মুক্তাত্মাদের অসীম শক্তি লাভের উল্লেখ দেখা যায়—যাহার নিকট অষ্টসিদ্ধিও নগণ্য। এই মুক্ত সিদ্ধ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই স্বামী বিবেকানন্দ এক যায়গায় বলিয়াছিলেন—"ইচ্ছা করিলে আমি চন্দ্র সূর্য্যের গতিরোধ করিতে পারি!"

কোন জাতির বা সমাজের সমবেত শক্তির ক্রিয়াও অসাধারণ। যখন কোন জাতি বা সমাজ বিশিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্ত্তন কামনা করে, অথচ নানা কারণে তাহা সম্পূর্ণ করিতে পারে না, তখন জাতির সমবেত ইচ্ছাশক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ স্বরূপ শক্তিশালী কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, যিনি জাতির সেই ইচ্ছাকে সফল করিতে সমর্থ হয়েন। জগতের বিভিন্ন দেশে মহাপুরুষের আগমনের পূর্ব্বে এইরূপ একটা চাঞ্চল্য ও অপূর্ণ ইচ্ছা দেখিতে পাওয়া যায়। 'অদ্বৈতের হুঙ্কারে মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয়' বলিয়া যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহারও মূলে সমাজের এই ইচ্ছাশক্তি বর্ত্তমান। সমাজে বা দেশে কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইলে মানুষ তাঁহাকে নির্ব্বিবাদে মানিয়া লয় কেন? মহাপুরুষের ব্যক্তিত্ব, ও ব্যক্তিগত শক্তির জন্যও লোকে তাঁহাকে মান্য করে সত্য, কিন্তু তাঁহার মধ্যে নিজেদের ইচ্ছার স্বরূপ দেখিতে পায় বলিয়া তাঁহাকে নিতান্ত আপনার জন মনে করে, নিজের প্রতিরূপ ভাবে। মানুষের সুপ্তচৈতন্য অংশে যে ইচ্ছা তাহার নিজের অজ্ঞাতসারে ক্রিয়া করিতেছিল, মহাপুরুষের মধ্যে তাহাই প্রকাশিত দেখিয়া তাঁহার ইচ্ছাকে নিজের ইচ্ছা বলিয়া গ্রহণ করে। শক্তি অবিনাশী। জাতির সমবেত ইচ্ছাশক্তি লেই সমাজে মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। জাতির ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে এখানে আর আলোচনার প্রয়োজন নাই।

মনের একাগ্রতার উপর এই শক্তির তারতম্য বহু পরিমাণে নির্ভর করে। সমস্ত জিনিসকেই বিভাগ করিলে [illegible]মিয়া যায়। ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধেও ইহার অন্যথা হয় না। মনের সমগ্র শক্তি কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের উপর উপযুক্ত ভাবে প্রয়োগ করিতে পারিলে তাহার ফল ফলিবেই। কিন্তু একাগ্রতা লাভের জন্য সাধনা চাই। আমাদিগের পুরাণাদিতে বর্ণিত 'অভিশাপ' বা 'বর' সম্বন্ধে আমরা অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। তাহার মধ্যে বহু পরিমাণে অতিরঞ্জন থাকিলেও একেবারে গাঁজাখুরী গল্প নয়। ইচ্ছাশক্তির উপযুক্ত প্রয়োগে আজকালও 'অভিশাপ' বা 'বর' প্রদান অসম্ভব নয়। আর, তাহা কেবল জাতি বিশেষের এক-চেটিয়া অধিকারও নয়। উপযুক্ত সাধনের প্রভাবে সকলেই এই শক্তি লাভ করিতে পারেন।

একটা উদাহরণের উল্লেখ করা যাউক। দুর্ব্বাসা মুনি শকুন্তলাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন যে,—দুষ্মন্ত তাঁহাকে বিস্মৃত হইবেন। ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে অন্যের মনের বিকার উৎপন্ন করা আজকাল আর গাঁজাখুরী গল্প নয়—প্রত্যক্ষ সত্য। আজকালও ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে অন্যের মনে এরূপ বিস্মৃতি উৎপাদন করা যায় এবং করা হইতেছে। বর্ত্তমান বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের আলোকে আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা করিলে অনেক ধূলিরাশিই স্বর্ণরেণুতে পরিণত হইবে। আমরা এ বিষয়ে মাত্র দু'-একটী ইঙ্গিত করিব, বাকীটুকু পাঠক-পাঠিকারা নিজে পূরণ করিয়া লইবেন। প্রাচীনের ব্যাখ্যা দেওয়াও আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, আর তাহা সম্ভবপরও নয়। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের আলোকে কিরূপে প্রাচীনের চর্চ্চা করা সম্ভবপর, তাহার একটু আভাষ দেওয়া গেল মাত্র।

ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে আর একটী কথা বলিবার আছে। আগুণ যেমন মানুষের খুব উপকারী, তেমনি উহার তুল্য অনিষ্টকারী সর্ব্বধ্বংসীও আর কেহ নাই। ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য। ইহার সাহায্যে মানুষের যেমন বহুবিধ মঙ্গল সাধন করা যায়, তেমনি অনিষ্টও করা যায়। শক্তি অগ্নি-ধর্ম্মী। সুতরাং ইহার প্রয়োগে সাবধান হইতে হয়। ইহা যে কেবল পরকে পোড়ায় তাহা নয়, শক্তি-প্রয়োগকারীও ইহার হাত হইতে নিস্তার পান না। তাহারও যথেষ্ট দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

তার পর, অপব্যবহারে শক্তি অতি শীঘ্রই নষ্ট হয়। অমঙ্গল সাধনে শক্তি প্রয়োগ করিলে তাহা বিশ্বমঙ্গল-নীতির সহিত সঙ্ঘর্ষে পরাজিত হয়, না হয় তো দুর্ব্বল হইয়া যায় তাই পুরাণাদিতেও উল্লেখ দেখিতে পাই যে, অভিশাপ

দেওয়ার ফলে তপঃশক্তি নষ্ট হয়। বর্ত্তমান সময়েও যাঁহারা অমঙ্গলের পথে শক্তি চালনা করেন, তাঁহাদের শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। কোন কোন সময়ে শক্তি প্রয়োগকারীর অনিষ্ট সাধন করে—ইহারও দৃষ্টান্ত আছে। সংযত মন ও উন্নত উদার হৃদয় ব্যতীত এই শক্তিকে ধারণ করা যায় না। যাঁহারা ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিতে চাহেন, তাঁহারা সাবধানে তাহা করিবেন। নতুবা, শক্তিক্ষয় অথবা নিজের অনিষ্ট হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে কোন বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে প্রথমতঃ মনকে সংযত ও একাগ্র করা চাই। নির্দ্দিষ্ট বিষয় ব্যতীত অন্য কোন দিকে যাহাতে মন না যায়, যাহাতে কোনরূপ চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত না হয় সে সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া উচিত। প্রথমতঃ নির্জ্জনতার প্রয়োজন। সাধনায় অগ্রসর হইলে তত সাবধানতার দরকার নাই। প্রথমে নিজের উপর ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করা ভাল। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই কোন-না-কোনও দোষ-ক্রটী আছে। আত্ম-অনুসন্ধানের দ্বারা সেই ক্রটী বাহির করিয়া তাহা সংশোধনের জন্য শক্তি প্রয়োগ করা চাই। একদিনে বা এক মুহূর্ত্তে সফলতা লাভ করা সম্ভবপর নয়। ক্রমশঃ যখন নিজের উপর ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইবে, তখন বহির্জগতে শক্তি প্রয়োগ করা যায়। নিজের উপর শক্তি প্রয়োগ সম্বন্ধে একটী সহজসাধ্য সাধারণ দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

ইচ্ছাসত্ত্বেও অনেকের প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গে না। রাত্রে শুইবার সময় দৃঢ়ভাবে একাগ্রতার সহিত মনে মনে সঙ্কল্প করিবেন—"আমাকে কল্য প্রাতে সাড়ে পাঁচটার সময় ঘুম হইতে উঠিতেই হইবে।" অথবা নিজকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন—"ক, তোমাকে এই সময় ঘুম থেকে উঠিতেই হইবে।" এই দুই প্রকার Suggestion (ইঙ্গিত) এর মধ্যে প্রথমোক্তটীই ভাল। কারণ তাহার দ্বারা আত্ম-শক্তি জাগরণের পক্ষে সুবিধা হয়। দুই তিন দিনের মধ্যেই এই শক্তির ফল প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন। ক্রমশঃ অন্যান্য বিষয়ে শক্তি প্রয়োগ করিবেন; কিন্তু এক সঙ্গে একাধিক বিষয়ে শক্তি প্রয়োগ করিবেন না। অনেকের থিয়েটার বা ঘোড়দৌড় রোগ আছে। তাঁহারা ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে এই রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। সর্ব্বনাশের পথে যাইতেছেন জানিয়াও অনেকে আত্মসম্বরণ করিতে পারেন না।

অনেকেই হয় ত প্রশ্ন করিবেন—আমি ইচ্ছা করি বলিয়াই ত রেসে (Race) যাই, ইচ্ছা না করিলে যাইব না। কথাটা খুবই ঠিক। কিন্তু আসল বিষয়—এই ইচ্ছাটাকে কিরূপে পরিচালিত করা যায়। ঐখানেই গোল। অনেকেই ভাবেন—'ইচ্ছা করিলেই হয়'—কিন্তু আত্ম-অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, আদতে সেই ইচ্ছাশক্তিটাই তাহাদের নাই। তাহারা যাহাকে নিজের ইচ্ছা বলিতেছেন—সেটা নেশার ইচ্ছা, নিজের নয়। এই দারুণ আত্ম-প্রতারণা হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে নিজের সত্যিকার ইচ্ছাশক্তিকে জাগরিত করিতে হইবে।

যাহা হউক, এ বিষয়ে উদাহরণ দিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে আর একটী জিনিস দরকার—সেটা 'ইঙ্গিত' (suggestion)। অন্যান্য বিষয়ের আলোচনার সময় ইঙ্গিত সম্বন্ধে বলিতে হইবে, তাই এখানে তাহার উল্লেখ মাত্র করিলাম। পরিশেষে একটা কথা বলা দরকার। যাঁহারা ইচ্ছাশক্তির বিকাশ সাধন করিতে চাহেন, তাঁহারা মঙ্গল উদ্দেশ্য ও সংযত মন লইয়া যেন কার্য্যে অগ্রসর হয়েন। নতুবা শক্তির অপ-ব্যবহারে জগতের অনিষ্ট তো হইবেই—সেই শক্তির আগুণে নিজেও পুড়িয়া মরিবেন। আবার সংযত মন, প্রশান্ত হৃদয় লইয়া সাধনায় অগ্রসর না হইলে, সফলতা লাভও সম্ভবপর নয়। মিথ্যা পরিশ্রমে নিজের অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্টলাভ হইবে না। আমরা যাহা করিতে চাই না কেন, জগতের মূলনীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হইবে, নতুবা দুঃখভোগ অনিবার্য্য।

তার পর, আমাদের চিন্তা-শক্তিকে বিশেষ ভাবে নিয়মিত করার প্রয়োজন। কোন শক্তিরই ধ্বংস হয় না। আজ আমি পরিহাসচ্ছলে যাহা চিন্তা করিতেছি, যাহা কামনা করিতেছি তাহার শক্তিও নষ্ট হয় না। তবে তাহা আমাদের মনের সুপ্তচৈতন্য অংশে কিরূপ ভাবে সঞ্চিত হইতেছে আমরা তাহার খবর রাখি না। ধীরে ধীরে মনের মধ্যে সঞ্চিত কামনা সামান্য একটু অনুকূল বাতাসের সাহায্যে হঠাৎ একদিন দাবদাহ উপস্থিত করে, পূর্ব্ব জীবনকে ভস্মীভূত করিয়া দেয়। তাই আমরা মানুষের

জীবনে অনেক সময় একটা আকস্মিক ওলট পালট দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাই। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কিছুই আকস্মিক নয়। পূর্ব্বে জাতিগত চিন্তাশক্তির প্রভাবে মহাপুরুষের আবির্ভাব সম্বন্ধে যে কথা বলা হইয়াছে—ব্যক্তিগত জীবনেও তাহা প্রযোজ্য। তাই অতি সাবধানে আমাদের চিন্তা, কর্ম্ম, ইচ্ছাকে পরিচালিত করা দরকার।

আবার অনেক সময় আমরা এলোমেলো ভাবে অথবা উল্টাপাল্টা রকমের ইচ্ছা করি বলিয়া কোনটাই সফল হয় না। সংযতভাবে, একাগ্রতার সহিত চিন্তা করিতে হইবে। প্রত্যেক চিন্তার বা ইচ্ছার একটা সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য থাকা চাই। নতুবা এলোমেলো ভাবে ইচ্ছা করিয়া সফলতা লাভ সম্ভবপর নয়।

আমাদের প্রবন্ধের তুলনায় ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা করা হইল। কারণ অন্যান্য প্রায় প্রত্যেক শাখার সহিত এই ইচ্ছাশক্তির যোগ আছে। তবুও যতদুর সম্ভব সংক্ষিপ্তভাবে মোটামুটী কয়েকটী বিষয় মাত্র উত্থাপিত করিয়াছি।

পক্ষী-তীর্থ

রায় শ্রীরমণীমোহন ঘোষ বাহাদুর বি-এল

শ্রীচৈতন্যদেব দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করিয়া যে সকল তীর্থ দর্শন করিয়াছিলেন পক্ষী-তীর্থ তাহাদের অন্যতম। চরিতামৃত গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে—"পক্ষ তীর্থ যাই কৈল শিব-দরশণ।" দ্রাবিড় দেশে, এই তীর্থ "তিরু কলুড়ি কুণ্ড্রম" * (The Sacred kite Kill) নামে পরিচিত। এই স্থান মান্দ্রাজ হইতে মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ। এই তীর্থের বৈশিষ্ট্য এই যে, অজ্ঞাত দেশ হইতে দুইটি পক্ষী প্রত্যহ এখানে আসিয়া পূজা গ্রহণ করিয়া যায়। অনেক দিন যাবৎ আমার স্বচক্ষে এই ব্যাপার দেখিবার জন্য কৌতূহল ছিল। অবশেষে যখন মান্দ্রাজপ্রবাসী একজন বন্ধু সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইলেন, তখন যাত্রার দিন নির্দ্ধারিত করা গেল।

মহাবলিপুরমের দৃশ্য (রায়া গোপুরম্ হইতে—চিঙ্গলপুট)

৭ই আগষ্ট প্রাতে ৭টায় এগ্‌মোর ষ্টেশনে ট্রেণে উঠিয়া ১০॥ টায় চিঙ্গলপুট জংসন ষ্টেশনে পৌছিলাম। মান্দ্রাজ হইতে এই ষ্টেশন ৩৫ মাইল। এই জংসন হইতে একটি ব্রাঞ্চ লাইন মান্দ্রাজ-সাউথ-মাহারাট্টা-রেলওয়ের আর্কোনাম পর্য্যন্ত গিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন তীর্থ কাঞ্চী (Conjeeveram) যাইতে হইলে, এই ব্রাঞ্চ লাইনের গাড়ী ধরিতে হয়।

• চিঙ্গলপুট রেল লাইনের নিকটেই হ্রদের ন্যায় একটি

* বাঙ্গালা অক্ষরে নামটি ঠিক উচ্চারণের অনুরূপ করিয়া লিখিতে পারিলাম না। "ড় ল য়োর ভেদ":—কিন্তু এখানে "ল" এবং "ড়" সংযুক্ত।—'তিরু'=শ্রী, "কুণ্ড্রম্"=পাহাড়।

বিস্তৃত জলাশয়—দৈর্ঘ্যে ২ মাইল, প্রস্থে ১ মাইল। রেল ষ্টেশন হইতে পক্ষী তীর্থ ৯ মাইল দূরে। যাত্রিদের জন্য, মোটর সার্ভিস আছে। ট্রেণ পৌঁছিবার ১০ মিনিট মধ্যেই মোটর-বস্‌-এ আরোহণ করিয়া গন্তব্য স্থানের অভিমুখে রওনা হইলাম। দুই পার্শ্বে উন্মুক্ত প্রান্তর এবং পথের ধারে ধারে তেঁতুল গাছের সারি। আধ ঘণ্টা পরে, সম্মুখবর্ত্তী পর্ব্বতের শিখরদেশে গিরিদুর্গের ন্যায় একটি মন্দির আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। অল্পকালের মধ্যেই মোটর-বাস্‌ পাহাড়ের পাদমূলে পৌঁছিল। ইহাই তিরু-কল্‌ড়ি-কুণ্ড্রম্‌। নগরীর মধ্যস্থলে প্রাচীর-বেষ্টিত 'গোপুরম্‌-শোভিত বৃহৎ শিব-মন্দির; উহার চারিধারে

দেবগিরীশ্বর পাহাড়ে পুরোহিত পক্ষীদিগকে আহার দিতেছেন (তিরুকল্‌ড়িকুণ্ড্রম্‌—চিঙ্গলপুট)

তিরুকল্‌ড়িকুণ্ড্রম্‌

রাজপথ কিন্তু গিরিশীর্ষে অবস্থিত, "বেদ-গিরীশ্বর" শিব-পক্ষাতীর্থ নামে পরিচিত। ঐ তীর্থের মাহাত্ম্যে মন্দিরস্থ নগরীস্থ মন্দিরটি যথোচিত খ্যাতিলাভ করিতে পারে নাই। নতুবা স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন স্বরূপ দ্রাবিড় দেশের অনেক বিখ্যাত মন্দিরের সঙ্গে এই মন্দিরের নামও উল্লেখ-যোগ্য।

তিরু-কল্‌ড়ি-কুণ্ড্রম্‌ সহরের লোকসংখ্যা বেশী নহে। কিন্তু তীর্থ দর্শন উপলক্ষে সময়ে সময়ে এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। তাহাদের বাসের জন্য সহরে অনেকগুলি যাত্রি-নিবাস আছে। তিরু-কল্‌ড়ি-কুণ্ড্রমের জল-বায়ু স্বাস্থ্যকর, সেই জন্য স্বাস্থ্যোন্নতির উদ্দেশ্যেও অনেকে এখানে আসিয়া থাকেন। সহরের এক প্রান্তে একটি বৃহৎ সরোবর আছে—নাম "শঙ্খ-তীর্থ।" পাণ্ডাগণ বলেন, প্রতি দ্বাদশ বৎসরে এই সরোবর হইতে একটি করিয়া শঙ্খ নির্গত হয়। সেই জন্য বার বৎসর পরে একবার শঙ্খতীর্থে

স্নান করিবার যোগ ঘটিয়া থাকে। ঐ সময় তিরু-কল্‌ড়ি কুণ্ড্রম অসংখ্য যাত্রীর সমাগমে কোলাহলপূর্ণ নগরে পরিণত হয়। সরোবরের মধ্যস্থলে জলটুঙ্গির ন্যায় একটি মন্দির—নাম "নীরালি-মণ্ডপ।" স্নান করিবার জন্য একাধিক সুন্দর পাথরে-বাঁধা ঘাট আছে। এই সরোবরের তীরে একজন মহাজনের গৃহে আমরা আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

শঙ্খতীর্থের নির্ম্মল জলে অবগাহন করিয়া আমরা পক্ষীতীর্থ দর্শন জন্য শৈলশিখরে আরোহণ করিতে প্রস্তুত হইলাম। প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে পক্ষিযুগল এই তীর্থে আবির্ভূত হইয়া পূজা গ্রহণানন্তর তৎক্ষণাৎ চলিয়া যায়। সুতরাং ঠিক সময়ে গিরিশৃঙ্গে উপস্থিত হইতে না পারিলে সে দিন আর পক্ষিদেবতার দর্শন লাভ ঘটিবে না।

পাথরের সিঁড়ি বাহিয়া প্রায় অর্দ্ধপথ উঠিয়াছি এমন সময় সহসা গিরিশৃঙ্গে বাদ্য-ধ্বনি ও জয়-কোলাহল শুনিয়া আমরা বুঝিলাম যে পক্ষিযুগল দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইয়াছে। আমরা যথাসাধ্য দ্রুতপদে পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম, কিন্তু অনভ্যাস বশতঃ চরণ ক্রমশঃই অবশ হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু বিশ্রামের আর তিলমাত্র অবসর ছিল না। ক্লান্তদেহে আমরা তীর্থস্থানে উপস্থিত হইলাম। পর্ব্বতের সানুদেশে ক্ষুদ্র অঙ্গনের ন্যায় সমতল স্থানে একটি চত্বর—উহাই পক্ষিদেবতার পূজা-মণ্ডপ। অনেক ভক্ত সেখানে সমবেত। একজন পুরোহিত বসিয়া মন্ত্র পাঠ করিতেছিলেন। কিন্তু এত চেষ্টা করিয়াও আমরা ঠিক সময়ে পৌছিতে পারি নাই। পক্ষিযুগলের "ভোগ" হইয়া গিয়াছে। পুরোহিতের হস্ত হইতে ভোগ গ্রহণ করিয়া পক্ষিদ্বয় শিখরের প্রান্তে পাথরের উপর বসিয়া আছে। পাখী দুইটি সম্ভবতঃ গৃধজাতীয়—বাণ সাদা ... রূপ পাখী ... দেশে দেখি নাই। দুই তিন মিনিট পরে পাখী উড়িয়া পূর্ব্বদিকে চলিয়া গেল। এখান হইতে ৮।৯ মাইল পূর্ব্বে বঙ্গসাগর। পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে সমুদ্রের নীলাম্বুরাশি এবং উপকূলে মহাবলিপুরমের আলোকস্তম্ভ—(Light house) চিত্রবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল।

পুরোহিত (অথবা পাণ্ডা) তখন আমাদের নিকট পক্ষিতীর্থের লোকপরম্পরাগত ইতিহাস বিবৃত করিলেন। এই পর্ব্বতের নাম বেদাচল, ইহার চারিটি শৃঙ্গ চারি বেদের প্রতিরূপ। এই যে দুইটি পক্ষি-দেবতা ইঁহারা সত্যযুগ হইতে বর্ত্তমান আছেন। সত্যযুগে ইঁহারা ছিলেন দুইজন
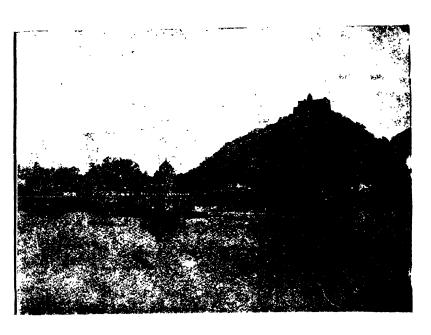
বেদগিরীশ্বর মন্দির, পাহাড় ও সরোবর।

ঋষি ; ত্রেতায়—জটায়ু ও সম্পাতি, দ্বাপরে চণ্ড ও প্রচণ্ড, এবং কলিতে পূষা ও বিধাতা। ইঁহারা প্রত্যহ আকাশ পথে কাশী হইতে রামেশ্বরম্ যাতায়াত করেন। মধ্যাহ্নে পূর্ব্ব-সাগরে স্নানান্তে বেদাচল-শৃঙ্গে নামিয়া ভোগ গ্রহণ করিয়া যান। কাশী ও রামেশ্বর তীর্থে পক্ষিযুগল কাহারও নয়নগোচর না হইলেও, প্রত্যহ মধ্যাহ্নকালে তাঁহাদের পক্ষিতীর্থে অবতরণ করিয়া ভোগ-গ্রহণের কখনও ব্যতিক্রম হয় না।

বাস্তবিক, পক্ষিতীর্থের পক্ষি-সমাগম ব্যাপারটি রহস্যা-

করেন—তাহার পূর্ব্বেই পক্ষিতীর্থ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। একজন প্রাচীন ওলন্দাজ ভ্রমণকারীর গ্রন্থে লিখিত আছে যে তিনি ১৬৮১ খৃষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী দ্বিপ্রহরে এই তীর্থে দুইটি পাখীকে ভোজন করিতে দেখিয়াছিলেন। শত শত বৎসর যাবৎ এক জাতীয় দুইটি পাখী নিয়মিতরূপে প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে এই গিরি শৃঙ্গে আসিতেছে। আহার্য্যের লোভেও দুইটির বেশী পাখী আসে না কেন, এবং কালক্রমে একটি পাখীর আয়ুঃ শেষ হইলে অমনি ঐ জাতীয় আর একটি পাখী আসিয়া কেমনে তাহার স্থান অধিকার করে, এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর কাহারও নিকট পাই নাই। যাঁহারা অবিশ্বাসী, তাঁহারা বলিয়া থাকেন ইহা পাণ্ডাদিগেরই একটা কারসাজি।

পক্ষি-দর্শন শেষ করিয়া পর্ব্বত শীর্ষে 'বেদগিরীশ্বর,' শিবের মন্দির দেখিলাম। শিব-মন্দির সংলগ্ন দেবীর মন্দির। দেবীর নাম "শাকাম্মা।" পর্ব্বতের চূড়া হইতে বহু নিম্নে তিরু-কলুড়ি-কুণ্ড্রম্ সহরের মন্দির, রাজপথ, সরোবর, বৃক্ষ-শ্রেণী খুব সুন্দর দেখায়। আমরা একদিকের সিঁড়ি বাহিয়া পর্ব্বতশিখরে উঠিয়াছিলাম, অন্যদিকের পথ ধরিয়া নিম্নে সমতলভূমিতে অবতরণ করিলাম।

কৈবর্ত্ত-দিদি

শ্রীরমলা বসু

গ্রামের যখনই যার যা দরকার হোত, "কৈবর্ত্ত দিদি"র তখনি ডাক পড়ত। কারুর ঘরে ধান ভানতে, কারুর ঘরে ডাল বাচতে, কারুর বা গম ভাঙ্গতে, কোথাও বা ক্ষারে সেদ্ধ করে কাপড় কাচতে, বড়ি দিতে, আমসত্ব দিতে, পূজোয় আচ্ছায়, বিয়েতে পার্ব্বণীতে—প্রতি দিন কারু না কারুর ঘরে ডাক তার ছিলই ছিল।

হাসি-মুখে সব কাজই সে করে যেত। তার বদলে যে যা খুসী হয়ে দিত, তাই নিয়েই সে খুসী হয়ে চলে যেত। তা ছাড়া, দুবেলা দুমুটো ভাত, আর বছরে দু একখান কাপড়, কি এক-আধ আঁজলা ধান, চাল, কি দুটো কলা-মুলোও তার প্রায় জুটে যেত। নিজের জন্যে আর কিছু তার দরকারও হোত না। বছরের তিনশো চৌষট্টি দিন তার এমনি ভাবেই কেটে যেত; কিন্তু একটী দিন বাদ—সে দিন বোধ হয় সমস্ত রাজ্যের লোভ কিম্বা হাজার পেয়াদার ভয়েও তাকে তার গ্রামের সীমানার নির্জ্জন নদী-তীরের ক্ষুদ্র কুটীরটুকু থেকে কেউ বার করে আনতে পারত না।

নাম ছিল তার রাসমণি। গ্রামের বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা সেই নামেই তাকে ডেকে থাকলেও, অল্প-বয়স্কের কাছে সে "কৈবর্ত্ত দিদি" বল্লেই সুপরিচিত। লোকের বিপদ-আপদে, সুখ-দুঃখে, রোগ-শয্যায় সে অক্লান্ত পরিশ্রমে, প্রসন্ন বদনে, ডাক পড়লেই ছুটে আসত,—লোকের অস্তিত্বে নিজের অস্তিত্ব মিলিয়ে দিয়ে। কিন্তু বছরের সেই একটী দিন সে একেবারে নিজের সত্বায় ডুব দিয়ে তলিয়ে গিয়ে, এমন একটা বিপুল রহস্যময় স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করত যে, কারুর সাধ্য ছিল না সে দিন তার সে সুনিবিড় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে। গ্রামের লোক শেষে, বছরের আর পাঁচটা অবশ্যম্ভাবী তিথি-নক্ষত্রের বিশেষ দিনের মত সেই দিনটাকে "কৈবর্ত্ত দিদির দিন" বলে মেনে নিয়েছিল। তারা জানত, হাজার প্রলোভন, হাজার অনুনয় বিনয়েও সেদিন তাকে কিছুতেই পাওয়া যাবে না।

শুধু দূর হতে তার ক্ষুদ্র কুটীরের রুদ্ধ দ্বারটুকু দেখা যেত। কি জানি কি অজানিত সম্ভ্রমে ও ভয়ে সে দিক পানে লোক-চলাচলও যেন সেদিন স্থগিত হয়ে যেত।

বলা বাহুল্য, সংসারে তার রক্তের সম্পর্ক হিসাবে কেউই ছিল না; আর সম্পত্তির মধ্যে সেই ক্ষুদ্র কুটীরখানা বইও আর কিছুই ছিল না। কিন্তু যেমন ভাবে তার বছরের অবশিষ্ট দিনগুলি কেটে যেত, তাতে আত্মীয় স্বজনের অভাব বা খাবার-পরবার অভাবে তার কিছুই এসে যেত না। এমন ভাবে যে সবার মধ্যে কায়মনে

আপনাকে বিলিয়ে দিতে পারে, তার সংসারে পর বলে কিছু থাকতে পারে না, —বিশেষ ছবেলা ছমুঠো অন্ন ও এক কোণে একটা ছেঁড়া মাছুরে শয়নেই যার সব অভাব মিটে যায়। এ রকম করে কত বছর কেটে গিয়ে এখন রাসমণির চোখের দৃষ্টি অনেক হ্রাস হয়ে এসেছে, শরীরে সে শক্তিও আর নেই।

* * * *

তখন প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে,—রায়-গিন্নীর উঠানে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালা হয়ে গেছে। পশ্চিমের দাওয়ায় বসে একটা কাঠের উনুনে মাটীর খোলা চাপিয়ে রাসমণি খোলার পর খোলা খই ভেজে চলেছে। একটা ছালার উপর তা রাশ করে ঢালা রয়েছে। আর এক পাশে মেজবৌ বসে একটা বড় কড়ায় গরম ফুটন্ত গুড়ের মধ্যে কতকগুলি মুড়ী নিয়ে একটা কাঠের হাতা দিয়ে নাড়ছে, এমনি তা একটু ঘন হয়ে এলে, নাড়ু ক'রে করে হাঁড়ীর মধ্যে পুরে রাখা হবে। অন্য দিকে একটু সরে এসে প্রকাণ্ড বঁটী পেতে, রায়-গিন্নী বসে গেছেন রাত্তিরের রান্নার আনাজ কুটতে। বড় বৌ এই মাত্র কাপড় কেচে এসে, ঘরে ঘরে সন্ধ্যে প্রদীপ দেখিয়ে, তুলসীতলায় প্রণাম করে এসেছে। তার পর রান্নাঘরে ঢুকে চালের কুন্‌কী হাতে বার হয়ে এসে শাশুড়ীকে জিজ্ঞেস করল, "মা, রাতের জন্য কত চাল নেব—ঠাকুর তো রুটী খাবেন ?" "হ্যাঁ, এই যেমন নেও মা—না ভুলে গেছি—রাসমণির চাল আজ নিও না। আচ্ছা দেখি ওকে জিজ্ঞেস করে, যদি দুটো খেয়েই যায়। রাসি, আজ তুই বাড়ী যাবি না কি লো ?" "হ্যাঁ মা তাই যাব—এই খইকটা হয়ে গেলেই উঠে পড়ব মা।" "তা নয় যাবি যাবি, দুটী রাঁধা ভাত খেয়েই যা না ?"

"না মা, এই খোলাটা ভাজা হলেই উঠে পড়ি। আমার ভিটেখান তো কোশভর হবে মা, তাই সকাল সকালই যাব।" "তা তোর সে তেপান্তরের মাঠ—এ রেতের বেলা না গেলেই কি নয় রে। আমার ঘরে বড়ীকটাও বাড়ন্তি, ডালকটাও পচে যেতে চল্ল—কাল দিনটেও ভাল ছিল, তা তোকেও ত কাল মরলেও পাওয়া যাবে না।"

ততক্ষণে শেষ খোলাটা নামিয়ে রেখে জ্বলন্ত উনানের কাঠকুটা টেনে এনে ঠুকে ঠুকে নেবাতে নেবাতে রাসমণি বল্লে "না মা, কাল তো আর হবে না। না হয় পরশু ভোরের বেলাই একটা ডুব দিয়ে এসে, যা বল মা, তাই করতে লেগে যাব।"

"হ্যাঁ মা, তা তো জানি। কি সে "বত্ত" তা তুইই জানিস মা, জানতেও দিলিনে কাউকেও।"

অঞ্চলের এক কোণে রায়গিন্নী প্রদত্ত খানিকটা খই মুড়ী ও গুড়ের নাড়ু বেঁধে নিয়ে অন্ধকার গ্রাম্য পথ দিয়ে নির্জ্জন নদী তীরের উঁচু ঢালু জমীটুকুর উপর তার সেই ছোট্ট ভিটেটুকুর পানে সে যতই অগ্রসর হয়ে আসতে লাগল, ততই যেন সমস্ত সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মন তার এক নতুন রাজ্যে ডুবে যেতে লাগল। প্রতি বছর এই চব্বিশটা ঘণ্টা সে এমনি করেই এ রাজ্যের মধ্যে বাস করে এসেছে। সে কি উন্মুখ আশায় সমস্ত সত্বা ভরিয়ে দিয়ে—ওঃ সে কত কত বছর হতে চল্ল ! !

তখন সে প্রথম নূতন যৌবনে পা দিয়েছে; সমস্ত দেহ-মন তার,—তার সে পরিপূর্ণ জোয়ারে কাণায় কাণায় ভরে এসেছিল—যৌবনের তৃষ্ণায় অধীর হয়ে।

তার এই শিথিল কালো অঙ্গ, কালো হলেও নিটোল সৌন্দর্য্যে ভরপুর ছিল; জীবন একটা সুখের নেশায় কেটে যাচ্ছিল, হলেই বা তাদের দুঃখের সংসার। এই ভিটে-মাটীর প্রত্যেক ইট-কাঠটুকুও যে তার কাছে মাধুর্য্যে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। আজও বুঝি তাই আছে! কারণ, বছরের বেশীর ভাগ এ ঘরে তার রাত না কাটলেও, আশ্চর্য্য যত্নের ও পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে এর ভেতর-বার রক্ষিত। যদি কেউ প্রবেশের অধিকার পেত, তো এই ক্ষুদ্র সামান্য কুটীরের ভেতরে তার গুছান পারিপাট্য দেখলে অবাক হয়ে যেত।

আর যে ছিল তার এই মধুরতার আধার, সে ছিল তার প্রাণ—সে ছিল যেন তার দিনের আলো—নয়নের মণি। গ্রামের বুড়োদের মধ্যে আজও অস্পষ্ট ভাবে কারুর কারুর "মিহির দাস"কে মনে পড়ে; কিন্তু গ্রামের তরুণেরা কেউই তখন প্রায় এ পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক পাতায়নি। কুটীর-খানার সঙ্গে ছোট একটুকুরো জমীও তখন তাদের ছিল। সেই খানেই তরকারীর ফসল করে কোন রকমে তাদের

দুজনকার দিন-গুজরান হোত। কিন্তু তবুও কি সুখের দিন ছিল সেগুলি !

সেই সারাদিন তার সঙ্গে সঙ্গে আবাদের সাহায্য করা—তার পর পরিষ্কার করে দেব-মন্দিরের মত তার কুটীরটুকু লেপে মুছে, ঘরের পাশে বেল ফুল, জুঁই ফুল, তুলসী-তলার ঝাড়ু বেঁধে—সেই তার জন্যে যত্ন করে দুবেলা দুটী রেঁধে দিয়ে—সেই বাজারে বিক্রী করবার আনাজ থেকে দুটো ভাল জিনিষ লুকিয়ে রেখে তার জন্য ভাল করে রান্না করে—সেই.ধরা পড়ে বকুনি ! সেই ক্ষার দিয়ে তার আট-হাতী ছোট ধুতিখান পরিষ্কার করে ধুয়ে দিয়ে—সেই শত-তালি গায়ের মুটীয়া চাদরখানা তালি দিয়ে দিয়ে—সেই সন্ধ্যেবেলা কাজের শেষে ছোট্ট দাওয়ায় ছেঁড়া মাদুর পেতে, ছোট হুঁকোটায় জলভরে, কল্কেয় ফুঁ দিতে দিতে তামাক সেজে দেওয়া, তখন তার সেই ঠাট্টা "আমার কালা রাঙ্গা বিবি" ব'লে—কল্কের আভায় মুখ তার যখন রাঙ্গা হয়ে উ'ঠত। সারাদিনের খাটুনির পর রাত্তিরে শুয়ে পড়ে পড়েও যার মুখখানার প্রতি চেয়ে থাকতে থাকতে যেন আঁখির আশ মি'ত না !

তার পর এলো সেই অকালের দিন। মাঠে মাঠে ধান শুকিয়ে যেতে লাগল, গরু-বাছুর না খেতে পেয়ে মরতে লাগল ; মানুষের মধ্যেও জলাভাবে হাহাকার উঠতে লাগল। বরুণ দেবতা কি জানি কি অবসাদে তাঁর নির্দ্দিষ্ট সময়ে আগমনে বিলম্বই করে চলতে লাগলেন। সূর্য্যদেবও বরুণের অবহেলায়, তাঁর মেয়াদের অধিক কর্ম্ম করতে হওয়ার দরুণ, সে কোপ, নিরীহ ধরার উপরই বর্ষণ করে যেতে লাগলেন। গ্রামের পাশের ছোট নদীর দেহ যেন ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্ত কিশোরীর লাবণ্য-বিশুষ্ক শীর্ণ-জীর্ণ মুখশ্রীর দশায় পরিণত হোল। পানীয় জলেরই টানাটানি,—ক্ষেত আবাদের জল মানুষ কোথায় পাবে ?

তার পর এক দিন পৃথিবীর শেষ শ্যামলতার চিহ্নটুকুও প্রায় মুছে যায় বুঝি—এমন মনে হতে লাগল। তখন হঠাৎ অবসাদ-শয্যা থেকে উঠে বরুণদেবের করুণার উদয় হোল। অজস্র বর্ষণে মাঠ ঘাট নদ নালা তিনি কাণায় কাণায় পূর্ণ করে দিতে লাগলেন। ছোট নদীর বুকও আবার আশায় আনন্দে চঞ্চল ঢেউয়ের উচ্ছ্বাসে কূলে কূলে ফুলে উঠতে লাগল। পুকুর নালা ভরে গিয়ে পানীয় জলের অভাব মিটল।

যাদের ঘরে সঞ্চিত সম্বল ছিল, তাদের প্রাণ আবার নূতন আবাদের দিকে তাকিয়ে আশায় ভরে গেল ; কিন্তু রাসমণি ও মিহির দাসের মত ছোট একটুকরো মাটী চাষ করে "দিন আনি দিন খাই" করে যাদের দিন-গুজরান হোত, তাদের ঘরে বরুণ দেবের এ অকালের করুণায় কোন হাহাকারই মেটাতে পারল না। অনেকেই ঘটী বাটী বেচে দিন-গুজরান করে কিম্বা মহাজনের ঋণের দায়ে গিয়ে ঠেকল। রাসমণিরাও শেষ তাদের বুকের সম্বল, আহারের গ্রাস, জমীটুকু বেচে ঋণ শোধ করল।

এমন সময় উজ্জ্বল নদীর বুক বেয়ে কে এক বাবু কোন্ এক সুদূর প্রবাস থেকে নৌকো করে নদী-বিহারচ্ছলে গ্রামে এসে দেখা দিল। রাসমণি তখন এটা ওটা এবাড়ী সেবাড়ী করে দু' এক পয়সা রোজগার করতে আরম্ভ করে দিয়েছে, আর মুখ অন্ধকার করে মিহির ঘরের কোণে বসে আছে। তার মুখে একটুখানি হাসি ফোটাবার জন্য রাসমণির সে কত প্রয়াস ! সে বুঝতেই পারে না, নিটোল স্বাস্থ্য ও যৌবনের শক্তি থাকতেও দুজনা পরস্পরের কাছে থাকতে পেলে, এমন কি দুঃখ সংসারে আসতে পারে—যার জন্যে একেবারে অমন করে হতাশ ভাবে অবসাদের গহ্বরে ডুবে যেতে হবে ! কিন্তু কিছুতেই তা সে মিহিরকে বোঝাতে পারত না।

এক দিন দত্তবাড়ীর আঙ্গিনা লেপে আঁচলের খুঁটে দুটো পয়সা ও গামছায় কিছু খুদ-কুঁড়ো ও দুটো পাকা বেগুন বেঁধে সে ঘরে ফিরে আসছিল, এমন সময় দেখল, নদী-পার থেকে শিস্ দিতে দিতে মিহির আসছে। প্রথমটা তো তার বিশ্বাসই হোল না, যে, মিহিরই ঘরের কোণ থেকে বার হয়ে এমন করে শিস্ দিতে দিতে আসছে। একই সঙ্গে প্রায় দুজনে ভিতরের আঙ্গিনায় এসে পৌছল। তার পর মিহিরের হতাশ অবসন্ন মুখের পরিবর্ত্তে আশা-উজ্জ্বল চোখ দুটীর দিকে তাকিয়ে প্রাণ তার যেমন আনন্দে ভরে যেতে লাগল, তেমনি তখনি তার কারণ যা শুনতে পেলে, তাতে প্রথমে মনে হোল, তার বুকের কলিজাটা হঠাৎ বুঝি বন্ধ হয়েই যাবে।

তার পর দিন কয়েক কত কান্নাকাটী, অনুনয়-বিনয়ের

পালা চল্ল; কিন্তু মিহিরের মন তখন অনির্দ্দিষ্ট ভাগ্যদেবীর সন্ধানের দিকে একেবারে এমন ঝুঁকে পড়েছে যে, তাকে থামিয়ে রাখা অসাধ্য। নৌকার সেই বাবুটা না কি কোন দূর দেশের বড় সহরের এক কলের বাবু। মিহিরের মত জোয়ান লোকেরই তাঁর খুব দরকার। আর সে দেশে এমন স্বাস্থ্য ও শক্তি নিয়ে যে যায়, সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর বরপুত্র হয়ে উঠতে তার বেশী দিন লাগে না।

তার পর একটা বছর বই তো নয়? যে দিনটা সে বিদেশে সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর সন্ধানে যাবে, সেই দিনটার তিথি দেখেই ঠিক সে তার বরমাল্য হাতে করে রাসমণির কাছে ফিরে আসবে—তার পর সঙ্গে আনবে কত কি! তারই অফুরন্ত আকাশ-কুসুমের কাহিনীতে মাঝের দুটো দিন কেটে গেল।

তার পর এক দিন বাবুর দেওয়া দশটা টাকা ও হাট থেকে কেনা একটা নীলাম্বরী ডুরে ও এক জোড়া গিল্টী-করা খাড়ু রাসমণির আড়ষ্ট হাত দুখানার মধ্যে গুঁজে দিয়ে এক রৌদ্রোজ্জ্বল সোণালী প্রভাতে কোন এক অজানা দূর দেশের পথে সে মিলিয়ে গেল। যাবার সময় কাপড়ের খুঁট দিয়ে রাসমণির ডাগর চোখের অতি-কষ্টে-রোধ-করা অশ্রুজল মোছাতে মোছাতে বলে গেল, "কাঁদিসনে মণি, একটা বছর বই তো নয়—এই দিনেই ঠিক আমি ফিরে আসব। আমার জন্যে নীলাম্বরী ডুরেখানা পরে চুল বেঁধে, খয়েরের টিপ পরে সেজে গুজে তৈয়ের হয়ে থাকিস! আর দেখিস, ঘরে দোরে গোবরছড়া দিয়ে, দুয়োর খুলে রেখে মুখ হাত পা ধোবার জল রাখিস! রান্নাও তৈয়ের রাখিস—গরম গরম! দেরী হয় না যেন সারাপথ ক্লান্ত হয়ে এসে খেতে দেতে! সব ঠিক রাখিস, বুঝলি—ভুলিস নে যেন!"

নৌকার অস্পষ্ট ছায়াটুকু যখন একেবারে দিগন্তের কোণে নিঃশেষে মিলিয়ে গেল, তখন রাসমণি তার সেই উঁচু ঢিবি থেকে নেমে এসে মিহিরহীন ঘরের দাওয়ায় লুটিয়ে পড়ল, দুদিনের অশ্রুর বাঁধ একেবারে ভেঙ্গে দিয়ে। তার পর কবে যে সে চোখ মুছে, বুক বেঁধে, বছরের পর বছর সেই একটী তিথির প্রতীক্ষায় চব্বিশ ঘণ্টা তার আবাহনের নীরব পূজার ডালি নিয়ে, বসে বসে কাটিয়ে, শেষে ব্যর্থ অর্ঘ্য নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে, পরের দিন আবার শান্ত ভাবে জগতের কর্ম্মচক্রের মধ্যে নিজেকে জুড়ে দিতে শিখেছে, সেদিনের কথা বছরের অন্যান্য দিন ক্রমে অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর হয়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু এই একটী সাঁঝে আবার তা প্রত্যেক বছরেই ঠিক তেম্নি সতেজ ও নবীন হয়ে ফুটে উঠে। আর সেই ত্রিশ বৎসর আগেকার পঁচিশ বছরের যুবক মিহির তার বলিষ্ঠ সুঠাম দেহ ও কুঞ্চিত কেশরাশি নিয়ে এই বৃদ্ধার মন ভুবন-মোহন রূপের স্রোতে ডুবিয়ে দেয়।

… … … … … …

কুটীরের আঙ্গিনায় প্রবেশ করে, কুলুঙ্গি থেকে একটা মাটীর প্রদীপ নিয়ে জ্বেলে, প্রথমেই সে তুলসীতলায় একটা প্রণাম ঠুকে এলো। তার পর ঘরের কোণ থেকে একটা বড় ঘড়া বার করে নদী-পার থেকে ঘড়া ঘড়া জল এনে সমস্ত ঘর দুয়ার উঠান আঙ্গিনা সেই রাতে ব'সেই নিকোতে লাগল। তার পর ঘরের যা দু একটা আসবাব ছিল, সমস্তগুলি ঝেড়ে পুঁছে ঝক্ ঝক্ করে রাখল। যা কিছু বাসনপত্র ছিল, সেগুলিও বার করে বসে বসে মাজতে লাগল।

রায়-গিন্নীদের বাড়ীতে সারাদিন তাকে সেদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করতে হয়েছিল; কিন্তু তবুও সারারাত জেগে অক্লান্ত ভাবে সে তার কুটীরখানির সংস্কার আরম্ভ করে দিল। ভোরের দিকে অল্প একটু বিশ্রাম করেই লোকজনের ভিড়ের আগেই ভোরের হাটে কিছু মাছ, তরকারী, দুধ ইত্যাদি সংগ্রহ করে নিয়ে এলো—অন্যান্য জিনিষ আগে থেকেই সংগ্রহ করা ছিল। তার পর তার ছোট রান্নাঘরটীতে পাতা দুটো উনুন জ্বেলে পরিপাটি ভাবে নানা আয়োজনের সঙ্গে রেঁধে রেখে দিল। তার পর নদী থেকে স্নান করে এসে সে তার নির্জ্জন ঘরটীর মাঝে আত্মপ্রসাধনে মগ্ন হয়ে গেল।

একটা ছোট কাঠের বাক্স থেকে একখানি নীলাম্বরী সাড়ী বার করে পরিপাটি করে পরল, হাতে দু'গাছা খাড়ু ও উঠাল। তার পর সেই বিরল শ্বেত কেশ-গুচ্ছের মধ্যে সিঁদুরের রেখা মস্ত করে টেনে এনে দিল। লোলচর্ম্ম কুঞ্চিত কপোলের মধ্যে খয়েরের টিপ দিতেও ভুলল না। একটা ছোট পেটরা টেনে তার মধ্যে থেকে আল্‌তা ও কাজল বার করে যথাক্রমে পায়ে ও চোখে পরাল।

তার পর বেলফুল গাছ থেকে সংগৃহীত ফুলকটা নিয়ে অতি কষ্টে আন্দাজে আন্দাজে মালা গাঁথতে বসল। কাণ তার সর্ব্বদা উন্মুখ হয়ে রইল, বাহিরের পদশব্দের আশায়!

দাওয়ার এক কোণে একটা পরিষ্কার মাদুর পাতা। তার একপাশে সাজা হুঁকোয় করে জল ভরা। একটা ছোট পানের ডিবেতে সাজা পান। রেকাবীতে নানারকম ফল ও মিষ্টি সাজান। রান্নাঘরের সামনে একটা পীঁড়ি পাতা, গোবরছড়া দেওয়া পরিষ্কার করা, পরিষ্কার গেলাসে জল ও পাত পাড়া। উঠানে ঘড়াভরা জল ও ঝক্‌-ঝকে সোনার মত গাড়ু ও পরিষ্কার লাল গামছা। শোবার ঘরটীতে তক্তপোষে পরিষ্কার চাদর ও বালিশ পাতা। একটা দড়ীর আলনায় এক জোড়া ধুতি চাদর।

চারিদিকেই অতিথির সাদর অভ্যর্থনার ডালা সাজিয়ে দয়িতের আগমন আশায় উৎফুল্ল হয়ে বছরের পর বছর এই দিনটা তার এমনি ভাবেই ব্যাকুল আগ্রহে কেটে যেত। সারা রাতও তার দীপোজ্জ্বল ঘরটীর মধ্যে আকুল প্রতীক্ষায় অতিবাহিত হোত। যদি বা পথে আসতে আসতে মিহিরের দেরী হয়ে গিয়ে থাকে—ক্লান্ত চোখ যদি বা নিজের তার কখন ঘুমের আবেশে ভরে আসে, এই ভয়ে দুয়ারের অর্গলও সে রাতে আর বন্ধ করত না—পাছে শ্রান্ত পথিকের এক মুহূর্ত্তও ঘরে ঢুকতে দেরী হয়ে যায়!

এই বিপুল আয়োজনের একটুকুও সে নিজে মুখে স্পর্শ করত না। দেবতার নৈবেদ্যের মত পরদিন তা নদীজলে ভাসিয়ে দিয়ে আসত; কিম্বা পথে কোন ভিখারীকে পেলে দান করে ফেলত। এমনি করেই পঁচিশ বছর তার এসেছে ও বিফল প্রতীক্ষার ডালি নিয়ে ফিরে গেছে।

* * * *

সন্ধ্যার গাঢ় কালিমা ঘনিয়ে এসেছে। লোকালয় এড়িয়ে এড়িয়ে পথিক ক্লান্ত ভাবে পথ বেয়ে চলেছে। আজ কত দিন যে সে এমনি ভাবেই পথে পথে চলেছে তার ঠিকানা নেই। দিনের বেলায় কোন ঝোপে-ঝাপে আড়ালে আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে থেকে নিশাচরের মত রাত্তিরের অন্ধকারে পেটের জ্বালায় বার হয়ে এধার ওধার খাবার সন্ধান করে বেড়ায়। কখন বা গৃহস্থের ক্ষেত থেকে মূলোটা-আশটা চুরি করে কোন রকমে ক্ষুধার শান্তি করে। লোকালয় হতে তাড়িত বন্য পশুর মত অবস্থা হয়েছে তার। এমনি করে দিনের পর দিন আইনের হাত থেকে পালিয়ে পালিয়ে সে বেড়াচ্ছে।

বিচার স্থান হতে অনেক দূরে এসে পড়লেও তবু দোষী মন তার মানুষের সমাজে ভয়ে মুখ দেখাতে সাহস পাচ্ছে না। বলিষ্ঠ দেহখানি তার পরিপুষ্ট আকার এখনও না হারালেও, চোখ দুটী অল্পাহারে ও দুশ্চিন্তায় কোটরে ঢুকে তার মধ্যে থেকে ক্ষুধিত বন্য পশুর মত যেন জ্বলছে। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া একরাশ চুল চোখের উপর এসে পড়ছে।

নির্জ্জন নদীতটে লোকালয় হতে দূরে একখানা কুটীরে আলোর সন্ধান পেয়ে ক্ষুধিত ক্লান্ত দেহখান বয়ে, যেন সে তার অজ্ঞাতসারেই সে দিকে অগ্রসর হয়ে চল্লো। তার পর কখন যে পা দুটো তার উন্মুক্ত গৃহদ্বার দিয়ে একেবারে ভেতরে একখান ঘরের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হোল, তা সে জানতেও পারল না।

তার পর হঠাৎ দেখল এক পাগলিনী মূর্ত্তি না কি মালা হাতে অগ্রসর হয়ে তার লোলচর্ম্ম দুখানা হাত দিয়ে তার হাত দুটো চেপে ধরলে। পাগলিনী ছাড়া সে মূর্ত্তিকে আর কিছুই বলা যায় না,—বৃদ্ধার দেহে এমন নিপুণ করে তরুণীর সাজ-সজ্জা ও স্বপ্নাবেশ-মণ্ডিত চোখের দৃষ্টিতে তাকে এ ছাড়া আর কিছু কেউ ভাবতেও পারত না। যুবকের চমক ভেঙ্গে প্রথমেই ইচ্ছা হোল আত্মরক্ষার্থ এর কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়ার; কিন্তু তারি সঙ্গে বৃদ্ধার অপূর্ব্ব ব্যবহারে তার কৌতূহলও হোল যথেষ্ট; আর ততক্ষণে পালিয়ে যাবার সুযোগও সে হারালে।

"এসো, এসো—এতদিন পরে বুঝি তোমার আসবার অবসর হোল? আমি যে কত তিথি ধরে অপেক্ষা করে বসে আছি! এসো, এসো—বড় ক্লান্ত হয়ে গেছ, তাই বুঝি আর মুখ দিয়ে কথা বার হচ্ছে না? ··থাক্—এখন আর কিছু বলতে হবে না।···চল, ঐখানে পা ধোবার জল রেখেছি...। থাক—হাত সরিয়ে দিচ্ছ কেন? পা দুটী আমিই ধুইয়ে দি এসো...ধুইয়ে কি দিই নি কখনো? কত ধুলো জমে আছে পায়...কত দূর থেকে আসতে হয়েছে বুঝি...তাই এতো দেরী হোল! এবার এদিকে এসো, একটু জল খেয়ে নেবে—তার পর সব খাবার গরম করে রেখেছি, খাবে এসো।...আহা! পথে আসতে কিছু বুঝি মুখে দেবার জুটেনি, এত ক্ষিধেও পেয়েছিল তাই!

ষাট্—চোখ দেব না। আমারি আন্দাজের ভুল হয় গেছে। আহা! আরো চারটী যদি বেশী করে বেঁধে রাখতাম।··· পিঠে? হ্যাঁ আরো কটা আছে বই কি। এখনি এনে দিচ্ছি; মাথা খাও...উঠে পড়ো না যেন।...জল গড়িয়ে আনব? বেশ—এখনি আনছি।...কথা বলতে ইচ্ছে করছে না? বড় ক্লান্ত আছ বুঝি? হ্যাঁ, তা বুঝতে পারি। একটু বসবে চল মাদুরের উপর, আমি তামাক সেজে আনি।···বসবে না? শোবে? আচ্ছা বেশ, আমিও তোমার পাতে দুটো প্রসাদ করে এই এলাম বলে—ঘুমিয়ে পড় না কিন্তু। কত কথা বলবার আছে। এই দুটো মালা গেঁথে রেখেছি, দেখেছ? একটা তুমি আমায় পরিয়ে দেবে, কেমন? আজ "ফের" করে আমাদের বাসর রাত হবে।···ও কি, ও কি, ঘরে গিয়ে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলে যে? আমি আসব কি করে?···আমি, আমি যে তোমার মণি, মণিয়া—চিনতে পাচ্ছ না—ও কি? আচ্ছা থাক্—আজ বড় ক্লান্ত আছ বুঝতে পারছি—আচ্ছা, আমি আজ এই সামনের দাওয়াটাতে শুয়ে থাকব।···"

শয়ন-কুঠুরীর ভেতর থেকে ভাল করে খিল টেনে দিয়ে যুবক মনে মনে বলে উঠল "উঃ, বুড়ীর পাল্লা থেকে আচ্ছা বাঁচন বাঁচলাম। নিশ্চয় একটা পাগলী হবে, নইলে এমন বেশ আর "ফোগলা" দাঁতের ভেতর থেকে এমন সব উচ্ছ্বাসের কথা! আমায় কি ঠাউরেছে বুড়ী কে জানে! কিন্তু ভাগ্যে শুধু একটা পাগলী—তাও কিছু মারাত্মক রকমের নয়,—অনেক দিন পরে খেয়ে নেওয়া গেল খুব এক চোট। আজ আমার বরাত ছিল ভাল। আর হিঃ-হিঃ—জল আনবার ছুতো ক'রে বুড়ীকে পাঠিয়ে এই পিঠে কটাও চাদরের খুঁটে বেঁধে নিয়েছি, আর এক দিনের খোরাক চলবে এখন। তার পর এই মালা দুটো দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরলেই হয়েছিল আর কি! আচ্ছা ফন্দি করে পার পেয়েছি। এখন বুড়ীর নাকের ডাক শুনতে পেলেই এ পাগলা গারদ থেকে দে চম্পট।

* * * *

পরদিন মধ্যাহ্নেও যখন গ্রাম মধ্যে কারুর ঘরেই কর্ম্মনিরতা "কৈবর্ত্ত-দিদিকে" দেখতে পাওয়া গেল না, আর জলের ধারে জেলেরাও বল্লে—সকালে উঠে খাবার হাতে নদীর দিকেও কেউ তাকে আসতে দেখেনি,—তখন গ্রামের লোকের মনে নানা রকম সন্দেহ হতে লাগল। এ রকম ধারা তো তারা কোন দিনও হতে দেখেনি। তখন কয়েকজনে মিলে তার নির্জ্জন ধ্যান-কুটীরের দিকে সাহস করে অগ্রসর হতে লাগল। সামনে এসে দেখল, দুয়ারটা খোলা পড়ে আছে। ভেতরে গিয়ে প্রথম দেখে মনে হোল, উৎসবান্তে ঘর-দুয়ারের চেহারা যে রকম হয়, সেই রকম। চারিদিকে সাজান গোছান; কিন্তু তা যেন কেউ ব্যবহার ও ভোগ করে গেছে, এমন ধারা।

উঠানের এক পাশে এক ঢাল এঁটো বাসন ও খাবারের উচ্ছিষ্ট, কিন্তু খেলে কে? এমন ধারা হতে তো কোন দিন শুনতে পাওয়া যায় নি! যদিও সেদিনকার মত কৈবর্ত্ত-দিদি নিজেকে এক সুনিবিড় রহস্যজালে সুদৃঢ় করে বেঁধে রাখত, তবু গাঁয়ের লোকের জানতে বাকী থাকত না যে, সে দিন তার ঘরে এক পর্ব্বের ভোজ রাঁধা হোত, আর সে ভোজ যে কেউ ভোগ করত না ও পরদিনে হয় নদীর জলে কিম্বা কোন রাস্তার ভিখারীর ভাগ্যে তা জুটত, তাও কারুর অবিদিত ছিল না।

তার পর তারা দেখতে পেলে, ভেজানো শোবার কুঠুরীর বিছানা-পত্তর ওলট-পালট করা, আর তারই এ পাশে বাহিরের পানে দরজা ঘেঁষে চৌকাঠের কাছে মাথা রেখে তাদেরই কৈবর্ত্ত-দিদি এক অদ্ভুত সজ্জায় সজ্জিত হয়ে অঘোর নিদ্রায় মগ্ন রয়েছে—হাতে তার দুগাছা শুকনো বেল ফুলের মালা। দেহ স্পন্দহীন, তুষারের মত কঠিন ও শীতল।

দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরে বিফল প্রতীক্ষায় কাল্পনিক তৃপ্তিতে ক্লান্ত হয়ে প্রাণ তার বুঝি কোন অজানা লোকে দয়িতের অভিসারে নিজেই আজ দেহ-ছাড়া হয়ে পড়েছে!

ব্রিটিশ আফ্রিকা

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(৪)

নাইগার নদী-তীরবর্ত্তী দীর্ঘ অপরিসর ভূখণ্ডে আর একদল কৃষ্ণকায় জাতি বাস করে। তাদের আকৃতি-প্রকৃতি, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার সমস্তই প্রায় যোরুবা দেশবাসীদের অনুরূপ। তারা বহুকাল হাউশাদের প্রভুত্বাধীনে ছিল; পরে ফুলানীরা এসে তাদের দেশ জয় করে নিয়ে তাদের উপর নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করেছিল।

নিয়ে পরস্পর ভীষণ সংঘর্ষ হয়ে গেছে! আফ্রিকায় নিগ্রো জাতিদের মধ্যে এই হাউশারাই হচ্ছে সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জাতি। এদের মধ্যে প্রাচীন সভ্যতার যে একটা সুদূর ভিত্তি আছে, সেটা, তাদের কারুকার্য্য ও শিল্পকলার মধ্যে, 'কানো' প্রভৃতি প্রাচীর-বেষ্টিত সুপ্রতিষ্ঠিত নগরীর মধ্যে, এবং তাদের হাজার বছরের

মাচার উপর ঘর

('সুবর্ণ-তীরা'ধিবাসীরা দোতলার সমান উঁচু মাচার উপর গৃহ নির্ম্মাণ ক'রে। কারণ সমুদ্রতীরস্থ জলাভূমি বাসের অযোগ্য। তা ছাড়া এটা শত্রুর আক্রমণ থেকে গৃহ রক্ষা করবারও একটা উপায়।)

নদীর পরপারে যে বিশাল ভূখণ্ড, সেইখানে আফ্রিকার অতীত ও বর্ত্তমানের বহু ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে গেছে। সেইখানে ঘোর কৃষ্ণকায় হাউশা ও নাতিকৃষ্ণবর্ণ ফুলানী এই দুই রহস্যময় শক্তিশালী কাফ্রী জাতির মধ্যে সাম্রাজ্য

পুরাতন ব্যবসায়-বাণিজ্যক্ষেত্রে, যা ভূমধ্যসাগর থেকে নাইগার ও নীলনদ পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত।

এরাই এক দিন তুলার চাষ করে' সেই তুলা থেকে নানা বর্ণের সুতা প্রস্তুত করে' বিচিত্র বর্ণের পোষাক

বয়ন করেছিল। এরাই এক দিন বিশ্ববিখ্যাত মরোক্কো চামড়ার সৃষ্টি করেছিল। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে আর সমস্ত কাফ্রী-দেরই এরা পশ্চাতে ফেলে রেখে এগিয়ে এসেছে। এরা বেশী। একমণ দেড়মণ ভারি বোঝা মাথায় ক'রে নিয়ে এরা সারাদিন অনায়াসে পথ চল্‌তে পারে।

পুরাকালে হাউশারাই ছিল অফ্রিকার সবচেয়ে বীর

বিলাতী সাজে

(সুবর্ণ-তীরাধিবাসিনীরা অনেকেই আজকাল য়ুরোপীয় মহিলাদের পরিচ্ছদ ব্যবহার করছে।)

জল্‌কে চলে

(এরা কাঁখে কলসী নেয় না, মাথার উপর রেখে পথ চলে।)

যোদ্ধা। তারাই আবার ক্রীতদাস সংগ্রহ করবার প্রধান উদ্যোগী ছিল। এক দিকে তারা মুসলমানদের সঙ্গে বিরোধ করেছে, অন্যদিকে খাঁটি নিগ্রোদের পদানত করে নিজেদের চাষবাসের কাজে দাসের মতো খাটিয়ে নিয়েছে। সেকালে

নিম্ন শ্রেণীর নিগ্রোদের শিক্ষিত ক'রে নিয়ে নিজেদের জাতে তুলে নেয়। এদের দৈহিক শক্তি আশ্চর্য্য রকম

মকাই ক্ষেতে। (আসামি কৃষকবালা ক্ষেতে মকাই সংগ্রহ ক'র
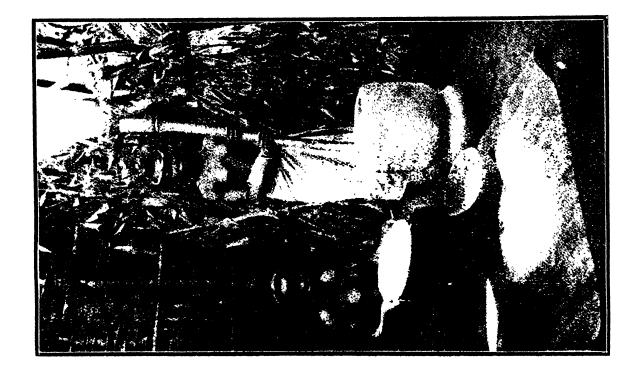
বেকীভাই সর্দ্দারের দরবার

(প্রকাণ্ড রাজছত্রতলে উচ্চ বেদীর উপর স্বর্ণ-অলঙ্কার ও সুবর্ণ-অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে আমিরী চালে বেকীভাই সর্দ্দার উপবিষ্ট। তার আশে পাশে বন্ধু, সহযোগী, অনুচর, ভৃত্য ও বাদক দল সমবেত ।)

কাফ্রি তাঁতি তাঁত বুনছে
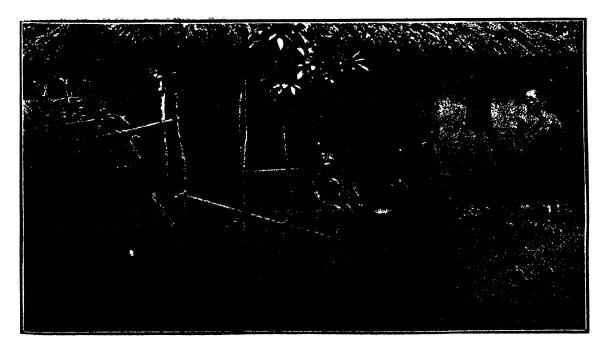
সকল দিক দিয়েই এরা এত প্রবল ও প্রধান হ'য়ে উঠেছিল যে, এদের ভাষা তখন সমগ্র আফ্রিকার চলিত ভাষা হয়ে উঠেছিল।

কাফ্রি ক'নে

(চুমদার রেশমী সাড়ী অলঙ্কার ও শিরভূষণ পরে' বিবাহের বধূ বেশে সুসজ্জিতা কাফ্রী তরুণী।)

আজ আর এদের সে প্রতাপ নেই। এদের লোক সংখ্যা এখন এত কমে গেছে যে, 'কানো' আর 'শোকো-তোর' কিয়দংশ ছাড়া আর কোথাও এদের তেমন জনপূর্ণ বসতি দেখতে পাওয়া যায় না।

হাউশাদের অবনতির দিনে ফুলানীরা তাদের অসংখ্য গরুর পাল নিয়ে এদের জমীর উপর প্রথমে চরাতে আসতো। গরু চরার জন্ত জমী সারবান হ'তো বলে হাউ-শারা এদের বাধা দিত না; কিন্তু এক দিন এই ফুলানীদের একজন মুসলমান সর্দ্দার ওশমান হাউশাদের সঙ্গে যুদ্ধ

মাপন-রাজ

(মস্তকে কেশবন্ধনী, চরণে পাদুকা ও দৃঢ় বলিষ্ঠ পেশী সন্নিবেশিত সুগঠিত অঙ্গে বিচিত্র উত্তরীয় জড়িয়ে মাপন-রাজ দাঁড়িয়ে আছেন যেন এক প্রাচীন রোমক সম্রাট।)

ঘোষণা ক'রে তাদের পরাস্ত করে শোকোতোয় নিজের রাজধানী স্থাপন ক'রে হাউশাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল।

গুরুমশাই !

(মুসলমান কাফ্রীদের মধ্যে পাঠশালা আছে। বৃদ্ধ গুরুমশাই ব। কাফ্রি মৌলভী সাহেব সেখানে নিগ্রো ছেলেদের লেখাপড়া শেখান।)

শিরোভূষণ (য়ুরোপীয় মহিলাদের পোষাক পরলেও এরা কিন্তু 'হ্যাটের' পক্ষপাতী নয়। 'হ্যাটে'র পরিবর্ত্তে এরা পাগ্‌ড়ীর মতো একরকম টুপী পরতে ভালবাসে।)

ফুলানীদের শাসন-পদ্ধতি ভাল হ'লেও শাসকরা অনেকেই ভাল ছিল না। কাজে কাজেই তাদের অত্যাচারে হাউশারা অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিল। সুতরাং সেখানে ইংরাজের পদার্পণকে তারা সৌভাগ্য বলে মেনে নিয়ে তাদেরই সাহায্যে আবার ফুলানীদের কাছ থেকে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার ক'রে নিয়েছে।

বাউলচীর পার্ব্বত্য প্রদেশে এখনও যে সব বর্ব্বর আদিম নিগ্রোরা বাস ক'রে, তারা তাদের প্রাচীন রাক্ষস-প্রবৃত্তি ভুলতে পারেনি। এখনও নরমাংস ভোজনের লোভে তারা আত্মীয়দের হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হয় না!

বেণুনদী-তীরেও যে সব আদিম কৃষ্ণকায় জাতি বাস ক'রে, তাদের মধ্যে মুন্‌সী, বাস্কামা, মামাংঙ্গে প্রভৃতি জাতির ভয়ানক হিংস্র, রক্তলোলুপ ও যুদ্ধপ্রিয় দুর্দ্দান্ত জাত। এদে

সুবর্ণ-তীরবাসিনী তরুণী।
(ক্ষেত থেকে ফেরবার পথে মাথার মকাইয়ের বোঝাটা একটু নামিয়ে রেখে ক্ষণেক বিশ্রাম ক'রছে।)

আখ্‌ড়ার গুরুমা!
(ইনি মন্ত্রতন্ত্র, ঝাড়ফুঁক ইত্যাদিতে পারদর্শিনী। একটী প্রতীক্ উপাসক সম্প্রদায়ের ইনিই গুরুমা বা গোঁসাই ঠাকরুণ।)

বুট কুরাঙ্গের দামামাদল। (সমস্ত পশ্চিম আফ্রিকার মধ্যে ঢাক ঢোল ও দামামার সাঙ্কেতিক বোল বা ভাষা আছে, যা সাধারণের পরিচিত। প্রত্যেক কাফ্রী সর্দ্দারের নিয়োজিত বাদকদলের পৃথক পৃথক নিজস্ব বোল আছে।)

বণ্টুকু সর্দ্দার ও তাঁর দ্বাদশ পত্নী। (স্বর্ণ-তীরবাসিনীরা সতীনের সঙ্গে মিলে মিশে বাস করতে জানে বলে সেখানে বহুবিবাহ প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও পরিবারের মধ্যে অশান্তি দেখা যায় না।)

মধ্যে এখনও কোনও সমাজবন্ধন স্থাপিত হয়নি, এমন কি এরা এখনও জাতি হিসাবেও দলবদ্ধ হয়ে বাস ক'রতে শেখেনি!

নাইগেরীয়ার উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলে বোর্ণূদের রাজত্ব। দাস-ব্যবসায়ই ছিল তাদের জাতীয় পেশা। চাঁদ হ্রদ-তীরবর্ত্তী তাদের প্রবল পরাক্রান্ত সহর 'কুকা' থেকে তারা প্রতি বৎসর অসংখ্য উটের গাড়ী পূর্ণ করে দেশ-বিদেশে 'দাস' চালান দিতো। তাদের বাসগৃহ আজকাল

কীওাম্পুর বারিবাহিনী
(এই আশান্তি তরুণীর দেহ সৌষ্ঠব যে কোনও ভাস্করের তক্ষণাদর্শ!)

গামান নিগ্রো বালা
(ভুট্টার দানা শিলে বেঁটে গুঁড়িয়ে নিচ্ছে।)

বোর্ণূয়া ঠিক খাঁটি নিগ্রো নয়, নিগ্রো ও লাইবীয়ান কাফ্রী-দের সংমিশ্রণে এদের উৎপত্তি বলে এদের মুখ সব চওড়া এবং নাকগুলি চ্যাপ্‌টা! প্রায় হাজার বছর ধ'রে অধিকাংশই খড়কুটোয় তৈরি। তাদের প্রাচীন রাজধানী বিসীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এখনও রাজপ্রাসাদ ও প্রাসাদ-প্রাচীরের পাকা ইটের গাঁথুনি দেখতে পাওয়া যায়।

বোর্ণুর 'কাণুরা' মেয়েরা নিগ্রোদের মধ্যে সব চেয়ে কুৎসিত দেখ্‌তে; কিন্তু আচারে ব্যবহারে সভ্যতায় ভব্যতায় এই 'কাণুরা' জাতটাই সমস্ত কৃষ্ণাঙ্গ কাফ্রিদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত উন্নত। তারা কৃষিকার্য্যে উত্তম পারদর্শী; শিল্প ও কারুকার্য্যেও বেশ সুদক্ষ। এদের সামাজিক ও শাসন-ব্যবস্থায় একটা সুবিধি আছে বটে, কিন্তু ব্যবহারে সমাজ বা শাসনকর্ত্তারা অধিকাংশই স্বেচ্ছাচারী।

বোর্ণুর বীর যোদ্ধাদের পরিচ্ছদ অতি চমৎকার! এরা দস্তুরমতো বর্ম্ম চর্ম্ম পরিধান করে! তুয়ারেগ্, তেবা, কানেম্বু ও শুবা আরবদের বিচিত্র পোষাকও উল্লেখযোগ্য।

ফাণ্ডিদের ছাদের সিঁড়ি

(একটা মোটা খোঁটায় খাঁজ কেটে-কেটে এরা ছাদে ওঠ্‌বার সিঁড়ি তৈয়ার করে রাখে। শত্রুরা আক্রমণ করলে এরা ছাদে উঠে প'ড়ে সিঁড়িটা উপরে তুলে নেয় এবং ছাদের উপর থেকে শত্রুদের লক্ষ্য করে তীর মারে।)

মাত্র বিশ বৎসর পূর্ব্বে নিগ্রোরা রাব্‌টার অধীনে বোর্ণু আক্রমণ ক'রে, সুলতানকে পরাস্ত ক'রে বোর্ণুর রাজবাটী বিধ্বস্ত ক'রে তাদের ক্ষমতা ও প্রাধান্য নষ্ট ক'রে দিয়েছিল। কিন্তু বোর্ণুরা তাদের প্রতিবেশী হাউশাদের মতো শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্যে থেকে ক্রমে ক্রমে তাদের পূর্ব্ব গৌরব পুনরায় অর্জ্জন করছে!

ইংরাজদের পদার্পণের পর সেখানে মোটরগাড়ী, রেল, ষ্টীমার প্রভৃতির প্রচলন হওয়ায় উত্তর নাইগেরীয়ার প্রাচীন ভূমি আজ আবার নব সম্পদে ও নবজীবনে উজ্জীবিত হ'য়ে উঠেছে।

ফুলানী আমীররাই হ'চ্ছে দেশের শাসনকর্ত্তা; তবে ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীদের আদেশ উপদেশ ও পরামর্শ মতোই তাদের চলতে হয়। রাজস্ব যা আদায় হয়, সে টাকা ইংরাজদের কতক ভাগ দিয়ে অবশিষ্ট অংশ তারা ভোগ করে। তবে ইংরাজদের সতর্ক দৃষ্টির উপর থাকায় তারা প্রজাদের উপর আর পূর্ব্বের মতো অযথা উৎপীড়ন করে অতিরিক্ত খাজনা আদায় করতে পারে না। যুদ্ধের সময় এরা ইংরাজদের প্রায় বাইশ তেইশ লক্ষ টাকা দান করেছে।

দক্ষিণ নাইগেরীয়াতেও যোরুবাস, বেনা ও এগবাদের মধ্যে ঠিক এইরূপ শাসন-পদ্ধতিই প্রচলিত হ'য়েছে। দক্ষিণ নাইগেরীয়ার প্রধান সহর টোগো থেকে প্রাচীন সহর কোনো পর্য্যন্ত এবং হার্কোট বন্দর থেকে উদী কয়লার খনি অবধি প্রায় হাজার মাইল রেলপথ বিস্তৃত হ'য়েছে; এবং উদী থেকে কাদুনা পর্য্যন্ত আরও পাঁচশত মাইল নূতন রেলপথ নির্ম্মিত হচ্ছে। দক্ষিণ নাইগেরীয়া তুলার চাষের জন্য বিখ্যাত। ভবিষ্যতে এখানে তুলার চাষ যে আরও বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে, এটা খুবই আশা করা যায়।

নাইগেরীয়ার পরই আফ্রিকার 'গোল্ড কোষ্ট' বা 'সুবর্ণ-বেলা' উপনিবেশের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই উপনিবেশের অধীনেই আবার আশান্তি উপনিবেশ উত্তর-রাজ্য (North territories) এবং ব্রিটিশ 'টোগো ভূমি' (Togo Land) সন্নিবেশিত। এ সকল প্রদেশের অধিকাংশেই বর্ব্বর, মূর্ত্তি-উপাসক নিগ্রোদের বাস। এরা প্রবল জ্বরের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য জঙ্গল ছেড়ে পালিয়ে এসে আজকাল সহরে

বসবাস করছে। তা বলে যে জঙ্গলগুলি একেবারে জনশূন্য হয়ে পড়েছে তা নয়। এখনও জঙ্গলেও বহু নিগ্রো থাকে। সমুদ্রতীরে প্রায় সাড়ে তিনশত মাইল-ব্যাপী বালুকাময় ভূখণ্ডে অন্যূন পঞ্চাশ রকম বিভিন্নজাতীয় নিগ্রো বাস করে। এদের মধ্যে তিনচার রকম ভাষা প্রচলিত। কাফ্রি ভাষার মধ্যে 'ইয়ু' ও 'চিঙ্গ' এই দুটি ভাষা নিম্ন শ্রেণীর নিগ্রেরো খুব বেশী ব্যবহার করে। উত্তর আফ্রিকায় হাউশাদের ভাষাই প্রধান এবং দক্ষিণে ফাণ্ডিদের ভাষা প্রচলিত।

কোকোর চাষটাই নিগ্রোদের প্রধান কৃষি-ব্যবসায়। মুসলমান মৌলভী ও খৃষ্টান পাদ্রীদের প্রাণপণ চেষ্টাতেও আফ্রিকার বর্ব্বর নিগ্রোরা অধিকাংশই তাদের স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করেনি। তাদের মধ্যে শতকরা পাঁচজনের বেশী মুসলমান পাওয়া যায় না এবং খৃষ্টানের সংখ্যা শতকরা সাতজন মাত্র। বাকী সবাই সেই মূর্ত্তি ও পুতুল পূজা এবং ভূতপ্রেতের উপাসনা করে।

মন্দির-পথে

দিবাস্বপ্ন
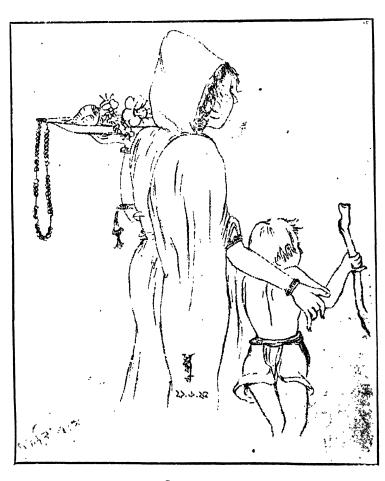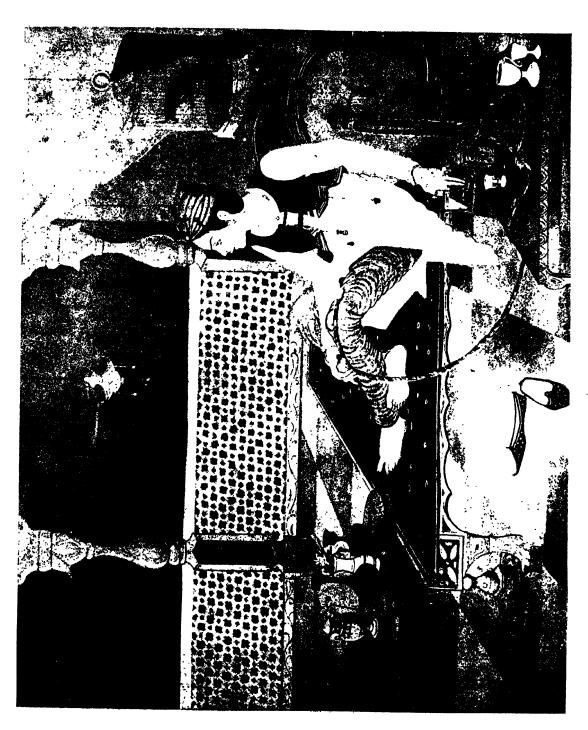
বাস্তব উপন্যাস

ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল-এম্-এস্

"উপন্যাস" বলিলে, কল্পিত কথাকেই বুঝায়। মানুষ মাত্রেই কল্পনাপ্রিয়। এই জন্য আজকাল উপন্যাসে বারো আনা কলেবর না পূর্ণ করিলে, কোনও বাঙ্গালা মাসিক পত্র বিকায় না। আমি উপন্যাস-লেখকও নহি, এবং কল্পিত কথারও অবতারণা করিতে বসি নাই। তবে, শ্রীভগবানের শ্রীমন্দির—এই দুর্লভ নরদেহের মধ্যে, উপন্যাসের অপেক্ষাও বহুগুণ চিত্তাকর্ষক এমন ব্যাপার কতকগুলি আছে, যদ্বিষয় পাঠ করিলে বিস্ময়ে ও পুলকে মন ভরিয়া উঠে। আজ আমি তাহাদিগের মধ্যে একটি বিষয়ের কথা বলিব—জানি না, সেরূপ মনোমুগ্ধকর ভাবে বলিতে পারিব কি না। বাস্তব নরদেহে, উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক বিষয়ের কথা বলিব বলিয়াই এই প্রবন্ধের শিরোদেশে, "কাঁঠালের আমসত্ব," "সোণার পাথর বাটী," "একাদশীর দিনে জন্মাষ্টমী" প্রভৃতির ন্যায় ভাষায় "বাস্তবে উপন্যাস" রূপ অদ্ভুত নামকরণ করিয়াছি।

আমার বক্তব্য বিষয়টির বাঙ্গালা নামকরণ এখনো হয় নাই। ইংরাজীতে ইহাকে
ক্লড্ বার্ণার্ড বলেন—ইণ্টার্ণাল্ সিক্রিসান্
ষ্টালিং বলেন—হর্ম্মোন
সেফার বলেন—অটাফয়েড { উত্তেজকগুলিকে—হর্ম্মোন; অবসাদকগুলিকে—চ্যালোন }

এই শ্রুতিকঠোর নামগুলি শুনিয়া পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না—যেহেতু প্রত্যেক প্রতিশব্দই অতি সুন্দর ভাবে বিষয়টির পরিচায়ক। এই কারণে, আমরা যথাসম্ভব ঐ কথাগুলির ভাবার্থও দিব। আজ যে বিষয়ের আলোচনা করিব—তাহা পূর্ব্বে কোনও দেশের চিকিৎসা-শাস্ত্রে ছিল না বিধায়ে, এই বিষয়ের ঠিক্ নাম দেওয়া সম্ভবপর নয়। "এণ্ডোক্রাইন" শব্দটি "অন্তঃসলিলা"র ভাব-জ্ঞাপক। "হর্ম্মোন" শব্দটি কর্ম্মে প্রবৃত্তিদান করা অর্থ-জ্ঞাপক। "চ্যালোন" শব্দটি অবসাদজ্ঞাপক এবং "অটাফয়েড্" কথাটি, আত্ম-চিকিৎসা অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ, যে বিষয়টির কথা বলিতে যাইতেছি, তাহা অন্তঃসলিলা হইয়া দেহের মধ্যে সঞ্চারিত হয় এবং দৈহিক কোনও কোনও ব্যাধির সম্ভাবনা ঘটিলে, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকারও করে। যে জিনিসটির বিষয়ে আমরা জানিতে চাহিতেছি, সেই জিনিসই মানুষকে মনুষ্যত্ব দেয় এবং দৈহিক কোনও দুষ্ট অংশকে দমনে রাখিয়া আমাদের অশেষ কল্যাণ সাধন করে।

এমন "মাতেব হিতকারিণী" জিনিসটি কি? সেটি ইংরাজীতে "ইণ্টার্ণ্যাল সিক্রিসান্" অর্থাৎ অদৃশ্য অথবা আভ্যন্তরিক রস। "আভ্যন্তরিক রস" কথাটি দুর্ব্বোধ শব্দ। ইহার ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। আমরা সকলেই জানি যে, চক্ষে কিছু পড়িলে, চক্ষে জল সঞ্চারিত হয়; নস্য লইলে, নাসিকা হইতে রসস্রাব (সর্দ্দি) ঘটে; মুখ-রোচক জিনিস দেখিলে, শুঁকিলে, ভাবিলে বা তাহার কথা শুনিলে, মুখে লালা ক্ষরিত হয়। অর্থাৎ, সাধারণ অবস্থায়, নাক, চক্ষু, মুখ—কোথাও অনবরত রস স্রুত হয় না;—অথচ, আবশ্যক হইলে, তথায় রস নিঃসৃত হয়। এই রস আমরা চাক্ষুষ দেখিতে পাই।

আর এক দিকের কথা ধরা যাউক। আমরা কিছু খাইলে, সেই খাদ্য পাকাশয়িক রস (গ্যাষ্ট্রিক-যূষ), ক্লোম রস (প্যান্‌ক্রিয়াটিক্ যূষ) ও আমাশয়িক রস (সাক্কাস্ এণ্টারিকাস্) প্রভৃতির রসে পরিপাক হইয়া যায়। এই সকল রস আমরা চক্ষে নিত্য দেখিতে না পাইলেও, কোনও জীবন্ত প্রাণীকে ক্লোরোফরম নামক সংজ্ঞাপহারক ঔষধের বলে অজ্ঞান করিয়া, পেট চিরিলে, দেখিতে পাই। কাজেই কি নাক মুখের রস, কি পরিপাক-রস—এ সকল রসই ইচ্ছা করিলে আমরা দেখিতে পাই। এই জন্য এই জাতীয় প্রত্যক্ষ রসকে সুধু "রস" বা "সিক্রিসান্" বলা হয়।

এইখানে এই "রসে"র একটু ইতিবৃত্ত জানান আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, চক্ষু নাসিকা পাকস্থলী প্রভৃতি

কোথাও তৎ তৎ স্থানের রস তৈয়ারী মজুদ থাকে না—আবশ্যক মত উহারা তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়। যেমন একই মাটিতে নীম ও আমগাছ জন্মিয়া তিক্ত ও মিষ্টগুণ-প্রধান স্ব স্ব রসযুক্ত ফলোৎপাদন করে; তেমনি চক্ষুই বল, আর পাকাশয়ই বল,—দৈহিক সকল যন্ত্রই রক্ত হইতে আপনার প্রয়োজনীয় দ্রব্য উঠাইয়া লইয়া, তাহা হইতেই স্ব স্ব রস প্রস্তুত করে। যেখানে রস প্রস্তুত হয়—অর্থাৎ রসের ভিয়েন-ঘরকে—গ্ল্যাণ্ড বা গ্রন্থি বলে। গলায় বীচি হইলে যে গ্ল্যাণ্ড বা গ্রন্থিকে হাতে টিপিয়া অনুভব করা যায়, তাহাকে নাসিকা-রস-বাহী গ্রন্থি বা লিম্‌-ফ্যাটিক গ্ল্যাণ্ড বলে। রস-স্রাবী যন্ত্রগুলিকে "সিক্রিটিং" বা রসস্রাবী গ্রন্থি কহে। এই প্রবন্ধে গ্ল্যাণ্ড বা গ্রন্থি বলিলে, উক্ত "সিক্রিটিং" বা রস-স্রাবী গ্রন্থিকেই লক্ষ্য করা হইবে। এই হিসাবে লিভার বা যকৃতকেও গ্ল্যাণ্ড বলা হয়। যাহা হউক, সিক্রিটিং গ্রন্থি-গুলি সম্বন্ধে আমাদিগকে এই কথাই ক্ষ্য করিতে হইবে—প্রথমতঃ, তাহাদের রস দেখা বা দেখান যায়; দ্বিতীয়তঃ, স্থানিক প্রয়োজন মত সেই স্থানের রস নিঃসৃত হইয়া সেই স্থানেরই উপকার সাধন করে; এবং তৃতীয়তঃ, স্থানিক রসের অভাবে যতটা স্থানিক ক্ষতি হয়, ততটা দেহের সাধারণ ভাবে ক্ষতি হয় না।

এইবারে ইন্‌টার্ণাল সিক্রিসান্‌ বা অদৃশ্য আভ্যন্তরিক রসের কথা বলিব। প্রথমেই গোলযোগ উপস্থিত হয়—যাহা দেখা বা দেখান যায় না, তদ্বিষয়ে কেমন করিয়া বিশ্বাস বা প্রমাণ দেওয়া সম্ভবপর? ইহার উত্তর খুব সহজ। আমরা নিত্যই নিদ্রা যাই; কিন্তু নিদ্রার উপকারিতা সম্বন্ধে অনেকে অজ্ঞ; যদি কাহাকেও উপর্য্যু-পরি দুই তিন রাত্রি নিদ্রা যাইতে না দেওয়া হয়, তবে সেই ব্যক্তি নিদ্রার উপকারিতা বুঝিতে পারে। লবণ খাওয়া ভাল কি মন্দ, এ কথার উত্তর শোথগ্রস্ত ব্যক্তি যত শীঘ্র ভাল করিয়া বুঝিবে, অপরে তাহা বুঝিবে না। তেমনি, এ দেহের মধ্যে, কোন একটি বা একাধিক অদৃশ্য রস সঞ্চারিত হয় কি না, তাহার প্রমাণ সহজেই করা যায়। দৃষ্টান্ত লউন:—(১) যদি কোনও ব্যক্তি আজীবন বীর্য্য বা শুক্র কোনও ক্রমে ক্ষয় না করে,—তবে তাহার দেহের লাবণ্য ও কান্তি এবং মনের বল, মেধা প্রভৃতি খুব বাড়ে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অতিশয় ইন্দ্রিয়পরায়ণ তাহার চেহারা, দৈহিক ও মানসিক অপকর্ষতা অতি সুস্পষ্ট প্রতীয়মান। (২) যদি কোনও বিবাহিত রমণীর অল্পবিস্তর গোঁফ ও দাড়ি উদ্ভূত হয়, তবে দেখা যায়, সে রমণী নিঃসন্তানা। (৩) যে ঘোটকেরা অতি উচ্ছৃঙ্খল, তাহাদিগের অণ্ডকোষ ছেদন করিলে, তাহারা ঠাণ্ডা হইয়া যায়। (৪) যে কুক্কুটের অণ্ডকোষ ছিন্ন করা হয় (ইংরাজীতে ইহাদিগকে "কেপন্‌" বলে), তাহাদিগের মাংস অতীব নরম ও সুস্বাদু হয়। (৫) সম্প্রতি ইংরাজী সংবাদপত্র পাঠকেরা অবগত আছেন যে বৃদ্ধত্ব-প্রাপ্ত ও জরাগ্রস্ত মনুষ্যের ত্বকের নিম্নে বানরের অণ্ডকোষ প্রবিষ্ট করাইয়া দিলে সেই জরাগ্রস্ত ব্যক্তি যৌবন ফিরিয়া পায়। (৬) পাঁঠার মেটুলি ভোজনে, "রাতকাণা" ব্যারাম সারে। (৭) কোনও কোনও লোক অতি গরীব হইলেও, বিপুল-কায় হয়। (৮) কেহ কেহ অসম্ভব ঢেঙা হয়। (৯) কোনও কোনও ছেলে হাঁ-করা হয় এবং তাহাদিগকে হাজার শিখাইলেও তাহারা কিছুই শিখিতে পারে না। (১০) গর্ভের সঞ্চার হইলেই স্তনে "দুধ নামে" এবং প্রসবান্তে শিশুকে ভাল করিয়া স্তন দিলে, প্রসূতির জরায়ুর সংকোচন শীঘ্র ও সুন্দর রূপে সংসাধিত হইয়া শীঘ্র শীঘ্র প্রসূতির "গা শুকাইয়া যায়।" আশা করি, এই কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতেই পাঠক পাঠিকারা বেশ বুঝিতে পারিবেন যে, দেহের মধ্যে এমন কিছু অদৃশ্য রসের আধিক্য বা অভাব ঘটে, যাহার ফলে, উপরের দৃষ্টান্তগুলি ঘটিয়া থাকে।

যদি কাহারো তদ্বিষয়ে সন্দেহ ঘটে, পরে সে সন্দেহ নিরশন হইবার যথেষ্ট অবকাশ ঘটিবে। এইবার প্র[illegible] হইতেছে—যদিই বা দেহের মধ্যে অদৃশ্য রস সঞ্চার ঘটিয়া থাকে, তাহাতে কাহার কি আসে যায়? জনসাধারণে[র] তদ্বিষয়ে মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন কি? যে ব্যক্তি ধনী তাহাকে অর্থের জন্য লালায়িত হইয়া চাকুরীর জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না। তেমনি, যে ব্যক্তি স্বাস্থ্যবান্‌—অর্থাৎ, যাহার দেহের সকল প্রকার রস-সঞ্চারের যথায[থ] সামঞ্জস্য আছে—তাহার ইণ্টার্ণাল সিক্রিসান্‌ বা অদৃ[শ্য] রসের জন্য মাথা বকাইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু এ[ই] ডিস্‌পেপসিয়া, ডায়াবিটিস, সূতিকা প্রভৃতি বহুল দেশে এ[ই] বিষয়ের আলোচনার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে।

এইবারে, বিষয়টি ক্রমশঃ একটু জটিল হইয়া পড়িবে।

উপায় নাই। ধৈর্য্য ধরিয়া পাঠ করিলে পাঠক-পাঠিকা মহাশয়দিগের শ্রম সার্থক হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি। যাহাতে বিষয়টি তাদৃশ জটিল না হয়, এই জন্য প্রথমে দুই একটি রোগের বর্ণনা করিব। পাঠক মহাশয়েরা রোগের নাম করিতেছি শুনিয়া এইখানেই পড়া বন্ধ করিবেন না— বরং একটু বেশী মনোযোগের সহিত এই অংশগুলি পড়িবেন।

প্রথমে ডিস্পেপ্সিয়া রোগের কথা ধরা যাউক। আজ কাল ঘরে ঘরে যুবকদিগের ও অল্পবয়স্কা রমণীদিগের ডিস্পেপ্সিয়া। "অম্লরোগ", "অজীর্ণ","গরহজম","বদ্হজম" প্রভৃতি নানা নামে ইহা এখন এদেশে সুপরিচিত। এ ব্যারামে হয় কি ?—পরিপাক করিবার জন্য আমাদের পেটের মধ্যে যে কয়েকটি রস সঞ্চারিত হয়, সেগুলির মধ্যে একটির বা একাধিকটির অভাবে এ ব্যারাম হয়। পরিপাক করিবার জন্য, মুখে লালা, পাকাশয়ে গ্যাষ্ট্রিক যুষ, পরে পিত্তরস, ক্লোমযন্ত্রের রস (প্যান্‌ক্রিয়াসের রস) এবং আমাশয়ের "সাক্কাস্ এন্টারিকাস্" নামক রস—এতগুলি রসের প্রয়োজন হয়। শ্রীভগবানের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা,—এই নরদেহে প্রথম পরিপাক-রসের কার্য্যের উপরে তৎপরবর্ত্তী রসের কার্য্য নির্ভর করে; আবার দ্বিতীয় রসের কার্য্যের উপরে তৃতীয়টি নির্ভর করে। এইরূপ কতকটা যেন অঙ্গাঙ্গী ভাবে রসগুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকে। কাজেই, যে ব্যক্তি প্রথম রসের বেলায় অবহেলা করে—অর্থাৎ, যথার্থ ভাবে ও যথেষ্ট রূপে চর্ব্বণ কার্য্য সম্পন্ন করে না, তাহার মুখের লালা-স্রাবের অসম্পূর্ণতা রহিয়া যায়। লালাস্রাব অসম্পূর্ণ হইলেই, পাকাশয়ের রসের তারতম্য ঘটে,—এবং এই ভাবে বরাবর শেষ পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। এই যে একটি রস ঠিক্ পরবর্ত্তী রসের উত্তেজক রূপে কাজ করে, ইহাকেই ইংরাজীতে হর্ম্মোন্ বলে। অর্থাৎ মুখের লালা, পাকাশয়িক রসের হর্ম্মোন বা উত্তেজক। অবশ্য লালা, পাকাশয়িক রস, ক্লোমরস, পিত্ত ও সাক্কাস্ এন্টারিকাস্—পরিপাক কার্য্যের সহায়ক এই পাঁচটি রসই দেখা ও দেখান যায়; কিন্তু ইহাদের মধ্যে এমন একটি অদৃশ্য সূত্র আছে, যাহার ফলে, একটি রস তৎপরবর্ত্তী রসের উত্তেজক রূপে কায করে। সেইটি অদৃশ্য রস।

তাহার পরে, ডায়াবিটিজ নামক ব্যারামের কথা ধরা যাউক। এই দুর্ভাগ্য বাঙ্গালা দেশে, এই ব্যারামে, বলিতে গেলে একরকম যৌবনেই, বহু মনীষী সুসন্তান ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছেন। এই ব্যারাম শিক্ষিত বাঙ্গালী, তথা লেখকশ্রেণীর যম স্বরূপ। চলিত কথায় ইহাকে "প্রস্রাবের ব্যারাম" ও কবিরাজী ভাষায় ইহাকে "মধুমেহ" বলে। ভাতই খাও আর সুধু মাংসই খাও, যাহার শরীরে এই ব্যারাম-রূপ ঘুণ ধরিয়াছে, তাহার প্রস্রাবে শর্করা বাহির হইবেই—সে আজীবন জীবন্ত খেজুর গাছ হইয়া থাকিবে। এ ব্যারাম কেন হয়, তাহা পরম রহস্যজালে এতদিন আবৃত ছিল। আমাদের উদরের মধ্যে প্যানক্রিয়াস্ বা ক্লোমযন্ত্র নামে একটি যন্ত্র আছে। প্যানক্রিয়াটিক যুষ বা ক্লোমরস নামক তাহার একটি রস আছে—ইহাকে দেখা ও দেখান যায়—ইহা বহুকাল পরিচিত। কিন্তু প্যান্‌ক্রিয়াসের মধ্যে "ল্যাঙ্গারহ্যান্স" দ্বীপ নামক স্থানের এক প্রকার অদৃশ্য রস আছে, যাহার প্রাচুর্য্যে ডায়াবিটিস্ থাকে না এবং তাহার অভাব হইলে, ডায়াবিটিজ্ অবশ্যম্ভাবী। এই সত্যটি আগে জানা যায় নাই। আপনারা অনেকেই "ইন্‌সুলীন্" নামক ঔষধের নাম শুনিয়াছেন। এই ঔষধটি ডায়াবিটিজ-গ্রস্তদিগের পক্ষে ভগবানের আশীর্ব্বাদ স্বরূপ। যখন ডায়াবিটিজে রোগী জর্জ্জরিত, তখন "আইল্যাণ্ড অফ ল্যাঙ্গারহ্যান্সে"র এই উগ্রবীর্য্য রস অধস্ত্বাচিক প্রয়োগে মৃতের দেহে প্রাণ সঞ্চারিত হয়। এখন বুঝিলেন, অদৃশ্য রস কত কায করে ?

গর্ভাবস্থায় যখন অতিমাত্রায় বমন হইয়া, গর্ভিণীর জীবন-সংশয় করিয়া তোলে, তখন কোনও ঔষধেই তাহাকে রোধ করা যায় না। তখন স্ত্রীজাতির ডিম্বকোষ বা ওভারিতে "কর্পাস্ ল্যুটিয়াম" নামক যে এক পদার্থ পাওয়া যায়, তাহা সেবন করাইলে, ঐ বমন কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়! বমনকারিণী রমণীর স্বকীয় ওভারি বা ডিম্বকোষস্থ কর্পাস্ ল্যুটিয়াম নামক পদার্থের অদৃশ্য রসের অভাবেই ঐরূপ ভীষণ বমি হইতে থাকে; অতএব, ঐ জিনিসটি সেবন মাত্রেই বমন বন্ধ হইয়া যায়।

এই ভাবে দৃষ্টান্ত ধরিয়া বুঝাইতে গেলে, প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। এই কারণে, কয়েকটি ব্যারামের নাম, ও সেই সেই ব্যারাম দেহস্থ কোন্ কোন্

যন্ত্রের অদৃশ্য রসের অভাবে ঘটিয়া থাকে, তাহার সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে দিলাম।—

(১) হাঁপানির ব্যারাম—অনেক স্থলে পরোক্ষে অ্যাড্রেনাল্ নামক গ্রন্থির অদৃশ্য রসের অভাবে ঘটিয়া থাকে। এই জন্য অনেক স্থলে, যখন রোগীর খুব হাঁপানির টান ধরে, তখন ৫ হইতে ১০ ফোঁটা "অ্যাড্রেনালীন্ হাইড্রোক্লোরাইড্ দ্রব" নামক ঔষধ ফুঁড়িয়া চামড়ার তলায় দিলে, তৎক্ষণাৎ হাঁপানির টান বন্ধ হইয়া যায়।

(২) মুদ্রাদোষ।—যাহাদিগের বাতব্যাধি বা মেদাধিক্য আছে অথচ মুদ্রাদোষ খুব বেশী, তাহাদিগকে থাইরয়েড্ ও পিটুইটারী সেবন করাইলে উহা আরাম হয়।

(৩) ক্ষুদ্ররজঃ।—থাইরয়েড্ গ্রন্থি ও কর্পাস ল্যুটিয়াম পদার্থ সেবনে উপকার হয়।

(৪) "শেষে-মোতা"।—থাইরয়েড্ গ্রন্থি সেবনে আরোগ্য হয়।

(৫) খর্ব্বাকৃতি (বাল্যবয়সে)। পিটুইটারী গ্রন্থির সম্যক্ রসের অভাবে সাধারণতঃ ইহা ঘটিয়া থাকে। অতি শৈশবে উক্ত গ্রন্থিখণ্ড ও আবশ্যক মত থাইরয়েড্ গ্রন্থিখণ্ড সেবনে খর্ব্বত্ব কমিয়া যায়।

(৬) জন্মজড়ত্ব।—যে জননী উপর্য্যুপরি জন্মজড় সন্তান প্রসব করেন, তাঁহাকে গর্ভকালীন থাইরয়েড্ গ্রন্থি-খণ্ড সেবন করাইলে অনেক সময়ে উপকার দর্শে।

(৭) "শ্বেতী" (প্রবল)।—থাইরয়েড্-খণ্ড ভোজনে সারে।

(৮) স্থূলত্ব (অতিকায়)।—থাইরয়েড্ (এবং আবশ্যক মত অ্যাড্রেনাল বা পিটুইটারী খণ্ড) সেবনে কমিয়া যায়।

এই ভাবের দৃষ্টান্ত আর দিব না।

যাঁহারা উপরের কয়েক ছত্র মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, পূর্ব্বে থাইরয়েড্ ও অ্যাড্রেনাল্ গ্রন্থিদ্বয়ের নাম বারম্বার করা হইয়াছে; তাহার কারণ, খুব স্থূল হিসাবে এইটা ঠিক যে—

বাল্যকালে থাইমাস্ নামক গ্রন্থিই প্রধানতঃ কায করে;
যৌবনে ও প্রৌঢ়ে—গোনাড্দলভুক্ত " "
বার্দ্ধক্যে—অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি " "

অর্থাৎ বাল্যে, থাইমাস্ গ্রন্থির কার্য্য ফলে অস্থি পুষ্টি, মস্তিষ্কের ক্রমবিকাশ এবং তৎকারণবশতঃ চাঞ্চল্য প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে। যৌবনে "গোনাড্" দলভুক্ত গ্রন্থিগুলিরই প্রাধান্য দেখা যায়। "গোনাড্" বলিলে, পুরুষের অণ্ডকোষস্থ লেডিগ্-কোষগুলিকে এবং রমণীর ডিম্বাশয়ের কর্পাস্ ল্যুটিয়াম এবং "ফুল" বা প্ল্যাসেণ্টার একপ্রকার অদৃশ্য রস এই গুলিকে প্রত্যক্ষে, এবং তৎসঙ্গে উহাদের কার্য্যের সহায়ক অ্যাড্রেনালীন, পিটুইটারী ও থাইরয়েড্ গ্রন্থিগুলিকে পরোক্ষে বুঝায়। এই গোনাড্গুলির কর্ম্মকুশলতার ফলে, স্ত্রীলোকের স্ত্রী-ধর্ম্ম ও মাতৃত্বের বিকাশ সম্ভবপর হয় এবং পুরুষদিগের পৌরুষ-ধর্ম্ম প্রকাশিত হইয়া থাকে। বার্দ্ধক্যে জরা ও দৌর্ব্বল্য আসিয়া জুটে। তখন অ্যাড্রেনালীন গ্রন্থির রসই শরীরে বলাধান করিয়া বাঁচাইয়া রাখে। আশা করি, এতক্ষণে পাঠক-পাঠিকা মহাশয়েরা—উঠিতে, বসিতে, খাইতে, শুইতে,—এক কথায়, সর্ব্বাবস্থায় ও সর্ব্বকালে অদৃশ্য রসস্রাবী গ্রন্থিগুলির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে পারিয়াছেন।

পাঠক পাঠিকাদিগের ধৈর্য্য থাকিলে, আরও একটু-আধটু কথা বলিতে চাহি। যাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথামালায় "উদর ও অন্যান্য অবয়ব" গল্পটি পড়িয়াছেন, তাঁহারা বেশ উপলব্ধি করিয়াছেন যে, এই মানব-দেহের প্রত্যেক পরমাণু প্রত্যেক অপর পরমাণুর সুখ-দুঃখের সঙ্গে গাঁথা। অর্থাৎ এ দেহের মধ্যে "একালষেঁড়ে" ভাব নাই—প্রত্যেক অংশ প্রত্যেক অপর অংশের সুস্থাসুস্থতার জন্য দায়ী। এই ভাবটি এই অদৃশ্য রসস্রাবী গ্রন্থিগণের পক্ষেও সুন্দর ভাবে প্রযোজ্য। দৃষ্টান্ত লউন:—

পিটুইটারী নামক গ্রন্থির স্বধর্ম্ম—শারীরিক অস্থির গঠন ও বৃদ্ধি এবং পুং-জননেন্দ্রিয়ের পূর্ণতা ও মস্তিষ্কের উন্নতি বিধান করা। প্যারা-থাইরয়েড্ খণ্ডও বালে অস্থি সংগঠনে সহায়তা করে। থাইরয়েড্ ও ক্লোম যন্ত্র (প্যানক্রিয়াস্) পরস্পরের কার্য্য হ্রাস করে আড্রেনাল্ ও প্যানক্রিয়াস পরস্পর কার্য্যের লঘুত্ব সম্পাদন করে। থাইমাস ও গোনাড্দলভুক্তেরা পরস্প

বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন। পিটুইটারী গোনাড্ দলভুক্তদিগকে উত্তেজিত করে; কিন্তু গোনাড্ দলের রস পিটুইটারীর কার্য্যের অবসাদক। ইত্যাদি।

আর দৃষ্টান্ত না বাড়াইয়া, একটি গ্রন্থি ধরিয়া বিষয়টিকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। কয়েকদিন ধরিয়া সংবাদপত্রে প্রায়ই "মঙ্কি গ্ল্যাণ্ড" (অর্থাৎ বানরের অদৃশ্য রস সঞ্চারী গ্রন্থি মনুষ্যদেহে প্রবিষ্ট করানর ফলের কথা) শুনা যাইত—এখন আর তাহা শুনা যায় না। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ফ্র্যাঙ্ক লিড্ষ্টোন এবং ১৯১৯ সালে এস্ ভোরোনফ্ কয়েকটি ছাগ ও মেষের উপরে এই পরীক্ষা করেন। বয়স হইয়াছে এবং জরা আসিয়াছে—এইরূপ অবস্থাগ্রস্ত পুং ছাগ ও পুং মেষের চর্ম্মের নিম্নে স্বজাতীয় (অর্থাৎ ছাগের বেলায় ছাগের ও মেষের বেলায় মেষের) ও যুবক জন্তুর অণ্ডকোষ প্রবিষ্ট করাইয়া সেলাই করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার ফলে বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত ছাগ ও মেষগুলি কয়েক মাসের জন্য যৌবন-সুলভ ইন্দ্রিয়-শক্তি, এবং দেহের ও মনের স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে ঊর্দ্ধরেতা হইলে যেমন দেহের কান্তি, পুষ্টি ও ক্ষমতা লাভ হয় তৎসদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই পরীক্ষার ফলে, ডাঃ ভোরোনফ সিদ্ধান্ত করেন যে—বার্দ্ধক্য, দৌর্ব্বল্য (যে বয়সের হউক), ধ্বজভঙ্গ—এই অবস্থায় ঐ রূপ অণ্ডকোষ মনুষ্যত্বকের নিম্নে সেলাই করিলেও তদনুরূপ সুফলের সম্ভাবনা—অর্থাৎ ঐ ঐ দুরবস্থ লোকদিগের দেহের ও মনের বল সঞ্চার এবং সন্তানোৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি ঘটিবার কথা। অণ্ডকোষটি স্বগোষ্ঠীর দেহ হইতে লওয়া চাই; বানরই মানুষের স্বগোষ্ঠী; এইজন্য বানরের অণ্ডকোষই লওয়া হইত। এই অণ্ডকোষটি ত্বকের নীচে, অথবা উদরাভ্যন্তরে (পেরিটোনিয়াম-গহ্বরে), অথবা অণ্ডকোষ থলিতে সেলাই করিয়া দিতে হয়। নরদেহে সুস্থ ও যুবক বানরের অণ্ডকোষ প্রবিষ্ট করানর ফলে, ঐ অণ্ডকোষ কর্ত্তৃক নরের অ্যাড্রেনালের কার্য্যবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে—যেহেতু, অ্যাড্রেনাল ও গোনাডগ্রন্থিগুলি (যাহাদের মধ্যে মুষ্ক একটি প্রধান গ্রন্থি) পরস্পরের কার্য্যের সহায়ক। অ্যাড্রেনাল গ্রন্থির রসস্রাবের ফলে, দেহে ও মনে স্ফূর্ত্তি আসে। কাজেই বৃদ্ধ যৌবন ফিরিয়া পায়। অ্যাড্রেনালের কার্য্যাধিক্য বশতঃ কেশের অবস্থা ভাল হয় এবং মাংসপেশী সমূহে বলাধান করে। আবার, এই বাহিরের অণ্ডকোষের রসের উত্তেজনায় মানুষটির স্বকীয় অণ্ডকোষ কিছুদিনের জন্য পূর্ব্বকার্য্যকরী ক্ষমতাটিকে ফিরিয়া পায়।

কিন্তু "নির্ব্বাণে দীপে কিমু তৈল দানম্?" যাহার শরীরে কিছু নাই—অর্থাৎ বয়স বা ব্যাধির ফলে যাহার দেহ জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহার দেহে ঐরূপ গ্রন্থি বসানর ফলে, দুদিনের জন্য সকলই ফিরিয়া আসে বটে, কিন্তু একসঙ্গে দুই দিক হইতে কুফল ফলিতে আরম্ভ করে। প্রথম কুফল এই:—যাহার দেহ বয়স বা ব্যাধির ফলে একরকম ফোঁপরা হইয়া গিয়াছে, সেখানে দুইদিন অস্বাভাবিক উত্তেজনার ফল—সত্বর মৃত্যু। এইটি আমার ধারণা। দ্বিতীয় কুফল—দেহের মধ্যে আগন্তুক মুষ্কটির উপরে তাহার থাইরয়েডের দৃষ্টি পড়ে। থাইরয়েড্ শারীরিক কার্য্যবৃদ্ধি করে—কাযেই, শীঘ্র শীঘ্র ঐ আগন্তুক মুষ্কটিরও ক্ষয় সাধন করে—কাযেই অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই উহার লীলাখেলা ফুরাইয়া যায়। এই জন্য, উক্ত মঙ্কিগ্ল্যাণ্ড চিকিৎসা এত চিত্তাকর্ষক হইয়াও "ধোপে টিকিল না।"

পাঠক-পাঠিকা মহোদয়গণের ধৈর্য্যচ্যুতির ভয় থাকিলেও আরো দু' একটি দৃষ্টান্ত দিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। প্রথমে দুইটি রোগীর বিবরণ দিব—অনুগ্রহ করিয়া মনোযোগ সহকারে পাঠ করিবেন:—প্রথমটি রমণী। ইনি ছয়টি সন্তানের জননী। শেষ সন্তান প্রসবের দুই তিন বৎসর পরে দেখা গেল যে, তাঁহার মুখ, হাত, পা, এবং ক্রমশঃ সমস্ত দেহ ফুলিয়া গেল—এত ফুলিল যে, চলৎশক্তি ত রহিত হইলই, পরন্তু ভাল করিয়া চোখ খুলিবারও সামর্থ্য রহিল না। মাথার চুল আপনা-আপনিই ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, বুদ্ধির হ্রাস ঘটিতে লাগিল, রাতদিন ঘুম পায়—প্রস্রাব ও দাস্ত সুস্থবৎ হইত, জ্বর ছিল না। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া হঠাৎ অনেকেই ব্রাইট্স্ ডিজিস্ নামক সাংঘাতিক মূত্রগ্রন্থির (কিড্নীর) পীড়া বলিয়া ঠিক্ করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যারামটির যথার্থ নাম—মিক্সিডীমা। গলায় থাইরয়েড্ নামক যে গ্রন্থি আছে তাহার ক্ষয় হইলে—অর্থাৎ দেহে থাইরয়েড্ গ্রন্থির আভ্যন্তরিক রস স্রাবের ন্যূনতা বা অভাব ঘটিলে উপর্য্যুক্ত লক্ষণগুলি ঘটে। এই রোগিনীকে থাইরয়েড্ গ্রন্থি-খণ্ড খাওয়াইবার ফলে—

অর্থাৎ তাঁহার স্বদেহস্থ থাইরয়েড্ গ্রন্থির রস না থাকায় তৎস্থানে বাহির হইতে উক্ত রসযুক্ত থাইরয়েড্ গ্রন্থি তাঁহার রক্তের সঙ্গে মিশিবার ফলে—তিনি সত্বর সুস্থ হইয়াছেন এবং এখনো নিয়মমত উক্ত গ্রন্থি খাইতেছেন। খাওয়ার ফলে মাথায় আবার চুল উঠিয়াছে, স্থূলত্ব চলিয়া গিয়াছে, বুদ্ধির জড়তা আর নাই। তবে আর তাঁহার সন্তানাদি হয় নাই। ইহাও থাইরয়েড রসের ফল। দ্বিতীয় রোগীটি যুবক।—হঠাৎ মানুষ ভয় পাইলে যেমন হয়, আজ কয়েক বৎসর ধরিয়াই ইঁহার সেইরূপ অবস্থা চলিতেছে। চোখ দুটি যেন ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইবার মত বড় হইয়াছে, রাতদিন বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করে, যখন তখন গা ছম্-ছম্ (ভয়) করে। গায়ে কাঁটা দেয়, হাত পা থর থর কাঁপে। দেহের মধ্যে থাইরয়েডের রসাধিক্য হইলে এই ব্যারামটি হয়। লক্ষ্য করিবেন—থাইরয়েড্ গ্রন্থির অদৃশ্য রসের—

অভাব ঘটিলে—বোকার মত চেহারা হয়। (মিক্‌সিডীমা)

আধিক্য হইলে—ভয় পাইবার মত চেহারা হয়। (এক্‌স্-অফ্‌থ্যালমিক্ গয়টার্)

শেষের লোকটির দেহের মধ্যে অতিমাত্রায় থাইরয়েড্ গ্রন্থির রস-সঞ্চার ঘটে। খুব সম্ভব, এই যুবকটি অতি-মাত্রায় ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিল। যাহা হউক, রক্তের ভিতর যেটুকু বাড়্‌তি থাইরয়েড্ রস আছে, তাহাকে ত বাহির করিয়া লইবার উপায় নাই;—কাজেই, যাহাতে থাইরয়েড্ রস একেবারে নাই, এমন খাদ্য (দুগ্ধ) দিয়া, বাড়্‌তি টুকুর "পাষাণ ভাঙা" ছাড়া, চিকিৎসার অন্য উপায় নাই। এইজন্য, ছাগীর থাইরয়েড্ গ্রন্থিকে অস্ত্রোপচার দ্বারা নষ্ট করিয়া, সেই ছাগীর দুধ সেবনে ঐ ব্যারামের উপশম ঘটান গিয়াছে। দুঃখের বিষয়, থাইরয়েড্ হীন হইয়া কোন ছাগীই বেশী দিন বাঁচে না।

আষাঢ়ে গল্পের মত এই সকল বৈজ্ঞানিক কত তথ্য আছে—আমরা তাহার সন্ধান রাখি না। যদি পাঠক-পাঠিকাদিগের বিরক্তি বোধ না হয়, তবে বারান্তরে অপর একটি "উপন্যাসের" আভাষ দিবার ইচ্ছা রহিল।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

জয়দেব

(কবি-জীবন)

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

কবির পরিচয় তাঁহার কাব্যে; যে রসে কবির প্রাণ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, যে ভাবে কবির হৃদয় উদ্বেলিত হয়, ভাষায় ও ছন্দে তাহার সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি অসম্ভব হইলেও, কাব্য সেই রস-ভাবেরই দ্যোতনা মাত্র। মানুষের অন্তরে যিনি কবি-রূপে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন,—কাব্য সেই অন্তর-দেবতার স্বতঃস্ফূর্ত্ত লীলা-বিলাস। সুতরাং কবিকে সত্য করিয়া জানিবার পক্ষে তাঁহার কাব্য পরিচয়ই যথেষ্ট। রসের বিষয় এবং আশ্রয়, ভাবোদ্দীপনের জন্য পরিকল্পিত দেশ, কাল ও ঘটনাবলীর সংস্থান এবং সন্নিবেশ, তদনুসারী ছন্দে গ্রথিত বাগার্থ পরম্পরার বিন্যাস-ভঙ্গী ইত্যাদি বহুবিধ বিচারে নানা দিক দিয়া কবির রুচি এবং প্রকৃতির গতি নির্দ্ধারিত হইতে পারে। কিন্তু পাঠকের কৌতূহলের সীমা নাই। পাঠক কেবল কাব্য আলোচনা করিয়াই পরিতৃপ্ত হইতে চাহেন না, অথবা পারেন না। তিনি চাহেন, অন্তরে বাহিরে সমগ্র মানুষটাকে জানিতে; অন্তর-দেবতা যাঁহার কাব্যে ধরা দিয়াছেন, বাহিরে—সাংসারিক জীবনে ব্যক্তিগত চরিত্রে মানুষ হিসাবে তিনি কেমন ছিলেন, তাহার সমস্ত খুঁটিনাটী খবর না জানিতে পারিলে পাঠকের যেন সোয়াস্তি হয় না। এ কৌতূহল ভাল কি মন্দ সে কথা বলিতেছি না, ইহা কবির কাব্যখানিকে বুঝিবার পক্ষে কোনরূপ সহায়তা করে কি না সে কথারও আলোচনা করিতেছি না, আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য—সংসারে ইহাই স্বাভাবিক।

অবশ্য ইহা আরও স্বাভাবিক যে আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের মিলন সংসারে কচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্যই আদর্শ যাঁহার বাস্তব জীবনে মূর্ত্ত হইয়া উঠে, আমরা তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া অভিনন্দিত করি। কবিদিগের এ সম্বন্ধে বিশেষ সুনাম আছে বলিয়াও মনে হয় না। সুতরাং কাব্য ও জীবন মিলাইতে গেলে

প্রায়শঃ ঠেকিতেই হয়। কিন্তু জীবনের সমগ্রতা কাব্যে সুপরিস্ফুট হইয়াছে, আবার সারা কাব্যখানি জীবনে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, এ হেন কবি-জীবন সংসারে সর্ব্বত্র সুলভ না হইলেও, আমার মনে হয় বাঙ্গালায় তাহা দুর্লভ নহে। বাঙ্গালার বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে অনেকের জীবন এই ভাবের সুন্দরতর উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। কবি জয়দেবের জীবন ইহার একটী সুন্দরতম দৃষ্টান্ত স্থল। যদিও তাঁহার জীবন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লিখিত কোনও ইতিহাস নাই, তথাপি আজও পর্য্যন্ত প্রচলিত কয়েকটী প্রবাদে কবি-জীবনের চিত্র গ্রথিত রহিয়াছে। তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, দেশবাসী তাঁহার জীবন ও কাব্যকে একরূপ অভিন্ন ভাবেই গ্রহণ করিয়াছিল। তাই ভারতের এক অনতিবৃহৎ সম্প্রদায় কবির শ্রীগীতগোবিন্দ কাব্যখানিকে যেমন প্রেম-ধর্ম্মের সূত্র-গ্রন্থ বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন, কবির জীবনকেও তেমনি সেই সূত্রেরই এক মধুরোজ্জ্বল ভাষ্য স্বরূপ পূজা দান করিতে কুণ্ঠিত হন না।

দুঃখের বিষয়, কবিরাজ গোস্বামী জয়দেবের জীবনী সম্বন্ধে আধুনিক পাঠকের কৌতূহল পরিতৃপ্তির কোনো উপাদান নাই। চন্দ্রদত্ত প্রণীত 'সংস্কৃত ভক্তমাল', নাভাজী কৃত 'হিন্দী ভক্তমাল' এবং বীরভূমের কবি বনমালী দাসের "জয়দেবের চরিত্র" গ্রন্থে কবি জয়দেবের জীবন-কাহিনী বর্ণিত আছে। কিন্তু বর্ত্তমান কালে "জীবনী" বলিতে যাহা বুঝায়, ইহার কোনখানিতেই তাহা পাওয়া যাইবে না। "জয়দেব চরিত্র" গ্রন্থখানি প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' ইহা প্রকাশিত করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম-এ, সি-আই-ই মহোদয় এই গ্রন্থ সম্বন্ধে ভূমিকায় লিখিয়াছেন, 'তিনশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী ভক্তবৃন্দ ভক্তচূড়ামণি জয়দেবকে যে ভাবে দেখিতেন, উহাতে তাহার পূর্ণ চিত্র আছে। সে চিত্র ইতিহাস না হইলেও মনোহর, জীবনচরিত না হইলেও উপদেশ-পূর্ণ, ধর্ম্ম গ্রন্থ না হইলেও ভক্তিভাবে ভোর।' কিন্তু এ কালের পাঠক এই সমস্ত আলোচনায় পরিতৃপ্ত হইবেন কি না সন্দেহের বিষয়। তথাপি আমরা জয়দেব-চরিত্র হইতে দুইটী প্রবাদ এবং তৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বিবৃত করিতেছি।

১ম প্রবাদ—"দক্ষিণ দেশীয় এক ব্রাহ্মণ-দম্পতি বহু দিন অনপত্য থাকিয়া নিতান্ত সন্তপ্তচিত্তে শ্রীধাম পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে আসিয়া শ্রীজগন্নাথ দেবের নিকট প্রার্থনা করেন যে, আমাদের পুত্র জন্মিলে তাহাকে আপনার সেবকরূপে এবং কন্যা জন্মিলে আপনার সেবিকা-রূপে চিরতরে দান করিব। এই ঘটনার দ্বাদশ বৎসর পরে কন্যা পদ্মাবতীকে লইয়া শ্রীজগন্নাথ দেবের করে সমর্পণ মানসে ব্রাহ্মণ-দম্পতি পুরীধামে আসিয়া উপনীত হন। নীলাচলনাথ তাঁহাদিগকে স্বপ্নাদেশ দেন 'তোমরা কেন্দুবিল্বে গিয়া আমার অংশস্বরূপ দ্বিজ জয়দেবকে কন্যা সম্প্রদান কর।

"তাহারে দেখিয়া মনে ঘৃণা না করিবে।
যেমত আমাকে জান তেমতি গণিবে।"

সে দান আমিই গ্রহণ করিব, তোমরাও অঋণী হইবে।' ব্রাহ্মণ-দম্পতি কেন্দুবিল্বে আসিয়া পদ্মাবতীকে জয়দেবের হস্তে সমর্পণ করেন। এইরূপেই জয়দেব-পদ্মার মিলন সংঘটিত হয়।

২য় প্রবাদ—কবির নিত্যকার্য্য ছিল—

রাত্রি শেষে উঠি মঙ্গল আরতি করিয়া।
প্রাতঃকালে সুকুসুম আনেন তুলিয়া॥
পদ্মাবতী নানারঙ্গে গাঁথে ফুলহার।
গীতগোবিন্দ রচে প্রভু কৃষ্ণলীলা সার॥

× × × ×
× × × ×

প্রহরেক পর্য্যন্ত যায় গ্রন্থের বর্ণনে।
তার পর গঙ্গাতীরে যান গঙ্গাস্নানে॥

(জয়দেব চরিত্র)

স্নানান্তে দেবসেবা ও ভোগ সমাপনান্তে প্রসাদ গ্রহণ করেন, পুনরায় শ্রীগীতগোবিন্দ লিখিত হয়। এইরূপে "স্মরগরলখণ্ডনং মমশিরসি মণ্ডনং" পর্য্যন্ত লিখিয়া কবির লেখনী থামিয়া গেল—

কৃষ্ণ চাহে পাদপদ্ম মস্তকে ধরিতে।
কেমনে লিখিব ইহা বিস্ময় এই চিতে॥

গ্রন্থে ডোর পড়িল, কবি গঙ্গাস্নানে গেলেন। এদিকে ভক্ত-বৎসল ভগবান স্বয়ং জয়দেবরূপে আসিয়া কবির অভিপ্রেত "দেহি পদ পল্লব মুদারং" লিখিয়া কবিতার পাদপূরণ করিয়া দিলেন। পদ্মাবতীর বিশ্বাসের জন্য ভগবান কবির অনুষ্ঠিত দেবসেবাদি নিত্য নিয়মিত কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক ভোজনান্তে শয়ন গৃহে গিয়া শয্যা পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। পদ্মাবতী প্রভুর পাদ সম্বাহনান্তে রন্ধনাগারে আসিয়া প্রসাদান্ন লইয়া আহারে বসিয়াছেন, এমন সময় কবি (স্নানের পর) গৃহে ফিরিলেন। উভয়েরই বিস্ময়ের অবধি নাই। ক্রমে সমস্ত রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িল।

তখন—

"একচিত্তে গ্রন্থপাত খুলিল ঠাকুর।
অর্দ্ধকলি ছিল পদ হইয়াছে পুর॥
অর্দ্ধ কলি কৈলা পদ জয়দেব সার।
কৃষ্ণ হস্তে দেহি পদপল্লবমুদার॥
পাদ পূর্ণ দেখি মনে হৈল প্রত্যয়।
কৃষ্ণ পূর্ণ কৈলা মোর মনের আসয়॥

× × × ×
× × × ×

শয়নে আছেন প্রভু মনে অভিপ্রায়।
মন্দির ভিতর শীঘ্র দেখিবারে যায়।
কৃষ্ণ অঙ্গ পরিমলে পালঙ্ক পূরিল।

শয়নের চিহ্ন সব দেখিল শয্যাতে।
শয্যা মাত্র আছে কৃষ্ণ না পায় দেখিতে॥"

জয়দেব চরিত্র)

—কবি শেষে পদ্মাবতীর ভোজ্যাবশিষ্ট গ্রহণে কৃতার্থ হইলেন। এইরূপ প্রবাদ আরো কয়েকটা আছে, বাহুল্য বোধে বর্জ্জিত হইল।

১ম প্রবাদে কবিকে শ্রীজগন্নাথ দেবের অংশ স্বরূপ বলা হইয়াছে। নাভাজী তাঁহার হিন্দী ভক্তমালে বর্ণনা করিতেছেন—

"এবে কহি শ্রীল জয়দেবের চরিত্র।
শ্রবন সুখদ আর পরম পবিত্র॥
কেন্দুবিল্ব নামে গ্রাম সাগর হইতে।
শ্রীমান জয়দেব দ্বিজ হইলা বিদিতে॥
শ্রীল পুরুষোত্তম মহাকাশ গিয়া।
বন্ধুত্ব করিলা অঙ্গ পূর্ণচন্দ্র পায়া॥
উভয় প্রণয় রসে ভেট দোঁহে করে।
পুরুষোত্তম চন্দ্র দিল শ্রীরঙ্গ সাদরে॥
জয়দেব চন্দ্র নিজ বন্ধুর চরিত।
বর্ণন করিলা করিয়া মোহিত॥"

(শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী কৃত অনুবাদ)

বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে; সুতরাং উদ্ধৃত কবিতা কয়েক ছত্র পূর্ব্বোক্ত প্রবাদেরই সমর্থন করিতেছে। এইবার দেখা যাউক, শ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীমূর্ত্তি কোন্ ভাবের প্রতীক? প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের শ্রীমুখ বাক্য—

"যবে দেখি জগন্নাথ সুভদ্রা বলাই সাথ
তবে জানি আইনু কুরুক্ষেত্র।
হেরি পদ্মলোচন সফল হইল জীবন
জুড়াইল তনু মন নেত্র॥"

শ্রীজগন্নাথ দেবকে দর্শন করিলে বৈষ্ণব হৃদয়ে ভগবদৈশ্বর্য্যের স্মৃতিই জাগরিত হয়। শ্রীজগন্নাথ দেবকে দেখিয়া মনে পড়ে—"সূর্য্য গ্রহণের সময় দ্বারকা হইতে শ্রীকৃষ্ণ যেন কুরুক্ষেত্রতীর্থে আগমন করিয়াছেন,—সঙ্গে পরাক্রান্ত যদুবীরগণ, রুক্মিণ্যাদি মহিষীগণ, এবং অগণিত করী-তুরগ-পদাতি-পরিবেষ্টিত স্যন্দনসমূহ। আবার সাক্ষাৎ প্রার্থনায় সমাগত ভোজ মৎস্য কুরু পাঞ্চাল প্রভৃতি নরনাথবৃন্দ—তাঁহাদের সঙ্গেও মর্য্যাদার অনুরূপ সৈন্যবাহিনী। সুবিস্তীর্ণ স্যমন্ত-পঞ্চকে যেন তিলধারণের স্থান নাই। সংবাদ শ্রীধাম বৃন্দাবনে পৌঁছিয়াছে—হৃদয়েশ্বরকে দেখিবার জন্য গোপীযূথপরিবৃতা শ্রীমতী বৃকভানু রাজনন্দিনী, প্রাণ কানাইকে দেখিবার জন্য শ্রীদামাদি রাখালগণ এবং নয়নপুত্তলী ননীচোরকে দেখিবার জন্য গোপরাজ নন্দ ও জননী যশোমতী কুরুক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কোথায়—ব্রজের সেই নয়নানন্দ! "ইহঁ হাতী ঘোড়া রথ মনুষ্য গহন"—এখানে তো শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া তৃপ্তি হইতেছে না। শ্রীমতীর মনে পড়িয়া গেল আমন্দের শত-স্মৃতি-বিজড়িত যমুনার কাল জল,—আর তারই তীরে সেই পুষ্পিত নিকুঞ্জবন, নীপ-তরুতল! রাখালগণের নয়ন সমক্ষে ভাসিয়া উঠিল—উন্মুক্ত আকাশতলে প্রকৃতির সেই আনন্দ-কানন,—দিগন্ত-বিস্তৃত শ্যাম শষ্পক্ষেত্র—গোষ্ঠভূমি! আর জননী যশোমতীর অশ্রুসিক্ত আঁখি খুঁজিতে লাগিল ব্রজভূমির সেই নিরালা নিকেতনের কক্ষ-কুট্টিম! সেই কৃষ্ণ, সেই দেখা, সেই মিলন! কিন্তু দর্শনে সে তৃপ্তি কই? মিলনে সে আনন্দ কই? দেখা হইল বটে, কিন্তু সে দেখায় এ দেখায় পার্থক্য কত! মাধুর্য্যের স্বতঃ উচ্ছ্বসিত অমৃত-প্রবাহ,—প্রকৃতির আনন্দ নির্ঝর গিরিবক্ষ বাহিয়া, বনপথ ধরিয়া ক্রীড়াশীল স্বচ্ছন্দ ধারায় যে অবাধ মুক্ত গতিতে ছুটিয়া যায়, কৃত্রিম উদ্যানের মণিমণ্ডিত অবস্বাহিকায় তাহার সে আবেগ, সে লীলায়িত ভঙ্গিমার স্থান কোথায়? তাই মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—

"যবে দেখি জগন্নাথ সুভদ্রা বলাই সাথ
তবে জানি আইনু কুরুক্ষেত্র।"

ভগবদুপাসনার দুইটি দিক আছে, একটী ঐশ্বর্য্যের দিক, অপরটী মাধুর্য্যের দিক। উল্লিখিত প্রথম প্রবাদ আলোচনা করিলে মনে হয়, জয়দেব গোস্বামী প্রথম জীবনে ঐশ্বর্য্যের উপাসক ছিলেন এবং এই ভাব হইতে সাধনার ক্রম-বিকাশে তিনি মাধুর্য্যের ব্রজকুঞ্জে প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন। অন্ততঃ কবির কাব্য পাঠে ত এইরূপই উপলব্ধি হয়। শ্রীগীতগোবিন্দে ঐশ্বর্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া রসের ক্রম-পরিপুষ্টিতে কিরূপে মাধুর্য্যের উৎকর্ষ বর্ণিত হইয়াছে, এবং সে রস-পরিপুষ্টি যে কবি-হৃদয়ের অনুভূতি-প্রত্যক্ষ পরম সত্যের কবিত্বময় বিকাশ—রসজ্ঞ পাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। শ্রীগীতগোবিন্দের আরম্ভ ভাগে "দশাবতার স্তোত্রে" এবং "শ্রিত কমলা কুচ মণ্ডল" সঙ্গীতটীতে শ্রীকৃষ্ণের কেবল ঐশ্বর্য্য স্বরূপই প্রকাশিত হইয়াছে; দশাবতার স্তোত্রে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাবতারের কেন্দ্ররূপে বর্ণিত হইয়াছেন। কবি বন্দনা করিতেছেন—"দশাকৃতি কৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নম"। টীকাকার পূজারী গোস্বামী বলিতেছেন, এই দশটী অবতার দশটী রসের অধিষ্ঠাতা, আর সর্ব্ব অবতারের অবতরি শ্রীকৃষ্ণ—তিনিই সকল রসের আদি অথবা আদি রসের আকর। বৈষ্ণব আলঙ্কারিকের মতে মধুর রস বা আদি রস সকল রসের শ্রেষ্ঠ,—শ্রীকৃষ্ণ মধুররসের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ। টীকাকারের মতে মৎস্য অবতার বীভৎসরসের, কূর্ম্ম অদ্ভুত রসের, বরাহ ভয়ানক রসের, নৃসিংহ বৎসল রসের, বামন সখ্য রসের, পরশুরাম রৌদ্র রসের শ্রীরাম করুণ রসের, বলরাম হাস্য রসের, বুদ্ধ শান্ত রসের এবং কল্কি বীর রসের অধিষ্ঠাতা।

"শ্রিত কমলাকুচমণ্ডল" সঙ্গীতটীতে একবারও শ্রীরাধার নাম উল্লিখিত হয় নাই, আদ্যন্তে শ্রীর নামই কীর্ত্তিত হইয়াছে। পুত্র, ভ্রাতা, পতি, বন্ধু প্রভৃতি রূপে মানবের আদর্শ শ্রীরামচন্দ্রের, এবং তৎপরেই লক্ষ্মীপতির বর্ণনায়—

জনক সুতাকৃত ভূষণ জিত দূষণ সমরশমিত দশকণ্ঠ।
অভিনব জলধর সুন্দর ধৃত মন্দর শ্রীমুখচন্দ্র চকোর॥

কবি বলিতেছেন—

"হে জানকী কুচভূষণ, দূষণবিজয়ী, তুমি সমরে দশাননকে শাসন করিয়াছিলে। হে সুন্দর, সমুদ্র মন্থন কালে মন্দার ধারণ করিয়া তুমিই অমৃতের হেতু হইয়াছিলে। কিন্তু দেবগণকে অমৃত দান করিয়া আপনি সমুদ্র-সম্ভবা লক্ষ্মীকে গ্রহণ করিয়াছিলে। আবার রমার মুখচন্দ্রে সেই অমৃতের সন্ধান পাইয়া চকোরের মত সেই সুধামৃত পান করিতেছ ; কিন্তু তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া, সেই অমৃতায়মান মুখচন্দ্রকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, এখন অভিনব জলধর রূপে প্রতীয়মান হইতেছ।" শ্রীরাধার প্রেমের উৎকর্ষ দেখাইবার জন্য কবি শ্রী ও সীতার প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নায়কত্বের দুইটী দিক প্রদর্শন করিলেন। সীতা-রামের প্রণয় দাম্পত্য প্রণয়ের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্তস্থল, লক্ষ্মী-নারায়ণের প্রণয়-কাহিনী পুরাণ-প্রসিদ্ধ। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের প্রেম আরো গুরু, আরো গাঢ়, আরো মধুর,—তাহার তুলনা হয় না। টীকাকার বলিতেছেন—এই সঙ্গীতে "ধীর ললিত", "ধীর শান্ত", 'ধীরোদ্ধত", এবং "ধীরোদাত্ত"—নায়কের এই চারি প্রকার লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ধীর-ললিত নায়কই শ্রেষ্ঠ বলিয়া আদি ও অন্তে শ্রীপতি রূপে তিনিই উল্লিখিত হইয়াছেন। কিন্তু ভাগবত বলিতেছেন, এই সৌন্দর্য্য-সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীদেবীও গোপী প্রেমের আকাঙ্ক্ষা করিতেন "ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ বাহুযষ্টির দ্বারা ব্রজ-রমণীগণের কণ্ঠ আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে যেরূপ প্রসাদে অনুগৃহীত করিয়াছিলেন, লক্ষ্মী তদীয় হৃদয়বাসিনী হইয়াও, এবং সুরবালাগণ কমল গন্ধ ও কমল কান্তি ধারণ করিয়াও সে প্রসাদ লাভ করিতে পারেন নাই।" সুতরাং বুঝিতে পারা যাইতেছে—কবি এই দুইটী সঙ্গীতে ঐশ্বর্য্যের পরিপূর্ণ বর্ণনায় ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন,—এইবার ধীরে মাধুর্য্যের পথে অগ্রসর হইবেন। কারণ, শ্রীকৃষ্ণ কেবল ধীর ললিতই নহেন,—তাঁহাতে নায়কের অপর কয়েকটী গুণও বর্ত্তমান আছে, তিনি সকল নায়কের শিরোভূষণ এবং শ্রীমতী রাধা ঠাকুরাণী নায়িকাকুল-শিরোমণি।

২য় প্রবাদ হইতেও আমাদের পূর্ব্বোক্ত অনুমানই সমর্থিত হয়। কবি "দেহি পদপল্লবমুদারম্" লিখিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন, শ্রীমতী রাধিকার পাদপদ্মে তিনি কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের মস্তক স্পর্শ করাইবেন, এই সঙ্কোচে তাঁহার হৃদয় দ্বিধা দ্বন্দ্বে আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যের ভাব তিনি তখনও ভুলিতে পারেন নাই, পারিলে তাঁহার মনে এরূপ সন্দেহের অবকাশই থাকিত না। সংশয় জাগিয়াছিল—কারণ জীবন ও কাব্য তাঁহার ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত ছিল। সাধনার পথে তিনি যেমন কুঞ্জের পর কুঞ্জ অতিক্রম করিতেছিলেন, সাধনালব্ধ সত্যগুলিও তেমনি তাঁহার কাব্যে অভিব্যক্ত হইতেছিল। অবশেষে তাঁহার গভীরতর আর্ত্তিতে আকৃষ্ট হইয়া সাধনার ধন এক দিন স্বয়ং আসিয়া জীবনের সকল সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া শ্রেষ্ঠ, সার্থক ও সুন্দরতম পরিণতি রূপেই ভগবৎ-প্রেম লাভ করিয়াছিলেন। পদ্মাবতীর প্রেমই তাঁহাকে অপ্রাকৃত কান্ত প্রেমের প্রকৃত আস্বাদ দান করিয়াছিল। তাই পদ্মাবতীর মধ্য দিয়াই তিনি সেই চিররসময় পরম প্রেম-স্বরূপের দিব্য অনুভূতি লাভ করিয়াছিলেন। আবার পদ্মাবতীর পতি-প্রেম এতই প্রগাঢ়, এমনই নিষ্ঠাপূর্ণ যে—ভগবান তাঁহাকে জয়দেব রূপেই দর্শন দিয়া তাঁহার নারীত্বের সাধনাকে সার্থক করিয়াছিলেন। পতিপরায়ণা পতিরূপেই জগৎ-পতিকে লাভ করিয়া ধন্যা হইয়াছিলেন। কবি-জীবনের এই সাধনার ইতিহাস তাঁহার দেশবাসী জানিত, বুঝিত বলিয়াই, কবি তাহাদের নিকট শ্রীজগন্নাথ দেবের অংশ স্বরূপে পূজা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আজিও দেশবাসীর উত্তর-পুরুষ কবিকে সেইরূপেই পূজা করিতেছে।

শ্রীগীতগোবিন্দ আলোচনা করিলে পরকীয়া ভাবের পরিস্ফুট স্বরূপ উপলব্ধি হয় না,—নয়ন সমক্ষে ভাসিয়া উঠে, কেবল একটী আপন-ভোলা দাম্পত্য জীবনের মধুময় চিত্র! সে চিত্র মর্ত্ত্যের নহে, সে চিত্র কবি-জীবনের নিবিড়তর অনুভূতির সুন্দরতম বর্ণ-বিন্যাসে কবি কল্প লোকের কান্ত আলোকে সদাসমুজ্জ্বল। কবি-বিরচিত এই গোবিন্দ সঙ্গীত পড়িতে পড়িতে হৃদয়ে অজয় তীরবর্ত্তী একটী নিরালা নিকুঞ্জের সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব প্রতিভাত হইয়া উঠে। কুঞ্জের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের মাঝে দেখিতে পাই, প্রেম-মাতোয়ারা কবি-দম্পতী—জয়দেব ও পদ্মাবতী। অনুরাগ, অভিমান, বিরহ, মিলনের অপরূপ ঘাত-প্রতিঘাতে দম্পতী-জীবন প্রণয়-লীলার মধুময় ভঙ্গিমায় নিত্য নবরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিতেছে ; আর সেই লহরীমালা শ্রীগীতগোবিন্দের ছন্দে শ্লোকে লীলায়িত হইতেছে।

কিন্তু পরক্ষণেই চাহিয়া দেখি—কোথায় অজয়! এ যে কালিন্দী! পদ্মার নয়ন-কজ্জলে জল কখন কাল হইয়া গিয়াছে! কেন্দুবিল্ব কোথায়? এ-ত বৃন্দাবন! জয়দেব সরস্বতীর মধুর কোমল-কান্ত পদাবলী এ তো নয়, এ যে সেই ভুবনমোহন শ্রবণ-মনোরসায়ন মুরলী-নিঃস্বন! কবি-দম্পতীকে কোথায় হারাইয়া ফেলি,—দেখি, কুঞ্জে কুঞ্জে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলাভিনয়! দেখিতে দেখিতে অশ্রুতে নয়ন ভরিয়া উঠে, দৃষ্টি নিষ্প্রভ হইয়া যায় ; মনে হয় মেঘে অম্বর মেদুর হইয়া আসিয়াছে। এক স্নিগ্ধ কৃষ্ণতায় ধীরে ধীরে তমালতরুনিকরে শ্যামায়মান ভূমিকে ছাইয়া ফেলিতেছে,—শুনিতে পাই, সেই গন্ধে-ভরা অন্ধকারকে কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া কে যেন গাইতেছে—

"* * নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
শ্রীরাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলেরহঃকেলয়ঃ"

রাষ্ট্রীয় শাসন-পদ্ধতি

শ্রীনৃত্যগোপাল রুদ্র এম-এ

ইংলণ্ডীয় শাসন-পদ্ধতি

নর্ম্মান বিজয় :—নৃপতি এডোয়ার্ড দি কনফেসরের মৃত্যুর পর ইংলণ্ডের সিংহাসনে কে অধিরোহণ করিবেন, তদ্বিষয়ে বাদ-বিসম্বাদ উপস্থিত হইয়াছিল। এড্গার দি এথেলিং প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিলেন; কিন্তু তৎকালে তাঁহার বয়স অল্প ছিল এবং তিনি দুর্ব্বল-প্রকৃতির লোক ছিলেন। আবার, এডোয়ার্ড মৃত্যুকালে হেরল্ডকে মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন। এই সকল কারণ হেরল্ডই এডোয়ার্ডের মৃত্যুর পর ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। কিন্তু এই বিষয়ে আর একজন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, নর্ম্ম্যাণ্ডির ডিউক উইলিয়ম—নৃপতি হেরল্ডের মাতুলের পুত্র। তিনি ইংলণ্ডের সিংহাসন দাবী করিলেন; বলিলেন, এই বিষয়ে হেরল্ড তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কিন্তু এডোয়ার্ডের মৃত্যুকালীন শেষ ইচ্ছা ক্রমেই হেরল্ড রাজা হইলেন। যাহা হউক ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে ১৭ই অক্টোবর সৈন্যসহ উইলিয়ম ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলেন। বিখ্যাত সেন্‌লাকের যুদ্ধে তিনি বিজয়ী হইলেন, ও ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। এই হেতু তিনি William the Conqueror বা বিজেতা উইলিয়ম এই নামে পরিচিত।

উইলিয়ম যেন এডোয়ার্ড কর্ত্তৃক প্রদত্ত উত্তরাধিকার সূত্রেই রাজা হইয়াছেন, এই ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সুতরাং তাঁহাকে বাহ্যতঃ ইংলণ্ডীয় আইন কানুন সমুদায় রক্ষা করিয়াই চলিতে হইবে। কিন্তু কার্য্যতঃ কোনু কিছুরই অপেক্ষা না করিয়া তাঁহার ইচ্ছানুসারেই তিনি কার্য্য করিতেন। এই বিজেতা নৃপতি প্রথমবার যখন ইংলণ্ড হইতে নর্ম্ম্যাণ্ডিতে গিয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহার প্রতিনিধিদ্বয়ের কু-শাসনে ইংরাজগণ বিদ্রোহী হইয়াছিল। কিন্তু তিনি প্রত্যাগমন করিয়া তাহা নিবারণ করেন। যাঁহারা রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ভূসম্পত্তি নৃপতি স্বাধিকারে লইয়া আইসেন।

ইংলণ্ডীয় শাসন-পদ্ধতির ক্রমবিকাশের কথা আলোচনা করিতে গেলে, উইলিয়ম-প্রবর্ত্তিত জায়গীর প্রথার উল্লেখ করার বিশেষ প্রয়োজন। তিনিই ইংলণ্ডে জায়গীর প্রথার প্রবর্ত্তন করেন। তবে নর্মান বিজয়ের পূর্ব্বে যে ইংলণ্ডে জায়গীর প্রথা বীজাকারে বিদ্যমান ছিল, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। যৎকালে নর্মানগণ কর্ত্তৃক ইংলণ্ড বিজয় সংঘটিত হয়, তখন ফরাসী দেশে এই প্রথা সম্পূর্ণরূপে স্থাপিত হইয়াছিল। তবে ইংলণ্ডের জায়গীর প্রথা ও ফরাসী দেশের প্রথার মধ্যে বিভিন্নতা আছে। ক্ষুদ্র জোতের মালিকগণ জমিদারগণের অধীনে থাকিলে জমিদারগণের প্রভাব যে অত্যধিক বৃদ্ধি পাইতে পারে, ফরাসী দেশেই উইলিয়ম তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাইয়াছিলেন। এই হেতু এবার উইলিয়ম সতর্ক হইলেন। তিনি এই ব্যবস্থা করিলেন যে, কি বড় জমিদার, কি ক্ষুদ্র জোতের মালিক, সকল ভূমিপতিকেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার নিকট সম্মান-জ্ঞাপন করিতে হইবে। এই সম্মান-জ্ঞাপনকে হোমেজ করা বলে। ভূমিপতিগণ হাঁটু গাড়িয়া নৃপতির হস্তদ্বয়ের মধ্যে তাঁহাদের হস্তদ্বয় স্থাপন করিয়া বলিবেন, 'অদ্যাবধি আমি আপনার ব্যক্তি হইলাম' Je deveigne votre homme। এই homme অর্থাৎ man বা ব্যক্তি শব্দ হইতেই হোমেজ কথার ব্যুৎপত্তি।

এই জায়গীর প্রথার দ্বারা নৃপতির ক্ষমতা খুব বৃদ্ধি পাইল বটে, কিন্তু এই প্রথার বহুবিধ দোষও ছিল। নৃপতি প্রজার নিকট হইতে নানা প্রকারে অর্থ আদায় করিতে পারিতেন। এই হেতু তজ্জনিত দোষসমূহ ক্ষালনের নিমিত্ত অতঃপর নৃপতি জনের আমলে জমিদারগণ তাঁহার নিকট হইতে গ্রেট চার্টার বা প্রধান দলিল সম্পাদন করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন।

উইলিয়মের মৃত্যুর পর উইলিয়ম ও হেনরি নামধেয় তাঁহার দুইজন পুত্র যথাক্রমে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। অতঃপর ষ্টিফেন রাজা হন। প্রথম হেনরির আমলে সম্পাদিত Charter of Liberties বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্দারা বহুপ্রকার অন্যায় কর গ্রহণ প্রথা রহিত হয়; এবং ইংলণ্ডে আইনসঙ্গত জাতীয় স্বাধীনতা আছে ও রাজশক্তি সীমাবদ্ধ, ইহাও স্বীকার করা হয়।

ষ্টিফেনের পর প্রথম হেনরির দৌহিত্র দ্বিতীয় হেনরি ইংলণ্ডের নৃপতি হন। তাঁহার পৈত্রিক রাজ্য ফরাসীর আনজু প্রদেশ। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত ও বুদ্ধিমান রাজা ছিলেন। ইংরাজ প্রজাগণও তাঁহার সবিশেষ অনুগত ছিল। ঐতিহাসিক ষ্টাব্‌স্ বলেন, তাঁহার রাষ্ট্রনৈতিক নৈপুণ্যের গুণে তিনি ইংলণ্ডে সম্পূর্ণ নূতন শাসন-পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার আমলে অনেকগুলি আইন সম্পাদিত হয়। জুরির দ্বারা বিচারের প্রথার তিনিই প্রবর্ত্তন করেন। প্রাচীনকালে দ্বন্দ্ব যুদ্ধাদির দ্বারা যেরূপ বিচার করা হইত, এই প্রকারে তৎসমুদায় রহিত হইয়া যায়।

এই পরাক্রান্ত নৃপতির দুই পুত্র রিচার্ড ও জন যথাক্রমে ইংলণ্ডের রাজা হন; এবং দুইজনকেই বিভিন্ন কারণে অপমান ভোগ করিতে হয়। রিচার্ড বহু বৎসর ধরিয়া ধর্ম্মযুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। একবার প্রত্যাবর্ত্তন কালে পথিমধ্যে তিনি অন্য নৃপতি কর্ত্তৃক বন্দী হন। অতঃপর প্রজাগণ বহু অর্থ দিয়া তাঁহার উদ্ধার সাধন করে। আর জনের কু-শাসন যখন চরম সীমায় উঠে, তখন প্রজাগণ তাঁহাকে বাধ্য করিয়া গ্রেট চার্টার বা প্রধান দলিল সম্পাদিত করিয়া লইয়াছিল।

ইংলণ্ডে সাধারণ ব্যক্তিগণ জমিদারগণের সহিত যোগ দিয়া রাজাকে এই দলিল দিতে বাধ্য করে। শুধু জমিদারগণের নিজ স্বার্থের নিমিত্ত অথবা সাধারণ সম্প্রদায়ের নিজ স্বার্থের নিমিত্ত ইহা সম্পাদিত হয় নাই। সমুদায় রাজ্যেরই হিতকর ব্যবস্থা এই দলিলের দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক হালাম বলেন, ইংলণ্ডীয় জনগণের যে স্বাধীনতা রহিয়াছে, এই দলিলই তাহার মূল ভিত্তি। আর্ক বিশপের নিয়োগ লইয়া

মতের অনৈক্য বশতঃ পোপ এই নৃপতির উপর অসন্তুষ্ট হন। অতঃপর পোপ যখন ফ্রান্সের রাজাকে ইংলণ্ড দখল করিয়া লইতে আহ্বান করেন, তখন জন পোপের মতে মত দেন, এবং বড়ই অপদস্থ হন। অনন্তর প্রজাগণ যখন রাজার কু-শাসনে বিরক্ত হইয়া দলবদ্ধ হইয়া অস্ত্রধারণ করে, তখন অগত্যা বাধ্য হইয়া তিনি ম্যাগনা চার্টা বা গ্রেট চার্টার সম্পাদিত করিয়া দেন।

উপক্রমণিকায় লিখিত বিষয়টী বাদ দিলে দেখা যায়, গ্রেট চার্টারে ৬৩টী সর্ত্তের কথা বর্ণিত আছে। এই চার্টারের দ্বারা প্রথমতঃ ঘোষণা করা হয় যে, ইংলণ্ডের চার্চ স্বাধীন থাকিবে; চার্চের স্বত্ব ও স্বাধীনতা বিষয়ে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা হইবে না। অতঃপর যাবতীয় প্রজার স্বত্বাদির ব্যবস্থা হয়। যে সকল বিষয় বর্ণিত আছে, তৎসমুদায়কে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(১) জায়গীর প্রথার বাধ্যতামূলক কার্য্যসমূহের আলোচনা: প্রজাবর্গের হিতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তৎসমুদায় নিরূপিত হইয়াছে; ইতঃপূর্ব্বে নৃপতিগণ ও জমিদারগণ অর্থলোভে তাঁহাদের অধীন জোতের মালিকগণের বিধবাগণকে পুনরায় পতিগ্রহণ করিতে বাধ্য করিতেন। এই চার্টারের দ্বারা তাহা নিবারণ করা হইল। এই প্রকারে উত্তরাধিকারিগণ সম্বন্ধে ও অন্যান্য সমুদায় ব্যাপার সম্বন্ধে সাধারণের হিতকর ব্যবস্থা করা হইল।

(২) আইন ও শাসন-পদ্ধতি সম্বন্ধীয় বিষয়সমূহ: গুরুতর অপরাধসমূহের বিচার সাধারণ বিচারকের নিকট হইবে না; নৃপতির জাষ্টিস্‌গণ এই সব বিচার করিবেন। কোন বেলিফ ভবিষ্যতে রীতিমত সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতীত মাত্র মুখের কথায় কাহাকেও তাঁহার আইনের অধীনে আনিতে পারিবে না। এতাদৃশ নানাবিধ বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

(৩) শাসন পদ্ধতির মূল বিষয়গুলি সম্বন্ধীয়:—প্রজাগণের নিকট হইতে যখন তখন অন্যায় সাহায্য আদায় করা হইবে না। মাত্র তিনটী কারণে সাহায্য লওয়া যাইতে পারিবে—নৃপতির উদ্ধারার্থ, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে নাইট করণার্থ, ও তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দেওয়ার নিমিত্ত (মাত্র একবার)। রাজ্যের আইন অনুসারে বিচার না করিয়া কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা, কারারুদ্ধ করা, নির্ব্বাসিত করা ইত্যাদি হইতে পারিবে না। কাহাকেও তাহার প্রকৃত অধিকার বা রাজকীয় বিচার হইতে বঞ্চিত করা হইবে না।

(৪) নগর, বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ক: লণ্ডন নগর ও অন্যান্য নগর বন্দর প্রভৃতি তৎসমুদায় সংক্রান্ত স্বাধীনতা ভোগ করিতে পাইবে। একই প্রকারের ওজনের প্রণালী রাজ্যময় থাকিবে। যুদ্ধকাল ব্যতীত অন্য সময়ে কোন প্রকার অন্যায় শুল্ক না দিয়া, এবং প্রচলিত শুল্ক দিয়া, বাণিজ্যার্থে যে কোন বণিক ইংলণ্ডে প্রবেশ করিতে, বাস করিতে ও যাতায়াত করিতে পারিবেন, এবং ইংলণ্ড হইতে প্রস্থান করিতে পাইবেন।

(৫) অন্যায় কর বিষয়ক: যদি বিক্রেতা ইচ্ছা করিয়া না দেয় তাহা হইলে কোন কনষ্টেবল বা রাজকীয় বেলিফ কোন ব্যক্তির শস্য বা অন্য কিছু বিনামূল্যে লইতে পারিবে না। মালিকের সম্মতি ব্যতীত নৃপতি বা তাঁহার কর্ম্মচারী কোন ব্যক্তির অশ্ব বা শকট ইত্যাদি কোন প্রয়োজনের নিমিত্ত লইতে পারিবেন না। এবং-বিধ প্রজাসাধারণের হিতকর বহু বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যাহা হউক, নৃপতি জন কর্ত্তৃক সম্পাদিত এই ম্যাগনা চার্টা বা প্রধান দলিল, এবং ষ্টুয়ার্ট-বংশীয় নৃপতিগণের আমলে সম্পাদিত পিটিসন অফ্ রাইট্ ও বিল অফ্ রাইট্‌স্ ইংলণ্ডীয় শাসন-পদ্ধতির মূলভিত্তি স্বরূপ।

নৃপতি জন ১২১৩ খৃষ্টাব্দে প্রজাগণকে এই ম্যাগ্‌না চার্টা প্রদান করিয়াছিলেন। রাজার নিকট হইতে প্রজাগণ এই যে সুবিধা ও অধিকার সকল লাভ করিল,—ইংলণ্ডের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব, অতঃপর বহু নৃপতি কর্ত্তৃক প্রধান দলিলের এই সর্ত্ত সমুদায় সমর্থিত ও দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। অবশ্য মধ্যে মধ্যে কতিপয় নৃপতি মৌখিক সম্মান দেখাইয়া কার্য্যতঃ প্রধান দলিলখানিকে অবহেলা ও অমান্য করিতে থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের সে প্রযত্ন স্থায়ি-ভাবে ফলপ্রদ হয় নাই। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই, রাজা তৃতীয় হেন্‌রি কর্ত্তৃক পুনঃপুনঃ ম্যাগ্‌না চার্টা সমর্থিত ও দৃঢ়ীকৃত হয়; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি ম্যাগ্‌না চার্টার প্রবল শত্রু ছিলেন; এবং কার্য্যতঃ তিনি ইহার অবহেলা করিতে থাকেন। ক্রমে ক্রমে নানা কারণে নৃপতি তৃতীয় হেনরির উপর প্রজাগণ অসন্তুষ্ট হইতে থাকে। কতিপয় বিদেশীয় ব্যক্তির প্রতি তিনি বিশেষ ভালবাসা দেখাইতেন। তাঁহার পুত্র এডমাণ্ডের নিমিত্ত শিশিলি রাজ্য লাভ করিবার উদ্দেশ্যে বহু ব্যয় করিতে থাকেন, বেআইনী কর সংগ্রহ করিতে থাকেন, ইত্যাদি কারণে প্রজাগণ রাজার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইতে থাকে। পরিশেষে ১২৫৮ খৃষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল তারিখে পার্লামেণ্ট সম্মিলিত হইল। নৃপতি ব্যারনদিগের কথা মানিয়া লইতে বাধ্য হইলেন। তাঁহাদিগের ইচ্ছানুসারে চতুর্ব্বিংশতি জনের দ্বারা গঠিত একটী কমিটী নিয়োগ বিষয়ে নৃপতি সম্মতি দিলেন। কমিটীর হস্তে শাসন-সংস্কারের ভার দেওয়া হইল, এবং কমিটীকে অসীম ক্ষমতাও প্রদান করা হইল। তাঁহারা কতকগুলি নিয়ম লিপিবদ্ধ করিলেন; তৎসমুদায় Provisions of Oxford নামে খ্যাত।

যাহা হউক, ১২৬১ খৃষ্টাব্দে নৃপতি স্পষ্টভাবে বলিলেন, তিনি উক্ত Provisions অনুসারে চলিবেন না। ফলে রাজার সহিত প্রজা-পক্ষের সমর ঘোষিত হইল। অবশেষে নৃপতি আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন, এবং Simon de Montfortএর হস্তে সমুদায় ক্ষমতা প্রদত্ত হইল। ইনি রাজার নামে পার্লামেণ্ট আহ্বান করিলেন। পার্লামেণ্টে রাজ্যের সমুদায় অংশ হইতে প্রতিনিধি গ্রহণ প্রথা ইঁহারই দ্বারা উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়। প্রতি কাউণ্টি হইতে চারিজন করিয়া সুবিজ্ঞ নাইট্‌কে ইনি আহ্বান করিলেন। প্রকৃতপক্ষে Simon de Montfortই হাউস্ অফ কমন্সের প্রতিষ্ঠাতা। ১২৯৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত Simon de Montfortএর পার্লামেণ্টের

অনুকরণেই পার্লামেন্ট আহূত হইত। নৃপতি প্রথম এডোয়ার্ডের আমলে ১২৯৫ অব্দে যে পার্লামেন্ট আহূত হইল, তাহাতেই যেন নিশ্চিত ভাবে স্থিরীকৃত হইল, পার্লিয়ামেণ্টে তিনটি অংশ আছে, যথা, নৃপতি, জমিদার সম্প্রদায় ও সাধারণ সম্প্রদায়। অনন্তর ক্রমশঃই সাধারণ সম্প্রদায়ের উন্নতি ঘটিতে থাকে। নৃপতি তৃতীয় এডোয়ার্ডের আমলে সাধারণ সম্প্রদায়ভুক্ত সভ্যগণ রাজ্যের শাসন-পদ্ধতি সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিতে থাকেন। উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে পার্লামেন্টের নিকট তাঁহাদের যে অভিযোগ করার ক্ষমতা আছে, ১৩৭৬ অব্দে তাহা কার্য্যে পরিণত হয়। বাস্তবিক পক্ষে এই রাজার আমলে সাধারণ সভ্যগণের মত প্রয়োজনীয় বিষয়ে প্রায়ই লওয়া হইত। সমর ও সন্ধি বিষয়ে তাঁহারা সতত পরামর্শ দিতেন।

ল্যাঙ্কাষ্ট্রীয়ান বংশীয় রাজগণের আমলে পার্লামেন্টের সভ্যগণের নানাবিধ সুবিধা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। বক্তৃতার স্বাধীনতা ভোগ, গ্রেপ্তার না হওয়া প্রভৃতি অনেক সুবিধা এই সময়েই প্রথম প্রবর্ত্ত হয়। এই নৃপতিগণের আমলে নূতন কোন মৌলিক স্বত্ব পার্লামেণ্ট প্রাপ্ত হয় নাই; পূর্ব্ব পূর্ব্ব সময়ে যে সমুদায় স্বত্ব পাওয়া গিয়াছে, তাহাই এই আমলে রক্ষিত ও দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। অনন্তর টিউডর বংশীয় রাজগণের কথা। এই নৃপতিগণের রাজত্বকাল ষোড়শ শতাব্দী (১৪৮৩—১৬০৩) পর্য্যন্ত। এই ষোড়শ শতাব্দীতে দেশের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। বিদ্যা ও ধর্ম্মের আলোচনা বর্দ্ধিত হয়; কিন্তু রাজনীতির অবনতি ঘটিতে থাকে। মুদ্রাযন্ত্রের দ্বারা বহুল ভাবে পুস্তক প্রচার সংঘটিত হয়; ধর্ম্ম সংস্কারের বিরাট আন্দোলন চতুর্দ্দিকে পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু টিউডর রাজগণের স্বেচ্ছাচারিতার প্রকোপে পার্লামেন্টের শির অবনত থাকে। এই বংশের প্রথম রাজা সপ্তম হেনরি বড় অর্থশোষক রাজা ছিলেন। তবে তিনি ধনবান্দিগের অর্থ বহুল ভাবে গ্রহণ করাটাই সুবিধাজনক মনে করিতেন। সাধারণের উপর কর স্থাপন না করিয়া প্রায় তিনি এইরূপই করিতেন। তাঁহার চতুর্ব্বিংশ বর্ষ ব্যাপী রাজত্বকালে সাতবার মাত্র পার্লামেণ্ট আহূত হয়। অর্থ সংগ্রহের নিমিত্তই পার্লামেণ্ট আহ্বান করা প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। অতঃপর নৃপতি অষ্টম হেনরির রাজত্বকালে স্বেচ্ছাচারিতার চরম সীমা দেখিতে পাওয়া যায়। এই রাজার আমলে পার্লামেণ্ট সতত রাজার ইচ্ছার অনুগামী হইয়া থাকিত; রাজা পার্লামেন্টের নাম দিয়া যখন যাহা ইচ্ছা হইত তাহাই সম্পাদন করাইয়া লইতেন। অনন্তর রাজ্ঞী এলিজাবেথের আমলেও এতাদৃশ স্বেচ্ছাচারিতা দেখিতে পাওয়া যায়।

অতঃপর ষ্টুয়ার্ট বংশীয় রাজগণ ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইতঃপূর্ব্বে দেখা গিয়াছে, রাজা অষ্টম হেন্‌রির শাসনকালে স্বেচ্ছাচারিতা চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিল। তার পর ধীরে ধীরে প্রজাপক্ষের শক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। উক্ত বংশের রাজা প্রথম জেম্‌স্‌এর রাজত্বকালে বড়ই বিশৃঙ্খলা দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার রাজত্বের প্রথম প্রথম কার্য্যগুলির আলোচনা করিলে অনুমান হয়, স্বেচ্ছাচারী ভাবে তিনি রাজ্য শাসন করিবেন, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল। একবার লণ্ডন যাইবার কালে তিনি আদেশ দিলেন, একজন চোরকে বিনা বিচারে বধ করা হউক। তাঁহার প্রথম পার্লামেণ্ট্‌ ভঙ্গের পর ১৬১১ অব্দ হইতে ১৬১৪ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি বিনা পার্লামেণ্টে শাসন-কার্য্য চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে অর্থ সংগ্রহ ব্যাপারে বিশেষ বিঘ্ন ঘটিতে লাগিল। তিনি পুনরায় পার্লামেণ্ট্‌ আহ্বান করিতে বাধ্য হইলেন। এই দ্বিতীয় পার্লামেন্টের স্বাধীন আচরণে রাজা অসন্তুষ্ট হইলেন। স্পষ্টভাষা প্রয়োগের নিমিত্ত চারিজন সভ্যকে কারারুদ্ধ করা হইল; আরও কতিপয় সভ্যের প্রতি অন্যবিধ দণ্ডবিধান করা হইল। অতঃপর যখন তৃতীয়বার পার্লামেণ্ট্‌ আহ্বান করা হয়, তখন সভ্যগণ কয়েকজন বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থাপিত করেন। যাহা হউক, জেম্‌স্‌ ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে তনু ত্যাগ করেন। অনন্তর প্রথম চার্লস্‌ রাজা হইলেন। তিনিও পিতার ন্যায় স্বেচ্ছাচারের বশবর্ত্তী হইয়া রাজ্য চালাইতে কৃতসংকল্প হইলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বর্ষ মাত্র। তাঁহার রাজ্যাভিষেকের পর পনর মাসের মধ্যে দুইবার পার্লামেণ্ট্‌ আহ্বান করা হয়, এবং দুইবারই খামখেয়ালী করিয়া সভা ভঙ্গ করিয়া দেওয়া হয়। তাঁহার প্রিয়পাত্র বাকিংহাম এই সকল বিষয়ে তাঁহাকে পরামর্শ দিতেন। প্রজাগণ বাকিংহামের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া পড়ে। কিন্তু রাজা নিয়তই প্রজাপক্ষের রোষবহ্নি হইতে বাকিংহামকে রক্ষা করিতে থাকেন। অনন্তর তৃতীয় পার্লামেণ্টে সাধারণ সম্প্রদায়ভুক্ত সভ্যগণ তাঁহাদিগের যে সকল চিরন্তন স্বত্ব রহিয়াছে তৎসমুদায় একটী দরখাস্তের আকারে লিপিবদ্ধ করেন। ইহারই নাম পিটিসন অফ রাইট্‌। প্রজাপক্ষের স্বত্ব সমুদায় এই দলিলের দ্বারা সুদৃঢ় করিয়া লওয়া হয়। প্রথমতঃ রাজা এই দলিলে নিজ সম্মতি প্রদান করেন নাই। অনন্তর যখন সভ্যগণ তাঁহার প্রিয়পাত্র বাকিংহামকে অনুযোগ করিতে যাইতে-ছিলেন, তখন রাজা সম্মতি দান করিলেন, এবং এই দলিল আইনে পরিণত হইল।

তৎকালে রাজ্য মধ্যে যে সকল অন্যায় অবিচার হইতেছিল, এই পিটিসন অফ্‌ রাইটে তৎসমুদায়ের আলোচনা করা হয়। ঋণ গ্রহণের নাম দিয়া অন্যায় অর্থ সংগ্রহ, যে সব প্রজা ইহাতে অসম্মত হইতেছিল তাহাদের উপর অন্যায় অত্যাচার, সাধারণ লোকের স্কন্ধে সৈন্যগণের ব্যয়ভার বহন করান, সামরিক আইনের দ্বারা অপরাধীকে শাস্তি প্রদান—এই সমুদায় বিষয়ের আলোচনা করা হয়। যাহাতে এবংবিধ অত্যাচার না হয়, অন্যায় অর্থ সংগ্রহ, সামরিক আইন পরিচালনা ইত্যাদি না হইতে পারে, তদ্বিষয়ে প্রার্থনা করা হয়। প্রজাগণের যে সমুদায় চিরন্তন স্বত্ব সুবিধা আছে, কোন রাজকর্ম্মচারী তাহা লঙ্ঘন না করিয়া চলেন, ইহাই প্রার্থনা করা হয়। যাহা হউক, এই পিটিসন অফ্‌ রাইটের দ্বারা প্রজাগণের স্বত্ব-সুবিধাসমূহ সুদৃঢ় করিয়া লওয়া হইল।

নৃপতি প্রথম চার্লসের তৃতীয় পার্লামেন্টে এই পিটিসন অফ্ রাইট্ আইনে পরিণত হইল। পার্লামেন্ট ভঙ্গের পর হইতে রাজা পুনরায় অত্যাচার করিতে লাগিলেন। আর পার্লামেন্ট আহ্বান করিবেন না, ইহাই তিনি মনস্থ করিলেন। যে ওয়েন্টওয়ার্থ ইতঃপূর্ব্বে প্রজাপক্ষের প্রধান প্রতিনিধি ছিলেন, তিনি রাজার পক্ষে আসিয়াছিলেন। ক্রমশঃ রাজ-সম্মান লাভ করিতে করিতে তিনি Earl of Stratford হইলেন; এবং রাজাকে নানাবিধ কুপরামর্শ দিতে আরম্ভ করিলেন। রাজার অত্যাচার খুবই প্রবল হইতে লাগিল। ষ্টার চেম্বারের দ্বারা বিচার করাইয়া বহু লোককে গুরুতর দণ্ড প্রদান করা হইতে লাগিল। শিপ-মনি নামক এক নূতন কর সংগ্রহ করা হইতে লাগিল। ১৬২৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৪০ অব্দ পর্য্যন্ত পার্লামেন্ট্ আহ্বান করা হইল না। ১৬৪০ অব্দে পার্লামেন্ট্ সভা আহ্বান করিয়া অল্প দিনের মধ্যে রাজা অসন্তুষ্ট হইয়া সভা ভঙ্গ করিয়া দিলেন। ঐ বৎসর পুনরায় পার্লামেন্ট্ আহ্বান করা হইল। বহু বৎসর ধরিয়া ইহা আর ভঙ্গ হইল না। এই পার্লামেন্টের নাম লং পার্লামেন্ট্। এক্ষণে প্রজাগণের অসন্তোষ চরম সীমায় উঠিয়াছিল। ১৬৪৮ অব্দে লর্ডগণকে বাদ দিয়া সাধারণ সম্প্রদায়ের সভ্যগণ রাজার অত্যাচারের বিচার করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড করিলেন। অনন্তর দ্বাদশ বর্ষ যাবৎ সিংহাসন রাজশূন্য থাকিল। ক্রমওয়েল প্রজার পক্ষের প্রতিনিধি স্বরূপ রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। ১৬৫৮ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার উত্তরাধিকারী দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক ছিলেন।

এইরূপ ভাবে যে কোন সাধারণ লোকের দ্বারা রাজ্য শাসন করান প্রজাপক্ষ সমীচীন বিবেচনা করিলেন না। এই হেতু প্রজাগণ ষ্টুয়ার্ট বংশীয় দ্বিতীয় চার্লস্‌কে রাজা করিলেন। ইহাঁর রাজত্বে কু-শাসন চলিতে লাগিল বটে, তবে মধ্যে মধ্যে হিতকর আইন সকল প্রণীত হইয়াছিল। দ্বিতীয় জেম্‌স্ ১৬৮৫ অব্দে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। প্রকৃতিপুঞ্জের চিরন্তন স্বত্বের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া রাজা শাসন করিবেন, ইনিও এইরূপ ইচ্ছা করেন। ফলে ১৬৮৮ অব্দে তিনি রাজ্য ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হন। অতঃপর ১৬৮৯ অব্দে উইলিয়ম ও মেরির রাজত্বের প্রারম্ভে বিল্ অফ্ রাইট্‌স্ নামক বিখ্যাত দলিল আইন রূপে গণ্য হয়।

এই বিল অফ্ রাইট্‌সে প্রথমতঃ নৃপতি দ্বিতীয় জেম্‌সের কৃত অন্যায় অবিচারের বিষয় উল্লেখ করা হয়। তিনি পার্লামেন্টের মত গ্রহণ না করিয়া আইন সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎসমুদায় যাঁহারা না মানিয়াছেন তাঁহাদের দণ্ডবিধান করিয়াছেন, অন্যায় রূপে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, পার্লামেন্টের সম্মতি না লইয়া শান্তির সময়ে রাজ্যের মধ্যে সেনা রাখিয়াছেন, বে-আইনী ভাবে সৈন্যগণের অবস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছেন, প্রোটেষ্টান্ট্ মতাবলম্বীগণের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে, ইত্যাদি বিষয় সমুদায় আলোচনা করা হয়। অতঃপর উল্লিখিত হইয়াছে—প্রিন্স্ অফ্ অরেঞ্জ (উইলিয়ম) পার্লামেন্টের সভ্যগণকে আহ্বান করায়, তাঁহারা ঘোষণা করিতেছেন, প্রাগুক্ত নিতান্ত বে-আইনী, এবং আপত্তিকর কার্য্যসমূহের প্রতিকারের নিমিত্ত ও আইনসমূহের সংশোধন, সুদৃঢ়ীকরণ ও পরিরক্ষণের নিমিত্ত পার্লামেন্ট্ নিয়ত আহূত হইবে ইত্যাদি। অনন্তর বিল্ অফ্ রাইট্‌সে উল্লেখ করা হয়, উইলিয়ম ও মেরি ইংলণ্ডের রাজা ও রাজ্ঞী হইলেন। তাঁহাদের মৃত্যুর পর ইংলণ্ডের সিংহাসনের উত্তরাধিকারিদের বিষয়ও ইহার দ্বারা স্থিরীকৃত হয়; এবং অন্যবিধ কতিপয় বিষয়েরও আলোচনা হয়।

ইতঃপূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, ম্যাগনা চার্টা, পিটিসন অফ্ রাইট্ ও বিল অফ্ রাইট্‌স্—এই তিনটী দলিল ইংলণ্ডের শাসন-পদ্ধতির মেরুদণ্ড স্বরূপ। প্রজাগণের বহুকাল-লব্ধ স্বত্ব-সুবিধা সুদৃঢ়ীকৃত করা হইয়াছে। এই স্থলে ম্যাক্ট্ অফ্ সেট্‌লমেন্টের উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। বিল্ অফ্ রাইটস্ পাশের স্বল্পকাল পরেই Act of Settlement পাশ হইয়াছিল।

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীসৌরেন্দ্রচন্দ্র দেব বি-এস্‌সি

টেলিফোণের কথা

বহু দূর ব্যবধান সত্বেও টেলিফোণে কথা চলা'তে, মনে হয়, অদূর-ভবিষ্যতে টেলিগ্রাফের ব্যবহার আর থাক্‌বে না। সম্প্রতি জন জে কার্টি (John J. Carty) নামক একজন মার্কিণ বৈজ্ঞানিক এক প্রকার নূতন ধরণের টেলিফোণ উদ্ভাবিত করেছেন, যদ্দ্বারা তিনি নিউ ইয়র্ক (New York) সহর থেকে বিলাতের লণ্ডন সহরে যে কোনও বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে কথা বল্‌তে পারবেন। এই
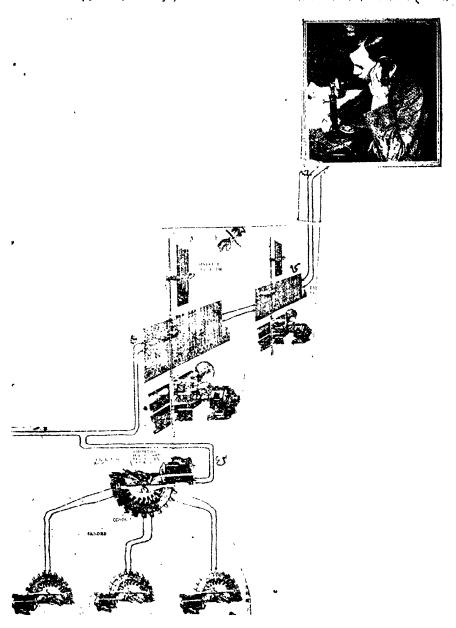
সংবাদ পাঠান। (ক চিহ্নিত স্থান থেকে সংবাদ প্রেরক নূতন টেলিফোণে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় সংযুক্ত করলে বার্ত্তা খ, গ, ঘ ঙ চ ছ চিহ্নিত স্থানের ভিতর দিয়ে গিয়ে সংবাদ-গ্রাহককে নিজের আগমন জানায় ; আর সংবাদ গ্রাহক জ চিহ্নিত স্থানের সাহায্যে সংবাদ শ্রবণ করে)

নূতন টেলিফোণের বিশেষত্ব হ'চ্ছে যে, এতে আহূতের সহিত সংযোগ ক'রে দেবার লোকের কোনও প্রয়োজন নাই, আহ্বায়ক নিজেই নিজের ইচ্ছা মত সংখ্যায় টেলিফোণ সংযুক্ত ক'রে কথা বল্‌তে পারেন।
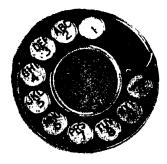
নূতন টেলিফোণের ডায়াল (Dial)
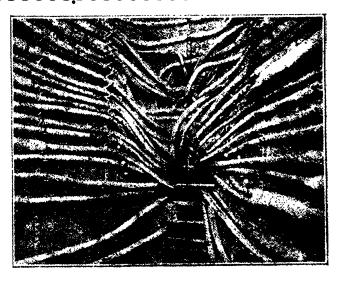
তারের কথা।
(নূতন টেলিফোণের আলমারীর পিছনে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার তার সংযুক্ত থাকে)
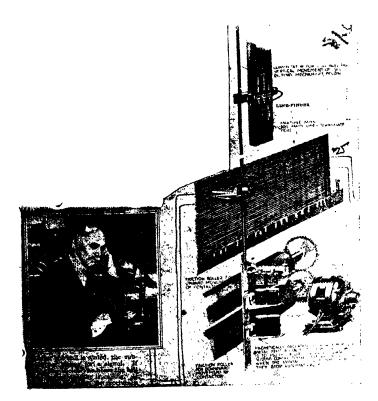
Commutator
(নীচেকার যন্ত্রপাতি সঠিক রাখবার যন্ত্র)
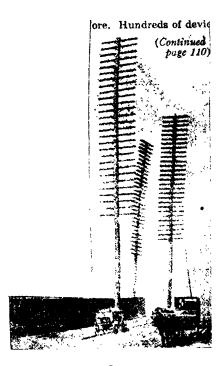
Post
নূতন টেলিফোণের পোষ্ট

John J. Carty সাহেব
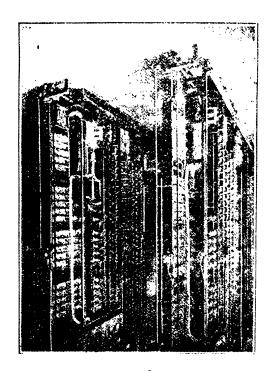
আলমারী

(এই আলমারিতে প্রত্যেক টেলিফোনের নম্বর সংযুক্ত থাকে। প্রয়োজন হলে নির্দ্দিষ্ট স্থানে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় সংযুক্ত ক'রে দিলে বাক্যালাপ করা যায়)
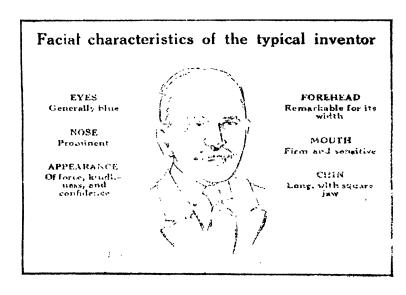
কুমেরু-যাত্রী

পৃথিবীর ইতিহাসে ভূগোলের বিস্তৃতি ও মানবের জ্ঞানের ভাণ্ডার বৃদ্ধি ক'রবার জন্য কত বৈজ্ঞানিক যে বিপদ সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছেন, তা' নির্ণয় ক'রা যায় না। স্যার আর্নেষ্ট সেক্লটন্ (Sir Earnest Shakleton) সেই যে ১৯২১ সালে বিমানপোতে কুমেরু যাত্রা ক'রেছিলেম, বহুকাল অতীত হ'ল তাঁর আর কোনও উদ্দেশ পাওয়া যায় নি। সম্ভবতঃ কুমেরুতে তাঁর তুষার-সমাধি
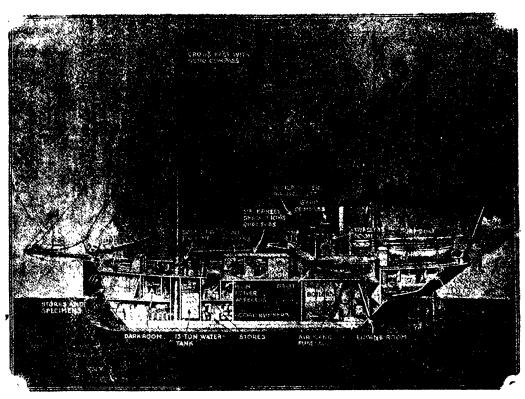
হ'য়েছে। সেকেল্টনের পর সেদিন কাপ্তেন আমুন্দসেনেরও সেই অবস্থা হয়েছিল,—তবে সৌভাগ্যের বিষয় যে জন্ম-বীজ হ'চ্ছে স্বর্ণাদি ধাতু। কিন্তু তাঁর ধারণা সমস্তই অমূলক, বলে প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন মিচিগান বিশ্ব-

বিমানপোত। (Shakleteton সাহেব এই বিমানপোতে ক'রে কুমেরু-যাত্রা করেছিলেন।)

কিছুদিন হ'ল তাঁর নিরাপদে ফিরে আসার সংবাদ পাওয়া গেছে।

পৃথিবীর জন্ম-রহস্য

প্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববিদ্ ওয়াশিংটন (Washington) সাহেব তাঁর "ভূততত্ত্বের ইতিহাসে" বলে গেছেন যে, পৃথিবীর আদি জন্ম-বীজ হ'চ্ছে স্বর্ণাদি ধাতু। কিন্তু তাঁর ধারণা সমস্তই অমূলক, বলে প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডাঃ উইলিয়াম, এইচ, হবস্ (Dr. William H. Hobbes)। তাঁর মতে পৃথিবীর আদি জন্মবীজ হ'চ্ছে লৌহ ও প্রস্তর। লৌহ ও প্রস্তর পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন প্রকারে নিহিত থাকায় পৃথিবীর অস্তিত্ব সম্ভব হ'য়েছে।

Hobbes সাহেব

Washingten সাহেব

পৃথিবীর জন্মরহস্যের আকর

জ্বালামুখীর জন্ম
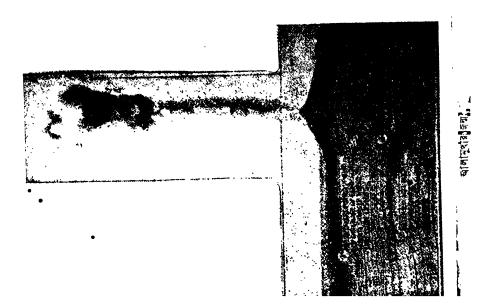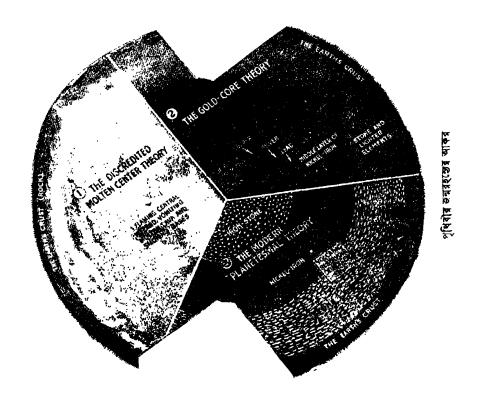
ছায়াচিত্রে বাস্তবতা

ছায়াচিত্রে নায়ক বা নায়িকার প্রেমালাপের সময় রক্তবর্ণ কপোল, বিষাদের সময় মুখের পাণ্ডুর আভা—এইগুলি অনেক সময় ছায়াচিত্রে প্রতিফলিত না হওয়ায় সুন্দর সুন্দর চিত্রগুলি অনেক সময় তাদের অনেক সৌন্দর্য্য হারিয়ে ফেলে। এই অসুবিধা দূর ক'রবার জন্ত ডাঃ ডানিয়েল ফ্রষ্ট কাউণ্টষ্টক্ (Dr. Daniel Frost

Frost সাহেব

ছায়াচিত্র
(Colour ক্যামেরা'র সাহায্যে তোলা ফটো)

Light Rays Split and Filtered in New Color Camera

THIS diagram explains in simplified form the ingenious process of color movie photography perfected by Dr. Daniel Frost Comstock and fully described in the accompanying article. Two photographs of an object, such as the flag shown above, are taken at the same instant through the single lens of the movie camera. Incoming light is split in half by a perforated mirror just back of the lens, one half being led through a color filter that allows only blue-green light to reach the film negative, the other half led through a second color filter that allows only red-orange light to pass to the film.

Thus the film negative of the flag, shown at the right (slightly reduced), consists of a succession of double images, alternating blue-green and red-orange impressions, but still in black and white. In the positive print of this negative, the blue-green and red-orange images are superimposed, one on the front, the other on the back of the positive film. The positive film then is dyed, the blue-green [illegible] blue-green dye and [illegible] ages red-orange dye.

When projected [illegible] film gives [illegible] the original [illegible]

Countstock) নামক একজন বৈজ্ঞানিক নূতন ধরণের এক প্রকার colour camera নির্ম্মাণ ক'রেছেন, যা'র মধ্য দিয়ে ছায়াচিত্র প্রতিফলিত হ'লে মুখভাবের সঙ্গে মুখের বর্ণ-পরিবর্ত্তনও সুস্পষ্ট ভাবে লক্ষ্য করা যাবে।

সহরের হাওয়া

বর্ত্তমান কালে আমাদের ভগ্ন-স্বাস্থ্য হ'বার কারণ হ'চ্ছে, সহরে বিশুদ্ধ বায়ুর একান্ত অভাব। যন্ত্র-রাজ্যের আধিপত্য আর কলকারখানার প্রাচুর্য্য প্রতি দিন এত

চোখের কাজ
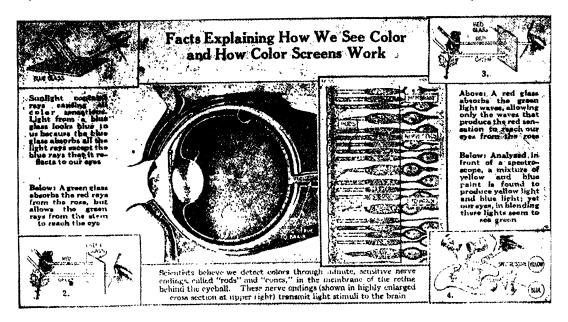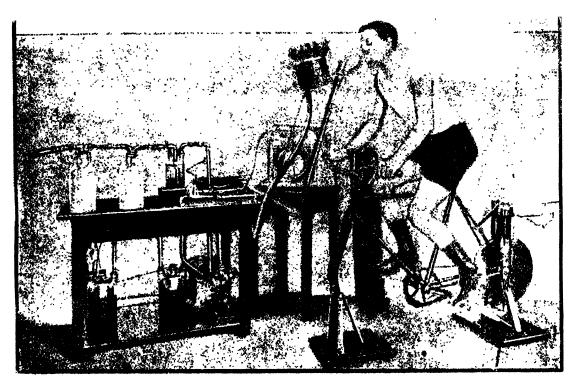
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হ'চ্ছে যে, সহরের বেশীর ভাগ স্থানই কারখানায় পরিণত হ'য়ে যা'চ্ছে। এই সব কারখানার চিমণী হইতে দিবারাত্রি দুর্গন্ধ ও দূষিত ধূম নির্গত হ'য়ে সহরের সমস্ত আবহাওয়া বিষাক্ত ক'রে তোলে। এই বিষাক্ত বায়ু দিবারাত্রি নিশ্বাসের সহিত শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হ'য়ে সহরবাসীর শরীর দূষিত ও বিষাক্ত হয়ে উঠে।

কর্ণের ব্যায়াম

একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক বলেন যে, বধিরতা প্রায় সমস্ত লোকেরই আছে; তবে কাহারও অধিক

কর্ণের ব্যায়াম (বৈজ্ঞানিক 'কর্ণের ব্যায়াম' ক'রবার প্রণালী শেখাচ্ছেন)

কাহারও বা অল্প। তবে যাঁহারা অধিক মাত্রায় বধির, তাঁদের শ্রবণ-শক্তি বৃদ্ধি ক'রবার জন্য নিয়মিত ভাবে কর্ণের ব্যায়াম করা উচিত; এবং সেই জন্য তিনি এক প্রকার যন্ত্রও আবিষ্কার ক'রেছেন, যদ্দ্বারা অল্লাধিক বধির ব্যক্তি নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম ক'র্‌লে শীঘ্রই নিরাময় হয়ে যায়। কিন্তু যাঁদের শ্রবণ-যন্ত্র একেবারে বিকল হ'য়ে গেছে—তাঁরা এই যন্ত্রে নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম ক'র্‌লেও কোনও সুফল পা'বার আশা যেন না করেন।

সংগ্রাম বনাম সভ্যতা
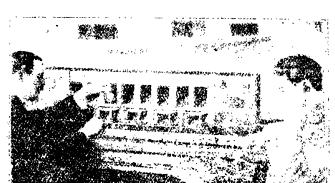
সংগ্রাম ও সভ্যতার মধ্যে চিরদিনের জন্য সাম্য থাকা অসম্ভব। আজ যে জাতি সভ্যতার উচ্চ শিখরে সুপ্রতিষ্ঠিত, কাল সংগ্রামের প্রকোপে সে জাতির সর্ব্বনাশ আর সঙ্গে সঙ্গে তা'র বিশাল গৌরবের সমাধি হ'য়ে থাকে। শুধু

সুখবার

সন্তান পালনে

যুদ্ধের পরিণাম

প্রাচীন চিত্রের নব কলেবর

অনেক সময় বহু প্রাচীন চিত্র পাওয়া গেলেও সেগুলি নূতন অবস্থায় কিরূপ ছিল তা' বোঝা যায় না। কারণ চিত্রগুলি ধুলায় ও অযত্নে এরূপ বিকৃত হ'য়ে থাকে যে, তা' পরিষ্কার ক'রতে গেলেও প্রাচীন চিত্রটি আবার নষ্ট হ'য়ে যায়। এই অসুবিধা দূর করবার জন্য এম্, ল্যামবার্ট (M. Lambert) নামক একজন নবীন চিত্রকর একপ্রকার অণুবীক্ষণ যন্ত্র উদ্ভাবিত ক'রেছেন, যা'র সাহায্যে, ধুলা থাকা সত্ত্বেও, পুরাতন চিত্রগুলি নূতন অবস্থায় কিরূপ ছিল, তা' ধরা যায়; এবং তদনুযায়ী পুরাতন চিত্রে নূতন রং দিয়ে তা'কে পূর্ব্বের ন্যায় নূতন ক'রা যায়।

প্রাচীন চিত্রের নবকলেবর (বৈজ্ঞানিকেরা যন্ত্রপরীক্ষা ক'রছেন)

সাপুড়ে

'বিরহী দেওয়ানা

শ্রীমুরলীধর গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ

(১)

সমস্ত দিন সে নেবুতলার মোড়ে বসিয়া জুতা সেলাই করিত। কত গ্রীষ্মের দারুণ রৌদ্র তাহার মাথার উপর দিয়া চলিয়া যাইত। কত বর্ষার ভীষণ প্লাবনে তাহার ছেঁড়া কুর্ত্তিটা ভিজিয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা ছিল না। কিন্তু তাহার প্রাণটা ছিল খুবই উদার। রাস্তায় অন্ধ, আতুর দেখিলে, সমস্ত দিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পয়সা ক'টা তাহাদের বিলাইয়া দিয়া, অনেক দিন সে রিক্তহস্তে গৃহে ফিরিয়া আসিত। তাই অনেকে অনুমান করিত, হয়ত চিরদিনই সে "মুচি" ছিল না। কে একজন বৃদ্ধ ফকির এক দিন বলিয়াছিল—'যৌবনে "বক্তার" খুব আমীর আদ্‌মি ছিল, তাই তা'র "দিল্" অত "পুরু"।'

ইহসংসারে তা'র একটিমাত্র মেয়ে ছাড়া আর কেহই ছিল না। সে মেয়েটির নাম রাখিয়াছিল "বেলা"। সমস্ত দিন জুতা সেলাই করিয়া যখন সে ঘরে ফিরিয়া আসিত, তখনই একরাশ বেলফুলের মত "বেলা" তা'র বাপের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িত। সেই মুহূর্ত্তে মুচির মনে হইত, যেন সে স্বর্গে আছে। বাস্তবিক মুচির ঘরে এমন মেয়ে দেখা যায় না।

নদীর বাঁকে, নির্জ্জন পল্লীপথে, ছোট একখানা মেটে ঘরে, তা'রা বাপ আর বেটীতে, একটা ছোটখাট সংসার পাতিয়াছিল। সে সংসারে, তোমার-আমার সংসারের মত কলহ, কচ্‌কচি ছিল না। সেখানে উচ্ছৃঙ্খল আকাঙ্ক্ষার তীব্র তাড়না ছিল না। মুচির ঘরে সর্ব্বদাই একটা স্নিগ্ধ শান্তি বিরাজ করিত। তখনকার দিনের কলিকাতা এত বড় ছিল না। তখন কোম্পানীর আমলের প্রথম যুগ মাত্র; তখনও গঙ্গার ধারের রাস্তার উপর অনেক মেটে ঘরই ছিল।

(২)

সন্ধ্যার ধূসর ছায়া স্তিমিত গোধূলির বুকে বিষাদের ছবি আঁকিয়া দিতেছিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে, তখনও নেবুতলার মোড়ে, দুই একজন বাদসাহী ফৌজ বেড়াইতেছিল। "বক্তার" পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধিয়া ব্যাগ ঘাড়ে করিয়া বাটী ফিরিবার উদ্‌যোগ করিতেছে মাত্র, এম্নি সময়ে একজন ওমরাহ গোছের মুসলমান, একজোড়া জরির জুতা সারাই-বার জন্য লইয়া আসিল। "মুচির" কিন্তু মেয়েটার জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। যে আসিয়াছিল, সে যে একজন ওমরাহ, তাই তাহার জুতা না সারিয়া ত উপায় নাই। তাই সে আবার ব্যাগ্‌টা খুলিল। ছেঁড়া কম্বলের টুক্‌রা-খানা বিছাইয়া, গাছের তলায় তাহার মিট্‌মিটে কেরো-সিনের ডিবাটা জ্বালাইয়া লইল। জুতা জোড়ার ছিন্ন স্থান অল্প সময়ের মধ্যেই সে বেমালুম করিয়া ফেলিল। সৌখীন ওমরাহ জুতা জোড়াটা দেখিয়া, আহ্লাদে মুচির হাতে একটা আস্‌রফি গুঁজিয়া দিয়া বিদায় হইল। মুচি, ওমরাহকে সাত সেলাম ঠুকিয়া বাড়ীর দিকে ফিরিল।

(৩)

আকাশে তখন মেঘ উঠিয়াছে; কড়্ কড়্ শব্দে ঘন ঘন গর্জ্জন আরম্ভ হইয়াছে। মুচির প্রাণের ভিতর তোলাপাড়া করিতেছিল। সে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইল। নিম্নে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি, উপরে অশনিসম্পাত। গঙ্গার ধারে, কাঁচা রাস্তায় যখন সে পৌছিল, তখন গঙ্গায় বান ডাকি-য়াছে। "মুচির" ক্ষুদ্র কুটীরের সম্মুখে একগলা জল হইয়াছিল। মুচিপাড়ার শেষ স্মৃতিটুকু পর্য্যন্ত তখন ভাগীরথী-বক্ষে মিলাইয়া গিয়াছে। "মুচি" একটা মর্ম্ম-ভেদী চীৎকারে গঙ্গাবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

(৪)

পলাশীক্ষেত্রে তখন রণডঙ্কা বাজিয়া উঠিয়াছে। কত আমীর-ওমরাহের তলব পড়িয়াছে; কত ইজারাদার, তহশীলদারের উপর নবাবের পরোয়ানা জারি হইয়াছে। মধ্যাহ্নের দীপ্ত সূর্য্য তখন মুর্শিদাবাদের বড় বড় রাজপথের উপর তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস ছড়াইয়া দিতেছিল। একজন ওম-রাহ সেই তপ্ত মধ্যাহ্নে, অশ্বারোহণে, পলাশী-প্রাঙ্গণে ছুটিয়াছিল। ওমরাহ যুবক। তাহার দীর্ঘ, উন্নত দেহে

লাবণ্যের লহর খেলিয়া যাইতেছিল। পথের পার্শ্বে সে দেখিল, একটা পাথরের উপর এক সুন্দরী যুবতী বসিয়া আছে। তাহার গোলাপী গণ্ডের উপর মধ্যাহ্নের সূর্য্যরশ্মি ঝিক্‌ঝিক্ করিতেছিল। ওমরাহ পথের মাঝে ঘোড়া থামাইল। সুন্দরী উঠিয়া দাঁড়াইয়া ওমরাহকে কুর্নিশ করিল। ওমরাহের নাম ছিল "হামিদ খাঁ"। হামিদখাঁর মনে হইল যেন কত যুগ-যুগান্তর পূর্ব্বে সে-ঐ রকম একখানা মুখ কোথায় দেখিয়াছিল। সে মুখ বোধ হয় কোনও যুবতীর ছিল না, বোধ হয় কোনও বৃদ্ধের ছিল। সে বৃদ্ধ কে? কোথায় বসতি? তাহা কিছুতেই তাহার স্মৃতির দুয়ারে উদয় হইল না। সে কত চেষ্টা করিল, কত ভাবিল, কিন্তু সেই যে একটা যুগান্তের বিস্মৃতির কালো যবনিকা, তাহা কিছুতেই অপসারিত হইল না। যুবক সম্মুখের চটিতে যাইয়া পার্শ্বচর হোসেনকে কি ইঙ্গিত করিল। হোসেন ছিল "কাফ্রি খোজা"। সে বড়ই বিশ্বস্ত। "নসির খাঁ" নবাব আলিবর্দ্দীর খুবই প্রিয়পাত্র ছিল। বৃদ্ধ আলিবর্দ্দীর দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই একে একে অতীত স্মৃতিগুলি সবই মুছিয়া যাইতে লাগিল। পুরাতনের ধ্বংসের বুকে তখন নূতনের আহ্বান আসিয়াছিল। সেই ভাঙ্গা-গড়ার দিনে মুসলমান ওমরাহ "হামিদ খাঁ", আলিবর্দ্দীর দৌহিত্র সিরাজের পার্শ্বে, পলাশীক্ষেত্রে যাইয়া দাঁড়াইল।

(৫)

খোজার হস্তে বিপন্না যুবতীর ভার ন্যস্ত করিয়া "হামিদ" ছুটিল মুসলমানের শেষ জীবন-যুদ্ধের শেষ-রক্ষার জন্য। বাঙ্গলার মসনদ তখন রাজনৈতিক ভূমিকম্পের তাণ্ডব সঙ্ঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছিল। পলাশীক্ষেত্রে রণদামামা বাজিয়া উঠিল। মধ্যাহ্নের মধ্যপ্রহরে অকস্মাৎ কোথা হইতে একটা রক্তিম গোলা ছুটিয়া আসিল। দূরে, আমগাছের ফাঁকে একটা বন্দুকের আওয়াজ হইল। কে একজন অলক্ষ্যে থাকিয়া বন্দুক ছাড়িতেছিল। অব্যর্থ তার সন্ধান, একজন ইংরেজ সৈনিক হত হইল, দুইজন আহত হইল। "হামিদের" মাথায় তাহারাই তরবারি তুলিয়াছিল।

পলাশীর যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল।

যুদ্ধশেষে "ওমরাহ" চটিতে ফিরিয়া আসিল। ক্ষুদ্র কুটীরের মেঝেতে একখানা কাশ্মীরি শাল জড়াইয়া, রক্তাক্ত-কলেবরে যেন একছড়া রক্ত-করবীর মালা পড়িয়া ছিল,—তাহার সর্ব্বাঙ্গে লোহিত রক্তের তরঙ্গ খেলিতেছিল।

ওমরাহ—কি কর্‌লে পিয়ারি!

পিয়ারি—কিছু নয় হামিদ। যাকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছি, তার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়ে যে কত সুখ, তা' যে বোঝাবার যো নেই প্রিয়তম! এস আমার চিরবাঞ্ছিত, কাছে এস, মনে পড়ে আজ সেই অতীতের স্মৃতি;—তুমি যখন গঙ্গার ধারে ঘোড়া ছুটিয়ে চ'লে যেতে, তখন ক্ষুদ্র কুঁড়ে ঘরের দাওয়ায় একটী ছোট মেয়ে ব'সে থাক্‌ত। মাঝে-মাঝে তুমি তাকে সোহাগ ক'রে গাল টিপে দিতে; খাবার কিনে দিতে। সাম্‌নে দিয়ে ভাদ্রের গঙ্গা তরঙ্গে তরঙ্গে, রঙ্গে রঙ্গে, হাসির লহর তু'লে, উজান ব'য়ে চ'লে যেত। ছোট মেয়েটির বাপ সমস্ত দিন পরে জুতো সেলাই ক'রে বাড়ী ফিরে আস্‌ত। তখন বাপে আর বেটীতে, সেই ভাঙ্গা কুঁড়েটাকে স্নেহ-বাৎসল্যের করুণ সঙ্গীতে মুখরিত ক'রে তুল্‌ত। তুমি আমাদের সেই স্বর্গীয় সারল্যে মুগ্ধ হয়ে মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে ব'লে উঠ্‌তে—"এ রত্ন কখনও মুচির ঘরে জন্মে না; এরা নিশ্চয় ওমরাহের ঘরে জন্মেছে।" বাবা তখন একটু মুচ্‌কি হেসে, একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্‌তেন; যেন তার কত দিনের ব্যথার বোঝাটা হঠাৎ নূতন ক'রে বুকে চেপে বস্‌ত। তুমি হয়ত ভাব্‌ছ—আমি এত কথা গুছিয়ে বল্‌তে শিখ্‌লুম কোত্থেকে?

হামিদ—এ্যাঁ! তুমি কি বল্‌ছ, রসো, একবার ভেবে দেখি। সে আজ কত যুগের কথা!

পিয়ারি—হাঁ সাহেব। তার পর আমি বানের জলে ভেসে গিয়েছিলাম। বাবা আমায় খুঁজ্‌তে গিয়ে ম'রে গেলেন। "জাফরালীর" নকিব আমায় বাঁচিয়েছিল। সেই থেকে তাঁ'রই ঘরে মানুষ হয়েছিলাম। মহীয়সী "মণি-বেগম সাহেবা" আমাকে বড়ই স্নেহের চক্ষে দেখ্‌তেন। তাঁ'রই কাছ থেকে আমার লেখা পড়া এবং যা কিছু সামান্য যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা হয়েছিল। তার পর যেদিন জানলাম........; যুবতী বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। হোসেন এক গ্লাস সরাব লইয়া আসিল। সরাব পান করিয়া যুবতী পুনরায় বলিল,—হামিদ, যে দিন জান্‌লাম,

তুমি নবাবকে কত ভালবাস, সেই দিন থেকে মীরজাফরের আশ্রয় ত্যাগ কর্লাম; মণিবেগমের স্নেহের ডোর ছিঁড়ে চ'লে এলাম এক অজানার সন্ধানে। গাঁয়ের লোকের সাহায্যে হাতের পুঁজি দিয়ে "গম্" আনিয়ে তাই পিষে বাজারে পাঠিয়ে দিতুম, তাতেই এক রকমে দিন চ'লে যেত। প্রথম প্রথম খুবই কষ্ট হ'ত। নবাব মীরজাফরের "হারেমের" সুখ ঐশ্বর্য্যে বেড়ে উঠে, তার পর অতটা কষ্ট! কিন্তু যখনই আমার প্রিয়তমের মুখখানা মনে পড়ত, তখন সব দুঃখ, সব কষ্ট আমার প্রাণে একটা আনন্দের মুক্ত উচ্ছ্বাস ঢেলে দিয়ে যেত। সে আজ কত যুগের কথা। হঠাৎ তোমায় দেখ্লাম জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে। মণিবেগমের বাঁদির সঙ্গে খুবই ভাব ছিল, তা'রই সাহায্যে সেই মহালে যে সব ভাল বন্দুক, টোটা থাকৃত, তাই থেকে একটা ভাল বন্দুক আর টোটা নিয়ে ছুটে এলাম তোমার প্রাণ রক্ষা কর্ব্বার জন্যে। আমার কাজ ফুরিয়ে গেছে; আমার সাধ মিটে গেছে। তোমার কাছে আমার ইহজন্মের প্রার্থনা রইল, যেন পরজন্মে তোমাকেই পা'ই।

হামিদ খাঁর চোখ দুটো তখন লাল টক্‌টকে হইয়া গিয়াছে; তা'র বুকের ভিতরের একটা যন্ত্র বুঝি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সে, "পিয়ারি" "পিয়ারি" বলিয়া পিয়ারিকে বুকে জড়াইয়া ধরিল।

একটু পরেই হাকিম আসিয়া ক্ষত স্থান বাঁধিয়া দিল; ঔষধ দিয়া গেল। কিন্তু "পিয়ারি"র যাত্রা শেষ হইয়া গেল। পলাশীর শেষ গরিমার সূর্য্যের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই হামিদের প্রেম-প্রতিমা অস্তাচলে ডুবিয়া গেল।

(৬)

সন্ধ্যার অন্ধকারে, ব্যথাভরা বুকে, পিপাসিত, আকুল চিত্তে হামিদ যখন একটা মস্‌জিদের ফটকে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সে দেখিল, এক জরাজীর্ণ বৃদ্ধ সেই মস্‌জিদের নীচের সিঁড়িতে বসিয়া আছে। রাস্তার আলোতে তার বড় বড় চোখ দুটা জল্ জল্ করিতেছিল,—দেখিয়া মনে হয়, যেন সে এপারের সুখ-দুঃখের কোনই ধার ধারে না। হামিদ তখন শ্রমক্লান্ত দেহ, রণশ্রান্ত মন লইয়া মস্‌জিদের উপর হইতে মর্ম্মভেদী স্বরে ডাক দিল—বক্তার!

সে চমকিয়া উঠিল। এতকাল ত কেহ তাহাকে ঐ নাম ধরিয়া ডাকে নাই। তাহার বক্ষপঞ্জরের ভিতর হইতে কে যেন তা'র ইহ-পরকালের আপনার জনের সন্ধানের আশ্বাস দিয়া গেল। সে ধীরে ধীরে ওমরাহের হাত ধরিয়া উপরে উঠিল। হামিদের অতীত জীবনের কাহিনীটা শেষ হইয়া গেলে, সে "বেলার" কথা বলিয়া গেল। বক্তার শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িল। হামিদ তন্ময় হইয়া বলিয়া যাইতেছিল। যখন তার কাহিনী শেষ করিয়া সে বেলার একখানা পত্র (যাতে তাদের বনেদী বংশ পরিচয়ের কথা এবং তুর্কির বাদসাহের মোহর চিহ্ন ছিল) তাহার হাতে তুলিয়া দিতে যাইবে, সে দেখিল বক্তার তখন সব বলা-কওয়ার পরপারে চলিয়া গিয়াছে। হামিদ দু'চারবার "বক্তার", "বক্তার" বলিয়া চীৎকার করিল, তখন সহরতলীর "ফটক" বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সেই নিশীথ নিস্তব্ধতায়, অদূরে পলাশীর পথে, একটা শান্ত কবর হইতে কি যেন করুণ সঙ্গীত ভাসিয়া আসিতেছিল।

পরদিন হামিদ পিয়ারির কবরের পাশে "বক্তারের" কবর শেষ করিয়া, সেইখানে অল্প দিনের মধ্যে এক বিশাল মস্‌জিদ তৈরী করিয়া দিল। তার পর সে মক্কা চলিয়া গেল। সর্ব্বধ্বংসী কাল সেই মস্‌জিদের ভগ্ন দেউলে এখন শৃগালের আবাসভূমির সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু, এখনও মাঝে-মাঝে দুরাগত পথিক পলাশীর পথে, নিস্তব্ধ রাত্রে, সেই জীর্ণ মস্‌জিদের মধ্য হইতে কি যেন করুণ সঙ্গীত শুনিতে পায়। কিংবদন্তী বলে,—কোন্ বিরহী দেওয়ানা বুঝি তা'র প্রেমিকের জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারারাত, প্রেমসঙ্গীতে, নির্জ্জনে পুঞ্জীভূত ব্যথার বোঝা নামাইয়া রাখে।

নিষ্ফল নিশা

শ্রীনরেন্দ্র দেব

সাঁঝের প্রদীপ-শিখা যেই
একে একে এই
ধরণীর মন্দিরে মন্দিরে—
জ্বলে ওঠে ধীরে;
গগনের নীল সভাতলে
দলে দলে
তরুণী তারার দল নিয়ে
তালি দিয়ে
যৌবন-উল্লাসে
চাঁদ আসে
জাগিতে বাসর;
যামিনীর মিলন-আসর
আলো করি রূপে,
অলোক-ঐশ্বর্য্য হারে
আপনারে
ভরি চুপে চুপে,
জ্যোছনা নাচিতে যবে নামে,
নিত্য সে যে থামে
তোমারই এ বাতায়নে এসে,
উঁকি মেরে অতি স্নিগ্ধ হেসে
বলে, এসো সই—
তোমাতে আমাতে আজ প্রাণ খুলে দু'টো কথা কই;
এস প্রিয় এস আজ
দূরে ফেলে সব লাজ—
ছিঁড়ে ফেলে সকল বাঁধন;
নিশিদিন অকারণ বুকভরা ল'য়ে এ কাঁদন
কেন মিছে রচিতেছ ক্ষুব্ধ-ক্ষুণ্ণ-খর-ক্ষুধানলে
প্রতি পলে পলে
ব্যাকুল বুকের চারিপাশে
তীব্র তপ্ত সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসে
তৃষাতুর শুষ্ক মরুভূমি!

জানো না কি তুমি
ওগো বিশ্বপ্রিয়া,
নিখিল বিরহী-জন-হিয়া
তোমারে চাহিয়া
ফিরিতেছে কেঁদে!
তবু কি পাষাণে বুক বেঁধে—
ওগো মম
চির-প্রিয়তম,
মরমের মানসী মধুর,
জীবনে বিমুখ করি চিরদিন রবে হেনদূর?
প্রেম যে দাঁড়াল' এসে
ভালবেসে
তোমার নিভৃত তরুতলে;
পরাইয়া দিতে গলে
সে আজি আপন হাতে
মধুরাতে
গাঁথিয়া এনেছে ওগো বালা,
আকুল-বকুল-ফুল-মালা!
প্রতি দিবসের মতো আজও তার বুকে শেল হানি
ফিরাইয়া দিবে কি গো রাণী?
নিরাশার জন-শূন্য পথে,
লক্ষ্যহীন সে কি কোনও মতে
অসাড় এ জীবনেরে টানি
নিয়ত চলিবে পাছে পাছে?
এখনও সময় আছে,
এস কাছে,—
উদ্গত আঁখির জল রুদ্ধ করি মর্ম্ম-বেদনায়
জীবনের দিন সই অকারণ বৃথা বয়ে যায়!
সুদিন আসিয়াছিল যত
একে একে নিষ্ফল হইয়া ক্রমাগত
অনন্ত আঁধারে গেছে ডুবে!

হায় শুভে,
মিলন-যামিনী আসে যায়,
সে র'হেনা কারো প্রতীক্ষায় ;
খুলে দে' খুলে দে' বাতায়ন,
কথা শোন্,
ওরে ও অভাগী !
সকাতর আঁখি দু'টি তুলি কেন শুধু ক্ষমা নিস্ মাগি ?
প্রতিদিন বুকভাঙা দুঃখে
ম্লান মুখে
অসিত গুণ্ঠনখানি টানি
এ কোন্ দুর্ভেদ্য ব্যূহে আপনারে ঘেরিতেছ রাণী ?
আঘাত করিয়া যার
অন্ধকার
অবরুদ্ধ দ্বারে
ব্যর্থ হ'য়ে ফেরে বারে বারে
প্রেমের অনন্ত সাধা-সাধি !
তবে কি ও জীবনের যৌবনেই হ'য়েছে সমাধি ?
তাই কি পিঞ্জরে ঘিরে
শৃঙ্খলিত চিত্তটিরে
রাখিয়াছ সদা সঙ্গোপনে
প্রতিক্ষণে
অতি সাবধানে
শাস্ত্রের জটিল জালে আবরিয়া অন্তর শ্মশানে
সর্ব্বলোক-দৃষ্টি-অন্তরালে !
কোনও দিন কভু কোনও কালে
কাহারও চরণ ধ্বনি—করুণ আহ্বান
উদ্বেলিত করি তব প্রাণ
পশিবে না সেথা একেবারে ?
নিষেধ-নিগড়ে নিপীড়িত অসহায় দীর্ণ হাহাকারে
চিরনিশি একা সে কি যাপিবে যামিনী ?
লো সুর-কামিনী,
তা কি কভু হয় ?
সৃষ্টির বিচিত্র লীলা মানবের ছেলে-খেলা নয় ;
বন্যা যবে আসে উন্মাদিনী,
শীর্ণ স্রোতস্বিনী
সহসা হইয়া স্ফীত, উচ্ছ্বসিত মত্ত কুতুহ'লে
দুকূল প্লাবিয়া ছুটে চলে !
তারে কি গো ধ'রে রাখা যায়
পরমার্থ তত্ত্ব দিয়া, স্তূপাকার নীতির কথায়
প্রাণপণে বেঁধে চারিধার ?
নিশ্চিত এ মরণের অনিশ্চিত গ'ড়ে পরপার
উপবাস-ক্লিষ্ট কল্পনায়.
কে বাঁচে কোথায় ?
তুমি তবে অকারণে চিরদিন রবে বলো কেন
জড় হেন
অচল অটল ?
মাটির-প্রতিমা সাজি প্রাণ-দেবতারে দেবী কোর না বিফল !

* * *

জ্যোছনা মিলায়ে যায়
আপনার রূপের আভায়
নিশান্তে নিদ্রিত চাঁদে চুমি ধীরে ধীরে,
গাঢ় আলিঙ্গন দিয়া অনুরাগে প্রভাত-সমীরে
প্রণয়িনী সম,
অধীর অধর-প্রান্তে ফুটাইয়া অতি অনুপম
বিদায়ের ক্ষীণ হাস্য-রেখা
উষার উদয়-লেখা
গগনের ভালে
দুখ-দীপ্ত দিনের মশালে
ঢেকে দেয় ম্লান শুক-তারা ;
অশান্ত বালক সম বালসূর্য্য চির-ধৈর্য্য-হারা
মুছে দেয় ধরণীর সীমন্তের সমুজ্জ্বল টিপ
রজনীর আনন্দের অনাদৃত আরতি-প্রদীপ
একে একে কেঁদে নিভে যায়
পাণ্ডুর শোভায়
নিভিত যেমতি প্রতি রাতে,
নিবিড় নিষ্ফল বেদনাতে !

নিরঞ্জন

শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ ক'দিন ধরিয়া খুব চাপিয়া শীত পড়িয়াছে। একটু আগেই চারিদিক নিবিড় কুয়াসায় আচ্ছন্ন ছিল, সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা মিলাইয়া গিয়াছে। বাহিরের বাগানে পাতা-বাহারের গাছগুলি হইতে মুক্তার মত শিশির-বিন্দু তখনো ঝরিতেছিল। বেলা প্রায় আটটা বাজে। দোতালার ঘরে খাটের উপর বসিয়া অমিয় কি লিখিতেছিল···সামনে একখানা খোলা "নিমন্ত্রণ পত্র"। লেখা শেষ হইলে, অমিয় পাশের খোলা জানালার ভিতর দিয়া নীল আকাশের একখণ্ড ছোট শুভ্র সঙ্গি-হারা মেঘের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। কখন যে প্রভাত-অরুণের হেমরশ্মি তাহার সোণালী পা ফেলিয়া চুপে চুপে আসিয়া তাহাকে স্পর্শ করিয়াছে তাহা সে খেয়ালই করে নাই।

পাশে টিপয়ের উপর পেয়ালাপূর্ণ চা—চাকর কখন রাখিয়া গিয়াছে, সেই জিনিসটির সদ্ব্যবহার করিবার কথা কেহ তাহাকে মনে করিয়া দেয় নাই বলিয়াই বোধ হয় তাহা জুড়াইয়া ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। এ সত্যটি সরযূ বিশেষ করিয়াই জানিত। তাই এই আপন ভোলা স্বামীটির ক্ষুধা পাইবার কথাও মনে করিয়া দিবার ভার ইচ্ছা করিয়াই সে নিজের ঘাড়ে লইয়াছিল। এ দায়টি যে নিতান্ত তাহারই, এ কথা তাহার চেয়ে আর কেহ বুঝিত না। সকল কাজের মাঝেও তাহার হৃদয়ের সমস্ত অনুভূতি এই ভোলানাথ স্বামীর অভিমুখে সদাই সজাগ হইয়া থাকিত।

সরযূ পিছনের দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহার স্বামী আকাশের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে, এবং হাতের কলমের একটা দিক দাঁতে কাটিতেছে! নিঃশব্দে খাবারের রেকাব ও জলপূর্ণ গ্লাসটা রাখিয়া যেমন সে বাহির হইবে, অমনি পশ্চাৎ হইতে দুইখানি বলিষ্ঠ পরিচিত প্রিয় হাত তাহাকে নিবিড় আলিঙ্গনে বেষ্টন করিয়া ধরিল।

"তবে রে দুষ্টু......ভেবেছিলে চুপে চুপে পালিয়ে যাবে···কেমন?···এখন···?"

"লক্ষীটি ছাড়: ছাড়...এখ্খুনি কেউ এসে পড়বে... দরজা খোলা···কেউ দেখ্‌লে ভারি ঠাট্টা করবে...না... সত্যি···উঃ···আঃ—"

সরযূর মুখ বন্ধ হইল। তাহার দেহখানি এখন সম্পূর্ণরূপে অমিয়ের আয়ত্তের মধ্যে দেখিয়া, নিতান্ত অসহায় ভাবে সে কহিল "এমন করলে আর কখ্খনো দিনের বেলায় তোমার ঘরে আসব না কিন্তু···খাবার দিয়ে এসে মা আমায় চন্দন ঘষে রাখতে বলেছেন...দেরী হলে কি ভাববেন বল ত?"

সরযূর হৃদয়ের প্রত্যেক ঘাত-প্রতিঘাতগুলি বুঝি তখন অমিয়ের হৃদয়ে সজোরে আঘাত করিতেছিল। স্নিগ্ধ পুষ্প-সৌরভপূর্ণ অলকগুচ্ছ শিথিল ভাবে তাহার বাহু-পার্শ্বে দুলিতেছিল, মৃদু সুগন্ধ প্রতি নিশ্বাসের সঙ্গে প্রবেশ করিয়া তাহার হৃদয়খানিকে মথিত করিয়া তুলিতেছিল। অমিয় হাসিয়া কহিল, "মা কি ভাব্‌বেন শুনি?"

উঠিয়া যাইবার কিছুমাত্র প্রয়াস না করিয়া সরযূ কহিল, "ভাববেন—কি বেহায়া মেয়ে...তোমার আর কি? ···সব দোষ আমার ঘাড়েই পড়বে!"

মুচ্‌কী হাসিয়া অমিয় বলিল, "মিথ্যা বল্‌তে যখন তুমি নারাজ, তখন সত্যি কথাই বোলো...বোলো যে আমায় ছেড়ে দেয়নি!"

—"আহা কি কথাই বল্লেন!···ঐ কথা মাকে বলা যায়?...পাস্ করলে লোকে বলে বুদ্ধি হয়...ছাই হয়... মাথা হয়···সত্যি ছাড়···কাজ আছে! তুমি খাবারটা খেয়ে নাও, আমি রেকাবীটা নিয়ে যাই।"

"খালি যাই যাই, আর কাজ কাজ! কি তোমার এত কাজ শুনি?...গণ্ডাখানেক ঝি-চাকর রয়েছে, তবু তোমার কাজই ফুরোয় না!...বেস্ বল, আর ক'জন

ঝি-চাকর চাই—আমি না হয় আজই এনে দিচ্ছি !… প্রাণভরে এক মিনিট যে কথা কইব—"

"এক মিনিট !……এই বুঝি তোমার এক মিনিট !… সারা রাত্রেও বুঝি এক মিনিট হয় না !"

অমিয় কহিল, "তা না-ই হোক, তোমায় কাজ করতে হবে না। কাজ করাবার জন্যে তোমায় বুঝি বিয়ে ক'রে এনেছি ?"

"না, তা কেন, রাত-দিন তোমার কাছে হাজির থাকলেই বুঝি কাজ হবে !…লোকে তাহ'লে আমায় খুব সুখ্যাত করবে, না ?"

মুখখানা গম্ভীর করিয়া অমিয় কহিল, "তাই ত ! বেজায় নিন্দা করবে তাহ'লে…আর মুখ দেখাতে পারবে না…কি অপকর্ম্মই কচ্ছ !—"

"যাও, তুমি ভারি ই'য়ে—আচ্ছা, তোমার কি ক্ষিধে তেষ্টাও পায় না ?…চা-টাও ত পড়ে আছে দেখছি !"

অমিয় উদাস কণ্ঠে কহিল, "ক্ষিধে-তেষ্টা ত সকাল থেকেই পেয়েছে, কিন্তু তাতে কারই বা কি এসে যায়… কেউ ত তা দেখবার জন্য এ দিকও মাড়ায় না……এলেও কাজ আর কাজ, যাই আর যাই……"

"খুব সত্যি কথাগুলো বল্‌ছ, যা'হোক্ ! কখন থেকে খাবার এনে খোসামোদ করছি, সে কথা কাণেই তুলছ না ! ক্ষিধে যে পেয়েছিল, এ কথা একটুও বোঝা যাচ্ছে না !"

অমিয় হাসিয়া কহিল, "ক্ষিধেটা এখন মিটে গেছে। তোমার ঐ অধরের—"

সরযূ অমিয়র মুখে হাত চাপা দিয়া কহিল, "থাক্ থাক্ কবি মশাই !…কবিত্ব রেখে এখন ঐ রেকাবীর দিকে নজর করুন।…জানি না বাবু, কি যে রাত দিন ছাই-পাশ লেখা হচ্ছে ! আমি এক দিন টেনে ওসবগুলো কুচি কুচি করে ছিঁড়ে আগুন ধরিয়ে দোব !"

"কেন, ওদের অপরাধ ?"

"অপরাধ ! অপরাধ ষোল আনা—ওরাই হয়েছে আমার—"

—"বল, বল, ওরা তোমার কি হয়েছে—"

"যাও—আমি জানি না !" একটুখানি থামিয়া সরযূ পুনরায় কহিল "ওরা হয়েছে যেন আমার সতীন !"

অমিয় হাসিয়া কহিল, "ওঃ ! তাই বুঝি এত হিংসে ?… আচ্ছা সরযূ, বলতে পার, মেয়েমানুষের সতীনের ওপর এত হিংসে হয় কেন ?…আমাদের যদি সতীন হবার ব্যবস্থা থাকতো, সত্যি বলছি সরযূ, তাহ'লে দুজনে মিলে তোমায় যা ভালটা বাস্‌তাম…"

রাগে অভিমানে সরযূর মুখখানা রাঙা হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি কহিল "ফের ! ফের…ওরকম বল্লে সত্যি আমি আসব না…কখ্‌খনো না…কথার ছিরি ঘ্যাখো !"

"কেন, কিছু অন্যায় বলেছি কি ? পুরুষ মানুষ যখন দুটো বিয়ে কর্‌তে পারে, তখন মেয়েরাই বা না পারবে কেন ?"

"তাই বুঝি মেয়েদের করতে আছে ?"

"নেই কেন ?"

—"জানি না বাবু ! মেয়েদের কথা, মেয়েরা বুঝবে… তোমার এত মাথা-ব্যথা কেন ?….. হ্যাঁ, দেখ, একটা কথা তোমায় বল্‌তে ভুলে গেছি। সবিতার বিয়ের ত আজও কিছু ঠিক হ'ল না !…সবিতা গো !…সেই যে আমার খুড়তুত বোন.. তুমি ত দেখেছ তাকে, মনে পড়ছে না ?"

অমিয় হাসিয়া কহিল, "মনে আর পড়ছে না,…খুবই মনে পড়ছে…বিশেষতঃ যখন সম্পর্কে শালি !… তাতে আবার বেস্ ডাগোর ডোগর !"

"সব সময়েই তোমার ঠাট্টা…শোন…না হলে আমি চলে যাই।"

সরযূর হাত ধরিয়া অমিয় বলিল, "বল, বল।"

"কাকা লিখেছেন, যদি তোমার সন্ধানে কোন ভাল পাত্র থাকে।…বেশী কিছু দিতে পারবেন না…আর ত রাখাও চলে না ! দেখতে শুনতে ত আর মন্দ নয়…ঐ রংটাই যা…"

"বেস্ ত, বেস্ ত…আমি ত আর নেহাৎ অপাত্র নই…আর দেখতে শুনতেও যে একেবারে লোহার কার্ত্তিক, এ কথাও তুমি বল্‌তে পার না !…আমার সঙ্গেই কেন হ'য়ে যাক্ না—"

"সব তাতেই তোমার ঠাট্টা—যাও !"

"যেও না, যেও না, সত্যি বলছি, ঠাট্টা নয়…একবার ত একটা মেকা জিনিস দিয়ে—"

"থামো থামো, আর বলতে হবে না…এই মেকীর

জন্যই হেঁটে হেঁটে তোমাদের পায়ের জুতো ছিঁড়ে গিয়েছিল—"

"সেই জন্যই ত বলছি যে, এবার এমন একজনকে আনা যাবে, যার গুমোর থাকবে না...আর সুন্দর যা, তা ত দেখাই যাচ্ছে...একবার কালই না হয় পরখ করা যাক্।"

"বেশ্ ত, বেশ্ ত...কর্ না...সত্যি বলছি, একটি ভাল মেয়ে দেখে বিয়ে কর না। সে কত তোমার কাজ করবে...কত সেবা-যত্ন করবে...তোমার ঠিক উপযুক্ত... মনের মতনটি হবে—আমি সত্যি খুব খুসী হব।" শেষের দিকে সরযূর গলা ধরিয়া আসিল।

অমিয় তাহা লক্ষ্য না করিয়া কহিল, "বড় সাহস দেখছি যে···ভাবছ, আমি বুঝি আর বিয়ে করতে পারি না...কেমন!"

—"কেন পারবে না! পুরুষ মানুষদের ঐখানেই ত বিশেষত্ব।...থাক্ সে কথা! সত্যি···মানুষ কে ক'দিন বাঁচে, সে কথা ত কেউ বলতে পারে না।···ধর, যদি আমি হঠাৎ মরেই যাই, তবু জানব তোমার অযত্ন হবে না!... আমি কিন্তু মেয়ে দেখে দেব!...আচ্ছা···হাঁগা, আমার কথা তা হলে তুমি ভুলে যাবে?" একটা অনিশ্চিত বেদনার আঘাত সরযূর অন্তরে বাজিল। দুই বিন্দু অশ্রু তাহার আর্দ্র চক্ষু দিয়া ঝরিয়া পড়িল।

অমিয় ক্ষণকালের জন্যও মনে মনে সরযূর অভাব কল্পনা করিয়া শিহরিয়া উঠিল। তাহাকে আরও নিবিড় ভাবে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "সরযূ, তোমাকে হারাবার কথা মনে হলেই আমার বড় ভয় হয়,···মনে হয়, আমার চারি ধারের আলো যেন নিভে গেছে। কাল রাত্রে যখন তুমি ঘুমুচ্ছিলে, জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে তোমার মুখের ওপর পড়েছিল! সে কী সুন্দর! মনে হল, এই আমার সরযূ, একে যদি আমি হারাই, তা'হলে আমি বাঁচব না! বুকের ভিতর যেন কেমন করে উঠল, তাই তোমায় ঠেলে তুলেছিলুম।"

সরযূ কহিল, "ওমা, আমি মনে করেছিলুম, সকাল হয়েছে বলে তুলে দিচ্ছ!"

"সরযূ, আমায় ছেড়ে কোথাও যাবে না বল?"

"কোথায় যাব? তোমায় ছেড়ে যেতে আমার কি কষ্ট হবে না? এখন খেয়ে নাও লক্ষ্মীটি, মা হয় ত আমার জন্যে বসে আছেন!"

অমিয় অনিচ্ছার সহিত সরযূকে মুক্তি দিয়া খাবারের রেকাবীটা টানিয়া লইল। "এখন এত খাব না, বেলা হয়েছে, তুমি কিছু খাও!"

সরযূ হঠাৎ হাসিয়া তাহাকে একটু ঠেলিয়া দিয়া কহিল, "যাও, সত্যি, খেয়ে নাও, আমার কাজ আছে।"

"—'যাও' কেন, তোমাদের বুঝি ক্ষিধে পেতে নেই, হাওয়া খেলেই বুঝি চলবে?"

"হাওয়া খেয়ে না চলুক, বেটা ছেলের মতন ঘণ্টায় ঘণ্টায় খেলে আমরা—"

"খেতে দিয়ে আবার বদনাম করা হচ্ছে? আমি ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাই, আমি পেটুক, আমি রাক্ষস—"

সরযূ লজ্জিত হইয়া বলিল, "আমি সে কথা বলিনি! যাদের যা অভ্যাস, তা না করলে চলবে কেন? এই যে, তোমরা সিগারেট খাও, আমাদের কি তাই বলে খেতে হবে?"

অমিয় সরযূর হাত ধরিয়া কহিল, "এইটুকু খাও; কিছু দোষ হবে না, তার পরে যত কাজ আছে গিয়ে কর...... ও "না না" আমি শুনব না। বেস্, আমিও খাব না...... সত্যি, আমার বড় ক্ষিধে পেয়েছে, এইটুকু খেয়ে নাও।"

সরযূ হাসিয়া কহিল, "বেশ মজার লোক ত তুমি,— ক্ষিধে পেলে তোমার, খাব আমি?"

"হ্যাঁ, খাবে তুমি। সত্যি, নাও বলছি; একটা কথা রাখবে না? খাও লক্ষ্মীটি, সেই ফুলশয্যার রাত্রের মত একসঙ্গে—"

"দেৎ! আচ্ছা, তুমি খেয়ে নাও; তার পর পাতে থাকলে—" অমিয় একটা সন্দেশ লইয়া সরযূর মুখে চাপিয়া ধরিয়া হাসিয়া কহিল, "খাও বলছি—"

সরযূ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। অমিয় সন্দেশের অর্দ্ধেকটা মুখে ফেলিয়া দিতেই কহিল, "ওমা, তুমি আমার এঁটো খেলে?"

"তাই ত, জাত গেল যে! কি লোকের বোন—"

"নাও, শিগ্‌গির খেয়ে নাও, আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে।"

"কেন, আজ তোমাদের কেরানী বাবুদের মতন "মেল ডে" না কি?"

সরযূ হাসিয়া কহিল, "হ্যাঁ! এই নাও, পান নাও!"

"এটিও প্রসাদ হয়ে যাক্‌।"

"না, তাহ'লে ধরা পড়ে যাব! ওরা সব বলবে, বৌ দাদার মুখ থেকে পান খেয়েছে।"

"তা বলুক, তোমায় খেতে হবে!"

"আচ্ছা, এ কি জুলুম বল ত?"

"হ্যাঁ, জুলুমই ত। তুমি যে আমার নিজস্ব! এই তোমার চাঁপার মতন আঙ্গুলগুলি, এই কোঁক্‌ড়ান কাল চুলগুলি, এই সুন্দর চোখ দুটি—এ সব আমার! এই যে সরযূ, এ আমার!"

"ছেড়ে দাও, লক্ষ্মীটি, আমার কাজ আছে।"

"আচ্ছা, আর পাঁচ মিনিট থাক।"

"পাঁচ মিনিট অনেকক্ষণ হয়ে গেছে।"

"না, সত্যি, পাঁচ মিনিট হলে নিশ্চয়ই তোমায় ছেড়ে দেব। দেখছ, ঘড়ীর বড় কাঁটাটা এখানে রয়েছে, এটা যখন সরে এই ঘরটায় আসবে—"

"আমায় বোকা পেয়েছ কি না! সত্যি, ছাড়, কি মনে করছে!"

"আচ্ছা, ছেড়ে দেব, তুমি যদি আর একটি—"

"কি জ্বালাতনে পড়লুম বাপু! আচ্ছা, আমায় ছুঁয়ে দিব্যি কর যে ছেড়ে দেবে!" এমন সময় বাহির হইতে এককালীন চাপা হাসির শব্দে উভয়ে চমকিত ও অপ্রস্তুত হইল! সরযূ বাহির হইয়া গেল!

"তোর মুখে কি লেগে রয়েছে লা বউ? সন্দেশের গুঁড়ো বুঝি? মা যে তোকে দাদার জন্যে নিয়ে যেতে বল্লে? ওমা গালে আবার লাল দাগ কিসের?"

সিঁড়ীর পাশ থেকে কে একটি মেয়ে বলিয়া উঠিল "ওটা খাজনা আদায়ের চিহ্ন!"

সর সর ভাই, হ্যাঁ রাতদিন তোমাদের ইয়ারকি ভাল লাগে না!" সরযূ নীচে নামিয়া আসিয়া ঘরের ভেতর দেওয়ালে ঝুলানো বড় আর্সির সম্মুখে আসিয়া গামছা দিয়া মুখখানা মুছিয়া শাশুড়ীর নিকট যাইয়া নতমুখে সুপারি কাটিতে লাগিল।

২

অমিয়র ছোট ভাই নীলু কয়েকখানা ডাকের চিঠি লইয়া আসিয়া নকিবের ন্যায় চীৎকার করিয়া এক একখানি পড়িতে লাগিল। শ্রীমতী বরদাসুন্দরী দেবী, শ্রীমতী—......সরযূ উন্মুখ আগ্রহের সহিত শুনিতেছিল যদি তাহার কোন চিঠি থাকে। আগের চিঠিতে সে ছোট ভাইটির অসুখের কথা শুনিয়াছিল; সে জন্য কিছু চিন্তিত ছিল। তাহার নাম ডাক হইতেই সে কম্পিত আগ্রহে হাত বাড়াইল। কিন্তু সরযূর চিঠির উপরেই সকলের উপদ্রব চলিত। তাহার ননদ চিঠিখানা ছোঁ মারিয়া কাড়িয়া লইতেই, সরযূর শাশুড়ী বলিলেন "তোরা কি বল্‌ ত? ওকে তোরা ভারী জ্বালাতন করিস। দে ওর চিঠি! ওঁরা কি লিখেছেন পড় ত মা। সব খবর ভাল ত?"

সরযূ ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "হ্যাঁ...আর দাদার মেয়ের বিয়ে, তাই যাবার কথা লিখেছেন!" কম্পিত আগ্রহে সরযূ শাশুড়ীর গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

"তাই ত! এই মাসের ২৬ শে আবার হিমুর ভাত দিতে হবে! দুটো কাজই এক সময়ে প'ড়ে গেল যে!"

সরযূর মুখখানি বিষণ্ণ হইল। শাশুড়ী তাহা লক্ষ্য করিয়া বধূকে বলিলেন, "দেখি অমিয়র সঙ্গে পরামর্শ করে, সে কি বলে! তোমার ভাইঝির বে, না গেলে তাঁরাই বা কি ভাববেন!"

সারাদিনের মধ্যে সরযূ অমিয়র দেখা পাইল না। রাত্রে সকলের খাওয়ার পর—সরযূ যখন ঘরে আসিল, দেখিল, অমিয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সে ধীরে ধীরে মশারী ফেলিয়া স্নেহভরে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পরে তাহার কপালের উপর একটি স্নেহের চুম্বন আঁকিয়া দিল।

অমিয় হো হো শব্দে হাসিয়া কহিল, "চুরি করা বড় দোষ!"

"হ্যাঁ, তাই ত, কি চুরি করেছি, কখখনো না—এত মিথ্যে কথাও কইতে পার!"

"মিথ্যে কথা হল!..."

"ক'রে থাকি বেশ করেছি!...নিজের জিনিস নিলে বুঝি চুরি করা হয়?...চালাকী!"

"সরযূ তুমি আমায় এত ভালবাস! আমায় ছেড়ে তুমি একটুও থাকতে পারবে?" বাপের বাড়ী যাবার কথাটা মনে হওয়ায় সরযূ একটু চঞ্চল হইল!

"বল না সরযূ!"

"মা লিখেছেন দাদার মেয়ের বিয়ে—যাবার জন্তে!"

"হ্যাঁ, তোমার দাদা আমাকেও লিখেছেন বটে! কিন্তু মা বলছিলেন, যদি হিমুর ভাত দেওয়া হয়, তা'হলে তোমার কি করে যাওয়া হ'তে পারে!"

"বলেছেন তাই? আমি আর কিছু শুনিনি বুঝি? তোমার মতলব আমাকে না যেতে দেওয়া!…তাই বল্লেই হয় স্পষ্ট ক'রে!"

"হ্যাঁ, আমার যে তাতে স্বার্থ আছে!"

"বলতে লজ্জা হল না! এই কটা দিন বুঝি আর একলা কাটাতে পার না? কেবল নিজেদের সুখটাই দেখবে—আমার মনের সুখ দুঃখ কিছুই বুঝি থাকতে নেই? এমন ত কিছু লিখে পড়ে দেওয়া হয়নি যে, এক রাত্রি ঘরে না শুলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে!"

অমিয় বিস্মিত ভাবে বলিল, "এ সব কি বলছ সরযূ! আমি তোমায় স্বার্থের জন্যে ভালবাসি! তুমি যাও সরযূ, তোমায় কেউ বারণ করবে না! আমি মাকে বলে কালই তোমার যাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি!" অমিয় পাশ ফিরিয়া শুইল।

সরযূ বুঝিল, কথাটা বড় কঠিন ভাবে বলা হইয়াছে। তাই সেটাকে সরল করিয়া লইবার জন্য বলিল, "কি গো, বড় গম্ভীর হয়ে উঠলে যে! অমন করে চাইছ যে, মারবে না কি?" অমিয়র মুখখানা হইতে যেন সমস্ত রক্ত চলিয়া গেল! সরযূ ঠাট্টা করিতে যাইয়া এ কি অন্যায় ভাবে স্বামীকে আঘাত করিল! সে ইচ্ছা করিয়া এ কথা বলে নাই; কিন্তু তথাপি তেজী ঘোড়া যেমন দুই পা তুলিয়া অগ্রসর হইলে আর পিছাইতে পারে না, সরযূও পারিল না—চুপ করিয়া রহিল!

অমিয় ভগ্ন স্বরে কহিল, "এখনও এত ছোট হইনি সরযূ! জ্ঞান থাকতে যে কোন রকমে বাক্য মন বা কার্য্যের দ্বারা তোমার ওপর অন্যায় করতে পারি, এ কথা তোমার বিশ্বাস হয়? কিসের জন্যে আমায় আজ এতখানি নীচ ভাবলে তা জানি না। আমার চোখের পানে চেয়ে দেখ, আমি কোন নেশা করিনি! আমার মনে হয়, নিশ্চয় একটা কিছু হয়েছে, তা না হলে তুমি সেই সরযূ—তুমি আমায়—" অমিয় আর বলিতে পারিল না!

সরযূ অমিয়র পা ধরিয়া কহিল, "আমায় মাফ কর! আমি না বুঝে তোমার মনে কষ্ট দিয়েছি! বল, মাফ করলে কি না—চুপ করে থেক না—বল—বল আমায়—তা না হলে আমার মন মানবে না!" অমিয় অভিমানের সুরে কহিল "তুমি ত কিছু দোষ করনি, দোষ আমিই করেছি, তুমি বরং আমায় ক্ষমা কর। আমার মত অযোগ্যের সঙ্গে তোমার বিয়ে হওয়া উচিত হয়নি! যদি কোন রকমে তোমায় মুক্তি দেবার উপায় থাকত সরযূ, তাহলে আমি তাই দিতুম! আমার মরণ হলে তোমায় এক নিষ্কৃতি দেবার উপায় আছে—বল—আমি মরলে তুমি সুখী হও?" সরযূ মাথা হেঁট করিয়া যেমন বসিয়া ছিল তেমনি রহিল। অমিয় দেখিল তাহার দুই গণ্ড বাহিয়া টপ্‌ টপ্‌ করিয়া অশ্রু ঝরিতেছে। অমিয়র ইচ্ছা হইল সরযূর মাথাটা বুকে টানিয়া লয়; এই মিথ্যা অভিমান—অভিনয়ের যবনিকা পড়িয়া যায়; কিন্তু কেমন বাধ বাধ ঠেকিল। অমিয় বলিল, "আমার মতন হতভাগা জগতে নেই, না হলে তোমার মতন স্বর্গের দেবীর ভালবাসার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হব কেন? আমি আশ্চর্য্য হই যে, আমাকে স্বামী ভাবতে তোমার মনটা ঘৃণায় ভর্ত্তি হয়ে যায় না কেন? সত্যি, তুমিই বল না—আমার মরা কি উচিত নয়? তাহ'লে তুমি একটু তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলতে পার! আমি তোমায় বেঁধে রাখতে চাই না সরযূ!"

সরযূ তাহার শান্ত চক্ষু দুটি তুলিয়া স্থির নিথর ভাবে স্বামীর মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া কাঁদনভরা সুরে কহিল, "থামলে কেন, বলে যাও,—যতক্ষণ না তৃপ্ত হও, আমায় দুঃখু দাও,—এ আমার প্রাপ্য! আমি মুখ্যু মেয়ে-মানুষ, না বুঝে অসাবধানে একটা কথা বলে ফেলেছিলুম—তার শাস্তি আমায় ভাল করে দাও! তুমি লেখাপড়া শিখেছ, ভাল করে গুছিয়ে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে বলে যাও, যাতে আমার বুকের পাঁজরগুলো ভেঙ্গে যায়! আমার প্রাণে যত লাগুক, তাতে ক্ষতি নাই, তুমি যে তাতে সুখী হবে সেই ভাল!" সরযূ মাথার বালিসটা লইয়া ধীরে ধীরে খাট হইতে নামিয়া মেঝেয় গিয়া শুইয়া পড়িল। অমিয় গভীর বিস্ময়ে সরযূর পানে চাহিয়া ভাবিল, এ কি হইতে কি হইল! দুই জনে মিলিয়া ক্ষুদ্র মিথ্যার গায়ে রং ফলাইতেছিল; কিন্তু কেহই বুঝিতে পারে নাই—তাহারই মধ্য দিয়া কত বড় সত্য ফুটিয়া উঠিয়াছে!

সরযূ যে কথাগুলো এই মাত্র বলিয়া গেল, সেগুলো

তাহার নিজের কথা নয়—সে তাহা ভাল রকমই জানিত! কিন্তু আজ দুই দিন হইল কি একখানি ভাল নভেলে এই কথাগুলো সে পড়িয়াছিল, এমনি একটা অভিমানের পালা—তাহার পর মিলনের মহানদী—তাই সে ভাবিল দেখি, কেমন দাঁড়ায়!

অমিয় সরযুর কাছে গিয়া তাহার হাত দুটি ধরিয়া কহিল "আমায় ক্ষমা কর সরযু! চল, বিছানায় শোবে চল!"

"আমি বেশ আছি, আমায় ছেড়ে দাও!"

"আমি মাফ চাচ্চি, ওঠ, আমায় আর কষ্ট দিও না, লক্ষ্মীটি—তুমি কালই বাপের বাড়ী যেও, তোমায় ছেড়ে থাকতে পারি না বলেই...কিন্তু সত্যি তোমার কি আর বাপ মাকে দেখতে ইচ্ছে করে না! আমি ভয়ানক স্বার্থপর! আমায় এবারটি ক্ষমা কর সরযু! তোমায় কালকেই পাঠিয়ে দেব!"

"আমি যাব না!"

"যাবে না কেন?"

"আমার ইচ্ছে!"

"এ ইচ্ছে ত এতক্ষণ ছিল না!"

"এখন হল!"

"কি কারণ শুনি?"

"সব জিনিসের কি কারণ থাকে?"

"তবু—"

"আমায় বকিয়ো না—আমার ঘুম পেয়েছে! আমি তোমার দাসী, দয়া করে তোমরা আমায় কিনে এনেছ! কাজেই আমার কোন সুখ সুবিধা থাকতে নেই, থাকা উচিত নয়! এখন যদি দয়া করে অনুমতি দাও, তাহ'লে একটু ঘুমুই—আর না হলে বল তোমার—"

অমিয় ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল, "না, তুমি ঘুমোও সরযু, কিন্তু মিনতি করছি, বিছানায় গিয়ে শোও!" সরযু উঠিয়া বিছানায় গিয়া অমিয়র দিকে পিছন ফিরিয়া শুইল! অমিয় বলিল,—"এই মিথ্যে অভিমানের ঝগড়া করতে গিয়ে মনে হচ্ছে সরযু, সত্যি তুমি আমার হাতে পড়ে দুঃখ পেয়েই এসেছ! যদি যোগ্য কারুর সঙ্গে তোমার বিয়ে হত, তাহ'লে সুখী হতে তুমি! মা বাপ তোমার আপনার, কিন্তু আমার ধারণা ছিল স্বামী স্ত্রীলোকের বেশী আপনার হয়। তুমি আমাকে আপনার ভাবতে পারনি, মনে মনে ভালবাসতে পারনি, তাতে তোমার কোন দোষ নেই! স্ত্রীর কর্ত্তব্য তুমি ঢের করেছ, কিন্তু ভালবাসা ত সত্যি হাত ধরা নয়!" সরযু দেওয়ালের দিকে ফিরিয়া চুপ করিয়া শুনিয়া যাইতেছিল। একবার ইচ্ছা হইল, এই মিথ্যা কথাগুলোর জবাব দেয়; কিন্তু আর কথা বাড়াইতে চাহিল না। সরযু যখন এই ডাহা মিথ্যা কথাগুলোর প্রতিবাদে কিছুই বলিল না, তখন অমিয় তাহাকে কথা কহাইবার জন্য নূতন কথা মনের মধ্যে খুঁজিতে লাগিল! একটু পরে হাসিয়া কহিল, "হয় ত বা এমন কেউ আছে, যাকে আমার চেয়ে ভালবাসতে পারবে—হয় ত বা—"

"কি? কি?—কি বললে?—"

"বলছি, যদি এমন কেউ থাকে, যার জন্য আমায় হয় ত ভালবাসতে—তাতে তোমার কোন দোষ নেই..."

"ওঃ—এমন যার মন সে বিয়ে করেছিল কেন?" সরযু দুই হাতের মধ্যে মুখ চাপিয়া রাখিল।

"রাগ করলে না কি? সত্যি, ফেরো, তোমায় রাগাবার জন্যে,...আমায় ক্ষমা কর!" অমিয় সরযুর হাত দুটো সরাইয়া একটী চুম্বন করিল!

"আঃ সর—"

অমিয় আর কথা বাড়াইতে চাহিল না। চুপ করিয়া রহিল। সকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইতে অমিয় দেখিল, সরযু পার্শ্বে নাই! দৃষ্টি ফিরাইতেই দেখে, সরযু মেঝের উপর পড়িয়া আছে। তাহার চোখের কোণে অশ্রুর দাগ তখনও শুকায় নাই! সেই ম্লান মুখখানির দিকে অমিয় মুগ্ধ ব্যথিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সরযু চোখ চাহিয়াই দেখে, অমিয় একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। সরযু তাড়াতাড়ি উঠিয়া গায়ে কাপড় টানিয়া দুয়ারের দিকে চলিয়া গেল! অমিয়র ইচ্ছা হইল ডাকে, কিন্তু সরযু ততক্ষণে চলিয়া গিয়াছে। অমিয় উঠিয়া জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল। কতক্ষণ কাটিয়া গেলে, একটি ছোট মেয়ে ঘরে ঢুকিতেই, অমিয় সচকিতে মুখ ফিরাইল! বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, "এখানে কি?"—কণিকা ভীতিপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, "মামীমার কাপড়—" অমিয় আলনা হইতে একখানা সাড়ী লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া কহিল, "যাঃ, বেরো!"—সরযু সিঁড়ীর পাশে দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া ছিল। মেয়েটি ঘর হইতে বাহির হইতে

সরযূ হাত নাড়িয়া তাহাকে ডাকিল। কিন্তু পরক্ষণেই অমিয়র চটি জুতার শব্দ পাইয়াই দ্রুত নামিয়া গেল। অমিয় সিঁড়ীতে জলের ছিটা ও পায়ের ভিজা দাগ দেখিয়া জানিল, সরযূ আসিয়াছিল, কিন্তু ঘরে যায় নাই! তাহার মন ক্ষোভে পরিপূর্ণ হইল! সে বাহিরের ঘরে আসিতে, একটি স্ত্রীলোক, তাহার ছোট ছেলেটিকে লইয়া এতক্ষণ বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল।

অমিয় বিরক্তিপূর্ণ স্বরে কহিল, "আবার কি চাও?" স্ত্রীলোকটি মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া কহিল, "বাবা, আপনার দয়াতেই ছেলেটা প্রাণে বেঁচেছে; কিন্তু বাবা, হাতে একটি পয়সাও নেই, ওর পথ্যির জন্তে—তাই বউমা বলেছিল—"

অমিয় বাধা দিয়া বিরক্তিপূর্ণ স্বরে চীৎকার করিয়া কহিল, "কিছু মিলবে না, যাও।" সৈরভী ঝি আসিয়া স্ত্রীলোকটিকে দরজার পাশ হইতে হাত নাড়িয়া ডাকিল, এবং নিকটে আসিলে কহিল, "বউমা ডাকছেন—"অমিয় ঘরে আসিয়া দেখিল, সরযূ বাক্স খুলিয়া টাকা বাহির করিতেছে। সরযূ অমিয়র পাশ দিয়া নীচে নামিয়া আসিল, এবং স্ত্রীলোকটির হাতে দুটি টাকা দিতে, সে বলিল, "মা, তোমার দয়া—" সরযূ বাধা দিয়া কহিল, "এখন যাও, আবার এস।" উপরে ঘরে আসিয়া বাক্স বন্ধ করিয়া ফিরিবার উপক্রম করিতেই, অমিয় গম্ভীর ভাবে ডাকিল, "শোন—এমন ভাবে সকলের সামনে আমায় অপমান না করলে হত না?"

সরযূ গভীর বিস্ময়ে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া কহিল, "আমি তোমায় অপমান করলুম? কেউ মনক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে গেলে অমঙ্গল হবে, তাই—"

"অমঙ্গল হয় আমার হবে—তোমার ত হবে না, তোমার ত তাতে কোন ক্ষতি নেই—"

সরযূ স্বামীর দিকে ব্যথিত দৃষ্টি তুলিয়া কহিল, "স্পষ্ট এসব বলতে মুখে আটকাচ্ছে না? উঠতে বসতে আমায় এমন করে বিঁধছ কেন বল ত? আমি কি করেছি—" সরযূ আঁচলে চোখ মুছিল!

"তোমাদের ওই ত প্রধান অস্ত্র!" সরযূ কোন কথা বলিল না। সে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতেই অমিয় কহিল, "শোন, কথা আছে—" ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সরযূ কহিল "তোমার সঙ্গে আমার কোন কথা নেই! আমি তোমার শত্রু, আমি তোমার কেউ নয়, তোমার অমঙ্গল হলে আমার কিছু ক্ষতি হয় না, আরও যা বল তাই—" চক্ষে আঁচল দিয়া সরযূ চলিয়া গেল।

৩

আজ কয়দিন ধরিয়া দুই জনের কথা বন্ধ! অমিয় ঘরে থাকিলে সরযূ সহজে সে ঘরে আসিত না। যদি বা কোন দরকারে তাহাকে আসিতে হইত, তাহা হইলে অমিয়র দিকে পিছন ফিরিয়া আলমারী খুলিয়া টাকা বাহির করিয়া চলিয়া যাইত। আর কেহ যে সে ঘরে আছে বা তাহার লক্ষ্যের মধ্যে আসিয়াছে, এমন কোন চিহ্নই সরযূর মুখে প্রকাশ পাইত না। অমিয় ইহা লক্ষ্য করিত এবং দুঃখ ক্ষোভ ও রাগে তাহার মনটা ভরিয়া উঠিত। নিজের দুর্ব্বলতাকে জোর করিয়া সরাইয়া দিয়া জেদের বশে সেও মুখ ফিরাইয়া লইত! এমনি মান-অভিমান, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া দুই জনের দিন কাটিতেছে। সরযূর ইচ্ছা হইয়াছিল, অন্য কোথাও শয়ন করে। কিন্তু তাহাতে বাড়ীর সকলে কি বলিবে, এই রকম সাত পাঁচ ভাবিয়া সে মেঝের উপর আলাদা বিছানা পাতিয়া শয়ন করিত। তাহার শাশুড়ী ও বাড়ীর দু'তিন জন মেয়ে সরযূর মুখ দেখিয়া বুঝিয়াছিল, যেন কোথায় একখানা বড় মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে; আর তাহারই ছায়া আসিয়া চিরহাস্যময়ী সরযূর মুখটি মলিন করিয়া দিয়াছে। কিন্তু সরযূ সে কথা স্বীকার করে নাই—হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছে।

সেদিন রাত্রে সরযূ ঘরে ঢুকিয়া দেখিল অমিয় ঘুমাইতেছে। সে অমিয়র ঘুমন্ত সুন্দর মুখখানির দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইল, না, সে আর এমন করিয়া অমিয়র কাছ হইতে তফাৎ হইয়া থাকিতে পারিবে না! সে যে স্বামী ছাড়া আর কাহাকেও জানে না! তাহার ইচ্ছা হইল, অমিয় যেন এখনি জাগিয়া উঠে; জোর করিয়া তাহার সর্ব্ব গর্ব্ব অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া দেয়, দুইখানি বলিষ্ঠ বাহুর......ঘুমের ঘোরে অমিয় একটু নড়িয়া উঠিতেই সরযূ চমকিয়া দেখিল, সে একেবারে বিছানার কাছ ঘেঁসিয়া আসিয়াছে! সে সরিয়া আসিল। ছিঃ ছিঃ! অমিয় কি ভাবিবে! নারীর দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে

কত দিন সে স্বামীর সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদ করিয়াছে—কিছুতেই, কোন মতেই তাহা স্বীকার করে নাই। আর আজ—সরযূ আর ভাবিতে পারিল না—ধীরে ধীরে মেঝের আপনার শয্যার উপর শুইয়া পড়িল।

৪

কয়দিন হইল হারাণ বাবুর পত্নী বিমলা কন্যা সবিতাকে লইয়া অমিয়দের বাড়ীতে আসিয়া রহিয়াছেন। যে দিন সরযূ অমিয়কে সবিতার জন্য পাত্রের সন্ধান করিতে অনুরোধ করে, অমিয় সেই দিনই তাহার খুড়শ্বশুরকে চিঠি লিখিয়া দিয়াছিল যে, সবিতাকে তাহাদের বাড়ীতে দুই চারি দিনের জন্য পাঠাইয়া দিলে, সে পাত্র নির্ব্বাচন করিয়া দিতে পারিবে। বিবাহের কথাবার্ত্তা কহিতে গেলে পাত্রপক্ষকে 'কনে' দেখাইবার ব্যবস্থা করিয়া রাখা দরকার। হারাণ বাবু তদনুসারে স্ত্রী-কন্যাকে জামাতৃ-ভবনে পাঠাইয়া দিয়াছেন। পাত্র-পাত্রী মনোনয়ন হইলে তিনি স্বয়ং কর্ম্মস্থল হইতে দিন কয়েকের ছুটী লইয়া আসিয়া কথাবার্ত্তা পাকা করিয়া ফেলিতে পারিবেন।

সবিতা খুব সপ্রতিভ মেয়ে। সে ভগিনীপতির গৃহে পদার্পণ করিয়াই সরযূকে প্রায় বেদখল করিয়া ফেলিয়াছে। স্বামীর প্রতি সরযূর মন এখনও প্রসন্ন হয় নাই। সে পূর্ব্বের মত স্বামীর সকল কাজ নিজ হস্তে করিতে আর তেমন আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। সুচতুরা সবিতা এ বাড়ীতে আসিয়াই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই মনোমালিন্যটুকু ধরিয়া ফেলিয়াছিল এবং সরযূর পরিত্যক্ত কর্ম্মভার নিজের হস্তে তুলিয়া লইয়াছিল। ভগিনী আসা অবধি সরযূ স্বামীর সঙ্গে প্রয়োজন বুঝিয়া দুই একটা কথা কহিত—নচেৎ, সবিতা কি মনে করিবে! কিন্তু মনে যা করিবার তা সবিতা অনেক আগেই করিয়া ফেলিয়াছিল; তবে সরযূ তাহা বুঝিতে পারে নাই।

৫

সে দিন সকালবেলা অমিয় নিজের ঘরে বসিয়া তাহার চিরাভ্যস্ত লেখাপড়ার কাজে নিযুক্ত ছিল। সরযূ তাহার আলমারি খুলিয়া একরাশ কাপড় চোপড় বাহির করিয়া তাহা পুনরায় গুছাইয়া আলমারীতে তুলিতেছিল। এমনি সময়ে এক হাতে চায়ের পেয়ালা আর অপর হাতে জল-খাবারের রেকাবী লইয়া সবিতা সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, "আজ আমি অন্য কাজে যোড়া ছিলুম, তাই আপনার চা আর জলখাবার আনতে দেরী হয়ে গেল।...... তা দিদি, তুমিই কেন জামাইবাবুর চা-জলখাবারটা এনে দিলে না?"

অমিয় হাসিয়া কহিল, "তোমার জামাইবাবু এখন তোমার দিদির সতীনকে নিয়ে ব্যস্ত আছেন কি না, তাই তোমার দিদি এদিকে ঘেঁসবেন না!"

অমিয় ঠাট্টা করিয়া কথাটা বলিলেও সবিতার মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, অমিয় তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া এই কথাটা বলিয়াছে। সে একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "যান্—কি যে ঠাট্টা করেন!"

স্বামীর কথা শুনিয়া সরযূও চমকিয়া উঠিয়াছিল, এবং তৎক্ষণাৎ উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। সবিতার লজ্জারক্ত মুখের ভাব তাহার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই।

অমিয় দেখিল, সবিতা তাহার কথা উল্টাভাবে বুঝিয়াছে। বস্তুতঃ সে এখন সবিতাকে লক্ষ্য করিয়া সতীন কথাটি ব্যবহার করে নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে সরযূ যে তাহার লিখিত কাগজপত্রগুলিকে সতীন আখ্যা দিয়া সেগুলি পোড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিল, সেই কথা মনে করিয়াই, তাহার কাগজপত্রগুলিকে লক্ষ্য করিয়াই, সে এখন সতীন কথাটি ব্যবহার করিয়াছিল। তাই সে সবিতার ভ্রম সংশোধনের জন্য তাড়াতাড়ি কহিল, "তোমার দিদির সতীন কে, তা জান না বুঝি! তোমার দিদিকেই জিজ্ঞেসা করে দেখ না—উনি কি বলেন? কেমন গো, তুমি কাকে তোমার সতীন বলে পোড়াতে চেয়েছিলে, বলে দাও না তোমার বোনকে!"

সরযূ অমিয়র এই কৈফিয়তের এক বর্ণও বিশ্বাস করিল না, কোন কথাও কহিল না, শুধু কেবল উভয়ের দিকে একটা তীব্র রক্ত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া আবার গম্ভীরভাবে কাপড় চোপড় গুছাইতে লাগিল। দিদির কাছ হইতে কোন জবাব না পাইয়া, কতকটা আত্মরক্ষার জন্য, সবিতা অমিয়কেই প্রশ্ন করিল, "দিদির সতীন কে জামাইবাবু?"

অমিয় তাহার লিখিত একগোছা কাগজ হাতে তুলিয়া লইয়া, সবিতার দিকে হাত বাড়াইয়া দেখাইয়া কহিল, "এই এরাই গো—এরাই তোমার দিদির সতীন! বেচারীদের

ওপর ওঁর এমন রাগ যে উনি এদের অগ্নিসংকার করতে চেয়েছিলেন।"

সরযূ যে রাগিয়াছে তাহা অমিয় বুঝিতে পারিয়াছিল এবং বিলক্ষণ কৌতুক বোধ করিতেছিল। তাহাকে আরও রাগাইবার জন্ম সে সবিতাকে প্রশ্ন করিল, "কিন্তু তুমি নিজে কি মনে করেছিলে বল দেখি?"

সবিতা লজ্জায় আবার রাঙা হইয়া উঠিল। কোন জবাব তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। অমিয় তখন হাসিতে হাসিতে কহিল, "না, সত্যি,—তোমার জন্যে পাত্রের সন্ধান করবার ভার নিয়েছি বটে, কিন্তু তেমন সুপাত্র ত চোখে পড়ছে না। তার চেয়ে আমি বলি কি, আর বাইরে খোঁজাখুঁজির দরকার কি। তুমি যখন এ বাড়ীতে এসে পড়েছ, তখন এইখানেই থেকে যাও। কেন, আমি কি নেহাত অপাত্র? কি বল, আমাকে তোমার পছন্দ হয়?"

সরযূ তাহার হাতের কাপড় চোপড় ফেলিয়া দিয়া উভয়ের দিকে আর একটা তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সবিতা ভয় পাইয়া কহিল, "কি করলেন জামাইবাবু! আপনার কি একটু বিবেচনা নেই—অমন করে ঠাট্টা করতে আছে?"

অমিয় কহিল, "ঠাট্টা চিরকালই ঠাট্টা,—তাতে তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন? তোমার দিদি ঠাট্টা বোঝে না—তাই ওর অল্পেতেই বড় রাগ হয়।"

সবিতা কহিল, "আপনি দিদিকে এখনও ভাল ক'রে চিনতে পারেন নি। নিন, চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল, খেয়ে ফেলুন" বলিয়া সেও ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

৬

রাত তখন প্রায় তিনটা—হঠাৎ কি একটা শব্দে অমিয়র ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়া সে দেখিল সরযূ পাশে নাই। তাহার মনটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল; কিন্তু সে মনে করিল, সরযূ হয় ত কোন প্রয়োজনে বাহিরে গিয়াছে—এখনই ফিরিয়া আসিবে। এই ভাবিয়া সে আর বিছানা ছাড়িয়া উঠিল না। কিন্তু মিনিট দশ বারো কাটিয়া গেল, অথচ সরযূ এখনও ফিরিয়া আসিল না দেখিয়া, সে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে ঘরের বাহিরে কোলাহল, ছুটাছুটির শব্দ ও একটা গোঙানির অস্পষ্ট আওয়াজ তাহার কাণে আসিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার জননীর কণ্ঠস্বরে সে শুনিল, "ওরে অমিয়, ওঠ—ওঠ, বৌমা যে পুড়ে মোলো!"

"কি হয়েছে মা" বলিতে বলিতে তড়াক করিয়া খাট হইতে লাফাইয়া পড়িয়া দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া অমিয় দেখিতে পাইল, দালান পার হইয়া ওদিককার একতলার ছাদে প্রচণ্ড একটা অগ্নিশিখা, এবং বাড়ীশুদ্ধ লোক সেই ছাদে আসিয়া জমা হইয়াছে!

সাময়িকী

দুর্গোৎসবের পর হিন্দুর প্রচলিত প্রথা অনুসারে আমরা 'ভারতবর্ষের' গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠক ও লেখক মহোদয়গণকে বিজয়ার যথাযোগ্য প্রণাম, নমস্কার, অভিবাদন ও আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিতেছি। জগজ্জননীর নিকট প্রার্থনা করি, আজ দ্বাদশ বৎসরের অধিককাল তাঁহাদের নিকট হইতে যে সহানুভূতি ও অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি, তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগকে অধিকতর নববলে বলীয়ান করুক।

এবার 'ভারতবর্ষে'র প্রচ্ছদপটে যাঁহার প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইল, তিনি স্বনামধন্য মনীষী, ব্যারিষ্টার-প্রবর, পরলোকগত মনোমোহন ঘোষ মহাশয়। বাঙ্গালীর মধ্যে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা প্রদান করিবার জন্য যে দুইটী যুবক প্রথম বিলাত গমন করেন, স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ মহাশয় তাঁহাদের অন্যতর; তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন পরলোকগত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়। ঠাকুর মহাশয় সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন; কিন্তু দেশের সৌভাগ্যক্রমে মনোমোহন ঘোষ মহাশয় উক্ত

পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া বারিষ্টার হইয়া এদেশে আগমন করেন। কলিকাতা হাইকোর্টে তাঁহার অসাধারণ প্রসার হয়; ফৌজদারী মোকদ্দমায় তিনি কত আসামীর পক্ষ সমর্থন করিয়া তাহাদিগকে নিরপরাধ সপ্রমাণ করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না। মনোমোহন ঘোষ দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন। বাঙ্গালা দেশে যাঁহারা দেশ-মাতৃকার সেবায় প্রথম অগ্রসর হইয়াছিলেন, মনোমোহন ঘোষ তাঁহাদের অন্যতম। এখনও লোকে তাঁহার ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রসিদ্ধ বাগ্মী লালমোহন ঘোষের নাম স্মরণ করিয়া শ্রদ্ধাভরে মস্তক অবনত করে। আমরা 'ভারতবর্ষে'র প্রচ্ছদপটে তাঁহার প্রতিকৃতি প্রকাশিত করিয়া তাঁহার দেশহিতৈষণা, তাঁহার দরিদ্র-বাৎসল্য ও তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছি।

পূজার পূর্ব্বে বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতির একটী অধিবেশন হইয়াছিল। এই সমিতি অনেক দিন পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু মুসলমান সাহিত্যিকগণের ঔদাসীন্যে এই সমিতি এত দিন মৃতবৎ অবস্থায় ছিল। বঙ্গীয় মুসলমানগণের এ ঔদাসীন্য যে বড়ই গর্হিত কার্য্য, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন। তাই তাঁহারা এই সমিতিকে সঞ্জীবিত করিবার আয়োজন করিয়াছেন। তাঁহারা স্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালা ভাষাই তাঁহাদের মাতৃভাষা। এই মাতৃভাষার উন্নতি সাধন তাঁহাদের অবশ্য-কর্ত্তব্য কার্য্য। কিছু দিন পূর্ব্বে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় শিক্ষিত মুসলমান ভদ্রলোক বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে কিছুতেই আমল দিতে চাহেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা হইতে পারে না। কিন্তু, তাঁহাদের এ মত সহৃদয় মুসলমান যুবকগণ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এই বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-সেবার দ্বারাই হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য-বন্ধন দৃঢ় হইবে, তাঁহাদের মধ্য হইতে হিংসা-দ্বেষ দূরীভূত হইবে, তাঁহাদের জাতীয়ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমরা মুসলমান সাহিত্যিক ভ্রাতৃবৃন্দকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। আমরা ত বরাবরই বলিয়া আসিতেছি যে, বাঙ্গালার মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দকে বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিতেই হইবে। আমাদের সে আশা পূর্ণ হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। যে অল্পসংখ্যক মুসলমান সাহিত্যিক বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিতেছেন, আমরা তাঁহাদিগকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়া থাকি। মুসলমান সাহিত্য-সমিতির চেষ্টায় আরও অধিক সংখ্যায় মুসলমান যুবকগণ মাতৃভাষার সেবায় অগ্রসর হইবেন এবং তাঁহাদের প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হইবে, আমরা তাহা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি। সেইজন্য কবির ভাষায় বলিতেছি

"এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন,
আসিবে সে দিন আসিবে।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালা ভাষাকে অধিকতর ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। মহাত্মা সার আশুতোষ বাঙ্গালা ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান দান করিয়াছিলেন, বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তখন কেবল পরীক্ষারই ব্যবস্থা হইয়াছিল, এম-এ পরীক্ষার্থীদিগের জন্য শিক্ষারও ব্যবস্থা হইয়াছিল; আর প্রবেশিকা, আই-এ, বি-এ প্রভৃতিতে পরীক্ষার সামান্য ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিল না বলিলেই হয়; কোন কোন কলেজে সপ্তাহে এক কি দুই ঘণ্টা বাঙ্গালা রচনা শিক্ষা দেওয়া হইত মাত্র। ছাত্রেরাও বাঙ্গালা শিক্ষার দিকে তেমন মনোযোগ দিতেন না, এমন কি অনেকে নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক পর্য্যন্তও কিনিবার আবশ্যকতা অনুভব করিতেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যগণ ইহা বুঝিতে পারিয়া, যাহাতে পঠিতব্য অধিকাংশ বিষয়ই বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে পঠিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন; এবং এখনও যাহাতে বিদ্যামন্দির-সমূহে যথারীতি বাঙ্গলা সাহিত্য পঠনের ব্যবস্থা হয় তাহাও করিয়াছেন। এখন আশা করা যাইতে পারে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মন বাঙ্গালা শিক্ষার দিকে অধিকতর আকৃষ্ট হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবর্ণমেণ্টের অর্থ-সাহায্যের গোল এখনও মিটে নাই। পরলোকগত সার আশুতোষের

সময় হইতে যে গোল আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার জের এখনও চলিতেছে। যত গোল ঐ পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগ লইয়া। তাহারই ব্যয় অধিক, এবং সেই অত্যধিক ব্যয়ভারে বিশ্ববিদ্যালয় প্রপীড়িত। এই ব্যয় সংকোচ করিবার জন্য এবং উক্ত বিভাগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও আলোচনা করিবার জন্য একটী প্রতিনিধি-সভা গঠিত হইয়াছিল। সেই সভার অধিকাংশ সদস্য উক্ত বিভাগের কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয় মনে করেন নাই, ব্যয় সংকোচ সম্বন্ধেও তেমন কিছু করেন নাই। উক্ত প্রতিনিধি-সভার অল্পসংখ্যক সদস্য অধিকাংশের সহিত একমত হইতে পারেন নাই; তাঁহারা যথেষ্ট ব্যয়-সংকোচের সপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। এ দিকে বাহিরেও দুইটী দল হইয়াছে। অধিকাংশ সদস্যের অভিমত অনুসারে গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রতি বৎসর তিন লক্ষ টাকা স্থায়ী সাহায্যের প্রার্থনা করা হইয়াছে। অপর পক্ষ বলেন, এত টাকার কোন প্রয়োজন নাই; বিশ্ববিদ্যালয় পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগের অনেক অধ্যাপককে বিদায় করিয়া দিলেও উক্ত বিভাগের শিক্ষার কোন অসুবিধা হইবে না, ব্যয়ও কম হইবে। এই দুই মতের মাঝখানে পড়িয়া গবর্ণমেণ্ট যে কি করিবেন, ভাবিয়া পাইতেছেন না। তাই, তাঁহারা পূজার পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ও কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্যকে দারজিলিংয়ে আহ্বান করিয়াছিলেন। আলোচনাও হইয়া গিয়াছে; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তরফ হইতে কোন মত প্রকাশিত হয় নাই। তবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যগণ আশা করিতেছেন যে, গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লাভে তাঁহারা বঞ্চিত হইবেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগের যে ব্যয়-সংক্ষেপ প্রয়োজন এবং উচ্চশিক্ষার সংকোচ-সাধন না করিয়াও যে ব্যয়-সংক্ষেপ করা যাইতে পারে, এ কথা আমরাও বলি। দেখা যাউক, গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করেন।

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

ভ্রম-সংশোধন—বিগত সংখ্যার 'ভারতবর্ষে' 'সুন্দরবনের প্রাচীন ইতিহাস' শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে নিম্নলিখিত কয়েকটী ভ্রম আছে; তাহা সংশোধন করিয়া দিতেছি। (১) ৬২৩ পৃষ্ঠার ১ম কলমে ৫ম ছত্রের পরে 'মাল্লগুলে' কথার পরিবর্ত্তে 'সাল্লগুলে' হইবে। (২) ৬২২।৬২৪।৬২৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'জটার দেউল' 'বাইষ হাটার মঠবাড়ি' প্রভৃতি ছবির নিম্নে 'জাতের দেউল' 'বৈশাটা হইবে। (৩) ৬২৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত দেবী মূর্ত্তির নিম্নে 'দেবী কালীমাতার পরিবর্ত্তে 'দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী' হইবে।

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল প্রণীত আত্মানুসন্ধান; ।০ আনা।

ডাঃ শ্রীযুক্ত আশুতোষ পাল প্রণীত বৈষ্ণব সাহিত্য; মূল্য ।০

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত দেশবন্ধুর বজ্রবাণী মূল্য ॥০

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত লক্ষ্যভ্রষ্ট ও চীনের জুজু মূল্য—প্রত্যেক খানি ৷৷০ আনা।

শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী প্রণীত পরীর দৃষ্টি—মূল্য ।৵০

স্বামী সদাশিবানন্দ প্রণীত ৺কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ—মূল্য ৷৷০ আনা।

কাজী নজরুল ইসলাম প্রণীত ছায়ানট—মূল্য ১।০

শ্রীমতী সুধাদেবী প্রণীত ভুলের কারসাজী; মূল্য—১৲

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল পাল চৌধুরী প্রণীত 'স্ত্রীর অধিকার'; মূল্য ১৲

শ্রীযুক্ত মধুসূদন দেব প্রণীত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন—মূল্য ৶০

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত বিদ্রোহী; মূল্য—১।০

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত দুনিয়ার দান; মূল্য ২৲

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত মধুচ্ছন্দার মন্ত্রমালা; মূল্য—১।০

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী প্রণীত বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস মূল্য—৪৲

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী প্রণীত শিকার ও শিকারী—মূল্য ২৲ টাকা।

Publisher—**Sudhanshusekhar Chatterjea.**
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons.
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—**Narendranath Kunar,**
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street. CALCUTTA.

কচ ও দেবযানী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত ভূপেনচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

অগ্রহায়ণ, ১৩৩২

প্রথম খণ্ড | ত্রয়োদশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যভাগবত

অধ্যাপক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ঐতিহাসিকাচার্য্য

বাঙ্গালার ইতিহাস, বিশেষতঃ, বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস, অধ্যয়ন ও পর্য্যালোচনা করিতে হইলে, বৈষ্ণব-গ্রন্থগুলি বিশেষরূপে অনুসন্ধান করা আবশ্যক। শুধু সামাজিক নহে, অর্থনৈতিক তথ্য সংগ্রহেও এইগুলি বিশেষরূপে প্রয়োজনীয়। অবশ্য, এই সকল পুস্তক সামাজিক বা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রণীত হয় নাই; এবং তজ্জন্য ইহা হইতে উপাদান সংগ্রহ করা সহজসাধ্য নহে এবং সংগৃহীত উপাদানও পরিমাণে বেশী হয় না। তথাপি, যাহা পাওয়া যায়, তাহাও নিতান্ত নগণ্য নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ অদ্য আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবতের আলোচনা করিব।

মহাত্মা বৃন্দাবন দাস-বিরচিত, বৈষ্ণবদিগের বিশেষ আদরের ধন, শ্রীচৈতন্যভাগবত ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে বিরচিত। ঐ সময়ে মুগল বাদশাহ হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট। মুগল সিংহাসন ও মুগল রাজত্ব তৎকালে দৃঢ় হয় নাই। দিল্লী ও তৎসন্নিকটস্থ প্রদেশ তখন অশান্তিপূর্ণ ছিল। বঙ্গদেশে তখন শেরশাহের অভ্যুদয় হইতেছিল। নবদ্বীপে সে সময়ে শান্তি বিরাজমান ছিল। গ্রন্থকার নবদ্বীপের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে এই উক্তি সমীচান বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

"নবদ্বীপ-হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাঞি।
যাহিঁ অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোসাঞি॥
অবতারিবেন প্রভু জানিঞা বিধাতা।
সকল সম্পূর্ণ করি থুইলেন তথা॥
নবদ্বীপের সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে?
একো গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥
ত্রিবিধ বয়সে একো জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী দৃষ্টিপাতে সভে মহাদক্ষ॥
সভে 'মহা-অধ্যাপক' করি গর্ব্ব ধরে।
বালকে-হো-ভট্টাচার্য্য-সনে কথা করে॥

নানাদেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পঢ়িলে সে বিত্থারস পায়॥
অতএব পঢ়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষকোটি অধ্যাপক—নাহিক নির্ণয়॥"

(শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সংস্করণ, ১৭২)

এইরূপ নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎকালে নবদ্বীপ বিদ্যাহিসাবে ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

ধনসমৃদ্ধিতেও নবদ্বীপ হেয় ছিল না। "রমা দৃষ্টিপাতে সর্ব্বলোক সুখে বসে।" (১৭ পৃ) তবে ব্যবহার ভাল ছিল না। বৃন্দাবন দাসের কথায়ই বলি :—

"ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে॥
কৃষ্ণনাম ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার॥
'ধর্ম্ম-কর্ম্ম' লোক সভে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোনজনে।
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহু ধনে॥
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়ে।" (১৭ পৃঃ)
"মদ্য মাংস দিয়া কেহো যক্ষপূজা করে।
নিরবধি নৃত্যগীত বাদ্য কোলাহলে।" (১৮ পৃঃ)

অপিচ

"ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য-গোমাংস ভক্ষণ।
ডাকা, চুরি, পরগৃহে দাহে সর্ব্বক্ষণ।" (২৪৯ পৃঃ)

এই পাপসঙ্কুল নবদ্বীপে, নবদ্বীপ তারণার্থ নবদ্বীপ-রত্ন জন্মগ্রহণ করেন। মাসান্তে

"বালক-উত্থান-পর্ব্বে যত নারীগণ।
শচী-সঙ্গে গঙ্গাস্নানে করিলা গমন॥
বাদ্যগীত কোলাহলে করি গঙ্গাস্নান।
আগে গঙ্গাপূজি তবে গেলা ষষ্ঠী স্থান॥
যথাবিধি পূজি সব দেবের চরণ।
আইলেন গৃহে পরিপূর্ণ নারীগণ॥
খই, কলা, তৈল, সিন্দূর, গুয়া, পান।
সবারে দিলেন আই করিয়া সম্মান॥
বালকেরা আশিষিয়া সর্ব্ব নারীগণ।
চলিলেন গৃহে, বন্দি আইর চরণ॥" (২৮ পৃঃ)

পরে, নামকরণের কথা উঠিল। অনেক জল্পনা কল্পনার পরে নাম স্থির হইল।

"সর্ব্ব-শুভক্ষণ নামকরণ সময়ে।
গীতা, ভাগবত, বেদ ব্রাহ্মণ পঢ়য়ে॥
দেবগণে নরগণে করয়ে মঙ্গল।
হরিধ্বনি, শঙ্খ, ঘণ্টা বাজয়ে সকল॥
ধান্য, পুঁথি, খড়ি, স্বর্ণ, রজতাদি যত।
ধরিতে আনিঞা করিলেন উপনীত॥
জগন্নাথ বোলে, "শুন বাপ বিশ্বম্ভর।
যাহা চিত্তে লয়, তাহা ধরহ সত্বর॥"
সকল ছাড়িয়া প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
'ভাগবত' ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গন॥" (৩০ পৃঃ)

তৎপরে হাতে-খড়ি হইল। কিছু দিন পরে কর্ণবেধ সমাপ্ত হইল। তখন আসিল যজ্ঞসূত্র ধারণের সময়। বন্ধুবর্গকে আমন্ত্রণ করা হইল—তাঁহারাও নিজ নিজ যোগ্য কার্য্য করিতে লাগিলেন।

"নটগণে মৃদঙ্গ, সানাঞি, বংশী বা'য়॥
বিপ্রগণে বেদ পড়ে, ভাটে রায়বার।
শুভমাসে, শুভদিন, শুভক্ষণ করি।
ধরিলেন যজ্ঞসূত্র গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
হাতে দণ্ড, কান্ধে ঝুলি, শ্রীগৌরসুন্দর।
ভিক্ষা করে প্রভু সর্ব্ব সেবকের ঘর।" (৫৫ পৃঃ)

শ্রীচৈতন্য ইতিমধ্যেই পাঠাভ্যাস আরম্ভ করিয়াছিলেন। "রাতিদিন বিদ্যারসে নাহি অবসর।" (৭২ পৃঃ)। মুরারিগুপ্ত বড় পণ্ডিত হইলে কি হয় ?

"*** বৈদ্য ! তুমি ইহা কেনে পঢ়।
লতাপাতা নিঞা গিয়া রোগী কর দঢ়॥
ব্যাকরণ-শাস্ত্র এই বিষমের অবধি।
কফ-পিত্ত-অজীর্ণ-ব্যবস্থা নাহি ইথি॥
মনে মনে চিন্তি তুমি কি বুঝিবে ইহা।
ঘরে যাহ তুমি রোগী দঢ় কর গিয়া। (৭২ পৃঃ)

মুরারিগুপ্ত চটিয়া লাল ; কিন্তু প্রভুর নিকট হার মানিলেন

প্রভুর বয়স হইতে লাগিল। মা চিন্তিতা হইতে লাগিলেন। "বিবাহের কার্য্য মনে চিন্তে অনুক্ষণ।" ঘটক আসিলেন, কিন্তু বিশেষ সুবিধাজনক উত্তর পাইলেন না—

"***পিতৃহীন বালক আমার।

জীউক পড়ুক আগে, তবে কার্য্য আর।" (৭৪ পৃঃ)

কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা অন্যরূপ। ঘটকঠাকুর ইঙ্গিত পাইয়া, আবার মার কাছে চলিলেন। মার আদেশ পাইয়া তিনি বল্লভাচার্য্যের নিকটে গেলেন। বল্লভাচার্য্যও ত ইহাই চান। কিন্তু তিনি বড় দরিদ্র।

"সবে এক বচন বলিতে লজ্জা পাই।

আমি সে নির্ধন, কিছু দিতে শক্তি নাঞি॥

কন্যা মাত্র দিব, পঞ্চ হরীতকী দিয়া।" (৭৫পৃঃ)

সব স্থির হইল। অধিবাস হইল, দিব্য গন্ধ, চন্দন, তাম্বুল, মালা দিয়া ব্রাহ্মণগণকে তুষ্ট করা হইল। প্রভাতে উঠিয়া স্নান, দান ও পিতৃগণের পূজা করিয়া, গোধূলি সময়ে মিত্রাদি সঙ্গে প্রভু শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইলেন। পঞ্চ হরীতকীর কথা থাকিলেও, কন্যাকে সর্ব্ব অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া কন্যা পাত্রস্থ করা হইল। শুভকার্য্য সমাধা হইল। তথায় রাত্রি-বাস করিয়া পরদিন প্রভু দোলায় চড়িয়া, নৃত্যগীত বাদ্য কোলাহলে সন্ধ্যাকালে আপন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শচীদেবী অন্যান্য ব্রাহ্মণ-পত্নী-সহ বধূকে গৃহে বরণ করিয়া লইলেন।

দুঃখের বিষয়, এ বধূ অকালে স্বর্গে গমন করিলেন। সুতরাং শচীমাতা পুত্রের সদৃশ কন্যার জন্য ব্যস্ত হইলেন। অভীষ্টও সিদ্ধ হইল। রাজপণ্ডিতের কন্যা স্থির হইল। বন্ধুগণ ব্যয়ভার বহনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। অধিবাস-লগ্ন স্থির হইল।

"বড় বড় চন্দ্রাতপ সব টানাইয়া।

চতুর্দ্দিকে রুইলেন কদলী আনিয়া॥

পূর্ণ-ঘট, দীপ, ধান্য, দধি, আম্রসার।

যতেক মঙ্গলদ্রব্য আছয়ে প্রচার॥

সকল একত্রে আনি করি সমুদায়।

সর্ব্ব ভূমি করিলেন আলিপনাময়॥

যতেক বৈষ্ণব আর যতেক ব্রাহ্মণ।

নবদ্বীপে আছয়ে যতেক সুসজ্জন।

সভারেই নিমন্ত্রণ করিলা সকালে।

অধিবাসে গুয়া আসি যাইবা বিকালে।"

অধিবাস খুব ধূমধামের সহিত সম্পন্ন হইল। বাদ্যের— মৃদঙ্গ, সানাঞি, জয়ঢাক, করতালের অভাব রহিল না। ভাটগণ "রায়বার" পড়িতে লাগিল, পতিব্রতাগণ জয়-জয়কার করিতে লাগিলেন, বিপ্রগণ বেদধ্বনি করিতে লাগিলেন—সকলেই গন্ধ, চন্দন, তাম্বুল, মাল্য পাইলেন—এক আধবার নয়—তিন তিনবার—সুতরাং "হেন অধিবাস নাহি করে কারো বাপে।"

তৎপরে কন্যার অধিবাস ও লোকাচার হইলে, গঙ্গাপূজা ও পরে ষষ্ঠীপূজা হইল। স্ত্রীগণ খই, কলা, তৈল, তাম্বুল ও সিন্দুর পাইলেন। এত তৈল খরচ হইল যাহাতে "তৈলে স্নান করিলেন সর্ব্ব নারীগণ" (১১২ পৃঃ) যথাসময়ে সুবেশ ধারণ করিয়া ধান্য, দূর্ব্বাসূত্র বন্ধন করিয়া ও দর্পণ হস্তে খুব ধূমধামের সহিত শোভাযাত্রা করিয়া, সমস্ত নবদ্বীপপুরী ঘুরিয়া

"আগে যত পদাতিক বুদ্ধিমন্ত খাঁর।

চলিল হইয়া দুই সারি পাটোয়ার॥

নানা-বর্ণে পতাকা চলিল তার কাছে।

বিদূষক সকল চলিলা নানা ধাচে॥

নর্ত্তক বা না জানি কতেক সম্প্রদায়।

পরম উল্লাসে দিব্য নৃত্য করি যায়॥

জয়ঢাক, বীরঢাক, মৃদঙ্গ, কাহাল।

পটহ, দগড়, শঙ্খ, বংশী, করতাল॥

বরুগো, শিঙ্গা, পঞ্চশব্দী বাদ্য বাজে যত।

কে লিখিবে বাদ্যভাণ্ড বাজি যায় কত॥"

বর কনের বাড়ীতে শুভাগমন করিলেন। পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনী বস্ত্র, অলঙ্কার দিয়া "বরণব্যভার" হইল। পরে, দিব্য ধেনু, ভূমি, শয্যা, দাস, দাসী ও অনেক প্রকার যৌতুক দিয়া, বেদাচার লোকাচার সম্পন্ন করিয়া শুভবিবাহ সম্পন্ন হইল।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের অন্যান্যাংশে আমরা উপরি উক্ত বিষয় সম্বন্ধে আর কিছু পাই না। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলের কি ভাবে শিক্ষা-দীক্ষা উদ্বাহাদি হইত, তাহার কিছু কিছু প্রমাণ আমরা দেখাইলাম। ধনী পণ্ডিতের চিত্র আমরা বিদ্যানিধি মহাশয়ের বর্ণনায় পাই। (২০০ পৃঃ)

"বসিয়া আছেন পুণ্ডরীক মহাশয়।

রাজপুত্র হেন করিয়াছেন বিজয়॥

দিব্য চট্টা হিঙ্গুল-পিত্তলে শোভা করে।

দিব্য চন্দ্রাতপ তিন তাহার উপরে॥

তাহি দিব্য শয্যা শোভে অতি সুক্ষ্ম-বাসে।
পট্ট-নেত-বালিস শোভয়ে চারি পাশে ॥
বড় ঝারি ছোট ঝারি গুট পাঁচ সাত।
দিব্য পিত্তলের বাটা, পাকা পান তা'ত ॥
দিব্য আলবটি দুই শোভে দুই পাশে।
পান খাঞা অধর দেখি দেখি হাসে ॥
দিব্য ময়ূরের পাখা লই দুইজনে।
বাতাস করিতে আছে দেহে সর্ব্বক্ষণে ॥
চন্দনের ঊর্দ্ধ পুণ্ড্র তিলক কপালে।
গন্ধের সহিত তথি ফাগুবিন্দু মিলে ॥
কি কহিব সে বা কেশভারের সংস্কার।
দিব্য গন্ধ আমলকী বই নাই আর।"

এতদ্ব্যতীত আমরা স্থানে স্থানে সামাজিক চিত্রের আরও কিছু কিছু আভাষ পাই। ঘরে ঘরে, খই, কলা সন্দেশের অভাব ছিল না। (৩১পৃঃ) ঘৃত সহ পরমান্ন অত্যুৎকৃষ্ট খাদ্য ছিল। গৃহস্থের ঘরে, তৈল, ঘৃত, লবণ, দুগ্ধ, তণ্ডুল, কার্পাস, "লোণ" (?), বড়ী, মুদ্গের প্রতুলতা ছিল (১৮৩পৃঃ)। দধি, দুগ্ধ, নবনীত, মিশ্রী, সন্দেশ, কদলী, চিপীটকই উৎকৃষ্ট খাদ্য ছিল (২১৬, ২২১পৃঃ)। বর দোলায় চড়িয়া বিবাহ করিতে যাইতেন এবং বড় বড় বিষয়ীরাও দোলায় যাতায়াত করিতেন (১০১পৃঃ)।

অতিথি সর্ব্বাপেক্ষা বড়—এ কথা তখনও সকলে জানিতেন এবং সর্ব্বপ্রকারে অতিথির পরিচর্য্যা করা হইত। সেইজন্য গ্রন্থকার মনুসংহিতা হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, "দরিদ্রতা নিবন্ধন অন্নদানে অসমর্থ হইলেও অতিথির শয়নের জন্য তৃণ, বিশ্রামের জন্য ভূমি, পাদ-প্রক্ষালনাদির জন্য জল আর চতুর্থতঃ প্রিয় বচন—ধার্ম্মিকের গৃহে এ সকলের উচ্ছেদ বা অভাব কখনই হইতে পারে না। তাই শ্রীপ্রভুর পিতৃদেব স্বয়ং অতিথির পদ প্রক্ষালন করিয়া দিয়াছিলেন। (৩৪পৃঃ)

তখনও কাজির বিচার ছিল এবং বিশেষ শাস্তি দিতে হইলে "বাইশ-বাজারে" যাইয়া অপরাধীকে মার খাইতে হইত। বাজারে দুগ্ধ, ঘৃত, দধি, সর, ননীর অভাব ছিল না। গোপ তাহার পণ্যসম্ভার লইয়া, গন্ধবণিক গন্ধ সহ, মালাকার মাল্য, তাম্বুলী তাম্বুল, শঙ্খবণিক শঙ্খ লইয়া বাজার আলো করিয়া থাকিত। এসব ভালো জিনিষও থাকিত, আবার

"ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য-গোমাংস ভক্ষণ।
ডাকা, চুরি, পরগৃহ দাহে সর্ব্বক্ষণ" ॥ (২৪৯ পৃঃ)

তাহারও অভাব ছিল না।

আমরা প্রবন্ধারম্ভেই স্বীকার করিয়া লইয়াছি যে, উপাদান যাহা পাওয়া যায়, তাহা খুব বেশী নহে; তথাপি, তিল কুড়াইয়া তাল সংগ্রহ করাও অসম্ভব নহে।

হেমন্তে

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ

১

আজি তমসার নীরে
পুণ্য স্নানে এল কি রে
দিক্‌-বধূগণে?
ভুবনে গগনে
কুয়াশার পড়িল কানাট!
ঢেকে দিল পথঘাট।
আলোকের কৌতূহলী আঁখি
গেল দূর লোকে,
বাষ্পভরা চোখে,
নিরাশ্র চাহনি শুধু দিগন্তরে আঁকি!

২

কুয়াশার পরপারে
মনে হয় বারে বারে
আসে-যায় কা'রা,
ভূষণের সাড়া
নদী তীরে যেন ক্ষণে ক্ষণে,
বেজে ওঠে কাশ বনে,
পদধ্বনি যেন শোনা যায়,
কেশধূপ ভারে,
আকাশ আঁধারে,
দেখা নাই, মন শুধু দূরান্তরে ধায়!

মিলন-পূর্ণিমা

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল

(৩)

সৌরীন যখন রেখাদের বাড়ী হইতে চা খাইয়া ফিরিয়া আসিল, তখন সে হাওয়ায় উড়িয়া চলিতে লাগিল। সংসার তার চক্ষে লুপ্ত হইয়া গেল, সমস্ত বিরাট বিশ্ব একটী ক্ষুদ্র নারীমূর্ত্তিতে পর্য্যবসিত হইল—সে নারী রেখা।

রেখার মত সৌরীনও স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। কত কথাই তার কল্পনায় আসিতে লাগিল! সব কল্পনার কেন্দ্র রেখা—আর সব কথার বাঁধন-দড়ি প্রেম! রেখাকে যদি সে পত্নী রূপে পায়, তবে যে তার জীবন চিরকালের জন্য ধন্য হইয়া যাইবে, এ কথা স্থির করিবার জন্য তার গবেষণা করিতে হয় নাই—সে ইহা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। কেমন করিয়া এই পরম লোভনীয় ব্যাপার সম্ভব হইতে পারে, তাহাই ছিল তার কল্পনার বিষয়।

প্রথম কথা—রেখা কি তাকে ভালবাসিবে? তাহাকে কি সে পতি রূপে গ্রহণ করিতে সম্মত হইবে? অবশ্য সে রেখার যোগ্য নয়—রেখাকে যে বিবাহ করিবে, সে তার চেয়ে বয়সে অনেক বড়, পদমর্য্যাদা ও ধনসম্পদে সে অনেক বড় হইবে—ইহাই সম্ভব! কিন্তু, এমনও তো হয় যে, নারী, যে তার যোগ্য নয়, তাকেও ভালবাসে! রেখা কি তাকে ভালবাসিবে না?

যদি রেখার ভালবাসা পাওয়া যায়, তবে সে তাহাকে বিবাহ করিতে পারিবে কি? রেখা সৌরীনকে যে রাজপুত্র কল্পনা করিয়াছিল, সে তেমন কিছু নয়। সে সাধারণ গৃহস্থের সন্তান, পিতৃমাতৃহীন। সংসারে তার এক ভগিনী ভিন্ন অন্য কেহই নাই। তার ঘর-বাড়ী এক-রকম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—জমীজমা যা' যৎকিঞ্চিৎ আছে, তাহাতে তার বৃত্তির সাহায্যে কোনও মতে তার খাওয়া-পরা ও লেখাপড়া চলে। ইহার ভরসায় বিবাহ করা চলে না—আর রেখার মত বিদুষী মহীয়সী মহিলাকে তাহার সঙ্গে সংসার করিতে বলা চলে না।

পিতৃমাতৃহীন সৌরীনের বিষয়কর্ম্ম দেখার অভ্যাস আছে। সংসারে নিজের কাজ তার নিজেরই করিতে হয়। তাই কত ধানে কত চাল হয়, তাহার সম্বন্ধে তার মোটের উপর বেশ স্পষ্ট ধারণা আছে। সে বুঝিল যে, একটু স্বচ্ছল ভাবে সংসার চালাইতে হইলে, তার মাসে তিন শ' টাকা রোজগার করা দরকার। সে কি এম-এ পাশ করিলে তিন শ' টাকা রোজগার করিতে পারিবে? সে না পারিলেও তারা স্ত্রী পুরুষে—রেখা আর সে দুজনে কাজ করিয়া পারিবে বোধ হয়! যদি সে পাশ করিয়াই

একটা চাকরী পায়, আর সঙ্গে সঙ্গে রেখাও একটা চাকরী করে, তবে হয় তো বছর দুয়েকের মধ্যেই তাহারা বিবাহ করিতে পারে।

কিন্তু রেখা বিবাহ করিবে কেন?—সে এত বড় পণ্ডিত হইয়াছে, সে হয় তো লেখাপড়া করিয়াই জীবন কাটাইতে ইচ্ছা করিবে। রেখার মত কৃতী ছাত্রীর পক্ষে এম-এ পাশ করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করা কিছুই আশ্চর্য্য হইবে না। এখন সে দরিদ্র; কিন্তু এক বৎসর কি দুই বৎসর পরে হয় তো তার অবস্থা খুব ভাল হইয়া যাইবে। সে সম্পদ ও স্বাধীনতা ছাড়িয়া রেখাই বা তার গৃহলক্ষ্মী হইতে চাহিবে কেন? যদিই বা বিবাহ করিতে চায়, তবে যে সৌরীনের চেয়ে শতগুণে ভাগ্যবান লোক তাহাকে পত্নী রূপে বরণ করিয়া ধন্য হইতে চাহিবে। তবে—যদি রেখা তাহাকে ভালবাসে! সে এমন কি একটা, যে, রেখার মত মেয়ে তাকে ভালবাসিবে! আজ তার কথায়-বার্ত্তায় কাজকর্ম্মে সৌরীনের সঙ্গে যে সহৃদয়তা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সে কি ভালবাসা? না কৃতজ্ঞতা, না কেবল সৌজন্য? কে জানে? ভালবাসা হওয়া সম্ভব নয়। এ নিশ্চয় কৃতজ্ঞতা মাত্র। কিন্তু—এই সূত্রে সে তবু তো রেখার হৃদয়ে প্রবেশের একটা পথ পাইয়াছে। রেখা তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়ীতে লইয়া গিয়াছে। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া সে রেখাকে নানা মতে সেবা করিতে পারিবে—হৃদয় কি ক্রমে জয় করিতে পারিবে না?

যাই হউক, সে আশা ছাড়িতে পারিল না; স্থির করিল, রেখার বাড়ীতে আবার যাইবে—কালই যাইবে। কিন্তু কি উপলক্ষ করিয়া যাইবে? অমনি সুধু সুধু যাইয়া কি বলিয়া দাঁড়াইবে? কি উপলক্ষ করিয়া যাওয়া যায়? সে অনেক কথা ভাবিতে লাগিল, কোনও পন্থাই তার মনঃপূত হইল না। তা ছাড়া কালই আবার যাওয়াটা তার কাছে ভারী অশোভন বলিয়া মনে হইল। এতটা আগ্রহ দেখিতে পাইলে রেখা ও তার মা হয় তো কিছু মন্দ ভাবিবেন—হয় তো শেষ পর্য্যন্ত তার তাড়া খাইতে হইবে। আর দুই এক দিন পরেই যাইবে।

এমনি ভাবিতে ভাবিতে সে হোষ্টেলে ফিরিয়া আসিল। তার ঘরের কাছে একটা ঘরে সৌরীন দেখিতে পাইল, একপাল ছেলে জটলা করিয়া খুব আগ্রহের সঙ্গে কি একটা ভয়ানক মুখরোচক কথার আলোচনা করিতেছে—মহা হাসাহাসি করিতেছে। তাহাকে দেখিয়াই সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "এই যে Knight of La Mancha!"

একজন বলিল, "Dulcineaর সংবাদ কি Knight?"

ক্রমে কথাটা পরিষ্কার হইয়া গেল। আজ সৌরীন যে কাণ্ড করিয়াছে, তাহাই এই পরিষদের আলোচ্য বিষয়। আলোচনা যখন রসে বেশ ভরপুর হইয়া আসিয়াছে, সেই সময় একজন আসিয়া সংবাদ দিয়াছিল যে, সৌরীন রেখার সঙ্গে তার বাড়ীতে গিয়াছে—বক্তা স্বচক্ষে তাদের দুজনকে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছে। তখন রসটা বেশ পরিপক্ক হইয়া উঠিল; আর বেশ তৃপ্তির সহিত সকলে এই ব্যাপারটাকে পরিপূর্ণ রূপে উচ্চ অঙ্গের আদিরসাশ্রিত করিয়া আলোচনা করিতে লাগিল।

ইহাদের কথাবার্ত্তার ঢঙ্গে সৌরীন ভয়ানক অসন্তুষ্ট হইল; কিন্তু ইহাদের রঙ্গরহস্যে বাধা দিয়া ভিমরুলের চাকে ঢিল ছুঁড়িতে তার প্রবৃত্তি হইল না। সে নিঃশব্দে আপনার ঘরে প্রবেশ করিল। জামা ছাড়িয়া সে ঘরের আলোটা জ্বালাইয়া দিয়া চিৎপাত হইয়া বিছানায় শুইয়া ভাবিতে লাগিল—রেখার কথা।

খাওয়া-দাওয়ার পর যখন হোষ্টেল অনেকটা নীরব হইয়া আসিয়াছে, সে সময়ে সৌরীনের পিছু পিছু তার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল নিত্যরঞ্জন। নিত্যরঞ্জন আইন কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে—সে গত বৎসর এম-এ পাশ করিয়াছে। বয়সে সে সৌরীনের অপেক্ষা পাঁচ-ছয় বৎসরের বড়। তাহাদের এক দেশে বাড়ী; দূর সম্পর্কও কিছু আছে। ইহাদের দুইজনে সৌহার্দ্দ্য খুব বেশী; কিন্তু সৌরীন তার বয়োজ্যেষ্ঠকে বিশেষ একটু শ্রদ্ধা ও সম্মান করিয়া থাকে। নিত্যরঞ্জনও তাহার বয়সের জোরে আপনাকে সৌরীনের এক রকম অভিভাবক বলিয়া মনে করে।

দুই একটা বাজে কথার পর নিত্যরঞ্জন বলিল, "সৌরীন, এরা যা বলছে, তা কি সত্যি? তুই রেখার বাড়ী গিয়েছিলি?"

এ কথার ভিতর যে একটা অভিযোগের সুর ছিল, তাহা সৌরীনকে আঘাত করিল। কিন্তু তাহা অগ্রাহ্য

করিয়া সে বলিল, "হাঁ নিত্যদা, গিয়েছিলাম। মিস সান্ন্যাল কিছুতে ছাড়লেন না, বল্লেন, এক পেয়ালা চা খেয়ে যেতেই হ'বে। না গেলে অভদ্রতা হয় বলে' গিয়েছিলাম।"

কথাটা বলিয়া সৌরীনের মনে হইল যে, এমন একটা দোষক্ষালণের চেষ্টার মত করিয়া কথাটা বলা তার অন্যায় হইল। সে যে রেখার বাড়ীতে গিয়াছে, এটা যে আপাত-দৃষ্টিতে একটা দোষ বলিয়াই মনে হওয়া উচিত, তাহা যেন সে ইহাতে স্বীকার করিয়া লইল। এই ভাবটা রেখার পক্ষে ভয়ানক অসম্মানকর বলিয়া তার মনে হইল। তাই কথাটা বলিয়া সে অপ্রসন্ন হইল।

নিত্যরঞ্জন তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল সেখানে কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, কে কি বলিয়াছিল বা করিয়াছিল। সৌরীন তার এই রকম প্রশ্নে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেও যথাযথ সব কথা বর্ণনা করিয়া গেল। নিত্যরঞ্জন বলিল, "যাক, গিয়েছ, বেশ ক'রেছ. আর ওদিকে বড় একটা ঘেঁসো না। এই কথা নিয়েই তোমার নামে যে রকম হৈ চৈ পড়ে গেছে, তা'তে আর যাওয়া আসা ক'রলে একটা ভয়ানক কলঙ্ক রটে যাবে। তা ছাড়া, এ সব মেয়েদের সম্বন্ধে আমার ভয়ানক সন্দেহ আছে যে, ওদের মতলব ভাল নয়।"

বেশ একটু উষ্ণ ভাবে সৌরীন বলিল, "নিত্যদা, তোমার মুখে এ কথা শুনে বড় দুঃখিত হ'লাম। একজন ভদ্রলোকের মেয়ের সম্বন্ধে এমন অযথা সন্দেহ তোমার যোগ্য নয়।"

"ও কে, কেমন ভদ্রলোকের মেয়ে, তা' আমি জানি না। তা' ছাড়া, ওদের সমাজে মেয়েদের যেখানে নিজের চেষ্টায় স্বামী সংগ্রহ করতে হয়, সেখানে ওরা স্বামী সংগ্রহের চেষ্টা করছে বল্লে, ওদের খুব অসম্মান করা হয় বলে আমি মনে করি না।"

"মিস সান্ন্যাল সে শ্রেণীর মেয়ে নয়।"

"কয়েক ঘণ্টার আলাপেই তুমিও জোর করে এ কথা বলতে পার না, আমিও জোর করে' এ কথা অস্বীকার করতে পারি না। তবু সাবধানের মার নেই। যদিই ও মেয়েটী তোমাকে হাত করবার চেষ্টা করে, তোমার আত্মরক্ষা বিষয়ে সজাগ হওয়া উচিত।"

"কি যে বলছ নিত্যদা, তার ঠিক নেই। মিস সান্ন্যাল যদি বে' ক'রতে চান, তবে আমার চেয়ে ঢের ভাল ভাল বর উনি অনায়াসে জোটাতে পারেন।"

"সে জানি না। ওদের সমাজে তো খুব ভাল বরের খুব বেশী বাহুল্য দেখতে পাই না। ব্রাহ্মদের মধ্যে যারা ভাল মেয়ে তারা বেশীর ভাগ হিন্দু সমাজ থেকেই ভাল ছেলে ভাঙ্গিয়ে নিয়ে থাকেন তো দেখি। সে যাই হ'ক, সাবধানের তো মার নেই। না হয় ওদের ধার দিয়ে তুমি আর নাই ঘেঁসলে?"

"এ সব তোমার ভারী অন্যায় কথা নিত্যদা। এর মধ্যে তুমি আগাগোড়াই এই কথাটা ধরে নিচ্ছ যে, আমি একটা ভয়ানক অন্যায় কিছু ক'রেছি। যা ক'রেছি তা' তো সব শুনলে, এর ভিতর আমার সাধারণ সহজ ভদ্রতা ছাড়া আর কি দেখতে পেলে? আমার সামনে একটা অসভ্য ছেলে একটা অসহায় মেয়েকে অপমান ক'রছে দেখে আমি তো চুপ করে' দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না! তার পর আমি কি ক'রেছি? বৈকালে তাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়েছি। তা না ক'রলে ঐ হতভাগা যে আবার একটা অপমানের চেষ্টা করে' গায়ের ঝাল ঝাড়তো না—কে জানে? এ সমস্তের ভিতর তুমি এমন কি অন্যায় দেখলে, যাতে তুমি আমাকে এত করে' সাবধান ক'রতে এসেছ?"

"তোমার কোনও কাজ অন্যায় হ'য়েছে—তা' আমি বলছিও না, মনেও ক'রছি না। কিন্তু আমি ভাবছি যে, এর ভিতর একটা ভয়ের কারণ আছে—সেই কথাটা তোমাকে বলছি মাত্র।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সৌরীন্দ্র বলিল, "একটু নিন্দার ভয়ে তা' হ'লে তুমি আমাকে মিস সান্ন্যালের কাছ থেকে তফাতে থাকতে বলছো। কিন্তু তার দিক থেকে যে ভয়টা আছে সেটা দেখছো না। কয়েকটা বদমায়েস ছেলে তাকে লাঞ্ছনা করবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করছে। তার প্রতিকার করবার সাধ্য বেচারার নেই। আর আমি জেনে শুনে হাত পা গুটিয়ে বসে' থাকবো, তাকে রক্ষা ক'রবার কোনও চেষ্টা করবো না—এটা বোধ হয় খুব বড় রকমের বীরধর্ম্ম হ'বে তোমার মতে? তা' ছাড়া, কলেজের সুনামও তো একটা দেখবার জিনিস। এই

কয়টা বদ ছোকরার জন্য কলেজের একটা কেলেঙ্কারী যদি হয়, আর আমরা কাপুরুষের মত আত্মরক্ষার চেষ্টায় চুপ করে বসে' থাকি, তবে শীগ্‌গিরই আমাদের একটা খুব বদনাম যে দেশময় রটে' যাবে, সে কথা ভাবছো?"

নিত্যরঞ্জন নৈতিক হিসাবে খুব ভাল ছেলে। তা ছাড়া সে শক্তিমান যুবক। বীরধর্ম্মের অনুশীলন তার চিরজীবনের আদর্শ। সে এই ধর্ম্মের আদর্শে অনেক ছাত্রকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। তাই তাহাকে এইরূপে খোঁচা দিয়া সৌরীন্দ্র কথাটা বলিল।

একটু হাসিয়া নিত্যরঞ্জন বলিল, "তুই এখনও নেহাৎ ছেলেমানুষ র'য়ে গেছিস সৌরীন। তুই কি আমাদের দেশের লোককে এখনও চিনিসনি? যদি তেমন একটা কাণ্ড হয়, যদি আমাদের কলেজের ছেলেরা সত্যি তেমন একটা অত্যাচার করে মিস সান্ন্যালের উপর, তবে আমাদের লোকে বদনাম করবে মনে ক'রছিস? কিছু না। ওটা আমাদের স্বভাব-ধর্ম্মের উপর চাপিয়ে তারা গাল দেবে মিস সান্ন্যালকে; আর যে-কেউ তাকে কলেজে ভর্ত্তি করবার জন্য দায়ী, তাদেরই নিন্দা ক'রবে। আমরা ছেলে হ'য়ে জন্মেছি বলে যে আমাদের সাতখুন মাপ!"

"এই তবে তোমার বীরধর্ম্মের নূতন ভাষ্য নিত্যদা!"—

"এ আমার ভাষ্য নয়—এ ভাষ্য আমাদের সমাজের বেশীর ভাগ লোকের। আমি তাদের খুব বেশী দোষ দিতে পারি না। আমাদের সমাজের যে অবস্থা, তাতে হঠাৎ একপাল ছেলের মধ্যে এক-আধটা মেয়েকে ছেড়ে দেওয়া খুব সঙ্গত কি না বলতে পারি না। কিন্তু সে যাই হ'ক, এ কথা ঠিক যে, যখন একটি মেয়ে এমনি অবস্থায় আমাদের ভিতর এসে পড়েছে, তখন তাকে রক্ষা করা আর আমাদের ইজ্জৎ রক্ষা করা যে আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য, সে আমি স্বীকার করি। আজ দুপুর বেলায় কথাটা শুনে অবধি আমি এ সম্বন্ধে ভেবে ভেবে একটা ফন্দী ঠিক ক'রেছি।"

"কি ফন্দী?"

"আমি ভাবছি যে, আমরা কয়েকজন যদি দল বেঁধে ওই মেয়েটিকে রক্ষা ক'রবার ভার নি, এমন ভাবে ওকে দেখা-শোনা করি যে, বাড়ী থেকে বেরুনো অবধি বাড়ীতে ফেরা পর্য্যন্ত তার কোনও দিন কোনও অনিষ্ট হ'তে না পারে, অথচ সেও জানতে না পারে যে আমরা এমনি একটা আয়োজন ক'রেছি, তবেই বোধ হয় ভাল হয়।"

"খুব ভাল হয়। কিন্তু কে কে এ কাজ ক'রবে বল?"

"কেন তুই আছিস, তা' ছাড়া নবজীবন, সত্যেন, চারু, যোগেশ, মতি এরা ক'জন আছে। আর দু'চারজনকে জোগাড় করে নিলেই হ'বে। রোজ দুজন করে ছেলে ওর কলেজে আসবার সময় ওর বাড়ী থেকে ওর সঙ্গে ট্রামে উঠবে; আর যে পর্য্যন্ত ও ক্লাশে না যায় সে পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে থাকব। আবার বিকেলে তেমনি করে' ওকে বাড়ী পৌঁছে দেবে। ছ'জন হ'লে প্রত্যেকে সপ্তাহে দু'দিন ডিউটি ক'রলেই চলবে।"

সৌরীন উৎসাহিত হইয়া বলিল, "এ খুব ভাল কথা নিত্যদা, চল তবে এখনি এর বন্দোবস্ত করা যাক।"

তখন তাহারা আর চারটি ছেলে একত্র করিল। রেথার ক্লাশের রুটীন সংগ্রহ করিয়া তাহারা তাহাদের মধ্যে কার্য্য ভাগ করিয়া লইল। সব পাকা বন্দোবস্ত হইয়া গেল।

নিত্যরঞ্জন শেষে বলিল, "কিন্তু এ কাজ সফল করতে গেলে সবার কাছে একটা প্রতিশ্রুতি চাই। কেউ এ কথা কারও কাছে প্রকাশ ক'রবে না, আর কেউ মিস সান্ন্যালের সঙ্গে কোনও রকম কথাবার্ত্তা বা কোনও রকম সম্ভাষণ ক'রবে না, এ শপথ ক'রতে হ'বে।"

সকলেই স্বীকার হইল; কেবল সৌরীন বলিল, "সে কেমন করে' হ'বে? আমার সঙ্গে যখন তাঁর আলাপ হ'য়েছে, তখন তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লে, সম্ভাষণ না করা যে ভয়ানক অভদ্রতা হবে!"

"তা হয় হোক, তিনি যাই ভাবেন ভাবুন, কিন্তু আমরা যে কেবল মাত্র বিশুদ্ধ কর্ত্তব্য বোধে এ কার্য্য করছি, এটা ঠিক রাখতে গেলে এ প্রতিশ্রুতির দরকার আছে—এ ছাড়া চলতে পারে না।"

সৌরীন। তা ছাড়া, এমন অবস্থা তো হ'তে পারে, যখন তাঁর সামনাসামনি হ'য়ে তাঁকে কিছু বলা ঠিক আমাদের এই কাজের জন্যই দরকার হ'তে পারে।

নিত্য। নিতান্তই যদি দরকার হয়, তবে সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক যেমন কথা কয়, তেমনি কোনও কথা চলতে পারে—কিন্তু সে একেবারে অনিবার্য্য না হ'লে নয়।

নিত্যরঞ্জন যে কাজটা ধরিত, সেটা ভারি শৃঙ্খলার

সহিত সম্পন্ন করিত। আর একটা কঠোর বৈরাগের আদর্শ তার কাছে বীরধর্ম্মের অত্যাজ্য অঙ্গ ছিল। তাই সে এই কঠোর বিধান কিছুতেই ছাড়িতে রাজী হইল না। অগত্যা সৌরীন্দ্র তাহাতেই সম্মত হইল।

পরের দিন হইতেই নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে কার্য্য আরম্ভ হইল। তাই সৌরীন আর কোনও দিন রেখাকে কোনও রকম সম্ভাষণ করে নাই,—পরিচয়ের চিহ্ন পর্য্যন্ত প্রকাশ করে নাই। ইহাতে তার অন্তর লজ্জায়, ব্যথায়, দুঃখে ভরিয়া গিয়াছে। যখনই তার সঙ্গে রেখার চোখোচোখি হইয়াছে, তখনই সে রেখার মুখে বিস্ময় ও বিরক্তির ভাব লক্ষ্য করিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছে। কিন্তু প্রতিজ্ঞা হইতে সে বিচলিত হয় নাই। কয়েক দিনের মধ্যেই তাদের দলের মধ্যে একটা নাম তারা গড়িয়া তুলিল—তাদের দলের নাম হইল Chivalry Brigade. (ক্রমশঃ)

শিল্পী—সুধীররঞ্জন খাস্তগির যোগী

কাব্য-কল্পনায় আর্ট *

শ্রীব্রজেন্দ্রসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল্

আজকাল আমাদের ভিতর শিক্ষা ও তাহার চর্চ্চা সকল রকমেই দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। আমরা এক্ষণে আর কোন বিষয়ে ভাসা-ভাসা আলোচনা করিয়া সুখী হই না, অথবা কোন বিষয়ে মতামতের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে চাহি না। ইহা বড়ই আনন্দ ও সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। আমরা নিজেরাই সকল বিষয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার সূক্ষ্ম তত্ত্ব সকল বিশ্লেষণ করিয়া তাহার গুণাগুণ বিচার করি। শিল্প, সাহিত্য, এমন কি, বিজ্ঞানেও ইহার যথেষ্ট প্রমাণ চারিদিকেই লক্ষ্য করা যায়। সাহিত্য-সমালোচনা ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম নাই। আমরা আজকাল কোন গ্রন্থের সমালোচনায় পুরাতন গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ থাকিতে চাহি না। আমাদের চিরন্তন সংস্কারগত সুন্দর-কুৎসিতের ধারণা হইতে উহার বিচার না করিয়া, ঐ গ্রন্থে প্রকৃত সার্ব্বজনীন সৌন্দর্য্য কতটুকু আছে, তাহাই দেখিতে চাহি। যে সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি সংস্কার বিশেষের উপর নির্ভর করে না, যাহা সকলেই সকল অবস্থাতেই অনুভব করিতে সমর্থ, যাহা সকলকেই সমান ভাবে আনন্দ দেয়, উহাই সার্ব্বজনীন সৌন্দর্য্য। উহাকেই প্রকৃত সৌন্দর্য্য বলা যাইতে পারে। আমাদের দেশীয় ইদানীন্তন সমালোচকগণ প্রায়ই কাব্যগত এই সৌন্দর্য্যের বিশ্লেষণে আর্ট (Art) শব্দটি ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ভাষা ও ভাব লইয়া কাব্য গঠিত। দুইটীই আর্টের বিষয়। ভাষাগত আর্ট ভাবগত আর্টের সহায়ক। আমরা এই প্রবন্ধে প্রথমোক্তের বিচার করিব না—শেষোক্তেরই বিচার করিব।

অক্সফোর্ড অভিধানের সঙ্কলয়িতা আর্ট শব্দের মুখ্য অর্থ দিয়াছেন "skill" অর্থাৎ নৈপুণ্য। ঐ নৈপুণ্যকে তিনি প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—প্রথম, 'natural art' অর্থাৎ স্বাভাবিক নৈপুণ্য; দ্বিতীয়—art acquired by knowledge or practice; অর্থাৎ শিক্ষা বা অভ্যাসলব্ধ নৈপুণ্য। অস্ত্র-চিকিৎসক রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার করিয়া থাকেন। ঐ উপচারে তাঁহার ক্ষিপ্রতা, ধৈর্য্য প্রভৃতি যে সকল স্বাভাবিক গুণ তাঁহার নৈপুণ্যের সহায়ক, উহাই তাঁহার natural art অর্থাৎ স্বাভাবিক নৈপুণ্য। আর যে নৈপুণ্যের বলে তিনি রোগীর মাংস ত্বক ভেদ করিতে পারেন, যাহার বলে তিনি তাহার অসংখ্য শিরা, উপশিরা, অস্থি, নালী প্রভৃতি বাঁচাইয়া রোগের স্থানে পৌঁছিতে পারেন, উহাই তাঁহার art acquired by knowledge or practice, অর্থাৎ শিক্ষা বা অভ্যাসলব্ধ নৈপুণ্য। পক্ষী নীড় রচনা করে, উহা তাহার natural art, কেহ তাহাকে শিখায় নাই।

স্বাভাবিক ও অভ্যাসলব্ধ এই দুই প্রকারের নৈপুণ্য অথবা কৌশল লইয়া অনেক মতভেদ আছে। ইংরাজিতে সাধারণতঃ natural art অর্থাৎ স্বাভাবিক যে কৌশল, তাহাকে nature শব্দেই অভিহিত করা হয়, উহার সহিত আর art শব্দ প্রয়োগ করা হয় না। আর যে art acquired by knowledge or practice তাহাকেই art বলা হয়। বাস্তবিক কোন্‌টী যে art, আর কোন্‌টী যে nature, তাহার বিচার করা বড়ই কঠিন। কেহ কেহ বলেন art বলিয়া কোন বিভিন্ন বিষয় নাই। উহা natureএর একটী অংশ। তাঁহারা বলেন, পৃথিবীতে যত প্রকার শক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সমস্ত natural অর্থাৎ প্রকৃতি-দত্ত। ঐ সকল শক্তির পরিণতি অথবা স্থলবিশেষে উদ্দেশ্যমূলক একত্র সন্নিবেশেরই নাম art.

Art is but the employment of powers of nature for an end.—John Stuart Mill.

ইহার উত্তরে আর একদল বলেন, কথাটা কতকটা ঠিক, Nature হইতেই artএর উৎপত্তি বটে, কিন্তু তথা

* তৃতীয় বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সাহিত্য শাখার জন্য লিখিত

দুইটাকে এক জিনিস বলা যায় না। স্বাভাবিক শক্তিই nature। উহা হইতে মনুষ্যের চেষ্টা দ্বারা যাহা কিছু সৃষ্ট, উহাই art। উহাকে স্বাভাবিক শক্তি হইতে ভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

এ সকলই পণ্ডিতমণ্ডলীর কূট তর্ক। বস্তুতঃ দুইটা জিনিস দেখা যায়,—একটা স্বাভাবিক শক্তি, অপরটা ঐ শক্তির উদ্দেশ্যমূলক চালনা। উদ্দেশ্যমূলক বলিতে হইবে; কারণ চালনা বিনা উদ্দেশ্যে হয় না। নাম যাহাই হউক না কেন, একটা অপরটার অন্তর্ভুক্ত হউক বা নাই হউক, জিনিস এই দুইটা। চলিত ভাষায় একটীকে nature ও দ্বিতীয়টাকে art বলে। ঐরূপ বলাই সঙ্গত; কেন না বুঝিবার পক্ষে উহাই সুবিধাজনক।

অতএব দেখা যাইতেছে, কাব্য-সৃষ্টি একটা art; কারণ-মানুষ স্বীয় চেষ্টা ও যত্নের দ্বারাই কাব্যের সৃষ্টি করিয়াছে—ইহার 'স্বাভাবিক' কোন সত্ত্বা নাই। এইবার আমরা দেখিব, এই art, যাহা হইতে কাব্যের সৃষ্টি হইয়াছে, উহা কোন্ জাতীয়। কেন না, তাহা হইলে কিসে ঐ artএর উৎকর্ষ বা অপকর্ষ হইতে পারে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিব। আজ পর্য্যন্ত জগতে যত প্রকারের art সৃষ্ট হইয়াছে, মোটামুটি তাহাদের দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। প্রথম, সেই সকল art, যাহা মানুষ তাহার জীবনের অভাব দূরীকরণার্থ উদ্ভাবন করিয়াছে। মানুষ কাপড় পরে। কাপড় পরা তাহার আবশ্যক বিষয়। এই কাপড়ের জন্য সে কেমন সুন্দর বস্ত্র-বয়ন-পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছে; উহার জন্য কত রকমের যন্ত্রপাতির সৃষ্টি করিয়াছে; এবং প্রতি দিনই আরও নূতন নূতন সৃষ্টি করিতেছে।

মানুষকে খাইতে হয়। তাহার জন্য সে কত ভিন্ন ভিন্ন উপাদেয় শস্যাদির উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়াছে; এবং ঐ সকলকে রসনানুকূল করিবার জন্য কত পরিপাটী রন্ধন-প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছে। এই রকম তাহার শোয়া, যাওয়া, দেখা প্রভৃতি সকল প্রকারের আবশ্যক বিষয়ের সুবিধার্থ সে নানা রকম বিচিত্র 'আর্টের' সৃষ্টি করিয়াছে। এই সকল এক শ্রেণীর আর্ট। আর এক শ্রেণীর আর্ট আছে, যাহা মানুষ শুধুই নিজের সুখ-বিধানার্থ সৃষ্টি করিয়াছে। তাহার জীবন-যাত্রার সহিত সে সকলের কোনই সম্বন্ধ নাই। ঐ সকল ব্যতিরেকেও তাহার জীবন-যাত্রা স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহিত হইতে পারে। নৃত্য, গীত, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহারই নাম fine arts। কাব্য ইহাদেরই অন্তর্গত। শুধু মানুষের জীবন সুখময় করিবার জন্য এই সকলের সৃষ্টি হইয়াছে। উহাতেই ইহাদের সার্থকতা। সুস্বর-সমন্বিত সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া, অথবা একখানি সুন্দর ছবি দেখিয়া, বা একটী ভাল গল্প শুনিয়া মানুষ তাহার জীবন-যাত্রার পথে কোনই সাহায্য পায় না,—উহা তাহার মনের সন্তোষ বিধানের দ্বারা মনকে প্রফুল্ল করে মাত্র। কাব্য এই সকল আর্টের শ্রেষ্ঠতম স্তর। কারণ, মানুষের মন যখন সম্যক পরিণত হয়, তখনই সে সম্পূর্ণ ভাবে কল্পনাশ্রিত সুখকর বিষয়ের অনুধাবন করিতে পারে ও তদ্দ্বারা তাহার মনে সুখবোধক বৃত্তির প্রেরণা জন্মিতে পারে। মনের এই সুখ সম্পাদনকে কাব্য-সৃষ্টির একমাত্র কারণ বলিয়া গ্রহণ করিতে আমরা বাধ্য; কেন না, উহারই জন্য এই আর্টের সৃষ্টি।

এইবার দেখা যাউক, কাব্যোপভোগজনিত এই যে সুখ, ইহার মূল কোথায়? মূল প্রসঙ্গে আমরা মনোবিজ্ঞানের নিয়মানুসারে ইহা objective অর্থাৎ বিষয়গত কি subjective অর্থাৎ বিষয়াগত ইত্যাদি সূক্ষ্মতত্ত্বের আলোচনা করিব না; কেন না বর্ত্তমান প্রবন্ধের পক্ষে উহা নিষ্প্রয়োজন। সাধারণতঃ কি কারণে কাব্য পাঠে আমাদের মনে সুখের উদয় হয়, তাহাই আমরা দেখিব। কাব্য পাঠে মন প্রফুল্ল হয়। মনের প্রফুল্লতা কিসে আসে? মনের প্রফুল্লতা তখনই আসে, যখন মনের সামনে এমন একটা বিষয় আসিয়া উপস্থিত হয়, যাহা মন চাহে, যাহা মনের স্পৃহনীয়, কিন্তু যাহা সাধারণতঃ সুলভ নহে। যাহা সুলভ, তাহাতে বৈচিত্র্য থাকে না; অতএব উহা আর স্পৃহনীয় হয় না। এই স্পৃহনীয়ত্বের অনুভূতিকেই সুখবোধের কারণ বলিতে হইবে। যাহাতে উহা থাকে, তাহারই সাধারণ নাম সুন্দর। অতএব বলিতে হইবে, কাব্য-সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য এই সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি।

মন যাহা চাহে না, যাহাতে মনের বিরক্তি বোধ হয়, উহা কুৎসিত; অতএব উহা কাব্যের বিষয় নহে। সুন্দর বস্তু সহজ-লভ্য নহে; কিন্তু উহা অসাধারণ অর্থাৎ অলৌকিকও হইতে পারে না; কারণ, যাহা অলৌকিক তাহা দুরাস্বাদ্য; অতএব তাহাতে স্পৃহা স্বভাবতঃ কমিয়া যায়; সুতরাং সৌন্দর্য্যের

হানি হয়। কাব্য হইতে সদুপদেশ পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু উহা গৌণ ভাবে,—মুখ্যতঃ নহে। সুন্দর উপদেশ দিতে পারে; কিন্তু উপদেশ দেয় বলিয়াই তাহা সুন্দর নহে।

এই জন্যই সংস্কৃত সাহিত্যে শেষ আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ কাব্যের লক্ষণ করিয়াছেন—"চিত্রং বাক্যং কাব্যং"; অর্থাৎ যে কথা চিত্র অর্থাৎ মনোহারী, উহাই কাব্য; যাহা চিত্র নহে, যাহাতে মনোহারিত্ব নাই, তাহা কাব্য নহে। এত অল্পে অথচ এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে যে কাব্যের লক্ষণ হইতে পারে, তাহা বোধ হয় এই লক্ষণ বিদ্যমান না থাকিলে কেহ কল্পনাই করিতে পারিতেন না। কাব্য প্রকাশকার তাঁহার লক্ষণে অলঙ্কার শাস্ত্রের সূক্ষ্মতম পারিভাষিক রস শব্দ ব্যবহার করিয়া ঠকিয়া গিয়াছেন। যে রস কি বুঝিয়াছে, তাহার নিকট আর কাব্যের লক্ষণ বিবৃত করিবার প্রয়োজন কি? আমরা এই কয় ছত্রে একটীবারও রস শব্দ প্রয়োগ করিতে সাহস পাই নাই। রস কাব্যের শেষ কথা—পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডারে ভারতীয় প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান। এটা ভাল লাগে, ওটা ভাল লাগে না—এ কথা সকলেই, এমন কি বালকেও, বলিতে পারে। কিন্তু কেন এটা ভাল লাগে, ওটা ভাল লাগে না—এ কথা সকলে বলিতে অথবা বুঝাইতে পারে না। উহা বুঝাইতেই কাব্য-প্রসঙ্গে আর্টের কথা আসিয়া পড়ে; এবং এই আর্টেরই প্রাণ বলিতে যাহা বুঝা যায়, তাহাই রস। আমার যতদূর স্মরণ হয়, প্রথম সাহিত্য-সম্মিলনে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে স্বর্গীয় মাতামহ সম্বন্ধে artist শব্দের স্থলে 'রসস্রষ্টা' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। আমাদের মনে হয়, artist শব্দের উহা অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী বঙ্গানুবাদ আর হইতে পারে না।

এইবার দেখা যাউক, কাব্য-সৃষ্টির প্রাণ স্বরূপ এই যে সৌন্দর্য্য—এই জিনিসটা বস্তুতঃ কি? আমাদের সংস্কার ও শিক্ষালব্ধ জ্ঞানানুসারে আমরা যাহাকে সুন্দর বলিয়া জানি, তাহাই যে সকল সময় সুন্দর, এবং ঐ জ্ঞানানুসারে যাহাকে কুৎসিত বলিয়া জানি, তাহাই যে সকল সময়ে কুৎসিত, এ কথা কিছুতেই বলা চলে না। ইহা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে যে, অনেক সময়ে যাহা আমরা কুৎসিত বলিয়া জানি, তাহার ভিতর এমন এক একটা জিনিস আমাদের চোখের সামনে আসিয়া পড়ে যে, আমাদের শত বদ্ধমূল ধারণা সত্ত্বেও, উহা আমাদের চক্ষে একান্ত স্পৃহনীয় সুন্দর রূপে প্রতিভাত হয়। পক্ষান্তরে, যাহা আমরা সাধারণতঃ সুন্দর বলিয়া জানি, তাহার ভিতরেও সময়ে সময়ে এমন এক একটা প্রাণহীনতা দেখিতে পাই যে, উহাকে আমরা যতই কেন সুন্দর বলিয়া লইতে চেষ্টা করি, আমাদের মন কিছুতেই তাহা মানিতে চাহে না। মানুষের মনকে আকর্ষণ করিবার এই যে শক্তি, ইহাকেই আমরা সৌন্দর্য্য বলিব, এবং যাহাতে উহা আছে তাহাকেই সুন্দর বলিব। কিন্তু মন ইন্দ্রিয়পরায়ণ, অতএব ভ্রান্ত। রূপরসাদির প্রতি মন সহজেই আকৃষ্ট হয়, এবং তজ্জনিত সুখকেই প্রকৃত সুখ বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহে। তাহা হইলে ঐ সুখই কি প্রকৃত সুখ, এবং যাহা ঐ সুখ দেয়, তাহাই কি সুন্দর? কদাচ নহে। ইন্দ্রিয় স্থূল, অতএব তজ্জনিত সুখবোধও স্থূল। ঐরূপ স্থূল সুখবোধে কল্পনাশ্রয়ী মনের তৃপ্তি হয় না। ঐ সকল বিষয় হইতে তাদৃশ মন আপনা হইতেই সরিয়া আইসে। মনকে এই বিষয়ে চালিত করে মনঃস্বামীর বুদ্ধিবৃত্তি। বুদ্ধিবৃত্তিই তাহাকে শিখাইয়া দেয়—এইটা সুন্দর, এইটা অসুন্দর। যে মনঃস্বামীর বুদ্ধিবৃত্তি একবার সূক্ষ্ম তত্ত্বের অনুধাবন করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার মন আর কদাচ স্থূলে সন্তুষ্ট হইবে না। স্থূল ইন্দ্রিয়জ বিষয় স্বতঃই তাদৃশ মনের নিকট হীন হইয়া পড়িয়াছে। ঐ মন সর্ব্বদাই ইন্দ্রিয়ের ভিতর অতীন্দ্রিয়ের সন্ধান করিবে, এবং যেখানে তাহা পাইবে তাহাকেই সুন্দর বলিয়া গ্রহণ করিবে। অতএব কাব্যে ইন্দ্রিয়পরায়ণতার স্থান নাই। নিম্নশ্রেণীর জীবজন্তু অথবা অসভ্য জাতিদের ভিতর কাব্য নাই। কিন্তু ভগবদ্‌ভক্তি প্রভৃতি যে সকল বিষয় সম্পূর্ণ ভাবে অতীন্দ্রিয়, তাহাও কাব্যের বিষয় নহে কেন না, তাহাতে মন স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হয় না। ঐ সকল বিষয় বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা কর্ত্তব্য বোধে জোর করিয়া মনকে গ্রহণ করাইতে হয়। অতএব মনের স্বাভাবিক আকর্ষণ উৎপাদনের জন্য ইন্দ্রিয়কে চাই; আবার ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া অতীন্দ্রিয়ত্বকেও চাই। আবিলতা চাই, আবিলতার ভিতর যে অনাবিলত্ব আছে, তাহাকে চাই। এই যে আবিলতা হইতে অনাবিলত্বের আস্বাদ—ইহা কাব্যের প্রকৃত সৌন্দর্য্য। ইহার সর্ব্বপ্রধান দৃষ্টান্ত-স্ব

আমাদের আদিরস। যেখানে এই সৌন্দর্য্য আছে উহাই কাব্য, এবং যাঁহারা উহার স্রষ্টা তাঁহারাই কবি।

এইবার দুই-একটী উদাহরণ দিয়া আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আমাদের বিচারের ক্ষেত্র স্বরূপ আমরা তিনখানি গ্রন্থ লইব—দুইখানি বিদেশীয়, একখানি দেশীয়। বিদেশীয় দুইখানির একখানি রাসিয়ান্ কবি টলষ্টয় (Tolstoy) প্রণীত 'এ্যান্না ক্যারেণীনা' (Anna Keranina); দ্বিতীয়খানি আমেরিকান্ গ্রন্থকার ন্যাথানিয়াল্ হথার্ণ (Nathaniel Hawthorne) প্রণীত 'দি স্কারলেট্ লেটর।' (The Scarlet Letter); তৃতীয়খানি 'চন্দ্রশেখর।'

এ্যান্না ক্যারেণীনা সুখেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিল। স্বামি-সেবা, পুত্র পালন, সখিগণের সহিত আমোদে আহ্লাদে সুখেই তাহার জীবন কাটিতেছিল। কিন্তু সহসা তাহার এই সুখের জীবনে দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হইল। ভ্রন্স্কাই (Vronsky) তাহার সম্মুখে এক মোহিনী শক্তির আকর্ষণের সন্ধান আনিয়া দিল, যাহার সন্ধান তাহার এই গতানুগতিক জীবনে সে কখনও পায় নাই, এবং ভ্রন্স্কাই সহসা আসিয়া তাহার জীবন-পথে উদিত না হইলে হয়ত কখনও পাইত না। এ্যান্না তাহার পরিণত-বয়স্ক, নানা কার্য্যে ব্যতিব্যস্ত, স্বল্পাবসর, স্বামীতে বহু চেষ্টাতেও ঐ আকর্ষণ পাইল না; বরং আশা ভঙ্গে ঐ সর্ব্বগ্রাসী আকর্ষণ আরও সর্ব্বগ্রাসী হইল। স্বামী, পুত্র, চিরপরিচিত গৃহ, আত্মীয় স্বজন, সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া 'এ্যান্না ক্যারেণীনা' অনাবিল অমৃত ভ্রমে এই আকর্ষণের পশ্চাৎ ধাবিত হইল। কিন্তু বাস্তবিক ইহাত অনাবিল অমৃত নহে। ইহা আবিলতাময়, তীব্র হলাহলে পূর্ণ। এ্যান্না ও তাহার সঙ্গী ভ্রন্স্কাই আকণ্ঠ ভরিয়া অমৃত ভ্রমে এই গরল পান করিল ও ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল উভয়েই মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিল।

আমেরিকান্ গ্রন্থ 'স্কার্লেট লেটর' (Scarlet Letter) এও ঠিক এই রসই চিত্রিত হইয়াছে। আমি 'রস' বলিলাম,—শাস্ত্রীরা আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। সেখানেও অমৃতের ভ্রমে গরল আসিয়াছে—প্রভেদের মধ্যে নায়িকা 'হেষ্টর প্রিন্' (Hestor Prynne) অসীম-সাহসে নীলকণ্ঠের ন্যায় সেই গরল ধারণ করিয়া তাহাকে সত্য সত্যই অনাবিল অমৃতে পরিণত করিয়াছে। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনার হিসাবে ও ঘটনা-বৈচিত্র্যে 'এ্যান্না ক্যারেণীনা'র স্থান অবশ্য Scarlet Letter অপেক্ষা উচ্চে। কিন্তু রসের হিসাবে শেষোক্ত গ্রন্থই বরীয়ান ও উহার ভিত্তি দৃঢ়তর।

এই যে গ্রন্থদ্বয়-বর্ণিত তীব্র হলাহল, ইহা যে শুধুই হলাহল, তাহা নহে। ইহার সহিত প্রকৃত অনাবিল অমৃতও মিশ্রিত আছে। আছে বলিয়াই, (Anna Keranina) এ্যান্না ক্যারেণীনা বিনা চিন্তায়, অনায়াসে সংসারের যাহা কিছু সুখময়, এমন কি পুত্র পর্য্যন্তও, পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিল। এবং তজ্জন্য বিন্দুমাত্রও অনুশোচনা শেষ পর্য্যন্তও তাহার মনে উদয় হয় নাই। তাহার দুঃখ এই—যাহা সে শীতল বলিয়া আশ্রয় করিয়াছিল, বাস্তবিক উহা শীতল নহে। উহা দহনশীল অগ্নিশিখা। যে উহা স্পর্শ করে তাহার দাহন অনিবার্য্য। এ্যান্না যখন ইহা বুঝিল, তখন সে দ্বিধাশূন্য মনে তাহা গ্রহণ করিল। এবং পতিপুত্রত্যাগিনী হইয়াও আমাদের নিকট হইতে এক বিন্দু অশ্রুর দাবী করিয়া গেল। হেষ্টর প্রিন্ (Hester Prynne) জানিয়া শুনিয়া পুড়িবার জন্য মনকে প্রস্তুত করিয়াই এই অগ্নি স্পর্শ করিয়াছিল। তাহার আভ্যন্তরিক এই উত্তপ্ততার সহিত বাহ্যিক অগ্নির সংঘর্ষণে উভয় অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া তাহার মনকে সত্যই এক চিরশীতল চন্দ্রালোকের রাজ্যে উপনীত করিল। লোকলজ্জা, রাজদণ্ড, সর্ব্বোপরি প্রিয়জনের অনিষ্টাশঙ্কা তাহার মনের সমস্ত মলিনত্বটুকুকে ধুয়াইয়া মুছাইয়া পরিষ্কার করিয়া দিল। নায়ক (Dimmsdale) ডিম্স্ডেলের অদৃষ্টে ইহা ঘটিল না। সুতরাং তাঁহাকে ভস্মীভূত হইতে হইল। 'হেষ্টারের' ত্যাগে তাঁহার উদ্ধার হইল। 'এ্যান্নার' ত্যাগের ভাগ কম, তাহাকে পুড়িতেই হইল। এই যে হলাহলের ভিতর অমৃতের স্ফুরণ, আবিলতার সহিত অনাবিলত্বের অপূর্ব্ব মিশ্রণ—এইটুকুই সৌন্দর্য্য এবং ইহারই জন্য এই সকল গ্রন্থ কুৎসিতের আধার হইলেও মহাকাব্য।

'চন্দ্রশেখরে'র শৈবলিনীও এই আবিলতা ও অনাবিলত্বের লীলাভূমি। সেও তাহার বিবাহিত স্বামী, তাহার গৃহ, তথাকার চিরপরিচিত তুলসীমঞ্চ, স্বহস্তরোপিত পুষ্পবৃক্ষ, ভীমা পুষ্করিণী, সুন্দরী সখী—সমস্তই ত্যাগ করিয়া অমৃত ও

গরলের আধার মনের অনুশাসনে স্বচ্ছন্দে চলিয়া গেল। কিন্তু সে ফিরিল,—'এ্যান্না কারেণীনা'(Anna Keranina) বা 'হেষ্টর্ প্রিন্' (Hestor Prynne) যাহা পারে নাই, যাহা তাঁহাদের সাধ্যাতীত, শৈবলিনী তাহা করিল। সে আবার পুরাতন গৃহে ফিরিয়া আসিল। আমরা এই প্রত্যাবর্ত্তন একটু ভাল করিয়া আলোচনা করিয়া দেখিব। কেন না 'চন্দ্রশেখর' গ্রন্থের, Anna Keranina ও 'Scarlet Letter' হইতে এইটুকুই পার্থক্য। এই-টুকুই উহার বৈশিষ্ট্য।

শৈবলিনী যদি অমনি অমনি এদিক ওদিক দুই চারি দিন বেড়াইয়া, সুস্থ চিত্তে, সবল দেহে, কোন আকস্মিক ঘটনায় অথবা নিজেরই খেয়ালে, নিজের পাপ বুঝিতে পারিয়া অনুশোচনায় সম্পূর্ণরূপে বিদ্ধ হইয়া, পরিত্যক্ত স্বামীর জন্য সহসা ভক্তি ও প্রীতিতে পরিপূর্ণ হইয়া, ফিরিয়া আসিত, তাহা হইলে আমরা বলিতাম 'চন্দ্রশেখরে'র গ্রন্থকার প্রকৃতির নিকট ভীত হইয়া পড়িয়াছেন; অনাবিলের সম্পূর্ণ প্রভাব দেখাইতে তাঁহার সাহসে কুলায় নাই; 'আর্ট' তাঁহার ক্ষুণ্ণ হইয়াছে; তিনি Tolstoy অথবা 'Nathaniel Hawthorne'এর নিকট হারিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। শৈবলিনা ফিরিয়াছে বটে, কিন্তু নিজের চেষ্টায় আদৌ নহে। শৈবলিনাকে ফিরাইতে গ্রন্থকার 'আর্টের' উপর 'আর্টে' গিয়া পৌঁছিয়াছেন। তিনি 'Sublime'এ উঠিয়াছেন। তাঁহাকে 'প্রতাপ'-চরিত্রের সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। শৈবলিনীর প্রত্যাবর্ত্তন ঠিক বুঝিতে গেলে প্রথমতঃ এই 'প্রতাপ' চরিত্রের একটু প্রণিধান করিয়া দেখিতে হয়।

মানুষ যখন তাহার কোন উপাস্য বিষয়কে এমন ভাবে একাগ্রচিত্তে উপাসনা করে, যে, ঐ উপাস্য বিষয় ব্যতিরেকে তাহার নিকট জগৎসংসারে আর কোন বিষয়েরই অস্তিত্ব থাকে না, তখন ঐ উপাস্য বিষয়ই ঐ সাধকের সমস্ত অস্তিত্বের একমাত্র আধারে পরিণত হয়। ঐ বিষয় ভিন্ন অন্য কোন বিষয়েরই সত্তা সাধকের চক্ষে থাকে না। উহাতেই সাধক সম্পূর্ণরূপে তন্ময় হইয়া যায়। যখন এই তন্ময়ত্ব আসে, তখন আর উপাস্য বিষয়ে কোনরূপ দেহিত্ব থাকে না। কারণ, উপাসকের নিকট তখন তাহার নিজের বিশিষ্টতাদ্যোতক ইচ্ছাশক্তি ও তৎসঙ্গে সমস্ত বাহ্য সংসার বিলুপ্ত। থাকে শুধু তন্ময়ত্ব এবং উহাতেই সাধকের তৃপ্তি।

মানুষ যখন এই তন্ময়ত্বে উপস্থিত হয়, তখন ইন্দ্রিয়জ সমস্ত বিষয়ের, অর্থাৎ সুখ, দুঃখ, জীবন, মরণ ইত্যাদির, আর কিছুই পার্থক্য তাহার নিকট থাকে না। সে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে, অথবা বিনা সঙ্কোচে, বিনা দ্বিধায় মরিতেও পারে। তাহার সকল কাজ, সকল কর্ত্তব্য এই একই কেন্দ্র হইতে চালিত হয়; এবং উহারই পবিত্র আলোকে আলোকিত হইয়া সকলের চক্ষে এক মহা-মহিমান্বিত রূপে উদ্ভাসিত হয়।

শৈবলিনীর চিন্তার ভিতর দিয়া প্রতাপ এই তন্ময়ত্বের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাহারই উপাসনা তাঁহার নিজের ও তাঁহার নিকটবর্ত্তী সমস্ত জগৎ সংসারের অস্তিত্ব অধিকার করিয়াছিল। তাঁহার মরণ বাঁচন, শুভাশুভ সমস্তই শৈবলিনীতে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। এই উপাসনায় উপাসক উপাস্যের গুণাগুণ বিচার করে না। উপাস্যের উপাসনাতেই তাহার সন্তোষ। গুণাগুণ বিচার ইন্দ্রিয়-পরায়ণতার অন্যতম বিকাশ। কোনরূপ ইন্দ্রিয়পরায়ণতা থাকিতে মানুষ এ অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারে না।

যখন এ হেন ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শ-শূন্য প্রতাপরূপ মহাদ্রিতে প্রতিহতা হইয়া তাহার পঙ্কিলা গতি প্রতিরুদ্ধা হইল, তখন শৈবলিনার না ফিরিলা আর উপায় কি? নচেৎ সে কদাচ ফিরিত না। প্রতাপের দেবচরিত্রের নিকট আসিয়া, সেই আত্মস্থ সমাহিত অটল গিরিবরের সংস্পর্শে তদীয় দিব্যৌষধির প্রভাবে, তাহার কলুষিত বারিপ্রবাহের সমস্ত আবিলত্বটুকু কাটিয়া গেল। যখন 'মরা গঙ্গায় চাঁদের আলোর ন্যায়' পুণ্যালোক তাহার সঙ্কীর্ণ অন্তস্তল সমুদ্ভাসিত করিল, তখনই সে ফিরিল। কিন্তু 'এ ফেরা' সে সহ্য করিতে পারিল না। তাহার ন্যায় কোন স্ত্রীলোকই পারে না, সে পাগল হইল। আমরাও ধন্য হইলাম, গ্রন্থকারও অমর হইলেন।

কোন শ্রদ্ধেয় প্রবীণ সমালোচক, প্রতাপের স্বেচ্ছা-মৃত্যুকে লক্ষ্য করিয়া, রূপসীর প্রতি তাঁহার ঔদাসীন্য প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া, তাঁহার চরিত্রে দোষারোপ করিয়াছেন, ও রূপসীর পরিণাম সম্বন্ধে গ্রন্থে কিছু বলা হয় নাই বলিয়া গ্রন্থেরও কিছু ক্ষুণ্ণতা হইয়াছে বলিয়াছেন।

রূপসীর পরিণাম গ্রন্থের প্রতিপাদ্য নহে। গ্রন্থের মূল ঘটনা, ইংরাজিতে যাহাকে 'final catastrophe' বলে, তাহার সহিত রূপসীর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন সম্পর্ক নাই। নায়কের চিত্তশুদ্ধির উপায় স্বরূপ তিনি পরোক্ষ ভাবে উহার কতকটা সাহায্যকারিণী বটে, কিন্তু মুখ্যতঃ তিনি উহার সহিত নিঃসম্পর্কা। অতএব তাঁহার পরিণামের বিবৃতি কতকটা অপ্রাসঙ্গিক। বিশেষতঃ উহা সহজেই অনুমেয়। ঐরূপ বস্তুর বর্ণনায় রসের পোষণ হয় না; বরং হানিই হয়।

রূপসীর প্রতি প্রতাপ আদৌ উদাসীন বা অমনোযোগী ছিলেন না। গ্রন্থে তাঁহাদের পরস্পরের সম্বন্ধে যা দুই একটী কথা আছে, তাহা হইতে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই, প্রতাপ রূপসীর প্রতি সম্পূর্ণ স্নেহশীল ও মনোযোগী। সুন্দরীর মুখে চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর গৃহত্যাগের কথা শুনিয়া যখন তিনি মুঙ্গেরে যাত্রা করিলেন, তখন তিনি কোথায় গেলেন কাহারও কাছে প্রকাশ করিলেন না। কেবল রূপসীকেই বলিয়া গেলেন, তিনি চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর সন্ধান করিতে চলিলেন। সন্ধান না করিয়া ফিরিবেন না। স্নেহশীল স্বামী যাহা করিয়া থাকে, তিনি তাহাই করিলেন। পত্নীর নিকট কোন কথাই গোপন করিলেন না। যখন ইংরাজের নৌকা হইতে পলায়নের পর শৈবলিনী মরিয়াছে বলিয়া প্রতাপ সিদ্ধান্ত করিলেন, তখন রূপসীর উপর একটু রাগ করিলেন,—কেন শৈবলিনীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ না হইয়া রূপসীর সঙ্গে হইল। যদি সত্যই তিনি রূপসীর প্রতি অমনোযোগী থাকিতেন, তবে এ সময়ে এ রাগ তাঁহার মনে কখনই আসিত না। প্রতাপের এক অমনোযোগ,—তিনি শৈবলিনীর স্থানে রূপসীকে বসাইতে পারেন নাই। রূপসীর দ্বারা শৈবলিনীকে দূরীভূত করিতে পারেন নাই। পারেন নাই বলিয়াই তিনি অত বড়, তাঁহার স্থান অত উচ্চে। যদি তিনি পারিতেন, তাহা হইলে তিনি আমাদের নিকট কিছুমাত্র উচ্চাসনের দাবী করিতে পারিতেন না। আমরা বলিতাম, তাঁহার প্রীতি ইন্দ্রিয়-লালসোৎপন্ন কলুষিত চিত্তাকর্ষণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। রূপসী যদি যথার্থই তাঁহার স্বামীর প্রতি স্নেহশালিনী সহধর্ম্মিণী হইয়া থাকেন, যদি অনাবিলত্ব তাঁহার হৃদয়ে কিছুমাত্র প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, তাহা হইলে যে স্বামী তাঁহার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এমন ভাবে আত্মোৎসর্গ করিতে পারেন, তাঁহাকে তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা ত করিবেনই, অধিকন্তু তাঁহার মহান গৌরবে গৌরবান্বিতা হইয়া সীতার ন্যায় বলিবেন "স এব ভর্ত্তা ন তু * বিপ্রয়োগঃ"।

ডিকেন্স (Dickens) প্রণীত "A Tale of Two Cities" নামক উপন্যাসের 'সিড্‌নি কার্টন' (Sidney Carton)-এর সহিত প্রতাপ-চরিত্রের কিছু সাদৃশ্য অনুভূত হইতে পারে। সিড্‌নি কার্টনও প্রতাপের ন্যায় স্বীয় প্রণয়-পাত্রীর উপকারার্থ নিজের জীবন দান করিয়াছিলেন। কিন্তু সেখানে ঐ প্রণয়পাত্রীর স্বামী 'এভারমণ্ডের' (Evermonde) জীবন সঙ্কটাপন্ন ছিল। কার্টন স্বীয় বুদ্ধিবলে নিজেকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া তাঁহাকে সেই স্থান হইতে অপসারিত করেন। তাহাতেই তাঁহার জীবন রক্ষা হয়। কিন্তু প্রতাপ যখন আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দেন, তখন শৈবলিনী বা চন্দ্রশেখর কাহারও জীবনের কোনও আশঙ্কা ছিল না। পাছে ভবিষ্যতে, তাঁহার অস্তিত্বে পুনরায় উঁহাদের জীবনে কোন অশান্তির উদয় হয়, সেই ভবিষ্যৎ আশঙ্কাকে সম্পূর্ণ ভাবে বিলুপ্ত করিবার জন্য তিনি নিজেকে পৃথিবী হইতে অপসারিত করিলেন। অতএব আমাদের মনে হয়, প্রতাপের আত্মত্যাগ আরও গভীর ও মহত্তর। আর একটী বিশেষ পার্থক্য এই যে, 'সিড্‌নি কার্টনের' কার্য্য আকস্মিক। তাঁহার পূর্ব্ব জীবনের সহিত ইহার কোন মিল নাই। তাঁহার দ্বারা যে এরূপ নিঃস্বার্থ ভাবে আত্ম-বলিদান সম্ভব, তাহা তাঁহার পূর্ব্বজীবন হইতে অনুমান করা যায় না। আকস্মিক উত্তেজনায় মানুষ ভাল কাজও করিতে পারে, মন্দ কাজও করিতে পারে। আত্মোৎসর্গও করিতে পারে, নরহত্যাও করিতে পারে। আকস্মিক উত্তেজনায় 'সিড্‌নি কার্টন' 'লুসির' স্বামীর জীবন রক্ষার্থ নিজের জীবন দান করিলেন! আবার এই 'লুসি' যদি তাঁহার নিকট কখনও আত্মসমর্পণ করিত, তাহা হইলে তখনকার আকস্মিক উত্তেজনার ফলে তিনি যে ভ্রনসকায়ের মত 'লুসি'কে লইয়া চলিয়া যাইতেন না, তাহার স্থিরতা কি? বরঞ্চ 'লুসির' প্রতি তাঁহার আকর্ষণের যেরূপ গভীরতা দেখা গেল, এবং তাঁহার জীবন

---

* বিচ্ছেদঃ।

যেরূপ উচ্ছৃঙ্খল, তাহাতে তাঁহার পক্ষে 'লুসিকে' লইয়া চলিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। অতএব এ হিসাবে 'প্রতাপের' সহিত তাঁহার তুলনা কোথায়? সিড্‌নি কার্টনের পক্ষে অবশ্য একটা কথা বলা যায় যে, 'লুসি' তাঁহার প্রতি কখনও কোনরূপ পক্ষপাতিনী হয় নাই, কখনও হইবার সম্ভাবনাও ছিল না। তথাপি তাহারই প্রিয়ানুষ্ঠানার্থ তিনি তাঁহার নিজের জীবন পর্য্যন্ত দান করিলেন। ইহা খুবই মহত্ত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু এটুকু সম্পূর্ণ হইত, যদি তিনি তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার এই কার্য্য 'লু সিকে' জানাইবার উপায় নিজেই না করিয়া যাইতেন। গ্রন্থকার যে তাঁহার দ্বারা সেটুকু করান নাই, তাহা খুবই সঙ্গত হইয়াছে; কারণ, সে তৃপ্তিটুকু হইতেও আত্মাকে বঞ্চিত করিবার ক্ষমতা সাধারণতঃ মানুষের হয় না। উহা সাধনাসাপেক্ষ, আজন্ম-সাধনা-সিদ্ধ 'প্রতাপেরই' পক্ষে উহা সম্ভব। তিনিই মৃত্যুকালে রমানন্দ স্বামীকে বলিয়া যাইতে পারেন, "কখনও মানুষে তাহা জানিতে পারে নাই—মানুষে তাহা জানিতে পারিত না—এই মৃত্যুকালে আপনি কথা তুলিলেন কেন?"

শৈবলিনীর প্রত্যাবর্ত্তনের দ্বিতীয় কারণ তাহার আকর্ষণে অপেক্ষাকৃত অনাবিলত্ব। চন্দ্রশেখর যখন 'রমানন্দ স্বামীর' কমণ্ডলুস্থিত জলপানে মন্ত্রমুগ্ধা শৈবলিনীকে জিজ্ঞাসা করেন "প্রতাপ কি তোমার জার?" তাহার উত্তরে তদ্‌বস্থ—শৈবলিনী বলে "ছি ছি * * * *, এক বোঁটায় আমরা দুইটী ফুল, এক বনমধ্যে ফুটিয়াছিলাম, ছিঁড়িয়া পৃথক করিয়াছিলে কেন?" এ কথা এ্যান্না কারেণীনা ত বলিতেই পারে না, হেষ্টর প্রিন্‌ও বলিতে পারে না। শৈবলিনীর ইন্দ্রিয়পরায়ণতার অল্পতার আর একটী নিদর্শন—চন্দ্রশেখরের প্রতি তাহার অশ্রদ্ধা বা বিরক্তির অভাব।

সে প্রতাপের প্রতি আজন্ম আকৃষ্টা, "এক বোঁটায় দুইটী ফুল," সে তাহাকেই চাহে; কিন্তু তাই বলিয়া চন্দ্রশেখরের প্রতি অশ্রদ্ধা বা কোনরূপ বিরক্তিকর ভাব তাহার মনে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। হেষ্টর প্রিন্ গরলামৃত পান করিয়া তাহার প্রিয়জন ডিমস্‌ডেলের হিত কামনায় যখন একবার তাহার পূর্ব্বস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করে, তখন সেই ভীষণ ভাবে পরিবর্ত্তিত তাহারই কারণে দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখিয়া তাহার মনে কতকটা অনুকম্পার উদয় হইয়াছিল বটে, কিন্তু তথাপি ঘৃণার উদ্রেককে সে দমন করিতে পারে নাই।

"Be it sin or not" said Hestor bitterly "I hate the man."

'এ্যান্না কারেণীনা', 'ভ্রনসকাইয়ের' সহিত প্রথম সাক্ষাতের পর, যদিও তখনও সে ঠিক বুঝিতে পারে নাই যে তাহার ভবিষ্যৎ জীবন উহারই সহিত গ্রথিত, তত্রাচ তাহার পরে যখন সে স্বামীর সহিত মিলিত হয়, তখন প্রথমেই তাঁহার দৈহিক বৈষম্যই তাহার নয়নে সর্ব্বাপেক্ষা পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

"Oh Mercy! why do his ears look like that?" শৈবলিনীর প্রতাপের প্রতি আসক্তিতে যদি ইহাদের মত ইন্দ্রিয়পরায়ণতা থাকিত, তাহা হইলে চন্দ্রশেখরের প্রতি এতজ্জাতীয় বিরক্তি তাহার মনে আসিতই আসিত। কিন্তু তাহা হয় নাই, চন্দ্রশেখরের প্রতি ব্যক্তিগত ভাবে কোনরূপ বিরক্তি কোথাও তাহার মনে দেখিতে পাওয়া যায় না। মুঙ্গেরে শৈবলিনী ভাবিয়াছে, "আমি তাঁহার যোগ্যা নহি বলিয়া আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। তাহাতে কি তাঁহার কোন ক্লেশ হইয়াছে? তিনি কি দুঃখ করিয়াছেন?" এই জন্যই তাহার কল্পিত ভাব কাটিয়া গেলে, শৈবলিনী দেখিতে পাইল, "এই যে ললাট, প্রশস্ত, চন্দনচর্চ্চিত, চিন্তারেখা-বিশিষ্ট—এ যে সরস্বতীর শয্যা—ইন্দ্রের রণভূমি—মদনের সুখকুঞ্জ—লক্ষ্মীর সিংহাসন!"

অনেক গ্রন্থকার এই সর্ব্বগ্রাসী আকর্ষণ বর্ণনা করিতে যাইয়া ভয়ে ভয়ে নায়ক-নায়িকার দেহটাকে শুদ্ধ রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার জন্য তাঁহারা অনেকে অনেক রকম ক্ষীণ উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ বা সামাজিক বৈষম্যকে আনয়ন করিয়াছেন, কেহ বা আকস্মিক ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন—আবার কেহ কেহ বা বিবাহের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। বিবাহ-প্রণোদিত ধর্ম্মবুদ্ধিদ্বারা মনের এই অবাধ গতির অসংবরণীয় আকর্ষণকে সংযত করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। আমরা ইঁহাদিগকে রসস্রষ্টা বলিতে মোটেই প্রস্তুত নহি। ইঁহারা প্রকৃতির প্রকৃত লীলা দেখাইতে অক্ষম। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র

সেন মহাশয়ের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, "যেখানে সূচনা আছে অথচ ভীরু লেখকেরা পরিণতি আঁকিতে ভয় পাইয়াছেন, সেখানে আর্ট কোথায়?" বিবাহ এই অবাধ গতির নিরোধার্থ, এই দেহজ ভাবকে যতদূর সম্ভব দূরীকরণার্থ ভগবন্নির্দ্দিষ্ট শ্রেষ্ঠ উপায়, কিন্তু উহা উপায়, সাধক,—সাধ্য নহে। বিবাহ হইলেই মনের গতির পরিবর্ত্তন হয় না। বিবাহের শক্তির বিবাহিত ব্যক্তির মনের উপর সম্পূর্ণভাবে ক্রিয়া করা আবশ্যক,—মনকে ঐ শক্তির সম্পূর্ণ উপযোগী করা আবশ্যক। তবেই বিবাহের ইপ্সিত ফল আশা করা যাইতে পারে, নচেৎ নহে।

উপসংহারে আমরা বলিতে চাহি যে, সতীর সতীত্ব বর্ণনা করিলেই উৎকৃষ্ট কাব্য হয়, এবং উহার অভাবেই যে অপকৃষ্ট হয়, এমন নহে। সতীর স্বার্থত্যাগ, সহিষ্ণুতা, তাঁহার ধর্ম্মপ্রবণতা—এ সকল খুব উৎকৃষ্ট বিষয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু কাব্যে ইহাদের স্থান ততটুকু, যতটুকু ইহারা আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত প্রকৃত সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে। এ কথা হইতে এরূপ যেন কেহ ভাবিবেন না যে, লম্পটের লাম্পট্য বা কুলটার কুপ্রবৃত্তির বর্ণনার দ্বারাও কোথাও কোথাও উহা সৃষ্ট হইতে পারে। সতীর সংযমাদির বর্ণনায় অনিপুণ হস্তে সকল সময় সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি না হইলেও, কতকটা উহার ভাবের সৃষ্টি হইবেই। কেন না অনাবিলত্ব হইতেই ইহাদের উৎপত্তি এবং ইহারা উহারই পার্শ্বচর। কিন্তু লাম্পট্যাদির অবতারণা হইতে ঐরূপ আভাষেরও সৃষ্টি কদাচ সম্ভব নহে। কেন না, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঐ সকল অত্যন্ত স্থূল—উহা হইতে সূক্ষ্ম তৃপ্তির উদ্ভব হইতেই পারে না।

আজকাল কেহ কেহ এই সকল ব্যভিচারপুষ্ট মনোভাবের উপর এক নিষ্ঠার ছাপ দিয়া উহাকে শ্লাঘনীয় করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। কেহ কেহ বা উহার উপর সম্পূর্ণ অতীন্দ্রিয়তার আরোপ করিয়াছেন। ইহাতে ফল আরও ভীষণ দাঁড়াইয়াছে। অস্বাভাবিকতা আসিয়া গ্রন্থকারগণের সকল চেষ্টা নষ্ট করিয়া দিয়াছে। ঐরূপ যে একেবারেই অসম্ভব, শুধু ঐ জাতীয় চিত্তবৃত্তিকে মহনীয় করিবার পক্ষপাত প্রযুক্ত একটা ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র—এই কথাটা সর্ব্বদা মনের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, ঐ সকল গ্রন্থের অন্তর্নিহিত পশুভাবই উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে। ব্যভিচারী ব্যক্তিও যে অনাবিলতার ভাগী হয় তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। কিন্তু উহা দুটা কথা কহিয়াই খোসমেজাজে হয় না। উহার জন্য বহু কাঠ-খড়ের প্রয়োজন। বিশেষতঃ যাহারা একবার সংযম পরিত্যাগ করিয়া হীন পন্থা অবলম্বন করিয়াছে, তাহাদের আবার সংযমের পথে আনিয়া অতীন্দ্রিয়ত্বে স্থাপিত করা যে কতদূর কঠিন ব্যাপার, আদৌ সম্ভবপর কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না। আমরা ছেলেবেলায় পড়িয়াছিলাম

"It is long before a principle restored
Can become so firm as one never Shaken.
(Smiles)

এ কথাটা যে কি পরিমাণে সত্য, তাহা বলা যায় না। আমরা দিন দিন অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যেও ইহার সারবত্তা অনুভব করি। অতএব আজকাল যাঁহারা এই সকল উন্মার্গগামীদের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে যদি কেহ ঐ সকল বিষয়ে মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৃত্তির অনুসরণ, সমাজে স্বাভাবিক আবেষ্টনে তাহার যথোপযুক্ত পরিণতি ও স্থান নির্দিষ্ট করণ প্রভৃতি যথাযথ ভাবে করিতে পারিয়া থাকেন, তবেই তাঁহার শ্রম সার্থক হইয়াছে। নহিলে সমস্তই বিড়ম্বনা।

শিল্প-বাণিজ্যে বঙ্গে চন্দননগরের স্থান

শ্রীহরিহর শেঠ

(২)

চন্দননগর নামের উৎপত্তি নির্ণয় প্রসঙ্গে অনেকের গ্রন্থ হইতে মনে হয়, এখানে পূর্ব্বকালে চন্দনকাষ্ঠের কাজ ছিল। শম্ভুচন্দ্র দে মহাশয় তাঁহার গ্রন্থের পাদটিকায় এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। (১) অহিফেনের আবাদ সম্বন্ধে যেমন স্পষ্ট কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না, তেমনই চন্দন কাষ্ঠের এখানে বন ছিল বা আবাদ হইত এমন কথা কোথাও দেখা যায় না, বা কোন লেখা হইতে বুঝা যায় না। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে এখান হইতে ফেলিপো (Phelypeaux) নামক জাহাজে করিয়া ফ্রান্সে চন্দনকাষ্ঠ রপ্তানি হইয়াছিল তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (২) বাহির হইতে আসিয়া এখানে খরিদ বিক্রী হইত এরূপও হইতে পারে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, রপ্তানী ব্যবসার মধ্যে পূর্ব্বকালে রেশমের কাজ অন্যতম প্রধান ছিল। প্রচুর পরিমাণে সোরা, মোম, মরিচ, সপিন কাষ্ঠ, শাল কাষ্ঠ প্রভৃতি এখান হইতে রপ্তানী হইত। (৩) বলা বাহুল্য, ইহার

গুরুবাবুর আড়ৎ—পুরাতন লক্ষ্মীগঞ্জ।

(১) Hughly Past and Present.

(২) La Compagnie Des Indes Orientales.

(৩) La Compagnie Francaise Des Indes (1604-1875)

মধ্যে অনেক জিনিসই বাহির হইতে আসিত। সোরা বিহার হইতে আসিত। (৪) খাদ্য দ্রব্যের সর্ব্বদা অভাব হেতু পণ্ডিচারীতে এখান হইতে খাদ্য দ্রব্য প্রায়ই প্রেরিত হইত।

আধুনিককালে এখানকার উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে যাহা বিদেশে রপ্তানী হইত বলিয়া জানা যায়, তন্মধ্যে চর্ব্বির উল্লেখ করা যাইতে পারে। অনেক দিন হইতে স্থানীয়

৺বনমালী মিত্র।

হাড়িদের মধ্যে অনেকে শূকরের চর্ব্বির কাজ করিত। তৎপরে কতিপয় অত্রসহরবাসী ভদ্রলোক মিলিয়া কপিলচন্দ্র দে এণ্ড কোম্পানি নাম দিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে একটি বড় চর্ব্বির কারখানা স্থাপন করেন। সলিখা, কোন্নগর, নৈহাটী প্রভৃতি কতিপয় স্থানে ইঁহাদের শাখা কারখানা ছিল। উৎপন্ন মালের মধ্যে অধিকাংশই মরিশস্ দ্বীপে যাইত, রেঙ্গুন এবং ফ্রান্সেও রপ্তানী হইত বলিয়া শুনা যায়। এই কারখানায় প্রস্তুত চিন চিন (chin chin) মার্কা চর্ব্বি প্রসিদ্ধ ছিল এবং সকল স্থানেই বিশেষ আদরের সহিত গৃহীত হইত। এই কারখানা পরে উহার অন্যতম অংশীদার কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠাতা বটকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় ক্রয় করিয়াছিলেন। চীন দেশজাত চর্ব্বির প্রতিযোগিতায় এখানকার কাজ ক্রমে অসুবিধাজনক হয় এবং বটুবাবুর ইহলোক ত্যাগের সহিত কারখানাটির অস্তিত্ব লোপ পায়। চর্ব্বির কাজ আর এখানে নাই বলিলেই হয়। (৫)

বেণীমাধব পাল।

এখান হইতে কড়ি খরিদ হইয়া অন্যত্র চালান হইত, এ সংবাদ গ্রন্থ মধ্যে পাওয়া যায়। ১৭১৮-২১ খৃষ্টাব্দে বৃটীশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রতি মাদ্রাজ মুদ্রায় ৩৬ পৌন্ হিসাবে কড়ি খরিদ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। (৬) প্রেমনারায়ণ বসু মহাশয়ের কড়ির কাজ ছিল।

স্থলপথ অপেক্ষা জলপথে পণ্য বহনের সুবিধা থাকায়

(৪) আলিবর্দ্দী খাঁর পরওয়ানা—পণ্ডিচারীর অপ্রকাশিত রেকর্ড।

(৫) শ্রীমান শরৎচন্দ্র পালের নিকট হইতে চর্ব্বির কারখানার বিষয় প্রধানতঃ জানিতে পারি।

(৬) The Early annals of the English in Bengal. Vol. III.

এখান হইতে যেমন শত শত পণ্যবাহী নৌকা ও অর্ণবপোত বাণিজ্য সম্ভার লইয়া দিকে দিকে ছুটিত, সেইরূপ, নৌ-শিল্পের উন্নতিও যথেষ্ট হইয়াছিল। এখানে নৌকা প্রস্তুতকারী সূত্রধর পূর্ব্বে অনেক ছিল। এক্ষণে এই কার্য্য

৺সত্যপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

হ্রাস প্রাপ্ত হইলেও, এ শিল্প এখান হইতে একেবারে লোপ পায় নাই। এখনও, শুধু স্থানীয় প্রয়োজন ভিন্ন অন্যান্য স্থানে সরবরাহ করিবার জন্যও এখানে প্রতি বৎসর অনেক নৌকা প্রস্তুত হইয়া থাকে। (৭)

গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ইট, কাঠ, চূণ, শুরকি প্রভৃতি দ্রব্যাদির ব্যবসায় এখানে নিকটবর্ত্তী স্থান সকল অপেক্ষা অনেক বেশী। কাঠের কাজ বিশেষতঃ চেয়ার এবং অন্যান্য আসবাব পত্র এখানে যত অধিক প্রস্তুত হয়, কলিকাতার পর বাঙ্গলার অন্যত্র এত অধিক আর কোন এক স্থানে হয় কি না সন্দেহ। চেয়ারের কাজ এখানে বহু বিস্তৃত। কলিকাতার অধিকাংশ চেয়ারই এই স্থান হইতে যাইয়া থাকে। হুগলীর উত্তরে কেওটা এবং মিরকালা নামক স্থানে যে সব চেয়ার প্রস্তুত হয়, তাহার অধিকাংশ চন্দননগরের ব্যবসায়িগণ মিস্ত্রীদের কাঠ ও দাদন দিয়া করাইয়া লন। ডেস্ক ও বাক্স এখানে প্রচুর উৎপন্ন হইত। (৮)

সূক্ষ্ম বাটালির কাজ এখানে খুব সুন্দর হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এখানে বহু সংখ্যক ভাল ভাল শিল্পী ছিলেন। এখন যে কয়েকজন আছেন, তন্মধ্যে সত্যচরণ মাঝি, প্রসন্নচরণ মাঝি, অধরচন্দ্র মালিক, গগনচন্দ্র মালিক প্রভৃতির নাম বেশি শুনা যায়। বহু বৎসর পূর্ব্বে সেরউড্ কোম্পানি (Sherwood Co.) নামক এখানে একটি বড় কাঠের কারখানা ছিল। (৯) কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ল্যাজেরাস্ কোম্পানী (Lazarus Co.) এখানে অনেক দিন যাবৎ একটি সুবৃহৎ চেয়ারের কারখানা চালাইয়াছিলেন। স্থানীয় লোকের মধ্যে গোলোকচন্দ্র নন্দী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবগোপাল ঘোষ মহাশয় এখানে প্রথম

শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র।

চেয়ারের কারখানা স্থাপন করেন। তৎপরে শ্রীনাথ রায় মতিলাল কুণ্ডু ও উমেশচন্দ্র কুণ্ডু এই ব্যবসা করেন। 'চন্দননগর চেয়ার' নামে যে চেয়ার কলিকাতায় বিশেষ আদৃত, শুনা যায় মতিলাল কুণ্ডু মহাশয় দ্বারা উহা উদ্ভাবিত হইয়াছিল। পুরাতন এবং আধুনিক মৃত

(৭) চন্দননগরের শিল্প —স্বরাজ ১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪ সাল।

(৮) Bengal District Gazetteers—Hughly.

(৯) চন্দননগরের শিল্প।—স্বরাজ ১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪ সাল।

শিল্পীদের মধ্যে বাটালির কাজে কৈলাসচন্দ্র কুড়, হরিচরণ পাল, নীলমণি নাথ, হরিপ্রসাদ পাল, শ্রীনাথ পাল, ভূষণ মল্লিক, হরিগোপাল দাস ও পূর্ণচন্দ্র দাস প্রভৃতির নাম প্রসিদ্ধ। চোরসা অর্থাৎ ইমারতি কাজে গোপাল সাঁতরা, গোবিন মল্লিক, নবীন রাণা, বাবুলাল দাস, নারাণ দাস, চারুপাল, মেঘনাদ দাস, বেণী পাল, কৈলাস কুণ্ডু ও

শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সেন।

শিবনাথ দাসের নাম শুনা যায়। (১০) পূর্ব্বের তুলনায় এ কাজ এখন কিছু কমিয়া যাইলেও, ইহা এখনও এখানকার একটি বড় শিল্প এবং উৎকৃষ্ট দারুশিল্পের জন্য চন্দননগরের প্রসিদ্ধি এখনও কম নহে। এখানকার মধ্যে ৺মতিলাল দাস, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র শীল, ঘোষ রক্ষিত দে কোম্পানীর কারখানা উল্লেখযোগ্য। এবং সেগুন কাষ্ঠের গোলা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাস ও বি, এন, নন্দী কোম্পানীর সর্ব্বাপেক্ষা বড়। শাল কাষ্ঠের কাজ এখানে পূর্ব্বে অনেক ছিল, এখন খুবই কমিয়া গিয়াছে। রামধন শেঠ, গোপালচন্দ্র শেঠ, শ্রীধর মল্লিক, যাদবেন্দু নন্দী ও প্রহ্লাদ মল্লিকের শাল কাষ্ঠের গোলা প্রসিদ্ধ ছিল। তাঁহারা সকলেই প্রায় বলাগড় হইতে কাষ্ঠ আনিয়া এখানে ব্যবসা করিতেন। (১১)

চেয়ারের কারখানা অনেক থাকায় বেত বোনা কাজও এখানে অনেক আছে। এ দেশে কাচের শাসির প্রচলনের পূর্ব্বে কাষ্ঠের ফ্রেমে বোনা বেতের জানালা হইত। দুই একটি পুরাতন বাটীতে এইরূপ জানালা দেখিয়া মনে হয়, পূর্ব্বকালেও এখানে বেতের কাজ ভাল হইত। ঝুড়ি, পেতে, চাঙ্গারি প্রভৃতি তৈয়ারি করিয়াও কতকগুলি গরীব লোক তাহাদের অন্নসংস্থান করে। ইহাও একটি গৃহ-শিল্প, সাধারণতঃ ডোমেদের স্ত্রীলোকদের মধ্যেই উহা নিবদ্ধ।

এখানে বহুদিন যাবৎ অনেকগুলি বড় বড় ইটখোলা আছে। এক্ষণে বি, এন, নন্দী কোম্পানী, গুরুদেব সিং ও সুরেন্দ্রনাথ পালিতের পগ্‌মিল্ ইটখোলাগুলিই বড়।

ভূতপূর্ব্ব ম্যার ৺নবীননাথ চন্দ্র।

পূর্ব্বে কালীপদ মান্না, মতিলাল মল্লিক ও অদ্বৈতচরণ শেঠের কাজ বড় ছিল। নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের তুলনায় এখানকার

(১০) নামগুলি প্রধানতঃ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র শেঠ ও শ্রীযুক্ত বলাইচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নিকট হইতে জানিতে পারি।

(১১) শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ পাল মহাশয়ের নিকট হইতে নামগুলি জানিতে পারি।

টালি ভাল। এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের টালির খ্যাতি অধিক।

চূণ সুরকীর কাজও এখানে কম নহে। ৺যদুনাথ ঘোষ ও ৺অদ্বৈতচরণ শেঠের সুরকির কল সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। উপস্থিত এখানে মোট ৭।৮টি সুরকীর কল আছে। এখানে যখন কল প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তখন জেলখানায় ঢেঁকি দ্বারা সুরকি ভাঙ্গা হইত। যজ্ঞেশ্বর

শ্রীযুক্ত মধুসূদনচন্দ্র সরকার।

বন্দ্যোপাধ্যায়, রামেশ্বর উড়িয়া, কালীচাঁদ মান্না ও হরি পরামাণিক ইহাদেরও এই সময় ঢেঁকি-ভাঙ্গা সুরকির কারখানা ছিল। প্রত্যেকেরই আট দশটি ঢেঁকি ছিল। দীননাথ দাস সর্ব্বপ্রথম লালদীঘির ধারে কল স্থাপন করিয়াছিলেন। (১২)

চূণ এখানে বহু পরিমাণে বিক্রীত হইয়া থাকে। বহু পূর্ব্বের চূণ ব্যবসায়ীদের মধ্যে পরাণচন্দ্র নন্দী, গোলোকচন্দ্র কুণ্ডু, সারদাপ্রসাদ দে ও মধুসূদন কুণ্ডুর নাম শুনা যায়। শেষোক্ত ব্যক্তির ছাতক চূণের আড়ৎ ছিল। এক্ষণে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র কুণ্ডুর যে ছাতক ও অন্যান্য চূণের কাজ আছে উহাই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। ইহাই সতীশবাবুর বৃদ্ধ পিতামহ গোলোক কুণ্ডু মহাশয়ের দোকান ছিল।

চন্দননগরের মৃৎশিল্পের কথাও উল্লেখযোগ্য। এখানকার মাটির বাসন উৎকৃষ্ট। (১৩) এখানকার মত

চিত্রকর শ্রীআশুতোষ মিত্রের পেন্ এণ্ড ইঙ্কে অঙ্কিত তাঁহার পিতা ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র মিত্রের প্রতিকৃতি।

হাঁড়ি এ প্রদেশে কোথাও হয় না। লালবাগান, শুরের পুকুর ও হরিদ্রাডাঙ্গায় বিস্তর কুম্ভকারের বাস ছিল, এখনও অনেকে জাতি-ব্যবসা করিয়া থাকেন। শুরের পুকুরের কুঁজা খুব ভাল হয়। পাতকুয়ার পাড় চন্দননগর ভিন্ন নিকটে কোথাও হয় না। প্রতিমা গঠনের জন্য ভাল কুম্ভকার এখানে বরাবরই আছেন। তাঁহাদের দ্বারা নির্ম্মিত সুবৃহৎ জগদ্ধাত্রী সরস্বতী প্রভৃতি প্রতিমা বা ভিন্ন ভিন্ন

(১২) শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সাধুর নিকট হইতে এই সকল জানিতে পারি।

(১৩) Bengal District Gazetteers—Hughly.

মেলায় যে-সব মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। আধুনিকের মধ্যে গদাই, নতি ও সাধুচরণ পাল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এখানে ভাল ভাল পটুয়াও অনেক ছিল। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বেও এখানে পোটোর তৈয়ারি পট খুব বিক্রয় হইত। উহা দুই প্রকারের হইত। এক কালীঘাটের পটের ন্যায় কাগজে আঁকা, আর এক খাকারির বাঁধা ফ্রেমে কাপড় আঁটিয়া তাহাতে মাটির সূক্ষ্ম প্রলেপ দিয়া তদুপরি অঙ্কিত হইত। ইহাকে বাঙ্গলার একটি নিজস্ব শিল্প বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বেকার পটুয়ারাও এখন নাই, আর সে সব ছবিও দেখা যায় না।

চিত্রকর শ্রীযুত অনুকূলচন্দ্র সরকারের অঙ্কিত একখানি প্রাচীন ইরানী চিত্রের অনুলিপি।

আধুনিক চিত্র শিল্পের জন্য চন্দননগরের কোন বিশেষ খ্যাতি প্রচারিত না থাকিলেও, এখানে অনেকগুলি উচ্চ শ্রেণীর চিত্র শিল্পীর উদ্ভব হইয়াছে। খ্যাতনামা যাঁহাদের কথা জানা আছে, তন্মধ্যে বেণীমাধব পাল মহাশয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। পুরাতন প্রথায় সুন্দর ও সুভাব বিশিষ্ট দেব দেবীর তৈল-চিত্র অঙ্কনে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কলিকাতার কোন কোন স্থানে এবং এখানে অনেকের বাটীতে তাঁহার অঙ্কিত ছবি আছে। তাঁহার পুত্র মতিলাল পালও একজন ভাল চিত্রকর ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ বসন্তলাল মিত্র মহাশয় প্রতিকৃতি অঙ্কনে তাঁহার সময়ে একজন বঙ্গবিখ্যাত চিত্রকর ছিলেন। তিনিই একমাত্র বাঙ্গালী, যিনি খৃঃ ১৮৮৮ সালের গ্লাসগো শিল্প প্রদর্শনীতে চিত্রের জন্য পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। তিনি জাষ্টিস রমেশচন্দ্র মিত্র, রংপুরের মহারাজা গোবিন্দলাল, ম্যাজিষ্ট্রেট বিটসন্ বেল্ প্রভৃতি বহু বড় লোকের তৈল-চিত্র আঁকিয়া বিশেষ সুখ্যাতিলাভ ও স্বর্ণ পদকাদি পুরস্কার পাইয়াছিলেন। তাঁহার অঙ্কিত মহাত্মা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র এখনও কলিকাতা হাইকোর্টে দেখিতে পাওয়া যায়।

এখানে ৺সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র, শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সেন, ৺দ্বিজপদ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অনুকূলপ্রসাদ সরকার প্রভৃতির নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রাকৃতিক দৃশ্য হইতে জলের রংয়ে এবং কালী কলমে (pen and ink) প্রতিকৃতি অঙ্কনে আশু বাবুর ন্যায় শিল্পী বাঙ্গলায় অধিক নাই। পরেশবাবুও একজন উচ্চদরের চিত্রকর। তাঁহার অঙ্কিত বহু সুন্দর সুন্দর চিত্র কলিকাতার ঠাকুর-বাটীতে আছে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে তাঁহার অঙ্কিত চিত্র আছে। স্যার জন উড্‌রফ পরেশবাবুর অঙ্কিত বহু চিত্র ক্রয় করিয়া বিলাতে পাঠাইয়া দেন এবং তাঁহাকে পুরস্কৃত করেন। তিনি অনেক

পুরস্কার, বৃত্তি ও পদকাদি পাইয়াছেন। ইনি এক্ষণে কলিকাতাবাসী। (১৪)

ডাকের সাজের এবং বিবাহের রোসনাই প্রভৃতি মালাকরের কাজ এখানে পূর্ব্বে অধিক ছিল, এখনও সে কাজ কিছু কিছু আছে। কৈলাসচন্দ্র ও ক্ষেত্রনাথ প্রভৃতি মালাকরগণ উৎকৃষ্ট শিল্পী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। নেড়োর মোহনা অঞ্চলে কয়েকঘর ভাল মালাকর ছিলেন।

আশাশোটা, তক্তারামা, মহাপায়া, বরের পোষাক প্রভৃতি বরসজ্জার সামগ্রীর ভাড়া, এমন কি ইংরাজি বাজনা পর্য্যন্ত এই জেলার মধ্যে এই স্থানেই পাওয়া যায়।

পোটোর অঙ্কিত পুরাতন পট।

এখানে বড় বড় ময়রার দোকান আছে। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ভীম ময়রা, পরাণ ময়রার খুব নাম-ডাক ছিল। ফরাসডাঙ্গার ছানাবড়া ও ভীম ময়রার জোড়া মোণ্ডা এতদঞ্চলের প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন ছিল। এক্ষণে সূর্য্য ময়রার জলভরা তালশাঁস সন্দেশ, তারিণী ময়রার গজা ও হরি ময়রার রসগোল্লা খুব উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। কিশোরচন্দ্র ঘোষের দোকান সর্ব্বাপেক্ষা বড়।

চন্দননগরের কলকারখানার কথা বলিতে, অবশ্য গোঁদলপাড়া জুট্ মিল্ এবং গরুটিস্থিত এঙ্গাস্ কোম্পানীর মিল প্রধান। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইলেক্‌ট্রিক্ সাপ্লাই এণ্ড্ ট্র্যাকশন্ কোং লিমিটেডের বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের কারখানা তৎপরে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের ম্যানেজিং এজেণ্ট হইতেছেন মেসার্স নরসিংসহায় মদনগোপাল। এই কোম্পানীর উন্নতির সঙ্গে এখানকার আটা ময়দা তৈল প্রভৃতির ছোট ছোট কল প্রতিষ্ঠা এবং ছোট ছোট শিল্পের উন্নতি সম্ভব। এক্ষণে দুইটি আটা ও একটি

বাঁকারির ফ্রেম কাপড়ের উপর পোটোর অঙ্কিত পুরাতন চিত্র

তৈলের কল চলিতেছে। এখানকার জলের কলের সহিত ব্যবসার কোন সম্পর্ক না থাকিলেও, কলের হিসাবে উহারও উল্লেখ হওয়া উচিত। বটকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের কাপড়ের কল এক সময় প্রসিদ্ধ ছিল। বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই এ কার্য্যে অগ্রণী। তাঁহার কলে সুন্দর কাপড়, জামার কাপড়, তোয়ালে প্রভৃতি প্রস্তুত হইত। (১৫)

জগমোহন দাসের ময়দার কল এবং কেশবচন্দ্র দাস

(১৪) ১ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা প্রবর্ত্তকে প্রকাশিত "চন্দননগরের চিত্রকলা ও গীত বাদ্য" নামক মল্লিখিত প্রবন্ধে চিত্রকরদের বিষয় বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

(১৫) ২য় খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা 'কমলায়' শ্রীযুক্ত বিরিঞ্চিমোহন করের "ফরাসডাঙ্গায় কাপড়ের কল" প্রবন্ধে বটকৃষ্ণবাবুর কলের কথা বিশদভাবে লিখিত আছে।

…শয়ের চাউলের কল দুইটিও ছোট নহে, কিন্তু উহা …হিরে প্রতিষ্ঠিত। ময়দার কলটি অগ্নিসাৎ হইয়া গিয়াছে। …হু বৎসর পূর্ব্বে গদাধর সাধুখাঁ নামে এক ব্যক্তি গরুর দ্বারা এককালে চারিখানি জাঁতা ঘুরাইয়া এখানে একটি আটা ভাঙ্গার কল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। রাজবল্লভ শীল নামক এক ব্যক্তি এখানে বোড়াইচণ্ডীতলায় প্রথম ময়দার কল স্থাপন করিয়াছিলেন। এখানে "অন্নপূর্ণা রাইস্ মিল্" নামক একটি চাউল ছাঁটাই কল আছে। শ্রীযুক্ত

কারুকার্য্য বিশিষ্ট পুরাতন কাঠের বেঞ্চ।
কথিত আছে বৰ্দ্ধমানের জাল প্রতাপচাঁদ চন্দননগরে অবস্থিতিকালে উহা ব্যবহার করিয়াছিলেন।

কথিত আছে এই বাড়ীর পশ্চাতে বহুপূর্ব্বে একটি বড় ঘড়ির কারখানা ছিল।

সতীশচন্দ্র সাহা মহাশয় উহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এক্ষণে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র নন্দী উহার স্বত্বাধিকারী! শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র পাল মহাশয়-দিগেরও বর্দ্ধমানে "সর্ব্বমঙ্গলা রাইস্ মিল্" নামক একটি চাউলের কল আছে। রসুলপুরে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন কুণ্ডুদিগের একটি কল প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

ইহার পূর্ব্বে চেয়ার ব্যবসায়ী নবগোপাল ঘোষ এই স্থানে একটি জয়েণ্টষ্টক্ কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা করেন। শুনা যায়, তিনিই এ কার্য্যে এখানকার প্রথম। (১৬)

দীনবাবুর ঔষধের কারখানা ও মদচোলাইখানার কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এখানে এখন কোরাল প্রেস্ সাধনা প্রেস্ ও বিপ্র প্রেস্ নামে তিনটি ছাপাখানা আছে। পূর্ব্বে ব্যাস প্রেস্, সুলভ প্রেস্, অদ্বৈত প্রেস ও তারা প্রেস্ নামে চারিটি প্রেস্ ছিল।

পূর্ব্বে এখানে সোডাওয়াটারের কল ৩৪টি ছিল। যদুনাথ ঘোষ মহাশয়েরটিই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন হোটেল দে প্যারিতে একটি আছে।

ফটোগ্রাফারদের মধ্যে শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ভড়, সিটি ফটো-গ্রাফার্সের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত গদাধর দত্ত, যুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত গৌরগোপাল কুণ্ডু প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ নন্দী মহাশয় ছোট এঞ্জিন সাহায্যে জাঁতি, ছুরি প্রভৃতির একটি ছোট কারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন। তথায় সুন্দর জাঁতি প্রস্তুত হইত। সুরেন্দ্র বাবু ও তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত রাখালদাস নন্দী উভয়েই শিল্পী এবং লোহা ও ষ্টীলের বিবিধ কার্য্যে পারদর্শী। সুপ্রসিদ্ধ বেহালা-বাদক ৺গুণমণি কর্ম্মকার ও তাঁহার পুত্র উপেন্দ্রনাথ কর্ম্মকারের প্রস্তুত কাতুরি ও জাঁতি অতি সুন্দর; এবং বহু দূর হইতে স্বর্ণকারগণ তাঁহাদের কারখানার প্রস্তুত কাতুরি ও অন্যান্য স্বর্ণকারদের যন্ত্র লইয়া যান। শ্রীযুক্ত গৌরচাঁদ দে ও সুরেন্দ্রনাথ পাঁড়ুই উৎকৃষ্ট তালা প্রস্তুত করিতে পারেন।

ইংরাজি ১৮৮৮ সালের গ্লাসগো প্রদর্শনীতে পুরস্কার প্রাপ্ত ৺বসন্তলাল মিত্রের অঙ্কিত তৈল চিত্র।

সারদাচরণ, কৈলাসচন্দ্র, অন্নদাচরণ দে, নারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি মিলিত হইয়া ৪০।৪২ বৎসর পূর্ব্বে একটি যৌথ কোম্পানী গঠন করিয়া "ইণ্ডিয়া প্রেস্" নামে কলিকাতায় একটি পাইটকসা কল স্থাপন করিয়াছিলেন। উহা শেষে এণ্ড্রু ইউল্ কোম্পানীকে বিক্রয় করা হয়।

(১৬) "প্রজাবন্ধু" ১২৯০ সাল।

গৌরচাঁদ চাবুসের তালা বা কল না খুলিয়া চাবি প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ দাস নামক একটি যুবক ষ্টেথেস্কোপ, ক্যাথিটার, ছুরি, প্রোব্ প্রভৃতি ডাক্তারি যন্ত্রাদি অতি সুন্দর রূপে প্রস্তুত করিতে পারেন। তাঁহার পিতা হরিচরণ দাসও এ বিষয়ে উৎকৃষ্ট শিল্পী ছিলেন। কলিকাতার ঔষধ ব্যবসায়ীরা ইহা লইয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র শেঠের নেম্‌ক্রুচ সেফ্‌টি পিন্ অতি সুন্দর। এত অল্প সময়ের মধ্যে তিনি ইহা প্রস্তুত করিতে পারেন যে, তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। বহু প্রদর্শনী হইতে এই যুবক পদকাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ

চিত্রকর বেণীমাধব পালের অঙ্কিত তৈলচিত্র।

দে ও নগেন্দ্রনাথ শেঠ সুন্দর ও মজবুৎ বঁড়শি প্রস্তুত করিতে পারেন। প্রমথনাথ স্বর্ণকারের কাজ করেন। তিনি এক প্রকার ট্রস্ নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। বহু ব্যবসায় বিষয়ক গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীযুক্ত সন্তোষনাথ শেঠ এক প্রকার পকেট হুঁকা আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাও উল্লেখযোগ্য।

কৃষ্ণ কর্ম্মকার নামক একজন খুব সূক্ষ্মবুদ্ধি এবং মাথা-ওয়ালা মিস্ত্রী ছিলেন। তাঁহার নিজ উদ্ভাবিত নৌকার জলুইকাটা কল ও স্বদেশী ট্রস্ বিশেষ ব্যবহারযোগ্য। প্রথমোল্লিখিত কলটির দ্বারা একজন স্ত্রীলোকও অতি অল্প সময়ে অনায়াসে বিস্তর জলুই (নৌকার তক্তা জুড়িবার জন্য এক প্রকার পেরেক) প্রস্তুত করিতে পারে। (১৭) পালপাড়া নিবাসী পরাণচন্দ্র বসু মহাশয়ের নারিকেল দড়ি প্রস্তুতের কারখানায় তিনি যখন কাজ করিতেন, তখন ছোবড়া পরিষ্কার করিবার একটি যন্ত্র নিজ মস্তিষ্ক হইতে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। নীলমণি কর্ম্মকার নামক একজন লৌহ ও পিতলের সূক্ষ্ম কলকব্জা প্রস্তুত কারক ও মেরামতের উৎকৃষ্ট মিস্ত্রী ছিলেন।

৺নবগোপাল ঘোষ।

অলঙ্কার প্রস্তুতের দোকানের এখানে কিছু বাহুল্য পরিদৃষ্ট হয়।

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র সরকার নির্ম্মিত চুড়ি অতি সুন্দর সস্তা ও মজবুত। হাটখোলার শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ নন্দী দিয়াশালাই সাবান ও কালী প্রস্তুত করিতে পারেন। জে, সি, ঘোষের সরস্বতী মার্কা এবং আর, এন, নন্দীর ব্লু ব্ল্যাক্ কালিও সুন্দর। ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রমোহন

(১৭) "চন্দননগরের শিল্প"—স্বরাজ ১০ম সংখ্যা, ১ম বর্ষ।

নন্দীর যোয়ানের আরক, ডিষ্টিল ওয়াটার ও কতিপয় পেটেণ্ট ঔষধ প্রস্তুতের একটি কারখানা আছে।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ এসেন্স্ বাস-তৈল প্রভৃতি ব্যবসায়ী শ্রীযুত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিবাস চন্দননগর। এ, এম, বানার্জ্জি; এম, এল, প্রামাণিক; নন্দী ব্রাদাস; আই, এম, বানার্জ্জি; কালীপ্রসন্ন বসু; আর, সি, চন্দ্র কোম্পানী; গৌরভূষণ চন্দ্র প্রভৃতি অনেকেই অটো,

মদ চোলাইয়ের যন্ত্র।

পমেটম, সাবান, বাস-তৈল, তরল আলতা, দন্ত মঞ্জন প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া ব্যবসা করিয়াছিলেন, কিন্তু কাহারও বিশেষ সুবিধা হয় নাই।

সিদ্ধেশ্বরী পাচন, অমৃতবিন্দু, সারসা প্যারেলা প্রভৃতি এখানকার কয়েকটি পেটেণ্ট ঔষধ বেশ চলিতেছে। চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে শকুন্তলা চূর্ণ, সুধাসিন্ধু, যোগরাজ রসায়ন প্রভৃতি কতিপয় পেটেণ্ট ঔষধ এখানে প্রস্তুত হইত। ৺আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বনবিনাশিনী নামক গাছপালা ধ্বংস করিবার একটি ঔষধ এবং অন্য কয়েক প্রকার ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

দেশী ধূপের কাজ এখানে অনেকে করিয়া থাকেন শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ মাদ্রাজি ধূপের অনুকরণে ধূপ প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতেছেন। শ্রীযুত প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামক এক উৎসাহী যুবক নিজ চেষ্টায় কিছু দিন যাবৎ সাইস্‌ষ্টোন্ অর্থাৎ পাটকলের ছুরি শান দিবার পাথর ও কারবন প্রস্তুতের একটি কারখানা করিয়াছেন। তিনি দরিদ্র প্রতিবেশী স্ত্রীলোকদের দ্বারা এই সকল কাজ করাইয়া থাকেন। পাটকল সমূহে তাঁহার প্রস্তুত সাইস্ ষ্টোনের বেশ আদর হইয়াছে। বিলাত হইতে এই জিনিসের আমদানী ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। লিখিবার জন্য কৃত্রিম শ্লেট প্রস্তুতের তিনি চেষ্টা করিতেছেন।

যে সকল শিল্পীর কথা এই প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে কয়েকজন বিশেষ শিল্প-প্রতিভা-বিশিষ্ট। চেষ্টা, অর্থ এবং অপরের নিকট হইতে উৎসাহ লাভের অভাবে তাঁহাদের কৃতিত্ব অনেকের নিকট অজ্ঞাত।

পূর্ব্বে এখানে বারুদ ও বাজি অনেক তৈয়ারি হইত। বেণীমাধব চক্রবর্ত্তী ভাল বাজিকর বলিয়া খ্যাত ছিলেন। এখন এ কাজটি আর নাই বলিলেই হয়।

আরসি প্রস্তুত এখানকার এক সম্প্রদায়ের একটি বিশিষ্ট গৃহ-শিল্পের মধ্যে পরিগণিত ছিল। উহা সহরের উত্তর দিকে তালডাঙ্গার নিকট অধিক হইত। উহাও এখন লোপ পাইয়াছে।

কাচের চুড়ির ব্যবসা যেমন এখানে খুব বেশী, তেমনই উর্দ্দু বাজারের মুসলমানদের মধ্যে চুড়ি তৈয়ারির কাজও প্রবল। আজকাল জাপানি চুড়ি গালাইয়া বেঁকি চুড়ি প্রস্তুতই অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে।

এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে বাহিরে যাঁহারা কিছু অভিনব কাজ করিয়াছেন, তন্মধ্যে রামতারণ চক্রবর্ত্তীর কানপুরে বুরুসের কারখানা এবং ৺নটুবিহারি চট্টোপাধ্যায় ও শীল এণ্ড কোম্পানীর কলিকাতায় সোলার টুপির কাজ উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দাস মহাশয়ের ঝরিয়ায় কয়লার কাজ ও বটকৃষ্ণ ঘোষের নাগপুরের জঙ্গলের কাজ উল্লিখিত হওয়া উচিত।

বাঙ্গালীই এখানকার প্রধান ব্যবসায়ী হইলেও, অন্য স্থানের ন্যায় মাড়োয়ারি খোট্টার সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। ইহা অবশ্য তাঁহাদেরই কৃতিত্বের পরিচায়ক। সাহেব ব্যবসায়ীর মধ্যে কয়েকটি হোটেলওয়ালা আছেন। এখানে বরাবরই অনেক গুলি হোটেল আছে। উপস্থিত হোটেল দে প্যারী, থিসল্ হোটেল, বিভেরা হোটেল প্রভৃতি মোট ছয়টি হোটেল আছে।

বর্ত্তমানে চন্দননগরে সর্ব্বপ্রকারে ব্যবসা প্রচুর এবং বড় বড় ব্যবসাদার অনেক থাকিলেও, পূর্ব্বের মত খুব বড় কোন কারবার আর এখন নাই। কতিপয় কারণে এখানে আর বড় ব্যবসার সুযোগ না থাকায়, অনেকেই কলিকাতায় বা অন্যত্র ব্যবসায় করেন। পূর্ব্বে যাঁহারা অন্যত্র কারবার করিয়া খ্যাতিপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শিশুরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, মোল্লা আব্দুল হাদি, নীলকণ্ঠ সরকার, রামমোহন শ্রীমানী, কার্ত্তিকচরণ দে, কাশীনাথ কুণ্ডু, দেবীচরণ সরকার, ফিরিঙ্গিকমল ওরফে রামকমল বসু, অদ্বৈতচরণ মণ্ডল, প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী, শম্ভুচন্দ্র শেঠ, দুর্গাচরণ রক্ষিত, জগমোহন দাস প্রভৃতির নাম শুনা যায়। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ জাহাজের মাল সরবরাহ করিয়া বা কুঠি স্থাপন করিয়া যথেষ্ট ধনশালী হইয়াছিলেন। কলিকাতায় বা অন্যত্র বড় ব্যবসা করেন এরূপ লোক এখন এখানে অনেকগুলি আছেন।

শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

১৭

কিরণ বীণার সঙ্গে চলিয়া গেলে, লীলা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। সেদিনের সমস্ত আনন্দ উৎসব খেলা আমোদ সবই যেন এক মুহূর্ত্তে ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। জীবনের পরিপূর্ণ সুধাপাত্র যে এক নিমেষে এমন ভাবে শুকাইয়া যাইতে পারে, তাহা আগে কে জানিত?

বিস্তর চেষ্টা করিয়াও লীলা তাহার বর্ত্তমান অবস্থাটা ঠিক বুঝিতে পারিল না। তাহার ক্ষুব্ধ হৃদয়ের আহত অভিমান মনে মনে গর্জ্জিয়া উঠিতেছিল। কিরণ যদি অনর্থক রাগ করিয়া তাহাকে এত উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্য করিতে পারে, তবে তাহারি বা তাহাতে ক্ষতি কি? সেও তাহার সহিত আর সম্বন্ধ রাখিবে না! কিরণের বন্ধুত্ব হারাইলে জগৎ কিছু আর তাহার অন্ধকার হইয়া যাইবে না। সে ছাড়া সংসারে ভাবিবার ও করিবার কাজ যথেষ্টই আছে। কিন্তু মনের ভিতর হইতে এ সংকল্পে সে কোথাও কোন বল পাইল না। কিরণের কঠোর মুখ ও এই বিষম উপেক্ষা তাহার অন্তরে শেলের মত বাজিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, সে ছুটিয়া কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়া একবার প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া আসে, কিন্তু সে সেখান হইতে এক পাও নড়িতে পারিল না। শুধু স্তব্ধ হৃদয়ে সন্ধ্যার নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে তাকাইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

অরুণের সঙ্গে সাক্ষাতের পর হইতে এক সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে কিরণের সঙ্গে আর লীলার দেখা

হয় নাই। সে যখন অরুণকে দেখিতে বসন্তপুরে যাইত, কিরণ তাহার আগে বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইত। সন্ধ্যায় ক্লবে খেলিতে আসাও কিরণ ছাড়িয়া দিয়াছিল। যেখানে যখন লীলার সঙ্গে দেখা হইবার সম্ভাবনা, কিরণ সযত্নে সে সব স্থান পরিহার করিয়া চলিয়াছে। তাহার এই স্পষ্ট বিরাগে লীলা দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছিল। তবু এত দিন তাহার আশা ছিল, সে কিরণের সঙ্গে দেখা হইলেই তাহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া শান্ত করিবে; কিন্তু আজ যখন তাহাদেরই নিমন্ত্রণে তাহাদের বাড়ী আসিয়া লীলার আহ্বান অগ্রাহ্য করিয়া কিরণ বীণার সঙ্গে ফিরিয়া গেল, তখন তাহার আশা করিবার আর কিছুই রহিল না।

অথচ একটা কথা লীলা কিছুতেই বুঝিতে পারিত না। কিরণ তাহার উপর রাগ করিয়া অন্তরে থাকার যে বেদনা তাহার মনে সর্ব্বক্ষণ কাঁটার মত বিঁধিয়া ছিল, অরুণের কাছে গেলেই সে সব তাহার মন হইতে তখনি ঝরিয়া যাইত। সে যতক্ষণ অরুণের নিকট থাকিত, হাসি, গল্প, গানে সে প্রফুল্ল ও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। অরুণের প্রতি অগাধ ভালবাসায় তাহার মন তখন পরিপূর্ণ,—কিরণের কথা তখন তাহার মনেও পড়িত না, কিন্তু যেমন সে অরুণকে ছাড়িয়া বাহিরে আসিত,—সে গৃহের চারিদিকে কত দিনের কত পরিচিত দৃশ্য, কত দিন পূর্ব্বের সুখময় স্মৃতি জাগাইয়া তুলিত, তখন আবার তাহার হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন ব্যথা তাহাকে আকুল করিয়া তুলিত,—খেলায় আমোদে, পড়াশুনায় কিছুতেই সে শান্তি পাইত না,—তাহার মন অনুক্ষণ কিরণের জন্য কাঁদিয়া ফিরিত। এ কি বিষম এক সমস্যায় সে পড়িল! কিরূপে বা কোথায় এ সমস্যার সমাধান হইবে, কিছুই সে ভাবিয়া পাইত না।

লীলার খেলার সঙ্গীরা এতক্ষণে খেলা ও বিশ্রাম শেষ করিয়া জলযোগের জন্য দলে দলে তাঁবুতে ফিরিতেছিল। তাহাদের কলরবে লীলা সচেতন হইয়া ফিরিয়া চাহিল।

কিছু দূরে বীণা ও কিরণ তাঁবুর সামনে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছিল। লীলা দেখিল, বীণা আজ কি সুন্দর বেশে সাজিয়াছে! তাহার কালো চোখের সলজ্জ ও সানুরাগ দৃষ্টি কিরণের মুখের উপর! কিরণ কি কথা বলিতেছে, তাহা লীলা শুনিতে পাইল না, তবে কিরণের মুখেও পূর্ব্বের মত বীণার সম্বন্ধে উদাসীন ভাব নাই!

এ দৃশ্য লীলা বেশীক্ষণ দেখিতে পারিল না। সে মুখ ফিরাইয়া সেখান হইতে একেবারে নিজের ঘরে আসিয়া অন্ধকারেই বিছানায় শুইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে ক্ষান্ত ঘরে আলো দিতে আসিয়া, তাহাকে এমন সময়ে বিছানায় দেখিয়া বলিল, "এ কি গো! দিদিমণি, এমন সময়ে বিছানায় শুয়ে যে? কিছু অসুখ বিসুখ করেনি ত?"

লীলা একটু অন্যমনা হইবার জন্য বলিল, "না, অসুখ করেনি—এমনি একটু শুয়ে আছি। খেলতে খেলতে মাথাটা কেমন ঘুরে উঠলো তাই। তুই একটু বোস দেখি এখানে। গল্প কর, শোনা যাক!"

ক্ষান্ত গল্পের নামে আশ্বস্ত হইয়া তখন মেঝেয় পা ছড়াইয়া বসিল। বলিল, "তা মাথা আর ঘুরবে না? দিবে রাত্তির এই দস্যিগিরি! হাজার হোক, বলি, মেয়েমানুষ ত? চব্বিশ ঘণ্টা অমন পুরুষের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে বেড়ালে শরীর থাকে কখনো? তা থাক, একটু শুয়েই থাক—জিরেন হোক একটু।"

লীলা বলিল, "তোর এখন কিছু কাজ আছে না কি?"

ক্ষান্ত হাত নাড়িয়া বলিল, "কাজের কথা আর বোলো না বাছা! পোড়া কাজের কি আর শেষ আছে? যতই করে যাচ্ছি, ততই বাড়ছে! সে মরুক গে যাক্, তুমি একলাটি পড়ে আছ বুঝি একটু এইখানে! হ্যাঁ গা দিদিমণি! একটা কথা মনে হলো—বলি তুমি ত এত যায়গায় যাও,—এখানকার ডেপুটি বাবুর বউকে দেখেছ কখনো?"

"না, কেন বল তো?" লীলা বুঝিল, ক্ষান্ত আজ একটা নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছে।

"তাই বলছিলুম—এখানকার সকলেই তাকে জানে কি না! বড় চমৎকার লোক! দেখতেও বেশ সুন্দর! আর সব মেয়েমহলে ডেপুটির স্ত্রী আছেই! তবে তোমরা আর দেখবে কি করে! ডেপুটি বাইরে খুব সাহেব—কিন্তু বাড়ীর ভিতরে সব গোঁড়া হিঁদুয়ানী! তোমাদের মত এমন খিরিষ্টানী কাণ্ড সেখানে হবার যো-টি নেই! বাবুরা বাইরে যা খুসি করুক—মেয়েরা ঠিক থাকলেই হল!

তাদের মেয়েরা পালকী ছাড়া এক-পা হাঁটে !' তা মরুকগে সে কথা ! এখন যা বলছিলুম—সেই তাদের বাড়ী এক ভয়ানক কাণ্ড হয়ে গেছে !" ক্ষান্ত একটি ছোট বাক্স হইতে একটা পান বাহির করিল। একটি কৌটা হইতে দোক্তা লইয়া পানে মিশাইয়া পানটি আলগোছে মুখে ফেলিয়া দিল। তাহার পর বলিল---

"ডেপুটি বাবুর ভাই বিলেত গেছে জানো ? কি পড়া শিখতে ! তার যে বৌটি, সে যে কি সুন্দরী, সে আর তোমায় কি বোলবো ! এমন রূপ আমি কখনো দেখিনি যেন একেবারে মা ভগবতী ! যখন বিয়ে করে তাকে রেখে যায়, তখন সে ছোট ছিল ; এখন বেশ বড়টি হয়েছে ! নাম তার জোছনা, তা ঠিক জোছনার মতই ফুটফুটে মেয়েটি।"

লীলা বলিল, তুই লোকের ঘরের খবর এত সব জানিস কি করে ? যত বাজের খবর কি তোরই কাছে আসে ?

অবাক কথা ! আমি না জানলুম কি করে ! এ সহরে কার ঘরের কথা আমি না জানি ? আর তাদের বাড়ী ত আমার বোন কাজ করে ! আমি এক দিন বোনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সেই বউটিকে দেখে এসেছিলুম ! আহা ! সেই রূপের জন্যেই ছুঁড়ির কি খোয়ারটাই হলো গো ! আমার বোন তাকে বড় ভালবাসতো—সেই এখন মরছে কেঁদে কেঁদে !

লীলা ব্যগ্র হইয়া বলিল,—কেন ? কি হয়েছে তার ?

ক্ষান্ত উৎসাহের সহিত হাত নাড়িয়া বলিল, হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু ! একদিন হলো কি, সব ছেলেরা চাঁদা তুলে সহরে দেবতা পূজো করেছিল। সেইখানে ঠাকুরের সুমুখে তারা রাত্রে একটা থিয়েটার করলে। সহরের যত সব বড় বড় ঘরের মেয়েরা সবাই গিছলো সেখানে। ডেপুটির বউও তার ছোট জাকে নিয়ে দেখতে গেছে। তখন কি জানে ছাই, যে, এমন কাণ্ড হবে ? না, তা জানলেই বা কেউ সে পোড়া থিয়েটার দেখতে যায় ? তাই সব এখন ওরা বলছে যাওয়া কেন ? না গেলে ত এমন হতো না ! আমি বল্লুম, মা। তা আগে থেকে কি লোকে হাত গুণে জানবে ? সবাই ত আর জান্ নয় ? এই যে সব এত মেয়েরা গেল---তা কারুর কিছু হলো না---আর—

লীলা অধীরা হইয়া বলিয়া উঠিল,—কি হয়েছে তাই আগে বল্ না ? তোর জ্বালায় কি আপদেই যে পড়েছি আমি ! যেখানে এক কথা বললে চুকে যায়, সেখানে কেন'যে তোরা এত গজর গজর করে মরিস, তা আমি বুঝতে পারি না ! সে বউটার হল কি ?

—সেই কথাই ত এতক্ষণ ধরে বলছি গো ! তা তোমার কি আর শোনবার তর আছে ছাই ! সব তাতেই তেরিয়া মেজাজ ! যেন দিনে রাত্তির ঘোড়ার ওপর জিন চড়িয়েই বসে আছ ; পাঁচ কথা গুছিয়ে না বল্লে বুঝবে কি করে বল দেখি ? তা সেই ত সব থিয়েটার দেখতে গেল,—শেষ হতে একেবারে সকাল ! তখন মেয়েরা যে যার গাড়ীতে উঠছে। ডেপুটির স্ত্রীও তার জা'কে নিয়ে গাড়ীতে উঠছিল ! সেই সব ভিড়ের মধ্যে কোথায় না কি এক মুখপোড়া বদমাস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যত সব মেয়েদের দেখছিল ! পড়বি ত পড় সেই মুখপোড়ার নজর একেবারে জোছনার ওপর ! আমার বোন ওদের সঙ্গেই ছিল, সে বলে তার চোখ যেন বাঘের মত, মেয়েটাকে যেন সে একেবারে গ্রাস করছিল। ছুঁড়ির যে কি হবে— আমি ত তাই ভেবে এখন কেঁদে মরছি ! বামা ত রাতদিন কাঁদছে আর কাঁদছে, সে কান্নার আর বিরেম বিশ্রেম নেই ! ডেপুটির ভাই দেশে ফিরলে যে আবার কি একটা খুনোখুনি কাণ্ড বাধবে, আমার ত এখন থেকে বুক কাঁপছে !

—মরগে যা বকে বকে ! যত সব বাজে কথা ! কি যে হয়েছে, তা এ পর্য্যন্ত শুনলুম না ! খালি গল্প বানানো খালি মিছে কথা !

ক্ষান্ত বিষম উত্তেজিত হইয়া উঠিল।---মিছে কথা বই কি ! ক্ষেন্তি গয়লানি মিছে কথা বলবার লোক নয়, তা সবাই জানে ! আমি যদি মিছে কথা বলে থাকি—এই দণ্ডে যেন আমার মাথায় বাজ পড়ে ! বলে---বাজারময় এ কথা ঢি ঢি পড়ে গেছে, আর আমি ওনার কাছে মিছে কথা বলছি ! শোন তবে ! সেই বদমাস লোকটা তাদের গাড়ীর পিছনে পিছনে গিয়ে ওদের বাড়ী ঘর দেখে গিয়েছিলো। দিন কতক পরে জোছনা ভাত খেয়ে নিজের ঘরে দুয়োর দিয়ে ঘুমোচ্ছে।—রোজই সে এমনি ঘুমোত,—দিনে ঘুমোন অভ্যেস তার ! সেদিন সন্ধে হল— তবু সে দুয়োর খোলে না। তখন সব ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি

পড়ে গেল,—কিছুতেই ত তার সাড়া পেলে না। দুয়োর ভেঙ্গে দেখে ঘর খালি, জোছনা নেই—তাকে জানলা ভেঙ্গে নিয়ে চলে গেছে! জানলার গরাদে সব ভাঙ্গা—বোঝ একবার ব্যাপারখানা!

লীলা রুদ্ধ-নিশ্বাসে গল্প শুনিতেছিল। সে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল,—সে গেল কোথায়? কে তাকে নিয়ে গেল?

ক্ষান্ত গম্ভীর মুখে বলিল,—কেউ সে কথা জানে না। শুধু আমি আর আমার বোন জানি—সেই লোকটা তাকে নিয়ে পালিয়েছে।

তোরা কি করে জানলি?

—সে অনেক কথা! এক টেলিগেরাপ পিয়ন, সে একটা লাল বাইসিকেলে চড়ে সহরে অনেক অনেক দূরে টেলিগেরাপ বিলি করে বেড়ায়। তারি মুখে সন্ধান পাওয়া গেছে! আমার বোন এক দিন বাজারের বটগাছতলায় শুয়ে রোদ পোহাচ্ছিল,—সেইখানকার এক মিনসে দোকানীর সেই পিয়নটা ভাগ্নে হয়,—তারাই দুজনে ভয়ে ভয়ে চুপি চুপি এ কথা বলাবলি কচ্ছিল,—ডেপুটির কাণে গেলে আবার হাঙ্গাম বাধবে ত? এখান থেকে অনেক দূরে আরামবাগ বলে একটা জায়গা আছে,—সেই লোকটা সেখানকার জমীদার। তার নামের একটা টেলিগেরাপ বিলি করতে গিয়ে পিয়ন দেখে এসেছে,—জোছনা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে! তার গায়ে সব জড়োয়া গয়না। ভাল দামি রেশমি সাড়ি পরে তাঁকে আরো কত সুন্দর দেখাচ্ছে!

লীলা অত্যন্ত চিন্তিত ভাবে বলিল,—"এটা বড় মন্দ ঘটনা ক্ষান্ত! মেয়েটা এমন একটা খারাপ লোকের কবলে পড়লো, তার অনেক দুর্দ্দশা আছে দেখছি!

—তা'তো আছেই! তার স্বামী ফিরে এসে সব শুনে মেয়েটাকে আর ঐ লোকটাকে—দুজনকেই খুন করবে। তা ছাড়া সকলেই বলছে, সে লোকটাও না কি বড় পাজি,—তার স্ত্রী তার অত্যোচারে বিষ খেয়ে মরেছে!

—কবে এমন হোলো?

—সে প্রায় মাস দুই আগে! তবে আমি ত এত দিন তোমার অসুখের জন্যে বাইরে কোথাও যাই নি, তাই শুনতে পাইনি কিছু! আমার বোন এখন সেখানেই আছে। সে জোছনার সন্ধান পেয়েই সেই দিনই সেখানে চলে গেছে। তা লোকটা এদিকে ভাল, বামাকে তার কাছে থাকতে দিতে কিছু গোল করেনি। আজ বামা সহরে গোটাক'তক জিনিস কিনতে এসেছিল কি না, তাই তার মুখে আমি আজ সবই শুনলুম।

লীলা নিজের কথা ভুলিয়া গিয়া জোছনার কথাই একমনে ভাবিতে লাগিল। বেচারা জোছনা! নিতান্তই ছেলেমানুষ সে! জীবনের কঠোরতা কিছুই জানে না! হয় ত বা সে সেই লোকটার উপর অগাধ বিশ্বাস রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছে! এখন সে যদি সে বিশ্বাস রাখিয়া চলে, তবেই ভাল! নয় তো সে অভাগা মেয়েটার কপালে না জানি কত দুর্দ্দশাই আছে!

সে ভাবিতে ভাবিতে বলিল,—আচ্ছা ক্ষান্ত! তোর বোন তো সেখানে থাকে—সে সেই লোকটার কথা কি বলে? সে জোছনাকে কি সত্যিই ভালবাসে? তাকে আদর-যত্ন করে তো?

ক্ষান্ত অবজ্ঞাভরে তাহার কালো কালো ঠোঁট দুটি উল্টাইয়া বলিল, "আঃ পোড়াকপাল! ও সব লোকের আবার ভালবাসা! ঝাঁটা মারতে হয় তাদের ভালবাসায়! তোমরা তো এ সব কথা কিছু জানো না দিদিমণি! না হয় দু' দশখানা বইই পড়েছো! আমার তো সংসারের কাণ্ড কারখানা দেখে দেখে মাথার চুল পেকে গেল! ওরা কি কখনো কারুকে ভালবাসতে পারে? ওদের দুদিনের আমোদ দুদিনেই ফুরোয়! তার পর যে কে সেই! আর এ লোকটা তো আবার শুনি এখানকার লোক নয়! ও বাংলা দেশে থাকে! সেখানকার মস্ত জমীদার! এখানেও ওদের বাড়ী-ঘর আছে, মাঝে মাঝে এসে থাকে, আবার চলে যায়। তার চাকর-বাকরদের কাছ থেকে বামা তার সব কথাই শুনেছে! এই অল্প দিনই এখানে এসেছে এবার! এসেই এই কীর্ত্তি! দুদিন বাদে নিজে আবার ফিরে যাবে,—আর ছুঁড়িটা রাস্তার ধারে পড়ে থাকবে—এই আর কি! ও সব কাজের শেষ ফলটা তো এই রকমই হয় কি না!"

লীলা বলিল, "কিন্তু এ কথাটা যখন আমি শুনলুম, তখন যাতে সে মেয়েটির কোন কষ্ট না হয়, আমি তার ব্যবস্থা করবো। তোর বোন তো সেখানেই আছে,—তাকে বলিস, যখন তার কোন কষ্ট হবে, তখন আগে এসে যেন তোর কাছে খবর দেয়।"

ক্ষান্ত হৃষ্টচিত্তে বলিল, "তা সে দেবে। মেয়েটার একটা হিল্লে হলে সে তো বাঁচে! সে দিন-রাত তার গোয়ারের কথা ভেবে কেঁদে কেঁদে মরতে বসেছে। এবার যেদিন এদিকে আসবে, সেদিন তাকে বলে রাখবো।"

লীলা আবার নিজের অন্তর অন্তরে কিরণের অভাব তীব্রভাবে বোধ করিতে লাগিল। তাহার সখা, বন্ধু, সহায়, কিরণ,—সে যে সকল বিষয়ে, সকল কাজে ছোট শিশুটির মতো তাহারই সবল আশ্রয়ের উপর নির্ভর করিত! আজ যে জোছনার জন্য সে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে—কে আজ তাহাকে এ বিষয়ে সুপরামর্শ দিবে? যাহাকে না হইলে তাহার জীবনের একটা দিনও চলে না, তাহাকে বাদ দিয়া তাহার সারা জীবন যে কিরূপে কাটিবে, লীলা অনেক ভাবনা ভাবিয়াও তাহার কোন কূল পাইল না।

(ক্রমশঃ)

বিবিধ-প্রসঙ্গ

স্বভাবকবি গোবিন্দদাস

শ্রীসতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ

"Full many a gem of purest ray serene ;
The dark unfathom'd caves of ocean bear ;
Full many a flower is born to blush unseen
And waste its sweetness on the desert air."

উদ্যানে ফুল ফুটে, সৌরভে দশ দিক্ আমোদিত করে, ঝরিয়া পড়ে। সিন্ধুর অতলদেশে মুক্তা জন্মে, নিরলজ্যোতিতে তলদেশ সমুদ্ভাসিত করে, আপন অস্তিত্ব লইয়া আপনিই লুক্কায়িত থাকে। জগৎ হয়ত ইহাদের খোঁজ রাখে না; তবুও ইহারা আপনার গৌরবে আপনি গৌরবমণ্ডিত।

গোবিন্দদাসও এক নগণ্য পল্লীর নিভৃত কন্দরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কোলাহলময়ী নগরীর বাহ্যাড়ম্বরের অতি দূরে থাকিয়া কবিত্বসুধাধারায় বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়াছিলেন। কতদূর দেশ তাঁহার খোঁজ রাখে নাই, তথাপি আপনার তেজে, আপনার মহত্বে তিনি মহামহিমান্বিত। শোক ও দুঃখের উদ্দাম দানবী লীলায় তাঁহার জীবন-নাটকের প্রতি অঙ্ক পরিপূর্ণ। জীবনব্যাপী হাহাকার, জীবন-ব্যাপী সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তুমুল সংগ্রাম তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভাকে গ্রাস করিতে চিরব্যস্ত ছিল। কিন্তু বাণীর একনিষ্ঠ সেবক, স্বাধীনতার উপাসক, বাগ্‌দেবীর চরণকমলে মধুপানোন্মত্ত ভ্রমর, কবি গোবিন্দচন্দ্রের মধ্যে প্রাক্তন সংস্কারলব্ধ যে প্রজ্ঞা নিহিত ছিল, দারিদ্র্য ও পরাধীনতার ঘন মেঘান্ধকারে তাহা আচ্ছন্ন হইলেও, ক্ষণপ্রভার তীব্র জ্বালাময় জ্যোতিঃর মত প্রায়শঃ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। তিনি শৈশবাবধি পরান্নপুষ্ট ছিলেন, তাই বোধ হয়, কলকণ্ঠের মত বিষাদময় জীবনের দুঃখ কাহিনী, পল্লীজীবনের আত্মকথা, দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার, হিংসাদ্বেষ-কলুষিত গার্হস্থ্য জীবন, বিয়োগবিধুর পল্লীবাসীর হাহাকার, মহিলার প্রতি পুরুষের শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম—ইত্যাদি প্রত্যেক পল্লীবাসীর দৈনন্দিন জীবনের নিরবচ্ছিন্ন বিষাদগাথা আমরণ মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় মর্ম্মভেদী সুরে গাহিয়া গাহিয়া কাব্যকানন মুখরিত করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্য বাঙ্গালার, দুর্ভাগ্য বঙ্গসাহিত্যের,—তাহার কৃতবিদ্য সন্তানগণ এইরূপে দারিদ্র্যের কশাঘাতে নিষ্পেষিত ও নিপীড়িত না হইলে বঙ্গভাষার ভাবৈশ্বর্য্য আরও উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইত। বড় দুঃখে তাই কবি হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—

"হায় মা ভারতি, চিরদিন তোর
কেন এ কুখ্যাতি ভবে,
যে জন সেবিবে ও পদযুগল
সেই সে দরিদ্র হবে?"

গোবিন্দদাস বঙ্গসাহিত্যের বার্ণস ছিলেন। স্কটলণ্ডের কবি রবার্ট বার্ণসের ন্যায় তিনি ও গ্রাম্য কবি—প্রেমের কবি। বার্ণস কৃষককবি নামে অভিহিত—আর গোবিন্দদাস ময়মনসিংহে সারস্বত কবি বলিয়া খ্যাত। দুই জনই নগণ্য পল্লীর নিভৃত কন্দরে জন্মগ্রহণ করিয়া কলকণ্ঠের ন্যায় মধুর ললিত ঝঙ্কারে, সুন্দর সঙ্গীতে এককালে সমগ্র দেশ মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। গীতিকবিতাবলীর ভাষায়, ভাবে, মাধুর্য্যে, সারল্যে, ঝঙ্কারে দুইজনই সমপর্য্যায়ভুক্ত। মনে হয় যেন, স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি ভগবানের অবদান সঙ্গে করিয়াই ইঁহারা পৃথিবীতে আগমন করিয়াছিলেন; এবং কবিত্বের সম্মোহনী শক্তিতে জগৎকে মোহিত করাই ইঁহাদের জীবনের গূঢ়তম উদ্দেশ্য।

বঙ্গীয় গীতিকাব্য-লেখকদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক শ্রেণী প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে মনুষ্যকে স্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন। ইঁহাদের কবিতায় বহিঃপ্রকৃতির প্রাধান্য। তাই

কবিতায় মাধবী যামিনী, মলয় সমীরণ, ললিতলতা, শারদীয়চন্দ্রিমা, কলকণ্ঠমুখরিত কানন, শ্যামজলধর প্রভৃতির সঙ্গে রমণীর বদনমণ্ডল, ভ্রূবল্লী, বাহুলতা, অলসনিমেষ প্রভৃতির চিত্র বাত্যাবিক্ষুব্ধ তটিনীতরঙ্গবৎ সদা চাকচিক্য সম্পাদন করে। আর এক শ্রেণী বাহ্যপ্রকৃতিকে দূরে রাখিয়া কেবল মনুষ্য-হৃদয়কেই সৃষ্টি করেন। ইঁহাদের কাব্যে বাহ্য-প্রকৃতির অস্পষ্টতা লক্ষিত হয়। তৎপরিবর্ত্তে মনুষ্য-হৃদয়ের গূঢ়তলচারী ভাব সকল প্রধান স্থান গ্রহণ করে। গোবিন্দদাস প্রথম শ্রেণীভুক্ত, বাহ্যপ্রকৃতির কবি এবং তাঁহার কবিতা বহিরিন্দ্রিয়ের অনুগামী। বাহ্যপ্রকৃতির সঙ্গে মানবের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ নিকট, তাই কবিতায়ও ইন্দ্রিয়ের ছায়া পড়িয়া থাকে,—কামনা, বাসনা ভোগের অনুগামিনী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। গোবিন্দদাসের গীতিকবিতায় অনেক সময় স্থূলপ্রকৃতির শক্তির বিকাশ পরিলক্ষিত হয়।

গোবিন্দদাসের প্রেমমূলক কবিতা স্বচ্ছ, শারদীয়া জ্যোৎস্নায় মেঘমুক্ত আকাশের মত উদার, অনাবিল আনন্দের সুধাধারা পাঠকের হৃদয়ে স্বতঃ প্রবাহিত করিয়া দেয়। নিষ্কলঙ্ক দাম্পত্যপ্রেম তাঁহার দুঃখ-দৈন্যপীড়িত জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা—দুঃখবাদ ও নৈরাশ্যের ভিতর দিয়া ভাষায় মূর্ত্তিমান হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তিনি নারীভক্ত কবি ছিলেন। নারীভক্তিতে তাঁহার উদ্বেলিত প্রাণের উচ্ছ্বাস প্রকটিত হইত—

"সে আমার পুণ্যময়ী প্রিয় ভাগীরথী,
সহস্র যোজনে থাকি নিলে তার নাম,
হৃদয় নির্ম্মল হয় শান্ত হয় মতি,
অনায়াসে জয় করি পাপের সংগ্রাম!
স্মরণে অনন্ত পুণ্য, মরণে উল্লাস,
আমি পাপী—আমি আর কিছুই না জানি,
দগ্ধবুক অনুখে বহে বারোমাস,—
তোমরা বৈকুণ্ঠ লহ, আমি—পা দুখানি।"

কিন্তু আবার গভীর নৈরাশ্যে নারীচরিত্র বিচিত্রভাবে আক্রমণ করিয়াছেন:—

"দয়া মায়া নাহি যারি, আমি জানি সেই নারী
আমি জানি রমণীর ইহাই লক্ষণ;
আমি দেখি নাগপাশে, রমণী জীবননাশে,
আনন্দে এবার ভাসে—বলে আলিঙ্গন।"

গোবিন্দদাসের দাম্পত্যপ্রেম মরজগতের মাংসপেশীর উপর সম্বন্ধ উল্লঙ্ঘন করিয়া এক অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় প্রেমদ্যুতিতে সমুদ্ভাসিত। কবিপত্নী সারদাসুন্দরী বহুদিন মরজগৎ ত্যাগ করিয়াছেন। প্রকৃতি-সুষমা সেই একই পুরাতন সাজে নিত্য সজ্জিত হইয়া জনমানবের চিত্তাকর্ষণ করে। এই সব পুরাতনের ভিতর সারদাসুন্দরীর স্মৃতিও পুরাতন হইয়া গিয়াছে। পুরাতন স্মৃতি উদ্ঘাটন করার কাহারও প্রয়োজন নাই; কিন্তু কবির আছে,—তাঁহার পবিত্র স্মৃতি আজিও কবি-হৃদয়ে সমভাবে জাগরূক রহিয়াছে। যাহার অকৃত্রিম ভালবাসা এক দিন এই দুঃখময় জীবনে শান্তির স্নিগ্ধ ধারা বর্ষণ করিয়াছিল, মরণে শয়নে স্বপনে যিনি নিত্যসাথী, জগতের হিসাবে তাঁহার বিদায় পুরাতন হইলেও, আত্মার কাছে সে চিরনূতন। তাই বিয়োগবিধুর কবি "চন্দনে" লিখিয়াছিলেন—

"আছে প্রয়োজন আছে, নহিলে কি প্রাণ বাঁচে
নহিলে কি তার কথা করি আন্দোলন?

* * * *

রক্তমাংসে মাখামাখি, সে আকাঙ্ক্ষা নাহি রাখি
করে না কামের ক্লেদে কুটু বুটু মন।
পবিত্র তাহার স্মৃতি, পবিত্র উচ্ছ্বাস নিতি
পবিত্র করিয়া দেয় প্রাণ পুরাতন।"

এই পতিপত্নী সম্বন্ধ পার্থিব নহে, জীবনের পরপারেও ইহা নিত্য স্থায়ী। ইহার স্মৃতিমাত্র প্রাণ আনন্দ-রসে আপ্লুত হয়, এক অভিনব ভাবে অভিষিক্ত হয়। আষাঢ়ের প্রারম্ভে যক্ষের প্রাণে যে বিরহানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, নববর্ষে কবি-হৃদয়েও সেই বিরহজনিত দুঃখ তদপেক্ষা ন্যূন নহে—

"সেই মম নববর্ষ, আনন্দ আহ্লাদ হর্ষ,
শুভ্র চন্দ্র সম তার শুভ্র চন্দ্রানন,
কি পুণ্য অমৃতযোগ, প্রাণে করি উপভোগ,
একটি মুহূর্ত্ত তারে করিলে স্মরণ।"

অলকার অভিশপ্ত বিরহী যক্ষের ও গোবিন্দদাসের—উভয়েরই বিরহশোকোচ্ছ্বাসের মূলে দুঃখবাদ বা pessimism নিহিত আছে। তবে পার্থক্য এই, যক্ষের বিরহে ভবিষ্যৎ শুভমিলনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান, আর গোবিন্দদাস শুধুমাত্র পত্নীর স্মৃতিতর্পণ করিয়াই সুখী।

গোবিন্দদাস বহিঃপ্রকৃতির কবি। বহিঃপ্রকৃতি-প্রভাবে গোবিন্দদাসের প্রেমমূলক কবিতা স্থানে স্থানে বর্ত্তমান রুচি অনুসারে অশ্লীল হইয়া পড়িয়াছে। তিনি স্বভাব কবি—তাই নগ্ন সৌন্দর্য্যের উপাসক ছিলেন যে সকল অভিনব বাস্তব চিত্র সমাজের সর্ব্বত্র সচরাচর দেদীপ্যমান তাহার প্রত্যেকটি কবি শিল্পীর অঞ্জনশলাকায় চিত্রিত করিয়া মধুময় ভাষায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কাহারও কাহারও নিকট যাহা অশ্লীল, কাহারও কাহারও মতে তাহাই আবার মাধুর্য্যগুণসম্পন্ন তাঁহার অশ্লীল রচনাও শ্রুতিসুখাবহ, অথচ বর্ণনাভঙ্গী ও কৌশল পরিপূর্ণ। পতি পত্নীর মধ্যে যে একটা যৌন সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে তিনি তাঁহার কবিতায় তাহা বাদ দিতে পারেন নাই।

দুঃখবাদ বা pessimism গোবিন্দদাসের কবিতার ছত্রে ছত্রে বিরাজমান। ইহা তাঁহার নিজস্ব খাঁটি সম্পত্তি, পাশ্চাত্য দেশ হইতে ধার করা নহে। আজীবন দুঃখদৈন্য-নিষ্পেষিত, নির্ব্বাসন অনলদগ্ধ অত্যাচার জর্জ্জরিত কবি মর্ম্মভেদী সুরে প্রাণস্পর্শী ভাষায় আত্ম-জীবনের বিষাদগাথা গাহিয়াছেন। তাঁহার কবিতায়ও দুঃখময় জীবনের ঘনান্ধকারের ছায়া প্রতিফলিত। গোবিন্দদাসের শোকমূলক কবি-

বড় করুণ বড় মর্ম্মস্পর্শী। জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত কবি প্রাণের অপরিসীম জ্বালায় লিখিয়াছিলেন—

"কি হবে শুনিয়া ভাই কোথা বাড়ীঘর ?
যে দেশে আছিল বাড়ী, আজি তার নরনারী
শোকে দুঃখে বিষাদিত ব্যথিত কাতর।
নীরবে সকলি সহে, মরার মতন রহে
মা বোন্ সতীত্বহারা করে ধড়ফড়।
হায় সে দেশের কথা দুঃখময় সে বারতা
আমি যে রেখেছি বুকে চাপিয়া পাথর।
কি হবে শুনিয়া ভাই কোথা বাড়ীঘর ?"

গোবিন্দদাসের বিদ্রূপরসাত্মক কবিতা ইংরাজীর stoical satireএর মত; অনাচার ব্যভিচার প্রভৃতি অন্যায় ও পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এ জাতীয় কাব্যের মধ্যে তাহার "মঘের মুলুক" সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভাওয়াল রাজবাড়ীর কতকগুলি আবর্জ্জনাপূর্ণ ঘটনার উদ্ঘাটন করাই এই কাব্যের উদ্দেশ্য ছিল। "বিক্রমপুরে বসন্ত" ও "বিচিত্রপুর" কবিতাদ্বয়ও ব্যঙ্গরসাত্মক। গোবিন্দচন্দ্রের ব্যঙ্গ জ্বলদনল সদৃশ দুঃসহ।

গোবিন্দদাসের সামাজিক কবিতাও ব্যঙ্গরসাত্মক,—সমাজের তীব্র সমালোচনাপূর্ণ। বাঙ্গালার ভীরুতার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া লিখিয়াছেন—

"রেলে কি জাহাজে গেলে,
কেহ তারে ঠেলে ফেলে,
নিলে তার মা বোনেরে চুপ করে রয়।
জুতা, লাথি, ঝাঁটা, বেতে,
এরা না কিছুতে চেতে,
অচেতন জড়ে কবে ব্যথা বোধ হয় ?
দেও তারে শত গালি,
দেও তারে চুণ কালী,
বেহায়ার তাতে কিবা লোক লাজ ভয়।
বাঙ্গালী মানুষ যদি প্রেত কারে কয়।"

পতিতা রমণীদের দুঃখ নিরীক্ষণ করিয়া এবং তাহাদের দুর্দ্দশার জন্য পুরুষকেই সমাধিক দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহাদের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন,—

"তুমিই নরকে নিলে,
নারকী করিয়া দিলে,
তুমিই আমারে শেষে ছোঁওনা ঘৃণায় !"

সমাজে বরপণপ্রথা বহু অনর্থ উৎপাদন করিতেছে দেখিয়া তিনি ১৩১৭ সনে পণপ্রথার বিরুদ্ধে "থাকুক আমার বিয়া" কবিতা লিখিয়াছিলেন। তাহার অব্যবহিত পরেই স্নেহলতা নাম্নী জনৈকা যুবতী অগ্নিসংযোগে জীবন নাশ করেন। ঐ কবিতাটী মনে হয় যেন, স্নেহলতার প্রতি আত্মহত্যার ইঙ্গিত। উহার কয়েকটী ছত্র—

"রাজপুতানী মেয়ের মত, কর্ম্ম না হয় জহরব্রত,
তারাও নারী মোরাও নারী—নারীর হৃদয় দিয়া,
থাকুক্ আমার বিয়া।"

স্নেহলতার চিত্রের নিম্নে সন্নিবেশিত ছিল। জনসাধারণ স্নেহলতার ভূয়সী প্রশংসাবাদ করিলেও গোবিন্দদাস তাহাকে ধিক্কার দিয়া পুনঃ লিখিয়াছিলেন—

"এত নয় সে জহরব্রত, এ যে বিষম পাপ
নির্নিমিত্তে আত্মহত্যা, বিধির অভিশাপ।
লোকের হিতে, দেশের হিতে সমর্পিলে প্রাণ
সে ত নয়রে আত্মহত্যা সে যে আত্মদান।
আত্মদান আর আত্মহত্যা, স্বর্গনরক ভেদ,
বুঝলি না তুই বোকা মেয়ে এই যে বড় খেদ !"

বাল্যবিবাহ সমাজের অশেষ অকল্যাণ সাধন করিতেছে দেখিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"না খুলিতে বালকের জ্ঞানের নয়ন,
রে পাপিষ্ঠ দুরাচার সমাজ নিষ্ঠুর,
সংসারের এ বিষাক্ত কণ্টক কাননে,
প্রবেশ করাও তারে পিশাচ অসুর !"

গোবিন্দদাস দেশাত্মবোধের কবি ছিলেন। তাঁহার দেশভক্তি অতীব শ্লাঘনীয়। জন্মভূমির প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল—

"ভাওয়াল আমার অস্থি মজ্জা, ভাওয়াল আমার প্রাণ
আমি যে তার নির্ব্বাসিত অধম সন্তান !
বুকের শোণিত দিলে, যদি তার শুভ মিলে,
যদি তার দুঃখনিশি হয় অবসান,
আপনি ধরিয়া ছুরি, আকণ্ঠ হৃদয় পুরি,
কলিজা কাটিয়া দেই করি শতখান !"

নির্ব্বাসিত, লাঞ্ছিত, শোকদুঃখজর্জ্জরিত হইয়াও যিনি জন্মভূমির মঙ্গল সাধনার্থ প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত, তাঁহার দেশপ্রীতি কত মহান্, কত উচ্চ তাহা সহজেই অনুমেয়। যে দেশপ্রীতি জন্মভূমির প্রতি তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছিল, বিদেশে বহির্গত হইবার পর তাহাই দেশাত্মবোধে পরিণত হইল,—

"পুণ্যযোগ গতবর্ষ আমার জীবনে
আমি ভারতের পুত্র আর্য্য কুলাঙ্গার,
স্বদেশ স্বজাতিপ্রেম মৃত সঞ্জীবনে
এতদিনে জাগিয়াছে হৃদয় আমার।
* * * *
যে জাতীয় উদ্দীপনা, জাতীয় সম্মান,
মহান্ জাতীয় স্বত্ব ভিক্ষা দিছ তুমি
ভুলিবনা সেই আত্মঅধিকার জ্ঞান,
স্বর্গাদপি গরীয়সী প্রিয় জন্মভূমি।"

তিনি প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতার ঝোঁকে একদিনে ভারতবর্ষটাকে "মা" বলিয়া চিনিয়া দেশভক্তির বিজয়ডঙ্কা বাজাইতে নারাজ ছিলেন। তিনি নীরব সাধক—নীরবে দেশের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন—

"প্রাণের গভীর এই ভক্তি, প্রেম, স্নেহ
সামান্য পল্লীতে বাস,
করিয়াছি বারমাস,
গোপনে বেসেছি ভাল নাহি জানে কেহ।
শতমুখে বাগ্মীবেশে
বলি নাই দেশে দেশে
তোমারে করেছি যত ভক্তি, প্রেম, স্নেহ
স্বদেশ হিতৈষী বলি নাহি জানে কেহ।"

জাতীয় অভ্যুত্থানের জন্য যে একতা অত্যাবশ্যক, প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে তিনি এক অখ্যাত পল্লীপ্রান্তে বসিয়া লিখিয়াছিলেন—

"এস ভাই ভিন্নভাব করি পরিহার,
শুধু এই মহাপাপে, জননীর অভিশাপে
নয়নের অশ্রুজল ঘোচেনা কাহার,
শুধু এই ভ্রাতৃভেদ, দুঃখিনী জননী খেদে
জীর্ণশীর্ণ পড়িয়ে আছে মৃতের আকার,
শুধু এই পাপের জন্য, অঙ্গ বঙ্গ অচৈতন্য
বীরজাতি বীরভূমি রাজপুতনার
শুধু এই পাপের জন্য দুর্দ্দশা সবার।

বিলাসিতা, আলস্য, জড়তা, ভীরুতা, কাপুরুষতা যে এই "বাবু" নামধেয় বাঙ্গালী জাতিটিকে মরণের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, সেই কথাটা গোবিন্দদাস বহুপূর্ব্বে তীব্র স্বরে জ্বালাময়ী ভাষায় বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন—

"পরিচ্ছন্ন ফুল কোঁচা, বাবরী পেনের খোঁচা,
পদাঘাতে পীলেফাটা—এই শেষ গতি!
যাহা কিছু উচ্চশিক্ষা, উদ্দেশ্য দাসত্ব ভিক্ষা,
ছোট বড় সকলের একই পদ্ধতি!

* * * *

এহেন বেবুনবংশ, একদিনে হলে ধ্বংস,
জগতের লাভ বই নাহি কোন ক্ষতি।
দুর্ভিক্ষ অকাল যায়, 'হাহাকার, হায়, হায়,'
কুটীরে কৃষক করে আনন্দে বসতি!
আলস্য শূকর পালে, কাজ নাই কোন কালে,
বৃথা আরো অপবিত্র করে বসুমতী!
একটী সিংহের ছানা, অবশ্য বসায় থাবা,
রচে শৈল সিংহাসন—সাজে পশুপতি!
বাবুজন্য বাঙ্গালার কি হবে হে গতি?"

মুখ-সর্ব্বস্ব জাতিটার আস্ফালন আন্দোলন দেখিয়া অবজ্ঞার স্বরে কঠোর ভাষায় কহিয়াছিলেন—

"নপুংসকের গোষ্ঠি তোরা
জন্ম-অন্ধ কাণা খোঁড়া,
ভিস্তিওয়ালা পাখাকুলী, পীলাফাটার ভয়,
কার স্বদেশে সর্ব্বনেশে এমন অভিনয়?"

দেশের দুঃখদৈন্য দেখিয়া গোবিন্দদাসের অবরুদ্ধ হৃদয়ের শোকাবেগ জলপ্লাবনের ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। তাই করুণ স্বরে লিখিয়াছিলেন—

"কি করি কঠিন এত হলে শশধর?
আহা হা ভারতভূমি!
কি করে দেখিয়া তুমি
ধৈরয ধরিয়া আছ, কাঁদে না অন্তর?"

হা অন্ন! হা অন্ন! করিয়া যিনি সারাটা জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, ভাগ্যের নির্ম্মম কশাঘাতে যিনি সতত নিস্পেষিত, শোক ও দুঃখ যাঁহার বক্ষপঞ্জর ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল, তাঁহার হৃদয়ে কেমন করিয়া এত বড়, এত উচ্চ দেশাত্মবোধ নিহিত থাকে, ভাবিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়।

স্বভাব-কবি গোবিন্দদাস পাশ্চাত্য ভাষা শিক্ষার সুযোগ পান নাই। তিনি বাঙ্গালীর একমাত্র খাঁটি জাতীয় কবি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ইংরাজী না জানিয়াও তিনি তাঁহার বহু কবিতায় অত্যন্ত সুসঙ্গত এবং যথাযথভাবে অনেক ইংরাজী শব্দের প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। যথা—

"বাজ্‌ছে কেমন বিজয় ব্যাণ্ড, মৃত্যু কর্‌ছে শ্যাক হ্যাণ্ড
কেমন গ্র্যাণ্ড অভ্যর্থনা অকূল জলধির!
তোমরা বটে আসল মানুষ! তোমরা বটে বীর!"

অনেকে গোবিন্দদাসের কবিতা প্রাদেশিকতা-(Provincialism) দোষদুষ্ট বলেন। কিন্তু তাঁহার গুরুগম্ভীর কবিতার পার্শ্বে একটি চটুল কবিতা উদ্ধৃত করিলেই ইহার সত্যতা কতদূর তাহা অনুমান করা যাইবে। যথা

(১) সাগরের যেন নীল জলরাশি,
বিভেদ করিয়ে উঠিছে প্রকাশি,
কমলার চারু সুস্মিত হাসি,
তেমনি উঠিছে উষা,
প্রভাতী মঙ্গল পাখীরা গাইল,
প্রকৃতি বিবিধ কুসুমে পূজিল
তরুণ অরুণ পরাইয়া দিল,
কিরণ কিরীট ভূষা! ইত্যাদি।

(২) আয় বালিকা খেল্‌বি যদি এই এক নূতন খেলা!
রেখে দে তোর টোপাঠালি,
সারাদিনই খেলিস্ খালি,
মাটীর বেলুন মাটির ভাত, হাত ধুইয়ে ফেলা!

প্রতীক্ষা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত শরদিন্দুকুমার সিংহ

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

পুতুল টুতুল রেখে দিয়ে
চল বকুলের বনে গিয়ে
"বৌ বৌ বৌ" খেলি মোরা ফুল্ল সন্ধ্যাবেলা।
আয় বালিকা খেলবি যদি এই এক নূতন খেলা।"

এইরূপ গম্ভীর, মেঘমন্দ্রভাষায় বিরচিত কবিতার পার্শ্বে তাঁহার চটুল, সরল, প্রাদেশিকতাপূর্ণ কবিতা ভাষার উপর তাঁহার অসাধারণ অধিকারেরই পরিচয় দিয়া থাকে। যে সকল কবিতায় তিনি প্রাদেশিক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতেও মনোহর শব্দ চয়নে তাঁহার নৈপুণ্যই প্রকাশিত হয়। তিনি ভাষাজ্ঞানে পরম পণ্ডিত, মধুর অথচ অপূর্ব্ব ভাবরাশি কবিতায় সন্নিবেশিত করিতে অদ্বিতীয় ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, কবি গোবিন্দদাসের কবিতায় সার্ব্বজনীনতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ইহা একান্তই অমূলক ও ভিত্তিহীন। তাঁহার পরিপক্ক বয়সের রচনায় সার্ব্বজনীনতার অভাব আদৌ ছিল না।

গোবিন্দদাস বাস্তবিকতার কবি—কল্পনার নহে। বাঙ্গালীর প্রাণের কথা, হৃদয়ের ব্যথা, সুখদুঃখের কাহিনী, পল্লী-জীবনের আলেখ্য, জাতীয় উদ্দীপনা, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা লইয়া তিনি কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রায় প্রত্যেক কবিতাই বাস্তব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এমন কি, ইংরাজ কবি বাইরনের মত তাঁহার অনেক কবিতায় নিজের জীবনের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত। গোবিন্দদাস সহস্র উপেক্ষা, সহস্র নির্য্যাতনের মধ্যে তাঁহার নরদেহ ত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার অমৃতনিস্যন্দী গীতিকবিতা শতাব্দী পরেও তাঁহাকে সমভাবে বঙ্গসাহিত্যে অমর করিয়া রাখিবে।

স্বকীয়া পরকীয়া

শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা এম-এ

গ্রীক্ পুরাণে আছে, নার্কিসাস্ হ্রদের সলিলে প্রতিবিম্বিত নিজ মূর্ত্তি দেখিয়া নিজের রূপে নিজেই পাগল হইয়াছে। আপনার রূপে আপনি মুগ্ধ। আপনার প্রতি আপনি আসক্ত। সে নিজে কি তার নিজের কাছে নাই? সে কি সে নয়? সে কাহাকে চায়? কি সে চায়? নিজেকেই চায়। সে নিজে ত তার সঙ্গেই রহিয়াছে! তাহাকে ব্যাপিয়াই রহিয়াছে!—না; তা' নাই। সে নিজেই নিজের পর হইয়া গিয়াছে। সে নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। আবার সেই হারানো নিজের সন্ধান পাইয়া তাহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। তাহার এক স্বরূপ দুই হইয়া গিয়া দ্বিতীয় স্বরূপ প্রথম স্বরূপকে রূপের মোহে মাতাইয়া তুলিয়াছে। তাহাকে না পাইলে তাহার জীবন ব্যর্থ হইয়া যায়।

ইহা রূপ-কথা নহে; রূপকও নহে। ইহাই বিশ্ব-জগতের তত্ত্ব। সৃজনের নীতি প্রেম। তবে হিংসা-দ্বেষ কেন? হিংসা-দ্বেষ প্রেমেরই বিপরীত দিক—antithesis। প্রেম thesis। রাগ দ্বেষের দ্বন্দ্ব যখন নির্ম্মুক্ত হইয়া আত্মারামে পরিণত হয়, তখন হয় Synthesis, তাহার উপর আর কিছু নাই। আবার পুনরাবৃত্তি হইতে পারে।

সৃজনের নীতি প্রেম, বলিয়াছি। প্রেম মানে কি পরকে ভালবাসা? নিশ্চয়ই না। পরকে কেহই ভালবাসে না।—ভালবাসতে পারেও না। অতি যে স্বার্থপর, সেও যেমন নিজেকে ভালবাসে, আবার অতি যে বিশ্বপ্রেমিক সেও নিজেকেই ভালবাসে। তফাৎ এই, একজনের সত্তা অতি ক্ষুদ্র; আর একজনের সত্তা অতি বৃহৎ। স্বার্থত্যাগ মানে প্রকৃত স্বার্থলাভের জন্য মিথ্যা-স্বার্থের অর্থাৎ পরার্থের পরিত্যাগ। মায়ের যে ভালবাসা সন্তানের প্রতি, তাহা আমরা একান্ত নিঃস্বার্থ বলি। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভুল। মায়ের ভালবাসা সব চেয়ে স্বার্থপর। কারণ ঐ সন্তানের চেয়ে মায়ের অধিকতর স্বার্থ আর কিছুই নাই। ঐ সন্তানের চেয়ে মায়ের অধিকতর আপন আর কিছুই নাই। আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ। ইহাই সত্য কথা। কাজেই পুত্র স্নেহ।

মানুষ কখনো পরার্থের অনুসরণ করে না। স্বার্থ ও পরার্থের যে ভেদ আমরা দেখি, তাহা স্বার্থ-কল্পনার ভেদ-জনিত বস্তুতঃ সমস্তই স্বার্থের অন্বেষণ। ক্ষুদ্র পিপীলিকাও স্বার্থ খুঁজিতেছে, আবার বুদ্ধ-চৈতন্যও স্বার্থ খুঁজিয়াছেন।

প্রকৃত-পক্ষে আমরা স্বার্থও খুঁজি না। শুধু ঐ 'স্ব'-টুকুই খুঁজি। আর ঐ 'স্ব'-এর জন্যই যত 'অর্থের' সন্ধান। ঐ নার্কিসাসের মতই প্রত্যেক মানুষ—প্রত্যেক জীব। ব্রহ্মের সৃষ্টিও ঠিক ঐ নার্কিসাসের রূপোন্মাদের মত। তিনি নিজের সঙ্গে যেই প্রেম করিলেন, অমনি শতলক্ষ জগন্মণ্ডলের সৃষ্টি হইল। সেইজন্যই ভগবান্ এ জগৎকে এত ভালবাসেন; এ জগৎ যে তাঁহার স্বরূপাংশ। সেইজন্যই তিনি আমাকে ভালবাসেন; সেইজন্যই আমি তাঁহাকে ভালবাসি। তবে যে আমরা ভগবান্‌কে ভুলিয়া থাকি? আমি আমার প্রিয়তমার দেহ মন প্রাণ প্রেম সমস্ত ভুলিয়া যদি তাঁহার কেশাগ্রের লক্ষাংশের এক অংশ লইয়া উন্মত্ত হইয়া থাকি, তাহাও যেমন, ভগবান্‌কে ভুলিয়া স্ত্রী পুত্র ধন রত্ন লইয়া মত্ত হইয়া থাকাও ঠিক সেইরূপ।

ভগবানের মায়া-শক্তি প্রভাবেই এই জগৎ-রচনা-রূপ লীলা সংঘটিত হয়, আবার সেই মায়ার দুরন্ত মোহেই মানুষের নানা ভ্রম জন্মে।—সেইজন্যই "কৃষ্ণ ভুলি জীব-সব অনাদি বহির্মুখ।"

আমি আমাকেই ভালবাসি। সর্ব্বত্রই 'আমি' আমাকে ভালবাসে। 'আমি' ছাড়া আর কোথাও কিছু নাই। 'আমিই' মায়া বশে ভাগ হইয়া প্রথমতঃ আমি-তুমি দ্বন্দ্ব হইয়া যায়। তখন 'আমি' 'তুমি'কে ভালবাসে—অর্থাৎ 'তুমি'কে লাভ করিবার জন্য, ভোগ করিবার জন্য, পাগল হইয়া উঠে। আবার ঐ এক 'তুমি' এক হইতে বহু হইয়া যায়। তখন 'আমি' কাহাকেও ভালবাসে, কাহাকেও হিংসা করে। এইরূপে সংসার-লীলায় অনন্ত জটিলতা, অনন্ত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

আমি আমাকে ছাড়া আর কাহাকেও ভালবাসতে পারি না। আবার আমার এই আমি পর-রূপে প্রতীয়মান না হইলেও, অর্থাৎ এই আমি আমা হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া যাইয়া, আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, রূপের জ্যোতিঃ বিকীরণ করিতে না থাকিলেও, আমি আমাকে ভালবাসিতে পারি না। কিন্তু এই আমিকে সম্পূর্ণরূপে পাওয়া অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। আমরা খণ্ড-আমি লইয়া—আমির অণু-পরমাণু লইয়া ভুলিয়া মজিয়া থাকি। তাই আমাদের তৃপ্তি নাই, তাই আমাদের শান্তি নাই,—এক ছাড়ি, আর ধরি! কিছুতেই সন্তুষ্ট হই না। অন্ধকারে খদ্যোতের অনুসরণ করিয়া মানুষ চিরকাল ছুটিয়া চলিয়াছে। যাহাকেই ধরে তাহারি জ্যোতিঃ হাতের মধ্যে মিলাইয়া যায়। আবার আর একটির পশ্চাতে ছোটে, কিন্তু এইসব জ্যোতিরিঙ্গন যে জ্যোতির ছলনা মাত্র।

প্রকৃত জ্যোতির সন্ধান পাইলে মানুষের সকল দুঃখ—সকল আর্ত্তি ঘুচিয়া যায়। কিন্তু সে জ্যোতির কথা মানুষ ভাবে না! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৈল-বর্ত্তিকার শিখা সঞ্চার করিয়া তদ্দ্বারাই জীবনের সকল অন্ধকার দূর করিতে চায়! প্রতিকূল বায়ু-প্রবাহের অন্ত নাই। প্রকৃত জ্যোতিঃ কতদূরে, কেমন করিয়া তাহার সমীপবর্ত্তী হওয়া যায়, সে অনুসন্ধান প্রায় কেহই করে না। অজ্ঞানান্ধকারের পরপারে সে জ্যোতিঃ বিরাজ করিতেছে। সহস্র আদিত্য-তেজ তাহার সম্মুখে নিভিয়া যায়! তাই তাহাকে "আদিত্য-বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" বলিয়াই বুঝিতে হয়।

> ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র-তারকম্
> নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
> তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
> তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥

এই যিনি, তিনিই আমার সম্পূর্ণ আমি। তাহারি জন্য আমি পাগল। তাহাকে না পাইয়াই আমার সকল দুঃখ। তাহার বিরহ-তাপে কত কি বুকে জড়াইয়া ধরি, প্রাণ জুড়ায় না। বুকে আছে জ্বাল, অন্তরে অনন্ত পিপাসা। আকাশের সমস্ত মেঘ একসঙ্গে বারি-বর্ষণ করিলেও সে পিপাসা মিটিবে না। যে সৌন্দর্য্যের আকাঙ্ক্ষা এ হৃদয়ে, জগতের সমস্ত প্রস্ফুটিত কুসুম-রাশি, ধরণীর সমস্ত কুসুম-সৌরভময়ী রূপ-গৌরববতী যুবতী রমণীও সে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করিতে পারিবে না। এই আকাঙ্ক্ষার পীড়নে আমি পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি। কিন্তু সে আপন গন্ধে মম কস্তুরী-মৃগ সম। দিশাহারা হইয়া যাই। পাগল হই। যাহা চাই তাহা ভুল করিয়া চাই। যাহা পাই তাহা চাই না।

এই আত্ম-প্রীতি-তত্ত্ব সমস্ত সৃষ্টির মূলে, ভগবানের সমস্ত লীলার মূলে। গোলোক-বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ-লীলার ইহাই তাৎপর্য্য। পরমাত্মা পরদেবতা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির যাহা নির্য্যাস তাহাই শুদ্ধপ্রেম; প্রেমের নির্য্যাস ভাব; ভাবের নির্য্যাস মহাভাব। শ্রীরাধা এই মহাভাব-স্বরূপিণী। শ্রীরাধার কায়-বূহ বা রূপ-বিভূতি ব্রজগোপীগণ। শ্রীকৃষ্ণ এই শ্রীরাধা ও গোপীগণের সঙ্গে অমৃত মধুর প্রেম-লীলা করেন। এই লীলা অনাদি ও অনন্ত। শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বতঃ আত্মাতেই রমণ করেন। লীলায় যোগ-মায়া প্রভাবে এই আত্ম-রমণ পরকীয়া প্রীতিতে পরিণত হয়—অর্থাৎ তদ্রূপে প্রতীয়মান হয়। শ্রীকৃষ্ণের সকল লাম্পট্য নিজ হ্লাদিনী শক্তির সহিত। এই হ্লাদিনীর পরিণতি রাধা ও ব্রজাঙ্গনাগণ। ইহাদের সঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণ রস-বিলাস করেন। লৌকিক ব্যবহারের নৈতিক আদর্শ যাহারা কৃষ্ণ-লীলার বিচার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্যভিচার দোষারোপ করেন তাঁহারা নিতান্ত অজ্ঞ।

মানুষ মাত্রেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে প্রেমের জন্য লালায়িত। সে পরের স্পর্শ চায়, পরকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া সুখী হইতে চায়। কিন্তু এই পর যে আপনারি রূপান্তর তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বিকসিত শিশির-সিক্ত গোলাপটী মন্দমধুর প্রভাত-বায়ুস্পর্শে মন্দ মন্দ আন্দোলিত হইতেছে। দেখিয়া আমার হৃদয় নাচিয়া উঠিল। আমি উৎফুল্ল হইলাম। কিন্তু এই প্রীতির মধ্যেও একটু অতৃপ্তি অনুভূত হয়। কেনই বা এই প্রীতি আর কেনই বা এই অতৃপ্তি? ঐ গোলাপটী যে আমার সৌন্দর্য্য পিপাসু হৃদয়েরই প্রতিবিম্ব, বিদ্যুৎ-স্ফুরণের মত এই জ্ঞান-প্রকাশেই আমার প্রীতি। আর উহা যে আমার হইয়াও পর হইয়া গিয়াছে, আমি যে উহাকে হৃদয়ে পাইতেছি না, এইজন্য অতৃপ্ত। হৃদয়কে সৌন্দর্য্য-পিপাসু বলিয়াছি। কিন্তু সৌন্দর্য্য কোথায়? সৌন্দর্য্য হৃদয়ের বাহিরে হইলে, হৃদয় তাহা পাইত না, বুঝিতও না। সৌন্দর্য্য হৃদয়েরই অংশ, হৃদয়েরই শক্তি! বাহিরে তাহার প্রতিচ্ছায়া পড়ে।—কিংবা—একই কথা,—বাহিরের কোনো উদ্দীপনী, কোনো Stimulus, আমার হৃদয়ের ঘুমন্ত সৌন্দর্য্যবৃত্তিকে জাগাইয়া দেয়! সে বাহিরে নিজের প্রতিভাস দেখিয়া নার্কিসাসের মতই নিজেই পাগল হয়।

> গভীর চিত্তে গোপন-শালা,
> সেথা ঘুমায়ে যে রাজ-বালা
> জানিনে সে কোন্ জনমের পাওয়া!
> দেখে নিলেম ক্ষণেক তারে
> যেমনি আজ মনের দ্বারে
> যবনিকা উড়িয়ে দিল হাওয়া।

ইহাই সৌন্দর্য্য-অনুভূতি। ইহারই ভাবান্তর রাগাবেশ বা প্রেমানন্দ।

সদ্যঃপ্রস্ফুটিত যূথীর মত অই তরুণ শিশুটী খেলা করিতেছে। উহার নয়নে কি স্নিগ্ধ-চঞ্চল দৃষ্টি! উহার আননে কি কোমল-মধুর হাস্য বিভাস! উহা বিশ্ব-সৌন্দর্য্যের একটী তরল তরঙ্গ! উহাকে দেখিয়া কোলে তুলিয়া লইতে ইচ্ছা করে। উহাকে বুকের মধ্যে ভরিয়া রাখিতে ইচ্ছা করে। উহার ললাটে চুম্বন করিতে ইচ্ছা করে। করিবে না? নিশ্চয়ই করিবে। ও যে আমার অন্তঃহৃদয়ের মাধুর্য্য বিলাসের একটী মূর্ত্তি কিরণ-রেখা—কেমন করিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে।

ঐ যে নব-বসন্তের কুসুম-বিকাশোন্মুখী পল্লবিনী-সঞ্চারিণী-লতা

স্বরূপিণী কিশোরী—প্রীতিময়ী, গীতিময়ী, আমার জন্মজন্মান্তরের স্মৃতিময়ী প্রতিমাখানি, উঁহাকে দেখিয়াই উঁহার পদতলে আমার দেহ-মন জীবন যৌবন সমর্পণ করিয়াছি! না দিয়া কি উপায় আছে? আমার অন্তরের গুপ্ত মঞ্জুষার মধ্যে আমার যে হৃদয়-রত্ন লুক্কায়িত ছিল, ঐ কিশোরী আমার সেই রত্ন-রচিতা প্রতিমা। কোন্ সে চতুর তস্কর আমার অন্তঃপুরে সিঁধ কাটিয়া আমার সেই গুপ্ত হৃদয়-মণি চুরি করিয়া আনিয়া ঐ কিশোরী-মূর্ত্তি রচনা করিয়াছে তাও আমি জানি না! যাহা আমারই একান্ত আপনার ছিল, তাহারি জন্ম এখন আমাকে হাহাকার করিয়া দিগ্‌দিগন্ত ছুটিতে হইবে! হায় অদৃষ্ট! আমি কি উঁহাকে আর পাইব? উঁহাকে না পাইলেও ত উপায় নাই! আমি আমাকে হারাইয়া কেমন করিয়া বাঁচিব?

পয়দি প্রয়াণে যাগে শাস্ত থাপয়ি
সে পাওয়ে বহুভাগী!

আমার কি সে ভাগ্য আছে?

ইহাই প্রেম। এ প্রেম স্বকীয়ও নয়, পরকীয়ও নয়। ইহা স্বকীয়-পরকীয়।

এই ভাবের ভূমি হইতে নামিয়া আসিয়া ব্যবহারিক জগতে এই তত্ত্বের রূপ ও ক্রিয়া দেখিতে চেষ্টা করিব।

লৌকিক প্রণয়ের দুইটি ভেদ আছে। এক স্বকীয়া আর পরকীয়া। নিজের বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি যে ভালবাসা, তাহাই স্বকীয়া। আর সধবা বা বিধবা পর নারীর প্রতি যে আসক্তি, তাহাই পরকীয়া। স্বকীয়া বৈধ; পরকীয়া অবৈধ। নিজের স্ত্রীকে কেহ কেহ ভালবাসে, কেহ কেহ ভালবাসে না। কিন্তু স্ত্রীর প্রতি যে প্রণয় তাহা প্রায়ই দুর্ব্বল। তাহাতে কোনো তীব্রতা থাকে না। কোনো উচ্ছলতা থাকে না। অন্ততঃ কোনো চঞ্চলতা—কোন অশান্তি থাকে না। এই প্রেমে আকস্মিক উদ্দামতা নাই। নীতিবাদীরা দাম্পত্য-প্রেমের যতই মহিমা কীর্ত্তন করুন, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, কিন্তু দাম্পত্য-প্রেম স্বভাবতই মৃদু ও নিস্তরঙ্গ ইহাতে উচ্ছ্বসিত প্রবাহ এবং দুর্দমনীয় বেগের অভাব! ইহা পুণ্যময় হোক্, ধর্ম্মময় হোক্, মঙ্গলময় হোক্—অতি গভীরও হোক্—স্বীকার করা যাইতে পারে; কিন্তু ইহা উদ্বেলও নয় সতেজও নয়। ইহা অনেকটা Static; Dynamic force ইহাতে খুব কম। স্বকীয়-প্রেমে এই যে সমস্ত গুণের অভাবের কথা বলিলাম, পরকীয়-প্রেমে সে সমস্ত গুণই আছে; এবং ইহা ছাড়া আরো আছে। পর-রমণীর প্রতি প্রীতি দুর্নিবার বেগবতী গিরি-তরঙ্গিণীর মত ক্ষিপ্রগামিনী। ইহা হৃদয়ে কখনো মৃদু-মারুত-হিল্লোলে শত-তরঙ্গ কলনিনাদে নৃত্য করিতে থাকে। আবার কখনো ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ উন্মত্ত ক্রুদ্ধ সিন্ধুর মত ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া সমস্ত জীবন রসাতলে করিয়া দিতে চায়! পুত্রের প্রতি জননীর যে স্নেহ, তাহাও এই পরকীয় প্রণয়-বেগের কাছে পরাজিত হইয়া যায়। সেইজন্যই কুলটারা পুত্র-কন্যা পরিত্যাগ করিয়া অনায়াসে অকাতরে বাহির হইয়া যাইতে পারে। পুত্র-কন্যার মমতার বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে, এমন শক্তি এক অবৈধ প্রণয় ব্যতিরেকে আর কিছুতই নাই। ভগবানের প্রতি মানুষের প্রেম লম্পট পুরুষের প্রতি স্বৈরিণী রমণীর প্রেমের মত দুর্দমনীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়—এবং তাহাই আদর্শ। ইহারি নাম শৃঙ্গার-রসের বা মধুর-রসের ভগবদ্‌-ভজন। মানবমাত্রেরই সংসার ও সংসার-বিধানের বন্ধন, নারীর স্বামী ও স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্য-বিধানের বন্ধনের সহিত তুলনীয়। নারীর যেমন স্বামী আছে, পুরুষেরও তেমনি স্বামী আছে। সংসার-ধর্ম্মই পুরুষের স্বামী। নর-নারী যখন এই স্বামী পরিত্যাগ করিয়া 'কুলটা' হইয়া ভগবানের কাছে ছুটিয়া যাইয়া তাঁহার পাদ-পদ্মে আত্ম-সমর্পণ করে, তখনই তাহাদের পরম পুরুষার্থ লাভ হয়। ঐ যে তিনি বলিয়াছেন,—

সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।

ইহা কুলটা হইবার উপদেশ। সর্ব্ব ধর্ম্ম মানে কুল-ধর্ম্মও। পরমার্থ ভাবে কুলটা হওয়ার চেয়ে শ্রেষ্ঠ পথ মানুষের আর কিছু হইতে পারে না। সামান্য পুরুষের জন্য নারী যখন কুল-ধর্ম্ম ত্যাগ করে তখন সে পরিষ্কার নরকের দিকে নির্ব্বিবাদে চলিয়া যায়। আর পরম পুরুষের জন্য—পরম পুরুষের রূপ গুণে মুগ্ধ হইয়া নর-নারী যখন সকল ধর্ম্ম, সকল বিধি পরিত্যাগ করে—তখন সহস্র স্বর্গ সুখ তাহাদের পদতলে লুণ্ঠিত হয়! ভগবান্ লম্পট ত নিশ্চয়ই। লম্পটের শিরোমণি! তাঁহার "শত কোটী গোপীতে নহে কাম নির্ব্বাপন।" মানুষ মাত্রেই তাঁর পরা-প্রকৃতির অংশ স্বরূপিণী! মানুষ যে প্রকৃতি, পুরুষ ত নয়। পুরুষ ত একজনই। সমস্ত বিশ্ব-'পুর' ব্যাপিয়া 'বাস' করিতেছেন। স্ত্রী পুরুষ সকলেই রমণী। সকলেই গোপী। ভগবান এই সব রমণীর কুল নষ্ট করিবার জন্য চির-তৎপর! সংসারই এই কুল। বহু জন্ম জরা-মরণ-রূপ সংসারে নিবৃত্ত না হইলে জীবের পরমা শক্তি লাভ হয় না।

পরকীয়া প্রীতি অত্যন্ত বেগবতী এবং শক্তিশালিনী, আমরা স্বীকার করিলাম। পরকীয়া রতির বিধানেই বৃন্দাবনের নিখিল-লীলা-ব্যাপার নিয়মিত। ব্যবহার-জগতের পরকীয় প্রেম নিন্দনীয়, ঘৃণ্য ও বর্জ্জনীয়। ইহা ব্যভিচার। ইহা পাপ; ইহা নরকের পথ সন্দেহ নাই। কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনের যে পরকীয়-রস-লীলা, তাহার আস্বাদনের জন্য ব্রহ্মাদি দেবতাগণও তপস্যা করেন। স্বয়ং লক্ষ্মীও ঐ লীলায় প্রবেশের জন্য চির-লালায়িতা। লক্ষ লক্ষ জন্মের রাশিকৃত পুণ্যও এক মুহূর্ত্তের এই লীলারসাস্বাদনের তুল্য হইতে পারে না।

অনেকের ধারণা—বৈষ্ণব-শাস্ত্র ব্যভিচার সমর্থন করে। ইহার চেয়ে সাংঘাতিক ভ্রান্তি আর দ্বিতীয় নাই। অমৃতকে পুরীষ মনে করাও যা, বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে ব্যভিচারাশ্রয় মনে করাও তাই। একটা কথা মনে রাখিলে এই কুৎসিত ভ্রমটী কাহারও হইবে না। বৈষ্ণব

দর্শনানুসারে জীব মাত্র রমণী। কারণ জীবমাত্রই ভগবানের পরা প্রকৃতির অংশ।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।

নিজের এই কৃষ্ণ-প্রেমময়ী রমণী স্বরূপ অনুভূত হইবার জন্য যে শুদ্ধ ও সুপবিত্র কর্ম্ম ও ভাবনা-পরম্পরা, তাহাই বৈষ্ণব সাধন। বেদান্ত মতে জীব মাত্রই ব্রহ্ম। অবিদ্যা হেতু তত্ত্বমসির তাৎপর্য্য জ্ঞানের বাধা হয়। বৈষ্ণব দর্শন মতে জীবমাত্রই ব্রহ্মের পরা-প্রকৃতির অংশ। অবিদ্যা হেতু আমি পুরুষ—এই প্রকার ধারণা হয়। সাধন বশে শুদ্ধ সুনির্ম্মল কৃষ্ণ-প্রেম যখন প্রকাশিত হয়, তখন আর প্রকৃত স্ত্রী-পুরুষ ভাবের আবরণ থাকে না। সকলেই কৃষ্ণ-প্রেম-পাগলিনী হইয়া উঠে। কারণ শ্রীকৃষ্ণ—

পুরুষ-যোষিৎ কিংবা স্থাবর জঙ্গম,
সর্ব্ব চিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ মদন।

চিত্তের সমস্ত রাজসিক ও তামসিক বৃত্তি সমূহ এবং তজ্জনিত কাম-ক্রোধ-মোহ প্রভৃতি নিঃশেষে নিরাকৃত না হইলে জীবের স্বরূপোপলব্ধি হইতে পারে না। কৃষ্ণ প্রেম পরম-পুরুষার্থ। কৃষ্ণ-প্রেমের প্রকৃত অধিকারিণী একমাত্র গোপী। সাধনের উদ্দেশ্য—সেই গোপী ভাব প্রাপ্ত হওয়া। ইহাই যে ধর্ম্মের মূল সূত্র, সেখানে ব্যভিচারে প্রশ্রয় দিবার অবসর কোথায়? স্বর্গ কামনা পর্য্যন্ত বৈষ্ণব শাস্ত্রের অত্যন্ত অবজ্ঞাত। মোক্ষ-বাঞ্ছাকেও বৈষ্ণব ঋষি 'কৈতব-প্রধান' বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন।

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতং
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।

ইহার চেয়ে উচ্চতর ভক্তির আদর্শ সাধন ত দূরের কথা, মানুষের কল্পনায়ও আসে নাই। এই ভক্তির আবার কতকগুলি ক্রমোন্নত স্তর আছে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এই যে মধুর রসের ভক্তি যাহার অন্য নাম রাগানুগা—ইহাই বৈষ্ণবের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ। আবার এই মধুর প্রেমেরও নানা ভেদ এবং ক্রমোচ্চ বিবিধ ভূমি আছে, এখানে তাহা আলোচ্য বিষয় নয়।

লৌকিকী পরকীয়া-প্রীতির কথা বলিতেছিলাম। এই পরকীয়া এত শক্তিশালিনী কেন? আর দাম্পত্য-প্রেমই বা এত নিস্তেজ কেন? এ কেন'র উত্তর সহজেই অনুমিত হয়। দাম্পত্য-প্রেমে যাহা পাইবার তাহা পাওয়া হইয়া গিয়াছে। আর হারাইবার ভয় নাই। এই স্বকীয় প্রেমে আকাঙ্ক্ষিত কিছুই নাই। আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত প্রেম কোথায়? অপ্রাপ্তের প্রাপ্তির প্রয়াস ব্যতিরেকে প্রীতি কোথায়? লোভ না থাকিলে Love কোথায়? * লাভের আশা থাকা চাই তবে ত Love! প্রেমের মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত লোভ আছে—একটী দুরন্ত বাসনা আছে। স্বকীয় প্রেমের মধ্যে সেই লোভের অভাব। সেখানে একটী গভীর প্রণয়ের সম্বন্ধ রহিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক প্রণয়টা প্রায় সেখানে নিষ্ক্রিয়। পরকীয়ায় দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার ব্যাপার। সুদূরে অবস্থিত একটী সুন্দর বস্তু আমার হৃদয়-মন হরণ করিয়াছে। আমি তাহাকে চাই। তাহারি জন্য আমার হৃদয়ে বাসনার দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। তাহার সংস্পর্শ-মেঘ-বারি-বর্ষণ বিনা সে আগুণ কিছুতেই নিভিবে না। কেমন করিয়া তাহার কাছে যাই? কেমন করিয়া তাহাকে পাই? আমার জগতের সকল আলো সকল রূপ সে হরণ করিয়াছে। তাহাকে চাইই।

ওপারে বঁধুর ঘর বৈসে গুণনিধি।
পাখী হ'য়ে উড়ে যেতে পাখা না দেয় বিধি।
যমুনাতে ঝাঁপ দিব না জানি সাঁতার।
কলসে কলসে সেঁচি না ঘুচে পাথার।

এই যে ভাব, ইহা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কখনই হয় না, তাহা নহে। প্রোষিত-ভর্তৃকা যে প্রবাসী স্বামীর বিরহে জ্বলিয়া জ্বলিয়া কঙ্কাল-সার হইয়া যায়—তাহা অনন্ত প্রেম নিশ্চয়ই। বিরহাবস্থায় স্বকীয়-প্রেম পরকীয় ভাব ধারণ করে। তাই তার এত আবেগ।

মেঘ-দূতের কান্তা-বিরহী যক্ষের প্রেমকে চলিত ভাষায় স্বকীয়ই বলা হইবে। কিন্তু যাহা স্বকীয় তাহার জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া যক্ষ শুকায় কেন— কনক-বলয়-ভ্রংশ-রিক্ত-প্রকোষ্ঠঃ'—হাতের কনক-বালা খসিয়া প'ড়য়া হাত খালি হয় কেন? যক্ষ-প্রেয়সী দৈব-দুর্ব্বিপাকে যে 'পরকীয়া' হইয়া গিয়াছে—প্রাপ্তি-সীমার পরপারে গিয়াছে। সীতা-হরণের পর এবং সীতার বনবাসের পর শ্রীরামের যে অসহনীয় দুঃখ, তাহা উদ্দীপ্ত-প্রণয়-জনিত নিশ্চয়ই। সে প্রণয়কে স্বকীয় না বলিয়া স্বকীয়-পরকীয় বা শুধু পরকীয় বলাই ভাল। প্রজা-সাধারণের নিন্দাবাদে প্রাণের সীতা পর হইয়া গেল। পরকীয়া কথাটার ব্যঞ্জনার সীমা বিস্তৃত করিয়া লওয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষে স্বকীয় প্রেম একটা মিথ্যা কথা। প্রেম মাত্রই পরকীয়। শিশুর প্রতি যে জননীর স্নেহ তাহাও পরকীয়। শিশুকে হারাই হারাই বলিয়া জননী সর্ব্বদাই সশঙ্কিতা। ও যে সাত রাজার ধন এক মাণিক। উহা পাইয়াও পাওয়া হয় নাই। কখন নিয়তির বজ্র-কঠোর হস্ত উহাকে টান দিয়া মুহূর্ত্তে লইয়া যাইবে—কিছুই ত ঠিকানা নাই। তাই ত জননী 'আমার' বলিতে কাঁপিয়া উঠে। তাই ত মাতৃ-প্রেমের এত আবেগ। মাতৃ-প্রেম পরকীয়। যাহা প্রাপ্ত, এবং যাহা হাত হইবার ভয় নাই, তাহার জন্য কাহারো হৃদয় চঞ্চল হয় না।

কোনো কোনো স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে নিবিড় ভালবাসা, জীবন্ত চলন্ত উচ্ছলিত প্রেম দৃষ্ট হয়। আমার এক সুহৃৎকে দেখি, তিনি তাঁহার স্ত্রীর প্রতি যে ভাব ও ব্যবহার করেন, তাহা লক্ষ্য করিলে মনে হয় তাঁহার স্ত্রী যেন উঁহার চির-বাঞ্ছনীয়া। এখনো যেন তিনি তাহাকে

---

* ইংরেজী 'Love' আর সংস্কৃত 'লোভ' শব্দ দুইটা একই মূল প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। লোভের root 'লুভ্' আর Loveএর root 'Luf', (Anglo-Saxon Lufian—to love)

লাভ করিতে পারেন নাই। তাহার গৃহিণী যেন' এখনো কোন সিন্ধু-পার-বাসিনী বিদেশিনী।

ভুবন ভ্রমিয়া শেষে
আমি এসেছি তোমারি দেশে,
আমি অতিথি তোমারি দুয়ারে আজি
ওগো বিদেশিনি।

অনেকটা এই প্রকার তাহার ভাব।

কেন এমন হয়?—হৃদয়ের আশা মিটে নাই। দেহ পাইয়াছে, মন পাইয়াছে, প্রেম পাইয়াছে, তবু সব পাওয়া হয় নাই। হৃদয়ের তৃপ্তি হইল কৈ? ঐ মনের মধ্যে আরো মন আছে। তাহাই চাই। ঐ প্রাণের অন্তরালে আরো প্রাণ আছে, তাহা পাওয়া হয় নাই। তাই চাই, এখনো সে দূরে রহিয়াছে। এখনো ঐ দূর-আকাশের নীল উজ্জ্বল তারাটীর মত সে আমাকে মুগ্ধ করিতেছে, আমাকে প্রলুব্ধ করিতেছে। সে আমার গৃহের অন্তঃপুরে আসিয়াছে। কিন্তু অন্তরের অন্তঃপুরে ত আসে নাই। তাহার কিরণ পাইয়াছি, কিন্তু কিরণ-দায়িনীকে ত এখনো পাই নাই! এই যে প্রেম, ইহা স্বকীয় হইয়াও পরকীয়। তাহাই ইহাকে স্বকীয়া-পরকীয়া বলিতে চাই!

এই স্বকীয়া-পরকীয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগুলি।

উপন্যাসের আখ্যান-বস্তুর সর্ব্বপ্রধান উপাদান প্রণয়। আর সে প্রণয় পরকীয় হওয়া চাই। ঔপন্যাসিক ঘটনাবলীর উদ্রেক করিয়া সঞ্চালন করিবার যথেষ্ট শক্তি স্বকীয় প্রেমের নাই। সে শক্তি পরকীয়া-প্রীতির আছে; আর সে ক্ষমতা আছে পূর্ব্ব-রাগ বা কোর্টশিপ ব্যাপারের। আমাদের দেশে বিবাহের পূর্ব্বে বর-কন্যার দেখা-সাক্ষাৎ হওয়ারই কোনো উপায় নাই। পূর্ব্ব-রাগ চলিবে কি করিয়া? আর পরকীয়া প্রীতির সুযোগ সম্ভাবনা ত খুব কম। বিধবার রাজ্যে যা'ও বা কিঞ্চিৎ প্রণয় প্রয়াস দেখা যায়—একটু চাওয়া-চাওয়ি, একটু লুকোলুকি, একটু কাণাকাণি, একটু ঢাকাঢাকি—তাও সমাজের ক্ষুর-ধার ক্রূর দৃষ্টির আঘাতে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যায়। সমাজ-দৃষ্টিকে যদি কেউ উপেক্ষা করিয়া অবৈধ পথে বাঞ্ছিত লাভের চেষ্টা করে, সমাজ তাহার উপর নিদারুণ প্রতিহিংসা সাধন করে। সুতরাং নর-নারীর অবাধ প্রণয়-লীলা আমাদের দেশে বিরল। অবরোধ প্রথা হৃদয়ের স্বাধীন বৃত্তিসমূহকে একেবারে অবরোধ করিয়া রাখিয়াছে। এ ব্যবস্থা অবশ্য সমাজের কল্যাণকর। কিন্তু উপন্যাসের জগতে ইহার ফল দুর্ভিক্ষ। উপন্যাস জীবন ধারণের উপযুক্ত ভিক্ষা পায় না।

বঙ্কিম ছিলেন আদর্শ-সমাজ-সংস্কারক। উদারনৈতিক হইলেও তিনি তাঁহার সাহিত্যে কঠোর চরিত্র-নীতির অনুসরণ করিয়াছেন। শুধু রস-সৃষ্টির জন্য কিংবা শুধু মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের জন্য তিনি কোথাও দুর্নীতির প্রশ্রয় দেন নাই, যদিও চরিত্র-নীতি রক্ষা করিতে যাইয়া তিনি স্থানে স্থানে সৌন্দর্য্য-নীতি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন—বিশেষতঃ 'বিষবৃক্ষে' এবং কৃষ্ণকান্তের উইলে।

পরকীয়া-প্রীতি অবৈধ। সুতরাং তিনি পরকীয়ার ভিত্তির উপর তাঁহার উপন্যাসের মন্দির স্থাপন করিতে পারেন নাই। কিন্তু স্বকীয়া দিয়াও উপন্যাস হয় না। এই সমস্যায় পড়িয়া তিনি এক আশ্চর্য্য সুন্দর উপায় উদ্ভাবন করিয়া উভয় দিক রক্ষা করিয়াছেন। তিনি প্রায় সর্ব্বত্রই স্বকীয়াকে নানা উপায়ে পরকীয়ায় পরিণত করিয়া লইয়াছেন। তাহাতে সমাজ-প্রথা এবং নৈতিক বিধানও রক্ষা পাইয়াছে, উপন্যাসের আবশ্যক প্রেমের উদ্দামতা এবং ক্ষিপ্র ও ক্ষিপ্ত ক্রিয়াশীলতাও লাভ হইয়াছে।

মৃণালিনীতে পশুপতি মনোরমার প্রতি আসক্ত। পশুপতির বিশ্বাস মনোরমা বিধবা। মনোরমা, তাহার কূট-রাজ-নীতির নানাবিধ-সমস্যা-সমাধান-ব্যস্ত ষড়যন্ত্র-পরায়ণ নীরস হৃদয়ের উপরও উচ্ছল প্রণয়-বন্যা বহাইয়া দিয়াছে। এক দিকে সমগ্র গৌড় রাজ্য, অন্য দিকে মনোমোহিনী মনোরমা! অথচ মনোরমা বিধবা। তাহাকে বিবাহ করিলে সমাজে পতিত হইতে হয়। কিন্তু মনোরমাকে লাভ করা চাইই। পশুপতি যদি রাজা হইতে পারে, তবে কা'র সাধ্য তাহার কার্য্যের বিরুদ্ধে কথা বলে। ইত্যাদি রূপে পরকীয়া-প্রেম নিজ শক্তি বিস্তার করিয়া উপন্যাসের উপাদান সৃষ্টি করিতেছে। কিন্তু মনোরমা পশুপতির বিবাহিতা স্ত্রী। পশুপতিও এ কথা জানে না। মনোরমাও জানে না।

দেবী চৌধুরাণীতে প্রফুল্ল ব্রজেশ্বরের পরিণীতা ভার্য্যা। কিন্তু পিতৃ-শাসনে ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। প্রফুল্ল নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। প্রফুল্লর অদর্শনে ব্রজেশ্বরের জীবন অসম্ভব হইয়া উঠিল। আহার নিদ্রা গেল। প্রাণহীনের মত সে প্রফুল্লর স্বপ্ন দেখিয়া দিন যাপন করিতে লাগিল। তার পর এক দিন ব্রজেশ্বরকে ডাকাতেরা ধরিয়া লইয়া গেল। প্রখ্যাতনাম্নী দস্যুদলের নেত্রী দেবী চৌধুরাণীর হাতে পড়িয়া ব্রজেশ্বর বিপদাপন্ন। রাজ-সজ্জায় সজ্জিত বজরার মধ্যে ব্রজেশ্বর দেবী চৌধুরাণীর রাজরাণীর মত রূপ দেখিয়া বিস্মিত হইল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, দস্যু-নেত্রী দেবী-চৌধুরাণী তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ না দিয়া রাশি রাশি স্বর্ণমুদ্রা দিয়া বিদায় করিল। বিদায়কালে ব্রজেশ্বর দস্যু-রাণীর নয়নে অশ্রুধারা দেখিয়া বিমুগ্ধবিহ্বল হইয়া কি যেন মোহাভিভূত-ভাবে অবশে তাহাকে চুম্বন করিয়া ফেলিয়া শিহরিয়া চমকিয়া উঠিয়া পলায়ন করিল। ইত্যাদি অনেক কিছু ব্যাপার হইল। অথচ ব্রজেশ্বর জানে না যে দেবী-চৌধুরাণী প্রফুল্ল, তাহারি স্ত্রী। স্বকীয়া প্রফুল্ল অচিন্তনীয় ঘটনা-পরম্পরার অধীনে পরকীয়া দেবী-চৌধুরাণী হইয়া সমস্ত উপন্যাসখানির উপাদান যোগাইল।

শ্রী সীতারামের পত্নী। সীতারাম শ্রীকে পরিত্যাগ করিয়াছে। শ্রীর কোষ্ঠীতে লেখা আছে, সে প্রিয়-প্রাণহন্ত্রী। স্ত্রীলোকের, স্বামীই একমাত্র প্রিয়। পুত্র-কন্যা পরের কথা। কাজেই দৈবজ্ঞের গণনায় শ্রী স্বামীর অকল্যাণকারিণী। এইজন্য শ্রী পরিত্যক্তা হইল। শ্রী ছোট ছিল, বড় হইয়াছে। সীতারাম বহুদিন তাহাকে দেখে নাই। এক দিন সীতারাম শ্রীকে রণরঙ্গিণী দেবী-প্রতিমার বেশে বিপুল জন-

সঙ্ঘের মধ্যে দেখিয়া বিস্মিত বিমোহিত হইয়া গেল। কিন্তু সেই যে একবার দেখিল, আর দ্বিতীয়বার সীতারাম তাহাকে দেখিতে পাইল না। আর একটিবার তাহাকে দেখিবার জন্য সীতারাম উন্মত্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু কোথায় শ্রী? অসংখ্য-জন-প্রবাহের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল! সীতারাম সর্ব্বত্র তাহার অনুসন্ধান করিল। পথে পথে, পল্লীতে পল্লীতে, প্রান্তরে প্রান্তরে, বনে বনে, কত অন্বেষণ করিল। কিন্তু কোথায় শ্রী! শ্রী একবার বিদ্যুৎ-ঝলকের মত দেখা দিয়া সীতারামের হৃদয়-মন হরণ করিয়া পলাইয়া গেল। আর তাহাকে পাওয়া গেল না। শ্রীর অদর্শনে সীতারাম চারিদিক্ অন্ধকার দেখিল। সীতারাম উপন্যাসের এই সূত্রপাত। পরে সীতারাম যখন শ্রীকে পাইল, তখন শ্রী সন্ন্যাসিনী। নিকটে থাকিয়াও দূরে। সীতারাম শ্রীকে সর্ব্বদা দেখে, কিন্তু পায় না। উভয়ের মধ্যে অতি-বিস্তৃত বিরহ-বাহিনী বহিয়া যাইতে লাগিল।

দুইজনে তটিনীর দুই তটে। শ্রী এইভাবে সীতারামের কাছে থাকিয়া অজ্ঞাতসারে সীতারামের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া দৈবজ্ঞের ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক করিতে লাগিল। সীতারামের মন-প্রাণ শ্রীর পদতলে পড়িয়া রহিল। রাজ্যের তত্ত্বাবধান কে করে। সব বিশৃঙ্খল হইতে লাগিল। এইরূপে শেষ পর্য্যন্ত শ্রী ও সীতারামের সম্বন্ধ দেখান হইয়াছে। শ্রী পরিণীতা স্ত্রী হইয়াও সীতারামের চির-আকাঙ্ক্ষিত হইয়া রহিল। এইরূপে বঙ্কিমচন্দ্র স্বকীয়াকে পরকীয়ায় পরিণত করিয়াছেন।

আনন্দমঠে শান্তি জীবানন্দের জন্য সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ পরিয়া সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় ভুক্ত হইল। জীবানন্দ শান্তির স্বামী। সেই স্বামীর দর্শন ও সাহচর্য্য লাভের জন্য কত কাণ্ড! জীবানন্দের ব্রত ভঙ্গ হইল। জীবানন্দ প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য প্রস্তুত হইল।—ইত্যাদি।

কপাল-কুণ্ডলায় মতিবিবি ঘটনাক্রমে এক দিন নবকুমারকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল। তাহার অন্তর-রাজ্যে এক মহা-বিপ্লব ঘটিল। তাহার জীবনের গতি নূতন পথে প্রবর্ত্তিত হইল। সে দিল্লী সিংহাসনের লোভ পরিত্যাগ করিয়া সপ্তগ্রামের বন-প্রান্তে আসিয়া বাসা লইল। কিসের জন্য? এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রণয়াকাঙ্ক্ষায়—শুধু তাহার দাসী হইবার জন্য। কিন্তু তাহার সে আশা পূর্ণ হইল না। দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঐশ্বর্য্যবতী যবনীর প্রেম ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিল। অবশেষে মতিবিবি নবকুমার ও কপালকুণ্ডলা উভয়ের সর্ব্বনাশের কারণ হইল। অথচ নবকুমার মতিবিবির স্বামী। মতিবিবি নবকুমারের বিবাহিতা পত্নী পদ্মাবতী। দৈব-দুর্ব্বিপাকে জাতিভ্রষ্টা যবনী! কপালকুণ্ডলাও নবকুমারের স্ত্রী হইয়াও—সর্ব্বদা নিকটে রহিয়াও বহুদূরে—সপ্তসমুদ্রের পর-পারে! নবকুমার এক মুহূর্ত্তের জন্যও কপালকুণ্ডলাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। কপালকুণ্ডলার বাস নক্ষত্র-লোকে—নবকুমার ভূমিতলে! তাই নবকুমার কপালকুণ্ডলার জন্য সর্ব্বদাই ব্যাকুল।

বঙ্কিমের উপন্যাসে কোনো না কোনো ভাবে সর্ব্বত্রই এই অপূর্ব্ব প্রণয়-নীতি পাওয়া যাইবে। আপনার জন,—আপনার স্বামী বা স্ত্রী, ঘটনার ও অবস্থার উচ্ছৃঙ্খল আবর্ত্তাঘাতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পর হইয়া গিয়াছে! তাহাকে পুনরায় লাভ করিবার জন্য অনন্ত আকুলতা,—দেশে দেশে অক্লান্ত অনুসন্ধান! সন্ধান পাইয়া আত্মসাৎ করিবার জন্য সহস্র চেষ্টা—উন্মত্ত উদ্যম! শত শত প্রতিকূল অবস্থার পাষাণ গাত্রে বারবার আহত হইয়া ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাওয়া! যে দুষ্প্রাপ্য বস্তুর প্রত্যাশায় নিষ্ঠুর নিয়তির সঙ্গে এই প্রাণপণ সংগ্রাম, সে কিন্তু নিতান্তই আপনার ছিল, এখন নাই! এই অদ্ভুত অবস্থা সৃজন করা বঙ্কিমী উপন্যাসের একটী প্রধান অঙ্গ। ইন্দিরার প্রধান বিষয় যাহা, তাহাও এই স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে পরকীয়া প্রীতি।

এই যে প্রেম, ইহাকে স্বকীয়া বলা চলে না। ইহা পরকীয়াই, তবু পরকীয়া নয়।

এইজন্যই ইহাকে স্বকীয়া-পরকীয়া নাম দিয়াছি। এই বিষয়টীর এখানে উল্লেখমাত্র করিলাম। প্রবন্ধান্তরে এ বিষয়ের সবিস্তারে আলোচনা ও অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা রহিল। পরিষ্কার পরকীয়ার ব্যাপারও বঙ্কিমে আছে। গোবিন্দলাল-রোহিণী, কুন্দ-নগেন্দ্র, শৈবলিনী-প্রতাপ, হীরা ও দেবেন্দ্র,—ইহাদের মধ্যে যে প্রণয় তাহা সাধারণ পরকীয়া। বঙ্কিমচন্দ্র অতি সাবধানে দেখাইয়াছেন, এই প্রণয় কখনই মঙ্গল-জনক হইতে পারে না। গোবিন্দলাল নারীহত্যা করিল, পতিপ্রাণা সতীর মৃত্যুর কারণ হইল। সূর্য্যমুখী মৃত্যু-মুখ হইতে ফিরিয়া আসিল, কুন্দ আত্ম-হত্যা করিল। কলুষিতা শৈবলিনীকে ধর্ম্ম-পথে আনিবার জন্য যোগ-বলের প্রয়োগ হইল, তারপর অনুতাপের জ্বলন্ত অনলে দগ্ধ করা হইল। হীরা উন্মাদ-গ্রস্তা হইল দেবেন্দ্র কুৎসিত রোগ ভোগ করিয়া অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হইল!

এইভাবে বঙ্কিমচন্দ্র অবৈধ প্রণয়ের বিচার করিয়াছেন।

মনের পরশ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(১৪)

কেম্ব্রিজে সুদীর্ঘ চারমাস-ব্যাপী ছুটিও ফুরিয়ে এল। দুই বন্ধু লণ্ডন থেকে কেম্ব্রিজে ফিরে গেল। পল্লব অবশেষে মনস্থির ক'রে ফেলেছিল। সে সঙ্গীত--হার্মনি—পড়তে আরম্ভ ক'রে দিল। সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডনে ব্যারিষ্টারির জন্য ফী জমা দিয়ে রাখ্‌ল।

মোহনলালের সে রাতের আন্তরিক কথাগুলি, উদ্দীপ্ত যুক্তিতর্ক ও আর্ত্ত স্বর কিন্তু অনেকদিন ধ'রেই তার কাণে বাজতে লাগ্‌ল। দেশে তার জীবনস্রোত বরাবর পড়াশুনো ও খেলাধুলো নিয়ে এক রকম উজান ভাবেই ব'য়ে এসেছিল। জীবনের অসঙ্গতি, অদৃষ্টের পরিহাস ও হৃদয়ের আশাভঙ্গ যে কি বস্তু, সে সম্বন্ধে কোনও গভীর রকমের অভিজ্ঞতা লাভ করবার সুযোগ তার এতদিন ঘটে নি। কাজে কাজেই সে সত্যই নানা বিষয়ে বড়ই অজ্ঞ থেকে গিয়েছিল। তাছাড়া তার শৈশব থেকে অনুপম পুত্রের সঙ্গীনির্ব্বাচনের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখ্‌তেন ব'লে তার স্কুল ও কলেজ-জীবনে কুসুম ও মোহনলাল ছাড়া বন্ধু এক রকম ছিল না বল্‌লেই হয়। আর বাড়ীতেও তার দুটি ছোট ভাই বোন ছাড়া আর কেউ ছিল না। অনুপম তাঁর অবসর সময়টার অনেকখানি ইচ্ছা ক'রেই পুত্রের সাহচর্য্যে কাটাতেন—নইলে পাছে পল্লব একলা বোধ করে। এমন কি তিনি তাকে নিজের বন্ধুবান্ধবদের মজলিশেও যোগদান করতে প্রায় অবাধ অধিকার দিয়েছিলেন। বাল্যকাল থেকে পিতৃবন্ধুদের তর্কালোচনা শুন্‌তে শুন্‌তে সে এতে সত্যই আনন্দ পেত। এক কথায় অনুপম পুত্রের হৃদয়ে শুধু পিতার আসন নয়, বন্ধু ও সহচরের আসনও পেতে ব'সেছিলেন। ফলে পল্লবের বাল্য ও কৈশোর জীবন মূলতঃ পিতা, কুসুম ও মোহনলাল এই তিন বন্ধুর সাহচর্য্যে এবং পড়াশুনো ও খেলাধুলোয়ই কেটে এসেছিল এবং সে বাড়ীতে বা স্কুল কলেজে কোথাওই খুব বেশি লোকের সঙ্গে মিশ্‌বার সুযোগ পায় নি। এই সব কারণে সাধারণ ডিগ্রীধারী ছাত্রদের তুলনায় জীবনের অনেকগুলো গুপ্ত ও রহস্যময় দিক্ তার প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল বল্‌লেই হয়। অথচ মুখে সে তা স্বীকার করত না, ও কেউ তাকে অনভিজ্ঞ বল্‌লে মহা উত্তপ্ত ভাবে প্রতিবাদ করত।

কিন্তু সত্যকে তার স্বরে অস্বীকার ক'রে বেশি দিন ঠেকিয়ে রাখা যায় না। সে বিলেতে এসে তার তর্ক ও আপত্তি সত্ত্বেও প্রতি পদক্ষেপে জীবন সম্বন্ধে তার গভীর অনভিজ্ঞতা উপলব্ধি করছিল। সঙ্গে সঙ্গে তার ছেলে-মানুষি অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত অনেক ধারণাই বিদেশের নানান্ ঘটনা-বৈচিত্র্যের অভিঘাতে স'রে যাচ্ছিল, যেমন স্রোতের বেগে পায়ের তলার বালি স'রে যায়। তবে এতদিন তবু সে দাঁড়িয়ে ছিল; কিন্তু মোহনলালের অপ্রত্যাশিত পতনে যেন শুধু তার পায়ের নীচের বালি নয়, মাটির দৃঢ় ভিত্তিও টলমলায়মান হ'য়ে উঠেছিল।

কিন্তু সময়ে অতিবড় আঘাতও মানুষের স'য়ে যায়। দু তিন সপ্তাহের মধ্যে পল্লবেরও মোহনলালের পতন গা-সওয়া হ'য়ে এল। (মোহনলালের শত যুক্তি-তর্ক সত্ত্বেও পল্লব মোহনলালের প্রেমে-পড়াটাকে পতন ছাড়া আর কিছু মনে করতে পারে নি।) কিন্তু এ আঘাত সে যতই পরিপাক ক'রে নিচ্ছিল ততই বদ্‌লে যাচ্ছিল। ইতিপূর্ব্বে সে নিজের প্রকৃতির পরিবর্ত্তনটা বড় লক্ষ্য করবার অবকাশ পায় নি। কিন্তু মোহনলালের পতনের অভিজ্ঞতা তাকে হঠাৎ এতখানি বদ্‌লে দিয়েছিল যে সে এবার নিজের পরিবর্ত্তনটা অনেকটা স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছিল।... তার কুসুমের একটি কথা মনে পড়্‌ল।

পল্লব যখন বম্বে থেকে বিলাত যাত্রা করে, তখন কুসুম

তাকে 'ব্যালাড্ পিয়ারে' জাহাজে তুলে দিতে এসেছিল। জাহাজে উঠিয়ে দেবার কয়েক মিনিট আগে কুসুম তাকে একটু হেসে বলেছিল: "আজকালকার দিনে যদি আর-ব্যোপন্যাসের যুগের মত একটা দৈবী আয়না বা ভৌতিক দূরবীণ মিল্‌ত যার মধ্যে দিয়ে মানুষের ভবিষ্যৎ দেখা যায় তা'হলে কেমন দেখ্‌তাম ভাই তোমার বিলেত প্রবাসের পর কি রকম পরিবর্ত্তনটি হবে।" তাতে পল্লব বিজ্ঞভাবে ব'লেছিল: "আমি বদ্‌লাব না মোটেই।" তার এ ছেলেমানুষি কথায় কুসুম সেদিন শুধু একটু হেসেছিল, কোনও তর্ক করে নি। এতদিন পরে পল্লবের মনে হ'ল—হঠাৎ সেই হাসির কথা, ও সে বুঝতে পারল তার মর্ম্ম। কিন্তু অপর দিকে আবার তার মনে বড় ভয় হ'ল যে 'অপরের' জীবনের উপর একটা আকস্মিক অভিঘাতের দৃশ্যেই যদি সে নিজে এতখানি বদ্‌লে যায় তবে কি সে নিজে অনুরূপ আঘাত পেলে একটা অন্য মানুষ হ'য়ে যাবে নাকি? পল্লব অনেকের মতন ভাব্‌ত যে নিজের মনের পরিবর্ত্তনটা বুঝি মোটের ওপর বাঞ্ছনীয় নয়। এটা যে তার অহমিকার দরুণ ছিল তা নয়—যে অহমিকার প্ররোচনায় মানুষ স্বতঃই মনে করতে ভালবাসে যে সে যা আছে বেশ আছে। সে পরিবর্ত্তন কামনা করত না, যেহেতু পরিবর্ত্তনের মধ্যেকার গভীর অনিশ্চয়তা কল্পনা করলে সে কেমন যেন ত্রস্ত হ'য়ে উঠ্‌ত। মোহনলালের অনেকগুলি কথা ও ভবিষ্যদ্বাণী তার মনে কেমন একটা ভীতি জন্মিয়ে দিয়েছিল।...যদি সে মোহনলালের মতন হ'য়ে যায়?...যদি নৈতিক নিষ্কলঙ্কতার আদর্শে তার মোহনলালের মতন চ্যুতি ঘটে?...হায়, সে তখন বোঝে নি যে মোহনলালের মতন স্থলে তার মতন মতিস্থৈর্য্য ও আন্তরিকতা বজায় রাখাটা কত বড় জিনিষ! সে তখন বোঝে নি যে মোহনলাল যে-ভাবে তার জীবনের আকস্মিক মোড়-ফিরে-যাওয়াটা গ্রহণ করতে পেরেছে সেটা বড় সহজ ক্ষমতা নয়। কারণ সে তখন অবধি তার দেশের মতামতকে আঁকড়ে ধ'রে থাক্‌তে চাইত,—যেন তাহ'লেই তা বজায় রাখা যায়। তার প্রায়ই মনে হ'ত যে একদিন একটা বিখ্যাত নাটকে সে প'ড়েছিল যে একজন আমোদপ্রিয় অভিজাত বলছেন: "জীবন এতই জটিল যে গুটিকতক বাঁধা-ধরা নীতি মেনে নিয়ে তাকে ধরা-ছোঁওয়া যায় না"।* কথাগুলি তার কাছে তখন ভাল লাগে নি। কারণ তখনও অবধি জীবন-সম্বন্ধে এই রকম কয়েকটি বাঁধা-ধরা নিয়মই তার কাছে ধ্রুবতারার মতন ভাস্বর মনে হ'ত—যেমন আমাদের দেশের অনেক তথাকথিত ভালছেলেদের ক্ষেত্রেই হ'য়ে থাকে। তাই সে সেদিন পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি আমোদপ্রিয় নায়কের বিস্রম্ভ উক্তি হিসেবেই গ্রহণ ক'রেছিল—চিন্তনীয় হিসেবে গ্রহণ করে নি। কিন্তু তার আদর্শচরিত্র বন্ধুর অভাবনীয় পতনের পর হ'তে তার এই কথাগুলি মনে হয়ে Oscar Wildeএর ওপর একটু শ্রদ্ধার ভাব না এসেই পারে নি। তার মনে হ'তে লাগ্‌ল যে সত্যি কথা, জীবনকে দুচারটি নীতিসূত্র দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করতে গেলে হয় ত তাকে বোঝাও যায় না, মাপাও যায় না। তাই এখন থেকে মানবচরিত্র সম্বন্ধে তার বিশ্বাসবিরুদ্ধ কথা শুন্‌লে সে আগেকার মতন নিশ্চিতভাবে হেসে উড়িয়ে দিতে পারত না। অনেকদিনের অভ্যাসের ফলে তর্ক হয় ত সে করত, কিন্তু সে তর্কের মধ্যেও 'তুমি-যা-বল-তা-বল-আমিই-ঠিক্' ভাবটা আর তেমন ভাবে প্রকাশ পেত না।...

মোহনলাল লুকোচুরির পক্ষপাতী ছিল না। কাজেই অল্পদিনের মধ্যেই তার কেম্ব্রিজের সমস্ত সহপাঠী জান্‌ল যে সে এক কেরাণীর মেয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়ে গেছে। কথাটা সাত-কাণে ও পাঁচ-মুখে ফেণিয়ে দুদিনেই পরনিন্দা-পরায়ণ ছাত্রদের মধ্যে এক বিশ্রী আকার ধারণ করল। কেউ বল্‌ল 'মোহনলালের ভাবগতিক কোনও দিনই ভাল ছিল না'। কেউ বল্‌ল 'ও আমরা আগেই জান্‌তাম। কোনও সুন্দরী মেয়ে দেখ্‌লেই মোহনলাল যে চাষার মতন হাঁ করে চেয়ে থাক্‌ত!'—আরও কত রকম বিশ্রী ইঙ্গিত ও কুৎসিত জনরবই রট্‌ল, যেগুলোর অধিকাংশই সকলে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বিশ্বাস করে বস্‌ল।

পরের কুৎসাকীর্ত্তন ও সেটা বিশ্বাস করার উৎসাহ যে মানুষের মধ্যে কি প্রবল সে সম্বন্ধে পল্লব একজন চিন্তাশীল ইংরাজ লেখকের লেখায় একটা কথা প'ড়েছিল। সে কথাটা

* I think life is too complex a thing to be settled by hard and fast rules......Lady Windermere's Fan... Wilde.

এই যে আমাদের ভিতরটা যে এখনও আদিম মানবের অসভ্যতা-দুষ্ট সেটা প্রমাণ হয় যখন দেখা যায় যে পরের অখ্যাতি ঘোষণা করা ও তাকে বিশ্বাস করার আগ্রহের আর মানুষের অভাব নেই। মোহনলালের সম্বন্ধে সে নানা স্থলে যে প্রকার রটনা ও ইঙ্গিত শুন্ত তাতে তার মনে হ'ত যে এ কথাটি শুন্তে খারাপ হ'লেও বস্তুতঃ মিথ্যা নয়। তবে আশ্চর্য্য এই যে মোহনলালের মুখের উপর এ বিষয়ে কোনও সহজ প্রশ্ন করতে কেউই সাহস করত না। সকলেই তার অসাক্ষাতে নিন্দা ক'রে প্রকাশ্যে তার সঙ্গে অন্যরূপ ব্যবহার করত। কিন্তু বুদ্ধিমান মোহনলাল বুঝেছিল যে তার আসন্নবিবাহ সম্বন্ধে অনেক ছেলেই কুৎসিত ইঙ্গিত ক'রে আমোদ পেতে ছাড়ে না। বিশেষতঃ ভারতীয় ছাত্রের পরচর্চ্চাপ্রবণতা তার জানা ছিল। সে যে নিজেই তার কত সহপাঠীর অশ্লীল অসত্য নিন্দাবাদে উত্তপ্ত ভাবে প্রতিবাদ করেছে! তাই এখন তাদের মধ্যে এ সম্বন্ধে কি রকম কাণাঘুষো চল্ছে সেটা অনুমান ক'রে নেওয়া তার পক্ষে কঠিন ছিল না। সে এতে আশ্চর্য্য হয় নি। কারণ সে যে অনেকটা এই রকমই আশা ক'রেছিল!

কিন্তু তার বড় রকমের আঘাত লাগ্‌ল যখন সে দেখ্‌ল যে তার প্রিয়তম বন্ধু কুসুমও তার সঙ্গে একটু অবজ্ঞামিশ্রিত ঔদাসীন্যের সঙ্গে ব্যবহার করছে। কারণ কুসুমের এ সব বিষয়ে কঠোর মতামত তার বিশেষ রকম জানা থাক্‌লেও সে আশা করেছিল যে তার বন্ধুপ্রীতি এ কঠোরতাকে জয় করবে। সে ঠিক্ করেছিল যে কুসুমকে সে নিজে থেকেই সব কথা বল্‌বে। কিন্তু প্রথম দুচারদিন বল্‌বার সুযোগ সে খুঁজে পায় নি। ইতিমধ্যে তার অন্য পাঁচজন শুভাকাঙ্ক্ষী কথাটির উপর নানা রং-ফলিয়ে কুসুমের কাণে ব্যাপারটিকে গুরুতর ক'রে তুল্‌তে ছাড়ে নি। কুসুম প্রথমটা অবিশ্বাস করতে চাইলেও মোহনলালের একটু সন্ত্রস্ত ভাব দেখে সে হঠাৎ বিশ্বাস ক'রে বস্‌ল যে সে যা শুনেছে তার অনেকটাই সম্ভবতঃ সত্য। এই কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার হৃদয়টি তার অজ্ঞাতে যেন হঠাৎ কঠিন হ'য়ে উঠ্‌ল। মোহনলালের সহজ অনুভূতি নিজের হৃদয়ের ব্যথা জানাতে এসে এ কাঠিন্যের দ্বারা প্রতিহত হ'য়ে চুপ ক'রে গেল। সে কোনও মতেই আর নিজের হৃদয়ের দুয়ার খুল্‌তে পার্‌ল না।

কুসুম ভাব্‌ল মোহনলাল নিশ্চয়ই গুরুতর অপরাধী নইলে সে সব কথা তাকে বল্‌ত। অপর পক্ষে মোহনলালের হৃদয়ও অভিমানে ভ'রে গেল এই ভেবে যে কুসুম তাকে বন্ধুভাবে সব জিজ্ঞাসা না ক'রে তার প্রতি পর-পর ব্যবহার করতে উদ্যত হ'ল কেন? এই নিহিত অভিমানের ফলে হ'ল এই যে তার প্রকাশ-উন্মুখ হৃদয় এই অপ্রত্যাশিত নিষ্ঠুর আঘাত পেয়ে নিজের ব্যথাভারকে বন্ধুর কাছে প্রকাশের দ্বারা লঘু করতে পারল না। পরিণামে এই দুই বাল্য বন্ধুর মধ্যে এক ভুলবোঝার কালমেঘ উদয় হ'য়ে প্রত্যেকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকেই একটু ঝাপসা ক'রে দিয়ে গেল। মোহনলাল নিজের নিবিড় বেদনার কথা অভিমানে খুলে বল্‌তে পার্‌ল না। ওদিকে কুসুমও নিজের মনকে জোর ক'রে বোঝাল যে মোহনলাল আর তাদের গ্রাহ্য করে না—তার কাছে এখন শ্বেতাঙ্গিনীই সর্ব্বেসর্ব্বা; অতএব এখন থেকে 'নিজের মান নিজের কাছে' নীতি অনুসরণ ক'রে দূরে দূরে থাকাই ভাল।

একমাত্র পল্লব মোহনলালের গভীর ব্যথার কথা খানিকটা বুঝেছিল। কিন্তু সে এ বিষয় নিয়ে কুসুমের কাছে কোনও কথা উত্থাপন করতে ঠিক্ সাহস পেত না। এমন কি, কুসুম যখন একদিন তার কাছে বল্‌ল যে মোহনলালের সম্বন্ধে তার অনেক আশাই ছিল, তখনও সে মাত্র একটু মৃদু আপত্তি ক'রেই চুপ ক'রে গেল। মোহনলাল সম্বন্ধে তার নিজেরও মস্ত আশাভরসার মূলে যে আজ কুঠার প'ড়েছিল! তবে পল্লবের হৃদয় একটু বেশি কোমল ছিল ব'লে সে এজন্য মোহনলালের সঙ্গে কুসুমের মতন ছাড়া-ছাড়া ব্যবহার করতে পারত না। অবশ্য জীবনের কঠিন পরিহাস ও অসঙ্গতি-দোষের সঙ্গে তার আজও ভাল ক'রে পরিচয়লাভের সুযোগ হয় নি ব'লে শ্রদ্ধা তার একটু ক'মে না গিয়েই পারে নি। তবে তাই ব'লে সে ব্যবহারে মোহনলালের প্রতি একটুও ভাববৈলক্ষণ্য দেখাত না।

কিন্তু মোহনলালের তেজস্বী হৃদয় অন্য পাঁচজনের ভাব-বৈলক্ষণ্যকে পরিপাক ক'রে নিলেও—কুসুমের অবিচারে গভীর ভাবে আহত না হ'য়েই পারে নি।

সে পল্লবের মতন অভিমানী প্রকৃতির ছেলে না হ'লেও কুসুমের কাছে এই নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যানে তার সুপ্ত অভিমান অনেকটা জাগ্রত হ'য়ে উঠেছিল। তার প্রতিক্রিয়ায় তার ক্রমশঃই মনে হ'তে লাগ্‌ল যে সে আজ সকলের কাছে শুধু যে অবজ্ঞেয় তাই নয়, উপহাসেরও পাত্র হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ক্রমে তার এ ধারণা এত দৃঢ় হ'য়ে পড়ল যে সে পথে ঘাটে পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের দেখ্‌লে প্রায়ই পাশ কাটিয়ে যেতে চেষ্টা পেত। নেহাৎ যদি কেউ তাকে এসে সম্ভাষণ কর্‌ত্‌ তা'হ'লে সে তার সম্ভাষণের প্রত্যুত্তরটি মাত্র দিত।...তার অভিমান-কুণ্ঠার মাত্রা ক্রমশঃ এমন বেড়ে উঠ্‌ল যে শেষটায় পথে কাউকে অন্য কারুর সঙ্গে হাসি গল্প করতে দেখ্‌লে তার মনে হ'ত তারা বুঝি তার বিবাহের কথা নিয়েই হাসাহাসি করছে। মাঝে মাঝে সে নিজের মনকে যে বোঝাতে চেষ্টা না পেত এমন নয়, কিন্তু হায়! হৃদয় যে সব সময়ে বুদ্ধির যুক্তিতে কাণ দেয় না।...

শেষটায় ক্রমে এমন হ'ল যে মোহনলাল পল্লবের সঙ্গেও দূর ব্যবহার আরম্ভ করল। পল্লব তার ওখানে মাঝে মাঝেই আস্‌ত, কিন্তু মোহনলাল নিজে থেকে পল্লবের ওখানে যেত না। সে মুখ গুঁজে ল্যাবরেটরিতে কাজ করত ও মাঝে মাঝে week-endএ লণ্ডনে যেত—ভাবী বধূর সঙ্গে দেখা করতে।

পল্লব তার এ দূর ব্যবহারে মনে মনে কম দুঃখিত হ'ত না, কিন্তু সে অনেকটা বুঝতে আরম্ভ করেছিল যে মোহনলালের অভিমান ক্ষত প্রত্যহ শুকিয়ে না গিয়ে উত্তরোত্তর বিষিয়ে উঠ্‌ছে ব'লেই সে ক্রমশঃ সকলকে পরিত্যাগ করছে।...এক একবার সে ভাব্‌ত যে মোহনলালকে বল্‌বে যে তার বিবাহের দরুণ তাদের বন্ধুত্বের হানি হওয়া উচিত নয়। কিন্তু এ প্রসঙ্গ উত্থাপন কর্‌তে তার কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকত।

শেষটা সে নিজের এ অস্বস্তির জন্য দায়ী করল কুসুমকে। কারণ একমাত্র সেই বুঝেছিল যে তেজস্বী মোহনলালকে অন্য সকলের অবজ্ঞা বিশেষ স্পর্শ করতে না পারলেও, তার বন্ধুনিষ্ঠ হৃদয় কুসুমের ঔদাসীন্যে গভীর ভাবে ক্ষুব্ধ হ'য়েছিল—যে আঘাতের ফলে সে শেষে পল্লবকেও একটু অবিশ্বাসের চোখে না দেখে পার্‌ছে না।

সাত পাঁচ ভেবে সে একদিন কুসুমকে সব খুলে বল্‌ল: "মোহনলাল ক্রমেই শামুকের মতন নিজের পড়াশুনো ও ল্যাবরেটরির মধ্যে নিজেকে একান্ত ভাবে গুটিয়ে নিয়েছে; বন্ধুবান্ধবদের কারুর সঙ্গে মেশে না; দেখা হ'লে কাউকেই হেসে সম্ভাষণ করে না" ইত্যাদি। কুসুম এ সংবাদে কৃত্রিম ঔদাসীন্য প্রকাশ করে বল্‌ল: "তা আমি কি করব পল্লব?" পল্লব বল্‌ল: "তোমার ব্যবহারেই মোহনলাল সব চেয়ে বেশি ব্যথা পেয়েছে। নইলে অন্য সকলের শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধার সে বড় একটা ধার ধারে না।"

কুসুম তার শত চেষ্টা সত্ত্বেও এ কথায় আনন্দ বোধ না ক'রেই পার্‌ল না। কারণ সে নিজের অনুভূতির কণ্ঠ যতই কেন না রোধ কর্‌তে চেষ্টা করুক, কিছুতেই ভুল্‌তে পাচ্ছিল না যে সে মোহনলালের প্রতি অবিচার করেছে। আজ পল্লবের কথা তার সেই অবিচার করাকেই বেশি ক'রে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। তার মন তার আপত্তি সত্ত্বেও পল্লবের কথায় সায় দিয়ে বল্‌ল যে মোহনলালের গভীর ভালবাসার সে যথেষ্ট মূল্য দেয় নি। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে আনন্দও হ'ল যে মোহনলালের কাছে তার বন্ধুত্ব এত মূল্যবান্! অবশ্য সে যে একথা জান্‌ত না তা নয়। তবে সম্প্রতি মোহনলাল বদ্‌লে গিয়েছে ব'লে যে সংশয়টা তার মনে মাঝে মাঝেই উদয় হ'ত, পল্লবের কথায় সে সন্দেহ মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হ'য়ে যাওয়ার দরুণ সে এতে বেশি করে খুসি না হ'য়েই পারল না। সঙ্গে সঙ্গে সে মোহনলালের সঙ্গে অনিচ্ছাকৃত মনান্তরে নিজের ব্যথা দিয়ে বন্ধুর ব্যথার গভীরতা অনেকটা কল্পনা ক'রে নি'ল। তবে সে অনেকটা নিজের অজ্ঞাতে সব বন্ধুরই কাছ থেকে তার মতন শুষ্ক পরহিতব্রত জীবনযাপন আশা কর্‌ত। তাই যেখানে সেটা পেত না সেখানে অনেকটা নিজের অজ্ঞাতসারেই অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠ্‌ত, যদিও মুখে এটা স্বীকার করত না।...মানুষ নিজের মনের অনেক গভীর স্রোতেরই নাগাল পায় না।

কুসুমের এই অসহিষ্ণুতা-প্রসঙ্গে মোহনলাল ও পল্লবের সঙ্গে আগে আগে তার প্রায়ই তর্ক হ'ত। মোহনলাল একদিন তাকে ব'লেছিল যে যদি সে সকলের কাছেই নিজের আদর্শ অনুযায়ী কাজ আশা করে তা'হ'লে তাকে নিরাশ হওয়ার ব্যথার জন্য প্রস্তুত থাকতেই হবে। উত্তরে

কুস্থম বল্‌ত যে সে মোটেই এত অসহিষ্ণু আদর্শবাদী নয়; তবে সে চায় যে প্রতি ভারতবাসী নেলসনের কথা মনে রাখে যে প্রত্যেকেরই দেশ তার কাছ থেকে কর্ত্তব্য সাধনের দাবী-দাওয়া রাখে।

আজ পল্লবের অনুযোগে তার এক মুহূর্ত্তে এ সব তর্কের স্মৃতি চিত্তপটে ভেসে উঠ্‌ল। মনে হ'ল যে মোহনলাল তার অসহিষ্ণুতার মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে যা যা অভিযোগ করত সেগুলি হয়ত বস্তুতঃ মিথ্যা নয়।...তবে আশ্চর্য্য, নিজের মন সম্বন্ধে এ সাদা সত্যটি বুঝতেও অনেক সময়ে এত বিলম্ব হয়!...যেন নিজের মনটিও মানুষের ঠিক্ নিজের নয়!

সঙ্গে সঙ্গে আজ সন্ধ্যার ম্লানিমায় মোহনলালের স্নেহ প্রীতি ও সহিষ্ণুতার কত স্মৃতিই না তার মনের তটে আছড়ে পড়তে লাগ্‌ল।...মনে হ'ল, একদিন দেশে ফুটবল খেল্‌তে খেল্‌তে সে অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়েছিল। তার ফলে জ্বরের সময় তার মেসে মোহনলাল ও পল্লব পর পর কয় রাত্রি তার শিয়রে ব'সে হাওয়া করেছিল!...মনে হ'ল যেদিন সে বিলেতে টিলবেরিতে পৌছয়। সেদিন মোহনলালই তাকে জাহাজ থেকে নামিয়ে নিয়ে লণ্ডনে থাকার বন্দোবস্ত ক'রে দেয়। তখন তার প্রিয়বিচ্ছেদ-বিধুর মনের উপর মোহনলালের সঙ্গ ও সান্ত্বনা তার কি স্নিগ্ধই মনে হ'ত!...তার পর কেম্ব্রিজেও সে ভর্ত্তি হ'তে পেরেছিল প্রধানতঃ মোহনলালের চেষ্টায়। মোহনলাল তার জন্য কলেজে কলেজে কি ঘোরাটাই না ঘুরেছিল!...তার পর সেদিনও তার আঙুলতাড়া হয়ে কাটাকুটির পর মোহনলালই রোজ তার অঙ্গুষ্ঠটি ব্যাণ্ডেজ করে দিয়ে যেত।...পল্লবের অনুযোগের পর দুই বন্ধু অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল। কারণ উভয়েরই হৃদয় একটা অব্যক্ত ভাবে পূর্ণ হ'য়ে উঠেছিল।...কেউই কোনও কথা বল্‌তে সাহস পাচ্ছিল না। পল্লব বুঝতে পেরেছিল যে কুস্থম বন্ধুর প্রতি অবিচারের কথাই ভাবছিল ও সেই সমবেদনায় এর মধ্যেই আর্দ্র হ'য়ে উঠেছিল। কারণ বাইরের কঠিন পবিত্রতার আবরণের নীচে কুস্থমের হৃদয়টি যে কত কোমল ছিল তা বাইরের লোকে বড় একটা জানবার সুযোগ না পেলেও তার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের অবিদিত ছিল না।

উভয়ে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকার পর কুস্থম একটু ইতস্ততঃ ক'রে জিজ্ঞাসা কর্‌ল: "পল্লব! একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব, যদি সঙ্কোচ না ক'রে পুরোপুরি উত্তর দাও।" পল্লব বল্‌ল: "কুস্থম! এ সম্পর্কে তোমার কাছে আমার গোপন করার কি থাকতে পারে বল ত?" কুস্থম বল্‌ল: "তা জানি পল্লব...তবু...কি জান?..." ব'লে একটু থেমে জিজ্ঞাসা কর্‌ল: "মোহনলাল কি এ সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বল্‌তে বলে নি?" পল্লব বুঝ্‌ল কুস্থম মোহনলালের কাছ থেকে একটু বন্ধুসুলভ আবেদন চাইছে। তার মনটা ভিজে উঠ্‌ল—কুস্থমের মোহনলালের সঙ্গে পুনর্মিলনের এই আগ্রহের কথা ভেবে। কিন্তু সে দুঃখিত হ'য়ে বল্‌ল: "না, ভাই, মোহনলাল তোমার ব্যবহারে একেবারে বদ্‌লে গেছে। সে এমন দুর্জ্জয় অভিমানী হ'য়ে প'ড়েছে যে বোধ হয় আমাকেও বর্জ্জন কর্‌ল ব'লে।"

কুস্থমের হৃদয়টি এবার উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌ল। মোহনলাল যে কতখানি ব্যথা পেয়ে পল্লবের মতন বন্ধুবৎসল হৃদয়কেও এড়িয়ে চল্‌তে আরম্ভ করেছে, সেটা কল্পনায় সে বড় ক'রে না দেখেই পার্‌ল না। তবে উচ্ছ্বাস-আবেগ প্রকাশ করা কুস্থমের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল। সে দৃঢ়ভাবে দাঁত দিয়ে অধর দংশন ক'রে চুপ করে গৃহচুল্লীর দিকে চেয়ে বসে রইল। সেই সময়ে দুচারটে টুক্‌রো কাগজে আগুন লেগে চুল্লীটি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠ্‌ল। তার উজ্জ্বল রক্তাভ আলোকে পল্লব দেখ্‌ল যে অধর দংশন করা সত্ত্বেও কুস্থমের ওষ্ঠটি থেকে থেকে থর থর ক'রে কেঁপে উঠ্‌ছে।...হঠাৎ কুস্থম বুঝতে পারল যে পল্লব একদৃষ্টিতে তারই দিকে চেয়ে আছে। সে মুখ তুলে একটু লজ্জিত হ'য়ে জোর ক'রে সহজ সুরে বল্‌ল: "পল্লব, হয়ত আমারই ভুল—তোমারই ঠিক্। আমার অভিমানই হয়ত আমাকে মোহনলালের উপর অবিচার করতে বাধ্য করেছে।...কিন্তু...কিন্তু...এখন কি রকমভাবে মোহনলালের কাছে সব কথা খুলে বলা যায় বল ত?"

পল্লব বল্‌ল: "কেন! সোজাসুজি একদিন চল না কেন তার ওখানে গিয়ে সব মিটমাট করে ফেলা যাক্। তুমি একটি নরম কথা বল্‌লেই সব মিটে যায়।" কুস্থম একথা শুনে গভীর ভাবে বিচলিত হয়ে উঠল। কিন্তু মুখে শুধু বল্‌ল: "আচ্ছা। তাই হবে।" কিন্তু হায়,

মানুষ কি ভাবে আর কি হয় !...এমন সময়ে এমন একটা ঘটনা ঘটল......

(১৫)

কেম্ব্রিজ ও অকস্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত দুটি ক্লাব আছে। ক্লাবের নাম—য়ুনিয়ন (union)। য়ুনিয়নে প্রতি সপ্তাহে অনেকটা পার্লিমেন্টের পদ্ধতি অনুসারে একটি ক'রে তর্কালোচনা (debate) হয়। য়ুরোপে এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে এ সব সাপ্তাহিক তর্কালোচনায় তারা অনেক সময়ে বক্তা হিসেবে ইংলণ্ডের বড় বড় লোককে নিমন্ত্রণ ক'রে থাকে। এমন পার্লিমেন্টের প্রধান মন্ত্রী, সচিব, কার্য্যাধ্যক্ষ প্রভৃতিকেও তারা সময়ে সময়ে নিমন্ত্রণ ক'রে আনে। শুধু তাই নয় তাঁদের সমক্ষে এ সব তর্কে ছাত্রেরা তাঁদের সঙ্গে সমান সমান ভাবে তর্ক ক'রে থাকে। তাদের তর্কের standard মধ্যে মধ্যে এত উঁচু হয় যে টাইম্‌স প্রভৃতি সংবাদপত্রাদিতেও সে সব আলোচনার সার মর্ম্ম ছাপা হয়। (কারণ বিলেতে তরুণের যুক্তিতর্ক আমাদের দেশের মতন শুধু তারুণ্যের ওজরে অবজ্ঞাত হয় না।) প্রতি তর্কের শেষে ছাত্রবৃন্দের ভোট নেওয়া হয় ও যাদের দল বেশি ভোট পায় তারাই তর্কে জয়ী সাব্যস্ত হয়।

কুসুম, মোহনলাল ও পল্লব তিন জনেই কেম্ব্রিজ য়ুনিয়নের সভ্য ছিল ও নিয়মিত রূপেই তর্কালোচনায় যোগদান করত। পল্লব ভাল বলতে পারত না ব'লে সভায় উঠে দাঁড়িয়ে বড় একটা কিছু বলতে রাজি হ'ত না। কুসুম ও মোহনলাল বেশ বলতে পারত। তাই তারা মাঝে মাঝেই উঠে দাঁড়িয়ে দু' চার কথা বলত। বক্তৃতায় কুসুম একটু বেশি অলঙ্কারের পক্ষপাতী ছিল বটে, কিন্তু সে এত সুন্দর ইংরাজী বলত ও সচরাচর এত উৎসাহের সঙ্গে বক্তৃতা দিত যে সে প্রায়ই খুব হাততালি পেত। মোহনলাল যেত বেশি যুক্তির দিক্ দিয়ে ও বলতও—ধীরে ধীরে। তাই সে সুবক্তা ব'লে নাম করতে পারে নি,—এক দু' দশজন বুদ্ধিমান চিন্তাশীল ছাত্রদের মধ্যে ছাড়া।

যেদিন কুসুমের সঙ্গে পল্লবের আলোচনা হয় তার পর দিনই সন্ধ্যায় য়ুনিয়নে আলোচনার বিষয় ছিল: "ইংরাজ জাতির কাছ থেকে ভারতীয়েরা আজই পূর্ণ স্বরাজ পাবার যোগ্য কি না।" কুসুম ছিল একজন প্রধান বক্তা। প্রথমে একজন liberal আইরিশ ছাত্র খুব খানিক বক্তৃতা দিল যে ভারতকে আজই স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া উচিত, নইলে ক্রমে ভারত আয়র্লণ্ডের অবস্থা পাবে ইত্যাদি।

তারপর সমর্থনের ভার ছিল কুসুমের উপর। কুসুম সমর্থন ক'রে এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিল। তার সার মর্ম্ম এই যে ভারতীয়েরা আজ পূর্ণ স্বরাজ্য পাবার অযোগ্য ত নয়ই, বর্ত্তমান সময়ে এ ভার পাওয়া তাদের একান্ত প্রয়োজন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ দায়িত্ব না পেলে মানুষের দায়িত্বজ্ঞান বিকাশ পেতেই পারে না। কাজেই আগে যোগ্য না হ'লে স্বাধীনতার দাবী করা চলে না—ইংরাজদের এরূপ যুক্তি অত্যন্ত অসার। কুসুম ইতিহাস থেকে উদ্ধৃত ক'রে দেখাল যে সব দেশেই শাসক চিরকালই অধীন জাতিকে নানা ষড়যন্ত্রে অযোগ্য ও হীনবল ক'রে রেখেছে ও শেষে ব'লে এসেছে যে যেহেতু তোমরা অযোগ্য সেহেতু তোমরা স্বাধীনতা পেলে সব তছনছ করে ফেলবে, নিজেদের মধ্যেই কাটাকাটি ক'রে মরবে, শান্তি বজায় রাখতে পারবে না,—ইত্যাদি ইত্যাদি। বলতে বলতে কুসুমের সুগৌর, তেজঃ-পূর্ণ মুখমণ্ডল স্বদেশভক্তিতে প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠল। সে বক্তৃতা শেষে ভারতীয় ছাত্রগণের সোৎসাহ করতালির মাঝখানে পুলকিত হ'য়ে ব'সে পড়ল।

এমন সময়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে হঠাৎ মোহনলাল উঠে দাঁড়াল ও বলল যে সে আজ প্রমাণ করবার চেষ্টা পাবে যে ভূতপূর্ব্ব বক্তা (অর্থাৎ কুসুম) ভারতীয়দের স্বরাজ্য পাবার যোগ্যতা সম্বন্ধে যে সব যুক্তি প্রয়োগ করলেন সে সব যুক্তি নিরপেক্ষ বিচারের সামনে টিঁকতে পারে না। কারণ সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি মাত্রেরই স্বীকার করতেই হবে যে ভারতীয়েরা আজও সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন পাবার যোগ্য হয় নি। এ যোগ্যতা যদি আমাদের থাকত তা হ'লে কি আমাদের সৃষ্টির আদিম কাল থেকে হয় শক হুন, না হয় মোগল পাঠান ও না হয় ইংরাজ ফরাসীর অধীনে বাস করতে হ'ত! যে দেশে ধর্ম্ম নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়াতে আজও য়ুরোপের মধ্যযুগের মতন অর্থহীন রক্ত-পাতের সীমা থাকে না; যে দেশের অস্পৃশ্যদের ছায়া মাড়ালে আজও উচ্চতর বর্ণের হিন্দুকে স্নান ক'রে শুদ্ধ হ'তে হয়; যে দেশে ভাই ভাইয়ের উন্নতিতে হিংসায়

ভ'রে ওঠে ; যে দেশে একজন রোজগার করলে দশজন তার স্কন্ধে ভর করতে অণুমাত্রও লজ্জা বোধ করে না ; যে দেশের লোকের আজও সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে কাজ করতে শেখার বর্ণপরিচয় হয় নি ; যে দেশের লোকের আত্মসম্মান জ্ঞান নেই ; ও যে দেশের লোকে চোখের সাম্‌নে নারী-নিগ্রহ দেখ্‌লেও পালিয়ে প্রাণ বাঁচায় ;—সে দেশের লোকের স্বাধীনতার দাবী করাকে বাতুলতা বই আর অন্য কি নামে অভিহিত করা যেতে পারে ? বল্‌তে বল্‌তে স্বভাবতঃ শান্ত যুক্তির পক্ষপাতী স্থির-মস্তিষ্ক মোহনলালও কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌ল। সে বল্‌তে লাগ্‌ল : "আমরা সামাজিক বিষয়ে অন্ধ গোঁড়ামির পক্ষপাতী হ'য়েও মনে করি রাজনীতিতে নিজেদের উদারপন্থী বলে জাহির করা চলে। আমরা ইংরাজদের বৈষম্যবাদে রুষ্ট হই, অথচ যেখানে আমাদের এলাকা সেখানে ছুঁৎমার্গবাদের সমর্থন ক'রে দুর্ব্বলের ওপর অত্যাচার করতে এতটুকুও কুণ্ঠিত হই না। আমরা ইংরাজদের সদ্‌গুণাবলীর প্রতি অন্ধ থেকে সামাজিকতায় তাদের আদবকায়দা মাত্র আমদানী ক'রে ভাবি যে আমরা তাদের সমকক্ষ হয়েছি। আমরা নিজেদের কোনও বিশিষ্ট দানের মহিমা প্রমাণ করতে না পেরে ভাবি যে শুধু গলাবাজিতে বুঝি ইংরেজের শ্রদ্ধা পাওয়া যায়। আমাদের জাতির অসারতার ভূরি ভূরি উদাহরণ দিতে কেবল লজ্জায় মাথা হেঁট হয় মাত্র। তবে যেহেতু সত্যই জগতে সব চেয়ে বড় সেহেতু প্রতি স্বদেশভক্ত ভারতীয়ের ইংরাজদের গালি না পেড়ে সর্ব্বাগ্রে নিজের সমাজের অসারতার অন্ধতমসা দূর করায় মনোনিয়োগ করা উচিত। সেজন্য চাই শিক্ষা, সত্যনিষ্ঠা ও চেষ্টা ; সেজন্য চাই আত্ম-সমালোচনা, শেখার ইচ্ছা ও নিয়মানুগত্য ; সেজন্য চাই ব্যবসায়ে সাধুতা, দায়িত্বজ্ঞানের বিকাশ ও বৃথা ভূত-গৌরবের বড়াই পরিহার।...ও সব জাতীয় গুণ না থাকলে শুধু রঙ্গমঞ্চে ও স্থানে-অস্থানে বড় গলা ক'রে আমাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে মিথ্যা প্রচারে কাউকেই ধাপ্পা দেওয়া যায় না। কারণ জগৎকে আমরা যতটা বোকা ভাবি আসলে সে ততটা বোকা নয়।" উত্তেজিত ভাষায় এ কথাগুলি বল্‌তে বল্‌তে মোহনলাল ইংরাজছাত্রগণের ঘোর করতালির মধ্যে আসন গ্রহণ করল।

কেউই ভাবে নি মোহনলাল হঠাৎ এ রকম বিপরীত যুক্তি এতখানি উষ্মার সঙ্গে প্রচার করবে। ভারতীয় ছাত্রেরা সকলেই তার প্রতি বিষম ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠ্‌ল। পল্লব নিজেও নিতান্ত কম আঘাত পায় নি।...আর কুসুম ? পল্লব দেখ্‌ল তার মুখখানি রাগে, ক্ষোভে, লজ্জায়, অপমানে ও বিস্ময়ে রক্তবর্ণ হ'য়ে উঠেছে। মোহনলালের শেষ যুক্তিগুলির প্রত্যেকটি যেন তার পিঠে চাবুকের মতন পড়ছিল। সে কখনও সঙ্কুচিত, কখনও তড়িৎস্পৃষ্ট ও কখনও স্তম্ভিতের মতন মুখভাব প্রকাশ করছিল। পল্লব বেশ বুঝতে পেরেছিল যে প্রিয়বন্ধু মোহনলালের স্বজাতির প্রতি এই কশাঘাত যেন কুসুম নিজের গায়েই পেতে নিচ্ছিল। তার মুখ-চোখের প্রতি ভাব, প্রতি ভঙ্গী, প্রতি আকুঞ্চন যেন বল্‌ছিল : "এই কি আমার বাল্যবন্ধু মোহনলাল!...যার সঙ্গে আমি স্কুল থেকে একত্রে খেলা ক'রে এসেছি!"...সেই মোহনলাল...এ যে তার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল!...এ যে ...অভাবনীয়!...

সভার অন্য সব ভারতীয় ছাত্রেরাও মোহনলালের এরূপ উত্তেজিত ভাষায় আশ্চর্য্য না হ'য়েই পারে নি।... কারণ মোহনলালের মেম বিবাহ করা এক, আর গায়ে প'ড়ে স্বদেশবাসীকে বিদেশীদের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পাওয়া আর।...একমাত্র পল্লব খানিকটা বুঝতে পেরেছিল যে মোহনলাল কেন আজ এরূপ অকস্মাৎ এ ভাবে জ্বলে উঠ্‌ল, যদিও সমস্ত কারণটা সে-ও ধরতে পারে নি।

ব্যাপারটা হয়েছিল এই।—তেজস্বী মোহনলাল প্রথমতঃ ভারতীয়দের কাছে নিজেকে একটু বেশি ক'রে অশ্রদ্ধের কল্পনা ক'রে যথেষ্ট আহত হ'য়েছিল। তার উপর কুসুমের ঔদাসীন্যে তার ব্যথাক্ষত দশগুণ গভীর হ'য়ে উঠেছিল। এ ক্ষতের তীব্র জ্বালার একটু উপশম হবামাত্র তার আত্মাভিমান বেশি ক'রে মাথা চাড়া দিয়ে না উঠেই পারে নি।...বিবাহ সম্বন্ধে সে বন্ধু কেন, পিতামাতারও যে কিছু বল্‌বার আছে তা স্বীকার করত না। এ বিষয়ে তার একটা খুব দৃঢ় মত বরাবরই ছিল। দেশে সে পিতার বিশেষ ইচ্ছা সত্ত্বেও বিবাহ না ক'রেই বিলাতে আসে। সে বল্‌ত বিবাহ সম্বন্ধে প্রত্যেকেরই সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে নেওয়া উচিত। এ বিষয়ে আদেশ, অনুরোধ বা খাতিরে চলা কোন মতেই কর্ত্তব্য নয়। কুসুম তার এ

মত জান্‌ত। কাজে কাজেই তার ইংরাজ-কন্যা বিবাহ করার জন্য যে কুস্কুমের মতন মহৎ উদার বন্ধুও তাকে অন্য সকলের সঙ্গে মিলে অবজ্ঞা করতে পারে এ কথা সে সম্ভব ভাবে নি। তাই তার ব্যথা আরও মর্ম্মান্তিক হয়েছিল।... তার আত্মসম্মান তাকে বল্‌ল: "এ ত কুস্কুমের মহা জুলুম! তার বন্ধুত্ব বজায় রাখার সর্ত্ত কি তার মতামতের দাসত্ব করা?...কাজ নেই আমাদের অমন বন্ধুত্বে!"

কিন্তু হায়! শৈশবের শতস্মৃতিবিজড়িত বন্ধুত্ববন্ধন যুক্তির বিদ্রোহে এক কথায় কেটে দেওয়া যায় না। তাই তার শত যুক্তি ও কুস্কুমকে ভোল্‌বার চেষ্টা সত্বেও তার বিদ্রোহী হৃদয় কুস্কুমের সঙ্গে মিলনোন্মুখ না হ'য়েই পারে নি। চল্‌তে, ফিরতে, পড়্‌তে, লিখ্‌তে কুস্কুম ও তার মধ্যে এই আকস্মিক দুস্তর ব্যবধানের কথা মনে ক'রে তার সমগ্র মনটি ব্যথায় ভ'রে উঠ্‌ত। যতই সে ভাব্‌ত যে কুস্কুমকে ভুলে যাবে, ততই কুস্কুমের সম্বন্ধে নানান্ ছোটখাট দৈনিক স্মৃতি তার কাছে উজ্জ্বলভাবে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠ্‌ত। কুস্কুমের সঙ্গে যখন বন্ধুত্ববন্ধন সুদৃঢ় ছিল, তখন ত কই এ রকম সর্ব্বদা তার কথাই মনে হ'ত না! এ যেন তার বিদ্রোহী মনের অনর্থক তাকে জব্দ করার চেষ্টা।...

কুস্কুমের খবর জান্‌বার জন্য তার সমগ্র মনটি উন্মুখ হ'য়ে থাক্‌ত, কিন্তু তার এ খবর পাবার কোনও উপায় ছিল না। কুস্কুম ও তার ক্লাস আলাদা জায়গায় আলাদা সময়ে বস্‌ত। কেম্ব্রিজে প্রতি রবিবারে ভারতীয়দের "মজলিশ" ব'লে একটি গল্পালোচনার আসর বস্‌ত। কিন্তু মোহনলাল কুণ্ঠাসঙ্কোচের দরুণ সেখানে যাওয়া একেবারে ছেড়ে দিয়েছিল ব'লে কুস্কুমের সঙ্গে তার দেখা করার একটা সাপ্তাহিক সুযোগ হ'তে সে বঞ্চিত হ'য়েছিল।...এক পল্লবের কাছে সে কুস্কুমের খবর পেতে পার্‌ত। কিন্তু পল্লবও যেমন তার কাছে কুস্কুম সম্বন্ধে কোনও প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে সঙ্কুচিত হ'ত, মোহনলালও তেম্‌নি গভীর অভিমান-ক্ষোভে নিজের ব্যথা তার কাছে খুলে না ব'লে নিজের মনোমধ্যেই পুষে রাখ্‌ত। সে পল্লবের কাছে এমনই ভাব দেখাত যেন কুস্কুম ব'লে কাউকে সে কখনও জানে নি, চেনেনি বা দেখেনি।...অথচ পল্লবের কাছ থেকে কুস্কুম তার সম্বন্ধে কি বলে জান্‌বার আগ্রহ ছিল তার প্রচণ্ড।...

সে দিন 'য়ুনিয়নে' মোহনলাল এসেছিল প্রধানতঃ কুস্কুমের সঙ্গে দেখা হবে এই আশায়। কারণ অন্যত্র এ রকম কোনও ওজর পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না; সে নিজে থেকে কুস্কুমের সঙ্গে সাক্ষাতের সব সুযোগই বর্জ্জন ক'রে কেম্ব্রিজের ভারতীয় সমাজ হ'তে এক রকম বিচ্ছিন্ন হ'য়ে বসে ছিল। 'য়ুনিয়নে' ইংরেজ ছেলেই বেশি ব'লে সেখানে সে ভারতীয় ছেলেদের পাশ কাটিয়ে যেতে পারবে ভেবেছিল। সেই জন্যই তার কুস্কুমের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হওয়ার আগ্রহ তার সঙ্কোচকে জয় করতে পেরেছিল।... অন্ততঃ 'য়ুনিয়নে' গেলে ত আর কুস্কুম বা পল্লব সন্দেহ কর্‌তে পারবে না যে সে মূলতঃ কুস্কুমের সঙ্গে দেখা করতেই সেখানে এসেছে! স্নেহের অভিমান এমনই স্বচ্ছ আত্ম-প্রবঞ্চনার ঊর্ণাজালের আশ্রয় নিতে উন্মুখ হ'য়ে থাকে! কারণ মোহনলাল জান্‌ত যে কুস্কুম নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে সে হঠাৎ অনেকদিন বাদে আজ য়ুনিয়নে কেন এসেছে। কিন্তু তার মনটি সহজেই নিজেকে চোখ ঠেরে এই ব'লে তার য়ুনিয়নে যাওয়ার সমর্থন কর্‌ল যে য়ুনিয়ন ত কারুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় যে কুস্কুম এমন সন্দেহ ক'রে বস্‌তে পারে যে তার জন্যই মোহনলাল সেখানে গেছে! বুদ্ধিমান লোকে প্রয়োজন হ'লে কেমন অম্লানবদনে এরূপ যুক্তি-তর্কের আড়ালে আশ্রয় নিতে পারে! কুস্কুম কি মনে করবে, সেই নিয়েই যে মোহনলালের এত মাথাব্যথা হয়েছিল তা নয়, কুস্কুমের মনে করাটা যাতে তার অভিপ্রায় মাফিক হয় সেই জন্যই তার যত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যুক্তিপ্রয়োগ ও ওজর সৃষ্টি!

মোটের উপর সেদিন মোহনলালের মনে একটা ক্ষীণ আশার দীপ জ্বল্‌ছিল যে, হয়ত অনেকদিন বাদে য়ুনিয়নে দেখা হ'লে কুস্কুমের সঙ্গে তার সহজেই মিলন হ'য়ে যাবে! হয়ত কুস্কুম নিজে থেকেই অনুতপ্ত হ'য়ে তাকে সম্ভাষণ করবে!...কারণ সত্যিই ত এবার কুস্কুমই তাকে তার বিবাহ সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা না ক'রে তার প্রতি অবিচার ক'রেছে! অথচ সে মনে মনে জান্‌ত যে দেশভক্ত কুস্কুম বিলিতি মেয়ের উপর বরাবরই অত্যন্ত বিমুখ। কিন্তু তবু...এ যে অবিচার ও জবরদস্তি যে, তার বিবাহ করবার সময়েও তাকে কুস্কুমের অনুমোদনের অপেক্ষায় থাক্‌তে হবে!...

এরূপ আশা ও সংশয়ের দোলায়মান অবস্থায় সে সেদিন য়ুনিয়নে এসেছিল। অপরদিকে কুসুমও ঠিক তার আগের দিন পল্লবের সঙ্গে আলোচনার পর ঠিক করেছিল যে, সেই মোহনলালের কাছে ক্ষমা চাইবে। এক কথায় দুজনের মনই মিলনের অনুকূল অবস্থাতেই ছিল, কিন্তু মানুষের হৃদয়ের ঘাতপ্রতিঘাতের গতি বিচিত্র।

কুসুম য়ুনিয়ন হলে প্রবেশকালে মোহনলালকে দেখেই ভাবল যে প্রকাশ্যে তার কাছে ক্ষমা চাওয়া সম্ভব নয়, অথচ কয়েক সপ্তাহ ব্যাপী মনান্তরের বাদে নিতান্ত লৌকিকভাবে সম্ভাষণ করাও তার অনুতপ্ত মনের পক্ষে সহজ ছিল না। তাই মোহনলালকে দেখে তার সঙ্গে কথা বল্‌বার আগ্রহে তার হৃৎস্পন্দন একটু দ্রুত চল্‌লেও সে আপাততঃ মোহনলালকে ইচ্ছে ক'রেই পাশ কাটিয়ে গেল। সে ভাব্‌ল বক্তৃতার পর সে মোহনলালকে নিজের বাসায় নিয়ে গিয়ে নিজের অসহিষ্ণু জুলুমের জন্য অকপটে মাপ চাইবে।

কিন্তু মোহনলাল কুসুমের পাশ-কাটিয়ে-যাওয়াকে সম্পূর্ণ উল্‌টো বুঝল। তার মনে একটা নিহিত আশা ছিল যে এতদিনের বিচ্ছেদের পর আজ অন্ততঃ কুসুম তাকে 'কেমন আছ' বা অনুরূপ কোনও লৌকিক প্রশ্ন করবে। কিন্তু কুসুম যে তাকে দেখেও দেখ্‌লে না এতে তার সেই গোপন আকাঙ্ক্ষায় ঘা পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তার ধূমায়মান মর্ম্মদাহ হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে উঠ্‌ল—যেমন বন্ধুত্বের গভীর অভিমানের ক্ষেত্রে অনেক সময়ে হ'য়ে থাকে। হঠাৎ সেই দাহনের জ্বালায় সে কুসুমকে তার আঘাত সুদ শুদ্ধ ফিরে দেবার জন্য নিষ্ঠুর সঙ্কল্প ক'রে বসল।...কি জুলুম! কুসুম চায় আমি তার বন্ধুত্বের জন্য তার কাছে সর্ব্বদাই নীচু হ'য়ে থাকব! যেন আমি এক মহা অপরাধী!...আর আমাকে দোষী সাব্যস্ত করার আগে কি আমার বক্তব্যটা একবার জিজ্ঞাসা করাও তার দরকার ছিল না! আমার বন্ধুত্বের দাম কি এতই কম!...আমার আত্মসম্মানের দাবী কি এতই নগণ্য!...তবে আর কেন?...এ বন্ধন একেবারেই নির্দ্দয়ভাবে ছিন্ন ক'রে দেওয়াই ভাল।

কুসুমকে আঘাত করবার জন্য তার মনটা উস্‌খুস্ করতে লাগ্‌ল।...কিন্তু কি উপায়ে?...অথচ এমন ভাবে আঘাত করতে হবে যাতে কুসুম ছাড়া আর কেউ জান্‌তে না পারে...

কিন্তু এত দৃঢ়সঙ্কল্প সত্ত্বেও কুসুমের উদ্দীপ্ত বক্তৃতা শুন্‌তে শুন্‌তে মোহনলালের ব্যথার জ্বালার একটু উপশম হ'য়ে আস্‌ছিল।—এমন সময়ে সে পাশের দুটি অপরিচিত নূতন ছাত্রের মধ্যে ফিস্‌ফিস্ শুন্‌তে পেল। তাদের মধ্যে একজন কুসুমের তেজোগর্ভ বক্তৃতা শুনে উৎসাহিত হ'য়ে কি একটা কথা বল্‌তেই তার সঙ্গী তাকে বল্‌ল যে কুসুমের মতন ছেলের জাতই আলাদা। ও জাত সাপ!...মুখে বন্ধুত্ব ও স্বদেশভক্তি দেখিয়ে কাজে ফিরিঙ্গি মেয়ের রাঙা শ্রীচরণে দেহমন বিকিয়ে দেউলে হয়ে ব'সে থাক্‌বার ছেলে নয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

যে ক্ষোভ, অভিমান ও অপমানকে মোহনলাল এতদিন যুক্তি-বলে কোনও মতে শান্ত করে রেখেছিল, আজ উপর্য্যুপরি এই কয়েকটি আঘাত পেয়ে তারা আর বাধা মান্‌ল না। এই শেষ অপমানকর মন্তব্য শুনে তার যুক্তি, স্থৈর্য্য, নিরপেক্ষতা—এক কথায় তার সমগ্র মন দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠ্‌ল। এর পরও সে এরূপ অসারচিত্ত ছেলেদের সঙ্গে ভোট দেওয়া অপমানকর মনে না ক'রেই পার্‌ল না। তাছাড়া তার মনে বিদ্যুতের মতন এই ধারণাটি প্রবেশ কর্‌ল যে আজ কুসুমের স্বপক্ষে ভোট দিলে যেন সেটা বাস্তবিকই খোসামোদের মতন দেখাবে—অন্ততঃ এই সব ছেলেদের চোখে। ক্রোধে, জ্বালায়, অপমানে সে অন্ধ হ'য়ে বক্তৃতামঞ্চে লাফিয়ে উঠ্‌ল।...কুসুম ও অন্য সব ছেলেরা দেখুক যে সে তার স্বদেশবাসীদের মতামতকে কিরূপ তৃণজ্ঞান করে!...এত স্পর্দ্ধা তাদের যে তারা ভাবে যে সে কুসুমকে খোসামোদ ক'রে বন্ধুত্ব বজায় রাখ্‌তে চায়!...হঠাৎ তার মাথায় রক্ত চ'ড়ে গেল ও তার চিত্ত-বিভ্রম ঘট্‌ল। সে নিজের সঞ্চিত আঘাতকে সুদে আসলে ফিরিয়ে দেবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে উত্তেজনার মাথায় শুধু স্বদেশ ও স্বদেশবাসীকে আক্রমণ করা নয়—বাল্য-বন্ধু কুসুমের সত্যনিষ্ঠা ও স্বদেশপ্রাণতাকেও অসার প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা পেল—যেটা তার পক্ষে যে কখনও সম্ভব হতে পারে সে কথা সে ইতিপূর্ব্বে স্বপ্নেও ভাবেনি।

(১৬)

মোহনলালের নিন্দায় কেম্ব্রিজের ভারতীয় ছাত্রসমাজ

শতমুখ হয়ে উঠ্‌ল। দিনকতক চা-পার্টি, মজলিশ, টেনিস-ফুটবল-মাঠে, নৌকায় ছেলেদের দাঁড় টানার পার্টিতে, সর্ব্বত্রই বিজ্ঞ ছেলেরা মোহনলালের দেশবৈরিতার নানা-রকম কল্পিত কারণ নির্দ্দেশে রত হয়ে পড়্‌ল। কেউ বল্‌ল মেম বিয়ে কর্‌লে যে মনুষ্যত্ব থাকে না এ কথা কে না জানে? কেউ বল্‌ল মোহনলাল এতদিন শুধু সুযোগ খুঁজছিল পুরো দস্তুর সাহেব হবার। কেউ সন্দেহ প্রকাশ কর্‌ল যে এটা ইংরাজদের মধ্যে 'পপুলার' হবার একটা সাময়িক চাল মাত্র। কেউ বল্‌ল যে এতে কেবল মোহনলালের মূঢ়তাই প্রমাণ হয়, যেহেতু ধূর্ত্ত ইংরাজজাতি বিশ্বাসঘাতককে এক আঁচড়েই চিনে নেয়। কেউ বা একথার সমর্থনে ক্লাইভের উমিচাঁদের প্রতি ব্যবহার নজীর হিসেবে উদ্ধৃত কর্‌ল। এক কথায় কেম্ব্রিজের ভারতীয় ছেলেরা সকলেই মোহনলালের উপর এক চোট গায়ের ঝাল আশ মিটিয়ে ঝেড়ে নিল। কেননা কে না জানে যে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার সব চেয়ে সস্তা উপায় হচ্ছে অপরকে প্রাণ ভ'রে নিন্দা করা। কেবল কুস্থম মোহন-লালের নিন্দায় যোগ দিত না। সে একেবারে চুপ ক'রে গেল। কিন্তু এখন থেকে সে মোহনলালের সঙ্গে কথাবার্ত্তা একদম বন্ধ ক'রে দিল। এমন কি রাস্তায় কদাচিৎ মোহনলালের সঙ্গে দেখা হ'লেও মুখ ফিরিয়ে নিত।

সকলেই একজোট হ'য়ে মোহনলালকে 'বয়কট' কর্‌ল। তার ভারতীয় বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র পল্লব মাঝে মাঝে তার বাড়ীতে আস্‌ত। কারণ একমাত্র সেই খানিকটা বুঝেছিল মোহনলাল কতখানি ব্যথা পেয়ে স্বদেশকে ও কুস্থমকে অন্যায় আক্রমণ ক'রেছিল ও তার দরুণ সে পরে মনে মনে কতটা অনুতপ্ত হ'তে বাধ্য। তাছাড়া তার মনটা এই আকস্মিক ঘটনাটির ট্রাজিডিটা বেশি ক'রে উপলব্ধি করেছিল। কারণ একমাত্র সে জান্‌ত যে সেদিন মোহনলাল হঠাৎ ও-ভাবে আগুন হ'য়ে না উঠলে কুস্থমের সঙ্গে দুএকদিনের মধ্যেই মিলন হ'য়ে যেত। তাই এ ঘটনার নিষ্ঠুর পরিহাসের কথা ভেবে তার দুঃখ ও আক্ষেপের সীমা ছিল না। এবং সেইজন্যেই সে অনেকটা গায়ে প'ড়েই মোহনলালের সঙ্গে সংশ্রব বজায় রাখার চেষ্টা পেত। তার ইচ্ছা ছিল একদিন মোহনলালকে সময়মত বল্‌বে যে সে কি অন্যায়ই না ক'রেছে! ও কি সময়ে!—যখন কুস্থম ঠিক্ তার কাছে মাপ চাইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়েছিল ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তেই কি না…এ দুঃখ রাখবার কি যায়গা আছে। তার প্রায়ই মনে হ'ত নিয়তির দুর্ব্বোধ্য পরিহাস সম্বন্ধে শেক্ষপীয়রের একটি কথা: "The pity of it Iago, the pity of it!"

সে একথাটা মোহনলালকে অনুকূল মুহূর্ত্তে জানাবার জন্য ব্যাকুল হ'য়েছিল প্রধানতঃ এই কারণে যে তার মনে তখনও একটা ক্ষীণ আশার শিখা নির্ব্বাপিত হয় নি যে দুজনের মন ঠাণ্ডা হ'লে সে হয়ত মধ্যস্থ হ'য়ে তার মহৎ বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে এ ভুলবোঝার আঁধি দূর করতে অক্ষম না হ'তেও পারে। যৌবনের কোনও আশাই সহজে নির্ম্মূল হয় না।

কিন্তু সেদিন থেকে সে মোহনলালের বাড়ীতে বড় একটা তার দেখাই পেত না। মোহনলাল ইচ্ছে ক'রেই বড় বেশি বাড়ী থাক্‌ত না। ল্যাবরেটারিতে খুব সন্ধ্যা অবধি কাজ ক'রে কলেজেই খেয়ে একা নদীতে দাঁড় টেনে রাত্রি নটা সাড়ে নটার পর বাড়ী ফিরত। কাজেই পল্লব সপ্তাহে হয়ত একদিন কি দুদিনের বেশি তার দেখা পেত না। আর পেলেও বড় বেশি ক্ষণের জন্য নয়। দুজনের মধ্যে একটা অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা বিরাজ করার পর পল্লবকে অনেকটা বাধ্য হ'য়েই বক্তব্যটা না ব'লেই বিদায় নিতে হ'ত।…

এমন সময়ে একদিন মোহনলাল তাকে একটু বেশিক্ষণ চুপ ক'রে তার সামনে ব'সে থাকতে দেখে খানিকক্ষণ উস্‌খুস্ ক'রে হঠাৎ জিজ্ঞাসা ক'রে বস্‌ল "কি পল্লব, আর কেন? তুমিই বা আমাকে ছাড়তে ইতস্ততঃ কর্‌ছ কেন খুলে বল দেখি! আমাকে বুঝি এখনও কিছু আঘাত দেওয়ার বাকি আছে?" কথাটা মুখ থেকে বেরিয়ে যেতে না যেতে মোহনলালের মনে আক্ষেপের উদয় হ'ল।… মিছামিছি নিরীহ পল্লবকে তার বিশ্বস্ততার জন্যই আঘাত দেবার মতন নিষ্ঠুর সে কেমন করে হ'তে পার্‌ল! ছি ছি।……চিরদিন আত্মসংযমের গৌরবে গর্ব্বিত মোহনলাল আজ এত বিচারহীন ও নিষ্ঠুর হয়ে পড়্‌ল কেমন ক'রে?

পল্লব এ অন্যায় আঘাতে অত্যন্ত ব্যথিত হ'য়ে কি একটা উত্তর দিতে গিয়ে থেমে গেল। মিনিটখানেক

ঘরের মধ্যে নিস্তব্ধতা বিরাজ কর্‌ল। ক্ষুব্ধ মোহনলাল মাপ চাওয়া উচিত জেনেও কোনও মতেই নিজের দোষ স্বীকার ক'রে একটা কথাও উচ্চারণ কর্‌তে পার্‌লে না।...... চারিদিক থেকে উপহাস ও আঘাত পেয়ে পেয়ে মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলির উপর একটা অবিশ্বাসের ভাব তার মনকে দখল ক'রে বসেছিল। তাই তার সূক্ষ্ম উচিত-অনুচিত-বোধ কেমন যেন একটু বিবর্ণ হ'য়ে গিয়েছিল।... পল্লব খানিকক্ষণ চুপ ক'রে আবার একটু ইতস্ততঃ ক'রে হঠাৎ উঠে পড়ল ও নিজের টুপিটি নিয়ে কোনও কথা না ব'লে নিঃশব্দে বিদায় নিল। মোহনলালের ইচ্ছা হ'ল তাকে হাত ধ'রে বসিয়ে মাপ চেয়ে নিজের হৃদয়ভার লাঘব করে। কিন্তু ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করতে না করতে পল্লব নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেল। মোহনলাল চুপ ক'রে ব্যথাতুর হৃদয়ে বাইরের অশ্রান্ত তুষার পাত দেখ্‌তে লাগ্‌ল।......

সেদিন পূর্ণিমা। কিন্তু মেঘাবৃত আকাশে চন্দ্রালোকের স্তিমিত দ্যুতি কেমন যেন বিবর্ণ আকার ধারণ করেছিল। পল্লবের চোখে যেন এ বিবর্ণতা আরও ম্লানিমাময় মনে হ'ল। অল্প অল্প তুষার পড়ছিল। পল্লব ব্যথিত হৃদয়ে ধীর মন্থরগতিতে কুঙ্কুমের ওখানে যাচ্ছিল। সে মোহনলালের নিষ্ঠুর কথায় আজ বড়ই আহত হ'য়েছিল। মোহনলাল তাকে দিনের পর দিন উদাসীন ব্যবহারের দ্বারা ব্যথা দিলেও সে যে শেষটায় স্বতঃপ্রণোদিত হ'য়ে তার উপর এরূপ নিষ্ঠুর কটাক্ষ কর্‌তে পারে এ কথা যে সে স্বপ্নেও ভাবে নি! প্রিয়বন্ধুর কাছ থেকে অহেতুক বাক্যবাণে বিদ্ধ হবার এরূপ সুযোগ তার ইতিপূর্ব্বে কখনও হয় নি। সে বাল্যকাল থেকেই একটু বেশিরকম বন্ধু-বৎসল ছিল।...তার এক স্কুলের বন্ধু একবার দুচারজন ছেলেকে অযথা গালি দেওয়াতে ক্লাসের সব ছেলেরা একজোট হ'য়ে তার সঙ্গে কথা বন্ধ ক'রেছিল। কেবল পল্লব তাকে এভাবে বর্জ্জন করতে পারে নি। সে সুযোগ পেলেই তার সঙ্গে লুকিয়ে একটা আধটা কথা না ক'য়ে ছাড়ত না,—যদিও বেশিক্ষণ কথা কইতে তার সাহস হ'ত না। কারণ একবার ধরা পড়লে যে তার কি রকম লাঞ্ছনাটা হবে সেটা তার বালক-কল্পনার কাছেও অবিদিত ছিল না। তবু সে থাকৃতে পারৃত না। ক্লাসের মধ্যে ও বাইরে তার বন্ধুকে একা একা বেড়াতে বা অপর ছেলেদের খেলাধূলায় শুধু দর্শকমাত্রে পর্য্যবসিত হ'তে দেখে তার অত্যন্ত কষ্ট বোধ হ'ত। তাই সে আড়ালে আবডালে সুবিধা পেলেই তার একঘরে সতীর্থের হাতে হয় দুটো চানাচুর না হয় এক ঠোঙা অবাক্ জলপান না হয় দুটো রঙীন মারবেল গুঁজে দিয়ে তাকে জানিয়ে দিত যে অন্ততঃ তার হৃদয় এ বয়কটের চক্রান্তের মধ্যে নেই।......কিন্তু তার সমস্ত সতর্কতা সত্ত্বেও তাদের ক্লাসের 'হেড-স্পাই' ভূতো একদিন তার চতুরালি ধ'রে ফেলে সকলকে ব'লে দিল।...ফলে অনেকদিন ধ'রে যে পল্লবের সহপাঠীদের হাতে কি নির্য্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল...ঘরশত্রু বিভীষণ, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির প্রভৃতি কতরকম মনোজ্ঞ ডাকনামে ভূষিত হ'তে হ'য়েছিল...বালকদের নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে তার যে গভীর অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছিল...সে সব কথা সহজেই অনুমেয়। এবং অভিমানী বালকের মন যে এরূপ নব-নব-উদ্ভাবিত লাঞ্ছনা-গঞ্জনায় কতখানি নুয়ে না প'ড়েই পারে নি সেটাও কল্পনা করা কঠিন নয়। কিন্তু তবু তার মন তার কাণে কাণে বলত যে সে ভালই ক'রেছে।......কেন না এই-ই ছিল তার প্রকৃতি, এবং আজও সে যে মোহনলালকে অন্য সকলের মতন ত্যাগ করতে পারে নি তার মূল কারণও ছিল—তার প্রকৃতি। সে জানৃত যে তার সহপাঠীরা যদি জান্‌তে পারে যে সে ভিতরে ভিতরে মোহনলালের সংশ্রব একেবারে ত্যাগ করে নি তাহ'লে তারা তার প্রতি মোটেই খুসি হবে না। কিন্তু অপ্রিয় হবার এ সম্ভাবনা আছে জেনেও সে নিজের প্রকৃতিকে অতিক্রম করার মতন কাঠিন্য খুঁজে পেত না। বন্ধুদের দুঃখকষ্ট দেখ্‌লে সে প্রায়ই অন্য অনেকের মতন এই ভেবে সান্ত্বনা পেতে পারৃত না যে এজন্য তারা নিজেরাই দায়ী। এ ক্ষেত্রেও হয়েছিল তাই। একদিন মোহনলাল রোখের মাথায় তাকে ব'লেছিল যে সে ত খুনিয়নে মিথ্যা কিছুই বলে নি, স্বজাতির দোষ সমালোচনা করা সে অনুচিতও মনে করে না ইত্যাদি;—তখনও সে অনেকটা জোর ক'রে তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ ক'রেছিল। সে যে মোহনলালের কথায় প্রতিবাদ করেনি তার কারণ, সে নিশ্চয় জানৃত যে মোহনলালের মতন আন্তরিক ছেলের নিজেকে এ বৃথা-প্রবোধ-দেওয়া মাত্র। তাই তার এ কথায় প্রতিবাদ ক'রে মোহনলালের ব্যথাতুর হৃদয়ের উপর আরও ব্যথা-

ভার চাপানোর প্রয়োজন আছে ব'লে সে মনে করে নি। তাছাড়া তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে মোহনলাল মুখে যতই কঠিন হোক্ না কেন ভিতরে ভিতরে জানে যে সে তার ঔদাসীন্য সত্ত্বেও আসে—শুধু সাধ্যমত তার ব্যথা লাঘব করবার জন্যই, অন্য কোনও অভিপ্রায়ে নয়। তবে তা সত্ত্বেও যে মোহনলাল তার আন্তরিক শুভেচ্ছার মর্য্যাদা রাখ্‌ল না এতে পল্লবের সমগ্র অন্তর বেদনায় রাঙা হ'য়ে না গিয়েই পারে নি।

পল্লব নতমুখে ব্যথিত হৃদয়ে বিদায় নেওয়ার পর মোহনলালের নিজের অপরাধের গুরুত্ব সম্বন্ধে প্রথম চোখ ফুট্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে তার যেন চৈতন্য হ'ল যে তার আত্মাভিমান তার সদ্বুদ্ধিকে কতটা নীচে টেনে এনেছে।... সেই না সেদিন সুনীতি দুনীতি নিয়ে পল্লবকে বিজ্ঞভাবে উপদেশ দিয়েছিল! অথচ আজ তার চিরকালের শিষ্য-বন্ধু পল্লবও যে সত্যকার জ্ঞানে ও নিরভিমানতায় তার গুরুস্থানীয় হ'য়ে গেছে একথা ত সে অস্বীকার করতে পারে না! মোহনলালের মনে হ'ল যে নিজেকে ঠিক্ ঠিক্ চেনা যে কত কঠিন তা সে আগে উপলব্ধি করে নি। উঃ! অভিমান তার কতখানি অবনতিই না সাধন করেছে!...এইসব ভাব্‌তে ভাব্‌তে তার হঠাৎ মনে হ'ল যে বোধ হয় সে এতদিন বৃথাই পণ্ডিতমূর্খের মতন লম্বা লম্বা বুলিই আওড়ে এসেছে, জীবনে সে সবের প্রয়োগ শেখে নি। তাই সে তৎক্ষণাৎ স্থির ক'রে বস্‌ল যে সে তার পরদিনই পল্লবের কাছে গিয়ে মাপ চেয়ে আস্‌বে।...

সেদিন রাত্রে তার ভাল ঘুম হ'ল না ও রাত্রে হৃদয়ের দুর্ব্বল অবস্থায় তারপর দিন পল্লবের হাত ধরে কি কি কথা ব'লে মাপ চাইবে ভাব্‌তে ভাব্‌তে তার চোখ দুটির পাতা ভিজে উঠ্‌ল।......ভাব্‌তে ভাব্‌তে সে ঘুমিয়ে পড়্‌ল।

পরদিন সকালে আকাশ নির্ম্মল হ'য়ে গিয়ে সূর্য্যালোকের প্রখর রশ্মি যখন তার ঘরের মধ্যে এসে তার ঘুম ভেঙে দিল তখন বেলা হ'য়ে গেছে। মোহনলাল ধড়মড় ক'রে উঠে কলেজে যাবার জন্য তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ সেরে নিল। সে ঠিক্ করেছিল যে ক্লাসে যাবার আগেই পল্লবের ওখানে হ'য়ে যাবে। কিন্তু সকালে উঠ্‌তে দেরি হ'য়ে যাওয়ার দরুণ সে তাড়াতাড়ি সাইক্‌লে ক'রে ক্লাসের অভিমুখে ধাবমান হ'ল। ফেরবার পথে অনেকদিন বাদে প্রখর সূর্য্যকিরণে সে একটু উৎফুল্ল না হ'য়েই পার্‌ল না ও তখন তার মনে হ'ল যে পল্লবের বাড়ী গিয়ে তার মাপ চাওয়াটা যেন একটু বিসদৃশ, সেণ্টিমেণ্টাল, গোছের দেখাবে।...কাজ নেই। আজ কালের মধ্যে পল্লব এসে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবে। দিনের আলোয় রাতের হৃদয় দৌর্ব্বল্য অনেকটা ক'মে যায়।

পল্লব যে দু-চার দিনের মধ্যেই আবার আস্‌বে এ সম্বন্ধে মোহনলালের কোনই সন্দেহ ছিল না। কিন্তু আসলে সে পল্লবের ক্ষমাশীলতাকে একটু বেশি ক'রে দেখ্‌তে চেয়েছিল শুধু এই জন্য যে পল্লব এলে তার মাপ-চাওয়াটা সহজ হ'য়ে আস্‌বে। মানুষ কত সময়েই না নিজের সুবিধামত অপরের চরিত্রকে কল্পনা ক'রে থাকে!

কিন্তু এবার মোহনলাল পল্লবের কাছ থেকে একটু বেশি ঔদার্য্য প্রত্যাশা করেছিল। পল্লব সেদিন থেকে মোহনলালের ওখানে যাওয়া ছেড়ে দিল।...মোহনলালের শেষ নিষ্ঠুর সন্দেহ তাকে বড়ই বিঁধেছিল।

সে মোহনলালের প্রসঙ্গ কুঙ্কুমের কাছে ইচ্ছা ক'রেই কখনও তুল্‌ত না। কুঙ্কুমও জিজ্ঞাসা করত না। পল্লব নিজে কুঙ্কুম ও মোহনলালের মধ্যে মিলন ঘটাবার জন্য উৎসুক হ'লেও সাহস ক'রে মোহনলাল সম্বন্ধে কোনও কথা কুঙ্কুমকে বল্‌বার শক্তি খুঁজে পেত না। তার মনে হ'ত হয়ত বা এতে উল্‌টো উৎপত্তি হবে। কাজেই মোহনলাল ও কুঙ্কুমের মধ্যে সংযোগের শেষ সেতুটিও রুদ্ধ হ'য়ে গিয়েছিল।

পল্লব মোহনলালের কাছে নিষ্ঠুর আঘাত পেয়ে রোজই ভাব্‌ত যে হয়ত মোহনলাল তার কাছে মাপ চাইতে আস্‌বে। কারণ মোহনলাল বরাবরই স্বদোষ স্বীকার করতে অত্যন্ত তৎপর ছিল। তাই পল্লবের আশা ছিল যে মোহনলাল দু'তিনদিনের মধ্যে আস্‌বে। কিন্তু মোহনলাল যখন সপ্তাহকালের মধ্যেও এল না তখন তার এ শেষ আশাও লুপ্ত হ'য়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে সে প্রথম উপলব্ধি কর্‌ল মোহনলাল তার হৃদয়ের কতখানি স্থান অধিকার করে আছে। তার নিরন্তরই মোহনলালের কথা মনে হ'ত। এক একবার তার ম্লান মুখ ও নিঃসঙ্গ জীবন কল্পনা ক'রে সে ভাব্‌ত যে ছুটে একবার তার

কাছে যায়। কিন্তু তখনই আবার তার মনটা বলে উঠ্‌ত যে থাক্ কাজ নেই। পাকে চক্রে প'ড়ে যে তার সঙ্গে মোহনলালেরও এ ভাবে বিচ্ছেদ হ'তে পারে এ কথা কিছুদিন আগে কেউ তাকে বল্‌লে সে হেসে উড়িয়ে দিত। কিন্তু যা কল্পনাতীত তা-ই অনেক সময়ে জীবনে বাস্তবে পরিণত হয়।

পল্লবের ব্যথার কিন্তু উপশম হ'ল না। শেষে সে একদিন থাক্‌তে না পেরে হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় কুস্কুমকে সব কথা খুলে বল্‌ল, যদিও সে যে তার কাছে বিশেষ সহানুভূতি পাবে এ ভরসা বিশেষ পোষণ করে নি। তবু বেদনার কথা বন্ধুর কাছে খুলে বল্‌লে মনের ভার খানিকটা লাঘব হয়। বোধ হয় সেইজন্যই সে অনেকদিন বাদে কুস্কুমের কাছে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মোহনলালের প্রসঙ্গ তুল্‌তে বাধ্য হ'ল।

কুস্কুমের হৃদয় এতদিনে মোহনলালের প্রতি একটু একটু ক'রে সদয় হচ্ছিল, যদিও সে মুখে সে কথা পল্লবের কাছে ঘুণাক্ষরেও স্বীকার করে নি। বরং সে উত্তরে কঠিন শান্তস্বরে বল্‌ল যে মোহনলাল বিলিতি মেয়ের মোহে পড়ে আর সে মোহনলাল নেই। তাই সে এখন তাদের এ ভাবে বর্জ্জন করতে বদ্ধপরিকর। সুতরাং একতরফা বন্ধুত্ব কর্‌তে গিয়ে ফল কি? মুখে সে এ কথা বল্‌ল বটে কিন্তু হঠাৎ বিদ্যুতের মতন একটা করুণ অনুভূতি তার হৃদয়ের মধ্য দিয়ে খেলে গেল, যার আলোতে সে নিজের হৃদয় মুকুরে মোহনলালের হৃদয়ের ব্যথার প্রতিবিম্ব যেন স্পষ্ট দেখ্‌তে পেল। তার মনে হ'ল মোহনলাল কম ব্যথা পেয়ে পল্লবকে এ ব্যথা দেয় নি। এবং যদি সে আজ বদ্‌লে গিয়েও থাকে তবে সে বিলাতি মেয়ের মোহবশে নয়—তাদের মিলিত নীরব উৎপীড়নের নিষ্ঠুরতায়। কারণ সে যা-ই করুক না কেন তার অপরাধের যে মার্জ্জনা ছিল না এমন নয়। কিন্তু তখনি আবার দেশাভিমান তার সহানুভূতির কণ্ঠরোধ কর্‌ল। না, না— মোহনলালের প্রতি কঠোর হওয়াই যে এস্থলে প্রতি ভারতবাসীর কর্ত্তব্য! ব্যক্তিগত অপমান কুস্কুম ভুল্‌তে পার্‌ত, কিন্তু স্বদেশের অপমান?...কখনই না। বিদেশীর সাম্‌নে স্বজাতিকে অকথ্য ভাষায় গালি দেওয়া!...এরূপ অপরাধীর সঙ্গে সংশ্রব রাখা যে একান্ত অকর্ত্তব্য!...

পল্লব কুস্কুমের কাছে যে ভাবে কথাটা পেড়েছিল তাতে সে মোহনলালের নিঃসঙ্গতার দিক্‌টার উপরই বেশি জোর দিয়েছিল, নিষ্ঠুর আঘাত-দেওয়ার উপরে দেয়নি। সে ভেবেছিল হয়ত কুস্কুম মোহনলালের এ নিঃসঙ্গতার বেদনার কথা ভেবে তাকে ক্ষমা কর্‌তে না পার্‌লেও— তার প্রতি একটু কম বিমুখ হবে।...কিন্তু হিতে বিপরীত হ'ল।...এতদিন তার মনে একটা আশার দীপ নির্ব্বাপিত-প্রায় হ'য়ে একেবারে নেভে নি যে মোহনলালকে আবার ফিরে পাওয়া যাবে। কিন্তু আজ তার ব্যথাতুর মনে প্রথম সন্দেহের কীট প্রবেশ কর্‌ল যে মোহনলাল মেমের মোহে পড়ে সত্যিই তার পূর্ব্ব বন্ধুদের ঝেড়ে ফেল্‌তে চাচ্ছে না ত?...এ সংশয় তার মনে ইতিপূর্ব্বে কখনও ছায়াপাতও করে নি। কিন্তু আজ তার হঠাৎ Charles Lambএর একটি ব্যঙ্গাত্মক কথা মনে পড়্‌ল যে নারীর স্বভাবই এম্‌নি যে স্বামীর বিবাহের পূর্ব্বেকার বন্ধুদের প্রতি তাকে বিমুখ ক'রে দেবার চেষ্টার ও কৌশলের তার আর অন্ত থাকে না। কেবল এক ক্ষেত্রে তাঁরা এ বন্ধুত্ব মঞ্জুর করতে পারেন—যদি মঞ্জুর হোক্ ব'লে এ অভাগ্যগণ তাঁদের শ্রীচরণে দরখাস্ত পেশ করে। তখন সে এ ব্যঙ্গটি প'ড়ে খুব হেসেছিল, কিন্তু আজ তার মনে হ'ল যে এ উক্তিটি হয়ত নিছক্ ব্যঙ্গাত্মক না হ'তেও পারে। মনে হ'ল যে মিস স্মিথের যদি ভারতীয় বিদ্বেষ প্রবল হয় তবে হয়ত...মোহনলালেরও ক্রমে ক্রমে এ পরিবর্ত্তন...না না ছি ছি!...তা কখনও হ'তে পারে! মোহনলালের মতন চিন্তাশীল, আদর্শবাদী ছেলের প্রকৃতি একদিনে এমন বদ্‌লে যেতে পারে কখনো?...কিন্তু তখনি আবার তার মনে হ'ল যে নারীর মোহের দুর্জ্জয় প্রভাব যে কি বস্তু সে সম্বন্ধে ত সে এতাবৎকাল কেবল প'ড়েই এসেছে মাত্র! তাই সে কেমন ক'রে এক্ষেত্রে সম্ভব ও অসম্ভবের মধ্যে সীমানা টান্‌বে?

এ সংশয়ের দ্বন্দ্বের ভিতরে প'ড়ে সে এক গভীর অশান্তির মধ্যে দিন কাটাতে লাগ্‌ল।...কিন্তু মানুষের মন সহানুভূতির কাঙাল। পল্লব এখন বুঝ্‌ল যে 'দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না' কথাটি বড়ই সত্য। কিন্তু এক্ষেত্রে কুস্কুম ত সোজাসুজিই জবাব দিয়ে দিয়েছে। তাই কার কাছে সে যায়, কার সঙ্গে পরামর্শ করে? ভেবেচিন্তে সে ঠিক্

করল যে মিসেস্ নর্টনের কাছেই সে সব কথা খুলে বলে হৃদয়ভার লাঘব করবে।

(১৭)

তার পর দিন সন্ধ্যায় সে মিসেস নর্টনের বাড়ীর সাম্‌নের দরজার ঘণ্টাটি বাজাতে না বাজাতে দুম দুম করে ছুটে এসে রিণা দুয়ার খুলে দিল। পল্লবকে দেখ্‌বামাত্রই তার চোখ দুটি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল। সে তার ছোট্ট হাতখানি দিয়ে পল্লবের গলা জড়িয়ে ধ'রে ঠোঁট দু'খানি ফুলিয়ে বল্‌ল: "আপনি আজকাল ভারি দুষ্টু হয়েছেন মিষ্টার বাক্‌চি। আপনার ওখানে এর মধ্যে আমি দু' তিনবার...চারবার...পাঁচবার···না না তারও বেশিবার... গিয়েছি, কিন্তু আপনি কিছুতেই বাড়ী থাকবেন না। অথচ আমাদের এখানেও আস্‌বেন না···অথচ আমি সর্ব্বদা বাড়ী থাকি জেনেও।...অথচ..."

পল্লব উৎসাহিতা বালিকাকে উৎসাহের মাথায় বক্তব্য ভুলে যেতে দেখে, হেসে তার গাল দুটি টিপে দিয়ে বলল: "অথচ চকলেট বিস্কুটও পাঠাবেন না...অথচ জানেন যে আমি এসব উপহারে কি রকম বিশ্বাস করি...আর কতরকম অথচ আছে রিণা?"

রিণা একটু লজ্জা পেয়ে কৃত্রিম কোপে ব'লে উঠল: "যান্। আপনি বড় দুষ্টু। যেন আমি আপনাকে চকলেটের জন্যই আস্‌তে বলি। মা-ও ঐ কথা বলেন আজ আপনিও!"

পল্লব যে চকলেটের কথা ব'লে রিণার আত্মসম্মানে এতখানি আঘাত দিয়ে ফেলতে পারে তা আগে ভাবেনি। সে হেসে বল্‌ল: "না না রিণা! তুমি হচ্ছ আমার কত বড় বন্ধু! তুমি শুধু চকলেটের জন্য আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছ এ কথা কখনও আমি বল্‌তে পারি?"

বল্‌তে বল্‌তে সে অলষ্টার ও টুপিটা খুলে আল্‌নায় রেখে দিল। রিণা এক কথায় অনেকটা শান্ত হ'য়ে পল্লবের একটা হাত ধ'রে তাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে একটা সোফায় বসিয়ে বল্‌ল: "মা এখুনি আসছেন মিষ্টার বাক্‌চি।" ব'লেই ঘরের আগুনটা একটু উস্কে দিয়ে বল্‌ল: "আচ্ছা মিষ্টার বাক্‌চি, আপনি আজকাল কোথায় থাকেন বলুন ত? আপনাকে ত কখ্‌খনো বাড়ীও পাওয়া যায় না, এখান থেকে আপনার পিয়ানোও ত কই আর শোনা যায় না?"

পল্লব তাকে কোলে বসিয়ে তার কাঁধের ওপর একটি হাত রেখে সাগ্রহে বল্‌ল: "আমি কি করি শুন্‌বে?... সকাল বেলা ক্লাস করি—এক। দুপুর বেলা কলেজেই লাঞ্চ করি—দুই। তারপর দু'তিন ঘণ্টা কলেজের পিয়ানোটাই বাজাই—তিন। কারণ সেটা আমার ঘরের পিয়ানোর চেয়ে ঢের ভাল ও লাঞ্চের পরে কলেজ-হলে জনপ্রাণী থাকে না। সকলে হয় খেল্‌তে না হয় দাঁড় টান্‌তে বেরিয়ে যায়। তারপর বিকেল বেলা বন্ধুবান্ধবদের ওখানে চা খাই গল্প করি ও না হয় কিছু খেলি—কত হ'ল? পাঁচ, না?"

রিণা বল্‌ল: "না ত! চার হ'ল যে!"

পল্লব তার নিবিষ্টচিত্তা শ্রোত্রীর অঙ্কশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি দেখে খুসি হ'য়ে বল্‌ল: "ঠিক্ ঠিক্। চার বটে। হ্যাঁ হ্যাঁ যেদিন বৃষ্টি না পড়ে সেদিন কখনও কখনও ক্যাম নদীতে খুব দাঁড় টানি। কাজেই বাড়ী থাকি কখন বল ত?"

রিণা এতক্ষণ তার কথা বিশ্বাস করছিল। এবার তার কথায় আস্থা হারিয়ে বল্‌ল: "ইস্! দাঁড় টান্‌লে বুঝি বাড়ী থাক্‌তে নেই? আমার দাদা ত থাকেন। অথচ তিনি আপনার চেয়ে কত ভাল দাঁড় টানেন—"

পল্লব কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বল্‌ল: "কেমন ক'রে জান্‌লে রিণা?"

রিণা আরও গম্ভীর হয়ে বিজ্ঞ নিশ্চয়তার সঙ্গে বল্‌ল: "আমি জানি। আমাদের মেড বার্থা সেদিন বল্‌ছিল যে আমার দাদার মতন দাঁড় টান্‌তে ও সাঁতার দিতে কে—উ পারে না।"

পল্লব এরূপ অভ্রান্ত নজীরের পর একেবারে হেরে গিয়ে হেসে পরাভব স্বীকার ক'রে বল্‌ল: "বল কি রিণা! বার্থা নিজে তোমাকে ব'লেছে! সত্যি নাকি! তাহ'লে ত আর কথাটি বলা চলে না!···কিন্তু রিণা পৃথিবীতে কে—উ তোমার দাদার মতন সাঁতার দিতে বা দাঁড় টান্‌তে পারে না এটা বার্থা জান্‌ল কেমন ক'রে বল দেখি?"

রিণা তৎক্ষণাৎ নিঃসঙ্কোচে বল্‌ল: "ওঃ—বার্থা সব জানে। সে নিজে লণ্ডনে টেম্‌সে সাঁতার কাটত যে!"

পল্লব এ অকাট্য যুক্তির সাম্‌নে মাথা নীচু করতে বাধ্য

হওয়া সত্ত্বেও বল্‌ল: "কিন্তু তবু সে দেখ্‌ল যে কেউ পারে না ?"

রিণা ঢোঁক গিলে সজোরে মাথা নেড়ে সগর্ব্বে বল্‌ল: "কেউ না।" কিন্তু তখনি আবার চেঁচিয়ে ব'লে উঠল: "ওহো—হ্যাঁ হ্যাঁ। একজন পারতেন বটে। মা বলেছেন বাবার মতন সাঁতার দিতে কেউ পার্‌ত না। আর—হ্যাঁ আমার এক ছফুট লম্বা মামা আছেন তিনি পারেন আর... আর..."

এমন সময় রিণার জন্য একটা আধ-বোনা উলের কম্ফর্টার ও ক্রুসের কাঁটা হাতে মিসেস নর্টন ঘরে প্রবেশ করলেন।

রিণা মাকে পেয়ে যেন অকুল-পাথারে কূল পেল। সে ব্যগ্রভাবে লাফিয়ে উঠে মিসেস নর্টনের কটি বেষ্টন ক'রে ব'লে উঠল: "আর কে যেন দাদার চেয়ে ভাল দাঁড় টান্‌তে পারে মা ?"

সে মুহূর্ত্ত আগে যে তার দাদাকে নিঃসঙ্কোচে অদ্বিতীয় দাঁড়ী ব'লে প্রচার ক'রে বসেছিল উৎসাহের মাথায় সে কথা এখন একেবারে ভুলে গিয়েছিল। পল্লব হেসে উঠল। মিসেস নর্টনও হেসে বল্‌লেন: "অনেকেই পারে। তবে রিণা তুমি এখন খেয়ে শুতে যাও, লক্ষ্মী মেয়ে! তোমার শরীর ভাল নেই, রাত কোরো না।"

রিণা আবদারের সুরে বল্‌ল: "না মা আমি এখন থাকি মা...লক্ষ্মী মা। আমার শরীর খুব ভাল আছে মা। অথচ তোমার মুখে রোজই ঐ এক কথা। তুমি যেন আমাকে তাড়াতাড়ি ঘুম পাড়াতে পারলেই বাঁচো। কেন ? আমি কি জেগে থাকলে দুষ্টুমি করি—আইরিণের মতন ?"

মিসেস নর্টন হেসে রিণার গাল টিপে দিয়ে বল্‌লেন: "না! তা করবে কেন ? তোমার মতন শান্তশিষ্ট মেয়ে কি জগতে আর কখনও জন্মেছে ?"

রিণা এ পরিহাসে আপত্তি ক'রে কি একটা কথা বল্‌তে যাবামাত্র মিসেস নর্টন বল্‌লেন: "কিন্তু মাত্র কাল থেকে তোমার কাশিটা একটু ক'মেছে। আজ রাত জাগ্‌লে আবার বাড়্‌তে পারে। তাই আজ শুতে যাও। কাল যদি কাশিটা কমে ত আরও একঘণ্টা পরে তোমাকে বার্থা শুতে নিয়ে যাবে।"

রিণা তার ঠোঁট দুখানি ফুলিয়ে বল্‌ল: "আহা—হা। কাল আমি জেগে থেকেই বা করব কি ? তুমি উল্ বুন্‌বে—বার্থাও আজকাল গল্প বলে না—আর তা ছাড়া কাল মিষ্টার বাক্‌চিও ত আস্‌বেন না!"

পল্লব সস্মিতমুখে বল্‌ল: "আচ্ছা, আচ্ছা আস্‌ব রিণা। আর কাল চকলেট আন্‌তেও ভুলব না।" তার আগমনে এ ক্ষুদ্র বালিকা বান্ধবীর এ উৎসাহে তার মনটা এক বিমল খুসিতে ভ'রে উঠল।

মিসেস নর্টন বল্‌লেন: "রিণা বুঝি আপনাকে আবার চকলেটের জন্য বিরক্ত ক'রেছে মিষ্টার বাক্‌চি ? রিণা, তোমাকে না সেদিন ব'লেছি যে যার তার কাছে চকলেট চাইবে না ?"

রিণা কাঁদ কাঁদ সুরে বলে বস্‌ল: "মিষ্টার বাক্‌চির কাছে চাওয়া বুঝি যার তার কাছে চাওয়ার সমান ?"

মিসেস নর্টন এ কথায় একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে হেসে বল্‌লেন: "আমি কি তাই বলেছি রিণা ? তুমি আজকাল যে কি ছাই ভস্ম বকো—"

রিণা মোটেই না দ'মে বল্‌ল: "আমি ছাই ভস্ম বকি বই কি ? তুমিই ত যা-তা বল মা! নইলে কি বল্‌তে যে আমি যার-তার কাছে চকলেট চাই ? তোমার বাড়ীতে আসে কে শুনি যে আমি যার তার কাছে চকলেট চাইব ? লণ্ডনে তবু তোমার সঙ্গে দেখা করতে কত বড় বড় লোক ফুলের তোড়া নিয়ে আসতেন। কিন্তু এখানে ত তুমি কাউকেই আস্‌তে দাও না—এক মিষ্টার বাক্‌চি ছাড়া, আর মিষ্টার—" কন্যার মুখে নিজের পাণিপ্রার্থী অভিজাত-গণের এই সরল উল্লেখেও মিসেস নর্টন আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন। একটু বিরক্তির সুরে বল্‌লেন: "তুমি বড় দুষ্টু হয়েছ রিণা। তোমাকে আদর দিয়ে দিয়ে সকলে—"

রিণার চোখদুটি জলে ভ'রে উঠ্‌ল, ওষ্ঠাধর কাঁপতে লাগল।

আদরিণী ক্রন্দনোদ্যতা রিণাকে তাড়াতাড়ি কাছে টেনে নিয়ে পল্লব এবার জোর ক'রে বাধা দিয়ে একটু রাগ ক'রে বলল: "আপনিও কিন্তু আচ্ছা নাছোড়বন্দ লোক মিসেস নর্টন।...সত্যি! আচ্ছা, রিণা যদি আমার কাছে কখনও কখনও চকলেট লবেঞ্চুষ চেয়েই বসে তাহ'লে কি তাতে—"

মিসেস নর্টন একটু হেসে বাধা দিয়ে একটু ঠাট্টার সুরে বল্লেন: "শুধু আপনার কাছে চাইলে তেমন যায় আসে না মিষ্টার বাক্‌চি। কেননা আপনি রিণার প্রেমে প'ড়ে গেছেন।" ব'লেই রিণার দিকে চেয়ে একটু চোখ ঠেরে সস্মিতমুখে বল্লেন: "কিন্তু আমার রিণা ভাবেন যে সকলেই বুঝি তাঁর প্রেমে প'ড়ে যেতে বাধ্য, তাই আমার আপত্তি।"

রিণা সরলভাবে সজোরে ঘাড় নেড়ে বলে বস্‌ল: "কখ্‌খনো না। আমি কি জানিনা যে সকলেই বুঝি মিষ্টার বাক্‌চি নয়? বারে বা!"

পল্লব হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌ল। গত কয় সপ্তাহ তার মনটা এত ভারি ছিল যে এতটা মন খুলে হাস্‌বার সুযোগ সে অনেকদিন পায় নি। তার হাসি আর থামে না। শেষটায় সে হাসির সংক্রামকতায় মিসেস নর্টন ও রিণাও যোগ না দিয়ে পার্‌ল না। রিণার সরল হাসির কলধ্বনি পল্লবের কাছে যেন ঝর্‌ণার মতনই স্বচ্ছ ও পবিত্র মনে হ'ল। বালিকার নির্দ্দোষ জবাবদিহির সারল্য তার সৌরভে যেন সমস্ত ঘরটিকে আমোদিত ক'রে তুল্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে তার দুষ্টামি-ভরা নীল চোখ দুটি যেন গর্ব্বে উজ্জ্বল হ'য়ে বল্‌তে লাগ্‌ল: "দেখ, আমি কি বাহাদুর! অথচ তোমরা ভাব আমি কিছুই বুঝি না! কেমন জব্দ।"

খানিক বাদে হাসি থাম্‌লে মিসেস নর্টন বল্লেন: "এবার আমার হার হয়েছে রিণা।" ব'লে একটু থেমে পল্লবের দিকে চেয়ে বল্লেন: "ঠাট্টা থাক্ মিষ্টার বাক্‌চি। কি জানেন? আমাদের দেশের এটিকেটে বলে যে ছোট ছেলেমেয়েদের অতিথিকে উদ্ব্যস্ত করতে দেওয়া বড় অন্যায়। তাই আমি রিণাকে শেখাতে চাই যে—"

পল্লব আবার একটু রাগ ক'রে বল্‌ল: "তা হোক্‌গে মিসেস নর্টন। অন্ততঃ দয়া ক'রে আমার ওপর দিয়ে রিণাকে এটিকেট শেখাবেন না। আমি কিছু আপনাদের দেশের লোক নই যে আপনাদের এটিকেট-জগতে পান থেকে চুণ খস্‌লে আমি চোখে সরষের ফুল দেখ্‌ব।"

মিসেস নর্টন কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সুরে বল্লেন: "তা বল্লে কি চলে মিষ্টার বাক্‌চি! জানেন ত আমাদের জ্ঞানীরা বলেন, While in Rome you must do as the Romans do?"

পল্লব তার গাম্ভীর্য্যের চাপে মিসেস নর্টনের গাম্ভীর্য্যকে নিষ্পিষ্ট ক'রে দেবার জন্য বল্‌ল: "জানি, কিন্তু মানি না। জীবনে প্রতি পদক্ষেপে কবে কোন্ জ্ঞানী কোন্ আচরণ সম্বন্ধে কি বলেছেন সেই ভেবে চল্‌তে গেলে ত আর বাঁচা চলে না। তার চেয়ে বলুন না কেন আত্মহত্যা করা যাক্?"

মিসেস নর্টন হেসে বল্লেন: "এবার আমি হাল ছেড়ে দিলাম মিষ্টার বাক্‌চি। তবে তার আগে একটা কথা আমি বল্‌বই যে আপনাকে যতটা ভালমানুষ দেখায় আপনি আসলে ততটা ভালমানুষ নন—বিশেষতঃ ছেলে-পিলেদের আবদার দেওয়া বিষয়ে। এ বিষয়ে আপনার জুড়ি বোধহয় জগতে মেলা ভার।"

রিণা এতক্ষণ চুপ করে ছিল; কিন্তু এত বড় একটা অসত্য উক্তির প্রতিবাদ না ক'রে থাক্‌তে পার্‌ল না, বল্‌ল: "কেন মা? আইরিণের কাকা? তিনি আইরিণকে ত কত বেশি আবদার দেন? দেন না মিষ্টার বাক্‌চি? বলুন ত? আর যত শাসন মার আমার বেলায়।"

পল্লব রিণার এ গভীর অভিযোগে হাস্‌তে গিয়ে হাসি চেপে কৃত্রিম সমবেদনার সুরে বল্‌ল: "তোমার মা যে বড় দুষ্টু, এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ একমত রিণা। তবে আজকের দিনটা তোমার মার কথা শুনে একটু সকাল সকাল শুতে গেলে কাল থেকে তিনি তোমার চক্‌লেট চাওয়াতে আপত্তি কর্‌বেন না।"

রিণা লাফিয়ে উঠে ছুটে গিয়া মার গলা জড়িয়ে ধ'রে বল্‌ল: "কেমন মা কর্‌বে না ত? তাহ'লে আমি এখনই শুতে যেতে রাজি।"

মিসেস নর্টন কণ্ঠলগ্না কন্যার দুই বাহুতে দুটি চুম্বন দিয়ে বল্লেন: "কর্‌ব না গো কর্‌ব না। হ'ল? তবে একটা সর্ত্ত আছে। তুমি মিষ্টার বাক্‌চির কাছ থেকে ছাড়া আর কারুর কাছ থেকে চকলেট নিতে পারবে না। কেমন, রাজি?"

ধ্রুবের আসন্ন লাভের লোভে অধ্রুবকে এক কথায় ত্যাগ করাটা শিশুর কাছে কঠিন ব'লে গণ্য হয় না। রিণা এ প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিয়ে বল্‌ল: "রাজি। কিন্তু তুমিও এ সর্ত্ত ভুল্‌তে পাবেনা—তা ব'লে রাখ্‌ছি।"

মিসেস নর্টন গভীর স্নেহে রিণার দুই ফুল্লকমলবৎ

আরক্ত গণ্ডে দুইটি চুমা দিয়ে বল্লেন: "আচ্ছা গো আচ্ছা। এখন শোওগে যাও—good night, darling!"

রিণা তার মার গালে চুম্বন ক'রে good night mama ব'লে সোৎসাহে নিষ্ক্রান্ত হবার উপক্রম করতেই মিসেস নর্টন তাকে বল্লেন: "রিণা! চকলেট পাওয়াটাই বুঝি সব? চকলেটদাতাকে বুঝি প্রতিদানে দেবার কিছু থাকতে পারে না? নিলে দিতে হয় রিণা। নইলে আর পাওয়া যায় না।"

রিণা চকিত দৃষ্টিতে পল্লবের দিকে তাকিয়ে একটু লজ্জা পেয়ে অনুতপ্ত স্বরে বল্ল: "ও হো! ভুলে গিয়েছিলাম। মাপ করবেন মিষ্টার বাক্‌চি।" ব'লে ছুটে এসে পল্লবকে একটি চুমা দিয়ে 'good-night' ব'লে একটু অপ্রস্তুত ভাবে ঘর থেকে এক ছুটে বেরিয়ে গেল।

বিলেতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা রাত্রে শুতে যাবার সময় শুধু পিতামাতা নয়, আত্মীয় বা প্রিয় বন্ধুদেরও হয় চুমা ক'রে না হয় হস্তমর্দ্দন ক'রে রাতের মত বিদায় নিয়ে থাকে। এ প্রথাটি পল্লবের প্রথম প্রথম কেমন বিসদৃশ বোধ হ'ত। মিষ্টার টমাসের বাড়ীতে প্রথম প্রথম সে তাঁদের একাদশ বর্ষীয়া কন্যার এরূপ সম্ভাষণে বেশ একটু বিব্রত বোধ করত। কিন্তু আজকাল সে কথা মনে ক'রে তার হাসি পেত। তার মনে হ'ত বাড়ীর ছেলেমেয়েদের রাত্রে শুতে যাবার সময়ে অতিথি-বন্ধুর কাছ থেকেও এ ভাবে বিদায় নেওয়ার প্রথার মধ্যে একটা সত্য মাধুর্য্য আছে। অথচ আজকাল তার মনে হ'ত এরূপ নির্দ্দোষ সুন্দর প্রথাকেও সামান্য ঠাট্টা তামাসা ক'রেই কত অশোভন ক'রে তোলা যায়! কারণ কোনও বিদেশী প্রথাকে ঠাট্টা ক'রে ছোট প্রতিপন্ন ক'রে তোলার মতন সহজ কাজ সংসারে কমই আছে। তার মাঝে মাঝেই এ সম্পর্কে একটা কথা বিশেষ ক'রে মনে হ'ত। একবার সে তার দুই একজন ভারতীয় বন্ধুর সঙ্গে লণ্ডনে তার এক পরিচিত স্কচ বন্ধুর বাড়ীতে গিয়েছিল। তাঁর একটি ১২ বছরের গোলাপ ফুলের মতন সুন্দর মেয়ে ছিল। তার জন্য সে সেদিন এক বাক্স চকলেট নিয়ে গিয়েছিল। চকলেট দেবা মাত্র বন্ধুকন্যা তাকে ধন্যবাদ দিয়ে চুম্বন করেছিল। তাতে সে তার শত চেষ্টা সত্ত্বেও তার সহচরদ্বয়ের ঠাট্টার কথা ভেবে ভারি অস্বস্তি বোধ না ক'রেই পারে নি। অথচ আশ্চর্য্য এই যে সে ঘরে অনেক লোক থাকা সত্ত্বেও সে বালিকা মুহূর্ত্তের জন্যও ইতস্ততঃ করে নি। পল্লব ভাবত প্রথার কি আশ্চর্য্য প্রভাব!

দখিন দমকা হাওয়ার মতন রিণা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কিন্তু তার সৌরভটি ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা করত লাগল। পল্লব আর্দ্র কণ্ঠে বল্ল "আপনার মেয়েটির কি সুন্দর স্বভাব মিসেস নর্টন!...আমার রিণার ওপরে এমন মায়া প'ড়ে গেছে যে গত চার মাস ছুটির সময়ে আমি মাঝেমাঝেই তাকে স্বপ্ন দেখতাম।...কেম্ব্রিজ ছেড়ে যাবার সময়ে রিণার জন্য আমার সত্যি ভারি মন কেমন করবে।"

কন্যার প্রশংসায় জননীর মুখখানি আনন্দে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল। কিন্তু তার পরই তিনি পল্লবের বৎসর খানেক পরে ছেড়ে যাওয়ার কথা ভেবে দুঃখিত হ'য়ে বল্লেন: আপনার জন্য রিণাও প্রথমে ভারি কান্নাকাটি করবে। এ বছর খানেকের মধ্যেই ও যে আপনার কি রকম ভক্ত হ'য়ে উঠেছে তা আপনি জানেন না মিষ্টার বাক্‌চি। বলি শুনুন। সেদিন যখন ও ষ্টেশনে আপনাকে তুলে দিতে যেতে চেয়েছিল তখন আমি প্রথমে ওকে নিয়ে যেতে চাই নি। কারণ ও কোনও প্রিয়জনকে এভাবে ষ্টেশনে তুলে দিতে গেলেই বিদায়ের সময় ভারি কান্নাকাটি করে। কিন্তু এবার ও বল্ল যে কখনই কাঁদবে না। অগত্যা আমি নিয়ে গেলাম। লাল ফুলের রঙীন আশা ওকে সেদিন অনেকক্ষণ ভুলিয়ে রেখেছিল যে আপনি ট্রেণে চড়ে অনেকদিনের জন্য চ'লে যাচ্ছেন। কিন্তু যেই গাড়ী ছেড়ে দিল সেই ওর কি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না! যেন ও আপনার সঙ্গে চিরবিদায় নিল আর কি!"...ব'লে তিনি একটু হাসলেন।

পল্লব এ কাহিনী এই প্রথম শুনল। ঘরের মধ্যে মিনিট খানেক নিস্তব্ধতা বিরাজ করল। পল্লবের সমগ্র চিত্ত এক মধুর কারুণ্যে ভ'রে উঠল। তার হঠাৎ মনে হ'ল: "কেন এ মায়া বাড়ানো, যখন বছর খানেকের মধ্যেই এ মায়াকে তাকে কাটাতেই হবে!" ভাবতে ভাবতে তার হৃদয় এক বিচিত্র কারুণ্যরসে আপ্লুত হ'য়ে উঠল।

(ক্রমশঃ)

আশুতোষ

শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী

আশুতোষ টাউনহল হইতে কোন কোন ছাত্রকে গৃহে পাঠাইয়া গৃহের মহিলাগণকে নির্ভয়ে থাকিতে বলিয়া পাঠায়। আশুতোষের জননী তাহা শুনিয়া ছাত্রদিগকে বলিয়াছিলেন, স্বদেশের হিত কল্পে তাঁহার সন্তানবর্গ বন্দী হইয়া কারাগৃহে যাইলেও তিনি কিছুমাত্র ভীত বা দুঃখিত হইবেন না। সন্ধ্যা সমাগমে যুবক ছাত্রবৃন্দে পরিবৃত হইয়া "বন্দেমাতরম্" ধ্বনিতে দিগদিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া তাহারা সকলে নিরাপদে গৃহে আসিয়া পৌছিল। তখনকার সেই আন্দোলন একটা অপূর্ব্ব ঘটনা। আশুতোষ নির্ভীক ভাবে ন্যায়-পথে দাঁড়াইয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে একান্ত ভাবে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিল। ন্যায়-ধর্ম্মে যাহা করা কর্ত্তব্য, তাহা করিতে সে কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ হয় নাই। মাননীয় ৺অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি যখন নির্ব্বাসন দণ্ড পান, সে সময় না কি আশুতোষেরও নাম তাঁহাদিগের মধ্যে ছিল। আশুতোষ এমন কোন কাজই করে নাই, যাহার জন্য তাহাকে রাজবন্দী করিতে পারে।

যে সময় Universityর নাম হয় "গোলামখানা" এবং অনেক কৃতী ছাত্র সর্ব্বপ্রকার পরীক্ষা দিতে পরাঙ্মুখ হইয়া বসিয়াছিলেন, তৎকালে আশুতোষ তাঁহাদের গৃহে গৃহে যাইয়া ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা রূপ সুপরামর্শ দানে তাঁহাদিগকে দিয়া পুনর্ব্বার পরীক্ষা দেওয়াইয়াছিল। সে সব স্মরণীয় দিন বঙ্গমাতার স্মৃতি-পটে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। আশা করা যায়, সেদিনের সে সব ছাত্রগণও তাহা বিস্মৃত হন নাই। তৎকালে চতুর্দ্দিকে নানারূপ গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায়, এক রবিবারে ডক্ হইতে ৩০০—৪০০ কুলী "বন্দেমাতরম" গাহিতে গাহিতে আশুর গৃহে আসিয়া সাহায্য ভিক্ষা করে। তাহারা দুই দিন অনাহারে থাকিয়া এই মহা নগরীর কাহারো নিকট সহানুভূতি পায় নাই। আশু তৎক্ষণাৎ সেই ক্ষুধাতুর কুলীদিগের আহার্য্য চিঁড়া দই গুড় ইত্যাদি আনাইয়া সবাইকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করায়। তাহার পরিবারের মহিলাগণই এই বুভুক্ষিত শ্রান্ত অতিথিগণকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন।

বিলাতে শ্রমিকরা strike করিলে তাহাদিগের আহারের জন্য প্রচুর অর্থ থাকায়, কাহারও অন্ন বস্ত্রের কষ্ট হয় না; কিন্তু এই দুর্ভাগা দেশে এমনি অন্ন মিলা ভার! তাহার উপরে strike করিলে কুলী মজুরের ক্ষুধার জ্বালায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ান ছাড়া উপায় নাই। শাস্ত্রে অবিচারে ভিক্ষা দানের বিধি আছে। এ মহাবাক্য কেহ প্রতিপালন করে না। কাজেই শ্রমিকরা strike করিলে, তাহাদের পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতে হয়।

আশু সেই সকল ব্যক্তিকে নানা প্রকারে বুঝাইয়া ও সাধ্যমত সামান্য কিছু কিছু দিয়া কার্য্যক্ষেত্রে পাঠাইয়া দেয়। অবস্থার উন্নতির সহিত আবার Circular Roadএর বাসা বাটী ত্যাগ করিয়া আশুতোষ ১৬নং Store Road বালীগঞ্জে উঠিয়া আইসে; এবং নিজের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য স্থান অন্বেষণ করিতে করিতে স্যার তারকনাথ পালিতের বাগান ক্রয় করিয়া লইল। সে গৃহ নির্ম্মাণ করিবার ভিত্তি স্থাপন নিজ হস্তেই করিয়াছিল। সে গৃহের নক্সা তাহার নিজের। তাহার পরম হিতৈষী অকৃত্রিম বন্ধু ৺শ্রীদামচন্দ্র শীল এই গৃহ নির্ম্মাণের পর্য্যবেক্ষণ কার্য্যে সতত নিযুক্ত থাকিয়া সকল কাজ করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীদামবাবু আশুকে বড় স্নেহের চক্ষে দেখিতেন; আপদ বিপদে অনেক সাহায্যও করিয়া-ছিলেন। তাঁহার উপকার জীবনে ভুলিবার নহে। আশুও প্রতিদানে সমুচিত প্রত্যুপকার করিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইতে ত্রুটী করে নাই। বালীগঞ্জে Sunny Parkএর বৃহৎ সুদৃশ্য প্রাসাদ তুল্য বাটী নির্ম্মিত হইলে আশু সপরিবারে স্থায়ী ভাবে সেই বাড়ীতে বাস করিবার জন্য উঠিয়া আসিয়াছিল। ১৬ নম্বর গৃহে তাহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র দিব্যকান্তি (দেবকুমার) "দেবুর" জন্ম হয়। ঐ গৃহেই মাতৃস্বসা লোকান্তরে গমন করেন। সুতরাং সে গৃহের সহিত সুখ-দুঃখের স্মৃতি বিজড়িত। এই সময় আশুর স্বাস্থ্য উত্তম ছিল; উপার্জ্জন, উৎসাহ ও উদ্যমশীলতা অসাধারণভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। তাহার Sunny Park-এর বাটীর বিচিত্র আসবাব (Furniture) সকল স্বদেশ-জাত। কত দেশ-দেশান্তর হইতে বহু অর্থে সেসব আনাইয়া সে গৃহ সজ্জিত করিয়াছিল। সে গৃহের প্রত্যেক দ্রব্য স্বদেশী। স্বদেশানুরাগে প্রণোদিত হইয়া সে যখন যেখানে গিয়াছে, সেই স্থানের সব সুন্দর সুন্দর দ্রব্যাদি আনিয়া সযত্নে রক্ষা করিয়াছে। তৎকালে জাপানীরা অনেক ভাল ভাল চিত্র তাহার জন্য প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। এখন তাহা দুর্লভ ও বহু মূল্যবান।

পিয়ারী

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল

২০

অমল পাগলের মত একেবারে পথে আসিয়া দাঁড়াইল। চলিয়াছে তো চলিয়াছেই; বুকের মধ্যে এমন চঞ্চলতা... বহুদূর আসিয়া সে ভাবিল, তাইতো, এ সে কোথায় চলিয়াছে! চপলা—চপলার বাড়ী তো সে জানে না—কোথায় সে থাকে! কাকেই বা জিজ্ঞাসা করিয়া তার ঠিকানা জানিবে!

কিন্তু সে আসিয়া তার সেবায় অমন করিয়া প্রাণ-মন লুটাইয়া দিল যে,—হঠাৎ আজ তার অন্ধতা ঘুচিলে চলিয়া গেল কেন?...ঠিক, পাপিয়ার কাজ! এই দুর্বৃত্তা নারী নিজের স্বার্থের জন্য নিশ্চয় তাকে এমন কিছু বলিয়াছে,—বা হয়তো কোন ভয় দেখাইয়াছে—যার জন্য বেচারী সে,—এখান হইতে সরিয়া গিয়াছে!...সে তো জানে এই নারী—তাকে গ্রাস করিবার জন্য কি তার ব্যাকুলতা! প্রলোভনেরও কসুর করে নাই! সেই আংটী ফেলিয়া যাওয়া—সেই তার ঘরে সকাতর মিনতি।..পাগল! চপলার পাশে পাপিয়া!...সে কি নারীর লাবণ্য, কি তার যৌবনশ্রীর জন্যই মুগ্ধ হইয়াছিল,—সে গুণের পক্ষপাতী—চপলার মধ্যে সে যা দেখিয়াছে, ষ্টেজে তার—অসাধারণ কৃতিত্ব—তার জন্য শ্রদ্ধা তো ছিলই—তার উপর তার এই অসহায় অন্ধতায় নিজেকে বলি দিয়া এই যে প্রাণপণ সেবা—বিশ্বের ইতিহাসে যে তার তুলনা নাই!

অমল তবু চলিয়াছে, চলার তার বিরাম নাই।...হঠাৎ তার মনে হইল, ঠিক, সে তো পাপিয়ার বাড়ী জানে! সেইখানে গিয়া কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলে চপলার ঠিকানা নিশ্চয় মিলিবে। ঠিক!—

অমল গিয়া পাপিয়ার বাড়ীতে উঠিল।...সামনে একটা ভৃত্য বসিয়া ছিল—তাকে জিজ্ঞাসা করিল, চপলা বিবির বাড়ী জানো?

জানি। বলিয়া সে একদিকে সঙ্কেত করিল। অমল একটু থামিল, একটা ফিকির তার মাথায় আসিল। সে বলিল, আমায় পাপিয়া বিবি পাঠিয়েছে একটা দরকারে,—তুমি বাড়ীটা দেখিয়ে দেবে চল!

পাপিয়ার কথা শুনিয়া ভৃত্য উঠিল, এবং তার সঙ্গে গিয়া বাড়ী দেখাইয়া দিল।

এই বাড়ী...তার কামনার মন্দির!...আঃ...মন তার উত্তেজনায় ভরিয়া উঠিল—চপলা, চপলা, আমি আসিয়াছি, আমি অকৃতজ্ঞ নই—তোমার সেবা, তোমার মহত্ত্বের মূল্য আমি বুঝি,—তাই তোমাকে আজ প্রাণের কৃতজ্ঞতা জানাইতে আসিয়াছি।

কম্পিত বুকে সে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিল। সামনের একটা ঘরে খুব কলরব চলিয়াছে!...উচ্ছ্বসিত আনন্দ বুকে লইয়া প্রদীপ্ত সস্মিত-চোখে অমল সে ঘরে ঢুকিল, ডাকিল, চপল—এ কি...একরাশ লোক মদের নেশায় আচ্ছন্ন, আর তাদের মাঝখানে আলু-থালু বেশে...ঐ নারী...চোখ জবাফুলের মত রাঙা, মাথার কেশরাশি বিস্রস্ত—হাতে কাঁচের গ্লাসে তরল পানীয়,—অমল শিহরিয়া থামিয়া পড়িল, এই চপলা...? এই তো সেই ষ্টেজের সীতা...

চপলা কহিল—কে তুমি চাঁদ?...মাঝ গগনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লে যে...চলে এসো...

এ যে স্বপ্ন, স্বপ্ন, ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন...না, না, এই তো অমল জাগিয়া—শুধু পায়ের নীচে মেঝেটা দুলিতেছে—

সঙ্গীর দল কহিল—কে তুমি হতভম্বরাম?...কি চাও?

তাদের পানে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া চপলার পানে চাহিয়া অমল কহিল,—আমায় চিনতে পারছো না চপল?

চপলা গ্লাসের তরল পদার্থটুকু গলায় ঢালিয়া আরক্ত-ঘূর্ণিত চোখে কহিল,—না, কে বট তুমি? বলিয়াই উঠিয়া সুরের ভঙ্গীতে কহিল,—

তুমি কে বট হে
আমারি দুয়ারে আস কি নিতি হে
কোন্ শঠ নট হে···

এ কি এ...অমলের চোখের সামনে হইতে বিশ্বের যা কিছু আলো কোথায় উবিয়া গেল, সমস্ত পৃথিবীটার গায়ে কে যেন নিমেষে কালো কালি লেপিয়া দিল!

চপলা টলিতে টলিতে অমলের পানে অগ্রসর হইয়া আসিল। অমল তীব্র দৃষ্টিতে তাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। খানিক আগাইয়া আসিয়া চপলা কহিল,—না বাবা! প্রণাম করছি, চিনতে পারলুম না...হায়!

অমল কহিল,—মনে পড়চে না···অন্ধ অসহায় আমাকে কাশীপুরের জীর্ণ ঘরে কি সেবায় তুমি আরাম করে তুলেছ!...

একটা কুৎসিত কথা বলিয়া চপলা অমলের গালে ঠোনা মারিল, পরে কহিল,—

তুমি যাও হে চলে,

কোনো ছলে পাবে না হে ঠাঁই—বলিয়া এমন অট্টহাসি হাসিল, সে যেন বাজের হুঙ্কার!···তার পর কহিল, তোমাকে কখনো দেখেচি বলে তো মনে পড়ে না...

সঙ্গীর দল সেই হাস্যধ্বনিতে ফিরিয়া চাহিল, কহিল,—ব্যাপার কিগো ?

চপলা তাদের পানে ফিরিয়া চাহিয়া কহিল,—এসেছে, নতুন নাগর···এর রঙ্গর কথা শোনো—বলেন অন্ধ অসহায়, সেবায় সুখী করেছ—

একজন সঙ্গী বলিল—অন্ধ নাগর তো এখানে কেন বাবা? নিজের পথ ত্যাখো

এ কথার পর অমল দমখাওয়া চেতনহীন পুতুলের মত টলিতে টলিতে নামিয়া আসিল,—আঁধার, আঁধার—চারিদিকে ঘনীভূত আঁধার...নীচে নামিয়া কোনমতে বাহিরের পথে আসিয়া সে নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল,—আঃ—সে যেন এতক্ষণ জ্বলন্ত গৃহে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, সে আগুণের জ্বালা এখনো তার সর্ব্বাঙ্গে লাগিয়া।

দিক্‌ভ্রান্তের মত সে চলিয়াছিল, হঠাৎ কে ডাকিল, বাবু···

অমল বাধা পাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।...কে?

সে কহিল,—আমি আপনাকে হাঁসপাতাল থেকে নিয়ে যাই...কাশীপুরের বাড়ীতে।

অমল সবিস্ময়ে কহিল,—তুমি?

লোকটা কহিল,—আমি পাপিয়া বিবির চাকর।

পাপিয়া বিবি! অমল আকুল-প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে তার পানে চাহিল।

লোকটা কহিল,—বিবির কথায় ডাক্তারবাবুকে নিয়ে গেছলুম আপনার চোখ সারাতে।

পাপিয়া!···

অমল কহিল,—তোমার বিবি কোথায়?

সে কহিল—যতদিন আপনার অসুখ, তিনি তো আপনার ওখানেই—আমিও ছিলুম; তা এখানে চৌকি দেবে কে—তাই বিবি বললেন, খুব দরকার পড়লে তুই সেখানে যাস, নইলে এখানেই থাক। তা আপনি···এধারে এসেছিলেন চোখ বেশ সেরে গেছে তো? আবার কাশীপুরেই যাচ্ছেন?

অমলের মাথা ঘুরিয়া গেল! এ সেবা, এ যত্ন পাপিয়ারই তবে? আর তাকে সে কি নিষ্ঠুর আঘাত করিয়াছে! ওরে অকৃতজ্ঞ, ওরে বেইমান!

কিন্তু চপলার নাম লইল কেন?

ঠিক···সে তো জানে চপলার প্রতি কি অন্ধ অসীম তার অনুরাগ!···ছি ছি! চপলা তো ঐ—পাপিয়া তো সত্য বলিয়াছে—

সে কহিল—তোমার বিবিও কি এসেছে?

সে কহিল—না। তিনি তো কাশীপুরেই—আপনি কখন বেরিয়েছেন?

অমলের মনে আগুন জ্বলিল। সে তাড়াতাড়ি একটা ট্যাক্সি করিয়া কাশীপুরের দিকে ছুটিল। গাড়ীতে উঠিবার সময় লোকটাকে বলিল,—যদি বিবি এর মধ্যে ফেরেন তো তাঁকে থাকতে বোলো—আমি কাশীপুর হয়ে এখানে আসবো। তাঁকে দরকার আছে—ভারী দরকার।

লোকটা অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল! ট্যাক্সি অমলকে লইয়া ছুটিল।

কাশীপুরে......ট্যাক্সি হইতে নামিয়া অমল ঊর্দ্ধশ্বাসে নিজের জীর্ণ গৃহের পানে ছুটিল।—পাপিয়া...পাগলের মত সে ডাকিল···পাপিয়া...

ঘরে…নাই, নাই—কোথায় গেল পাপিয়া?…… আশঙ্কায় তার বুক যেন দশ হাত বসিয়া গেল। সে ক্ষিপ্তের মত বাড়ীর পিছনে নদীর ধারে আসিল—ঐ কে…পাপিয়া …সে চমকিয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া ডাকিল পাপিয়া— …চারিদিকে চাহিয়া দেখিল…

…ঐ না,…ঐ…ঐ চাতালে উপুড় হইয়া পড়িয়া…

অমল ছুটিয়া চাতালের ধারে গেল—ঠিক.. পাপিয়াই তো…

অমল ডাকিল—পাপিয়া…

পাপিয়া ফিরিয়া চোখ চাহিল,—অমল অমনি একেবারে তার পাশে বসিয়া তার হাতটা টানিয়া নিজের হাতের মধ্যে লইল, কহিল—আমায় মাপ কর পাপিয়া।

পাপিয়ার চোখ বিস্ফারিত হইয়া উঠিল—সে কি জাগিয়া…হাঁ, জাগিয়াই তো—! আর তার সামনে—

অমল কহিল—আমায় মাপ কর। আমি শুধু চক্ষু বুচিয়েই অন্ধ ছিলুম না, আমার মনও অন্ধ ছিল…আমাব অকৃতজ্ঞতার জন্য মাপ কর পাপিয়া।…

পাপিয়া শুধু অমলের পানে চাহিয়াই রহিল। অমল তার হাতদুটা ধরিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল,—এই সেবা, এই যত্ন—কি উপেক্ষারই বদলেই তুমি ধরে দেছ!… অন্ধ কাঙালের কাছে কোন কিছুর প্রত্যাশা না করে রাজার ঐশ্বর্য্য ফেলে এই দারিদ্র্য দীনতা বরণ করা—এ যে দেবীও পারে না…পাপিয়া! আর আমি তোমায় কথার বিষে জর্জ্জরিত করেছি, লাঞ্ছনার আঘাতে চূর্ণ করেছি…বল! আমায় মাপ করবে…? তার পর মৃদু হাসিয়া কহিল,—জানি মাপ করবে।…তুমি তো আমায় চেনো . আমি অন্ধ যে…

পাপিয়া কহিল,—এ কথা কেন বলছো…?

অমল কহিল,—কেন বলছি! তুমি যা বলেছ, চপলা যে কত বড়—

—যাক সে কথা! পাপিয়া কহিল,—এখন আমায় তা'হলে হাসি মুখেই বিদায় দিলে তো…! একটু মিষ্ট কথায়—

বিদায়!…অমল আবেগে পাপিয়াকে বুকের মধ্যে টানিয়া কহিল—তোমায় বিদায় দেবো!—তা হয় না পাপিয়া,—তুমি আমার অন্ধতার সুযোগ পেয়ে যে সেবার স্পর্শে ক্ষণে ক্ষণে আমায় প্রলুব্ধ বিহ্বল করেছ, আজ দৃষ্টি পেয়ে আমি যে তা সব শোধ দেবো। তোমার কাছে ঋণী থাকবো না আমি ..

পাপিয়া প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে অমলের পানে চাহিল।

অমল কহিল,—বুঝচো না?…অর্থাৎ যে অন্ধকে দৃষ্টি দিয়ে তাকে নতুন মানুষ করে তুলেছ তাকে দেখার সব ভার তোমারই যে! যত্নে আদরে আমাকে এমনি তোমার উপর নির্ভরতা শিখিয়েছ যে আশ্রিতা লতার মত তোমার ঐ সেবা যত্ন ধরেই আমি আজ দাঁড়িয়ে আছি। এ আশ্রয় সরিয়ে নিলে আমি সেই মুহূর্ত্তে পড়ে যাবো!…হেঁয়ালি থাক, পাপিয়া—এসো, পূর্ণ নব জীবনের সঙ্গে সঙ্গে আজ তোমার প্রেমের অভিষেক গ্রহণ করি। আজ থেকে আমরা দুয়ে মিলে এক…

পাপিয়া বাধা দিয়া বলিল—কিন্তু আমি যে কলঙ্কিনী গণিকা,—সমাজের আবর্জ্জনা—

অমল কহিল—সমাজ তোমায় জানে না! যে তোমার প্রাণের পরিচয় পায়নি, সে আবর্জ্জনা ভাবতে পারে। কিন্তু যে তোমার এ প্রাণের পরিচয় পেয়েছে সেই জানে তুমি কোহিনুর—সমাজের মাথার মুকুটমণি হয়ে বসতে পারো…! অতীত কলঙ্ক সে তো বাইরের ময়লামাত্র… এ উদারতা এ সেবাতেও যদি তা ধুয়ে মুছে না গিয়ে থাকে তাহলে বুঝবো পৃথিবীতে সেবায় কোন পুণ্য নেই।… বড় বড় মহাপাতকেরও প্রায়শ্চিত্ত আছে—আর তোমার কবেকার খেয়ালে করা দুটো তুচ্ছ খেলা, তার মার্জ্জনা নেই!…কলঙ্ক পাপ এ সব বাইরের জিনিষ, তোমার যে মহত্বে চরিত্রের যে মাধুর্য্যে সে সব বাইরের ময়লা সাফ হয়ে তোমার ভিতরকার খাঁটী-মানুষটি আজ সামনে দেখছি,… অমল নীরব হইল, মুগ্ধ দৃষ্টিতে পাপিয়ার পানে চাহিল; পাপিয়া গৌরবের লজ্জায় শির নত করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। অমল সাদরে তার চিবুক ধরিয়া তুলিল, তুলিয়া তাকে বুকের মধ্যে টানিয়া বলিল, পাপিয়া, তা ঐ, গঙ্গার জলের মতই শুভ্র অনাবিল, নির্ম্মল—অমনি পুণ্যে উচ্ছ্বসিত!…

সরমে বাঁকিয়া পাপিয়া কহিল,—ও কি বলছে গো। আমি…আমার মত দুর্ভাগিনী যে পৃথিবীতে নেই—খালি ভাবি এই নারীত্বকে আমি পণ্য করে বাজারে ধরেছিলুম—

অমল কহিল,—সে গ্লানি ধুয়ে সাফ হয়ে গেছে। তুমি তোমার মন দেখতে পাচ্ছ না, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি, নবজীবনের তেজে, পুণ্যে সে মন সমুজ্জ্বল, শিশুর চিত্তের মতই তা নির্ম্মল সরল! এখন আমায় ক্ষমা করেছ তো একটা অনুমতি দাও...

পাপিয়া মুখ তুলিয়া কহিল, কি?

অমল কহিল,—তোমায় পত্নীত্বে বরণ করে আমার এই অকৃতজ্ঞতার মহা কলঙ্ক থেকে মুক্তি পাই!

পাপিয়া কহিল—ছি—

অমল কহিল, সমাজের ভ্রূকুটির ভয় করছো। বলেছি তো, সমাজ তোমার কতটুকু জানে, কিন্তু আমি জানি তুমি এ সমাজের মুকুটমণি হবার যোগ্য। তোমায় মাথায় নিলে হিংসায় জর্জ্জরিত এই জীর্ণ গলিত পচা সমাজও ধন্য কৃতার্থ হয়ে যাবে!

অমল পাপিয়াকে আবার বুকের মধ্যে টানিয়া লইল, তার পর তার মাথায় হাত রাখিয়া আবেগভরা মৃদু স্বরে ডাকিল—পাপিয়া,—পাপিয়া—

পাপিয়ার কাণে সে স্বর স্বর্গের এক অজানা ছন্দে কি গানই যে তখন গাহিতেছিল...আনন্দের উত্তেজনায় তার বুক সঘন কম্পিত হইতেছিল।

মাঝ গঙ্গায় একটা পান্সী ভাসিয়া চলিয়া ছিল। পান্সীতে বসিয়া হারমোনিয়ম বাজাইয়া কে এক সৌখীন ছোকরা গাহিতেছিল—

...জাগো নবীন গৌরবে,
নব বকুল-সৌরভে,
মৃদু মলয় বীজনে
জাগ নিভৃত নির্জ্জনে।...

শেষ

শিল্পী—শ্রী[illegible]

যশোহর.

শ্রীসুজননাথ মিত্র মুস্তৌফী

(আলোক-চিত্র—শ্রীললিতাপ্রসাদ দত্ত এম-আর-এ-এস্ মহাশয়ের সৌজন্যে।)

(২)

আমরা ঈশ্বরীপুরের পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত হইয়া দারুণ উৎকণ্ঠা হইতে পরিত্রাণ পাইলাম। কারণ, এই দিবস নগ্ন পদে বার বার নদী ও খালের জল ও কর্দ্দম অতিক্রম করিতে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছে। শুনা ছিল যে, হুগলী জেলার কোন গ্রামের ত্রৈলোক্য বাবু নামক এক ব্যক্তির বাটীর সম্মুখে একটি ভয়াবহ কর্দ্দমের দহ ছিল। উহার মধ্যে জীব-জন্তু পড়িয়া গেলে সহজে উঠিতে পারিত না; একাধিক গবাদি পশু উহাতে জীবন হারাইয়াছে। লোকে সেই কর্দ্দমের দহকে "ত্রৈলোক্য কাদা" আখ্যা দিয়াছিল। এই দুই দিবস আমরা যে কর্দ্দম অতিক্রম করিয়াছি, তাহা "ত্রৈলোক্য কাদার" সহিত সমকক্ষতা করিতে পারে।

ঈশ্বরীপুর গ্রামের মধ্য দিয়া ৺যশোরেশ্বরীর বাটীর উত্তর দিকের সদর দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। তখন বেলা ৪টা হইয়াছে। এই দিনটি শনিবার হওয়ায় ৺যশোরেশ্বরীর পূজা দিতে অনেকগুলি যাত্রী আসিয়াছেন এবং দেবীর সম্মুখে কয়েকটি পাঁঠা বলি হইয়াছে। বাবু শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের যত্নে আমরা এই ঠাকুর-বাটীর পশ্চিম দিকের দ্বারের উত্তর দিকে একটি দ্বিতল প্রকোষ্ঠে আশ্রয় পাইলাম।

ঈশ্বরীপুর—৺যশোরেশ্বরীর বাটীর প্রবেশ-দ্বার।

যশোরেশ্বরীর পূজা-বাটী ঈশ্বরীপুর গ্রামের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহা চতুষ্কোণ, প্রাচীর-বেষ্টিত ও সুবৃহৎ। এই বাটীর চারিদিকে চারিটি দ্বার আছে। উত্তরদিকের দ্বারটি যে ইংরাজের আমলে সংস্কৃত হইয়াছে, তাহা দেখিয়াই বুঝা

যায়। ইহাই এক্ষণে প্রধান দ্বার এবং ইহার বহির্দ্দেশে ঈশ্বরীপুরের ক্ষুদ্র বাজার আছে। এই পূজা-বাটীর প্রত্যেক দিকের দ্বার সেই দিকের মধ্যস্থলে অবস্থিত আছে। পশ্চিম দিকের দ্বারের দুই পার্শ্বে এবং উপরে দ্বিতলে যে প্রকোষ্ঠগুলি ছিল, এখন তাহাদের অধিকাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই দ্বারের উত্তর দিকে নীচের তলায় দুইটি প্রকোষ্ঠ ও তদুপরি একটি দ্বিতল প্রকোষ্ঠ আছে, তথায় বিদেশ হইতে সমাগত ভদ্র অতিথিগণ আশ্রয় প্রাপ্ত হন। আমরা এই দ্বিতলের প্রকোষ্ঠে আশ্রয় পাইয়াছিলাম। এই প্রকোষ্ঠে প্রতাপাদিত্যের কীর্ত্তি-চিহ্ন—নানা প্রকার নক্সা ও কারু-কার্য্য-বিমণ্ডিত ইষ্টক, শঙ্খ, প্রস্তরময় এবং লৌহ নির্ম্মিত কামানের গোলা, মৃন্ময় পাত্রের ভগ্নাবশেষ, কুম্ভীরের মস্তকের হাড় প্রভৃতি যাহা ঈশ্বরীপুরের মৃত্তিকা-গর্ভে পাওয়া গিয়াছে তাহার, এবং প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে পুস্তক ও প্রবন্ধাদির একটি ক্ষুদ্র প্রদর্শনী (museum) আছে। ইহা একমাত্র শ্রীশ বাবুর চেষ্টার ফল। এই প্রকোষ্ঠের পার্শ্বে দ্বিতলে একটি নহবতের ঘর ছিল; তাহা এক্ষণে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পশ্চিমের দ্বারের উপরে যে দ্বিতল প্রকোষ্ঠের ভগ্নাবশেষ আছে, ঐ স্থানে পূর্ব্বে বৈঠকখানা ছিল। উহার পূর্ব্ব দিকে যে বারান্দা ছিল, তাহার কয়েকটি যোড়া থাম এখনও আছে। পশ্চিম দ্বারের দক্ষিণ দিকে যে দ্বিতল গৃহ ছিল, উহার নীচের তলার তিনটি প্রকোষ্ঠের ও তদুপরিস্থ পূর্ব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ একটি প্রকোষ্ঠের দেওয়াল মাত্র দণ্ডায়মান আছে। পশ্চিম দিকের এই দ্বিতল প্রকোষ্ঠগুলির নীচে দিয়া উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ একটি অপ্রশস্ত গলি-পথ আছে। উহা দ্বারের উত্তর ও দক্ষিণ দিকের নীচের তলার প্রকোষ্ঠগুলিকে পূর্ব্ব-পশ্চিমে সমভাগে বিভক্ত করিয়াছে। এই গলি-পথের ও দ্বারের মধ্যে প্রবেশ করিবার পথের সঙ্গম-স্থলের দক্ষিণ-পশ্চিম-কোণায় সাধুদিগের থাকিবার জন্য অতিথিশালা ছিল, এক্ষণে উহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের "Smythe's Report of 24 Perganahs" নামক গ্রন্থে পশ্চিমের এই দ্বারটিকে প্রধান দ্বার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই দ্বার দিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলে, সম্মুখে উঠানে একটি মহিষ-বলির ও একটি পাঁঠা-বলির জন্য হাড়িকাঠ পোতা আছে দেখা যায়। এখানে পাঁঠা প্রত্যহ বলি হয়। যাত্রীগণ মানসিকের জন্য কদাচ কখন মহিষ বলিও দিয়া থাকেন। হাড়িকাঠের পূর্ব্ব দিকে ও বাটীর মধ্যস্থলে পাকা নাটমন্দির আছে। কালুতলা গ্রামনিবাসী গোপ জাতীয় বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষ নিজ ব্যয়ে এই নাটমন্দির ও ইহার তিন দিকের টিনের ছাদযুক্ত বারান্দা তৈয়ার করাইয়া দিয়াছিলেন। নাটমন্দিরের পশ্চিম প্রান্তের রোয়াকের যে অংশ হাড়িকাঠের সম্মুখে অবস্থিত, উহা বহু দিনের সঞ্চিত বলিদানের রক্তে মসীবর্ণ ধারণ করিয়াছে। নাটমন্দিরের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে ৫টি করিয়া খিলান-করা ফোকর আছে। নাটমন্দিরের উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে বারান্দা আছে, কিন্তু বারান্দার ছাদ নাই। বারান্দাগুলির বহির্দ্দেশে ছাদের ভার বহনের জন্য চতুষ্কোণ থাম আছে। উত্তর-দক্ষিণ দিকে ৮টি করিয়া ১৬টি এবং পশ্চিম দিকে দুইটি থাম আছে। নাটমন্দিরের ভিতরে উত্তর-পূর্ব্ব কোণায় দেওয়ালের গাত্রে তাম্রের ফলকে সংস্কৃত ভাষায় কিন্তু বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা আছে :

শ্রীশ্রীকালী

" ধরাগ্ন্যদ্রিধরা মানে শাকে শ্রীকালিকা পুরীং
" নির্ম্মায় চৈতলী চট্ট বংস পৌরন্দরো মহান্
" বলরাম ক্ষিতি সুরঃ সমর্প্যাকিঞ্চনে ময়ি
" বিভবঞ্চাপি তৎসেবা মানন্দ ভুবনং যযৌ ॥
" তদগ্রজ সুতঃ শ্রীমান্ কালী কিঙ্করঃ ভূসুর
" লিলেখৈত দরিরস সিন্ধুচন্দ্র মিতে শকে।"

অর্থাৎ ১৭৩১ শকে = ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে চৈতলী চট্ট বংশীয় পুরন্দরের সন্তান বলরাম নামক ব্রাহ্মণ এই কালী-বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দেবীর পূজার ভার স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র কালীকিঙ্করের হস্তে অর্পণ করিয়া পরলোকে গমন করেন। কালীকিঙ্কর এই ফলক ১৭৭৬ শকে = ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত করেন।

নাটমন্দিরের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণায় দেওয়ালের গাত্রে অন্য একটি পিত্তলের স্মৃতি-ফলকে লেখা আছে :—

" শ্রীশ্রীকালিকা

" বঙ্গাব্দ বারোশ শোল শাল পরিমাণ,
" শ্রীমহাকালিকাপুরী করি সুনির্ম্মাণ,

"চৈতলীয় চট্টবংস পুরন্দর সন্তান,
"ক্ষিতিশ্বর বলরাম মহামতিমান
"যে কিছু বিষয় সেবা অধমে অর্পিত
"আনন্দে আমন্দ ধামে আছেন বসিত
"তাঁহার জ্যেষ্ঠের সুত শ্রীকালীকিঙ্কর
"বারো শ একান্ন শালে লিপিতত: পর।"

নাটমন্দিরের উত্তরে উঠান, উঠানের উত্তর দিকে পূজাবাটীর আধুনিক সদর দ্বার। এই সদর দ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলে দ্বারের দুই পার্শ্বে প্রত্যেক দিকে দুইটি করিয়া একতালা প্রকোষ্ঠ আছে। নাটমন্দিরের দক্ষিণ দক্ষিণের দ্বার, তৎপরে পশ্চিমের দ্বার এবং সর্ব্বশেষে উত্তরের দ্বার প্রধান দ্বার রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

নাটমন্দিরের সহিত সংলগ্ন ভাবে পূর্ব্ব দিকে ছাদে কড়ি-বরগা দেওয়া ৺যশোরেশ্বরীর একতলা কোঠা ঘর আছে। এই কোঠাঘরের পশ্চিমদ্বারী বড় প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থলে ইষ্টক নিম্মিত বেদীর উপরে ৺যশোরেশ্বরী কালীর মূর্ত্তি আছেন। দেবীর মস্তকের উর্দ্ধদেশে ছাদের উপরে ধূম নির্গমনের স্থানের ন্যায় একটি ফোকরযুক্ত গাঁথনি আছে, ইহাকেই চূড়া বলা হয়। কথিত আছে যে, "দেবী জ্বালাময়ী। যতবার দেবীর মন্দির করিয়া দেওয়া হইয়াছে, ততবার

বংশীপুর—প্রাচীন দুর্গ মধ্যস্থ সমতলভূমি—এক্ষণে যাহাকে কেহ কেহ চাঁদবাযের দীঘি কহে

দিকে একটি উঠান আছে। উহার পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে রোয়াকযুক্ত ঘর আছে। এই উঠানের দক্ষিণে পূজাবাটীর দক্ষিণ দিকের বৃহৎ দ্বার আছে, উহা উত্তর দিকের সদর দরজার ঠিক সম্মুখে অবস্থিত। দক্ষিণ দিকের দ্বারের পূর্ব্ব পার্শ্বে দুইটি প্রকোষ্ঠ ও পশ্চিম দিকে তিন ফোকরযুক্ত একটি দালান বা বারান্দা আছে। Smythe সাহেবের পূর্ব্বোক্ত রিপোর্টে দেখা যায় যে, তিনি দক্ষিণ দিকের একটি দ্বারের ধ্বংসাবশেষের কথা লিখিয়াছেন এবং উহাই যশোরেশ্বরী পশ্চিমাস্যা হইবার পূর্ব্বে প্রধান দ্বার ছিল। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, সর্ব্ব প্রথমে উহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সেই কারণে জ্বালা নির্গমনের জন্য এই ফোকরযুক্ত এই গাঁথনি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উহা দেখিতে Sky lightএর ন্যায়। দেবীর প্রাচীন ভগ্ন মন্দিরের শিখরদেশের লৌহচক্র ভগ্নস্তূপ হইতে উদ্ধার করিয়া এই গৃহের চূড়ায় স্থাপিত হইয়াছে। দেবীর বর্ত্তমান গৃহের সন্নিকটে দেবীর প্রাচীন ভগ্ন মন্দিরের গাঁথনি এখনও আছে; ইহা "খুলনা ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে" লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৺যশোরেশ্বরীর কৃষ্ণ-প্রস্তর-নির্ম্মিত বদনমণ্ডল মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। উহা বিশাল ও ভীষণ। দেবীর

মুখবিবর হইতে অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত দীর্ঘ রক্তবর্ণে রঞ্জিত সুবর্ণনির্ম্মিত জিহ্বা বাহির হইয়াছে; কিন্তু অন্যান্য কালী-মূর্ত্তির ন্যায় জিহ্বার উপরে উপরের দন্তপাটি স্থাপিত নাই; অর্থাৎ দেবী দন্ত দ্বারা জিহ্বা কাটিয়া নাই। জিহ্বার উর্দ্ধদিক হইতে কণ্ঠের ভিতর দিকে কণ্ঠনালীর ন্যায় একটি গর্ত্ত চলিয়া গিয়াছে। তাহাতে মূর্ত্তিটি দেখিতে আরও ভয়াবহ

ঈশ্বরীপুর—৺গঙ্গাদেবী

হইয়াছে। দেবীর মুখবিবর রক্তবর্ণ। দেবীর আয়ত লোচনের শ্বেতাংশ অযত্নে অপরিষ্কার হইয়াছে। দেবীর মুখমণ্ডল দেখিতে কতকটা ৺কালীঘাটের কালীর ন্যায়। দেহের অন্যান্য অংশ শিলাখণ্ড মাত্র, উহার কোন অবয়ব নাই। উহার উপরে ফুলদার রক্তবর্ণের বেনারসী শাড়ী হয়, যেন দেবী বেদীর উপরে বসিয়া আছেন। দেবীর হস্ত-পদাদি কিছুই নাই। দেবীর ললাটে সোণার মুকুট। তাহার কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে অপেক্ষাকৃত বড় একটি রৌপ্য মুকুট আছে। দেবীর বেদীর চারি কোণায় চারিটি দণ্ড আছে, তাহার উপরে চন্দ্রাতপ আছে। চন্দ্রাতপের মধ্যস্থল টানিয়া উপর দিকে তুলিয়া বাঁধিয়া দেওয়ায়, উহা দেখিতে তাম্বুর চূড়ার ন্যায় হইয়াছে। দেবীর সম্মুখে বেদীর নীচে ঘরের মেঝেয় একখণ্ড চৌকা শ্বেত প্রস্তরের নীচে মৃত্তিকাগর্ভে দেবীর পাণিপদ্ম রক্ষিত আছে বলিয়া শুনা যায়। দেবীর সম্মুখে রৌপ্যনির্ম্মিত কোশাকুশী ও রৌপ্য কুণ্ড আছে। কোশা ও কুণ্ডের গাত্রে বাঙ্গালা অক্ষরে "শ্রীকালী" খোদিত আছে। শুনা যায় যে, এগুলি প্রতাপাদিত্যের সময়ের। শুনিলাম যে, কিছুকাল পূর্ব্বে দেবীর সোণার মুকুট, সিঁথি, কাণের ঝুমকা টেঁড়ী, জিহ্বা, গলদেশের ১০৮ ভরির ১০৮ টি মুণ্ডমালা ইত্যাদি অলঙ্কার চোরে জানালা ভাঙ্গিয়া চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে দেবীর সোণার ও রূপার এক প্রস্থ করিয়া গহনা ছিল, এখন আর তাহা নাই। দেবী ও তাঁহার গৃহ পশ্চিমাস্য।

দেবীর ডাইন দিকে পৃথক স্থানে একটি চতুষ্কোণ কাঠের টুলের উপরে কৃষ্ণবর্ণের কষ্টি প্রস্তরের যশোরেশ্বর চণ্ডভৈরব নামক শিবলিঙ্গ আছেন। উহা দেখিতে দুই-প্রান্ত-সরু বড় নোড়ার ন্যায়। ইঁহাকে বাণলিঙ্গ বলা হয়, এবং ইনি যশোরেশ্বরীর ভৈরব। ভগ্ন স্তূপের মধ্য হইতে প্রতাপাদিত্য এই লিঙ্গাংশ পাইয়াছিলেন। ইহার গৌরীপাট শ্বেত প্রস্তরের ও ত্রিকোণ; কিন্তু ইহার গাত্রে পদ্মপুষ্পের ন্যায় কারুকার্য্য খোদাই করা আছে। এই গৌরীপাট প্রতাপ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া প্রবাদ আছে; কিন্তু উহা দেখিয়া মনে হয় না যে, উহা তত দিনের পুরাতন। শ্বেত প্রস্তরের ত্রিকোণ গৌরীপাটে কৃষ্ণবর্ণের এই বাণলিঙ্গ ভাল মানায় নাই। চড়কের সময় চণ্ডভৈরবের বিশেষ পূজা ও তদুপলক্ষে মেলা হয়।

যশোরেশ্বরীর বাম দিকে সাধারণ বাটনা-বাটা শিলের গঠন বিশিষ্ট প্রায় ১৷৹ হাত উচ্চ একটি কৃষ্ণবর্ণ শিলার উপরে গঙ্গাদেবীর মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে। মূর্ত্তিটি অতি সুশ্রী। দেবী মকরের পৃষ্ঠের উপরে অতি সুন্দর ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া

দুইটি হস্ত প্রসারণ করিয়া, একটি পুষ্প-মালিকার দুই প্রান্ত দুইটি হস্তে ধারণ করিয়া আছেন। দেবীর মস্তকে, কর্ণে, কণ্ঠে, বাহুদ্বয়ে, কটিদেশে ও পদদ্বয়ে নানা প্রকার সূক্ষ্ম কারুকার্য্যময় আভরণ আছে। দেবীর কেশগুচ্ছ মস্তকের পশ্চাৎ দিকে এক নূতন প্রকারের ঢংএর সুশ্রী কবরী বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া স্কন্ধের নিম্নে ঝুলিতেছে। দেবীর ডাইন দিকে একটি ক্ষুদ্র ছত্রধারী পুরুষ দণ্ডায়মান হইয়া একটি সুদীর্ঘ দণ্ডযুক্ত ছত্র দেবীর মস্তকে ধরিয়া আছে,—ঐ ছত্রধারীর মস্তকের উপর সর্প ফণা বিস্তার করিয়া আছে। দেবীর বাম দিকে একটি স্ত্রী-মূর্ত্তি হস্তে ঘট ধারণ করিয়া দণ্ডায়মানা আছে, উহারও মস্তকের উপর সর্প ফণা বিস্তার করিয়া আছে। শিলাটির উর্দ্ধদেশে উহার দুইটি কোণায় দুইটি অপ্সরী পুষ্পমাল্য হস্তে লইয়া উড্ডীয়মান অবস্থায় আছে। লোকের ধারণা এই যে, এই মূর্ত্তিটি প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু ইহার গঠন প্রণালী দেখিয়া মনে হয় যে, ইহা প্রতাপের অনেক পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে। দেবীর অষ্টধাতু-নির্ম্মিত একটি ঘট আছে, উহা অতি প্রাচীন। উহা প্রায় ১ ফুট উচ্চ ও অত্যন্ত ভারি। কিয়ৎ দিবস পূর্ব্বে এই দেবী ভ্রম ক্রমে অন্নপূর্ণা বিমলা বলিয়া পূজিত হইতেছিলেন; এক্ষণে ভুল ধরা পড়ায় গঙ্গা বলিয়া পূজিত হইতেছেন। বিলাতে এই মূর্ত্তির ফটোগ্রাফ আদৃত হইয়াছে; কারণ, এই প্রকারের গঙ্গামূর্ত্তি অতি বিরল।

পূর্ব্বোক্ত চণ্ডভৈরবের ডাইন দিকে একটি স্থান আছে; উহাকে পঞ্চমুণ্ডীর আসন কহে। যশোরেশ্বরীর ঘরের উত্তর দিকে একটি হোমকুণ্ড আছে, তথায় যে-কোন যাত্রী হোম করিতে পারেন। যশোরেশ্বরীর বেদীর নিকটে একটি খাটের উপরে লক্ষ্মী-জনার্দ্দন-নামক একটি শালগ্রাম শিলা আছেন। লোকে বলিয়া থাকে যে, উহা প্রতাপাদিত্যের সময়ের। অন্য একটি ছোট খাটের উপরে পিত্তল নির্ম্মিত ক্ষুদ্র অন্নপূর্ণা ও গণেশ মূর্ত্তি আছেন। ইহা ছাড়া মৃত ব্যক্তিগণের কতকগুলি শালগ্রাম শিলা এই ঘরের মধ্যে আছেন। বলিদানের সময় এই শালগ্রাম-গুলিকে এক পার্শ্বে সরাইয়া রাখা হয়।

যশোরেশ্বরীর ঘরের উত্তরে একটি একতলা কোঠার

ঈশ্বরীপুর—৺যশোরেশ্বরী

পশ্চিম দিকের প্রাচীর মাত্র দণ্ডায়মান আছে। ঐ স্থানে পূর্ব্বে দুইটি প্রকোষ্ঠ ছিল। তথায় কিছু দিন আগে পূর্ব্বোক্ত গঙ্গাদেবী থাকিতেন। যশোরেশ্বরীর ঘরের দক্ষিণ দিকে একটি ক্ষুদ্র উঠান আছে। উহার মধ্যস্থলে একটি ইষ্টক-নির্ম্মিত সমত্রিভুজ চৌবাচ্চার ন্যায় স্থান আছে। উহা

প্রত্যেক দিক প্রায় ৭ হাত দীর্ঘ এবং ২।০ হাত উচ্চ। ইহাকে "পুষ্পকুণ্ড" কহে। পূজার নির্ম্মাল্য ইহার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। এই পুষ্পকুণ্ডের পশ্চিমে ও যশোরেশ্বরীর কোঠার দক্ষিণে একটি একতলা ঘর আছে। তথায় এক্ষণে যশোরেশ্বরীর ভোগ রন্ধন হয়। যশোরেশ্বরীর কোঠার পূর্ব্ব দিকে একটি সরু উঠান আছে। উহার উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিক প্রাচীর বেষ্টিত। কোঠার পূর্ব্ব দিকে পূজাবাটীর পূর্ব্ব দিকের দ্বার আছে। এই স্থানে যশোরেশ্বরীর কোঠার পশ্চাৎ দিকে যে ভোগের ঘর ছিল, উহা বহু দিন হইল ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ হইয়াছে। লোকমুখে শুনা যায় যে, এই

বংশীপুর—টেঙ্গা মসজিদ

স্থানেই যশোরেশ্বরীর প্রাচীন মন্দির ছিল। ১২১৬ সালে যশোরেশ্বরীর বাটীর কতকাংশ নূতন করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে।

যশোরেশ্বরীর পূজা বাটীর পশ্চিম দিকে প্রায় ১০০ হাত দূরে উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ একটি দীঘি আছে। উহার নাম "মণিকর্ণিকা দীঘি।" উহাতে ৩।৪ হাত গভীর জল আছে। যাত্রীগণ এই পুকুরের জল পানার্থ ব্যবহার করেন। এই দীঘির বা পুকুরের নামের সহিত জড়িত একটি সংস্কৃত শ্লোক প্রচলিত আছে যথা—

"যশোহর পুরী কাশী দীঘিকা মণিকর্ণিকা।
তর্ক পঞ্চাননো ব্যাসঃ বসন্তঃ কালভৈরবঃ" ॥

এখানে যশোহরকে কাশীর সহিত, মণিকর্ণিকা দীঘিকে কাশীর মণিকর্ণিকার সহিত, তর্কপঞ্চানন অর্থাৎ যশোহর রাজবংশের গুরু শ্রীকৃষ্ণ তর্কপঞ্চাননকে ব্যাসের সহিত ও রাজা বসন্ত রায়কে কাশীর কালভৈরবের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। পুকুরের পূর্ব্ব দিকের পাড়ের মধ্যস্থলে একটি শান-বাঁধান অৰ্দ্ধ-ভগ্ন ঘাট আছে। ঐ ঘাট যশোরেশ্বরীর বাটীর পশ্চিম দ্বারের ঠিক সম্মুখে অবস্থিত। পশ্চিম দ্বার হইতে ঘাট পর্য্যন্ত ইটের খাদরি-করা একটি পথ আছে। এই পথের দুই পার্শ্বে ফুল-বাগানের জমি পড়িয়া আছে।

যশোরেশ্বরীর বাটীর পূর্ব্ব দিকে একটি ত্রিকোণ পুকুর আছে, উহার নাম "খর্পর পুকুর।" উহা প্রতাপাদিত্যের সময়ের। পূর্ব্বকালে যখন বহু ছাগ ও মহিষ বলি হইত, সেই সময় রুধির-স্রোত এই পুকুরে আসিয়া পড়িত। যশোরেশ্বরীর বাটীর উত্তর দিকের সরকারি রাস্তার উত্তরে একটি উন্মুক্ত স্থানে যশোরেশ্বর চণ্ডভৈরবের ত্রিকোণ এক-তলা কোঠা ঘর আছে। এই ঘরের ছাদে কড়ি বরগা ছিল, এক্ষণে ছাদটি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় চণ্ডভৈরব যশোরেশ্বরীর গৃহে আছেন।

যশোরেশ্বরী অতি প্রাচীন দেবতা। ইহা ৫১ পীঠের মধ্যে অন্যতম পীঠ। "ভবিষ্য পুরাণে" প্রকাশ আছে যে, এই

স্থানে সতী দেহ হইতে বিচ্যুত হইয়া সতীর বাহু ও পদ পতিত হইয়াছিল :—

"কলেঃ সাৰ্দ্ধং যশোরে চ যবনানাঞ্চ রাজ্যকে।
যশোরেশী মহাদেবী চান্তর্দ্ধানং ভবিষ্যতি।
তত্রৈব পতিতৌ দেব্যাঃ হস্তপাদৌ পুরাদ্বিজ।
রুরুভৈরবো হস্তীতি চেশ্বরীপুর মধ্যতঃ॥"

"তন্ত্র চূড়ামণি"তে লিখিত আছে :—"যশোরে পাণি পদ্মঞ্চ দেবতা যশোরেশ্বরী।"

"পীঠমালা"য় লিপিবদ্ধ হইয়াছে :—"যশোরে পাণি পদ্মঞ্চ দেবতা যশোরেশ্বরী। চণ্ডশ্চ ভৈরবস্তত্র যত্র সিদ্ধি-মবাপ্নুয়াৎ॥"
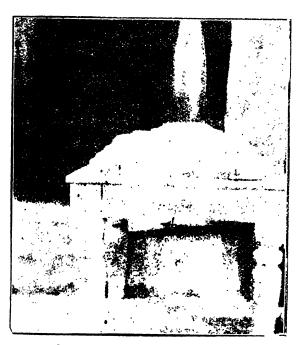
ঈশ্বরীপুর—৺চণ্ড ভৈরব

কবিরাম তাঁহার "দিগ্বিজয় প্রকাশে" লিখিয়াছেন যে, অনরি নামক এক ব্রাহ্মণ এই দেবীর জন্য একটি শত দ্বারযুক্ত গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থে আরও লিখিত আছে যে, যশোরাদিদেশ 'কানন সংযুক্তা নৃপশার্দ্দূল' পূর্ণ ও নদীবহুল, এবং উহা ভাগীরথীর পূর্ব্ব পারে উপবঙ্গে অবস্থিত, এবং সেন বংশীয় রাজা লক্ষ্মণ সেন দেব যশোরেশ্বরীর নিকটে একটি শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, পুরাকালে গোকর্ণ বংশীয় ধেনুকর্ণ নামক ক্ষত্রিয় রাজা বন কাটাইয়া যশোরেশ্বরীর মন্দিরের নিকটে একটি কোঠা বাড়ী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, অতি প্রাচীন কালে যশোরেশ্বরীর পূজা প্রচলিত ছিল এবং এতদঞ্চলে লোকালয় ছিল; কিন্তু কালক্রমে এতদঞ্চল জনশূন্য ও জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া সুন্দরবনের কুক্ষিগত হইয়াছিল। কতবার যে এইরূপ হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব তাঁহার "Report on the District of Jessore" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, সুন্দরবন মধ্যে এরূপ বহু স্থান আছে, যেখানকার চাষীগণ বলিয়া থাকে যে, অতি প্রাচীন কালেও ঐ সকল জমিতে চাষ আবাদ হইত। মহারাজা বিক্রমাদিত্য ও রাজা বসন্ত রায় যশোহর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া এতদঞ্চলে লোকজন আনিয়া বসাইতে আরম্ভ করিলে, ক্রমে বন জঙ্গল পরিষ্কৃত হইতে লাগিল। রাম রাম বসুর ১৮০১।২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে" এবং তাঁহার অনুকরণে হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার প্রণীত "রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে" লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, ধূম-ঘাটের বাহির গড়ের সেনাপতি কমল খোজা মহারাজা প্রতাপাদিত্যের নিকট নিবেদন করিলেন যে, তিনি রাত্রি দুই প্রহরের পরে একটি বনের মধ্যে প্রচণ্ড দাবানলের ন্যায় অগ্নি জ্বলিতে দেখিয়াছেন, কিন্তু দিবসে তথায় যাইয়া দেখেন যে কিছুই নাই। তিনি আরও নিবেদন করিলেন যে, তিনি সেই স্থানে এক অতি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিতে দেখিয়াছেন : সেই বনের মধ্যে এক ঢিপি আছে। রাখাল বালকগণ গরু ছাড়িয়া দিয়া, সেই ঢিপিকে ফুল দিয়া সাজাইয়া উহাকে কালী-প্রতিমা ভাবিয়া তাহারা কেহ পুরোহিত, কেহ কামার, কেহ পাঁঠা হইল। পূজার অভিনয়ের পরে বলিদানের অভিনয় কালে, যে বালকটি পাঁঠা সাজিয়াছে, তাহার গলদেশে, কামারের স্থলাভিষিক্ত বালকটি হোগলা পাতার খাঁড়ার দ্বারা আঘাত করিতেই, উহার দেহ হইতে মুণ্ড বিচ্যুত হইয়া প্রবল বেগে রুধির-প্রবাহ ছুটিল। ইহা দেখিয়া বালকগণ ভয়ে পলায়ন করিল। মহারাজা কমল খোজার মুখে এই বৃত্তান্ত শুনিয়া, সভাসদগণ সহ ঘটনাস্থলে যাইয়া উক্ত বালকদিগের নিকটে সকল কথা শুনিলেন। মৃত বালকের শব বহুক্ষণ পড়িয়া থাকা

সত্ত্বেও উহার কোন বিকৃতি হইল না। তখন মহারাজা উক্ত শব ও ছিন্ন মুণ্ড একটি সিন্দুকের মধ্যে বন্ধ করিয়া উহার চাবি নিজের নিকটে রাখিলেন, এবং কহিলেন যে, তিনি পরের দিন বালক-হত্যার বিচার করিবেন। সে রাত্রে রাজা বহির্দুর্গে অবস্থানকালে গভীর নিশীথে দেখিলেন যে, আকাশ হইতে একটি অগ্নির ন্যায় জ্যোতিঃ বিশিষ্ট পদার্থ পূর্ব্বোক্ত বনে পতিত হইল, ও ক্রমে উহা প্রবল আকার ধারণ করিয়া গগনস্পর্শী প্রলয়ানলের ন্যায় ভীষণ হইয়া উঠিল। তখন মহারাজা উক্ত খোজাসহ অশ্বারোহণে সেই অগ্নি অভিমুখে চলিলেন। কিছু দূর যাইলে মহারাজার অনুগামী খোজা জ্ঞান হারাইয়া অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া গেলেন, মহারাজা তাহা জানিতে পারিলেন না। আরও কিছু দূর যাইলে মহারাজার অশ্ব ভীত হইয়া পড়িয়া গেল; কিন্তু মহারাজা ভীত না হইয়া পদব্রজে দ্রুত অগ্রসর হইয়া উক্ত জ্যোতির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, বনের ঊর্দ্ধ শূন্যে সেই জ্যোতিঃ স্থাপিত আছে; তন্মধ্যে এক সুন্দরী সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন, এবং তাঁহারই শরীর হইতে এই জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছে। তৎপরে মহারাজা মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পড়িয়া গিয়া স্বপ্নাবেশে সেই জ্যোতির মধ্য হইতে এই আকাশ-বাণী শুনিলেন—"প্রতাপাদিত্য, চাহিয়া দেখ, আমি তোমার ইষ্টদেবী, আমি তোমার উপর প্রসন্ন আছি। এজন্য আমার পীঠস্থানের নিকটে তোমাকে বাস করিতে দিলাম। এই ঢিপি খনন করিয়া ঢিপির মধ্যে তুমি যাহা পাইবে, তাহা আমারই স্বরূপ জানিয়া, এই স্থানে প্রতিষ্ঠা করিবে। সেই রাখাল বালক মরে নাই, সে তাহার মাতার ক্রোড়ে সুখে নিদ্রা যাইতেছে। তোমার বহু ঐশ্বর্য্য হইবে ও এতদঞ্চল সমস্তই তোমার হইবে। যত দিন তুমি আমাকে বিদায় করিয়া না দিবে, তত দিন আমি কন্যারূপে তোমার গৃহে থাকিব। আমার এই কথা মানিয়া চলিও,—কখন কোন স্ত্রীলোকের জীবন নাশ করিও না, বা তাহাকে দুঃখ দিও না। আমার আদেশ অমান্য করিলে তোমার পতন হইবে।" চৈতন্য লাভ করিয়া মহারাজা ও কমল খোজা ফিরিয়া আসিয়া সেই মৃত বালকের দেহাধার সিন্দুক খুলিতে গিয়া দেখিলেন যে, সিন্দুক খোলা পড়িয়া আছে, তন্মধ্যে সেই মৃত দেহ নাই। তখন সেই রাত্রে উভয়ে বালকের বাটীতে যাইয়া অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, সে তাহার মাতৃ-ক্রোড়ে সুখে নিদ্রা যাইতেছে। তৎপরে মহারাজা সেই ঢিপি খনন করাইতে লাগিলে, উহার মধ্য হইতে একটি প্রস্তর নির্ম্মিত মুণ্ড বাহির হইল। ঐ মুণ্ডের গলদেশ পর্য্যন্ত বাহির হইলে অকস্মাৎ দৈববাণী হইল—"ক্ষান্ত হও, আর খুঁড়িও না।" মহারাজা সেই পর্য্যন্ত বাঁধাইয়া দিয়া উহার উপরে গৃহ প্রস্তুত করিয়া দিলেন। দেবী পূর্ব্বে দক্ষিণাস্যা ছিলেন; কিন্তু প্রতাপাদিত্যের পতনের অব্যবহিত পূর্ব্বে, মান সিংহের যশোহর আক্রমণের সময়, প্রতাপ এক দিন প্রাতঃকালে কোন ঝাড়ুদারণীকে বক্ষের আবরণ উন্মোচন করিয়া ঝাড়ু দিতে দেখিয়া, তাহার এই লজ্জা-হীনতার জন্য স্তন কাটিয়া দিবার আদেশ দেন এবং সেই আদেশ পালিত হয়। (কিন্তু Major Ralph Smyth তাঁহার ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের "Statistical and Geographical Report of the 24 Perganahs District" নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, প্রতাপের সম্মুখে ঝাড়ুদারণী রাজপ্রাসাদে ঝাড়ু দিতে থাকায় প্রতাপ তাহার শিরশ্ছেদের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।) প্রতাপ দেবীর আশ্রিত ছিলেন। এই ঘটনার পরে দেবী তাঁহার উপরে অসন্তুষ্ট হইলেন। একদা প্রতাপ যখন রাজসভায় সভাসদ-গণ সহ উপবিষ্ট ছিলেন, সেই সময় দেবী তাঁহার এক কন্যার রূপ ধারণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় প্রার্থনা করিলে, প্রতাপ যুবতী কন্যাকে এরূপ নির্লজ্জ ভাবে রাজসভায় আসিতে দেখিয়া, তাহাকে "দূর দূর" করিয়া চলিয়া যাইতে কহিলেন। দেবী তখন তাঁহাকে আপন পরিচয় দিয়া পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। (প্রতাপের সমসাময়িক শ্রীপুরের ভূঞা কেদার রায়কে যখন মানসিংহ দমন করিতে যান, তখন দেবী ঠিক এই প্রকারে কন্যার রূপ ধারণ করিয়া ছলনা করিয়াছিলেন, বলিয়া প্রবাদ আছে। সে জন্য কেহ কেহ মনে করেন যে, কেদার রায় সম্বন্ধীয় প্রবাদটী কালক্রমে প্রতাপাদিত্যের সম্বন্ধে আরোপিত হইয়াছে।) পর দিন প্রত্যূষে দেখা গেল যে, মন্দির সহ দেবী পশ্চিমাস্যা হইয়াছেন। সেই হইতে দেবী পশ্চিমাস্যা হইয়া আছেন। প্রতাপ তাঁহার গুরু কাশ্যপ গোত্রীয় শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় তর্ক-পঞ্চাননের কনিষ্ঠ ভ্রাতা চণ্ডীবরকে পুরোহিত পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্যতম সভাপণ্ডিত অবিলম্ব

ঘরের কোণে বসে' থাকলে কেউ কি কোনো দিন সত্যের সন্ধানে ছুটতে পারে? শাস্ত্র সনাতন নয়—যুগ-ধর্ম্মের সঙ্গে সে যদি আপোষ করে' না চলে, তবে তাকেই শুধু ঠকতে হয়। ঠাকুরদাদার পূজার মণ্ডপে চাঁদির ঝাড়ে গন্ধতেলের দীপ জ্বল্‌তো—তাতে আমার কি? আমার কুটীরের আঁধার ত তা'তে দূর হয় না! আমি চাই তৈল, আমি চাই অগ্নি, আমি চাই দীপ। ভিক্ষায় তা' মিলে নাই, মিলতে পারেও না। যজ্ঞবেদীর অরণি ঘষে' সে আগুন আমায় সংগ্রহ করে' নিতে হ'বে—তবে ত আমার হোমের শিখা জ্বল্‌বে। সমস্যার অভাব নাই, জটিলতার অভাব নাই, অতি-সাবধানতার অভাব নাই। কিন্তু বিশ্বের নিয়মই হচ্ছে এই যে যাঁরা জীবন দিয়ে সেই জটিলতার মীমাংসা করেন তাঁরাই বরেণ্য। তাঁরা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেন—বানের গঙ্গার মুখে কুটা যেমন ধায়। তেমনি—শুধু শাস্ত্রটাকে অবলম্বন করলে, সমাজকে বহন করাই হয়,—অগ্রসর করা আর হয় না। গর্দ্দভ শুধু রজকের বোঝাটাই বয়, কিন্তু অশ্ব নিয়ে যায় তার রথ—পথ বন্ধুর কি সহজ তা' দেখে না, উদ্‌ঘাত কি অনুদ্‌ঘাত তা মানে না—অশ্ব ধেয়েই চলে শুধু সম্মুখে—পেছনে পড়ে' থাকে তপোবন, পেছনে পড়ে' থাকে কুঞ্জকানন, পেছনে পড়ে' থাকে প্রাচীনের পদাঙ্কখচিত ধূলিধূসরিত পুরাতন রথ্যা—যার প্রয়োজনটা হয়ত তখন আর তেমন নাই, যেটা সঙ্কীর্ণ যেটা বক্র, যার বুকের উপর কাঁটা গাছের ঝোপ গজিয়েছে, বহুদিনের পুরাতন বলে। ঝড়ের মুখে নৌকা ভাসানো দুঃসাহসিকতা বটে—কিন্তু সেই দুঃসাহসের মধ্যেই যে বিপুল একটা আনন্দ ও গৌরব আছে। কত বুদ্ধিমানের যুক্তি-তর্ক-বিচার বুদ্‌বুদের মত উঠেছিল, বুদ্‌বুদের মতই আবার বিলীন হয়েছে। বেঁচে আছে শুধু পাগলের পাগলামী—যেটা এই ধরার বুকে দাগ রেখেছে, যেন পাষাণের গায়ে অস্ত্রের লেখা। মানুষের কাব্য, শিল্প, কলা যুগের পর যুগ এই পাগলামীতেই বেড়ে উঠেছে, জীবন পেয়েছে। আমরা চাই সেই পাগলের দল, যারা কালের বুকে নিজেদের মোহর এঁকে দিতে সর্ব্বত্যাগী হবে—বিধি নিষেধ মানবে না—উল্কার মত ধেয়ে যাবে সমস্ত আকাশের গায়ে আগুন জ্বেলে।

যেটা চিরাচরিত, যেটা বহুদিন থেকে চলে' আস্‌ছে—ভালো হোক্ আর মন্দ হোক্ তাকে ছাড়তে গেলে শঙ্কা মনে জাগে। যুক্তি দিয়ে সে শঙ্কাকে দূর করা যায় না। তাকে ত্যাগ করতে হ'লে বিচার-বুদ্ধিকে কিছু খর্ব্ব করে' মনের বলকেই বেশী অবলম্বন করতে হয়। মনে মনে ভরসা রাখতে হয়—

তীরে কি আর আসবেনা তোর তরী?
ঢেউ দেখে তুই মরিস্ ভয়ে
সেই লাজেতেই মরি।
চেয়ে ঝড়ের মেঘের পানে,
শান্তি যে তোর নাইরে প্রাণে;
কাণ্ডারী তোর হাস্‌চে বসে
ডান্ হাতে হাল ধরি।
মিথ্যা স্বপন তোর
এম্‌নি করে' জড়িয়েছে রে
ঘুচ্‌লোনা তোর ঘোর।—
প্রভাত আসে তোমার পানে,
আলোর রথে আশার গানে,
সে খবর কি দেয়নি কাণে
আশার বিভাবরী?

ভগবানে যে ভরসা রাখে, আলোর রথে আশার গানে সত্যই তার প্রভাত আসে। চীন তার বেণী কেটেছিল এই ঊষাকেই বরণ করে' নিতে—জাপান তার দ্বার খুলেছিল এই ঊষারই কিরণ গ্রহণ করতে। এই ঊষা রাজপুতের এসেছিল, মারাঠার এসেছিল—এই ঊষার আলোকে মার্কিন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। ইতিহাস আরও এমন কত নজির দেখিয়ে দিতে পারে। কিন্তু নজির দেখে বুঝে চলাও যা—পরের বোঝা বহন করাও তাই।

আমাদের দীর্ঘ দিনের পুরাতন একটা সমাজ নানা অবস্থার ভিতর দিয়ে গড়ে উঠেছে, নানা পরগাছাকে মাথায় ক'রে। পরগাছা গাছকে মেরে নিজেই যে শুধু বাঁচতে চায় একথাটা মন থেকে দূর করে' দিলে চল্‌বে না। চাই যদি আমরা তটবিপ্লাবিনী পূতসলিলা ভাগীরথী—হোক্ না সে বারিধি দিগন্তবিস্তারী, কি কাজ আমার তাতে?

এই যে মনের বল—যাকে অবলম্বন করে আমরা অজানা নবীনকে আলিঙ্গন করতে চাই—সেটা কোথায়

পাব ? এইটেই হলো বাঙ্গালীর সাধনার সামগ্রী। দেবতার বরেই সে বল লাভ করবো বটে, কিন্তু সেই বরকেই অর্জ্জন করবো অর্চ্চনার দ্বারা—অনায়াসে তা' লভ্য নয়, পরবশে তা' লভ্য নয়—বিনা সাধনায় তা' পাওয়া যায় না। করতালিমুখর সভায় সে বর পাবার সম্ভাবনা নাই—ভানে তা' মিলে না—ফাঁকিতে তা' দুষ্প্রাপ্য।

মহাত্মা কবীর বলেছিলেন—

মালা তো করমে ফিরে, জিভ্ ফিরে মুখ নাহি।
মন্নুআ তা দহদিশ ফিরে, এতো সুখিরণ নাহি ॥

তোমার জপের মালা করে করে ফিরছে, তোমার জিভটাও ফিরছে মুখে—কিন্তু মন যে তোমার ফিরে বেড়াচ্ছে দশ দিকে—এর নাম ত জপ নয়। যদি—

মন মালাকো ফেরত, ঘট উজ্‌য়ারী হোয়'—যদি মনের মালাকে বার বার ফেরাতে পারো, তবেই দেখবে তোমার ঘট উজ্জ্বল হয়েছে—সকল অগ্নির আধার যিনি, তাঁর করুণা তোমার মনকে পুড়িয়ে সোণা করেছে। তুমি ভাবতে পার—সংস্কারের বিরুদ্ধে তলোয়ার তুলে' নিন্দাকে কি মাথায় নেবো। নিন্দককে ভয় কি ভাই ?

নিন্দক দূর ন কিজিয়ে, কিজৈ আদর মান।
নিরমল তনমন যা করে, ওয়াকে আনহি আন ॥

কবীর বলেছেন—নিন্দককে কখনো দূর করো না। তোমার জয়ের পথের সহায় সে। তাকে মান দাও—আদর করে' বসাও। সে নিন্দা করে' বলেই ত লোকের দেহ আর মন শুচি হয়। ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—"যে বলে আমার হবে না, তার হয় না। মুক্ত অভিমানী মুক্তই হয়, আর বদ্ধ অভিমানী বদ্ধই হয়। যে জোর করে বলে, আমি মুক্ত হয়েছি, সে মুক্তই হয়। রাত দিন যে বলে, আমি বদ্ধ আমি বদ্ধ, সে বদ্ধই হয়ে যায়!" মহাপুরুষের বাণী কখনো মিথ্যা হয় না।

"শিকল-দেবীর ঐ যে পূজার বেদী
চিরকাল কি রইবে খাড়া ?
পাগলামি তুই আয়রে দুয়ার ভেদি !
ঝড়ের মতন, বিজয় কেতন নেড়ে
অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে,—
ভোলানাথের ঝোলা ঝুলি ঝেড়ে
ভুলগুলো সব আনরে বাছা বাছা !
আয় প্রমত্ত আয়রে আমায় কাঁচা !
আন্‌রে টেনে বাঁধা-পথের শেষে।
বিবাগী কর অবাধ-পানে,
পথ কেটে যাই অজানাদের দেশে।
আপদ আছে জানি, আঘাত আছে,
তাই জেনে ত বক্ষে পরাণ নাচে
ঘুচিয়ে দে ভাই পুঁথি পোড়োর কাছে
পথে চলার বিধি বিধান যাচা।
আয় প্রমত্ত আয়রে আমায় কাঁচা।"

আজ তাই করযোড়ে আবাহন করছি সেই কাঁচাদের—সেই নবীনদের, সেই প্রমত্তদের। যারা ভোলানাথের ঝোলা ঝুলি ঝেড়ে শুধু ভুলের বোঝাই মাথায় করে' আনবে, যারা শিকল-দেবীর পূজার বেদীকে ভেঙ্গে চূর্ণ করবে—যারা এই স্থানুবৎ অচলায়তনকে টেনে আনবে বাঁধা পথের শেষে। এই বহু দিনের জগন্নাথের রথ—বিশ্ব-মানব তার ডুরি না ধরলে সে নড়ে না। তাকে নড়াতেই হবে—সে রথকে টেনে টেনে গুণ্ডিবাড়ীতে আন্‌তেই যে হ'বে। ভারত মহামানবের মিলন-ক্ষেত্র—কত যাত্রী আস্‌ছে এখানে, কত যাত্রী যাচ্ছে। তাদের মিলিয়ে এক কর—বিশ্বভারতীর বীণার তারে নবীন সঙ্গীতের ঝঙ্কার বেজে উঠবে—বাঙ্গালী, তোমারই উদ্বোধন গাইতে। আগে সমাজ, তার পর তোমার রাষ্ট্র—আগে তোমার ঘর, তার পর তোমার বিশ্ব। ঘরে আলো আনো, সেই শিখায় বাহিরের দীপ অনায়াসেই জ্বাল্‌তে পারবে। কবি দ্বিজেন্দ্র-লাল বলেছেন—

"জীবনটাত দেখা গেল শুধুই কেবল কোলাহল।
এখন যদি সাহস থাকে, ওরে মরণটাকে দেখ্‌বি চল্।"

যে বাঙ্গালাদেশে প্রতি দেড় মিনিটে শুধু ম্যালেরিয়া জ্বরে এক জন লোক মরে, যে বাঙ্গালাদেশে প্রতি ৪ মিনিটে একজন মরে ওলাউঠায়, প্রতি ৮ মিনিটে একটী করে নারী সূতিকায় প্রাণ দেয়—যে দেশে এখন জন্মের হার ৪৬ মৃত্যুর হার ৪০—যে দেশে প্রত্যেক ১৩ হাজার লোক পিছু মাত্র একজন করে ডাক্তার, সে দেশে মরণটাকে দেখার জন্য ঘরের বাহির হবার প্রয়োজন হয় না। নিউজিলাণ্ড—

সেও একটা দেশ, যেখানে পুরুষ বাঁচে গড়ে ৫৯ বৎসর, আর ভারতবর্ষের জীবনকাল ২৩। এখনো আমাদের কি আর মিথ্যা নিয়ে কোলাহল করবার সময় আছে? ক্ষুদ্র স্বার্থের সঙ্কীর্ণতা নিয়ে আঁদালতে আইন ও নজিরের জাল বুন্‌বার অবসর আছে?

সবল মন পেতে হ'লে দেহটাকে আগে সবল করতে হ'বে। আবার ফিরিয়ে আন্‌তে হ'বে সেই দিন, যে দিন বাঙ্গালীরা একদিনে ৭০ মাইল পথ হাঁটতে পারতো। দৃষ্টান্ত তার রুদী বিশ্বাস। আবার সেই দিনকে ফিরিয়ে আন্‌তে হ'বে যেদিন বাঙ্গালীর হাসি ছিল শুভ্র শেফালীর মত, শরচ্চন্দ্রের জ্যোৎস্নার মত, পরিপূর্ণ-হৃদয়া কুলপ্লাবিনী ভাগীরথীর কলস্বনের মত। নিরন্ন আমরা, তাই কি হাস্‌তে পারিনে? আমার মনে হয়, দিনে দিনে আমরা এতই অনুদার হয়েছি যে, হাসির কবাট আপনা হতেই রুদ্ধ হয়েছে। মন যার বড়, দুঃখ তার ছোট—কারণ আমাদের অনেক দুঃখই আপন হাতে গড়া।

ঘরের আরাম-চেয়ারে বসে' সংবাদপত্র পড়তে পড়তে পরদুঃখকাতরতায় গলে' জল হওয়ায়, আদৌ কোনো ঝঞ্ঝাট নাই। কিন্তু প্রাণের সঙ্গে প্রাণের দেনা-পাওনার হিসাব করা তা'তে চলে না। স্নেহের অত্যাচার আছে বটে, কিন্তু সে অত্যাচারের মধ্যেও যে সুখ আছে, যে আনন্দ আছে—যে ব্যথা ভুলানো মধুর ভাব আছে—তার তুলনা নেই। মানুষের পৃথিবী তারই পরশ পেয়ে স্বর্গ হয়—মানুষ তারই কাছে শক্তি পেয়ে এত উপরে উঠে যে ভগবান স্বর্গের সিংহাসন থেকে তার কাছ পর্য্যন্ত নেমে আসেন। দেবে-মানবে সেইখানে হয় মধুর মিলন। দেবতা মুগ্ধ হন, মানুষ ধন্য হয়।

সহর যতই বড় হয়, ততই হয় সেটা অরণ্য। সে কাননে নিজেকে হারিয়ে ফেলা আর বেশী কি। একটা দারুণ ব্যাকুলতা তার পথে পথে বিরাজ করে, স্বার্থপরতার একটা ছায়া তার অনেক অনুষ্ঠানকে ঢেকে রাখে, মৌখিক এবং লৌকিক শিষ্টাচার মাত্রই সেখানকার প্রধান সম্বল। সেই চঞ্চল ভিড়ের মধ্যে সকলেই চায় দু' হাতে পথ করে কোনো মতে এগিয়ে যেতে। বাঙ্গালার প্রাণ তাই সেখানে নয়। সে প্রাণ সেইখানে যেখানে তেঁতুল গাছের ছায়ায় দাদাঠাকুর তাঁর সনাতন হুঁকাটা হাতে চন্দ্রবেষ্টিত গ্রহের মত বসে' থাকতেন, আর কিনু তাঁতি, হরিশ পাত্র,—মমিন শেখ এবং চারু হালদার তাঁর গলা ধরে' কাঁদতো, তাঁর গলা ধরেই আবার হাস্‌তো। রায়বাড়ীর উচ্ছৃঙ্খল একটা ছেলে—হোক্‌না কেন বড় মানুষ—দাদাঠাকুরের স্নেহ-মাখানো ভয়ে মাটীর ভিতর প্রবেশ করতে পথ পেত না! কোর্টফি এবং দালাল—তা' হোক্‌না সে মূর্খ কি হোক্ না সে সরস্বতীর বরপুত্র—সেকালে আর বাঙ্গালীর ঘাড়ে চেপে বস্‌তে পেত না। তা'তে যে দেশে অবিচারটাই বিচার বলে' মেনে নিতে হ'তো এমন কথা আমি কখনো বল্‌বো না—অথচ কারো বাস্তু ভিটায় ঘুঘু নামক নিরীহ পাখীটাকে তখন উড়তে দেখা যেত না। সেকালে বিচার দান করা হতো, একালে বিচারকে কিন্‌তে হয়। বেশী দিনের কথা নয়—দু' তিন বছর আগেকার একজন সাক্ষীর কথা বলি। তাঁর নাম হলো কালীমোহন ঘোষাল। একবার কোনও মামলা-প্রিয় মুসলমান-গ্রামে গিয়ে তিনি হিসাব করে' দেখেছেন যে, সেই গ্রামে গোটা একটা বছরে যত শস্য উৎপন্ন হয়, তার তিন ভাগের এক ভাগই যায় মামলা মোকদ্দমার খরচ যোগাতে। ঘোষাল মহাশয় আরও হিসাব করে' দেখেছিলেন যে, সেই গ্রামের বাৎসরিক মোকদ্দমার সমুদায় খরচ ত নয়ই, তার দশ ভাগের এক ভাগ পেলেও পাঁচ বছরে, সেই শ্রীহীন অনাদৃত পরিত্যক্ত গ্রামের যথেষ্ট উন্নতি করতে পারা যায়। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ধর্ম্ম, জ্ঞান—সবই সেখানে প্রবেশ করতে পারে—মুক্ত বাতাসের মত। সেকালের সহৃদয়তা সহানুভূতি ও সত্য-নিষ্ঠার উপর সমাজের এত বড় একটা সৌধ দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু একালের আদালত তার মর্ম্মর গাত্রে চির না ধরিয়ে দিয়ে আর থামে না। ফাটল যতই বিস্তৃত হয়—অর্থের স্রোত ততই বেগে বেরিয়ে আসে। মাঠের শস্য মাঠে থাকতেই এক দিকে কাবলীওয়ালা, আর একদিকে মহাজন তাকে নিয়ে টানাটানি আরম্ভ করে। তখন উড়ে এসে ছোঁ দেয় জমীদারের নায়েব, গোমস্তা, পাইক! ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, হুক্‌ওয়াম প্রভৃতি অতিথিদের যথাযোগ্য সৎকার ক'রেও বাঙ্গালার প্রাণ এখনো সেখানে ধুক্ ধুক্ করছে—নিয়ে যেতে হ'বে সেইখানে চোখের জল, প্রাণের হাসি—সেই আঁধার ঘরে জ্বাল্‌তে হ'বে স্নেহের দীপ। সেই পদ্ম পুকুরের শুকনো বুকে ঢালতে হবে অমৃতের

যায়। পারি যদি আমরা, করি যদি আমরা—দেবতার বর অবশ্যই পাবো। তিন বৎসর অন্তর ভোট কুড়িয়ে মান ভিক্ষার সময় পল্লীর বন্ধু সেজে হাত পাতলে শুধু যে মিথ্যাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয় তা নয়—নির্লজ্জতারও চরমে এসে দাঁড়াতে হয়! আমরা সভায় দাঁড়িয়ে যা কিছু বলি না কেন—মনের কাছে লুকোচুরি চলে না। সাত সমুদ্র তের নদীর ওপার থেকে এমন একটা হাওয়া বৈতে আরম্ভ হয়েছে যে বাঙ্গালী তার খোলস ছাড়ছে! আগে তার অন্তর যেখানে কাঁদ্‌তো এখন সে হয়েছে সেখানে পরদেশী। এই সব দেখে শুনেই দ্বিজেন্দ্রলাল ব্যঙ্গ করে' গেয়েছিলেন—

"আমরা বক্তৃতায় কাঁদি ও কবিতায় হাসি
কিন্তু কাজের বেলায় সব ঢুঁ ঢুঁজ।

আমাদের চেনেনাকো যে—
surely he is an awful goose."

আমি যদি এগুতে চাই, আমাকেই তার পথ করে' নিতে হ'বে। ওপারের দমকল এসে এপারের দাবানল নিবিয়ে দেবে এমন ভরসাটাও যে করে' সে হয় বাতুল, না হয় ভণ্ড! জীবন-যুদ্ধটা এতই হয়েছে প্রবল যে, এখন পুত্রও পিতার ধনের দিকে লুব্ধ নেত্রে চেয়ে থাকে ভাবে, 'কি আপদ! বুড়োটা এখনো পথ ছাড়েনা!' এটাকে materialism বল্‌তে যদি হয় তা বল্‌তেই হ'বে; কিন্তু সে কাল ত আর এখন নেই যে সন্ন্যাসীর তপোবন আমাকে আর আশ্রয় দিতে পারবে। সেকাল আর নেই যখন আবশ্যকের সীমা ছিল কম—যখন গৃহিনীর হাতে লাল সূতা আর কলার পাতে তেঁতুলের অম্বল যোগে আউসের ভাত—দিগ্‌গজ পণ্ডিতেরও পেটের ক্ষুধাকেই যে নিবৃত্ত করতে পারতো তা নয়—তাঁর ভোগের ক্ষুধাটাকেও দূর করে' দিত! মহারাজ চক্রবর্ত্তী স্বর্ণমুষ্টি ভিক্ষা দিতে এসে এই কথা শুনে তখন লজ্জায় ম্রিয়মাণ হ'তেন।

"দৈবাৎ পরম্ বলং"—এটা হচ্ছে অন্ধের হাতে ভাঙ্গা লাঠি। সেই লাঠিটাকে অবলম্বন করে শুধু দুর্ব্বলে। তার ধর্ম্মই এই যে সে কোনো কিছুতেই নিজেকে অপরাধী কারো উপরে চাপানোরই সুবিধে না থাকে, তবে বেচারা দৈবের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েই আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি! দৈব যখন এত প্রবল, তখন কাজ কি আর নড়া-চড়ায়! কিন্তু ঘুমন্ত সিংহের মুখে শিকার আপনি এসে' পড়ে— এ কথা কি কেউ কোনো দিন শুনেছে? ভারতের যখন সুদিন ছিল, তখন দৈব এত বলবান হ'তে পারেনি। ঘরের ছেলেকে শ্মশানের পথে বের করে' অথচ কুইনাইনের নিন্দায় শত মুখ হ'য়ে, তখন কেউ বল্‌তনা যে—এ মরণ বিধির লেখা। তখন ছিল—দৈবেন দেয়ং ইতি কাপুরুষা বদন্তি—তখন ছিল সর্ব্বং পরবশং দুঃখং, সর্ব্বং আত্মবশংসুখং। নিজের ভিতর শক্তি লাভ ক'রে বলশালী হ'তেই লোকে তখন চেষ্টা করতো। নিজের মনে যে শক্তি না পায়— পর কি তাকে বল দিতে পারে? সেবারে যখন রুষ-জাপানে অতবড় যুদ্ধটা হচ্ছিল, তখন একজন জাপানী বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—"মশায়, এক একটা কসাক যেন সাক্ষাৎ যমদূত—যেমন লম্বা চৌড়া তেমনি বলবান। আর আপনারা হলেন ছোট্ট এতটুকু যেন বামন অবতার। ওদের সঙ্গে আপনাদের লড়াই চল্‌ছে কেমন করে।" আমার প্রশ্ন শুনে' বন্ধুটী তাঁর হাতের পুঁথিখানা বন্ধ করে' এমন ভাবে আমার মুখের দিকে চাইলেন, যেন বল্লেন এমন অসম্ভব প্রশ্নও কেউ করে? আমি লজ্জিত হ'য়ে উঠলেম। বন্ধু বল্লেন—"দেহ কি আর লড়াই করে বাবু, লড়াই করে মন।" বড় সত্য কথা। তার পর অনেক দিন চলে' গেছে বল্‌টিক ফ্লীট কলার খোলার মত চৌচির হ'য়ে ডুবে গেছে— পোর্টআর্থারের মুখটা হয়ে গেছে—বোতলে ছিপি আঁটা। রুষের জার যাঁর ভয়ে ভারতের রাষ্ট্রতন্ত্র ভীত হতো— য়ুরোপের রাজন্য-সমাজ বা গণতন্ত্রের নিশ্চিন্তে নিদ্রা হতোনা —তিনি এখন বিগত, বিস্মৃত, পরাজিত, নিহত। কিন্তু ক্ষুদে জাপান রক্তবীজের মত বেড়েই চলেছে তার নৌবহর, অশ্বারোহী আর পদাতির মর্য্যাদা নিয়ে। তাদের উপর দিয়ে এতবড় যে একটা ভূকম্প সেদিন চলে গেল—ভারতের বিপণি দেখলে সে কথা মনে হয় না! মনই লড়াই করে, দেহ লড়াই করে না। অনন্ত শক্তির আধার থেকে জন্মেছি আমরা—আমরা চেয়ে থাকবো পরের মুখের দিকে? রাজপুত্র আমরা—ভিখারীর ঝোলা কাঁধে নেবো! বিশ্ব
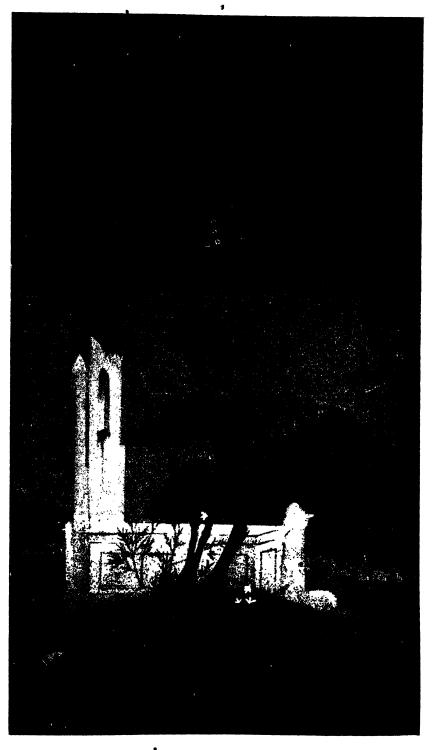
শান্তি-নিকেতন

সকলের পশ্চাতে মৌন ক্ষুব্ধ লজ্জিত, ম্রিয়মাণ। আমরা কি দৈব লাঞ্ছিত ধিক্কৃত উপহসিত পরিত্যক্ত। আর বুক পিঠ চাপ্ড়ে শুধু এই বলেই কাঁদবো—

"ভেইয়া দেশকা এ কেয়া হাল্।
খাক্ মিট্টী জোহর্ হোতী সব, জোহর্ হায় জঞ্জাল।"

এ কথা যেন আমরা ভুলে না যাই যে মানুষের ভিতর দিয়েই দেবতার প্রকাশ হয় —মানুষের ভিতর দিয়েই ফুটে' উঠে বিশ্বের অনন্ত শক্তি। কালের মহাযাত্রা-পথে বিশ্ব-মানব যে উল্কার বেগে ছুটে' চলেছে, সে একটা আদর্শের আশায়, একটা ভাবের প্রেরণায়, একটা মুক্তির সন্ধানে। যে তার রূপ দেখেছে সে ত মজেছেই—যে দেখে নাই, যে তার বাঁশীটাই শুধু শুনেছে, সেও মজেছে। সেই জীবন্ত অথচ অদৃষ্ট মহা বস্তু যে কি, কেমন, যে তার রূপ, তারই ধ্যান নিয়ে যুগের পর যুগ বিশ্ব যোগমগ্ন! ক্লান্তি নাই, শ্রান্তি নাই, বিরাম নাই! বিশ্ব কবি তারই কথায় প্রাণের আবেগে বলেছেন—

"কে সে? জানি না কে'! চিনি নাই তারে,
শুধু এইটুকু জানি,—তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানব-যাত্রী যুগ হ'তে যুগান্তের পানে
ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর-প্রদীপখানি। শুধু জানি, যে শুনেছে কাণে
তাহার আহ্বানগীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সঙ্কট আবর্ত্ত মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জ্জন।
নির্য্যাতন লয়েছে সে বক্ষপাতি, মৃত্যুর গর্জ্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মত। দহিয়াছে অগ্নি তারে,
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে;
সর্ব্ব প্রিয়-বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি জ্বেলেছে সে হোম হুতাশন,
হৃৎপিণ্ড করি' ছিন্ন, রক্তপদ্ম অর্ঘ্য উপহারে
ভক্তি ভরে জন্মশোধ শেষ পূজা পূজিয়াছে তারে
মরণে কৃতার্থ করি প্রাণ।"

এই যে আদর্শ, যার জন্য শক্তিমান মানুষ তার সর্ব্বপ্রিয় বস্তুকে ইন্ধন করে', তারি জন্য চিরজনম হোম-হুতাশন প্রজ্জ্বালিত করেছে—আমরা ভ্রান্ত, তাই সেই আদর্শটার জন্য পশ্চিমা দমকা হাওয়ার দিকে চেয়ে আছি—আর বিসর্জ্জন [illegible] এই পরমুখাপেক্ষাই আমাদের এগিয়ে যাবার পথের পরিপন্থী হয়ে উঠেছে। এই পরগাছা এমন করেই বেড়ে উঠেছে যে, আমাদের ঘর আর বাহির দুইই তার আওতায় পড়ে' মলিন ও আঁধার হচ্ছে। স্যার আশুতোষ তাই বার বার বল্‌তেন—"Do not hesitate to own at all times that you are genuine Indians." আমরা যদি কালের ভেরীর পশ্চাতে পতাকা নিয়ে জয়-যাত্রা করি তখন যেন এ কথাটা ভুল না হয় যে বাঙ্গালীর ভাগ্য-বিধাতা তাকে তার বিশিষ্টতা ও পরিবেশের মধ্যে গড়ে' তুলে যে সম্মান দিয়েছেন সে হেমকিরীটে যেন পথের ধূলা না লাগে—যে মান পেয়েছি তাঁর কাছে, কখনো যেন তার এতটুকু অপমানও সহ্য না করি। এই আত্ম-সম্মান জ্ঞানই যেমন ব্যক্তিকে, তেমনি মানুষকে জাগ্রত-সচেতন করে, বল দেয়, প্রাণ দেয়, আকাঙ্ক্ষা দেয়। এই আত্মসম্মান জ্ঞান থাক্‌লেই আসে সেই সজীব প্রাণ যা' প্রকৃতির অসীম সুন্দর মহান্ দান দেখে প্রীতি-প্রবণ হ'য়ে ওঠে। যা' তখন কবি Wordsworthএর মত বল্‌তে শেখায়—

There is joy in the mountains,
There is life in the fountains.

যা' তখন পূজা করতে শেখায় এই ভুবনমোহিনী মায়াকে তন্বঙ্গী শ্রীর মত—যা' তখন বল্‌তে শেখায়—

"আকাশ আমারে আকুলিয়া ধরে
ফুল মোরে শিরে বসে।
কেমনে না জানি জ্যোৎস্না প্রবাহ
সর্ব্বশরীরে পশে।
ভুবন হইতে বাহিরিয়া আসে
ভুবনমোহিনী মায়া—
যৌবন ভরা বাহুপাশে তার
বেষ্টন করে কায়া॥

যে মহা আনন্দের একান্ত আতিশয্যে হৃদয়ে ব্যথা জেগে ওঠে, অবসন্নতা এনে দেয়।

যে শিক্ষাই দাও—যেমন করেই বিদ্যাশাস্ত্রপীঠের রচনা কর, তা'তে আপত্তি নাই—দয়া করে' জাতির বিশেষত্বটাকে বাঁচাও—সেই বৈশিষ্ট্যকে বেড়েই বাঁচতে দাও মহামহীরুহকে বেড়ে যেমন লতা বাঁচে তেমনি—সেই বৈশিষ্ট্যের চরণতলেই দয়া করে মরতে দাও—

মানসী প্রতিমার চরণতলে শিল্পী যেমন আত্মত্যাগ করে তেমনি। এই বিশিষ্টতাকেই সেদিন বিচারপতি উডরফ্ বলেছিলেন—Seed of race.—আমার শাল পিয়াল তমালকেই বারিসেচনে সতেজ ক'রে তোলো—তাদের উপড়ে ফেলে 'ওকে'র চাষে কাজ নেই।

যেমন দান, তেমনি দক্ষিণে। এ প্রবচনটার মত সত্য বোধ হয় আর কিছুতে নেই। এরই ইংরাজি নামান্তর "Society is paid back in its own coins." জঙ্গল কাটো, কুঞ্জ রচনা কর—জীর্ণকে দীর্ণ কর, নবীনকে বসাও। সেই মন্দির রচনাকালে যদি নূতন পাথর কুড়িয়ে আনতে হয়, আনো তাই—যাদের গায়ে চির ধরেছে তাদের উপর ভরসা রেখো না। ভরসা কর সেই ভগবানের উপর—এতদিনের পাপে ভরাটা পূর্ণ দেখেও যিনি আজও তরীখানা ডুবিয়ে দেন নি। বাঙ্গালীর বরেণ্য কবির সঙ্গে এক কণ্ঠে বল—

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশী সে কি সহজ গান ?
সেই সুরেতে জাগ্‌ব আমি, দাও মোরে সেই কাণ।
ভুল্‌বনা আর সহজেতে,
সেই গানে মন উঠ্‌বে মেতে,
মৃত্যু মাঝে ঢাকা আছে অন্তহীন যে প্রাণ।
সে ঝড় যেন সই আনন্দে চিত্ত-বীণার তারে
সপ্তসিন্ধু দশ দিগন্ত নাচাও হে ঝঙ্কারে।
আরাম হ'তে ছিন্ন করে'
সেই গভীরে লও গো মোরে'
অশান্তির অন্তরে যেথায় শান্তি সুমহান্।
আসুক রোগ আসুক শোক—আসুক দৈন্য আসুক দুঃখ-
"আমি ভয় করবনা, ভয় করবনা
'বেলা মরার আগে,
মরবনা ভাই মরবনা।
তরিখানা বাইতে গেলে,
মাঝে মাঝে তুফান মেলে ;
তাই বলে, হা'ল ছেড়ে দিয়ে
কান্নাকাটি ধর্‌বনা।
ধর্ম্ম আমার মাথায় রেখে,
চল্‌চ সিধে রাস্তা দেখে,
বিপদ যদি এসে পড়ে
ঘরের কোণে মরবনা।
আমি ভয় করবনা—ভয় করবনা।

অনুযোগ

শ্রীহরিধন মিত্র

আমি প্রাণের জ্বালার ফুল
তোমার চরণে ধরি,
আমি বুকের রুধির দিয়ে
তোমার অর্চ্চনা করি !
নিঠুর দেবতা তুমি
আছ, কি কঠোর ঘুমি
দাওনা কিছুতে সাড়া
উঠে ঘুম পরিহরি।

কবে আমায় আনিয়া দিবে
হৃদয়ের ফুলদল !
যবে বুকের আসিবে থেমে
রক্তের চলাচল ?
আমার আসিলে ঘুম
হবে কি জাগার ধুম
প্রাণ-হীন তনুখানি
সাজাবে পরাণ ভরি ?

অমরত্ব *

শ্রীনলিনীকান্ত ব্রহ্ম, এম-এ, পি-আর-এস

মানুষ অমর হইতে চাহে—অর্থাৎ কোনও কালে আমার বিনাশ হউক, ইহা মানবের ঈপ্সিত নহে। অমরত্বের বাসনা মনুষ্যমাত্রেরই অন্তরে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কেমন করিয়া অমর হইতে পারা যায়, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। উপনিষৎ বলিতেছেন—'তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'—তাঁহাকে, সেই পরম পুরুষকে জানিলে—মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারা যায়, আর কোনও উপায়েই মৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না,—ব্রহ্মৈবেদমমৃতং—অর্থাৎ ব্রহ্মই অমৃত। সুতরাং ব্রহ্মকে লাভ করিলেই অমৃতত্ব লাভ করা যায়। 'তরতি শোকমাত্মবিৎ'—যিনি আত্মাকে জানিয়াছেন তিনিই শোক অতিক্রম করিয়াছেন বা করিতে পারেন। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতে দেখিতে পাই—জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি'—জ্ঞানলাভ করিলে শাশ্বত শান্তি অচিরেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। বলা বাহুল্য যে, এখানে পরাশান্তির অর্থ অমৃতত্ব। 'জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে'—আমি যাহা জ্ঞেয় তাহাই বলিব, যাহাকে জানিলে 'অমৃতত্ব' লাভ করা যায়'। এইরূপে শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে অসংখ্য বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, জ্ঞান ও বিজ্ঞানই অমরত্ব লাভের উপায় বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই জ্ঞান কি করিয়া লাভ করা যায় এবং এই জ্ঞান কিসের জ্ঞান। শ্রুতি বলিতেছেন যে, আত্মজ্ঞান লাভ করিলেই অমরত্ব লাভ হয়। "তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ"—সেই অদ্বয় আত্মাকে জান—সেই অদ্বয় আত্মা অমৃতের (সংসার সমুদ্র পার হইবার) সেতু। অমর আত্মাকে অমর বলিয়া জানিলেই অমরত্ব লাভ হয়। আত্মার জন্মমৃত্যু নাই—"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ, অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে"—আত্মা নিত্য, শাশ্বত, জরামৃত্যুহ্রাসবৃদ্ধি-রহিত। যে সকল উপায় দেহবিনাশে সমর্থ, তাহারা আত্মার নাশ ঘটাইতে অসমর্থ। "নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ, ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।"

* নদীয়া সাহিত্য পরিষদে পঠিত।

শস্ত্র ইহাকে ছেদন করিতে সমর্থ নহে, অগ্নি ইহাকে দহন করিতে পারে না, জলও ইহাকে দ্রব করিতে পারে না। বায়ু ইহাকে শোষণ করিতে পারে না। এই আত্মা প্রতি জীবে ব্যবস্থিত; তাই জীবাত্মা সত্য সত্যই অমর। কিন্তু অজ্ঞানবশতঃ জীব আপনার তত্ত্ব জানে না। দেহের সহিত সর্ব্বদা সংস্পৃষ্ট থাকিয়া জীবের দেহাত্মাভিমান জন্মে। এই দেহাত্মাভিমানই জীবের অজ্ঞান—জীব তাহার দেহটাকেই তাহার সর্ব্বস্ব বলিয়া ধরিয়া লয়। কিন্তু দেহের অভ্যন্তরে যে দেহী, যে অবিনাশী আত্মা বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার কথা জীবের স্মরণ থাকে না। ঐ অবিনাশী আত্মার কোনও উপলব্ধি জীবের গোচর হয় না—তাই জীব আপনাকে সীমাবদ্ধ, ক্ষুদ্র, কালকবলে পতিত বলিয়া অনুভব করে, এবং সত্যসত্যই মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করে। শুধু অজ্ঞান, অর্থাৎ নিজ স্বরূপের জ্ঞানের অভাবই জীবের সকল দুঃখ-যন্ত্রণা ও জন্ম-মৃত্যুর হেতু। একবার স্বরূপবোধ জন্মিলে, একবার আত্মতত্ত্বের উপলব্ধি হইলে, তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান দূরে পলায়ন করে এবং সেই অমর আত্মা মেঘমুক্ত ধ্বান্তারি আদিত্যের মত প্রকাশিত হন।

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মণঃ।
তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরং॥ গীতা

এই আত্মজ্ঞান লাভ হইলে জীব কৃতার্থ হন, জীব অমরকে উপলব্ধি করিয়া নিজে অমরত্ব লাভ করেন, আর জীবের জন্মমৃত্যুজনিত ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। তখন অদ্বয় অফুরন্ত আনন্দের উপলব্ধি হইতে থাকে। এই অবস্থার কথাই শ্রুতি বলিতেছেন—ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি—যিনি ব্রহ্মকে বা আত্মাকে জানেন তিনি ব্রহ্ম হইয়া যান।

এই আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান আমাদের প্রচলিত সাধারণ বস্তুর জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের জ্ঞান—ইহার আর তুলনা নাই—ইহা সত্যই একমেবাদ্বিতীয়ম্—ইহার দ্বিতীয় নাই, কারণ ইহার তুল্য আর কিছুই নাই। কোনও বস্তুর জ্ঞান হইলে জ্ঞাতা ত সেই বস্তুত্ব প্রাপ্ত হন না;—জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানের ভেদ সাধারণ জ্ঞানে বর্ত্তমান। সাধারণতঃ জ্ঞাতা জ্ঞেয় হইতে পৃথক্ থাকিয়া জ্ঞান লাভ করেন, কিন্তু এই যে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের কথা শ্রুতি বলিতেছেন, এই জ্ঞানে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানের ত্রিপুটী ভাঙ্গিয়া যায়। জ্ঞাতা জ্ঞেয়ের সহিত তাদাত্ম্যলাভ করিয়া জ্ঞানমাত্রে পর্য্যবসিত হন। ব্রহ্মকে জানিলেই ব্রহ্ম হন, আত্মাকে জানিলেই আত্মলাভ হয়—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের ইহাই তাৎপর্য্য। ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে যে, এই আত্মজ্ঞান অন্যান্য সর্ব্ববিধ জ্ঞান হইতে পৃথক্ ধরণের। এই কথা স্মরণ না রাখিলে অদ্বৈত তত্ত্বের বা জ্ঞানমার্গের কোন কথাই বুঝিতে পারা যায় না। ব্রহ্ম ও আত্মা অভি অভিন্ন,—ব্রহ্মই আত্মা, আত্মাই ব্রহ্ম। শ্রুতি বলিতেছেন-পরমাত্মা ব্রহ্ম আবার এই ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ—সত্যং জ্ঞানমনন্ত ব্রহ্ম,—ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, ব্রহ্ম অনন্ত ব্রহ্ম কোনও বস্তু বা object নহে, যাহার জ্ঞান আমাদে হইয়া থাকে বা হইতে পারে। ব্রহ্মকে বস্তু বা obje বলিয়া ধারণা করিলে ভুল বুঝা হয়। ব্রহ্মই জ্ঞানস্বরূপ—ব্রহ্ম বলিতে অনন্তের বা ভূমার উপলব্ধিকে বুঝায়। ব্রহ্ম ভূমার অপরোক্ষানুভূতি। ব্রহ্ম জ্ঞাতা ও জ্ঞান হইতে ভি জ্ঞেয় নহেন,—ব্রহ্ম জ্ঞেয় ও জ্ঞান হইতে ভিন্ন জ্ঞাতা নহেন। ব্রহ্ম হইতেছেন আনন্দ, ব্রহ্ম হইতেছেন চি আবার এই চিৎ ও আনন্দই সৎ। ব্রহ্ম আনন্দ হই অভিন্ন, আর এই আনন্দ এবং আনন্দের অনুভূতির ম বিশেষ পার্থক্য নাই। তাই ব্রহ্মকে object বা বস্তু ভাবিয়া আনন্দভাবে চিন্তা করিলে ইহার স্বরূপের যৎসামা আভাস পাওয়া যাইতে পারে। ব্রহ্মকে stage realisation বা অনুভূতির স্তর বলিয়া মনে করাও অসঙ্গ নহে। এই ব্রহ্ম ভূমা, অনন্ত। অনন্তের জ্ঞান হইতে জ্ঞাতা অনন্তে মিশিয়া যান। কারণ, অনন্ত ত দুইটী হই পারে না। অনন্তের বাহিরে কিছুই থাকিতে পারে না তাই অনন্তের দর্শন হইলেই অনন্তে প্রবিষ্ট হইয়া যাই হয়। এই অনন্তই সর্ব্বসুখাশ্রয়। আর সান্ত বা সসীম হ সর্ব্বদুঃখনিলয়। শ্রুতি বলিতেছেন—ভূমৈব সুখং না সুখমস্তি, যাহা অল্প তাহা মর্ত্ত্য বা মরণশীল। সুতর পরিচ্ছন্ন বস্তুর প্রাপ্তিতে সুখ নাই। কারণ পরিচ্ছি বস্তুমাত্রই অল্প ও সান্ত এবং বিনাশশীল। সুতরাং তা শাশ্বত শান্তি দান করিতে পারে না। ভূমা বলি আমরা শুধু বিরাট্ মহান্ বা অতি বৃহৎ স বুঝি না। এই ভূমা অনন্ত, ইহা অণোরণীয়ান্ মহ মহীয়ান্—ইহাতেই অনন্তের অনন্তত্ব, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রে

মধ্যেও যেমন, মহান্ অপেক্ষা মহত্তরের মধ্যেও ঠিক তেমনিভাবে বিরাজিত—ইহাই অপরিচ্ছিন্নের স্বভাব। অপরিচ্ছিন্ন বলিতে বিরাট্‌কে বুঝিলে অপরিচ্ছিন্নের জ্ঞান হয় না; সত্তা যত বৃহৎই হউক না কেন, পরিমাণ থাকিলেই তাহা পরিচ্ছিন্ন সত্তা। তাই শ্রুতি বলিতেছেন—পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদোঽস্যামৃতং দিবি—সমস্ত বিশ্ব উহার একপাদ মাত্র, বাকী তিনপাদই জগৎকে অতিক্রম (transand) করিয়া আছে। শ্রীগীতাতেও দেখিতে পাই, একাংশেন স্থিতো জগৎ—সমস্ত জগৎটাও অনন্তের তুলনায় অতি সামান্য। এই অংশ বা parts গণিতের গণনা নহে—ইহার ভাবার্থ হইতেছে যে, অসীম সর্ব্বদাই সসীমকে অতিক্রম (transand) করিয়া থাকে। কাহারও কাহারও ধারণা যে, ব্রহ্ম যদি অপরিচ্ছিন্ন, তবে তিনি 'অণোরণীয়ান্' হইলেন কিরূপে? এই অণোরণীয়ান্ কথাতেই না কি তাঁহার পরিচ্ছিন্ন রূপের কথা বলা হইয়াছে—এই ধারণা যুক্তিযুক্ত নহে। অপরিচ্ছিন্ন বা infiniteকে বর্ণনা করিতে হইলে এইরূপ বিরুদ্ধ বাক্য দ্বারাই প্রকাশ করিতে হয়—যথা "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্"। শুধু মহতো মহীয়ান্ হইলে পরিচ্ছিন্নই থাকিয়া যায়। শুধু অণোরণীয়ান্ বলিলেও ঐরূপ পরিচ্ছিন্ন সত্তার কথাই বলা হয়। তাই এই contradiction বা বিরুদ্ধধর্ম্মী বাক্য দ্বারা ভূমাকে বা অনন্তকে বর্ণনা করিবার চেষ্টা করা হয়। অপরিচ্ছিন্ন, বিরাট্, মহান্ ইহারা সমানার্থবাচক শব্দ নহে। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ভূমার বর্ণনা করিতে গিয়া বলিতেছেন—স এবাধস্তাৎ, স উপরিষ্ঠাৎ, স পশ্চাৎ, স পুরস্তাৎ, স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ, সএব বেদং সর্বামতি, যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি, নান্যৎ বিজানাতি, স ভূমা যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং, স ভগবো কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি, স্বে মহিম্নি, যদি বা ন মহিম্নীতে। এইরূপ সত্তাই প্রকৃত ভূমা বা অনন্ত বা অপরিচ্ছিন্ন—যাহার আর দ্বিতীয় নাই, সর্ব্বসত্তা যাহার দ্বারা গ্রস্ত, যে অবস্থায় অন্য কিছুই দেখা যায় না, শুনা যায় না, জানা যায় না, সেই অবস্থাই, সেই অনুভূতিই ভূমা, এই ভূমা নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত, অথবা তাঁহার আবার প্রতিষ্ঠার কথা কি? এই ভূমাই আনন্দ, এই অনন্তকে বা ভূমাকে জানিলেই আর অমর না হইয়া পারা যায় না। কারণ অনন্তের বাহিরে কি করিয়া সান্তকে ধরিয়া রাখা যায়? সান্ত অনন্তের বাহিরে থাকিলেত অনন্ত সান্তই হইয়া পড়িবে। তাই বিরাট্ সত্তার, মহানের বাহিরে অন্য পরিচ্ছিন্ন সত্তা থাকিবার সম্ভাবনা থাকিলেও ব্রহ্মের, ভূমার, প্রকৃত অপরিচ্ছিন্নের বাহিরে কোনও সত্তা থাকিবার সম্ভাবনা নাই। তাই ব্রহ্মকে জানিলে ব্রহ্ম হইয়া যাইতে হয়। এই ব্রহ্ম হওয়া বলিতে ব্রহ্মের অংশ হওয়া বুঝায় না—কারণ নিরবয়বের আবার অবয়ব কল্পনা কি করিয়া হইবে? একমাত্র অনন্তই, অপরিচ্ছিন্নই, ভূমাই অমর। তাই মহান্ সত্তাকে জানিলেও অমর হইবার সম্ভাবনা নাই। সেই অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্', সেই অনন্ত অখণ্ড অদ্বিতীয় সত্তাকে জানিলে, উপলব্ধি করিলে, তাহাতে প্রবেশ করিলে তবে অমর হওয়া যায়। এই জানা, দেখা ও প্রবেশ করা—তিনটী পৃথক কার্য্য নহে। অনন্ত জ্ঞানস্বরূপকে দেখিলেই, জানিলেই, তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া যাইতে হয়। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতে এই তিনটী ভাবের কথা একত্র বলা হইয়াছে—জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ। ১১।৫৪। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ১৮।৫৫।

কেহ কেহ বলেন যে অপরিচ্ছিন্নের বা অনন্তের জ্ঞান আমাদের হইতে পারে না। কারণ, মানবদৃষ্টি সমস্ত সাবয়ব বস্তু নিচয়ের সহিত অনাদিকাল হইতে সম্বদ্ধ। সে দৃষ্টিতে অনন্তের বা অনবয়বের স্বরূপ কোন মতেই প্রকাশিত হইতে পারে না। ভূমার কথা শাস্ত্র সাহায্যে কর্ণে প্রবেশ করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহার জ্ঞান বা উপলব্ধি হইতে পারে না। এই মতাবলম্বী লোকদিগকে সাধারণতঃ অজ্ঞেয়বাদী বা agnostic আখ্যা দেওয়া হয়। কেহ কেহ আবার ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠতা দেখাইবার জন্যও এইরূপ যুক্তির দ্বারা জ্ঞানমার্গের অসারতা প্রতিপাদন করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। এই শেষোক্ত সম্প্রদায় বলেন যে অপরিচ্ছিন্নের জ্ঞান আমাদের হইতে পারে না—কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ কৃপা করিয়া ভক্তের নিকট পরিচ্ছিন্ন-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া ভক্তকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। আমি অজ্ঞেয়বাদীদের অভিপ্রায় বরং বুঝিতে পারি, কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্ম জীবনে ভক্তির শ্রেষ্ঠতা দেখাইতে গিয়া

ধর্ম্মজীবনের মূল ভিত্তিটী উন্মূলিত করিতে চান, তাঁহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারি না। ভূমাকে বা অনন্তকে জানিতে পারা যায় না বলিলে ধর্ম্মজীবনের ভিত্তি উৎপাটিত হয় বলিয়া আমার ধারণা। সান্ত ক্ষুদ্র মানব অনন্তের প্রয়াসী, তাহার জ্ঞান লাভাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নাই, তাহার সদ্‌গুণ লাভ বাসনার তৃপ্তি নাই, তাহার আনন্দাস্বাদনাভিলাষের শেষ নাই, কোনও দিকেই কোনও সীমাবদ্ধ বস্তু তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না। মানব-হৃদয় চায় অনন্ত জীবন, অনন্ত অক্ষয় শাশ্বত আনন্দ, অনন্ত অফুরন্ত অপরিচ্ছিন্ন চেতনা। এই অনন্ত জীবন বা অমরত্বের বাসনা অর্থাৎ ভূমাকে বা infiniteকে জানিবার পাইবার বা ভূমা হইবার বাসনাই—ধর্ম্মজীবন বা একমাত্র Religious lifeএর মূল ভিত্তি। এই অনন্তের আভাস ক্ষীণ হইলেও ইহাই ধর্ম্মবিষয়ে চেতনা (Religious consciousness) জাগাইয়া দেয়। সত্য সত্য মানব যদি অমৃতের পুত্র না হইত, সত্য সত্যই মানবাত্মা যদি অমর অবিনাশী শাশ্বত নিত্য সত্তা না হইত, তবে কি ক্ষুদ্র সান্ত মানবহৃদয় বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার আশা করিত? এই ভূমা লাভের বাসনাই বলিয়া দেয় যে ভূমা আছে, এবং এই ভূমার আভাসই মানবহৃদয়কে আকর্ষণ করিয়া চলিয়াছে। এই আকর্ষণই শেষে ভূমার দর্শন মিলাইয়া দিয়া জীবকে কৃতার্থ করে, জীবকে অমৃতের অধিকারী করিয়া দেয়।

অল্পে অতৃপ্ত মানবহৃদয় ভূমাকে না পাইলে শান্তিলাভ করিতে পারে না। অপরিচ্ছিন্ন সত্তা পরিচ্ছিন্ন আকারে দেখা দিলে দর্শকের চিত্তে শান্তি আসিতে পারে না। যে অনন্তের প্রয়াসী সে কি সান্ত দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে? সান্ত আকারেও সান্তের মধ্যেও অনন্তত্ব ফুটিয়া উঠিবার দরকার—নতুবা ভূমাদর্শনের তৃপ্তি সান্তের মধ্যে জাগিবে কেন? তাই শ্রীভগবানের সাকার মূর্ত্তির মধ্যে তাঁহার তত্ত্ব, তাঁহার অনন্তত্ব ফুটিয়া উঠিলে, তবেই ভগবদ্দর্শন সার্থক হয়। নতুবা কেবল আকার বা পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তির উপর দৃষ্টি রাখিলে ত সাধারণ বস্তুদর্শনের মত দর্শনই হয়। ভূত দেখিলাম কি ভূতনাথ ভগবান্‌কে দেখিলাম, ইহা চিনিবার উপায় হইতেছে, এই আকারের পশ্চাতে তত্ত্বকে দেখা, এই সমস্ত পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তির মধ্যে সেই অদ্বয় তত্ত্বকে দেখা। আর এই তত্ত্ব ভুলিয়া বা তত্ত্বের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া শুধু আকারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ভগবান্‌কে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া ভাবিলে বা উপাসনা করিলে ক্ষুদ্র দেবতারই উপাসনা হয়, কিন্তু সেই সর্ব্বলোক মহেশ্বর-ভাবের উপাসনা হয় না। তাই শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতে এ বিষয়ে আমরা অনেকস্থলে স্পষ্ট উক্তি দেখিতে পাই—

> অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
> পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমং॥

আমার পরভাব, আমার অব্যয় জন্মরহিত ভাব না জানিয়া অল্পজ্ঞ মূঢ় ব্যক্তিরাই আমাকে জাত, পরিচ্ছিন্ন, ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করে।

> অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ মানুষীন্তনুমাশ্রিতম্।
> পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥

যাহারা বিমূঢ়চেতা তাহারা আমার এই সর্ব্বভূত মহেশ্বর ভাব জানিতে পারে না, তাই আমাকে মনুষ্য মনে করিয়া আমাকে অবজ্ঞা করে।

> ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
> ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥

আমার প্রতি ভক্তিলাভ হইলে, আমার প্রতি তীব্র আকর্ষণ জন্মিলে আমার যথার্থ তত্ত্বের জ্ঞান হয়। আর আমার তত্ত্বের জ্ঞান হইলে তাহারা আমাতে প্রবিষ্ট হইয়া যায়! আমার তত্ত্বের জ্ঞানই হইল আমার অজ অব্যয় নিত্য অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন, সর্ব্বভূত মহেশ্বর ভাবের জ্ঞান। আর এই জ্ঞান হইলেই আমাতে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সান্ত অনন্তকে দেখিলেই, অনন্ত হইয়া যায়। এই 'তত্ত্বতঃ' কথাটী এই শ্লোকেই দুইবার বলিয়াছেন। এই তত্ত্বকে না দেখিলে ভগবান্‌কে দেখা যায় না। আর এই তত্ত্বই হইল অব্যয় তত্ত্ব, অপরিচ্ছিন্ন বা অনন্তত্ব, সুতরাং এই 'তত্ত্বতঃ' কথাটা বাদ দিলে গীতার মর্ম্ম বুঝা যায় না। সাধারণতঃ মনে হয় শ্রীগীতাতে বুঝি কেবল পরিচ্ছিন্ন ভাবের কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু একটু নিবিষ্ট হইয়া দেখিলে বুঝা যায় যে পরমতত্ত্ব শ্রীভগবান্ কোনও স্থলেই তত্ত্ব কথা বলিতে গিয়া 'তত্ত্ব' ত্যাগ করেন নাই। অন্যত্রও দেখিতেছি—

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবম্বিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥

বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা, যজ্ঞ দ্বারা, তপস্যা দ্বারা আমাকে এই ভাবে দেখা যায় না, এই ভাবে জানা যায় না, এই ভাবে তত্ত্বে প্রবিষ্ট হওয়া যায় না। কিন্তু কেবলমাত্র ভক্তিতে এইভাবে দেখা যায়, জানা যায়, আমাতে প্রবিষ্ট হওয়া যায়। এই ভক্তি হ'ল তীব্র আকর্ষণ। ক্ষুদ্র জীব যখন ক্ষুদ্র ও অল্পের প্রতি আকর্ষণ ত্যাগ করিয়া ভূমার দিকে আকৃষ্ট হয়, তখনই তাহার ভক্তি লাভ হয়। এই ভক্তিই জ্ঞানপ্রাপক; এই ভক্তিই অনন্তকে, ভূমাকে উপলব্ধি করাইয়া দেয়। এই উপলব্ধি বা প্রাপ্তিই জ্ঞান; আর এই জ্ঞানলাভের জন্য, এই ভূমা প্রাপ্তির জন্য অভিলাষ বা আকর্ষণই ভক্তি। তাই শ্রীভগবান্ বলিলেন—ভক্ত্যা মামভিজানাতি। অন্যত্র বলিতেছেন—জ্ঞানী তু আত্মৈব মে মতিম্। আমি জ্ঞানস্বরূপ, যে জ্ঞানী সে ত আমার আত্মাই। সে ত আমাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পাইতেছে।

ভূমালাভের আকাঙ্ক্ষাই বলিয়া দেয় যে ভূমা আছে এবং মানব এই ভূমালাভে সমর্থ। সত্য সত্যই মানবাত্মা অমর। নতুবা অমরত্বলাভের বাসনা তাহার মধ্যে জাগিত না। আর এই বাসনা উদিত হইয়াই যে লীন হইয়া যায় তাহা নহে। এই বাসনা মানবাত্মার সহিত দৃঢ়ভাবে বিজড়িত। যত বড় সান্ত বস্তুই মানবাত্মা লাভ করুণ না কেন, শাশ্বত শান্তি তাহা হইতে প্রাপ্ত হন না। ভূমা না পাইয়া যাঁহার তৃপ্তি নাই, তিনি ভূমা—তাই—আত্মা সত্যই অমর। তাই উপনিষদের ঋষি তাঁহার ঋতম্ভরা প্রজ্ঞাদৃষ্ট সত্য তারস্বরে ঘোষণা করিতেছেন শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। শোন শোন বিশ্ববাসী, তোমরা সব অমৃতের সন্তান। তোমরা সকলেই অমৃতের অধিকারী। উঠ, উঠ, জাগ জাগ, নিজ নিজ স্বরূপ উপলব্ধি কর, আর এই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া অমর হও।

উপনিষদের ঋষি আবার বলিতেছেন :—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥

আমি জানিয়াছি এই আদিত্যবর্ণ, উজ্জ্বল মহান্ পুরুষকে, এই পুরুষকে জানিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। মৃত্যু হইতে উদ্ধারের আর কোনও উপায় নাই।

এই বাণী মিথ্যা কে বলিবে? এই অনুভূতিকে শুধু কথার কথা। কি বলা যায়? শ্রুতিবাক্যের সহিত মহাপুরুষের অনুভব আজ আনন্দে গদ গদ হইয়া বাক্য মিশাইয়া বলিতেছেন :—

ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং নিত্যং স্বাত্মানমঞ্জসা বেদ্মি।
ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং ব্রহ্মানন্দো বিভাতি মে স্পষ্টম্॥
ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং প্রাপ্তব্যং সর্ব্বমদ্য সম্পন্নং।
ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং তৃপ্তির্মে কোপমা ভবেল্লোকে॥

অন্তরাত্মাও বলিতেছেন—এই উপনিষদের বাণীই ত আমার প্রাণের কথা। এতদিন ত আমি ইহাই খুঁজিতেছিলাম। এতদিন ত ইহাকেই চাহিতেছিলাম। এতদিন ত ইহাই হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে গোপনে লুকাইয়া ছিল! আজ জননীর ন্যায় হিতৈষিণী শ্রুতি সেই হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশের অজানা—গোপন কথা বজ্রনিনাদে ঘোষিত করিয়া বলিলেন "তত্ত্বমসি"।

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীসৌরেন্দ্রচন্দ্র দেব

আবর্জ্জনায় কাঞ্চন

এম্ ডি ভেন্স্ (M. D Vains) নামে একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক আবর্জ্জনার সঙ্গে নিক্ষিপ্ত খড় থেকে তাঁর নবোদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে সুন্দর ও মূল্যবান কাগজ তৈয়ারী ক'রতে পারেন। তিনি বলেন যে প্রত্যহ যে পরিমাণে খড় আমরা আবর্জ্জনার সঙ্গে নিক্ষিপ্ত ক'রে থাকি তা' যদি ঠিক সংগ্রহ ক'রে রাখা যায় তাহ'লে তা' থেকে যে কাগজ দৈনিক উৎপন্ন হবে তা'তে মার্কিন রাজ্যের সমস্ত লোকের কাগজের ব্যয় নির্ব্বাহ করা যায়।
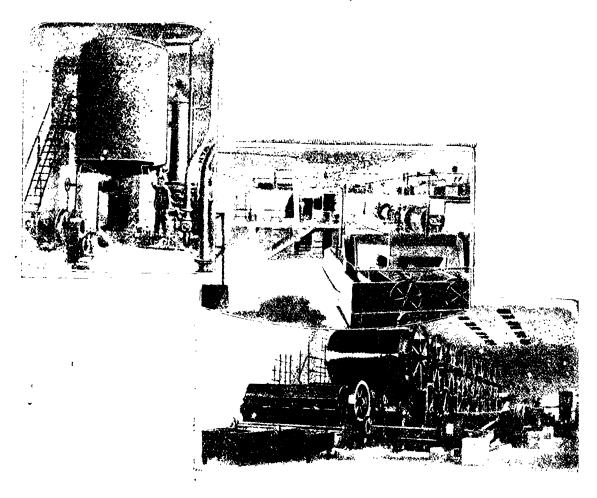
কাগজ তৈয়ারী ক'রার যন্ত্র (এই চিত্রের মধ্যে সম্মুখস্থিত বড় আধারটির ভিতর খড় ফেলে দেওয়া হয়)

কাগজ তৈয়ারি (যন্ত্রের মধ্যে কাগজ তৈয়ারী হ'চ্ছে)

কাগজ বাহির হওন (কাগজ যন্ত্রের মধ্যে বাহির হচ্ছে)

আবর্জ্জনা

(খড়কে আমরা আবর্জ্জনা মনে ক'রে অনেক সময়েই পুড়িয়ে ফেলি)

বিমান থেকে লাফ

দেড় হাজার ফুট উচ্চ থেকে প্যারাসুট সাহায্যে নামা আজ পর্য্যন্ত সার্জ্জেণ্ট র‍্যাণ্ডেল এল্ বোস (Sergeant

বোস্ ও বার্গো

(Sergeant Randle L. Bose (বাঁধদিকে) এবং corporal Arthur R. Bergo বিমানপোতে উঠবার আগে প্যারাসুট নিয়ে তৈরী হয়ে রয়েছেন)
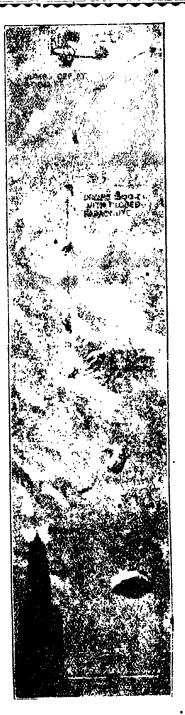
পৃথিবীর বক্ষের দিকে।—

(প্যারাসুট থেকে ঝাঁপ দেবার পর Bergo সাহেব পৃথিবীর বক্ষের দিকে অগ্রসর হ'চ্ছেন)

Randle L Bose) ও করপোরাল আর্থার আর বার্গো (corporal Arthur R Bergo) নামে দু'জন অসম-সাহসিক বৈজ্ঞানিক ব্যতিরেকে আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে ওঠেনি। বোস সাহেব দেড়হাজার ফুট উচ্চ হ'তে বিমানপোত থেকে লাফিয়ে পড়ে নিরাপদে পৃথিবীতে এসে পৌঁছেছেন। বারগো সাহেবও বারোশত ফুট উচ্চ হ'তে বিমানপোত থেকে লাফিয়ে পড়ে প্যারাসুট সাহায্যে পৃথিবীতে অক্ষত শরীরে নেমে এসেছেন।

ঝম্পপ্রদান : (Bergo সাহেব প্যারাসুট থেকে ঝাঁপ দিচ্ছেন।)

মানুষের গতি

(লোকে মনে করে যে সে সোজাভাবেই পথ চল্‌ছে কিন্তু তা' সচরাচর ঘটে ওঠে না)

সোজা গতি

রবার্ট ই মার্টিন (Robert E. Martin) নামে একজন মার্কিণ বৈজ্ঞানিক সম্প্রতি পরীক্ষা ক'রে আবিষ্কার ক'রেছেন যে মানুষ কখনও অভ্রান্ত সোজা গতিতে চল্‌তে পারে না। সে যতই চেষ্টা করুক না কেন সে কখনও সোজা চল্‌তে পারবে না। তিনি এর কারণ দেখিয়েছেন যে, মানবের মস্তিষ্কের কিয়দংশ ও কর্ণের মধ্যস্থিত সারকুলার কেনাল (circular canal) মানবকে তার হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও তা'র চলার গতি বক্র ক'রে দেয়।

গতিনির্দ্দেশক (গতিনির্দ্দেশক স্থান থেকে স্নায়ু মস্তিষ্কে Sensation বহন করে ও গতি নির্দ্দেশ করে থাকে)

([illegible] সাহায্যে আমাদের গতি নির্দ্দেশিত হয়)

শূন্যে রেলগাড়ী

শূন্যে রেল লাইন দিয়ে রেলগাড়ী চালান মসিঁয়ো ফ্রান্সিস্ লর্ (Monsieur Francis Lahr) নামে একজন ফরাসী

যন্ত্রবিদ্ সম্ভবপর ক'রেছেন। তিনি তাঁর নবোদ্ভাবিত রেল লাইন নির্ম্মাণ ক'রে। এই দুই সহরের ব্যবধান রেলচালনার পরীক্ষা ক'রেছেন প্যারী (Paris) হ'চ্ছে ষাট মাইল। তিনি তাঁর পরীক্ষায় সম্পূর্ণ সফলকাম থেকে সেণ্ট ডেনিস্ (St Denis) সহর পর্য্যন্ত শূন্যে হ'য়েছেন।

শূন্যে রেলগাড়ী

এঞ্জিন গাড়ী
(শূন্যে রেলগাড়ী চালাবার এঞ্জিন)
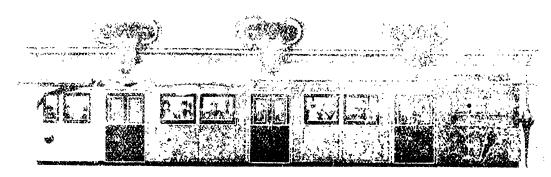
William Beebe সাহেব।

মধ্য আতলান্তিক পরিভ্রমণ

মধ্য অতলান্তিক (Mid Atlantic) অনেক দিন ধরে মানবের পদার্পণের বাইরে ছিল; আজ সেখানে গিয়ে পরি-

ভ্রমণ ক'রছেন উইলিয়াম বীবি (William Beebe) নামে নিউ ইয়র্ক জুলজিকাল সোসাইটির (New York zoological society) একজন কর্ম্মকর্ত্তা (Curator)। তাঁর সঙ্গে নিজেদের অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিবার জন্য গিয়েছেন Mrs. C. J Fish ও Miss Lilian Segal নামে দুজন মার্কিন রমণী বৈজ্ঞানিক। এঁরা তিন জনে অনেক কষ্টভোগ ক'রবার পর দেশে ফিরে এসেছেন।
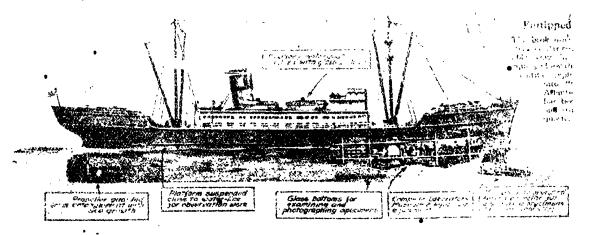
পরীক্ষা (Mrs. C. J. Fish (ডাইনে) ও eliss Lilian দু'জনে Saragassa সমুদ্র থেকে আনুবীক্ষণিক ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জানোয়ার ধরে তাদের পরীক্ষা ক'রছেন)

জীবন রক্ষার সরঞ্জাম

কোনও বাড়ীতে আগুন লাগলে অনেক সময় বাটির ভেতরকার লোক বাহিরে আসিতে পারে না এবং সেই জন্য তাঁরা অনেকেই অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান। এই অসুবিধা দূর ক'রবার জন্য

How a Scientist Goes Fishing

বিলাতের অনল নির্ব্বাপক কোম্পানী (Fire Brigade) যখনই কোনও যায়গায় আগুন লাগে নানারূপ নবোদ্ভাবিত জীবন রক্ষা ক'রবার যন্ত্রসহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে থাকেন। স্বয়ংবহ টেলিফোঁ (Auto telephone) পালমোটর (Pulmotor) রোপসট্ (Rope-shot) অক্সিএসিটেলিন (oxya-ceteline) ইত্যাদি সরঞ্জাম-গুলি তাঁদের প্রত্যেক পদে ব্যবহার ক'রতে হয়।
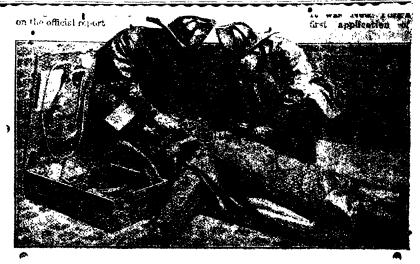
Pulmotor (ধূমে দমবন্ধ হয়ে যাবার যোগাড় হ'য়েছিল এমন লোককে উদ্ধার ক'রে Fire Brigadeএর লোকেরা এই যন্ত্রের সাহায্যে তা'র দম ফিরাবার চেষ্টা ক'রছে)

Photos © Keystone

Auto telephone

(Auto telephoneএর সাহায্যে বাড়ীর চারিদিকে আগুন থাকলেও বাহিরের লোকের সঙ্গে কথা কওয়া যায়। Fire Brigadeএর একজন লোক এই যন্ত্রের সাহায্যে বাহিরের লোকের সঙ্গে কথা বলছে)

Oxyaceteline
(এই যন্ত্রের সাহায্যে fire brigadeএর লোকেরা লোহার গরাদ গলিয়ে দিয়ে একজন লোককে উদ্ধার ক'রছে)

Rope-Shot
(বন্দুকের মতো এই যন্ত্রের সাহায্যে অনেকদূরে দড়ি নিক্ষেপ করা যায়)

উদ্ধার করণ
Rope Shotএর সাহায্যে দড়ি বাটীর ছাদে নিক্ষেপ করে দুজন লোককে উদ্ধার করা হ'চ্ছে)

আকাশবাণী।
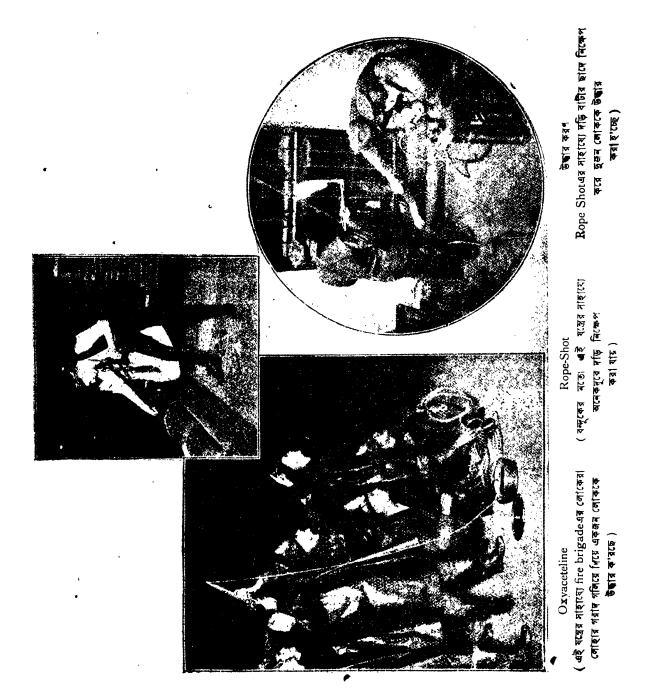
লণ্ডন ডেলি এক্সপ্রেস (London Daily Express) একটি অভিনব যন্ত্র সাহায্যে শূন্যে পঁচিশ মাইল দূর পর্য্যন্ত লেখার হরফ প্রতিফলিত ক'রতে পারে। একটি পিতলের
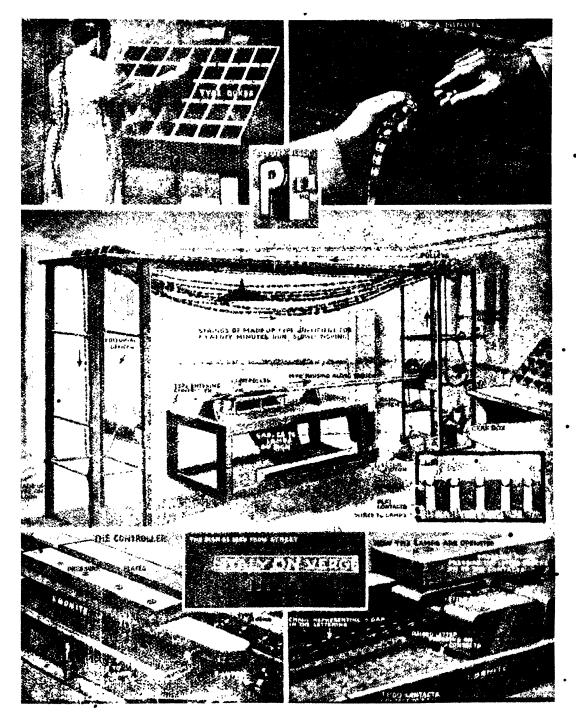
হরপ সাজান।—Control Apparatus (এর ভিতর দিয়ে ব্লকের উপর আটকান হরফগুলি বৈদ্যুতিক বাতির দিকে অগ্রসর হ'চ্ছে)। হরফ-ব্লক। নবোদ্ভাবিত যন্ত্র। এই নতন যন্ত্রে কোথায় কি ভাবে কি কি কাজ হয়ে থাকে তাহা নির্দ্দেশক চিহ্ন সাহায্যে বর্ণনা করা হয়েছে।

ব্লকের উপর কথা সাজিয়ে সেটিকে নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের (control apparatus) ভিতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে স্থিতিস্থাপক যন্ত্রের (Spring) সাহায্যে বৈদ্যুতিক বাতি সাজান স্থানে এনে হাজির ক'রে; সেখানে ব্লকের হরফ অনুযায়ী বাতিগুলিকে কলে ঠেলে তুলে দেয়। পরে চাবি টিপে বাতিগুলি জ্বালিয়ে দিলে সেগুলি শূন্যে প্রতিফলিত হয়ে আগুনে লেখা আকাশবাণীর মতো দেখ্‌তে হয়।

অদ্ভুত সাইকেল

ইউরোপের গত মহাযুদ্ধে অনেক রকম কল, কব্জারই উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এবং ঐ সময় হইতেই বর্ত্তমান সাইকেল অপেক্ষা অধিক গতিশালী সাইকেল উদ্ভাবন জন্য ইউরোপের সকল জাতিই চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু ইংরাজ জাতিই সর্ব্বাগ্রে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাঁহাদের উদ্ভাবিত সাইকেল, দেখিতে সাধারণ সাইকেলেরই মত, কিন্তু গতিতে রেলগাড়ী। সেদিন বিলাতে Herne Hillএ Monseiter. I. Brean নামক জনৈক সাহেব নব-উদ্ভাবিত উক্ত আমষ্ট্রং সাইকেল (Armstrong Cycle) ১০ মাইল পথ ১৪ মিনিট ৫৯⅘ সেকেণ্ডে অর্থাৎ ঘণ্টায় ৪০ মাইলেরও অধিক বেগে অতিক্রম করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে এইরূপ মজবুত ও Frictionless সাইকেল অদ্যাবধি

অদ্ভুত সাইকেল

উদ্ভাবিত হয় নাই। শুনিতেছি এই Armstrong Cycle ভারতবর্ষেও আসিতেছে।

সন্ধ্যা

প্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়

(এক)

আমার জীবন যেমন আগাগোড়া ছন্ন-ছাড়া, তেমনি চাকরীও জুটেছিল ভবঘুরে,—ডেপুটিগিরি। সাতঘাটের জল পেটে না পড়্‌লে পাকা হাকিম হয় না, তাই কোম্পানি বাহাদুর আমায় এখান সেখান করে' ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। সাত ঘাট ছেড়ে হয়তো তিন সাত্তে একুশ ঘাটের জল আমার পেটে গিয়েছিল, তবুও আমার ভাগ্যে পাকা স্থায়ী হাকিমি জোটেনি। আমার অদৃষ্ট যে আগাগোড়া দৈব বিড়ম্বনায় ভরা। কাজেই সব দিক দিয়েই এই শোল মাছও হাত থেকে পালিয়ে জলে চলে যায়। নইলে শ্রীবৎস রাজারই বা এত দুর্দ্দশা হবে কেন; আমি তো কোন্ ছার। তবে এইটাই ভাবি যে, আমার উপরই বা কেন এত অদৃষ্টের পরিহাস। জন্ম থেকে যে বিফলতাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি, সে নেহাৎ বন্ধু ভাবে আমায় জড়িয়ে ধরে আছে। কিছুতেই তা'কে ছাড়াতে পারছি না। এখন আমার অবস্থা, 'হাম্‌তো ছোড়্‌তা, লেকেন্ কম্‌লিতে নেই ছোড়্‌তা' গোছের হয়েছে। আমি বিফলতাকে যত

চাঁদিনী-রাতে

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকীল

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

তার পর আরো বেশী করে' ছন্ন-ছাড়া উদ্দেশ্যহীন করে' দিয়েছিল সে।

সেবার যেখানে বদ্‌লি হলাম—ভারী সুন্দর জায়গা। আমার থাক্‌বার বাড়ীখানিও সুন্দর পেয়েছিলাম। বাড়ীর পা ধুয়ে দিয়ে চলেছে ছোট একটি আঁকাবাঁকা নদী, চলেছে তা'র কোন্ অজানা প্রিয়র সঙ্গে মিল্‌তে। বাড়ীর হাতায় ছোট্ট একটি ফুল বাগান। নানা জাতীয় ফুলে ভরা। সকল ঋতুর ফুলই আছে,—শেফালী, যূঁই, কামিনী, গোলাপ, আরও কত, যেন চিরযৌবনা বাসন্তী-লক্ষ্মী হাসি মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

বর্ষাকাল। আষাঢ়ের মাঝামাঝি। নদীটি পূর্ণযৌবনা তরুণীর মত চঞ্চল, শব্দমুখর। জল একেবারে গেরী মাটির রং। আকাশে মেঘ জমে আসন্ন বৃষ্টির সূচনা জানাচ্ছে। মেঘলার জন্যে সমস্ত দিক একটা ধূসর রংয়ে মোড়া। মনে হচ্ছে কে যেন ধরিত্রীকে একখানি ধূসর রংয়ের শাড়ী পরিয়ে দিয়েছে, আর নদীটি যেন সেই শাড়ীর গেরুয়া পাড়, তাঁর বুকের উপর দিয়ে ঘুরে গেছে।

আমার নিঃসঙ্গ জীবন এখানে এসে যেন একটু স্বস্তি পেলে। কথা ছিল যে, এখানে এখন কিছু দিন থাক্‌তে হ'বে। আর তা ছাড়া ছুটির দরখাস্ত করেছিলাম। ইচ্ছে—ছুটি নিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে এখানে কিছু দিন আরাম কর্‌বো। আমাদের তো কেবল ঘুর্‌তে হয় ম্যালেরিয়ার ডিপোয় ডিপোয়, আর দেখ্‌তে হয় এঁদো পুকুর, পচা ডোবার পাট পচানি জল। এই সৌন্দর্য্য নিয়েই বেশীর ভাগ সময় কাটে। আর এর উপর আছে চোর ছ্যাঁচড়ের সঙ্গ। কাজেই জীবন হ'য়ে উঠে কঠোর, কোমলতার লেশশূন্য। সেই জন্যে এমন সুন্দর জায়গা ছাড়তে ইচ্ছে কর্‌ছিল না।

বিকেলবেলা খুব এক পশ্‌লা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। এখন মেঘের কোণভাঙ্গা ফাঁক দিয়ে পড়ন্ত লাল রোদ এখানে-সেখানে-জমা জলের উপর পড়ে চিক্‌মিক্ কর্‌ছে। ভিজে কাকগুলো ডানা ঝেড়ে এগাছ ওগাছ ক'রে উড়ে বেড়াচ্ছে। তাদের পায়ের নখের আঘাতে পাতায় জমা জল ঝরে পড়্‌ছে, যেন গাছগুলো তাদের পায়ের আঘাতে কাঁদছে।

আমি গিয়ে বাগানে কামিনী গাছটার গোড়া বাঁধানো কোরে' ফুলগুলো সব মাটিতে ঝরে পড়েছে—যেন কোন্ দেবতা পৃথিবীকে আশীর্ব্বাদ করছেন তাঁর মাথায় পুষ্পবৃষ্টি করে। আমি কতকগুলো ফুল হাতে তুলে নিলাম। খানিক পরে মন আমার এলোমেলো চিন্তায় ডুবে গেল।

হঠাৎ চমক ভাঙ্‌ল একটা লঘু পদক্ষেপের শব্দে। চেয়ে দেখি, আমার দিকেই ছুটে আস্‌ছে একটি হরিণ-শিশু—আর তার পিছনে একটি তন্বী তরুণী এলোচুলের গুচ্ছ দুলিয়ে। হরিণ-শিশুও আমার কাছে এসে থমকে দাঁড়ালো, সঙ্গে সঙ্গে তরুণীও লজ্জা ও অপ্রতিভের ধাক্কায় থম্‌কে দাঁড়ালো। আমি কি জানি কেন হঠাৎ উঠে দাঁড়ালাম। হরিণ-শিশু আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো, আর তরুণীও লজ্জা-রক্তিম মুখে লাজ-অলস আঁখি মেলে আমার মুখের দিকে চাইল, যেন প্রথম জ্যোৎস্নাপাতে পদ্মকোরক প্রস্ফুটিত হলো। পরক্ষণেই মুখ নামিয়ে নিলে। মুখে ফুটে উঠ্‌লো অপ্রতিভ-লজ্জা-মিশ্রিত মৃদু হাসি। সেই চাহনির অপূর্ব্ব মাধুরী আমার মনে একটা রঙিন্ ছোপ ধরিয়ে দিলে, আর সেই লজ্জাজড়িত চরণে থমকে দাঁড়ানোর অপরূপ ভঙ্গিমা আমার প্রাণকে পুলকের তালে নাচিয়ে তুল্‌লে।

তরুণীর পরণে ছিল একখানি খুব ফিকে বেগুনি রঙের শাড়ী, আর তারই মিল-করা একটা আঁটসাঁট ব্লাউজ্। কপালের উপর জলছিল সন্ধ্যাকাশের গায়ে সন্ধ্যাতারার মত একটি সিঁদূরের টিপ। এলায়িত চুলগুলি নিবিড় কালো মেঘের মত সারা পিঠ ছেয়ে ফেলেছে। চুলগুলি ডগার দিকে অল্প অল্প কোঁকড়া কোঁকড়া, যেন কালো আঙুরের গুচ্ছ। তারই দু'একটা উড়ে এসে মুখের উপর পড়েছে। তরুণী যেন একটা স্বপ্নের মত, প্রহেলিকার জালে নিজেকে জড়িয়ে আমার সামনে এসে উপস্থিত। আমি তাকে অতৃপ্ত হৃদয়ের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। জানি না, সে কোন্ কণ্ব মুনির পালিত শকুন্তলা। কোথা দিয়ে সে বাগানে এলো এবং কেমন করে এলো, সবই কেমন গোলমাল ঠেকলো। এতদিন এখানে এসেছি,—কই, একে তো দেখিনি। আজ এই গোধূলি লগ্নে আমার মানস-লক্ষ্মী মূর্ত্তি ধরে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে শুভ দৃষ্টি কর্‌ছেন। অন্তর পুলকে দুলে উঠলো। জীবনের সবখানিই তা'হলে আমার বিফল নয়।

হঠাৎ বাগানের বেড়ার ওপার হ'তে কে ডাক্‌লে—সন্ধ্যা।

তরুণী মুখ ফিরিয়ে একবার দেখ্‌লে। তার পরই আর একবার তেমনি ভাব-বিভোর বড় বড় ভাসা ভাসা চোখের দৃষ্টি আমার মুখের উপর বুলিয়ে নিয়ে যেমন দৌড়ে এসেছিল তেমনি দৌড়ে চলে গেল! দৌড়ুবার সময় তা'র চঞ্চল অঞ্চল আমার অঙ্গ স্পর্শ করে গেল। এ কি সৌভাগ্য! আমি অবশ হ'য়ে বসে পড়্‌লাম। তার চাহনি ও থমকে দাঁড়ানোর অপরূপ ভঙ্গিমা আমার প্রাণে কেবলই জেগে উঠ্‌ছিল। তার লীলায়িত তনুখানি যেন চুনীর মদের পেয়ালা, চোখ দুটি লাল লালসাপূর্ণ মদ। আমি পান করে পাগল হয়ে উঠলাম। এ কি জ্বালা! কোথায় তার সন্ধান পাব কিছুই জানি না। অথচ মন জোর করে ঠেলতে লাগ্‌লো তাকে পেতেই হবে। এ কি দৈব বিড়ম্বনা!

নাম তার সন্ধ্যা। সন্ধ্যার ই সে নম্র ও কম্র। তেমনি আবার ক্ষণস্থায়ী চঞ্চল। কিছুক্ষণের জন্য স্থির থেকে রাত্রির অন্ধকারে মিশে যায়। তবু সে সুন্দর, শাশ্বত, জাগ্রত, চিরমধুর। প্রাণে সে নূতন ভাবের প্রেরণা জাগায়; কিন্তু স্থায়ী হতে দেয় না। রাত্রির বিষাদ এসে সকল মাধুর্য্য ঢেকে ফেলে! নিজেও কালো ঘোমটায় মুখ ঢাকে। আমি বসে বসে এই হঠাৎ-ঘটা ব্যাপার তলিয়ে আগাগোড়া ভাবতে লাগলাম।

ভাব্‌তে লাগ্‌লাম, এই তরুণী হয় তো প্রতি দিনই আমার বাগানকে তার নীরব লীলা-চঞ্চল চরণ স্পর্শে ধন্য করে। বাগানের সৌভাগ্যে আমার ঈর্ষা হতে লাগলো। হয়তো, তরুণী কত শীতে, বসন্তে, বর্ষায়, তাদের ফুল তুলে নিয়ে গেছে। তারা তার হাতের মোহনস্পর্শে হয়তো পুলকে শিউরে কেঁপে উঠেছে। তার জন্যে নিজেরা পুষ্পিত হয়ে' অর্ঘ্য যত্নে সাজিয়ে রেখেছে। আগ্রহে ফুল ভোর হবার আগেই ফুটে উঠেছে, এখনি তরুণী এসে তুলে তার অলক গুচ্ছে গুঁজবে, তার বুকের উপর চেপে ধর্‌বে, পাতলা রাঙা ঠোঁটের চকিত স্পর্শে তাদের পুষ্প-জীবন ধন্য করে দেবে।

এমনি করে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে ভাব্‌তে ভাব্‌তে বাগানের এক কোণে এসে পৌঁছলাম। সেখানে দেখ্‌তে পেলাম ছোট্ট একটি আগড় দেওয়া দোর। এতদিন এটা লক্ষ করিনি। এই পথেই তরুণী বাগানে এসেছে, আবা[র] চলে গেছে,—এমনি কত সন্ধ্যায়, প্রভাতে, নিদাঘে। কত দিন হয়তো তার অঞ্চল উড়ে এই আগড়ে জড়িয়ে গেছে আমি চুপ করে' আগড় ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

সন্ধ্যার অন্ধকার বাগানের কোণ থেকে আরম্ভ ক'[রে] সারা দেশকে আচ্ছন্ন করে ফেল্‌লে। দিক্‌দিগন্তে তারা বধূর সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বলে উঠ্‌ল। কোথায় কোন্ দু[রে] সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বেজে উঠে আমার চমক ভাঙ্গিয়ে দিলে।

(দুই)

সেই দিন থেকে প্রতি দিন সন্ধ্যার প্রতীক্ষায় বাগা[নে] আবেগ-স্পন্দিত হৃদয় নিয়ে বসে থাক্‌তাম। কিন্তু কোনে[া] দিনই দেখা পেতাম না। নিরাশ হ'য়ে পড়্‌তাম বাগান আরো বেশী করে সাজিয়ে তুললাম। সন্ধ্যা[র] চাক্ষুষ দেখা না পেলেও বাগান তার আগমনের সাক্ষ[্য] দিতো।—প্রতি দিনই লক্ষ্য কর্‌তাম যে, ফুল গাছ থেকে কে ফুল তুলে নিয়ে যায়। এ তো আর কেউ নয়, এ সেই তবে কেন তাকে ধর্‌তে পারি না।

আপিস থেকে বাড়ী এসে জামা কাপড় ছে[ড়ে] তাড়াতাড়ি বাগানে এলাম। এসে যা দেখ্‌লাম তা'[তে] আমার প্রাণ আনন্দে পাগল হ'য়ে উঠ্‌লো। সন্ধ্যা আমা[র] বস্‌বার সেই বেদীর কাছে অন্যমনে দাঁড়িয়ে আছে। বাঁ হাতে তার একটি প্রস্ফুটিত কামিনী ফুলের ডাল শুদ্ধ গুচ্ছ ফুলগুলো যেন তা'র স্পর্শে হাস্‌ছে। ডান হাত দি[য়ে] গাছের একটা উঁচু ডাল ধরেছে। আঁচল কাঁধ হতে স্খলি[ত] হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে! দেহখানি লতার ম[ত] বেঁকেচুরে এলিয়ে উঠেছে। মুখে তার ভাববিভো[র] ভাব।

আমার সাড়া পেয়ে সে চমকে উঠে অপ্রতিভ ও লজ্জি[ত] হয়ে নিজেকে সম্বৃত ক'রে নিলে। হাত থেকে ফুলে[র] গুচ্ছ মাটিতে প'ড়ে গেল। সন্ধ্যা আবার তেমনি প্রাণ মাতানো চাহনি মেলে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলো। আমি তাড়াতাড়ি ফুলের গুচ্ছ কুড়িয়ে নিয়ে তার দিকে অগ্রস[র] হয়ে দ্বিধা-শঙ্কিত কণ্ঠে বললাম,—ফুলটা পড়ে রইলো, নি[য়ে] গেলে না। এই নাও আমি কুড়িয়ে এনেছি। আমা[র] কথা শুনে সে যেতে যেতে আবার তেমনি অপূর্ব্ব ভঙ্গীমা

থমকে দাঁড়িয়ে, আমার মুখের দিকে ফিরে চেয়ে লজ্জারুণ মুখে মৃদু হেসে মাথা নীচু করলে। তারপর কিছু পরে শঙ্কা-কম্পিত হাতে আমার হাত হতে ফুল নিলে। ফুল নেবার সময় তার পুষ্প-পেলব কোমল আঙুল আমার হাতে ছুঁয়ে গেল। কোনো কথা সে বললে না। আর বলবার দরকারও ছিল না। তা'র কম্পিত চকিত স্পর্শই তা'র অন্তরের সকল কথা ব্যক্ত করে দিলে। তার ছোঁয়া লেগে আমার সমস্ত শরীর শিউরে উঠ্‌লো। আনন্দের আতিশয্যে আমি কেমন মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়্‌লাম। সন্ধ্যাও একবার, হ্যাঁ, একবার চম্‌কে উঠেই মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে বাগান হ'তে চলে গেল।

সন্ধ্যার চকিত স্পর্শ আমার প্রাণের ভিতর একটা অনাস্বাদিত সুখের আবেশ ছড়িয়ে দিলে। সমস্ত জীবনের যে সুপ্ত অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা প্রাণের কোন্ নিভৃত কন্দরে বন্দী হয়ে ছিল, সেগুলো আজ জেগে উঠে দিগ্বিদিকে পুলকের বাণ ডাকিয়া দিলে। চারিদিক থেকে আনন্দের ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে আমার প্রাণে আঘাত করতে লাগ্‌লো। তার সেই স্পর্শ হলো যেন আমার সোনার কাঠির স্পর্শ, আমার প্রাণের জীয়ন কাঠির স্পর্শ। যে প্রাণ জেগেও মরে ছিল, সে আজ নব জাগরিত হয়ে পুলকে পাগল হয়ে উঠ্‌লো। তার আনন্দ এখন রোখা দায়। সে বাঁধন-মুক্ত ঘোড়ার মত চার পা তুলে উর্দ্ধ-পুচ্ছ হয়ে কোন্ অনন্তের উদ্দেশ্যে অনির্দ্দিষ্ট বেগে ছুটে চলেছে। কোনো বাধা সে মানতে চায় না, কোনো শাসন সে শুন্‌তে চায় না। আজ সে মুক্ত স্বাধীন,—দিগ্বিজয় করতে চলেছে। যেন কোন্ পরাক্রান্ত রাজার অশ্বমেধের ঘোড়া। কপালে জয়-পতাকা বেঁধে সগর্ব্বে বুক ফুলিয়ে রাজ্যের পর রাজ্য পার হয়ে চলেছে বাধাহীন গতিতে।

তারপর দিনও আমি তাড়াতাড়ি আপিস থেকে বাড়ী এসে বাগানে গিয়ে নিজের হাতে একটি ফুলের তোড়া সন্ধ্যাকে উপহার দেবার জন্যে বেঁধে তার আগমন প্রতীক্ষায় বসে রইলাম। সেই তোড়ার মধ্যেই আমার হঠাৎ-সজাগ প্রেমের গুপ্ত কথাটি গোপন করে, ফুলের বুকের ভিতর দিয়েই তার কাছে প্রেরণ করবার জন্যে বসে রইলাম। বসে বসে ভাব্‌তে লাগ্‌লাম যে, আমি তো আমার মানস লক্ষ্মীর জন্য অর্ঘ্য সাজিয়ে বসে রইলাম। কিন্তু সে কি এসে আমায় ধন্য করবে, আমার জীবনকে মঞ্জরিত করবে এতটা আশা তো আমি করতেও পারি না। না পারলেও, তবু তা'র আশায় বসে থেকে যে আমার সাধনা ব্যর্থ হবে এতেও আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করবো। তার চরণ-নুপুরের মৃদু নিক্বণ আমার হৃদয়-পুরের পথে পথে বেজে উঠেছে। তার দেখা পাই আর নাই পাই, তাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। তার দেখা না পাওয়াও আমার লাভ। কারণ তার হৃদয়ের যে গোপন নীরব ভাষার ঝঙ্কার আমার প্রাণের তারে সুর তুলেছে সেইটুকুই যে আমার পাওয়ার দাবী। তার বেশী তো আমি আশা করতেই পারি না। যদিই তার বেশী কিছু ঘটে তো সেটা আমার পুণ্য বলে ঘটেছে মনে করবো।

আমায় কিন্তু নিরাশ হ'তে হলো না। সন্ধ্যা একটি রঙিন্ প্রজাপতির মত তার ধানি রংয়ের চঞ্চল অঞ্চল উড়িয়ে আমার সাম্‌নে এসে তার স্বাভাবিক ভঙ্গিমায় থমকে দাঁড়িয়ে বিলোল কটাক্ষ মেলে চাইলে। ঠোঁটের কোণে, নিশুতি রাতের বহু দূরের একটুকরো কালো মেঘের বুকের স্বল্প বিদ্যুৎ দীপ্তির মত মৃদু হাসি ফুটে উঠ্‌লো। আমি মোহিত হয়ে গেলাম।

নিজেকে সংযত করে জোর করে তার দিকে কম্পিত হাতে তোড়া এগিয়ে ধরে বাধ বাধ গলায় বল্‌লাম—এটা তোমার জন্য রেখেছি। নেবে কি ?

সন্ধ্যা মৃদু হাসির রেখা ঠোঁটের উপর টেনে লজ্জা-কম্পিত হাতে তোড়া নিলে। নিয়ে একবার গন্ধ শুঁকে আস্তে আস্তে বল্‌লে—ভারী সুন্দর ফুল। আমি ফুল বড় ভালবাসি। সেই জন্যেই আপনার বাগান আসি, কিছু মনে করবেন না।

কিছু মনে করবো আমি। তোমার আগমনে আমার বাগান ধন্য হয়ে গেছে। ততোধিক ধন্য হয়েছি আমি। তুমি রোজ আসবে এই আমি চাই। নইলে হয়তো কিছু মনে করবো। বলে তার দিকে চাইলাম।

সন্ধ্যা আমার কথা শুনে মুখ নামিয়ে নিলে। আমার প্রশংসায় সে কুণ্ঠিত হয়ে পড়্‌লো। তারপর আজই প্রথম সে আমার সঙ্গে কথা কইলে। সঙ্কোচ এসে তার দেহের উপর ছড়িয়ে পড়্‌লো। সে আস্তে আস্তে চলে গেল,

আর কোনো কথা বল্‌লে না। আমি আজ তার সঙ্গে বাগানের শেষ পর্য্যন্ত গেলাম।

সেই দিন হতেই আমাদের ছ'জনের সঙ্কোচ অনেক কমে গেল। ছ'জনেই কথাবার্ত্তা বেশ নিঃসঙ্কোচে কইতাম। পরিচয় পেলাম, সে আমারই প্রতিবেশী রামসদয় বাবুর মেয়ে। আমাকে রামসদয় বাবু ভারী স্নেহ করেন। এই পরিচয়ে আমার মনের আর এক দিকের সমস্যা কেটে গেল। হয়তো সন্ধ্যাকে পাওয়া কিছু দুরাশা নয়। রামসদয় বাবুকে বল্‌লেই হয়তো তিনি রাজী হবেন। তবে সন্ধ্যা! সে তো এই কদিনেই আমার সঙ্গে বেশ মিশে গেছে।

আমি সেই দিন থেকেই রামসদয় বাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আরো বাড়িয়ে তুল্‌লাম। সন্ধ্যাও মধ্যে মধ্যে রামসদয় বাবুর পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের কথায় যোগ দিতো। রামসদয় বাবুও জান্‌তেন যে, সন্ধ্যা আমার বাগানে আসে, ফুল নিয়ে যায়। একদিন বল্‌লেন—বাবা, সন্ধ্যা তো তোমার বাগান উজাড় করে ফুল নিয়ে আসে। বারণ করি তবু শোনে না।

আমি সন্ধ্যার মুখের দিকে চাইলাম, সে মুখ নীচু করলে। মনে মনে বল্‌লাম, ফুল উজাড় করে আনে বলেই ফুল ধন্য। আমিও নিজেকে উজাড় করে বিলিয়ে দিয়ে নিজেকে ধন্য কর্‌বার জন্য ব্যাকুল। রামসদয় বাবুকে বল্‌লাম—তা' আনুক। ফুল তো আমার কোনো কাজেই লাগে না।

সন্ধ্যার সময় সেদিন যখন আমি রামসদয় বাবুর বাড়ী গেলাম, সন্ধ্যা তখন কি একটা গান গাইছিল। আমায় দেখে চুপ করলে। রামসদয় বাবু পাশে বসে শুনছিলেন। তাকে চুপ কর্‌তে দেখেই তিনি বল্‌লেন—লজ্জা কি, কুমুদ বাবুকে গান শোনা না। গানে লজ্জা নেই, গা।

সন্ধ্যা লজ্জিত হয়ে এটা সেটা বাজানোর পর ধীরে ধীরে গান ধর্‌লে,—

> বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে,
> আমার নিভৃত নব জীবন পরে।

আমি আত্মহারা হ'য়ে গেলাম। একি তার প্রাণের কথা। আমার প্রাণের বীণাতো নূতন ছন্দে ছন্দে বেজে উঠেছে। তারাও কি তাই। তার সেই সুরের ঝঙ্কার আমার হৃদয়ের সমস্ত গোপনতাকে আরো পরিস্ফুট করে ফুটিয়ে তুল্‌লে। যা আমি ধর্‌তে পারিনি, তাই সে আমার সামনে ধরিয়ে দিলে। আমি মোহাবিষ্টের মত বাড়ী ফিরে এলাম—আমার সকল গোপনতার অজ্ঞানতার ঘা[illegible] মুক্ত করে।

(তিন)

সেদিন বিকেলে বাগানে এসে দেখ্‌লাম সন্ধ্যা বেদী[illegible] উপর গালে হাত দিয়ে বসে আছে। যেন একটি হরে[illegible] রংয়া প্রজাপতি। হাতের চাপে গালে রক্ত জমে উ[illegible] মুখ ফোটা-জবার মত হয়েছে। আমাকে দেখে হে[illegible] বল্‌লে—আজ আপনাকে হারিয়েছি। আপনার আ[illegible] এসেছি।

আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে হেসে বল্‌লাম—প্রজাপতির কাজ[illegible] তো তাই, সকলের আগে উড়ে গিয়ে ফুলে ব[illegible] প্রজাপতির দৌরাত্ম্যেই তো আমি অস্থির।

আমি তাকে প্রজাপতি বলে ডাক্‌তাম সে জান্‌তো। আজ প্রজাপতি শব্দটা অর্থবোধক [illegible] ব্যবহার কর্‌লাম। সে বুঝতে পার্‌লে কি না, বুঝ[illegible] পার্‌লাম না। শুধু মুখ নীচু করে একটু টানা [illegible] বল্‌লে—যান্।

আমি তার কাছে বসে আস্তে আস্তে তা'র [illegible] নিজের হাতের মধ্যে নিতেই সে, কি জানি কেন, [illegible] পৃষ্ঠের মত লাফিয়ে উঠে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌লে—[illegible] কর্‌লে আর কোনো দিনও আসবো না, তা বল্‌ছি।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ঠিক বুঝ্‌তে পা[illegible] না কেন সে অমন করে উঠ্‌লো। আজ প্রথম [illegible] তাকে ইচ্ছাকৃত স্পর্শ কর্‌লাম; তার দরুণ সঙ্কোচ, লজ্জ[illegible] অতি আনন্দের আতিশয্যে সে অমন ক'রে উঠ্‌লো [illegible] কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। তবে কি আমার কল্পনা মিথ্যা। তৃষ্ণা যখন প্রবল হয় তখনই তো স[illegible] মরীচিকা দেখে। আমারো কি তবে তাই। তবে সে প্রতিদিন আমার প্রতীক্ষায় বাগানে আস্‌তো, ব[illegible] গল্প কর্‌তো। সমস্তই কি ভুল দিয়ে ঘেরা। সব [illegible] তাল পাকিয়ে ঘুলিয়ে গেল।

তারপর কদিন আর সন্ধ্যার দেখা পাইনি। আমি প্রতিদিনই তার আশায় বাগানে বসে থেকে থেকে নিরাশ হয়ে উঠে চলে আস্‌তাম। তার বাড়ী গিয়েও তার দেখা পাইনি। রামসদয় বাবুকেও জিজ্ঞাসা কর্‌তে কেমন সঙ্কোচ বোধ হতো।

সেদিন আপিস থেকে বাড়ী ফির্‌তে দেরী হয়ে গিয়েছিল। এসে ঘরে ঢুকে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। সন্ধ্যা আমার ঘরের জান্‌লার দুটো গরাদে ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। জানলার ফাঁক দিয়ে ভাগ-করা জ্যোৎস্না ঘরে এসে তার পায়ের কাছে খেলা কর্‌ছে। সন্ধ্যা আমার সাড়া পেয়ে চম্‌কে অপ্রতিভ হয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠ্‌লো—আপনাকে বাগানে না দেখে ভাবলাম কি হয়েছে, তাই ঘরে দেখ্‌তে এলাম। কিন্তু এসে আপনাকে না দেখে দাঁড়িয়ে ভাব্‌ছিলাম।

আমি হেসে বল্‌লাম--কদিন তো প্রজাপতির দেখা পাইনি কাজেই যাইনি, আর তা' ছাড়া ঘরেই যদি প্রজাপতিটির শুভাগমন হয় তা'হলে কষ্ট করে বাগানে যাওয়ার দরকার কি।

সন্ধ্যা কোনো উত্তর না দিয়ে আমার হারমোনিয়াম বাজাবার ঘুর্ণী টুলটায় বসে অলস শ্লথ ভাবে এলোমেলো হারমোনিয়ামের চাবি টিপ্‌তে লাগ্‌লো।

আমি বল্‌লাম—অমন করে না বাজিয়ে একটা ভাল করেই গাও না।

সন্ধ্যা টুলটায় একটা ঝাঁকানি দিয়ে এক পাক ঘুরে বল্‌লে—দায় পড়েছে আমার গান গাইতে।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সে ঠিক হয়ে বসে গান ধর্‌লো। আমি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে একেবারে তার পাশে বস্‌লাম। সে একবার আমার মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে গান ধর্‌লে—

সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার করিব হে!
সবার মাঝারে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে!

আমি মুগ্ধের মত বসে শুনতে লাগ্‌লাম। এ কি তার প্রাণের কথা সে, আমায় জানাচ্ছে। গান শেষে সন্ধ্যা আমার দিকে চেয়ে ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে মুখ অন্ত

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আমি বল্‌লাম—যা গাইে এ কি তোমার সত্যি কথা?

সন্ধ্যা মুখ ঘুরিয়ে বল্‌লে—অত সত্যি মিথ্যে জানিনে যা মনে এলো গাইলাম।

আমি হেসে বল্‌লাম—তা যদি হয় তা' হলে তোমা বাবাকে বলি যে, আমি তোমায় চাই, আর তুমিও—

সন্ধ্যা টুলটায় আবার একটা পাক দিয়ে গম্ভীর মু বল্‌লে—যাও তুমি ভারী দুষ্টু। কিছু জানিনে আমি।

তার হঠাৎ এই 'তুমি' সম্ভাষণে পুলকিত হয়ে আমি দুষ্টুমি করে বল্‌লাম—তা'হলে বল্‌বো না। তুমি রাজ নও তো। বলে, যেন দুঃখিত হয়ে মুখ গম্ভীর কর্‌লাম।

সন্ধ্যা এই কথা শুনে আমার দিকে ফিরে আমার মুখে উপর তার ভাসা ভাসা চোখের চাহনি বুলিয়ে নিয়ে মু নীচু করে আস্তে আস্তে বল্‌লে—আমি কি তোমায় বল্‌ বারণ কর্‌ছি। তোমার যা খুশী বলগে না। কে তোমা বারণ কর্‌ছে বল্‌তে।

সন্ধ্যার এই উত্তর শুনে আমার সমস্ত শিরা উপশিরা ভিতর দিয়ে কি একটা অজানিত আনন্দের পুলক-প্রবা বহে যেতে লাগ্‌লো। ওরে, সবখানিই তোর ব্যর্থ নয় বিফল নয়। বিফলতার মধ্যে দিয়েও যে কখন সার্থক উঁকি মারে তা বলা যায় না। আর বিফলতা আ বলেই তো সফলতা। দুঃখের অনুভূতির মধ্যেই তো সুখে মোহন স্পর্শের মধুরতা বোঝা যায়। নিরবচ্ছিন্ন সুখ দুঃখেরই সামিল হয়ে যেতো। তার মোহনতা, মাধু কিছুই বোঝা যেতো না। দুঃখ আছে বলেই সুখকে সু বলে চেনা যায়। সেই জন্যেই বোধ হয় দুঃখ মানুষে অমন বন্ধু ভাবে আমরণ জড়িয়ে থাকে। বৃক্ষ তার বেষ্টি লতার চাপে নিজেকে পঙ্গু করে ফেল্‌ছে, তবুও সে লতাকেই তার নিজের প্রাণ-রসটুকু নিস্বার্থ ভাবে দান ক তাকে পুষ্ট করে নিজের মরণ ডেকে আনে। তবুও সে সুখী মানুষও তেমনি দুঃখকেই বাড়িয়ে তোলে সকল দিক দি সুখ পাবার জন্যে নিজেকে মেরে। তবু সে তার ম দিয়েই সুখকে পেতে চায়।

(চার)

রামসদয় বাবুকে বলি বলি করেও বলা হলো ন

আর তা ছাড়া মনে করলাম এখন তো এইখানেই কিছুদিন থাকবো, তবে আর তাড়াতাড়ি কি ; একদিন গুছিয়ে ধীরে-সুস্থে বললেই হবে।

কিন্তু আমার জীবনের সমস্ত পাতাগুলো এলোমেলো করে দিয়ে একদিন এক পরওয়ানা এসে উপস্থিত হলো। আমার ছুটিতো মঞ্জুর হয়-ই নি, উপরন্তু চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমায় সেখান হতে বদলি হয়ে চলে যেতে হবে। আমি নাকি খুব কড়া হাকিম ; তাই যেখানে যেতে হবে সেখানে একটা দাঙ্গা হয়েছে বলে তাই দমন করতে আমায় যেতে হবে। এ কি অদৃষ্টের পরিহাস ! আমার সব খেই হারিয়ে গেল। কোথা দিয়ে কেমন করে যে, আমার জীবন-বীণার তারগুলো এমন করে এক সঙ্গে জড়িয়ে বেসুরো বেতালা বেজে উঠলো কিছুই বুঝতে পারলাম না। আমি মুহ্যমান হয়ে ঘরে বসে রইলাম। যেতেই হবে, যত কষ্ট হোক না কেন।

এমনি সময় সন্ধ্যা হাসিমুখে ঘরে ঢুকলো। বন্ধ জানালায় আছাড়-খাওয়া জ্যোৎস্না যেমন জানলা খুলে দিলেই ঘরের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার সকল সৌন্দর্য্য নিয়ে, ঠিক তেমনি ভাবেই সন্ধ্যা ঘরে ঢুকলো। আমার ভাব দেখে তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, যেন মেঘের চাপে চাঁদের হাসি চাপা পড়লো। আমি তাকে সব খুলে বললাম। সে খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নিয়ে একটা চেয়ারের উপর ধপ্ করে বসে পড়লো। চোখ তার অশ্রু-সজল হয়ে উঠলো। আমি তার পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে বললাম—ছিঃ, লক্ষ্মীটি কেঁদো না। আমি শীগগির ফিরে আসবো।

সন্ধ্যা মুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে কান্না গোপন করে বললে,—দায় পড়েছে আমার কাঁদতে। কিন্তু যাচ্ছ যাও। এর ফল তোমায় একদিন প্রাণে প্রাণে ভুগতে হবে। তখন কিন্তু আমায় দোষ দিও না তা' আগে থাকতেই বলে রাখছি। বলে' দ্রুত ঘর হতে বেরিয়ে চলে গেল। আমার কোনো কথাই সে শুনলে না। আমি অবশ ভাবে শোফার উপর বসে পড়লাম। এ কি অভিশাপ সে আমায় দিয়ে গেল।

হয়ে ঘুরে ঘুরে প্রায় এক বছরের উপর কেটে গেল। রামসদয় বাবুকে প্রায়ই পত্র দিতাম। কিন্তু সন্ধ্যার খবর জিজ্ঞাসা করতে পারতাম না। কি জানি যদি কিছু অন্য রকম শুনি যে, তার বিয়ে হয়ে গেছে। মেয়েরা যতই কিছু করুক না কেন নিজের হৃদয়ের গোপনতাকে কিছুতেই প্রকাশ করে না, যতই দুঃখ কষ্ট তার জন্য বরণ করতে হোক না কেন, বিশেষতঃ এই ব্যাপারে। সন্ধ্যা মুখ বুঁজে সকল অত্যাচার সইবে তবু এ কথা হয়তো বলতে পারবে না। রামসদয় বাবুও কি জানি কেন তার কোনো খবর দিতেন না। এমনি উদ্বিগ্নের ভিতর দিয়ে দিন কেটে যেতে লাগলো।

একটা কাজের জন্য একটু দূর জায়গায় যেতে হয়েছিল। ট্রেণে করে চলেছিলাম। গাড়ীর কামরা ফাঁকা। আমি একলা বসে আশা নিরাশার দ্বন্দ্বের মীমাংসা করবার চেষ্টা করছিলাম। আর এই ভেবে আশ্চর্য্য হচ্ছিলাম যে, এই পৃথিবীতে যে যা চায় বা ভালবাসে সে ঠিক সেইটির উল্টো ফল পায়। আকাঙ্ক্ষার বস্তু সহজে মেলে না। অথচ এইটাই মজা যে, যা পাবো না সেইটার জন্যই আকাঙ্ক্ষা বেশী। হয়তো সন্ধ্যাকে পাবো না বলেই তাকে পাবার স্পৃহা আমার এত প্রবল হয়ে উঠেছিল। তাকে তো পরে পাই-ই নি, আমার বলে কাছে রাখবার মত কোনো পার্থিব স্মৃতিচিহ্নও তার কাছ থেকে চেয়ে নিয়নি। কারণ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাই তখন মনে প্রবল হয়ে উঠেছিল। কাজেই অন্য কিছু ভাবতেও পারিনি।

কেবল আমি তাকে দিয়েছিলাম ছোট্ট একটি লকেট, তার নাম লিখে। সেটা পেয়ে তার কি আনন্দ। সেটা বরাবরই সে কাছে রাখতো, আর আমায় দেখিয়ে আনন্দ প্রকাশ করতো। আর আমি পেয়েছিনু তার অযত্ন-পরিত্যক্ত একখানি পত্রের ছিন্ন এক টুকরো, ঠিক আমার জীবন-পাতার ছিন্ন টুকরোর মতই। সেটা কুড়িয়ে পেয়েছিলাম বাগানে। কৌতূহলী হয়ে সেটা কুড়িয়ে রেখেছিলাম শুধু তাতে তার নিজের নাম সই ছিল বলে। এখন সেইটাই আমার জীবন-সম্বল অমূল্য বস্তু, পার্থিব সম্পদ, আমার মনের সকল আনন্দ ও তৃপ্তি।

ঘোমটার ফাঁকের সলাজ কৌতূহলী একটি দৃষ্টির মত চন্দ্রমা আকাশে ফুটেছিল। সুন্দরীর সমস্ত মুখখানা দেখবার জন্য নবীনা তারা-বধূরা আশে-পাশে মিট্ মিট করে তাকাচ্ছিল। তাদের দৃষ্টিও লাজ-ভঙ্গি-জড়িত, কম্পিত। ট্রেণের সঙ্গে অজানা গাছের ঝোপগুলো দৈত্য শিশুর মত দৌড়চ্ছিল ট্রেণকে দৌড়ে হারাবার জন্যে। কিন্তু তারা পিছিয়েই পড়্ছিল সবাই।

আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম। আমার পাশের গাড়ীই ছিল মেয়েদের। হঠাৎ আমার চমক ভাঙিয়ে সেই গাড়ী হতে কে গেয়ে উঠ্লো—

কেন নিবে গেল বাতি ?
আমি অধিক যতনে ঢেকেছিনু তারে
জাগিয়া বাসর রাতি,
তাই নিবে গেল বাতি।

গানের সুর এসে আমার চমক ভাঙিয়ে দিলে। এ কি ! এ যে সন্ধ্যার কণ্ঠ। এ স্বর তো আমার বড় পরিচিত। এ স্বর চিন্‌তে তো আমার কোন ভুল হয় নি। সে কোথায় চলেছে। আমারই পাশের গাড়ীতে, মাঝখানে মাত্র একটি সরু কাঠের ব্যবধান; অথচ কিছুই জানি না। মন কেমন একটা অমঙ্গল আশঙ্কায় দুলে উঠ্লো। এ বিষাদের গান কেন গাইছে সন্ধ্যা। এতো গান নয়। সুর যে তার হৃদয় মথিত করে কান্না হয়ে ছুটে বের হচ্ছে। সুর বেদনা-হত হয়ে কেঁদে কেঁদে ফির্‌তে লাগ্লো। তার কি তবে—। ভাব্‌তেও পার্‌লাম না। মাথা ঝিম্ ঝিম্ কর্‌তে লাগলো। অবসন্ন হয়ে গদির উপর শুয়ে পড়্লাম।

কি একটা ষ্টেশনে গাড়ী থাম্‌লো। অন্যমনস্ক হয়ে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ষ্টেশন দেখ্‌তে লাগলাম। এমনি সময় একজন লোক, মোটা বেঁটে, ঠিক গরুর গাড়ীর চাকার মত, তায় কালো, গলায় তুলসীর তিন কণ্ঠী মো[illegible] মালা, চুল কদমফুলী ছাঁটা খোঁচা খোঁচা, মধ্যেখানে এ[illegible] গোছা মোটা টিকি, মেয়ে গাড়ীর দরজার কাছে এ[illegible] দাঁড়ালো। দরজা খুলে ভিতরে মুখ ঢুকিয়ে বল্‌লে—ওগে[illegible] নেমে এসো। তার কথার সঙ্গে সঙ্গে একটি তরুণী ঘোমট[illegible] মুখ ঢেকে নেমে এসে দাঁড়ালো। লোকটা তাকে বল্‌লে— তুমি একটু দাঁড়াও আমি একটা মুটে ডেকে আনি। ব[illegible] তরুণীকে একলা রেখে চলে গেল। আমার কেমন সন্দে[illegible] হলো—এই আমার সন্ধ্যা।

হঠাৎ তরুণী আমার দিকে মুখ ফেরালে। তার মাথা ঘোমটা তখন প্রায় খুলে গেছে। আমি দেখেই স্তম্ভি[illegible] হয়ে গেলাম। এই তো সন্ধ্যা ! সিঁথির উপর জ্বলে[illegible] আগুনের মত সিঁদুর। এই লোকটাই কি তবে তার— সন্ধ্যাও আমাকে দেখে চমকে উঠ্লো। মুখ সাদা ফ্যাকা[illegible] হয়ে গেল। আমি চীৎকার করে ডাক্‌তে গেলাম—সন্ধ্যা অশ্রু-রুদ্ধ স্বর কণ্ঠমুক্ত হলো না। সন্ধ্যার চোখও অশ্রু[illegible] সজল হয়ে উঠ্লো। ঝর্ ঝর্ করে অশ্রু ঝরে বুক ভাসি[illegible] দিলে। সে আমায় হাত তুলে প্রণাম কর্‌লে।

ঠিক এমনি সময় সেই লোকটা এসে বল্‌লে—চল, মু[illegible] এসেছে।

সন্ধ্যা অশ্রু গোপন কর্‌বার জন্যে তাড়াতাড়ি ঘোম[illegible] টেনে দিলে। সেই মুহূর্ত্তেই ট্রেণও যেন আমাদের দুঃ[illegible] ব্যথিত হয়ে হু' হু' করে শ্বস্‌তে শ্বস্‌তে ছুটতে আর[illegible] কর্‌লে। আমি মূঢ়ের মত গাড়ীতে বসে রইলাম। আ[illegible] আমার হৃদয়ের এই আকুল ব্যাকুলতাকে বেদনাকে দিকে[illegible] দিকে বিশ্বের নীরবতার মধ্যে দিয়ে তার উদ্দেশে পাঠাচ্ছি তার প্রাণের তন্ত্রীতে কি এ-বেদনার সুর ঝঙ্কার তুল্‌ছে না কে জানে ? আমার কাণের কাছে আজও ধ্বনিত হচ্ছে—

কেন নিবে গেল বাতি ?

বৃদ্ধা ধাত্রীর রোজনামচা

ডাক্তার শ্রীসুন্দরীমোহন দাস এম-বি

বেজায় ধাক্কা

(১)

(লোফা)

জয় ঈশা ঘোষে আজি ধরা।
তব প্রেমে ভব মাতোয়ারা॥
পাপীকুলে, নিলে কোলে,
বরষিলে করুণাধারা॥ ১॥

(ঠুংরি)

রাজমুকুট কত, তব পদে লুণ্ঠিত,
ওহে দীনজনবন্ধু।
দীন পাপীর তরে, দিলে প্রাণ অকাতরে,
অপার তোমার কৃপাসিন্ধু॥ ২॥

(যৎ)

জয় মেরীনন্দন!
বাল-বৃদ্ধ মেলি করে তব বন্দন॥
দ্বাদশ দুখী লয়ে, মেষশাবক হয়ে,
অনায়াসে জিনিলে ভুবন হে।
হরষিত অন্তরে, পরিলে শিরোপরে,
কণ্টক মুকুট ভূষণ হে॥৩॥

(লোফা)

তব প্রেম দ্রব হয়ে,
বহিল কপাল ব'য়ে,
অবিরল রুধির ধারা॥ ৪ ॥

আজ ২৫এ ডিসেম্বর খ্রীষ্টমাস। দেবালয়ে খ্রীষ্টোৎসব। খ্রীষ্ট-কীর্ত্তন খুব জমিয়াছে। দুই চারিজন নিমন্ত্রিত খ্রীষ্টান কীর্ত্তনের একটা নূতন প্রভাব অনুভব করিতেছেন। মহাপ্রভুর আশীর্ব্বাদ। খোল করতালের ধ্বনির সঙ্গে কীর্ত্তনের সুর মিশ্রিত হইবামাত্র একটা উন্মাদনা আসিল! এই উন্মাদনার সময় সমুদয় রস ভঙ্গ করিয়া খ্রীষ্টান বক্তা বলিলেন :—

"ঈশ্বর এমত প্রেম করিলেন যে তিনি জগৎকে তাঁহার একজাত পুত্র দান করিলেন। সেই একজাত পুত্র অকথ্য প্রেমে প্রেম করিয়া আজ সমগ্র জগতের পরিত্রাতারূপে পূজিত হইতেছেন।"

রসভঙ্গ হওয়াতে আমি অন্যমনস্ক হইয়াছি। এমন সময় একটী যুবক কাণে কাণে আমাকে বলিল, "আপনাকে এই সময় বিরক্ত করচি, ক্ষমা করবেন। আমার মায়ের বড় অসুখ; আপনাকে এখনি যেতে হবে; গাড়ী প্রস্তুত!"

আমিও বাঁচিলাম। অকথ্য প্রেমের কথা শুনিয়া গাম্ভীর্য্য রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। যুবকটীর গোঁপ দুদিকে আধখানা কামান, চুল হালফ্যাসনে ছাঁটা, হাতে সোনার চেনে সোনার রিষ্ট-ওয়াচ্ আঁটা, সবই হালফ্যাসনের। মোটরে গিয়া পঁহুছিতে দশ মিনিটের অধিক লাগে নাই। ইতিমধ্যে যুবকের নিকট শুনিলাম তিনি রোগিনীর ধর্ম্মপুত্র! বিলাতে তাঁহার গড্-মাদার তাঁহাকে গড্-সন্‌রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(২)

——রোডে প্রকাণ্ড বাড়ীর প্রাঙ্গনে গিয়া মোটর থামিবামাত্র একটী ছোট কোলো-কুকুর (ল্যাপ্-ডগ্) কোলে উঠিবার জন্য আমাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল। আমার অনাস্থা দেখিয়া যুবকটী তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন; কুকুর তাঁহার গাল চাটিতে লাগিল। একে আমার কুকুরাতঙ্ক, তাহার উপর এই গুক্কারজনক দৃশ্য। আমি যুবককে, বলিলাম, "কুকুর ছেড়ে দিয়ে তোমার মার কাছে আমাকে শীঘ্র নিয়ে চল।"

রোগিনীর বয়স আনুমানিক পয়তাল্লিশ। নিখুঁত সুন্দরী। এই বয়সেও দুধে আলতা রঙের জলুস কত?

পটল-চেরা চক্ষু দুটীর এক অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণী শক্তি। হাসির সঙ্গে যেন মধু ক্ষরিয়া পড়িতেছে। লোক সরাইয়া দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া তিনি আমাকে বলিলেন : "দেখুন, অতি প্রবীণ ও বিচক্ষণ ব'লে আপনাকে ডেকেছি। আমরা খ্রীষ্টান। চারি বৎসর হ'ল আমি বিধবা হয়েছি। আট মাস পূর্ব্বে ঋতু বন্ধ হয়েছে। সাত মাস পূর্ব্বে স্বপ্ন দেখেছি যিশুখ্রীষ্ট আমার পেটে এসেছেন। আপনাকে সব কথাই খুলে বলি। যীশু বলেছেন পুরুষ-সঙ্গম ব্যতিরেকে কোন ধার্ম্মিক স্ত্রীলোকের গর্ভে তিনি আবার এসে জগৎকে পরিত্রাণ করবেন। আপনি দেখুন, আমার গর্ভের সমুদয় লক্ষণই বর্ত্তমান। পেট বড়, গা ম্যাকার-ম্যাকার, ঋতু বন্ধ, পেটে ছেলে নড়া, সবই হয়েছে। আপনি দেখ্‌লে সবই বুঝতে পারবেন। আর একটা কথা, সেই সময়ে কিন্তু আপনার থাকা চাই।"

স্ত্রীলোকটীর কথাবার্ত্তা শুনিয়া ও ঘরের ছবি প্রভৃতি দেখিয়া তাঁহাকে ধর্ম্ম-পাগল বলিয়া বোধ হইল। পরীক্ষা করিয়া যখন বলিলাম, গর্ভ মিথ্যা, তখন তাঁহার মুখ ও চক্ষু দুটী আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন "আপনি কি বল্‌তে চান যীশুখ্রীষ্ট মিথ্যা কথা বলেছেন?"

আমি। যীশুখ্রীষ্ট আমারও পূজ্য। তাঁর কথা তুল্‌বেন না। স্বপ্ন-রাজ্য ছেড়ে একবার বাস্তব-রাজ্যে আসুন। ৭।৮ মাসের গর্ভের লক্ষণ সম্বন্ধে ভুল হ'তে পারে না। ষ্টেথেস্কোপ্ যন্ত্র পেটে লাগালেই শুন্‌তে পাওয়া যায় ঘড়ির মতন টিক্‌টিক্ শব্দ। ঘড়ির সেকেণ্ড হ্যাণ্ডের কাঁটার দিকে লক্ষ্য রেখে সেই টিক্‌টিক্ শব্দ শুন্‌লে ও গুণলে মিনিটে ১২৪—১৪৪ বার এই শব্দ শুন্‌তে পাওয়া যায়। কিছু কম কি কিছু বেশিও হ'তে পারে। আপনার পেটে সে শব্দ মোটেই শোনা যায় না। ছেলের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কিছুই মালুম হয় না।

রোগিনী। পেটে ন'ড়ে বেড়ায় তবে কি?

আমি। হাওয়া আর পেটের নাড়ীভুঁড়ি।

রোগিনী। ঋতু কি শুধু শুধু বন্ধ হয়?

আমি। আপনার বয়স বোধ হয় পঁয়তাল্লিশ। এই বয়সে অনেকেরই স্বভাবতঃ ঋতু বন্ধ হয়। ইংরাজীতে এই অবস্থাকে বলে মিন পজ্। এর কতকগুলি আনুসঙ্গিক চোক মুখ কাণ হঠাৎ লাল হয়ে উঠে। মাথাও বোধ হয় ঘোরে কিম্বা ধরে। মেজাজটাও বোধ হয় একটু খিট্‌খিটে হয়।

রোগিনী। আপনি বোধ হয় ঠিক ধরেছেন! আমার ঐ রকম হয় বটে।

আমি। ডাক্তার ডেকে দেখাবেন। তাঁরা হর্মটোন্ প্রভৃতি ঔষধ দিলেই রোগ সেরে যাবে। আপনি আমার উপর বিরক্ত হবেন না। আপনার ত একটা ভ্রান্তি দূর হল, এই পর্য্যন্ত। কষ্টের কোন কারণ নাই। আমার কথা শুনে ভ্রান্তি দূর হবার সঙ্গে সঙ্গে কত লোকের কত আশার প্রাসাদ ভেঙ্গে পড়েছে, এমন কি জীবনটাও ব্যর্থ হয়েছে। একটা গল্প শুনুন।

(৩)

"বৌমার কাল সাধ, আপনার নিমন্ত্রণ রইল, নিশ্চয় যেতে হবে। আমার একটীমাত্র ছেলে। অনেক বাছাই করে পরীর মতন একটী বৌ এনেছিলাম। ছেলে হয় না। সকলেরই মনে কষ্ট। কত কার্ত্তিক পূজা, কত পাঁচু ঠাকুরের কাছে ধর্ণা। কিছুতেই কিছু হয় না। বাবু বলেন ছেলেকে আবার বে দেবো। বৌমার চক্ষে জল; ছেলের মুখ ভারি। আমি বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাবুকে থামালুম। বল্লুম "শেষকালটা কি বাড়ীতে একটা কাণ্ড হবে? সেই দুই সতীনের ঝগড়া না হোক, আজকাল কেরোসীনে পুড়ে মরাটা ত হতে পারে? আর চৈতন্য যীশুখ্রীষ্ট কারুর বংশ রইল না, আমরা কি তাঁদের চেয়েও বড় যে আমাদের বংশ না থাকলে এই পিরথিমিটা একেবারে রসাতলে যাবে?" অনেক ক'রে বুঝিয়ে ত বাবুকে ঠাণ্ডা করা গেল। এখন সবুরে মেওয়া ফলেছে। বৌমা এই কুড়ি বছর বয়সে আট মাসের পোয়াতি। বড় আনন্দ হয়েছে মা; তোমাকে যেতেই হবে।"

মুখুয্যে-গিন্নির কথাগুলি শুনিয়া মনে কেমন একটা খট্‌কা লাগিল। আমি বলিলাম "দেখুন মা, অনেক লোক আসবে, হট্টগোল হবে। প্রথম পোয়াতিকে বড় সাবধানে রাখতে হয়। আর অনেকগুলি নিয়ম রক্ষা করাও উচিত।"

"তবে তুমি এখনি একবার চল," এই কথা বলিয়া

গর্ভ সর্ব্বৈব মিথ্যা। জরায়ু ছোট, মুখ বন্ধ। পেট চর্ব্বিতে বড় হইয়াছে। সমস্ত আয়োজন পণ্ড হইল। নিরাশা ও নিরানন্দের একটা গভীর আর্ত্তনাদ যেন বাড়ীময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। আমি যেন তাহাদের কি একটা অনিষ্ট মহা অনিষ্ট করিয়া অপরাধীর মতন ক্ষমা চাহিয়া বাড়ী ফিরিলাম।

ইঁহারা শিক্ষিত। বন্ধ্যা বলিয়া স্ত্রী ত্যাগ করেন নাই। ইহুদীদের কাণ্ড বিপরীত। তাহারা স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে ত্যাগ করে। বোম্বাই হইতে ফিরিয়া আসিয়া একটী পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্কা ইহুদী স্ত্রীলোক আমাকে বলিল "ডাগ্‌তারণী, তুম কেইসা বোলো হামকো লাড়কা নাহি হোগা?" এই বলিয়া তাহার পেট দেখাইল। "বড়া ডাগতার বোলা, ঝুট বাত নেহিন্। আউর এক বাত। 'এক বরস্ হামারা সাহেবেকো সাত মোলাকত নাহি হুয়'। তুম্ ত জান্‌তা তিন দফে হাম নস্তর করায়া লাড়্কা হোনেকো ওয়াস্তে। সাব্ বোলা দোস্‌রা লাড়কীকো সাদি করোঙ্গে। হাম লোককা কেতাবমে লিখা বিনা মরদ সে লাড়কা হোগা সো লাড়কা পেগম্বর, ইমানুয়েল্ হোগা। বহুৎ হুসিয়ারী হোকর হামকো খালাস করো। পেগম্বর আওয়েগা। সব হুনিয়ামে ইহুদী রাজ্‌ত্বী হোগা।"

আমি তাহার পেট পরীক্ষা করিয়া বলিলাম, তাহার পেটে কেবল চর্ব্বি ও হাওয়া; ছেলে তাহার মগজে, পেটে নাই। সে এত চটিয়া গেল যে আমার ফি পর্য্যন্ত দিল না। বলিল "আজ শনিবার এৎবার, রূপিয়া নাহি ছোঁতা।" অন্য বারে পূর্ব্বদিনে টাকা এক জায়গায় রাখিয়া দিত; শনিবারে গেলে আমি তাহার হাত হইতে টাকা না নিয়া ঐ জায়গা হইতে টাকা তুলিয়া লইতাম।

পরে একদিন কাঁদিতে কাঁদিতে সে আসিয়া আমাকে জানাইল, তাহার স্বামী দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ করিয়াছে।

গল্প দুইটী শুনিয়া মিসেস মৈত্র অনেকটা ঠাণ্ডা হইলেন এবং আমাকে তাঁহার ইতিবৃত্ত আদ্যোপান্ত শুনাইলেন।

মিসেস মৈত্রের কথা

(৪)

"মিষ্টার মৈত্র তাঁর পিতামাতাকে না জানিয়ে আমাকে একমাত্র ভরসা ছিল আমার অনুপম সৌন্দর্য্য। তিনি ভাবলেন তাঁর মতন তার মা বাপ এবং গ্রামশুদ্ধ সকলে আমার রূপ দেখে ভুলে যাবে। কিন্তু আমার রূপই কা[ল] হল। শাশুড়ী দেখে বল্‌লেন "একে ঘর অজানা, তাঁর প[র] বোধ হয় ইহুদীদের মেয়ে, একে কেমন ক'রে ঘরে তুল্‌ব বাঙ্গালীর ঘরে কি এ রকম মেয়ে হতে পারে?" এ[ই] প্রকার অভ্যর্থনা দেখে স্বামী ত হতভম্ব। আমি তখ[ন] ছোট, কাঁদতে লাগলুম। স্বামী সেই গাড়ীতেই উ[ঠে] কলিকাতার মেসে ফিরে এলেন। তিনি অত্যন্ত অভিমা[নী] ছিলেন; বাপের আদুরে ছেলে। পরদিন রেভারে[ণ্ড] মিষ্টার লাহিড়ীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে স্থির করলে[ন] পরদিন আমরা ব্যাপটাইজ হবে। সকালে পরিষ্কা[র] কাপড় চোপড় পরে গির্জ্জায় গিয়ে দেখি অ[ন্য] একজন কে ব্যাপটাইজ্ হতে গিয়েছে। তার পরণে ময়[লা] কাপড়, গায়ে একটা সার্ট, আর হাতে একটা ছাতি। তা[কে] পরিষ্কার কাপড় পরিয়ে যখন জর্ডানের জলের ছিটে দি[তে] যাবে, অমনি সে ব'লে উঠল "মশাই গো, বেশি দিও [না] লেশাটা ছুটে যাবে।" ব্যাপটাইজ্ হ'য়ে পরিষ্কার কা[পড়] পরে লোকটা বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরেই এ[সে] বল্লে" মশাই গো, আমায় ধুতো সার্ট আর ছাতটা ফিরি[য়ে] দাও। আর খেষ্টান হবার দরকার নেই; গিন্নির স[ঙ্গে] ভাব হ'য়ে গেছে।"

রেভারেণ্ড টমসন মিষ্টার লাহিড়ী মশাইকে বল্‌[লেন] "দেখ, পাথরের উপর বীজ নিক্ষেপ করিতে নাই। [এই] বালক বালিকা দুইটী তৃষিত হইয়া আসিয়াছে। ইহা[দের] মস্তকে পবিত্র ধর্ম্মের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক।"

দুজনে বেপ্‌টাইজ্ হ'য়ে লং সাহেবদের ব্যারাকে আ[সি।] পাদ্রী সাহেবের অনুরোধে একটী সওদাগরী আফিসে স্বা[মীর] ভাল চাকরী হল। হিন্দুশাস্ত্রে বলে স্ত্রীচরিত্র আর পুরু[ষের] ভাগ্য দেবতারাও জানেন না। আমি বলি পুরুষ চরি[ত্র] একটা হেঁয়ালি। আমাকে বিয়ে করেছিলেন পুরুষটী [মা-] মাকে কাঁদিয়ে, ত্যজ্যপুত্র হবার ভয় অগ্রাহ্য ক[রে] মাহিনের টাকাটা এনে আমার হাতে দিয়ে বল্‌[লেন] "তোমার লক্ষ্মীর হাতে দিলুম; খরচ ক'রে বাকি সি[ন্দুকে] জমা দিও, কারণ বাবার কাছে কিছুই আশা নেই

গেল। সওদাগর সাহেব স্বামীকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। মিউনিশন্ বোর্ডের বড় সাহেব তাঁরই অনুরোধে স্বামীকে চটের অর্ডার দিলেন। ভাগ্য খুলে গেল। সিন্দুক ভর্ত্তি হ'তে লাগ্ল। স্বামীর মুখ আর দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। চাকুরী-স্থল থেকে এসেই কারবার আফিসে রাত বারোটা পর্য্যন্ত থাকতেন, আবার ভোরে উঠেই সেখানে যেতেন। সিন্দুকে টাকার ঝনঝনি শব্দে ঘুম ভেঙ্গে দেখতাম স্বামী তন্ময় হ'য়ে টাকা দেখ্‌চেন। তিনি ঘুমিয়ে পড়লে আমি সিন্দুককে প্রণাম ক'রে বল্‌তুম "মা লক্ষ্মী, তুমি যদি সত্যি সত্যি এই সিন্দুকে বাস কর, বিদায় হও, আর তোমায় চাই না।" একদিন স্বামীকে বল্‌লুম "দেখ, সেই সোনার মেরীর গল্পটা মনে আছে ত? স্পর্শ মাত্র সব সোনা হবার বঁর একজন পেয়েছিল। নিজের অতি আদরের মেয়ে মেরীকে ছোঁবা মাত্র যখন সে প্রাণহীন সোনার পুতুল হয়ে গেল, তখন মেরীর বাপ হায় হায় করতে লাগল। সেও তোমার মতন স্তূপাকার সোনার জিনিসগুলি সমস্ত রাত জেগে তন্ময় হ'য়ে দেখ্‌ত। তার পর দেবতাদের কাছে বর নিলে যা ছোঁবে তাই সোনা হ'য়ে যাবে। নিজের মেয়ে যখন প্রাণহীন পুতুল হ'য়ে গেল, তখন দেবতাদের বল্‌লে বর ফিরিয়ে নিতে। লক্ষ্মী যদি কেউ থাকেন তাকে তুমিও বল তাঁর বর ফিরিয়ে নিতে।" স্বামী হেসে বললেন, "দেখ প্রথম বয়সের নেশা রূপ, শেষ বয়সের নেশা রূপো। রূপচাঁদ হাতে থাকলে পৃথিবী বশ করা যায়।" আমি চুপ ক'রে রইলুম। স্বামী রূপোসাগরে ডুবলেন। কারবারে ৬ লক্ষ টাকা লাভ হল।

আমি ইতিমধ্যে রীতিমত মেম সাহেব হয়েছি। মেম রেখে ইংরাজী কায়দায় কথা কইতে শিখেছি। সুর করে ঠিক মেমের মত "বয়" বলে ডাকি, দুই ঠোঁট চেপে আস্তে আস্তে রুটী চিবুই; হাঁচি এলে রুমাল দিয়ে চাপি; আধখানা দাঁত বার ক'রে হাসি। কাঁটা চামচ ধরতে কখনও ভুল হয় না। সাহেব-সুবোর পার্টীতে বেড়াই।

১৯২১ সালে সন্ন্যাস রোগে স্বামীর অকস্মাৎ মৃত্যু। ইতিপূর্ব্বে তিনি শ্বশুর ও শ্বাশুড়ীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে অনেক চিঠি লিখেছিলেন। কোন উত্তর পান নাই। স্বামীর মৃত্যুর দুমাস পরে উকীলের একখানা চিঠি পেলাম। শ্বশুর শ্বাশুড়ী দুজনেই মারা গিয়েছেন। মৃত্যুর একমাস পূর্ব্বে শ্বশুর আমার নামে সমুদয় বিষয় লিখে দিয়েছেন। দলিল উকীলের নিক আছে।

আমার মন রবারের মতন স্থিতিস্থাপক। সব শোক ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বিষয়ের একটা সুব্যবস্থা ক'রে নিলাম। নগদ ছয় লক্ষ টাকা আর শ্বশুরের প্রকাণ্ড বিষয়। গ্রামে গিয়ে বাস করা অসম্ভব। দুদিন গিয়ে টের পেয়েছি সকলেই খ্রীষ্টান বলে ঘৃণা করে। আমার বল ভরসা একমাত্র আমি। ভালবাসা দেবার বা নেবার কেউ নেই। বিলাত যাবার জন্য অনেকদিন থেকে প্রাণ ব্যাকুল হয়েছিল। যুদ্ধ থেমে গেছে। যাবার সুযোগও জুটল।"

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্ত)

হাইফেন

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

* * * * *

পুরী থেকে কলকাতায় ফিরিবার দিন যতই অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল, মলয় ও মৃদুলা ততই বিষণ্ন হইতেছিল এবং ত্রিলোক ততই চিন্তিত হইতেছিলেন। ত্রিলোক বুঝিতে পারিতেছিলেন মলয় ও মৃদুলার অন্তরে প্রণয় সঞ্চার হইয়াছে; যদি কোনো কারণে উহাদের মিলন না ঘটে করিয়াই বিধবা হইবে—কারণ, বাগ্‌দত্ত স্বামী বলিয়া মলয় এতদিন তার কল্পনার প্রীতিপাত্র মাত্র ছিল, এখন সে বাস্তব প্রণয়ী হইয়া উঠিয়া অনায়াসেই মৃদুলার পতির আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

পুরী ছাড়িয়া যাইতে বিলোপেরও কষ্ট বোধ হইতেছিল; কিন্তু ব্যথা বোধ করিতেছিল বলিয়াই সে সেই বেদনাকে

আসিয়া দেশ দেখিয়া ফিরিয়া যাইতেছে, এই দেশের প্রতি তার যেটুকু মমতা তাহা সুদৃশ্যের প্রতি টানের অতিরিক্ত আর কিছু নয়।

বিদায়ের দিন মলয়ের মুখ ম্লান হইয়া উঠিয়াছে, মৃদুলার চোখ ছলছল করিতেছে—সে থাকিয়া থাকিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া অবাধ্য অশ্রুকে শাসনে সায়েস্তা করিয়া চক্ষু-কারাগারে রুদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিতেছে, আর ত্রিলোক গম্ভীর হইয়া থমথম করিতেছেন। কেবল বিলোপ খুশীর' ভাণ করিয়া সকলের সঙ্গে হাসি-মুখে অনর্গল গল্প করিয়া বেড়াইতেছে ও চেষ্টা করিয়া রঙ্গ রসিকতার ভিতর দিয়া সকলকে সান্ত্বনা দিবারও চেষ্টা করিতেছে। সে মলয়কে চুপিচুপি বলিল—তুমি নিশ্চিন্ত থাকো মলয়, এই ফাল্গুন বসন্তের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তোমার বাড়ীতে শ্রীক্ষেত্রের শ্রী প্রতিষ্ঠা করে' তবে আমার অন্য কাজ।

বিলোপ সুযোগ খুঁজিয়া খুঁজিয়া মৃদুলাকে একান্তে পাইয়া তাহাকে বলিল—শ্রীর ক্ষেত্র ছেড়ে যেতে হচ্ছে বলে' মলয় তো কাঁদো কাঁদো হয়ে উঠেছে; আমি তাকে আশ্বাস দিয়েছি ফাল্গুনে বসন্তের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তার সংসারেও শ্রীর আবির্ভাব হবে। বসন্তেই মৃদুল মলয় প্রবাহিত হয়ে থাকে, তা কারো বাধা মানে না। আমাকে ভালো করে' ঘটক বিদায় দিতে হবে।

বিলোপ বিদায় শব্দটির উপর কণ্ঠের জোর দিয়া কথাটি বলিল। মৃদুলা ম্লান মুখ সলজ্জ স্মিত হাস্যে সুন্দরতর করিয়া তুলিয়া কৃতজ্ঞতাভরা স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে বিলোপের মুখের দিকে শুধু চাহিল, সে কোনো কথা বলিতে সাহস করিল না, পাছে তাহার সযত্নে সংরুদ্ধ অশ্রু অবাধ্য হইয়া পড়ে, অথবা কণ্ঠস্বর কম্পিত হইয়া যায়।

বিলোপ ত্রিলোককে বলিল—জ্যেঠামশায়, এই ফাল্গুনেই তো মৃদুলা দেবীর বিয়ে হয়ে যাবে। তখন আমি এসে আপনার কাছে থাকব। আমি আপনার ছেলে হলেও মেয়ের মতনই সেবা করতে পারব।

ত্রিলোক স্বভাব-বশে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন, কিন্তু সেই হাস্যের গমক তেমন স্বচ্ছন্দ হইল না এবং তাহা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেই নিরস্ত হইয়া অল্পদিনের চারিটি পরিচিত প্রত্যেকেই চোখের জল গোপন করিয়া ব্যথিত হৃদয়ে বিচ্ছিন্ন হইল।

* * * * *

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াই বিলোপ মলয়ের পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল এবং কথাপ্রসঙ্গে বলিল—পুরীতে খাসা একটি মেয়ে দেখে এসেছি; তার সঙ্গে মলয়ের বিয়ে হলে খুব ভালো হয়; আপনি অনুমতি করলে আমি ঘটকালি পাকা করি।

বিলোপের কথা শুনিয়া আদিত্য বুঝিলেন যে, তাঁহার পুত্র সেই কন্যাকে পছন্দ করিয়াছে বলিয়াই তাহার হইয়া তাহার বন্ধু বিবাহের ঘটকালির প্রস্তাব লইয়া তাঁহার কাছে আসিয়াছে; তাই তিনি গম্ভীর হইয়া বলিলেন—মলয়ের জন্যে একটি পাত্রী অনেক দিন থেকে ঠিক হয়ে আছে—সে আমার এক সহপাঠী বন্ধুর কন্যা; আমাদের পুত্র কন্যা জন্মের পূর্ব্বেই আমরা স্বীকার করেছিলাম যে আমাদের পুত্র কন্যা হলে বিবাহ দিতে হবে। আমার পুত্র মলয়ের শৈশবে আমার সেই বন্ধু ত্রিলোকের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ হয়, তখন আমি তাকে বলি—আমি তো ছেলের লেখাপড়া শেষ না হলে বিয়ে দেবো না, ততদিন তোমার মেয়েকে কি আইবুড়ো রাখতে পারবে? তাতে সে বলে—আমিও আমার মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে তার বাগ্‌দত্ত স্বামীর উপযুক্ত করে' প্রতীক্ষা করিয়ে রাখ্‌ব। অনেক দিন আমার সেই বন্ধুর খোঁজ-খবর কিছু পাই নি। সে সিলোনে প্রফেসার; তাকে চিঠি লিখে জান্‌তে হবে তার মেয়ে এখনো আইবুড়ো আছে কি না; যদি না থাকে, তবে তোমার দেখা এই পাত্রীটি···

বিলোপ বলিল—আমার দেখা এই পাত্রীটি আপনারই বন্ধু ত্রিলোক বাবুরই কন্যা মৃদুলা···

আদিত্য প্রফুল্ল ও উৎসাহিত হইয়া বলিলেন—ত্রিলোক কি এখন পুরীতে আছে নাকি? বেশ লোক তো, আমাকে একটা খবর পর্য্যন্ত দেয় নি!

বিলোপ বলিল—হ্যাঁ, তিনি কর্ম্ম থেকে অবসর নিয়ে পুরীতে' বাস করছেন; আমার সঙ্গে সমুদ্রতীরে হঠাৎ পরিচয় হয়; তার পর আমার বন্ধু বলে' তিনি মলয়ের সঙ্গেও একদিন পরিচয় করেন; পরিচয় পেয়েই তিনি আমাদের আর হোটেলে থাকতে দেন নি, নিজের বাড়ীতে

নিয়ে গিয়ে রেখেছিলেন। আমারও সৎসঙ্গে কাশীবাস হয়ে গিয়েছিল।

আদিত্য সন্তুষ্ট হইয়া হাসিমুখে বলিলেন—সে এত কাণ্ড করেছে, কিন্তু আমাকে তো একখানা চিঠিও দেয় নি...

বিলোপও হাসিতে হাসিতে বলিল—তিনি ভয়ে চিঠি দেন না...

আদিত্য আশ্চর্য্য হইয়া ও কৌতুক অনুভব করিয়া বলিলেন—তার আবার আমার কাছে ভয়টা কিসের?

বিলোপ বলিল—পাছে আপনি মনে করেন তিনি মেয়ের বিয়ে দেবার জন্যে আপনার সঙ্গে পুরাতন বন্ধুত্বের দাবী করছেন...

আদিত্য হাসিতে হাসিতে বলিলেন—পাছে আমি তার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে এখন অস্বীকার করি, তাই বুঝি আমার ছেলেকে ধরে' নিয়ে গিয়ে তার মন ভুলিয়ে মেয়ে গছাবার চেষ্টা! ভট্‌চায্যি বুদ্ধি আর কাকে বলে! তার ঠিকানাটা কি? আমি আজকেই তাকে মেয়ে নিয়ে কল্‌কাতায় আমার বাড়ীতে এসে থাকতে চিঠি লিখ্‌ছি।

বিলোপের মন হর্ষবিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া গেল; হর্ষ হইল যে এত সহজে বন্ধুর অভিলাষ পূর্ণ হইল, এবং বিষাদ হইল যে, সে সর্ব্ব জায়গাতেই অনাবশ্যক, সব যোগাযোগ ঠিক হইয়া আছে, সে কেবল পূর্ব্বপ্রকল্পিত ঘটনাকে সত্বর অগ্রসর করিয়া দিতেছে মাত্র! সে যেন সমাসবদ্ধ পদের মধ্যে তুচ্ছ একটি ক্ষুদ্র হাইফেন—শব্দে শব্দে যোগসাধন করে সেই, কিন্তু শব্দের মিলনের মধ্যে সে নগণ্য, মিলনের পর সে না থাকিলেও চলে।

* * * *

বিলোপের ভবিষ্যৎ-বাণী সত্য প্রতিপন্ন করিয়া মলয় ও মৃদুলার বিবাহ ফাল্গুন মাসেই সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

আগে বিলোপ মলয়ের বাড়ীতে প্রায়ই আসিত; কিন্তু মলয়ের বিবাহের পর সে মলয়ের বাড়ীতে যাওয়া বন্ধ করিয়াছে। মলয় অনুযোগ করিলে সে বলে—"এখন তো 'metal more attractive' পেয়েছ, আর আমাদের সঙ্গ প্রীতিকর হবে না বলে'ই ভয়ে কাছে ঘেঁষি নে।" ইহাতে নিরস্ত না হইয়া মলয় তাহাকে তাহাদের বাড়ীতে যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলে সে বলে "কেন অনর্থক আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে অভিশাপের ভাগী করবে? আমি গিয়ে যাঁর অখণ্ড মিলনে ব্যাঘাত ঘটাব তিনি আমাকে তো আশীর্ব্বাদ করতে পারবেন না!" মলয় মৃদুলার নামে নিমন্ত্রণ করিলে সে বলে—আমার পড়া, এখন সময় নেই।

মলয় মৃদুলার কাছে হাসিমুখে দুঃখ জানায়—তোমাকে পেয়ে আমি বন্ধুকে হারালাম। ভগবান্ কিছু না নিয়ে কিছু দেন না!

মৃদুলা ক্ষুণ্ণ হইয়া বলে—সত্যি, বিলোপবাবুর জন্যেই আমাদের মিলন এত সহজে শীঘ্র হতে পারল; কিন্তু বিয়ে হয়ে অবধি তাঁর আর টিকি দেখবার জো নেই।

বিলোপ মৃদুলার সম্মুখে যাইতে ভয় পায়, পাছে তাহার অন্তরের গোপন প্রণয় কোনো অসাবধান মুহূর্ত্তে তাহার চোখে মুখে কথায় ব্যবহারে প্রকাশ পাইয়া মৃদুলা কি মলয়ের কাছে ধরা পড়িয়া যায়। মৃদুলাকে ভালোবাসিয়া যে অন্যায় সে করিয়া ফেলিয়াছে, তাহা ধরা পড়িয়া গেলে তাহার নিজের লজ্জা, বন্ধুর মনঃক্ষোভ ও বান্ধবীর বিরক্তি জন্মিবার আশঙ্কা যখন পুরা মাত্রায় আছে, তখন সেই দুর্দ্দৈবকে দূরে পরিহার করিয়া চলাই বুদ্ধিমানের কার্য্য স্থির করিয়া বিলোপ মৃদুলার নিকট হইতে দূরে থাকিতেই চেষ্টা করিতেছিল। তাহার মনে এই দুরাশা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, কিছুদিন চেষ্টা ও কষ্ট করিয়া দূরে থাকিতে পারিলেই মৃদুলার প্রতি তাহার অনুরাগ অনেকখানি হ্রাস হইয়া যাইবে এবং সে তখন কেবল মাত্র বন্ধু ভাবেই মৃদুলার নিকটে যাইতে পারিবে।

যখন বিলোপ নিজেকে মৃদুলার নিকট হইতে যথাসাধ্য বিলোপ করিবার চেষ্টা করিতেছিল তখন মৃদুলা ও মলয়ের এক নূতন বন্ধু-দম্পতি লাভ হইল। মলয়দের বাড়ীর পাশের বাড়ীতে নূতন ভাড়াটে আসিল, নূতন ব্যারিষ্টার অনন্ত ও তাহার নব-পরিণীতা পত্নী রূপালী। তাহাদের চাল-চলন উগ্র রকমের সাহেবী; নূতন ভেক লইয়াছে বলিয়া সাহেবিয়ানা তাহাদের আচরণের সঙ্গে বেশ খাপ খাইয়া যায় নাই, পরের পোশাক চাহিয়া পরার মতন তাহাদের আচরণ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যে বাড়ী তাহারা ভাড়া লইয়াছে তাহা মলয়দেরই; এটর্ণীর

বাড়ীর পাশেই এটর্ণীরই বাড়ীতে ভাড়াটে হইয়া থাকিলে এটর্ণীর সহিত সৌহার্দ্দ হইবে এবং তাহার ফলে রোজগারেরও কিছু সুবিধা হইবে এই উদ্দেশ্য মনে গোপন রাখিয়াই মিষ্টার এ কে রয় এই বাড়ীটি ভাড়া লইয়াছে। বাড়ী ভাড়া লইয়াই মিষ্টার রয় মলয়ের সহিত স্বয়ং উপযাচক হইয়া পরিচয় করিল। মলয় সন্ধ্যার প্রাক্কালে বিলোপের নিকটে যাইতেছিল, অনন্ত তখন তাহার শ্বশুরের প্রদত্ত আসবাবে সজ্জিত ড্রয়িংরুমে বসিয়া বসিয়া সিগার টানিতেছিল। মলয়কে যাইতে দেখিয়াই অনন্ত তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বারান্দায় বাহির হইয়া আসিতে আসিতে ডাকিল—হেলো মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি! গুড্ ইভ্নিং! আউট ফর্ এ কন্ষ্টিটিউশানাল, এঃ?

মলয় নমস্কার করিয়া হাসিয়া বলিল—এক বন্ধুর কাছে চলেছি, রথ দেখা কলা বেচা দুই হয়ে যাবে।

অনন্ত বলিল—আর্ ইউ ইন্ এ হারী?

মলয় অনন্তর প্রশ্নের অর্থ বুঝিয়া তাহার বারান্দায় উঠিতে উঠিতে বলিল—না, কোনো কাজ তো নেই, কাজেই তাড়াতাড়িও নেই……

অনন্ত মলয়কে অভ্যর্থনা করিয়া ঘরে লইয়া যাইতে যাইতে বলিল—ও! সো ভেরি গ্ল্যাড্! প্লীজ্ টেক্ ইওর সীট্ মিঃ চ্যাটার্জ্জি। উড্ ইউ মাইণ্ড্ এ কাপ্ অফ টী?

মলয় বলিল—এখন চা খাবার বিশেষ দরকার ছিল না; তবে যদি আপনার কোনো অসুবিধা না হয় আর আপনি দিতে চান তবে আমি খেতেও পারব।

"ও! সো ভেরী কাইণ্ড্ অব ইউ!" বলিয়া অনন্ত ব্যস্ত হইয়া ডাক-ঘণ্টা বাজাইল।

একজন চাপ্কান-পাগ্ড়ী-পরা খান্সামা আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেই অনন্ত বলিয়া উঠিল—বয়, টী লাও। আউর মেম-সাহেব-কো সেলাম দেও।

খান্সামা চলিয়া গেল।

অনন্ত তাড়াতাড়ি একটা কুশন লইয়া মলয়ের পিঠ ও চেয়ারের ঠেসানের মধ্যে ঠাসিয়া দিতে দিতে বলিল—বি কমফর্টেব্ল্ ফ্রেণ্ড! উই আর নেবার্স্, অ্যাণ্ড উই হোপ্ টু বি ফ্রেণ্ড্স্, ডোণ্ট্ উই?

মলয় ভদ্রতার খাতিরে বলিল—নিশ্চয়ই, আমাদের

অনন্ত বলিয়া উঠিল—ও মাই! হোয়াট্ ডাজ্ দ্যাট্ আন্ইন্টেলিজিব্ল্ জার্গন মীন? ইট্ মাষ্ট্ বি সাম্থিং ভেরী নাইস আই থিঙ্ক্! ও, হাউ সরী নট্ টু নো দ্যাট্ ল্যাঙ্গোয়েজ!

মলয় অনন্তের সাহেবিয়ানার নেকামি দেখিয়া মনে মনে বিরক্ত হইয়াও ভদ্রতার খাতিরে হাসিয়া বলিল—ও কথাটার মানে হচ্ছে আলাপ হলে বন্ধুত্ব হতে বিলম্ব হয় না।

অনন্ত পরম উৎসাহ প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিল—এক্জ্যাক্ট্লি সো!

খান্সামা চা লইয়া আগে আগে আসিল, এবং তাহার পশ্চাতে আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল একটি মহিলা। তাহার গায়ের রং তত ফর্সা নয়, কিন্তু মার্কোলাইজ্ড্ ওয়াক্স্ অর্থাৎ পারদ-ঘটিত মোম অথবা হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড মাখিয়া মাজিয়া ঘষিয়া গায়ের রং ফ্যাকাশে করিয়া তুলিয়াছে; তাহাকে দেখিয়াই মলয়ের মনে হইল সে নিশ্চয় আর্সেনিক খাইয়া খাইয়া গায়ের রং ফ্যাকাশে করিয়া তুলিয়াছে। তাহার পরণের খয়ের রঙের শাড়ী দেহযষ্টিকে জড়াইয়া গমনে প্রতিপদে বাঁধা দিয়া দিয়া তাহার গমনভঙ্গীকে কৃত্রিম উপায়ে সলীল করিয়া তুলিতে চাহিতেছে। তাহার পায়ে লাল চামড়ার উপর জরীর প্রচুর কাজ করা সেলিম-শাহী দিল্লিওয়াল জুতা। সে নিকটে আসিতেই একটি মৃদু সৌরভ ভাসিয়া আসিয়া মলয়কে পুলকিত করিল। মলয় দেখিল সেই মহিলার গালে ও ঠোঁটে রুজের ছোপ ও চোখে মদালস দৃষ্টি। এই মহিলার প্রসাধনের আতিশয্য ও পারিপাট্য এবং তাহার ভাবভঙ্গী মলয়ের তেমন ভালো লাগিল না; ইহাকে দেখিয়াই তাহার মনে পড়িল মৃদুলাকে, এবং তাহার সরল অথচ সুন্দর বেশভূষার শালীনতা ও শ্রী তুলনায় ইহার প্রসাধন-বাহুল্য নিষ্প্রভ হইয়া গেল।

সেই মহিলাটি ঘরে আসিতেই অনন্ত তাহার দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠিল—"আওয়ার ল্যাণ্ড্লর্ড নেবার অ্যাণ্ড্ ফ্রেণ্ড্ মিষ্টার চ্যাট্যার্জ্জি জুনিয়ার।" এবং পরক্ষণেই মলয়ের দিকে ফিরিয়া বলিল—মাই ডিয়ার বেটার হাফ্।

মলয় পরিচয় পাইবার পূর্ব্বেই আসন হইতে উঠিয়া মহিলাটিকে স্মিতমুখে নমস্কার করিয়াছিল; এখন অনন্তে

মিসেস রয় কায়দা-দুরুস্ত ভাবে মাথা বাঁকাইয়া মলয়ের অভিবাদন স্বীকার করিয়া বলিল—সো গ্ল্যাড্ টু মিট্ ইউ মিষ্টার চ্যাট্যার্জ্জি! ডু প্লীজ সীট ডাউন।

মলয় রয়-দম্পতির ইংরেজী কথার উত্তরে পরিষ্কার বাংলায় বলিল—আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন।

মিসেস রয় এবারও ইংরেজীতে যাহা বলিল তাহার বাংলা অর্থ এই যে—আপনি বসুন, আমি আপনার চা তৈরি করে' দিয়ে বসছি।

মিসেস রয় চা তৈরি করিয়া মলয়ের সম্মুখে বাটি সরাইয়া দিল এবং এক প্লেট কেক ও দেশী মিষ্টান্ন তাহার পাশে রাখিল।

মলয় বলিল—সন্ধ্যাবেলা এখন আর ও-সব কিছু ।না।

মিসেস রয় ইংরেজীতেই বলিল—এ-সব বাজারের নয়, সব বাড়ীতে তৈরি······

মলয় বলিল—তার জন্যে নয়, এখন অসময়, আর আমি বেশী মিষ্টি খাইনে··· ··

মিসেস রয় ইংরেজীতে বলিল—আচ্ছা একটা রসগোল্লা কি পান্তয়া চেখে দেখুন—আমি নিজের হাতে তৈরি করেছি······

মলয় মিসেস রয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া হাসিমুখে বলিল—তা হলে তো মিষ্টান্ন আরো বেশী মিষ্টি লাগ্‌বে···

মিসেস রয় ও সঙ্গে সঙ্গে মিঃ রয় মধুর স্বরে হাস্য করিবার প্রয়াস করিল।

মলয় চা খাইতে খাইতে মিসেস রয়কে বলিল—আপনারা অনুগ্রহ করে' একদিন আমাদের বাড়ীতে যাবেন······

মিসেস রয় বলিয়া উঠিল—ও শিওর্!

মিঃ রয় বলিল—বন্ধুত্ব যখন হল, তখন বিনা নিমন্ত্রণেই যাওয়া আসা চল্‌বে।

মলয় বলিল—আপনাদের বাড়ী থেকে আমাদের বাড়ীতে যাবার পথ বাড়ীর ভিতর দিয়েই আছে; দু বাড়ীর মাঝের দরজাটা খুলে দিলেই সহজেই যাওয়া আসা চল্‌বে।

মিসেস রয় বলিয়া উঠিল—ও! আমি আজই ও-দরজাটা খুলিয়ে রেখে দেবো। আমি কালই গিয়ে মিসেস্ চ্যাট্যার্জ্জির সঙ্গে পরিচয় করে' আস্‌ব।

মলয় আহার সমাপ্ত করিয়া শেষ চুমুক চা দিয়া গলা ধুইয়া লইয়া বলিল—সে তো অত্যন্ত আনন্দের কথা হবে। তাঁকেই না হয় আগে আমি পাঠিয়ে দেবো, তিনি এসে আপনাকে নিয়ে যাবে ।

মিসেস রয় বলিল—না না, সে হবে না; আজ আপনি আগে এসেছেন, কাল আমি আগে যাব।

মলয় হাসিয়া বলিল—বন্ধুত্বের মধ্যে অত হিসাব-কিতাবের কৃত্রিমতা থাকা ঠিক নয়।

মিসেস রয় একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল—না, এর পর আর হিসাব-কিতাব থাকবে না, তখন বে-হিসাবী বন্ধুদের জ্বালায় জ্বালাতন হয়ে উঠবেন।

এবার মলয় ইংরেজীতে বলিল—দ্যাট্ উইল বি মোষ্ট ওয়েল্‌কাম্। আবার আপনাদের দুজনকে নিমন্ত্রণ করে' যাচ্ছি—আপনারা ফর্ম্যালিটির সঙ্কোচ কিছুমাত্র না রেখে বেশ বাঙালী রকমে আমাদের বন্ধু করে' নেবেন।

এই কথার খোঁচায় লজ্জিত হইয়া অনন্ত বলিল—নিশ্চয়, নিশ্চয়।

মলয় উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আজ আমি তবে যাই আমাদের তো এখন হামেশাই দেখা-সাক্ষাৎ হবে।

অনন্ত আবার "নিশ্চয়, নিশ্চয়" বলিয়া মলয়কে বারান্দা পর্য্যন্ত আগ বাড়াইয়া দিতে চলিল। যাইতে যাইতে মলয়ের দিকে সিগারেটের বাক্স আগাইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ডোণ্ট্ ইউ স্মোক? "না থ্যাঙ্ক্‌স" বলিয়া মলয় রয়-দম্পতিকে নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিল।

মলয় চলিয়া গেলে মিসেস রয় বলিল—লোক বেশ ভদ্রলোক।

অনন্ত বলিল—আন্‌কাল্‌চার্‌ড্ বুর!

মিসেস রয় বলিল—না না, বেশ সরল, খোলাখু মানুষটি!

অনন্ত গম্ভীর হইয়া সিগারে এক টান দিয়া বলিল হবে। মেয়েদের পছন্দ অপছন্দ বোঝা মুস্কিল।

মিসেস রয় হাসিয়া বলিল—ইয়েস, উওম্যান্ এ মিষ্টেরী!

অনন্ত বলিল—নট্ এ মিষ্টেরী, এ পাজ্‌ল্!

মিসেস রয় বলিল—ঐ একই কথা। (ক্রম

ব্রিটিশ আফ্রিকা

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(৫)

ফান্তি ও আশান্তিরাই হচ্ছে 'সুবর্ণ বেলার' (Gold Coast) প্রধান অধিবাসী। বহু শত শতাব্দী ধ'রে এরা ব্যবসায়-ক্ষেত্রে ভিন্ন দেশের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। 'সুবর্ণ বেলার' স্বর্ণ-ভাণ্ডার আশান্তিদের অধিকারে ছিল। এই সুবর্ণ সম্পদের অধিকারই তাদের দেশের নাম দিয়েছে 'সুবর্ণ বেলা'। এদের উভয় জাতিরই শরীর বেশ সুগঠিত,

কাফ্রী সৈন্যদল।

কিন্তু মন এখনও উন্নত হয়নি। অসংখ্য কুসংস্কারের মধ্যে এরা এখনও গভীর ভাবে নিমজ্জিত রয়েছে। চার শতাব্দী ধরে য়ুরোপের সংস্পর্শে এসেও এরা এখনও নিজেদের বর্ব্বরতা থেকে মুক্তিলাভ ক'রতে পারেনি। অথচ য়ুরোপীয় সংস্কার গ্রহণে এরা কোনও দিনই পরাঙ্মুখ নয়।

আশান্তিরা বরাবরই দুর্ব্বল গোলামের জাত ছিল। এদের ধরে নিয়ে গিয়ে দাস ব্যবসায়ীরা মুসলমান য়ুরোপীয় ও আমেরিকান ক্রেতাদের নিকট বিক্রয় ক'রতো। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আশান্তিদের মধ্যে একজন পরাক্রান্ত ও বুদ্ধিমান রাজা শাসনভার পেয়ে সৈন্য সংগ্রহ করে তাদের যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে এবং ওলন্দাজদের কাছে কামান ক্রয় করে উত্তরবাসী নিগ্রোদের অধীনতা-পাশ থেকে দেশকে মুক্ত ক'রেছিলেন। এই রাজাকে আশান্তিরা দৈবশক্তি-সম্পন্ন ব'লে জান্‌তো; তারা তাকে মানুষ বলে বিশ্বাস ক'রতো না। তারা ব'লতো, ইনি কোনও ছদ্মবেশী দেবতা—আমাদের উদ্ধার করবার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাদের এই বিশ্বাস ও

.ভক্তি-শ্রদ্ধার জোরে এই দেবাংশ-সম্ভূত রাজা কেবল ধেঙ্ক্‌জেরা নৃপতিকে যুদ্ধে পরাস্ত করে স্বদেশকে স্বাধীন করেছিলেন তাই নয়—স্যুদানী প্রভৃতি বহিশত্রুর আক্রমণও বহুবার ব্যর্থ করে তাঁদের নবার্জ্জিত স্বাধীনতাকে রক্ষা করেছিলেন। পরে এরা নিজেরাই দাস ব্যবসায় আরম্ভ ক'রে পশ্চিম আফ্রিকার কণ্টক স্বরূপ হ'য়ে উঠেছিল। এদের রাজধানী 'কুমাশী' তখন নরবলির একটি ভয়াল তীর্থ বলে
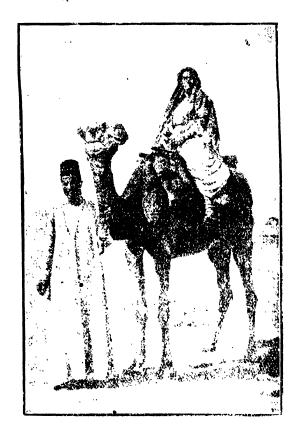
মরুসাগর কাণ্ডারী।

(আফ্রিকার বিশাল মরুভূমি পার হইবার একমাত্র উপায় এই উট। সকলের আগে পৃথিবীতে যে সব জীবজন্তু মানুষের বশ্যতা স্বীকার ক'রেছিল উট তাহাদের অন্তর্ভুক্ত।)

পরিগণিত ছিল। কারণ রাজাদেশে দাস ব্যবসায়ের জন্য ধৃত নিগ্রোদের সংখ্যা যদি ক্রেতাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত হ'য়ে প'ড়তো, তাহ'লে রাজা তাদের আহার্য্য দিয়ে নূতন কোনও ক্রেতার জন্য 'জীইয়ে' না রেখে আশান্তিদের সর্ব্বপ্রধান দেবতা তাণ্ডোর মন্দিরে তাদের বলি দিয়ে

মান্দিঙ্গো মহিলাবৃন্দ।

(ম্যাঞ্চেষ্টারের অনুগ্রহে এদের নিজেদের হাতের তৈরী বিচিত্র রঙীন মোটা কাপড় আর দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। সস্তায় বিলাতী কাপড়ে সীয়েরা-লিওনের বাজার ছেয়ে গেছে। এখানকার মেয়েরাও বিলাতী কাপড়ের ব্যবসা করে।)

শিলুকের কবরী ও শিরোভূষণ।

(শিলুকদের চুলের কারিকুরি একটা দেখ্‌বার জিনিস। মাথা

দাস ব্যবসায়ে প্রাপ্ত প্রচুর অর্থের সাহায্যে তারা আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র সমস্ত সংগ্রহ ক'রে কাফ্রাদের মধ্যে অজেয় হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু ফান্তিদের সঙ্গে যখন তাদের ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতা নিয়ে যুদ্ধ বাধে, তখন ফান্তিদের পশ্চাতে

বীণাবীণ রাখাল বালিকাদ্বয়।

ফন্দাং যোদ্ধা।

(এরা ক্যামেরুণের আদিম অধিবাসী। কাঁধের উপর থেকে, কন্ডী পর্য্যন্ত মাংস কেটে কেটে কারুকার্য্য করেছে বটে, কিন্তু তীক্ষ্ণ শাণিত দ্বি-ফলকযুক্ত-দীর্ঘ-বর্ষা নিক্ষেপ করবার সময় এরা কোনও অসুবিধাই বোধ করে না !)

ইংরাজের সহায়তা থাকায় তারা বারম্বার যুদ্ধে পরাস্ত হয়। সম্পূর্ণরূপে জয় ক'রে তাদের দেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত ক'রে শেষ ১৯০০ খৃঃ অব্দে ইংরাজ বাহিনী গিয়ে তাদের নেয়। কিন্তু রাজার যে সোনার সিংহাসনখানি ছিল,

চুল বাঁধা। (প্রয়োজন হ'লে স্যুদানের নিম্ন শ্রেণীর কাফ্রী মেয়েরা পথে বসেই চুল বেঁধে নেয়।)

ন্যাম্-ন্যাম্ নারী। (সুখ-সন্তোষ আনন্দের সাক্ষাৎ প্রতিমা-স্বরূপিনী এই অনূঢ়া ও তরুণী ন্যাম-ন্যাম্ শ্রেণীর নারীর নিদর্শন।)

সেখানি ইংরাজরা বহু অনুসন্ধানেও খুঁজে পায়নি। কাফ্রিরা বলে সেই সিংহাসনের এমন একটা ভৌতিক গুণ আছে যে, যে সেই সিংহাসনে বসবে, সেই আশ্চর্য্য দৈব-শক্তির অধিকারী হ'তে পারবে !

বাঁশারীণ শকট-চালকের দল। (এরা সব মাল খালাস ক'রে দিয়ে বিশ্রাম ক'রছে।)
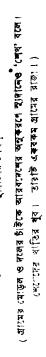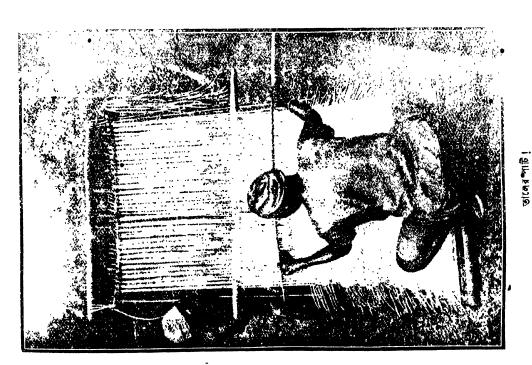
তালের পাটি !

(কামেরুণ কাফ্রীরা তালপাতার অতি চমৎকার পাটি বোনে। এটি বোনবার যন্ত্রটি এদের অনেকটা আমাদের দেশের কাপড় বোনা তাঁতের মতো ।)

স্যুদানের শেখ !

(গ্রামের মোড়ল ও দলের চাঁইকে আরবদেশের অনুকরণে স্যুদানেও 'শেখ' বলে। শেখদের খাতির খুব। তারাই একরকম গ্রামের রাজা।)

স্বর্ণ-বেলার শিল্পীরা অতি সুনিপুণ স্বর্ণকার। তাদের নির্ম্মিত কোনও কোনও অলঙ্কার কারুকার্য্যের সূক্ষ্মতায় বহু সুসভ্য দেশের শিল্পকলাকেও ম্লান ক'রে দেয়। উপস্থিত একাধিক য়ুরোপীয় কোম্পানী এই সুবর্ণ-বেলার স্বর্ণখনিগুলি অধিকার করে অগাধ অর্থ উপার্জ্জন করছে! যে সব আশাস্তিরা পূর্ব্বে এই সুবর্ণ-খনির মালিক ছিল,

কাফ্রী কৃষ্ণা

(আফ্রিকার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণের কাফ্রী স্ত্রীপুরুষ দেখতে পাওয়া যায় সুদানে। 'সুদান' শব্দটি আরব। এর অর্থ হচ্ছে 'কালা বা কৃষ্ণা।' এই স্ত্রীলোকটী ঘোরতম কৃষ্ণবর্ণের কাফ্রী নারী।')

তারা এখন চাষবাস ক'রে কিম্বা কোকো ও তূলার ব্যবসা অবলম্বন ক'রে অতি কষ্টে দিনাতিপাত ক'রছে। দাসব্যবসায় ইতিপূর্ব্বেই সেখানে বন্ধ হ'য়ে

আশাস্তি নিগ্রোর দল প্রথমটা সীয়েরা লিওনে * গিয়েই আশ্রয় নিয়েছিল। সীয়েরা লিওন তখন দাসত্বমুক্ত ক্রীতদাসদের একটা উপনিবেশ হ'য়ে উঠেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই মুক্তি-পাওয়া ক্রীতদাসদের সংখ্যা

লাতুকার লাবণ্যময়ী!

(নীলনদের উপত্যকার মধ্যে এই লাতুকা শ্রেণীর নিগ্রোরা বাস করে। এদের সুদীর্ঘ সুগঠিত ও সুঠাম দেহ শিল্পীর ধ্যানের বস্তু। এদের মুখও বেশ সুশ্রী, তবে গালে লম্বা লম্বা দাগ কেটে উল্কী পরে ব'লে প্রথমটা দেখতে খারাপ লাগে বটে।)

খুব বেশী বেড়ে উঠেছিল। ইংরাজ রণতরী ও আমেরিকা জাহাজ বোঝাই হ'য়ে দলে দলে স্বাধীনতা-প্রাপ্ত দাসে

* ভারতবর্ষে ইতিপূর্ব্বে আমি এদেশের নামটি "শীএড়া লেঁয়ে" বলে উল্লেখ করেছিলাম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বে অধ্যাপক বন্ধুবর ডাঃ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আমার

এখানে আসতে আরম্ভ করে। তারা এই পশ্চিম তীরের সকল শ্রেণীর নিগ্রোদের সঙ্গে একত্র বসবাস করাতে তাদের মধ্যে একটা নিগ্রো-ইংরাজী ভাষার প্রচলন হয়। এবং সেই ভাষাটাই সেখানে ক্রমে সার্ব্ব-জনীন ভাষা হ'য়ে ওঠে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে য়ুরোপের নানা দিগ্‌দেশ হ'তে নবাগত দাসত্বমুক্ত নিগ্রোর দল সে দেশের জল-হাওয়া সহ্য ক'রতে পারলে না! কালাজ্বর, হাজা জ্বর, প্রভৃতি মারাত্মক জ্বরের প্রকোপে তারা এত শীঘ্র ও এত অধিক সংখ্যায় মারা পড়তে লাগল যে উপনিবেশের অধিবাসী বৃদ্ধি হওয়ার চেয়ে হ্রাস হয়ে পড়ল বেশী।

কাফ্রী মুসলমান ফকীর

ওদিকে মহানিদ্রা রোগেও (Sleeping sickness) মেন্‌দী, তিমানী প্রভৃতি আশে পাশের জাতগুলির সংখ্যাও যথেষ্ট হ্রাস ক'রে এনেছিল। প্রাচীন সীয়েরা লিওন ও তাহার বহু জনাকীর্ণ নগর ফ্রী-টাউন বেশ প্রীতিপ্রদ স্থান নয়। সীয়েরা লিওন যদিও এখন ব্রিটীশ রক্ষিত দেশ, তথাপি সেখানে এখনও গোপনে নরবলি হয় এবং নরমাংসভোজী রাক্ষসের সংখ্যাও সেখানে এখনও প্রচুর। সেখানকার বর্ব্বর অধিবাসীরা সকলেই প্রতীক উপাসক। তারা ভূত-পূজার গুপ্ত সমিতির অনুষ্ঠিত হিংস্র ও বীভৎস ধর্ম্মাচরণ মেনে চলে।
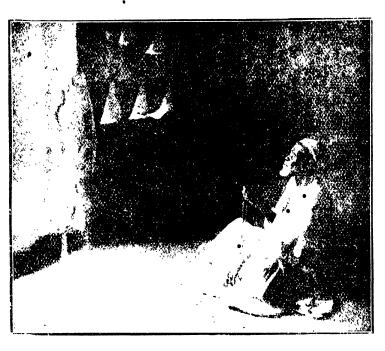
সীয়েরা লিওনের ফাউরাবে অঞ্চলে শিক্ষাবিস্তারের জন্য একটি বিশ্বর বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখে-

বীশাবাণ বেদের ছেলে মেয়েরা।

ছাগ চর্ম্মের তাবু খাটিয়ে বীশারীণ বেদের দল এই সব ছেলে-মেয়ের পাল নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়। নীল নদ ও লোহিত-সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশেই

'চাউ'

(আরবদের অর্ণবপোতের নাম 'চাউ' ! নীলনদের ভিতর দিয়ে এরা ভূমধ্যসাগরে ও লোহিত সাগরে যাতায়াত করে। আরব খালাসীরা অতি সুদক্ষ নাবিক।)

হাদেন্দোয়া।

(হাদেন্দোয়ারা বীরের জাত। সর্ব্বদা অস্ত্রে শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে থাকে। ইংরাজরা এদের নিয়ে একটী কাফ্রী সৈন্যদল গঠন করেছে।)
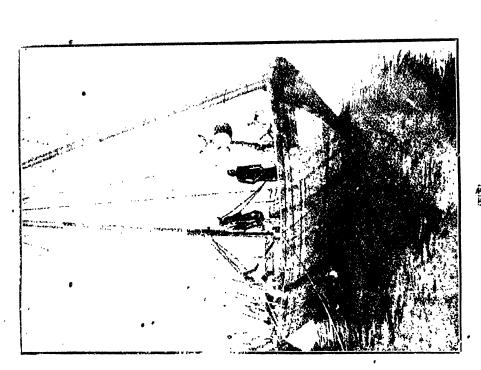
বিষয় যে সেখানে পঁচিশটির বেশী ছাত্র নেই ফ্রী-টাউনের সুরক্ষিত বন্দর ইংরাজ বাণিজ্য-তরী ও রণতরীসমূহের কয়লা যোগাবার একটা প্রধান ঘাঁটি। ইংরাজ গভর্মেণ্ট এখানে প্রায় চারশ' মাইল রেলপথ ও দেড়শ' মাইল মটর গাড়ী চলাচলের রাস্তা নির্ম্মাণ ক'রেও ব্যবসায়ের দিক দিয়ে বিশেষ কিছু সুবিধা ক'রে উঠ্‌তে পারেন নি। রপ্তানীর সুযোগের অভাবে এদেশের উৎপন্ন মাল অধিকাংশই মাঠে মারা যায়।

গাম্বীয়া প্রদেশ সীয়েরা লিওনের চেয়ে আকারে ও লোকসংখ্যায় অনেক ছোট হ'লেও এখানকার চানের বাদাম য়ুরোপের বাজার ছেয়ে ফেলেছে। অথচ এখানে মাত্র চার হাজার বর্গমাইল পরিমিত জমীতে চাষ হয়, আর সীয়েরা লিওনের চাষের জন্য ব্যবহৃত ভূমির পরিমাণ প্রায় সাড়ে সাতাশ হাজার বর্গমাইল; কিন্তু তবু এরা য়ুরোপের বাজারে কিছুই পাঠাতে পারে না।

গাম্বিয়ার লোকসংখ্যা অল্প হ'লেও তাদের মধ্যে নানা শ্রেণীর সমন্বয় দেখতে পাওয়া

বীশারীণ যুবকদ্বয়। (আফ্রিকার মধ্যে এরাই হচ্ছে এক প্রাচীন সভ্যজাতির ধ্বংসাবশেষ। স্যুদানের উত্তর পূর্ব্ব অঞ্চলেই এদের [illegible] বেশী দেখ্‌তে পাওয়া যায়। উপস্থিত পশু চরিয়ে ঘুরে বেড়িয়ে দিন গুজরাণ ক'রে বটে, কিন্তু [illegible] মধ্যে এখনও সেই আরবদের প্রাচীন প্রতিনিধি বেজা, রোমানদের [illegible] বাইবেলের সেই কুশাইৎরা এবং হেরোডোটাসের এথিয়োপীয়ানদের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়। এদের আকৃতি দীর্ঘ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুগঠিত ও সুপরি[illegible] এদের ভাবপ্রবণ সূক্ষ্ম মুখভাব ও সৌম্য আকার [illegible] এদের হেমেটিক জাতির অন্তর্ভুক্ত মানুষ বলে প্রমাণ করে দেয়।)

সিলুক সুন্দরী

(এরা সুদানের সিলুক শহরবাসিনী। গ্রাম্য ভগ্নীদের সঙ্গে এদের বিশেষ কোনও পার্থক্য নেই কেবল কণ্ঠহারের সংখ্যাধিক্য মাত্র! এরা খুব পরিশ্রমী পত্নী, কর্তব্যনিষ্ঠ জননী এবং সুগৃহিণী। নাকের বেসরটি মাথার মুকুটের সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা সুদান সুন্দরীদের অলঙ্কার ব্যবহারের একটা বিশেষত্ব।)

দেশী ও বিলাতী (এই সুদানী রমণী য়ুরোপীয় পরিচ্ছদ পরেছে বটে কিন্তু এখনও তবু দেশীয় পোষাক ছাড়তে পারেনি।)

তরুণী সুদানী সুন্দরী! (লম্বা, ছিপছিপে গড়ন, গহনা পরা, ওড়না ঢাকা গালে উল্কী, সুন্দরী সুদানী যুবতীদের প্রায়ই সুদানের পথ আলো করে চলেছে দেখতে পাওয়া যায়!)
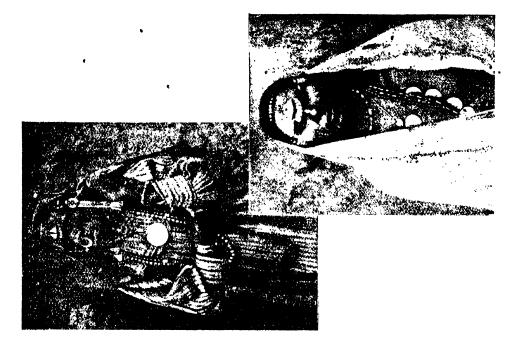
যায়। উত্তর নাইগেরীয়ার রাজবংশীয় ফুলানী আমীরদের দরিদ্র 'আত্মীয়েরা এইখানে তাদের পশুপাল নিয়ে চরিয়ে বেড়ায়। মান্দিঙ্গো ও ফুলানী নিগ্রোদের সংমিশ্রণেজাত তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও শিল্পদক্ষ কাফ্রীরাই এখানকার প্রধান অধিবাসী। এরাই ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পেলী সাম্রাজ্য গঠন ও পরিচালন করেছিল। এই সাম্রাজ্য একদিন তিম্বুক্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল এবং এদেরই নির্ম্মিত একটি রাজপ্রাসাদ স্পেনের আল্‌হাম্‌ব্রা প্রাসাদের সঙ্গে গঠন-পারিপাট্যে ও স্থাপত্যশিল্পে সমতুল্য বিবেচিত হয়েছিল। এরা অনেকেই আজকাল আবার সেই ভূতপূর্ব্ব বর্ব্বর অবস্থায় নেমে গেছে এবং মুসল্মান ধর্ম্ম ভুলে পুনরায় মূর্ত্তি-পূজা, ভূতার্চ্চন ও প্রতীক উপাসনা সুরু করেছে। তবে কনকতক দৃঢ়বিশ্বাসী এখনও পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে প্রবল আস্থাবান আছে।

আরও একদল মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী নিগ্রোদের এখানে দেখতে পাওয়া যায়; তারা হ'চ্ছে জোলফ্। এখানে ইংরাজের প্রভুত্ব না থাকলে এই জোলফ্‌রা এখানকার খাঁটি ও অমুসল্মান 'জোলা' নিগ্রোদের এতদিন উচ্ছেদ ক'রে ফেলতো। এই ছোট্ট দেশটুকু আজ ব্রিটীশসাম্রাজ্যের মধ্যে মহামূল্যবান হ'য়ে উঠেছে, কারণ বিমান-যানে পৃথিবী ভ্রমণের পক্ষে এই স্থানটা একটা সুবিধাজনক আস্তানা বলে বিবেচিত হয়েছে।

যতগুলি সমুদ্র-বন্দর আছে, তার মধ্যে এখানকার 'বাথ্‌হার্ষ্ট' একটি বিখ্যাত প্রধান বন্দর। বাথহার্ষ্ট বন্দরের দু'পাশে হাজার মাইল পর্য্যন্ত সমুদ্রকূলে ভাঁটার সময়ও সাতাশ ফুট গভীর জল পাওয়া যায়। সমুদ্রকূলের পক্ষে এ একটা দুর্লভ সম্পদ! একমাত্র ফরাসী বন্দর 'দ্যাকার' এর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার যোগ্য বলে বিবেচিত হ'তে পারে। ব্রেজিলের পার্ণামবুকোর সঙ্গে বিমানযানে যোগাযোগ রাখার পক্ষে এই বন্দরটিও 'দাকারের' অপেক্ষা কোনও অংশে অযোগ্য বলে বিবেচিত হ'তে পারে না।

ব্রিটীশ আফ্রিকার মধ্যে স্যুদান হ'চ্ছে সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বর দেশ, কারণ নীলনদ ছাড়াও অসংখ্যশাখা-স্রোতস্বিনী পরিপুষ্ট বাড়েল্-গাজাল্ প্রবাহ এই প্রদেশটিকে নদীমাতৃক ক'রে তুলেছে। তুলা, চিনি, কৃষিদ্রব্য ও খনিজ সম্পদের জন্য এই দেশই আজ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হ'য়ে উঠ্‌তে পারতো, যদি এখানে প্রচুর লোকের বসবাস থাকতো। কেবলমাত্র লোকাভাবেই এদেশের একাধিক সম্পদ অনাদৃত প'ড়ে রয়েছে। এদেশ থেকে আবিসিনীয়া পর্য্যন্ত প্রায় আড়াই হাজার মাইল দূর জলপথে যাতায়াত করতে পারা যায়। ইংরাজ কোম্পানীর জাহাজ এখানে নিয়মিত চল্‌ছে। তারা দার্ফুরনদী, লোহিত সাগর, মিশর ও ভূমধ্যসাগরের সমস্ত বন্দরে যাতায়াত করে। লোকের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অদূর ভবিষ্যতে স্যুদান যে একটি বিশেষ সুসমৃদ্ধ দেশ হ'য়ে উঠ্‌বে এ বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই।

স্যুদানের অধিবাসীদের মধ্যে সুশ্রী ও সুপুরুষ 'বেজা'দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরা যেমন বিলাসী ও বাবু, তেমনি সাহসী ও বলিষ্ঠ! এদের বিলাসিতার মধ্যে কেশ-প্রসাধনই হ'চ্ছে প্রধান এবং নানা বর্ণের চূর্ণ (Powder) ব্যবহার করাও এদের একটা বিশেষত্ব

বিরহী

শ্রীরমলা বসু

আপনারে আপনি গো পারিনা বুঝিতে
কি সে ব্যথা হৃদয়েতে, কিসের অভাব?
কি যেন ছিল গো মোর, নাহি তাহা আর,
অগাধ তিমির স্রোতে গিয়াছে ভাসিয়া।
কোথা কূল, কোথা পার, নাহি জানি কিছু,
কোথায় ঠেকিবে তরী, কোন্ পারাবারে।
সাথী কি গো ছিল কেহ? আপনার জন?
সুধাত মধুর ভাষে, জানাত বেদন?
কিম্বা অভিশপ্ত আমি যুগান্তর ধরি
একাকী জীবন-স্রোতে চির ভাসমান

অনন্ত এ পুঞ্জীভূত অন্ধকার মাঝে
নাহি পাল, নাহি দাঁড়, নাহিক কাণ্ডারী
তবে সে কিসের ব্যথা, হৃদয় মাঝারে
বারে বারে জানাতেছে অভাব কাহার?
সে কে ওগো? সে কি মোর অলীক স্বপন?
কল্পনা জল্পনা শুধু, বিকৃত মস্তকে?
কেউ কি ছিলনা কভু? রবে না কখন!
যুগান্তর ধরি শুধু ব্যর্থ অন্বেষণে
ফিরিব সে ছায়া পিছু উন্মাদ সন্ধানে
সাথীহীন অভিশপ্ত এ জীবনে সদা?

বড়দিনের উপহার

শ্রীমণীশ ঘটক এম-এ

এক

জীর্ণ পুরোণো বাড়ীটির জানলার ধারে বসে সে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। চারদিক নিরানন্দ,—পাহাড়, মাঠ, বন, কোথাও এক ফোঁটা রং নেই—শুধু কুয়াসা। অন্য কোন বাড়ীও চোখে পড়ে না।

কারো সঙ্গ সে কোনদিনই বড় একটা পছন্দ করত না। আপন মনে সেলাই করতে অথবা পড়তে তার মন্দ লাগত না। বেশী কথাবার্ত্তা কইতেও তার ভালো লাগত না। যদি একা থাকতে পেত, তবে, বোধ হয় এই নিরানন্দ জীর্ণ ভাঙ্গা বাড়ীটাতেও সে খুসী থাকত।

বিয়ের আগে সেলাই আর পড়াশুনা নিয়ে অমন কত সন্ধ্যা তার একা কেটে গেছে। কই, তখন ত এ-রকম খারাপ লাগেনি? আর এখন—?—থাক্।

দিনের বেলা অবসর একটুও নেই। গেরস্থালীর কাজে সাহায্য করবার দোসরা লোক নেই। এই সন্ধ্যাটুকুর লোভে লোভে, এর অনাবিল শান্তি ও নিস্তব্ধতার আশায় দিনটা একরকম কেটে যেত। কিন্তু এখন সে আশাটুকুও তার পূরণ হয় না। সন্ধ্যা লাগতে না লাগতেই উনুনের পাশে গিয়ে বসতে হয়। তদুপরি তার স্বামীর অনুযোগ, অভিযোগ, হুকুম ও চেঁচিয়ে খবরের কাগজ পড়ার তাড়ায় যেটুকুও বা শান্তি ছিল, তাও দেশ-ছাড়া হয়েচে।

স্বামী ছিলেন ঠিক তার উল্টো। সে নিজে কথাবার্ত্তা বেশী কইত না, চুপচাপ ভালো বাসত—কিন্তু তাঁর, নিজের গলার আওয়াজ শুনতে ও শোনাতে না পারলে ভাতই হজম হ'ত না। তার সাথে কথা কইতে গেলে তিনি খামখাই হুঙ্কার দিয়ে উঠতেন। এ-ঘর থেকে ও-ঘরে ডাকবার সময় এমন হাঁকাহাঁকি সুরু করে দিতেন, যে বাইরে থেকে কেউ শুনলে ভাবত বাড়ীতে বুঝি ডাকাত পড়েচে! আর তাঁর জীবনের প্রধান আরামই ছিল সন্ধ্যার সময়, উচ্চৈঃস্বরে চেঁচিয়ে খবরের কাগজ পড়ে স্ত্রীকে শোনান, আর সাথে সাথে নিজের গলার তারিফ করা!

এই খবরের কাগজ পড়াটাই তার অসহ্য হয়ে উঠেছিল। এক একদিন এমন হয়েচে, যে আর্ত্তনাদ করে উঠতে গিয়ে তাকে আত্মসংবরণ করতে হয়েচে। আর সে কি থামে! পড়া চলচে ত চলচেই—ঘ্যানঘেনে কর্কশ গলায়—অসহ্য!

গেরস্থালির কাজে সে হয় ত ব্যস্ত রয়েচে। হঠাৎ বাজখাঁই গলায় হুকুম হল,—"ওগো, শুনচ, তামাকের পাইপটা দিয়ে যাও ত!' কিম্বা, "চটিজোড়া নিয়ে এস ত চট্ করে!" সময় সময় তার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হত। তার সমস্ত মন বিদ্রোহী হয়ে উঠত। "চটি-ফটি নিজে দেখে নাও গে"—তার ঠোঁটের আগায় এগিয়ে আসত বটে, কিন্তু বেরুত না, কারণ সে ছিল সেই প্রকৃতির মানুষ যারা চটাচটির কিম্বা উঁচু কথা অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করে।

এই দশ বছর, সে সমস্তই মুখ বুজে সয়ে এসেচে। তাই মনে হ'ত বোধ হয় বাকী জীবনটাও কেটে যাবে! কিন্তু আজ নিরানন্দ সন্ধ্যায় শীতের অস্পষ্ট বহির্বিশ্বের দিকে হতাশ ভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হচ্ছিল,—আর পারা যায় না!

পর সপ্তাহেই বড়দিন; মনে করে সে একট বিষণ্ণ হাসি হাসল। এমন সময় রাস্তার মোড়ে স্বামীর চিরপরিচিত মূর্ত্তি দেখা গেল।

খানিক পরেই বাড়ী কাঁপিয়ে ডাক শোনা যেতে লাগল—

"কই,—ওগো শুনচ!"

সে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল। স্বামীর হাতে একখানা চিঠি।

"এই মাত্র এল। তোমার মাসীর চিঠি।"

সে আস্তে আস্তে চিঠিখানা খুলল। চিঠির মর্ম্ম দুজনেরই বিলক্ষণ জানা ছিল।

"বড়দিনে আমাদের যেতে বলেচেন !"

স্বামী অসন্তোষের সাথে মাথা নেড়ে বল্লেন, "হ্যাঃ ! গিয়ে কি হবে ? মাসী ত বদ্ধ কালা ! কানে বোমা মারলেও ত কিছু শুন্‌তে পান না। তাঁর মারও শুনেচি এ ব্যাঁরাম ছিল। আরে বাপু, মানুষকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে গিয়ে কি লাভ, যখন তার একটা কথাও শুন্‌তে পাবেন না ?"

স্ত্রী জবাব দিল না। এসব তার জানাই ছিল। স্বামী বরাবরই এই রকম করেন, কিন্তু যাবার ইচ্ছে তাঁরই বেশী। মেসোর সাথে তাঁর বন্‌তও খুব। তা ছাড়া, একটু বেড়ানোও হত। দুচারটে নতুন কথা, নতুন খবর শোনা যেত। আর চাকরের জিম্মায় বাড়ী রেখে যেতেও কিছু আপত্তি ছিল না।

তার মাসীর এই কানে না শুন্‌তে পাওয়ার কথা পাঁচখানা গাঁয়ের সবাই জান্‌ত। তার দিদিমার মা বছর তিরিশেকের সময় হঠাৎ কালা হয়ে যান। দিদিমাও এ থেকে পরিত্রাণ পাননি। মাসীকেও ঐ বয়েসেই রোগে ধরে।

"আচ্ছা বেশ,—তাহলে যাওয়াই যাবে। তাই লিখে দাও।" তার চুপ করে থাকার উত্তরে এই কথা ক'টা বলে স্বামী চলে গেলেন।

দুই

বড়দিনের সন্ধ্যা। তারা দুজনেই মাসীর বাড়ীর খাবার ঘরে বসে। মাসী আগুনের ধারে বসে সেলাই নিয়ে ব্যস্ত। তাঁর শুক্‌নো মুখে সর্ব্বদাই একটু গভীর বিদ্রূপের হাসি লেগে রয়েচে। মেয়েটীর স্বামী আর মেসো দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গল্প কর্‌ছেন। সে জান্‌লার ধারে একটা টেবিলে ঠেস দিয়ে বসে লক্ষ্যহীন ভাবে বাইরে তাকিয়ে ছিল। বাইরে বিষ্টির মতো মুষলধারে বরফ পড়্‌চে। ভেতরে গন্‌গনে আগুনের তেজে বাসন-টাসন-গুলো ঝক্ ঝক্ কর্‌চে।

হঠাৎ মেসো ডাক্‌লেন "ওগো, শুন্‌চ ?"

কোনো সাড়া নেই।

"কই,—শুন্‌লে !"

মাসী কোন জব্বাব না দিয়ে নিজ মনে সেলাই করে যেতে লাগ্‌লেন। ঠোঁটের কোণে সেই অদ্ভুত হাসিটুকু।

ভয়ানক চেঁচিয়ে মেসো বল্লেন "শুন্‌চ— ! ওগো—"

এইবারে মাসী যেন একটু শুন্‌তে পেলেন। মেসো ক্রুদ্ধ ভাবে বল্লেন—"যাও,—ওপর থেকে চট্ করে ফোটোগুলো নিয়ে এস ত। জামাইকে দেখাই !"

মাসী বল্লেন, "বোটের কি করব ?"

"ফোটো—ফোটো—"

"কোন্ কোটটা ?"

মেয়েটী অবাক্ হয়ে একবার মাসীর মুখের দিকে আর একবার মেসোর দিকে তাকাতে লাগ্‌ল। মেসো ভয়ানক বিরক্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

খানিক পরেই তিনি এক বোঝা পিক্‌চার-কার্ড হাতে করে ফিরে এলেন।

"কিছুর জন্যই কারো উপর নির্ভর কর্‌তে নেই ! যত সব—যাক্। এই যে, এ ছবিটা আমার ভাই পাঠিয়েচে, উটাকামণ্ড থেকে। সে এখন সেখেনেই থাকে কি না ! জায়গাটা কিন্তু বেশ ! অন্ততঃ ছবি দেখে তাই মনে হয় !"

তার স্বামী ছবিগুলো হাতে নিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। তারপর মাসীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস্ কর্‌লেন "ওঁর অবস্থা আরো খারাপ হয়েচে—না ?"

মাসী আগুনের দিকে মুখ ফিরিয়ে সেলাইয়ে মগ্ন হয়ে গেচেন। ঠোঁটের কোণে সে হাসিটুকু স্ফুট।

মেসো দাড়িতে হাত বুলিয়ে বল্লেন,—"হ্যাঁ, এখনো ওঁর মার মতো অত খারাপ হয় নি, তবে, আর বিশেষ দেরীও নেই !"

"ওঁর দিদিমারও ত এ রোগ ছিল ?"

"হ্যাঁ। ওঁকে কিছু বলার চেয়ে নিজে সেটা করা ঢের ভালো। সময় অনেক কম নষ্ট হয়। কালা হলেই মানুষ একটু বোকা হয় ! যাই বল না কেন, কিচ্ছু বোঝে না ! একা থাকতে দেওয়াই ওদের সুবিধে !"

স্বামী মাথা নেড়ে বল্লেন—"তা ঠিক !" মেসো দরজা খুলে বল্লেন, "এই যে বরফ পড়া বন্ধ হয়েচে ! একটু হেঁটে আসা যাক্ —কি বল ?"

"চলুন না !"

দু'জনে টুপি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। তাঁদের বেরোবার

সাথে সাথেই একটা দম্‌কা হাওয়া এসে ঘরটা কন্‌কনে করে দিয়ে গেল।

"লক্ষ্মী— !"

মেয়েটী চম্‌কে উঠলো! এমন আদর করে ত কেউ তাকে বহুদিন ডাকে নি!

মাসী একটু ঝুঁকে তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

"লক্ষ্মিটী, আহা কাছে আয়—কাছে আয়!"

মেয়েটী বল্‌ল খুব আস্তে—

"মাসি, আজ কতদিন পরে তুমি আমায় আদর কর্‌চ!"

"ছিঃ মা, তাতে রাগ কর্‌তে আছে?"

মেয়েটী অবাক্‌ হয়ে গেল। "মাসি, আমি এত আস্তে কথা কইলাম তাও শুন্‌তে পেলে?"

মাসী নিঃশব্দে হাস্‌তে লাগ্‌লেন, আর চেয়ারটা পিঠ দিয়ে ঠেলে দুল্‌তে সুরু করে দিলেন। অনেক দিনের চাপা আনন্দ আজ যেন ছাড়া পেয়েছে।

"পেলাম বৈ কি! তোর কথা ত সবই শুন্‌তে পাই!"

সে ব্যগ্রভাবে মাসীর হাত ধরে বল্‌ল "তবে তুমি সেরে গেচ, মাসি!"

"সার্‌ব কিরে পাগ্‌লী! আমার হয়েচে কি, যে সার্‌ব?"

"তবে—তুমি—"

"না—না। আমি একদম্‌ কালা নই। কোনো কালেই ছিলাম না—আর ভগবান করুন যেন কখনোই না হতে হয়। এই তোদের নিয়ে একটু মজা কর্‌লাম আর কি!"

সে অবাক্‌ হয়ে গেছ্‌ল। তার গলায় আওয়াজ ফুট্‌ল না।

খানিক পরে সে বল্‌ল, "তবে—তুমি সত্যিই কালা নও?"

"ওরে না, না। আমি, তোর দিদিমা, আমার দিদিমা —কেউ না!"

সে হতাশ হয়ে চেয়ারে বসে পড়্‌ল। "তোমার কথা আমি কিচ্ছু বুঝ্‌তে পারছি না মাসি! তবে এতদিন ধরে— সবাই তোমরা কি ফাঁকি দিয়ে এসেচ?"

মাসী তার দিকে কিছুক্ষণ চুপ্‌ করে তাকিয়ে থাক্‌লেন। তার পর তাকে ঠেলে বুকের ওপর নিয়ে বল্‌লেন "লক্ষ্মী মাণিক আমার, আজ তোকে একটা উপহার দোব। মাসীর বড়দিনের সওগাত, বুঝ্‌লি? তোর বয়েসে আমার মা আমায় সেটা দিছ্‌লেন। শুনেচি, তিনিও নাকি দিদিমার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। আমার ত আর নিজের মেয়ে নেই—তাই তোকেই দিচ্চি। আর তোর বোধ হয় দরকারও আছে। আমি প্রথম থেকেই দেখ্‌চি তুই যেন কি একটা অশান্তিতে আছিস্‌! আমার কিছু লুকোস্‌ না লক্ষ্মি!—হ্যাঁ—আমি তা আগেই বুঝেচি। উপহারটা কিন্তু একটা গোপন কথা—" এই বলে তার কানে-কানে মাসী কি যেন বল্‌লেন।

"বুঝ্‌লি ত! হঠাৎ হলেও কেউ আশ্চর্য্য হবে না! এ আমাদের বংশগত রোগ। তোর যা খুসী শুন্‌বি— যা খুসী শুন্‌বি না। ব্যস্‌। অনবরত হুকুম আর ফরমাসের জ্বালা থেকে বাঁচ্‌তে হবে ত!"

সে কাঁপ্‌ছিল। "না—না মাসি, সে—সে আমি পার্‌ব না!"

"পাগ্‌লি! তা, তোর যা খুসী তাই করিস্‌। আমি তোকে উপহার দিলাম। কাজে লাগানো—সে ত তোরই হাতে—"

মাসী চুপ্‌ কর্‌লেন। ধীরে ধীরে তাঁর ঠোঁটের উপর সেই হাসিটুকু ফিরে এল।

হঠাৎ দরজা খুলে মেসো আর তার স্বামী ঘরে ঢুক্‌লেন। আবার খানিকটা ঠাণ্ডা হাওয়া সবাইএর হাত কাঁপিয়ে দিয়ে গেল।

সে তার নিজের মনেই বল্‌ছিল, "না,—এ আমি কখ্‌খনো পার্‌ব না—"

তার স্বামী টুপীটা খুলে টাঙিয়ে রাখ্‌তে রাখ্‌তে বল্লেন, "আমরা বেশী দূর যাইনি! যা বরফ পড়া সুরু হয়েচে!"

মাসী উঠে খাবার আয়োজন কর্‌তে লাগ্‌লেন। সে নিস্তব্ধ হয়ে আগুনের দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

মেসো তার দিকে তাকিয়ে, তার স্বামীকে জিজ্ঞেস কর্‌লেন, "ওর শোন্‌বার গোলটোল কিছু ত টের পাও নি? ওর মাসীরও কিন্তু ওই বয়েসেই প্রথম হয়েছিল—"

"হ্যাঁ—তাই শুনেচি—" বলে তার স্বামী ডাক্‌লেন— "শুন্‌চ—ওগো—"

.তার সমস্ত মুখ চোখ লাল হয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু ভাবভঙ্গী দেখে মনে হল না যে কিছু শুন্‌তে পেয়েচে।

মেসো অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তার স্বামীর দিকে তাকালেন।

মাসী এক সেকেণ্ডের জন্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে গেলেন—তাঁর দুহাতে দুটো পেয়ালা, আর ঠোঁটের আগায় সেই হাসি,—মৃদু অথচ গভীর।*

* Richmal Crompton—(ইংরেজ লেখক)-এর ভাব অবলম্বনে।

ব্যর্থ বরষা

শ্রীনরেন্দ্র দেব

আকাশ যবে আত্মহারা
পাগল পারা
আপন মনে দোলে
শ্রাবণ-মেঘের কোলে ;
কণ্ঠে বাজে উল্লাসে তার গভীর কলরোল ;
মুঞ্জরিত লতায় পাতায়
যৌবন-সুর ঢেউ খেলে যায়,
নাচিয়ে দেখায় কোন্ ঝুলনের মন-ভুলানো দোল্ !
উপ্‌চে পড়া নদীর জলে
যেদিন প্রেমের বান উথলে
নয়ন-কোণের কোন্ ইসারায়
এক নিমেষে আপন হারায়
ভাসিয়ে দিয়ে কূল কিনারায়
ঝাঁপিয়ে প'ড়ে উচ্ছ্বসিত মুখে
কোন্ অতলের অসীম অপার উদ্বেলিত বুকে।
পারে না আর শাসন বাঁধন রাখ্‌তে তার নু'য়ে ;
ঈপ্সিত সেই মিলন হতে দূরে
পাষাণ-প্রাচীর বেষ্টিত তার আজন্মের আঁধার কারায় পুরে ;
আত্মদানে আনন্দিতার অনিন্দিত চরণ দুটি ছুঁয়ে
কুৎসা-গ্লানি-কলঙ্কভার-নিন্দা-আবর্জ্জনা
চূর্ণ হ'য়ে মিলায় যেন শূন্যে বায়ুর কণা !
সহকারের অঙ্গ বেড়ি নিলাজ হ'য়ে কণ্ঠ-লগ্ন-লতা—
কইছে যখন কানে কানে দিবানিশিই প্রাণের গোপন কথা,
তরুণ তৃণের সিক্ত সবুজ শীষ

স্নিগ্ধ-সজল পূবের হাওয়ায় মর্ম্মরিয়া কাঁপে
নিদাঘ মরুর তীব্র দহন তাপে
জুড়িয়ে দেখায় এসে
লক্ষ ধারায় মেঘের ঝারা অট্টহাসি হেসে !
কেয়া-ফুলের গন্ধ লোটে অন্ধ সমীরণ,
চম্‌কে দিয়ে মন,
হঠাৎ ক্ষণে ক্ষণে
টুপুর টুপুর বাজিয়ে নূপুর দূর কদমের বনে
বিরহিনী ধরণী যায়, সিক্ত আঁচলখানি
নূতন ক'রে শিউরে-ওঠা তরুণ-বুকে টানি
কোন্ সে প্রিয়র প্রেমের অভিসারে
বনের বিজন গহন পথের পারে
রক্ত মাটির কোমল বুকে ছাপ রেখে তাঁর পদ্ম চরণ দু'টির ;
দীর্ঘ দিনের জীর্ণ আঁধার উৎসবহীন কুটীর
যতই করে পিছন হ'তে শেষ মিনতির করুণ হাহাকার,
চায়না ফিরে আর,
কূলহারানো স্রোতস্বিনীর তন্ময়তার মতো
আপন মনে কতো
গুন্‌গুনিয়ে কাজরী গেয়ে চলে ;
উন্মনা সেই উন্মাদিনীর মরাল-কণ্ঠ-তলে
নাচে দোদুল দোলন-চাঁপার আল্‌গা ফোটা ফুল,
দুকানে তার লাল দোপাটির দুল্‌ছে দু'টি দুল !
শুভ্র হাসির স্নিগ্ধতীরে

শুভ্র সজল কুন্দ কলির মুক্তাবলী-মালা !
নয়নে তার প্রেমের অনল বিরহ-দীপ জ্বালা।
সেই শিখারই দীপ্ত আলো
ঘন মেঘের কাজল-কালো
নিবিড় এলো চুলে
জড়িয়ে যেন পড়েছে আজ ভালবাসায় ভুলে !
তুমিই শুধু একলা ওগো, আজকে তোমার সকল
দুয়ার আঁটি,
এমন মধু-মন্দ-মৃদুল বাদল-নিশি মরি, অবহেলায়
করছ সখী মাটি;
ঝড় এসে ওই ঝাপটা দেখায় দ্বারে ;
মেঘ ডেকে যায় ঘা'দিয়ে সই, কেবল বারে বারে,
ক্ষণে ক্ষণে সৌদামিনী বাতায়নে হঠাৎ উঁকি দিয়ে
বল্‌ছে "ওগো যক্ষরাজের প্রিয়ে !
আষাঢ় কি আর বাজবেনা তোর মনে ?
দেখ্‌না চেয়ে ভরা ভাদর উথলে যে আজ পড়ে
বঞ্চিত তোর তরুণ প্রাণের অরুণ উদয়-গড়ে !
এমন দিনে কেমন ক'রে বন্ধ-ঘরের কোণে
লুকিয়ে আছিস্ একলাটি সই বল,
ওরে আমার মানস-হ্রদের ফুল্ল-প্রেমোৎপল,
রাত ব'য়ে যায় বৃথায় যে লো,
বর্ষা বুঝি ফুরিয়ে এলো,
আয়, ছুটে আয়, অভিসারেই চল্ !
যুগে যুগেই চিরতরুণ নারী
এম্‌নি সজল-শাঙন-সাঁঝে মাথায় যবে ঝরে বরুণ-ঝারী
কেকার সুরে ময়ূর গেয়ে নাচে,
সব দিয়ে সে পরাণ-প্রিয়র সঙ্গ শুধুই যাচে !
তুমিই কেন চাইবেনা
স্মৃতি-শাস্ত্রে লুকিয়ে মাথা
কেবল কি এই কাঁদবে সঙ্গোপনে ?
এমন মনে মনে
মরবে ক'দিন হীন মরণে হৃদয়টাকে চেপে ?
যে সঙ্গীত উঠেছে আজ বিশ্বভুবন ব্যেপে
যে আনন্দে সজীব হয়ে জীবন জাগে, আজকে
পাষাণ ফুঁড়ে—
ছেড়ে ও তোর মরণ-ঘেরা কুঁড়ে,
আয় নেমে আয় তার মাঝে তুই
বিশ্বপ্রেমের বিজয় এ ভুঁই,
হয়ত' হেথা মনের মানুষ পেতেও পারিস খুঁজে
পাবিনি যা এ জনমে মুখটি যদি বুঁজে
থাকিস্ সখী—এম্‌নি করেই লুকিয়ে প্রাচীর-তলে ;
তাই বলি আজ বেরিয়ে পড়্ এই অভিসারের দলে !"

* * * *

বরষা ফিরিল বৃথা সাধি বার বার।
রুদ্ধদ্বার বাতায়ন তার
খুলিল না ধর-বরিষণে,
কলকণ্ঠ দাদুরী গুঞ্জনে ;
গগনের প্রলয় হুঙ্কার
বৃথা শুধু করি হাহাকার,
নীরব হইয়া গেল বিপুল হতাশে ;
পূবের বাতাসে
অঙ্গে তার এলো-মেলো দিয়ে পরশন
কদম্ব কেশর-শিহরণ
তোলে নাই প্রতি রোমে রোমে
অশনি আছাড়ি শুধু ব্যোমে
চূর্ণ হয়ে গেল অকারণ,
ঝঞ্ঝার ঝাঁঝর করে মত্ত প্রভঞ্জন
উল্লাসে গরজি গাহি মল্লার সঙ্গীত
বরিল মরণে,
চপলা চমকি ক্ষণে ক্ষণে
আচম্বিতে হারাল সম্বিত ;
ধূলায় মিলায়ে গেল কেতকী-পরাগ
বিশ্ব-হিয়া আলোড়নী মিলনের আকাঙ্ক্ষিত যাগ
ব্যর্থ করি, শাশ্বত বিরহে
পাষাণী শশ্মানে একা রহে—
মূঢ় মূক চেতনাবিহীন
চিরদিন।

দক্ষিণাপথ

রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

প্রতি বছরই পূজার ছুটীর পূর্ব্বে বন্ধুমহলে প্রশ্ন ওঠে, এবার কে কোথায় বেড়াতে যাচ্ছেন। এ প্রশ্ন আমাকেও অনেক শুনতে হয়। এবারও পূজার মাসখানেক আগে থেকেই অনেকে জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করেছিলেন "দাদা, এবার কোথায় যাচ্ছেন?" আমি সকলকেই সাফ জবাব দিয়েছিলাম, কলিকাতা পরিত্যজ্য পাদমেকম্ ন গচ্ছামি। তাঁরাও সেই কথাই সত্য ব'লে মনে করে নিয়েছিলেন। আমার কিন্তু কলিকাতায় থাকবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। আমি মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম যে, এবার আমার সেই ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত, মশক-গুঞ্জিত, জঙ্গল সমাকীর্ণ জন্মভূমিতে যাব। কথাটা প্রকাশ করি নি কেন জানেন? আমার মনের মধ্যে একটা গর্ব্বের ভাব এসেছিল। যাঁরা সভা-সমিতিতে বক্তৃতা ক'রে গঙ্গা ভাঙ্গেন, যাঁরা পল্লীর জন্য চোখের জল ফেলে সংবাদ ও সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠা ভিজিয়ে ফেলেন, যাঁরা না কি গ্রাম ও পল্লীর দুর্দশার কথা ভেবে রাত্রে নিদ্রা যান না, অথচ যাঁরা স্বপ্নেও দেশে যাবার কথা ভাবেন না, অবকাশ পেলে দারজিলিং, শিমলা, কাশী, ওয়াল্‌টেয়ার, মধুপুর ইত্যাদি ইত্যাদি স্থানে চ'লে যান, তাঁদের সুমুখে গর্ব্ব করে বলতে হবে যে, এই দেখ. তোমরা দেশে গেলে না, আর আমি ম্যালেরিয়াকে উপেক্ষা করে দেশে গিয়েছিলাম। দেখ ত, আমার জন্মভূমির উপর কেমন টান! কিন্তু, তখন কি জানি যে, আমার এই দর্প, এই গর্ব্ব চূর্ণ করবার জন্য দর্পহারী ভগবান অলক্ষ্যে ব'সে হেসেছিলেন। নইলে, কোথায় যাব আমার পল্লী-ভবনে—সেই পূর্ব্ববঙ্গের কাছাকাছি, তা না হয়ে বিধাতা আমাকে নিয়ে গেলেন একেবারে ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্তে—সেতুবন্ধ-রামেশ্বরে! যখন যুবক ছিলাম, যখন শরীরে বল ছিল, যখন মৃত্যুকে পর্য্যন্ত ভয় করতাম না—বিপদ-আপদ ত দূরের কথা, তখন হিমালয়ে গিয়েছিলাম; [illegible] সম্ভবও হয়েছিল; কিন্তু, এই বুড়া বয়সে, যখন এই কলিকাতা সহরের হেদোর মোড় থেকে গোলদিঘীতে যেতে হ'লে ট্রামের দিকে চেয়ে থাকতে হয়, যখন হৃদ্‌স্পন্দনের হঠাৎ আক্রমণের ভয়ে পকেটে ঔষধের শিশি নিয়ে বেড়াতে হয়, তখন যে সুদূর দক্ষিণ-সীমান্তে কেমন করে যাবার সাহস হোলো, তার একটু ইতিহাস আছে সেই কথাটাই আগে বলি।

আমাদের সদাশয় ভারত-গবর্ণমেণ্ট কিছুদিন পূর্বে একটা কমিটি গঠন করেছেন। তার নাম The Indian Taxation Enquiry Committee; বাঙ্গালা তর্জ্জমা করলে দাঁড়ায় ভারতের 'কর অনুসন্ধান কমিটি' অর্থাৎ কি না বৃটীশ ভারতবর্ষে এখন যে সকল কর প্রচলিত আছে, তাদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান। উদ্দেশ্য অতি মহান্! এই করভার প্রপীড়িত ভারতবাসীদিগের উপর আরও কোন নূতন কর বসানো যেতে পারে কি না, অথবা যে সকল কর এখন প্রচলিত আছে, তার কোন-কোনটা বাড়িয়ে সরকারের তহবিলকে সচ্ছল করা যেতে পারে কি না, তারই সম্বন্ধে মতলব স্থির করবার জন্য এই কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নামটা কিন্তু এমন সুন্দর যে, মনে হয় আমাদের করভারের আধিক্য দেখে পরম মহানুভব সরকার বাহাদুর এই ভারটা একটু কমাবার সাধু উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে এই কমিটি বসিয়েছেন। তা নয় বন্ধু, সে আশা নেই। কমিটি যা বলুন না কেন, কর যে বাড়বে ছাড়া কমবে না, এ কথা বালকেও বলতে পারে।

যাক্ গে, সে ভাবনা এখন ভেবে কি হবে; এখন ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বলি। এই যে কমিটির কথা বললাম, তাতে বিলাতী ও দিশী কয়েকজন সদস্য মনোনীত হয়েছেন;—মনে রাখবেন মনোনীত (nominated) হয়েছেন—নির্ব্বাচিত (elected) হন নি। আমাদের বর্দ্ধমানের শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুর এই কমিটির একজন সদস্য। ব'লে রাখা ভাল বাঙ্গালা দেশের আর কেহ

কমিটিতে নেই। এই সদস্য মহোদয়েরা বৎসরাধিক কাল ভারতবর্ষ এবং ব্রহ্মদেশের নানা সহরে নগরে বৈঠক ক'রে ভারতের কর-বিষয়ে অভিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ অনেক মহাশয়ের লিখিত ও বাচনিক সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন। পরম্পরায় শুনেছি যে, সেগুলি যদি ছাপানো যায়, তা হ'লে পাঁচ সাতখানি অষ্টাদশ-পর্ব্ব মহাভারত হতে পারে, এবং কেউ যদি ধৈর্য্য ধরে সেগুলি পড়তে পারেন, তা হোলে তার মধ্যে ষড়রসেরই আস্বাদ লাভ করতে পারেন। সাক্ষ্য গ্রহণ যখন শেষ হোলো, তখন এই গন্ধমাদন পরীক্ষা করবার জন্য ত একটা নিরিবিলি স্থান চাই। শুধু নিরিবিলি হ'লেই হবে না, স্বাস্থ্যকর হওয়া চাই, নয়ন-মনোরঞ্জক স্থান হওয়া চাই। ভারতবর্ষের মধ্যে মহীশূর রাজ্যে বাঙ্গালোরই সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম স্থান বলে গবর্ণমেন্ট স্থির করেন। কমিটী এখন সেখানে সুখাসীন হয়ে সেই পর্ব্বতপ্রমাণ কাগজপত্র পরীক্ষা করে রিপোর্ট লিখ্ছেন। সুতরাং বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুরকে ঘরবাড়ী, নিজের কাজকর্ম্ম ছেড়ে সেই সুদূর বাঙ্গালোরে থাকতে হয়েছে।

কিন্তু, তা ব'লে ত আর একটানা ভাবে বিদেশে থাকা তাঁর পোষায় না; তাই তিনি মধ্যে কয়েকদিনের জন্য দেশে আসেন, আবার চ'লে যান। বিগত শ্রাবণ মাসের শেষে বাঙ্গালা দেশে এসে কয়েকদিন পরে ভাদ্রের মাঝামাঝি সময়ে যেদিন তিনি বাঙ্গালোর যাত্রা করেন, আমি সেদিন হাবড়া ষ্টেসনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম। আমার তখন শরীর ভাল ছিল না, বড়ই দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিলাম। মহারাজাধিরাজ বাহাদুর আমার শরীরের অবস্থা দেখে বিশেষ দুঃখিত হয়ে বল্লেন যে, পূর্ব্বে বছরে দুইবার ক'রে তাঁর সঙ্গে দারজিলিংয়ে গিয়ে আমার শরীর অনেকটা সুস্থ হোতো। এখন তিনি ত একরকম ভবঘুরে হয়েছেন, তাই আমারও কোথাও যাওয়া হয় না। তারপর তিনি বল্লেন "আমি বাঙ্গালোর চল্লাম। দেখি, আমার যে বাড়ী পাওয়ার কথা আছে, তাতে আপনার মত অসুস্থ ব্যক্তির থাকবার সুব্যবস্থা যদি করতে পারি, তা হোলে চিঠি লিখব, আপনি মহারাজাধিরাজকুমারের সঙ্গে চলে যাবেন।" শ্রীযুক্ত উপস্থিত ছিলেন; তিনিও সাগ্রহে এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে বি-এ পড়েন; কলেজ বন্ধ হলেই তিনি বাঙ্গালোরে বেড়াতে যাবেন, এই স্থির হয়েছিল।

মহারাজের এই প্রস্তাবে আমি হাঁ কি না, কিছুই বল্লাম না। তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীমান ললিতমোহন দাস বল্লেন "বাঙ্গালোরে যে বাড়ী পাওয়া গেছে, তা তেমন বড় নয়, তবে কম্পাউণ্ড খুব বড়। আমাদেরই হয়ত তাম্বুতে বাস করতে হবে। দাদার এই দুর্ব্বল শরীরে কি তা সইবে?" এর থেকে বুঝতে পারা গেল যে, বাঙ্গালোরে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই, আমার পূর্ব্ব ব্যবস্থাই বহাল থাকবে।

শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুর বাঙ্গালোরে পৌঁছে তিন চারদিন পরেই আমাকে পত্র লিখ্লেন। শ্রীমান ললিত যা বলেছিলেন, পত্রেও তাই ছিল। অধিকন্তু ছিল এই যে, তখন বাঙ্গালোরে খুব বৃষ্টি হচ্চে। এমন বৃষ্টির মধ্যে তাম্বুতে থাকলে, আমার শরীর ভাল থাকবে কি না, এইটীই মহারাজের চিন্তার বিষয় হয়েছে। আমি তাঁর সেই স্নেহপূর্ণ পত্র যেদিন পেলাম, তার পরের দিন প্রাতঃকালেই উত্তর দিলাম যে, এত যখন অসুবিধা মহারাজ মনে করছেন, তখন আমার যাওয়া হবে না, আমি এবার পূজার অবকাশ-সময়টা দেশেই কাটাব।

সেই দিনই বিকেল-বেলা সব উল্টে গেল। এইখানে একটা কথা বলে রাখি। আমরা পণ্ডিত মানুষ কি না, তাই শাস্ত্র-বচন মানি। এই শাস্ত্র-বচন শিরোধার্য্য করে আমরা শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজকুমার বাহাদুরের উপাধির অর্দ্ধেক অংশ ত্যাগ করে শেষার্দ্ধ রেখেছিলাম—ধিরাজ-কুমার, এবং এই শেষার্দ্ধই বর্দ্ধমান-রাজ কর্ত্তৃক মঞ্জুর হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং অতঃপর অত বড় উপাধিটা বারবার না ব'লে ধিরাজকুমার বাহাদুর উপাধিটাই এই দক্ষিণাপথ ভ্রমণে ব্যবহার করব।

বলেছি ত, সকালে যাওয়া বন্ধ করে মহারাজাধিরাজ বাহাদুরকে পত্র লিখেছিলাম, বিকেলেই তা উল্টে গেল। বিকেল বেলা শ্রীযুক্ত ধিরাজকুমারের প্রাইভেট সেক্রেটারী আমার বাসায় এসে হাজির। তিনি বল্লেন যে,

দিনই গাড়ী রিজার্ভ করেছেন ; ২৯শে সেপ্টেম্বর, ৩রা আশ্বিন শনিবার মাদ্রাজ মেলে আমাদের যাত্রা করতে হবে। পূজার সময় অনেক আগে ব্যবস্থা না করলে রিজার্ভ পাওয়া যায় না। প্রাইভেট সেক্রেটারী মহাশয় সেই সংবাদ আমাকে দিতে এসেছেন এবং একবার ধিরাজকুমার বাহাদুরের সহিত দেখা করতে বল্লেন। তাঁরই কাছে শুনলাম যে, যাত্রী আমরা চারি জন। স্বয়ং ধিরাজকুমার বাহাদুর, তাঁর সঙ্গে যাবেন তাঁর আত্মীয় শ্রীমান্ ভগবতীপ্রসাদ মেহেরা, আর যাবেন প্রসিদ্ধ চিত্র-শিল্পী শ্রীমান রামেশ্বরপ্রসাদ বর্ম্মা, আর যাব আমি। স্থির হয়েছে যে, আমরা ৩রা আশ্বিন শনিবারের মাদ্রাজ মেলে যাত্রা করব ; রাস্তায় কোথাও বিশ্রাম না করে একেবারে ৪০ ঘণ্টা গাড়ীতে থেকে ৫ই আশ্বিন সোমবার প্রাতঃকালে মাদ্রাজে পৌঁছিব। শ্রীযুক্ত ধিরাজকুমার বাহাদুর ও শ্রীমান ভগবতী সেইদিনই মধ্যাহ্নের গাড়ীতে বাঙ্গালোর চ'লে যাবেন ; আমি আর রামেশ্বরপ্রসাদ সারাদিন মাদ্রাজে থেকে রাত্রি দশটার ট্রেণে বাঙ্গালোর যাত্রা করব এবং পরদিন মঙ্গলবার প্রাতঃকালে বাঙ্গালোরে পৌঁছিব। মাদ্রাজ থেকে বাঙ্গালোরে যাবার গাড়ী রিজার্ভ করবার পত্রও সেইদিনই চলে গিয়েছে।

তখন আর কি করি, শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুরকে আর একখানি পত্র লিখে আমার পূর্ব্ব পত্র প্রত্যাহার করতে হোলো এবং তার পরদিনই আলিপুরে শ্রীযুক্ত ধিরাজকুমার বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি পূর্ব্বেও দুইবার বাঙ্গালোরে গিয়েছিলেন, সুতরাং সেখানকার সমস্ত ব্যাপারই অবগত ছিলেন। তিনি বল্লেন যে, যা যা দরকার সবই তিনি গুছিয়ে নিয়ে যাবেন ; আমি শুধু পথের মত যা হয় তাই যেন নিয়ে যাই, বেশী কিছু নেবার দরকার নেই। তিনি জানেন যে, দরকার থাকলেও আমি কতকগুলো লগেজ নিয়ে পথ চল্‌বার বিরোধী। তাঁর কাছেই শুনলাম, আমার কি কি দরকার হ'তে পারে, তা তিনি রামেশ্বরকে ব'লে দিয়েছেন এবং রামেশ্বরই সে সব গুছিয়ে নিয়ে যাবে ; আমাকে শুধু তার সঙ্গে ষ্টেসনে যেতে হবে, এই মাত্র। শ্রীমান রামেশ্বর ও ভগবতী যখন সঙ্গে আছে, তখন যে আমার কোন অসুবিধাই হবে না এবং শ্রীমান ধিরাজকুমার যখন সহযাত্রী, তখন আমি এই দীর্ঘ পথ যে অনায়াসে যেতে পারব, এ সাহস আমার হোলো।

শ্রীযুক্ত ধিরাজকুমারের নিকট বিদায় নিয়ে আমি তীর্থ-রামেশ্বর দর্শনের অগ্রদূত জলজীয়ন্ত রামেশ্বরের কাছে গেলাম। সে আমাকে খুব সাহস দিল এবং যা যা বন্দোবস্ত করতে হয়, সবই সে করবে, আমাকে কিছু ভাবতে হবে না, এই আশ্বাস দিল। স্থির হোলো যে, ৩রা আশ্বিন শনিবার অপরাহ্ণ সাড়ে তিনটার সময় সে প্রস্তুত হোয়ে আমার বাসায় যাবে এবং আমাকে তুলে নিয়ে চারটার সময় ষ্টেসনে পৌঁছিবে -গাড়ী ছাড়বে কিন্তু পাঁচটা নয় মিনিটে। এই সব স্থির করে বাসায় ফিরে এসে, সকলের কাছে প্রকাশ করলাম যে, আমি সেতুবন্ধ রামেশ্বরে যাচ্ছি। তখন বাড়ীতে কলরব উঠল। ওগো, সে—কি—এখানে! এই দুর্ব্বল শরীর নিয়ে বারো-তেরশ মাইল পথ রেলে যেতে পথের মধ্যেই সব দেখা শেষ হয়ে যাবে। বন্ধুরাও অনেকে এই কথা বলেই ভয় দেখাতে লাগ্‌লেন। আমি কিন্তু স্থিরচিত্ত। জীবনে অন্য কোন ব্যাপারেই কাহারও কথা অমান্য করি নে ; কিন্তু, কোন্ খানে বেড়াতে যেতে হবে শুনলে আমি একেবারে নেচে উঠি। সেই হিমালয়-যাত্রা থেকে আরম্ভ করে এই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত বেড়াবার উৎসাহ আমার কমলো না। কোথাও যাওয়ার প্রস্তাব হ'লে আমি আমার বৃদ্ধত্ব, আমার দুর্ব্বলতা, আমার ভয়ানক হৃদ্‌স্পন্দন সব কথা ভুলে যাই ; আমার হৃদয়ে যেন যৌবনের নববল ফিরে আসে। আর পরীক্ষা করেও দেখেছি, এতে আমার কোন কষ্টই বোধ হয় না, কোন অসুবিধাই আমি অনুভব করি না।

অনেকের দেখি, একদিনের জন্য কোথাও যেতে হ'লে কত উনকোটী চৌষট্টি গোছাতে হয় ; আমার সে সব বালাই নেই ; আমি আমার জীবনে অভাবকে যথাসম্ভব সংক্ষেপ করতেই অভ্যস্ত হয়েছি ; দারিদ্র্যের পীড়নে এই সুদীর্ঘ জীবনকালে কোন বিলাসিতাই আমাকে আক্রমণ করতে পারে নাই ; আমি কোন কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি ক'রে কখনই নিজেকে অসুবিধায় ফেলি নি ; সুতরাং পথে ঘাটে আমার কোন কষ্টই হয় না। তাই ত, থাকব কোথায়, খাব কি শোবার কি হবে, এ সব কথা কোন দিনই আমি আমল দিই নি। তবে, এখন বয়স বেড়েছে কি না, তা

পদব্রজে বেশী দূর চল্‌বার কথা হোলেই একটু ভয় পাই। এবার কিন্তু সে সব ভাবনাই আমার নেই; যাব রেলে রিজার্ভ গাড়ীতে, সঙ্গে থাকবেন শ্রীযুক্ত ধিরাজকুমার বাহাদুর, ভগবতী ও রামেশ্বর। গিয়ে উঠ্‌ব বাঙ্গালোরে শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের স্নেহশীতল আশ্রয়ে। ইহার মধ্যে ভয় বা উদ্বেগের প্রবেশাধিকারই নেই। এক কথা এই যে, একটানে চল্লিশ ঘণ্টা রেলে যেতে হবে; কিন্তু মনস্তত্ত্ববিদ্‌, চিকিৎসকপ্রবর, সোদরপ্রতিম শ্রীমান গিরীন্দ্রশেখর বসু ভায়া বল্লেন "দাদা, কোন চিন্তা নেই, আপনার উৎসাহ ও উন্মাদনাই আপনাতে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চার করবে, এ আমি ব'লে দিচ্ছি।" এইখানেই বলে রাখি যে, তাঁর মনোবিজ্ঞান-মূলক ভবিষ্যদ্‌বাণী সত্যসত্যই সফল হয়েছিল; এই দীর্ঘ পথ ভ্রমণে আমি কোন সময় একটুও ক্লান্তি বোধ করিনি।

সব বাধা বিঘ্ন ঠেলে ১৯শে সেপ্টেম্বর ৩রা আশ্বিন শনিবার এসে উপস্থিত হোলো। তার পূর্ব্বে, ১৭ই সেপ্টেম্বর বাঙ্গালোর থেকে শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের এক জরুরী তার পেলাম। তাতে তিনি জানিয়েছেন যে, তিনি সব ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলেছেন, আমার কোন অসুবিধা হবে না। আমি যেন যেতে অমত না করি। এদিকে আমি কিন্তু যাওয়ার আয়োজন করে ফেলেছি। আর সে আয়োজনও তেমন কিছু না—শুধু একটা ছোট বিছানা, একটা ক্ষুদ্র বাক্সে কয়েকখানি কাপড়, আর একটা ততোধিক ক্ষুদ্র ব্যাগে একখানি কাপড়, একখানি গামছা, আর গোপন করে কাজ নেই, আমার বদ-অভ্যাসের সঙ্গী কয়েকটী অর্থাৎ শ-খানেক কড়া বর্ম্মা চুরুট। যাবার দিন বৌমা বল্লেন, পথের জন্য কিছু খাবার তৈরী করে দিই। কিন্তু এতকালের মধ্যে পথের ভাবনা তো কখনও ভাবি নাই। হেসে বল্লাম, মা, সে ভার অন্নপূর্ণার হাতে দিয়েই নিশ্চিন্ত হও; পথে খাবার ভাবনা তিনিই ভাব্‌বেন এবং তাঁর প্রতিনিধিরাই তার ব্যবস্থা করবেন।

১৯শে সেপ্টেম্বর শনিবারও যথাসময়ে 'ভারতবর্ষ'আফিসে গেলাম। তার পূর্ব্বেই আমি কার্ত্তিকের 'ভারতবর্ষে'র সমস্ত ব্যবস্থা শেষ করে রেখেছিলাম; এবং কি জানি যদি আমার অগ্রহায়ণের কাগজের অসুবিধা না হয়, এবং যদি না-ই ফিরি, তা হোলেও ত্রয়োদশ বর্ষের 'ভারতবর্ষে'র প্রথমার্দ্ধের শেষ সংখ্যায় (অগ্রহায়ণ মাসেই প্রথমার্দ্ধ শেষ হয়) সম্পাদক ব'লে আমার নামটা ৺সংযুক্ত হয়ে বাহির হয়, তার ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম। আফিসে গিয়ে যাকে যা বল্‌তে হয়, শেষ করে শ্রীমান হরিদাস ও সুধাকে অভিবাদন করে, প্রেসের ম্যানেজার শ্রীমান রামকৃষ্ণকে সময়োপযোগী উপদেশ দিয়ে একটার সময় বাসায় গেলাম;—সাড়ে তিনটায় রামেশ্বর আস্‌বেন, তখনও অনেক বিলম্ব। তখন শ্রীমান গিরীন্দ্রশেখরের বাড়ী গিয়ে তাঁর উপর বাসার সমস্ত ভার দিয়ে এবং চিত্রশিল্পী শ্রীমান যতীন্দ্রকুমারের জেদে পড়ে এক মাসের মত এক পেয়ালা চা পান করে বাসায় এলাম।

একটু পরেই রামেশ্বর ট্যাক্সি নিয়ে হাজির। তখন কিন্তু আড়াইটা বেজেছে—গাড়ী ছাড়বে সেই পাঁচটা নয় মিনিটে। কি করা যায়, ট্যাক্সি বসিয়ে রেখে ভাড়া দিয়ে লাভ কি। তখনই যাত্রা করা গেল। তার পর পাকা আড়াই ঘণ্টা ষ্টেসনের প্ল্যাটফরমে অবস্থান। সাড়ে চারটার সময় প্ল্যাটফরমে গাড়ী দিল; শ্রীযুক্ত ধিরাজকুমার ও শ্রীমান ভগবতীও তখনই লোকজন সঙ্গে এসে পড়লেন। একখানি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী মিলিত গাড়ী আমাদের রিজার্ভ ছিল; প্রথম শ্রেণীর সমস্ত কামরাটাই রিজার্ভ, দ্বিতীয় শ্রেণীর দুইটী নিম্নের আসন রিজার্ভ। আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর একটী আসন দখল করে বসলাম। দেখি, আমাদের দুইটী রিজার্ভ ব্যতীত আরও একজনের একটী রিজার্ভ আসন আছে। তাঁর নাম দেখ্‌লাম মিঃ এন্‌, বানার্জ্জি (Mr N. Banerji)। এই বিলাতী নাম দেখেই ত ভয় হোলো। শ্রীযুক্ত ধিরাজকুমারের রিজার্ভ প্রথম শ্রেণীতে গেলাম না এই জন্য যে, সেখানে গায়ের জামা খুলে, হাঁটুর কাপড় তুলে আয়েস করে বস্‌তে বাধ-বাধ ঠেকবে; জামাজোড়া পরে এতটা পথ ভদ্রলোকের মত ব'সে যাওয়া আমার পোষাবে না; তাই রামেশ্বরকে নিয়ে এই গাড়ীতে উঠেছি; যখন-তখন গিয়ে ফাষ্ট ক্লাসে আরাম করা যাবে। এখন দেখ্‌ছি, এখানেও সাহেব;—আবার যেমন তেমন নয়, একেবারে বাঙ্গালী সাহেব—মিঃ এন্‌,

বিলাতী সাহেবদের সঙ্গেও কোন রকমে বাস

করা যায়—একটু তোয়াক্ক ক'রে ; কিন্তু বাঙ্গালী সাহেব—একেবারে নরসিংহ। তাঁদের আদব-কায়দা, চলন-ফেরণ, ভাবভঙ্গী একেবারে ফুটন্ত - boiling point এ উঠেই আছে। ভীতচিত্তে, শঙ্কিত-হৃদয়ে এই ইঙ্গ-বঙ্গ মহাপুরুষের আগমন প্রতীক্ষা করতে লাগ্‌লাম। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হোলো না ; সাহেব দেখা দিলেন। সত্যিই সাহেব ; সেই হ্যাট কোট, সেই টাই-কলার, সেই প্রকাণ্ডকায় ট্রাঙ্ক, সেই বৃহৎ-বপু হোল্ড-অল। তিনি যখন তাঁর সাহেবী আস্‌বাব নিয়ে গাড়ীতে উঠ্‌লেন, তখন আর তাঁর দিকে চাইতে সাহস হোলো না। কিন্তু, তিনি আমাকে দেখেই ইংরাজী না বলে, নমস্কার করে অতি বিনীত ভাবে বাঙ্গালা ভাষায় বল্‌লেন "আমাকে চিন্‌তে পারছেন না ?" তখন তাঁর দিকে চেয়ে, তাঁর সেই বিলাতী পোষাকের মধ্য থেকে চিনে ফেললাম তিনি যে আমাদের জামাই বাবাজি শ্রীমান নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়,—শ্রীমান হরিদাস ভায়ার জামাতা। তখন গলায় জল এল, মুখে হাসি বেরুল। বাবাজিকে আদর করে বসালাম। তিনি হাইকোর্টের উকিল ; বেড়াতে যাচ্ছেন আপাততঃ ওয়ালটেয়ার, পরে আরও দক্ষিণে যাবার অভিপ্রায় আছে। সঙ্গী কেউ নেই, একটা ভৃত্যও নয়। যাক্‌, পরদিন বেলা একটা পর্য্যন্তর সুন্দর সাথী মিল্‌ল ; একেই বলে সৌভাগ্য। তার পর কিন্তু আমাদের গাড়ীতে একটী খাঁটি সাহেবও উঠেছিলেন এবং তিনি মাদ্রাজ পর্য্যন্তই আমাদের সহযাত্রী ছিলেন। তাতে আমাদের বিশ্রামের বা আমোদ-আনন্দের ব্যাঘাত হয় নাই, কারণ সাহেবটী নিতান্তই ভালমানুষ ; সাহেবের তীব্র গন্ধ তাঁর গায়ে মোটেই ছিল না।

ঠিক পাঁচটা নয় মিনিটের সময় আমাদের গাড়ী ছেড়ে দিল। দুর্গানাম স্মরণ করে আমরা সেতুবন্ধ রামেশ্বর উদ্দেশে যাত্রা করলাম।

রেল গাড়ীতে চড়ে একটা বিরক্তিবোধ সব সময়ই হয়। ধীরগতি যাত্রীর গাড়ীতে চড়ে যখন সব ষ্টেসনে গাড়ী থামতে থামতে যায়, তখন মনে হয়, একটানে যদি গাড়ী চলে যায় তা হ'লেই বেশ হয়। আবার যদি দ্রুতগামী মেল গাড়ীতে উঠে একটানে ষাট সত্তর মাইল গিয়ে গাড়ী থামে, তখন যেন হাঁফিয়ে উঠ্‌তে হয় ; মনে হয় মধ্যে মধ্যে একটু জিরুলে বেশ হয়। সে দিন মাদ্রাজ মেলে উঠেও এই বিরক্তি বোধ হয়েছিল। সেই যে হাওড়া ষ্টেসন থেকে গাড়ী ছাড়্‌ল, আর থামে না—চলেছে ত চলেছে-ই। দু ঘণ্টা ক্রমাগত দৌড়ে একেবারে খড়্গপুর গিয়ে মাদ্রাজ মেল হাত-পা ছড়িয়ে বস্‌ল। এখানে গাড়ী কুড়ি মিনিটের উপর থাকে। এখান থেকে ছেড়ে এ গাড়ী যে পথে যাবে, আমি কোন দিন সে পথে যাই নি। এ রেলে আমি একদিকে পুরুলিয়া গিয়েছি, আর একদিকে চক্রধরপুর পর্য্যন্ত গিয়েছি, পুরী কটক কোন খানেই আমার যাওয়া হয় নাই। কিন্তু এই অদৃষ্ট পথ দেখবার সৌভাগ্য আমার হোলো না, খড়্গপুরেই সন্ধ্যা হয়ে গেল। এই ষ্টেসনেই ধিরাজকুমার এসে বল্‌লেন যে, রেলের খাবার গাড়ীতে আমার জন্য ভাত ও নিরামিষ তরকারী তৈরী হয়েছে ; তিনি হাবড়াতেই এই আদেশ দিয়েছিলেন। আমি বল্‌লে তখনই দিয়ে যেতে পারে। তখন সবে সাড়ে সাতটা রাত। কি করি সেখানে খাবার না নিলে হয় কণ্টাই রোড, আর না হয় রূপসা কি বালেশ্বরে আমার খাবার আস্‌তে পারে। তাঁরা কিন্তু তখনই খাবার গাড়ীতে (Dining Car) খেতে যাবেন। তাই সেই সন্ধ্যার সময়ই ভাত তরকারী আনিয়ে নিলাম ; কিন্তু, তা আর বেশী খেতে হোলো না। এক দিকে শ্রীমান রামেশ্বর তাঁর খাবারের ভাণ্ডার খুলে দিলেন ; আর এক দিকে জামাতা নন্দলাল বাবাজি তাঁর গৃহ হইতে আনীত সুখাদ্য পরিবেশন করলেন ; সুতরাং আমার সঙ্গীদের চাইতে আমারই জিত হোলো ;—তাঁরা বিলাতী অখাদ্য খেলেন, আর আমি রাজ-ভোগ খেলাম। তার পর, বিছানা ত পাতাই ছিল, শয়ন করা গেল। কোন্ দিক দিয়ে যে বালেশ্বর, ভদ্রক, বৈতরণী-রোড, কটক, ভুবনেশ্বর, খুরদা রোড (এখান থেকেই পুরী যেতে হয়) প্রভৃতি পার হয়ে গেল, জান্‌তেও পারলাম না। ঘুম যখন ভাঙ্গলো, তখন দেখি গাড়ী গঞ্জামের অন্তর্গত বহরমপুর দাঁড়িয়ে। একেবারে উড়িষ্যার প্রান্তে এসে গিয়েছি। চারিদিকে চেয়ে দেখি, আমার সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জ-শীতলা, শস্য-শ্যামল বঙ্গভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই দৌড়ে এসেছে। পশ্চিম দেশে যেতে কিন্তু এমন হয় না বর্দ্ধমান ছেড়ে একটু এগুলেই মনে হয় যেন এক রাজা মুল্লুক ছেড়ে আর এক রাজার মুল্লুকে এসেছি ; c

দেশের সঙ্গে আমার বাঙ্গালার কিছুই মেলে না। কিন্তু, এই যে সারা রাত্রি মেল ট্রেণে ছুটে তিন শত পঁচাত্তর মাইল এসেছি, সঙ্গে সঙ্গে আমার শ্যামা প্রকৃতি-জননী এসেছেন। শোভা যেন আরও বেড়েছে। বাঙ্গালা দেশে প্রকৃতির যে শোভা দেখে চোক জুড়িয়ে যায়, এ দিকের শোভা যেন তার থেকেও সুন্দর, তার থেকেও মনোরম। সেই দূর-বিস্তৃত ধানের ক্ষেত, সেই আম কাঁঠালের বাগান, সেই উন্মুক্ত শ্যামলতা, সেই মধ্যে মধ্যে উন্নত-শীর্ষ শৈলমালা ধ্যানপরায়ণ ঋষির মত দণ্ডায়মান;—শোভা আরও বেড়ে গেছে সারি সারি অগণিত তাল আর নারিকেল কুঞ্জের নয়ন-তৃপ্তিকর দৃশ্যে! আমার সুধুই মনে পড়তে লাগল অমর কবি কালিদাসের সেই অমর বর্ণনা—তমালতালীবনরাজিনীলা!

কিন্তু, এ কবিত্ব বেশীক্ষণ টিকল না, ধিরাজকুমারের কক্ষ হতে তাঁর ভৃত্য চা রুটি প্রভৃতি নিয়ে হাজির হলেন। তখন তাড়াতাড়ি হাতে-মুখে জল দিয়ে চায়ের সদ্ব্যবহার করা গেল। সারারাত্রি গাড়ীর ঝাঁকুনীতে সুনিদ্রা হয় নাই, অথচ এতটা পথ যে কোন্ দিক দিয়ে পার হোলো, তাও জান্‌তে পারিনি; এ সময় এক পেয়ালা চা—আঃ, কি আরাম!

প্রায় সাড়ে ছয়টার সময় গাড়ী ছাড়ল। সেই মধুর গমন, সেই আট-দশটা ষ্টেসন পার হয়ে গাড়ীর বিশ্রাম। বিজয়নগ্রামে যখন গাড়ী পৌছিল, তখন বেলা প্রায় বারটা। এর পূর্ব্বেই আমরা স্নান শেষ করে নিয়েছি। সকলে খানা খেতে গেলেন, আমার ব্যবস্থা সেই পূর্ব্বরাত্রির মত। রামেশ্বরের ভাণ্ডার অফুরন্ত, নন্দলালেরও তাই—আমার ভাবনা কি? দুই বাড়ীর দুই অন্নপূর্ণা এই দরিদ্র, অন্নাভাবগ্রস্থ বৃদ্ধের জন্য থরে থরে সুখাদ্য সাজিয়ে দিয়েছেন।

এখান থেকে গাড়ী ছেড়ে যেখানে থামবে, তার নাম ওয়ালটেয়ার। এইখানেই শ্রীমান নন্দলাল আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করবেন। এই ওয়ালটেয়ারের এ-পাশের ষ্টেসনের নাম সীমাচলম্। এখানে মাদ্রাজ মেল থামে না, একেবারে ওয়ালটেয়ারে যায়। এই সীমাচলম্ হইতেই অধিকাংশ গ্রাম ও সহরের নামের শেষে 'ম্' যুক্ত হতে আরম্ভ হয়েছে। শব্দশাস্ত্রে আমার পাণ্ডিত্য মোটেই নেই, সুতরাং এই ম-অন্ত নামের বহুলতার কারণ আমি নির্দ্দেশ করতে পারব না; হয় ত পুঁথিপত্র ঘাঁটলে কিছু হদিশ পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তাহলে আর ভ্রমণবৃত্তান্ত হবে না, প্রত্নতত্ব হয়ে পড়বে।

সীমাচলে আমাদের মেল গাড়ী থামল না। জানালা দিয়ে সীমাচলের যে দৃশ্য দেখলাম, তা অতি মনোরম। পাহাড়ের পার্শ্বে ছোট গ্রাম; তাতে অনেকগুলি সাদা দেওয়ালওয়ালা খড়ের ঘর, মাঝে মাঝে এক একটা পাথর কি ইঁটের তৈরী বাড়ী মাথা উঁচু করে গ্রামখানির পাহারা দিচ্ছে; অদূরে পাহাড়, পাহাড়ের উপর একটা ছোট মন্দির দেখা যাচ্ছিল; মন্দিরে যাবার সিঁড়ি পাহাড়ের গা-বেয়ে উঠেছে। ইচ্ছা করতে লাগ্‌ল, গাড়ীখানি যদি এখানে খানিকক্ষণ থামে, তা হ'লে একদৌড়ে ঐ সিঁড়িগুলি ভেঙ্গে পাহাড়ের মাথায় গিয়ে মন্দিরটী দেখে আসি। কিন্তু, তা আর হোলো না; মাদ্রাজ মেল ছুটে গিয়ে একেবারে ওয়ালটেয়ার দাখিল হোলো। আমাদের সঙ্গী শ্রীমান নন্দলাল সেখানে নেমে পড়লেন; যাবার সময় ব'লে গেলেন যে, যদি ওয়ালটেয়ার ভাল না লাগে, তা হলে দুই একদিনের মধ্যে তিনি মাদ্রাজ অঞ্চলে চ'লে যাবেন।

এই ওয়ালটেয়ারই বেঙ্গল নাগপুর রেলের এদিকের শেষ ষ্টেসন। এখান থেকে ছোট একটা লাইন ভিজিগাপটম্ গিয়েছে; আর একটা বড় লাইন মাদ্রাজ গিয়েছে। সে রেলপথের নাম মাদ্রাজ ও দক্ষিণ মারাঠা রেলওয়ে কোম্পানী লিমিটেড্ (Madras and Southern Mahratta Railway Co Ltd)। অন্য রেল কোম্পানী বলে আমাদের গাড়ী বদল করতে হোলো না, আমাদের ঐ গাড়ীই মাদ্রাজ পর্য্যন্ত যাবে। ওয়ালটেয়ারে যখন গাড়ী পৌছিল, তখন রেলের সময় বারটা তিপান্ন মিনিট। প্রায় এক ঘণ্টা এখানে গাড়ী রইল। শুন্‌লাম, ওয়ালটেয়ার সহর ষ্টেসন থেকে দূরে; দেখেও তাই বোধ হোলো। ষ্টেশনের নিকটে সুধু রেলের বাড়ীঘর, কারখানা দেখা গেল; পাহাড় দৃষ্টিরোধ করে দাঁড়িয়ে আছেন, দূরের সহর দেখা গেল না। এই স্থানটা খুব স্বাস্থ্যকর ব'লে জাহির হয়ে গিয়েছে। শুনেছি যত ম্যালেরিয়ার রোগী সব ওয়ালটেয়ারে এসে বাসা বাঁধে;

অনেকের না কি রোগ সেরে গেছে এখানে এসে; তাই এখানকার নাম-ডাক বেড়েছে। ভিজিগাপটম্ ওয়াল-টেয়ারের কাছেই; এত বড় নামটাকে সংক্ষেপ করে বলা হয় ভাইজাগ্।

ওয়ালটেয়ার থেকে গাড়ী ছাড়ল প্রায় দুইটার সময়। এইবার মাদ্রাজ অঞ্চলে পড়া গেল; তাল আর নারিকেল গাছ ক্রমেই বাড়তে লাগল; যে দিকে চাই সুধু তাল গাছ আর নারিকেল গাছ। গাড়ী দুই চারটা ষ্টেসন পার হয়ে একেবারে শ্যামলকোটে উপস্থিত হোলো। এইখান থেকে একটা শাখা লাইন কোকনাদ বন্দর পর্য্যন্ত গিয়েছে। কোকনাদ সহরের নাম বিখ্যাত, কারণ এখানে খুব ভাল চুরুট পাওয়া যায়। শ্যামলকোট থেকে কোকনাদ মোটে যখন দশ মাইল পথ, তখন শ্যামলকোটে নিশ্চয়ই ভাল চুরুট পাওয়া যাবে; এই মনে করে রামেশ্বরকে চুরুট দেখতে বললাম। সে নিয়ে এল 'পয়সায়ে তিন চুরুট' —খুব কড়া, একেবারে বিড়ি-জাতীয়।

অপরাহ্ণ সাড়ে ছয়টার সময় আমাদের গাড়ী রাজমন্দ্রীতে পৌছিল। সেকালে যখন ভূগোলসূত্র পড়েছিলাম, তখন স্থানটীর নাম পড়েছিলাম রাজমহেন্দ্রী; এখন দেখি 'হে' নেই; কিন্তু রাজমন্দ্রী অপেক্ষা রাজমহেন্দ্রী নামই ত ভাল। এই রাজমন্দ্রীর পরের ষ্টেসনই গোদাবরী। রাজমন্দ্রী আর গোদাবরী বললে গেলে একই সহর, দুই ষ্টেসনের দূরত্ব দুইমাইল মাত্র। গোদাবরী ষ্টেসন একেবারে গোদাবরী নদীর ধারেই। প্রকাণ্ড রেলের সেতু। গোদাবরী নদীতে স্নানতর্পণ করলে মহাপুণ্য লাভ হয়। আর তার প্রমাণও রাজমন্দ্রী ষ্টেসনে পাওয়া গেল। একদল পাণ্ডা এসে আমাদের আক্রমণ করল। এরা সেতুবন্ধ রামেশ্বর ও গোদাবরী, এই দুই স্থানেরই পাণ্ডাগিরি করে। তারা আমাদের চেপে ধরল রামেশ্বরের পাণ্ডাগিরি করবার জন্য। আমি কি করি, আমাদের সঙ্গী শ্রীমান রামেশ্বরকে দেখিয়ে বললাম, এই দেখ, আমাদের সঙ্গে সশরীরে রামেশ্বর রয়েছেন, আমাদের এই রামেশ্বরই তীর্থ। তারা বেগতিক দেখে 'গঙ্গেচ যমুনাশ্চৈব গোদাবরী সরস্বতী' শ্লোক আউড়ে গোদাবরী তীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করতে আরম্ভ করল এবং সেই সন্ধ্যাবেলা গোদাবরী ষ্টেসনে নেমে পরদিন প্রাতঃকালে গোদাবরীতে স্নান ও তীর্থকার্য্য শেষ করে অক্ষয় পুণ্য অর্জ্জন করবার প্রলোভন দেখাতে লাগল। গোদাবরী নদীর তীরে একেবারে সুন্দর ধর্ম্মশালায় আমাদের মোকান করে দেবে, আমাদের কোন কষ্ট হবে না, এ সকল কথা জানাতেও ত্রুটী করল না। কিন্তু, আমরা তাদের হিতবচনে কর্ণপাত না করায় তারা তাদের দিশী ভাষায় আমাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করতে করতে চলে গেল।

তারপরই গোদাবরী ষ্টেসনে গাড়ী এল। ষ্টেসনটী বেশ বড়, রাজমন্দ্রী ষ্টেসনেরই মত। সেখান থেকেই সেতু আরম্ভ। প্রকাণ্ড সেতু—এ পারে গোদাবরী ষ্টেসন, ও-পারে কাভুর ষ্টেসন। সেতুটী দুই মাইল দীর্ঘ। নদীর মধ্যে চড়া পড়েছে; তা হোলেও নৌকা চলাচল করতে পারে। তারপরই রাত্রি হয়ে পড়ল; আমরাও আহারাদি শেষ করে শয়ন করলাম। কোন্ দিক দিয়ে ইলোর, বেজওয়াদা, নেলোর প্রভৃতি পার হয়ে গেল। পোনেরি ষ্টেসনে প্রাতঃকালে আমাদের নিদ্রাভঙ্গ হোলো। সেখানেই প্রাতঃকৃত্য সেরে চা পান করা গেল। তখন প্রায় সাতটা। রেলের আটটার সময় গাড়ী মাদ্রাজে পৌছিবে। আমরা তখন বিছানাপত্র বেঁধে প্রস্তুত হলাম। ঠিক আটটার সময় আমাদের গাড়ী মাদ্রাজ ক্যান্টনমেণ্ট ষ্টেসনে পৌছিল। আমাদের সঙ্গে লোকজন ছিলই, তবুও বাঙ্গালোর থেকে একজন জমাদার এসে ষ্টেসনে অপেক্ষা করছিল। তার হাতে শ্রীমান ললিতমোহনের চিঠি পাওয়া গেল। তিনি লিখেছেন যে, শ্রীযুক্ত ধিরাজকুমার ও ভগবতী যেন মধ্যাহ্নের গাড়ীতেই রওনা হন। তাঁদের জন্য সন্ধ্যার পর বাঙ্গালোর ক্যান্টনমেণ্ট ষ্টেসনে সমস্ত বন্দোবস্ত থাকবে। আর আমরা যেন রাত নটার গাড়ীতে যাত্রা করি; আমাদের জন্য পরদিন প্রাতঃকালে বাঙ্গালোর সিটি ষ্টেসনে লোকজন ও গাড়ী থাকবে। তথাস্তু!

কে দায়ী ?

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়, এম-এ

জীবনের তো অনেকেরই অশ্রুজলে পরিসমাপ্তি হয়—তাহাতে যথেষ্ট দুঃখ থাকিয়াও নাই। কিন্তু এমনটি হইয়াছে কোথায় ?

* * * * *

মাঝ রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। শুনিলাম চারিদিকে সোরগোল। ব্যস্ত হইয়া বারান্দার রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইতেই দেখিলাম, আমাদের বাড়ী হইতে কিছু দূরে একখানা বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে ; তাই উপস্থিত নিষ্কর্ম্মাদিগের নিষ্ফল গর্জ্জন, আর সঙ্গে সঙ্গে নারী-কণ্ঠের ভয়-ব্যাকুল আর্ত্তধ্বনি। কোন্ বাড়ীটায় আগুন লাগিয়াছে তাহা দূর হইতে ঠাহর করিতে না পারিয়া, দ্রুত অগ্রসর হইয়া বহ্নি-বেষ্টিত গৃহের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলাম। একটু দ্বিধার ভাব আসিল,—এ বাড়ীটার সুনাম নাই ; কিন্তু বাড়ীর সুনাম না থাকিলেও, যেখানে সুনাম ও সম্ভ্রমশালী লোকের পায়ের ধূলো পড়ে, যাহার সামনে ধনীর জুড়ি দাঁড়ায়, এ বাড়ী সেই সব বাড়ীর একটি। সমাজের সেই প্রকাণ্ড শ্রেণীর অভাগিনীদের এক দল এখানে তাহাদের দেহের বেসাতি করে। এখনও দমকল আসিয়া পৌঁছায় নাই। উপর হইতে এই হতভাগিনীদের পালিত ময়না, টিয়ার খাঁচাগুলি দোতালা তেতলা হইতে তাহারা ফেলিয়া দিতেছে—বহিয়া নামিবার সময় নাই ; ফেলিয়া দিলে যদি বাঁচে—আগুনের হাত হইতে রক্ষা পায় ! কেউ বা খাঁচার পাখী ছাড়িয়া দিতেছে। জিনিস-পত্র, দেওয়ালগিরি, খাট-পালঙ্ক, সোফা—যে সব ইন্ধন নিত্য জীবন্ত মানুষ পোড়াইয়া মারে,—সেগুলিও আজ আগুনের কবলে। সে সব বাহির করিবার বা রক্ষা করিবার অবসর নাই। গহনার বাক্স লইয়া কেউ নামিয়া আসিয়াছে ; কেউ বা গহনা আঁচলে বাঁধিয়া বাহিরে আসিতেছে। দুটি রাত্রি-প্রবাসী অর্দ্ধ-মাতাল বাবু টলিতে টলিতে বাহির হইল দেখিলাম। আগুনের এই রুদ্র রূপ—এ সৌন্দর্য্য বহু দিন দেখি নাই। আঁধারের বুক চিরিয়া এই প্রচণ্ড আলোর শিখা যে মূর্ত্তি বিস্তার করিয়াছে, তাহা যেমন ভীষণ, তেমনি চমৎকার ! রোজ যেখানে শান্তভাবে বিজলীর আলোর নীচে আর মকমলের গালিচার উপরে নটির নূপুর-নিক্কন চলে, রৌপ্যের অনুপাতে যেখানে হাসি, রূপ, গান সরসতা মেশে—হৃদয় লইয়া যেখানে ছিনিমিনি চলে, তাহার ভিতরকার সমস্ত গ্লানি ও অভিশাপ যেন মূর্ত্তি ধরিয়া আগুন আজ পোড়াইতেছে,—তাই অগ্নি বুঝি পাবক।

আমি ও একটি সেবা-সমিতির কয়েকটি যুবক মিলিয়া সাধ্যমত সময়োপযোগী যাহা করিবার করিতেছিলাম ; কিন্তু আগুন বাড়িয়া চলিল—তাহার উত্তাপ আর সহ্য করা সম্ভব নয়। অনেকেই বাধ্য হইয়া বাহির হইয়া আসিল। আমি দূরে সরিয়া দাঁড়াইব, এমনি সময় একটি মেয়ে বাহির হইতে বলিল, বেলা কই, বেলা কই, তাকে তোরা কেউ দেখেছিস ? যদি কেউ ভিতরে আট্‌কা পড়িয়া থাকে, এই ভাবিয়া আমি অগ্রসর হইব মনে করিতেছি, ঠিক সেই সময় দেখিলাম, একটি মেয়ে উত্তরের বারান্দা দিয়া দ্রুত আসিতেছে—বুকে তার ঘুমন্ত শিশু। আমাকে সামনে দেখিয়াই সে ভয়-ব্যাকুল চোখে থমকিয়া দাঁড়াইল। আমি তাহার মুখ দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম।

ক্ষণকালের জন্য এই কুৎসিত গৃহ, এই ক্ষুধিত অগ্নিশিখা, উপস্থিত জনসংঘের উন্মত্ত চীৎকার—এসব ভুলিয়া গেলাম।

আজ দুবছর হইল যে উমা জলে ডুবিয়া মরিয়াছে, তাহাকে ঘুমন্ত শিশু বক্ষে আজ এই অচিন্ত্যপূর্ব্ব স্থানে অকস্মাৎ দেখিয়া আমি নির্ব্বাক হইয়া গেলাম ! আমি 'উমা' এই দুটি অক্ষর উচ্চারণ করিতেই, সে আতঙ্কে সামনের বারান্দার দিকে ছুটিল। সে বুঝি আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িতে যায় ! তাই আমিও তাহার পশ্চাতে দ্রুত অগ্রসর হইলাম। সে আমাকে এড়াইবার জন্য পূর্ব্ব-

দিকের বারান্দা ধরিল ; কিন্তু কিছু দূর যাইয়া আর অগ্রসর হইতে পারিল না। পেছনে আগুন, সামনে আমি। সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, প্রভাত-দা, আমায় ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও।

আমি কোনও কথা না বলিয়া তাহার বক্ষ হইতে শিশুকে কাড়িয়া লইলাম। তাহার হাত শক্ত করিয়া ধরিয়া তাহাকে গৃহের বাহিরে লইয়া আসিলাম। তাহাকে দেখিয়াই তাহার সঙ্গিনীরা চেঁচাইয়া উঠিল, এই যে বেলা এয়েচে, বেলা এয়েচে—তোকে এতক্ষণ আমরা খুঁজে মরছিলুম।

*   *   *   *   *

দমকল আসিয়া আগুনের কবল হইতে উমার ঘরখানি বাঁচাইয়াছিল। দিন দুই পরে আমি যাইয়া উমাকে বলিলাম, উমা চল, আমি তোমায় নিতে এসেচি, তোমায় যেতে হবে।

উমা আমার পায়ে হাত দিয়া বলিল, লক্ষ্মী দাদাটি আমার, আমায় আর যেতে বোলো না। কত কষ্টে, কত বিপদে পড়ে বাড়ী ছেড়ে এসেচি, তা তো তুমি জান না। সকলেই যেমন জানে উমা মরেচে, তুমিও তাই জানতে—সেই ছিল ভালো। সেদিনেও পেতে না আমায়—আমি ঠিক আগুনে ঢুকতুম এ কালমুখ তোমায় দেখাবার আগে। কিন্তু কোলে আমার বিশু ছিল, তাই পারি নি।

আমি বল্লুম, এত যদি কষ্ট, কেন এলে তবে বাপ মা ভাই সব ছেড়ে ? তুমি তো বাপ-মায়ের একমাত্র মেয়ে—কত আদরের !

উমা কাঁদিতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে বলিল, বিনোদকে চেন তো ? সে গাঁয়ের স্কুলে মাষ্টারি কর্ত্ত। তোমাকে সব বলে এখন লাভ নেই প্রভাত-দা,—আর বোনের এই দুর্গতির ইতিহাস শুনতেও তোমার ভালো লাগবে না—আমার বলতেও বাধবে। সেই বিনোদ আমাদের বাড়ী আসতো তা জান। পরে এক দিন আমি টের পেলুম যে, আমি সন্তানের মা হতে যাচ্ছি। বিধবা আমি—সে কি লজ্জা, সে কি ঘেন্না ! সে দিন সারারাত্রি আমার ঘুম হোল না। আমার কতখানি দোষ ছিল, তা আজ বলবার দিন নয়। এ কথা কেমন করে গোপন কর্ব্বো—কেমন করে বৃষ্টি ! বাগানের পাশে আষাঢ়ের নবগঙ্গা তখন জলে থই থই। আমি আমার নিজের একখানা কাপড় আমাদের বাড়ীর ঘাটের সামনে রেখে চলে আসি,—আর হাঁটুজলে কলসীটি ইচ্ছে করেই ফেলে আসি। তা থেকেই লোকের ধারণা হয় যে, আমি জলে ডুবে মরেচি। বাবা-মাও তাই জানেন। জীবনে তাঁদের আমি এই একটিবার মাত্র বঞ্চনা করেচি। এই আমার প্রথম, আর এই আমার শেষ। যে দুঃখ অসহ্য, যে যন্ত্রণা সহনাতীত, তাও আজ সম্ভব হয়েচে। এই পর্য্যন্ত বলিয়া উমা দুই হাতে মুখ ঢাকিল।

আমি ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলাম, উমা, তুমি ফিরে চলো ! আমি ঠিক জানি—তোমার বাবা-মা আবার তোমায় নেবেন। এর জন্যে যদি তাঁদের কোনও কষ্ট স্বীকার কর্ত্তে হয়, তাও তাঁরা কর্ব্বেন।

উমা ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, উমা তো আর নেই দাদা, সে জলে ডুবে মরেচে। এখন বেলা এখানে রয়েচে।

একটু থামিয়া উমা বলিল, বাবা-মার সুখ-স্বপ্ন আমি আর ভাঙ্গতে যাবো না। আমি জেনেছিলুম এই, তোমার কাছেও শুনলুম যে, তাঁরা আমার স্মৃতি অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে রক্ষা করেন। আমার সাড়িটি সেমিজটি আল্‌নায় গোছান রয়েচে—আমার বইগুলি, আমার চুল বাঁধবার ফিতেটি পর্য্যন্ত যত্ন করে তুলে রেখেচেন। আমার কল্পিত মৃত্যু-দিনে তিনি ভিখারীদের দান করেন, আমার নামে তিনি স্কুলে মেডেল দেন, প্রাইজ দেন। আহা, তাঁরা এই নিয়েই থাকুন—আর কতদিনই বাঁচবো দাদা ? তাঁদের তুমি আমার কথা জানিয়ো না।

শয্যাশায়ী ঘুমন্ত পুত্রের দিকে চাহিয়া উমা বলিল, ওর বয়েস দুবছর হোল। আশীর্ব্বাদ কর, ও যেন বেঁচে থাকে—নইলে কি নিয়ে থাক্‌বো ? অনেক দিন থেকে ওর কথা ভাবচি—আজ একটা যেন কূল পেলুম ;—ও সুশিক্ষার ভার তোমার ওপরেই দেবো, বলিয়া সে চুপ করিল।

*   *   *   *   *

ক'দিন পরেই গাঁয়ে ফিরিলাম। উমার পিতার সঙ্গে দেখা হইল। আজ কি বলিব ভাবিয়া পাইলাম না তিনিই বলিলেন, প্রভাত এসেচ—আমি তোমার কথা ভাবছিলুম। অগ্রসর হইয়া তিনি আমার মাথায় সস্নে

স্পর্শ করিয়া বলিলেন, এবার মকর-সংক্রান্তির দিনে উমার নামে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা কর্ব্ব মনে করেচি। সে বড্ড শিবপুজো ভালোবাসতো জানো তো। নবদ্বীপ ও ভাটপাড়া থেকে সেই উপলক্ষে কয়েকজন পণ্ডিতকেও আনবো ইচ্ছে আছে। দেখ বাবাজি, তোমায় একটু খাটতে হবে। তার পর একটু থামিয়া গাঢ়কণ্ঠে বলিলেন, উমা তো তোমার আপন বোনটির মতোই ছিল।

আমি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে তাঁহার কথা শুনিয়া নতমস্তকে শুধু ছোট্ট একটি 'আচ্ছা' বলিয়া সরিয়া পড়িলাম—যেন আমার মুখটা আজ তাঁহার চোখে না পড়ে।

* * * *

বিনোদ আজ ওকালতি করিতেছে। ছাত্র-সমিতিতে সে চরিত্র-গঠন, ছাত্র-জীবন—ওই রকম সব ভাল ভাল বিষয়ে বক্তৃতা করে। ডাক্তার গৌড়ের কন্‌সেণ্ট বিল্ সম্বন্ধে তাহার অত্যন্ত আপত্তি। ইহাতে সনাতন হিন্দুসমাজের বড়ই ক্ষতি করিবে বলিয়া সেদিন সে ইংরেজী কাগজে কি একটা লিখিয়াও ছিল। হয়ত বা ইদানীং দেশের কাজেও লাগিয়া পড়িবে। উমার স্মৃতি-জড়িত শিবমন্দিরে পুজো-অর্চ্চনাও ঠিক হইবে—সংসার যেমন চলিতেছে চলিবে। শুধু উমা,—না, সে কথায় আর কাজ কি?

আমার মন যতই বলে, না—এ বিধান ঠিক নয়, এর কোথাও বড় রকমের গলদ রহিয়াছে,—বাহিরের জগৎ বলে 'চুপ'! তাই শিশুশিক্ষার সুবোধ ছেলেটির মত চুপ করিয়া আছি। শুধু ভগবানকে যদি একবার মুখোমুখি পাই, তবে তাঁহাকেই দুএকটি কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে,—কোনও মানুষকে নয়।

শিবসমুদ্রম্

শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি-ই

১৯১৫ অব্দের জুলাই মাসের মাঝামাঝি হইতে সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি দুই মাস কাল অবিশ্রান্তভাবে দাক্ষিণাত্যের নগরে, গ্রামে, পর্ব্বতে, অরণ্যে ভ্রমণ করিয়া মহিশূরের অন্তর্গত ব্যাঙ্গালোরস্থ রামকৃষ্ণ মিশনের মঠে ফিরিয়া আসিলাম। স্বামীজিরা আমার ভ্রমণ-কাহিনী শুনিয়া বিশেষ প্রীত হইলেন। এখন ২।১ দিন বিশ্রাম করিয়া শরীরকে একটু সবল ও সুস্থ করিতে উপদেশ দিলেন। শরীরের কিছুই হয় নাই; তবে মহিশূরের গ্রামে গ্রামে অর্দ্ধাশনে ও গো-যানে ভ্রমণ করিয়া শরীর সামান্যরূপ অবসন্ন হইয়াছিল; মন কিন্তু পূর্ণ মাত্রায় সতেজ ছিল। ফিরিয়া আসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম যে এবার কোথায় যাওয়া যায়। সকলে বলিলেন যে ইঞ্জিনিয়ার হইয়া যে শিবসমুদ্রমের জলপ্রপাত, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করিবার কারখানা ও কোলারের স্বর্ণ-খনি দেখিব না, ইহা হইতেই পারে না এবং ইহা নিতান্তই অসঙ্গত হইবে। আমার মস্তিষ্ক কিন্তু তখন হৈসল, কদম্ব, গঙ্গাবল্লাল নরপতিদিগের কীর্ত্তি-কলাপে পূর্ণ ছিল। তখনও শ্রবণ বেলগোলাস্থ গোমতেশ্বরের বিরাট মূর্ত্তি মনের মধ্যে যে স্বপ্নজাল রচনা করিয়াছিল, তাহা অপসৃত হয় নাই; আর স্থানীয় জৈনদিগের আতিথেয়তা আমায় মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ শিবসমুদ্রম্ দেখিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। শিবসমুদ্রমের এঞ্জিনিয়ার তাঁহাদের বিশেষ ভক্ত; তিনি বঙ্গদেশের মঠ হইতে নবাগত সন্ন্যাসী অম্বিকানন্দ স্বামীকে পূর্ব্বেই নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার এই মহা সুযোগ।

শিবসমুদ্রম্ হইতে বৈদ্যুতিক প্রবাহ প্রেরিত হইয়া ব্যাঙ্গালোর ও মহিশূর নগর আলোকিত করে; এখান হইতে বৈদ্যুতিক প্রবাহ কোলারের স্বর্ণ-খনিতেও প্রেরিত হয়। সেইজন্য কোলারের স্বর্ণখনি দেখিতে যাইবার পূর্ব্বে শিবসমুদ্রমে যাওয়া উচিত; আমিও তাহাই করিলাম। স্বামীজিরা শিবসমুদ্রমের এঞ্জিনিয়ার মিষ্টার কৌশিককে পত্র লিখিয়া দিলেন যে, আমরা যাইতেছি।

আমি কলিকাতা হইতে যাত্রা করিবার সময় শিল্পী-বন্ধু জী-বাবুকে সঙ্গে আনিয়াছিলাম; রামেশ্বরম্ হইতে

ইঁহার সহিত ছাড়াছাড়ি; ইনি সিংহল দেখিবার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়াছিলেন বলিয়া রামেশ্বরম্ হইতে সিংহলের দিকে গেলেন, আর আমি শ্রীরঙ্গম্ হইয়া মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠে ফিরিয়া আসিলাম। সে প্রায় এক মাসের কথা। ব্যাঙ্গালোরে আসিয়া শুনিলাম যে জী-বাবু তথা হইতে মহিশূর সহরের দিকে যাত্রা করিয়াছেন এবং এতদিনে শিবসমুদ্রমে যাইবার কথা। আবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে আশায় মন প্রফুল্ল হইল, কারণ তাঁহার মত সজ্জন ও রসজ্ঞ বন্ধু মিলা ভার।

আমি ও স্বামী অম্বিকানন্দ ১১ সেপ্টেম্বর প্রত্যূষে শিবসমুদ্রম্ যাইবার জন্য রওনা হইলাম। গাড়ি ছাড়িবার পূর্ব্বে ব্যাঙ্গালোর ষ্টেসনে গাড়িতে বসিয়া গল্প করিতেছি, দেখিলাম একটি সি, আই, ডি, কর্ম্মচারী কয়েকবার আমাদের গাড়ির সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিল। তাহাকে আমি চিনিতাম। অনেকবার ইতস্ততঃ করিয়া স্বামীজির নাম জিজ্ঞাসা করাতে আমি তাঁহার হইয়া উত্তর দিলাম "জিজ্ঞাসা করিবার পরওয়ানা দেখাও"। সে বলিল যে, সমস্ত সাধু-সন্ন্যাসীর নামই লওয়া হয়। আমি বলিলাম যে পরওয়ানা দেখাইলেই নাম ধাম বলা যাইবে, এবং কোন সভ্য দেশে যে আইন প্রচলিত নাই, এ প্রকার আইন এখানে কি করিয়া আছে? আমি ভালরূপই জানিতাম যে অনেক সভ্য দেশেই এই প্রকার আইন বর্ত্তমান; তথাপি এ প্রকার বলা গেল। সি আই ডি অফিসার মহাশয় পলায়ন করিলেন, আর আসিলেন না। স্বামী অম্বিকানন্দ মহাশয় অসুস্থ ছিলেন, স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় ভুগিতেছিলেন। গাড়ি ছাড়িলে তাঁহার সহিত নানা গল্প করিতে করিতে যাওয়া গেল। ইনি একজন সঙ্গীত-বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ; যাঁহারাই রামকৃষ্ণ মিসনের বিশেষ সংস্রবে আসিয়াছেন, তাঁহারাই ইঁহার গন্ধর্ব্বনিন্দিত কণ্ঠের সঙ্গীত-সুধা পান করিয়াছেন। ইঁহার ভজনগুলি আমার বড়ই ভাল লাগিত। ইঁহার সহিত অনেক সুখ দুঃখের কথা হইল। ইনি কাশীধামে যাইবার জন্য ব্যস্ত; সেখানে যাইয়া নির্জ্জনে পাঠাদি ও সাধন ভজন করেন এইরূপ ইচ্ছা।

গাড়ি প্রায় ১০টার সময় ৫০ মাইল দূরস্থিত মাদ্দুর ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল; এখান হইতে শিবসমুদ্রম্ ২৮ মাইল দূরে অবস্থিত। মাদ্দুর ষ্টেশনস্থিত হোটেলে বিশেষ তৃপ্তির সহিত আহার করা গেল। হোটেলের ব্রাহ্মণকে ধন্যবাদ দেওয়াতে সে বিশেষ আনন্দিত হইল। সঙ্গে কিছু আহার্য্য লওয়া গেল। উত্তর ভারত অপেক্ষা দক্ষিণভারতে রেলপথে ভ্রমণ করা সহজ; প্রত্যেক ষ্টেশনে ব্রাহ্মণের হোটেল আছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখানে অন্নব্যঞ্জনাদি মিলে। পাঞ্জাবেও বিশেষ সুবিধা দেখিয়াছি; এখানেও ষ্টেশনে "গোস্‌রোটি" পাওয়া যায়। বিশেষ কষ্ট বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মধ্য ভারত প্রভৃতি প্রদেশে। আহারের পর বিশ্রাম না করিয়াই শিবসমুদ্রম্ যাত্রা করিবার বন্দোবস্ত করিতে হইল; কেন না ২৮ মাইল পথ যাইতে হইবে। ২॥০ টাকায় একটি "ঝট্‌কা" বা অশ্বযান ভাড়া করা গেল। যাত্রা করিতে যাইব এমন সময় একটি শিক্ষিত যুবক আসিয়া বলিল "আপনারা সেখানে যাইয়া যাঁহার অতিথি হইবেন, আমিও তথায় তাঁহারই অতিথি হইব। আমায় লইয়া চলুন।" আমাদের সঙ্গে যাইলে তাঁহার কিছু খরচ কমিবে বলিয়া অনুরোধ করাতে বিশেষ কষ্ট সত্ত্বেও তাঁহাকে লওয়া গেল। গাড়িওয়ালা আর একজন দেখিয়া বাঁকিয়া দাঁড়াইল, অগত্যা তিন টাকায় আর একটি গাড়ি ভাড়া করা গেল।

কি কুক্ষণেই যে আমরা বাহির হইয়াছিলাম বলিতে পারিনা; কেননা অর্দ্ধপথ যাইয়া গাড়ি কিছুতেই চলেনা; অনুনয়, বিনয় ও আসুরিক প্রহারেও অশ্বমহাশয়ের চৈতন্য হইলনা। অশ্বটি একটু স্থূলোদর দেখিয়া আমি পূর্ব্বেই ভাবিয়াছিলাম যে এইরূপ হইবে। আমি নামিয়া তাহার মুখ ধরিয়া দৌড়াইতে চেষ্টা করিলাম; কিছুতেই কিছু হইলনা। কিছু দূর যাইয়া বোম্, লাগাম, সজ্জা প্রভৃতি লইয়া ও তাহাতে নিজেকে জড়াইয়া অশ্বমহাশয় ভূমিশায়ী হইলেন। আমি পূর্ব্বে লাফাইয়া পড়িয়াছিলাম; অপরিচিত ভদ্রলোকটির বস্ত্র ছিঁড়িয়া গেল ও গাত্রে আঘাত লাগিল। ঘোড়াটির সাজ কাটিয়া দিয়া কোন প্রকারে তাহাকে তোলা গেল। যখন ঘোড়াটি পড়ে, তখন দেখি তাহার চক্ষু মুদ্রিত। চক্ষু মুদিয়া সে বিলাস-স্বপ্ন দেখিতেছিল, না দুষ্টামি, তাহা গবেষণা করিবার সময় পাই নাই। সত্য কথা বলিতে কি প্রশ্নের জন্য নাই হউক নিজেদের জন্য বড়ই ভাবনা হইল। এই পার্ব্বত্য পথে, চড়াই উৎরাইএর মধ্যে নিজেদের মোট বহিবার চিন্তায় মনকে

বিশেষ উদ্বিগ্ন করিল। রজ্জুদ্বারা ছিন্ন সজ্জা বাঁধিয়া অশ্বকে আবার গাড়ির সহিত জোড়া হইল; অশ্বের অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ, তাহার রক্ষা নাই। এবার অশ্বটি বুঝিল যে তাহার বুদ্ধি খাটিল'না, অগত্যা চলিতে লাগিল। স্বামীজি ও আমি সঙ্গীত সম্বন্ধে চর্চ্চা করিতে লাগিলাম। সর্ব্বজনবিদিত প্রসিদ্ধ গায়ক অঘোর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কথা উত্থাপন করিলে স্বামীজি বলিলেন যে, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ভজন গানের পুঁজি বিশেষ ছিল এবং ভজন-সঙ্গীতে তিনি কিছু সিদ্ধ ছিলেন; তবে তাঁহার মতে রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী মহাশয়কে অধিকতর পারদর্শী বলিয়া তাঁহার ধারণা। পেয়ারা সাহেব, রমজান, শিবপুরের নিকুঞ্জ দত্ত মহাশয় ও তদীয় ভ্রাতা মন্মথবাবুর কথা উঠিল। স্বামীজি অনেকগুলি ভজন গাহিয়া শুনাইলেন। পথের কষ্ট ভুলিয়া গেলাম। এইরূপে ১৪ মাইল আসিয়া আমরা মালবল্লী তালুকে পঁহুছিলাম। এখান হইতে শিবসমুদ্রম্ ১৪ মাইল। আজ হাটবার বলিয়া এখানে বিশেষ ধুম ও জনতা। এখান হইতে শিবসমুদ্রমের পথ তো সুদূর; পথের দুইধারে বৃক্ষের শাখা যেন আকাশ একেবারে ছাইয়া ফেলিয়াছে; এক এক স্থানে আকাশ আদৌ দৃষ্ট হয়না। এইবার অপরিচিত ভদ্রলোকটির সঙ্গে সাংসারিক অনেক কথাবার্ত্তা হইল; কথাবার্ত্তায় অসতর্ক ভাবে তিনি বলিয়া ফেলিলেন যে কৌশিক মহাশয়ের সহিত অর্থাৎ আমরা যাঁহার অতিথি হইব তাঁহার সহিত কোন পরিচয় নাই; পূর্ব্বে চিনেন বলিয়া আমাদের সঙ্গ লইয়াছিলেন, এখন বলিলেন চিনেননা। এই মিথ্যা আচরণে আমার বিশেষ ক্রোধের উদয় হইল। এ লোকটি ব্যাঙ্গালোরস্থ এক পরিচ্ছদ-ব্যবসায়ীর দালাল; শিবসমুদ্রমে জামাকাপড়ের অর্ডার সংগ্রহ করিতে যাইতেছেন। বলিলাম, এ প্রকার লোককে আর কি শিক্ষা দিব। মিথ্যাচরণের জন্য সে নিজেই অনুতপ্ত হইবে; ইহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট শিক্ষা হউক। অপরাহ্ন ৬টার সময় কৌশিক মহাশয়ের বাসায় পঁহুছিলাম; তিনি আমাদের অভ্যর্থনার জন্য দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া ছিলেন। বন্ধু জী—বাবুকেও দেখিলাম; তিনি সেইদিন প্রাতেঃ আসিয়া পঁহুছিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া বিশেষ আনন্দ হইল। কৌশিক মহাশয়কে বেশ গম্ভীর প্রকৃতির বলিয়া বোধ হইল; তাঁহার ঘন শুম্ফ ও মুখশ্রী দেখিয়া পূজনীয় বালগঙ্গাধর তিলককে মনে পড়িল। লোকটিকে দেখিয়া ভক্তি হইল; বোধ হইল যেন চরিত্রগত দৃঢ়তা মাখান রহিয়াছে। তাঁহার সহিত ব্যবহারেও তাহা দেখিলাম। তাড়াতাড়ি হস্ত মুখ ধৌত করিয়া ও কফি পান করিয়া পাওয়ার ষ্টেশন (Power Station) দেখিবার জন্য যাত্রা করা গেল। কিয়দ্দূরে যাইয়া আমরা ক্রমনিম্ন (inclined) রেলের নিকট উপস্থিত হইলাম। পাহাড়ের গাত্র কাটিয়া তাহার উপর ঢালু ভাবে রেল লাইন পাতা হইয়াছে। রেলটি দৈর্ঘ্যে ১০০´ ফিট, এবং উপর হইতে নিম্নতলস্থ বৈদ্যুতিক কারখানার গভীরতা ৪০০ ফিট। ইহা হইতে ঢালুটি কিরূপ তাহা বেশ বুঝা যাইবে; ত্রিকোণমিতির পরিভাষানুসারে ধরাতল ও ঢালের সম্পাতকোণের জ্যা দুই-পঞ্চমাংশ অর্থাৎ কোণটি ২৩°৩০´। একটি ট্রাক্ ও বেঞ্চির সহিত লোহার দড়ি (wire rope) বাঁধা; একটি ট্রাক্ উঠিতেছে ও আর একটি নামিতেছে; দুইটিতে ভারের সাম্য রক্ষা করা হইয়াছে। নামিবার সময় বেশ আরাম বোধ হইতেছিল। নামিয়া পাওয়ার হাউস বেশ করিয়া দেখিয়া লইলাম; কৌশিক মহাশয় সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝাইয়া দিলেন। কিপ্রকারে ইহা চলিতেছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবেনা।

তিন মাইল দূরে ড্যাম (Dam) বা বাঁধ দ্বারা কাবেরীর জল বাঁধা হইয়াছে। সেই অবরুদ্ধ জল ৪´×১´৬´´ যুক্ত ৮টি ফোকর বা sluice দ্বারা দুইটি সমান্তরাল খালের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া যে স্থানের নিম্নে পাওয়ার হাউস আছে, সেই স্থানে আসিয়া একটি পুষ্করিণীর মত স্থানে মিশিয়াছে। এই পুষ্করিণীর নাম Fore bay। ইহার তলদেশ ও বাঁধের নিকট যেখানে খাল দুইটি আরম্ভ হইয়াছে, তাহার তলের মধ্যে প্রভেদ বা অন্তর ৩০ ফিট। Fore bayর দুইধারে weir wall আছে; যতটুকু জলের প্রয়োজন তাহার অতিরিক্ত জল ইহার উপর দিয়া বহিয়া যায়; এবং এই Fore bayর একটি scouring sluice আছে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে পলি পড়িয়া পুষ্করিণীর তলদেশ উচ্চ হইলে scouring sluice খুলিয়া দেওয়া হয়; জলের বেগে পলি বহিয়া যায়। Fore bay বা পুষ্করিণীর এক পার্শ্বে কয়েকটি কপাট আছে। এইগুলি খুলিয়া দিলে জল বহির্গত হইয়া যায়; এবং কপাটগুলির মুখে কয়েকটি লৌহের নল বা

পয়ঃপ্রণালী আছে। ঐই নলগুলি দিয়া জল প্রবাহিত হইয়া একেবারে ৪০০ ফিট নিম্নে পাওয়ার হাউসে চলিয়া যায়। নলগুলির অধিকাংশ ৩৬ হইতে ক্রমশঃ নিম্নে ২৭ ইঞ্চিতে পরিণত হইয়াছে। কেবলমাত্র ২টি বড় নল আছে; ইহাদের ব্যাস ৪ ফিট হইতে নীচে গিয়া ৩৭ ইঞ্চিতে পরিণত হইয়াছে। পাহাড়ের ক্রমনিম্ন গাত্রের উপর নলগুলি স্থাপিত। এই সকল নলের মধ্যে যে জল প্রবাহিত হয়, তাহা পাওয়ার হাউসে অবস্থিত জলচক্র বা Water wheelর বাটির উপর আঘাত করে। প্রত্যেক নল চলচক্রের নিকট দুইটি ক্রমশঃ সূক্ষ্মীভূত নল-মুখে (Nozzle) পরিণত হইয়াছে; ইহার উদ্দেশ্য জলের চাপ বৃদ্ধি করিবার জন্য। এই দুইটী হইতে জল আসিয়া চক্রে আঘাত করে এবং এইজন্য চক্র ঘুরিতে থাকে। জলচক্রের shaft বা অক্ষদণ্ডের সহিত ডাইনামো (Dynamo) সংযুক্ত বলিয়া জলচক্র ঘুরিলে ডাইনামোও (Dynamo) ঘুরিতে থাকে। ডাইনামো বা জেনারেটারের সম্মুখে একটী উত্তেজক বা exciter বিদ্যমান; তাহা হইতে direct current বা বৈদ্যুতিক প্রবাহ আসিয়া জেনারেটারের মধ্যে চৌম্বক ক্ষেত্র বা magnetic fieldর সৃষ্টি করে। এই magnetic field ঘূর্ণনের জন্য জেনারেটারের মধ্যে যে তাড়িতপ্রবাহ অপবাহিত হয়, তাহা direct নহে; তাহার নাম alternate current বা পর্য্যায়ক্রমে আগত প্রবাহ।

জলচক্র যন্ত্রের চক্রটি মিনিটে ৩০০ বার ঘুরে; এবং ইহার ব্যাস ৫ ফিট। প্রত্যেক চক্রের সহিত ২৪ যোড়া বাটি সংযুক্ত। যে জল চক্রে আঘাত করে তাহার বেগ সেকেণ্ডে ১৬৭ ফিট; যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ উৎপন্ন হয় তাহার শক্তি ২২০০ ভোল্ট্। যে জল আসিয়া চক্রে পতিত হয়, তাহার চাপ বা Head ৪০০ ফিট, অর্থাৎ ৪০০ ফিট উচ্চ হইতে জল প্রবাহিত হইলে এক বর্গ ইঞ্চি পরিমাণ স্থানের উপর যে চাপ প্রদত্ত হয়, সেই চাপ চক্রের এক বর্গ ইঞ্চি পরিমাণ অংশের উপর প্রদত্ত হইতেছে; মোটামুটি তাহার পরিমাণ ১৬০ পাউণ্ড বা ২ মণ এক স্কোয়ার ইঞ্চি জমির উপর রাখিলে যাহা দাঁড়ায়, তাহা।

রাত্রে কৌশিক মহাশয় পরম তৃপ্তির সহিত আহার করাইলেন; তাঁহার স্ত্রী আমাদের পরিবেশন করিলেন ও অন্যান্য ষোড়শী বালারা আমাদের নিকট আসিতে দ্বিধাবোধ করিলেন না। আমার কিন্তু বিশেষ লজ্জা বোধ হইতেছিল; আমি তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিতে পারিতেছিলাম না। হায় সংস্কার! আমরা কিছু না বলিয়া বাটীর ভিতর যাইতেছি। বাটীর ভিতর মুখ ধুইবার সময় আমার বন্ধুজী বাবুকে বলিলাম "মহাশয়, একটু দাঁড়ান"। তিনি ত আমাকে উপহাস করিয়া বলিলেন "আপনি যে লজ্জায় স্ত্রীলোককে হারাইলেন"।

এখানে বেশ শীত; কিন্তু কৌশিক মহাশয় রাত্রিকালে দ্বার বন্ধ করিলেন না; দ্বারে যে wire netting বা জাল সংলগ্ন আছে, শুদ্ধ তাহাই বন্ধ করিলেন। তিনি বলিলেন যে তাঁহার শিশুসন্তান প্রভৃতির শয়ন করিবার প্রকোষ্ঠেও জানালা বন্ধ করিয়া বায়ু সঞ্চালনের পথ প্রতিরোধ করেন না। আমাদের এতটা অভ্যাস নাই, তাই ভয় হইতেছিল। প্রত্যূষে দেখিলাম শরীরে কোন গ্লানি নাই। রাত্রে আমরা ১টা পর্য্যন্ত নানা বিষয়ে গল্প করিলাম। আমার বিরাট ভারতবর্ষের জাতি-সমূহকে বুঝিবার একান্ত ইচ্ছা; ইহাদের ইতিকথা, প্রবাদ প্রভৃতি কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়াছি। জাতিকে বুঝিতে হইলে তাহার প্রবাদগুলির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইলে চলিবে না। ইহার মধ্যে জাতীয় প্রাণের বিশেষ সন্ধান পাওয়া যায়। কৌশিক মহাশয় আমার সহিত দেশের নেতাদিগের সম্বন্ধে গল্প জুড়িয়া দিলেন; মৃত জে ঘোষাল মহাশয় কৌশিক মহাশয়কে বিশেষ স্নেহ করিতেন, তাহার পরিচয় দিলেন। মিঃ রাণাডের কথা উঠিলে তিনি বলিলেন যে তিনি তাঁহার মৃত্যু সময়ে Press Representative বা পত্রিকাসমূহের প্রতিনিধি হইয়া বম্বেতে গিয়াছিলেন। রাণাডে মহাশয় যে রাত্রে দেহত্যাগ করেন সেইদিন সন্ধ্যাকালে কৌশিক মহাশয়ের কণ্ঠস্বরে জাগরিত হইয়া রাণাডে মহাশয় তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, আহার হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন; তিনি যে আর রক্ষা পাইবেন না তাহাও বলিলেন। রাত্রে ১১॥০টার সময় তাঁহার মৃত্যু হইল। পুনার কেহ জানিত না যে রাণাডে মহাশয় এত পীড়িত ও এত শীঘ্র মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয় নিষ্পন্ন করিবার জন্য বিলম্ব করা হইল, কেননা পুনা হইতে স্পেশাল ট্রেণ করিয়া তাঁহার বন্ধু, আত্মীয়, স্বজন ও নগরবাসীদের আসিবার জন্য তার করা হইয়াছিল

স্পেশাল আসিলে মৃতদেহ শ্মশানে আনীত হইল। মিঃ গোখলে ত বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতেছিলেন; গবর্ণর ও চিফ্‌ জষ্টিস্‌ সামান্য বক্তৃতা করিয়া শবের উপর মাল্য স্থাপিত করিলেন।' মিঃ তিলক কিছু বলিলেন; মিঃ কৌশিক বলিলেন যে মিঃ তিলকের বক্তৃতা সর্ব্বাপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল এবং শ্মশানক্ষেত্রে যে দৃশ্য হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করিতে পারা যায় না। কৌশিকের দ্বারের উপর মিঃ রাণাডের চিত্র লম্বমান; ইহাতে বুঝা যায়, তাঁহার উপর কৌশিক মহাশয়ের কি ভক্তি! মিঃ কৌশিক বলিলেন যে ১৮৯৮ ও ১৯০৩ অব্দে মাদ্রাজ কংগ্রেসের সময় তিনি স্বেচ্ছাসেবকদিগের নেতা ছিলেন। তিনি বলিলেন যে, ডেলিগেটদিগের নাম রেজিষ্টারি করিবার সময় বেশ কৌতুকপ্রদ ঘটনা ঘটিয়াছিল; সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখাইলেন "কুলীন ব্রাহ্মণ"; শেলি বানার্জ্জি মহাশয় লিখাইলেন "ব্রাহ্মণ" ইত্যাদি। সুরেন্দ্রবাবুর প্রতি তাঁহার ভক্তি অসাধারণ। স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয়কে ইঁহারা বিশেষ ভক্তি করেন। মিঃ কৌশিক বলিলেন যে, সুরেন্দ্রবাবু একবার 'হিন্দু'র সম্পাদক জি, সুব্রহ্মণ্য মহাশয়ের সহিত সার্‌ ভাষ্যম্‌ আয়াঙ্গার মহাশয়কে কংগ্রেসে যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করিতে তাঁহার বাটী যান। সার্‌ ভাষ্যম্‌ হাইকোর্টের জজ হইবেন স্থির হইয়া যাওয়াতে কংগ্রেসে যোগদান করিতে পারেন নাই। মিঃ কৌশিক বলেন যে, সুরেন্দ্রবাবু সার ভাষ্যম্‌কে ২।১ কথার দ্বারা তিরস্কার করিলেন। তিলক-প্রসঙ্গে কৌশিক বলিলেন যে, পুনায় তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি দেখিয়াছেন। একবার গণপতি উৎসবের সময় তিলক সকলকে বলিলেন যেন কেহ মদ্য পান না করে; সাধারণতঃ সেইদিন মদ্য বেশী বিক্রয় হয়। তিনি প্রত্যেক মদ্যের দোকানে লোক রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা মদ্যপায়ীদিগকে অনুরোধ করিয়া ফিরাইতে লাগিলেন, এবং তাহাতে অকৃতকার্য্য হইলে বলপ্রয়োগ করিয়াও ফিরাইতে লাগিলেন। কৌশিক মহাশয় বলেন যে, সেদিন পুনায় ১০ টাকার মদ্য বিক্রয় হয়। ইহাতে গবর্ণমেণ্ট, যে-যে ব্যক্তি মদ্য বিক্রয়ে বাধা দিয়াছিলেন, তাঁহাদের নামে নালিস করিয়া অর্থ-দণ্ড করেন। মিঃ তিলক সমস্ত টাকা নিজে দিয়া তাহাদিগকে খালাস করিয়া আনেন। পরে মিঃ হ্যারল্ড ম্যানের নেতৃত্বে এক সভা আহূত করা হয় এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট এক আবেদন করা হয়। এই প্রকারের নানা গল্প করিতে করিতে রাত্রি ১টা বাজিয়া গেল। স্বামীজির নিদ্রার ব্যাঘাত হইতেছিল বলিয়া তিনি বিশেষ বিরক্ত হইতেছিলেন। তখন আমরা মাতিয়া গিয়াছি; তাঁহার তিরস্কার কে শুনে? ইহার পর আমরা শয়ন করিলাম।

পরদিন প্রত্যূষে পুনরায় পাওয়ার হাউস্‌ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিবার জন্য যাত্রা করা গেল। এখানকার Co-operative stores'ও দেখিলাম। এখানে সমস্ত প্রকার দ্রব্যই পাওয়া যায়। প্রত্যেক সেয়ার বা অংশের মূল্য ৫০ টাকা।

শিবসমুদ্রম্‌ পাওয়ার হাউস্‌ ও বৈদ্যুতিক কলকারখানার অধ্যক্ষের নাম মিঃ শেষাদ্রি আয়াঙ্গার। তাঁহার নিম্নেই মিঃ কৌশিক। আয়াঙ্গার মহাশয় এম-এ উপাধি লইয়া আমেরিকা হইতে Electric Engineering শিখিয়া আসিয়াছেন। ইনি ব্রাহ্মমতে আমাদের বঙ্গদেশীয়া একটী মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি তখন শিবসমুদ্রমে ছিলেন না, বাঙ্গালোরে গিয়াছিলেন; আর তাঁহার স্ত্রীকন্যা দার্জ্জিলিঙ্গে অবস্থান করিতেছিলেন।

মধ্যাহ্নে আহারান্তে আমরা কাবেরী নদীর Head works দেখিয়া জলপ্রপাত দেখিতে গেলাম। কাবেরী নদীটি ইংরাজ ও মহীশূর রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিতা। Head works এর নিকট যে সেতু রহিয়াছে, তাহা ইংরাজ-রাজ্যবাসী এক জায়গীরদারের অধীনে। ইহার আরও দক্ষিণে কাবেরী দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে; হেড ওয়ার্কস্‌ পশ্চিম শাখার ধারে। দুই শাখার মধ্যস্থ ভূখণ্ডের নাম শিবসমুদ্রম্‌। সেতু পার হইবার সময় জায়গীরদারের লোকেরা ২ আনা ৮ পাই মাশুল লইল। ২ আনা ৯ পাই না হইয়া ২ আনা ৮ পাই কেন লইল, ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, পূর্ব্বে এখানে যে মুদ্রায় মাশুল লওয়া হইত তাহার বর্ত্তমান মূল্য দুই আনা ৮ পাই; সেই মুদ্রা লোপ হওয়ায় তাহার মূল্য স্বরূপ ২ আনা ৮ পাই লওয়া হয়। পূর্ব্বোক্ত সেতু পার হইয়া তিন মাইল গেলে বাম পার্শ্বে যে জলপ্রপাত পাওয়া যায় তাহার নাম "বর চাকি।" এই প্রপাতটি কাবেরীর ২টী শাখার পূর্ব্ব শাখার পূর্ব্ব ধারে। কারণ তাহা লোকে বাম পার্শ্বে বা কাবেরীর পশ্চিম শাখায়

পূর্ব্বধারে আর একটি জলপ্রপাত দেখা যায়; ইহার নাম "গগন চাকি"। সেদিন ইহার নিকটে যাইবার অবকাশ পাই নাই। দূর হইতে দেখিয়াছিলাম। তবে "বর চাকি" জলপ্রপাত সবিশেষ দেখিবার সুবিধা হইয়াছিল। তাহার কথাই বলিব।

আমরা যে সময় যাই, সেই সময় জলপ্রপাত দেখিবার বেশ সুবিধা; বর্ষাকালে অবশ্য ইহার বিশালতা ও গাম্ভীর্য্য মন মুগ্ধ করে। দূর হইতে অবিশ্রান্ত শব্দে এক সুন্দর ভাব হৃদয়ে জাগিয়া উঠিতেছিল। আমরা রাস্তা হইতে সিঁড়ি দিয়া প্রায় ৩৫০ ফিট্ নিম্নে কাবেরী নদীর তলদেশ হইতে জলপ্রপাতের শোভা দেখিতে গেলাম! সিঁড়ির প্রস্তরগুলি যত্নবিন্যস্ত নহে; তথাপি ইহাতে অবতরণ করিবার বিশেষ অসুবিধা হইল না। ইহার দুই পার্শ্বে নিবিড় বন। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ১০।১২টি ক্ষুদ্র প্রপাত রহিয়াছে দেখা গেল; নীচে পড়িয়া জলস্রোত বোগ প্রবাহিত হইতেছে। জলপ্রবাহ মধ্যে মধ্যে আহত হইয়া যে জলকণার সৃষ্টি করিতেছে, তাহা আকাশে অনেক দূর উড়িয়া যাইয়া ঠিক যেন চূর্ণীকৃত তুলার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। বর্ষার সময় এই সকল ভিন্ন ভিন্ন জলপ্রপাত এক হইয়া প্রায় অর্দ্ধ মাইল স্থান বহিয়া নীচে পড়ে। সে দৃশ্য অনির্ব্বচনীয়! সেই সময় ইহার শোভা অতিশয় মনোজ্ঞ। এখনই যাহা দেখিলাম তাহাতে আবেশে মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম। নীচে নদীতলস্থ প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া গায়ত্রী জপ করিতে লাগিলাম। মন শান্তরসে পূর্ণ হইল। এই স্থানে কুটীর বাঁধিয়া জপ করিলে বোধ হয় শীঘ্রই সিদ্ধিলাভ হয়। বন্ধুবর জী বাবুও ধ্যান করিতে লাগিলেন; স্বামীজি অবাক্ হইয়া চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। জলপ্রপাতটি ৩৫০ ফিট উচ্চ হইতে পড়িতেছে। আমরা যে সময় এখানে আসি, সেই সময় মাদ্রাজ-গবর্ণমেণ্টের ডেপুটি স্যানিটারি কমিশনার মহাশয় কার্য্য-ব্যপদেশে আসিয়া জলপ্রপাতটিও দেখিতে আসিয়াছিলেন। ভদ্রলোকটি এদেশী ক্রিশ্চিয়ান; বর্ণ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। ইঁহার শিক্ষা য়ুরোপে।

ফিরিয়া আসিবার সময় পথে শ্রীরঙ্গস্বামী ও সোমেশ্বর শিবের মন্দির দেখা গেল। মন্দিরগুলি ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর বলিয়া বোধ হইল। শ্রীরঙ্গপট্টমে শ্রীরঙ্গনাথ স্বামীর [illegible] যেন একটু হ্রস্বাকার বলিয়া বোধ হইল। লঙ্কা হইতে আসিয়া বন্ধুবর জী—বাবুর দেখি ভক্তি বিশেষ বাড়িয়াছে। তিনি দাক্ষিণাত্যের প্রথামত নারিকেল ভাঙ্গিয়া পূজা দিলেন; ইহাকে "নারিকেল ফাটান" বলে। সোমেশ্বর মন্দিরের এক বিশেষত্ব দেখিলাম; মন্দিরের গোপুরম্ বা দ্বারদেশের শীর্ষে প্রকাণ্ড বৃষমূর্ত্তি; শিবসমুদ্রমের সন্নিকটে স্থিত আর এক মন্দিরেও এইরূপ দেখিয়াছি, বোধ হয় ইহা আধুনিক।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম, কেননা আজ রাত্রে কৌশিক মহাশয়ের বাসায় সঙ্গীতের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থানীয় এঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার প্রভৃতি অনেক কর্ম্মচারী সমবেত হইয়াছেন। স্বামী অম্বিকানন্দ হারমোনিয়াম্ সহযোগে গাহিতে লাগিলেন। শ্রোতারা সকলেই বেশ শিক্ষিত। এখানেও দেখি বস্ত্র পরিধান করিয়া গলদেশে টাই, কলার বাঁধা। এই বিসদৃশ পরিচ্ছদ আমি ওয়াল্টেয়ার হইতে দেখিয়া আসিতেছি। ইঁহারা অনেকেই মস্তকের কেশ বেশ হাল-ফ্যাসানে কাটিয়াছেন; সে ঝুঁটি বা শিখা নাই; গুম্ফও ইংরাজ বা Charlie Chaplin ধরণে ছাঁটা; কিন্তু কপালে টিপ। এই টিপ্টির জন্য মুখশ্রী সুন্দর দেখাইতেছিল। গান বেশ জমিল; আমি মাঝে মাঝে উহার ব্যাখ্যা করিয়া দিতে লাগিলাম। কৌশিক মহাশয় একটু-আধটু হিন্দী বুঝেন; তিনিও বুঝাইতে লাগিলেন। বাটীর কর্ত্রী ও মেয়েরা পার্শ্বের প্রকোষ্ঠে বসিলেন। সকলেই গানে তন্ময় হইয়া উঠিলেন। অনেকগুলি গান গাওয়া হইলে আমি বলিলাম ইনি ত গাহিলেন, আপনারা একটা গান। সকলেই মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলেন। অবশেষে একটি যুবক সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। এ যুবকটি শুনিলাম উৎপথপ্রস্থিত হওয়াতে কৌশিক মহাশয় ধরিয়া ফিটারের (Fitter) কার্য্যে লাগাইয়া দিয়াছেন। এই প্রকারে তিনি অনেকগুলি যুবকের উপকার ও উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। এই যুবকের গান রসপূর্ণ; মধুর বা শান্ত রস না থাকিলেও ইহার সঙ্গীতে হাস্যরসের উৎস লুকায়িত। লোকটি মুখ বিকৃত করিয়া ভজন গাহিতেছিল, এবং গানের গতি মেল ট্রেনকেও হার মানাইয়া দিয়াছিল। আমাদের দেশের মত কর্ণে হস্ত প্রয়োগ করিয়া মস্তক কম্পিত করিয়া যেরূপ গাহিতেছিল, তাহাতে হাস্য সংবরণ

করা কষ্টসাধ্য হইয়াছিল। স্বামীজি আমার দিকে কেবল চাহিতেছিলেন ; আমি মনে করিলাম বেশী চাওয়া ভাল নয়, তাহা হইলে চোখের হাসি মুখে ফুটিয়া উঠিবে। সভ্যতার খাতিরে গান সুন্দর মর্ম্মার্থপূর্ণ বলিয়া গায়ককে বাহবা দিতে লাগিলাম। সে আরও উত্তেজিত হইয়া পুনরায় গাহিল। এইরূপে একটুমাত্র বিশ্রাম না করিয়া উৎসাহপ্রদীপ্তমুখে সে তেলেগু, কানারী, ও সংস্কৃত গান গাহিল। আমি দেখিলাম তাহার গান-রোগে পাইয়াছে ; এদিকে রাত্রিও অনেক হইয়াছে। তাহাকে কোনরূপে প্রকৃতিস্থ করিয়া সভাভঙ্গ করা হইল। স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করিলাম "মহাশয় ও ব্যক্তি যে সুরগুলি গাহিল, ওগুলি আমাদের ভৈরবী, ইমন, সাহানা, প্রভৃতি কোন্‌টির অন্তর্গত বা অন্তর্গত না হইলেও নিকটবর্ত্তী।" স্বামীজি হাস্য করিয়া বলিলেন "ভৈরবী টৈরবী ভুলিয়া যাউন, ইহা বোধ এদেশেরই খাস জিনিষ। আপনিই ত মহাশয় উহাকে অনুরোধ করিয়া ও অত বাহবা দিয়া গোল বাঁধাইলেন।"

রাত্রে যেমন হইয়া থাকে তেমনই হইল, অর্থাৎ চর্ব্ব্য, চুষ্য করিয়া ভোজন করা হইল। এখানকার ঘৃতসিক্ত রুটি বড় সুস্বাদু লাগিল ; আমি ত আমাদের দেশে, এমন কি ব্যাঙ্গালোর মঠেও এরূপ রুটি দেখি নাই। ইঁহারা রুটির উপর চিনির সামান্য প্রলেপ দিয়া দেন ; এদেশে লুচির চলন নাই ; ২।১ স্থলে দেখিয়াছি ইহার দুই পৃষ্ঠ চিনি দ্বারা আবৃত। এদেশের লোকের রাত্রের আহার অন্ন ; এবং অবস্থাপন্ন হইলে অন্নের সহিত ঘৃত মিশ্রিত করে। আমাদের দেশে যেমন রাত্রে ঘৃত ভক্ষণ নিষিদ্ধ, দাক্ষিণাত্যের কোথায়ও এ রীতি দেখি নাই। দ্রাবিড় দেশেও যেমন, এখানেও অন্নের সহিত রসম্, কড়ুচ্ছো ও ঘোল।

পরদিন প্রাতে আমাদের ফিরিয়া যাইবার কথা। ঝট্‌কা সংগ্রহে বিশেষ অসুবিধার কথায় একটু উদ্বিগ্ন করিয়াছিল। প্রাতে উঠিয়া জিনিষপত্র বাঁধিয়া গাড়ি আসার অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় আসিবার দিনের সেই সঙ্গীটি জিজ্ঞাসা করিলেন "রজক পাওয়া যাইবে কি ? এ দেশে গর্দ্দভের পৃষ্ঠে কি মলিন বস্ত্র বহিয়া লইয়া যাওয়া হয় ?" আমি বলিয়া উঠিলাম "বাঃ বেশ, অদ্য ফিরিয়া যাইবার শুভ নামোচ্চারণ হইতেছে, আজ আর গাড়ি কিছুতেই মিলিবেনা"। স্বামীজি বরাবরই লোকটার উপর বিরক্ত ; বলিলেন "গোড়া হইতে আমাদের ঘাড়ে চাপিয়া সব মাটি করিতেছে ; সর্ব্বনাশ ঘটাইবে দেখিতেছি"। হাসির রোল পড়িয়া গেল। কৌশিক মহাশয় বলিলেন "গাড়ি না পাওয়া যায় ত বেশ হয় ; বৈকালে যাইবেন"। ১৪।১৫ মাইল দূরে মালবল্লী হইতে গাড়ি আনয়ন করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। আমরা অগত্যা "গগন চাকি" জলপ্রপাত দেখিতে গেলাম। ইহা আমাদের বাসা হইতে প্রায় ১ মাইল দূরে। দেখিবার জন্য কাবেরীর অপর পারে ও জলপ্রপাতের ঠিক সম্মুখে একটা প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করিয়া রাখা হইয়াছে এবং পাহাড়ের উপর সিঁড়ি কাটা হইয়াছে। প্রাতঃকাল বলিয়া "গগন চাকি" প্রপাত পূর্ব্বদিন অপরাহ্নে-দৃষ্ট বড় চাকি অপেক্ষা অধিকতর সুন্দর বোধ হইল।

শিবসমুদ্রমের চতুঃপার্শ্বে ভ্রমণ করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিয়া দেখি বাটীর ছোট ছোট ছেলেরা চিত্রাঙ্কনে ব্যস্ত ; সর্ব্ব কনিষ্ঠ একটি ৩,৪ বৎসর বয়স্ক বালকের চিত্রটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। জী বাবু ও স্বামীজি তাহাদের ছবির অশুদ্ধি সংশোধন করিয়া দিলেন। ইঁহারা দুইজনই শিল্পী। স্বামী অম্বিকানন্দ পূর্ব্বাশ্রমে বাস কালে কলিকাতা আর্ট স্কুলে (Calcutta Art School) অধ্যয়ন করিতেন, ইনিও সুন্দর তৈলচিত্র অঙ্কণ করিতে পারেন। জী-বাবু আর্ট স্কুল শিক্ষকতা করিয়াছেন ও একজন কৃতী আর্টিষ্ট। কৌশিক মহাশয়ের ১৫।১৬ বৎসর বয়স্কা কন্যাটি ভিত্তি-গাত্রে ভারতবর্ষের একটি সুন্দর মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন ; চিত্রটি তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই ; কিন্তু যতদূর হইয়াছিল তাহাতেই বেশ সুন্দর দেখাইতেছিল। বালিকাটিকে তাহার পিতা বেশ শিক্ষা দিতেছেন। তাহার বিবাহ হইয়াছে, তথাপি মধ্যাহ্নে গৃহশিক্ষক আসিয়া তাহাকে ও ভ্রাতৃগণকে পড়াইয়া যায় দেখিলাম। কৌশিক মহাশয়ের সংসারটিতে একটি পবিত্র ও জীবন্তভাব সর্ব্বত্র দেখিয়াছিলাম। এ সামান্য আলাপে বালকেরা আমাদের নিকট আত্মীয় হইয়া গিয়াছিল। যাইবার সময় দেখিলাম তাহাদের চ বেশ ছলছল করিতেছে। অপরাহ্নে ১৫ মাইল দূর হইতে

বারান্দায় কৌশিক মহাশয়ের স্ত্রী, কন্যা পুত্র প্রভৃতি সকলে আসিয়া দাঁড়াইলেন; আমরা সকলকে অভিনন্দন করিয়া বিদায় লইলাম।

সায়াহ্নে যখন দুই ধারের সারিবদ্ধ বিশালকায় বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য দিয়া গাড়ি চলিতেছিল, তখন ভয়ঙ্কর ও মধুরের যে সুন্দর চিত্র দেখিয়াছি তাহা বাক্যে প্রকাশ করা অসম্ভব। তখনও বাহিরের প্রকৃতি অন্ধকারে ডুবিয়া যায় নাই; কিন্তু আমাদের মস্তকের উপর যে গাছগুলি শাখা বিস্তার পূর্ব্বক আকাশ ঢাকিয়া আলোকপথ বন্ধ করিয়াছিল, তাহার মধ্যে জমাট-বাঁধা অন্ধকার দেখিয়া এক অব্যক্ত সৌন্দর্য্যে হৃদয় ও মন মুগ্ধ করিল। নিকটে লোকালয় নাই, আর অদূরে পর্ব্বতমালা। কত চড়াই উৎরাই ভাঙ্গিতেছি! কত চিন্তা যে মনকে আচ্ছন্ন করিল তাহার ইয়ত্তা নাই; তাহার আদি, অন্ত নাই। মাঝে মাঝে আবেগে আত্মহারা হইয়া গাহিতেছিলাম, "কেন জাগেনা জাগেনা অবশ পরাণ" ইত্যাদি। কিয়ৎক্ষণ পরে চন্দ্র উঠিল; এই চন্দ্রমাশালিনী রজনীতে শস্যক্ষেত্র হাসিতে লাগিল; পার্ব্বত্য বাঁধে জল চিকিমিকি খেলিতে লাগিল; আর মাঝে মাঝে এক একটা পাখীর ডাকে সমস্ত চিন্তা কোথায় ভাসিয়া যাইতে লাগিল। শকটচালক মাঝে মাঝে "সম্মুখে এস ও পিছনে বস" বলিয়া রসভঙ্গ করিতেছিল। মালবল্লী গ্রামে ঘোড়া বদ্‌লাইয়া চলিতে লাগিলাম; তিনখানি গাড়ি একসঙ্গে চলিল। গ্রামের মধ্যে আমরা খুব চীৎকার করিতে করিতে কে সকলের অগ্রগামী হইবে, এই প্রতিযোগিতায় মত্ত হইয়া চলিতে লাগিলাম।

যখন মাদুর ষ্টেসনে পঁহুছান গেল, তখন রাত্রি পৌনে বারটা; ষ্টেসনস্থ সমস্ত লোক সুপ্ত; বহিঃদ্বার খুলাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ক্ষুৎপিপাসায় আমরা সকলেই কাতর। ষ্টেসনস্থ হোটেল বন্ধ; দ্বারে বহু আঘাত করাতেও কেহ দ্বার খুলিয়া দিল না। হোটেলস্থ সকলেই নিদ্রামগ্ন; একজনের নিদ্রা ভাঙ্গিলে কি যে উত্তর দিল বুঝা গেল না। শকট-চালকেরা বলিল যে তাহারা রাত্রে ভয়ে দোকান খুলিতেছে না। রাত্রি সার্দ্ধ দ্বিপ্রহরে ব্যাঙ্গালোর-গামী ট্রেণ আসিয়া পঁহুছিল। গাড়ির মধ্যে "ন স্থানং তিল ধারণং"। সকলেই শয্যা হইতে উঠিয়া আমাদের বসিবার স্থান করিয়া দিল, কিন্তু একজন উঠিল না। এত রাত্রে, এত ভিড়ে কি বসিয়া বসিয়া নিদ্রা যাওয়া যায়; অগত্যা গল্প জুড়িয়া দেওয়া গেল। এ ব্যক্তিটি শুইয়া শুইয়া ২।১টি অল্প কথায় সায় দিতে লাগিল। আমি তাহাকে স্বদলে আনিবার জন্য কৌশলের সহিত বলিলাম, "মহাশয় আসুন আমরা সকলে মিলিয়া গল্প করি; আপনি শুইয়া আছেন বলিয়া গল্প বেশ জমিতেছে না।" সে ব্যক্তি আমা অপেক্ষাও ধূর্ত্ত; বেশ ধূর্ত্ততার সহিত উত্তর দিল, "মহাশয়, ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে; তবে কি জানেন আমার শরীরটা বড্ডই খারাপ; যদি ক্ষমা করেন ত শুয়ে শুয়েই গল্প করি। আমি আমার সামান্য অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে শুয়ে-শুয়েই আমার গল্প ভাল জমে। আমি বসিলেই গল্পকারীদের হাঁফ লাগিবে আমার মত ওদেরও শরীর খারাপ হয়ে গেছে।" আমি ও স্বামীজি লোকটার ধূর্ত্ততায় অবাক্; হাস্যসম্বরণ করিতে পারা গেল না; লোকটাও বিকট ভাবে হাসিয়া আমাদের হাস্যের প্রত্যুত্তর দিল। এইরূপ রঙ্গরস, গল্প, সঙ্গীত ও তন্দ্রায় রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রভাত হইবার সময় আমরা ব্যাঙ্গালোর ষ্টেসনে আসিয়া পঁহুছিলাম। তখনও সমস্ত সহরটি বৈদ্যুতিক আলোকমালায় দীপ্ত; ইহার উচু নীচু রাস্তাগুলি আলোকমালায় অতিশয় সুন্দর দেখাইতেছিল

পুস্তক-পরিচয়

শরতের ফুল।—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত; মূল্য আড়াই টাকা। এবার শরতে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় যে ফুল ফুটাইয়াছেন, তাহার সুগন্ধে বাঙ্গালা গল্প-সাহিত্য আমোদিত হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে যাঁহারা গল্প সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই পণ্ডিত মহাশয়ের এই সংগ্রহে ফুল সাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্র কুমার মুখোপাধ্যায়, রায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বাহ ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন, ডাক্তার শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠা রসরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু প্রভৃতি সকলেই ফুল যোগাইয়া শুনিলাম পণ্ডিত মহাশয় বাঙ্গালা দেশের সকল গল্প লেখকেরই

নাই। অনায়াসে দ্বিতীয় খণ্ড হইতে পারে। গল্পের পরিচয় না দিলেও চলে, কারণ যাঁহারা গল্প লিখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই প্রতিষ্ঠাপন্ন লেখক; তাঁহাদের লেখার আর কি পরিচয় দিব? প্রশংসা করিতে হয় পণ্ডিত মহাশয়ের চেষ্টা, যত্ন ও অধ্যবসায়ের। বইখানির ছাপা, বাঁধানো, কাগজ অতি সুন্দর। দেশের সর্ব্বপ্রধান লেখকগণের সুবাসিত পুষ্পে সুরভিত এই শরতের ফুলের আদর বাঙ্গালী মাত্রেই না করিয়া পারিবেন না; সুতরাং পণ্ডিত মহাশয়ের এই প্রচেষ্টা সফল হইবে।

গরমিল।—শ্রীনরেন্দ্র দেব প্রণীত; মূল্য দেড় টাকা। এই গরমিল উপন্যাস ও তাহার লেখক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেবের পরিচয় 'ভারতবর্ষে'র পাঠকগণের নিকট নিশ্চয়ই দিতে হইবে না; গরমিল 'ভারতবর্ষে'ই প্রকাশিত হইয়াছিল এবং আমাদের অনেক পাঠক এই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত উপন্যাসের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। এখন উপন্যাসখানি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেবের প্রশংসা করিলে আত্মপ্রশংসাই করা হয়; তাই বিরত হইলাম; কিন্তু এ কথা বলিতে পারি যে, যাঁহারাই এই উপন্যাসখানি পাঠ করিবেন, এমন কি যাঁহারা ভারতবর্ষে ইহা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাও যদি আর একবার পড়েন, তাহা হইলে লেখকের লিপি-চাতুর্য্যের প্রশংসা না করিয়াই পারিবেন না।

রাজপথ।—শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য তিন টাকা। অল্পদিনের মধ্যেই যাঁহারা বাঙ্গালা দেশে উপন্যাস-সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র বাবু তাঁহাদের শীর্ষ-স্থানীয়, এমন কি অনেক প্রবীণ লেখকের লিখিত উপন্যাস অপেক্ষা উপেন্দ্র বাবুর উপন্যাসগুলি কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে; তাহার প্রমাণ এই 'রাজপথ'। এই উপন্যাসখানি যখন পত্রান্তরে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতেছিল, তখনই আমরা বিশেষ আগ্রহ সহকারে পড়িয়া-ছিলাম এবং লেখকের লিপিকুশলতা, চরিত্র চিত্রণের প্রশংসা করিয়া-ছিলাম। মাধবী, সুরেশ্বর, বিমানবিহারী, সুমিত্রা, কোন্‌টা রাখিয়া কাহার নাম উল্লেখ করিব; সবগুলি চরিত্রই পাকা ওস্তাদের হাতে একেবারে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বইখানি পড়িবার জন্য সকলকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। ইহাতে এমন কিছু আছে, যাহা সকলেরই প্রণিধানযোগ্য।

আলোকে আঁধারে।—রায় শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর ডি-লিট্, কবিশেখর প্রণীত; মূল্য দেড় টাকা। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সুধী, সুপণ্ডিত; তাঁহার পাণ্ডিত্যের, তাঁহার অনুসন্ধিৎসার প্রশংসা সকলেই করেন, আমরাও করি। কিন্তু, এ সকল অপেক্ষাও আর একটী গুণের জন্য আমরা তাঁহাকে অধিকতর প্রশংসা করিয়া থাকি। তাহা এই যে, তিনি যখনই যাহা লেখেন, প্রাণ ঢালিয়া দিয়া লেখেন; তাঁহার লেখার মধ্যে কৃত্রিমতা নাই; যাকে বলে ন্যাকামি, তাহা তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন। তাঁহার উপন্যাসগুলিতে উপন্যাসখানি আমাদের হাতে দিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার এই গুণ বর্ত্তমান। কয়েকখানি চিঠির দ্বারা তিনি বর্ত্তমান সময়ের নরনারীর শিক্ষার যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার যে অবশ্যম্ভাবী পরিণতি তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াই লিখিয়াছেন। এই জন্যই তাঁহার এই উপন্যাসখানি আমাদের ভাল লাগিয়াছে; তাঁহার চিত্রিত চরিত্রগুলির বিশ্লেষণ করিতে সেই জন্যই বিরত রহিলাম। এক শ্রেণীর পাঠক এই উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া নিশ্চয়ই আনন্দ লাভ করিবেন। গভীর বিষয়ের চর্চ্চায় নিবিষ্ট থাকিয়াও দীনেশবাবু যে মধ্যে মধ্যে গল্প উপন্যাস লেখেন, ইহা তাঁহার সাহিত্য-প্রীতিরই অন্যতম নিদর্শন।

দেশবন্ধুর বজ্রবাণী।—শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত, মূল্য আট আনা। অতি সুসময়ে শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় দেশবন্ধুর বজ্রবাণী প্রকাশিত করিয়াছেন। দেশবন্ধু অকালে স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সে বজ্রগম্ভীর স্বর আর আমরা শুনিতে পাইব না; কিন্তু এতদিন ধরিয়া তিনি যে মহতী বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা অমর। সেই অমর বাণীগুলি এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তক-খানি দিন-পঞ্জিকার মত প্রত্যেক বাঙ্গালীর গৃহে থাকা উচিত।

'অনুক্ত-কাহিনী' ও 'ত্রিবেণী'।—শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক প্রণীত; মূল্য যথাক্রমে এক টাকা সাত আনা ও নয় আনা। দুইখানি পুস্তকেরই পরিচয় এক সঙ্গে দিলাম, কারণ দুইখানিই ছোট গল্প-সংগ্রহ। লেখক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বাঙ্গালা-সাহিত্যে সুপরিচিত, এবং 'ভারতবর্ষে'র পাঠকগণের বিশেষ প্রীতিভাজন। তাঁহার ব্রজবুলিতে লিখিত কবিতা, তাঁহার ছোট ছোট গল্প আমরা অনেক ছাপিয়াছি। তাহাদেরই অনেকগুলি এই অনুক্ত-কাহিনী ও ত্রিবেণীতে স্থান পাইয়াছে। গল্পগুলি সেকালের, আর সেই সেকালও অশোকের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরাজের প্রথম আমল পর্য্যন্ত; অথচ গল্পগুলি এমনই সুলিখিত যে একবার পড়িলে তৃপ্তি বোধ হয় না, বার বার পড়িতে হয়, লেখকের রচনা-কৌশল এমনই মনোহর! আমরা সুপণ্ডিত সুরেশ বাবুকে সাদরে গ্রন্থকার শ্রেণীতে বরণ করিতেছি। আরও আনন্দের কথা এই যে, আমরাই তাঁহাকে বই ছাপাইবার জন্য কতবার অনুরোধ করিয়াছি; এতদিনে তিনি সেই অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন।

বেগম সমরু।—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ২৷৹ টাকা। এখানি ইংরাজী ভাষায় লিখিতে বেগম সমরুর জীবন-কথা। ব্রজেন্দ্রনাথ ইতঃপূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় বেগমের জীবন-কথা লিখিয়াছেন; উক্ত পুস্তকের একাধিক সংস্করণও হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তিনি ইংরাজীতে এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। আমরা আগাগোড়া পড়িয়া দেখিলাম যে, এখানি সম্পূর্ণ নূতন পুস্তক; বাঙ্গালা পুস্তকে যাহা আছে, তাহা অপেক্ষা প্রভূত নূতন তথ্য এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ব্রজেন্দ্রবাবু যে ঐতিহাসিক মহলে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাহার প্রধান কারণ এই যে, তিনি কোন বিষয় একবার লিখিয়াই ক্ষান্ত হন না; সে সম্বন্ধে অধিকতর তথ্য অনুসন্ধানের স্পৃহা তাঁহাকে একেবারে অধীর করিয়া তুলে। তাহারই ফলে তিনি নব নব তথ্য সংগ্রহে কৃতকার্য্য হন। সেই জন্যই এই বইখানি একেবারে নূতন আকার ধারণ করিয়াছে, এবং তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম, অনন্য সাধারণ অধ্যবসায় তাঁহাকে জয়যুক্ত করিয়াছে। এই পুস্তকখানি যে সুধী সমাজে পরম আগ্রহে গৃহীত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইংরাজী ভাষায় যাঁহারা পণ্ডিত তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, ব্রজেন্দ্রবাবুর ইংরাজী ভাষায় অধিকার তাঁহার বাঙ্গালা লেখা হইতে কোন অংশেই কম নহে।

এল-এম-এস প্রণীত, মূল্য ৩৷০ টাকা। এই পুস্তকখানির নাম দেখিলে প্রথমেই মনে হয় যে, ইহা কবিরাজী চিকিৎসা পুস্তক। প্রকৃত পক্ষে তাঁহা নহে, আয়ুর্ব্বেদ শব্দ এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার ইংরাজী নাম বলিতে গেলে বলিতে হয় মেডিকেল জুরিস্‌প্রুডেন্স। চিকিৎসা-শাস্ত্রের যে সমস্ত অত্যাবশ্যক তথ্য চিকিৎসক মাত্রেরই জ্ঞাত থাকা কর্ত্তব্য, বহুদর্শী চিকিৎসক শ্রীযুক্ত সান্যাল মহাশয় এই গ্রন্থে সেই সমস্ত বিষয়ই আলোচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আইন-ব্যবসায়িগণ, বিশেষতঃ যাঁহারা ফৌজদারী আইন সংক্রান্ত কাজকর্ম্ম করেন, এবং পুলিশের কর্ম্মচারিগণও এই গ্রন্থ হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইবেন। এইরূপ একখানি গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন ছিল; অভিজ্ঞ চিকিৎসক দেবপ্রসাদ সে অভাব পূর্ণ করিয়া শুধু চিকিৎসা-ব্যবসায়ী নহে, সকলেরই ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন, কারণ সাধারণ গৃহস্থও ইহা হইতে যথেষ্ট অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন।

গুরু-শিষ্য-সংবাদ।—শ্রীমৎস্বামী সন্তদাস বাবাজী ব্রজবিদেহী মহন্ত মহারাজ প্রদত্ত উপদেশের কিয়দংশ। মূল্য পাঁচ সিকা। এখানি ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে গুরু-শিষ্যের প্রশ্নোত্তর ভাবে লিপিবদ্ধ। গুরু শ্রীমৎ স্বামী সন্তদাস মহারাজ, শিষ্য দৌলতপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুধীরগোপাল মুখোপাধ্যায় এম-এ; সুতরাং প্রশ্নগুলিও যেমন সুন্দর উত্তরও তেমনই পাণ্ডিত্যপূর্ণ। যাঁহারা অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানে অগ্রবর্ত্তী তাঁহারা এই পুস্তকখানি পাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন; সাধারণ পাঠকের নিকট ইহা কিঞ্চিৎ দুরূহ বোধ হইবে, কারণ জ্ঞানমার্গে যাঁহারা অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদেরই একজন নিজের সন্দেহ নিরসনের জন্য প্রশ্ন করিয়াছেন এবং গুরুদেবও সেই ভাবেই উত্তর দিয়াছেন।

সংসারী।—শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য দেড় টাকা। এখানি উপন্যাস, গ্রন্থকারও নবীন নহেন। তিনি সমাজদর্শী। তিনি এই গ্রন্থে দুইটী অশিক্ষিতা রমণী-চরিত্র পাশাপাশি চিত্রিত করিয়াছেন; একটী দেবী আর একটীকে দানবী বলিলেই হয়। এই দুইটী চিত্রই বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থকার বিনা আড়ম্বরে অতি সরল সুন্দর ভাবে এই উপন্যাসখানি লিখিয়াছেন। অদূর ভবিষ্যতে তাঁহার সাধনা যে সফল হইবে, তাহা আমরা বলিতে পারি।

ঝড়ের দোলা।—শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায় প্রণীত, মূল্য এক টাকা বারো আনা। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রবাবু বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে অপরিচিত নহেন; তাঁহার কবিতা সকলে আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়া থাকেন; তাঁহার গদ্য রচনাও কবিতারই মত। এই ঝড়ের দোলা উপন্যাসে তাঁহার রচনা-শক্তির যথেষ্ট পরিচয় আছে। উপন্যাসখানি পড়িতে আরম্ভ করিয়া বিদুষী বিধবা অমলার গতিবিধি ও ব্যবহার দেখিয়া প্রথমে ত আমাদের ভয়ই হইয়াছিল; প্রবৃত্তির ঝড় তাঁহাকে এমন আলোড়িত করিয়াছিল যে, তিনি যে সামলাইয়া লইবেন, এ ভরসাই হয় নাই; কিন্তু এই যুবতী বিধবার দৃঢ় নিষ্ঠা, তাঁহার অকপট সহৃদয়তা তাঁহাকে প্রবৃত্তির ঘোর তুফান অতিক্রম করিতে সমর্থ করিয়াছিল। এইখানেই গ্রন্থকারের কৃতিত্ব। আমরা হেমেন্দ্রবাবুর এই উপন্যাসখানি পড়িয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি।

ঝড়ের আলো।—শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল বি-এল প্রণীত মূল্য ১৷০। প্রফুল্লবাবুর নাম সাহিত্যক্ষেত্রে অপরিচিত নহে। বর্ত্তমান বাঙ্গালী-এই গ্রন্থে অনেকগুলি সুন্দর ছবি দেওয়া হইয়াছে। বলিতে গেলে সমাজে যে সমস্যাটা খুব বড় এবং জটিল হইয়া দেখা দিয়াছে, সেই নারী-নির্য্যাতনের একটা বড় করুণ দিককে ভিত্তি করিয়া লেখক এই আখ্যায়িকাটি গড়িয়া তুলিয়াছেন। বিষয়টি খুবই ভাল; তার উপর লেখকের অনাড়ম্বর মিষ্ট ভাষা এবং চরিত্রচিত্রণের কৌশল বইখানিকে বেশ উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। নায়িকা সীতার চরিত্র, তাহার তেজস্বিতাটুকু বেশ ফুটিয়াছে। আমরা আশা করি, 'ঝড়ের আলো' পাঠকসমাজে বিশেষ আদর পাইবে। ছাপা এবং বাঁধাই সুন্দর।

সোক্রাটীস (দ্বিতীয় খণ্ড)।—শ্রীরজনীকান্ত গুহ এম-এ প্রণীত, মূল্য ৮৲ টাকা। আমরা কিছুদিন পূর্ব্বে এই সুন্দর পুস্তকের প্রথম খণ্ডের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলাম। এক্ষণে বৃহদাকার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই খণ্ড তিন ভাগে বিভক্ত: প্রথম ভাগে সোক্রাটীসের জীবন-চরিত, দ্বিতীয় ভাগে প্লেটো বিরচিত সোক্রাটীসের বিচার ও মৃত্যুর কাহিনী এবং তৃতীয় ভাগে জেনফোর্ন হইতে সঙ্কলিত সোক্রাটীসের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। সোক্রাটীস, বলিতে গেলে, ইউরোপীয় দর্শনের আদিগুরু। তাঁহার জীবন-কথা এবং তাঁহার অমূল্য উপদেশাবলী সকলেরই অবশ্য পাঠ্য। গ্রীক্ ভাষায় সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীবাবু এই পুস্তকখানি প্রকাশিত করিয়া বাঙ্গালা ভাষাকে অমূল্য রত্ন দান করিয়াছেন। তিনি শুধু সোক্রাটীসের জীবন-কথাই লেখেন নাই; সোক্রাটীসের জীবন-কথা ও তাঁহার উপদেশাবলী সম্যক্ বুঝিতে হইলে পূর্ব্বাচার্য্য ও তাঁহাদের শিষ্যগণের দর্শন বিষয়ে মতবাদের আলোচনা করিতে হয়; রজনীবাবু তাহাও করিয়াছেন। সুতরাং এই সুন্দর পুস্তকখানি, বলিতে গেলে, গ্রীক্ দর্শন শাস্ত্রের ইতিহাস। উপযুক্ত ব্যক্তি কার্য্যে হস্তার্পণ করিলে কাজটী যেমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, রজনী বাবুর এই বইখানি তাঁহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

রামপ্রসাদ।—শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ৫৲ টাকা। সুদীর্ঘকাল বিপুল পরিশ্রম ও অশ্রান্ত অধ্যবসায়ের ফলে সুধী গ্রন্থকার রামপ্রসাদের সম্পূর্ণ জীবন-কাহিনী ও তাঁহার পদাবলী প্রকাশ করিয়াছেন। পুস্তকখানি প্রণয়ন করিতে যে গ্রন্থকারকে কত আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে, তাহা এই বিপুল গ্রন্থের পত্রে পত্রে বিদ্যমান। মহাত্মাদিগের জীবন-কথা লিখিতে হইলে লেখকের হৃদয়ে যে অকৃত্রিম ভক্তি ও শ্রদ্ধা থাকা একান্ত প্রয়োজন, সুলেখক অতুল বাবুতে তাহা যথেষ্ট আছে; আছে বলিয়াই তিনি এই পবিত্র কার্য্যে অগ্রসর হইতে সাহসী হইয়াছিলেন। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি তাঁহার চেষ্টা, যত্ন, অধ্যবসায় ও বিপুল অর্থব্যয় সার্থক হইয়াছে। এই গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখিয়াছেন সাধকপ্রবর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়। এই ভূমিকাটী গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। অতুলবাবুর এই জীবনব্যাপী চেষ্টায় যতদূর হইতে পারে, তিনি তাহার কিছুমাত্র ত্রুটী এই গ্রন্থপ্রণয়নে করেন নাই। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার প্রার্থনা করি।

ফরাসী-উপকথা।—শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত, মূল্য পাঁচ সিকা। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবাবু ফরাসী ভাষায় সুপণ্ডিত। তিনি মূল ফরাসী ভাষা হইতে এই উপকথাগুলি বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি ফ্রান্সদেশে অবস্থানকালে একটী ফরাসী মহিলার অনুগ্রহে একখানি দুষ্প্রাপ্য ফরাসী পুঁথি সংগ্রহ করেন। তাহা হইতেই তিনি এই কয়েকটী উপকথা লিখিয়াছেন। লেখা অতি সুন্দর হইয়াছে; বালক বালিকা কেন, তাঁহাদের অভিভাবকগণও এই উপকথাগুলি উপভোগ করিতে পারিবেন।

বিচিত্রা

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

চঞ্চল হিয়া, বল বল প্রিয়া,
বল বল প্রিয়তমা,
মনো-মধুপের মোহন রূপের
সুধা-শতদল সমা !
কোন্ অলকার কামনা-দুয়ার খুলি'
মৃণাল-গরবী সলিল-শয়ন ভুলি'
ফুটিলে আমার বক্ষ-সরসে দুলি'
প্রেমারুণ অনুরাগে।
ওগো মনোরমা, উষা প্রিয়তমা
এত মোরে ভালো লাগে !
সেদিন গোধূলি, আঁখি-পাতা তুলি'
হাসিমুখে সুবিমলে,
চেয়েছিলে দুটি ডাগর নয়নে
মুগ্ধ-মরম-তলে।
যেদিন প্রথম-পরিচয়-ক্ষণে
সুধু পলকের মৃদু দরশনে
জীবনের রথ টানিলে চরণে
অলথ হৃদয়-হারে,
নিমেষে চমকি', সঁপিলাম, সখি,
নিঃশেষে আপনারে।
তোমার বুকের চীনাংশুকের
রজতাঞ্চল রুচি
কৌমুদী-ছলে নিল কি ধরার
সকল ম্লানিমা মুছি ?
দ্রাক্ষা-অধর চুমায় তোমার
বকুল-নালিকা বিভল হিয়ার
খুলিল কি ধীরে মৃদু দল তার
কিশোরী-বয়স লভি' ?—
তোমার বুকের আলিঙ্গনের
বহিয়া বিনোদ ছবি।
প্রেয়সীর বেশে, নিলে ভালোবেসে
মোরে যে বরণ করি' ;
নয়নের ডোরে বাঁধিলে যে মোরে
হে হৃদয়-ঈশ্বরী !
চরণ-সেবার নিয়েছি যে ভার,
জানি, নহি আমি যোগ্য তাহার ;
সোণা করি' দিলে মোর সংসার,
হে পরশমণি তুমি !
স্নেহের আমার গোমুখী-প্রপাত,
প্রেমের তীর্থভূমি !
কে তোমারে প্রিয়া, রাখিল সৃজিয়া
সোহাগে আমারি তরে !
কোন্ মায়ারথে আসিলে লক্ষ্মী
লক্ষ্মীছাড়ার ঘরে !
কোন্ সে অতীত পুণ্যের ফলে
রচিলে আলয় পরাণ-কমলে
তব উৎসব-দীপ আজি জ্বলে
আনন্দে দিবাযামী,
কোন্ শিব'জটা বহি, বল্লভী
মানসে আসিলে নামি।
দুলিয়া ফুলিয়া প্লাবন-জাগর
মিলন-সাগর, সখি,
লুটায়ে পড়িছে বক্ষ-বেলায়
তোমারি কিরণে, ওকি,
তোমারি পেলব-পীযূষ-তৃষায়
চিত্ত-চকোর ফিরে কি নিশায়
পরশ-রভসে হারায়ে দিশায়
অধর-কুমুদ জাগে ;
তোমারি জীবনে জীবন তাহার
দাবী তার সব আগে।
যাচিয়া চরণ, হৃদয়-আসন
পেতেছিনু তব প্রিয়া ;
ধন্য করিলে অঙ্ক তাহার
শ্রীপদ'-প্রসাদ দিয়া।
থাক' থাক' সেথা হইয়া অচল
নিখিল-নারীর হে রাকা অমল
তোমারি ধ্যানের মন্ত্রে কেবল
ফুটুক আমার বাণী ;
তুমি থাক মোর সকলের বাড়া,
তুমি থাক' মোর রাণী।

সাময়িকী

'ভারতবর্ষে'র প্রচ্ছদ-পটে এবার যাঁহার প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইল, তিনি স্বনামপ্রসিদ্ধ মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়। ১৮৬৭ অব্দে রমেশচন্দ্র, বিহারীলাল গুপ্ত ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এই তিনজন সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাতে যান। তিনজনই উত্তীর্ণ হন, রমেশচন্দ্র প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত হন। কিন্তু সরকারী কার্য্য তাঁহাকে একেবারে গ্রাস করিতে পারে নাই; অবসর-সময়ে তিনি ইতিহাস ও সাহিত্য-চর্চ্চা করিতেন। তাহারই ফলে আমরা পাইয়াছি ভারতবর্ষের ইতিহাস, ঋগ্বেদের অনুবাদ, জীবন-সন্ধ্যা, মাধবীকঙ্কন, বঙ্গবিজেতা, জীবন-প্রভাত, সংসার ও সমাজ। এতদ্ব্যতীত তিনি অনেক ইংরাজী গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন। সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের পর তিনি কিছুদিন বরোদা রাজ্যের মন্ত্রীত্ব করেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের তিনিই প্রথম সভাপতি। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য সাহিত্য-পরিষৎ ও অন্যান্য ভদ্রলোকের যত্ন ও চেষ্টায় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সংলগ্ন ভূমিতে 'রমেশ-ভবন' নির্ম্মিত হইয়াছে। আমরা আজ বঙ্গের এই সুসন্তান, সুধী সাহিত্যিকের স্মৃতি-পূজা করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

পরলোকগত সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মৃত্যুর চারি বৎসর পূর্ব্বে একখানি উইল করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই উইলে তিনি তাঁহার সম্পত্তির কি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা কেহই জানিতে পারে নাই। তাঁহার পরলোক-গমনের পর সেই উইলের মর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা অবগত হইলাম যে, পরলোকগত সুরেন্দ্রবাবু তাঁহার একমাত্র পুত্রের জন্য তাঁহার বারাকপুরের বাড়ী এবং নগদ এক লক্ষ টাকা মাত্র দিয়া গিয়াছেন; অবশিষ্ট সমস্ত সম্পত্তি বাঙ্গালা দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য দান করিয়া গিয়াছেন। এই সম্পত্তির মূল্য প্রায় পনর লক্ষ টাকা এবং ইহার বার্ষিক আয় প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা। এই সম্পত্তির যথাযথ ব্যবস্থার জন্য তাঁহার জামাতা ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, এটর্ণী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু ও তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত ভবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে ট্রষ্টী নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। বলিতে গেলে, সার সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনের সমস্ত উপার্জ্জনই বাঙ্গালা দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি-কল্পে দান করিয়া গিয়াছেন। এ সংবাদে দেশবাসী মাত্রেই আনন্দিত হইবেন এবং পরলোকগত মহাত্মার প্রতি শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবেন।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য সমিতির পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত এস, ওয়াজেদ আলি, কলিকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহা এতই সুন্দর হইয়াছিল যে আমরা নিম্নে তাঁহার সেই অভিভাষণের কয়েকটী কথা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। বাঙ্গালী মুসলমানগণের অবনতির কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া মনস্বী সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন—

"পৃথিবীর মুসলমানদের মধ্যে বাঙ্গালার মুসলমানদের অবস্থা আজ সব চেয়ে হীন। নানা লোক এর নানা কারণ নির্দ্দেশ করে থাকেন। আমার কিন্তু মনে হয়, আমাদের মাতৃ-ভাষার প্রতি অবজ্ঞাই এর একটী প্রধান কারণ। আর সেই অবজ্ঞা আমাদের মধ্যে যতদিন থাকবে, ততদিন আমাদের অবস্থার প্রকৃত পরিবর্ত্তন হবে না। ততদিন আমরা আমাদের মানসিক এবং নৈতিক Current-এর জন্য পরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবো, ততদিন আমাদের প্রতিবেশী হিন্দুরা এবং অন্যান্য দেশের মুসলমানেরা আমাদের কৃপার পাত্র বলেই মনে করবে। এই লজ্জাজনক সঙ্কট থেকে আমরা যত শীঘ্র নিজেদের মুক্ত করতে পারি ততই ভাল। এ বিষয়ে দ্বিধা করবার আর সময় নাই, কেবল কাজেরই সময় আছে।"

তাহার পর সাহিত্যের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন—

"আপনাদের মত বিজ্ঞ সুধী মণ্ডলীর সভায় সাহিত্যের আবশ্যকতা নিয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু তবুও এ বিষয়ে ছচার কথা না বলে থাকতে পারলুম না। আজ-কালকার কলেজ এবং স্কুলের মুসলমান ছাত্রদের দেখলে, সাহিত্যালোচনায় অবহেলা করে আমরা যে আমাদের জাতির এবং সমাজের কি ঘোর অনিষ্ট করেছি, সে কথা স্পষ্টই বুঝা যায়। এখনকার অধিকাংশ ছাত্রেরাই নিজে-দের মুসলমান বলে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করে। মুসলমানী পোষাক পরা এখন তাদের মধ্যে কুরুচির পরি-চায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। মোস্‌লেমের ইতিহাস, মোস্‌লেমের সাহিত্য, মোস্‌লেমের কীর্ত্তির বিষয় তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং উদাসীন। হিন্দু লেখকদের লেখা ইতিহাস, উপন্যাস প্রভৃতি পড়ে তাদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে যে তারা এদেশের নীচ জাতীয় হিন্দু হতে উৎপন্ন; আর এই কুসংস্কারের দরুণ তাদের মন আজ আত্ম-ঘৃণায় এবং আত্ম-তাচ্ছিল্যে পরিপূর্ণ। তাদের কুশিক্ষার ফলে তারা আজ মনুষ্যত্ব-বর্জ্জিত, আত্ম-সম্মানহীন এবং সর্ব্ব বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী। তাদের দ্বারা সমাজের কোন মঙ্গল হতে পারে না। এই ঘৃণিত ব্যাধি যদি আমাদের সমাজে আরও গভীর ভাবে ব্যপ্ত হয়ে পড়ে, তাহলে বঙ্গের মুসলমানকে চিরকাল পরের দাসানুদাস হয়েই জীবন কাটাতে হবে।"

বাঙ্গালা ভাষাই যে বঙ্গীয় মুসলমানগণের মাতৃভাষা, এ বিষয়ে সভাপতি মহাশয়ের মন্তব্য আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—

"বাঙ্গলা হচ্ছে আমাদের মাতৃভাষা। বাঙ্গালাতেই আমাদের জাতীয় সাহিত্যের সৃষ্টি করতে হবে। অন্য কোন ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করলে সে চেষ্টা নিশ্চয়ই বিফল হবে। তবে এ কথা ভুললেও চলবে না যে এখন পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষা এবং সাহিত্য হিন্দু সমাজের অঙ্কেই প্রতিপালিত হয়েছে, এবং হিন্দুধর্ম্মের মানসিক এবং নৈতিক অমৃতেই পরিপুষ্ট হয়েছে। আমাদের ধর্ম্মের এবং সমাজের উপযোগী করবার জন্য এ ভাষাকে আমাদের দর-কার মত অনেকটা গড়ে-পিটে নিতে হবে। এখন থেকে এ বিষয়ে Theorise করে কিন্তু বিশেষ কোন লাভ নাই। সাহিত্যিকের সাধনার উপরই নির্ভর করবে। আমি কেবল আপনাদের এই কথা বলতে চাই যে, ভাষাকে যে জাতীয় ছাঁচে ঢালবার দরকার আছে, সে কথা আপনারা ভুলবেন না। আর এই মূল কথাটী মনে রেখে যদি আপনারা আপ-নাদের সাহিত্যিক Instinctএর অনুসরণ করেন, তা হলেই যথেষ্ট হবে। আজকাল হিন্দু লেখকেরা সংস্কৃত-বহুল সমাসাদি-পূর্ণ পদের ব্যবহার ত্যাগ করে সোজাসুজি চলিত বাঙ্গালাতেই সাহিত্য-সৃষ্টির চেষ্টায় ব্যস্ত আছেন। আমাদের সাধারণ মুসলমান লেখকেরা কিন্তু ভাষাকে জটিল করে তোলাকে এই Democratic যুগে সাহিত্য-শিল্পের চূড়ান্ত নিদর্শন বলে মনে করেন। এই কুনীতির অনুসরণ করাতে তাঁদের অনেকের লেখার মধ্যে, একটা প্রাণহীন আড়ষ্টতা দেখতে পাওয়া যায়, যা সাহিত্যের পক্ষে প্রকৃতই মারা-ত্মক। আশা করি তাঁরা শরৎচন্দ্র প্রভৃতি লেখকদের অনুসরণ করে ভাষাকে যতদূর সম্ভব সরল এবং স্বচ্ছ করে তুলবার চেষ্টা করবেন। এতে তাঁদের ভাবের মধ্যে প্রাঞ্জ-লতা আসবে, আর তাঁদের ভাষায় স্বাভাবিকতার সৌন্দর্য্য ফুঠে উঠবে।"

তাহার পর বর্ত্তমান সময়ের মুসলমান সাহিত্যের আলোচনা উপলক্ষে সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন—

"সর্ব্বত্রই দেখা যায় দেশের রাজধানীই দেশের সাহিত্যের এবং অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার সমবায় অনুষ্ঠান এবং জীবনের কেন্দ্র। ইংরাজি culture এবং সাহিত্যের কেন্দ্র হচ্চে লণ্ডন; ফ্রেঞ্চ culture এবং সাহিত্যের কেন্দ্র হচ্চে প্যারিস; আমাদের দেশেও আমাদের ও হিন্দু প্রতি-বেশীদের বর্ত্তমান culture এবং সাহিত্যের কেন্দ্র হচ্চে কলিকাতা। গত এক শত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালী হিন্দু-দের মধ্যে যা কিছু আন্দোলন অনুষ্ঠান হয়েছে, তার পত্তন গড়া হয়েছে এই কলিকাতা সহরেই, মফঃস্বলে নয়। রাম-মোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি প্রভৃতি মনীষিগণ সমাজের জন্য যা কিছু করেছেন, তার আরম্ভ এই কলিকাতা থেকেই করেছেন। এই কলিকাতা সহরই হচ্চে বাঙ্গালা সাহিত্যের কেন্দ্রস্থান। এইখান থেকেই বাঙ্গালা সাহিত্য-গ্রন্থ সকল মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হচ্চে;

পৃথিবীর খবর নিয়ে এবং দেশের ভাল মন্দের কথা নিয়ে বাঙ্গলার মফঃস্বল-বাসীদের ঘরে ঘরে প্রবেশ করছে, আর তাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ আর সমাজাত্মবোধ জাগিয়ে তুলছে। আজ যা সহরের লোকে ভাবছে, কাল তা মফঃস্বলের লোকে ভাবছে; আজ সহরে যে অভাব অনুভূত হচ্চে, কাল মফঃস্বলে সেই অভাব অনুভূত হচ্চে; আর যে আন্দোলন আজ সহরে প্রতিষ্ঠিত হচ্চে, তার সাড়া কাল পল্লীতে পাওয়া যাচ্ছে। মস্তিষ্কের সঙ্গে শরীরের যে সম্বন্ধ, মফঃস্বলের সঙ্গে রাজধানীরও সেই সম্বন্ধ। মস্তিষ্ক ক্ষীণ হলে যেমন সমস্ত শরীর ক্ষীণ হয়, রাজধানীর জীবন ক্ষীণ হলেও সেইরূপ মফঃস্বলের জীবন ক্ষীণ হয়; আর মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলি সবল হলে যেমন সমস্ত শরীর বলশালী হয়, সেইরূপ রাজধানীর জীবন পরিপূর্ণ এবং সুস্থ হলে মফঃস্বলের জীবনও পূর্ণ এবং সুস্থ হয়। আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্য যে রাজধানীর সঙ্গে আমাদের মফঃস্বলের মিল নাই। রাজধানীর মুসলমান ভাঙ্গা উর্দ্দু বলেন, আর মফঃস্বলের মুসলমান বাঙ্গালা বলেন। রাজধানীর জীবন মফঃস্বল বুঝে না, আর মফঃস্বলের জীবন রাজধানীতে বুঝে না। রাজধানীর নেতারা মফঃস্বলের লোকেদের সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলতে পারেন না; আর মফঃস্বলের লোকেরা রাজধানীর নেতাদের তাদের মনের ভাব জানাতে পারে না। সহর এবং মফঃস্বলের যে ঘাত-প্রতিঘাতের উপর সব দেশের এবং সব সমাজের সর্ব্বপ্রকার জীবনেরই ভিত্তি, সেই ঘাত-প্রতিঘাতের প্রণালীগুলির মধ্যে এই ভাষার ব্যবধান এক দুর্ল্লঙ্ঘ্য বাঁধের মত দাঁড়িয়ে আমাদের উভয় তরফের জীবনকেই সামঞ্জস্যহীন এবং বিপদ-সঙ্কুল করে তুলেছে। আর সেই বাঁধ যতদিন আমরা না ভাঙ্গতে পারবো, ততদিন আমাদের দুর্ব্বলতা কোন মতেই ঘুচবে না; ততদিন আমরা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়েই থাকবো; আর ততদিন সামবায়িক শক্তিতে বলশালী হতে আমরা কোন মতেই পারবো না। এখন এই ব্যাধিকে কি করে সমাজ থেকে তাড়ান যেতে পারে, সেইটাই হচ্চে আমাদের একটি প্রধান সমস্যা। আমাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গল এই সমস্যার উচিত সমাধানের উপর সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করছে। আনুসঙ্গিক খুঁটিনাটি কথা বাদ দিলে সমস্যা এই দাঁড়ায়,—কলিকাতাবাসীরা উর্দ্দু ছাড়বে, না মফঃ-বাঙ্গলার মুসলমানের ভাল চান, তাঁরা এই প্রশ্নের একটী মাত্র উত্তর দিতে পারেন; আর সেই উত্তর হচ্চে কলিকাতা-বাসী মুসলমানদের উর্দ্দু ছাড়তে হবে। কি করে এই কাম্য ফল লাভ করা যেতে পারে, সে বিষয় নিয়ে এখানে তর্ক তুলবো না। আপাততঃ এই বল্লেই যথেষ্ট হবে যে যদি আপনারা Calcutta Corporationকে বাঙ্গলা মকতব প্রভৃতির প্রচলনে সাহায্য করেন এবং অন্যান্য উপায়ে বাঙ্গলা দেশে, বিশেষতঃ কলিকাতা সহরে বাঙ্গলা ভাষার প্রচলনে সাহায্য করেন, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের মনস্কাম পূর্ণ হবে। আর তাতে যে বাঙ্গলার মুসলমানের অশেষ উপকার হবে, সে বিষয়ে আমার তিল-মাত্র সন্দেহ নাই।"

অবশেষে সভাপতি মহাশয় হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা বলিয়াছেন। সাহিত্য-সমিতিতে এ প্রশ্ন লইয়া বিশেষভাবে আলোচনা করা সম্ভব ও শোভন হইবে না, মনে করিয়াই তিনি সামান্য মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"বাঙ্গালা ভাষা এবং সাহিত্যের আলোচনায় হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে দু-এক কথা না বল্‌লে বক্তৃতা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বঙ্কিমের যুগের হিন্দু লেখকেরা মুসলমানদের অযথা ভাবে অকথ্য ভাষায় অনেক গালাগালি করেছেন। তাঁদের দ্বারায় সাহিত্যের এই অসংযত অপব্যবহার আজিকার হিন্দু-মুসলমান বিরোধের জন্য বিশেষ ভাবে দায়ী। তাঁদের অনুসরণ করে এখনকার একদল মুসলমান লেখক ঠিক তাঁদের উল্টা পালা গাইতে আরম্ভ করেছেন। মনের সাধে হিন্দুদের গালি দিয়ে তাঁরা মুসলমান-নিন্দার প্রতিশোধ নিচ্ছেন। এটা বড়ই পরিতাপের বিষয়। গালি দিয়ে কেউ কখন প্রকৃত সাহিত্য গড়তে পারেনি এবং পারবেও না। এই খিস্তাখিস্তির লজ্জাজনক দৃশ্যটার উপর ভদ্রতার যবনিকা যত শীঘ্র পড়ে ততই ভাল।"

সভাপতি মহাশয়ের সাগ্রহ আবেদন নিষ্ফল হয় নাই। আমাদের মুসলমান সাহিত্যিক বন্ধুগণ যে নিবেদন-পত্র

দিলাম। তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া আমরাও এই প্রচেষ্টার সফলতা সাধন সাহিত্যিক হিসাবে অতীব মহৎ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। নিবেদনে লিখিত হইয়াছে—

"বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের ভবিষ্যৎ তাহাদের জাতীয় সাহিত্যের উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর করিতেছে। সেই জাতীয় সাহিত্যেই তাহাদের গৌরব-কাহিনী কীর্ত্তিত হইবে, তাহাদের জাতীয় আদর্শ প্রস্ফুটিত হইবে, তাহাদের প্রাণের আশা এবং অনুভূতি ধ্বনিত হইবে। এই মহান আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিতে হইলে বঙ্গের মুসলমান সাহিত্যিক-দিগের বিক্ষিপ্ত ব্যক্তিগত প্রয়াসকে কেন্দ্রীভূত এবং সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইবে; আর সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য একটী জাতীয় সাহিত্য-সঙ্ঘের প্রয়োজন অত্যধিক। সমাজের এই অভাব দূরীকরণের জন্যই বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। সমিতির পরিচালকেরা আমাদের সমাজের সাহিত্য-সেবীদিগকে তাঁহাদের নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের এবং বিশেষত্বের উপর কোনরূপে হস্তক্ষেপ না করিয়া, সমাজের মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিবেন এবং তাঁহাদের সমক্ষে আমাদের জাতীয় সভ্যতার উজ্জ্বল স্বরূপ সংস্থাপনের জন্য মনোযোগী হইবেন। আমরা অতীব আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, বঙ্গের অধিকাংশ প্রতিভাশালী মুসলমান-সাহিত্যিক ও সাহিত্যামোদী ব্যক্তিই আমাদের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। সাহিত্যিক প্রতিভার এই একত্র সমাবেশ যে জাতির পক্ষে বিশেষ কল্যাণপ্রদ হইবে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। সমিতির স্বচ্ছলতার জন্য, সমিতি-সংশ্লিষ্ট পাঠাগারের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য এবং সমিতি-কর্ত্তৃক একটী উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা পরিচালনের জন্য অর্থের প্রয়োজন। আমরা বিশেষ চিন্তা করিয়া স্থির করিয়াছি, যদি সমাজ এককালীন ১০,০০০ দশ হাজার টাকা সমিতিকে দান করেন, তাহা হইলে এই সমিতিটী সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত হইয়া বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্যে নূতন প্রাণের সঞ্চার করিতে সক্ষম হইবে। আমরা তাই আজ উদার বঙ্গ সমাজের নিকট আর্থিক সাহায্যের জন্য সানুনয়ে আমাদের ঐকান্তিক নিবেদন জ্ঞাপন করিতেছি। আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস সমাজ-হিতৈষী মহাত্মাগণ আমাদের প্রয়াসের সামাজিক মূল্য অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন এবং তাঁহাদের আন্তরিক সহানুভূতি এবং আর্থিক সাহায্যে আমাদের এই উদ্যম সফল করিতে অগ্রসর হইবেন।"

কলিকাতার গৃহ-সমস্যা

শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় বি-ই

গত ভাদ্র মাসের 'ভারতবর্ষে' যে বাড়ীর নক্সা দিয়াছিলাম, সেরূপ বাড়ী বালিগঞ্জে তৈয়ারী হইতেছে। এবার আমি কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে একটী বাঙ্গালো বাড়ীর নক্সা নিম্নে দিলাম।

এই বাড়ীতে দুইটী পরিবার থাকিতে পারে। ইহাতে মোট ১ কাঠা ১৪ ছটাক জমী আবশ্যক। প্রত্যেক অংশে ৩ খানি করিয়া ঘর, স্নানের ঘর ও পায়খানা আছে। এ বাড়ী তৈয়ারী করিতে মোট ৮৪৫০৲ টাকা খরচ হইবে। নিম্নে হিসাব দেওয়া গেল—

১।	বুনিয়াদের মাটী কাটাই	২৫১৬ ফুট	১০৲ হাজার	২৫৲
২।	মেজে প্লিন্থ ভরাট	৪৩৩০ "	১০৲ হাজার	৪৩৲
৩।	বুনিয়াদের কংক্রিট	৪১৯ "	৪০৲ শত	১৬৮৲
৪।	বুনিয়াদ গাঁথুনি	২৫৮০ "	৪৫৲	১২৬১৲
৫।	ড্যাম্প প্রুফ	২১৫ "	১০৲ শত	২২৲
৬।	একতালার গাঁথুনি	১৮১০ "	৫০৲ শত	৯০৫৲
৭।	একতালার মেজে	১৪৪০ "	২৫৲ শত	৩৬০৲
[illegible]	[illegible]	১ সেট		২৫৲

প্রস্তাবিত বাঙ্গালোর নক্‌সা

১০।	চুণের কাজ ৩ কোট	২৯৯৮	৷৹	৭২৲
১১।	কলার ওয়াস্ অন্তর ও বাহির ৩ কোট	৩২৭৮	৶৹	২৪৲
১২।	চৌকাটের কাঠের কাজ	৯৬ ফুট	৬৲	৩১৪৲
১৩।	১½″ সেগুন কাঠের খড়খড়ি ও দরজা ও জানালা	৪৯৮ ফুট	১৶৹ হিঃ	৮৭১৲
১৪।	সেগুন কাঠের দরজা ও জানালা	৪০৮ „	১।৹	৬১২৲
১৫।	১½″ সেগুন কাঠের প্যানেল দরজা	২৪৫ „	১৷৹	৩৬৭৲
১৬।	রাণীগঞ্জ টাইলের ছাদ কাঠের ফ্রেম সহিত	১৫৭২ ফুট	৶১ হিঃ	১১৭৯৲
১৭।	৯″ ভেন্টিলেটার	৩০ নম্বর	৶৹ হিঃ	২২৲
১৮।	ঘরের ভিতরের কার্ণিশ	৩০০ রাণিং ফুট	।৹ হিঃ	৭৫৲
১৯।	দরজা ও জানালার উপরের মোলডিং	২৫০ রাণিং ফুট	।৹ হিঃ	৬২৲
২০।	কাঠের ছাদ সিলিং	১৫৭২ রাণিং ফুট	।৹ হিঃ	৩৯৪৲
২১।	পায়খানা ও স্নানের ঘর	১ দফা		৪০০৲
২২।	জলের নালী	১৫০ রাণিং ফুট	।৹ হিঃ	৩৮৲
২৩।	লোহার ফ্রেম	৩২ হন্দর	১২৲ হিং	৩৮৪৲
২৪।	১″ ইঞ্চি পেটেণ্ট ষ্টোন	১৪৪০ ফুট	২০৲ শত	২৮৮৲
২৫।	১″ সিমেণ্ট পলস্তারী	৪৫০ ফুট	১০৲ শত	৪৫৲
২৬।	দরজা জানালা ও লোহার কাজে রংকরা	৫২১০ ফুট	৫ হিঃ	২৬০৲

শোক-সংবাদ

৺সারদারঞ্জন রায়

কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজের প্রিন্সিপাল সারদারঞ্জন রায় মহাশয় বিগত ১লা নবেম্বর রবিবার মধ্যাহ্নে দেওঘরে পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যু সময়ে তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর হইয়াছিল। সারদারঞ্জন বাবু গণিত শাস্ত্রে এম-এ পাশ করিয়া ঢাকায় কিছুদিন অধ্যাপনা করেন; তাহার পর আলিগড় কলেজে চলিয়া যান। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে সেখান হইতে মেট্রোপলিটান কলেজের সহকারী প্রিন্সিপালের পদে নিযুক্ত করিয়া এখানে লইয়া আসেন এবং পরে প্রিন্সিপাল নগেন্দ্রনাথ ঘোষের মৃত্যুর পর তিনি প্রিন্সিপাল হইয়া এতদিন কার্য্য করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি গণিত-শাস্ত্রে এম-এ পাশ করিয়াছিলেন বটে এবং গণিতে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতাও ছিল; কিন্তু তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনের জ্ঞান তাঁহার গণিতবিদ্যাকেও ছাপাইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার চেষ্টায় সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্য আমাদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পক্ষে সুগম হইয়াছিল। এ সকল ত সারদারঞ্জন বাবুর লেখাপড়ার কৃতিত্বের কথা। তিনি কিন্তু দেশবিখ্যাত হইয়াছিলেন ক্রিকেট-বীর বলিয়া। বলিতে গেলে আমাদের দেশে ক্রিকেট খেলার তিনিই অগ্রণী ছিলেন। সেইজন্য দেশবিদেশ তাঁহাকে এদেশের ক্রিকেট খেলার জন্মদাতা বলিয়া সম্মানিত করিয়াছিল। এই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্তও তাঁহার ক্রিকেট খেলায় উৎসাহের বিরাম ছিল না এবং তাঁহার শিষ্য-সংখ্যাও কম ছিল না। এতকাল তাঁহার ব্যায়ামপুষ্ট শরীরও সুস্থ ছিল। অল্প দিন হইল তাঁহার শরীর কিঞ্চিৎ অসুস্থ হওয়ায় তিনি বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য দেওঘরে গমন করেন এবং সেখানেই

৺সারদারঞ্জন রায়

তাঁহার দেহাবসান হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশের একজন গণনীয় ও স্মরণীয় ব্যক্তির পরলোকগমনে সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিবেন। আমরা তাঁহার বিয়োগ-সন্তপ্ত আত্মীয়গণের গভীর শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

৺গোকুলচন্দ্র নাগ

গোকুলচন্দ্র নাগ

'কল্লোলে'র সম্পাদক গোকুলচন্দ্রের অকালে পরলোক-গমনে আমরা গভীর মর্ম্মবেদনা পাইয়াছি। গোকুলচন্দ্র সুলেখক ছিলেন। তাঁহার অনেক গল্প 'ভারতবর্ষ' ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি 'পথিক' নামে একখানি অতি সুন্দর উপন্যাস প্রকাশ করিয়াছিলেন। গোকুলচন্দ্র শুধু সুলেখক ছিলেন না, একজন প্রতিভাবান চিত্র-শিল্পীও ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সরলপ্রকৃতি, মিষ্টভাষী, পরদুঃখকাতর সোদরোপম বন্ধুকে হারাইয়া আমরা হৃদয়ে বড়ই ব্যথা পাইয়াছি। কাল থাইসিস রোগ এই নবীন যুবককে আক্রমণ করিয়াছিল; তিনি বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য দারজিলিং গমন করিয়াছিলেন; সেইখানেই নবীন বয়সে, কত সাধ হৃদয়ে লইয়া গোকুলচন্দ্র অকালে চলিয়া গেলেন। ভগবানের এ যে কি বিধান, আমরা তাহার কি বুঝিব!

সেকালের তীর্থযাত্রী

শ্রীকামিনী রায় বি-এ

(শ্রীক্ষেত্রের পথে)

জাগিস্ যদি রাত থাকতেই আমায় জাগাস্ ডেকে,
যাত্রা যদি করিস্ ভোরে যাস্‌নে আমায় ফেলে,
জানিস্ তো, ভাই, আমার দেরী উঠ্‌তে ঘুম থেকে,
টেনে তুলিস, তুলতে যদি নাই পারিস্ ঠেলে;
তবু যাস্‌নে ফেলে, ভাইরা, যাস্‌নে একা ফেলে।
চলবে না পা, মরব পথেই সবাই চলে গেলে।

অনেক রাস্তা পেরিয়ে এনু ভাইরা তোদের সাথে,
পায়ের ব্যাথা ভুলিয়ে দিনু গেয়ে হাসির গান,
হাতে হাত বেঁধে রইনু কত আঁধার রাতে,
দস্যুর হাঁকে, পশুর ডাকে ভয়ে কম্পমান্;
অসাড় দেহে, ঘুমঘুম চোখে ভোরের আলো পেয়ে
সবার আগে নৃত্য করে' উঠেছি গান গেয়ে।

তখন তোরা ভুলে গিয়ে রাতের ভাবনা ভয়
দাঁড়িয়ে উঠে আলার সাথে মিলিয়ে দিয়ে সুর
গাইতিস্ জোরে "জয় জগন্নাথ, জগন্নাথের জয়!"
বয়ে যেত আকাশ বাতাস করে ভরপুর
আলোর জোয়ার—বুকে বুকে আনন্দের কি ঢেউ!
পড়ব পথে, মরব পথে ভাবিনি তো কেউ!

অনেক পথ তো চলা হল, আর তো বেশী নাই,
ঘর ছেড়েছি মাসেক কাল, গোটা সাতেক দিন
সাম্‌নে আছে, গেলেই মোরা পুরুষোত্তম পাই;
তারপর এ প্রাণটা প্রভু রাখুন—কিম্বা নিন,
রোগ বাড়ান, তোদের ছাড়ান, যা তাঁর খুসী তাই
হোক্ না কেন, দর্শন পেলে আর কিছু না চাই।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীযুক্ত মাণিক ভট্টাচার্য্য প্রণীত নূতন উপন্যাস "অশ্রুনির্ঝর"—২৲
শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত "মথুরা"—১৲
শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "ক্ষত্রিয় গৌরব'—১৷৹
শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ শিকদার প্রণীত "মিলন মঞ্চ"—১৲
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "বাঙ্গলার সিংহাসন"—১৲
শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস ঘোষ প্রণীত "ব্রহ্মবোধিকা"—৷৹
শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "তানমালা"—৩৲
নজরুল ইসলাম প্রণীত "ছায়ানট"—১।
শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত "৺কাশীধামে স্বামীবিবেকানন্দ
মূল্য—৸৹

Publisher—**Sudhanshusekhar Chatterjea.**
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA

Printer—**Narendranath Kunar,**
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street, CALCUTTA.